

CUK-H.4855-33-P30101

প্রবাসী ১৩২৪ বৈশাখ—আশ্বিন

২২নং ভাগ প্রথম খণ্ড

विद्युत-सूत्र

33

আবদুল গান (কবিতা)—সুনির্মল বসু	১১৬
আসাম-বাঙালার মাঝখানে (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৪৫
আড়াই স্কট কা সাহায্যের সর্ভ	২১১
ইউরোপ-আমেরিকায় নানা দেশের নারী ছাত্রী (সচিত্র)	২৬৭
ইজিপ্টের নারী—হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, বি-এ	২৫৫
ইলেক্ট্রিক ট্রেন (সচিত্র)	৬৭
উচ্চে উড্ডয়ন—নগেন্দ্র গুপ্ত ও হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়	৪৪১
উচ্চে উড্ডয়ন	৮৫৩
উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন সংগ্রহণক সমিতি	১৫৩
উপনিষদ শিক্ষা-প্রণালী ও ব্রহ্মবিদ্যায় ব্রাহ্মণের প্রভাব—ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম-এ, বি-এল, পি-এসসি-এস, পি-এইচ-ডি	৪২৫, ৬৪৬
উপসংহার (কথিত) (কষ্টি)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৯০
উমরাগী (গল্প)—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ	৫১৪
এক অপরিজ্ঞাত বৈষ্ণব কবি—কালী প্রসন্ন বিদ্যাবূষণ	১৭৯
একচাকার আগামগাড়ী (সচিত্র)	১০০
এবং জন জাপানীর আত্মবলিহান	৪৬৯
একটি বাঙালী ভাস্কর (সচিত্র)—প্রমোদকর আত্মধী	৫০০
একবৎসর ছুপ টাটকা রং—নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী	৫৮
এক মাইল লম্বা দরখাস্ত—নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী	২৪৮
ওষধি-পর্ধ্যায়ে তাল জাতীয় একশ্রেণীর গাছ (সচিত্র)—পিয়েরমডি	৭২৪
কক্স বাজারের বিপন্ন লোকদের সাহায্য	৪৫২
কখনো পুরুষ কখনো স্ত্রী—নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী	৫৮
কচুরী পানা (সচিত্র)—জগদ্বানন্দ রায়	৮২০
কচুরী পানা কমিটি	৭৮১
কদলী ও তাহার ব্যবহার (কষ্টি)	১০৮
কবিবন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ (কবিতা)—বতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী, বি-এ	৫২৮
কবি সত্যেন্দ্রনাথ—কুসুমদত্ত মল্লিক, বি-এ	৫৭৮
কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (সচিত্র)	৬২৬
কমলা মিঠে নীল—মহিউদ্দীন আহমদ চৌধুরী	৪২৬
কন্যা পাশার জয়	৮১৫
কবিশ-পদপ্রার্থী রজক	৮২৭
কয়েকজন নেতার কারামোচন	৭৬৪
কয়েকটি রাজনৈতিক প্রশ্ন	৭৬১
কর্ণহানের কর্ণ (সচিত্র)	২৪৫
কলার কথা (কষ্টি)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী	৮৬১

কলিকাতা বিদ্যাপীঠ	৪৭২	খন্দর পরিধান ও সংকর্শনীতা	...
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন	৯০৭	“খন্দর পরিধান ও সংকর্শনীতা”	..
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ	৯১৩	খন্দরের গান (কবিতা)—হেমেন্দ্রকুমার রায়	..
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি কনিটির রিপোর্ট	৭৭৮	খন্দরের প্রচলন	...
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সংস্থাপিত	৬২৫	খাইবার গিরিসঙ্কট রেলওয়ে	...
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন	৯০৬	খন্দর প্রচলনের চেষ্টা ও বিদেশী সূতা ও কাপড়ে	...
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দান বিভাগ	৬১৭	আম্মানি	...
কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান	৪৭২	খাদ্য-কথা—অমৃতলাল দীল, এম-এ	..
কলিকাতার গান-তত্ত্বাসী	৬৩২	খাদ্য-কথার সমালোচনার মূদ্রণ অশুদ্ধি	...
কলিকাতার কথা (কষ্টি)—প্রমথনাথ মল্লিক	১০৯, ৩৫০	খাদ্য-কথা (সমালোচনা)—রায় বাহাদুর বোগেশচন্দ্র	...
কলের কবিতা (সচিত্র)	২৪৫	রায়, এম-এ, বিদ্যানিধি, বিজ্ঞানভূষণ	...
কষ্টিপাথর	১০৩, ২৮৯, ৩৪৫, ৫৯৯, ৬৬৯	জৈর-গাছের উঠা নামা	..
কম্ববীর্ষাঙ্গী গান্ধীর অভিভাবণ	৪৫৯	“খোকা-হোকা” পাখী (গল্প)—জগদীশনাথ মজুমদার	...
কংগ্রেসের অনুমোদিত কাক্সের সংবাদ	৪৬০	গর্গমেটের ধ্বংস করিবার ক্ষমতা	...
কংগ্রেসের কণী কনিটির দুইটি নিবন্ধ	৩০৭	গাছ-কাটা বল (সচিত্র)	...
কংগ্রেসের সভাপতিত্ব	৪৬৮	গান (কষ্টি)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১১৬, ৩৪৫, ৬৬৯, ৬৭০, ৬৭১
কাকাতৃণ-পাখী সাত রাজপুত্র (গল্প)—কার্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত বি-এ	৪১৮	গান্ধীর প্রভাবের কারণ	...
কাগজের ছোদ (সচিত্র)	৬৭৭	গিডিডি বালিকা বিদ্যালয়—দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...
কাজের গান (কবিতা)—নরসিং	৮৬৯	গিডিডি বালিকা বিদ্যালয়	...
কাঠের মডি (সচিত্র)	৬৮০	গৃহশিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক	..
কাঠের ভৈরবী তবু মাছ-মুষ্টি (সচিত্র)	৫৭	গোপনবাসী (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...
কাঠের বই (সচিত্র)	২৭২	গোপনীয় কাগজ প্রকাশ	...
কান্তকবি রজনীকান্ত (সমালোচনা—সচিত্র)—অনন্যো-পাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ, সি-আই-ই	৭৩৫	গোপনীয় বর্গ (সচিত্র)—ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...
কাপড়ে তনয়ের তায় পাকা রং করিবার উপায়—নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী	৩৯৫	গ্যাস গিল্ড	...
কালোমেঘ (কবিতা)—রাধাচরণ চক্রবর্তী	৭৩৮	গ্রামবাসী ও ডাকাইতদের লড়াই	..
কাশীচন্দ্র ঘোষাল	৪৭৩	গ্রামের পথ (কবিতা)—প্যারীমোহন দেন্ডু	..
কাঁছনে পুতুল (সচিত্র)	৪১৮	গ্রীষ্ম মেঘের প্রাচীন কীর্তি আবিষ্কার (সচিত্র)	...
কুকুর-চালিত গাড়ী (সচিত্র)	৫৫৬	গাঁটো তেওয়ারী (গল্প)—সুনীল বসু	...
কুড়ানো গান (কষ্টি)—মহেন্দ্র ফ্যাণা	৩৫৮	বামের ফোটা (কবিতা)—রাধাচরণ চক্রবর্তী	..
কুমারী মণালিনী চট্টোপাধ্যায়—জ্যোতির্ময়ী গঙ্গো-পাধ্যায়, এম-এ	৮৪৬	বাস (গান)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...
কুমারী লেনা—অনন্তকুমার সাত্তাল	৮৪৫	ঘূর্ণী	..
কুপনের শাস্তি (গল্প)—প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত	৬৫১	বোড়-দোড় জুয়াখেলা	...
কুম্ভাবিনী-স্বভিসভায়—কেন্দ্রবীর দেবী	২৬৭	চক্ষু—নতুন ও পুরাতন—ললিতকুমার মিত্র	...
কেন্দ্রবীর ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়	৪৭১	চক্ষু ও খন্দর—রায় বাহাদুর বোগেশচন্দ্র রায় এম-এ	...
কুস্তুর খেলা—বিধুপেশ্বর ভট্টাচার্য শাস্ত্রী	১৬৬	বিদ্যানিধি, বিজ্ঞানভূষণ	...
খন্দর (আলোচনা)	৮৭৩	চক্ষু ও বঙ্গ সমগ্র বঙ্গমহিলার কর্তব্য—সার	...
খন্দর—গাতি—হুজ—ব্রিজিমা বেগম	৫৬৩	প্রফুল্লচন্দ্র রায়	...
খন্দর চাই কেন ?—রায় বাহাদুর বোগেশচন্দ্র রায়, এম-এ, বিদ্যানিধি	৭৮২	চক্ষুর সূতা—রায় বাহাদুর বোগেশচন্দ্র রায়, এম-এ	...
		বিদ্যানিধি বিজ্ঞানভূষণ	...
		চক্ষু ও খন্দর	...

বিষয় সূচী

কলিকাতা বিদ্যাপীঠ	৪৭২	খন্দর পরিধান ও সংকল্পশীলতা	...
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আম্রব্যাস	৯০৭	"খন্দর পরিধান ও সংকল্পশীলতা"	...
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ	৯১৩	খন্দরের গান (কবিতা)—হেমেন্দ্রকুমার রায়	...
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি কনিটির রিপোর্ট	৭৭৮	খন্দরের প্রচলন	...
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন সংস্থিতি	৬২৫	খাইবার গিরিসঙ্কট রেলওয়ে	...
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন	৯০৬	খন্দর প্রচলনের চেষ্টা ও বিদেশী হুতা ও কাপড়ে	...
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দান বিভাগ	৬১৭	আম্রদান	...
কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান	৪৭২	খান্দ্য-কথা —অমৃতলাল শীল, এম-এ	...
কলিকাতায় খানাতল্লাসী	৬৩২	খান্দ্য-কথার সমালোচনার মুদ্রণ অশুদ্ধি	...
কলিকাতায় কথা (কষ্টি)—প্রমথনাথ মল্লিক	১০৯, ৩৫০	খান্দ্য-কথা (সমালোচনা)—রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র	...
কলের করাত (সচিত্র)	২৪৫	রায়, এম-এ, বিদ্যানিধি, বিজ্ঞানভূষণ	...
কষ্টিপাথর ১০৩, ২৮৯, ৩৪৫, ৪৯৯, ৬৬৯	৬৬৯	খোজুর-গাছের উঠা নামা	...
কস্তুরীবাঈ গান্ধীর অভিভাবণ	৪৫৯	"খোকা-খোক" পাখী (গল্প)—দুর্গাপ্রসাদ মজুমদার	...
কংগ্রেসের অন্তিমোদিত কাজের সংবাদ	৪৬০	গণপরিষদের গণ করিবার ক্ষমতা	...
কংগ্রেসের কর্মী কমিটির হুইট নির্ধারণ	৫০৭	গাছ-কাটা বল (সচিত্র)	...
কংগ্রেসের সভাপতিত্ব	৪৬৮	গান (কষ্টি)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১১৬, ৩৪৫
কাকাতুরা-পাখী সাত রাজপুত্র (গল্প)—কার্তিকচন্দ্র	৬৬৯, ৬৭০, ৬৭		
দাশগুপ্ত বি-এ	৪১৮	গান্ধীর প্রভাবের কারণ	...
কাগজের জোয় (সচিত্র)	৬৭৭	গিরিডি বালিকা বিদ্যালয়—দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...
কাজরী গান (কবিতা)—দরবেশ	৮৬৯		
কাঠের বাড়ি (সচিত্র)	৬৮০	গিরিডি বালিকা বিদ্যালয়	...
কাঠের তৈরী জবজ্ব মাল্লখ-মুর্তি (সচিত্র)	৫৭	গৃহশিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক	...
কাঠের বই (সচিত্র)	২৭২	গোপন্যবাসী (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...
কান্তকবি রজনীকান্ত (সমালোচনা—সচিত্র)—মহামহো-		গোপনীয় কাগজ প্রকাশ	...
পাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ, সি-আই-ই	৭৩৫	গোয়ালপুর দুর্গ (সচিত্র)—ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...
কাপড়ে ভস্মের ছায় পাকা রং করিবার উপায়—			
নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী	৩৯৫	গ্যাস পিস্তল	...
কালোমেঘ (কবিতা)—রাধাচরণ চক্রবর্তী	৭৩৮	গ্রামবানী ও ডাকাইতদের লড়াই	...
কাশীচন্দ্র বোষাল	৪৭৩	গ্রামের গৃহ (কবিতা)—প্যারামোহন সেনগুপ্ত	...
কাঁড়নে পুতুল (সচিত্র)	৪১৮	গ্রীস দেশের প্রাচীন কীর্তি আবিষ্কার (সচিত্র)	...
কুকুর-চালিত গাড়ী (সচিত্র)	৫৫৬	গাঁটা তেওয়ারী (গল্প)—অনুশীল বসু	...
কুড়ানো গান (কষ্টি)—মহেন্দ্র ফাপা	৩৫৮	ঘামের ফোটা (কবিতা)—রাধাচরণ চক্রবর্তী	...
কুমারী মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায়—জ্যোতির্ষ্ময়ী গল্পো-		ঘাস (গান)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...
পাধ্যায়, এম-এ	৮৪৬	ঘণী	...
কুমারী লেনা—অনন্তকুমার সাহা	৮৪৫	ঘোড়-দৌড়ে জুমাখেলা	...
কৃপণের শাস্তি (গল্প)—প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত	৬৫০	চরকা—নূতন ও পুরাতন—ললিতকুমার মিত্র	...
কৃষ্ণভাবিনী-স্বস্তিসভায়—কেমলকরী দেবী	২৬৪	চরকা ও খন্দর—রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় এম এ	...
কেন্দ্রিজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়	৪৭১	বিজ্ঞানিধি, বিজ্ঞানভূষণ	...
কুন্দের খেলা—বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী	১৬৬	চরকা ও বস্ত্র সমস্তায় বঙ্গমহিলার কর্তব্য—সার	...
খন্দর (আলোচনা)	৮৭৩	প্রফুল্লচন্দ্র রায়	...
খন্দর—খাদি—কুন্ড—রিজিয়া বেগম	৫৬৩	চরকার হুতা—রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায়, এম-এ	...
খন্দর চাই কেন?—রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রা-		বিজ্ঞানিধি বিজ্ঞানভূষণ	...
এম-এ, বিদ্যানিধি	৭৮২	চরকা ও অরাজ	...

কৌশল (সচিত্র)	২৪৬
কষ্টি)—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৬০১
কবিতা)—চণ্ডীচরণ মিত্র	২৭৬
ষ্ট্রেট এবং নিউপায়েনার নারী (সচিত্র)—	
হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় বি-এ	৭২৪
ভাকাত ও গুণ্ডার অভ্যাস	৭৭০
ভাণ্ডিটে কাণ্ড (সচিত্র)	২৪৫
তরুণী (কবিতা)—নীহারিকা দেবী	৬৮৭
তলোয়ারের ফলার উপরে নাচ (সচিত্র)	৫৬০
তারহীন টেলিগ্রাফ (সচিত্র)	৪১৭
তিনহাজার টাকা দামের ফুলগাছ (সচিত্র)	৪১৪
তিমিতুণ পক্ষী (সচিত্র)—সত্যচরণ লাহা এম-এ,	
বি-এল,	৫৬১
তৃতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ী	৩১৩
তেলে জলে (আলোচনা)—প্রভাতমলিনী	
বন্দোপাধ্যায়	৮৭৫
দমন ও নিগ্রহ-নীতি	৩১৪
দমন-নীতি	৬২৮
দাফিন্ড মোমাহির চাপ (সচিত্র)	৪১১
দাশ-বিজয়ের প্রাচীন দলিল (সচিত্র)—মণীন্দ্র	
মোহন বহু, এম-এ	৩৮৭
করের প্রাচীন দলিল" প্রবন্ধ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত—	
আনন্দনাথ রায় ও কুমুদলাল শীল এম-এ	৫০৩
ব্যবসায় (কষ্টি)—চাক্রাক রায়	১০৪
দায়িত্ব কথা (কষ্টি)—বলেন্দ্রচন্দ্র রায়	৬৬৯
দুবের কলশ (সচিত্র)	৫৫৮
দূরদর্শন (সচিত্র)	৪১৩
দৃষ্টি ও কৃষ্টি (কষ্টি)—ভাষ্কর অবনীন্দ্রনাথ	
ইকুর	৩৫৩
দেবত্ব (কষ্টি)—বহাদুরচাঁপাধ্যায় প্রমথনাথ	
জর্জবন্দ	১০৭
দেবী কুমারাবতী দাস—বলেন্দ্রচন্দ্র রায় সর্বাধিকারী	৪৪১
দেহাঙ্গনে গঙ্গালী (সচিত্র)—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	৩৩১
দেশবিদেশের কথা (সচিত্র)	
২১৮, ২৭৭, ৪৪৩, ৬০৫, ৭৩৯, ৮৭৯	
দেশালাইয়ের কাঠির বেহালা (সচিত্র)	৬৭৯
ধর্মপূজা—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	১৫৮, ৩২১, ৬৫৫
ধাতু-নির্মিত গোলাপ-গাছ	৫৫
ধ্বনি-সন্দন	৪১৩
ধর্মসাবিশিষ্ট ইউরোপ—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	
বি-এল	১২৫, ২২৩, ৪৭৫
নদীর উপর পাহাড় (সচিত্র)	৮৫৪
নাগার্জুন পুস্তক	১৪৯

নারী (কবিতা)—স্বয়ীকেশ চৌধুরী	
নারী-কাণ্ডের সখা হ্রাস	
নারী-প্রগতি	
নারী শব্দ-সমিতির কার্যক্ষেত্র বিস্তার	
নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা	৪৭
নারীর শিক্ষা সমিতি	৪৫৭
নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় (কষ্টি)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬-৩
নিউজল্যান্ডের নারী (সচিত্র)—হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়,	
বি-এ	৩৭৬
নিউজিল্যান্ড (গনি) (কষ্টি)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২২৭
নিরবঙ্গের মঠ (সচিত্র)—নলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম-এ	৭৩
নিরঞ্জনর সেবা (কষ্টি)—পুরুষচন্দ্র নাথজী	৩৪৮
নিকুপার (কবিতা)—হরীন্দ্রনাথ চৌধুরী, বি-এ	২-১
নিলাজতা	৩০৬
নিশীথে (কবিতা)—অমিয়া চৌধুরী	৪৮
নূতন মানুষ—হরীন্দ্রনাথ চৌধুরী, বি-এ	২২৪
জায়েগ দেবক (কবিতা)—জানকীনাথ দত্ত	৫৭২
পকেট বিখকোষ (সচিত্র)	৫৭
পঞ্চমুখী পেন্সে (সচিত্র)—অধ্যাপক অমৃতদাস	
নীল, এম-এ	২৪৮
পঞ্চশত (সচিত্র)—৫৪, ২৪৪, ৪০৯, ৫৫৭, ৬৭১, ৮৫২	
পাণ্ডিত্য রম্যবাসী সরস্বতী	১৫৩
পঞ্চ-নোটন—প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ	৩৪২
পদার্থ ও তাহার পরিণতি—ইন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	
বি-এসসি	৮৬৫
পদ্যলোকপুস্তক মতিলাল ঘোষ (সচিত্র)	৯০৩
পদীর পরিচয় (কথিকা) (কষ্টি)—রবীন্দ্রনাথ	
ঠাকুর	২২১
পল্লীসংস্কার সমাজ—নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,	
বি-এসসি (হিলনয়)	২১৮
পটিলে বৈশাখ (কবিতা) (কষ্টি)—রবীন্দ্রনাথ	
ঠাকুর	৬৭১
পাণ্ডা গুল্ফ খেলোয়াড় (সচিত্র)	৬৮২
পাখা-চুপী (সচিত্র)	৮৫৩
পাখী (কবিতা)—“বনকুল”	৭০৪
পাখীর গর—রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও জগদ্বজ্র পাল	৮৯
পারস্যের নারী (সচিত্র)—হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, বি-এ	৫৪৬
পারস্যের টেট	১২৫, ২২৩, ৪২৫
পাহাড় থেকে কাঠ নামানো	৬৭৯
পাণ্ডার সমান উইয়ের টিপি (সচিত্র)	৬৮১
পিচ কাঠী দিয়ে বাড়ী তৈরী (সচিত্র)	৫৪
পুনরাবৃত্তি (কথিকা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৫৫
পুনর্মিলক (গল্প)—হেমেন্দ্রনাথ সান্যাল	৭০৬
পরিচয়	
প্রকৃতির পাঠশালা	
প্রতিযোগিতা মূলক পত্র	
প্রথম চিঠি (কষ্টি)—রবীন্দ্রনাথ	
প্রথম সেন্সর ও তাঁহার সময়	
মুখোপাধ্যায়	
প্রবল বাতাসে প্রদীপ—নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্ট	
প্রবেশিকা পরীক্ষার ভাষা ও শিক্ষণীয় বিষয়	
প্রায়োগিক (কবিতা)—কাজী নজরুল ইসলাম	
প্রাচীন কালের প্রার্থনা—নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী	
প্রাচীন জীবন প্রথ (কষ্টি)—হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী	
প্রাচীন মূর্তি (সচিত্র)	
প্রাণশক্তি রসশ্রোত (কষ্টি)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
প্রাদেশিক দেবতত্ত্ব (কষ্টি)—গিরিশচন্দ্র	
বেদান্ত-গীর্ষ	
প্রাণীর চোখ-রাঙানী	
প্রেম (কবিতা)—রাধাচরণ চক্রবর্তী	
ফাউন্টেন পেন্ সাফ্ করা	
ফাউন্টেন পেন্ সাফ্ করা (আলোচনা)—বীরেন্দ্র-	
নাথ ঘোষ ও হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়	
ফাস্ট বাতাস (কবিতা)—রাধাচরণ চক্রবর্তী	
ফুল তাজা রাবির উপায়	
বঙ্গীয় নমঃশূ কনকরেজ	
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনকরেজের কয়েকটি নির্ধারণ	
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা	
বঙ্গ অবাঙালী	৪৬৪
বঙ্গ কাব্যানার সংখ্যা	
বঙ্গ ডাক্তার	
বঙ্গ নূতন লাইটের প্রথম কাজ	
বঙ্গ শিক্ষার জন্ত নূতন সরকারী সাহায্য	
বদন-চন্দ্রনা (কবিতা)—কাজী নজরুল ইসলাম	
বদরপুরের ভূর্ণি—জগদ্বজ্র পাল	
বনমহাশয়ের কথা (সচিত্র)—হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়,	
বি-এ	
বন্দী অক্টোপাস্ (সচিত্র)	
বজ্রবিদ্যুৎ	

কবিতা) - রাবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৪২৪	বিনয়-বাবুর "উইণ্ড, মিল" সম্বন্ধে প্রতিবাদ—	
(গান) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৫৩	নীরদরঞ্জন মজুমদার, বি-এ	২৭৫
কবিতা) - চেম্বারচটে পাখ্যাদ, বি-এ	২৭২	বিপ্লব রূপী মনস্বীদের কল্প সাহায্য প্রার্থনা	৪৩১
কল বহনের সুবিধা (সচিত্র)	৮৫৪	বিবিধ প্রশ্ন (সচিত্র)	১৩৬, ২২৪, ৪৫৩, ৬১২, ৭৬৭, ৮২৮
কবিতা) - প্রমথনাথ বিশী	১৭৫	বিমান-বীর - নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য	২৪৮
কি "বরকুনো" ?	৭৮২	বিলাতে বাঙ্গালী এজিনোয়ার (সচিত্র)	২০২
র আ-বাঙালীর একটি প্রভেদ	৭৭৩	বিশ্বদরদী (কবিতা) - সুনীতি দেবী	৫৩৭
বাঙালীর আলম	৬১২	বিশ্ববিদ্যালয়ে "অটোনমি"	১৪৯
বাঙালী লেখকদের প্রশংসা	৪৬৯	বিশ্ববিদ্যালয়ে বরাও বন্দোবস্ত	৬২২
স্থানীয় জমিদারদের পতন - অধ্যাপক		বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-প্রাপ্তি	৬২৩
বহুনাথ সরকার, এম-এ, পি আর এস	৬৩৬	বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ	৬২৫
র লোকসংখ্যা (কষ্টি)	১০৮	বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর গভর্নমেন্টের ক্ষমতা	৭৭৮
কি বরকুনো (আলোচনা) - অমৃতলাল		বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অসুপস্থিতি	৩০৬
নীল, এম-এ	৮৭১	বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অসুপস্থিতি - গুণেন্দ্রনাথ	
র বিশিষ্টতা (কষ্টি) - বিপিনচন্দ্র পাল	৮৫৬	মুখোপাধ্যায় ও সম্পাদক	৪৪২
ভবন	৩০১	বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রশ্ন চুরি	৩০৯
বাণী-বন - শান্তা দেবী, বি এ	৩৭৫	বিশ্ববিদ্যালয়ের পোট্, গ্র্যাজুয়: বিভাগ	৪৬৭
দাদে-বাজা বাণী (সচিত্র)	৪১৩	বিহারের এক প্রাচীন ঔপনিবেশিক বাঙ্গালী পরিবার	
দিন (কবিতা) - প্রবোধচন্দ্র বসু	৫৪২	- জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	২৪৯
মাসের খাতের তালিকা (ছড়া) - দুর্গাপ্রসাদ		বীবর-ছেদিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ (সচিত্র)	৫৫৭
মজুমদার	২২৫	বীরের সম্মান	৩০০
ম্পাদক	৪১৫	বৃক্ষের অজভঙ্গী (সচিত্র) - সার্ব জগদীশচন্দ্র বসু	২২৮
দারিদ্র্য নিবারণের চেষ্টা	৪৬০	বৃক্ষের বৈধব্য (কবিতা) - শৈলেন্দ্রনাথ রায়	৬০
সংক	১৩২, ২৮৪, ৪৫৩, ৬০৯, ৭৪৩, ৮৮৩	বৃষ্টি-বিন্দু মোটরকার (সচিত্র)	৬৭৯
শে ডাকাতি	৩০৪	বৃষ্টিরোজ (কবিতা, কষ্টি) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮৫৯
শের জীশিকা-সংস্কার - মণীন্দ্রনাথ		বেতালের বৈঠক	১১১, ২৯৩, ৪৩৫, ৫৭০, ৭১৫, ৮৬২
এম-এ	৩৭০	বেথুন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল	৬৩২
ময় (কবিতা) - নীহারিকা দেবী	২৫	বেরির চরখা ও তাঁত - ললিতকুমার মিত্র ও নৃপেন্দ্র-	
নববৃক্ষের কথা (কষ্টি) - বিপিনচন্দ্র পাল		মোহন ঘোষ	৪৪২
	৩৫৫, ৬৮২, ৬৭২	বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতবাসীর স্থান-নির্ণয় - সার্ব	
বৈশিষ্ট্য (কষ্টি) - বিপিনচন্দ্র পাল	১০৫	প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও প্রিয়দারঞ্জন রায়, এম-এ	৩১৫
মনসা পূজা - ক্ষিত্তিমোহন সেন, এম-এ	৩৮৪	বৈশাখ (গান, কষ্টি) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬০২
(গান) (কষ্টি) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৮৯	বৈশাখী ঝড় (গান, কষ্টি) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬০০
(কথিকা) (কষ্টি) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৮৯	বৈষ্ণব-বৃগে নারীর শক্ত - অমৃতলাল গুপ্ত	৭২০
প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এল,		"দো কপা কপু" - জগদীশচন্দ্র ঐ-চার্য	৫৫৪
	১১৮, ২৭৭, ৪৪৩, ৬০৫, ৭৩৯	বাখার গৌরব (কবিতা) - গোলাম মোস্তফা, বি-এ	৮৫৫
স্বল্প জর নিবেদ	৭৬৮	বাবস্থাপক সভা কাজে লাগাইবার উদ্যম	৩১৩
স্বল্প প্রকাশিত পদ (কষ্টি)	৩৪৯	বাবস্থাপক সভার সভ্যদের খাইখরচ ও রাহাখরচ	৭৭৭
স্বল্প - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭৪৯	বায়-সংক্ষেপ কমিটি	৬৩
স্বল্প বাণী-ভবন (সচিত্র)	৪৫৮	ভক্ত ও ভগবান (কবিতা) - নরেন্দ্রনাথ সেন	৮৬
স্বল্প বাণী-ভবন - অমলা বসু	৭৪৯	ভবিষ্যতের এয়ারপ্লেন	৫৬২
স্বল্পের প্রতি প্রকাশ-প্রদর্শন	৬২৫	ভাঙ্গা বেহালা (কবিতা) - কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ	১৬৫

ভাঙের কেন গালা হয় কেন?—প্রভাত সেন	৫৩৬	মাটির তলার আগুন (আলোচনা)—সুধাবিন্দু বিশ্বা	...
বন্ধোপাধ্যায় ও যোগেশচন্দ্র রায়, এম.এ.	...	মাঠে আগুন (আলোচনা)—সন্তোষকুমার বসু	...
ইত্যাদি	...	মাতৃহের কার্যক্ষেত্র (কষ্টি)—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	...
ভারতীয় শিল্প-প্রতিভা (সচিত্র)—ডাক্তার ষ্টেলা	...	মাতৃহের শতকরা	...
ক্রামরিশ, পি-এইচ-ডি (ভিয়েনা) ও অমিরচন্দ্র	...	মাথার খুলির শক্তি (সচিত্র)	...
চক্রবর্তী	৮০৩	মালুঘের গায়ের জোর (সচিত্র)	...
ভারতীয়ের বিলাতি নিন্দা	৮৬৯	মানের দার (গল্প)—শান্তা দেবী, বি-এ	...
ভারতে মদের আমদানী—যতীন্দ্রমোহন সিংহ চৌধুরী	৮৫২	মাদ্রাজের আড়িমার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এক দিন	...
ভারতের ঐক্য (কষ্টি)—বহুনাথ সরকার, এম-এ.	৮৬০	(সচিত্র)	...
পি-আর-এস	...	মাবলাদের সত্যাগ্রহ	...
ভারতের ও বঙ্গের ব্যয় সংক্ষেপ	৬১৫	মালবিকা (গল্প)—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	...
ভারতবর্ষ—হেমেন্দ্রলাল রায় ১২৯, ২৮০, ৪৪৪, ৬০৭, ৭৪৫,	৮৭৭	মালবারে আর্থ সমাজের কার্য	...
ভারতবর্ষের প্রভাব (কষ্টি)—অধ্যাপক সিলভা	৩৪৬	মিউনিশান বোর্ডের মামলা	...
লেভি	...	মিউনিসিপালিটির মহিলা কমিশনার—হেমেন্দ্রলাল	...
ভারত সভা	৭৮০	রায়	...
ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের সম্পাদিকার নিবেদন—	...	মিটারযুক্ত টেলিকোন	...
প্রিয়দা দেবী, বি-এ	১৬৯	মিনিটে তিনমাইল মোটরকার (সচিত্র)	...
ভালুকের বাচ্চা	২৭১	মিষ্টার হুজুগারফের তাঁত	...
ভাসে (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৩৫	মিষ্টি বাড়ী (সচিত্র)	...
ভালুদের অসন্তোষ	৩০৯	মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়	...
ভুল-সংশোধন	৭৮২	মুক্তধারা (জার্মান সমালোচনা)—	...
ভূমিহস্তের পূর্বলক্ষণ (সচিত্র)	২৬৪	মুক্তধারা (নাটক)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...
ভোগের অনাচার—সানু প্রফুল্লচন্দ্র রায়	৪৭৫	মুক্তধারার জার্মান সমালোচনা	...
ভ্রমর ও প্রজাপতি (কবিতা)—চণ্ডীচরণ মিত্র	৮৬	মুখর আঁধার (কবিতা)—রাধাচরণ চক্রবর্তী	...
ভ্রম-সংশোধন	৯২২	মূলশীপেটায় সত্যাগ্রহ	...
মজার জ্ঞান মানুষ খুন	৯১৭	মুসলমান মেয়েদের আত্মা আছে কি নই—গোলাম	...
মধ্যপ্রদেশে বাঙালী (সচিত্র)—জ্ঞানেন্দ্রমোহন	৬৬৪, ৮৩২	মোস্তাফা, মোহাম্মদ খলিল রহমান, হেম	...
দাস	...	চট্টোপাধ্যায়, বি-এ	...
মনসা পূজা—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	৭৩৩	মুক (কবিতা)—সুপ্রেম শম্মা	...
“মনসা পূজা” সম্বন্ধে কয়েকটি কথা (আলোচনা)—	...	“মেরে লেডুকী কী গিরফ তারি”	...
ক্ষিতিমোহন সেন, এম-এ	৮৭১	মোটরকারের কথা (সচিত্র)	...
মহাত্মা গান্ধীর কারাদণ্ড	১৩৬	মোটর সেন্সাস—অলক	...
মহাপ্রস্থান (কবিতা)—সুবোধচন্দ্র রায়	৫৯৭	মৌলানা হুসরু মোহানীর প্রতিবাদ	...
মহিলা-প্রগতি—হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, বি-এ	৯৩	মৌলানা হুসরু মোহানীর শাস্তি	...
মহিলা মজলিস (সচিত্র) ৯৩, ২৫৩, ৫৭০, ৫৪৬, ৭২০,	৮৪৩	মডাগাস্কারের নারী (সচিত্র)—হেমন্ত চট্টো-	...
মহিল মান্নিসিপাল কমিশনার	৩১৩	পাধ্যায়, বি-এ	...
মাটির ডিম হইতে পুঁদনার উৎপত্তি (আলোচনা)	২৭৬	মুজের ধণ ও ক্ষতিপূরণের দাবী	...
মাছের চামড়ার জুতা	২৪৫	রঘুনাথ কৃষ্ণ ফড়কে (সচিত্র)—প্রমোদ	...
মাটির গান (কষ্টি)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৪৭	আতর্ষী	...
মাটির ডাক (কবিতা) (কষ্টি)—রবীন্দ্রনাথ	১০৩	রণরঙ্গ (কবিতা)—গোপেন্দ্রনাথ সরকার	...
ঠাকুর	...	রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি	...
মাটির তলার আগুন—ক্ষিতিমোহন সেন, এম-এ	৪৫৩	রবীন্দ্র-পরিচয়—প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ— ২১৫, ৩৫	...

(উপহাস) — মনীন্দ্রলাল বসু—৪০, ২০১,	৩৫৮, ৪৮৪, ৭০২, ৮১২
তে ইন্ডিয়ের ইন্ড্রজাল—বামিনীকান্ত সেন,	৩০২
এল	৭৮৭
পিপীলিকার দ্বারা গৃহ পরিষ্কার	৬৮২
ওক সাপুড়িয়া	৭৬৬
তানায় বাদালীর দ্বিত—জ্ঞানেন্দ্রমোহন	৫৭২
কবিতা) — সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়	২৭৪
ভোর (গল্প) — কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	৭০৩
লে হৃদয়ের কাণ্ডা—অলক	৫৮
বকুর্চনাথ সেন বাহাদুর (সচিত্র)	৪৫৫
ধাওয়া মোটির গাড়ী (সচিত্র)	৬৮১
(কবিতা) — প্রিয়দ্বন্দ্বা দেবী, বি-এ	৩৩৪
তারতমা (কবিতা) — চণ্ডীচরণ মিত্র	২৩৭
বার্তাবহ	৫৬২
ওর খেলা (সচিত্র)	৫৯
ওয়ে টেনে থাইবার গাড়ী	২৭
বিস্তারের জঙ্গল	১৫১
সাদা ও রেলের ব্যা	১৫২
স মালের ভাড়া	১৫০
রিক (সচিত্র) — সুধীরকুমার চৌধুরী, বি-এ	৪২৭
এ নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির	
ঠিক	৪৮৮
(কবিতা) — প্রিয়দ্বন্দ্বা দেবী, বি-এ	৭০৮
সুজের বড়তা	৭৭৫
সী কেরা (সচিত্র) —	৫৮১
কর মাথা ডিঙিতে হাঁটা (সচিত্র)	৪১৫
স শাধনার ত্যাগ ও গ্রহণ	৮২৯
স চাকর চাকরাণী	৬৩২
স ও শূখলা বক্ষার মন্তব্য	৩১৪
সনিকেনে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম ও বিশ্বভারতী	৬৩০
সর উৎসব—বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল	৭৮০
সী (কবিতা) — প্রিয়দ্বন্দ্বা দেবী, বি-এ	৭৩২
কবি সংবাদ (কষ্টি)	১০৭
ভাষা (কষ্টি) ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর,	
আই-ই	৬০১
অবিস্মর (কষ্টি) — ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর,	
আই-ই	১০৫
অন্ধকার বৃণ (কষ্টি) — ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ	
ঠাকুর, সি-আই-ই	১১৫

শিল্পের সৌন্দর্য ও অসৌন্দর্য (কষ্টি) — ডাক্তার	
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি-আই-ই	৬৭০
শিশুশিক্ষায় মহিলা — চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ	৯
সুভাষা (গল্প) — কীরণশঙ্কর রায়, বি-এসসি	
(লগুন)	৬১
শূদ্র — মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এম-এ	২৭৫
শূদ্র — বিধুশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ও দীনেশচন্দ্র কবিরত্ন	৫৬৭
শূদ্র ও ক্ষুদ্র (আলোচনা) — ক্ষিত্তিমোহন সেন, এম-এ	৮২
শেখ সাহীর কাসিদা ও গজল (সচিত্র) — সুব্রহ্মচন্দ্র	
নন্দী	১৮১
শেখালি (কবিতা) — সুব্রহ্মচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৮২
শেখাল কেন জুকা জুকা করে (গল্প) — সুনির্মল বসু	২৭৩
শেখ বেলা (গান) (কষ্টি) — অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৮৩
শ্রী শ্রী ৬ গজেশ্বরী দেবী (কষ্টি)	৩৪২
শ্রী শ্রী সারদেশ্বরী আশ্রম ও 'হন্দুবালিকা' বিদ্যালয়	
(সচিত্র)	৪৫৬
শেষ ও অন্তের পরস্পর তাগবাসা	৪৬৮
বল্লী মঙ্গল (কষ্টি)	১১৪
সঙ্কচিত্ত মনি (সচিত্র)	৫৫
সচল চিত্রের অভিনয়ে প্রভুত্ব	৫২
"সঙ্গীতবীণা" ও প্রবাসী-সম্পাদক	৭৭৭
সঙ্গীতবীণার ভ্রম	৬৩১
সঙ্গীত (কবিতা) — দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭১৩
সঙ্গীত শিক্ষায় মহিলা — চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ	৯০
সঙ্গীত সজ্জার শাখা	১৫৪
সঙ্গীতে নারী	২৫
সত্য (কবিতা) — জ্ঞানকৌনাথ দত্ত	৫৭১
সত্যোজ্ঞ-উৎপন্ন (কবিতা) — প্যারীমোহন সেনগুপ্ত	৫৭৫
সত্যোজ্ঞনাথ দত্ত (কবিতা) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৭৪
সত্যোজ্ঞনাথ দত্ত (কবিতা) — হু	৫৭৮
সত্যোজ্ঞনাথের কথা — কালীচরণ মিত্র	৫৭৯
সত্যোজ্ঞনামা (কবিতা) — নরেন্দ্র দেব	৫২৬
সত্যোজ্ঞ-পরিচয় (সচিত্র) — চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	
বি-এ	৫৮৩
সত্যোজ্ঞ-প্রমাণ (কবিতা) — দেবীদাস মুখোপাধ্যায়	৫৭৬
সত্যোজ্ঞ-স্বরূপ (কবিতা) — সুব্রহ্মচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৭৭
সনেটের প্রভি (কবিতা) — সুব্রহ্মচন্দ্র শর্মা	৮৫১
সন্ধ্যা (কবিতা) — রাধাচরণ চক্রবর্তী	৭৮
সন্ধ্যাকিশোরী (কবিতা) — শ্রী গোপেন্দ্রনাথ সরকার	৮৭৮
সন্ধ্যাছায়া (কবিতা) — প্রবোধচন্দ্র বসু	৬৮৩
সপ্তে ব্রত — রামজলাল বিশ্বাসিনিধি	২৭৪
সব-পেয়েছির দেশে (গল্প) — মনীন্দ্রলাল বসু	১৩২
সমস্যা (গল্প) — সত্যীশচন্দ্র সেন, এম-এ	৮০১

চিত্র-সূচী

সমুদ্রে কুড়ানো জিনিসে বাড়ী তৈরি (সচিত্র)	৮৫২	স্বতঃস্ফূর্তি—ডাক্তার ষ্টেলা ক্রাম্বিশ, পি-এইচ-ডি
সমুদ্রের গভীরতা ও আয়তন—অলক	৫২	(ভিয়েনা)
সরস্বতী পূজা (কষ্টি)	১১১	স্বদেশীর দ্বিতীয় যুগ—ডাক্তার রাখাকমল মুখোপাধ্যায়
সরকারী বায়-সংক্ষেপ	৩০৩	এম-এ, পি এইচ-ডি
সর্বকনিষ্ঠ রেড-অপারেটর (সচিত্র)	৪১৭	স্বরাজ প্রার্থনা
সহযোগিতাবর্জন ও ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ	৩১০	স্বাধীনতার আকাজিকা প্রকাশ ও রাজদ্রোহ
সংবাদ প্রকাশে বিপদ	৬৩১	স্বাধীনতার ফল
সাইকেলে বিপদ (কবিতা)—সুনির্মল বসু	৫৫৪	স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বৃহৎ ব্রিটিশ লাঠির যুক্তি
সাইবেরিয়ার বুরী জাতি (সচিত্র)—রমেশ বসু, এম-এ	১৭৩	স্বামী ব্রহ্মানন্দ (সচিত্র)
সাগরিকা (সচিত্র)	৫৬১	হরিদাস ঘোষ (আলোচনা)—কিরণচন্দ্র দত্ত
সাধনা ও সিদ্ধি—সাবু ওফুরচন্দ্র রায়	৮১	প্রকাশচন্দ্র দত্ত, উমাপ্রসাদ ঘোষ
সাবানের কেনার মধ্যে অভিনয় (সচিত্র)	৫৬	হস্তচীন লোকের লেখা (সচিত্র)
সাঁওতাল পুরাণ (কষ্টি)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ	৩৫০	হুম্বৎ মোহানী
সিন্ধুরবসল গুণামনিয়ের চিত্রাবলী (সচিত্র)	৪৭০	হাউস অব লর্ডস এর প্রথম নারী সভা (সচিত্র)
সিদ্ধ (কথিকা, কষ্টি)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫২৯	হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, বি-এ
সুইটজারল্যান্ডের নির্বাচন-ভূমি (সচিত্র)	৮৫২	ওয়েল সাগেব ও ভাইন-চ্যামেলার
সুমিত্রা (গল্প)—সীতা দেবী, বি-এ	৬৫	হাতচীন গোলন্দাজ (সচিত্র)
সুয়ে হুগো (কষ্টি)	১১৪	হাতীর সাহায্যে মেবের দৃঢ়তা পরীক্ষা (সচিত্র)
সুখের মত পৃথিবী কিরণ দেয় না কেন?—দ্বীরোদ-বিহারী গুপ্ত	৫৬৪	হারামণি—সংগ্রাহক প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত
সেয়ানা বোকা (কবিতা)—নরেন্দ্র দেব	৭-৮	অনাথনাথ বসু
সোভিয়েট কৃষিায় নারী	২৪	হারামণি?—নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
তত্ত্ব বাদল (কবিতা)—কাজি নজরুল ইসলাম	৫৫৬	হাসিকান্না (গল্প)—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়
হুলাশেষে যুদ্ধের উচিত্যানোচিত্য আলোচনা	৩০৫	হাসি কারা হাঁচ কাশি নাকডাকার কারণ (সচিত্র)
সাবু বিল্লাদাস দামোদর ঠাকুরসী	২১৬	হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রণ
		হোটেল ফেরিওয়াল

চিত্র সূচী

অস্ত্রোপাস	৫৫৮	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আদ্রে কার্পেলে
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ছাত্রীবৃন্দ	২৬৮	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী
অলার শতধোতেন মলিনত্ব ন মুক্তি (ব্যঙ্গচিত্র)		অবলা বসু
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৪২	আকন্দের তুলার জামা
অণুতে পরমাণু সংস্থান	৫২	আকন্দের ফল ও তুলা
অদাহ কাপড়	৭৮১	আট হাতীর রথে ভারতীয় মহারাজা ও ইংলণ্ডের
অর্জুনাসীমর—সুনন্দী দেবী	৫৪৪	যুবরাজ
অহুলেখক (রঙীন)—বীরেশ্বর সেন	৭৭২	আর্মডার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
অন্তিম পবায় সত্যোক্তনাথ	৫৮৭	আনন্দের সপ্তম স্বর্গে
অন্ধজনে দয়া কর	৬৮৬	আবুল কাদীর জিলানি মসজিদ, বাগদাদ
অন্ধবালক (রঙীন) দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী	৩০৮	আবুল কাদীরের গোর বাগদাদ

আমরা দুই, ওরা দুধ খায় (বাঙ্গাচিত্র)	২০২	কৃষ্ণভামিনী দাস	২৬৫
আমেরিকার চিত্রানটকের অভিনয়ের বিষয়-নির্ণয়	৪২২	কেওয়ার গ্রামের মঠ, ঢাকা	৭৩
আবতির বেলা	৪২৩	কেবল রমণী	২৬১
আলজিরিয়ার নারী	২৬০	কৈলাশ মন্দির—এলোর।	৮০৬
আলজিরীয়া রমণীর সন্তান বহন	২৬০	কোরিয়ার উচ্চশ্রেণীর লোক	৫৩২
আলোক ও আঁধারের দ্বন্দ্ব	২৩১	কোরিয়ার একজন শাসনকর্তা	৫৩২
আলোকের দিকে প্রদানিত লজ্জাবতী ও সূর্যমুখীর		কোরিয়ার নারী	৫৩৩
পাতা	২২৮	কোরিয়ার প্রথম রাজার সমাধি-মন্দির	৫৩৩
ইকথিওসরাস, অথবা নৃপতি সামাজিক জীব	৪১০	কোরিয়ার প্রাচীন মানমন্দিরের অবশেষ	৫৩৪
ইছাই ঘোষের দেউল, বীরভূম	৭৬	কোরিয়ার রাজপ্রাসাদের সিংহাসন-গৃহের ছাদতলের	
ইজিপ্টের নারী	২৫৬	কাঙ্কুকায়া	৫৩৬
ইজিপ্টের বিবাহ-মিছিলে কস্তুর চতুর্দোল	২৫৮	কোরিয়ার রাজসিংহাসন	৫৩৬
ইলেকট্রিক ট্রেন	৬৭৭	কবি শেখ সাদা	১৮২
হকাল ও পরকাল	৬৮৬	কলের করাতে গাছ কাটা	২৪৫
শানচন্দ্র দেব, রায় সাহেব	৩৩২	কস্তুরী বাদি গান্ধী	৪৪৭
উইটিপি	৬৮১	খুকীর বাগান (রঙীন)—শান্তা দেবী	২৭০
পকারের উপদ্রব (বাঙ্গা-চিত্র) - চারুচন্দ্র রায়	২৮৮	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৪৩
স্বিপা মাওরী নারী	৩৭৩	গাছ-কাটা কল	৬৮২
কচাকাড়ার আরাম-গাড়ী	৫৬০	গুপ্ত ধন	৪৩২
একটা বৈজ্ঞানিক সূত্র (বাঙ্গাচিত্র) - চারুচন্দ্র রায়	৫৬২	গুব্বের পোকার দেহবল	৫৫
কুশরত্ন মঠ, ঢাকা	৭৭	গোয়ালিনী—সুনীতি সেন রায়	১২০
এন বরদারাজুলু নাইডু, দৌড় বজ্রতা	৪৫০	গোয়ালিয়র হুর্গ	৬৯৮
"ঐ আসে ঐ আসে ঐ ঐ ঐ রে!" (বাঙ্গাচিত্র)		গোয়ালিয়র হুর্গের পথের বাঁটা	৬৯৭
দৌনেশরঙ্গন দাস	৫৭৩	গোয়ালিয়র হুর্গে শাশ-বহুর মন্দির	৭০০
মার খৈয়াম—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২০	গোয়ালিয়র ফাটক ও হাওয়া পাছাড়	৬৯৯
মফোন্ যন্ত্র	২৪৫	গোয়ালিয়রের মান-মন্দির	৬৯৯
মণিপুঞ্জ হুং—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২০	জায়েরলমো মার্কিন, তারহীন টেলিগ্রাফের	
রুরী পানা ও চন্দ্রমল্লিকা গাছের উপর হইতে		অন্ততম উদ্ভাবক	৪১১
বিষপ্রয়োগের ফল	৮৯৭	গ্রামবধু—সুনয়নী দেবী	৫৪৩
রুরী পানার দাম	৮৯২	বড়ী-সাণা মিল্লা	৬৮৭
রুরী পানার মরণ-আক্ষেপ	৮৯৪	বরমুখো—দেবী প্রসাদ রায় চৌধুরী	১২০
রুরী পানার শিকড়	৮৯৩	চতুর্ভুজ মন্দির—খাজুরাহো	৮১১
রুরী পানার শিকড়ে বিষপ্রয়োগের ফল	৮৯৫	চন্দ্রমল্লিকার গাছের নীচে বিষপ্রয়োগের ফল	৮৯৬
শাগজের নৌকা (রঙীন)—শান্তা দেবী	৭০২	চিত্তরঞ্জক দাশ	৭৬৫
শাগজের তাগৎ	৬৭৭	চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় কুমারী ব্রহ্মদেব	৪২৩
শাগজের সময় কাজ	৫৫২	চীনা বরষা	৯৮
শাঠের বাড়ি	৬৮০	চীনা সুন্দরীর খোঁপার গহনা	১০১
শাঠের বই লইয়া ছোট ছেলেমেয়ে	২৭২	চীনা সুন্দরীর চরণ-কমল	৯৭
শতকবি রজনীকান্ত	৭৩৫	ছড়ি বেহালা	৮৫৩
শকবা সন্দাঙ্গের সঙ্কচিত্ত মমি	৫৫৫	ছাতার গায়ে রেডিও	৫৬০
শম্মা এস ওয়েষ্টকট	৫৬১	ছুবী কাঁটা না হলে বাওয়া হয় না	৫৫৩
শনে পুতুল	৪১৮	ছেলেদের রেলগাড়ী	৫৫৫
শ্রু-চালিত গাড়ী	৫৫৬	ছোট রেলগাড়ী	৬৭৮

জগদীশচন্দ্র বসু	২২৭, ৮৯১	নবরত্ন মঠ—বাগড়া, বরিশাল	৭৭
জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত “ইলেক্ট্রিক প্রোব” দ্বারা		নায়াগ্রা প্রপাতের গায় জাগ্রাস্	২৪৬
বৃক্ষের স্নায়ু-নির্ণয়	২২৯	নিউইয়র্কের যাত্রাবরে জন্তর চামড়া ভরাট করিবার	
জগদীশ দেবী	৪৫০	ভাস্কর্য	৪১৪
জলসত্র (রঙীন)—নন্দলাল বসু	৩১১	নিউগারেনার “ইরোপি” নৃত্য	৭৩০
জলের উপর পাহাড়	৮৫৪	নিউগারেনার পিঠে-উকি-কাটা বিধবা	৭২৫
জলো সাইকেল	৬৮০	নিউগারেনার বালিকা	৭২৫
জলকে	৫০৪	মিকোলান্স - নৃপাটিনোভিক্ রোএরিক	৪২৭
জীবন্ত-দেবতা তারানাথ	১৭৩	নিমাই পণ্ডিতের টোল—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২০
জেনোয়ার সার্কাস	৭৬৭	নিরাশায় বৃকে আশার জঁকুর—দেবীপ্রসাদ রায়	
জ্যাস্ত কুমীর লইবার কোশল	২৪৬	চৌধুরী	৭৯৪
জাহিরলাল নেহরু	৪৪৭	নিশান-দাগার ডগায় জাগ্রাস্	২৪৫
টারায়ের ভিতর বসিয়া গড়ানো	৪১৭	পকেট-বিশ্বকোষ	৫৫৭
টুপী পাখা	৮৫৩	পঞ্চমুখী পোঁপে, পশ্চাৎ হইতে	২৪৮
ঠাকুর পাঠশালা—সারদাচরণ উকিল	৬০৪	পঞ্চমুখী পোঁপে, সম্মুখ হইতে	২৪৮
ডিনামাইটের মুখে স্যাণ্ডার্স	২৪৬	পল্লব যুগের গুহা-মন্দিরের প্রাচীর-চিত্র	৪৬০
ডেলফির এক ধন-ভাণ্ডারের বহির্ভাগ	৪০৯	পাকা গল্ফ খেলোয়াড়	৬৮২
তলোয়ারের কলার উপর নাচ	৫৬০	পারস্তুর নারী—অস্তঃপুরে	৫৪৭
তিন হাজার টাকা দামের ফুল গাছ	৪১৪	পারস্তুর নারী— বাহিরে	৫৪৮
তিমি-তুও পক্ষী	৫৬১	পারস্যের নারীর আগুন পোহানো	৫৪৯
“তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইক অবহেলা”		পারস্যের নারীর আগুন পোহানো	৫৪৯
(ব্যঙ্গচিত্র)—দীনেশচন্দ্র দাস	৭৮	পারস্যের নারীর আগুন পোহানো	৫৪৯
ত্রয়ী—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২০	পাচ্কারী দিয়া কনক্রিট্ ছোড়া	৫৪
ত্রয়ী	৫৮৫	পাচ্কারী দিয়া তৈরী বাড়ী	৫৪
ত্রিমূর্তি—হস্তীশুল্ক	৮০৪	পূজারতা—সুন্নয়নী দেবী	৫৪৪
থাবায় করিয়া ষিড়ালের ছদ্ম খাওয়া	২৭২	পৃথিবীর সব চেয়ে প্রকাণ্ড বেহালা	৮৫৫
দবুগা হইতে (রঙীন)—মুহম্মদ আবদার রহমান		প্রণয়পত্র—প্রাচীন চিত্র	১৫৫
চাষতাই	৪১৪	প্রণয়—সারদাচরণ উকিল	৭২
দাস বিক্রয়ের দলিল—ফারুদী অংশ	১৮৮	প্রত্যাশী—সারদাচরণ উকিল	২২৬
দাস-বিক্রয়ের দলিল—বাংলা অংশ	১৮৯	“প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে” (রঙীন)—শান্তা	
দাস-বিক্রয়ের দলিল—শীল-মোহর	১৮৭	দেবী	৫৬২
দাস-বিক্রয়ের দলিল—সাক্ষীদের নামের সহিত	১৯০	প্রকল্পকুনার বোঝাল	৪২৪
দিনের শেষে	৫০৫	প্রবচন	৬৮৪
হৃৎকর কল	৫৫৮	প্রাচীন মালবীপের ভাষায় লিখিত সমাদিত্ত	৮২৩
দূর-দর্শন যন্ত্রে দূরস্থ বজ্র ছায়ার সঙ্গে কথা	৪১৩	কলীন্দ্রনাথ বসু, বাড়ানী ভাস্কর	৫০০
দেশলাইএর কাঠির বেহালা	৬৭৯	ফরজলের খাস দরবার	১৭৭
দৌলতরাও সিন্ধিয়া	৭০১	ফরজলের দরবার-গৃহ	১৭৬
দ্বিতল রাস্তা	৪১২	বড়োদার মহারাজা	৫০০
দীর্ঘজীবী ঘোষ, বার-এট-ল	৮৩৫	বদ্ধ জানালার রক্তের আলোর দিকে প্রসারিত	
ধ্যানী বুদ্ধ—সিংহল	৮০৭	লতার পাতা	২৩০
নটরাজ শিব	৮০৮	বর্ষায় ভাল গাছ	৭৩২
নন্দোৎসব (রঙীন)—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডি-লিট,		বাইসাইকেল গুটিয়ে বুলিয়ে নেওয়া	৮৫৪
সি-আই-ই	৬৩৬	বাউল—সুন্নয়নী দেবী	৫৪৩
		বাগদাদে ভারতবাসী	১৭৭

বাজ খেলোয়াড়	৫০৩	মিনিটে তিন-মাইল মোটরকার	৬৮০
বাতাবিয়ার হোটেল-ফিরিওয়াল	৪১৪	মিশগান বিধবিন্যালে এসিয়ার ছাত্রী	২৬৮
বাতাসে-বাজা বাণী	৪১৩	মিষ্টি বাড়ী	৬৭৮
বিমলাচরণ সোম	৩৩৩	মেঘের গায়ে চাষের বিজ্ঞাপন	২৪৭
বিশা-বাদিনী—স্বধীরচন্দ্র বসু	১২০	মোটরগাড়ীর অতিবৃদ্ধ-প্রসিতামহ	৪১২
বীষর-ছেদিত বৃক্ষ	৫৫৭	মোটর-সাইকেলের উপর দিয়া চলা	৪১৬
বীরেন্দ্রনাথ দে	৯০৩	মৌমাছির দাড়ি	৪১১
বুদ্ধদেব যশোধরা ও রাজল (রতিন) অঙ্কশাণ্ডহ চিত্র		যশোদা ও কৃষ্ণ	৬৮৬
হইতে অক্ষকৃত—নন্দলাল বসু	১	যাত্রা—সারদাচরণ উকিল	৭৯
ব্রাহ্মের নাচঘর	১৭৪	রঘুনাথ কৃষ্ণ ফড়কে	৬৮৪
ব্রহ্মী নামা সাধু মন্দির	১৭৪	রঘুনাথ বসু	৪৬৬
বৃষ্টি বিন্দু মোটরকার	৬৭৯	রবার্ট গার্সিয়া	৪১৮
বৃষ্টি-বিন্দু মোটর-গাড়ীর অবাধ গতি	৬৭৯	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৪
বেটসিমিনীরা কা নারী	৮৫৮	রমনার কালী-মন্দির, ঢাকা*	৭৭
বেটসিলেও নারীর লাক্ষ্য-পরিধান-রীতি	৮৫০	রমা প্রসাদ রায়	৩৩৪
বেটসিলেও বালিকা	৮৪৭	রহস্যময়ী প্রকৃতি (রতিন)—অসিতকুমার হালদার	৪১৫
বৈকুণ্ঠনাথ সেন, রায় বাহাদুর	৪৫৫	রাজাবাড়ীর মঠ, ঢাকা	৭৪
বোঝার ভাৱে (বাদ্যচিত্র)—চাক্রচন্দ্র রায়	২৪৮	রাজাবাড়ীর মঠের দরজার কারুকার্য	৭৫
বাথিভা—সারদাচরণ উকিল	৯১১	রাজেশ্বর মিত্র, রায় সাহেব	৮৩৯
ভাইকাউন্টেন্স রোণ্ডা, লর্ড সভার প্রথম মহিলা-সভা	৩৮৩	রাস্তা-ধোয়া মোটর গাড়ী	৬৮১
ভুবনেশ্বরের মন্দির	৭৬	লজ্জাবতী-পত্রের বিবিধ অংশ	২৩১
ভূমিকম্পে বাড়ীর স্থান পরিবর্তন	২৪৪	লগুনে ভারতীয় মহিলা-ছাত্রী	২৩৭
মতিলাল ঘোষ	৯০৪	লগুনের ভারতীয় মহিলা-ছাত্রীরা টেনিস খেলায়	
মন্দির পথে	৫০৫	রতা	২৬৭
মসজিদ ছক্কু মিস্কিট ও মুনাক মিনার, মালদ্বীপ	৮২২	লাইব্রেরী ফেরী	৬৮১
মসজিদ ছক্কু মিস্কিটের খোদিত প্রাচীর-গাত্র	৮২৩	লাইব্রেরীতে রচনা রত সত্যেন্দ্রনাথ	৪৮৬
মহম্মদ সামসুউদ্দীন, মালদ্বীপের সুলতান	৮১৯	লুমিট্যানিয়া স্থিতিচিহ্ন	৮৫৫
মহাদজী সিক্কিয়া	৭০১	শক-জাহাজের উপর আলোর গোলা	৫৬
মহারাজ জিয়াজিরাও সিক্কিয়া	৭০১	শরৎচন্দ্র সান্যাল	৮৪০
মাণ্ডির মহিলা	৩৭৭	শিউলে কেংবক রাজ প্রাসাদের তোরণ	৫৩০
মাণ্ডির মহিলাদের নাকে নাক বদিয়া অভ্যর্থনা	৩৮১	শিউলে প্যাগোডা উদ্যান	৫৩১, ৫৩৫
মাধার পুলিশ তাগদ্	৪১১	শিকারী	৫০১
মালদ্বীপের নারী ও বালক বালিকা	৮২৫	শিবাজী মহারাজ	৬৮৬
মালদ্বীপের নারী ও শিশু	৮২৪	শীত-প্রভাত—বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়	১২০
মালদ্বীপের পুরুষ	৮২৪	শুকর-গেলা সাপ	৫৫৮
মালদ্বীপের প্রধান মসজিদ ছক্কু মিস্কিট অভিমুখে		শ্রীশ্রীগৌরীপুরী দেবী	৪৫৬
সুলতানের শোভাযাত্রা	৮২০	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৫৮৩, ৬২৬
মালদ্বীপের রাজ প্রাসাদের আবেষ্টন-গৃহ	৮২২	সন্ধ্যা—সারদাচরণ উকিল	৬৫৮
মালদ্বীপের সুলতান-পুত্রের প্রাসাদ	৮২১	সব-চেয়ে বড় পুরানো মুদ্রা	৫৫
মালিনী—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২০	সর্বশেষ দেবদূত	৪৩৩
মাসাকুচির কাঠের মূর্তি	৫৮	সমুদ্রের সাহাবো তৈরি বাড়ী	৮৫২
মায়াপুণী	৪০১	সাইবেরিয়ার শুভ লামা	১৭৩
		সাকলাজা নারী	৮৪৭

সাধু	৫০২	স্বাভাবিক ঘটনা (ব্যঙ্গচিত্র)—চাক্চন্দ্র রায়	৫০৬
সাধু প্রোকোপিয়াসের আশীর্বাদ	৪৩০	স্বরূপরানী দেবী	৪৪৮
সাপ খেলানো (ব্যঙ্গচিত্র)—	৭৬৬	স্বামী ব্রহ্মানন্দ	৩০৮
সাপুড়ে	৫০১	হরিদাস চট্টোপাধ্যায়	৬৬৪
সাবানের ফেনার মধ্যে নৃত্য	৫৭	হরিমতি দত্ত	৪৫২
সাঁচি স্তূপ	৮০২	হস্তহীন লোকের বুক দিয়ে লেখা	৮৫৪
সাঁচি স্তূপের কারুকার্য—লতানো নারীমূর্তি	৮০৭	হাকিম আজমল খাঁ	৪৪৯
সাঁচি স্তূপের ভোরণ	৮১০	হাসরের স্বভাব সংশোধন (ব্যঙ্গচিত্র)	২১০
সাঁচি স্তূপের হেলিওর গায়ে পদ্মলতা	৮০৪	হাতীর সাহায্যে মেয়ের শক্তি পরীক্ষা	৬৭৮
সাঁঝের বাতি—সারদাচরণ উকিল	২২৬	হাতহীন গোলন্দাজের গুলি ছোড়া	২৪৫
সিগারেটটাও চলে	৫৫৩	হাসি কান্না, হাঁচি কাশি নাকজাকার উৎপত্তি	৬০
সুইজারল্যান্ডের নির্বাচনভূমি	৮৫৩	হাটের পথে (রঙীন)—শান্তা দেবী	২২
সুখা-বন্দনা	৪২৮	হেনপ্রভা মজুমদার ও পুত্রদ্বয়	৪৬৯
সোনারঙের মঠ, ঢাকা	৭৩	হোতা নাও	৮৪৯

লেখক ও তাহাদের রচনা

অতুলপ্রসাদ সেন, বার-এ্যাট-ল—		আনন্দনাথ রায়—	
প্রবাসে বঙ্গসাহিত্য-চর্চা (অভিভাবন)	২৩৫	দাসবিজয়ের প্রাচীন দলিল প্রবন্ধ সম্বন্ধে সংকীর্ণ	
অনন্তকুমার সান্তাল—		(আলোচনা)	৫৬৩
কুমারী লেনা	৮৪৫	ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, বি-এস সি—	
অবলা বসু—		জিনিষ নষ্ট হয়ে যায় কোথা ?	৫৫৫
বিদ্যাসাগর “বাণীভবন”	৭৪২	পদার্থ ও তাহার পরিণতি	৮৬৫
অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী—		কপিল হুসাদ ভট্টাচার্য্য—	
ভারতীয় শিল্প-প্রতিভা (সচিত্র)	৮০৩	রাজাড়ে ভোর (গল্প)	৭০৩
অমিয়া চৌধুরী—		বমলা মুখার্জি—	
নিশীথে (কবিতা)	৪০৮	আইরিশ বিপ্লবে আইরিশ রমণী	৮৪৩
অমৃতলাল গুপ্ত—		কাজী নজরুল ইসলাম—	
বৈষ্ণব বৃগে নারীর শক্তি	৭২০	প্রলয়োল্লাস (কবিতা)	১২১
অমৃতলাল শীল, এম-এ—		শুক বাদল (কবিতা)	৫৫৬
পঞ্চমুখী পেপে (সচিত্র)	২৪৮	কালীচরণ মিত্র—	
“দাসবিজয়ের প্রাচীন দলিল” প্রবন্ধ সম্বন্ধে		মতোজনাথের কথা	৫৭২
সংকীর্ণ (আলোচনা)	৫৬৬	কালীপ্রসন্ন বিদ্যাতৃষণ—	
শাশ্বাকথা (আলোচনা)	৫৬৫	এক অপরিজ্ঞাত বৈষ্ণব কবি	১৭৯
বাঙ্গালী কি স্বরূপে ? (আলোচনা)	৮৭০	কিরণশঙ্কর রায়, বি-এস সি (লণ্ডন)—	
		শুকতারা (গল্প)	৬৮৮

কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ—

ভাঙ্গা বেহালা (কবিতা)

... ১৬৫

কবি সত্যেন্দ্রনাথ (কবিতা)

... ৫৭৮

ক্ষিতিমোহন সেন, এম-এ—

বাংলার মনসা পূজা

... ৩৮৪

মাটির তলায় আগুন

... ৪৫৩

"মনসা পূজা" সম্বন্ধে কয়েকটি কথা (আলোচনা)

৮৭১

শুভ্র ও ক্ষুদ্র (আলোচনা)

... ৮৭২

কীরোদবিহারী গুপ্ত—

স্বর্গের মত পৃথিবী কিরণ দেয় না কেন ?

(আলোচনা)

... ৫৬৪

ক্ষেমঙ্গরী দেবী—

কুম্ভভাবিনী স্মৃতি-সভায় (সচিত্র)

... ২৬৪

গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—

বিশ্ববিজ্ঞানের পরীক্ষার অনুপস্থিতি

... ৪৪২

গোপেন্দ্রনাথ সরকার—

রণরঙ্গ (কবিতা)

... ৫১৩

সন্ধ্যা-কিশোরী (কবিতা)

... ৮৭৮

গোলাম মোস্তফা, বি-এ

মুসলমান মেয়েদের আত্মা (আলোচনা)

... ৭৩৩

ব্যথার গৌরব (কবিতা)

... ৮৫৫

চণ্ডীচরণ মিত্র—

ভ্রমর ও প্রজাপতি (কবিতা)

... ৮৬

রূপের তারতম্য (কবিতা)

... ২৩৭

ঝিলুক (কবিতা)

... ২৭৬

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ—

শিশুশিক্ষার মহিলা

... ৯৩

সঙ্গীত-শিক্ষার মহিলা

... ৯৩

সত্যেন্দ্র-পরিচয় (সচিত্র)

... ৫৮৩

চিত্র-পরিচয় ইত্যাদি

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ—

অব্যক্ত ও ব্যক্ত

... ১৬৩

চুণীলাল বসু, এম-বি, রায় বাহাদুর—

আরোগ্য-দীপদর্শন (সমালোচনা)

... ৬৬২

জগদ্বজ্জ পাল—

পাখীর গল্প

... ৮৯

জগদানন্দ রাই—

বচুরী পান্না (সচিত্র)

... ৮৯০

জগদীশচন্দ্র বসু, সার্—

বৃক্ষের অঙ্গভঙ্গী (সচিত্র)

... ২২৮

জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—

"বৌ কথা কও"

... ৫৫৪

জগন্নাথ দেব—

বঙ্গরপুরের ভূর্গ (আলোচনা)

... ৫৬৫

জানকীনাথ দত্ত—

সত্য (কবিতা)

... ৫৭১

জ্ঞানের সেবক (কবিতা)

... ৫৭২

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—

বিহারের এক প্রাচীন ঔপনিবেশিক বাঙ্গালী

পরিবার

... ২৪৯

দেবদত্তের বাঙ্গালী (সচিত্র)

... ৩৩১

রাজপুতানায় বাঙ্গালীর স্মৃতি

... ৫৭২

মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালী (সচিত্র)

৬৬৪, ৮১২

জ্যোতিষ্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ—

কুমারী মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায়

... ৮৪৬

"দরবেশ"—

কাজরী গান (কবিতা)

... ৮৬৯

দুর্গা প্রসাদ মজুমদার—

বারো মাসের ঝাঙের তালিকা (ছড়া)

... ২২৫

চাতকের স্মৃতি (গল্প)

... ৭০৭

"খোকা হোক" পাখী (গল্প)

... ৮৬৫

দ্বিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

সঙ্গীত (কবিতা)

... ৭১৯

দীনেশচন্দ্র কবিরঙ্গ—

শুভ্র (আলোচনা)

... ৫৬৭

দেবীদাস মুখোপাধ্যায়—

সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ (কবিতা)

... ৫৭৬

দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—

গিরিডি বালিকা বিজ্ঞান

... ৩৮৩

ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ—

জাতীয় শিক্ষা

... ৬২

নগেন্দ্র গুপ্ত—

উচ্চে উড্ডয়ন (আলোচনা)

... ৪৪১

নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—

চিত্রশিল্পে বালিকার কৃতিত্ব

... ২৫

কাপড়ে তসরের জ্বালায় পাকা রং করিবার উপায়

৩৯৫

পঞ্চশত

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—

জয়ন্তী (উপন্যাস)

৭৫২, ৮২৭

কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ—		জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—	
ভাঙ্গা বেহালা (কবিতা)	... ১৬৫	“বৌ কথা ক’ও”	... ৫৫৪
কবি সত্যেন্দ্রনাথ (কবিতা)	... ৫৭৮	জগন্নাথ দেব—	
ক্ষিতিমোহন সেন, এম-এ—		বঙ্গরপুরের দুর্গ (আলোচনা)	... ৫৬৫
বাংলায় মনসা পূজা	... ৩৮৪	জানকীনাথ দত্ত—	
মাটির তলায় আস্তান	... ৪৫৩	সত্য (কবিতা)	... ৫৭১
“মনসা পূজা” সম্বন্ধে কয়েকটি কথা (আলোচনা)	৮৭১	জ্ঞানের দেবক (কবিতা)	... ৫৭১
শূদ্র ও ক্ষুদ্র (আলোচনা)	... ৮৭২	জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—	
কীরোরবিহারী গুপ্ত—		বিহারের এক প্রাচীন ঔপনিবেশিক বাকালী	
স্বর্ঘ্যের মত পৃথিবী কিরণ দেয় না কেন ?		পরিবার	... ২৪৯
(আলোচনা)	... ৫৬৪	দেবদাহন বাকালী (সচিত্র)	... ৩৩১
ক্ষেমকরী দেবী—		রাজপুতানায় বাকালীর স্থিতি	... ৫৭২
কৃষ্ণভাবিনী স্থিতি-সত্য (সচিত্র)	... ২৬৪	মধ্যপ্রদেশে বাকালী (সচিত্র)	৬৬৪, ৮৩২
গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—		জ্যোতিষ্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ—	
বিশ্ববিজ্ঞানের পরীক্ষায় অসুপস্থিতি	... ৪৪২	কুমারী মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায়	... ৮৫৬
গোপেন্দ্রনাথ স্বকাকার—		“দরবেশ”—	
রণরঙ্গ (কবিতা)	... ৫১৩	কাজরী গান (কবিতা)	... ৮৬৯
সন্ধ্যা-কিশোরী (কবিতা)	... ৮৭৮	দুর্গা প্রসাদ মজুমদার—	
গোলাম মোস্তফা, বি-এ		বারো মাসের খাতের তালিকা (ছড়া)	... ২২৫
মুসলমান মেরেদের আত্মা (আলোচনা)	... ৭৩৩	চাতকের সৃষ্টি (গল্প)	... ৭০৭
ব্যথার গোরব (কবিতা)	... ৮৫৫	“খোকা হোক” পাখী (গল্প)	... ৮৬৫
চণ্ডীচরণ মিত্র—		দ্বিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর—	
ভ্রমর ও প্রজাপতি (কবিতা)	... ৮৬	সঙ্গীত (কবিতা)	... ৭১৯
রূপের তারতম্য (কবিতা)	... ২৩৭	দৌনেশচন্দ্র কবিরঙ্গ—	
কিছুক (কবিতা)	... ২৭৬	শূদ্র (আলোচনা)	... ৫৬৭
চাক্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ—		দেবীদাস মুখোপাধ্যায়—	
শিশুশিক্ষায় মহিলা	... ৯৩	সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ (কবিতা)	... ৫৭৬
সঙ্গীত-শিক্ষায় মহিলা	... ৯৩	দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—	
সত্যেন্দ্র-পরিচয় (সচিত্র)	... ৫৮৩	গিরিডি বালিকা বিজ্ঞান	... ৩৮৩
চিত্র-পরিচয় ইত্যাদি		ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ—	
চাক্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ—		জাতীয় শিক্ষা	... ৬২
অব্যক্ত ও ব্যক্ত	... ১৬৩	নগেন্দ্র গুপ্ত—	
চুনীলাল বসু, এম-বি, রায় বাহাদুর—		উচ্চে উদ্ভঙ্গন (আলোচনা)	... ৪৪১
আরোগ্য-দ্বিগদর্শন (সমালোচনা)	... ৬৬২	নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—	
জগদ্বন্ধু পাল—		চিত্রশিল্পে বালিকার কৃতিত্ব	... ৯৫
পাখীর গল্প	... ৮৯	কাপড়ে তসরের জায় পাকা রং করিবার উপায়	৩৯৫
জগদানন্দ রাই—		পঞ্চশস্য	
বচুরী পানা (সচিত্র)	... ৮৯০	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—	
জগদীশচন্দ্র বসু, সার্ব—		জয়ন্তী (উপন্যাস)	৭৫২, ৮২৭
বৃক্ষের অঙ্গভঙ্গী (সচিত্র)	... ২২৮		

মালবিকা (গল্প)	৭২৫	ভোগের অনাচার	৪৭৫
নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এস সি (ইলিনয়)—		প্রবোধচন্দ্র বসু—	
পল্লী-সংস্কার সমস্যা	২১৮	বাঙ্গাল দিনে (কবিতা)	৫৪২
নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—		সন্ধ্যা-ছায়া (কবিতা)	৬৮৩
হারামণি (আলোচনা)	৪৪১	প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এল—	
নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস,		ধ্বংসাবশিষ্ট ইউরোপ	১:৫, ২২৩, ৪২৫
পি-এইচ-ডি—		বিদেশ	১:৮, ২৭৭, ৪৪৩, ৬০৫, ৭৩৯, ৮৮৭
উপনিষদে শিক্ষা-প্রণালী ও ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্রাহ্মণের		প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—	
প্রভাব	৪২৫, ৬৪৬	ধর্মপূজা	১৫৮, ৩২১, ৬৫৫
নরেন্দ্র দেব—		প্রভাতনন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়—	
সত্যেন্দ্র-নামা (কবিতা)	৫৯৬	ভাতের ফেন গালা হয় কেন ? (আলোচনা)	৫৬৬
সেয়ানা বোকা (কবিতা)	৭০৮	তেলে জলে (আলোচনা)	৬৭০
নরেন্দ্রনাথ সেন—		প্রমথনাথ বিনী—	
ভক্ত ও ভগবান (কবিতা)	৮৬	বাউল (কবিতা)	১৭৫
নলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম-এ—		প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ—	
নিরবজের মঠ (সচিত্র)	৭৩	রবীন্দ্র-পরিচয়	২১৫, ৩৪২, ৫০৭
নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী—		পথ-মোচন	৩৩৫
চাতকের সৃষ্টি (আলোচনা)	৮৭০	প্রিয়দর্শনা দেবী, বি-এ—	
নীরদরঞ্জন মজুমদার, বি-এ—		ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের সম্পাদিকার নিবেদন	২৬৯
বিনয়-বাবুর "উইণ্ডমিল" সম্বন্ধে প্রতিবাদ	২৭৫	রূপান্তর (কবিতা)	৩৩৪
নীহারিকা দেবী—		শিবানী (কবিতা)	৭৫২
বাংলা মেয়ে (কবিতা)	৯৫	লক্ষ্মী (কবিতা)	৭৩৮
তরুণী (কবিতা)	৬৮৭	প্রেমাসুর আতর্ষী—	
নৃপেন্দ্রনারায়ণ সর্কাদিকারী—		আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের নাটক (সচিত্র)	৪২২
দেবী কৃষ্ণভাবিনী দাস (আলোচনা)	৪৪১	একটি বাঙালী ভাস্কর (সচিত্র)	৫০০
নৃপেন্দ্রমোহন ঘোষ—		রঘুনাথ কৃষ্ণ ফড়কে (সচিত্র)	৬৮৪
বেটির চরখা ও তাঁত (আলোচনা)	৪৪২	দিবেহি রাজ্জে (সচিত্র)	৮১৯
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—		ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—	
হাসিকান্না (গল্প)	৮৪১	গোয়ালিয়র জুর্গ (সচিত্র)	৬২৭
প্যারীমোহন সেনগুপ্ত—		"বনফুল"—	
গ্রামের পথ (কবিতা)	১০২	পাখী (কবিতা)	৭৩৪
সত্যেন্দ্র-তর্পণ (কবিতা)	৫৭৫	চোখ গেল (গল্প)	৮২৬
পঞ্চশত ইত্যাদি		বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল—	
প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত—		শারদীয় উৎসব	৭৭৯
কৃষ্ণের শান্তি (গল্প)	৬৫০	বিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রী—	
প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সার—		ফুলের খেলা	১৬৬
সাধনা ও সিদ্ধি	৮১	জাতক (সমালোচনা)	১৬৯
চরকা ও বস্ত্র-সম্রাজ্য বঙ্গমহিলার কর্তব্য	২৫৩	শুদ্ধ (আলোচনা)	১৬৭
বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতবাসীর স্থান-নির্ণয়	৩১৫	পুস্তক-পরিচয়	

মালবিকা (গল্প)	৭৯৫	ভোগের অনাচার	৮৭৫
নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এস সি (ইলিনয়)—		প্রবোধচন্দ্র বসু—	
পল্লী-সংস্কার সমস্তা	২১৮	বাদল দিনে (কবিতা)	৫৪২
নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—		সন্ধ্যা-ছায়া (কবিতা)	৬৮৩
হারামণি (আলোচনা)	৪৪১	প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এল—	
নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস,		ধ্বংসাবশিষ্ট ইউরোপ	১০৫, ২২৩, ৪২৫
পি-এইচ-ডি—		বিদেশ	১২৮, ২৭৭, ৪৪৩, ৬০৫, ৭৩৯, ৮৮৭
উপনিষদে শিক্ষা-প্রণালী ও ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্রাহ্মণের		প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—	
প্রভাব	৪২৫, ৬৪৬	ধর্মপূজা	১৫৮, ৩২১, ৬৫৫
নরেন্দ্র দেব—		প্রভাতনন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়—	
সত্যেন্দ্র-নামা (কবিতা)	৫৯৬	ভাতেব কেন গালা হয় কেন ? (আলোচনা)	৫৬৬
সেয়ানা বোকা (কবিতা)	৭০৮	তেলে জলে (আলোচনা)	৬৭০
নরেন্দ্রনাথ সেন—		প্রমথনাথ বিনী—	
ভক্ত ও ভগবান (কবিতা)	৮৬	বাউল (কবিতা)	১৭৫
নলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম-এ—		প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ—	
নিম্নবঙ্গের মঠ (সচিত্র)	৭৩	রবীন্দ্র-পরিচয়	২১৫, ৩৪২, ৫০৭
নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী—		পথ-মোচন	৩৩৫
চাতকের সৃষ্টি (আলোচনা)	৮৭০	প্রিয়দর্শনা দেবী, বি-এ—	
নীলদরশন মজুমদার, বি-এ—		ভারত জ্বী-মহামণ্ডলের সম্পাদিকার নিবেদন	২৬৯
বিনয়-বাবুর “উইণ্ডমিল” সম্বন্ধে প্রতিবাদ	২৭৫	রূপান্তর (কবিতা)	৩৩৪
নীহারিকা দেবী—		শিবানী (কবিতা)	৭৩২
বাংলা মেয়ে (কবিতা)	৯৫	লক্ষ্মী (কবিতা)	৭৩৮
ভরুণী (কবিতা)	৬৮৭	প্রেমাসুর আতর্ষা—	
নৃপেন্দ্রনারায়ণ সর্বাধিকারী—		আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের নাটক (সচিত্র)	৪৭২
দেবী কৃষ্ণভাবিনী দাস (আলোচনা)	৪৪১	একটি বাঙালী ভাস্কর (সচিত্র)	৫০০
নৃপেন্দ্রমোহন বোষ—		বয়ুনাথ কৃষ্ণ ফড়কে (সচিত্র)	৬৮৪
বেরির চরখা ও তাঁত (আলোচনা)	৪৪২	দিয়েছি বাজে (সচিত্র)	৮১৯
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—		কলীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—	
হাসিকান্না (গল্প)	৮৪১	গোয়ালিয়র ভূর্গ (সচিত্র)	৬৯৭
প্যারীমোহন সেনগুপ্ত—		“বনফুল”—	
গ্রামের পথ (কবিতা)	১০২	পাখী (কবিতা)	৭৩৪
সত্যেন্দ্র-তর্পণ (কবিতা)	৫৭৫	চোখ গেল (গল্প)	৮২৬
পঞ্চশত ইত্যাদি		বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল—	
প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত—		শারদীয় উৎসব	৭৭৯
কৃষ্ণের শান্তি (গল্প)	৬৫০	বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী—	
প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সার্—		মৃত্যুর খেলা	১৬৬
সাধনা ও সিদ্ধি	৮১	জাতক (সমালোচনা)	১৬৯
চরকা ও বস্ত্র-সমস্তায় বঙ্গমহিলার কর্তব্য	২৫৩	শূদ্র (আলোচনা)	১৬৭
বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতবাসীর স্থান-নির্ণয়	৩১৫	পুস্তক-পরিচয়	

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ—		বাস (কবিতা)	... ৪৫৩
উমারগী (গল্প)	... ৫১৪	বর্ষা-প্রাতে (গান)	... ৪৫৩
বৌদ্ধলনাথ ঘোষ—		আসা-যাওয়ার মাঝখানে (কবিতা)	... ৫৪৫
ফাউন্টেন্ পেন্ সাক্, কহা (আলোচনা)	... ৪৪১	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (কবিতা)	... ৫৭৪
বেতাল ভট্ট—		ভাসে (গান)	... ৬২৫
অগ্নির প্রতি কুহুম (কবিতা)	... ৫৩	গোপনবাসী (গান)	... ৬৩৫
মণীন্দ্রনাথ রায়, এম-এ—		বিভাগগর	... ৭৫৯
বাংলা দেশের স্ত্রীশিক্ষাসংস্কার	... ৩৭১	রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—	
মণীন্দ্রমোহন বসু, এম-এ—		পাখীর গল্প	... ৮৯
দাস-বিক্রয়ের প্রাচীন দলিল (সচিত্র)	... ১৮৭	রমেশ বসু—	
মণীন্দ্রলাল বসু—		সাইবেরিয়ার বৃষী জাতি (সচিত্র)	... ১৭৩
রমলা (উপজ্ঞাস) ৪০, ২০২, ৩৫৮, ৪৮৪, ৭০৯, ৮১২		পুস্তক-পরিচয়	
• সব-পেয়েছির দেশ (গল্প)	... ১৯২	রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম-এ, পি-আর-এস,	
মহম্মদ শহীদুল্লাহ, এম-এ—		পি এইচ-ডি—	
শূদ্র (আলোচনা)	... ২৭৫	স্বদেশীর দ্বিতীয় যুগ	... ৬৫১
মহি-উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী—		রাধাচরণ চক্রবর্তী—	
কমলা মিঠে করা	... ৪২৬	কাগুন বাতাস (কবিতা)	... ৭২
মহেশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি-টি—		সন্ধ্যা (কবিতা)	... ৭৮
পুস্তক-পরিচয়		চৈত্র (কবিতা)	... ১১৬
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান—		বর্ষা (কবিতা)	... ৪২৪
মুহলমান মেহেদের আত্মা (আলোচনা)	... ৭৩৩	প্রেম (কবিতা)	... ৬৭৩
বতীন্দ্রমোহন বাগ্চী, বি-এ—		আমার খোকার হাসি (কবিতা)	... ৭১৯
কবিরাজ সত্যেন্দ্রনাথ (কবিতা)	... ৫৯৮	কালো মেঘ (কবিতা)	... ৭৩১
বতীন্দ্রমোহন সিংহ চৌধুরী—		মুখর আধার (কবিতা)	... ৮০০
ভারতে মদের আমদানী	... ৪৫২	ঘামের ফোঁটা (কবিতা)	... ৮৬১
বহুনাথ সর্কার, এম-এ, পি-আর-এস—		রামহুলাল বিদ্যানিধি—	
বাঙ্গলার স্বাধীন জমিদারদের পতন	... ৬৩৬	সপ্তে ব্রত	... ২৭৪
যামিনী বাস্তব সেন, বি-এল—		রিজিয়া বেগম—	
রসসৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল	... ৭৮৭	খন্দর-খান্নি-কুদ্র (আলোচনা)	... ৫৬৩
যোগেশচন্দ্র রায়, এম-এ, রায় বাহাদুর, বিজ্ঞানিধি,		ললিতকুমার মিত্র—	
বিজ্ঞানভূষণ ইত্যাদি—		বেরির চরকা ও তাঁত (আলোচনা)	... ৪৪২
খাণ্ড কথা (সমালোচনা)	... ২৩২	চরকা—নূতন ও পুরাতন	... ৯২২
চরকা ও খন্দর	... ৩২৪	শান্তা দেবী, বি-এ—	
ভাঙের ফেন গালা হয় কেন (আলোচনা)	... ৫৬৬	“বাণীভবন”	... ৩৭৫
চরকার হুতা	... ৬৫৯	মানের দায় (গল্প)	... ৩৯৬
খন্দর চাই কেন ?	... ৭৮২	শৈলেন্দ্রনাথ রায়—	
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—		বৃদ্ধার বৈধব্য (কবিতা)	... ৬০
মুক্তধারা (নাটক)	... ১	ইলা জামরিশ্, পি এইচ-ডি (ভিয়েনা)—	
পুনরাবৃত্তি (কথিকা)	... ১৫৫	স্বতঃস্ফূর্তি (সচিত্র)	... ৫৪৩
		ভারতীয় শিল্প-প্রতিভা (সচিত্র)	... ৮০৩

বিত্তভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ— উমারানী (গল্প)	... ৫১৪	ঘাস (কবিতা)	... ৪৫৩
বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ— ফাউন্টেন্ পেন্ সাক্ করা (আলোচনা)	... ৪৪১	বর্ষা-প্রাতে (গান)	... ৪৫৩
বেতাল ভট্ট— অলির প্রতি কুমুম (কবিতা)	... ৫৩	আসা-যাওয়ার মাঝখানে (কবিতা)	... ৫৪৫
মণীন্দ্রনাথ রায়, এম-এ— বাংলা দেশের জৌশিকাসংস্কার	... ৩৭১	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (কবিতা)	... ৫৭৪
মণীন্দ্রমোহন বসু, এম-এ— দাস-বিক্রয়ের প্রাচীন দলিল (সচিত্র)	... ১৮৭	ভাসে (গান)	... ৬৩৫
মণীন্দ্রলাল বসু— রমলা (উপন্যাস) ৪০, ২০২, ৩৫৮, ৪৮৪, ৭০৯, ৮১২ •সব-পেয়েছির দেশে (গল্প)	... ১২২	গোপনবাসী (গান)	... ৬৩৫
মহম্মদ শহীদুল্লাহ, এম-এ— শুভ্র (আলোচনা)	... ২৭৫	বিদ্যানাগর	... ৭৫৯
মহি-উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী— কমলা মিঠে করা	... ৪২৬	রমেশচন্দ্র শুট্টাচার্য— পাখীর গল্প	... ৮৯
মহেশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি-টি— পুস্তক-পরিচয়		রমেশ বসু— সাইবেরিয়ার বৃষ্টি জাতি (সচিত্র)	... ১৭৩
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান— সুন্দরানী মেয়েদের আশ্রয় (আলোচনা)	... ৭৩৩	পুস্তক-পরিচয়	
মতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী, বি-এ— কবিত্ব সত্যেন্দ্রনাথ (কবিতা)	... ৫২৮	রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম-এ, পি-আর-এস, পি এইচ-ডি— স্বদেশীর দ্বিতীয় যুগ	... ৬৫১
মতীন্দ্রমোহন সিংহ চৌধুরী— ভারতে শ্রমের আমদানী	... ৪৫২	রাধাচরণ চক্রবর্তী— কাল্পন বাতাস (কবিতা)	... ৭২
মহুনাথ সর্কার, এম-এ, পি-আর-এস— বাঙ্গলার স্বাধীন জমিদারদের পতন	... ৬৩৬	সন্ধ্যা (কবিতা)	... ৭৮
মামিনী বাসু সেন, বি-এল— রসস্রুতিতে ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল	... ৭৮৭	চৈত্র (কবিতা)	... ১১৬
যোগেশচন্দ্র রায়, এম-এ, রায় বাহাদুর, বিজ্ঞানিপি, বিজ্ঞানভূষণ ইত্যাদি— খাণ্ড কথা (সমালোচনা)	... ২৩২	বর্ষা (কবিতা)	... ৪২৪
চরকা ও খন্দর	... ৩২৪	প্রেম (কবিতা)	... ৬৭৩
ভাতের কেন গালা হয় কেন (আলোচনা)	... ৫৬৬	আমার খোকার হাসি (কবিতা)	... ৭১৯
চরকার সূতা	... ৬৫৯	কালো মেঘ (কবিতা)	... ৭৩১
খন্দর চাই কেন ?	... ৭৮২	মুখর আঁধার (কবিতা)	... ৮০০
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— মুক্তধারা (নাটক)	... ১	ঘামের ফোঁটা (কবিতা)	... ৮৬১
পুনরাবৃত্তি (কথিকা)	... ১৫৫	রামদুলাল বিদ্যানিধি— সংশ্লিষ্ট ব্রত	... ২৭৪
		রিক্সিয়া বেগম— খন্দর-খাদি-কুদ্ (আলোচনা)	... ৫৬৩
		ললিতকুমার মিত্র— বেরির চরকা ও তাঁত (আলোচনা)	... ৪৪২
		চরকা—নূতন ও পুরাতন	... ৯২২
		শান্তা দেবী, বি-এ— “বাণীভবন”	... ৩৭৫
		মানের দায় (গল্প)	... ৩৯৬
		শৈলেন্দ্রনাথ রায়— বৃক্ষার বৈধব্য (কবিতা)	... ৬০
		টোলা ক্রামরিশ, পি এইচ-ডি (ভিয়েনা)— স্বতঃস্ফূর্ত (সচিত্র)	... ৫৪৩
		ভারতীয় শিল্প-প্রতিভা (সচিত্র)	... ৮০৩

সতীশচন্দ্র সেন, এম এ—		স্বপ্নেশ্বর শর্মা—	
সমস্যা (গল্প)—	... ৮০১	মুক (কবিতা)	... ৮৫১
সত্যচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল—		সনেটের প্রতি (কবিতা)	... ৮৫১
তিমিতুণ্ড পক্ষী (সচিত্র)	... ৫৬১	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ, সি-অ'ই-ই, মহঃমহো- পাধ্যায়—	
সন্তোষকুমার বসু—		কান্তকবি রজনীকান্ত (সমালোচনা -- সচিত্র)	৭৩৫
নাঠে আগুন (আলোচনা)	... ৮৭২	হরিপদ তেওয়ারী—	
সীতা দেবী, বি-এ—		অমির ফয়জল (সচিত্র)	... ১৭৬
স্মৃতি (গল্প)	... ৬৫	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—	
সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়—		মনসা পূজা (আলোচনা)	... ৭৩৩
রাজা (কবিতা)	... ২৭৪	হৃষীকেশ চৌধুরী—	
সুধাবিন্দু বিশ্বাস—		নারী (কবিতা)	... ১২৪
“মাটির ওলায় আগুন” (আলোচনা)	... ৫৬৫	চিরন্তনী (কবিতা)	... ৭০২
সুধীরকুমার চৌধুরী, বি-এ—		হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, বি-এ—	
অচেনা (কবিতা)	... ১২৭	পুস্তকস্বাভূত যা বিছা পরহস্তগতং ধনম্ (গল্প)	... ৯০
নিরুপায় (কবিতা)	... ২০১	মহিলা-প্রগতি	... ৯৩
নূতন মানুষ	... ২২৪	চীন দেশের নারী (সচিত্র)	... ৯৬
রো-রিক্ (সচিত্র)	... ৪২৭	ইজিপ্টের নারী (সচিত্র)	... ২৫৫
পঞ্চশস্য ইত্যাদি		বর্ষায় (কবিতা)	... ২৭২
সুনির্মল বসু—		নিউজিল্যান্ডের নারী (সচিত্র)	... ৩৭৬
গাটী তেওয়ারী (গল্প)	... ৮৭	হাউস্ অব্ লর্ডস্-এর প্রথম নারী সভা (সচিত্র)	... ৫৮২
শেয়াল কেন লুকা লুকা করে (গল্প)	... ২৭৩	পারস্যের নারী (সচিত্র)	... ৫৪৬
আষাঢ়ের গান (কবিতা)	... ৪১৬	বনমাল্যবৈ কথ্য (সচিত্র)	... ৫৫২
সাইকেলে বিপদ (কবিতা)	... ৫৫৪	টরেন্স্ স্ট্রিট্ এবং নিউ গায়ের নারী (সচিত্র)	... ৭২৪
সুনীতি দেবী, বি-এ—		ম্যাডাগাস্কারের নারী (সচিত্র)	... ৮৪৭
বিশ্বদরদী (কবিতা)	... ৫৩৭	পঞ্চশস্য ইত্যাদি	
সুবোধচন্দ্র রায়—		হেমেন্দ্রকুমার রায়—	
মহাপ্রস্থান (কবিতা)	... ৫৯৭	শব্দরের গান (কবিতা)	... ৯২১
স্বপ্নেশচন্দ্র নন্দী—		হেমেন্দ্রনাথ সান্যাল—	
শেখ্ সাদীর কাসিদা ও গজল্ (সচিত্র)	... ১৮১	পুনর্মুখিক (গল্প)	... ৭০৬
স্বপ্নেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—		হেমেন্দ্রলাল রায়—	
সত্যেন্দ্র-স্মরণে (কবিতা)	... ৫৭৭	ভারতবর্ষ ১২৯, ২৮০, ৪৪৪, ৬০৭, ৭৪৫, ৮৭৯	
স্বপ্নেশানন্দ ভট্টাচার্য্য—		মিউনিসিপ্যালিটির মহিলা কমিশনার	... ৩৮৩
শেখালি (কবিতা)	... ৮৪২		

সতীশচন্দ্র সেন, এম এ—		সুরেশ্বর শর্মা—	
সংস্যা (গল্প)—	... ৮০১	মুক (কবিতা)	... ৮৫১
সত্যচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল—		সনেটের প্রতি (কবিতা)	... ৮৫১
তিমিতুণ্ড পক্ষী (সচিত্র)	... ৫৬১	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ, সি-আই-ই, মহামহো- পাধ্যায়—	
সন্তোষকুমার বসু—		কাস্তকবি রজনীকান্ত (সমালোচনা -- সচিত্র)	৭৩৫
মাঠে আশ্বিন (আলোচনা)	... ৮৭২	হরিপদ তেওয়ারী—	
সীতা দেবী, বি-এ—		অমির কয়লা (সচিত্র)	... ১৭৬
সুমিত্রা (গল্প)	... ৬৫	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—	
সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়—		মনসা পূজা (আলোচনা)	... ৭৩৩
রাজা (কবিতা)	... ২৭৪	জয়ীকেশ চৌধুরী—	
সুধাবিন্দু বিশ্বাস—		নারী (কবিতা)	... ১২৪
"মাটির তলায় আশ্বিন" (আলোচনা)	... ৫৬৫	চিরস্তনী (কবিতা)	... ৭০২
সুধীরকুমার চৌধুরী, বি-এ—		হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, বি-এ—	
অচেনা (কবিতা)	... ১২৭	পুস্তকহা তু যা বিজ্ঞা পরহস্তগতং ধনম্ (গল্প)	... ৯০
নিকপায় (কবিতা)	... ২০১	মহিলা-প্রগতি	... ৯৩
নূতন মামুষ	... ২২৪	চীন দেশের নারী (সচিত্র)	... ৯৬
রো-এরিক্ (সচিত্র)	... ৪২৭	ইজিপ্টের নারী (সচিত্র)	... ২৫৫
পঞ্চ শস্য ইত্যাদি		বর্ষায় (কবিতা)	... ২৭২
সুনির্মল বসু—		নিউজিল্যান্ডের নারী (সচিত্র)	... ৩৭৬
গাঁটো তেওয়ারী (গল্প)	... ৮৭	হাউস্ অব বর্ডস্-এর প্রথম নারী সভা	
শেখাণ কেন জুকা জুকা করে (গল্প)	... ২৭৩	(সচিত্র)	... ৩৮২
আষাঢ়ের গান (কবিতা)	... ৪১৬	পারস্যের নারী (সচিত্র)	... ৫৪৬
সাইকেলে বিপদ (কবিতা)	... ৫৫৪	বনমাহুয়ের কথা (সচিত্র)	... ৫৫২
সুনীতি দেবী, বি-এ—		টরেন্স্ ট্রেন্ট্ এবং নিউ গার্ডেনার নারী	
বিশ্বদরদী (কবিতা)	... ৫৩৭	(সচিত্র)	... ৭২৪
সুবোধচন্দ্র রায়—		ম্যাডাগাস্কারের নারী (সচিত্র)	... ৮৪৭
মহাপ্রস্থান (কবিতা)	... ৫৯৭	পঞ্চশস্ত ইত্যাদি	
সুরেশচন্দ্র নন্দী—		হেমেন্দ্রকুমার রায়—	
শেখ সাদীর কাসিদা ও গজল্ (সচিত্র)	... ১৮১	খন্দের গান (কবিতা)	... ৯২১
সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—		হেমেন্দ্রনাথ সান্যাল—	
সত্যেন্দ্র-স্মরণে (কবিতা)	... ৫৭৭	পুনর্মূবিক (গল্প)	... ৭০৬
সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য—		হেমেন্দ্রলাল রায়—	
শেফালি (কবিতা)	... ৮৪২	ভারতবর্ষ ১২৯, ২৮০, ৪৪৪, ৬০৭, ৭৪৫, ৮৭৯	
		নিউজিল্যান্ডের নারী কমিশনার	... ৩৮৩



“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

২২শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩২৯

১ম সংখ্যা

মুক্তধারা

[উত্তরকূট পার্বত্য প্রদেশ । সেখানকার উত্তরবৈরব-মন্দিরে যাইবার পথ । দূরে আকাশে একটা অল্পভেদী লৌহযন্ত্রের মাথাটা দেখা যাইতেছে এবং তাহার অপর-দিকে ভৈরব-মন্দির-চূড়ার ত্রিশূল । পথের পার্শ্বে আম-বাগানে রাজা রণজিতের শিবির । আজ অমাবস্যায় ভৈরবের মন্দিরে আরতি, সেখানে রাজা পদব্রজে যাইবেন, পথে শিবিরে বিশ্রাম করিতেছেন । তাঁহার সভার যন্ত্ররাজ বিভূতি বহুবৎসরের চেষ্ঠায় লৌহযন্ত্রের বাঁধ তুলিয়া মুক্তধারা ঝর্ণণাকে বাঁধিয়াছেন । এই অসামান্য কীটিকে পুরস্কৃত করিবার উপলক্ষ্যে উত্তরকূটের সমস্ত লোক ভৈরব-মন্দির-প্রাঙ্গণে উৎসব করিতে চলিয়াছে । ভৈরব-মন্ড্রে দীক্ষিত সন্ন্যাসীদল সমগুদিন হুতবগান করিয়া বেড়াইতেছে । তাহাদের কাহারো হাতে ধূপাধারে ধূপ জলিতেছে, কাহারো হাতে শঙ্খ, কাহারো ঘণ্টা । গানের মাঝে মাঝে তালে তালে ঘণ্টা বাজিতেছে ।]

গান

জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর,

জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর,

শঙ্কর শঙ্কর ।

জয় মংশয়ভেদন,

জয় বন্ধন-ছেদন,

জয় সংকট-সংহর

শঙ্কর শঙ্কর ।

[সন্ন্যাসীদল গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল । পূজার নৈবেদ্য লইয়া একজন বিদেশী পথিকের প্রবেশ । উত্তর-কূটের নাগরিককে সে প্রশ্ন করিল,—

আকাশে ওটা কি গড়ে' তুলেচে ? দেখতে ভয় লাগে ।

নাগরিক

জান না ? বিদেশী বুঝি ? ওটা যন্ত্র ।

পথিক

কিসের যন্ত্র ?

নাগরিক

আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতি পঁচিশ বছর ধরে' যেটা তৈরি করছিল, সেটা ঐ ত শেষ হয়েছে, তাই আজ উৎসব ।

পথিক

যন্ত্রের কাজটা কি ?

নাগরিক

মুক্তধারা ঝর্ণণাকে বেঁধেচে ।



“সত্যম্ শিবম্ হৃদয়ম্ ।”

“নামস্মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

২২শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩২৯

১ম সংখ্যা

মুক্তধারা

[উত্তরকূট পার্বত্য প্রদেশ । সেখানকার উত্তরভৈরব-
মন্দিরে বাইবার পথ । দূরে আকাশে একটা অল্পভেদী
লৌহযন্ত্রের মাথাটা দেখা যাইতেছে এবং তাহার অপ-
দিকে ভৈরব-মন্দির-চূড়ার ত্রিশূল । পথের পার্শ্বে আম-
বাগানে রাজা রণজিতের শিবির । আন্ধ অমাবস্তার
ভৈরবের মন্দিরে আরতি, সেখানে রাজা পদত্রেয়ে যাইবেন,
পথে শিবিরে বিশ্রাম কবিতেছেন । তাঁহার সভাব
যন্ত্ররাজ বিভূতি বহুবংশরের চেষ্ঠায় লৌহযন্ত্রের বাঁধ তুলিয়া
মুক্তধারা ঝরুণাকে বাধিয়াছেন । এই অসামান্য কীর্তিকে
প্রস্তুত করিবার উপলক্ষ্যে উত্তরকূটের সমস্ত লোক ভৈরব-
মন্দির-প্রাঙ্গণে উৎসব করিতে চলিয়াছে । ভৈরব-মন্দি-
রীক্ষিত সন্ন্যাসীদল সমস্তদিন স্তবগান করিয়া বেড়াইতেছে ।
তাঁহাদের কাহারো হাতে ধূপাধারে ধূপ জলিতেছে,
কাহারো হাতে শঙ্খ, কাহারো ঘণ্টা । গানের মাঝে মাঝে
তালে তালে ঘণ্টা বাজিতেছে ।]

গান

জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর,
জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর,
শঙ্কর শঙ্কর ।

জয় সংশয়ভেদন,

জয় বন্ধন-ছেদন,

জয় সংকট-সংহর

শঙ্কর শঙ্কর ।

[সন্ন্যাসীদল গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল । পূজার
নৈবেদ্য লইয়া একজন বিদেশী পথিকের প্রবেশ । উত্তর-
কূটের নাগরিককে সে প্রশ্ন করিল,—

আকাশে ওটা কি গড়ে? তুলেচে? দেখতে ভয় লাগে ।

নাগরিক

জান না? বিদেশী বুঝি? ওটা যন্ত্র ।

পথিক

কিসের যন্ত্র?

নাগরিক

আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতি পঁচিশ বছর ধরে' ঘেঁটা তৈরি
করছিল, সেটা ঐ ত শেষ হয়েছে, তাই আন্ধ উৎসব ।

পথিক

যন্ত্রের কাজটা কি?

নাগরিক

মুক্তধারা ঝরুণাকে বেঁধেচে ।

পথিক

বাবারে! ওটাকে অস্থরের মাথার মত দেখাচ্ছে, মাংস নেই, চোয়াল বোলা। তোমাদের উত্তরকূটের শিয়রের কাছে অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে; দিনরাত্তির দেখতে দেখতে তোমাদের প্রাণপুরুষ যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

নাগরিক

আমাদের প্রাণপুরুষ মজবুৎ আছে, ভাবনা কোরো না।

পথিক

তা হতে পারে, কিন্তু ওটা অমনতর সূর্যাতারার সামনে মেলে রাখবার জিনিস নয়, ঢাকা দিতে পারলেই ভাল হ'ত। দেখতে পাচ্চ না বেন দিন-রাত্তির সমস্ত আকাশকে রাগিয়ে দিচ্ছে।

নাগরিক

আজ ভৈরবের আরতি দেখতে যাবে না?

পথিক

দেখব বলেই বেরিয়েছিলুম। প্রতিবৎসরই ত এই সময় আসি, কিন্তু মন্দিরের উপরের আকাশে কখনো এমনতর বাধা দেখি নি। হঠাৎ ঐটের দিকে তাকিয়ে আজ আমার গা শিউরে উঠল—ও যে অমন করে মন্দিরের মাথা ছাড়িয়ে গেল এটা বেন স্পষ্টর মত দেখাচ্ছে। দিয়ে আসি নৈবেদ্য, কিন্তু মন প্রসন্ন হচ্ছে না।

[প্রস্থান।]

[একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ। একখানি শুভ্র চাদর তাহার মাথা পরিয়া সর্বাপ্র ঢাকিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছে।]

স্ত্রীলোক

স্বমন! আমার স্বমন! (নাগরিকের প্রতি) বাবা আমার স্বমন এখনো কিরলো না! তোমরা ত সবাই ফিরেচ।

নাগরিক

কে তুমি?

স্ত্রীলোক

আমি জনাই গাঁয়ের অধা। সে যে আমার চোখের আলো, আমার প্রাণের নিশ্বাস, আমার স্বমন!

নাগরিক

তার কি হয়েছে বাছা?

অধা

তাকে যে কোথায় নিয়ে গেল। আমি ভৈরবের মন্দিরে পূজো দিতে গিয়েছিলুম—কিরে এসে দেখি তাকে নিয়ে গেছে।

পথিক

তা হলে মুক্তদারার বাধ বাধতে তাকে নিয়ে গিয়েছিল।

অধা

আমি শুনেচি এই পথ দিয়ে তাকে নিয়ে গেল, ঐ গৌরীশিখরের পশ্চিমে—সেখানে আমার দৃষ্টি পৌছয় না, তার পরে আর পথ দেখতে পাই নে।

পথিক

কৈদে কি হবে? আমরা চলেছি ভৈরবের মন্দিরে আরতি দেখতে। আজ আমাদের বড় দিন, তুমিও চল।

অধা

না বাবা, সেদিনও ত ভৈরবের আরতিতে গিয়েছিলুম। তখন থেকে পূজো দিতে যেতে আমার ভয় হয়। দেখ আমি বলি তোমাকে, আমাদের পূজো বাবার কাছে পৌঁছেছে না—পথের থেকে কেড়ে নিচ্ছে।

নাগরিক

কে নিচ্ছে?

অধা

যে আমার বৃকের থেকে স্বমনকে নিয়ে গেল সে। সে যে কে এখনো ত বুঝলুম না। স্বমন, আমার স্বমন, বাবা স্বমন!

[উভয়ের প্রস্থান।]

[উত্তরকূটের যুবরাজ অভিজিৎ যশ্বরাজ বিভূতির নিকট দূত পাঠাইয়াছেন। বিভূতি যখন মন্দিরের দিকে চলিয়াছে তখন দূতের সহিত তাহার সাক্ষাৎ।]

দূত

যশ্বরাজ-বিভূতি, যুবরাজ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

বিভূতি

কি তাঁর আদেশ?

পথিক

বাবারে! ওটাকে অস্থরের মাথার মত দেখাচ্ছে, মাংস নেই, চোখাল ঝোলা। তোমাদের উত্তরকূটের শিয়রের কাছে অমন ই। করে' দাড়িয়ে; দিনরাত্তির দেখতে দেখতে তোমাদের প্রাণপুরুষ রে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

নাগরিক

আমাদের প্রাণপুরুষ মজবুৎ আছে, ভাবনা কোনো না।

পথিক

তা হতে পারে, কিন্তু ওটা অমনতর সূর্য্যতারার সামনে মেলে রাখবার জিনিষ নয়, ঢাকা দিতে পারলেই ভাল হ'ত। দেখতে পাচ্চ না যেন দিন-রাত্তির সমস্ত আকাশকে রাগিয়ে দিচ্ছে।

নাগরিক

আজ ভৈরবের আরতি দেখতে যাবে না?

পথিক

দেখব বলেই বেরিয়েছিলুম। প্রতিবৎসরই ত এই সময় আসি, কিন্তু মন্দিরের উপরের আকাশে কখনো এমনতর বাধা দেখি নি। হঠাৎ এটের দিকে তাকিয়ে আজ আমার গা শিউরে উঠল—ও যে অমন কবে' মন্দিরের মাথা ছাড়িয়ে গেল এটা যেন স্পষ্টর মত দেখাচ্ছে। দিবে আসি নৈবেদ্য, কিন্তু মন প্রশন্ন হচ্ছে না।

[প্রস্থান।]

[একজন জীলোকের প্রবেশ। একখানি শুভ্র চাদর তাহার মাথা বিরিধা সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছে।]

জীলোক

স্বমন! আমার স্বমন! (নাগরিকের প্রতি) বাবা আমার স্বমন এখনো কিরুলো না! তোমরা ত সবাই ফিরেচ।

নাগরিক

কে তুমি?

জীলোক

আমি জনাই গাঁধের অধ্বা। সে যে আমার চোখের আলো, আমার প্রাণের নিশাস, আমার স্বমন!

নাগরিক

তার কি হয়েছে বাছা?

অধ্বা

তাকে যে কোথায় নিয়ে গেল। আমি ভৈরবের মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিলুম—ফিরে এসে দেখি তাকে নিয়ে গেছে।

পথিক

তা হলে মুরুধারার বাধ বাধতে তাকে নিয়ে গিয়েছিল।

অধ্বা

আমি শুনেচি এই পথ দিয়ে তাকে নিয়ে গেল, ঐ গৌরীশিখরের পশ্চিমে—সেখানে আমার দৃষ্টি পৌঁছয় না, তার পরে আর পথ দেখতে পাই নে।

পথিক

কেঁদে কি হবে? আমরা চলেছি ভৈরবের মন্দিরে আরতি দেখতে। আজ আগাদের বড় দিন, তুমিও চল।

অধ্বা

না বাবা, সেদিনও ত ভৈরবের আরতিতে গিয়েছিলুম। তখন থেকে পূজা দিতে যেতে আমার ভয় হয়। দেখ আমি বলি তোমাকে, আমাদের পূজা বারার কাছে পৌঁচছে না—পথের থেকে কেড়ে নিচ্ছে।

নাগরিক

কে নিচ্ছে?

অধ্বা

যে আমার বুকের থেকে স্বমনকে নিয়ে গেল সে। সে যে কে এখনো ত বুঝলুম না। স্বমন, আমার স্বমন, বাবা স্বমন!

[উভয়ের প্রস্থান।]

[উত্তরকূটের যুবরাজ অভিজিৎ যজ্ঞরাজ বিভূতির নিকট দূত পাঠাইয়াছেন। বিভূতি যখন মন্দিরের দিকে চলিয়াছে তখন দূতের সহিত তাহার সাক্ষাৎ।]

দূত

যজ্ঞরাজ-বিভূতি, যুবরাজ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

বিভূতি

কি তাঁর আদেশ?

দূত

এতকাল ধরে' তুমি আমাদের মুক্তধারার বরণাকে বাধ দিয়ে বাধতে লেগেচ। বারবার ভেঙে গেল, কত লোক ধুলোবাঁলি চাপা পড়ল, কত লোক বস্তায় ভেসে গেল। আজ শেষে—

বিভূতি

তাদের প্রাণ দেওয়া ব্যর্থ হয় নি। আমার বাধ সম্পূর্ণ হয়েছে।

দূত

শিবতরাইয়ের প্রজারা এখনো এ খবর জানে না। তারা বিশ্বাস কর্তেই পারে না, যে দেবতা তাদের যে জল দিয়েছেন কোনো মানুষ তা বন্ধ করতে পারে।

বিভূতি

দেবতা তাদের কেবল জলই দিয়েছেন, আমাকে দিয়েছেন জলকে বাধবার শক্তি।

দূত

তারা নিশ্চিত আছে, জানে না আর সপ্তাহ পরেই তাদের চাষের ক্ষেত—

বিভূতি

চাষের ক্ষেতের কথা কি বল্চ ?

দূত

সেই ক্ষেত শুকিয়ে মারাই কি তোমার বাধ বাধার উদ্দেশ্য ছিল না ?

বিভূতি

বাঁলি-পাথর-জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে' মানুষের বুদ্ধি হবে জয়ী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন্ চাষীর কোন্ ভূটার ক্ষেত মারা যাবে সে কথা ভাববার সময় ছিল না।

দূত

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করছেন এখনো কি ভাববার সময় হয় নি ?

বিভূতি

না, আক্ষিযন্ত্রশক্তির মহিমার কথা ভাব্চি।

দূত

ক্ষুধিতের কান্না তোমার সে ভাবনা ভাঙাতে পারবে না ?

বিভূতি

না। জলের বেগে আমার বাধ ভাঙে না, কান্নার জোরে আমার যন্ত্র টলে না।

দূত

অভিশাপের ভয় নেই তোমার ?

বিভূতি

অভিশাপ ! দেখ, উত্তরকূটে যখন মজুর পাওয়া যাচ্ছিল না তখন রাজার আদেশে চণ্ডপতনের প্রত্যেক ঘর থেকে আঠারো বছরের উপর বয়সের ছেলেকে আমরা আনিয়ে নিয়েছি। তারা ত অনেকেই করেছে নি। দেখানকার কত মায়ের অভিশাপের উপর আমার যন্ত্র জয়ী হয়েছে। দৈবশক্তির সঙ্গে যার লড়াই, মানুষের অভিশাপকে সে গ্রাহ্য করে ?

দূত

যুবরাজ বল্চেন কীষ্টি গড়ে' তোলবার গৌরব ত লাভ হয়েছেই, এখন কীষ্টি নিজে ভাঙবার যে আরো বড় গৌরব তাই লাভ কর।

বিভূতি

কীষ্টি যখন গড়া শেষ হয় নি তখন সে আমার ছিল ; এখন সে উত্তরকূটের সকলের। ভাঙবার অধিকার আর আমার নেই।

দূত

যুবরাজ বল্চেন ভাঙবার অধিকার তিনিই গ্রহণ করবেন।

বিভূতি

স্বয়ং উত্তরকূটের যুবরাজ এমন কথা বলেন ? তিনি কি আমাদেরই নন ? তিনি কি শিবতরাইয়ের ?

দূত

তিনি বলেন—উত্তরকূটে কেবল যন্ত্রের রাজত্ব নয়, সেখানে দেবতাও আছেন, এই কথা প্রমাণ করা চাই।

বিভূতি

যন্ত্রের জোরে দেবতার পদ নিজেই নেব এই কথা প্রমাণ করবার ভার আমার উপর। যুবরাজকে বোলো আমার এই বাধবন্ধের মুঠো একটুও আলগা করতে পারা যায় এমন পথ খোঁজা রাখি নি।

দূত

বিভূতি

এতকাল ধরে' তুমি আমাদের মুক্তধারার স্বর্ণাঙ্কে বাঁধ দিয়ে বাঁধতে লেগেচ। বারবার ভেঙে গেল, কত লোক ধূলোবালি চাপা পড়ল, কত লোক বন্ধ্যা ভেসে গেল। আজ শেষে—

না। জলের বেগে আমার বাঁধ ভাঙে না, কামার জোরে আমার স্বর্ণ টলে না।

দূত

অভিশাপের ভয় নেই তোমার ?

বিভূতি

বিভূতি

তাদের প্রাণ দেওয়া ব্যর্থ হয় নি। আমার বাঁধ সম্পূর্ণ হায়েচ।

অভিশাপ! দেখ, উত্তরকূটে যখন মজুর পাওয়া যাচ্ছিল না তখন রাজার আদেশে চণ্ডপতনের প্রত্যেক ঘর থেকে আঠারো বছরের উপর বয়সের ছেলেকে আমরা আনিয়ে নিয়েছি। তারা ত অনেকেই কেরে নি। সেখানকার কত মায়ের অভিশাপের উপর আমার স্বর্ণ জরী হয়েছে। দৈবশক্তির সঙ্গে যার লড়াই, মানুষের অভিশাপকে সে গ্রাহ্য কবে ?

দূত

দূত

শিবতরাইয়ের প্রজারা এখনো এ খবর জানে না। তাঁরা বিশ্বাস করুতেই পারে না, বে, দেবতা তাদের যে জল দিয়েছেন কোনো মানুষ তা বন্ধ করুতে পারে।

যুবরাজ বলছেন কীর্তি গড়ে' তোলবার গৌরব ত লাভ হয়েছেই, এখন কীর্তি নিজে ভাঙবার যে আরো বড় গৌরব তাই লাভ কর।

বিভূতি

দেবতা তাদের কেবল জলই দিয়েছেন, আমাকে দিয়েছেন জলকে বাঁধবার শক্তি।

দূত

বিভূতি

তাঁরা নিশ্চিত আছে, জানে না আর সপ্তাহ পরেই তাদের চাষের ক্ষেত—

কীর্তি যখন গড়া শেষ হয় নি তখন সে আমার ছিল, এখন সে উত্তরকূটের সকলের। ভাঙবার অধিকার আর আমার নেই।

বিভূতি

দূত

চাষের ক্ষেতের কথা কি বল্চ ?

যুবরাজ বলছেন ভাঙবার অধিকার তিনিই গ্রহণ করবেন।

দূত

বিভূতি

সেই ক্ষেত শুকিয়ে মারাই কি তোমার বাঁধ বাঁধার উদ্দেশ্য ছিল না ?

স্বয়ং উত্তরকূটের যুবরাজ এমন কথা বলেন ? তিনি কি আমাদেরই নন ? তিনি কি শিবতরাইয়ের ?

বিভূতি

দূত

বাগি-পাথর-জলের যড়যন্ত্র ভেদ করে' মানুষের বুদ্ধি হবে জরী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন্ চাষীর কোন্ ভূট্টার ক্ষেত মাঝা মাঝে সে কথা ভাববার সময় ছিল না।

তিনি বলেন—উত্তরকূটে কেবল যন্ত্রের রাজত্ব নয়, সেখানে দেবতাও আছেন, এই কথা প্রমাণ করা চাই।

দূত

বিভূতি

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করছেন এখনো কি ভাববার সময় হয় নি ?

যন্ত্রের জোরে দেবতার পদ নিজেই নেব এই কথা প্রমাণ করবার ভাব আমার উপর। যুবরাজকে বোলো আমার এই স্বাধীনতার মুঠো একটুও আলগা করুতে পাবা যায় এমন পথ খোঁসা রাখি নি।

বিভূতি

না, আশীষশক্তির মহিমার কথা ভাব্চি।

দূত

স্ববিতের কামা তোমার সে ভাবনা ভাঙতে পারবে না ?

দূত

ভাঙনের বিনি দেবতা তিনি সব সময় বড় পথ দিয়ে
চলাচল করেন না। তাঁর জন্তে বেসব ছিদ্রপথ থাকে
সে কারো চোখে পড়ে না।

বিভূতি (চমকিয়া)

হিঙ্গ? সে আবার কি? হিঙ্গের কথা তুমি কী
জান?

দূত

আমি কি জানি! যার জন্মবার দরকার তিনি
জেনে নেবেন।

[দূতের প্রস্থান।]

[উত্তরকূটের নাগরিকগণ উৎসব করিতে মন্দিরে
চলিয়াছে। বিভূতিকে দেখিয়া —]

১

বাঃ যন্ত্ররাজ, তুমি ত বেশ লোক! কখন ফাঁকি দিয়ে
আগে চলে' এসেচ টেরও পাইনি।

২

সে ত ওর চিরকালের অভ্যাস। ও কখন ভিতরে
ভিতরে এগিয়ে সবাইকে ছাড়িয়ে চলে যায় বোঝাই যায়
না। সেই ত আমাদের চব্বাগায়ের ছাড়া বিভূতি,
আমাদের একমুগ্ধ কৈলেশগুপ্তর কানমলা খেলে, আর
কখন সে আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে এসে এত বড়
কাণ্ডটা করে' বদল।

৩

ওয়ে গব্ব, ঝুড়িটা নিয়ে ইঁ করে' দাঁড়িয়ে রইলি
কেমন? বিভূতিকে আর কখনো চক্ষে দেখিস নি কি?
মালাগুলো বের কর, পরিবে দিই।

বিভূতি

থাক থাক আর নয়।

৩

আর নয় ত কি? যেমা তুমি হটাৎ মত্ত হয়ে উঠেচ
তেমনি তোমার গলাটা যদি উঠের মত হটাৎ লম্বা হয়ে
উঠে আর উত্তরকূটের সব মানুষে মিলে তার উপর
তোমার গলায় মালার বোঝা চাপিয়ে দিত তাহলেই ঠিক
মানাত।

২

ভাই, হরিণ ঢাকী ত এখনো এসে পৌছল না!

১

বেটা কুঁড়ের সন্দার, ওর পিঠের চামড়ায় ঢাকের চাটি
লাগালে তবে—

৩

সেটা কাজের কথা নয়। চাটি লাগাতে ওর হাত
আমাদের চেয়ে মজবুত।

৪

মনে করেছিলুম বিশাই সামস্তের রথটা চেয়ে এনে
আজ বিভূতিদাদার রথযাত্রা করাব। কিন্তু রাজাই নাকি
আজ পায়ে হেঁটে মন্দিরে যাবেন!

৫

ভালই হয়েছে। সামস্তের রথের বে দশা, একেবারে
দশরথ! পথের মধ্যে কথার কথার দশখানা হয়ে পড়ে।

৬

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! দশরথ! আমাদের লম্বা
এক-একটা কথা বলে ভাল! দশরথ!

৭

সাধে বলি! ছেলের বিয়েতে ঐ রথটা চেয়ে নিয়ে-
ছিলুম। যত চড়েছি তার চেয়ে টেনেচি অনেক বেশি!

৮

এক কাজ কর! বিভূতিকে কাঁধে করে' নিয়ে যাই!

বিভূতি

আরে কর কি! কর কি!

৯

না, না, এই ত চাই। উত্তরকূটের কোলে তোমার
জন্ম, কিন্তু তুমি আজ তার ঘাড়ে চেপেচ। তোমার মাথা
সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

[কাঁধের উপর লাঠি সাজাইয়া তাহার উপর বিভূতিকে
তুলিয়া লইল।]

সকলে

জয় যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়।

গান

নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র!

দূত

ভাঙনের যিনি দেবতা তিনি সব সময় বড় পথ দিয়ে
চলাচল করেন না। তাঁর জন্তে যেসব হিঙ্গপথ থাকে
সে কারো চোখে পড়ে না।

বিভূতি (চমকিয়া)

হিঙ্গ? সে আবার কি? ছিঙ্গের কথা তুমি কী
জান?

দূত

আমি কি জানি! যার জানবার দরকার তিনি
জেনে নেবেন।

[দূতের প্রস্থান।]

[উত্তরকূটের - নাগরিকগণ উৎসব করিতে মন্দিরে
চলিয়াছে। বিভূতিকে দেখিয়া —

১

বাঃ যজ্ঞরাজ, তুমি ত বেণ লোক! কখন ফাঁকি দিবে
আগে চলে' এসেচ. টেবণ পাইনি।

২

দে ত ওব চিরকালের অভ্যেস। ও কখন ভিতরে
ভিতরে. এগিষে সবাইকে ছাড়িষে চলে' ঘাষ বোঝাই ঘাষ
না। নেই ত আমাদের চব্বাগাধের ছাড়া বিভূতি,
আমাদের একদিকেই কৈলেশগুহর কানমলা খেলে, আর
কখন সে আমাদের সবাইকে ছাড়িষে এসে এত বড়
কাণ্ডটা করে' বন্ল।

৩

ওরে গব্ব, ঝুড়িটা নিয়ে হাঁ করে' দাঁড়িয়ে রইলি
কেন? বিভূতিকে আর কখনো চক্ষে দেখিস নি কি?
মালাগুলো. বের কর, পরিবে দিই।

বিভূতি

থাক থাক আর নব।

৩

আর নয় ত কি? ধোমা ভুঁগি হটাং মত্ত হয়ে উঠেচ
তেমনি তোমার গলাটা যদি উটেব মত হটাং লম্বা হয়ে
উঠত আর উত্তরকূটের সব মানুষে মিলে তার উপর
তোমার গলায় মালাব বোঝা চাপিয়ে দিত তাহলেই ঠিক
মানাত।

২

ভাই, হরিণ ঢাকী ত এখনো এসে পৌছল না!

১

বেটা কুঁড়ের সন্দাব, ওর পিঠের চাণ্ডাঘ ঢাকের চাটি
লাগালে তবে—

৩

সেটা কাজের কথা নয়। চাটি লাগাতে ওর হাত
আমাদের চেয়ে মজবুৎ।

৪

মনে কবেছিলুম বিশাই সামন্তের রথটা চেখে এনে
আজ বিভূতিদাদার রথযাত্রা করাব। কিন্তু রাজাই নাকি
আজ পায়ে হেঁটে মন্দিরে যাবেন!

৫

ভালই হয়েছে। সামন্তের রথের বে দশা, একেবাবে
দশরথ! পথের মধ্যে কথাষ কথায় দশখানা হয়ে পড়ে।

৬

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। দশরথ! আমাদের লম্বু
এক-একটা কথা বলে ভাল! দশরথ!

৫

সাধে বলি! ছেলের বিষেতে ঐ বথটা চেখে নিয়ে-
ছিলুম। যত চড়েচি তার চেখে টেনেচি অনেক বেশি!

৪

এক কাজ কর! বিভূতিকে কাঁধে কবে' নিয়ে যাই!

বিভূতি

আবে কর কি! কর কি!

৫

না, না, এই ত চাই। উত্তরকূটের বোলে তোমার
জন্ম, কিন্তু তুমি আজ তাব ঘাড়ে চেপেচ। তোমাব মাথা
সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

[কাঁধের উপর লাঠি সাজাইরা তাহাব উপর বিভূতিকে
তুলিয়া লইল।]

সকলে

জয় যজ্ঞবাজ বিভূতির জয়।

গান

নমো যজ্ঞ, নমো যজ্ঞ, নমো যজ্ঞ, নমো যজ্ঞ!

তুমি চক্রমুখরমঞ্জিত,
 তুমি বজ্রবহুবিন্দিত,
 তব বস্ত্রবিশ্ববক্ষদংশ
 ধ্বংস-বিকট দস্ত !
 তব দীপ্ত অগ্নি শত শতগ্নী
 বিদ্রববিজর পঙ্খ ।
 তব লোহগলন শৈলদলন
 অচল-চলন মস্ত্র ।
 কহু কাষ্ঠলোষ্ট্রইষ্টক দৃঢ়
 ঘনপিনক্ক কায়া,
 • কহু ভূতল-জগ-অন্তরীক্ষ-
 লজ্জন লঘুমায়া,
 তব ধনি-ধনিত্র-নখ-বিদীর্ণ
 ক্ষিতি বিকীর্ণ-অস্ত্র,
 তব পঞ্চভূত-বন্ধনকর
 ইন্দ্রজাল তন্ত্র ।

[বিভূতিকে লইয়া সকলে প্রস্থান করিল ।

[উত্তরবকৃটের রাজা বণজিৎ ও তাঁহার মন্ত্রী শিবিরের
 দিক হইতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন ।] •

বণজিৎ

শিবতরাইবের প্রজাদের কিছুতেই ত বাধ্য করিতে
 পারিলে না। এতদিন পরে মুক্তধারার জলকে আশ্রয় কবে'
 বিভূতি ওদের বণ মানাবার উপায় করে' দিলে। কিন্তু মন্ত্রী
 তোমার ত তেমন উৎসাহ দেখচিনে। ঈর্ষা ?

মন্ত্রী

ক্ষমা করবেন, মহারাজ। থস্তা কোদাল হাতে মাটি-
 পাথরের সঙ্গে পালোধানি আমাদের কাজ নয়। রাষ্ট্রনীতি
 আমাদের অস্ত্র, মাথুষের মন নিয়ে আমাদের কারাবাব।
 যুবরাজকে শিবতরাইবের শাসনভার দেবার মন্ত্রণা আমিই
 দিযেছিলুম, তাতে যে বাধ বাধা হতে পারত সে কম
 নয়।

বণজিৎ

তাতে কল হল কি ? হুবহুর খাজনা বাকি। এমনতর
 ছুর্ভিক্ষ ত দেখানে বাবে বাবেই ঘটে, তাই বলে' রাজ্যর
 প্রাপ্য ত বন্ধ হয় না।

মন্ত্রী

খাজনার চেয়ে দুর্ধূল্য জিনিষ আদায় হচ্ছিল, এমন
 সময় তাঁকে ফিবে আসতে আদেশ করুলেন। রাজ্যকাণ্ডে
 ছোটদের অবজ্ঞা করতে নেই। মনে রাখবেন, যখন
 অসহ্য হয় তখন দুঃখের জোরে ছোটরা বড়দের ছাড়িয়ে
 বড় হবে ওঠে।

বণজিৎ

তোমাব মন্ত্রণার সুব ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। কতবাব
 বলেচ উপরে চড়ে' বসে' নীচে চাপ দেওয়া সহজ, আর
 বিদেশী প্রজাদের সেই চাপে রাখাই রাজনীতি।—এ কথা
 বল নি ?

মন্ত্রী

বলেছিলুম। তখন অবস্থা অন্তরকম ছিল, আমার
 মন্ত্রণা সমযোচিত হয়েছিল। কিন্তু এখন—

বণজিৎ

যুবরাজকে শিবতরাইয়ে পাঠাবার ইচ্ছে আমার একে-
 বারেই ছিল না।

মন্ত্রী

কেন মহারাজ ?

বণজিৎ

যে প্রজাবা দূরের লোক, তাদের কাছে গিয়ে বেঁধা-
 বেঁধি করলে তাদের ভয় ভেঙে যাব। শ্রীতি দিয়ে পাওয়া
 যায় আপন লোককে, পরকে পাওয়া যায় ভয় জাগিয়ে
 রেখে।

মন্ত্রী

মহাবাজ, যুবরাজকে শিবতরাইয়ে পাঠাবার আসল
 কারণটা ভুলছেন। কিছুদিন থেকে তাঁর মন অত্যন্ত
 উতলা দেখা গিয়েছিল। আমাদের সন্দেহ হল যে, তিনি
 হয়ত কোন সূত্রে জানতে পেরেচেন যে তাঁর জন্ম বাজ-
 বাড়িতে নয়, তাঁকে মুক্তধারাব ঝাড়গাভরা থেকে কুড়িয়ে
 পাওয়া গেছে। তাই তাঁকে ভূসিয়ে রাখবার জন্তে—

বণজিৎ

তা ত জানি—ইদানীং ও যে প্রাণ রাত্রে একলা ঝাড়গা-
 তলায় গিয়ে শুয়ে থাকত। খবর পেয়ে একদিন রাত্রে
 সেখানে গেলুম, ওকে জিজ্ঞাসা করলুম, “কি হয়েছে

অভিজিৎ, এখানে কেন ?” ও বললে, “এই জলের শব্দে আমি আগাব মাতৃভাষা শুনতে পাই।”

মন্ত্রী

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, “তোমার কি হয়েছে যুবরাজ ? রাজবাড়ীতে আজকাল তোমাকে প্রায় দেখতে পাইনে কেন ?” তিনি বল্লেন, “আমি পৃথিবীতে এসেচি পথ কাটবার জন্তে, এই খবর আমার কাছে এসে পৌঁচেচে।”

রণজিৎ

ঐ ছেলের বে রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ আছে এ বিশ্বাস আগাব ভেঙে থাকে।

মন্ত্রী

যিনি এই দৈবলক্ষণের কথা বলেছিলেন তিনি বে মহারাজের গুরু গুরু অভিরামস্বামী।

রণজিৎ

ভুল করেচেন তিনি। ওকে নিয়ে কেবলি আমার ক্ষতি হচ্ছে। শিবতরাইয়ের পশম যাতে বিদেশের হাটে বেরিয়ে না যায় এইজন্তে পিতামহদের আমল থেকে নন্দিসঙ্কটের পথ আটক করা আছে। সেই পথটাই অভিজিৎ কেটে দিলে। উত্তরকূটের অমবস্ত্র দুর্মূল্য হয়ে উঠবে যে।

মন্ত্রী

অল্প বয়স কিনা। যুবরাজ কেবল শিবতরাইয়ের দিক থেকেই—

রণজিৎ

কিন্তু এ বে নিজের লোকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। শিবতরাইয়ের ঐ বে ধনঞ্জয় বৈরাগীটা প্রজাদের ক্ষেপিয়ে বেড়াই, এর মধ্যে নিশ্চয় সেও আছে। এবার কষ্টীহুঁ তার কণ্ঠটা চেপে ধরতে হবে। তাকে বন্দী করা চাই।

মন্ত্রী

মহারাজের ইচ্ছার প্রতিবাদ করতে সাহস করিনে। কিন্তু জানেন ত এমন সব দুৰ্যোগ আছে যাকে আটকে রাখার চেয়ে ছাড়া রাখাই নিরাপদ।

রণজিৎ

আচ্ছা সেজন্তে চিন্তা করো না।

মন্ত্রী

আমি চিন্তা করি না, মহারাজকেই চিন্তা করতে বলি।

[প্রতিহারীর প্রবেশ।]

প্রতিহারী

মোহনগড়ের খুড়া মহারাজ বিশ্বজিৎ অদূরে।

[প্রস্থান।]

রণজিৎ

ঐ আর-একজন। অভিজিৎকে নষ্ট করার দলে উনি অগ্রগণ্য। আত্মীয়রূপী পর হচ্ছে কুঁজো মাহুশের কুঁজ, পিছনে লেগেই থাকে, কেটেও ফেলা যায় না, বহন কবাও দুঃখ।—ও কিসের শব্দ ?

মন্ত্রী

ভৈরবপন্থীর দল মন্দির প্রদক্ষিণে বেবিয়েচে।

[ভৈরবপন্থীদের প্রবেশ ও গান—

তিমির-হৃদবিদারণ

জলদগ্নি-নিদারুণ,

মরুশ্মশান-সঙ্কর,

শব্দ শব্দ।

বজ্রধোষ-বাণী,

কুঁদ্র, শূলপাণি,

মৃত্যুসিঙ্হ-সম্ভব

শব্দ শব্দ।

[প্রস্থান।]

[রণজিৎের খুড়া মোহনগড়ের রাজা বিশ্বজিৎ প্রবেশ করিলেন। তাঁর শুভ্র কেশ, শুভ্র বস্ত্র, শুভ্র উষ্ণীষ।]

রণজিৎ

প্রণাম। খুড়া মহারাজ, তুমি আজ উত্তরভৈরবের মন্দিরে পূজায় বোগ দিতে আসবে এ দৌভাগ্য প্রত্যাশা করিনি।

বিশ্বজিৎ

উত্তরভৈরব আজকের পূজা গ্রহণ করবেন না এই কথা জানাতে এসেচি।

রণজিৎ

তোমার এই দুৰ্বাক্য আমাদের মহোৎসবকে আজ—

বিশ্বজিৎ

কি নিয়ে মহোৎসব ? বিশ্বের সকল তৃষিতের জন্তে

দেবদেবের কমণ্ডলু যে জলধারা টেলে দিচ্ছেন সেই মুক্ত জলকে তোমরা বন্ধ করলে কেন ?

রণজিৎ

শত্রু দমনেব জন্তে ।

বিশ্বজিৎ

মহাদেবকে শত্রু করতে ভয় নেই ?

রণজিৎ

ধিনি উত্তরকূটের পুরদেবতা, আমাদের জন্মে তাঁরই জন্ম। সেইজন্তেই আমাদের পক্ষ নিয়ে তিনি তাঁর নিজের দান ফিরিয়ে নিয়েছেন। তৃষ্ণার শূলে শিব-তরাইকে বন্ধ করে' তাকে তিনি উত্তরকূটের সিংহাসনের তলায় ফেলে দিয়ে যাবেন।

বিশ্বজিৎ

তবে তোমাদের পূজা পূজাই নয়, বেতন।

রণজিৎ

খুড়া মহারাজ, তুমি পরেব পক্ষপাতী, আত্মীয়ের বিরোধী। তোমার শিক্ষাতেই অভিজিৎ নিজের রাজ্যকে নিজেব বলে' গ্রহণ করতে পারচে না।

বিশ্বজিৎ

আমার শিক্ষা? একদিন আমি তোমাদেরই দলে ছিলাম না? চণ্ডপত্তনে যখন তুমি বিদ্রোহ স্থাপ্ত করেছিলে সেখানকার প্রজাব সর্বনাশ কবে' সে বিদ্রোহ আমি দমন করিনি? শেষে কখন ঐ বালক অভিজিৎ আমার হৃদয়ের মধ্যে এল—আলোর মত এল। অন্ধকারে না দেখতে পেয়ে যাদেব আঘাত করেছিলুম তাদেব আপন বলে' দেখতে পেলুম। রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ দেখে যাকে গ্রহণ করলে তাকে তোমার ঐ উত্তরকূটের সিংহাসনটুকুর মধ্যেই আটকে রাখতে চাও?

রণজিৎ

মুক্তধারার বর্ণণাতলায় অভিজিৎকে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল একথা তুমিই ওর কাছে প্রকাশ কবেছ বুঝি?

বিশ্বজিৎ

হাঁ, আমিই। সেদিন আমাদের প্রাসাদে ও'ব দেয়ালির নিমন্ত্রণ ছিল। গোষ্ঠীর সম্মুখ দেখি অলিন্দে ও একলা দাঁড়িয়ে গৌরীশিখের দিকে তাকিয়ে আছে। জিজ্ঞাসা

করলুম, “কি দেখচ, ভাই?” সে বললে, “যেসব পথ এখনো কাটা হয়নি ঐ দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই ভাবীকালের পথ দেখতে পাচ্ছি—দূরকে নিকট করবার পথ।” শুনে তখন মনে হল, মুক্তধারার উৎসের কাছে কোন ঘরছাড়া মা ওকে জন্ম দিয়ে গেছে, ওকে ধবে' বাংবে কে? আর থাকতে পারলুম না, ওকে বললুম, “ভাই, তোমার জন্মক্ষেণে গিবিরাজ তোমাকে পথে অভ্যর্থনা করেছেন,—ঘরেব শত্রু তোমাকে ঘরে ডাকে নি।”

রণজিৎ

এতক্ষণে বুঝলুম।

বিশ্বজিৎ

কি বুঝলে?

রণজিৎ

এই কথা শুনেই উত্তরকূটের রাজগৃহ থেকে অভিজিৎের মমতা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সেইটেই স্পষ্ট করে' দেখাবাৰ জ্ঞান নন্দিসঙ্কটের পথ সে খুলে দিবে।

বিশ্বজিৎ

কতি কি হবে? যে পথ খুলে যায় সে পথ সকলেবই—যেমন উত্তরকূটের তেমনি শিবতরাইয়ের।

রণজিৎ

খুড়া মহারাজ, তুমি আত্মীয়, গুরুজন, তাই এতকাল ধৈর্য্য বেধেচি। কিন্তু আর নয়, স্বজনবিদ্রোহী তুমি, এ রাজ্য ত্যাগ করে' যাও।

বিশ্বজিৎ

আমি ত্যাগ করতে পারব না। তোমরা আমাকে ত্যাগ যদি কর তবে সহ্য করব। [প্রস্থান।

অন্ধার প্রবেশ (রাজার প্রতী)

ওগো তোমরা কে? সূর্য্য ত অস্ত যাব—আমার স্বমন ত এখনো কিবল না।

রণজিৎ

তুমি কে?

অন্ন

আমি কেউ না। যে আমার সব ছিল তাকে এই পথ দিয়ে নিয়ে গেল। এ পথের শেষ কি নেই? স্বমন কি তবে এখনো চলেচে, কেবলি চলেচে, পশ্চিমে গৌরীশিখ

পেরিয়ে যেখানে স্বর্ঘ্য ডুবচে, আলো ডুবচে, সব
ডুবচে ?

রণজিৎ

মন্ত্রী, এ বুঝি—

মন্ত্রী

হাঁ মহারাজ, সেই বাধ বাধাব কাজেই—

রণজিৎ (অস্থাকে)

তুমি খেদ কোরো না। আমি জানি, পৃথিবীতে
সকলেব চেয়ে চরম যে দান তোমার হেলে আজ তাই
পেয়েচে।

অস্থা

তাই যদি সত্যি হবে তাহলে সে-দান সন্ধে-বেলায় সে
আমাব হাতে এনে দিত, আমি যে তার মা।

রণজিৎ

দেবে এনে। সেই সন্ধে এখনো আসে নি।

অস্থা

তোমার কথা সত্যি হোক, বাবা। ভৈরবমন্দিরের
পথে পথে আমি তার জন্তে অপেক্ষা করব। স্থান !

[প্রস্থান।]

[একদল ছাত্র লইয়া অদূরে গাছের তলায় উত্তরকূটের
গুরুমশায় প্রবেশ করিল।]

গুরু

খেলে, খেলে, বেত খেলে দেখ্‌চি। খুব গলা ছেড়ে
বল, জয় রাজরাজেশ্বর !

ছাত্রগণ

জয় রাজরা—

গুরু

(হাতের কাছে দুই একটা ছেলেকে ধাবড়া মারিয়া)

—জেশ্বর !

ছাত্রগণ

জেশ্বর !

গুরু

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

ছাত্রগণ

শ্রী শ্রী শ্রী—

গুরু (ঠেলা মারিয়া)

পাঁচবার।

ছাত্রগণ

পাঁচবার।

গুরু

লক্ষ্মীছাড়া বাদর ! বল শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

ছাত্রগণ

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

গুরু

উত্তরকূটাদিপতির জয়—

ছাত্রগণ

উত্তরকূট—

গুরু

—দিপতির

ছাত্রগণ

দিপতির—

গুরু

জয়।

ছাত্রগণ

জয়।

রণজিৎ

তোমরা কোথায় যাচ্ছ ?

গুরু

আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতিকে মহারাজ শিরোপা দেবেন
তাই ছেলেদের নিয়ে যাচ্ছি আনন্দ করতে। যাতে উত্তর-
কূটের গৌরবে এরা শিশুকাল হতেই গৌরব করতে শেখে
তার কোন উপলক্ষ্যই বাদ দিতে চাইনে।

রণজিৎ

বিভূতি কি করেছে এরা সবাই জানে ত ?

ছেলেরা (লাকাইয়া হাততালি দিয়া)

জানি, শিবতবাইয়ের খাবার জল বন্ধ করে' দিয়েছেন।

রণজিৎ

কেন দিয়েছেন ?

ছেলেরা (উৎসাহে)

ওদের জব্দ করার জন্তে।

রণজিৎ

কেন জব্দ করা ?

ছেলেরা

ওবা যে খারাপ লোক !

বণজিৎ

কেন খারাপ ?

ছেলেরা

ওরা খুব খারাপ, ভয়ানক খারাপ, সবাই জানে।

বণজিৎ

কেন খারাপ তা জান না ?

গুরু

জানে বই কি, মহারাজ। কি রে, তোরা পড়িস্ নি—
বইয়ে পড়িস্ নি—ওদের ধর্ম খুব খারাপ—

ছেলেরা

হাঁ, হাঁ, ওদের ধর্ম খুব খারাপ।

গুরু

আর ওবা আমাদের মত—কি বল্ না—(নাক
দেখাইয়া)

ছেলেরা

নাক উচু নয়।

গুরু

আচ্ছা, আমাদের গণাচার্য্য কি প্রমাণ করে দিয়েছেন—
নাক উচু থাকলে কি হয় ?

ছেলেরা

খুব বড় জাত হয়।

গুরু

তারা কি করে ? বল্ না—পৃথিবীতে—বল্—তারাই
সকলের উপর জরী হয়, না ?

ছেলেরা

হাঁ, জরী হয়।

গুরু

উত্তরকূটের মাছুষ কোনো দিন যুদ্ধে হেরেচে
জানিস্ ?

ছেলেরা

কোনো দিনই না।

গুরু

আমাদের পিতামহ-মহারাজ প্রাগজিৎ ছুশো

তিরেনবই জন সৈন্ত নিয়ে একত্রিশ হাজার সাড়ে সাতশো
দক্ষিণী বর্ষরদের হাট্রে দিয়েছিলেন না ?

ছেলেরা

হাঁ দিয়েছিলেন।

গুরু

নিশ্চয়ই জানবেন, মহারাজ, উত্তরকূটের বাইরে যে
হতভাগারা মাতৃগর্ভে জন্মায়, একদিন এইসব ছেলেরাই
তাদের বিভীষিকা হয়ে উঠবে। এ যদি না হয় তবে
আমি মিথ্যে গুরু। কত বড় দায়িত্ব যে আমাদের সে
আমি একদণ্ড ভুলিনে। আমরাই ত মাছুষ তৈরী
করে' দিই, আপনার অমাত্যরা তাদের নিয়ে ব্যবহার
করেন। অথচ তাঁরাই বা কি পান আর আমরাই বা
কি পাই তুলনা করে' দেখবেন।

মন্ত্রী

কিন্তু ঐ ছাত্ররাই যে তোমাদের পুরস্কার।

গুরু

বড় স্তম্ভর বলেচেন, মন্ত্রীশায়, ছাত্ররাই আমাদের
পুরস্কার ! আহা, কিন্তু খাদ্যসামগ্রী বড় দুর্শূল্য—এই
দেখেন না কেন, গব্যমুত, যেটা ছিল—

মন্ত্রী

আচ্ছা বেশ, তোমার এই গব্যমুতের কথাটা চিন্তা
করব। এখন যাও, পূজার সময় নিকট হল।

[জয়ধ্বনি করাইয়া ছাত্রদের লইয়া গুরুমশায় প্রস্থান
করিল।

বণজিৎ

তোমার এই গুরুর মাথার খুলির মধ্যে অস্ত্র কোনো
ঘুত নেই, গব্যমুতই আছে।

মন্ত্রী

পক্ষগব্যের একটা কিছু আছেই। কিন্তু, মহারাজ,
এইসব মাছুষই কাজে লাগে। ওকে যেমনটি বলে,
দেওয়া গেছে, দিনের পর দিন ও ঠিক তেমনটি
করে' চলেচে। বুদ্ধি বেশি থাকলে কাজ কলের মত
চলে না।

বণজিৎ

মন্ত্রী, ওটা কি, আকাশে ?

মন্ত্রী

মহারাজ, ভুলে যাচ্ছেন, ওটাই ত: বিভূতির সেই যন্ত্রের চূড়া।

রণজিৎ

এমন স্পষ্ট ত কোনো দিন দেখা যায় না।

মন্ত্রী

আজ সকালে বাড় হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, তাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

রণজিৎ

দেখেচ, ওর পিছন থেকে সূর্য যেন জ্বল হয়ে উঠেছেন। আর ওটাকে দানবের উদ্যত মুষ্টির মত দেখাচ্ছে। অতটা বেশি উচু করে তোলা ভাল হয় নি।

মন্ত্রী

আমাদের আকাশের বুকে যেন শেল বিধে রয়েছে মনে হচ্ছে।

রণজিৎ

এখন মন্দিরে যাবার সময় হল।

[উভয়ের প্রস্থান।]

[উত্তরকূটের দ্বিতীয়দল নাগরিকের প্রবেশ]

দেখুলি ত, আজকাল বিভূতি আমাদের কি রকম এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। ও যে আমাদের মধ্যেই মাছুষ সে কথাটাকে চামড়ার থেকে ঘসে ফেলতে চায়। একদিন বুঝতে পারবেন খাপের চেয়ে তলোয়ার বড় হয়ে উঠলে ভাল হয় না।

তা যা বলিস, ভাই, বিভূতি উত্তরকূটের নাম রেখেচে বটে।

আরে বেধে দে, তোরা ওকে নিয়ে বড় বাড়িবাড়ি আরম্ভ করেচিস। ঐ যে বাঁধটি বাঁধতে ওর জিব বেরিয়ে পড়েচে ওটা কিছু না হবে ত দশবার ভেঙেচে।

আবার যে ভাঙবে না ভাই বা কে জানে?

দেখেচিস ত বাঁধের উত্তর দিকের সেই টিবিটা?

কেন, কেন, কি হয়েছে?

কি হয়েছে? এটা জানিসনে? যে দেখতে সেই ত বলচে—

কি বলচে ভাই?

কি বলচে? ভ্রাক নাকি রে? এও আবার জিগগেস করতে হয় নাকি? আগাগোড়াই—সে আর কি বলব।

তবু ব্যাপারটা কি একটু বুঝিয়ে বল না—

রজন, তুই অবাক করলি। একটু সবর কর না, পষ্ট বুঝবি হঠাৎ যখন একেবারে—

সর্বনাশ! বলিস কি দাদা? হঠাৎ একেবারে?

হা ভাই, ঝগড়ুর কাছে শুনে নিস। সে নিজেকে মেপে জুখে দেখে এসেচে।

ঝগড়ুর ঐ গুণটি আছে, ওর মাথা ঠাণ্ডা। সবাই যখন বাহবা দিতে থাকে, ও তখন কোথা থেকে মাপকাটি বের করে বসে।

আচ্ছা ভাই, কেউ কেউ যে বলে বিভূতির যা কিছু বিদ্যে সব—

আগি নিজে জানি বেস্টবর্খার কাছ থেকে চুরি। হা, সে ছিল বটে গুণীর মত গুণী—কত বড় মাথা—ওরে বাসরে! অথচ বিভূতি পায় শিরোপা, আবু সে গরীব না খেতে পেয়েই মারা গেল।

শুধুই কি না খেতে পেয়ে?

আরে না খেতে পেয়ে কি কার হাতের দেওয়া কি
খেতে পেয়ে সে কথায় কাজ কি? আবার কে কোন্ দিক
থেকে—নিম্নকের ত অভাব নেই? এ দেশের মানুষ যে
কেউ কারো ভালো সহিতে পারে না।

তা তোরা যাই বলিস লোকটা কিন্তু—

আহা, তা হবে না কেন? কোন্ মাটিতে ওর জন্ম,
বুঝে দেখ! ঐ চবুয়া গায়ে আমার বুড়ো দাদা ছিল, তার
নাম শুনেচিস ত?

আরে বাসরে! তাঁর নাম উত্তরকূটের কে না জানে?
তিনি ত সেই—ঐ যে কি বলে—

হাঁ, হাঁ, ভাঙ্কর। নস্তি তৈরি করার এত বড় ওস্তাদ
এ মুহুর্তে হয় নি। তাঁর হাতের নস্তি না হলে রাজা
শক্তির একদিনও চলত না।

সে সব কথা হবে, এখন মন্দিরে চল। আমরা হুমু
বিকৃতির এক গাঁয়ের লোক—আমাদের হাতের মালা আগে
নিয়ে তবে অষ্ট কথা। আর আমরাই ত বসব তার
ডাইনে।

নেপথ্যে
যেয়ো না ভাই, যেয়ো না, ফিরে যাও।

ঐ শোনো বটুক বুড়ো বেরিয়েচে।

[বটকের প্রবেশ, গায়ে ছেঁড়া কপাল,
হাতে বাঁকা ডালের লাঠি, চুল উন্মোখুঙ্কো।]

কি বটু, যাচ্ছ কোথায়?

সাবধান, বাবা, সাবধান। যেয়ো না ও পথে, সময়

থাকতে ফিরে যাও।

কেন বল ত?

বটু

বলি দেবে, নরবলি। আমার দুই জোহান নাড়িকে
জোর করে নিয়ে গেল, আর তারা ফিরুল না।

বলি কার কাছে দেবে, খুড়ো?

বটু

তুষা, তুষা দানবীর কাছে।

সে আবার কে?

বটু

সে যত খায় তত চায়—তার শুক রসনা ঘি-খাওয়া
আগুনের শিখার মত কেবলি বেড়ে চলে।

পাগ্লা! আমরা ত যাচ্ছি উত্তর-ভৈরবের মন্দিরে,
সেখানে তুষা দানবী কোথায়?

বটু

খবর পাওনি? ভৈরবকে যে আজ ওরা মন্দির থেকে
বিদায় করতে চলেচে। তুষা বসবে বেদীতে।

চুপ্ চুপ্ পাগ্লা! এসব কথা শুনে উত্তরকূটের মানুষ
তোকে কুটে ফেলবে।

বটু

তারা ত আমার গায়ে ধুলো দিচ্ছে, ছেলেরা মারছে
ঢেলা। সবাই বলে তোর নাভী দুটো প্রাণ দিয়েচে সে
তাদের সৌভাগ্য।

তারা ত মিথ্যে বলে না।

বটু

বলে না মিথ্যে? প্রাণের বদলে প্রাণ যদি না মেলে,
মৃত্যু দিয়ে যদি মৃত্যুকেই ডাকা হয়, তবে ভৈরব এত বড়
শক্তি সহিবেন কেন? সাবধান, বাবা, সাবধান, যেয়োনা ও
পথে।

[প্রস্থান।]

২:

দেখ, দাদা, আমার গারে কিন্তু কাঁটা দিয়ে উঠছে।

১:

রজ্জু, তুই বেজায় ভীতু। চল চল।

[সকলের প্রস্থান।]

[যুবরাজ অভিজিৎ ও রাজকুমার সঞ্জয়ের প্রবেশ]

সঞ্জয়

বুঝতে পারচিনে, যুবরাজ, রাজবাড়ি ছেড়ে কেন বেরিয়ে যাচ্ছ?

অভিজিৎ

সব কথা তুমি বুঝবে না। আমার জীবনের শ্রোত রাজবাড়ির পাথর ভিঙিয়ে চলে' বাবে এই কথাটা কানে নিয়েই পৃথিবীতে এসেছি।

সঞ্জয়

কিছু দিন থেকেই তোমাকে উতলা দেখছি। আমাদের সঙ্গে তুমি যে বাঁধনে বাঁধা সেটা তোমার মনের মধ্যে আগুণ হয়ে আসছিল। আজ কি সেটা ছিঁড়ল?

অভিজিৎ

ঐ দেখ সঞ্জয়, গৌরীশিখরের উপর সূর্যাস্তের মুর্ত্তি। কোন আশ্বনের পাখী মেঘের ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেছে। আমার এই পথবাত্রার ছবি অন্তর্যঙ্গ আকাশে ঝুঁকে দিলে।

সঞ্জয়

দেখ না, যুবরাজ, ঐ ঘরের চূড়াটা সূর্যাস্ত মেঘের বুক ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেন উড্ডম পাখীর বুক বাণ বিবেচে, নে তার ডানা ঝুলিয়ে রাত্রির গহ্বরের দিকে পড়ে' যাচ্ছে। আমরা এ ভালো লাগছে না। এখন বিশ্রামের সময় এস। চল, যুবরাজ, রাজবাড়িতে।

অভিজিৎ

যেখানে বাবা যেখানে কি বিশ্রাম আছে?

সঞ্জয়

রাজবাড়িতে যে তোমার বাবা, এতদিন পরে সে কথা তুমি কি করে' বুঝলে?

অভিজিৎ

বুঝলুম, যখন শোন। গেল মুক্তধারায় ওরা বাধ বেঁধেছে।

সঞ্জয়

তোমার এ কথার অর্থ আমি পাইনে।

অভিজিৎ

মাগ্বের ভিতরকার রহস্য বিধাতা বাইরের কোথাও না কোথাও লিখে রেখে দেন; আমার অন্তরের কথা আছে ঐ মুক্তধারার মধ্যে। তারই পায়ে ওরা যখন গোহার বেড়ি পরিয়ে দিলে তখন হঠাৎ বেন চরক ভেঙে বুঝতে পারলুম উত্তরকূটের সিংহাসনই আমার জীবন-শ্রোতের বাঁধ। পথে বেরিয়েছি তারই পথ খুলে দেবার জন্তে।

সঞ্জয়

যুবরাজ, আমাকেও তোমার সঙ্গী করে' নাও!

অভিজিৎ

না ভাই, নিজের পথ তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমার পিছনে যদি চল তাহলে আমিই তোমার পথকে আড়াল করব।

সঞ্জয়

তুমি অত কঠোর হোমো না, আমাকে বাজুট্ট।

অভিজিৎ

তুমি আমার হৃদয় জানো, সেইজন্তে আঘাত পেয়েও তুমি আমাকে বুঝবে।

সঞ্জয়

কোঁথাপি তোমার ডাক পড়েছে তুমি চলেছ, তা নিয়ে আমি প্রশ্ন করতে চাইনে। কিন্তু যুবরাজ, এই যে সঙ্গে হয়ে এসেছে, রাজবাড়িতে ঐ যে বন্দীরা দিনাবাসনের গান ধরলে, এরও কি কোনো ডাক নেই? বা কঠিন তার গৌরব থাকতে পারে, কিন্তু যা মধুর তারও মূল্য আছে।

অভিজিৎ

ভাই, তারি মূল্য দেবার জন্তেই কঠিনের সাধনা।

সঞ্জয়

সকালে যে আসনে তুমি পূজায় বস, মনে আছে ত সেদিন তার সামনে একটি খেত পল্ল দেখে তুমি অবাক হবেন্তিলে? তুমি জাগ্রবার আগেই কোন জোরে ঐ পল্লটি লুকিয়ে কে তুলে এনেছে, জানতে দেয় নি সে কে—কিন্তু এইটুকুর মধ্যে কত স্নর্ধাই আছে সে কথা কি আজ মনে করবার নেই? সেই ভীষণ যে আপনাকে গোপন করেছে,

কিন্তু আপনার পূজা গোপন করতে পারে নি, তার মুখ তোমার মনে পড়চে না?

অভিজিৎ

পড়চে বই কি। সেইজন্মেই সইতে পাচ্চিনে ঐ বীভৎসটাকে যা এই ধরণীর সঙ্গীত-রোধ করে" দিয়ে আকাশে লোহার দাঁত মেলে অটুহাস্য করচে। স্বর্গকে ভাঁলো-লেগেচে বলেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই কর্ত্তে যেতে দ্বিধা করিনে।

সঞ্জয়

গোমুলির আলোটি ঐ নীল পাহাড়ের উপরে মুচ্ছিত হলে রয়েছে—এর মধ্যে দিয়ে একটা কামার মূর্ত্তি তোমার হৃদয়ে এসে পৌঁচছে না?

অভিজিৎ

হাঁ, পৌঁচছে। আমারও বুক কামায় ভরে' রয়েছে। আমি কঠোরতার অভিমান রাখিনে।—চেয়ে দেখ ঐ পাখী দেবদারু-গাছের চূড়ার ডালটির উপর একলা বসে আছে; ও কি নীড়ে যাবে, না, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূর প্রবাসের অরণ্যে যাত্রা করবে জানিনে; কিন্তু ও যে এই স্বর্ঘ্যাস্তের আকাশের দিকে চূপ করে' চেয়ে আছে সেই চেয়ে থাকার সুরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজ্ছে, হৃদয় এই পৃথিবী। বা কিছু আমার জীবনকে মধুময় করেছে সে সমস্তকেই আজ আমি নমস্কার করি।

[বটুর প্রবেশ]

বটু

যেতে দিলে না, মেরে ফিরিয়ে দিলে।

অভিজিৎ

কি হয়েছে, বটু, তোমার কপাল কেটে রক্ত পড়চে যে।

বটু

আমি সকলকে সাবধান করতে বেরিয়েছিলুম, বলছিলুম, "ঘেরো না ও পথে, ফিরে যাও!"

অভিজিৎ

কেন, কি হয়েছে?

বটু

জান না, যুবরাজ? ওরা যে আজ যন্ত্রবেদীর উপর

তুম্বারাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা করবে। মাহুম-বলি, চাৰা।

সে কি কথা?

বটু

সেই বেদী গাথ'বাব সময় আমার দুই নাভীর রক্ত ঢেলে দিয়েচে। মনে করেছিলুম পাপের বেদী আপনি ভেঙে পড়ে' যাবে। কিন্তু এখনো ত ভাঙল না, ভৈরব ত জাগলেন না।

অভিজিৎ

ভাঙবে। সময় এসেচে।

বটু (কাছে আসিয়া চূপে চূপে)

তবে শুনেচ বুঝি? ভৈরবের আহ্বান শুনেচ?

অভিজিৎ

শুনেচি।

বটু

সর্বনাশ! তবে ত তোমার নিষ্কৃতি নেই?

অভিজিৎ

না, নেই।

বটু

এই দেখ'চ না, আমার মাথা দিয়ে রক্ত পড়চে, সর্বনাশে ধুলো। সইতে পারবে কি, যুবরাজ, যখন বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাবে?

অভিজিৎ

ভৈরবের প্রসাদে সইতে পারব।

বটু

চারিদিকে সবাই যখন শত্রু হবে? আপন-সোক যখন ধিক্কার দেবে?

অভিজিৎ

সইতেই হবে।

বটু

তাহলে ভয় নেই।

অভিজিৎ

না ভয় নেই।

বটু

বেশ বেশ। তাহলে বটুকে মনে রেখো। আমিও ঐ পথে। ভৈরব আমার কপালে এই যে রক্ততিলক

এঁকে দিয়েচেন তার থেকে অন্ধকারেও আমাকে চিন্তে
পারবে।

[বটুর প্রস্থান।]

[রাজপ্রহরী উদ্ধবের প্রবেশ]

উদ্ধব

নন্দিসকূটের পথ কেন খুলে দিলে, যুবরাজ ?

অভিজিৎ

শিবতরাইয়ের লোকদের নিত্যভুক্তি থেকে বাঁচাবার
জন্তে।

উদ্ধব

মহারাজ ত তাদের সাহায্যের জন্তে প্রস্তুত, তাঁর ত
দরগাঘা আছে।

অভিজিৎ

ডান-হাতের কার্পাস দিয়ে পথ বন্ধ করে' বাঁ-হাতের
বদান্যতা বাঁচানো যায় না। তাই ওদের অন্ন-চলাচলেব
পথ খুলে দিয়েচি। দয়ার উপর নির্ভর করার দীনতা
আমি দেখতে পারিনে।

উদ্ধব

মহারাজ বলেন, নন্দিসকূটের গড় ভেঙে দিয়ে তুমি
উত্তরকূটের ভোজনপাত্রের তলা খসিয়ে দিয়েচ।

অভিজিৎ

চিরদিন শিবতরাইয়ের অন্নজীবী হয়ে থাকবার দুর্গতি
থেকে উত্তরকূটকে মুক্তি দিয়েচি।

উদ্ধব

দুঃসাহসেব কাজ করেচ। মহারাজ খবর পেয়েচেন
এব বেশি আব কিছু বলতে পারুব না। যদি পার ত
এখনি চলে যাও। পথে দাঁড়িয়ে তোমাব সঙ্গে কথা
কওয়াও নিরাপদ নয়।

[উদ্ধবের প্রস্থান।]

[অম্বার প্রবেশ]

অম্বা.

সুমন! বাবা সুমন! বে পথ দিয়ে তাকে নিষে গেল
সে পথ দিয়ে তোমাব কি কেউ যাও নি ?

অভিজিৎ

তোমাব ছেলেকে নিষে গেচে ?

অম্বা

হাঁ, ঐ পশ্চিমে, বেখানে স্থগি ডোবে, যেখানে দিম
ফুরোয়।

অভিজিৎ

ঐ পথেই আমি যাব।

অম্বা

তাহলে দুঃখিনীর একটা কথা রেখো—যখন তার দেখা
পাবে, বোলো মা তার জন্তে পথ চেয়ে আছে।

অভিজিৎ

বলুব।

অম্বা

বাবা, তুমি চিরজীবী হও। সুমন, আমার সুমন!

[প্রস্থান।]

[ভৈরবপন্থীদের প্রবেশ ও গান—

জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর,

জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর।

জয় সংশব-ভেদন

জয় বন্ধন-ছেদন

জয় সংকট-সংহর,

শঙ্কর, শঙ্কর!

[প্রস্থান।]

[সেনাপতি বিজয়পালের প্রবেশ—

বিজয়পাল

যুবরাজ, রাজকুমার, আমার বিনীত অভিভান্ন গ্রহণ
করুন। মহারাজের কাছ থেকে আস্চি।

অভিজিৎ

কি তাঁর আদেশ ?

বিজয়পাল

গোপনে বলুব।

সঞ্জয় (অভিজিৎকে হাত চাপিয়া ধরিয়া)

গোপন কেন ? আমার কাছেও গোপন ?

বিজয়পাল

সেই ত আদেশ। যুবরাজ একবার *রাজশিবিরে
পদার্পণ করুন।

সঞ্জয়

আমিও সঙ্গে যাব।

বিজয়পাল

মহারাজ তা ইচ্ছা করেন না।

সঞ্জয়

আমি তবে এই পথেই অপেক্ষা করব।

[অভিজিৎকে লইয়া বিজয়পাল শিবিরের দিকে
প্রস্থান করিল।

[বাড়ির প্রবেশ—

গান

ও ত আর কি হবে না রে, কি হবে না আর, কি হবে না রে!

ঝড়ের মুখে ভাসল তরী

কূলে আর ডিড়বে না রে।

কোন পাগলে নিল ডেকে,

কাদন গেল পিছে রেখে,

ওকে তোর বাহর বাধন ঘির্বে না রে।

[প্রস্থান।

[ফুলওয়ালীর প্রবেশ]

ফুলওয়ালী

বাবা, উত্তরকূটের বিকৃতি মাছটি কে?

সঞ্জয়

কেন, তাকে তোমার কি প্রয়োজন?

ফুলওয়ালী

আমি বিদেশী, দেওতলী থেকে আসছি। শুনেছি উত্তর-
কূটের সবাই তাঁর পথে পথে পুষ্পবৃষ্টি কর্তে। সাধুপুরুষ
বুঝি? বাবার দর্শন করব বলে' নিজের মালিকের ফুল
এনেছি।

সঞ্জয়

সাধুপুরুষ না হোক, বুদ্ধিমান পুরুষ বটে।

ফুলওয়ালী

কি কাজ করেচেন তিনি?

সঞ্জয়

আমাদের স্বর্ণপাটাকে বেঁধেচেন।

ফুলওয়ালী

তাই পুজো? বাধে কি দেবতার কাজ হবে?

সঞ্জয়

না, দেবতার হাতে বেড়ি পড়বে।

ফুলওয়ালী

তাই পুষ্পবৃষ্টি? বুলুম না।

সঞ্জয়

না বোঝাই ভালো। দেবতার ফুল অপাত্রে নষ্ট
কোরো না, কিরে যাও!—শোনো, শোনো, আমাকে
তোমার ঐ শ্বেতপদ্মটি বেচবে?

ফুলওয়ালী

সাধুকে দেব মনন করবে' যে ফুল এনেছিলুম সে ত
বেচতে পারব না।

সঞ্জয়

আমি যে-সাধুকে সব-চেয়ে ভক্তি করি তাঁকেই দেব।

ফুলওয়ালী

তবে এই নাও। না, মূল্য নেব না। বাবাকে আমার
প্রণাম জানিষো। বোলো আমি দেওতলীর দুখ্নী
ফুলওয়ালী। [প্রস্থান।

[বিজয়পালের প্রবেশ]

সঞ্জয়

দাদা কোথায়?

বিজয়পাল

শিবিরে তিনি বন্দী।

সঞ্জয়

যুবরাজ বন্দী! এ কি স্পর্ধা!

বিজয়পাল

এই দেখ মহারাজেব আদেশপত্র।

সঞ্জয়

এ কার ষড়যন্ত্র? তাঁর কাছে আমাকে একবার যেতে
দাও।

বিজয়পাল

কমা করবেন।

সঞ্জয়

আমাকেও বন্দী কর, আমি বিদ্রোহী।

বিজয়পাল

আদেশ নেই।

সঞ্জয়

আচ্ছা, আদেশ নিজে এখনি চলুম। (কিছু দূরে

গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) বিজয়পাল, এই পদ্যটি আমার নাম
করে দাদাকে দিয়ে।

[উভয়ের প্রস্থান।]

[শিবতরাইয়ের বৈরাগী ধনঞ্জয়ের প্রবেশ]

পান

আমি মারের সাগর পাড়ি দেব

বিষম ঝড়ের বায়ে

আমার ভয়-ভাঙা এই নারে।

মাইভ: বাণীর ভরসা নিয়ে

ছেঁড়াপালে বুক ফুলিয়ে

তোমার ঐ পারেতেই যাবে তরী

ছায়াবটের ছায়ে।

পথ আমারে সেই দেখাবে

বে আমারে চায়—

আমি অভয়নে ছাড়ব তরী

এই শুধু মোর দায়।

দিন ফুরোলে জানি জানি

পৌছে ঘাটে দেব আনি

আমার দুঃখদিনের রক্তকমল

তোমার করুণ পায়ের।

[শিবতরাইয়ের একদল প্রজার প্রবেশ]

ধনঞ্জয়

একেবারে মুগ্ধ চুন যে! কেন রে, কি হয়েছে?

প্রভু, রাজশ্যালক চণ্ডপালের মার ত সহ্য হয় না।
সে আমাদের যুবরাজকেই মারেন না, সেইটেতেই আরো
অসহ্য হয়।

ধনঞ্জয়

ওরে আজ্ঞা মাবকে জ্বিংতে পারলিনে? আজ্ঞা
লাগে?

রাজার দেউড়িতে ধরে নিয়ে মার! বড় অপমান!

* এই নাটকের পাণ্ডে ধনঞ্জয় ও তাহাব কথোপকথনের অনেকটা
অংশ "প্রায়শ্চিত্ত" নামক আমাব একটি নাটক হইতে লওয়া। সেই
নাটক এখন হইতে পনেরো বছরেরও পূর্বে লিখিত।

ধনঞ্জয়

তোদের মানকে নিজের কাছে রাখিনি, তিত্তে যে

ঠাকুরটি আছেন তাঁরই পায়ের কাছে রেখে আয়, সেখানে
অপমান পৌছবে না।

[গণেশসদ্বারের প্রবেশ]

গণেশ

আর সহ্য হয় না, হাত ছুটো নিশ্চয় কবুচে।

ধনঞ্জয়

তাহলে হাত ছুটো বেহাত হয়েচে বল।

গণেশ

ঠাকুর, একবার হুকুম কর ঐ ষণ্ডমার্ক চণ্ডপালের দণ্ডটা
খসিয়ে নিয়ে মাঝ কাকের বলে একবার দেখিয়ে দিই।

ধনঞ্জয়

মার কাকে না বলে ভা দেখাতে পারিনি? জোর
বেগি লাগে বুঝি? চেউকে বাড়ি মারলে চেউ থাকে না,
হালটাকে স্থির করে রাখলে চেউ জ্বল-করা যায়।

৪৬

তাহলে কি কর্ত্তেবল?

ধনঞ্জয়

মার জ্বিনিঘটাকেই একেবারে গোড়া ঘেঁষে
লাগাও!

সেউটি কি করে হবে, প্রভু?

ধনঞ্জয়

মাথা তুলে যেমনি বলতে পারবি লাগুচে না, অমন
মারের শিকড় যাবে কাটা।

লাগুচে না বলা যে শক্ত।

ধনঞ্জয়

আমল মাথুটি যে, তার লাগে না, সে যে আলোর
শিখা। লাগে জ্বলটার, সে যে মাংস, মার খেয়ে কেঁই
কেঁই করে মরে। ইং করে রইলি যে? কথাটা
বুঝলি নে?

তোমাকেই আমরা বুঝি, কথা তোমার নাই বা
বুঝলুম।

ধনঞ্জয়

তাহলেই সর্বনাশ হয়েচে।

গণেশ

কথা বুঝতে সময় লাগে, সে তবু নয় না; তোমাকে বুঝে নিখোঁচি, তাতেই সকাল-সকাল তবে যাব।

ধনঞ্জয়

তার পরে বিকেল যখন হবে! তখন দেখু'বি কুলের কাছে তরী এসে ডুবেচে। যে কথাটা পাকা, সেটাকে ভিতর থেকে পাকা করে' না যদি বুঝিস্ ত মজু'বি।

গণেশ

ও কথা বোলো না, ঠাকুর! তোমার চরণাশ্রয় যখন পেয়েছি তখন যে করে' হোক বুঝেছি।

ধনঞ্জয়

বুঝিস্ নি যে তা আব বুঝতে বাকি নেই। তোদের চোখ রয়েছে রাঙিয়ে, তোদের গলা দিয়ে স্বর বেরল না। একটু স্বর ধরিয়ে দেব?

গান

আরো, আরো, প্রভু, আরো, আরো!

এমনি করেই মারো, মারো!

ওরে ভীতু, মার এড়াবার জন্তেই তোরা হয় মারতে নয় পালাতে থাকিস, ছুটো একই কথা। ছুটোতেই পশুর দলে ভেড়ায়, পশুপতির দেখা মেলে না।

লুকিয়ে থাকি আমি পানিয়ে বেড়াই,

ভরে ভরে কেবল তোমায় এড়াই;

যা-কিছু-আছে সব কাড়ো কাড়ো।

দেখ বাবা, আমি মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে চলেছি। বলতে চাই, "মার আমার বাঁজি কি না তুমি নিজে বাজিয়ে নাও।" যে ডবে কিষা ডর দেখায় তার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এগতে পারব না।

এবার যা করবার তা সারো, সারো,

আমিই হারি, কিষা তুমিই হারো।

হাটে ঘাটে বাটে কবি খেলা,

কেবল হুসে থেলে, গেছে বেলা,

দেখি কেমনে কাদাতে পারো!

সকলে

সাবাস, ঠাকুর, তাই সই!—

দেখি-কেমনে কাদাতে পারো!

২

কিন্তু তুমি কোথায় চলেচ, বল ত?

ধনঞ্জয়

রাজার উৎসবে।

৩

ঠাকুর, রাজার পক্ষে যেটা উৎসব তোমার পক্ষে সেটা কি দাঁড়ায় বলা যায় কি। সেখানে কি করতে যাবে?

ধনঞ্জয়

রাজসভায় নাম রেখে আসব।

৪

রাজা তোমাকে একবার হাতের কাছে পেলে—না, না, সে হবে না!

ধনঞ্জয়

হবে না কি রে? খুব হবে, পেট ভরে' হবে।

১

রাজাকে ভয় কর না-তুমি, কিন্তু আমাদের ভয় লাগে।

ধনঞ্জয়

তোরা যে মনে মনে মারতে চাস তাই ভয় করিস, আমি মারতে চাইনে তাই ভয় করিনে। যার হিংসা আছে ভয় তাকে কান্ডে লেগে থাকে।

২

আচ্ছা, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।

৩

রাজার কাছে দরবার করব।

ধনঞ্জয়

কি চাইবি রে?

৩

চাইবার ত আছে ঢের, দেয় তবে ত?

ধনঞ্জয়

রাজা চাইবি নে?

৩

ঠাকুর, ঠাকুর?

ধনঞ্জয়

ঠাট্টা কেন করুব? এক পায়ে চলার মত কি দুঃখ আছে? রাজহু একলা যদি রাজ্যেরই হয়, প্রজার না হয়, তাহলে সেই খোঁড়া রাজহুের লাকানি দেখে তোরা চমকে উঠতে পারিস্ কিন্তু দেবতার চোখে জল আসে। ওরে রাজ্যের খাতিরেই রাজহু দাবী করতে হবে।

২

বখন তাড়া লাগাবে?

ধনঞ্জয়

রাজহুদ্বারের উপরতলার মাছুষ যখন নালিশ মঞ্জুর করেন তখন রাজ্যের তাড়া রাজ্যকেই তেড়ে আসে।

গান

তুলে যাই থেকে থেকে

তোমার আসন পরে বসাতে চাও

নাম আগাদের হৈকে হৈকে।

সত্যি কথা বলব, বাবা? যতক্ষণ তাঁরই আসন বলে' না চিন্‌বি ততক্ষণ সিংহাসনে দাবী খাটবে না, রাজ্যেরও নয়, প্রজারও না। ও ত বুক-ফুলিয়ে বসবার জায়গা নয়, হাত জোড় করে' বসা চাই।

দ্বারী মোদের চেনে না যে,

বাধা দেয় পথের মাঝে,

বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি,

লগ ভিতবে ডেকে ডেকে।

দ্বারী কি সাথে চেনে না? ধুলোয় ধুলোয় কপালের রাজতীকা যে মিলিয়ে এসেছে। ভিতরে বশ মানুল না, বাইরে রাজহু করতে ছুটবি? রাজ্য হলেই রাজ্যসনে বসে; রাজ্যসনে বসলেই রাজ্য হয় না।

মোদের প্রাণ দিয়েচ আপন-হাতে

মান দিয়েচ তারি সাথে।

থেকেও সে মান থাকে না যে

লোভে অঁর ভয়ে লাঞ্জে,

জ্ঞান হয় দিনে দিনে,

যায় ধুলোতে ঢেকে ঢেকে।

যাই বল, রাজহুদ্বারে কেন যে চলেচ বুকতে পারলুম না।

ধনঞ্জয়

কেন, বলব? মনে বড় ধোঁকা লেগেচে।

১

সে কি কথা?

ধনঞ্জয়

তোরা আমাকে যত জড়িয়ে ধরুচিস্ তোদের সাঁতার শেখা ততই পিছিয়ে যাচ্ছে। আমারও পার হওয়া দায় হল। তাই ছুটি নেবার জন্যে চলেচি সেইখানে, যেখানে আমাকে কেউ মানে না।

১

কিন্তু রাজ্য তোমাকে ত সহজে ছাড়বে না।

ধনঞ্জয়

ছাড়বে কেন রে! যদি আমাকে বাঁধতে পারে তাহলে আর ভাবনা রইল কি?

গান

আমাকে যে বাঁধবে ধরে' এই হবে যা'র সাধন,

সে কি অমনি হবে?

আমার কাছে পড়লে বাঁধা সেই হবে মোর বাঁধন,

সে কি অমনি হবে?

কে আগারে ভরসা করে আনতে আপন বশে?

সে কি অমনি হবে?

আপনাকে সে করুক না বশ, মজুক প্রেমের রসে,

সে কি অমনি হবে?

আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন

সে কি অমনি হবে?

২

কিন্তু বাবাঠাকুর, তোমার গায়ে যদি হাত ভোলে সহিতে পারব না।

ধনঞ্জয়

আমার এই গা বিকিয়েচি আর পায়ে তিনি যদি সন, তবে তোদেরও সহিবে।

১

আচ্ছা, চল ঠাকুর, শুনে আসি, শুনিয়া আসি, তার পরে কপালে যা পাকে।

ধনঞ্জয়

২ :

তবে তোরা এইখানে বোস, এ জায়গায় কখনো আসি নি, পথঘাটের খবরটা নিয়ে আসি। [প্রস্থান।

১

দেখ্‌চিস্, ভাই, কি চেহারা ঐ উত্তরকূটের মানুষ-গুলোর? যেন একতাল মাংস নিয়ে বিধাতা গড্ডতে স্বপ্ন করেছিলেন শেষ করে' উঠতে ফ্রুসং পান নি।

২

আর দেখেচিস্ ওদের মালকোঁচা মেরে-কাপড় পরাব ধরণটা?

৩

যেন নিজেকে বস্তায় বেঁধেচে, একটুখানি পাছে লোক-মান হয়।

১

ওরা মজুরী করবার জন্মেই জন্ম নিয়েচে, কেবল সাত ঘাটের জল পেরিয়ে সাত হাটেই ঘুবে বেড়ায়।

২

ওদের যে শিকাই নেই, ওদের যা শাস্তর তাব মধ্যে আছে কি?

১

কিছু না, কিছু না, দেখিস্ নি তার অক্ষবগুনো। উই-পোকাকার মত।

২

উইপোকাই ত বটে! ওদের বিদ্যে ঝুঁপেখানে লাগে সেখানে কেটে টুকুরো টুকুরো করে।

৩

আর গড়ে তোলে মাটির ঢিবি।

২

ওদের অন্তর দিয়ে মাঝে প্রাণটাকে, আর শাস্তর দিয়ে মারের মনটাকে।

২

পাপ, পাপ! আমাদের গুরু বলে ওদের ছায়া মাড়ানো নৈব নৈবচ। কেন জানিস?

৩

কেন বলন্ত?

তা জানিস্ নে? সমুদ্রমহাশয় পর দেবতার-ভাঁড় থেকে অমৃত গড়িয়ে যে মাটিতে পড়েছিল আমাদের শিবতরাইয়ের পূর্বপুরুষ সেই মাটি দিয়ে গড়া। আর দৈত্যরা যখন দেবতার উজ্জিষ্ট ভাঁড় চেটে চেটে নক্ষ্মায় ফেলে দিলে তখন সেই ভাঁড়-ভাঙা পোড়া-মাটি দিয়ে উত্তরকূটের মানুষকে গড়া হয়। তাই ওরা শক্ত, কিন্তু ধুঃ—অপবিত্র।

৩

এ তুই কোথায় পেলি?

২

স্বয়ং গুরু বলে' দিয়েচেন।

৩

(উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া)

গুরু, তুমিই সত্য।

[উত্তরকূটের একদল নাগরিকের প্রবেশ]

উ ১

আর সব হল ভাল, কিন্তু কামারের ছেলে বিভূতিকে বাজা একেবারে ক্ষত্রিয় কবে' নিলে, সেটা ত—

উ ২

ওসব হল ঘরের কথা, সে আমাদের গাঁয়ে ফিরে গিয়ে বুঝে পড়ে' নেব। এখন বল, জয় যজ্ঞরাজ বিভূতির জয়।

উ ৩

ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রে বৈশ্যের যজ্ঞে যে মিলিয়েচে, জয় সেই যজ্ঞরাজ বিভূতির জয়।

উ ১

ও ভাই, ঐ যে দেখি শিবতরাইয়ের মানুষ।

উ ২

কি করে' বুঝলি?

উ ১

কান-ঢাকা টুপি দেখেচিস্ নে? কিরকম স্বত্ব দেন্তে? যেন উপর থেকে খাবা' মেরে হঠাৎ কে ওদের বাড় বন্ধ করে' দিয়েচে।

উ ২

আচ্ছা, এত দেশ থাকতে ওরা কান-ঢাকা টুপি পরে কেন? কি ভাবে কানটা বিধাতার মতিভ্রম?

উ ১

কানের উপর বাধ বেঁধেছে বুদ্ধি পাছে বেবিয়ে যায়।
(সকলের হাস্ত)

উ ৩

ছাই ? না, ভুলক্রমে বুদ্ধি পাছে ভিতরে ঢুকে পড়ে।
(হাস্ত)

উ ১

পাছে উত্তরকূটের কানমলার ভূত ওদের কানছুটাকে
পেয়ে বসে। (হাস্ত) ওরে, শিবতবাইয়ের অজবুগের
দল, সাড়া নেই, শব্দ নেই, হযেচে কি রে ?

উ ৩

জানিস নে আজ আমাদের বড় দিন। বল যজ্ঞরাজ
বিভূতির জয়।

উ ১

চুপ কবে' রইলি বে ? গলা বুজে গেছে ? টুঁটি চেপে
না ধরলে আওয়াজ বেরবে না বুদ্ধি ? বল যজ্ঞরাজ
বিভূতির জয় !

গণেশ

কেন বিভূতির জয় ? কি করেছে সে ?

উ ১

বলে কি ? কি করেছে ? এত বড় খবরটা এখনো
পৌছয় নি ? কান-ঢাকা টুপির গুণ দেখলি ত ?

উ ৩

তাদের পিপাসার জল যে তার হাতে ; সে দয়া না
করলে অনাবৃষ্টির ব্যাঙগুলোর মত শুকিয়ে মরে' যাবি।

শি ২

পিপাসার জল বিভূতির হাতে ? হঠাৎ সে দেবতা
হয়ে উঠল নাকি ?

উ ২

দেবতাকে ছুটি দিয়ে দেবতার কাজ নিজেই চালিয়ে
করে।

শি ১

দেবতার কাজ ! তার একটা নমুনা দেখিত ?

উ ১

ঐ-যে মুক্তধারার বাধ।

(শিবতবাইয়ের সকলের উচ্ছ্বাস)

উ ১

এটা কি তোরা ঠাট্টা-ঠাউরেচিস ?

গণেশ

ঠাট্টা নয় ? মুক্তধারা বাধবে ? ভৈরব স্বহস্তে যা
দিয়েচেন, তোমাদের কামারের ছেলে তাই কাড়বে ?

উ ১

স্বচক্ষে দেখনা, ঐ-আকাশে !

শি ১

বাপরে ! ওটা কি রে ?

শি ২

যেন মস্ত একটা লোহার ফড়িং, আকাশে লাফ মারুতে
যাচ্ছে।

উ ১

ঐ ফড়িঙের ঠ্যাং দিয়ে তোমাদের জল আটকেচে।

গণেশ

বেখে দাও সব বাজে কথা। কোন দিন বলবে ঐ
ফড়িঙের ডানায় বসে' তোমাদের কামারের পোঁ চাদ
ধরতে বেবিয়েচে।

উ ১

ঐ দেখ, কান ঢাকার গুণ ! ওরা শুনেও শুনবে না,
তাই ত মবে !

শি ১

আমরা মরেও মরবে না পূণ কবেচি।

উ ৩

বেশ করেচ, বাঁচাবে কে ?

গণেশ

আমাদের দেবতাকে দেখনি ? প্রত্যক্ষ দেবতা ?
আমাদের ধনঞ্জয় ঠাকুর ? তার একটা দেহ মন্দিবে, একটা
দেহ-বাইরে।

উ ৩

কানঢাকারা বলে কি ? ওদের মরণ কেউ ঠেকাতে
পারবে না। [উত্তরকূটের দলের প্রস্থান।]

[ধনঞ্জয়ের প্রবেশ]

ধনঞ্জয়

কি বলছিল রে বোকা ? আমারই উপর তোমাদের

বাঁচাবার ভার? তাহলে ত. সাতবার মরে ভূত হয়ে
রয়েচিস।

গণেশ

উত্তরকূটের ওরা আমাদের শাসিয়ে গেল যে, বিভূতি
মুক্তধারার বাঁধ বেঁধেছে।

ধনঞ্জয়

বাঁধ বেঁধেছে, বললে?

গণেশ

হ্যাঁ, ঠাকুর।

ধনঞ্জয়

সব কথাটা শুনলিনে বুঝি?

গণেশ

ও কি শোন্বার কথা? হেসে উড়িয়ে দিলুম।

ধনঞ্জয়

তোদের সব কানগুলো একা আমারই জিন্মায়
বেথেচিস? তোদের সবার শোনা আমাকেই শুনতে হবে?

শি ৩

ওর মধ্যে শোন্বার আছে কি, ঠাকুর?

ধনঞ্জয়

বলিস্ কি রে? যে শক্তি-ছরস্তু তাকে বেঁধে ফেলা কি
কম কথা? তা দে অস্তরেই হোক আর বাইরেই হোক।

গণেশ

ঠাকুর, তাই বলে আমাদের পিপাসার জল আটকাবে?

ধনঞ্জয়

সে হল আর-এক কথা। ওটা ভৈরব সইবেন না।
তোরা বোস, আমি সন্ধান নিয়ে আসিগে। জগৎটা
বাণীময় রে, তার বৈদিকটাতে শোনা বন্ধ করুবি সেইদিক
থেকেই মৃত্যুবাণ আসবে।

[ধনঞ্জয়ের প্রস্থান।]

[শিবতরাইয়ের একজন নাগরিকের প্রবেশ]

শি ৩

এ কি বিবণ্ডে! খবর কি?

বিষণ

যুবরাজকে রাজা শিবতরাই থেকে ডেকে নিয়ে এসেছে,
তাকে দেখানে আর বাখুঁরে না।

সকলে

সে হবে না, কিছুতেই হবে না।

বিষণ

কি করুবি?

সকলে

ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

বিষণ

কি করে?

সকলে

জোর করে।

বিষণ

রাজার সঙ্গে পারুবি?

সকলে

রাজাকে মানিনে।

[রণজিৎ ও মজীর প্রবেশ]

রণজিৎ

কাকে মানিসনে?

সকলে

প্রণাম।

গণেশ

তোমার কাছে দরবার করতে এসেচি

রণজিৎ

কিসের দরবার?

সকলে

আমরা যুবরাজকে চাই।

রণজিৎ

বলিস্ কি?

হ্যাঁ, যুবরাজকে শিবতরাইয়ে নিয়ে যাব।

রণজিৎ

আর মনের আনন্দে খাঁজনা দেবার কথাটা ভু-
যাবি?

সকলে

অন্নবিনে মরুচি বে।

রণজিৎ

তোদের সন্ধার কোরায়?

২ (গণেশকে দেখাইয়া)

এই যে আমাদের গণেশ সর্দার।

রগজিৎ

ও নয়, তোদের বৈরাগী।

গণেশ

ঐ আস্চেন।

[ধনঞ্জয়ের প্রবেশ]

রগজিৎ

তুমি এই সমস্ত প্রজাদের ক্ষেপিয়েচ ?

ধনঞ্জয়

ক্ষাপাই বই কি, নিজেও ক্ষেপি।

(গান)

আমারে পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায়

কোন ক্ষাপা সে ?

ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে

কি যে বাজায় কোন্ বাতাসে ?

গেল রে গেল বেলা,

পাগলের কেমন গেলা ?

ডেকে সে আকুল করে, দেয় না ধরা,

তারে কানন গিবি খুঁজে ফিরি

কৈদে মরি কোন্ হতাশে !

রগজিৎ

পাগলামি করে' কথা চাপা দিতে পারবে না। খাজনা
দেবে কি না, বল।

ধনঞ্জয়

না, মহারাজ, দেব না।

রগজিৎ

দেবে না ? এত বড় আত্মপক্ষা ?

ধনঞ্জয়

বা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

বগজিৎ

আমার নয় ?

ধনঞ্জয়

আমার উদ্ধৃত্ত অস্ত্র তোমার, ক্ষুধার অস্ত্র তোমার নয়।

রগজিৎ

তুমিই প্রজাদের বারণ কর খাজনা দিতে ?

ধনঞ্জয়

ওরা ত ভবে দিয়ে ফেলতে চায়, আমি বারণ কবে'
বলি, প্রাণ দিবি তাঁকেই প্রাণ দিয়েচেন যিনি।

রগজিৎ

তোমার ভরসা চাপা দিয়ে ওদের ভয়টাকে ঢেকে
রাখ বই ত নয়। বাইরের ভরসা একটু ফুটো হলেই
ভিতরের ভয় সাতগুণ জোরে বেরিয়ে পড়বে। তখন
ওরা মরবে যে। দেখ, বৈরাগী, তোমার কপালে ছুঃখ
আছে।

ধনঞ্জয়

যে ছুঃখ কপালে ছিল সে ছুঃখ বুকে তুলে নিষেচি।
ছুঃখের উপরওয়াল সেখানে বাস করেন।

রগজিৎ (প্রজাদের প্রতি)

আমি তোদের বলছি, তোরা শিবতরাইয়ে ফিরে যা !
বৈরাগী, তুমি এইখানেই রইলে।

সকলে

আমাদের প্রাণ থাকতে সে হবে না।

ধনঞ্জয়

(গান)

রইল বলে' রাখলে কা'বে ?

হুকুম তোমার ফল্বে কবে ?

টানাটানি টিকবেনা, ভাই,

র'বার যেটা সেটাই র'বে।

বাজা, টেনে কিছুই রাখতে পারবে না। সহজে রাখ-
বার শক্তি যদি থাকে তবেই রাখা চলবে।

রগজিৎ

মান কি হল ?

ধনঞ্জয়

যিনি সব দেন তিনিই সব রাখেন। লোভ করে' যা
বাখতে চাইবে সে হল চোরাই মাল, সে টিকবে না।

গান

যা-খুসি তাই করতে পার,

গায়ের জোরে রাখ মার.

খাঁর গায়ে তার ব্যথা বাজে

তিনিই যা' স'ন সেটাই স'বে।

রাজা, ভুল কর্চ এই, যে, ভাব্চ জগৎটাকে কেড়ে
নিলেই জগৎ তোমার হ'ল। ছেড়ে রাখলেই যা'কে পাও,
মুঠোব মধ্যে চাপতে গেলেই দেখবে সে ফসকে গেছে।

(গান)

ভাব্চ, হবে তুমি যা চাও,

জগৎটাকে তুমিই নাচাও,

দেখবে হঠাৎ নয়ন মেলে

হয়না যেটা সেটাও হ'বে।

রণজিৎ

মন্ত্রী, বৈরাগীকে এইখানেই ধবে' রেখে দাও !

মন্ত্রী

মহারাজ—

রণজিৎ

আদেশটা তোমার মনের মত হচ্ছে না ?

মন্ত্রী

শাসনের ভীষণ যন্ত্র তৈরি হয়েছে, তার উপরে ভয়

হারা চড়াতে গেলে সব যাবে ভেঙে।

প্রজারা

এ আমাদের সখ হবে না।

ধনঞ্জয়

যা বল্চি, কিরে যা !

১

ঠাকুর, যুবরাজকেও যে হারিয়েচি, শোননি বুঝি ?

২

তাহলে কাকে নিয়ে মনের জোর পাব ?

ধনঞ্জয়

আমার জ্বরেই কি তোদের জ্বোর ? একথা যদি

বলিস তাহলে যে আমাকে স্বচ্ছ তুর্কল করবি।

গণেশ

ও কথা বলে' আজ ফাঁকি দিয়ে না। আমাদের

সর্বলের জোর শুকা তোমারই মধ্যে।

ধনঞ্জয়

তবে আমার হার হয়েছে। আমাকে সরে দাঁড়াতে

সকলে

কেন ঠাকুর ?

ধনঞ্জয়

আমাকে পেয়ে আপনাকে হারাবি ? এত বড় লোক-
সান মেটাতে পারি এমন সাধ্য কি আমার আছে ? বড়
লজ্জা পেলুম।

১

সে কি কথা ঠাকুর ? আচ্ছা, যা কর্তে বল তাই
করব !

ধনঞ্জয়

আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে' যা।

২

চলে' গিয়ে কি করব ? তুমি আমাদের ছেড়ে থাকতে
পারবে ? আমাদের ভালোবাসো না ?

ধনঞ্জয়

ভালোবেসে তোদের চেপে মারার চেয়ে ভালোবেসে
তোদের ছেড়ে থাকাই ভালো। যা, আর কথা নয়, চলে' যা !

সকলে

আচ্ছা, ঠাকুর চল্লম, কিন্তু—

ধনঞ্জয়

কিন্তু কি রে ! একেবারে নিকিস্ত হয়ে যা, উপরে মাথা
তুলে।

সকলে

আচ্ছা, তবে চলি।

ধনঞ্জয়

ওকে চলা বলে ? জ্বরে !

গণেশ

চল্লম, কিন্তু আমাদের বলবুজি রইল এইখানে গড়ে'।

[প্রস্থান।

রণজিৎ

কি বৈরাগী, চূপ করে' রইলে যে।

ধনঞ্জয়

ভাবনা ধরিয়ে দিয়েচে, রাজা।

রণজিৎ

কিসের ভাবনা ?

ধনঞ্জয়

তোমার চণ্ডপালের দণ্ড লাগিয়েও যা করতে পারি নি আমি দেখুচি তাই করে' বসে আছি। এতদিন ঠাউরে-ছিলুম আমি ওদের বলবুন্ধি বাড়াচ্ছি; আজ মুণের উপর বলে' গেল আমিই ওদের বলবুন্ধি হরণ করেচি।

রণজিৎ

এমনটা হয় কি করে' ?

ধনঞ্জয়

ওদের যতই মাতিবে তুলেচি ততই পাকিয়ে তোলা হয়নি আর কি। দেনা ঘাদের অনেক বাকি, শুধু কেবল দৌড় লাগিয়ে দিয়ে তাদের দেনা শোধ হয় না ত। ওরা ভাবে আমি বিধাতার চেয়ে বড়, তাঁর কাছে ওরা যা ধারে আমি বেন তা নামঞ্জুর করে' দিতে পারি। তাই চক্ষু বুজে আমাকেই জাঁকড়ে থাকে।

রণজিৎ

ওরা যে তোমাকেই দেবতা বলে' জেনেচে।

ধনঞ্জয়

তাই আমাতেই এসে ঠেকে গেল, আসল দেবতা পর্যন্ত পৌছল না। ভিতরে থেকে বিনি ওদের চালাতে পারতেন বাইরে থেকে আমি তাঁকে রেখেচি ঠেকিয়ে।

রণজিৎ

রাজার খাজনা যখন ওরা দিতে আসে তখন বাধা দাও, আর দেবতার পূজো যখন তোমার পায়ের কাছে এসে পড়ে তখন তোমার বাজে না ?

ধনঞ্জয়

ওরে বাপু! বাজে না ত কি! দৌড় মেয়ে পালাতে পারলে বাচি। আমাকে পূজো দিবে ওরা অন্তরে অন্তরে দেউলে হতে চলল, সে দেনার দায় বে আমারও ঘাড়ে পড়বে, দেবতা ছাড়বেন না।

রণজিৎ

এখন তোমার কর্তব্য ?

ধনঞ্জয়

তকালে থাকা। আমি যদি পাকা করে' ওদের মনের বাধ বেঁধে থাকি, তা হলে তোমার বিহৃতিকে আর আমাকে ভৈরব বেন এক সঙ্গেই তাড়া লাগান।

রণজিৎ

তবে আর দেরি কেন ? সর না!

ধনঞ্জয়

আমি সরে' দাঁড়ালেই ওরা একেবারে তোমার চণ্ডপালের ঘাড়ের উপর গিরে' চড়াও হবে। তখন যে-দণ্ড আমার পাওনা সেটা পড়বে ওদেরি মাথার খুলির উপরে। এই ভাবনার সর্বতে পারি নে।

রণজিৎ

নিজে সর্বতে না পারি আমিই সরিয়ে দিচ্ছি। উদ্ধব, বৈরাগীকে এখন শিবিরে বন্দী করে' রাখ।

ধনঞ্জয়

(গান)

তোর শিকল আমার বিকল করবে না।

তোর মারে মরম মরবে না।

তাঁর আপন হাতের ছাড়-চিঠি সেই যে,

আমার মনের ভিতর-রয়েছে এই যে,

তোদের ধরা আমায় ধরবে না।

যে পথ দিয়ে আমার চলাচল

তোর প্রহরী-তার খোজ পাবে কি বলু ?

আমি তাঁর দুয়ারে পৌছে গেছি রে,

মোরে তোর দুয়ারে ঠেকাবে কি রে ?

তোর ডরে-পরাণ ডরবে না।

[ধনঞ্জয়কে লইয়া উদ্ধবের-প্রস্থান।]

রণজিৎ

মন্ত্রী, বন্দিশালায় অভিজিৎকে দেখে এসগে। যদি দেখে সে-আপন কৃতকর্মের জন্তে অমৃতপ্ত, তাহলে—

মন্ত্রী

মহারাজ, আপনি স্বয়ং গিয়ে একবার—

রণজিৎ

না, না, সে নিজরাজ্যবিদ্রোহী, যতক্ষণ অপরাধ স্বীকার না করে ততক্ষণ তার মুখদর্শন করব না। আমি রাজধানীতে-যাচ্ছি, দেখানো আমাকে সংবাদ দিয়ে।

[রাজ্যাব প্রস্থান।]

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

(গান)

তিমির-হৃদবিদারণ জলদগ্নি-নিদাকরণ,

মরু-অশান-সঞ্চর !

শঙ্কর শঙ্কর !

বজ্রঘোষ-বাণী, রুদ্র শূলপানি,

মৃত্যুসিদ্ধু-সস্তর,

শঙ্কর, শঙ্কর !

[প্রস্থান ।

[উদ্ধবের প্রবেশ]

উদ্ধব

এ কি ? যুবরাজের সঙ্গে দেখা না করেই মহাবাজ চলে' গেলেন ?

মন্ত্রী

পাছে মুখ দেখে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় এই ভয়ে । এতক্ষণ ধরে' বৈরাগীর সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন মনের মধ্যে এই দ্বিধা নিয়ে । শিবিরের মধ্যেও যেতে পারছিলেন না, শিবির ছেড়ে যেতেও পা উঠছিল না । যাই যুবরাজকে দেখে আসিগে ।

[প্রস্থান ।

[দুইজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ]

১

মাসী, ওরা কেন সবাই এমন রেগে উঠেছে ? কেন বস্কে যুবরাজ অন্তায় কবেচেন—আমি এ বস্কেতেও পারিনে, সহিতেও পারিনে ।

২

বস্কেতে পারিসনে উত্তরকূটের মেয়ে হয়ে ? উনি নন্দী-সঙ্কটের রাস্তা খুলে দিয়েছেন ।

১

আমি জানিনে তাতে অপরাধ কি হয়েছে ? কিন্তু আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিনে যে যুবরাজ অন্তায় করেচেন ।

২

তুই ছেলেমানুষ, অনেক দুঃখ পেয়ে তবে একদিন বস্কে বাইরে থেকে যাদের ভালো বলে' বোধ হয় তাদেরি বেশি সন্দেহ করতে হয় ।

৪

১

কিন্তু যুবরাজকে কি সন্দেহ করচ তোমরা ?

২

সবাই বলচে যে শিবতরাইয়ের লোকদের বশ করে' নিষে, উনি এখনি উত্তরকূটের সিংহাসন জয় করতে চান,—ওঁর আর তর সহিচে না ।

১

সিংহাসনের কি দরকার ছিল ওঁর ! উনি ত সবাই হৃদয় জয় করে' নিবেচেন । যাবা ওঁর নিন্দে করচে তাদেরই বিশ্বাস করব আর যুবরাজকে বিশ্বাস করব না ?

২

তুই চুপ কর । একরকমি মেয়ে, তোর মুখে এসব কথা সাজে না । দেশস্বর্গ লোক যাকে অভিসম্পাত করচে তুই হঠাৎ তার—

১

আমি দেশস্বর্গ লোকের সামনে দাঁড়িয়ে একথা বলতে পাবি যে—

২

চুপ চুপ ।

১

কেন চুপ ? আমার চোখ ফেটে বেরতে চায় । যুবরাজকে আমি সব-চেয়ে বিশ্বাস করি এই কথাটা প্রকাশ করবার জন্যে আমার যা-হয় একটা কিছু করতে ইচ্ছা করচে । আমার এই লম্বা চুল আমি আজ ভৈরবের কাছে মানং করব—বলব, “বাবা, তুমি জানিয়ে দাও যে যুব-রাজেরই জয়, যারা নিন্দুক তাবা মিথ্যে ।”

২

চুপ চুপ চুপ । কোথা-থেকে কে শুনতে পাবে । মেয়েটা বিপদ ঘটাবে দেখছি !

[উভয়ের প্রস্থান ।

[উত্তরকূটের একদল নাগরিকের প্রবেশ]

১

কিছুতেই ছাড়চিনে, চল-রাজার কাছে যাই ।

২

কল কি হবে ? যুবরাজ যে রাজ্যের বঙ্গের-মাণিক,

তাঁর অপরাধের বিচার করতে পারবেন না, মাঝেব থেকে
রাগ করবেন আমাদের পবে ।

১

করুন বাগ, পষ্ট কথা বল্ব কপালে যাই থাক ।

৩

এ দিকে যুবরাজ আমাদের এত ভালোবাসা দেখান,
ভাব করেন ঘেন আকাশের চাঁদ হাতে পেড়ে দেবেন, আর
তলে তলে তাঁরই এই কীর্তি? হঠাৎ শিবতবাই তাঁর
কাছে উত্তরকুটের চেয়ে বড় হয়ে উঠল ?

এমন হলে পৃথিবীতে আর ধর্ম রইল কোথা? বল ত
দাদা !

৩

কাউকে চেনবার জো নেই ।

১

বাজ্ঞা শুকে শান্তি না দেন ত আমরা দেব ।

২

কি করবি ?

১

এ দেশে শুঁব ঠাই হচ্ছে না । যে পথ কেটেচেন সেই
পথ দিয়ে শুঁকেই বেবিয়ে যেতে হবে ।

৩

কিন্তু ঐ ত চবুয়া গাঁধের লোক বল্লে, তিনি
শিবতবাইয়ে নেই, এখানে বাজ্ঞার বাড়িতেও তাঁকে পাওয়া
যাচ্ছে না ।

১

রাজা তাকে নিশ্চয়ই লুকিয়েচে ।

৩

লুকিয়েচে ? ইন, দেয়াল ভেঙে বেব করব ।

১

ঘরে আগুন লাগিয়ে বেব করব ।

৩

আমাদের ফাঁকি দেবে ? মরি মরুব তবু—

[উদ্ধবের সহিত মন্ত্রী প্রবেশ]

মন্ত্রী

কি হয়েছে ?

লুকোচুবী চলবে না । বেব কব যুবরাজকে ।

মন্ত্রী

আবে বাপু, আমি বের করবার কে ?

২

তোমরাই ত মন্ত্রণা দিয়ে তাঁকে—পারবে না কিন্তু,
আমরা টেনে বেব করব !

মন্ত্রী

আচ্ছা, তবে নিজের হাতে রাজহ নাও, বাজ্ঞার গারা
থেকে ছাড়িয়ে আনো ।

৩

গারদ থেকে ?

মন্ত্রী

মহারাজ তাকে বন্দী করেচেন ।

সকলে

জয় মহারাজের, জয় উত্তরকুটের !

২

চল বে, আমরা গারদে ঢুকব, সেখানে গিয়ে—

মন্ত্রী

গিয়ে কি করবি ?

২

বিভূতিব গলার মালা থেকে ফুল খসিয়ে দড়িগাছটা
ওব গলায় ঝুলিবে আসব ।

৩

গলায় কেন, হাতে । বাঁধ বাঁধাব সম্মানের উচ্ছ্রিষ্ট
দিয়ে পথ-কাটাব হাতে দড়ি পড়বে ।

মন্ত্রী

যুবরাজ পথ ভেঙেচেন বলে' অপবাদ, আর তোমরা
ব্যবস্থা ভাঙবে, তাতে অপবাদ নেই ?

২

আহা, ও বে সম্পূর্ণ আলাদা কথা । আচ্ছা বেশ, যদি
ব্যবস্থা ভাঙি ত কি হবে ?

মন্ত্রী

পাথের তলাব মাটি পছন্দ হল না বলে' শূণ্ডে কাঁপিয়ে
পড়া হবে । সেটাও পছন্দ হবে না বলে' বাধ্চি । একটা
ব্যবস্থা আগে কবে' তবে অন্য ব্যবস্থাটা ভাঙতে হয় ।

৩

আচ্ছা, তবে গাবদ থাক্, রাজবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে

মহারাজের জয়ধ্বনি করে' আসিগে।

৩

ও ভাই, ঐ দেখ্! সূর্য্য অস্ত গেছে, আকাশ অন্ধকার
হবে এল, কিন্তু বিহুতির যন্ত্রেব ঐ চুড়াটা এখনো জল্চে।
রোদ্দুরেব মদ খেয়ে বেন লাল হবে বয়েচে।

২

আর ভৈরব-মন্দিরেব ত্রিশূলটাকে অন্তঃসূর্য্যেব আলো
জ্বাক্ড়ে রয়েছে বেন ডোব্বাব ভবে। কি রকম
দেখাচ্ছে।

[নাগরিকদের প্রস্থান।

মন্ত্রী

মহাবাজ কেন যে যুবরাজকে এই শিবিরে বন্দী কর্তে
বলেছিলেন এখন বুঝেচি।

উদ্ধব

কেন?

মন্ত্রী

প্রজাদের হাত থেকে ঠেকে বাঁচাবা জন্তে। কিন্তু
ভাল ঠেকে না। লোকের উত্তেজনা কেবলি বেড়ে
উঠে।

[সঙ্ঘের প্রবেশ]

সঙ্ঘ

মহারাজকে বেশী আগ্রহ দেখাতে সাহস করলুম না,
তাতে তাঁর সঙ্ঘ আরো দৃঢ় হয়ে ওঠে।

মন্ত্রী

রাজকুমার, শাস্ত থাকবেন, উৎপাতকে আবো জটিল
কবে' তুলবেন না।

সঙ্ঘ

বিস্রোহ ঘটবে আমিও বন্দী হতে চাই।

মন্ত্রী

তার চেয়ে মৃত্যু থেকে বন্ধন মোচনের চিন্তা করুন।

সঙ্ঘ

সেই চেষ্টাতেই প্রজাদের মধ্যে গিয়েছিলুম। জান্তুম
যুবরাজকে তাবা প্রাণের অধিক ভালোবাসে,—তাঁব বন্ধন

ওরা সহিবে না। গিয়ে দেখি নন্দিসঙ্ঘটের খবর পেয়ে
তারা আগুন হয়ে আছে।

মন্ত্রী

তবেই বুঝেচেন, বন্দিশালাতেই যুবরাজ নিবাপদ।

সঙ্ঘ

আমি চিরদিন তাঁবই অনুবর্তী, বন্দিশালাতেও
আমাকে তাঁব অনুসরণ কর্তে দাও।

মন্ত্রী

কি হবে?

সঙ্ঘ

পৃথিবীতে কোনো একলা মানুষই এক নয়, সে অর্ধেক।
আরেক জনেব সঙ্গে মিল হলে তবেই সে ঐক্য পায়।
যুবরাজের সঙ্গে আমাব সেই মিল।

মন্ত্রী

রাজকুমার, সে কথা মানি। কিন্তু সেই সত্য মিল
বেখানে, সেখানে কাছে কাছে থাকবার দরকার হয় না।
আকাশেব মেঘ আব সমুদ্রের জল অন্তরে একই, তাই
বাইরে তাবা পৃথক হয়ে ঐক্যটিকে সার্থক কবে। যুবরাজ
আজ বেখানে নেই, সেইখানেই তিনি তোমার মধ্য দিবে
প্রকাশ পান।

সঙ্ঘ

মন্ত্রী, এ ত তোমার নিজের কথা বলে' শোনাচ্ছে না, এ
বেন যুবরাজেব মুখেব কথা।

মন্ত্রী

তাঁব কথা এখানকার হাওয়ায় ছড়িয়ে আছে, ব্যবহার
কবি, অথচ ভুলে যাই তাঁব কি আমার।

সঙ্ঘ

কিন্তু কথাটি মনে করিয়ে দিয়ে ভালো করেচ, দুব থেকে
তাঁবই কাজ করুব। যাই মহারাজের কাছে।

মন্ত্রী

কি কর্তে?

সঙ্ঘ

শিবতরাইয়েব শাসনভার প্রার্থনা করুব।

মন্ত্রী

সময় যে বড় সঙ্ঘটের, এখন কি—

সঙ্ঘ

সেইজন্তেই এই ত উপযুক্ত সময়।

[উভয়ের প্রস্থান। হবে।]

[বিশ্বজিতের প্রবেশ]

বিশ্বজিৎ

ও কে ও? উদ্ধব বুঝি?

উদ্ধব

হাঁ, খুড়া মহারাজ।

বিশ্বজিৎ

অন্ধকারেব জগ্রে অপেক্ষা করছিলুম, আগাব চিঠি
পেয়েচ ত?

উদ্ধব

পেয়েচি।

বিশ্বজিৎ

সেই-মত কাজ হয়েছে?

উদ্ধব

অল্প পরেই জানতে পারবে। কিন্তু—

বিশ্বজিৎ

মনে সংশয় কোবো না। মহারাজ ওকে নিজে মুক্তি
দিতে প্রস্তুত নন, কিন্তু তাঁকে না জানিয়ে কোনো উপায়ে
আর কেউ যদি একাজ সাধন করে তা হলে তিনি বেঁচে
যাবেন।

উদ্ধব

কিন্তু নেই আব-কেউকে কিছুতে ক্ষমা করবেন না।

বিশ্বজিৎ

আগাব দৈন্ত আছে, তাবা তোমাকে আব তোমার
প্রহরীদের বন্দী করে' নিষে যাবে। দায় আগাবই।

নেপথ্যে

আগুন, আগুন।

উদ্ধব

ঐ হয়েছে। বন্দীশালাব সংলগ্ন পাকশালার তাঁবুতে
আগুন ধবিধে দিচ্ছে। এই সুযোগে বন্দী ছটিকে বেব
কবে' দিই।

[কিছুক্ষণ পরে অভিজিতের প্রবেশ]

অভিজিৎ

এ কি দাদামশায় ঘে!

বিশ্বজিৎ

তোমাকে বন্দী করতে এসেচি। মোহনগড়ে বেতে

?

অভিজিৎ

আমাকে আজ কিছুতেই বন্দী করতে পারবে না, না
ক্রোধে, না মেহে। তোমরা ভাব্চ তোমরাই আগুন
লাগিয়েচ? না, এ আগুন বেগুন করেই হোক লাগ্‌ত।
আজ আমার বন্দী থাকবার অবকাশ নেই।

বিশ্বজিৎ

কেন, ভাই, কি তোমাব কাজ?

অভিজিৎ

জন্মকালেব ঋণ শোধ করতে হবে। শ্রোতাব পথ
আমার ধাত্রী, তার বন্ধন মোচন করব।

বিশ্বজিৎ

তার অনেক সময় আছে, আজ নয়।

অভিজিৎ

সময় এখনি এনেচে এই কথাই জানি, কিন্তু সময়
আবাব আসবে কি না সে কথা কেউ জানি নে।

বিশ্বজিৎ

আমবাও তোমাব সঙ্গে যোগ দেব।

অভিজিৎ

না, সকলেব এক কাজ নয়, আমার উপর যে কাজ
পড়েচে সে একলা আমারই।

বিশ্বজিৎ

তোমার শিবতরাইনের ডক্কদল যে তোমার কাজে হাত
দেবার জন্যে অপেক্ষা কবে' আছে, তাদের ডাকবে না?

অভিজিৎ

যে ডাক আমি শুনেছি সেই ডাক যদি তারাও শুনত
তবে আমার জন্তে অপেক্ষা করত না। আমার ডাকে
তাঁবা পথ ভুলবে।

বিশ্বজিৎ

ভাই, অন্ধকার হবে এসেচে ঘে।

অভিজিৎ

যেখান থেকে ডাক এসেচে সেইখান থেকে আলোও
আসবে।

বিশজিৎ

তোমাকে বাধা দিতে পারি এমন শক্তি আমার নেই।

অন্ধকারের মধ্যে একলা চলেচ তবুও তোমাকে বিদায়
দিয়ে ফিরতে হবে। কেবল একটি আশ্বাসের কথা বলে
যাও যে, আবার মিলন ঘটবে।

অভিজিৎ

তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হবার নয় এই কথাটি
মনে রেখো।

[দুই জনের দুইপথে প্রস্থান।

ধনঞ্জয়

(গান)

আশুন, আমার ভাই,

আমি তোমারি জয় গাই।

তোমার শিকল-ভাঙা এমন রাঙা

মুক্তি দেখি নাই।

হুহাত তুলে আকাশ পানে

মেতেছ আজ কিসের গানে ?

একি আনন্দময় নৃত্য-অভয়

বলিহারি যাই।

যেদিন জ্বরের মেঘাদ ফুরোবে, ভাই,

আগল যাবে সরে'

সেদিন হাতের দড়ি পায়ের দড়ি

দিবি রে ছাই করে'।

সেদিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে

ঐ নাচনে নাচবে রঙ্গে,

সকল দাহ মিটবে দাহে,

যুচবে সব বাদাই।

[বটুর প্রবেশ]

বটু

ঠাকুর, দিন ত গেল, অন্ধকার হয়ে এল।

ধনঞ্জয়

বাবা, বজ্রের আলোর উপর ভরসা রাখাই অভ্যাস,

তাই অন্ধকার হলেই একেবারে অন্ধকার দেখি।

বটু

ভেবেছিলুম ভৈরবের নৃত্য আজই আরম্ভ হবে,

কিন্তু যন্ত্ররাজ কি তাঁরও হাত পা যন্ত্র দিয়ে বেঁধে
দিলে ?

ধনঞ্জয়

ভৈরবের নৃত্য যখন সবে আরম্ভ হয় তখন চোখে পড়ে
না। যখন শেষ হবার পালা আসে তখন প্রকাশ হয়ে
পড়ে।

বটু

ভরসা দাও, প্রভু, বড় ভয় ধরিয়েচে।—জাগো,
ভৈরব, জাগো! আলো নিবেচে, পথ ডুবেচে, সাড়া পাইনে
মৃত্যুঞ্জয়! ভয়কে মারো ভয় লাগিয়ে! জাগো, ভৈরব,
জাগো!

[প্রস্থান।

[উত্তরকূটের নাগরিক দলের প্রবেশ]

১

মিথ্যে কথা! রাজধানীর গারদে সে নেই। ওকে
লুকিয়ে রেখেচে।

২

দেখ, কোথায় লুকিয়ে বাখে!

ধনঞ্জয়

না, বাবা, কোথাও পাববে না লুকিয়ে রাখতে। পড়বে
দেয়াল, ভাঙবে দরজা, আলো ছুটে বের হয়ে আসবে—
সমস্ত প্রকাশ হয়ে পড়বে।

১

এ আবার কে রে? বুকের ভিতরটায় হঠাৎ চমকিয়ে
দিলে।

৩

তা বোঝা হয়েছে। একজন কাউকে চাই। তা এই
বৈরাগীটাকেই ধর। ওকে বাঁধ।

ধনঞ্জয়

যে মানুষ ধরা দিয়ে বসে' আছে তাকে ধরবে কি
করে' ?

১

সাধুগিরি রাখ, আমবা ও সব মানিনে।

ধনঞ্জয়

না মানাই ত ভালো। প্রভু স্বয়ং হাতে ধরে' তোমাদের

মানিয়ে নেবেন। তোমরা ভাগ্যবান। আমি যে-সব
অভাগাদের জানি তারা কেবল মেনে মেনেই গুরুকে
ধোয়ালে। আমাকে স্বদ্ধ তারা মানাব তাড়ায় দেশ ছাড়া
কবেচে।

১

তাদের গুরু কে ?

ধনঞ্জয়

বার হাতে তারা মাঝ খায়।

১

তা হলে তোমার উপর গুরুগিরি আমাবাই স্বদ্ধ করি-
না কেন ?

ধনঞ্জয়

রাজি আছে, বাবা। দেখে নিই ঠিকমত পাঠ দিতে
পাবি কি না। পরীক্ষা হোক।

২

সন্দেহ হচ্ছে তুমিই আমাদের যুবরাজকে নিয়ে কিছু
চালাকী কবেচ।

ধনঞ্জয়

তোমাদের যুবরাজ আমার চেয়েও চালাক, তাঁর
চালাকী আমাকে নিয়ে।

২

দেখলি ত, কথাটার মানে আছে। দুজনে একটা
কি ফন্দি চলছে।

১

নইলে ত্রৈতী রাত্রে এখানে ঘুবে বেড়ায় কেন ?
যুবরাজকে শিবতবাইয়ে সবাবাব চেষ্ঠা। এইখানেই
ওকে বেঁধে রেখে যাই। তাব পরে যুবরাজের সন্ধান
পেলে ওর সঙ্গে বোকা-পড়া করব। ওহে, কুন্দন, বাধ
না। দড়িগাছটা ত তোমাব কাছেই আছে।

কুন্দন

এই নাও না দড়ি, তুমিই বাধ না।

২

ওবে, তোরা কি উত্তরকূটের মাগুষ ? দে, আমাকে
দে। (বাধিতে বাধিতে) কেমন হে, গুরু কি বল্চেন ?

ধনঞ্জয়

কষে চেপে ধরেছেন, সহজে ছাড়্চেন না।

[ভৈরব পন্থীর প্রবেশ]

গান

তিমির-হৃদবিদারণ

জগদগ্নি-নিদারুণ,

মরুশ্মশান-সঞ্চব,

শঙ্কর শঙ্কর।

বজ্রধোষ-বাণী

রুদ্র, শূলপাণি,

মৃত্যু-সিদ্ধু-সম্ভব

শঙ্কর শঙ্কর।

[প্রস্থান।

কুন্দন

ঐ দেখ চেয়ে। গোধুলির আলো যতই নিবে আসচে
আমাদের যন্ত্রের চূড়াটা ততই কালো হয়ে উঠ্চে।

১

দিনের বেলায় ও সূর্য্যেব সঙ্গে পালা: দিয়ে এসেছে,
অন্ধকাবে ও বাত্রিবেলাকার কালোব সঙ্গে টক্কর দিতে
লেগেচে। ওকে ভুতের মত দেখাচ্ছে।

কুন্দন

বিভূতি তাব কীষ্টিটাকে এমন কবে'গড়ল কেন ভাই ?
উত্তরকূটের যে দিকেই ফিরি ওর দিকে না তাকিয়ে
খাঁক্‌বার জো নেই, ও যেন একটা বিকট-চীৎকারেব মত।

[৪র্থ নাগবিকেব প্রবেশ]

৪

খবব পাওয়া গেল, ঐ আমবাগানের পিচনে রাজাব
শিবির পড়েচে, সেখানে যুবরাজকে রেখে দিয়েচে।

২

এতক্ষণে বোবা গেল। তাই বটে বৈরাগী এই
পথেই ঘুরচে। ও থাক্ এইখানে বাধা পড়ে'। ততক্ষণ
দেখে আসি।

[প্রস্থান।

ধনঞ্জয়

(গান)

শুধু কি তাব বেঁধেই তোব কাজ ফুবাতিব,

গুণী মোর ও গুণী ?

বাধাবীণা বইবে পড়ে' এমনি ভাবে,

গুণী মোর, ও গুণী ?

তাহ'লে হার হ'ল যে হার হ'ল

শুধু বাঁধাবাঁধিই সার হ'ল

গুণী মোর, ও গুণী !

বাঁধনে যদি তোমার হাত লাগে,

তাহ'লেই স্তর জাগে,

গুণী মোর, ও গুণী !

না হলে ধূলায় পড়ে' লাজ কুড়াবে ।

[নাগরিকদের পুনঃ প্রবেশ]

এ কি কাণ্ড ?

খুড়ো মহারাজ যুবরাজকে সমস্ত গ্রহরীক্ষক মোহনগড়ে
নিষে গেলেন ! এর মানে কি হল ?

কুন্দন

উত্তরকূটের রক্ত ত ঠাঁর শিরাষ আছে । পাছে এখানে
যুবরাজের উচিত বিচার না হয় সেইজন্যে তাঁকে জোর
কবে' বন্দী করে' নিষে গেছেন ।

ভারি অন্যায্য ! একে অত্যাচার বলে । আমাদের
যুবরাজকে আমরা শাস্তি দিতে পারব না ?

এই উচিত বিধান হচ্ছে—বুঝলে, দাদা—

হাঁ, হাঁ, ওঁদের সেই সোনার খনিটা—

কুন্দন

আর জানিস্ ত, ভাই, ওঁর গোষ্ঠে কিছু না হবে ত
পচিশ হাজার গোক আছে ।

তার সব কটি গুণে নিয়ে তবে—কি অন্যায্য ! অসহ
অন্যায্য !

আর ওঁদের সেই জাফরানের ক্ষেত, তার থেকে অস্ত্র
পক্ষে বংশরে—

হাঁ, হাঁ, সেটা দিতে হবে ওঁকে দণ্ড । কিন্তু এখন এই

বৈরাগীকে নিয়ে কি করা যায় ?

ও এখানেই থাকনা পড়ে' ।

[প্রস্থান ।

ধনঞ্জয় গান

ফেলে রাখলেই কি পড়ে র'বে ? (ও অবোধ)

যে তার দাম জানে সে কুড়িয়ে লবে । (ও অবোধ)

ওযে কোন্ রতন তা দেখনা ভাবি,

ওর পরে কি ধুলোর দাবী ?

ও হাবিয়ে গেলে তাঁরি গলার

হার গাঁথা যে ব্যর্থ হবে ।

ওর খোঁজ পড়েচে জানিস্ নে তা ?

তাই দূত বেরল হেথা সেথা ।

যাবে করুলি হেলা সবাই মিলি,

আদর যে তার বাড়িয়ে দিলি,

যারে দরদ দিলি, তার ব্যথা কি

সেই দরদীর প্রাণে স'বে ?

[কুন্দনের পুনঃ প্রবেশ]

কুন্দন

ঠাকুর, তোমার বাঁধনটা খুলে দি,—অপরাধ নিষো না ।

তুমি এখনি বাড়ি পালাও । কি জানি আজ বাজ্রে—

ধনঞ্জয়

কি জানি আজ রায়ে যদি ডাক পড়ে সেইজন্মেই ত
বাড়ি পালাবার জো নাই ।

কুন্দন

এখানে তোমাব ডাক কোথায় ?

ধনঞ্জয়

উৎসবের শেষ পালাটায় ।

কুন্দন

তুমি শিবতরাইয়ের মাহুষ হয়ে উত্তরকূটের—

ধনঞ্জয়

ভৈরবের উৎসবে এখন শিবতরাইয়ের আরতিই কেবল
বাকি আছে ।

নেপথ্যে

জাগো, ভৈরব, জাগো !

কুন্দন

আমার ভালো বোধ হচ্ছে না, চলেম।

[উভয়ের প্রস্থান।]

[উত্তরকূটের দুইজন রাজদূতের প্রবেশ]

এখন কোন্ দিকে যাই? নগ্নসামুদ্রে ঘাঁরা ছাগল
টরাই তারা ত বললে, তারা দেখেচে যুবরাজ একলা এই
পথ দিবে পশ্চিমের দিকে গেছেন।

আজ রাত্রে তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে মহারাজের
ছকুম।

মোহনগড়ে তাঁকে নিয়ে গেছে বলে' কথা উঠেচে।
কিন্তু অথ পাগলীর কথা শুনে স্পষ্ট বোধ হচ্ছে সে যাকে
দেখেচে সে আমাদের যুবরাজ—আর তিনি এই পথ দিয়েই
উঠেচেন।

কিন্তু এই অন্ধকারে তিনি একলা কোথায় যে যাবেন
বোঝা যাচ্ছে না।

আলো না হলে আমরা ত এক পা এগুতে পারব না।
কোটপালের কাছ থেকে আলো সংগ্রহ করে' অনিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।]

[একজন পথিকের প্রবেশ]

পথিক (চীৎকার করিয়া)

ওরে বৃধ—ন, শঙ্কু—উ! বিগদে কেললে। আমাকে
এগিয়ে দিলে, বললে, চড়াই পথ বেয়ে সোজা এসে
আমাকে ধরবে। কারো দেখা নেই। অন্ধকারে ঐ
কালো যন্ত্রটা ইসারা করচে। ভয় লাগিয়ে দিলে। কে
আসে? কে হে? জবাব দাও না কেন? বৃধ না কি?

২ পথিক

আমি নিম্‌কু, বাতিওয়ালা। রাজধানীতে সমস্ত বাত
আলো জ্বলবে, বাতির দরকার। তুমি কে?

১ পথিক

আমি ছব্বা, যাত্রার দলে গান করি। পথের মধ্যে
দেখতে পেলো কি আন্দু অধিকারীর দল?

নিম্‌কু

অনেক মানুষ আসচে, কাকে চিনব?

ছব্বা

অনেক মানুষের মধ্যে তাকে ধোরো না, আমাদের
আন্দু। সে একেবারে আস্ত একখানি মানুষ—ভিড়ের
মধ্যে তাকে খুঁটে বের করতে হয় না—সবাইকে ঠেলে
দেখা দেয়। দাদা, তোমার ঐ বুড়িটার মধ্যে বোধ কবি
বাতি অনেকগুলো আছে, একখানা দাও না। ঘরের
লোকের চেয়ে রাস্তার লোকের আলোর দরকার বেশি।

নিম্‌কু

দাম কত দেবে?

ছব্বা

দামই যদি দিতে পারতুম তবে ত তোমার সঙ্গে হেঁকে
কথা কইতুম, মিঠে স্বর বের করব কেন?

নিম্‌কু

রসিক বট হে!

[প্রস্থান।]

ছব্বা

বাতি দিলে না, কিন্তু রসিক বলে' চিনে নিলে। সেটা
কম কথা নয়। রসিকের গুণ এই, ঘোর অন্ধকারেও
তাকে চেনা যায়।—উঃ, ঝিঝির ডাকে আকাশটার গা
ঝিমঝিম করচে। নাঃ, বাতিওয়ালা'র সঙ্গে রসিকতা না
করে' ডাকাতি করলে কাজে লাগত।

[আরেকজন পথিকের প্রবেশ]

পথিক

হেইয়ো!

ছব্বা

বাবারে, চমকিধে দাও কেন?

পথিক

এখন চল!

ছব্বা

চলব বলেই ত বেরিয়েছিলুম। দলের লোককে
ছাড়িয়ে চলতে গিয়ে কি রকম অচল হয়ে পড়তে হয় সেই
তত্ত্বটা মনে মনে হজম করার চেষ্টা করছি।

পথিক

দলের লোক তৈরী আছে এখন তুমি গিয়ে ছুটলেই
হবে।

ছব্বা

কথাটা কি বললে? আমরা তিনমোহনার লোক, আমাদের একটা বড় অভ্যেস আছে পষ্ট কথা না হলে বুঝতেই পারিনে। দলের লোক বলচ কাকে?

পথিক

আমরা চব্বা গাঁয়ের লোক, পষ্ট বোঝাবার বড় অভ্যেসে হাত পাকিয়েছি। (ধাক্কা দিয়া) এইবার বুঝলে ত?

ছব্বা

উঃ, বুঝেছি। ওব সোজা গানে হচ্ছে, আমাকে চলতেই হবে মর্জি থাক আর না থাক। কোথায় চলব? এবার একটু মোলায়েম করে জবাব দিয়ো। তোমার আলাপের প্রথম ধাক্কাতেই আমার বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে এসেছে।

পথিক

শিবতরাইয়ে যেতে হবে।

ছব্বা

শিবতরাইয়ে? এই অমাবস্যারাত্রে? সেখানে পালাটা কিসের?

পথিক

নন্দিনীকণ্ঠের ভাড়া গড় ফিরে গাঁধার পালা।

ছব্বা

ভাড়া গড় আমাকে দিয়ে গাঁধাবে? দাদা, অন্ধকারে আমার চেহারাটা দেখতে পাচ্চ না বলেই এত বড় শব্দ কথাটা বললে। আমি হচ্ছি—

পথিক

তুমি ধেই হও না কেন, দুখানা হাত আছে ত?

ছব্বা

নেহাং না থাকলে নয় বলেই আছে নইলে একে কি—

পথিক

হাতের পরিচয় মুখের কথায় হয় না, ষাখানাই হবে, এখন ঠুই।

[দ্বিতীয় পথিকের প্রবেশ]

পথিক

ঐ আবেকজন লোককে পেয়েছি, কঙ্কর।

কঙ্কর

লোকটা কে?

আমি কেউ না, বাবা, আমি লছমন, উত্তরভৈরবের মন্দিরে ঘণ্টা বাজাই।

কঙ্কর

সে ত ভালো কথা, হাতে জোর আছে। চল শিবতরাই।

লছমন

যাব ত, কিন্তু মন্দিরের ঘণ্টা—

কঙ্কর

বাবা ভৈরব নিজের ঘণ্টা নিজেই বাজাবেন।

লছমন

দোহাই তোমাদের, আমার জী রোগে ভুগছে।

কঙ্কর

তুমি চলে' গেলে তার রোগ হয় সার্বর্বে, নর্থ সে মরবে; তুমি থাকলেও ঠিক তাই হত।

ছব্বা

ভাই লছমন, চুপ করে মেনে যাও। কাজটাতে বিপদ আছে বটে, কিন্তু আপত্তিতেও বিপদ কম নেই, আমি একটু আভাস পেয়েছি।

কঙ্কর

ঐ যে, নরসিঙের গলা শোনা যাচ্ছে। কি নরসিং ধবর ভালো ত?

[কয়েকজন লোককে লইয়া নরসিঙের প্রবেশ।]

নরসিং

এই দেখ, দল জুটিয়ে এনেছি। আবো কয়দল আগেই রওনা হয়েছে।

কঙ্কর

তা হলে চল, পথের মধ্যে আরো কিছু কিছু জুটবে।

দলের একজন

আমি যাব না।

কঙ্কর

কেন যাবে না? কি হয়েছে?

উত্তরব্যক্তি

কিছু হয় নি, আমি যাব না।

কঙ্কর

লোকটার নাম কি, নরসিং ?

নরসিং

ওর নাম বনোয়ারি, পল্লবীজের মালা তৈরি করে।

কঙ্কর

আচ্ছা, ওব সঙ্গে একটু বোঝাপড়া করে নিই—কেন
যাবে না বল ত ?

বনোয়ারি

প্রবৃত্তি নেই। শিবতবাইয়ের নোকের সঙ্গে আমার
ঝগড়া নেই। ওরা আমাদের শত্রু নয়।

কঙ্কর

আচ্ছা, না হয় আমরাই ওদের শত্রু হলুম, তাবও ত
একটা কর্তব্য আছে ?

বনোয়ারি

আমি অস্ত্রায় করতে পারব না।

কঙ্কর

জায় অগায় ভাববার স্বাভাব্য যেখানে সেইখানেই
অন্যায় হচ্ছে অন্যায়। উত্তরকূট বিরাট, তার অংশরূপে
যে কাজ তোমার দ্বারা হবে তার কোনো দাবিই তোমার
নেই।

বনোয়ারি

উত্তরকূটকে ছাড়িয়ে থাকেন এমন বিরাটও আছেন।
উত্তরকূটও তাঁর যেমন অংশ, শিবতবাইও তেমনি।

কঙ্কর

ওহে নরসিং, লোকটা তর্ক করে যে! দেশের পক্ষে
ওর বাড়ি আপদ আর নেই।

নরসিং

শত্রু কাজে লাগিয়ে দিনেই তর্ক ঝাড়াই হয়ে যায়।
তাই ওকে টেনে নিয়ে চলেছি।

বনোয়ারি

তাতে তোমাদের ভার হয়ে থাকবে, কোনো কাজে
লাগবে না।

কঙ্কর

উত্তরকূটের ভার তুমি, তোমাকে বর্জন করার উপায়
খুঁজি।

ছন্দা

বনোয়ারি খুড়ো, তুমি বিচার করে' সব কথা বুঝতে
চাও বলেই, যারা বিনা বিচারে বুঝিয়ে থাকে তাদের সঙ্গে
তোমার এত ঠোকাঠুকি বাধে। হয় তাদের প্রশংসীটা
কাবদা করে' নাও, নয় নিজেব প্রশংসীটা ছেড়ে ঠাণ্ডা হয়ে
বসে' থাক।

বনোয়ারি

তোমার প্রশংসীটা কি ?

ছন্দা

আমি গান গাই। দেটা এখানে খাটবে না বলেই জ্বর
বের করছি নে—নইলে এতক্ষণে তান লাগিয়ে দিতুম।

কঙ্কর

(বনোয়ারির প্রতি)

এখন তোমার অভিপ্রায় কি ?

বনোয়ারি

আমি এক পা নড়ব না।

কঙ্কর

তাহলে আমরাই তোমাকে নড়াব। বাঁধো ওকে!

ছন্দা

একটা কথা বলি, কঙ্কর দাদা, রাগ কোবো না। ওকে
বয়ে নিবে বেতে বে জোরটা খরচ করবে সেইটে বাঁচাতে
পারলে কাজে লাগত।

কঙ্কর

উত্তরকূটের দেবদাস যাবা অনিশ্চুক তাদের দমন করা
একটা কাজ, সমব থাকতে এই কথাটা বুঝে দেখো।

ছন্দা

এরি মধ্যে বুঝে নিয়েছি।

[নরসিং ও কঙ্কর ছাড়া আর সকলের প্রস্থান।]

নরসিং

ঐ যে বিভূতি আসচে। যন্ত্রবাজ বিভূতির জয়!

[বিভূতির প্রবেশ]

কঙ্কর

কাজ অনেকটা এগিয়েচে, লোকও কম জ্বোটে নি।
কিন্তু তুমি এখানে কেন? তোমাকে নিষে সবাই যে
ঈশ্বর করবে।

বিভূতি

উৎসবে আমার সখ নেই।

নরসিং

কেন বল ত?

বিভূতি

আমার কীর্তি খর্ব করবার জন্যেই নন্দী-সঙ্কটের গড় ভাঙার খবর ঠিক আশ্র এসে পৌঁছল। আমার সঙ্গে একটা প্রতিবোধিতা চলে।

কঙ্কর

কার প্রতিবোধিতা, যন্ত্ররাজ?

বিভূতি

নাম করতে চাইনে, সবাই জানে। উত্তরকূটে তাঁর বেশি আদর হবে, না আমার, এই হবে দাঁড়াল সমস্ত। একটা কথা তোমাদের জানা নেই; এর মধ্যে আমার কাছে কোনো পক্ষ থেকে দূত এসেছিল আমার মন ভাঙাতে; আমার মুক্তধারার বাঁধ ভাঙবে এমন শাসন-বাক্যেরও আভাস দিয়ে গেল।

নরসিং

এত বড় কথা?

কঙ্কর

তুমি সহ করলে, বিভূতি?

বিভূতি

প্রলাপবাক্যের প্রতিবাদ চলে না।

কঙ্কর

কিন্তু বিভূতি, এত বেশি নিঃসংশয় হওয়া কি ভালো? তুমিই ত বলেছিলে বাঁধের বন্ধন ছই এক জায়গায় আলগা আছে, তার সন্ধান জানলে অল্প একটুখানিতেই—

বিভূতি

সন্ধান বে জানবে সে এও জানবে যে, সেই ছিন্ন খুলতে গেলে তার বক্ষা নেই, বজ্রায় তখনি ভানিয়ে নিয়ে যাবে।

নরসিং

পাহারা রাখলে ভালো করতে না?

বিভূতি

সে ভিত্তেব কাছে যম স্বয়ং পাহারা দিচ্ছেন। পাঁধের

জন্তে কিছুমাত্র আশঙ্কা নেই। আপাতত ঐ নন্দীসঙ্কটের পথটা আটকে দিতে পারলে আমার আর কোনো খেদ থাকে না।

কঙ্কর

তোমার পক্ষে এ ত কঠিন নয়।

বিভূতি

না, আমার যন্ত্র প্রস্তুত আছে। মুকিল এই যে, ঐ গিরিপথটা সঙ্কীর্ণ, অনায়াসেই অল্প কয়েক জনেই বাধা দিতে পারে।

নরসিং

বাধা কত দেবে? মরতে মরতে গোঁথে তুলব।

বিভূতি

মরবার লোক বিস্তর চাই।

কঙ্কর

মরবার লোক থাকলে মরবার লোকের অভাব ঘটে না।

নেপথ্যে

জাগো, ভৈরব, জাগো।

[ধনঞ্জয়ের প্রবেশ]

কঙ্কর

ঐ দেখ, যাবার মুখে অবাঁজা।

বিভূতি

বৈরাগী, তোমাদের মত সাধুরা ভৈরবকে এ পর্যন্ত জাগাতে পারলে না, আর যাকে পাঁচও বল সেই আমিই ভৈরবকে জাগাতে চলেছি।

ধনঞ্জয়

নৈকখা মানি, জাগাবার ভার তোমাদের উপরেই।

বিভূতি

এ কিন্তু তোমাদের ঘণ্টা নেড়ে আরতির দীপ জালিয়ে জাগানো নয়।

ধনঞ্জয়

না, তোমরা শিকল দিয়ে তাঁকে বাঁধবে, তিনি শিকল ছেঁড়বার জন্যে জাগবেন।

বিভূতি

সহজ শিকল আমাদের নয়, পাকের পর পাক গুটির পর গুটি।

ধনঞ্জয়

বিকৃতি

দূর্ভাগ্যে চেষ্টা করি যদি তখনই তাঁর সময় আসে।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

(গান)

জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর,

জয় জয় জয় প্রলয়ধর।

জয় সংসার-ভেদন,

জয় বন্ধন-ছেদন,

জয় সংকট-সংহর,

শঙ্কর, শঙ্কর!

[প্রস্থান।]

[রণজিৎ ও মন্ত্রী প্রবেশ]

মন্ত্রী

মহারাজ, শিবির একেবারে শূন্য, অনেকখানি পুড়েছে।

অল্প কয়েকজন প্রহরী ছিল, তারা ত—

রণজিৎ

তারা যেখানেই থাক না, অভিজিৎ কোথায় জানা চাই।

কঙ্কর

মহারাজ, যুবরাজের শাস্তি আমরা দাবী করি।

রণজিৎ

শাস্তির বে বোধ্য তার শাস্তি দিতে আমি কি তোমাদের অপেক্ষা কবোঁ থাকি?

কঙ্কর

তাঁকে খুঁজে না পেয়ে লোকের মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছে।

রণজিৎ

কি! সংশয়! কার সমক্ষে?

কঙ্কর

কি কবোঁ, মহারাজ। প্রজাদের মনের ভাব আপনার জানা চাই। যুবরাজকে খুঁজে পেতে যতই বিলম্ব হচ্ছে ততই তাদের অধৈর্য্য এত বেড়ে উঠছে যে, যখন তাঁকে পাওয়া যাবে তখন তারা শাস্তি জ্ঞে মহারাজের অপেক্ষা করবে না।

মহারাজের আদেশের অপেক্ষা না করেই নন্দিনীকে ভাঙা দুর্গ গড়ে তোলবার ভার আমরা নিজের হাতে নিয়েছি।

রণজিৎ

আমার হাতে কেন রাখতে পারলে না?

বিকৃতি

যেটা আপনারই বংশের অপকীর্তি, তাতে আপনারও গোপন সম্মতি আছে এ বকম সন্দেহ হওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

মন্ত্রী

মহারাজ, আজ জনসাধারণের মন একদিকে আস্ত-স্বাধীন অন্তরিকে ক্রোধে উত্তেজিত। আজ অধৈর্য্যের দ্বারা অধৈর্য্যকে উদ্দাম করে তুলবেন না।

রণজিৎ

ওখানে ও কে দাঁড়িয়ে? ধনঞ্জয় বৈরাগী?

ধনঞ্জয়

বৈরাগীটাকেও মহারাজের মনে আছে দেখছি।

রণজিৎ

যুবরাজ কোথায় তা তুমি নিশ্চিত জান।

ধনঞ্জয়

না, মহারাজ, বা আমি নিশ্চিত জানি তা চেপে রাখতে পারিনে, তাই বিপদে পড়ি।

রণজিৎ

তবে এখানে কি কর্চ?

ধনঞ্জয়

যুবরাজের প্রকাশের জন্তে অপেক্ষা করছি।

নেপথ্যে

স্বমন, বাবা স্বমন! অন্ধকার হয়ে এল, সব অন্ধকার হয়ে এল।

রাজা

ও কে ও?

মন্ত্রী

নেই অন্ধকার।

[অম্বর প্রবেশ]

অম্বর

কই, সে ত কিবুল না।

রণজিৎ

কেন খুঁজচ তাকে? সময় হযেছিল, ভৈরব তাকে ডেকে নিয়েছেন।

অম্বর

ভৈরব কি কেবল ডেকেই নেন? ভৈরব কি কখনো ফিরিয়ে দেন না? চুপিচুপি? গভীর রাত্রে?—হুম্ন, হুম্ন।

[প্রস্থান।]

[চরের প্রবেশ]

চর

শিবতরাই থেকে হাজার হাজার লোক 'চলে' আস্চে।

বিভূতি

সে কি কথা? আমরা হঠাৎ গিষে তাদের নিরস্ত্র করব এই ত ঠিক ছিল। নিশ্চয় তোমাদের কোনো বিশ্বাস-
—রক্ষাতক তাদের খবর দিয়েচে। ককর, তোমরা কয়জন ছাড়া ভিতরের কথা কেউ ত জানে না। তা হলে কি কবে—

ককর

কি বিভূতি! আগাদেরও সন্দেহ কর না কি?

বিভূতি

সন্দেহ করার সীমা কোথাও নেই।

ককর

তাহলে আমরাও তোমাকে সন্দেহ করি।

বিভূতি

নে অধিকার তোমাদের আছে। যাই হোক সময় হলে এর একটা বোঝা-পড়া করতে হবে।

রণজিৎ (চরের প্রতি)

তারা কি অভিপ্রায়ে আস্চে তুমি জান?

চর

তারা শুনেচে—যুবরাজ বন্দী হযেচেন, তাই পণ করেছে তাঁকে খুঁজে বের করবে। এখন থেকে মুক্ত কবে তাঁকে

• • • • •

বিভূতি

আমরাও খুঁজছি যুবরাজকে, আর ওরাও খুঁজ্চে, দেখি কাব হাতে পড়েন।

ধনঞ্জয়

তোমাদের দুই দলেবই হাতে পড়বেন, তাঁর মনে পক্ষপাত নেই।

চর

ঐ যে আস্চে শিবতরাইয়ের গণেশ সর্দার।

[গণেশের প্রবেশ]

গণেশ (ধনঞ্জয়ের প্রতি)

ঠাকুর, পাব ত তাঁকে?

ধনঞ্জয়

ই রে, পাবি।

গণেশ

নিশ্চয় করে' বল।

ধনঞ্জয়

পাবি বে।

রণজিৎ

কাকে খুঁজ্ছিস?

গণেশ

এই যে, রাজা, ছেড়ে দিতে হবে।

রণজিৎ

কাকে রে?

গণেশ

আমাদের যুবরাজকে। তোমরা তাকে চাও না, আমরা তাকে চাই। আমাদের সবই তোমরা আটক করে' বাধ্বে? ওকেও?

ধনঞ্জয়

মাহুস চিন্‌লিনে, বোকা? ওকে আটক কবে এমন সাধ্য আছে কার?

গণেশ

ওকে আমাদের রাজা করে' বাধ্বে।

ধনঞ্জয়

• • • • •

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

(গান)

তিমির-হৃদবিদারণ,

জ্বলদগ্নি-নিদারুণ,

মরুশ্মশান-সঙ্কর,

শঙ্কর, শঙ্কর !

বজ্রঘোষ-বাণী,

রুদ্র, শূলপাণি,

মৃত্যুদিক্—সস্তর

শঙ্কর, শঙ্কর ।

[প্রস্থান ।

নেপথ্যে

মা ডাকে, মা ডাকে ! ফিরে আয়, হুম্নন, ফিরে আয় !

বিভূতি

ও কি শুনি ? ও কিসের শব্দ ?

ধনঞ্জয়

অন্ধকারের বৃকের ভিতর 'খিল্ খিল্ কবে' হেসে উঠল
যে ।

বিভূতি

আঃ থাম না, শব্দটা কোন্ দিকে বল ত ?

নেপথ্যে

জয় হোক, ভৈরব !

বিভূতি

এ ত স্পষ্টই জলস্রোতের শব্দ ।

ধনঞ্জয়

নাচ আবস্তের প্রথম ডমরুধ্বনি ।

বিভূতি

শব্দ বেড়ে উঠছে যে, বেড়ে উঠছে ।

কঙ্কর

এ যেন—

নবসিং

বোধ হচ্ছে যেন—

বিভূতি

হাঁ, হাঁ, সন্দেহ নেই । মুক্তধারা-ছুটেছে । বাধ কে
ভাঙলে ?—কে ভাঙলে ?—তার নিস্তার নেই ।

কঙ্কর, নবসিং ও বিভূতির ক্ষত প্রস্থান ।

রণজিৎ

মন্ত্রী, এ কি কাণ্ড ?

ধনঞ্জয়

বাধ-ভাঙার উৎসবে ডাক পড়েচে ।

(গান)

বাজে রে বাজে ডমরু বাজে

হৃদয় মাঝে, হৃদয় মাঝে ।

মন্ত্রী

মহারাজ, এ যেন—

রণজিৎ

হাঁ, এ যেন তারি—

মন্ত্রী

তিনি ছাড়া আর ত কারো—

রণজিৎ

এমন সাহস আর কার ?

ধনঞ্জয়

(গান)

নাচে রে নাচে চরণ নাচে,

প্রাণের কাছে, প্রাণের কাছে ।

রণজিৎ

শান্তি দিতে হয় আমি শান্তি দেব । কিন্তু এইসব
উন্মত্ত প্রজাদের হাত থেকে—আমাব অভিজিৎ দেবতার
প্রিয়, দেবতার। তাকে রক্ষা করুন ।

গণেশ

প্রভু, ব্যাপার কি হল কিছু ত বুঝতে পারছি নে ।

ধনঞ্জয়

(গান)

প্রহর জাগে, প্রহরী জাগে,

তারায় তারায় কাঁপন লাগে ।

রণজিৎ

ঐ পায়ের শব্দ শুন্নি যেন ! অভিজিৎ, অভিজিৎ !

মন্ত্রী

ঐ যেন আসছেন !

ধনঞ্জয়

(গান)

মরমে মরমে বেদনা ফুটে,

বাধন টুটে, বাধন টুটে ।

[সঙ্কয়ের প্রবেশ]

রঞ্জিত

এ যে সঙ্কয়। অভিজিৎ কোথায় ?

সঙ্কয়

মুক্তধারার স্রোত তাঁকে নিয়ে গেল, আমরা তাকে পেলুম না।

রঞ্জিত

কি বলচ, কুয়ার !

সঙ্কয়

যুবরাজ মুক্তধারার বাধ ভেঙেছেন।

রঞ্জিত

বুঝেছি, সেই মুক্তিতে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। সঙ্কয়, তোমাকে কি তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন ?

সঙ্কয়

না, কিন্তু আমি মনে বুঝেছিলুম তিনি ঐখানেই যাবেন, আমি গিয়ে অন্ধকারে তাঁর জন্তে অপেক্ষা করছিলুম, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত -বাধা দিলেন, আমাকে শেষ পর্য্যন্ত যেতে দিলেন না।

রঞ্জিত

কি হল আরেকটু বল।

সঙ্কয়

ঐ বাধের একটা জটিল-সন্ধান কি করে' তিনি জেনেছিলেন। সেইখানে যন্ত্রাসুরকে তিনি আঘাত করলেন, যন্ত্রাসুর তাঁকে সে আঘাত ফিরিয়ে দিলে। তখন মুক্তধারা

তাঁর সেই আহত দেহকে মায়ের মত কোলে তুলে নিয়ে চলে' গেল।

গণেশ

যুবরাজকে আমরা যে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম তাহলে তাঁকে কি আর পাব না!

ধনঞ্জয়

চিরকালের মত পেয়ে গেলি।

[ভৈরবপন্থীর প্রবেশ—

গান

জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর,

জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর।

জয় সংশয়-ভেদন,

জয় বদন-ছেদন,

জয় সংকট-সংহর,

শঙ্কর শঙ্কর।

তিমির-হৃদবিদারণ

জলদগ্নি নিদারুণ,

মরু-অশান-সংকর,

শঙ্কর শঙ্কর।

বজ্রঘোষ-বাণী,

কদ্র, শূলপাণি,

মৃত্যুসিদ্ধ-সম্ভর,

শঙ্কর শঙ্কর!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৌষ সংক্রান্তি ১৩২৮, শান্তিনিকেতন

রমলা

রক্তের মতন রাঙা লালমাটির পথ। আলোছায়ায়
দিগন্তের কোল হইতে নামিয়া কত গিরিমালার তট দিয়া
কত শালবনের তলে তলে কত গ্রামের পাশে পাশে
আঁকিয়া ঝাঁকিয়া কত নদী ডিঙাইয়া কত প্রান্তর পার
হইয়া পথটি চলিয়াছে, চলিতে চলিতে কখনও যেন শ্রান্ত
হইয়া পৃথিবীর বুকে নামিয়া পড়িয়াছে, আবার লাফাইয়া
উঠিয়া স্বদূর দিগন্তের নীল মায়ার দিকে ছুটিয়াছে।

পথ দিয়া একটি পুস্পুস-গাড়ী অতি ধীরে
চলিয়াছে। সাধারণতঃ পুস্পুস-গাড়ী এত আশ্বে যায় না,
কিন্তু গাড়ীর মধ্যে যে যুবকটি একা বসিয়া সাক্ষাৎ
দেখিতেছিল সে পুস্পুসওয়ালাদের অতি ধীরে চালাইতে
বলিয়াছে। তাহার প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল, এত
আশ্বে চলিলে কাল সকালে হাজারিবাগ পৌছানো
যাইবে না। যুবকটি জানাইল, তাহাতে কিছুই আসে
যায় না। পথের ধারে গ্রামে গ্রামে খাবার পাইলে সে
এই পার্বত্যশোভাময় পথে কয়েকদিন কাটাইয়া যাইতে
রাজী আছে।

যুবকটি একজন চিত্রশিল্পী। তাহার ছয়ফুট দীর্ঘ
সুঠাম দেহ মাংসমেদবহুল নয়, পাংলা ছিপছিপে চেহারা
যেন প্রাণের ফোয়ারা; চুলগুলি একটু লম্বা কোঁকড়ানো,
ডান দিকে টেরী কাটা, রেখাবিহীন প্রশস্ত ললাটে
ঘোবনের টীকা জলিতেছে, মুখের দিকে চাহিলেই মনে
হয় ইহার অন্তরে কিসের আগুন অহর্নিশি জলিতেছে,
স্বপ্নময় দীর্ঘ চোখদুইটির উপর চশ্মার কাচদুইটি ঝক-
ঝক করিতেছে, সৰু লম্বা নাকে প্যাস্‌নের নাকীটি স্বন্দর
ভাবে লাগানো; দাড়ি-গোফ-কামানো মুখের গঠন একটু
লম্বা, চোয়াল দৃঢ় প্রশস্ত হইলেও চিবুক অধর অতি
সুসুন্দর কোমল, তরুণীর আননের মত তারুণ্যমণ্ডিত;
চুলগুলি লম্বা বলিয়াই হউক বা মাথার পেছনটা একটু উঁচু
বলিয়াই হউক মাথার তুলনায় গলাটা একটু সৰু দেখায়;
সবচেয়ে স্বন্দর তাহার লম্বা আঙুলগুলি, যেন রঙেব
আঙুনের শিখা। হাত উঁচু করিয়া তাহাব উপর দুই

হাতের আঙুলে আঙুলে ঝড়াইয়া হাত রাখিয়া দূরপথেব
দিকে চাইয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, সোনার আংটির
নীলাটি ঝকঝক করিতেছে।

পিছনে নীল পাহাড়ের সারি স্বন্দরীর নীলাশ্রয়ী শাড়ীর
মত গোখলির আলোষ ঝলমল করিতেছে, দুই পাশের
শালের বনে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ অন্ধকার রহস্তলোকের মত জমা
হইতেছে; পথটি দেখানে অনেকখানি নামিয়া আসিয়া
অতি স্বচ্ছভাবে অনেকখানি উঠিয়া গিয়াছে। গাড়ী হইতে
নামিয়া যুবকটি গাড়ীর আগে আগে জোরে চলিতে
লাগিল। সে যেন বীরপথিক, দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম
করিয়া কাহাকে সে জয় করিবার জন্য চলিয়াছে, মনে এই
ভাবটি জাগাইয়া পায়ে পায়ে চলিয়া সে চড়াই পথে উঠিতে
লাগিল। পথের উচ্চ সীমায় উঠিতেই সম্মুখে সূর্যাস্তের
অপকর্ণ রূপে স্তব্ধ হইয়া সে দাঁড়াইল। তেপান্তরের মাঠের
মত শূন্য প্রান্তর দিগন্তের সহিত গিয়া মিলিয়াছে, তাহারই
উপর চক্রবাল রাঙাইয়া রক্তমেঘস্বপ্নে সূর্য্য অন্ত যাইতেছে,
যেন কোন নীড়-হারা পথিক বিহঙ্গ দুই রাঙা ডানা মেলিয়া
দিনশেষে রাত্রিব অনন্ত তারা-লোকের দিকে উড়িয়া
চলিয়াছে, কোন প্রেমবেদনায় তীরবিদ্ধ তাহার চঞ্চল
বক্ষ হইতে রক্ত চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছে, পাহাড়ের
মাথায় মাথায় শালগাছের পাতায় পাতায় তাহারই বৃকের
রক্তবিন্দু উপলম্বণির মত জলিতেছে, ওই রক্ত মেঘগুলি
তাহারই ছিন্নবিচ্ছিন্ন পালকের দল, এই প্রান্তরভরা রাঙা
আলো তাহারই বৃকের আগুন, বনের মর্ম্মরে, শূন্যপ্রান্তরে
হাওয়ার নৃত্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাহারই পক্ষসঞ্চালনের
শব্দ শোন। যাইতেছে, রাত্রির অন্ধকারপারে কোন নব
অরুণ-লোকের দিকে হু হু করিয়া সে উড়িয়া চলিয়াছে—

যুবকটি লাফাইয়া উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—

“আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন

উষা দিশাহারা নিবিড়-তিমির আঁকা,

ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর,

এখনি অন্ধ বন্ধ কোবো না পাখা”

গাড়ীটি যখন যুবকের নিকট আসিয়া পৌঁছাইল, সে চালকদিগকে তাহাদের চীৎকার ও গাড়ীচালানো থামাইয়া চূপ করিয়া দাঁড়াইতে বলিল। নিকষগণির মত কালো এই পাহাড়ের ছেলেরা তাহাদের যাত্রীটির দিকে অবাক হইয়া তাকাইল,—প্রতিদিনেব সূর্য্যাস্তের মধ্যে এমন কি অসামান্য নৌন্দর্য্য আছে যে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে হইবে।

কিছুক্ষণ চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া আবার যুবকটি চলিতে আরম্ভ করিল। কিছুদূর গিয়া আবার গাড়ী থামাইয়া গাড়ীর ভিতর হইতে চামড়ার ব্যাগটা বাহির করিল। ব্যাগটা খুলিয়া আঁকিবাব সরঞ্জাম তুলিগুলির পাশ হইতে নেপচা বাঁশীটা তুলিয়া ব্যাগ বন্ধ করিয়া নাগুরা জুতাটা খুলিয়া গাড়ীর সম্মুখে পা ঝুলাইয়া বসিয়া গাড়ী চালাইতে বলিল। গাড়ীর চাকা লাল ধূলি উড়াইয়া করুণ আর্ন্তনাদে চলিল, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে যুবকটি বাঁশীতে এক নেপালী গান বাজাইতে লাগিল। সরল দীপ্ত পাহাড়ী স্বরে কুলীদেব মনগুলিও সাড়া দিয়া উঠিল, বাঁশরী-তান-মুখর রাঙা-আলো-ভরা পথ দিয়া তাহাণা আনন্দের সঙ্গে গাড়ী টানিতে টানিতে চলিল।

কিন্তু বেশীক্ষণ নির্বিবাদে বাঁশী বাজানো চলিল না, পিছন হইতে এক মোটরকারের হুকারধ্বনি বনপথ ধ্বনি করিয়া আসিতে লাগিল। মেল্ সার্ভিসের মোটরকার ষ্টেশন হইতে যাত্রী লইয়া আসিতেছে। মোটর-লবী তখন কিছু দূরে ছিল; তবু কুলীরা অতি সম্ভ্রত চঞ্চল হইয়া উঠিয়া পথের এক পাশ দিয়া ধীরে ধীরে গাড়ী টানিতে লাগিল, পাশের বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে যেন তাহারা বাঁচিয়া যায়। যন্ত্রণার গর্জনের সঙ্গে বাঁশী অনেকক্ষণ পাল্লা দিল বটে, কিন্তু কলদৈত্যের হুকারের সঙ্গে ব্যাকুলবেগে কতক্ষণ পারিয়া উঠিবে—বিরুদ্ধ হইয়া যুবকটি গাড়ীটা পথের এক পাশে রাখিতে বলিয়া নামিয়া পড়িল। মুহূর্তের মধ্যেই দুই রক্তবর্ণ চক্ষু জ্বলাইয়া মোটর-লবী নিকটে আসিল এবং তাহাদেরই সম্মুখে আসিয়াই হঠাৎ থামিয়া গেল। কি একটা যন্ত্র খারাপ হইয়াছে বলিয়া ড্রাইভার তাড়াতাড়ি নামিয়া কল ঠিক করিতে সুরু করিল।

যুবকটি পথের পাশে গাহের তলায় দাঁড়াইয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিল, মোটরকারের দিকে চাহিয়া দেখা আবশ্যক বোধ করে নাই। কিন্তু মোটর থামিতেই তাহার মনে হইল কে যেন পিছন হইতে তাহার দিকে অনিবেশনয়নে চাহিয়া আছে; মুখ ফিরাইয়া দেখিল গাড়ীভরা যাত্রী যেন তাহারই দিকে চাহিয়া—অস্পষ্ট আলোয় তাহাদের স্পষ্ট দেখা বাইতে-ছিল না, কেবল কতগুলি নানা রংএর ছায়ামূর্ত্তি। তবু প্রথম বেষ্ণের একেবারে শেষ প্রান্তে যে মূর্ত্তিটি রাঙা নদীজলের মত টলমল করিতেছিল তাহাকে সে চিনিয়া; ওই শ্রাম্পেন-রংএর শাড়ীপরা মেয়েটির সঙ্গেই ত সে কলিকাতা হইতে এক ট্রেনে এক কম্পার্টমেন্টে আসিয়াছে, তাহার চম্পক-মুখে গোবুলির আলো যেন লোএরপু মাখাইয়া দিয়াছে, ওই আবেশময় চোখ দুইটি রঙীন স্বপ্নে ভরা, অজস্র চিত্র-শিল্পীরা আপন অন্তরের রং ও আনন্দ দিয়া নারীর যে আঁখি আঁকিয়া গিয়াছেন সেই দীর্ঘপল্লবৎ সারঙ্গ-নয়ন তাহাকে মগ্নমুগ্ধ করিল, গড়ের কালো তিলটি দেখা বাইতে ছিল না, শুধু তমাল-দিবির সন্ধ্যাজলের মত দুইটি নিম্গ চোখ।

কল ঠিক করিয়া ড্রাইভার মোটরে উঠিল। মোটর-লবী আবার গর্জন করিয়া নড়িল। সেই স্থির চোখ দুইটি নদীর ডেউয়েব মত তুলিয়া ছলছল করিয়া উঠিল, তাহার দীপ্তমুখে কি ছটামিভরা হাসি খেলিয়া গেল, তারপর সেই তরুণী হাতের নীল রুমালটা তাহারই দিকে, হাঁ, তাহারই দিকে নাড়িতে নাড়িতে পথেব অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

মোটর-লবী যখন বহুদূর চলিয়া গিয়াছে, তাহার পিছনের আলোটা আর দেখা বাইতেছে না, শুধু সম্মুখে পথের শেষপ্রান্তে দুইটি তাবার আলো জ্বলজ্বল করিতেছে, যুবকটি তখন ধীরে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল এবং জোরে গাড়ী চালাইতে বলিল। বাহকেরা চীৎকার করিতে করিতে গাড়ী লইয়া ছুটিল।

বাঁশী বাজাইতে আর ইচ্ছা রহিল না। গাড়ীর সব জান্না খুলিয়া একটা বালিশে অর্দ্ধহেলান ভাবে বসিয়া যুবকটি পকেট হইতে হাভেনা সিগার বাহির করিল, কিন্তু দেশলাইটা বাহির করিয়া দেখিল ট্রেনে সব কাটি নিঃশেষিত হইয়াছে। কুলীদের নিকট হইতে একটা দেশলাই

চাওয়া লইয়া সে তাহাদিগকে সিগারেট দিতে গেল, তাহাবা একটু আশ্চর্য্য হইয়া আপত্তি জানাইল, পরেব গ্রামে গিয়া তাহাবা তামাক পাইবে, তব্দলেব মধ্যে বে সব-চেয়ে অল্পবয়স্ক ছিল সে একটা সিগারেট চাহিয়া লইয়া ট্যাকে শু জ্বিয়া বাপিল।

গিবিবনপ্রান্তরে সন্ধ্যাব কালো ছায়া নিবিড় হইয়া আসিতেছে, পশ্চিমের বন্ধুমায়া গিলাইবা যাইতেছে, যেন রাঙা গোলাপের পাতাগুলি ধীবে ধীবে কালো হইয়া আসিতেছে; একে একে তাবা ফুটিয়া উঠিতেছে।

বালিশে হেলান দিয়া চুকট টানিতে টানিতে এই আলো-ছায়ায় উদাস প্রান্তরের দিকে চাহিয়া অনেক কথাই যুবকটির মনে পড়িতে লাগিল। ধীরে ধীরে সম্মুখে নবমীর চাঁদ উঠিল, তাহাবই রূপালী আলো শালবনের অন্ধকাবে দৈত্যপুবে জুপ্ত কোন্ বাজকন্ডাব জুগু যেন পথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিবিতেছে, ছোটপাহাড়গুলিকে দেখাইতেছে যেন দৈত্যেবা সারি বাঁধিয়া তর্জ্জনী তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই তাবভরা আকাশের তলায় উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে জ্যোৎস্নার মাঝালোকে রূপকথা-রাজ্যের ছায়া খুলিয়া যায়, অন্তরের অনন্তকালের রাজপুত্র জাগিয়া উঠে, এই গিবিবন লঙ্ঘন কবিষা তেপান্তরের মাঠের পব মাঠ পার হইয়া কোথায় যাইতে চায়—অসীম তাহার আশা, হৃজ্জয় তাহার শক্তি, দুর্গম তাহাব পথ, সূদূরের বাণী তাহাকে ঘবছাড়া করিয়াছে।

তিনটি সিগারেট পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, আব-একটি ধবাইল। তরুণীর বসিবার ভঙ্গীর অপূর্ণ সুষমাগম্য ছবিটি তাহার চোখে বার বার জাগিতে লাগিল। ফুলের গন্ধে মৌমাছি ধেমল আকুল হইয়া উঠে এই তরুণীর মুখ তাহাব মনে তেমনি নেশা জাগাইয়াছিল। বাব বার সে ভাবিতে-ছিল, এ মুখ সে আজকে টেনে নয়, ইহাব পূর্বেও কোথায় দেখিয়াছে, ভাবিয়া ভাবিয়া কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছিল না।

সিগারেটের বাস্ম খুলিয়া আব-একটা সিগারেট তৈরী করিবা ধরাইল। এতক্ষণে মনে পড়িল, বসেটাব আঁকা এক-খানা ছবি দেখিয়াছিল, তাহারই মত এই মুখখানি; ছবিটির নাম মনে পড়িল না, নাই পড়ুক—বসেটাব সেই

ছবিখানি মূর্তিমতী। দেখিয়াই সে বিমুগ্ধ হইয়াছিল। প্রভেদেব মধ্যে শুধু এ মুখের গাওে একটি তিল। প্রিয়াব তিল সম্বন্ধে হাফেজের কবিতা যখন সে পড়িয়াছিল, তখন সে তাহা কবিব পাগুলামী ভাবিয়াই মনে মনে হাসিয়াছিল, আজ মনে হইল, সত্যই একটি তিলেব জলজ ত্রিভুবন দেওয়া যায়।

বাহিবেব প্রকৃতিব মত সেও আপন মনে মাঝা-জাল বুনিতে লাগিল। তাহার এই তেইশ বছরের জীবন অনেক তরুণীর স্পর্শেই চঞ্চল রঙীন হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কোথাও সে আশ্রয় খুঁজিয়া পাষ নাই। সূর্য্যাস্তেব যে রক্ত-বিহঙ্গরূপ সে দেখিয়াছিল, তাহারই মত তাহার প্রাণ—এ নীড়-হাবা পথিক-পাখী নব-নব সৌন্দর্য্যলোক পাব হইয়া উড়িয়া চলিয়াছে।

তাহার প্রথম প্রেম হইয়াছিল এক পুতুলের সঙ্গে। সে যখন তিন বছরের, তখন তাহার মামা তাহাকে ষে জাম্বান পুতুলটা কিনিবা দিয়াছিলেন, সেই নানা রংএব সাজপরা মেমটাকে বৃকে জড়াইয়া সে প্রথম বাত ঘুমাতেই পারে নাই। তাহার বয়স যখন সাত বৎসর, সে তাহার সমবয়স্ক এক জেঠুতো বোনকে বড় ভালোবাসিত; আচার চুরি হইতে লাগু ঘোবানো, পুকুবে নাওয়া, কুলগাছে চড়া, সব বিষয়ে বোনটিকে সঙ্গী না পাইলে কিছুই করিতে পারিত না। নয় বছর বয়সে সে তাহাব এক বন্ধুর বোনকে ভালো-বাসে। তাহাকে সে একদিন গাড়ী চড়িয়া যাইতে দেখিয়াছিল মাত্র, পরদিন মাসিক পরীক্ষায় অর্ধেক আঁক না কদিয়া ও অর্ধেক আঁক ভুল কদিয়া আসিয়া-ছিল। মাঝে মাঝে বন্ধুকে ডাকিতে যাইবা বন্ধু বোনকে গাছে দোল খাইতে দেখিত, তাহার সঙ্গে কোনদিন কথা হয় নাই। চোদ্দ বৎসব বয়সে সে তাহার বোনের এক বন্ধুকে ভালোবাসে। সেবার তাহারা পুখীতে বেড়াইতে গিয়াছিল, সেই সমুদ্রতীরে ঝিহুক কড়ানোব ভালোবাসা, যত স্নন্দর ঝিহুক পাইত সে তাহাকে আনন্দের সঙ্গে উপহার দিত। যাইবার সময় তাহার দেওয়া অর্ধেক ঝিহুক মেয়েটি ফেলিয়া গেল দেখিবা সে সমস্ত বাত কাঁদিয়াছিল।

তাহার যবে বাহিবে পথে বিপথে কত তরুণীর

ধর্মান্ধতা কিন্তু তাহার দৃঢ়মতসম্প্রদায়বল দেহ দেখিলেই মনে হয় এ যেন একটা শক্তির ডাইন্ডামো, গোলগাল ভরা মুখ, জলজলে চোখ দুইটি সর্বদা সজাগ, চারিদিকে ঘুরিতেছে। রজতের দীর্ঘদেহ দেখিলেই মনে হয় এ যেন প্রাণরসের কোয়ারা, বিদ্যুৎশিখার মত কাপিতেছে। তাহার লীলায়িত দেহখানি যতীন-লোহার মত দৃঢ় হস্তে ধরিয়া ঝাঁকুনি দিয়া বলিল,—স্বপ্ন সব ছেড়ে দাও ভাই, dreamsএ দেশের এই দশা, কাজ চাই, কাজ—

রজত মুচ্চি হাসিয়া বলিল,—তুমি কি কাজ করছ ভাই?

—আমি? ওই ত বলুম টাকা পাচ্ছি না, না হলে দেখতে এখানে লোহা তৈরী করবার কারখানা করতুম—লোহা—বুঝ্লে, লোহা হচ্ছে এ যুগের দেবতা, এদেশে তার জয় দিতে হবে—প্রতিষ্ঠা করতে হবে—যেদিন জার্মানীর মত হবে—

যতীনের উদ্দীপ্ত বাক্যধারায় বাধা দিয়া একটু ব্যঙ্গের স্বরে রজত বলিল,—তবেই ভারতের মুক্তি?

—নিশ্চয়! দেখবে সেদিন সে পরাধীন নেই! যদি শক্তি পাই, আমি এখানে ইঞ্জিন তৈরী করব, মোটর,—এই কোর্ডকাবের মত Dutt-car, তোমরা চড়বে, এমো লেগে যাও আমার কাজে—বলিয়া নিজের মোটরটা ধরিয়া ঝাঁকুনি দিল।

—কেন ভাই? এই সামনে শাস্ত গ্রাম ঘুরোচ্ছে দেখ্হ, তোমার কাজেব চোটে এদের চোখে দিনরাতে নিজা থাকবে না, বুকে থাকবে অতৃপ্ত জ্বালা,—এ গ্রামের জায়গায় আসবে কুলীদের বস্তির কদর্যতা আর বীভৎসতা, মদের দোকান আর বারবনিতা—তোমার কলে একঘণ্টায় একশো মাইল যাবে, হাজার হাজার মাইল দূর থেকে কথা শুন্বে, এক মিনিটে একখানা কাপড় হবে, এক সপ্তাহে একখানা বাড়ী হবে, আবার এক নিমিষে মাল্লুস মেরে • কেল্বে, নগর পুড়িয়ে দেবে—পাহাড় ভিঙাবে, সাগর পেরোবে, আকাশে উড়বে—সব মানলুম—কিন্তু সত্যিহুত্ব দিতে পারবে কি?

—স্বপ্ন দিতে পারব না? এই কপের জন্ত কত

material comforts বেড়ে গেছে, এই রেলগাড়ী, মোটর, ইলেকট্রিকের আলো, কত বল্বে—Silly—তোমাদের মত ভাবুকদের বোঝাতে পারব না—ওসব খিওরী বুঝি না, আমি বুঝি কাজ, কাজ,—

—আচ্ছা অনেকক্ষণ ত মোটরের গান শুন্লে এখন আমার বাশীটা একটু শুন্বে, শুলে বাশী শোন্বার জন্য আমার কতই না ক্ষেপাতে—

রিষ্ট-ওয়াচটার দিকে আবার দেখিয়া যতীন বলিল,—না ভাই; আজ সময় নেই, হাজারিবাগে শীগ্গির আসছি, তখন শোনা যাবে, কোথায় উঠছ?

—বোগেশচন্দ্র ঘোষের বাড়ী।

—বোগেশচন্দ্র—আচ্ছা মনে থাকবে, আর দেরী করলে মেল পাব না।

রজতের কোমল হাত তাহার শক্ত হাতে ধরিয়া মোটরের দরজার কাছে টানিয়া আনিয়া দীপ্ত স্বরে যতীন বলিল,—কাজ—কাজ—কাজ চাই ভাই, সব স্বপ্ন ছেড়ে দাও—ভাবতে হবে কি করছ তুমি। এই মানবশক্তির জন্য, মানবসভ্যতার উন্নতির জন্য কি করছ—science, civilisation, happiness—

মোটরের দরজাটায় এক খান্ধড় দিয়া যতীন বলিতে লাগিল,—এই যে মোটরটা—এ কি একটা শুধু জড কল ভাবো? আমার মোটেই তা মনে হয় না, এ আমার জীবন্ত বন্ধু, আমার চলার শক্তি, আমার পায়ে সবচেয়ে বড় muscle, তেজী ঘোড়া হাঁকিয়ে যা আরাম তার চেয়ে আরাম একে চালিয়ে—আচ্ছা ভাই আজ আসি—বলিয়া সে দরজা না খুলিয়াই মোটরে লাফাইয়া উঠিল। মোটর গর্জন করিয়া উঠিল, তাহার শব্দে তাহার au revoir ডুবিয়া গেল, কালো পথে হুঙ্কার করিতে করিতে মোটর নিমেষে কোথায় মিলাইয়া গেল।

আবার সব স্তব্ধ, শুধু হাওয়াব সন্গম শব্দ। ধীরে এক গেলাস জল গড়াইয়া বাইয়া রজত অতি আন্তে গাড়ীতে উঠিল। তরু-ছায়ায় ঘুমন্ত গ্রামের দিকে চাহিল, তারাতারা উদার আকাশের দিকে চাহিল, শিখরে শিখরে নানাভাবেব রেখাগুলি যে তরঙ্গায়িত হইয়া

উঠিয়াছে, এই পাহাড়গুলো বেন অচল বস্তৃপুঞ্জ নয়, ওই সচল বেখাগুলি নীলাকাশের পটে তাহাদের প্রাণের গতিকের টানিয়া উচ্ছ্বসিত করিয়া দিয়াছে। তেমনি তাহাব প্রাণ কোন্ বংএর রেখাপথ দিয়া যাইবে?

জান্নার ফাঁক দিয়া একটু চাঁদের আলো তাহাব মুখে আসিয়া পড়িল। সেই জ্যোৎস্নাময় নীলিগার দিকে চাহিয়া রজত ভাবিতে লাগিল, সত্যই সে মানব-সভ্যতার উন্নতির জন্য কি করিতেছে? বিজ্ঞান, সভ্যতা, মানবের স্বথ,—যতীনের কথাগুলি ব্যঙ্গের স্বরে কি বেদনার স্বরে তাহার কানে বাজিতে লাগিল তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিল না।

বালিশ ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। বিপুলরহস্যময় দিগন্তের দিকে চাহিয়া বহিল। সত্যই কি চাই? অজন্তার চিত্রশালা, না কয়লাব খনি? রবীন্দ্রনাথের গানগুলি, না লোহার কারখানা? এইসব সবলনয় গ্রাম্য-জীবন, না নগরের রুজ্জিম মুখোস-পবা সভ্যতা? হুই-ই চাই? বাঁশীর স্বরের সঙ্গে মোটরকারকে কে বাধিতে পারিবে?

আবার সে ধীবে গুইয়া পড়িল। তারাগুলি যেন মাথাব গোড়ায় প্রদীপের শিখার মত দপ্ দপ্ করিতেছে, ঝি ঝি পোকাব আওয়াজে সমস্ত আকাশ ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। এ-সমস্ত ভাবিতে তাহাব ভালো লাগিল না। তাবাগুলিব দিকে চাহিয়া সে ভাবিতে লাগিল, এখন হযত সেই তরুণী বাড়ী পৌঁছিয়া গিয়াছে, সেও হযত তাহারি মত এদেশে নূতন আসিয়াছে, এ অজানা দেশ এই জ্যোৎস্না-রাত্রির মাঝায় আরও অপূর্ণ লাগিতেছে; সেও হযত এগ্নি বিছানায় গুইয়া মাথাব গোড়ায় জান্না খুলিয়া ছিন্নমালাব ফুলদলের মত তারাগুলি দেখিতে দেখিতে সাবাদিনের যাত্রাব কথা, তাহার কথাও একটু ভাবিতেছে, তাহার কেশে মুখে নীলাকাশে এগ্নি জ্যোৎস্না ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, অপূর্ণ ছাতিময় তাহার চোখ দুটি ওই তারাটির দিকে চাহিয়া আছে।

ভাবিতে ভাবিতে বজ্রতব চোখ নিম্নায় ভবিয়া আসিল।

২

পবদিন রজত যখন হাঙ্কাবিবাগে পৌঁছাইল, তখন সুন্দর প্রভাত। পাহাড়ের গা হইতে স্বচ্ছ কুজ্জাটিকা উড়িয়া যাইতেছে, ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায় শিশিরের বিন্দুগুলি ধীরে ধীরে শুকাইতেছে। সহর হইতে মাইল তিন দূরে এক খোলা প্রান্তরের মধ্যে বড় লালবাড়ীব সামনে কুলীরা গাড়ী থামাইল। বাড়ীটি পথ হইতে কিছু দূরে, উচ্চভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। লতামণ্ডিত গেটের সম্মুখে নামিয়া লাল কাঁকরের বাঁহা দিয়া রজত বাড়ীর দিকে উঠিয়া চলিল। পথেব দুই পাশে ইউক্যালিপ্টাস ও পাম-গাছেব সাবি, তাহাব মাঝে মাঝে ক্রোটনের সার, লতাফুল, পুষ্পবীথি।

প্রায় অর্ধেক পথ উঠিয়া পথের এক বাঁকে রজত দেখিল, এক বাউ-গাছের ছায়ায় এক সাদা বেতেব চেয়ারে বসিয়া একটি মেয়ে নিবিষ্টমনে বই পড়িতেছে, বাসন্তী বংএর শাড়ীব উপর লাল বংএর বইখানি, সাদাপাতাগুলির উপর সোনার বালিগুলি ঝিকিমিকি করিতেছে। পাঠনিবতা তরুণী-মূর্তির পাঠভঙ্গীর অপূর্ণ স্বয়ম্ভাষ চিত্রের দিকে চাহিয়া বজ্রত চূপ করিয়া দাঁড়াইল। লুটাইয়া-পড়া শাড়ীর পাড় হইতে ঝুলিয়া-পড়া চুলগুলি পর্য্যন্ত দেহেব সব রেখা যেন বইখানির উপর পরম প্রীতিতে প্রণত হইয়া পড়িয়াছে; মুক্ত কালো কেশে অর্ধেক মুখ ঢাকা। রজতের কেমন ধাবণা হইয়াছিল কালকেব পথে-দেখা মেয়েটিকে সে এ বাড়ীতে আসিয়া দেখিতে পাইবে, অবশ্য এ বিশ্বাসের কোন যুক্তিযুক্ত কাবণ সে খুঁজিয়া পায় নাই। তাহাকে না দেখিয়া সে যতখানি ক্ষুণ্ণ হইবে ভাবিয়াছিল তাহা হইল না।

মেয়েটি তাহাব দিকে লক্ষ্যই করিতেছে না দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া বজ্রত একটু মেকী কাশিয়া নাগুবা জুতটাকাঁকবে বসিল। শব্দে চমকিত হইয়া হাত দিয়া চুলেব গুচ্ছগুলি মুখ হইতে সবাইয়া চাহিতেই এক অপরিচিত যুবককে সম্মুখে দাঁড়াইতে দেখিয়া মেয়েটি অতি অপ্রতিভ ভাবে দাঁড়াইয়া উঠিল। রজত দেখিল বেন মূর্তিমতী পূর্ণিমা। সে একটি ছোট নম্রাব করিল। প্রতিনম্রাব করিতে গিয়া হাত হইতে বইখানি সশব্দে পড়িয়া যাইতে

মেয়েটির মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। রক্ত বইখানি তুলিয়া তাহার হাতে দিতে সে সিঁড়র-মাথানো মুখে তাহার দিকে চাহিল।

রক্ত ধীরে বলিল,—এটা কি যোগেশ-বাবুর বাড়ী?

প্রশ্নটি অবশ্য নিশ্চয়োজন, কেননা এটা যে যোগেশ-বাবুর বাড়ী সে সম্বন্ধে কুলীরা তাহাকে বার বার আশ্বাস দিয়াছে। কিন্তু কাহারও সহিত, বিশেষতঃ কোন মেয়ের সম্বন্ধ কথা আবশ্য কবিতো হইলে, এই নিরর্থক নিশ্চয়োজন কথাগুলিই সবচেয়ে কাজে লাগে।

নতদৃষ্টিতে স্নিগ্ধকণ্ঠে মেয়েটি বলিল,—হাঁ। আপনি?

—আমাকে তিনি আস্তে লিপেছিলেন, একজন আর্টিষ্টের দরকার ছিল না?

দীপ্তচক্ষে রক্তের দেহ ও বেশভূষার দিকে চাহিয়া পরিচিতজনের মত বলিল,—ও, আপনি, আসন্ন।

তারপর লঙ্কাঙ্কুশিত চরণে ভেলভেটের চটিজুতোটা পরিয়া, কাঁকবে-লুটানো শাড়ীর আঁচলটা গেকষা-রংএর ব্লাউজের উপর টানিয়া সে ধীরে অগ্রসর হইল। রক্ত চলিল, ঠিক তাহার পাশেও নয়, ঠিক তাহার পেছনেও নয়।

স্নিগ্ধকণ্ঠে মেয়েটি বলিল,—পুষ্পপুসে এলেন বুঝি?

—হাঁ।

রক্তের দিকে ক্ষণিকের ক্ষণ মুখ ফিরাইয়া মেয়েটি বলিল,—আমরা আপনাকে কাল expect করেছিলাম।

তাহার দেহের গতিচ্ছন্দের দিকে চাহিয়া রক্ত হাসিমাথানো স্বরে বলিল,—ও!

আবার রক্তের মুখ নিমেষের জ্ঞান দেখিয়া লইয়া তরুণী বলিল,—বাবা ভাবলেন বুঝি এলেন না। তারপর রমলা বললে—বলিয়াই থামিয়া গেল। একটু দ্রুতপদে চলিতে লাগিল।

রক্ত তাহার পাশে আসিয়া পড়িল। নীরবে পথের আর-একটা বাঁক উঠিতে রক্ত পথের ধারের ক্রোটনের পাতাগুলিতে হাত দিয়া বলিল,—ভারি সুন্দর ক্রোটনগুলো ত, কি সুন্দর গোলাপগুলোও!—বলিয়া মেয়েটির মুখের দিকে চাহিল।

মেয়েটি আব-একবার রক্তের দিকে চাহিয়া বলিল,

—হাঁ, কাজীর ভাবি ফুলের সখ, এই গাছগুলো ওর প্রাণ।

চোখে চোখ রাখিয়া রক্ত বলিল,—ফুল ত সবাই ভালোবাসে।

নতদৃষ্টিতে মেয়েটি বলিল,—হাঁ।

বাকী পথটুকু আবাব নীরবে কাটিল।

বাড়ীর সিঁড়ির সম্মুখে আসিতেই শ্রিতহাস্যে মেয়েটি রক্তের দিকে চাহিয়া বলিল,—আসন্ন! তারপর দুইজনে তিন ধাপ সিঁড়ি উঠিয়া ফুলের টবগুলির পাশ দিয়া বারান্দা পাব হইয়া এক বড় হলঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। সেটি ড্রিং-রুম। মেঝেতে সবুজ কার্পেট পাতা, দেওয়ালগুলো নীল আর ছাদটা সোনালী-রং-করা, ছবি সোফা কোচ ইত্যাদি দিয়া ঘরটা সাহেবী ক্যাসানে সাজানো বটে কিন্তু চেয়ার টেবিল সব ভারতীয় শিল্পকলাব নিদর্শন। ঘরের মাঝখানে এক সোফা ছাই-রংএর স্টুট পরিষা এক বলিষ্ঠ দীর্ঘাকৃতি বৃদ্ধ ভদ্রলোক হেলান দিয়া বসিয়া আছেন, আর তাহার পাশে এক সিংহাসনের মত চেয়ারে গেক্ষা রংএর আলখাল্লা পরিয়া এক প্রোট মুসলমান এক ফার্সী বই পড়িয়া শুনাইতেছেন। বৈরাগীর মত কৌকুড়া চুল তাহার ঘাড়ের ঝুলিয়া পড়িয়াছে; কাঁচাপাকা দাড়ি খুব লম্বা নয়, খুব ঘনও নয়, চোখ দুইটি বাউলদের মত ভাসাভাসা ঘেন কোন স্বপ্নলোকে স্থিত; দেহ দীর্ঘ স্তম্ভ। মাঝে মাঝে দাড়িতে আবুল চালাইয়া মুসলমানটি ফার্সী পড়িতেছেন আর তর্জমা করিয়া বুঝাইতেছেন। তাহারই ছিন্নটুকরা কয়েকটি কানে আসিল—

কাজীসাহেব ওমার খায়াম পড়িতেছিলেন—

গোয়েন্দ বেহেশৎ-ই-ইদন বা-হুর্ খুশন্ত;

মন্ মী-গোয়েন্ কে আব-ই-আবুর খুশন্ত।

ই নক্ ব-গীর, ও দস্ আজ্ আ নসিয়াহ্ ব-দার,

ক-আওয়াজ-ই-তোল বরাদব্ আজ্ দুব্ খুশন্ত।

লোকে বলে—ইদন-স্বর্গ পরীর পসরা খুশী-করা; আমি বলি—আবুরের রসই খুশী-করা। এই যা নগদ তাই চেপে ধরো, আর হাত গুটিয়ে নাও ধাবের কারবার থেকে; তোলের আওয়াজ ভাই দূর থেকেই.....

কাজী-সাহেব পড়িতে পড়িতে সহসা থামিয়া গেলেন

দেখিয়া বোগেশ-বাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কোণের পিয়ানোর কাছ হইতে কে ধেন ঢঞ্চল চরণে সরিয়া গেল।

কঙ্কার দিকে চাহিয়া বোগেশ-বাবু বলিলেন,—কি মাধু-মা? ইনি?

রজত একটি ছোট নমস্কার করিয়া বলিল,—আমাকে আপনি আসতে লিখেছিলেন—আমার নাম রজতকুমার—

তাহাকে বাধা দিয়া বোগেশ-বাবু প্রফুল্লমুখে বলিয়া উঠিলেন,—ও! আর বলতে হবে না, চিনেছি, আপনিই exhibition-এ সেই বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যার ছবি এঁকে-ছিলেন, আর খুকীর ছবিটা—

—আজ্ঞে হাঁ,

—বেশ, বেশ! বসুন। দেখুন, ছবিটা আমাদের ভারি ভালো লেগেছিল, সেটা আগে কে কিনে নিয়েছিল বলে' আমার মেয়ের কি চুঃখ—বোসো না তুমি—

হাতের বইয়ের পাতাগুলি উন্টাইতে উন্টাইতে মাধবী গগু রাঙা হইয়া উঠিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রজত ধীরে ধীরে একটা চেয়ার টানিয়া বসিল।

বোগেশ-বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—হাঁ আমি ভেবেছিলুম কোন বয়স্ক আর্টিষ্টের আঁকা, যখন শুনলুম এক ইয়ং আর্টিষ্ট—তাই আপনার ডেকে পাঠালুম—কাজী সাহেব সেই কলকাতার ছবিখানার কথা মনে নেই—ঝড়ের—

কাজী-সাহেব ওয়ার খায়াম উন্টাইতে উন্টাইতে স্নিগ্ধচোখে একবার রজতের দিকে চাহিলেন।

বোগেশ-বাবু বলিতে লাগিলেন,—ছবিটা আমার চোখের সামনে ভাসছে—কালো কালো মেঘে আকাশ কালীতে ভরা, সাপের ফণাব মত বিদ্যুৎ চম্কাচ্ছে, তার তলায় ছিপটি-মারা কালো ঘোড়ার মত নদীব জল ফুলে ফুলে উঠছে, দুধারে গাছের সাঁবি দিশাহারা—জলে স্থলে ধুলো-বালিতে মেঘে বাতাসে ধেন ঝড়ের আবির্ভাব—আর একটা পাখী ছুই সাদা ডানা মেলে তারি মধ্যে উড়ে চলেছে। আশ্চর্য আপনার রেখার টানগুলো—পাখীটা আমার চোখে ভাসছে—ঝোড়োবাতাসে ভরা নৌকার পালের মত তার ডানা ছুটো।

কাজী-সাহেব মাথার চুলগুলি নাড়িয়া রজতের দিকে

প্রসন্নমুখে চাহিয়া বলিলেন,—আমি ত বলেছিলুম, এ ছবি নয়, এ রংএ তৈবী ঝড়ের গান।

মাধবী রজতের দিকে চাহিতেই তাহার মুখ গর্ভস্থে রাঙা হইয়া উঠিল।

বোগেশ-বাবু বলিতে লাগিলেন,—পাখীটা আশ্চর্য কৌশলে এঁকেছেন, ঠোট হতে ডানার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত রেখাগুলো এমন গতিশীল উত্তাল হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে ঝড়ের গর্জন যত বাড়ছে, বায়ুর বেগ যত উন্নত, ততই তার বক্ষ নেচে উঠছে, কণ্ঠে দীপক-রাগিনী বাজছে, নির্ভয়ে মহানন্দে ঝড়ের মেঘের বুকে ছুটে সে চলেছে—দেখুন নদীর তট থেকে গাছের পাতা থেকে পাখীর ডানা থেকে বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা অগ্নিপথ পর্যন্ত রেখাগুলো ধেন কোন ক্ষুদ্রতালে নাচছে, উত্তাল তরঙ্গের মত এই রংএর ঝড় সৃষ্টি করেছে—

রজত বাধা দিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, বোগেশ-বাবু অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন,—তাই আপনাকে ধরে' আনলুম, আমাদের কয়েকখানা ছবি এঁকে দেবেন—বেশী নয়, আমার শোবার ঘরে খান চারেক, লাইব্রেরীতে খান তিনেক, এই ঘরটায় যে ক'খানা হয়, আর আমার মেয়ে কি তার ঘরটা না সাজিয়ে ছাড়বে—তাছাড়া কাজীর একখানা portrait—

কাজী-সাহেব চুলগুলি দোলাইয়া দাড়ি নাড়িয়া অতি বিনীতভাবে আপত্তি তুলিলেন,—না—না, আমার কেন সাহেব, আপনারই—

বোগেশ-বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—আর আমার মেঘের একখানা ভালো দেখে—এই—

মাধবী অকাবণে পাশের টেবিলের বইগুলি গোছাইতেছিল, রাঙামুখ তুলিয়া বলিল,—আর তোমার খানা বুঝি আঁকতে হবে না, বাবা!

—সে কি আর না আঁকিয়ে ছাড়বি—তা কি কি ছবি আঁকবেন সে বিষয়ে আপনার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, তবে আমার কতকগুলো আইডিয়া আছে, ধরুন—

স্নিগ্ধকণ্ঠে বাধা দিয়া মাধবী বলিল,—বাবা—

—কি মাধু?

—উনি এইমাত্র আনছেন।

—ও! তাহলে এখন বিশ্রাম নেওয়া দরকার। আচ্ছা বিকেলে কথা হবে এখন। তুমি ওঁকে ঘর দেখিয়ে দাও—
কাজী-সাহেব হুকুর করো—

হরগিঙ্ক, ঘম্‌ছ বোজ্‌ ম-রা যাদ্‌ ন-কিশ্‌.....

কাজী তাহার ফার্সী কবিতায় মনোনিবেশ করিলেন।

মাধবী রজতকে লইয়া বারান্দায় বাহির হইল।

বারান্দাটি বাড়ীর চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিয়াছে।
ড্রিং‌রুমটি পশ্চিমমুখী। তাহারা সে দিকের বারান্দা পার হইয়া উত্তর দিকের বারান্দায় গিয়া পড়িল। রজত তাহার পিছন পিছন যাইতে যাইতে চুড়িগুলির দিকে চাহিতে তাহার হাতের বইখানির নাম সরবে চিন্তা কবিবাব মত ধীরে পড়িল, Great Hunger—

রজত বইখানির নাম উচ্চারণ করিতে, মাধবী একটু থামিয়া তাহার সঙ্গ লইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল,—হাঁ, বইখানি পড়েছেন?

—পড়েছি।

—বড় দুঃখের কথা লেখে, ট্রান্স্‌জি পড়তে আমার

মোটাই ভালো লাগে না—

—ওইটাই জীবনের মর্মের কথা।

মাধবী যাইতে যাইতে রজতের মুখের দিকে স্মিত-নয়নে চাহিয়া বলিল,—আপনি এই বয়সেই দেখছি জীবনের সব অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

—আপনাব চেয়ে বয়সে বড় হব বোধ হয়।

—তা বলে খালি কান্নাব কথা লিখে কি লাভ বলুন?

—জগতের সব শ্রেষ্ঠ সাহিত্য এই কান্নাব সাহিত্য।

আমার মোটেই ভালো লাগে না, এত মন পাঁরাপ হয়ে যায়।

—কিন্তু জীবনটা কি দেখুন—আগাদের দেশের লোকেরা

বলে লীলা; কিন্তু পশ্চিমের লোকেরা ঠিক বলে, সংগ্রাম—
বাহিরের বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে, আব সমাজ রাষ্ট্রের সঙ্গে
হানাহানি কাড়াকাড়ি—

তাহার দীর্ঘ বিপর্যস্ত চুলগুলির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া সে আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, মাধবী খোলা চুলগুলি একটা ঘোঁপা করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে

• • বলিল,—এ সব ফিলজফি আমি বুঝি না, যা পড়ে বেশ

আনন্দ হয় তাই লেখো, যাতে মানুষ বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে তাই করো—

—কিন্তু জীবনটা যে দুঃখ কান্নায় ভরা—

—তা বলে কি হাসতে মানা—সত্যি যে লেখকের লেখা পড়ে খালি কান্নাতে হয় তার ওপর আমার এমন রাগি হয়—আমুন, এইটা আপনার ঘর—

উত্তরদিকের বাবান্দা পার হইয়া তাহারা পূর্বদিকের শেষ সীমান্তে এক ছোট ঘরের সম্মুখে হাজির হইল। পাশের ঘবে এক ছুটামিডরা হাসির শব্দ শোনা গেল, ঘর-দেখানো কাজটা কোন চাকর দিয়া করাইলে ত অতিথিকে সমাদরের বিশেষ ক্রটি গৃহকর্ত্রীর হইত না, এই হাসির এই অর্থ। কর্তব্যের মাত্রাটা একটু বেশী হইতেছে।

ঘবটি একটু ছোট, আসবাবপত্র সাধারণ। চাকর স্বাক্ষর, ব্যাগ, বেডিং ইত্যাদি আগেই আনিয়া ফেলিয়াছে, তাহাকে কি একটা কাজে পাঠাইয়া মাধবী একটু বিনীত স্বরে বলিল,—দেখুন, আপনার জন্তে ওপরের একটা ভাল ঘর বাবা ঠিক কবেছিলেন—

রজত বাধা দিয়া বলিল,—না, না, এ ঘর ত সুন্দর! আমার কল্‌কাতার ঘর যদি দেখেন।

—আপনি কাল রাতে আসবেন ভেবে, দোতলার ঠিক এর ওপরের ঘবটাই সাজিয়ে রাখা হইছিল, কিন্তু আমার এক বন্ধু—

হাঁ, কিন্তু আমার এক বন্ধু—বলিয়া শাড়ীর রাঙা রং ও চোখের দীপ্ত হাসির চেউ তুলিয়া সমস্ত ঘর চঞ্চল করিয়া মাধবীর বন্ধুটি বাতাসের দোলায় দোহুল পুষ্পলতার মত রজতের সম্মুখে হাসিয়া দাঁড়াইল।

বিস্ময়বিমুগ্ধনে রজত দেখিল, কালকেব পথে-দেখা সেই তরুণী। তরুণী হাস্যমধুবকণ্ঠে বলিয়া যাইতে লাগিল,—
হাঁ, কিন্তু এই বন্ধুটি এসে ঘরটি দখল করেছে, আর আপনি আসবেন জানলে—

মাধবী লজ্জায় রাঙা হইয়া বিরক্তির সহিত বন্ধুটির দিকে চাহিয়া ধীর কণ্ঠে বলিল,—ইনি বমলা বস্ত্র আর ইনি—

হাসির স্বরে রমলা বলিল,—থাক, তোমায় আর

ইন্ট্রোডিউস করিবে দিতে হবে না; রেল-কোম্পানী কালকেই ও কাজটা সেরে রেখেছে!—তাব পর চোখে হাসির আগুন ঠিকুরাইয়া বজ্রতকে বলিল,—দেখুন, পুষ্পসে এসে এই ঠকলেন, ঘরটি বেদখল হয়ে গেল।

—ঠকে যা আনন্দ পেলুম আপনি জিতেও তা পান নি—

তাহাদের দুইজনের মধ্যে কথাবার্তা চলিতে লাগিল, মাধবী একটু খেন ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

রমলা বলিল,—তা বটে, যে রকম বাঁশী বাজাতে বাজাতে আসছিলেন আমার লোভই হচ্ছিল মোটর থেকে নেমে আপনার গাড়ীতে গিয়ে জুটি—আ, যেমন মোটরবের মধুর সঙ্গীত তেমনি তার মুখ দোলা!—ঝাঁকুনিতে গা ব্যথা হয়ে গেছে।

—ও ঝাঁকুনি বেকে আমিও জ্ঞান পাইনি, ওটা যানের দোষ নয় এ দেশের পথের।

—কিন্তু ভারী জন্মের আপনার বাঁশী বাজছিল, আমার পাশের এক মেম ত প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল, সে নেপালে এক পাহাড়ীৰ মুখে এমি স্বর শুনেছিল।

—হা, ওটা এক নেপালী গান। কাল কখন পৌছোলেন?

—সে অনেক রাত্রে, ঘড়ি দেখিনি কটা। আচ্ছা আপনার ভয় করুল না, পথে ত বাধা-বেরোধ শুনেছি।

—কই, ভাগ্যে ত দেখা মিললো না।

—আচ্ছা সকালে কিছু খেয়েছেন?

—ও এক গাঁবে এমন মিষ্টি দুধ দিলে, তা ছাড়া বাড়ী থেকে খাবার এনেছিলুম বাসি লুচি—

—বাসি লুচি—O lovely! আমার favourite—কিন্তু ওই দুধটা, আঃ!—বলিয়া রমলা একটু নাক সিঁট-কাইয়া রজতের হাসিমাখা মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—আমি মোটেই খেতে পারি না, কেমন করে? যে লোকেরা খায়! আচ্ছা, আপনি হাত মুখ ধুয়ে নিন, আমি খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি, গরম গরম কাঁটলেট ভাজছিলুম—আপনি নেনই ত?

—মোটাই না।

—আর এক-কাপ চা কি ককি

—না, এক-কাপ চা-ই পাঠান।

—আচ্ছা, গোটেন্ কৈ? বা! মাধবী কোথায়? কি অশচর্য্য মেয়ে!

মাধবী যে কথাবার্তার মধ্যে কখন বাহির হইয়া গিয়াছিল তাহা কেহই লক্ষ্য করে নাই।

নীল ভেলভেটিনের চটিজুতার-হিলের উপর লাটুর মত ঘুরিয়া চারিদিকে হাসির আলো ঠিকুরাইয়া রমলা বাহির হইয়া গেল।

ব্যাপার ত অতি সামান্যই। কিন্তু মাধবী যে কেন তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না; তাহা সে নিজেই বুঝি উঠিতে পারিল না। সে ঘরে থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল, ধীরে পাশের ঘরে গিয়া তাহাদের কথাবার্তা শুনিতে লাগিল। রমলা এখন রাম্মাঘবের দিকে চলিয়া গেল, সে ধীরে ধীরে পাশের সিঁড়ি দিয়া উপরে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

(৩)

নূতন জামগাটির সহিত পরিচয় করিবার জন্য রজত বিকালে ঘর হইতে বাহির হইল, কিন্তু বাড়ীর বাবান্দাতেই আটক পড়িয়া গেল। ‘ড্রয়িং-রুমের পাশ দিয়া ঘাইতেছে, দেখিল রমলা ও মাধবী ভিতরে বসিয়া। রমলা পিয়ামোটা খুলিয়া টুটাং করিতেছে আর মাধবী কি একখানা সচিত্র বিলাতী মাসিকপত্রিকার পাতা উন্টাইতেছে। রজত দরজার গোড়ায় আসিয়া ঢুকিবে কিনা ভাবিতেছে, রমলা পিয়ানোর ওপর আঙুলগুলি মৃদু খেলাইতে খেলাইতে বলিল,—আসুন না। আপনি নিশ্চয় পিয়ানো বাজাতে জানেন।

রজত ধীরে তাহাকে একটি নমস্কার করিয়া মাধবীর দিকে চাহিয়া আর একটি নমস্কার করিল। মাধবী চুপ করিয়া পত্রিকার পাতা উন্টাইয়া ঘাইতে ঘাইতে মাথাটা কোনমতে নীচু করিল। রমলা হাসিয়া পিয়ানোর এক স্বর তুলিয়া বলিল,—দেখুন আস্তে ধেতে এত নমস্কার করলে ইঁপিয়ে উঠব, তার চেয়ে এসে একটু বাজান।

বিনীতকণ্ঠে রজত বলিল,—ওটা ত আমি মোটে জানি না, এই চায়ী পাহাড়ীদের বাঁশী একটু বাজাতে পারি।

অতি উৎসাহের সহিত রমণী বলিল,—তবে সেইটাই
নিষে আসুন।

অল্পনয়ের স্ববে রজত উত্তর দিল,—না, দেখুন এখন
নয়।

হাসির স্বরের সঙ্গে একটু ঝাঁঝ মিশাইয়া রমণী
বলিল,—বেশ, আমি তবে পিয়ানো বন্ধ করুলুম।

ক্ষমা চাহিবার ভঙ্গিতে রজত বলিল,—না দেখুন—
মাধবী বই হইতে মুখ না তুলিয়া মুছকণ্ঠে বলিল,—
—থাক্ই না এখন বাপু।

একটু কড়া স্বরে বমলা বলিল,—না, আপনাদের সঙ্গে
ঝগড়া, পিয়ানো বাজানো শুনতে এসেছিলেন আর—

বাধা দিয়া রজত হাসিয়া বলিল,—আর আপনি ত
কাল বাঁশী শুনেছেন।

—তা হবে না—স্থিরকণ্ঠে বলিয়া রমণী সশব্দে
পিয়ানো বন্ধ করিয়া গভীর মুখে চুপ করিয়া বসিল।

রজত অতি অপ্রতিভ হইয়া কি করিবে ভাবিতে না
পারিয়া উঠিয়া দাড়াইল। মাধবী কয়েকখানা ছবি
উল্টাইয়া ধীরে বলিল,—পারবেন না ওর সঙ্গে আপনি।
ভালোয় ভালোয় বাঁশীটা নিয়ে আসুন।

রজত ধীরে দরজার দিকে অগ্রসর হইতেই রমণী
পিয়ানো তুলিয়া এক ঝঙ্কার দিয়া হার্সি-মাথা স্বরে বলিল,—
আচ্ছা থাক্, বাঁশীটা রাতের জগ্ন রইল।

রজত তবু দ্বার প্রায় পার হইল দেখিয়া সে একটু
ভীতকণ্ঠে বলিল,—আমুন এখন বাঁশী শুনবো না, দুব্বার
নেই।

তাবপর সে আপন মনে পিয়ানো বাজাইতে স্বর
করিল।

নারীব, বিশেষতঃ তরুণীদেব, অস্ত্রের লীলা চির-
রহস্যের, এ কথা রজত জানিত। আজ তাহার সত্যতা
চোখের সম্মুখে প্রমাণ হইল দেখিয়া অবাক হইল না।
তাহার কবিরন্ধু ললিতের কথা মনে পড়িল,—নারী হচ্ছে
পুরুষের কাছে এক জীবন-জোড়া জিজ্ঞাসাব চির, নীল-
সমুদ্রের মত অতল, সন্ধ্যার রক্তমায়ায় মত চঞ্চল, ওদের
সমক্ষে কোন খিওরী গোড়ো না, বুদ্ধি দিয়ে এ চিররহস্যময়
• • যন্ত্রটিকে বুঝতে খেও না, পারবে না, প্রতিফলনে এর নব

নব রূপ। প্রেমের সহিত স্পর্শ কর, যখন সে স্বরে আঘাত
করবে, তার খেমনই হোক ঝঙ্কার ঠিক পাবে। নারী-
সেতাবকে বুঝতে খেও না, প্রেমের হাতে আনন্দে
বাস্তাও।

কোন প্রকার বুদ্ধিতে চেষ্টা না করিয়া সে দেখিতে
বসিল। তাহাদের পিছনে খোলা জান্না দিয়া অব্যাহত
মাঠ আর উন্মুক্ত আকাশ দেখা যাইতেছিল, সেই
নীলাকাশের রক্তিমাত পটে ছুই তরুণী বন্ধু খেন ছবির
মত আঁকা।

বিশ্বশিল্পী ছইজনকেই হৃন্দর করিয়া গড়িয়াছে বটে,
কিন্তু একজনকে অতি আশ্চর্য্য কৌশলে গড়িয়া গড়া শেষ
করিয়া ফেলিয়াছে; আব একজনকে নিখুঁত ভাবে
গড়িলেও; গড়া তার শেষ হইতে চাহিতেছে না।
মাধবী খেন কোন গ্রীকভাস্করের গঠিত মূর্ত্তি, তাহার
ধোবনপুষ্পিত তম্ব বসন্তরততীর মত পরিপূর্ণ কিন্তু টলমল
করিতেছে না; তাহার দেহের বর্ণ স্থিরদামিনীর মত
স্বচ্ছ স্নিগ্ধ প্রসরের শুভ্রতার মত, প্রতি অঙ্গ সুগঠিত,
কোথাও সৌন্দর্যের রিক্ততা নাই, তাহার নাক চোখ
ঠোট মুখ হিসাব করিয়া সাজানো, প্রতি অঙ্গের
সহিত প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীর চমৎকার সামঞ্জস্য, এ
মূর্ত্তিমতী পূর্ণিমা, মনকে মুগ্ধ করে বটে কিন্তু মস্ত করে না।
আর রমণীকে দেখিলে মনে হয় এ শিল্পীর তুলিতে
আঁকা হৃন্দর ছবি; এ অল্পকৃতি শিল্প নয়; ভাবাত্মক; প্রতি
অঙ্গভঙ্গী ভাবের ব্যক্তনায় ভরা, দেহের গঠনে বর্ণে সৌন্দর্য্য
ফুরাইয়া যায় নাই; তাহার নাক চোখ মুখ একটু অসম
ভাবেই গড়া, কিন্তু তাহাতে সৌন্দর্য্য বাড়িয়াই গিয়াছে,
চক্ষে গড়ে মাঝে মাঝে কিসেব দীপ্তি বলদিয়া ওঠে, মুখের
বং সব সময়ে এক রকম থাকে না, কখনও পদ্মপরাগের
মত-রাঙ্গা হয় কখনও শুকনো গোলাপ-পাতার মত কালো
হয় কখনও পলাশের মত জলজ্বল করে, তাহার মনের
ছন্দেব মত তাহার দেহ লীলায়িত,—সবচেয়ে হৃন্দর
তাহার সারঙ্গ-নধন, কখনও হাসির আলো কখনও
স্বপ্নের মায়া কখনও দীঘির কালো কখনও মেঘের
ছায়া, তাহার চক্ষু-তাবকায় বে আলো জলিতেছে,
তাহা সূর্য্যেব নয় তারার নয় তাহা বিদ্যুতের, তাহার

দিকে চাহিলে সমস্ত জগৎ প্রাণময় প্রেমময় হইয়া ওঠে।

বীঠোফেনের একটি sonata বাজাইয়া রমলা দীপ্তমুখে রজতের দিকে চাহিল। রজত উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিল,—ভারি সুন্দর, আর-একটা বাজান না।

—বাজাচ্ছি, মাধু তোর গানের বইগুলো কোথায়?

—ওপরে আছে বোধ হয়, তোর ত বেশ হাত পিয়ানোতেও, তোর কাছে রোজ শিখলে হয়।

—তুমি ত শিখছিলে এখনকার কোন্ মেমের কাছে।

—সে আর বোলো না, আনব নাকি ওপর থেকে?

—থাক, আমি-এমিই বাজাচ্ছি, ভুল হলে কেউ ত আর ধরতে পারছে না!—বলিয়া কৌতুক-ভরা চোখে রজতের দিকে চাহিয়া বীঠোফেনের এক বাডের গান বাজাইতে শুরু করিল।

নির্ণিমেঘ নয়নে রজত এই পিয়ানোবাদিনীর দিকে চাহিয়া রহিল, এ ঘেন একটা সুরের ছবি—চোখ দুইটির আনত কম্পিত রেখায়, রাঙা ঠোঁট দুইটির আনন্দে-তরঙ্গিত টানে, পদ্মরাগের মত আঙ্গুলগুলির লীলায়িত ছন্দে, হেলিয়োট্রোপ রংএর শাড়ীর ছলিয়া-ওঠার ভঙ্গিতে, দেহের প্রতি রেখা সুরকে মূর্ত, গানকে গতিশীল সাকার করিয়াছে, পায়ের তলে—লুটানো লাল পাড় হইতে উদ্ভূত বেগীর কেশগুলি পর্যন্ত ছবির রেখাগুলি প্রাণের ফোয়ারার মত উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে—এই-রমলা-ছবিখানিতে বিশ্ব-শিল্পী রেখাকে বক্ষে একটু ওঠাইয়া কটিতে একটু গড়াইয়া কণ্ঠে একটু টানিয়া কেশে রাড়াইয়া শাড়ীর পাড়ে দোলাইয়া কি বিচিত্ররূপ আঁকিয়াছে। এই দেহভঙ্গির সুসমার দিকে চাহিতে চাহিতে রজতের চিত্ত কোন সঙ্গীতলোকে হারাইয়া গেল।

গানের সুরের কি আশ্চর্য্য শক্তি, আত্মার অন্তরতম গৃহের বন্ধদ্বার সব খুলিয়া যায়, চিত্তের নীলাকাশে রক্তরাঙা সন্ধ্যার স্বপ্নহাওয়া ব্লাইয়া দেয়। গানের সুর রূপকথার রাজপুত্রের মত সোনার কাঠির স্পর্শে চিত্তের ঘুমন্ত রাজপুত্রী জাগাইয়া তোলে, প্রাণ-শতদল-শাখিনী-চিরবিরহিনী কোন সৌন্দর্য্যময়ী জাগিয়া ওঠে! রজতের মনে হইল তাহাব হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে ঘুমন্ত

রাজকন্যা আজ জাগিয়া উঠিয়া প্রাণের দুয়ার খুলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহারি সম্মুখে মূর্তিমতী বসিয়াছে।

বাজানো শেষ করিয়া রমলা দীপ্তনেত্রে রজত ও মাধবীর দিকে চাহিল। দুইজনকেই স্তব্ধ দেখিয়া বলিল,—কি হলো?

রজত বিমূঢ় হাসিয়া বলিল,—না সুরের ঝড় জ্বললেন।

—এখন ত কেটে গেছে? না, না, এখন একটু বেড়াতে যাওয়া যাক চলুন,—বলিয়া চেয়ার হইতে একটু নাচের ভঙ্গিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। —কিন্তু বাশির কথাটা বেন রাতে মনে থাকে,—বলিয়া পিয়ানোটা বন্ধ করিল।

রজতের সঙ্গে সঙ্গে মাধবীও উঠিয়া দাঁড়াইল, আবার নিকটের এক সোফায় বসিয়া পড়িল, তাহাব সহসা মনে পড়িয়া গেল, এই অপরিচিত যুবকটির সহিত বেড়াইতে যাওয়া ঠিক হইবে না। অবশ্য কোন্ কারণে সে বলিল তাহা বলা শক্ত, যাইতে তাহার কোথায় বেদনা বোধ হইতেছিল।

বগলা তাহার নিকট স্বরিতপদে অগ্রসর হইয়া বলিল,—কি হলো তোমার!

—ভাই এই গল্পটা শেষ করি।

—নাও, এই সন্ধ্যাবেলা তোমায় গল্প শেষ করতে হবে না,—বলিয়া বায়স্কোপের ম্যাগাজিনটা টান মারিয়া কার্পেটে ফেলিয়া দিল।

রজতও একসঙ্গে বেড়াইতে যাইবার মত শক্তি মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছিল না, সে পাশের দরজা দিয়া ধীরে ঘরের দিকে যাইতেছে দেখিয়া রমলা একটু বিস্মিতনয়নে চাহিয়া বলিল,—কোথায়?

দীনভাবে রজত বলিল,—ঘরে একটু কাজ আছে।

একটু তিত্তকণ্ঠে রমলা বলিল,—আচ্ছা।

এ-সব চং সে মোটেই সহিতে পারে না।

বারান্দার কোণে কাজী-সাহেব চুপ করিয়া বসিয়া সন্ধ্যার আনোষ পাহাড়গুলির দিকে তাকুাইয়া ছিলেন। রমলা ছুটিয়া গিয়া প্রায় তাহার দাড়ির ওপর পড়িয়া হাত ধরিয়া ঝাঁকুনি দিয়া গেক্ষা রংএর আলখাল্লাটা টানিয়া বলিল,—চলো ত কাজী সাহেব!

উদাসহুয়ে কাজী-সাহেব বলিলেন,—কোথায় ?

চুড়ির ঝঙ্কার তুলিয়া কাজী-সাহেবের হাত ধরিয়া টানিতে

দীপ্তকণ্ঠে রমলা বলিল,—চলো না, আমবা বেড়িয়ে

টানিতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রাস্তার দিকে চলিল।

এসে এমন বেড়ানোর গল্প বল্!—তাব পর সোনার

(ক্রমশঃ)

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

অলির প্রতি কুসুম

পূবেব আকাশ লাল হবে ঐ এলো,

উঠেছে ঐ শুকতারাটি জ্বলি'.

জাগো প্রিথ, নয়ন ছুটি মেলো,

জাগো আমার বক্ষ-কোষের অলি।

সারাটি বাত জেগেই আছি আমি

দণ্ড প্রহর পল অল্পপল গুনি',

জাগো বধু, ফুরিয়ে আসে যামী—

ভোর-আবতির ঘণ্টা কাঁসর গুনি।

জানো না নাথ কি করে' যে মম

রাত কেটেছে মরণ প্রতীক্ষায়,

বারেক জাগো নিষ্ঠুর প্রিয়তম,

আমাব সময় ফুরিয়ে এলো হায়।

হাজাব চোখে পূব্ আকাশে চাই,

হাজাব কানে শুন্ছি প্রতিধ্বনি,

মোব বিদায়েব আর যে দেবী নাই,

জাগো আমার হাজাব চোখের মণি।

“জব মা জগদম্বা” বলে' হায়

নিষ্ঠুর বায়ুন উঠেছে ঐ জেগে,

হন্তে সাজী, নামাবলি গায়

এদিক পানে আস্ছে ক্ষত বেগে।

বাবেক জেগে আমাষ বিদায় দাও,

হের এ চোখ শিশিরে যাম ভাসি',—

শেষ কথাটি গুজরিয়া গাও—

কর্ণে বহি' বিদায় নিষ্ক এ দাসী।

দেবীর পায়ে ভিক্ষা এবাব লব'

“জন্ম দিও, এবার দিখে প্রাণ-

এমন দেশে, হয না যেথা তব

পূজাব লাগি' প্রেমের বলিদান।”

বেতালভট্ট

উদাসস্বরে কাজী-সাহেব বলিলেন,—কোথায় ?
দীপ্তকণ্ঠে রমলা বলিল,—চলো না, আমরা বেড়িয়ে
এসে এমন বেড়ানোর গল্প বলব!—তার পর সোনার

চুড়ির ঝঙ্কার তুলিয়া কাজী-সাহেবের হাত ধরিয়া টানিতে
টানিতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রাস্তার দিকে চলিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

অনির প্রতি কুসুম

• পূবের আকাশ লাল হয়ে ঐ এলো,
উঠেছে ঐ শুকতারাটি অনি;
জাগো প্রিয়, নয়ন দুটি মেলো,
জাগো আমার বক্ষ-কোষের অনি।

সারাটি রাত জেগেই আছি আমি
দণ্ড প্রহর পল অন্তর পল গুনি',
জাগো বন্ধু, ফুরিয়ে আসে যামী—
ভোর-আরতির ঘণ্টা কাদর শুনি।

জ্ঞানো না নাথ কি করে' যে মম
রাত কেটেছে মরণ প্রতীক্ষায়,
বারেক জাগো নিষ্ঠুর প্রিয়তম,
আমার সময় ফুরিয়ে এলো হায়।

হাজার চোখে পূব আকাশে চাই,
হাজার কানে শ্রুতি প্রতিধ্বনি,

মোর বিদায়ের আর যে দেবী নাই,
জাগো আমার হাজার চোখের মণি।

“জব মা জগদদ্বা” বলে' হায়
নিষ্ঠুর বামুন উঠেছে ঐ জেগে,
হস্তে সাজী, নামাবলি গায়
এদিক পানে আসছে দ্রুত বেগে।

বারেক জেগে আমার বিদায় দাও,
হের এ চোখ শিশিরে মায় ভাসি,—
শেষ কথাটি গুজরিয়া পাও—
কর্ণে বহি' বিদায় নিক এ দাসী।

দেবীর পায়ে ভিক্ষা এবার লব'
“জন্ম দিও, এবার দিয়ে প্রাণ
এমন দেশে, হয় না যেথা তব
পূজার লাগি' প্রেমের বলিদান।”

বেহালভট্ট



পিচকারী দিয়ে বাড়ী তৈরী—

আজকাল আমাদের দেশে এবং বিদেশে কনক্রিট দিয়ে বেশীর ভাগ বাড়িই তৈরী হচ্ছে। এই জিনিষটা দিয়ে কাজ হয় খুবই চটপট আর বাড়ীপানিও হয় পাণ্ডের মত শক্ত। এতদিন পর্যন্ত কাঠের ফ্রেমের মধ্যে কনক্রিটের কাঁচা মসলা ঢেলে দিয়ে (কনক্রিটের) বাড়ী তৈরী হচ্ছিল। এখন এক রকম নতুন কায়দায় এই কনক্রিটের বড় বড় বাড়ী তৈরী হচ্ছে। একটা লম্বা ক্যান্সিসের নলের আশায় ৩ ইঞ্চি ব্যাসওয়াল একটা লোহা বা অস্ত্র কোন শক্ত খাতুর মূণ লাগানো থাকে। দেয়ালো দেপ্তে অনেকটা কলিকাতার রাস্তায় জল-সেওয়ার নলের মত। একটা চৌবাচ্চায় শুধু কনক্রিট ঢালা থাকে, তাবপব তাব মধ্যে জোবে জল ঢেলে দেওয়া হয়। তারপর কনক্রিট গলে' যাবা মাত্র সেটাকে ঐ নলের মধ্যে দিয়ে বাড়ী তৈরী করার ফ্রেমের গায়ে ছুড়ে আঁবস্ত করা হয়। এই তরল কনক্রিট নলের মধ্যে থেকে ঠিক পিচকারীর মত বেরিয়ে আসে। ফ্রেমের একটা দিক আলুকাংবা-মাথানো কাগজ আঁব খুব হাল্কা লোহার জালে মোড়া থাকে। কনক্রিট শুকিয়ে যাবা মাত্র আলুকাংবা-কাগজ আর লোহার জাল খুলে ফেলা হয়। এই রকম বাড়ীর সব দেওয়াল, মেঝে, এমন কি দেওয়ালের গায়ে বেকি চেয়ার পর্যন্ত কনক্রিট দিয়ে করা যায়। এই রকম কবে' পিচকারীতে কনক্রিট ছুড়ে তৈরী একখানা বাড়ীকে, একটা কনক্রিটের বড় টুবুরা বলা যায়।

একটা পাঁচ-ঘর-ওয়াল বাড়ী মাত্র দুদিনে করা যায়। পিচকারীর মধ্যে দিয়ে তবল কনক্রিট এত জোরে বেরিয়ে আসে যে ফ্রেমের মধ্যে কোথাও সামান্য ফাঁকও থাকে না। চৌবাচ্চাব মধ্যে কনক্রিট খুব ভাল কবেই নিশা যায়, কাঁবপ-বাজে মাল দেওয়ালের গায়ে বসে না, স্ববে' পড়ে' যায়। দেওয়াল যত-ইচ্ছা পুরু করা যায়। প্রথম যে বাড়ী এই বকমে তৈরী করা হয়, তার দেওয়াল ছিল ৬ ইঞ্চি পুরু। এই রকম কবে' বাড়ী তৈরী করার সুবিধা প্রচুর, অথচ অসুবিধা বিশেষ কিছু নেই বলেও হয়।

লোকে এব সুবিধাব বিষয়ে অভিজ্ঞ হলে ক্রমে ক্রমে সকলেই এই বকমে বাড়ী তৈরী-কবে' আশা করা যায়। কাঠের ফ্রেমের মধ্যে তবল কনক্রিট ঢাললে তস্তা অনেক নষ্ট হয়। কিন্তু এই কনক্রিট-ছোড়া পিচকারীর সাহায্যে বাড়ী তৈরী করলে কেবল আলুকাংবা-মাথানো কতকগুলো কাগজ ছাড়া আঁব কিছুই নষ্ট হয় না। এতে খাটুনিও অনেক কম, আঁব বাড়ীপানিও হ'ব অনেক অংশে ভাল।



পিচকারী দিয়া কনক্রিট ছোড়া হইতেছে।



পিচকারী দিয়া তৈরী বাড়ী।

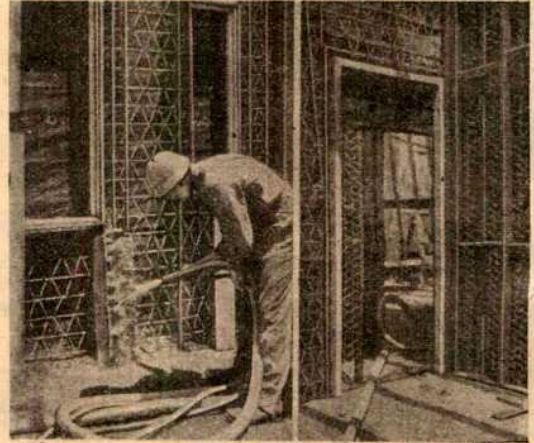


পিচকারী দিয়ে বাড়ী তৈরী—

আজকাল আমাদের দেশে এবং বিদেশে কনক্রিট দিয়ে বেশীর ভাগ বাড়িই তৈরী হচ্ছে। এই গিনিঘটা দিয়ে কাজ হয় খুবই চটপট আর বাড়ীখানাও হয় পাথরের মত শক্ত। এতদিন পূর্বাস্ত্র কাঠের ফ্রেমের মধ্যে কনক্রিটের কাঁচা মসলা ঢেলে দিয়ে (কনক্রিটের বাড়ী তৈরী হচ্ছিল। এখন এক রকম নতুন কার্যদায় এই কনক্রিটের বড় বড় বাড়ী তৈরী হচ্ছে। একটা লম্বা ক্যাথিসের নলের আগায় ৩ ইঞ্চি ব্যাসওয়াল। একটা লোহা বা অল্প কোন শক্ত বাতুর মুখ লাগানো থাকে। দেগুলো দেপ্তে অনেকটা কলিকাতার রাস্তায় জল-দেওয়া নলের মত। একটা চৌবাচ্চার শুকনো কনক্রিট ঢালা থাকে, তারপর তার মধ্যে জোরে জল ঢেলে দেওয়া হয়। তারপর কনক্রিট গলে যাবা মাত্র নেটাকে ঐ নলের মধ্যে দিয়ে বাড়ী তৈরী করবার ফ্রেমের গায়ে ছুড়ে তৈরী করা হয়। এই তরল কনক্রিট নলের মধ্যে থেকে ঠিক পিচকারীর মত বেরিয়ে আসে। ফ্রেমের একটা দিক আলুকাংরা-মাথানো কাগজ আর খুব হুগ্গা লোহার জাল মোড়া থাকে। কনক্রিট শুকিয়ে যাবা মাত্র আলুকাংরা-কাগজ আর লোহার জাল খুলে ফেলা হয়। এই রকম বাড়ীর সব দেওয়াল, মেঝে, এমন কি দেওয়ালের গায়ে বেক্সি চেয়ার পূর্বাস্ত্র কনক্রিট দিয়ে করা যায়। এই রকম করে পিচকারীতে কনক্রিট ছুড়ে তৈরী একখানা বাড়ীকে, একটা কনক্রিটের বড় টুকরা বলা যায়।

একটা পাঁচ-ঘর-ওয়াল বাড়ী মাত্র দুদিনে করা যায়। পিচকারীর মধ্যে দিয়ে তরল কনক্রিট এত জোরে বেরিয়ে আসে যে ফ্রেমের মধ্যে কোথাও সামান্য ফাঁকও থাকে না। চৌবাচ্চার মধ্যে কনক্রিট খুব ভাল করেই মিশ খায়, কারণ বাজে মাল দেওয়ালের গায়ে বসে না, বারো পড়ে' যায়। দেওয়াল যত ইচ্ছা পুরু করা যায়। প্রথম যে বাড়ী এই রকমে তৈরী করা হয়, তার দেওয়াল ছিল ৬ ইঞ্চি পুরু। এই রকম করে বাড়ী তৈরী করার সুবিধা প্রচুর, অগচ্ছ অসুবিধা বিশেষ কিছু নেই বলেও হয়।

লোকে এর সুবিধার বিষয়ে অভিজ্ঞ হলে ক্রমে ক্রমে সকলেই এই রকমে বাড়ী তৈরী করবে আশা করা যায়। কাঠের ফ্রেমের মধ্যে তরল কনক্রিট ঢাললে তত্ত্ব অনেক নষ্ট হয়। কিন্তু এই কনক্রিট-ছোড়া পিচকারীর সাহায্যে বাড়ী তৈরী করলে কেবল আলুকাংরা-মাথানো কতকগুলো কাগজ ছাড়া আর কিছুই নষ্ট হয় না। এতে খাটুনিও অনেক কম, আর বাড়ীখানাও হয় অনেক অংশ ভাল।



পিচকারী দিয়ে কনক্রিট ছোড়া হইতেছে।



পিচকারী দিয়ে-তৈরী বাড়ী।

সঙ্কুচিত মাগি—

ইজিপ্টে পুনাকালের অনেক বাতায় মাগি পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্বে আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটসে এক লাল মানুষের মাগি আনীত হইয়াছে। মাগিটির বয়স ৪০০ বছরের বেশী। জন ক্রাটিয়েল নামক পেরুদেশীয় একজন ইঞ্জিনিয়ার ইতা আনিয়াছেন। মাগির দৈর্ঘ্য মাত্র ২৫ ইঞ্চি।



ফাফবা সর্দারের সঙ্কুচিত মাগি।

নাডে তিন হাত লম্বা মানুষের দেহকে কেমন কবিয়া যে এত সঙ্কুচিত করা যায় তাহা দক্ষিণ-আমেরিকার লাল-মানুষেরাই কেবল জানে। এই উষধের সন্ধান পৃথিবীর আর কোন জাতির জানা নাই। এই মাগি ফাফবা নামে একজন পেরুদেশীয় সর্দারের। তিনি ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে স্প্যানিয়ার্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ক্রাটিয়েল মাতৃদেব গলার পুতির মালাগুলিও এই মাগির সঙ্গেই পাওয়া গেছে।

মানুষের গায়ের জোর—

দেহের অন্তর্গতে মাতৃদেব যে-পরিমাণ শক্তি আছে সামান্য সামান্য পোক-মাকড়স শক্তি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। দেহের অন্তর্গতে মানুষ পোকের কাছে অতি ধীনবদ বলিয়া মনে হয়। মাছির অন্তর্গতে যদি আমাদের পায়ের চেয়ে থাকিত তবে আমরা অন্যথাসে একটা ৩০০ ফুট উঁচু স্থান হইতে লাগ দিতে পারিতাম। মাঝে-মাঝে বলা যায় একটা পিপ্‌ড়া একটা মাটির তেলকে টানিয়া লইয়া বাইতেছে।



চুবলে পোকের ভীণ দেহবল।

এই কাচটি একজন লোকের একটি বেলগাডী টানিয়া লইয়া যাওয়ার সমান। একটা পিপ্‌ড়া তাহার দেহের ১৪০০-গুণ ওজনব জিনিষ টানিতে পারে। পিপ্‌ড়া তাহার দেহের অপেক্ষা ৪০০০ গুণ ওজন তুলিতে পারে। গুবরে-পোকা তাহার দেহের পাঁচগুণ ওজন বহন করিতে পারে। এই অল্পপাতে-মানুষের ১০০ গুণ ওজন বহন করিতে পারে উচিত।

প্রাচীন মুদ্রা—

সার্বেন জাবার নামক এক ভ্রমলোকের নিকট পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পুরানো একটি মুদ্রা আছে। মুদ্রাটি হোমার, তাহার মাপ ১০ মিমিটার। ইতার ওজন মাত্র ত্রিশ পাউন্ড বা প্রায় সাড়ে তিন মিমিটার উপর ১৭৩০ খৃষ্টাব্দের ছাপ আছে। তুইডেনে হাদশ চারদিকের যুদ্ধের সময় এটা তাহার পবেও এইরকম মুদ্রার চূরন ছিল। এই



সব-চেয়ে বড় পুরানো মুদ্রা।

ভ্রমলোকের ৩০,০০০ মুদ্রা আছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে আবস্ত কবিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত নানা দেশের নানা বকস এবং নানা সময়ের মুদ্রা এই ভরবিলে আছে। ভ্রমলোকের সমস্ত সম্পদের দাম কোটি টাকারও বেশী। ইতার কাছে এমন দু-একটি মুদ্রা আছে যাহা আর কোথাও নাই বলিলেও হয়। তাহাদের মূল্যও কিছু স্থির করা সম্ভব নয়।

ধাতুনির্মিত গোলাপ-গাছ—

আমেরিকার পিলাডেল্‌ফিয়া নগরের একজন গুস্তাফ মিস্ত্রি এক রকম খাত্তা দ্বারা একটি গোলাপ ফুলের গাছ তৈরী কবিয়াছেন। এই মিস্ত্রির নাম স্টেভেন গাভুর্গিন। অক্সি-এসিটিলিন দ্বারা সাহায্যে খাত্তার টুকরাগুলিকে ছোঁড়া লগানো হইয়াছে। গোলাপ-ফুলগুলি ধাতুনির্মিত নহে। রঙিন কাঁচের দ্বারা ফুলগুলি নির্মিত হইয়াছে। এই গোলাপ-গাছটিকে দেখিলে একবারে আসল গোলাপ-গাছ বলিয়াই মনে হয়।

আলোর গোলা—

এতদিন পর্যন্ত সমুদ্রের মাঝে সন্ধানকারে শত্রুজাহাজের সন্ধান করিতে হইলে সার্চলাইটের বা সন্ধানী-আলার সাহায্যে কবিতো হইত।

সঙ্কুচিত মামি—

ইজিপ্টে পুরাকালের অনেক রাজার মামি পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্বে আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটসে এক লাল মানুষের মামি আনীত হইয়াছে। মামিটির বয়স ৪০০ বছরের বেশী। জন ক্রাটিয়েল নামক পেরু-দেশীয় একজন ইজিপ্তিয়ার ইহা আনিয়াছেন। মামির দৈর্ঘ্য মাত্র ২৫ ইঞ্চি।



ফরাসী সর্দারের সঙ্কুচিত মামি।

নাড়ে তিন হাত লম্বা মানুষের দেহকে কেমন করিয়া যে এত সঙ্কুচিত করা যায় তাহা দক্ষিণ-আমেরিকার লাল-মানুষেরাই কেবল জানে। এই ঔষধের সন্ধান পৃথিবীর আর কোন জাতির জানা নাই। এই মামি কারবা নামে একজন পেরুদেশীয় সর্দারের। তিনি ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে স্প্যানিয়ার্ডদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ক্রাটিয়েল সাহেবের গলার পুত্রের মালাগুলিও এই মামির সঙ্গেই পাওয়া গেছে।

মানুষের গায়ের জোর—

দেহের অনুপাতে মানুষের যে-পরিমাণ শক্তি আছে সামান্য সামান্য পোকা-মাকড়ের শক্তি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। দেহের অনুপাতে মানুষ পোকার কাছে অতি হীনবল বলিয়া মনে হয়। মাকড়ের অনুপাতে যদি আমাদের গায়ের জোর থাকিত তবে আমরা অনায়াসে একটা ৩০০ ফুট উঁচু স্থান হইতে লাফ দিতে পারিতাম। মাঝে মাঝে দেখা যায় একটা পিঁপড়া একটা মাটির ঢেলাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।



গুবরে পোকার ভীষণ দেহবল।

এই কাজটি একজন লোকের একটি রেলগাড়ী টানিয়া লইয়া যাওয়ার সমান। একটা পিঁপড়া তাহার দেহের ১০০০ গুণ ওজনের জিনিষ টানিতে পারে। পিঁপড়া তাহার দেহের অপেক্ষা ৪০০০ গুণ ওজন তুলিতে পারে। গুবরে-পোকা তাহার দেহের পাঁচগুণ ওজন বহন করিতে পারে। এই অনুপাতে মানুষের ১০০০ গুণ ওজন বহন করিতে পারা উচিত।

প্রাচীন মুদ্রা—

ফারেন জরিবে নামক এক ভদ্রলোকের নিকট পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পুরানো একটি মুদ্রা আছে। মুদ্রাটি তাহার, তাহার মাপ ১০ বর্গ ইঞ্চি। ইহার ওজন নাড়ে তিন পাউণ্ড বা প্রায় নাড়ে তিন দেয়। মুদ্রার উপর ১৩৩০ খৃষ্টাব্দের ছাপ আছে। হুইটমেন দ্বাদশ শতাব্দীর যুদ্ধের সময় এবং তাহার পরেও এইরকম মুদ্রার চালান ছিল। এই



সবচেয়ে বড় পুরানো মুদ্রা।

ভদ্রলোকের ৩০,০০০ মুদ্রা আছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত নানা দেশের নানা রকম এবং নানা সময়ের মুদ্রা এই তহবিলে আছে। ভদ্রলোকের সমস্ত সঞ্চয়ের দাম কোটি টাকারও বেশী। ইহার কাছে এমন ছ-একটি মুদ্রা আছে বাহা আর কোথাও নাই বলিলেও হয়। তাহাদের মূল্যও কিছু স্থির করা সম্ভবপর নয়।

ধাতুনির্মিত গোলাপ-গাছ—

আমেরিকার কিলডেলফিয়া নগরের একজন গুস্তাদ মিস্ত্রি এক রকম ধাতু দ্বারা একটি গোলাপ ফুলের গাছ তৈয়ারী করিয়াছেন। এই মিস্ত্রির নাম স্টেভেন গাভুর্ন। অগ্নি-গ্রাসিটিলিন শিপার সাহায্যে ধাতুর টুকরাগুলিকে জোড়া লাগানো হইয়াছে। গোলাপ-ফুলগুলি ধাতুনির্মিত নহে। রঙিন কাঁচের ফাল্গু দিয়া ফুলগুলি নির্মিত হইয়াছে। এই গোলাপ-গাছটিকে দেখিলে একেবারে আসল গোলাপ-গাছ বলিয়াই মনে হয়।

আলোর গোলা—

এতদিন পর্যন্ত সমুদ্রের মাঝে অন্ধকারে শব্দজাহাজের সন্ধান করিতে হইলে মাচ লাইটের বা সন্ধানী-আলোর সাহায্যে করিতে হইত।



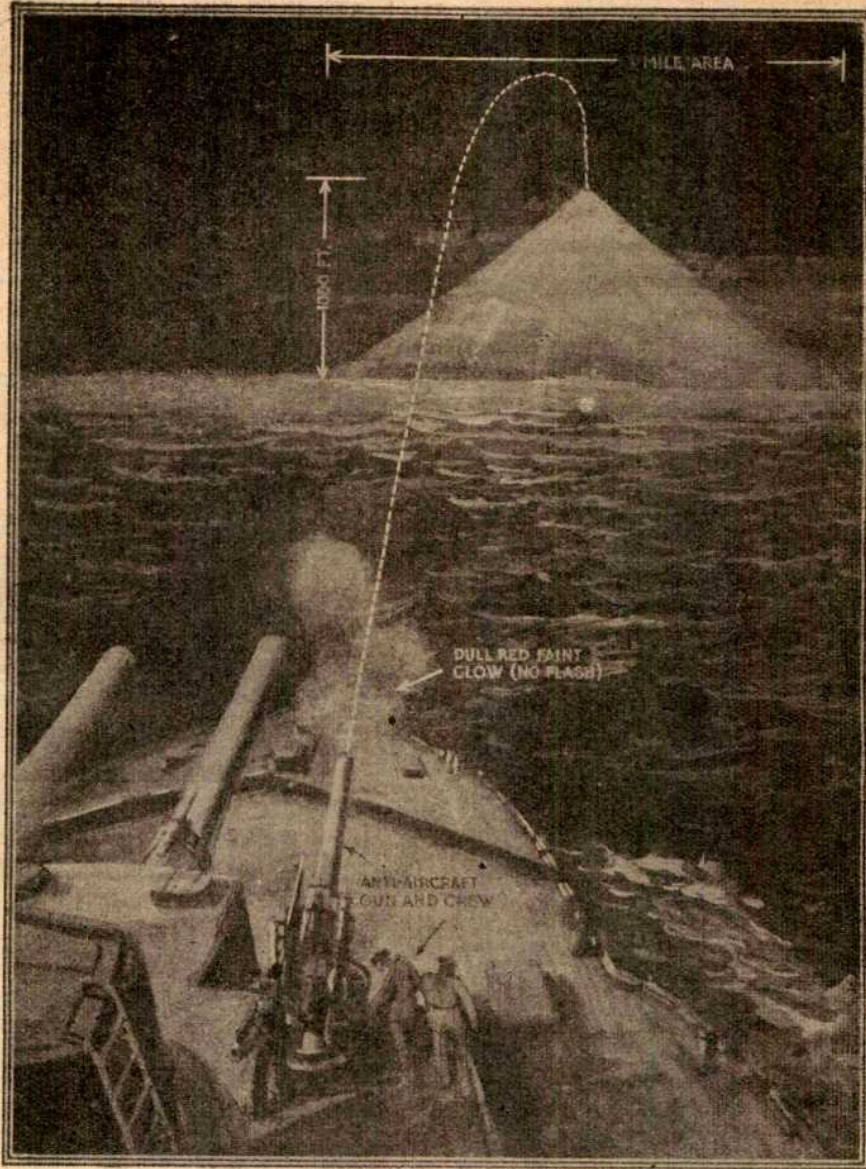
শত্রু-জাহাজের উপর আলোব গোলা ।

ইহাতে অনুসন্ধানকারী জাহাজও শত্রুর কাছে ধরা পড়িয়া যাইত। এক প্রকার নূতন গোলাব আবিষ্কার হইয়াছে, এই গোলা ৫-ইঞ্চি বা ৩-ইঞ্চি-মুখওলা কামানের মধ্যে ভবিষ্য ছুড়িতে হয়। গোলা ৬ মাইল গিয়া নষ্টিয়া যায়। তখন এই গোলাব মধ্য হইতে একটা ৮ লক্ষ বাতিব জ্বোরের আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই আলো সমুদ্রের উপর প্রায় এক মাইল স্থান দিবে মত পরিষ্কার করিয়া দেয়। গোলা ছুড়িবার সময় কামানের মুখে কোন বকমেব আলো বা আগুন দেখা যায় না। কেবল খানিকটা ধোঁয়া বাহির হয়। এই ধোঁয়া ঘূব হইতে একেবারেই দেখা যায় না। ৫-ইঞ্চি-মুখ-ওলা কামানের মধ্যে হইতে যখন গোলা

বাহির হয়, তখন সামান্য একটা আগুনের ফিলিক বাহির হয়। কিন্তু তাহা দেখিয়া শত্রু-জাহাজ, অনুসন্ধান-কারী জাহাজের স্থান নিশ্চয় করিতে পারে না।

সাবানের ফেনার মধ্যে অভিনয় —

বায়ুস্রোপ এবং পিস্টোলে নানা বকমেব চমৎকার এবং অদ্ভুত চিত্র-পট দেখা যায়। মাঝে মাঝে এমন অদ্ভুত ছ-একখানা পট এবং দৃশ্য দেখা যায় যাহাতে দর্শকবা একেবারে হতভম্ব হইয়া যায়। কিছুদিন



শত্রু-জাহাজের উপর আলোর গোলা ।

ইহাতে অনুসন্ধানকারী জাহাজও শত্রুর কাছে ধরা পড়িয়া যাইত। এক প্রকার নুতন গোলার আবিষ্কার হইয়াছে, এই গোলা ৫-ইঞ্চি- বা ৩-ইঞ্চি-মুখওয়ালা কামানের মধ্যে ভরিয়া ছুড়িতে হয়। গোলা ৬ মাইল গিয়া ফাটিয়া যায়। তখন এই গোলার মধ্যে হইতে একটা ৮ লক্ষ বাতির জ্বরের আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই আলো সমুদ্রের উপর প্রায় এক মাইল স্থান দিনের মত পরিষ্কার করিয়া দেয়। গোলা ছুড়িবার সময় কামানের মুখে কোন রকমের আলো বা আগুন দেখা যায় না। কেবল থানিকটা ধোয়া বাহির হয়। এই ধোয়া দূর হইতে একেবারেই দেখা যায় না। ৫-ইঞ্চি-মুখ-ওয়ালা কামানের মধ্যে হইতে যখন গোলা

বাহির হয়, তখন সামান্য একটা আগুনের ঝিলিক বাহির হয়। কিন্তু তাহা দেখিয়া শত্রু-জাহাজ, অনুসন্ধান-কারী জাহাজের স্থান নিশ্চয় করিতে পারে না।

সাবানের ফেনার মধ্যে অভিনয় —

বায়োস্কোপ এবং থিয়েটারে নানা রকমের চমৎকার এবং অদ্ভুত চিত্র-পট দেখা যায়। মাঝে মাঝে এমন অদ্ভুত ছ-একখানা পট এবং দৃশ্য দেখা যায় বাহাতে দর্শকরা একেবারে হতভম্ব হইয়া যায়। কিছুদিন



সাবানের ফেনার মধ্যে নৃত্য ।

পূর্বে একজন থিয়েটারের কর্তা সাবানের ফেনার বুড়দের মধ্যে নাচ দেখাইয়া দর্শকদের চমৎকৃত করিয়া দিয়াছেন। একটা প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা মধ্যে সাবান গোলা হয়। চৌবাচ্চাটা ৪০ ফুট লম্বা এবং ২০ ফুট চওড়া। চৌবাচ্চা হইতে সাবানের কেনা নলের মধ্য দিয়া বহুস্থিত-বুদ্ধ নাচঘরের মেঝের তলায় লইয়া যাওয়া হয়। তারপর ঘরের মেঝের তলায় সাবানের কেনা জমিলে তাহার ভিতর দিয়া বাতাস ছাড়া হয় এবং মেঝের ছিদ্রদ্বারের ভিতর দিয়া মেঝের উপর সাবানের বুড়ের জমা হইয়া উঠে। তাহার মধ্যে বখন নর্তক-নর্তকীরা নৃত্য করে, তখন তাহা কোন এক স্বপ্নরাজ্যের পর্বতের বসন্ত-ঈড়া বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

অ-নিষ্ঠুর মোঘের লড়াই—

মহিব-যুদ্ধে রক্তপাত হওয়াটা এত স্বাভাবিক হইয়া পিমাছে যে বিনা-বক্তাপাতে মহিব-যুদ্ধের কথা অনেকে করনাও কবিতে পাবেন না। মেরিকোর লোকেরা মহিব-যুদ্ধ-প্রিয়। সেখানে মহিব-যোদ্ধারা লম্বা লম্বা ধারালো বর্শা লইয়া আসরে নামিয়া পড়িত, এবং বর্শার ধোঁচাতে মহিবকে তান্ত্র বিরক্ত করিয়া তাহাকে একেবারে পাগল করিয়া তুলিত। ধানিকরণ যুদ্ধ করার পর মহিব বেচারী একেবারে মরার মত হইয়া পড়িত, এবং সর্বোচ্চ ক্ষত বিক্ষত হইয়া শুইয়া পড়িত। যুদ্ধের শেষে মহিবের প্রাণশূন্য দেহটাকে বাহিবে টানিয়া কেলিয়া দেওয়া হইত। একজন মেরিক্যান্ এবার একটি নতুন বকমের মহিব-যুদ্ধ করিয়াছেন। এই যুদ্ধে যোদ্ধার হাতে ধারালো বর্শার বদলে ভোঁতা বর্শা থাকে। এই বকম বর্শার মুখে খুব চট্টচটে এক বকম আঠা লাগানো থাকে। দুই হইতে ইহাকে ঠিক আসল বর্শার মত মনে হয়, এবং ইহার ধোঁচা

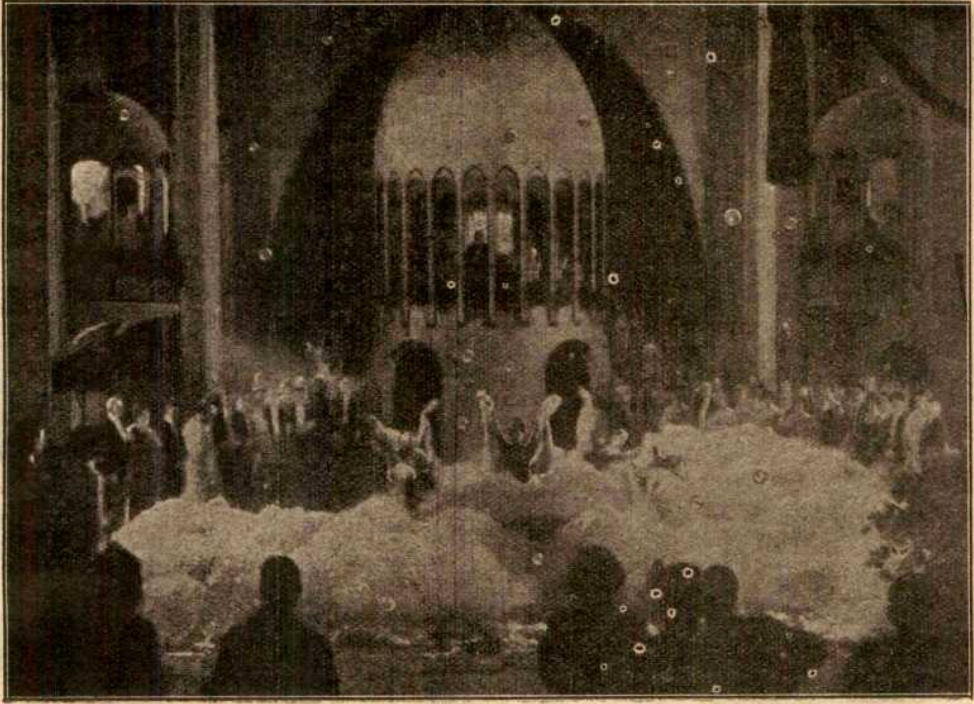
খাইবা মহিবও বেশ উত্তেজিত হইয়া উঠে। বুদ্ধ যেমন হইবার তেমনিই হয়। কেবল হয় না অনর্থক রক্তপাত। যুদ্ধের শেষে মহিবকে একটা ফটক দিয়া আগুনের বাহিরে তাড়িয়া দেওয়া হয়। দর্শকগণ ইহাতে পুবা মাত্রায় আনন্দ পায়। ঘরে ফিবিবাব সময় তাহারা তাহাদের ব্রাস মনে বীতৎস লাল রক্তের ছোপ লইয়া যায় না। অথচ মহিব-যুদ্ধের আনন্দটুকু তাহারা বেশ ভাল করিয়া ভোগ করিয়া যায়।

চলন্ত গির্জা—

হারিসবার্গের অনু ফুটন এক চলন্ত গির্জা নির্মাণ করিয়াছেন। যে-সব লোক গির্জায় আসিবা। সময় পায় না, সারা-দিন নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে, অথবা আসিবার ইচ্ছা থাকিলেও কাছাকাছি গির্জা পায় না, তাহাদের দুহাথে দুহাথে এই গির্জা ঘুরিয়া বেড়াইবে। এক-ধানা প্রকাণ্ড মোটর পাড়ীর উপর এই গির্জা। পাড়ীর সামনেব রিকে পাদবী মহাশয়ের থাকিবার ঘর এবং পিছনের দিকে ছোট একটি বেদী। এই বেদী হইতে পাদবী মহাশয় উপাসনা করেন। স্থবিধা-মত স্থানে এই চলন্ত গির্জা ধামানো হয়। আশেপাশের লোকেরা এবং মোটরভ্রমণকাবীরা এই গির্জাতে আসিয়া যোগদান করেন।

কাঠের তৈরী হুবহু মানুষ-মূর্তি —

আমেরিকার স্তান ফ্রান্সিস্কোর নোকোবা জাপানী মিজি হামানউমা মাসাহুচির তৈরী একটি কাঠের মূর্তি দেখে অবাক হয়ে গেছে। এই মূর্তিটি ওস্তাদেব নিজের চেহারা-ব প্রকৃতি-ব বঙ্গ মনে হয়। কোথাও



সাবানের কেনার মধ্যে নৃত্য।

পূর্বে একজন থিয়েটারের কণ্ঠ্য সাবানের কেনার বৃত্তদের মধ্যে নাচ দেখাইয়া দর্শকদের চমৎকৃত করিয়া দিয়াছেন। একটা প্রকাণ্ড চৌবাচ্চার মধ্যে সাবান গোলা হয়। চৌবাচ্চাটা ৩০ ফুট লম্বা এবং ২০ ফুট চওড়া। চৌবাচ্চা হইতে সাবানের কেনা নলের মধ্য দিয়া বহুজিহ্ব-যুক্ত নাচঘরের মেকের তলায় লইয়া যাওয়া হয়। তারপর ঘরের মেকের তলায় সাবানের কেনা জমিলে তাহার ভিতর দিয়া বাতাস ছাড়া হয় এবং মেকের ছিদ্রদ্বারের ভিতর দিয়া মেকের উপর সাবানের বৃত্ত জমা হইয়া উঠে। তাহার মধ্যে যখন নর্তক-নর্তকীরা নৃত্য করে, তখন তাহা কোন এক স্বপ্নরাজ্যের পরীক্ষার বসন্ত-ক্রীড়া বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

অ-নিষ্ঠুর মোষের লড়াই—

মহিব-যুদ্ধে রক্তপাত হওয়াটা এত স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে যে বিনা-রক্তপাতে মহিব-যুদ্ধের কথা অনেকে কল্পনাও করিতে পারেন না। মেক্সিকোর লোকেরা মহিব-যুদ্ধ-প্রিয়। সেখানে মহিব-যোদ্ধারা লম্বা লম্বা ধারালো বর্শা লইয়া আনরে নামিয়া পড়িত, এবং বর্শার খোঁচাতে মহিবকে তাজ্র বিরক্ত করিয়া তাহাকে একেবারে পাগল করিয়া তুলিত। ধানিকক্ষণ যুদ্ধ করার পর মহিব বেচারি একেবারে মরার মত হইয়া পড়িত, এবং সর্বান্তে ক্ষত বিক্ষত হইয়া শুইয়া পড়িত। যুদ্ধের শেষে মহিবের শ্রাণশূন্য দেহটাকে বাহিরে টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইত। একজন মেক্সিকান এবার একটা নতুন রকমের মহিব-যুদ্ধ করিয়াছেন। এই যুদ্ধে যোদ্ধার হাতে ধারালো বর্শার বদলে ভোঁতা বর্শা থাকে। এই রকম বর্শার মুখে খুব চটচটে এক রকম আঠা লাগানো থাকে। দূর হইতে ইহাকে ঠিক আসল বর্শার মত মনে হয়, এবং ইহার খোঁচা

খাইয়া মহিবও বেগ উত্তেজিত হইয়া উঠে। যুদ্ধ যেমন হইবার তেমনই হয়। কেবল হয় না অনর্থক রক্তপাত। যুদ্ধের শেষে মহিবকে একটা কটক দিয়া আনরের বাহিরা তাড়াইয়া দেওয়া হয়। দর্শকগণ ইহাতে পুরা মাত্রায় আনন্দ পায়। ঘরে ফিরিবার সময় তাহার তাহাদের ক্রান্ত মনে বীভৎস লাল রক্তের ছোপ লইয়া যায় না। অথচ মহিব-যুদ্ধের আনন্দটুকু তাহারা বেগ ভাল করিয়া ভোগ করিয়া যায়।

চলন্ত গির্জা—

হারিসবার্গের জন ফুটন এক চলন্ত গির্জা নির্মাণ করিয়াছেন। যে-সব লোক গির্জায় আসিবার সময় পায় না, সারা দিন নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে, অথবা আসিবার ইচ্ছা থাকিলেও কাছাকাছি গির্জা পায় না, তাহাদের দুয়ারে দুয়ারে এই গির্জা ঘুরিয়া বেড়াইবে। এক-ধানা প্রকাণ্ড মোটর গাড়ীর উপর এই গির্জা। গাড়ীর সামনের দিকে পাদ্রী মহাশয়ের থাকিবার ঘর এবং পিছনের দিকে ছোট একটা বেদী। এই বেদী হইতে পাদ্রী মহাশয় উপাসনা করেন। অবিধা-মত স্থানে এই চলন্ত গির্জা ধামানো হয়। আশেপাশের লোকেরা এবং মোটরপ্রমণকারীরা এই গির্জাতে আসিয়া যোগদান করেন।

কাঠের তৈরী হুবহু মানুষ-মূর্তি—

আমেরিকার স্তান ফ্রান্সিস্কোর নোকেরা জাপানী মিস্ত্রি হামানউমা মাসাকুচির তৈরী একটা কাঠের মূর্তি দেখে অবাক হয়ে গেছে। এই মূর্তিটি ওস্তাদের নিজের চেহারার প্রতিবিম্ব বলে মনে হয়। কোথাও



মানসাকুটির স্বহস্তে তৈরী নিজের মূর্তি।

মানসাকুটি খুঁত নেই। বড় আয়নার সামনে ঝাঁড়িয়ে শিল্পী ছোট ছোট কার্ভের টুকরা শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের সমান মাপে কেটেছিলেন। এই রকম কবে দুই শতেরও বেশী কার্ভের টুকরা তাঁকে কাটতে হয়েছে। তাবপর সেগুলিকে শিরির আঠা এবং কার্ভের পৌঞ্জের সাহায্যে খাপে খাপে বসানো হয়েছে। সব টুকরাগুলিকে বসানো হলে পর ওস্তাদ মূর্তিটিতে মানুষের গায়েব বঙের মত রঙ লাগিয়েছেন। বং লাগানোরও বাহাদুরী আছে, কাবণ মানুষের শরীরের বঙের সঙ্গে তার কোথাও বিন্দুমাত্র অমিল নেই। কার্ভের মূর্তির গায়ে নকল লোমকূপ আছে এবং তাতে শিল্পীর নিজের শরীরের লোম বসানো হয়েছে। ওস্তাদ চোখ দুটি কাঁচ দিয়ে তৈরী করেছেন। তাঁর নিজের মাথাব চুল কেটে তার মাথাব লাগিয়েছেন। এত বড় ওস্তাদেব এই কাজটি কবতে লেগেছে তিন বছর। মানসাকুটি হাতিব দাঁতের কাজেও খুব পাকা।

ফাউন্টেন পেন সাফ করা—

কিছুদিন ব্যবহার করার পব দেখা যায় যে ফাউন্টেন পেন আঁব ভাল কাজ দিতেছে না। তাহার মুখ দিয়া কালি পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে বন্ধ হইয়া যায়, আঁবার মধ্যে মধ্যে একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। এই বন্ধ হইবার একমাত্র কারণ, কলমের ভিতরে কালি জমিয়া প্রায় দানা দানা হইয়া যায়। এইসময় কালির দানা কালি পড়িবার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। এই দানাগুলিকে কলম হইতে

রাহির করিয়া দিলে কলম আবার বেশ ভাল কাজ দিবে। কলম সাফ করিতে হইলে কলমের মধ্যে গরম জল ভরিতে হইবে। তারপর ধোঁমসিটাবের পানি নামাইবার মত কলমটাকে বেশ জোর করিয়া ধরিয়া হাত একেবারে মাথার উপর তুলিতে হইবে, তারপর খুব জোর ঝাঁকানি দিয়া হাত একেবারে নীচে নামাইতে হইবে। এইরকম কয়েকবার করিলেই কলম বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইবে। “সেল্ফ-ক্লিয়ার” কলমে ঝাঁকানি না দিলেও চলে। কারণ এই সব কলমের মধ্যেব জলকে এমননি তাহার মুখ দিয়া খুব জোরে বাহির করা যাইতে পারে।

হেমন্ত

প্রবঙ্গ বাতাসে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ লইয়া যা বার কোশল—

সমান পরিমাণ গন্ধক ও সমুদ্রকেনা মিশাইয়া ধানিকটা তুলিতে মাখাইয়া সলিতা প্রস্তুত করিবেন। ঐ সলিতা তিল-তৈলযুক্ত প্রদীপে জালিয়া প্রবল বাতাসের মধ্য দিয়া লইয়া গেলেও নিভিবে না।

পৃথিবীতে কত চরকা আছে—

পৃথিবীতে সর্বসমেত ১৫ কোটি ২০ লক্ষ চরকা আছে। তন্মধ্যে ঐটে ব্রিটেন আছে—৫ কোটি ৬ লক্ষ—

এক বৎসর যাবৎ দুধ টাটকা রাখিবার উপায়—

প্রথমতঃ দুধের জল মারিয়া তাহাব সহিত কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইবেন। তারপর উহা কোন পাত্রের মধ্যে রাখিয়া তাহার মুখ একপাভাবে বন্ধ করিবেন যে, উহাতে বায়ু প্রবেশ কবিতে না পারে। এইরূপ করিলে ঐ দুধ একবৎসর পর্যন্ত টাটকা থাকিবে।

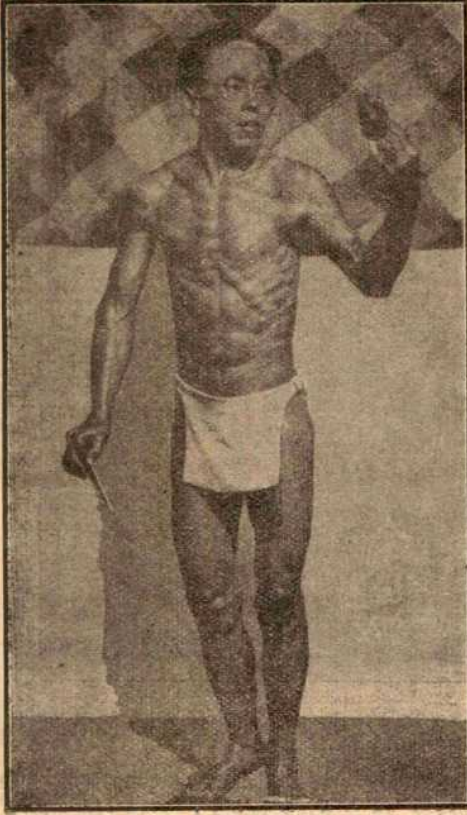
কখন পুরুষ, কখন স্ত্রী—

শুষ্টি বা কিছুক বধন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার পুরুষ থাকে। কিন্তু কিছুদিন পবে তাহার স্ত্রীতে পরিণত হয়। শুষ্টি-স্ত্রীবে এই পরিবর্তন যে মাত্র একবার হয় তাহা নহে। মাইমাউথের সামুদ্রিক-স্ত্রী-বিষয়ক পরীক্ষাগারে দেখা গিয়াছে যে, ২৭ দিনের মধ্যে একটি ঋতুক দশলক্ষ সন্তানের জননী হইয়া আবার পুরুষে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীমৎপ্রচন্দ্র ভট্টশালী

রাত্রিকালে হৃদযন্ত্রের কার্য—

রাত্রিকালে শয়নকালীন আমর চাদর বা অন্ত কোন প্রকার প্রাণাবরণ পায়ে দিই। চাদর প্রভৃতি গায়ে দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমরা নিশ্চয়ই উত্তর দিব শীত অনুভব করিলে শরীরকে গরম করিতে উহা ব্যবহার করা হয়। এখন জিজ্ঞাস্য আমবা শীত অনুভব করি কি জন্ত ? তার সহজ উত্তর এই যেওরা যাইতে পারে—রাত্রিতে নিদ্রাকালীন হৃদযন্ত্রের স্পন্দন বা সাদা (Beat) জাগ্রতাবস্থা অপেক্ষা প্রতিনিয়তই



মাসাকুচির স্বহস্তে তৈরী নিজের মূর্তি ।

সামান্যও খুঁত নেই। বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শিল্পী ছোট ছোট কাঠের টুকরা শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের সমান মাপে কেটেছিলেন। এই রকম করে দুই শতেরও বেশী কাঠের টুকরা তাঁকে কাটতে হয়েছে। তারপর সেগুলিকে শিরিষ আঠা এবং কাঠের গোঁজের মাহাঘ্যে খাপে খাপে বসানো হয়েছে। সব টুকরাগুলিকে বসানো হলে পর ওস্তাদ মূর্তিটিতে মানুষের গায়ের রঙের মত রঙ লাগিয়েছেন। রং লাগানোরও বাহাদুরী আছে, কারণ মানুষের শরীরের রঙের সঙ্গে তার কোথাও বিন্দুমাত্র অমিল নেই। কাঠের মূর্তির গায়ে নকল লোমকূপ আছে এবং তাতে শিল্পীর নিজের শরীরের লোম বসানো হয়েছে। ওস্তাদ চোখ দুটি কাঁচ দিয়ে তৈরী করেছেন। তাঁর নিজের মাথার চুল কেটে তার মাথায় লাগিয়েছেন। এত বড় ওস্তাদের এই কাজটি করতে লেগেছে তিন বছর। মাসাকুচি হাতির দাঁতের কাজেও খুব পাকা।

ফাউন্টেন পেন সাফ করা —

কিছুদিন ব্যবহার করার পর দেখা যায় যে ফাউন্টেন পেন আর ভাল কাজ দিতেছে না। তাহার মুখ দিয়া কালি পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে বন্ধ হইয়া যায়, আবার মধ্যে মধ্যে একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। এই রকম হইবার একমাত্র কারণ, কলমের ভিতরে কালি জমিয়া প্রায় দানা দানা হইয়া যায়। এইসমস্ত কালির দানা কালি পড়িবার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। এই দানাগুলিকে কলম হইতে

বাহির করিয়া দিলে কলম আবার বেশ ভাল কাজ দিবে। কলম সাবু করিতে হইলে কলমের মধ্যে গরম জল ভরিতে হইবে। তারপর থার্মোমিটারের পারা নামাইবার মত কলমটাকে বেশ জোর করিয়া ধরিয়া হাত একেবারে মাথার উপর তুলিতে হইবে, তারপর খুব জোর ঝাঁকানি দিয়া হাত একেবারে নীচে নামাইতে হইবে। এইরকম কয়েকবার করিলেই কলম বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইবে। “সেল্ফ-ফিলার” কলমে ঝাঁকানি না দিলেও চলে। কারণ এই সব কলমের মধ্যে জলকে এমনই তাহার মুখ দিয়া খুব জোরে বাহির করা যাইতে পারে।

হেমন্ত

প্রবল বাতাসে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ লইয়া যা বার কোশল—

সমান পরিমাণ গন্ধক ও সমুদ্রফেনা মিশাইয়া পানিকটী তুলিতে মাথাইয়া সলিতা প্রস্তুত করিবেন। এই সলিতা তিন-তৈলযুক্ত প্রদীপে জ্বালিয়া প্রবল বাতাসের মধ্য দিয়া লইয়া গেলেও নিভিবে না।

পৃথিবীতে কত চরুকা আছে—

পৃথিবীতে সর্বসমেত ১৫ কোটি ২০ লক্ষ চরুকা আছে। তন্মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনে আছে—৫ কোটি ৬ লক্ষ।

এক বৎসর যাবৎ ছুফ্ফ টাটকা রাখিবার উপায়—

প্রথমতঃ ছুফ্ফের জল মারিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইবেন। তারপর উহা কোন পাত্রের মধ্যে রাখিয়া তাহার মুখ এতদূর ভাবে বন্ধ করিবেন যে, উহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। এইরূপ করিলে এই ছুফ্ফ একবৎসর পর্যন্ত টাটকা থাকিবে।

কখন পুরুষ, কখন স্ত্রী—

শুভি বা ঝিনুক যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার পুরুষ থাকে। কিন্তু কিছুদিন পরে তাহার স্ত্রীতে পরিণত হয়। শুভি-জীবনে এই পরিবর্তন যে মাত্র একবার হয় তাহা নহে। প্রাইমাউথের সামুদ্রিক-জীব-বিবয়ক পরীক্ষাগারে দেখা গিয়াছে যে, ২৭ দিনের মধ্যে একটি ঝিনুক দশলক্ষ সন্তানের জননী হইয়া আবার পুরুষে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীমৎশ্রী চন্দ্র ভট্টশালী

রাত্রিকালে হৃদযন্ত্রের কার্য—

রাত্রিকালে শয়নকালীন আমরা চাদর বা অল্প কোন প্রকার গাত্রাবরণ গায়ে দিই। চাদর প্রভৃতি গায়ে দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমরা নিশ্চয়ই উত্তর দিব শীত অনুভব করিলে শরীরকে গরম করিতে উহা ব্যবহার করা হয়। এখন জিজ্ঞাস্য আমরা শীত অনুভব করি কি জন্ম? তার সহজ উত্তর এই দেওয়া যাইতে পারে—রাত্রিতে নিদ্রাকালীন হৃদযন্ত্রের স্পন্দন বা মাড়া (Beat) জাগ্রতাবস্থা অপেক্ষা প্রতিনিয়তই

১০ বার কম পাওয়া যায় অর্থাৎ স্পন্দন বা সাড়া ঘণ্টায় ৬০০ বার কম হয়। সাধারণতঃ মানুষ ৮ ঘণ্টা নিদ্রা যায়; ঐ ৮ ঘণ্টায় রুদ্রবস্ত্রের স্পন্দন বা সাড়া ৫ হাজার বার কম হয়। ডাক্তারদের মতে প্রতিবার স্পন্দনে বা সাড়ায় ৬ আউন্স রক্ত উত্তোলিত হয়। শিরাসমূহে প্রবাহিত হয়। এখন দেখা গেল ৮ ঘণ্টার নিদ্রার ফলে দিনের বেলা অপেক্ষা ৩০ হাজার আউন্স কম রক্ত উত্তোলিত হয়। শিরাসমূহে চলাচল করে। শরীরের স্বাভাবিক উষ্ণতা রুদ্রবস্ত্রের এই রক্ত-প্রবাহের উপর নির্ভর করে, ও নিদ্রাকালীন এই কম রক্ত চলাচলের জন্য শরীরের স্বাভাবিক উষ্ণতা কমিয়া যায়। এইজন্য আমরা শীত অনুভব করি। রাত্রিকালেই আমাদের প্রকৃতি-নির্দিষ্ট নিদ্রার সময়। সেইজন্য রাত্রিকালে শীত আমরা বেশী অনুভব করি ও তাহা নিবারণার্থ গাভীর গা বান্ধা ব্যবহার করিয়া থাকি।

সমুদ্রের গভীরতা ও আয়তন—

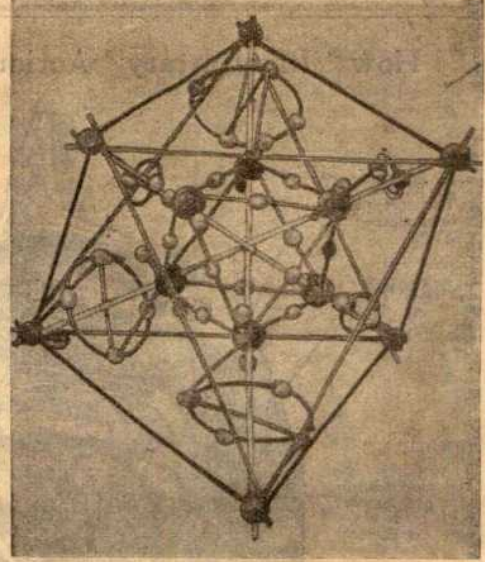
সমুদ্রের গভীরতা ও আয়তন কত বিশাল তাহা আমরা ধারণায় আনিতে পারি না। নীচে মহাসাগরগুলি আনুমানিক কত-মাইল-বাপী স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের গভীরতা প্রভৃতি দেখান হইল। প্রশান্ত মহাসাগর ৬ কোটি ৮০ লক্ষ; আটলান্টিক মহাসাগর ৩ কোটি; ভারত মহাসাগর আর্কটিক ও আন্টার্কটিক মহাসাগর একত্রে ৪ কোটি ২০ লক্ষ; মাইল স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

একমাইল লম্বা একমাইল চওড়া ও একমাইল গভীর এরূপ একটি চৌবাচ্চা ৪৪০ বৎসর ধরিয়া প্রত্যহ পূর্ণ করিলে তবে প্রশান্ত মহাসাগরের জলরাশি মাপিয়া নিশ্চেষ্ট করিতে পারা যাইবে। প্রশান্ত মহাসাগরের জলরাশির আনুমানিক ওজন হচ্ছে ৯৪৮..... কোটি টন। আটলান্টিক মহাসাগরের গভীরতা অধিকাংশ স্থানেই প্রায় ৩ মাইল ও উহার ওজন ৩২৫..... কোটি টন। আটলান্টিক মহাসাগরের জলরাশি পূর্ণ করিতে ৪৩০ মাইল চৌকা একটি চৌবাচ্চার প্রয়োজন। অপর তিনটি মহাসাগরের আয়তন ও গভীরতা, প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগর অপেক্ষা অনেক কম। সমস্ত পৃথিবীর সাগর ও উপসাগরগুলি জলপূর্ণ করিতে ১০০০ মাইল চৌকা একটি চৌবাচ্চার দরকার।

অলক

অগুর গঠন—

রেডিয়াম আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা মনে করিতেন বস্তুর সূক্ষ্মতম অস্তিত্ব হইতেছে একটি অণু। সম্প্রতি বস্তুবিজ্ঞানসমিতিতে একটি অণুর ২৫ কোটি গুণ বৃদ্ধিতায়তন একটি নকল তৈরি করিয়া দেখানো হয়; সেই নকলটি মাত্র ৯ ইঞ্চি মোটা একটি কেলোশ বা দানা; ক্ষুদ্রতরং একটি অণুর আকার ৯ ইঞ্চি মোটা একটা মিছরি বা ফুটকিরির দানার ২৫ কোটি ভাগের এক ভাগ। একটি অণু কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি; এই নকল অণুতে সেই পরমাণুর সংস্থান বিবিধ বর্ণ ও আকারের গুটিকা-বিন্দুসে দেখানো হইয়াছে। এই-সব গুটিকার সংস্থান নৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহ সংস্থানের সমান; অন্তরীক্ষে যেমন গ্রহ-উপগ্রহ সূর্যের চারিদিকে আবর্তিত হয়, একটি অণুর অন্তরেও তেমনি পরমাণু-গুলি সর্বদা নিজ নিজ এক-একটি নির্দিষ্ট কক্ষায় আবর্তিত হইয়া থাকে।



অণুতে পরমাণু সংস্থান।

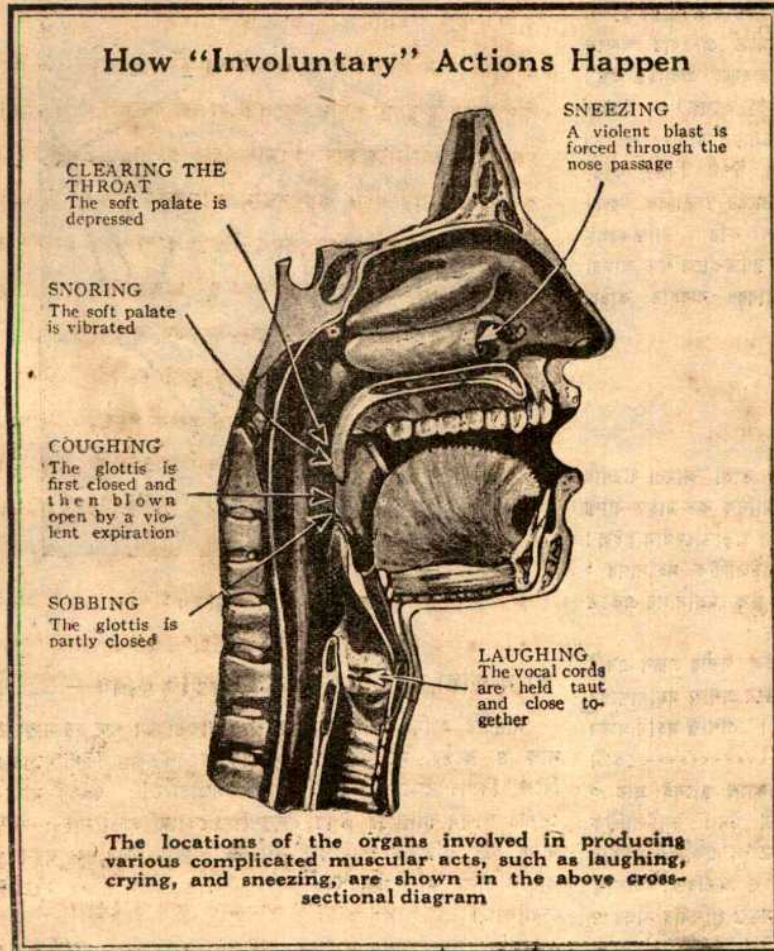
হাসি কান্না, হাঁচি কাশি, নাকডাকার কারণ—

মানুষের হাসি কান্না হাঁচি কাশি ও নাকডাকার শব্দ হয় মানুষের নাক ও কণ্ঠের মধ্যকার বিশেষ বিশেষ কতকগুলি মাংসপেশীর বিশেষ বিশেষ রকমের স্পন্দন আকৃষ্টন সম্প্রসারণে; এইসব মাংস-পেশীর স্পন্দন-ব্যাপারের উপর ইচ্ছাশক্তির কোনো হাত নাই; তাই মানুষ ইচ্ছা করিলেই হাসি-কান্না-হাঁচি-কাশি-নাকডাকার শব্দ অনুকরণ করিতে পারে না—ওস্তাদ হরবোলার নকলও মেকি বলিয়া সহজেই চেনা যায়।

হাসির ভাব অন্তরে উপস্থিত হইলেই কণ্ঠনালীর মধ্যে কণ্ঠার কাছে বাক্তরী খুব টান হইয়া কথিয়া যায়, এবং ক্রমান্বয়ে অল্প অল্প প্রথাসের ধাক্কায় সেই তরী থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া বাজিয়া হাসির ধ্বনি সৃষ্টি করে; প্রাণখোলা দরাজ হাসির সময় বাক্তরী-বাচ্ছ ছাড়া কণ্ঠনালীর পেশীর (larynx ও pharynx) স্পন্দন হইয়া থাকে।

কান্নার সময় কণ্ঠনালীর মুখের ঢাকনি (glottis) আববোজা হয়, এবং ব্রূষ অথচ জোরালো নিশ্বাস ভিতরে টানিয়া দীর্ঘপ্রশ্বাস ত্যাগ করা হয়, এবং তাতেই কান্নার ধ্বনি উঠে; কান্না যদি অধিকক্ষণ চলে তবে পেটের মধ্যকার আবরক পর্দা (diaphragm) অকস্মাৎ আকস্মে স্পন্দিত হয় এবং ফুসফুসে ক্রমান্বয়ে একবার চাপ পড়ে ও চাপ আরা হয়, এবং তার ফলে নিশ্বাস-প্রশ্বাস দমকে দমকে বাওয়া-আসা করিতে থাকে, আর এই ব্যাপারকে আমরা বলি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ফুলে ফুলে কান্না। কান্নার সময় কণ্ঠপেশীর স্পন্দনে অশ্রু-গ্রন্থিগুলি উত্তেজিত হইয়া অশ্রু মোচন করিতে থাকে।

কাশির সময় গভীর নিশ্বাসের টানে কণ্ঠনালীর ঢাকনি আববোজা হয় আর তারপর জোরে প্রথাসের ধাক্কা সেই ঢাকনিতে গিয়া লাগে, সেই ধাক্কায় কণ্ঠঢাকনি হঠাৎ খুলিয়া যায়, কাশির শব্দ হয় এবং কণ্ঠনালীর মধ্যে আগন্তুক উত্তেজক বস্তু গ্লেম্মার সঙ্গে ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া যায়।



হাসি কান্না, হাঁচি কাশি, নাকডকার উৎপত্তি।

গলা-খাঁখারি দিবার সময় ফুন্-ফুন্ হইতে খানিকটা বাতাস জোরে বাহির হইয়া আসে, জিহ্বার মূলের উপর তালু-মূল (soft palate) অবনত হইয়া কণ্ঠদ্বার প্রায় বন্ধ করে, 'এবং সেই প্রবাহের কণ্ঠনির্গমে শব্দ হয়।

হাঁচির সময় দীর্ঘনিশ্বাস 'ক্রত' তানিয়া হঠাৎ তাহা নাসাপথে পিচ্-কারি দিয়া বাহির হওয়াতে হ্যাঁচ্ছো শব্দ উৎপন্ন করে। কণ্ঠনালীর ঢাকুনিটা হাঁচির সময় খোলা থাকে।

ঘূমের সময় যদি মুখ দিয়া নিশ্বাস লওয়া ও ফেলা যায়, তবে লম্বিত তালু-মূল (soft palate) ও জিহ্বা-ব্রহ্মাগত কম্পিত হইয়া বড়বড় শব্দ উৎপন্ন করে।

হেঁচকির কারণ পেটের আবরক পর্দা (diaphragm) নিশ্বাসের ঠেলায় কুঞ্চিত হইতে হইতে হঠাৎ কণ্ঠ-ঢাকুনি (glottis) বন্ধ হওয়াতে ছাড়া পায়—যেন ফুটবলের ব্লাডারে বাতাস ভরিতে ভরিতে হঠাৎ ছাড়িয়া দেওয়া হইল,—আর অমনি কণ্ঠ হইতে হেঁচক হেঁচক শব্দ নির্গত হয়।

এইসব ব্যাপার এতগুলি বিভিন্ন যন্ত্রের কার্যের উপর নির্ভর করে যে ইচ্ছা করিলেই এসব ব্যাপারের শব্দ অনুকরণ করা যায় না; সেইজন্য ভদ্রতারক্ষার হাসির নাম কাণ্ডহাসি, অসত্য কান্নার নাম মায়াকান্না, চেষ্টাকৃত নাসিকাগর্জনের নাম জেগে ঘুমানো।

বিজ্ঞান-ভিক্ষু

বুদ্ধার বৈধব্য

বারেক শোনো ওগো আমার গোপন হিয়ার কথা,—
এ অভাগীর জীবন-শেষের জমাটবাধা ব্যথা।
আজ নিমেষেই দীর্ঘ আমার অতীত জীবনখানি—
মূর্ত্ত হয়ে উঠছে স্মৃতির লাথ ছুরিকা হানি'।

নিমেষ আজি লক্ষ যুগের বার্তা লয়ে' ফেরে;
অতীত-জীবন-তোরণ খোলা, বাধ্বে কেবা এরে?
জীবন-ব্যাপী কাজ-অকাজের উঠছে ছবি ফুটি';—
নাও গো দেখে, এর পরে যে নিতেই হবে ছুটি!

চলা তোমার থামবে না যে—সে কথা তো জানা,
জন্ম-যবনিকার তলে পাঁড়াও, শোনো মানা।

পড়ছে মনে কোন্ ফাগুনের কোন্ চাঁদিনী রাতে;
আমার এ হাঁত মিলিয়েছিলাম তোমার কিশোর হাতে!
বাঁশুর-রাতের আলোয় ঘেরা সেই ঘে মিলন-মেলা—
এখনো তার দীপ্তিটুকু মনেই করে থেলে।
কিশোর গুণো! শঙ্কাঘেরা সেই নিমেষের দেখা,
নারী-প্রাণের কোমল পাতায় আঁকল অমর রেখা।
দীর্ঘ আমার অতীত জীবন কাটল তারিধ্যানে,
তুলব না তো, তুলতে পারি জীবন-অবসানে?

পড়ছে মনে তোমায় আমার ঘর-কম্বার দিনে,
চলত না তো একটি তিলও কারুর কাউকে বিনে।
আঁকল দুটি তরুণ-প্রাণের মিলন-অভিলাষ,
নিবিড় করেই ধাঁধুত হয়ে-অটুট বারো মাস।
আদর সোহাগ ছাপিয়ে উঠে ভাসিয়ে দিত ছুয়ে;—
পার্ব দিতে মন থেকে তার স্মৃতিটুকু ধুয়ে?
কথায় কথায় চলত দুয়ের অকারণের আড়ি;
কথায় কথায় লোক-দেখানো ছাড়াছাড়ি।
একটুখানি অস্থখ হলে ভাসিয়ে দিতাম কেঁদে;
আমার বেলায় রাত জেগে যে রাখতে বুকে বেঁধে।
পড়ছে মনে শচীন তখন বছর তিনের ছেলে,
যাচ্ছিলে সেই কোন্ বিদেশে আমায় একা ফেলে;
কেঁদেই আঁকুল, হলো না আর যাওয়া বিদেশমুখী,
কেঁপিয়েছিলে আমায় বলে, 'নেহাং কচি খুকী'।

আজকে মনে অতীত দিনের অনেক কথাই উঠে;
বলব কত?—বলতে ভাষা কঠে কি আর ফুটে?
একটি পলের সোহাগঢালা একটুখানি কথা,
কোন্ ক্ষণিকের প্রথমমাখা হাসির চপলতা;

একটি ছুটি ছোটখাটো প্রেমের অভিন্ন,
নিবিড় হয়ে, বিরাট হয়ে জাগছে পরাণময়।

জাগছে মনে ঘরকম্বার শতক-রকম ছবি;—
বীণার বিয়ে হতে শচীর বিলৈত যাওয়া, সবি।
গৃহ-রাজ্যে বানিয়েছিলে আমায় যেচে রাণী;
করার যা মোর হয়ত করা হয়নি অনেকখানি।
কিন্তু তোমার উৎসাহময় সরব-নীরব ভাষা—
জানিয়ে দিত পেয়েছি রে করিনি যা আশা।
আমার অল্পমতির আশায় জন্মত কাজের রাশি;
'কিই বা জানি' বলতে তুমি একটু চপল হাসি।
যাক সে কথা-তুলব না আর মনেই মরুক যুগে,
কাজ কি তাহায় বাইরে এনে কালের পাহাড়ি শুড়ে?

বুড়ো হলাম, ভাবতাম দুয়ে কখন বা অজানা,
কার কপালে জুটবে এসে পারের পরোয়ানা।
কার আগে কে ঘমড়ার কবু-করাঘাত,
সেই ভাবনায় কাঁটত অনেক নীরর-নিরুন্ন রাত।
হঠাৎ দেখি মূলে আঁধি, ভাঙল চমক মোর;
বুঝলাম একাই কবুতে হবে জীবন-আমার ভোর।
পেরিয়ে এলাম দুজনাতে দীর্ঘ পথের রেখা;
জীবনের এই সন্ধ্যাকালে সজিনী হয়ে একা!
দীর্ঘ জীবন-সাথী গুণো! জীবনের শেষ তীরে—
সঙ্গী হারা চেয়ে দেখি মরণ আসে ঘিরে।
মৃত্যু-সাগর-উর্ধ্ব মাঝে ডুবতে একা ভয়;
আজ আমি কেই বা মোরে লঙ্ক করে' লয়?
দীর্ঘ পথের সঙ্গী গুণো! খেয়ার ঘাটে সাঁঝে,
হঠাৎ মোদের ছাড়াছাড়ি বিদায়-বিলাপ মাঝে।
পথ তো আমার সাজ হল, সন্ধ্যা নেমে আসে;
মরণ-পারে চলব যবে, চলবে কি মোর পাশে?

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়

জাতীয় শিক্ষা

জাতীয় শিক্ষা বলিয়া একটা রব উঠিয়াছে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষার অর্থ কি? ইহা কি আরণ্যক কবির আশ্রম, না ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর বিহারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা? ইহা কি সিন্দুর-চর্চিত গ্রাম্য-বটবৃক্ষের উদ্বোধন-না গিরিগহ্বরের অন্ধকারের আবাহন? এ শিক্ষা কি অন্ধের মৌখিক উচ্চারণ, পরম্পরাগত বাক্যের শ্রবণ ও শ্রবণ এবং অলস শাস্ত্র ও গুরু চরণে আত্মনিবেদন?

প্রাচীনের এক প্রতীতি: সম্ভব নয়। সম্ভব হইলেও সমন্বয়যোগী হইবে না। চেষ্টা বিফল হইবে। যুগোপযোগী করিয়া নিজেকে গড়িয়া তোলাই ভারতের বিশেষ প্রকৃতি। তাঁহা কপালে অসামঞ্জস্য লেখা নাই। ভারত যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়া নূতনের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া চলিয়াছেন, যুগে যুগে নব কলেবর লাভ করিয়াছেন। পারসিক-কি গ্রীক, সেমেটিক কি সিদিয়ান, তুর্কী কি খুস্তান, যুগে যুগে যিনি হিমাদ্রিক্রীট মহাসিদ্ধবিদ্যোত এই মহাদেশে আসিয়া বসবাস স্থাপন করিয়াছেন তাঁহাকেই এই প্রকৃতি মন্থমুগ্ধ করিয়াছে। স্বরণাতীতকাল হইতে ভারতে যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে, সময়ে উপর তাহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। আরম্ভ হইয়াছিল কোন্-প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোন্ গোত্রের মানুষ লইয়া তার ত কোন্ ঝোঁকই নাই। সে আদিমানবের পদচিহ্ন আজও আমরা বক্ষে ধারণ করিতেছি। তারপর কোলারীয়-ক্রাবিড়ীয়,—তাও ত বিশ্বতির গর্ভে। আর আজ-কালকার খুস্তান মুসলমান—এসকল লইয়া সময়ে আজও চলিতেছে। এই সময়ের মধ্যে বাহ্যপ্রকৃতি মানবপ্রকৃতির আলিঙ্গন-পাশে বন্ধ—এই বিশেষ-যেখানে প্রাণের সাড়া আছে—মানবপ্রাণ মস্তক নত করিয়া তাহারই সঙ্গে আত্মীয়তাস্বপ্নে আবদ্ধ হইয়াছে এবং ব্যক্তি সমষ্টিগত জ্ঞান হইতেই আপনকার পরিপূর্তির মালমসলা সংগ্রহ করিয়া সঞ্জীবিত হইয়াছে। ভারতের এই বিশেষ প্রকৃতি হইতে যে রাজপুত্র ও ফকীরের পুজকে সমান পদবীশে দাঁড়াইতে শিক্ষার উৎস উৎসারিত হইয়াছিল তাহা প্রাচীন গ্রীসের বা নব্য যুরোপের শিক্ষাপ্রণালী হইতে কোন অংশেই হীন নহে। ভারতীয় শিক্ষার নিজস্ব উপাদানের মধ্যে বিশেষ

ভাবে উল্লেখযোগ্য—(১) বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা। বিস্তীর্ণ বটবৃক্ষতলে গুরুশিষ্য-সমাগম শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রায় সমস্ত টাকার্টা হৃদয়নির্মাণে ব্যয় করিবার স্বযোগ-না থাকার ফলস্বরূপ। ইট-পাটকেলের পিছরে আবদ্ধ জীবন অপেক্ষা গণপুঞ্জী বৃক্ষতলার সঙ্গে সহানুভূতিস্বপ্নে আবদ্ধ জীবন কত উচ্চ, কত সুন্দর। (২) অতি বাল্যেই পারিবারিক জীবনের স্ফীর্ণ গভীর বাহিরে আসিয়া গুরুগৃহের-বিস্তৃততর পরিবারের অঙ্গীভূত হইয়া বহিঃগর্তের দশজনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়ার অধিকার। এক কথায় Citizen হইবার যোগ্যতালাভ। (৩) সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সকল আকর্ষণ হইতে দূরে থাকিয়া জ্ঞানাত্মীলনের স্ফীর্ণ অবসর। এবং (৪) সর্বোপরি ব্রহ্মচর্যের নিয়মাসূচরণ। কেবল পুণ্ড্রিগত বিজ্ঞান নয়, কিন্তু যাহা স্বীকার করিয়া কার্যগত জীবনে তাহা পালন।

চরিত্রগঠন না হইলে, কোন শিক্ষাই শিক্ষা নয় এবং যাহা শিখিলাম তাহা কার্যে পরিণত করিবার অভ্যাস না হইলে চরিত্রও গঠিত হইল না। যাহা শুভ তাহার আচরণের নাম অভ্যাস এবং যাহা শুভ তাহা হইতে নিবৃত্তির নাম বৈরাগ্য—এই দুই চরিত্রগঠনের প্রধান সাধন। চরিত্র গঠনে প্রাচীন ভারতের ছাত্রজীবনের ত্রিভুজ—পবিত্রতাব্রত, দারিদ্র্যব্রত, ও অমত্রভ—অবশ্য গ্রহণীয় ও অমুচ্যেয়। কামনোবাক্যের সংযম বা চিত্তচাক্ষুস ও ভোগাসক্তি পরিত্যাগই পবিত্রতার একমাত্র সাধন ছিল তাহা নহে, প্রাণপণে সত্যাসূচরণ ছিল ইহার প্রধান অঙ্গ। যে সময়ে অর্থোপার্জনই বিজ্ঞার্থীর চরম লক্ষ্য, দারিদ্র্যব্রতের প্রয়োজনীয়তা সে সময়ে কত তা বলাই বাহুল্য। অর্থগৃহুতা ও অর্থলালসা পরিহার করিতে হইত এমনভাবে। যে অর্থব্যয়ে হইত। আজকালকার একই ছাত্রাবাসে বাস করিয়া যেমন ধনীপুত্রের এক ব্যবস্থা আর গরীবের ছেলের অল্পরূপ, সেখানে তাহা হইতে পারিত না। শারীরিক

পরিশ্রমটা 'ছোট-লোকের' কাজ বলিয়া যেসব 'ছোট-লোকের' ধারণা তাদের বিতর্কিত হইবার অধিকার ছিল না। 'দৈহিক জমির' মধ্যদা স্বীকার করিয়াই গুরুগৃহে প্রবেশ করিতে হইত। কেবল গুরু নয়, শিষ্যভ্রাতৃমণ্ডলীর সর্বপ্রকার শারীরিক সেবার ভার বহনে প্রস্তুত থাকিতে হইত। তাহাতে ধনী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিচার ছিল না। ইংলণ্ডের 'রাজপুত্রকে' যদি ইটন-স্কুলে ভর্তি হইতে হয় তবে সহাধ্যায়ী জুতা পরিকারটা অসম্মানের কাজ বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিলে চলে না। সেকালের বিতর্কিতকে কেবল গৃহনির্মাণে নয়, গৃহসম্পাদনেও রাজী হইতে হইত এবং গুরুকুলের অসম্মানের জন্য রাজপুত্রের শিক্ষায় বর্জিত হওয়া অসম্মানের কাজ ছিল না। আমরা ডিমক্রাসী ডিমক্রাসী বলিয়া চীৎকারই কেবল করিতেছি, হাতে-কলমে তার শিক্ষার ব্যবস্থা কি করিয়াছি? পরিবাবে সামাজিক জীবনে শিক্ষা-ক্ষেত্রে তো তার বিপরীত আচরণই লক্ষিত হইতেছে। যখন দেখি ছাত্রাবাসে বিভিন্নবর্ণের ছাত্রগণ আপনাদের বর্ণ-মধ্যদা রক্ষা করিতে, নিতান্ত স্থগ্য বিবাদে প্রবৃত্ত, তখন ডিমক্রাসীর সকল আশায় ছলাপুলিই দিতে হয়। জাতিভেদের প্রকোপকালেও তো ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য গুরুকুলে ভ্রাতৃত্বাবে একত্র বাস করিয়াছে। আমরা যে প্রাচীনকালে কিরিয়া যাইতে চাই, কোথায় যাইব তাহা ঠিক করিয়াছি কি?

যাহা হউক, প্রাচীন কালের শিক্ষার আদর্শ দুইভাগে বিভক্ত ছিল—ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত। ব্যক্তিগত দিকের শিক্ষা আত্মবিদ্যা—মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া দিন দিন মোক্ষপথে অগ্রসর হইবে। মানুষ জন্মমাত্র যে-সকল ক্ষণে আবদ্ধ হয় ক্ষতি-ক্ষণ তার অন্ততম। জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডারে পূর্বপুরুষদিগের সঞ্চিত যে-সকল কলা ও বিদ্যা রহিয়াছে পুরুষপরম্পরায় যে-সকল শিক্ষা ও সাধনা চলিয়া আসিতেছে, তাহা আয়ত্ত করিয়া ভবিষ্যৎ-বংশীয়দিগের জন্য সংরক্ষণ ঐ ক্ষতি-ক্ষণ শোধের পন্থা। ইহাই শিক্ষার সমষ্টিগত দিক। সমষ্টিগত জীবনে ব্যক্তির যে স্থান, শিক্ষাটা তাহার অবিচ্ছিন্ন অঙ্গরূপে নিষ্টিষ্ট হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অবশ্যগ্রহণীয়

উচ্চশিক্ষার ও পল্লীসংঘসমূহের একরূপ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ ক্রেষ্টিয় হইতে কলিকাতায় আসে নাই, মাদ্রাজ হইতেই ম্যাঞ্চেষ্টারে গিয়াছিল। শিক্ষার সর্বসাধারণের সমান অধিকার ছিল। শিক্ষা পুণ্ডিত ছিল না; বিদ্যা ও কলার সাহায্যে কার্যকরী করা হইয়াছিল।

আধুনিক টোল ও চতুষ্পাঠীতে ইহার ব্যতিচার ঘটয়াছিল বলিয়াই রাজা রামমোহন রায় ইহাদের উপর খণ্ডাহস্ত হইয়া উঠেন। তিনি যখন দেখিলেন, টোল-চতুষ্পাঠীর শিক্ষাপ্রণালী হইতে কলা ও বিদ্যা তিরোহিত হইয়াছে, আছে কেবল পরম্পরাগত অর্থশূন্য কতকগুলি বাণিজ্যের চর্চিত-চর্চণ, তখন তিনি একদিকে নূতন করিয়া Art ও Science-এর প্রতিষ্ঠা ও অন্যদিকে বোদান্তবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আত্মবিদ্যার অহুশীলন—জাতীয় শিক্ষাধারার এই দুই বিচ্ছিন্ন ও বিনষ্টপ্রায় দিক পুনরুদ্ধার করিয়া ইহার সংরক্ষণ ও ইহার সঞ্চারবীনের যোগ স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এই দুই দিকের পূর্ণ সম্মিলন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছাড়া কেবল vocational training, অর্থকরী বিদ্যা বা কার্যকরী শিক্ষার পশ্চাতে ছুটিলে যাহা বাস্তবিক স্বদেশী বস্তু, আমাদের জাতীয় শিক্ষা তাহা লাভ হইবে না। আমাদের এই যে জাতীয় শিক্ষা-বস্তু ইহার কাছে বর্তমানকালের শিক্ষামন্দির-সকলের শিথিলার অনেক রহিয়াছে। আমাদের শিক্ষাসৌধ এই জাতীয় ভিত্তির উপরই গড়িতে হইবে। বর্তমানযুগের পরিবর্তিত অবস্থার প্রয়োজন বুঝিয়া, বর্তমান জটিল সার্বভৌমিক শিক্ষার ও সাধনার দারী স্বীকার করিয়া সে ভিত্তিকে গভীরতর ও বিস্তৃততর করা যাইতে পারে। কিন্তু নির্মাণকার্য এই ভিত্তির উপরেই করিতে হইবে।

তবে, আজ যে এক জাতীয়-শিক্ষার কথা শুনিতেছি তাহা খোল-নলচে বাদ একটি ছকো। তাহা না শিক্ষা, না জাতীয়। পাছে বৈদেশিক হাওয়া ঘরে প্রবেশ করে এই ভয়ে ঘর ভাঙিয়া ফেলা। ইহা ভারতের আত্মধর্মের বিরোধী। ভারত কখনও বাহিরকে প্রত্যাখ্যান করেন নাই—যাহা সত্য, যাহা শিব, যাহা

হুন্সর তাহা সর্বত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন ও সর্বত্র বিলাইয়াছেন। কিন্তু আজ্ঞা—এ ‘কি দেখি!’ বাহাকে বলি বৈদেশিক শিক্ষা তাহারই শিক্ষাশালা হইতে জনকতক ছাত্র ভাগাইয়া লইয়া পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলাম আর নাম হইল জাতীয় বিদ্যাপীঠ। এ ঘেন নামাবলী দিয়া পেটলান গড়িয়া নাম দিলাম জাতীয় পরিচ্ছদ। উলঙ্গ হইয়া উলঙ্গ প্রকৃতির কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেই কি ভারতের এতকালকার সাধনার সিদ্ধি! শেষ কালে কি সব ছাড়িয়া হিন্দী ও চব্বাকার চর্চাই এ জাতির পিতৃ-পুরুষ পূজ্যপাদ ঋষিগণের ঋণশোধের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে? হাঃ! ঋষিগণের যুগযুগান্তের তপশ্চর্য্যার কি এই পরিণাম! ইহারই নাম ‘আমার বুদ্ধি শোন, ঘর দোর ভেঙ্গে ফেলে নটে শাক বোন।’ যদি নটে শাক বুন। এতই প্রয়োজনীয় হয় তবে ঘর দোর ভাঙিতেই হইবে এমন কি কথা আছে। যে জাতীয় শিক্ষা বিজ্ঞান যন্ত্রবিদ্যা ও বৈদেশিক সংশ্লিষ্ট পৰিত্যাগ করে, তাহা আর বাহাই হউক ভারতীয় নয় ইহা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিতে হইবে। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় বৈদেশিক যান্ত্রিক রাসায়নিক ও দাত্তবিদ্যাবিদদের জন্য যেমন উন্মুক্ত ছিল, জগতের বাজারে ভারতও অন্যান্য পণ্যের ন্যায় বিদ্যা-বাণিজ্যের আদান-প্রদানের দাবী কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। ইহারই ফলে ভারতে নীল পাকা রং ও ইস্পাতের উদ্ভব—যাহারা একদিন ভাবতমাতাকে মধ্যাশিরার কত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ভারত-মাতা যে একদিন সহস্রাধিক বর্ষ ধরিয়া প্রাচ্য-প্রতীচ্যের শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী-রূপে বিরাজ করিয়াছিলেন, জগতের জাতিসকল যে সর্ববাদিসম্মতরূপে তাহার প্রাধান্য নির্বিবাদে মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা কেবল তাঁহার জন্মের চন্দনকাষ্ঠ ও স্বগন্ধি মসলা-সম্ভার, আকরের হীরা আর

জলের মুক্তার মহিমায় নয়। তাঁর মাহুযগুণিরও কিছু কিম্বত উহার মধ্যে ছিল। স্বতরাং প্রাচীরের দিকে কেবল মুখ কিরাইলেই আমাদের সকল দুর্গতির অবসান হইবে না। আমরা যদি বাস্তব জাতীয়তা লাভ করিতে হয় তবে সেই শিক্ষা-পদ্ধতিকেই পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে যাহার অল্প রাজা রামমোহন রায় আপনার সমগ্র সাধনা নিয়োগ করিয়াছিলেন যাহার মধ্যে পরা-ও অপরা-বিদ্যা সমঞ্জসীভূত হইয়া রহিয়াছে এবং যাহার বলে এই প্রাচ্য ভূখণ্ড কোনোকণ সাম্রাজ্যপিপাসাঘরা পরিচালিত না হইয়াও সেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যাহাতে পূর্ব উপদ্বীপ হইতে পূর্ব আফ্রিকা ও দক্ষিণ যুরোপ পর্য্যন্ত এক বিশ্ব-জোড় বৈদেশিক বাণিজ্য তাহার করায়ত্ত হইয়াছিল।

যে শিক্ষা বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যাকে অহিংসার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিতে সমর্থ নয়, বিজ্ঞানের একটা বিকৃতির সঙ্গে হিংসার যোগ দেখিয়া বিজ্ঞানকেই পরিত্যাগ করিতে উদ্যত—যে শিক্ষা পার্থীর লাভালাভের সঙ্গে আধ্যাত্মিক মুক্তির পথও দেখাইবে না, তাহা ভারতের জাতীয় শিক্ষা বলিয়া কখনও অধীজনকর্তৃক গৃহীত হইবে না। সত্য বটে ভারতই প্রথমে বিজ্ঞানের সাহায্যে ধ্বংসের মন্ত্র “Damascus blade” এর রহস্য জগৎকে শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া তিনি বিশ্বমৈত্রী ও পরাশাস্তির পথও জগৎকে দেখাইয়াছেন। যে শিক্ষায় এই শান্তি, এই মৈত্রী, এই মুক্তির দ্বার খোলে, যদি সেই শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত করিতে পার, তবে জাতীয় শিক্ষার কথা বল। নতুবা বা করিতেছিলে তাই কর, পাপের বোকা বাড়াইও না।*

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরা

* মহীশূর-বিশ্ববিদ্যালয়ের তাহিস-চ্যান্সেলার পণ্ডিতবর ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ শীল মহাশয়ের কন্ঠোক্তকথন শিষ্ট অবলম্বনে লিখিত।

সুমিত্রা

সুমিত্রার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনটা এখনও বেশ মনে পড়ে। অনেককাল আগেকার কথা। সে সময়কার জীবনটা বেশীর ভাগই আপ্সা হয়ে এসেছে; বিশ্বস্তির কুয়াসা তার অনেকখানি ঢেকে কৈলেছে; দু-একটা দিন, হোটোখাটো গোটা কতক ঘটনা, এই কেবল এখনও মনোলোকে স্থম্পষ্ট আকার নিয়ে টিকে আছে।

পুজোব ছুটিতে বাড়ীস্থদ্ধ মামার বাড়ী এসেছিলাম। খুব বেশী দূর আসতে হয়নি। কলকাতার একটা পাড়া ছেড়ে আর-একটা পাড়ায় গিবে ওঠা, এই মাত্র। কিন্তু পুজোর সময় বাপের বাড়ী যাওয়ার নিয়মটা মা ভাঙতে রাজি ছিলেন না। এতকাল আমাদের বিদেশে কেটেছে, সেখান থেকে আসাটার মধ্যে বেশ একটা গোরব ছিল। মাঝে কত-শ' মাইলের ব্যবধান, বাড়ী ছেড়ে ঘোড়াব গাড়ীতে ওঠা, তার থেকে ট্রেন, ট্রেন থেকে নেমে আবার ঘোড়ার গাড়ী, তারপর মামার বাড়ী। তার তুলনায় এই ছোটো বড় রাস্তা আর সঙ্কীর্ণ তিনটে গলির দূরত্ব অত্যন্তই নগণ্য লাগছিল, কিন্তু গিবে পৌছবার পর আনন্দটা সেজন্তে কিছু কম হল না।

তখন সেকেণ্ড ক্লাশ ছেড়ে এন্ট্রান্স ক্লাশে উঠবার উপক্রম করছি। এন্ট্রান্স ক্লাশ বে ম্যাট্রীকুলেশন ক্লাশ নয়, এ কথা মনে বেখে আশা কবি কেউ আমার মামার বাড়ী যাওয়ার আনন্দটাকে অসহ্য স্ত্রাকামি মনে করবেন না;—তখন আমার বয়স মাত্র তেরো বৎসর।

বিকেলের দিকে বেড়াতে যাবাব ইচ্ছায় দোতলা ছেড়ে একতলায় নামছিলাম। রান্নাঘরের সামনের বারাণ্ডায় তখন একটা রীতিমত সভা বসে গিবেছে। দিদিমা তরকারি কুটতে বসেছেন, চাবপাশে তাঁর নাতি-নাতনীর দল। কড়াইখুঁটি ছাড়াবার ছুতোয় কেউ খেতে ব্যস্ত আছে, কেউ তার অনাচারটা কর্তৃপক্ষের গোচবে এনে পুণ্য-অর্জনের বৃথা চেষ্টা করছে, কেউ বা ছোট ভাই-বোনকে চিম্টি কেটে বা চুল ধরে' টেনে নিজের চিত্ত-বিনোদন করছে।

এ দৃশ্যটা কিছু নতুন নয়, এবং মাহুষগুলিও কেউই অপরিচিত নয়; কাজেই এখানে দাঁড়াবার কারণ এখানে না খুঁজে, অন্য কোনো দিকে খুঁজতে হয়।

আমি নামতেই আমার বড়মামী চৈটিয়ে বল্লেন, “বীক, দে-না ওদের দুটোকে ছাড়িয়ে, গেল যে!”

বারাণ্ডারই একেবারে শেষ প্রান্তে যে একটা মল্লযুদ্ধ চলছে তা এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। মামীর কথার ঘোঁস্কা ছুটির মাঝখানে পড়ে তাদের ছাড়াতে গেলাম। আমার এই শাস্তিস্থাপনের সাধু চেষ্টার প্রথম ফল হল এই যে দুজনেব কিল চড় আঁচড় কামড় সব-কটা আমার গায়ে এসে পড়ল। মিনিট পাঁচ-ছয় বেন আমার উপর দিয়ে একটা ঘূর্ণী বায়ু বয়ে গেল। তিন ছোড়া হাত-পা এমন লক্ষ্যহীন নিরপেক্ষ ভাবে চালিত হতে লাগল, যে, তার শেষ পরিণাম খুবই শোচনীয় হতে পারত, যদি না বাইরের থেকে আরো সাহায্যকারী দেখা দিতেন। তিনজনে যখন তিন জায়গায় দাঁড়ালাম, তখন আমার মাথা এবং মুখ জালা করছে, কোটের দুটো বোতাম ছিঁড়ে গিয়েছে এবং বাকি পোষাক-পরিচ্ছদের সৌষ্ঠবও অমান নেই।

আর দুটি মাহুষের মধ্যে যেটি আমার ভাই, তিনি আমার সামনেই ছই-চোখ-ভবা জল আর মুখ-ভরা তীক্ষ্ণ আক্রমণের চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। একটু পাশের দিকে একটা সাত-আট বছরের মেয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে হাঁপাচ্ছে। তার কাপড়খানা ধুলোয় প্রায় গৈরিক হয়ে উঠেছে, মাথার চুলের কাল রঙও অনেকখানি চাপা পড়ে গিয়েছে। চোখ দুটো ক্রুদ্ধ পশুশাবকের মত জলজল করছে। আমাদের দুজনের চেয়ে চড়-চাপড় সে বেশী বই কম খায়নি, কিন্তু চোখে এক-কোঁটা জল নেই; এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন সুবিধা পেলেই আর-এক পালা শুরু করতে তার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।

দিদিমার সভাটা এই আকস্মিক উৎপাতে একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। তিনি উঠে পড়ে সেই রণরঙ্গিণী

মেধেটির ছুই হাত ধরে বললেন, “আয় স্মি, মটরস্কটি নিবি?”

সে এক ঝটকায় নিজের হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, “চাই না তোমার ছাইয়ের মটরস্কটি, তোমার ঐ পোড়াবমুখো নাতিকে দাও,” বলেই ছুটে বেরিয়ে গেল।

ছুই ছেলেব মুখ হাত জল ঢেলে পরিষ্কার করতে আমার মা অত্যন্ত চটে বললেন, “বাবা! মেয়ে না ত ডাকাত! ছেলটাকে খামচেছে দেখ কেমন কবে? কাদেব এমন দস্তি মেয়ে?”

দিদিমা বললেন, “ঐ যে গলির মোড়ে লাল বাড়ীটা, ঐ বাড়ীর মেয়ে। ওর বাবা নতুন এসেছে এখানে, আগে তুই দেখিস্নি। ছেলে-মেয়ে দুটো প্রায়ই যায আসে, বড়দের সঙ্গে এখনো আলাপ হয়নি।”

মায়ের রাগ তখনও পড়েনি। তিনি গাম্ছা দিয়ে নিজের ছোট ছেলেব মুখ মুছতে মুছতে বললেন, “আহ! কি গেয়েই তৈবি কবেছে! আমার ধীর ত বোটা ছেলে, কিন্তু অমন মারকুটনে নয়। বাছার মুখটা একেবারে চষে’ দিয়েছে যেন।”

একটা সামান্য মেয়ের কাছে দুই ভাইয়ে এমন ভাবে অপমানিত হবে আমার পৌরুষ অত্যন্তই আহত হয়েছিল। মায়ের কথায় আবো বাগ বেড়ে গেল। “আবো ছেলেদের আফ্লাদে ননীগোপাল বানাও, তারপর হামাণ্ডি-দেওয়া খোকার কাছেও লাথি পেয়ে মরবে,” বলে’ রেগে আবাব আমি উপরে চলে’ গেলাম। বেড়াতে যেতে হলে গলি পার হতেই হবে। পথের মধ্যে স্মিত্রার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এ ইচ্ছা আমাব একেবারেই ছিল না। প্রথম পরিচয়ের তীব্র অগ্নিহুতি আমি তখনও একটুও ভুলতে পারিনি।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি আমার বোন কুসুমের সঙ্গে স্মিত্রাব অত্যন্ত ভাব হয়ে গিয়েছে। দরজার কাছে বসে’ হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে মাটির ঢেলার উল্লন তৈরি করে’ ঘরকন্নার কাজ পূরোদমে চলেছে। আমি যেন তাকে দেখতেই পাইনি এমন মুখ কবে’ বেরিয়ে গেলাম। সে যে চোখে একবাশ কৌতূহল নিয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল, তাতে খুসি হওয়া উচিত, না সেটা

সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা উচিত তা একেবারেই ঠিক করতে পারলাম না।

নীচ থেকে মুখ ধুয়ে, খাবার খেয়ে আবার উপরেই উঠতে হল। বাবার কড়া হুকুম ছিল সকাল বেলা দুঘণ্টা অন্ততঃ পড়তেই হবে। পড়বার বই বেশীর ভাগ নীচের একটা ঘরে থাকত, কিন্তু জিওমেট্রীখানা উপরে গোবার ঘরে ছিল। কি কারণে জানি না আমার মনে হল যে সকাল বেলা জিওমেট্রী পড়াই উচিত, কারণ শক্ত জিনিষ সকাল বেলা পড়লে বেশ সহজে বোঝা যায়।

বই আনতে উপরে চললাম। ঢুকবার পথেই মেয়ে দুটি ঘরকরুনা সাজিয়ে বসে’। ইচ্ছা করেই হোক বা অসাবধানতা-বশতঃই হোক, আমার পা লেগে উল্লনের একটা দিক গড়িয়ে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার উপরের কড়াটাও কাত হয়ে পড়ল। এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটিলে দিখে কিন্তু একবারও ফিরে তাকলাম না। চেয়ার টেনে নিয়ে জিওমেট্রী খুলে খুব একমনে পড়তে বসে’ গেলাম।

শুলাম স্মিত্রা তীব্র বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলে উঠল, “দেখলে তোমার দাদার হাঁটবার ছিঁরি! দিল আমার উল্লনটা ভেঙে। চোখে দেখতে পায় না নাকি?”

সামান্য একটা মেয়ের কথাকে আমার গ্রাহ্য না করারই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কেমন করে’ জানি না কথাগুলো মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—বললাম, “চোখ নেই তাদের, যারা লোকের দরজা জুড়ে ইট পাটকেল নিয়ে বসে’ থাকে। মাহুষেব কাজের সময় তারা ঘবে ঢুকবে না নাকি?”

আমার কথাগুলো বোধ হয় উচিত কথা বলেই স্মিত্রার মনে হল। সে একটু স্বর নরম কবে’ বললে, “তা বললেই ত হত, আমি সরিয়ে নিতাম। লাথি মেরে না ভাঙলেই কি চলত না?”

অতঃপর আর কি বলা যায় ভেবে পেলাম না। অগত্যা পড়ায় মন দেবার চেষ্টা করা গেল। কিন্তু মন যে বিশেষ লাগল তা নয়। অনেকক্ষণ দরজার গোড়ায় কোনো রকম শব্দ না শুনে একবার পিছন ফিরে তাকলাম। দেখলাম হাঁড়িকুঁড়ি সমেত রন্ধনকারিণী দুজনই অস্তর্ধান করেছেন।

মৃষ্টিমতী উপজব দুটি সরে’ যাওয়াতে কিন্তু আমার

বিজ্ঞানচর্চার কিছু সুবিধা হল না। বইয়ের দিকে যতবার তাকালাম, ঘড়ির দিকে তার চেয়ে ঢের বেশীবার তাকালাম, এবং শেষে ঘড়িটা অন্ততঃ আধ ঘণ্টা দৌল চলে স্থির করে' বই ফেলে উঠে পড়লাম।

কুসুম আর তার বন্ধু সরে' গিয়েছিল বটে, কিন্তু বেশী দূরে সরেনি। পাশের ঘরেই তাদের দেখতে পেলাম। স্মিত্রা আমাকে দেখতে পাবামাত্র বললে, "এরি মধ্যে বুঝি সব কাজ হয়ে গেল?"

আমি গম্ভীর মুখ করে' সংক্ষেপে বললাম, "হঁ।"

তারা আবার খেলায় মন দিল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম—আমার চলে' যাওয়া উচিত, না আর-একটু থেকে স্মিত্রার সঙ্গে পরিচয়টা পাকাপাকি করে' নেওয়া উচিত। এ পর্যন্ত সেই প্রথমে প্রশ্ন করেছে, আমি নিতান্ত ছেলেমানুষের মত উত্তর দিয়েছি মাত্র। সেই বেন সব দিক দিয়ে বড়। কিন্তু এটা হওয়া ত উচিত ছিল না।

স্মিত্রার নাম ভাল করে'ই জানতাম, তবু আব কিছু বলবার না পেয়ে বললাম, "তোমার নাম কি?"

সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "স্মিত্রা। আর তোমার নাম কি?"

ভয়ানক রাগ হল। মেয়েটার কি আশ্পর্ক! আমার নাম কি তা জানবার তার কি দরকার? আর দরকার থাকলেও কুসুমের কাছ থেকে আড়ালে ত জানা যায়। আরো বেশী গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কি পড়?"

স্মিত্রা তেমনি চট করে' বললে, "শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ। তুমি কি পড়?"

তাকে জব্ব করবার ইচ্ছাটা আমার গতিরোধ করল, তা না হলে প্রায় দু-তিন পা এগিয়ে গিয়েছিলাম। যতগুলো যতবিষয়ের বইয়ের নাম মনে পড়ল, খুব বিকৃত ইংরিজি করে' সব কটা হুড়হুড় করে' বলে গেলাম।

কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে স্মিত্রা বললে, "সব ক'খানা শেষ করেছে?"

আমি অগ্নানবদনে বললাম, "হ্যা।"

স্মিত্রা বললে, "আমার বইটাও শেষ হয়ে এলো,

• • দু-তিনটে পাতা বাকি আছে, ছিড়ে দিলেই হবে।"

এর পর পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হল।

বিকালে আবার তার সঙ্গে দেখা। বড়মামী তখন বাড়ীর স্বীকৃতিয়া সব ক'টি মানুষকে আটক করে' তাদের চুল বাঁধতে বসেছিলেন। যাদের বন্ধনদশা থেকে মুক্তিলাভ হয়েছিল তারা একটু সরে' বসে' অন্যদের দেখছিল, এবং মাঝে মাঝে জলের ঘটা, ভিজ্জে গাম্ছা, তেলের শিশি প্রভৃতি এগিয়ে দিয়ে বড়মামীর সাহায্য করছিল। স্মিত্রা তার কপ্প চুলের বাশ নাক-মুখের উপর বিক্ষিপ্ত করে' একমনে বড়মামীর আঙুলের খেলা দেখছিল। আমি ঘরে ঢুকে দেখলাম তখন কুসুমের কেশবিচ্ছাসের পালা চলছে। মুখ এবং মাথার অর্ধেক ময়লা ভিজ্জে গাম্ছার আড়ালে চাপা, চুলগুলো স্বভাব ত্যাগ করে' বড়মামীর ইন্দ্রজাল বিদ্যার বলে মাছেরে রূপান্তরিত হয়ে আসছে। সোজা ঘাড় এক চুল এদিক ওদিক নড়বামাত্র পিঠেব উপর কিল পড়ে' তাকে আবার সোজা করে' দিচ্ছে।

কুসুম ছাড়া পাবামাত্র বড়মামী দয়া করে' বললেন, "স্মি, আর তোর চুলগুলোও বেঁধে দিই। কি শ্রী হয়েছে দেখ না।"

স্মিত্রা ঝাঁকড়া চুল স্নদ্ধ মাথাটা সজোরে-নেড়ে বললে, "না, আজ কেন বাঁধব? আজ ত বাবা নেই।"

বড়মামী গালে হাত দিয়ে বললেন, "শোন' মেয়ের কথা! বাবা নেই ত আর চুল বেঁধেও কাজ নেই। এর যে বড় হয়ে কি দশা হবে।"

আলাপের আরম্ভটা এই রকম। তারপর কেমন করে' কোন্ পথে সেটা বেড়ে চলল, তা এখন ভাল কবে' মনে পড়ে না। কিন্তু এখন নিজের প্রায়-ভুলে-যাওয়া সেই অতীত জীবনকে যখন মানসচক্ষে দেখতে চেষ্টা করি, তখন নিজের বালকমুষ্টির পাশে সর্বদা যার উজ্জল দীপ্ত মুখ ভেসে ওঠে, সে আমার ভাই বোন কেউ নয়, কোন সমপাঠী বালকবন্ধু নয়, সে এই স্মিত্রা। পরবর্তী জীবনে তার যে চেহারা দেখেছিলাম, কালের প্রভাবে তা অনেক-খানি মন থেকে মুছে গেছে, কিন্তু বালিকা স্মিত্রার মুখ এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে।

পূজোব ছুটি দেখতে দেখতে শেষ হয়ে এলো। আবার নিজেকে বাড়ী ফেরা গেল। পায়ে হেঁটে যেখানে রোজ

ছুবেলা যাওয়া যায়, সেখান ছেড়ে আসতে বিশেষ দুঃখ হবার কথা নয়, তবু মনে হল যেন অনেক দূরে চলে' এলাম।

পরের কয়েকটা বছরের কথা মনে করবার চেষ্টা করলে কেবল এই মনে হয়—একটার পর একটা পরীক্ষার পড়া কেবলি বুকের উপর পাষণ্ড ভারের মতন চেপে থাকছে, আর প্রাণপণে খেটে রাত জেগে কোনোরকমে তাকে ঝেড়ে ফেলছি। কিন্তু সিদ্ধুবাদ নাবিকের গল্পের দ্বীপবাসী বুড়োর মত কখন সেটা আবার অতর্কিতে এসে ঘাড়ে চেপে বসছে, আর আবার তাকে নামাতে প্রাণপাত করতে হচ্ছে।

২

আমার জীবনের অন্ত সব বছরগুলোর চেয়ে বে বছরে আমার বয়স পঁচিশ ছিল সেটাকে আমি সর্বদা প্রাধান্য দিয়ে থাকি। তার কারণ, মানুষের ভাগ্যে দুঃখবিধান যিনি করেন সেই দেবতা আমার উপর সে বছরে অনিমেয় দৃষ্টিপাত করে' রেখেছিলেন। প্রথম সেই বছর আমার বাবা মারা গেলেন; এবং তাঁর শ্রাদ্ধ সমাপন করে', যখন শেষ অতিথিটিকে বিদায় দিতে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি, তখন টেলিগ্রামে খবর পেলাম অমৃতসরে যে ব্যাঙ্কে বাবা তাঁর সমস্ত সঞ্চয় গচ্ছিত রেখেছিলেন, সেই ব্যাঙ্কটি ফেল করেছে। মাকে খবর দিতে গেলাম, তিনি একটা কাপাও বললেন না।

শৈশবে যে বাড়ীতে দিন কেটেছিল, সেটাকে অনেক দিন হল ছেড়ে এসেছিলাম। আমার বোন কুসুমের বিয়ে হয়ে যাবার কিছু পরেই সেই বাড়ীতে আমার ছোট ভাই ধীরেন মারা যায়। মা আর সে বাড়ীতে থাকতে চাইলেন না। দিন কতক অস্থায়ীভাবে আমার বাড়ী বাস করে' মহানগরীর একপ্রান্তে ছোট একখানি বাড়ীতে এসে আমরা আবার নতুন করে' ঘর বাধবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

এবারকার প্রতিবেশী যারা তারা আমাদের অপরিচিতই থেকে গেল। কারণ, পরিচয় স্থাপনে সব আগে পা বাড়ায় যারা, সেই বালিকাজাতীয় জীব একটিও আমাদের সংসারে তখন ছিল না। মা রান্নাঘর আর উড়ারঘর ছেড়ে

কোথাও বেরতেন না, কাজেই তাঁর ভিতর দিয়েও অচেনাকে চিন্তাবাব কোনো সম্ভাবনা ছিল না। সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামার পথে, ছাতে বেড়াতে গিয়ে অনেক সময় এধার-ওধারের অনেক বাড়ীর মানুষগুলির মুখ দেখতে পেতাম, তাদের কর্তৃত্ব সারা দিনরাত শুনতাম; কিন্তু অপরিচয়ের যবনিকা যেমন দুর্ভেদ্য গোড়ায় ছিল, শেষ অবধি প্রাণ তাই থেকে গেল।

সন্ধ্যার সময় বেববার উপক্রম করছি এমন সময় মা বললেন, “বীরেন, একটু সকাল-সকাল ফিরিস। রাত্তার উপরের দরজাটা দশটা রাত অবধি হাঁ করে' খোলা থাকে, এ ত ঠিক না।”

আমি বললাম, “এ বৈঠক কাজটা ত আজ্ঞায় চলে আসছে।”

মা বললেন, “না না, পাড়ায় ক'দিন থেকে ভয়ানক চুরি হতে আরম্ভ হয়েছে, ঝিটা বলছিল। সাবধান হওয়া ভাল।”

মায়ের অত্যাশঙ্কিত রক্ষা করেছিলাম-কি না মনে নেই। কিন্তু মাঝবাত্রে ভীষণ চীৎকার আর বিকট কোলাহলে ঘুম যখন চমকে ছুটে গেল, তখন মায়ের ঝির উপর রাগ হল তার সত্যবাদিতার জন্তে। উঠে বেরিয়ে এসে চারিদিকে তাকিয়ে বুঝলাম চোর আসেনি, অন্ততঃ আমাদের বাড়ী আসেনি। অল্প একটু দূরে, সরু একটা গলির ভিতর অনেকগুলো খোলার ঘর তাদের অধিবাসীদের কুশী দারিদ্র্য সর্বাস্থে প্রকাশ করে' আমাদের চোখকে পীড়া দিত। আজ সেই মলিন ছবিখানার উপর কোন্ অদৃশ্য চিত্রকর আগুনের দীপ্তিময় প্রলেপ দিয়ে তাকে ভীষণরকম রমণীয় করে' তুলেছেন। পাড়ার যত লোক, এবং পাড়ার বাইরেরও অনেক লোক এই প্রলয়নাট্যে দর্শক এবং অভিনেতারূপে এসে জুটেছে, প্রত্যেক বাড়ীর ছাদ বারাণ্ডা জানুলা সব মানুষে পরিপূর্ণ। গলির ভিতর ভীড় তখন এত বেশী যে চট করে ঠিক করতে পারলাম না যে নেমে গিয়ে ওর মধ্যে ঢুকতে পারব কি না, এবং যদি পারিও তা হলেও কোনো কাজ করতে পারব কি না।

এমন সময় কে যেন বলে উঠল, “ওরা ফায়ার-ব্রিগেডে খবর দিচ্ছে না কেন?” গলার স্বরটি ক্রীলোকের।

একজন পুরুষ তার উত্তরে বল্লেন, “গিষে পরামর্শ-টা দিয়ে এসো না?”

সামনে চেয়ে দেখলাম। আগুনের আভা তখন রাত্রির অন্ধকারকে অনেকখানি দূরে ঠেলে নিয়ে গিষে-ছিল। কাজেই থাকে দেখলাম তাকে বেশ ভাল করেই দেখলাম। স্মিত্রাকে গত পাঁচ বছরের মধ্যে চোখে দেখিনি, তার খোঁজ-খবরও বিশেষ জান্তাম না; অকস্মাৎ দুগুজ দূরে দাঁড়িয়ে সে কথা বলছে দেখে একটু অবাক হয়ে গেলাম। দিনের আলোয় কোনোদিন যার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি, এই মাঝরাত্রে ঘরপোড়ানো আগুন কি কবে তাকে দৃষ্টিলোকে টেনে আনল?

মাকে বললাম, “মা, সামনে চেয়ে দেখ ত, ও স্মিত্রা না?”

মা একবার তাকিয়ে দেখে বল্লেন, “তাই ত, আবার এখানেও এসে জুটেছেন!” তিনি তৎক্ষণাৎ ঘরে ঢুকে গেলেন। স্মিত্রার সঙ্গে প্রথম পরিচয় আমাদের কাকুই বিশেষ মধুরভাবে হয়নি, কিন্তু আর-সকলে আরম্ভের তীব্রতাকে পরের মাধুর্যে ভুলতে পেরেছিল, মা সেটা পারেননি। যে ছেলেকে উপলক্ষ্য করে সে পরিচয়ের সূত্রপাত হয়, সে বেঁচে ছিল না, এটা তাঁর বিরাগের একটা কারণ। তা ছাড়া কবেক বছর আগে যে ঘটনাটা স্মিত্রাকে আমাদের জীবন থেকে নির্বাসিত করে দিল, তার স্মৃতিও কিছু সূত্রপ্রদ নয়।

বাবা অনেক চেষ্টার পর কুহুমের জন্ত অল্প খরচে একটি ভাল পাত্র স্থির করেছিলেন। কথা প্রায়:পাকাপাকি হয়ে এসেছিল। আমার বেশ মনে আছে আমি ঘরে বসে নিজের ক'জন বন্ধুবান্ধবকে বোনের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করব মনে মনে তার তালিকা করছিলাম। এমন সময় পাশের ঘরে বাবা-মামের গলার স্বর আমার মনকে সেদিকে টেনে নিয়ে গেল। বেশ জোরেই তাঁরা কথা বলছিলেন, কাজেই শুনবার কোনো ভুল হল না। শুনলাম স্মিত্রার বাবা লুকিয়ে লুকিয়ে সেই পাত্রের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে স্থির করে ফেলেছেন। দু-একদিনের মধ্যেই বিয়ে, আজ আমাদের বাড়ী নিমন্ত্রণার্থে লোক পাঠানোও হয়েছে।

স্মিত্রার বিবাহ সম্বন্ধে অল্প রকম ব্যবস্থা হয়ত মনে মনে আমার ছিল। খবর পেয়ে আমার মনোভাবটা যে-রকম হল, সেটার সঙ্গে আমার বাবা কিম্বা মা যা অলুভব করছিলেন তাব খুব বেশী সাদৃশ্য ছিল না। তাঁরা কুহুমের বিবাহ না-হওয়াটা নিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন; আমার কাছে স্মিত্রার বিবাহ হওয়াটা তার চেয়ে বেশী উত্তেজনার কারণ হয়েছিল, এ কথা স্বীকার করছি। স্মিত্রার বাবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আমরা যে কেউ যাইনি এ কথা বোধ হয় বলা বাহুল্য।

লিখতে যতক্ষণ লাগল, এ-সব কথাগুলো মনে করতে তত সময় লাগেনি। হটাৎ চকিত হয়ে দেখলাম, দমকলের গাড়ী ঘণ্টা বাজিয়ে গলির মুখে এসে দাঁড়াল। নাটকের পঞ্চমাক্ষের সময় হয়ে এসেছিল, এই ঘটনাধর্মির সঙ্গে সঙ্গে শেষ যবনিকা পড়ে গেল। বাকী যা রইল তা নিয়ে কাব্য-রচনা করা চলে বটে, কিন্তু আমার গল্পের মধ্যে তার বিশেষ কোনো স্থান নেই।

পরদিন সন্ধ্যার সময় ছাতের উপর বেড়াতে বেড়াতে গত রাত্রির কথাই ভাবছিলাম। আশে-পাশের কলের চিম্নীর ধোঁয়ার উজ্জ্বলে তখনও আকাশ বাতাস ভারাক্রান্ত। অসংখ্য পাপের স্মৃতিতে ব্যথিত মহা-নগবীর বিরাট বক্ষ ভেদ কবে এই কালিমাময় বিপুল দীর্ঘশ্বাসগুলি আমার মনেব ভিতরটা পর্য্যন্ত আধারে ভরে দিয়েছিল। কেবলি ভাবছিলাম ভুলে থাকা আর ভুলে যাওয়ার ভিতর এতবড় প্রভেদ কেন? শুকতারার মত দিনের আলো প্রথর হতেই যে আকাশের গায়ে মিলিয়ে গিয়েছিল, আজ সন্ধ্যা হবার আগেই সে সাঁজের তারার মত কিবে এল কেমন করে?

নীচে মাঘের সঙ্গে তাঁর একমাত্র সঙ্গিনী ঝির আলোচনা চলছে, তার এক-একটা টুকরা হাওয়ার স্রোতে কানে ভেসে আসছিল। আলোচনার বিষয় আর কিছু নয়, আমাদের সংসারের সীমাহীন দুর্গতির কাহিনী। বাবা ঋর বে পবিমাণে রেখে গিয়েছিলেন, টাকা সে পরিমাণে রেখে যেতে পারেন নি। ষাণ্ড বা রেখে গিয়েছিলেন, তার তার অল্প লোকে গ্রহণ করেছিল, কেবল ঋগগুলির উত্তরাধিকার থেকে কেউ আমাদের

বঞ্চিত করেনি। কিন্তু আমরা সকলে মিলে যে সমস্তার সমাধান করতে পারিনি, ঝি যে তা পারবে, এ বিশ্বাস আমার ছিল না।

যে বাড়ীতে হুমিাত্রাকে কাল রাতে দেখেছিলাম, সেটা অত্যন্তই কাছে। কিন্তু হুমিাত্রা ত একেবারেই কাছে ছিল না। তাদের বাড়ীর সন্নিধি বারান্দাটা ঠিক গলিব ওপারেই। অনেকবার তাকালাম, কেউ সেখানে নেই। শেষবার একজন মানুষ দেখতে পেলাম, কিন্তু তাকে না দেখলেও আমার কিছু ক্ষতি হত না। আমারই বয়সী একজন ছেলে খুব চোখ পাকিয়ে এখার ওখার দেপে ঘরের ভিতর চলে' গেল।

মা কোনোদিন ছাতে ওঠেন না, হটাৎ সেদিন এসে উপস্থিত। বল্লেন, “জানিস বীরেন, ধর্ম্মেব কল বাতাসে নড়ে। আমি তখনই বলেছিলাম না?”

আমি বললাম, “কলটা হটাৎ কোথায় তুমি নড়তে দেখলে? আর তখন যে কি বলেছিলে তা আমার একেবারেই মনে নেই, বলে' দিতে হবে।”

আমার রসিকতার প্রশাসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে' ম' বল্লেন, “আমাদের কাঁকি দিয়ে বুড়ো ভেবেছিল যে খুব জ্বিতে নেবে। এখন মেঘে ছুবেলা কাঁটা খাচ্ছে।”

বুখাই না বুঝবার চেষ্টা করলাম, বললাম, “কি যে বল্ছ! কোন্ বুড়ো এবং কোন্ মেয়ে?”

মা বল্লেন, “ঐ তোমাদের হুমিাত্রা গো! ক্যান্সার মা ওদের ওখানেও কাজ কবে, সেই গল্প করছিল। বুড়ো বাপ মরে' গিয়েছে; ওর স্বামীটা আসামে না কোথায় কাজ করে; শাশুড়ী আর দেওরের সঙ্গে ও এখানে রয়েছে।”

শেষ অবধি শুনবার ইচ্ছায় বললাম, “তোমার ঝি দেখছি খুব উপভাস বানাতে পারে।”

মা চটে' বল্লেন, “বানাবে কেন? ও তেমন মানুষ নয়। সেদিন দেওরটা হুমিাত্রার কাছে টাকা চেয়েছিল, ও দেখনি। শাশুড়ী ছেলের হাথে বউয়ের হাতেব গহনা খুলে নিতে গিয়েছিলেন, তাও পারেননি। ও মেয়েকে পারলে ত বুড়ী! তারপর নাকি দরজা বন্ধ কবে' সবাই মিলে তাকে মারধোর করেছে। শক্ত মেয়ে, একবার চোঁচিয়ে কাঁদেওনি!”

আমি বললাম, “তার স্বামী কি করতে আছে?”

মা বল্লেন, “পোড়া কপাল তাব স্বামীর! টাকার লোভে বিয়ে করেছিল, তা বুড়ো তাদেরও কাঁকি দিয়েছে। তার মত না থাকলে কি আর বাড়ীর লোকে বউকে অত যত্ন দিতে পারে?”

ছাতে বেড়ান অসমাপ্ত বেধে নীচে চলে' গেলাম। ওদের বাড়ীটার সামনে কষেকবার ঘুরে' এলাম। কিন্তু তাতে লাভ হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

এর পর থেকে মাঝে মাঝে হুমিাত্রাকে দেখতে পেতে আরম্ভ করলাম। হযত আগেও দেখতে পারতাম, কিন্তু যার সম্ভাবনা মাত্রও মনে ছিল না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ থাকতে পারিনি। চেহারা খুব যে বদলেছে তা নয়, কিন্তু এই যে আমার শৈশবের খেলার সঙ্গিনী তা ঠিক যেন অমুভব করতে পারতাম না। প্রভেদ একটা অমুভব করতে পারতাম কিন্তু সেটা এতটা অপরিষ্কৃত যে ভাষার রাজ্যে তাকে আমল দেওয়া চলে না।

ক্যান্সার মায়ের সঙ্গে আমার মায়ের অতঃপর যা-কিছু আলোচনা হত, সব-তাতে আমি ভাগ নেবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু ক্রটিমধুর কিছু লাভ করিনি এটা নিশ্চয়। পাড়ায় চোরের উপদ্রব যে দিন-দিন বাড়ছে এ খবরটা চোরেরা না দিলেও আমি রোজই পাচ্ছিলাম।

কাজেই সেদিন রাত সাড়ে-দশটায় যখন বাড়ীতে ঢুকতে যাচ্ছি, তখন হটাৎ যে আমার পাশ দিবে তীরের মত একটি মল্লম্যমুষ্টি ছুটে চলে' গেল, তাতে অবাক যত না হলাম, ভয় তার চেয়ে বেশী পেলাম। আমার কোনো মূল্যবান সম্পত্তি চুরি হয়ে গেল—ভয় এজ্ঞাত নয়, কারণ ভগবান আমাকে সে ভয় থেকে মুক্তি দিয়ে-ছিলেন। চোর যদি সত্যিই এসে থাকে তাহলে আমার মা সে বিষয়ে যেভাবে নিজেব মত ব্যক্ত করবেন—সেইখানেই আমার ভয় ছিল। তাই চোরের চেয়েও চুপিচুপি উপরে উঠে যখন আবিষ্কার করলাম যে মা যথাবীতি দরজা বন্ধ করে' ঘুমুচ্ছেন এবং আমার ঘরের যা-কিছু অস্বাবর সম্পত্তি সবই যথাস্থানে বিবাজ কচ্ছে, তখন আশ্বস্ত হলেও অবাক হলাম।

শোবার সময় আলো নিভিয়ে দিবে বালিশে মাথা •

দিতে গিয়েই চমকে উঠে বসলাম। কিসের একটা হিম শীতল স্পর্শ আমাকে একেবারে ঘুমের দেশের সীমানার পারে টেনে নিয়ে এল। আবার আলো জ্বলে সেটা হাতে করে' বিছানার কাছে এসে দাঁড়লাম।

আমার বালিশের উপরে সোনার হার চুড়ি বালা প্রভৃতি কয়েকটি জিনিষ পড়ে' রয়েছে। সেই মুহূর্তেই বুঝলাম সে কে যাকে আমি চোর মনে করেছিলাম। কিন্তু তার ব্যবহারের কোনও মানে আবিষ্কার করবার ক্ষমতা আমার হল না। ঘুমও হল না। সারাটা রাত কেবল কি করে' এই অদ্ভুত দানের একটা কিনারা করব, তাই ভেবেই কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু কেবলমাত্র ভাবলে কোনো সমস্যার সমাধান হয় না। অথচ কাজে কিছু করবার কোনো উপায় নেই। অগত্যা মন যদিও নিজের চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত রইল, তবু অল্প দিনের মত স্নানাহার, স্নুলে যাওয়া, কিছুই বাদ গেল না। জিনিষ কটা সন্ধে করে' নিয়ে বেরলাম, ঘরে রেখে যেতে সাহস হল না।

বিকেলবেলা বাড়ী কিরে আসতেই মায়ের কাছে যা শুন্লাম তাতে বুঝলাম যে শুধু ভাববার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এইবার করবার পালা; উপায় না থাকে, উপায় করে' নিতে হবে।

সকাল দশটা আন্দাজ সময়ে সুমিত্রাদের বাড়ী মহা গোলমাল শুনে পাড়ার লোক গিয়ে উপস্থিত হয়। ওদের বোয়ের গায়ের সব গহনা নাকি রাত্রে চুরি গিয়েছে। তার জন্তে বোকে উৎপীড়ন করার অর্থ প্রথমে সকলে বুঝতে পারেনি, পরে শোনা গেল যে বউ গহনা নিজে লুকিয়ে রেখেছে, চোরে নিয়ে যায়নি। কোথায় যে লুকিয়ে বেপেছে তাই আবিষ্কার করবার জন্তেই এই ব্যবস্থা।

নির্যাতনের বর্ণনা মা বেরকম বিশদভাবে করলেন, আমি তা করতে চাই না। অসহ্য যন্ত্রণাও যে মুখ বুজে নীরবে সহ্য করছে, তবু নিজের ব্যথাকে দেশের কোতুহল আর অবজ্ঞামিশ্রিত ককণার জিনিষ করতে চায়নি, তার গোপন বেদনাকে আজ লোকের সামনে টেনে আনলে আমি তার বন্ধুর কাজ করব না।

ঘরের ভিতর ঢুকে যথাসাধ্য ভাবতে চেষ্টা করলাম কি

এখন আমার করা উচিত। আমি সুমিত্রাকে বাঁচাতে চাই, যেমন করেই হোক। কিন্তু কি করব? নির্ধিষ্ঠারে যা খুসি করে' গেলেই কি তার উপকার হবে? অপকার কি তার চেয়েও বেশী হবে না? সুমিত্রা নিজে কি চায়? কেন সে আমার কাছে তার জিনিষ রেখে গেল।

এমন সময় হটাৎ চোখ পড়ল তাদের বাড়ীর দিকে। সদর দরজায় তাল লাগিয়ে সুমিত্রার শাওড়ী আর দেওর কোথায় চলেছে? সুমিত্রা কোথায়?

ছাতের উপর থেকে লাফ দিয়ে সৰু গলিটা ডিঙিয়ে তাদের বাড়ীর ছাতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ভেবে চিন্তে এমন কাজ কেউ করে না। কিন্তু এতক্ষণ কেবলি ভেবেছি, কাজে কিছুই করিনি; তাই এবার ভাবনাটাকে বাদ দিলাম।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলাম। সামনের ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিল, ঠেলা দিতেই খুলে গেল।

ঘরের মেঝের উপর যে শুয়ে ছিল, সে উঠে বসল। তার খোলা চুলের রাশ মুখের উপর এসে পড়েছে, এক হাত দিয়ে সেগুলো সরিয়ে সে চেয়ে দেখল। কপালের উপরে একটা রক্তের ধারা তখনও শুকোয়নি।

আমার আসাটাতে কোনো বিস্ময় না দেখিয়ে সে বললে, “তুমি শিগগির যাও, ওরা এখনি ফিরে আসবে।”

আমি বললাম, “তোমার জিনিষ কিরিয়ে নাও, আমি এখনি বাচ্ছি।”

সুমিত্রার চোখ দুটো জ্বলে উঠল। আমার মনে হল মাঝখান থেকে বারোটা বছরের ব্যবধান যেন খসে' গেল, সামনে যাকে দেখলাম সে যেন এই উৎপীড়িতা অপরিচিতা সুমিত্রা নয়, এ আমার শৈশবের সঙ্গিনী, যাকে প্রায় নিজের মতই আমি জানতাম।

একটুকু চূপ করে' থেকে সে বললে, “ফিরে নেব? আমার কপালের উপরের রক্ত এখনও শুকোয়নি দেখছ? এ শুধু আজ নয়, একবছর ধরে' প্রায় প্রতিদিনই এমনি চলছে। সব বিকল হবে?”

বুঝতে পারলাম না। বললাম, “কি বলছ ঠিক ধরতে পারছি না। আমি তোমার গহনা রাখলে তোমার কিছু সুবিধা হবে?”

স্বমিত্রা হাসবার চেষ্টা করল। তার সেই রক্তরঞ্জিত মুখে হাসি যে কেমন দেখিয়েছিল তা না দেখলে বুঝবার উপায় নেই। সে বললে, “স্ববিধার আশায় করিনি। কিন্তু ঐ কটা সোনার টুকরো নেবার ক্ষেত্রে যারা আমাকে খুন করতেও পারে তাদের হাতে আমি কিছুতেই ওগুলো দেবে না।”

আবার সেই আট বছরের স্বমিত্রার অজ্ঞেয় মনটাকে দেখলাম। কিন্তু রাগ হল, বললাম, “স্বমিত্রা, কিন্তু আমাকে জড়াচ্ছ কেন এর ভিতর? আমি তোমার প্রতিহিংসার অঙ্গ হতে চাই না। তুমি তোমার গহনা ফিরে নাও, নিয়ে নন্দনায় ফেলে দাও কি যা-খুসি কব। আমি এসব রাখব না।”

তার মুখের উপর কেমন একটা ছায়া এসে পড়ল। মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বললে, “আমার বাবার দেওয়া জিনিষ, এ তোমাকে ছাড়া কাউকে আমি দিতে পারব না। তুমি যা-খুসি কোরো,—বেচে ধার শোধ কোরো। ওর দাম খুব বেশী হবে না জানি, কিন্তু আমার আর-কিছু নেই, এইটুকু মনে রেখো। এখন যাও।”

আমি বললাম, “আমি যাচ্ছি; কিন্তু তুমি কি এই খুনেদের মধ্যেই থাকবে?”

স্বমিত্রা বললে, “থাকব না ত, যাব কোন্ চুলোয়?”

আমি বললাম, “তুমি স্বামীব কাছে চলে যাও না?”

সে বললে, “আমার স্বামী কোথায় যে যাব? দেখছ না আমার কপালে সিঁচরের বদলে রক্তের দাগ?”

আমি বললাম, “তোমাকে কোনো রকমে কি সাহায্য করতে পারি না?”

স্বমিত্রা বললে, “আমি সাহায্য চাই না। যার বিপদের গোড়ায় তার নিজের বাপ আর স্বামী, সে কোন্ লজ্জায় অস্ত্রের সাহায্য নেবে? তুমি আমার আর খোঁজ নিও না। আমার দিবি রইল।”

ফিরে এলাম। আমার বাবার ঋণ শোধ কিছু হল না, কিন্তু স্বমিত্রার যা ঋণ আমার কাছে ছিল তা শোধ হয়ে গেছে।

এর পরে কি হল তা আব বলে লাভ নেই। খবরের কাগজে অসংখ্য আকস্মিক গোচরীয় মৃত্যুসংবাদে মধ্য একদিন তাব নাম দেখেছিলাম। কিন্তু তখন আর কল্‌কাতায় ছিলাম না, খবর নেবার উপায় ছিল না, তা ছাড়া খবর নেওয়াতে তাব নিষেধ ছিল। তারই মত বাদেব মাল্লুবে পিষে মারছে এমন লোকের সাহায্যার্থে তার ধন দান করে দিয়েছিলাম। স্বরণচিহ্ন আমার কাছে ছিল কেবল তার শেষ কথার স্মৃতি। লোকের চোখে হযত আমি পরস্ব-অপহারী, কিন্তু যে পিতাকে সে সংসারে সবচেয়ে ভালবাসত, তাঁর দেওয়া উপহার সে আমাকে ছাড়া কাউকে দিতে পাবে নি—এরই আনন্দ আমাকে বর্ষের মত ঘিরে আছে। আমার বাড়ীর লোকে আর স্বমিত্রার নাম করে না। কিন্তু আমার শৈশব যেমন আমার এই অকাল-বার্দ্ধক্যের মধ্যে লুকানো আছে, একেবারে হারিয়ে যায়নি, তেমনি সে মরেও আমার জীবনে বেঁচে আছে।

শ্রীসীতা দেবী

ফাগুন-বাতাস

ফাগুন-বাতাস—ব্যাকুল মলয়,

দুটি পাখাই সমান চপল—প্রথম-স্রষ্টি, শেষের প্রলয়!

কচি কিশলয়ের পুঞ্জ

সবুজ স্বর্ণ গড্‌চে কুঞ্জ,

ঝরা-পাতার ঘূর্ণিঝড়ে সমান মাতাল সকল সময়।

ফাগুন-বাতাস—ব্যাকুল মলয়,

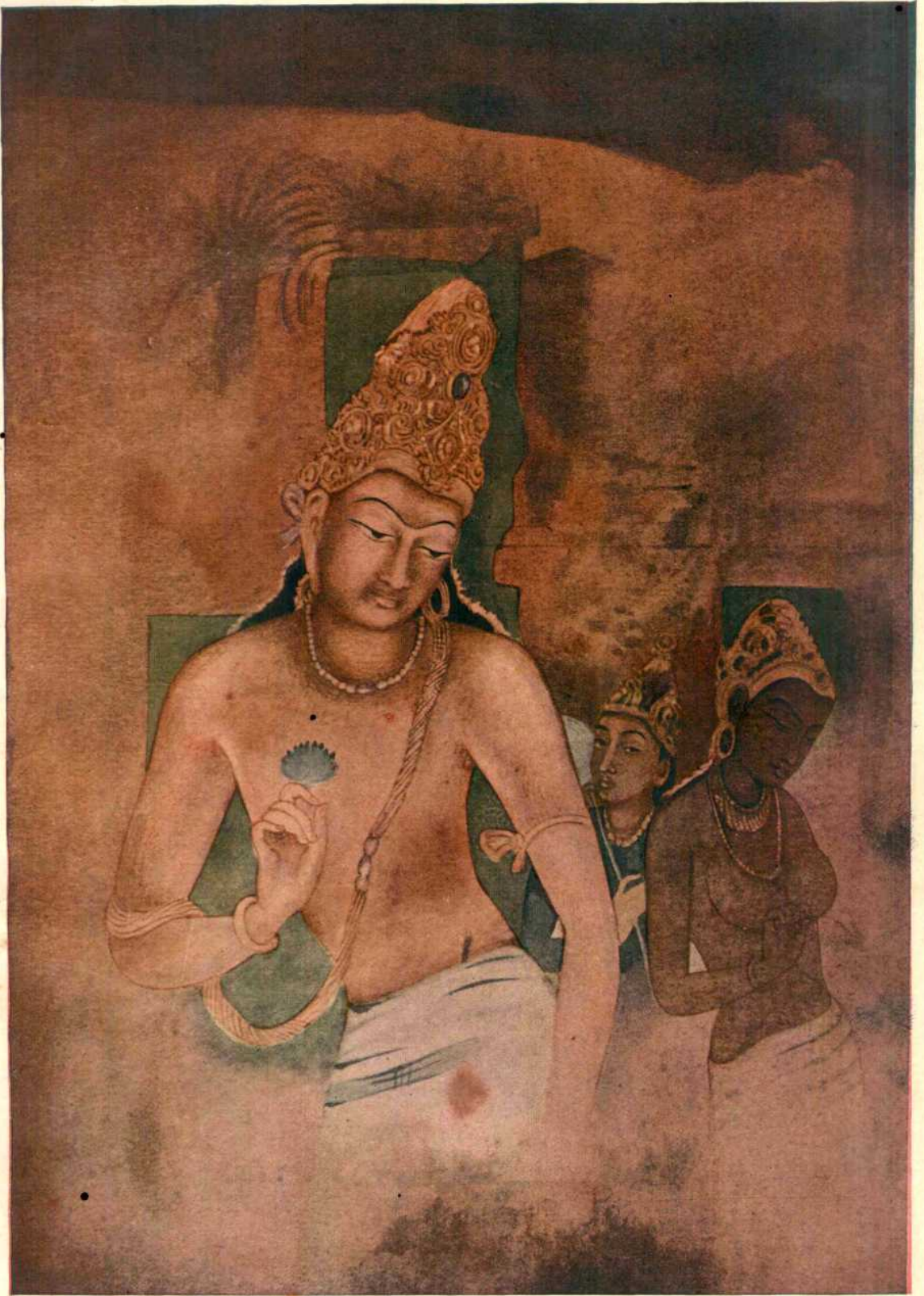
ধোঁটার পুটে ফাটিয়ে কুড়ি ফুটিয়ে কুসুম উজ্জান সে বয়।

সেই উজ্জানের ফাঁকে ফাঁকে

আবার তাঁটার ভাঙন লাগে,

ফলেব ধবা এগিয়ে আসে—ফুলের মরা আসন্ন হয়!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্তী



বুদ্ধদেব, যশোধরা ও রাহুল।

P30108

নিম্নবঙ্গের মঠ

জগদ্বংশী কবি কাঁদিয়া কহিয়াছিলেন যে,—

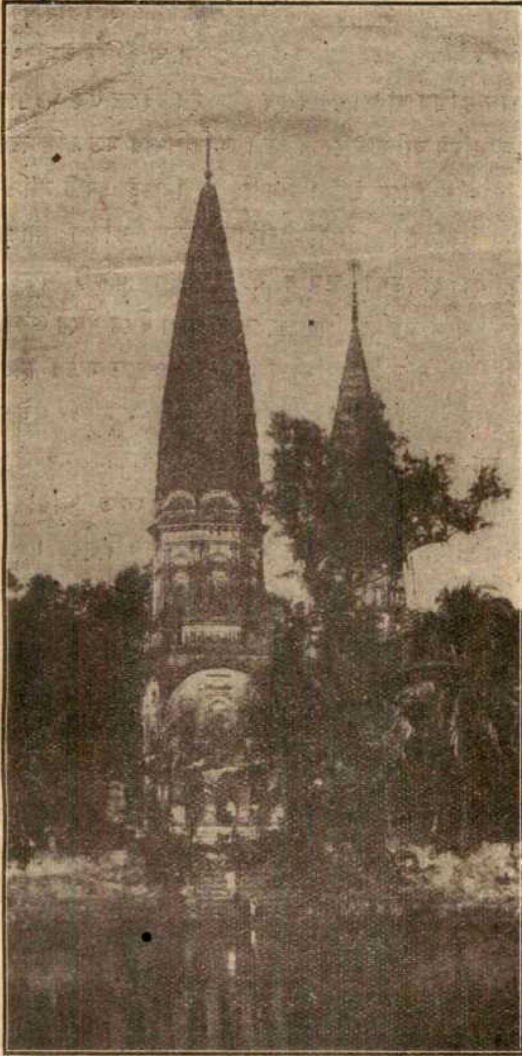
“ও ভাই বন্দবাসী, আমি ম'লে

তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ ?”

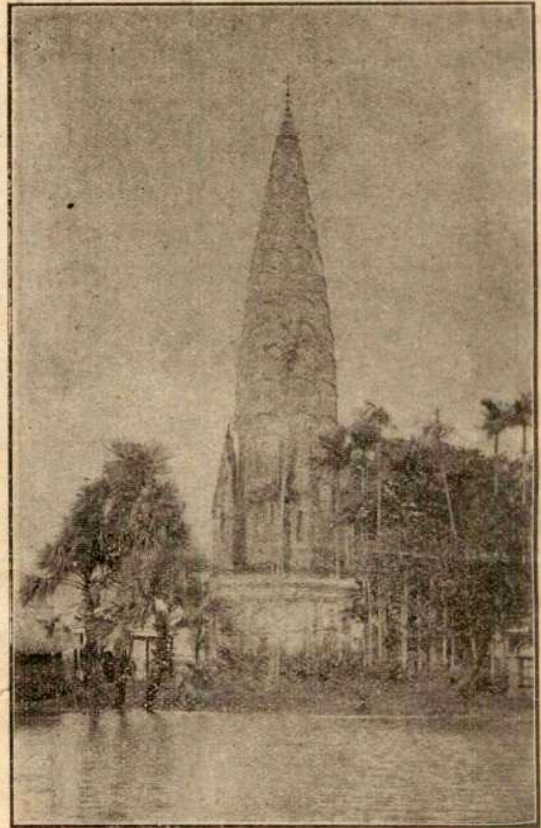
চিতার উপর মঠ প্রতিষ্ঠিত হউক ইহা প্রাচীন কালের হিন্দুর চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। পরলোকগত পিতামাতার ও আত্মীয়-স্বজনের চিতায় মঠ দিয়া

প্রাচীনকালে হিন্দুসন্তান আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। এই প্রথা এখনও পূর্ববঙ্গে লুপ্ত হয় নাই, এখনও বাহারই সাধ্যো কুলায় তিনিই পিতা-মাতার শ্মশানে মঠ প্রতিষ্ঠিত করা পুণ্য-জনক মনে করেন। কিন্তু এখন আর মঠগুলি আগের মত অন্ন ভেদ করিয়া উঠে না, পাচ ক্রোশ দূর হইতে আর তাহাদের শির দেখা যায় না। দায়-সারা গোছের হাত দশ বার তৈয়ারী হইলেই খুব হইল। অনর্থক অত ইট স্তম্বকি স্তম্বীকৃত করিয়া কেলিয়া রাখে কে ?

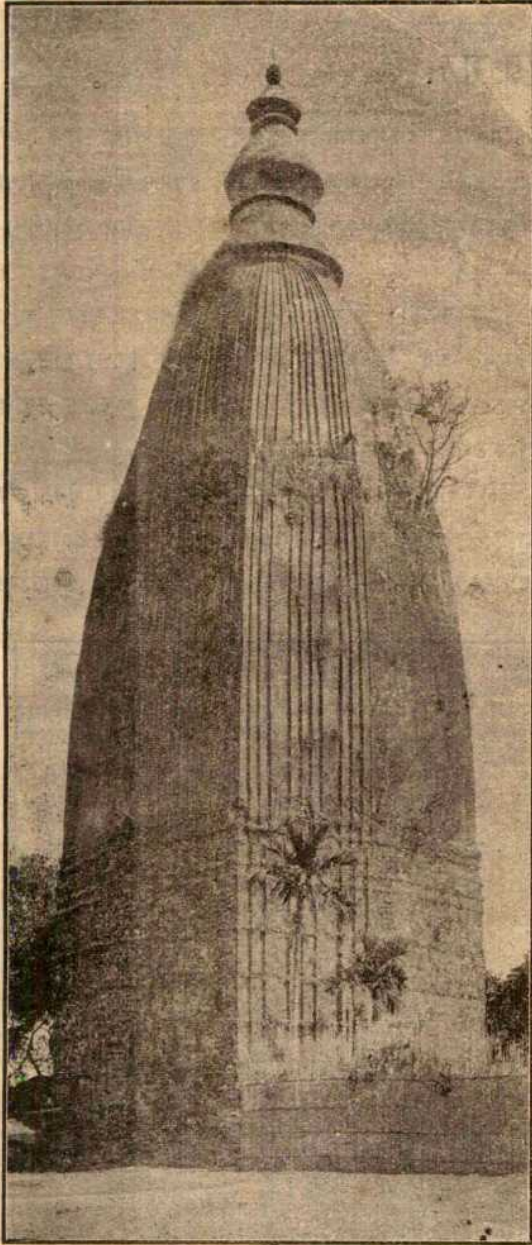
এই নয়নানন্দদায়ক স্থাপত্যনিদর্শনগুলি নানা নৈসর্গিক উৎপাতে ক্রমেই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের বিখ্যাত ভূমিকম্পে আমাদের গ্রামের প্রকাণ্ড একটি মঠ



সোনারদেবের মঠ—ঢাকা।



কেওয়ার গ্রামের মঠ—ঢাকা।



রাজাবাড়ীর মঠ—ঢাকা।

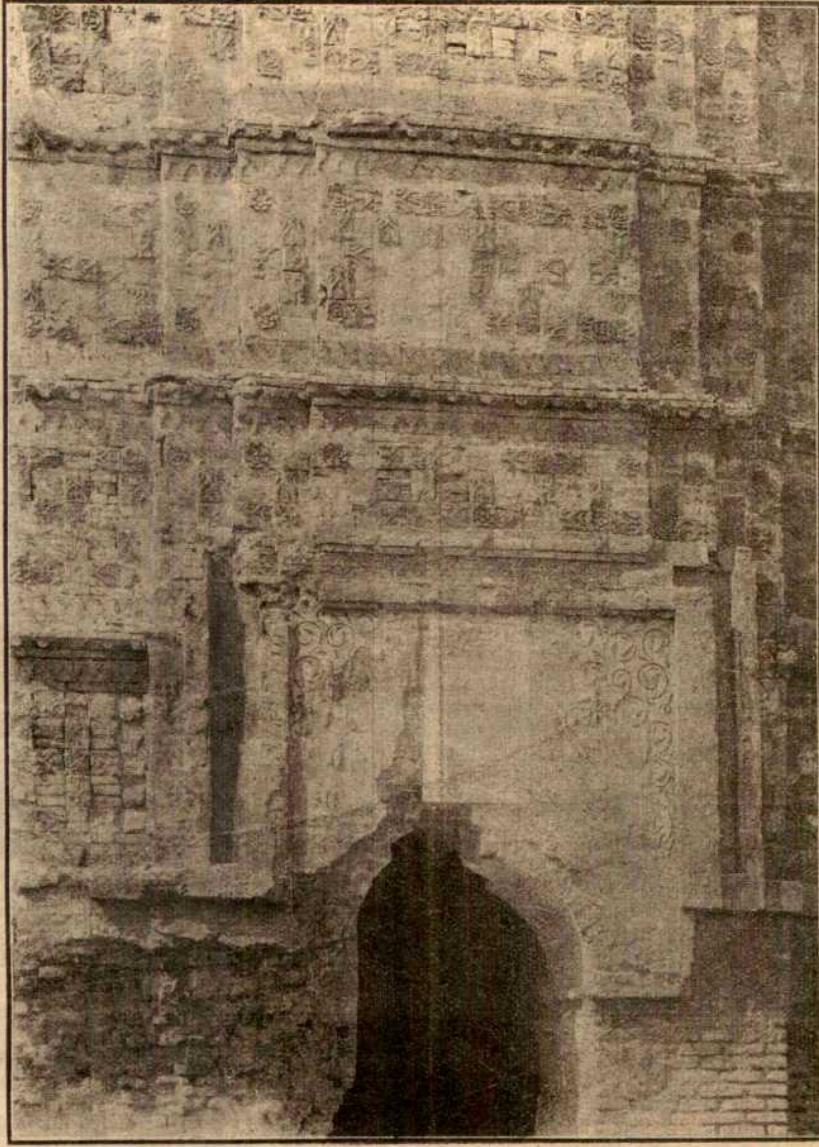
ভূমিসাং হয়; ঐ ভূমিকম্পে অনেক মঠেরই হয়ত ঐ দশা হইয়াছিল। দুই চারিট কঠিনপ্রাণ মঠ এখনও দাঁড়াইয়া থাকিয়া বর্তমান ও অতীতের সন্ধন্ধ বজায় রাখিয়াছে।

পূর্ববঙ্গের ও দক্ষিণবঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তুলনা নাই। সুন্দরবন হইয়া যিনি একবার কলিকাতা হইতে

ঢাকা আসিয়াছেন অথবা ঢাকা হইতে কলিকাতা গিয়াছেন তিনিই জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ আনন্দস্মৃতি অর্জন করিয়া লইয়াছেন, সন্দেহ নাই। অফুরন্ত আনন্দ-উৎসের মত দুই ধারে জুপারি-তাল-নারিকেলের সবুজ সৌন্দর্য ধরণীবক্ষ হইতে সরল রেখায় অবিশ্রাম উল্কে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সারি সারি বীণার তারের মত তাহাদের নিরাভরণ কৃশ কাণ্ড—বাতাসে অনবরতই তাহাতে ঝঙ্কার উঠিতেছে।

এই তালীবনের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ দুই-একটি উচ্চ মঠের চূড়া নয়নগোচর হয়; অমনি আমরা বঝিতে পারি যে রসভঙ্গ হয় নাই, ঠিক এমনটিরই দরকার ছিল। জুপারি-তালের মেলায় এমন অগ্নিশিখার মত স্থাপত্যই তাল রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, অগ্না যে-কোন আকৃতির ইমারতই অত্যন্ত কৃত্রিম বলিয়া বোধ হইত। দূর হইতে এই মঠগুলি কি মনোরম বলিয়াই বোধ হয়। অগ্নিশিখার মত রক্তিমবর্ণ মঠ আকাশ পানে উঠিয়া গিয়াছে। নিম্নেই একটি নাতি-বৃহৎ পুষ্করিণী। পাড়ে তাহার ছায়া করিয়া আছে আমলকী হরিতকী তমাল বট অশ্বথ। একটি অর্দ্ধভগ্ন সিঁড়ি জলে নামিয়া গিয়াছে, তাহা দিয়া ধীরে ধীরে একটি পল্লীবধু কলস কক্ষে নামিতেছে। পুষ্করিণীতে মঠের ছায়া পড়িয়াছে। ছায়ার দিকে চাহিয়া চাহিয়া মনে হয়, ইহা কি ইট-স্মৃকির মঠ? এ যেন পিতার আত্মার মঙ্গলার্থে ভগবানের সিংহাসন পানে সন্তানের চিরোৎসৃত আন্তরিক আকুল প্রার্থনা শিল্পীর হাতে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

শিল্পী লাভ-ক্ষতির বিচার বাদ দিয়া এই মঠ গড়িতে বসিয়াছিল। যে ইট-স্মৃকির স্তূপ এই মঠ গড়িতে ব্যয় হইয়াছে, তাহাতে অনেক-কোঠাওয়ালা একটা প্রাসাদ তৈয়ার হইতে পারিত। তাহা না করিয়া শিল্পী নিম্মাণ করিল ক্ষুদ্র একটি প্রকোষ্ঠ, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইল ক্ষুদ্র একটি শিবলিঙ্গ এবং তাহার চূড়া টানিয়া টানিয়া উঠাইল একেবারে মেঘের সীমায়। এত বড় চূড়াটা মাতুলের বিশেষ কোন কাজেই লাগিল না। চূড়ায় যত্ননিমিত্ত অসংখ্য থোপে যত রাজ্যের পাখী আসিয়া নিশ্চিন্ত বাসা বাঁদিয়া বসিল। বিষয়ী চূড়ার দিকে চাহে আর ভাবে,—“কি অপব্যয়! ভূমিকম্পে তো ইহা ভাঙ্গিয়া পড়িল বলিয়া!” গ্রাম্য শিশু ক্রোশেক দূর হইতে “ঐ রে, মামার বাড়ীর মঠ দেখা যায়!”



রাজাবাড়ীর মঠের দরজার উপরের কারুকাৰ্য্য।

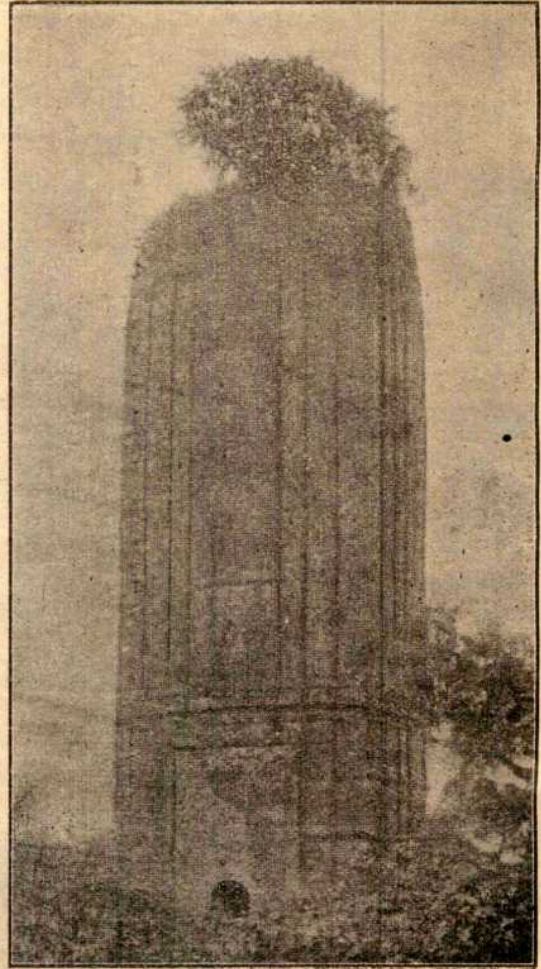
বলিয়া নাচিতে নাচিতে দৌড়িতে থাকে। সন্ধ্যায় পাস্ত-বিরল পথে পশ্চিম গগনে স্পষ্টীকৃত মঠের দিকে চাহিয়া খুসী হইতে থাকে, পথ তাহার কাছে ফরাইয়া আসে। বর্ধার অন্ধকার রাত্রে গ্রাম্য খালের গলি-ঘূর্ণিতে দিক্‌ভ্রান্ত ভিক্ষু-নৌকার মাঝি মঠের চড়ার দিকে চাহিয়া দিক ঠিক করিয়া লয়।

পূর্ববঙ্গে এমন একটি প্রাচীন গ্রামও পাওয়া যাইবে

না যেখানে ছই-একটি মঠ নাই। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই মেই গ্রামেরই নিজস্ব। ছই-একটির খ্যাতি কিন্তু সারা দেশটাই জুড়িয়া আছে। এই বিখ্যাত মঠগুলির মধ্যে রাজাবাড়ীর মঠই প্রাচীনতম ও বিখ্যাততম। রাজাবাড়ী ঢাকার জেলায় বিক্রমপুরে পদ্মা ও মেঘনার সঙ্গমে অবস্থিত। মঠটি পদ্মার একেবারে পাড়ে। গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জ অথবা নারায়ণগঞ্জ হইতে গোয়ালন্দ



ভুবনেশ্বরের মন্দির।



ইছাই ঘোষের দেউল—বীরভূম।

(বীরভূম বিবরণ হইতে গৃহীত)

যাইতে জাহাজের যাত্রীগণ এই মঠটির দিকে চাহিয়া থাকেন যতক্ষণ দেখা যায়। কতবার পদ্মা ইহার দিকে ছুটিয়া আসিয়াছে, রাজাবাড়ীর মঠ বুঝি এবার আর টিকিল না ভাবিয়া প্রত্নপ্রিয় ব্যক্তিগণ শঙ্কিত হইয়াছেন। কিন্তু মঠটি যেন দৈবরক্ষিত, অমর! প্রত্যেক বারই পদ্মা উহার পাদমূল হইতে কিরিয়া গিয়াছে।

রাজাবাড়ী মঠের গায়ে কোন লিপি অঙ্কিত নাই। কাজেই ইহা কোন্ সময় তৈয়ারী হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। কিন্তু উড়িষ্যার মন্দিরাবলীর আকৃতির সদৃশ ইহার বিশিষ্ট বর্ত্তলাকৃতি দেখিয়া মনে হয় যে ইহা যে

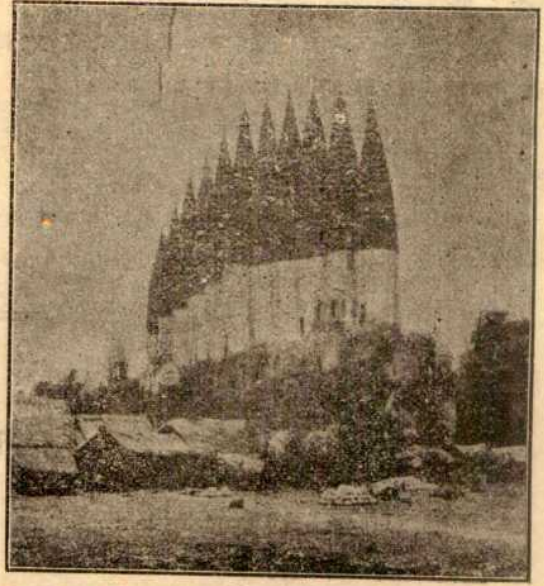
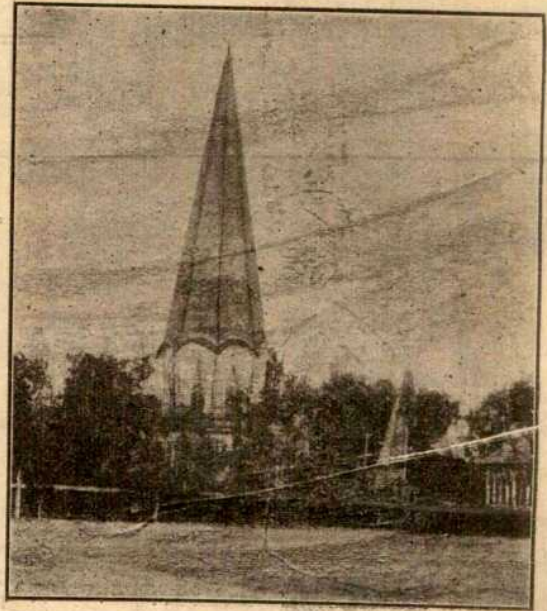
সময় তৈয়ার হইয়াছিল তখন পর্য্যন্ত শিল্পীগণ হিন্দুস্থাপত্যের বিশেষত্ব ভোলে নাই। রাজাবাড়ী মঠের কয়েকটি বিশেষত্ব বিশেষ লক্ষ্যের যোগ্য। প্রথমতঃ, মাথায় যে ঘণ্টাকৃতি চূড়া ও কুম্ভ আছে উহা হিন্দুস্থাপত্যেরই বিশেষত্ব। দ্বিতীয়তঃ, ঘণ্টা হইতে নিম্নে পাদদেশ পর্য্যন্ত যে থাক্ থাক্ খাঁজ নামিয়া আসিয়াছে তাহা প্রাক্‌মুসলমান যুগের মন্দিরাবলীতেই দেখা যায়। যতদূর জানি, বঙ্গাল দেশে আর-একটি মাত্র মঠে এই বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া গিয়াছে—উহা বীরভূম জেলায় কেন্দুবিল্বের নিকটে অবস্থিত এবং ইছাই ঘোষের দেউল নামে খ্যাত। জন-



নবরত্ন মঠ (আধুনিক)—বাসগা, বরিশাল।

প্রবাদ এই যে এই দেউল বা মঠ ইছাই ঘোষের নির্মিত, কাজেই ইহা প্রাকমুসলমান যুগের। প্রাকমুসলমান যুগের না হউক, ইহা যে রাজাবাড়ীর মঠের মতই খুব পুরাণা, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। প্রবাদ অনুসারে রাজাবাড়ীর মঠ কেদার ঝায়ে মায়ের চিতার উপর নির্মিত। রাজাবাড়ীর মঠও পূর্বদ্বারী, ইছাই ঘোষের দেউলও পূর্বদ্বারী। রাজাবাড়ীর মঠের গায়ে নানা-রকম খোদাই ইষ্টকের কারুকাৰ্য্য আছে।

অন্য যে কয়টি মঠের ছবি দেওয়া গেল সেগুলি দেখিলেই মনে হইবে যে ইতিমধ্যে রচনারীতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। রাজাবাড়ীর মঠ মৌল্যে স্থলাঙ্গী বীরপ্রসবিনীর মত। আর এই মঠগুলি তদ্বদী জ্যোৎস্নাপাণিকা লঘুচ্ছন্দা নাট্যিকার মত। রাজাবাড়ীর মঠে হিন্দু স্থাপত্যের ছাপ বেশ আছে, কিন্তু এগুলিতে তাহা ধরা কঠিন। আরও অহুসঙ্কান না করিয়া এই পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে জোর

একুশরত্ন মঠ—রাজনগর, ঢাকা।
(শ্রীযুক্ত বোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিক্রমপুরের ইতিহাস হইতে)

রমনার কালী মন্দির—ঢাকা।

করিয়া কোন কথা বলা যায় না। কিন্তু আমার সন্দেহ হইতেছে যে ইয়োরোপীয়গণের বান্দালায় আগমনের সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের গীর্জা প্রভৃতিতে স্মৃষ্টিচূড় গথিক স্থাপত্য-প্রথার প্রবর্তন দেখিয়া তাহারই অতুলকরণে এই অগ্নিশিখার

আকৃতি মঠের উদ্ভব হইয়াছিল। এই অতুকেরণে আমাদের লজ্জিত হইবার কিছুই নাই। এই তাল-নারিকেলের দেশে এই সৃষ্টিচূড় স্থাপত্য-প্রথা এমন চমৎকার মানাইয়াছে যে এই নূতনত্ব-প্রয়াসে শিল্পের বিকাশই হইয়াছে, শিল্পের প্রাণ ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

যতদূর দেখা যায়, এই প্রথা বোধ হয় রাজা রাজবল্লভই তাঁহার একুশরত্ন নির্মাণে প্রথম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে

একুশরত্নের অতুকেরণে এই প্রথা দেশময় আদর লাভ করিয়াছিল। ৫২ বৎসর পূর্বে ১২৭৬ সনে একুশরত্ন পদ্মাগ্রামে পতিত হয়। একুশরত্নের অতুকেরণে নির্মিত মঠে আজ দেশ ছাইয়া গিয়াছে। ঢাকা মহরের রমনার কালীর মন্দিরও এই প্রথাতেই প্রায় এক শতাব্দী হইল নির্মিত হইয়াছিল।

শ্রীমলিনীকান্ত ভট্টশালী

সন্ধ্যা

দিনের কমল মুদল আঁথি

সন্ধ্যা-সাগর-জলে,

নিদ্-পাড়ানি বুলায় আকাশ

গভীর ছায়া-ছলে;

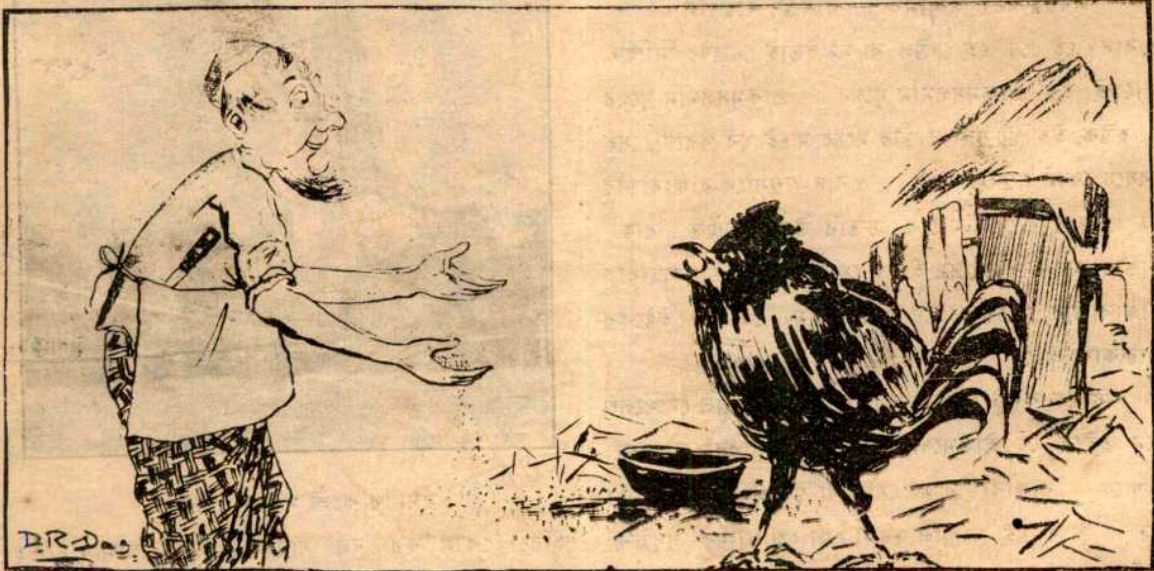
রাত্রি আসে কালো ভ্রমর

আঁধার-পাখা বোঝে,—

পদ্ম-পাতের পরাগ-কোটা

জলচে তারা হোয়ে।

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্তী



মোরগ—“তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইক অবহেলা।”

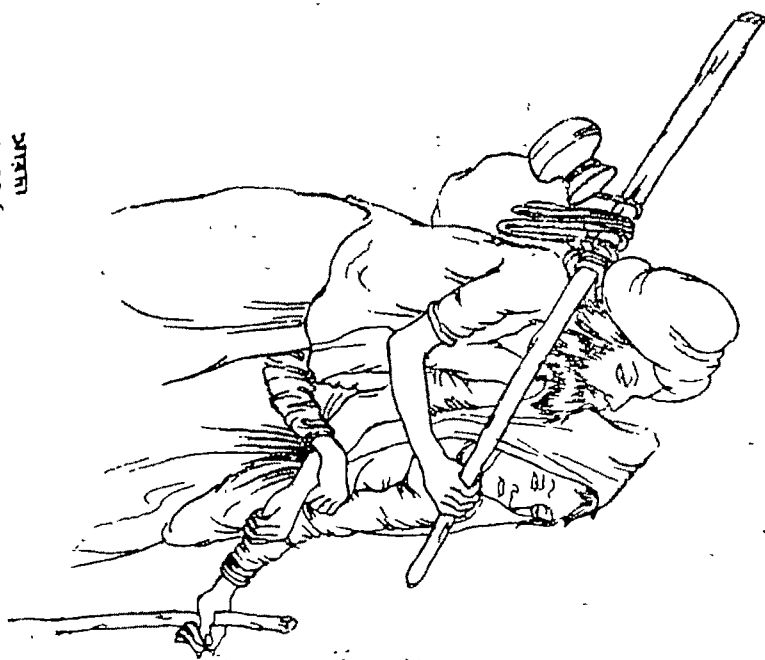
চিত্রকর শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সৌজত্বে।



প্রণাম
২.৩২৬

চিত্রকর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ডিকিন মহাশয়ের সৌজন্যে।

প্রণাম



যাত্রা
২.৩২৬

চিত্রকর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ডিকিন মহাশয়ের সৌজন্যে।

যাত্রা

হারামণি

গত পৌষ সংক্রান্তিতে কেন্দুবিষের মেলায় বাউলদের
কাছ থেকে কতকগুলি গান সংগ্রহ কবেছিলাম, সেগুলি
ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করুব। এবার যে তিনটি গান দেওয়া
হচ্ছে, এগুলি গায়ক—রঘুনাথ দাস, বয়স ৪৫ বৎসব,
বাসগ্রাম মাটিয়াডা, থানা ভরতপুর, পোষ্ট অফিস যজ্ঞান,
সাব-ডিভিজন কান্দী, জেলা মুর্শিদাবাদ। রঘুনাথ
দাসের গুরুর নাম শাবদ মোহান্ত বা স্ফটাদ।

১

ওরে অহুমানো ভাব্লে মাহুষ ধরা যাবে না।
যদি বর্জমানো ধ্বতে পার, নইলে পারবে না ॥
সেই মাহুষ করুছে খেলা,
আর সেই মাহুষ করুছে লীলা,
যদি মাহুষ দেখে করুছ হেলা তবে কিছুই হবে না।
আমিঃশুনি সাধুজনার কাছে—
এই মাহুষে সেই মাহুষ আছে,
তুগি যুক্তি নাওগে গুরুর কাছে, নইলে পাবে না।
সেই মাহুষ-রূপে নন্দের ঘরে,
আর মাহুষ-রূপে বলির দ্বাবে,
সেই মাহুষ আছে সব আশ্বারে,
(পাগল মন) চিন্তে পার না।
দাস রঘুনাথের এই বাসনা—
সেই মাহুষ কবি উপাসনা ;—
আমাব গৌসাই স্ফটাদের এই চরণ বিনা
আমি চিন্তে পারলাম না ॥

২

যবে গুড় থাকিতে মন বে ময়রা ভিয়েন করুলি না ;—
তোব সাধের খোলা রইল পড়ে'
হাতা তাহায দিলি না।
গুড় রাখলি পেলে ভবে',
পেলের মুখ না লেপিলে,

ডোরো পিঁপড়ে জুটে গুড় সব খেলে লুটে ;
তাতে ভিয়েন করুলে মাল জমিত রে,
তুই ভিয়েন করতে গেলি না।
আগুন আছে তোর ঘরে,
সে জলছে জোর করে',
এই বেলাতে তাড়াতাড়ি নে ভিয়েন করে'।
মোর রসেব খোলা জুড়িয়ে গেলে
শেষে ভিয়েন করা হবে না।

দাস রঘুনাথ ভণে—

মনের নিষ্ঠা-আগুনে

গুরুর প্রতি দৃষ্টি কবি বসুগে ভিয়েনে।

কোরো না আখার পাড়ে আঁকাবাকি,

তা হলে ভিয়েন কবা হবে না ॥

৩

তারে দেখবি যদি নয়ন ভরে'

এ ছটো চোখ কর রে কাণ।

আর শুনবি যদি সে মধুর বুলি,

তো বাইরের কানে আঙুল দে না।

কিসের মধু চিনি সে যে,

গাঢ়-প্রেমের মিছরি-পানা ;

আবার খাবি যদি কসে' এঁটে,

তো বেধে বাধু তোর কু-রসনা।

রাজার রাজা,—তার হজুরে

যাবি যদি নাই বে মানা,—

পরশমণি পরশ কবে'

হতে যদি চাও রে সোনা।

ওরে কাস্ত বলে সে-সব

আছে আমার প্রাণে জানা,

আমি জেনে শুনে ভেবে শুনে

তুলে রইলাম কি কারখানা ॥

সংগ্রাহক—

শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত ও শ্রীঅনাথনাথ বসু

সাধনা ও সিদ্ধি *

কথারস্তু মহাত্মা রামমোহন রায়ের পবিত্র নাম গ্রহণ করি,—যাঁর সাধনায় বর্তমান ভারতের সকল প্রচেষ্টার সিদ্ধির বীজ উদ্ভূত হয়েছিল; যিনি নব্য ভারতের সৃষ্টিকর্তা; অজ্ঞানকুসংস্কারাচ্ছন্ন অমানিশায় যিনি জ্ঞানেব বর্জিকা হস্তে জীবনেব সকল পথে অগ্রসর হয়েছিলেন; ১০০ বৎসরেরও পূর্বে যিনি জীবনবাহীতে জাগরণের স্বর তুলে স্বপ্ন দেশ-বাসীকে নূতন পথের পথিক হতে আহ্বান করেছিলেন; ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রে যিনি সর্বপ্রথম সংস্কার-চেষ্টা আৰম্ভ করেছিলেন; আধুনিক বঙ্গভাষার একজন জয়দাতা প্রাতিশ্রুতীসেই রাজা রামমোহন রায়! রামমোহনের সিদ্ধির মূলে ছিল তাঁর আজীবন সাধনা। সাধনা বিনা সিদ্ধি নাই, এই কথাই আজ আমি বাঙালী যুবককে বড় আশা করে বসতে এসেছি। আজ এই জীবনসম্বন্ধে জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে আমি শিখেছি ওই একটা পরম সত্য—সাধনা বিনা সিদ্ধি নাই।

আজ বাঙালীকে এই পরম সত্যটি গ্রহণ করতে হবে—শুধু মুখস্থ করা নয়, শুধু স্বীকার করা নয়, একবারে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মহামতি গোপলে বলেছেন—What Bengal thinks to-day, the whole of India thinks to-morrow—বাঙালীর মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তা সারা ভারত গ্রহণ করে। রামমোহনের সময় থেকে মস্তিষ্কচালনার ক্ষেত্রে বাঙালী অগ্রণী বলে গণ্য হয়ে এসেছে—বাঙালার কোলে অনেক ধর্মসংস্কারক, সমাজসংস্কারক, স্বলেখক, বৈজ্ঞানিক, দেশবিশ্রুত বাগ্মী, জ্ঞানগ্রহণ করেছেন—বুদ্ধিম, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি এক এক ক্ষেত্রে এক এক জন দিকপাল বাঙালার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়ে দিয়েছেন। বাঙালী আগুয়ান হয়ে চলেছে স্বীকার করি—তবু আজ একবার বাঙালী যুবককে কঠোর আত্মপরীক্ষা করে দেখতে হবে, তার চরিত্রের গঙ্গদ

কোথায়, অন্তরের কোন্ বাধাটা তার চলার পথে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে।

সফ্রেটিং বলেছেন, যারা আঠার বৎসর পার হয়েছেন, তাদের উপদেশ দিয়ে কোন ফল নেই। তাই আমার বক্তব্য আজ দেশের যুবকবৃন্দের কাছে—যারা আমাদের ভবিষ্যতের আশা—আমাদের হৃদয়ের ধন। এই সম্পর্কে আর এক কথা এই যে “ন ক্রবাং সত্যমগ্রিম্”, এটা আমাব কাছে নিতান্তই বাজে কথা;—আমি বলি “ক্রবাং সত্যমগ্রিম্” অগ্রিম সত্য বলতে হবে—দেশবাসীকে প্রীতি নিবেদন করে খুব স্পষ্টভাবেই তাদের তুল ভ্রান্তি দেখিয়ে দিতে হবে। পত্রাবরণে ভগ্ন স্থান লুকিয়ে রাখলে দুর্গ-প্রাচীরও সহজেই ভূমিসাৎ হয়ে যায়। ঢাকলে অভাব ঘোচে না; অভাবকে সকল সময়েই মোচন করতে হয়,—আর তার জন্তে চাই কঠোর আত্মপরীক্ষা, আর তীব্র বেগবতী ইচ্ছাশক্তি।

দুই বৎসর পূর্বে মাদ্রাজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত প্রিন্সিপাল আয়েজার তাঁর বক্তৃতায় একস্থলে কতকগুলি মূল্যবান তথ্যপূর্ণ কথা বলেছিলেন। কথগুলি এই, যে, অনেক কষ্ট স্বীকার ক’বে এবং যথেষ্ট ধৈর্যসহকারে তিনি মাদ্রাজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আঠার হাজার গ্রাজুয়েটের জীবনেব ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ৩৭০০ জন সরকারের চাকরী করেছেন, তাঁরও অধিক ইন্সলু মাষ্টার হয়েছেন, আর ৭৬৫ জন ডাক্তার হয়ে বাহির হয়েছেন। এই তালিকা দৃষ্টে এঁরা ভবিষ্যৎ জীবনে কি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা অতি সহজেই অনুমেয়। মাদ্রাজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদারীগণ জীবনের একটানা বাধা রাস্তা ছেড়ে জ্ঞানজগতে নব নব পথেব সম্মানে বের হন নি। আর মাদ্রাজী গ্রাজুয়েট সম্বন্ধে যা সত্য, বাঙালী গ্রাজুয়েট সম্বন্ধে সেই কথাই সর্বোতোভাবে প্রযুক্ত। বাঙালী দেশেও ঐ—একই দশা—কেরানী, মাষ্টার, ডাক্তার আর উকীল। আর সেই গলাধঃ-করণ, উদ্বিগ্নতা, পবীক্ষাপাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ, তারপর

* ১২ই মাঘ ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত বক্তৃতা সারাংশ শ্রীযুক্ত রতনমণি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক লিপিবদ্ধ।

মা সরস্বতীর সঙ্গে সেলাম্ আলেকম্। মুন্সেফ, ডেপুটী, জজ,—তা মাদ্রাজী গ্রাঙ্জুয়েট বাঙালীর সঙ্গে পাক্সা দিয়ে হ'য়ে গিয়েছেন, কিন্তু সবাই বাধা ওই চাকরীর ঘানীতে আর সবার অন্তরের কথা হচ্ছে—“মা আমায় ঘুরাবি কত—কলুব চোপ-ঢাকা বলদের মত।”

আবার এই গ্রাঙ্জুয়েট উৎপন্ন করবার শক্তি মাদ্রাজের চেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই বেশী। এই ব্যাপারে কলকাতা সবার অগ্রণী—কিন্তু হেসো না, এ-সব ঘরের কথা বাইরে না যায়। অসহযোগ, সহযোগ স্বীকার করি না; এবার ২০,০০০ ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবে আর শতকরা অন্ততঃ ৮০ জন পাশ হবে। কিন্তু একজন উপাধিকারী কি প্রকার কৃপণগুরু তা চিন্তা করলে মন বিষাদিত হয়। বর্তমান প্রাণহুমারে একজন এম-এসসি কিনা এম-এ'র ভূগোলের কোন জ্ঞান না থাকলেও চলতে পারে। ইতিহাস পাঠও ইচ্ছাধীন। আব্রাহাম লিঙ্কলন্, ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতির নাম শোনে নি এমন গ্রাঙ্জুয়েটও অনেক আছেন। ভূগোল চাই না, ইতিহাস চাই না, দেশের কথা চাই না, পৃথিবী' কথা চাই না,—শুধু পাশ করে' যাও—ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ, ফাষ্টক্লাস, সরেস এম্-এ। উচ্চশিক্ষিত যুবক হয়ত ম্যাট্রিসিনীর নাম শুনেছেন—গ্যারীবাণ্ডিকেও হয়ত মন্ত একটি বীর বলে জানেন কিন্তু কাব্রের কথা জিজ্ঞাসা করলেই মাথা চুলকাতে আরম্ভ করবেন। যদি প্রশ্ন করি আমেরিকায় অস্ত্রবিবাদ (Civil War) কেন হ'ল—এ বিপ্লবে কে কে রথী ছিলেন—লিঙ্কলন্ জ্যাকসন্ কে, কোন্ পক্ষ জয়ী হ'ল, বিরোধের ফলাফলে দেশের লাভ লোকসান কি হ'ল? তাহলেই ফিনসকির ফাষ্টক্লাস এম্-এ একবারে অবাক হ'বে ই' ক'রে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবেন;—এ-সব আবার কি? প্রফেসরের কোনো নোটে ত এ-সব লাল নীল সবুজ পেন্সিলে দাগ দিয়ে কব্বিন্ কালে পাঠ করি নি।

চতুর্থবার বিলাত গিয়ে গতবৎসর এই সময় আমি দেশে ফিরে আসি। সেখানে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, বার্মিংহাম, লীড্‌স্, এডিন্‌বরা প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেছি। অনেকস্থলে এক একটা কলেজ এক একটা বিশ্ববিদ্যালয়। নানা বিভাগশীলনের জন্ত বিভিন্ন বিভাগ

রয়েছে আর প্রত্যেক বিভাগেই পাঁচ ছয় জন ছাত্র সেই বিশেষ বিভাগ সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করছেন। আর পর পর এমন বড় লোক ঐসকল বিদ্যামন্দির থেকে বাহির হ'য়ে আসছেন, বা ভাবলে আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে হয়। এঁদের অনেকে একটা বিশেষ বিষয়ের গবেষণার নেশায় ভরপুর হয়ে সারা জীবন উৎসর্গ করে' দিয়েছেন। শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ একের শূন্যস্থান অপারে পূরণ করছেন। আর এই-সকল বিষয়ের বৈচিত্র্যই বা কি! একখান। “নেচার” তুলে নিবে চোখ বুজে তার যে-কোন স্থান খুলে য়ুরোপে অমুশীলিত কত রকম বিদ্যার কত রকম রোজনাশুচা যে দেখতে পাওয়া যায়; সেখানে কতশত অমুসন্ধান-সমিতি, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, রাষ্ট্রনৈতিক, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতিতে মানবের জ্ঞানভাণ্ডার নিষত পরিপুষ্ট করছে। এই ইউরোপের সব দেশে স্বাধীন চিন্তার স্রোত নিষত মানবের জীবনকে কত উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাচ্ছে,, যে তার আর শেষ নেই। কত শত বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে কত শত প্রচেষ্টা, কত অমুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, কত একনিষ্ঠ জ্ঞানসাধকের ঐকান্তিক চেষ্টা এ-সব দেশে বিদ্যার্থীগণের তথা জনসাধারণের চিন্তাবৃত্তিকে সদা জাগ্রত করে' রেখে— দিয়েছে। ৩০০০ বৎসর পূর্বে মিশর, আসীরিয়া, বাবিলন প্রভৃতি দেশে লোকে কিরূপ জীবনযাপন করছিলেন সেই-সকল প্রত্নতত্ত্বের বিচারের ফলে য়ুরোপীয় স্বধীর্ঘ জ্ঞান-রাজ্যের এক একটা নূতন দিক উন্মুক্ত করে' দিয়েছেন যার নাম হয়েছে—ইজিপ্টোলজি, আসিরিওলজি ইত্যাদি। লেয়ার্ড, রলিন্সন, পেট্রি (Layard, Rawlinson, Petrie) প্রভৃতি এই-সকল বিজ্ঞান হোতা।

তার পর প্রাচ্যের প্রান্তে এসে দেখা যাক। আপানে তোকিও, কোবে, কিয়োটো, প্রভৃতি বিখ্যাত নগরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নোষ্ঠবে ও জ্ঞানামুশীলনে সর্বাত্মক য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অমুরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সেবার বিলাতগামী জাহাজে আমার সঙ্গে প্রায় দুই শত ভারতবাসী ছাত্র ইউরোপে চলেছিলেন। এঁদের মধ্যে দুই এক জন ছাড়া সবাই কেমন করে' ফাঁকি দিয়ে একটি বিলাতি সস্তা ডিগ্রি এনে দেশী ডিগ্রির উপর টেকা দিবেন সমস্ত সময় সেই চিন্তা ও পরামর্শ করছিলেন। আমাদের

দেশের ১০-সব ছাত্র মাট্রিক বা আই-এ, আই-এসসি প্রভৃতি পাশ করে' বিলাত চলে' যান, দেখতে পাওয়া যায় জ্ঞানান্বেষণ তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তাঁদের চিন্তা, কি করে' শীঘ্র একটা বিলাতী ডিগ্রি নিয়ে এসে দেশবাসীর চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেবেন। জাপানী ছাত্র আপন দেশে কোন একটি বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করবার পব যুরোপ যান এবং সেখানে সেই বিশেষ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ মহামহোপাধ্যায়ের নিকট অবস্থান করে' সেই বিষয়টিই শিক্ষা করেন। আর আমাদের ছাত্রগণ অনেকস্থলে ভিটে মাটি বেচে, কেউ বা বড়লোকের জামাতা হবার লোভে ডিগ্রী লাভের আশায় মুগ্ধ হ'য়ে বিলাত যান। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই বে এরূপ ঘটে তা বলছি না। এর ব্যতিক্রম আছে নিশ্চয়ই। আমাদের ছাত্র জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও মেঘনাদ সাহা বিদেশে একবার জাপানী ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করে- ছিলেন, “আপনারা কি লণ্ডনের ডিগ্রী নিতে এসেছেন?” তাঁরা জাতীয় গর্বে অল্পপ্রাণিত হয়ে বলেন, তাঁরা নিজেরদের দেশের ডিগ্রীকে কোন প্রকারে হীন জ্ঞান করেন না। আমাদের দেশেরও উক্ত শ্রীমান্বেষ বিলাতি ডিগ্রির মোহে স্বাদেশিকতাকে খর্ব করেন নি, এ পরম গৌরবের কথা। বাস্তবিক ঐ-সব জাপানী ছাত্র এসেছেন, স্তব জোসেফ টমসন, রাদারফোর্ড প্রভৃতি বিজ্ঞানবিশারদদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করবার জন্য, ডিগ্রীলাভের জন্য নয়।

কিন্তু আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে সেই ১৮৮৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বে হাজার হাজার গ্রাজুয়েট উৎপন্ন হয়েছে তাদের মধ্যে ক'জন পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে নিজের কিছু দিতে পেরেছে যা একেবারে মৌলিক ও নূতন, যাতে মানবের জ্ঞান পুষ্টিলাভ ক'রে বৃদ্ধি পেয়েছে। কেহই বে কিছু দেন নি এমন কথা বলছি না। ব্যতিক্রম ত আছেই। কিন্তু তাঁদের আজীবন সাধনার ভিতরের কথা কে বুঝার চেষ্টা করে—কে তাঁদের অহেতুকী জ্ঞানতৃষ্ণার যথার্থ সম্মান করতে পারে? এখানে বে সব ছাত্রই ডিগ্রী চাচ্ছেন আর চাকরী করছেন! কোন বিষয়ে কৃতিত্ব ত কেউ দেখাতে পারলেন না। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার দেশের শ্রেষ্ঠ ইতিহাসিক। আপন বোজ্জগাবের প্রদান

অংশ পুরাতন পার্সী পুঁথি ক্রয় করতে ব্যয় করেছেন, পাটনা খোদাবক্স লাইব্রেরীতে বৎসরের পর বৎসর ধরে নিবিষ্টভাবে অধ্যয়ন করেছেন। তাই মোগলযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি আজ Authority বা প্রামাণ্য পণ্ডিত। তাঁর উপর আর কেউ কথা বলতে পারেন না, এদেশেও নয়, যুরোপেও নয়; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীই এর পাণ্ডিত্যের কারণ নয়—এই কৃতিত্বের পশ্চাতে রয়েছে তাঁর জীবনের সাধনা।

কি কুক্ষণেই শিক্ষিত বাঙালীর চাকরীর দিকে ঝোঁক পড়েছিল। সেই পুর্বাতন হিন্দুকলেজের ছাত্র হ'তে আরম্ভ করে সকলেই আজ চাকরীর উমেদার। হিন্দু কলেজের ছেলেরা যারা মাইকেল-রাজনারায়ণের সমপাঠী—তাঁরা গ্রাজুয়েট হ'লেই প্রথম লর্ড হার্ভিল্ডের গবর্নমেন্ট তাঁদের ডেকে বড় বড় চাকরী দিতেন। এই সময় থেকে মতিগতি যে চাকরীর দিকে গেল সে আর ফিরলো না। বাঙলার ধনে ইংরেজ-মাদোয়ারীর সিন্ধুক বোঝাই হ'ল, আর বাঙলার গোপালেরা শাস্ত শিষ্টভাবে ডিগ্রীলাভের সাধনা করতে লাগলেন। সাধনা—ডিগ্রী, তাই সিদ্ধি—চাকরী।

এইরূপে আদর্শ খাটো হ'য়ে গেল। তাই গভীর জ্ঞান-সাধনা দেশে প্রতিষ্ঠিত হ'ল না। ভাসা-ভাসা জ্ঞানেই বাঙালী যুবক সন্তুষ্ট থাকতে শিখলেন। মল্লিনাথ, বসন্ত, তারাকুমার, সাবদারওয়ান—এই-সব টাকার সাহায্যে এক সর্গ ভট্ট, বা রঘুবংশ প'ড়েই সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হলেন, কেউ বা আধ সর্গ প্যারাইডাইস-লটের নোট মুখস্থ করে' ইংরেজি সাহিত্য দখল কবে' বললেন। কিন্তু লাইব্রেরী থেকে একখানা বাহিরের বই নিবে কেউ পড়ে' নেই—না—বেহেতু সে পাশ করার কাজে লাগে না। এখন বিশ্ব-বিদ্যালয় হ'তে ভূগোল এক প্রকার নির্বাসিত হয়েছে; ইতিহাসও না পড়লে চলে। বাস্তবিক কি লজ্জা, কি পরিতাপের কথা যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ এম-এ, এম-এসসিগণ অশিক্ষিত, অধ্বশিক্ষিত অথবা কুশিক্ষিত। ক্যালেণ্ডারে পাঠ্যপুস্তকের তালিকা অল্পকোর্স, কেব্লিজ, হার্ডবার্ডকেও ছাড়িয়ে যাব। কিন্তু সারা ছুবছর ফুটবল ক্রীকেট খেলেছে ও দেখেছে বলে' আমার এক বন্ধু যখন আপন পুত্রের এম-এ পাশ করা সম্বন্ধে হতাশ

হয়ে পড়লেন, তখন চতুর পুত্র কবেক দিনের মধ্যে যেদ থেকে যেদান্তব ঘূবে নোট জোগাড় করলে এবং পরীক্ষকের মন জুগিয়ে চলে' অবহেলে পাশ করে' ফেলে বাপকে একেবারে তাক লাগিয়ে দিলে!

তাই বলি সর্বনাশ হয়েছে এই ভাসা-ভাসা জ্ঞানে, আর অতি সস্তা পাশে। কিস্ক্যাল-কমিশনে আর ইব্রাহিম রহিমতুল্লা, ঘনশ্রামদাস বিব্লা প্রভৃতি রস্বেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডারে এঁদের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ক্যালেন্ডারে খাঁদের নাম জলজল করছে সেই (Cobden Medallist) স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত - বাঙালী যুবক ত ঐ অতি প্রবোজনীয় ব্যাপারের আলোচনাও আহুত হলেন না। স্তাব বিষ্ঠলদান ঠাকরুনে বড় বড় কলের মালিক—পরন্তু “গোষ্ঠ মেডেলিস্ট” নন। টাকা নিষে হাতে-কলমে কাছ করেন বলে' মহামতি গোথলে বজেট-বক্তৃতা প্রস্তুতের কালে তাঁর পরামর্শ বহুমূল্য জ্ঞানে গ্রহণ করতেন। ভারতবর্ষে রেলওয়ে-কাব্বার-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে তাঁর মতামত-বহুমূল্য বলে' বিবেচিত হয় তিনি হচ্ছেন-ডিগ্রীহীন সাতকড়ি ঘোষ। চিন্তামণি, কালীনাথ রাধ প্রমুখ সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ অনেকেই ডিগ্রীশূন্য; কিন্তু এঁরা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে যে-সব মূল্যবান কথা লেখেন, বড় বড় ডিগ্রীধারীগণ তা থেকে ঘণ্টে শিক্ষালাভ করতে পারেন।

আমরা নিজেদের আধ্যাত্মিক জাতি বলে' গর্ব করবে' থাকি আর যুরোপীয়দের জড়বাদী বলে' গালি দিই। কিন্তু জড়বাদী ওরাই আমাদের দেশের স্থানে স্থানে নানা কুঠালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপন করে। ভারতবর্ষে ৭২ টি কুঠালয় আছে, তন্মধ্যে দেওবরে বোগীজননাথ বহু কর্তৃক স্থাপিত একটা ছাড়া আর সবই তো ওদের। ফাদার ডামিয়েন তাঁর জীবাই তো কুঠীর সেবায় তিলে তিলে বিলিয়ে দিলেন! আন্তর্কে কেউ কোলে তুলে নিচ্ছে আবার কেউবা বন্ধে—ওকে ছুঁয়ে না। বাস্তবিক কি বৈচিত্র্য ওদের জীবনে! জ্ঞানবার, বুঝবার, পারার কি ছুঁবিবার চেষ্টা! কেউ হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করবার জন্তে বৎসরের পর বৎসর চেষ্টা করছেন, তাঁর আয়োজনই বা কত, কেউ বা আফ্রিকা মহাদেশের

কিলিমেঞ্জেরো পর্বতের চিরতুহিনাচ্ছন্ন চূড়া কোন চিরনূতনকে দেখবার প্রয়াস করছেন। স্ব-উচ্চ গিরিদেগে স্বাসরোধ হয়ে কেউ বা প্রাণ হারিয়েছে—তু দূকপাত নেই! মস্তের সাধন কিম্বা শরীর পাতন। মেক্সিকো প্রদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা জানবার জন্ত ফ্রাঙ্কলিন, জ্যানসেন, জ্যাকস্টন প্রমুখ অসুস্থস্বাস্থ্য কত অসাধ্য না সাধন করেছেন। মাহুষের যা সাধ্য তা এঁরা করবে, আবার মাহুষের যা অসাধ্য তাও এঁরা করবে। কি বিপুল দুর্দান্ত জীবন! উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ ইংরেজ লুকার বিচিত্র লতাগুল্লের সম্বন্ধে দিকিম প্রদেশে গিয়ে সেখানে বন্দী হলেন। তাই নিয়ে যুদ্ধই বেধে গেল। যুদ্ধজয়ের পর তিনি মৃত হলেন। তাঁর Flora Indica বর্ণিত সংগ্রহ বিলাতে কিউ গার্ডেনে (Kew Garden) কত যত্নে রক্ষিত হয়েছে। আবার পশুতত্ত্ববিৎ যুরোপীয়ান সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-স্বাপদসকল আফ্রিকার জঙ্গলে খাঁচার মধ্যে বান করে' মার্শের পর মাস কাটিয়ে দিচ্ছেন—উদ্দেশ্য গরিলা দিমপাঞ্জী প্রভৃতি বনমাহুষের অভ্যাস ও আচরণ জানবেন; তাদের ত ভাষা নেই, তাই সঙ্কেতে তাদের ভাববিনিময় লক্ষ্য করবেন। এমনি অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারেই তাঁরা সত্যের আবিষ্কার করেন।

জ্যোতির্বিদ্যা, টাইকো ব্রেহী, কেপ্লার, গ্যালিলিও, নিউটন, হার্শেলের সম্পর্ক কত নিবিড়, কত গভীর! এত গভীরতা শোণিতসম্পর্কে কোথায় পাবে! গ্যালিলিও কেপ্লার সমদাময়িক ছিলেন। কেপ্লারের অভাবে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলীর আবিষ্কারের পথ সুগম হত না। কত বিনিয় রজনীতে উদার উন্মুক্ত অসীম আকাশের দিকে কি আনন্দে কি আশায় এঁরা চেয়ে থাকতেন! কি অমূল্য রত্ন এঁরা পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারে দিয়ে গেছেন। এঁদের জ্ঞান-সাধনার মূলে গভীর অভিনিবেশ! একবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে এঁরা সাধ্য বস্তুর সন্ধান করেছিলেন, তাই সিদ্ধিলাভ ঘটেছিল। জ্ঞানান্বেষণে নিউটন এমনই ভগ্ন হ'য়ে যেতেন যে আপন আহ্বারের কথাই বিস্মৃত হতেন। একদিন নিউটন গভীর চিন্তায় মগ্ন। ভূত্যা আহাধ্যাত্রা সম্মুখে রেখে গেল। তাঁর বন্ধ কোঁতুক ক'বে সেইগুলি খেয়ে নিয়ে

হাড়গুলি ঢাকা দিয়ে রাখলেন। ধানভণ্ডের পর আহার, গিয়ে পিছনে পড়ে গেছি। সর্বনাশকারী পল্লবগ্রাহিতা কর্তে গিয়ে নিউটন দেখলেন হাড়গুলি পড়ে আছে। অতএব পণ্ডিতবর সিদ্ধান্ত করলেন তাঁর আহার হয়ে গিয়েছে কিন্তু অত মনে নেই। তাই পাছে কেউ ঠাট্টা করে এই আশঙ্কায় চারিদিক চেয়ে দেখান থেকে চলে গেলেন। কি আপন-ভোলা ভাব! একপ তন্নয়নের আরও কয়েকটি নিদর্শন দেখাই। রেনেসাঁস যুগে প্যারিস নগরে হোমারভক্ত প্রোটেষ্ট্যান্ট স্থানিগার আপন ঘরে পাঠে নিমগ্ন; এদিকে বাহিবে হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল (Massacre of St. Bertholomew); কত প্রোটেষ্ট্যান্টকে খুন করা হল, কিন্তু তিনি এমনই তন্নয় যে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপার তাঁর পরদিন জানলেন। এথেন্সের সৈন্যদলভুক্ত হয়ে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সক্রেটিস একটানা ২৪ ঘণ্টা নিত্যক হ'য়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতেন, তবেই ত দুকহ তত্ত্বসমূহের মীমাংসা পেতেন। গ্রীকদর্শনের তিনি শ্রেষ্ঠ গুরু। প্লেতো তাঁর শিষ্য। ভাষাতত্ত্ববিদ বুদ্ধিসংগর বিবাহদিনে গিরজায় কনে এসেছেন, অস্ত্রাস্ত্র বরষাত্রী ও কন্ধ্যাত্রীও উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু বর কোথায়? বরকে ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন বরের পাঠগৃহে গিয়ে দেখা গেল তিনি ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় মগ্ন আছেন। ঋষি বিয়ে তাঁব মনে নেই। রোমান সৈন্য যখন আর্কিমিডিসকে খুন করতে এসেছে তখন আর্কিমিডিস বললেন—দাঁড়াও একটু, এ বৃত্তটা নষ্ট করে দিও না, এ প্রমাণটা শেষ করি। বর্বর সৈনিক তাঁকে খুন করে জগতেব মহৎ সত্য উদ্ঘাটনের পথ হয়ত কঙ্ক করে দিয়ে গেল। এগুনই করে আপনহারা হয়ে সাধনা না করলে কি কেউ কখনও কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে?

এই নিঃস্বার্থ সাধনায় সকলেই মুগ্ধ হয়েছে। যেখানে স্বার্থপরতা সেখানেই সঙ্কোচ—স্বার্থপর ক্রোড়পতিব কেউ সংবাদ লয় না। কিন্তু তাঁর অর্থ যখন ‘জনহিতায়’ ব্যয় হয়, তখন তিনি হন শ্রেষ্ঠ ও মাতা। জ্ঞানসাধকের সাধনালক্ষ্য যা-কিছু অ পৃথিবীর সকলেরই সম্পত্তি। তাই তাঁরা সকলেরই বড় আপনার জন। কিন্তু আমরা নষ্ট হয়েছি সাধনার অভাবে, সঙ্কচিত হয়েছি স্বার্থপরতার প্রভাবে। তাই বিদ্যাক্ষেত্রে, র্যাবসাক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রেই আমরা হ’টে

গিয়ে পিছনে পড়ে গেছি। সর্বনাশকারী পল্লবগ্রাহিতা আমাদের নষ্ট করেছে। প্রতাপ মুজুমদার বলতেন “জাপানীরা অপেক্ষাকৃত হীদা, বাঙালী অতি বুদ্ধিমান।” সেইজন্যই বাঙালী আজ দুর্দশাগ্রস্ত। আত্মঘাতী উগ্ম-হীনতা আমাদেরকে স্বল্পায়ুসে কৃতকার্যতা লাভ করতে চেষ্টিত করে। তাই আজ সব ক্ষেত্রেই চাই সাধনা। অন্নসমস্তা, বস্ত্রসমস্তা, অর্থসমস্তা, স্বাস্থ্যসমস্তা প্রভৃতি নানাসমস্তায় পড়ে আমরা সব রকমে মাটি হ’য়ে যেতে বসেছি। এখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে লেগে পড়ে থেকে এক একটি সমস্তার মীমাংসা করতে না পারলে আমাদের আর বাঁচবার আশা নেই।

আর একটা কথা। আমাদের সর্বদা স্বরণ রাখতে হবে চেষ্টামাত্রেরই অথবা কিছুদিনের চেষ্টাতেই যে এই-সকল কঠিন সমস্তার মীমাংসা হ’য়ে যাবে তা কখনই নয়। হুতরাং কাজ আরম্ভ করেই ফলের আকাঙ্ক্ষা করলে চলবে না। মনে রাখতে হবে, প্রাথমিক সাক্ষর কার্যেই করার আনন্দটাই মুখ্য, পাওয়ার আনন্দ নয়; মুগ্ধায় যেমন অধেষণেই আমোদ, তেমনি প্রকৃতির গুঢ়রহস্য ধীরে উদ্ঘাটন করেন তাঁদের সেই চেষ্টাতেই অপার আনন্দ। আজ আমাদের তাই এই প্রচেষ্টার আনন্দের আনন্দ গ্রহণ করতে হবে। জার্মান দার্শনিক লেপিং সম্বন্ধে একটা কথা আছে যে যদি ঈশ্বর এসে তাঁকে বলতেন—তুমি সত্য চাও না সত্যের সন্ধান চাও, তবে তিনি জবাব দিতেন—আমি সত্যের সন্ধান চাই, কিসে পাব, কেমন করে পাব, এই সে দেখা দেবে, পরক্ষণে আড়ালে লুকোবে; এই খোঁজের খেলার বিপুল আনন্দে আমি ভরপুর হ’য়ে থাকতে চাই। এই ত প্রাণবন্তের লক্ষণ; বাস্তবিক আনন্দ প্রাপ্তিতে নয়, অধেষণে। আর এই অধেষণ বা সাধনা একই কথা।

ধর্মজগতে বুদ্ধি, যীশু, মোহাম্মদ, চৈতন্য—এঁদের সিদ্ধিলাভের ইতিবৃত্ত একই। জনকোলাহলের বাহিরে পর্বতে জঙ্গলে, গুহার মধ্যে জীবনের কিয়দংশ সাধনা করে এঁরা ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। অরণ্যে লোকচক্ষু অস্তরালে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ গ্রথিত হয়েছে। আবার বুদ্ধদেবেরও অপর নাম এইজন্য “সিদ্ধার্থ”; আমরা অতীতেব ‘গন্ধ’ কবে’ থাকি, কিন্তু

অতীতের প্রাণের লক্ষণগুলিকে আপন জীবনে ফুটিয়ে তুলতে চাই না;—অতীতের সিদ্ধি উপর আমাদের লোভটুকু বোল আনা আছে, কিন্তু তার জীবনব্যাপী কঠোর সাধনার কথা শুনেই আমরা আতঙ্কে মরে যাই। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা আজ শতদলপদ্মের মত বিকশিত হয়েছে। কিন্তু একটির পর একটি করে এই শতদল ফুটেছে,—এর পিছনে আছে একনিষ্ঠ সাধনা। গোথলে ইন্সলমাঠার ছিলেন, শ্রীনিবাস শাস্ত্রীও ছিলেন। পরাধীনপেও তাই। ৭৫ টাকা মাহিনায় গোথলে ফার্মগুন কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। কিন্তু গোথলে আজ দেশপূজ্য, তার কারণ তিনি দেশসেবার সাধনা করেছিলেন। এই দারিদ্র্যব্রতধারীর বজ্রেট-বজ্রতায় ব্যবস্থাপক সভায় লার্ট কন্সট্রাক্টর কাপ্তেন। আর এক প্রাতঃস্মরণীয় মহামনীষীর কথা বলে আমার কথা শেষ করি;—তিনিও দারিদ্র্যব্রতধারী, মহাসাধক মহাত্মা গান্ধী। গান্ধী আজ বিশ্ববিজিত। কিন্তু একদিনেই কি তাঁর নাম সারা বিশ্বের বিশ্ব উৎপাদন করেছে? ২১ বৎসর পূর্বে আলবার্ট হলে দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতবাসীদের হৃদয় দেশবাসীর নিকট বিবৃত করতে আমিই প্রথম তাঁকে আহ্বান করি। স্বর্গগত নরেন্দ্রনাথ সেন সেই সভায় সভাপতি ছিলেন। গান্ধীর বক্তৃতার বিষয় ছিল—কেপ কলোনিতে (Cape Colony) ভারতবাসীর অশেষ হৃদয়শার কথা। মহাত্মা তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের নেতা। তিনি দেশবাসীর

হিতের জন্ত আপনাকে একবারে নিঃশেষ করে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। নেটাল প্রদেশে তিনি তাদের সঙ্গে তুল্য ভাবে নিগৃহীত, নিপীড়িত, লাহিত ও অত্যাচারিত হয়েছিলেন। মাশে ৫১৬ হাজার টাকা আয়ের ব্যারিষ্টারী তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে সবার ব্যয়বৈক্য বুক পেতে দিবে গ্রহণ করেছিলেন। কতবার জেলে গেছেন, কত কষ্ট সহ্য করেছেন, মেধারের কাজ পর্যন্ত করেছেন। তাই ত তিনি আজ জনসাধারণের হৃদয় মন অধিকার করতে পেরেছেন। আজ অন্ততঃ ২৭১২৮ বৎসর যাবৎ তিনি নিগৃহীত ভারতবাসীর নেতা—যেখানে অত্যাচার উৎপীড়ন, সেইখানেই মহাত্মা গান্ধী; তাই আজ তাঁর নামে দলিত জনসংঘের প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে—আশাষ উৎসব হয়। এই অনন্তপ্রতিবন্ধী-প্রভাবের পশ্চাতে রয়েছে মহাত্মাজীর আজীবন সাধনা।

রামমোহন রায়কে বাঙালীর ঘরে পাঠানো বিধাতার একটি বিশেষ-বিধান বলে আমার মনে হয়। আমার স্থির বিশ্বাস, বাঙালীর স্বারাই ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের পথ উন্মুক্ত হবে। কিন্তু এই গোরবের পদ অধিকার করতে হলে বাঙালীর জীবনে জাজ চাই সাধনা—‘বিতল তিল করে’ আত্মদান। বাঙালী আজ স্থিরপ্রতিষ্ঠ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে, ব্যক্তিগত স্বার্থের ক্রমশঃ জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের কাজে লেগে পড়ে থাকলে ভারতের নিদারুণ হৃদয়শা ঘুচেবেই। আজ বিধাতার ইঙ্গিত—বাঙালীর সাধনা ভারতে সিদ্ধি আনয়ন করবে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

ভ্রমর ও প্রজাপতি

জীবনটা এই—পথের ধারের ফুল,
চুচ্ছ ভেবেই প্রজাপতি তার কাছ থেকে রম্য দূর;
ভ্রমর কিন্তু করে না মোটেই ভুল—
সন্ধানী সে যে, ব্যথার বদলে মধু খায় ভরপুর ॥

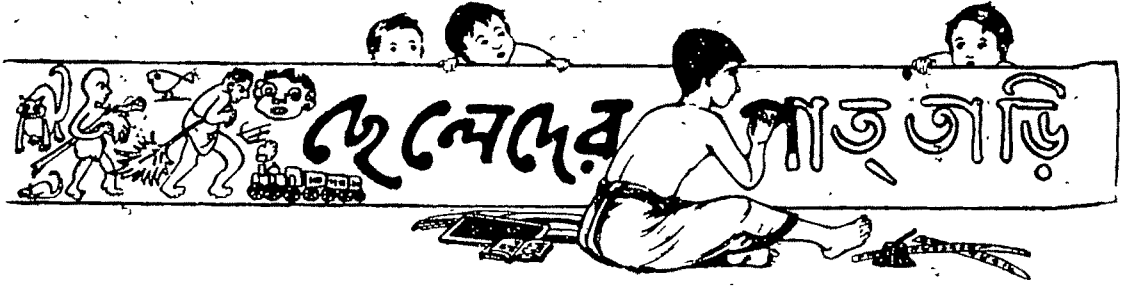
শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

ভক্ত ও ভগবান

মদ-এ-খুদা ন-বাশদ—
বলেক্ অজ খুদা জুদা ন-বাশদ। •

ভগবৎ-ভক্ত জন ভগবান নয়—
ভগবান হ'তে তবু ভিন্ন কেবা কর?

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন



প্রকৃতির পাঠশালা

বস্তুর রঙের বিভিন্নতার কারণ কি?—আলোকরশ্মির মধ্যে সাতটা রং আছে—বেগুনী নীল আসমানী সবুজ হলুদে কমলা লাল; রঙের নাম কটা মনে রাখবার জন্তে প্রত্যেক নামের আদ্য অক্ষর একসঙ্গে জুড়ে একটা কথা আমরা তৈরি করতে পারি—বেনী-আসহ-কলা। একটা তেশিরা কাঁচের ভিতর দিয়ে যদি সূর্য্যরশ্মি চালনা করা যায়, তবে সূর্য্যের সাদা আলো ভেঙে সাত টুকরো হয়ে ছড়িয়ে যায় বেনীআসহকলা সাত রঙে। আমরা বস্তু দেখতে পাই যখন সেই বস্তু থেকে আলো প্রতিকলিত হবে এগে আমাদের চোখে সেই বস্তুর আকাবের একটি ছায়াপাত করে, আর সেই প্রতিকৃতির — অল্পভূতি থেকে আমাদের বস্তুজ্ঞান জন্মে। বস্তুব গায়ে যখন আলো গিয়ে পড়ে, তখন আলোর সবটুকুই আলোর গা থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসে না, কতকটা আলো সেই বস্তু নিজের শোষণ করে নেয়। যে-বস্তু প্রায় সবটুকু আলোই প্রতিকলিত করে, সেই বস্তুকে আমরা সাদা অর্থাৎ সাতরঙের সমষ্টি দেখি—যেমন কাগজ, চুখ, চুন ইত্যাদি; যে বস্তু কেবল মাত্র লাল রংটুকু ছেড়ে দিয়ে বাকী ছয় রং আত্মসাৎ করে সে বস্তু আমাদের চোখে ঠেকে লাল—যেমন পদ্ম গোলাপ, পাকা মাকাল, তেলাকুচো; এইরূপে কোনো বস্তু বা কেবল হলুদে, কেবল সবুজ, অথবা কেবল নীল রং ত্যাগ করে, আর বাকী অল্প কটাকে গ্রাস করে,—সে-সব বস্তু তাদের তুল্য রঙের হোপেই আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়; কোনো বস্তু আবার নিজের অঙ্গের এক অংশ থেকে এক রং ছাড়ে ও অল্প অংশ থেকে অল্প রং ছাড়ে, তাই দাঁচুরে-আমে আপেলের আর দোপাটা প্রভৃতি ফুলে একসঙ্গেই অনেক রকম রং দেখতে পাওয়া যায়; যে বস্তু সমস্ত

আলোটুকুই শোষণ করে, কিছুই ত্যাগ করে না, তার রং দেখায় কালো—অর্থাৎ সকল বর্ণের অভাব। বস্তুর এই যে আলোর কিছু ভগ্নে নেওয়া ও কিছু ছেড়ে দেওয়া ধর্ম, এর কারণ এখনো নির্ণয় হয়নি; বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন,—ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর, অণু-সংস্থানের তারতম্যই এর কারণ।

আলো জিনিসটা কি?—বহু প্রাচীনকালেই অদিম মানুষ আবিষ্কার করেছিল যে আলো জিনিসটা একটা গতি; যে আলোর তেজ আর উজ্জলতা যত বেশী সে আলো তত বেশী দূর পর্য্যন্ত যায়। যায় ত; কিন্তু কি যায়? এ প্রশ্নের উত্তর নিউটন এই দিলেন যে—আলো থেকে সেই বস্তুর অতি সূক্ষ্ম কথা ছুটে গিয়ে আমাদের দৃষ্টিকে ও অব্যাহ স্থানকে ভরিয়ে তুললেই সেখানে আলোর অল্পভূতিও প্রকাশ হয়। সবাই এই কথা বহু কাল মনে চলেছিলেন—প্রামাণিক সত্য বলে' নয়, নিউটনের মতন একজন অতবড় বৈজ্ঞানিক আন্দাজ করছেন এইজন্তে। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শাস্ত্র আর গুরুর দোহাই চলে না; লোকে নিউটনের সিদ্ধান্তে সন্দেহ করে' সন্ধান লেগে গেল—সত্য যা কেবল তাই মাত্র, সত্যকেই পেতে হবে এই সঙ্কল্প নিয়ে। শেষে আবিষ্কার হল যে আলো একরকমের অদৃশ্য অনন্তভূত পদার্থের তরঙ্গ—এই পদার্থ সর্বব্যাপী এবং এর নাম ঈথার বা ব্যোম।

সুন্দার পোড়ো

গাঁটা তেওয়ারী

(হিন্দুস্থানী গল্প)

রাজ্যমশাই সভায় বসে' বসিচ্ছেন,—চারিধারে পাত্র মিত্র, জ্ঞানী গুণী সকলে তাঁকে বিরে রবেছে; কারুর মুখে একটিও কথা নেই, সকলেই চুপচাপ। এমন সময় একটি

বিটকেল-বামুন-রাজসভায় এসে রাজাকে প্রকাণ্ড এক পড়ে পড়ে ঘুমোয়। রাজার পালোয়ানেরা আর কেউ সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। মাথায় ভারি প্রকাণ্ড এক পাগড়ি সাহস করে তার সঙ্গে লড়তে আসতে চায় না—কি আর কাঁধের উপর সাড়ে তেরো হাত লম্বা এক বাঁশের জানি-বাবা, কাকে কখন লাগি মেরে ছাত্ত বানিয়ে দেবে।

এর মধ্যে একদিন কোথা থেকে একটা বুনো মোষ রাজ্যমশায়ের তজ্জা কোথায় ছুটে গেল, তিনি ভারি ব্যস্ত হবে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর দুই-একবার ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা করলেন—“কে তুমি, কি চাও বাপু?”

সে চটপট বলে ফেলল—“হুজুর, আমার নাম গাঁটা তেওয়ারি, আমার বাবার নাম লাটু তেওয়ারি, আমার পিসের নাম—”

রাজা তাকে বাধা দিয়ে বলেন—“তা বেশ, তা বেশ,—তোমার নিজের পরিচয় পেলেই যথেষ্ট, তোমার বাপ-পিসের নাম জেনে আমার কোনও দরকার নেই। বলি তুমি ত ব্রাহ্মণ ঠাকুর, রান্নাবান্না করতে পার কি?”

গোঁপে চাড়া দিয়ে গাঁটা বলে—

“মুই রসুই ভি করি

ফিন্ কুস্তি ভি লড়ি।”

রাজা বলেন—“বেশ বেশ, তুমি রসুইও করবে, আবার মাঝে মাঝে আমার বড় বড় পালোয়ানদের সঙ্গে কুস্তিও লড়বে। কেমন পারবে ত?”

একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে গাঁটা বলে—“হুজুরের হুকুম হয়ত এফুনি লড়তে পারি। ভিখন সিংএর মেসো পালোয়ান দিলবাহাছর আমার সঙ্গে এসেছিল কুস্তি লড়তে, আমি তাকে এমনি চোপাট্টা প্যাচ লাগলাম যে বেচারী সাড়ে পাঁচবার ডিগ্বাজী খেয়ে বিশ হাত দূরে ছিটকে পড়ল। পালোয়ানের কথা ছেড়েই দিন না মহারাজ, কত বড় বড় জঙ্গলে গিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঘ হাতীকে আমি লাগি মেরে একেবারে ছাত্ত বানিয়ে দিয়েছি।” বলে সে ঘন ঘন তাল ঠুকতে লাগল।

রাজার সভার রুড় বড় পালোয়ানেরা মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে নীরবে মাথা চুলকাতে লাগল।

গাঁটা তেওয়ারি রাজার বাড়ীতে বেশ সুখেই আছে। রাজবাড়ীতে বামুন-চাকরের অভাব নেই, তাই তাকে বিশেষ কিছু কাজ-কর্ম করতে হয় না। খায় দায় আর

এসে রাজ্যে একেবারে হলুদুল লাগিয়ে দিল। রাজা, মশায় ভারি ভাবনায় পড়লেন। তিনি সভায় বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছেন—কি করা যায়, এমন সময় মন্ত্রী উঠে বলেন—“মহারাজ! আমাদের গাঁটা তেওয়ারি থাকতে আর ভয় কিসের?”

এই কথা শুনে রাজা-মশায় লাফিয়ে উঠে চৈচিয়ে বলেন—“আরে তাই ত, তাই ত, এ কথা ত আমার ঘোটেই মনে হয়নি—আরে গাঁটা থাকতে আমাদের ভয় কিসের?”

সভাসদেরা ঘাড় নেড়ে বলে—“তাই ত গাঁটা থাকতে আমাদের কিসের ভয়?”

রাজা গাঁটাকে ডেকে আনতে হুকুম করলেন।

দু মিনিটের মধ্যে তেওয়ারিজি সামনে এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

রাজা বলেন—“গাঁটা, এবার তোমার বীরত্ব একটু দেখাতে হচ্ছে, এই বুনো মোষটাকে তাড়িয়ে দিতে হবে।”

খুব এক চোট হেসে নিয়ে গাঁটা বলে—“এই ইহুরের বাচ্চাটাকে আর তাড়াব কি হুজুর, বা হাত দিয়ে এক চড় মেরে তার ভূত ভাগিয়ে দেব। আমি গাঁটা তেওয়ারি—আমার বাপ লাটু তেওয়ারি,—পিসে টাটু ছবে, মেসো ছোট্ট মিশির, মামা খোটা চৌবে—ব্যাটা পানাবে কোথায়?”

রাজ্যে খুব খুসী হয়ে তাকে বিদায় দিলেন, আর এদিকে গাঁটা কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী এল। কারণ সে তার জন্মেও এমন কাজ আর করে নি।

বাড়ী এসে গাঁটা ঠিক করল যে সেই রাত্রেই সে রাজ-বাড়ী থেকে সরে পড়বে! তা না হলে তার মানও যাবে প্রাণও যাবে।

শেষরাত্রে যখন সকলে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়েছে—সেই সময় গাঁটা তেওয়ারি তল্লাতজ্ঞা বেঁধে খিড়কীর দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় গাঁটার পথ দেখতে

বেশী কষ্ট হচ্ছিল না। সে ছুটছে আর মাঝে মাঝে পিছনে তাকিয়ে দেখছে—রাজবাড়ীর কেউ দেখে ফেলল কি না।

কিছুদূর গিয়েই সে দেখতে পেল—ও রে বাবা, তার 'ইঁদুরের বাচ্ছাটা' একটা ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে ফোস্ ফোস্ আওয়াজ করছে। আর যায় কোথা, পালোয়ান সিং তল্লাতিয়া মাটিতে ফেলে একটা গাছের উপর উঠে ঠক্ঠক্ করে কাপতে লাগল। মোষটা এদিক ওদিক চেয়ে একদোড়ে একেবারে গাছের নীচে এসে হাজির। এসেই আর কথাবার্তা নেই—গাছের গুঁড়িতে মেবেছে এক চুঁ। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে গাট্টা পড়বি ত পড় একেবারে টিপ করে তারই ঘাড়ে। পড়ার সময় গাট্টা ভেবেছিল, পড়েই বুঝি সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। কিন্তু যখন দেখল যে সে মোটেই অজ্ঞান হয়নি আর মোষের শিংএর উপর না পড়ে তার পিঠেরই উপরে পড়েছে, তখন তার সাহস আর বুদ্ধি আশ্চর্য্য রকম বেড়ে গেল। মাথার পাগুড়িটা খুলে সে আচ্ছা করে তার চোখে আর শিংয়ে বাঁধল; তার পর শোজা রাজবাড়ীর দিকে হাকিয়ে দিল।

এত যে কাণ্ড হবে মোষ তা মোটেই ভাবেনি। আর তার জন্তে সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে বেচারী কেবল গাছের গুঁড়িতেই এক চুঁ মেরেছিল—সেই সঙ্গে সঙ্গে যে গাছের উপরের মৃত্তিমানটি তার পিঠে চড়ে বসবেন—এ তার মোটেই মনে হয়নি। যা হোক, সে ভীষণ ঘাবড়ে গেল আর বুঝল সে যে-লোকের হাতে পড়েছে তার সঙ্গে আর বেশী গোলমাল করা চলবে না। কাজেই গাট্টা তাকে যে দিকে নিয়ে চলল সে শাস্ত শিশুটির মত সেই দিকেই চলল।

ভোরে উঠে রাজামশায় বাইরে পাখচারী করছেন এমন সময় দেখলেন, দূরে গাট্টা তেওয়ারি একটা প্রকাণ্ড মোষের পিঠে চড়ে সেই দিকে আসছে। রাজামশায় ত "বাবা গো, মা গো!" বলে সেই যে অন্তরমহলে ছুটে পালালেন সমস্ত দিন আর বেরলেন না। পরদিন যখন

শুনতে পেলেন মোষটাকে শিকল দিয়ে গোয়ালে বেধে রাখা হয়েছে, তখন তিনি সাহস করে বাইরে বেরলেন আর সামনে গাট্টাকে দেখতে পেয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধেই ধেই করে নাচ আরম্ভ করে দিলেন। রাজামশায় লোক একমুখে বলতে লাগল, "ধন্য গাট্টা, ধন্য গাট্টা!"

শ্রীমুনির্মল বসু

পাখীর গল্প

বাজপাখী

এক সময়ে "দীর্ঘজট" নামে এক ব্রহ্মচারী বহুকাল ধরে তপস্বী করে কিছু ফল পেয়েছেন কি না পরীক্ষা করবার জন্য বাবার সময়ে মালবদেশের মধ্যে এক ভীষণ বনে ধ্যানে বসলেন। তিনি ধ্যানেতে জানতে পারলেন, "এখানে 'রক্তাক্ষ' নামে এক নিষ্ঠুর ব্যাধ বাস করে। সে এই বনের পশুপাখীদের হত্যা করে মনে খুব আনন্দ পায়। সে রক্তের সঙ্গে মেশান কাঁচা মাংস খেতে ভালবাসে।" পরের কষ্ট দেখলে দীর্ঘজটের হৃদয় গলে যেত। তিনি প্রাণী-বধে কাতর হয়ে ব্যাধের সামনে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "রে রক্তাক্ষ, কেন তুই পশুপাখী মেয়ে ভয়ানক-পাপ করছিস?"

ব্যাধ এই কথা শুনে রেগে চেঁচিয়ে বললে, "আমার খুসী! বে ভণ্ড সন্ন্যাসী! তোকেও মেবে ফেলব।"

ব্রহ্মচারী চোখ লাল কবে বললেন, "ওরে পাজি, আমার তপস্বীর ফল দেখ। তোর যে গুণ আছে, সেই গুণে তুই বাজপাখী হয়ে যা।"

কি আশ্চর্য্য! দীর্ঘজটের শাপে রক্তাক্ষ তখনই বাজপাখী হয়ে আহার খুজবার জন্যে এক গাছ থেকে আর-এক গাছে উড়ে বেড়াতে লাগল। সেই সময় থেকে সে পাখীদের প্রাণ নষ্ট করে ও তাদের রক্তপান কবে "বাজপাখী" হয়ে আছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীজগদ্বন্ধু পাল

পুস্তকস্থা তু যা বিত্তা, পরহস্তগতং ধনম্

গোকুল একটা ব্যাঙ্কে কাজ করত, তার কাজ ছিল টাকা আদায় করা। দশ বছর সে এই ব্যাঙ্কে কাজ করছে, কোনোদিন হিসাবে তার এক পয়সাও গোলমাল হয়নি। কর্তারা বলতেন যে তার মত বিশ্বাসী লোক দেশে ত নেইই, বিদেশেও আছে কি না সন্দেহ! কোনোদিন তার কামাই হতো না। কাজে সামান্য ক্রটিও তার কেউ কোনোদিন ধরতে পাবেনি। এমনই কর্তব্যপাষণ ভূত্য সে!

সামান্য যা বেতন পেত, তাতেই তার দিন বেশ চলে' যেত। তার সামান্য অবস্থার জ্ঞান বিধাতাব কাছে অভিযোগ করতে তাকে কেউ কখনো দেখেনি। মাঝে মাঝে তার দু-একজন বন্ধু তাকে জিজ্ঞেস করত—“ওহে, তুমি গাদা গাদা টাকা নাড়াচাড়া কর, তোমার হাত কি একটুও জুড়জুড় করে না?” সে তার উত্তরে বলতো—“আরে তোমরাও ধেমন—বে টাকা আমার নয়, তা ত টাকাই নয়, তাকে পথের বালি বললেও হয়।” প্রতিবেশীরা তাকে বড় শ্রদ্ধা ভক্তি করত। বিপদে আপদে তার পবামর্শ নেওয়াটা তারা বড় প্রয়োজন মনে করত।

* * * *

একদিন সে সন্ধ্যা বেলায় এক পেয়লা চা খেয়ে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বেরিয়ে পড়ল টাকা আদায় করতে। মাসের শেষ দিন, কাজেই অনেক টাকা সেদিন তাকে আদায় করতে হবে। রোজ যে সময় সে বাড়ী ফিরে আসত, সেদিন তার অনেক পরেও সে বাড়ী এলো না। আপন বলতে কেউ তার ছিল না, তবুও পাড়ার লোকে তার জন্তে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সবাইকার মনে সন্দেহ হল, পথে হত সে ডাকাতের হাতে পড়ে' মারা গেছে। অনেক টাকা তার কাছে আছে। পুলিশে খবর দেওয়া হলো। খোঁজ করতে করতে জানা গেল, সন্ধ্যা সাতটার সময় সে একটা দূরের বস্তি থেকে টাকা আদায় করে' বাড়ির দিকে ফেরে। তার কাছে

তখন মোট আড়াই লাখ টাকার নোট ছিল। তারপর যে তার কি হলো, সে কোথায় গেল, তার কোন খবর জানা গেল না। চারিদিকের মাঠ ঘাট বন বাদাড় সব তন্নতন্ন করে' খোঁজ করা হলো চারিদিকে তার করে' দেওয়া হলো, সব বে-কাজের হলো। সে নেই, তার কোনো খবরও পাওয়া গেল না। তখন যত-সব পাকা পাকা পুলিশের লোক আর ব্যাঙ্কের মোড়লরা এই মনে করলেন, যে সে বিশ্বাসী লোক, টাকা নিয়ে সে কোথাও পালাতে পারে না; পথে নিশ্চয়ই ডাকাতের হাতে পড়ে' সে মারা গেছে। তাঁরা এটাও বুঝতে পারলেন, যে ডাকাতের দলের লোকেরা ডাকাতি করবার পূর্বেই এই মতলবটা স্থির করেছিল।

তার অদৃশ্য হবার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। খবরের কাগজেও খুব বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়ে গেল। পাড়ার লোকে বলল, “হায় হায়! এমন একজন লোক যাওয়াতে আমাদের পাড়ার জোর অনেকখানি কমিয়ে গেল।” ব্যাঙ্কের কর্তারা বললেন, “আমরা এমন লোক আর পাব না। দশ বছরে সে আমাদের যা কাজ দিয়েছে, অল্প কেউ চল্লিশ বছরেও তা দিতে পারবে না।” এই রকম নানা লোকে নানা কথা বলতে লাগল।

এদিকে যখন এত-সব কাণ্ড হচ্ছে, তখন কিছু দূরের একটা সহরে বসে একজন সাধু লোক সব দেখে-শুনে মনে মনে হাসছে। পুলিশ যখন তার জন্তে আকাশ-পাতাল হাতড়ে মরছিল তখন সে একটা নদীর ধারে তার কাপড়-চোপড় বদল করে' পুরান কাপড়গুলো একটা পৌঁটলা করে' একটা পাথরের সঙ্গে বেঁধে নদীর জলে ফেলে দেয়। তার পর নোটের থলটাকে বেশ করে' বুকের কাছে রেখে সেই এখানে পালিয়ে আসে। তার মনে কোনো ভয়-বা ভাবনা ছিল না। একটা হোটেলে সে বেশ করে' খেয়ে, রাত কাটায়। পরদিন সকালে যখন সে ঘুম থেকে উঠল, তখন সে কি করবে না-করবে সব স্থির করে ফেলেছে।

ধরা তাকে পড়তেই হবে, এটা তার জানা ছিল।

পুলিসের চোখে বড় বেশীদিন ধুলো দিয়ে থাকা অসম্ভব। সে তখন ঐ আড়াই লাখ টাকার নোটগুলোকে একটা মোটা খামে ভরে' বেশ করে বন্ধ করে' তার ওপর গোটা দশেক শীল মোহর করুল। তারপর সে এক উকিলের বাড়ী গেল।

উকিলকে গিয়ে বলল, “দেখুন মশায়, আমার এই খাম-টাতে কয়েকটা দরকারী দলিল-পত্র আছে। আমি কয়েক বছরের জন্তে বিদেশ যাচ্ছি। তা যাবার আগে এগুলো আমি আপনার কাছে রেখে বেতে চাই। এতে আশা করি আপনার কোনো আপত্তি হবে না?”

উকিল-মশায় বললেন, “আরে না না, আপত্তি আর কি হবে, তবে আপনি একটা রসিদ নিয়ে যান।”

সে রসিদের কথা ভাবেনি। রসিদ নিয়ে আর-এক ফ্যাসাদ হবে, পুলিসের হাতে পড়ে' যদি রসিদখানা তাদের হাতে যায়, তবে সব নষ্ট হবে। তাই সে বলল, “দেখুন, রসিদ নিয়ে আমার কোনো লাভ নেই। আমার আপন লোক কেউ নেই যে তার কাছে রসিদ রেখে যাব, তার চেয়ে ওটা অমনি থাক। কিই বা ওতে আছে। আমি এসে আমার নাম বললে আপনি ওটা আমায় দেবেন। ফিরতে আমার অনেক দেরী হতে পারে।”

উকিল-মশায় আর কি করেন—বললেন, “তা বেশ, তবে আপনার নামটা বলে' যান, খামের ওপর লিখে রাখি, আপনি এসে ঐ নাম বললে আপনি খাম ফেরৎ পাবেন।”

একটু ভেবে সে বললে, “আমার নাম জলধর—জলধর চক্রবর্তী।”

উকিলের বাড়ী ছেড়ে যখন সে রাস্তায় এলো, তখন তার মনে আর কোনো চিন্তা নেই। সে তখন একেবারে বে-পবোয়া। মনে মনে বলতে লাগল, ‘ধরুক এখন পুলিসে! কি করবে আমার? কি প্রমাণ তারা পাবে? আমায় ধরবে বটে, কিন্তু যার জন্তে আমায় ধরা, তার দেখাও বাছারা পাবেন না। বড়-জোর বছর-পাঁচেক জেল হবে। কুছ-পবোয়া নেহি! নিয়ম মত খাওয়া দাওয়া, ব্যায়াম, নিজা! কোন চিন্তা নেই! শরীরটা ভাল করে' আসতে পারবো। তারপর বেরিয়ে এসে? আঃ! কি

আরাম! আড়াই লাখ! দূরের একটা গ্রামে চলে' যাব, নদীর ধারে একটা বাড়ী করব। সেখানে কে বা আমার চিনবে? আমি যে তখন শ্রীযুক্ত জলধর চক্রবর্তী! বাড়ীটা বেশী বড় করব না। দান-ধানও করব কিছু কিছু। লোকের চোখে গোলাপজলে ধোওয়া বালি বেশ দিতে পারব—বেশ হবে। আর তাকে? ই্যা নিশ্চয়ই!’

আরো একটা দিন সে লুকিষে কাটালো—নোট-গুলোর নম্বর বেরিয়েছে কি না জানবার জন্তে। সেগুলো বেরোয়নি দেখে তার মনটা আরো হাল্কা হয়ে উঠল।

শেষে সে পুলিসের হাতে ধরা দিল। পুলিসের জেরাতে বলল, “পথের ধারে বাদাম-গাছের তলায় একটা বেঞ্চে আমি টাকা ইত্যাদি সব নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। হটাৎ যখন ঘুম ভাঙল দেখলাম নোটের থলি, খাতা-পত্র সব কোথায় চলে' গেছে। তারা যে কোথায় গেছে আমি অনেক খোঁজ করে'ও জানতে পারলাম না।”

পথে হটাৎ ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে তার পাঁচ বছর জেলে ঘুমোবার বন্দোবস্ত করে' দেওয়া হলো।

জেলখানাতে তার দিন আনন্দেই কাটতে লাগল। জেলখানার কষ্টটাকে সে তার সামান্য পাপের একটু প্রায়শ্চিত্ত বলেই গ্রহণ করুল। এখানে তার কাজকর্মে সবাই সন্তুষ্ট। কর্তারা বললেন, “এমন লোকের যে জেল কেন হলো বুঝতে পারি না—এ লোক কখনো চুরি করতে পারে না।” তার শরীর জেলখানায় বেশ ভাল হতে লাগলো।

দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে সে বাইবের মুক্ত হাওয়ায় বেরিয়ে এলো। পথে সে চলেছে আর মনে ভাবছে, “এতদিন পরে আমার সব সার্থক হলো। এখন কিছু খেয়ে আর পোষাকটা বদলে নিয়ে উকিলের বাড়ী যাব। সে আমায় প্রথমে চিন্তেই পারবে না। সে হয়ত আমার মুখের দিকে ইঁ করে' চেয়ে থাকবে—আমি তখন আমার খামখানা ফেরৎ চাইব। তার হয়ত কিছুই

মনে নেই! হাঃ হাঃ হাঃ! কি মজাই না হবে! তারপর উকিল-মশায় বলবেন—‘তা আপনার নাম বলুন ত, ধামধানা বার করে দি।’ আমি তখনো নাম বলব না—একটু মজা করুব তাকে নিয়ে! বেচারী একেবারে বোকা বনে’ যাবে—! শেষে আমি নাম বলব—আমি শ্রী—! এঁা!—এ কি! শ্রী—কি? নামটা ভুলে গেলাম নাকি?”

তার পথ চলা বন্ধ হয়ে গেল। সে হটাত থমকে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ল। কোনো রকমেই আর নামটা তার মনে আসে না! সে একটা বেঞ্চে বসে’ নামটার জন্তে আকাশ পাতাল খুঁজতে লাগলো। ক্রমাগত মনে আসে শ্রী—তাবপব আর কিছুই মনে আসে না। নামটা যেন তার গলার কাছে এসে আটকে আছে, মুখে আর কোনো রকমেই আসে না। কেবল শ্রী—শ্রী—তারপর আর কিছুই মনে আসে না। ঘণ্টা দুয়েক এমনি করে’ ভাববার পর তার মাথা গরম হয়ে উঠল। চোখ মুখ দিয়ে আগুন বেরুতে লাগল। তার গা দিয়ে তখন দরদর করে’ ঘাম পড়ছে। হাত যেন হাজার চারেক পিপড়েতে কামড়ান্টে বলে’ মনে হতে’ লাগল। তার বসে’ থাকা অসম্ভব হলো। সে মাটিতে খুব জোরে একটা লাথি মেরে উঠে পড়ল।—“এমন করে’ এক আয়গায় বসে’ তাবলে নামটা মনে আসবে না, আবার দূরে পালাবে, তার চেয়ে কিছু খেয়ে নি, একটু শান্ত হলেই আবার মনে আসবে ঠিক।” এই মনে কবে সে রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল ক্ষেপার মতন। পথের লোকজনের ব্যস্তভাবে চলাফেরা, গাড়ীর শব্দ—এই-সবের মধ্যে সে তার আড়াই-লাখ-পাবার নামের খোঁজ করতে লাগল। “শ্রী—শ্রী—” আর কিছুই মনে আসে না।

সন্ধ্যা হলো। সে ক্রমাগত পথে পথে ঘুরছে। তার খাওয়ার কথা মনে নেই—চুল উকো খুকো। চোখ-হুটো আগুনের মত জ্বলছে। লোকেব বাড়ীতে আর রাস্তাব দোকানে আলো জলে’ উঠল। সে ঘুরতে ঘুরতে

উকিলের বাড়ীর দ্বারে এসে দরজার হাতলটা ধরে’ বলে’ উঠল, “উঃ আর পাচ্ছি না, আমি পাগল হলাম নাকি? আড়াই লাখ টাকা—চুরি করেছি বটে কিন্তু তার জন্তে শাস্তিও ত বড় কম ভোগ করিনি! টাকা রয়েছে, উকিল রয়েছে, আমিও রয়েছে! সব যাবে কি? একটা কথা, একটা নামের জন্তে আমার সব যাবে কি? শ্রী—শ্রী—না, আর মনে আসবে না—তাকে কি?—শ্রী—শ্রী—”

সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ল। রাস্তা দিয়ে চলেছে সে—হুঁস্ নেই! লোকের গায়ে ধাক্কা লাগছে, পথের লোকে তার দিকে চেয়ে তাকে পাগল মনে করে’ দূরে সরে’ যাচ্ছে, তার খেয়াল নেই। কতবার সে গাড়ীর তলায় পড়তে পড়তে বেঁচে গেল! গাড়োয়ান গাল দিয়ে গেল—কোনো দিকে তার মন নেই। “শ্রী—শ্রী—” তার পর আর মনে আসে না!

একটু রাত হলে পর সে ক্লান্ত হয়ে নদীর ঘাটে এসে দাঁড়াল। পলকহীন চোখে নদীর স্তব্ধ জলে চেয়ে রইল। “নদীর জলে কি নামটা পাওয়া যাবে? ইয়াত বা যাবে”—এই কথা তার হৃদয় মনে হলো। তারপর সে ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে জলের কাছে গিয়ে আঁজলা করে’ জল খেল। এ কি! নদীর জল তাকে টানচে কেন? হারানো নামটার সন্ধান দেবে বলে’? স্নেহে থাকতে পারল না—পড়ল নদীর জলে কাঁপ দিয়ে! ডুবে গেল। আবার ভেসে উঠল। হটাত চীৎকার করে উঠলো—“পেয়েছি! পেয়েছি! শ্রীজলধর—শ্রীজল—”

ঘাটে লোক ছিল না। নদীতে নৌকা ছিল না।—স্তব্ধ জলে পথের ধারের আলোর আর আকাশের তারাব ছায়া পড়ে নাচ্ছিল। একবার একটা শব্দ হলো, থানিকটা জল ছলান করে ঘাটে এসে লাগল;—তারপর সব নিস্তব্ধ।*

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

মহিলা সজ্জনিস



শিশুশিক্ষায় মহিলা

ডাক্তার ফ্রোবেলের উদ্ভাবিত কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিশুশিক্ষার কথা অনেকেই জানেন। ছেলেদের খেলার ছলে শিক্ষা দেওয়া এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য। ডাক্তার মেব্রিয়া মন্তসরী অধুনাতন খেলার ছলে শিক্ষা দিবার পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এখন এর পদ্ধতিতে শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা প্রায় সকল দেশেই হইয়াছে। ইনি ইটালীবাসিনী ও প্রথমে চিকিৎসক ছিলেন। ছেলে-মেয়েরা খেলিতে খেলিতে নিজেরাই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বুঝিয়া আপনা-আপনি জ্ঞান আহরণ করিবে এই মূলমন্ত্র ধরিয়া তিনি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে বলেন। এই-রূপে শিশু নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করে—কেন? আর নিজেই তার উত্তর খুঁজিয়া জ্ঞান সঞ্চয় কবে। এই মহিলার ছবি ও শিক্ষাপদ্ধতির বৃত্তান্ত পূর্বেই প্রবাসীতে আমরা প্রকাশ করিয়াছি; সুতরাং পুনরাবৃত্তি নিম্নপ্রয়োজন।

সঙ্গীত-শিক্ষায় মহিলা

আগে ইংলণ্ডে সঙ্গীত শিক্ষা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বিত্তা ছিল। কুমারী সাবা এন্ড গ্লোভার ছিলেন এক স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, তিনি টনিক-সল-ফা স্বরলিপি-পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়া অতি সাধারণ লোকের পক্ষেও সঙ্গীত সহজসাধ্য করিয়া দিয়াছিলেন। এর চেয়ে সহজ-পদ্ধতির স্বরলিপি এ পর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই। এই পদ্ধতিতে এখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ও যে-সে গান শিখিয়া গাহিতে ও বাজাইতে পারে। কুমারী গ্লোভার দেশের ঘরে ঘরে সঙ্গীতের বিমল আনন্দ ছড়াইয়া দিয়া ৮২ বৎসর বয়সে ১৮৬৭ সালে আনন্দধামে প্রস্থান করেন।

চার্লস বন্ডোপাধ্যায়

মহিলা-প্রগতি

পুরুষের লেখা সমস্ত শাস্ত্রবিধান অগ্রাহ্য করিয়া নারী আপনাতর অধিকার পূর্ণমাত্রায় দখল করিতেছে। এতদিন পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় সমাজে নারী ধর্মপ্রচারক এবং শিক্ষক ছিল না বলিলেই হয়। বর্তমানে নারী ধর্মপ্রচারকের ও শিক্ষকের সংখ্যা বেশ বাড়িয়া উঠিতেছে।

মিস্ হেনড্রিক্ (তাঁহার পুরা নাম এখনও জানা যায় নাই) জগতে এই প্রথম ট্র্যাফিক্ ম্যানেজারের পদ পাইয়াছেন। এই ভদ্রমহিলা জাহাজ-চলাচল বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ।

ক্যানাডাব পার্লামেন্টের প্রথম নারী সভ্য এগ্নিস্ ম্যাক্ফেল। তাঁহার বয়স মাত্র একত্রিশ বছর।

আমেরিকার ওরগন্ প্রদেশে একটি নূতন আইন পাশ হইয়াছে। বিবাহার্থী প্রত্যেক লোককে এবং জীলোককে বিবাহের পূর্বে ডাক্তারকে শরীর দেখাইতে হইবে। মিশিগানেও এই রকম একটি আইন পাশ হইয়াছে। ডাক্তার যদি শরীর ভাল এবং ব্যাধিমুক্ত বলিয়া সার্টিফিকেট দেন তবেই সে বিবাহের অনুমতি পাইবে। সংক্রামক কোন রোগ থাকিলে সে বিবাহ করিতে পায় না।

নরওয়ে, জার্মেনী, এবং ভায়েনাতেও এমনি কতকগুলি আইন পাশ হইয়াছে। এই-সমস্ত দেশে বোর্ড নিযুক্ত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে, ব্যক্তিগতভাবেই এই বোর্ডের মত লইয়া তবে বিবাহের যোগ্য হইতে পারিবে।

আমাদের সোনার বাংলা দেশে এই রকম কোন আইন পাশ হইলে সর্বনাশ হইবে। তাহা হইলে আর মেয়ের বয়স হইলেই, কানা খোঁড়া, অশ্রুশ্রবণে পথে যাত্রী পাঞ্জা ধরিয়া, দেশের ধর্ম, সমাজের মুখ, এবং নিজের জাতি বাঁচানো চলিবে না। আমাদের আইন-মঞ্জলিসেও বোধ হয় এইরূপ কোন আইন-প্রস্তাবকারীকে মঞ্জলিসে একঘরে হইতে হইবে।

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

সোভিয়েট রুশিয়ায় নারী

বহু শতাব্দী ধরিয়া রুশিয়ায় নারী-পুরুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠতা অপকৃষ্টতা লইয়া যে তক্কার চলিতেছিল, সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের কলমেব এক আঁচড়েই তাহার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। নারীপুরুষের তুলনার বিচার-ভার এখন আর একমাত্র পুরুষের উপর ন্যস্ত নাই, রুশিয়ার বিপ্লবে স্বাধীনতাকামী নারীরা পুরুষের সমানে সমানে প্রাণপাত করিয়া লড়িয়াছেন, বর্তমান সোভিয়েট রুশিয়ার গঠনে নারীর বুদ্ধি-বিচক্ষণতা ঐকান্তিকতা স্বার্থত্যাগ পুরুষের অপেক্ষা কোন অংশে কম প্রযোজন্য হয় নাই, তাই সোভিয়েট-রুশিয়াতে নারী সর্বত্র সর্বপ্রকারে সর্বতোভাবে পুরুষের সমকক্ষ। সমান শ্রমে পুরুষ ও নারীর সমান পারিশ্রমিক ব্যবস্থা; নিম্নতম হইতে উচ্চতম রাজপদগুলিতে নারীপুরুষের সমান অধিকার। পারিবারিক জীবনযাত্রার নানা তুচ্ছ প্রয়োজনে, সন্তানপালনের নানা অনাবশ্যক খুঁটিনাটিতে নারীজীবনের কত অমূল্য সময় ব্যথা ব্যয়িত হয়, তাহার প্রতিকারের জন্ত সোভিয়েট রাষ্ট্র গভির্ণী মাতার তত্ত্বাবধান ও শিশু সন্তানের লালন-পালনের বহুলাংশ নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন; নারী অতঃপর তাঁর অথও অবসর সমাজ ও পৃথিবীর হিতচিন্তায় ও হিতাহুতানে নিবেগন করিতে পারিবেন। সোভিয়েট রুশিয়াতে এতদিন নারীর নিশাশ্রম বা পনির রুদ্ধতায় শ্রম আইনতঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে। নারীর মাতৃত্বের উপর সমাজের কল্যাণ অকল্যাণ যে কত বেশী নির্ভর করে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই শ্রম-আইন তৈরি হইয়াছে। এই আইন অনুসারে প্রসবের দুইমাস পূর্বে হইতে প্রসবের দুই মাস পর পর্যন্ত প্রসূতি নারীরা সকল প্রকার পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি পান। শুধু তাহাই নহে ঐ বিশ্রামের চার মাস তাহারা পূর্ণহারে বেতন এবং শতকবা পঁচিশ টাকা ভাতা পাইয়া থাকেন। প্রসবের পর প্রায় বৎসরকাল পর্যন্ত প্রসূতির দিনে মাত্র ছয় ঘণ্টা শ্রম এবং প্রত্যেক দুই ঘণ্টা পর পর আধ ঘণ্টা বিশ্রাম ব্যবস্থা। প্রসবের সময় প্রসূতি, বিনামূল্যে ধাত্রী ও চিকিৎসকের সাহায্য এবং ঔষধাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নবজাত শিশুর পরিচর্যা

সম্বন্ধে উপদেশাদি দেওয়ার জন্ত সর্বত্র চিকিৎসকদের ঘাটি আছে।

শিশু সম্বন্ধে মাতৃদের ছুশিক্ষিতা সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট প্রায় সবখানিই লাঘব করিয়া দিয়াছেন। শিশু জন্মিবার মাত্রই তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার রাষ্ট্রের। সে শিশু বিবাহজাত কি না এ প্রশ্ন কুতরাপি কহারো মনে উঠে না। মাতা ইচ্ছা করিলেই শিশুকে রাষ্ট্রপরিচালিত শিশু-আশ্রমগুলির কোন একটির তত্ত্বাবধানে রাখিয়া কাজে প্রত্যাভর্তন করিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে তাহা না করিতেও পারেন। রুগ্ন শিশুদের জন্ত স্বাস্থ্যকর পল্লীতে বা অগ্রত মৃতপ্রকৃতির মধ্যে স্বাস্থ্য-আশ্রম বা বিখালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। বিখালয়গুলিতে বিনামূল্যে আহার ব্যবস্থা।

নারীদিগকে ঘরকন্নার অনাবশ্যক হাকামা হইতে মুক্তি দিবার জন্ত রাষ্ট্রের পরিচালনায় জনসাধারণের সমবেত পাকশালা ও আহারস্থান নির্মিত হইয়াছে। রুশিয়ার প্রায় ৫০ লক্ষ লোক এই আহারস্থানগুলিতে আহার করিয়া থাকে।

কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রে নারীদের এই-সমস্ত অধিকার ও স্বত্বস্ববিধার মূলে নারীদের নিজেদেরই জীবনব্যাপী অক্লান্ত চেষ্টা ও প্রাণপাত, ইহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। ইহার প্রমাণ স্বরূপ একটি কথা উল্লেখ করিলেই কেবল যথেষ্ট হইবে।—সোভিয়েট রুশিয়াকে আভ্যন্তরীণ ও বহিঃ-শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিবার ভার নারীরা পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও গ্রহণ করিয়াছেন। দলে দলে নারীরা সৈন্যদলগুলিতে যোগ দিয়াছেন ও দিতেছেন। তাহারা কেবল যে গুরুধাকারিণীর কাজেই ব্রতী হইতেছেন তাহা নহে, অস্ত্রধারিণীর সংখ্যাও বড় কম নহে। অস্ত্রধারণ যদি অনায়াস হয় তবে পুরুষ ও নারী উভয়ের পক্ষেই অগ্রাঘ। বিধাতার নিয়মে নারী ও পুরুষের জন্ত পৃথক অধিকার-ব্যবস্থা যেমন নাই পৃথক বিধি-ব্যবস্থাও তেমনই নাই; সোভিয়েট রুশিয়াতে কর্তব্য ও অধিকারে নারী ও পুরুষে তাই সম্পূর্ণ অভেদ।

স. চ.

চিকিৎসা-বিদ্যায় ব্রহ্মদেশীয়া মহিলা

রেঙ্গুনে ব্যাপ্টিষ্ট কলেজ হইতে যে ব্রহ্ম-মহিলা সর্বপ্রথম গ্রাজুয়েট হন তাহার নাম মা স সা। ইনি কলেজের পাঠ শেষ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ডাক্তারীর দিকে ইহার বিশেষ ঝোক ছিল। ইনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতেও বি-এ পরীক্ষা দেন। তারপরে ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করেন ও অস্ত্র-চিকিৎসায় বিশেষ অগ্রগতি হইয়া উঠেন। ইনি ব্রহ্মদেশের সর্বত্র হইতে এক বৃত্তি লাভ করিয়া বিলাত যান এবং ডাবলিনের রয়্যাল কলেজ অব্ ফিজিসিয়ান্স ও সার্জন্স হইতে উপাধি লাভ করেন। দেশে ফিবিয়া আসিয়া ইনি রেঙ্গুনের ডাক্তারি হস্পাতালের পরিচালিকা নিযুক্ত হন। বর্তমানে মা স সা তাহার দেশে স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় নানা হিতকর অল্পেখানে নিযুক্ত আছেন।

*

নারী-কারাগারের সংখ্যা হ্রাস

কয়েক-বৎসর আগে ইংলণ্ডে অপরাধিনী নারীদের জন্য এক শত কারাগার ছিল। বর্তমানে এক শতের জায়গায় মাত্র পঁচিশটি কারাগার টিকিয়া আছে। তাহার কারণ ইংলণ্ডের নারীদের মধ্যে এখন অপরাধের মাত্রা হ্রাস পাইয়াছে। ১৯২০ সালে এই পঁচিশটি কারাগারেব প্রতিদিন পঞ্চাশের অধিক অপরাধিনী জীবিত ছিল। জীবিতদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে শাস্তির বিস্তার করিতে পারিলে তাহাদের মধ্যে অপরাধের মাত্রা হ্রাস হইতে বাধ্য। আমাদের দেশে অপরাধিনী নারীর সংখ্যা কম নয়, কেননা এখানে জীবিতদের বিস্তার নাই বলিলেই চলে। কবে আমরা আমাদের নারীদিগকে শিক্ষায় ও স্বাস্থ্যে উন্নত করিয়া সমাজের অর্ধেক অঙ্গ বলবান্ কবিয়া তুলিব?

*

সঙ্গীতে নারী

ইংলণ্ডের রয়্যাল ফিল্‌হার্মনিক্ সোসাইটিতে আগে সঙ্গীত শিক্ষার জন্য নারীদের প্রবেশ-অধিকার ছিল না। বর্তমানে নারীরা সেখানে প্রবেশের অধিকার লাভ করিয়াছেন। এই সোসাইটি যখন স্থাপিত হয় তখন

মেয়েরা কেবলমাত্র গায়িকারূপে হাজির হইতে পারিতেন। এখন তাহারা এখানে সভ্য হইবার অধিকার পাইলেন, এমন কি অনেক বিভাগে পরিচালিকা হইবার ক্ষমতাও তাহারা পাইয়াছেন।

গুপ্ত

চিত্র-শিল্পে বালিকার কৃতিত্ব

১৯২১ সালের—সপ্তমের রাজকীয় চিত্রশালায়, (Royal Academy of Arts) বাসন্তী চিত্র-প্রদর্শনী উপলক্ষে, কুমারী ইলিন শোপার নামে ১৫ বৎসব বয়স্কা একটি বালিকা, নিজে আঁকিয়া দুখানা ছবি পাঠান। প্রতিযোগী ১২০০০ হাজার বিখ্যাত চিত্রকরদের মধ্যে যে এ বালিকাটি স্থান পাইবে, ইহা কেহ কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই। কিন্তু বিচারকদের চক্ষে ইলিনের দুখানা ছবি পুরস্কার পাইবার উপযুক্ত এবং প্রদর্শন-যোগ্য বিবেচিত হয়। এত অল্পবয়সে কোন চিত্রকরই এরূপভাবে সম্মানিত হন নাই। ইলিন আর্ট স্কুলে পড়িয়া চিত্র-বিদ্যা শিখেন নাই। এই বালিকা ছেলেবেলা হইতেই পিতার নিকট চিত্রাঙ্কন-বিদ্যা অভ্যাস করেন। ইহাব পিতা একজন বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী, নাম জর্জ শোপার, আর্-ই। ১৩ বৎসর বয়স হইতেই ইলিন ছবি আঁকিতে আরম্ভ করেন। যশস্বী চিত্রশিল্পী বলিয়া ইলিনের নাম এখন জগদ্বিখ্যাত।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

বাংলা মেয়ে

ঘরের কোণে জুয়ার এঁটে বন্দী কেন রহিস্ নারী,
পড়িস্ কেন-যুগল-পায়ে অধীনতা-ব শিকল ভারী?
স্রোতসেতে তোর ঘরের মাঝে

হাপিয়ে-তোলা ধোয়ার কালো

দাসত্বেরই পঙ্কিলতা—সেই কি তোমার লাগ্‌চে ভালো?
কারাগৃহের ঘুলুঘুলিটি খোলনি কি একটি বারো,
চিরকালই বন্দী-শালায় রক্ত জালায় নিশাস ছাড়ো?
আকাশ সে কি নীল নয়নে ইঙ্গিতে হায ছায়নি ডাক,
জান্‌লা খুলে উড়ন্ত ঐ ঝাংখনি কি পাখীর ঝাঁক?

মুক্তি-আশায় আকুল হয়ে অধীর বুক কি উঠল তুলে,
না ঐ সোনার পিরবেতেই রইলে নীরব সকল ভুলে ?
মলমল তোমায় শুনায়নি কি দুরন্ত তার পাগল বাঁশী,
জ্বলন্ত তোমার উঠল না কি অগাধ শ্রোতেই উথলে ভাসি' ?
পুণিবার-ই চাঁদনী কভু—অন্ধকারের লক্ষ তাবা,
স্বাধীন-পথে বেরিয়ে যেতে হাতটি তাদের ছায়ায় নাড়া ?
পর্দানশীন পতিব্রতা লক্ষ্মী-সতী বাঙলা-মেয়ে,
চিরকালই অন্ধতা এই রইবে তোমাব জীবন ছেয়ে ?
বিশ্ব-ভোবে মুহূর্ষু এই যে বিবর্তনের দোল,
তুলবে না কি ঝনঝনানি আগরণের একটু বোল ?
জীবন তোমার পীড়ন সধে' চুপাট করে' শুধুই কাদা,
বাঁট-দেওয়া আর ঘর-নিকানো চচ্চড়ি-শাক-ছেঁড়া রাঁধা ?
সূর্য্য দেখেই সরম পেয়ে বোম্টা তোমার দিচ্ছ টেনে,
সূর্য্য-ও তাই বজ্র প্রখর বাবে-বাবে দিচ্ছে হেনে !
অধীনতার রোদন যদি মুহূর্তে চাপে হে একেবাবে,
ইচ্ছা-ভে জাগাও অনাড মনেব তুহিন-শীতল স্পৃষ্টাবে !
মুক্তিপথের যাত্রী হয়ে যোগ্য হওয়া চাই-ই যে আজ,
বিলোহিণী, কণ্ঠে তোমাব গর্জ্জে' উঠুক রুদ্ধ বাজ !
অত্যাচারে বিকৃত যে স্বেচ্ছা-উছল তোমাব বুক,
বোম্টা খুলে দেখাও তোমার অশ্র-সজল মলিন মুখ !
যুদ্ধ সাধর শুদ্ধ কর, সত্য তোমার ন্যায়ের দাবী,
পশ্চাতে আজ থাকবে কেন—এই কথাটা দাঁড়াও ভাবি' !

শ্রীমহাকবি দেবী

চীনদেশের নারী

কোন একটা জাতির বিষয় কেবল বাহির হইতে দেখিয়া কিছু বলা শক্ত। তাহাদের বিষয় সম্পূর্ণ কিছু বলিতে হইলে তাহাদের সমস্ত আচার ব্যবহার রীতি নীতির সহিত ভাল কবিয়া পরিচয় হওয়াই প্রয়োজন আছে। চীন দেশের নারীদের বিষয় চর্চা করিয়া কিছু বলা বড় শক্ত। তাহারা কি পরে, কি খায়, ইত্যাদি অনেক কিছু একদিনের পরিচয়ে বলা যায় বটে, কিন্তু তাহাদের জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়, তাহারা কেমন করিয়া তাহাদের দিন কাটায়, সমাজে তাহাদের কি স্থান, ইত্যাদি বিষয় কেবল বাহির হইতে একদিনের দেখায় বলা যায় না। অনেক লেখকের মতে

চীনা নারীর, সমাজে স্বামীকে বাদ দিয়া নিজের কোন বিশেষ স্থান নাই। তাহার বাহা-কিছু সবই স্বামীকে জড়াইয়া। চীনা নারী যদি তাহার সমক্ষে বিদেশীর এই উচু ধারণা শোনে, তবে সে বিশেষ খুসী হইবে বলিয়া মনে হয় না।

চীন দেশে প্রথম পা-কেলিরাই চোখে পড়ে বন্দরের মধ্যে লাল বা কাল ঢোলা পায়জামা আব. কুর্তী পরা চীনা নারী-কুলী। স্ত্রী-পুরুষের পোষাক প্রায় এক রকমের, নারীর মাথার বিশেষ আচ্ছাদন দেখিয়া তাহাকে চেনা যায়। বন্দর ছাড়িয়া চীনদেশের ভিতরে যেখানে যাওয়া যায়, সেইখানেই এই-সব নারী-কুলীদের দেখা যায়। তাহারা পিঠে পাহাড়ী মেয়েদের মত ছেলে বাধিয়া আপন মনে কাজ করিয়া যায়। হাতে বাজাবে পপে-ঘাটে সব জায়গায় ইহাদের দেখা যায়। চীনা সম্রাট ঘরের নারীরা কিন্তু অনেকটা আমাদের দেশের মেয়েদের মত পর্দানশীনা। এ বিষয়ে সমাজ-পতিদের কোন কড়া হুকুম নাই, কিন্তু লোক-মত বলে, যে বড়-ঘরের মেয়েদের স্থান দর্শকজনের মাঝে নষ। তাহাদের নিজের অন্তরে যথেষ্ট কাজ করিবার আছে। তবে গবীর ঘরের মেয়েদের বাহিরে আসিতে হয় অভাবে পড়িয়া—পেটের দায়ে।

একই পরিবাবে এমন দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রী সমাজে একসঙ্গে ঘরে এবং ঘরের বাহিরে কাজ করে, সমাজে এবং ঐ বাড়ীর অন্ত মেয়েরা-ঘরে বসিয়া বসিতেছে।

অন্যান্য দেশের মতই চীন দেশে গরিব লোকের ঘরের মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য আছে। চীন দেশের সমাজ দৃঢ় লোকমতের উপর। এখানে পরিবারকে লইয়া সমাজ। সমাজের বাহিরে বিশেষ কোন একজনের কোন দাবী থাকে না। এই পরিবারে নারীর স্থান খুবই উচুতে কেবলমাত্র একটি দিক দিয়া—তাহা সন্তানের জননীরূপে। বিবাহের পর নারী তাহার স্বামীর হারাইয়া স্বামীর মুহিত এক হইয়া যায়।

চীন দেশের পুরুষদের পুত্র-সন্তান না থাকিলে অকল্যাণ হয়। অকল্যাণের শেষ কেবল ইহ-জগতেই নয়, পর-

জগতেও তাহার জের চলে। কন্যা-সন্তান পুত্রের কাজ কবিত্তে পারে না, কারণ বিবাহের পর কন্যা অল্প পরিবারের লোক হইয়া যায়। অল্প দেশের মেয়েদের বিবাহের পরেও বাপের বাড়ীর সহিত অনেক যোগ থাকে; কিন্তু চীন দেশে মেয়েরা বিবাহের পর একেবারে তাহাদের স্বামীর এবং শশুর-শাশুড়ীর সম্পত্তি হইয়া যায়। বাপের বাড়ীর সহিত তাহার আর কোন সম্বন্ধই থাকে না।

চীনদেশে দাম্পত্যে নারীর কোন অধিকার নাই। এইজন্যই বোধ হয় বাবা-মা তাড়াতাড়ি মেয়ের বিবাহ দিয়া থাকেন। তাহা না হইলে অনেক সময় পিতাব মৃত্যুর পর কন্যা একেবারে অসহায় হইয়া পড়ে। বিবাহিত নারীর পুত্রসন্তান হইলে পর তাহার আদব অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যায়। শশুর-বাড়ীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কন্যার বাপের বাড়ীর লোকে আপত্তি করিতে পারে, কিন্তু লোকমত প্রায়ই স্বামীর বাবা এবং মায়ে পক্ষেই যায়।

চীনদেশে নারীর স্থান পুরুষের নীচে হওয়ার কারণ আছে। তাহাদের শাস্ত্রে বলে নারী নাকি জগতের যত



চীনা-স্বন্দরীর চরণ-কমল

নিম্ন এবং মৃত্যুর কারণ এবং পুরুষ যত মঙ্গলের হেতু। জগতের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে, নারী তাহার পাপের কারণ লয় কবে। নারীরাও এই শাস্ত্রমত মানিয়া নেয়। এই মতের বিরুদ্ধে তাহারা কোন কথা বলে না। কিন্তু চীনদেশেই পুরুষ নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আসন পায়। বড়-ঘর এবং ছোট-ঘরে কোন তফাৎ

পরিবারে বিশেষ আনন্দ দেখা যায়। যে কন্যা একটু বড় হইলেই গরীবের ঘরে মেয়ের নব আগমন হুঃখের কারণ, কারণ মেয়ের বিবাহ-ব্যাপার বড় ব্যয়সাধ্য। এইজন্য গরীব-ঘরে অনেক সময় শিশু বালিকা হত্যা করা হয়। অবশ্য তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালেই হয়। সমস্ত চীনদেশে এমনি ভাবে যে কত বালিকা-শিশু-হত্যা হয় তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত, কারণ তাহা কোন পাতায় বা সরকারী পুস্তকে লেখা হয় না।

এই শিশুহত্যার কথা শুনিয়া কেহ বেন মনে করিবেন না যে চীনারা তাহাদের ঘর-আলোকরা ছোট ছোট হাদি-খুসী ছেলেমেয়েদের ভালবাসে না। তাহারা তাহাদের ছেলেমেয়েদের আপনার এবং আমার মত সমান ভালবাসে। নব বৎসরের প্রথম দিনে ছোট ছোট মেয়েরা যখন লাল এবং হলুদে কাপড় পরে, মুখে রং মাখে, হাতে এবং পায়ে পুতিব বালা এবং মল পরে, তখন তাহাদের দেখিতে পরীষ দেশের মাছুষ বলিয়া মনে হয়। সাত আট বছর বয়স পর্য্যন্ত ছেলে-মেয়ে সমান ভাবে পালিত হয়। তার পর ছেলের বিদ্যারস্ত্র হয় এবং মেয়ে অন্দরে প্রবেশ করে। অন্দরে প্রবেশ কবিন্দ্ৰা সে লিখিতে পড়িতে এবং সেলাইয়ের কাজ শেখে। গরীবের ঘরের মেয়েরা অন্দরে যায় না, তাহারা ঘরের বাহিরে মাঘের কাজে সাহায্য করে।

মেয়ের বিবাহের অনেকদিন পূর্বেই সে বাগদত্তা হয়। বিবাহ ঠিক হইয়া গেলে পর তাহাকে সব সময়



চীন বনসিকা।

ভাবী শুর-বাড়ীর লোকদের চোখ এড়াইয়া চলিতে হয়।
বিবাহের পূর্বে শুর-বাড়ীর কাহারো দৃষ্টিপথে পড়া চীন

দেশের মেয়েদের কাছে বড়ই লজ্জার কথা।
মেয়ের ভাবী স্বামী প্রায়ই দূরেব গ্রাম বা
সহরের লোকেই স্থির করা হয়—মেয়ের
এক গ্রামেব পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বড়
একটা দেখা যায় না। ঘটকেরাই সব স্থির
করে। তাহারা এই সূত্রে বেশ দুপয়সা
রোজ্জীব করিয়া নয়। অনেক সময় খুব
শিশুকালেই ছেলে এবং মেয়ের বিবাহ
স্থির হইয়া থাকে, এবং খুব ভয়ানক কিছু
হইলেও বিবাহের কথার নড়চড় কদাচিৎ
দেখা যায়। বিবাহের পাকা কথা হইয়া
গেলে পর ভাবী বধূকে বর বিবাহের
পূর্বে আর দেখিতে পায় না। তবে মাতৃমের
মনের ভিতরকার লোকটি সব দেশেই এক
রকম। বর এবং কন্যার মধ্যে লোকচক্ষুর
অন্তরালে মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ এবং
গোপনে প্রণয়লিপির আদানপ্রদানও চলে।
চীন দেশের গোড়া লোকমত হিসাবে মেয়ে-
দের লেখা পড়া শিখানো ভাল নয় বটে
কিন্তু ঐ দেশের নাটকের এবং উপন্যাসের
নাটিকা প্রায়ই লেখা-পড়া-জানার
শিক্ষিতা হন। এমন কি মাঝে মাঝে
সুরসিকা এবং কবি নাটিকাব্যবসায়
যায়।

চীনদেশের বিভিন্ন প্রদেশের বিবাহের
নানা রকম পদ্ধতি আছে। তবে কতকগুলি
বিষয়ে সব প্রদেশেই একরকম নিয়ম আছে।
বিবাহের পূর্বে উভয় পক্ষের কর্তারা
জায়গায় বসিয়া কথাবার্তা স্থির করেন।
কোন্সি দেখার নিয়মও আছে। বরের
কন্যার শাশুড়ীদের বিষয় আলোচনা হয়।
উভয় পক্ষকেই প্রতিজ্ঞা করিতে হয় যে
উভয়ে উভয়ের মান-সম্মান রক্ষা করিয়া
চলিবেন।

কথা স্থির হইয়া গেলে পর খুব বড় লাল কার্ড আদান-

প্রদান হয়। এই কার্ড প্রদান এবং গ্রহণ হইয়া গেলে পর বৃত্তিতে হইবে যে বিবাহের সমস্ত স্থিতি হইয়া গেল।

৪. ঘোঁতুকাতির আদান-প্রদানও হয়।

৫. দক্ষিণ চীনে বরের পিতা বরের জন্য কন্যাকে বলিতে গেলে এক প্রকার ক্রয় করেন। এই স্থানে ঘটক মহাশয়েরা বিশেষ স্থবিধা করিতে পারেন না। কনের বাড়ীর খবর, বড়, ভয়ানক হয়। ঘোঁতুক এবং পণে তাহাদের মাঝে মাঝে ঘর বাড়ীও বিক্রয় করিতে হয়।

শিক্ষিত সমাজের বিবাহে কন্যাপক্ষকে অনেক রকমের ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। বিছানা, খাট, পালঙ্ক, তৈজস-পত্র ইত্যাদি অনেক কিছুই দিতে হয়। তাহার উপর উপলক্ষে বিশেষ করিয়া ভোজের বন্দোবস্ত করিতে বর এবং কনের বন্ধু-বান্ধবেরা নানা রকমের হাটবাহ দেয়।

বিবাহ-উৎসবে অন্যান্য সভ্যদেশের মত প্রাণ্ডা-দাওয়া প্রধান ব্যাপার। কন্যাপক্ষ যদি গরীব হয়, তবে বর বন্ধু-বান্ধবেরা এবং আত্মীয়-স্বজনদের অর্থ এবং অনিষপত্র দিয়া সাহায্য করে।

কন্যা বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইয়া বরের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। বাপের বাড়ী হইতে সে একটা লাঠ কাপড়ে মোড়া দোলায় চড়িয়া আসে। চীন-নারীর ভাগ্যে জীবনে একবার মাত্র এই দোলায় চড়া ঘটে। কনে খুব দায়ী পোষাক পরে, তারপর লাল বেশ্য বা ভাল শালুতে বোম্টা দিয়া এই দোলায় বসে। দোলায় বসিয়া বড় আরাম হয় না, অনেকের গরমে দম বন্ধ হইয়া যায়। আবার শীতকালে জমিমা ঘাইবার মত অবস্থাও অনেকের ভাগ্যে হয়। এইসব কাণে কোন মেয়ে ছাবা এই দোলায় চড়িতে চায় না।

স্বামী বাড়ী যাত্রা করিবার সাতদিন পূর্বে হইতে মেয়েকে তাহার আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের মাঝে বসিয়া শোক করিতে হয়। মন দুঃখ হোক বা না হোক শোক প্রকাশ করিতে হইবেই। বরের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে পর স্বামী পাশে বসিয়া তাহাকে সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলিতে হইবে। কোন প্রকার ক্রান্তি কিছু প্রকাশ

করা অসম্ভবতা বলিয়া ধরা হয়। বিবাহ-উৎসব শেষ হইলে পর বধূকে স্বামীর মাতার এলাকাধীন হইতে হয়।

শান্ত্তীর কড়া শাসন দেখিয়া হত আমাদের মনে হইতে পারে চীনা-নারী বিবাহ করিয়া স্থায়ী হয় কি না। এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া শক্ত, কারণ সব দেশের স্ত্রীর মাপকাঠি এক বকম নয়। আমবা যেমন চীনা বিবাহ-প্রকৃতি অদ্ভুত বলিয়া মনে করি, তাহারও হয়ত আমাদের মাকিছু সবই অদ্ভুত বলিয়া মনে করিতে পারে।

চীনা সমাজে বিবাহ বাতিল করা বা অন্য রকম কুৎসার কথা প্রায়ই শোনা যায় না। তবে একটা বয়সে মেয়েদেব আত্মহত্যা করিবার বড় ঘটা দেখা যায়। স্বামীর মায়ের অত্যাচারের ফলেই এই ব্যাপার বেশী হয়। ঘরের বধূ আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন প্রতিকারের পথ নাই। তবে সমাজে নারীশিক্ষার বিস্তার হইলে ইহা কমিয়া যাইবার আশা আছে।

স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের ফলে পরিবারে অনেক রকমের গোলমাল হয়। চীনা শাস্ত্র এক স্ত্রী বর্তমানে অন্য দার গ্রহণ করার পক্ষে নয়। কিন্তু এক স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে আবার বিবাহ করা চলিতে পারে। বড় লোকের ঘরেই এটা বেশী হয়।

বাবা মা বর্তমানে পরিবারের সব ছেলে এক বাড়ীতেই বাস কবে। তাহাদের সকলকেই কঠোর জুকুমে চলিতে হয়। তাহাদের মতের বিশেষ কোন দাম নাই। মেয়েরা রান্নাবান্না ইত্যাদি ঘরের কাজ করে। পুরুষদের সঙ্গে নসিমা নারীদের খাইবার অবিকার নাই। পুরুষবা বাড়ীর বাহির মহলে উঠানে দাঁড়াইবা বা বসিয়া খায়। মেয়েরা অন্তরে বসিয়া খায়। ঘবেব বাহিবে নারীর সম্মান বেশী—স্বামী গাড়ী জুড়িয়া স্ত্রীকে তাহাতে বসাইয়া নিজে পাশে পাশে হাঁটিয়া যায়।

চীন দেশের বাড়ী-বরের কথা কিছু বলা দরকার। অবশ্য বড়-লোকের বাড়ী গরীবের বাড়ী অপেক্ষা অনেক ভাল হয় একথা বলা বাহুল্য। বাড়ীর চাষিদিকে দেওয়ান থাকে। দেওয়ালের মধ্যে অন্তর, মহল এবং বাহির মহল ভাগ করা আছে। ঘবগুলি সবই একতলা এবং সারি মাঝি পাকে। তাতে ছাবা ছাড়া জানুলা নাই বলিলে

হয়। বড় লোকের বাড়ীতে অনেক মহল থাকে। স্ত্রী-মহল এবং পুরুষ-মহলের মাঝে দেওয়াল দেওয়া এবং দুয়ার বন্ধ থাকে। বড়-লোকের বাড়ী বেশ সাজানো থাকে। দেওয়ালে লাল এবং সোনালি কাপড় মোড়া থাকে। ঘরের মধ্যে বেশ দামী নানা রকম তৈজস-পত্র সাজান থাকে।

চীনা দোকানে নানা রকমের চমৎকার সেলাইয়ের কাজ দেখা যায়। তাহা এইসব দোকানীর মের মেয়েদের তৈরী। চীনদেশে চায়ের ব্যবসা এবং চাষ খুবই চলে। এই কাজে মেয়েরাই বেশীরাই ভাগ নিযুক্ত থাকে। পিঠে সস্তান বাঁধিয়া তারা অক্লান্ত ভাবে সাবাদিন মাঠে কাজ করে।

দক্ষিণ চীনে মাটির উপর স্থানাভাব, তাই অনেক পরিবারকে চিরকাল জলের উপর নৌকায বাস করিতে হয়। নৌকার উপর মেয়েদের স্বাধীনতা একটু বেশী। তাহারা খোলা হাওয়ায় বসিয়া ঘরের সব কাজ কর্ত্ব কবে, বড় ঘরের মেয়েদের মত তাহারা ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকিয়া চিরকাল কাটিয়া দেয় না। একটি গল্প চীনদেশে চলিত আছে। কো কি নামে এক বড়-ঘরের মেয়ের বাড়ীতে আগুন লাগে, বাড়ীর কর্ত্তা বাড়ীতে না থাকায় তিনি লোক-সঙ্কর ভয়ে আগুনে পুড়িয়া মরেন, তবু ঘরের বাহির হইল না।

নব বৎসরের প্রথম দিন নারীদের একটি বিশেষ আনন্দের দিন। এই দিনে তাবা নূতন পোষাক পরিয়া কাছাকাছি কোন বাগানে গিয়া আনন্দ-উৎসব করিয়া নূতন বৎসরকে বরণ করে এবং দিনশেষে বনভোজন করিয়া বাড়ী ফেরে।

মাঝে মাঝে মেয়েবা বাপের বাড়ী যায়। বাপের বাড়ীতে তারা সব সময় আদর পায় না। তবুও তাদের মাঝে মাঝে স্বস্তরঘর ত্যাগ করিয়া বাপের বাড়ীর আনন্দের মধ্যেই যাইতে হয়। তাহাতে স্বামীর ঘরের লোকেরা বুঝিতে পারে যে তাহার মাথা রাখিবার অন্য একটা আস্থানা আছে।

বড় ঘরের মেয়েরা থিয়েটার ইত্যাদি দেখিতে পায় না, তবে বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে অভিনয়ের আয়োজন করিয়া

বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করা হয়। গবীবের ঘরে এসব সম্বন্ধে কোন বিশেষ বাধা নাই।

বড়-ঘরের মেয়েদের শিক্ষাকাল হইতে পা ছোট্ট করিবার বন্দোবস্ত হয়। লোহার জুতা পরাইয়া পাকে বাড়িতে দেওয়া হয় না। কিছুকাল পরে পা-চুথানি ছোট্ট গজালের মত দেখিতে হয়। এই রকম পাকে চীনারা বলে "চরণ-কমল"। বড় ঘরের মেয়েদের এটা রূপের একটা বিশেষ চিহ্ন। পা-ছোট্ট মেয়েদের অকেজো করিয়া রাখা হয়, তাহারা চলিতে পারে না, দাঁড়াইতেও পারে না। এখন এই প্রথাটা বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছে। কয়েকস্থানে প্রথাটি মন্দা পড়িয়াছে; কিন্তু একেবারে দূর হয় নাই। চীনের অনেক প্রদেশে এই ভীষণ প্রথা বেশ বাচিয়া আছে।

চীনদেশে মেয়েদের পোষাক অনেককাল ধরিয়া এক রকমই চলিয়া আসিতেছে। বড়-ঘরের মেয়েরা মাথায় টুপি পরে, তাহা দেখিতে তাহার স্বামীর টুপির মত হয়। চাই। টুপীতে সাটিন জড়ানো থাকে। সকল মেয়েদের টুপীতে সোনার কোন কিছু লাগাইবার অধিকার নাই। গবীবের ঘরের মেয়েদের টুপীর কোন বাহার নাই। সকল শ্রেণীর মেয়েরাই তোলা পাঞ্জাবী জামার মতন কুর্তী পরে। বড় ঘরের মেয়েরা পেটিকোট ব্যবহার করে—অবশ্য সকলেই করে না।

বড়-ঘরের মেয়েরা সাটিনের তৈরী জুতা পরে। তাহারা অবস্থা-মত রেশম সাটিন বা স্থতার পোষাক ব্যবহার করে। পোষাক তাহারা নিজের হাতে তৈরী করে। ছেলে-মেয়েদের পোষাক বড়দের মতই, তবে ছোট্ট আকারের হয়। শীতকালে ছেলে-মেয়েরা এবং লোকে জামার উপর জামা পরিয়া দেখিতে অনেকটা কাপড়ের বস্তার মত হয়। গবীব ছেলে-মেয়েরা তুলা-ভরা জামা পাবে।

ছোট ছোট্ট মেয়েদের মাথা কাঁগাইয়া দেওয়া হয়। কেবল মাথাব ছ-পাশে দুই গুচ্ছ চুল রাখিয়া দেওয়া হয়। মেয়ে বড় হইলে তবে চুল রাখিয়া খোঁপা বাঁধে। মাথার খোঁপা বাঁধা বড় কষ্টকর ব্যাপার বলিয়া চীনা মেয়েরা ৭ দিনে একবার খোঁপা খোলে। কাঠের বালিসে মাথা রাখিয়া ঘুমায়ে, তাহাতে খোঁপা নষ্ট হয় না; জাপানী

মেয়েরাও ঠিক এইরূপ করিয়া থাকে। খোঁপাতে নানা প্রকার গয়না ব্যবহার করার প্রথা আছে—রং-বেবঙের নকল ফুল, চুলের কাঁটা ইত্যাদি অনেক কিছুই খোঁপায় গোঁজা হয়। চীনা মেয়েদের খোঁপার বাহার আছে নানা রকমের।

অনেক বড় ঘরের মেয়েরা হাতের নখ কাটে না, তাহা ঢাকনা দিয়া রক্ষা করে।

চীনা-নারীর স্থান পরিবারে যতই খারাপ বা পরাধীন হউক না কেন—এমন নারীও ঐ দেশে দেখা যায় যাহারা গলার জোরে শক্ত শাড়ী এবং স্বামীকে বেশ জব্দ করিয়া রাখে। এইসমস্ত বধুরাই অনেক সময় ঘরের কর্ত্রী হয়। স্বামী বেচারাকে সব ব্যাপারে তাহার কথা মানিয়া চলিতে হয়। চীনদেশে জৈন স্বামীর সম্বন্ধে নানা প্রকার গল্প প্রচলিত আছে। নারীরা অনেক সময় বেশী বুদ্ধিমান হয় এবং তাহাদের মনের জোরও পুরুষ অপেক্ষা বেশী হয়। এই কারণেও তাহারা অনেক সময় ক্রমের শাসন করে।

চীন দেশে একখানি বিশ্বকোষ আছে—তাহাতে মোট ৬২৮ খানি পুস্তক আছে। তাহার মধ্যে ৩৭৬ খানি নারী সম্বন্ধে।

পিতামাতার প্রতি ভক্তি এবং শ্রদ্ধা সম্ভানদের প্রধান কর্তব্য। পিতামাতার জীবিত অবস্থায় সব বিষয়ে তাহাদের মত লইয়া সম্ভানদেব চলিতে হয়। মাতার মৃত্যুতে তিন বছর শোক করিতে হয়। সেই সময় বাহিরের প্রায় সব কার্যই তাগ করিতে হয়।

বিধবাদের স্থান চীনা সমাজে খুব খারাপ নয়। তাহারা ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিতে পারে। বিধবার বিবাহে খরচ খুবই কম, এইজন্য অনেকে বিধবা বিবাহ খুব আনন্দের সঙ্গেই কবে। চীনারা বিধবাদের “হাল-হীন নৌকা” বলে। সকলেই বিধবাদের একটু কৃপার চোখে দেখিয়া থাকে।

কিন্তু বর্তমানে চীনা সমাজে নারীদের মধ্যে হঠাৎ কেমন একটা জাগরণের সাড়া আসিয়াছে। এতদিনকার আলস্য আর পুরুষ-প্রাধান্য এতদিন পরে হঠাৎ তাহারা হিঁড়িবার জন্ত উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে।



চীনা-নারীর খোঁপার গহনা।

এখন নারীরা আমেরিকার নারীদেরও পাল্লা দিতে চলিয়াছে। পিকিংএর কলেজে নারী এবং পুরুষ এক-সঙ্গে বিদ্যালভ করিতেছে। চীন ইতিহাসে এ ব্যাপার এই প্রথম। কেহ ইহার কল্পনাও করিতে পারে নাই। বালিকাবা নানা রকমের খেলা দর্শনেব সামনেই স্বরূপ করিয়া দিয়াছে। চীনদেশে সব-চেয়ে শিক্ষিত প্রদেশে হুনাং নারীবা ভোটের অধিকার পাইয়াছে। অনেক চীনা সরকারী কর্মচারী মেয়েদের কাছে গালে চড় খাইয়াছেন। মেয়েবা দলবদ্ধ হইয়া ভোট দিবার এবং অন্তান্ত স্ত্রী-সম্বন্ধে অধিকার দাবী করিতেছেন। চারিদিকে নাবী-শিক্ষার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। পুরুষরাও এই নারী-জাগরণ কোন প্রকার মন্দ চোখে দেখিতেছে না। তাহারাও অনেক কার্যে মেয়েদের সাহায্য করিতেছে। এইসমস্ত দেখিয়া মনে হইতেছে—চীনা নারী-সমাজ আর খুব বেশীদিন অন্যান্য সভ্যদেশেব নাবী-সমাজের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না। গোড়া চীনা-পুরুষসমাজ নারী-জাগরণকে খুব স্নেহের চোখে দেখে না, কিন্তু তাহাদের গলাব স্বর বড় ক্ষীণ, কাণে দে দলে লোক বড় কম।

তাহাদের আপত্তি ক্রমে যুবকদের উৎসাহে চাপা পড়িয়া একে একে সবই বদলাইয়া যাইবে বলিয়া আশা যাইতেছে। চীনা সমাজ পূর্বে যা ছিল, তাহা হইতেছে।

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

গ্রামের পথ

গ্রামের মাঝে পথখানি সে বট-অশথে ঢাকা—
পানিক তারি নুকিয়ে আছে, পানিকটা তার ফাঁকা ;
সে ঘেন ঠিক গ্রামের বধু—খানিক চেয়ে আড়ে
নুকিয়ে পড়ে ঘোমটা টেনে আম-বনেরি ধারে ।
আঁকাবঁকা নদীর সাথে যায় সে একে বেকে
কত কুঁড়ের ছাঁচতলা দে' ঘাট পিছনে রেখে ।
হাটে বাটে সব দেখে' সে আবার কোথা চলে—
লক্ষ গায়ে পরশ দিয়ে কমনে কিসের ছলে ।
এ ঘেন রে খুঁজতে বাছুর গয়লাদের এক মেয়ে
বনের আশে পাশে ঘোরে ব্যাকুল চোখে খেয়ে ।
বামুনদের এক তরু নিয়ে নাথে মাসী কীরি
কুটুম-বাড়ী চলছে ঘেন অলস ধীরি ধীরি ।
এমনি গ্রামের পথখানি সে স্বপ্নে ঘেন ভরা,
ছায়ার স্নেহে নদীর গানে মোহন শ্রমহরা ।
টুনটুনি ও বুলবুলিরা লক্ষ কথা পাড়ে,
মোমাছি গায় বৈচি-বনে কামিনী-ফুল-ঝাড়ে ।
সে পথ দিয়ে চল্ব আমি কাজ রবে না কিছ,
কোথায় যাব নেই ঠিকানা, ডাকবে না কেউ পিছু ।
গ্রামে গ্রামে পরশ দিয়ে চল্ব নব গায়ে
বাবলাবনের গন্ধ শুঁকে হাটকে রেখে বাঁধে ।

যেইখানেতে নদীর সাথে পথের চেনাশোনা—
সেখায় অশথতলায় শুয়ে স্বপ্ন কত বোনা ।
পাশে বেধে কলুবাড়ী, কেয়াবনের রাশি
পেবিঘে অলস চল্ব যুছ শীতল বায়ে ভাসি' ।
কা'কে দেবো কিসের খবর তা রবে না মনে,
মনে হবে চেনা ছিল কুটারগুলোর মনে ।
এ পথ দিয়ে চল্ব অশেষ অচিন্ গায়ে কোথা—
চমকে চা'ব অচিন্ ঘাটে—বধুরা স্নানরতা,—
দেখিয়ে হাসি ডাকবে মুখে গাম্‌ছা আড়াল দিয়ে,
নিশাস ফেলে চল্ব পুন নূতন প্রীতি পিয়ে ।
দেখ্ব কোথা ছুটু ছেলে কোমর বেধে ছুটে
পাততাড়ি ও মাদুব নিয়ে পাঠশালাতে জুটে ।
কলসী ভাঙা জীর্ণ মাদুর নিয়ে শ্মশান যোথা
চোখ মেলিয়ে অবাক ঘেন পথটা রহে সেথা ।
শতেক গ্রামের প্রয়োজনের এইটি গতিবিধি,
“হবিবোল্” ও পথিক-গীতি শুন্‌ছে এ যে নিতি ;
বনের ছায়ে ঘুমোয় কোথা, রোদেব মাঝে জাগে,
ঝিল্লি ভেক ও শতেক সাপে বক্ষ ইহার মাগে ।
পথটি ঘেন পল্লী-মায়ের সুদীর্ঘ এক স্নেহ—
বাড়িয়ে বাছ বাঁধছে সবায়, চিনায় সবে গেঁহ ।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

কণ্ঠ পাথর



মাটির ডাক

শালবনের ঐ অঁচল ঘোপে
যেদিন হাওবা উঠত মেপে
শান্তন-বেলাব বিপুল বাকুলতার,
যেদিন দিকে দিগন্তবে
লাগত পুলক কি মস্তবে
কচি পাতার প্রথম কলকপায়,
সেদিন মনে হ'ত কেন
ঐ ভাণাবি বাণী যেন
লুকিয়ে আছে হৃদয়কুঞ্জহায়ে ;
তাই অমনি নবীন বাণে
কিশলয়ের সাদা লাগে
শিউবে'-ওঠা আমাব সাবা গায়ে ।
আবাব যেদিন আশ্বিনেতে
নদীর ধারে ফসল-ক্ষেতে
হৃদ্য-ওঠাব বাঙা-রঙীন বেলায়,
নীল আকাশের কুলে কুলে
সবুজ সাগর উঠত ঢুলে'
কচি ধানের খাম্বেরালি খেলায়,
সেদিন আমাব হ'ত মনে
ঐ সবুজের নিমন্ত্রণে
যেন আমাব প্রাণের আছে দাবী ;—
তাইত হিয়া ছুটে পালায়
ঘেতে তাবি বজ্রশালায়,
কোন ভুলে হায় হারিবেছিল ঢাবী ।

কর কথা এই আকাশ বেয়ে
কেলে আমাব হৃদয় ছেয়ে,
বলে দিনে, বলে গভীর বাতে,
“যে জননীর কোলের পবে
জন্মেছিলি সন্তানবে,
প্রাণ ভরা তোর যাহার বেদনাতে,
তাহার বক্ষ হ'তে তোরে
কে এনেচে হরণ কবে’,
বিবে তোর বাণে নানান্ পাকে ।
বাঁধন-ছেঁড়া তোব সে নাড়ী
সইবে না এই ছাড়াছাড়ি,
কিবে কিবে চাইবে আপন মাকে ।”
শুনো আমি ভাবি মনে,
তাই বাণা এই অকাবণে,

প্রাণের মাস্তে তাই ত ঠেকে হাঁকা.
তাই বাজে কাব করণ স্নবে—
“গেছিন্ দূবে, অনেক দূবে,”
কি যেন তাই চোখের পবে ঢাকা ।
তাই এতদিন সকলখানে
কিণেব অভাব জাপে প্রাণে—
ভালো কবে' পাইনি তাহা বুঝে ;
কিবেছি তাই নানামতে,
নানান্ হাটে, নানান্ পথে,
হাবানো কোল কেবল খুঁজে খুঁজে ।

আজকে স্বব পেলেম বাঁট—
না আমাব এই ছায়ায় মাটি,
অন্যে ভবা শোভাব নিকেতন ;
অব্রশ্বেদী মন্দিরে তাব
বেদী আছে প্রাণ-দেবতাব,
ফুল দিবে তাব নিত্য আধাধন ।
এইখানে তাব আন্তন মাকের
প্রভাত-ববিব শব্দ বাজে,
আলোব ধাবায় পানের ধাবা মেসে,
এইখানে সে পূজাব কালে
সন্ধ্যারতিব প্রদীপ আলো
শান্তমনে ক্রান্ত দিনেব শেষে ।
হেথা হ'তে গেলেম দূবে
কোপা যে ইট-কাঠের পুবে
বেড়া-যেবা বিধম নিকাননে,
তৃপ্তি যে নাই, কেবল নেশা,
ঠেলাঠেলি, নাই ত মেণা,
আবর্জনা জমে উপার্জনে ।
যন্ত্র-জ'তায় পবাণ কাঁদায,
কিবি ধনেব গোলক-ধাঁধায়,
গূলতাবে সাঙ্গাই নানা সাজে,
পথ বেড়ে' যায বুবে বুবে,
লব্ধ্য কোণায পালায় দূবে,
কাজ বলে না অবকাশের মাকের ।

বাই বিবে বাই মাটির বুকে,
বাই চলে' বাই মুক্তি-স্বপ্নে,
ইটের নিকল দিই ফেলে' দিই টুটে',
আজ ববণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমাব পাতে,
বল দিয়েচেন সাজিয়ে পত্রপুটে ।

আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিঃশব্দে মোব খবর আসে—
কোণাখ আছে বিশ্বজনের প্রাণ ;
ছয় ঋতু ধাধ আকাশভরা,
তাঁর সাপে আর আমার চলায়
আজ হ'তে না বইল ব্যবধান ।
যে দূতগুলি গগন পাবেব,
আমার ঘবেব ক্রন্দন হবেব
বাইবে দিমেই ফিবে ফিবে যায়,
আজ হযেচে পোলাপুলি
ভাসেব সাপে কোলাকুলি,
মাঠের ধারে পথতরফ চাষ ।
কি ভুল ভুলেছিলেম, তাহা,
সব চেয়ে যা' নিকট, তাহা
স্বপ্ন হযে ছিল এতদিন ;
কাছেকে আজ পেলেম কাছে
চাবুকিকে এই যে-ঘব আছে
তার দিকে আজ ঝিল উদাসীন ।

(শান্তিনিকেতন, চৈত্র, ১৩২৮)

শ্রীবীজনাথ ঠাকুর

দাস-ব্যবসায়

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে দাসব্যবসায় প্রচলিত ছিল ।...
তৎকালের খৃষ্টীয়ান বণিকগণ এদেশে অতি বিস্তৃতরূপে দাসব্যবসায়
চালাইতেন বলিলে একটু বিপ্লিত হইতে হয় । আমাদের
দেশের পরিব হিন্দু পিতামাতা গল্পবাহুব বোচাব মত শিশু-ও কিশোর-
বয়স্ক পুত্রকন্যা বিক্রয় করিত ।...

বাংলার সবল জেলায় পূর্বাতন কাগজপত্রের ও তৎকালের
সংবাদপত্র-সমূহে দাসব্যবসায়ের ভূবি ভূবি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া
যায় । তখনকার জীবনে দাসব্যবসায়, দাসদাসী ক্রয় একটা অতি
সাধারণ ঘটনা ছিল । প্রত্যেক সমৃদ্ধ মুসলমান ও খৃষ্টীয়ানের সংসারে
পাল পাল ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী ছিল ।...

মবিশাস ও বুর্ব এই দুইটি দ্বীপ মধ্য-বাসোপযোগী কবিতা
কৃষিকার্যাদির দ্বারা সমৃদ্ধ কবিবাব মানসে স্বাধীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া
কোম্পানী...ক্রীতদাসের পাল ভাবতবর্ষ হইতে সংগ্রহ কবিয়া...
উক্ত দ্বীপদ্বয়ে প্রেরণ করেন (French East India Company's
letter to the Pondichery Council, dated Paris—25 h
September, 1727) । প্রথমে চন্দননগরের উপর ক্রীতদাস
সংগ্রহের ভাব পড়ে ; কত সে বাঙ্গালী ও বিহারী দবিশ বাক্তি
জাহাজ বোকাই হইয়া সমুদ্র পাবে বুর্বর বনে ও মবিশাসের উৎকট
উত্তাপে ইহলীলা সাস্র কবে তাহা এখন নির্ণয় কবা কঠিন ।

১৭২৯ সালের মধ্যভাগে পণ্ডিতাবী হইতে হুকুম আসে যে চন্দননগর
হইতে ক্রীতদাস কনিয়া আর পাঠাইতে হইবে না, মাত্রাজ উপকূলবর্তী
এদেশে দুর্ভিগ হইবাছে, দেখানে বাংলা অপেক্ষা সম্ভা দবে ক্রীতদাস
পাওয়া যাইতেছে (Letter of Pondichery Council to
the Council at Chandernagore, dated Fort Louis,
Pondichery, the 14th June, 1729) । উই বৎসর পবে
নে এদেশে হুজুমা হয় । তখন হুকুম আসে দেখানে দব, চড়া, অতএব

আবার চন্দননগর হইতে ক্রীতদাস পাঠান হউক (The same,
dated 12th March, 1731) । ১৭৩৫ সালের সেপ্টেম্বর
মাসে চন্দননগর হইতে পণ্ডিতাবীতে সংবাদ যায় যে পাটনার নবাব
(আলিবর্দী খা) কোন এক হিন্দু রাজাকে (সম্ভবতঃ বিহাবের কোন
জমিদার বা বজ্রাধা নামক দস্তাধরকে) যুদ্ধে পরাজিত কবিয়া ১২
হইতে ১৫ হাজার বন্দীকে ক্রীতদাস কাববা বিক্রয় করিতেছেন ।
চন্দননগর হইতে ডুধে এই সংবাদ প্রেরণ কবিয়াই সঙ্গে সঙ্গে
পাটনার ফরাসী কুটম্বাল Grousselleকে হুকুম দিলেন—“৩০০ ক্রীতদাস
ক্রয় কব ।” পণ্ডিতাবী হইতে সংবাদ আসিল—“যদিও বুর্ব দ্বীপে
প্রতি বৎসর ২০ জন মাত্র পাঠাইবার হুকুম আছে—মবিশাস দ্বীপে
৩০০ ক্রীতদাস পাঠাইলে কাজে আসিবে, এবং যেহেতু মনে হয় মাল
সম্ভাষ পাওয়া যাইবে, প্রত্যেক জাহাজে কিছু কিছু কবিয়া ৩০০
শতই পাঠাইয়া দেওয়া হউক ।” (Letter of Pondichery
Council to that of Chandernagore, dated Fort Louis,
Pondichery, 24th September 1735.)

La Bourdonnais তখন মবিশাস দ্বীপের শাসনকর্তা । তাঁহার
উপর কোম্পানির হুকুম ছিল—তিনি আবশ্যক মত ভাবতবর্ষ হইতে
ক্রীতদাস আমদানি কবিত্তে পারিবেন (The same 13th March,
1736) । ১৭৫১ সালে বুর্বর শাসন-সম্ব হইতে আবেদন আসে
—৬০ জন ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী, বয়ঃক্রম ১৫ হইতে ৩০, পাঠান
হউক ।—পণ্ডিতাবী হইতে চন্দননগরের উপর সে আবেদন রক্ষা করিবার
ভাব পড়ে (The same, dated 8th September, 1751) ।

...আমরা শিশুগণকে যে ছেলেধরাব ভব দেখাই, দাসসংগ্রাহকগণ
সেই ছেলেধরা (Anandaranga Pillai's D'ary—Madras
Govt. publication—Vol., I, p 227) । ইয়োরোপীয় বণিকগণের
প্রত্যেক আডডাঘ—চন্দননগরে, ছগলিতে, চুচুড়ায়, শ্রীমমপুবে ও
কলিকাতায় দাসের আডডা ছিল, দাসের হাট বসিত । গহনাব
মৌকার বোকাই দিয়া যেমন আত্মকাল ব্যবসায়ী হাটে বেসাত লইয়া
আসে, তৎকালে দাসব্যবসায়ী দাসদাসী বোকাই দিয়া শ্রীগীবনী-বন্ধ
বহিয়া দাসের হাটে জীবন্ত বেসাত লইয়া যাইতেছে, এ দৃশ্য একে-
বারেই অভিনব ছিল না ।...এদেশে বোমান কাথালিক পরিবাবের মধ্যেই
অধিক-সংখ্যক দাসদাসী পোখিত হইত । হিন্দু গৃহস্থের ঘবে ক্রীত-
দাসদাসীর নিদর্শন কোথাও পাই নাই । কৃষাণ বা মজুর হিসাবে হিন্দুব
ঘবেও হয়ত ক্রীতদাস ছিল । কিন্তু গৃহসংসারেব পবিচাবিকা বা
পবিচাবক হিসাবে থাকা সম্ভব নহে । হিন্দুগণ অর্থেব লোভে আগন্তুক
খৃষ্টীয়ানগণের ও মুসলমানগণের দাসব্যবসায়ের সহায়তা করিতেন সন্দেহ
নাই ; কিন্তু তাঁহারা নিজে যে দাসদাসী পুখিতেন তাহাব পবিচব পাই
নাই । মুসলমানগণ ক্রীতদাসদাসীর প্রতি অতিশয় সদ্যবহাব করিতেন ।
...দাসদাসীকে স্বাধীনতা দান কবা মুসলমানের পক্ষে পুণ্য কর্ম । মৃত্যু-
শয্যায় শয়ন কবিয়া অনেক মুসলমান দাসদাসীকে মুক্তি প্রদান
কবিতেন ।

...খৃষ্টীয়ান সংসারে দাসগণ অনেক সময়ে অতি নৃশংস ব্যবহাব প্রাপ্ত
হইত, অতি সামান্ত অপরাধের জন্য বেত্রাঘাত অতি-সাধারণ শাস্তি
ছিল, মাধেব শীতে উল্লঙ্গ কবিয়া দাস বা দাসীকে মস্তকে উপর্যুপবি বহ
কলনী ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দেওয়া একটা আমোদজনক প্রক্রিয়ার মধ্যে
পরিগণিত ছিল ।

দাস ক্রয় বা বিক্রয় কবিত্তে হইলে স্বকাবকে একটা মাণ্ডল
দিতে হইত । ইংবেজ সরকার দাসপ্রতি ৪১০ চারি টাকা চাবি আনা
শুধ লইতেন । ফবাসী সরকার দাসখণ্ডপানি লিখিবার কাগজের অম্ম
পাঁচ সিকা লইতেন এবং দাসদাসীর মূল্যের উপর শতকরা পাঁচ টাকা

ପ୍ରିୟାଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ବାସ

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

3

...অলসসম কুতো শিল্প ? নিশ্চর অমাদেব এখানকার জীবনযাত্রা ? কোথাও একটা কল বিগুডেছে যাতে কবে' জীবনটা বিক্রী বৎ খুঁড়িয়ে চলছে, শবীর বেটে মগ্ছে কিন্তু মনটা পড়ে' আছে ত-... অলস !...শিল্পী যা ছুঁয় দেয় তাই সোনা হয়ে যায়, অগচ সোনা দিয়ে যেচোবা ছেলে-মেয়েব গা কোনোদিন ডরে' দিতে পারবে না ; তাছােব পাণব যাত্রা পালিস করলে—আয়নার মতো বকবদে, দু-... মতো মাশা কবে', মুক্তোর চেয়েও লাংখা দিয়ে তার গম্বুছটা গড়' দে, বারা, বেগুয়ালের গায়ে অমরদেশেব পারিজাত-লত' চড়িয়ে দি ত গেল যে নিপুণ সব নালি, তারা বোজ-মজুরী কত পেয়েছিল... সিঁটা নীচ ছাত হলেও সে শিল্পেব পাণিগ্রহণ করেছে, সেই কারণে মত সময়ে শিত্তি বিস্কন্ধ—এই কথা; ভাণ্ডবর্ষো' বহিবা বনে ঘোরে', কিন্তু যেখানে এই শিল্প আকর্ষণের-কোন-স্বার্থের এআয়ের প্রাণ পাচ্ছে, সেইখানেই সে মলিন হচ্ছে—তুং বেমন চাঁদকে মার' (সি-ব, হাতে পড়ে') এব উপাধি কি ?

কাজের বন্দীর দামের সঙ্গে পচিশ পনিষ ঘটকর কি আশা
করবে? কন থাকবে না? কান বন্ধ আনাদেরই মধ্যে পড়া দিচ্ছে
একটি বই, শিল্পী, বইক—এ বা মন এই কাজের দগড়ের বাইরে
একটু নোনা নোনা উপরে এসে পড়বে কবিতার তা তো নয়। এই যে
কবিতা তখন তখন এত আনন্দ বাস্তব, তাই ধারণ তাই স্বল্পত্ব ফল
কুটিলেই। এত চিন্তামণ্ডিত মজি কবি, শিল্পী গাইয়ে, ওণ
সুদৃষ্ট, পচিশ বৎসর—পয়সার ওপ নয়, কিম্বা কাজ ছেড়ে ভরপুর
আনন্দ ও নয়।

মন দে তো বাধা মানবের পাত্রই নয়। জলপানার দবজা
মস্ত-বাল খল তো বেরিয়ে যেতে পারে একেবারে নীল আকাশের ও
ওপানে। সে তো মৃত্যুর বনাল পড়ে ও রচনা কবিতা পারে অমৃত-লোক।
তবে কোথায় নিরাশ? কোথায় বাধা? কবি শিল্পী কেউ কাজের জগৎ
ছেড়ে বসফলিত তিলক টেনে অথবা জটাজুটে ছাউ-ভয়ে একেবারে
নসগতাব বোঝে কেবলি সন্মান আর গল্পসাপবেব দিকে পালিয়ে
চলছেন তা তো কোনো ইতিহাস বলে না। যত্ন দিলে গড়া এষ্ট
অমরবসর পেয়ালা, শুকনো চামড়ার বাকী, যাব মধ্যে বসে হয়ে
গোল গজল, কাচের সত্যায় গাঁথা পারিজাত ফল—এইগুলোকে
ভাবা জীবনে অস্বীকার করে চলতে চেষ্টা করেন নি, উটে বসে যারা
কাছে নাবার হয়ে একেবারেই বসে বাবার জুড়ে বেগী আশ্রয়
দেয়, যাও মন বন্ধ দিয়ে বলেছেন 'জেরা কা তো হুইনো'—
আব অবস্থ, ঠিক যেমন আট চমকই স্থির থাক। কথাই বসেছে
কাকফল্য। কাজের ওটিলতার শ্রম শ্রান্তি, সমস্তই যেনে নিলে
ওবে তো সে শিল্পী। এই মহাবসর মধ্যে লাড়িয়েছি কি আমবা বলতে
পারি বস কোথায়—তাক খুঁজে পাচ্ছি, শিল্প কোথায়—তাকে
দর্শন পাচ্ছি। উল্লান্দগমির ঢাকন দিয়ে ঢাক, এই প্রকাণ্ড
বসের পেয়ালা, কালা-নালা দাঁকা-সোদা, বস-বস কাকফল্য দিয়ে
লাদা বলে সাগরানো, এটি ধরা বসেছে—তোমারও সামনে, তাও
সামনে, আমবাও সামনে, ওবও সামনে—বিশব, বসে' কাক জুড়ে
তো এটা নম—জামগা বসেও তো এটা বাসা চমনি—তবে ছাশ
কেনেখানে? ঢাকা পোনার বাধা কি? কত শক্ত-শক্ত কাজে
জামগা এগিয়ে গাউ, এই লাটোই কি—পুর কঠিন আর ভসমাণ্য
বস? তাই বা তোমার অবসর পয়েমা না—এটাই তো কি জামল
ক? বস অবসর পয়েমা—পর্কপকম খেট-খুটি ঢাকা তমিয়ে
তো পাটের ভাবনাও তাইতে চল না—মোদের বিয়েও নয়, চাকরিও
না, কিম্বা আধিন-আদালত ইসুলগলোব সঙ্গে একদম শাড়ি গোথো
—এটা নট-পাওয়া গেল—বসের পেয়ালাটার তলানি পর্যন্ত
কি? পোছার। কিন্তু এত বসে হলো কি?—লাড়জুব পকের এত
বসে চমলা যে দিল্লি বাদশাহ মেঠাই ওয়ালাও যত্ন ২শর জোগাড়
হলে। তাইএব বলতেই হয় অবসর ও অর্গেব মাদ্রাস তবতলে
কম পাওয়া না পাওয়ার কম-বেশ ঘটেছে না, অগায়েব ইচ্ছে না-ইচ্ছে,
দি ইচ্ছে, কেনম ইচ্ছে—এবি উপরে সব নির্ভর করছে, এই
ইচ্ছেটা না পেতে চাই তাই পাওয়া, পণ দেখা এই ইচ্ছে।
না বিগড়ে গেলে আনাদের, না-জলে শিল্পে আগাগোড়া—তাব
পানি শুষ্কসম্মান সমস্তই চোখে পড়তো আমায়ে: কি চোপ
চাম্জান, কিসের গানে চাইতো? গোথ কি দেখলে এবং মন কি চাম্জল
তা কেনম করে? দেখলে, মন কেনম ভাব চাইতো, চোপ, পুজোই
কি না? মন চাইতোই কি?—এবি উপরে পাওয়া না-পাওয়া, কি
পাওয়া, যেমন পাওয়া, সবই নির্ভর কলজ।

কাজের উপরে ডাকফো রক্ত চক্ষু নিষে নয় সহস্র চোখ সহস্র
দৃষ্ট এবং সেই নিষেব ১৫৫ ঠাঙ্কা এবং আত্মবিক ইচ্ছা—এই

নিষে নিষিদ্ধকৃতনিষদবায়: 'জায়েবন'—মনজুবহা, বসবসকৃত্য;
যিনি তার সঙ্গে শুভাঙ্কি করছে 'যা মাস'—বসের পেয়ালায় যদি
নাগাণ্ড পাওয়া: গেল বসন আদ কিম্বা উপরে? যতটুকু সবদর্শই
কোকন কেন তাই ভাবির নিলেম মনে যমনই কাজ হোক না
কেন তাই করে গেলেম—যমন যখন মনোনের সঙ্গে; বা বলেম,
কতলেম, লিপলেম, পড়লেম, শুকলেম, মনোলেম—সবার মধ্যে বস
এলো মৌসভ এলো স্বপ্ন, দেখা দিলে;—শিল্প ও বস শুকশাখীর মতো
বদাপ্রপণে চিবকালের মতো; বস বাসা বাধতো। 'যি ফরি, কি শিল্পী,
কিবা তুপি, কিবা আনি এই বিরাট স্থিতির মধ্যে যেদিন অতিশয় ঘূর্ণন,
বসের পূর্ণপাত্র তা কাকব সঙ্গে ছিল না, একেবারে খালি পাত্রই নিষে
এলেন, এলো কেবল মাসের মাথা হয়ে একটুখানি পিপাসা। আবার
না জানতে মাতৃগেহে বসে গেল আশ্বিনাত সেই এতটুকু পেয়ালা
আনাদের, তার পণ থেকে সেই আনাদের চাউ পেয়ালা—তাকে শুধে
সিতে কানে-কানে শাসে-পাল দিন-বাত্রে এক ততু থেকে আব-এক
ধুতুতে বসেব ধাবা করেই চলো, তার ভেঁা বিদ্যে দেখা গেদে না, ওখ
কেউ ভবিষ্যে নিষে বসে বইলেম নিজেব পেয়ালা বসে কাজের সম্মো
দিয়ে নিলেট কবে, কেউ বা বলেম গবে সেটা বস-বস বস প্রফেন
বাত্রেই দেটা খালি বসে-কবে'। এই কারণে আমবা মনে কবি হটকর্তা
কোন্সে মাসফল কবে' পাঠালেম বসের সম্পূর্ণ অধিকারী, কাউকে
পাঠালেম এমোবাস নিষ বসে' য কি কখনো হতে পারে? বসে
বৈম, বলে বাতে বসে, ডাবলেম, ফিল কি বসে? বাত্রে মতো
কাউ? দিলেন কনহা, কাউকে বাত্রেম অফস কবে, শিল্পী বসে
যিনি তার বি এমন অনাফলি-মাব্ধান, হবে—কাউ পালে ফলি বস,
স্থিতি বসেব আবিদগ, আব-একজন কিউ পালে না? এত বড় জল
কেনব সেই মাতৃগেহ লব যে মাত্রেব মোর নিজে বসিত হয়ে বিরাটকে
দেখ গল্পনা।

এক-একবার গবে মতো থেকেও চমকে ঘুরে যাবে মনে ছয় দর্শজটা
কোথায় হাবিবে মোর—উত্তরে কি দিল্লি পিছে টিক পাওয়া যাচ্ছে
না; বসব মতো চুপে খেলে আনাদের বসব মতান, আব শিল্পেব চাউ
বসে মিত্রজাউ উপায় নির্মাণ, বর্ষ কতকটা উপায়।

আগবেব বসব মতো পে খাবি বসে বাধা, বসে, ছমো বাধা, বর্গি, তুপে
বাধা বাধা, মাদ্রাস বসবই তো যে বস বসে চিবরাও এবই নির্মাতি
ওব' প্রকাশ পাচ্ছে, 'অণ্ড বসেব পণ্ডপণ্ড টুকনো তো ধরা—একটি
মালোব থেকে জামানে' হাজার প্রাণ, এক শিল্পেব বিচিত্র প্রকাশ।
এব আধিকার পাওয়ার জগ্রে কোনো মাফেজান কোন শাপচর্চাই দব্বাব
কর না। কাজের জগতের মায়েই বসে বসে—আনাদের স্বধা
আনোব মোবা; তাই দটি ছাশ বস বসে ভবি অনন্ত; আব কোথায়
যাবে,—শিল্প শিপ্তে শিল্পকে জানতে? নীল আব সবজ এমনি সাই
বসে মাতৃগেহ পাড়া, গ্রাি মদ্যেই ধবা বসেছে বসদাশ, শিল্পশাস্ত্র,
দর্শন, কবিতা—সমস্তের মূলহস্ত মাধা সমস্তই। এমন চিত্রশালা
যাব চুবিব শেষ সেই বস বাণি-মালিব বেগানে কবিতার অবিশ্রান্ত
পাওয়া-মোবা বসেই, এমন সম্মীতনালা মপানে স্ববের নদী সমস্ত বসে
চলছে অবিদ্যে, এব উপরে বসকে পাবা, শিল্পকে লাভ করবার, আব
কি আনাদের মালি মেমোবেব তবে কবিতা পাবি? এব উপরে
শিল্প শুভাব আনাদের জানায়ে পাবি? Artistsএব সেবা কবিগবেব
সেবা—বিশ্বকর্মাণ এই অশ চিত্র দান, এটি নিষেই তো বসে থাক
চলে,—দেখ আব লেখ, মৌন আব বসে থাক।

আব এটা কিছুব জগ্রে চেষ্টা হয় না ইচ্ছাও হয় না। এত উপার্জিত
অপায়াশ্রু কটি অব বস—একেই বস পেতে নিষে স্থিতি যা কিছু—
মোদের থেকে সবাই চপচাপ বসে বইলো ঘাউ ষ্টেট করে বসেব মধ্যে

বাঙ্গালার লৌকসংখ্যা

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে পাল্লারচোরা মে যৌকসংখ্যা ছিল, এখানে বিপোর্ট পোর্ট জানা যায় তখন যে ততদশ বৎসরের মধ্যে সমগ্ৰ প্রদেশে শতকরা ২৫ লোক বাড়িয়াছে। অর্থাৎ মগ বৎসর পূর্বে পাল্লারচোরা মে যৌকসংখ্যা ৪৬,৩০৫,১৭০ ছিল। তাহা বাড়িয়া ৫০,৫৯২,৩০২ হইল। এই জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষ ২৫,৩০৮,৩৬৫ জন এবং স্ত্রীলোক ২৫,২৮৩,৯৩৭ জন। বাঙ্গালী দেশে ত্রীলোক অগোনা পুরুষের সংখ্যা অধিক।

কোন বিভাগের কোন কোন লোকসংখ্যা, এবং শতকরা বৎসর হ্রাস বা বৃদ্ধি আছে, তাহার একটি তালিকা নিয়ে একত্রে দিইল :—

বর্তমান বিভাগ।

বিভাগ	মোট লোকসংখ্যা	শতকরা বৃদ্ধি	শতকরা হ্রাস
বঙ্গদেশ	১৪৮৮২২৩	০	৬.৭
মুর্শিদাবাদ	৮৪৭৫৭০	০	১.৪
মালদহ	১০১৯৯৪১	০	১.৮
মুর্শিদাবাদ	২৫৩৬৬১	০	৫.১
মুর্শিদাবাদ	১০৮০১৪২	০	১.০
মুর্শিদাবাদ	১২৭৪০৩	৫.৭	০

মোট ৮০৫০৬২২

প্রেসিডেন্সী বিভাগ।

মুর্শিদাবাদ	২৬৮২০৫	৮	০
মুর্শিদাবাদ	৯০৮৫১	১.৩	০
মুর্শিদাবাদ	১৪৮১৫৭০	০	০
মুর্শিদাবাদ	১০৬৫১৪	০	০
মুর্শিদাবাদ	১৫২২১১০	১.৮	০
মুর্শিদাবাদ	১৪৬৩০৩৫	৬.৭	০

মোট ৯৪৬১১০৫

বঙ্গদেশীয় বিভাগ।

মুর্শিদাবাদ	১০৮২৩০২	০.৫	০
মুর্শিদাবাদ	১০৬৫১৪	১	০
মুর্শিদাবাদ	১০৬২৬০	৩.০	০
মুর্শিদাবাদ	১০২৭৬০	৬.৫	০
মুর্শিদাবাদ	১০৭৮৫১	৫.১	০
মুর্শিদাবাদ	১০৮১০৩	৬.০	০
মুর্শিদাবাদ	১০৮৯৯৪১	০	১.০
মুর্শিদাবাদ	১০৮৬৬৫	০	১

মোট ১০৬০৬৬৪

চাক্রা বিভাগ।

চাক্রা	১১২৫১১৭	৮.৩	০
মুর্শিদাবাদ	৪৮৩৭৭০	৬.০	০
মুর্শিদাবাদ	২৪৮৮৫৮	৪.৮	০
মুর্শিদাবাদ	১৬২৩৭৫১	৮.২	০

মোট ১১৮৩৭৭১৭

চট্টগ্রাম বিভাগ।

বিভাগ	মোট লোকসংখ্যা	শতকরা বৃদ্ধি	শতকরা হ্রাস
চট্টগ্রাম	২৭৪০৭০	৯.৭	০
চট্টগ্রাম	১৫৭২০১৬	১.০	০
চট্টগ্রাম	১৬১১৪২২	৬.৮	০
চট্টগ্রাম	১০২২৪০	১২.৬	০
মোট	১০০০৫০৪		

ব্রাহ্মণ্য বিভাগ।

ব্রাহ্মণ্য	১০২৪০	০	০.১
ব্রাহ্মণ্য	১০৪৪১৭	৩২.৬	০

মোট ৮০৬০০৩

(গুরুত্বপূর্ণ, কাকুল)

কদলী ও তাহার ব্যবহার

কদলী মূল্যে কদলী বা কলা একটি-মোট পাল্লার হইয়া পুষ্টিবান উপাদানে পূর্ণ। ইহাতে শর্করা, যেতনার পদার্থ (starch), অ্যালবুমিন (albumen) ও লবণ (mineral salts) আছে। বৈজ্ঞানিক উপাদানে ইহাকে নান্দীকৃত অর্থাৎ, ইহার তলীয়ভাগকে অক্সিডাইজ (dehydration) করিতে পারিবে, কলাব ড্রাইফ্রুট, কলাব আটা, ও পাকা কলা ইহাতে উপাদানে পাল্লার, প্রস্তুত করিতে পারিবে। বৈজ্ঞানিক উপাদানে কদলীকে নান্দীকৃত করিবার উপায় বিগত মহাব্যবসায় সময় আধুনিকীভূত আবিষ্কৃত হইয়াছিল। নান্দীকৃত কদলী ইহা, কদলীর সমস্ত জার্মানি ও অষ্ট্রিয়ার বহুলোক প্রাপ্যবান করিয়াছিল।

কলা ইহাতে আটা বা পাদ্যস্রাব প্রস্তুত করিতে হইলে, সুগন্ধ ও পানীয় কলা বা আটা করিবে লইতে হয়। সুগন্ধ কলা ইহাতে গুরুত্ব প্রস্তুত করিতে হইলে, ফ্রিট ছোট আকারে কলাই উপাদানে, কলা পানিদ্রা হবিষ্কার্ভ ইহা, তাহার ছোট ও আটা তুলিয়া বৈজ্ঞানিক হয়। পূর্বে হুতরাবট ছোট ও আটা ছোট হইতে। কিন্তু এখন ছোট ও আটা তুলিবার প্রস্তুত হইয়াছে। ছোট ও আটা তুলিবার তাহা দুই নিম্নের কলা করিতে। তাহা পূর্ণ ছোট কলাগুলি পূর্ণ বা পূর্ণের পূর্ণ সাচাইয়া বৈজ্ঞানিক উপাদানে ছোট ছোট গাউন্ডে বোঝাই করা হয়। সেই গাউন্ডুলি কদলী উপাদানে উত্তম পদ্ধতির মধ্যে চালিত হইতে থাকে। এইকালে কদলী বন বা তলীয়ভাগ প্রায় ১ অংশ কমিয়া যায়, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কলাব বৈজ্ঞানিক পানিবর্জনও হয়। এই পানিবর্জন-বলে কলাব যেতনার (starch) অংশগুলি শর্করাতে পরিণত হয়। কলা এইকালে প্রস্তুত হইলে, তাহার বৎসরান মত হয়, এবং তাহা দ্রিগু (dry) কদলী মত চট্টাটে হয়। এইগুলি বাসে পূর্ণ বা দ্রিগু বাসিলে, এবং বাসগুলি নীচের, শুষ্ক ও বাস-সংশ্লিষ্ট ভানে রাখিলে, অনেক দায় ধরিয়া কলাগুলি কদলীর ব্যবহার থাকে এবং গ্রাহক বৎসর ও আধুনিক ও চমৎকার থাকে যদি অধিক পুরু বা অধিক কলা ব্যবহার হয় তাহা হইলে কদলীর মত পুরু বা অধিক তাহার ব্যবহার হইয়া যায়।

শুধু কদমীও প্রস্তুত করিতে হইল, বড় বড় কাঁচকলা সংগ্রহ করিতে হয়। কাঁচকলাব মধ্যে যেতমাত্র পদার্থ অধিক পরিমাণে ও শকলী কল্প পরিমাণে থাকায়, তাহা হইতে ভাল বর্ণ প্রস্তুত হয় না। শুধু কদমী-খণ্ডগুলি এলোই ভাসিয়া যায় এবং তাহা বলে চর্ণ করিলে তাহা হইতে চমৎকার আঁটা প্রস্তুত হয়। এই আঁটা গমের আঁটাব সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা হইতে বিস্কুট প্রস্তুত করিলে, সেই বিস্কুট দৌগকমুত, উপাদেশ ও নহরপাচ্য হয়। কলাব আঁটা হইতে পিষ্টক, পাই (Pie) ও মিষ্টান্নও প্রস্তুত হয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কলাপাণি শুষ্ক করিবার সময়ে বায়বীয়িক প্রক্রিয়া দ্বারা তাহাদের যেতমাত্র অংশগুলি সহজ-পাচ্য করণার্থে পরিণত হয়। অপর কদমী নান্য ইত্যাদির অ্যালু-মিনিয়াম লবণের ভাণ্ড স্থাপিত থাকে।

সদ্যবগৃহীত তাজা কলা অপেক্ষা এই নানীকৃত কলাব খাদ্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে নর পোষ্য ওজননের কলা হইতে অধিক পের পরিমিত নানীকৃত কলাব খাদ্য প্রস্তুত হয়। এই খাদ্যের পুষ্টিকারক গুণ তাজা কলা অপেক্ষা দ্রুত চাবিষ্টা বেনী, এবং ইহা প্রায় ছয় বারনা মূল্যব। এই খাদ্য অতিশয় সহজপাচ্য এবং ইহার তুলা পুষ্টিকারক খাদ্য খুব কম ক্ষেত্রে পাওয়া যায়।

বাহ্যিক দিশে অল্প পরিমাণে কলা তৈরী। যদি পুষ্টিগত প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায়ে বেশ অপর কলা হইতে উপাদেশ ও পুষ্টিকর খাদ্য এবং কাঁচকলা হইতে আঁটা প্রস্তুত করিতে পারেন তবে হইলে তিনি যে তদার বিবরণ লাভবান হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জার্মানীর বার্লিন (Berlin) নগরে ডাক্তার হার্মান লুথজে (Dr Herman Luthje) বৈজ্ঞানিক উপায়ে কলাব খাদ্য ও আঁটা প্রস্তুত করিবার কারখানা আছে। কেহ দেখানে এই এই খাদ্য ও আঁটা প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া শিখিয়া আসিতে পারিলে, দেশের প্রভুত মঙ্গল হইবে।

(গল্পবিশিক, বাক্তন)

কলিকাতার কথা

১৭৮৪ খৃঃ পূঃ পাহাৰী গিৰ্জা বা 'সেন্ট জন চাপেল' তৈয়ারী হইয়াছিল। ১৭৮৩ খৃঃ ১৮ই জানুয়ারি এমিগাটিক মোসাইটিব প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ও ১৭৮৭ খৃঃ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ লোকুটনাট্ কর্ণেল রবার্ট কিড্ শিবপুরে বোটানিকাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহারই পুত্র জেমস্ কিড্ শিবপুরেব ডক্ তৈয়ারি করিয়াছিলেন। তাহার নাম হইতে শিবপুর হইয়াছিল।

তখন কলিকাতায় খুনজখন, নরবলি, দাসবিজ্ঞী হইত। বাগবাজারে, চিবপুরে কালীর মন্দিরে ১৭৮৮ খৃঃ ৬ই এপ্রেল শনিবার অমাবস্যায় নরবলি হইয়াছিল। কুমারবল্লভ মিত্রের ছেলের বিবাহে কোম্পানীর কেল্লার কামানদাগা হইয়াছিল।

চৌব-ডাকাতের উৎপাত ধামাইবার জন্ত তখন তাহাদের বাঁদী দেওয়া হইত।

১৭৮৮ খৃঃ খ্রিস্টপূর্ব বৈষ্ণবখানা ও বিবিজিতলায় গবীন্দেব মধ্যে বিতৃষ্ণি বিতরণ করিবার অমঙ্গল ঘোণা হইয়াছিল। পীড়িতগণের সেবা-শুশ্রূষার জন্ত বৈষ্ণবখানার বাগানে একটি অস্থায়ী হাঁসপাতাল হইয়াছিল। কর্ণওয়ালিস্ নিজে তিন হাজার টাকা টান দিয়া সর্বপ্রথমে এ দেশেব লোকের জন্ত হাঁসপাতাল খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তখন এ দেশেব লোকেরা ইংরেজি ভাষায় দেখাইত না বা তাহাদের ঔষধ খাইত না। কলিকাতায় নানাবিধ গিৰ্জা এবং তত্ত্ব মন্দির ছিল।

চারিটেবল্ কাণ্ডের সূচনা হইয়াছিল। তখন সঙ্গিত হুঁদানীয়া বড়দিন ছোটদিন ও গুড় দ্রুতহুঁতে উক্ত বড় হইতে টাৰ্ণেডি হইত। তখন লোকেরা গঙ্গাহানের জন্ত বাট করিয়া দেওয়া বড় পক্ষী কাঞ্জ বঙ্গীয় মনে করিত। দেবালের কলিকাতার ঘাটের পশ্চিম তখনকার নামজালা নৌক ও জাহাজের বিরা জ্ঞানী যায়। ইংরেজ মধ্যে ইংরেজ ও আর্মিনিব নাম পাওয়া যায়। তাহারা তাহাদের নাল কুলিবার সুবিধার জন্ত এদিকল বাট করিয়াছিল।

কর্ণওয়ালিসের আমলে কেট উইলিয়ম কলেজ হইয়াছিল। জাহা উইলিয়ম জোল্ দ্বন্দ্বল আদি নাটক ও অন্যান্য গ্রন্থ লিখিয়া কবিয়া বেচিয়া বাহা পাইতে তাহাতে অল্পম দেনাদানের টাৰ্ণ করিতেন। যেখানে নন্দকুমারের বিচার হইয়াছিল সেই ওল্ড-কোর্ট হাউস ভাসিয়া কর্ণওয়ালিস্ সেইখানে সেই সুবিধার প্রার্থিতার জন্য বোব হয় স্কচ গিৰ্জা তৈয়ারি করিয়াছিলেন। স্থানবল্লভ গবীন্দ শুনপ্রস্তুতকারী মল্লীবা তাহাদের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তখন নটীর মুক্তি গড়িয়া পূজা করিত।

বাহালায় ১৭৮৯ খৃঃ গোয়াটামালা হইতে নীলেন নমুন আনায় বিলাইয়া ইহার চান আশ্রয় হইয়াছিল। কলিকাতায় ১৭৯৬ খৃঃ পঞ্চম বোধাপি চাব হইয়াছিল। তখন কলিকাতা হইতে চিঠি (১৮০০) কাগজে ১৮০, পটিনায় ১৮০, ভাগলপুর নাটোর বীৰভূম রায়মহল ১৮০, বর্ধমান নদিয়া শান্তিপুর মুর্শিগাবাদ ৮০ মাডলে পৌঁছিত। উহা সাহেব এম্বলানেড হইতে কলিকাতায় বাহি ৮টা-৯টা সময় এখা বেলেউ উঠিয়াছিলেন। এখন দেখানে নূতন চানবাজার আছে সেখানে লেকডেক্ সাহেব বাঙ্গালীর ভাবতল্ল বাহেব বিজ্ঞানবল্ল ইংরেজি যন্ত্রের সহিত গভারিতে মিলিয়া এক নূতন ধরণের যন্ত্রেরা খুঁজিয়াছিলেন। নৌগোমোহন ঠাকুর উহা ভাসিয়া নূতন চানবাজার করিয়াছিলেন। ১৭৯৮ খৃঃ ২৬শে আগষ্ট কলিকাতায় বাঙ্গালীর প্রথম নাটক, এক সভায় বিনহারার আটলত টাকা চান। তুলিয়া ট্রিটিগাটিক নেপোলিয়নের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত পাঠান হইয়া। কর্ণওয়ালিসের আসলেই হাঁহুড়ে বাহুড়ে গৈ চৌব ডাকাতের জা কমিয়াছিল বাহা পাকা হইয়াছিল; বাহুড়ে নেট বান্ধি হইয়া।

(স্বর্ণবণিক-সমাচার, কাক্তন)

শ্রী প্রমথনাথ মণিক

আইন্সলণ্ডের সাগা সাহিত্য

ইউরোপীয় সাহিত্যে সাধাবশতঃ যে-কোন প্রকার কিশোর পূর্ণ প্রায়তন কাব্যকাহিনী সাগা (Saga) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই-সকল কাহিনী যে একেবারে ঐতিহাসিক তাহাও বলা চলে না, অথচ একেবারে কাল্পনিক বলিয়াও ইহাদিগকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু আইন্সলণ্ডের সাগা বলিতে আইন্সলণ্ডীয় ভাষায় তদ্রূপবর্ণিত তত্রস্ত কোন বীৰপুংগব জীবন কাহিনী-সম্বন্ধিত পদ্যকাব্য বুঝায়। আইন্সলণ্ডের এই সাগা সাহিত্য জগতের এক অপূর্ণ সৃষ্টি এবং ইহাই এই দ্বীপটির গৌরবের বস্তু।

এই সাগা সাহিত্যের আশোচন্য দ্বারা ও ধর্মতঃ আইন্সলণ্ডের একটা ধারাবাহিক আটান ইতিহাস ও তদ্রূপবর্ণিত পুরাতন কীৰ্ত্তিচিহ্ন ও সংবাদ-সাক্ষ্য একটী হৃদয়গ্রন্থিত চিত্র পাওয়া যায়। ইষ্টীয় নরম শতাব্দী সত্ত্বের কোঠায় পড়িলে রাজ্যবিদ্রোহের ফলে নরপুংগব কতগুলি অধিবাসী দেশভ্রমণপূর্বক আইন্সলণ্ডে বসতি উঠিয়া লয়। বায়।...বস্তুতঃ বলিতে গেলে একজন সাগা সাহিত্য...ইহা অতিশয় দীর্ঘ।

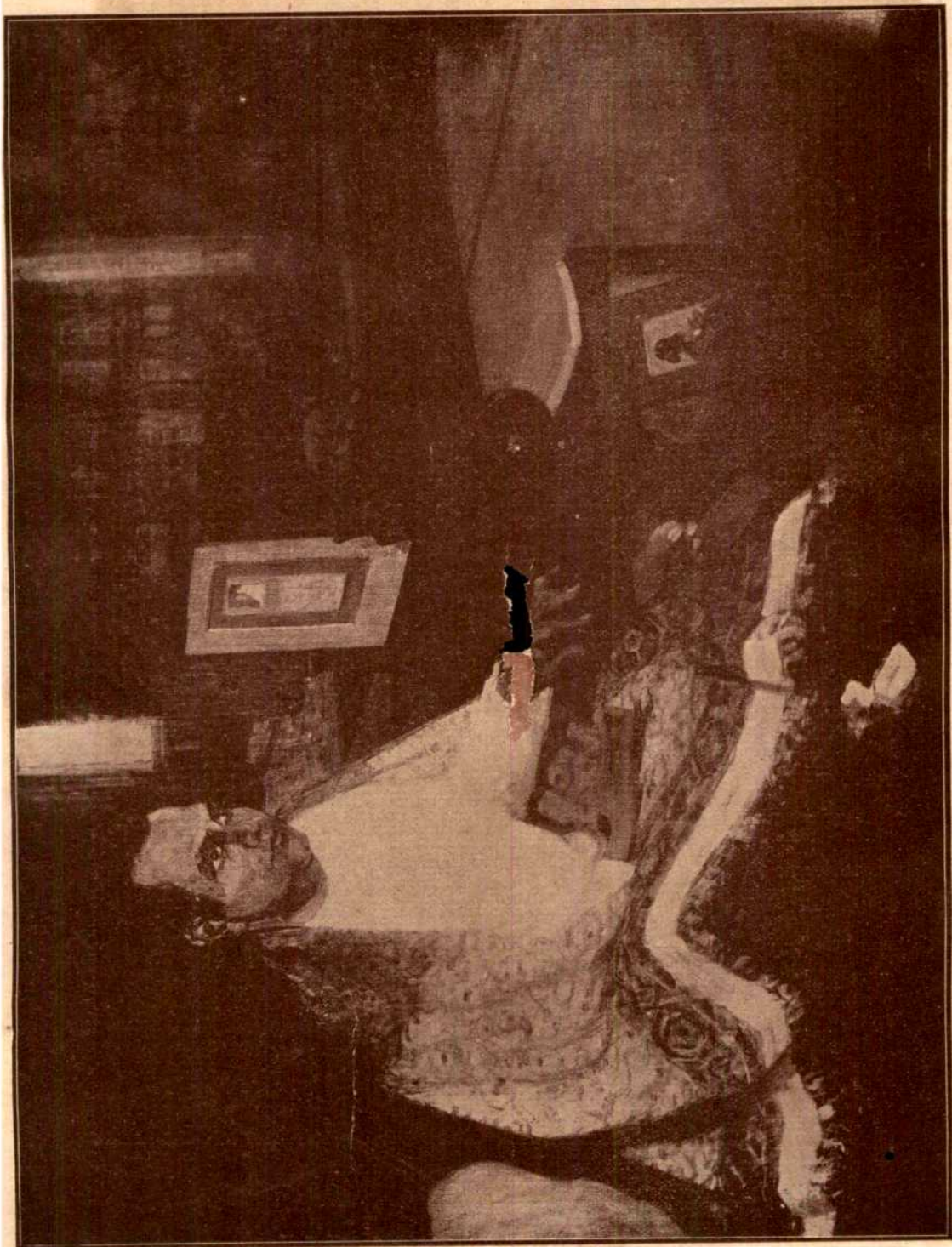


হাটের পথে ।
শ্রীশাস্তা দেবী কর্তৃক অঙ্কিত ।

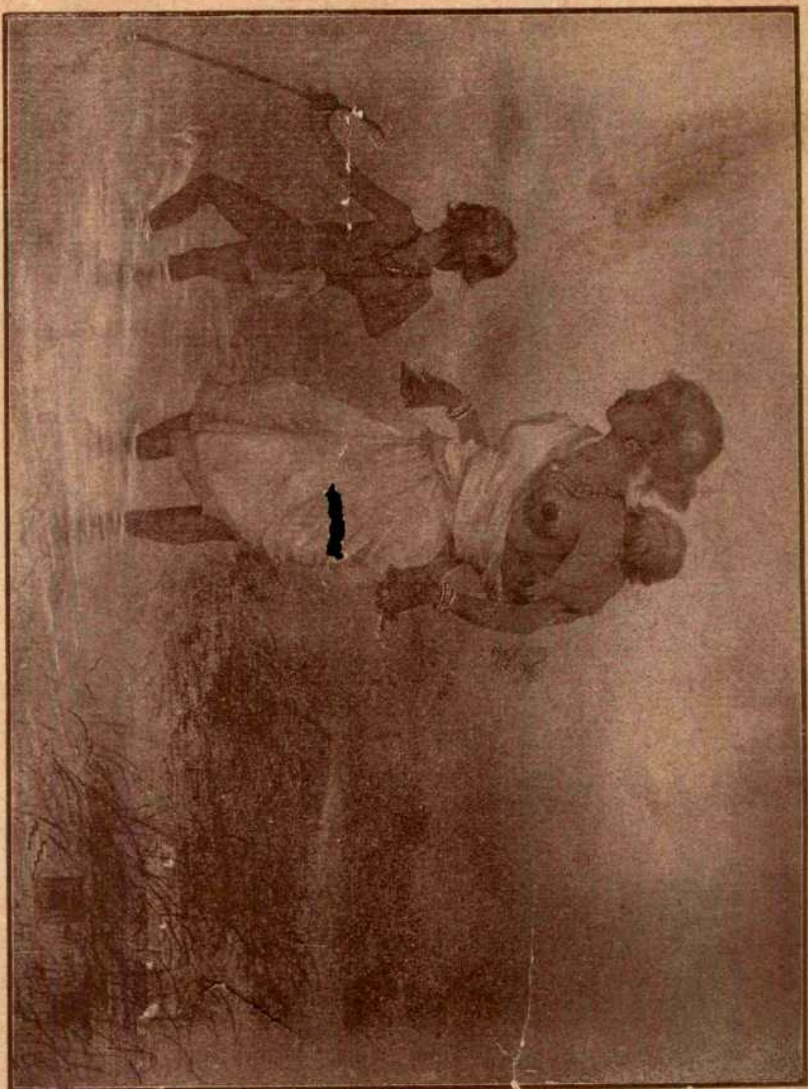


শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী নির্মিত মূর্তির ছবি, তাঁহারই সৌজন্যে মুদ্রিত।



শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
শ্রীমতী আদ্রে কাপেলে কর্তৃক অঙ্কিত ।



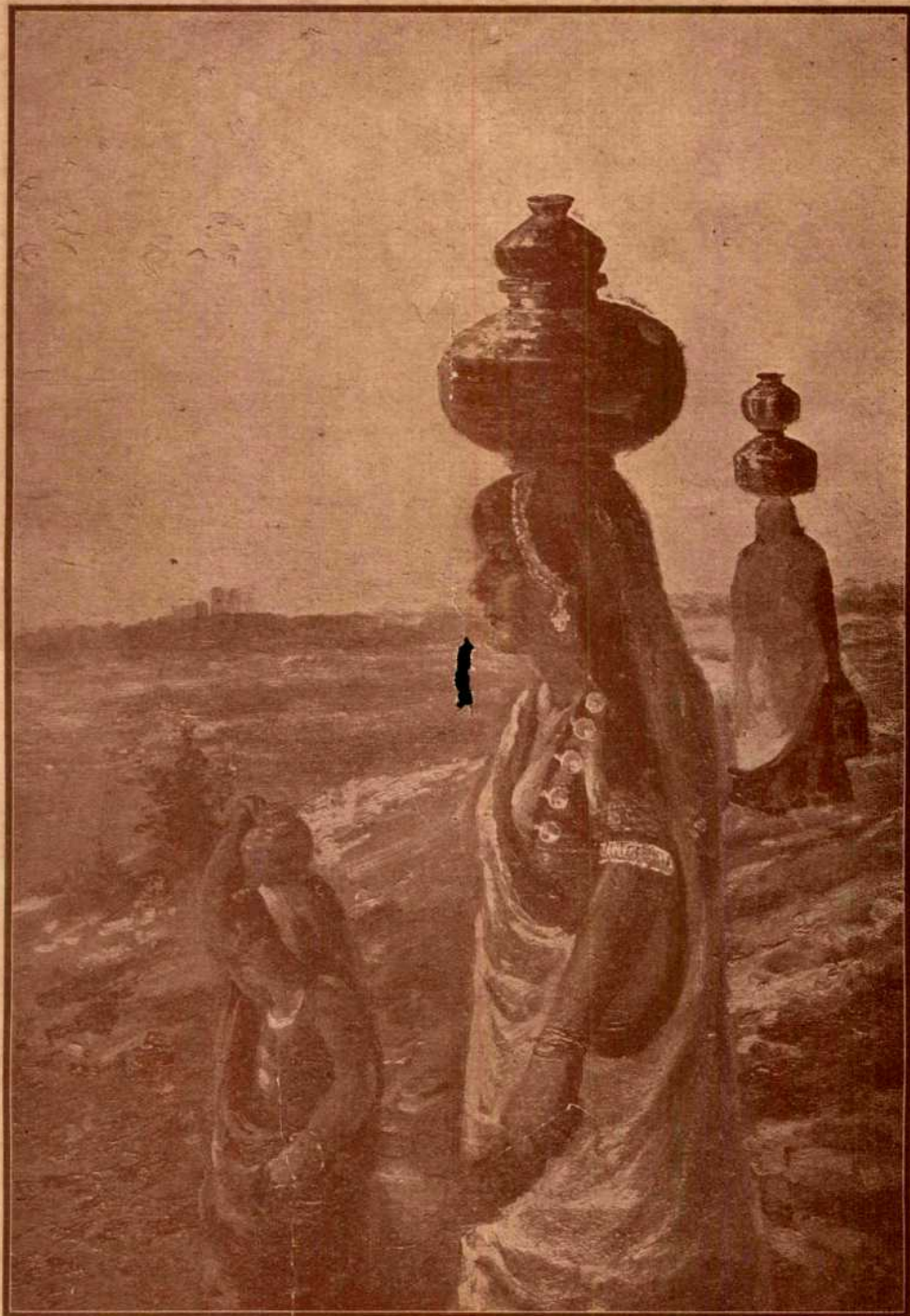
ধরমুখো ।

চিত্রকর শ্রীদেবী প্রমাদ রায়চৌধুরী মহাশয়ের সৌজন্যে ।

। প্রিন্টার

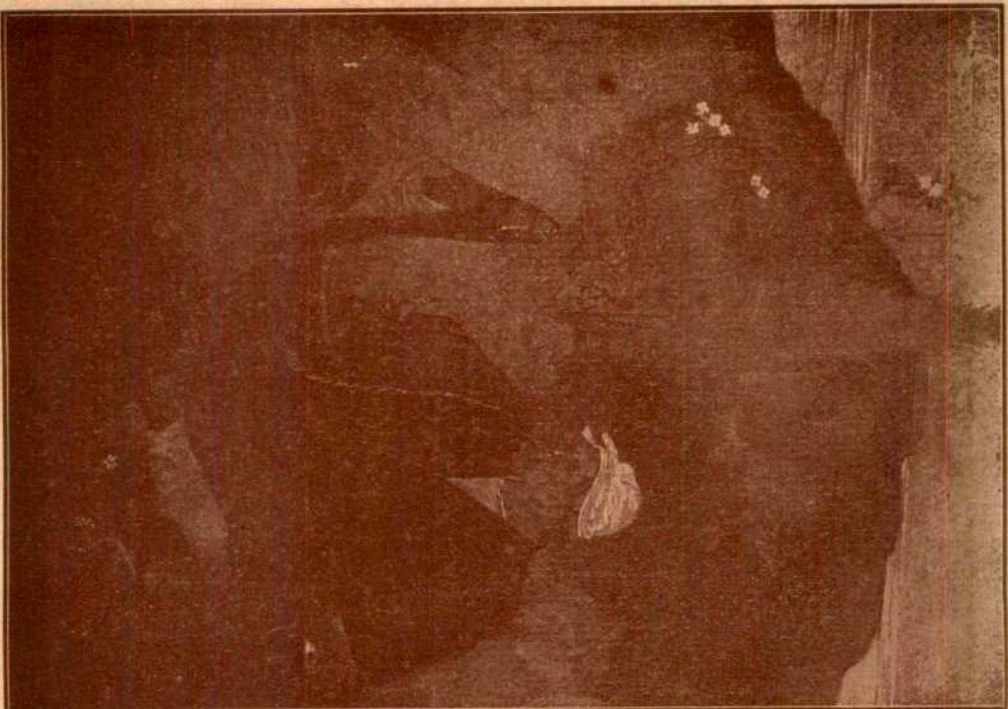
। প্রিন্টার

। প্রিন্টার



গোয়ালিনী।

চিত্রশিল্পী শ্রীমতী সুনীতি সেন রায়ের সৌজন্যে।



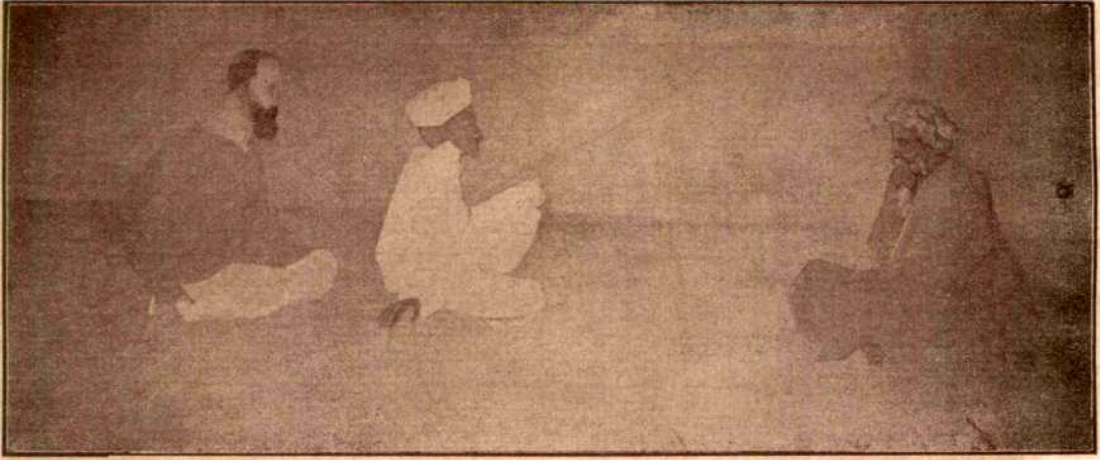
ওমার ঐয্যাম।

চিত্রকর শ্রী অরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দৌজাত্যে।



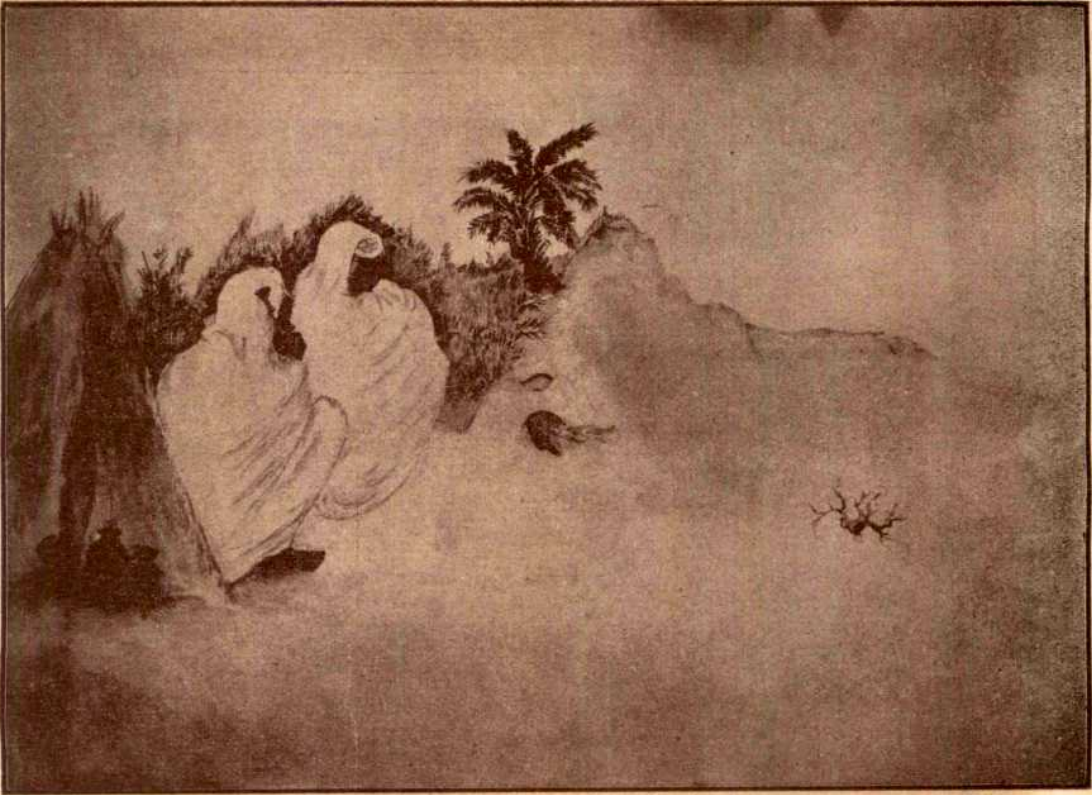
মালিনী

চিত্রকর শ্রী অরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দৌজাত্যে।



ত্রয়ী ।

চিত্রকর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজ্ঞেয় ।



শীত-প্রভাত ।

চিত্রকর শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজ্ঞেয় ।



বীণা-বাদিনী ।

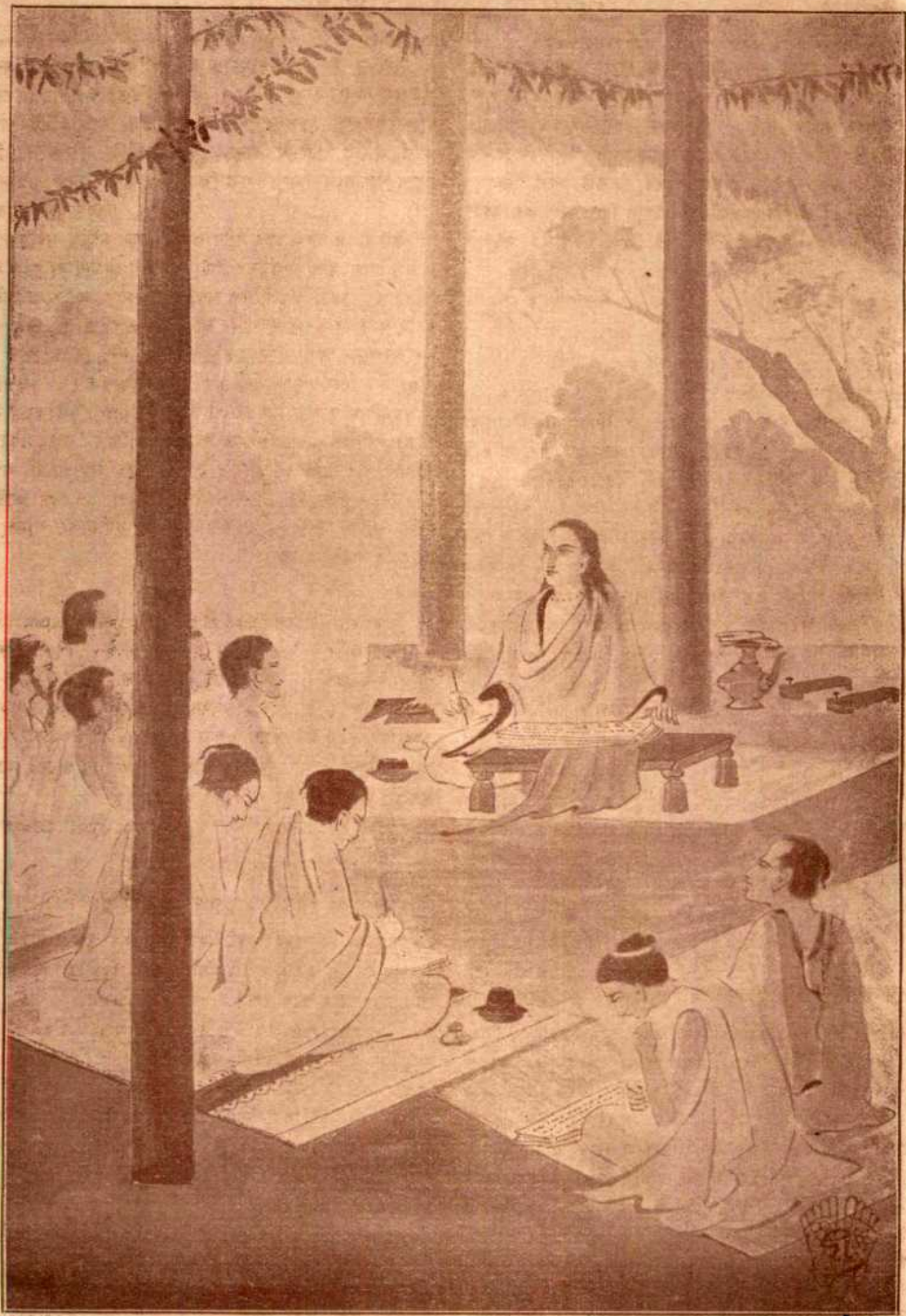
চিত্রকর শ্রীমদীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সৌভাগ্যে ।



ওঁ মণিপদ্মে হুং ।

চিত্রকর শ্রীমদীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

চিত্রাধিকারী শ্রীচন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সৌভাগ্যে মুদ্রিত ।



নিমাই পণ্ডিতের টোল।

চিত্রকর শ্রীগগেনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে।

—তার কি বিয়ে হয়েছে ?

—না, এই ত গেলো বছর এসেছে।

দীপ্তকণ্ঠে কাজী বলিলেন,—মদ ছেড়ে যেন বিয়ে করে সে, আর যদি ছাড়তে না পারে, বিয়ে যেন সে না করে। বোলো, কাজী বলেছে, আমার মত জীবনটা জালিয়ে ছাই করে দেওয়াও ভালো, ত—

আপন আবেগ দমন করিয় কাজী থামিয়া গেলেন।

রমলা স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল,—চলো, কাজী, বড় অন্ধকার হয়ে আসছে।

তুইজনে উঠিয়া লাল পথ দিয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

রমলা মুছ হাসিয়া বলিল,—এখন তোমায় ঠিক দেখাচ্ছে একজন মুসলমান ফত্বর, তোমার একতারাটা যদি আনতে।

—বাঁশির কাছে কি একতারা বাজানো ভালো লাগবে ?

রমলার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। ধীরে বলিল,—রক্ত-বাবু কিন্তু ভারি সুন্দর বাঁশি বাজান।

নামটি উচ্চারণ করিতে রমলার পানে-রাজা ঠোট দুইটি বে কিকপ কাঁপিল তাহা কাজী লক্ষ্য কবিলেন না। রক্তের সম্বন্ধে কথা বলা তুইজনেরই মনে মনে ইচ্ছা থাকিলেও তাহা কেমন সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। রমলার বর্তমান জীবনের কথা লইয়াই গল্প চলিল। তাহার বোর্ডিং-জীবন, দু'একজন শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রী সম্বন্ধে নানা কৌতুক পরিহাস করিতে করিতে তাহারা বাড়ীর গেটে আসিয়া পৌঁছাইল।

গেট পার হইতেই রক্ত তাহাদের দিকে অতি ব্যস্ত ভাবে ছুটিয়া আসিল। রমলা কিন্তু তাহার উদ্বিগ্নতা কিছু গ্রাহ্য না করিয়া বলিল—আমরা কতদূর বেড়িয়ে এলুম, নদী দেখে এলুম।

রক্ত কাজীর দিকে চাহিয়া গভীর স্বরে বলিল,—কাজী-সাহেব, আপনি শীগগীর ওপরে যান, আপনাকে ডাকছেন।

কাজী একটু ভীত হইয়া বলিলেন,—আমায়, কে ডাকছেন ? মাধু ?

রক্ত ব্যস্তভাবে বলিল,—হঁ, যান, আপনাকে দরকার।

কোনো অজানা ভয়ে শিহরিয়া কাজী দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে ছুটিলেন। পিছনে রমলা ও রক্ত নীরবে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। এরূপ নীরবে চলা রমলার সহ্য হয় না, সে বাড়ীর সিঁড়িতে উঠিয়া বলিল,—কৈ বাঁশিটা এবার—

—ভোলেন নি দেখছি।

—না, ফাঁকি হচ্ছে না।

রক্ত ককণ-বাধিত কণ্ঠে বলিল,—দেখুন, আমায় ক্ষমা করবেন, এখন আমি বাঁশি বাজাতে পারবো না।

রমলা কি বলিতে যাইতেছিল, রক্তের মুখের দিকে চাহিয়া চূপ করিয়া গেল। ধীরে সে সিঁড়ির দিকে যাইতেছে দেখিয়া রক্ত বলিল,—ওপরে যাবেন না।

বিস্মিতনয়নে চাহিয়া রমলা বলিল,—কেন ?

—বারণ করে' দিয়েছেন।

—বারণ ? কে ?

কি বলিবে রক্ত ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, ধীরে বলিল,—বারণ করে' দিলেন।

একটু কক্ষশ্বরে, আচ্ছা, বলিয়া রমলা পিছনে বাগানের দিকে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

(৬)

রাজি গভীর না হইলেও, চারিদিক স্তব্ধ, বাড়ীখানি নীরব। ঘরেই রক্তের খাবার দিয়া গিয়াছিল। কোণের মার্বেল-টেবিলে খাবার চাপা দিয়া সে সে-ঘরের জানলার কাছে চূপ করিয়া বসিয়া ছিল। তাহার ঠিক পাশের ঘরে যে কাজী-সাহেব দুধের বাটি ঢাকা দিয়া দিগন্তের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন তাহা সে জানিত না। ধীরে একটিন দিগারেট ও তাহার বাঁশি লইয়া রক্ত ঘর হইতে বাহির হইল। বাহিরে শুক্লাধারশীর চন্দ্র হইতে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছে, লালপথে অস্ত্রের কুচিগুলি ঝকঝক করিতেছে, একটু বাতাস বহিতেছে, গাছগুলি যেন নীরবে ভিজিতেছে।

রক্ত ভাবিল, বাড়ীর সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে জানিত না খানসামা আর চাকর মনিয়া ছাড়া সবাই নিঃশব্দ ঘরে বিন্দ্র রক্তনী কাটাইতেছে। ধীরে

(৩) অলহস্ত হইয়াই শাপ দিবার কথা পুরাণ এবং মহাভারত-দিতে দেখা যায় এবং প্রসিদ্ধিও আছে। “কুশ”-হস্ত হইয়া শাপ দিবার কথা কোন শাস্ত্রে নাই। অভিধানে (প্রকৃতিবাদ) দেখা যায় “কুশ”-সংজ্ঞা-বাচক শব্দ। এবং পুং ও স্ত্রীবাচক “কুশের” অনেক অর্থ রহিয়াছে। তন্মধ্যে স্ত্রীবাচক কুশের একটি অর্থ “জল”। অতএব ইহা নিশ্চিত যে কবিকল্প চণ্ডীর “শাপ দিতে নন্দী কুশ লৈলা হাত” এখানকার এই “কুশ” শব্দটি কবি “জল” অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দেব

(২) শিব যে যতুরাশ্রয় সে বিষয়ে প্রমাণ আছে।—

“যতুরকৈশ ঘো লিঙ্গং সফলং পূজ্যতে নরঃ।

ন গোলাদ্বকমং প্রাপ্য শিবলোকে মহীয়তে ॥”—তবিষয়পূরণ।

(৩) শাপ দেওয়ার সময় যাহাতে শাপবাক্য নিখল না হয় সেজন্য শাপদাতা আচমনাদি দ্বারা শুদ্ধ হইয়া লয়েন, এরূপ প্রমাণ শাস্ত্রে ভূরি ভূরি আছে। শুদ্ধ এবং পবিত্রভাবে যে কথা বলা বাব তাহার গুরুত্ব যে সাধারণ কথা হইতে অনেক বেশী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শাপদাতা শুদ্ধ হইয়া ইহাও দেখান যে তিনি ঠাট্টা করিতেছেন না, তিনি প্রকৃত-পক্ষেই শাপ দিতে উদ্যত। কুশ হিন্দুদিগের অতি পবিত্র জিনিষ। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণের সর্বদা কুশ হাতে রাখিবার নিয়মও রহিয়াছে। কোনও শাস্ত্রীয় কার্যাদির সময় কুশ না লইলে অপবিত্রই থাকিতে হয়, ইহা আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে। এ অবস্থায়, শাপ-দান-কালে কুশ হাতে লওয়া অতি স্বাভাবিক।

শ্রীচিন্তাহরণ চন্দ্রবর্মা

(১৩৪)

বদরপুর ঘাটের ভূর্ণ

পোড়োঘর বাদশাহ হুসেমান কব্বাণীব সময় রাজা দেবীদাস ছাতকের রাজা (বা জমিদার) ছিলেন। বরাক নদীর তীরেব ভূর্ণ তৎকর্তৃক বা তাহাব পূর্বতন রাজগণ কর্তৃক নির্মিত হইয়া থাকিবে।

শ্রীশ্বেতাংশুভূষণ বসু

(১৩৩)

মুদ্রিত চক্ষু কেমন করিয়া আলোক অনুভব করে

আমাদের শরীরেব সকল স্থানেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমকূপ আছে এবং উহা দ্বারা আমাদের দেহের মধ্যে সকল স্থানেই অঙ্গবিস্তার আলো প্রবেশ করিতে পারে। কোনও কোনও স্থানেব লোমকূপগুলি এত অধিক ক্ষুদ্র যে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদের চক্ষুর পাতাব উপরও ঐ প্রকার অতি ক্ষুদ্রাকৃতি লোমকূপ আছে। চক্ষু মুদ্রিত কবিয়া অন্ধকার গৃহে বসিয়া থাকিবার সময় যদি কেহ আলো লইয়া গৃহে প্রবেশ করে তবে ঐ আলো কিঞ্চিপরিমাণে লোমকূপগুলিও ভিতর দিয়া আমাদের চক্ষুর ভিতর প্রবেশ করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিলেও আমরা চক্ষু দ্বারা আলোব অনুভূতি বুঝিতে পারি। যে পরিমাণ আলো লোমকূপেব ভিতর দিয়া আমাদের চক্ষুর ভিতর প্রবেশ করে তাহা দেখিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে; হতরাস আমরা উহা দ্বারা কিছুই দেখিতে পাই না। কেবল অন্ধকাবের গাঢ়তা কিছু কমিয়া যায় এই মাত্র। যদি দেখিবার উপযুক্ত আলো লোমকূপের ভিতর দিয়া প্রবেশ কবিতো পাবিত তবে আমরা চক্ষু না মেসিয়াও সকল বস্তু বেশ দেখিতে পাইতাম।

শ্রীবিনয়লেকিশোর গুপ্ত

চোখেব উপরকার চামড়ার আবরণটি খুব পাতলা। একটা আয়তল প্রদীপের আলোর কাছে ধবলে, সেটাব ভিতর-আলোর যে কেমন অবাধ গতি তা সবাই হয়ত দেখেছেন। পাতলা চামড়াব এই আবরণটি ভেদ করে আলো চোখের সামনে যে উজ্জ্বল কি মারবে সেটা বিচ্ছিন্ন নয়। চোখে পুরু কাপড় চাপা দিলে কিন্তু দ্বার আলো দেখা যায় না।

শ্রীহেমগোপাল সমাদ্দার

আমরা যে-সকল বস্তু দর্শন কবি, চক্ষের সম্মুখে অবস্থিত বস্তু (convex) লেন্স দ্বারা তাহাদের উট্টা প্রতিরূপ বেটনা বা অক্ষিপক্ষাব উপর পতিত হয়, কিন্তু আলোকের অনুভূতি আমরা অল্পকালে পাইয়া থাকি। আলোক ইথর-কণার কম্পনের ফলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইথর-কণার এই কম্পনের স্পর্শ বেটিনায হইলে ইহার পশ্চাতে অবস্থিত (Optical Nerve) চক্ষু-স্নায়ুতে এককণ উত্তেজনায স্থগিত হয়; চক্ষু-স্নায়ু দ্বারা এই উত্তেজনা মস্তিষ্কের (Visual Sensorium) দৃষ্টিকেন্দ্রে নীত হইলে আমরা আলোকের অনুভূতি পাইয়া থাকি। চক্ষুর সম্মুখে যে চরময় আবরণ রহিয়াছে আলোকের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণরূপে অস্বচ্ছ নহে; ফলে ইথর-কম্পনের কিয়দংশ এই চরময় আবরণ ভেদ করিয়া বেটিনাব উপর আঘাত করে। এইজন্য চক্ষু বন্ধ থাকিলেও আমরা আলোকের অনুভূতি পাইয়া থাকি।

ম. ক. ব.

আমাদের চোখের ভিতর পীত-অংশ (yellow spot) ও অন্ধ-অংশ (blind spot) বলে দুটো জায়গা আছে। পীত-অংশের অনুভব-শক্তি খুব বেশী। অন্ধকারে চোখ বন্ধ করে বসে থাকিলেও আলোর অনুভূতি পাবার কারণ, যে আলোর রশ্মি চোখে লাগা মাত্র আমাদের ভূবর নীচেকার একটা শির (nerve) একটু কুঞ্চিত হয়, ও তাহাব দ্বারা আমাদের পীত-অংশ আঘাত পায় ও সেই মুহূর্তে আমরা আলোর সঞ্চার অনুভব করি।

শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

(১৪০)

বেলপাতা তুলসী ও দুর্বার-পবিত্রতা

বিষবৃক্ষ হিন্দুদের নিকট অতীব পবিত্র বৃক্ষ। নানা শাস্ত্রে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। সেই হেতু বিষবৃক্ষ পূজার্থে ব্যবহৃত হয়। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বিধি :—

তৎফলৈশ্চত্বৈশ্চৈব তৎপত্রৈঃ প্রপূজয়েৎ।

তৎকাষ্ঠৈশ্চৈবৈর্বাণি স মে ভক্তঃ স মে শ্রিয়ঃ।

(যোগিনী তন্ত্র)।

তুলসীও হিন্দুশাস্ত্র মতে পবিত্র। তুলসীপত্র পূজাবিধি সম্বন্ধে প্রমাণ—

বাজিদন্তকপত্রৈশ্চ পুষ্পোদৈরপি চণ্ডিকাম্।

তুলসীকুহমৈঃ পত্রৈরর্চয়েচ্ছ্রীবৃদ্ধয়ে।

(কালিকা পুরাণ)।

গম্যশ্রাদ্ধকলাং দাতুঃ পিতৃণাং পরিতোষদম্।

তৎফলং শ্রাদ্ধতণ্ডণং তুলসীপত্রাদিনতঃ।

(বৃহদ্রত্নপুরাণ)।

দুর্বারীশ্রমী ব্রতকথায় দুর্বার উৎপত্তি ও পবিত্র বলিয়া ব্যবহৃত হইবার কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতেই আছে—

তৈরিত্যং স্পর্শমাসাদ্য দুর্বারী চৈবাজরামবা।

বন্দ্য্য পবিত্রা দেবেশ্ব সর্বাদ্যার্চ্যতা তথা।

শ্রীবিষ্ণুকৃষ্ণ-বায়

কাজীর একটু নিকটে সবিয়া আসিয়া রমলা বলিল,—
সত্যি, তোমার গল্পটা বলো না—

—আগ্রায়, যমুনার ধারে এক গাছের তলা থেকে
আমার কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে যিনি মাহুষ কবেন, তিনি
দিল্লীর এক প্রসিদ্ধা বাইজী—

—তারপর ? বা, তোমার জীবন নিয়ে দিবা এক
উপন্যাস আরম্ভ করা যেতে পারে।

উদাস হুবে কাজী বলিলেন,—তারপর আর কি,
সেইখানে মাহুষ হয়ে উঠেছিলুম।

রাঙা নদীর জলের দিকে চাহিয়া কাজী থামিয়া
গেলেন। রমলা ধীবে বলিল,—আচ্ছা, কাজী, ওরা কি
খুব খারাপ। আমার মনে হয় সমাজ ওদেব যত খাপ
বলে তত নয়। আমার এত জানতে ইচ্ছে করে।

—খারাপ বলা যায় না মা, তবে কি জানো—

কাজী থামিয়া গেলেন। রমলা বলিল,—না, বলো
কাজী।

কাজী ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—এই দেখ আমার
ত অন্ধকের ওপর জীবন ওই নরককুণ্ডেই কেটেছে, সুখ
নেই মা ওখানে, শুধু জালা—জালা—আমার মাঝে কথা যখন
ভাবি কান্না পায়—নাচে, গানে, মদে, টাকায় সুখ পাননি।
গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যেত, দেখি আমাকে জড়িয়ে তিনি
সজলচোখে অশ্রাস্ত চুমো খাচ্ছেন। এখনও হঠাৎ চমকে
উঠি, কে যেন ডাকলো মাগিক সোনা! সংসারের বিষটাই
ওদের ভাগ্যে পড়েছে, অমৃতের স্বাদ যে ওরা মোটেই
পায় না—আমার এত খারাপ লাগতো।

নদীর জলে ভেজা বালির দিকে চোখ রাখিয়া কাজী
চুপ করিল। কাজীর আবও নিকটে সবিয়া আসিয়া রমলা
বলিল,—আচ্ছা তুমি কোথাও চোলে গেলে ত পারতো।

—পালাইনি কি ? ছ’তিন বার পালালুম, আবার ছুটে
এলুম বাইজী মার কাছে। বাইরের লোক এত ঘৃণা
করতো, কেউ যদি একটু ভালোবাসতো! কয়েক বার মা
নিজে আমায় ছ’তিন জায়গায় পাঠালেন, আবার নিজে
টেনে নিয়ে গেলেন।

—আচ্ছা, তোমার মত সুন্দর বাঁশী বাজাতে আর
গাইতে নাকি দিল্লী সহবে কেউ পারতো না ?

একটু ব্যঙ্গের স্ববে কাজী বলিলেন,—হ্যাঁ, আর এমন
মদ খেতে গুণাগি করতে তালুকদারদের ছেলেদের উচ্ছ্র
দিতেও কেউ পারতো না।

—না, না, কাজী তুমি খুব ভদ্র ছিলে।

—না মা, এ কাজীকে যৌবনে দেখলে তুমিও ভয়ে
পালাতে।

—আচ্ছা, কাজী, তোমার তাহলে সাদি হয় নি ?

মুহু হাসিয়া কাজী বলিলেন,—সাদি হয় নি! স্বয়ং
স্বরের ছরীর সঙ্গে আমাব সাদি হয়ে গেছে।

কাজী কথাটা বলিলেন বটে, কিন্তু দ্রাক্ষারসেব মত
রাঙা নদীর স্থির জলে কাহার মুখ ভাসিয়া উঠিল।
কাজী স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া বহিলেন। সে তরুণী
কিশোরীব মুখ নয়, পূর্ণবয়স্ক নারীর মুখ। তাজমহলের
বাগানে এক ছোয়াস্মার আলোব তাহাকে দেখিয়া মদের
পেয়ালা, পাপপূরীর জালা সব ছাড়িয়া তিনি পথে বাহির
হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাজী মুখ তুলিয়া দীপ্ত নয়নে রমলার
মুখের দিকে চাহিলেন। তাহাবও গণ্ডে এলি একটি তিল
ছিলো, হান্সমধুর কণ্ঠে কাজী বলিলেন,

আগরু আঁ তুরকু-শীরাঙ্গী

কদম্ব আরদ্ দিল্-মাঝা।

বখাল-ই-হিন্দ-রস্ বখশম্

সমরকন্দ ও বুখাবা-রা ॥

রমলা কোঁতুকভরা মুখে উচ্চ হাসিয়া বলিল,—ওটা কি
হল কাজী-সাহেব ?

—ওটা কিছু নয়, একটা ভোলা কথা মনে হল।

—ও, আচ্ছা, জীবনটা কি মজার নয় ? তোমার
জীবনটা মনে করো না—

—হ্যাঁ,—মজাবই বই কি, হাসি পায়, কান্নাও আসে—

দোষ কাকে দি ? রক্তের দোষ আছে, অবস্থার দোষ,
ভাগ্যের দোষ, আর-নিজের দোষ ত আছেই—এই সাত
বছর ধরে মদ ছুঁইনি, তবু মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে—

মদ কথাটা কাজী উচ্চারণ করিতে বমলা অত্যন্ত
উৎসুক হইয়া আগ্রহ সহকায়ে বলিল,—আচ্ছা কাজী,
আমার দাদাকে তুমি বিলেত থেকে এসে দেখানি,
মদ খেলে কেমন দেখায় বল তো ? আমাব বোধ হয়—

Human Magnetism

Human Magnetismকে এক কথায় ব্যক্তিগত আকর্ষণী-শক্তি বলা যায়। এই শক্তি প্রত্যেক মানবেরই অন্তরে গুপ্ত বা অগোচরে অবস্থান করে। ইহার প্রকৃত অনুশীলন দ্বারা মানুষ জন-সমাজের দৃষ্টি ও প্রীতি সহজেই আকর্ষণ কবিত্তে সক্ষম হয়। ইহা ব উৎকর্ষ সাধন হেতু নৈতিক ও স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মগুলি বিশেষভাবে পালনীয়, যেমন-সিখ্যা, রা-ক-রুখা, বলিবনা, কাপা রা, খোড়াকে দেয়িরা হাসিবনা, বড় বড় নখ রাখিবনা, মুখ-গহবর অপরিষ্কার রাখিবনা, সময়ের কাপড় পরিধান করিবনা ইত্যাদি। Latent Light Culture, Tinneylyর নিকট এসকল বিষয়ের বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া যায়।

শ্রীমাধববাল চৌধুরী

ভারতে নোট

পূর্বকালে এদেশে নোটের বা তদ্বৎ অল্প কোন মুদ্রার প্রচলন ছিল না। দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ তোগলক একবার নোট চালাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু উহাতে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে তাম্রমুদ্রা চালাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু উহাতেও অকৃতকার্য হন। নোটের বা তদ্বৎ অল্প কোন মুদ্রার প্রচলন থাকিলে প্রজারা উহা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিত। মহম্মদের পরে ইংরেজদের পূর্বে নোট বা তদ্বৎ কোন মুদ্রার প্রচলন সম্বন্ধে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

শ্রীমোহনচন্দ্র বসু

(১৪৪)

ফসফরিক এসিড

Phosphoric Acid জীবদেহের অত্যন্ত উপাদান। জীবজন্তু ক্ষক্ষেট সাধারণতঃ উদ্ভিদ হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে। উর্বর ভূমিতে ক্ষক্ষেট অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। কোনও কোনও বনিজ পদার্থেও ক্ষক্ষেট পাওয়া যায়। আমাদের দেশীয় সহজলভ্য বস্তুর মধ্যে ধান, গম প্রভৃতি শস্যের বিচালী হইতেও ক্ষক্ষেট পাওয়া যায়। প্রায় ১৫১৬ মণ বিচালী হইতে আধদস পরিমাণ ক্ষক্ষেট বা বক্ষেটরূপে বর্তমান আছে। জীবজন্তু ও মানুষের মলমূত্র হইতেও ক্ষক্ষেট (সাধারণতঃ Sodium Ammonium Phosphate রূপে) পাওয়া যায়। Guano নামক উৎকৃষ্ট সাব প্রাধান্তঃ একপ্রকার সামুদ্রিক পক্ষীর পবিত্র মল। গবাদি পশুর বক্ষেও ক্ষক্ষেট বর্তমান আছে; এইজন্য কশাইখানায় যে বস্ত্র পাওয়া যায় তাহাকে জমাইয়া শুকাইয়া উৎকৃষ্ট সাব-রূপে ব্যবহার করা হয়।

মক

Basic Slag বা ধাতু মল একটি (Phosphoric Acid) প্রস্রাবক-জাবক বহুল পদার্থ। ইহার অপর নাম লৌহ প্রস্রাবক (Iron Phosphate), Thomas Phosphate, প্রস্রাবক ধাতু মল (Phosphate Slag) বা নির্গন্ধ দীপক (Odourless Phosphate)। লৌহ-কাবখানার ইপাত প্রস্তুতকালে যে ধাতু-মল বা Slag পাওয়া যায় তাহাই asic Slag-নামে অভিহিত। অতঃপর ইহা ইপাতের By-product। এজন্য এই প্রস্রাবক-বহুল সারের মূল্যও অতি অল্প ধাতু মলে (Basic Slag) শতকরা ১৪ হইতে ২০ ভাগ পর্যন্ত প্রস্রাবক চূর্ণের (Calcium) সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে।

কিছুদিন পূর্বে আমি, কয়েকটি Basic Slag বানায়নিক বিশেষণ করিয়াছিলাম, তদ্বধ্যে একটি নমুনার বিশ্লেষণের ফলাফল লিখিত হইল :-

চূর্ণকাল (CaO) Lime	৪০.৮৬%
মগনেসিয়াম (MgO) Magnesia	৩০.৩০%
লৌহ (Ferrous & Ferric Oxide)	২৪.১৮%
ম্যাঙ্গানীক্স (Manganous Oxide)	৪.৬২%
আলুমিনা (Al ₂ O ₃) Alumina	১.৮৭%
প্রস্রাবক (P ₂ O ₅) Phosphoric Acid Anhydride	১৬.৬৮%
গন্ধক (SO ₃) Sulphuric Anhydride	০.৩৪%
বাগুনী প্রভৃতি Silica etc.	৮.১২%

মোট ১০০.৬৭

Basic Slagকে যত অল্পতম অংশে বিভক্ত করা হইবে উহাতে জবীয় প্রস্রাবক জাবকেব (Soluble Phosphoric Acid) ভাগ ততই অধিক হইবে। এইজন্য ইহা এত মিহি কবিয়া শুদ্ধ করিতে হয় যে উহার শতকরা ৭৫ ভাগ প্রতি ইঞ্চিতে ১৬০টি ছিদ্রযুক্ত সূক্ষ্ম চালুনীর (160 holes sieve) মধ্য দিয়া বাহির হইবে ও অবশিষ্ট শতকরা ২৫ ভাগ প্রতি ইঞ্চিতে ১০০ ছিদ্রযুক্ত চালুনীর (100 holes sieve) মধ্য দিয়া বাহির হইবে। এরূপ মিহি অবস্থায় ইহাতে শতকরা প্রায় ১৯ ভাগ জবীয় প্রস্রাবক (P₂O₅) পাওয়া যায়। হাড় হইতে যে প্রস্রাবক সার পাওয়া যায় ইহা তাহার প্রায় তিনগুণ অধিক কার্যকারী। অধুনা আমাদের দেশে এই সাব প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কাবণ Tata Iron & Steel Co. Ltd., Bengal Iron & Steel Co. Ltd., প্রভৃতি লৌহ-কাবখানায় উহা এই সার প্রস্রাবক By-product হিসাবে পাওয়া বাইতেছে। Messrs. D. Waldie & Co. Ltd., Messrs. Shaw Wallace & Co. নামক সার-ব্যবসায়ীগণ এই সকল ধাতু মল ক্রয় কবিয়া সাররূপে বিক্রয় করিয়া থাকেন।

প্রকৃতির ফোড়েও প্রস্রাবকবহুল বনিজের অভাব নাই। মাল্ভাজ প্রদেশের ত্রিচিনাপল্লীর অন্তর্গত পেরাঘুলা তালুকের মধ্যে মৃত্তিকা-পর্ভে এই বনিজের পিণ্ড প্রচুর পরিমাণে আছে। ১৮৯৩ খৃঃ ভাস্কর রাথ (Dr H. Wrath) অনুসন্ধান করিয়া দেখেন যে ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় দুইশত ফুট নীচে একটি কক্ষ-স্তরে এই বনিজের পিণ্ড (Nodules) চতুর্দিকে বিস্তৃত আছে। সেখানে এই বনিজ-পিণ্ড এত অধিক আছে যে তথা হইতে প্রায় ২১ কোটি মণ প্রস্রাবক পাওয়া যাইতে পারে। তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্থান খনন করিয়া দেখিয়াছিলেন যে প্রতি একশত বর্গফুটে প্রায় ১৪ হইতে ২৪ সেব এবং কোনো কোনো অংশে ৩৫ সেব পর্যন্ত প্রস্রাবক অন্তর্ভুক্ত ধাতু সহিত মিশ্রিত অবস্থায় আছে। এই-সকল বনিজ-পিণ্ডে শতকরা ৩৮ হইতে ৪৭ ভাগ প্রস্রাবক ও ১৬ ভাগ চূর্ণকাল আছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত ইহা সহিত শতকরা ৪ হইতে ৮ ভাগ লৌহ ও আলুমিনা আছে। তৎকালে এই বনিজ-পিণ্ডগুলি উঠাইবার জন্য দুইবার চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু উহার ভেদন চাহিদা (Demand) না থাকায় সে চেষ্টা সফল হয় নাই।

পশু-পক্ষীর বর্জ্য-কর্ষণপরিমাণে প্রস্রাবক জাবক আছে। পায়রা, হাঁস, মুরগী প্রভৃতির বিষ্ঠায় শতকরা ০.৫ হইতে ০.৭৫ ভাগ ও শুক অবস্থায় ০.৮৮ হইতে ১.৭ ভাগ; গোমূত্রে ০.২৩ হইতে ০.২৭ ভাগ; মানবের বিষ্ঠায় ০.১৮ হইতে ০.২৭ ভাগ প্রস্রাবক আছে।

দীর্ঘে মাধবী ঘরে ঢুকিয়া পিতার চেয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া অতি মুহূর্তে ডাকিল,—বাবা।

—কি মাধু, কি মা ?

—চলো, একটু বারান্দায় বেড়াই।

যোগেশ-বাবু চোখ আবার ঘেন ঘোলাটে হইয়া আসিল, অস্বাভাবিক কণ্ঠে তিনি বলিলেন,—আচ্ছা মাধু, বিভা মরার আগে কি বলেছিলো, জানিস ?

কাতরকণ্ঠে মাধবী বলিল,—জানি বাবা, তুমি ওঠো।

রক্ত দীর্ঘে ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার কানে যোগেশ-বাবুর করুণকণ্ঠ আসিল, বলেছিলো সে আমাকে ভাল বাসে। মাধবীর প্রদীপ্ত কথাগুলি কানে আসিল,—বাবা, চলো, তুমি আজ বড় বেশী পড়েছো। আবার যোগেশ-বাবুর ক্লান্তকরণ স্বর,—আর তোর মা বলেছিলো—

আবার মাধবীর কান্নার সুরে ডাক,—বাবা।

আবার যোগেশ-বাবুর উদাস স্বর,—আমি কি তোকে ভালোবাসি না মা ?

রক্ত সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল কিন্তু মাধবীর দীপ্ত তীক্ষ্ণকণ্ঠ কানে আসাতে থামিয়া গেল,—কে, কে দিয়েছে, কে দিয়েছে আবার বোতোল বের করে ? মনিয়া, হতভাগা ছোঁড়া।

—না, মা, মনিয়া নয়, আমি নিজে, নিজে।

ঝন্ঝন্ করিয়া কাঁচের গেলাস ভাঙ্গার শব্দ হইল। যোগেশ-বাবুর কণ্ঠ,—ও, তুমি কেঁদো না, তুমি কেঁদো না, ও poor dear, dear, ওই তোর মা কি বলছে জানিস, আমায় ত সারাজীবন জালিয়েছো, আমার মেয়েকে জালিও না—তোকে আমি কি কষ্ট দিই মা ?

—বাবা, চলো বাইরে।

পাগলের মত যোগেশ-বাবু বলিতেছেন,—ও, ওঘরের দরজাটা কে খুলেছে ? বন্ধ করে দিয়ে এসো, না, না, আসতে দিও না, তালা ভেঙে আসবে !

এক বোতোল ভাঙ্গার শব্দ হইল।

এবার মাধবীর দীর্ঘ কণ্ঠ,—বাবা, একটু স্থির হয়ে শোও।

রক্ত বাহিরে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না,

লাইব্রেরীর দিকে অগ্রসর হইতে মাধবী তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল,—আপনি নীচে যান, কাজী-সাহেব যদি থাকে পাঠিয়ে দেবেন,—কাজীকে,—রমলা যেন না আসে,—শীগগীর যান।

দীর্ঘে রক্ত সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল।

কান্নাভরা সুরে মাধবীর ডাক কানে আসিল,—বাবা।

(৫)

কাজী-সাহেবকে ধরিয়া লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে রমলা এক ছোট নদীর ধারে গিয়া পড়িল। শীর্ণা শ্রোত-ধারা অতি ঝিরঝিরি বহিতেছে। বালির উপর কতকগুলি বড় বড় কালো পাথরের স্তূপ ; তাহারই উপর দুইজনে গিয়া বসিল। দূরে পাহাড়ের আড়াল দিয়া সূর্য অস্ত যাইতেছে, সূর্যের রক্তাভা নদীর জলে ঝিলিমিলি, বালির উপর চিকিমিকি কবিতাচ্ছ, অতি মুহূর্তে বাতাস বহিতেছে।

নদীর স্থির জলে বালি ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে রমলা বলিল,—কাজী-সাহেব।

পশ্চিমাকাশের দিকে চাহিয়া কাজী বলিলেন,—কি রমলা-মা ?

—আচ্ছা, কাজী, তোমার দেশ কোথায় ?

দাড়িতে হাত বুলাইয়া উদাস প্রান্তরের দিকে চাহিয়া কাজী বলিলেন,—আমার দেশ ? যেখানে থাকি সেই আমার দেশ।

—যাও, আমি বলছি, তুমি কোথায় জন্মেছিলে ? আমার মত তো তোমারও বাবা মা নেই, কিন্তু তাঁরা কোথাকার লোক ছিলেন ?

—কেন মা ?

—তোমার দেখলে মনে হয় তুমি যেন একটা রহস্য, তাই জানতে ইচ্ছে করছে।

—আমি জন্মেছিলুম—এম্মি মাটির বুকেই জন্মেছিলুম।

—যাও বলবে না, তাহলে তোমায় কক্কনো পিয়ানো শোনাবো না, পাকা চুলও তুলে দেবো না।

—সত্যি মা, আমি পথের ধূলায় জন্মেছিলুম, কোন ঘরহারা মা যে আমায় পথে জন্ম দিয়ে গিছলো তাঁকে ত আমি জীবনে দেখিনি।

কোনও কোনও ভদ্র-লভ্যবিন্দু ভদ্রশতকবা ২ হইতে ৪ ভাগ পর্যন্ত বর্ধমান আছে। বেড়ির স্থানে ১৩ ভাগ, তুলার-বীজের স্থানে ৩:১২ ও তিসির স্থানে—২ ভাগ প্রস্তুতকর আছে।

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রী

কাঁচ তৈয়ারির স্থান

ভারতবর্ষের নিম্নলিখিত কারখানাগুলিতে কাঁচ তৈয়ারী হইয়া থাকে :-

- ১। নাইনী গ্রাম ওয়ার্কস—নাইনী—এলাহাবাদ।
- ২। পাঞ্জাব গ্রাম ম্যানুফ্যাকচারিং কোং—আম্বালা।
- ৩। হিমালয়ান গ্রাসওয়ার্কস লিমিটেড—রাজপুর, দেহাদুন।
- ৪। পয়দাফ ও গ্রাস-ওয়ার্কস—তেলেগাঁও—পুনা।
- ৫। পীরমহম্মদ গ্রাস ম্যানুফ্যাকচারিং কোং—বোম্বাই।
- ৬। জবলপুর গ্রাস ফ্যাক্টরী—জবলপুর।
- ৭। ইম্পিরিয়াল গ্রাস-ওয়ার্কস—ভাওয়াল—পাঞ্জাব।
- ৮। ইউনাইটেড প্রভিন্সেস গ্রাস-ওয়ার্কস—মোরাদাবাদ।

এতদ্ভিন্ন আবও কয়েকটি ছোট ছোট কাঁচের কারখানা আছে। প্রায় ৬৬ মাস পূর্বে পাঞ্জাব গ্রাস ম্যানুফ্যাকচারিং কোং ভারতীয় ছাত্রগণকে এ বিষয় শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলেন। উপযুক্ত লোকবিরগণকে এ বিষয় শিক্ষা দিতে তাহার সর্বদাই প্রস্তুত আছেন। হুতরাং এ কোম্পানীর সম্পাদক বা অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিলে শিক্ষাপ্রাপ্তি অসম্ভব হইবে। আর যদি জাপান বা ইউরোপে যাইয়া শিখিবার ইচ্ছা থাকে আমাকে স্বতন্ত্রভাবে পত্র লিখিলে আমি এ বিষয় সবিস্তারে তত্ত্ব জানাইব।

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রী
উত্তরপাড়া

আমাদের গ্রামের কতিপয় অর্থশালী ব্যবসায়ীর উদ্যোগে এখানে একটি সুবৃহৎ কাঁচের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের গ্রামটি কলিকাতার উপকণ্ঠে; জিহ্মায় স্বয়ং আসিয়া বালি, দোরা, সিমেন্ট ও অন্যান্য বাসায়নিক উপাদান সংযোগে কাঁচের প্রস্তুত-প্রক্রিয়া এবং তাহা হইতে চিনী, জার, বাসন, ইত্যাদি বিবিধ দ্রব্য নির্মাণ দেখিয়া যাইতে পাবেন। শিক্ষা করিবার কথা কারখানার পরিচালকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিশ্চয়ই স্বীকৃত হইবেন।

৮ প্রসন্নকুমার লাহিড়ীর বাটী,

সাঁত বাগাছি, হাওড়া

(১) বেলজিয়ম, জার্মানী, জাপান বা আমেরিকার গিয়া কাঁচ তৈয়ারী শিখিতে পারা যায়। ভারতবর্ষেও কাঁচের কারখানা প্রচুর; তন্মধ্যে জবলপুর, এলাহাবাদ ও হাওড়া-রমিরাজতলা এই তিনটি স্থানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোম্পানীর নাম (i) Jubbulpore Glass Works, Jubbulpore, C. P., (ii) The Allahabad Glass Factory, Allahabad ও (iii) The Rajah Glass Works Factory, at Ramrajahatola, Howrah.

শ্রীমদ্ব্যননাথ চৌধুরী, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার পাল

(১৯৬)

বেশমী পশমী বা সূতী কাপড়ে লোহার দাগ

উঠাইবার উপায়

বেশমের কাপড়ে বা পশমের কাপড়ে লোহার দাগ ধবিলে তাহা

“গোড়া-লেবুর” রসে ভিজাইয়া পবে জলে কাচিয়া ফেলিলে দাগ উঠিয়া যায়। (পরীক্ষিত।) শ্রীশ্রীশ্রীশ্রী

দাগওয়াল কাপড়খানাতে উত্তমরূপে সাবান মার্গাইয়া। বাসের উপর পাতিয়া রাখুন (রৌদ্র থাকে যেন)। কাপড়ের জল ক্ষয়পরিমাণে শুক হইলে, কিঞ্চিৎ জল ছিটাইয়া দিন এবং এ দাপের উপর লেবুর রস মাখাইয়া দিন। লেবুর রস দিয়া এ জায়গাটা একটু দলিয়া দিন। কয়েকবার এরূপ করিয়া কাপড়খানা কাচিতে লইয়া যান। কাচিবার কালে দাগটা একটু দলিয়া দিলেই দাগ উঠিয়া যাইবে।

শ্রীমহাশয় শ্রীশ্রীশ্রী

বেশমী, পশমী বা সূতী কাপড়ের লোহার দাগ উঠাইবার প্রক্রিয়া—

১। লোহার দাগ লাগা স্থানটি অক্সালিক অ্যাসিড (Oxalic Acid) গাঢ় দ্রবে কয়েক মিনিট কাল ভিজাইয়া পরে পরিষ্কার ইপাতের ছবি দ্বারা অল্প অল্প ঘষিলে দাগ উঠিয়া যাইবে। অন্তঃপর পরিষ্কার জলে ঐ স্থান উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিতে হইবে। ঐ প্রক্রিয়া আমরান-ডাবক, ১০ ভাগ জলে মিশাইলে অমরান-ডাবকের গাঢ় দ্রব হইবে।

২। এক আউন্স পবিত্র জলে এক গ্রেণ পটাশ্-ক্যারোনেট (Yellow Prussiate of Potash) ও এক ফেটি গন্ধক-অ্যাসিক (Sulphuric Acid) মিশাইয়া দাগ-লাগা স্থানটি এই দ্রবে কিছুক্ষণ ভিজাইবার পর ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে। পরে এক আউন্স জলে ১০ গ্রেণ পটাশ্কাই (Pearl Ash or Carbonate of Potash) মিশাইয়া পুনরাধ ঐ স্থানটি এই পটাশের জলে ভিজাইয়া পবিত্র জলে উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিলে লোহার দাগ উঠিয়া যাইবে।

৩। পটাশ বিন অক্সালেট (Potash Bin-Oxalate) ১ ভাগ, নবু-৫ ভাগ ও পবিত্র জল—৪০ ভাগ মিশাইয়া কাপড়ের যে স্থানে লোহার দাগ লাগিয়াছে তাহার লাগাইয়া ৪৫ ঘণ্টা কাল রাখিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে ঐ স্থানটি ভিজাইয়া দিয়া অল্প অল্প রগড়াইতে হইবে। পরে পরিষ্কার জলে ধুইলে দাগ উঠিয়া যাইবে।

৪। দাগ-লাগা স্থান লেবুর রস ও লবণ দ্বারা ভিজাইয়া রৌদ্রে স্বেদিলে দাগ উঠিয়া যায়। এই প্রক্রিয়ায় যদি একবার লাগাইলে না উঠে তবে দ্বিতীয়বার লাগাইলে উঠিয়া যাইবে।

৫। দাগলাগা স্থানটি জলে ভিজাইয়া উহার উপর সমভাগে অক্সিক-ডাবক (Citric Acid) ও ক্রীম অব টার্টার (Cream of Tartar) মিশাইয়া অস্ত্রে অস্ত্রে ঘষিলে দাগ উঠিয়া যাইবে।

পশমী কাপড় পরিষ্কার করিবার প্রক্রিয়া—

পশমী কাপড় পবিত্র জলে ধুইয়া প্রথমে কাপড়গুলি বোনে দিয়া ব্রশ সাহায্যে উহার ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। পরে নিম্ন-লিখিত যে কোন উপায়ে উহা পরিষ্কার করা যাইতে পারে।

১। অক্সেস ভাল সাবান টুকরা টুকরা করিয়া কাচিয়া ছুইসের আন্দাজ ফুটন্ত জলে গলাইতে হইবে। সাবানের জব ঠাণ্ডা হইলে উহার সহিত ৬ ড্রাম আন্দাজ স্পিরিট অব টার্পিন (Spirit of Turpentine) ও দুই ড্রাম আন্দাজ অ্যামোনিয়া (Liquor-Ammonia) মিশাইয়া দুই গ্যালন দ্রবজল জলের সহিত মিশাইতে হইবে। এখন এই জলে কাপড়গুলি উত্তমরূপে নাড়িয়া-চাড়িয়া কাচিয়া পরিষ্কার জলে ৩৪ বাব ধুইয়া ফেলিলে কাপড় বেশ পরিষ্কার হইবে। হাতের ঘূণ দিয়া কাপড়ের জল বাহির করিয়া দিতে হইবে। নিড়াইলে কাপড় বাষ্প হইবে।

২। কেমিন বা পিবিট অব টার্পিন

নরম সাবান (Soft Soap)

মিসিবিন

এক ছটাক

দুই ছটাক

আধ ছটাক

আনন্দ হয়েছিলো, কাল সারারাত ঘুমোতে পারি নি, ও যে আসবে ভাবিনি। কোথায় সে?

—তিনি কাজী-সাহেবের সঙ্গে বেড়াতে গেলেন দেখলুম।

—মার, ওই কাজী, আশ্চর্য্য ও লোকটা, একটা রত্ন, সমস্ত পশ্চিম ঘুরে আমি ওকে ধবে' এনেছি, দিল্লীর কোনো বাইজীর গলায় ওর মত মিষ্টি গান শুনিনি—এখন ওর বুড়ো বয়স, ভাঙা গলা, বিশ বছর আগে ওর গলায় যা গান শুনেছি, আহা,—এই বুড়ো বয়সে ওর কবিতা আর গজল শুনে প্রাণটা তাজা রয়েছে। না হলে, এই যে বইয়ের স্তূপ দেখছেন, এই যে কাব্যগ্রন্থ, আটের বই, ছবিব বই, শুকনো পাতা—সব শুকনো পাতা, গোলাপের রাঙা পাতা শুকিয়ে গেলে যেমন লাগে—words, words, words—ভাক দি ওই কাজীকে, ভরপুর ওর প্রাণ, জীবনের রসে ভরপুর—এই আট বছর আমার সঙ্গে আছে, কোনোদিন দেখিনি কাজী বলেছে ভালো লাগছে না,—বলিতে বলিতে আবাব বৃদ্ধ থামিয়া গেলেন।

বাহিরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, সামনের পাম-গাছগুলি একটু মুহু ছলিতেছে, ঘরটা যেন কি রহস্যমায়ায় ভরা।

বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন,—কি বলছিলুম?

রক্তত আপনাতর অজ্ঞাতে বলিয়া উঠিল,—রমলার কথা কি বলছিলেন।

—হাঁ, রমলা, ওর মা আমার ভারি বন্ধু ছিলো, তাই ও মেয়েটাকে বড় ভালোবাসি। ওর বাবা আর আমি এক সঙ্গে বিলেত যাই, আমি I. C. S. পাশ করে' এলুম, সে ব্যারিষ্টার হয়ে এলো,—ও, বেশ মনে পড়ছে, সেনেদের বাড়ীর সে রাতটা, তখন বিভার বয়স রমলার মতনই সতেরো আঠারো হবে, আর দেখতে,—ও, কাল রাতে হঠাৎ যখন রমলা আমার সামনে এসে দাঁড়ালো,—দেখো, তুমি রমলার একটা portrait এঁকে দেবে।

বৃদ্ধের প্রদীপ্ত কণ্ঠ থামিয়া গেল, ঘরের অন্ধকারে তাঁহার মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না, শুধু চোখ দুইটি জ্বলজ্বল করিতেছে। রক্তত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বৃদ্ধ ক্লান্ত করুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন,—সে 'বিভা কতদিন চলে' গেছে, তারপর তার স্বামীও গেছে, স্বপ্নের মত মনে হয় জীবনটা, সেদিন যেন শুরু হল, আর এই ছুরিয়ে গেল,—রহস্য, মহা রহস্য, কোথায় নিষে চলেছো,—

শেষ কথাগুলি কোনো অজানা শক্তির উদ্দেশ্যে বলিয়া যোগেশ-বাবু ঘরের কোণের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেলেন। বাহিরের আকাশে কয়েকটি তারা দৃশ্য-দৃশ্য করিতে লাগিল, ঘরের স্তব্ধ অন্ধকার যেন কিসের ভারে কাঁপিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে সচকিত হইয়া যোগেশ-বাবু বলিলেন,—হাঁ, কি বলছিলুম?

রক্তত ধীরে বলিল,—আপনি বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, আর কথা বলবেন না।

করুণ হাসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন,—শ্রান্ত নয় বাবা, পঙ্কু হয়ে পড়েছি এই বাতে। হাঁ, আচ্ছা, ওই বে অয়েল-পেন্টিংটা দেখছেন,—অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছেন না? কিন্তু আমি জ্বলজ্বল দেখছি, ও হচ্ছে আমার স্ত্রী, সেনেদের বাড়ীতেই ওর সঙ্গে আলাপ হয় সেই নেমস্তম্বর রাতে, হাঁ, বেশ মনে পড়ছে, ও গাইলে রবিবাবুর একটা গান আর বিভা একটা ফ্রেঞ্চ গান, চোখ দু'টো ভারি করুণ লাগছে, না? কিন্তু মুখেব হাসিটা কি মিষ্টি, মাঝে মাঝে যেন ঠোঁট দুটো নড়ে' ওঠে, কি কথা বলতে যায়, পারে না, বোবা, ভাষা ভুলে গেছে,—ও মরবার আগে—

যেন কোন ঘুমঘোর হইতে সজাগ হইয়া উঠিয়া যোগেশ-বাবু থামিয়া গেলেন। রক্তত শ্রোতা-রূপে বসিয়া থাকিলেও যোগেশ-বাবুর কণ্ঠস্বরে ও দেহের ভঙ্গিতে কাতর হইয়া পড়িতেছিল। সে মুহূর্ত্তে বলিল,—আপনি বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, চলুন একটু বাইরের হাওয়ায়।

যোগেশ-বাবু এবার সহজ কণ্ঠে বলিলেন,—হাঁ, ভারি সুন্দর রাত, আপনি বরং বাইরে একটু বেড়িয়ে আসুন, আর দেখুন, আপনার কোনো অস্ববিধে হচ্ছে না ত? মাংসবী যথাসাধ্য দেখবে জানি, যদি কোনো অস্ববিধে হয় জানাবেন।

—না, কোনো অস্ববিধে নেই।

মিশাইয়া কাপড়ের সর্বত্র লাগাইয়া ১০ মিনিট কাল রাখিতে হইবে। পরে ঈষদ্রব জলে কাচিয়া পরিষ্কার জলে ধৌত করিলে পশমী কাপড় পরিষ্কার হইবে।

৩। নরম পরিষ্কার জল অথবা বুটর জলে সাবান গুলিয়া উহার সহিত হাত-সওয়া পরম জল মিশাইয়া সেই জলে কাপড়গুলি বার বার ডুবাইয়া তুলিতে হইবে। কয়েক মিনিট কাল এইরূপ করিলে কাপড়ের সমস্ত ময়লা দূর হইবে। সাবানের জল যদি অত্যধিক ময়লা হইয়া যায় তবে আব ধানিকটা পরিষ্কার সাবানের জলে কাপড়গুলি বার বার ডুবাইয়া তুলিতে হইবে। যদি প্রথম বারে কাপড় বেশ পরিষ্কার হয় তবে দ্বিতীয় বার আর সাবানের জলে না চুবাইয়া ঈষদ্রব পরিষ্কার জলে ধুইলেই চলিবে।

৪। পরম কাপড়ের উপর পাতলা কব্বিয়া (Starch) যেতমাত্র অথবা Kaoline বিছাইয়া দিয়া কাপড়খানি ঝাঁক করিয়া ৭৬ দিন রাখিয়া পরে কাড়িয়া ফেলিলে ঐ Starch বা Kaolineএর সহিত তৈলাদি চলিয়া যায়। এরূপভাবেও পরম কাপড় পরিষ্কার করা হইয়া থাকে। কোর্স ও রঙ্গিন কাপড় পরিষ্কার করিতে হইলে ঐ Starch বা Kaoline প্রথমে সেই রূপে রঞ্জিত করিতে হয়।

রেশমী কাপড় পরিষ্কার করিবার প্রক্রিয়া—

১। অর্ধ পেরা অথবা অর্ধ পোয়া নরম সাবান (soft soap) ও অর্ধ পোয়া জিন্দ নামক মদ্য, অর্ধ সের ফুটন্ত জলে মিশাইয়া ঠাণ্ডা করিতে হইবে। একটি কাঠের মকের উপর একখানি হুতি কাপড় বিছাইয়া তাহার উপর রেশমী কাপড়টি বিছাইতে হইবে—যেমন কোনও স্থান জড় হইয়া না থাকে। এখন একখানি নরম বৃক্ষশত্রু মিশ্রিত জবে ডুবাইয়া রেশমের কাপড়ের উপর আস্তে আস্তে ঘসিতে হইবে। সাবানের জল যেন কাপড়ের সর্বত্র যসা হয়। ১০ মিনিট কাল কাপড়খানি ঐ সাবান মাখাইয়া রাখিয়া পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে ধুইলে বেশ পরিষ্কার হইবে।

২। নরম সাবান ৪ আউন্স, ব্র্যান্ডি (Brandy) ১ আউন্স ও জিন্দ (Gin) এক পাইন্ট উত্তমরূপে মিশাইয়া কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া

লইতে হইবে। একটি স্পঞ্জ (Sponge) বা ক্লোথের কাপড় দিয়া রেশমের কাপড়ের উত্তর পৃষ্ঠে এই স্পঞ্জকটি মাখাইয়া ২০ বার পরিষ্কার জলে ধুইয়া ফেলিলে নুতনের মত পরিষ্কার হইবে। কোন রঙ্গিন রেশম হইলেও রংয়ের পার্থক্য ঘটবে না।

৩। বর্জিন বেশম পরিষ্কার করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করা বিধেয়।

এক সের ফুটন্ত জলে আখপোয়া আন্দাজ পরিষ্কার ভাল সাবান গুলিয়া ঠাণ্ডা করিতে হইবে। হাত-সওয়া পরম থাকিতে থাকিতে কাপড়গুলি বার বার উহাতে চুবাইয়া তুলিতে হইবে। পরে ঈষদ্রব জলে ধুইয়া ফেলিতে হইবে। যদি বেশমের বর্ণ উজ্জ্বল পীত, আপিলল লোহিত, লোহিত বা নীলাভ পাচ লাল হয় তবে এক গ্যালন জলে সামান্য গন্ধক-দ্রাবক (Sulphuric Acid) দিয়া জলের আধাধন সামান্য টিক হইলেই হইবে। তাহাতে কাপড় চুবাইয়া পরে পরিষ্কার জলে ধুইতে হইবে।

পিজল অথবা ক্রমলা-লেবুর বর্ণের বেশম হইলে দ্রাবকের জলে ডুবাইবার প্রয়োজন নাই। উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের রেশম রাং-লবণকের (Tin-Chloride) জবে ডুবাইয়া পরিষ্কার জলে ধুইতে হইবে। ঈষৎ লাল বা কিরোজা প্রভৃতি রংয়ের কাপড় সামান্য লেবুর রস অথবা সিরকা (Vinegar) মিশ্রিত জলে ধুইতে হইবে। আব আসমানি রংয়ের কাপড় সামান্য Potash-এর জলে ধুইতে হইবে। ফটকিরি জলে ধুইলেও রেশমের বর্ণ নষ্ট হয় না।

পরিষ্কার জলে কাচিবার পর হাতের চাপে জল বাহির করিয়া কোনও হুতি কাপড়ের সহিত কাঠের রোলারে শুটাইয়া পরে ঘরের মধ্যে শুকাইয়া লইতে হইবে।

হুতি কাপড় ধুইবার ও পরিষ্কার করিবার প্রক্রিয়া আশিন মাসের 'ভারতবর্ষ' একবার লিখিত হইয়াছে। সেজন্য উহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

ঐকান্তোব দত্ত, বি-এস সি

নারী

নারী সে যে,—হোক না সে স্বরূপ কুরূপ,

আমি ছায়ে গড়ি নিত্য দিয়া নব রূপ ;

যা-কিছু স্বন্দর, আর যাহা রমণীয়,

চিত্ত মোর যাহা চায়, যাহা-কিছু প্রিয়,

এ-বিষের রূপে রসে গন্ধে আর গানে,

এ-হিয়াবের টানে যাহা অমৃতের পানে,—

সে-সবার মাঝে, মোর স্বজন-সীলায়

সমগ্ধের সাথে, মোর চিত্ত-নিরালায়,

নারী সে যে যুগে যুগে নিত্য গড়ি উঠে,

আনন্দের মহিমা তারি রূপ ফুটে !

জ্যোতিষ্মদী, সে যে দীপ্ত, ব্যাপ্ত ত্রিভুবনে,

বাধা সে ত' পড়ে নাই দেহের বাধনে ;

ক্ষুদ্র করে' দেখি 'তা'রে রূপ-রেখা মাঝে,

মানবের চিত্তে সে যে মুক্তি লভিয়াছে !

কে তারে বাধিবে আজ ক্ষুদ্রতার ছাঁদে ?

মুক্ত-হিয়া মানবের তারি লাগি কাদে ;

যুগে যুগে, দেশে দেশে প্রেমিকের হিয়া

রূপ তারে দেছে প্রেম-অমৃত সিঞ্চিয়া ;

সে ত নহে একা মোর, আশারি কেবল,

মোর প্রেমে বাধি তাকে কোথা হেন বল ?

মিছে তারে পিছে বাধা, মিছে টানাটানি,

ডাকে তারে অসীমের ঐ হাত-ছানি ।

শ্রীজয়ীকেশ চৌধুরী

রমলা

(৪)

রক্ত ঘরে বাইবে বলিয়া বাহির হইল বটে কিন্তু তাহার ঘরে যাওয়া হইল না। পথেই চাকর মনিষা আসিয়া জানাইল, সাহেব ডাকিতেছেন। দোতলায় ঘোগেশ-বাবুর লাইব্রেরীতে মনিষা লইয়া গেল।

কালো ওভারকোট মুড়ি দিয়া ইঞ্জিচেয়ারে হেলান দিয়া শুইয়া ঘোগেশ-বাবু একখানা বই পড়িতেছিলেন; রক্ত প্রবেশ করিতেই বইখানি টেবিলে বইয়ের গাদায় রাখিয়া চশমাটা খুলিয়া বলিলেন,—আমুন, আমি ভাব-ছিলুম আপনি বেড়াতে গেছেন।

নমস্কার করিয়া রক্ত জান্নার কাছে এক চেয়ারে বসিল, ধীবে বলিল,—না, এই বেরুচ্ছিলুম।

—বেশ বেড়ানোর জায়গা, কেমন লাগছে আপনার ?

—খুব সুন্দরই লাগছে, কলকাতার ঘোঁরা খেয়ে থেয়ে ত—

—হাঁ, আমাবও জায়গাটা ভাবি পছন্দ, এই ধরুন retire করে' পাঁচ বছর হয়ে গেল বরাবরই এখানে আছি, তবে গ্রীষ্মকালটা কোন hillএ চলে যেতে হয়।

—পাঁচ বছর আছেন ?

—হাঁ, একবার বেড়াতে এসে আমার স্ত্রীর এ জায়গা ভাবি পছন্দ হয়েছিলো, তাই পেন্সন নিয়ে এইখানেই বাড়ী করলুম। তা, তাঁকে আর এ বাড়ী ভোগ করতে হল না, এসে প্রথম বছরেই মারা গেলেন—ওই যে পাশের ঘরটা, ওই ঘরটায়, ওটা বন্দই থাকে—

বৃদ্ধের গম্ভীর কণ্ঠ উদাস হইয়া উঠিল, তাঁর শুভ্র ভ্রু তলায় গ্রন্থপাঠশিল্পি বড় বড় কালো চোখ জলচ্ছল হইয়া আসিতেছে দেখিয়া রক্ত কথার ধারাটা অত্মদিকে চালাইবার পথ খুজিতে লাগিল, কিন্তু কিছু বলিতে না পারিয়া চূপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বৃদ্ধ আপনাকে দমন করিয়া ধীরে বলিলেন,—ওই মা-হারী মেয়ে আমার মা হয়ে আছে। কোথায় মাধবী-মা ?

—তিনি নীচে আছেন।

—আচ্ছা থাক।

—আপনার কোনো ছেলে নেই ?

—ছেলে ? কি জানো বাবা, তাদের নিজের সংসার হয়েছে, বুড়ো বাপের সঙ্গে কি সম্বন্ধ বলো ? হাঁ, আছে বৈ কি, এক ছেলে রাওলপিণ্ডিতে ডাক্তার, আব এক ছেলে সিমলা নেক্রেটেরিষেটে আছে,—আর মেয়েই বা কি আপন বলুন, মেয়েকেও ত পরেব ঘরে পাঠাবার জন্তে মাহুষ করা, তা হলেও সে মেয়ে। এই ঘরভরা বই দেখছেন, এই বই আর মা-টিকে নিয়ে বেঁচে আছি। যাক, আপনাকে ডেকে পাঠালুম, আপনার ছবি ভারী ভালো লেগেছে; তুলির টানগুলো দিবেছেন, যেমন bold তেন্নি আইডিয়ায় ভরা। ভাবলুম কত রাজ্যেব বই কিনে ত টাকার শ্রাদ্ধ করছি, একজন দেশের আর্টিষ্টের একটু সাহায্য করা যাক—তাই—

—আমি আপনার ছবি বখাসাধ্য ভালো করেই আঁকবো—ছোট বেলা থেকেই ছবি আঁকার সখ, সারাজীবন যদি রাখতে পারি—

—হাঁ, ছবি এঁকে এ দেশে পেট চলা মুশ্কিল, তবে আপনার ছবি,—না, ছবি আঁকা কিছুতেই ছাড়বেন, আর দেখুন, মাধুব ছবি আঁকার ভারি সখ, শুকে শিখিয়ে দিতে হবে, ও নিজে চেষ্টা করে' যা এঁকেছে একটা talent আছে বোধ হয়, না, আপনি স্ত্রীবনে যে professionএই যান, ছবি আঁকা ছাড়বেন না।

ঘোগেশ-বাবু নীরব হইলেন। কথা শেষ হইয়া গেল ভাবিয়া রক্ত উঠিয়া দাঁড়াইতেই ঘোগেশ-বাবু বলিলেন,—ও কি উঠছেন যে, বসুন।

রক্ত তাঁহার হৃৎস্পন্দিত বার্নিক্যজীর্ণ মলিন মুখের দিকে চাহিয়া বসিল। সন্ধ্যার ছায়ায় সেই কালো ওভারকোট-জুড়ানো মূর্ত্তিকে বড় করুণ দেখাইতেছিল। বাঁধানো দাঁতগুলি বাহিব করিয়া মুহূ হাসিয়া ঘোগেশ-বাবু উদাস স্বরে বলিলেন,—কি জানেন রক্ত-বাবু, সুখ জিনিষটা, ওটা বড় রহস্যের, বড় আশ্চর্যের। ও কখন আসে কখন যে যায়,—আজ আপনাকে দেখে কেমন একটা আনন্দ হচ্ছে,—আব ওই রমলাকে দেখে কাল যে কি



ধ্বংসাবশিষ্ট ইউরোপ

মুসলমানের ধর্ম-অঙ্গুর রাশিতে বারবার প্রতিশ্রুত হইয়াও ইংবেজ কেন তাঁহার মুসলমান প্রজাদিগকে অসন্তুষ্ট করিয়াও সেভাসপলিতে তুরস্ক-শক্তিকে প্রায় সমূলে উৎখাত করিয়া গ্রীক-শক্তিকে প্রবল করিবার প্রয়াসী হইয়া উঠিলেন তাহা বুঝিতে হইলে পশ্চিম-প্রান্তিক প্রাচ্যের সমস্যাটিকে ভাল-করিয়া বুঝিতে হইবে। রুশ-শক্তি যখন প্রবল ছিল তখন তাহার ভারত-অভিযান প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী তুরস্ক-শক্তিকে প্রবল রাখা সুবিধাজনক বোধ হওয়াতে ইংরেজ তুরস্কের সহিত মূখে মিত্রতা দেখাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু খৃষ্টান-শ্রীতি ও প্রাচ্যের প্রতি অবজ্ঞা ইংরেজের মনে বরাবরই প্রচ্ছন্ন থাকিতে ভিতরে ভিতরে তুবস্কের খৃষ্টান-প্রজা-বিদ্বেষগুলি অমুকুলতা করিতেও বিধাবিহীন হন নাই। ইংরেজের মনোভাব তুরস্কের জানী ছিল। ১৮৭৭ সালের জুনমাসে 'নাইনটিথ সেক্সুরি' নামক মাসিকপত্রে তুরস্কের প্রধান উজির মিখাৎ পাশা এক বিস্তৃত প্রবন্ধে এই ব্যাপারের আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন যে—

"Turkey was not unaware of the attitude of the English Government towards her; the British Cabinet had declared in clear terms that it would not interfere in our dispute. This decision of the English Cabinet was perfectly well-known to us, but we knew still better that the general interests of Europe and the particular interests of England were so bound up in our dispute with Russia that, in spite of all the declarations of the English Cabinet, it appeared to us to be absolutely impossible for her to avoid interfering sooner or later in the Eastern dispute."

অর্থাৎ ইংরেজ-সরকারের তুবস্কের প্রতি মনোভাব তুরস্কের অজানা নাই। বৃটিশ মন্ত্রীসভা পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন যে আমাদের বিবাদে হস্তক্ষেপ করিবেন না। ইংরেজ মন্ত্রীসভার এই সিদ্ধান্ত আমাদের বেশ জানাই ছিল কিন্তু আমরা আরও ভাল-করিয়া জানিতাম যে রাশিয়ার সহিত আমাদের বিবাদে কল্যাণকর সহিত সমগ্র ইউরোপের এবং বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডের স্বার্থ এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত যে ইংরেজ-সরকার প্রাচ্য বিবাদে হস্তক্ষেপ না করিয়া পারিবেন না।

ইংরেজের রুশ-ভীতি যে শুধু তুরস্ককেই প্রবল রাখিরাছিল তাহাই নহে। অষ্ট্রিয়াকেও প্রবল করিয়া সার্ব-সুভায় আন্দোলনকে প্রতিরোধ করাও ইংরেজের রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজন বলিয়া গণ্য হওয়াতে ইংরেজ অষ্ট্রিয়াকে নানাক্রমে সাহায্য করিতে থাকে।

কিন্তু রুশ-আপত্ত যুদ্ধে পব রুশ-শক্তি হীনবীৰ্য হইয়া পড়তে ভারতে রুশভীতি কমিয়া যায়। এসিকে জার্মানী ফরাসী-যুদ্ধের পর হইতেই এত শীঘ্র শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে যে তাহার পূর্ব-অভিযানে ব্যাঘাত দেওয়া ইংরেজের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। রাশিয়ার বলক্ষমে তুবস্ককে প্রতাপশালী করিয়া রাখা আর ইংবেজের

স্বার্থ রহিল না। তাই এসিয়াবাসী এই জাতির প্রতি যেতকারদিগের সহজাত-বিদ্বেষ ফুটরা উঠিতে লাগিল। Sickman of Europeকে ইউরোপ হইতে বিতাড়িত করিতে পারিলেই যেন ইংরেজ নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কারণ ঠিক এই সময়েই কাইরো ও স্তাম্বুলে (Pan-Islamic) সার্ব-মোসলেম আন্দোলনের উদ্ভব হয় এবং এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মুসলমান জাতি-সমূহকে সংযুক্ত করিয়া পরাক্রান্ত কবিয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। ইসলামের এই সংহতিতে ইংরেজের স্বার্থহানি হইবার সম্ভাবনা যথেষ্টই ছিল। তাই ইসলামের এই জাগরণের প্রতিষ্ঠা তাহার ভাল না লাগিবারই কথা এবং জার্মানী ইসলামের জাগরণে সাহায্য করিয়া ইসলাম-বন্ধুত্বে প্রাচ্য প্রজ্ঞাবিশ্তারের সুযোগটি গ্রহণ করিতে আরম্ভ করায় ইংরেজ আরও বিব্রত হইয়া উঠে। এসিয়া ঐতিহাসিক হলান্ড রোজ (Holland Rose) তাঁহার ইউরোপীয় জাতিসমূহের বিকাশ (The Development of European Nations) নামক পুস্তকের "বৃহৎ শক্তিসমূহের নব সমন্বয়" (New Groupings of Great Powers) নামক অধ্যায়ে বলেন,—"Constantinople and Cairo were the centres of this Pan-Islamic movement, which aiming at the closer union of all Moslems in Asia, Europe and Africa around the Sultan threatened to embarrass Great Britain, France and Russia. The Kaiser, seeing in this revival of Islam an effective force, took steps to encourage the 'true believers' and strengthen the Sultan. Germany and Austria were likely to undermine British interests in the Near East, while on the other hand, the diversion of Russia's activities from Central Asia and the Balkans to the Far East, lessened the Muscovite Menace which had so long determined the trend of British policy. Moreover, Russia's ally France, showed conciliatory spirit. Forgetting the rebuff at Fashoda she aimed at expansion in Morocco. Now Korea and Morocco did not vitally concern us. The Bagdad railway and the Kaiser's court to Pan-Islamism were definite threat to our existence as an Empire. The aggressive character of the German schemes explains why France, Great Britain and Russia began to draw together for mutual support."

"কাইরো ও স্তাম্বুল হইয়াছিল সার্ব-মোসলেম আন্দোলনের কেন্দ্র বিন্দু। এই আন্দোলন, অসংখ্যানের সিংহাসনতলে ইউরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকার মুসলমানদিগকে সৌহার্দ্যবন্ধনে আবদ্ধ করিবার প্রয়াস করিয়া প্রেট্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়াকে বিব্রত করিতেছিল। কাইজার মুসলমানদিগের জাগরণে জার্মানীর শক্তিসঙ্করের সুবিধা বুঝিয়া ইলুতানের শক্তিকে দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিতে হইলেন। জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া পশ্চিম-

ছেড়ে খোলাছাদে গিয়ে দাঁড়ালুম। ধোঁওয়া কেটে গেছে,
অকলঙ্ক নীল আকাশে তারাগুলো ঝলমল করছে, হাসা-
হানাব গন্ধ বাতাসে ভেসে এলো। ইটের পব ইট, তাতে
সাঁতুল-কীট।—ওই বস্তি ওই গলি; ওই যেখানে আলো
মান হয়ে এসেছে কি বীভৎসতা কি কদর্যতা, যন্ত্রদৈত্য-
পিষ্ট স্বর্ণলোলুপ শক্তিমদমস্ত বণিক-সভ্যতাব প্রতিক্রপ
এই নগর বেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনো অতি ভীষণ
জঙ্ঘর মত অতি শ্রান্ত হবে পড়ে' আছে। শুধু রজনী-
গন্ধাব বাড়টা দক্ষিণ হাওয়ায় মগ্নর করে' বসে,

“নাইক পথে ঠেলাঠেলি

নাইক হাটে গোল,

ওরে কবি এইখানে তোর

কুটীরখানি তোলা।

ধুয়ে ফেল রে পথের ধূলো,

নামিয়ে দে রে বোঝা,

বেঁধে নে তোর সেতারখানা,

রেখে দে তোর ধোঁজা।

পা ছড়িয়ে বস রে হেথাষ

সারাদিনের শেষে,

তারাব ভরা আকাশতলে

সব-পেয়েছির দেশে !”

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু [এম-এ]

নিরুপায়

গেছে চলে' হাসি চিরতবে,

কেন গেছে কে তা জানে ?

ছুখের দেবতা এসো ওগো,

চুপি চুপি এসো প্রাণে।

চোখে ছলছল ভরে' লয়ে' জল বলো কথা কানে কানে।

ছুখে কাহারো নাহি লোভ,

কেউ নাই তাই কাছে;

কাবো কোনো কাছে লাগি নাই,

সবে তাই ছাড়িযাছে;

শ্রম বোর আঁখিপুটে মোর শুধু ব্যবধান আছে !

সুন্ধ এ অমা-নিশিথিনী,

আধাবে ধরণী ছা'য়,

জানিবে না কেহ আজি যদি

এসো গো নীরব পাশ।

একখানি বাঁমী, শুধু তুমি আগি, প্রাণ আর নাহি চায় !

বলো, মুখপানে চেয়েছিলে,

জেনেছিলে সব কথা,

বেদনে বেদনা পেয়েছিলে,

বুঝেছিলে সব ব্যথা,

ছিলে নিশিদিন উপায়বিহীন বৃকে চেপে নীববতা।

বলো, হাতে তব কিছু নাই,

সকল দিয়েছ মোরে,

যা চাহিতে পারি, যাহা চাই—

দিয়েছ শূন্য করে',

সহিতেছ ভার মহারিক্ততার সকল জীবন ভরে' !

* * *

ছুখের দেবতা এসো ওগো,

শোনো কথা কানে কানে;

দবদী আমার কত আছে,

ভালোবাসে প্রাণে প্রাণে—

তোমার নয়ন মুছাবার জন কেউ নাই কোনোখানে !

নিরুপায় ওগো, দ্বারে দ্বারে

ঘুরে ঘুরে লও তুলি'

কোটি বৃক হতে এক বৃকে

বেদনা-আধাত-গুলি !

তোমার বেদনা স্মরিয়া বন্ধু আমার বেদনা তুলি !

শ্রীস্বধীরকুমার চৌধুরী [বি-এ]

প্রান্তিক প্রাচ্যে ইংরেজ-স্বার্থের বিপরীতে নিজশক্তি সকার করিতে ইংরেজদিগের ক্ষতি হইতে লাগিল; অপবদিকে বস্কান ও মধ্য এশিয়া হইতে স্বাধীনতা একান্ত-পূর্বে বাজ্য-বিস্তারে মনোনিবেশ কবাসে ইংরেজের স্বাধীনতা কমিয়া গেল। রাশিয়ার নিজকপে ক্রান্ত-পূর্বে বিরোধ-ভুলিয়া ইংবেজদিগের সহিত মেলোমেরাও আগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন। ফ্যাসোদার-অপমান ভুলিয়া ক্রান্ত মরুভূমিতে বাজ্য বিস্তারের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কোরিয়া ও মনচোর সহিত ইংবেজ-স্বার্থ যুক্ত ছিল না, অপব পক্ষে বাগদাদ বেল লাইন এবং কাইজোবেব-তুবা-নীতি আমাদের স্বার্থের অন্তর্গত। এবং উহাতে আমাদের সাম্রাজ্যের ক্ষতিব-কাষণ হইবার সম্ভাবনা। জার্মানীর বস্তুনিষ্ঠ উপায়গুলি ক্রান্ত, রাশিয়ার ও ইংবেজের স্বার্থের প্রতিফল হওয়াতে উক্ত তিন শক্তি পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য মিত্রতা-যুগে আবদ্ধ হইলেন।

কাজে কাজেই জার্মান-শক্তিকে ধর্য করিতে চেষ্টা পাওয়া ইংবেজ, করানী ও রাশ-মন্ত্রীবর্গের প্রধান চিন্তা হইয়া পড়িয়াছিল। আলবেনিয়া লইয়া ইতালী ও অট্টোমান-মনোবিদ্যার বাড়িয়া তুলিতে এই রাজনীতি-ধুরন্ধরেবা যথেষ্টই প্রয়াস পাইলেন। এবং তুবসের নিকট হইতে ত্রিপলী অন্যায় ভাবে কাড়িয়া লইতে ইতালীকে কেহ বাধা দিলেন না। এইরূপে ক্রমে ক্রমে উহার ইতালীকে ত্রিমিত্র-মিলন (Triple Alliance) হইতে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে লাগিলেন। ত্রয়ী (Triple Entente) রাষ্ট্রনীতির গতি এইরূপে ত্রিমিত্রমিলনের বিপরীত দিকে চলিতে লাগিল। তাই যুগোব-বুখিয়া বস্কান-শক্তি-পুঞ্জ ইতবীর্ষ্য তুবসকে আক্রমণ করিয়া বসিলেন। কিন্তু নবীন তুবস-সম্প্রদায়ের (Young-Turks) শৌর্য্যে তুবস কোনক্রমে আত্মবক্ষা করিতে সমর্থ হয়। যুদ্ধাবস্থার পূর্ব পর্যন্ত মোটামুটি ইউরোপের রাষ্ট্র-নৈতিক অরহা এই। এইরূপ সম্বন্ধাপন স্ববস্থা সম্বন্ধে ইংবেজ সান্ত্বনা ও বুলগেরিয়া প্রভৃতি বস্কান বাজ্য-সমূহের সহিত ভিতরে ভিতরে সহানু-ভূতি দেখাইয়া আসিলেন ও এভাবে প্রকাশ্য ভাবে তুবসের শত্রুতা করেন নাই। তাই যুদ্ধাবস্থানে ইংবেজের তুবসের প্রতি প্রকাশ্য বিশ্বস্ততা দেখিয়া অনেকেরই বিস্মিত হইয়াছিলেন। এইরূপ প্রকাশ্য শত্রুতা ইংবেজের মুসলমান প্রজাবৃন্দের মহা-অসন্তোষের কারণ হইবে জানিয়াও কেন যে ইংবেজের হঠাৎ গ্রীক-নীতি এতটা আগিয়া উঠিল তাহা প্রথমে পবিষ্কার বুঝিয়া উঠা যায় নাই।

ইংবেজের গ্রীক-নীতি যে অহৈতুকী নয়, ইহাও অন্তর্ভালে যে গোপন অভিসন্ধি ছিল তাহা সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে।

যুদ্ধের পূর্বে ভূমধ্যসাগরে ইংবেজের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। কিন্তু যুদ্ধাবস্থানে আড্রিয়াটিক উপকূলে ইতালী তাহার প্রাচীন অধিকার পূর্ণ দখলে আনিয়া যখন হঠাৎ বলশালী হইয়া ইংবেজের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন তখন ইতালীর বিপরীত শক্তিকে প্রবল কবিয়া-ভুলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী গড়িয়া ইতালীর শক্তিকে ধর্য করিবার প্রয়াস-পাওয়া ইংবেজের প্রয়োজন হইল। গ্রীস অনেক দিন হইতেই ইতালীর প্রতিকূলতা-কবিয়া আসিতেছিল, তাই ভূমধ্য সাগরে গ্রীসশক্তিকে প্রবল কবিয়া ইতালীর set off সৃষ্টি কবা ইংবেজের স্বার্থ হইল। ইতালী যখন আড্রিয়াটিকের পূর্ব উপকূলে প্রভুত্ব বিস্তার কবিবার জন্য নিজের দাবী শাস্তি-বৈঠকে উপাসন করিলেন তখন হইতেই ইংবেজপক্ষ হইতে তাহার প্রতিকূলতা আরম্ভ করা হইল। ইষ্ট্রিয়া ও ডালমেসিয়া প্রদেশ পুৰাতন ভিনিস রাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল বলিয়া, ইতালী সেইগুলিকে নিজের দখলে আনিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ইতালীর এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে যুগোস্লাভিয়া-বাজ্যকে তলে তলে উন্মোচন দিবার প্রয়াস মিত্র-শক্তি-স্বর্গেব তরফ হইতে চলিতে লাগিল।

যুগোস্লাভিয়া ডালমেসিয়াব অনেকটাই দখল কবিয়া বসিলেন। দ্যাম্বুসিয়ার প্রবোচনায় ইতালিয়া ইবেনডেটা নামে নব্য ইতালীর তরফ সমুদায় এক দল গঠন কবিয়া যুগোস্লাভিয়াব বিরুদ্ধে অভিযান করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া মিত্রশক্তিবর্গের বাজ্যনীতি-ধুরন্ধরেবা একটা বধ্য-নিষ্পত্তির চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। ইতালীর ব্যবহারে কিন্তু স্পষ্ট বুঝা-গিয়াছিল যে ইতালী আড্রিয়াটিকে প্রাধান্য লাভ না কবিতো পাবিলে সহজে এই বিরোধের কোনই সমাধান হইবে না। কিন্তু আড্রিয়াটিকে ইতালীকে প্রাধান্য দিবার পূর্বে গ্রীসকে শক্তিশালী কবিয়া তুলা একান্ত প্রয়োজন মনে কবিয়া মিত্রশক্তিবর্গ তুবসের সঙ্গে একটা বধ্য-নিষ্পত্তি করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট ক্রান্তের সেভার্স সহবে তাড়াতাড়ি একটা সন্ধির বন্দোবস্ত করা হইল। লয়েড জর্জ যে-সকল প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়া ছিলেন এবং অধিবাসীদিগের ইচ্ছা সম্বন্ধে উইলসন যে-সকল অভিমত প্রকাশ কবিয়াছিলেন তাহাকে উপেক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক এই-সন্ধিপত্র প্রায় ও সত্যের মর্যাদা রক্ষা করে নাই। ইহাতে তুবসের প্রতি যোবতর-অবিচার করা হইয়াছে, কেননা গ্রীসকে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর বস্কান রাজ্য হইতে ভূমধ্যসাগরস্থ প্রথম শ্রেণীর শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়া তুলাই এই সন্ধিপত্রের স্বাধ্য-উদ্দেশ্য ছিল, কাজে কাজেই ভ্রাত্যেব দিকে দৃষ্টি রাখিবার বড় একটা অবকাশ ছিল না।

"The Treaty of Sevres will have changed the position of Greece from that of a Balkan State of secondary importance into that of a Mediterranean power whose influence must be far-reaching"—H. Charles Wood in the Quarterly.

ভূমধ্যসাগরে গ্রীসের প্রভাব বাড়াইবার উদ্দেশ্যেই মৌসিটোনিয়া ইজিয়ান দ্বীপ-খণ্ড ও আর্গা তুবসের নিকট হইতে কাড়িয়া গ্রীসকে দেওয়া হইল। ইতালী সেভার্স-সন্ধির বলে ডোডিকানিস দ্বীপ-সমূহ অধিকার করিয়াছিল কিন্তু তার কিছুদিন পরে ইতালী একপ্রকার বাধ্য হইয়া উক্ত দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশই গ্রীসকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। ১৫ বৎসর পরে যদি সাইপ্রাস দ্বীপ ইংবেজ গ্রীসকে প্রদান করেন তাহা হইলে ইতালী বোডন দ্বীপও গ্রীসকে ফিরাইবা দিতে বাধ্য থাকিবেন বলিয়া স্বীকার করেন।

১০ই আগষ্ট আর-একটি সন্ধিপত্রে ইংবেজ ও কবাসী ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ অবধি নানা সন্ধিসন্ধিতে গ্রীসের উপর প্রবরদারী কবিবার যে-সকল অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন, বিনা সন্তে সেই-সকল অধিকার বর্জন কবিতো স্বীকার করিলেন। বুলগেরিয়াব ইজিয়ানে সাগরে সহজে ব্যতায়িত করিবার পথ উন্মুক্ত রাখিতে মিত্রশক্তি-বর্গ যে প্রতি-শ্রুতি কবিয়াছিলেন যে-সকল গ্রীসের স্বাধিকারভুক্ত হইতে দিয়া তাহার সম্ভাবনাকে নষ্ট করিলেন। এইরূপ নানা প্রজ্ঞার-দ্বারা গ্রীসপ্রভাব বজায় রাখিবার চেষ্টা হইল। তাহার পর ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ মধ্য রাপালো সহরে একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই রাপালো সন্ধিধারা আড্রিয়াটিক সমস্তার একটি অসীমায়ো সমত্বপব হইয়াছে। জাবা দ্বীপপুঞ্জ ব্যতীত সমস্ত ডালমেসিয়া প্রদেশেব উপর ইতালী নিজের দাবী ছাড়িয়া দিলেন এবং তৎপরিবর্তে যুগোস্লাভিয়া ইষ্ট্রিয়াব উপর তাহার দাবী ছাড়িয়া দিলেন। ইতালী আড্রিয়াটিকে প্রভাব বিস্তার করিলেন বটে কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রীসশক্তি ভূমধ্যসাগরে আবণ্ড শক্তিশালী হইয়া উঠিয়া ইতালী-শক্তিব-প্রদায়ের অন্তরায় হইয়া

—সাকী !

—সদ্বার !

বেগুনপথে জ্যোৎস্না-ধুমধুম করিতে লাগল।

ধীবে বল্লম—অনেক ত ঘোরা হলো, এবার আমার বাড়ীর পথ চিনিয়া দাও।

হেসে বল্লে—বাড়ী ? বাড়ী কি হবে ?

—এ দেশে কি সবাই পথে পথেই চলে, কেউ ঘর বাঁধে না ? কারুর কি নিজের বাড়ী নেই ? তোমার কি ঘর নেই বন্ধু ?

তার চোখে জল ভরে' এলো, ব্যথিত স্বরে সে বল্লে—এদেশে সব সুখ, শুধু ওই দুঃখ। প্রেম এখানে স্বরাট্ বলে' প্রেমের মিথ্যা অভিনয় তো এদেশে চলে না। দুই তরুণ-তরুণী প্রাণে মিলিত হলে যেমন প্রেমের সঙ্গে আনন্দে ঘর বাঁধে, তেমনি তাদের প্রেমে কোথাও একটু ফাঁকি হলেই আবার ঘর ভেঙে পথে বেরিয়ে পড়তে হয়।

দুজনে স্তব্ধ হয়ে চল্লুম।

বন্ধু ধীরে বল্লে—এতক্ষণ হাসি শুনে এসেছ, কারার স্বরের মত একটা বাঁশী শুনতে পাচ্ছ—নদীর ওপারে বসে' কোন বিরহী একা বাজাচ্ছে।—

আমার চোখ অশ্রুতে ভরে' এলো।

—ওই যে পথের বাঁকে বাঁশগাছের তলায় কুঁড়েটা দেখ্ছ, আল্পনাকাটা আঙিনার একটি মাটির স্বতপ্রদীপ জ্বলছে, দরজার গোড়ায় মাটির মঙ্গল-কলস বসানো, দেওয়ালে শব্দ ও চরকা আঁকা, ওই যে বাঁশের বেড়ার গা ধরে' কুম্ভকো-লতা উঠেছে, তার পাশে একটা হরিণ চাঁদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—ওই খড়ে-ছাওয়া মাটির বাড়ীটার আমি রোজ রাতে গিয়ে ওই বাঁশীর চেয়েও করুণ স্বরে সেতার বাজাতে বসি,—ওই আমার একা থাকবার বাড়ী।

ভাঙা গলায় আমি বল্লুম—এখন তুমি কি ওখানে যাবে ? আমি তবে বিদায় নি।

মান হেসে সে বল্লে—না চলো, আগে তোমার নদীৰ কোনো ময়ূরপঙ্খীতে ঘুম পাড়িয়ে আসি—তারপর যাব।

পথের শেষে নদীতে এসে পৌঁছলুম। কি স্নিগ্ধ অমল

জলধারা ! তীরে মিলের কদম্বাতা, ছোট্ট গুদামের সারি নেই, মধুমলের মত সবুজ ঘাসের পাড় আর গাছের সারি।

শৃঙ্গল-মূল্য নদী আনন্দে চলেছে। প্রকাণ্ড কল-দৈত্যের মত ষ্টিমার-লঞ্চগুলো বৃকে চেপে নেই, ছোট ছোট নৌকো বলাকার মত অমল জলে বেন ঘুমিয়ে আছে।

দুজনে গিয়ে একটা তবীতে উঠলুম, পেছন থেকে কে ডাকলে—‘বন্ধু !’ দেখি আমার এই দোঁসিয়ালিষ্ট বন্ধু ! আনন্দে তার হাত জড়িয়ে বল্লুম—এসো ভাই।

তিনজনে নৌকায় গিয়ে বসলুম। মণি-প্রদীপের মত একটা রেডিয়াম হালের কাছে জ্বলতে লাগল।

দোঁসিয়ালিষ্ট বন্ধুটি বল্লে—আজ তো রাতে উৎসবের আনন্দ দেখলে, কাল দিনে কাজের আনন্দ দেখাব। সবপেয়েছির দেশের আনন্দ যেমন অফুরন্ত, তার দেখাও অফুরন্ত ; সময় চাই। আজ ঘুমোও।—

“এক রজনীর তরে হেথায়

দূরের পাশ এসে

দেখতে না পায় কি আছে এই

সব পেয়েছির দেশে।”

আমি ধীরে বল্লুম—আজ ছোট ছেলে-মেয়ে থেকে বৃদ্ধ সবাইয়ের মুখে যে হাসি দেখলুম, গান শুনলুম, তাতেই আমি ধন্ত হয়েছি।

নৌকার এক কোণ থেকে সেতার বের করে' সাকী ঝঙ্কার দিলে। একবার সাকীর অরুণ-বরণ সাজের দিকে আর-একবার উন্মুক্ত নীলাকাশের অনন্ত তারালোকের দিকে চাইলুম। মনে হলো, সৃষ্টির আরম্ভ হতে মানুষের বৃকে একটি ক্ষুধা—তা প্রেমের ক্ষুধা, সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি এ অগ্নিশিখা অনির্বাপ থাকবে।—মানুষের সব সুখ হতে পারে, কিন্তু লাখ লাখ যুগ গেলেও প্রেম-ভূষিত অন্তর জুড়াবে না।

সেতারের স্বরলোক চারিদিকে সৃষ্টি হয়ে উঠল। জ্যোৎস্নাধারার দিকে চেয়ে অন্তর কানায় কানায় অশ্রুতে কি সুধারসে ভরে' উঠল জানি না। ধীবে ধীরে চোখ বুজ্বে এলো।

* * * * *
গির্জাব দড়িতে বাত এগাবোটা বাজল। বারান্দা

উঠিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রনীতির এই কূট ব্যবস্থাই আবার ইউরোপের
কতিবন্ধার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বুলগেরিয়া ইজিপ্ত সাগরে কোনও
বন্দর না পাওয়াতে বুলগার শস্ত অবাধে ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত দেশে
বিত্যাসিত কবিত্তে পাবিতেছে না। বুলগার শস্ত ইউরোপের শান্তির
স্বভাব খুচাইয়া আসিয়াছে। তাহার অভাবে বর্তমানে ইউরোপে শান্ত
অগ্নিমুলা হইয়া উঠিয়াছে। গ্রীস-শক্তির আকস্মিক বিকাশে রুমেনিয়া
জ্যেষ্ঠসৌভাগ্যিকি ও বুলগেরিয়া স্বাধীন হইয়া গ্রীসের বিপক্ষে এক
হইয়াছেন। এদিকে সুত্তায়া কামাল পাশা তুর্কপ্রভাব অকুণ্ঠ রাখিবাব
জন্ত গ্রীসের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা কবিতা তাকে বাবাব পরাস্ত কবিতা

দিয়াছেন। মিত্রশক্তি গোপনে গ্রীসকে সাহায্য করিয়াও কামালের
শক্তি-বিকল্পে আটকিত হইতে পাবেন না। কামাল নিজ শক্তি
বৃদ্ধি জন্য বোলশেভিকদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপনের উদ্যোগী
হওয়াতে ইংরেজ বিপদ পনিতেছেন। তাই তুর্ক-শক্তি-সম্মত পুনর্বিচাৰে
কথা উঠিয়াছে। যদি নিজ স্বার্থের হানি না কবিতা কোনও রকমে
তুর্ক-শক্তিকে খুসী করা চলে। কিন্তু গ্রীস-সমস্তা ভিন্ন আরব-
সমস্তা পশ্চিম-প্রান্তিক প্রাচ্যে ইংরেজকে বড়ই বিপদ করিয়া
তুলিয়াছে। সে সমস্তাব কথা বাবাবের আলোচনা কবিতাব
ইচ্ছা বহিল।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

অচেনা

নিশিদিন প্রতি পলে পলে

কে যে মোর সাথে সাথে চলে

কি কহিতে চায় কানে কানে,

ধরার রহস্যকথা সে কি জানে, সে কি সব জানে?

কি আড়াল ছন্নয়নে দোলে,

এ ধরা উত্তল কলরোলে

কোথায় ডোবায় তার বাণী,

তবু সে মোহাগ-ভরে কাছে এসে ধরে হাতখানি।

কে গো সে?

ওঠে ঝড় কাল-বৈশাখীর,

কোলাহল অমৃত পাখীর

দিক হতে দিকে যায় ভাসি,

চোপে তার কি অভয়, মুখে কোন্ প্রশান্তির হাসি।

কোন সে দুকহ তপস্যায়

ধ্যান-নেত্রে দিন তার যায়,

কোথায় সে উতরিবে শেষে,

কোন অঘটন কথা শোনায়ে ফিরিবে দেশে দেশে?

কে গো সে?

দূর হতে দূরে অবিরত

চলি আমি মুগ্ধ স্বপ্নাহত,

নিশিদিন চলি তার পাশে,

ধরার রহস্যকথা যেইজন জানে সব জানে।

চলি সব ছুঃখক্লেশ সহি,

শক্তি-অতীত ভার বহি,

মানবের সব ছুঃখভার

বেথা গিয়ে অবসান-ওগো সে সন্ধান জানে তার।

কে গো সে?

পাশরি' সকল স্বপ্ন আশা

তারেই দিয়েছি ভালোবাসা

যে আমার সাথে সাথে চলে,

নয়নে হেরিতে তারে ভাসি সদা নয়নের জলে।

সে কি আমি, সে কি মোর আমি?

আমারই মাঝারে দিব্যাময়ী

আপনারে লুকাইয়া রাখে,

ব্যর্থ এ জীবন মোর লাজ পেয়ে সে কি মুখ ঢাকে?

কে গো সে?

শ্রীশুধীরকুমার চৌধুরী।

কেউ রূপকথার রাজকন্যা, কেউ কোন উপন্যাসের নায়ক, কেউ কোন নাটকের নায়িকা, কেউ ইবাণী, কেউ নবওয়েজিয়ান, কেউ জাপানী, কেউ মেক্সিকান। কোনো টেবিলে কোনো কবি তার কবিতা পড়ছে, কোনো টেবিলে মুখে মুখে গল্প হচ্ছে অথবা গল্পপাঠ চলছে, ঘবেব কোনো কোণে একটা ছোট অভিনয় চলছে। হঠাৎ এক কোণে পুলিশের লাল পাগড়ী আর বিচারপতির লাল গাউন দেখে 'আমি চমকে বল্লম—ওটা কি হচ্ছে বন্ধু ?

সে হেসে বল্ল—ও একটা প্রহসন হচ্ছে। তোমাদের যুগে কি রকম আইনের বিচার হোত, আমাদের ফাসের দরকার হলে তারই অভিনয় করি।

কাশের মত সাদা লীলাপদ্ম-আঁকা কাঁচের থালায় বেগম রাজা পোলাও দিয়ে গেলো। কাঁবাবটা মুখে দিতে বন্ধু বল্ল—ভেবো না এটা মাংস।

—মাংসের চেয়ে স্বাস্থ্য খেতে।

—এ দেশে ত জন্তু বধ হয় না।

পোলাও শেষ হতে না হতেই এক চীন-রমণী টেবিলেব কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে—কোনো চীনে ডিশ খাবে ?

—খুব খাব।

ভ্রাগন-আঁকা একটা চীনেগাটির ডিশ নিয়ে সে কি আনতে গেল।

আমাদের পাশের টেবিলে কাবুলী-মাজ-পরী কয়েকটি যুবক মুখে মুখে এক গল্প রচনা করছিল। গল্পের স্তুতোটা সবাই মিলে টেনে টেনে যখন প্রাণ ছেঁড়ে, আমাব দিকে সবাই মিলে তাকিয়ে বল্ল—ভাই, এটা শেষ করে' দাও না!

আমি কোনমতে গল্পটা শেষ করে' বল্লম,—তা গল্পটা ত মন্দ হলো না। এখানে বুঝি কোনো মাসিকপত্রের সম্পাদক নেই-? থাকলে নিশ্চয় তোমাদের তাগাদা দিয়ে এটা লিখিয়ে ছাড়তেন।

আমাব কথা শুনে সবাই আমার দিকে অবাক হয়ে চাইল, যেন কিছুই বুঝতে পারলে না। তরগীবন্ধু একটু হেসে বল্ল—এ হচ্ছে নতুন বিদেশী, আমাদের দেশের কিছুই জানে না। জানো বন্ধু, আমাদের দেশে মাসিক-পত্রিকা আব খবরের-কাগজ নেই, এমন কি কোন ঘরে বইয়ের আলমারি নেই। লেখক লিখেই খালাস—আর

গল্প কবিতা শুনিযেই তাঁব আনন্দ। তারপর লেখা খুব ভালো লাগলে সমজ্ঞদার বন্ধুরা সেটা নিজের হাতে কপি করে' রাখে, আব যদি অনেক লোকেরই সে লেখাটা দরকার হয় তবে সবাই মিলে প্রেসে গিয়ে নিজেরাই ধেটে ছাপাব আর বন্ধুদের উপহার দেয়।

—তোমাদের তাহলে কোন মাসিক-পত্রিকা নেই ?

—পত্রিকা আছে, তবে সেগুলো ঠিক মাসে মাসে বেবয না। লেখকরা ত আব যত্ন নষ ?—এই যে এখানে একখানা পড়ে' রয়েছে দেখো না।

পত্রিকাখানা তুলে নিলুম, ভেল্ডেট কাফে বাঁধানো, ময়ন তুলট কাগজগুলোর উপব কি স্বন্দব হাতের লেখা! হাতে আঁকা কয়েকখানি ছবি,—মিথ্যা বিজ্ঞাপনের বোঝা আর কলের ফিতের মত ক্রমশঃ-প্রকাশ উপন্যাস নেই।

ভূষারের মত সাদা এক কাকাতুয়া আর এক কালো ময়না কোথা থেকে উড়ে এসে আমাদের পাশে বসল। তাদের ভাগ দিয়ে খাওয়া চলতে লাগল।

খাওয়া শেষ হলে বন্ধু উঠে বল্ল—তোমার তখন জলভেটা পেয়েছিল, আমি সব্বৎ করে' নিয়ে আসছি, তুগি ততক্ষণ থালা-বাটিগুলো ওই জলের ধারায় ধুয়ে নিয়ে এসো।

টেবিল পরিষ্কার করে' থালা-বাটি ধুয়ে সাজিয়ে রেখে দেওয়ালের ছবিগুলো দেখছিলুম, বন্ধু সব্বৎ নিয়ে এলো।

মধুর মত মিষ্টি, মদের মত আবেশময় সে সব্বৎ, বন্ধুর অন্তরের প্রেমস্বধার মত স্নিগ্ধ। তাই পান করে' সব বন্ধুদের আমাদের আনন্দ জানিয়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়লুম।

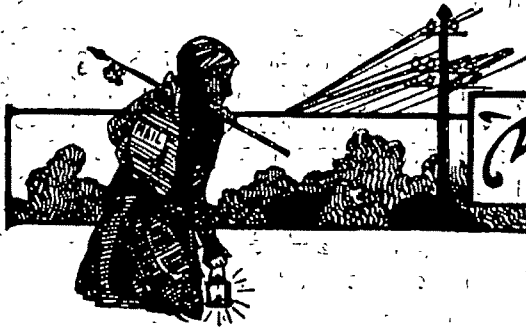
রজনী গভীবা, নিরালা পথ, পুষ্পবীথিকার বাতাস আনন্দে অধীব হয়ে উঠছে, কুহুধ্বনি থেমে গেছে।

বন্ধুর হাত ধীবে টেনে নিয়ে বল্লম—তোমার নামটা কি জানা হলো না ত বন্ধু !—

—আমার নাম ? আমার তো কোন নাম নেই, যে যা বলে' ডাকবে তাই আমার নাম। আমার যত বন্ধু তত নাম।

—আমি তোমায় কি বলব ?

—যা খুসী।



দেশ-বিদেশের কথা

বিদেশ

জেনোয়া বৈঠক—

ঋণসাবিশিষ্ট ইউরোপের হতশ্রীর পুনরুদ্ধার সাধনের উপায় উদ্ভাবনের জন্ত কান্ন সহরে যে অর্থনৈতিক বৈঠক বসিরাছিল তাহার সিদ্ধান্তগুলি ফরাসী রাষ্ট্রের মহাসভা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে কান্ন বৈঠক বৃথা হইয়া গেল।

ইংবেজ ও ফরাসীর মনোস্তব ও পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস। এতই বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে জেনোয়া-বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। ত্রিয়ার পদত্যাগে ফরাসী-ইংরেজের মিত্রতাবন্ধন আরও শিথিল হইয়া উঠে। কিন্তু মধ্য-ইউরোপের আর্থিক অবস্থা এমনই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে এবং মধ্য-ইউরোপের ভাগ্যের সহিত সমস্ত ইউরোপের ভাগ্য এমনই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে যে মধ্য-ইউরোপের বাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের জন্ত প্রাণপণ প্রয়াস না পাইলে ইউরোপকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করা এক প্রকার অসম্ভব। তাই জেকো-মোভাকিয়ার প্রধান মন্ত্রী বেন্টিসের প্রচেষ্টায় ফ্রান্স জেনোয়া-বৈঠকে উপস্থিত হইতে সম্মত হইয়াছেন। ১১ই এপ্রিল জেনোয়া-সহরে বৈঠক আরম্ভ হইবে। ইউরোপের অর্থনৈতিক সাম্য এবং মুক্তার নিরূপণ ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয়। ইহা ব্যতীত মধ্য-ইউরোপের রাজ্যসমূহকে স্বাধীন, রাশিয়ার সহিত বন্ধা-নিষ্পত্তি প্রভৃতি আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা হইবার কথা আছে।

বৈঠকে উপস্থিত হইবার জন্ত ইংলণ্ডের তরফ হইতে লয়েড জর্জ, লর্ড কার্জন ও স্ত্রার রবার্ট হর্ণ প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন। লর্ড কার্জন কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িতে, বৈঠকের আবেশে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। ফরাসী তরফ হইতে চার্লিট প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবার কথা, কিন্তু বিচাথ-মন্ত্রী বাথু (M. Barthou) স্ত্রি আবেশে এ পর্যন্ত নির্বাচিত হন নাই। ফরাসীরা বৈঠকের ফল সম্বন্ধে এতই সন্দিগ্ধ যে কোনও ফরাসী কূটনীতি-বিশাব্দ বৈঠকে যোগ দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হইতেছেন না। মিলের। আফ্রিকা পবিত্রনের অজিলায় বৈঠক হইতে দূরে থাকিতেছেন; পোয়াকারে ফ্রান্স ছাড়িয়া যাইতে অপারগ বলিয়া জানাইয়াছেন। বাথু ভার্সাই সন্ধি-সর্ব ও লয়েড জর্জের সন্ধি-স্থাপন-প্রণালীকে আক্রমণ করিয়া প্রায় দুই বৎসর পূর্বে স্থবিধাত হইয়া উঠেন। ইনি ফরাসী ক্ষত্রশক্তিকে প্রবল করিয়া তুলিতে সর্বদাই সচেষ্ট। ফরাসী ও রাশিয়ার মধ্যে মিত্রতাবন্ধন স্থাপনের জন্তও ইনি উৎসাহী। তাই ইহার নিরীক্সনে ইংরেজদের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা দেখা দিয়াছে।

ফরাসী মন্ত্রীসভা অনেক বাস্তবিকতার পব ছিন্ন করিয়াছেন যে ইউরোপের পুনরুদ্ধারের সকল প্রচেষ্টাতেই ফ্রান্স বধাসাধ্য সাহায্য

কবিতে চেষ্টা পাইবে, এবং অর্থনৈতিক সকল সমস্যা পূরণের জন্ত নানা আলোচনার সাগ্রহে যোগ দিবে। কিন্তু জেনোয়া-বৈঠকে যদি চাটুরী করিয়া প্রাচ্য-সমস্যা, বোলশেভিক-সমস্যা প্রভৃতি রাষ্ট্র-নৈতিক সমস্যা-পূরণের প্রয়াস দেখা যায় তবে ফরাসী স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি বাধিয়া ফরাসী প্রতিনিধিগণ সেই-সকল আলোচনার বাধা দিবেন।

সোভিয়েট রাশিয়াকে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার জন্ত করা হইয়াছে। ইংবেজ-সরকার প্রস্তাব করিবেন যে রাশিয়ার পুরাতন ঋণ যদি সোভিয়েট গবর্নমেন্ট স্বীকার করিয়া লয়েন তাহা হইলে সোভিয়েট রাষ্ট্রতন্ত্রকে রাশিয়ার নিয়মসম্মত রাষ্ট্রতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করা হইবে। তবে রাশিয়ার বর্তমান চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া পাঁচ বৎসর কাল পর্যন্ত কোনও হুদ লওয়া হইবে না।

রাশিয়ার প্রতিনিধি চিচেরিন বলেন যে সোভিয়েট অর্থনৈতিক ভিত্তিকে আঘাত না করিয়াও বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ ও পুরাতন ঋণ স্বীকারের পদ্ধতি আবিষ্কার করা যাইতে পারে। পুঞ্জীকৃত ধনের অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রতন্ত্র চেষ্টা পাইতেছেন বটে; তথাপি পারিপার্শ্বিকের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে প্রথমে একটু-আধটু রক্ষা-নিষ্পত্তি করিয়া চলিতেই হইবে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ স্বীকার করিবার পূর্বে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের সোভিয়েট রাষ্ট্রতন্ত্রকে রাশিয়ার নিয়মসম্মত ও প্রকৃত রাষ্ট্রতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। রাশিয়ার প্রতিনিধি জেনোয়া-বৈঠকে নিম্নলিখিত সর্বজনলি দাবী করিবেন।

(১) রাশিয়ার জাহাজের সর্বত্র অবাধ গতিবিধির অধিকার দিতে হইবে।

(২) সোভিয়েট নিশানকে রাশিয়ার নিশান বলিয়া স্বীকার কবিতে হইবে এবং তাহার প্রাপ্য সম্মান দিতে হইবে।

(৩) রাশিয়ার বাণিজ্য-জাহাজ বন্দরের ভিতর প্রবেশাধিকার পাইবে।

(৪) যুদ্ধের পূর্বে রাশিয়ার যে-সমস্ত বাণিজ্য-জাহাজ ছিল তাহা এখন মিত্রশক্তিবর্গের কবলগত হইয়া আছে। তাহার শতকরা বাটপানি আবার সোভিয়েট গবর্নমেন্টকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।

(৫) যে-সমস্ত জাহাজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে বা ফেরৎ দেওয়া হইবে না তাহার জন্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

(৬) দার্কেনেলিশ প্রণালীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত যে কমিশন বসিবে তাহাতে সোভিয়েট প্রতিনিধিকে গ্রহণ করিতে হইবে। মিত্রশক্তিবর্গ যদি এই-সকল সর্ব স্বীকৃত হন তবে রাশিয়ার মিত্রশক্তি-বর্গের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য আবৃত্ত করিতে প্রস্তুত আছেন, নতুবা নহে।

দেখা যাউক জেনোয়া-বৈঠকের ফল কিরূপ হয়।

সেই শিল্প-সৌন্দর্যের সামনে মাথা নত হয়ে এলো।
একটু জনবহুল পথে গিয়ে পড়লুম।

বন্ধু বল্লে—এই দেখ আমাদের দেশের-গাড়ী।
জন্তুদের মত দেখতে বটে ওরা, সত্যি জন্তু নয়।

একটি লাল ঘোড়ায় চড়িয়ে মা তার ছেলেকে টেনে
নিয়ে গান গাইতে গাইতে চলেছে, এক বুড়োকে এক
ভেড়ার ওপর বসিয়ে তার নাংনী টানছে আর হাসছে,
এক ময়ূরের গাড়ীতে বসিয়ে প্রেমিক তার প্রিয়াকে ফুট
বাক্সাতে বাক্সাতে টেনে নিয়ে চলেছে। সব শব্দ একটা
গানের সুরের মত বাজছে।

বন্ধু—এ যে সব মাহুষ-টানা গাড়ী!

—না, গাড়ীগুলো নিজেরাই যেতে পারে, ওরা ইচ্ছে
করে টানছে। কি আনন্দে হাসছে দেখছ!

রাজহংসের মত একটি মখমল-মোড়া গাড়ী পথের
পাশে পড়ে ছিল, বন্ধু—তুমি একটু বসো না, আমি
একটু টানি।

গর্বোৎফুল্ল মুখে হেসে বন্ধু বল্লে—না, পায়ে চলতেই
আমার বেশ লাগছে।

এ পথ পেঁচিয়ে এক পদ্মবনের ধারে এক বড়
বাড়ীর সামনে এসে পৌঁছলুম।

—এত বড় বাড়ী ত আগে কোথাও দেখিনি?

—এটা সবাইয়ের খাবার বাড়ী কি না, তাই একটু
বড়। বড় বাড়ী আমরা তৈরী করিনি বিংশ-শতাব্দীর
কয়েকখানা বড় বাড়ী ভাঙা হয়নি। ওই যে দূরে বাড়ী-
খানা দেখছ ওটা নাকি ছেলে-মেয়েদের কলেজ ছিল, এখন
আমরা ময়দার গুদাম ছাড়া কোন কাজে লাগাতে পারিনি।

—বাড়ীর কিন্তু গুণ আছে, এর সামনে এসেই
আমার স্নিগ্ধে পাচ্ছে।

—এসো না কিছু খেয়ে নেওয়া যাক—কি রকম
ভাবে খাবে বল তো!

—কি রকম গানে?

—কান্নর বাড়ীতে উঠে তার অতিথি হয়ে খেতে
পারো, অথবা দোকান বা ভাণ্ডার থেকে জিনিষ এনে
গাছের তলায়-আলানায় রান্না করে খেতে পারো, অথবা
সাধারণ ভোজনাগারে গিয়ে।

—তোমাকে তো একবার রাঁধালুম, আর কষ্ট দেবো
না—চলো এই খাবারের বাড়ীতেই ঢোকা যাক।

মার্কেলের প্রাসাদে ঢুকে পড়লুম। সামনেই শ্বেত-
পাথরে গড়া শঙ্খবল লক্ষ্মীর মূর্তি, তারপর সাদা মার্বেল
প্রকাণ্ড ঘর। লাল নীল কত রংএর আলো জ্বলছে,
চারিদিকে ছোট ছোট নানা রংএব পাথরের কারুকায়ময
টেবিল, তাদের ঘিরে চন্দনকাঠের চেয়ার মখমল-মোড়।

হংসমিথুন-আঁকা এক রাজহংসের মত সাদা পাথরের
টেবিলে এক কোণে আমরা দুজন বসলুম।

—কে আমাদের খাবার এনে দেবে?

—তুমি ভাবছ খান্সামাকে ডাকবে?—এখানে হয়
কোন বন্ধু আনন্দের সঙ্গে খাওয়ায়, না হলে নিজেরা রেঁধে
খাবার জিনিষ বয়ে নিয়ে আসতে হয়।

আমাদের টেবিলের একপাশে কয়েকজন পাকা আমেব
মত বৃদ্ধ গল্প করছে দেখে আমি একটু সঙ্কচিত হয়ে
উঠলুম, তারপর দেখলুম, দিদিমা-ঠাকুমাদের মত অনেক
প্রৌঢ়া নারী তসর-গরদের কাপড় পরে প্রতি টেবিলের
ধারে ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

বন্ধু আমার দিকে একটু মুচুকে হেসে বল্লে—কোন
ভয় নেই, এদেশের বৃদ্ধেরা বিভীষিকার বস্তু নন, বুঝলে?—
এখানে যারা রেঁধে আনন্দ পায় তারা রাঁধতে আসে, আর
যারা খাইয়ে আনন্দ পায় তারা খাওয়ায়। ওই বর্ষাঘরীরা
প্রতি টেবিলে খাওয়ানো তদারক করে বেড়াচ্ছেন।

আমরা বসবার একটু পরেই মোগল-বেগমের মত
সাজ পরে, কেশে কেতকীর মালা জড়িয়ে এক বালা
আমাদের কাছে হেসে দাঁড়িয়ে বল্লে—বন্ধু, তোমরা কি
খাবে বলো, আমি আজ এক বাদশাহী পোলাও আর
কাবাব রেঁধেছি, তোমাদের খাওয়াতে পারলে ভারি
আনন্দ পাব।

আমি হেসে বন্ধু—তোমার যা-খুসি নিয়ে এসো।

তার পেছনে তার বন্ধু মোগল-বাদশার বেশ পরে
দাঁড়িয়ে ছিল, সে বল্লে—কিসের খালায় আনব? রুপোর,
না কাঁচের, না মাটির?

—কাঁচের খালাতেই নিয়ে এসো।

অবাক হয়ে চারিদিকে চাইলুম,—কত রকমের সাজ!

পশ্চিম-প্রান্তিক প্রাচ্য—

গ্রীস ও তুরস্কের বিবাদ মিত্রশক্তির পক্ষে নানা অসুবিধার কারণ হওয়াতে উভয় একটা রক্ষানিষ্পত্তি ব্যবস্থা কবিবার জন্য প্যারিস সহবে এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। এই বৈঠকে অ্যাঙ্গোরা পক্ষে ইউসুফ কামাল তুরস্কের-স্বলভানেব পক্ষে ইজ্জত পাশা, ইংবেল্ল পক্ষে লর্ড কার্জন, ফরাসীদিগের পক্ষে পরোঁকাবের এবং ইতালীর পক্ষে স্কাভ্রাব উপস্থিত ছিলেন। গ্রীস কোনও প্রতিনিধি প্রেরণ করেন নাই কিন্তু মিত্রশক্তিবর্গের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। বৈঠকে ইতালীর প্রতিনিধি বলেন যে ভূমধ্যসাগরে শক্তিসম্ময় বক্ষা করিয়া চলিতে হইলে তুরস্কের স্বাধীনতা ও পূর্বগোবব অল্প বাপা একান্ত প্রয়োজন। অ্যাঙ্গোরা ও তুরস্কের প্রতিনিধিবর্গ থোস ও স্যানাটোলিয়া দ্বিবিধা পাইবার দাবী করেন। লর্ড কার্জন বক্ষানিষ্পত্তি হইবার পূর্বে তুরস্ক গ্রীস যুদ্ধ স্থগিত বাধিবাব প্রস্তাব করেন। কিন্তু ফরাসী প্রতিনিধি এই প্রস্তাবে প্রতিবাদ কবিয়া বলেন যে যুদ্ধ স্থগিত বাধিলে গ্রীসকে অজ্ঞারভাবে সাহায্য করা হয়। এমন গ্রীসশক্তি ক্ষয়েব মুখে বহিয়াছে; যুদ্ধ স্থগিত রহিলে গ্রীক সৈন্য আত্মরক্ষা কবিবার অবদর পাইয়া কোনও ক্ষুদ্র স্থানে আবাব সমবেত হইয়া নুতন অভিযানের জোগাড় কবিত্তে পারে। গ্রীসের এই অসুবিধাটুকু কবিয়া দেওয়া উচিত নহে। যুদ্ধ স্থগিত রাখিবাব প্রস্তাবটি কিন্তু খুব আগ্রহের নহিত গ্রীস গ্রহণ কবিয়াছে। অনেক আলোচনার পর মিত্রশক্তিবর্গ যেকণ মীমাংসা দ্বারা তুরস্ক-গ্রীক সমস্তাব নিষ্পত্তি কবিত্তে চাহিয়াছেন তাহাব সাবমর্গ বিগত ৩০শে মার্চ লর্ড মহানভাধ লর্ড কার্জন বিস্তৃত কবিয়াছেন। সিদ্ধান্তগুলি মোটামুটি এইঃ—

যুদ্ধস্থ শক্তিবর্গ যুদ্ধ স্থগিত বাধিতে সম্মত হইলে মিত্রশক্তিবর্গের তরফদানে গ্রীকসৈন্য এসিয়া-মাইনর হইতে অপসারিত হইবে। এক-একটি প্রদেশ হইতে গ্রীকসৈন্য সবিধা যাইলেই সেই সেই প্রদেশ তুরস্ক-শাসনের অধীনে আসিবে। মিত্রশক্তিবর্গ তুরস্কের খৃষ্টান প্রজাদিগের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। পরে তুরস্ক যদি জাতিদুসুহের সংঘের সভা নির্দাচিত হয় তবে এই খৃষ্টান প্রজাদিগের স্বার্থরক্ষার ভাব সবেব নির্দাচিত প্রতিনিধি হস্তে থাকিবে। আর্থেনীয়ানদিগের একটি স্বাধীন বাসভূমি ব্যবস্থা কবিবার প্রয়াস পাওঁয়া যাইবে। পূর্বে থেসের কতকটা অংশ তুরস্ককে দিবাঁইয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু পশ্চিম থেস গ্রীসের থাকিবে। লর্ড কার্জন বলেন যে গ্রীস সৈন্য পশম থেসকে অধিকার কবিয়া বেশ হৃদ্যভাবে অবস্থান কবিত্তেছে তপন থেসের সম্পূর্ণ অংশ দিবাঁইয়া দিতে গ্রীসকে অসুবিধা কবা যায় না। কাজেকাজেই আড্রিয়ানোপল ও গ্যালিপোলি গ্রীসের থাকিবে। মিত্রশক্তিবর্গ আবও বলেন যে, দার্দানেলিসের উত্তর তীরেব দুর্গগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে এবং তীরেব ধারে সৈন্যবাস থাকিতে দেওয়া হইবে না। গ্যালিপোলি উপত্যকার দুর্ঘটনার পুনবতিনয় হইতে দিতে মিত্রশক্তিবর্গ সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক, অতএব তাহা যাহাতে সম্ভবপ না হয় সেই ব্যবস্থা কবিত্তে হইবে।

লর্ড কার্জন বলেন যে এই সিদ্ধান্ত চরমসিদ্ধান্ত না হইলেও বেশ সুমীমাংসাই বটে এবং তুরস্ক ও গ্রীস এই উভয় পক্ষেবর্ত্ত ইহাকে গ্রহণ কবা উচিত। তুরস্ক ও অ্যাঙ্গোরা মীমাংসাগুলি সম্বন্ধে এখনও কোনও অভিমত প্রকাশ করেন নাই। তাহাবা সমস্ত সর্গগুলিকে তন্নতন্ন কবিয়া পরীক্ষা কবিয়া দেখিতেছেন। তবে যতদূর বোঝা যায়, তাহাবা এইকণ সিদ্ধান্ত সহজে গ্রহণ কবিবেন না। ভারতীয় খেলাফৎ কমিটিও এই মীমাংসার তীব্র প্রতিবাদ কবিয়াছেন। তাহাবা বলেন, গ্যালিপোলি, আড্রিয়ানোপল ও

পশ্চিম-থেস গ্রীসের অধীন বাপা অত্যন্ত অন্যায়। অধিবাসীদিগের দাবী মানিয়া চলিলে এইগুলি তুরস্কের প্রাপ্য। উইলসনের প্রস্তাবিত স্ব-সংকল্প এই স্থানে ব্যবহৃত না-হইয়া অন্য ব্যবস্থা হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। জাঙ্গিবাং-উল-আবব সম্বন্ধে ব্যবস্থা এবং দার্দানেলিস হইতে সৈন্য-সমাধেব তুলিয়া দেওয়াও ইহাদের মতে অত্যন্ত অন্যায়। খেলাফতী মতাবর্ত্ত ইহাতেই মুসলমানদিগের মনেব ভাব বেশ বুঝা যায়। তাই মনে হয় তুরস্কের সহিত বক্ষানিষ্পত্তি এত সহজে হইবাব নয়।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ

মহাত্মার বিচার—

বোম্বাই গবর্নমেন্টের আদেশ অনুসারে গত ১০ই মার্চ আহমেদাবাদের পুলিশ-হুপরিটেণ্টেট ‘ইং ইণ্ডিয়া’ পত্রিকার সম্পাদক মহাত্মা গান্ধী এবং প্রকাশক শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল বাল্লভকে গ্রেপ্তার করেন। পূর্বে দিনই তাঁহাদিগকে ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে হাজির কবানো হয়। তাঁহাদের বিবৃদ্ধে অভিযোগ ছিল, গবর্নমেন্টের বিবৃদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করা। গত জুন মাস হইতে গত ডেব্রয়ারী মাস পর্যন্ত যে-সমস্ত প্রবন্ধ ‘ইং ইণ্ডিয়া’ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের ভিত্তি চাণিট প্রবন্ধে নাকি এই বিদ্বেষ প্রচার করা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে বলিয়াছিলেন, তিনি যে গবর্নমেন্টের বিবৃদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার কবিয়াছেন, এ কথা বর্ষাকালে যথাস্থানে স্বীকার কবিবেন। ইহাব পর ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনেব ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের দায়বাহতে মোপর্দ করেন।

গত ১৮ই মার্চ দায়বা-জজ মিঃ ক্রমফোর্ডের এজলাসে ইহাদের বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। বিচারক মহাত্মার প্রতি ছয় বৎসর এবং শঙ্করলালের প্রতি এক বৎসর শ্রমহীন কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন। এই এক বৎসর কারাবাস ছাড়া শঙ্করলালকে এক হাজার টাকা জরিমানাও দিতে হইবে। জরিমানার অর্থ না দিলে তাঁহাকে আরো ছয় মাস কারাবাসও ভোগ কবিত্তে হইবে।

আদালতে মহাত্মা গান্ধী নিজের অপরাধ নিষাপত্তিতে স্বীকার কবিয়া লইয়াছেন। সত্যতা সাধনী হান্সা কিছুমাত্র সন্মত কবিত্তে হয় নাই। যেকণ আশ্রয়বাহিত ভাবে এবং অনাড়ম্বরেব সহিত তিনি দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ কবিয়াছেন, তাহাতে এই বিচারটি ভাবতেন ইতিহাসে চিহ্নকাল অরুণ হইয়া থাকিবে।

আদালতে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন—“এডভোকেট জেনারেল আমাব প্রতি কিছুমাত্র অবিচার করেন নাই। বর্তমান গবর্নমেন্টের প্রতি বিদ্বেষ প্রচার কবাই আমাব একমাত্র কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এডভোকেট জেনারেল সতাই বলিয়াছেন, ‘ইং ইণ্ডিয়া’ সংশ্রবে আসিবাব অনেক পূর্ব হইতেই আমি গবর্নমেন্টের বিবৃদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার কবিত্তেছি।

“আমাব ঘাড়ে যে দায়িত্ব-ভার চাপানো আছে তাহাব ওকৎ যে আমি জানি না এমন নহে। সব জানিয়া-শুনিয়াই আমি আঁগাব কর্তব্য সম্পন্ন কবিয়াছি। মাল্লাজ-বোম্বাই-চৌরীচৌরার অপরাধের জন্য আমাকে দাবী করা হইয়াছে—সে দায়িত্ব আমি স্বীকার কবিত্তেছি না। আজ যদি আমাকে মুক্তি দেওয়া হয় আমি আঁগাব দেই আগুন লইয়া খেলা কবিব। জন-সাধারণ সর্বত্র সংঘত হইয়া চলে নাই। তথাপি অহিংসাই যে আমাব মূলমন্ত্র তাহাতেও কিছুমাত্র

আমার কোন কথা বেন না বুঝতে পেরে তিনজনে আমার মুখেব দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

আমি আবার বল্লম—কত দাম, খুব বেশী নাকি?

তরুণী তখন মধুর হেসে বল্লে—এ আজ নতুন এসেছে।

এ দেশে ত কোন জিনিষের দাম দিতে হয় না; সে হিসাব বর্ষরতার যুগ অনেকদিন কেটে গেছে—আমাদের ত কোন টাকাই নেই!

আমি কাপড়-জামাগুলো তুলে গুটিয়ে নিচ্ছি দেখে সে আরও হেসে বল্লে—ও কাপড়-জামার বোঝা কেন মিছে বয়ে মরবে? যদি পরে পরতে ইচ্ছে হয়, এ দোকানে কিবা যে-কোন দোকানে গিয়ে পাবে।

আমার হাতের টাকা সিকি দুখানি দেখে ইরাণী আনন্দে লাফিয়ে আমার হাতের উপর ঝুঁকে পড়ে নিজে হাতে ছিনিষে নিয়ে বল্লে—কি মজার জিনিষ, এগুলো কি?

—আমাদের দেশের টাকা।

—আগেকার লোকগুলোর একটুও সৌন্দর্য্য-বোধ ছিল না, আমাদের দেশের ছেলেরা যে টাকাগুলো নিয়ে খেলা করে নেগুলো এব চেয়ে ভাল দেখতে। তাতে এব চেয়ে ভালো ছবি আছে।—কি একটা ছবি—কাব?

—আমাদের রাজার।

—রাজা! এই রকম রাজা?

রাজপুত বল্লে—চলো আমাদের ঐতিহাসিক বন্ধুর কাছে, সে সব বলে দিতে পারবে—এ রাজা কোন্ যুগের কোন্ দেশের ছিল, এর মন্ত্রীরা কিরকম যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা করত।

আমি ধীরে বল্লম—তোমাদের রাজা নেই?

তরুণী ধীরে আমার হাত ধবে বল্লে,—আছে বৈকি বন্ধু! আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের রাজা; আবার তুমি আমার রাজা, আমি তোমার রাজা! এসো তোমার বাজারটা দেখাই।

বাইবে বেবিঘে এলুম। দুধাবে ছোট ছোট বাড়ীর মাঝি, কোনটা কাঠ ও কাচের, কোনটা নানাবংএব পাথরের, কোনটা পর্ণকুটীর, কোনটা মন্দিরের মত! মাঝে মাঝে বেশুপপ, লতাকুণ্ড, পুষ্পবীথিকা। বাড়ীর দেওয়ালে মাঝে

মাঝে স্তম্ভব স্তম্ভব ছবি আঁকা, থিয়েটারের, চুরুটের, ঔষধের বিজ্ঞাপন ইত্যাদি কোন বিজ্ঞাপনের বিশ্রী কাগজ মারা নেই, ব্যবসাদারদের স্প্রচুর মিথ্যাকথায় ভরা লাল নীল নানা রংএব কাগজে কালীতে দেওয়ালগুলো কদর্য্য হয়ে ওঠেনি, এমনকি দোকানের সামনে কোন সাইনবোর্ডও নেই। জুতোর দোকানের সামনে মস্ত জুতো ঝুলছে, জামার দোকানের সামনে জামা।—কি শাস্ত স্নিগ্ধ সব! শুধু মালুযেব পাথের চলার ধ্বনি, 'গানের স্বর আর হাসির শব্দ।

এ পথ ছাড়িয়ে এক প্রশস্ত পথে এসে পড়লুম। এক-কোণে কয়েকটি মণির অক্ষরে জলছে, 'মালবিকা'।

বল্লম—ওটা কি!

—ও হচ্ছে এ পথের নাম। মালবিকা এক প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী ছিল, তাঁর নামেই পথ। এ দেশে ত গভর্ণর বা বড়-লোক নেই যে তাদের নামে প্রতিদিনের চলবার পথ হবে?—যারা সত্যিকার হৃদয়জয় করে যায়, যেমন শিল্পী কবি বৈজ্ঞানিক, তাদের নামেই পথ হয়।

—আচ্ছা তোমাদের দেশে কি কোন গাড়ী নেই?

—আমরা পায়ে চলতে এত আনন্দ পাই যে গাড়ীতে চড়ি না। অবশ্য মোটর ট্রাম, সেই-সব বীভৎস শব্দকারী যন্ত্রবান-জন্তুগুলি নেই।—আচ্ছা চলো মঞ্জুলিকা পথ দিয়ে।

—মঞ্জুলিকা কে?

—সে ছিল এক গায়িকা। স্বরসাধনের শতদলের মত ফুটে উঠেছিল। সে অফুবন্ত গান গেয়েছে আর তাব বন্ধু ভক্তেরা তার গলার স্বরের সঙ্গে ঝড়ির পর ঝড়ি মাটি কেটেছে, রাস্তা তৈরী কবেছে।

কিছুদূর গিয়ে এক শ্বেতশাখবের গম্বুজের সামনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে বল্লম—কি স্তম্ভব! ঘেন এক-ফোঁটা চোখেব জল জমাট হয়ে গেছে, জ্যোৎস্নায় টলমল করছে।

তরুণী বল্লে—হাঁ, মঞ্জুলিকার গানে যে-সব শিল্পীদের প্রাণ জেগে উঠেছিল তাবাই দিনরাত ধবে আপন প্রাণের ব্যথা ও আনন্দ দিয়ে গানের সুবেব সঙ্গে অশ্রুজল গিশিয়ে এই নির্মল শুভ্র মর্ষরতাজ গড়েছে।—এ ত প্র্যান কবে' বাজমিস্ত্রীদের মাহিনা দিয়ে পাথরের পব-পাথর বসিয়ে গড়া নয়?

ভুল নাই। আমাকে লঘু শাস্তি দেওয়া হোক এ প্রার্থনা আমি কখনো করি না। আমাকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়াই সঙ্গত। বিচারক যদি খাঁটি হন তবে হয় তাঁহাকে আমার প্রতি ষণ্ডারীতি আইনসঙ্গত সাজার ব্যবস্থা করিতে হইবে, অথবা তাঁহাকে পদ পরিত্যাগ করিয়া আমার মত অসন্তোষ প্রচার করিয়া বেড়াইতে হইবে। অসহযোগই বর্তমান চুর্নকার প্রতিকারের একমাত্র উপায়।

“আমাকে ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। এই ধারাটি দণ্ডবিধির রাজনীতিক বিভাগের সকলের সেবা ধাৰ্য্যকরণে কিছুমাত্র অত্যাধিকার হয় না। প্রজার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করিবার এমন সুন্দর উপায় আর নাই। আইনের সাহায্যে দেশের সম্ভাব্য বৃদ্ধি করা যায় না। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি যদি কাহারো ভালোবাসা না থাকে তবে তাহা প্রকাশের স্বাধীনতা তাহার আছে। আমি ও শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল ঘোষাইন অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছি, বহু জনপ্রিয় নেতা এই আইন অনুসারে দণ্ডিত হইয়াছেন। রাজ্যের প্রতি বিষো দূরের কথা, ব্যক্তিগত ভাবে কোনো রাজকর্মচারীর বিরুদ্ধেও আমার কোনো বিদ্বেষ নাই। যাহা দেশবাসী-মাত্রেয়ের প্রধান কর্তব্য, আইনের চক্ষু তাহাই স্থপিত সম্প্রদায়। ‘এ আইনের বাহা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আমি তাহাই প্রাণনা করিতেছি।’

এমন নির্ভীক, এমন সুস্পষ্ট উত্তর কেবলমাত্র মহাত্মার নিকট হইতেই আশা করা যায়। ষাঁহার দেশের স্বাধীনতাকামী, তাহার মুক্তিপ্রার্থী, দেহেব আপে তাঁহাদের মন স্বাধীনতা লাভ করে। তাঁহাদের মন চুপ-স্তব্ধে ভাবনা হইতে স্বাধীন; সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা বর্জিত হইতে স্বাধীন। স্বাধীনতা এই শীর্ষদেহ ককালসার লোকটির মনেব ভিতর যে কিরূপ ভাবে জন্মট বীধিয়া উঠিয়াছে তাহা এই পাবাণ-প্রাচীরের ঘেরা বিচার-গৃহে, পরিপূর্ণ ভাবেই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে।

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি—

মহাত্মা গান্ধীর প্রেরণার পর কংগ্রেসের কার্যপ্রণালী স্থির করিবার জন্য গত ১৭ই মার্চ কংগ্রেসের কার্য-পরিচালক-সমিতির এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে :—

(১) মহাত্মা গান্ধীর প্রেরণাও দেশবাসী বরূপ বৈর্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবেই প্রশংসার। কংগ্রেস কমিটি আশা করেন, ভবিষ্যতে নিদাক্ষণ সঙ্কটের সময়েও দেশবাসীর ভিতর এই ধৈর্য্য এবং স্থির বুদ্ধির অভাব ঘটিবে না।

(২) কার্য-নির্বাহক-সমিতির ধারণা, এক্ষণ সময়েও এই শাস্তি অহিংস-অসহযোগ নীতির উন্নতিবই পরিচয় প্রদান করিতেছে। মহাত্মা গান্ধীর প্রেরণা এবং এই বৈর্যের দ্বারা খেলাফত-অবিচারের ও পাঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিকারের সুবিধা হইবে—স্বরাজ লাভের পথ সুগম হইবে।

(৩) মহাত্মা গান্ধীর প্রেরণার কংগ্রেসের কার্যপ্রণালীর কোনো পরিবর্তন হইবে না। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহকে বরদহই এবং দিল্লীর প্রস্তাবানুযায়ী গঠন-ব্যবস্থার দিকেই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিতে হইবে। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি ব্যক্তিগত আইন-জমান্য ব্যাপারে বাহাতে হঠাৎ লিপ্ত না হন, সেজন্য এই কমিটি তাঁহাদিগকে সার্বধান কবিয়া দিতেছেন।

(৪) কংগ্রেস ও খেলাফত প্রতিষ্ঠানসমূহকে, খন্দব প্রচলনের আন্দোলন আরো তীব্রতর ভাবে চালাইতে হইবে। সকল রাজ-

নীতিক সম্ভাব্যেব নব-নারীকেই খন্দর প্রচলনের আন্দোলন পূর্ণ ভাবে সমর্থন করিবার জন্য এই সমিতি বিশেষভাবে অমুরোধ করিতেছেন। কারণ ইহার বাস্তবনৈতিক উপযোগিতা রেমণ, অর্থ-নৈতিক উপযোগিতাও তেমনি বেশী। লক্ষ লক্ষ ভারতীয় পরিবার ইহাতে কুটীল-শিল্পের সুবিধা পাইবে। এই কুটীল-শিল্পে কেবলমাত্র অবসরকালটুকু নিবোধ করিলে, অর্দ্ধাশনকষ্ট ভারতের বহু নব-নারীর অর্থপ্ৰমেরও একটা উপায় হইবে। মিল্লা মহম্মদ হাজি, জান মহম্মদ ছোটানী ও শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজ, মহাজন ও অন্যান্য সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জাতীয় কুটীল-শিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা করিবেন। সমিতি তাঁহাদের উপবেই সে ভাব অর্পণ করিতেছেন।

উপরের এই প্রস্তাবগুলি ছাড়া আরো কতকগুলি প্রস্তাব ১৭ই-১৮ই মার্চের সভায় পৰিগৃহীত হইয়াছে :—

(১) অধিক পরিমাণ খন্দর প্রস্তুত করিবার জন্য নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি হইতে তিন লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইবে।

(২) এই সমিতি ৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত এক সপ্তাহ কাল ‘জাতীয় সপ্তাহ’ বলিয়া গণ্য করিবার জন্য দেশবাসীকে অমুরোধ করিতেছেন। ৬ই এপ্রিল উপবাস করিয়া ভগবানের উপাসনা করিতে হইবে এবং ১৩ই এপ্রিল সম্পূর্ণ নিকপত্রভাবে হরতালের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ‘জাতীয় সপ্তাহে’ তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্য টাঙ্গা সংগ্রহ এবং বন্দরের প্রমাণ ও প্রচারকল্পে বিশেষভাবে আয়নিবোধ করিতে হইবে।

কংগ্রেসের এই প্রস্তাবগুলির ভিতর হইতেই বোঝা যায় ভাঙার অপেক্ষা তাঁহাদের নব্বই বিশেষভাবে পড়িয়াছে পড়ার দিকে। এই পড়ার কাজ ছাড়া জাতি যে জাগিতে পাবে না—বড় হইতে পারে না—তাহা বলাই বাহুল্য।

সংবাদপত্রের বিপদ—

গবর্ণমেণ্টের মনোমত কথা দিয়া কাগজ ভর্তি না করিয়া অনেক অপ্রিয় সত্য কথা বলার অপবাধে ভাবতবর্ষের অনেকগুলি কাগজ বর্তমানে বেজার বকসে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে—কাহাবো বা জামিনের টাকা সবকায়ে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে, কাহাবো বা সম্পাদক জেলে পঠিতেছেন। কতকগুলি বিপন্ন সংবাদপত্রের নাম এবং তাহাদের বিপদের নমুনা নীচে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল :—

‘বন্দেমাতরম্’ লাহোরের কাগজ। ইহার সহকারী সম্পাদক লালী বামপ্রসাদের প্রতি ১৮ মাস বিনাশ্রমে কারাবাস ও এক সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। জরিমানার অর্থ দিতে না পাবিলে ইহাকে আরো ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। ইহার সম্পাদক-লালী শান্তিনাবায়ণ এবং প্রিন্টার কেদারনাথকে ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে প্রেরণার করা হইয়াছে।

চট্টগ্রামের ‘জ্যোতিঃ’ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্তী ও মৌলবী মহম্মদ-কাজিম আলি ভাবতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১১৭ ধারা অনুসারে তিন মাস ও ১৪৩ ধারা অনুসারে একমাস অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ইহা ছাড়া পুন্ড্রিশ-আইনের ৩২ ধারা অনুসারে ইহাদের প্রত্যেককে দুই হাজার টাকা জরিমানা দিতে হইবে। জরিমানা অনাদারে আরো তিন মাস কারাবাস।

সিল্প প্রদেশের ‘শক্তি’ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচাঁদ বাসুনীর প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

মাজারের ‘কোয়ামি বিপোর্ট’ নামক দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক

—হাসালে তুমি, অমন কাণ্ড এদেশের নাট্যালাসার
রঙ্গমঞ্চে ছাড়া আর কোথাও হয় না।

যব পরিষ্কার করে' পথে বেরিয়ে পড়তেই আমি
বল্লম—কিন্তু একটু ত জল খাওয়া হলো না।

—জলতেটা পেয়েছে? চলো সামনের বাড়ী যাওয়া
বাক।

—ওই বাড়ীটার? ঠিক বেন মধ্যযুগের ব্যারনদের
ক্যাসল?—জানাশুনো আছে?

—নাই বা রইলো!

—নাই বা রইলো!—trespass হয় যদি?

—কি? কি বললে?

—trespass—অনধিকার-প্রবেশ।

—ও, মনেই থাকে না তুমি বিদেশী।—এদেশে কার
কি অধিকার বা কর্তব্য তা কেউ জানে না, তাই নিয়ে
তর্কসভা ডাকতে, কমিটি কমিসান বসাতে বা বড় বড় পুঁথি
রিপোর্ট লিখতেও হয় না;—সবাই আনন্দে কাজ করে'
যায়—যার যখন যা ইচ্ছে হয়।—আমাদের জীবনের একটা
principle, সেটা হচ্ছে—খুসি!

—আমার বন্ধু, খুসি হচ্ছে ওই যে মেয়েটা সবুজ-
ঘাঘরা ঘোরাতে ঘোরাতে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ছুলিয়ে
লোহার চাকাটা বোঁ বোঁ করে' চালিয়ে চলেছে, ওর
দিকে একটু চাকা ঘোরাই।

—তা চলো না! বা এই যে ছুখানা চাকা পড়ে' রয়েছে,
কাটি স্বল্প—চলো—

সত্যিসত্যিই ছুখান ছুখানা চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে
চল্লম। সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই, রাস্তার কোণে বেণুবনের
তলায় যে ভট্টাচার্য্য-পণ্ডিতেরা প্রবীণাদের সঙ্গে বসে' গল্প
করছিলেন, তাঁরা একটুও আপত্তি জানালেন না, একটু
জব্বাবও করলেন না।

চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে আমরা এক বড় রাস্তায়
এসে পৌঁছলুম। বন্ধুর চাকাটা বলে' উঠল—এবার আমরা
দোকানের রাস্তায় এসে পড়েছি!

আশ্চর্য্য এদেশের মেয়েরা, এরা লোহার চাকা থেকে
মিষ্টি কথা বের করতে পারে।

চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে বন্ধু এক লাল কাচের

বাড়ীতে ঢুকে পড়ল। এ বাড়ীগুলোর কোন দরজা লাগানো
নেই, দরওয়ানও নেই। আমিও বন্ধুর পেছন পেছন
গিয়ে সবুজ মথ্মলে মোড়া ঘরে চাকা-স্বল্প ঢুকে ভারি
অগ্রস্বতে পড়লুম, ডাবলুম এবার বুঝি দোকানের লোক-
গুলো তেড়েই আসে। কিন্তু একটি যুবক ও নারী হাসতে
হাসতে আমাদের দিকে অগ্রসর হলো দেখে' ভবসা হলো।
একজনের সাজ লাল সিঙ্কের, রাজপুতের মতো; আব
একজনের সাজ ইরানী সুন্দরীর মত। আমার তরুণী
বন্ধু চাকাটা গলায় মালার মত ঝুলিয়ে তাদের দিকে
এগিয়ে যেতে যেতে হেসে বললে—আজকের রাতে কি সাজ
করা যায় বল তো রাজপুত?

—তুমি ধেরকম চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে এলে, আজ
জিপির সাজ পরে।

—আচ্ছা বেশ। আমার এই নতুন বন্ধুকে একটি বেশ
ভালো সাজ দাও। এর গান্ধীর খন্দর পছন্দ হচ্ছে না।

ইরানী বললে—আচ্ছা একে বেহুয়িন্ সর্দার সাজিয়ে
দিচ্ছি।

—আচ্ছা তাই, তা হলে শীগগীর আমাদের দাও।

আমি দেখলুম, বড় ঘরের চারদিকে কত রংয়ের কত
রকমের সাজসজ্জা টাঙানো, বেন একটা বড় সিনেমা
কোম্পানির গ্রীনরুম। আফ্রিকার অসভ্যদের সাজ, গ্রিন-
ল্যাণ্ড-বাসীদের সাজ থেকে চীনে জাপানী কতরকমের
সাজসজ্জা। বন্ধুটি বললে—এই ছুইজনের পৃথিবীর সকল
দেশের সকল যুগের সাজসজ্জা সম্বন্ধে জ্ঞান অভূত।

বন্ধু জিপির-তরুণী সাজলে, রক্তের মত লাল মথ্মলেব
ঘাঘরা, উষার মত অরুণ-বরণ সিঙ্কের জামা, তার ওপর
সমুদ্রের মত নীল ওড়নায় তারার মত হীরের কুচি জন্মে,
মুক্ত বেণীর সঙ্গে রক্ত-গোলাপের মালা জড়ানো। বেহুয়িন-
সর্দারের জম্বুকালো সাজটা পরে' আমি এতই অভিভূত
হয়ে পড়েছিলুম যে পুরানো জামাকাপড়ের কথা মনে
ছিল না। জিপির সুন্দরী বললে—বেশ সাজ হয়েছে তোমার,
চলো। তখন মনে পড়ল পকেটে যে অনেক টাকা ছিল।
তাড়াতাড়ি খন্দরের পাঞ্জাবীটা ইরানীর হাত থেকে
ছিনিয়ে পকেট থেকে নোট টাকা বের করতে করতে
বল্লম—কত দাম দিতে হবে এর, সাজের কত দাম?

এল, এম, পোলায় মহম্মদ দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

জব্বলপুরের 'তিলক' নামক হিন্দী সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকের নিকট হইতে কর্তৃপক্ষ ৬০০ টাকার জামিন তলব করিয়াছেন।

সিদ্ধ হাবদ্রাবাদের 'হিন্দু' পত্রের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জেঠানন্দের প্রতি দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 'হিন্দু'র সম্পাদকের পক্ষে এরূপ লালচনা নূতন নহে। এ পর্যন্ত ইহার তিনজন সম্পাদক গবর্নমেন্টের এই নূতন ধরণের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশের 'বেঙ্গল মার্গ টাইমস' ও 'নলেজ' নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক কাবাপায়ে পচিতেছেন।

কলিকাতার 'হিন্দুস্তান'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুপ্তের উপর ১২৪ ধারা অনুসারে নোটিশ জারি করা হইয়াছে। তাঁহার মামলার শুনানি এখনও শেষ হয় নাই।

শ্রীহট্টের 'জনশক্তি' পত্রিকার জামিনেব দুই হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে। অর্থাভাবে ইহার প্রচার এখন বন্ধ আছে। পরিচালকরা ভিক্ষার কুলি বহিয়া সাধাবশেষে দায়স্থ হইয়াছেন।

'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদক মহাত্মা গান্ধী এবং উহার প্রকাশক শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল ব্যাঙ্কানের প্রতি যথাক্রমে ছয় বৎসর এবং এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

কলিকাতার বাংলা দৈনিক 'বঙ্গমাতারমেব' মুদ্রাকর এবং প্রকাশক শ্রীযুক্ত পঞ্চাশ ভট্টাচার্য্য দুইটি প্রবন্ধের জন্য ১২৪ (ক) এবং ১৫৩ (ক) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছেন। প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে তাঁহার বিচার চলিতেছে।

এতগুলি কাগজ রাজশ্রোহ করিয়াছে, একথা যেমন অবিষ্মিত তেমনি অদ্ভুত। আর যদি করিয়াই থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, গবর্নমেন্টের আইনকাহ্ননের-ভিতর এমন কোন গলদ আছে বাহাতে রাজশ্রোহ খুব সহজে হয়।

এক্য আন্দোলন—

বৃহৎ প্রদেশের এক্য আন্দোলন গইয়া। কলিকাতার ইংলিস্থান পত্রিকা যেক্ষণ ভাবে হৈঠে অবস্থ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকেরই মনে করিতেছিলেন, ইংবেজ রাজত্ব উঠাইয়া দিবার জন্য আবার একটা প্রবল ষড়যন্ত্র মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহার ফলে একটা রক্তগর্জার সৃষ্টি হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। এই ভয় যে অমূলক তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ব্যাপারটাব তদন্তের ভার পড়িয়াছিল কমিশনার লেক্টেজেন্ট কর্ণেল কন্থোপসের উপর। তিনি এসম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় এক্য সমিতিসমূহে প্রধানতঃ আলোচিত হয়—

(১) যে শাজনা স্থির করা আছে তাহাব বেশী শাজনা দেওয়া হইবে না।

(২) শাজনা দিয়া বসিদের দাবী করিতে হইবে।

(৩) বাজে কোনো বকমেব কব দেওয়া হইবে না ; বিনা পরসার পাটা হইবে না।

এক্য-আন্দোলনকারীদের দাবী যে অস্ত্রার বা অসজ্জত নহে তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমত্রেই স্বীকার করিবেন। জমীদারদের নানারকমেব অস্ত্রার এতদিন প্রস্তারা যে সম্বন্ধ করিয়া আসিয়াছে তাহার এক কাবণ, দেশের আর্থিক সমস্তা বর্তমানে যে-অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ইতিপূর্বে জাব কখনো সে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ার নাই ; দ্বিতীয় কাবণ,

যুগের যে শিক্ষা লোকের মনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্পৃহাটাকে প্রবুদ্ধ করিয়া দিয়াছে ইতিপূর্বে তাহা তাহাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। তাহার এখন আর প্রবলের পায়ের তলায় পড়িয়া থাকিতে চায় না। এমন অবস্থায় শত শত বৎসরের ধামি ঝাড়িয়া ফেলিতে গিয়া জনসাধারণ যদি একটু আধটু মাজা ছাড়াইয়া যায়।

মোপ্লা হাঙ্গামা—

মোপ্লা হাঙ্গামার সম্বন্ধে মিঃ এ আর স্ট্যাপ মালাবারের স্পেশাল কমিশনার নিযুক্ত হন। তিনি সম্পত্তি মোপ্লাদের সম্পর্কে একটি ঘোষণা-বাণী প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'মালাবারের শাস্তিবন্ধার জন্য যে-সব মোপ্লাকে কয়েদ বা নির্বাসিত করা প্রয়োজন তাহাদের ভিন্ন অতিরিক্ত একজন লোককেও গবর্নমেন্ট বন্দী বা নির্বাসিত করিতে ইচ্ছা করেন না। তাহা ছাড়া যাহাবা নিজদের অপরাধের জন্য অনুশোচনা করিতে বাজি আছে এবং ভবিষ্যতে আব কখনো একপ কাজ করিবে না বলিয়া যাহাবা প্রতিজ্ঞা করিতে প্রস্তুত, গবর্নমেন্ট তাহাদিগকেও মার্জনা করিতে রাজি আছেন।

শ্রীমতী কস্তুরী বাই গান্ধী—

মহাত্মার কারাদণ্ডের পর তাঁহার পত্নী শ্রীমতী কস্তুরী বাই গান্ধী দেশবাসীর কাছে নিম্নলিখিত বাণী প্রচার করিয়াছেন :—

দেশের প্রিয় নবনাবীগণ, মহাত্মা আজ ছয় বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। তাঁহার এই গুণ শাস্তিতে আমি যে ব্যাপিত হই নাই একথা কিছুতেই বলিতে পারি না। তবে আমার আশা এই—এই কাবণও তাঁহাকে দীর্ঘকাল ভোগ করিতে হইবে না। তাঁহার দশকাল উত্তীর্ণ হইবার বহুপূর্বেই আমরা আমাদের স্বীয় কার্যের দ্বারা তাঁহার মুক্তির পথ সহজ করিয়া দিতে পারিব। আমার সান্ত্বনা—তাঁহার দশকাল হ্রাস করিবার উপায় আমাদের নিজেদের ভিতরেই আছে। ভারত যদি জাতিয়া উঠে, সে যদি কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্যতালিকা অনুসারে কাজ শুরু করিয়া দেয়, তবে কেবলমাত্র তাঁহাকে মুক্ত করা নহে, গত দেড়বৎসর ধরিয়া আমরা যে তিনটি সমস্তাব নীমাংসার জন্য চেষ্টা করিতেছি তাহাবও সমাধান সহজেই আমাদের মুঠাব ভিতর আসিয়া পড়িবে। প্রতিকাব আমাদের নিজেদের হাতেই আছে। যদি কৃতকার্য্য না হই তবে সে দেব আমাদের।

সুতরাং আমাদের দুঃখের প্রতি বাঁহাদের সহানুভূতি আছে, মহাত্মার প্রতি বাঁহাবা প্রজ্ঞাবান, তাঁহাদের সকলকেই আমি কংগ্রেসের কার্য-তালিকা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য অনুবোধ করিতেছি। মহাত্মা চরুকা এবং শব্দবের উপবেই বিশেষ ভাবে জোব দিয়া গিয়াছেন। এই পদব এবং চব্কার সাফল্য লাভ করিতে পারিলে আমাদের কেবলমাত্র অর্থ-নীতিক সমস্যাবই সমাধান হইবে না—ইহাতে আমাদের পায়ের রাজনীতিক শৃঙ্খলও পসিয়া পড়িবে। সুতরাং মহাত্মার প্রেরণাবে তিনটি বিাব আমাদের মূলমন্ত্রস্বরূপ হওয়া উচিত :—

(১) নরনারী নির্বিশেষে সকলকেই বিদেশী বস্ত্র বর্জন করিয়া পদব ব্যবহার করিতে হইবে এবং পদব ব্যবহারের জন্য সকলকেই প্ররোচিত করিতে হইবে।

(২) সূতাকাটা নারী-সমাজের দৈনন্দিন ধর্মকাব্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) ব্যবসায়ীদের বিদেশীবস্ত্রের কাব্বান-বস্ত্র করিতে হইবে।

চাউলের বণ্টানি—

চাউলের দব অতিবিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় গবর্নমেন্ট গত দুই

ওটা যার দরকার হবে গাছতলা থেকে তুলে নেবে।—
তোমার কি বাজনা শুনতে ইচ্ছে করছে ?

—হাঁ, একটা গাও না কিছু !

—দেখি এ কস্মসগুলোর কাছে নিশ্চয়ই কেউ কোন
বাস্তব্য রেখে গেছে। এই দেখো, একটা বীণ পাওয়া
গেলো।

—তুলে নিলে যে, ক'র ওটা ?

—ক'র কি ! এখানে সব জিনিষ যে প্রত্যেকের
জিনিষ। বীণটা আমার দরকার হয়েছে আমি নিয়ে চল্লুম,
বাজানো শেষ হলে কাউকে দিয়ে দেবো অথবা কোথাও
রেখে যাব।

বীণ বাজাতে বাজাতে একটা ঘরের সামনে এসে
দাঁড়ালুম—তার মেজেটা লাল মার্বেলের, দেয়ালগুলো
নীল কাঠের আর ছাদটা হীরের মত সাদা কাঁচের।
ঘরের মধ্যে জাপানী-পোষাক-পরা এক যুবক এক ঠোভে
গরম গরম বেগুনী ফুলুরী ভাজছে, আর লাল ভেলভেটের
ক্রক পরা এক খুকীকে মহানন্দে খাওয়াচ্ছে।

আমি বল্লুম—কি সুন্দর বেগুনীগুলো ভাজছে !

—তোমার ভারি লোভ হচ্ছে ? এসো না কিছু খাওয়া
যাক।

—না, নিশ্চয় পচা তেল।

—কি, পচা ! অবাক করলে তুমি, সবপেয়েছির
দেশের এতবড় অপমান কেউ কখনও করেনি। এখানকার
সব জিনিষ তাজা, সব মানুষ চিরনবীন, সতেজ স্বাধীন—
এসো তুমি।

আমরা কাছে পৌছতেই জাপানীটি বল্লো—এসো
বন্ধু, আমার ভাজা শেষ হয়েছে, তোমাদের কি আমি
ভেজে দেবো ?

তরুণী বল্লো—না, আজকে আমার নতুন বন্ধুকে আমি
দ্রিঙ্গ হাতেই ভেজে খাওয়াব।

যুবক ও খুকীটি কয়েকখানি বেগুনী মহানন্দে খেতে
খেতে চলে গেল।

আমি বল্লুম—ও দোকান ছেড়ে গেল কোথায় ?

অস্বস্তিময় বটিতে নীলবেগুনগুলো ফালা করতে
করতে বন্ধু হেসে বল্লো—আহা তুমি ভুলে যাও কেন, এ

দোকান যে সবাইয়ের দোকান, এখানে private
property বলে কোন হস্তকর জিনিষ নেই। আমাদের
বেগুনী খাবার ইচ্ছে হলো, আমরা ভেজে খেয়ে গেলুম।
তুমি কড়ায় তেলটা চড়াও অথবা বীণটা বাজাও,
বেগুনী ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে তারের স্বর ভারি সুন্দর
শোনাবে।

নিঃসঙ্কোচে বীণটা তুলে নিলুম এবং আশ্চর্য্য বিষয়
মন্দ বাজালুম না।

জিজ্ঞাসা করলুম—এটা কি ইলেকট্রিক ঠোভ ?

—হাঁ, এটা অনেক শতাব্দীর আগেকার জিনিষ ; এখন
সবচেয়ে নতুন রাম্মার উদ্ভূত হচ্ছে সূর্য্যমণি—সে আর-
কিছু নয় একটা পাত্রে সূর্য্যের তেজ জমা করা হয়, তা'র
আশ্রনের শিখায় বেগুনী রান্না করা যায় ;—আব এই ঠোভের
ইলেকট্রিসিটিও সূর্য্যের আলো থেকে নেওয়া—না, না, এ
দেখছি বর্ষার জলধারা থেকে জমা করা।

খুব আনন্দের সঙ্গে রাম্মা আর খাওয়া শেষ হলো,
তারপর বন্ধু দক্ষিণ-হাওয়ার মুখে বাঁধবার যন্ত্রটা কি রকম
কাষদা করে রাখলে।

বল্লুম—ওটা কি হলো ?

—অনেকখানি ত আগুন খরচ করলুম, হাওয়া থেকে
কিছু আগুন ওতে জমা হোক।—রোসো জায়গাটা পরিষ্কার
করে' যাই।

ঘরের কোণ থেকে সোনার সরু কাটির গুচ্ছের
মত একটা কাঁটা টেনে নিয়ে বন্ধু ভারি খুশি হয়ে সমস্ত
ঘর কাঁটা-দিতে আরম্ভ করলে। দেখলুম কাঁটার কাটিগুলি
থেকে বিন্দু বিন্দু জল বারে' মেজেটাকে ধুইয়ে দিচ্ছে,
কোন ধুলো উঠল না।

বল্লুম—কাঁটাটা ত ভাবি মজার।

—আর কাঁটা দিতেই কি মজা কম ?

—বাস্তবিক কাঁটা দিতে ভারি আনন্দ পাচ্ছ দেখছি।
তোমরা পৃথিবীর স্ত্রী কিনা, অমৌল্য ত্রোমাদেব সয় না,
সব মলিনতা আপন হাতে নির্মল সুন্দর কবে' তুলতে
চাও। কিন্তু কাঁটার মুখটা যতক্ষণ মাটির বুকের দিকে
ধাকে ততক্ষণই ভাল, আকাশের দিকে উঠতে চাইলেই
মুশিল হয়।

বুৎসর ভাবত হইতে চাইলেব বপ্তানি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই বপ্তানি বন্ধের আদেশ তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। কৈফিয়ৎ ভারতে এবং ব্রহ্মদেশে গত বুৎসর বেশ ভালো রূপে হইয়াছে, হতবাক আর বপ্তানি বন্ধ রাখিবাব প্রয়োজন নাই।

প্রয়োজন আছে কি না, দরিদ্র চাণার সুখের দিকে চাইলে বোঝা যায়; নিরম জনসংখ্যার দৈনিক জীবনযাত্রার পদ্ধতিটা খতাইয়া দেখিলে বোঝা যায়।

ভারতবর্ষের জনসাধারণের দিন যে কিরূপ ভাবে কাটিতেছে, পরের সুখে ঝাঁপ খাইয়া তাহার স্বকপ নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। অথচ তাহা ছাড়া পর্বমেন্ট আর এমন কোনো উপায়ও জানেন না যাহা দ্বারা এই স্বকপটা নির্ণীত হইতে পারে।

চাইলেব রপ্তানি চালাইবাব ব্যবস্থা করিয়া পর্বমেন্ট - অর্থাৎ হাবী কোটি কোটি লোকের অর্থাৎ হাবীকে আরো কমাইয়া, ধনী মহাজন এবং দালালদের প্রচুরকে আরো প্রচুরতর করিবাব ব্যবস্থা কবিয়া দিলেন।

মহিলার কারাদণ্ড—

মাদ্রাজের মহিলা কর্মী ক্রীমতী পদ্ম ভাগীরথী স্বতন্ত্র দেবীকে গত ২২শে মার্চ গ্রেপ্তার কবিয়া কোকনদ জেলে আটক রাখা হইয়াছিল। গত ৪ঠা এপ্রিল তাহার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, গর্বমেন্টের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রচাৰ করা। বিচারক তাহাকে একবৎসরের জন্ত একটি একশত টাকা এবং দুইটি দুইশত টাকার জামিন দিবাব আদেশ দিয়াছিলেন। জামিন দিতে অস্বীকৃত হওয়ার পরে দেবী প্রতি এক বৎসর সমস্ত কারাবাসের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ইনি আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই। কিছুদিন পূর্বে স্বতন্ত্র দেবী বলিয়াছিলেন, “গ্রেপ্তার হওয়ারটা আমার পক্ষে সত্য সত্যই ইঙ্গিত-বস্তু। কারণ তাহা হইলে জেলে গিয়া আমি-আমি বদেশের বন্দী ভাইদিগকে সহস্রে বন্ধন কবিয়া ধাক্কাহুইতে পাবিব।”

রাজনৈতিক অপরাধে কারাবরণ করিয়া লওয়া ভারতীয় মহিলাব পক্ষে এই প্রথম নহে। ইতিপূর্বে দার্জিলিংএর সাবিত্রী দেবী বন্দেনী প্রচারের অপরাধে বোম্বাই জেলে বন্দী হইয়াছেন।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

বাংলা

দরিদ্র দেশের অর্থের অবস্থা—

সর্বনাশ শৈলবিহাব

রাজ্যলার গরীব রাহাছের গান মজলিসের সমস্তগণ ও জনপ্রিয় নগ্নপুণ্ড্রের দার্জিলিং শৈলবিহাব বারদে কত টাকা খরচ হইয়াছে তাহাব একটা হিসাব সরকার দিয়াছেন।—

সার হেনরী হইলাবেব বাবদে পড়িয়াছে—১ হাজ্জাব ২১ টাকা ৭ আরা ৫ পাই।

মহারাষ্ট্রপ্রিজাজ, বিজয়চন্দ্র বাবদে—২ হাজ্জাব ৩ শত ৯১ টাকা ২ আনা—সার হেনরী হইলাবেব খরচের দ্বিগুণ।

মিষ্টার কামের বাবদে—প্রায় দেড় হাজ্জাব টাকা।

সার আবদর রহিমের বাবদে—প্রায় দুই হাজ্জাব টাকা।

সার সুরেন্দ্রনাথের বাবদে—প্রায় আড়াই হাজ্জাব টাকা।

মিঃ পি, সি, মিত্রের বাবদে—প্রায় ২০০০ টাকা।

মদাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরীর বাবদে—প্রায় ১৬০০ টাকা।

—মোহাম্মদী

দেশের আয় ব্যয়—

বাংলা বজেট

১৯১১—২২

বাজালাব মোট রাজস্ব	২,৭১,৮২,০০০
বাজালাব মোট খরচ	১১,৮০,১৩,০০০
আব অপেক্ষা বেশী খরচ	২,০৮,৩১,০০০
পুলিশের খরচ	২,৯০,৮৫,০০০
শিক্ষার খরচ, দেশের সকল শ্রেণীর শিক্ষক	
ও সকল বিভাগের কর্মচারীর বেতন সমেত	১২,৬০,০০০
স্বাস্থ্য বিভাগের খরচ	২৯,৪৬,০০০
চিকিৎসা বিভাগের খরচ	৫২,২৯,০০০
কৃষি বিভাগের খরচ	২১,৪১,০০০

(বঙ্গবানী)

—মোহাম্মদী

স্বাস্থ্য-কথা—

ছাত্রগণের স্বাস্থ্য :—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গত ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাস হইতে ছাত্রগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা আরম্ভ করেন। এ পর্যন্ত ৩৫০০ ছাত্রকে পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট তাহার প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে বাঙ্গালার যুবজনের স্বাস্থ্যের নমুনা দিতেছি :—

শতকরা ৩৬ জনেব চক্ষু খাবাপ; এবং তৃতীয়াংশ ছেলেব দাঁত খারাপ এবং শতকরা ৪১ জন কুজাকৃতি।

—জানন্দবাজার পত্রিকা

বস্ত্র-কথা—

নৃত্য নাটাইবাব অদ্ভুত বস্ত্র

আমাদের বয়ন বিভাগের শিক্ষক শ্রীমন্ত বিধুভূষণ দাসের চেষ্টায় আমরা একটি নূতন নৃত্য-নাটান কল প্রস্তুত করাইতে সমর্থ হইয়াছি। এই নূতন কল দ্বারা ঘণ্টায় ১ মোড়া অর্থাৎ ২০ কেটি নৃত্য সহজে নাটান যায়। মূল্য ২ নয় টাকা। অগ্রিম ৫ টাকা সহ অর্ডার পাইলেই প্রীম অবদা বেল যোগে পাঠাইতে পারি।

শ্রীহেমন্তকুমার মল্লমদার, হেড মাস্টার,

বিনোদপুর পোষ্ট, বঙ্গমুখা উচ্চ বিদ্যালয়।—কল্যাণী

চট্টগ্রামে বয়ন-কারখানা—চট্টগ্রামে চাকরিয়া মহিলা সমবায় স্পিনিং ও টেডিং কোম্পানী নামে একটি বয়ন-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় দেড় হাজ্জার মহিলা সেখানে নৃত্য উৎপন্ন করেন। ইহা ছাড়া কারখানা হইতে উৎকৃষ্ট চব্বা, তাঁত প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে।

—সম্মিলনী

বিদেশী বস্ত্র বর্জনে

বোম্বাইয়ের বস্ত্র-ব্যবসায়ী-সমিতি ইস্তাহার জারি কবিয়াছেন যে, মহান্না গান্ধীর কাবান্ড হওয়ার জন্ত কোন বস্ত্র-ব্যবসায়ীর পক্ষে বিলাতে কাপড়ের অর্ডার দেওয়া উচিত নহে। যদি কোন বস্ত্র-ব্যবসায়ী বিলাতী কাপড় আমদানী করেন, তাহা হইলে প্রতি খণ্ড কাপড়ের জন্ত তাহাকে একশত টাকা কবিয়া জব্বিমান দিতে হইবে।

—হিন্দুস্থান

আবগারী সংবাদ—

বাংলা দেশের আবগারী বিভাগের ১৯২০-২১ অবদের বিপোর্টে প্রকাশ সে, ঐ বৎসরে সমস্ত বাংলা দেশে পূর্ব বৎসর অপেক্ষা এগাবো হাজ্জাব দুইশত সাতশতী গ্যালন সব বেশী বিক্রয় হইয়াছিল। অবশ্য ইহা শুধু দেশী মদেব হিসাব।

এদেশের পথ চিনি না, মানুষদেরও জানি না, তুমি যদি আমার সঙ্গী হও। তোমার কোন কাজ নেই ত ?' তার পাশের সঙ্গিনীর কথা আমার সত্যি মনে ছিল না।

বন্ধুটি আবার অট্টহাস্য করে' উঠল, বলে,—‘এ দেশের ত পথ চিনতে হয় না, সব পথই ত পথ, অপথ কোথাও নেই; আর লোকদের চেনা—পথের ধারে কি অচেনা ঘবে থাকে ভালো লাগবে, ভালো বাসতে ইচ্ছে করবে, তাকে বন্ধু বলে' ডাকলেই হলো, সে তোমার চিরপ্রিয় হয়ে গেলো।—আর কাজের বালাই এখানে মোটেই নেই, সব সময়ের ছুটি—যে যা করবে তাই তার কাজ।’

হাওয়ায় গোলাপকুঞ্জটা ছলে উঠল, কানের কাছে এসাজের ঝঙ্কার উঠল, ফিরে দেখি বন্ধুর তরুণী সঙ্গিনীর চন্দনকাঠের এসাজটা আমায় ডাকল ‘বন্ধু !’

জ্যোৎস্নাধোত আকাশের নীলিমাব মত নীলসাড়ি অরুণতরুণরী জড়িয়ে ঝলমল করছে, যমুনাঙ্গলের মত কালো কেশে কেতকীকদম্বের মালা জড়ানো, চম্পক-অকুলির স্পর্শে সোনার তারগুলিতে ঝঙ্কার দিয়ে তারার আলোর মত পথ-ভোলানো নয়নে চেখে ডাকলো,—‘বন্ধু !’

ধীরে এগিয়ে পদ্মের পাণ্ডুর মত তার আকুলগুলি জড়িয়ে আমিও ডাকলুম,—‘বন্ধু !’

তরুণী মুখে কিছু বলে না, এসাজের তারে কথা বেজে উঠলো,—এসো, আমি তোমার সঙ্গিনী হয়ে এ দেশ দেখাচ্ছি।

অবাক হয়ে আমার পুরানো বন্ধুর দিকে চাইলুম। তরুণী এসাজটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে ঝর্ণার সুরে বলে,—‘এসো বন্ধু !’ আমার হাত ধরে' টেনে নিয়ে চল।

অ্যানার্কিষ্ট বন্ধুটি মুচুকে হেসে বলে, ‘না; না, আমি একটুও রাগ করছি না। জানো, এ দেশে ঈর্ষাবিষ নেই। কোন ভয় নেই তোমার। ওই দেখছ লাগড়োরা-কাটা বাসন্তী রংএর সাড়ি-পর্য ছোট ধুকীটি, একটা খরগোস কোলে করে' আসছে, ওব সঙ্গে ডাব করে' আমি এখুনি এখানে বাঁশী বাজাতে বসে' যাব।’

অন্ত সময় হলে আমার বোধহয় ভয় হোত। সে দেশের হাওয়ার কি গুণ ছিল,—আমার একটুও দ্বিধা সঙ্কোচ

হলো না, জু'জনে হাত ধরাধরি করে' চলুম; সবচেয়ে আশ্চর্য—তরুণীর সঙ্গে আমি গান জুড়ে দিলুম, গলা ঠিক মিলে গেল, একটু বেহর হল না।

সে থেমে বলে—তুমি গাঙ্গীযুগের লোক, নয় ?

—হাঁ। কেমন করে' বুঝলে ?

—তোমার ওই মোটা খন্ডরের সাজ দেখে'। আমি ইতিহাসটা ভালো করে' পড়েছি কিনা, তাই তোমায় সব দেখাবার ভার নিতে সাহস হলো।

—সাজটা এদেশের মত করে' নিতে পারলে ভালো হয় বোধ হয়।

—কি দরকার, এখানে যে যার নিজের খুসিমত সাজে। ওই ছেলেটা দেখো ইউরোপিস্-যুগের গ্রীকের মত সেজে চলেছে আর তার পাশের বন্ধুটি ক্রিয়োপেটীর সময়ের ঈজিপ্সিয়ান নারীর মত সেজে যাচ্ছে। তোমার কি কাপড়-জামা বদলাতে ইচ্ছে করছে ?

—হাঁ, এ দেশের মত।

—বলুম ত এ দেশের কোন বিশেষ সাজ নেই, আপন সৌন্দর্যবোধ অনুসারে যে যা-খুসি সাজে, যে কোন গত-শতাব্দীর যে কোন দেশের সাজ পরতে পারে।

পথের দুইধারে গাছের সারির মধ্য দিয়ে চলুম। গাছের পাতার মাঝে মাঝে লাল নীল সাদা নানা রংএর আলো মানিকের মত জ্বলছে।

বলুম—ওগুলো কি ইলেকট্রিকের আলো ?

হেসে বলে,—না, ইলেকট্রিক কি, আমরা রেডিয়ামের যুগও পার হয়ে এসেছি। ওগুলো হচ্ছে মণি, ওই ইন্ড-নীলমণি, ওই চন্দ্রকান্তমণি...

—কি স্বন্দর দেখতে, কিন্তু তোমার এসাজটা যে ফেলে এলো!

—ফেলে এসেছি কি ?

—হাঁ সেই গোলাপ-গাছের তলায়।

—ও, তুমি আজ নতুন কিনা, তুমি জানো না দেশের কথা; এখানে প্রত্যেক জিনিষ হচ্ছে সবাইয়ের জিনিষ, যার যখন যে-জিনিষ দরকার সে সে-জিনিষ ব্যবহার করে।—আমি ত এখন এসাজ বাজাচ্ছি না, অবশ্য কোনো দোকানে রেখে এলে ভালো হত—তা

মদ বিক্রয় বৈধী হওয়ায় যে কাবণ এই রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে হাওড়া, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি স্থানে নূতন ইটখোলা, ট্যানারী, গালা প্রভৃতিব কাবখানা প্রতিষ্ঠা হওয়ায় অল্প এবং অন্য অল্প কয়েকটি জেলায় কালের কুলী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মদ্য মদে বিক্রিও বৈধী হইয়াছে। রিপোর্টে প্রকাশ যে, হুগলী এবং আবও দুই এক স্থানে মদ বিক্রয় বৃদ্ধির কাবণ কুলীদেব মাইনা বৃদ্ধি। সর্বসমেত ১৬টি জেলায় মদ বিক্রয় বাড়িয়াছে এবং ১১টি জেলায় মদেব কাটতি কমিয়াছে। আবগারী কলেটব তাড়ি সম্বন্ধে বড়ই নিবাণ হইয়াছেন; লাভেব দিক দিবা এই কাজে তেমন হবিবা হইবে না। তবুও আলোচ্য বৎসবে তাড়ি হইতে লোকনান ত হব নাই, বব লাভই হইয়াছে।

গাঁজার বৈধী বাঙ্গালীরা ছাড়িয়া দিতেছে বলিবা মনে হয়। আলোচ্য বর্ষের পূর্বে বৎসবে বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালীরা দুই হাজার বাহার মন ছয় সেব গঞ্জিকা দেবন কবিয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে এক হাজার আটশত চল্লিশ মন ছাড়িয়া দেব গাঁজা খবচ হইয়াছিল। অর্থাৎ দুইশত এগারো মন বিগ সেব গাঁজা কম খবচ হইয়াছে।

আকিমের মাত্রা একটু বাড়িয়াছে। পূর্বে বৎসবে এক হাজার আটশিশ মন পাঁচ সেব আকিম খবচ হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে এক হাজার পঁয়ষট্টি মন চৌত্রিশ সেব আকিম বিক্রয় হইয়াছে। অর্থাৎ এ বৎসর সাতাশ মন উনত্রিশ সেব আকিম বৈধী বিক্রয় হইয়াছে। সতেরোটি জেলায় আকিমের খবচ বাড়িয়াছে এবং নয়টি জেলায় খবচ কমিয়াছে। আকিমের খবচ বাড়িলেও মদেব মতন বাড়ি নাই, একথা স্বীকার করিতে হইবে।

লুকাইয়া কোকেন আমদানী চলিতেছে। বলিকাতা এবং এই সহরের আশপাশের স্থানসমূহে চক্ষিন পরগণা, হাওড়া, বর্ধমান, হুগলি, প্রভৃতি স্থানে লুকাইয়া কোকেন বিক্রয় ও খাওয়া চলিতেছে। মেদিনীপুর ও করিদপুরে একটি কবিয়া কোকেনের আড্ডা পাওয়া গিয়াছে।—হিন্দুস্থান

দান—

ভবানীপুর, ৩১ নং কালীঘাট বোডস্থিত নিখিল ভাবত অনাথ আশ্রমে শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনাথায় মুবোদিয়া ১৬০০ টাকাব ২৭০/ মণ চাউল, চুপালাল কিরণলাল ৪০০ টাকাব একটি মৌনীন ও দি গ্রেট বেঙ্গল কার্পেসী ৮০ টাকাব ঔষধ দান করিয়াছেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

ভবানীপুর, ৩১ নং কালীঘাট বোডস্থিত নিখিল ভাবত অনাথ আশ্রমে শ্রীযুক্ত বাবু গৌরচন্দ্র লাহা ও শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকিশোর গুপ্ত মহাশয়গণ ২৫০ ও ১০০ টাকা বৎসরক্রে দান কবিয়াছেন।

—মোহাম্মদী

হিতকর অমুঠান—

কুঠাশ্রম।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ জে, ক্যাম্পবেল বরেন্দ্রার বাঙ্গলায় কুঠবোগীদেব অল্প একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠাব অল্প বাংলা সরকারের নিকট ৫০,০০০ টাকা প্রার্থনা কবিয়াছিলেন, প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। এই আশ্রমেব অন্য মেদিনীপুর জেলায় ৭০৭ একর জমি পাওয়া গিয়াছে। এই জমি একজন সদাশয় ব্যক্তি দান কবিয়াছেন। এই আশ্রমে প্রথমত এক হাজার কুঠরোগী থাকিতে পারিবে। পরে লোক-পন্থায় দেখা যায়, বাংলাপ্রদেশে সর্বশুদ্ধ ১৭,৪৮০ জন কুঠরোগী আছে।—সম্মিলনী

সাহিত্য-সংবাদ—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পদক ও পুরস্কার :—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অষ্টাবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে—

১। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী হরবর্ণ পদক—জাতীয় জীবন পঠনে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।

২। যোমকেশ মুস্তফী হরবর্ণ পদক—(ক) বৈষ্ণব সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসেব উপকরণ (অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত)।

৬। যোমকেশ মুস্তফী হরবর্ণ-পদক—(খ)—২৪ পরগণা ও কলিকাতাব জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহাব অসিদ্ধি অর্থ ও প্রয়োগ।

৪। হেমচন্দ্র রোপ্য-পদক—বঙ্কিমচন্দ্র ও হেমচন্দ্রে জাতীয় ভাব।

৫। শশিপদ বোপ্য-পদক—বঙ্গদেশে সামাজিক সম্প্রদায়ের প্রবোধন।

৬। রামগোপাল বোপ্য-পদক—কবি অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়েব 'এবা' কাব্য সমালোচনা।

৭। অক্ষয়কুমার বড়াল রোপ্য-পদক—(ক)—অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী-চিত্র।

৮। অক্ষয়কুমার বড়াল রোপ্য-পদক—(খ)—বাঙ্গলাব গীতিকাব্যে অক্ষয়কুমার বড়ালের স্থান।

৯। নবীনচন্দ্র সেন বোপ্য-পদক—নবীনচন্দ্রেব কাব্যে "জয়ংকর" চিত্র।

১০। হরেন্দ্রচন্দ্র সমাজপতি বোপ্য-পদক—বাঙ্গলা সাহিত্যে হরেন্দ্রচন্দ্র।

১১। আচার্য্য রামেন্দ্রহুম্মর ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরস্কার (১০০)—শতপথ পোপব ঐতবেয তাত্ত্ব ব্রাহ্মণেব আখ্যান ও উপখ্যানসমূহেব বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

১২। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫)—পুষ্টিবর্মে ভক্তিবাদ।

—মোহাম্মদী

বচন প্রতিযোগিতা

বিষয় :—(১)- আদর্শেব সংঘর্ষ—প্রাচ্য ও অর্ন্তাচ্য।

(২) লাইব্রেরী ও তাহাব প্রতিষ্ঠা :—প্রথম বচনটি যে-কোন ব্যক্তি লিখিতে পারিবেন, কিন্তু দ্বিতীয়টি বিশেষভাবে ছাত্রগণেব জন্য নির্বাচিত হইয়াছে। উপযুক্ত পরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষা কবাইয়া নির্বাচিত বিষয় দুইটির প্রত্যেকটিতে যে দুই ব্যক্তির বচন সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাঁহাদিগকে একখানি কবিয়া বোপ্য-পদক প্রদান কবা হইবে। যাঁহাব বচন প্রতিযোগিতায় যোগদান কবিত্তে ইচ্ছক তাঁহাবা ৩০শে মের মধ্যে আপন আপন রচনা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

ঐষ্টব্য :—প্রতিযোগিতাব অল্প প্রেবিত সকল রচনাই লাইব্রেরী সম্পত্তি বলিয়া বিবিগণিত হইবে।

সাবস্বত লাইব্রেরী।

২৩, দেওয়ান লেন,

কলিকাতা।

শ্রীবাজেন্দ্রনাথ দে,

অবৈতনিক সম্পাদক

নারীর প্রতি অত্যাচার—

আহিবীটালার ষোল বছরেব মেয়ে আনন্দময়ীর উপর তাব যশুর-বাড়ীব সকলেব অত্যাচারেব সংবাদ আমরা আগেই দিয়াছি। সম্প্রতি আনন্দময়ী কোর্টে এই অত্যাচারেব কথা প্রকাশ কবিয়াছেন। তাহা অত্যন্ত অমানুষিক, বীভৎস। হিন্দু সমাজেব এই অপবাব অমার্জনীয়।

ছাওয়া মাটির গর্তগুলো আব নেই—সে স্থানে নারিকেল তালি তমাগ-গাছের সারি, তাদের তলে তলে কাঁচ ও কাঠের ছোট ছোট কুটার; মসণ, শ্রামল পাতায় পাতায় লাল নীল নানা রংএর কাচের ছাদে দেওয়ালে জোৎস্নার আলো রংএর হোলিখেলা করছে;—কয়েকখানি ছোট বাড়ীর মাঝে দধির মত স্নিগ্ধস্তম্ভ খেতপাথরের বাড়ী, সেখান থেকে হাসি-গানের শব্দ আসছে, মনে হলো খুব ভোজ চলছে; লাল পাথরের জালতি দেওয়া দরজায় যে মুসলমান নারী দাঁড়িয়ে হাসছে আর গল্প করছে, তার স্নিগ্ধমুখ মিষ্ট কণ্ঠ শুনে অবাক হলাম। বস্তির সামনের জলের কলে তার দোদীপ্ত প্রতাপ সবাই জানে, সবার শেষে এসে নিছক-গলার জোরে ও মুগ্ধভঙ্গিতে দে আপনার কলসীগুলি সবাইয়ের আগে ভরে' নিষে ঘাষ। সে যাদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে' গল্প করছিল তাদের মধ্যে একজন গুজবাটী আর-একজন বাদ্গালী বাবুর বেগে থাকলেও বেশ চিন্তে পারলুম—প্রথম জন হচ্ছে আমার এক গান্ধীভক্ত ননুকা বন্ধু গোলদিঘিতে বক্তৃতা দিয়ে জেলতীরে গেছে; আর যে পুলিশ সার্জেন্টটা বন্ধুকে যেরে হাত ভেঙ্গে দিয়ে লালবাজারে ধরে' নিয়ে গিছিলো, সে-ই আন্দ্রিস প্লাঞ্জাবী পরে' আতব মেখে গল্প জমিয়েছে। এ সব দেখতে দেখতে এত আবিষ্ট হয়ে গিছলুম যে আশ্চর্য হবার মত মনের ভাব ছিল না—কিন্তু গাছের তলা ছেড়ে পথে একটু যেতেই পরমাশ্চর্যকর এক ব্যাপারে মনটা নড়ে উঠল। তারার মালাব মত বেলফুলের ঝড়ের তলায় আমাদের পাড়ার সেই সুদখোব বেনে মহাজনটা—হাঁ, সেই সুদখোর পাষাণটা, ভোর হতে গভীর রাত পর্যন্ত তাকে কেবল বাঁধের মত হিংস্র চোখ দুটো জ্বালিয়ে দিনকে টাকা তুলতে আর খাঁড়ার মত নাকটা হিসেবের খাতায় শুঁজে স্বদের অঙ্ক কসতেই দেখছি—সে আনন্দে বেহালা বাজাচ্ছে আর শরৎসেফালির সুন্দর এক থুকের সঙ্গে নাচ্ছে, মাঝে মাঝে চাপা গুঁব চুলগুলোর ওপর চুমো খাচ্ছে—সোনাবটার প্রতি লোভি এখনও তার ঘায়নি। ব্যাপারটা দেখে পথের মাঝখানে এক গোলাপ-গাছের তলায় বসে' পড়লুম। একটু বসেই-গাড়ীচাপা পড়বার ভয় হলো; কিন্তু কোথাও

কোন মোটর বা গাড়ীর শব্দ নেই, এ রাস্তা দিয়ে যেন কখনও কোন গাড়ী চলে না।

বসে' ভাবছি, এ কোন্ অদ্ভুত দেশে পৌঁছলুম; না জানি এবার কি বিচিত্র কাণ্ড ঘটবে। বেশীক্ষণ ভাবতে হলো না, দেখি অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্রেঞ্চম্যানের মত সেজে এক যুবক এক বাদ্গালী মেয়ের হাত ধবে' গান গাইতে গাইতে আসছে—

‘চলি গো চলি গো, যাই গো চলে’,

পথের প্রদীপ জ্বলে গো—গগনতলে।’

তারা এসে আমার গাছের কাছে দাঁড়ালে, ভেবেছিল হয়ত জায়গাটায় কেউ নেই। গাছের তলাটা আমার ছেড়ে দেওয়া উচিত ভেবেই দাঁড়িয়ে উঠলুম। আমাব মুখে পথের আলো পড়তেই রবেসুপেয়ারের মত সাজপরা যুবকটি আনন্দের সঙ্গে ডাকলে, ‘বন্ধু, তুমি!’

ভালো কবে' চেয়ে দেখি এ যে আমার সেই রেভলিউ-জানিষ্ট বন্ধু। কি আশ্চর্য, তার শীর্ণদেহ লাভণ্যে ভরে' উঠেছে, চোখের চশমাটা খসে' গেছে, আব সবচেয়ে আশ্চর্য তার হাতে কোন বই নেই, আছে একটা বাঁশী। সে কোন তর্ক স্বরূপ করলে না।

আমি বল্লুম,—‘তোমাকে দেখে বাঁচলুম। এ যে কোন্ অদ্ভুত দেশে এসে পড়েছি ভাই, আমি ত কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।’

সে হো হো করে' হেসে উঠল, এমন প্রাণ খোলা হাসি যে সে হাসতে পাবে তা আমার ধারণাই ছিলো না। বল্লুম,—‘তুমি যে ভাই এমন গান গাইতে পারো—এটা এতদিন লুকিয়ে রাখা তোমার ভয়ঙ্কর অস্ত্রায় হয়েছে।’

হাসিটা কোনমতে থামিয়ে সে বল্লেন,—‘এ হচ্ছে সব পেয়েছির দেশ, জানো না কবি বলে' গেছেন,—“যে ঘায় সে গান গেয়ে ঘাষ, সবপেয়েছির দেশে।”’

আমাদের পাশ দিয়ে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি বাউলের বেশ পবে' এক হবিণ-শিশু কোলে নিয়ে একতারা বাজাতে বাজাতে চলে' গেলো, তার পেছন পেছন নৃত্য দোহুল ছোট ছেলের দল।

বন্ধুর দিকে চেয়ে বল্লুম—‘এ দেশটা দেখবার জুড়ে আমার অনেকদিন থেকেই খুব ইচ্ছে। আমি ত ভাঃ

যাঁরা নাবীক প্রতি আত্মাশীল তাঁরা এইরূপ নির্দিষ্ট ব্যবহারের বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন করিবেন—আশা কবি।

বালিকা বধু তাহাব পিতাকে অত্যাচারের কথা বাহা বলিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ :—

“আমাকে উহার পদিকাবুস্তি অবলম্বন কবিয়া অর্ধোপার্জন করিতে নলে। আমি স্বীকার পাই নাই। ইহাতে আমাব নন্দী আমাকে শাসাইয়া বলে, “তোব জিন কি করিয়া ভাঙিতে হব তাহা দেখাইব।” ইহার পর হইতে আমার উপর নির্ধাতন অবস্থ হয়। আমাব হাত পা কোমর ইত্যাদি সর্বস্থানে বাঁধন দিয়া প্রহাব করা হইত। আমার পলায় কঁাস দিয়া কুলাইয়া রাখা হইত এবং সর্বদা তপ্ত লৌহশলাকাব ছেকা দেওয়া হইত। পূজাব সময় হইতে একখানা কাপড় পরাইয়া রাখা হইয়াছিল। বন্ধনাবস্থায় মলমূত্র ত্যাগ এক স্থানেই হইত, কাজেই ঐ বস্ত্র পুতিপুতপূর্ণ হইয়াছিল। কুকুরের মত দিনান্তে একমুঠা ভাত খাইতে দিত। হাতেব পায়েব বাঁধনের কসনে সর্বদা ক্ষত হইয়াছিল, উহাতে পুণ পূর্ণ হইয়াছিল। বস্ত্রের দুর্গন্ধ ও ক্ষতের পুণেব দুর্গন্ধে ঘর নরকেব আকাব ধাবণ করিয়াছিল।”

—বহুমতী

নারী প্রসঙ্গ—

শ্রমজ সাধনার আদামেব মহিলা।—চিক্রগড় মহিলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্তা বাজবালা বড়ুয়া বি-এ, ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্তা দেবীপ্রভা ভূঞা, শ্রীযুক্তা সুরবালা বড়ুয়া ও শ্রীযুক্তা নিজাবতী বড়ুয়া কংগ্রেসেব কার্যে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। মেয়ে-মহলে চরকা প্রচলনেব জন্য তাহাবা উষ্ণিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। এই মহিলাগণ বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মেয়েদিগকে চরকাব সূতা কাটা শিখাইতেছেন। বাহাতে স্কুলেব বালিকারা অন্তত পক্ষে অবসব-কালটা চরকাব সূতা কাটিয়া কাটায় তাহাব জন্য তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করা হইতেছে।—নবসংঘ

মহাত্মার পত্র ও বঙ্গ রমণীর কর্তব্য—

বর্তমান জাতীয় পুনরুত্থানে বঙ্গ নারীরা যে কাজ কবিতেছেন, তাহা বস্তুতই বিস্ময়কর। কিন্তু বাঙ্গালার মহিলারা পূর্বকালে যেমন মনোহর সূতা কাটতেন বত দিন বাঙ্গালার ছয় বৎসরের অধিক বয়স্ক প্রত্যেক বালিকা ও মহিলা তেমন ভাবে চরকাব সূতা না কাটেন ততদিন আমি সন্তুষ্ট হইব না। একনিষ্ঠ হইবা, চরকাব সূতা না কাটিলে যে আমরা আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশ হইতে দারিদ্র্য ও অভাব দূর কবিতে পারিব না—সে বিষয়ে আমরা বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।—চারুমিহিব

নারীশিক্ষা—

দ্বাদশ শতাব্দীর পব থেকেই বাঙালীর পতন আরম্ভ হয়েছে। জ্ঞান-বীর্যেব অভাবে, পুরুষেব সঙ্গে নারী-জাতীরও অধঃপতন চরম সীমায় গিয়ে ঠেকেছে। পুরুষ আজ জাগরণেব রক্তমকে আলোয় লাগিয়ে উঠলেও, নারী তার পিছনে পড়ে আছে; তাহেব পথে আড়াল করে দাঁড়ালে জাতীয় উত্থান স্বপ্নেব মতই নিবন্ধক হবে।

নারীকে আমরা আজও আঁধারে বদ্ধ ক'বে রেখে দিতে চাই। আমাদের মতে, নারী পুরুষেব মত শিক্ষা পেলে সমাজবিপ্লব উপস্থিত হবে; কথটা মব জাতিব পক্ষেই শোভা পায়।

ঘোলাবতী পুরুষেব মত জ্ঞানলাভ করেছিল; জাত কি তার জন্ত কলঙ্কিত হয়েছে? ভাস্করমতী, কর্ণাটরাজমহিষী, কবি কালিদাসেব পত্নী, এ'বা সবাইবিদুষী ছিলেন, সমাজ কি সে জন্য অধঃপাতে

গিয়েছিল? তার পব উপনিষদের যে দুক্ল ব্রহ্মজ্ঞান, যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে সেই পরম জ্ঞান উপদেশ দিবেছিলেন। সে গৌরবে আজও আমরা কৃতার্থ হয়ে আছি।

শত বৎসর পূর্বেও, যে নারী স্বামীর চিতা-শয্যায় হাসতে হাসতে প্রাণ বিসর্জন দিত, সেই নারী জাতিব প্রতি পুরুষের দান আজও— যদি উদারভাবে গ্রহণ না হয়, তা হলে বিধাতার অভিশাপে আমাদের জাতিটা যে উৎসন্ন হবে, সে-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

—নবসংঘ

পুলিসের ভীষণ অত্যাচার—

নিরীহ কৃষক আহত। (কংগ্রেস নিউজ সার্ভিস)

গত ২৯শে ফাল্গুন সোমবার নোয়াখালী জিলাব অন্তর্গত সাহাপুর গ্রামে একখণ্ড জমিতে ৬ জন কৃষক চাষেব কাজ করিতেছিল। তখন প্রাতঃকাল; পথ, ঘাট, মাঠ কুয়াশাচ্ছন্ন। তাহাবা “আল্লাহ আকবর” “বন্দেমাতরম” প্রভৃতি ধ্বনি কবির কার্যারম্ভ করিয়াছিল, এ জিলাব কৃষকেব একপ অজকাল সর্বদাই করিয়া থাকে। ঠিক সেই সময় ৩৮ জন অস্ত্রধারী পুলিশ ও ৩৪ জন উপরিতন পুলিশ কর্মচারী পার্শ্ববর্তী বাস্তা দিগা আসিতেছিল। কয়েক দিন যাবৎ ঐসকল পুলিশ জিলা পেবেড় করিতেছে।

৩৪ জন অস্ত্রধারী পুলিশ “আল্লাহ আকবর” “বন্দেমাতরম” শব্দ শুনিয়াই মাঠে নামিয়া ঐ কৃষকদিগকে ছুরিকা ও বন্দুকের ঝাঁট দ্বারা আঘাত করে। ফলে একজন কৃষকেব কপালেব ডান দিকে ১ ইঞ্চি পরিমাণ একটা গুহম হইয়াছে। তাহার শরীরেব আরো নানা স্থানে প্রহার পড়িয়াছে। কৃষকটিব নাম এছাহাক। সে এখন সাহাপুর কংগ্রেস আফিসে চিকিৎসিত হইতেছে। ইহার অস্ত্রধারী পুলিশদিগকে-কুন্দ কবিবাব জন্য আনন্দম্বন কবে নাই। পুলিশদের সঙ্গে ধীর স্থি-ভাবে বীয়েব মত কথাবার্তা বলিয়াছে। প্রাণনাশ হইবাব আশঙ্কা সত্ত্বেও আল্লাব নাম উচ্চারণ কবিতে বিবত হয় নাই। তাহারা বলিয়াছে আল্লাব জন্ত কেব্দা দিব ইহা আব বেশী কি? তাহারা পুলিশের বিক্ষোভেব সর্বকারের আদালতে মামলা কবিতে রাজী নয়।

এই অশিক্ষিত মুসলমান কৃষকেব আরও সন্তান নোয়াখালী জিলা গুহ হইয়াছে।—শ্রীহরিকৃষাব বার।—নোয়াখালী সম্মিলনী চট্টগ্রাম জেলে রাজনৈতিক কয়েদীদিগেব অবস্থা—

অমৃতবাঙ্গার পত্রিকা'ব একজন সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, চট্টগ্রাম জেলে রাজনৈতিক কয়েদীদিগেব প্রতি দুর্ভাবহার ক্রমেই বাড়িয়া চলিবাছে। সম্প্রতি ষাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন, তাহারা জেলেব অবস্থাব বিষয়ে একটা রিপোর্ট দিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ যে এই দারূণ ঐর্ষ্যে যে ঘবটিতে ৩৫, ৩৬ জন লোককে বদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তাহাতে সাধারণতঃ ১৫, ১৬ জনেব বেশী ধবে না। যে সামান্য পানীয় জল দেওয়া হয়, তাহাতে অনেকেরই তৃষ্ণা নিবারণ হয় না এবং মুসলমানরা ‘উলু’ করিবা'ব জন্য এক ফোঁটা জলও পান না। চালের সঙ্গে দান ও বালি প্রচুরভাবে মিশ্রিত থাকে; ভাল ও তরকারী'ব অবস্থাও সেইরূপ শোচনীয়। হাসপাতালে ছ'গবট মামুলি ঔষধেব বোতল সাজান ভিন্ন বোগ মারাইবা'ব আর কোন ব্যবস্থা নাই। সহবেব মধ্যেই নাকি ৭, ৮ জন জেল-পরিদর্শক আছেন। তাহাবা কি নাকে সবিবা'ব তেল দিয়া ঘুমা'ইতেছেন?—আশুশক্তি

বাঙ্গালার এ পর্যন্ত যতজন হিন্দু ও মুসলমান অসহযোগী কারাগারে গিয়াছেন, বঙ্গীর প্রাদেশিক কংগ্রেস ও খেলাফত কমিটি তাহাব একটা তালিকা প্রকাশ কবিয়াছেন; তাহাতে দেখা যায়

সব পেয়েছির দেশে

সেদিন সমস্ত দুপুর ও বিকেল আমার সেই শীর্ণদেহ অ্যানারকিষ্ট বন্ধুব সঙ্গে অশ্রাস্ত তর্ক করে' শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলুম। টুর্গনিভ্ তাঁর এক নভেলে রুসযুবক সম্বন্ধে লিখেছেন—রাসিয়ানরা অফুরন্ত তর্ক চালাতে ওস্তাদ। কিন্তু তিনি যদি বঙ্গযুবকদের সঙ্গে পরিচিত থাকতেন তবে তাঁকে স্বীকার করতেন হত অপরিদ্রীম তর্ক করবার অপরিমেয় শক্তিতে বঙ্গযুবকদিগের নিকট রুসযুবকগণও হার মানেন; রুডিনের অপেক্ষা বাকবীর এদেশে অনেক খুঁজে পেতেন। সোসিয়ালিজম, অ্যানারকিজম, নিহিলিজম কমিউনিজম—অনেক ইজম-এর ঘাতপ্রতিঘাতে মার্ক্স, টলষ্টয়, জোপটকিন, লেলিন, গান্ধী, অনেক বিদ্বান্নর নামের বঙ্গধন শব্দ-উৎসবে তর্কের ঝড় উদ্দাম হয়ে উঠছিল। তর্ক হয়ত সারারাত ধামতো না, ভাগ্যক্রমে আমার বন্ধুর মনে পড়ে' গেল কোন্ আড্ডায় কি বিষয় নিয়ে তাঁর অন্তত বাক্‌চাতুরী দেখাবার নিমন্ত্রণ আছে। আমাদের রেহাই দিয়ে তিনি যখন গেলেন তখন সন্ধ্যার স্নিগ্ধতাহীন অন্ধকার। চেয়ারটা টেনে বারান্দায় এসে বসলুম, বিষ-নিশ্বাসের মত ধূমে আতঙ্কিত নগর ছঃশ্বপ্নের মত পড়ে' রয়েছে, ধোঁওয়ার কুস্মটিকা পার হতে না পেরে তাঁদের আলো করুণনয়নে চাইল। রজনীগন্ধার ঝাড়টা ড়েনের দুর্গন্ধের কাছে হার মেনে নতমুখে পড়ে' রয়েছে; দূরে গ্যাসের আলোটা ধেন কোন্ চিরজ্বালাময় তৃষ্ণা-লোকের প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ বসে' দম আটকে আসতে লাগল। বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।

পথে কোথাও একটু ধোঁওয়ার কালিমা নেই; অকলর নীলাকাশে তাবালোক জুইফুলের ঝাড়ের মত মাধার ওপর ছেয়ে বসেছে; স্বধাসৌরভময় বসন্তের বাতাস বইছে। আশ্চর্য হয়ে গেলুম। মনে হলো কোন্ রূপ-কথার স্বপ্নময় সৌন্দর্য্যলোকে এসে পৌঁছেছি। মোড়ের কাছে যে ভাষ্ট্বিন্টি ছিল, সেটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, তার জায়গায় একটা সোনালী ডালিষা ফুলের গাছ; তার পাশে যে পত্রহীন শীর্ণ কুম্বুড়াগাছ দিন দিন দীর্ণ হচ্ছিল, সেটা ফুলে ফুলে ভরে' নটবব অগ্নিশিখার

মত বাতাসে নৃত্য করছে; সহসা একটা কৃষ্ণ ডেকে উঠল। অবাক হয়ে চমকে দেখি, রাস্তার মোড়ে যে বৃদ্ধা ভিখারিণী করুণ আর্তনাদে ভিক্ষা চাইত, আর যে ছোট মেয়েটা ভয়ঙ্কর ময়লা ছেঁড়া নেকড়া পবে' জাঁতাঝুড়ে জাঁতাঝুড়ে ছেঁড়া কাগজ আর নেকড়া কুড়িয়ে বেড়াত, তারা জোৎস্নার মত শুভ্র নির্মল বসন পরে' হাসছে আর খেলা করছে। রোজ যখন এই পথ দিয়ে গেছি—ওই ভিখারিণীব কঙ্কালসার দেহ ভীতিপ্রদ করুণ মুখ দেখে চোখ বুজতেই ইচ্ছে কবেছে; দেখেছি—মানব-শক্তি ও সভ্যতাব মহাদস্তের মত মোটরকার তার পাশ দিয়ে জয়ধ্বনি কবে' চলে' গেছে, কিন্তু সে অইনিশি করুণ ক্রন্দনে সবাইকে এই কথাই স্মরণ করিয়েছে—মানব-সভ্যতা একদিকে মোটরকার আর একদিকে এই রোগ-নারিদ্বেষের মূর্ত্তি সৃষ্টি করে' চলেছে। আজ তার মুখের হাসি দেহের দিব্য শ্রী দেখে বহুক্ষণ চেয়ে রইলুম। মন-ভোলানো বাঁশীর তান কানে এলো। ওই কোণে যে বিড়ির দোকানটা ছিলো, সিগারেটের ও দেশলাইয়ের বাস্ক দিয়ে তৈরী ঘরে বসে যত পক ও অকালপক লোকগুলো ছোট ছেলেদের নিয়ে সারাদিন বিড়ি পাকাতো আর অলীল গল্প করত, তাদের হীনবাস কালিভরা-মুখ ও বিড়ির গন্ধে স্থানটায় যেতে স্বপ্ন হত—দেখি, সে বিড়ির দোকান নেই, সেখানে এক কদমফুলের গাছ উঠেছে, আর তার তলায় মুসলমান ছেলেরা লাল নীল নানা রংএর সাজ পরে' বাঁশী বাজাচ্ছে। আর ওইখানে যে মহাপঙ্কিলতাময় ভয়ঙ্কর বস্তি ছিল, যেখানে নর্দমায় নর্দমায় বাঁধা জল পচে, রক্ত মাটির কুপে কুপে দাসত্বপীড়িত প্রাণ পচে, সভ্যতার বন্ধজ্বোত পচে' বিষিয়ে ওঠে, সূর্য্যের আলো কি জ্ঞানের আলো যেখানে পৌঁছাতে পারে না, দখিন বাতাস কি প্রেমের হাওয়া প্রবেশ করত পথ খুঁজে খুঁজে ফেরে, পাপবিভীষিকাময় রোগাতঙ্কিত ছঃশ্বদারিদ্বেষ চিব-অন্ধকারময় বাত্রিলোকে ভূতের মত মাছুষেরা ঘোরে— অবাক হয়ে দেখলুম আদিমযুগের অসভ্যমাছুষের গুহাগহ্বরের চেয়েও ভয়ঙ্কর সেই শ্রমিক জন্তুদেব গোসা-

ঢাকার হিন্দু ১৬৭ মুসলমান ৩৪, ময়মনসিংহে হিন্দু ১৬৭ মুসলমান ৭৪, কবিদপুর্বে হিন্দু ২২২ মুসলমান ৮৮, নোয়াপালীতে হিন্দু ২৫ মুসলমান ৪২, ত্রিপুরায় হিন্দু ৩৩ মুসলমান ১৪, বশোহরে হিন্দু ২৩ মুসলমান ১৮, নদীয়ায় হিন্দু ১৬ মুসলমান ৩১, পাবনায় হিন্দু ৮ মুসলমান ২, দাখিলিংশে হিন্দু ৮৩ মুসলমান নাই, খুলনায় হিন্দু ২০ মুসলমান নাই, মেদিনীপুরে হিন্দু ২৪ মুসলমান ৭, বরগুণায় হিন্দু ৭৮ মুসলমান ১৭২, কলিকাতায় হিন্দু ১৮৬৮ মুসলমান ১২৮১, চট্টগ্রামে হিন্দু ২২০ মুসলমান ৩৪৭, বরিশালে হিন্দু ২১৭ মুসলমান ৭৮ জন দণ্ডিত হইয়াছেন।—বশোহর

শোক-সংবাদ—

কবি লোকান্তরঃ—চট্টগ্রামের কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত গত ১২ই মার্চ রবিবার রাত্রিতে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে

বাঙ্গালার কাব্য-জগতেব বিশেষ ক্ষতি হইল সন্দেহ নাই। জীবেন্দ্রকুমার স্বভাব-কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত “তপোবন” প্রভৃতি গ্রন্থই তাঁহার স্মৃতিবঙ্গ। কবিবে। —ঢাকা প্রকাশ

স্বরাজ-প্রসঙ্গ—

মহাত্মা পাক্ষীয় অভিমত—বন্দরই স্বরাজ দিবে। যখন বিদেশী বস্ত্র বয়কট সম্পূর্ণ হইবে এবং সকল লোক ধর্মের পরিতে আরম্ভ কবিবে, তখন স্বরাজ স্থাপিত হইবে। এবং সেজন্য বাঁহাণী কারাধিকার হইয়াছেন দেশের লোকে তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করিবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে ভাবভেব লোকে যদি তাঁহার কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করে, তাহা হইলে শুধু ইংলণ্ডেব নহে সমস্ত জগতেব রাজনৈতিক আবহাওয়া বদলাইয়া যাইবে। —হিন্দুস্থান

সেবক

বদন-চন্দ্রমা

অধর নিম্পিস্
নধর কিস্মিস্,
রাতুল তুলতুল কপোল ;—
ঝরুলো ফুলকুল,
করুলো গুল তুল
বাতুল বুলবুল চপল।
নাসাঘ তিল ফুল
হাসাঘ বিলকুল,
নয়ান চল্‌ছল উদাস,
দৃষ্টি চোর চোর
মিষ্টি ঘোর ঘোর,
বয়ান ঢল্‌ঢল্‌ হতাশ!
অলক তুলতুল,
পলক তুলতুল,
নোলক চুম খায় মুখেই ;
দি'ছর মুখটুক
হিঁদুর টুকটুক,
দোলক ঘুম যায় বকেই।

মলাট বল্‌মল্
মলাট মল্‌মল্,
টিপটি টল্‌টল্‌ সিঁথির,
ভুরুর কায় ক্ষীণ,
শুরুর নাই চিন্,
দীপটি জল্‌জল্‌ দিঠির।
চিবুক টোল্‌ খায়,
কি স্বপ্ন-দোল্‌ তায়
হাসির ফাঁস দেয়, সাবাস!
মুখটি গোলগাল,
চুপটি বোলচাল,
বাঁশীর শ্বাস দেয় আভাস।
আনার-লাল-লাল-
দানার তার গাল,
তিলেব দাগ তায় ভোমর,
কপোল-কোল ছায়
চপল টোল, তায়
নীলের রাগ ভায় চুমোর!

কাজী নজরুল ইসলাম

প্রলয়োল্লাস

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

এ নূতনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখীর বাড় ।

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

তোবা সব জয়ধ্বনি কর !!

আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,
সিঙ্কু-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ডাঙল আগল !

মৃত্যু-গহন অন্ধকূপে

মহাকালের চণ্ডকূপে

ধুম ধূপে

বজ্র-শিখার মশাল জ্বলে আসছে ভয়ঙ্কর—

ওরে ঐ হাসছে ভয়ঙ্কর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

ঝামঝাম তাহার কেশের দোলার বাপটা মেরে গগন ঢুলায়,
সর্বনাশী জালামুখী ধূমকেতু তার চামর ঢুলায় !

বিশ্বপাতার বক্ষ-কোলে

রক্ত তাহার রূপাণ ঝোলে

দোতুল দোলে !

অটরোলের হট্টগোলে স্তম্ভ চরাচর—

ওরে ঐ স্তম্ভ চরাচর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

দ্বাদশ রবির বহ্নি-জালা ভয়াল তাহার নয়ন কটায়,
দিগন্তের কাদন লুটায় পিঙ্গল তার জন্ত জটায় !

বিন্দু তাহার নয়ন-জলে

সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে

কপোল-তলে !

বিশ্বমায়ের আসন তারি বিপুল বাছর 'পর—

ইাকে ঐ “জয় প্রলয়ঙ্কর !”

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

তোবা সব জয়ধ্বনি কর !!

মারিঃ মারিঃ ! অগং জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিষে আসে,
জরায়-মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ লুকানো ঐ বিনাশে !

এবার মহানিশার শেষে

আসবে উষা অরুণ হেসে

করুণ বেশে !

দিগন্তের জটায় হাসে শিশু চাঁদের কর—

আলো তার ভরবে এবাব ঘর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

ঐ সে মহাকাল-সারথি রক্ত-তড়িৎ-চাবুক হানে,
রণিয়ে ওঠে হ্রেশ্বর কাদন বজ্র-গানে ঝড়-ভুদানে !
ক্ষুব্ধের দাপট তাবাম লেগে উচ্চা ছুটায় নীল খিলানে—

গগন-তলের নীল খিলানে !

অন্ধকারাব বন্ধ কূপে

দেবতা বাধা যজ্ঞ-যুগে

পাষণ-স্তূপে !

এই ত রে তার আসার সময় ঐ রথ-ঘর্ষব—

শোনা যায় ঐ রথ-ঘর্ষর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর ? প্রলয় নূতন-স্বজন-বেদন !
আসছে নবীন, জীবন-হারা অসুন্দরে কর্ত্তে ছেদন !

তাই সে এমন কেশে বেশে

প্রলয় বধেও আসছে হেসে—

• মধুর হেসে !

ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

ঐ ভাঙা গড়া খেলা যে তার কিসেব তবে ডর ?

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !—

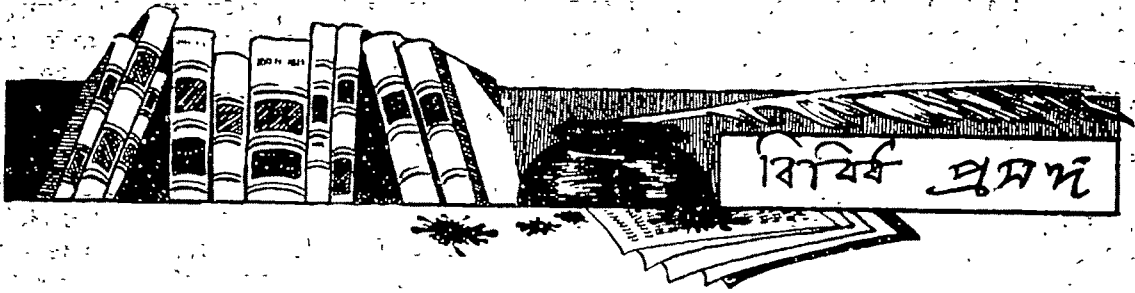
বধূরা প্রদীপ তুলে ধর !

ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর !—

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

তোবা সব জয়ধ্বনি কর !!

কাজী নজরুল ইসলাম



স্বরাজ প্রার্থনা

বর্ষারম্বে বিশ্বপতির নিকট পূর্ণ স্বরাজ প্রার্থনা করিতেছি। ব্যক্তিগত স্বরাজ চাহিতেছি, সমষ্টিগত স্বরাজ চাহিতেছি।

যে আত্মকর্তৃত্ব চাহিতেছি, তাহা মনুষ্যহৃদয়ে নিরুপ্ত প্রবৃত্তিকুলের কর্তৃত্ব নহে। যে আত্মকর্তৃত্ব চাহিতেছি, পরমাশ্রয় কর্তৃত্বই তাহার ভিত্তি।

বিশ্বনিয়ন্তার রাজত্ব আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে ও সকলের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউক। তাহা হইলেই আমরা প্রত্যেকে ও সকলে স্ব-রাজ্য লাভ করিতে পাবিব।

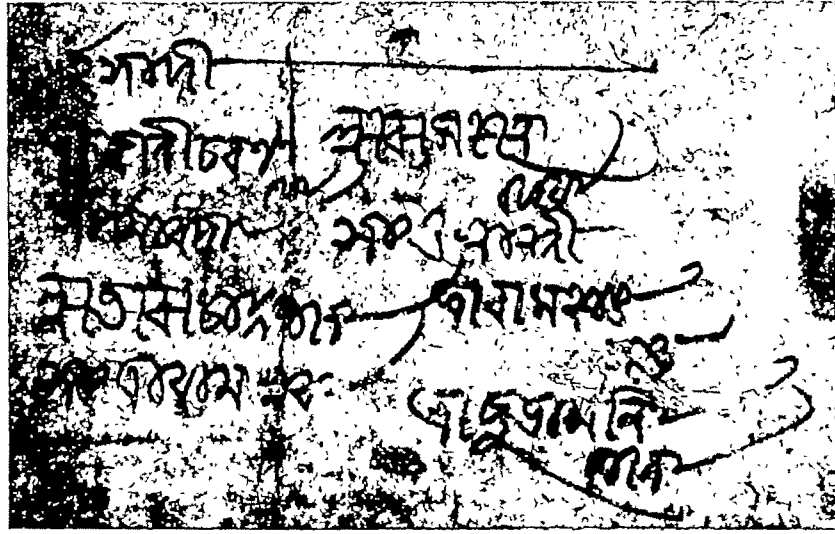
মৌলানা হসরৎ মোহানীর প্রতিবাদ

গত কংগ্রেস সপ্তাহে আহমদাবাদে মৌলানা হসরৎ মোহানী মহাত্মা গান্ধীর সহিত যে বাগবিতণ্ডা করিয়াছিলেন বলিয়া কতকগুলি খবরের কাগজে বাহির হইয়াছিল, মৌলানা সাহেব তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইহাতে আমরা সান্ত্বিত আশ্বাসিত হইয়াছি। মৌলানা সাহেব বলিয়াছেন, যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া বাধাইবার জন্ত অমূলক কথা রটান হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধীর কারাদণ্ড

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরাগ-উৎপাদক ও রাজদ্রোহ-উত্তেজক প্রবন্ধ লিখন অপরাধে মহাত্মা গান্ধীর বিনাশ্রমে ছয় বৎসরের কারাদণ্ড হইয়াছে। তাহার অপরাধ প্রমাণার্থ তাহার লেখা এইরূপ তিনটি প্রবন্ধ বিচারকের সমীপে উপস্থিত করা হইয়াছিল। প্রত্যেক প্রবন্ধের জন্ত দুই বৎসর, হিসাবটা এইরূপ। কিন্তু গান্ধী

মহাশয় আরো অনেক প্রবন্ধ ও বক্তৃতা দ্বারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরাগ উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। বক্তৃতা ছাড়াই দিয়া, কম করিয়া ধরিলেও এষ্ট প্রকার প্রবন্ধেরই সংখ্যা ত্রিশ চল্লিশ হইবে। তাহা হইলে তাহার ষাট কিম্বা আশী বৎসরের জেল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাঁহার বয়স এখন পঞ্চাশের উপর। সুতরাং তাঁহাকে পুরামাত্রায় জেল খাটাইতে হইলে, ইহলোকে তিনি যতদিন থাকিবেন, তাহার উপর পরলোকেও তাঁহাকে অনেক বৎসর কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরলোক এখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে আছে। পৃথিবীতে স্বাধীনতা বিস্তার এবং পৃথিবীকে গণতন্ত্রের জন্ত নিরাপদ করিবার নিমিত্ত যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার ফলে ইউরোপের ব্রিটিশ ও অন্ত কয়েকটি জাতি বহুদেশ শাসন করিবার হুকুমনামা (mandate) পাইয়াছেন। অনেক বৎসর অপেক্ষা না করিলে বোঝা যাইবে না, যে, সে-কালে পরদেশ জয় এবং হালফাশানের এই হুকুম-নামায় কোম প্রভেদ আছে কি না, এবং থাকিলে সে প্রভেদটুকু মাত্রা, পরিমাণ ও স্বরূপ কি। পরলোক এখনও ব্রিটিশ কিম্বা অন্য কোন জাতির দখলে আসে নাই, তাহা শাসন করিবার হুকুমনামাও কেহ পায় নাই; হয়ত ভবিষ্যতে বৃহত্তর কোন যুদ্ধের দ্বারা পরলোকেও স্বাধীনতা বিস্তার এবং গণতন্ত্রের জন্ত পরলোকে নিরাপদ করিবার চেষ্টা হইবে। আপাততঃ কিন্তু কাহাকেও কারাদণ্ড দিতে হইলে ইহলোকে তাহার যতদিন বাচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক হওয়ায়, তজ্জনই সম্ভবতঃ মহাত্মা গান্ধীর কেবল তিনটি প্রবন্ধের উপর তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ খাড়া করা হইয়াছিল; কেন



দাস বিক্রমের দলিল—দলিলের পিঠে সাক্ষীদের নাম

“ইসাদী—

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ রাধা

শ্রীগোপীকৃষ্ণ সর্মা”

এবং পার্শ্ব লেখার শেষভাগে এক পাঠে

“নিসাণ সৌ

শ্রীরামধন দত্ত”

লিখিত রহিয়াছে; এবং অপর পৃষ্ঠে সাক্ষীগণের দস্তখত আছে।

এই দলীলের ভাষা সম্বন্ধে কোন কথা না বলিলেও চলে, কারণ ইতিপূর্বে অনেক আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু “খরিদা নফর” ও “বিক্র করিলাম” কথাতে দাস-ব্যবসায় যে বিশেষভাবে বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ছিল তাহাই বুঝা যায়। ইহা ব্যতীত বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের একটি বিশেষত্ব এই দলীলে লক্ষ্য করিবার আছে। পূর্ববঙ্গে “রাঢ়ী” ও “বরেন্দ্র” ব্রাহ্মণগণ এখনও তাঁহাদের শ্রেণীগত বিশেষত্ব বজায় রাখিয়াছেন; কিন্তু অনেক কায়স্থ রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমি হইতে পূর্ববঙ্গে গিয়া বঙ্গ কায়স্থগণের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন। যে রামনরসিংহ দত্ত এই রঙ্গদাসকে পবিত্র করেন, তাঁহাব বংশধরগণ

এখনও উক্ত শিমুলিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন, এবং তাঁহারা আমার প্রতিবেশী। প্রায় দুই বৎসব পূর্বে তাঁহাদের ঘরে একখানা কুলজীগ্রন্থ আমি পাইয়াছিলাম। তাহা আমি রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিজ্ঞানহার্ণব মহাশয়কে দিয়াছি। ঐ কুলজী গ্রন্থে লিখিত আছে যে রামনরসিংহ দত্ত মহাশয়ের পূর্বপুরুষগণ পূর্বে রাঢ়দেশে শ্রীরামপুর, বারিষা প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেন, পরে বঙ্গদেশে গমন করেন। এই দলীলে দাসবিক্রেতা রামধনদত্তের নিবাস শ্রীরামপুর বলিয়া লিখিত আছে। বিক্রমপুর্বে শ্রীরামপুর নামে কোন গ্রাম আছে বলিয়া আমি জানি না। এই দলীলে বুঝা যায় যে রামনরসিংহ দত্তের পূর্বপুরুষগণ তখন সবেমাত্র শ্রীরামপুর হইতে উঠিয়া বঙ্গদেশে গিয়াছিলেন এবং তখনও তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীরামপুরের সম্বন্ধ লোপ পায় নাই। দলীলের অপর পৃষ্ঠে সাক্ষীগণের যে নাম ধাম আছে তাহাতে “শ্রীতারানন্দ পাল, সাং শ্রীরামপুর” বলিয়া লিখিত আছে। কুলজীগ্রন্থের “আগে রাঢ়, শেষে বঙ্গে” এই উক্তি এই দলীলের দ্বারা কতকটা প্রমাণিত হয়।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু [এম-এ]

কাপড় বোনা ইংরেজী স্কুলসকলের অন্ততম শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া ধাৰ্য্য হয়। বিপোর্টে দেখিতেছি, যে, দুইশত সাতচল্লিশটি স্কুল সূতা কাটা ও কাপড় বোনা শিখাইবাব প্রস্তাব করেন। তা ছাড়া বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয় সরকারী ইন্স্কুল সকলেও চরখার প্রবর্তন করিতে দিতে রাজী হইয়াছেন—অবশ্য এই সৰ্ত্তে যে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে অতিবিক্ত অর্থব্যয় করিতে হইবে না। অমৃতবাজার পত্রিকায় দেখিলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি বোম্বেবাবুর মতে চরখা প্রবর্তনের চেষ্টা এক প্রকার বাজ্জনৈতিক চাল। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই, যে, কলিকাতার সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহাৰ জানিত ২৪৭টি ইংবেজী স্কুল এবং বাংলা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা মন্ত্রী উহার প্রশংসা দিলেন কেন?

আমরা চরখা ও হাতের তাঁতের দ্বারা দেশের বস্ত্রের অভাব দূর করা সম্ভব মনে করি না। যদি এই উপায়ে আমাদের আবশ্যিক সব কাপড় প্রস্তুত নাও হব, তাহা হইলেও যত হয়, ততই ভাল। কারণ ইহা দ্বারা দেশের বিস্তর লোকের অসংখ্য হইবে, এবং স্বত্র ও বস্ত্র নির্মাণাদিগকে অল্পের জন্য গ্রাম পরিত্যাগ করিতে হইবে না। উৎপাদন ও বিক্রয়ের স্ববন্দোবস্ত করিতে পারিলে, খাদ্যাবের ও কলের কাপড়ের মূল্যও বেশী তক্কা হইবে না। তা ছাড়া, মানুষ ধোঁসব স্থলে মূল্যের দ্বারাই চালিত হয়, তাহা নহে। কোথাও গোমাংস সৰ্ব্বাপেক্ষা সুলভ হইলেও হিন্দু তাহা ব্যবহার করে না, কোথাও শূকর মাংস সৰ্ব্বাপেক্ষা সুলভ হইলেও মুসলমান তাহা স্পর্শ করে না, আমিষ খাদ্য কোথাও নিরামিষ আহার্য্য বস্তুর চেয়ে সুলভ হইলেও নিরামিষভোজীরা তাহা খায় না। একপ খাদ্যাখাদ্যের বিচার ভাল, কি মন্দ, এখানে তাহার আলোচনা করিতেছি না।

ইহাই বলব, যে, মূল্যের ন্যূনতা বিশেষ ক্রমে প্রবৃত্ত আমরা যদি

জিনিষ উৎপন্ন হইতে পাবে না; কতক জিনিষ অত্যন্ত দেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। কিন্তু ভাবতবর্ষে কাপাস জন্মে, এবং আরও জন্মিতে পারে। এখানে তন্তুবায় আছে, এবং অল্প জাতিতেও বস্ত্র বয়ন কবে ও করিতে পারে। যখন কলের কাপড়ের সৃষ্টি হয় নাই, তখন আমরা নিজেই নিজেদের কাপড় উৎপন্ন কবিতাম। হইতে পারে, যে, তখন আমরা এখনকার মত এত বেশী কাপড় ব্যবহার করিতাম না। কিন্তু এখন যেমন বেশী কাপড় দরকার, সেইরূপ চরখার এবং তাঁতের উন্নতিও হইয়াছে, এবং আগেকার চেয়ে বেশী লোক সূতা কাটা ও কাপড় বোনায় নিযুক্ত হওয়াও অসম্ভব নহে। আমরা অল্প কার্য্য নিযুক্ত অনবসব লোকদিগকে তাহাদের অধিকতর আয়ের কাজ ছাড়িয়া দিয়া ন্যূনতর আয়েব সূতা কাটা বা কাপড় বোনাৰ কাজে প্রবৃত্ত হইতে বলিতেছি না। দেশে লক্ষ লক্ষ বেকার লোক আছে; তা ছাড়া লক্ষ লক্ষ এরূপ লোক আছে, যাঁহারা বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস কাজ করে, বা দিনের মধ্যে অল্প সময় কাজ কবে। এইসকল লোক যত সহজে ও যত কম মূলধন খাটাইয়া সূতা কাটিয়া ছুপয়সা বোজগার করিতে পাবে, আর কোন উপায়ে তাহা পারে না। আলস্য ত্যাগ করিয়া শ্রমে অভ্যস্ত হওয়াটাও কম লাভ নহে। যদি মানুষ কাপড়ের কলে মজুরী কবিতো গিয়া যন্ত্রের অংশবং এবং কতকটা দাসবং হইয়া কাজ কবে, নিজ গ্রাম ও আত্মীয়স্বজন হইতে দূরে থাকিয়া সামাজিক শাননেব ও পারিবারিক প্রভাবের অভাব বশতঃ নৈতিক শিথিলতায় অভ্যস্ত হব, তাহা বাঞ্ছনীয়, না গ্রামের পরিবারেব ও আত্মীয়স্বজনেব মধ্যে থাকিয়া অনলস আত্মীয় জীবন যাপন ভাল?

অর্থনীতি শাস্ত্রে আমরা পণ্ডিত নহি। কিন্তু ইহা বুঝি, যে, অপেক্ষাকৃত বেশী দাম দিয়া দেশী জিনিষ কিনিলেও দেশ দরিদ্র না হইয়া ধনশালী থাকিতে পারে। পাঁচ ভাইযেব মধ্যে এক ভাই বিদেশীর নিকট হইতে সম্ভাব কোন জিনিষ কিনিলেও সেই অল্প মূল্যটুকু বিদেশে চলিয়া যায়। কিন্তু সে যদি বেশী দাম দিয়া নিজের ভাইয়ের নিকট হইতে সেই জিনিষ কেনে, তাহা হইলে টাকাটা পরিবারের মধ্যেই থাকে। দেশ ও জাতি একটি বৃহৎ

প্রিয়াদিকি
 কামানবলিহাঙ্গ জাহিন বিস্ময়
 মিত্রানিয়া সচকিত্ত নিমিত্ত বাক্যমবদ্য
 উনাদকসকসমান ২৩ ন গবিসম ১৪ জাহিনবাক্য
 প্রক সস মনিস বিক্রিয়মিহ সচকিত্ত (৭) অমী
 মোহাদিকি হগাং পেডামান আছী আবসেব
 নক নায়াছে এসব আমাব গবিদা নকব বাক্য
 দসম ওমর চৌদ বডিহ এহাং আমাব আপোন মোহ
 সজীকপত বাহাল তবিযে আপোন হান বি
 লিগম এহাং নগদ স্ব পুৱগুন দহমাসী ১২ বাড
 কপাইবা আপোন হান দতবদত পাইলাম এহাং
 মোহাং জীমা খোবাক পোমাক দিয়া তোমার পুত্র
 পুত্রাদী ক্রেমে দানবিক্রাদী কাবি হইয়া নকরি
 ইচ্ছাক হতবহ এহাং মনিস বিক্রী করিলাম
 ইতি ৫ এগা নকর সন বাক্য
 ১৬ বাড

দাস বিক্রয়ের দলিল—বাংলা অংশ

স্মৃতিতেষু লিপিত শ্রীবামদন দত্ত ওলদে কৃষ্ণবাম দত্ত ইভান
 হবিরাম দত্ত সাকীন শ্রীবামপুত্র কন্ত মনিস্ত বিক্রী-পত্রদি
 কার্জকণে আমি মহোচ্চরিকো হালাক পেডামান আছী
 আর কোন লক্ষ নায়াছে এসব আমাব গবিদা নকব
 শ্রীরঙ্গনদাস ওমর চৌদ বডিহ এহাং আমাব আপোন
 খোমবাজী বকবতে বাহাল তবিযে আপোনাং স্থানে
 বিক্র কবিলাম এহার নগদ মূল্য পুৱগুন দহমাসী ১২ বাড

কপাইবা আপোনার স্থানে দত্তবদন্ত পাইলাম এহার
 নোঙরা জীমা খোবাক পোমাক দিয়া তোমার পুত্র
 পুত্রাদী ক্রেমে দানবিক্রাদী কাবি হইয়া নকরি
 কর্ম করাইতে রহ এদদর্থে মনিস্ত বিক্রী করিলাম।
 ইতি ৫ এগা নকর সন বাক্য তাবিথ ১৬
 আবেণ—।”

দলীলের শিৰোদেশে মোহরের অগব দিকে—

পরিবরণ। দেশে বাহ্যিক কাঁচা মাল জন্মে একপ-দেশী পণ্যদ্রব্য বেশী দাম দিয়া কিনিলেও টাকাটা দেশে ও জাতির হাতেই থাকায় তাহাতে লাভ আছে।

চরখা ও স্বরাজ

চরখার প্রবর্তন দ্বারা স্বরাজ লাভ হইবে কিনা, এই প্রশ্ন অনেক করেন। চরখার প্রবর্তন দ্বারা সাক্ষাৎভাবে স্বরাজ লাভ হইতে পারে, ইহা আমরা মনে করি না; কারণ, কিরূপে তাহা হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। কেহ বুঝাইয়া দিলে বুঝিতে ইচ্ছুক আছি। দেশে যখন কেবল চরখার সূতা ও হাতের তাঁতের কাপড় ছিল, তখনও ত দেশ স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। যে অবস্থা স্বাধীনতা রক্ষায় আমাদের সমর্থ করে নাই, তাহা স্বাধীনতা পুনর্লাভে সাক্ষাৎ ভাবে আমাদের নিশ্চয়ই সমর্থ করিবে, ইহা বলা যায় না। তবে প্রত্যেক ভাবে চরখার প্রচলন দ্বারা স্বরাজ লাভের পথ প্রস্তুত হইতে পারে, ইহা আমরা বুঝি ও বিশ্বাস করি। সংক্ষেপে খুলিয়া বলিতেছি।

স্বরাজ জিনিষটি শুধু রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপার নহে। ইহা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব ত বটেই, পণ্যদ্রব্য উৎপাদন, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা; প্রভৃতি বিষয়ে জাতীয় আত্মকর্তৃত্বও বটে। যেমন দেহেব কোন একটি অঙ্গকে বলশালী করিতে হইলে সমস্ত অঙ্গগুলিকেও সজল করিতে হয়, এবং দেহের বলবিধানের মনঃসংযোগ জীবন্তক হয়; তেমনি এক-একটি বিষয়ে আত্মকর্তৃত্ব অস্ত্রান্তর বিষয়ে আত্মকর্তৃত্বের উপর নির্ভর করে, এবং সকল বিষয়ে আত্মকর্তৃত্ব লাভ সজাগ সতর্ক অনলস মন ও দেহের উপর নির্ভর করে। কোন-একটি বিষয়ে আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিতে হইলে সমস্ত জাতির চেষ্টাকে একমুখী, অশৃঙ্খল, ও সমবেত করিতে হয়, এবং সকলকে নিজেব স্বার্থ অস্ত্রান্তর ক্রান্তকর্তা ত্যাগ করিয়া সমস্ত জাতির মঙ্গল-চিন্তায় ও অস্ত্রান্তরে অভ্যস্ত হইতে হয়। চরখা ও হাতের তাঁতকে আমাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র যোগাইবার প্রধান উপায় করিতে হইলে, অশৃঙ্খল, সমবেত, একমুখী চেষ্টার এবং পরার্থ-পরতার একান্ত প্রয়োজন হইবে। এই সাধনায় আমরা যদি সিজি লাভ করি, তাহা হইলে পণ্যশিল্প ও

বাণিজ্যের একটি প্রধান অংশ আমাদের জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবেই, অধিকন্তু আমাদের জাতীয় চরিত্র ভালর দিকে এমনভাবে পরিবর্তিত ও গঠিত হইবে, যে, তাহা রাষ্ট্রীয় ও অস্ত্রান্তর স্বরাজ লাভে আমাদের খুব কাজে লাগিবে। যে জাতির লোকেরা একজোট হইয়া বস্ত্রসম্বন্ধে পরমুখাপেক্ষিতা দূর করিতে পারে, তাহার অস্ত্রান্তর দিকেও সেই দলবদ্ধ চেষ্টার প্রয়োগ করিয়া সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হইতে পারে, একপ আশা জুরাশা নহে।

খাদ্যের উৎপাদনে বিস্তর লোক কাজ পাইবে; শুধু বাহ্যিক সূতা কাটিবে ও কাপড় বুনবে তাহারা নহে, বাহ্যিক চরখা ও তাঁত তৈয়ার করিবে ও অস্ত্রান্তর আত্মকর্তৃত্ব কাজ করিবে, তাহারাও। লক্ষ লক্ষ উৎপাদক ও লক্ষ লক্ষ ক্রেতার মধ্যে এইরূপে একটি যোগ স্থাপিত হইবে। জাতীয় একতা এই প্রকার নানা উপায়ে জন্মে।

স্বরাজ লাভ করিতে হইলে নানা প্রকারের প্রচারক ও কর্মীর প্রয়োজন। তাহাদের ভরণপোষণ ও বাতায়াতের ব্যয়, পুস্তিকা ও পুস্তক মুদ্রণ ও প্রচারের ব্যয়, প্রভৃতির জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। ভারতের আবশ্যক কাপড় ভারতের তুলায় ভারতীয়দের দ্বারা ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইলে, বিদেশী বস্ত্রের মূল্য স্বরূপ, যে অনেক কোটি টাকা বিদেশে চলিয়া যায়, তাহা দেশেই থাকিবে, এবং তাহা হইতে স্বরাজ-প্রচেষ্টার সাহায্য পাওয়া যাইবে।

এইরূপ আরও অনেক সুবিধার বিষয় বলা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা হৃদয়-মনেব আশ্রয় উন্নতিকেই সর্কাপেক্ষা বড় লাভ মনে করি। নিজেদের দরকারী কাপড় নিজেরা উৎপন্ন করিতে পারিলে আমাদের মনে যে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ও আত্মনির্ভর জন্মিবে, আমবা বেরূপ উৎসাহিত হইব, তাহা আমাদের কাছে নানা কাব্যক্ষেত্রে “অসাধ্য” সাধনে সমর্থ করিবে।

আরও একটি জন্ম নিজেদের হৃদয়-মনেব মত আত্মশক্তিতে পরিবর্তিত হইবে।

“অস্পৃশ্যতা” দূরীকরণ ও স্বরাজ ।

মহাত্মা গান্ধীর অনেক সহকর্মীও বুঝিতে পারেন না, যে তিনি “অস্পৃশ্যতা”-দূরীকরণকে স্বরাজ লাভের জন্ত একান্ত আবশ্যক কেন মনে করবেন । ইহা বড় আশ্চর্যের বিষয় ।

আমরা কেন উহা একান্ত আবশ্যক মনে করি, তাহা অনেকবার বলিমাছি । আবার সংক্ষেপে বলি ।

যদি আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা থাকিত, এবং সে অবস্থাতেও যদি আমাদের মধ্যে কোন শ্রেণীর লোককে অস্পৃশ্য মনে করা হইত, তাহা হইলেও আমরা তাহাদের “অস্পৃশ্যতা” দূর করা একান্ত আবশ্যক মনে করিতাম । কোম্পানীতেব বা শ্রেণীর সকল মানুষকে কেবল তাহাদের বংশের নিমিত্ত পুরুষাভ্যুত্থানে অস্পৃশ্য মনে করা মহাভ্রম, এবং তাহাতে তাহাদের প্রতি অত্যন্ত অশ্রদ্ধা ও অমানুষিক নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয় । কোন মানুষ কেবল দুটি কারণে কিছুকালের জন্ত অস্পৃশ্য হইতে পারে—(১) যদি তাহার ছোঁয়াচে কোন রোগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে নীরোগ না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে তাহার সেবা-শ্রমিকের নিমিত্ত ব্যতীত ছোঁওয়া উচিত নয় ; তন্নিমিত্ত ছুঁইলে তাৎপরে হস্তাদি উত্তমরূপে প্রক্ষালন করা কর্তব্য ; (২) যদি কাহারো শরীরের কোন অংশে কোন ময়লা, অশুষ্টি, বা অনিষ্টকর পদার্থ লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার দেহের সেই স্থানট অস্পৃশ্য ; তাহা স্পর্শ করিলে হস্তাদি প্রক্ষালন করা কর্তব্য । কিন্তু কোটি কোটি লোকেব সমষ্টি কতকগুলি জাতি পুরুষাভ্যুত্থানে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে না, এবং তাহাদের প্রত্যেকের দেহে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ময়লা লাগিয়া থাকে না । সুতরাং তাহারা সর্বদা অস্পৃশ্য হইতে পারে না । অতএব ত্রাশ্রমাদি বে-সব জাতি “অস্পৃশ্য” বিবেচিত হয় না, তাহাদের অনেকে কখন কখন ছোঁয়াচে ও কুংসিং ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, এবং তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও কখন কখন অত্যন্ত নোংরা অবস্থায় থাকে । সেই সেই সময়ে, তাহাদের সেবা-শ্রমিক বা তাহাদের দেহ প্রক্ষালনার্থ ভিন্ন তাহাদিগকে স্পর্শ করা উচিত নয় ।

কিন্তু যে যে কারণে কোন কোন মানুষ কখন কখন অস্পৃশ্য হইতে পারে, আমরা তাহা নির্দেশ করিলেও “অস্পৃশ্যতা” বা “অনাচরণীয়তা” সম্পর্কে মানুষের মনে যে ঘৃণা অবজ্ঞা ঘেষ থাকে, কণকালের নিমিত্তও আমরা তাহার সমর্থন করি না । কাহাকেও অবজ্ঞা করা মহা ভ্রম ও মহা অধর্ম । ঈশ্বর সর্বত্রুতে বিজ্ঞান । কাহাকেও অবজ্ঞা করিলে ঈশ্বরকে অবমাননা করা হয়, এবং নিজেরও অপমান ও অনিষ্ট কবা হয় । যিনি যত অধিক পরিমাণে যত বেশীসংখ্যক জীবকে প্রীতি কবিত্তে পারেন, তিনি তত অধিক মহৎ ও ঈশ্বরের সদৃশ হন । কঠিন বসন্ত রোগে বা গলিত কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদ্বিগকে, তাহাদের সেবা করিবার নিমিত্ত ভিন্ন, ছুঁইবার আবশ্যক নাই ; কিন্তু তাহার মানে এ নয় যে তাহাদিগকে কণকালের স্তম্ভ ও ঘৃণা করিতে হইবে । তাহাদের প্রতি করুণা ও প্রীতিই একমাত্র ধর্মসম্মত মনোভাব ।

অবজ্ঞা অবজ্ঞাত ও অবজ্ঞাতা উভয়েরই অনিষ্ট করে । মানুষ অবজ্ঞাত হইতে হইতে নিজেই নিজে হীন মনে করিতে অভ্যস্ত হয় । পুরুষাভ্যুত্থানে কোন জাতির মনেব ভাব এইরূপ হইলে তাহা বা মলুষ্যহীন, নিন্তেজ, মহাদা-কাজ্জাবিহীন হইয়া বাস্তবিক হয়ে উঠিয়া পড়ে । “অস্পৃশ্যতা”-বোধ এই প্রকারে এদেশে বহুকোটি মানুষকে বহুশতাব্দী ধরিয়া অমানুষ করিয়া রাখিয়াছে । স্বরাজের অর্থ এই, যে, আমরা নিজে নিজেব দেশেব ও জাতির সকল কর্মেব কর্মী ও কর্তা হইব । এই “আমরা” কাহা বা ? শুধু “স্পৃশ্য” জাতিগুলি “আমরা” নহি ; বহুকোটি “অস্পৃশ্য” ও “অনাচরণীয়” লোকেবও এই “আমরা”র অন্তর্গত । কিন্তু যদি তাহা বা হয়, হীন, অমানুষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সমুদয় জাতিটি ত দেশের সব কাজের কাজী, সব কর্মেব কর্তা হইতে পারে না । কর্তা যে হইবে, তাহার শিবদাঁড়াটা মোজা এবং মাথাটা উচু হওয়া চাই । কিন্তু যে-সব জাতি পুরুষাভ্যুত্থানে অবজ্ঞাত হইয়া আপনাদিগকে হীন ভাবিয়া আসিতেছে, তাহাদের শিবদাঁড়া মোজা, মাথা উচু, সমস্ত শরীরটা সাহসে ও স্বাধীনগতিতে বিধাসে খাড়া হইবে কেমন করিয়া ?

যে অবজ্ঞাত কেবল তাহারই অমানুষ হইবার সম্ভাবনা

দাস বিক্রয়ের প্রাচীন দলীল

পূর্বে এই দেশে যে দাসব্যবসায় প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ আমাদের বর্তমান সমাজেও বিরল নহে। কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রাচীন দলীল পত্রাদিতেও কখন কখন পাওয়া যাইতেছে। ১৩২০ সনের ভাদ্রমাসের “সাহিত্য” পত্রিকায় এইরূপ একখানা দলীল প্রকাশিত হইয়াছিল। গত বর্ষের “ভারতবর্ষে” ও বর্তমান বর্ষের “প্রবর্তকে” এক-একখানা দলীল প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত উভয় দলীল হইতে জানিতে পারা যায় যে প্রায় ১৩০ বৎসর পূর্বে লোকে দুরবস্থায় পড়িয়া দাসরূপে বিক্রীত হইত, এবং স্বয়ং গ্রহণ করিয়াও দাসত্ব স্বীকার করিত। ইহাতে আমাদের দেশের কোন দুরবস্থাপন্ন পরিবারের শোচনীয় পরিণামের কথাই জানিতে পারা যায়; কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় যেভাবে দাসব্যবসায় প্রচলিত ছিল, আমাদের দেশেও যে সেইভাবে দাসগণ ক্রীত ও বিক্রীত হইত, ইহার প্রমাণস্বচক কোন দলীল-পত্রাদি এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমি

জানি না। এইরূপ একখানা দলীল প্রকাশিত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই দলীলের প্রধান বিষয় এই যে ইহার প্রথম ভাগ পার্সী-ভাষায় লিখিত এবং সেই সময়ের প্রচলিত প্রথাযুগ্মী রাজদ্বারে রেজেষ্টারী-কৃত। দলীলের শিবোদেশে একটি বৃত্তাকার মোহরের চিহ্ন আছে, তাহাতে “খাদেমসরে কাজি, কেরামুদ্দিন” ও তাহার পাশে—“মোহর নং ৯” পার্সী ভাষায় লিখিত রহিয়াছে। দলীলের তারিখ বাঙ্গলা ১১২৫ সন অর্থাৎ ইংরেজী ১৭৮৮ সাল। সেই সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালীস বঙ্গদেশ শাসন করিতেন।

দলীল

[দলীলের প্রথমার্ধ পার্সী ভাষায় লিখিত, তাহা আমাদের ভাষায় গুণ্ডীব বহিষ্কৃত। ইহা পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত শেষের অংশের পাঠ প্রকাশিত হইল।]
“ইবাদিকিদ্—

শ্রীরাগনরসিংহ দস্ত সাকিন বিক্রমপুর সিমুলিয়া



দাস বিক্রয়ের দলিল—শীল-মোহর

পারে, তাহা নহে, কে অস্বজ্ঞা করে দেও অমাহুষ হয়।
তাহার প্রমাণ আমাদের দেশের “অপুশ্চ” জাতিরা। তাহারা
“অপুশ্চ”দিগকে অবজ্ঞা করে, কিন্তু নিজেরাও এমন
অমাহুষ যে দীর্ঘকাল ধরিয়া বিদেশী জাতির দাসত্ব করিতে
স্বভাৱে হইয়া গিয়াছে, তাহাতে মর্যাদাসিক শিকার বোধ
হয় না। মনুষ্যত্বের অবমাননা বোধ করে, তাহার নিজেরও
মনুষ্যত্বের আদর্শ খাট হইয়া যান, সে-নিজেও ক্ষুদ্রাশয়,
হীনচেতা, কাপুরুষ হইয়া পড়ে।

স্বরাষ্ট্রের মানে সোজা কথাই এই, যে, আমাদের জাতীয়
জীবনের পূর্ণতার জন্য স্বাধীনত্বক সব কাজ আমরা নিজে
করিতে পারি। তাহার মানে এই, যে, আমরা সক্ষম সমর্থ
কৃষ্টি জীবন নীতিমান সাবিক জাতি হইব। কিন্তু জাতির
পঞ্চমাংশ বা ষষ্ঠাংশ হীন দশায় পড়িয়া থাকিলে ইহা
কেমন করিয়া সম্ভব? কাহারো শরীরকে কার্যক্ষম বলিষ্ঠ
করিতে হইলে, তাহার একটা হাত বা একটা পা বা বুকের
একটা দিক বা একটা পাঁজরায় কম জোর থাকিলে চলে কি?
জাতীয় একতা ভিন্ন আমরা কখন উন্নত ও অগ্রসর
হইতে পারি না, ইহা স্বলের বালকদের রচনার খাতাতেও
দৃষ্ট হইতে পারে। জাতীয় উন্নতি খুব বড় ও কঠিন কাজ। ইহা
সকলের চেয়ে-বাৎসল্য। জাতির কোটি কোটি লোককে
বুঝি দিয়া ইহা করা যাইতে পারে না। তা ছাড়া,
আমাদিগকে এমন কতকগুলি অধিকার ও ক্ষমতা
ইংরেজদের হাত হইতে জিনিয়া লইতে হইবে, যাহা হইতে
আমরা রক্ষিত হইয়া আছি। ইহা আমরা বরাবর
দেখিয়া আসিতেছি, যে, ইংবেজরা কখন বহুসংখ্যক
মুসলমানকে, কখন বহুসংখ্যক “অবনত” জাতির লোককে,
কখন অ-ব্রাহ্মণদিগকে, (non-Brahmans) কখন
জমীদারদিগকে, কখন বা বোদ্ধাজাতীদের লোকদিগকে
জাতীয়-আত্মকর্তৃত্ব-লাভ-প্রদানী দল হইতে চূত করিয়া
নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া আসিতেছে। তাহার ষত
সহজে এই ভেদ জমাইতে পারিয়াছে, তাহা সম্ভব হইত
না, যদি আমাদের মধ্যে রক্ষা না থাকিত। কোথাও
অশুচিতা থাকিলে, হিন্দু থাকিলে, তবে শনি প্রবেশ
করিতে পারে। পরস্পরের প্রতি অস্বজ্ঞা ও পবস্পরকে
স্বার্থসিদ্ধি এই অশুচিতা, এই রক্ষা।

কালসাগরে জাতীয়-জীবনের তরী ভাসাইয়া তাহাতে
যাত্রা করিতে হইবে। কিন্তু তাহার কতকগুলি মান্নামাঝি
স্পৃশ, অগ্নেরা-অস্পৃশ। যে কাছটি, যে পালটি, একদল
লোক ছুঁইবেন, অগ্নেরা তাহা ছুঁইবেন না; যে নকরটি
তুলিবার বা ফেলিবার জন্য একদল লোক হাত লাগাইবেন,
অগ্নেরা তাহাতে হাত লাগাইবেন না। এ অবস্থায়
জাতীয়-জীবন-তরী চলিবে কেমন করিয়া? এ অবস্থাও
তবু ভাল; কিন্তু যদি একদল জাহাজ ঘাটে ব্যধিতে
অগ্নদল ভাসাইতে, একদল পাল তুলিতে, অগ্নদল গুটাইতে,
একদল নকর তুলিতে অগ্নদল ফেলিতে, ইচ্ছা করে, তাহা
হইলে জাহাজ চলে কেমন করিয়া?

শত্রুতা বরং সহ হয়, অবজ্ঞা সহ হয় না। তুমি
আমার সঙ্গে মারামারি লাঠানাঠি কর, আমাকে মারিয়া
কেল, বুঝি তুমি আমাকে শত্রু মনে করিলেও প্রতিদ্বন্দ্বী
ও মায়া ভাবিয়াছিলে; ভবিষ্যতে তোমার স্বত্বান ও
আমার স্বত্বানে মিশ্রতা হইতে পারিবে। কিন্তু যদি তুমি
আমাকে এত হীন মনে কর, যে, গরু গোড়া গাধা ছাগল
ভেড়া উকুন ছারপোক মশা মাছি ছুঁইতে পার অথচ
আমার স্পর্শে আমার ছায়ায় আমার দৃষ্টিতেও তুমি
কলুষিত হও, এ অপমান অমঙ্গ, অমার্জ্জনীয়, ইহার স্বত্তি
ততদিন মুহিবে না। ততদিন অবজ্ঞার পরিবর্তে প্রীতিশ্রদ্ধা
এবং দূরত্বের পরিবর্তে মমতার উদ্বেক না হইবে।

“আমরা সব ভাই ভাই।” বৈশিষ্ট্য কথা। তোমার
ভাইকে তুমি এক আসনে বসায়, তাহাকে ছোঁও, তাহার
সঙ্গে আহার কর, তাহার দেওয়া-অন্নজন গ্রহণ করনা
আমাকে ছোঁও না কেন, একাসনে বসিতে দাও না কেন,
আমার সঙ্গে আহার কর না কেন, আমার দেওয়া অন্নজন
গ্রহণ কর না কেন? অন্তরিকে আমার উৎসর্গ ও আমার
ছোঁওয়া ফল মূল শস্ত শরীর পুষ্ট করিতে, তোমার কোন
আপত্তি দেখি না।

মহাত্মা গান্ধী “অস্পৃশতা” দূর করিতে চান, কিন্তু
তিনি “অস্পৃশ”দের সহিত পংক্তিভোজন ও বৈবাহিক
জ্ঞান-প্রদান চান না। অস্পৃশতা দূরীকরণ বলিতে
তিনি অস্পৃশ ও অনাচারনীতির জাতিদের সহিত কি
কি প্রকায়ে সমানে সমানে ব্যবহার চান, তাহার

কবি শেখ সাদী তৎকালীন এক দুশ্চরিত্র রাজকুমারের আদেশে গদ্যপদ্যময় অশ্লীল গজল রচনা করেন। এই-সমস্ত গজল নীতি-বিশ্ব কবি (Ethical Poet) শেখ সাদীর দ্বারা রচিত হইয়াছে বলিয়া আদৌ বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কবি শেখ সাদী এই অশ্লীল বচনাব জ্ঞাত কৈফিয়ৎ দিয়াছেন ও অতীত হইয়া শ্রীভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।* তিনি বলিয়াছেন—“এক বাদশাহপুত্র হকিম সোজানীর অশ্লীল গজলকে আদর্শ করিয়া আমাকে কতকগুলি গজল রচনা করিতে আদেশ করেন। আমি তাঁহার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে অস্বীকৃত হইলে, তিনি আমাকে হত্যা করিবেন বলিয়া ভয় দেখান। প্রাণবধের আশঙ্কায় ভীত হইয়া একপ রচনা কবিত্তে বাধ্য হইয়াছি। এই রুচিবিরূপিত কর্ণেব জ্ঞাত আমি অতীত ও শ্রীভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। পারস্য-সাহিত্যেব ইতিহাস আলোচনা কবিলে জানা যায় যে শুধু শেখ সাদীই নহেন, পাবস্যের অনেক কবি, নীতিবেত্তা, অমার্জিত রুচি, চিন্তা ও ভাব দ্বারা নীতিব সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন।

পাবস্যের প্রাচীন যুগে যে কবি অশ্লীলতার অবতাব রূপে “হকিম” উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন এবং ষাঁহার অশ্লীল বচনকে আদর্শ করিয়া কবি শেখ সাদী খেউড় গজল বচনা করিবাব জ্ঞাত তৎকালীন বাদশাহ-পুত্র কর্তৃক আদিষ্ট হন, সেই খেউড় গজলের কবি হকিম সোজানীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম। সমরখন্দনিবাসী হকিম মহম্মদ বি আলি সোজানী প্রধানতঃ অশ্লীল এবং বিজ্ঞপাত্যক কবিতাব জ্ঞাতই বিশেষ ভাবে বিখ্যাত। শৈশব হইতে সোজানী প্রধানতঃ অশ্লীল ও বিজ্ঞপাত্যক রচনার অনুরাগী হন এবং পরিণত বয়সে তাঁহার প্রতিভা কুরুচি ছাড়া সুরুচিপূর্ণ কবিতা রচনাব দিকে অতি অল্প সময়ই নিয়োজিত হইয়াছিল। হকিম সোজানীর

* The author, however, seems to have repented of having written these indecent verses, yet endeavours to excuse himself on account of thus giving a relish to other poems, as “salt is used in the seasoning of meat.”—T. W. Peal.

† তাবিখ-ই-গুজিদা—ইঁহার নাম আবুবকর ইব্রিম-সোল্‌মানি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

রচিত অশ্লীল গজলগুলির মত অশ্লীলতার একরূপ অত্যাশ্রয় নিদর্শন বোধ হয় কোন দেশের সাহিত্যে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক হাম্‌দুল্লাও বলিয়াছেন, সোজানী তাঁহার কাব্যে চরম-অশ্লীলতা প্রকাশ করিয়াছেন।* দৌলত সাহ তৎপ্রণীত পাবস্য কবিগণের জীবনী পুস্তকে লিখিয়াছেন—সোজানীর কবিতা এতই অশ্লীল যে পড়িলেই বমনের উদ্রেক কবে।† এই কারণেই তিনি অশ্লীলতা প্রকাশ বৃদ্ধির ভয়ে সোজানীর কবিতা উদ্ধার হইতে বিরত হইয়াছেন। কিন্তু পারস্যের সুপণ্ডিত লেখক ও জীবনীকার আউফি সোজানীর অশ্লীল গজলগুলিকে প্রতিভাশালী কবির প্রতিভা-সম্পন্ন রচনা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।‡ কবির অশ্লীল রচনা ব্যতীত অল্প সংখ্যক সুরুচি ও গভীর ভাবপূর্ণ কবিতা আছে। ঐতিহাসিক হাম্‌দুল্লা মৃত্যুকি বলেন, সোজানীর এইসকল রচনা সুন্দর ও অতুলনীয়। কথিত আছে নিম্নলিখিত কবিতা রচনার জ্ঞাত কবি শ্রীভগবানের ক্ষমার পাত্র। আমরা নিম্নে সেই কবিতাটির অনুবাদ প্রকাশ করিলাম :—

তোমার এ বিশ্ব-গৃহে নাহি দুখ নাহি দৈন্ত নাহি ক্রটিপাপ,
পাত্র ভরি' আমি তাহা কবিয়া স্বজন বাড়াই সন্তাপ ॥—
৫৬২ হিজবাকে (১১৭৩—৭৪) হকিম সোজানীর মৃত্যু হয় ॥

শ্রীমুরেশচন্দ্র নন্দী

* তারিখ-ই-গুজিদা।

† অধ্যাপক ব্রাউন সম্পাদিত, আমির দৌলত সাহ প্রণীত তজ্জিরাতুশুশোয়াব দ্রষ্টব্য।

‡ ইনি মহম্মদ আউফি নামে সুপরিচিত। ইঁহার প্রবৃত্ত নামি মহম্মদ আব্দব রহমান বি আউফি। আউফি তৎকালীন অনেকগুলি সাধু জীবনচরিত রচনা করেন। “লুবাবুল্লাল্লাবাব” নামক গ্রন্থের জন্য আউফি বিখ্যাত। আউফি সুলতান নশীর্দীন কুবচাবের বাজ্ব-সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন।

§ While Awfi, though regarding his facetiae as full of talent, considers it best * * *—Oriental Biographical Dictionary.

¶ তাবিখ-ই-গুজিদা।

॥ লেখকের যত্নে ঐ শেখ সাদীর জীবনী এক পরিচ্ছেদ। বেঙ্গল পাবলিশিং হোম কর্তৃক শীঘ্রই পুস্তক প্রকাশিত হইবে।

কোন বর্ণনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কিন্তু তিনি যাহা চান, তাহা কতকটা অমুমান করিতে পারি। আমরা অবশ্য তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক প্রার্থনা চাই। আমরা সকলের সঙ্গে পংক্তিভোজনে এবং সকলের অন্নগ্রহণে কোন দোষ দেখি না। বৎ ইহাতে জাতীয় ঐক্য ও পরস্পরের সহিত প্রীতিবন্ধন বাড়িতে পারে মনে করি। যাগাদের সভ্যতা, ভাষা, ধর্ম, শিক্ষা, আচার-ব্যবহার একরকমের, তাহাদের মধ্যে, জাতি-নিবিশেষে, বৈবাহিক আদানপ্রদানে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা করি না; রং মনে করি বে ইহা ভিন্ন সম্পূর্ণ একজাতি হইতে সম্ভব নহে।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধী যতটুকু চান বলিয়া অমুমান করি, কাথ্যতঃ ততটা হইলেও জাতীয় একতা কিয়ৎপরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে। দৃষ্টান্ত দিবা বলিতে গেলে এই বলা যায়, যে, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সামাজিক ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষ্যে পংক্তিভোজন না করিতে পারেন, তাহাদের মধ্যে ঔদাহিক আদানপ্রদানও নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এক আসনে বসেন, এক পুকুরে এক ঘাটে স্নান করেন, এক-কূপ হইতে জল তোলেন, কাষস্থের দেওয়া জল ব্রাহ্মণ পান করেন, কায়স্থকে ছুইলে ব্রাহ্মণ স্নান করেন না, ইত্যাদি। কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের মধ্যে পরস্পর যে আচরণ চলিত আছে, হাড়ি ডোম মুচি বাউরী প্রভৃতি জাতি, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ প্রভৃতি জাতির কাছে সেই ব্যবহার পাইলে তাহাতেও অনেক দৃষ্টান্ত হয়। অনেকে বলিবেন, হাড়ি ডোম প্রভৃতি জাতি বড় অপরিষ্কার থাকে। আমরা বলি, তাহাদের প্রত্যেকেই একরূপ নহে। নোংরা নিরক্ষর দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণকে যদি অস্পৃশ্য মনে না করা হয়, তাহা হইলে সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নমঃশূদ্রকে কেন অনাচরণীয় মনে করা হইবে? মাছুষটিকে দেখিবা শুনিবা তদনুসারে তাহার সহিত যথাযোগ্য ব্যবহার করাই কর্তব্য, জাতি ও বংশ অনুসারে নহে।

একজন মুচি খুষ্টিয়ান হইয়া গেলে আমাদের নিকট হইতে যেকণ ব্যবহার পাইবেন, স্বার্থে থাকিলে তাহা পাইবেন না, ইহা কি যুক্তিসঙ্গত?

মাস্ত্রাজ অঞ্চলে সাহাবা শত্রু হইতেও হীন বিবেচিত

হয়, তাহাদিগকে “পঞ্চম” বলে। পঞ্চমরা অপমানদিগকে আদি ডাবিড় বলে। মাস্ত্রাজ প্রদেশে কেবল যে ব্রাহ্মণ ও অ-ব্রাহ্মণের মধ্যে হিংসা ঘেষ প্রবল হইয়াছে, তাহা নহে, আদি ডাবিড় এবং ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণের জাতিদের মধ্যে রক্তারক্তি পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব সহজে লব্ধ হইতে পারে কি? হইলেও তাহা কি জাতির কিয়দংশেরই কর্তৃত্ব হইবে না? জাতীয় বলিতে ত জাতির সকল শ্রেণীর বৃদ্ধিতে হইবে?

কিছুকাল পূর্বে বখন মাস্ত্রাজ প্রদেশের কোন কোন স্থানে নিরস্ত্র অবাধ্যতা (civil disobedience) আরম্ভ করিবার নিমিত্ত জমীর খাজনা দেওয়া বন্ধ করিবার কথা হয়, তখন তথাকার গবর্ণমেন্ট এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, যে, যাহারা খাজনা দিবে না, তাহাদের জমী বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়া উহা “অবনত” শ্রেণীর (depressed classes) লোকদিগকে দেওয়া হইবে। সকল প্রদেশেই “অবনত” শ্রেণীর মধ্যে খুব গরীব লোক আছে, অল্প শ্রেণীর মধ্যেও আছে। “অবনত” শ্রেণীর লোকেরা জমী পান, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই; কিন্তু গবর্ণমেন্টের কর্তব্য্য দরিত্রতা অনুসারে মাছুষের সাহায্য করা, জাতি অনুসারে নহে। জাতি বা ধর্ম অনুসারে সাহায্য করিলেই বুঝা যায় যে, ভেদনীতি (“divide and rule”) অবলম্বিত হইতেছে। তাহার একটি দৃষ্টান্ত গবর্ণমেন্টের শিক্ষার বিষয়ক বিশেষ ব্যবস্থায় পাওয়া যায়। হাড়ি ডোম বাউরী মুচি বাগদী কৈবর্ত প্রভৃতি জাতির মধ্যে শিক্ষার দিগন্তার মুসলমানদের চেয়েও কম। অথচ গবর্ণমেন্ট অনেক বৎসর হইতে মুসলমানদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু হাড়ি ডোম প্রভৃতির জন্য সেকণ কিছু করেন নাই। ইহার কারণ, ভেদনীতি প্রয়োগ দ্বারা শক্তিশালী মুসলমান-সম্প্রদায়কে হাত করিবার ইচ্ছা। মুসলমানেরা সকলে খুব সুশিক্ষিত হউন, ইহা আমরা সর্বান্তঃকরণে চাই। কিন্তু ইহাও চাই, যে, জাতিধর্মনির্বিণেষে সকল সম্প্রদায়ের যেরূপই সুশিক্ষা পান। শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইলে যে-যে শ্রেণী যে পরিমাণে অধিক নিরক্ষর তাহাদের জন্য তত বেশী স্বেচ্ছা ও ব্যবহৃত কর্তব্য্য ধর্ম বা

ছিলেন, পরে মুসলমান হন। কবি থাকানি পারস্তের প্রাচীন কবি কালাকির শিষ্য। সুলতান থাকানি মালুচরের রাজত্বকালে প্রচলিত বলিয়া শেরওঘান প্রদেশের রাজকুমার কবিকে 'থাকানি' উপাধিতে ভূষিত করেন। গজল রচনার ক্ষুদ্র কবি থাকানি বিশেষ প্রসিদ্ধ। কবি অনেকগুলি গজল-গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে "হাকুত-আকলিম" বিখ্যাত গজল-গ্রন্থ। কবি পদ্যে একখানি ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থও রচনা করেন। এই ভ্রমণ গ্রন্থখানির নাম "তুফৎ-উল-ইরাকিন"। এই গ্রন্থে থাকানি, ইরাক-আজাম, ইরাক-আরব দেশের বর্ণনা করিয়াছেন। ৫৮২ হিজরাদে (১১৮৬ খ্রিঃ) তাম্রিজে কবির মৃত্যু হয় এবং তাম্রিজ প্রদেশের অন্তর্গত শাব্বার নামক প্রসিদ্ধ স্থানে কবিকে সমাধিস্থ করা হয়।

কবি জাবালি, ঘাজ্বিস্তানের পার্শ্বত্যা প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া ইহার নিশবা অর্থাৎ উপাধি আল জাবালি অর্থাৎ পার্শ্বত্যাপ্রদেশবাসী। কবির সম্পূর্ণ নাম আব্দুল ওয়াজিদ আল জাবালি। কবি জাবালি গজল রচনাব জ্ঞান সর্বিশেষ প্রসিদ্ধ। কবি ঘাজ্বিস্তান হইতে হিরাত ও গাজারায় আগমন করেন। কিছুকালের জ্ঞান গজলি-পতি সুলতান বাহরাম সাহ বিন মাহমুদের দরবারে তিনি রাজকবি রূপে অবস্থান করেন। কিছুকাল অবস্থান করিবার পর সুলতান বাহরাম সাহের সহিত সুলতান সজর শালজুকির যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সুলতান বাহরাম সাহ পরাজিত হন। কবি এই যুদ্ধ-ব্যাপারকে গরিমাময় ভাব এবং ছন্দের মধ্যে প্রকাশ করেন। এই কবিতায় কবি বিজয়ী সুলতানের বীর্য-বস্তার মহিমা কীৰ্ত্তন করেন। সুলতান কবির কবিত্তে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজ রাজ্যের রাজকবি রূপে সম্মানের সন্নিহিত লইয়া যান। ৫৫৫ হিজরাদে কবির মৃত্যু হয়। ইহাব রচিত অনেকগুলি গজল-গ্রন্থ আছে।

সাদির গজলগুলি চারিপ্রণীতে বিভক্ত; যথা :—

(১) তায়াবাৎ (২) বদেয়া (৩) খাওয়াতিম (৪) খুস্বিসায়েৎ।

তায়াবাৎ—কবির সাদাসিদা ধরণেব সাধারণ গজল-গ্রন্থ হইলও বিশেষতঃ পূর্ণ। ইহাব বিশেষতঃ সমৃদ্ধ

সুবিখ্যাত প্রাচ্যভাষাবিৎ সুপণ্ডিত সার উইলিয়ম জোন্স ও ডাক্তার জেমস্ রস বলেন, এই গ্রন্থের প্রথম চারিটি গজলের প্রথম দুই চরণ আলিফে ও অপর চরণগুলি ক্রমান্বয়ে আলিফ ও তৎপরবর্তী বর্ণের সহিত শেষ হয়।*

বদেয়া—শকালঙ্কারপূর্ব অতীন্দ্রিয় ভাব ও ভক্তিরসপূর্ণ গজল-গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি সাধারণের নিকট অতি প্রচার ও আদরের বস্তু। ইহাতে কবি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণন ও শ্রীভগবানের মহিমা কীৰ্ত্তন করিয়াছেন।

খাওয়াতিম—কবির পরিণত বয়সের রচনাবলীর মধ্যে এই গজল-গ্রন্থখানি গভীর ও গরিমাময় ভাবে পূর্ণ। যে সময় কবি পার্থিব জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগীর মত ধ্যানজীবন যাপন করিতেন, যে সময়ে কবির মিলনাকাঙ্ক্ষী আত্মা সত্য-শিব-সুন্দরের শ্রীচরণে মিলিত হইবার আশায় সতৃষ্ণ ন্যম্নে অপেক্ষা করিতেছিল, সেই ঈশ্বর-সমাধির পূর্বরাগরঞ্জিত মুহূর্ত্তে কবি এই অপূর্ণ-শ্রীসম্মিত গজলগুলি রচনা করেন। ইহা পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে কবির হৃদয় মন সেই বিরাট বিশালতায় ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত গরিমা, সমস্ত সৌন্দর্য তাঁহার প্রাণে সংহত হইয়া উঠিয়াছে।

খুস্বিসায়েৎ অর্থাৎ পদ্যে ও পদ্যে রচিত অনুল্লীল গজল-গ্রন্থ। অনুল্লীল গজলের প্রচলন গজলী রাজাদের সময় হইতে আরম্ভ হইয়া দেশময় বিস্তৃতি লাভ করে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সাধারণ কবিগণ অপেক্ষা পেউড গজলের কবিগণ সর্বিশেষ আদর প্রাপ্ত হইতেন, এমন কি তাঁহাবা হকিম (doctor) উপাধিতে পর্যন্ত ভূষিত হইতেন। তৎকালীন কবিত্তে এই শ্রেণীর রচনা অনুল্লীল বলিয়া সাধারণের নিকট বিবেচিত হইত না।†

* ... the two first lines of the first four Ghazals terminate in an Alif, and the others in succession in each letter of the alphabet.

+ Swift, stern, and other wits of our last and the preceding age could relish indecency and nastiness, and it is creditable perhaps to the present generation that it has no taste for such grossness. This was not, however, the case in the age and country in which Sadi flourished any more than it was in the early and best parts of our own literary history.—Introduction to Gulistan, translated by Dr. Ross, 1823.

জাতি অহুসারে বিশেষ ব্যবস্থা রাজনৈতিক-ভেদবুদ্ধি-প্রকৃতি

যাহা ইউরোপীয়গণকে দৌষ দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য, ইহা ভেদনীতি প্রয়োগের পথ যে আমরা খুলিয়া রাখিয়া দিয়াছি, এবং সেই পথ যে অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত, আমরা ইহাই বলিতে চাই।

অবজ্ঞা দ্বারা আমরা নমঃশূদ্রদিগকে অনাস্বীয় করিয়া ফেলিয়াছি। প্রীতিশ্রদ্ধা দ্বারা তাহাদিগকে আস্বীয় করিতে হইবে। এই অবজ্ঞাজাত অনাস্বীয়তা বশতঃ স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে মুসলমানেরা উহাতে যোগ দেন নাই, নমঃশূদ্রেরাও যোগ দেন নাই। বর্তমান সময়ের স্বাধীনতা (Nationalist) প্রচেষ্টার সহিত বিস্তর মুসলমানের যোগ আছে; তাহাও একটি কারণ, মহাত্মা গান্ধী খিলান্ড আন্দোলনকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত জড়িত করিয়াছেন। বিস্তর নমঃশূদ্র কিন্তু এখনও স্বাধীনতা প্রচেষ্টা হইতে দূরে রহিয়াছেন। তাহারা অল্পদিন পূর্বে বাগেরহাটে এক সভা করিয়াছিলেন।

সেদিন একখানি ইংরেজী দৈনিকে এই মত পড়িতে-ছিলাম, যে, বাংলা দেশে অস্পৃশ্যতা নাই। পড়িয়া বিস্মিত হইলাম। সম্পাদক এ কোন্ বাংলাদেশের কথা বলিতেছেন? আমরা গ্রীন্ডাও হইতে আসি নাই, বাংলাদেশেই আমাদের জন্ম ও নিবাস। আমরা ত এখনও অস্পৃশ্যতা বোধিতেছি। তবে ইহা ঠিক বটে, যে, দক্ষিণ ভারতে যে প্রকারেব “অস্পৃশ্যতা”র মত প্রচুর্তাব; বাংলাদেশে তাহা তত নাই।

হিন্দুসমাজের অত্যন্ত দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় ছুঃমার্গের নিন্দা পড়িয়া প্রীত হইলাম।

আমাদের সহিত সকলে একমত হইবেন, এ আশা আমরা করি না। কিন্তু আমরা একটা প্রস্তাব করি; তাহাতে আপত্তি না হওয়া উচিত। দেশনায়কেরা সমুদয় অনাচরণীয় জাতির লোকদের প্রতিনিধিদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে বলুন, “আপনারা কি কি সামাজিক প্রথা রীতিনীতি প্রভৃতি ব্যবহার করিতে তাহা মন খুলিয়া বলুন।” তাহাদের কথা শুনিয়া নেতৃত্ব প্রদান করিব

চেষ্টা করুন। চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের অধিবেশনের সময় ইহা হইতে পারিবে কি?

অনেকে মনে করেন ও বলেন, যে, স্বরাজ্যলাভের পর অনাচরণীয়দের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা যাইবে। আমরা বলি, দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের লাঞ্ছনা ও তাহাদের প্রতি মমতাবিহীন ব্যবহার ও অত্যাচার ভারতবর্ষের অধঃপতনের ও অধঃপতিত অবস্থার থাকিবার একটি প্রধান কারণ। ইহার প্রতিকার না হইলে ভারতের সুদৃশ্য হইবে না। তা ছাড়া, আগেই আমরা দেখাইয়াছি, যে, স্বরাজ্যের প্রকৃত অর্থ অহুসারে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাও স্ব-রাজ্য হইবে না, যদি স্বনতশ্রেণীর লোকেরাও আমাদের আকাজক্ষিত স্ব-রাজ্যের অর্থায় আত্ম-রাজ্যের অংশী না হয়, এবং সেরূপ অংশী তাহারা হইতে পারে না, যতদিন তাহারা সামাজিক মর্যাদায়, শিক্ষায়, জ্ঞানে, আর্থিক অবস্থায় উন্নত না হইতেছে।

তোমরা কবে তোমাদের স্বরাজ্য লাভ করিবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা লালিত হইতে থাকিব, ইহা কোনদেয়ী ধর্ম, ত্যাগ, আত্মত্যাগ, বা দেশভক্তি?

স্বনত শ্রেণীর লোকেরা, স্বরাজ্যলাভের পর অনাচরণীয়দিগকে সামাজিক অধিকার প্রদানেচ্ছু ব্যক্তিগণকে এই একটি প্রশ্ন করিতে পারেন, “যখন কোন ভিন্নধর্মী বিদেশী ভারত-আক্রমণ ও অংশতঃ জয় করে নাই, সেই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার যুগেও ত আপনাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে অনাচরণীয় হইতে আচরণীয় হইতে উন্নীত করেন নাই? তখন কি বাধা ছিল যাহা ভবিষ্যতে আপনারা স্বরাজ্য পাইলে থাকিবে না?”

ত্যাগবিরুদ্ধ, মরুত্যাগবিরুদ্ধ, নিধন ব্যবস্থার প্রতিকার এখনই করিতে হইবে। প্রত্যেক রকমের উন্নতি-অন্য, সব রকমের উন্নতির সহিত জড়িত। কোনটিকে যদি দিয়া কোনটি হয় না। যদি বা আপাততঃ মনে হয়, যে, হইয়াছে, তাহা হইলেও তাহার মধ্যে এমন কিছু যৎ থাকিয়া যায়, যাহাতে সেই উন্নতি সত্য ও স্থায়ী হয় না।

যায় যে, থাকানি জাবালি প্রভৃতি সাদীর পূর্ববর্তী কবিগণ গজল রচনা করিয়াছেন। সুতরাং সাদী প্রথম গজল-কবি না হইলেও, তিনি তাঁহার সমসাময়িক এমন কি পূর্ববর্তী গজলরচনাকারীগণ অপেক্ষা গজল রচনায় অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন; ঐতিহাসিক হামদুলা মুস্তোফি বলেন, গজল রচনায় শেখ সাদী চরমোৎকর্ষ লাভ করেন।* এমন কি সাদীর রচিত গজল ভিন্ন অন্যান্য কবিগণের গজল, গজল নামেরই উপযুক্ত নহে।† অধ্যাপক ব্রাউনও বলিয়াছেন, গজল রচনায় শেখ সাদী অন্যান্য পারস্য কবিগণ এমন কি হাকিজ্ঞ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন।‡ বাঁকিপুর ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরীর মৌলভী আব্দুল মজিদ সাহেব বলেন, পারস্যে যে-সমুদয় গীতি-কবি আবির্ভূত হইয়াছেন তন্মধ্যে হাকিজ্ঞকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়। গজলের উৎকর্ষ-জনিত গৌরব খ্যাতনামা শেখ সাদীর প্রাপ্য সন্দেহ নাই; হাকিজ্ঞের প্রবর্তিত রীতি যথেষ্টই মাজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন (refined and polished) এবং তাঁহার বিশেষ প্রকাশ-মৌলদ্য আজ পর্যন্ত কেবল অনতিক্রম্য হইয়া আছে তাহা নহে, তাহার সমকক্ষও নাই। পারস্যের কবিগণের মধ্যে সাদীর যশ অবশ্যই প্রচুর এবং তাঁহার গুণিত। বৃত্ত। এই দুটি শ্রেষ্ঠ রচনা তাঁহাকে অমর করিয়াছে। কিন্তু হাকিজ্ঞের সহিত তাঁহার গজলের তুলনা করিলে একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে সাদীর গজল অধিকতর প্রশংসার্য।§ সাদীর গজল, হাকিজ্ঞের সরস অনাহতগতি ছন্দপ্রবাহে পূর্ণ অথবা জেলালুদ্দিন রুমির ভক্তিরস ও ঈশ্বর-প্রেমের উজ্জ্বলিত

পরিমায় ভাবধারায় পূর্ণ না হইলেও, উহা গভীর করুণরস এবং নির্ভীক সত্যানুভবের পরিচয়ে পূর্ণ; বাহা প্রাচ্য দেশের কবিতায় কদাচিত্ দেবিত্তে পাওয়া যায়।* বাহা হউক শেখ সাদী প্রথম গজলরচনাকারী না হইলেও, তাঁহার দ্বারাই যে পারস্যের গজল-কৃষ্ণের শোভা-সম্পদ বদ্ধিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং গজল বা গীতিকাব্য বচনায় কবি শেখ সাদীই প্রথম অমরত্ব লাভ করিয়া সাধারণের শ্রদ্ধা লাভ করিয়া কবি মোসানা হত্যকার গজলের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। সমরুখন্দ নিবাসী কবি নিজামী-অরুদি বলিয়াছেন, সাদীর দিওয়ান ভাবের উদ্দীপক ও চরমোৎকর্ষে পূর্ণ।† পারস্যের কবিগণের মধ্যে সাদীই প্রথম শ্রেণীর গজল-রচয়িতা এবং তাঁহারই গজল ঐতিহাসিক হিসাবে বিখ্যাত (classic)।‡ অধ্যাপক ব্রাউন, সাদীর গজলের প্রচার ও জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে বলেন, পারস্যের কোন কবিই আজ পর্যন্ত সাদীর মত লক্ষপ্রতিষ্ঠ ও প্রতিভা-বশা হইতে পারেন নাই, কবির যশ কেবলমাত্র তাঁহার জন্মভূমির মধ্যেই বিস্তৃত ছিল না, পরন্তু যে দেশে পারস্য-ভাষার আলোচনা হয়, সেই দেশেই তাঁর যশ বিস্তৃতি লাভ করে। বহুল প্রচার ও জনপ্রিয়তার হিসাবে হাকিজ্ঞের পরই সাদীর গজলের স্থান।§

সাদীর পূর্ববর্তী গজল-কবি থাকানি ও জাবালি সম্বন্ধে যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখিত হইল। থাকানি, পারস্যের শেরওয়ান প্রদেশ নিবাসী বিখ্যাত কবি। পারস্যের কবিগণের মধ্যে ইনিই “সুলতান্ উস্-শোওয়ারা” অর্থাৎ কবি-সুলতান রূপে সম্মানিত ছিলেন। ‘থাকানি’ কবির কল্পিত নাম। গজল প্রদেশে (আধুনিক এলিজা-ভেতপল) কবি থাকানি ৫০০ হিজরাদে (১১০৬-৭ খ্রি:) জন্মগ্রহণ করেন। কবির প্রকৃত নাম আফজল উদ্দিন ইব্রাহিম বিন আলি শেরওয়ান। কবির পিতা সূত্র-ধরের কর্ম করিতেন এবং মাতা প্রথমে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী

* তারিখইর গুজিরা।

† It is in the Persian Ghazal or ode, that he is especially held by orientals to have surpassed all other poets. They even go so far as to say that previous to Sadi there was no ode worthy of the name in existence.—Platts.

‡ In his Ghazals or odes Sadi is considered as inferior to no Persian poet, not even Hafiz.

—Literary History of Persia.

§ Khan Saheb Abdul Muqadir's Catalogue of Persian and Arabic Manuscripts, Vol. I, 1908.

* আতসকাধা।

† চাহার মক্কা।

‡ খাওয়ারতিম-ই-সাদী ভ্রষ্টব্য।

§ Literary History of Persia

হিন্দুমুসলমানের মিলন

উপরে যাহা লিখিয়াছি, তাহার ভিত্তিকৃত মূলনীতি-সমূহ অল্পসারে স্বরাজের জন্য হিন্দুমুসলমানের আন্তরিক মিলনও একান্ত আবশ্যিক। তাহা যাহাতে হয়, সেই চেষ্টা করা হিন্দুমুসলমান উভয়েরই কর্তব্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অটোনমি

একটা কথা উঠিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অটোনমি অর্থাৎ আত্মকর্তৃত্ব থাকা উচিত কি না। আমাদের মতে নিশ্চয়ই থাকা উচিত। কিন্তু ইহাও বলব্য যে অটোক্রাসি বা স্বৈরতন্ত্র অটোনমি নহে। আরও বলব্য, যে, যে বংশ-বাদকে বাণী বাজাইবার জন্ত টাকা দেয়, তাহার, কি স্বর বাজাইতে হইবে, তাহা নির্দেশ করিবার অধিকার থাকা উচিত। টাকাটা বাণী বাজাইবার জন্তই খরচ হইল কি না, তাহা দেখিবার অধিকারও দাতার থাকা উচিত। আইন অল্পসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অটোনমি আছে, কেহ কেহ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ক আইন আমরা অধ্যয়ন করি নাই; এইজন্য বলিতে পারিলাম না, যে, আইন অল্পসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অটোনমি আছে কি না। কিন্তু উহার যে আশুনামি, অর্থাৎ, “হে আশু (-তোষ), নমি (তব পায়)”, এইরূপ মতি আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রার্থীর চোখ-রাঙানী

কোন কোন ইংরেজী দৈনিক কাগজের একাধিক পত্রলেখক এইরূপ তর্ক করিয়াছেন, যে, যেহেতু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট, অর্থাৎ এম্-এ, এম্-এসসী, পীএইচ্-ডী, ডী-এসসী পড়াইবার ব্যবস্থা গবর্ণমেন্টের অল্পসারে হইয়াছিল, এবং যেহেতু শিক্ষকদের পাণ্ডিত্য হিসাবে যোগ্যতা অযোগ্যতা ব্যতীত অন্য কারণে তাহাদের নিয়োগ নামঞ্জুর করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেন্টের থাকা সত্ত্বেও গবর্ণমেন্ট সে ক্ষমতা প্রায় প্রয়োগ করেন নাই, অতএব গবর্ণমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ঋণ শোধ করিতে এবং ব্যয়বাহুল্যের ভার অনেকটা বহিতে বাধ্য।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, আইন অল্পসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত গবর্ণমেন্টের সম্পর্ক ও বাধ্যবাধকতা কিরূপ আমরা তাহা অধ্যয়ন করি নাই, অতরাং সন্দেহ দিয়া কিছু বলিব না। গবর্ণমেন্ট টাকা দিতে বাধ্য কি না, কেবল সেই বিষয়ে একটি কথা বলিতে চাই। পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষার বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্ত গবর্ণমেন্ট যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার প্রস্তাব করিবার ক্ষমতার সীমা-নির্দেশ প্রসঙ্গে গবর্ণমেন্ট বলেন,

“The Committee should frame its recommendations merely with a view to the best expenditure of existing funds and it should understand that further grants for post-graduate education cannot be expected in the near future.”—Calcutta University Commission (1917-19) Report, volume II, p. 51.

এই কমিটির সভ্য ছিলেন স্যার আন্তোণি মুখোপাধ্যায়, মিঃ হব্‌নেল, ডাঃ হেডেন, ডাঃ শীল, ডাঃ হাউয়েলস্‌স, ডাঃ রায়, মিঃ হ্যামিল্টন, মিঃ ওয়ার্ড সুওয়ার্থ, এবং মিঃ এণ্ডার্সন।

পত্রলেখকদের যুক্তি সন্দেহে আমাদের আরও বলব্য আছে। কিন্তু আপাততঃ আর কিছু বলিব না।

নাগার্জুনের পুরস্কার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের যে ছাত্র বৎসরের মধ্যে রাসায়নিক গবেষণায় সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব দেখাইবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় তাহাকে পুরস্কার দিবার জন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দশ হাজার টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহার আয় হইতে প্রতি বৎসর এই পুরস্কার দেওয়া হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় কৃতজ্ঞতার সহিত এই দান গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ প্রাচীন ভারতীয় রাসায়নিক নাগার্জুনের নামে আচার্য রায় তাহার এই পুরস্কারের নামকরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে রাসায়নিক গবেষণার পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা রায় মহাশয়ের এই দান উপযুক্ত প্রকারের হইয়াছে, এবং নামকরণও উত্তম হইয়াছে।

আয়ল্যাণ্ডের অবস্থা

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আয়ল্যাণ্ডকে বহু পরিমাণে আত্ম-

হৃদয়ে যে উল্লাস উথিত হয়, তাহার উচ্ছ্বাস বর্ণনাই গজলের উদ্দেশ্য।*

কবি গজলকে গানের উপযোগী করিয়াই রচনা করেন। ইহাদের ছন্দভঙ্গীও গীতের উপযোগী। সাধারণ গানের মত গজল কতকগুলি বয়েৎ বা কলিতে বিভক্ত; উহার প্রথম বয়েৎ বা কলিকে মংলা বলে। প্রথম বয়েৎ বা মংলা এগার হইতে সতের মাত্রায় রচিত হয়। গজলের প্রথম কলি বা মংলার দুই চরণের পরস্পর মিল থাকে। কিন্তু মংলার পরবর্তী অষ্টাশ্রু বয়েৎএর দুই চরণেব পরস্পর মিল থাকে না। অপিচ পরবর্তী বয়েৎএর শেষ চরণের সঙ্গে প্রথম বয়েৎ বা মংলাব মিল থাকে। এই প্রকার মিলই ডাক্তাব জেম্‌স বসেব মতে কারশী এবং আরবী কবিতার ছন্দবৈশিষ্ট্য। কাসিদার ছন্দভঙ্গীও গজলের অমুরূপ। ইহারও মংলা বা প্রথম কলির দুই চরণের পরস্পর মিল থাকে এবং পরবর্তী বয়েৎএর দুই চরণের পরস্পর মিল না থাকিলেও গজলের মত শেষ চরণের সহিত মংলার বা প্রথম কলির মিল থাকিবে। ছন্দভঙ্গীতে কাসিদা এবং গজল একরূপ হইলেও বিষয় এবং দৈর্ঘ্যে বিভিন্ন। সাদীর গজলগুলি সাধারণতঃ সৌন্দর্য, প্রেম ও অধ্যাত্মত্ব বিষয়ক। ইহা উচ্ছ্বাস-সংখ্যা দশ বা বারটি পদ বা বয়েৎএর রচিত হয়। কাসিদা সাধারণতঃ স্তুতি, ব্যঙ্গ, ধর্ম, দার্শনিক-তত্ত্ব অথবা নীতিকথা বিষয়ক। গজলের শেষ ছত্রে কবি নিজ তাখাছুস অর্থাৎ ভগিতা সংযোগ করেন।† কিন্তু কাসিদাতে কোনপ্রকার ভগিতা দিবার নিয়ম নাই।

অধ্যাপক ব্রাউন বলেন, পারস্ত এবং ভারতবর্ষীয় কাব্যবসিকগণ আববী ভাষায় রচিত সাদীর কাসিদা-গুলিকে অতি উৎকৃষ্ট রচনার নিদর্শন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু আরবীয় বিদ্বানগণ উহাকে মাঝারি রকমেব রচনা (mediocre performance) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।‡ কবির পারস্ত কাসিদাও অতি

চমৎকার। হাজি নতিফ আলি খাঁ বলেন, শেখ সাদীর কাসিদা, গজল, নীতি-উপদেশপূর্ণ কবিতা ও হাস্য-বসান্বক রচনা কবিহে সৌন্দর্যে সর্বদ্বন্দ্বন্দর ও চরমোৎকর্ষে অমূল্য।*

সাদীর বাইশখানি গ্রন্থের মধ্যে চারখানি গজল-গ্রন্থ।† তন্মধ্যে একখানি খুস্‌বিসায়েৎ খেউড গজল ইব্রাহিম খাঁ ঃ বলেন, সাদীই সর্বপ্রথম পারস্তের গীতি-কুঞ্জের শোভা-সম্পদ বর্দ্ধন করেন। আমীব দৌলত সাহ ঃ বলেন, দিল্লির কবি আমীর খসরু গজল-রচনায় সাদী অপেক্ষা অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। উপরিউক্ত অভিমত সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অধ্যাপক ব্রাউন প্রণীত পারস্ত-সাহিত্যের ইতিহাস ও ডাক্তার জেম্‌স রসের অনুদিত গুলিস্তার ভূমিকা পাঠে জানা

scholars of Arabic speech regard them as very mediocre performances.—Literary History of Persia.

* Sadi's lyrical poems possess neither easy grace and melodious charms of Hafiz's songs nor the overpowering grandeur of Jalaluddin Rumi's divine hymns, but they are nevertheless full of deep pathos and show such a fearless love of truth as is seldom met with in Eastern poetry.—Encyclopaedia Britannica, eleventh edition.

† কবির গ্রন্থসংখ্যা নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে নানা পণ্ডিতের নানা মত আছে। যবানী দেশীয় প্রাচ্যভাবাবিৎ পণ্ডিতদ্বয় De Sacy De Herbelo ও Sir William Jones বলেন বৃন্তী, গুলিস্তার ও মুলুমাত এই পুস্তকত্রয় ভিন্ন শেখ সাদী অন্য কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। Major Stewart তৎপ্রণীত ইতিহাস-বিখ্যাত হুলতান টিপুব রাজকীয় পাঠাগারের তালিকার মধ্যে সাদীব বচিত সতেরখানি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কবির বন্ধু বিসতুন নিবাসী আলি বিন আহমদ ও J. Harrington সাদীর রচিত বাইশখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত Bodlin (Oxford), British Museum (London), India Office (London), Oriental Public Library (Bankipore) প্রভৃতি পাঠাগারে রক্ষিত আবব্য ও পারস্য ভাষার পাণ্ডুলিপিরাতালিকার কবির বচিত বাইশ খানি গ্রন্থের নাম উল্লেখ আছে। আমবা আধুনিক প্রচলিত মত অমুরূপ করিলাম।

‡ ইব্রাহিম খাঁ অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখক ও বাবাণসীব অধিবাসী।

§ দৌলত সাহ পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখক ও খোবাসানিব অধিবাসী। আমিব আলা উদ্দৌলা ইস্‌ফাবানিব পুত্র। তিনি মহম্মে পাণ্ডিত্যে যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি নিরহঙ্কার ও বিনয়ী ছিলেন। তাঁহার তজ্জকিরাতুস্‌ শোয়ারা অর্থাৎ পারস্ত কবিগণের জীবনচরিত পুস্তক অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

* সাহিত্য ১৩১৩ ও Miss Costello প্রণীত Rose Garden of Persia দ্রষ্টব্য।

† অধ্যাপক ব্রাউন অমুরূপ করেন, ষাটশ শতাব্দী হইতে গজলে ভগিতা দিবার প্রথা প্রচলিত হয়।

‡ In Persia and India it is commonly stated that Sadi's Arabic Qasidas are very fine. But

কর্তৃত্ব দিতে বাধ্য হইয়াছেন। যে-সব আইরিশ নেতা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া, নূতন শাসনবিধিতে দেশের কাজ করিয়া চলেন তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু আইরিশ সাধারণতন্ত্রের দলের লোকেরা ভিত্তালের ন্যায় নেতৃত্বে, তাহাদের দেশকে গ্রেট ব্রিটেন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন দেশ দেখিতে চান। এই হেতু, নূতন গবর্ণমেণ্টের দল ও আইরিশ সাম্রাজ্যতন্ত্রের দলে আবার প্রকাশ্য ও গোপন যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। রক্তারক্তি খুব হইতেছে। ইহা সান্ত্বিনীয় পরিতাপের বিষয়।

কোন জাতি যদি তাহাদের দেশকে বিন্দুমাত্রও অন্ধর স্বাধীন দেখিতে না চায়, যদি তাহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইতে চায়, তাহা হইলে এই মহৎ ও স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার জন্ত তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। জগতের লোকে যদি মনে করে, যে, পূর্ণ স্বাধীনতাকামী এই জাতির বিপক্ষে যে শক্তি দণ্ডায়মান, তাহা অপরাধের, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে জাতি যদি আশায় বুক বাঁধিয়া মনে করে যে তাহারা “অসামান্য” সাধন করিতে “অসম্ভব”কে সম্ভব করিতে পারিবে, তাহা হইলেও তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। এই রকম লোকদের দ্বারা ই পৃথিবীর কঠিনতম কাজ সম্পাদিত হইয়াছে ও মানবজাতির বহু উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু আমাদের হৃদয় রক্তারক্তিতে সায় দেয় না। আমাদের মনে কেবল এই আকাঙ্ক্ষার উদয় হইতে থাকে যে, মারামারি কাটাকাটি রক্তারক্তি যুদ্ধ ছাড়া পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার অন্যত্র উপায় আছে, ইহা প্রমাণিত হইয়া গেলে জগতের সমহান উপকার হইবে। জগতের যোদ্ধা শক্তিশালী জাতিরা আমাদের এই রক্তারক্তিবিমুগ্ধতা আমাদের প্রাধান্যতা ও দুর্বলতা হইতে উপায় মনে করিতে পারেন। তা রক্তনামের আমরা-সাহাকে শ্রেয়ঃ মনে করি তাহাকে শ্রেয়ঃ বলিবই। আমরা আইরিশদের পূর্ণ স্বাভাব্য ও আত্ম-কর্তৃত্বের পক্ষপাতী, কিন্তু হিংসাদেহ রক্তারক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী।

আইরিশরাই কেবল প্রতিশোধের রক্তারক্তি করিয়াছে,

বা তাহারা প্রথমে উহার স্বত্বপাত করিয়াছে, ইহা আমরা বলি না; কারণ, ঐতিহাসিক সত্য তাহা নহে। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া আজ পর্যন্ত আয়ারল্যাণ্ডে ব্রিটিশ জাতির অত্যাচারের কাহিনী অতি লোমহর্ষণ। এই জন্য আমরা ব্রিটিশজাতিরও নিন্দা করি। কিন্তু প্রতিহিংসা ও তজ্জনিত পুনঃপ্রতিহিংসার সমর্থন ও প্রশংসা করিতে আমরা অক্ষম।

রেলে মালের ভাড়া

রেলে যাত্রীদের ভাড়া পূর্বেই বাড়িয়াছে, এখন তাহা গরীব তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের পক্ষে অত্যন্ত বেশী হইয়াছে, ইহা সকলেই জানেন, রেলে মালের ভাড়াও বাড়িয়াছে। মালের ভাড়ার হার বেনীতি অনুসারে যে-প্রকারে বাড়ান হইয়াছে, তাহা দেশী পণ্যদ্রব্য ও পণ্যশিল্পের পক্ষে অসুবিধাজনক এবং বিদেশী পণ্যদ্রব্য ও পণ্যশিল্পের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে। তাহাতে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক জিনিষ দ্রুত হইবে। সার্ভেট কাগজে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। রেল কোম্পানীর দায়িত্বে মালগাড়ীতে প্রেরিত ঘীর ভাড়া দ্বিগুণ হইয়াছে। আমাদের এই দৈনন্দিন আহাৰ্য্য জিনিষটি, খাটি অবস্থায় পাওয়া অনেকদিন হইতেই কঠিন হইয়াছে; দামও অত্যন্ত বাড়িয়াছে। এখন উহা আরও দ্রুত হইবে, এবং ভেজালও বাড়িবে। ইহাতে দেশের লোকদের স্বাস্থ্যের অনিষ্ট ও কর্মক্ষমতার হ্রাস হইবে।

দেশী কাপড়সহ এক মণের মাইলপ্রতি কত ভাড়া, বিদেশী কাপড় এক মণেরও সেই ভাড়া স্থির হইয়াছে, যদিও দেশী স্বতার দাম বিদেশী কাপড়ের দাম অপেক্ষা কম। ইহাতে দেশী স্বতা একস্থান হইতে অন্য স্থানে চালান করিয়া দেশেই কাপড় প্রস্তুত করিবার অসুবিধা হইবে; কিন্তু বিদেশী কাপড় দেশের নানাস্থানে চালান করিবার সুবিধা হইবে। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে আবশ্যকমত চরখার স্বতা কাটিয়া তাহা হইতে সেই সেই স্থানেই কাপড় বুনাইলে এই অন্যান্য নিয়মের প্রতিকার হইতে পারে।

পরিস্কৃত চিনি (যাহা বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া) এবং দেশী গুড়ের ভাড়া সমান বাখা হইয়াছে, যদিও



পারস্যের কবি শেখ সাদী

হিউগো, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে যেমন রবীন্দ্রনাথ, পারস্যসাহিত্যে তেমনি কবি শেখ সাদী।

কবি শেখ সাদী দেবতার প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত।* কবি মোলানা হতিকা তাঁহার দিওয়ানে লিখিয়াছেন,— যদিও পৃথগধর মহম্মদ বলিয়াছেন, আমার পব আর কোন পুণ্যধর জয়গ্রহণ করিবে না, তথাপি কবিদের

মধ্যে তিনজন কবি ভগবৎ-প্রেরণায় কাব্য-শাস্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিয়া পৃথগধর রূপে ভক্তি ও পূজা পাইবেন। ফিরোদৌসী বীররস কাব্যে, আনওয়ারী বিষাদসঙ্গীতে, ও শেখ সাদী গজল বা গীতি-কবিতা রচনায় চির অমররূপ লাভ করিবেন।

কবির সর্বতোমুখিনী প্রতিভার উজ্জ্বল-আলোকরশ্মি-পাতে পারস্য-সাহিত্যেব সকল বিভাগই অপূর্ণ শ্রী ধারণ করিয়া ঐজ্জ্বলিকের প্রভাব বিস্তার করে। পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে পারস্য-সাহিত্য নানা ঐশ্বর্যে মণ্ডিত। তন্মধ্যে প্রধানতঃ—(১) হুজা (২) গজল (৩) কাসিদা (৪) তস্বেব (৫) মস্নবী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সম্পদে সমৃদ্ধ। শেখ সাদীর কুশলিয়ার্ অর্থাৎ প্রহ্লাবলীর মধ্যে বৃত্তা, গুলিত্তা ও কয়েক খণ্ড রাশেদা (ধর্মপুস্তিকা) ব্যতীত অবশিষ্টগুলি প্রধানতঃ কাসিদা ও গজল। এগুলি আবব্য ও পারস্য ভাষায় রচিত। শেখ সাদীর সময় হইতেই দিওয়ান অর্থাৎ

গজলকে একত্র করিয়া আদ্য অক্ষর অল্পসারে প্রকাশ প্রথার প্রচলন হয়।* কবির বন্ধু, বিস্তৃত নিবাসী আলি বিন আহম্মদ ৭২৬ হিজরাকে সাদীর গজলগুলিকে দিওয়ানে পরিণত ও ৭৩৪ হিজরাকে সম্পাদন করেন।†

গজল একপ্রকার গীতি-কবিতা অর্থাৎ ইহা শুধু কবিতা নয়, গান ও কবিতা উভয়ই। হুন্দরীর সাহচর্যে গায়কের

* মবসী কবিষয় কবিউদ্দিন আতাব ও জাদী প্রণীত তজ্কিরাতুস্ আউলিয়া ও নাফাৎ-উল-আনাস প্রভৃতি।

দব শায়েরস্তান পায়াম্বাবান্ আম্।

কন্তলিত্ত কে জুমলাগী বরু আঁ আম্।

ফিরোদৌসী উ আনওয়ারী উ সাদী

হুচনন্ কী লা না-বি আদি।

* Catalogue of the Arabic and Persian Manuscripts in the Oriental Public Library at Bankipore, prepared by Khan Saheb Maulvi Abdul Muqtadir, Vol. I, 1908, প্রভৃতি।

† Catalogue of the Arabic and Persian Manuscripts in the British Museum, prepared by Charles Rieu, Vol. II, প্রভৃতি।

উভয়ের মূল্যে অনেক তফাৎ। আমাদের দেশের অনেক ছোটবড় কারখানায় গুড় পত্রিকা করিয়া চিনি প্রস্তুত করা হয়, আকের রস হইতে সাক্ষাৎভাবে চিনি প্রস্তুত করা হয় না। নূতন ‘রেলভার্ডাউ’ এইসব কারখানার অস্থবিধা হইবে, এবং তথায় উৎপন্ন চিনি দুর্মূল্য হইবে।

সুতরাং কাপড় এবং গুড় ও চিনির ভাড়া নির্দেশে বিদেশীর স্থবিধা ও দেশীর অস্থবিধা যে নীতি অনুসারে করা হইয়াছে, গম ও আটা ময়দা এবং তৈলবীজ ও তৈলের ভাড়া নির্দেশে সেই নীতি অল্প প্রকারে প্রযুক্ত হইয়াছে। উক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে দেখা যায়, যে, কাঁচা মাল ও তৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের ভাড়া সমান রাখা হইয়াছে; কারণ তাহাতেই বিদেশীর স্থবিধা। কিন্তু সরিষা প্রভৃতি তৈলবীজ ও গম বিদেশীর স্থবিধার জন্য বিদেশে রপ্তানী করা দরকার, এবং তৎপন্ন তৈল ও আটা ময়দা স্থজি দেশেই দেশী লোকের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন। এইজন্য গম ও তৈলবীজের (অর্থাৎ কাঁচা মালের) ভাড়া আটা ময়দা স্থজি ও তৈলের (অর্থাৎ কাঁচা মাল হইতে উৎপন্ন পণ্য-দ্রব্যের) ভাড়া অপেক্ষা কম রাখা হইয়াছে। এই নজীর অনুসারে স্থতা ও গুড়ের ভাড়া বিদেশী কাপড় ও বিদেশী চিনি অপেক্ষা কম হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তাহাতে যে বিদেশীর অস্থবিধা ও দেশীর স্থবিধা!

২. রেল বিস্তারের জন্য ধান

২. রেলওয়েতে দেশী ও বিদেশী লোকদের একপ্রকার ক্ষতি-নাশ ও স্থবিধা-অস্থবিধার দৃষ্টান্ত উপরে দেওয়া হইয়াছে। রেলওয়ে দ্বারা আমাদের কোনই কার্য-সৌকর্য ও উপকার হয় নাই, তাহা নহে। ইহাতে যাতা-য়াতের স্থবিধা, জিনিষপত্র পাঠাইবার স্থবিধা, ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থবিধা, দেশ দেখিয়া যাব পাঠাইবার ও জ্ঞান বাড়াইবার স্থবিধা, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকদের পরস্পর জানিবার চিনিবার এবং সেই উপায়ে এক মহাজাতি হইবার স্থবিধা, স্বীয়-মনের সংকীর্ণতা দূর করিয়া উদারতা বৃদ্ধি করিবার স্থবিধা, প্রভৃতি হইয়াছে। কিন্তু অস্থবিধা এবং ক্ষতিও হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ও প্রসার বাড়িয়াছে, কোন সংক্রামক ব্যাধির আবির্ভাব দেশে

হইলে তাহা অতি দ্রুত ছড়াইয়া বাইতেছে; বিদেশী পণ্য-দ্রব্য গ্রামের অলি-গলিতে পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, শিল্প ও শিল্পীর ক্রমশঃ তিরোভাব হইয়া আসিতেছে; তাহাতে বহুসংখ্যক লোকের জীবিকা-নির্বাহের কৌলিক পথ বন্ধ হওয়ায় অত্যন্ত অধিক লোককে জমীর ও সাধারণ মজুরীর উপর নির্ভর করিতে হইতেছে; এই কারণে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইয়া আসিতেছে; ইত্যাদি।

বিদেশীদের কিন্তু বেল বিস্তারে স্থবিধাই বেশী। তাহাদের শিল্প বাণিজ্যের ইহাতে খুব স্থবিধা হইয়াছে; রেলওয়ের লোহা ইস্পাতের লাইন, এঞ্জিন, গাড়ী ও অন্তঃনানাবিধ জিনিষ জোগাইয়া তাহারা ধনী হইয়া আসিতেছে; রেলওয়েতে মূলধন পাঠাইয়া বা মূলধন দ্বারা তাহার লভ্যাংশ বা সুদ তাহারা পাইতেছে; রেলওয়ের খুব-মোটো ও অল্প-মোটো বেতনের কাজগুলিতে নিযুক্ত থাকিয়া বিদেশীরা ধনবান হইতেছে; রেলওয়ে দ্বারা খুব সহজে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে দ্রুত ও অধিক সংখ্যায় সৈন্ত পাঠাইবার উপায় থাকায় ভাষ্যতবর্ধকে জয় কবিবার ও অধীন রাখিবার স্থবিধা হইয়াছে।

সুতরাং রেলওয়ের বিস্তারের জন্য বিদেশী গবর্ণমেন্ট ও ব্যবসাদারেরা যে খুব ব্যগ্র থাকিবেন, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। সেই ব্যগ্রতা-প্রযুক্ত ভারত-গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন, যে, বিলাতে দেড়শত কোটি টাকা ঋণ করিয়া এখন হইতে পাঁচ বৎসর ধরিয়া এদেশে রেলওয়ে বিস্তার ও তাহার উন্নতি করিবেন। এ বিষয়ে অনেক কথা বলিবার আছে।

রেলওয়ে বাড়ান অপেক্ষা অনেক বেশী দরকারী কাজ এদেশে আছে। দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য অতি সামান্য চেষ্টা ও ব্যয় করা হয়। তাহার সমুচিত ব্যবস্থা করিয়া তবে রেলওয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল। এখনও শতকরা ৯৪ জন লোক এদেশে নিরক্ষর রহিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেন্টের শিক্ষা-রিপোর্ট অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে ছাত্রপ্রতি বার্ষিক প্রায় ৭ টাকা খরচ হয়। ব্রিটিশ ভারতের মোট অধিবাসীর শতকরা ১৫ জন প্রাথমিক শিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীর উচ্চতম সংখ্যা ধরিলে অবৈতনিক সার্বজনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের ব্যয়

হয়, কীর্তনের সুবিধার নিমিত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালা আকারে পদগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছিল। মহারাজ বীরচন্দ্র নাগিকের পূর্বে ঐরূপ সংগ্রহের চেষ্টা হইবার কথা শুনা যায় নাই,—এবং তৎপরেও এরূপ চেষ্টা হইতে দেখা যায় নাই। সুতরাং উক্ত মহারাজের সময়েই পায়কগণের ব্যবহারার্থ প্রাচীন পুঁথিসমূহ আলোড়ন করিয়া এই খাতা লিপিত হইয়াছিল, আমাদের ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস।

অন্য যে-সকল অপরিজ্ঞাত পদকর্তার নাম ও অপ্ৰকাশিত পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা ক্রমে প্রকাশ করা হইবে। সেই-সকল পদকর্তার বিবরণ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমরা বিশেষ চেষ্টিত রহিলাম।

ত্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যাত্তম

শেখ সাদীর কাসিদা ও গজল

পারস্ত-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে পারস্তের কাব্য-কুঞ্জে তিনজন কবি-পয়গম্বরের আবির্ভাব হয়। কবি শেখ সাদী ইহাদের অন্যতম। পারস্তের কোন কবিই আজ পর্যন্ত শেখ সাদীর মত স্বদেশে কি বিদেশে সম্পূর্ণ হইয়া কবির নিজ উক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারেন নাই।* হাজি নতিফ আলি খা তাঁহার “আতস কাদা” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “পারস্তের কবি-প্রতিভার জাগরণ-কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত এমন কোন কবির আবির্ভাব হয় নাই, যিনি ফিরদৌসী, নিজামী, আনওয়ারী এবং শেখ সাদী, এই কবি-চতুষ্টয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে পারেন। কি প্রাচীন কি আধুনিক যুগের লেখকগণের মধ্যে কবি শেখ সাদী অসাধারণ জ্ঞানী ও প্রতিভাশালী লেখক; বাগ্মিতা ও রচনা-বৈশিষ্ট্যের জ্ঞাত বিখ্যাত চারিজন প্রতিভা-সম্রাটের অন্যতম।”† কবির জ্ঞান, কবিত্ব, অন্তর্দৃষ্টি, অভিজ্ঞতায় মুগ্ধ হইয়া পারস্তের বিখ্যাত বিদ্বান ও লেখক মীর সৈয়দ আলি মশটক কবিকে পরম শ্রদ্ধাভরে “হাজার গানের বুলবুলি” নামে সম্মানিত

করিয়াছেন।* বাস্তবিকই কবির স্থূললিত বাক্যবিন্যাস, শব্দনির্বাচন, সমৃদ্ধ অলঙ্কার-স্বয়মা, ইঙ্গজালময়ী কাব্যমায়ার বিচিত্র বিকাশ, নানা-বিষয়িণী রচনার মধ্য দিয়া পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াই ক্ষান্ত নহে; ভাবের অল্পভূতিতে, উন্মেষণে, মানব-চরিত্র অধ্যয়নে, অভিজ্ঞতায়, চিন্তাশীলতার বিকাশেও তাহা চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সাধারণ পাঠক কবির মধুর কোমলকাস্তপদাবলীর ভাবে নৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হন, কিন্তু ধীশক্তিসম্পন্ন তীক্ষ্ণদৃষ্টি সমালোচক কবির কাব্য-ভাবের প্রবাহ ও অসাধারণ মনীষার পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্য হন। সাদীর রচনাবলী পারস্ত-সাহিত্যের ‘নিমক্-দান’ অর্থাৎ লবণ-ভাণ্ডার নামে সম্মানিত। লবণ অমৃত-বিশেষ অর্থাৎ লবণ ভিন্ন রন্ধনের অন্ত্যস্ত প্রচুর উপাদান সত্ত্বেও যেমন কোনপ্রকার ভোজ্য ব্যঞ্জন স্বস্বাদু, মুখরোচক ও তৃপ্তিকর হয় না, তেমনি শেখ সাদীর রচনাবলী ভিন্ন পারস্ত-সাহিত্য অন্ত্যস্ত লেখকের সুরচিত রচনা সত্ত্বেও অপূর্ণ ও অঙ্গহীন; সাদীর রচনাবলী পারস্ত-সাহিত্য-রত্নহারের উজ্জ্বলতম মধ্যমণি। সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন কালিদাস, ইংরেজী সাহিত্যে যেমন সেক্সপীয়র, জার্মান সাহিত্যে যেমন গেটে, ইতালীয় সাহিত্যে যেমন দান্তে, ফরাসী সাহিত্যে যেমন ভিক্টর

* কবি, বিদ্বান সর্বত্র পূজিত। খাওয়ারিসি প্রস্তব্য। এই উক্তি ও কুশাপ্রবৃদ্ধি চাণক্যের উক্তি একার্থসূচক।

† Prof. Eastwick অনুদিত হাজি নতিফ আলি খা রচিত সাদীর জীবনী গ্রন্থ আতস কাদা ইংরেজী অনুবাদ প্রস্তব্য।

* খোরাসান-নিবাসী বিখ্যাত লেখক আখির দৌলত সাহ প্রণীত ও Prof. Brown সম্পাদিত তজ্জিক্রাতুস্ শোয়ারা প্রস্তব্য।

প্রায় ছাব্বিশ কোটি টাকা হয়। কিন্তু গবর্ণমেন্ট, রেলবিভাগ, সৈনিকদের বরণদ্রব্য, ও সরঞ্জামের উৎকর্ষ সাধন, প্রভৃতি কত কাজে সরকারী রাজস্ব হইতে বা গুণ করিয়া কত কোটি টাকা ঢালিতেছেন, অথচ অবৈতনিক শিক্ষা দিবার কথা তুলিলেই বলেন, টাকা কোথায়, তোমরা! নূতন টান্স-মেশিন টাকা তুলিয়া ঐ কাজে হাত দাও। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্ত ব্যয় করিতে বলিলেও ঐ একই জবাব পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মত, জনসেচনের ব্যবস্থা ও অগ্রাঙ্ক উপায়ে কৃষির উন্নতি, অরণ্যসকলের সংরক্ষণ ও উন্নতি, জনপথসকলের রক্ষা উন্নতি ও বিস্তৃতি, আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে পণ্যব্যবসকল উৎপাদনের নিমিত্ত শিক্ষাদান, মূলধন-প্রাপ্তির সুযোগবিধান, কারখানা স্থাপন, প্রভৃতি কত কাজ আছে, যাঁহা রেলওয়ের আগে বা অন্ততঃ সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে মনোযোগ ও অর্থব্যয়ের দাবী করিতে পারে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের সে দিকে দৃষ্টি নাই। কারণ ইহা বিদেশী গবর্ণমেন্ট।

রেলওয়ের আবশ্যক সর্বত্রই বলিয়া মানিয়া লইলেও তাহার জন্ত মূলধন গুণ ভারতবর্ষে না করিয়া বিলাতে কেন করা হইতেছে? উহার সুদ যখন ভারতীয় রাজকোষ হইতেই দিতে হইবে, তখন ভারতীয় ধনীরা ঐ গুণ দিয়া সুদটা পান, ইহাই তো স্বাভাবিক ও গ্রাহ্যদ্রব্য। ভারতবর্ষ হইতে গুণ পাওয়া না গেলে বিদেশে যেখানে সর্বাপেক্ষা সস্তা সুদে টাকা ধার পাওয়া যায়, সেখানেই ধার চাওয়া উচিত। ইউরোপের সকল দেশই এখন গুণী দেশ; গ্রেটব্রিটেনও গুণী দেশ। কেহই আমেরিকার প্রভুত গুণ শোধ করিতে পারিতেছে না। অধর্ম দেশের লোকদের চেয়ে উত্তম দেশের লোকদের নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত সস্তা সুদে টাকা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু উচ্চ সুদটা ইংরেজ ধনীদিগকে দেওয়া দরকার বলিয়া বিলাতেই গুণ করা হইতেছে।

তাহার পর, গুণ করিয়া সেই টাকার রেলওয়ের জিনিষ বেশীর-ভাগ বিলাতেই কেনা হইবে। কিন্তু লোহার রেল-আদি ভারতেই অপেক্ষাকৃত কম দরে টাটা কোম্পানী দিতে পারে। যুবরাজের ভ্রমণের চমৎকার গাড়ী যখন ভারত-

বর্ষেই প্রস্তুত হইয়াছে, তখন মালগাড়ী ও সাধারণ যাত্রী-গাড়ীও এখানে নিশ্চয়ই হইতে পারে। যদি এদেশে নাও হয়, তাহা হইলেও, ইহা জানা কথা, যে, রেলওয়ের উৎকৃষ্ট সব জিনিষ বিলাত অপেক্ষা অন্য কোন কোন দেশে সস্তায় পাওয়া যায়। সেই-সব দেশে কেন কেনা হইবে না? ইহা সম্প্রষ্ট যে বিলাতের লোকদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভারতবর্ষের ক্ষতি নানা প্রকারে করা হইতেছে।

রেলভাড়া ও রেলের ব্যয়

রেলভাড়ার বর্তমান উচ্চতার একটা এই কারণ দেখান হইতেছে, যে রেলওয়ে চালাইবার খরচ যুদ্ধের আগে অপেক্ষা বাড়িয়াছে। কিন্তু ভারত স্বাধীন হইলে খরচ খুব কমান যাইত। উচ্চতম ও উচ্চতর চাকরীগুলির বেতন অত্যন্ত বেশী; তাহাতে উপযুক্ত ভারতীয় কর্মচারী রাখিলে খরচ অনেক কমিত। বিলাতে উচ্চ সুদে টাকা ধার না করিয়া অন্যত্র কম সুদে টাকা ধার করা চলিত। চড়া দামে বিলাতী রেলওয়ে-সামগ্রী না কিনিয়া অন্যত্র সস্তাভিত্তি উৎকৃষ্ট জিনিষ কিনিলে ব্যয় অনেক কমিত। এদেশে পুর্বেকার বা এখনকার রেল-ভাড়া আমেরিকার বা বিলাতের রেল-ভাড়া অপেক্ষা কম; ইহা বস্তুতঃ মিথ্যা কথা। আগের কত অংশ ব্যয় করিয়া কোন দেশের লোক কি জিনিষ বা সুবিধা পাইতে পারে, তাহার তুলনা করিয়া দেখিলে তবে বলা যায়, কোন দেশে কোন জিনিষ বা সুবিধা কম ব্যয়ে বা বেশী ব্যয়ে পাওয়া যায়। সার্ভেট কাগজে রেলওয়ে বোর্ডের প্রকাশিত একটি বহি হইতে একট মত উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে, যে, ১৯০৩ সালে আমেরিকার একজন মজুর তাহার একদিনের মজুরী ব্যয় করিয়া রেনে-ফার্ট মাইল যাইতে পারিত, কিন্তু ভারতবর্ষে ঐ শ্রেণীর একজন মজুর একদিনের মজুরী খরচ করিয়া চৌদ্দ মাইলের বেশী রেল যাইতে পারে না।

খাদ্যাদ, প্রচলনের-চেষ্টা ও বিদেশী

সুতা ও কাপড়ের আমদানী ১৯২০-২১ সালের মে এগার মাসে ফেব্রুয়ারীতে শেষ হয়, তাহাতে ১১২ কোটি টাকার সুতা ও কাপড় ভারত-

পুলকিত তম্ব মোর সম্মুখে নারি ।
যে জন বাজালে বাঁশী দাস হব তারি ।
সুবল লইয়া কান্না ক্ষতগতি চলে ।
চন্দ্র বেড়িয়া তারা আছে তরুতলে ॥^২
তটস্থ হইয়া শ্রাম দাঁড়াইয়া রহে ।
জগতমোহিনী রূপ পূর্ণানন্দ কহে ॥^৩

(২)

কাতর হইয়া পুছে রসময় শ্রাম,
তোমার নাম কহ, গোরে পরিচয় দেহ—
কোন জাতি, কোথা নিব্ব ধাম ॥
আমি থাকি এই বনে, চরাই সব ধেনুগণে,
কছু তোমায় না পাই দেখিতে ।
বসাই দাদার সঙ্গে থাকি, তোমায় কখন নাহি দেখি,
সন্দেহ লাগয়ে মোর চিতে ॥
এত শুনি কহে গৌরী, শুন হে নন্দের হরি,
তোমাকে দিব পরিচয় ।
প্রেম নাম আমি ধরি, বাসপুর মধুপুরী,
মাতা মোর তব পূজা হয় ॥

(২) চন্দ্র—শ্রীরাধিকা, তারা—সখীগণ ।

(৩) তটস্থ—নিকটবর্তী ।

(৪) শেখরদাসের ভণিতাযুক্ত একটি পদের প্রথমংশ অন্তরূপ হইলেও শেষাংশ ঠিক এই পদটির অনুরূপ । পদাবলী-সাহিত্যে একাধিক ব্যক্তির ভণিতাযুক্ত একটি পদ, অথবা সামান্যরূপ পরিবর্তিত একটি পদে একাধিক ব্যক্তির ভণিতা প্রযুক্ত হইবার দৃষ্টান্ত বিরল নহে ; ইহার কারণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । শেখরদাসের পদটি এস্থলে উদ্ধৃত হইল । পূর্ণানন্দের পদ অপেক্ষা এই পদটি বিস্তৃত এবং সম্পূর্ণ-ভাবব্যঞ্জক ।

রাবার বাঁশীর স্বরে গগন ভেদিল ।
শুনি শ্রাম নাগর অমন অধৈর্য হইল ।
দূর হতে হৃদয় শুনিতে পাইল কাণ ।
বাখালে কহিছেন কিরাসে আন ধেনু ।
শুনিয়া বেণুব ধনি নটবর শ্রাম ।
চিত চমকয়ে হরে অবশে বহান ॥
এক অপরাধনি শুনিলাম অবশে ।
এমন বেণুব ধনি হানিল পবাশে ॥
পুলকিত তম্ব মোর সম্মুখে নারি ।
যেজন বাজালে বাঁশী দাস হব তারি ॥
সুবল লইয়ে কাণ ক্ষতগতি চলে ।
চন্দ্র বেড়িয়া তারা আছে তরুতলে ॥
তটস্থ হইয়া শ্রাম দাঁড়াইয়া রহে ।
জগতমোহিনী রূপ দাস শেখর কহে ॥

তোমার প্রিয় মাতা যে, আমাবও পূজা দে,
সে জন আমার হয় তাতে ।^১

আমার বন্ধু যেই জনে, তাহারে সকলে জানে,
দাস পূর্ণানন্দ ভাবে চিতে ॥

(৩)

ফিবাঠিতে কর নারে গিরিধব,
আকুল হইল শ্রাম ।
চেখে নত পানে দেখে রাই-চরণে
লেখা আছে শ্রাম নাম ॥
অন্ধের পরশে নাগর হরিষে
বুঝিল রাইয়ের কাজ ।
যত সখীগণ গেল অন্ত বন,
মিলয়ে নিকুঞ্জ মাঝ ॥
কাতর ভাবে হরি ছুই কর জুড়ি
কহে শুন প্রাণেশ্বরী ।
তোমার মহিমা বেদে নাহি সীমা
নাহি জানে হর গৌরী ॥
বাই বলে শ্রাম, মোর নিবেদন,
তোমা না দেখিলে মরি ।
দব তেমাগিয়া দেখিলাম আসিয়া
নটবর-বেশ-ধারী ॥
সজ্জের সজ্জিয়া মিলিল আসিয়া
রাধিকা কাণুর কাছে ।
প্রেম সমাধিয়া আনন্দে চলিলা,
কহে পূর্ণানন্দ দাসে ॥

উদ্ধৃত পদগুলি যে খাতায় পাওয়া গিয়াছে, সেই খাতা-
খান। কোন সময়ের লিখিত, জানা যায় নাই । রসজ্ঞ বৈষ্ণব
কবি ও সাহিত্যস্বরাগী স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্য
বাহাদুরের সময়ে বিস্তর প্রাচীন গ্রন্থ সংগৃহীত ও প্রচারিত
হইয়াছিল । তৎকালে আগরতলায় প্রাচীন পদাবলী
চর্চাও পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল । মনোহরসাই কীৰ্ত্তনের
নিমিত্ত কতিপয় স্বেচ্ছাসিক দরবারে নিযুক্ত ছিলেন । খাতাব
সংগৃহীত পদগুলি নানা ব্যক্তির রচিত হইলেও, ঘটনাব
শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া সম্মিলিত হইয়াছে, দেখিলে মনে

(১) ইহাব তাৎপর্য্য কিছুই বুঝা গেল না ।

আমদানী হইয়াছিল। ১৯২১-২২-এর ঐ এগার মাসে আমদানী মূল্য ও কাপড়ের মূল্য ৫৭ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। পাদার প্রচলনের চেষ্টা এই হ্রাসের একমাত্র কারণ না হইলেও একটি কারণ নিশ্চয়ই বটে।

বঙ্গ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত যাহারা অন্যত্র চরখা, হাতের তাঁত ও পাদার চালাইবার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহারারা বুঝা চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

বঙ্গের নূতন লাটের প্রথম কাজ

বঙ্গের নূতন লাট তাঁহার এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, বে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নাগজুরী ছুটি বরাদ্দ তাঁহার নিজের আইনসম্মত ক্ষমতা অনুসারে গঞ্জর করিতে তিনি বাধ্য হইবেন। আমাদের বিবেচনার সভ্যকে এই প্রকারে বার বার অপদস্থ না করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিলে ভাল হইত। লর্ড বোনাল্ডশের আমলেও কিছুদিন আগে ব্যবস্থাপক সভার গৃহীত একাদিক প্রস্তাব অনুসারে গবর্ণমেন্ট কাজ করেন নাই। ব্যবস্থাপক সভাগুলির ক্ষমতা ও মর্যাদার পরিমাণ ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে।

গবর্ণমেন্টের ঋণ করিবার ক্ষমতা

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাদ্বয়ের মত না লইয়া বা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুমতিক্রমে টাকা দাব করিবার ক্ষমতা ভারত-গবর্ণমেন্টের নতদিন থাকিবে, ততদিন বঙ্গের আলোচনা এবং গঞ্জুরী না-গঞ্জুরী ব্যাপারটা প্রহসনের মত বোধ হইতেছে। খাটি স্বরাজের মধ্যে একপ ভেজাল একটুকুও থাকিতে পারে না। একটুকুও মেকি কিছু থাকিলে তাহা স্ববাক্যনামের যোগ্য নহে।

জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

চট্টগ্রামের কবি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্তের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে এবং অন্য নানাবিধ বিষয়ে প্রায়ই কবিতা লিখিতেন, এবং তৎসমুদয় মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইত। তাঁহার দেহ স্বস্থ

সবল ছিল না, তাহাই তাঁহার অকালমৃত্যুর কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

পণ্ডিতা রমাবাদী সরস্বতী

পণ্ডিতা রমাবাদী সরস্বতীর মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন প্রধান বিদুষী এবং কর্মিষ্ঠা জনহিতসাধিকা মহিলার সেবা হইতে বঞ্চিত হইলেন। মহারাষ্ট্রেব কেদগাঁওয়ের নিকট স্থপ্রতিষ্ঠিত “মুক্তি” নামক পল্লীতে তিনি প্রায় দেড়হাজার বিধবা নারী ও অনাথ বালিকাকে প্রতিপালন করিতেন এবং ধর্ম ও সাধারণ শিক্ষা দিতেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত গত ১৩২৮ সালের শ্রাবণ মাসের প্রবাসীর ৫৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উত্তর-ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য-সন্মিলন-

সংস্থাপক সমিতি

লক্ষ্মী-প্রবাসী শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন, শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতির নেতৃত্বে “উত্তর-ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য-সন্মিলন-সংস্থাপক সমিতি” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্গের বাহিরে উত্তর-ভারতে ধে-ধে-স্থানে বান্ধালী আছেন, তাহাদের মধ্যে বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের অন্তর্শীলন বৃদ্ধি, ইহাদের মধ্যে বাহা বা সাহিত্যমুরাগী তাহাদের পরস্পরের ভাববিনিময়, প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ইহা স্থাপিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য মহৎ। আমবা ইহার সমর্থন কবিতেছি।

নারীশিক্ষাসমিতির কার্যক্ষেত্র বিস্তার

নারীশিক্ষাসমিতি বিধবা ও অন্য সহায়হীনা নারী-দিগকে শিক্ষা দিবা নিজ নিজ জীবিকানির্বাঁহে সমর্থ করিবার নিগিত একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন কবিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহার খুব প্রয়োজন আছে। সর্বসাধারণ এই উদ্দেশ্য-সাধনে সমিতিতে আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্যে দিলে সাতিশর আত্মাদের বিষয় হইবে।

নারীশিক্ষাসমিতি ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় গৃহে বালিকা ও মহিলাদিগকে বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি নানাবিধ অর্থকর

একপ আকারের মসজিদ সচরাচর কোথাও দেখা যায় না। বাগদাদ রেল-স্টেশন হইতে এখানে বাইতে মাত্র সাত-আট মিনিট লাগে। যে জায়গায় মসজিদটি অবস্থিত সেখানকার নাম বাবু-এল-শেখ। মসজিদেব ভিতরে হিন্দুদের যাইবার অধিকার নাই। তবে বাহির হইতে মসজিদের বাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অতি চমৎকার। ইহার উপরকার শিল্প ও কারুকার্য বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। ১৯২০ সালের অশান্তির সময় প্রায়

দশ-বারো হাজার বেতুইন একসঙ্গে গোপনে ইহার ভিতর সভা করে, এবং তাহাব পবেই লড়াই বাধে।

হামিদ পাশা বাগদাদের আর-একজন প্রধান লোক। ইনি রাজ্যের আভ্যন্তরিক ব্যাপাবের কর্তা। ১৯২০ সালে অশান্তির সময় ইনি ইংরেজের ঘেষ্টে সাহায্য কবিয়াছিলেন। লেখক ইহার বাড়ীতে অনেকদিন অতিথি ছিলেন। ইনি সচরিত্র ও খুব মিশ্রক।

বাগদাদ

শ্রীহরিপদ তেওয়ারী

এক অপরিজ্ঞাত বৈষ্ণব কবি

অনেকদিনের কথা, আগরতলা বীরচন্দ্র লাইব্রেরীর কীটদষ্ট বিস্তর গ্রন্থ ও কাগজ রক্ষার অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় জ্বালাইবার নিমিত্ত শুপাকারে রাখা হইয়াছিল। একদিন সেই আবর্জনা-শুপ উপর উপর ঘাটিয়া একখানা হস্তলিখিত খাতা পাইলাম; তাহাতে কতকগুলি বৈষ্ণব-পদাবলী লিখিত ছিল।

অল্পদিন হইল, আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখা গেল, তাহাতে কতিপয় অপরিজ্ঞাত পদ এবং কয়েকটি পদে অপরিচিত পদকর্তার ভণিতা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তদর্শনে কোতুল্লাবিষ্ট হৃদয়ে অল্পসম্মানে প্রবৃত্ত হইয়া পদকল্পতরু প্রভৃতি যে-সকল মুদ্রিত পদাবলীগ্রন্থ আলোচনা করিবার স্বযোগ ঘটিয়াছে, তাহাতে ঐ-সকল পদ অথবা পদকর্তার নাম পাই নাই; এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থেও তদ্বিষয়ক কোন কথার উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। 'বঙ্গীয় কবি' গ্রন্থ প্রণয়ন উপলক্ষে আমরা যে-সকল বিবরণ ও কাগজপত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা আলোচনা করিয়াও কিছু পাওয়া গেল না।

পরিশেষে, আগরতলা রাজগ্রন্থাগারে রক্ষিত হস্তলিখিত বহু প্রাচীন গীতকল্পতরু, গীতচন্দ্রোদয় ও পদায়তসিদ্ধ প্রভৃতি অপ্রকাশিত গ্রন্থনিচয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া পূর্বোক্ত খাতায় সন্নিবিষ্ট কোন কোন পদ ও ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। প্রাপ্ত খাতায় যে-সকল অপরিজ্ঞাত কবির নাম পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে পূর্ণানন্দ দাস

একজন। ভণিতায় উল্লিখিত নাম ব্যতীত আমরা পূর্ণানন্দের কোনরূপ পরিচয় বা বিবরণ পাই নাই। এই-সকল বিবরণ জানিবাব আশায় কোন কোন বৈষ্ণব-সাহিত্যগ্রন্থাগারী ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারস্থ হইয়াছিলাম; তাহাবা জানাইবাছেন, তাহারা অতাপি পূর্ণানন্দের অথবা তাহার বচিত পদাবলীর সন্ধান পান নাই।

আমরা 'পূর্ণানন্দ' ভণিতায়ুক্ত দুইটি ও 'পুণ্যানন্দ' ভণিতাব একটি পদ পাইয়াছি। পূর্ণানন্দ ও পুণ্যানন্দ অভিন্ন ব্যক্তি, লিপিকরপ্রমাদে নামেব এবিধ পার্থক্য ঘটিয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস, কিন্তু এই বিশ্বাস অশ্রান্ত কি না, বলিবাব বা বুঝিবার উপায় নাই। যে তিনটি পদ পাইয়াছি তাহা উদ্ধৃত কবিয়া, পাঠক ও বিশেষজ্ঞগণেব হস্তে স্থিরসিদ্ধান্তেব ভাব অর্পণ করা ব্যতীত গতাস্তর দেখিতেছি না। পদগুলি এই :—

(১)

শুনিয়া বেণুর ধ্বনি নটবর-শ্রাম।

চিত চমকিবে হরে শ্রবণে বদান ॥

এ কি অপকৃপধ্বনি শুনিলাম শ্রবণে।

এমন বেণুর ধ্বনি হানিল পবাণে ॥

(১) হবে শ্রবণে বদান—বাণীর বব শ্রবণে কর্তৃ এত তলাত হইয়াছে যে তদ্রূপ বদনেব ক্রিয়া বহিত হইয়াছে, অর্থাৎ নিকট হইয়া বাণী-ধ্বনি শুনিতেছে।

কার্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই চেষ্টা প্রশংসনীয়।

সঙ্গীত সংঘের শাখা

অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গীত শিক্ষার বন্দোবস্ত আমাদের দেশে অল্পই আছে। সঙ্গীত সংঘ বহু বৎসর ধরিয়া এই

অভাব কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি সংঘ কলিকাতার উত্তর অঞ্চল নিবাসী গৃহস্থদিগের হৃবিধার জন্য ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে একটি শাখা খুলিয়াছেন। সঙ্গীত শিক্ষার্থিনীদের ইহাতে খুব সুবিধা হইবে।

চিত্র-পরিচয়

আমাদের মুখপাত ছবিগানি অঙ্কটা-গুহার একটি প্রাচীর-চিত্রেব নকল। ছবির বিষয় হইতেছে—বুদ্ধদেব তপস্যায় বোধি লাভ করিয়া পিতৃরাজ্য কপিলবাস্তুতে ফিরিয়া আসিয়াছেন; তিনি রাজ্যান্তঃপুরে আসিয়া দেখিলেন তাঁহার পত্নী যশোধরাও পতির সন্ন্যাস গ্রহণের সংবাদ শ্রবণ করা অবধি কাষায়-বস্ত্রধারিণী সন্ন্যাসিনী হইয়া কুচ্ছত্রত পালন করিতেছেন। যশোধরা স্বামীকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন, বুদ্ধদেব তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। তখন যশোধরা পুত্র রাহুলকে বলিলেন—‘বৎস, বাও, তোমার পিতার নিকট হইতে তোমার পিতৃধর্মের উত্তরাধিকার চাহিয়া লও।’ শিশু রাহুল বহু সন্ন্যাসীর মধ্যে পিতাকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘মা, কোন্ জন আমার পিতা?’ যশোধরা পুত্রের প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া বলিলেন—‘বহু

পুরুষের মধ্যে পুরুষোত্তম যিনি, তিনিই তোমার পিতা— তাঁহাকে তুমি চিনিয়া লও।’ রাহুল দেখিয়া দেখিয়া বুদ্ধদেবকেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ স্থির করিয়া তাহার কাছে গিয়া প্রার্থনা করিলেন—‘পিতা, আমার পিতৃধর্মের উত্তরাধিকার আমাকে দান করুন।’ তখন বুদ্ধদেবের ইচ্ছিতে আনন্দ একখানি কাষায় উত্তরীয় রাহুলের অঙ্গে বেষ্টন করিয়া দিয়া রাজপ্রাসাদের মধ্যে রাজ্যের পৌত্রের হাতে সন্ন্যাসীর ভিক্ষাপাত্র দান করিলেন। তার পর আনন্দ বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘প্রভু, শিশুর মাতাকেও কি প্রসাদ বিতরণ করিবেন?’ তখন বুদ্ধদেব বলিলেন—‘আমার ধর্ম নরনারী সকলের জন্তই।’ যশোধরা দীর্ঘ বৈধব্যের অবসানে আনন্দিত হৃদয়ে পতির সহিত প্রব্রজ্যা স্বীকার করিলেন।

চাক

পুস্তক-পরিচয়

মতিচূর—বিসিস্ আর, এস, হোসেন। ৮৬ পৃষ্ঠার মার্কিউলার রোড, কলিকাতা। ছই টাকা।

বইখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। ‘ডেলিশিয়া-হত্যা’ গুবই ভাল করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

লেখিকার ভাষা বেশ সহজ-এবং সরল, তাহাতে অনাবস্থক পাণ্ডিত্য বা ভাবের ক্ষেণ নাই। এইজন্যই পুস্তকখানি পড়িতে আরো ভাল লাগিয়াছে।

ঐশ্বর্য্য—ঈদ্রানকীবল্লভ বিশ্বাস। গুণদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। ছই টাকা।

সামাজিক উপন্যাস। বইখানি উপন্যাস হিসাবে গুব ভাল নাই হইলেও একেবারে বাজে নয়। প্রায়ের চিত্রগুলি ছ-এক জায়গায় বেশ ভালই ফুটিয়াছে। বইখানি আমাদের মন্দ লাগে নাই। বাঁধাই ও ছাপা ভাল।

ঐশ্বর্য্যকীট



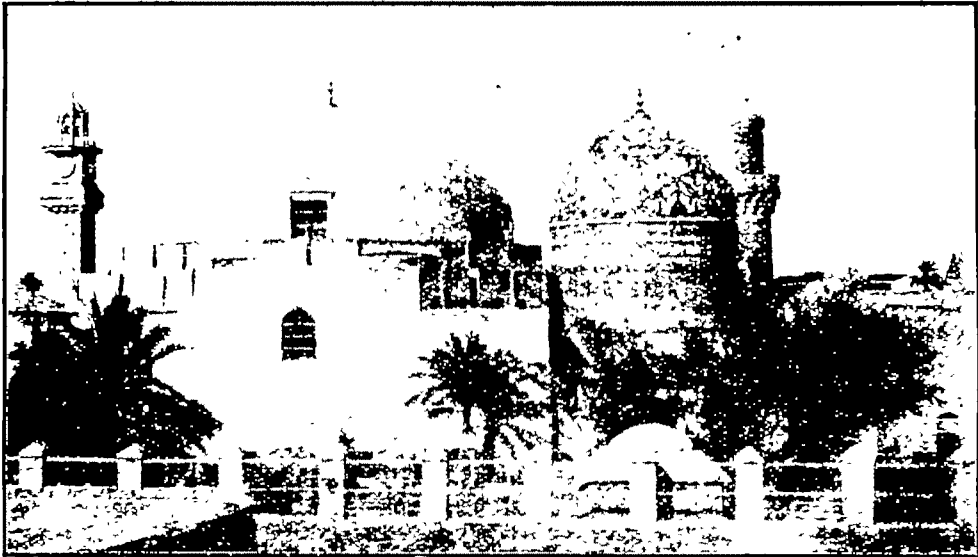
আব্দুল কাদির জিলানি মসজিদ—বাগ্দাদ

মোট্টেই মদের দোকান থাকিবে না। নৈতিক উন্নতি বিষয়ে তাঁহার এই সং-চেষ্টা প্রশংসনীয়। তাঁহার এই চেষ্টার ফলও খুব ভাল হইয়াছে। আগে বাগ্দাদে ১২০ টি দেশী ও বিলাতী মদের দোকান ছিল; এখন তাহার জায়গায় ২০২১খানি মাত্র দাঁড়াইয়াছে। থিয়েটার ছিল ৮৯টা, এখন প্রায় সমস্তই বন্ধ।

এই প্রসঙ্গে বাগ্দাদের কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য বাড়ী, ও দরবারের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির কথা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এখানকার দরবারগৃহ Clock Tower বা Serai Building নামে প্রসিদ্ধ। পূর্বে ইহা তুর্কীর রাজপ্রাসাদ ছিল। টাইগ্রীস নদীর উপরে ইহা অবস্থিত। এই প্রাসাদটি এত প্রকাণ্ড যে ইহাব ভিতরে একসঙ্গে পাঁচ ছয় হাজার লোক জমায়িত হইতে পারে। তুর্কী জাতি যে বনিবাদী ও বিলাসী তাহা এই বাড়ী দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়।

সৈয়দ ইমানী আলি বাগ্দাদেব একজন প্রসিদ্ধ শেখ। ইহাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট। মক্কা শবীফের রাজাব পরই ইহার আসন। ইনি আবার সূন্নিদের মসজিদ আব্দুল কাদির জিলানীর মালিক। ইনি আমীর ফয়জলের রাজ-পুরোহিত।

আব্দুল কাদির জিলানী মসজিদটি এত বড় যে



আব্দুল কাদিরের গোর—বাগ্দাদ

পুরস্কার ২৫০০০ পাঁচশ হাজার টাকা।

১৩২৯ সনের “সাহিত্য” গ্রন্থ প্রকাশকবর্গের মধ্যে বিতরিত হইবে।

১৩২৮ সালের ১ম অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০০ গ্রন্থক পুরস্কার পাইয়াছেন।

১ম পুরস্কার নগদ ১০০০০	হিসাবে	১টা,	২য় পুরস্কার নগদ ৫০০০	হিসাবে	১টা
৩য় " " ১০০০	"	১টা,	৪র্থ " " ২৫০	"	৫ টা
৫ম " " ১০০	"	৫০০টা	৬ষ্ঠ " " ৫০	"	৩৬৮০টা

মোট পুরস্কার ৪.৩৩ টা।

সচিত্র।

ব্রহ্মদাকার বিরাট মণ্ডুর

১০ খণ্ড।

সাধনা

সচিত্র।

সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দুমৌলমানের

অপূর্ণ সম্মিলন।

সম্পাদক—প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সরকার ও মৌলভি আব্দুর রশিদ সিদ্দিকী।

১৩২৯ সনের বৈশাখ হইতে ৪র্থ বর্ষে পদার্পণ করিবে, এবং দশ ভাগে অভিনব সাজে রং বেরংয়ের চিত্রকলায় সুশোভিত হইয়া প্রকাশিত হইবে।

- ১ম ভাগ প্রবাহিনী—সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু গবেষণামূলক গ্রন্থ।
- ২য় " উপকল্প—উপন্যাস, নব্যন্যাস, ছোট গল্প, কথিকা, প্রভৃতি উপকথা।
- ৩য় " হৃদয়ভাষ্য—বঙ্গের বিখ্যাত কবিবর্গের কাব্য, কবিতা, সম্রাট, খরলিপি প্রভৃতি।
- ৪র্থ " প্রতিধ্বনি—বাংলার এসিদ্ধ এসিদ্ধ মাসিক দৈনিক প্রভৃতি কাগজ হইতে সার প্রবন্ধাদি চয়ন করা হইবে।
- ৫ম " সন্দেশ—প্রশ্নোত্তর, সম্পাদকের বৈঠক, রঙ্গ-বাক্য, কোড়াক, চুটকি প্রভৃতি আমোদজনক বিষয়ের সমাবেশ হইবে।
- ৬ষ্ঠ " আদ্যম জীবন—ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্প, কলা, কৃষি, জীবজগৎ, জীবপ্রকৃতিপ্রণালী, স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হইবে।
- ৭ম " সংস্কার—রাজনৈতিক সমাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক আন্দোলন আলোচনা।
- ৮ম " নবীন জীবন—এই ভাগে নতুন লেখকদিগের গ্রন্থাদি সংশোধিত হইয়া প্রকাশ করা হইবে।
- ৯ম " সংবাদ—পুরা এক মাসের সমস্ত পৃথিবীর আবহাওয়ার সংবাদাদি থাকিবে।
- ১০ম " মহিলা-দর্পণ—নারীর কথা, নারীর বাণী, নারীর আশা, নারীর ভাবা, নারীর লেখা, প্রভৃতি নারীর শিক্ষা, প্রভৃতি বিষয়ে থাকিবে।

এই দশভাগের প্রতিভাগই অন্যান্য সাধারণ এক-একখানা মাসিক পত্রিকার সমতুল্য।

এহেন সর্ববিধরসবলিত নূতন ধরণের বৃহৎ মাসিক বাহাতে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে শোভা পায়, এতদুদ্দেশ্যেই এই পুরস্কারের বিরাট আয়োজন করা হইয়াছে। বাধিক মূল্য ভাষ্যরচনায় ৫ পাঁচ টাকা। ২০শে বৈশাখের মধ্যে যিনি মনিষডারে টাকা পাঠাইয়া গ্রন্থক হইবেন, তিনি ৫ টাকা পাইবেন। পরে ৫ টাকা করিবে কাহাকেও গ্রন্থক করা হইবে না। অতএব সকলেই তৎপর হউন।

ঠিকানা—ম্যানেজার ‘সাধনা’, ৫নং কলুটোলা লেন, কলিকাতা।

নূতন মাসিক পত্র

সরনী

বাৎসরিক মূল্য সভাক ২৥০ টাকা

সম্পাদক—শ্রীমুখা কান্ত রাসচৌধুরী

প্রাপ্তিস্থান—পোঃ শান্তিনিকেতন, জিঃ বীরভূম।

সরনী যে অল্পমূল্যের উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র তাহা অগ্রহায়ণ সংখ্যা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। নাগপুর, কানপুর, লক্ষৌ, বধে, দিল্লী, বর্ধা প্রভৃতি স্থানে ইতিমধ্যেই ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে অতি শীঘ্র ঐ সব অঞ্চলে প্রকাশী বাঙ্গালীদের মধ্যে ইহার প্রচার অধিকতর হইবে। গ্রন্থক সংখ্যা আরো দুই শত হইলে ইহার কলেবর বৃদ্ধি করা হইবে। বাহাতে ছোট গল্প, কথানাট্য বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ও নানাবিধ চিত্তাকর্ষক রচনা “সরনীতে” স্থান পায় সে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। টাকাকড়ি চিঠিপত্র সম্পাদকের নামে শান্তিনিকেতনে পাঠাইতে হইবে। ১০ পয়সার মূল্যের ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে নমুনা কাপি পাঠান হয় না। নূতন লেখকগণ সরণীর লেখক সভায় হইলে তাঁহাদের কাঁচা লেখাও সংশোধন করাইয়া ছাপান হয়। লেখক সভা হইবার জন্য অর্ধ আনার ষ্ট্যাম্পসহ সম্পাদককে পত্র লিখুন—বিস্তৃত বিবরণ পাইবেন।



রাঙ্গা ফয়জলের খাস দরবার। ছবিব বাঁ দিক হইতে—হাই কমিশনার, হামিদ পাশা, হাই কমিশনারের সেক্রেটারী, বাঙ্গা ফয়জল, বাঙ্গাব দেওয়ান, ইবাক্ জাতীয় সৈন্যদলের সেনাপতি এবং প্রধান সেনাপতি



বাগদাদে ভাবতবাসী—বাঁ দিকের দ্বিতীয় মিঃ এইচ তেওয়ারীর সৌজন্যে আমবা বাগদাদের চিত্রগুলি মুদ্রিত করিবার জন্য পাইয়াছি

রেশমী ও মটকা কাপড় প্রস্তুতকারক
পদ্মানন সিংহ ক্যান্ট্রী
পোঃ মালদহ, বেঙ্গল।

ভিঃ পিঃতে মাল পাঠাই। অপছন্দে ফেরৎ লই।

গরম চাদর ১০ হইতে ২০; গরম লাল ও কাল পাড়ের ধুতি ১৫ হইতে ২২; গরম লাল ও কাল পাড়ের শাড়ী ১৮ হইতে ২৫; গরম ধান ৪০ ইং X ১০ গজ ৩৫ হইতে ৪৫; গরম কুমাল ১ হইতে ৩ টাকা। মটকা চাদর ১০ হইতে ১৮; মটকা ধুতি ও শাড়ী ১০ হইতে ১৫; মটকা ধান ৩৬ ইং X ১০ গজ ২৪ হইতে ৩৫ টাকা। ইহা ব্যতীত কেটে, তুসর, এণ্ডি প্রভৃতি কাপড়ও পাওয়া যায়।

Rammohun Roy and Modern India

By Ramananda Chatterjee

With a portrait of Rammohun Roy in colours after the oil-painting
by Briggs in Bristol Council Chamber.

Price Eight Annas, Per V. P. P. 13 Annas.

The Evolution of Japan and Other Papers

By Lala Lajpat Rai

Price Re. 1 ; per V. P. P. Re. 1-6.

Second Edition. Revised and Somewhat Enlarged.

The United States of America

A Hindu's Impressions and a Study

By Lala Lajpat Rai

Cloth. Gilt-lettered. Pages 475 + XII. Price Rs. 4 ; Postage and Packing Extra.

আমীর ফয়জল

আমীর ফয়জল ইংরেজ-রক্ষিত বর্তমান মেসোপটে-মিয়ার রাজা। ইনি মক্কা শরীফের রাজপুত্র, গোঁড়া মুসলমান-সন্তান। ফয়জলের বয়স অল্প, ৩৩।৩৪ হইবে। ইনি শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, উদারস্বভাব এবং ধর্মভীরু। বীরোচিত গুণ ইহার চরিত্রে যথেষ্ট আছে। শুনা যায় পূর্বে ইনি ইংরেজের ভক্ত ছিলেন না। কিন্তু এখন তাঁহার মত বদলাইয়াছে। আজ তিনি ইংরেজের বন্ধু এবং তাহাদের অভিভাবকত্বে সম্বলিত হইয়া রাজ্য চালাইতেছেন। তাঁহার বুদ্ধি ও শক্তি ইংরেজের হাতে রক্ষিত। প্রতি মাসে ইংরেজের কাছ হইতে তিনি মাসহারা পাইতেছেন তিরিশ হাজার টাকা, আর একত্রিশটি করিয়া তোপধ্বনি তাঁহার বরাদ্দ। ইহা কি কম গৌরবের কথা ?

যাহা হউক—আমীর ফয়জল নিজের শক্তিগুণে দুর্দান্ত

আরব ও বেতুইন দস্যুদের শাসন করিয়া শান্তিতে রাজত্ব করিতেছেন।

ফয়জল খুব দৃঢ়চিত্ত লোক। তাঁহার দেশে শেখ ও বন্দুদের মধ্যে নিবন আছে বড়লোক হইলে যত ইচ্ছা বিবাহ করা যায়। এমন দেশেও ফয়জল আজ অবধি কোমার্ধ্য ব্রত অবলম্বন করিয়া আছেন। এমনও শুনা যায় যে ইনি নিরামিষভোজী।

রাজত্বকে বসিষাই ফয়জল বাগদাদেব অনেক নিয়ম-কানুন বদলাইয়া ফেলিয়াছেন। এ-সমস্ত পরিবর্তন ফয়জলের বুদ্ধিমত্তাব পরিচায়ক। তিনি প্রচার করিয়াছেন বাগদাদ কোরান শরীফের মতে শাসিত হইবে;—কোনো মসজিদের কাছে মদেব দোকান থাকিতে পাইবে না, থিয়েটারে নর্তকী থাকিতে পাইবে না, এবং শহরের মধ্যে



রাজা ফয়জলের দরবার-গৃহটি ব্লক-টাওয়ার বা সরাই বিভিন্ন বলিয়া খ্যাত। এই বাড়ীটি ইউক্রেটিস নদীর তীরস্থ পুবাণ তুর্কী প্রানাদেব এক অংশ। সমস্ত বাড়ীতে পাঁচ ছয় হাজার লোক ধবিতে পারে। বর্তমানে ইহা “রাজপ্রাসাদ” বলিয়া খ্যাত। রাজা ফয়জল সিংহাসনে বসিয়া। ব্যজাব বা দিকে দাঁড়াইয়া (১) জেনাবেল স্তার এইলুমার হালুডেন, (২) সৈয়দ ইমান আলি—ইনি বাগদাদের একজন প্রসিদ্ধ শেখ। ইহার আসন মকার রাজার পরেই এবং ইনি বিখ্যাত হুন্নি মসজিদ আবুতুল জিলানীর কর্তা।

ইনি এখন রাজ্যের পরামর্শদাতা রূপে কাজ করিতেছেন। রাজ্যের ডান দিকে দাঁড়াইয়া, (১) রাজ্যের মন্ত্রী, (২) হাই কমিশনারেব প্রাইভেট সেক্রেটারী (৩) স্তার পার্সি কল্ল—হাই কমিশনার



“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নামস্কাংগা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

২২শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯

২য় সংখ্যা

পুনরাবৃত্তি

১

সেদিন যুদ্ধের খবর ভালো ছিল না। রাজা বিগর্ষ হয়ে
—বাগানে বেড়াতে গেলেন।

দেখতে পেলেন প্রাচীরের কাছে গাছতলায় বসে
খেলা করছে একটি ছোট ছেলে, আর একটি ছোট মেয়ে।

রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা কি খেলচ?”

তারা বললে, “আমাদের আজকের খেলা রাম-সীতার
বনবাস।”

রাজা সেখানে বসে গেলেন।

ছেলেটি বললে, “এই আমাদের দণ্ডক বন, এখানে
কুটীর বাঁধছি।”

সে একরাশ ভাঙা ভালপালা খড় ঘাস জুটিয়ে এনেচে,
ভারি ব্যস্ত। আর মেয়েটি শাকপাতা নিয়ে খেলার
—জুড়িতে বিনা আগুনে রাঁধছে; রাম খাবেন, তারি
আয়োজনে সীতার একদণ্ড সময় নেই।

রাজা বললেন, “আর ত সব দেখছি, কিন্তু রাক্ষস
কোথায়?” ছেলেটিকে মান্তে হল তাদের দণ্ডকবনে
কিছু কিছু ক্রটি আছে। রাজা বললেন, “আচ্ছা, আমি
হব রাক্ষস।”

ছেলেটি তাঁকে ভালো করে দেখলে। তাব পবে
বললে, “তোমাকে কিন্তু হেরে যেতে হবে।”

রাজা অবল্লেন, “আমি খুব ভালো হাবুতে পাবি।
পরীক্ষা করে দেখ।”

সেদিন রাক্ষসবধ এতই স্বচাক্ষুরূপে হতে লাগল যে,
ছেলেটি কিছুতে রাজাকে ছুটি দিতে চায় না। সেদিন
এক বেলাতে তাঁকে দশ-বারোটা রাক্ষসেব মরণ
একলা মরতে হল। মরতে মরতে তিনি হাঁপিয়ে
উঠলেন।

ত্রেতা যুগে পঞ্চবটীতে ধেমন পাখী ডেকেছিল সেদিন
সেখানে ঠিক তেমনি করেই ডাকতে লাগল। ত্রেতায়ুগে
সবুজ পাতার পর্দায় পর্দায় প্রভাত-আলো ধেমন কোমল
ঠাটে আপন স্বর বেঁধে নিয়েছিল আজও ঠিক সেই স্বরই
বাঁধলে।

রাজার মন থেকে ভার নেমে গেল। মন্ত্রীকে ডেকে
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “ছেলে মেয়ে দুটি কার?”

মন্ত্রী বললে, “মেয়েটি আমারই, নাম রুচিরা। ছেলে
নাম কোশিক, ওর বাপ গবীষ ব্রাহ্মণ, দেবপূজা করে
দিন চলে।”

করিলে লোকেরা এঁদের পূজা করে, স্তুতি করে, আশীর্বাদ লয়, আর নিজের নিজের ভবিষ্যতের কথা জিজ্ঞাসা করে। এঁদের আসন দালাই লাগার নীচে।

বুরী-লামারা কোন বিশেষ পর্ব উপলক্ষে এক-প্রকার আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা করেন। ইহার নাম 'টঙ্কম' বা নাচ। নাচের সময় বড় বড় ঢোল, তুরী, নাকড়া, শঙ্খ বাজান হয়, আর বিচিত্র-বেশী মূর্তিগুলি নানা রঙে নানা ঢঙে নাচিতে থাকে। কেউ মৃত্যু-দেবতা, কেউ দৈত্য ইত্যাদি সাজে। সোনালি জ্বরির কাপড় ও মণিগয়ালজ্বার পরিয়া এই ভয়ঙ্কর মূর্তিগুলি স্বদেশীদের আনন্দ ও বিদেশীদের ভ্রাস উৎপাদন করে। লামারা নিজেদের ধর্মের মধ্যে স্থানিক দেবতা আর ভূতের পূজা সামিল করিয়া লইয়াছেন, আর এই উৎসবের আয়োজন করিয়া বুরীদের মধ্যে লামা-ধর্মের প্রচারের পথ করিয়া লইয়াছেন।

এই জাতির ডাক্তারদের রোগীর অবস্থা ও চালচলন বুঝিয়া চলিতে হয়। বুরীরা ত আর এক জায়গায় স্থির

থাকে না, আজ যে রোগী এখানে, কাল হয় ত সে চল্লিশ মাইল দূরে পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছে। তাই ডাক্তার বেচারাকে আপনার ঔষধের পোটলাপুটলি উট বা টাটুর উপর চাপাইয়া দিয়া সারা দেশ ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। এদের চিকিৎসা একরকম যাতুগিরি। হয়ত কান্না বাতের ব্যারাম;—তাহাকে ধরিয়া লাঠি দিয়া কয়েক ঘা দিয়া, কোন গাছের রস খাওয়াইয়া, হয়ত কোন পশুর কোন অবয়ব, এমন কি, লোমশ পশুর চামড়া পর্যন্তও ঔষধের অম্লপান ধার্য করিয়া চিকিৎসা চলিতে থাকে।

এই জাতি মানবের আদিপিতা আদমের সময়কার শাস্তি উপভোগ করিতেছে বলা যাইতে পারে; তবে এখনকার সভ্যতার কিরণ এই গভীর অন্ধকারের মধ্যেও ছুটিয়া আসিতেছে।*

শ্রীরমেশ বসু [এম-এ]

* ("সবস্বতী",—জানুয়ারী. ১৯২১।)

বাউল

গাও

গাও গো বাউল তোমার তরল একতারাতে তান তুলে
নাম-ভোলা ঐ নীল আকাশের বুকের মাঝে ঢেউ আনি;
দখিন হাওয়া থমকে দাঁড়াক্, চমকে গুলুক্ কান খুলে

স্বপ্নপুরের সেই বাণী।

মউল কেন ধবুল আজি পউষ-রাতের আম-বনে ?
কোন কাণ্ডনের স্বপ্ন দেখে জাগল কোকিল চোখ চেয়ে ?
শীতের সাঁঝে শিরিষ শাখে কি যে বাজায় আনুগনে

সেই বারতা যাও গেয়ে !

শিশির-শ্রামল মাঠের পথে চলব তোমার গান শুনে,
রাতের ছোয়া লাগবে আগার কঠিন পায়ে চার-পাশে,
বনের ছায়া কাঁপবে তোমার একতারাটির তান শুনে,
চলব আমি তার আশে।

বনের ঘন স্বপনখানি বাজবে না কি সেই স্বরে—

হাওয়ায যে গান ঘুমিয়ে আছে প্রাণের মূর্ছ আস্থানে ?
বলবে কি সে, 'এই যে আমি তোমার কাছে, নেই দূরে,—
ডাকো আমার কোনখানে ?'

শোনাও আমার দূর আকাশের ভাষা-বিহীন গান আনি'
মানস-সরের কলধ্বনি একতারাতে তান তুলে,
চোখ-চলে-না এমন দেশের ছায়ায় মতন রূপখানি
দেখব আমি সব ভুলে।

গাও

গাও গো বাউল তোমার অবুঝ একতারাতে তান দিয়ে
ব্যথার বনে শনশনিষে লাগুক কাঁপন মন-হরা।
গাঁয়ের পথে চলবে তুমি—সাথে আমার প্রাণ নিয়ে,
হব তোমার পথ-ধরা।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

রাজা বল্লেন, “যখন সময় হবে, এই ছেলেটির সঙ্গে ঐ মেয়ের বিবাহ হয় এই আমার ইচ্ছা।”

শুনে মন্ত্রী উত্তর দিতে সাহস করলে না, মাথা হেঁট করে’ রইল।

২

দেশে সব-চেয়ে বিনি বড় পণ্ডিত রাজা তাঁর কাছে কৌশিককে পড়তে পাঠালেন। যত উচ্চ বংশের ছাত্র তাঁর কাছে পড়ে। আর পড়ে রুচিরা।

কৌশিক যেদিন তাঁর পাঠশালায় এল সেদিন অধ্যাপকের মন প্রসন্ন হল না। অল্প সকলেও লজ্জা পেলে। কিন্তু রাজার ইচ্ছা। সকলের চেয়ে সৰ্ব্বট রুচিরার। কেন না, ছেলেরা কানাকানি করে। লজ্জায় তাঁর মুখ লাল হয়, রাগে তার চোখ দিয়ে জল পড়ে।

কৌশিক যদি কখনো তাকে পুঁথি এগিয়ে দেয়, সে পুঁথি ঠেলে ফেলে। যদি তাকে পাঠের কথা বলে, সে উত্তর করে না।

রুচির প্রতি অধ্যাপকের স্নেহের সীমা ছিল না। কৌশিককে সকল বিষয়ে সে এগিয়ে যাবে এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা, রুচিরও সেই ছিল পণ।

মনে হল সেটা খুব সহজেই ঘটবে, কারণ, কৌশিক পড়ে বটে কিন্তু একমনে নয়। তার সাঁতার কাটতে মন, তার বনে বেড়াতে মন, সে গান কবে, সে যন্ত্র বাজায়।

অধ্যাপক তাকে ভৎসনা কবে’ বলেন, “বিদ্যায় তোমার অহুরাগ নেই কেন?”

সে বলে, “আমার অহুরাগ শুধু বিদ্যায় নয়, আরও নানা জিনিষে।”

অধ্যাপক বলেন, “সে-সব অহুরাগ ছাড়।”

সে বলে, “তাঁহলে বিদ্যার প্রতিও আমার অহুরাগ থাকবে না।”

৩

এমনি করে’ কিছুকাল যায়।

রাজা অধ্যাপককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার ছাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?”

অধ্যাপক বল্লেন, “রুচিরা।”

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, “আব কৌশিক?”

অধ্যাপক বল্লেন, “সে যে কিছুই শিখেচে এমন বোধ হয় না।”

রাজা বল্লেন, “আমি কৌশিকের সঙ্গে রুচির বিবাহ ইচ্ছা করি।”

অধ্যাপক একটু হাসলেন, বল্লেন, “এ যেন গোখুলিব সঙ্গে উষার বিবাহের প্রস্তাব।”

রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বল্লেন, “তোমার কন্ঠার সঙ্গে কৌশিকের বিবাহে বিলম্ব উচিত হয় না।”

মন্ত্রী বল্লে, “মহারাজ, আমাব কন্ঠা এ বিবাহে অনিচ্ছুক।”

রাজা বল্লেন, “জীলোকের মনের ইচ্ছা কি মুণেব কথায় বোঝা যায়?”

মন্ত্রী বল্লে, “তার চোখের জলও যে সাক্ষ্য দিচ্ছে।”

রাজা বল্লেন, “সে কি মনে করে কৌশিক তার অযোগ্য?”

মন্ত্রী বল্লে, “হাঁ, সেই কথাই বটে।”

রাজা বল্লেন, “আমার সামনে দুজনেব বিদ্যার পরীক্ষা হোক। কৌশিকের জয় হলে এই বিবাহ সম্পন্ন হবে।”

পরদিন মন্ত্রী রাজাকে এসে বল্লে, “এই পণে আমার কন্ঠাব মত আছে।”

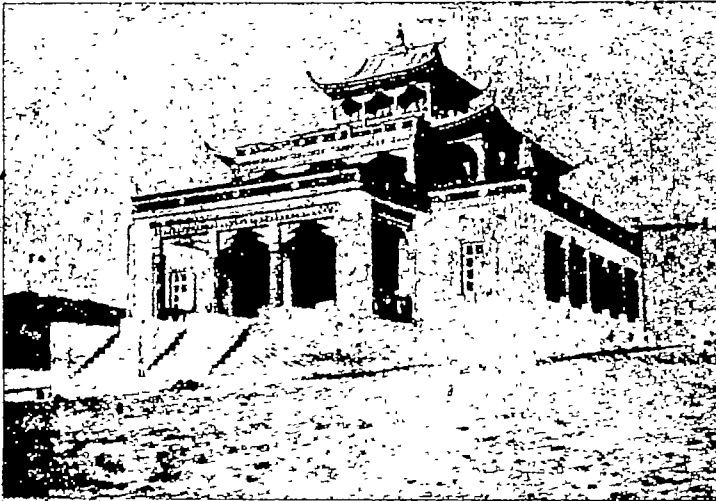
৪

বিচার-সভা প্রস্তুত। রাজা সিংহাসনে বসে’, কৌশিক তাঁর সিংহাসনতলে। স্বয়ং অধ্যাপক রুচিকে সঙ্গে করে’ উপস্থিত হলেন। কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে’ তাঁকে প্রণাম ও রুচিকে নমস্কার করলে। রুচি দৃকপাতও করলে না।

কোনোদিন পাঠশালার রীতিপালনের জ্ঞেও কৌশিক রুচির সঙ্গে তর্ক করেনি। অল্প ছাত্রেরাও অবজ্ঞা করে’ তাকে তর্কের অবকাশ দেয়নি। তাই আজ যখন তাঁর যুক্তির মুখে তীক্ষ্ণ বিজ্ঞপ তীরের ফলায় আলোর মত ঝিক-ঝিক করে’ উঠল, তখন গুরু বিস্মিত হলেন, এবং বিরক্ত হলেন। রুচির কপালে ঘাম দেখা দিল, সে বুদ্ধি স্থির রাখতে পারলে না। কৌশিক তাকে পরাভবের শেষ কিনাবায় নিয়ে গিয়ে তবে ছেড়ে দিলে।



বুদীদেব নাচঘর



বুদী লামা সাধুব মন্দির

জিন্সা করিয়া দেওয়া হয়। লামারা এদেব জিয়াকাও, তিব্বতীয় ব্রহ্মবিদ্যা, সাহিত্য, আয়ুর্বেদ, বৌদ্ধ দর্শন, গণিত, ফলিত জ্যোতিষ ইত্যাদি শিক্ষা দেন। অনেকেই আসলে কিছু শেখে না, কেবল লিখিতে পড়িতে জানে

পালন করেন। তিব্বতের দালাই লামার মত এই দেবতাদেরও অবতার হয়। বুদীদের বিশ্বাস যে দেবতাদের দেহরক্ষার পরে এঁদের আত্মা নবজাত শিশুর মধ্যে প্রবেশ করে। এই দেবতারা কোন মঠে পদার্পণ

মাত্র, আর শাস্ত্রের অর্থ বুঝিতে চেষ্টাও কবে না। তবে অনেকে আবার খুব বিদ্বান হয়। এইরূপ একজন লামার নাম স্তম্ভ লামা। ইনি সাইবেরিয়ার লামাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিলেন। এক সময় ইনি সিংহলে গিয়াছিলেন।

এদের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রথা আছে। এরা জীবিত মানুষকে দেবতা মনে করিয়া পূজা করে। এই দেবতাদের সংখ্যা এখন একশ'র উপরে হইবে। এঁরা তিব্বত, চীন ও মঙ্গোলিয়ায় যাওয়া-আসা করেন। লামাদের মত এঁরা অখণ্ড ব্রহ্মচর্য

ক্ৰোধে অধ্যাপকের বাকরোধ হল, আর রুচির চোখ দিয়ে ধারা বেয়ে জল পড়তে লাগল।

রাজা মন্ত্রীকে বললেন, “এখন বিবাহের দিন স্থির কর।”

কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে জোড় হাতে রাজাকে বললে, “ক্ষমা করবেন, এ বিবাহ আগি করব না।”

রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন, “জয়লক্ষ পুরস্কার গ্রহণ করবে না?”

কৌশিক বললে, “জয় আমারই থাক, পুরস্কার অস্ত্রের হোক।”

অধ্যাপক বললেন, “মহারাজ, আর এক বছর সময় দিন, তাব পরে শেষ পরীক্ষা।”

সেই কথাই স্থির হল।

৫

কৌশিক পাঠশালা ত্যাগ করে' গেল। কোনোদিন সকালে তাকে বনের ছায়ায়, কোনোদিন সন্ধ্যায় তাকে পাহাড়ের চূড়ার উপর দেখা যায়।

এ দিকে রুচির শিক্ষায় অধ্যাপক সমস্ত মন দিলেন।

কিন্তু রুচির সমস্ত মন কোথায়?

অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বললেন, “এখনো যদি সতর্ক না হও, তবে দ্বিতীয়বার তোমাকে লজ্জা পেতে হবে।”

দ্বিতীয়বার লজ্জা পাবার জন্তেই যেন সে তপস্যা করতে লাগল। অপর্ণার তপস্যা যেমন অনশনের, রুচির তপস্যা তেমনি অনধ্যায়ের। ষড়্দর্শনের পুঁথি তার বন্ধই রইল, এমন কি, কাব্যের পুঁথিও দৈবাৎ খোলা হয়।

অধ্যাপক রাগ করে' বললেন, “কপিল-কণাদের নামে শপথ করে' বল্টি আর কখনো জীলোক ছাত্র নেব না। বেদবেদান্তের পার পেয়েছি, জীজ্ঞাতির মন বুঝতে পার্বেলেন না।”

একদা মন্ত্রী এসে রাজাকে বললে, “ভবদন্তর বাড়ি থেকে কস্তার সম্বন্ধ এসেচে। কুলে শীলে ধনে মানে তারা অদ্বিতীয়। মহারাজের সম্মতি চাই।”

বাজা জিজ্ঞাসা করলেন, “কস্তা কি বলে?”

মন্ত্রী বললে, “মেয়েদের মনের ইচ্ছা কি মুখের কথায় বোঝা যায়?”

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, “তাব চোখেব জল আজ কি রকম সাক্ষ্য দিচ্ছে?”

মন্ত্রী চুপ করে' রইল।

৬

বাজা তাঁর বাগানে এসে বসলেন। মন্ত্রীকে বললেন, “তোমার মেয়েকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।”

রুচিরা এসে রাজাকে প্রণাম করে' দাঁড়াল।

রাজা বললেন, “বংশে, সেই রামের বনবাসের খেলা মনে আছে?”

রুচিরা স্মিতমুখে মাথা নীচু করে' দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা বললেন, “আজ সেই রামের বনবাস খেলা আব-একবার দেখতে আমার বড় সাধ।”

রুচিরা মুখের একপাশে আঁচল টেনে চুপ করে' রইল।

বাজা বললেন, “বনও আছে, বাঘও আছে, কিন্তু গুন্টি বংশে, এবার সীতাব অভাব ঘটেচে। তুমি মনে করলেই সে অভাব পূরণ হয়।”

রুচিরা কোনো কথা না বলে' বাজার পায়ে কাছের নত হয়ে প্রণাম করলে।

রাজা বললেন, “কিন্তু বংশে, এবাব আমি রাক্ষস সাজতে পারব না।”

রুচিরা স্নিগ্ধ চক্ষে রাজার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

রাজা বললেন, “এবার রাক্ষস সাজবে তোমাদের অধ্যাপক।”

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাইবেরিয়ার বুরীজাতি

সাইবেরিয়ায় বুরীজাতি নামে এক জাতি আছে। বৈকাল হ্রদেব পূর্বদিকে বৈকাল প্রদেশে এদের বাস। ইহার। যাযাবর প্রকৃতির লোক। এই জাতির লোকদের ঘোড়া দৌড়ানর সখ খুব বেশী। পার্শ্বতা দেশেও ইহার। ঘোড়ায় চড়িয়া দেশের এক দিক হইতে আরেক দিকে খুব দ্রুতবেগে যাইয়া থাকে। এই দেশ শীতপ্রধান আর জমি উর্ববা নয় বলিয়া এরা পশু পালন করে এবং দেশের যেখানে পশুপালনেব সুবিধা আছে সেইখানে যাইয়া কিছুদিনেব জন্তু আড্ডা করে, আবার আরেক জায়গায় চলিয়া যায়।

এদের খাণ্ড বাজরা আর ভেড়ার চৰ্কি। মাখন আর ছুধ দিয়া এরা চা খায়। মাঝুদের মত এরা পোষাক পরে আর টুপী মাথায় দেয়। এদের খাওয়া পরা বেশ সাদাসিধে।



সাইবেরিয়ায় পুস্ত লামা

এরা সাধারণতঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তবে কেউ কেউ অনেক পশু পালন করে, আর এক জায়গাতেই বসবাস করে। এদের নাম 'বৈস'।

১৮শ শতাব্দীর আগে এরা যাহুম্ম ও ভূতসিদ্ধিতে খুব বিশ্বাস করিত। তার পর হইতে এরা বৌদ্ধ হইয়াছে এবং লামাদের ধর্ম মানিয়া চলে। বৈকাল হ্রদের নিকটে ডটসন নামক স্থানে এদের ধর্ম-পীঠ আছে। তাহার নাম 'জিলং-নার' বা মহাস্তদের হ্রদ। এখানে প্রায় ১০০১৫০ লামা-মাধু বাস করেন।

লামা-পদ পাওয়া ধনী বুরীদের জীবনের এক শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। এইজন্ত ছোট-বেলা হইতেই ছেলেদের লামার



জীবন্ত-দেবদ্রা তাবানাখ

ধর্ম-পূজা

(ভূমিকা)

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে (৪০৫—৪১১) চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান ভারতবর্ষে আসেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে ভারতবর্ষে পূর্বাঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা পশ্চিমদিকের চেয়ে অনেক ভাল ছিল। সে যুগে তাম্রলিপ্তি বাংলাদেশের একটা মস্ত বন্দর বলে সুপরিচিত ছিল। সেখানে তখন বাইশটা বৌদ্ধ মঠ ছিল। ফাহিয়ানের কিঞ্চিদধিক দুই শ বছর পরে আসেন হুয়েন সাং। তিনি বৌদ্ধধর্মকে সর্বত্রই নিম্প্রভ দেখে যান; তাম্রলিপ্তিতে দশ-বারটা বৌদ্ধ মঠ তিনি দেখেন নি, ভিক্ষুর সংখ্যা সেখানে হাজারের বেশী ছিল না। প্রায় ৫০টা দেবমন্দির দুই শ বৎসরের মধ্যে গড়া হয়েছিল, আর ঐ নগরে বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ একত্র বাস করতো। মোটের উপর সমস্ত বাংলা দেশে খুব কম কবে দশহাজার সজ্জারাম ছিল ও প্রায় এক লক্ষ ভিক্ষু সেইসব আরামে বাস করতেন। এই দুই চৈনিক পরিব্রাজকের বর্ণনা পাঠ করলে জানা যায় যে ৭ম শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অধোগতি শুরু হয়েছে। কিন্তু অধোগতি শুরু হলেও লোপ পাবার পূর্ব পর্যন্ত এই বাংলাদেশেই বৌদ্ধধর্ম টিকে ছিল। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু'র "Modern Buddhism" গ্রন্থে ভূমিকায় বলেছেন যে বাংলাদেশের এই এক লক্ষ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভরণ-পোষণের জন্য খুব কম করে এক কোটি পরিবারের প্রয়োজন। তাঁর মত সত্য বলে মানতে হলে বাংলাদেশে দেড় হাজার বছর আগে চার কোটি বৌদ্ধ বাস করত। এবং আর দুই কোটি হিন্দুও ছিল। সুতরাং ৭ম শতাব্দীতেই ৬ কোটি লোক বাংলা দেশে ছিল একপ অল্পমান করতে হয়। কিন্তু সংখ্যানির্ণায়ক রীতি (Statistical method) অনুসরণ করে আমরা এ অনুমান প্রক্ষেপ বলে মানতে পাবি না। আমরা জানি যে ভারতের সর্বত্র ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দী থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুদয় শুরু হয়। বাংলাদেশেও সেই প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল। আদিবৌদ্ধের ঐতিহাসিক সত্য কি না

জানি না, তবে আদিবৌদ্ধের পঞ্চব্রাহ্মণ আমদানী করার প্রবাদের মধ্যে বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্যের স্বত্বপাত হয়েছিল সেটা নিশ্চিত কথা।

কিন্তু বৌদ্ধধর্ম মরে নি। সে নানা আকারে দেশের নানা জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল। মাঝখানে পাল-রাজাদের আমলে বৌদ্ধধর্ম বেশ জেগে উঠেছিল। সে কথা আমরা যথাস্থানে আনবো। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যে শাখাকে আমরা মহাযান আখ্যা দিয়ে থাকি তার সম্বন্ধে লোকেব একটা গোড়াব ভুল আছে। মহাযান বলতে কোনো ধর্ম-মত বুঝায় না, বুঝায় কতকগুলি শাখার দর্শনশাস্ত্র। সেই মহাযান নানা বিকৃত আকার ধারণ করে চীন জাপান কোরিয়া তিব্বত নেপাল প্রভৃতি স্থানে যেমন বিচিত্র ধর্মমত সৃষ্টি করেছে, তেমনি ভারতের পূর্বাঞ্চলে মহাযান বৌদ্ধমত বিলুপ্ত হবার আগে অনেক-রকম ধর্ম-সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিল। সেইসব ধর্মসম্প্রদায়গুলি বর্তমানে ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত হয়ে পড়েছে। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় মধ্যযুগে তাদের পৃথক অস্তিত্ব ছিল, হিন্দুধর্মের সহিত তাদের বিরোধ ছিল, এবং সেই বিরোধ মিটাবার জন্য ধর্মমঙ্গলকারগণের চেষ্টাও ছিল। আমরা এই প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্মের একটি শাখা ধর্ম-ঠাকুরের বিষয় আলোচনা করব। নাথপন্থ ও সহজযান সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করবার আশা রাখি।

ধর্মপূজা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাংলাদেশে আলোচনা করেন। তবে তিনি এ বিষয় আলোচনা করবার পরে শূন্তপুরাণ, ধর্মপূজাবিধান ও অন্যান্য গ্রন্থ আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়েছে। * এইসব গ্রন্থ এ পর্যন্ত ভাল করে আলোচিত হয় নি। 'ধর্ম-পূজা' বুদ্ধেরই পূজা। কেহ কেহ বলেন—এই ধর্ম বৌদ্ধ-ত্রি-রত্নের দ্বিতীয়-রত্ন। কিন্তু সে ধর্ম নারীমূর্তিতে পরিকল্পিত। ধর্ম ও সজ্জ উভয়ের চারি চারি হস্ত, কিন্তু

* সম্প্রতি শাস্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখেছেন—
Buddhism in Bengal, Dacca Review for October, 1921.

প্রকাশ করেন, যেমন নিশানাথ খ্যাতবতই সমস্ত জগৎ (জ্যোৎস্নার) ধ্বলিত করেন।

এখানে মূলত অ প খি তো + অ রি (অপ্রার্থিতো + অপি), পরে সন্ধিব নিয়মে অকাব লোপে অ প খি তো রি। ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ বহুপ্রয়োগ হইতে হইতে শেষে অ রি (অপি) স্থানে রি হইয়া গিয়াছে, এবং সেইজন্যই প্রাকৃত্তে দেখা যায় ন রি (নাপি)। আলোচ্য প্রাকৃত কবিতাটিতে চের শব্দ এ র অর্থে প্রযুক্ত। প্রাকৃত্তেব নিয়মে চ + এর = চের। কিন্তু ভাষার বহুবাব ইহাব প্রয়োগ হওয়ায় পববর্তী কালে চকারের অর্থেব দিকে কোনো লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল এ র-অর্থেই ইহা প্রাকৃত্তে প্রযুক্ত হইতে থাকে। সংস্কৃততও অ র আর অ পি উপসর্গের অকার লোপ প্রসিদ্ধ, যথা র গা হ = অ র গা হ, পি ধা ন = অ পি ধা ন। “বৃষ্টি ভাণ্ডবিরলোপম্ অব্যাপ্যরূপসর্গয়োঃ।” বৈয়াকরণিকেরা না খরিলেও অ ধি উপসর্গেরও অকাবের লোপ দেখা যায়, এবং দেখা যাইবাবই কথা, “হৃদি সরস্যা ধি ষ্ঠিত মৃ (গীতা, ১৩, ১৭)।

এইরূপেই লঙ্কা বংশের অ লঙ্কা র হইতে উৎপত্তি সম্ভব, পরে অনুমানিক ঙকাব পরিত্যক্ত হওয়ায় তাহাই ল কা র হইয়াছে। আমাব তো ইহাই মনে হইতেছে, পাঠকগণের মত জানিতে পারিলে আনন্দিত হইব।

প ট (< প ত্র) হইতে পা ট, এবং তাহা হইতে ক্রমে (পা ড় > পা ল >) পা ল। কিন্তু ইহার পূর্বে সংস্কৃত সাহিত্যে ‘পা ল’ অর্থে কোন শব্দ প্রযুক্ত হইত কোনো পাঠক জানাইলে অনুগ্রহীত হইব। বা ত প ট, বা ত প ট খুব প্রাচীন নহে, স্পষ্টই দেখা যায়। বা ত প ট কথাসরিৎসাগরে আছে (M. M. Williams)।

সী লানি সং স শব্দের শেষ পদের সংস্কৃত আ নি শং স, ছাপিতে ভুল হওয়ায়, অ নি শং স হইয়া গিয়াছে (পৃ, ৭০, টকা)।

চূড়ামন-জাতকে আছে (পৃ, ১১৭) — “উ প রি গঙ্গা য তোবং... হলপাদে...ছিন্দিয়া...।” এখানে, উ প রি গঙ্গা শব্দের অনুবাদ “উপরি গঙ্গাতটে” করার (পৃ, ৭৪) অর্ঘট্য পরিষ্কার হয় নাই। উহার অর্থ হইতেছে গঙ্গার উজানেব দিকে। ইংরেজী অনুবাদ বেশ পরিষ্কার — “Upper Ganges” এইরূপ গঙ্গা নি ব র্ত্ত ন (পৃ, ১১৭) শব্দের অর্থও পরিষ্কার হয় নাই, ন দী - নি ব র্ত্ত ন (পৃ, ৭৪) বলিলে কিছু বুঝা যায় না। এহলেও ইংরেজী অনুবাদটা ভাল (“a bend of the river”)।

“চারিটা বৃহৎ পাত্রে ছাপন পূর্বক” (পৃ, ৭৫),—এখানে মূলে পাত্রেব (‘ভাজন’) কথা থাকিলেও “চারি টা বৃহৎ পাত্রেব” কথা মূলে নাই।

পালিতে লিখিত নাম, বা ব্যক্তিবাচক শব্দগুলি বাঙলায় লিখিতে হইলে একটা কোনো প্রণালী অবলম্বন করা উচিত। ঐ-সকল শব্দকে সংস্কৃত্তে পরিবর্তন করিয়া লইতে হইবে, না পালিতে যেমন

আছে তেমনি রাখিতে হইবে? সংস্কৃত্তে করিলে মন্দ হয় না, কিন্তু সর্বত্র তাহা স্বকর নহে। বোধ হয় এইজন্যই ঈশান বাবু কতক সংস্কৃত্ত করিয়া লিখিয়াছেন, কতকক বা অর্ধ অংশ সংস্কৃত্তে করিয়াছেন, আবার কতককে ঠিক পালিতেই রাখিয়াছেন। প ক ত্ত প ণ র/জাতক (১২৫), ইহা পালিতেই রাখিয়াছে (পূর্বত + উপস্তর); চূ-ল প্রলো ভ ন জাতক (২৬০) এখানে প্রথম অংশ (চুল) পালি রাখিয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় অংশ (‘প্রলোভন’) সংস্কৃত্তে করা হইয়াছে। অন্যত্রও এরূপ আছে। বাঙলায় সহিত ‘মিলাইতে’ হইলে সংস্কৃত্ত কবিলে ভাল হয়, কিন্তু যতদূর সম্ভব সর্বত্রই তাহা করা উচিত। চূ ল শব্দকে অন্যায়সেই সংস্কৃত্ত কবিবা ক্ষু ভ্র দেখা যাইত। আব যদি ইহা ভাল না হয়, তবে সর্বত্র মূল পালিটাই লিখিয়া লওয়া ভাল, সংস্কৃত্ত শব্দটা বুঝাইবাব জন্য বঙ্গানীষ মধ্যে একবাব তাহা দেওয়া যাইতে পারে।

জাতকের আলোচ্য খণ্ডেব প্রধান বিশেষত্ব ইহাব জা ত কে পু রা ত স্ব -নামক অংশ। জাতকসমূহে যে-সমস্ত সামাজিক, বা রাজনীতিক প্রভৃতি প্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায়, ইহাতে তৎসমুদয় সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। ইহা পড়িলে সেই কালের একটা চিত্র পাওয়া যায়। ইহাতে জাতকের বাঙলায় প্রকাশিত কেবল দুই খণ্ডেবই নহে, অবশিষ্ট খণ্ডগুলিবও বিবরণ সংকলিত হইয়াছে। বাঙলায় একপ সম্মেলন নূতন। স্কি সাহেব জর্জান ভাষায় Social Organisation in North-East India in Buddha's Time * পুস্তকে বিস্তৃত ভাবে এইসব আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যখন উহা বচনা করেন তখন জাতকের শেষ খণ্ড (৬ষ্ঠ) প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া তাহা ব্যবহার করিতে পারেন নাই। ঈশান বাবু তাহাও করিয়াছেন। এই-সমস্ত বিবরণকে বৃ ক্কে ব সম্মেব বলা ঠিক নহে, কারণ জাতকসমূহ তাহার পরিনির্বাণেব অনেক পবে বচিত; তবে হইতে পারে কোনো-কোনো গল্প বা তাহার অংশ-বিশেষ পূর্ব হইতে চলিয়া আসিবা থাকিবে, কিন্তু তাহার কোনো বিশেষ প্রমাণ নাই।

পূর্বে আমাবা কয়েকটি ত্রুটিব উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু কেবল তাহাই দেখিয়া আলোচ্য পুস্তকখানির গুণসমূহ অস্বীকার কবিলে তাহ নিতান্ত অন্যায় হইবে। উহাব গুণ ও দোষ উভয়কেই সমুখে রাখিয়া অসঙ্কোচে বলিতে পারি বঙ্গের পাঠকগণ, সাধারণই হউন আব বিশেষজ্ঞই হউন, ইহার দ্বাবা প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হইবেন। তাই ইহাব বহুল প্রচাব হইতে দেখিলে আমাবা অত্যন্ত আনন্দিত হইব।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

* পাঠকেরা জানিয়া আনন্দিত হইবেন, ডাক্তার শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র মহাশয় ইহা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন, এবং কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

বুদ্ধের দুইখানি হস্তের অধিক কখনো দেখা যায় না। ‘ধর্ম’ মহাধানে সর্বদাই নারী-রূপে অঙ্কিত; তাঁহার দুইখানি হাত বুদ্ধের কাছে ধর্মচক্র-মুদ্রা আকারে নিবদ্ধ। তৃতীয় হস্তে পদ্ম অথবা পুঁথি। চতুর্থ হস্তে মালা। * নেপালে ধর্মের যে মূর্তি পাওয়া যায় তাহা নারী-মূর্তি। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার Archaeological Survey of Mayurbhanja গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—

“In the fifth century of the Christian era, Dharma, one of the Buddhistic trinity, came to be represented in the form of a goddess. A female form of Dharma similar to the above, has been discovered near the Mahabodhi. Such forms are also found in all Buddhistic Chaityas in Nepal. An image of Dharma has also been found at Badasai (Mayurbhanj). The Buddhist Newars worship Dharma as a goddess, under the names of Adi Dharma, Prajnaparamita, Dharma Debi, Arya Tara and Gayeswari.” (P. XCVI.)

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্ততম ধর্মের মূর্তি ময়ূরভঞ্জের স্থানে স্থানে পাওয়া গেছে। সেই-সব মূর্তি ও নেপালের চৈত্যগুলিতে উৎকীর্ণ ধর্ম দেবী-মূর্তিতেই পরিকল্পিত। বৌদ্ধ নেওয়ার জাতি ধর্মকে দেবীরূপে, ও আদিধর্ম প্রজ্ঞাপারমিতা ধর্মদেবী আর্ঘ্যতাবা ও গায়েস্বরী নামে পূজা করিয়া থাকে।

বাংলাদেশের ধর্মঠাকুর এই ধর্ম নন। তিনি কোথায়ও নারীরূপে পরিকল্পিত হন নি। তা ছাড়া তাঁর নাম ‘ধর্মরাজ’। বীরভূম প্রভৃতি জেলায় ধর্মরাজের পূজা বলেই লোকে জানে। এই ধর্মরাজ হচ্ছেন স্বয়ং বুদ্ধ, কারণ বৌদ্ধ আভিধানিক অমরসিংহ লিখেছেন—“সর্বজ্ঞঃ স্ফুটো বুদ্ধ ধর্মরাজস্তু তথাগতঃ”। এই ধর্মরাজের পূজাই হচ্ছে শূত্রপুরাণ ও ধর্মমঙ্গল সাহিত্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। বুদ্ধের ধর্ম বৌদ্ধদের নিকট কখনো ‘বৌদ্ধধর্ম’ বলে অভিহিত হতো না; তারা বলতো সঙ্ঘধর্ম। পালি সাহিত্যে এই শব্দের দ্বারা বৌদ্ধধর্মকে বুঝানো হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে তিব্বতীলামা তারানাথ বৌদ্ধধর্মের যে ইতিহাস লিখেছিলেন তাতে তিনি বাংলার তান্ত্রিক বৌদ্ধ-মতকে কেবলমাত্র ‘ধর্ম’ নামে আখ্যাত করে’ গেছেন। †

তিব্বতী ভাষায় ‘ছো(ম)’ বলতে বৌদ্ধধর্মই বেশী করে’ বুঝায়। সুতরাং ধর্ম বলতে যে বৌদ্ধধর্ম ও ধর্মরাজ বলতে যে বুদ্ধদেব বুঝায় এ কথা আর বেশী করে’ প্রমাণ করতে হবে না। আমরা ধর্মসাহিত্য থেকে ধর্মপূজকদেব ধর্মমত যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করতে চেষ্টা করবো এবং মহাধান বৌদ্ধধর্মের সহিত তাদের মিল ও গর্মিল দেখাবার চেষ্টা করবো না।

আমরা ধর্মপূজকদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সর্বপ্রথম আলোচনা করবো।

শূত্রপুরাণ তার নাম সার্থক করে’ প্রথমেই শূত্রতার যে বর্ণনা দিয়েছে তা এত স্পষ্ট যে তার খানিকটা নিয়ে উদ্ধৃত করে’ দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বস্তু চিন।
ববি সঙ্গী নহি ছিল নহি রাতি দিন ॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ।
মেক্স মন্ডাব ন ছিল ন ছিল কৈলাস ॥
নহি ছিল ছিটি আব ন ছিল চলাচল।
দেহারা দেউল নহি পরবত সকল ॥
দেবতা দেহারা ন ছিল পুজিবাক দেহ।
মহাবুদ্ধ মধ্যে পবতুর আর আছে কেহ ॥
রিসি জে তপসী নহি নহিক বাস্তব।
পাহাড় পবত নহি নহিক ধাবব সঙ্কম ॥
পুন্য থল নহি ছিল নহি গঙ্গাঙ্গল।
নাগর সঙ্গম নহি দেবতা সকল ॥
নহি ছিটি ছিল আর নহি হর নব।
বস্তা বিষ্টু ন ছিল ন ছিল আঁবর ॥
বার ববত নহি ছিল রিসি জে তপসী।
তীর্থ থল নহি ছিল গঙ্গা ববানসী ॥
পৈরাগ মাধব নহি কি কবিবু বিচাব।
সরগ মরত নহি ছিল সন্তি ধুসুকার ॥
দস বিকপাল নহি মেঘ তারাগন।
আউ মিস্ত্র নহি ছিল জমের তাড়ন ॥
চারি বেদ নহি ছিল সাপ্তর বিচার।
গুপত বেদ করিলেন্দ্র পরজু কর্তাব ॥
জীব জন্ত নহি ছিল ন ছিল বিদুপাতি।
দেব থল নহি ছিল ন ছিল জগদ্রাধ ॥
হুস্তত ভরমন পরভুর হন্যে কবি ভর।
কাহারে জন্মাব পবতু ভাবে মাধাব ॥

শূত্রপুরাণ-কাব পূর্বের কোনো সৃষ্টি স্বীকার করেন নি। প্রলয়ের কোনো কথা উপর্যুক্ত পংক্তিগুলির ভিতর থেকে পাওয়া যায় না। কিন্তু ধর্মপূজাবিধানে সৃষ্টি-লয়ের কথা পাই—

* Oldfield—Sketches of Nepal, Vol. II, p. 159.

† Journal A S B. 1891.

শব্দটির ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ দেন নি। অন্য কোনো লেখকেরও এ বিষয় কোনো মন্তব্য আমি এপর্যন্ত জানি না। আমি যে উহার অনুবাদ প্রজ্ঞাবতী কবিত্তে বলিতেছি আমিই তাহার একমাত্র উত্তরদাতা। প্রজ্ঞাবতী (—সন্তানবতী স্ত্রী, পরে সাধারণত স্ত্রী) বলিলে একটা অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু বাঁ টি সংস্কৃত প্রজ্ঞাপতী করিলে তাহার অর্থ matron, wife কিরূপে হইতে পারে, আমি তো বুঝিতে পারি না। তকাবে দীর্ঘ ঈটা কোথা হইতে আসিল ইহাও ভাবিতে হইবে। বৈদিক সংস্কৃতে এত অসিদ্ধ প্রজ্ঞাপতি শব্দটি পালি সাহিত্যে প্রজ্ঞাবতী হইয়া স্ত্রী-বাচক হইয়া পড়িল, ইহাও একটা ভাবিবার বিষয়। পুত্রবতী শব্দে যেমন সাধারণত বাহার পুত্র আছে সেই স্ত্রীলোককেই বুঝাইয়া থাকে, প্রজ্ঞাবতী শব্দও সেইরূপ প্রথমত সন্তানবতী স্ত্রীকেই বুঝাইত; ক্রমে তাহা কেবল স্ত্রী-অর্থেও প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে (অভিধানৱ, ২৩৭)। শব্দের উৎপত্তি আলোচনা করিলে ইহাই বলিতে হয়। আমি বলিবাছি আগাদের পো বা তী শব্দ প্রজ্ঞাবতী হইতে। এই উভয় শব্দের অর্থগত যদি কিছু পার্থক্যও থাকে, তবে বতস্পদ অন্য কোনো উপযুক্ত ব্যাখ্যা না পাইতেছি ততক্ষণ ভাষাতত্ত্বের প্রামাণ্যে উপব নির্ভব কবিত্তা আমাকে বলিতেই হইবে পো বা তী শব্দ প্রজ্ঞাবতী শব্দের অপভ্রংশ। পোমাতী পর্ভবতী স্ত্রীকে বুঝায়, আবাব প্রসবের পবেও যতদিন সন্তান একটু বড় হইয়া না উঠে ততদিন এক্সপ স্ত্রীলোককেও বুঝায়। কিন্তু কেবল প্রাদেশিক প্রয়োগেব উপব নির্ভব কবিত্তা কোনো প্রাচীন সাহিত্যে প্রযুক্ত শব্দের অর্থ নির্ণয় করা সর্বত্র নিরাপদ নহে। প্রজ্ঞা=সন্তান, প্রজ্ঞাবতী—সন্তানবতী, ইহাই ঠিক অর্থ। দুই-একটা প্রমাণ দিই :—

“সাম্প্রত্যং সর্গকর্ষ্মমাদিষ্টং ব্রহ্মণা মম।

সোহং পত্নীমভীশামি ধন্যাং দিবাং প্রজ্ঞাবতীম্।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৯৭, ১৮।

—প্রজ্ঞাবতী=সন্তানবতী। যিনি প্রজ্ঞাবতী অর্থাৎ সন্তানবতী হইতে পাবেন, সেই পত্নীবই কথা এখানে বলা হইয়াছে। রাজশেখরও (বাল-ভাবত, নির্ঘণাগর, ৩২ পৃঃ) দ্রৌপদীর বিশেষরূপে প্রজ্ঞাবতী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, (“প্রজ্ঞাবতি, তবায়মভিপ্রায়ঃ”)।

“ভাতৃভাষা” অর্থেও এই শব্দের প্রয়োগ আছে (অমর, ৩, ৬, ৩০)। সীতাকে বর্জন কবিবার সময় তাঁহার সম্বন্ধে বাম লক্ষ্মণকে বলিতেছেন (ববু, ১৪, ১৫)—“প্রজ্ঞাবতী দোহনঃসিনী তে।” কিন্তু বসন্ত এখানেও বাম গর্ভবতী সীতাকে লক্ষ্য কবিত্তা এই কথা বলায় ঐ শব্দটি সন্তানবতীকেই বুঝাইতেছে।

এখানে একটা আপত্তি হইতে পারে, সংস্কৃতেব অন্তস্থ ‘ব’ পালিতে ‘গ’ হয় কি? অনেক হয়; যথা, সংস্কৃত শাবর, পালি ছাপ; এইরূপ শাবর, ছাপ (পক্ষি-বিশেষ); সংস্কৃতেব প্র+অ+ব্ ধাতু হইতে পালিতে পাঠ পতি। এইরূপ আরো আছে।

এ বিষয়ে আব-একটি শেষ প্রমাণ দিই। পালির মহাপ্রজ্ঞাপতী গৌতমীকে বলিতবিস্তরে (বাল্মীকীমিত্র) একই পৃষ্ঠায় (১১৫ পৃঃ) তিনবার মহাপ্রজ্ঞাবতী গৌতমী বলা হইয়াছে। Lefmann-এর সংস্করণে (মূল ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০০) যদিও মহাপ্রজ্ঞাপতী আছে, তথাপি পাঠান্তরে (২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫) মহাপ্রজ্ঞাবতী পাঠ দেখা যাইবে।

সীলানিসংস জাতকে (১৯০) একস্থানে (পৃঃ ১১২) আছে :—
“তয়ো কুপক। ইন্দনীলমণিমবা, হুবরময়ো লকাবো, বজ্রতমযানি যোত্তানি...।” ঈশান বাবু অনুবাদ করিয়াছেন (পৃঃ ৭১) :—“উহার মাস্তুল তিনটা ইন্দ্রনীল মণি দ্বারা, বাতপট্টসমু হুবর্ণ দ্বারা, রজ্জুগুলি রৌপ্য দ্বারা...পঠিত হইল।” ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে, ঈশান বাবু

মূলের লকারকে ‘বাতপট্টসমু’ বলিতেছেন, বাতপট্ট শব্দের অর্থ নৌকাব ‘পাল’, তাহা হইলে বাতপট্টসমু আর মাস্তুল (কুপক) একই হইয়া পড়ে, তাই তিনি টীকাব বলিয়াছেন লকার শব্দ মাস্তুলেব ভিন্ন ভিন্ন অংশ; কিন্তু আবাব অন্যত্র (পৃঃ ২৪৮/০) বলিয়াছেন, ‘পাল খাটাইবাব জনা’ মাস্তুলগুলিব ‘গায়ে...এড়োকাঠ (লকার অর্থাৎ yard)...।’ লকার শব্দের পাঠান্তব লঙ্কার। Cowell সাহেব ইহাই দেখিয়া উহার অর্থ নঙ্গর (কাবনী লঙ্কার) কবেন। ইহা যে সঙ্গত নহে ঈশান বাবু তাহা বলিয়াছেন। স্বর্গায় হরিনাথ দে (Journal of the Pali Text Society, 1906-1907, p. 173) Cowell সাহেবেব এই মত খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উহার অর্থ নৌকাব ‘পাল’। তিনি বিহুজ্জিমগণ (ব্রহ্মদেশীয় সংস্করণ, পৃঃ ১১০) হইতে নিম্নলিখিত বাক্যটি প্রমাণ স্বরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

“যথা চ অচ্ছেকো নিয়ামকো বলববাত্তে লঙ্কারং পুবেত্তো।
নাংব বিদেশং পঞ্চন্দাপেতি; অপবো অচ্ছেকো মন্দবাত্তে লঙ্কারং
ওরোপেত্তো নাংব তথৈব ঠপেতি; ছেকো পন মন্দবাত্তে লঙ্কারং
পুবেত্তো বলববাত্তে অজ্জ লঙ্কারং পুবেত্তো। নোখিনা ইচ্ছিতট্টানং
পাপুণাতি।”

ইহার ভাবার্থ হইতেছে—যেমন কোনো অনিপুণ মান্নি প্রবল বাবুতে পাল উড়াইয়া নৌকাকে বি-দেশে (অর্থাৎ বেধানে বাইবার কথা সেখানে না গিয়া অস্ত্র) লইয়া ফেলে; আর অস্ত্র কোনো অনিপুণ মান্নি মন্দ বাবুতে পাল খুলিয়া ফেলিয়া নৌকাকে সেইখানেই রাখে; কিন্তু নিপুণ মান্নি প্রবল বাবুতে অল্পেকটা পাল উড়াইয়া ভাল-ভালয় অতীষ্ট স্থান প্রাপ্ত হয়...।

এ স্থলে লকার শব্দেরও একটা প্রয়োগ দিতে পারা যায়, ইহাতেও বুঝা যাইবে তাহার অর্থ ‘পাল’ :—

“অচলপদববজ্জ হুট্টিতোদারকুপসু

উদিতপুথুলকারং দক্ষ-নিয়ামকং চ।

সমমভিমতলঙ্কারামিনং নারমেতে

সপদি সমুপরুল্লংগ অদহং রাপিজেহি।”

দাঠাবংস, ৪. ৪২ (Journal, P T S, 1884, p 140).

উদিতপুথুলকার—উদিত পুথুলকার, ‘বাহার চণ্ডা পাল উদিত হইয়াছে।’ লক্ষ্মণ—আলোচ্য জাতক, পূর্বে উদ্ধৃত বিহুজ্জিমগণ, ও দাঠাবংসের নৌকার বর্ণনা একই রূপ, এবং তাহার শব্দাবলীও একই।

নৌকাব ‘পাল’ বুঝাইতে পালিতে লঙ্কার কোথা হইতে আসিল, ইহার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ কি? আমার মনে হইতেছে, মূল অলঙ্কার হইতে হইয়া থাকিবে। পাল তুলিলে নৌকাব বিশেষ রকমেব শোভা হইয়া থাকে, তাই সেই অর্থে প্রথমে অলঙ্কার শব্দটি চলিয়া যায়, পরে শব্দবিশেষের সংসর্গে অকারটি লোপ হওয়াব লঙ্কার হইয়া পড়িবাছে। যেমন উদ্ধবর হইতে আমাদের ডুধর ‘ডুম্ব’ হইয়াছে; অভ্যস্তর হইতে ভিতব। প্রাকৃতো ইব স্থানে ব, অপি স্থানে রি, এবং অন্ত্যস্থ এইরূপ শব্দ পূর্বেও প্রাণীতে কেবল মাত্র আদিস্থিত স্ববেব লোপেই হইয়াছে। একটু গবিদ্ধাব করিয়া বলি :—

প্রাকৃত

“অপথিতো রি হয়শো কঙ্গণ কররে গুণে পয়াসেই।

ধরলেই জয়ঃ সযলঃ সম্ভারও চের নিসি-নাহো”

হরহল্লবীচবিজ্ঞ (• কহা), কাশী, ১৯১৬, ১২৭।

সংস্কৃত

অপ্রাধিতোহপি হুজনঃ করীনাং কাব্যে গুণান্ প্রকাশয়তি।

ধরলয়তি জগৎ সকলঃ স্বভারতঃ এর নিশি-নাহঃ।

প্রার্থনা না করিলেও হুজন ব্যক্তি কবিত্তার কাব্যে গুণসমূহ

সব হলা নাশ তেজ বাধাকাশ
হত হলা রবি সসি ।
গত দিবা রাত্তি হত হলা খেতি
চতুর্দশ ভুবন আদি ॥ (পৃ: ১২৯)

মাণিক গাঙ্গুলী তাঁর ‘ধর্মমঙ্গলে’ লিখেছেন :—

অতল বিতল সপ্ত রসাতল
সংনিধি সমুদ্র সাত ।
অহব কিম্ব আদি চবাচর
সকলি হইল পাত ॥
সৃষ্টি করি লয় দেব দয়াময়
আপনি বহিল পুস্তে ।
চিন্তামনি তবে চিন্তিত বৈভবে
সৃষ্টি সজ্জিবার ক্ষণে ॥ (পৃ: ২)

শ্রুতপুরাণ-কারেব মতে ‘পরভু’, ‘মাআধর’, ‘করতা’ হচ্ছেন পরম দেবতা। প্রথমে প্রভু ‘অনিল’দের সৃষ্টি করলেন। তারপর তিনি ‘পুরুষ’রূপে নিজেকে সৃষ্টি করলেন। এই পুরুষের চক্ষু অবয়বাদি কিছু ছিল না—“রজবীজে জনম তার নহিক বাপ মাও।” এই মত হচ্ছে মাধ্যমিক দর্শনের মত—অরূপপাদক। নাগার্জুনের এই মত যে কেবল তাঁর মাধ্যমিক রুত্তির মধ্যে ছিল তা নয়, বেদান্ত পর্য্যন্ত সেই মত গ্রহণ করেছিলেন। পুস্যা (La Vellie Poussin) লিখেছেন যে—

“The main idea that there is no birth, production, *jati*, *utpada*, that causation is impossible since the cause cannot be identical with, nor different from the effect, since neither being, nor non-being, nor being+non-being, can originate, is thoroughly madhyamika.” (J. R. A. S., 1910 ; p. 136)

এই পুরুষের নাম নিরঞ্জন। নিরঞ্জন শব্দের অর্থ আমরা জানি নিরাকার, অঞ্জন-রহিত। পূর্বের কায়াহীন চক্ষুহীন পুরুষের নাম যে নিরঞ্জন হবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কিন্তু লোকে তার একটা সহজ ব্যাখ্যা বার করেছিল। প্রভু জলে, (নীরেতে) ছিলেন—“নীরেত নিরমল কায়্য নাম নিরঞ্জন”—তাই তাঁর নাম নিরঞ্জন হয়েছে বলে, সাব্যস্ত হয়েছিল।* মাণিক গাঙ্গুলী কিন্তু এপ্রকার শব্দতত্ত্ব সৃষ্টি করেন নি; তিনি লিখেছেন—“নির্সিকার, নিরাকার, নিরঞ্জন তুমি,” ইত্যাদি (১২।১৮)।

* এই রকম Sound Philology যে কেবল গ্রাম্য কবির করতেন তা নয়, বিষ্ণুপুরাণ-কার নারায়ণের অর্থ দিয়েছেন—

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরহনবঃ ।

অনং তস্মা তাঃ পূর্বাং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ১ ৪ ৬ ।

বাই হোক, ধর্ম নিরঞ্জন যোগে বসলেন ও চৌদ্দযুগ ব্রহ্মজ্ঞানে কেটে গেল। তার পর হাই তুলতে গিয়ে উলুক (প্যাচা) হঠাৎ বের হয়ে পড়লো। এই উলুক-মুনি প্রভুকে চৌদ্দযুগ টেনে টেনে শেষকালে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন ও প্রভুকে কিছু খাদ্য দেবার জন্ত বসলেন। প্রভুর সম্বল ছিল মুখের নিষ্ঠীবন মাত্র; তাই দিয়ে উলুকের প্রাণ বাঁচালেন; নিষ্ঠীবনের ছই এক কোঁটা উলুকের মুখের বাইরে পড়াতে সাগর সৃষ্টি হলো। সেই সাগর-জলে উভয়ে ভাসতে লাগলেন।

এই উলুক-সৃষ্টি ধর্মসাহিত্যের একটা বিশেষত্ব। উলুক হিন্দুদের কাছে খুব স্বপ্ন্য। বেদে বার চারেক উলুকের উল্লেখ পাই; মৃত্যুর সঙ্গে উলুকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।* লৌকিক ধর্মেও উলুকের স্থান নাই। এখন প্রশ্ন—ধর্মসাহিত্যে ও ধর্মপূজায়—এই উলুক কোথা থেকে এল। আমার মনে হয়—মধ্যযুগে যখন হিন্দুধর্ম ও পুরাণকথা লোকের মধ্যে প্রচারিত হচ্ছিল, তখন বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা অনেক ভাব গল্প প্রবাদ অজ্ঞভাবেই গ্রহণ করেছিল। লৌকিক ধর্মে যমকে ধর্মরাজ বলে—তা আমরা জানি; যমের সহিত উলুকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। বোধ-হয় যম ও ধর্মরাজের অর্থ ও ভাবের গোলমালে—উলুক ধর্ম-পূজকদের নিকট অত বড় আসন পেয়েছে। ধর্মরাজ ও যমরাজের আসন-পরিচ্ছদাদির মধ্যেও গুণগোল মাঝে মাঝে দেখা যায়।

সাহিত্যপরিষৎ থেকে “ধর্মপূজাবিধান” নামে যে গ্রন্থখানি ছাপা হয়েছে—তাতে দুই জায়গায় সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। শ্রুতপুরাণেব বিশদবর্ণনা ধর্মপূজা-বিধানে পাওয়া যায় না। প্রভু শ্রুতের মধ্যে জন্ম নিলেন; সেই শ্রুতই অনিল। অনিল নিরঞ্জনকে বলছেন যে তিনিই পিতা, তিনিই মাতা—তিনিই আদিতে ‘বিষুকে’র মধ্যে ছিলেন, ইত্যাদি। এই গ্রন্থের মধ্যে আমরা

* “A bird, either the owl or the pigeon (*kapota*), is said to be the messenger of *yama* apparently identified with death. In another place a demoness is compared with an owl. In the Sutrās the owl is the messenger of Evil Spirits.”—[Macdonell—Vedic Mythology.]

পাঠককে স্থানে স্থানে কিছু সাবধান হইতে হইবে। মূল জাতকে অধিকাংশই পদ্য, ও কিছু কিছু পদ্য আছে। পদ্য অংশের অনুবাদে মূলকে বসতা অনুসরণ করা হইয়াছে, পদ্য অংশে সেকপ না করিয়া অনেক বসতত্যাগ অবলম্বন করা হইয়াছে। ইহা ঠিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পদ্য অংশেরও অনুবাদে স্থানে স্থানে ক্রটি লক্ষিত হইল।

“অমাত্যেরা সমস্ত দিন ধর্মাসনে বসিয়া থাকিতেন” (পৃ. ১)। মূলের বি নি চ্ছ ব ট্ট ঠা ন শব্দের অর্থ ‘বিচারস্থান’ বা ‘বিচারালয়’, ‘ধর্মাসন’ নহে। ইংরেজী-অনুবাদের bench লিখিয়াছেন, ইহাতে ‘law-court’ বুঝাইতে পারে। বি নি চ্ছ ব ট্ট ঠা ন শব্দে যে ‘ধর্মাদিকরণ’, অনুবাদক নিজেই তাহা এখানেই একটু পরে লিখিয়াছেন (“স্বব্যবস্থার গুণে অচিরে ধর্মাদিকরণ”)। “এই নিলঙ্ক বুদ্ধকে ধবত।” (পৃ. ৬) মূলে আছে ‘ছু ট্ট ঠ’। তদনুসারে ‘ছুট্ট’ লিখিলেই বেশ হইত, ‘নিলঙ্ক’ লিখিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। মূলে আছে (vol. II p. 11, l. 13) “সু চি জা তি কো সী হো” (‘শুচি জাতিকঃ সিংহ’), ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে ‘সিংহ অতি শুচিপ্রিয়’ (পৃ. ৭)। ইহা ঠিক নহে। শুচি-জাতিক আব শুচি-প্রিয় এক নহে। ঐ কথাটার ইহাই তাৎপর্য যে, সিংহ-জাতি শুচি, পবিত্র। উৎসর্জাতকে মূলের (p. 13, l. 10) ম হা স ম জ্জা (মহাসমজ্জা) শব্দের অর্থ “মহাসমারোহ” (পৃ. ৯) করা হইয়াছে। কিন্তু ‘সমারোহ’ আর ‘সমজ্জা’ এক নহে; সমজ্জা বলিতে সভা, সমিতি, পবিত্র; সম্মেলন শব্দে ইহাও ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে। “সে (নাগ) ... নদীর পৃষ্ঠোপরি ছুটিয়া বাইতে লাগিল” (পৃ. ৯)। এখানে পৃষ্ঠোপরি শব্দের অর্থটা পরিস্ফুট নহে। মূলে আছে ‘নদী-পিট্টেন’ (নদীপুতেন), নদীর পৃষ্ঠ দিয়া, —এখানে পৃষ্ঠ শব্দের অর্থ ‘তল’, নদীর তল-দেশ দিয়া অর্থাৎ নীচে দিয়া; ইহাই ঐ শব্দটার তাৎপর্য। “বোধিসত্ত্ব... হৃদয়কে আশীর্বাদ করিলেন” (পৃ. ৯); এখানে মূলের ‘অ সু নো দ ন (অথবা অ সু নো দ ন) শব্দের অর্থ আশীর্বাদ ঠিক নহে। পূর্বেজাতকে (পৃ. ১০) “বলাবলি আরম্ভ করিল” — ইহা মূলের ‘উ জ্জা য় স্তি’ শব্দের অর্থ মনে হয়, কিন্তু ‘উ জ্জা য় স্তি’ (অবধায়স্টি) শব্দের অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে ‘অবজা করিতে লাগিল’ লিখিলে ঠিক হইত। ‘অবজা’ অর্থে ‘অবধান’ শব্দ সংস্কৃতের প্রসিদ্ধ। “প্রত্যাবিধান করিলে”, “প্রত্যাবিধান করিতে হইবে” (পৃ. ১০); উভয়স্থানেই লিখিতে হইলে ‘প্রত্যাবিধান’ লিখিলে ঠিক হইত, ‘প্রত্যাবিধান’ ঠিক নহে, এবং ‘আশীর্বাদ’ ও ‘অভিধান’ও এক নহে। জলীনচিহ্ন-জাতকে (p. 18, l. 10) আছে, “ছুতারেরা সমস্ত কাঠে চিহ্ন করিয়া (স এ ঞ্জ ক ঙ্গ) ...”। ইশান-বাবু অনুবাদ করিয়াছেন “সমস্ত কাঠে এক ছই ইত্যাদি অঙ্ক চিহ্নিত করিয়া...”। সংজ্ঞা শব্দে পণ্ডিতের অঙ্ক বুঝাইতে পারে না। আলোচ্য অনুবাদ পড়িলে লোকের এ বিষয়ে নানা ভ্রম হইবার সম্ভাবনা আছে। (জাতকে পুর্বাত্ত অংশে (পৃ. ২১, ২১০) ‘এক ছই ইত্যাদি অঙ্ক তন্ত্রণের’ কথা দেখিয়া সহজেই বুঝা যাইতে পারে কেমন ভ্রম হইবার আশঙ্কা আছে।) ‘সংজ্ঞা কবার’ ইহাই তাৎপর্য যে, কোন কাঠে নহিত কোন কাঠবান জোড়া দিতে হইবে তাহা ঠিক বাখিবার জন্য একটা দাগ বা চিহ্ন দিয়া রাখিত। “কাঠ কাটিতেছে ও ছিগিতেছে” (পৃ. ১২) —এখানে ‘ছিগিতেছে’ শব্দটি অধিক, মূলে নাই। “হাতী... কাঠের একখানা চেলার উপর পা দিয়াছিল” (পৃ. ১২)। মূলে আছে থা মু ক (অথবা থা গু ক), —ইহাও অর্থ শব্দ, ছোট গোরু, গোরু, চেলা নহে। পরে (পৃ. ১৩) আবার ইহার অর্থ ‘কাঠের কুচি’ করা হইয়াছে, ইহাও ঠিক হয় নাই। “তীক্ষ্ণধার শস্ত লইয়া” —এখানে মূলের অনুসরণে বাইশ বা বাহলা নামের বিশেষ শস্তকে (“তি শি ন বা সি রা”, তীক্ষ্ণ বাশ্য) উল্লেখ করাই উচিত ছিল। তাহা হইলে বুরিতে পারা যাইত যে, উহার প্রচলন তখনো ছিল।

“যন্ত্রপাতি বহিয়া আনিত” (পৃ. ১৩), —এখানেও মূলে আছে “বাশী প্রভৃতি”। হস্তী ছুতারদের কেমন কাজ করিত তাহার বর্ণনায় এক স্থানে আছে—ত ছ স্তা নং প রি ব স্তে জা দে তি . সো জা য বে ঠে জা কা ল স্ত কো টি যং গ ন হা তি”। ইশান বাবু অনুবাদ করিয়াছেন “যখন তাহার কাঠ ছিলিত, তখন শুড়িগুলি (পাছগুলি বলিলে মূলানুযায়ী হইত) উঠাইয়া পাটাইয়া দিত...। সে-সমস্ত জবাই শুণ্ড দ্বারা এমন বেটন করিয়া ধবিত যে কিছুই পড়িয়া যাইত না।” শেষাংশের মূল “কালস্ত কোটিয়ং গণহাতি,” —ইহার টীকার উক্ত হইয়াছে—“কালস্ত কোটিয়ং গণহাতি অর্থাৎ যমেব যন্ত্রের দ্বারা ধবিত—এমন ভাবে ধবিত যে, কিছুতেই কঙ্কাইয়া যাইত না।” এ ব্যাখ্যা বড় কষ্টকরিত। ছুতাব-মিস্ত্রীর কাঠের কাজ কবিবার সময় কাল-রং-মাখান একরকম হুতা দিয়া প্রথমে কাঠে আবশ্যক-মত দাগ দিয়া পরে সেই দাগ অনুসারে তাহা কাটে। বাহাতে এই হুতা জড়ান থাকে ছুতার-মিস্ত্রী নিজেই তাহা ধবে, আব অপব দিকটা অস্ত্রকে ধবিত দিয়া তাহাও সাহায্যে কাঠে দাগ দেয়। এখানেও এই কথাই বলা হইতেছে,—হাতীটি কাল হুতাব আগাটি শুড়ে জড়াইয়া ধরিত। পালি কথাটার আক্ষরিক অর্থ হইতেছে—শুণ্ডের দ্বারা বেটন কবিয়া কৃষ্ণ যন্ত্রের অগ্রভাগে (অর্থাৎ অগ্রভাগকে) ধারণ করিত। উক্ত Journal of the Pali Text Society, 1881, pp 76-78। এখানে আলোচ্য শব্দটির সুবিশেষ আলোচনা আছে।

পালির চা টি শব্দের অর্থ করা হইয়াছে (পৃ. ৩৬৭, ১৪) ‘কলদ’ বা ‘কলনী’, কিন্তু বস্তুত কলদ ও চা টি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। চাটিকে বাঙলায় কোনো কোনো স্থানে ‘চাডি’ বা ‘চাড়া’ বলে, ইহা মাটির গোলাকার অভিবৃহৎ পাত্র, পরকে ইহাতে খাবার দেয়। দেখিয়াছি (রাজশাহীতে) ছোট ছোট নদীও ইহাতে পান হওয়া যায়। অনেক স্থলে আবার ইহাকে ‘নাদা’ বলে।

ইশান বাবু কর্ণিকার পুস্তকে (১৭ পৃ.) ‘কনক-চাপা’ বলিয়াছেন, কিন্তু বস্তুত তাহাই কি? কনক-চাপার বেশ গন্ধ আছে, কিন্তু কর্ণিকারের গন্ধ নাই (“এবং কর্ণিকারের সতি কর্ণিকারের দুর্গন্ধোক্তি নির্গন্ধতয়া স্ম চেতঃ। প্রায়েণ সাংখ্যবিধৌ গুণানং পরাঙ্গুণী বিশ্বসজঃ প্রবৃতিঃ।” —কুমার, ৩২৮)। ইহা সৌদাল, সোনাল, হিন্দীতে কনিষ; ইহাও লম্বা-লম্বা কল হয়; কবিবাজেরা ইহাতে জোলাপ দিয়া থাকেন।

আমার মনে হইতেছে, জাতকের প্রথম খণ্ডের সমালোচনায় লিখিয়া-ছিলাম গৌতমীকে বাঙলায় স হা প্র জা প তী না লিখিয়া মহা প্র জা . যু তী লেখা উচিত ছিল, এবং আরো লিখিয়াছিলাম যে, প্র জা ব তী শব্দ হইতেই আমাদের পোয়া তী শব্দটা আসিয়াছে। আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ডেও (পৃ. ২৬, ২৩৮) দেখিতেছি ইশান বাবু প্র জা প তী ই লিখিয়াছেন। কেন আমি প্র জা ব তী লিখিতে চাই বলিয়া বলি। Childers সাহেব অভিধানপদীপিকা (২৩৭, ১০০০) ও ধর্মপদের (১৮৫, ২৪৫) উল্লেখ করিয়া প্র জা প তী লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু বস্তুত ঐ ছই পুস্তকে ও অন্যান্য পালি পুস্তকে আছে প্র জা প তী, প্র জা প তী নহে, পালিতে ইহা থাকিবার কথাও নহে। দিব্যাবদান (পৃ. ২, প. ২; পৃ. ৯৮, প. ২১) প্রভৃতি বৌদ্ধ সংস্কৃত পুস্তকে প্র জা প তী শব্দ আছে; কিন্তু এই দিব্যাবদান ও বিশেষত ললিতবিস্তর ও মহাবস্তু প্রভৃতি বৌদ্ধ সংস্কৃত বা পাঠ্য ভাষায় লিখিত পুস্তকসমূহে এরূপ অনেক শব্দ আছে যাহা খাঁটি সংস্কৃত নহে। পালি-প্রাকৃতের মিশ্রণে ঐ এক-বকম অদ্ভুত সংস্কৃত করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, কোনো কোনো শব্দের একাংশ খাঁটি সংস্কৃত হইলেও অপরাংশ খাঁটি পালি বা প্রাকৃত, ইহা যে-কেহ বলিবেন। প্র জা প তী শব্দটিও এই প্রকার। Childers বা M. M. Williams কেহই

হিন্দুদের ব্রহ্মতত্ত্ব ভাল করে' পাই—“যেক ব্রহ্ম দিত্যি নাহিক আর” (পৃ: ২০০)।

শ্রুতপূরণের গল্পাংশ যতই উদ্ভট হোক, বেশ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। উলুক-মুনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লে প্রভু তার দেহ থেকে একটা পাখা ছিঁড়ে জলে ফেলে দিলেন এবং তখনই হংস সৃষ্টি হলো। সেই হংস বলছে যে তারও “নাহিক বাপ মাও”। বাই হোক, চৌদ্দ যুগ প্রভুকে বহন করে' হংসরাজ দেবতাকে ঠেলে ফেলে আকাশে উড়ে গেল। এখানেও লৌকিক বিশ্বাস ও শাস্ত্রের উদ্ভট ঠিক দেখা যাচ্ছে। হংস পবিত্র; পুরাণে হংসের স্থান খুব উচ্চ।* সেখানে সে বিষ্মকে অক্লান্তভাবে বহন করেই ধন্ত; কিন্তু এখানে হংস ঠাকুরকে ফেলে পালিয়ে গেল। ধর্মপূজাবিধানের এক জায়গায় আছে “হংসরণে বিজয় ঠাকুর নিরঞ্জন” (পৃ: ২১৬); তবে সেখানে নিরঞ্জন পরব্রহ্মের নামান্তর মাত্র। তা ছাড়া ধর্মপূজাবিধানে যে হিন্দুপ্রভাব অনেক বেশী তা আমরা দেখতে পাব।

প্রভু হংসের পর কচ্ছপ সৃষ্টি করলেন; কিন্তু যে কচ্ছপ পৃথিবীর ভাব সহ্য করছেন—তিনিও চৌদ্দযুগ পরে চম্পট দিলেন। প্রভু খুবই মুগ্ধিলে পড়লেন। তখন তিনি সোনার পৈতা ছিঁড়ে জলে দিলেন ফেলে, ভাবলেন বাহনটি অন্তরের মত অকৃতজ্ঞ হবে না। কিন্তু পৈতা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল বাহুকি নাগ। বাহুকি তখনই প্রভুকেই খাবার জন্ত তেড়ে ছুটলো; ধর্ম বেগতিক দেখে উলুকের পরামর্শে কানের কুণ্ডল খুলে ফেলে দিলেন। সেই কুণ্ডল জলে পড়েই ব্যাঙ হয়ে গেল—বাহুকি সেই ব্যাঙ খেতে মন দিলেন। ধর্মপূজাবিধানে আছে যে ধর্মের পৈতা হচ্ছে হাজার-মাথা অষ্টনাগ। এটা পৌরাণিক অনন্ত নাগের বর্ণনার সঙ্গে মেলে। কিন্তু কোথায়ও ত দেখা যায় না যে বাহুকি প্রভুকে খেতে ছুটেছে! স্মরণ্য এই আখ্যায়িকাটাও লৌকিক বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যাচ্ছে।

এখানে একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে। হিন্দুদের স্বর্ণা মৃত্যুর দূত উলুক হচ্ছেন মুনি, ধর্মের নিত্যসহচর।

ধর্মের সঙ্গে উলুকের যোগের কথা আমরা পরে বিশদভাবে আলোচনা করবো। হংস, কুর্শ, বাহুকি সকলেই বেশ শাস্ত্র কৃতজ্ঞ বলেই শাস্ত্রে উক্ত; কিন্তু ধর্মসাহিত্যে তাদের যে কপ দেখা গেল সেটা আদৌ আদর্শস্থানীয় নয়। এই-সবের মানে কি তা স্পষ্ট করে' বলা বড় কঠিন; হিন্দুদের যেটা পূজা তাকেই ছোট করা ও যেটা অপূজ্য সেটাকে বড় করাই যদি এর ভিতরকার কথা হয়, তবে এ কয়টি প্রাণীই বেছে নেওয়ার মানে কি ?

এখন আমরা সৃষ্টিতত্ত্বের অন্ত্যান্ত কোটায় প্রবেশ করি। ধর্মপূজকদের মতে পৃথিবী ধর্মের গায়ের ময়লা; তিনি বাহুকির মাথায় সেই ময়লা চাপিয়ে দেন বলেই পৃথিবীর অপর নাম বহুমতী। মাণিক দত্তের মণ্ডলচণ্ডীতেও আমরা যে সৃষ্টিতত্ত্ব পাই সেটি ধর্মপূজকদের বিশ্বাসেব অনুরূপ। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকাষ আলোচনা করেছেন। মাণিক দত্তের মতে ধর্ম পাতালে বান মাটি আনবার জন্ত। সেখান থেকে শ্রুতমুর্তিতে তিনি উপরে উঠে আসেন। মাণিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গলের লেখক হলেও তাঁর বই আরম্ভ হয়েছে ধর্মকে নিয়ে, আর তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে শ্রুতপূরণ বা আর কোনো ধর্মপূজার বইএর প্রভাবে লিখিত হয়েছিল। শ্রুতপূরণের সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে আদ্যাশক্তি ধর্মের ধর্ম থেকে সৃষ্টি হন। এই আদ্যাশক্তি গৌরী বলেও উক্ত হয়েছেন (পৃ ১৫২)। এই দেবী ধর্মের কস্তার ছায়া; এঁর গর্ভে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব জন্মগ্রহণ করেন। ঘনরাম লিখেছেন “পরম ব্রহ্ম বামে পরা জগ্নিল প্রকৃতি” “প্রকৃতি হইতে জন্মে ত্রিগুণ আধান” “বিধি বিষ্ণু মহাদেব জগ্নিল মহান্।” শ্রুতপূরণ ও ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু মাণিক গাঙ্গুলীর মধ্যে একটা গোঁজামিল দেবার চেষ্টা দেখা যায়। তিনি অকস্মাৎ সৃষ্টিকার্য স্তব্ধ করিয়েছেন। শ্রুতপূরণ, ঘনরাম, ধর্মপূজা-বিধান, মাণিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডীর বর্ণনাব মধ্যে একটা পারস্পর্য্য আছে। কিন্তু মাণিক গাঙ্গুলী উলুক ও সাগর সৃষ্টি করে' লিখছেন—

“শক্তি সনে তথি একে স্থিতি গতি,
তিন যুগি সেই কালে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন দেব
ইহার উপমা কিবা।

শক্তি হলো তিন ইথে নাহি তিন
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী শিবানী।”

মাণিক গাঙ্গুলী বোধ হয় কতকগুলি ঘটনা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় ত্যাগ করেছিলেন। পৌরাণিক আখ্যায়িকার প্রভাব ধর্মমঙ্গলকারগণের মধ্যে যতটা দেখা যায়, প্রাচীন-তর এসে ততটা পাওয়া যায় না। শূন্যপূরণে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের স্থান যে খুব উচ্চ নয় তা আমরা দেখেছি; তাঁদের জন্ম হলো আদ্যার কাম থেকে। তাঁরা সব ধর্মের নির্দেশ-মত যে ধার কান্ড ভাগ করে’ নেন। ধর্ম চারি জনের উপর সৃষ্টি পরিচালনের ভার দিয়ে নিশ্চিত হলেন। মাণিক গাঙ্গুলীও তাই করেছেন বটে, কিন্তু প্রত্যেক দেবতার একটি কবে’ শক্তি জুটিয়েছেন, যেমন ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, শিবানী।

তার পর দেখা যায় যে ব্রহ্মাদি তিনজন দেবতা ধর্মের ধ্যানে বসেছেন এবং ধর্ম তাঁদের পরীক্ষা করবার জন্ত বেব হয়েছেন। মাণিক এখানে দেবতাদের জ্বানী ধর্মের যে স্তব জুড়েছেন সেটা একেবারে পৌরাণিক ছাঁদে গড়া। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টি-অধ্যায়টা পড়তে পড়তে বেশ দেখা যায় যে তিনি ধর্ম দেবতার সম্মান ও ব্রহ্মাদির সম্মান দুই রাখবার জন্ত ব্যস্ত। তাই ব্রহ্মাদির উৎপত্তি যে বৌদ্ধ-সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্মত এটা জানাতে তিনি কুণ্ঠিত বলেই উল্লুখ সৃষ্টির পরেই প্রকৃতি হতে ব্রহ্মাদির উৎপত্তি দেখালেন। পুরাণো মত থেকে ধর্মমঙ্গলকারগণ অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিলেন।

এতক্ষণ আমরা শূন্যপূরণ ও ধর্মমঙ্গলগুলির সৃষ্টি-তত্ত্বের কথাই বললাম। এখন বৌদ্ধসৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে এমিল-অমিলগুলি দেখানো যাক।

বুদ্ধদেব যদিও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে নিষেধ করেছিলেন, তথাচ লোকে তাঁর নিষেধ বেশীদিন মানেনি। ব্রাহ্মণ্য সৃষ্টিতত্ত্বের উপর তাঁরা নিজেদের সৃষ্টিতত্ত্ব গড়ে’ তুললেন। নেপালের বৌদ্ধধর্মের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্বের বেশ একটা ছবি আমরা পাই। তাঁদের মতে আদিবুদ্ধ হচ্ছেন পরমদেবতা। ওল্ডফিল্ড (Oldfield) লিখেছেন—

“The system of theology taught in the Buddhist scriptures in Nepal is based upon a belief in the divine supremacy of Adi-Buddha as sole and self-existent spirit pervading the universe.”—Sketches of Nepal, Vol. II, p. 111.

হজ্জসন (Hodgson) নেপালের বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে

যেকপ খেটেছিলেন, এ পর্যন্ত অত পরিশ্রম আর কেউ করেছেন কি না সন্দেহ। তাঁর মতটা নিয়ে উদ্ধত করে’ দিচ্ছি। স্বয়ম্ভু-পুরাণ-মতে আদিতো শূন্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না; শুণকুরগুব্যহে লেখা আছে যে যখন কিছুই ছিল না—তখন স্বয়ম্ভু ছিলেন একা; কেবল তিনিই আদিতো ছিলেন বলে’ তাঁকে বলতো আদিবুদ্ধ। তাঁর বহু হবার কামনা হলো—সেই কামনা হচ্ছেন ব্রহ্মা। বুদ্ধ ও ব্রহ্মাব যোগে ব্রহ্মা-উপায় বা শিব-শক্তি বা ব্রহ্মা-মাষার সৃষ্টি। এই কামনার উদ্বেকের সঙ্গে পঞ্চদেব বা পঞ্চবুদ্ধের জন্ম হলো। সেই পঞ্চ বুদ্ধ হচ্ছেন বৈরোচন, অশোক, রত্নসম্ভব, অমিতাভ বা পদ্মপাণি, অমোঘসিদ্ধি। প্রত্যেক বুদ্ধের উপর এক এক বোধিসত্ত্ব সৃষ্টি করবার আদেশ হলো আদিবুদ্ধের। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের সম্বন্ধ পিতাপুত্রের মত। চার বুদ্ধ ও বুদ্ধকল্প গত হয়েছে। বর্তমান কল্প হচ্ছে বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির রাজত্ব। পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবকে সৃষ্টি করলেন—এবং জগতের সৃজন পালন ও সংহারের কাজে জুড়ে দিলেন। বৌদ্ধসৃষ্টিতত্ত্ব পড়লে বেশ দেখা যায় যে হিন্দুদের প্রধান দেবতাদের স্থান আদিবুদ্ধ, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বেরও নীচে। শূন্যপুরাণ ও মঙ্গল-সাহিত্যে আমরা দেখতে পেয়েছি যে ব্রহ্মাদি প্রধান দেবতার উৎপত্তি মোটেই হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত নয়। এঁরা সকলে ধর্মের কল্পা আদ্যার পুত্র-স্থানীয়। এখানে আমরা যেমন দেখলাম ব্রহ্মাদির অবস্থা, পরে প্রসঙ্গক্রমে হিন্দু সন্তান্য দেবদেবীর স্থান ও মানের কথা আসবে। সেখানে দেখা যাবে যে ইন্দ্রাদি দেবগণ ধর্মের দেহারায় উপস্থিত হচ্ছেন! শুধু তাই নয়, তাঁরা ধর্মের জন্ত রীতিমত তপস্শা করছেন। বৌদ্ধ (মহাধান) মতামুযায়ী সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে শূন্যপুরাণোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের খানিকটা মিল আছে। মূলতঃ সৃষ্টি বৌদ্ধমতের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই দেখা যাচ্ছে। আগামীবারে আমরা পুণ্ডিতদের বিষয় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখাবো যে শূন্যপুরাণের সহিত নেপালী বৌদ্ধধর্মের যোগ আরও কত ঘনিষ্ঠ।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

Δ * খ ট অ Δ * খা টা অ Δ খা টা । বলা - ঘাইতে
 পারে গ. চ. ক. খ. ট. অ. খা. টা. অ. খা. টা.

কোনো কোনো সংস্কৃত কোশে 'ধর্বা' অর্থে খট্টা ন শব্দ
 ধরা হইয়াছে (Apte, Monier Williams) ও আয়াদের
 মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন, এই খট্টা ন হইতেই খাট
 হইয়াছে। খট্টা না শব্দ ষষ্ঠ মূলত সংস্কৃত তাহার প্রমাণ নাই,
 আর তাহা হইতে খাট হইতেও পোরে না। শেষের ন
 কারেব' স্থানে একটা অ (ক) থাকিলে 'অবশ্য' হইতে
 পৌরিত।

নতুন হিন্দীতে এবং কোনো কোনো প্রাদেশিক
 বাঙালি 'কুদ্র' অর্থে 'খুদ' বা 'শব্দ' প্রচলিত আছে।
 ইহা স্পষ্টতই সংস্কৃত 'কুদ্র' শব্দ হইতে (> খুদ' অ'
 > খুদিরা) আবার ঠিক ঐ অর্থেই 'খুচ' বা 'শব্দ' প্রচলিত
 আছে। ইহা খুদ' বা শব্দেরই অপর রূপ। ন-টা ক্রীড়ণে
 চ' হইল তাহা ভাবিবার বিষয়। এই প্রসঙ্গে দুইটি
 ইরানীয় শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সংস্কৃত
 হইতে পহলবীতে (ক-যোগে) 'খু' ব-দ ক্রঃ ফারসীতে
 'খু' ব-দ। কেহ বলিতে পারেন, ইহা হইতেই রব্র' বিপর্যয়ে
 হয় তাহা আলোচ্য ঐ দুই শব্দ হইয়া থাকিবে। এই
 এইরূপে 'খু' ব-দ 'খু' ব-দ 'খু' ব-দ 'খু' ব-দ
 এইবার আমরা 'কু-য়ে-র' পালা, আরস্তা ক্রিয়াক্রম, 'কু-
 থ এই উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ দেখে, 'কু-য়ে-র' প্রাণ,
 'কু-য়ে-র' প্রাণ, 'কু-য়ে-র' প্রাণ, 'কু-য়ে-র' প্রাণ, 'কু-য়ে-র'
 উভয়ের প্রাণ, 'কু-য়ে-র' প্রাণ, 'কু-য়ে-র' প্রাণ, 'কু-য়ে-র'
 আকার ধারণ করে। এই নিয়মে 'কু-য়ে-র' প্রাণ, 'কু-য়ে-র'
 হওয়া পূর্ব প্রাদেশিক (৪৫) 'খু' ব-দ 'খু' ব-দ 'খু' ব-দ
 হইয়া সিংহলীতে 'কু' হ 'কুদ্র' হইয়া দেখা দিয়াছে।

১১। সংস্কৃতের ক্ষুদ্র অব্যেতায় খ্ খ্ ড্র (xudra) ;
 তাঁহাড়া তাহাতে 'ক্ষু.ড্র' বা ছোট; অর্থেই-আর একটি শব্দ
 হইতেছে কু ত ক (kutaka) । কারসীতেও ঠিক এই অর্থে
 কু.ত.ক. হইতেছে আর একটি শব্দ-ইহাতেছে কু.ত.ক.ব,
 অর্থ ক্ষুদ্র শিশু । লিখ্যানিয়ায় পাঠ্যমাণ্যম
 প্রাকৃতের য-প্রতি-নিয়ম (আমাব-প্রতি-য-প্রতি-প্রবন্ধ
 প্রত্যয়) শাস্তি-নিবেদন, ১৩২, বৈশাখ-১৩৭ উচ্যায় অনুসরণ
 করিলে প্রত্যয়-বান-খ-এর, ক-এর, তালিষিয়া-খ-এর, ক-এর
 ইত্যাদি লেখা উচিত ।

kudikis শিশু । এই শব্দগুলি তুলনা করিলে মনে হয় ইহাদের একটি সাধারণ মূল আছে, এবং হইতে পারে ইহা কু, ক্, ক্ব, ক্বা ইহারও পূর্ববর্তী এইরূপ আর কোনো একটি শব্দ । পূর্বের কু, ক, কু, ত, ক, ও কু, চ, ক; এই তিনটি শব্দ, অক্ষরবিকর্তনে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে (কু, দ, ক :- কু, ত, ক :- কু, চ, ক) । আমাদের কু, চ বা, কু, চা, ও কু, চি, শব্দ (যেমন 'কু, চা' অর্থ বা, কু, চ নৈবেদ্য', 'কু, চি বাসন') এই ফারসী কু, চ, ক (কু, চ, ক) শব্দই হইতর দিয়া আসিয়াছে। 'ক, চি, পাতা', 'ক, চি, হাত' ইত্যাদির ক, চি (কু, চ, ক) শব্দও এই কু, চ, ক হইতে । ফারসীর কু, চার্থে প্রযুক্ত কু, দ, ক ও লিথুয়ানিয়ার kudikis ছোট শিশুকে বুঝায় । ফারসীর কু, দ, ক হইতে পূর্ববঙ্গে কু, দ্বা, কো, দা, 'ধোকা' (কো, দী, 'খুকা') এবং ইহা হইতেই মালদহের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে 'ধোকা' অর্থে প্রযুক্ত শু, ধা, শব্দ হইয়াছে ।

১২৪। এইবার: আমরা ছন্দগ্ৰন্থে কণ্ঠ্য বর্ণিত। আমরা
 দেখিয়া আসিলাম ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এইরূপ ইহা আবার ছন্দ
 হয়। সংস্কৃত ক্ষুণ্ণ হইতে আমাদের ছান্দ্যের কণ্ঠ্য
 একসঙ্গেই আমরা ইহার পরিচয় পাই। ক্ষুণ্ণ কণ্ঠ্য
 খুড় ক হইয়া দেখা গেল। সেইরূপ তাহা হইতে আবার
 * ছুড় ক শব্দও হয়। ইহা হইতে * ছুড় অ, পরে উক্তার
 স্থানে ওকার প্রথম উক্তারের লোপে পূর্বস্বর সান্নানাসিক
 ও শেষের ছই অকার মিলিয়া আকার হওয়ায় ছোড়া
 আবার ড হোমল (ঘোষ), ইহা কঠোর (অঘোষ)
 হইলে ট হইয়া যায় (ঈদৃশ স্থলে পৈশাচী প্রাকৃতের প্রভাব
 বলিতে পারা যায়), তাহা হইলেই * ছুড় ক হইয়া
 গেল ছুট ক (= ছুট অ, ছুট, পাই অলঙ্কার, ৪৭২)। ইহা

ইহাতে উর্দুর শব্দকার হওয়ার ইয়্যা-গেল ছোট্ট একটা
টাকার লোপে ছোট্ট, হিন্দিতে ছোট্ট। ছ-রের
শাসটার খেলাচাতাই চ ফুঁড়িয়া পড়েছে এইকরে এনে
ইহিতেছে ঐছোট্ট বা নছোট্ট ইহিতে হিন্দীর চোনটা
(‘তুব্ব’, ‘চোর’) ইয়্যা থাকিবে।

পুষ্কি দেখিয়াছি। কুত্রক হইয়াছে। খুন্সক, কিন্তু
বধন ছ হয় তখন সেইরূপেই তাহা হইতে হয় * কুন্সক

আঁখাবেই শেষ, মাঝে দুই-একটি কীর্ণ আলো-রেখা দেখা বাইরেছে।
মাথুয়ের অধ্যবসার-বলে ঘন কুয়াসা অপসারিত হইবে এই বিশ্বাস
একদিন জ্যোতির্গর হইয়া উঠিবে।”

তারাইনি অলংকার পরীক্ষা করিতে করিতে আচার্য্য
দেখিলেন, সে, কলের বসিড়ি প্রথম প্রথম বৃহৎ হয় কিন্তু
উহা ক্রমশঃ কীর্ণ হইয়া লুপ্ত হইয়া যায়। দেখিলেন, দিবা
রস্তেই পরীক্ষণ শ্রেয়ঃ কারণ সারাদিন পরীক্ষার পর কল
ক্লান্ত হইয়া যায়। তখনই প্রশ্ন তিনি কিছুতেই উড়াইতে
পারিলেন না। যে কলের এ কীর্ণ কেন হইয়া অনেকগুলি
আবিষ্কার কেবল লিখিবার অপেক্ষায় ছিল যাহা সে-সব
ছাড়িয়া দিয়া প্রিন্টম্যান প্রিন্টের উত্তর অল্পসন্ধান করিতে
প্রবৃত্ত হইলেন। প্রিন্টম্যান দেখিতে পাইলেন, জীবনহীন
ধাতু উত্তেজিত এবং অবসাদগ্রস্ত হইয়া যে সাড়া দিবার
শক্তি জীবনের এক প্রাণনি চিহ্ন বলিয়া সংগ্ৰহ করিয়া
তাহার ক্রিয়া পরিস্ফুট দেখিতে পাইলেন।
জীবন্ত বস্তুদিগের হস্তে এইসব নূন্যতম রাখিয়া
পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা একিরিয়া
আসিবেনা মনে করিতেছিলেন। কিন্তু তাহা ঘটিয়া
উঠিল না। সর্বপ্রধান জীবন্ত বস্তু বার্ডনি সেণ্ডার্সন
বলিলেন, জীবন্ত বস্তু সম্বন্ধে আপনি যে পরীক্ষা করিয়াছেন
সে সম্বন্ধে আমাদের চেষ্টা পূর্বে নির্ফল হইয়াছে, সুতরাং
আপনার কথা অসম্ভব ও অগ্রাহ্য। এ আক্ষেপ আপনার
অনিধিকার-চর্চা হইয়াছে, আপনি পদার্থবিদ্যায় অশাস্ত্রী
হইয়াছেন; আপনার সম্বন্ধে সেই প্রশস্ত পথে বহু কতিয়
রাইয়াছে, আপনার অজ্ঞানি লম্বা হইতে। নিবৃত্ত হউন
আচার্য্য উত্তর করিলেন, নিবৃত্ত হইব না, এই বন্ধুর
পথই আমার, আজ হইতে সোজা পথ ছাড়িয়া, অজ্ঞ
ফাঁদে প্রত্যাশা করিইল, তাহাই সত্য; ইচ্ছা তেই। উক
অনিচ্ছাতেই উক, তাহা সকলকে গ্রহণ করিতেই হইবে।
তৎপরে বহুবৎসব্যাপী সাধনা দ্বারা নব নব উদ্ভাবিত যন্ত্রে
বহুবিধ পরীক্ষণ বৃক্ষজীবনের মানবীয় জীবনের প্রতিকৃতি
দেখিয়া নিকট জীবনের উত্তেজনা মানবের অহুতীর
স্বস্ত্যাপ্ত করিলেন। বৃক্ষের অদৃশ্য বৃক্ষ মাটি প্রেন এবং
বিভিন্ন আহার্য্য ব্যবহার্য্য সেই বৃক্ষের মাত্রেরি মুহূর্ত্তক
পরিবর্তন নিরূপণ করিলেন। মনুষ্যের পক্ষে যে সমস্ত
হৃদয় তাহা দেখাইলেন তাহা যে উত্তেজক মানুষকে উৎসাহ

করে, যে মানক তাহাকে অবসন্ন করে, যে বিষ তাহার
প্রাণনাশ করে, উদ্ভিদেও সেই-সময়ের একই-বিধ ক্রিয়া
প্রমাণ করিলেন। উদ্ভিদ প্রাণীর স্পন্দন লিপিবদ্ধ করিয়া
তাহাতে মানবরক্তের স্পন্দনের প্রতিচ্ছায়া দেখাইলেন।
বৃক্ষের বীজের স্তায় প্রবাহ স্তায়িকার ক্রিয়া তাহার বেগ
নির্ণয় করিলেন। ক্রমাগত করিলেন যে যন্ত্রকল যন্ত্রে
মানুষের স্নায়ব উত্তেজনা বৃদ্ধিত বা মুদ্রীভূত হয় সেই
একই কারণে উদ্ভিদে স্নায়ব স্তায়িকার উত্তেজিত অথবা
প্রশমিত হয়। রক্তের স্বহস্তে সঞ্চিত এই সকল সাক্ষ্য
বিশ্ব রাস্তার পূর্বে যে সকল সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল
স্বাক্ষর তাহা সর্বত্র স্তায়ের গৃহীত হইয়াছে বিরোধী
বাহারা ছিলেন, এখন তাহারাও পবন সিত হইয়া
দাড়াইলেন; এবং বিজ্ঞান ক্ষেত্রে ভারতীয় সাধক পৃথিবীর
নিকট হইতে জয়মালা আহরণ করিলেন।
আমরা অনেকই কেবল মাত্র পূর্বপুরুষগণের
গৌরব ঘোষণা করিয়া সন্তুষ্ট থাকি। কিন্তু তাহা
কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষগণের জয়মালার বাণী
গিয়াছেন এবং দুই-চারিজন বিদেশীও কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহা
বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যে বৈদ-উপনিষদ-রচয়িতার
বংশধর আজকালোমার স্থান কোথায়? হারি আনন্দের
তোমার দিবানন্দ কি কোন্ দিন ভাঙিবে না? তোমার পুণ্যের
শুভ গিষ্ঠি ও কাঁচ। স্বপ্ন ও ইবক বলিয়া তাহা বিক্রয় করিবে মনে
করিয়াছিল। এবং অলীক ধর্মের আপনাকে ধনী মনে করিয়া জোয়া
লক্ষীকে পূজা করিল। মর্শকুপের উপহাস এত অল্পদিনেই
ভুলিয়াছে? কি বলিতেছে? তোমার পূর্বপুরুষ ধনী ছিলেন,
তাইরি পুণ্যকর বিদানে বিহার করিতেন। কিন্তু সে কি
করিয়া সেই সম্পদ হারাইল? চাহিয়া দেখে মনে যে রক্ত পুরুত
দেখিতেছে, তাহা নব-কঙ্কালে নির্মিত। তুমি বাহাদিরকে স্নেহ বলিয়া
মর্শ কর, উহা তাহাদেরই অস্থি। দেখ, কাহার সেই অস্থিনির্মিত
দোণান ব্রাহ্মণ প্রিন্টের উঠিয়াছে এবং স্তম্ভ-বাগ্গ দিয়া নীলাকরণ
তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। উত্তীর্ণমান স্তম্ভ-পক্ষী-পেঁপু
বলিয়া বাহা মনে করিয়াছে দেখিতে দেখিতে সেগুলি মেঘের অন্তরালে
অস্তিত্ব হইল। অবাক হইয়া তুমি উকি চাহিয়া আছ। অজ্ঞান
মেঘরাগ হইতে নিকট রক্ষণের তোমার চতুর্দিকে পৃথিবী বিদীর্ণ
করিল। কোথায় তুমি পলায়ন করিবে? গম্বরে প্রবেশ করিয়াও
নিশ্চয় নাই। বিবাহক বাসে তোমাকে সে স্থান হইতে বাহির
হইতে হইবে।
আজকে মস্ত্র দীক্ষিত হইয়া ভ্রাতৃত্ববন্ধন বন্ধীভবনের
স্পন্দন অনুভব করিতেছে বহুবৎসর পূর্বে আচার্য্য তাহার
পরীক্ষার দ্বারা দেখাইয়াছিলেন যে, ছিন্ন-শাখ বৃক্ষ

৫। সংস্কৃত ক্ষুদ্র ক হইতে প্রাকৃত-প্রভাবে গাথা বা বৌদ্ধ-সংস্কৃতে খু ড় ক (সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, ৪৬০ পৃঃ দুইবার)। ইহা হইতে ক্রমশ খু ড় অ হইয়া আমাদের নিকট খু ড়া ও খু ড়ো (জীলিঙ্গে খু ড়ী)। যদিও ইহা মূলত বিশেষণ, তথাপি আমরা ইহাকে বিশেষ্য করিয়া লইলাম। কাকাকে বুঝাইতে পারে এরূপ কিছু ইহাতে না থাকিলেও (অর্থাৎ খু ল্ল তা ত শব্দে যেমন তা ত জুড়িয়া দেওয়া ছিল সেরূপ কিছু না থাকিলেও) আমরা ইহাকে 'কাকা' অর্থে চলাইয়া লইলাম। কিন্তু যদিও আমরা কাকাকে খুল্লতা ত শব্দের মত খু ড় তা ত শব্দে ডাকি না, তথাপি একদিন যে এই শব্দটি ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তাই শেষে একটা অ (< ক) জুড়িয়া দিয়া তাহা হইতে (অর্থাৎ খু ড় তা ত অ হইতে) বিশেষণ করিয়া লইলাম খু ড় তা ত^৩। 'খুড-তা ত' ভাইবোন' আমরা সাধারণতই বলিয়া থাকি। কোনো কোনো অঞ্চলে কোমলভাবে উচ্চারিত হইয়া ইহাই হয় খু ড় তু ত^৪। এইরূপ জে ঠা তা ত, জে ঠা তু ত ইত্যাদি। কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে খুল্লতা তের স্থান খু ড় তা ত প্রভৃতিতেও জীলিঙ্গ নাই, এবং ছিলও না। আমাদের খু ড় না শ, বা খু ড় শু শ, 'খুড়ী শাশুড়ী', ও খু ড় শ শুর 'খু ড়া শ শুর' শব্দেও এই ক্ষুদ্রের খেলা দেখিতে পাই। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে খু ড়া বা খু ড় বিশেষণ হইয়া পড়িয়াছে।

৬। ড আবার ট হওয়ায় (৪৭) এই খু ড় শব্দই খু ট আকার ধারণ করিয়া হিন্দীতে দেখা দিয়াছে,— সেখানে ইহা 'ক্ষুদ্র' বা 'নিকট' অর্থেই প্রযুক্ত হয়। যেমন, খু ট চাল, 'খাবাপ ব্যবহার', খু ট চালী 'দুই', 'দুর্ভিক্ষ'।

৭। ভাষাসমূহে এইরূপ একটা নিম্নম দেখা যায় যে, মূলত যাহা কোমল (ঘোষ), তাহা কঠোর (অঘোষ)

৩। ভাল প্রভৃতি শব্দের লকারস্থ স্বর বস্তুত হ্রস্বতর ওকাব। ইহা হ্রস্বনা করিবার জন্য অকারের উপর একটু দাঁড়ি দেওয়া হইয়াছে (অ)। সর্বত্র এইরূপ বৃত্তিই হইবে।

৪। অথবা পূর্বোক্ত খু ড় > খু ট > খু ট এইরূপও হইতে পারে। খু ট শব্দ যে, বস্তুত অয়োগে ছিল তাহা যশোর অঞ্চলে 'ছোট' তেলের ভাঁড় বুঝাইতে প্রস্তুত খু ট শব্দ হইতেই ধরা যায়। পবনতী এম টিকা প্রভৃতি। তুলনীয় ছুট, (১২)।

হয়; এবং যাহা কঠোর তাহাও কোমল হইয়া যায়। যেমন সংস্কৃতেব ব ক বাঙলায় ব গ; এইরূপ কা ক, কা গ; 'কা গা ব গা' প্রসিদ্ধ। আবার ধো বা হইতে ধো পা; বী অ হইতে বি চি। এই নিয়মামুসারে খু ড় অ শব্দের ড-কারটা ট-কার হইয়া গেল। তারপর পূর্ববর্তী উকারটা ওকার আর শেষের অকার দুইটা মিলিয়া আ হওয়ায় হইল খো টা। ইহা হিন্দীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অর্থ 'নিকট' 'খাবাপ'। যেমন, খো টা সোনা, 'খাবাপ সোনা', খো টা আদমী 'খাবাপ মাছ'। গরীত বাঙালী হিন্দীকে খো টা 'খাবাপ' ভাবিয়াছে। তাই এই খো টা-ভাবীদিগকে (অর্থাৎ হিন্দীভাবীদিগকে) তাহারা অবজ্ঞাব সহিত বলিয়া আসিয়াছে (যদিও কোনরূপে বলা উচিত ছিল না) খো টা। যেমন জোর দিতে গিয়া আমাদের নিকট স ক ল হয় স ক ল, ক খ ন হয় ক ক খ ন, সেইরূপ জোব দেওয়াতেই হিন্দী খো টা বাঙলায় হইয়াছে খো টা^৫।

৮। মনে হইতেছে আমাদের 'ছোট' অর্থে খা ট' শব্দকেও এইখানে গাঁথিয়া দিতে পারা যায় কি? খু ড় অ > খু ট অ > খা ট অ > খা ট। কিন্তু উকার স্থানে অকাব হওয়ার উদাহরণ যদিও পাওয়া যায় (যেমন সং পু ন র্ পালি-প্রাকৃত প ন, সং শ্ব র তি, পালি ফ র তি, সং যু কু ট, প্রা ম উ ড়; সং যু কু র, প্রা ম উ র), তথাপি উকার স্থানে আকার হওয়ার উদাহরণ নিতান্ত অল্প, কচিং পাওয়া যায় (যেমন সং ভা হু ম তী 'ইন্দ্রজাল', মারাঠা ভা না ম তী)। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা যদি মনে করি যে, অকারটাই পরে আকার হইয়া পড়িয়াছে তবে তাহাতে দোষ হইতে পারে না। তাই খু ট অ

৫। তুলনীয়—বাঙলার খু ত 'দোষ' 'ফ্রেট', খো টা বা খো টা ও হিন্দী প্রভৃতির খো ট 'দোষ' 'গল্পনা'। মনে হয়, এ শব্দগুলিও ক্ষুদ্র শব্দের সহিত যোগ রহিয়াছে। খু ত ও খো টা য অনুনাসিক স্বর থাকার তাহা হ্রস্বনা কবিত্তেছে যে, তাহার পবে যথাক্রমে ত ও ট বর্ণের কোনো সংযুক্ত বর্ণের প্রথম অংশটি লোপ হইয়াছে, এবং তাহারই ফলে ঐ অনুনাসিক স্বরটি হইয়াছে। যেমন ক ক > ক ক খ > কা খ, মা জ্জ ন > ম জ্জ ন > ম জ্জ ন, মী জ্জ ন (কবিবাল মহাশয়দেব দ স্ত ম জ্জ নের শব্দ ম জ্জ ন মোটেই সংস্কৃত নহে, ইহাতে সংস্কৃতেব আ কার না ত্র রহিয়াছে); এইরূপ মূ দ্ গ > মূ গ্ গ > মূ প (মূ দ্ গ); ক ক ব > ক ক ক ব > কা ক ব; ইত্যাদি অনেক।

আহত ও মূর্খ হইয়াও কয়েক দিন পরে বাঁচিয়া ওঠে, আর বিচ্যুত পত্র নানা ভোগে লালিত হইয়াও মৃত্যুসুখে পুতিত হয়। কেন তবু এই রিভিমতা ?

“ইহার কারণ এই যে, বৃক্ষের মূল একটা নির্দিষ্ট ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, যে স্থানের রস দ্বারা তাহার জীবন সংপৃক্ত হইতেছে। সেই ভূমিই তাহার স্বদেশ ও তাহার পরিপোষক।

“বৃক্ষের ভিতরেও, আর একটি শক্তি, নিহিত আছে, যাহা দ্বারা যুগে যুগে সে আপনাকে সিনাশ হইতে বদ্ধ কবিয়াছে। বাহিরে কত পরিবর্তন ঘটিলে, অন্তঃকরণে সে পরিত্রাণ হইতে পারে না। বাহিরের আঘাতের উত্তরে, পূর্ণজীবন দ্বারা সে বাহিরের পরিবর্তনের সহিত যুগিয়াছে।

আরও একটি শক্তি তাহার চিবসম্বল রহিয়াছে। সে যে বটবৃক্ষের বীজ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এই স্মৃতির ছাপ তাহার প্রতি অঙ্কে রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্র তাহার মূল ভূমিতে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত, তাহার শির উক্কে আলোকের সম্মানে উন্নত এবং শাখা-প্রশাখা দ্বারা দানে চতুর্দিকে প্রসারিত। তবে কি কি শক্তি-বলে সে আহত হইয়াও বাঁচিয়া থাকে ? যে বৈধব্য, যে দুর্ভিক্ষ-সে তাহার স্থান দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, যে অমৃতভিত্তি, সে ভিতর ও বাহিরের সামঞ্জস্য কবিয়া লয়, যে স্মৃতিতে বহু জীবনের সঞ্চিত শক্তি নিষ্কাশন কবিয়া লয়। আর সে হতভাগ্য আপনাকে স্থান ও স্বদেশ হইতে বিচ্যুত করে, সে পর-অঙ্গে প্রতিপালিত হয়, সে জাতীয় স্মৃতি ভুলিয়া যায়, সে হতভাগ্য কি শক্তি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে ? বিনাশ তাহার সমুখে, ফরসেই তাহার পরিণাম।

আমুন্সে উত্তেজনা-প্রবাহের হ্রাসবৃদ্ধি পরীক্ষা করিতে করিতে আচার্য্য দেখিলেন, যে, বাহিরের নির্দিষ্ট শক্তির প্রয়োগে উত্তেজনা-প্রবাহের হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া যায়।

তার তার ছিঁড়ে গেছে কোণে আছে টাঙানো
খাক থাক ভাগ নয়-তার সুম ভাঙানো
নাই-হুব স্বপ্নের, মীড় তার খেলে না,
আড়ানার সাড়া নাই-মেলে না ক তেলোনা

উঠে নাক বাকার বারোয়া কি ইমনে;
চূপ কবে বিমাইছে, ভাবিতেছে কি মনে?
মনে বুঝি পড়ে তার অতীতের পরিমা,
আগিতে যে পারে না কি-কি নিবিড় জড়িমা।

প্রাণ তার ভরপূর সাহানার দোহাগে,
ভোগবিত্তি টেনে আনে স্বপ্নের বেহাগে,
পূজা পূজা শেষ করে সাধু মনে মনে আরতি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক [বি-এ]

“কিন্তু বাহিরের শক্তি দ্বারা যাহা ঘটয়া থাকে, ভিতরের শক্তি দ্বারাও তাহা সঞ্চিত হয়। তবে মানুষ ত কেবল অদৃষ্টের দাস নহে। তাহারই মধ্যে এক শক্তি নিহিত আছে, যাহা দ্বারা সে বহির্জগতের নিরপেক্ষ হইতে পারে, তাহারই ইচ্ছামুসারে বাহির-ভিতরের প্রবেশ-দ্বার কখনও উন্মুক্ত কখনও আবদ্ধ হইতে পারিবে। এই রূপে দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতার উপর সে জয়ী হইবে।

ভিতরের শক্তি, কত বৈচিত্র্য। তবে জীবনের একান্ত স্তরে এই শক্তির উদ্ভব হইয়াছে ? জন্মবার, মৃত্যুর ও অন্তরায় হইয়া এই শক্তিসংগে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। তখন বাহিরের শক্তি ভিতরে প্রবেশ করিয়া শরীর লালিত ও বর্জিত করিয়াছে। মাতৃস্তনের সহিত মেহ, মায়ী, মৃত্যু-অস্তরে প্রবেশ কবিয়াছে, এবং বন্ধুজনের প্রেমে দ্বারা জীবন উৎফুল্ল হইয়াছে। ছদ্মবেশে বাহিরের আঘাত-কলে ভিতরের শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে এবং তাহারই বলে বাহিরের সহিত যুগিতে সক্ষম হইয়াছি। ইহার মধ্যে আমাব নিজের কোথায় ? এইসবের মূলে আমি না তুমি ?

একের জীবনের উচ্চাসে তুমি অস্ত জীবন পূর্ণ করিয়াছ। অনেক তোমাব নিদেশে-জ্ঞানসন্ধানার্থ জীবন পাত করিয়াছে। মানবের কল্যাণহেতু রাজ্য সম্পদ ত্যাগ করিয়া ছুঃখদারিত্য বরণ করিয়াছে এবং দেশ-সেবায় অকাতরে বধ্যমকে আরোহণ করিয়াছে। সেইসব জীবনের বিকশিত শক্তি অন্য জীবন জ্ঞান ও ধর্ম, শৌর্ধ্য ও বীর্ঘ্যে পরিপূরিত করিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশে রক্তভাষা কতই না দীন। কিন্তু মনীষীর কাছে ভাষার এ দৈহিক কোনরূপ সজ্জায় হইল না, এবং অব্যক্তে যাহা ব্যক্ত হইল, তাহাতে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের এক মহান মিলন সম্ভব হইল।

শ্রীচরুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য [বি-এম-এ]

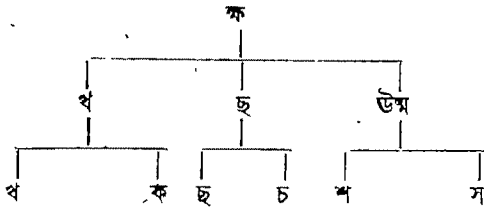
অলকার সন্দেশ এ নীস ভুলোকে
স্বরনদী সত্য কি সিকতায় হারালো ?
দেবতা কি দাক্ষমণী ছবি-হয়ে দাঁড়ালো ?
না গো-না না-গুণেরি-যে ভ্রমর-কেঁদেছে

মধুভরা মধুচাকে আজি বাসা বেধেছে।
সময়ের শেষ তার আজি তার ছুটি রে,
স্বপ্নের জয়-গৌরব বসি একা কুটারে।
আজি রথ খামাইয়া চলিতেছে সারথি,

পূজা শেষ করে সাধু মনে মনে আরতি।
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক [বি-এ]

ক্ষুদ্রের খেলা

আমাদের প্রাদেশিক ভাষা-সমূহ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, ক্ষ এই সংযুক্তাক্ষরের যে-সকল পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রধানত তিন ভাগ করা যাইতে পারে। এই এক-একটি ভাগকে আমরা বর্ণ নামে উল্লেখ করিব। (১) প্রথম, খ বর্ণ; (২) দ্বিতীয়, ছ বর্ণ; এবং (৩) তৃতীয়, উষ্ম বর্ণ। (১) খ-বর্ণের মধ্যে খ ও ক; (২) ছ-বর্ণের মধ্যে ছ ও চ; এবং (৩) উষ্ম-বর্ণের মধ্যে শ ও স। দ্রষ্টব্য—



২। ক্ষুদ্র শব্দের উষ্ম-বর্ণের মধ্যে যে পরিবর্তন হয় তাহা আমি শূদ্র নামে একটি পৃথক প্রবন্ধে (প্রবাসী, পৌষ, ১৩২৮) সবিশেষ প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা দেখাইয়াছি, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিব না। তাহাব সার কথাটা এই যে, আর্বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত শূদ্র শব্দটি মূল ক্ষুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যেহেতু শূদ্রেরা সেই প্রাচীন কালে অপর তিন বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য অপেক্ষা গুণে ও কর্মে নিকৃষ্ট বা ছোট ছিলেন, সেই-জন্ত তাহাদিগকে ক্ষুদ্র বলা হইত, এবং এই ক্ষুদ্র শব্দই নিজের প্রাকৃতিক পরিবর্তনে ক্রমে-ক্রমে শূদ্র আকারে পরিণত হইয়াছে।

৩। খ-বর্ণের মধ্যে প্রথমে খ-কে গ্রহণ করা যাউক। ক্ষুদ্র প্রাকৃতে খুদ্র, তাহা হইতে ক্রমশ আমাদের খুদ্র। যদিও উহা মূলত বিশেষণ ছিল, তথাপি আমাদের নিকট বিশেষ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বলি 'চাউলের খুদ্র' অর্থাৎ 'কণা'। ওড়িয়া ও অসমীয়াতেও এই। বলা বাহুল্য খুব ক্ষুদ্র বলিয়াই ইহার নাম খুদ্র হইয়াছে। তুলঃ—সিংহলী ক্ষুদ্র 'ছোট', 'ক্ষুদ্র'। খুদ্র যখন বিশেষ্য হইয়া

দাঁড়াইল, তখন একটা বিশেষণের অভাব বোধ হইল, তাই আমরা বিশেষণ পাইলাম খু দি, খু দে (< খু দি য়া, < খু দ্রি য়া—যোগেশ বাবু, অসমীয়া)। এই খুদ শব্দটা যে কত প্রাচীন তাহা সম্পূর্ণ ঠিক করিয়া বলিতে না পারিলেও মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে ইহা অশোকের সময়ে ছিল। তাঁহার শিলালিপিতে আমরা 'ক্ষুদ্র' অর্থে খুদ ক শব্দের দেখা পাই (Rock Edict X., Kalasi)।

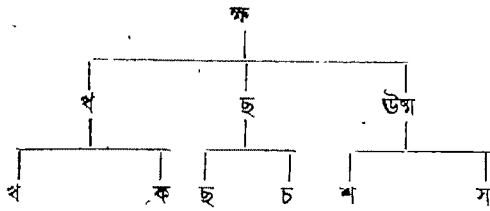
৪। ক্ষুদ্র ক হইতে স্পষ্টত প্রাকৃত-প্রভাবে উৎপন্ন ক্ষুদ্র ক শব্দ অধরবর্ণ (দুইবার) তৈত্তিরিয় সংহিতা ও শতপথ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বহু বৈদিক গ্রন্থে আছে। পাণিনিও ইহা ধরিয়াছেন (৬.২. ৩৯)। কিন্তু কাশিকাকার ইহার ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন চমৎকার! তিনি বলেন ইহা হইয়াছে ক্ষুদ্র + ল (লা ধাতু) হইতে, অর্থাৎ যে ক্ষুদ্রকে ছেদন কবে! বাহাই হউক, এই ক্ষুদ্র কের ককার-হীন অংশ ক্ষুদ্র হইতে পূরাদন্তর-মত প্রাকৃত শব্দ হইল খুদ্র। পূর্বে ক্ষুদ্রের শেষ দ্র অংশটাই প্রাকৃত ভাবে ল হইয়াছিল, ক্ষু অবিকৃত ছিল, এখন তাহাও খাটি প্রাকৃত হইয়া খুদ্র হইল, সম্পূর্ণ শব্দটি হইল খুদ্র। ইহাব সহিত তা ত শব্দ লাগাইয়া আমরা 'কাঁকা'-কে বলিতে লাগিলাম খুদ্র তা ত। ছ বর্ণের একটি শব্দের সহিত এখানে আমরা তুলনা করিতে পারি। পরে আমরা দেখিতে পাইব ক্ষ স্থানে চ হয়, এই নিয়মে ক্ষুদ্র হইতে চুদ্র হয়। এই চুদ্রের পর তা ত শব্দ যোগ করিয়া চুদ্র তা ত হয়। ইহা হইতে প্রাকৃতেই নিয়মে ক্রমশ মারাঠীতে দেখা গেল চুল-তাৎ। মারাঠীরা কাকাকে বলে চুল-তা, আর কাকীকে বলে চুল-তী। আমাদের খুদ্র তা ত গুরু-গম্ভীর আকারে শুদ্ধ হইয়া ছিলেন, উচ্চ ভাষা ভিন্ন ইহাকে দেখা যায় নাই, তাই আমরা ইহার সাহায্যে আমাদের কাকীমাকে ডাকিতে পারি নাই; খুদ্র তা ত শব্দের জ্বলিল নাই। তাই বলিতে হয় এ ক্ষেত্রে মারাঠীরা জিতিয়াছেন, তাহারা একটা বেশী শব্দ পাইয়াছেন।

১। কিরূপে এই-সমস্ত পরিবর্তন হইয়াছে তাহা প্রদর্শন করা এ প্রবন্ধের বিষয় নহে, এবং বলিতে গেলে ইহার কলেবর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠা সম্ভাবনা, তাই এখানে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিলাম না।

২। চুল তা শব্দের অন্তর্গত লকার-স্থিত অকারটা গ্রন্থ অর্থাৎ উচ্চারিত হয় না। ইহাই হুচনা করিবার জন্য ল-কারের পর একটু ফুটকি (ল') দেওয়া হইয়াছে। অন্যত্রও এইরূপ বুদ্ধিতে হইবে।

ক্ষু দ্রে র খেলা

আমাদের প্রাদেশিক ভাষা-সমূহ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, ক্ষ এই সংযুক্তাক্ষরের যে-সকল পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রধানত তিন ভাগ করা যাইতে পারে। এই এক-একটি ভাগকে আমরা বর্গ নামে উল্লেখ করিব। (১) প্রথম, খ বর্গ; (২) দ্বিতীয়, ছ বর্গ; এবং (৩) তৃতীয়, উষ্য বর্গ। (১) খ-বর্গের মধ্যে খ ও ক, (২) ছ-বর্গের মধ্যে ছ ও চ; এবং (৩) উষ্য-বর্গের মধ্যে শ ও স। দ্রষ্টব্য—



২। ক্ষু শব্দের উষ্য-বর্গের মধ্যে যে পরিবর্তন হয় তাহা আমি শূ দ্র নামে একটি পৃথক প্রবন্ধে (প্রবাসী, পৌষ, ১৩২৮) সবিশেষ প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা দেখাইয়াছি, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিব না। তাহার সার কথাটা এই যে, আর্বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত শূ দ্র শব্দটি মূল ক্ষু দ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যেহেতু শূ দ্রের সেই প্রাচীন কালে অপর তিন বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য অপেক্ষা গুণে ও কৰ্মে নিকৃষ্ট বা ছোট ছিলেন, সেই-জন্ম তাঁহাদিগকে ক্ষু দ্র বলা হইত, এবং এই ক্ষু দ্র শব্দই নিজের প্রাকৃতিক পরিবর্তনে ক্রমে-ক্রমে শূ দ্র আকারে পরিণত হইয়াছে।

৩। খ-বর্গের মধ্যে প্রথমে খ-কে গ্রহণ করা যাউক। ক্ষু দ্র প্রাকৃতে খু দ্র, তাহা হইতে ক্রমশ আমাদের খু দ্র। যদিও উহা মূলত বিশেষণ ছিল, তথাপি আমাদের নিকট বিশেষ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বলি 'চাঁড়লের খু দ্র' অর্থাৎ 'কণা'। ওড়িয়া ও অসমীয়াতেও এই। বলা যাওয়া খুব ক্ষু দ্র বলিয়াই ইহার নাম খু দ্র হইয়াছে। তুল:—সিংহলী কু দু 'ছোট', 'ক্ষুদ্র'। খু দ্র যখন বিশেষ্য হইয়া

দাঁড়াইল, তখন একটা বিশেষণেব অভাব বোধ হইল, তাই আমবা বিশেষণ পাইলাম খু দি, খু দে (< খু দি দ্বা, ৩° খু দি দ্বা—যোগেশ বাবু, অস° খু দী দ্বা)। এই খু দ শব্দটি যে কত প্রাচীন তাহা সম্পূর্ণ ঠিক করিয়া বলিতে না পারিলেও মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে ইহা অশোকের সময়ে ছিল। তাঁহার শিলালিপিতে আমরা 'ক্ষুদ্র' অর্থে খু দ ক শব্দের দেখা পাই (Rock Edict X., Kalasi)।

৪। ক্ষু দ্র ক হইতে স্পষ্টত প্রাকৃত-প্রভাবে উৎপন্ন ক্ষু ল ক শব্দ অধর্কবেদ (দুইবার) তৈত্তিরিয় সংহিতা ও শতপথ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বহু বৈদিক গ্রন্থে আছে। পাণিনিও ইহা ধরিয়াছেন (৬.২. ৩৯)। কিন্তু কাশিকাকার ইহার ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন চমৎকার! তিনি বলেন ইহা হইয়াছে ক্ষু ধ + ল (লা ধাতু) হইতে, অর্থাৎ যে ক্ষুধাকে ছেদন করে! যাহাই হউক, এই ক্ষু ল কের ককার-হীন অংশ ক্ষু ল হইতে পুরাদস্তুর-মত প্রাকৃত শব্দ হইল খু ল। পূর্বে ক্ষু দ্রে র শেষ দ্র অংশটাই প্রাকৃত ভাবে ল হইয়াছিল, ক্ষু অবিকৃত ছিল, এখন তাহাও খাটি প্রাকৃত-হইয়া খু—হইল, সম্পূর্ণ শব্দটি হইল খু ল। ইহার সহিত তা ত শব্দ লাগাইয়া আমরা 'কাঁকা'-কে বলিতে লাগিলাম খু ল তা ত। ছ বর্গের একটি শব্দের সহিত এখানে আমরা তুলনা করিতে পারি। পরে আমরা দেখিতে পাইব ক্ষ স্থানে চ হয়, এই নিয়মে ক্ষু দ্র হইতে চু ল হয়। এই চু লের পর তা ত শব্দ যোগ করিয়া চু ল তা ত হয়। ইহা হইতে প্রাকৃতেরই নিয়মে ক্রমশ মারাঠীতে দেখা গেল চু ল. তাং। মারাঠীরা কাকাকে বলে চু ল. তা, আর কাকীকে বলে চু ল. তী। আমাদের খু ল তা ত গুরু-গম্ভীর আকারে স্তব্ধ হইয়া ছিলেন, উচ্চ ভাষা ভিন্ন ইহাকে দেখা যায় নাই, তাই আমরা ইহার সাহায্যে আমাদের কাকীমাকে ডাকিতে পারি নাই; খু ল তা ত শব্দের জীলিক্স নাই। তাই বলিতে হয় এ ক্ষেত্রে মারাঠীরা জিতিয়াছেন, তাঁহারা একটা বেশী শব্দ পাইয়াছেন।

১। কিরূপে এই-সমস্ত পরিবর্তন হইয়াছে তাহা প্রদর্শন করা এ প্রবন্ধের বিষয় নহে, এবং বলিতে গেলে ইহার কলেবর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠান সম্ভাবনা, তাই এখানে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিলাম না।

২। চু ল তা শব্দের অন্তর্গত লকাব-স্থিত অকারটা ঐক্য অর্থাৎ উচ্চারিত হয় না। ইহাই হুচনা করিবার জন্য ল-কারের পব একটু ফুটকি (ল.) দেওয়া হইয়াছে। অন্যত্রও এইরূপ বর্ণিত হইবে।

আহত ও মুমূর্ষু হইয়াও কয়েক দিন পরে বাঁচিয়া ওঠে, আর বিচ্যুত পত্র নানা ভোগে লালিত হইয়াও মৃত্যুগুণে পুতিত হয়। কেন তবু এই বিভ্রমতা?

ইহার কারণ এই যে, বুদ্ধের মূল একটা নির্দিষ্ট ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, যে স্থানের রস দ্বারা তাহার জীবন সংপৃষ্ঠিত হইতেছে। সেই ভূমিই তাহার স্বদেশ ও তাহার পরিপোষক।

বুদ্ধের ভিতরেও আর একটি শক্তি, নিহিত আছে, যাহা দ্বারা যুগে যুগে সে আপনাকে পিনাক হইতে রক্ষা করিয়াছে। বাহিরে কত পরিবর্তন ঘটাইছে, অদৃষ্টবৈপ্লব্যে সে পিনাক হইয়া নাই। বাহিরের আঘাতের উত্তরে, পূর্ণজীবন, শোণী, সে বাহিরের পরিবর্তনের সহিত যুঝিয়াছে।

আরও একটি শক্তি তাহার চিরসঞ্চল রহিয়াছে। সে যে কটর স্বদেশ-বীজ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এই স্মৃতির ছাপ তাহার প্রতি, স্মৃতি রহিয়াছে। এই স্মৃতি তাহার মূল ভূমিতে সূচ-প্রতিষ্ঠিত, তাহার শিব উজ্জ্বল আলোকের সন্ধানে উন্নত এবং শাখা-প্রশাখা ছায়া-দানে চতুর্দিকে প্রসারিত। উর্বর কিংকি শক্তি-বলে সে আহত হইয়াও বাঁচিয়া ওঠে। সে যে স্বদেশ, সে যে মৃত্যু, সে তাহার বিহীন দুঃস্বপ্নে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, যে অন্তর্ভুক্তিতে সে ভিতর ও বাহিরের সামঞ্জস্য করিয়া লয়, যে স্মৃতিতে বহু জীবনের সঞ্চিত শক্তি নিঃসৃত করিয়া যায়। আর, যে ইতস্তাধ্য আপনাকে বৃদ্ধান ও স্বদেশ হইতে বিচ্যুত করে, সে পর-অঙ্গে প্রতিপালিত হয়, সে জাতীয় স্মৃতি ভুলিয়া যায়, সে ইতস্তাধ্য কি শক্তি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? বিনাশ তাহার সম্মুখে, ফলসিঁড়ি তাহার পরিধামি।

আয়ুর্মূলে উত্তেজনা-প্রবাহের হ্রাসবৃদ্ধি পরীক্ষা করিতে করিতে আচার্য্য দেখিলেন যে, বাহিরের নির্দিষ্ট শক্তির প্রয়োগে উত্তেজনা-প্রবাহের হ্রাসবৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করা যায়।

তাহার তার-ছিঁড়ি গেছে, কোণে আছে টাঙানো তার, থাক থাক ভাল নয়, তার খুম-ভাঙানো তার হইতে নাই স্বর স্বমধুর, মীড় তার খেলে না, আড়ানার আড়া নাই, মেলে না কতেনোনা, উঠে না কব্বার বীরোয়া কি ইমানে, চুপ করে বসিয়াছে, ভাবিতেছে কি মনে।

মনে বসি পড়ে তার অতীতের পরিমা, আগিতে যে পারে না কিংকি নিবিড় জড়িমা। প্রাণ তার ভরপুর সাহানার দোহাগে, ভোগবতী টেনে আন স্বরশব্দে বেহাগে,

শ্রীকুমারদত্ত মল্লিক [বি-এ]

কিন্তু বাহিরের শক্তি দ্বারা যাহা ঘটয়া থাকে, ভিতরের শক্তি দ্বারাও তাহা সংঘটিত হয়। তবে মানুষ ত কেবল অদৃষ্টের দাস নহে। তাহারই মধ্যে এক শক্তি নিহিত আছে, যাহা দ্বারা সে বহির্জগতের নিরপেক্ষ হইতে পারে। তাহারই ইচ্ছামুত্রে বাহির-ভিতরের প্রবেশ-দ্বার কখনও উন্মুক্ত কখনও আবদ্ধ হইতে পারিবে। এই ক্ষেপে দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতার উপর সে জয়ী হইবে।

ভিতরের শক্তি আছে খেঁচা। তবু জীবনের কোন ক্ষেত্রে এই শক্তির উদ্ভব হইয়াছে? স্মৃতির, স্মরণ, স্মরণ, ও স্মরণ হইয়া এই শক্তিগুণে নিষ্কিন্ত হইয়াছিলাম। তখন বাহিরের শক্তি ভিতরে প্রবেশ করিয়া শরীর-লালিত ও বর্ধিত করিয়াছে। মাতৃস্তনের সহিত য়েহ, মীমা, মমতা, অস্ত্রের প্রবেশ করিয়াছে, এবং বুদ্ধের প্রবেশ দ্বারা জীবন উৎকৃষ্ট হইয়াছে। হৃদয়েও বাহিরের আঘাত-কলে ভিতরের শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে এবং তাহারই বলে বাহিরের সহিত যুঝিতে সক্ষম হইয়াছি। ইহার মধ্যে আমার নিজস্ব কোথায়? এইসবের মূলে আসি না তুমি?

একের জীবনের উচ্চাসে তুমি অন্ত জীবন পূর্ণ করিয়াছ। অনেকে তোমার নিদেশে—জ্ঞানসন্ধানার্থ জীবন পাত করিয়াছে। মানবের কল্যাণহেতু রাজ্য সম্পদ তাগ করিয়া দুঃখদাবিত্য বরণ করিয়াছে এবং দেশ-সেবার অকৃতরে বধ্যমকে আরোহণ করিয়াছে। সেইসব জীবনের বিকিণ্ড শক্তি অন্য জীবন জ্ঞান ও ধর্মে, শৌর্য ও বীর্যে পরিপূর্ণিত করিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশে বক্তব্য কতই নূনতম। কিন্তু মনীষীর কাছে ভাষার এ দৈহিক কোনরূপ সঙ্কল্প হইল না, এবং অব্যক্তে যাহা ব্যক্ত হইল, তাহাতে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের এক মহান মিলন সূক্ষ্মচিত্ত হইল।

শ্রীচন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য [এম-এ]

অলকার সন্দেশ এ নীবস ভুলোকে গিয়াছে তার মনে। স্বরনদী সত্য কি সিকতায় হারালো? দেবতা কি দাকমরী ছবি হয়ে দাঁড়ালো? না গো না—গুমরিয়া যে ভরমকে দেছে, এমনি মধুভরা মধুচাকো আজি বাসা বেঁধেছে। সমরের শেষ তার আজ তার ছুটি রে, স্বরে জয়-গৌরব বসি একা ছুটাবে। আজ রথ ধামাইয়া চুলিতেছে সারথি,

শ্রীকুমারদত্ত মল্লিক [বি-এ]

শ্রীকুমারদত্ত মল্লিক [বি-এ]

শ্রীকুমারদত্ত মল্লিক [বি-এ]

৫। সংস্কৃত ক্ষুদ্র ক হইতে প্রাকৃত-প্রভাবে গাথা বা বৌদ্ধ-সংস্কৃতে খুড় ক (সঙ্ঘপুণ্ডরীক, ৪৬০ পৃ: ছইবার)। ইহা হইতে ক্রমশ খুড় অ হইয়া আমাদের নিকট খুড়া ও খুড়ো (জীলিঙ্গে খুড়ী)। যদিও ইহা মূলত বিশেষণ, তথাপি আমরা ইহাকে বিশেষ্য করিয়া লইলাম। কাকাকে বুঝাইতে পারে এরূপ কিছু ইহাতে না থাকিলেও (অর্থাৎ খুজতাত শব্দে যেমন তা ত জুড়িয়া দেওয়া ছিল সেরূপ কিছু না থাকিলেও) আমরা ইহাকে ‘কাকা’ অর্থে চালাইয়া লইলাম। কিন্তু যদিও আমরা কাকাকে খুজতাত শব্দের মত খুড়তাত শব্দে ডাকি না, তথাপি একদিন যে এই শব্দটি ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তাই শেষে একটা অ (< ক) জুড়িয়া দিয়া তাহা হইতে (অর্থাৎ খুড়তাত অ হইতে) বিশেষণ করিয়া লইলাম খুড়. তা. ত^৩। ‘খুড়-তা.ত ভাইবোন’ আমরা সাধারণতই বলিয়া থাকি। কোনো কোনো অঞ্চলে কোমলভাবে উচ্চারিত হইয়া ইহাই হয় খুড় তু. ত। এইরূপ জে. ঠ. তা. ত, জে. ঠ. তু. ত ইত্যাদি। কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে খুজতাতের জায় খুড়. তা. ত প্রভৃতিরও জীলিঙ্গ নাই, এবং ছিলও না। আমাদের খুড়. শা. শ, বা খুড়. শু. শ. ‘খুড়ী শাশুড়ী’, ও খুড়. শ. শু. র ‘খুড়া শ. শু. র’ শব্দেও এই ক্ষুদ্রের খেলা দেখিতে পাই। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে খুড়া বা খুড় বিশেষণ হইয়া পড়িয়াছে।

৬। ড আবার ট হওয়ায় (৪৭.) এই খুড় শব্দই খুট আকার ধারণ করিয়া হিন্দীতে দেখা দিয়াছে— সেখানে ইহা ‘ক্ষুট’ বা ‘নিকুট’ অর্থেই প্রযুক্ত হয়। যেমন, খুট চাল, ‘খারাপ ব্যবহার’, খুট. চালী ‘ছুট’, ‘ছুর্তি’।

৭। ভাষাসমূহে এইরূপ একটা নিম্নম দেখা যায় যে, মূলত যাহা কোমল (ঘোষ), তাহা কঠোর (অঘোষ)

৩। ভা. ল প্রভৃতি শব্দের লকারস্থ স্বর বস্তুত ইষতব ওকার। ইহা সূচনা করিবার জন্য অকারের উপর একটু দাঁড়ি দেওয়া হইয়াছে (অ.)। সর্বত্র এইরূপ বৃষ্টি হইবে।

৪। অথবা পূর্বোক্ত খুড় > খুট > খুট এইরূপও হইতে পারে। খুট শব্দ যে, বস্তুত প্রয়োগে ছিল তাহা যশোব অঞ্চলে ‘ছোট’ তেলের ভাঁড় বুঝাইতে প্রস্তুত খুট শব্দ হইতেই ধরা যায়। পববর্তী ১ম টীকা দ্রষ্টব্য। তুলনীয় ছুট, (১২)।

হয়, এবং যাহা কঠোর তাহাও কোমল হইয়া যায়। যেমন সংস্কৃতির ব ক বাঙলায় ব গ; এইরূপ কা ক, কা গ; ‘কা গা ব গা’ প্রসিদ্ধ। আবার ধো বা হইতে ধো গা; বী জ হইতে বি চি। এই নিয়মাত্মসারে খুড় অ শব্দের ড-কারটা ট-কার হইয়া গেল। তারপর পূর্ববর্তী উকারটা ওকার আর শেষের অকার দুইটা মিলিয়া আ হওয়ায় হইল খো টা। ইহা হিন্দীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অর্থ ‘নিকুট’ ‘খারাপ’। যেমন, খো টা সোনা; ‘খারাপ সোনা’; খো টা আদমী ‘খারাপ মানুষ’। গর্কিত বাঙালী হিন্দীকে খো টা ‘খারাপ’ ভাবিয়াছে। তাই এই খো টা-ভাবীদিগকে (অর্থাৎ হিন্দীভাষীদিগকে) তাহারা অবজ্ঞাব সহিত বলিয়া আসিয়াছে (যদিও কোনরূপে বলা উচিত ছিল না) খো টা। যেমন জোর দিতে গিয়া আমাদের নিকট স ক ল হয় স ক ল, ক খ ন হয় ক খ ন, সেইরূপ জোর দেওয়াতেই হিন্দী খো টা বাঙলায় হইয়াছে খো টা^৪।

৮। মনে হইতেছে আমাদের ‘ছোট’ অর্থে খা ট শব্দকেও এইখানে গাঁথিয়া দিতে পারা যায় কি? খুড় অ > খুট অ > খা ট অ > খা ট। কিন্তু উকার স্থানে অকার হওয়ার উদাহরণ যদিও পাওয়া যায় (যেমন সং. পু ন ব্ পালি-প্রাকৃত প ন; সং. ক্ষু র তি, পালি ফ র তি; সং. মু কু ট, প্রা. ম উ ড; সং. মু কু র, প্রা. ম উ র), তথাপি উকার স্থানে আকার হওয়ার উদাহরণ নিতান্ত অল্প, কচিং পাওয়া যায় (যেমন সং. ভা মু ম তী ‘ইন্দ্রজাল’, মারঠী ভা না ম তী)। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা যদি মনে করি যে, অকারটাই পরে আকার হইয়া পড়িয়াছে তবে তাহাতে দোষ হইতে পারে না। তাই খুট অ

৫। তুলনীয়—বাঙলায় খু. ত ‘দোষ’ ‘ত্রুটি’, খো টা বা খো টা ও হিন্দী প্রভৃতির খো ট ‘দোষ’ ‘গল্পনা’। মনে হয়, এ শব্দগুলিরও ক্ষুদ্র শব্দের সহিত যোগ রহিয়াছে। খু. ত ও খো টা য় অধুনাসিক স্বর থাকায় তাহা সূচনা করিতেছে যে, তাহার পবে যথাক্রমে ত ও ট বর্ণের কোনো সংযুক্ত বর্ণের প্রথম অংশটি লোপ হইয়াছে, এবং তাহারই ফলে ঐ অধুনাসিক স্বরটি হইয়াছে। যেমন ক ক > ক ক খ > কা খ; মার্জ্জ ন > ম জ্জ ন > ম জ্জ ন, মার্জ্জ ন (কবিবাক্স মহাশয়দের দ স্ত ম জ্জ নের পেষ শব্দ ম জ্জ ন মোটেই সংস্কৃত নহে, ইহাতে সংস্কৃতের আ. কার না জ বহিয়াছে); এইরূপ মু. দ গ > মু. গ্. গ > মু. প (মু. দ); ক ক ব > ক ক ব > কা ক র; ইত্যাদি অনেক।

আঁধারেই শেষ, মাঝে দুই-একটি ক্ষীণ আলো-রেখা দেখা যাইতেছে। মানুষের অধ্যবসায়-বলে ঘন কুয়াসা অপসারিত হইবে এই আশা করিয়া একদিন জ্যোতির্গর্ভ হইয়া উঠিবে।”

তাহারই এই কথাগুলি পরীক্ষা করিতে করিতে আচার্য্য দেখিলেন, বে, কলের সড়ি প্রথম প্রথম বৃহৎ হয় কিন্তু উহা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া লুপ্ত হইয়া যায়। দেখিলেন, দিবাঃ রস্তেই পরীক্ষণ শ্রেষ্ঠ কারণ সারাদিন পরীক্ষার পর কল ক্রান্ত হইয়া যাবার তখন এই প্রশ্ন তিনি কিছুতেই উড়াইতে পারিলেন না, যে কলের এই ক্রান্তি কেন হয়। অনেকগুলি আবিষ্কার কেবল লিখিবার অপেক্ষায় ছিল যাহা-সে-সব ছাড়িয়া দিয়া ক্রান্তন প্রক্রিয়া উত্তর অহসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশঃ দেখিতে পাইলেন, জীবনহীন দ্রবীভূত উত্তেজিত এবং অবসাদগ্রস্ত হয়। সেই সড়ি দিবার শক্তি জীবনের এক প্রদর্শন চিহ্ন বলিয়া গণ্য, উত্তেজিত তাহার ক্রিয়া পরিস্ফুট দেখিতে পাইলেন। জীবনতত্ত্ববিদগণের হস্তে এই-সেই নূতন তত্ত্ব রাখিয়া পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে অহসন্ধান করিবার অন্তঃকিরিয়া আসিবেন। মনে করিতেছিলেন, কিস্তি তাহা ঘটনা উঠিল না। সর্বপ্রধান জীবনতত্ত্ববিদ বার্ডেন সেওয়ারসন বলিলেন, জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি যে পরীক্ষা করিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমাদের চেষ্ঠা পূর্বে নির্ফল হইয়াছে, সুতরাং আপনার কথা অসম্ভব ও অগ্রাহ্য। এই আশ্রিত আপনার অনধিকার-চর্চা হইয়াছে; আপনি পদার্থবিদ্যায় অশরী হইয়াছেন; আপনার সম্মুখে সেই প্রশস্ত পথে বহু কঠিন রহিয়াছে, আপনার অজ্ঞানতা দেখা হইতে নিবৃত্ত হউন। আচার্য্য উত্তর করিলেন, “নিবৃত্ত হইক না, এই বন্ধু পৃথিবী আমার; আজ হইতে সোজা পথ ছাড়িয়া, আজ যাই প্রত্যাখ্যাত হইল, তাহাই সত্য; ইচ্ছাতেই। ইউক্লিড অনিচ্ছাতেই ইউক্লিড, তাহা সকলকে গ্রহণ করিতেই হইবে।” তৎপরে বহুবৎসবযাপী সাধনা দ্বারা নব নব উদ্ভাবিত যন্ত্রে বহুবিধ পরীক্ষা বৃক্ষজীবনের মনোবীজ জীবনের প্রতিকৃতি দেখাইয়া নিকট জীবনের উত্তেজনা মানবের অহুত্বের স্তম্ভভাঙা করিলেন। ব্রহ্মের অদৃশ্য বৃত্তি মাপিলেন এবং বিভিন্ন আইর ও বাবহারে সেই বৃত্তির মাত্রার মূহুর্তক লক্ষ্য করিয়া নিকট করিলেন। মনুষ্যপক্ষেও বৃক্ষ যে সম্বন্ধিত হইয়াছে তাহা দেখাইলেন। তাহা উত্তেজক মানুষকে উৎফুল্ল

করে, যে মানক তাহাকে অবসন্ন করে, যে বিষ তাহার প্রাণনাশ করে, উদ্ভিদেও সেই-সময়ের একই-বিধ ক্রিয়া প্রমাণ করিলেন। উদ্ভিদ-গোষ্ঠীর স্পন্দন লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে মানবজন্মের স্পন্দনের প্রতিচ্ছায়া দেখাইলেন। বৃক্ষপরীক্ষায় সাক্ষ্যপ্রমাণ আবিষ্কার করিয়া তাহার বেগ নির্ণয় করিলেন। প্রমাণ করিলেন যে সূর্য-সুকল কারণে মানুষের শাখা উত্তেজনা বৃদ্ধিত বা মন্দীভূত হয়। সেই একই কারণে উদ্ভিদ শাখাও উত্তেজিত অথবা প্রশান্ত হয়। বৃক্ষের স্বভব স্পষ্টিত এই-সুকল সাক্ষ্যে বিশ্ব রংসুর পূর্বে যে-সুকল সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল, আজ তাহা সর্বত্র আঘাতে গৃহীত হইয়াছে। বিরোধী ধারার ছিলেন, এখন তাহাবাই পবন-মিত্র হইয়া দাঁড়াইলেন; এবং বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে ভারতীয় সাধক পৃথিবীর নিকট হইতে জয়মালা আহরণ করিলেন।

আমরা অনেকেই কেবল মাত্র পূর্বপুরুষগণের গৌরব ঘোষণা করিয়া সন্তুষ্ট থাকি। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষগণের পুণ্যপুণ্যের সমস্ত তত্ত্বমূলক রাখিয়া গিয়াছেন এবং দুই-চারিজন বিদেশীও কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহা বৃত্তিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যে বেদ-উপনিষদ-রচয়িতা বংশধর আজ তোমার স্থান কোথায়? চাহি আলমদ্বারা তোমার দিবাধর্ম কি কোনও দিন ভাঙিয়ে না? তোমার পণ্যেরা শুধু সিন্টি ও কাচ। স্বর্গ ও স্বর্গ বলিয়া তাহা বিক্রয় করিবে মনে কবিয়াছিলে এবং অলীক মনে আপনাকে ধনী মনে করিয়া ভাগ্য-লক্ষীকে পূজাঘাত্র করিলে। দর্শকগণের উপহাস এত অসহ্য হইল তুমি কি বলিতেছ? তোমার পূর্বপুরুষ ধনী ছিলেন, তাঁহারা পুণ্যকর্মে বিদ্যানে বিহার করিতেন। তুমি কি কবিয়া সেই সম্পদ হারাইলে? চাহি যে-সুবে যে-সুবে পূর্বত দেখিতেছ, তাহা নয়-কালে নির্মিত। তুমি বাহাদিরকে রেখে বলিয়া মনে কর, উহা তাহাদেরই অস্থিভূমি। দেখ, কী হারা সেই অস্থিনির্মিত গোপীনা বাহিরা গ্রিশুকে উঠিয়াছে এবং স্তম্ভে-রাগিয়া নীলাকাশে তাহার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। উভয়মান ক্ষুণ্ণ-পক্ষী-শ্রেণী বলিয়া বাহা মনে করিয়াছ, দেখিতে দেখিতে সেগুলি মেঘের অন্তর্ভালে অন্তর্ভুক্ত হইল। অবাক হইবা তুমি উদ্ভেচা হিরা। আজ তোমার মেঘরাগ হইছে নিকট রহিলে, তোমার চক্ষু নিকট পৃথিবী বিদীর্ণ করিল। কোথায় তুমি পলায়ন করিবে? গম্ভীর প্রশ্ন কবিয়াও নিস্তার নাই। বিবাহক বাপে তোমাকে সে স্থান হইতেও বাহি হইতে হইবে।

আজ যের মস্ত্র দীক্ষিত হইয়া ভূতরত্ন নবজীবনের স্পন্দন অহুত্ব করিতেছে, বহুবৎসর পূর্বে আচার্য্য তাহার পরীক্ষণার হইতে সেই সত্যের ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি পরীক্ষার দ্বারা দেখাইয়াছিলেন যে, জিন্ম-শাখ ব্রহ্ম

> * খ টা অ > * খা টা অ > খা টা বলা > ঘাইতে
পারে।

কোনো কোনো সংস্কৃত কোশে 'খ' বা 'অ' অর্থে খ টা ন শব্দ
ধরা হইয়াছে (Apte, Monier-Williams)। আমাদের
মাধ্যম 'কেই' 'কেহ' বলিতেছেন, এই খ টা ন হইতেই খা ট
হইয়াছে। খ টা ন শব্দ কে মূলত সংস্কৃত তাহার প্রমাণ নাই,
আর তাহা হইতে খা টা হইতেও পারে না। শেষের ন-
কারের স্থানে একটা অ (<ক) থাকিলে অবশ্য হইতে
পারিত।

খ টা ন হিন্দীতে এবং কোনো কোনো প্রাদেশিক
বাউলদিগে 'কুদ্র' অর্থে খুঁদী বা শব্দ প্রচলিত আছে।
ইহা স্পষ্টতই সংস্কৃত 'কুদ্র' শব্দ হইতে (> খুঁদ্র অ
> খুদ্র)। আবার ঠিক ঐ অর্থেই খু চা রা শব্দ প্রচলিত
আছে। ইহা খু দ রা শব্দেরই অপর রূপ। ম-টা ক্রমে
চ হইল তাহা ভাবিবার বিষয়। এই প্রসঙ্গে দুইটি
ইরানীয় শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সংস্কৃত
হইতে গুলবীতে (ক-মোগে) খু কু দ কু : ফারসীতে
খু কু দা কেহ বলিতে পারেন, ইহা হইতেই বর্ণ বিপর্যয়ে
হয় তো আলোচ্য এই দুই শব্দ হইয়া থাকিবে।

এইরূপে ছু বর্গের খ-য়ের পালা শেষ করিয়া
এইবার আমরা ক-য়ের পালা আরম্ভ করিব। ক ও
খ এই উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ ক্ষেত্রক স্তম্ভপ্রাণ, আর
পাশ্চাত্য প্রাণ : ক-য়ের শাস দিলে তাহাই খ হইয়া ফুটিয়া
উঠে। স্পষ্টতই খ-য়ের শাসনা, থাকিলে তাহা ক-য়ের
আকার ধারণ করে। এই নিয়মে খ-য়ের শাসনা পরিত্যক্ত
হওয়া পূর্বপ্রদর্শিত (৪৫) খু স নিষেব শেষে উকার
সহিত সিংহলীতে কু ছ 'কুদ্র' হইয়া দেয়া দিয়াছে।

১১। সংস্কৃতের কুদ্র অবস্থায় খু খু দ্র (xudra) ;
তাছাড়া তাহাতে 'কুদ্র' বা ছোট অর্থেই আর একটি শব্দ
হইতেছে কু ত কু (kutaka)। ফারসীতেও ঠিক এই অর্থে
কুচ কু : ইহাতে আর একটি শব্দ হইতেছে কু চ দ কু,
অর্থাৎ 'কুদ্র' শব্দ। লিথুয়ানিয়ান কু চ দ কু :
কুচ দ কু : আকৃতির ব-স্তুর নিয়ম (আর্য্যাবিধিক য-স্ত-প্রবক্ত
ঐষ্টব্য শা স্তিনিকোভ, ১৩২৭, বৈশাখ) ও উচ্চারণ অনুসরণ
করিলে এতদ্রূপ স্থানে খ-এর, ক-এর না লিখিয়া খ-য়ের, ক-য়ের
ইত্যাদি লেখা উচিত।

kudikis শব্দ। এই শব্দগুলি তুলনা করিলে মনে হয়
ইহাদের একটি সাদৃশ্য মূল আছে, এবং হইতে পারে
ইহা কুদ্র : কু : অথবা ইহারও পূর্ববর্তী এইরূপ : আর
কোনো একটি শব্দ। পূর্বের কু দ কু : কু ত কু : কু চ কু :
এই তিনটি শব্দ, ক্রমপরিবর্তনে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে
(কু দ কু : > কু ত কু : > কু চ কু :)। আমাদের কু চ বা : কু চা,
ও কু চি শব্দ (যেমন 'কুচা' অর্থবা কুচ নৈবেদ্য : 'কু চি
বাসন') এই ফারসী কু চ কু (< কু চ অ) শব্দেরই ভিতর
দিয়া আসিয়াছে। 'ক-চি পাতা' 'ক-চি হাত' : ইত্যাদির
ক-চি (< 'কুদ্র') শব্দও এই কু চ কু : হইতে। ফারসীর
কুদ্রার্থে প্রযুক্ত কু দ কু : ও লিথুয়ানিয়ান kudikis ছোট
শব্দকে বুঝায়। ফারসীর 'কু দ কু : হইতে পূর্ববর্তে
কু 'ছোট কোদা' 'খোকা' (কো দী 'খুকী') : এবং ইহা
হইতেই মালদহের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে 'খোকা' অর্থে প্রযুক্ত
খু দা : শব্দ হইয়াছে।

এইবার আমরা ছু বর্গের ক-য়ের পালা। আমরা
দেখিয়া আসিলাম কু ও হয়, এইরূপ ইহা আবার ছু ও
হয়। সংস্কৃত কু ও হইতে আমাদের ছা ও-খা ও কথায়
একসঙ্গেই আমরা ইহার পরিচয় পাই। কু ও কু যেমন
খু ডু কু হয় দেখা গেল, সেইরূপ তাহা হইতে আরার
* ছু ডু কু শব্দও হয়। ইহা হইতে * ছু ডু অ পরে উকার
স্থানে ওকার প্রথম উ-কারের লোপে পূর্বের সাহুনাশিক
ও শেষের দুই অকার মিলিয়া আকার হওয়ায় ছো ডা
আবার ড কোমল (ঘোষ), ইহা কঠোর (অঘোষ)
হইলে ট হইয়া যায় (ঈদৃশ স্থলে পৈশাচী প্রাকৃতের প্রভাব
বলিতে পারা যায়)। তাহা হইলেই * ছু ডু কু হইয়া
গেল ছু ট কু (< ছু ট অ, ছু ট, পাই অলঙ্কার, ৪৭২)। ইহা
হইতে উকার ওকার হওয়ায় হইয়া গেল ছো ট, একটি

টকারের লোপে ছো ট, হিন্দীতে ছো টা। ছ-য়ের
শাসনা গেলে তাহাই চ হইয়া পড়ে। এইরূপ মনে
হইতেছে 'এ ছো টা বা ছো টা' হইতে হিন্দীর 'চোন্টা'
('চুর্ভু', 'চোর') হইয়া থাকিবে।

পূর্বের 'কুদ্র' দেখিয়াছি 'কুদ্র' ক হইয়াছে খু দ কু, কিন্তু
বখন ছ হয় তখন সেইরূপেই তাহা হইতে হয় * ছু দ কু

অব্যক্ত ও ব্যক্ত

চতুর্দিক ব্যাপিয়া যে মৌন জীবন প্রসারিত, তাহাব অব্যক্ত জন্মন আচার্য জগদীশচন্দ্র জগৎ-সম্মুখে সর্ব-প্রথম প্রকাশ করিলেন [অব্যক্ত—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, এফ-আর-এস প্রণীত—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত—মূল্য ২।০]।

বিজ্ঞান তো সার্বভৌমিক। তবে বিজ্ঞানের মহাক্ষেত্রে এমন কি কোন স্থান আছে, যাহা ভারতীয় সাপকের সাধনা ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিবে? পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে পুরা হইতেছে, বিভিন্ন শাখার মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর তোলা হইতেছে। দৃশ্য জগৎ বিচিত্র এবং বহুকণী। এই সত্য-চকল প্রাণী আর এই চির-মৌনী অবিচলিত উদ্ভিদ, ইহাদের মধ্যে তো কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই ভারতবর্ষে উঠিলেন এক সাধক, যিনি তাঁহার চিন্তাকে কল্পনাব উন্মুক্ত রাজ্যে অব্যবহৃত প্রেরণ করিয়া আবার পর মুহূর্ত্তে তাহাকে শাসনের অধীনে আনিয়া প্রকৃতির এই বৈষম্যেব মধ্যে একতার সন্ধানে ছুটিলেন, এবং জড়, উদ্ভিদ ও জীবের মধ্যে এক সেতু কাঁচিয়া দিলেন। এই বৈচিত্র্যময় বিষয়ে যে মহান স্রমধুব ছন্দের সন্ধান আছে, ভারতের কবি জগদীশচন্দ্র সেই এক্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তবে কবি হইয়াও তিনি বৈজ্ঞানিক। তাই কবি যেখানে শুধু ‘যেন’ বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, সেখানে কবি ও বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র দৃঢ়স্বরে বলিলেন—‘এস, দেখ, এই সেই’। ভারতীয় সাধক নানা পথ দিয়া পদার্থবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণী-বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানকে এক কেন্দ্রে গিলিত করিয়া বিজ্ঞানের এই চতুর্বেণীসঙ্গমরূপ মহাতীর্থ স্থাপিত করিলেন।

জ্ঞানান অধ্যাপক হার্টস্ সর্বপ্রথমে বৈজ্ঞানিক উপায়ে আকাশে ডেউ উৎপাদন করেন। আকাশের স্পন্দনেই যখন আলোর উৎপত্তি, তখন হার্টস্-উৎপাদিত এই অদৃশ্য আলোক ও দৃশ্য আলোকের প্রকৃতি একই হওয়া উচিত। কিন্তু হার্টসের ডেউগুলি অতি বৃহদাকার বলিয়া সেই

ডেউ ও দৃশ্য আলোকের প্রকৃতির সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত করা স্বকঠিন হইল। আচার্য জগদীশচন্দ্র এক কল নির্মাণ করিলেন, যাহা হইতে অদৃশ্য আকাশোন্মির দৈর্ঘ্য দৃশ্য আলোকের দৈর্ঘ্যের কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিল। এই কলে একটি ক্ষুদ্র লঠনেব ভিতরে তাড়িতোন্মি উৎপন্ন হয়; একদিকে একটি খোলা নল; তাহার মধ্য দিয়া অদৃশ্য আলোক বাহির হয় এবং অপর দিকে সেই অদৃশ্য আলোক দেপিবার জন্য একটি কৃত্রিম চক্ষু। এই যন্ত্র দ্বারা তিনি বিশদ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, যে, দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি একই, যদিও আমাদের দৃষ্টিশক্তির অসম্পূর্ণতা হেতু উহাদিগকে বিভিন্ন বলিয়া মনে করি। অদৃশ্য আলোক ইটপাটুকৈল ঘরবাড়ী ভেদ করিয়া অনায়াসেই চলিয়া যায়, সুতরাং ইহার সাহায্যে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে। ১৮৯৭ সালের শেষভাগে প্রেসিডেন্সী কলেজে এইরূপে বিনা তারে সংবাদ প্রেরিত হইল। ১৮৯৫ সালে কলিকাতা টাউনহলে এ সম্বন্ধে তিনি বিবিধ পরীক্ষা প্রদর্শন করিলেন। বাঙ্গালার লেফটেন্যান্ট গবর্নর স্যার উইলিয়াম মেকেল্লি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞান-উন্মি তাঁহার বিশাল দেহ এবং আরও দুইটি রক্ত কক্ষ ভেদ করিয়া তৃতীয় কক্ষে একটি লোহার গোলা নিক্ষেপ করিল, পিতল আওয়াজ করিল এবং বাকনত্বপূর্ণ উড়াইয়া দিল। ইহার কয়েক বৎসর পরে মার্কনী তারহীন সংবাদ প্রেরণ করিবার পেটেন্ট গ্রহণ করিলেন। পূর্বে দূরদেশে কেবল টেলিগ্রাফের তাব দিয়া সংবাদ প্রেরিত হইত, আজ মহাশয়ের কণ্ঠস্বরও বিনা তারে আকাশতরঙ্গের সাহায্যে স্বদূরে স্রুত হইতেছে।

“দৃশ্যেব পরিমাণ কতই ক্ষুদ্র, কিন্তু অদৃশ্য যে সীমাহীন। তবে ত আমরা সেই অসীমেব মধ্যে একেবারে দিশাহারা! কতটুকুই বা দেখিতে পাই? একান্তই অকিঞ্চিৎকর। অসীম জ্যোতির মধ্যে অক্ষবর্ণ ঘুরিতেছি এবং ভয় দিক্শলাকা লইয়া পাথর-লঙ্ঘন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। হে অনন্তপথেব যাত্রী, কি সঞ্চল তোমা? সঞ্চল কিছুই নাই, আছে কেবল অন্ধ বিশ্বাস, যে বিশ্বাস-বলে প্রবাল সমুদ্রগর্ভে দেহাঙ্কি দিয়া মহাবীপ রচনা করিতেছে। জ্ঞানসাম্রাজ্য এরূপ অস্থিপাতে তিল তিল করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। আঁধার লইয়া আবৃত্ত,

শক্তি হলো তিন ইথে নাহি তিন
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী শিবানী।”

মাণিক গাঙ্গুলী বোধ হয় কতকগুলি ঘটনা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় ত্যাগ করেছিলেন। পৌরাণিক আখ্যায়িকার প্রভাব ধর্মমঙ্গলকারগণের মধ্যে যতটা দেখা যায়, প্রাচীন-তর গ্রন্থে ততটা পাওয়া যায় না। শূন্যপুরাণে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের স্থান যে খুব উচ্চ নয় তা আমরা দেখেছি; তাঁদের জন্ম হলো আদ্যার কাম থেকে। তাঁরা সব ধর্মের নির্দেশ-মত যে যার কাজ ভাগ করে’ নেন। ধর্ম চারি জনের উপর সৃষ্টি পরিচালনের ভার দিয়ে নিশ্চিত হলেন। মাণিক গাঙ্গুলীও তাই করেছেন বটে, কিন্তু প্রত্যেক দেবতার একটি করে’ শক্তি জুটিয়েছেন, যেমন ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, শিবানী।

তার পর দেখা যায় যে ব্রহ্মাদি তিনজন দেবতা ধর্মের ধ্যানে বসেছেন এবং ধর্ম তাঁদের পরীক্ষা করবার জন্য বের হয়েছেন। মাণিক এখানে দেবতাদের জবানী ধর্মের যে স্তব জুড়েছেন সেটা একেবারে পৌরাণিক ছাঁদে গড়া। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টি-অধ্যায়টা পড়তে পড়তে বেশ দেখা যায় যে তিনি ধর্ম দেবতার সম্মান ও ব্রহ্মাদির সম্মান ছুই রাখবার জন্য ব্যস্ত। তাই ব্রহ্মাদির উৎপত্তি যে বৌদ্ধ-সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্মত এটা জানাতে তিনি কুণ্ঠিত বলেই উল্লুখ সৃষ্টির পরেই প্রকৃতি হতে ব্রহ্মাদির উৎপত্তি দেখালেন। পুরাণে মত থেকে ধর্মমঙ্গলকারগণ অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিলেন।

এতক্ষণ আমরা শূন্যপুরাণ ও ধর্মমঙ্গলগুলির সৃষ্টি-তত্ত্বের কথাই বললাম। এখন বৌদ্ধসৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে এর মিল-অমিলগুলি দেখানো যাক।

বুদ্ধদেব যদিও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে নিষেধ করেছিলেন, তথাচ লোকে তাঁর নিষেধ বেশীদিন মানেনি। ব্রাহ্মণ্য সৃষ্টিতত্ত্বের উপর তাঁরা নিষেধের সৃষ্টিতত্ত্ব গড়ে’ তুললেন। নেপালের বৌদ্ধধর্মের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্বের বেশ একটা ছবি আমরা পাই। তাঁদের মতে আদিবুদ্ধ হচ্ছেন পরমদেবতা। ওল্ডফিল্ড (Oldfield) লিখেছেন—

“The system of theology taught in the Buddhist scriptures in Nepal is based upon a belief in the divine supremacy of Adi-Buddha as sole and self-existent spirit pervading the universe.”—Sketches of Nepal, Vol. II, p. 111.

হজসন (Hodgson) নেপালের বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যেসব খেটেছিলেন, এ পর্যন্ত অত পরিভ্রম আর কেউ করেছেন কি না সম্ভব। তাঁর মতটা নিয়ে উদ্ধৃত করে’ দিচ্ছি। স্বয়ম্ভু-পুরাণ-মতে আদিতে শূন্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না; গুণকরওব্যহে লেখা আছে যে যখন কিছুই ছিল না—তখন স্বয়ম্ভু ছিলেন একা; কেবল তিনিই আদিতে ছিলেন বলে’ তাঁকে বলতো আদিবুদ্ধ। তাঁর বহু হবার কামনা হলো—সেই কামনা হচ্ছেন প্রজ্ঞা। বুদ্ধ ও প্রজ্ঞার যোগে প্রজ্ঞা-উপায় বা শিব-শক্তি বা ব্রহ্মা-মায়ার সৃষ্টি। এই কামনার উদ্ভেকের সঙ্গে পঞ্চদেব বা পঞ্চবুদ্ধের জন্ম হলো। সেই পঞ্চ বুদ্ধ হচ্ছেন বৈরোচন, অকোভা, রত্নসম্ভব, অমিতাভ বা পদ্মপাণি, অমোঘসিদ্ধি। প্রত্যেক বুদ্ধের উপর এক এক বোধিসত্ত্ব সৃষ্টি করবার আদেশ হলো আদিবুদ্ধের। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের সম্বন্ধ পিতাপুত্রের স্থায়। চার বুদ্ধ ও বুদ্ধকল্প গত হয়েছে। বর্তমান কল্প হচ্ছে বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির রাজকল্প। পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবকে সৃষ্টি করলেন—এবং জগতেব স্বজন পালন ও সংহারের কাজে জুড়ে দিলেন। বৌদ্ধসৃষ্টিতত্ত্ব পড়লে বেশ দেখা যায় যে হিন্দুদের প্রধান দেবতাদের স্থান আদিবুদ্ধ, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের নীচে। শূন্যপুরাণ ও মঙ্গল-সাহিত্যে আমরা দেখতে পেয়েছি যে ব্রহ্মাদি প্রধান দেবতার উৎপত্তি মোটেই হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত নয়। এঁরা সকলে ধর্মের কল্পা আদ্যার পুত্র-স্থানীয়। এখানে আমরা যেমন দেখলাম ব্রহ্মাদির অবস্থা, পরে প্রসঙ্গক্রমে হিন্দু অন্তান্ত দেবদেবীর স্থান ও মানের কথা আসবে। সেখানে দেখা যাবে যে ইন্দ্রাদি দেবগণ ধর্মের দেহারায় উপস্থিত হচ্ছেন! শুধু তাই নয়, তাঁরা ধর্মের জন্য রীতিমত তপস্কা করছেন। বৌদ্ধ (মহাযান) মতানুযায়ী সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে শূন্যপুরাণোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের খানিকটা মিল আছে। মূলতঃ সৃষ্টি বৌদ্ধমতের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই দেখা যাচ্ছে। আগামীবারে আমরা পুণ্ডিতদের বিষয় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখাবো যে শূন্যপুরাণের সহিত নেপালী বৌদ্ধধর্মের যোগ আরও কত ঘনিষ্ঠ।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

পাঠকে স্থানে স্থানে কিছু সাবধান হইতে হইবে। মূল জাতকে অধিকাংশই পদ্য, ও কিছু কিছু পদ্য আছে। পদ্য অংশের অনুবাদে মূলকে বতর্টা অনুসরণ করা হইয়াছে, পদ্য অংশে সেক্ষেপ না কবিতা অনেক বতর্কৃত অবলম্বন করা হইয়াছে। ইহা ঠিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পদ্য অংশেরও অনুবাদে স্থানে স্থানে ভ্রষ্ট লক্ষিত হইল।

“অমাত্যেরা সমস্ত দিন ধর্মাসনে বসিয়া থাকিতেন” (পৃ. ১)। মূলের বি নি চ্ছ য় ট্ঠা ন শব্দের অর্থ ‘বিচারস্থান’ বা ‘বিচারালয়’, ‘ধর্মাসন’ নহে। ইংবেলী-অনুবাদের bench লিখিয়াছেন, ইহাতে ‘law-court’ বুঝাইতে পারে। বি নি চ্ছ য় ট্ঠা ন শব্দে যে ‘ধর্মাবিকরণ’, অনুবাদক নিজেই তাহা ঐধানের একটু পাবে লিখিয়াছেন (‘স্বব্যবহার গুণে অচিরে ধর্মাবিকরণ’)। “এই নিলজ্জ বুদ্ধকে ধনত ১” (পৃ. ৬) মূলে আছে ‘ছু ট্ঠা’। তদনুসারে ‘ছুট্ঠ’ লিখিলেই বোধ হইত, ‘নিলজ্জ’ লিখিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। মূলে আছে (vol. II p. 11, l. 13) “সু টি জা তি কো নী হো” (‘শুচিজাতিকঃ সিংহ’), ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে ‘সিংহ অতি শুচিপ্রিয়’ (পৃ. ৭)। ইহা ঠিক নহে। শুচি-জাতিক আব শুচি-প্রিয় এক নহে। ঐ কথাটার ইহাই তাৎপর্য যে, সিংহ-জাতি শুচি, পবিত্র। উৎসর্গজাতকে মূলের (p. 13, l. 10) স হা স ন জ্জা (‘মহাসমজ্জা’) শব্দের অর্থ ‘মহাসমাবোহ’ (পৃ. ৯) করা হইয়াছে। কিন্তু ‘সমাবোহ’ আর ‘সমজ্জা’ এক নহে; সমজ্জা বলিতে সম্ভা, সমিতি, পরিষদ; সম্মেলন শব্দে ইহাব ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে। “সে (নাগ) ... নদীর পৃষ্ঠোপরি ছুটিয়া যাইতে লাগিল” (পৃ. ৯)। এখানে পৃষ্ঠোপরি শব্দের অর্থটা পরিষ্কৃত নহে। মূলে আছে ‘নদী-পিটুর্চেন’ (‘নদীপুতেন’), নদীর পৃষ্ঠ দিয়া, —এখানে পৃষ্ঠ শব্দের অর্থ ‘তল’, নদীর তল-দেশ দিয়া অর্থাৎ নীচে দিয়া; ইহাই ঐ শব্দটার তাৎপর্য। “বোধিসত্ত্ব... হৃৎপর্শকে আশীর্বাদ করিলেন” (পৃ. ৯); এখানে মূলের ‘অ হু মো দ ন (অথবা অ হু মো দ না) শব্দের অর্থ আশীর্বাদ ঠিক নহে। পূর্গজাতকে (পৃ. ১০) “বলাবলি আরম্ভ করিল” — ইহা মূলের ‘উ জ্জা য় স্তি’ শব্দের অর্থ মনে হয়, কিন্তু ‘উ জ্জা য় স্তি’ (অব্যয়্যাস্তি) শব্দের অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে ‘অবজ্ঞা কবিত্তে লাগিল’ লিখিলে ঠিক হইত। ‘অবজ্ঞা’ অর্থে ‘অবধান’ শব্দ সংস্কৃতও প্রসিদ্ধ। “প্রত্যাবিধান করিলে”, “প্রত্যাবিধান করিতে হইবে” (পৃ. ১০); উক্তদ্বয়ান্নেই লিখিতে হইলে ‘প্রত্যাবিধান’ লিখিলে ঠিক হইত, ‘প্রত্যাবিধান’ ঠিক নহে, এবং ‘আশীর্বাদ’ ও ‘অভিধান’ও এক নহে। অলীনচিহ্ন-জাতকে (p. 18, l. 10) আছে, “ছুতারেরা সমস্ত কার্ঠে চিহ্ন করিয়া (সংক্রান্ত ক্রিয়া)...” ইশান-বাবু অনুবাদ করিয়াছেন “সমস্ত কার্ঠে এক ছুই ইত্যাদি অঙ্ক চিহ্নিত করিয়া...”। সমজ্জা শব্দে গণিতের অঙ্ক বুঝাইতে পারে না। আলোচ্য অনুবাদ পড়িলে লোকের এ বিষয়ে নানা ভ্রম হইবার সম্ভাবনা আছে। (জাতকে পুণ্ডরিক অংশেও (পৃ. ২১, ২২) ‘এক ছুই ইত্যাদি অঙ্ক তক্ষণের’ কথা দেখিয়া সহজেই বুঝা যাইতে পারে কেমন ভ্রম হইবার আশঙ্কা আছে।) ‘সংজ্ঞা করার’ ইহাই তাৎপর্য যে, কোন্ কার্ঠের সহিত কোন্ কার্ঠখানা জোড়া দিতে হইবে তাহা ঠিক রাখিবার জন্য একটা দাগ বা চিহ্ন দিয়া রাখিত। “কার্ঠ কাটিতেছে ও ছিলিতেছে” (পৃ. ১২) — এখানে ‘ছিলিতেছে’ শব্দটি অধিক, মূলে নাই। “হাতী... কার্ঠের একখানা চেলার উপর পা দিয়াছিল” (পৃ. ১২)। মূলে আছে বা নু ক (অথবা ধা নু ক), — ইহার অর্থ শব্দ, ছোট পোষ, পোঁচ, চেলা নহে। পাবে (পৃ. ১৩) আবার ইহার অর্থ ‘কার্ঠের কুচি’ করা হইয়াছে, ইহাও ঠিক হয় নাই। “তীক্ষ্ণধার শত্রু লইয়া” — এখানে মূলের অনুসরণে বাইশ বা বাহলা নামের বিশেষ শব্দকে (‘তি থি ন বা সি রা’, তীক্ষ্ণ বাশ্য) উল্লেখ করাই উচিত ছিল। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইত যে, উহার প্রচলন তখনো ছিল।

“ধর্মপাতি বহিয়া আনিত” (পৃ. ১৩), — এখানেও মূলে আছে “বাশী প্রভৃতি”। হস্তী ছুতারের কেমন কাজ করিত তাহার বর্ণনার এক স্থানে আছে — ত ছ স্তা নং প রি ব স্তে জা দে তি সো জা য় বে তে জা কা ল স্ত স্ত কো টি য়ং গ ন হা তি”। ইশান বাবু অনুবাদ করিয়াছেন “বথন তাহার কাঠ ছিলিত, তখন স্ত ডিঙলি (গাছগুলি বলিলে মূল্যায়ী হইত) উঠাইয়া পাঠাইয়া দিত...। সে-সমস্ত জবাই শুণ্ড দ্বারা এমন বেঠন করিয়া ধবিত যে কিছুই পড়িয়া যাইত না।” শেষাংশের মূল “কালহস্ত কোটিয়ং গণহাতি,” — ইহার টীকার উক্ত হইয়াছে — “কালহস্ত কোটিয়ং গণহাতি অর্থাৎ যমের সূত্রের দ্বারা ধবিত — এমন ভাবে ধবিত যে, কিছুতেই কঙ্কাইয়া যাইত না।” এ ব্যাখ্যা বড় কষ্টকল্পিত। ছুতার-মিস্ত্রীবা কার্ঠের কাজ কবিবার সময় কাল-রং-মাগান একরকম স্ততা দিয়া প্রথমে কার্ঠে আবদ্ধক-মত দাগ দিয়া পরে সেই দাগ অনুসারে তাহা কাটে। বাহাতে এই স্ততা জড়ান থাকে ছুতার-মিস্ত্রী নিজেই তাহা ধবে, আর অপর দিকটা অন্ধকে ধরিতে দিয়া তাহার সাহায্যে কার্ঠে দাগ দেয়। এখানেও এই কথাই বলা হইতেছে, — হাতীটি কাল স্ততাব আপাটা শুড়ে জড়াইয়া ধরিত। পালি কথাটার আক্ষরিক অর্থ হইতেছে — শুণ্ডেব দ্বারা বেঠন করিয়া বৃক সূত্রের অগ্রভাগে (অর্থাৎ অগ্রভাগকে) ধারণ করিত। জটব্য Journal of the Pali Text Society, 1881, pp 76-78। এখানে আলোচ্য শব্দটির সুবিশেষ আলোচনা আছে।

পালিবা চা টি শব্দের অর্থ করা হইয়াছে (পৃ. ৩৬৭, ১৪) ‘কলস’ বা ‘কলসী’, কিন্তু বস্তুত কলস ও চা টি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। চাটিকে বাঙলার কোনো কোনো স্থানে ‘চাড়ি’ বা ‘চাড়’ বলে, ইহা মাটির গোলাকার অতিবৃহৎ পাত্র, গরুর ইহাতে খাবার দেয়। দেখিয়াছি (রাঙ্গশাহীতে) ছোট ছোট নদীও ইহাতে পান হওয়া যায়। অনেক স্থলে আবার ইহাকে ‘নাদা’ বলে।

ইশান বাবু ক পি কা র পুস্পকে (১৭ পৃ.) ‘কনক-চাঁপা’ বলিয়াছেন, কিন্তু বস্তুত তাহাই কি? কনক-চাঁপাব বোধ গন্ধ আছে, কিন্তু কপিকারের গন্ধ নাই (‘বর্ষপ্রকর্ষে সতি কপিকারঃ স্তনোতি নির্গন্ধতয়া স চেতঃ। প্রায়েণ সাগরাবিধৌ শুণ্ণানাং পরামুখী বিষমঃ প্রবৃন্তিঃ।’ — কুমার, ৩২৮)। ইহা দৌদাল, দোনালু, হিন্দীতে কনিয়ব; ইহাব লম্বা-লম্বা ফল হয়; কবিরাঙ্গেরা ইহাতে জ্বালাপ দিয়া থাকেন।

আমার মনে হইতেছে, জাতকের প্রথম খণ্ডেব সমালোচনার লিখিয়া-ছিলাম গৌতমীকে বাঙলার স হা প্র জা প তী না লিখিয়া মহা প্র জা . ব তী লেখা উচিত ছিল, এবং আরো লিখিয়াছিলাম যে, প্র জা ব তী শব্দ হইতেই আমাদের পো দা তী শব্দটা আসিয়াছে। আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ডেও (পৃ. ২৬, ২৩৮) দেখিতেছি ইশান বাবু প্র জা প তী ই লিখিয়াছেন। কেন আমি প্র জা ব তী লিখিতে চাই পুনিরা বলি। Childers সাহেব অভিধানপত্রীপিকা (২৩৭, ১০০০) ও ধর্মপদেব (১৮৫, ২৪৫) উল্লেখ করিয়া প্র জা প তী লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু বস্তুত ঐ দুই পুস্তকে ও অন্যান্য পালি পুস্তকে আছে প্র জা প তী, প্র জা প তী নহে, পালিতে ইহা থাকিবার কথাও নহে। দিব্যাবদান (পৃ. ২, পৃ. ২; পৃ. ৯৮, পৃ. ২১) প্রভৃতি বৌদ্ধ সংস্কৃত পুস্তকে প্র জা প তী শব্দ আছে; কিন্তু এই দিব্যাবদান ও বিশেষত ললিতবিস্তার ও মহাবস্তু প্রভৃতি বৌদ্ধ সংস্কৃত বা গাথা ভাষায় লিখিত পুস্তকসমূহে একপ অনেক শব্দ আছে যাহা ঝাঁটি সংস্কৃত নহে। পাল্লি-প্রাকৃতের মিশ্রণে ঐ এক-রকম অস্কৃত সংস্কৃত করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, কোনো কোনো শব্দের একাংশ ঝাঁটি সংস্কৃত হইলেও অপরাংশ ঝাঁটি পালি বা প্রাকৃত, ইহা যে-কেহ বলিবেন। প্র জা প তী শব্দটিও এই প্রকার। Childers বা M. M. Williams কেহই

হিন্দুদের ব্রহ্মতত্ত্ব ভাল করে' পাই—“যেক ব্রহ্ম দিতিয় নাহিক আর” (পৃ: ২০০)।

শূত্রপুরাণের গল্পাংশ যতই উদ্ভট হোক, বেশ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। উলুক-মুনি যুব ক্লান্ত হয়ে পড়লে প্রভু তার দেহ থেকে একটা পাখা ছিঁড়ে জলে ফেলে দিলেন এবং তখনই হংস সৃষ্টি হলো। সেই হংস বলছে যে তাবৎ “নাহিক বাপ মাও”। যাই হোক, চৌদ্দ যুগ প্রভুকে বহন করে' হংসরাজ দেবতাকে ঠেলে ফেলে আকাশে উড়ে গেল। এখানেও লৌকিক বিশ্বাস ও শাস্ত্রের উট্টাটি ঠিক দেখা যাচ্ছে। হংস পবিত্র; পুরাণে হংসের স্থান খুব উচ্চ।* সেখানে সে বিষ্ণুকে অক্লান্তভাবে বহন করেই ধন্ত; কিন্তু এখানে হংস ঠাকুরকে ফেলে পালিয়ে গেল। ধর্মপূজাবিধানের এক জায়গায় আছে “হংসরথে বিজয় ঠাকুর নিরঞ্জন” (পৃ: ২১৬) ; তবে সেখানে নিরঞ্জন পরব্রহ্মের নামান্তর মাত্র। তা ছাড়া ধর্মপূজাবিধানে যে হিন্দুপ্রভাব অনেক বেশী তা আমরা দেখতে পাব।

প্রভু হংসের পর কচ্ছপ সৃষ্টি করলেন; কিন্তু যে কচ্ছপ পৃথিবীর ভার সহ্য করছেন—তিনিও চৌদ্দযুগ পরে চম্পট দিলেন। প্রভু খুবই মুন্সিলে পড়লেন। তখন তিনি সোনার পৈতা ছিঁড়ে জলে দিলেন ফেলে, ভাবলেন বাহনটি অস্ত্রদের মত অকৃতজ্ঞ হবে না। কিন্তু পৈতা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল বাস্কি নাগ। বাস্কি তখনই প্রভুকেই খাবার জন্ত তেড়ে ছুটলো; ধর্ম বেগতিক দেখে উলুকের পরামর্শে কানের কুণ্ডল খুলে ফেলে দিলেন। সেই কুণ্ডল জলে পড়েই ব্যাঙ হয়ে গেল—বাস্কি সেই ব্যাঙ খেতে মন দিলেন। ধর্মপূজাবিধানে আছে যে ধর্মের পৈতা হচ্ছে হাজার-মাথা অষ্টনাগ। এটা পৌরাণিক অনন্ত নাগের বর্ণনার সঙ্গে মেলে। কিন্তু কোথায়ও ত দেখা যায় না যে বাস্কি প্রভুকে খেতে ছুটেছে! স্ততরাং এই আখ্যায়িকাটাও লৌকিক বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যাচ্ছে।

এখানে একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে। হিন্দুদের ঘৃণ্য মৃত্যুর দূত উলুক হচ্ছেন মুনি, ধর্মের নিত্যসহচর।

ধর্মের সঙ্গে উলুকের যোগের কথা আমরা পরে বিশদভাবে আলোচনা করবো। হংস, কূর্ম, বাস্কি সকলেই বেশ শাস্ত্র কৃতজ্ঞ বলেই শাস্ত্রে উক্ত; কিন্তু ধর্মসাহিত্যে তাদের যে রূপ দেখা গেল সেটা আদৌ আদর্শস্থানীয় নয়। এই-সবের মানে কি তা স্পষ্ট করে' বলা বড় কঠিন; হিন্দুদের যেটা পূজা তাকেই ছোট করা ও যেটা অপূজা সেটাকে বড় করাই যদি এর ভিতবকাব কথা হয়, তবে এ কয়টি প্রাণীই বেছে নেওয়ার মানে কি ?

এখন আমরা সৃষ্টিতত্ত্বের অন্ত্যন্ত কোটায় প্রবেশ করি। ধর্মপূজকদের মতে পৃথিবী ধর্মের গায়ের ময়লা; তিনি বাস্কির মাথায় সেই ময়লা চাপিয়ে দেন বলেই পৃথিবীর অপর নাম বসুমতী। মাণিক দস্তের মণ্ডলচণ্ডীতেও আমরা যে সৃষ্টিতত্ত্ব পাই সেটি ধর্মপূজকদের বিশ্বাসের অন্তরূপ। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় আলোচনা করেছেন। মাণিক দস্তের মতে ধর্ম পাতালে বান মাটি আনবার জন্ত। সেখান থেকে শূত্রমুর্ত্তিতে তিনি উপরে উঠে আসেন। মাণিক দস্ত চণ্ডীমঙ্গলের লেখক হলেও তাঁর বই আরম্ভ হয়েছে ধর্মকে নিয়ে, আব তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে শূত্রপুরাণ বা আর কোনো ধর্মপূজার বইএর প্রভাবে লিখিত হয়েছিল। শূত্রপুরাণের সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে আদ্যাশক্তি ধর্মের ঘর্ম থেকে সৃষ্টি হন। এই আদ্যাশক্তি গোঁরী বলেও উক্ত হয়েছে (পৃ ১৫২)। এই দেবী ধর্মের কন্যার ছায়; এঁর গর্ভে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব জন্মগ্রহণ করেন। ঘনরাম লিখেছেন “পরম ব্রহ্ম বামে পরা জন্মিল প্রকৃতি” “প্রকৃতি হইতে জন্মে ত্রিগুণ আধান” “বিধি বিষ্ণু মহাদেব জন্মিল মহান।” শূত্রপুরাণ ও ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু মাণিক গাঙ্গুলীর মধ্যে একটা গোঁজামিল দেবার চেষ্টা দেখা যায়। তিনি অকস্মাৎ সৃষ্টিকার্য স্তব্ব করিয়েছেন। শূত্রপুরাণ, ঘনরাম, ধর্মপূজা-বিধান, মাণিক দস্তের মঙ্গলচণ্ডীর বর্ণনার মধ্যে একটা পারস্পর্য্য আছে। কিন্তু মাণিক গাঙ্গুলী উলুক ও সাগর সৃষ্টি করে' লিখেছেন—

“শক্তি মনে তখি একে স্থিতি গতি,
তিন মুর্ত্তি সেই কালে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন দেব
ইহার উপমা কিবা।

* Hopkins—Epic Mythology, p 19.

শব্দটির ব্যুৎপত্তিসম্বন্ধ অর্থ দেন নি। অন্য কোনো লেখকেরও এ বিষয় কোনো মন্তব্য আমি এ পর্যন্ত জানি না। আমি যে উহার অনুবাদ প্রজ্ঞাপত্রী করিতে বলিতেছি আমিই তাহার একমাত্র উদ্ভবদাতা। প্রজ্ঞাপত্রী (=সম্ভানবতী স্ত্রী, পরে সাধারণত স্ত্রী) বলিলে একটা অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু ষাট সংস্কৃত প্রজ্ঞাপত্রী করিলে তাহার অর্থ matron, wife কিরূপে হইতে পারে, আমি তো বুঝিতে পারি না। তকারে দীর্ঘ ঈটা কোথা হইতে আসিল ইহাও ভাবিতে হইবে। বৈদিক সংস্কৃতে এত প্রসিদ্ধ প্রজ্ঞাপত্রী শব্দটি পালি সাহিত্যে প্রজ্ঞাপত্রী হইয়া স্ত্রী-বাচক হইয়া পড়িল, ইহাও একটা ভাবিবার বিষয়। পুত্র বতী শব্দে যেমন সাধারণত বাহ্য পুত্র আছে সেই স্ত্রীলোককেই বুঝাইয়া থাকে, প্রজ্ঞাপত্রী শব্দও সেইরূপ প্রথমত সম্ভানবতী স্ত্রীকেই বুঝাইতে; ক্রমে তাহা কেবল স্ত্রী-অর্থেও প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে (অভিধান, ২৩৭)। শব্দের উৎপত্তি আলোচনা করিলে ইহাই বলিতে হয়। আমি-বলিয়াছি আমাদের পোয়াতী শব্দ প্রজ্ঞাপত্রী হইতে। এই উভয় শব্দের অর্থপত্র যদি কিছু পার্থক্য থাকে, তবে যতদূর অন্য কোনো উপযুক্ত ব্যাখ্যা না পাইতেছি ততদূর ভাষাতত্ত্বের প্রামাণ্যের উপর নির্ভর করিয়া আমাকে বলিতেই হইবে পোয়াতী শব্দ প্রজ্ঞাপত্রী শব্দের অপভ্রংশ। পোয়াতী গর্ভবতী স্ত্রীকে বুঝায়, আবার প্রসবের পবেও যতদিন সম্ভান একটু বড় হইয়া না উঠে ততদিন এরূপ স্ত্রীলোককেও বুঝায়। কিন্তু কেবল প্রাদেশিক প্রয়োগের উপর নির্ভর করিয়া কোনো প্রাচীন সাহিত্যে প্রযুক্ত শব্দের অর্থ নির্ণয় করা সর্বত্র নিষেধ নহে। প্রজ্ঞা=সম্ভান, প্রজ্ঞাবতী=সম্ভানবতী, ইহাই ঠিক অর্থ। দুই-একটা প্রয়োগ দিই :-

“সাম্প্রত্যং সর্গকর্তৃকামাধিঃ ব্রহ্মণা মম।

সোহং পত্নীমভীশামি ধন্যং বিদ্যাং প্রজ্ঞাপত্রীম্।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৯৭, ১৮।

—প্রজ্ঞাবতী=সম্ভানবতী। যিনি প্রজ্ঞাপত্রী অর্থাৎ সম্ভানবতী হইতে পারেন, সেই পত্নীবই কথা এখানে বলা হইয়াছে। রাজশেখরও (বাল-ভাবত, নির্ণয়দাগর, ৩২ পৃঃ) দ্রৌপদীর বিশেষণরূপে প্রজ্ঞাপত্রী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, (“প্রজ্ঞাবতি, তবায়মভিপ্রায়ঃ”)।

‘ভাতৃজ্ঞান’ অর্থেও এই শব্দের প্রয়োগ আছে (অমর, ৩, ৬, ৩০)। সীতাকে বর্জন করিবার সময় তাঁহার সম্বন্ধে রাম লক্ষ্মণকে বলিতেছেন (রঘু, ১৪, ১৫) —“প্রজ্ঞাপত্রী মোহমঃসিনী তে।” কিন্তু বস্তুত এখানেও বাম গর্ভবতী সীতাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলার এ একটি সম্ভানবতীকেই বুঝাইতেছে।

এখানে একটা আপত্তি হইতে পারে, সংস্কৃতের অন্তর্গত ‘ব’ পালিতে ‘প’ হয় কি? অনেক হয়; যথা, সংস্কৃত শাবর, পালি ছাপ; এইরূপ লা ব, লা প (পক্ষিবেশের); সংস্কৃতের প্র+আ+৷ বুঝা হইতে পালিতে পা রূপ পতি। এইরূপ আরো আছে।

এ বিষয়ে আব-একটি শেষ প্রমাণ দিই। পালির মহাপ্রজ্ঞাপত্রী পোতমীকে ললিতবিস্তবে (রাজেন্দ্রলাল মিত্র) একই পৃষ্ঠার (১৫ পৃঃ) তিনবার মা হা প্রজ্ঞাপত্রী পোতমী বলা হইয়াছে। Lefmann-এর সংস্করণে (মূল ১ম খণ্ড, পৃ. ১০০) বন্ধিও মহাপ্রজ্ঞাপত্রী আছে, তথাপি পাঠান্তরে (২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫) মহাপ্রজ্ঞাপত্রী পাঠ দেখা যাইবে।

সীলানিসংস জাতক (১৯০) একস্থানে (পৃ. ১১২) আছে :- “তয়ো কুপক। ইন্দ্রনীলমণিমবা, হুবরমরো লকাবো, রজতময়ানি বোস্তানি...।” ঈশান বাবু অনুবাদ করিয়াছেন (পৃ. ৭১) :- “উহার মাঞ্চল তিনটি ইন্দ্রনীল মণি দ্বারা, বাতপট্টদণ্ড হুবর্ণ দ্বারা, রজতগুলি রৌপ্য দ্বারা...পট্টিত হইল।” ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে, ঈশান বাবু

মূলের লকারকে ‘বাতপট্টদণ্ড’ বলিতেছেন, বাতপট্ট শব্দের অর্থ নৌকার ‘পাল’, তাহা হইলে বাতপট্টদণ্ড আর মাঞ্চল (কুপক) একই হইয়া পড়ে, তাই তিনি টীকায় বলিয়াছেন লকার শব্দ মাঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন অংশ; কিন্তু আবাব অন্যত্র (পৃ. ২৪০) বলিয়াছেন, ‘পাল পাটাইবার জন্য’ মাঞ্চলগুলির ‘পারে...এডোকাঠ (লকার অর্থাৎ yard) ...।’ লকার শব্দের পাঠান্তর লক্ষ্য ব। Cowell সাহেব ইহাই দেখিয়া উহার অর্থ নঙ্গর (ফারসী লঙ্গর) করেন। ইহা যে সম্ভব নহে ঈশান বাবু তাহা বলিয়াছেন। স্বর্ণায় হরিনাথ দে (Journal of the Pali Text Society, 1906-1907, p. 173) Cowell সাহেবের এই মত খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উহার অর্থ নৌকাব ‘পাল’। তিনি বিশ্বক্ৰিমগুপ্ত (ব্রহ্মদেশীর সংস্করণ, পৃ. ১১০) হইতে নিম্নলিখিত বাক্যটি প্রমাণ স্বরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন :-

“যথা চ অচ্ছেকো নিয়মকো বলবাবতে শঙ্করং পুবেস্তো নাং বিদেশং পৃথুলাপেতি; তপরো অচ্ছেকো মলবাবতে লঙ্কাং ওরোপেস্তো নাং তথৈব ঠপেতি; ছেকো পন মলবাবতে লঙ্কাং পুরেস্তা বলবাবতে অওচ লঙ্কাং পুরেস্তা সোখিনা ইচ্ছিতট্টানং পাপুণাতি।”

ইহার ভাবার্থ হইতেছে—যেমন কোনো অনিপুণ মাঝি প্রবল বায়ুতে পাল উড়াইয়া নৌকাকে বি-দেশে (অর্থাৎ যেখানে বাইবার কথা সেখানে না গিয়া-অন্তত্র) লইয়া কলে; আর অল্প কোনো অনিপুণ মাঝি মল বায়ুতে পাল ধুলিয়া ফেলিয়া নৌকাকে সেইখানেই রাখে; কিন্তু নিপুণ মাঝি প্রবল বায়ুতে অর্ধেকটা পাল উড়াইয়া ভালয়-ভালয় অতীষ্ট স্থান প্রাপ্ত হয়...।

এ স্থলে লকার শব্দেও একটা প্রয়োগ দিতে পারা যায়, ইহাতেও বুঝা যাইবে তাহার অর্থ ‘পাল’ :-

“অচলপদববন্ধং হুট্টিতোদারকুপম্

উদিতপুথুলকারং দক্ষ-নিয়ামকং চ।

সমমভিমতলক্ষ্যপানিনং নারমেষতে

সপরি সমুপকলংহং অন্ধং হাপিজেহি।”

দাঠাবস, ৪. ৪২ (Journal, P T S, 1884, p. 140).

উদিতপুথুলকার = উদিত পুথুলকার, ‘বাহাব চণ্ডা পাল উদিত হইয়াছে।’ লক্ষ্যপান—আলোচ্য জাতক, পূর্বে উদ্ধৃত বিশ্বক্ৰিমগুপ্ত, ও দাঠাবসের নৌকার বর্ণনা একই রূপ, এবং তাহার শব্দাবলীও একই।

নৌকার ‘পাল’ বুঝাইতে পালিতে লঙ্কা ব কোথা হইতে আসিল, ইহার ব্যুৎপত্তিসম্বন্ধ অর্থ কি? আমাব মনে হইতেছে, মূল অ লঙ্কা র হইতে হইয়া থাকিবে। পাল তুলিলে নৌকার বিশেষ রকমের শোভা হইয়া থাকে, তাই সেই অর্থে প্রথমে অ লঙ্কা র শব্দটা চলিয়া যায়, পরে শব্দবিশেষের সংসর্গে অকাবটা লোপ হওয়ার লঙ্কা র হইয়া পড়িয়াছে। যেমন উচ্চ স্বর হইতে আমাদের ডু স্বর ‘ডুমু’ হইয়াছে; অত্যন্ত র হইতে ভিতর। প্রাকৃতের ই র স্থানে র, অ পি স্থানে রি, এবং অন্ত্যস্ত এইরূপ শব্দ পূর্বোক্ত প্রণালীতে কেবল মাত্র আদিস্থিত স্বরের লোপেই হইয়াছে। একটু পরিষ্কার করিয়া বলি :-

প্রাকৃত

“অপথিতো রি হুমণো কঙ্গ করবে গুণে পবাসেই।

ধরলেই জয় সয়লং সম্ভারও চের নিসি-নাহো”

হরহম্বরীচরিত (০ কথা), কাশী, ১৯১৬, ১.২৭।

সংস্কৃত

অপ্রাথিতোহপি হুমণঃ কবীনাং কাব্যে গুণান প্রকাশয়তি।

ধরলয়তি জগৎ সকলং সম্ভারও এর নিশি-নাহোঃ

প্রাণনা না করিলেও হুমণ ব্যক্তি কবিগণের কাব্যে গুণসমূহ

সব হলা নাথ তেজ বাধা কাশ
হত হলা রবি সসি ।
গত দিবা রাত্তি হত হলা খেতি
চতুর্দশ ভুবন আদিঃ (পৃ: ১৯৯)

মাণিক গাঙ্গুলী তাঁর ‘ধর্মমঞ্জলে’ লিখেছেন :—

অন্তল বিতল সপ্ত বসাতল
সংনিধি সমুদ্র সাত ।
অস্বর কিম্বর আদি চরাচর
সকলি হইল পাত ।
সৃষ্টি কবি নয় দেব দয়াময়
আপনি রহিল শূন্যে ।
চিন্তামনি তবে চিন্তিত বৈভবে
সৃষ্টি যজ্ঞিবাব জন্তে ॥ (পৃ: ২)

শ্রুতপুরাণ-কারের মতে ‘পরভূ’, ‘মাআধর’, ‘করতা’ হচ্ছেন পরম দেবতা। প্রথমে প্রভু ‘অনিল’দের সৃষ্টি করলেন। তারপর তিনি ‘পুরুষ’রূপে নিজেকে সৃষ্টি করলেন। এই পুরুষের চক্ষু অবয়বাদি কিছু ছিল না—“রজবীজে জনম তার নহিক বাপ মাও।” এই মত হচ্ছে মাধ্যমিক দর্শনের মত—অনুপপাদক। নাগার্জুনের এই মত যে কেবল তাঁর মাধ্যমিক বৃত্তির মধ্যে ছিল তা নয়, বেদান্ত পর্যন্ত সেই মত গ্রহণ করেছিলেন। পুস্যা (La Vellie Poussin) লিখেছেন যে—

“The main idea that there is no birth, production, *jati, utpada*, that causation is impossible since the cause cannot be identical with, nor different from the effect, since neither being, nor non-being, nor being+non-being, can originate, is thoroughly madhyamika.” (J. R. A. S., 1910 ; p. 136)

এই পুরুষের নাম নিরঞ্জন। নিরঞ্জন শব্দের অর্থ আমরা জানি নিরাকার, অঞ্জন-রহিত। পূর্বের কায়াহীন চক্ষুহীন পুরুষের নাম যে নিরঞ্জন হবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কিন্তু লোকে তার একটা সহজ ব্যাখ্যা বার করেছিল। প্রভু জলে (নীরেতে) ছিলেন—“নীরেতে নিরমল কায়্য নাম নিরঞ্জন”—তাই তাঁর নাম নিরঞ্জন হয়েছে বলে, সাব্যস্ত হয়েছিল।* মাণিক গাঙ্গুলী কিন্তু এপ্রকার শব্দতত্ত্ব সৃষ্টি করেন নি; তিনি লিখেছেন—“নির্সিকার, নিরাকার, নিরঞ্জন তুমি,” ইত্যাদি (১২।১৮)।

* এই রকম Sound Philology যে কেবল গ্রাম্য কবির করতেন তা নয়, বিষ্ণুপুরাণ-কার নারায়ণের অর্থ দিয়েছেন—

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরহুবঃ ।

অহনং তস্য তাঃ পূর্বে তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ১. ৪. ৬ ।

যাই হোক, ধর্ম নিরঞ্জন যোগে বসলেন ও চৌদ্ধযুগ ব্রহ্মজ্ঞানে কেটে গেল। তার পর হাই তুলতে গিয়ে উলুক (প্যাচা) হঠাৎ বেব হয়ে পড়লো। এই উলুক-মুনি প্রভুকে চৌদ্ধযুগ টেনে টেনে শেষকালে ক্রান্ত হয়ে পড়লেন ও প্রভুকে কিছু খাদ্য দেবার জন্ত বসলেন। প্রভুর সম্বল ছিল মুখের নিষ্ঠীবন মাত্র; তাই দিয়ে উলুকের প্রাণ বাঁচালেন; নিষ্ঠীবনের ছুই এক ফোঁটা উলুকের মুখের বাইরে পড়াতে সাগর সৃষ্টি হলো। সেই সাগর-জলে উভয়ে ভাসতে লাগলেন।

এই উলুক-সৃষ্টি ধর্মসাহিত্যের একটা বিশেষত্ব। উলুক হিন্দুদের কাছে খুব স্থগ্য। বেদে বার চারেক উলুকের উল্লেখ পাই; মৃত্যুর সঙ্গে উলুকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।* লৌকিক ধর্মেও উলুকের স্থান নাই। এখন প্রশ্ন—ধর্মসাহিত্যে ও ধর্মপুজায়—এই উলুক কোথা থেকে এল। আমার মনে হয়—মধ্যযুগে যখন হিন্দুধর্ম ও পুরাণকথা লোকের মধ্যে প্রচারিত হচ্ছিল, তখন বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা অনেক ভাব গল্প প্রবাদ অজ্ঞভাবেই গ্রহণ করেছিল। লৌকিক ধর্মে যমকে ধর্মরাজ বলে—তা আমরা জানি; যমের সহিত উলুকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। বোধ হয় যম ও ধর্মরাজের অর্থ ও ভাবের গোলমালে—উলুক ধর্ম-পুজকদের নিকট অত বড় আসন পেয়েছে। ধর্মরাজ ও যমরাজের আসন-পরিচ্ছদাদির মধ্যেও গুণগোল মাঝে মাঝে দেখা যায়।

সাহিত্যপরিষৎ থেকে “ধর্মপূজাবিধান” নামে যে গ্রন্থখানি ছাপা হয়েছে—তাতে ছুই জায়গায় সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। শ্রুতপুরাণের বিশদবর্ণনা ধর্মপূজাবিধানে পাওয়া যায় না। প্রভু শূন্তের মধ্যে জন্ম নিলেন; সেই শূন্যই অনিল। অনিল নিরঞ্জনকে বলছেন যে তিনিই পিতা, তিনিই মাতা—তিনিই আদিতে ‘বিশ্বক’র মধ্যে ছিলেন, ইত্যাদি। এই গ্রন্থের মধ্যে আমরা

* “A bird, either the owl or the pigeon (kapota), is said to be the messenger of *yama* apparently identified with death. In another place a demoness is compared with an owl. In the Sutras the owl is the messenger of Evil Spirits.”—[Macdonell—Vedic Mythology.]

প্রকাশ করেন, যেমন নিশানাথ স্বভাবতই সমস্ত জগৎ (জ্যোৎস্নায়) ধবলিত করেন।

এখানে মূলত অ প খি তো + অ রি (অপ্রাথিতো + অপি), পরে সন্ধিবিশেষে অকাব লোপে অ প খি তো রি। ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ বহুপ্রয়োগ হইতে হইতে শেষে অ রি (অপি) স্থানে রি হইয়া গিয়াছে, এবং সেইজন্যই প্রাকৃত্তে দেখা যায় ন রি (নাপি)। আলোচ্য প্রাকৃত্ত কবিতাটিতে চে র শব্দ এ র অর্থে প্রযুক্ত। প্রাকৃত্তেব নিয়মে চ + এর = চে র। কিন্তু ভাষায় বহুবাব ইহাব প্রয়োগ হওয়ায় পূর্ববর্তী কালে চকারেব অর্ধের দিকে কোনো লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল এ র-অর্থেই ইহা প্রাকৃত্তে প্রযুক্ত হইতে থাকে। সংস্কৃততেও অ র আব অ পি উপসর্গের অকাব লোপ প্রসিদ্ধ, যথা র গা রু = অ র গা হ্য, পি ধা ন = অ পি ধা ন। “বসি ভাস্তবিলোপম্ অবাপ্যোপসর্গযোঃ।” বৈয়াকরণিকেরা না বলিলেও অ ধি উপসর্গেরও অকাব লোপ দেখা যায়, এবং দেখা যাইবাবই কথা, “হৃদি সরস্যা ধি ষ্ঠিতম্ (গীতা, ১৩, ১৭)।

এইকপেই ল ক্কা ব শব্দের অ ল ক্কা ব হইতে উৎপত্তি সম্ভব, পবে অনুমানিক ঙ্কার পরিত্যক্ত হওয়ায় তাহাই ল কা ব হইয়াছে। আমাব তো ইহাই মনে হইতেছে, পাঠকগণের গত জানিতে পারিলে আনন্দিত হইব।

প ট (< পত্র) হইতে পা ট, এবং তাহা হইতে ক্রমে (পা ড > পা ল >) পা ল। কিন্তু ইহার পূর্বে সংস্কৃত সাহিত্যে ‘পা ল’ অর্থে কোন শব্দ প্রযুক্ত হইত কোনো পাঠক জানাইলে অমুগ্ধ হইত হইব। বা ত প ট, বা ত প ট থুব প্রাচীন নহে, স্পষ্টই দেখা যায়। বা ত প ট কথাসংস্কৃতগবে আছে (M. M. Williams)।

মী লানি সং স শব্দের শেষ পদের সংস্কৃত আ নি শং স, ছাপিতে ভুল হওয়ায়, অ নি শং স হইয়া গিয়াছে (পৃ, ৭০, টীকা)।

চুল্লপহুম-জাতকে আছে (পৃ, ১১৭)—“উ প রি গঙ্গা য চোবং... হলপাদে... ছিম্বা...।” এখানে উ প বি গঙ্গা শব্দের অমুবাদ “উপবি গঙ্গাতটে” কবায় (পৃ, ৭৪) অর্ধটা পবিষ্কার হয় নাই। উহাব অর্ধ হইতেছে গঙ্গার উজানব দিকে। ইংবেজী অমুবাদ বেশ পবিষ্কার = “Upper Ganges” এইকপ গঙ্গা নি ব র্ত্ত ন (পৃ, ১১৭) শব্দের অর্ধও পবিষ্কার হয় নাই, ন দী - নি ব র্ত্ত ন (পৃ, ৭৪) বলিলে কিছু বুঝা যায় না। এম্মলেও ইংবেজী অমুবাদটা ভাল (“a bend of the river”)।

“চারিটা বৃহৎ পাত্রে স্থাপন পূর্বক” (পৃ, ৭৫),—এখানে মূলে পাত্রেব (‘ভাজন’) কথা থাকিলেও “চারি টা বৃহৎ পাত্রেব” কথা মূলে নাই।

পালিতে লিখিত নাম, বা ব্যক্তিবাচক শব্দগুলি বাঙলায় লিখিতে হইলে একটা কোনো প্রণালী অবলম্বন করা উচিত। ঐ-সকল শব্দকে সংস্কৃত পবিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে, না পালিতে যেমন

আছে তেমনি বাধিতে হইবে। সংস্কৃত কবিলে মন্দ হয় না, কিন্তু সর্ক্রে তাহা স্বকব নহে। বোধ হয় এইজন্যই ঈশান বাবু কতক সংস্কৃত কবিতা লিখিয়াছেন, কতকেব বা অর্ধ অংশ সংস্কৃত করিয়াছেন, আবাব কতকে ঠিক পালিতেই রাখিয়াছেন। প কা তু প থ ব জাতক (১২৫), ইহা পালিতেই রাখিয়াছে (পর্বত + উপস্থব) ; চু ল প্র লো ভ ন জাতক (২৬৩) এখানে প্রথম অংশ (চুল) পালি বহিষ্যছে, কিন্তু দ্বিতীয় অংশ (‘প্রলোভন’) সংস্কৃত করা হইয়াছে। অন্যত্রও একপ আছে। বাঙলাব সহিত মিলাইতে হইলে সংস্কৃত করিলে ভাল হয়, কিন্তু যতদূর সম্ভব সর্ক্রেই তাহা করা উচিত। চুল শব্দকে অনাধাসেই সংস্কৃত কবিতা ক্ষুদ্র লেখা যাইত। আব যদি ইহা ভাল না হয়, তবে সর্ক্রে মূল পালিটাই লিখিয়া লওয়া ভাল, সংস্কৃত শব্দটা বুঝাইবাব জন্য বঙ্গনীর মধ্যে একবার তাহা দেওয়া যাইতে পারে।

জাতকেব আলোচ্য খণ্ডেব প্রধান বিশেষত্ব ইহাব জা ত কে পু বা ত স্ব -নামক অংশ। জাতকসমূহে যে-সমস্ত সামাজিক, বা রাজনীতিক প্রভৃতি প্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায়, ইহাতে তৎসমুদয় সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। ইহা পড়িলে সেই কালের একটা চিত্র পাওয়া যায়। ইহাতে জাতকেব বাঙলায় প্রকাশিত কেবল দুই খণ্ডেবই নহে, অবশিষ্ট খণ্ডগুলিবও বিবরণ সম্বলিত হইয়াছে। বাঙলায় একপ সম্বলন নূতন। কিং সাহেব জর্জান ভাষায় Social Organisation in North-East India in Buddha's Time * পুস্তকে বিস্তৃত ভাবে এইসব আলোচনা কবিয়াছেন, কিন্তু তিনি যখন উহা রচনা কবেন তখন জাতকেব শেষ খণ্ড (৬ষ্ঠ) প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া তাহা ব্যবহাব কবিতো পাবেন নাই। ঈশান বাবু তাহাও কবিয়াছেন। এই-সমস্ত বিবরণকে বুঝেব সময়ের বলা ঠিক নহে, কারণ জাতকসমূহ তাহাব পবিনির্বাণেব অনেক পবে রচিত ; তবে ইহাতে পাবে কোনো-কোনো গল্প বা তাহাব অংশ-বিশেষ পূর্বে হইতে ‘চলিয়া আসিয়া থাকিবে, কিন্তু তাহাব কোনো বিশেষ প্রমাণ নাই।

পূর্বে আমাবা কয়েকটি ক্রটিব উল্লেখ কবিয়াছি। কিন্তু কেবল তাহাই দেখিয়া আলোচ্য পুস্তকখানির গুণসমূহ অস্বীকার কবিলে তাহা নিতান্ত অন্যায় হইবে। উহাব গুণ ও দোষ উভয়কেই সমুখে রাখিয়া অসঙ্কোচে বলিতে পাবি বঙ্গের পাঠকগণ, সাধাবণই হউন আব বিশেষজ্ঞই হউন, ইহাব দ্বাবা প্রভূত উপকাব প্রাপ্ত হইবেন। তাই ইহাব বহুল প্রচাব হইতে দেখিলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইব।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

* পাঠকেবা জানিয়া আনন্দিত হইবেন, ডাক্তাব শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্রে মহাশয় ইহা ইংবেজীতে অমুবাদ কবিয়াছেন, এবং কলিকাতা-বিষবিদ্যালয় হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

বুদ্ধের ছইখানি হস্তের অধিক কখনো দেখা যায় না।
‘ধর্ম’ মহাধানে সর্বদাই নারী-রূপে অঙ্কিত; তাঁহার
ছইখানি হাত বুদ্ধের কাছে ধর্মচক্র-মুদ্রা আকারে নিবদ্ধ।

তৃতীয় হস্তে পদ্ম অথবা পুঁথি। চতুর্থ হস্তে মালা।*
নেপালে ধর্মের যে মূর্তি পাওয়া যায় তাহা নারী-মূর্তি।
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার Archaeological Survey of Mayurbhanja গ্রন্থেব ভূমিকায়
লিখেছেন—

“In the fifth century of the Christian era, Dharma, one of the Buddhist trinity, came to be represented in the form of a goddess. A female form of Dharma similar to the above, has been discovered near the Mahabodhi. Such forms are also found in all Buddhist Chaityas in Nepal. An image of Dharma has also been found at Badasai (Mayurbhanj). The Buddhist Newars worship Dharma as a goddess, under the names of Adi Dharma, Prajnaparamita, Dharma Debi, Arya Tara and Gayeswari.” (P. XCVI.)

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্যতম ধর্মের মূর্তি ময়ূরভঞ্জের স্থানে স্থানে পাওয়া গেছে। সেই-সব মূর্তি ও নেপালের চৈত্যগুলিতে উৎকীর্ণ ধর্ম দেবী-মূর্তিতেই পরিকল্পিত। বৌদ্ধ নেওয়ার জাতি ধর্মকে দেবীরূপে, ও আদিধর্ম প্রজ্ঞাপারমিতা ধর্মদেবী জগদ্বারা ও গয়েস্বরী নামে পূজা করিয়া থাকে।

বাংলাদেশের ধর্মঠাকুর এই ধর্ম নন। তিনি কোথায়ও নারীরূপে পরিকল্পিত হন নি। তা ছাড়া তাঁর নাম ‘ধর্মরাজ’। বীরভূম প্রভৃতি জেলায় ধর্মরাজের পূজা বলেই লোকে জানে। এই ধর্মরাজ হচ্ছেন স্বয়ং বুদ্ধ, কারণ বৌদ্ধ আভিধানিক অমরসিংহ লিখেছেন—“সর্বজ্ঞঃ স্নগতো বুদ্ধ ধর্মরাজস্তু তথাগতঃ”। এই ধর্মরাজের পূজাই হচ্ছে শূন্যপুরাণ ও ধর্মমঞ্জল সাহিত্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। বুদ্ধের ধর্ম বৌদ্ধদেব নিকট কখনো ‘বৌদ্ধধর্ম’ বলে অভিহিত হতো না; তারা বলতো সদ্ধর্ম। পালি সাহিত্যে এই শব্দের দ্বারা বৌদ্ধধর্মকে বুঝানো হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে তিব্বতীলামা তারানাথ বৌদ্ধধর্মের যে ইতিহাস লিখেছিলেন তাতে তিনি বাংলার তান্ত্রিক বৌদ্ধ-মতকে কেবলমাত্র ‘ধর্ম’ নামে আখ্যাত করে’ গেছেন।†

তিব্বতী ভাষায় ‘ছো(ম)’ বলতে বৌদ্ধধর্মই বেশী করে’ বুঝায়। সুতরাং ধর্ম বলতে যে বৌদ্ধধর্ম ও ধর্মরাজ বলতে যে বুদ্ধদেব বুঝায় এ কথা আর বেশী করে’ প্রমাণ করিতে হবে না। আমরা ধর্মসাহিত্য থেকে ধর্মপূজকদের ধর্মমত যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করবো এবং মহাধান বৌদ্ধধর্মের সহিত তাদের মিল ও গরমিল দেখাবার ক্রটি করবো না।

আমরা ধর্মপূজকদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সর্বপ্রথম আলোচনা করবো।

শূন্যপুরাণ তার নাম সার্থক কবে প্রথমেই শূন্যতার যে বর্ণনা দিয়েছে তা এত স্পন্দর যে তার খানিকটা নিয়ে উদ্ধৃত কবে’ দেবার লোভ সম্বরণ করিতে পারলাম না।

নহি বেক নহি রূপ নহি ছিল বস্তু চিন।
বসি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন ॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ।
সেঙ্গ মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস ॥
নহি ছিল ছিটি আব ন ছিল চলাচল।
দেহাবা দেউল নহি পরবত সকল ॥
দেবতা দেহাবা ন ছিল পুঞ্জিবাক দেহ।
মহাহস্ত মধ্যে পবভূব আব আছে কেহ ॥
বিসি জে তপসী নহি নহিক বাস্তব।
পাহাড় পর্বত নহি নহিক ধার জঙ্গম ॥
পুণ্য থল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল।
নাগর সঙ্গম নহি দেবতা সকল ॥
নহি ছিটি ছিল আব নহি হুব নব।
বস্ত্র বিষ্ট ন ছিল ন ছিল আবর ॥
বাব বরত নহি ছিল বিসি জে তপসী।
তীর্থ থল নহি ছিল গঙ্গা ববানসী ॥
পৈবাগ মাধব নহি কি কবিবু বিচাব।
সবপ সবত নহি ছিল সন্নি বুদ্ধকাব ॥
দস দিকপাল নহি মেঘ তাবাপন।
আউ মিত্র নহি ছিল জমেব তাদন।
চাবি বেদ নহি ছিল সাম্বব বিচাব।
স্তপত বেদ কবিসেস্ত পবভু কবতাব ॥
জীব জন্ত নহি ছিল ন ছিল বিধুপাত।
দেব থল নহি ছিল ন ছিল জগদ্রাথ ॥
হুহুত সুরমন পরভূর হন্যে করি ভব।
কাহাবে জন্মাব পবভু ভাবে মাধাব ॥

শূন্যপুরাণ-কার পূর্বব কোনো সৃষ্টি স্বীকার করেন নি। প্রলয়েব কোনো কথা উপর্যুক্ত পংক্তিগুলির ভিতর থেকে পাওয়া যায় না। কিন্তু ধর্মপূজাবিধানে সৃষ্টি-লয়ের কথা পাই—

* Oldfield—Sketches of Nepal, Vol. II, p. 159.

† Journal A S B. 1891

সাইবেরিয়ার বুরীজাতি

সাইবেরিয়ায় বুরীজাতি নামে এক জাতি আছে। বৈকাল হ্রদের পূর্বদিকে বৈকাল প্রদেশে এদের বাস। ইহারা যাযাবর প্রকৃতির লোক। এই জাতির লোকদের ঘোড়া দৌড়ানর সখ খুব বেশী। পার্শ্বত্যা দেশেও ইহারা ঘোড়ায় চড়িয়া দেশের এক দিক হইতে আরেক দিকে খুব দ্রুতবেগে যাইয়া থাকে। এই দেশ শীতপ্রধান আর জমি উর্বরা নয় বলিয়া এরা পশু পালন করে এবং দেশের যেখানে পশুপালনের সুবিধা আছে সেইখানে যাইয়া কিছুদিনের জন্ত আড্ডা করে, আবার আরেক জায়গায় চলিয়া যায়।

এদের খাণ্ড বাজরা আর ভেড়ার চৰ্কি। মাখন আর ছুধ দিয়া এরা চা খায়। মাঞ্চুদের মত এরা পোষাক পরে আর টুপী মাথায় দেয়। এদের খাওয়া পরা বেশ সাদাসিধে।

এরা সাধারণতঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তবে কেউ কেউ অনেক পশু পালন করে, আর এক জায়গাতেই বসবাস করে। এদের নাম 'রৈস'।

১৮শ শতাব্দীর আগে এরা যাহুমন্ত্র ও ভূতসিদ্ধিতে খুব বিশ্বাস করিত। তার পর হইতে এরা বৌদ্ধ হইয়াছে এবং লামাদের ধর্ম মানিয়া চলে। বৈকাল হ্রদের নিকটে ডটসন নামক স্থানে এদের ধর্ম-পীঠ আছে। তাহার নাম 'জিল্গ-নার' বা মহাস্তদের হ্রদ। এখানে প্রায় ১০০১৫০ লামা-সাধু বাস করেন।

লামা-পদ পাওয়া ধনী বুরীদের জীবনের এক শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। এইজন্ত ছোট-বেলা হইতেই ছেলেদের লামার



সাইবেরিয়ার স্তম্ভ লামা



জীবন্ত-দেবতা তারানাং

ধর্ম-পূজা

(ভূমিকা)

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে (৪০৫—৪১১) চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান ভারতবর্ষে আসেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে ভারতের পূর্বাঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা পশ্চিমদিকের চেয়ে অনেক ভাল ছিল। সে যুগে তাম্রলিপ্তি বাংলাদেশের একটা মন্ত বন্দর বলে সুপরিচিত ছিল। সেখানে তখন বাইশটা বৌদ্ধ মঠ ছিল। ফাহিয়ানের কিছুদিনের ভ্রমণের পরে আসেন হুয়েন সাং। তিনি বৌদ্ধধর্মকে সর্বত্রই নিপুণ দেখে যান; তাম্রলিপ্তিতে দশ-বারটার বেশী মঠ তিনি দেখেন নি; ভিক্ষুর সংখ্যা সেখানে হাজারের বেশী ছিল না। প্রায় ৫০টা দেবমন্দির দুই শ বৎসরের মধ্যে গড়া হয়েছিল, আর ঐ নগরে বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ একত্র বাস করত।। সোটেব উপর সমস্ত বাংলা দেশে খুব কম করে দশহাজার সজ্জারাম ছিল ও প্রায় এক লক্ষ ভিক্ষু সেইসব আরামে বাস করতেন। এই দুই চৈনিক পরিব্রাজকের বর্ণনা পাঠ করলে জানা যায় যে ৭ম শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অধোগতি শুরু হয়েছে। কিন্তু অধোগতি শুরু হলেও লোপ পাবার পূর্ব পর্যন্ত এই বাংলাদেশেই বৌদ্ধধর্ম টিকে ছিল। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর "Modern Buddhism" গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন যে বাংলাদেশের এই এক লক্ষ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভরণ-পোষণের জন্য খুব কম করে এক কোটি পরিবারের প্রয়োজন। তাঁর মত সত্য বলে মানতে হলে বাংলাদেশে দেড় হাজার বছর আগে চার কোটি বৌদ্ধ বাস করত। এবং আর দুই কোটি হিন্দুও ছিল। সুতরাং ৭ম শতাব্দীতেই ৬ কোটি লোক বাংলা দেশে ছিল একরূপ অসংখ্য করে। কিন্তু সংখ্যানির্ণায়ক রীতি (Statistical method) অনুসরণ করে আমরা এ অসংখ্য অঙ্কে বল মানতে পারি না। আমরা জানি যে ভারতের সর্বত্র ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দী থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুদয় শুরু হয়। বাংলাদেশেও সেই প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল। আদিশিবের ঐতিহাসিক সত্য কি না

জানি না; তবে আদিশিবের পঞ্চব্রাহ্মণ আমদানী করার প্রবাদের মধ্যে বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্যের সূত্রপাত হয়েছিল সেটা নিশ্চিত কথা।

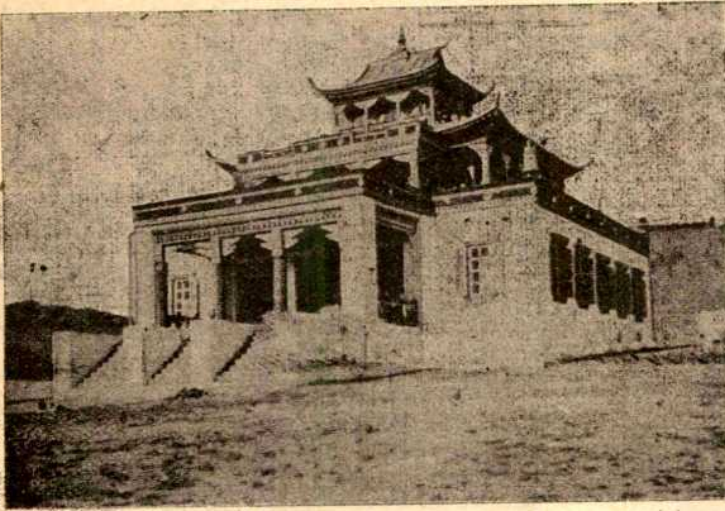
কিন্তু বৌদ্ধধর্ম মরে নি। সে নানা আকারে দেশের নানা জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল। মাঝখানে পাল-রাজাদের আমলে বৌদ্ধধর্ম বেশ জেগে উঠেছিল। সে কথা আমরা যথাস্থানে আনবো। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যে শাখাকে আমরা মহাযান আখ্যা দিয়ে থাকি তার সম্বন্ধে লোকের একটা গোড়ার ভুল আছে। মহাযান বলতে কোনো ধর্ম-মত বুঝায় না, বুঝায় কতকগুলি শাখার দর্শনশাস্ত্র। সেই মহাযান নানা বিকৃত আকার ধারণ করে চীন জাপান কোরিয়া তিব্বত নেপাল প্রভৃতি স্থানে যেমন বিচিত্র ধর্মমত সৃষ্টি করেছে, তেমনি ভারতের পূর্বাঞ্চলে মহাযান বৌদ্ধমত বিলুপ্ত হবার আগে অনেক-রকম ধর্ম-সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিল। সেইসব ধর্মসম্প্রদায়গুলি বর্তমানে ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত হয়ে পড়েছে। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় মধ্যযুগে তাদের পৃথক অস্তিত্ব ছিল, হিন্দুধর্মের সহিত তাদের বিরোধ ছিল, এবং সেই বিরোধ মিটিবার জন্য ধর্মমদলকারগণের চেষ্টাও ছিল। আমরা এই প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্মের একটি শাখা ধর্ম-ঠাকুরের বিষয় আলোচনা করব। নাথপন্থ ও সহজযান সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করবার আশা রাখি।

ধর্মপূজা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাংলাদেশে আলোচনা করেন। তবে তিনি এ বিষয় আলোচনা করবার পরে শৃঙ্গপুরাণ, ধর্মপূজাবিধান ও অন্যান্য গ্রন্থ আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়েছে। * এইসব গ্রন্থ এ পর্যন্ত ভাল করে আলোচিত হয় নি। 'ধর্ম-পূজা' বুঝেই পূজা। কেহ কেহ বলেন—এই ধর্ম বৌদ্ধ-ত্রি-রত্নের দ্বিতীয়-রত্ন। কিন্তু সে ধর্ম নারীমূর্তিতে পরিকল্পিত। ধর্ম ও সত্য উভয়ের চারি চারি হস্ত, কিন্তু

* সম্প্রতি শাস্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখেছেন—Buddhism in Bengal, Dacca Review for October, 1921.



বুরীদের নাচঘর



বুরী লামা সাধুর মন্দির

জিস্মা করিয়া দেওয়া হয়। লামারা এদের ক্রিয়াকাণ্ড, তিব্বতীয় ব্রহ্মবিদ্যা, সাহিত্য, আয়ুর্বেদ, বৌদ্ধ দর্শন, গণিত, ফলিত জ্যোতিষ ইত্যাদি শিক্ষা দেন। অনেকেই আসলে কিছু শেখে না, কেবল লিখিতে পড়িতে জানে

পালন করেন। তিব্বতের দালাই লামার মত এই দেবতাদেরও অবতার হয়। বুরীদের বিশ্বাস যে দেবতাদের দেহরক্ষার পরে এঁদের আত্মা নবজাত শিশুর মধ্যে প্রবেশ করে। এই দেবতারার কোন মঠে পদার্পণ

মাত্র, আর শাস্ত্রের অর্থ বুঝিতে চেষ্টাও করে না। তবে অনেকে আবার খুব বিদ্বান হয়। এইরূপ একজন লামার নাম স্তম্ভ লামা। ইনি সাইবেরিয়ার লামাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিলেন। এক সময় ইনি সিংহলে গিয়াছিলেন।

এদের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রথা আছে। এরা জীবিত মানুষকে দেবতা মনে করিয়া পূজা করে। এই দেবতাদের সংখ্যা এখন একশ'র উপরে হইবে। এঁরা তিব্বত, চীন ও মঙ্গোলিয়ায় যাওয়া-আসা করেন। লামাদের মত এঁরা অখণ্ড ব্রহ্মচর্য

ক্রোধে অধ্যাপকের বাকরোধ হল, আব রুচির চোখ দিয়ে ধারা বেয়ে জল পড়তে লাগল।

রাজা মন্ত্রীকে বললেন, “এখন বিবাহের দিন স্থির কর।”

কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে জোড় হাতে রাজাকে বললে, “ক্ষমা করবেন, এ বিবাহ আগি করব না।”

রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন, “জয়লক্ষ পুরস্কার গ্রহণ করবে না?”

কৌশিক বললে, “জয় আমারই থাক, পুরস্কার অগ্রাহ্য হোক।”

অধ্যাপক বললেন, “মহারাজ, আব এক বছর সময় দিন, তার পরে শেষ পরীক্ষা।”

সেই কথাই স্থির হল।

৫

কৌশিক পাঠশালা ত্যাগ কবে’ গেল। কোনোদিন সকালে তাকে বনের ছায়ায়, কোনোদিন সন্ধ্যায় তাকে পাহাড়ের চূড়ার উপর দেখা যায়।

এ দিকে রুচির শিক্ষায় অধ্যাপক সমস্ত মন দিলেন। কিন্তু রুচির সমস্ত মন কোথায়?

অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বললেন, “এখনো যদি সতর্ক না হও, তবে দ্বিতীয়বার তোমাকে লক্ষ্য পেতে হবে।”

দ্বিতীয়বার লক্ষ্য পাবার জন্তেই ঘেন সে তপস্যা করতে লাগল। অপর্ণার তপস্যা ঘেমন অনশনের, রুচির তপস্যা তেমনি অনধ্যাঘের। যড়দর্শনের পুঁথি তার বন্ধই রইল, এমন কি, কাব্যের পুঁথিও দৈবাৎ খোলা হয়।

অধ্যাপক রাগ করে’ বললেন, “কপিল-কণাদের নামে শপথ করে’ বল্টি আর কখনো জীলোক ছাত্র নেব না। বেদবেদান্তের পার পেয়েছি, জীজাতিব মন বুঝতে পার্লেম না।”

একদা মন্ত্রী এসে রাজাকে বললে, “ভবদত্তর বাড়ি থেকে কন্টার সম্বন্ধ এসেচে। কুলে শীলে ধনে মানে তারা অদ্বিতীয়। মহারাজের সম্মতি চাই।”

বাজা জিজ্ঞাসা করলেন, “কন্টা কি বলে?”

মন্ত্রী বললে, “মোয়েদের মনের ইচ্ছা কি মুখের কথায় বোঝা যায়?”

বাজা জিজ্ঞাসা করলেন, “তার চোখের জল আজ কি বকম সাক্ষ্য দিচ্ছে?”

মন্ত্রী চুপ্ কবে’ রইল।

৬

রাজা তাঁর বাগানে এসে বসলেন। মন্ত্রীকে বললেন, “তোমার মেয়েকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।”

রুচিরা এসে বাজাকে প্রণাম করে’ দাঁড়াল।

রাজা বললেন, “বৎসে, সেই রামের বনবাসের খেলা মনে আছে?”

রুচিরা স্নিতমুখে মাথা নীচু করে’ দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা বললেন, “আজ সেই বাগের বনবাস খেলা আব-একবার দেখতে আমার বড় সাধ।”

রুচিরা মুখের একপাশে জাঁচল টেনে চুপ করে’ রইল।

রাজা বললেন, “বনও আছে, রামও আছে, কিন্তু গুন্টি বৎসে, এবাব সীতার অভাব ঘটেচে। তুমি মনে করলেই সে অভাব পূরণ হয়।”

রুচিরা কোনো কথা না বলে’ রাজাব পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করলে।

রাজা বললেন, “কিন্তু বৎসে, এবাব আমি রাক্ষস সাজতে পারব না।”

রুচিরা স্নিত চক্ষে রাজার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বাজা বললেন, “এবার রাক্ষস সাজবে তোমাদের অধ্যাপক।”

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

করিলে লোকেরা এঁদের পূজা করে, স্তুতি করে, আশীর্বাদ লয়, আর নিজের নিজের ভবিষ্যতের কথা জিজ্ঞাসা করে। এঁদের আসন দালাই লামার নীচে।

বুরী-লামারা কোন বিশেষ পর্ব উপলক্ষে এক-প্রকার আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা করেন। ইহার নাম ‘টজম্’ বা নাচ। নাচের সময় বড় বড় ঢোল, তুরী, নাকড়া, শঙ্খ বাজান হয়, আর বিচিত্র-বেশী মূর্তিগুলি নানা রঙ্গে নানা ঢঙে নাচিতে থাকে। কেউ মৃত্যু-দেবতা, কেউ দৈত্য ইত্যাদি সাজে। সোনালি জরির কাপড় ও মণিময় অলঙ্কার পরিয়া এই ভয়ঙ্কর মূর্তিগুলি স্বদেশীদের আনন্দ ও বিদেশীদের ভ্রাস উৎপাদন করে। লামারা নিজেদের ধর্মের মধ্যে স্থানিক দেবতা আর ভূতের পূজা সামিল করিয়া লইয়াছেন, আর এই উৎসবের আয়োজন করিয়া বুরীদের মধ্যে লামা-ধর্মের প্রচারের পথ করিয়া লইয়াছেন।

এই জাতির ডাক্তারদের রোগীর অবস্থা ও চালচলন বুঝিয়া চলিতে হয়। বুরীরা ত আর এক জায়গায় স্থির

থাকে না, আজ যে রোগী এখানে, কাল হয় ত সে চল্লিশ মাইল দূরে পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছে। তাই ডাক্তার বেচারাকে আপনার ঔষধের পোটলাপুটলি উট বা টাটুর উপর চাপাইয়া দিয়া সারা দেশ ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। এদের চিকিৎসা একরকম যাতুগিরি। হয়ত কারু বাতের ব্যারাম;—তাহাকে ধরিয়া লাঠি দিয়া কয়েক ঘা দিয়া, কোন গাছের রস খাওয়াইয়া, হয়ত কোন পশুর কোন অবয়ব, এমন কি, লোমশ পশুর চামড়া পর্যন্তও ঔষধের অনুপান ধার্য্য করিয়া চিকিৎসা চলিতে থাকে।

এই জাতি মানবের আদিপিতা আদমের সময়কার শাস্তি উপভোগ করিতেছে বলা যাইতে পারে; তবে এখনকার সভ্যতার কিরণ এই গভীর অন্ধকারের মধ্যেও ছুটিয়া আসিতেছে।*

শ্রীরমেশ বসু [এম-এ]

* (“সরস্বতী”,—জানুয়ারী. ১৯২১।)

বাউল

গাও

গাও গো বাউল তোমার তরল একতারাতে তান তুলে
নাম-ভোলা ঐ নীল আকাশের বুকের মাঝে ঢেউ আনি’;
দখিন হাওয়া থম্কে দাঁড়াক্, চম্কে শুঙ্ক কান খুলে

স্বপ্নপুরের সেই বাগী।

মউল কেন ধরুল আজি পউষ-রাতের আম-বনে ?
কোন ফাগুনের স্বপ্ন দেখে জাগুল কোকিল চোখ চেয়ে ?
শীতের সাঁঝে শিরিষ শাখে কি যে বাজায় আনন্দের
সেই বারতা যাও গেয়ে।

শিশির-শ্রামল মাঠের পথে চলব তোমার গান শুনে,
রাতের ছোয়া লুগ্বে আমার কঠিন পায়ের চার-পাশে,
বনের ছায়া কাপ্বে তোমার একতারাটির তান শুনে,
চলব আমি তার আশে।

বনের ঘন স্বপ্নখানি বাজ্বে না কি সেই স্থরে—

হাওয়ায় যে গান ঘুমিয়ে আছে প্রাণের মুহূ আহ্বানে ?
বল্বে কি সে, ‘এই যে আমি তোমার কাছে, নেই দূরে,—
ডাকো আমায় কোনখানে ?’

শোনাও আমায় দূর আকাশের ভাষা-বিহীন গান আনি’
মানস-সরের কলধ্বনি একতারাতে তান তুলে ;
চোখ-চলে-না এমন দেশের ছায়ার মতন রূপখানি
দেখব আমি সব ভুলে।

গাও

গাও গো বাউল তোমার অবুঝ একতারাতে তান দিয়ে
ব্যথার বনে শনশনিয়ে লাগুক কাঁপন মন-হরা।
গাঁয়ের পথে চল্বে তুমি—সাথে আমার প্রাণ নিয়ে,
হব তোমার পথ-ধরা।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

রাজা বল্লেন, “যখন সময় হবে, এই ছেলেটির সঙ্গে ঐ মেয়ের বিবাহ হয় এই আমার ইচ্ছা।”

শুনে মন্ত্রী উত্তর দিতে সাহস করলে না, মাথা হেঁট করে’ রইল।

২

দেশে সব-চেয়ে বিনি বড় পণ্ডিত রাজা তাঁর কাছে কৌশিককে পড়তে পাঠালেন। যত উচ্চ বংশের ছাত্র তাঁর কাছে পড়ে। আর পড়ে রুচিরা।

কৌশিক যেদিন তাঁর পাঠশালায় এল সেদিন অধ্যাপকের মন প্রসন্ন হল না। অল্প সকলেও লজ্জা পেলে। কিন্তু রাজার ইচ্ছা। সকলের চেয়ে সঙ্কট রুচিবার। কেন না, ছেলেরা কানাকানি করে। লজ্জায় তাঁর মুখ লাল হয়, রাগে তার চোখ দিয়ে জল পড়ে।

কৌশিক যদি কখনো তাকে পুঁথি এগিয়ে দেয়, সে পুঁথি ঠেলে ফেলে। যদি তাকে পাঠের কথা বলে, সে উত্তর করে না।

রুচির প্রতি অধ্যাপকের স্নেহের সীমা ছিল না। কৌশিককে সকল বিষয়ে সে এগিয়ে যাবে এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা, রুচিরও সেই ছিল পণ।

মনে হল সেটা খুব সহজেই ঘটবে, কারণ, কৌশিক পড়ে বটে কিন্তু একমনে নয়। তার সাঁতার কাটতে মন, তার বনে বেড়াতে মন, সে গান করে, সে যন্ত্র বাজায়।

অধ্যাপক তাকে ভৎসনা করে’ বলেন, “বিদ্যায় তোমার অহুরাগ নেই কেন?”

সে বলে, “আমার অহুরাগ শুধু বিদ্যায় নয়, আরও নানা জিনিসে।”

অধ্যাপক বলেন, “সে-সব অহুরাগ ছাড়।”

সে বলে, “তাহলে বিদ্যার প্রতিও আমার অহুরাগ থাকবে না।”

৩

এমনি করে’ কিছুকাল যায়।

রাজা অধ্যাপককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার ছাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?”

অধ্যাপক বল্লেন, “রুচিবা।”

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, “আব কৌশিক?”

অধ্যাপক বল্লেন, “সে যে কিছুই শিখেচে এমন বোধ হয় না।”

রাজা বল্লেন, “আমি কৌশিকের সঙ্গে রুচির বিবাহ ইচ্ছা করি।”

অধ্যাপক একটু হাসলেন, বল্লেন, “এ যেন গোধূলিব সঙ্গে উষার বিবাহের প্রস্তাব।”

রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বল্লেন, “তোমার কন্ডাব সঙ্গে কৌশিকের বিবাহে বিলম্ব উচিত হয় না।”

মন্ত্রী বল্লে, “মহাবান্ধ, আমাব কন্ডা এ বিবাহে অনিচ্ছুক।”

রাজা বল্লেন, “স্বীলোকের মনের ইচ্ছা কি মুখেব কথায় বোঝা যায়?”

মন্ত্রী বল্লে, “তার চোখের জলও যে সাক্ষ্য দিচ্ছে।”

রাজা বল্লেন, “সে কি মনে কবে কৌশিক তার অযোগ্য?”

মন্ত্রী বল্লে, “হাঁ, সেই কথাই বটে।”

রাজা বল্লেন, “আমার সামনে দুজনের বিদ্যার পরীক্ষা হোক। কৌশিকের জয় হলে এই বিবাহ সম্পন্ন হবে।”

পরদিন মন্ত্রী রাজাকে এসে বল্লে, “এই পণে আমাব কন্ডাব মত আছে।”

৪

বিচার-সভা প্রস্তুত। রাজা সিংহাসনে বসে, কৌশিক তাঁর সিংহাসনতলে। স্বয়ং অধ্যাপক রুচিকে সঙ্গে করে’ উপস্থিত হলেন। কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে’ তাঁকে প্রণাম ও রুচিকে নমস্কার করলে। রুচি দৃকপাতও করলে না।

কোনোদিন পাঠশালার রীতিপালনের জন্তেও কৌশিক রুচির সঙ্গে তর্ক করেনি। অল্প ছাত্রেরাও অবজ্ঞা করে’ তাকে তর্কের অবকাশ দেয়নি। তাই আজ যখন তার যুক্তির মুখে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ তীরের ফলায় আলোর মত ঝিক-মিক করে’ উঠল, তখন গুরু বিস্মিত হলেন, এবং বিরক্ত হলেন। রুচির কপালে ঘাম দেখা দিল, সে বুদ্ধি স্থির রাখতে পারলে না। কৌশিক তাকে পরাভবের শেষ কিনাবায় নিয়ে গিয়ে তবে ছেড়ে দিলে।

আমীর ফয়জল

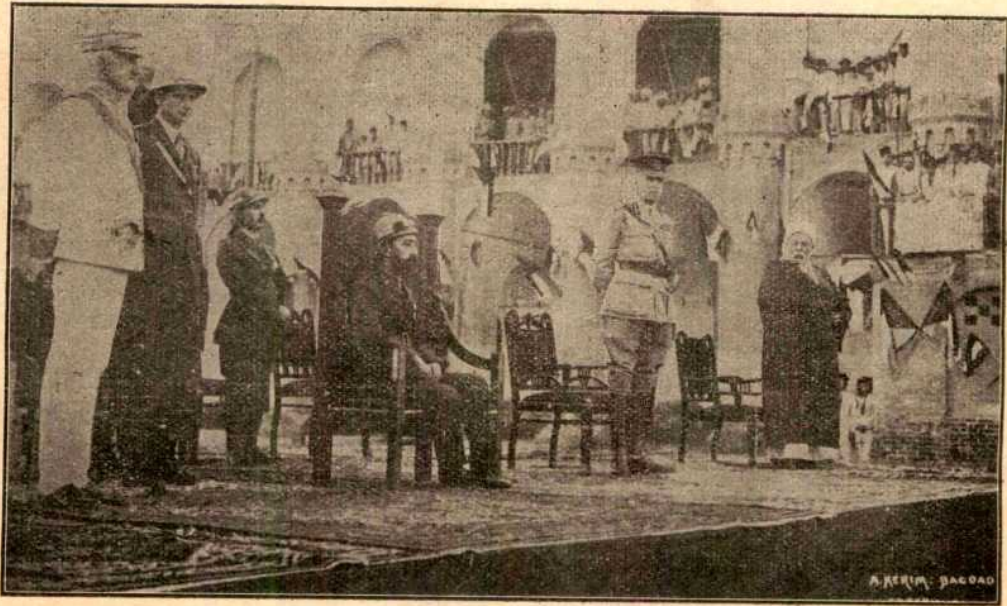
আমীর ফয়জল ইংরেজ-রক্ষিত বর্তমান মেসোপটে-মিয়ার রাজা। ইনি মক্কা শরীফের রাজপুত্র, গোড়া মুসলমান-সন্তান। ফয়জলের বয়স অল্প, ৩৩।৩৪ হইবে। ইনি শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, উদারস্বভাব এবং ধর্মভীরু। বীরোচিত গুণ ইহার চরিত্রে দৃষ্ট আছে। শুনা যায় পূর্বে ইনি ইংরেজের ভক্ত ছিলেন না। কিন্তু এখন তাঁহার মত বদলাইয়াছে। আজ তিনি ইংরেজের বন্ধু এবং তাহাদের অভিভাবকস্বত্ব সম্বন্ধে হইয়া রাজ্য চালাইতেছেন। তাঁহার বুদ্ধি ও শক্তি ইংরেজের হাতে রক্ষিত। প্রতি মাসে ইংরেজের কাছ হইতে তিনি মাসহারা পাইতেছেন তিরিশ হাজার টাকা, আর একত্রিশটি করিয়া তোপধ্বনি তাঁহার বরাদ্দ। ইহা কি কম গৌরবের কথা ?

যাহা হউক—আমীর ফয়জল নিজের শক্তিগুণে দুর্দান্ত

আরব ও বেতুইন দস্যুদের শাসন করিয়া শান্তিতে রা-করিতেছেন।

ফয়জল খুব দৃঢ়চিত্ত লোক। তাঁহার দেশে শেখ বন্দুদের মধ্যে নিয়ম আছে বড়লোক হইলে যত ই বিবাহ করা যায়। এমন দেশেও ফয়জল আজ অব-কোমার্ধ্য ব্রত অবলম্বন করিয়া আছেন। এমনও য়ায় যে ইনি নিরামিষভোজী।

রাজতক্তে বসিয়াই ফয়জল বাগ্দাদের অনেক নিয়-কাছন বদলাইয়া ফেলিয়াছেন। এ-সমস্ত পরিব-ফয়জলের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। তিনি প্রচার করিয়া বাগ্দাদ কোরান শরীফের মতে শাসিত হইবে;—কো-মসজিদের কাছে মদের দোকান থাকিতে পাইবে; থিয়েটারে নর্তকী থাকিতে পাইবে না, এবং শহরের মা-



রাজা ফয়জলের দরবার-গৃহটি ক্রুক-টাওয়ার বা সরাই বিল্ডিং বলিয়া খ্যাত। এই বাড়ীটি ইউফ্রেটিস নদীর তীরস্থ পুরাণ তুর্কী প্রাসাদের এক অংশ। সমস্ত বাড়ীতে পাঁচ ছয় হাজার লোক ধরিতে পারে। বর্তমানে ইহা “রাজপ্রাসাদ” বলিয়া খ্যাত। রাজা ফয়জল সিংহাসনে বসিয়া। রাজার বাঁ দিকে দাঁড়াইয়া (১) জেনারেল স্মার এইলুমার্স হালুডেন, (২) সৈয়দ ইমান আলি—ইনি বাগ্দাদের একজন প্রসিদ্ধ শেখ। ইহার আসন মক্কার রাজার পরেই এবং ইনি বিখ্যাত হুসনি মসজিদ আব্দুল জিলানীর কর্তা।

ইনি এখন রাজার পরামর্শদাতা রূপে কাজ করিতেছেন। রাজার ডান দিকে দাঁড়াইয়া, (১) রাজার মন্ত্রী, (২) হাই কমিশনারের প্রাইভেট সেক্রেটারী (৩) স্মার পার্সি কন্স—হাই কমিশনার



“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নামস্মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

২২শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯

২য় সংখ্যা

পুনরাবৃত্তি

১

সেদিন যুদ্ধের খবর ভালো ছিল না। রাজা বিমর্ষ হয়ে বঙ্গোনে বেড়াতে গেলেন।

দেখতে পেলেন প্রাচীরের কাছে গাছতলায় বসে পেলা করুচে একটি ছোট ছেলে, আর একটি ছোট মেয়ে।

রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা কি খেলচ?”

তারা বললে, “আমাদের আজকের পেলা রাম-সীতাব বনবাস।”

রাজা সেখানে বসে গেলেন।

ছেলেটি বললে, “এই আমাদের দণ্ডক বন, এখানে কুটীর বাঁধছি।”

সে একরাশ ভাঙা ডালপালা খড় ঘাস জুটিয়ে এনেচে, ভারি ব্যস্ত। আর মেয়েটি শাকপাতা নিয়ে খেলার ছাড়িতে বিনা আগুনে রাঁধুচে; রাম খাবেন, তারি আয়োজনে সীতার একদণ্ড সময় নেই।

রাজা বললেন, “আর ত সব দেখছি, কিন্তু রাক্ষস কোথায়?” ছেলেটিকে মানতে হল তাদের দণ্ডকবনে কিছু কিছু জেট আছে। রাজা বললেন, “আচ্ছা, আমি হব রাক্ষস।”

ছেলেটি তাঁকে ভালো করে দেখলে। তাব পবে বললে, “তোমাকে কিন্তু হেরে যেতে হবে।”

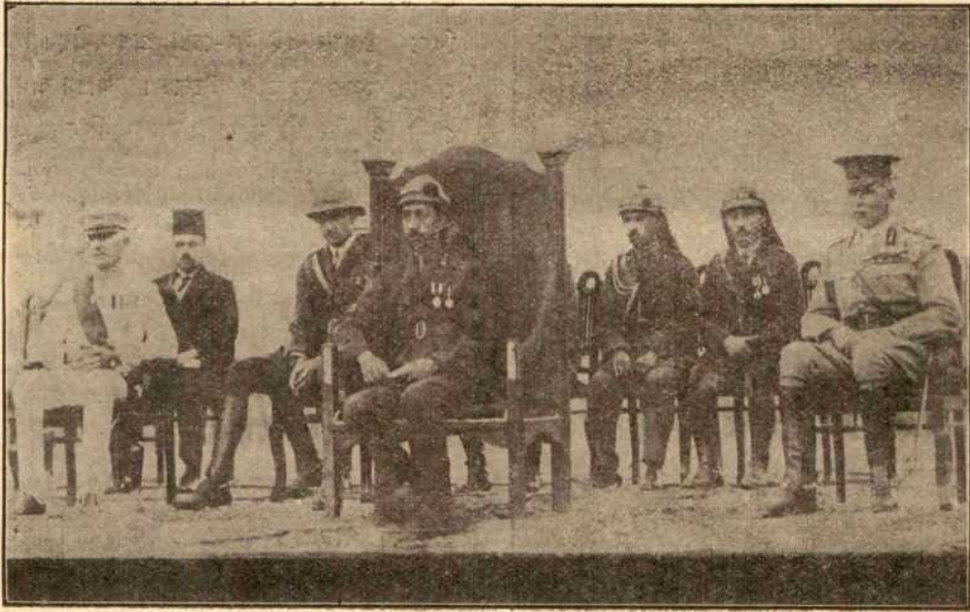
রাজা বললেন, “আমি খুব ভালো হাবুতে পারি। পবীক্ষা করে দেখ।”

সেদিন রাক্ষসবধ এতই হুচাকরুপে হতে লাগল যে, ছেলেটি কিছুতে রাজাকে ছুটি দিতে চায় না। সেদিন এক বেলাতে তাঁকে দশ-বারোটা রাক্ষসের মরণ একলা মরতে হল। মরতে মরতে তিনি হাঁপিয়ে উঠলেন।

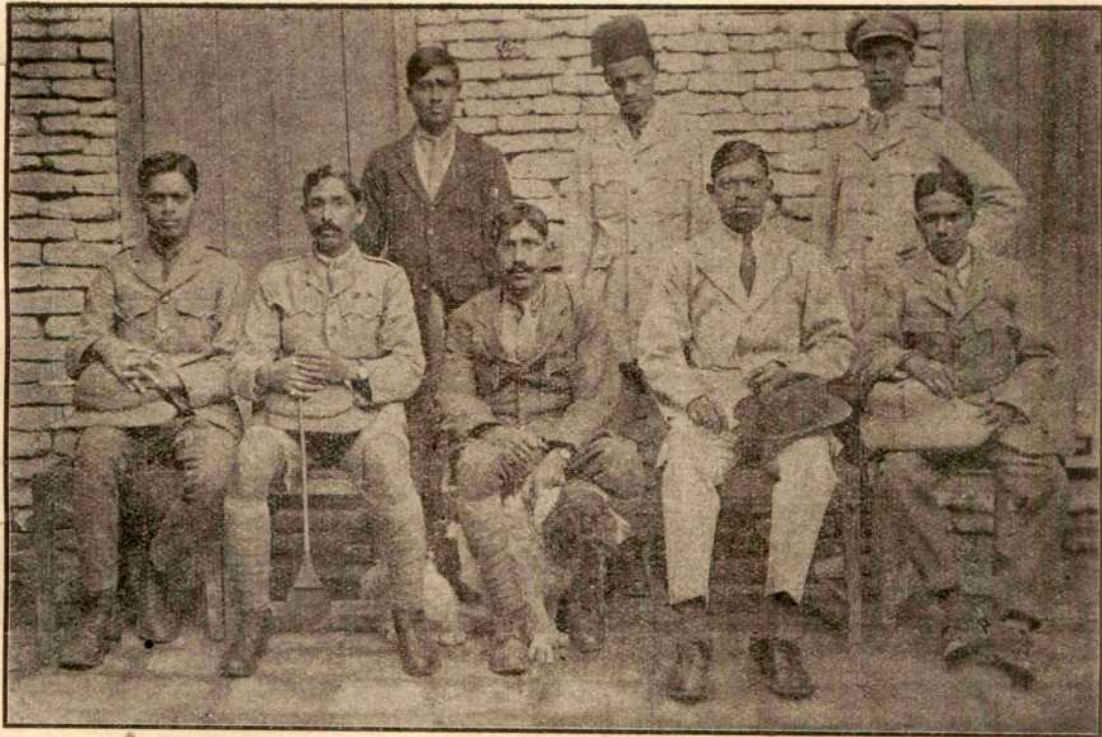
দ্বৈতা যুগে পঞ্চবটীতে যেমন পাখী ডেকেছিল সেদিন সেখানে ঠিক তেমনি করেই ডাকতে লাগল। দ্বৈতায়ুগে সবুজ পাতার পর্দাব পর্দায় প্রভাত-আলো যেমন কোমল ঠাটে আপন স্বর বেঁধে নিষেছিল আজও ঠিক সেই স্বরই বাঁধলে।

রাজার মন থেকে ভার নেমে গেল। মন্ত্রীকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “ছেলে মেয়ে ছুটি কার?”

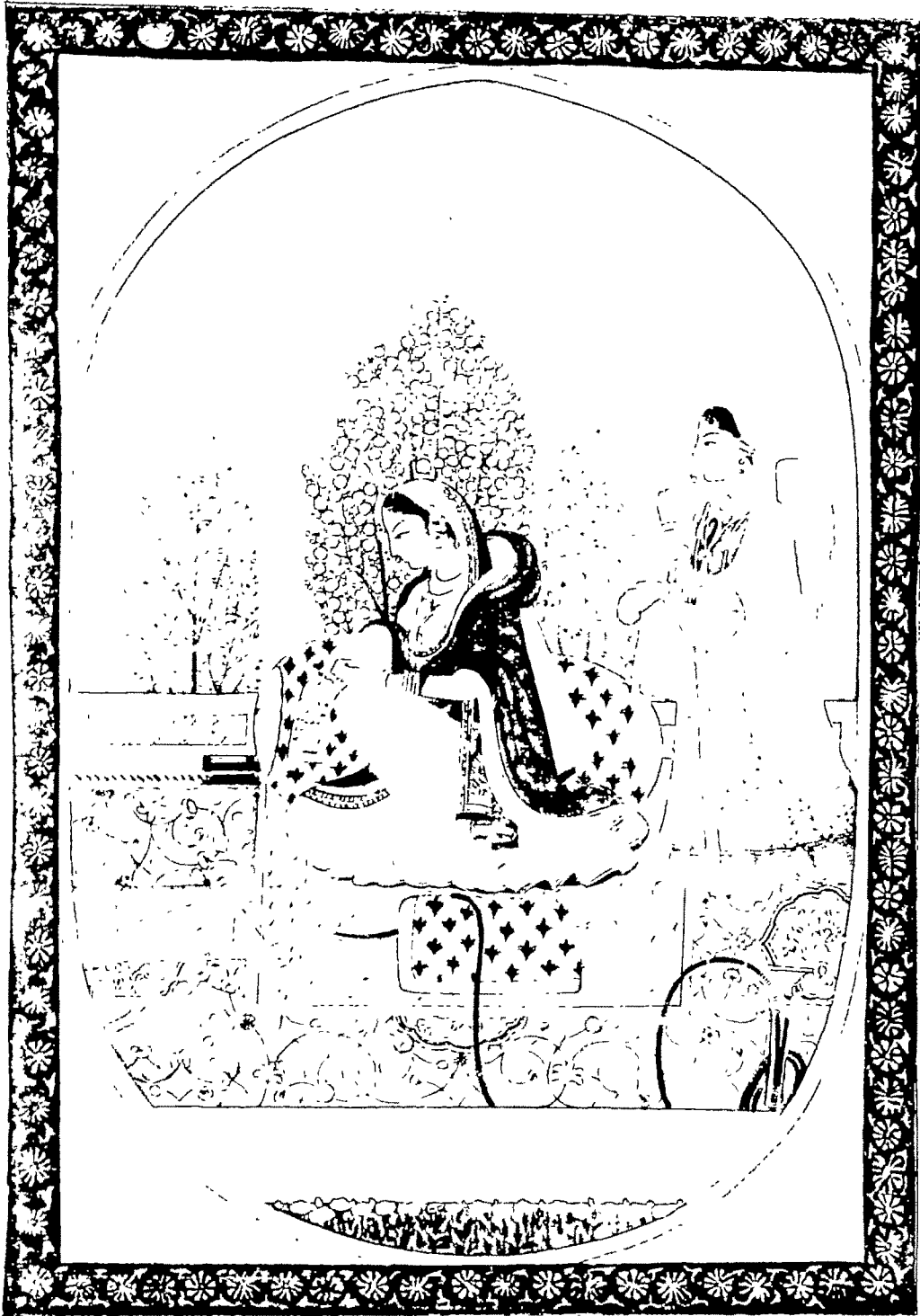
মন্ত্রী বললে, “মেয়েটি আমাবই, নাম কচিরা। ছেলেব নাম কোশিক, ওব বাপ গবীব ব্রাহ্মণ, দেবপূজা করে দিন চলে।”



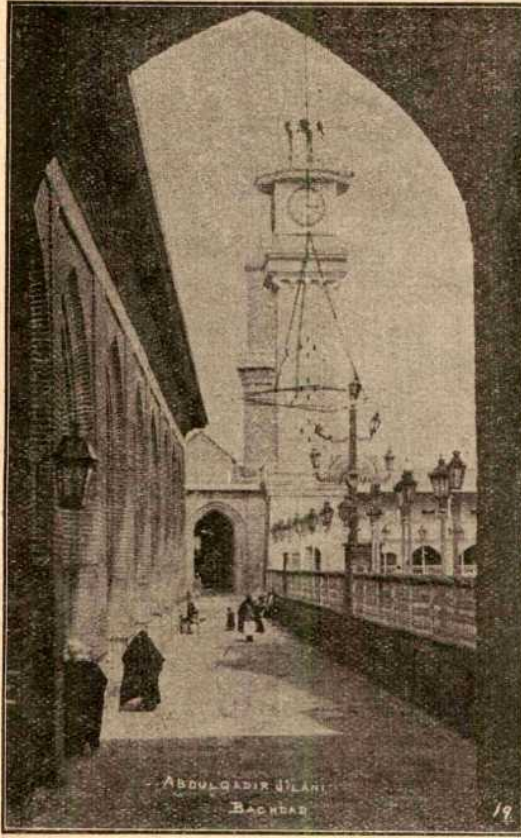
রাজা ফয়জলের খাস দরবার। ছবির বাঁ দিক হইতে—হাই কমিশনার, হামিদ পাশা, হাই কমিশনারের সেক্রেটারী, রাজা ফয়জল, রাজার দেওয়ান, ইরাক জাতীয় সৈন্যদলের সেনাপতি এবং প্রধান সেনাপতি



বাগদাদে ভারতবাসী—বাঁ দিকের দ্বিতীয় মিঃ এইচ তেওয়ারীর সৌজন্যে আমরা বাগদাদের চিত্রগুলি মুদ্রিত করিবার জন্য পাইয়াছি



প্রণয় পত্র
প্রাচীন চিত্র ইতিহাসে
চিত্রাধিকারী ঐযুক্ত বসন্ত সিংহ মহাশয়ের সৌজন্যে



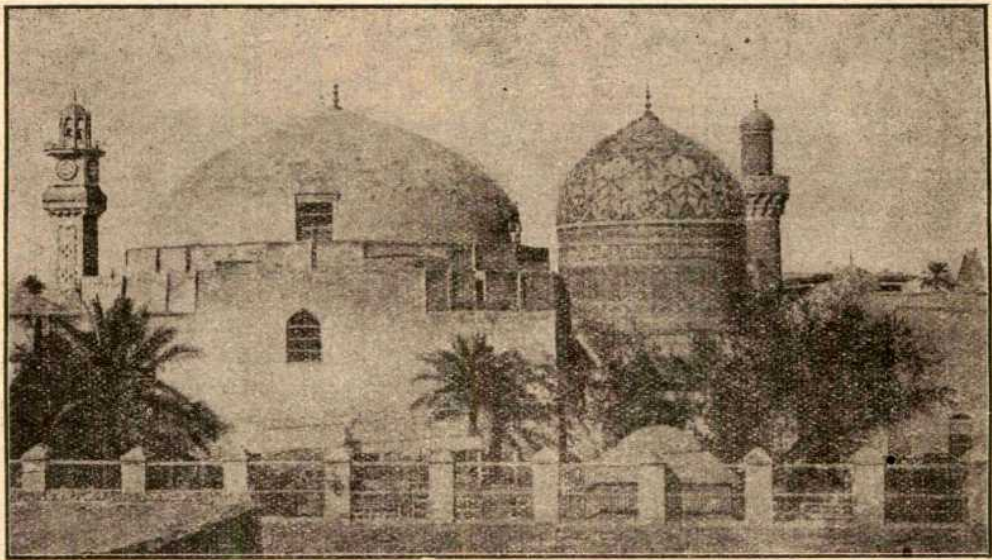
আব্‌দুল কাদির জিলানি মসজিদ—বাগদাদ

মোটাই মদের দোকান থাকিবে না। নৈতিক বিষয়ে তাঁহার এই সং-চেষ্টা প্রশংসনীয়। তাঁহার চেষ্টার ফলও খুব ভাল হইয়াছে। আগে বাগ্‌দাদে ১০ দেশী ও বিলাতী মদের দোকান ছিল; এখন তা জায়গায় ২০২১খানি মাত্র দাঁড়াইয়াছে। থিয়ে ছিল চারটা, এখন প্রায় সমস্তই বন্ধ।

এই প্রসঙ্গে বাগ্‌দাদের কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য বস্তু ও দরবারের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির কথা বোঝা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এখানকার দরবারগৃহ Clock Tower বা Serai Building নামে প্রসিদ্ধ। পূর্বে তুর্কীর রাজপ্রাসাদ ছিল। টাইগ্রীস নদীর উপরে অবস্থিত। এই প্রাসাদটি এত প্রকাণ্ড যে ইহার ভিত্তি একসঙ্গে পাঁচ ছয় হাজার লোক জমায়েত হইতে পারে। তুর্কী জাতি যে বনিয়াদী ও বিলাসী তাহা এই বস্তুর দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়।

সৈয়দ ইমানী আলি বাগ্‌দাদের একজন প্রসিদ্ধ নেতা। ইহার প্রতিপত্তি যথেষ্ট। মক্কা শরীফের রাজার ইহার আসন। ইনি আব্বাস খানদের মসজিদ আল-কাদির জিলানীর মালিক। ইনি আমীর ফয়জলের পুরোহিত।

আব্‌দুল কাদির জিলানী মসজিদটি এত বড়



আব্‌দুল কাদিরের গোর—বাগদাদ

রেশমী ও মটকা কাপড় প্রস্তুতকারক

পঞ্চানন সিন্ধু ক্যান্ট্রী

পোঃ মালদহ, বেঙ্গল।

ভিঃ পিঃতে আল পাঠাই। অপছন্দে ফেরত লই।

গরম চাদর ১০ হইতে ২০; গরম লাল ও কাল পাড়ের ধুতি ১৫ হইতে ২২; গরম লাল ও কাল পাড়ের শাড়ী ১৮ হইতে ২৫; গরম ধান ৪০ ইং X ১০ গজ ৩৫ হইতে ৪৫; গরম কমাল ১ হইতে ৩ টাকা। মটকা চাদর ১০ হইতে ১৮; মটকা ধুতি ও শাড়ী ১০ হইতে ১৫; মটকা ধান ৩৬ ইং X ১০ গজ ২৪ হইতে ৩৫ টাকা। ইহা ব্যতীত কেটে, তসর, এণ্ডি প্রভৃতি কাপড়ও পাওয়া যায়।

Rammohun Roy and Modern India

By Ramananda Chatterjee

With a portrait of Rammohun Roy in colours after the oil-painting
by Briggs in Bristol Council Chamber.

Price Eight Annas, Per V. P. P. 13 Annas.

The Evolution of Japan and Other Papers

By Lala Lajpat Rai

Price Re. 1; per V. P. P. Re. 1-6.

Second Edition. Revised and Somewhat Enlarged.

The United States of America

A Hindu's Impressions and a Study

By Lala Lajpat Rai

Cloth. Gilt-lettered. Pages 475 + XII. Price Rs. 4; Postage and Packing Extra.

The Modern Review Office, 210-3-1, Cornwallis Street, Calcutta.

এরূপ আকারের মসজিদ সচরাচর কোথাও দেখা যায় না। বাগ্দাদ রেল-স্টেশন হইতে এখানে যাইতে মাত্র সাত-আট মিনিট লাগে। যে জায়গায় মসজিদটি অবস্থিত সেখানকার নাম বাবু-এল-শেখ। মসজিদের ভিতরে হিন্দুদের যাইবার অধিকার নাই। তবে বাহির হইতে মসজিদের বাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অতি চমৎকার। ইহার উপরকার শিল্প ও কারুকার্য বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। ১৯২০ সালের অশান্তির সময় প্রায়

দশ-বারো হাজার বেতুইন একসঙ্গে গোপনে ইহার ভিতর সন্নিবিষ্ট করে, এবং তাহার পরেই লড়াই বাধে।

হামিদ পাশা বাগ্দাদের আর-একজন প্রধান লোক। ইনি রাজ্যের আভ্যন্তরিক ব্যাপারের কর্তা। ১৯২০ সালে অশান্তির সময় ইনি ইংরেজের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। লেখক ইহার বাড়ীতে অনেকদিন অতিথি ছিলেন। ইনি সচরিত্র ও খুব মিশুক।

বাগ্দাদ

শ্রীহরিপদ তেওয়ারী

এক অপরিজ্ঞাত বৈষ্ণব কবি

অনেকদিনের কথা, আগরতলা বীরচন্দ্র লাইব্রেরীর কীটদষ্ট বিস্তর গ্রন্থ ও কাগজ রক্ষার অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় জ্বালাইবার নিমিত্ত স্তুপাকারে রাখা হইয়াছিল। একদিন সেই আবর্জনা-স্তূপ উপর উপর খাটিয়া একখানা হস্তলিখিত খাতা পাইলাম; তাহাতে কতকগুলি বৈষ্ণব-পদাবলী লিখিত ছিল।

অল্পদিন হইল, আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখা গেল, তাহাতে কতিপয় অপরিজ্ঞাত পদ এবং কয়েকটি পদে অপরিচিত পদকর্তার ভণিতা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তদর্শনে কোতুহলাবিষ্ট হৃদয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া পদকল্পতরু প্রভৃতি যে-সকল মুদ্রিত পদাবলীগ্রন্থ আলোচনা করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে, তাহাতে ঐ-সকল পদ অথবা পদকর্তার নাম পাই নাই; এবং ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ গ্রন্থেও তদ্বিষয়ক কোন কথার উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। ‘বঙ্গীয় কবি’ গ্রন্থ প্রণয়ন উপলক্ষে আমরা যে-সকল বিবরণ ও কাগজপত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা আলোচনা করিয়াও কিছু পাওয়া গেল না। পরিশেষে, আগরতলা রাজগ্রন্থাগারে রক্ষিত হস্তলিখিত বহু প্রাচীন গীতকল্পতরু, গীতচন্দ্রোদয় ও পদামৃতসিন্ধু প্রভৃতি অপ্রকাশিত গ্রন্থনিচয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া পূর্বোক্ত খাতায় সন্নিবিষ্ট কোন কোন পদ ও ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। প্রাপ্ত খাতায় যে-সকল অপরিজ্ঞাত কবির নাম পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে পূর্ণানন্দ দাস

একজন। ভণিতায় উল্লিখিত নাম ব্যতীত আমরা পূর্ণানন্দের কোনরূপ পরিচয় বা বিবরণ পাই নাই। এই-সকল বিবয় জানিবার আশায় কোন কোন বৈষ্ণব-সাহিত্যানুরাগী ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারস্থ হইয়াছিলাম; তাঁহারা জানাইয়াছেন, তাঁহারা অত্যাধিক পূর্ণানন্দের অথবা তাঁহার রচিত পদাবলীর সম্বন্ধ পান নাই।

আমরা ‘পূর্ণানন্দ’ ভণিতায়ুক্ত দুইটি ও ‘পুণ্যানন্দ’ ভণিতার একটি পদ পাইয়াছি। পূর্ণানন্দ ও পুণ্যানন্দ অভিন্ন ব্যক্তি, লিপিকরপ্রমাদে নামের এবদ্বিধ পার্থক্য ঘটিয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস; কিন্তু এই বিশ্বাস অশ্রান্ত কি না, বলিবার বা বুঝিবার উপায় নাই। যে তিনটি পদ পাইয়াছি তাহা উদ্ধৃত করিয়া, পাঠক ও বিশেষজ্ঞগণের হস্তে স্থিরসিদ্ধান্তের ভার অর্পণ করা ব্যতীত গতান্তর দেখিতেছি না। পদগুলি এই :—

(১)

শুনিয়া বেণুর ধনি নটবর শ্যাম।

চিত চমকিয়ে হরে শ্রবণে বয়ান ॥

এ কি অপরূপধনি শুনিলাম শ্রবণে।

এমন বেণুর ধনি হানিল পরাণে ॥

(১) হরে শ্রবণে বয়ান—বীণীর রব শ্রবণে কর্ণ এত তন্দ্রাত হইয়াছে যে তদ্রূপ বদনের ক্রিয়া রহিত হইয়াছে, অর্থাৎ নির্বাক হইয়া বংশী-ধনি শুনিতেছে।

পুরস্কার ২৫০০০ পাঁচশ হাজার টাকা।

১৩২৯ সনের “সাহিত্য” গ্রন্থ গ্রাহকবর্গের মধ্যে বিতরিত হইবে।

১৩২৮ সালের ১ম অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০০ গ্রাহক পুরস্কার পাইয়াছেন।

১ম পুরস্কার নগদ ১০০০/-	হিসাবে	১টা,	২য় পুরস্কার নগদ ৫০০/-	হিসাবে	১টা
৩য় " " ১০০/-	"	১টা,	৪র্থ " " ২৫/-	"	৫ টা
৫ম " " ১০/-	"	৫০০ টা	৬ষ্ঠ " " ৫/-	"	৩৬৮০ টা

মোট পুরস্কার ৪.৩৩ টা।

সচিত্র।

রূহদাকার বিরাট দপ্তর

১০ খণ্ড।

সাধনা

সচিত্র।

সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দুযৌসলমানের

অপূর্ব সম্মিলন!

সম্পাদক—প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সরকার ও মৌলভি আব্দুর রশিদ সিদ্দিকী।

১৩২৯ সনের বৈশাখ হইতে ৪র্থ বর্ষে পদার্পণ করিবে, এবং দশ ভাগে অভিনব সাজে রং বেরংয়ের চিত্রকলায় সুশোভিত হইয়া প্রকাশিত হইবে।

- ১ম ভাগ এবাহিনী—সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ।
- ২য় " উপকল্প—উপন্যাস, নবন্যাস, ছোট গল্প, কথিকা, প্রভৃতি উপকথা।
- ৩য় " চন্দ্রাবতার—বঙ্গের বিখ্যাত কবিবার্গের কাব্য, কবিতা, সঙ্গীত, স্বরলিপি প্রভৃতি।
- ৪র্থ " প্রতিদ্বন্দ্বি—বাংলার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মাসিক বৈদিক প্রভৃতি কাগজ হইতে সার প্রবন্ধাদি চয়ন করা হইবে।
- ৫ম " সম্মেলন—প্রদত্ত, সম্পাদকের বৈঠক, রঙ্গ-বাস্তব, কোটুক, চুটকি প্রভৃতি আমোদজনক বিষয়ের সমাবেশ হইবে।
- ৬ষ্ঠ " আধুনিক জীবন—ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্প, কলা, কৃষি, জীবনগণ, জীবনশ্রুতি প্রণালী, স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হইবে।
- ৭ম " সংস্কার—রাজনৈতিক সমাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক আন্দোলন আলোচনা।
- ৮ম " নবীন ভাবুক—এই ভাগে নতুন লেখকদিগের প্রবন্ধাদি সংশোধিত হইয়া প্রকাশ করা হইবে।
- ৯ম " সংবাদ—পুরা এক মাসের সমস্ত পৃথিবীর আবিস্কারীয় সংবাদাদি থাকিবে।
- ১০ম " মহিলা-দর্পণ—নারীর কথা, নারীর ব্যথা, নারীর আশা, নারীর ভাবা, নারীর সেবা, প্রভৃতি বিষয়ে থাকিবে।

এই দশভাগের প্রতিভাগই অন্যান্য সাধারণ এক-একখানা মাসিক পত্রিকার সমতুল্য।

এহেন সর্ববিষয়সম্বলিত নূতন ধরণের বৃহৎ মাসিক বাহাতে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে শোভা পায়, এতদ্ভেদেই এই পুরস্কারের বিরাট আয়োজন করা হইয়াছে। বাৎসরিক মূল্য ডাকখরচসহ ৫ পাঁচ টাকা। ২০শে বৈশাখের মধ্যে যিনি বনিবন্ধীর টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হইবেন, তিনি ৫ টাকা পাইবেন। পরে ৫ টাকা কর কমে কাহাকেও গ্রাহক করা হইবে না। অতএব সকলেই তৎপর হউন।

ঠিকানা—ম্যানেজার ‘সাধনা’, ৫নং কলুটোলা লেন, কলিকাতা।

নূতন মাসিক পত্র

সরনী

বাৎসরিক মূল্য সভাক ২৥০ টাকা

সম্পাদক—শ্রীমুদ্রাকান্ত ব্রাহ্মচৌধুরী

প্রাপ্তিস্থান—পোঃ শান্তিনিকেতন, জিঃ বীরভূম।

সরনী যে অল্পমূল্যের উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র তাহা অগ্রহায়ণ সংখ্যা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। নাগপুর, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বম্বে, দিল্লী, বর্ধা প্রভৃতি স্থানে ইতিমধ্যেই ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে অতি শীঘ্র ঐ সব অঞ্চলে প্রকাশী বাঙ্গালীদের মধ্যে ইহার প্রচার অধিকতর হইবে। গ্রাহক সংখ্যা আরো দুই শত হইলে ইহার কলমের বৃদ্ধি করা হইবে। বাহাতে ছোট গল্প, কথানাট্য বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ও নানাবিধ চিত্তাকর্ষক রচনা “সরনীতে” স্থান পায় সে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। টাকাকড়ি চিঠিপত্র সম্পাদকের নামে শান্তিনিকেতনে পাঠাইতে হইবে। ১০ পয়সার মূল্যের ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে নমুনা কাপি পাঠান হয় না। নূতন লেখকগণ সরণীর লেখক সভা হইলে তাঁহাদের কাঁচা লেখাও সংশোধন করাইয়া ছাপান হয়। লেখক সভা হইবার জন্য অর্দ্ধ আনার ষ্ট্যাম্পসহ সম্পাদককে পত্র লিখুন—বিস্তৃত বিবরণ পাইবেন।

পুলকিত তনু মোর সন্ধিতে নারি ।
 যে জন বাজালে বাঁশী দাস হব তারি ॥
 স্রবল লইয়া কাহ্নু দ্রুতগতি চলে ।
 চক্রে বেড়িয়া তারা আছে তরুতলে ॥^২
 তটস্থ হইয়া শ্রাম দাঁড়াইয়া রহে ।
 জগতমোহিনী রূপ পূর্ণানন্দ কহে ॥^৩

(২)

কাতর হইয়া পুছে রসময় শ্রাম,
 তোমার নাম কহ, মোরে পরিচয় দেহ—
 কোন জাতি, কোথা নিজ ধাম ॥
 আমি থাকি এই বনে, চরাই সব ধেনুগণে,
 কহু তোমায় না পাই দেখিতে ।
 বলাই দাদার সঙ্গে থাকি, তোমায় কখন নাহি দেখি,
 সন্দেহ লাগয়ে মোর চিতে ॥
 এত শুনি কহে গৌরী, শুন হে নন্দের হরি,
 তোমাকে দিব পরিচয় ।
 প্রেম নাম আমি ধরি, বাসপুর মধুপুরী,
 মাতা মোর তব পূজ্য হয় ॥

(২) চক্রে—ক্রীড়াধিকা, তারা—সখীগণ ।

(৩) তটস্থ—নিকটবর্তী ।

(৪) শেখরদাসের ভণিতায়ুক্ত একটি পদের প্রথমার্শে অস্বরূপ হইলেও শেষার্শে ঠিক এই পদটির অস্বরূপ । পদাবলী-সাহিত্যে একাধিক ব্যক্তির ভণিতায়ুক্ত একটি পদ, অথবা সামান্যরূপ পরিবর্তিত একটি পদে একাধিক ব্যক্তির ভণিতা প্রযুক্ত হইবার দৃষ্টান্ত বিরল নহে ; ইহার কারণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । শেখরদাসের পদটি এস্থলে উদ্ধৃত হইল । পূর্ণানন্দের পদ অপেক্ষা এই পদটি বিস্তৃত এবং সম্পূর্ণ-ভাবব্যঞ্জক ।

রাধার বাঁশীর স্বরে গগন ভেদিল ।
 শুনি শ্রাম নাগর অমনি অধৈর্য হইল ॥
 দূর হতে সুস্বর শুনিতে পাইল কাণু ।
 রাখালেরে কহিছেন কিরায়ে আন ধেনু ॥
 শুনিয়া বেণুর ধনি নটবর শ্রাম ।
 চিত চমকয়ে হরে অবশে বয়ান ॥
 একি অপক্লপধনি শুনিলাম অবশে ।
 এমন বেণুর ধনি হানিল পরাণে ॥
 পুলকিত তনু মোর সন্ধিতে নারি ।
 যেজন বাজালে বাঁশী দাস হব তারি ॥
 স্রবল লইয়ে কাণু দ্রুতগতি চলে ।
 চক্রে বেড়িয়া তারা আছে তরুতলে ॥
 তটস্থ হইয়া শ্রাম দাঁড়াইয়া রহে ।
 জগতমোহিনী রূপ দাস শেখর কহে ॥

তোমার প্রিয় মাতা যে, আমার পূজ্য সে,
 সে জন আমার হয় তাতে ।^১
 আমার বন্ধু যেই জনে, তাহারে সকলে জানে,
 দাস পূর্ণানন্দ ভাবে চিতে ॥

(৩)

ফিরাইতে কর নারে গিরিধর,
 আকুল হইল শ্রাম ।
 চেয়ে নত পানে দেখে রাই-চরণে
 লেখা আছে শ্রাম নাম ॥
 অন্ধের পরশে নাগর হরিষে
 বুঝিল রাইয়ের কাজ ।
 যত সখীগণ গেলে অন্না বন,
 মিলয়ে নিকুঞ্জ মাঝ ॥
 কাতর ভাবে হরি ছুই কর জুড়ি
 কহে শুন প্রাণেশ্বরী ।
 তোমার মহিমা বেদে নাহি সীমা
 নাহি জানে হর গৌরী ॥
 রাই বলে শ্রাম, মোর নিবেদন,
 তোমা না দেখিলে মরি ।
 ধর তেয়াগিয়া দেখিলাম আসিয়া
 নটবর-বেশ-ধারী ॥
 সজ্জের সজ্জিয়া মিলিল আসিয়া
 রাধিকা কাণুর কাছে ।
 প্রেম সমাধিয়া আনন্দে চলিলা,
 কহে পুণ্যানন্দ দাসে ॥

উদ্ধৃত পদগুলি যে খাতায় পাওয়া গিয়াছে, সেই খাতা-খানা কোন সময়ের লিখিত, জানা যায় নাই । রসজ্ঞ বৈষ্ণব কবি ও সাহিত্যাত্মরাগী স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুরের সময়ে বিস্তর প্রাচীন গ্রন্থ সংগৃহীত ও প্রচারিত হইয়াছিল । তৎকালে আগরতলায় প্রাচীন পদাবলী চর্চাও পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল । মনোহরসাই কীর্ত্তনের নিমিত্ত কতিপয় স্তগায়ক দরবারে নিযুক্ত ছিলেন । খাতায় সংগৃহীত পদগুলি নানা ব্যক্তির রচিত হইলেও, ঘটনার শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে ; দেখিলে মনে

(১) ইহার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝা গেল না ।

কার্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই চেষ্টা প্রশংসনীয়।

সঙ্গীত সংঘের শাখা

অন্তঃপুরিকাদেব সঙ্গীত শিক্ষার বন্দোবস্ত আমাদের দেশে অল্পই আছে। সঙ্গীত সংঘ বহু বৎসর ধরিয়া এই

অভাব কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি সংঘ কলিকাতার উত্তর অঞ্চল নিবাসী গৃহস্থদিগের স্ববিধার জন্য ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে একটি শাখা খুলিয়াছেন। সঙ্গীত শিক্ষার্থিনীদের ইহাতে খুব স্ববিধ হইবে।

চিত্র-পরিচয়

আমাদের মূখপাত ছবিগানি অঙ্কটা-গুহাব, একটি প্রাচীর-চিত্রেব নকল। ছবির বিষয় হইতেছে—বুদ্ধদেব তপস্যায় বোধি লাভ করিয়া পিতৃরাজ্য কপিলবাস্ততে ফিরিয়া আসিয়াছেন; তিনি রাজ্যান্তঃপুরে আসিয়া দেখিলেন তাঁহার পত্নী যশোধরাও পতির সন্মাস গ্রহণের সংবাদ শ্রবণ করা অবধি কাষায়-বস্ত্রধারিণী সন্ন্যাসিনী হইয়া কচ্ছত্রত পালন করিতেছেন। যশোধরা স্বামীকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন, বুদ্ধদেব তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। তখন যশোধরা পুত্র রাহুলকে বলিলেন—‘বৎস, বাও, তোমাব পিতার নিকট হইতে তোমার পিতৃধনের উত্তরাধিকার চাহিবা লও।’ শিশু রাহুল বহু সন্ন্যাসীর মধ্যে পিতাকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘মা, কোন্ জন আমার পিতা?’ যশোধরা পুত্রের প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া বলিলেন—‘বহু

পুরুষেব মধ্যে পুরুষোত্তম যিনি, তিনিই তোমাব পিতা— তাঁহাকে ভুগি চিনিবা লও।’ রাহুল দেখিয়া দেখিয়া বুদ্ধদেবকেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ স্থিৰ করিয়া তাহার কাছে গিয়া প্রার্থনা করিলেন—‘পিতা, আমার পিতৃধনের উত্তরাধিকার আমাকে দান করুন।’ তখন বুদ্ধদেবের ইচ্ছিতে আনন্দ একখানি কাষায় উত্তরীয় রাহুলের অঙ্গে বেষ্ঠন করিয়া দিয়া রাজপ্রাসাদের মধ্যে রাজার পৌত্রের হাতে সন্ন্যাসীর ভিক্ষাপাত্র দান করিলেন। তার পব আনন্দ বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘প্রভু, শিশুব যাতাকেও কি প্রসাদ-বিতরণ করিবেন?’ তখন বুদ্ধদেব বলিলেন—‘আমার ধর্ম নরনারী সকলের জন্তই।’ যশোধরা দীর্ঘ বৈধবের অবসানে আনন্দিত হৃদয়ে পতির সহিত প্রব্রজ্যা স্বীকাব করিলেন।

চাকর

পুস্তক-পরিচয়

মতিচূব—মিসিস্ আর, এম, হোপেন। ৮৬ পৃষ্ঠাবান সার্কিউলার বোড, কলিকাতা। দুই টাকা।

বইখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। ‘ডেলিশিয়া-হত্যা’ খুবই ভাল কবিতা বর্ণনা করা হইয়াছে।

লেখিকার ভাষা বেশ সহজ এবং সরল, তাহাতে অনাবস্তক পাণ্ডিত্য বা ভাবের ফেলা নাই। এইজন্যই পুস্তকখানি পড়িতে আরো ভাল লাগিয়াছে।

ঐশ্বর্য্য—শ্রীজ্ঞানকীবল্লভ বিবাস। গুবদাস চট্টোপাধ্যায় এও বস, ২০১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। দুই টাকা।

সামাজিক উপন্যাস। বইখানি উপন্যাস হিসাবে খুব ভাল নই হইলেও একেবারে বাজে নয়। গ্রামের চিত্রগুলি ছ-এক জাযগায় বেশ ভালই ফুটিয়াছে। বইখানি আমাদের মন লাগে নাই। বাঁধাই ও ছাপা ভাল।

প্রমুখীট

হয়, কীর্তনের সুবিধার নিমিত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালা আকারে পদগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছিল। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের পূর্বে এরূপ সংগ্রহের চেষ্টা হইবার কথা শুনা যায় নাই,—এবং তৎপরেও এরূপ চেষ্টা হইতে দেখা যায় নাই। সুতরাং উক্ত মহারাজের সময়েই গায়কগণের ব্যবহারার্থ প্রাচীন পুঁথিসমূহ আলোড়ন করিয়া এই খাতা লিখিত হইয়াছিল, আমাদের ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস।

অন্য যে-সকল অপরিজ্ঞাত পদকর্তার নাম ও অপ্রকাশিত পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা ক্রমে প্রকাশ করা হইবে। সেই-সকল পদকর্তার বিবরণ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমরা বিশেষ চেষ্টা রচিলাম।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ

শেখ সাদীর কাসিদা ও গজল

পারস্য-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে পারস্যের কাব্য-কুঞ্জে তিনজন কবি-পয়গম্বরের আবির্ভাব হয়। কবি শেখ সাদী ইহাদের অন্যতম। পারস্যের কোন কবিই আজ পর্যন্ত শেখ সাদীর মত স্বদেশে কি বিদেশে সম্পূজিত হইয়া কবির নিজ উক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারেন নাই।* হাজি নতিফ আলি খাঁ তাঁহার “আতস কাদা” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “পারস্যের কবি-প্রতিভার জাগরণ-কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত এমন কোন কবির আবির্ভাব হয় নাই, যিনি ফিরদৌসী, নিজামী, আনওয়ারী এবং শেখ সাদী, এই কবি-চতুষ্টয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে পারেন। কি প্রাচীন কি আধুনিক যুগের লেখকগণের মধ্যে কবি শেখ সাদী অসাধারণ জ্ঞানী ও প্রতিভাশালী লেখক; বাগ্মিতা ও রচনা-বৈশিষ্ট্যের জন্ত বিখ্যাত চারিজন প্রতিভা-সম্প্রদায়ের অন্যতম।”† কবির জ্ঞান, কবিত্ব, অন্তর্দৃষ্টি, অভিজ্ঞতায় মুগ্ধ হইয়া পারস্যের বিখ্যাত বিদ্বান ও লেখক মীর সৈয়দ আলি মশটক কবিকে পরম শ্রদ্ধাভরে “হাজার গানের বুলবুলি” নামে সম্মানিত

করিয়াছেন।* বাস্তবিকই কবির স্থূললিত বাক্যবিশ্বাস, শব্দনির্বাচন, সমৃদ্ধ অলঙ্কার-সুধা, ইন্দ্রজালময়ী কাব্যমায়ার বিচিত্র বিকাশ, নানা-বিষয়িণী রচনার মধ্য দিয়া পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াই ক্ষান্ত নহে; ভাবের অল্পভূতিতে, উন্মেষণে, মানব-চরিত্র অধ্যয়নে, অভিজ্ঞতায়, চিন্তাশীলতার বিকাশেও তাহা চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সাধারণ পাঠক কবির মধুর কোমলকান্তপদাবলীর ভাবে সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হন, কিন্তু বীশক্তি সম্পন্ন তীক্ষ্ণদৃষ্টি সমালোচক কবির কাব্যে ভাবের প্রবাহ ও অসাধারণ মনোহার পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্য হন। সাদীর রচনাবলী পারস্য-সাহিত্যের ‘নিমক্-দান’ অর্থাৎ লবণ-ভাণ্ডার নামে সম্মানিত। লবণ অমৃত-বিশেষ অর্থাৎ লবণ ভিন্ন রন্ধনের অন্ত্যন্ত প্রচুর উপাদান সত্ত্বেও যেমন কোনপ্রকার ভোজ্য ব্যঞ্জন স্বচ্ছ, মুখরোচক ও তৃপ্তিকর হয় না, তেমনি শেখ সাদীর রচনাবলী ভিন্ন পারস্য-সাহিত্য অগ্রাচ্ছ লেখকের সুরচিত রচনা সত্ত্বেও অপূর্ণ ও অঙ্গহীন; সাদীর রচনাবলী পারস্য-সাহিত্য-রত্নহারের উজ্জ্বলতম মধ্যমণি। সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন কালিদাস, ইংরেজী সাহিত্যে যেমন সেক্সপীয়র, জার্মান সাহিত্যে যেমন গেটে, ইতালীয় সাহিত্যে যেমন দান্তে, ফরাসী সাহিত্যে যেমন ভিক্টর

* কবি, বিদ্বান সর্বত্র পূজিত। খাওয়ারতিম দ্রষ্টব্য। এই উক্তি ও কৃশাগ্রবৃদ্ধি চাণক্যের উক্তি একার্থসূচক।

† Prof. Eastwick অনুদিত হাজি নতিফ আলি খাঁ রচিত সাদীর জীবনী গ্রন্থ আতস কাদার ইংরেজী অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

* খোরাসান-নিবাসী বিখ্যাত লেখক আমির দৌলত সাহ প্রণীত ও Prof. Brown সম্পাদিত তজ্জ-কিরাতুস শোয়ারা দ্রষ্টব্য।

আমদানী হইয়াছিল। ১৯২১-২২-এর ঐ এগার মাসে আমদানী স্বতা ও কাপড়ের মূল্য ৫৭ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। খাদ্যের প্রচলনের চেষ্টা এই হ্রাসের একমাত্র কারণ না হইলেও একটি কারণ নিশ্চয়ই বটে।

বঙ্গের আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত ধাহাবা অন্যত্র চরখা, হাতেব তাঁত ও পাদ্যের চালাইবার জন্য বিশেষ পরিশ্রম কবিতেন, তাঁহারা বুখা চেষ্টা কবিতেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

বঙ্গের নূতন লাটের প্রথম কাজ

বঙ্গের নূতন লাট তাঁহার এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নামঞ্জুরী ছুটি বরাদ্দ তাঁহার নিজের আইনসম্মত ক্ষমতা অহুসাবে মঞ্জুর করিতে তিনি বাধ্য হইবেন। আমাদের বিবেচনায় সভাকে এই প্রকারে বার বাব অপদস্থ না করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিলে ভাল হইত। লর্ড বোনার্লুশেব আমলেও কিছুদিন আগে ব্যবস্থাপক সভার গৃহীত একাদিক প্রস্তাব অহুসাবে গবর্ণমেন্ট কাজ করেন নাই। ব্যবস্থাপক সভাগুলি বক্ষমতা ও মর্যাদার পরিমাণ ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে।

গবর্ণমেন্টের ঋণ করিবার ক্ষমতা

ভাবতীয় ব্যবস্থাপক সভাদ্বয়ের মত না লইয়া বা তাহা অগ্রাহ্য কবিয়া ব্রিটিশ পাল্‌মেণ্টের অহুমতিক্রমে টাকা ধার করিবার ক্ষমতা ভারত-গবর্ণমেন্টের বতদিন থাকিবে, ততদিন বঙ্গের আলোচনা এবং মঞ্জুরী না-মঞ্জুরী ব্যাপাবটা গ্রহণনের মত বোধ হইতেছে। খাটি স্বরাজ্বেব মধ্যে একপ ভেজাল একটুকুও থাকিতে পারে না। একটুকুও মেকি কিছু থাকিলে তাহা স্বরাজ্যনের যোগ্য নহে।

জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

চট্টগ্রামেব কবি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্তের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে এবং অন্য নানাবিধ বিষয়ে প্রায়ই কবিতা লিখিতেন, এবং তৎসমুদয় মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইত। তাঁহার দেহ স্বস্থ

বল ছিল না, তাহাই তাঁহার অকালমৃত্যুর কারণ বলিয়া অহুমিত হয়।

পণ্ডিত রমাবাদি সরস্বতী

পণ্ডিত রমাবাদি সরস্বতীর মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন প্রধান বিদুষী এবং কক্ষিষ্ঠা জনহিতসাধিকা মহিলার সেবা হইতে বঞ্চিত হইলেন। মহারাষ্ট্রেব কেদগাঁওয়ের নিকট স্বপ্রতিষ্ঠিত “মুক্তি” নামক পল্লীতে তিনি প্রায় দেড়হাজার বিধবা নারী ও অনাথ বালিকাকে প্রতিপালন করিতেন এবং ধর্ম ও সাধারণ শিক্ষা দিতেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত গত ১৩২৮ সালের শ্রাবণ মাসের প্রবাসীর ৫৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

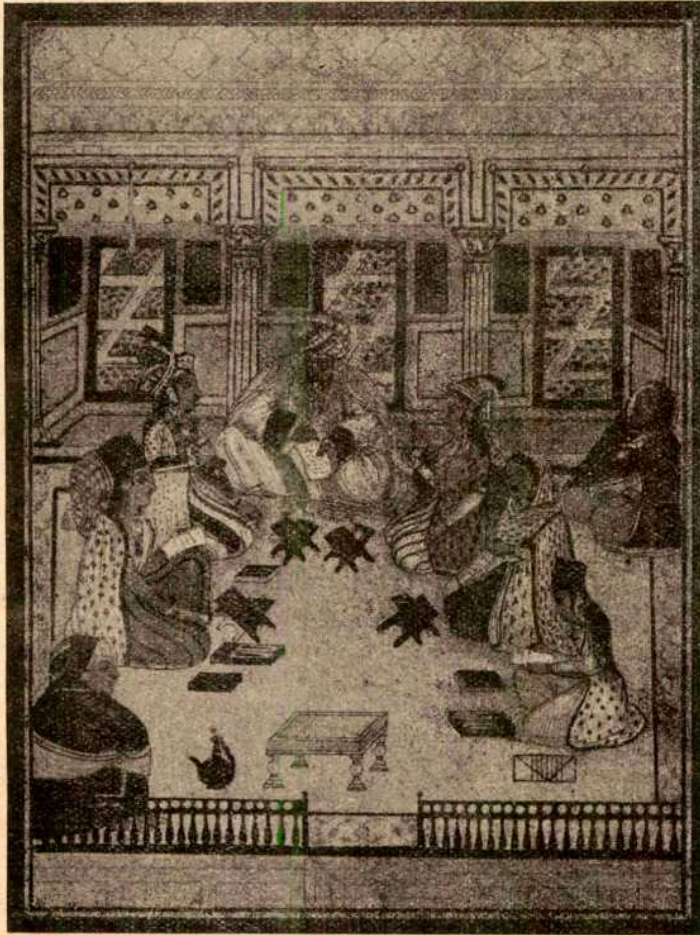
উত্তর-ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন

সংস্থাপক সমিতি

লক্ষ্মী-প্রবাসী শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন, শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতির নেতৃত্বে “উত্তর-ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন-সংস্থাপক সমিতি” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্গের বাহিরে উত্তর-ভারতে যে-যে স্থানে বাঙ্গালী আছেন, তাঁহাদের মধ্যে বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের অহুশীলন বৃদ্ধি, ইহাদের মধ্যে ধাহারা সাহিত্যাহুরাগী তাঁহাদের পরস্পরের ভাববিনিময়, প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ইহা স্থাপিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য মহৎ। আমরা ইহাব সমর্থন করিতেছি।

নারীশিক্ষাসমিতির কার্যক্ষেত্র বিস্তার

নারীশিক্ষাসমিতি বিধবা ও অন্য সহায়হীনা নারীদিগকে শিক্ষা দিবা নিজ নিজ জীবিকানির্কাহে সমর্থ কবিবার নিমিত্ত একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহার খুব প্রয়োজন আছে। সর্বসাধারণ এই উদ্দেশ্য-সাধনে সমিতিকে আর্থিক ও অনাবিধ সাহায্যে দিলে সাতিশব আত্মাদের বিবরণ হইবে। নারীশিক্ষাসমিতি ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় গৃহে বালিকা ও মহিলাদিগকে বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি নানাবিধ অর্থকর



পারস্যের কবি শেখ সাদী

হিউগো, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে যেমন রবীন্দ্রনাথ, পারস্যসাহিত্যে তেমনি কবি শেখ সাদী।

কবি শেখ সাদী দেবতার প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত।* কবি মোলানা হতিকা তাঁহার দিওয়ানে লিখিয়াছেন,— যদিও পরগম্বর মহম্মদ বলিয়াছেন, আমার পর আর কোন পরগম্বর জয়গ্রহণ করিবে না, তথাপি কবিদের

মধ্যে তিনজন কবি ভগবৎ-প্রেরণায় কাব্য-শাস্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিয়া পয়গম্বর রূপে ভক্তি ও পূজা পাইবেন। ফিরদৌসী বীররস কাব্যে, আনওয়ারী বিষাদসঙ্গীতে, ও শেখ সাদী গজল বা গীতি-কবিতা রচনায় চির অমরত্ব লাভ করিবেন।

কবির সর্বতোমুখিনী প্রতিভার উজ্জল-আলোকরশ্মি-পাতে পারস্য-সাহিত্যের সকল বিভাগই অপূর্ণ শ্রী ধারণ করিয়া ঐন্দ্রজালিকের প্রভাব বিস্তার করে। পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে পারস্য-সাহিত্য নানা ঐশ্বর্যে মণ্ডিত। তন্মধ্যে প্রধানতঃ—(১) সুজা (২) গজল (৩) কাসিদা (৪) তস্বীব (৫) মসনবী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সম্পদে সমুজ্জল। শেখ সাদীর কুল্লিয়াৎ অর্থাৎ গ্রন্থাবলীর মধ্যে বৃত্তা, গুলিতা ও কয়েক খণ্ড রাশেল্লা (ধর্মপুস্তিকা) ব্যতীত অবশিষ্টগুলি প্রধানতঃ কাসিদা ও গজল। এগুলি আরব্য ও পারস্য ভাষায় রচিত। শেখ সাদীর সময় হইতেই দিওয়ান অর্থাৎ

গজলকে একত্র করিয়া আদ্য অক্ষর অনুসারে প্রকাশ প্রথার প্রচলন হয়।* কবির বন্ধু, বিস্তুন নিবাসী আলি বিন আহম্মদ ৭২৬ হিজরাদে সাদীর গজলগুলিকে দিওয়ানে পরিণত ও ৭৩৫ হিজরাদে সম্পাদন করেন।† গজল একপ্রকার গীতি-কবিতা অর্থাৎ ইহা শুধু কবিতা নয়, গান ও কবিতা উভয়ই। সুন্দরীর সাহচর্যে গায়কের

* মরমী কবিবর ফরিদউদ্দিন আত্তার ও জানী প্রণীত তজ্কিরাতুস্ সাউলিয়া ও নাকাত-উল-আনাস দ্রষ্টব্য।

দর শায়েরস্তান পায়ামবারান্ আন্দ।

কতলিস্ত কে জুমলাগী বর আ আন্দ।

ফিরদৌসী উ আনওয়ারী উসাদী

হরচন্দ কী লা না-বি আদি।

* Catalogue of the Arabic and Persian Manuscripts in the Oriental Public Library at Bankipore, prepared by Khan Saheb Maulvi Abdul Muqtadir, Vol. I, 1908, দ্রষ্টব্য।

† Catalogue of the Arabic and Persian Manuscripts in the British Museum, prepared by Charles Rieu, Vol. II, দ্রষ্টব্য।

হৃদয়ে যে উল্লাস উদ্ভিত হয়, তাহার উচ্ছ্বাস বর্ণনাই গজলের উদ্দেশ্য।*

কবি গজলকে গানের উপযোগী করিয়াই রচনা করেন। ইহাদের ছন্দভঙ্গীও গীতের উপযোগী। সাধারণ গানের মত গজল কতকগুলি বয়েং বা কলিতে বিভক্ত; উহার প্রথম বয়েং বা কলিকে মংলা বলে। প্রথম বয়েং বা মংলা এগার হইতে সতের মাত্রায় রচিত হয়। গজলের প্রথম কলি বা মংলার দুই চরণের পরস্পর মিল থাকে। কিন্তু মংলার পরবর্তী অষ্টাশ্রু বয়েংএর দুই চরণের পরস্পর মিল থাকে না। অপিচ পরবর্তী বয়েংএর শেষ চরণের সঙ্গে প্রথম বয়েং বা মংলার মিল থাকে। এই প্রকার মিলই ভাস্কর জেমস রসের মতে ফারসী এবং আরবী কবিতার ছন্দবৈশিষ্ট্য। কাসিদার ছন্দভঙ্গীও গজলের অনুরূপ। ইহারও মংলা বা প্রথম কলির দুই চরণের পরস্পর মিল থাকে এবং পরবর্তী বয়েংএর দুই চরণের পরস্পর মিল না থাকিলেও গজলের মত শেষ চরণের সহিত মংলার বা প্রথম কলির মিল থাকিবে। ছন্দভঙ্গীতে কাসিদা এবং গজল একরূপ হইলেও বিষয় এবং দৈর্ঘ্যে বিভিন্ন। সাদীর গজলগুলি সাধারণতঃ সৌন্দর্য, প্রেম ও অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ক। ইহা উচ্চ-সংখ্যা দশ বা বারটি পদ বা বয়েংএর রচিত হয়। কাসিদা সাধারণতঃ স্তুতি, ব্যঙ্গ, ধর্ম, দার্শনিক-তত্ত্ব অথবা নীতিকথা বিষয়ক। গজলের শেষ ছত্রে কবি নিজ তাখাল্লুস অর্থাৎ ভণিতা সংযোগ করেন।† কিন্তু কাসিদাতে কোনপ্রকার ভণিতা দিবার নিয়ম নাই।

অধ্যাপক ব্রাউন বলেন, পারস্য এবং ভারতবর্ষীয় কাব্যরসিকগণ আরবী ভাষায় রচিত সাদীর কাসিদা-গুলিকে অতি উৎকৃষ্ট রচনার নিদর্শন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু আরবীয় বিদ্বানগণ উহাকে মাঝারি রকমের রচনা (mediocre performance) বলিয়া নিন্দিত করিয়াছেন।‡ কবির পারস্য কাসিদাও অতি

চমৎকার। হাজি নতিক আলি খাঁ বলেন, শেখ সাদীর কাসিদা, গজল, নীতি-উপদেশপূর্ণ কবিতা ও হাস্ত-রসাত্মক রচনা কবিত্তে সৌন্দর্য্যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও চরমোৎকর্ষে অমূল্য।*

সাদীর বাইশখানি গ্রন্থের মধ্যে চারখানি গজল-গ্রন্থ।† তন্মধ্যে একখানি খুস্‌বিসায়েং-খেউড় গজল ইব্রাহিম খাঁ‡ বলেন, সাদীই সর্ব্বপ্রথম পারস্যের গীতি-কুঞ্জের শোভা-সম্পদ বর্দ্ধন করেন। আমীর দৌলত সাহ§ বলেন, দিল্লির কবি আমীর খসরু গজল-রচনায় সাদী অপেক্ষা অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। উপরিউক্ত অভিমত সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অধ্যাপক ব্রাউন প্রণীত পারস্য-সাহিত্যের ইতিহাস ও ভাস্কর জেমস রসের অনূদিত গুলিস্তার ভূমিকা পাঠে জানা

scholars of Arabic speech regard them as very mediocre performances.—Literary History of Persia.

* Sadi's lyrical poems possess neither easy grace and melodious charms of Hafiz's songs nor the overpowering grandeur of Jalaluddin Rumi's divine hymns, but they are nevertheless full of deep pathos and show such a fearless love of truth as is seldom met with in Eastern poetry.—Encyclopaedia Britannica, eleventh edition.

† কবির গ্রন্থসংখ্যা নির্ধারণ সম্বন্ধে নানা পণ্ডিতের নানা মত আছে। ফরাসী দেশীয় প্রাচ্যভাষাবিদ পণ্ডিতস্বর De Sacy De Herbelo ও Sir William Jones বলেন বৃত্ত†, গুলিস্তা† ও মুলুম্যাত এই পুস্তকত্রয় ভিন্ন শেখ সাদী অন্য কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। Major Stewart তৎপ্রণীত ইতিহাস-বিখ্যাত সুলতান টিপু রাজকীয় পাঠাগারের তালিকাভুক্ত মধ্যে সাদীর রচিত সতেরখানি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কবির বন্ধু বিসতুন নিবাসী জাঙ্গি বিন আহম্মদ ও J. Harrington সাদীর রচিত বাইশখানি পুস্তকেব উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত Bodlin (Oxford), British Museum (London), India Office (London), Oriental Public Library (Bankipore) প্রভৃতি পাঠাগারে রক্ষিত আব্বা ও পারস্য ভাষাব পাণ্ডুলিপিবাতালিকায় কবির রচিত বাইশ খানি গ্রন্থের নাম উল্লেখ আছে। আমরা আধুনিক প্রচলিত মত অনুসরণ করিলাম।

‡ ইব্রাহিম খাঁ অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখক ও বারানসীর অধিবাসী।

§ দৌলত সাহ পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখক ও খোরাসানের অধিবাসী। আমির আলা উদ্দৌলা ইস্‌ফাহানির পুত্র। তিনি মহাশয় পাণ্ডিত্যে যেমন-জ্যেষ্ঠ, তেমনি নিরহঙ্কার ও বিনয়ী ছিলেন। তাঁহার তজ্জিকিরাতুস্‌ শোয়ারা অর্থাৎ পারস্য কবিগণের জীবনচরিত পুস্তক অতি প্রশংসিত গ্রন্থ।

* সাহিত্য ১৩১৩ ও Miss Costello প্রণীত Rose Garden of Persia প্রস্তাব।

† অধ্যাপক ব্রাউন অনুমান করেন, ষোড়শ শতাব্দী হইতে গজলে ভণিতা দিবার প্রথা প্রচলিত হয়।

‡ In Persia and India it is commonly stated that Sadi's Arabic Qasidas are very fine. But

যায় যে, থাকানি জাবালি প্রভৃতি সাদীর পূর্ববর্তী কবিগণ গজল রচনা করিয়াছেন। সুতরাং সাদী প্রথম গজল-কবি না হইলেও, তিনি তাঁহার সমসাময়িক এমন কি পূর্ববর্তী গজলরচনাকারীগণ অপেক্ষা গজল রচনায় অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন; ঐতিহাসিক হাম্বল্লা মুস্তোফি বলেন, গজল রচনায় শেখ সাদী চরমোৎকর্ষ লাভ করেন।* এমন কি সাদীর রচিত গজল ভিন্ন অন্যান্য কবিগণের গজল, গজল নামেরই উপযুক্ত নহে।† অধ্যাপক ব্রাউনও বলিয়াছেন, গজল রচনায় শেখ সাদী অন্যান্য পারস্ত কবিগণ এমন কি হাফিজ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন।‡ বাঁকিপুর ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরীর মৌলভী আব্দুল মস্তাদির সাহেব বলেন, পারস্তে যে-সমুদয় গীতি-কবি আবির্ভূত হইয়াছেন তন্মধ্যে হাফিজকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়। গজলের উৎকর্ষ-জনিত গৌরব খ্যাতনামা শেখ সাদীর প্রাপ্য সন্দেহ নাই; হাফিজের প্রবলিত রীতি বথেষ্টই মাজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন (refined and polished) এবং তাঁহার বিশেষ প্রকাশ-সৌন্দর্য্য আজ পর্যন্ত কেবল অনতিক্রম্য হইয়া আছে তাহা নহে, তাঁহার সমকক্ষও নাই। পারস্তের কবিগণের মধ্যে সাদীর যশ অবশ্যই প্রচুর এবং তাঁহার গুলিস্ত। বৃন্ত। এই দু'টি শ্রেষ্ঠ রচনা তাঁহাকে অমর করিয়াছে। কিন্তু হাফিজের সহিত তাঁহার গজলের তুলনা করিলে একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে সাদীর গজল অধিকতর প্রশংসার।§ সাদীর গজল, হাফিজের সরস অনাহতগতি ছন্দপ্রবাহে পূর্ণ অথবা জেলালুদ্দিন রুমিও ভক্তিরস ও ঈশ্বর-প্রেমের উচ্ছ্বসিত

* তারিখইর গুলিস্ত।

† It is in the Persian Ghazal or ode, that he is especially held by orientals to have surpassed all other poets. They even go so far as to say that previous to Sadi there was no ode worthy of the name in existence.—Platts.

‡ In his Ghazals or odes Sadi is considered as inferior to no Persian poet, not even Hafiz.

—Literary History of Persia.

§ Khan Saheb Abdul Muqadir's Catalogue of Persian and Arabic Manuscripts, Vol. I, 1908.

গরিমাময় ভাবধারায় পূর্ণ না হইলেও, উহা গভীর করুণরস এবং নির্ভীক সত্যাহ্বারগের পরিচয়ে পূর্ণ; বাহা প্রাচ্য দেশের কবিতায় কদাচিত্ দেখিতে পাওয়া যায়।* বাহা হউক শেখ সাদী প্রথম গজলরচনাকারী না হইলেও, তাঁহার দ্বারাই যে পারস্যের গজল-কুঞ্জের শোভা-সম্পদ বর্দ্ধিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং গজল বা গীতিকাব্য রচনায় কবি শেখ সাদীই প্রথম অমরত্ব লাভ করিয়া সাধারণের শ্রদ্ধা লাভ করিয়া কবি মোলানা হত্যকার গজলের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। সমরুখন্দ নিবাসী কবি নিজামী-অরুদি বলিয়াছেন, সাদীর দিওয়ান ভাবের উদ্দীপক ও চরমোৎকর্ষে পূর্ণ।† পারস্যের কবিগণের মধ্যে সাদীই প্রথম শ্রেণীর গজল-রচয়িতা এবং তাঁহারই গজল ঐতিহাসিক হিসাবে বিখ্যাত (classic)।‡ অধ্যাপক ব্রাউন, সাদীর গজলের প্রচার ও জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে বলেন, পারস্তের কোন কবিই আজ পর্যন্ত সাদীর মত লক্ষপ্রতিষ্ঠ ও প্রতিভা-বশা হইতে পারেন নাই, কবির বশ কেবলমাত্র তাঁহার জন্মভূমির মধ্যেই বিস্তৃত ছিল না, পরন্তু যে দেশে পারস্ত-ভাষার আলোচনা হয়, সেই দেশেই তাঁর যশ বিস্তৃতি লাভ করে। বহুল প্রচার ও জনপ্রিয়তাব হিসাবে হাফিজের পরই সাদীর গজলের স্থান।§

সাদীর পূর্ববর্তী গজল-কবি থাকানি ও জাবালি সম্বন্ধে যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখিত হইল। থাকানি, পারস্যের শেরওয়ান প্রদেশ নিবাসী বিখ্যাত কবি। পারস্তের কবিগণের মধ্যে ইনিই “সুলতান উদ্-শোওয়রা” অর্থাৎ কবি-সুলতান রূপে সম্মানিত ছিলেন। ‘থাকানি’ কবির কল্পিত নাম। গজা প্রদেশে (আধুনিক এলিজা-ভেতপল) কবি থাকানি ৫০০ হিজরাদ্দে (১১০৬-৭ খ্রী:) জন্মগ্রহণ করেন। কবির প্রকৃত নাম আফজল উদ্দিন ইব্রাহিম বিন আলি শেরওয়ান। কবির পিতা সুলতানের কর্ম করিতেন এবং মাতা প্রথমে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী

* আতসকামা।

† চাহার মক্কা।

‡ খাওয়ারতিম-ই-সাদী প্রটব্য।

§ Literary History of Persia

ছিলেন, পরে মুসলমান হন। কবি খাকানি পারস্যের প্রাচীন কবি কালাকির শিষ্য। সুলতান খাকানি মাহুচরের রাজত্বকালে প্রাচুর্য বলিয়া শেরওয়ান প্রদেশের রাজকুমার কবিকে 'খাকানি' উপাধিতে ভূষিত করেন। গজল রচনার জন্মই কবি খাকানি বিশেষ প্রসিদ্ধ। কবি অনেকগুলি গজল-গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে "হাফত-আকলিম" বিখ্যাত গজল-গ্রন্থ। কবি পদ্যে একখানি ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থও রচনা করেন। এই ভ্রমণ গ্রন্থখানির নাম "তুকৎ-উল-ইরাকিন"। এই গ্রন্থে খাকানি, ইবাক-আজ্জাম, ইরাক-আরব দেশের বর্ণনা করিয়াছেন। ৫৮২ হিজরাদে (১১৮৬ খ্রী:) তাজিক কবির মৃত্যু হয় এবং তাজিক প্রদেশেব অন্তর্গত শাব্বার নামক প্রসিদ্ধ স্থানে কবিকে সমাধিস্থ করা হয়।

কবি জাবালি, ঘাজ্বিস্তানের পার্শ্ব প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া ইহার নিশা বা অর্থাৎ উপাধি আল্ জাবালি অর্থাৎ পার্শ্বপ্রদেশবাসী। কবির সম্পূর্ণ নাম আব্দুল ওয়াজিদ আল জাবালি। কবি জাবালি গজল রচনার জন্ম সবিশেষ প্রসিদ্ধ। কবি ঘাজ্বিস্তান হইতে হিরাত ও গাজারায় আগমন করেন। কিছুকালের জন্ম গজল-পতি সুলতান বাহরাম সাহ বিন্ মাহুদের দরবারে তিনি রাজকবি রূপে অবস্থান করেন। কিছুকাল অবস্থান করিবার পর সুলতান বাহরাম সাহের সহিত সুলতান সঙ্গর জালজুকির যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সুলতান বাহরাম সাহ পরাজিত হন। কবি এই যুদ্ধ-ব্যাপারকে গরিমায় ভাব এবং ছন্দের মধ্যে প্রকাশ করেন। এই কবিতায় কবি বিজয়ী সুলতানের বীর্য-বতীর মহিমা কীর্তন করেন। সুলতান কবির কবিত্তে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজ রাজ্যের রাজকবি রূপে সম্মানের সহিত লইয়া যান। ৫৫৫ হিজরাদে কবির মৃত্যু হয়। ইহার রচিত অনেকগুলি গজল-গ্রন্থ আছে।

সাদির গজলগুলি চারিশ্রেণিতে বিভক্ত, যথা :—

(১) তায়াবাৎ (২) বদেয়া (৩) খাওয়াতিম (৪) খুস্বিসায়েৎ।

তায়াবাৎ—কবির সাদাসিদা দরবেষ সাধারণ গজল-গ্রন্থ হইলও বিশেষত্ব পূর্ণ। ইহাব বিশেষত্ব সম্বন্ধে

সুবিখ্যাত প্রাচ্যভাষাবিদ সুপণ্ডিত সার উইলিয়ম জোন্স ও ডাক্তার জেমস্ রস বলেন, এই গ্রন্থের প্রথম চারিটি গজলের প্রথম দুই চরণ আলিফে ও অপর চরণগুলি ক্রমায়ণে আলিফ ও তৎপরবর্তী বর্ণের সহিত শেষ হয়।*

বদেয়া—শব্দালঙ্কারপূর্ণ অতীন্দ্রিয় ভাব ও ভক্তিরসপূর্ণ গজল-গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি সাধারণের নিকট অতি প্রচার ও আদরের বস্তু। ইহাতে কবি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণন ও শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন।

খাওয়াতিম—কবির পবিপত বয়সের রচনাবলীর মধ্যে এই গজল-গ্রন্থখানি গভীর ও গরিমাময় ভাবে পূর্ণ। যে সময় কবি পার্শ্ব জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ত্রুণনিষ্ঠ যোগীর মত ধ্যানজীবন যাপন করিতেন, যে সময়ে কবির মিলনাকাজক্ষী আত্মা সত্য-শিব-সুন্দরের শ্রীচরণে মিলিত হইবার আশায় সতৃষ্ণ নয়নে অপেক্ষা করিতেছিল, সেই ঈশ্বর-সমাধির পূর্বরাগরঞ্জিত মুহূর্ত্তে কবি এই অপূর্ব-শ্রীসমন্বিত গজলগুলি রচনা করেন। ইহা পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে কবির হৃদয় মন সেই বিরাট বিশালতায় ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত গরিমা, সমস্ত সৌন্দর্য তাঁহার প্রাণে সংহত হইয়া উঠিয়াছে।

খুস্বিসায়েৎ অর্থাৎ গদ্য ও পদ্যে রচিত অল্লীল গজল-গ্রন্থ। অল্লীল গজলের প্রচলন গজনী রাজাদের সময় হইতে আরম্ভ হইয়া দেশগম্য বিস্তৃতি লাভ করে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সাধারণ কবিগণ অপেক্ষা পেউড় গজলের কবিগণ সবিশেষ আদব প্রাপ্ত হইতেন, এমন কি তাঁহারা হকিম (doctor) উপাধিতে পর্যন্ত ভূষিত হইতেন। তৎকালীন রুচিতে এই শ্রেণীর রচনা অল্লীল বলিয়া সাধারণের নিকট বিবেচিত হইত না।†

* ... the two first lines of the first four Ghazals terminate in an Alif, and the others in succession in each letter of the alphabet.

† Swift, stern, and other wits of our last and the preceding age could relish indecency and nastiness, and it is creditable perhaps to the present generation that it has no taste for such grossness. This was not, however, the case in the age and country in which Sadi flourished any more than it was in the early and best parts of our own literary history.—Introduction to Gulistan, translated by Dr. Ross, 1823.

ইবি শেখ সাদী তৎকালীন এক দুঃচরিত্র রাজকুমারের আদেশে গদ্যপদ্যময় অশ্লীল গজল রচনা করেন। এই-সমস্ত গজল নীতি-বিশ্ব কবি (Ethical Poet) শেখ সাদীর দ্বারা রচিত হইয়াছে বলিয়া আদৌ বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কবি শেখ সাদী এই অশ্লীল রচনার জন্ত কৈফিয়ৎ দিয়াছেন ও অল্পতপ্ত হইয়া শ্রীভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।* তিনি বলিয়াছেন—“এক বাদ-শাহপুত্র হকিম সোজানীর অশ্লীল গজলকে আদর্শ করিয়া আমাকে কতকগুলি গজল বচন করিতে আদেশ করেন। আমি তাঁহার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে অস্বীকৃত হইলে, তিনি আমাকে হত্যা করিবেন বলিয়া ভয় দেখান। প্রাণবধের আশঙ্কায় ভীত হইয়া এরূপ রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই রুচিবিরহিত কণ্ঠেব জন্ত আমি অল্পতপ্ত ও শ্রীভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। পারস্য-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে শুধু শেখ সাদীই নহেন, পারস্যের অনেক কবি, নীতিবেত্তা, অমার্জিত রুচি, চিন্তা ও ভাব দ্বারা নীতির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন।

পারস্যের প্রাচীন যুগে যে কবি অশ্লীলতাব অবতার রূপে “হকিম” উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন এবং যাহার অশ্লীল রচনাকে আদর্শ করিয়া কবি শেখ সাদী খেউড় গজল রচনা করিবার জন্ত তৎকালীন বাদশাহ-পুত্র কর্তৃক আদিষ্ট হন, সেই খেউড় গজলের কবি হকিম সোজানীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম। সমরখন্দনিবাসী হকিম মহম্মদ বি আলি সোজানীক প্রধানতঃ অশ্লীল এবং বিক্রপাত্মক কবিতার জন্তই বিশেষ ভাবে বিখ্যাত। শৈশব হইতে সোজানী প্রধানতঃ অশ্লীল ও বিক্রপাত্মক রচনাব অনুরাগী হন এবং পরিণত বয়সে তাঁহার প্রতিভা কুরুচি ছাড়া স্বরূচিপূর্ণ কবিতা রচনার দিকে অতি অল্প সময়ই নিয়োজিত হইয়াছিল। হকিম সোজানীর

বচিত অশ্লীল গজলগুলির মত অশ্লীলতার এরূপ অত্যাশ্চর্য্য নিদর্শন বোধ হয় কোন সভ্য দেশেব সাহিত্যে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক হামদুল্লাহ বলিয়াছেন, সোজানী তাঁহার কাব্যে চরম-অশ্লীলতা প্রকাশ করিয়াছেন।* দৌলত সাহ তৎপ্রণীত পারস্য কবিগণের জীবনী পুস্তকে লিখিয়াছেন—সোজানী কবিতা এতই অশ্লীল যে পড়িলেই বমনের উদ্রেক কবে।† এই কারণেই তিনি অশ্লীলতা প্রকাশ বৃদ্ধির ভয়ে সোজানী কবিতা উদ্ধার হইতে বিরত হইয়াছেন। কিন্তু পারস্যের সুপণ্ডিত লেখক ও জীবনীকার আউফিঃ সোজানীর অশ্লীল গজলগুলিকে প্রতিভাশালী কবির প্রতিভা-সঙ্গত রচনা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।‡ কবির অশ্লীল রচনা ব্যতীত অল্প সংখ্যক স্বরূচি ও গভীর ভাবপূর্ণ কবিতা আছে। ঐতিহাসিক হামদুল্লাহ যুক্তোক্তি বলেন, সোজানীর এইসকল রচনা সুন্দর ও অতুলনীয়। কথিত আছে নিম্নলিখিত কবিতা রচনার জন্ত কবি শ্রীভগবানের ক্ষমার পাত্র। আমরা নিম্নে সেই কবিশাট্রির অনুবাদ প্রকাশ করিলাম :—

তোমার এ বিশ্ব-গৃহে নাহি দুঃখ নাহি দৈন্য নাহি ক্রটিপাপ,
পাত্র ভরি' আমি তাহা করিয়া স্বজন বাড়াই সম্ভাপ।||
৫৬২ হিজরাকে (১১৭৩—৭৪) হকিম সোজানীর মৃত্যু হয়।||

শ্রীমুরেশচন্দ্র নন্দী

* তাবিখ-ই-গুজিদা।

+ অধ্যাপক ব্রাউন সম্পাদিত, আমির দৌলত সাহ প্রণীত তজ্জিবাতুসশোয়াব দ্রষ্টব্য।

‡ ইনি মহম্মদ আউফি নামে সুপরিচিত। ইঁহার প্রকৃত নাম মহম্মদ আবদুর রহমান বি আউফি। আউফি তৎকালীন অনেকগুলি সাধুব জীবনচিত্ত রচনা করেন। “লুবারউলআলবাব” নামক গ্রন্থেব জন্য আউফি বিখ্যাত। আউফি স্বপুত্র নশীর্দীন কুবচাবের রাজত্ব-সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন।

§ While Awfi, though regarding his facetiae as full of talent, considers it best * * * .—Oriental Biographical Dictionary.

¶ তাবিখ-ই-গুজিদা।

|| লেখকেব বস্তুত্ব জন্ত শেখ সাদীর জীবনীর এক পরিচ্ছেদ। বেঙ্গল পাবলিশিং হাус কর্তৃক শীঘ্রই পুস্তক প্রকাশিত হইবে।

* The author, however, seems to have repented of having written these indecent verses, yet endeavours to excuse himself on account of thus giving a relish to other poems, as “salt is used in the seasoning of meat.”—T. W. Peal.

+ তাবিখ-ই-গুজিদা—ইঁহার নাম আব্বাকর ইব্রিস-সোলমানি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

দাস বিক্রয়ের প্রাচীন দলীল

পূর্বে এই দেশে যে দাসব্যবসায় প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ আমাদের বর্তমান সমাজেও বিরল নহে। কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রাচীন দলীল পত্রাদিতেও কখন কখন পাওয়া যাইতেছে। ১৩২০ সনের ভাদ্রমাসের “সাহিত্য” পত্রিকায় এইরূপ একখানা দলীল প্রকাশিত হইয়াছিল। গত বর্ষের “ভারতবর্ষ” ও বর্তমান বর্ষের “প্রবর্তকে” এক-একখানা দলীল প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত উভয় দলীল হইতে জানিতে পারা যায় যে প্রায় ১৩০ বৎসর পূর্বে লোকে দুরবস্থায় পড়িয়া দাসরূপে বিক্রীত হইত, এবং ঋণ গ্রহণ করিয়াও দাসত্ব স্বীকার করিত। ইহাতে আমাদের দেশের কোন দুরবস্থাপন্ন পরিবারের শোচনীয় পরিণামেব কথাই জানিতে পারা যায়; কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকাযে ভাবে দাসব্যবসায় প্রচলিত ছিল, আমাদের দেশেও যে সেইভাবে দাসগণ ক্রীত ও বিক্রীত হইত, ইহার প্রমাণস্বচক কোন দলীল-পত্রাদি এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমি

জানি না। এইরূপ একখানা দলীল প্রকাশিত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই দলীলের প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহার প্রথম ভাগ পার্শী-ভাষায় লিখিত এবং সেই সময়ের প্রচলিত প্রথাভাষায় রাজদ্বারে রেজেষ্টারী-কৃত। দলীলের শিরোনামে একটি বৃত্তাকার মোহরের চিহ্ন আছে, তাহাতে “বাদেমেসরে কাজি, কেরামুদ্দিন” ও তাহার পার্শ্বে—“মোহর নং ৯” পার্শী ভাষায় লিখিত বহিষাছে। দলীলের তারিখ বাঙ্গলা ১১৯৫ সন অর্থাৎ ইংবেজী ১৭৮৮ সাল। সেই সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালীস বঙ্গদেশে শাসন করিতেন।

দলীল

[দলীলের প্রথমংশ পার্শী ভাষায় লিখিত, তাহা আমাদের ভাষার গুণীর বহির্ভূত। ইহা পবিত্যাগ করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত শেষের অংশের পাঠ প্রকাশিত হইল।]
“ইয়াদিকির্দ—

শ্রীরামনরসিংহ দত্ত মাকিন বিক্রমপুত্র সিমুলিয়া



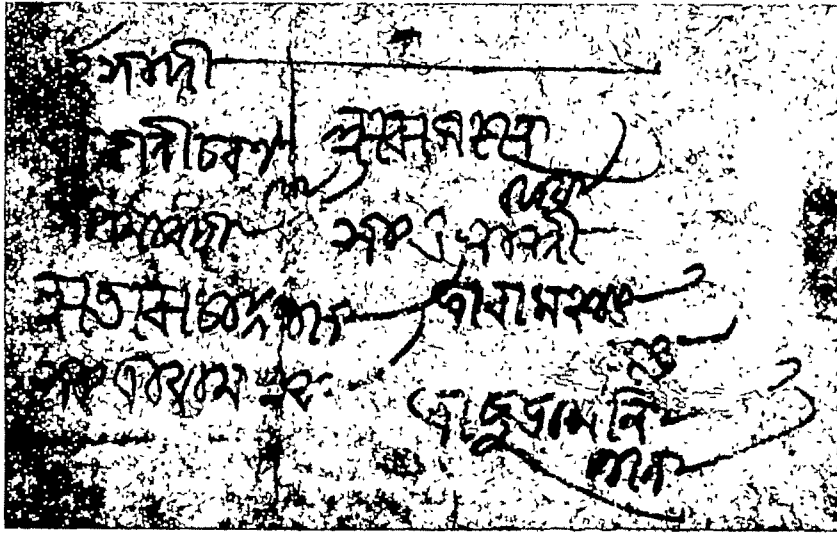
প্রমাণিত কিং
 বনামনবজিহাদ সাহিব বিক্রম—
 মিয়ানিয়া সচকিহ নিমিষ বাকমবদ—
 প্রবাদ কক্ষসামাদ ২৩ ন হকিমদ সাহিব বাকম—
 ধর স্য মনিস বিক্রিম মিদ ৫৪৪৪৪৪ অমী
 মোহাম্মদ হাকিম পেডাসান আদী আবশেব
 নকর নাযাদ এসব আমর সন্ধিমা বরষ বাকম
 দল ৩৪৪৪৪৪ বডিহ এহা আমর আপোন মো
 সজী কক্ষ বাহাল তবিয়ত আপোন হান বি
 লিগম এহা নগদ স্বর পূবওজন দহমাসী ১২ বাড
 কপাইথা আপোন হান দতবদত পাইলাম এহা
 মোহা জীমা খোবাক পোসাক দিয়া তোমাব পূজ
 পজাদী ক্রেমে দানবিকাদী কারি হইয়া নকরি
 ফাকর হতবত এদক্রে মনিস বিক্রী করিলাম
 ইতি ১২৪৪৪৪ ১৩ নবর সন বাঙ্গলা তারিখ ১৬
 আশ্বিন ১২৪৪৪৪

দাস বিক্রয়ের দলিল—বাংলা অংশ

উচরিতেষু লিপিত শ্রীরামধন দত্ত ওলদে কৃষ্ণরাম দত্ত ইভান
 হরিরাম দত্ত সাকীন শ্রীরামপুর কস্ত মনিস্ত বিক্রী-পত্রমিদ
 কার্জকগে আমি মহোদ্বিকো হালাক পেডাসান আদী
 আর কোন লক্ষ নাযাছে এসব আমাব খরিদা নকর
 শ্রীরামদাস ওমব চৌদ বডিহ এহাকে আমার আপোন
 খোষরাজী রকবতে বাহাল তবিয়তে আপোনার স্থানে
 বিক্র কবিলাম এহার নগদ মূল্য পূবওজন দহমাসী ১২ বাড

কপাইথা আপোনা স্থানে দতবদত পাইলাম এহার
 নোঙরা জীমা খোবাক পোসাক দিয়া তোমাব পূজ
 পজাদী ক্রেমে দানবিকাদী কারি হইয়া নকরি
 কর্ত করাইতে রহ এদদর্থে মনিস্ত বিক্রী করিলাম।
 ইতি..... এগা... নবর সন বাঙ্গলা তারিখ ১৬
 আশ্বিন—।”

দলীলের শিবোদেগে মোহরের অপর দিকে—



দাস বিক্রমের দলিল—দলিলের পিঠে সাক্ষীদের নাম

“ইসাদী—

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ রায়

শ্রীগোপীকৃষ্ণ সর্মা”

এবং পাশী লেখাব শেষভাগে এক পাঠে

“নিসাণ সৌ

শ্রীবামধন দত্ত”

লিখিত রহিয়াছে; এবং অপর পৃষ্ঠে সাক্ষীগণের দস্তখত আছে।

এই দলীলের ভাষা সম্বন্ধে কোন কথা না বলিলেও চলে, কারণ ইতিপূর্বে অনেক আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু “খরিদা নকর” ও “বিক্র করিলাম” কথাতে দাস-ব্যবসায় যে বিশেষভাবে বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ছিল তাহাই বুঝা যায়। ইহা ব্যতীত বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের একটি বিশেষত্ব এই দলীলে লক্ষ্য করিবার আছে। পূর্ববঙ্গে “রাঢ়ী” ও “বরেন্দ্র” ব্রাহ্মণগণ এখনও তাঁহাদের শ্রেণীগত বিশেষত্ব বজায় রাখিয়াছেন; কিন্তু অনেক কায়স্থ রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমি হইতে পূর্ববঙ্গে গিয়া বঙ্গীয় কায়স্থগণের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন। যে বামনরসিংহ দত্ত এই রঙ্গনদাসকে পরিদ কবেন, তাঁহার বংশধরগণ

এখনও উক্ত সিমুলিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন, এবং তাঁহারা আমার প্রতিবেশী। প্রায় দুই বৎসর পূর্বে তাঁহাদের ঘরে একখানা কুলজীগ্রন্থ আমি পাইয়াছিলাম। তাহা আমি রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিজ্ঞানহার্ণব মহাশয়কে দিয়াছি। ঐ কুলজী গ্রন্থে লিখিত আছে যে বামনরসিংহ দত্ত মহাশয়ের পূর্বপুরুষগণ পূর্বে রাঢ়দেশে শ্রীরামপুর, বারিষা প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেন, পরে বঙ্গদেশে গমন করেন। এই দলীলে দাসবিক্রেতা রামধনদত্তের নিবাস শ্রীবামপুর বলিয়া লিখিত আছে। বিক্রমপুর্বে শ্রীরামপুর নামে কোন গ্রাম আছে বলিয়া আমি জানি না। এই দলীলে বুঝা যায় যে বামনরসিংহ দত্তের পূর্বপুরুষগণ তখন সবেমাত্র শ্রীরামপুর হইতে উঠিয়া বঙ্গদেশে গিয়াছিলেন এবং তখনও তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীবামপুরের সম্বন্ধ লোপ পায় নাই। দলীলের অপর পৃষ্ঠে সাক্ষীগণের যে নাম ধাম আছে তাহাতে “শ্রীতারানাথ পাল, সাং শ্রীরামপুর” বলিয়া লিখিত আছে। কুলজীগ্রন্থের “আগে রাঢ়, শেষে বঙ্গে” এই উক্তি এই দলীলের দ্বারা কতকটা প্রমাণিত হয়।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু [এম-এ]

প্রলয়োল্লাস

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

এ নূতনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখীর ঝড়।

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,
সিদ্ধ-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ডাঙল আগল !

মৃত্যু-গহন অন্ধকূপে

মহাকালের চণ্ডরূপে

ধ্বংস ধূপে

বজ্র-শিখার মশাল জ্বলে আসছে ভয়ঙ্কর—

ওরে ঐ হাসছে ভয়ঙ্কর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

ঝামর তাহার কেশের দোলার ঝাপটা মেয়ে গগন চুলায়,
সর্বনাশী জালামুখী ধূমকেতু তার চামর চুলায় !

বিশ্বপাতার বক্ষ-কোলে

রক্ত তাহার রূপাণ কোলে

দোঁড়ল দোলে !

অট্টরোলের হুটুপে শুক চরাচর—

ওরে ঐ শুক চরাচর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

দ্বাদশ রবির বহি-জালা ভয়াল তাহার নয়ন কটায়,
দিগন্তের কাদন লুটায় পিছল তার ত্রস্ত জটায় !

বিন্দু তাহার নয়ন-জলে

সপ্ত মহাসিদ্ধ দোলে

কপোল-তলে !

বিশ্বমায়ের আসন তারি বিপুল বাহুর 'পর—

হাঁকে ঐ “জয় প্রলয়ঙ্কর !”

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

মাইভে মাইভে ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিষে আসে,

জরাধ-মরা মুয়ুর্দে প্রাণ লুকানো ঐ বিনাশে !

এবার মহানিশার শেষে

আসবে উষা অরুণ হেসে

করণ বেশে !

দিগন্তের জটায় হাসে শিশু চাঁদের কর—

আলো তার ভরবে এবার ঘর।

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

ঐ সে মহাকাল-সারথি রক্ত-তড়িৎ-চাবুক হানে,

রথিষে ওঠে হ্রৈয়ার-কাঁদন বজ্র-গানে ঝড়-তুফানে !

স্করের দাপট তাবায় লেগে উক্ক ছুটায় নীল খিলানে—

গগন-তলের নীল খিলানে !

অন্ধকারার বন্ধ কূপে

দেবতা বাঁধা যজ্ঞ-ধূপে

পাষণ-স্তূপে !

এই ত রে তার আসার সময় ঐ রথ-ঘর্ষর—

শোনা যায় ঐ রথ-ঘর্ষর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর ? প্রলয় নূতন-স্বজন-বেদন !

আসছে নবীন, জীবন-হারা অস্থলরে কর্তৃতে ছেদন !

তাই সে এমন কেশে বেশে

প্রলয় বয়েগে আসছে হেসে—

• মধুর হেসে !

ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-স্বন্দর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

ঐ ভাঙা গড়া খেলা যে তার কিসের তবে ভর ?

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !—

বধূরা প্রদীপ তুলে ধর !

ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে স্বন্দর !—

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

কাজী নজরুল ইসলাম

সব পেয়েছির দেশে

সেদিন সমস্ত দুপুর ও বিকেল আমাব সেই শীর্ণদেহ
অ্যানার্কিষ্ট বন্ধুব সঙ্গে অশ্রান্ত তর্ক করে' শ্রান্ত হয়ে
পড়েছিলুম। টুর্গনিভ তাঁর এক নভেলে রুসযুবক সম্বন্ধে
লিখেছেন—রাসিয়ানরা অফুরন্ত তর্ক চালাতে ওস্তাদ।
কিন্তু তিনি যদি বঙ্গযুবকদের সঙ্গে পরিচিত থাকতেন তবে
তাঁকে স্বীকার করতে হত অপরিণীত তর্ক করবাব
অপরিমেয় শক্তিতে বঙ্গযুবকদিগের নিকট রুসযুবকগণও
হার মানে, রুডিনের অপেক্ষা বাকবীর এদেশে অনেক
খুঁজে পেতেন। সোসিয়ালিজম্, অ্যানার্কিজম্, নিহিলিজম্
কমিউনিজম্—অনেক ইজম্-এর ঘাতপ্রতিঘাতে ম্যার্ক্স,
টলষ্টয়, ক্রোপটকিন, লেলিন, গান্ধী, অনেক বিদ্বান্নামের
বঙ্গধন শব্দ-উৎসবে তর্কের ঝড় উদ্দাম হয়ে উঠছিল। তর্ক
হয়ত সারারাত থামতো না, ভাগ্যক্রমে আমার বন্ধুর
মনে পড়ে' গেল কোন্ আড্ডায় কি বিষয় নিয়ে তাঁর
অদ্ভুত বাক্‌চাতুরী দেখাবার নিমন্ত্রণ আছে। আমাকে
রেহাই দিয়ে তিনি যখন গেলেন তখন সন্ধ্যার স্নিগ্ধতাহীন
অন্ধকার। চেয়ারটা টেনে বাবান্নাষ এসে বসলুম, বিষ-
নিশ্বাসের মত ধূমে আতঙ্কিত নগর হুঃস্থপ্নের মত পড়ে'
রয়েছে, ধৌণ্ডার কুজাটিকা পার হতে না পেবে চাঁদেব
আলো করণনয়নে চাইল। রজনীগন্ধার ঝড়টা ড্রেনের
ছুর্গন্ধের কাছে হার মেনে নতমুখে পড়ে' রয়েছে; দুবে
গ্যাসের আলোটা ধেন কোন্ চিরজ্বালাময় তৃষ্ণা-লোকের
গ্রহরীর মত দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ বসে' দম আটকে আসতে
লাগল। বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।

পথে কোথাও একটু ধৌণ্ডার কালিমা নেই, অকলঙ্ক
নীলাকাশে তাবালোক জুইফুলের ঝাড়ের মত মাথাব
ওপর ছেয়ে রয়েছে; স্বধাসৌরভময় বসন্তের বাতাস
বইছে। আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। মনে হলো কোন্ রূপ-
কথার স্বপ্নময় সৌন্দর্য্যলোকে এসে পৌঁছেছি। মোড়ের
কাছে যে ডাষ্টবিনটা ছিল, সেটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে
গেছে, তার জায়গায় একটা সোনালী ডালিয়া ফুলের
গাছ; তার পাশে যে পত্রহীন শীর্ণ কুম্বচূড়াগাছ দিন
দিন দীর্ণ হচ্ছিল, সেটা ফুলে ফুলে ভরে' নটবর অগ্নিশিখার

মত বাতাসে নৃত্য করছে; সহসা একটা কুহু ডেকে উঠল।
অবাক হয়ে চমকে দেখি, বাস্তার গোড়ে যে বৃদ্ধা ভিখারিনী
করুণ আর্ন্তনাদে ভিক্ষা চাইত, আর যে ছোট মেয়েটা
ভয়ঙ্কর ময়লা ছেঁড়া নেকড়া পরে' আন্তাকুড়ে আন্তাকুড়ে
ছেঁড়া কাগজ আব নেকড়া কুড়িয়ে বেডাত, তাবা জ্যোৎস্না-
মার মত শুভ্র নির্মল বসন পরে' হাসছে আর খেলা
করছে। বোজ যখন এই পথ দিয়ে গেছি—ওই ভিখারিণীর
কঙ্কালসার দেহ ভীতিপ্রদ করুণ মুখ দেখে চোখ বুজতেই
ইচ্ছে কবেছে; দেখেছি—মানব-শক্তি ও সভ্যতার
মহাদম্ভের মত মোটরকার তার পাশ দিয়ে জয়ধ্বনি কবে'
চলে' গেছে, কিন্তু সে অহিনিশি করুণ ক্রন্দনে সবাইকে এই
কথাই স্মরণ করিয়েছে—মানব-সভ্যতা একদিকে মোটরকার
আর একদিকে এই রোগ-দারিদ্র্যের মূর্তি সৃষ্টি কবে'
চলেছে। আজ তার মুখেব হাসি দেহেব দিব্য শ্রী দেখে
বহুক্ষণ চেয়ে বইলুম। মন-ভোলানো বাঁশীব তান কানে
এলো। ওই কোণে যে বিড়িব দোকানটা ছিলো,
সিগারেটের ও দেশলাইয়ের বাস্স দিয়ে তৈরী ঘরে বসে
যত পক ও অকালপক লোকগুলো ছোট ছেপেদের
নিয়ে সারাদিন বিড়ি পাকাতো আর অলীল গল্প করত,
তাদের হীনবাস কালিভরা-মুখ ও বিড়ির গন্ধে স্থানটায়
যেতে ঘুণা হত—দেখি, সে বিড়ির দোকান নেই,
সেখানে এক কদমফুলের গাছ উঠেছে, আব তাব তলায়
মুসলমান ছেলেরা লাল নীল নানা রংএর সাজ পরে' বাঁশী
বাজছে। আর ওইখানে যে মহাপঙ্কিলতাময় ভয়ঙ্কর
বস্তি ছিল, যেখানে নর্দমায় নর্দমায় বাঁধা জল পচে, রুদ্ধ
মাটির কূপে কূপে দাসত্বপীড়িত প্রাণ পচে, সভ্যতার
বন্ধশ্রোত পচে' বিষিয়ে ওঠে, সূর্যের আলো কি জ্ঞানের
আলো যেখানে পৌঁছাতে পারে না, দখিন বাতাস কি
প্রেমের হাওয়া প্রবেশ করতে পথ খুঁজে খুঁজে ফেরে,
পাপবিভীষিকাময় রোগাতঙ্কিত হুঃস্থদারিদ্র্যের চির-
অন্ধকারময় রাত্রিলোকে ভূতের মত মাহুঘেরা ঘোরে—
অবাক হয়ে দেখলুম আদিমযুগের অসভ্যমাহুঘের
গুহাগন্ধের চেয়েও ভয়ঙ্কর সেই শাসিক জন্তুদেব খোলা-

ছাওয়া মাটির গর্তগুলো আর নেই—সে স্থানে নারিকেল তালি তমাগা-গাছের সারি, তাদের তলে তলে কাঁচ ও কাঠের ছোট ছোট কুটীর; মহাশয়, শ্যামল পাতায় পাতায় লাল নীল নানা রংএর কাচের ছাদে দেওয়ালে জ্যোৎস্নার আলো রংএর হোলিখেলা করছে,—কয়েকখানি ছোট বাড়ীর মাঝে দধির মত স্নিগ্ধমুখ শ্বেতপাথরের বাড়ী, সেখান থেকে হাসি-গানের শব্দ আসছে, মনে হলো খুব ভোজ চলছে; লাল পাথরের জালতি দেওয়া দরজায় যে মুসলমান নারী দাঁড়িয়ে হাঁদছে আর গল্প করছে—তার স্নিগ্ধমুখ গিট্ট কণ্ঠ শুনে অবাক হলাম। বস্তির সামনের জলের কলে তার দোঙ্গাও প্রতাপ-সবাই জানে, সবার শেষে এসে নিছক গলার জোরে ও মুগ্ধমুখিতে সে আপনার কলসীগুলি বাইরের আগে ভরে নিয়ে যায়। সে যাদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে গল্প করছিল তাদের মধ্যে একজন গুজরাটী আর একজন বাঙ্গালী বাবুর বেশে থাকলেও বেশ চিন্তে পারলুম—প্রথম জন হচ্ছে আমার এক গাঙ্গীভক্ত ননকো বন্ধু গোলদিঘিতে বক্তৃতা দিয়ে জেলতীরে গেছে; আর যে পুলিশ সার্জেন্টটা বন্ধুকে মেরে হাত ভেঙ্গে দিয়ে লালবাজারে ধরে নিয়ে গিছিলো, সেই আঙ্গির পাগলাবী পরে আতর মেখে গল্প জমিয়েছে। এ সব দেখতে দেখতে এত আবিষ্ট হয়ে গিছিলুম যে আশ্চর্য হবাব মত মনের ভাব ছিল না—কিন্তু গাছের তলা ছেড়ে পথে একটু যেতেই পরমাশ্চর্যকর এক ব্যাপারে মনটা নড়ে উঠল। তারার মালার মত বেলফুলের ঝড়ের তলায় আমাদের পাড়ার সেই স্বদখোর বেনে মহাজনটা—হাঁ, সেই স্বদখোর পাশগুটা, ভোর হতে গভীর রাত পর্যন্ত তাকে কেবল বাঘের মত হিংস্র চোখ দুটো জালিয়ে সিন্দুক টাকা তুলতে আর খাঁড়ার মত নাকটা হিসেবের খাতায় গুজে স্বদের অঙ্ক কসতেই দেখেছি—সে আনন্দে বেহালা বাজাচ্ছে আর শরৎসেফালির মত স্বন্দর এক খুকীর সঙ্গে নাচছে, মাঝে মাঝে চাপা রংএর চুলগুলোর ওপর চুমো খাচ্ছে—সোনারংটার প্রতি লোভি এখনও তার ষায়নি। ব্যাপারটা দেখে পথের মাঝখানে এক গোলাপ-গাছের তলায় বসে পড়লুম। একটু বসেই গাড়ীচাপা পড়বার ভয় হলো; কিন্তু কোথাও

কোন মোটর বা গাড়ীর শব্দ নেই, এ রাস্তা দিয়ে যেন কখনও কোন গাড়ী চলে না।

বসে ভাবছি, এ কোন্ অদ্ভুত দেশে পৌঁছলুম, না জানি এবার কি বিচিত্র কাণ্ড ঘটবে। বেশীক্ষণ ভাবতে হলো না, দেখি অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রেঙ্কম্যানের মত সেজে এক যুবক এক বাঙ্গালী মেয়ের হাত ধরে গান গাইতে গাইতে আসছে—

‘চলি গো চলি গো, যাই গো চলে’,

পথেব প্রদীপ জলে গো—গগনতলে।’

তারা এসে আমার গাছের কাছে দাঁড়ালো, ভেবেছিল হৃৎ জায়গাটার কেউ নেই। গাছের তলাটা আমার ছেড়ে দেওয়া উচিত ভেবেই দাঁড়িয়ে উঠলুম। আমার মুখে পথের আলো পড়তেই রবেসপেয়ারেব মত সাজপরা যুবকটি আনন্দের সঙ্গে ডাকলে, ‘বন্ধু, তুমি!’

ভালো করে চেয়ে দেখি এ যে আমার সেই রেভলিউ-জানিষ্ট বন্ধু। ‘কি আশ্চর্য, তার শীর্ণদেহ লাবণ্যে ভরে উঠেছে, চোখের চশমাটা ধসে গেছে, আর সবচেয়ে আশ্চর্য তার হাতে কোন বই নেই, আছে একটা বাঁশী। সে কোন তর্ক স্বরূপ করলে না।

আমি বললুম,—‘তোমাকে দেখে বাঁচলুম। এ যে কোন্ অদ্ভুত দেশে এসে পড়েছি ভাই, আমি ত কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।’

‘সে হো হো করে’ হেসে উঠল, এমন প্রাণ খোলা হাসি যে সে হাসতে পারে তা আমার ধারণাই ছিলো না। বললুম,—‘তুমি যে ভাই এমন গান গাইতে পারো এটা এতদিন লুকিয়ে রাখা তোমার ভয়ঙ্কর স্ত্রায় হয়েছে।’

হাসিটা কোনমতে থামিয়ে সে বলল,—‘এ হচ্ছে সব পেয়েছির দেশ, জানো না কবি বলে’ গেছেন,—“যে যায় সে গান গেয়ে যায়, সব পেয়েছির দেশে।”’

আমাদের পাশ দিয়ে এক প্রোট ব্যক্তি বাউলের বেশ পরে এক হরিণ-শিশু কোলে নিয়ে একতাবা বাজাতে বাজাতে চলে গেলো, তার পেছন পেছন নৃত্য দোহুল ছোট ছেলের দল।

বন্ধুর দিকে চেয়ে বললুম—‘এ দেশটা দেখবার জে আমার অনেকদিন থেকেই খুব ইচ্ছে। আমি ত ভাই

এদেশের পথ চিনি না, মানুষদেরও জানি না, তুমি যদি আমার সঙ্গী হও। তোমার কোন কাজ নেই ত ?' তাব পাশের সঙ্গিনীর কথা আমাব সত্যি মনে ছিল না।

বন্ধুটি আবার অটহাস্য কবে' উঠল, বলে,—‘এ দেশের ত পথ চিনতে হয় না, সব পথই ত পথ, অপথ কোথাও নেই; আর লোকদের চেনা—পথের ধারে কি অচেনা ঘরে থাকে ভালো লাগবে, ভালো বাসতে ইচ্ছে করবে, তাকে বন্ধু বলে' ডাকলেই হলো, সে তোমার চিরপ্রিয় হয়ে গেলো।—আর কাজের বালাই এখানে মোটেই নেই, সব সময়ের ছুটি—যে যা করবে তাই তার কাজ।’

হাওয়ায় গোলাপকুস্তি ছলে উঠল, কানের কাছে এস্রাজের ঝঙ্কার উঠল, কিবে দেখি বন্ধুর তরুণী সঙ্গিনীর চন্দনকাঠের এস্রাজটা আমাব ডাকল ‘বন্ধু!’

জ্যোৎস্নাধোত আকাশের নীলিমাব মত নীলসাড়ি অরুণতরুণজ্বরী জড়িয়ে ঝলমল করছে, যমুনাজলেব মত কালো কেশে কেতকীকদম্বের মালা জড়ানো, চম্পক-অঙ্গুরির স্পর্শে সোনার তারগুলিতে ঝঙ্কার দিয়ে তাবার আলোর মত পথ-ভোলানো নখনে চেবে ডাকলো,—‘বন্ধু!’

ধীবে এগিয়ে পদ্মের পাপড়ির মত তাব আঙ্গুলগুলি জড়িয়ে আগিও ডাকলুম,—‘বন্ধু!’

তরুণী মুখে কিছু বলে না, এস্রাজের তারে কথা বেজে উঠলো,—এসো, আমি তোমাব সঙ্গিনী হয়ে এ দেশ দেখাচ্ছি।

অবাক হয়ে আমার পুরানো বন্ধুর দিকে চাইলুম। তরুণী এস্রাজটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে বেণে ঝর্ণার সুরে বলে,—‘এসো বন্ধু!’ আমাব হাত ধবে' টেনে নিয়ে চল।

অ্যানারকিষ্ট বন্ধুটি মুচ্কে হেসে বলে, ‘না, না, আমি একটুও রাগ করছি না। জানো, এ দেশে ঈর্ষ্যাবিদ্রোহ নেই। কোন ভয় নেই তোমার। ওই দেখ্‌ছ লালভোরা-কাটা বাসন্তী রংএর সাড়ি-পর্য ছোট খুঁকীটি, একটা খরগোস কোলে কবে' আস্ছে, ওর সঙ্গে ভাব কবে' আমি এখনি এখানে বাঁশী বাজাতে বসে' যাব।’

অল্প সময় হলে আমার বোধহয় ভয় হোত। সে দেশের হাওয়ায় কি গুণ ছিল,—আমাব একটুও দ্বিধা সঙ্কোচ

হলো না, দু'জনে হাত ধরাধরি করে' চলুম; সবচেয়ে আশ্চর্য্য—তরুণীর সঙ্গে আমি গান জুড়ে দিলুম, গলা ঠিক মিলে গেল, একটু বেহর হল না।

সে থেমে বলে—তুমি গান্ধীযুগেব লোক, নথ ?

—হাঁ। কেমন করে' বুঝলে ?

—তোমার ওই মোটা খন্দেরের সাজ দেখে'। আমি ইতিহাসটা ভালো করে' পড়েছি কিনা, তাই তোমাব সব দেখাবার ভার নিতে সাহস হলো।

—সাজটা এদেশের মত কবে' নিতে পারলে ভালো হয় বোধ হয়।

—কি দরকার, এখানে যে যার নিজের খুসিমত সাজে। ওই ছেলোটা দেখো ইউরিপিডিস্-যুগের গ্রীকের মত সেজে চলেছে আর তার পাশের বন্ধুটি ক্রিয়োটোর সময়ের ঈজিপ্সিয়ান নারীব মত সেজে যাচ্ছে। তোমার কি কাপড়-জামা বদলাতে ইচ্ছে করছে ?

—হাঁ, এ দেশের মত।

—বন্ধু ত এ দেশের কোন বিশেষ সাজ নেই, আপন সৌন্দর্য্যবোধ অনুসারে যে যা-খুসি সাজে, যে কোন গভ-শতাব্দীর যে কোন দেশের সাজ পরতে পারে।

পথের দুইধারে গাছের সাবির মধ্য দিয়ে চলুম। গাছের পাতার মাঝে মাঝে লাল নীল সাদা নানা রংএর আলো মাণিকের মত জ্বলছে।

বন্ধু—ওগুলো কি ইলেকট্রিকের আলো ?

হেসে বলে,—না, ইলেকট্রিক কি, আমরা বেডিয়ামের যুগও পার হয়ে এসেছি। ওগুলো হচ্ছে মণি, ওই ইন্দ্র-নীলমণি, ওই চন্দ্রকাস্তমণি...

—কি সুন্দর দেখতে, কিন্তু তোমার এস্রাজটা যে ফেলে এলে!

—ফেলে এসেছি কি ?

—হাঁ সেই গোলাপ-গাছের তলায়।

—ও, তুমি আজ নতুন কিনা, তুমি জানো না—এ দেশেব কথা; এখানে প্রত্যেক জিনিষ হচ্ছে সবাইয়ের জিনিষ, যার যখন যে-জিনিষ দরকার সে সে-জিনিষ ব্যবহার করে।—আমি ত এখন এস্রাজ বাজাচ্ছি না, অবশ্য কোনো দোকানে রেখে এলে ভালো হত—তা

ওটা যার দরকার হবে গাছতলা থেকে তুলে নেবে।—

তোমার কি বাজনা শুনে ইচ্ছে করছে?

—হাঁ, একটা গাও না কিছু!

—দেখি এ কন্মসগুলোর কাছে নিশ্চয়ই কেউ কোন বাস্তব রখে গেছে। এই দেখো, একটা বীণ পাওয়া গেলো!

—তুলে নিলে যে, কার ওটা?

—কার কি! এখানে সব জিনিষ যে প্রত্যেকের জিনিষ। বীণটা আমার দরকার হয়েছে আমি নিয়ে চলুম, বাজানো শেষ হলে কাউকে দিয়ে দেবো অথবা কোথাও রেখে যাব।

বীণ বাজাতে বাজাতে একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালুম—তার মেজ্জেটা লাল মার্বেলের, দেয়ালগুলো নীল কাঠের আর ছাদটা হীরের মত সাদা কাঠের। ঘরের মধ্যে জাপানী-পোষাক-পরা এক যুবক এক ঠোঙে গরম গরম বেগুনী ফুলুরী ভাজছে, আর লাল ভেলভেটের জ্বক পরা এক খুকীকে মহানন্দে খাওয়াচ্ছে।

আমি বল্লুম—কি হৃদয় বেগুনীগুলো ভাজছে!

—তোমার ভারি লোভ হচ্ছে? এসো না কিছু খাওয়া যাক।

—না, নিশ্চয় পচা তেল।

—কি, পচা! অর্থাৎ করলে তুমি, সবপেয়েছির দেশের এতবড় অপমান কেউ কখনও করেনি। এখানকার সব জিনিষ ভাজা, সব মানুষ চিরনবীন, সতেজ স্বাধীন—এসো তুমি।

আমরা কাছে পৌছতেই জাপানীটি বল্লেন—এসো বন্ধু, আমার ভাজা শেষ হয়েছে, তোমাদের কি আমি ভেজে দেবো?

তরুণী বল্লেন—না, আজকে আমার নতুন বন্ধুকে আমি নিজ হাতেই ভেজে খাওয়াব।

যুবক ও খুকীটি কয়েকখানি বেগুনী মহানন্দে খেতে খেতে চলে গেল।

আমি বল্লুম—ও দোকান ছেড়ে গেল কোথায়?

অস্বস্তামণিময় বাঁটিতে নীলবেগুনগুলো ফালা করতে করতে বন্ধু হেসে বল্লেন—আহা তুমি ভুলে যাও কেন, এ

দোকান যে সবাইয়ের দোকান, এখানে private property বলে কোন হাঙ্গর জিনিষ নেই। আমাদের বেগুনী খাবার ইচ্ছে হলো, আমরা ভেজে খেয়ে গেলুম। তুমি কড়ায় তেলটা চড়াও অথবা বীণটা বাজাও, বেগুনী ভাজার সঙ্গে সঙ্গে তারেব স্বব ভারি হৃদয় শোনাবে।

নিঃসঙ্কোচে বীণটা তুলে নিলুম এবং আশ্চর্যের বিষয় মন্দ বাজালুম না।

জিজ্ঞাসা করলুম—এটা কি ইলেকট্রিক ঠোঙ?

—হাঁ, এটা অনেক শতাব্দীর আগেকার জিনিষ; এখন সবচেয়ে নতুন রান্নার উল্লন হচ্ছে সূর্যমণি—সে আর কিছু নয় একটা পাত্রে সূর্যের তেজ জমা করা হয়, তাব আগুনের শিখায় বেশ রান্না করা যায়;—আর এই ঠোঙের ইলেকট্রিসিটিও সূর্যের আলো থেকে নেওয়া—না, না, এ দেখছি বর্ষার জলধারা থেকে জমা করা।

খুব আনন্দের সঙ্গে রান্না আর খাওয়া শেষ হলো; তারপর বন্ধু দক্ষিণ-হাওয়ার মুখে রাঁধবার যন্ত্রটা কি রকম কায়দা করে' রাখলে।

বল্লুম—ওটা কি হলো?

—অনেকখানি ত আগুন খরচ করলুম, হাওয়া থেকে কিছু আগুন ওতে জমা হোক।—রোসো জায়গাটা পরিষ্কার করে' বাই।

ঘরের কোণ থেকে সোনার সফ কাটির গুচ্ছের মত একটা ঝাঁটা টেনে নিয়ে বন্ধু ভারি খুশি হয়ে সমস্ত ঘর ঝাঁটি-দিতে আরম্ভ করলে। দেখলুম ঝাঁটার কাটিগুলি থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝরে' মেজ্জেটাকে ধুইয়ে দিচ্ছে, কোন ধূলো উঠল না।

বল্লুম—ঝাঁটাটা ত ভাবি মজাব।

—আর ঝাঁট দিতেই কি মজা কম?

—বাস্তবিক ঝাঁট দিতে ভারি আনন্দ পাচ্ছ দেখছি।

তোমরা পৃথিবীর স্ত্রী কিনা, অসৌন্দর্য্য তুমাদের সখ না, সব মলিনতা আপন হাতে নির্মল হৃদয় করে' তুলতে চাও। কিন্তু ঝাঁটার মুখটা যতক্ষণ মাটির বুকের দিকে থাকে ততক্ষণই ভাল, আকাশের দিকে উঠতে চাইলেই মুশকিল হয়।

—হাসালে তুমি, অমন কাণ্ড এদেশের নাট্যশালার রকমক্ষে ছাড়া আর কোথাও হয় না।

যব পরিষ্কার কবে' পথে বেরিয়ে পড়তেই আমি বল্লুম—কিন্তু একটু ত জল খাওয়া হলো না।

—জলতেষ্টা পেয়েছে? চলো সামনের বাড়ী যাওয়া যাক।

—ওই বাড়ীটা? ঠিক যেন মধ্যযুগের ব্যারনদের ক্যান্স?—জানান্তো আছে?

—নাই বা রইলো!

—নাই বা রইলো!—trespass হয় যদি?

—কি? কি বললে?

—trespass—অনধিকার-প্রবেশ।

—ও, মনেই থাকে না তুমি বিদেশী!—এদেশে কার কি অধিকার বা কর্তব্য তা কেউ জানে না, তাই নিয়ে তর্কসভা ডাক্তে, কমিটি কমিসান বসাতে বা বড় বড় পুঁথি রিপোর্ট লিখতেও হয় না;—সবাই আনন্দে কাজ করে' যায়—যার যখন যা ইচ্ছে হয়।—আমাদের জীবনের একটা principle, সেটা হচ্ছে—খুসি!

—আমার বন্ধু, খুসি হচ্ছে ওই যে মেয়েটা সবুজ ঘাঘরা ঘোরাতে ঘোরাতে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ছলিয়ে লোহার চাকাটা বোঁ বোঁ করে' চালিয়ে চলেছে, ওর সঙ্গে একটু চাকা ঘোরাই।

—তা চলো না! বা এই যে ছুখানা চাকা পড়ে' রয়েছে, কাটি হুকু—চলো—

সত্যিসত্যিই ছুখনে ছুখানা চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে চল্লুম। সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই, রাস্তার কোণে বেণুবনের তলায় যে ভট্টাচার্য্য-পণ্ডিতেরা প্রবীণাদের সঙ্গে বসে' গল্প করছিলেন, তাঁরা একটুও আপত্তি জানালেন না, একটু জ্বকুটিও করলেন না।

চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে আমরা এক বড় রাস্তায় এসে পৌঁছলুম। বন্ধুর চাকাটা বলে' উঠল—এবার আমরা দোকানের রাস্তায় এসে পড়েছি।

আশ্চর্য্য এদেশের মেয়েরা, এরা লোহার চাকা থেকে গিষ্টি কথা বের করতে পারে।

চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে বন্ধু এক লাল কাচের

বাড়ীতে ঢুকে পড়ল। এ বাড়ীগুলোর কোন দরজা লাগানো নেই, দরওয়ানও নেই। আমিও বন্ধুর পেছন পেছন গিয়ে সবুজ মৎসলে মোড়া ঘরে চাকাসুদ্ধ ঢুকে ভারি অপ্রস্তুতে পড়লুম, ভাবলুম এবার বুঝি দোকানের লোক-গুলো তেড়েই আসে। কিন্তু একটি যুবক ও নারী হাসতে হাসতে আমাদের দিকে অগ্রসর হলো দেখে' ভরসা হলো। একজনের সাজ লাল সিল্কের, রাজপুত্রের মতো; আর একজনের সাজ ইরাণী স্তন্যরীর মত। আমার তরুণী বন্ধু চাকাটা গলায় মালার মত ঝুলিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হেসে বললে—আজকের রাতে কি সাজ করা যায় বল তো রাজপুত্র?

—তুমি ধেরকম চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে এলে, আজ জিপ্সি সাজ পরো।

—আচ্ছা বেশ। আমাব এই নতুন বন্ধুকে একটি বেশ ভালো সাজ দাও। এর গাছীব খন্ডের পছন্দ হচ্ছে না।

ইরাণী বললে—আচ্ছা একে বেহুয়িন সর্দার সাজিয়ে দিচ্ছি।

—আচ্ছা তাই, তা হলে শীগগীর আমাদের দাও।

আমি দেখলুম, বড় ঘরের চারদিকে কত রংঘের কত রকমের সাজসজ্জা টাঙানো, যেন একটা বড় সিনেমা কোম্পানির গ্রীন্সকম। আফ্রিকার অসভ্যদের সাজ, গ্রিন-ল্যাণ্ড-বাসীদের সাজ থেকে চীনে জাপানী কতরকমের সাজসজ্জা। বন্ধুটি বললে—এই ছুইজনের পৃথিবীর সকল দেশের সকল যুগের সাজসজ্জা সম্বন্ধে জ্ঞান অজুত।

বন্ধু জিপ্সি-তরুণী সাজলে, রক্তের মত লাল মথুলের ঘাব্বা, উষার মত অরুণ-বরণ সিল্কের জামা, তার ওপর সমুদ্রের মত নীল ওড়নায় তারার মত হীরের কুচি জলছে, মুক্ত বেণীর সঙ্গে রক্ত-গোলাপের মালা জড়ানো। বেহুয়িন-সর্দারের জমকালো সাজটা পবে' আমি এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম যে পুরানো জামাকাপড়ের কথা মনে ছিল না। জিপ্সি স্তন্যরী বললে—বেশ সাজ হয়েছে তোমার, চলো। তখন মনে পড়ল পকেটে যে অনেক টাকা ছিল। তাড়াতাড়ি খন্ডের পাঞ্জাবীটা ইরাণীর হাত থেকে ছিনিয়ে পকেট থেকে নোট টাকা বের করতে করতে বল্লুম—কত দাম দিতে হবে এর, সাজের কত দাম?

আমার কোন কথা এন না বুঝতে পেরে তিনজনে আমার মুখেব দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

আমি আবার বল্লুম—কত দাম, খুব বেশী নাকি?

তরুণী তখন মধুর হেসে বল্লে—এ আজ নতুন এসেছে। বন্ধু, এ দেশে ত কোন জিনিষের দাম দিতে হয় না; সে ব্যবসার বর্বরতার যুগ অনেকদিন কেটে গেছে—আমাদের ত কোন টাকাই নেই!

আমি কাপড়-জামাগুলো তুলে গুটিয়ে নিচ্ছি দেখে সে আরও হেসে বল্লে—ও কাপড়-জামার বোকা কেন মিছে বয়ে মরবে? যদি পরে পরতে ইচ্ছে হয়, এ দোকানে কিষা যে-কোন দোকানে গিয়ে পাবে।

আমার হাতেব টাকা সিকি ছয়ানি দেখে ইরাণী আনন্দে লাফিয়ে আমার হাতের উপর ঝুঁকে পড়ে নিজের হাতে ছিনিয়ে নিয়ে বল্লে—কি মজার জিনিষ, এগুলো কি?

—আমাদের দেশের টাকা।

—আগেকার লোকগুলোর একটুও সৌন্দর্য্য-বোধ ছিল না, আমাদের দেশের ছেলেরা যে টাকাগুলো নিয়ে খেলা করে সেগুলো এব চেবে ভাল দেখতে। তাতে এর চেয়ে ভালো ছবি আছে।—কি একটা ছবি—কার?

—আমাদের রাজার।

—রাজা! এই রকম রাজা?

রাজপুত বল্লে—চলো আমাদের ঐতিহাসিক বন্ধুব কাছে, সে সব বলে দিতে পারবে—এ রাজা কোন্ যুগের কোন্ দেশের ছিল, এর মন্ত্রীরা কিরকম যুদ্ধ-যুদ্ধ পেলা করত।

আমি ধীরে বল্লুম—তোমাদের রাজা নেই?

তরুণী ধীরে আমার হাত ধরে বল্লে—আছে বৈকি বন্ধু! আমবা প্রত্যেকে প্রত্যেকেব রাজা; আবার তুমি আমার রাজা, আমি তোমার রাজা! এসো, তোমার বাজারটা দেখাই।

বাইরে বেরিয়ে এলুম। হৃদয়ে ছোট ছোট বাড়ীর সারি, কোনটা কাঠ ও কাচের, কোনটা নানারংব পাথরের, কোনটা পর্ণকুটীর, কোনটা মন্দিরের-মত! মাঝে মাঝে বেগুপথ, লতাকুড়, পুষ্পবীথিকা। বাড়ীর দেওয়ালে মাঝে

মাঝে স্তম্ভর স্তম্ভর ছবি আঁকা; থিয়েটারের, চুপটের, ঔষধের বিজ্ঞাপন ইত্যাদি কোন বিজ্ঞাপনের বিশেষ কাগজ মারা নেই, ব্যবসাদারদের স্প্রুচর মিথ্যাকথায় ভরা লাল নীল নানা রংব কাগজে কালীতে দেওয়ালগুলো কদর্য হয়ে ওঠেনি, এমনকি দোকানের সামনে কোন সাইনবোর্ডও নেই। জুতোর দোকানের সামনে মস্ত জুতো ঝুলছে, জামার দোকানের সামনে জামা।—কি শাস্ত স্নিগ্ধ সব! শুধু মাছবের পায়ে চলার ধ্বনি, গানের স্বর আর হাসির শব্দ।

এ পথ ছাড়িয়ে এক প্রশস্ত পথে এসে পড়লুম। এক-কোণে কয়েকটি মণির অঙ্করে জলছে, 'মালবিকা'।

বল্লুম—ওটা কি!

—ও হচ্ছে এ পথের নাম। মালবিকা এক প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী ছিল, তাঁর নামেই পথ। এ দেশে ত গভর্ণর বা বড়-লোক নেই যে তাদের নামে প্রতিদিনের চলবার পথ হবে?—যারা সত্যিকার হৃদয়জয় করে যায়, যেমন শিল্পী কবি বৈজ্ঞানিক, তাদের নামেই পথ হয়।

—আচ্ছা তোমাদের দেশে কি কোন গাড়ী নেই?

—আমরা পায়ে চলতে এত আনন্দ পাই যে গাড়ীতে চড়ি না। অবশ্য মোটর ট্রাম, সেই-সব বীভৎস শব্দকারী যন্ত্রবান-জন্তুগুলি নেই।—আচ্ছা চলো মঞ্জুলিকা পথ দিবে।

—মঞ্জুলিকা কে?

—সে ছিল এক গায়িকা। স্বরসারসের শতদলের মত কুটে উঠেছিল। সে অক্ষরস্ত গান গেয়েছে আর তার বন্ধু ভক্তেরা তার গলার স্বরের সঙ্গে ঝুড়ির পর ঝুড়ি মাটি কেটেছে, রাস্তা তৈরী করেছে।

কিছুদূর গিয়ে এক শ্বেতশাখরের গম্বুজের সামনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে বল্লুম—কি স্তম্ভর! যেন এক-ফোঁটা চোখেব জল জমাট হয়ে গেছে, জ্যোৎস্নাষ টলমল করছে।

তরুণী বল্লে—হাঁ, মঞ্জুলিকার গানে যে-সব শিল্পীদের প্রাণ জেগে উঠেছিল তারাই দিনরাত ধরে আপন প্রাণের ব্যথা ও আনন্দ দিয়ে গানের স্বরের সঙ্গে অশ্রুজল গিশিয়ে এই নির্মল স্তম্ভ মর্ম্মরতাজ গড়েছে।—এ ত প্রাণ করে' বাজমিস্ত্রীদের মাহিনা দিয়ে পাথরের পব-পাথর বসিয়ে গড়া নয়?

সেই শিল্প-সৌন্দর্যের সামনে মাথা নত হয়ে এলো।
একটু জনবহুল পথে গিয়ে পড়লুম।

বন্ধু বল্লে—এই দেখ আমাদের দেশের-গাড়ী।
জন্তদের মত দেখতে বটে ওরা, সত্যি জন্ত নয়।

একটি লাল বোডাষ চড়িয়ে মা তার ছেলেকে টেনে
নিয়ে গান গাইতে গাইতে চলেছে, এক বুড়োকে এক
ভেড়ার ওপব বসিয়ে তার নাংনী টানছে আর হাসছে,
এক ময়ূবের গাড়ীতে বসিয়ে প্রেমিক তার প্রিয়াকে ফুট
বাজাতে বাজাতে টেনে নিয়ে চলেছে। সব শব্দ একটা
গানের স্বরের মত বাজছে।

বন্ধু—এ যে সব মানুষ-টানা গাড়ী!

—না, গাড়ীগুলো নিজেরাই যেতে পারে, ওরা ইচ্ছে
করে টানছে। কি আনন্দে হাসছে দেখ্!

রাজহংসের মত একটি মখমল-মোড়া গাড়ী পথের
পাশে পড়ে' ছিল, বন্ধু—তুমি একটু বসো না, আমি
একটু টানি।

গর্কোৎফুল্ল মুখে হেসে বন্ধু বল্লে—না, পায়ে চলতেই
আমাব বেশ লাগ্ছে।

এ পথ পেথিয়ে এক পদ্মবনের ধারে এক বড়
বাড়ীর সামনে এসে পৌঁছলুম।

—এত বড় বাড়ী ত আগে কোথাও দেখিনি?

—এটা সবাইয়ের খাবার বাড়ী কি না, তাই একটু
বড়। বড় বাড়ী আমবা তৈরী করিনি বিংশ-শতাব্দীর
কয়েকখানা বড় বাড়ী ভাঙা হয়নি। ওই যে দূরে বাড়ী-
খানা দেখ্ছ ওটা নাকি ছেলে-মেয়েদের কলেজ ছিল, এখন
আমরা ময়দার গুদাম ছাড়া কোন কাজে লাগাতে পারিনি।

—বাড়ীর কিন্তু গুণ আছে, এর সামনে এসেই
আমার স্নিগ্ধে পাচ্ছে।

—এসো না কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্—কি রকম
ভাব খাবে বল তো।

—কি রকম গানে?

—কাকর বাড়ীতে উঠে তাব অতিথি হয়ে খেতে
পাবো, অথবা দোকান বা ভাণ্ডার থেকে জিনিষ এনে
গাছের তলায় আশ্রয় করে' খেতে পারো, অথবা
সাধারণ ভোজনাগারে গিয়ে।

—তোমাকে তো একবার রাঁধালুম, আর কষ্ট দেবো
না—চলো এই খাবারের বাড়ীতেই ঢোকা যাক্।

মার্কেলের প্রাসাদে ঢুকে পড়লুম। সামনেই শ্বেত-
পাথরে গড়া শঙ্খধবল লক্ষ্মীর মূর্তি, তারপব সাদা মার্কেলের
প্রকাণ্ড ঘর। লাল নীল কত রংএর আলো জল্ছে,
চারিদিকে ছোট ছোট নানা রংএর পাথরের কারুকর্মময়
টেবিল, তাইব ঘিরে চন্দনকাঠেব চেয়ার মখমল-মোড়া।

হংসমিথুন-আঁকা এক রাজহংসের মত সাদা পাথরের
টেবিলে এক কোণে আমবা দুজন বসলুম।

—কে আমাদের খাবার এনে দেবে?

—তুমি ভাব্ছ খানসামাকে ডাক্বে?—এখানে হয
কোন বন্ধু আনন্দের সঙ্গে খাওয়ায়, না হলে নিজেরা রেঁধে
খাবাব জিনিষ বয়ে নিয়ে আসতে হয়।

আমাদের টেবিলের একপাশে কয়েকজন পাকা আমেব
মত বৃদ্ধ গল্প কর্ছে দেখে' আমি একটু সঙ্কচিত হয়ে
উঠলুম, তারপর পেথলুম, দিদিমা-ঠাকুমাদের মত অনেক
প্রৌঢ়া নারী তসর-গরদের কাপড় পবে' প্রতি টেবিলের
ধারে ধারে ঘুবে বেড়াচ্ছেন।

বন্ধু আমার দিকে একটু মুচ্কে হেসে বল্লে—কোন
ভয় নেই, এদেশের বুদ্ধেরা বিভীষিকার বস্ত্র নন, বুঝ্লে?—
এখানে যারা রেঁধে আনন্দ পায় তারা রাঁধতে আসে, আর
যারা খাইয়ে আনন্দ পায় তারা খাওয়ায়। ওই বর্ষীয়সীরা
প্রতি টেবিলে খাওয়ানো তদারক করে' বেড়াচ্ছেন।

আমরা বসবার একটু পবেই মোগল-বেগমের মত
সাজ পরে', কেশে কেতকীর মালা জড়িয়ে এক বালা
আমাদের কাছে হেসে দাঁড়িয়ে বল্লে—বন্ধু, তোমরা কি
খাবে বলো, আমি আজ এক বাদশাহী পোলাও আর
কাবাব রেঁধেছি, তোমাদের খাওয়াতে পার্বে ভাবি
আনন্দ পাব।

আমি হেসে বল্লাম—তোমাব ঘা-খুসি নিয়ে এসো।

তার পেছনে তার বন্ধু মোগল-বাদশার বেশ পরে'
দাঁড়িয়ে ছিল, সে বল্লে—কিসেব খালায় আনব? রপোব,
না কাঁচের, না মাটির?

—কাঁচের খাল্লাতেই নিয়ে এসো।

অবাক হয়ে চারিদিকে চাইলুম,—কত রকমের সাজ!

কেউ রূপকথাব রাজকন্যা, কেউ কোন উপন্যাসের নায়ক, কেউ কোন নাটকের নায়িকা, কেউ ইবাণী, কেউ নরওয়েজিয়ান, কেউ জাপানী, কেউ মেক্সিক্যান। কোনো টেবিলে কোনো কবি তার কবিতা পড়ছে, কোনো টেবিলে মুখে মুখে গল্প হচ্ছে অথবা গল্পপাঠ চলছে, ঘবেব কোনো কোণে একটা ছোট অভিনয় চলছে। হঠাৎ এক কোণে পুলিশের লাল পাগড়ী আর বিচারপতির লাল গাউন দেখে আমি চমকে বল্লুম—ওটা কি হচ্ছে বন্ধু ?

সে হেসে বল্লো—ও একটা গ্রহসন হচ্ছে। তোমাদের যুগে কি রকম আইনের বিচার হোত, আমাদের ফার্সের দরকার হলে তারই অভিনয় কবি।

কাশের মত সাদা লীলাপদ্ম-জাঁকা কাচের খালায় বেগম রাজা পোলাও দিয়ে গেলো। কাবাবটা মুখে দিতে বন্ধু বল্লো—ভেবো না এটা মাংস।

—মাংসের চেয়ে স্বাস্থ্য খেতে।

—এ দেশে ত জন্তু বধ হয় না।

পোলাও শেষ হতে না হতেই এক চীন-রমণী টেবিলের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো—কোনো চীনে ডিশ্ খাবে ?

—খুব খাব।

ড্রাগন-জাঁকা একটা চীনেমাটির ডিশ্ নিয়ে সে কি আনতে গেল।

আমাদের পাশের টেবিলে-কারুলী-সাজ-পরা কয়েকটি যুবক মুখে মুখে এক গল্প-রচনা করছিল। গল্পের স্ত্রীটো সবাই মিলে টেনে টেনে যখন প্রায় ছেঁড়ে, আমার দিকে সবাই মিলে তাকিয়ে বল্লো,—ভাই, এটা শেষ করে' দাও না !

আমি কোনমতে গল্পটা শেষ করে' বল্লুম,—তা গল্পটা ত মন্দ হলো না। এখানে-বুঝি কোনো মাসিকপত্রের সম্পাদক নেই-? থাকলে নিশ্চয় তোমাদের তাগাদা দিয়ে এটা লিখিয়ে ছাড়তেন।

আমার কথা শুনে সবাই আমার দিকে অবাক হয়ে চাইল, যেন কিছুই বুঝতে পারলে না। তরণীবন্ধু একটু হেসে বল্লো—এ হচ্ছে নতুন বিদেশী, আমাদের দেশের কিছুই জানে না। জানো বন্ধু, আমাদের দেশে মাসিক-পত্রিকা আর খবরের-কাগজ নেই, এমন কি কোন ঘরে বইঘরের আলুমারি নেই। লেখক লিখেই খালাস—আর

গল্প কবিতা শুনিযেই তাঁর আনন্দ। তারপর লেখা খুব ভালো লাগলে সমজ্জদাব বন্ধুবা সেটা নিজেদের হাতে কপি হবে' রাখে, আর যদি অনেক লোকেরই সে লেখাটা দরকার হয় তবে সবাই মিলে প্রেসে গিয়ে নিজেরাই খেটে ছাপাব আর বন্ধুদের উপহাস দেয়।

—তোমাদের তাহলে কোন মাসিক-পত্রিকা নেই ?

—পত্রিকা আছে, তবে সেগুলো ঠিক মাসে মাসে বেরয় না। লেখকরা ত আর যত্ন নয় ?—এই যে এখানে একখানা পড়ে' বয়েছে দেখো না।

পত্রিকাখানা তুলে নিলুম, ভেলভেট কাফে বাঁধানো, মস্তণ তুলট কাগজগুলোর উপর কি সুন্দর হাতের লেখা ! হাতে জাঁকা কয়েকখানি ছবি,—মিথ্যা বিজ্ঞাপনের বোঝা আর কলের ফিতের মত ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস নেই।

তুষারের মত সাদা এক কাকাতুয়া আর এক কালো ময়না কোথা থেকে উড়ে এসে আমাদের পাশে বসল। তাদের ভাগ দিয়ে খাওয়া চলতে লাগল।

খাওয়া শেষ হলে বন্ধু উঠে বল্লো—তোমার তখন জলতেষ্ঠা পেয়েছিল, আমি সব্বৎ করে' নিয়ে আসছি, তুমি- ততক্ষণ থালা-বাটিগুলো ওই জলেব ধারায় ধুয়ে নিয়ে এসো।

টেবিল পরিষ্কার হবে' থালা-বাটি ধুয়ে সাজিয়ে বেখে দেওয়ালের ছবিগুলো দেখছিলুম, বন্ধু সব্বৎ নিয়ে এলো।

মধুর মত মিষ্টি, মদের মত আবেশময় সে সব্বৎ, বন্ধুব অন্তরের প্রেমস্বধাব মত স্নিগ্ধ। তাই পান করে' সব বন্ধুদের আমাদের আনন্দ জানিয়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়লুম।

রজনী গভীরা, নিরালো পথ, পুষ্পবীথিকার বাতাস আনন্দে অধীর হয়ে উঠছে, কুহুধনি থেমে গেছে।

বন্ধুর হাত ধীরে টেনে নিয়ে বল্লুম—তোমার নামটা কি জানা হলো না ত বন্ধু !—

—আমার নাম ? আমার তো কোন নাম নেই, যে যা বলে' ডাকবে তাই আমার নাম। আমার যত বন্ধু তত নাম।

—আমি তোমায কি বলব ?

—যা খুসী।

—সাকী !

—সদ্য !

বেগুনপথে জ্যোৎস্না ধমধম করতে লাগল।

ধীবে বল্লম—অনেক ত দোরা হলো, এবার আমার বাড়ীর পথ চিনিয়ে দাও।

হেসে বলে—বাড়ী ? বাড়ী কি হবে ?

—এ দেশে কি সবাই পথে পথেই চলে, কেঁউ ঘর বাঁধে না ? কারুর কি নিজের বাড়ী নেই ? তোমাব কি ঘর নেই বন্ধু ?

তার চোখে জল ভরে' এলো, ব্যথিত স্বরে সে বলে—এদেশে সব সুখ, শুধু ওই দুঃখ। প্রেম এখানে স্বরাট বলে' প্রেমের মিথ্যা অভিনয় তো এদেশে চলে না। দুই তরুণ-তরুণী প্রাণে মিলিত হলে যেমন প্রেমের সঙ্গে আনন্দে ঘর বাঁধে, তেমনি তাদের প্রেমে কোথাও একটু ফাঁকি হলেই আবার ঘর ভেঙে পথে বেরিয়ে পড়তে হয়।

দুজনে শুধু হসে চল্পম।

বন্ধু ধীরে বলে—এতক্ষণ হাসি শুনে এসেছ, কান্নার স্বরের মত একটা বাঁশী শুনে পাচ্ছ—নদীর ওপারে বসে' কোন্ বিরহী একা বাজাচ্ছে।—

আমার চোখ অশ্রুতে ভরে' এলো।

—ওই পথের বাঁকে বাঁশগাছের তলায় কুঁড়েটা দেখছ, আল্পনাকাটা আঙিনায় একটি মাটির স্তম্ভপ্রদীপ জলছে, দরজার গোড়ায় মাটির মঙ্গল-কলস বসানো, দেওয়ালে শব্দ ও চরকা ঝাঁকা, ওই যে বাঁশের বেড়ার গা ধরে' রুমকো-লতা উঠেছে, তার পাশে একটা হবিণ চাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—ওই খড়ে-ছাওয়া মাটির বাড়ীটায় আমি রোজ রাতে গিয়ে ওই বাঁশীর চেয়েও করুণ স্বরে সেতার বাজাতে বসি,—ওই আমার একা থাকবার বাড়ী।

ভাঙা গলায় আমি বল্লম—এখন তুমি কি ওখানে যাবে ? আমি তবে বিদায় নি।

স্নান হেসে সে বলে—না চলো, আগে তোমায় নদীর কোনো ময়ূরপঙ্খীতে ঘুম পাড়িয়ে আসি—তারপর যাব।

পথের শেষে নদীতে এসে পৌঁছলুম। কি স্নিগ্ধ অমল

জলধারা ! তীরে মিলের কদর্যতা, জেটর গুদামের সারি নেই, মধ্যমলের মত সবুজ ঘাসের পাড় আর গাছের সারি।

শৃঙ্খল-মুক্তা নদী আনন্দে চলেছে। প্রকাণ্ড কল-দৈত্যের মত ষ্টিমার-লঞ্চগুলো বুকে চেপে নেই, ছোট ছোট নৌকো বলাকার মত অমল জলে বেন ঘুমিয়ে আছে।

দুজনে গিষে একটা তীরে উঠলুম, পেছন থেকে কে ডাকলে—‘বন্ধু !’ দেখি আমাব সেই সোসিয়ালিষ্ট বন্ধু ! আনন্দে তার হাত জড়িয়ে বল্লম—এসো ভাই।

তিনজনে নৌকায় গিষে বসলুম। মণি-প্রদীপের মত একটা রেডিয়াম হালের কাছে জলতে লাগল।

সোসিয়ালিষ্ট বন্ধুটি বলে—আজ তো রাতে উৎসবের আনন্দ দেখলে, কাল দিনে কাজের আনন্দ দেখাব। সবপেয়েছির দেশের আনন্দ যেমন অফুরন্ত, তার দেখাও অফুরন্ত ; সময় চাই। আজ ঘুমোও।—

“এক রজনীর তরে হেথাষ

দূরেব পাশ্ব এসে

দেখতে না পায় কি আছে এই

সব পেয়েছির দেশে।”

আমি ধীরে বল্লম—আজ ছোট ছেলে-মেয়ে থেকে বৃদ্ধ সবাইয়ের মুখে যে হাসি দেখলুম, গান শুনলুম, তাতেই আমি খুশি হয়েছি।

নৌকোর এক কোণ থেকে সেতার বের করে' সাকী বন্ধুর দিলে। একবার সাকীর অরুণ-বর্ণণ সাজের দিকে আর-একবার উন্মুক্ত নীলাকাশের অনন্ত তাবালোকের দিকে চাইলুম। মনে হলো, সৃষ্টির আবাস হতে মাহুষের বুকে একটা ক্ষুধা—তা প্রেমের ক্ষুধা, সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত বুঝি এ অগ্নিশিখা অনির্বাপ থাকবে।—মাহুষের সব সুখ হতে পারে, কিন্তু লাখ লাখ যুগ গেলেও প্রেম-তৃষিত অন্তর জুড়াবে না।

সেতারের স্বরলোক চারিদিকে সৃষ্টি হয়ে উঠলো—জ্যোৎস্নাধাবার দিকে চেয়ে অন্তব কানায় কানায় অশ্রুতে কি সুধারসে ভরে' উঠল জানি না। ধীবে ধীবে চোখ বুজে এলো।

* * * * *
গির্জাব দড়িতে বাত এগাবোটা বাজল। বাবাম্মা

ছেড়ে খোলাছাদে গিয়ে দাঁড়ালুম। ধোঁওয়া কেটে গেছে,
অকলঙ্ক নীল আকাশে তারাগুলো ঝলমল করছে, হাস্তা-
হানার গন্ধ বাতাসে ভেসে এলো। ইটের পব ইট, তাতে
মাছুষ-কীট।—ওই বস্তি ওই গলি; ওই মেষানে আলো
ম্লান হয়ে এসেছে কি বীভৎসতা কি কদর্যতা, যন্ত্রদৈত্য-
পিষ্ট স্বর্ণলোলুপ শক্তিমদমস্ত বণিক-সভ্যতার প্রতিক্রম
এই নগর ঘন প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনো অতি ভীষণ
জঙ্ঘর মত অতি শ্রান্ত হয়ে পড়ে আছে। শুধু রজনী-
গন্ধার ঝাড়টা দক্ষিণ হাওয়ায় মর্মর করে বসে,

“নাইক পথে ঠেলাঠেলি

নাইক হাটে গোল,

ওরে কবি এইখানে তোর

কুটারখানি তোল।

ধুষে ফেল রে পথের ধূলো,

নামিয়ে দে রে বোঝা,

বেঁধে নে তোর সেতারখানা,

রেখে দে তোর খোঁজা!

পা ছড়িয়ে বস রে হেথা

সারাদিনের শেষে,

তারায় ভরা আকাশতলে

সব-পেয়েছির দেশে!”

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু [এম-এ]

নিরুপায়

গেছে চলে' হাসি চিরতরে,

কেন গেছে কে তা জানে?

দুখের দেবতা এসো ওগো,

চুপি চুপি এসো প্রাণে।

—চোখে ছলছল ভরে' লয়ে' জল বলো কথা কানে কানে।

দুঃখে কাহারো নাহি লোভ,

কেউ নাই তাই কাছে;

কাবো কোনো কাছে লাগি নাই,

সবে তাই ছাড়িয়াছে;

অশ্রুর বোর আঁধিপুটে মোর শুধু ব্যবধান আছে!

স্তব্ধ এ অমা-নিশিথিনী,

আঁধাবে ধরণী ছায়,

জানিবে না কেহ আজি যদি

এসো গো নীরব পাশ।

একখানি যামী, শুধু তুমি আমি, প্রাণ আর নাহি চায়!

বলো, মুখপানে চেয়েছিলে,

জেনেছিলে সব কথা,

বেদনে বেদনা পেয়েছিলে,

বুঝেছিলে সব বাখা,

ছিলে নিশিদিন উপায়বিহীন বৃকে চেপে নীরবতা।

বলো, হাতে তব কিছু নাই,

সকল দিয়েছ মোবে,

যা চাহিতে পারি, বাহা চাই—

দিয়েছ শূন্য করে’;

সহিতেছ ভার মহারিক্ততার সকল জীবন ভরে’!

* * *

দুখের দেবতা এসো ওগো,

শোনো কথা কানে কানে;

দবদী আমার কত আছে,

ভালোবাসে প্রাণে প্রাণে—

তোমার নয়ন মুছাবার জন কেউ নাই কোনোখানে!

নিরুপায় ওগো, দ্বারে দ্বারে

ঘুরে ঘুরে লও তুলি’

কোটি বৃক হতে এক বৃকে

বেদনা-আঘাত-গুলি!...

তোমার বেদনা স্মরিয়া বন্ধু আমার বেদনা তুলি!

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী [বি-এ]

রমলা

(৪)

রজত ঘরে বাইবে বলিয়া বাহির হইল বটে কিন্তু তাহার ঘরে যাওয়া হইল না। পথেই চাকর মনিয়া আসিয়া জানাইল, সাহেব ডাকিতেছেন। দোতলায় ঘোগেশ-বাবু লাইব্রেরীতে মনিয়া লইয়া গেল।

কালো ওভারকোট মুড়ি দিয়া ইঞ্জিচেরারে হেলান দিয়া শুইয়া ঘোগেশ-বাবু একখানা বই পড়িতেছিলেন; রজত প্রবেশ করিতেই বইখানি টেবিলে বইয়ের 'গাদাঘ রাখিয়া চশমাটা খুলিয়া বলিলেন,—আহ্ন, আমি ডাব-ছিলুম আপনি বেড়াতে গেছেন।

নমস্কার করিয়া রজত জানুয়ার কাছে এক চেয়ারে বসিল, ধীরে বলিল,—না, এই বেরুছিলুম।

—বেশ বেড়াবার জায়গা, কেমন লাগছে আপনার ?

—খুব সুন্দরই লাগছে, কলকাতার দোয়া খেয়ে খেয়ে ত—

—হাঁ, আগারও জায়গাটা ভারি পছন্দ, এই ধরন retire করে' পাঁচ বছর হয়ে গেল বরাবরই এখানে আছি, তবে গ্রীষ্মকালটা কোন hill এ চলে যেতে হয়।

—পাঁচ বছর আছেন ?

—হাঁ, একবার বেড়াতে এসে আমার স্ত্রীর এ জায়গা ভারি পছন্দ হয়েছিলো, তাই পেন্সন নিয়ে এইখানেই বাড়ী করলুম। তা, তাঁকে আর এ বাড়ী ভোগ করতে হল না, এসে প্রথম বছরেই মারা গেলেন—ওই যে পাশের ঘরটা, ওই ঘরটায়, ওটা বন্দই থাকে—

বৃদ্ধের গম্ভীর কণ্ঠ উদাস হইয়া উঠিল, তাঁর গুলু ক্রুর তলায় গ্রন্থপাঠক্ষিপ্ত বড় বড় কালো চোখ জলছলছল হইয়া আসিতেছে দেখিয়া রজত কথার ধারাটা অন্তরিক্কে চালানিবার পথ খুজিতে লাগিল, কিন্তু কিছু বলিতে না পারিয়া চূপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বৃদ্ধ আপনাকে দমন করিয়া ধীরে বলিলেন,—ওই মা-হারা মেয়ে আমার মা হয়ে আছে। কোথায় মাধবী-মা ?

—তিনি নীচে আছেন।

—আচ্ছা থাক।

—আপনার কোনো ছেলে নেই ?

—ছেলে ? কি জানো বাবা, তাদের নিজের সংসার হবেছে, বুড়ো বাপের সঙ্গে কি সম্বন্ধ বলো ? হাঁ, আছে বৈ কি, এক ছেলে রাওলপিণ্ডিতে ডাক্তার, আর এক ছেলে সিমলা সেক্রেটারিয়েটে আছে,—আর মেয়েই বা কি আপন বলুন, মেয়েকেও ত পরের ঘরে পাঠাবার জন্তে মামুষ করা, তা হলেও সে মেয়ে। এই ঘরভরা বই দেখছেন, এই বই আর মা-টিকে নিয়ে বেঁচে আছি। যাক, আপনাকে ডেকে পাঠালুম, আপনার ছবি ভারী ভালো লেগেছে ; তুলির টানগুলো দিয়েছেন, যেমন bold তেমনি আইডিয়ায় ভরা। ডাবলুম কত রাজ্যের বই কিনে ত টাকার শ্রদ্ধ করছি, একজন দেশের আর্টিষ্টের একটু সাহায্য করা যাক—তাই—

—আমি আপনার ছবি যথাসাধ্য ভালো করেই আঁকবো—ছোট বেলা থেকেই ছবি আঁকার সখ, সারাজীবন যদি রাখতে পারি—

—হাঁ, ছবি এঁকে এ দেশে পেট চলা মুকিল, তবে আপনার ছবি,—না, ছবি আঁকা কিছুতেই ছাড়বেন না। আব দেখুন, মাধব ছবি আঁকার ভারি সখ, ওকে একটু শিখিয়ে দিতে হবে, ও নিজে চেষ্টা করে' যা এঁকেছে, ওর একটা talent আছে বোধ হয়, না, আপনি জীবনে যে profession এই যান, ছবি আঁকা ছাড়বেন না।

ঘোগেশ-বাবু নীরব হইলেন। কথা শেষ হইয়া গেল ভাবিয়া রজত উঠিয়া দাঁড়াইতেই ঘোগেশ-বাবু বলিলেন,—ও কি উঠছেন যে, বহ্নন।

রজত তাঁহার দুঃখেরশ্রাবিত বান্ধক্যজীর্ণ মলিন মুখের দিকে চাহিয়া বসিল। সন্ধ্যার ছায়ায় সেই কালো ওভারকোট-জুড়ানো মূর্তিকে বড় করুণ দেখাইতেছিল। বাঁধানো দাঁতগুলি বাহির করিয়া মুছ হাসিয়া ঘোগেশ-বাবু উদাস স্বরে বলিলেন,—কি জানেন রজত-বাবু, সুখ জিনিষটা, ওটা বড় রহস্যের, বড় আশ্চর্যের। ও কখন আসে কখন যে যায়,—আজ আপনাকে দেখে কেমন একটা আনন্দ হচ্ছে,—আব ওই রমলাকে দেখে কাল যে কি

আনন্দ হয়েছিলো, কাল সারারাত ঘুমোতে পারি নি, ও যে আসবে ভাবিনি। কোথায় সে?

—তিনি কাজী-সাহেবের সঙ্গে বেড়াতে গেলেন দেখলুম।

—আর, ওই কাজী, আশুখি ও লোকটা, একটা রত্ন, সমস্ত পশ্চিম ঘুরে আমি ওকে ধবে' এনেছি; দিল্লীর কোনো বাইজীর গলায় ওর মত মিষ্টি গান শুনিনি—এখন ওর বুড়ো বয়স, ভাঙা গলা, বিশ বছর আগে ওর গলায় যা গান শুনেছি, আহা,—এই বুড়ো বয়সে ওর কবিতা আর গজল শুনে প্রাণটা তাজা রয়েছে। না হলে, এই যে বইয়ের স্তূপ দেখছেন, এই যে কাব্যগ্রন্থ, আর্টের বই, ছবির বই, শুকনো পাতা—সব শুকনো পাতা, গোলাপের রাজা পাতা শুকিয়ে গেলে যেমন লাগে—words, words, words—তাক দি ওই কাজীকে, ভরপুর ওর প্রাণ, জীবনের রসে ভরপুর—এই আট বছর আমার সঙ্গে আছে, কোনোদিন দেখিনি কাজী বলেছে ভালো লাগছে না,—বলিতে বলিতে আবার বুদ্ধ খামিয়া গেলেন।

বাহিরে সজ্জার অঙ্ককার ঘনাইয়া আসিতেছে, সামনের পাম-গাছগুলি একটু যুহু হুগিতেছে, ঘরটা যেন কি রহস্যমায়ায় ভরা।

বুদ্ধ বলিয়া উঠিলেন,—কি বলছিলুম?

রজত আপনার অজ্ঞাতে বলিয়া উঠিল,—রমলার কথা কি বলছিলেন।

—হাঁ, রমলা, ওর মা আমার ভারি বন্ধু ছিলো, তাই ও মেয়েটাকে বড় ভালোবাসি। ওর বাবা আর আমি এক সঙ্গে বিলেত যাই, আমি I. C. S. পাশ করে' এলুম, সে ব্যারিষ্টার হয়ে এলো,—ও, বেশ মনে পড়ছে, সেনেদের বাড়ীর সে রাতটা, তখন বিভার বয়স রমলার মতনই সতেরো আঠাবো হবে, আর দেখতে,—ও, কাল রাতে হঠাৎ যখন রমলা আমার সামনে এসে দাঁড়ালো,—দেখো, তুমি রমলার একটা portrait এঁকে দেবে।

বুদ্ধের প্রদীপ্ত কণ্ঠ খামিয়া গেল, ঘরের অঙ্ককারে তাঁহার মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না, শুধু চোখ দুইটি জলজল করিতেছে। রজত চূপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বুদ্ধ ক্লান্ত কক্ষণ স্বরে বলিতে লাগিলেন,—সে 'বিভা কতদিন চলে' গেছে, তারপর তার স্বামীও গেছে, স্বপ্নের মত মনে হয় জীবনটা, সেদিন যেন শুরু হল, আর এই ফুরিয়ে গেল,—রহস্য, মহা রহস্য, কোথায় নিয়ে চলেছো,—

শেষ কথাগুলি কোনো অজানা শক্তির উদ্দেশ্যে বলিয়া যোগেশ-বাবু ঘরের কোণের অঙ্ককারের দিকে চাহিয়া খামিয়া গেলেন। বাহিরের আকাশে কয়েকটি তারা দপ্-দপ্ করিতে লাগিল, ঘরের স্তব্ধ অঙ্ককার যেন কিসের ভারে কাঁপিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে সচকিত হইয়া যোগেশ-বাবু বলিলেন,—হাঁ, কি বলছিলুম?

রজত ধীরে বলিল,—আপনি বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, আব কথা বলবেন না।

কক্ষণ হাসিয়া বুদ্ধ বলিলেন,—শ্রান্ত নয় বাবা, পদ্ম হয়ে পড়েছি এই বাতে। হাঁ, আচ্ছা, ওই বে অয়েল্-পেন্টিংটা দেখছেন,—অঙ্ককারে দেখতে পাচ্ছেন না? কিন্তু আমি জলজল দেখছি, ও হচ্ছে আমার স্ত্রী, সেনেদের বাড়ীতেই ওর সঙ্গে আলাপ হয় সেই নেমস্তন্নর রাতে, হাঁ, বেশ মনে পড়ছে, ও গাইলে রবিবাবুর একটা গান আব বিভা একটা ফ্রেঞ্চ গান, চোখ দু'টো ভারি কক্ষণ লাগছে, না? কিন্তু মুখেব হাসিটা কি মিষ্টি, মাঝে মাঝে যেন ঠোঁট দুটো নড়ে' ওঠে, কি কথা বলতে যায, পারে না, বোবা, ভাষা ভুলে গেছে,—ও মরবার আগে—

যেন কোন ঘুমঘোর হইতে সজাগ হইয়া উঠিয়া যোগেশ-বাবু খামিয়া গেলেন। রজত শ্রোতা-রূপে বসিয়া থাকিলেও যোগেশ-বাবুর কণ্ঠস্বরে ও দেহের ভঙ্গিতে কাতর হইয়া পড়িতেছিল। সে মুহূর্ত্তবে বলিল,—আপনি বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, চলুন একটু বাইরের হাওয়ায়।

যোগেশ-বাবু এবার সহজ কণ্ঠে বলিলেন,—হাঁ, ভারি সুন্দর রাত, আপনি বরং বাইবে একটু বেড়িয়ে আসুন, আর দেখুন, আপনাব কোনো অসুবিধে হচ্ছে না ত? মাধবী যথাসাধ্য দেখবে জানি, যদি কোনো অসুবিধে হয় জানাবেন।

—না, কোনো অসুবিধে নেই।

বীরে মাধবী ঘবে ঢুকিয়া পিতাব চেয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া অতি মৃদুকণ্ঠে ডাকিল,—বাবা।

—কি মাধু, কি মা ?

—চলো, একটু বাবান্দায় বেড়াই।

যোগেশ-বাবুর চোখ আবার যেন ঘোলাটে হইয়া আসিল, অস্বাভাবিক কণ্ঠে তিনি বলিলেন,—আচ্ছা মাধু, বিভা মরার আগে কি বলেছিলো, জানিস ?

কাতরকণ্ঠে মাধবী বলিল,—জানি বাবা, তুমি-ওঠো।

বন্ধত ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার কানে যোগেশ-বাবুর করুণকণ্ঠ আসিল, বলেছিলো সে আমাদের ভাল বাসে। মাধবীর প্রদীপ্ত কথাগুলি কানে আসিল,—বাবা, চলো, তুমি আজ বড় বেশী পড়েছো। আবাব যোগেশ-বাবুর ক্লান্তকরণ স্বর,—আর তোর মা বলেছিলো—

আবাব মাধবীর কান্নার স্বরে ডাক,—বাবা !

আবার যোগেশ-বাবুর উদাস স্বর,—আমি কি তোকে ভালোবাসি না মা ?

বন্ধত সিঁড়ির দিকে অগ্রসব হইল কিন্তু মাধবীর দীপ্ত তীক্ষ্ণকণ্ঠ কানে আসাতে থামিয়া গেল,—কে, কে দিয়েছে, কে দিয়েছে আবাব বোতোল বের করে' ? মনিয়া, হতভাগা ছোঁড়া।

—না, মা, মনিয়া নয়, আমি নিজে, নিজে।

বন্ধন করিয়া কাঁচের গেলস ভাঙ্গার শব্দ হইল। যোগেশ-বাবুর কণ্ঠ,—ও, তুমি কেঁদো না, তুমি কেঁদো না, ও poor dear, dear, ওই তোর মা কি বলছে জানিস, আমায় ত সারাজীবন জালিয়েছো, আমাব মেয়েকে জালিও না—তোকে আমি কি কষ্ট দিই মা ?

—বাবা, চলো বাইরে।

পাগলের মত যোগেশ-বাবু বলিতেছেন,—ও, ওঘরের দরজাটা কে খুলেছে ? বন্ধ কবে দিয়ে এসো, না, না, আসতে দিও না, তালা ভেঙে আসবে !

এক বোতোল ভাঙ্গার শব্দ হইল।

এবাব মাধবীর ধীর কণ্ঠ,—বাবা, একটু স্থির হয়ে শোও।

রক্তত বাহিরে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না,

লাইব্রেরীর দিকে অগ্রসর হইতে মাধবী তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল,—আপনি নীচে যান, কাজী-সাহেব যদি থাকে পাঠিয়ে দেবেন,—কাজীকে,—রমলা যেন না আসে,—শীগগীর যান।

ধীরে রক্তত সিঁড়ি দিয়া নাগিতে লাগিল।

কান্নাভরা স্বরে মাধবীর ডাক কানে আসিল,—বাবা।

(৫)

কাজী-সাহেবকে ধরিয়া লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে রমলা এক ছোট নদীর ধারে গিয়া পড়িল। শীর্ণা শ্রোত-ধারা অতি ঝিরিঝিরি বহিতেছে। বালির উপর কতক-গুলি বড় বড় কালো পাথরের স্তূপ, তাহারই উপর হুইজনে গিয়া বসিল। দূরে পাহাড়ের আড়াল দিয়া সূর্য্য অন্ত যাইতেছে, সূর্য্যের রক্তাভা নদীর জলে ঝিলিমিলি, বালির উপর চিকিমিকি করিতেছে, অতি মৃদু বাতাস বহিতেছে।

নদীর স্থির জলে বালি ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে রমলা বলিল,—কাজী-সাহেব।

পশ্চিমাকাশেব দিকে চাহিয়া কাজী বলিলেন,—কি রমলা-মা ?

—আচ্ছা, কাজী, তোমার দেশ কোথায় ?

দাড়িতে হাত বুলাইয়া উদাস প্রাস্তরের দিকে চাহিয়া কাজী বলিলেন,—আমার দেশ ? যেখানে থাকি সেই আমার দেশ।

—যাও, আমি বলছি, তুমি কোথায় জন্মেছিলে ? আমার মত তো তোমারও বাবা মা নেই, কিন্তু তাঁরা কোথাকার লোক ছিলেন ?

—কেন মা ?

—তোমায় দেখলে মনে হয় তুমি যেন একটা রহস্য, তাই জানতে ইচ্ছে করছে।

—আমি জন্মেছিলুম—এমি মাটির বুকেই জন্মেছিলুম—

—যাও বলবে না, তাহলে তোমায় কক্ষনো পিয়ানো শোনাবো না, পাকা চুলও তুলে দেবো না।

—সত্যি মা, আমি পথের ধূলায় জন্মেছিলুম, কোন্ ঘরহারা মা যে আমায় পথে জন্ম দিবে গিছলো তাঁকে ত আমি জীবনে দেখিনি।

কাজীর একটু নিকটে সরিয়া আসিয়া রমলা বলিল,—
সত্যি, তোমার গল্পটা বলো না—

—আগ্রায়, যমুনার ধারে এক গাছের তলা থেকে
আমায় কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে যিনি মাহুষ করেন, তিনি
দিল্লীর এক প্রসিদ্ধ বাইজী—

—তারপর? বা, তোমার জীবন নিয়ে দিব্য এক
উপগ্রাস আরম্ভ করা যেতে পারে।

উদাস স্বরে কাজী বলিলেন,—তারপর আর কি,
সেইখানে মাহুষ হয়ে উঠেছিলুম।

রাঙা নদীর জলের দিকে চাহিয়া কাজী থামিয়া
গেলেন। রমলা ধীরে বলিল,—আচ্ছা, কাজী, ওরা কি
খুব খারাপ। আমার মনে হয় সমাজ ওদের যত খারাপ
বলে তত নয়। আমার এত জানতে ইচ্ছে করে!

—খারাপ বলা যায় না মা, তবে কি জানো—

কাজী থামিয়া গেলেন। রমলা বলিল,—না, বলো
কাজী।

কাজী ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—এই দেখ আমার
ত অজ্ঞের ওপর জীবন ওই নরককুণ্ডেই কেটেছে, সুখ
নেই মা ওখানে, শুধু জালা—জালা—আমার মার কথা যখন
ভাবি কান্না পায়—নাচে, গানে, মদে, টাকায় সুখ পাননি।
গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যেত, দেখি আমাকে জড়িয়ে তিনি
সজ্ঞগটোখে অশ্রাস্ত চুমো খাচ্ছেন। এখনও হঠাৎ চমকে
উঠি, কে যেন ডাকলো মাগিক সোনা! সংসারের বিষটাই
ওদের ভাগ্যে পড়েছে, অমৃতের স্বাদ যে ওরা মোটেই
পায় না—আমার এত খারাপ লাগতো।

নদীর জলে ভেজা বালির দিকে চোখ রাখিয়া কাজী
চুপ করিল। কাজীর আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া রমলা
বলিল,—আচ্ছা তুমি কোথাও চোলে গেলে ত পার্বতো।

—পালাইনি কি? ছ’তিন বার পালালুম, আবার ছুটে
এলুম বাইজী মার কাছে। বাইরের লোক এত ঘৃণা
করতো, কেউ যদি একটু ভালোবাসতো! কয়েক বার মা
নিজে আমায় ছ’তিন জায়গায় পাঠালেন, আবার নিজে
টেনে নিয়ে গেলেন।

—আচ্ছা, তোমাব মত সুন্দর বাঁশী বাজাতে আর
গাইতে নাকি দিল্লী সহবে কেউ পার্বতো না?

একটু ব্যঙ্গের স্বরে কাজী বলিলেন,—হ্যাঁ, আর এমন
মদ খেতে গুণামি করতে তালুকদারদের ছেলেদের উচ্ছমে
দিতেও কেউ পার্বতো না।

—না, না, কাজী তুমি খুব ভদ্র ছিলে।

—না মা, এ কাজীকে ঘোবনে দেখলে তুমিও ভয়ে
পালাতে।

—আচ্ছা, কাজী, তোমার তাহলে সাদি হয় নি?

মুহূ হাসিয়া কাজী বলিলেন,—সাদি হয় নি! স্বয়ং
স্বরের হরীর সঙ্গে আমার সাদি হয়ে গেছে।

কাজী কথাটা বলিলেন বটে, কিন্তু ত্রাঙ্কারসের মত
রাঙা নদীর স্থির জলে কাহার মুখ ভাসিয়া উঠিল।
কাজী স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। সে তরুণী
কিশোরীর মুখ নয়, পূর্ণবয়স্ক নারীর মুখ। তাজমহলের
বাগানে এক জ্যোৎস্নার আলোর তাহাকে দেখিয়া মদের
পেয়ালা, পাপপূরীর জালা সব ছাড়িয়া তিনি পথে বাহির
হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাজী মুখ তুলিয়া দীপ্ত নয়নে রমলার
মুখের দিকে চাহিলেন। তাহারও গণ্ডে এম্মি একটি তিল
ছিলো; হান্তমধুর কণ্ঠে কাজী বলিলেন,

আগরু আ তুব্বক-শীরাঙ্গী

কদন্তু আরদ্ দিল-মাঝা।

বখাল-ই-হিন্দ-রস বংশম্

সমরকন্দ ও বুখারা-রা ॥

রমলা কৌতুকভরা মুখে উচ্চ হাসিয়া বলিল,—ওটা কি
হল কাজী-সাহেব?

—ওটা কিছু নয়, একটা ভোলা কথা মনে হল।

—ও, আচ্ছা, জীবনটা কি মজার নয়? তোমার
জীবনটা মনে করো না—

—হ্যাঁ,—মজারই বই কি, হাসি পায, কান্নাও আসে—
দোষ কাকে দি? রক্তের দোষ আছে, অবস্থার দোষ,
ভাগ্যের দোষ, আর-নিজের দোষ ত আছেই—এই সাত
বছর ধরে মদ ছুঁইনি, তবু মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে—

মদ কথাটা কাজী উচ্চারণ করিতে রমলা অত্যন্ত
উৎসুক হইয়া আগ্রহ সহকারে বলিল,—আচ্ছা কাজী,
আমার দাদাকে তুমি বিলেত থেকে এসে দেখোনি,
মদ খেলে কেমন দেখায় বল তো? আমার বোধ হয়—

—তাঁর কি বিষে হয়েছে ?

—না, এই ত গেলো বছর এসেছে।

দীপ্তকণ্ঠে কাজী বলিলেন,—মদ ছেড়ে যেন বিষে করে সে, আর যদি ছাড়তে না পাবে, বিষে যেন সে না করে। বোলো, কাজী বলেছে, আমার মত জীবনটা জালিয়ে ছাই করে দেওয়াও ভালো, তবু—

আপন আবেগ দমন করিয়া কাজী থামিয়া গেলেন।

রমলা স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল,—চলো, কাজী, বড় অন্ধকার হয়ে আসছে।

ছুইজনে উঠিয়া লাল পথ দিয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

রমলা যুঁহু হাসিয়া বলিল,—এখন তোমায় ঠিক দেখাচ্ছে একজন মুসলমান ফকির, তোমার একতারাটা যদি আনতে।

—বাঁশির কাছে কি একতারা বাজানো ভালো লাগবে ?

রমলার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। ধীরে বলিল,—রক্ত-বাবু কিন্তু ভারি সুন্দর বাঁশি বাজান।

নামটি উচ্চারণ করিতে রমলাব পানে-বাজা টোট ছুইটি যে কিকপ কাঁপিল তাহা কাজী লক্ষ্য করিলেন না। রক্তের সম্বন্ধে কথা বলা ছুইজনেরই মনে মনে ইচ্ছা থাকিলেও তাহা কেমন সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। রমলার বর্তমান জীবনের কথা লইয়াই গল্প চলিল। তাহার বোর্ডিং-জীবন, ছ'একজন শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রী সম্বন্ধে নানা কৌতুক পরিহাস কবিতা কবিতা তাহার বাড়ীর গেটে আসিয়া পৌঁছাইল।

গেট পার হইতেই রক্ত তাহাদের দিকে অতি ব্যস্ত ভাবে ছুটিয়া আসিল। রমলা কিন্তু তাহার উদ্বিগ্নতা কিছু গ্রাহ্য না করিয়া বলিল,—আমরা কতদূর বেড়িয়ে এলুম, নদী দেখে এলুম।

রক্ত কাজীর দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল,—কাজী-সাহেব, আপনি শীগগীর ওপরে যান, আপনাকে ডাকছেন।

কাজী একটু ভীত হইয়া বলিলেন,—আমায়, কে ডাকছেন ? মাধু ?

রক্ত ব্যস্তভাবে বলিল,—ই, যান, আপনাকে দরকার।

কোনো অজানা ভয়ে শিহরিয়া কাজী দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে ছুটিলেন। পিছনে রমলা ও রক্ত নীরবে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। এরূপ নীরবে চলা রমলার সহ্য হয় না, সে বাড়ীর সিঁড়িতে উঠিয়া বলিল,—কৈ বাঁশিটা এবার—

—ভোলেন নি দেখছি।

—না, ফাঁকি হচ্ছে না।

রক্ত ককণ-বাখিত কণ্ঠে বলিল,—দেখুন, আমার ক্ষমা করবেন, এখন আমি বাঁশি বাজাতে পারবো না।

রমলা কি বলিতে বাইতেছিল, রক্তের মুখের দিকে চাহিয়া চূপ করিয়া গেল। ধীরে সে সিঁড়ির দিকে যাইতেছে দেখিয়া রক্ত বলিল,—ওপরে যাবেন না।

বিস্মিতমননে চাহিয়া রমলা বলিল,—কেন ?

—বারণ করে' দিবেছেন।

—বারণ ? কে ?

কি বলিবে রক্ত ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, ধীরে বলিল,—বারণ করে' দিলেন।

একটু কক্ষস্থরে, আচ্ছা, বলিয়া রমলা পিছনে বাগানের দিকে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

(৬)

রাত্রি গভীরা না হইলেও, চারিদিক স্তব্ধ, বাড়ীখানি নীরব। ঘরেই রক্তেব খাবার দিয়া গিয়াছিল। কোণের মার্বেল-টেবিলে খাবার চাপা দিয়া সে সে-ঘরের জানলার কাছে চূপ করিয়া বসিয়া ছিল। তাহার ঠিক পাশের ঘরে যে কাজী-সাহেব ছুধের বাটি ঢাকা দিয়া দিগন্তের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন তাহা সে জানিত না। ধীবে একটিন দিগারেট ও তাহাব বাঁশি লইয়া রক্ত ঘর হইতে বাহির হইল। বাহিরে শুক্লাবাদশীর চন্দ্র হইতে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছে, লালপথে অভ্রের কুচিগুলি ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে, একটু ব্যাকস বহিতেছে, গাছগুলি যেন নীরবে ভিজিতেছে।

রক্ত ভাবিল, বাড়ীর সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে জানিত না খান্‌সাখ আর চাকর মনিয়া ছাড়া সবাই নিঃশব্দ ঘরে বিন্দ্র রজনী কাটাইতেছে। ধীবে

সে সামনের টেনিসকোর্ট পার হইয়া কয়েকটি কস্মসের সার ছাড়াইয়া বড় রাস্তার নিকট এক কালো পাথরে বসিয়া চুপুট ধরাইল। ধীরে একটু বাতাস বহিয়া পিছনের ফুলগাছ দোলাইল। কি ফুলের গাছ তাহা সে দেখিতে পাইতেছিল না, শুধু বাতাসে অজানাফুলের মাদক গন্ধ আসিল। ওই পুষ্পলতার মত তাহার মনও এই জ্যোৎস্নারাতে হুলিতেছে, কাহার সৌরভ তাহার অন্তর এমন উন্নয়ন করিয়াছে? চুপ করিয়া ভাবিতে চেষ্টা করিতেছিল, সব চিন্তা যেন গোলমাল হইয়া গিয়াছে, গুহাইয়া সাজাইবার মত যেন ইচ্ছাশক্তিও নাই। চুপুটটা অন্ধের খাইয়া ফেলিয়া দিল, আর একটা চুপুট ধরাইল। গিরিবর্ণার মত চকলা কলহাসিনী এইরূপ তরুণীর সহিত তাহার এই প্রথম পরিচয়। ইহাকে সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। নারীহৃদয়ের রহস্যলোক, যে প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সে প্রেমের প্রদীপ। সেই অগ্নিশিখাই কি তাহার হৃদয়ে জ্বলিতেছে? প্রেমের নারীকে বোঝা যায়; তবু, সারাজীবন পাশাপাশি থাকিয়া সঙ্গী তাহার সঙ্গিনীকে চিনিতে পারে না কেন? বন্ধু ললিতের কথা মনে পড়িল, 'যদি কোন নারীব পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য অনুভব করতে চাও, তার অন্তরের অপরূপ মায়ালোকে প্রবেশ করতে চাও, তবে প্রথমে তাকে ভালোবাসো।' রজতের মনে হইতেছিল, তাহার জীবনধারা এই বাড়ীর তটভূমিতে আঘাত খাইয়া যেন কোন নূতন দিকে প্রবাহিত হইবে।

সে ভাবিতেছিল, জীবনের মূল সমস্যাটা কি? বাস্তবিক কি চাই? নিছক আত্মস্থ অথবা পরের মঙ্গল অথবা আর্টের উন্নতি অথবা যতীন বাহা বলিয়া গেল, Science civilisation, মানবের কল্যাণ? তাহার জীবনের সত্য কাজ কি?

এই যে বৃদ্ধ I. C. S., এই যে প্রৌঢ় গায়ক, ইহাদের জীবনের সার্থকতা কোথায়? এই দুই তরুণী আর তাহার মত কত যুবক তাহাদের শৈশব-কৈশোরের রূপকথার নদীগুলি পার হইয়া রতীন পাল তুলিয়া সম্মুখে উজ্জ্বল জীবন-সমুদ্রে যৌবনতরী ভাসাইয়া পড়িয়াছে—কোনদিকে বাহিতে হইবে, কোনদিকে? কোনো পরমাশ্রম্য জীবনী-

শক্তি কি তাহাদিগকে অন্ধের মত আপন খুঁসিতে প্রথর ঘটনার শ্রোতে টানিয়া লইয়া যাইবে? আপন তরুণ স্বপ্ন কি যৌবনশক্তি দিয়া জীবন সফল করিয়া তুলিতে পারিবে?

এই পাহাড়ের মালা ও তরুণায়িত লাল মাটির দিকে চাহিয়া তাহার বৈজ্ঞানিক মামার কথা, পৃথিবীর বিবর্তনের ধারার কথা মনে পড়িল। কোন জীবনশক্তি এক অগ্নিময় পিণ্ড হইতে এই শ্রামলা সুন্দরী পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, যুগে যুগে কতরূপে তাহার কত প্রকাশ, কত কুৎসিত বীভৎস বীজাণু হইতে আরম্ভ করিয়া সুন্দরী নারীর দেহ সে গড়িয়া চলিয়াছে; কেম্বো কেঁচো হইতে গোলাপ ফুল, *Diplodocus*; *Archæopteryx*, *Titanotheres*, *Tetrabelodon* হইতে আরম্ভ করিয়া কত রকম মাছ, পাখী, পশু, মানুষ—পৃথিবীর পর্বে পর্বে কত জীব-মুক্তি সৃষ্টি করিয়া সে চলিয়াছে। একদিকে সে ঘোড়া, রক্তচক্ষু, ক্ষুধার্ত, লালসাপীড়িত, তাই গাছের কাঁটা, বাঘের নখ, হাতীর দাঁত, গণ্ডারের চামড়া, সাপের জিহবা, আবার পাথরের বর্শা, লোহার বল্লম, তীর, বন্দুক, কামান, বারুদ। আর একদিকে সে প্রেমিক—ভোগ করিতে চায়, তাই গোলাপ-ফুল, রাঙা পালক, কুছর কণ্ঠ, নারীর আঁখি, শিল্পীর তুলি।

এই পৃথিবীর স্বজনধারায়, তাহার কোথায় স্থান, তাহার কি কাজ? বন্ধুর কথা তাহার মনে পড়িল, সে বলে, প্রতিজীবনের কাজ হচ্ছে আপনাকে বিকশিত করা। ধর্ম কি? সবার ধর্ম সমান নয়, সবার মুক্তিপথ এক নয়। কারো ধর্ম ছবি আঁকা, কারো ধর্ম লোহা পেটা, কারো ধর্ম বাঁশি বাজানো, কারো ধর্ম ইন্ধিন চালানো, কারো কাজ ধ্যান বসা, কারো কাজ লাঙ্গল চষা, কারো কাজ সেবা করা, কারো কাজ যুদ্ধে মারা। জগতে সত্য বীর কে? জীবন যে সত্যই কি, তা সে জানে; তার দুঃখ বেদনা জেনেও তাকে ভালোবাসে।

আজ এই জ্যোৎস্নারাত্রি রজতের চিন্তাগুলি এগ্নি এসোমেলোই আদিতেছিল। সাধারণতঃ সে এত ভাবে না, চোখে চাহিয়া উপভোগ করাটাই তাহার প্রকৃতি। কিন্তু আজ এ তরুণী দুইটি, তাহার অন্তরের কোন গোপন ছদ্মবেশ আঘাত করিয়াছে, সে জীবনটা বুঝিতে চাহিতেছে।

যৌবনে একটা সময় আসে যখন নাস্তিকতা মোহের মত তরুণ চিত্তকে আচ্ছন্ন করে। এই ঈশ্বরে অবিশ্বাস মনের কোনো অস্বস্থতা বা বিকৃতির লক্ষণ নয়। এ উচ্ছল যৌবন-শক্তির নবসৃষ্টিশক্তিরই লক্ষণ। এই সন্দেহের বিদ্রোহ-পথ দিয়া সত্যের মন্দিরে পৌছা যায়।

রজতের মনে কিছুদিন ধরিয়া এরূপ এক নাস্তিকতা পাইয়া বসিয়াছিল। কিন্তু এ মাধবী রাত্রে তারাতারা আকাশের স্নিগ্ধ প্রশান্তির দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইতেছিল, ঈশ্বর আছেন কি নাই, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। এই যে রূপের ঝর্ণা, এই যে রসের কোয়াঁরা, এই যে অপরূপ রংএর কোরা নিরন্তর ঝরিয়া পড়িতেছে, হুই চক্ষু ভরিয়া আনন্দে অহর্নিশি পান কর। এই চাঁদের আলো যেন কাহার হাসির অমৃতধারা। সে যাহা কিছু দেখিতেছে, যাহা কিছু স্পর্শ করিতেছে, সবার পিছনে সে আনন্দ-হাসি উছলিয়া উঠিতেছে।

এ জ্যোৎস্নারাত্রি তাহার শিল্পী প্রাণকে স্পর্শ করিল। মোনা লিসার মুখের চিররহস্যময় আনন্দ-হাস্তের মত আজ এ নীলাকাশ ভরিয়া কাহার হাসি, সেই হাসির স্বরে শুক রক্ত রক্ত মাটি হইতে সবুজ তৃণ মুখ তুলিতেছে, গাছে গাছে ফুল রঙীন হইয়া উঠিতেছে, পাঁহাড়ে পাঁহাড়ে ঝর্ণার মৃদঙ্গ বাজিতেছে। মানুষ কি? সে কি সত্যই অমর আত্মা, অমৃতলোকের বাসী? না, সে একটা বীজাণু, এক জীব-কোষ, মৃত্যুতে মাটিতে হাওয়ার মিশিয়া যাইবে? এ সব ভাবিবার দরকার নাই, আজ রজত যাহা দেখিতেছে, যাহা স্পর্শ করিতেছে,—চারিদিকে কি অনাহত বীণা বাজিতেছে, সবার পিছনে কাহার হাসির রঙের ধারা। বিশ্বশতদললীনা অনন্তউর্ধ্বশীর ও জ্যোৎস্নাহাসির দিকে চাহিয়া রজত বাঁশিটি মুখে তুলিল।

রজত যখন জ্যোৎস্নার আলোয় বসিয়া ভাবিতেছিল, তখন ধোঁগেশ-বাঁবু তাঁর শোবার ঘরে ইজিচেয়ারটায় চুপ করিয়া পড়িয়া ছিলেন। সে ঘরে মাধবী ছিল না বটে, কিন্তু সে পাশের ঘরে পিতার জন্ত সজাগ হইয়া ছিল। জানলার কাছে ইউক্যালিপটাস গাছের পাতাঘ চাঁদের আলো করুণ-চোখের মত ঝকঝক করিতেছে। সেই দিকে চাহিয়া

সে নিজ জীবনের কথাই ভাবিতেছিল। যতদিন তাঁর মা ছিলেন, ততদিন সে মনের সহজ আনন্দে বাড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর স্থল ছাড়িয়া পিতার গুরুভার বহিতে বহিতে সে যেন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। মুক্তি পাইলে যেন সে বাঁচে, কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে পিতার জন্ত এমন স্নানিবিড প্রীতি আছে যে পিতাকে ছাড়িয়াও সে যেন কোথাও থাকিতে পারিবে না। এ বাড়ীতে সে তাহার সমবয়স্ক কোনো সঙ্গী বা সঙ্গিনী পাষ নাই, শুধু মাঝে মাঝে রমলা ছুটির সময় আসে। বাড়ীতে থাকিলেও তাহার শিক্ষার কোনো ক্রটি হয় নাই। এক মেম শিক্ষয়িত্রী বরাবর ছিলেন, কয়েক মাস হইল তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হইয়াছে। কাজীসাহেবের কাছে সঙ্গীতচর্চা হয়, পিতাও মেয়ের পড়াশুনা মাঝে মাঝে দেখেন।

তাহার এই উনিশ বছরের জীবনে খুব কম যুবকদের সঙ্গেই আলাপ হইয়াছে। দার্জিলিং কি সিংলা কি পুরীতে গ্রীষ্মযাপনের সময় যে কয়েকজনের সহিত নগন্ধারের আলাপ হইয়াছিল, তাহাদের কেহই তাহার মন স্পর্শ করে নাই। কিন্তু যে তরুণ শিল্পী তুলি দিয়া তাহার চিত্তের প্রশংসা লাভ করিয়াছে, সে আজ তরুণ জ্যোতি দিয়া তাহার চিত্তের প্রেমও লাভ করিতে চায়।

একা থাকিয়া থাকি। বসিয়া বসিয়া ভাবা মাধবীর স্বভাব হইয়া গিয়াছিল। স্থিবতাই তাহার প্রকৃতি, কিন্তু চোখের জলের মত করুণ চাঁদের আলোয় ভরা ঘরে সে আজ কেমন বার বার চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। একবার চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া আয়নায নিজের মুখ দেখিল, জানলার কাছে গিয়া সুদূর দিগন্তের দিকে চাহিয়া রহিল, আবার চেয়ারে আসিয়া বসিল। মনকে বুঝাইল এ চঞ্চলতার কারণ তাহার পিতা। কাল রাতে এমি সময় রমলাকে দেখিবা তাহার পিতা কিরূপ উদ্বেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহার ভয়ই হইয়াছিল। সে অবশ্য জানিত তাহার পিতা রমলাব মাকে ভালোবাসিতেন। কিন্তু রমলা পূর্বেও তো বহুবার আসিয়াছে, কখনও তিনি এমন চঞ্চল হন নাই, আর জ্বালাময়ী প্রেমস্বাতিকে স্নিগ্ধ করিবার জন্ত মদেব দরকার হয় নাই। এবার রমলা যেন একটা ঘৃণীহাওয়াব মত আসিয়াছে। সে চারিদিকে

গোলমাল, আবর্ষের সৃষ্টি করিতেছে। নানা কথার মাঝে
বার বার রক্তের কথাই তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

পাশের ঘরে বুদ্ধ যোগেশ-বাবু ঠিক কিছু ভাবিতেছিলেন
না, তাঁহার চিন্তার স্রোত খালি জোট খাইতেছিল, চক্ষু দিয়া
হুঁ এক বিন্দু জলও ঝরিয়া পড়িতেছিল। স্ত্রীর মৃত্যু-শয্যার
পাশে বসিয়া তিনি যে প্রতিক্রিয়া করিয়াছিলেন, মদ আর
ছুইবেন না, সে প্রতিক্রিয়া অবশ্য রাখিতে পারেন নাই বটে,
কিন্তু এমন করিয়া কোনোদিন আত্মহার হন নাই। কাল-
রাতে যখন রমলা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তিনি
বিভা বলিয়া ছুটিয়া গিয়া হাত ধরিয়াছিলেন; বিবাহের রাতে
রক্তপট্টবস্ত্রপরিতা বিভা ঠিক এমনিই দেখাইয়াছিল। সে
বিবাহে 'অবশ্য নবদম্পতী সুখী হয় নাই,' আর তারপর
তিনি যে বিবাহ করেন, তাহাতেও কেহ সুখী হয় নাই।
শুধু একটু সময়ের গোলমালে কতকগুলি জীবন ভাঙিয়া
চুরিয়া গেল, তিনি যেদিন সন্ধ্যা বেলা বিবাহের প্রস্তাব
করিবেন বলিয়া ঠিক করিয়াছিলেন, সেইদিন প্রভাতে
বিভার বিবাহের লালচিঠি আসিল। সেই রাতে তিনি
আবার মদের পেয়ালা হুকুর করিলেন।

তারপর পূর্ণঘোবনে বিভা সহসা একদিন অ্যাপোপ্লেজিতে
তিনঘণ্টার মধ্যে মারা গেলেন। তাঁর স্বামীও কয়েকবছর
বাদে হঠাৎ নিউমোনিয়ায় মারা গেলেন; ডাক্তারেরা বলিয়া-
ছিলেন নিউমোনিয়া, মদ, ক্রিমিন্যাল ব্যারিষ্টারের রাত্রি
জেগে খাটুনি, এ ত্র্যহস্পর্শ হইলে কেউ বাঁচাতে পারে না।
আর তাঁর স্ত্রীও তো তাঁহার অত্যধিক মদ্যপান ও মানসিক
অশান্তির জন্ত অকালে মরিয়াছেন। সেই মদ আবার
ছুইলেন কেন? জালা, অসহনীয় জালা, মাঝে মাঝে সমস্ত
বিশ্বের বিরুদ্ধে মন হইতে আগুন জলিয়া সব পুড়াইয়া
ছাট করিয়া ফেলিতে চায়। ভুলিতে চান, ভুলিতে চান।
অস্পষ্টস্বরে শুধু বলিলেন,—না মাধু, আর জালাবো না।
আবার বিভার কথা মনে জাগিতে লাগিল।

যোগেশ-বাবুর ঠিক নীচের ঘরটিতে আর-একজন প্রৌঢ়
তাঁহার ঘোবনস্বপ্ন ভাবিতেছিলেন। মরুচে-পড়া তার-
ছেঁড়া পুরাতন বীণা ধুলায় ভরিয়া শুক হইয়া পড়িয়া-
ছিল, সহসা কিসের স্পর্শে ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে; পুরাতন
মধুর গানগুলি বাজিতেছে। আজ সন্ধ্যায় রমলা কাজীর

বুকের শুকনো পাত্তরগুলিতে যেন সুন্দর বাজাইয়া তুলিয়াছে।
এমনি জ্যোৎস্নারাত্রি আগ্রায় এক মর্ষরের প্রাসাদে বসিয়া
যে সাকীকে বীণ শুনাইয়াছিলেন, সে আজ কোথায়
তাহা কেহ জানে না। তখন কাজীর বয়স সতেরো
হইবে, বারবানিতাদের বীভৎসতা অসহ্য হওয়াতে কাজী
পালাইয়া এক বান্দালী ভদ্রলোকের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন,
তাঁর মেয়েকে গান শিখাইতেন। তাঁহার মনে পড়িল,
অর্ধরাত্রি বিনোদ্য কাটাইয়া ধীরে ধীরে উঠিলেন, সেই
কিশোরীর ঘরের দিকে যাইবার জন্ত উঠিলেন, ঘরের দরজা
পর্যন্ত গিয়া পাশের সিঁড়ি দিয়া ভূতের মত ছুটিয়া বাহির
হইয়া গেলেন, সেই রাতে আবার তাঁহার বাইজী মার
কাছে ক্রিয়লেন। তারপর জীবনে তাহার সহিত একবার
দেখা হইয়াছিল। তখন ঘোবনের শেষঘাটে, মমতাজের
অল্পময় মর্ষর-সমাধির ছায়ায় শুধু ক্ষণিকের চাউনি।
সে চাউনি প্রেমের সহিত বলিয়াছিল,—আর কেন?
এবার ও পেয়ালা ভেঙে ফেলো, আর ত সুখ কানায় কানায়
উচ্ছল হইবে উঠবে না, শুধু গরল তলায় জলবে। সেই
রাতে কাজী ককির হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। আজ
রমলাকে দেখিয়া সেই নবজীবনদায়িনী নারীর কথা বার
বার মনে পড়িতেছিল।

রমলা কিন্তু তাহার ঘরে ছিল না। সে বাহিরের
জ্যোৎস্নায় বসন্ত-বাতাসেরই মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।
উচ্ছল ঘোবনের অকারণ স্বপ্নে তাহার দেহ মন কানায়
কানায় ভরা। যে-সব খুঁটিনাটি তুচ্ছ ঘটনায় অত
মেয়েদের মনে মেঘ জমিয়া বজ্রগর্জন এমন কি বারিবর্ষণ
পর্যন্ত হইয়া যায়, সে-সব ঘটনা সে হাসির হাওয়ায় নিমেষে
উড়াইয়া দিত। বোর্ডিংএর বন্দীশালায় থাকিয়াও তাহার
মনের সম্ভাবিতা, আনন্দ উপভোগের শক্তি পঙ্খ হইয়া যায়
নাই। চানচুর কি জ্যোৎস্না রাত, গোলাপফুল কি ভালো
ফিল্ম, ভালো গান কি কাপড়ের রং, দেখিলেই সে নাচিয়া
বলিয়া উঠিত, how lovely! তাহাব দর্শনশাস্ত্র অনুসারে
পৃথিবীর সমস্ত জিনিষ দুই ভাগে ভাগ করা যায়,—এক
I adore it, আর এক I hate it, মধ্যপথ কিছু নাই।
সুখ জিনিষটা কি, কি করিয়া পাওয়া যায়, এ-সব ভাবিবার
শক্তি বা সময় তাহার ছিলো না। রমলার দর্শন অনুসারে

অতীতের জ্ঞান দুঃখ করিয়াই বা কি হইবে, ভবিষ্যতের জ্ঞান স্বপ্ন গড়িয়াই বা কি হইবে, যাহা পাও, উপভোগ করো, আনন্দ নিংড়াইয়া লও। তাই মাধবীর গান্ধীধ্বাকে সে পছন্দ করিত না, আর আনন্দ উপভোগেব কোনো উপায় সম্মুখে থাকিলে তাহা বৃথা যাইতে দিত না,—মোটর চড়াই হোক আর ঘব ঝাঁট দেওয়াই হোক, রান্না কবাই হোক আর নভেল পড়াই হোক, গল্প বলাই হোক আর খুনসুটি করাই হোক,—জীবনের প্রতিমূহুর্তের পেয়ালায় যে আনন্দ ডরা, ইহাই সে জানিত। পিতার মৃত্যুর পব ডায়োসেন্স-বোর্ডিং তাহার বাড়ী হইয়া উঠিয়াছে। বরাবর বোগেশ-বাবুই তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, এখন তাহার দাদাই তাহার ভার লইয়াছেন। বোর্ডিং-এর পচা রান্না, শক্ত চেয়ার টেবিল আর বন্ধ প্রাচীর হইতে এ প্রকৃতির মধ্যে মুক্তি পাইয়া সে স্বাধীনতা প্রদামে উপভোগ করিয়া লইতেছিল। এখানকার ভেলভেটে মোড়া চেয়ারে বসিবার আরাম, সোফায় শুইয়া পড়িবার আয়েস, আপন খুসিমত রাঁবিয়া পাইবার সুবিধা, মূল্যপথে যথেষ্টা ঘুরিবার সুখ, খুসিমত পিয়ানো বাজাইবাব আনন্দ, ইত্যাদি দেহ-মনের সব ছোটবড় স্বপ্নে সে পবম তৃপ্তি বোধ করিতেছিল। জ্যোৎস্নার আলোর গাছের ছায়াব ছায়াব সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

রক্ত অর্দ্ধদণ্ডচূর্কট মুখ হইতে ফেলিয়া বাঁশিটি মুখে তুলিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না ধীর বাতাসে বাঁশির সুরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

মাধবী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্নারাত্রির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, সাকী-হারা এক কুহর করণ কণ্ঠ ফুলের কুঞ্জে কুঞ্জে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিবিতেছে, এ ক্ষণস্থায়ী জ্যোৎস্না-সৌন্দর্য্যতীবে কোন্ চিরব্যর্থ প্রেমতৃষ্ণা ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে। বোগেশ-বাবুর চিন্তার জাল ছিড়িয়া গেল, তিনি সচকিত হইয়া উঠিয়া জানালাটা ভালো করিয়া খুলিয়া জ্যোৎস্নার আলোষ সোফায় বসিলেন। তাঁহার মনে হইল, বিভার সেই গানের সুর জ্যোৎস্নায় ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। কাজী-সাহেব ঘর ছাড়িয়া বারান্দায়

এক কোণে আঁসিয়া বসিলেন, তাঁহার ঘোবনধ্বপ্ন সুরের রং ভরিয়া গেল। বীণ বাজাইয়া যে গজল তিনি কৈশোরে এক রাতে গাহিয়াছিলেন, তাহারি সুর-ছরী যেন তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল।

আর রমলার মনে যে কি হইল তাহা বলা শক্ত, সে শুধু বেড়ানো বন্ধ করিয়া রাঙা কাঁকবের উপব বসিয়া পড়িল।

বহুক্ষণ বাঁশি বাজাইয়া রক্ত থামিল। শুক্ল বাড়ীর দিকে চাহিল। তারাতারা আকাশের নীল পটে আঁকা লালবাড়ীটি মহারহস্যভরা, যেন রূপকথার স্তম্ভ রাজকন্ডার নিঝুম পুরী,—রাজপুত্রের সোনার কাটিব ছোওয়া লাগিলেই জাগিয়া উঠে। ধীরে সে বাড়ীর দিকে চলিল। ছুধারে গাছগুলি নিদ্রিত দৈত্যের মত শুক্ল দাঁড়াইয়া।

বাঁশি থামিয়া গিয়াছে, জ্যোৎস্না ভরিয়া সে বাঁশিব তান যেন নীরবে বাজিতেছে। চারিদিক কি শুক্ল, শুধু তাহার ঘরের নিকট আসিতে পাশের কুঞ্জ হইতে কে চঞ্চল চরণে চলিয়া গেল। তারাতারা নীলিমার মত তার নীলশাড়ীর ঝলমলানি।

(৭)

পরদিন প্রভাতে চায়ের টেবিলে রক্তের ডাক পড়িল। সাদামার্কেলের লম্বা টেবিলের একদিকে বোগেশ-বাবু বসিয়াছেন। তাঁহার এক পাশে কাজীসাহেব আর-এক পাশে মাধবী। রমলা তাঁহাদের উন্টাদিকে দাঁড়াইয়া চা তৈরী করিয়া দিতেছিল।

রক্ত ধীরে নমস্কার করিয়া ঢুকিতেই, রমলা স্মিতহাস্যে তাহাকে অভিবাদন করিয়া তাহার পাশের চেয়ার দেখাইয়া দিল। মাধবী একবার নির্নিমেঘ নয়নে রক্তের মুখের দিকে চাহিয়া চক্ষু দুইটি চায়ের কাপে স্থাপিত করিল। কাজী-সাহেব প্রসন্ন হাসি হাসিলেন। আস্থন বলিয়া বোগেশ-বাবু অভ্যর্থনা করিলেন। রক্ত চেয়ারটা রমলার পাশ হইতে একটু টানিয়া ধীরে বসিল।

চা তৈরী করিয়া রমলা দুষ্টামিতরা চোখে বলিল,—চা খেতে কোনো আপত্তি নেই ত, না ছুধ এনে দেবো?

রক্ত যেন কিছুই বুঝিতে পারে নাই, এরূপ ভান

করিয়া মাধবীর দিকে চাহিয়া বলিল,—আগে ওঁকে দিন।

রমলা যেন একটু লজ্জিত হইয়া বলিল,—ঠিক বটে ladies first।

সে কাপটা মাধবীকে দিয়া পরের কাপটা রজতের দিকে অগ্রসর করিতেই রজত আবার বলিল,—আপনি আগে নিন।

রমলা হাসিমুখে বলিল,—না, guest first এবার।

চা দিগা সবাইকে রুটিতে মাখন মাখাইয়া দিতে দিতে রমলা জিজ্ঞাসা কবিল,—কাকাবাবু, আর-এক কাপ ? কাজী-সাহেব ?

দাড়ি নাড়িয়া কাজী বলিলেন,—না মা, আচ্ছা দাও, তোমার হাতে চা-টা আর-এক কাপ খেতে ইচ্ছে করছে।

কাজী-সাহেবকে আর-এক কাপ দিগা মাধবীর দিকে চাহিয়া রমলা বলিল—মাধু, চা ? আপনি ?

রজত ধীরে কাজীর দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিল,—আচ্ছা, দিন আব-এক কাপ ! রূপালী কাপে সোনালী চা !

রমলা হাসিয়া বলিল,—বা, ও তার চেয়ে কফি আরও সুন্দর দেখায়, lovely কফি। আচ্ছা কাকাবাবু, আজ খেয়ে ওই ফার্সী নিয়ে পড়তে পাবেন না, তার চেয়ে কোথাও বেড়াতে চলুন।

কাপটা মুখ হইতে নামাইয়া যোগেশবাবু স্নিগ্ধমুখে রমলার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—আমার দেখে বাত মা, বেশী চলতে তো পারবো না, এ কদিন আবার বেড়েছে। কৌতুক ভরা চোখে সবাইয়ের দিকে চাহিয়া রমলা বলিল,—বাত ! ও, আমি একটা বাতের শুধু জানি—এক হিমাতলের সম্মানীর স্বপ্নলব্ধ ঔষধ।

কাজী-সাহেব পেয়ালাটার চা নিঃশেষ করিয়া প্লেটে রাখিয়া বলিলেন,—তাই নাকি মা, বল তো।

রমলা মাধবী প্লেটে রুটি দিয়া বলিল,—ও সে বা ভয়ঙ্কর, নিশ্চয় মাধবী ভয় পাবে।

মাধবী ধীরে বলিল,—বলই না বাপু।

মাখন-মাখা ছুরিটা নাড়িতে নাড়িতে রজতভরা

হুয়ে রমলা বলিতে আরম্ভ করিল,—শুধুন কাকাবাবু, কুড়িটা কালো কাঁকড়া-বিছে, এ সাধারণ বিছে নয়, সে নাকি কোন পাহাড়ের জঙ্গলে পাওয়া যায়, সাপের মত বিষাক্ত, কেঁচোর মত কুণ্ডলী পাঁকিষে থাকে, কুচকুচে কালো,—চারটে ধুতরো-বিচি, এক তোলা গাঁজা, এক তোলা আফিম, আধ পো গরগরে লাল লঙ্গা, এই না দেড়সের সরষের তেলে ফেলে আগুনে চড়িয়ে সেদ্ধ করতে হবে, তারপর তেল যখন ফুঁবে ওই জীবন্ত বিছেগুলো ফেলে দিতে হবে—সেই তেল মরে' মরে' আধসের থাকতে নামাতে হবে, তাবপর তাই ছেকে ঘে কালো কুচকুচে তেল বেরোবে এ কয়েকদিন মাখলেই—এখন সে বিছে পাওয়াই মুশ্বিল।

রজত হাসিয়া বলিল,—সে বিছেও কোনো পাহাড়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না, আর সে তেলও কেউ তৈরী করতে পারবে না।

রমলা নিজের জন্ত এক কাপ চা তৈরী করিতে করিতে বলিল,—কেন, হুম্মান যদি এ যুগে থাকিতো, তবে হুকুম দিলেই পাহাড় স্বদ্ধ এসে হাজির হোত।

রজতের গুণ্ড একটু লাল হইয়া উঠিল, সে নীরবে রুটি চিবাইতে লাগিল, সে দিকে কোনো দৃকপাত না করিয়া রমলা চীৎকার করিয়া উঠিল,—এ মা, কি পিপড়ে জেলিটায়—কাকা-বাবু, আর রুটি ? না ?

জেলির শিশি হইতে পিপড়ে ঝাড়িতে ঝাড়িতে রজতের দিকে চাহিয়া রমলা বলিল,—জানেন, একবার একদল লাল পিপড়ে আমাদের বোর্ডিং আক্রমণ করলে, সে এমন কাণ্ড বেঁচিনি রেখে চা তৈরী করতে করতে চিনি উড়ে বেতে লাগলো।

রজত রুটিখানি শেষ করিয়া বলিল,—ও, যেমন হাম্মিলিন সহরে ইজিরেরা আক্রমণ করেছিল, কিন্তু ছেলেদের বোর্ডিং তো অগ্নি পিপড়ে হয় না।

রমলা উত্তর দিল,—তারা বিনা চিনিতে চা খান বলে, শুধুন না—সে এমন পিপড়ে, কাজী ত শুনেছো—

কাজী দাড়িতে হাত বুলাইয়া বলিলেন,—ই, আর তার সঙ্গে ছারপোকা আর আরসোনার আক্রমণটা বাদ দিছো যে ?

রমলা চামুচে করিয়া চায়ে চিনি মিশাইতে মিশাইতে
বলিল,—আমাদের গান হল জানেন কি, কাকাবাবু—

জ্যামেতে ছেলিতে শাড়ীতে ফুলেতে

পিপুড়ে সকল ঠাই,

পাউডার আর পমেটমটিতে

পিপুড়ের ভরা ভাই।

সাবান মাথাও দায়,

চানাচুর আর চকোলেট যত

নিমেষে উড়িয়া যায়।

যোগেশ-বাবু স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন,—কে লিখেছিলো
গানটা?

মাধবী ঠোট মুচ্কাইয়া হাসিয়া বলিল,—নিজেরই
লেখা গান, শোনানো হচ্ছে।

রজত তাহার মুখের দিকে চাহিতেই রমলা সলজ্জ-
ভাবে নিজের চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া নিজের কটিতে
জ্যাম মাখাইতে মনোনিবেশ করিল।

কাজী রজতের দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন,—
আর-একবার গাও তো, মা।

রমলা বলিল,—বা, আমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

আপন কটি-চা-তে সে এতক্ষণে গভীরভাবে মনোযোগ
দিল।

সবাই চুপচাপ দেখিয়া রজত ধীরে যোগেশ-বাবুর
দিকে চাহিয়া বলিল,—আজ থেকেই কাজ আরম্ভ করবো
ভাবছি।

কম্বলে মুখ মুছিতে মুছিতে যোগেশ-বাবু বলিলেন,—
আজ থেকেই! ছ' একদিন বিশ্রাম নিতে পাবেন।

রজত উত্তর দিল,—না, দরকার নেই। ছবিগুলো
একটু ডেবে আঁকতে হবে, কতকগুলো বড় ছবি
আঁকার কাগজ পাঠাতে আমার বন্ধুকে লিখে দিয়েছি,
তবে, পোর্টেট গুলো শীগগীর আরম্ভ করা যেতে
পারে।

যোগেশ-বাবু বলিলেন,—তা বেশ, কবে আরম্ভ
করবেন? কাজীসাহেব?

কাজী মাথা ও দাড়ি নাড়িয়া বলিলেন,—না, না,
আমার কেন, কি দরকার, আপনারই—

যোগেশ-বাবু স্নেহভরা চোখে মাধবীর দিকে চাহিয়া
বলিলেন,—তবে, মাধুমার?

মাধবী বাপেব দিকে শূন্য দৃষ্টি রাখিয়া একটু তিস্তস্বরে
বলিল,—না, বাবা।

মুহু হাসিয়া যোগেশ-বাবু বলিলেন,—তা হলে ত
আমারই আরম্ভ করতে হয়।

চায়ের কাপ শেষ করিয়া রমলা বলিল,—আমি বুঝি
বাদ গেলুম?

অতি অপ্রতিভ হইয়া যোগেশ-বাবু বলিলেন,—না, মা,
তোমার কথাও শুঁকে বলেছি, তা হলে তোমারই—

উঁহাকে বাধা দিয়া রমলা পরিহাসের স্বরে বলিল,—
আমি চুপ করে বসে থাকলে তো উনি আঁকবেন, আমি
sittingই দেবো না, চুপচাপ বসে থাকতে পারবো না—

রজত ঠোট মুচ্কাইয়া হাসিয়া বলিল,—sitting দেবার
দরকার হবে না।

তারপর ধীরে বলিল,—কাজীসাহেবের ছবি আগে
আরম্ভ করা যাক।

যোগেশ-বাবু বলিলেন,—আচ্ছা, তাই বেশ, আর
মাধু-মাঝে একটু আঁকতে শিখিয়ে দেবেন।

রজত বলিল,—একটা সময় ঠিক করলে ভালো হয়।

মাধবীর দিকে ফিরিয়া যোগেশ-বাবু স্নিগ্ধ স্বরে
বলিলেন,—কখন তোমার সময় হবে, মা।

চোখ না তুলিয়াই গম্ভীর কণ্ঠে মাধবী বলিল,—আমার
সময় হবে না, বাবা।

যোগেশ-বাবু একটু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন,—কেন
মা! শরীরটা ভালো নেই?

ধীরে বাবার দিকে নিমেষের অন্ত চাহিয়া মাধবী বলিল,
—আচ্ছা, দুপুরে এক ঘণ্টা।

রজত যোগেশ-বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল,—দু'ঘণ্টা
হলে ভালো হয়।

যোগেশ-বাবু মুহু হাসিয়া বলিলেন,—আচ্ছা, ও এক
ঘণ্টাই শিখুক, আর এক ঘণ্টা নয় রমুকে—

রমলা কটিব অঙ্কে মুখ হইতে ভাঙিয়া লইয়া বলিল—
না, কাকাবাবু, আগাব ও-সব ভালো লাগে না, ও-সব হবে
না, ততক্ষণ পুড়িং রাখলে—

কাজী হাসিয়া বলিলেন,—বেশ মা, আমাদের তুমি
রোজ নতুন নতুন পুডিং খাইও।

রমলা উৎসাহের সহিত বলিল,—আচ্ছা, কি খাবেন?

—Almond Pudding, Custard Pudding, French
Pudding, Quaking Pudding ?

রজত বলিল,—ও শেষেরটা নয়।

কাজী বলিলেন,—সেই কি রমলা পুডিং খাইয়েছিলে ?

—ও, বলিয়া রমলা তাহার ক্রটিতে মন দিল।

যোগেশ-বাবু উঠিয়া দাঁড়াইতে কাজী ও মাধবী উঠিয়া
দাঁড়াইলেন। তিনি একহাতে তাহার লাঠিতে আর-এক
হাতে মাধবীর হাতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির
হইলেন। কাজী তাহার পিছন পিছন চলিলেন। রজত
একবার রমলার মুখের দিকে বিমুগ্ধ নয়নে চাহিয়া পাশের
দরজা দিয়া বারান্দায় রাহির হইল। সবাই চলিয়া গেল,
রমলা তাহার জ্যাম-মাখা ক্রটির শেষটুকরা চিবাইতে
চিবাইতে একটা চামচ লইয়া প্লেটে কাপে টুং টুং শব্দ
করিয়া এক পিয়ানোর স্বর বাজাইতে লাগিল।

হাসিভরা স্বরে বলিয়া উঠিল,—কেমন বাজছে বল তো
মনিয়া ?

কিশোর চাকরটি কালো টিকের মুখে আগুনের মত
তাহার পানে-রাঙা ঠোঁটগুলি আনন্দে কাঁপাইয়া বলিল,—
ভারি সুন্দর, দিদিমণি, কিন্তু যখন ঝনঝন করে' প্লেট ভেঙে
পড়ে।

—তুই ভাঙতে পারিস এ প্লেটখানা ?

—খুব পারি !

—ভাঙ !

—বক্বেন, মাধু-দিদিমণি বক্বেন।

—আমি বলছি, তুই ভাঙ।

—না, দিদিমণি।

—আচ্ছা, আমি গর দাম দেবো, তুই বাজার থেকে
কিনে আনিস।

—না, দিদিমণি !

—যাঃ, ভীতু, দেখ—

রমলা চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া একখানি মাখন-
লাগানো পাখীফুল-জাকা বড় প্লেট মেজ্ঞেতে জোরে ফেলিয়া

দিল। ঝনঝন শব্দে প্লেটখানি ভাঙিয়া সাদাটুকরাগুলি
চারিদিকে ঠিকরাইয়া পড়িল। সহাস্য চোখে সেই ভগ্ন-
খণ্ডগুলির দিকে চাহিয়া রমলা দাঁড়াইয়া রহিল।

প্লেটভাঙার শব্দে দুই দিক হইতে মাধবী ও রজত ছুটিয়া
আসিল। মনিষা ভীতমুখে মাধবীর মুখের দিকে চাহিয়া
বলিল,—দিদিমণির হাত থেকে প্লেটটা পড়ে' ভেঙে
গেলো।

রমলা হাসির বাতাস তুলিয়া বলিল,—যা মিথ্যুক, এক-
খানা প্লেট ভেঙে দেখলুম ভাই, কেমন শব্দ শুনে।

মাধবীর গম্ভীর মুখ হাসির আলোয় একটু উজ্জ্বল হইয়া
উঠিল দেখিয়া রজতের দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রমলা
বলিল,—গ্যেটের গল্প জানেন না? একবার তিনি
রান্নাঘরে ঢুকে দেখেন, ঘরে কেউ নেই, সাদা ধপধপে
প্লেটগুলো টেবিলে সাজানো, একে একে সেগুলো তিনি
জানুলা দিয়ে রাস্তায় ফেলতে শুরু করলেন; প্রত্যেক
খানা ঝঙ্কার দিবে ভাঙে আর তিনি হাততালি দিয়ে গুঠেন;
—তাঁর মা তো শব্দ শুনে ছুটে এসেছেন, গ্যেটে মনের
আনন্দে প্লেটের পর প্লেট ভেঙে চলেছেন, মা এসেছেন
খেয়ালই নেই, মা তাঁর ছেলের স্বথের আনন্দের দিকে
চেয়ে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলেন, বহুনি দেওয়া হল না।

কথা শেষ করিয়া রমলা চাহিয়া দেখিল, মাধবী নাই,
চলিয়া গিয়াছে।

সেইক্ষণেই তিনি এত-বড় কবি হতে পেরেছিলেন,—
বলিয়া রজতও মুচকিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

রমলা একটা পিয়ানোর স্বর মুহু গাইতে গাইতে
মনিয়ার সঙ্গে প্লেটের ভাঙা অংশগুলি তুলিতে লাগিল।

(৮)

সেইদিনেই কাজ আরম্ভ করিয়া দিবে বলিল বটে কিন্তু
সমস্ত সকাল রজত আপন ঘরে হেলাফেলা করিয়া কাটাইল।
প্লেটভাঙার ঝনঝনানির স্বর তাহাকে ঘিরিয়া প্রভাতের
আলোয় বাজিতে লাগিল।

সমস্ত দুপুর অলসভাবে কাটিল। একবার মাধবীকে
চিত্রবিজ্ঞা শিখাইতে ডব্লিঙ্কমে গিয়াছিল। মাধবী একরূপ
আড়ষ্টভাবে বসিয়া রহিল যে সে কলেজের প্রফেসরের
মত মুখবন্ধ বক্তৃতা দিয়া আর মাঝে মাঝে 'কাগজে ছ'

চারিটি বেথা টানিয়া কোনোমতে আধ ঘণ্টা কাটাইল। তারপর মাধবী, ভালো লাগছে না, বলিয়া তাহাকে বিদায় দিল। এরা ঘরে সে দিবাসপত্রের আল বুনিতে লাগিল।

রজত বিকালে যখন বেড়াইতে বাহির হইল, মাধবী ও রমলা পিয়ানোর কাছে বসিয়া গল্প করিতেছিল। ড্রিং-রুমের পাশ দিয়া গেলেও কেহ তাহাকে ডাকিল না। সে ধীরে একা সম্মুখ পথ ধরিয়া বেড়াইতে চলিয়া গেল। নূতন অজানা জায়গার পথে ঘোরার মহারহস্য আছে, ইঠাৎ কোন্ পথ যে কোথায় লইয়া যাইবে, কোন্ কোণে যে কি পবমান্বর্ধ্যকর বস্তুর সন্ধান मिलিবে, তাহা কে জানে। চঞ্চল উৎসুক চিত্ত লইয়া রজত পথ ধরিয়া বরাবর চলিল।

রমলা মাধবীর নিকট তাহাব কলেজের গল্প করিতেছিল। রজত বাবান্দা দিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া রমলা বলিয়া উঠিল,—আচ্ছা ভাই মাধু, রজত-বাবু বেশ আকৃতে পারেন, না?

একখানি সচিত্র বিলাতী পত্রিকার পাতা উন্টাইতে উন্টাইতে মাধবী বলিল,—হঁ।

চেয়ারটা একটু দোলাইয়া রমলা বলিল,—কাল রাতে কি স্বপ্নব বাণি বাজাচ্ছিলেন! আমাদের বোর্ডিংয়ের সেই ফিরিঙ্গি মেয়েটা, মনে নেই বার মুখ ঠিক পানেন মত, সে এক খুঁটান ছেলের বাণি বাজানো শুনে তাকে বিধেই করে' ফেলে! এঁর বাণি শুনে কি করতো না জানি! আর আঁকেন ত চমৎকার, অবশ্য আমি ছবির কিছুই বুঝি না।

মুহূ হাসিয়া মাধবী পত্রিকাখানা মুড়িয়া বলিল,—শুণের ত ব্যাখ্যা হল, এবার তোনার 'কিস্ত' দিয়ে আরম্ভ কর।

রমলা যখন কাহাকেও প্রশংসা করিতে আরম্ভ করে তখন তাহার বকুবা সমস্ত হ' যা উঠে, কতকগুলি প্রিয় সত্য ও মিথ্যার পর না জানি কি অপ্রিয় তীক্ষ্ণ সত্যকথা বাহির হইবে। সে কাহারও দোষ বলিতে গেলে আগে তাহার গুণের তালিকা দিয়া শুরু কবে।

চেয়ারে স্থির হইয়া বসিয়া রমলা বলিল,—না, কিস্তটা থাক, তুমি তা হলে যা চটবে!

—বেশ মেয়ে! বা, আমি চটব কেন?

রমলা মাধবীর কাছে চেয়ারটা টানিয়া আনিয়া তাহার দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশগুলি নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—আচ্ছা, ভাই, গুর বাড়ী কোথায়, বাবা যা আছেন নিশ্চয়?

একখানি নূতন মাসিকপত্রিকা নাড়িতে নাড়িতে মাধবী বলিল,—তা আমি কি জানি, ছবি আঁকতে এসেছেন, তাঁব বাড়ির খবর কে জিজ্ঞেস করতে গেছে?

মাধবীর বাম গালটা টিপিয়া রমলা বলিল,—আঁকতেই তো এসেছেন, তোমার মনে কিছু না আঁকেন তাই বলছি।

রমলার হাতটা জোরে টিপিয়া মাধবী বলিল,—যা, বাজে বকিস্ না, কে কাব মনে কি আঁকে তা দেখা যাবে।

রমলা ধীরে উঠিয়া মাধবীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার হাতে খোলা পত্রিকাব উপর যেন ঝুঁকিয়া পড়িল। হাসিয়া বলিল,—এবার এসে তোকে ভারি স্বপ্নের দেখাচ্ছে, কি মেমগুলোর ছবি দেখছিস, ওদের চেয়ে তোকে দেখতে ভালো, দেখ তো, রং যেন ফেটে পড়ছে।—বলিয়া, তাহার রক্তিম অধরে এক চুম্বন করিল।

—আ, কি করিস, আর জালাতন করিস না, রমু।

—বেশ করবো,—বলিয়া তাহার ডান গালটা সম্বোরে টিপিয়া রমলা তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

মাধবী গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া রমলা বলিল,—তুমি কিন্তু এবাব এমন গম্ভীর হয়ে গেছো, আমার এসে প্রথম ভয়ই করেছিলো।

তারপর পিয়ানোর সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া রমলা বলিল,—এবার প্রাইজের সময় যে গানটা বাজিয়েছিলুম শুনবি?

পত্রিকা উন্টাইতে উন্টাইতে মাধবী বলিল,—আচ্ছা, বাজা।

রমলা পিয়ানোর ঝঙ্কার দিল।

একা একা বেশীদূর যাইতে রজতের ইচ্ছা হইল না। সে যখন বেড়াইয়া ফিরিল, সম্মুখ হয়-হয়। রমলা পিয়ানোর পাশে চুপচাপ বসিয়া আছে, মাধবী উপরে পিতার নিকট চলিয়া গিয়াছে।

রজত ড্রিং-রুমে ঢুকিতে রমলা তাহাকে লক্ষ্য করিল

না দেখিয়া সে বেন অন্ধকার ঘরটিকে উদ্দেশ করিয়া
বলিল,—আজ অনেক দূর বেড়িয়ে এলুম।

রমলা হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—মোটাই না, এই মাত্র ত
গেলেন।

অপ্রস্তুত হইয়া রক্তত বলিল,—অনেক দূরই ত বোধ
হল, বেশ আয়গাটা।

রমলা কোনো উত্তর না দিয়া চেয়ারটাকে যুহু দোলাইতে
লাগিল। রক্তত ধীরে বাহির হইয়া গেল। বারান্দা পার
হইয়া লাল পথ দিয়া গেটের দিকে চলিল। এবার সে
সত্যই বহুদূর ঘুরিয়া অনেক রাতে বাড়ী ফিরিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

রবীন্দ্র-পরিচয়

[রবীন্দ্রনাথের শৈশব-রচনা একপ্রকার লোপ পাইয়াছে
বলিলেই চলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে উনিশ
কুড়ি বৎসর বয়সের পূর্বে লেখা এগারো হাজার লাইন
কাব্যসাহিত্যের মধ্যে প্রায় কিছুই আজকালকার প্রচলিত
সংস্করণে পাওয়া যায় না। কিছুকাল হইল রবীন্দ্র-সাহিত্য-
স্থতী (Bibliography) সংকলন করিতে আরম্ভ
করিয়াছি। এই স্থতী-সংকলন কার্যের সঙ্গে সঙ্গে
রবীন্দ্র-সাহিত্যের কালানুক্রমিক পরিচয় দিবার ইচ্ছা
আছে। নির্দর্শন-স্বরূপ বাণ্য-রচনা হইতে কোন কোন
অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিব। এই সময়ের অধিকাংশ
লেখায় কোনো স্বাক্ষর নাই। এখন কিছু কিছু উদ্ধার
করিয়া না রাখিলে পরে আর কোনো চিহ্ন মাত্র
 থাকিবে না। সংকলন যেমন অগ্রসর হইবে রবীন্দ্র-
পরিচয়ও তেমনি বাহির হইতে থাকিবে। এইরূপ ঋণ
ঋণ ভাবে কার্য অগ্রসর হওয়ায় ইহাতে সমালোচনার
ধারাবাহিক ঐক্যত্বগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবারই
সম্ভাবনা। তাই মনে রাখা আবশ্যিক যে “রবীন্দ্র-পরিচয়”
সাহিত্য-সমালোচনা নহে, সমালোচনার পূর্বাভাস মাত্র।]

কবিকাহিনী

এই ঋণকাব্যখানি প্রথমে ভারতীতে প্রকাশিত হয়।
ভারতী ১ম বর্ষ ১২৮৪ সন (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ) পৌষ
২৬৪-২৬৮ পৃষ্ঠা, ১ম সর্গ—২৩৮ লাইন, মার্চ ৩১৮—৩২৫

পৃষ্ঠা, ২য় সর্গ—৪২৫ লাইন, ফাল্গুন ৩৬০—৩৬০ পৃষ্ঠা, ৩য়
সর্গ—১৫৫ লাইন, চৈত্র ৩৯৩—৩৯৯ পৃষ্ঠা, ৪র্থ সর্গ—৩৬৭
লাইন, মোট ১১৮৫ লাইন। রবীন্দ্রনাথের বয়স এই
সময়ে ষোল বৎসর।

“বনফুল” ইহার দুই বৎসর পূর্বে ১২৮২-১২৮৩
সনের (১৮৭৫-১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ) জ্ঞানাস্কুরে বাহির হইয়া
গিয়াছিল, কিন্তু ১২৮৬ সনে (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে) পুস্তকাকারে
কবিকাহিনীই প্রথম প্রকাশিত হয়। ‘জীবনস্মৃতি’তে
আছে—

“এই কবিকাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ-
আকারে বাহির হইল। আমি যখন মেজদাদার নিকট আমোদবাসে ছিলাম
তখন আমার কোনো উৎসাহী বন্ধু এই বইখানা ছাপাইয়া আমার নিকট
পাঠাইয়া দিয়া আমাকে বিক্ষিপ্ত কথিয়া দেন। তিনি যে কাজটা ভালো
করিয়াছিলেন তাহা আমি মনে-কবি না কিন্তু তখন আমার মনে যে
ভাবোদয় হইয়াছিল, শাস্তি দিবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে কোনো মতেই
বলা যায় না।” (১)

গ্রন্থ-পরিচয়

গ্রন্থখানির আকার ৬৪" + ৪৩" (১৭ মিমি ×
১০.৫ মিমি) ডবল ফুলস্ক্যাপ্ ১৬ পেজি ৩ ফর্ম্যা ৬ পৃষ্ঠায়
মোট, মুখপত্র + ৫৩ পৃষ্ঠা; স্মল পাইকা অক্ষরে প্রতি
পৃষ্ঠায় ২৪ লাইন ছাপা। উৎসর্গ-পত্র নাই। কবিকাহিনীর
এক লাইনও পরে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই; বইখানিও এখন
দুস্তাপ্য। নাম-পত্র (title page) এইরূপ—

(১) জীবন-স্মৃতি—১০৮ পৃঃ।

কবিকাহিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

ও

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

মেছুয়াবাজার—রোডের ৪২ সংখ্যক ভবনে

সরস্বতী যন্ত্রে

শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক

মুদ্রিত

সংবৎ ১৯৩৫।

আখ্যান-ভাগ। (২)

রবীন্দ্রনাথ নিজেই কবিকাহিনীর আখ্যান ভাগ সম্বন্ধে
এইরূপ লিখিয়াছেন :—

“যে বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই
কেবল নিজের অপরিচ্ছিন্নতার ছায়ামূর্ত্তিকেই খুব বড় করিয়া দেখিতেছে
ইহা সেই বয়সের লেখা। সেইজন্য ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে
লেখকের সত্তা তাহা নহে, লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে
ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে
যাহা বুঝায় তাহাও নহে—যাহা ইচ্ছা করা উচিত অর্থাৎ যেকোনটি হইলে
অন্ত দৃশ্যমানে মাথা নাড়িয়া বলিবে, ইহা কবি বটে, ইহা সেই
জিনিষটি।” (২)

প্রথম সর্গ

প্রথম সর্গে কাব্যের নায়ক কবির শৈশব কালের কথা
বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের মনে আদর্শ শিশুজীবনের ছবি
কিরূপ ফুটিয়াছিল তাহায় পরিচয় পাই। শিশু কবি
আপন মনে প্রকৃতির কোলে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে,
মনের আনন্দে গান গাহিতেছে—

জননীর কোল হতে পালাত ছুটিয়া,
প্রকৃতির কোলে গিয়া করিত সে খেলা।
ধরিত সে প্রজাপতি, তুলিত সে ফুল,
বসিত সে ভক্তুলে, শিশিরের ধারা
ধীরে ধীরে দেখে তার পড়িত বরিয়া। (২)

মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন, যে, মানুষের যে-সকল আকাঙ্ক্ষা
বাস্তব জগতে পূর্ণ হয় না, কল্পনার জগতে মানুষ তাহা
সন্তোষ করিয়া লয়। রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের কথা

স্মরণ করিলে মনে হয় যে বালক রবীন্দ্রনাথ কবিকাহিনীর
মধ্যে কল্পনার সাহায্যে নিজের অনেক অপরিচূর্ণ আকাঙ্ক্ষা
চরিতার্থ করিয়া লইয়াছেন। ‘জীবনস্মৃতি’তে আছে—

“বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বাধা ছিল; এমন কি বাড়ির
স্তম্ভবেও আসা সর্বত্র বেগুন-খুসি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম
না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল আবড়াল হইতে দেখিতাম।
বাহির বলিয়া একটি অনন্ত প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত,
অথচ যাহা বর্ত্তমান শব্দ পঙ্ক ঘাট-জানালার নানা কাঁক-ফুকন দিয়া এদিক
ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে বেন পরানের ব্যবধান
দিয়া নানা ইন্দ্রিয় আসা-যাওয়া সঙ্গে খেলা করিয়া চেষ্টা করিত। সে
ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বন্ধ,—নিয়ন্ত্রণের উপায় ছিল না,—সেইজন্য
প্রাণের আকর্ষণ ছিল প্রবল।” (১)

কবিকাহিনীর শিশু কবি কিন্তু সখ মিটাইয়া বাহিরের
জগতে খেলা করিয়া বেড়াইত।—

প্রফুল্ল উষার ভূষা অরুণ-কিরণে
বিমল সরসী যবে হোত তাবাময়ী,
ধরিতে কিরণগুলি হইত অধীর।
যখন গো নিশীথেব শিশিরাক্রমলে
ফেলিভেন উষাদেবী স্রসতি নিশাস,
গাছপালা লতিকার পাতা নড়াইয়া,
বুন ডাঙ্গাইয়া দিয়া যুগ্ম নদীর
যখন গাহিত বাবু-বন্য-গান তার
তখন বালক কবি ছুটিত প্রান্তরে,
দেখিত ধান্যের শিখ ছলিছে পবনে।
দেখিত একাকী বসি গাছের তলায়,
বর্ষময় জলধের সোপানে সোপানে
উঠিছেন উষাদেবী হাসিয়া হাসিয়া। (২)

প্রকৃতির কোলে শুধু খেলা করা নহে, শিশু কবি গাছপালা
পশুপক্ষীর সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়েরও খোঁজ রাখিত,—
কোথায় পাখীরা গান করে, কোথায় ফুলগুলি ঢলিয়া পড়ে,
কোথায় বাতাসে গাছের পাতা নাচিয়া উঠে!

বিজল ফুলায় বসি গাহিত বিহঙ্গ
হেথা হোণা উঁকি মারি দেখিত বালক
কোথায় গাইছে পাখী। ফুলদলগুলি
কামিনীর গাছ হোতে পড়িলে ঝরিয়া
ছড়ায়ে ছড়ায়ে তাহা করিত কি খেলা। (৩)

প্রকৃতির কোলে খেলা করিবার জন্য এই প্রবল আগ্রহ
এই অপরিচূর্ণ আকাঙ্ক্ষাই পরবর্ত্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথকে
বিস্তারিত প্রাস্তরের মধ্যে শালের বীধি আমলকী-

(১) জীবনস্মৃতি, পৃ. ১০৭।

(২) ভা. ১২৮৪, পৃ. ২৬৪। কবি-কাহিনী, ১ পৃষ্ঠা।

(১) জীবনস্মৃতি, পৃ. ১০৭।

(২) ভা. ১২৮৪, পৃ. ২৬৪-২৬৫। কবি-কাহিনী, ১-২ পৃষ্ঠা।

(৩) ক-কা, পৃ. ১-২। ভা. ১২৮৪, পৃ. ২৬৪।

কাননের ছায়ায় বালকদিগের ক্ষুদ্র বিদ্যালয় স্থাপন
করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। কবিকাহিনীর শিশুকবিও
রবীন্দ্র-সাহিত্যে হইতে লোপ পায় নাই, “শারদোৎসবের”

বালকদলও দিশাহারা হইয়া গাহিয়াছে—

কি কবি আজ ভেবে না পাই
পথ হারিয়ে কোন্ বনে বাই—
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই—
সকল ছেলে ভুট। (১)

শিশুকবি ধেমন্ড মায়ের কোল হইতে ছুটিয়া পালাইয়াছে,
বালকদলও তেমনি ঘর ছাড়িয়া বাহিবে ছুটিয়াছে—

ওরে বাব না আজ ঘবে বে ভাই
যাব না আজ ঘরে।
ওবে আকাশ ভেঙে বাহিবকে আজ
নেব রে গুট কবে। (২)

যাহা হউক শিশুকবির শৈশব ক্রমে ফুরাইয়া আসিল।
কবি ঘোঁরনে প্রবেশ করিলেন। প্রকৃতির সহিত যোগ
এখন আবও ঘনিষ্ঠ হইল।

প্রকৃতি আছিল তাব সঙ্গিনী মত।
নিজের মনের কথা যত কিছু ছিল,
কহিত প্রকৃতি দেবী তাব কানে কানে,
প্রভাতের সঙ্গীত বলা চুপিচুপি
কহে কুহকের কানে যবন-বারতা। (৩)

কবি প্রকৃতির দিকে চাহিয়া চাহিয়া তন্ময় হইয়া
বাহিত, আপনার মনে কত ভাবনাই ভাবিত।

ভাবিত নদীর পানে চাহিয়া চাহিয়া
নিশাই কবিতা আর দিবাঁই বিজ্ঞান।
দিবালোকে নাও যদি বনভূমি-পানে,
কাঁটা খোঁচা কর্মমাল্য বীভৎস জঙ্গল
তোমার চক্ষের 'পবে হবে প্রকাশিত ;
দিবালোকে মনে হয় সমস্ত জগৎ
নিয়মের বস্ত্র-চক্রে ঘুরিছে ঘুরি।
কিন্তু কবি নিশাদেবী কি মোহন-মন্ত্র
পড়ি দেয় সমুদয় জগতের পরে,
সকলি দেখায় যেন রহস্তে পুত্রিত ;
সমস্ত জগৎ যেন স্বপ্নের মতন। (৪)

কল্পনাদেবী তখন কবির প্রতি অমূল্য—

কল্পনা। সকল ঠাই পাইত শুনিতে
তোমার বীণার ধ্বনি, কখনো শুনিত

প্রস্তুত গোলাপের কদম্বে বসিয়া,
বীণা লয়ে বাজাইছ অসুট কি গান।

* * *
নীরব নিশীথে যবে একাকী রাখাল
হৃদয় কুটীরতলে বাজাইত বাঁশি,
ভূমিও তাহাব সাথে মিসাইতে ধ্বনি,
সে ধ্বনি পশিত তার প্রাণের স্তিতর। (১)

রাজিব অন্ধকারে যখন সমস্ত জগৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে
কবি তখন একাকী পর্বতশিখরে উঠিয়া প্রকৃতির স্তবগান
গাহিত।

সে পঙ্খীর গান তাব কেহ শুনিত না
কেবল আকাশ-ব্যাগী স্তব্ধ তারকাবা
একদৃষ্টে সুখপানে বহিত চাহিয়া।
কেবল পর্বতশৃঙ্গ করিয়া আঁধার
সরল পাদপবাজি নিস্তব্ধ পঙ্খীর
ধীরে ধীরে শুনিত গো তাহার সে গান ;
কেবল হৃদয়-বনে সিংহ-বাঁজার
হৃদয়ে সে গান পশি প্রতিধ্বনিক্রমে
মুহুর্তর হোবে পুন আদিত ফিরিয়া।
কেবল হৃদয় শৃঙ্গে নির্বিকম্পি বালা
সে পঙ্খী-গীতি মাথে কণ্ঠ মিশাইত,
নীরবে তটিনী যেত সন্মুখে বাহিয়া,
নীরবে নিশীথ-বায়ু কাঁপাত পল্লব। (২)

পনেরো ঘোল বৎসর বয়সে লেখা প্রকৃতি-স্তবের মধ্যেও
কল্পনা-শক্তির আশ্চর্য পরিচয় পাওয়া যায় ; প্রকৃতিকে
সম্বোধন করিয়া কবি গাহিতেছেন—

শত শত গ্রহতারা তোমার কটাক্ষে
কাঁপি উঠে ধবধরি, তোমার নিশাসে
ঝটিকা বহিয়া যায় বিশ্ব-চরাচরে।
কালের মহান পক্ষ করিয়া বিস্তার,
অনন্ত আকাশে থাকি হে আদি জননি,
শাবকের মত এই অসংখ্য জগৎ
তোমাব পাখার ছায়ে করিছ পালন। (৩)

ইহার পর নীহারিকা-পুঞ্জ হইতে ক্রমে ক্রমে জগতের
সৃষ্টি ও পরিণতি বর্ণনা করিয়া প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মের
কথা বলিয়াছেন—এই নিয়ম-বন্ধন যদি একবার কোথাও
ছিদ্র হয় তবে কি ভয়ঙ্কর প্রলয়কাণ্ডই উপস্থিত হইবে!

এ দৃঢ় বন্ধন যদি ছিঁড়ে একবার,
সে কি ভয়ানক কাণ্ড বাধে এ জগতে
কলহিঙ্গ কোটি কোটি সূর্য্যচন্দ্রতারা

(১) শারদোৎসব পৃ ২।

(২) শারদোৎসব, পৃ ১৯।

(৩) ক-কা, পৃ ৩। ভা, পৃ ২৬৫।

(৪) ক-কা, পৃ ৪-৫। ভা, পৃ ২৬৫।

(১) ক-কা, পৃ ৫-৬। ভা, পৃ ২৬৬।

(২) ক-কা, পৃ ৬-৭। ভা, পৃ ২৬৬।

(৩) ক-কা, পৃ ৮। ভা, পৃ ২৬৬।

অনন্ত আকাশময় বেড়ায় মতিয়া,
মণ্ডলে মণ্ডলে ঠেকি লক্ষ সূর্য্য গ্রহ
চূর্ণ চূর্ণ হোয়ে পড়ে হেথায হোথায ;
এ মহান্ জগতের ভগ্ন অবশেষ
চূর্ণ নক্ষত্রের স্তূপ, খণ্ড খণ্ড গ্রহ
বিশৃঙ্খল হয়ে বহে অনন্ত আকাশে । (১)

আবও কিছুদিন পরে “সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়” নামে
একটি কবিতায় কতকটা এই ধরণের বর্ণনা পাওয়া যায়।

প্রকৃতির ঋতু-মুষ্টি ববীন্দ্রনাথের মনকে চিরদিনই
আকর্ষণ কবিয়াছে, পরবর্তীকালের লেখায় সর্বত্রই
তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই বাল্যকালের
লেখাটির মধ্যেও আমবা প্রকৃতির প্রলব্ধকপেব বন্দনা
দেখিতে পাই।

যখন ঝটিকা ঝঞ্ঝা প্রচণ্ড সংগ্রামে
অটল পর্ব্বতচূড়া করেছে কম্পিত,
সুপ্তজীব অশ্রুনিধি উদ্গারের মত
কবিয়াছে ছুটীছুটি বাহার প্রতাপে,
তখন একাকী আমি পর্ব্বত-শিখরে
দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি সে ঘোর বিপ্লব,
মাথার উপর দিয়া সহস্র অশনি
হৃদিকট অটহাসে গিয়াছে ছুটিয়া,
প্রকাণ্ড শিলার স্তূপ পদতল হোতে
পড়িয়াছে বর্ষবিরা উপত্যাকা দেশে,
তুণ্য-নজ্জাত-রাশি পড়িছে বসিয়া
শূন্য হোতে শূন্যস্তরে উলটি পালটি । (১)

এই বয়স হইতে আরম্ভ কবিয়া সিদ্ধান্তরূপে “দোলে রে
প্রলয় দোলে” অথবা বর্ষশেষের “ঈশানের পুঞ্জমেঘ ধেয়ে
চলে আসে বাধাবন্ধহারা” পর্য্যন্ত ঝড়ের বর্ণনায় কবির
হাত কখনো কাঁপে নাই।

পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন, “মোবে কর
সভা-কবি ধ্যান-মৌন তোমার সভায় হে শরীরী” ; রাজি
ও সম্ভার স্তবও তিনি পবে অনেক লিখিয়াছেন ; কিন্তু
এই অল্প বয়সেব লেখাতেও নিশীথ-রাজির সভাকবি
হইবার ঘোষ্যতা পরিচয় দিয়াছেন।

অমানিশীথের কালে নীচের প্রাস্তবে
বসিয়াছি দেখিয়াছি চৌদিকে চাহিয়া,
সর্বব্যাপী নিশীথের অন্ধকার গর্ভে
এখনো পৃথিবী বেন হতেছে সজ্জিত।
স্বর্গের সহস্র আঁখি পৃথিবীর গরে

নীচবে রয়েছে চাহি পলকবিহীনে,
স্নেহময়ী জননী'র স্নেহ-আঁখি যথা
সুপ্ত বালকের পরে রহে বিকশিত । (১)

শুধু বাত্মি নয়, সন্দেহ সন্দেহই আছে—

কি হৃন্দব কপ তুমি দিয়াছ উদার
হাসি হাসি নিদ্রোখিতা বালিকার মত
আধঘুমে মুকুলিত হাসিমাখা আঁখি।
কি মন্ত্র শিখাবে দেছ দক্ষিণ বালারে—
যেদিকে দক্ষিণবধু কেলেন নিখাস
সেদিকে ফুটিয়া উঠে কুসুম-মঞ্জরী,
সেদিকে গাহিয়া উঠে বিহঙ্গের দল,
সেদিকে বসন্তলক্ষ্মী উঠেন হাসিয়া । (২)

দ্বিতীয় সর্গ

প্রকৃতির কোলে এই ভাবে কবির জীবন কাটিতে
লাগিল, কিন্তু কবির হৃদয় শূন্য থাকিয়া গেল—কিসের যেন
অভাব থাকিয়া গিয়াছে—

এখনো বুকের মাঝে, রয়েছে দাক্ষণ শূন্য,
সে শূন্য কি এ জনমে পুথিবে না আব ?
মনেব মন্দির মাঝে প্রতিমা নাহিক যেন,
শুধু এ আঁধার গৃহ রয়েছে পড়িয়া । (৩)

এই পনেরো ঘোল বৎসব বয়সেই রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়া-
ছিলেন—

মানুষের মন চায় মানুষেরি মন—
গম্ভীর সে নিশীথিনী, হৃন্দর সে উষাকাল
বিষর সে সাযাহের স্নান মুখচ্ছবি,
বিস্তৃত সে অশ্রুনিধি, সমুচ্চ সে গিবিবর,
আঁধার সে পর্ব্বতের গহ্বর বিশাল
* * *
পাবে না পুরিতে তাবা, বিপাল মানুষ-হৃদি,
মানুষের মন চায় মানুষেরি মন । (৪)

প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ ভালবাসিয়াছেন বটে কিন্তু
সন্দেহ সন্দেহ তিনি মানুষকেও ভালবাসিয়াছেন, তিনি
বলিয়াছেন—

মরিতে চাহি না আমি হৃন্দব ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবাবে চাই । (৫)

সেইজন্ত রবীন্দ্রনাথ মানুষকে বাদ দিখা কাব্য রচনা
করিতে পারেন নাই।

কবিকাহিনী'র নায়ক শূন্য হৃদয়ে বনে বনে ঘুরিয়া

(১) ক-কা, পৃ ৯-১০। ভা, পৃ ২৬৭।

(২) ক-কা,—পৃ ১০। ভা, পৃ ২৬৭-২৬৮।

(৩) ক-কা, পৃ ১২। ভা, মান, ১২৮৪, পৃ ৩১৮।

(৪) ক-কা, পৃ ১৩। ভা, পৃ ৩১৯।

(৫) কডি ও কোমল।

(১) ক-কা, পৃ ৭-৮। ভা, পৃ ২৬৭।

(২) ক-কা, পৃ ৯। ভা, পৃ ২৬৭।

বেড়াইত, একদিন অপরাহ্নে শ্রান্ত হৃদয়ে এক বৃক্ষতলে
শুইয়া পড়িল।

হেনকালে ধীরে ধীরে, শিয়রের কাছে আসি
দাঁড়াইল একজন বনের বালিকা,
চাহিয়া মুখের পানে কহিল করুণ স্বরে
কে তুমি গো পঞ্চশ্রী বিধির পশিক ?
অথবা বিবাহ বেন পেতেছে আসন তাব,
নবন কহিছে যেন শোকের কাহিনী।
তরুণ হৃদয় কেন অমন বিবাহময় ?
কি হুখে উদাস হোবে করিছ ভ্রমণ ? (১)

বালিকার নিকট কবি আপনার হৃদয়ের কত কথা
বলিল, কবির মনে হইল এতদিন পরে তাহার হৃদয় যেন
একটু জুড়াইল। বালিকা কবিকে তাহার পর্ণ-কুটারে
ডাকিয়া লইয়া গেল।

হোখাষ বিজন বনে দেখেছ কুটার ওই,
চল যাই ওইখানে যাই হুজুয়ায়।
বন হোতে কলমূল আপনি তুলিয়া দিব,
নিষ্কর হইতে তুলি আনিব সলিল,
যতনে পর্ণেব শয্যা দিব আমি বিছাইয়া,
হৃথনিজ্ঞা-কোলে সেখা লজ্জিবে বিবাহ,
আমার বীণাটি লয়ে গান শুনাইব কত,
কত কি কথায় দিন যাইবে কাটিয়া। (২)

“বনফুলে”র নায়িকা কমলাব ক্রাঘ নলিনীর সহিতও
বনের হরিণ বনের পাখী বনেব গাছপালাব একটি
হৃমধুর হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। বনফুল-পরিচয়-
প্রসঙ্গে পূর্বেই বলিয়াছি, প্রকৃতিব সহিত মানুষের
মিলনের আদর্শ বরীন্দ্রনাথকে বাল্যকাল হইতেই মুগ্ধ
করিয়াছে।

হবিণ-শাবক এক আছে ও গাছের তলে
সে যে আসি কত খেলা খেলিবে পশিক।
দূবে সরসীর ধারে আছে এক চারুহুত,
তোমাবে লইয়া পাশ্বে দেখাব সে বন,
কত পাখী ডালে ডালে সাবদিন গাইতেছে
কত যে হবিণ দেখা করিতেছে খেলা।
আবাব দেখাব সেই অরণ্যেব নিষ্কবিগী,
আবাব নদীর ধারে লয়ে যাব আমি,
পাখী এক আছে মোব, সে যে কত গান গান,
নাম ধোবে ডাকে মোব ‘নলিনী’ ‘নলিনী’।
যা আছে আমার কিছু, সব আমি দেখাইব,
সব আলি শুনাইব যত জানি গান। (৩)

নলিনীর সহিত কবি কুটীবে চলিয়া গেল। ক্রমে
ক্রমে কবির মন নলিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। নিজের
ভালবাসার কথা প্রকাশ করিতে না পাবা কবির মন
ব্যথিত হইয়া উঠিল।

হৃথ বা মুখের কথা বৃকের ভিতরে যাহা
দিনবাক্তি করিতেছে আলোড়িত প্রায়,
প্রকাশ না হোলে তাহা, মরমের গুপ্তভাবে
জীবন হইয়া পড়ে দারুণ ব্যথিত।
কবি তার মবয়ের প্রণয়-উচ্ছ্বাস-কথা
কি করি যে প্রকাশিবে পেত না ভাবিয়া,
পৃথিবীতে হেন ভাষা নাহিক মনের কথা
পারে যাহা পূর্ণভাবে করিতে প্রকাশ। (১)

কিন্তু এইভাবে বেশীদিন চলে না, একদিন কবি
বালিকার কাছে গিয়া অশাস্ত বালকের মত কত কি
বলিয়া ফেলিল, অসংলগ্ন কথা মনের ভাবকে প্রকাশ
না করিয়া সমস্ত গোলমাল করিয়া দিল।

কেবল অশ্রব জলে, কেবল মুখের ভাবে
পড়িল বালিকা তার মনের কি কথা।

বালিকাও কবির কাছে নিজের ভালবাসার কথা
প্রকাশ করিল।

তাহার পর নলিনী ও কবির একত্র জীবনধাপনের
কথা।

অরণ্যে দুজনে মিলি আছিল এমন স্থখে,
জগতে তারাই বেন আছিল দুজন ;
যেন তাবা স্বকোমল ফুলের হরতি শুধু,
যেন তাবা অঙ্গবাসী স্থখের সঙ্গীত।
আলুিত চুলগুলি সাজাইয়া বনফুলে
ছটিয়া আসিত বাল্য কবির কাছেতে,
একথা ও-কথা লবে, কি যে কি কহিত বাল্য
কবি ছাড়া আব কেহ বৃষ্টিতে নারিত। (২)

বালিকার মন প্রণয়ে মগ্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহার
মনে আর কোনো চিন্তা ছিল না।

শুধু সে বালিকা ভালবাসিত কবিবে।
শুধু সে কবির গান কত বে লাগিত ভাল,
শুনে শুনে শুনা তার মুগ্ধতা না আব।
* * *
শুধু সে কবিবে বাল্য শুনাতে বাসিত ভাল
কত কি—কত কি কথা অর্থ নাই যাব,
কিন্তু সে কথায় কবি, কত যে পাইত অর্থ,
গভীর সে অর্থ নাই কত কবিতায়। (৩)

(১) ক-কা, পৃ ১৫। ভা, পৃ ৩১২।

(২) ক-কা, পৃ ১৬। ভা, পৃ ৩২।

(৩) ক-কা, পৃ ১৭। ভা, পৃ ৩২।

(১) ক-কা, ১৯ পৃ। ভা, ৩২১ পৃ।

(২) ক-কা, ২০ পৃ। ভা, ৩২১ পৃ।

(৩) ক-কা, ২৬ পৃ। ভা, ৩২৪ পৃ।

বনবালিকার চরিত্রে কৃত্রিমতাব আভাস মাত্র ছিল না,
তাহার জীবন বনদেবতার মতনই সরল সহজ সুন্দর।

আধার আমার বাত্রে, একাকী পর্বত-শিরে
সেও পো কবির সাথে রহিত পাঁড়ারে,
উনমত্ত ঝড় বৃষ্টি পিছায় অশনি আব
পর্বতের বৃকে যবে বেড়াইত মাতিয়া,
তাহাবো হৃদয় যেন নদীর তবঙ্গ সাথে
কবিত গো। মাতাসাতি হেবি সে বিপ্লব।

* * *

বন-দেবতার মত এখন সে এলোথেলো,
কখনো ছুবন্ত অতি ঝটিকা যেমন,
কখনো এমন শান্ত, প্রভাতের বায়ু যথা,
নীবে শুনে পো যবে পাখীর সঙ্গীত। (১)

কিন্তু এত সুখেও কবির মন তৃপ্ত হইল না,

এখনো কহিছে কবি, “আবো দাও ভালবাসা,
আবো ঢাল ভালবাসা হৃদয়ে আমার।”

পনেবো বৎসব বয়সে রবীন্দ্রনাথ কবিচরিত্র সম্বন্ধে
যাহা লিখিয়াছেন জগত্তেব অনেক কবি সম্বন্ধে এ-সকল
কথা পাটে।

বাণীন বিহঙ্গ সন কবিরেব তবে দেবী
পৃথিবীর কাবাগাব যোগা নহে কভু।
অমন সমুদ্র সন আছে যাহাদেব মন
তাহাদেব তবে দেবী নহে এ পৃথিবী।
তাদের উদ্যব মন আকাশে উড়িতে যায়,
পিঞ্জবে ঠেকিয়া পক্ষ নিম্নে পড়ে পুনঃ,
নিরাশায় অবশেষে ভেঙ্গে চুবে যাব মন,
জগৎ পুবার তাবা আকুল বিলাপে। (২)

কবি বা শিল্পীর মন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না, কিছুতে
তার সন্তোষ নাই, সে এক অভিজ্ঞতাব পর আরেক
অভিজ্ঞতা ভাঙিয়া নূতন নূতন শিল্প-সামগ্রী সংগ্রহ করে।
কথাটা নূতন নহে, অনেকেই এই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু
এত অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথ এই জিনিষটি লক্ষ্য করিয়া-
ছিলেন ইহাই আশ্চর্যের বিষয়।

যাহা হউক কবির অতৃপ্তি ঘুচিল না।

কাতব ক্রন্দনে আহা আজিও কাঁদিল কবি,
“এখনও পুরিল না প্রাণেব শূন্যতা।”
বালিকার কাছে গিয়া কাতবে কহিল কবি
“আবো দাও ভালবাসা হৃদয় চালিয়া।
আমি যত ভালবাসি, তত দাও ভালবাসা,
নহিলে পো পুবিবে না প্রাণের শূন্যতা।” (৩)

বালিকা এ কথার কি উত্তর দিবে? সে ত কিছু বাকি
বাখে নাই—

যা ছিল আমার কবি দিবাছি সকলি,
এ হৃদয়, এ পবাণ, সকলি তোমার কবি
সকলি তোমার প্রেমে দেখি বিসর্জন।
তোমার ইচ্ছার সাথে ইচ্ছা মিশিয়েছি মোর
তোমার হৃদেব সাথে মিশিয়েছি হৃৎ। (১)

কবির মন কিন্তু তৃপ্ত হয় না—যা পাওয়া যায় না কবির
মন চায় তাই।

“ওই হৃদয়েব সাথে মিশাতে চাই এ হৃদি
দেহেব আড়াল তবে বহিল পো কেন?
সারাদিন সাধ যায শুনাই মনেব কথা,
এত কথা তবে কেন পাই না খুঁজিয়া?
সারাদিন সাধ যায দেখি ও মুখেব পানে,
দেখেও মিটে না কেন আঁখির পিপাসা?”

* * *

এত তাবে ভালবাসি, তবু কেন মনে হয়
ভালবাসা হইল না আশ মিটাইয়া,
আঁখিব সমুদ্রতলে কি যেন বেড়াই খুঁজে,
কি যেন পাইতেছি না চাহিতেছি যাহা।” (২)

মনের ভিতরে এই অতৃপ্তি, বাহিরেব কোন জিনিষে
মিটিবে না। কবি ঠিক করিল সে দেশ-ভ্রমণে বাহির
হইবে, অত্র দেশে অত্র লোকায়ে কোথাও তৃপ্তি পায়
কি না দেখিয়া আনিবে। কবি বালিকার নিকট বিদায়
লইয়া চলিয়া গেল।

বালিকা নয়ন তুলি নীরবে রহিল চাহি,
কি দেখিছে সেই জানে অনির্মিত চখে।
সন্ধ্যা হোয়ে এল ক্রমে, তবুও রহিল চাহি,
তবুও ত পড়িল না নয়নে নিমেষ।

* * *

কবি ত চলিয়া যায়—সন্ধ্যা হোয়ে এল ক্রমে,
আঁখাবে কাননকুমি হইল গম্ভীর—
একটি নড়ে না পাতা, একটু বহে না বায়ু,
স্তব্ধ বন কি যেন কি ভাবিছে নীরবে।

* * *

তখন বনান্ত হোতে হৃদীবে শুনিল কবি,
উঠিছে নীরব শূন্য বিষঙ্গ সঙ্গীত,
তাই শুনি বন যেন রয়েছে নীরবে অতি,
জোনাকি নয়ন শুধু মেলিছে মুদিছে। (৩)

বালিকা গান করিতে লাগিল।

(১) ক-কা, ২১ পৃ। ভা, ৩২১-৩২২ পৃ।

(২) ক-কা, ২২ পৃ। ভা, ৩২২ পৃ।

(৩) ক-কা, ২২ পৃ। ভা, ৩২২ পৃ।

(১) ক-কা, ২২ পৃ। ভা, ৩২২ পৃ।

(২) ক-কা, ২৩ পৃ। ভা, ৩২২ পৃ।

(৩) ক-কা, ২৭-২৮ পৃ। ভা, ৩২৪ পৃ।

কেন ভাল বাসিলে আমায় ?
কিছুই নাহিক গুণ, কিছুই জ্ঞানি না আমি,
কি আছে ? কি দিয়ে তব ভুবির হৃদয় ?
যা আমায় ছিল সাধা, সকলি কবেছি আমি,
কিছুই করিনি দোব চরণে তোমাব,
শুধু ভাল বাসিয়াছি, শুধু এ পবাণ মন
উপহার সঁপিয়াছি তোমার চরণে ।
তাতেও তোমাব মন ভুখিতে নাহিই যদি,
তবে কি করিব বল, কি আছে আমায় ? (১)

তৃতীয় সর্গ

কবি কত হৃগম নদী গিরি লজ্জন করিয়া চলিয়া
গেল, কত দূর দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিল, নূতন
লোকালয় দেখিল, কিন্তু তাহার হৃদয় শাস্ত হইল না ।
কবির হৃদয় বিকল হইয়া গিয়াছে—কিছুই তাহার ভাল
লাগে না, পাখীর গান নির্ঝরের ধ্বনিতেও কবির হৃদয়
আর পূর্বের স্মার জুড়ায় না । নলিনীর বিরহে সমস্তই
তাহার নিকট শূন্য ঠেকে । জ্যোৎস্না-প্রাবৃত রজনীর দিকে
চাহিয়া কবি বসিয়া থাকে ।

জ্যোৎস্নার নিমগ্ন ধরা নীরব রজনী ।
হেথায় ঝোপের মাঝে প্রচ্ছন্ন আঁধার,
হোথায় সবনী-বক্ষে প্রশান্ত জোহনা ।
নভ-প্রতিবিম্ব-শোভা ঘুমন্ত সরসী
চন্দ্র-তারকার স্বপ্ন দেখিতেছে যেন ।
সিদ্ধবাঞ্চে পাছপালা বিমাইছে যেন
ছায়া তাব পোড়ে আছে হেথায় হোথায় ।
অধীব বসন্ত-বাণু মাঝে মাঝে শুধু
ঝবঝবি কাপাইছে গাছের পল্লব । (২)

এইকপ নীরব রজনীতে কবির মন ব্যাকুল হইয়া
উঠে ।

দেখিয়াছি নীরবতা যত কথা কয়
প্রাণের মবন-ভলে, এত কেহ নয় ।
দেখি যবে অতি শাস্ত জোহনায় মন্দি
নীৰবে সমস্ত ধরা রয়েছে ঘুমায়,
নীৰবে পরশে পেহ বসন্তের বায়,
জ্ঞানি না কি এক ভাবে প্রাণেব ভিতর
উজ্জ্বলিয়া, উথলিয়া উঠে গো কেনন । (৩)

যখন রাজি হইয়া আসে পুরানো স্মৃতির কথা কবির
মনে পড়ে, কবির মন উদাস হইয়া যায় ।

কি যেন হারারে গেছে খুঁজিয়া না পাই,
কি কথা ভুলিয়া যেন গিয়েছি সহসা,
বলা হয় নাই যেন প্রাণের কি কথা,
প্রকাশ কবিত্তে গিয়া পাই না তা খুঁজি ।
কে আছে এমন যাব এ হেন নিশীথে
পুবাণো হৃদেব স্মৃতি উঠেনি উথলি ! (১)

কবির ত একপ অবস্থা । ওদিকে বনবালিকা নলিনীও
নিতান্ত বিষণ্ণ হৃদয়ে অরণ্য-কুটীরে দিন কাটাইতেছে ।
তাহার সেই সরল হাসি সেই সদানন্দ প্রফুল্লভাব আর
নাই—

আর সে গায় না গান, বসন্ত ঋতুর অন্তে
পাপিয়ার কণ্ঠ যেন হোমোছে নীবব ।
আর সে লইয়া বীণা বাজায় না ধীরে ধীরে,
আব সে ভ্রমে না বালা কাননে কাননে ।
সে আজ এমন শান্ত, এমন নীবব স্থিৰ,
এমন বি-শ শীর্ণ সে প্রফুল্ল মুখ । (২)

বালিকা এখন মবণের দিন স্মৃতিতেছে, মনে শুধু এক
সাধ যে কবিকে দেখিয়া যেন মবিত্তে পারে ।

কবির প্রত্যাবর্তন

ভ্রমণ কবিত্তে করিতে ক্লান্ত হইয়া কবি কুটীরে ফিরিয়া
আসিল ।

বহুদিন পরে কবি পদাৰ্পিল বনভূমে,
বৃক্ষলতা সবিতার পরিচিত সখা,
তেমনি সকলি আছে, তেমনি গাহিছে পাখী,
তেমনি বহিছে বায়ু ঝর ঝর কবি । (৩)

বাহিরের প্রকৃতির কোন পবিবর্তন হয় নাই, যা-কিছু
পবিবর্তন হইয়াছে তাহা মানুষেব হৃদয়ে, কবি অধীব হইয়া
কুটীরেব দিকে চলিল ।

দুয়ারেব কাছে গিয়া, দুয়াবে আঘাত দিয়া
ডাকিল অধীব স্ববে নলিনী নলিনী ।
কিছু নাই সাড়াশব্দ, দিল না উত্তব কেহ,
প্রতিফলি শুধু তাবে কবিল বিজ্ঞপ ।
কুটীরে কেহই নাই, শূন্য তা' বোয়েছে পড়ি,
বেষ্টিত বিতরী-বীণা লুতা-তন্ত-জালে । (৪)

কবি আকুল হইয়া কাননে কাননে নলিনীকে খুঁজিল,
কেহ সাড়া দিল না, শুধু ঘুমন্ত হরিণেরা ত্রস্ত হইয়া উঠিল,
কাতর কবি গিরিশৃঙ্গে গিয়া উঠিল ।

(১) ক-কা, ২৮ পৃ। ভা, ৩২৪ পৃ।

(২) ক-কা, ৩২ পৃ। ভা, ফাল্গুন, ৩৬১ পৃ।

(৩) ক-কা, ৩২-৩৩ পৃ। ভা, ৩৬১ পৃ।

(১) ক-কা, ৩৩ পৃ। ভা, ৩৬১ পৃ।

(২) ক-কা, ৩৪ পৃ। ভা, ৩৬২ পৃ।

(৩) ক-কা, ৩৫ পৃ। ভা, ৩৬২ পৃ।

(৪) ক-কা, ৩৫ পৃ। ভা, ৩৬২ পৃ।

দেখিল সে গিবিশুজ্জ, শীতল তুষার পবে
নলিনী ঘুমায়ে আছে ম্লান-মুখছবি।
কঠোর তুষারে তার এলায়ে পড়েছে কেশ,
খসিয়া পড়েছে পাশে শিখিল আঁচল।
বিশাল নয়ন তার অর্ধ-নিবীলিত,
হাত ছুটি ঢাকা আছে অনাবৃত বৃকে। (১)

নলিনী ব ঘুম আর ভাঙ্গিল না, কবির সহিত তাহার
আর দেখা হইল না। কবিকেও তাহার পব দিন হইতে
সেই বনে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

নিকটের জিনিষ অবহেলা করিয়া মাহুষ দূরে চলিয়া
যায়, নিকটকে হারায় এবং দূরকেও পায় না, এই কথাটি
রবীন্দ্রনাথ বার বার করিয়া বলিয়াছেন। ২০ বৎসর বয়সে
লেখা “ভগ্ন-হৃদয়” নামক নাটকখানিতে আরেক কবি
নলিনীরই মত সরলা বালিকা মুরলাকে ছাড়িয়া চলিয়া
গেল, কাছে থাকিতে বুঝিতে পারিল না যে সে মুরলাকেই
ভালবাসে। দেশে দেশে ঘুরিয়া সে কবিও একদিন
মুরলাকে খুঁজিল—

দেশে দেশে ভ্রমিতেছি কোণার—কোণায় ?
সমুখে বিশাল মাঠ ধূ ধূ কবিত্তেছে,
সে মাঠেতে অন্ধকার—বিশ্বাবিশ্ব বাহু তার—
ভ্রমিতে রাখিয়া মুখ কৈদে মরিতেছে।
কোথা তুই—কোথা মুরলা বে—
কোথা তুই গেলি বল—সুখাইব কারে ?” (২)

মুরলার সঙ্গে যখন দেখা হইল, মুরলা তখন মৃত্যুশয্যায়।
দেখা হইবার কিছু পরেই সব শেষ হইয়া গেল।

আবো কিছুদিন পরে, ২৮ বৎসর বয়সে লেখা
“মায়ার পেলা”র প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই স্বর
বাজিয়াছে—

কাছে আছে দেখিতে না পাও।
তুমি কাহার সন্ধানে দূবে যাও।
মনের-মত কাবে খুঁজে নব।
সে কি আছে ভুবনে।
সে যে রয়েছে মনে।

মায়া কুমারীরা বারবার গাহিয়াছে—

বিদায় কবেছ যাবে নবন-জলে
এখন কিবাবে তাবে কিসেব ছলে।
আজি মধু-সমীরণে নিশীথে কুহুমবনে
তাবে কি পড়েছে মনে বকুল-ভলে ?
এখন কিবাবে আব কিসেব ছলে।
মধুনিশি পূর্ণিমা ব কিবে আসে বারবাব
সে জন যেবে না আব যে গেছে চলে।

আবার বাট বৎসর বয়সে “তপস্বী”র কথা লিখিয়াছেন।

সাধনার একটা পর্ব শেষ কবে” সে চোখ মেলে দেখলে কাঠকুড়ানি
মেরেট খোঁপায় পবেচে একট অশোকের মঞ্জরী আর তার গাথের
কাপড়খানি কুহুম ফুলে বগু করা। যেন তাকে চেনা যায় অথচ চেনা
যায় না, যেন সে এমন একটা জানা স্বর যাব পদগুলো মনে পড়ে
না। * * তপস্বী দেখেও দেখলে না, আবাব তপস্তা মন দিলে। * *
মেয়েটি একদিন বললে “প্রভু, আমি বহু দূরদেশে যাব, আমাকে আশীর্বাদ
করো।” তপস্বী বললেন “যাও”। মেয়েটি চলে গেল। * * তাবপর
যখন তপস্তা পূর্ণ হল, যখন বর নেওয়ার সময় এল, ইন্দ্র ক্রিষ্ণাসা কবলেন
“কি চাও ?” তপস্বী তখন বললেন “এই বনের কাঠকুড়ানিকে”।

এই বয়সেই আবাব লিখিয়াছেন পরীস্থানের রাজপুত্রের
কথা।

উদাস কোরাব ধাবে বনের মেয়ে কাজরীকে পেয়ে যার মন তৃপ্ত
হল না, যে ভাবলে কাজরী কালো চেহারার-মাঝে পবী ছদ্মবেশে
সুকিয়ে আছে। রাজবাড়িতে নিয়ে গিয়েও যে রাজাই কাজরীকে
বলে “তোমার ছদ্মবেশ কেলে দাগ, আমি যে তোমার পরীর মুক্তি
দেখতে চাই।” তারপর একদিন যখন কাজরী বললে “না, আমি
আব ক’কি দেব না,” যখন কাষ্ঠিকী পুণিয়ার রাতে তিন প্রহরের
বাঁশি বাজল, তাঁর যখন পশ্চিমে হেলেচে, শোবার ঘরে বিছানার
শাদা আস্তরণের উপর বাঁশ কবা কুলফুল কেলে রেখে দিখে কাজরী
যখন চলে গেল, তখন বাজপুত্র বুঝলে, চলে গিয়ে পবী আপন পরিচয়
দিবে যায় তখন আব তাকে পাওয়া যায় না। †

অতএব দেখা যাইতেছে যে কবিকাহিনীর মধ্যেও
রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি মূল সুরের আভাস পাওয়া গেল।
এইরূপ মূল সুরের আভাস পাওয়া যায় বলিয়াই রবীন্দ্র-
নাথের বাল্য-রচনাব আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ [বি-এ (কান্ট্যাব)]

(১) ক-কা, ৩৬-৩৬ পৃ। ভা, ৩৬২ পৃ।

(২) ভগ্নহৃদয়, ২৭ শ সর্গ, পৃ ১৭৪।

† বঙ্গবাণী, বৈশাখ, ১৩২৯, সংক্ষিপ্ত আকারে উদ্ধৃত করা
হইয়াছে।



ধ্বংসাবশিষ্ট ইউরোপ

ভারতের মুসলমান প্রজাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য বিলাকং সম্বন্ধে নানারূপ প্রতিশ্রুতি ইংরেজস্বক্যাব বার বার করিয়া আসিতে ছিলেন। কিন্তু তুরস্ক-প্রাধান্য ইংরেজ-স্বার্থের পরিপন্থী হওয়াতে তুরস্কের পবিত্রত্ব অল্প কোনও মুসলমান রাজ্যের হস্তে জিজ্ঞাবৎউল্ আরব অর্থাৎ আরবের পবিত্র তীর্থগুলির ভার দেওয়া যাইতে পারে কি না তাহাই ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার বিবেচ্য হইয়া উঠিল। ধন ও জনবলে মধ্যপ্রাচ্যের সামন্তবাজ ইব্ন্ সাউদ্ প্রধান। আরব জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভবের পর হইতেই আরবের প্রজা-সাধারণ ইব্ন্ সাউদকেই আরব জাতীয়দের নেতৃত্বপদে বরণ কবিয়াছিল। উক্ত উইলসনের চৌদ্দ দফা অনুসারে আরব দেশে স্বাধীনরাজ্য স্থাপিত হইলে ইব্ন্ সাউদকেই রাজ-পদে অভিষিক্ত করা উচিত ছিল। প্রজাসাধারণের অভিরূচি অনুসারে আরবের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে মিত্রশক্তি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে ইংরেজ-মন্ত্রী ব্যাল্ফোর ঘোষণা করেন যে মিত্রশক্তিবর্গ আরবে আধিবাসীত্বের স্বৈচ্ছাবিধিত দেশ-বাস্তবতার প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করিবেন।

যুদ্ধান্তে চার্চিল সাহেব উপনিবেশ-সচিব এবং আরববন্ধু কর্ণেল লেবল তাঁহার সহযোগী ছিলেন। কাজে কাজেই আরবজাতীয়তাকে প্রবল কবিয়া তুলিতে ইংরেজ স্বক্যাব তখন খুব সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তুরস্ক সম্রাট ইব্রাহিমজগতের ধর্মগুরু খলিফা। তাঁহার প্রভাব বর্ধকরিতে হইলে ইব্ন্ সাউদের শক্তিবৃদ্ধি করিয়া তেমন দল, লাভ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বরং সাউদের প্রতিদ্বন্দ্বী মক্কার সরিক হসেনকে আরবের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা কবিলে মুসলমানদিগের ধর্মবিশ্বাস খুব বেশী ক্ষুণ্ণ না হইতেও পারে মনে করিয়া ইংরেজ-স্বক্যাব হসেনের সহিত একটা বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। মক্কার সরিক আরবের সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হইলে মুসলমানদিগের পুণ্যতীর্থগুলির সংরক্ষণ-ভাব উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত আছে মনে কবিয়া ভারতীয় মুসলমান প্রজাবৃন্দ নিশ্চিন্ত থাকিবেন একপ ভরসা ইংরেজের ছিল।

তাই ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতেই হসেনের সহিত ইংরেজ সরকারের কথাবার্তা চলিতে থাকে। ১৯১৭ সনের মাঝামাঝি সময়ে হসেন তুরস্কের অধীনতা অস্বীকার করিয়া হেজ্জাজে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। ইংরেজের সাহায্যে আসিবার সময় হসেন আশা কবিয়াছিলেন যে সিরিয়া হেজ্জাজ ইবাক কুর্দিহান প্রভৃতি আরবের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ লইয়া একটি আববসাম্রাজ্য স্থাপিত হইবে এবং হসেন তাহা শাসন-ভাব পাইবেন। কিন্তু যুদ্ধ-ঘোষণার কিছুদিন পর হইতেই তাহা সে স্বপ্ন ভাঙিয়া পেল। ইবাকি আববগণ তাহাদের স্বাভাব্য বজার বাধিবার দাবী কবিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত ইংরেজদিগের একটি বখা-নিষ্পত্তি হয়। এই বখা-

নিষ্পত্তি সাইক্স পিকো (Sykes Picot) নিষ্পত্তি নামে বিখ্যাত। ইহাতে ফ্রান্সের উপর সিরিয়ার খবরদারী করিবার অধিকার ইংরেজ স্বীকার করেন। কাজে কাজেই হেজ্জাজ ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশ হসেনের অধিকারে আসিবার বিশেষ কোন সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি ইংরেজ-সরকার হসেনকে সমস্ত আরবের অধীশ্বর করিবার প্রতিশ্রুতি করিতে বিবত হইলেন না। তাহা হইলে তাহা বিখ্যাত ছিলেন যে কার্যকালে ফ্রান্সকে কোনও রকমে বুঝাইয়া সিরিয়া হসেনকে দিতে পারিবেন। ইংরেজের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিয়া হসেনের পুত্র ফইজুল তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সেরিকিয়ান সৈন্য ইংরেজ সৈন্য পৌছিবার একদিন পূর্বেই ডামাস্কাস জয় কবিয়াছিলেন এবং মিত্রশক্তিবর্গ বিরুদ্ধে জয় করিতে অগ্রসর হইবার সাতদিন পূর্বেই বিজয় দখল কবিয়াছিলেন। ফরাসী সেনাপতি গুরো বিরুদ্ধে পৌছিয়াই ফইজুলকে সেরিকিয়ান পতাকা নামাইয়া ফেলিতে চকুম দিলেন। ফইজুল ইংরেজের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। মুখে ইংরেজ অনেক আশ্বাস দিলেন বটে, কিন্তু কাজে কোনই ফল হইল না। ("Faisal had our support in debate but not in action."—D. G. Hogarth.)

পারস্য বৈঠকে আরবদিগের দাবী উপস্থিত করিবার জন্য ফইজুল ফ্রান্সে গমন করেন; কিন্তু তাহাও সকল চেষ্টা নিষ্ফল হয়। মিত্র-শক্তিবর্গের ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া সিরিয়াবাসীগণ ডামাস্কাস সহরে এক মহাসভা আহ্বান করিয়া ফইজুলকে সিরিয়ার সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। ডামাস্কাস, হাম্মু, হামা ও আলেক্সো সহবে ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলিতে থাকে। ইহাতে ফরাসীজাতি ফইজুলের দলের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতে ইংরেজ সরকার কাঁপরে পড়েন। অনেক বাকবিতণ্ডার পর ১৯২০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্তানবোমো বৈঠকে আরবের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের খবরদারীর ভাব স্থির করা হয়। পার্স-সিরিয়ান (Pan-Syrian) মহাসভার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সিরিয়ার খবরদারীর ভাব ফ্রান্সকে দেওয়া হয় এবং ইংরেজ সরকার প্যাডোষ্টাইন ও মেসোপটেমিয়ার খবরদারীর ভাব প্রাপ্ত হন। জুলাই মাসে ফইজুল ফরাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতে থাকেন। হসেন ইংরেজের সাহায্য চাহিলে মন্ত্রী বোনার ল' বলেন "ফরাসীজাতি যে-সকল স্থানের খবরদারী করিবার ভাব পাইয়াছেন সেই-সকল স্থানের কোনও সীমাংশ হস্তক্ষেপ কবিবার কোনও অধিকার ইংরেজের নাই।" ("Britain has no right to interfere in a country where France has received the mandate.")

তাহার পর ১৯২০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে দেভার্স সন্ধি বন্ধু স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধিপত্র অনুসারে আর্মেনিয়া ও হেজ্জাজ স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ঘোষিত হয় এবং সিরিয়া, প্যাডোষ্টাইন ও মেসোপটেমিয়া স্তানবোমো বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে খবরদারীর অধীনে থাকিবে বলিয়া স্থির হয়।

হসেনের আবেদনের উত্তরে ইংরেজ সরকার জানাইয়াছিলেন যে

সিরিয়ার কোনও মীমাংসা করিবার অধিকার ইংরেজের নাই। কারণ ফ্রান্সের উপর জাতিসমূহের সংঘ নিবিয়ার স্ববরদারী ভাব অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে অক্টোবর অ্যাঙ্গোরার ইউনিক কামালের সহিত ফ্রান্সের Franklin Bouillion এবং বের্কা-নিপত্তি হয় তাহাতে সিরিয়ার কতকংশ অ্যাঙ্গোরাকে কিরাইয়া দেওয়াতে ইংরেজ সর্বকার পোরতর আগন্তিকী জানাইলেন। লর্ড কার্জন বলিলেন যে—এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়াতে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে-নভেম্বর মাসের লন্ডন চুক্তি এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসেব সের্ভাস সন্ধির মূল নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। নিসিবিণ ও জিজারৎ-ইবন-ওমার অ্যাঙ্গোরাকে কিরাইয়া দিবার অধিকার ফ্রান্সে নাই। ফ্রান্স সিরিয়ার ভাগ্যনিয়ন্তা নহেন, জাতিসমূহের সংঘের পক্ষ হইতে কেবল যাত্র স্ববরদারীর ভাব পাঁহিয়াছেন।” হুসেনেব দাবীর সময় ইংরেজ বলিলেন সিরিয়ার ব্যাপারে ইংরেজ কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। কিন্তু আবার অ্যাঙ্গোরার সহিত ফ্রান্সের রক্ষানিপত্তিতে ইংরেজই সর্বাপেক্ষা বেশী গণ্ডগোল করিলেন। অবশ্য অ্যাঙ্গোরা সন্ধিতে ইংরেজের ক্ষতি হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। লর্ড কার্জন বলেন নিসিবিণ ও জিজারৎ-ইবন-ওমার হইতে মেসোপটেমিয়া রাজ্যের বিরুদ্ধে সৈন্ত সমাবেশ করিবার পক্ষে খুব সুবিধা হয়। উহা কিরাইয়া পাওয়াতে অ্যাঙ্গোরা রাজ্য ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার সুযোগ পাইবেন। চোবানবে পর্য্যন্ত বাগদাদ রেল-লাইন কামাল পাশা কিরিয়া পাওয়াতে ভারতের প্রান্ত্র সীমা বিপন্ন অবস্থায় রহিল। যদি দাবিহান, ককেসাস, পারস্ত ও আফগান রাজ্যের মধ্যে সখ্য-স্থাপনে কামালের দল সুবিধা পায় তবে ভারত আক্রমণ করা কামালের পক্ষে অতি সহজ হইয়া পড়িবে। করাসীজাতি কামালকে সেই সুবিধা করিয়া দেওয়াতে সের্ভাস সন্ধির মূল নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

মক্কার আরব দল এই-সকল ব্যাপাবে ইংরেজ সরকারের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেছে দেখিয়া ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা এক চাল চালিলেন। তাহা হুসেনের পুত্র ফাইজুলকে মেসোপটেমিয়ার সিংহাসনে বসাইয়া দিয়া তাহাকে ইরাকের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু হুসেন ও ফাইজুল ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন। হুসেন বলেন, “You speak to me continually of the British Government and British policy. But I see five Governments where you see one and the same number of policies. There is a policy, first of your foreign office, second, of your army; third of your navy; fourth of your protectorate in Egypt; fifth, of your Government of India. Each of these British Government's seem to me to act on a Arab policy of its own.” “আপনারা ক্রমাগত আমার নিকট ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতি ও ব্রিটিশ শাসন-তন্ত্রের কথা বলিয়া আসিতেছেন। আপনারা যেখানে একটি মাত্র শাসনতন্ত্রের কথা বলেন আমি সেই স্থলে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র ও পাঁচটি ভিন্ন রাষ্ট্রনীতি দেখিতে পাই। আপনাদের পররাষ্ট্র বিভাগের এক প্রকার নীতি। সৈন্তবিভাগের নীতি অস্ত্ররূপ। তাহার পর আপনাদের নৌবহরের, ইজিপ্টস্বকারের ও ভারত-স্বকারের প্রত্যেকেই রাষ্ট্রনীতি ভিন্ন প্রকারের। এই পাঁচটি বিভাগের আরবনীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন।” বাস্তবিক প্রত্যেক বিভাগ নিজ স্বার্থের প্রতি কেবলমাত্র দৃষ্টি রাখিতে আববনীতি সম্বন্ধে এত গণ্ডগোলের সৃজন হইয়াছে যে আব ব্রিটিশ নীতির প্রতি হুসেন ও ফাইজুল বিবাস রাশিতে পারিতেছেন না। কল আরবে ভাষণ অসম্ভাব্যেব সৃষ্টি হইয়াছে। অ্যাঙ্গোরা সন্ধির যদি ভবিষ্যতে মিত্র-

শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন তাহা হইলে আরব জাতীয় দল তাহা সহিত হয় তো যোগ দিবে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতির সামঞ্জস্যের অভাবে যে-সকল গলদ ঘটয়াছে তাহা অবশ্যসম্ভাবী কল-রূপে আববে এই গণ্ডগোলের সূত্রপাত হইয়াছে।

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় [বি-এল]

নূতনমানুষ

একটা জাতির প্রাণের পরিচয় স্বভাবতই সব-চেয়ে বেশী আত্ম-প্রকাশ কবে সেই জাতির যুবন-সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়া। রক্তাশ্রিত পরাজিত জার্থেনীর যখন হুলাব শব্দ্য অবসন্ন হইয়া পড়িয়া থাকিবার কথা, তখন তার যুবনদের মধ্যে যৌবনের উদ্দাম অদমা প্রাণধাবা কি ভীষণ ধরগতিতে বহিয়া চলিয়া সমাজে রাষ্ট্রে সভ্যতার ভাঙন ধরাইয়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছে তাহা বর্ণনা শুনিতে বিস্মিত হইতে হয়। একজন প্রত্যক্ষদর্শী কথার—জার্থেনীর এই যুবন-আন্দোলন “লণ্ডন, বায়েনবাডেন্ প্রভৃতি স্থানে জার্থেন রাষ্ট্রনেতাদের স্বাক্ষরিত সন্ধিসম্মতিটির অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে” জার্থেনীর ভবিষ্যৎকে নিরমিত করিবে।

কুডি বৎসর আগে জার্থেনীর এই মনজাগ্রত যুবন প্রাণেব প্রথম স্পন্দন “বাণ্ডেব্‌ফোএপেল্” বা “নীড়হারা পাখীর দল” প্রভৃতি আন্দোলনে প্রথম অনুভূত হইয়াছিল। উহার মধ্যে দিয়া বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে জার্থেনীর তরুণতরুণীদের লাজুক অন্তঃপ্রকৃতির প্রথম পরিণয়ের সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান যুবন-আন্দোলন মুক্তপ্রকৃতির মধ্যে পাখীর মতো পাখা মেলিয়াই থুশী নহে। উহা যথেষ্ট লড়াইয়ের স্বর লাগিয়াছে। জরাব বিরুদ্ধে এই লড়াই, প্রাণহব অস্ত্রশস্ত্রের সহায়তার নহে; কেবলমাত্র চরুমনীর প্রাণশক্তির দ্বারা জীবনের যেখানে যেখানে—সমাজে রাষ্ট্রে; চিন্তার কর্ণে ব্যৱহারে—এই জরাব আধিপত্য; সেখানে হইতে তাহাকে স্থানচ্যুত করিয়া যৌবনের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করা এই লড়াইয়ের উদ্দেশ্য। লোভ-পরায়ণ সৈনিকতা, নিয়মবদ্ধ ধর্ম, কাব্যানার নিপোষণ, বিদ্যালয়ের সঙ্গীতা, ব্যবস্থার পবিত্রের যথেষ্টাচার—এসমস্তের বিরুদ্ধেই সম্রাতি যুদ্ধ-ঘোষণা করা হইয়াছে। কেননা জার্থেনীর বর্তমান জাতীয় জীবনসঙ্কটেব অস্ত্র প্রত্যক্ষ-ভাবে এগুলিই দারী।

জীবনের সমুদয় কর্ণক্ষেত্র হইতে যুবনদিকে বাদ দিয়া দূরে সরাইয়া রাখা স্বার্থপর বন্ধ লোকদের ধর্ম। জার্থেনীর যৌবনধর্ম ইহাও বিরোধী হইয়াছে। যৌবন তার স্বাধিকারের বলে দেশের জীবনকে সম্ভ্রাতাকে-নিজের হাতে নিজের মনোমত করিয়া পড়িয়া ভুলিবে, দেশের শুভা-স্তরের কথা ভাবিবে, নিজের বিশ্বাস ও ধারণা অমুখ্যায়ী অন্তত-নিজেদের জীবনকে গঠন করিবার পরিপূর্ণ অধিকার তাহার থাকিবে; তাহাতে সে বন্ধ বাক্‌শার ভুল কবিতা শিক্ষা লাভ করিবে, কিন্তু অখর্ব প্রাচীনত্বের হাত-ধরা হইয়া, জীবনের সর্বত্র দলে দলে “যো-হুহুম” জড়পিত্ত হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে না।

এই যুবন-আন্দোলন নবপ্রচলিত বিরাট ধর্ম-আন্দোলনের মতো; আজ যদিও জার্থেনীর এক প্রান্ত হইতে অস্ত্র প্রান্ত্র প্রাবিত-আলোড়িত করিতেছে, তথাপি ইহা যথেষ্ট নিয়মানুযায়ী সম্ভবত্বভাবে ভাব কিছুমান নাই। সম্ভব পড়িবার দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি না দিয়া ব্যাপকভাবে ব্যক্তির জীবনকেই সার্বজনীন আদর্শ-অমুখ্যায়ী পড়িয়া তোলা ইহার লক্ষ্য। সেইজন্য কতকগুলি বিশেষ আচাৰ-অনুষ্ঠান এবং আইন-

কামুনের সঙ্গীর্ণতা লইয়া নূতন একটি সম্প্রদায় পড়িয়া উঠিবার ভয় এই যুবন-ধর্মে নাই।

এই যুবনধর্ম তাই বলিয়া সমাজকে অস্বীকার করিতেছে না। সমাজ-সেবা ক্রমেই এই ধর্মামুঠানেব একটি খুব বড় অঙ্গ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু যুবনধর্মে সকলের উপবে ব্যক্তিত্ববই জরাজরকার। ইহার আদর্শ ব্যক্তি-জীবনের আদর্শ, তাই ইহার নীতি-পর্যায়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে স্বাস্থ্যরক্ষা—শরীরমাচ্ছন্ম খলু ধর্মসাধনম্। যাহাদেব ভিত্তি করিয়া জাতীয় সম্ভাব্য বনিয়াদ পড়িবে, এই বিচিত্র বিবে বিধাতার মানুষ-সৃষ্টির মহা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, তাহাবাই যদি ভগ্ন-স্বাস্থ্য জীবন হইত তবে শিক্ষা, ধীক্ষা, ধর্ম নীতি, ব্যবসা বাণিজ্য, যুদ্ধ শাস্তি প্রভৃতিব এত কোলাহল এত আয়োজন যে একান্তই নিবর্ধক ও পণ্ড্রম তাহা হৃদয়ঙ্গম কবা ইহাদেব কঠিন হয় নাই। মনের দিক হইতে সত্যনিষ্ঠা ও পবিত্রতা ইহাদের সবচেয়ে বড় সাধনার জিনিষ। অবিচলিতভাবে এই আদর্শ অনুযায়ী নিজেব জীবনকে-যাহারা নিয়ন্ত্রিত করেন তাহাদের নামকরণ হইয়াছে Der Neue Mensch বা নূতন মানুষ। ইহারা কোনও রকমেব মাদক তাম্রকুটাদি স্পর্শ করেন না, জীবন-ধারণের জন্ত নিতান্ত প্রয়োজনেব অতিরিক্ত অন্য সমস্ত বিলাস-বাসনা বর্জন করেন। কমিউনিজ্‌মেব আদর্শ অনুযায়ী সমাজ-জীবন গঠন কবিবার চেষ্টাও কোথাও কোথাও হইয়াছে।

এই আন্দোলনেব অন্তর্নিহিত কথাটি স্বাধীন, উহা যুবন মনের বেগবান আদর্শভিমুখীনতা। ইহা কেবলমাত্র গুরু বিচাব-বিতর্কেব

বিষয় নয়, লক্ষ লক্ষ তরুণ মনের ঐতিহ্যসেব অস্তিত্বেই ইহার জন্ম। এই হিসাবে পৃথিবীর ইতিহাসে বড় বড় ধর্ম-আন্দোলনগুলির সঙ্গে ইহার তুলনা চলিতে পারে। চলিত অর্থে ধর্ম বলিতে আমরা বাহ্যিক, যুবন-ধর্মে তাহাও বাদ পড়ে নাই। আমরা শুনিতে পাই জার্মেনীর উপাসনাগারের বেদীগুলিতেও বার্ষিক্যের একচ্ছত্র আধিপত্য লোপ পাইয়া যাইতেছে। ধর্মামুঠান-সমূহে অন্ধ নিয়মানুবর্তিতা ঘুচিয়া নিবিড় রসগভীর প্রাণেব স্পন্দন সঞ্চারিত হইতেছে। ভরোদ্রেককারী গুরুতা ভাঙিয়া দেবারতনগুলিতে প্রাণখোলা হাসির বন্যা কলরোল তুলিয়া বহিতেছে। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির দেবতার সঙ্গে এই নূতন মানুষগুলির পরিচয় ও আদানপ্রদানের বড় ক্ষেত্র হইতেছে মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতির কোলে, জনবহুল পথে বা উল্কাানে, পাহাড়ে প্রান্তরে বনে।

পৃথিবীতে জ্ঞানবুদ্ধ বয়োবৃদ্ধদের আধিপত্য চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে ; হঠাৎ যুবকদের এই অভ্যুত্থানে সমস্ত ইউরোপ আমেরিকার সাদা পড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে যাহারা আতঙ্কিত হইতেছেন তাহাদের একটা কথা নিশ্চয়ই আমরা ভাবিয়া দেখিতে বলিতে পারি। পৃথিবীর কাব্বার এতদিন ধরিয়া চালাইয়া বাহাবা দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাদের হাত হইতে যে কাব্বারেরব কর্তৃত্ব-খসিয়া যাওয়াটাই কি স্বাভাবিক নয় ? পৃথিবীকে নূতন করিয়া গঠন কবিবার প্রয়োজন আছে ; জার্মেনীর নূতন মানুষদের আমবা অভিনন্দন জানাইতেছি।

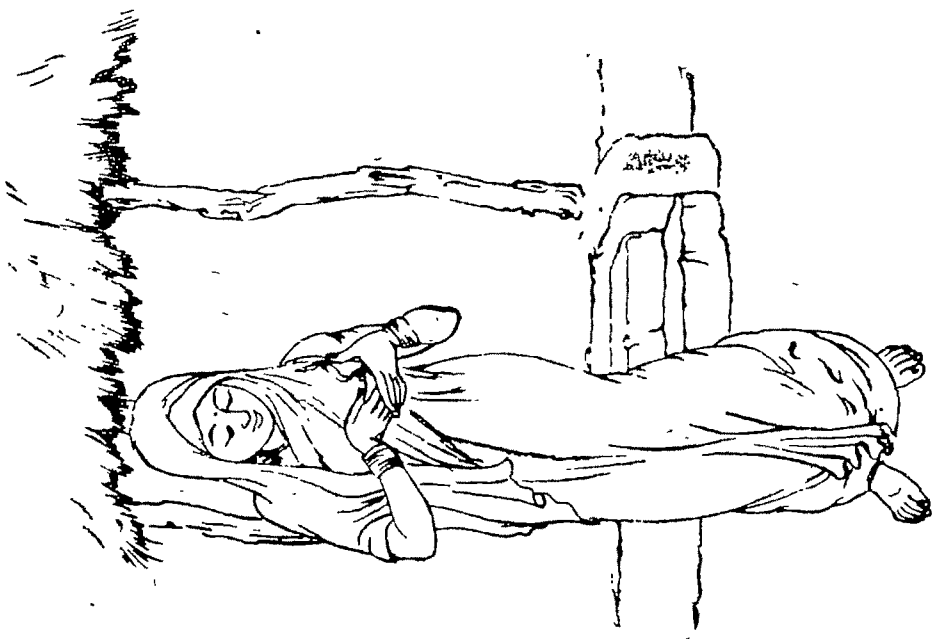
শ্রীস্বদীপকুমার চৌধুরী [বি-এ]

বারমাসের খাতের তালিকা

মাঘেতে মকর মিঠে
কুর্স্তি আলু সিম।
ফাল্গুনে ছপ্তম মিঠে
বার্তাকুতে নিম।
চৈত্রিতে শ্রীফল মিঠে
খেয়েছিলেন রাম।
বৈশাখেতে হয় মিঠে
শোল মাছে আম।
জ্যৈষ্ঠেতে আম জাম
আষাঢ়ে কাঠাল।

শ্রাবণেতে খই দই
ভাদ্রে পাকে তাল।
আশ্বিনেতে বুনো নারকেল
কার্ত্তিকেতে গুল।
অগ্রহায়ণে নবান্ন
চিংড়ি মাছের ঝোল।
পৌষেতে মুলো মুড়ি
থেতে বড় মিঠে।
গরম ছুধে চাঁপা কলা—
চন্দ্রপুলি পিঠে।

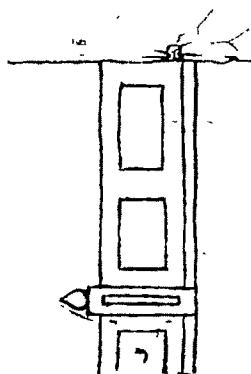
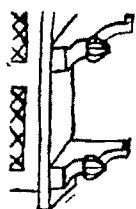
শ্রীতুর্গাপ্রসাদ মজুমদার



সারদা
১৩২৭

শ্রীমতের বাতি

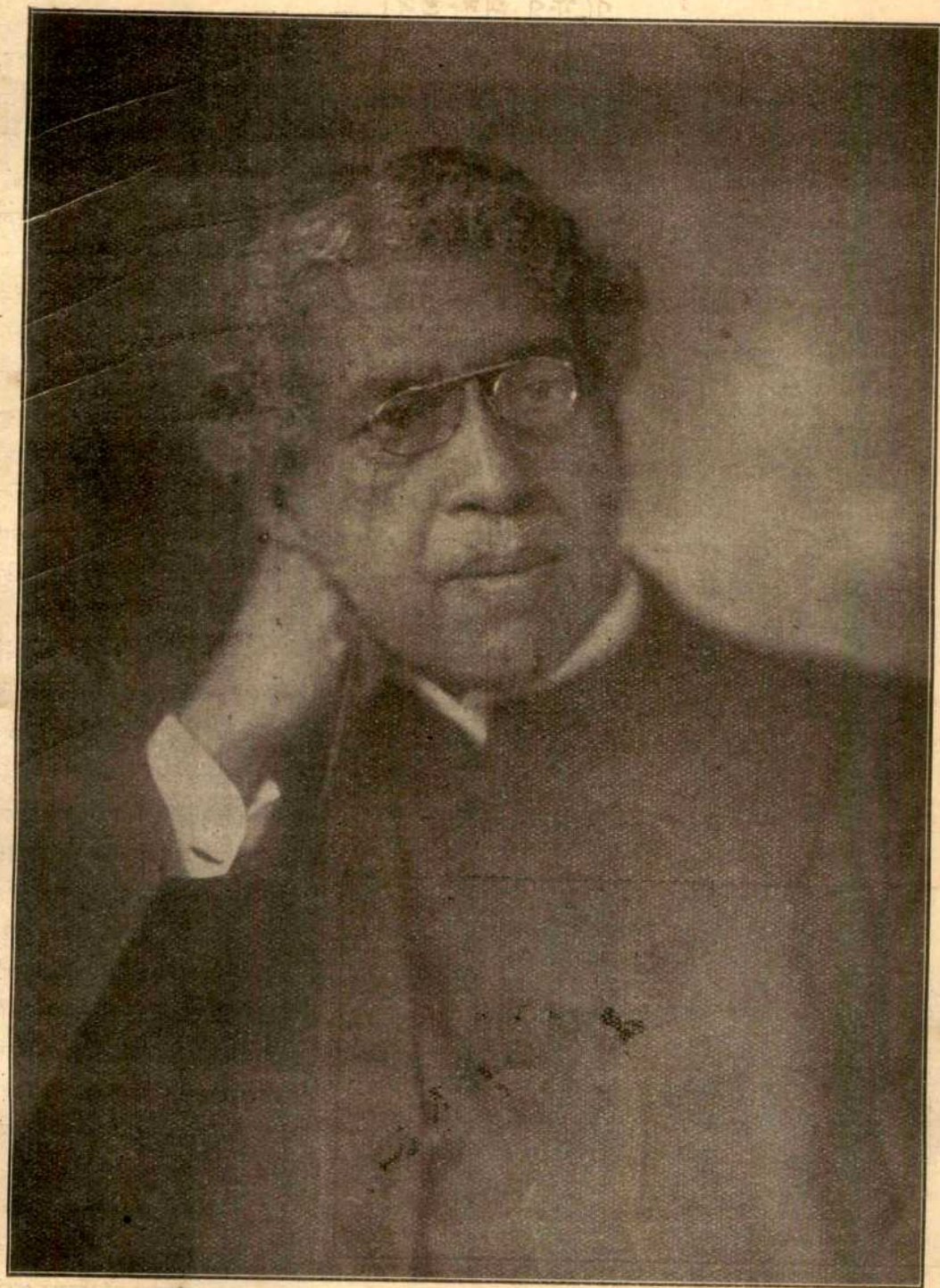
চিত্রকর শ্রীমত সারদাচরণ উকিল মহাশয়ের সৌজন্যে



সারদা
১৩২৬

প্রত্যাপ্তি

চিত্রকর শ্রীমত সারদাচরণ উকিল মহাশয়ের সৌজন্যে



আচার্য্য স্তাব্ জগদীশচন্দ্র বসু, ডি-এমসি, এফ-আর-এস

বৃক্ষের অঙ্গ-ভঙ্গী

মাহুষের অঙ্গ-ভঙ্গী হইতে তাহার ভিতরের অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। সকাল বেলা তাহার যে আকৃতি থাকে, দিনের শেষে সারাদিনের ক্লান্তিহেতু তাহা পরিবর্তিত হয়। স্থখে সে উৎফুল্ল, দুঃখে সে বিবশ। সব জীবজন্তুর মূর্ত্তি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হইতেছে; তাহা কেবল ভিতরের পরিবর্তন জনিত নহে। বাহিরের আঘাতেও তাহার অঙ্গ-ভঙ্গী বিভিন্ন হইয়া যায়। তাড়নায় কুপিতা কণিনী মুহূর্ত্তেই সংহাররূপিনী হইয়া থাকে।

এইরূপে অহরহ ভিতর ও বাহিরের শক্তির দ্বারা তাড়িত হইয়া জীব বহুরূপী হইয়াছে। ভিতরের শক্তির সহিত বাহিরের শক্তির নিরন্তর সংগ্রাম চলিতেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই, যে, বাহিরের আঘাতের ফলেই ভিতরের শক্তি দিন দিন পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

এক সময়ে ভিতরে কিছুই ছিল না, বাহির হইতে শক্তি প্রবেশ করিয়া ভিতরে সঞ্চিত হইয়াছে। যাহা বাহিরে অসীম ছিল, তাহাই ভিতরে সসীম হইল; এবং সেই ক্ষুদ্র তখন বৃহত্তর সহিত যুক্তিতে সমর্থ হয়। সেই ক্ষুদ্র কখনও বাহিরকে বরণ করে, কখনও বা প্রত্যাখ্যান করে। জীবনের এই লীলা বৈচিত্র্যময়ী।

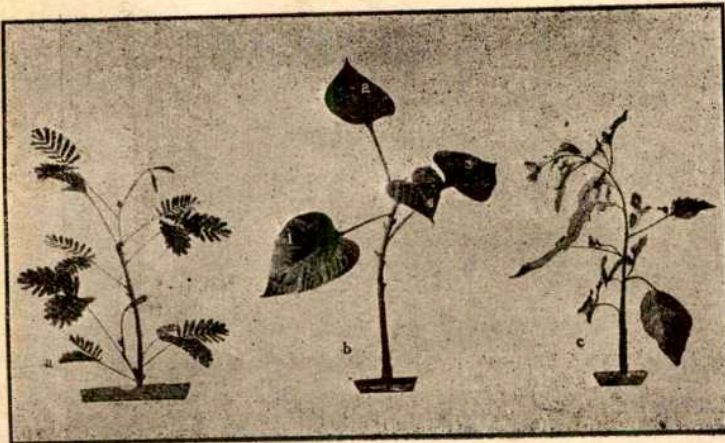
জীবের ছায়া বৃক্ষের ভঙ্গীও সর্বদা পরিবর্তিত

হইতেছে। পাতা কখনও আলোর সন্ধানে উন্মুখ হয়, কখনও প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ হইতে বিমুখ হয়। এই সকাল বেলায় বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম, যে, সূর্য্যমুখীর গাছটি পূর্ব্বগগনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। পাতাগুলি ঘুরিয়া একপে সন্নিবেশিত হইয়াছে, যে, প্রত্যেক পাতার উপরে বেন সূর্য্যরশ্মি পূর্ব্বরূপে পতিত হয়। ইহার জন্ত কোন পাতা উপরের দিকে উঠিয়া থাকে, আর পাশের পাতাগুলি ডান কিবা বামদিকে পাক পাইয়া সূর্য্যকিরণ পূর্ব্বমাত্রায় আহরণ করে। বৈকাল বেলায় দেখিতে পাইলাম, গাছ ও পাতা পশ্চিমগগনোন্মুখ হইয়াছে, ডাল এবং সব পাতাগুলি ঘুরিয়া গিয়াছে। কি শক্তির বলে এই পরিবর্তন ঘটিল? বাহিরের সহিত ভিতরের একি অদ্ভুত সম্বন্ধ! সূর্য্য ত প্রায় পাঁচ কোটি কোশ দূরে, তবে কি রাখীবন্ধনে গাছ দিবাকরের সহিত এইরূপ সম্মিলিত হইল?

উদ্ভিদ-বিদ্যাসম্বন্ধীয় পুস্তকে দেখা যায়, যে, সূর্য্যমুখীর এই ব্যবহার ‘হীলিওট্রোপিজম্’ জনিত। হীলিওট্রোপি-জমের বাঙ্গালা অনুবাদ, সূর্য্যের দিকে মুখ হওয়া। সূর্য্যমুখী কেন সূর্য্যের দিকে আকৃষ্ট হয়? কারণ “সূর্য্যের দিকে মুখ” হওয়াই তাহার প্রবৃত্তি! যখন কোন বিষয়ের

প্রকৃত সন্ধান না পাইয়া মাহুষ উৎকণ্ঠিত হয়, তখন কোন দুর্ব্বোধ্য মন্তব্য তাহাকে নিশ্চিত করে। তবে সেই মন্তব্য সংস্কৃত, লাতিন, কিবা গ্রীক ভাষায় হওয়া আবশ্যক। সোজা বাঙ্গালায় কিবা অল্প আধুনিক ভাষায় হইলে মস্তের শক্তি থাকে না। এই জন্তই গ্রীক হীলিওট্রোপিজম্ মন্ত্রে সূর্য্যমুখীর ব্যবহার বিশদ হইল।

সে যাহাই হউক, ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। এই-সব অঙ্গ-ভঙ্গী অদৃশ্য জীববিশ্বের প্রকৃতি-গত কোন পরিবর্তন দ্বারাই সাধিত

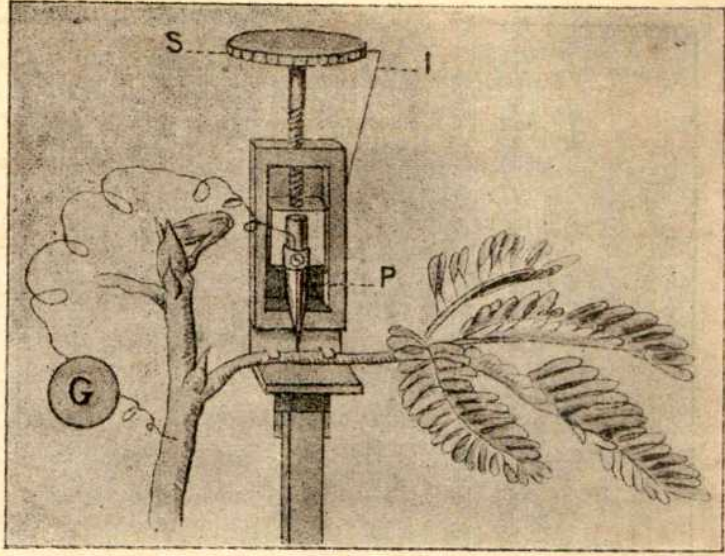


১) লজ্জাবতী এবং সূর্য্যমুখীর পাতাগুলি সূর্য্যের আলোকের দিকে প্রসারিত।
ডানদিকে স্থিত তৃতীয় ছবিটিতে সূর্য্যমুখীর আলোর গতি অনুসরণ।

হয়। জীব-বিন্দুর পরিবর্তন অল্পবীক্ষণ যন্ত্রেও অদৃশ্য। তবে কিরূপে সেই অপ্রকাশকে সুপ্রকাশ করা যাইতে পারে? বহুচেষ্টার পর বিদ্যুৎ-বলে সেই অদৃশ্য জগৎকে দৃষ্টি-গোচর করিতে সমর্থ হইয়াছি। এ বিষয়ে দুই-একটি কথা পরে বলিব।

কেবল সূর্যমুখীই যে আলোক দ্বারা আকৃষ্ট হয়, এরূপ নহে। টবে বসান একটি লতা অন্ধকার ঘরে রাখিয়া দিয়াছিলাম। রুদ্ধ জানালার একটি রন্ধু দিয়া অতি ক্ষুদ্র আলোক-রেখা আসিতেছিল। পরের দিন দেখিলাম, সব পাতাগুলি ঘুরিয়া সেই ক্ষীণ আলোকের দিকে প্রসারিত হইয়াছে।

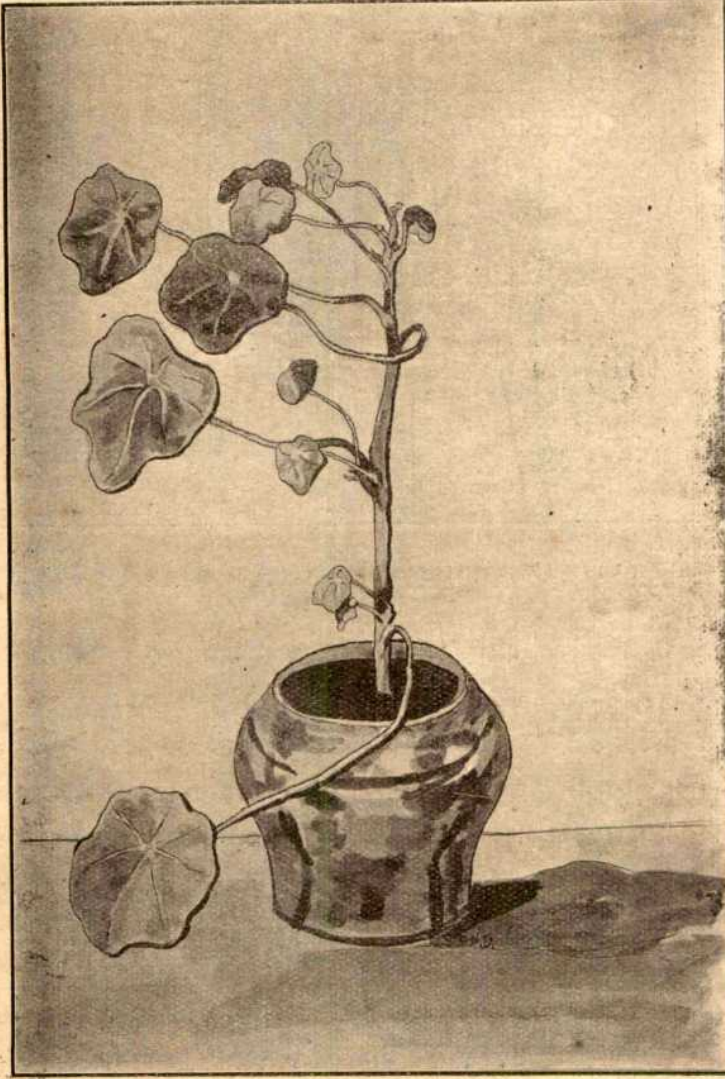
লজ্জাবতী লতাতেও এইরূপ ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। টবে বসান লতাটি যদি জানালার নিচুটে রাখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাই, যে, সব পাতাগুলি ঘুরিয়া বাহিরের আলোর দিকে মুখ করিয়া রহিয়াছে। টব ঘুরাইয়া দিলে পাতাগুলি পুনরায় নতন করিয়া ঘুরিয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই, যে, পাতাগুলি কেবল উঠে এবং নামে তাহা নয়, কোনগুলি ডানদিকে এবং কোনগুলি বামদিকে পাক খায়। পাতার ডাঁটার গোড়ায় যে স্থল পেশী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার দ্বারাই পাতাগুলি ঘুরিয়া থাকে, কখনও উঠানামা করে, কখন ডানদিকে কিবা বাম দিকে পাক খায়। পূর্বে বিশ্বাস ছিল, যে, পাতার গোড়ায় একটিমাত্র পেশী আছে যাহার দ্বারা কেবলমাত্র উঠানামা হয়। কিন্তু আমাদের হাত ঘুরাইতে হইলে অনেকগুলি পেশীর আকৃশন এবং প্রসারণের আবশ্যক। অহুসন্ধান করিতে গিয়া জানিতে পারিলাম, যে, লজ্জাবতীর পাতার মূলে চারিটি বিভিন্ন পেশী আছে, যাহার অস্তিত্ব ইতিপূর্বে কেহই মনে করিতে পারেন নাই। একটি পেশীর দ্বারা পাতা উপরের দিকে উঠে, আর-একটির দ্বারা নীচের দিকে



(২) আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত 'ইলেক্ট্রিক প্রোব' দ্বারা ভিতরের ঋগু নির্ণীত হইতেছে।

নামে, অণু একটির দ্বারা ডান দিকে পাক খায় এবং চতুর্থ পেশীর দ্বারা বাম দিকে ঘুরিয়া যায়।

ইহার প্রমাণ কি? প্রমাণ এই, যে, পালক দ্বারা উপরের পেশীটুকুতে স্বড়স্বড়ি দিলে পাতাটি উপরের দিকে উঠে এবং সেই উচ্চ গতি যন্ত্রের দ্বারা নিখিত হয়। এক নম্বরের বা চারি নম্বরের পেশীকে এইরূপে উত্তেজিত করিলে পাতাটি বামদিকে বা ডানদিকে পাক খায়, দুই নম্বর বা তিন নম্বরটিকে এরূপ উত্তেজিত করিলে পাতা নীচে নামে বা উপরে উঠিয়া যায়। সূর্যের আলো এই-রূপে পেশীর নানা অংশে নিক্ষেপ করিলে উক্তবিধ সাড়া পাওয়া যায় (৪নং ছবি দেখ)। তবে সূর্যের আলোক ত সব সময়ে পত্রমূলে পড়ে না, কারণ পাতার ছায়ায় পত্রমূলটি ঢাকা থাকে। লজ্জাবতীর বড় ডাঁটাটির সহিত চারিটি ছোট ডাঁটা সংযুক্ত, এবং সেই ছোট ডাঁটার গায়ে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা থাকে। আলো সেই ক্ষুদ্র পাতার উপরই পড়ে। পড়িবামাত্রই দেখা যায় যে পাতা নড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু পাতার নড়াচড়া ত সেই দূরের স্থল পেশীর আকৃশন প্রসারণ ভিন্ন হইতে পারে না। তবে ছোট পাতাগুলি আলোর অল্পত্ব-জনিত উত্তেজনায কি সঙ্কেত কোন্ পথ দিয়া দূরে



(৩) এই লতার পাতাগুলি বন্ধ জানালার ক্ষুদ্র রন্ধের আলোর দিকে ফিরিয়া আছে।

পাঠাইয়া থাকে? এই বিষয়ে অহুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, যে, চারিটি ছোট ডাঁটা হইতে পাতার মূল পর্যন্ত চারিটি বিভিন্ন স্নায়ুতন্ত্র প্রসারিত। তাহা দ্বারাই খবরাখবর পৌঁছিয়া থাকে। এক নম্বরের ক্ষুদ্র পাতাগুলিকে কোনরূপে উত্তেজিত করিলে একটি মাত্র স্নায়ু দিয়া পত্রমূলের এক নম্বরের পেশীতে উত্তেজনা প্রেরিত হয়, অমনি পাতাটি বামদিকে পাক থাইয়া যায়। চারি নম্বরের পাতাগুলিকে ঐরূপে উত্তেজিত করিলে ডানদিকে পাক যায়। দুই নম্বরের পাতাগুলিকে উত্তেজিত করিলে বড়

পাতাটি নীচের দিকে পড়ে। তিন নম্বরের ছোট পাতাগুলিকে উত্তেজিত করিলে উপরের দিকে উঠিয়া যায়। সুতরাং দেখা যায়, পাতার বাহির দিক হইতে ভিতরের দিকে জুকুম পাঠাইবার চারিটি রাশ আছে। কে সেই বল্গা টানিয়া সঙ্কেত পাঠায়?

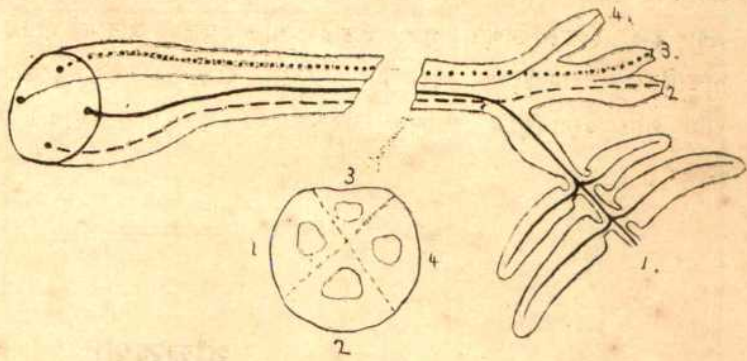
কেবল তাহাই নহে। কোন নির্দিষ্ট দিকে চালিত করিবার জ্ঞান একটা বল্গা টানিলে তাহা সাধিত হয় না। নৌকার একটি দাঁড় টানিলে নৌকা কেবল ঘুরিতে থাকে। দিশাহীন তবে এক দিকের টান! অন্ততঃ দুই দিকের দুইটি সমবেত টান দ্বারা গন্তব্যপথ নির্দিষ্ট হয়। এক সময়ে দুইটি দাঁড় টানা আবশ্যক।

পতঙ্গ আলোর দিকে ছুটিয়া যায়। তাহার দুইটি চক্ষুর উপর আলো পড়ে। প্রত্যেক চক্ষুর সহিত তাহার এক-একটি পাখার সংযোগ। একটি চক্ষু অন্ধ হইলে সে আর আলোর দিকে যাইতে পারে না। এক দাঁড়ের নৌকার ন্যায় কেবল ঘুরিতে থাকে। যখন দুইটি চক্ষুর উপর আলো পড়ে, কেবল তখনই দুইটি ডানা একসঙ্গে একই বলে আন্দোলিত হয়, এবং

সে সোজা পথে আলোর দিকে ধাবিত হয়। আলো যদি পাশে ঘুরাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে উহা কেবল একটি চক্ষুর উপর পড়ে, সেইজন্ত একটি পাখা প্রবল বেগে স্পন্দিত হয় এবং পতঙ্গটি ঘুরিয়া যায়। ঘুরিয়া যখন সোজাসুজী আলোমুখীন হয় এবং আলো দুইটি চক্ষুর উপর সমানভাবে পড়ে, তখন দুইটি পাখাই সমানভাবে একই শক্তিতে স্পন্দিত হইতে থাকে এবং পতঙ্গ তাহার অভীষ্ট লাভ করে,—জীবনে কিধা মরণে!

দুইটি দাঁড়ের দ্বারা তরণী কেবল নদীবক্ষে-উপরই গন্তব্য দিকে ধাবিত হইতে পারে। কিন্তু সর্কদিগ্-বিহারী জীব কখনও দক্ষিণে কখনও বামে কখনও উর্দ্ধে কখনও বা অধোদিকে ধাবিত হইতে চাহে। এরূপ সর্কমুখী গতি নিরূপণ করিবার জন্ত অন্ততঃ চারিটি রশ্মির আবশ্যক।

লজ্জাবতীর পাতার প্রতি কোষই আলোক ধরিবার ফাঁদ। সেই আলোর উত্তেজনা এক-একটি স্নায়ুস্থত্র ধরিয়া পত্রমূলের পেশীতে উপস্থিত হয়।



(৪) লজ্জাবতী পত্রের বিভিন্ন অংশ। নিম্নের ছবিতে উটার মূলে চারিটা পেশী দেখা যাইতেছে। ডানদিকের ছবিতে চারিটি ক্ষুদ্র উটা এবং তৎসংলগ্ন ছোট পাতা। স্নায়ুস্থত্র পাতা হইতে উটার মূলে গিয়া পৌছিয়াছে।



(৫) আলোক ও আঁধারের দ্বন্দ্ব। রথে অধিষ্ঠিত সবিতার আবির্ভাবে আঁধারের পরাভব।
(বহু বিজ্ঞানমন্দিরে স্থাপিত ধাতু-ফলক হইতে গৃহীত)

যতক্ষণ না চারিটি উটার পত্র-সমষ্টি সমানভাবে আলোক-মুখীন হয়, ততক্ষণ চারিটি বল্গার টানের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। পত্ররথ তখন দক্ষিণে, কিংবা বামে, উর্দ্ধে কিংবা নিম্নে চালিত হয়।

সবিতার রথ

সারথি তবে কে? দিবাকর নিজকে কোটা কোটা

অংশে বিভক্ত করিয়া ধরা-পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত। জানালার ক্ষুদ্র রন্ধ্র দিয়া সূর্য্যদেবের শত শত মূর্তি মেঝের উপর দেখিতে পাই।

সবিতা তবে প্রতি পত্রকে তাঁহার রথরূপে গ্রহণ করেন। পত্রের চারিটি বল্গা তাঁহারই হস্তে। অনন্ত আকাশ বাহিয়া সীমাহীন তাঁহার গতি। কিন্তু এই অসীম পথ

প্রদক্ষিণ করিবার সময়ও ধূলিকণার জায় এই পৃথিবী এবং তাহা হইতে উথিত ক্ষুদ্র লতার অতি ক্ষুদ্র পাতাটিরও আত্মান উপেক্ষা করেন না। নিজের শক্তির দ্বারা প্রতি জীববিন্দুকে স্পন্দিত করেন এবং ক্ষুদ্র

পাতাটির গতি নিরূপণ করিয়া থাকেন। জীবন এবং জীবনের গতির মূলে সেই শক্তিই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

সর্বভূতের চালক তুমি, তোমার তেজোরশিক্রে কে উদ্দীপ্ত রাখিতেছেন !

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

খাত্তকথা

খাত্ত-কথা। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। ৭০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০ আনা।

এই বহির মুখপত্রে দেখিতেছি, লেখক পূর্বে ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বসুর “ল্যাবরেটরীর” “রসায়ন বিজ্ঞান” ছিলেন। এক্ষণে তিনি “স্বাস্থ্য-সমাচার” পত্রের সহকারী সম্পাদক। দেখিতেছি বহিখানিতেও এই দুই কর্ম স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থাৎ, কিমিতি-বিজ্ঞান নাহায্যে খাদ্য বর্ণিত হইয়াছে, এবং “স্বাস্থ্য-সমাচার” পত্রের ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

এই দুই উক্তির একটু ব্যাখ্যা কত ক।

আমরা কি জানি, তা জানি। কিন্তু জানি না, কি খাদ্যে কি ভাগে কি কি কৈমিতিক উপাদান আছে। না জানাতে যে আমাদের দেহ-বাত্মা নিবাহের বিষয় হইতেছে, এমন নহে। কিমিতি-বিদ্যা সেদিনকার, আর খাদ্যের কৈমিতিক বিচার কালিকার বলিলেও চলে। তথাপি যুগযুগান্তর ধরিয়া মানুষ চলিয়া আসিতেছে। ইতর প্রাণীর বিদ্যা নাই, বহু বহু মানুষও বিদ্যাহীন। বিদ্যাহীন বটে, কিন্তু বুদ্ধিহীন নহে। সে বুদ্ধি সহ-জ (natural)। ইতর প্রাণীর সহজবুদ্ধি (instinct) আছে, মানুষেরও আছে। আরও কিছু আছে, সেটা ভ্রমোদর্শন, বারবার দেখিয়া শুনিয়া ভুগিয়া ঠকিয়া ফলাফল বিবেচনার বুদ্ধি।

এই একটা গাছের ফল, কখনও দেখি নাই, খাই নাই। সুতরাং টেকিল, ফলও ত বটে। মুখে দিলাম, স্বাদ বোধ হইল। রসনার অনুমতি হইল, ফলটি গলার সে পারে চলিয়া গেল। ক্ষুধিত ছিলাম, ক্ষুধা শান্ত হইল। এক বেলা গেল, দুই বেলা গেল, রেশ হইল না, ফলটি উদরে জীর্ণ হইয়া গেল। সে ফল সখি আমার জুটিল, তখন একটা নয়, দুইটা নয়, গণ্ডা গণ্ডা গলাবঃ করিয়া ফেলিলাম। এক বুদ্ধিমান, সেও ফলটি প্রথম দেখিল, কিন্তু খাইল না; কি জানি খাইলে যদি অসুস্থ হয়। কিন্তু দেখিল মকটে খায়, গোর বাছুরে খায়, পাগীতে খায়। শঙ্কা গেল, নিজে খাইল। আর এক বুদ্ধিমান দেখিল ফলটি খাইলে দেহের তৃপ্তি হয়। ফলটি খাদ্য ছিল, এখন ভো-জ্য হইল। কাঁচা আম খাদ্য বটে, কিন্তু ভোজ্য নয়। পাকা মিষ্ট আম খাদ্য ত বটেই, ভোজ্যও বটে। কাঁচা আম বার খাদ্য সে খাদক। পাকা আম বার ভোজ্য, সে ভোক্তা। এই দুই-এর প্রভেদ যিনি জানেন, তিনিই খাদ্যখাদ্য-বিচারের অধিকারী। আমরা দেবতার প্রদাদার্থে তাহার সম্মুখে থাকা কিবা খাদ্যোপকরণ ধরি না; ধরি ভোজ্য কিংবা আমান রাখিয়া তাহার ভোগ দিই, কারণ ভোক্তা ত দেহ নয় যে খাদ্য পাইলেই তুষ্ট হইবে। খাদ্য সম্বন্ধে দুই-তিনখানি বই বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়াছে। ভোজ্য সম্বন্ধে একখানিও হয় নাই।

কথাদি আর একটু বিস্তার করি। সেই অ-জানা, অভূতপূর্ব ফলটা কৈমিতিকের কর্মশালায় লইয়া গিয়া বলিলাম, “হে কৈমিতিক মহাশয়, আপনার যন্ত্র-তন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ জারণ মারণ প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা বলুন এটা আমাদের খাদ্য কি? ভোজ্য কি? অপখ্য, কুপখ্য, না সুপখ্য?” তখন কৈমিতিক ব্রহ্মিতে পারিলেন তাহার বিদ্যা একটা সাক্ষীমাত্র, বিচারক নহে। ভোক্তা স্বয়ং বিচারক, আমাশয়, পকামাশয় প্রভৃতি আশয়গুলিতে তাহার অধিষ্ঠান। প্রত্যেক আশয়ে বিচার চলিতে থাকে, স্থূল বিচার নয়, সূক্ষ্ম বিচার। এমন সূক্ষ্ম যে, বাজারের খাদ্য-নাক্ষক ‘পাস’ করিয়া খাটি বলিয়া ‘স্যাটিকট’ দিলেও মিষ্টানের ঘি মিশাল প্রতিপন্ন হয়। কৈমিতিক বলিতে পারেন, “সিদ্ধ ও আতপ চাউলে গুণগত বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না।” (খাদ্য-কথা, ১৯ পৃষ্ঠা)। কিন্তু অন্ততঃ সাড়ে চারিকোটি বাঙ্গালী জানে আতপ চাউলের ভাত গর-পাক, অনেক জানে খাইলে অসুস্থ হয়। ভাবিবার আছে, ধান সিদ্ধাইলে চালের কোন-না-কোন পরিবর্তন নিশ্চয়ই হয়। সেই পরিবর্তনে সিদ্ধ চালের ভাত লঘু। আরও মৌজা কথা আছে। দুই চালের গুণগত পার্থক্য উপলব্ধি না হইলে ধান সিদ্ধাইবার পরিপ্রসঙ্গ ও জালন খরচ কেন করা হইতেছে?

খাদ্যবিচারে কিমিতিবিদ্যার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে প্রয়োজন কি এবং কতটুকু, তাহা মনে না রাখিলে কিমিতির সাফের বাহিরে গেলে অ-সত্য আসিয়া পড়ে। সাক্ষী মাত্রেরই এই দশা ঘটে, জানার বাহিরে গেলেই মিথ্যা বলিয়া ফেলে। প্রত্যেক বিদ্বান (বিজ্ঞানের) এক একটা সীমা আছে। সীমার মধ্যে বিচরণ করিলে আমাদের সফল হয়, বাহিরে গেলে গলায় বিষম আগার মতন আমাদের বিচার-বুদ্ধিতে বিষম লাগে। সবাই জানি, একের ঘাড়া পথ্য, অশ্বের তাহা কুপথ্য হইতে পারে। যে খাদ্য খাইয়া খাইয়া, কেবল বাল্যাবদি নয়, পিতৃপিতামহাবদি, বাহার সাম্রাজ্য হইয়া গিয়াছে, অশ্বের কুপথ্য হইলেও তাহার পথ্য। চলিত কথায় বলি, অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। অতএব যখন বলি, এই আহার লঘু কি গুরু, সু-পচ কি দুপচ, তখন স্থূল বাক্যই বলি। অতএব আহার-বিদ্যা (dietetics) চাই, খাদ্য-বিদ্যা না জানিলেও চলে। পশ্চিমদেশে আহার-বিদ্যা সেদিন আরম্ভ হইয়াছে। কাজেই মতি এখনও অস্থির। আহারের পরে জল পান করিবে না, পশ্চিমদেশীয় ডাক্তারী বিদ্যার এই উপদেশে আমাদের কত শিকিত জন বিভ্রান্ত হইয়া অজীর্ণ রোগে পড়িয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। তাহার সামান্যাত্ম্য বিবেচনা করেন নাই, প্রকৃতিগত তৃষ্ণাও মানেন নাই। এইরূপ, কে বলিয়াছিল, কে জানে, ভাতের ফেনে ভাতের সারাংশ চলিয়া যায়, আমরা যে ফেন-গালা ভাত খাই, সেটা

ভাতের ছিঁড়। অমনই শিক্ষিত জন চিন্তিত হইলেন, ভাবিলেন না কেন পালা চলিত হইল কেন। “খাদ্য-কথা” লেখক ইহাও উল্লেখ করিয়া আশ্চর্য্য নিরাস কবিরাজেন। কিন্তু কেন-পালার মধ্যে যে আহাব-বিদ্যা আছে, তাহার কথা বলেন নাই।

এই বিষয়ে এত কথা বলিবার একটু প্রয়োজন আছে। খাদ্য সম্বন্ধে দুই তিন খানি বই বাঙ্গালার প্রকাশিত হইয়াছে। দুই একটা ব্যাখ্যানও (lectures) পড়িয়াছি। সবই ডাক্তারের কিংবা আখা-ডাক্তারের লেখা। তাঁহারা সবাই তাঁহাদের পশ্চিমদেশীয় গুরু পণ্ডে বিচরণ কবিরাজেন। ইহা স্বাভাবিক, এবং সে শিক্ষা সম্যক, যে শিক্ষা স্বাস্থ্যপথ অদৃষ্ট হয়। কিন্তু শিক্ষা (training) ও জ্ঞান এক নহে। যে শিক্ষা স্বদেশীয় জ্ঞান জন্মে, বিবিধ পণ্ডের সম্ভাবনা কবিত্তে দেয় না, সে শিক্ষা স্বাভাবিক দাসত্ব ঘটে। মানসিক দাসত্বের তুল্য উন্নয়নক আদ্য কিছুই নাই, কারণ দাসত্বের ক্রম অনুভূত হয় না। জেলের বন্দী শারীরিক ক্লেশ ভোগ করে, কিন্তু তাহার মন, কবেদখানার মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ায় না। কি জানি কেন আমাদের ডাক্তার মহাশয়েরা দেশী পথ দেখিতে পান না। জল বাবুতে, নীত গ্রীষ্মে, আহাব বিহাবে, ধর্ম কৰ্মে এদেশ ও ইব্রোপ কত ভিন্ন। দেশেশের পথ্য এদেশের পথ্য না হইবার কথা। যদি এদেশের পথ্য জানিবার বাসনা হয়, আয়ুর্বেদ আছে। ইহাতে কিমিতি নাই, কিন্তু আহাব-বিধি আছে। দেহের কাস্তি বল বর্ধ পুষ্ট চেষ্টা প্রভৃতির মূলে আহাব। যে বিদ্যার আহাব-বিধি জানিতে পারি, সে বিদ্যা আয়ুর্কব।

কিমিতি-বিদ্যা ভার্য্য খাদ্যের শরীবোপযোগী উপাদান নির্ণাত হইতে পারে। কিন্তু মনে বাধিতে হইবে, সে উপাদান স্থূল। মনে বাধিতে হইবে, সে উপাদান ব্যতীত অল্প উপাদান থাকিতে পারে, যজ্ঞতা হেতু বাহ্য কৈমিতিক পরীক্ষায় থা পড়ে না। একটা উদাহরণ দি-ই। “ভাইটামীন” নামক একটা উপাদানের কথা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। ইহা নূতন আবিষ্কৃত। ইহাও বিভিন্ন রূপ প্রকৃতি প্রভাব প্রভৃতি এখনও অজ্ঞাত বনিলে চলে। ইহার মাত্রা অল্প, কিন্তু বীৰ্য্য অতিশয়। খাদ্যে ইহার অভাব ঘটিলে দেহের পোষণ হয় না। দুগ্ধে ইহার সম্ভাব্য আছে। মহর্ষি চবক দুগ্ধকে “জীবন” বলিয়া গিয়াছেন। তিনি যে কিমিতি দ্বারা এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন তা নয়। যোগবলও নয়। ভূয়োদর্শন এবং কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-জ্ঞান দ্বারা কত অভাবনীয় তথ্য অবগত হইতে পারা যায়, তাহার এই একটা দৃষ্টান্ত।

খাদ্যের স্থূল উপাদান জানিয়া ফল আছে। খাদ্য হইতেই দেহের উপাদান। যে খাদ্যে যেটা নাই, সে খাদ্য হইতে সেটা পাইতে পারি না। যে খাদ্যে সে উপাদান মাত্রায় অধিক আছে, সে খাদ্য হইতে সে উপাদান দেহেরও পাইবার সম্ভাবনা কবিত্তে পারি। যি খাইলে দেহে মাংস বৃদ্ধি হইতে পারে না, সেহেতু যি-তে মাংসের উপাদান নাই। এক কথাও, যি ও মাংস স-মা-ন (similar) প্রব্য নয়। চরকে এই তত্ত্ব-সম্বন্ধে ব্যক্ত আছে। তাহাতে আছে শারীর ধাতু (anatomical elements—tissues) গুণসামান্য যোগে বৃদ্ধি, বিপর্য্যে হ্রাস হয় (শারীর স্থান)। থা, মাংসের সমান-গুণ মাংস; মাংসজোজনে মাংস বৃদ্ধি হয়। যদি মাংস না জোটে, তাহা হইলে মাংসের সমান গুণ-ভূয়িত অল্প আহাব গ্রহণ করিবে। যেমন ছেনা, দোল। কিমিতি-বিদ্যার জানি দোলে মাংসের তুল্য উপাদান আছে, এবং ভাগে মাংসের অপেক্ষাও অধিক। মাংসে যদি কুড়ি, দোলে পঁচিশ। তথাপি মাংস ও দোল সমানগুণসম্পন্ন নহে। ডাক্তারী বিদ্যা উক্ত তত্ত্ব পূর্বে স্বীকার করিত না, এখনও স্পষ্ট ভাবে করে না। কিন্তু দেখিতেছি, স্বীকার করিলে

খাদ্যের-উপাদান নির্ণয়ের প্রয়োগ সৌজ্ঞ্য হইয়া পড়ে। থা, দেহের মেহন (শ্রমতা) ইচ্ছা করিলে মেহ প্রব্য (যেমন যি) ভোজন কবিত্তে বৃহৎ (বৃদ্ধি) ইচ্ছা করিলে বৃহৎ প্রব্য (যেমন মাংস) ভোজন কবিত্তে। এখন দেখিব, কোন্ খাদ্যে মেহনের প্রব্য কত, বৃহৎয়ের প্রব্য কত।

ইহার পূর্বে আবও কথা আছে। সবিসা তেল একটা মেহ। যি-এর পরিষতে সন্নিবি তেল খাইলে চলে না কি? যি যি-ই চাই, পাওযা বিয়ের পরিষতে সন্নিবি যি খাইলে চলে না কি? কিমিতি-বিদ্যা ইহাও উত্তর নাই।

অতএব কিমিতি-বিদ্যার সীমা এবং খাদ্যের কৈমিতিক বিশ্লেষণের প্রয়োগ মনে রাখিয়া “খাদ্য-কথা” পড়িতে হইবে। তখন দেখা যাইবে, পুস্তকখানি উত্তর হইয়াছে।

এখন দ্বিতীয় সম্বন্ধ একটু ব্যাখ্যা কবি। “খাদ্য-কথা”র ভাষা ডাক্তারী ভাষা। কেহ কেহ মনে কবিত্তে পাবেন, ডাক্তারী গ্রন্থে ডাক্তারী ভাষা থাকিবে, তাহাতে নূতন কথা কি। কিন্তু সে কথা নয়। ডাক্তারী পরিভাষা থাকিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালী বহিতে বাঙ্গালী ভাষা থাকিবার কথা। ডাক্তারী ভাষা না-বাঙ্গালী, না-ইংরেজী। বং বং তে পারি, ভাষাটী ইংরেজীও আভাষা তজ্জমা। ইংরেজী বহি তজ্জমা নয়, ডাক্তারের নিজের ইংরেজীও তজ্জমা। যিনি ইংরেজী জানেন না, যিনি ডাক্তারী ভাষার ইংরেজী ভাবিয়া লইতে পারেন না, তাহাকে পদে পদে ধামিয়া ধামিয়া পড়িতে, এবং বুঝা বাঁকা নোজ্ঞা করিয়া লইয়া বৃষ্টিতে হইবে।

আমরা ইংরেজী পড়িয়া, ইংরেজীতে শি-ক্ষি-ত (educated) হইয়া সে ভাষায় ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ি। কাজেই লিখিবার কিংবা কথা কহিবার সময় সে অভ্যাস চলিয়া আসে। ফলে অল্প কিংবা ধনি বাঙ্গালী হইলেও ভাষা বাঙ্গালী রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। সবই সত্য। তথাপি ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী লেখক ও বাঙ্গালী বক্তা আছেন। ইহাদের ভাবার ইংরেজী ছাঁদ কদাচিত্ত পাই। ইহাও উত্তম লেখক। মধ্যম লেখক অনেক আছেন। কিন্তু ডাক্তার লেখক মধ্যম শ্রেণীতেও পড়েন না কেন? ইহাই আশ্চর্য্যের কথা। কারণ কি, কে জানে। হয়ত তিনি মনে করেন, তিনি বৈজ্ঞানিক, বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ভাষাজ্ঞান তত আবশ্যক নয়। হয়ত বা তাহাঁদের শিক্ষার পূর্বে মানসিক দাসত্ব প্রকট হইয়া উঠে। অল্প বয়সে কেবল বার্তা শিক্ষার দোহই এই। লেখায় সাবধান না হইলে, ভাষা ও সাহিত্য চর্চা না করিলে, চিত্তকে সর্ব-মুখে ছাড়িয়া না দিলে এই দোষ শোধবাহিতে পারা যায় না। ডাক্তারী বৃষ্টি ইংরেজ ডাক্তারের অনুকরণ; কাজেই চাল-চলন, এমন কি বসন-ভূষণও ইংরেজের মতন। ইংরেজী অনেকে শিখিতেছে কিন্তু ইংরেজের পোষাক পরিষতে কি? ডাক্তারখানার দেখি, তাহাঁদের বাড়ীতে দেখি, নিজের বাড়ীতে ডাকি, ডাক্তার ও সাহেবী পোষাকের নিত্যসম্বন্ধ দেখিতে পাই। ইহাতে মনে হয়, বৃষ্টিব অমুকরণ হইতে চবিত্তেও হয়। চবিত্তের কিংবদন্ত ভাষায় ব্যক্ত হয়। দেশীয় কৃষ্টিব (culture) অভাবে শত শত বিবাহ ও জ্ঞানবান্ বিদেশী হইয়া পড়িতেছেন।

“খাদ্যকথা” লেখক ডাক্তারের মূলে পড়িয়া নিজের মাভূষা ডাক্তারী কবিত্তা ফেলিয়াছেন। দুঃখ হইতেছে এত তথ্যপূর্ণ বইখানি বচনাব দোষে সাধারণের সুবোধ্য হইল না।

ডাক্তারী ভাষার আর-এক লক্ষণ পরিভাষায় স্পষ্ট দেখিতে পাই। জানি, পরিভাষা-গ্রন্থের অভ্যাস কঠিন। কিন্তু কঠিন বলিয়াই সর্বদা সাবধান হইতে হয়। ভাষাকে অবহেলা করাই বাহীদিগের ধর্ম, তাহাঁদের পরিভাষায় পবিশ্রম করিবেন কেন? তাহাঁদের আয়ুর্বেদ হইতে প্রচুর পরিভাষা গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু আয়ুর্বেদ তাহাঁদিগের অগ্রাহ্য, অস্পৃশ্য। বস্তুতঃ ডাক্তারী বিদ্যা ও আয়ুর্বেদ যেন দুই ঈর্ষাপরায়ণ

সপত্নী, একে অস্ত্রের সৌভাগ্য দেখিতে পাবে না। কালের স্তম্ভে ডাক্তারী বিদ্যা হ্রস্বো বাণী, দুর্ভাগ্য আত্মবর্ধ-বিদ্যার ছায়াও মাড়াইতে চান না। আমবা কিন্তু দুইএব মিলন বাঞ্ছা কবি, পূর্বদেশী ডাক্তারী বিদ্যাকে স্বদেশী কবিতা লইতে চাই। কিন্তু সম্প্রতি সে বাঞ্ছা পূর্ণ হইবাব নহে। ইহাব প্রধান অন্তরায় বর্তমানে ডাক্তারী শিক্ষা, যে শিক্ষায় বৈজ্ঞানিকের যোগ্য চিন্তাবাদীনতা লুপ্ত হইতেছে।

“খাদ্যকণা” পবিত্রাধা “ডাক্তারী” পবিত্রাধা। এখানে কয়েকটা উদাহরণ তুলি। আমাদের দেহেব স্থূল উপাদান পাঁচ প্রকার। খাদ্যে সেই পাঁচ প্রকার উপাদান অধারণ করা হইয়া থাকে। ইংবেজীতে এই পাঁচের নাম proteins, carbo-hydrates, fats, salts and water। ডাক্তারী ভাষায় proteid হইয়াছে ‘আমিষ জাতীয়,’ কেহ বা বলেন ‘ছানা জাতীয়’। ‘আমিষ’ অর্থে মাংস, আমিষ-জাতীয়—মাংস জাতিব অন্তর্গত (ইংবেজীতে of the same species as flesh)। কিন্তু ঠিক হইল কি? proteid মাংসেব একটা উপাদান; মাংস আরও অধিক হইলেও, একটা উপাদান। proteid ও মাংস এক নহে। কিন্তু মাংস-জাতীয়—মাংস যে দ্রব্য দেই দ্রব্য, এই অর্থ হয়। মাংসবৎ বলিলে বরং ঠিক হইত। ‘ছানা-জাতীয়’ এই পবিত্রাধা অগুব দুইটা দোষ ঘটরাছে। শব্দটা ছা-না নয়, ছে-না। ছা-না বলিলে শাবক বুঝি। ছে-না ঠাটি বান্ধালা।; জা-তী-ষ ঠাটি সংস্কৃত। উভয়েব যোগ বিরুদ্ধ যোগ। carbohyrates ডাক্তারী পবিত্রাধায় ‘শালি জাতীয়’। ‘স্বাস্থ্য সমাচার’ পত্রে এবং ‘খাদ্যকণা’ শেবে একা শা-লি আছে, জা-তী-ষ নাই। এই শা লি শব্দ কে দিয়াছিল, কে জানে। কিন্তু শালি সংস্কৃত শব্দ, অর্থ হৈমন্তিক ধাতু। সেই শব্দ অদ্যাপি বায়-শালি, মীতা-শালি প্রভৃতি ধানের নামে, শালি ধানের চাষে ও শালি জমিতে চলিত আছে। carbohyrates দুই জাতীয়—starch আব sugar। প্রথমটির বান্ধালা খেত-সাব কিছু দিন হইতে শূন্য আসিতেছি। এটি নূতন রচিত, পূর্বে কেহ জানিত না। লোকে পা-লো জানে, sugar শর্করা সবাই জানে। starch নাই শালি হইল, শর্করাও শা-লি? ‘স্নেহ-জাতীয়’ শব্দটা আরও হাস্যজনক হইয়াছে। কারণ স্নেহ ইংবেজীতে fats and oils; অতএব জাতীয় যোগে অনর্থ ঘটরাছে। salts ‘লবণ জাতীয়’ বরং বলা চলে, যদিও ল-ব-ণ নিজেই জাতিবাচক। দৃষ্টান্ত, আত্মবর্ধেব পক্ষ-লবণ।

পবিত্রাধা দোষ দেবাইয়া নিবৃত্ত হইলে লেখকের প্রতি অজ্ঞাষ করা হয়। এই কারণে আমার বচিত পরিভাষা উপস্থিত কবিতছি। ডাক্তার মহাশয়গণ ভালমন্দ বিচার কবিবেন।

Proteid—প-লী-য়। (প-ল—মাংস; পল সম্বন্ধীয় প-লী-য়)

Carbohyrates—প ল-লী-য়। [প-ল-জ—মাংস ও পক্ষ। পক্ষ অর্থ হইতে বান্ধালা প-লি sediment, silt। বোধ হয়, প-ল-ল হইতে পা-লো। starch এবং sugar (কেলাসিত crystallized) দুই-ই sediment।]

Fats and oils—স্নেহ।

Salts—ল-ব-ণী-ষ। (ল-ব-ণ বলিষ্ঠ ও চলে, তবে সামান্য লবণ বা নুন হইতে পৃথক কবিত ল-ব-ণী-ষ)

“খাদ্যের পবিপাক প্রণালী” নামক পবিচ্ছেদে অনেক পবিভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে মহা-প্রোক্তের (alimentary canal) বিভিন্ন অংশের নাম আত্মবর্ধে আছে, কয়েকটা নাই। সে সব নাম লইলে ক্ষতি কি ছিল জানি না। তৎপরিবর্তে নূতন নাম বচনা কবিতা ডাক্তারী বিদ্যাকে বিদেশীয় রাখিয়া দেশের জ্ঞানবুদ্ধির পথে বাঁটা দেওয়া হইতেছে। আত্মবর্ধে দেশী আঁঠির গাছ, মতেন্দ্র বহুব্যাপী। ইহাব ফল ছোট ও টকুয়া হইলেও গাছটা দেশের মাটি ও জল-বায়ু যোগ্য হইয়াছে। এই

আঁঠির গাছে বিদেশী ডাক্তারী বিদ্যাব কলম ধরাইলে, যত্নহেতু ‘দীর্ঘজীবী হইত, আমবা ফলও অধিক ও উত্তম পাইতাম। এই বাববাব শোনা যাইতেছে, বিদেশী বিদ্যা স্বদেশী কবিত হইবে। বিদেশী গাছ দেশী হইয়া গিয়াছে, আঁঠি পড়িয়া হইয়াছে। কত বিনষ্ট হইয়াছে, কত গাছ গণাস্তর পাইয়াছে। বিদেশী বি কালচক্রে নিক্ষেপ না কবিতা বুঝিয়া শুদ্ধিরা দেশী বিদ্যাব সহিত ব্রোড-কলম ঘটাইতে হইবে। দেশী বিদ্যাব পবিভাষা গ্রহণ ঘটনাব প্রথম পদ।

“খাদ্যের পবিপাক প্রণালী” পবিচ্ছেদে বহু কৈমিতিক দ্রব্য আছে। এ নামগুলি ইংবেজী না বাখিয়া উপায় নাই। কিন্তু পুস্তকের নাম ক-থা, তাহাতে অন্য পবিপাকের কৈমিতিক ব্য প্রয়োজন ছিল কি? আমবা বিবেচনায় পবিপাক-জন্ত দ্রব্যগুলি একভাবে বর্ণনীয়। কাবণ কে জানে, ‘পেপটোনা’ কি, ‘এমিনো’ এ কি? যে জানে সে ‘খাদ্য-কণা’ পড়িবে না, যে না জানে বুঝিবে না। নাম শুনিলেই বস্তু-গ্রহ হয় না।

“খাদ্যের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ” নামক পবিচ্ছেদ হইতেও অনেক বাদ পাবা যায়। বাদ দিলে সমগ্র পুস্তক সাবাবণ পাঠকের স্বেবোধ্য হ প্রমটা গুরুতব। আহাবেব মাত্রা নয়, খাদ্যেব মাত্রা নয়, কোন্ খাদ্যেব কত খাইলে আহাবেব প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? অর্থাৎ কত পলীয়, কত পললীয়, কত স্নেহ, কত লবণীয়, কত জল খাইবে কৈমিতিক উপায়ে এই প্রশ্নেব উত্তর পাওয়া যাইতে পাবে লেখ উপায় বলিয়াছেন। এখানেও বলি, যে জানে সে এই বই হইতে শিখিতে চাহিবে না, যে না জানে সে কিছুই বুঝিবে না। বস্তুতঃ হৃষ, লেখক কমিতি-বিদ্যা এত না জানিলে তাঁহাব বইখানি সা পাঠ্য হইতে পাবিত। কমিতি-বিদ্যাব সাধ্য কি ঐ প্রশ্নেব উত্তর আমাদেব শরীব যদি বা কৈমিতিক কর্মশালা হয়, তাহা হই দেখিতেছি যেমন গ্রাম্য কর্মকাবের কর্মশালা ও তবস্তা কোন্ কর্মশালা এক নয়, শরীব রূপ কর্মশালাও তেমন এক নয়। তা কর্মশালা কর্মকাবের প্রয়োজন বুঝিতে পারে কি?

লেখকও নিবপায় হইয়া আশু, অবশ্য পশ্চিম দেশীয় আশু, উদ্ভাব কবিষাছেন। শতাধিক বৎসর পূর্বে জার্মানি দেশে লিবিপ এক শ্রমিক কৈমিতিক ছিলেন। তাঁহাব বিবেচনায় আমিষ ত হইতে “শরীবেব সমস্ত শক্তি উৎপন্ন হয়।” ইহা লিখিয়া ব লিভেছেন, “আজকাল কোন পণ্ডিতই এই মতেব পক্ষপাতী নহে যদি তাই, তবে আর তাঁহাব নাম স্মরণ কেন?

এইরূপ, ভাইট নামক আব এক পণ্ডিত অপদস্থ হইয়াছেন। কিন্তু ডাক্তারী বিদ্যাব আহাবেব মাত্রা অদ্যাপি কথিবা দিতেছেন। ত মতে “পবিমিত পরিশ্রমী বয়স্ক ব্যক্তি (ইথোবোপীয়ানেব) খাে ১২০ গ্রাম আমিষ উপাদান, ৪০০ গ্রাম শালি উপাদান এবং ১০০ স্নেহ উপাদান থাকা আবশ্যক।”

বোধ হয় পাঠক ভাবিতেছেন, ইয়ুরোপীয়েব খাদ্যের জািনা তাঁহাব কি হিত হইবে, আব “গ্রাম” কথাটাই বা কি। লেখ হইয়া আমি উত্তর দিব কি? ইয়ুরোপীয় বিদ্যাব ইথোবোপীয় না হইয়া কি ভাবতীয় হইবে? “গ্রাম” তাঁহাদের পরিভাষা, বিে কমিতি-বিদ্যাব, যেমন আউন্স ইংবেজি। ডাক্তারী বিদ্যা বান্ধ লিখিলেও তোলা লেখা চলিবে না। ঐ কল্প বান্ধালীকে বুঝা হইলে লেখা হইত, ১০ তোলা পলীয়, ৩৪ তোলা পললীয়, ৮০ স্নেহ। মোট ২২৪ তোলা।

ইহার পব আরও দুই তিন জন বিদেশী মত আঁছে। মেডিক কলেজেব ডাক্তার মাকে সাহেবেব মতও আছে। এই মত তত উপেক্ষ

নহে। আমাদের খাদ্যে পলীয়াপাণ্ডা অল্প হইতেছে। কিন্তু লেখক সে মত অগ্রাহ্য করিয়া “সহজ পরিশ্রমী [?] বৎসর বাঙ্গালী ভ্রমলোকের দৈনিক খাদ্যে” প্রায় ৪ তোলা পলীয়া, ১৭ তোলা পললীয়া, ৫ তোলা স্নেহ-আবশ্যক বলিয়াছেন। এই মতের হেতু বাহাই হটক, খাদ্য মোট ২৬ তোলা হয়, ভইটসাহেবের প্রমাণের অর্ধেক। তা ছাড়া, সে ভ্রমলোক কোন সৌখিন বাবু বাহাঁব এত অল্প আহারে দিন চলে। এত বিচারের পবে লেখক কিন্তু ভোক্তার ঘাড়ে সব মাত্রা চাপাইয়া দিয়া মর্হাষি চরকের শরণ লইয়াছেন। লইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাঁকে বিপন্ন করিয়াছেন। কারণ চব্বকসংহিতার যে স্বত্ব উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে লেখকের বিচার্য বিষয় নাই। চরক বলিতেছেন, মাত্রাভোজী হইবে। লেখক জানিতে চান, আমিষ ও নিরামিষেব ভাগ কত হইবে।

“খাদ্য সম্বন্ধে বিচার” নামক পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে দুইএক কথা লিখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে পুরুভোজন হইয়া গিয়াছে। পুরুভোজন দুই কারণে হয়। মাত্রা-জ্ঞাত পুরু, আর সংস্কার-জ্ঞাত পুরু। অর্থাৎ লঘু খাদ্য, যেমন ভাত, অধিকমাত্রায় খাইলে পুরুভোজন হয়, আর চালের পিঠা অল্পমাত্রায় খাইলেও পুরুভোজন হইতে পারে। “খাদ্য-কথা” সংস্কার-জ্ঞাত পুরু হইয়াছে, আমার সমালোচনা মাত্রা-জ্ঞাত পুরু

হইয়া পড়িল। তথাপি আর একটু লেখা কতব্য মনে করিতেছি। “খাদ্যকথার” লেখক ঐচ্ছানি আমার তহাঁর ভ্রমার উপহার সরূপ দিয়াছিলেন। চাল কাঁড়া হটক, আকাঁড়া হটক, অচ্ছায় প্রদত্ত হইলে উত্তম বলাই শিষ্টাচার, আমিও উত্তম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহাতে কাহাবওব হিত হইত কি? দেশেব কত লোক দেখিতেছি, বসনে ও ব্যসনে পয়সা খরচ করিতেছে, কিন্তু অশনে অতিশয় মিতব্যয়ী। রাঢ়েব বিশেষতঃ এই বাঁকড়া জেলাব লোকগুলির শীর্ণ ও ক্লান্ত দেহ দেখিলেই মনে হয়, ইহাদের আহারে পলীয়া ও স্নেহেব অত্যন্ত ভাগ। অনুসন্ধানও জানিতেছি, তাহাই বটে। কে তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিবে?

‘ভাঙ্গারী ভাষা’ ও ‘ভাঙ্গারী পবিভাষা’ পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী ভাষা ও পবিভাষা ব্যবহার করিতেই হইবে। নতুবা জ্ঞান প্রচাৰ হইবে না। ভাঙ্গারী ভাষা ও পবিভাষাব নিদান অশেষণ করিতে গিয়া অশিষ্ট হইয়াছি। বড় ভুলে হইয়াছি। বিদ্যার এ-দেশ সে-দেশ নাই। তিনি সর্বত্র পূজনীয়। কিন্তু পূজার বিধি সবদেশে সমান নয়। একথা আমাদের ভাঙ্গারদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে। কারণ তাহাঁবা দেশ ভুলিলেও দেশ তাহাঁদিগকে ভুলিতে পারিবে না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

প্রবাসে বঙ্গসাহিত্য চর্চা

প্রবাসে মাতৃভাষাব সাধনা ও প্রচারের উদ্দেশ্য যে শুধু মহৎ তাহা নহে; ইহা আমাদের আত্মরক্ষা ও আত্মপুষ্টির জন্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এ সম্বন্ধের দুটি দিক আছে। একটি ভিতরের, অন্যটি বাহিরের। ভিতরের দিক, অর্থাৎ আমাদের নিজেদের দিক।

আমরা প্রবাসী বাঙ্গালী, সাহিত্যেব কেন্দ্র হইতে দূরে। বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে আমাদের সংগ্রহ ততটা ঘনিষ্ঠ নহে। এমন কি, হয়ত যুক্ত প্রদেশে এখনও অনেক বাঙ্গালী আছেন যাহাদের পক্ষে নির্দোষ বাঙ্গলা বলিতে কিম্বা লিখিতে পারা সাধ্যাতীত না হইলেও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। শুনিয়াছি এমন এক সময় ছিল যখন কোন কোন বাঙ্গালী মাতৃভাষায় একেবারে অজ্ঞ ছিলেন। এ সম্বন্ধে হাস্যকর অনেক গল্প আছে, তাহার অবতারণা এখন করিব না।

প্রবাসে যদি মাতৃভাষা চর্চা ও প্রচারের সুবিহিত ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে নিজভাষা সম্বন্ধে আমাদের এ অপবাদ সম্পূর্ণ দূর হইবে। মনুষ্য মাত্রই মাতৃভাষার গৌরব করে। বাঙ্গলাভাষাও বাঙ্গালীব বড় আদরের বস্তু।

এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে মাতৃভাষার সঙ্গে

সংযোগ বাধিবার জন্ত আমাদের সর্বদা সচেষ্ট থাকা আবশ্যক। প্রবাসে সাহিত্য-সভার প্রথম সার্থকতা এই যে, ইহার সাহায্যে বাঙ্গলাভাষার ও বাঙ্গলা সাহিত্যের সঙ্গে এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ঘটিবে। এটি আমাদের নিজেদের দিক।

বাঙ্গলা সাহিত্যের চর্চা দ্বারা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ঐক্য ও সামঞ্জস্য সুসম্বদ্ধ হয়। সাহিত্য জাতীয় জীবনের স্বদৃঢ় গ্রন্থি। আমরা বাঙ্গালীরা যে যেখানেই থাকিনা কেন, যত দূরেই বাস করিনা কেন, সকলেই যে এক পরিবার-ভুক্ত, আমাদের সাহিত্য তাহা স্মরণ করাইয়া দেয়। বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্র, ভাব ও চিন্তা বাঙ্গলা সাহিত্যে পরিস্ফুট। স্বদেশ-প্রীতি, ভক্তি-প্রবণতা, ভাবুকতা, কাব্য-ছুরাগ বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্বের মধ্যে গণ্য। যখন বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দে মাতরম্’, রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার বাংলা,’ দ্বিজেন্দ্রলালের ‘আমার দেশ,’ গোবিন্দ রায়ের ‘নিখিল সলিলে,’ আমাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে তখন বাঙ্গালীর হৃদয়ে যে স্বদেশ-প্রেমের তড়িত-স্রোত বহে, এমন আর কিসে হয়?

বাঙ্গালী জাতির আর-একটি বিশেষত্ব ভক্তি-প্রবণতা। বাঙ্গালার সাহিত্য ও কবিতা সে ভক্তিরসে সরস। যে বাঙ্গালী বহুদিন স্বদূর প্রবাসে রহিয়াছে, হয়ত অনেক দিন বাঙ্গালার ভাষা ও বাঙ্গালীর সংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহাকেও রামপ্রসাদেব শ্যামাসুন্দরী শোনাও, বৈষ্ণব কবিদের গীতিকবিতা শোনাও, অজ্ঞাতসারে তাহাঁচ চন্দ্র আর্দ্র হইবে।

বাঙ্গালীর অজ্ঞাত বিশেষত্বও তাহার সাহিত্যের মধ্যে উন্মেষিত দেখিতে পাই। প্রবাসে বাঙ্গালীচরিত্রের বিশেষত্ব বদি রক্ষা করিতে হয়, তাহার জাতীয়ত্ব যদি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলাসাহিত্যের অল্পশীলন একান্ত আবশ্যক। আমরা যে প্রদেশে বাস করি সে প্রদেশবাসীরা জাতীয় মহত্ব আমাদেরকে অল্পপ্রাণিত করিবে, ইহা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের নিজস্ব বাহা তাহা ভুলিলে চলিবে না।

প্রবাসে বাঙ্গলা সাহিত্য চর্চার অনেক সার্থকতা। তন্মধ্যে একটি এই—যে, আমরা যুক্ত প্রদেশে থাকিয়া বাঙ্গলাসাহিত্যের উন্নতিকল্পে নূতন উপকরণ যোগাইতে পারি। আদান-প্রদানে সাহিত্যের সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হয়। উর্দু সাহিত্য ও হিন্দি সাহিত্য-ভাণ্ডারে অনেক রত্ন আছে; সেগুলি সঞ্চয় করা আমাদের পক্ষে সুসাধ্য, এবং তাহা সঞ্চয় করিয়া আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য বাড়াইতে পারি। যাহারা উর্দু, ফার্সি কিম্বা হিন্দি ভালরূপে জানেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে একটি দায়িত্ব আছে। মধুকর যেমন নানা কুসুম হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া আপনাদের মধুচক্রের মধুভাণ্ডার পূর্ণ করে, সেইরূপ তাঁহাদের কর্তব্য যে এ দেশের বিবিধ সাহিত্যকুসুম হইতে মধুসংগ্রহ করিয়া আমাদের মধুচক্রের আয়তন বর্দ্ধিত করেন।

এদেশের ইতিহাস, এদেশের পুরাতত্ত্ব, এদেশের রীতিনীতি হইতে নানা প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় আহরণ করিয়া আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যকে পুষ্টতর ও আরও সারগর্ভ করিতে পারি।

এবিষয়ে আমাদের আর-একটি কর্তব্য আছে। আমরা যেমন এ দেশের সাহিত্যাদির সাহায্যে আমাদের নিজের

ভাষাকে আরও অলঙ্কৃত করিতে পারি, সেদিক সাহিত্যভাণ্ডার হইতে নূতন নূতন খণ্ড করিয়া এদেশের ভাষাকে আরও সুশ্রী ও সবল করি। আধুনিক হিন্দি সাহিত্য অনেকটা সাহিত্যের অমুকরণে গঠিত হইতেছে। উভয়েব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের উপর আর-একটি আছে—সেটি বাঙ্গালী জাতির বাহিরে বাঙ্গলা সাহিত্য বিস্তার। বাঙ্গলা সাহিত্য নানা সম্পদে আচ্ছন্ন। যে ইহা শুধু বাঙ্গালীর গৌরবের ধন নহে, সমগ্র আচ্ছন্ন এ সাহিত্যের স্লাঘা করে। বাঙ্গলা সাহিত্য জগতের সকল সুসভ্য জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধি করিয়াছে। কবিসম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর সাহিত্য জগতের শ্রেষ্ঠ মুকুট পরাইয়াছেন। এমন ইউরোপের প্রদেশেই সুশিক্ষিতেরা ফরাসী ও ইংরেজী ভাষা সুশিক্ষার অঙ্গ মনে করে, আমবা আশা করি সে দিন আসিবে যে দিন ভারতের সর্বত্রই সুশিক্ষিত বাঙ্গলা সাহিত্যকে তেমনই আদরে গ্রহণ করিবে। সাহিত্য শুধু বাঙ্গলার সাহিত্য হইবে না—ভাষা সাহিত্য হইবে। এ উচ্চ উদ্দেশ্য সংসাধনের আমাদের সর্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত। বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রসারের গুরুভার আমাদের হস্তে স্তম্ভ।

বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবাসী বাঙ্গালীর যে কৰ্ত্তব্যের বিষয় উল্লেখ কবিলাম তাহা সুসম্পন্ন ক নিমিত্ত নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায় প্রশস্ত।

প্রথমতঃ—যেখানে পঞ্চাশাধিক বাঙ্গালীর সেখানে বাঙ্গলা-পুস্তকভাণ্ডার স্থাপনা। সে শুধু গল্প ও উপন্যাসের বাহুল্য না থাকে সে বিষয়ে হইতে হইবে। আমাদের পুস্তকভাণ্ডারে অল্প প্রকার সদগ্রন্থ, ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের পুস্তকও রাখা উ সে পুস্তক পাঠের অধিকারী শুধু বাঙ্গালী হইবে এদেশীয়েরাও ইহার অধিকারী হইবে। তাহা বাঙ্গলা সাহিত্য বিস্তারের সহায়তা হইবে।

দ্বিতীয়তঃ—সাহিত্য-সমিতি, যেখানে সম্ভব, করা। যেখানে সাহিত্যোৎসাহী কয়েকটি বাঙ্গালী

সেখানে বাংলা সাহিত্য চর্চার ও আলোচনার জন্ত সমিতি স্থাপিত হইবে। এবং যাহারা বাংলা লিখন, তাঁহাদেরও সে সমিতির সভ্য হইবার অধিকার থাকিবে।

তৃতীয়তঃ—প্রাদেশিক সাহিত্যসম্মিলনী। সম্বৎসরে একবার সাহিত্যপ্রেমী বাঙ্গালীরা সম্মিলিত হইয়া সাহিত্য-লোচনা করিবে ও সাহিত্য প্রচার সম্বন্ধে সচুপায় উদ্ভাবন করিবে। যাহাতে বেশ সুশৃঙ্খল ভাবে বাংলা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে প্রচেষ্টা হইতে পারে তদ্বিষয়ে যত্নশীল হইবে।

চতুর্থতঃ—যুক্তপ্রদেশে একটি স্থলিখিত ও সুপরিচালিত মাসিক পত্রিকা স্থাপন। ইহার উপকারিতা নিঃসন্দেহ।

এদেশে যাহারা স্থলেখক, এ পত্রিকায় তাঁহাদের প্রবন্ধাদি বিশেষ ভাবে লিপিবদ্ধ হইবে। এ দেশের উদীয়মান লেখকদের উৎসাহ ও উন্নতির নিমিত্ত এরূপ একটি মাসিক পত্রিকা বিশেষ ফলপ্রসূ হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি যে বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারে এ দেশেরও দেশ অনেক জিনিষ আছে। আমাদের যাহা দিবার তাহা একটি মাসিক পত্রিকার সাহায্যে অনায়াসে দিতে পারিব। পত্রিকায় এমন অনেক রচনাদি থাকিবে যাহা এ দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, আচার ব্যবহার, শিল্পকলা ইত্যাদি উপকরণে পরিপুষ্ট। আমার মনে হয় এ পত্রিকার এক সংস্করণ, অন্ততঃ একাংশ, দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হওয়া আবশ্যিক, তাহা হইলে এদেশীয়দের মধ্যে বাংলা সাহিত্য প্রসারের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে।

পঞ্চমতঃ—এ দেশে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের শাখা বিস্তার করা। তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যের ক্রমোৎকর্ষের সঙ্গে আমাদের অক্ষুণ্ণ যোগ সংরক্ষিত হইবে। এখানকার পরিষদের একটি বিশেষত্ব এই হওয়া উচিত যে বাংলা সাহিত্যের উত্তম গ্রন্থাদি, এবং উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ ও কবিতার সংকলন দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হইবে। ভারতে যাহাদের ভাষা সংস্কৃতপ্রসূত, এ উপায়ে তাহাদের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের প্রসার ও আদর বাড়িবে। যে দেশ দেশান্তরে থাকি না কেন, মাতৃভাষা আমাদের নিত্য পূজার দেবতা। যদুন্দন সূদ্র প্রবাসে মাতৃভাষাকে সম্বোধন করিয়া বেক্রপ বলিরাছিলাম, আমবাও যেন সেকপ বলিতে পারি :—

“নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য বতন
অপণ্য ; তা সবে আমি অবহেলা কবি
অর্থলোভে দেশে দেশে কবিতু ভ্রমণ
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।

* * *
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোবে নিশার স্বপনে
কহিলা—“হে বৎস, দেখি তোমার ভক্তিত,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সর্বস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কাবণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধনপতি ?
কেন নিবানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে ?”

লালকোঁ

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

[এই অভিব্যক্তি কানপুরে উত্তরভারতীয় বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় কর্তৃক পঠিত হয়।]

রূপের তারতম্য

(তামিল কবিতা)

স্বরূপ, অথচ মূর্খ—চির অপকারী ;
রুৎসিত, বিদ্বান কিন্তু—নয় অসুন্দর।

সরল শরীর বেগ—প্রাণ-অপহারী,
বিকৃতগঠন বীণা—অমৃত-নির্ধার।

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র



চণ্ডীদাস কাব্য — শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা, এম-এ। দাম পাঁচ সিকা ; কাপড়ে বাঁধাই, দেউ টাকা।

মোটের উপর বইখানি ভালই হইয়াছে। তবে দু-একস্থানে জোর করিয়া কবিত্ব কবিত্তে গিয়া একটু একটু খাপছাড়া হইয়া গিয়াছে। যাহা কবিতাবসগ্রাহী, তাহা এই পুস্তক পাঠে আনন্দ পাইবেন। ছাপা ও কাগজ একবকর চলনসই হইয়াছে।

সচিত্র বয়ন-বিজ্ঞান—শ্রীবসন্ত সিংহ। আট আনা, প্রাপ্তিস্থান লেখকের নিকট, লালবাজার, বাকুড়া।

বর্তমান সময়ে দেশের চাবিদিকে তাঁত এবং চরকার ব্যবহার তাঁতি ছাড়া অল্প লোকেও কবিত্তেছেন। যাহা নতুন কবিয়া বয়ন-কার্য শিখিতে চান, তাহাদের কাছে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি আদৃত হইবে আশা কবি। লেখক বেশ সহজ ভাষায় এবং চিত্র-সাহায্যে বস্তব্য বিষয় সহজবোধ্য কবিয়াছেন।

হায়দার আলি — শ্রীহবেলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। চুঁচুড়া, তেলিনীপাড়া, দাক্ষিণী প্রেস হইতে প্রকাশিত।

একখানি নাটক। অভিনয় করিবার মত হয় নাই। তবে এমনি বই হিসাবে পড়িলে ভাল লাগিতে পারে। নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি ভাল করিয়া ফুটতে পারে নাই। ছাপার দোষ-প্রমাদ অনেক আছে, লেখক তাহা স্বীকার কবিলেও তাঁহাকে একেবারে সার্জন করিয়া যায় না। তাড়াতাড়ি কবিয়া যা-তা ছাপানো অপেক্ষা কিছু দেবী করিয়া ভাল করিয়া ছাপানোই উচিত। বইখানি ছোট কবিয়া ভুলচুক বাদ দিয়া ছাপাইলে অভিনয়ের মত হইতে পারে।

কার্পাস—বি, কে, মুখার্জি, পোষ্ট বেহালা, কলিকাতা।

এই পুস্তিকার লক্ষ্যেব প্রায় সব দেশের তুলার বিষয় কিছু না কিছু বলা হইয়াছে। যাহারা এখন চবুকা কাটিতেছেন এবং তাঁত চালাইতেছেন, এই বইখানি পাঠ কবিলে তাহাদের উপকার হইবে। ভারতের কার্পাস সম্বন্ধে আবো কিছু বেশী বলা উচিত ছিল, যাহা বলা হইয়াছে তাহা নেহাত সামান্য। মোটের উপর বইখানি পড়িলে অনেকেই কিছু শিখিবেন আশা করা যায়। ছাপা ভাল। বাঁধাই খারাপ।

গ্রন্থকীট

বান্দালোর বল বা বান্দালীর সামরিক ইতিহাস — শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, বি-এ প্রণীত। মানসী প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৫২২+৭১+২৬+১০+৮০ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। চার টাকা।

এই পুস্তকখানিতে মহাভারতের যুগ হইতে ইংরেজ অধিকারের আধুনিক কাল পর্যন্ত বাঙালী জাতির বাহুবল, যোদ্ধা হ্রের ও বীরত্বের ইতিহাস সুশৃঙ্খলার বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ একখানি প্রামাণ্য ইতিহাসের অভাব ছিল। এখন ইহা বাঙালী জাতির ও বাংলা সাত্তিকের

সম্পদ হইল। চমৎকার স্মৃতি উৎকৃষ্ট বই ; প্রত্যেক বাঙালী পাঠ করা উচিত। বাংলা বইএ নিতান্ত দুর্লভ শব্দহী এই সৌভব ও উপকাবিতা বুদ্ধি করিয়াছে ; যাহা ঐতিহাসিক অজ্ঞ এই পুস্তক আলোচনা করিবেন তাঁদের বিশেষ কাজে এই বইখানি পাইয়া আমবা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি ; বই পড়িবেন তিনিও আমাদের মতন আনন্দিত হইবেন জ্ঞো বলিতে পাবি।

নীলদর্পণ - ৮দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। কব মঞ্জুম কোম্পানী, ১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। ২৮৯ পৃষ্ঠা। বাঁধা। মূল্যেব উল্লেখ নাই।

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাটককারের শ্রেষ্ঠ নামজাদা বই ইতিহাসেব এক পবিচ্ছেদ এই নীলদর্পণ। তারই শেষ সংস্করণ। ভূমিকায় নীলবিদ্রোহেব ইতিহাস ও পবিশিষ্টে শব্দা দীনবন্ধুজীবনী আছে, নীলদর্পণ নাটকের ইতিহাস আছে। ব এমন স্মৃতি উপকারী সংস্করণেব বই হইতেছে ইহার জন্য প্র পাঠকদের ধন্যবাদভাজন। এই সংস্করণেব সমাদর যে বই বলাই বাহুল্য।

মহাত্মা গান্ধী—শ্রীবোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত পানিত্রাস হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ১৭০ পৃষ্ঠা টাকা। চতুর্থ সংস্করণ।

মহাত্মার জীবনী ও আধুনিকতম উপদেশবাণী এই সংস্করণে হইয়াছে। এই সংস্করণে ১২ খানি ছবি আছে—মহাত্মার তাঁব হস্তাক্ষরের এবং তাঁব কর্মজীবনেব সম্পর্কিত আর বিখ্যাত ব্যক্তি। এ বইএব প্রশংসা আমরা করিয়াছিলাম ; চতুর্থ সংস্করণ হইয়াছে তাব প্রশংসা করা নিশ্চয়োজন। মহাত্মা প্রতি সমগ্র দেশ ভক্তিমান হইয়াছে ; তাঁর জীবন ও উপদেশ করিয়া নিজেদের জীবনকে গঠিত করাব পক্ষে এই পুস্তক সকল সহায় হইতে পারিবে।

কেদার-বদরীর পথে শ্রীবীরেশচন্দ্র দাস, বি-এ এম, সি, সবকাব এণ্ড সন্স, ৯০১২ এ হাবিসন বোড, কলিকাতা পৃষ্ঠা। দেউ টাকা।

গৌরীশঙ্কর হিমালয় ভারতের পবিত্র তীর্থ। সেই তীর্থে পথের বুড়াত্ত ও যাবতীর জাতব্য তথ্য এই পুস্তকে আছে ; প মাইল অন্তর চটী সবাই, কোথায় কি স্থবিধা, কোথায় কি কর্তব্য আছে, ইত্যাদি কেজো কথাব সঙ্গে দেশের দুগ্ধেব সংযোজিত হওয়াতে ইহাব উপাদেয়তা বুদ্ধি হইয়াছে। একখা সংযোজন কবাত্তে তীর্থযাত্রীদের বিশেষ সাহায্য কবা হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা—অন্নদা ঠাকুর। ৫২২+১৮ টিট, কলিকাতা। ১৩৮ পৃষ্ঠা। ভালো কাগজ ছাপা। এ

এই বইএ কতগুলি কবিতা আছে, বিষয় তত্ত্বকথা—ধর্মতত্ত্ব নীতি ইত্যাদি। এই বই নাকি “ভগবান রামকৃষ্ণদেবের শ্রীযুগ হইতে ভক্ত অন্নদা ঠাকুরের স্বপ্নদশায় প্রাপ্ত।” বাই হোক, এ বই মধ্যে অনেক শাস্ত্র সত্যের কথা আছে।

তমস প্রসঙ্গ—শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ। উপাসনা প্রেস, ৪৪ ডি পুলিশ হাসপাতাল বোড, ইটালি, কলিকাতা, ৪২ পৃষ্ঠা। দু আনা।
তমস-কীট পালন কবিতার ও তমস-গুটি হইতে বেশমী হুতা বাহির করিবার প্রণালী এই পুস্তিকায় বর্ণিত হইয়াছে। বাবসায়ীদের কাজে লাগিবে।

চরক। শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাব লিখিত ভূমিকা সহিত। দুই পয়সা।

ভারতের বঙ্গ-শিল্পের অবনতির ইতিহাস ও তাব উন্নতির উপায়, চরকায় হুতা কাটার প্রণালী, চরকায় কিরূপ বোজগাব হইতে পাবে, হুতার পক্ষে কিরূপ তুলা উৎকৃষ্ট, ভারতের তুলা চাষ ও বপ্তানি হিসাব ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য তথ্য এই পুস্তিকায় আছে। চরকা-কাটুনে নব-নারী পড়িলে অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন।

খাদ্যকথা—শ্রীনবেন্দ্রনাথ বসু। স্বাস্থ্যসমাচার কার্যালয়, ৪৫ আমগাষ্ট্র স্ট্রিট, কলিকাতা। ৭০ পৃষ্ঠা। আট আনা।

এই পুস্তকে এই বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে—(১) খাদ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা। (২) খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা। (৩) খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান। (৪) খাদ্যের পকিপাক প্রণালী। (৫) খাদ্যসমূহের গুণাগুণ। (৬) খাদ্যের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ। (৭) খাদ্যসম্বন্ধে বিভ্রাৎ। (৮) খাদ্যের দোষে বোগ ভোগ। (৯) খাদ্যসমূহের বিক্রেষণ। বিশেষ উপকারী ও উৎকৃষ্ট পুস্তক। দেশী মাঝেবই দেহপোষণের জন্য খাদ্য আহ্বার প্রয়োজন; সেই খাদ্যের বিষয় জানা প্রত্যেক নব-নারীর—বিশেষ কবিতা মাতাদের—আবশ্যক। এই বই খাদ্য নির্বাচনে বিশেষ সাহায্য করিবে। বইখানি স্থলিখিত।

কারবার শ্রীকৃষ্ণবিহারী ঘোষ। নোবাপালি বড়বাজার। ২৫ পৃষ্ঠা। বারো আনা।

পশু, পক্ষী, পাখো, পাট, হুগুচি, কদল, সতবন্ধ, বাসন, কলা, কাপড়, কুড়ি, দালালী, কাঁচ, শস্য, শিবির, হাড়, সাবান, দেশলাই, নম্র, নকল-সোনা, ভেলী-রূপা, সিল্ক-ফুড ইত্যাদি কারবারের উপায় ও সফলতার কৌশল এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। ব্যবসায়ীদের কাজে লাগিবে।

ভারতে সুবরাজ—শ্রীআবদুল বাবি প্রণীত। হবিনাধারণপুর, নোবাপালী।

বাজসত্ত্বির উচ্ছ্বাস পদ্যে। ইংরেজের প্রশংসায় পদ্য বচনা।

সুবরাজ-সম্বন্ধনী কাব্য—শ্রীস্বপ্নকুমার রায়।

ভঁরঘট। কাব্যের বিশেষণ যে সম্বন্ধনী কেন হইল তা সন্ন্যাসীই জানেন যিনি কবিকে কৃপা করিবার ছলে বিভ্রম কবিরাছেন। ভারতে বর্ণতে প্রাণপণেতে মিল। তাতে কি; কার্ণব বিভ্রম হোক না, হুঁহু ধরিলেই হইল। এক কবিগোলা জাড়াগ্রাসে গিয়া জাড়াব বাবুদের স্তুতি গাহিয়া জাড়াতে ও তবুতে মিল কবিরাহিলেন; কিন্তু তাতে বঙ্গবাণী কুহু হইলেও লক্ষী এসন্ন হইয়াছিলেন; কবিগোলায় ছন্দ ও পদ্য মিলে নাই, কিন্তু তাব ভাগ্যে পুণ্ড্রাব মিলিরাহিল নিস্তব। শেখকেবও কিছু হবিদা হইয়া থাকিস হবত।

পঞ্চামৃত—শ্রীপরমেশ্বরপ্রসন্ন রায় বিদ্যানন্দ বি-এ। এম, সি, সবকাব এণ্ড সন্স কলিকাতা। মূল্য উল্লেখ নাই। ছাপা, কাগজ, বাঁধা উত্তম।

পাঁচটি ও পাঁচটি রক্তবচনা—(১) অকুবব বিভীষিকা। (২) ডবল আঁচড়া। (৩) ওএর রাজত্ব। (৪) আদালতীয় বাংলাব নালিশ। (৫) এএ প্রভুত্ব। (৬) শব্দ ব্রহ্ম। (৭) উকাব বনাম ওকার। (৮) না-যেব নয়। (৯) বৈদ্যোবা কবিবাছ কি ডাক্তার? (১০) ননদ ভাঙ্গ সংবাদ (প্রহসন)। বাবা ঘটা খানেক হাসিতে চাহেন তাঁবা কিনিবা পড়িবেন—বচনার রক্ত ও রস দুই আছে।

রোবাইয়াৎ—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ। বেঙ্গল পাবলিশিং হোম, ৫ মুবহম্মদ লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠাঙ্ক বা দাম দেওয়া নাই। বইএব বাঁধাই বেশ সুন্দর।

ইংরেজ কবি কিটজেবাল্ড ওমাব ধার্ম্যের শ্লোকাবলী আশ্রয় কবিবা একবকম স্বাধীনভাবেই কবিতা রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন; ইংবেজী কবিতাব মধ্যে ওমাবেব কবিতার প্রায় কিছুই নাই। এই পুস্তিকায় এক পাতে ইংবেজী কবিতা ও তাব সাম্যেব পাতে বাংলা অনুবাদ ছাপা হইয়াছে। অনুবাদ সুন্দর সব প্রঞ্জল হইয়াছে। তবে সাত নকলে আসল খাস্তা—ওমাব ধার্ম্য এ অনুবাদেব তন্নটি দিবাও বান নাই। এ বকম অনুবাদেব অনুবাদ পড়িবা কেউ যেন মনে না কবেন যে ওমাব ধার্ম্যেব কবিতাবস উপভোগ করিতেছেন।

কৃষ্ণকথা—শ্রীবিজয়র দাস বি-এ, শান্তিপুর মিউনিসিপাল উচ্চ ইংবেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ৪৪ পৃষ্ঠা, তিন আনা।

পদ্যে কৃষ্ণলীলাব কথার বিবৃতি।

বিশ্বস-হিতা—প্রণেতা ও প্রকাশক শ্রীরামবুদ্ধ দেব, ৫৮ আপার সাবকিউলাব বোড, কলিকাতা। চটি পুস্তিকা দুখণ্ড, এক আনা, তিন আনা।

লেখক এই পুস্তকেব পরিচয় স্বরূপ লিখিয়াছেন—“খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর মানব-সমাজ-বিধি অর্থাৎ পৃথিবীতে শান্তি, শ্রেহ, ভক্তি, ক্ষমা, দয়, কর্তব্যপালন প্রভৃতি দ্বাব সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়াব প্রণালীবিষয়ক সমাজ-সংস্কার ব্যবস্থা।” লেখকের আদর্শ সমাজে অনেক উৎকৃষ্ট, সকল দেশেব ধার্মিক চিন্তাশীলের অভিলষিত ব্যবস্থা থাকিবে; কিন্তু তাব মধ্যে মানবেব আচরণীয় ও অনাচরণীয় বিভেদও থাকিবে। এক কলসী দুধেব মধ্যে এক ফোঁটা চোনা—ব্যস্।

পঞ্চরত্ন—শ্রীহীবালাব বাহা। প্রকাশক শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ৪ সৃষ্টিধর দত্তেব লেন, কলিকাতা। ডিমাই আট পেজি ১০১ পৃষ্ঠা। এক টাকা।

কঠ, কেন, প্রথ, ঈশ, মণ্ডুক এই পঞ্চ উপনিষদের মূল টীকা অনুবাদ। এ বই মধ্যে অনেক উদ্ভট ও অদ্ভুত তত্ত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে—ধর্মসাদৃশ্য দেখিরাই বাইবেল ও উপনিষদের অনেক নামকে অভিন্ন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা আছে।

বসন্ত-উৎসব কাব্য—শ্রীশ্রী প্রণীত (শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়), হবিপুর, ভাঙ্গা শান্তিপুর, জেলা নদীয়া। ডিমাই ৮ পেজি ২৫৭ পৃষ্ঠা। আড়াই টাকা।

কোদালোব বাঁট চাঘেব কাজে উপযোগী হইলেও কবিতার ক্ষেত্রেব ক্ষতিই কবিবা থাকে। হইয়াছেও তাই। কোদালোব বাঁটের উপযুক্তই বসন্ত-উৎসব কাব্য এপানি।

শান্তি-গীতা—শ্রীশশীকবীন সেন। প্রকাশক শ্রীনলিনীরঞ্জন ভট্টাচার্য, ২২ রামকান্ত মিত্রের লেন, কলিকাতা।

পদ্যে তত্ত্বকথা। পদ্যেব মিল—ক্রুর, দূচ ; আবশ্যক, বোক ; অপারগ, লোক ; মহোষধ, রোধ ; ইত্যাদি। বাহুল্যোপলব্ধ।

শ্রীসয়াঙ্গী বৈজ্ঞানিক শব্দসংগ্রহ—প্রয়োজক শ্রীজয়-হুথরায় পুরুষোত্তম রায় জেবীপুরা অনে ভানুহুথবাস, নিম্ভূর্ণরাস মহতা। প্রকাশক বিদ্যাধিকারী কচেরী, ভাষান্তর শাখা, বড়োদা রাজ্য।

এই পুস্তকে ইংরেজী বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সংস্কৃত বা দেশী অনুবাদ বর্ণামুক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক পুস্তক প্রবন্ধ লেখকদের পক্ষে বিশেষ উপকারী পুস্তক। নাগরী-প্রচারিণী সভা ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ প্রভৃতির পরিভাষা আলোচনা করিয়া এই পবিত্রা সম্বলিত হইয়াছে ; হুতরায় ইহা পরিভাষার স্থায়ীসমাজে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে মনে হয়।

গার্গী—শ্রীপারীশঙ্কর দাশ গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক বগুড়া কমার্শিয়াল সিণ্ডিকেট লিমিটেড, বগুড়া। দ্বিতীয় সংস্করণ, পরিমার্জিত। ৪১ পৃষ্ঠা। চাব আনা।

উপনিষদের গার্গী ও মৈত্রেয়ীর ব্রহ্মজ্ঞান বিবরণক আখ্যায়িকা সর্বল সহজ ভাবে কথোপকথনের মধ্য দিয়া বিবৃত হইয়াছে। মহিলা ও বালিকাদের পাঠযোগ্য।

মিতা—মাসিক শিশু-সাহিত্য। শ্রীঅজয়চন্দ্র সর্বাঙ্গ সম্পাদক। কদমতলা চুঁচুড়া। প্রতি মাসে স্বসম্পূর্ণ এক-একখানি বই বাহির হইবে। বার্ষিক মূল্য পাঁচ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ছয় পয়সা।

প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে—খাতনামা কবি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিরচিত—আমাদের দেশ। কবিতায় ভারতবর্ষের বর্ণনা। শিশুদের মনে দেশাত্মবোধ, দেশের গৌরব-বোধ, দেশেব পবিত্র সম্ভাবিত করিবার পক্ষে ইহা সাহায্য করিবে।

অথেন্স—প্রথম ভাগ—শ্রীবিজয়দাস দত্ত প্রণীত। ২৬৪ পৃষ্ঠা। আড়াই টাকা। ৩ রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

বেদের মত আলোচনা করিয়া বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় বিশদ করিয়া বুঝানো হইয়াছে। বৈদিক কবিরা যে একেশ্বরবাদী ছিলেন, ও বৈদিক দেবতাপূজা যে একই দেবতার নামান্তর ইহাই এ পুস্তকের প্রতিপাদ্য। বেদের দেবতা ও যজ্ঞ প্রভৃতিব বিবৃত ব্যাখ্যা ও পবিত্র দেশের হইয়াছে। প্রত্যেক ভারতবাসীর বৈদিক culture সম্বন্ধে জ্ঞান থাকি উচিত। এই পুস্তক সেই জ্ঞান লাভে সহায়তা করিবে।

বড়া মিঠা—শ্রীশিশিরকুমার রাহা প্রণীত। দু আনা। দেশ-ও সমাজ-সেবার উৎসাহ করিবার জন্য দেশেব যুবকযুবতীদের প্রতি কতকগুলি মিষ্ট উপদেশ বাক্য। অনেক সত্য ও কাজেব কথা বলা হইয়াছে।

পল্লী ইউনিয়নের ট্যাক্স ও ভোটার—শ্রীনিবন্ধন চন্দ্র, বি-এন সংকলিত। চাব আনা।

গ্রামের চৌকিদারী ইউনিয়ন বোর্ডের উদ্দেশ্য ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক ও গ্রন্থপত্রের কর্তব্য প্রভৃতি বিবৃত করা হইয়াছে। গ্রামবাসীদের বিশেষ কাজে লাগিবে।

শ্রীশ্রীমন্তনারায়ণের পাঁচালী—বিষ্ণুগুপ্তের প্রাচীন

কবি স্বর্গীয় বিজয় রামকৃষ্ণ বিবচিত। বিষ্ণুগুপ্তের ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত। দু আনা।

প্রাচীন রচনা প্রচারের উপকারিতা আছে। বিশেষত যারা সত্য-নাবায়েণে ভক্তিমান তাঁরা এই পাঁচালী মুদ্রিত পাইয়া হৃদয় হইবেন।

পুরাণ তত্ত্ব—শ্রীমদ ব্রহ্মানন্দ ভারতী কর্তৃক ব্যাখ্যাত। ব্রাহ্মণ বর্ণণ-সভা, কাশীধাম। পাঁচ আনা।

কথোপকথনেব দ্বারা পুরাণের মধ্যে পরস্পরবিরোধী “স্বকপোল-কল্পিত ভেদাল সামগ্রী” কত যে আছে তাহা পাঁচ পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়া দেখানো হইয়াছে।

মহাশ্মা গাঙ্গী—শ্রীরমণীবন্ধন-গুহ বায়, বি-এ প্রণীত। প্রকাশক—পাশ ভট্টাচার্য্য কোম্পানী, ২১ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ৮২ পৃষ্ঠা। চাব আনা।

মহাশ্মা গাঙ্গীর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

আমিয়-গীতা—শ্রীমোহিনীমোহন বহ প্রণীত। চাকার লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়। আট আনা।

পদ্মে শ্রীমদভগবদ্ গীতার বাংলা অনুবাদ।

দেশের ডাক—শ্রীনবেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী। সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯, রামনাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৯ পৃষ্ঠা। দশ পয়সা।

দেশের ও দেশের বর্তমান শাসনযন্ত্রের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া দেশবাসীর বর্তমান কর্তব্য নির্দেশ করা হইয়াছে—সহযোগিতাবর্জন।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব চরিত—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কুণ্ড দাস। প্রকাশক—ইউডেন্ট ষ্টোব, ধাগড়া মুর্শিদাবাদ, ২৯ পৃষ্ঠা। চার আনা।

বৈষ্ণবের ধর্ম ও লক্ষণ কি তাহাই এই পুস্তিকায় লিখিত হইয়াছে।

স্বাস্থ্য—শ্রীমতী হুথলতা রাও। প্রকাশক—ইউ রায় এণ্ড সন্স, ১০০ গড়পার বোড, কলিকাতা। ৫০ পৃষ্ঠা। সচিহ্ন। ছয় আনা।

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার উপদেশমূলক বই। বইএব কাগজ ভালো, ছাপা ভালো, ছবি উত্তম, লেখা উৎকৃষ্ট ও সহজ। শিশুশিক্ষার উপযুক্ত বই সর্বোৎকৃষ্ট।

অম্রসত্ত্ব স্কেলে স্টীমে ১ ঘণ্টায় প্রস্তুত ও তৈয়ারী। অম্রসত্ত্ব ছুঁই দিয়া ও অম্রের রস ও বরফ দিয়া প্রস্তুত ও ব্যবহার-প্রণালী-সার—শ্রীমনোহর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। উত্তরপাড়া। বিবিধ প্রকাব আমের ছবি আছে। আমসত্ত্ব তৈরী করিবার প্রণালী সম্বন্ধীয় পুস্তিকা।

চার্য্যামুষ্ঠান-চন্দ্রিকা—শ্রীহরেশচন্দ্র বায় সংকলিত। প্রকাশক—শ্রীগণেশচন্দ্র বিদ্যাবতী, বাবইভাণ্ড, পাকানী পোষ্ট, পাবনা। পাঁচ আনা।

হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দৈনিক প্রাতঃ অবধি সাধ্যাকৃত্য আচার সম্বন্ধীয় বন্দনা তর্পণ ইত্যাদির বই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-গল্পলহরী—কমলা রামকৃষ্ণ সেবাসমিতিব সেবকগণ কর্তৃক সংকলিত। প্রকাশক দাশ চক্রবর্তী এণ্ড কোম্পানী, ৬ কালিদাস সিংহের লেন, কলিকাতা। ৪৪ পৃষ্ঠা। পাঁচ আনা।

রামকৃষ্ণ পবনসংসদেব তাঁর উপদেশের মধ্যে মধ্যে যে-সব গল্প

বনিতেন তাইই কতকগুলি বোধ হয় ছেলোদেব উপযোগী বাছিয়া একত্র করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। গল্পগুলি সরস ও শিক্ষামূলক।

ফরিদপুরের ইতিহাস—শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়, জপসা বাবুর বাড়ী, নগর, পোঃ উপসী, জেলা ফরিদপুর। ১৭৩ পৃষ্ঠা ডিমাই আট পেন্সি। সচিত্র। কাপড়ে বাঁধা। আড়াই টাকা।

ফরিদপুরের ইতিহাসের দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশিত হইল। প্রত্যেক জেলাই ইতিহাস সংগৃহীত না হইলে বাংলা তথা ভারতের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিত হইতে পারিবে না। যারা জেলাই ইতিহাস সম্বলন করিতেছেন তাঁরা জাতীয় ইতিহাস সম্পূর্ণ করিবার যত্নের স্বত্বিক। স্তত্রাং এই-সব ইতিহাস স্থানীয় লোকের নিকট ত সমাদৃত হইবেই, ঐতিহাসিক ও ইতিহাস-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি মাত্রেই নিকট সমাদৃত হইবে। এই ইতিহাসে ফরিদপুরের বহু গ্রাম ও ব্যক্তির বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে; সেই-সব বিবরণ বেশ চিত্তাকর্ষক।

ধর্ম ও কর্ম—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত। ২০১এ বহুবাক্যর ট্রাট, কলিকাতা। ৩০ পৃষ্ঠা। তিন আনা।

নির্বাসিতের আত্মকথা লিখিয়া লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন; দেশেব জন্ত প্রাণপণ করিয়া কঠোর নির্বাসন সহ করিয়া তিনি পূর্বেই খ্যাতি ও দেশেব লোকের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। লেখক এই পুস্তিকাখ বনিতেন—“মনের অতীত সত্যায় স্মারপ্রতিষ্ঠা করিয়া মন ও শরীরকে পূর্ণ জ্ঞান আনন্দ ও শক্তি প্রকাশের বরূপে রূপান্তরিত করা” “মম্ব্যাজীবনের উদ্দেশ্য”। “এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীব ব্রহ্মের মুর্ত্ত বিগ্রহ হইয়া দাঁড়ায়। তখনই সে প্রকৃত স্বাট।” “জীবনের মধ্যে জীবের পূর্ণরূপের প্রতিষ্ঠাই ধর্ম্মসাধনার উদ্দেশ্য।” নিজের শক্তি ও বুদ্ধি ভগবানের হাতে সমর্পণ করিয়া কর্ম করিয়া যাইতে হইবে—মর্মে অমরধাম প্রতিষ্ঠাই এ যুগের সাধনা। “ব্রহ্ম শুধু গুণা-তীত তুবীয় সত্তা নহেন, তিনি গুণময় ও গুণভোক্তা, সব জীবই তাঁহার লীলাকল—এ সত্য উপলব্ধি করিয়া তদনুযায়ী আমাদের সামাজিক পারিবারিক ও বাস্তবিক জীবন গড়িয়া তুলিবার দিন আসিয়াছে। বাট ও সমষ্ট্রব মধ্যে এই সত্য প্রতিকলিত হইয়া আমাদের জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিবে।”

বিচিত্র ভ্রমণ—শ্রীকললাল বসাক প্রণীত। সবস্বতী লাইব্রেরী, ২ বমানাধ মজুমদার ষ্ট্রাট, কলিকাতা। ১০২ পৃষ্ঠা। সচিত্র। এক টাকা।

গ্রন্থকার প্রসিদ্ধ সার্কাস খেলোয়াড়। তিনি বাব বাব নানা সার্কাস-মলেব সঙ্গে যোগ দিয়া ভারতের প্রায় সমস্ত শহর, বহির্ভারতের দ্বীপপুঞ্জ, বর্মা, শাম, চীন, জাপান, ফ্রান্স প্রভৃতি বহুদেশের বহু প্রসিদ্ধ স্থান ভ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া সেই সেই দেশের দৃশ্য রীতি নীতি ইতিহাস প্রভৃতি যাহা অবগত হইয়াছেন তাহা বিবরণ ও চিত্র এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। নানা দেশের বিচিত্র কাহিনী ছত্রে ছত্রে কৌতুহলান্বীপক ও চিত্তাকর্ষক। সমস্ত এশিয়াবঙ্গের সমুদ্রকূলের প্রধান প্রধান দেশের বিবরণ এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। এই ভ্রমণ-কাহিনী বাস্তবিকই বিচিত্র। যিনি পাঠ করিবেন তিনিই অনেক কিছু নূতন ধর জানিয়া প্রীত হইবেন, পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়িতে পারিবেন না। ইহা কোনো পুস্তকের সম্বন্ধে পবন প্রশংসা।

অঘোর প্রকাশ—স্বর্গায়্য দেবী অবদোবকানিনী বায়ের জীবনকাহিনী—শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় কর্তৃক বিবৃত। বাকিপুর, অবদোব-পরিবাব। ১২২ পৃষ্ঠা ডিমাই আট পেন্সি। দুই টাকা।

গৃহস্থ সন্ন্যাসিনী ব্রহ্মনিষ্ঠা মহিলার জীবনকাহিনী। মহৎ জীবনের দৃষ্টান্ত; ব্রহ্মনিষ্ঠ পরিবারের গৃহিণী আদর্শ জীবনের বর্ণা।

নিম্ন ও পতিত জাতি—শ্রীমধুসূদন আচার্য্য কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ। বাগিঘাট, ঢাকা। প্রকাশক—দি নিউ ইবা পাবলিশিং হাউস, ১৬৮ কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রাট, কলিকাতা। ১০৭ পৃষ্ঠা। এক টাকা ৬ আনা।

সমালোচনার জন্ত এই পুস্তক বহুকাল হইল পাইয়াছিলাম; তালা করিয়া পরিচর দিবার ইচ্ছা থাকাতোই বিলম্ব হইয়া গেল; এব জন্ত আমবা গ্রন্থকার ও প্রকাশকের নিকট ক্ষমা প্রার্থী। এই পুস্তকে গ্রন্থকার শাস্ত্র ও যুক্তি দিয়া কোনো ব্যক্তি বা জাতিকে নিম্নশ্রেণীর ও পতিত বলিয়া নির্দেশ করার অবৈধতা অনিষ্টকাবিতা ও অধার্ম্মিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই বাংলা দেশেই বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, বামসোহন, বিদ্যাসাগর, বামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়া পাতিত্য ও নিম্নত্বের বিকক্ষে মহৎ বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন; আমবা তাঁহাদের সেই আদেশ ও যুক্তি অমান্ত করিয়া নিজেদের অপমান করিতেছি, প্রতিবেশী বুদ্ধদেব অপমান করিতেছি, গুরুস্থানীয় মহাপুরুষ-দিগকে অপমান করিতেছি। আজ অবধি দেখা যাইতেছে সমাজেব শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণজাতীয় লোকেরাই এই কুপ্রথা ও কুসংস্কার দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আচার্য্য মহাশয় তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বলিষ্ঠ সাহস সমর্থিতা মহাপ্রাণতা সত্যায়ুগ ও ধার্ম্মিকতার পবিত্র দিয়াছেন। বে মহৎ বাণী কালে কালে বাবংবার বিদোষিত হইয়া ব্যর্থ হইয়াছে এবং যে মহৎবাণী মহাত্মা গান্ধীর প্রধান উক্তি ও বিশেষত্ব সেই পাতিত্য-পরিহাযেব বাস্তবাহক হইয়া আচার্য্য মহাশয় দেশেব ও সমাজেব কল্যাণেব চেষ্টা করিয়া সকলেব ধন্যবাদভাজন। মহাত্মা গান্ধীর এই যুগপ্রবর্তক সাম্যবাদ প্রচারিত হইবার পূর্বেই আচার্য্য মহাশয়ের এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে—ইহা গ্রন্থকারেব অধিকতর প্রশংসা বিবরণ। তিনি স্বয়ং এই কুপ্রথা অনিষ্টকাবিতা ও অজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করিয়া, যুক্তি ও শাস্ত্রেব নজিবে তাহা দূর করিবার জন্ত সকলকে অনুবোধ করিতেছেন। বর্তমান সাম্যবাদের দিনে এই পুস্তকেব বহুল প্রচার ও পাঠ বাঞ্ছনীয়।

পুঁতির মালা—শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। এম, সি, সবকার এও সঙ্গ, কলিকাতা। সচিত্র। ডিমাই ৮ পেন্সি ৭৬ পৃষ্ঠা। বোর্ডে বাঁধা। বাবো আনা।

বালক ভ্রাতৃদ্বয়ের শিশুপাঠ্য পুস্তক বই। মোহনলালের চারটি ও শোভনলালের তিনটি নোট সাতটি গল্প আছে। গল্পগুলি স্থলিখিত; ভাবায, ভঙ্গিমায, রচনায নিখুঁত; গল্পগুলি প্রায়ই মজাদার হাসি-ভবা—কাজেই শিশুদেব মনোহারী। বাড়ীর ছেলোমেয়েদের হাতে হাতে এর ফেরাব বিরাম নাই—ইহা হইতেই বইখানির কদর বোঝা যায়। শিশুদেব পড়িতে দিলে তাবা যে প্রীত হইবে তাহা সমালোচকের নিজের বাড়ীর অভিজ্ঞতা হইতে জ্ঞোর করিয়া বলা যায়। সমা-লোচনার জন্ত প্রাপ্ত বইখানি অনেক কষ্টে শিশুবাং হইতে উদ্ধার করিয়া এই পরিচরটুকু লিখিতে হইল। বইএব ছবিগুলিও উত্তম—ওস্তাদ চিত্রকরের আঁকা।

মুদ্রারক্ষস

পক্ষতত্ত্ব—(কঠ-কেন-প্রদ-ঈশ-মুক্তকেতি উপনিষদঃ পক্ষকাঃ) — প্রত্যেক মস্তেই বহু অর্থ ; কোন কোন মস্তেই না
সাক্ষরেন্দ্র-প্রদেহু শ্রীহীরালাস রাহা কর্তৃক অনুবাদিত। পৃঃ ১০১ দেওয়া হইয়াছে ; প্রত্যেক ব্যাখ্যাই অস্বত।
মূল্য এক টাকা।

এছকাবে এই খণ্ডে কঠোপনিষদের প্রথম বল্লীৰ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

নবহুল্লোড়। Reform Screams.



অক্রাং শত-ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি
চিত্রকর শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজাত্য

Review at the close of the year 1921. By Gaganendranath Tagore. Published for the Artist by Thacker Spink and Co., Calcutta and Simla 1921. Price Rs. 3.

বঙ্গের প্রধান ব্যঙ্গচিত্রকর শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত ১৫ খানি ব্যঙ্গচিত্র এই পুস্তকে আছে। ইহার উৎকৃষ্ট ছবিগুলির মধ্যে কোন কোনটি মর্ডার রিভিউ ও প্রবাসীতে মুদ্রিত হইয়াছিল। ছবিগুলির নাম—নব জন্মোষ্ঠী; প্রথম বাঙ্গালী শানন-কর্তার উদয়—কোথায় তিনি? বুড়ো বাংলার গঙ্গাযাত্রা; প্রজাপতির নির্বন্ধ—কনের মা কাদে আর টাকার পুটুলি বাঁধে; বিশ্ববিদ্যালয়ে অগ্নিযোগ; বিশ্ববিদ্যালয়ে জলযোগ; লে আও চৌবট্ট হাজার; জাতি-গঠনের বাধা; জগদীশের ধ্যানভঙ্গ; কবির ওড়া; পণ্ডিত শেখে দেখে, মূর্খ শেখে ঠেকে; বিভিন্ন পরিণয়; ভূতগত ব্যাপার; রং-কো-অপারেশন; জীয়েন্তে মরা। কতগুলি ছবির মধ্যে কেবল যে মজা আছে, তা নয়, দুঃখের কারণও আছে, এবং শিথিলার আছে। আমরা একটি ছবির প্রতিলিপি চিত্রকর মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত করিতেছি। ইহার তাৎপর্য এই, যে, স্পর্শদোষ অর্থাৎ কোন কোন শ্রেণীর মানুষকে ছুঁইলে অশুচি হইতে হয় এই ধারণা, আমাদের জাতির এমন অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে, যে, মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁহার পূর্ববর্তী অনেক দেশহিতৈষী এই ধারণা উন্মূলিত করিতে পারেন নাই। ইহা জাতি-গঠনের একটি প্রধান বাধা। ইহাকে চিত্রকর কালীর দাগ রূপে কল্পনা করিয়া দেখাইতেছেন, যে, ভারতের প্রধান রাসায়নিক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় অনেক চেষ্টা করিয়াও ধুইয়া ফেলিতে পারিতেছেন না। বাস্তবিক ভারতীয় লোকেরা হিন্দু-ধর্ম ত্যাগ করিয়া ধর্মাস্তর গ্রহণ করিলেও এই স্পর্শ-দোষ সম্বন্ধীয় ধারণাকে অনেকেই অতিক্রম করিতে পারেন না।

২

দর্শন সঙ্গীত—শ্রীউমেশচন্দ্র বিশ্বাস তত্ত্বনিধি প্রণীত। পোঃ আঃ ভাবদা, মূর্শিদাবাদ। মূল্য আট আনা। ১৩২৮ সাল।
ধর্মমন্দিরে এবং পারিবারিক উপাসনায় পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে যে-সকল সঙ্গীতের প্রচলন আছে, তাহার উদ্দেশ্য মানুষের পাপপুণ্ড্রগুলি দূর করিয়া, প্রাণের ভক্তি ও ভালবাসা ভগবৎ-চরণে অর্পণ করিয়া, নৈতিক মার্গে আত্মোন্নতি সাধন করা। ইহা ব্যতীত আর-একপ্রকার সঙ্গীত আমাদের দেশে দেখা যায়, দার্শনিক আধ্যাত্মিকতাই তাহার বিশেষত্ব। সংসার অসার, জগৎ মিথ্যা, তুমি কার, কে তোমার, এইরূপ বৈরাগ্যমূলক উপদেশ এই শ্রেণীর গানে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। আমাদের দেশে মাঠে কৃষকগণ ও নদীতে নৌকার মাঝিরা অনেক সময় এ-সকল গান গাহিয়া থাকে।

৩১৪—১২



বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গচিত্রকর

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে-সকল দার্শনিক শব্দের সমষ্টি দ্বারা গানগুলি বিরচিত হয়, সেগুলি পুনরাবৃত্তিবশতঃ প্রায়ই অর্থশূন্য বাগজালে পরিণত হইয়া পড়ে, তাহা দ্বারা মনে বৈরাগ্য কি অথবা কোন দার্শনিক ভাবের উদয় হয় না। বঙ্গ্যমাণ পুস্তকখানির প্রণেতা তাঁহার গানগুলিকে ভাবগর্ভ করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, এবং যে-সকল দার্শনিকতত্ত্ব তিনি সঙ্গীতাকারে ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন, সেগুলি স্পষ্ট করিবার জন্য টীকাধরূপে যড়দর্শন এবং বৌদ্ধ-ও চার্বাকদর্শন হইতে সূত্র ও শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের বঙ্গাহুবাদ স্বীয় মন্তব্য সহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যে-সকল পাঠক সঙ্গীতরসজ্ঞ নহেন, তাহাদের নিকট এই টীকাগুলি বেশ শিক্ষাপ্রদ হইবে। তাঁহারাও এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সুখী হইবেন।

জ

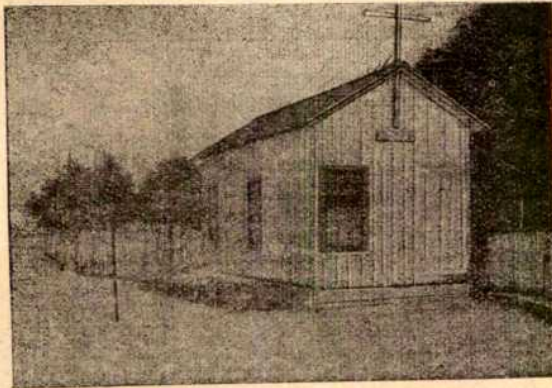


ভূমিকম্পের পূর্ববলক্ষণ—

ভূমিকম্পের সম্ভাবনা কিছুদিন আগে টের পাওয়া সম্ভব হইলে, বহু দুর্ঘটনা ও তার আনুমানিক প্রাণহানি ও অর্থক্ষতি নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ভূমিকম্পের সম্বন্ধে এতদিনকার নানা আনুমানিক ধারণা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিয়া ডাক্তার এ্যাণ্ড সিলসন নামক ক্যালিফোর্নিয়ার এক পণ্ডিত সম্প্রতি এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বর্তমানে ঝড়-বাতার সম্ভাবনা বহু আগে হইতেই যেমন নিভুলভাবে বলিয়া দেওয়া যায়, এই নূতন সিদ্ধান্তের সাহায্যে তেমনি করিয়া ভূমিকম্পেরও সম্ভাবনা আঁটিয়া বলা সম্ভব হইবে। লোকে সাবধান হইয়া বিপদের স্থান ত্যাগ করিয়া অশুভ চলিয়া যাইতে পারিবে; অথবা এমন সব উপায় অবলম্বন করিয়া ভূমিকম্পের জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারিবে, যাহাতে বিপদের পরিমাণ অনেকখানি কমিয়া যায়।

ডাক্তার লসনের মতে পৃথিবীর উপরকার মুক্তিকা, প্রস্তর ও ধাতুর স্তরগুলি উত্তর মেরুর টানে ক্রমাগত একটু একটু করিয়া উত্তরাভিমুখী গতিতে সরিয়া চলিতেছে। এই সচল স্তরের গভীরতা কোথাও নীচের দিকে মাত্র কয়েক ফুট, কোথাও বা শতাধিক মাইল পর্য্যন্ত। এই গতি এত মন্থর যে আপাত-দৃষ্টিতে অনুভব করা যায় না। কিন্তু অহোরাত্র একদণ্ডের জন্য এই গতির বিরাম নাই। পাহাড়, পর্বত, প্রান্তর, উপত্যকা এক অদৃশ্য শক্তির টানে অদৃশ্য গতিতে ক্রমাগত স্থানচ্যুত হইয়া সরিয়া যাইতেছে।

এখন, যে-কারণে ধনুকের ছিলাকে টানিয়া হঠাৎ ছাড়িয়া দিলে তাহা ছিটকাইয়া আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়া আসে, গতি-বিজ্ঞানো সেই একই নিয়মে চলমান মুক্তিকা-ও পৃথিবী স্তরগুলি উত্তরমেরুর টান হইতে কোনো কারণে মুক্তি পাইলেই পিছনের টানে



বাড়ীটি আগে কোনো খুঁটিটির কাছে ছিল, ভূমিকম্পের পাছু টানে প্রায় আড়াই হাত সরিয়া গিয়াছে।

ছিটকাইয়া পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে চায়। তখন সেই স্তর-পর্য্যায়ের মধ্যে যে দাক্ষণ আলোড়ন ঘটে তাহারই সাক্ষ্য পরিচয় আমরা ভূমিকম্পে পাইয়া থাকি। ধনুকের ছিলা দুই কারণে পূর্ব অবস্থায় ফিরিতে পারে;—এক যদি ধনুকধারী ছিল। হইতে তার হাত উঠাইয়া লয়, আর যদি ধনুকের বাক ভাঙ্গিয়া যায়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, উত্তর মেরুর টানের কথনো বিরাম নাই। কাজে কাজেই, ধনুকের বাক ভাঙার মতো টানের মুখে এক সময় স্তরপার্থ্যায়ের সংহতি হঠাৎ কোথাও ভাঙিয়া যায়;—তখনই ভূমিকম্প ঘটে।

স্তরপার্থ্যায়ের এই উত্তরাভিমুখী গতির সঠিক বেগ ডাক্তার লসন হিসাব করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। গতির টান্টি (tension) কতখানি হইলে স্তরপার্থ্যায়ের সংহতি ছুটিয়া যায় তাহারও নিরূপণ পাওয়া গিয়াছে। স্বতরাং অতঃপর এই দুই বিষয়ের পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া ভূমিকম্পের সম্ভাবনা অসম্ভাবনা সম্বন্ধে নিশ্চিত ভবিষ্যৎবাণী করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। যতদিন আবার ভূমিকম্পের সম্ভাবনা না হইতেছে ততদিন এই সিদ্ধান্ত ঠিক কি না তাহা নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হইতে পারিবে না।

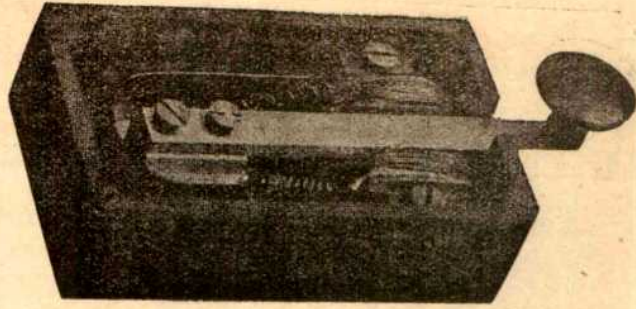
হাতহীন গোলন্দাজ—

ওহায়োতে উইনেমিলার নামক একটি লোক আছে। তার ডান হাতটি কাঁধের কাছ পর্য্যন্ত একবারেই নাই, বাঁহাতটিও কজির



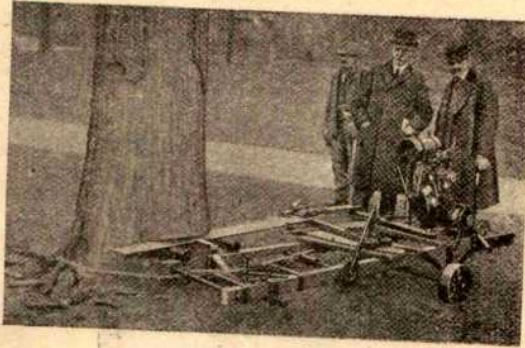
হাতহীন গোলন্দাজের গুলি ছোড়া।

কাছে কাটা। কাটা কজির কাছে একটি ছকে বন্ধুর মল আটকাইয়া ঘোড়ার সঙ্গে লাগানো ছোট একটি তার দ্বারা টানিয়া দে অবলীলায় বন্ধু ছুড়িতে পারে। বন্ধু খোঁচা, ভরা, সাক্ করা প্রভৃতি কাজও সে নিজেই করিয়া থাকে।



কলের করাত—

নিউ ইয়র্কের এক ব্যক্তি একটি কলের করাত নির্মাণ করিয়াছেন, ইহাতে পনেরো ইঞ্চি পরিধির গাছ দুই মিনিটে কাটিতে পারা যায়।



কলের করাতে গাছ কাটা।

মাছের চামড়ার জুতা—

মাছের ও সাপের চামড়ার জুতা ইউরোপ আমেরিকায় পরম সমাদরের সঙ্গে ব্যবহৃত হইতেছে। এই জুতার খরচ কম, টেকসই বেশী, দেখিতেও চমৎকার পরিপাটি। বাংলা মাছের দেশ, সাপও এ দেশে অপ্রচুর নহে, জুতা তৈরির এই নূতন উপকরণ কাজে লাগাইতে পারিলে দেশের সমৃদ্ধি বাড়িতে পারে।

কর্ণহীনের কর্ণ—

বধিরতা মোটামুটি দুই রকমের হইয়া থাকে। (১) মস্তিষ্ক হইতে কর্ণপট্‌হ পর্যন্ত বিস্তৃত শব্দবাহী স্নায়ু, বা মস্তিষ্কের শব্দ-গ্রাহী কোষগুলি নিকৃত হইয়া যে বধিরতা উৎপন্ন হয়। (২) স্নায়ু এবং মস্তিষ্ক অবিকৃত থাকিয়া কর্ণপট্‌হ বা কর্ণেল্লির বাহিরের আর-কোন পীড়া হেতু যে বধিরতা। প্রথমোক্ত বধিরতার কোনও প্রতিবিধানের উপায় বিজ্ঞান আজও পর্যন্ত করিতে পারে নাই; কৃত্রিম কর্ণপট্‌হ বা ear-trumpet আর অনুশ্রবণ যন্ত্রের সাহায্যে শোভোক্ত প্রকারের বধিরদের শুনিবার উপায় কতক কতক হইয়াছে। মিষ্টার এন্‌ জি ব্রাউন নামক এক ইংরেজ Ossiphone (ওসি-ফোন) নামক একটি যন্ত্রের উদ্ভাবনকর্তা। শব্দবাহী স্নায়ুগুলি যাহাদের অবিকৃত অবস্থায় আছে এমনতর বধির লোকেরা এই যন্ত্রটির সাহায্যে অতি মুহু শব্দও পরিষ্কার ভাবে শুনিতে পাইবেন। ধ্বনি-তরঙ্গ এই যন্ত্রটির অন্তর্গত চৌম্বক vibrato-এ স্পন্দিত হইয়া

ওসিফোন যন্ত্র।

কর্ণপট্‌হের পরিবর্তে শরীরের যে-কোনও হাড়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় ও শব্দবাহী স্নায়ুতে সঞ্চারিত হইয়া মস্তিষ্কে নীত হয়। যন্ত্রটিতে টেলিগ্রাফের প্রেরক যন্ত্রের মতো একটি হাতল লাগানো থাকে, তাহাতে-সংলগ্ন বোতামটিকে দাঁতে চাপিয়া আঙুলে টিপিয়া বা শরীরের যে-কোনও কঙ্কালবহুল জায়গায় লাগাইয়া রাখিলেই ধ্বনি স্পন্দনের সঙ্গে শব্দ অনুভূত হইতে থাকে। কাহারও সঙ্গে বসিয়া গল্পগুজব করিতে হইলে এই ওসিফোন ছাড়া টেলিফোন গ্রানোফোন প্রভৃতির মতো একটি sound box ব্যবহার করিতে হয়। অপর ব্যক্তি এই sound box-এর মধ্যে কথা বলে। প্রয়োজন হইলে অল্প একটি যন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনির জোর বহুগুণ বাড়াইতেও পারা যায়।

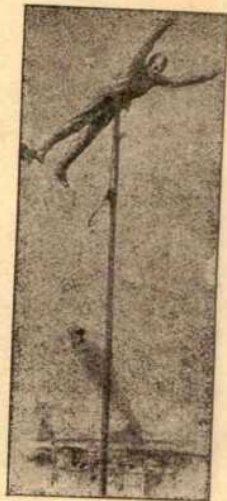
স. চ.

ডান্‌পিটে কাণ্ড—

ছবিগুলিতে যে-সব অতিসাহসিক কাজের নমুনা দেখানো হইছে তা সত্যিই ভয়ানক, কারণ এই রকম বাহাহুবি নেবার জন্তে অনেককেই চেষ্টা করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে বাহাহুরি জীবিত অবস্থায় তাঁরা পান না। বাহাহুরি দেখাবার সময়েই তাঁরা মারা যান। আমেরিকার আরভিংটন সহরের এ স্যাণ্ডার্স সাহেব এইসমস্ত ডান্‌পিটে কাজে অগ্রণী। তাঁর কতকগুলি কাজের নমুনা দেব।

(১) একবার পাল্লা দেবার জন্তে তিনি নিউইয়র্কে একটা খুব উঁচু পতাকা-স্তম্ভের ডগাতে উঠে, তার ডগাতে পেট রেখে শুয়ে ছিলেন। হাওয়া ভয়ানক জোর ছিল, তাতে তার একদিকে একটু বেশী হলেই পড়ে মরে যাবার সম্ভাবনা খুবই বেশী ছিল।

(২) নায়গ্রা জলপ্রপাতে তিনি একবার একটা ৬০ ফুট খাড়া জায়গার উপর উঠেছিলেন। চারদিক বরফ ঢাকা, ধরবার মত বিশেষ কোন অবলম্বন ছিল না; কেবল স্থানে স্থানে খোঁচা খোঁচা হয়ে যে বরফ ছ'-এক জায়গায় বেরিয়েছিল তারই সাহায্যে তিনি



নিশান-দাগার ডগায় ডান্‌পিটের সন্ধার স্যাণ্ডার্স।



নায়গ্রা প্রপাতের খাড়াইয়ের গায় স্থাণ্ডাস্।

এই অসম্ভব কাজটি করেন। একবার একটু পা এদিক ওদিক হলেই মৃত্যু। এই কাজ করার জন্য পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

(৩) একবার বায়স্কোপের চলন্ত ছবি তোলবার জন্তে তাঁকে



ডিনামাইটের মুখে স্থাণ্ডাস্।

একটা জাহাজের মাঙ্গলে চড়িয়ে মাঙ্গলটাকে ডিনামাইটের সাহায্যে উড়িয়ে দেওয়া হয়। তিনি অজ্ঞান অবস্থায় ৫০ ফিট দূরে গিয়ে পড়েন। পুলিশের ডাকাত-ধরা দেখাবার জন্তে এই ছবি তোলা হয়।

(৪) একবার একটা পুল রঙ করতে করতে তিনি নীচে, নদীর ওপর পড়ে যান। ওপরের জল জমে' বরফ হয়ে ছিল। তিনি বরফ ভেঙে একেবারে জলে গিয়ে পড়েন। বরফ ভেঙে, সাঁতার দিয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে, তিনি অনেক কষ্টে ডান্ডায় ওঠেন।

হেমন্ত

জ্যাস্ত কুমীর লইবার কৌশল—

আমাদের দেশে কুমীর ধরা কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। পাড়াগাঁয়ে সাঁওতাল প্রভৃতি জাতিরা মাঝে মাঝে পুকুরের ধার হইতে বা এঁদো গর্ত হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুমীর প্রায়ই ধরে। কিন্তু লোকালয়ে যখন আনে তখন প্রায়ই তাহাদের মারিয়া আনে, জ্যাস্ত আনিতে কদাচিৎ দেখা যায়। সম্ভ্রতি আমেরিকার একজন কুমীর-শিকারী একটা জ্যাস্ত কুমীর বেশ কৌশল করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। সে কুমীরটার গলার কাছে একটা খুব জোর ফাঁস লাগায় ও নাকের কিছু ওপরে একটা ফাঁস লাগায়। কিন্তু শিকার করিতে বা আক্রমণ করিতে কেবল মুখই কুমীরকে সাহায্য করে না, তাহার লাজ তাহার



জ্যাস্ত কুমীর লইবার কৌশল।

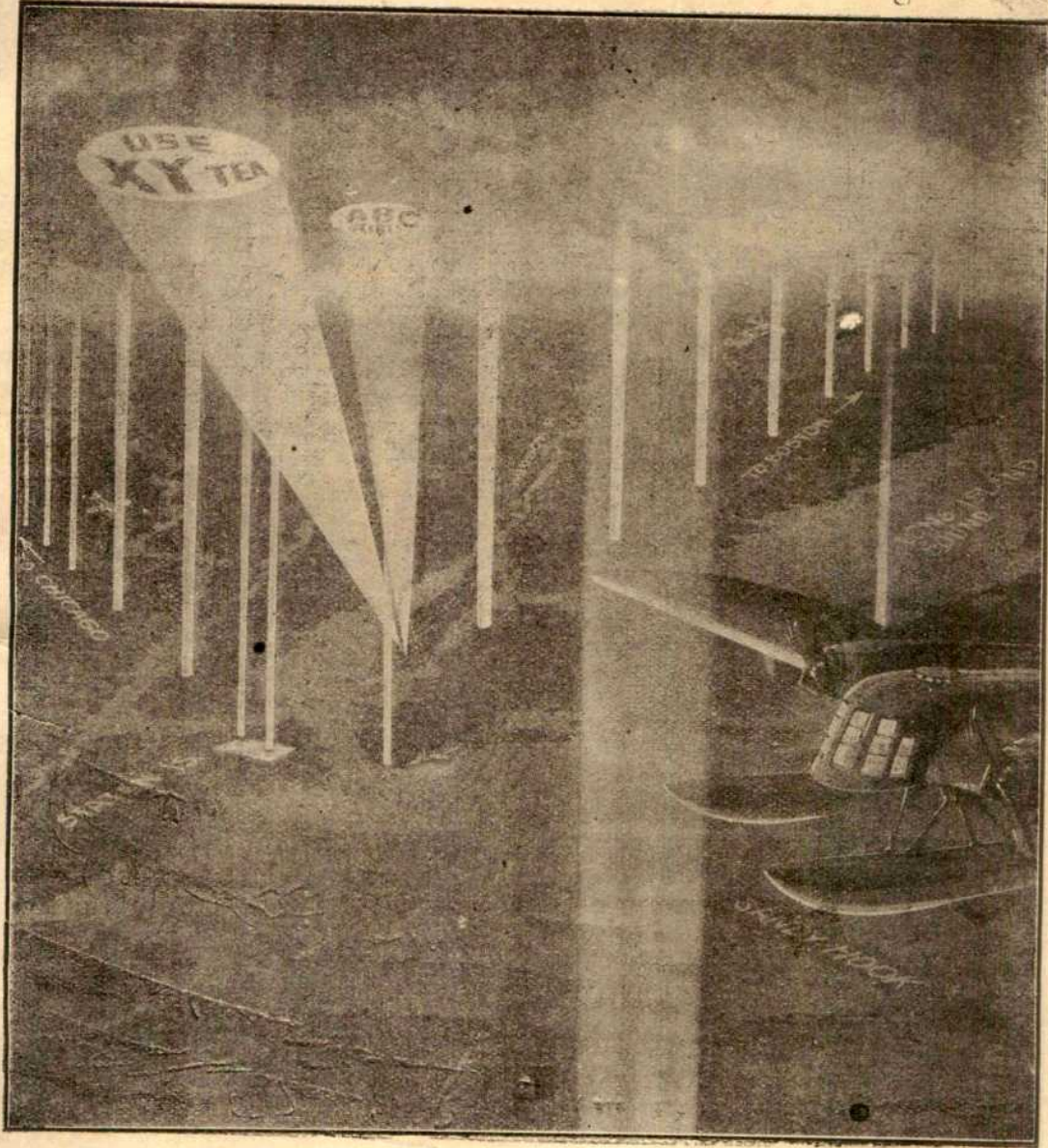
ভীষণ সহায়। ল্যাজের এক এক ঝাপটায় এক একটা জোয়ান মানুষকে তাহার বেশ ঘাল করিতে পারে। সেইজন্য ল্যাজ ঘুরাইয়া তাহার মুখের সহিত বুজাকার করিয়া বাঁধিলে আর কুমীর বাবাজীর কোন ক্ষমতা থাকে না। আমেরিকার শিকারীটি ঠিক এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। ইহাতে কুমীর জ্যাস্তও থাকে জবও হয়। ল্যাজ এইরকম ঘুরাইয়া লইলে ল্যাজের শিরা অবশ হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশে এমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুমীর আছে, যে এ উপায় সব সময় সফল হয় কি না সন্দেহ।

প

আকাশ-পথের আলো—

কিছু দিন পূর্বে নিউইয়র্কে কাছে সমুদ্রের উপর জাহাজ হইতে আকাশে খুব জোরালো সার্চ লাইট হইতে আলো ফেলা হইয়াছিল। অনেকে মেঘের গায়ে এই তীব্র আলোককে মেরুদ্বাতি (Aurora

Borealis) মনে করেন। অনেকে আবার ইহাকে তড়িতালোক স্থির করেন। যে সার্চ লাইট হইতে এই আলো ফেলা হয় তাহার জোর ১,৪০০,০০০,০০০ মোমবাতির সমান (candle-power)। ইহা এলুমার স্পেরি আবিষ্কার। এই আলো নোজা আকাশে উঠিয়া যায়। উপরে ১০ মাইল পর্যন্ত ইহা গতির পরিমাণ। বড় বড় বাবনায়ীরা এখন



দশ-মাইল-চলা আকাশ-আলোয় মেঘের গায়ে চায়ের বিজ্ঞাপন।

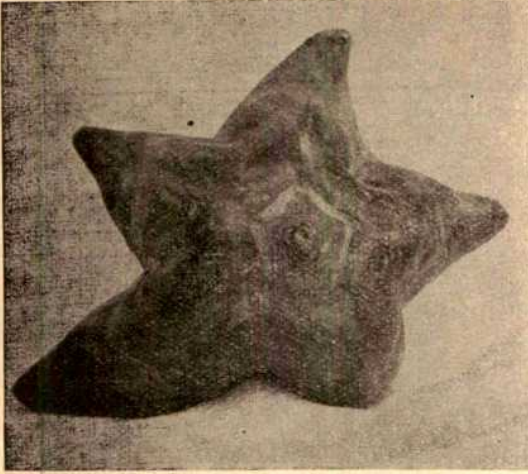
এই আলোর সাহায্যে আকাশে বিজ্ঞাপন দিবার চেষ্টা করিতেছেন। আলোর চাক্‌নি-কাচের উপর বিজ্ঞাপন লিখিলেই তাহা মেঘের গায়ে প্রতিফলিত হইতে পারে। উড়ো জাহাজের এয়ারোড্রোমের উপর নামিবার সময় এই আলো যথেষ্ট সাহায্য করিবে। চার-চাকাওয়ালা

গাড়ীর উপর এই আলো স্থাপিত থাকে। ছবিতে আলোর পরিচয় আরো ভাল করিয়া পাওয়া যাইবে।

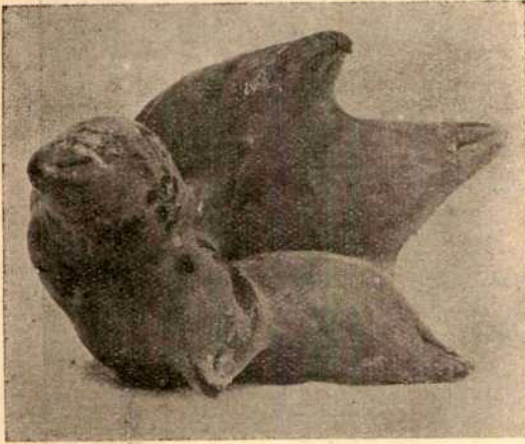
হেমন্ত

পঞ্চমুখী পের্পে—

হায়দ্রাবাদের (দক্ষিণাপথ) এক শেঠের বাগানে একটি পের্পে



পঞ্চমুখী পের্পে, উপর হইতে।



পঞ্চমুখী পের্পে, নীচে হইতে।

গাছে যত পের্পে ধরিয়াছে তার প্রত্যেকটি পাঁচ আঙুলের ধারার মতো দেখিতে। দেখিলে মনে হয় এক বোঁটায় পাঁচটি ফল এক সঙ্গে জুড়িয়া গিয়া ফলিয়াছে। আমরা ইহাকে পঞ্চমুখী পের্পে নাম দিয়াছি।

শ্রীঅমৃতলাল শীল (হায়দ্রাবাদ)

জীবন্ত বায়ুমান যন্ত্র—

একটি ৮ আউন্স শিশি পোনে ১ পাইট জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে একটি জীবন্ত জোক ছাড়িয়া দিয়া শিশিটির মুখ মসলিন বা দিকের কাপড় দ্বারা আবৃত করিলে একটি হৃন্দর জীবন্ত বায়ুমান যন্ত্র (Barometer) তৈয়ারী হইবে।

আবহাওয়া নির্ণয় হইলে শিশির মধ্যস্থ জোকটি শিশির নীচে গোলাকার ধারণ করিয়া পড়িয়া থাকিবে। বৃষ্টি আসিবার পূর্বে জোকটা মোজাহজি উপর দিকে উঠিয়া গিয়া স্থির হইয়া সমভাবে ভাসিতে থাকিবে ও বাত্যা আসিবার পূর্বে উহা দ্রুত নড়িয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিবে।

অলক

এক মাইল লম্বা দরখাস্ত—

লর্ড মিলফোর্ড, লর্ড স্মরণ একখানা দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন। দরখাস্তখানির দৈর্ঘ্য প্রায় এক মাইল! উহাতে নাম স্বাক্ষর আছে— ৭৫,১০৫ জনের!

বিমান-বোর—

ল্যারি বর্জেন্স সম্প্রতি দুইজন যাত্রীকে লইয়া ২১,৯০৯ ফিট উচ্চ বায়ুমণ্ডল হইতে হাওয়া খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। এত উচ্চ এ যাবৎ কেহই উঠিতে পারেন নাই।

নগেন্দ্র ভট্টশালী



বোম্বার ভারে

শ্রীচরচন্দ্র রায় কর্তৃক অঙ্কিত

‘তাম্রবাজার-পত্রিকা’ হইতে গৃহীত

[নিরন্ন ছড়িক্রিষ্ট বস্ত্রহীন ভারতবানীর খাড়ে সামরিক বিলাসিতার বিপুল ব্যয়ের বোঝা চাপিয়াছে।]

বিহারের এক প্রাচীন ঔপনিবেশিক বাঙ্গালী পরিবার

বরিশাল জেলায় খালিশকোট গ্রামে এক বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারে মুখোপাধ্যায়োপাধিক রমানাথ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের জন্ম হয়। দিল্লীর সিংহাসনে তখন মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব। দাক্ষিণাত্যে মহারাত্রিপতি শিবাজীর দৌর্দণ্ড প্রতাপ।

রমানাথ বিদ্যাবাগীশের গৃহে দোলদুর্গোৎসব হইতে বাব মাসে তের পার্বণ চলিতেছে, ঐশ্বর্য্য-সম্পদের অভাব নাই, গ্রামে অপ্রতিহত প্রভাব; কিন্তু তাঁহার অন্তরে সুখ নাই, পুত্র না হওয়ায় বিপত্তীক রমানাথ মনস্তাপে তাঁহার দিন যামিনী অতিবাহিত করিতেছিলেন। ভাবি-ছিলেন একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়া সুখী হইবেন, কিন্তু বিধাতা অন্তরূপ বিধান করিয়া রাখিয়াছিলেন। কন্যাটি অল্পদিনেই বিধবা হইয়া পিতাব মর্দ্দ-বেদনা বৃদ্ধি করিলেন। রমানাথ সমস্ত বিষয় ত্রস্তোত্তর কবিয়া দিয়া বিধবা কন্যাকে লইয়া কাশীবাসী হইলেন। রেল তখন কোথায়? তাঁহার নৌকা-যোগে, রওনা হইলেন। কথিত আছে, কাশীর নিকটে গঙ্গা-বক্ষে এক রাত্রিতে রমানাথের উপর স্বপ্নাদেশ হইল—“অপর নৌকায় এক ‘যাতাজীর’ ঝুলিতে ‘শ্রীধর শালগ্রাম’ আছে, তাহা লইয়া গিয়া যেন কাশীধামে প্রতিষ্ঠা করা হয়।” বলা বাহুল্য স্বপ্নাদেশ তিনি পালন করিয়া ছিলেন। বিধবা কন্যা বলিলেন—পিতা যখন শালগ্রাম পাইয়াছেন, তখন বংশ নিশ্চয়ই থাকিবে। কন্যার ইচ্ছাক্রমে তখন বৃদ্ধ রমানাথ ষাট বৎসরের অধিক বয়সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন। এবং তাহার ফলে কাশী-ধামেই কৃষ্ণানন্দ সার্কভোমের জন্ম হইল।

কৃষ্ণানন্দ অতি অল্প বয়সেই প্রতিভার পরিচয় দিয়া পণ্ডিত-সমাজে প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইয়াছিলেন। কাশীরেশ তাঁহার গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে স্বীয় সভাপণ্ডিতপদে বরণ করেন এবং তদবধি এই বংশের বিষয় সম্পত্তি পশ্চিমাঞ্চলে বিস্তৃত হইতে থাকে। অচিরেই তিনি কাশীর বিদ্যামণ্ডলী হইতে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক “সার্কভোম” উপাধি প্রাপ্ত হন। কাশীর মহারাজা চৎসিংহ কাশী অঞ্চলে তাঁহাকে

প্রকৃত ভূসম্পত্তি দিয়াছিলেন। নিঃসন্তান কাশী-নরেশ পুত্র-কামনা করিয়া পুত্রোষ্ট্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, কৃষ্ণানন্দ সার্কভোম ভট্টাচার্য্যই সেই যজ্ঞকার্য্য হুচাক্ষুসে সম্পন্ন করেন। মহারাজের এক পুত্র হয়। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ কাশীরেশ পূর্বোক্ত ভূসম্পত্তি তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা দেশে যখন চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent Settlement) আরম্ভ হয় সেই সময় সার্কভোম মহাশয় বেহার অঞ্চলে ইতিহাস-বিশ্রুত রাজগৃহের সন্নিকটে ২৩০০ বিঘা—বাঙ্গালা দেশের ৪০০০ বিঘা—মঙ্গলময় জমি ২২৯ রাজকরে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই জমিদারী তিনি উক্ত স্থায়ী ব্যবস্থাতেই পাইয়াছিলেন। পরে ইহা দুই লক্ষের অধিক মূল্যের সম্পত্তিতে ঠাঁড়ায়। এই জমিদারীর নাম “রৈতর”। ইহা আজিও বর্তমান। সার্কভোম মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী শিবরাম পিতার বিষয় রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। কারণ তিনি জ্ঞান-চর্চ্চা ও যোগ সাধনায় এতদূর মগ্ন থাকিতেন যে তাঁহার বিষয়-সম্পত্তির প্রতি আরো লক্ষ্য থাকিত না। তিনি তজ্জের বিধানে শবদাধনাদি করিতেন এবং কথিত আছে যে বাক্‌দিক্ হইয়াছিলেন।

বিষয়ে বীতরাগ শিবরামের ঔদাসীন্യের সুযোগ পাইয়া পার্শ্বস্থ জমিদার-মণ্ডলী তাঁহার কাশীর সমস্ত সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে করায়ত্ত কবিয়া লয়ন। শেষে বিহার অঞ্চলের রৈতর নামক সম্পত্তিও এইরূপ বিপন্ন হইয়া পড়িলে, তাঁহার পুত্র তারাশঙ্কর তাহা উদ্ধার করেন। তারাশঙ্কর হইতেই এই বংশের সমৃদ্ধি হয়। তাঁহার বয়স যখন পঞ্চদশ বৎসর মাত্র তখন তাঁহার পিতা শিবরাম গঙ্গালাভ করেন। কিশোর তারাশঙ্কর এই বয়সেই বিষয়-বুদ্ধিতে পরিপক্ব হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তখন হইতে পৈতৃক বিষয় রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া একাকীই বিহার অঞ্চলে যাত্রা করেন। তথায় গিয়া রৈতর জমিদারী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহা উদ্ধারের উপায় দেখিতে থাকেন। যে-সকল জমিদার তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি অধিকার করিয়া বসিয়া-

ছিলেন তাঁহাদের সহিত তাঁহাকে বিস্তর কৌজদারী মামলা এবং দেওয়ানী মোকদ্দমা কবিত্তে হয়। কত বিপদ কত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এবং কত বাব বে শত্রুদিগের চক্রান্তে জীবন সঙ্কটময় কবিত্তা অবশেষে জগদীশ্বরের রূপায় এবং স্বীয় উদ্যম ও পবাক্রম প্রভাবে বৈতর পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা তৎকালীন অরাজক অবস্থার কথা সাধারণ জ্ঞানেন তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে পাবিবেন। তিনি যেরূপ অধ্যবসায়ী ছিলেন তদ্রূপ কষ্ট-সহিষ্ণু এবং সাহসী ছিলেন। একাদিক্রমে দুই তিন দিন অশ্বাবোহণে থাকিলেও তিনি ক্লান্ত হইতেন না। তিনি কাশীধাম হইতে অশ্বারোহণে ৫১৬ দিনে রৈতবে আসিতেন। সিপাহী-বিদ্রোহের দিনে নানা স্থানের প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের ভ্রায় তিনিও মহা বিপন্ন হইয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বীয় শক্তি ও কার্যতৎপরতার প্রভাবে বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। তাঁহার গৃহে দোলভূগোঁসবাদি বার মাসে তের পার্শ্ব হইত। তাঁহার ভ্রাতৃপন আত্মীয়-কুটুম্বগণে পরিবৃত্ত থাকিত। আতিথেয়তা এই বংশের সাধারণ গুণ হইলেও তারাশঙ্করে তাহা বিশেষ লভ করিয়াছিল। এই ধীর নির্ভীক কর্মনিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ উদারহৃদয় অদ্ভুতকর্ম্য তারাশঙ্কর যুতাকালে প্রভূত সম্পত্তি রাখিয়া যান। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। কুহিলাব এবং নানার বান্ধালী জমিদারদ্বয় তাঁহাকে জায়গীরাদি দিয়া সম্মানিত করেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার পরিবারবর্গ গয়া বাঁকিপুর এবং কাশীতে পর্যায়ক্রমে বাস কবিতেন।

তারাশঙ্করের জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্গাশঙ্কর স্বীয় বুদ্ধি, কর্মশক্তি ও চরিত্র প্রভাবে বংশের নাম ও মর্যাদা বিশেষ উৎকর্ষ সাধন কবিত্তা ছিলেন। তিনি ইংরেজ-সরকারেও বেশ প্রতিপত্তি করিয়াছিলেন। এই বংশে তিনিই সর্বপ্রথমে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন এবং গয়া মিউনিসিপালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান, জেলা বোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান, লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং গয়ার অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেন। এই-সকল কার্যে তাঁহার দক্ষতা প্রকাশ পাইলে গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে পেনশনাল ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করেন এবং মহারাজী

ভিক্টোরিয়া ও সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড তাঁহাকে সম্মানকর প্রশংসাপত্র (Certificates of Honour) দিয়া সম্মানিত করেন। তিনি খুব রাশভারী লোক ছিলেন বটে, কিন্তু জনহিতকর কার্যে সাধারণের সহিত যোগ দান করিতে কখন কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি বহু দরিদ্র ভ্রমসন্তানের অন্নদাতা ছিলেন। কত অভাবগ্রস্ত বিপন্ন ঘে তাঁহার অর্থসাহায্য পাইয়াছেন তাঁহার ইয়ত্তা নাই। গয়া যাত্রী-হাসপাতালে (Gaya Pilgrim Hospital) তিনি স্বীয় পিতৃদেবের স্মরণার্থ দশ সহস্র টাকা দান করেন; হাসপাতালের সম্মুখে সংস্কৃতে লেখা তাঁহার স্মারক-লিপি আজিও বিদ্যমান আছে। তিনি সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ততোধিক ব্যয় করিয়া গিয়াছিলেন। এই উদার-হৃদয় পবহিতব্রত কর্মবীর জীবনে যশঃ সঞ্চার করিয়া এবং বহুসংখ্যক নরনারীর হৃদয় আকর্ষণ করিয়া ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে গয়াধামে চিরবিশ্রাম লাভ করেন। তিনি অপুত্রক থাকায় আপনাদিগের মধ্যে এক স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাসূত্রে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি অল্প ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়।

দুর্গাশঙ্করের কনিষ্ঠ সহোদর ভিখারীশঙ্কর শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রতি অতুরক্ত ছিলেন। তিনি এটেন্স ক্লাশ পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া শিল্প ও কলাবিজ্ঞান মনোনিবেশ করেন। স্বকুমার শিল্প আয়ত্ত করিবার জন্য তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করেন। বহু অর্থব্যয়, বহু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পর একনিষ্ঠার ফলস্বরূপ তিনি চিত্রাঙ্কন-সীবন, লৌহকার ও সূত্রধরের সূক্ষ্ম ও শ্রমশিল্প এবং ইলেক্ট্রাল প্রভৃতি গুপ্তবিদ্যা পারদর্শিতা লাভ করেন। গোজাতির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, গয়াতে তিনি গো-রক্ষণী সভা স্থাপন করেন, এই সভা অদ্যাবধি বহু গো সেবা করিয়া থাকে। লোক-সেবার জন্য তিনি স্বয়ং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া তারা ঔষধালয় নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এই ঔষধালয় হইতে আজিও দরিদ্র রোগীদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়।

ভিখারীশঙ্কর সকল ধর্মের প্রতি সমান ভক্তিমান ছিলেন, 'কারণ তিনি সর্বধর্মের মর্মই অবগত হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মের ধেরূপ অতুশীলন করিতেন, অনান্য ধর্মের মর্ম অবগত হইবার জন্ত সেইরূপ পরিশ্রম করিতেন। তিনি পাত্রির নিকট বাইবেল, মৌলভির নিকট কোরান এবং ব্রাহ্ম আচার্যের নিবট ব্রাহ্মধর্মের সারতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভিখারীশঙ্কর সাধুসম্মানসীকে যেমন, মুসলমান ফকিরকেও তেমনই ভক্তি করিতেন।

ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষাব জন্ত বহু অর্থ নষ্ট করিবার পর তিনি তাহাতে ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। তিনি ৬৮ বৎসর বয়সে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। কাশীর বিখ্যাত "তারার প্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌স্" নামক যন্ত্রালয় এই ভিখারীশঙ্কর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ইহার অল্প সহোদর এবং তারারশঙ্করের সকল পুত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধীশক্তি সম্পন্ন গদাধরশঙ্করের জীবনও বৈচিত্র্যময়। তাঁহার মধুর স্বভাব ও মিষ্ট ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তিনিও অগ্রজের ন্যায় ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় ময়না ও তেলের কারখানা করিয়া তিনি প্রথমে বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহার প্রাপ্য টাকা বাজার হঠাতে উঠাইয়া লইতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হন। এবং তাহার ফলে কারুবার বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন। টিকারীর মহারাজা তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। এই সময় তিনি তাঁহাকে তাঁহার বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তির অধিকাংশের সার্ক লু অফিসার পদে নিযুক্ত করেন। পরে টিকারীরাজের অনেকগুলি গ্রাম পত্তনি লইয়া তিনি লাভবান হন। ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহার দেহান্ত হয়। গদাধরশঙ্কর গয়া বেঞ্চে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার প্রতিপত্তি সরকারী বেসরকারী সকলের নিকটই সমান ছিল। তাঁহার সরস আলাপে ও মধুর আপ্যায়নে সকলেই আকৃষ্ট হইতেন। ভ্রমণের প্রবৃত্তি তাঁহার প্রবল ছিল। তিনি ভারতের প্রধান প্রধান দর্শনীয় স্থান দর্শন জন্ত ভ্রমণে বহির্গত হইতেন।

খৃঃ ১৯০০ অব্দে গয়াতে "শঙ্করভিলা" নামে সুন্দর আবাসবাটা নির্মাণ করিয়া তথায় গদাধরশঙ্কর স্থায়ী ভাবে

অবস্থিত করিতে থাকেন। সাহিত্য, ভৌগোলিক এবং নাট্যকলায় ও অভিনয়ে তাঁহার প্রগাঢ় অমুরাগ ছিল। "শঙ্কর ভিলা" এই-সকল বিষয় আলোচনার কেন্দ্রস্থান হইয়াছিল। কাশীধামে, বাকিপুরে এবং গয়াতে তাঁহার যত্নে অনেকগুলি নাটক অভিনীত হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং অতি সুপুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার অভিনয়-চাতুর্য্য বিলক্ষণ ছিল। সুতরাং তিনি যখন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেন, তখন সকলেরই অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইত। এই উপলক্ষে তিনি কলিকাতা হইতে অভিনয়দক্ষ শিক্ষিত বালকদিগকে আনাইয়া তাহাদিগকে গয়াতে স্থায়ী ভাবে বাস করাইবার জন্ত চাকরি, কণ্ট্রাক্টরি প্রভৃতি কর্মে নিযুক্ত করিয়া দিতেন। বঙ্গের স্বনামপ্রসিদ্ধ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মধ্যে মধ্যে গয়ায় আসিয়া এই নাট্যমোদীর "শঙ্কর-ভিলা"য় বাস করিতেন এবং তাঁহার আশ্রাব তৃপ্তির জন্তই যেন দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার কোন কোন শ্রেষ্ঠ নাটক এই ভবনেই রচনা করিয়াছেন।

তারারশঙ্করের চতুর্থ পুত্র বিষ্ণুশঙ্কর এবং সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শরৎশঙ্কর এক্ষণে বর্তমান। বিষ্ণুশঙ্কর ইতিপূর্বে জমিদারীর সমস্ত কাজ কর্ম স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি প্রাচীন মুসলমান রাজধানী এক্ষণে পাটনা জেলার সবডিবিজ্ঞন বিহারের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। অধুনা তিনি গয়াতেই অবস্থিত করিতেছেন। এখানে তিনি কয়েক বৎসর মিউনিসিপাল কমিশনার হইয়া গয়া সহরের উন্নতিকল্পে বহু আয়াস স্বীকার করেন। বিষ্ণুশঙ্কর সাধুসজ্জ, সদালাপ ও ধর্মচর্চায় বিশেষ জ্ঞানবান। গয়া গোরক্ষিনীর মহাত্মা পরমহংস স্বামী শিবসাগর পুরীর নিকট তিনি উপদেশ গ্রহণ করেন। ধনিওয়া পাহাড়ির ঠাকুরদাস বাবাজি তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কনিষ্ঠ শরৎশঙ্কর গীতবাছারুগী। প্রায় সকল প্রকার বাণ্যজ্ঞ তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন। বালাবধি গঙ্গা পক্ষী পালনে তাঁহার স্বাভাবিক ঝোঁক থাকায় তিনি লেখা-পড়ায় উন্নতি করিতে পারেন নাই। তিনি বিহার-সম্বিহিত রৈতর জমিদারীতেই বাস করেন।

ভিখারীশঙ্করের জ্যেষ্ঠপুত্র উমাশঙ্কর পিতাব আদেশে চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন পত্নপ্রতিষ্ঠিত

দাতব্য চিকিৎসালয় তাঁহারই পরিচালনাধীন। উমাশঙ্কর সদানন্দ নির্বিরোধী উদারমতি এবং সর্বজনপ্রিয়। তিনি স্বকীয় কোন চেষ্টা ব্যতিরেকে প্রতিবেশী ও স্থানীয় ভদ্র-মণ্ডলীর শুভ ইচ্ছায় মিউনিসিপাল কমিশনের এবং লজিং-হাউস বোর্ড ও হাসপাতাল কমিটির সদস্য হন। তিনি তাঁহার ভগিনীপতি কলিকাতা নিবাসী অধুনা ইংলণ্ড প্রবাসী ভাষাতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, পি-আর-এস, মহাশয়ের উৎসাহে প্রাচীন শিল্প-কলার আলোচনায় বিশেষ যত্নবান। তাঁহারই আগ্রহে মাগধী ভাষার চর্চায় তিনি মনোনিবেশ করিয়াছেন। উমাশঙ্কর মগধি কহাবত্ সংগ্রহ নামক বে গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন, তাহা যুরোপের বিদ্বৎমণ্ডলী দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছে। ডাক-টিকিট সংগ্রহ করা তাঁহার একটি বাস্তবিক, Philatelist (ডাকটিকিট সংগ্রাহক) বলিয়া তাঁহার নাম আছে। তিনি বে-সকল টিকিট সংগ্রহ করিয়াছেন, জর্নৈক বৈদেশিক “কাইলাটেলিষ্ট” তাহার জন্ত চারি সহস্র টাকা দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন; কিন্তু উমাশঙ্কর তাঁহার বহুদ্রু-সম্বন্ধিত টিকিটগুলি হস্তচ্যুত করেন নাই। তিনি কিছুদিন “Philatelic Advertiser” নামক পত্রিকার সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন।

তাঁহার মধ্যম সহোদর রমাশঙ্কর বিষয়-কর্মের দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা হেতু বিজ্ঞাভ্যাসে অগ্রজ বা কনিষ্ঠের স্থায় মনোনিবেশ করেন নাই। গীতবাগাদিতে তাঁহার অহুরাগ দৃষ্ট হয়। কিশোর বয়স হইতেই তিনি পিতা ও পিতৃব্যের জমিদারীর যাবতীয় কার্য পরিচালনা করেন এবং একজন সুদক্ষ জমিদার বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার পিতৃবন্ধু রাধাকান্ত লালের জমিদারী যতদিন তাঁহার তত্ত্বাবধানে ছিল, স্ত্রী বায় তিনি তাহাতে চুরি তছরূপ প্রভৃতি নিবারণ করিয়া অতি দক্ষতার সহিত তাহা পরিচালিত করেন।

তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর অর্থাৎ ভিখারীশঙ্করের তৃতীয়

পুত্র শ্রামাশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয় চিন্তাচর্য্যগী এবং উদার-প্রকৃতি। তিনি বি-এ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন হঠাৎ কোন গুরুতর শোক পাইয়া কলেজ ত্যাগ করেন। পূর্বে তিনি তাঁহার পিসেমহাশয়ের স্কুলে কর্ম করিতেন; কিন্তু তাঁহার গুরুদেব পরমহংস শিবসাগর পুরীর উপদেশে বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেন। তিনি অতি অল্প মূলধনে “B. S. B. Sons” নামে বাণিজ্যালয় গয়া কাছারী-রোডে স্থাপন করেন এবং অল্প কালের চেষ্টায় কারুবারের উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু তিন-চারি বৎসর তাহা সযত্নে পরিচালন করিবার পর ব্যবসার কার্যে ঐদামীন্ত অবলম্বন করেন। দেশভ্রমণে তিনি তাঁহার পিতৃব্য গদাধরশঙ্করের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি পদব্রজে এবং বেগ যোগে উত্তর ও মধ্যভারতের প্রায় সকল দর্শনীয় স্থানই পরিভ্রমণ করিয়াছেন। কাশীর প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজের বরগীয় ৬কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার দাদাশুভ্র ছিলেন এবং তৎপুত্র কাশীনরেশ্বর তহশীলদার ও সহকারী মজী ৬জ্ঞানানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার মামাশুভ্র ছিলেন। ধর্মপ্রাণ জ্ঞানানন্দ-বাবু তাঁহাকে পুত্র-স্থানীয় করিয়া আপনার নিকট রাখিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার সাধু-সঙ্গের অভাব ছিল না। স্ত্রী বায় জ্ঞানানন্দ-বাবুর আদর্শ এবং নিত্য সাধুসঙ্গই শ্রামাশঙ্করের ধর্মপ্রবণতা এবং গার্হস্থ্য সম্মাসের মূল। শ্রামাশঙ্কর গয়াধামে শঙ্কর-লাইব্রেরী নামে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং কলিকাতা কৃষ্ণনগর পুরাতন-গয়া জব্বলপুর ও কাশীতে শাখা কারুবার স্থাপন করিয়াছেন। “B. S. B. Sons” এর কারুবার এক্ষণে তাঁহার পিতৃব্য গদাধরশঙ্করের এক মাত্র পুত্র নির্বিরোধী সংস্কার এবং পিতৃগুণের অধিকারী আত্মশঙ্করের সুপরিচালনায় অটুট রহিয়াছে। এই “শঙ্কর”-পরিবারের এবং তারামশঙ্করের দৌহিত্র-গোষ্ঠীর অনেকেই এক্ষণে গয়াতেই স্থায়ী বাস স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

স্বাস্থ্য-সুজ্ঞান



চরকা ও বস্ত্রসমস্য়ায় বঙ্গমহিলা'র কর্তব্য *

মাতৃপূজার বিপুল যজ্ঞের হোতা কর্মবীর মহাস্বা-
গাক্ষী কারাগমনের অব্যবহিত পূর্বে যে পত্রখানি আমাকে
লিখিয়াছিলেন হয়ত অনেকে তাহা সংবাদপত্রে পাঠ
করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন, জাতীয় জীবনের এই
মহাসঙ্কটস্থলে দিগ্দিগন্ত হইতে জাগরণের সাড়া ভারতের
নব ইতিহাস নিয়তই রচনা করিতেছে। বাংলা দেশের গৃহ-
লক্ষ্মীগণের জাগরণ এই তরঙ্গকে নবধারা প্রদান করিবে
বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। তাই তিনি আজ আমাদের
মাতৃজাতির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া আছেন। যে
বিখ্যাত মসলীন একদিন স্বপ্নশিল্পের নিদর্শন হিসাবে
জগতে এক আশ্চর্য্য দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হইত, তাহা
এই বাংলা দেশেরই মায়েদের হাতে-কাটা সূতোয় তৈরি।
তাই আজ আমাদের নারীজাতির দিকে সমস্ত ভারতের
বিশেষ দৃষ্টি।

চরকা প্রচলনের প্রথম চেষ্টায় অষ্টাশ্ব দশজনের মত
আমিও সন্নিহান হইয়া বিক্রপ কবিয়াছি। এই রেল পুল
কলকজার ও কারখানার দিনে হাতে-বোরা কাঠের চরকার
প্রতিযোগিতা আপাতদৃষ্টিতে হাস্যকর বলিয়া মনে হওয়া
বিচিত্র নয়। কিন্তু বাংলার চরকার পশ্চাতে যে প্রাণশক্তির
আবেগময় স্পন্দন রহিয়াছে, তাহা তুচ্ছ করিবার নয়।
আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জাতীয় চরিত্রে যে দৃঢ়তা আনয়ন
করিতেছে তাহাই পরম সম্পদ। আজ আমি আপনাদের
নিকট আমার স্বগ্রামবাসীদের উপহার দেওয়া খন্দর
পরিধান করিয়া আসিয়াছি। তাই আজ আমার হৃদয়
দেশ-মাতৃকার স্বহস্তের স্নেহের দান লাভ করিয়া কানায়
কানায় পূর্ণ হইয়াছে। আজ উজ্জ্বলিত হৃদয় কান্ত কবির

ভাষায় আপনিই বলিয়া উঠিতেছে—“মায়েব দেওয়া মোটা
কাপড় মাথায তুলে নে রে ভাই”। আজ আমার পরি-
ধানের কাপড়, গায়ের জামা ও চাদর, যে সচিত্রা আনিয়া
দিয়াছে তাহার তুলনা নাই। এই সভাস্থানে আসিবার
কিৎকাল পূর্বে ডাকে আসামবাসী জনৈক ব্যক্তি এই যে
সূতো আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন তাহা ৬০ নম্বরের সূতা
অপেক্ষা সূক্ষ্মতার হীন নহে।

আজ সুজলা সুকলা বাংলা দেশের চারিদিকে যে অল্প-
বস্ত্রের মহা হাহাকার উঠিয়াছে, গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে
দরিদ্রতার যে ক্রন্দ সংহারমুক্তি দেখিয়া আজ দেশবাসী
আর্ন্ত, নেই দারিদ্র্য দূব করিতে হইলে দেশবাসীর বনাগমের
আয়োজন করা কর্তব্য। যে দেশে জন-প্রতি গড়ে দৈনিক
এক আনা আয়, সে দেশে যে-কোন প্রকারেরই ধনবর্ধনের
পথ মুক্তির পথেবই মতো অসকোচে অবলম্বনীয়। সমগ্র
ভারতের জনপ্রতি গড়ে দৈনিক আয় এক আনা। ইহাতে
বর্দ্ধমানাধিপ ও দ্বারবজ্রের মহারাজ্যাব ভ্রাঘ বিভ্রাট
ব্যক্তিগণের আয়ও যোগ করা হইয়াছে। অতএব এই
হতভাগ্য দেশ যে কি প্রকার নির্দন তাহা অধিক বলিবার
প্রয়োজন নাই। সুতরাং চরকা কাটিয়া যদি কেহ দৈনিক
আয় এক আনাও করিতে পাবে, তাহা হইলে দেশের বিস্ত
দ্বিগুণিত হইল বলিয়া মনে করা নাইতে পারে। অতএব
চরকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুক্তি ভিত্তিহীন।

চাই প্রাণ। অসাড় নিম্পন্দ হৃদয় সরস করিতে
মহাপ্রাণতা চাই। বাংলা দেশে বরিশালের মাটি মহা-
প্রাণ অশ্বিনীকুমার নব্বের প্রেবণায় আজ উর্বর। তাই
বরিশাল আজ খন্দর-প্রচলনে অগ্রণী। উষব পার্কতা
চট্টগ্রাম খন্দর বয়ন করিয়া আজ সরস হইয়াছে। চট্টগ্রামের
পার্কতা অঞ্চলে পাহাড়িয়া ও ভদ্রলোকদের মধ্যে কাপাস
চাষ ও খন্দর বুনন এতাবৎ চলিয়া আসিতেছে। তাই
নেপানে সহজেই রুতকার্য্যতা আসিয়াছে। কিন্তু বরিশালের
নূতন অধ্যবসায় আরো প্রাণসম্মত। ইতিমধ্যে আটশত

* ভবানীপুর পদ্মপুকুর চড়ক মেলাব শিল্পপ্রদর্শনীতে মহিলা-
দিগকে সন্মোদন করিয়া প্রদত্ত মৌখিক বক্তৃতা'র সাবাংশ। জীবান
জানেক্সনাথ রায়, এম-এসসি কর্তৃক লিপিত।

চবুকা ও একশত তাঁত চলিতেছে। সপ্তাহে পাঁচ মণ এবং মাসে কুড়ি মণ সূতা কাটা হইতেছে। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ছেলেরা এই-সমস্ত করিতেছেন। মা-বোন-দের সাহায্য লইয়া একজন যুবক অনায়াসে চবুকা ও তাঁতে দৈনিক পাঁচসিকা রোজ্জ্বার করিতে পারেন। আজ-কাল বি-এ, এম-এ, পাস করিয়া চাকরী লাভের জন্ত ঘে ছুর্ভোগ ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়, তাহাতে স্বাধীনভাবে ঘরে খাইয়া, দৈনিক পাঁচসিকা রোজ্জ্বার নিতান্ত উপেক্ষার যোগ্য নহে। গৃহলক্ষ্মীগণ যদি দিবানিজা, পরচর্চা ইত্যাদি একটু ছাড়িয়া এ বিষয়ে মনোযোগী হন, তাহা হইলে এই আয় ঘবে ঘরে হইতে পারে এবং দেশের শোচনীয় বস্ত্রসমস্যার সমাধানও যুগপৎ হয়।

বাংলাদেশে প্রতিবৎসর অনূ্যন ২০।২৫ কোটি টাকার বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় হয়। যিনি একজোড়া বস্ত্র ক্রয় করিলেন তাঁহার স্বরণ রাখা কর্তব্য যে তিনি তাহাতে বিদেশে ৩০।৫ টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইলেন। এই-প্রকারে বিস্তারিত দরিদ্র দেশ হইতে বস্ত্রের জন্ত আমরা সর্বসম ২২।০ কোটি টাকা ঘেন বিদেশে হেলায় নিক্ষেপ করিয়া আসিতেছি। সহরে অর্থ উপার্জনের জন্ত মাছুষের সরল জীবনগতি ক্রমশই জটিল হইয়া পড়িতেছে। অর্থগণের অপেক্ষাকৃত সুবিধা বশতঃ বিলাসিতাও সহরে অধিক। সহরে স্বামী ও পুত্রগণ বেশী অর্থোপার্জন করিয়া থাকেন। স্ত্রতরাং সহরের রমণীগণের আলস্ত ও বিলাসিতা বেশী হওয়া বিচিহ্ন নয়। তাই আমি গ্রামে গ্রামে মা-লক্ষ্মীগণের নিকট চবুকার বার্তা প্রচারে বাহির হইয়াছিলাম। গৃহলক্ষ্মীগণ যদি মোটা কাপড় পরিয়া অগ্রসর হইয়া স্বামী ও পুত্রগণকে লজ্জা দেন, তবে এ স্রোত ফিরাইতে বেগ পাইতে হইবে না। কলিকাতা বাংলা দেশে রুচি ও শিক্ষার আদর্শস্থান। কলিকাতাবাসিনীগণের দায়িত্ব কত গুরুতর, তাহা স্বরণ রাখা কর্তব্য। কেননা তাঁহাদেরই প্রবর্তিত ফ্যাশ্যন সর্বদা পল্লীপ্রান্তে প্রভাব বিস্তার করিবে।

মাছুষের স্বভাবই গতাঃগতিকতা। তাই ফ্যাশ্যনের প্রতাপ এত বেশী। সেদিন যখন স্থলে এক ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীতে চায়েব সঙ্গে হাট লী পামাবেব বিস্তুট দেখিয়া প্রথ

করিয়া আমিলাম চৌদ্দ-ছটাকী এক কোটার তিন টাকার উপর মূল্য লাগিয়াছে। বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমি দূততার সঙ্গে বলিতে পারি, এই বিস্তুট আমাদের মুড়ি অপেক্ষা খাণ্ডগুণে কোন রকমে শ্রেষ্ঠ নয়। কিন্তু কি আমাদের সংস্কার এবং বিকৃত রুচি। মুড়ি এবং নোলেন গুড় দিয়া কে আজ অতিথি সংকাব করিতে সাহসী হইবেন? বাহিবের চাকচিক্যেব মোহে, আমরা ভিতরে ছুঁচোর কীর্জন হইলেও বাহিরে কোঁচার পস্তন করিতেছি। সকলেরই স্বামী এমন অনেক কিছু রোজ্জ্বার করেন না। সীমন্তিনীগণ “মিহির উপর খাপী” না হইলে বস্ত্র পরিধান করিতে লজ্জা বোধ করেন। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি যে বিলাতী সূতায় প্রস্তুত সূক্ষ্ম দেশী ধুতি স্বদেশীবস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

বঙ্গললনাগণ কি গুঞ্জে ভারী বলিয়া তাঁহাদের সর্বাস্থের অলঙ্কাররাশি ফেলিয়া দেন? সর্বাস্থে অলঙ্কারের ভাব বহন করা যদি ক্রেশকর না হয়, তবে মোটা খন্দর বসন পরিধান কেন কর্তব্য হইবে? এই-সমস্তেরই মূলে দেখি ফ্যাশ্যন। তাই বলিতেছি, আপনারা পুর্ববাসিনীগণ, আপনারা পথপ্রদর্শন করুন। এ দায়িত্ব ভার আপনারদের। উচ্চশিক্ষিত অবস্থাপন্নগণই সমাজের সর্ববিধ আন্দোলনেব নেতৃত্ব করেন। যুদ্ধারম্ভে ইংলও হইতে সর্বপ্রথমে কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ডের বনিয়াদী আভিজাত্যভিমানী ঘরের পুত্রগণই রণক্ষেত্রে জীবন দান করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। শ্রমজীবী কিশা সন্ত সন্ত্রাদায় হইতে এ আন্দোলন উত্থিত হয় নাই। দেশের সর্ববিধ কল্যাণকর আন্দোলন সমাজের উচ্চস্তর হইতেই নিম্নস্তরে আসিয়াছে। তাই কলিকাতাবাসী সমবেত মহিলাবৃন্দের প্রতি আমার অল্পরোধ তাঁহারা যেন তাঁহাদের দায়িত্ব স্বরণ করিয়া এ দিকে একটু মনোযোগ প্রদান করেন। কেননা তাঁদের স্বরণ বাধিতে হইবে, অল্পশিক্ষিতা পল্লীগ্রামেব ভগিনীগণ তাঁহাদিগকেই অনুকরণ করিবেন।

আজ আমি সেই স্ত্রীনের প্রতীক্ষায় অছি যখন প্রতি পল্লীতে তাঁত চলিবে, মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণের সম্মানগণ বুখা আত্মমর্যাদার মোহে জীবনে শ্রেয়কে বরণ করিতে কোন কুঠা বোধ করিবেন না। গৃহেব আনন্দ বালক-বালিকা-

গণই বর্দ্ধন করে। ছোট ছোট বালিকাগণের নিপুণ নিষ্ঠায় যখন চরকার সূতা প্রতি গৃহে তৈরি হইতে থাকিবে তখন সে সৌন্দর্য্য কি অল্পমই না হইবে! গৃহিণীকে নানা কার্যে ব্যাপৃত হয়ত থাকিতে হয়; কিন্তু কণ্টাগণ প্রত্যেকে ঘণ্টায় ১।।০ তোলা সূতা কাটিতে পারেন। প্রতি দিনে মাত্র এক ঘণ্টার উৎপন্ন ১।।০ তোলা করিয়া ধরিলে বৎসরে ৪৫০ তোলা অর্থাৎ ৫।।০ সের সূতা হওয়া বিচিত্র নয়। ১০।২ নং সূতার ১২ ছটাকে একখানি বস্ত্র হইতে পারে। তাহা হইলে, বৎসরে ১০।১২ খানি বস্ত্র তৈয়ার করা কষ্টসাধ্য নহে। বস্ত্র বুননের মজুরি অতি নামমাত্রই দিতে হয়। জোড়া-প্রতি পাঁচসিকা। কাজেই প্রতি সংসারে দৈনিক ১।।০ তোলা সূতা প্রস্তুত হইলে বস্ত্রসমস্যার সমাধান করিতে গৃহের উপার্জ্জকদিগকে এত বেগ পাইতে হইবে না। আপাততঃ তুলা খরিদ করিয়াই করিতে হইবে। কিন্তু মফঃস্বলবাসী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এমন কে আছেন তিনি বলিতে পারেন তাঁহার গৃহপ্রান্ত্রে ১০।১৫টি রাম-কাপাসের বা গাছ-কাপাসের গাছ করিবার জমির অকুলান? এই ভবানীপুর অঞ্চলেও অনেকেরই বাড়ীতে ১০।১২টি কাপাসের গাছের উপযুক্ত জমির অভাব নাই। কিন্তু এ বিষয়ে মনোযোগের অভাব যথেষ্টই। আর কতদিন উদাসীন হইয়া থাকিব? দেশে যে ভাত-কাপড়ে শনি পড়িয়াছে তাহা কি আমরা দেখিয়াও দেখিব না? আজ দেশের জোলা তাঁতি লুপ্তব্যবসায় হইয়া ধ্বংসোন্মুখ।

এই মৃত বাংলায় প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে। আজ দেশের এই সঙ্কটে আমি মাতৃজাতিকে মৃতসঞ্জীবনী সূত্র হস্তে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছি। ইংলণ্ডের মহা সঙ্কট ও পরীক্ষার দিনে রমণী জাতিই আশ্রয়ান হইয়া আসিয়াছেন। নারী জাতির প্রেরণায় আবার আমাদের সাধনা সফল হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। কবি বলিয়াছেন—

“তোরা না করিলে এ মহা সাধনা

এ জীৱত আর জাগে না জাগে না।”

বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ মহিলাকবি লিখিয়াছেন—

“রমণী-শক্তি অস্তুর-দলনী,

তোরা নিবমিত কোন্ দাতু দিয়া?”

আজ হীনবীৰ্য্য দুর্বল অসহায় বাঙালী জাতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মন বিষাদিত হয়। এই মরুভূমির আবার উর্বরতা সাধন করিতে হইবে। মাতৃশক্তি জাগ্রত হইয়া দেশের অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান করিবেন, ইহাই বিশ্বাস করি। তাই আজ আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া বাংলা দেশের শক্তিশূন্য মাতৃজাতির প্রতি আমার নিবেদন যে তাঁহারা একবার জাগ্রত হউন। নিজের গৃহে পরিবারে তাঁহারা প্রেরণার অমৃত উৎস সৃজন করুন। বেশীদিন নয়, ছয় মাসের সাধনাই এই ক্লান্তি দূর করিয়া নবজীবন আনয়ন করিবে। প্রতিগৃহে চরকা গৃহদেবতার আসন গ্রহণ করিলে আবার আমরা বাঁচিব।

যিনি অদৃশ্যে কত জাতির অভ্যুদয় ও পতন সাধন করাইলেন, তাঁহার মঙ্গল-হস্ত ইতিহাসের বিপর্য্যয়ের মধ্যেও যেন আমরা দেখিতে পাই। তিনি কঠিন বিচারকের নির্মম ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে আমাদের সাধনামুদ্রপ সফল-তাই প্রদান করিবেন। অল্লাহসে অধিক লাভের চুরা-কাঙ্ক্ষা আমরা করিব না, অকুতোভয় হইয়া কক্ষ করিলে সিদ্ধি আমাদের আসিবেই। অন্তঃকরণে বিশ্বাস ও আশা লইয়া আমরা এই সাধনায় প্রবৃত্ত হই।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

ইজিপ্টের নারী

ইজিপ্টের বর্তমান জাতি, বাঙালীদের মত একটি মিশ্র জাতি। পুরাকালে, ইতিহাস লিখিবার বহুপূর্বে হয়ত কোন একটা বিশেষ জাতি ইজিপ্টে বাস করিত। কিন্তু তাহার পর জগতে সভ্যতার আলোর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নানা জাতি আসিয়া ইজিপ্টে বাস করিতে আরম্ভ করে। বর্তমান ইজিপ্ট-বাসী এই-সমস্ত জাতির সংমিশ্রণের ফল। তবে এখনো ফেলাহিন এবং কপ্ট নামক দুই শ্রেণীর লোক পাওয়া যায়। তাহারা অনেক পরিমাণে বিস্কৃত ইজিপ্টীয়। তাহাদের নাক মুখ চোখের গড়নের সঙ্গে ইজিপ্টের পুরানো দেবমন্দিরের গায়ে খোদিত মূর্তিদের নাক মুখ চোখের অনেক সাদৃশ্য আছে।

উপরোক্ত দুই শ্রেণীর লোকদের ভিতর ফেলাহিন জাতির বিস্কৃততা কিঞ্চিৎ বেশী-পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে।



ইজিপ্টের নারী।

ইজিপ্টের নিম্ন অংশের এবং নাইল ব-দ্বীপের বেশীর ভাগ অধিবাসীই ফেলাহিন। ফেলাহিন জাতির লোকদের কপাল বেশ চওড়া, বড় বড় কাল চোখ, সোজা উঁচু নাক। গড়ে তাহারা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা। আরব জাতির সঙ্গে তাহাদের বিবাহাদির দ্বারা মিশ্রণ বেশী হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদের দেখিলেই বেশ বোঝা যায় তাহারা পুরানো ইজিপ্টবাসীদের বংশধর।

গ্রীবীদের পোষাকের বিশেষ কোন আড়ম্বর নাই। বড়লোকদের ভিতর নানা রকম পোষাক চলিত আছে। কেহ তুর্কী পোষাক পরেন, কেহ আরবী পোষাক পরেন, আবার কেহ বা সাহেবী কেতার বেশে থাকেন। গ্রীব মেয়েদের সমস্ত অঙ্গ একটা লম্বা নীল রঙের আলখাল্লায় ঢাকা থাকে। বড়লোকের ঘরের মেয়েদের নানা রকম পোষাকের বাহার আছে, তাহার উপর তাহাদের গহনার ফর্দও বেশ প্রকাণ্ড। গহনা বেশীর ভাগই সোনার। বড়লোকের ঘরের মেয়েদের পরনে থাকে তুর্কী রমণীর মত পায়জামা, তাহার উপর ঢোলা কুর্ত্তা, তাহার উপর

একটা সাদা রঙের আলখাল্লা। তাহা কোমরে রঙীন সূতার দড়ি দিয়া বাঁধা থাকে। অনেকে এই আলখাল্লার উপরে কাঁধ হইতে হাঁটু পর্যন্ত আর-একটা জামা পরেন। শীতকালে এই রকমের আরো দু-একটা বেশী জামা পরিতে হয়। গরম কাপড়ের জামাও অনেকে ব্যবহার করেন।

উঁচু ঘরের ফেলাহিন নারীরা রূপ বাড়াইবার জন্ত চোখে স্ফুমা লাগান। অনেকে আবার অঙ্গে নানা রকমের উজ্জি পরেন। মেয়েদের চুল খুব প্রচুর হয়। চুলের বিছনী করা হয় কিন্তু খোঁপা বাঁধা হয় না। বিছনীগুলি পিঠে ঝুলিতে থাকে। দু-একটা বিছনী কালো সাপের মত বৃকের উপরেও পড়িয়া থাকে। সোনার বালা, চুড়ি, চুলের কাঁটা, চক্রণী ইত্যাদি অনেক কিছু গহনা ইহারা ব্যবহার করেন। অনেকে আবার সারি করিয়া মোহর গাঁথিয়া চুলের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখেন। বিছনীর শেষে রেশমের ফিতা বাঁধা হয়। তাহাতেও সোনার মোহর ঝুলিতে দেখা যায়।

সহরের বা গ্রামের সাধারণ কাজে মেয়েদের দেখা যায় না। তাহাদের যত কিছু কাজ সবই ঘরের ভিতর। ঘরসংসার দেখা এবং সন্তান পালন করা তাহাদের প্রধান কাজ। অবিবাহিতা নারীদের পিতার সংসারের রান্না-বাগ্না এবং কুর্ত্তা সেলাই ইত্যাদি কাজেই ব্যস্ত থাকিতে হয়। সকাল বেলায় বাড়ীর সকলে এক-পেয়শালা কফি এবং খানজয়েক করিয়া আঙুনে পোড়ানো কুটি খায়। তুর্কী রমণীর মত ইজিপ্টের নারীদের হারেমে বন্ধ থাকিতে হয় না বটে, তবে তাই বলিয়া বাহিরের জগতে তাহাদের পুরুষের মত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাই। সকাল বেলা তাহারা নিজেদের বন্ধুদের বাড়ী যাওয়া-আসা করিতে পায়, তখন তাহাদের প্রধান কাজ—বাজে গল্প করা, তামাক খাওয়া, কফি পান করা এবং নর্ত্তকীদের নাচ দেখা।

গ্রীবের ঘরের মেয়েদের বাহিরের জগতে স্বাধীনতা বেশী আছে। কারণ তাহাদের পরিশ্রম করিয়া থাইতে হয়। বসিয়া থাইবার মত অবস্থা তাহাদের নয়।

নারীদের শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই। দেখা-

পড়া-জানা নারী খুবই কম। নিজেদের সংসার এবং বন্ধু-বান্ধবদের বিষয় তাহারা কিছু কিছু খবর রাখে। অল্প কোন বিষয়ের খবর রাখা তাহাদের প্রয়োজনের বাহিরে।

বড়লোকের ঘরের মেয়েদের কখনো রাস্তায় ঘাটে দেখা যায় না। তবে খুব কদাচিৎ তাহারা এমনভাবে সর্বদা ঢাকিয়া পথ দিয়া চলিয়া যায় যে নিজের বাড়ীর লোকেও তাহাদের চিনিতে পারে না। গৃহস্থ ঘরের বয়স্ক মেয়েদের পথে দেখা যায়। সুন্দরী-দেখিতে-নয় মেয়েদের বিনা ঘোমটায় পথে দেখা যায়। গরীবের ঘরের মেয়েদের প্রায়ই দেখা যায়। ঘোমটার সম্বন্ধে তাহাদের অত বেশী কড়াকড়ি নাই।

এই দেশে মেয়েদের বিবাহ একটু কম বয়সেই হয়। তবে অবশ্য আমাদের সোনার বাড়ী দেশের মত সাড়ে সাত বছর বয়সে নয়। মেয়েদের সাধারণত ১৩ এবং ছেলেদের ১৬।১৭ বছর বয়সে বিবাহ হয়। কোনো অধিক-বয়স্ক মাঝারী অবস্থার লোক যদি অবিবাহিত থাকে, তবে সে লোকের চক্ষে বড় খেলো হইয়া থাকে। সে লক্ষ্যীছাড়া এবং চরিত্রহীন।

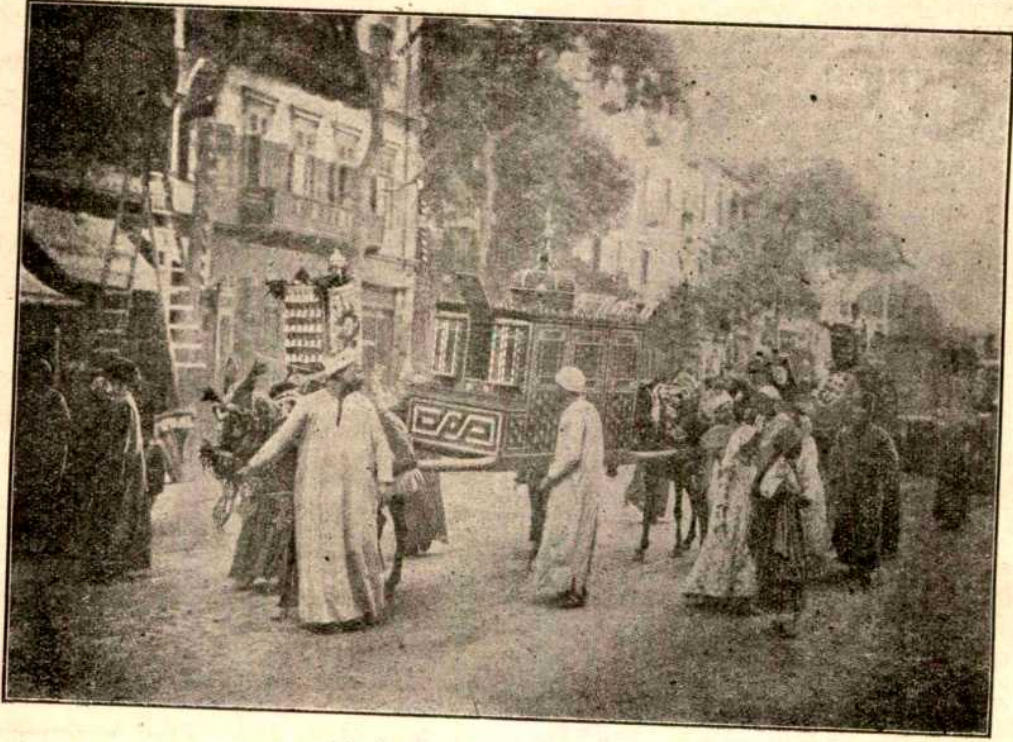
গয়না, তেল এবং সুবুমাওয়ালারা এখানে ঘটকীর কাজ করে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে আলাপ হয় না। কাজেই কেহ বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে এই ঘটকীদের আশ্রয় লইতে হয়। ঘটকীদের এখানে কাটবেহ্ বলে। তাহারা সব বাড়ীর অন্তরে প্রবেশ পায় এবং বরের মনোমত কন্ডার সন্ধান করে। কনের বাড়ীর লোকেরা ইহাদের আগমন বেশ বুকিতে পারে, এবং কনের মা বিশেষ করিয়া এই ঘটকীর মন প্রশ্ন করিতে চেষ্টা করেন; কারণ ঘটকীর মত হইলেই বিবাহ এক রকম হইয়া যায়। বিবাহ হইয়া যাইবার পূর্বে বর কন্ডার মুখ দেখিতে পায় না। ঘটকী কন্ডা পছন্দ করিয়া আসিলে বরের মা, বোন বা অল্প কোন নিকট-আত্মীয় কনের বাড়ী যান। ঘটকীর কথা কতখানি সত্য তাই দেখিয়া আসেন। তারপর বরের বাড়ীর মত হইলে ঘটকী কনের বাড়ী গিয়া পাকা কথা পাড়ে। কনের বাড়ীর মত এক রকম হইয়া থাকে, কারণ তাহা না

থাকিলে ঘটকী সেখানে দুবার প্রবেশ করিতে পায় না।

বিবাহে আপত্তি এবং অমত করিবার অধিকার মেয়ের আছে। তবে কাজে তাহা কখনো দেখা যায় না। কারণ ভাবী বরকে সে কখনো বিবাহের পূর্বে দেখিতে পায় না। সম্পর্কে ভাই হইলে খুব কম বয়সে তাহাকে হয়ত দু-এক বার দেখে। ঘটকী বর সম্বন্ধে খুবই প্রশংসা করে। এমন অবস্থায় মেয়ের আপত্তি করিয়া কোন লাভ নাই। না দেখিয়াই যখন বিবাহ করিতে হইবে, তখন স্বযোগ ছাড়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

তবে গরীবের ঘরের ছেলেমেয়েরা, তাহারা সারা দিন মাঠে কাজ করে। তাহারা ঘটকীর সাহায্য না লইয়াই নিজের ইচ্ছামত স্ত্রী বাছিয়া লয়। মেয়ের মত হইলে তাহাকে বিবাহ করে।

বিবাহের সমস্ত পাকা কথা হইয়া গেলে পর, দুই পক্ষের কর্তাদের মধ্যে দেনা-পাওনা সম্বন্ধে কথা উঠে। বিবাহের পূর্বে বরকে কনের জন্ম কিছু দিবার প্রতিজ্ঞা করিতে হয়। বিবাহ স্থির হইয়া গেলেই ঐ অংশ টাকা দিতে হয়। বাকি অংশ বিবাহ বাতিল না হইলে আর কোনদিন দিতে হয় না। কন্ডাপক্ষের লোকেরা বরের-দেওয়া-টাকা হইতেই কন্ডাপণ দিয়া থাকে। সেইজন্ম কোনো পক্ষেরই বিশেষ কষ্ট হয় না। এই-সমস্ত স্থির হইয়া গেলে পর কোন একজন ম্যাজিস্ট্রেট বা কাজির সামনে সব লেখাপড়া হইয়া যায়। তাহার পর বর দুইজন বন্ধু সঙ্গে করিয়া কনের বাড়ী যায়। সেখানে কনের পিতা তাহাদের ঘরে বসান। ঘরে কয়েকজন সাক্ষী এবং একজন কোরাণ-পাঠক বস্তুমান থাকে। কোরাণের প্রথম অধ্যায় পড়া হইলে পর বর এবং কনের পিতা মুখোমুখি বসেন, দুই-জনে দুই-জনার ডান হাত চাপিয়া ধরেন এবং হাত উপরে উঠাইয়া বৃদ্ধো আঙ্গুলের উপর বৃদ্ধো আঙ্গুল চাপিয়া রাখেন। কোরাণ-পাঠক তার পর উভয়ের হাত একটা কাপড়ে ঢাকিয়া দিয়া কিছু উপদেশ দেন এবং তাহার পর বরকে বাগদত্ত করেন। উপহার ইত্যাদির আদান-প্রদান হয়। কোরাণ-পাঠক কিছু পায়। তাহার পর



ইজিপ্টের বিবাহ-মিছিলে কত্তার চতুর্দোল।

সকলে মিলিয়া এক জায়গায় বসিয়া ভোজনাদি হয়। এই-সময় কাজ হইয়া গেলে পর বিবাহ হয়। বিবাহে উভয় পক্ষের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশী নিমন্ত্রিত হয়। ভোজন-উৎসব বিবাহের একটি বিশেষ অঙ্গ। বিবাহ হইয়া গেলে পর বর-কত্তা সংসার করিতে আরম্ভ করে।

নিম্ন ইজিপ্টে কত্তা বিবাহের পূর্বে দলবল লইয়া কোন বিশেষ স্নানাগারে স্নান করিতে যায়। কত্তা যদি অবস্থাপন্ন ঘরের হয় তবে এই স্নানোৎসব বেশ জাঁক-জমক করিয়াই হয়। একটি বেশ ছোটখাট শোভাযাত্রা হয়। দলের আগে গায়ক ও বাজকার থাকে। তাহার সারাপথ বাজ বাজাইতে ও গান করিতে করিতে যায়। স্নানাগারে প্রবেশ করিয়া প্রবেশ-পথে একটা কমাল লটকাইয়া দেওয়া হয়। ইহার অর্থ “পুরুষদের আসা নিষেধ।” স্নান শেষ হইয়া গেলে পর কত্তা সহচরী-বেষ্টিত হইয়া আমোদ-আহ্লাদ করে, নাচ দেখে এবং গান শোনে। স্নানাগার ত্যাগ করিবার পূর্বে কত্তা একতাল

হেনা-বাটা হাতে করিয়া লয়, তাহাতে কত্তার সহচরীবৃন্দ এক-একটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা লাগাইয়া দেয়। অবশ্য যাহার যেমন সাধ্য তেমন মূল্যের মুদ্রা দেয়। সকলকেই যে সমান দিতে হইবে এমন কোন আইন নাই। তাহার পর কত্তা তাহার হাতের এবং পায়ের নখ হেনাতে লাল করিয়া লইয়া বিদায় গ্রহণ করে। কত্তা চলিয়া যাইবার পর অত্যাচ্ছ অতিথিগণও তাহাদের নখ রাঙাইয়া লয়।

পরের দিন সকালে কত্তার সাজ-গোজ আরম্ভ হয়। সারা সকাল ইহাতেই কাটিয়া যায়। বিকালের দিকে কত্তা তাহার সঙ্গে তাহার বিশেষ দু-একজন আত্মীয়া লইয়া স্বামীর গৃহের দিকে যাত্রা করে। কত্তার সঙ্গে উট বা ঘোড়া বোঝাই করিয়া তাহার ঘোতুকাদিও প্রেরণ করা হয়। কত্তার দলের সঙ্গে আরব কুস্তিগীর, খেলোয়াড়, গায়ক, বাদক প্রভৃতি অনেক কিছু থাকে। তাহারা পথের মাঝে মাঝে থামিয়া নানা রকমের খেলা সঙ্গীত প্রভৃতি করে। সঙ্গে ভিক্ষুওমালা থাকে, সে পিপাসুকে জলদানে তৃপ্ত করে।

স্বামীর গৃহে কত্না পৌঁছিলে পর অভ্যাগতদের জন্ত নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ হয়। তাহার পর ভোজন শেষ হইলে পর সবাই বিদায় গ্রহণ করে। সব-শেষে কত্নার দ্বাত্রীও বিদায় লয়। এতসব কাণ্ড শেষ হইয়া গেলে পর স্বামী তাহার বধূর ঘোমটা তুলিয়া মুখ দেখিতে পায়। ঘটকীর কথা কতখানি সত্য তা এতদিন পরে সে নিজের চোখে দেখিবার অবসর পায়।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পর সাতদিন তাহাকে ঘরের বাহিরে আনা হয় না। এমন কি সন্তানের পিতাও তাহাকে দেখিতে পায় না। সাতদিন পরে বাড়ীর চারিদিকে প্রদীপ জ্বালা হয় এবং ভূত তাড়াইবার জন্ত ছন্দ এবং ঘর গম প্রভৃতি শব্দ ছড়ান হয়। কত্না-সন্তান হইলে প্রথম স্ত্রী-অতিথি এবং পাড়া-প্রতিবেশীরা তাহাকে দেখিতে পায়। পুরুষ-সন্তান হইলেও একই বিধি, তবে এই স্থলে পিতা তাহার বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে।

ছেলের নাম-করণ যেমন ভাবে হয়, তাহার বৃত্তান্ত হয়ত অনেকেরই ভাল লাগিবে না। কাজি এক-টুকরা আক লইয়া চিবায। তাহার মুখ হইতে রস গড়াইয়া শিশুর মুখে গিয়া পড়ে। তাহার পর শিশুর নাম রাখা হয়।

কপ্ট জাতি ইজিপ্টের আর-এক শ্রেণীর পুরানো অধিবাসী। তাহারা বেশীর ভাগ উপর-ইজিপ্টেই বাস করে। অ্যাসিউৎ প্রদেশে এবং লেক বিরুকেৎ-এল-কেন্ননে কপ্টদের ঘন বসতি আছে। নিম্ন ইজিপ্টে যে-সব কপ্ট বাস করে তাহাদের বেশীর ভাগই দোকানী বা কারুবারী। কপ্ট জাতি মুসলমান নয়—তাহারা খ্রীষ্টান, এই কারণেই বোধ হয় আরবদের সহিত তাহাদের মিশ্রণ বেশী হয় নাই এবং তাহারা কেলাহিনদের অপেক্ষা অধিকতর বিশুদ্ধ ইজিপ্টীয়। ধর্ম তাহাদের বরাবর একই থাকা সত্ত্বেও তাহাদের আচার-ব্যবহার এবং পোষাক-পরিচ্ছদের বহুল পরিবর্তন হইয়াছে। বর্তমানে তাহাদের পোষাক দেখিয়া, তাহাদের জাতি নির্ণয় করা কঠিন। মুসলমানদের সঙ্গে পোষাক-পরিচ্ছদে তাহাদের কোন অ-মিল নাই। পোষাকের রঙ সম্বন্ধে—তাহারা গাঢ় রঙই বেশী পছন্দ করে।

কপ্ট রমণীর পোষাকও অনেকটা বড়-ঘরের ফেলাহিন নারীর মত। চুল বাঁধা, গয়না পরা ইত্যাদি সবই এক ধাঁচের। তবে কপ্ট নারীর গয়না সম্বন্ধে একটা কথা বলা যায়—গয়না তাহাদের নতুন করিয়া বড় একটা কিনিতে হয় না। পূর্বপুরুষের সঞ্চিত গহনাদি তাহারা ভোগ করে। তবে অবস্থা-বিপদীয় ঘটিলে তাহারা গয়না বাঁধা রাখিতে ইতস্তত করে না, এমন কি মাঝে মাঝে কিছু বিক্রয়ও করে। কপ্ট নারী তাহার সেমিজের ওপর একটা জাঁটা বডিস পরে, তাহা সামনে রঙিন স্ফুতার বাঁধা থাকে। বোতামের পরিবর্তে রঙিন স্ফুতার আদর। নীচে পায়জামা বা ঢোলা পাখলুন পরে। পায়ে চটি থাকে। গরমকালে তাহারা কেবলমাত্র একখানা ঢোলা আলখাল্লার মত জামা ব্যবহার করে—অন্তান্ত সব পোষাকই এক রকম ত্যাগ করে।

ঘরের বাহিরে নারী এমন ভাবে আসে যে তাহার কোন অঙ্গই পথিকের চোখে পড়ে না।

বালিকাদের পোষাক বয়স্কাদের মতই। তবে অনেক ছোট মেয়ে কেবল একটা সেমিজ আর-একটা পায়-জামা পরে। মেয়ের একটু বেশী বয়স হইলেই সে তাহার বড়দের অনুকরণ করিতে শিখে। কোন অচেনা পুরুষ সামনে আসিয়া পড়িলে, সে, বয়স্ক নারীর মত, তাহার স্বন্দর কচি মুখখানি ঘোমটার আড়ালে লুকাইয়া রাখে।

সহরের নারীরা বেশীর ভাগ ঘরের কাজেই ব্যস্ত থাকে। বাহিরে তাহাদের কদাচিৎ দেখা যায়। গ্রামের মেয়েরা চাষবাসের কাজে অনেক পরিমাণে পুরুষদের সাহায্য করে। গরীব ঘরের মেয়েরা আটা পেয়ার কাজেই বেশী করে।

ইজিপ্টে নর্তকীদের একটা জাতি বলিলে কিছু অম্ভাষ হয় না। তাহারা পুরাকালের ফ্যারাওদের সময় হইতেই বাস করিতেছে। বর্তমানে ইজিপ্টে এমন কোন সহর নাই যেখানে ইহাদের দেখা যায় না। নর্তকীরা বলে যে তাহারা হারুণ-অল-রসিদের প্রিয় নফর বারমেকের বংশের লোক। অনেকে বলেন যে নর্তকীরা জিপ্সী জাতির একটা শাখা। কিন্তু তাহাদের বিবাহাদি ইজিপ্টের



আলজিরিয়ার নারী।

প্রায় সব জাতির সঙ্গেই হইয়াছে, কাজেই তাহারা একটা মিশ্র জাতি বলিয়া মনে হয়। নর্তকীরা সব শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই মিশে, কিন্তু তাহাদের বাস করিবার জন্ম সহরের মধ্যে নিদিষ্ট স্থান আছে। নর্তকীদের চরিত্র সম্বন্ধে প্রশংসা করিবার কিছু নাই। নর্তকীরা ধনী তুর্কী রমণীর মত জম্‌কালো পোষাক পরে। তাহাদের অবস্থা খুবই ভাল, এক-একজনকে ক্রোরপতি বলিলেও হয়। বর্তমান সময়ে ক্রীতদাসীরা নর্তকীদের দল-বৃদ্ধি খুব বেশী পরিমাণেই করিতেছে।

আলজিরিয়া এবং মরক্কো দুইটি ভিন্ন দেশ বটে, কিন্তু ঐ স্থানের লোকেরা ইজিপ্টের বাসিন্দাদের শাখা। ঐ দুইটি দেশের বেশীর ভাগ লোক বর্বর (Berber) জাতি। তাহা ছাড়া আরব, ইহুদি এবং নিগ্রো যথেষ্ট পরিমাণেই আছে।

বর্বর জাতি দেখিতে, অন্তত বর্ণে, ইউরোপীয়দের মতই। তবে পুরাকালে বর্বর এবং আরবজাতির কিছু



আলজিরীয় রমণীর সন্তান-বহন।

মিশ্রণ হইয়াছিল। উভয় জাতির একটা বিষয় একেবারে এক—তাহারা ককেশীয়দের বংশধর। তাহাদের চেহারাতেও অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তবে তাহাদের চেহারার মধ্যে আবার কয়েকটা বিষয়ে বেশ পার্থক্যও দেখা যায়। আরবদের মুখ একটু লম্বা ধরণের, বর্ণ খুব বেশী শাদা নয়, নাক খুবই উচু এবং চোয়াল মাঝারি। তাহাদের চোখ এবং চুল গাঢ় কালো। আরবরা বর্বরদের অপেক্ষা কম পরিশ্রমী এবং উৎসাহী। তাহারা বর্বরদের অপেক্ষা বেশী চিন্তাশীল। আরবের মন অধিকতর উচ্চস্থানে বিচরণ করে। আরবরা বর্বরদের অপেক্ষা অধিক সংযমী এবং শিক্ষিত।

আলজিরিয়ার বর্বরদের অনেক শাখা-প্রশাখা আছে। কেউ কেউ বলেন ইহাদের নাকি ১২০০ শাখা জাতি আছে; এইজন্য ইহাদের উত্তর আফ্রিকার স্বচ্ছ জাতি বলে। তবে বার্বার জাতি তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত। (১) সাগর তীরের বর্বর, ইহারা 'কেবিল' বলিয়া পরিচিত, (২) এটলা প্রদেশের স্ফুলা এবং মোগদর

প্রদেশের গুস্জাতি এবং (৩) কৃষ্ণ বর্কের বা হারাতিন, ইহারা এটলা পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে বাস করে।

বর্কের রমণীর পোষাক আরব রমণীর মত। ইহারা কাঁধে একটা শাল ফেলিয়া রাখে। আলখাম্মার মত যে লম্বা জামা পরে, তাহা কোমরে দড়ি দিয়া বাঁধা থাকে। আরব নারী অপেক্ষা ইহাদের স্বাধীনতা কিছু বেশী এবং ইহারা সর্কান্দ-ঢাকা কোন চাদর বা ঘোমটা (হেইক্) ব্যবহার করে না। অলঙ্কার স্বরূপ ইহারা হার, বালা, পুতির বা সোনার মালা, মাকড়ি বা ইয়ারিং এবং কেউ কেউ নাকছাবি বা নথ ব্যবহার করে।

গ্রামে এবং সহরে বর্কেরদের বাড়ী বেশীর ভাগ দোতলা এবং পাথরের তৈয়ারী। তবে অনেক স্থানে (তুয়ারেগ) ইহা বা তাঁবু বা ঘাসের ছাওয়া ঘরে বাস করে। ইহারা চাষবাস, সামান্য কারবার ইত্যাদি করে।

কেবিল রমণীর স্থান, আরব বা মুর নারীর অপেক্ষা বেশী সম্মানের। তাহাদের ঘরের বাহিরে আসিতে বাধা নাই, এবং বাহিরে আসিবার সময় ঘোমটাও পরিতে হয় না। স্বামীর সঙ্গে তাহার আসন সমান—অনেক স্থলে বরং উঁচু তবু নীচু নয়। কেবিল পুরুষ সাধারণতঃ এক বিবাহ করে। কেবিল নারীর পোষাক খুবই সাধারণ। বিশেষ কোনো জাঁক-জমক নাই।

আরবরা খৃষ্টীয় ৭ম এবং ১১শ শতাব্দীতে অ্যাল-জিরিয়া এবং মরক্কো জয় করেন। বর্তমান সময়েও ঐ দুইটি দেশে আরবরাই প্রধান অধিবাসী। অ্যাল-জিরিয়ার পশ্চিম অংশেই আরবদের ঘন-বসতি আছে।

আরব নারী একটা শালে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়া পথে চলে। এই শালকে ইহারা হেইক বলে। যাহার যেমন অবস্থা সে তেমনি দামের শাল ব্যবহার করে। হেইক্-এ মুখের প্রায় সব অংশই ঢাকা পড়ে, কেবল চোখ, নাক এবং কপালের এক অংশ অনাবৃত থাকে। অনেকে এত পাতলা ওড়না বা হেইক ব্যবহার করে যে তাহা ব্যবহার করা না-করা সমান। ইহাতে আরব নারীদের অতি চমৎকার দেখায়। ওড়নার ফাঁকে ঘোমটার আড়ালে সুন্দরী আরবনারীর কালো চোখ একবার দেখিলে আর তাহা ভুলিবার নয়।



কেবিল রমণী।

অনেকস্থানে আরব নারী কেবল একটি চোখ খোলা রাখিতে পায়, আর একটি চোখ আড়জারে বা মুখের উপর পাতলা ঘোমটায় ঢাকা থাকে।

সাধারণতঃ আরব রমণী দেখিতে সুন্দরী। তবে অনেকে কপালে উল্লি পরিয়া এই সৌন্দর্য মাটি করে।

আরব রমণীরা ঢোলা পায়জামা এবং তুর্কী ধরণের কুর্তী পরে। ইহা দেখিতে মোটেই সুদৃশ্য নয়; একটা কাপড়ের বস্তুর মত মনে হয়। গরীব ঘরের মেয়েদের পোষাকের জাঁক-জমক কিছু কম। ধনী নারীদের অনেকে ওয়েষ্ট কোটের মত এক রকমের জামা ব্যবহার করে। ইহা পরিলে তাহাদের এক রকম মন্দ দেখায় না।

প্রায় আরব রমণী হেনার দ্বারা নোখ এবং হাতের তালু রঙ করে। অনেকে আবার চুলের গোড়াতেও হেনা লাগাইয়া রঙিন করে।

আরবনারীর গয়নার বহর বড় ভয়ানক। বড় ঘরের মেয়েরা সব সোনার গয়না পরে। নাক হইতে স্ক্র

করিয়া পায়ের নোখ পর্যন্ত নানা রকমের গয়না থাকে। গরীব মেয়েরা রূপা এবং প্রবালের গয়না ব্যবহার করে। পুতির মালাও তাহারা খুব বেশী ব্যবহার করে। ভিখারী মেয়েরাও অঙ্ক-উলঙ্গ অবস্থায় একগাদা তামার বালা চুড়ি ইত্যাদি পরিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়।

সমাজে আরব রমণীর স্থান অত্যন্ত প্রাচ্য দেশ অপেক্ষা অনেক উচুতে। বিবাহ-ব্যাপারে মেয়েদের মতের যথেষ্ট দাম আছে। যাহাকে বিবাহ করিতে বলা হইবে, তাহাকেই যে বিবাহ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। মেয়ের অমতে জোর করিয়া বিবাহ হইতে পারে না। বিবাহের পূর্বে কন্ডাই তাহার স্বামীর গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সঙ্গে লোকজন উট ঘোড়া প্রভৃতি অনেক কিছুই যায়। অনেক সহরবাসী আরবরা তাহাদের পুত্রদের মক্কাভূমির বেহুইনদের সঙ্গে কিছুকাল বাস করিবার জন্ত পাঠাইয়া দেয়। ইহাতে তাহারা শক্ত এবং কষ্টসহিষ্ণু হইয়া ফিরিয়া আসে।

আসল বিবাহ-কার্য খুব সহজেই এবং অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। সহরে একজন কাজির নামক্কেই প্রতিজ্ঞা করিয়া বিবাহ পাকা করা হয়। মক্কাভূমিতে যেখানে কাজি মেলা দুফর, সেখানে কন্ডার পিতার তাঁবুর সামনে একটি ভাড়া হত্যা করিলেই বিবাহ হইয়া যায়। বরকে এই বলি দিতে হয়।

আরবদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু আজকাল বহুবিবাহ খুব কমই হয়। আরবদের মধ্যে স্ত্রী বদলের প্রথাও আছে। স্ত্রী বদল করা সম্বন্ধে ইহাদের কোন বাধা দেখা যায় না, বেশ হাসিমুখে স্বচ্ছন্দচিত্তেই তাহা করে। কিন্তু এই প্রথা সমাজের এবং দেশের পক্ষে খুব কল্যাণের নয়, তাহা বেশ সহজেই বুঝা যায়। সকল নারীই যে ইহাতে স্ত্রী হয় তাহা বলা যায় না।

স্ত্রীর সহিত বনিবনা না হইলে স্বামী তাহাকে বাপের বাড়ী ফেরৎ পাঠাইতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে স্ত্রীর বাড়ী হইতে সে যাহা-কিছু পাইয়াছে সবই ফেরৎ পাঠাইতে হয়। ভাই তাহার বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করিতে পারে; তবে ইহাতে ভ্রাতৃবধূর মত থাকা চাই।

আরবরা তাহাদের খুড়া জেঠার কন্ডাদের বিবাহ করিতে পারে। বড় ভাইএর দাবী সর্ব প্রথম। স্বামী তাহার স্ত্রীর সকল রকমের খরচ জোগাইতে বাধ্য। গরচ জোগাইতে না পারিলে স্ত্রী বিবাহ ভঙ্গ করিতে পারে। স্ত্রী যদি ঘরের বিশেষ কোন কাজ করিয়া দেয়, তাহার জন্ত স্বামীকে পয়সা দিতে হয়।

আরব পুরুষ নারীকে খুবই সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে। নারীর গভীরতম অপরাধকেও তাহারা অতি সহজেই ক্ষমা করে, তাহারা বলে—“নারী দুর্বল, পুরুষই তাহাকে পাপের পথে টানে, তাহাদের অপরাধের জন্য পুরুষই দায়ী, কাজেই তাহাদের অপরাধের বোঝা আমাদের ঘাড়েই বহন করিতে হইবে।” আমাদের দেশের নারীর স্থান কোথায় তাহার তুলনা বন্ধন। আরব জাতি অসভ্য—আমরা অনেকে তাই মনে করি।

কন্ডাকে জোর করিয়া পিতার ঘর হইতে কাড়িয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করার কথা এখনও শোনা যায়। এইরূপ বিবাহে স্ত্রী অস্থায়ী হয় না। কারণ বিবাহ হইয়া গেলে পর স্বামী স্ত্রীকে খুবই আদর এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে। তাহার সঙ্গে কাড়াকাড়ির সম্বন্ধই চিরকালের সম্বন্ধ হয় না।

আরব রমণীদের মধ্যে শিক্ষা বিশেষ নাই। খুব কম নারীই পড়িতে জানে, লিখিতে-জানা স্ত্রীলোক আরো কম। লেখাপড়াজানা যে দু'এক জন নারী আছেন তাহারা সবাই প্রায় বড় ঘরের মেয়ে। গরীব ঘরের মেয়েরা সংসারের কাজকর্ম শেষ করিয়া লেখাপড়ার সময় আর পায় না।

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

মাতৃহের শতকরা

আমেরিকার Child Welfare Magazineএ মাতৃহের নিম্ন লিখিত শতকরা নম্বরওয়ারি হিসাবটি বাহির হইয়াছে। আমাদের দেশের মায়েরা শতকরা কে কত নম্বর পাইবার যোগ্য, নিজেরাই নিজেদের পরীক্ষা করিয়া তাহা দেখিতে পারেন।

“১। শিশুর শরীরের অবাধ বৃদ্ধির জন্য পঁচিশ নম্বর।

শিশুর শরীরের ওজন বাহা হওয়া উচিত তাহার বাস্তবিক ওজন তাহা হইতে কম কি না, ইহা যদি আপনার না জানা থাকে তবে পাঁচ নম্বর কাটা যাইবে।

তার শরীরের ওজন উচিত ওজনের চেয়ে কম, অথচ যদি তার দেহ-বৃদ্ধি ভালো করিয়া পরীক্ষা করানো না হইয়া থাকে তবে দশ নম্বর কাটা যাইবে।

দেহপরীক্ষায় দৈহিক ত্রুটি ধরা পড়িয়াছে, অথচ সেই ত্রুটি নিরাকরণের উপায় অবলম্বন করা হয় নাই—এ যদি হয়, তবেও দশ নম্বর কাটা যাইবে।

২। শিশুর পারিবারিক নিয়মানুবর্তিতার জন্ত পঁচিশ নম্বর।

শিশুকে যদি বাধ্যতা শিক্ষা দেওয়া না হইয়া থাকে, তবে দশ নম্বর কাটা যাইবে।

অন্ত লোকের নিকট শিশুর নিয়মানুবর্তিতা শিখিবার পথে আপনি যদি বাধা হইয়া থাকেন তবে পাঁচ নম্বর কাটা যাইবে।

শিশুর মনে দায়িত্ব-বোধ জন্মাইতে আপনি যদি সাহায্য না করিয়া থাকেন তবে পাঁচ নম্বর কাটা যাইবে।

বিচার বুদ্ধির উপর যদি নিজের স্নেহপ্রবণতা প্রভৃতির স্থান দিয়া থাকেন তবে পাঁচ নম্বর কাটা যাইবে।

৩। শিশুর দৈনিক কাজের একটি হৃদয়বাহ্য ব্যবস্থার জন্য পঁচিশ নম্বর।

স্কুলে বা গৃহের বাহিরে অন্তত ছেলের অতিশ্রমে হায়রাণ হইয়া যাইবার হেতু কি কি তাহা যদি আপনার জানা না থাকে তবে পাঁচ নম্বর কাটা যাইবে।

আহার বিবয়ে ছেলের অভ্যাস স্বাস্থ্যকর হইয়াছে কিনা ইহা জানা না থাকিলে পাঁচ নম্বর কাটা যাইবে।

ছেলের অন্ত্যস্ত সমস্ত অভ্যাস তার স্বাস্থ্যের অনুকূল কি না ইহা আপনার জানা না থাকিলে পাঁচ নম্বর কাটা যাইবে।

তার নিত্যকর্মের ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংশোধনগুলি সমস্ত যদি না করা হইয়া থাকে, আর তার ওজন যদি তার উচ্চতার অনুপাতে কম হয়, তবে দশ নম্বর কাটা যাইবে।

৪। আদর্শ-শিক্ষার জন্ত পঁচিশ নম্বর।

বুক হাত দিয়া নিজের বিবেককে সাক্ষী রাখিয়া, যত বেশী নম্বর নিজেকে দিতে পারেন, দিতে চেষ্টা করুন। মোট পাইবার যোগ্য, এমন মায়ের অভাব নাই। যাহা আপনার সত্য দাবী, তাহা লইতে কুণ্ঠা বোধ করিবেন না।”

নারী-প্রগতি

আদালতে নারীদের উকিল, মোক্তার ও ব্যারিষ্টার হইতে এতদিন আইনের যে বাধা ছিল, বেহারের ব্যবস্থা-পরিষদ সে বাধা দূর করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর সেই প্রদেশে নারীরা ইচ্ছা করিলেই ওকালতি ও ব্যারিষ্টারী প্রভৃতি করিতে পরিবেন।

* * * *

বোম্বাইয়ের ভাটিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে শিশুমৃত্যু ও প্রসূতিদের অস্বাস্থ্যের প্রতিকারের জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থার আয়োজন হইতেছে। পুনর বিখ্যাত সেবাসদন এই কাজের ভার লইয়াছেন। ব্যয়ভার-নির্বাহ করিবেন ভাটিয়া সম্প্রদায়েরই দুইটি লোকহিত-অনুষ্ঠানের দুইজন টাঙ্গী। সেবাসদনের গুরুত্ববিভাগ হইতে দুইজন পাকা গুরুত্বকারিণী ও একজন সৌভাগ্যবান আসিয়াছেন, বোম্বাইয়ের কয়েকজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক ইহাদের কাজের সহায়তা করিবেন। গুরুত্বকারিণী ও মেয়ে-চিকিৎসকেরা বাড়ী বাড়ী

ঘুরিয়া প্রসূতি ও আসন্ন-প্রসবা, নবজাত শিশু প্রভৃতির সেবা-শুশ্রূষা ও ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া বেড়াইবেন।

* * * *

১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জাপানে রাজনৈতিক সভ্যসমিতিতে নারীদের যোগদান নিষিদ্ধ ছিল। নারীরা বহুদিন ধরিয়া বহুবার সে নিষেধ লঙ্ঘন করিয়াছেন। এতদিনে নিষেধ দূর হইয়াছে।

সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে একমাত্র টোকিওতে নারীদের ছাত্রীহিসাবে প্রবেশাধিকার আছে। জাপানের নারীরা সর্বত্র এই অধিকারের দাবী করিতেছেন।

জাপানের কারখানাগুলিতে অন্যান্য ৬ লক্ষ নারী-শ্রমজীবী কাজ করেন। সরকারী চাকরী ও ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত কাজে নারীদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। ধর্মমন্দিরগুলিতে মেয়েদের প্রধান উপাসিকা হইবার পক্ষে যে বাধা ছিল তাহাও অনেক জায়গায় অপসারিত হইয়া চলিয়াছে।

* * * *

ভিয়েনার আদালতে এই প্রথম একজন নারী ব্যারিষ্টার আইন-ব্যবসায় করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। ইহার নাম ‘ফ্রাউলিন’ মুল্জি মেইয়ার। ডবলিনের কোজদারী আদালতে ইনি কাজ শুরু করিয়াছেন।

* * * *

প্রাচীন বিধিব্যবস্থায় অষ্ট্রিয়াতে নারীদের আইন অধ্যয়ন নিষিদ্ধ ছিল, দেশে গণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে নিষেধ উঠিয়া গিয়াছে।

* * * *

‘সেনোরিতা’ কারমেন লিঅন স্প্যানিশ পাল্লামেন্টের প্রথম নারী সভাপদপ্রার্থী। মাত্রীদের একটি সম্প্রদায় কর্তৃক তিনি স্পেনের ব্যবস্থা-প্রণয়ন-পরিষদের সভ্যরূপে মনোনীত হইয়াছেন।

* * * *

হল্যান্ডের নারীদিগকে ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিবার অধিকার প্রথম দেওয়া হয় ১৯০১ খৃষ্টাব্দে। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রায় ১০০ নারী ইঞ্জিনিয়ার-প্রাজুয়েট হইয়া বাহির হইয়াছেন।

* * * *

যে-সমস্ত নারী স্ট্রেট দিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন আমেরিকায় এমন নারীদের একটি জাতীয় সম্মিলন গঠিত হইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু দেশের গণতন্ত্র এই সম্মিলনে নারী-প্রতিনিধি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দক্ষিণ আমেরিকায় পূর্বে এরূপ কোন ব্যবস্থা ছিল না। এখান হইতে যে নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন, তাহার নাম মিস মার্গারিটা কনরয়। ইনি জাতিতে ইংরেজ, কিন্তু বর্তমানে পেরুর অধিবাসী হইয়া গিয়াছেন। নারীর অবস্থা উন্নত করিতে ইনি বিশেষ সচেষ্ট।

* * * *

অন্ত দেশও যে এবিধে নিশ্চেষ্ট তাহা নহে। ক্যানাডা পাল্লামেন্টে যিনি প্রথম নারী সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন তাহার নাম মিস এ্যাগনেস ম্যাক্কেল। ইনি সর্ববিধেই খুব উন্নতিকামী। কৃষকদিগের উন্নতির জন্ত এক সমিতির তিনি সভ্য। ইহার জীবন-কথা উল্লেখযোগ্য। খোল বৎসর বয়সে গ্রাম্য জীবনের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতা ঘটে। এবং তখন হইতেই পল্লীর উন্নতি ও কৃষক

জীবনের উন্নতি তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়। পূর্ব অল্প কথায় বলিতে গেলে আয়ালগুে যেমন রাজনৈতিক সিন্ধি তিনি সেইরূপ কৃষিবিষয়ে একজন সিন্ধি।

* * * *

আমেরিকার কংগ্রেসওয়ালাদের সেখানকার নারী-সজ্জকে বিশেষ ভয় করিয়া চলিতে হয়। এই-সমস্ত নারী-সজ্জের একমাত্র কাজ মানবের হিতসাধন। নির্বাচনের সময় নারী-সজ্জ অনেক উপায়ে কাহারো ভোট বেশী করিয়া দিতে পারে আবার কাহারো ভোট পাইবার আশা একেবারে লোপ করিয়া দিতে পারে। ওয়াশিংটন সহরে এই সজ্জের কেন্দ্র আছে। কংগ্রেসের প্রত্যেক সভ্যের সমস্ত খোজ নারী-সজ্জ রাখে। কোন খবর ইহার কাছে গোপন রাখা চলে না। কোন কংগ্রেস-সভ্য কোথায় কি বলিলেন, কি করিলেন, কোন কথা রাখিতে পারিলেন না ইত্যাদি সব খবরই থাকে। একজন কংগ্রেসওয়ালার সঙ্ক্ষে নারী-সজ্জের খাতায় লেখা আছে—‘ইনি বিদ্যালয়ে ফুটবল এবং বেসবল খেলিতেন, এবং একটা সভায় ইনি একটা পাশ-হওয়া আইনকে পাশ হয় নাই বলিয়া ভুল করেন।’ কংগ্রেসওয়ালাদের সব সময়েই ভয় থাকে কখন তাঁহার এই নারী-সজ্জের বিস-নয়নে পড়েন।

কৃষ্ণভাবিনী-স্মৃতিসভায়

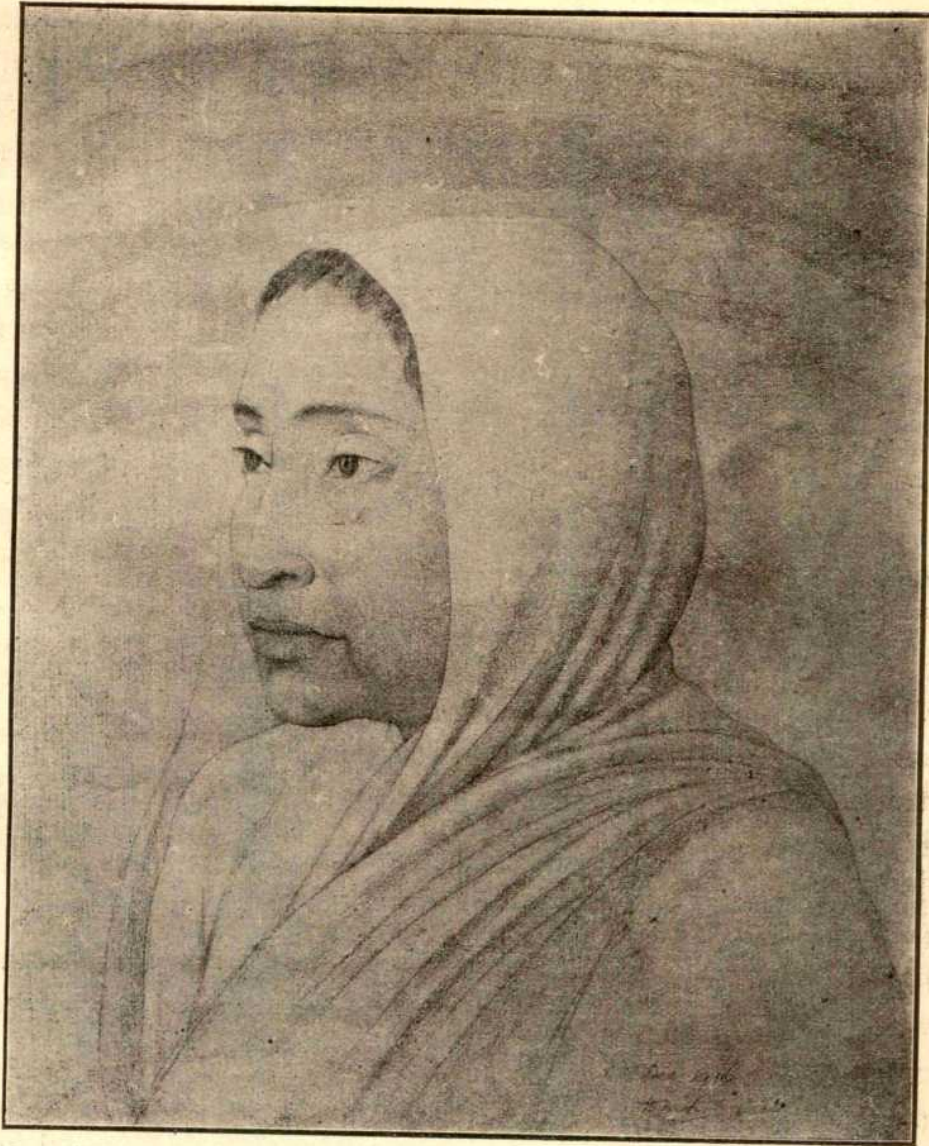
আজ যাহার স্মৃতিসভায় আমরা সমবেত হইয়াছি, সেই দেবী কৃষ্ণভাবিনী দাস চুয়াডাঙ্গার এক সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্ম-গ্রহণ করেন, ও পরে শ্রীনাথ দাসের পুত্রবধূ হন। ভবিষ্যতে তিনি যে একজন জগদ্বিখ্যাতা মহিলা হইবেন তাহার আভাস শৈশবকাল হইতেই পাওয়া গিয়াছিল। বিবাহের পর তিনি যখন দাস-মহাশয়ের গৃহে পদার্পণ করিলেন তখন তাঁহার রূপে ও গুণে সকলেই মুগ্ধ হইয়া-ছিলেন।

কিছুকাল পরে তাঁহার স্বামী দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় জ্ঞানপিপাসা বর্দ্ধনের জন্ত ও উচ্চশিক্ষা-লাভেচ্ছু হইয়া বিলাত-গমনের বাসনা করেন। তখন বিলাত-গমনের নাম শ্রবণ করিলেই সকলে ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইতেন। যাহারা বিলাতে গমন করিতেন তাঁহার জাতিচ্যুত হইয়া পিতার অবাদ্য ত্যাজ্যপুত্র রূপে পরি-গণিত ও এমন কি বিষয়সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতেন। দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়েরও সেই অবস্থা ঘটে। কৃষ্ণ-ভাবিনী দাস মহাশয়াও সমস্ত জানিদ্যা-গুনিয়াও, ঐ যে হিন্দুশাস্ত্র-মতে হাতে হাতে সঁপিয়া দিবার সময়

মা-বাবা বলিয়া দিয়াছিলেন—“পতিই দেবতা, স্বখে দুঃখে বিপদে তাঁর চিরসঙ্গিনী থেকো,”—সেই “পতিই দেবতা” এই কথা প্রাণে ইষ্টমন্ত্রের মত গ্রহণ করিয়া স্বামীর সঙ্গে বিলাত গমন করিবার বাসনা করেন। ইহাতে তাঁহার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি তাঁহাকে মধুর সান্ত্বনাবাক্য ও উপদেশাদি দ্বারা ক্ষান্ত করিতে চেষ্টা করেন। এমন কি দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ও তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্ত প্রাণপণ প্রয়াস করেন; কিন্তু কৃষ্ণভাবিনী দাস উত্তরে বলেন, “আমার সব থাক তাতে দুঃখ কি? মীতা রাজসম্পদ ত্যাগ করে’ রামের সঙ্গে বনে যেতে পেরেছিলেন আর আমি তো কোন্ ছার।”

এই সময় তাঁহার দুই বৎসরের একটি কন্যা ছিল। তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়াই তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছিল। নিজে হিন্দু-সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষা করিতে পাবেন নাই, কন্যা তিলোত্তমাকে দিয়া সে সাধ পূর্ণ করিবেন ইহাই তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল; কিন্তু বিলাত-গমনে তাঁহার স্বশুর-মহাশয় তিলোত্তমার তার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন এবং এক সম্ভ্রান্তবংশীয় ধনী যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। এই পাত্রের পড়িয়া তিলোত্তমা অত্যন্ত মনোকষ্ট পাইতেন, কিন্তু স্বামীকে ছাড়িয়া কিছুতেই যাইতে চাহিতেন না। মাতার উপযুক্ত কন্যা হইয়া নীরবে অশ্রুজল ফেলিতেন। তবুও এক মুহূর্তের জন্ত স্বামীকে ত্যাগ করিতেন না।

দশ বৎসর যাবৎ বিলাতে থাকিবার পর দেবেন্দ্রনাথ দাস যখন সস্ত্রীক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে স্নেহময় ক্রোড়ে স্থান না দিয়া ত্যাজ্যপুত্র করেন। তিনি সস্ত্রীক কখনও পৃথক বাটীতে কখনও হোটেলের থাকিতেন। তখনই তিনি কৃষ্ণভাবিনী দাস মহাশয়াকে লইয়া ট্রামে ও পদব্রজে গমনাগমন করাইয়া জীবনাবধি শিক্ষাদান করিয়া এবং বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত পরিচয় করাইয়া সঙ্কোচের ভাব-দূর করেন। এই সময়ে কৃষ্ণভাবিনী দাস নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বামীর আজ্ঞাঅবর্ত্তিনী হইয়া বিলাতীভাবে পরিচ্ছদাদি পরিধান করিতেন।



শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস ।

এই সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁহার কণ্ঠকে দেখিতে পাইতেন মাত্র। তাঁহাকে নিকটে রাখার সাধ্য তাঁহার ছিল না, কারণ তাঁহারা বিলাত-ফেরত।

এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় বরিশালে অধ্যাপকের কার্যে নিযুক্ত হন। সেখানে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই স্নেহ ও ভালবাসার দ্বারা শীঘ্রই ছাত্র ও দেশবাসিগণকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন।

এইরূপে কিছু কাল সংসার-ধর্ম করিয়া দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় পরলোক গমন করেন। তখন কৃষ্ণভাবিনী দাস অত্যন্ত নিরাশ্রয়া ও শোকে মুহুমান হইয়া পড়েন। তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান ছিল না। শ্রীনাথ দাসের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় তাঁহার গৃহে তাঁহাকে স্থান দেন।

কিছুকাল পূর্বে পাশ্চাত্য চালচলন যাহার অস্তি-

মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল, পতিবিয়োগে তিনি একেবারে সর্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী সাজিলেন। আহাৰাদি এদেশীয় হিন্দু বিধবাদিগের ন্যায় কঠিন হইতে কঠিনতর করিয়া লইলেন বটে, কিন্তু জাতিভেদ মানিতেন না।

পতিবিয়োগে তাঁহার পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহার ছয় মাসের মধ্যেই তাঁহার একমাত্র প্রিয়তমা কন্যা তিলোত্তমা পরলোক গমন করেন।

আঘাতের পর আঘাতই ক্লম্ভাবিনীর জীবন-তরীর মুখ ফিরাইয়া দিয়াছিল। তিনি আহাৰ-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অনবরত অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইতেন। কিন্তু ব্যথা-হারী তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার মনে কেবলই এই প্রশ্ন হইতে লাগিল—এক সন্তানের জন্ত যাহা পারি নাই জগতের সকল সন্তানকে বক্ষে ধরিয়া তাগ করিতে হইবে। তাহাতেই আনন্দ, তাহাতেই শান্তি। বৃথা শোক করিয়া দুর্বলতার পরিচয় দিই কেন? নারী যদি জীবনে দুঃখ কষ্ট নীরবে সহ্য করিতে না পারে তবে নারীর সার্থকতা কিসে?

তিনি হৃদয়ে বল পাইলেন, এক সন্তানকে শিক্ষা দিতে পারেন নাই, জগতে জীৱিকা বিস্তার দ্বারা সেই ক্ষোভ দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভারত-জী-মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

তাঁহার স্বামী আই-এ ও বি-এর পাঠ্য বইএর নোট লিখিতেন। সেই বইএর বার্ষিক আয় প্রায় ৩৪ হাজার টাকা ছিল। দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পিতা পুত্রবধূর গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে একখানি বাড়ী জীবনস্বত্ব লিখিয়া দেন, ইহার ভাড়াও মাসে প্রায় ৬০৭০ টাকা হইত।

স্বামীর নোট লেখার সম্পত্তি ও বাড়ী ভাড়ার ৬০৭০ টাকা—এই সকল টাকাই তিনি অনাথ ছাত্রছাত্রীদিগের বেতন ও নানারূপ সংকার্য্যে ব্যয় করিতেন। নিজের জন্ত ১০ টাকা মাত্র রাখিয়া দিতেন, ইহাতেই তাঁহার সব ব্যয় সঙ্কুলান হইত।

১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া প্রথম দিন যখন ক্লম্ভাবিনী দাসের সহিত পরিচিত হইতে গেলাম, সে যে কি মুগ্ধ দেখিলাম তাহা বলিতে পারি না। ত্যাগে

সন্ন্যাসিনী, ব্যবহারে মাতৃরূপিনী, রূপে লক্ষ্মীঠাকুরাণী, তেজে জলন্ত অগ্নি। অনেক সন্ন্যাস্ত মহিলার সহিত পরিচয় হইয়াছে, এমন আপনা হইতে মাথা তো কাহারও নিকট কখনও নীচু হয় নাই, এ যে আপনা হইতে মাথা নীচু হইয়া পড়িল। এমন প্রাণ হইতে প্রণাম আমি আর কাহাকেও কখনো করি নাই।

ছয় বৎসর যাবৎ তাঁহার সঙ্গে বসবাস করিয়াছিলাম। দিনের পর দিন যত যাইতে লাগিল ততই তাঁহাকে ভালো করিয়া চিনিতে লাগিলাম। দেবীই বটে—দেবী না হইলে যে পতিতাদের দেখিয়া আমরা ঘৃণায় মুখ ফিরাই, তিনি তাহাদের বুকে তুলিয়া লইয়া প্রাণ শীতল করিতেন। অনাথ বিধবার দুঃখ দূর করিবার জন্ত তিনি শক্তি সামর্থ্য অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন—“আমার এক সন্তান গিয়েছে, তার জায়গায় সহস্র সন্তান পেয়েছি—আনন্দময় আঘাতের ভিতর যে এত আনন্দ রেখেছেন তা জান্তাম না।” তিনি জীবনে সত্যকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধানও পাইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের ভিত্তি যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল আজও তাহার জলন্ত সাক্ষ্য রহিয়াছে।

যাঁহার বাৎসরিক আয় ৩৪ হাজার টাকা, কলিকাতার জনকোলাহলপূর্ণ নগরীতে তিনি কি প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালে, কি শীতকালে, কি বর্ষাকালে পদব্রজে কনে-বৌটির মত আপাদমস্তক দেশী মোটা চাদরে ঢাকিয়া নম্রপদে ভ্রমণ করিতেন। নিতান্ত দূরে যাইতে হইলে ট্রামে যাইতেন, কিন্তু কচিং কখনও তাঁহাকে গাড়ী চড়িতে দেখিয়াছি। বিদেশে যাইতে হইলে তিনি তৃতীয় শ্রেণী ছাড়া কখনও মধ্যম শ্রেণীতে যাইতেন না, বলিতেন—“নিজের আরামের চেয়ে ঐ টাকা যাদের প্রয়োজন তাদের দিলে প্রাণে আরাম পাই।”

তাঁহার হাত দুখানি সর্বদাই কার্য্যে লাগিয়া থাকিত। এমন কি দাসদাসীদিগকে অধিক পরিশ্রম করিতে দেখিলে তাহাদের কার্য্য নিজে ভাগ করিয়া করিতেন। ব্যথিতের ব্যথা দেখিলে তিনি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার প্রাণ ব্যথিত হইয়া উঠিত ও চঞ্চু

দুইটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিত। কি অনাথাশ্রম, কি বিধবাশ্রম, কি বন্ধুবান্ধবের বাটী, যখনই যেখানে যাইতেন তাঁহার স্বামীর প্রিয় খাণ্ডদ্রব্যাদি চাদরের নীচে লইয়া যাইতেন ও নিজের হাতে খাওয়াইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন।

তিনি নীরব কর্মী ছিলেন। তিনি আড়ম্বর ভাল-বাসিতেন না। কেহ তাঁহার প্রশংসা করিলে লজ্জায় অধোবদন হইতেন ও বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। তিনি নীরব কর্মী ছিলেন তাই নীরবে কর্ম আরম্ভ করিয়া নীরবে চলিয়া গিয়াছেন। শান্তিময় তাঁহার স্নেহকোড়ে তাঁহাকে স্থানদান করিয়াছেন। তাঁহার অমর আত্মা আজ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হউক। তাঁহার কর্মজীবনের অবসানেও তাঁহার অতিপ্রিয় মহামণ্ডলের কার্য সম্পন্ন হইতেছে। ভগবান মহামণ্ডল ও তাঁহার সম্পাদিকাকে দীর্ঘজীবী করুন—ইহাই কাম্যমনোবাঞ্ছা প্রার্থনা করি।

আজ আর তাঁহার জন্ম শোক প্রকাশ করিব না ; দেশের এ দুর্দিন নয়, সুদিন। এই নবজাগরণের মঞ্চে কৃষ্ণভাবিনীর আদর্শে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম যে যেখানে আছ জাগ। দেবী কৃষ্ণভাবিনী জন্মগ্রহণ করিয়া শুধু বঙ্গদেশে নয়, সমগ্র ভারতের ও নারীজাতির গৌরব বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন।

দেশের এই সুসময়—এস সকলে তাঁহার আদর্শে জীবন গঠন করি। পরহিতব্রত পালন করি—এই অভাগা দেশের চারিদিকে হাহাকার, দুঃখে তাপে আর্ন্তনাদে আমরা কি বধির হইয়া থাকিব ? আমরা যে নারী জাতি। নারীর কর্তব্য, নারীর ধর্ম, নারীর মাতৃত্ব, নারীকে দেবী করিবে তবেই নারীজন্মের সার্থকতা। তাই কবির সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আজ কেবল এই গাহিতে ইচ্ছা হয়—

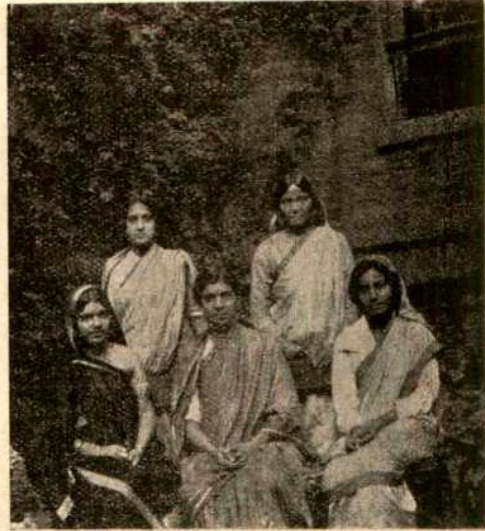
“না জাগিলে সব ভারত ললন।

এ ভারত আর জাগে না জাগে না।”

শ্রীক্ষেমস্বামী দেবী

ইউরোপ-আমেরিকায় নানাদেশের নারী ছাত্রী

জগতের আজ বিশেষ সুদিন। জগতের সর্বত্রই নারীরা সর্ব বিষয়ে আপনাদের উন্নত করিবার জন্ম উঠিয়া-



লণ্ডনে একদল ভারতীয় মহিলা-ছাত্রী। ছবির একেবারে বাঁ দিকে—মৈত্রেয়র প্রধান মন্ত্রী কন্যা। তাঁহার পরে শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী, ইহার বাঁ দী ত্রিবাঙ্কুড়ে, বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতেছেন। অষ্টাংশ সকলে ডাক্তারী পড়িতেছেন। আমেরিকার অধ্যাপক সুধীন্দ্র বসু এই ফোটোগ্রাফ পাঠাইয়াছেন।



লণ্ডনের ভারতীয় মহিলা-ছাত্রীরা টেনিস খেলিতে যাইতেছেন। আমেরিকার অধ্যাপক সুধীন্দ্র বসু এই ফোটোগ্রাফ পাঠাইয়াছেন।



• আমেরিকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে এশিয়ার ছাত্রী ।

ঊর্দ্ধ হইতে ডান দিকে—কুমারী এভা দাসগুপ্তা (ভারতবর্ষ), ক্লারা কষ্টলেক্ (জাপান), বুকি-ও-সাওয়া এবং মিংহুং দং (চীন) ।
এই ছবি একটি আমেরিকান কাগজ হইতে গৃহীত ।



অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্ট হাইন্ড্রাজ্ হলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ছাত্রীসমূহ ।

ঊর্দ্ধ দিক হইতে ডানদিকে—মিস্ রেমণ্ড (নিউজিল্যান্ড), মিস্ এ্যানার (অষ্ট্রেলিয়া),
মিস্ লব্ এবং মিস্ মার্ল্যাণ্ড (ক্যানাডা), মিস্ এ্যাস্পেন (দক্ষিণ আফ্রিকা)
এবং কুমারী কমলা সরকার (ভারতবর্ষ) । এই ছবি Lectures Pour
Tous নামক ফরাসী কাগজের ১৯২২ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা হইতে গৃহীত ।

পড়িয়া লাগিয়াছেন । স্বাধীন দেশ-
সমূহে এ চেষ্টা খুবই অগ্রসর, এমন
কি পরাধীন দেশেও নারীরা আপনা-
দের আত্ম-বর্ধাদা বৃদ্ধিত করিতে-
ছেন । বৃদ্ধিতে এবং শক্তিতে তাঁরা
যে পুরুষের সমকক্ষ তার যথেষ্ট পরিচয়
পাওয়া যাইতেছে । একদিন ছিল
যখন এশিয়া জ্ঞান-গরিমায় জগতের
শিক্ষাদাত্রীর আসন গ্রহণ করিয়া-
ছিল । আজ পশ্চিম জ্ঞানদাতা ।
পশ্চিমের জ্ঞান-মন্দিরে এশিয়ার যে-সব
নারী জ্ঞান আহরণ করিতে গিয়াছেন
তাঁদের কয়েকজনের ছবি আমরা
ছাপিলাম ।

ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের সম্পাদিকার নিবেদন

আজকার দিনে স্ত্রীশিক্ষা আবশ্যক, এ কথা বনিবার আর কোন প্রয়োজন নাই। আমরা প্রতিদিনের জীবনে এই শিক্ষার অভাব এত অধিক অনুভব করিতেছি যে এই কর্তব্য কত সত্তর স্বচাকুরূপে ক্রমে অগ্রসর করিতে পারি তাহাই ভাবিবার বিষয়। ছুটিফের দিনে মানুষ যাহা পায় তাহাই গলাধঃকরণ করে, তাহাতে সর্বাপেক্ষা প্রধান আবশ্যক প্রাণধারণ সম্ভবপর হয়; কিন্তু দারুণ অভাবের দিন যখন অতীত তখন যেমন আহাৰ্য্য সম্বন্ধে আমরা সাবধান হই এখন শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অর্ধ শতাব্দীরও উর্দ্ধকাল এদেশে পুরুষ-পরিচালিত স্ত্রীশিক্ষা চলিয়া আনিতেছে—ইহাতে আমাদের অনেক অভাব দূর হইলেও অনেক অভাবের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টিমাত্র পতিত হয় নাই। তাঁহারা এ কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন আপন সুবিধার জন্ত—আমরা এখন ইহা চাহিতেছি নিজস্ব শক্তির বিকাশের জন্ত—স্ত্রী এবং পুরুষে যে বৈশিষ্ট্য বিধিদ্ভূত, তাহা রক্ষা না করিলে তাহা অশিক্ষা না হইলেও কুশিক্ষায় পরিণত হয়। কাজেই শিক্ষা যে-ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল, এখন আর সে ভাবে চালানো চলিবে না; পরীক্ষা পাস করিয়া যে বিদ্যালয় হয় তাহাতে আমাদের অভাব পূরে না, অনেক শিখিবার বিষয় পরে শিখিতে হয়, তাহাতে জীবনের সামঞ্জস্য হয় না। স্ত্রীশিক্ষা ও শিশুশিক্ষার ভার মাতৃজাতিকেই লইতে হইবে। এই অভাব পূরণের জন্ত প্রাথমিক শিক্ষা ও অন্তঃপুর-শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে আমাদের।

আজ দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল এই ভার গ্রহণ করিয়া দেশের সহায়তায় অগ্রসর হইয়াছে। অনেক ক্রটিপূর্ণ ও বহু অভাবগ্রস্ত হইলেও এই কাজটির একমাত্র গৌরব—ইহা সম্পূর্ণ নারীশক্তিপরিচালিত। ইহার বিস্তার এবং শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণের আগ্রহ দেখিয়া আশা হইতেছে শ্রামলা বঙ্গভূমির বৃক এই যে ক্ষুদ্র বীজটি রোপিত হইয়াছিল, আজও যাহা অঙ্কুরের দ্বায় ক্ষীণ দুর্বল ও স্বকুমার তাহা একদিন মহীকূলে পরিণত হইয়া ছায়া,

আশ্রয়, ফুল-ফলদানে দেশকে নন্দিত করিতে পারিবে। আজ আমি ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের সেবিকারূপে আপনাদের সকলের সাহায্য ও সহায়ভূতি ভিক্ষা করিতেছি। মনে নিশ্চিন্ত আশা পোষণ করি যে কখনই বঞ্চিত হইব না। বর্তমানে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের অধীনে তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। পূর্বে দুইটি ছিল, গত বৎসর চৈত্রের প্রথমে মির্জাপুর স্টাটে একটি নূতন শাখা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রথম দিনে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫টি, এখন অন্যান্য ৫০টি। শিয়ালদহ কৃষ্ণভাবিনী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ডিসেম্বর মাসে ৭০টি এবং বহুবাজার কৃষ্ণভাবিনী বিদ্যালয়ে গত বৎসরের শেষে ছিল ৬৫টি। মির্জাপুর স্কুলে দুইজন এবং শিয়ালদহ ও বহুবাজার বিদ্যালয়ে তিনজন করিয়া শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত আছেন। ভবানীপুরে অন্তঃপুর-শিক্ষা-বিভাগে ৭জন ও কলিকাতা অন্তঃপুর-শিক্ষা-বিভাগে ৫জন শিক্ষয়িত্রী শিক্ষা কার্য পরিচালনা করেন। ভবানীপুরের অন্তঃপুর-ছাত্রীর সংখ্যা ৪০ আর কলিকাতা অন্তঃপুর-বিভাগের ছাত্রী-সংখ্যা ৪৫টি। বৎসরে দুইবার করিয়া স্কুলে ও অন্তঃপুরে পরীক্ষা করা হয় এবং যোগ্যতা অনুসারে পারিতোষিক ও পদক প্রভৃতি দিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠের উৎসাহ বাড়াইবার চেষ্টা করা হয় এবং এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নীত করিয়া পুস্তক পরিবর্তন করা হয়।

তিনটি স্কুল ও দুইটি অন্তঃপুর-শিক্ষা-বিভাগ ব্যতীত ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের নিজস্ব একটি শিক্ষয়িত্রী-ভবন আছে। তাহার ব্যয় কতক ব্যাকহিত টাকার হৃদ হইতে ও কতক ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের আয় হইতে পূরণ করা হয়। সকলপ্রকার ব্যয়, বিশেষতঃ গাড়ীভাড়ার ব্যয় এত অধিক হইয়া পড়িতেছে যে কোনরূপ ব্যয়-সঙ্কোচ না করিলে সমিতির বিশেষ কার্যহানির সম্ভাবনা। তাই সাধারণের নিকট এই আশ্রম রক্ষা করিবার নিমিত্ত সাহায্য প্রার্থনা করি—বিনি যাহা দান করিবেন প্রদান সহিত গৃহীত হইবে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী



প্রকৃতির পাঠশালা

ব্রটিং কাগজে কালী চোমে কেন ?

ব্রটিং কাগজের আঁশ ছাড়া ছাড়া, আঁশের মাঝে মাঝে ফাঁক থাকে, তাতে কাগজে অসংখ্য ছিদ্র হয় ; সরু ছিদ্রের মুখের সঙ্গে তরল কালী ঠেকাঠেকি হইবামাত্র কৈশিক-আকর্ষণে কাগজের ছিদ্রের মধ্যে কালী শুষিয়া যায়। কেশ বা চুলের গ্রায সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে আপনা হইতে জল আকৃষ্ট হয়, তাকে কৈশিক-আকর্ষণ বলে।

*

বৃদ্ধ গোল হয় কেন ?

জলের অতি পাতলা আবরণে যখন বাতাস বাঁধা পড়ে তখন হয় বৃদ্ধ ; পাতলা তরল আবরণের স্বাভাবিক একটা সঙ্কোচন-প্রবণতা (tension) থাকে ; তার জন্ত বৃদ্ধটি সব চেয়ে সম্ভব ছোট আকার ধারণ কবিবার চেষ্টা করে ; বৃত্তাকার হইতেছে বস্তুর সব-চেয়ে ছোট আকার ; কাজেই বৃদ্ধ বৃত্তাকার বা গোল হয়।

*

সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সময় আকাশে নানা বর্ণবিজ্ঞাস
হয় কেন ?

সূর্য্যের আলোক শাদা ; শাদা রং বহু বর্ণের সমাবেশে হয়,—শাদা রঙের মধ্যে মোটামুটি সাতটি রং মিশ্রিত থাকে—বেগুনী, নীল, আম্রমামী, সবুজ, হলদে, কমলা, লাল। শাদা আলো যদি খুব ছোট কোনো ফুটোর মধ্য দিয়া যায়, অথবা একটা তেশিরা কাঁচের মধ্য দিয়া যায়, তবে সেই শাদা আলো সাত রঙে ভাঙিয়া ছড়াইয়া পড়ে। সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সময় সূর্য্যের শাদা আলো তেরুছা হইয়া বায়ুস্তর ভেদ করিয়া আসে ; এবং ছুপ্রহরে আকাশের মাধ্যম সূর্য্য থাকাতে সূর্য্যালোক খাড়া নাগিয়া আসে ;

খাড়া সূর্য্যালোককে যতখানি গভীর বায়ুস্তর ভেদ করিতে হয়, তেরুছা সূর্য্যালোককে তার চেয়ে গভীরতর বায়ুস্তর ভেদ করিতে হয় ; গভীরতর বায়ুস্তর ভেদ করিবার সময় শাদা সূর্য্যালোক বাতাসের মধ্যকার ধূলি ও জলবাশ্পে ধাক্কা লাগিয়া সাত রঙে ভাঙিয়া ছড়াইয়া পড়ে এবং আকাশে বিবিধ বর্ণের বিজ্ঞাস হয়।

*

পরিশ্রম করিলে লোকে হাঁপায় কেন ?

মানুষ নিশ্বাসে যে বাতাস গ্রহণ করে, তাহার মধ্যকার অক্সিজেন গ্যাস তার রক্তকে ক্রমাগত তাজা করিতে থাকে ; রক্ত যত তাজা থাকে মানুষের শক্তি তত বেশী থাকে। পরিশ্রমের সময় শক্তি ব্যয় হয় ; কাজেই রক্তের মধ্যে বেশী অক্সিজেন গ্যাসের অভাব ঘটে, চাহিদা হয়, এবং ফুসফুস ঘনঘন বিস্ফারিত প্রস্ফারিত হইয়া নীচ মুখ দিয়া ক্রমাগত বাতাস শোষণ করিতে থাকে ; আর লোকে হাঁপাইতে থাকে।

*

সমুদ্রের তলার জলের তাপ।

প্রায় সকল জিনিসই ঠাণ্ডা লাগিলে সঙ্কুচিত হয় এবং সঙ্কুচিত হইলেই বস্তুপিণ্ড ঘন হয়। জল শীতল হইলে ঘন হইতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার তাপ শতভাগিক (সেন্টিগ্রেড) ৪ ডিগ্রিতে গিয়া পৌঁছে ; তার পর জল যত বেশী ঠাণ্ডা হয় তত বিস্ফারিত হইতে থাকে যে পর্যন্ত না শূন্য ডিগ্রিতে পৌঁছিয়া জমাট বরফ হইয়া যায়। যে বস্তু যত ঘন তাহা তত ভারি এবং তাহা তত তলায় পড়ে। সমুদ্রের জলরাশির বিরাট চাপে তার তলার জল সব-চেয়ে ঘন হয়, এবং জলের সবচেয়ে ঘন অবস্থার তাপ যখন শতভাগিক ৪ ডিগ্রি, তখন সমুদ্রতলের জলের তাপ ৪ ডিগ্রিই হইয়া থাকে।



খুকীর বাগান
শ্রীশক্তি দেবী কর্তৃক অঙ্কিত

বুষ্টি হয় কেন ?

বাতাস গরম হইলে হাঙ্কা হয়; হাঙ্কা জিনিস উপরে ভাসিয়া উঠে। কোথাওকার বাতাস গরম হইয়া উঠিলে উপরে উঠিয়া যায়; সেই বাতাস যদি জলবাষ্পে ভরা থাকে, আর উপরে উঠিতে গিয়া কোনো ঠাণ্ডা বাতাসের স্তরের সংস্পর্শে আসে, তাহা হইলে বাতাসের মধ্যকার ধূলিকণার গায়ে জলবাষ্প জমিয়া জল হয়; যদি বেশী ঠাণ্ডার ফলে অণুপরিমাণ জলবিন্দুগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া বড় বড় ফোঁটায় পরিণত হয় এবং বাতাসের ধারণের পক্ষে অধিকতর ভারী হইয়া পড়ে, তবে ফোঁটা ফোঁটা বুষ্টি পড়িতে থাকে; ফোঁটার পর ফোঁটা ক্রমাগত ও দ্রুত নামিতে থাকিলে ধারা-বর্ষণ হয়।

বৈজ্ঞানিকেরা এইসব কারণ-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কৃত্রিম উপায়ে বুষ্টি করানো সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন।

*

বিদ্যুৎ ও বজ্র

বৈজ্ঞানিক প্রবাহের চক্রপথের মধ্যে যদি একটু ছেদ করিয়া ফাঁক করা যায়, তবে তারের এক মুখ হইতে বিদ্যুৎ-ক্ষুণ্ণ ছুটিয়া বাহির হইয়া তারের অপর মুখে গিয়া লাগে। বাতাস সর্বদাই বিদ্যুতে ভরা থাকে; অতুল্য অবস্থার স্বযোগ পাইলেই বাতাসের বিদ্যুৎ এক স্থান হইতে অপর স্থানে লাফাইয়া গিয়া পড়ে; তখন আমরা বিদ্যুৎক্ষুরণ দেখি। যখন বাতাস ভেদ করিয়া বিদ্যুৎ ছুটে, তখন অনেকখানি বাতাস ধাক্কা খাইয়া ছুপাশে সরিয়া যায়; বিদ্যুতের ঝাঁপ খাওয়া শেষ হইবামাত্র সেই ঠেলা বাতাস হঠাৎ ছাড়া পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ফাঁক ভরাট করে এবং সেই চেষ্টায় বাতাসের ধাক্কা যেন শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাকে আমরা বলি বজ্রধ্বনি।

*

গরম লাগিলে লোকে বাতাস করে কেন ?

গরম লাগিলে গায়ে ঘাম হয়। ঘাম যদি তাড়াতাড়ি শুকাইয়া দেওয়া যায় তবে ঘাম শুকাইবার সময় শরীরের তাপ অনেকখানি শোষণ করিয়া লইয়া যায়। ঘামের উপর শুষ্ক বাতাস ক্রমাগত লাগিতে থাকিলে ঘাম

চটপট শুকায় ও শরীরের তাপ অনেকখানি শোষিত হওয়ায় শরীর ঠাণ্ডা বোধ হয়। কিন্তু বাদলা বা মেঘলা দিনে বাতাসের মধ্যে জলো বাষ্প প্রচুরভাবে পরিপূর্ণ থাকে বলিয়া বাতাস করিলেও ঘাম শুকায় না, এবং তখন আমরা বলি দিনটা গুমোট করিয়া আছে।

*

লুচি-কুটির ময়দা ঠাসার কি দরকার ?

যদি লুচি-কুটির ময়দা না ঠাসিয়া লুচি কুটি ভাজা যায়, তাহা হইলে লুচি কুটি চিমুড়ে শক্ত হয়। জল-মাখা ময়দা ঠাসিলে ক্রমাগত উপরের ময়দা নীচে ও নীচের ময়দা উপরে উঠা নামা করিতে থাকে ও ময়দার পরতে পরতে বাতাস বন্ধ হইয়া বাইতে থাকে; বাতাস-ভরা ময়দার লেচি বেলিয়া লুচি কুটি ভাজিলে গরম লাগিয়া বন্দী বাতাস বিক্ষারিত হয় এবং তার ফলে লুচি কুটি কোলে, পরতগুলি পাতলা হয় এবং পাতলা বাতাস-ভরা লুচি-কুটি মুড়মুড়ে হয়। পাউরুটি তৈরি করিতে ময়দার মধ্যে baking powder বা yeast যোগ করে; বেকিং পাউডারে জল পড়িলে সেই পাউডারের টাটারিক এসিড ও সোডিয়াম এসিড কার্বনেট মিলিয়া ময়দার মধ্যে কার্বন-ডায়োক্সাইড ছাড়িতে থাকে, এবং ময়দা সেই গ্যাসে পূর্ণ হইয়া থাকে বলিয়া পাউরুটি ফোঁপরা বহুছিদ্রল হয়; ইয়েষ্ট বা খমীর যোগ করিলেও এইরূপ কার্বন-ডায়োক্সাইড নির্গত হয়। জিলিপি অমৃতীর গোলাব মতোও এইরূপ বাসী দইএর খমীর যোগ করিয়া জিলিপির নল ফাঁপানো হয়।

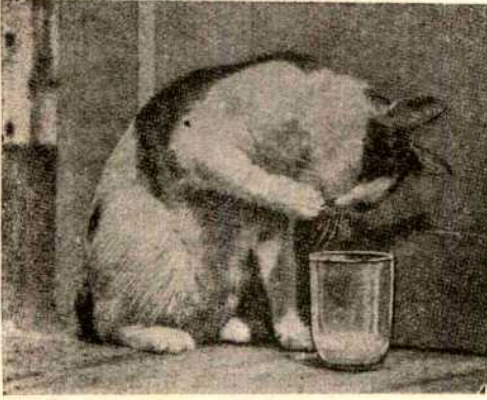
সদ্বার পোড়ো

ভালুকের বাচ্চা

প্যারিসে এক ভদ্রলোকের ছুটি ছোট ছোট ভালুক-বাচ্চা আছে। স্ত্রী ভালুকটি সাইবেরিয়ার এবং পুরুষ ভালুকটি আমেরিকার। বাচ্চা দুটি দেখিতে কুকুর-বাচ্চার মত। এই বাচ্চা-দুটির প্রত্যেকটির জন্ম ১০,০০০ করিয়া দাম উঠিয়াছে।

অদ্ভুত বিড়াল

আমেরিকার উত্তর উইস্কনসিন প্রদেশে এক ভদ্র-লোকের একটি বিড়াল আছে। এই বিড়ালটির খাইবার



বিড়াল খাবায় করিয়া দুধ খাইতেছে।

ধরণ-ধারণ মোটেই পশুর মত নয়। সে বাটিতে মুখ ঢোকাইয়া জিব দিয়া দুধ খায় না। খাবা দিয়া দুধ তুলিয়া মুখে দেয়। ইহাতে সময় কিছু বেশী লাগে, কিন্তু দুধ এক ফোঁটাও পড়িয়া থাকে না। জন্মের পর হইতেই সে এমনি ভাবে খায়।

কাঠের বই

সিংহলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাঠের বই



কাঠের বই লইয়া ছোট ছেলেমেয়ে পাঠশালার পথে।

পড়ে। কাঠের প্লেটের উপর রঙে পাঠ লেখা থাকে—সেই পাঠটি পড়বার মুখস্থ হইলে এবং সে তাহা বার-দুয়েক ঠিক মত বলিতে পারিলে, গুরুশায় রঙের লেখা তুলিয়া আবার নূতন পাঠ লিখিয়া দেন। ইয়োরোপে মুদ্রায়ন্ত্রের প্রচলনের পূর্বে এই পদ্ধতিতে পাঠ দেওয়া হইত। তবে কাঠের পরিবর্তে টিন ব্যবহার হইত। অক্ষর লিখিয়া তাহা মুছিয়া যাইবার ভয়ে শিঙের পাতে ঢাকিয়া দেওয়া হইত। ইহাকে “শিক্ষা-পুস্তক” বলা হইত।

হেমন্ত

বর্ষায়

ঘুটঘুটে কালো মেঘ, দেখে' লাগে ডর ;
এমন সময়ে বাছা ছেড়ে না 'ক ঘর।
ধোপে-থাপে কোলা ব্যাঙ, ঝোপে-ঝোপে সাপ,
দেখে' চম্কাবে পিলে, মরে' যাবে বাপ।
বিট্কেল আঁধারে ভুতগুলো পিল্পিল্প
সঁাতসঁাতে ভোবা ছেড়ে তালগাছে কিল্বিল।
সারাদিন বিছানায় ছেলেদের দুড়দুড়,
ছঁকো রেখে হাঁক দেয় ঘনশ্যাম পোন্ধর।
হেনকালে ও-পাড়ার ঢাঙ্গা তেলি প্যালারাম
গুটিগুটি চলে পথে, ভয়ে ডাকে রামনাম।
বাঁধ-পাড়ে মামদো—ভূত বড় বেয়াড়া,
কাঁচা ফল কেড়ে খায়—আম ডাব পেয়ারা,
ছোট ছেলে দেখে যদি নাকে দেয় খামচে,
থুথুড়ো বুড়ো পেলে দেয় মুখ ভাঙ্চে।
বাবলার গাছগুলো—ডাল তার পটুকা,
হাড়গিলে ভূত বলে' মনে লাগে থটুকা।
নদীপারে শরবনে বিহ্ব্যৎ দম্কায়ে,—
জান্নার ফাঁকে দেখি—তাও পিলে চম্কায়ে।
বাবুদের পোড়ো বাড়ী রাস্তার বাঁ-ধারে,
ছতুম-পেঁচার ডাকে থমথমে আঁধারে।
বাঁশবনে ফুস্ফাস্—বাতাসের ধাক্কায়ে,
কঞ্চিতে কঞ্চিতে শাঁকচুনি পাক খায়।
ওধারে যেয়ো না বাবা জ্বলপিতে ধরবে,
ভরা সাঁঝে কেন বাপু বাঁশঝোপে মরবে ?

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

শেয়াল কেন ‘হুকা হুকা’ করে

(সাঁওতালি গল্প)

— তিল-সংক্রান্তির দিন সাঁওতালরা ভাল খাওয়া-দাওয়া করে’ দল বেঁধে জঙ্গলে শীকার করিতে বেরায়। ঐ হ’ল ওদেব উৎসব। একবার এই তিলসংক্রান্তির দিন একদল সাঁওতাল শীকার করবার জন্তে একটা প্রকাণ্ড জঙ্গলে ঢুকেছে। এখন সেই বনে ছিল মস্ত এক বাঘ; সে দেখলে—গতিক ভাল নয়, এখানে বেশীক্ষণ থাকলেই সাঁওতালদের তীর তার পেট এ-ফোড় ও-ফোড় কবে’ ফেলবে। এই ভেবে সে পালাবার পথ খুঁজতে লাগল।

সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা রাস্তা ছিল। এক কাঠুরিয়া কাঠ কেটে তার গরুর গাড়ীতে বোঝাই করে’ সেই রাস্তা দিয়ে রোজ বাড়ী কিরে যেত। সে-দিনও বেচারা তার গাড়ী হাকিয়ে বাড়ীর পথে চলেছে, এমন সময় বাঘ হাঁপাতে হাঁপাতে তার কাছে এসে বলল—“কাঠুরে ভাই, কাঠুরে ভাই, আজ আমাকে তুমি বাঁচাও। সাঁওতালরা দেখতে পেলে এখনি আমায় সাবাড় করে’ ফেলবে। আজ যদি তোমার রূপায় প্রাণে বাঁচতে পারি — তবে কোনো দিন তোমাব অনিষ্ট ত করবই না, বরং চিরদিন তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।”

কাঠুরিয়া গরীব হলেও তার প্রাণটা ছিল বড় ভাল। অস্ত্রের ছঃখে তার প্রাণ কাঁদত। সে তাড়াতাড়ি একটা থলির ভিতর বাঘকে ভরে’ ফেলল আর আশ্বাস দিয়ে বলল—“বাঘ ভাই, তোমার আর কোনও ভয় নেই।”

শীকার শেষ করে’ সাঁওতালরা সেই পথ দিয়ে নিজের নিজের গ্রামে চলে’ গেল; থলির ভিতর যে বাঘ আছে তা তারা জানতেই পারল না।

তারা চলে’ গেলে কাঠুরিয়া থলির মুখ খুলে দিল, আর অমনি বাঘ বেরিয়ে এসে চোখ-ছুটো লাল করে’ বলল, —“আগে তোকেই খাই কি আগে গরু-ছুটোকেই খাই?”

কাঠুরিয়া বেচারা ত হতভম্ব। সে কাঁপতে কাঁপতে বলল—“সে কি ভাই, উপকারের প্রতিদান কি এই?”

বাঘ দাঁত কড়মড় কবে’ বলল—“নিশ্চয়, জিজ্ঞেস কর-না এই বটগাছকে।”

সেখানে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল, সে সমস্তই দেখেছিল। সে বলল—“ভাই, উপকারীর উপকার কেউ কবে না, এই দেখনা মানুষে আমার ছায়ায় বসে আবার আমাবই ভাল কেটে নিয়ে যায়।”

বাঘ বলল—“কেমন কাঠুরিয়া, এইবার তাকে খাই?”

কাঠুরিয়া আর কি বলবে? সে বেচারা পাড়িয়ে পাড়িয়ে ঠক্কট কবে’ কাঁপতে লাগল।

এমন সময় সেখান দিগে যাচ্ছিল এক শেয়াল। বাঘ বলল—“আচ্ছা এই শেয়াল-মামা যা বলবে তাই হবে।”

শেয়াল এসে সমস্ত কথা শুনল, তারপর ঘাড় নেড়ে বলল—“উহু, ব্যাপাবটা আমি নিজের চক্ষে না দেখলে কিছুই বলতে পারব না। বাঘকে আবার সেই থলির মধ্যে ঢুকতে হবে।”

বোকা বাঘ অমনি থলির মধ্যে গিয়ে ঢুকল, আর শেয়াল আচ্ছা করে’ তার মুখ বন্ধ করে’ দিয়ে কাঠুরিয়াকে বলল—“জায় বিচার যদি চাও তবে শীগ্গির বড় দেখে’ একটা মুণ্ডর নিয়ে এস।”

এতক্ষণে কাঠুরিয়ার আবার সাহস কিরে এসেছে। সে একটা প্রকাণ্ড মুণ্ডর এনে ধাঁই ধাঁই করে’ সেই থলির উপর এমন মাঝ দিল যে বাঘ একেবারে ছাত্ত হয়ে গেল।

তাবপর কাঠুরিয়া শেয়ালকে বলল—“ভাই, তোমাব উপকারের কথা আমাব চিরকাল মনে থাকবে। আজ থেকে তুমি আমাব বন্ধু—আর এই বন্ধুত্বের চিহ্নরূপ তোমাকে তোমাক খাবার জন্তে একটা হুকা উপহার দেব।” এই বলে’ কাঠুরিয়া বাড়ী চলে’ গেল।

শেয়াল সেই দিন থেকে হুকার অপেক্ষায় বসে’ রইল, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই কাঠুরিয়ার সঙ্গে তার আর দেখা হয় নি। তাই যখনই তার হুকার কথা মনে পড়ে তখনই ডাকে—“কই হুকা, হুকা, হুকা।”

শ্রীমুনির্দাল বসু

সপ্তে ব্রত

দিনাজপুর জেলার বিশেষতঃ রাইগঞ্জ থানার অন্তর্গত হাড়ী জাতীয় মেয়েরা প্রতিবৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমার পর কৃষ্ণা দ্বিতীয়াব দিন একটা ব্রতাহুষ্ঠান করিয়া থাকে, এই ব্রতকে ইহারা সপ্তে ব্রত বলে। আমার বিশ্বাস, শক্তি বা সতী ব্রত হইতেই সপ্তে ব্রত নাম হইয়াছে। ব্রতের পূর্বদিন মেয়েরা সংযম করিয়া ব্রতের দিন উপবাস করে এবং দুপ্রহরের পর্ব হইতেই যথাসম্ভব সাজসজ্জা করিয়া কোন এক নির্দিষ্ট বাড়ীতে আসিয়া সকলে মিলিত হয়। ব্রতের কথা শ্রীবৎস-চিন্তার উপাখ্যান। এই উপাখ্যানটি একটি বর্ষীয়সী নারী দ্বারা কথিত হয়। এবং ইহার সম্মুখে একটি ঘট স্থাপন করিয়া মধ্যে মধ্যে কথার বিরাম-কালে ঘটোপরি পুষ্পাঞ্জলি অর্পিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্রতচারিণী মেয়ে কলা কেশুর প্রভৃতি ফলমূল আনিয়া ঘটের চতুর্দিকে রাখিয়া দেয়। কথা শেষ হইলে কথয়িত্রী মেয়েটি প্রত্যেকের হাতে এক গুচ্ছ করিয়া ভোরা রাখী বাঁধিয়া দিয়া থাকে। ইহাদের বিশ্বাস এই ব্রত-স্থানে মানত করিলে বা বর প্রার্থনা করিলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। ভোরা বাঁধার পর সমবেত নারীগণুলী মিলিত-কণ্ঠে সঙ্গীতালপ করিয়া থাকে। সর্বসাধারণের পাঠের জন্ত ইহাদের কয়েকটি সঙ্গীত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সপ্তে ব্রতের গান

(১)

হাতে সবে বাজুবন, গলায়ে সবে ঢোলনা,
আজু দিনে চন্দনে ঢালবি এগেনা * ।
হামে নাই জানি রে সপ্তে মাঘের এগেনা,
আজু দিনে চন্দনে ঢালবি এগেনা। ইত্যাদি

(২)

খেলা খেলাইতে হারাইয়া গেল কোটরা,
ছাইবে দেহ * জালুয়া হে ভাইয়া ।
ও মোব সোনার কোটরা ।

(৩)

ইজুবন্ত শশুবালা গে বিজুবন্ত তোর নেইর গে,
কিসের লবে * মা এলেন মানবী-কুল গে ।
চন্দনের লবে মা এলেন মানবী কুল গে ।
ধূপের লবে সিন্দূরের লবে ফুলের লবে মা এলেন ।
ইত্যাদি ।

এখন এই হাড়ী জাতি সম্বন্ধে দুইটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহারা মৎস্য বিক্রয় করে, কিন্তু মৎস্য ধবে না। বিবাহ পূজা পরবে বাজনা বাজায়। কেহ কেহ বাঁশের চাটাই পাখা প্রভৃতি প্রস্তুত করে। ইহারা মুবদাফরাস জাতীয় হাড়ী বলিয়া বোধ হয় না। ইহাদের জাতীয় উপাধি কেহ কেহ হাজরা, সর্দার বলিয়া থাকে। অনেকের আক্ষরিক বিষ্ঠাও আছে। অনেকেরই বাড়ী-ঘর বেশ পরিষ্কার। ইহারা হরিনাম ভালবাসে। তুলসী-বেদী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। মাংস-ভক্ষণ ইহাদের পক্ষে নিষেধ। মেয়েদের মধ্যেও অনেকে বেশ গান গাইতে পারে।

* এগেনা = আসিলা ।

ছাইবে দেহ = খুঁজিয়া দাও ।

লবে = লোভে ।

হারাইয়া = হারাইয়া ।

শ্রীরামহুলাল বিদ্যা নথি

রাজা

কহিলেন বাদশাহ উজিরে তাঁহার,
'খোদা না পাবেন যাহা হেন কিছু কাজ,
করিতে পারার শক্তি আছে কি আমার ?
ঠিক না কহিলে তব মাথা যাবে আজ !'

কণেক ভাবিয়া নিবা কহিল উজির,
'আছে হেন কাজ প্রভু আছে হেন কাজ,
নিজ রাজ্য হতে কোন প্রকারে বাহির
করিতে পারে না খোদা, পার মহারাজ ।'

শ্রীহরিকৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায়



শূদ্র

ঐক্যাক্ষর ঐযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় শূদ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে গত পৌষ সংখ্যা প্রবাসীতে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাব সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি বক্তব্য আছে। তাঁহাব ব্যুৎপত্তি এইরূপ—শূদ্র > শূ > শু > শূদ্র।

প্রথম কথা ঐ বিবৃতি হইয়া বৈদিক যুগে (শূদ্র বৈদিক যুগের শব্দ) য হইতে পাবে কিনা। শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন আবেস্তায় ঐ স্থানে য হয়। কিন্তু আবেস্তায় শব্দতত্ত্ব (phonology) যে বৈদিক ভাষাও খাটিবে তাহাব প্রমাণ কি? প্রকৃত প্রস্তাবে মূল হিন্দু-ঐরাণীয় শ-স্ ও ক-স্ হইতে বৈদিকে ও সংস্কৃতে কৃ- (= ক) হইয়াছে। কিন্তু আবেস্তায় মূল শ-স্ স্থানে ব্, এবং মূল ক-স্ স্থানে খ-স্ হয়।* এই নিয়মানুসারে মূল হিন্দু-ঐরাণীয় *কৃহ্র হইতে আবেস্তায় ধ্বজ (কৃহ্র নহে) এবং বেদে কৃ (= ক) হ্র হইয়াছে† এবং মূল √*শ্চি, *মশ্চ, *দশ্চিন স্থানে বৈদিক, ক্ষি, মক্, দক্ষিণ এবং আবেস্তায় যি, মোয়, দযিণ হইয়াছে।‡ যদিও পঞ্চাবী ও আধুনিক পারসীতে মূল শ-স্ ও ক-স্ উভয়স্থানে ব্ (শীন) হয়; কিন্তু তাহা দ্বিতীয় স্তরের নব্য শব্দ-বিকার। প্রাচীন আবেস্তায় তাহাব কিংবা প্রাচীন পারসীতে এইরূপ দেখা যায় না। প্রাচীন ঐরাণীয় ভাষায় শ-স্ ও ক-স্ স্থানে য্, (বা শ্) হইলেও (যদিও ক-স্ > য্ হইবার কোন প্রমাণ নাই), প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় ঐরূপ বিকার না হইতেও পারে। ভারতীয় ভাষাব প্রমাণ হলে শাস্ত্রী মহাশয় ক্ষিপ্ৰা স্থানে শিপ্ৰায় দৃষ্টান্ত দিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে মারাতী প্রভৃতি ভাষাব ঐ স্থানে স হয় এবং বেদে স স্থানে শ হয়। এই প্রমাণ সম্ভবজনক মনে হইতেছে না। প্রথমতঃ, ক্ষিপ্ৰা > শিপ্ৰা সম্ভবজনক। ইহা সাধারণ ব্যুৎপত্তি (popular etymology) মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, মারাতী প্রভৃতির শব্দবিকার তৃতীয় স্তরের আধুনিক রূপ—বৈদিক কৃ > প্রাকৃত ছ > মাণ্ডী স। মাণ্ডী ভাষায় তালব্য বর্ণের উচ্চারণ (তালব্য স্বর যুক্ত না হইলে) দন্ত-তালব্য।§ এই দন্ত সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছ স্থানে দন্ত তালব্য tsh দিয়া স (এবং তালব্য স্বরের সহিত শ) হওয়া মাণ্ডীর একটি লক্ষণ; যথা, সং.

* Macdonellএব Vedic Grammar § ৩৪ ১।

† এ § ৩৪.১ b এবং Pischelএব Grammatik der Prakrit Sprachen § ৩১১।

‡ Macdonellএব Vedic Grammar § ৩৪ ১a, শাসনার্থে মূল √*ক্চি, বৈদিক √ক্ষি, আবেস্তা √খ্চি, মূল √*ক্চিপ্, বৈদিক √ক্ষিপ্, আবেস্তা √খ্চিপ্। আবেস্তা √সিপ্, মূল √*ক্চিপ্, হইতে আসিতে পারে না; হস্তরায় তাহা বৈদিক ক্ষিপ্‌এর সমান নহে।

§ G. R. Navalkarএব The Students' Marathi Grammar (3rd ed.) § ১৪ (২).

ছল > মা. সল্, সং. মংল > প্রা. মচ্ছ > মা. মানা।* মারাতীও পূর্বস্তুব মহাবাক্তী-প্রাকৃতে এইরূপ শব্দবিকার পাওয়া যায় না। সিংহলী প্রভৃতি ভাষায় ঐরূপ কোন কাৰণে মূল ক স্থানে পববর্তী ছএর মধ্য দিয়া স হইয়া থাকিবে। কাজেই মাণ্ডী প্রভৃতিও শব্দ-বিকারের একটি নিয়ম প্রাচীন বৈদিকযুগের প্রাকৃতে (যদি আমবা শূদ্রকে শূদ্র শব্দের প্রাকৃতরূপ সাব্যস্ত কবিতো চাই) খাটান সম্ভব মনে হয় না। তৃতীয়তঃ মারাতী প্রভৃতিও স স্থানে বৈদিকে শ করা একেবারেই যুক্তিবিকৃত।

তবে শূদ্র শব্দের উৎপত্তি কোথা হইতে? বতসিমিয়ুস (গ্রীক Ptolemaiss শব্দ হইতে আববীকৃত) উক্তব আরাখোসিয়া (Ara-chosia, আধুনিক আফগানিস্থানের অন্তর্গত) প্রদেশ) Sudroi নামে একটি জাতিও উল্লেখ কবিয়াছেন। বৈদিক যুগেও এই জাতির অস্তিত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে। তাহাবাই প্রথমে শূদ্ররূপে অভিহিত হইয়াছিল, পরে অন্তান্ত অনার্যগণ এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ বিবেচনা বোধ হয় অসম্ভব হইবে না।†

মহম্মদ শহীদুল্লাহ

বিনয়-বাবুর “উইণ্ড মিল” সম্বন্ধে প্রতিবাদ

ঐযুক্ত বিনয়কুমার সবকার মহাশয় তাঁহার “বালিনের পথে” প্রবন্ধে (প্রবাসী ফাল্গুন, ১৩২৮, ৬১১ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন,—“...মার্টের কোথাও কোথাও ছ-একটা কুঁড়ের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুযন্ত্র বা বাতাসে নিয়ন্ত্রিত কল দেখা যাইতেছে। এইগুলি বায়ুযন্ত্রের পূর্বকাল অর্থাৎ মধ্যযুগের নিদর্শন। এশিয়ার বোধ হয় কোনো যুগেই এই ধরণের উইণ্ড মিল (Wind Mill) উদ্ভাবিত হয় নাই।”

বায়ুযন্ত্র বা “উইণ্ড মিল” খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভিনীসীয় ভ্রমণকারী মার্কো পোলো (Marco Polo) চীন দেশ হইতে স্বদেশে লইয়া যান; তাঁহার “Spoils of the East”এবং মধ্যে এই উইণ্ড মিল একটি সামগ্রী। ঐতিহাসিক মায়ার্স (Myers) বলেন,—“Various arts, manufactures, and inventions (among these the Wind Mill) before unknown in Europe, were introduced from Asia.” তাঁহার footnote 16, উইণ্ড মিল প্রসঙ্গে মায়াস লিখিয়াছেন,—“Wind mills were chiefly utilised in the Netherlands, where they were used to pump the water from the oversoaked lands, and thus became the means of creating the

* Jules Blochএব La Formation de la Langue Marathe, §. ১০৩।

† Hastingsএব Encyclopaedia of Religion and Ethicsএব Sudra প্রবন্ধ।

most important part of what is now the Kingdom of Holland."

—Myers' 'Middle Ages', page 252.

বিনয়-বাবুকে এ সম্বন্ধে বার্লিনে পত্র দিয়াছিল। তাঁর ইচ্ছামত এই পত্র প্রবাসীতে পাঠাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন,—“উইণ্ড মিল (Wind Mill) সম্বন্ধে যে কথা লিখিয়াছেন তাহা আমার জানা ছিল না। মার্কো পোলোর বিবরণটি মনে থাকিলে একটা ভুল লিখিয়া বসিতাম না, নিশ্চয়। যাহা হউক লেখাটা যখন গ্রন্থাকারে বাহির হইবে, তখন শুধরাইয়া দেওয়া যাইবে। ইতিমধ্যে আপনি “প্রবাসীতে” একটা মন্তব্য পাঠাইয়া পাঠকপণের ও সঙ্গে সঙ্গে আমারও কৃতজ্ঞতা অর্জন করিতে পারেন। আশা করি আপনি পাঠক-পাঠিকাপণের অবগতিব জন্ত উপলিখিত মন্তব্যের সহিত এই পত্রাংশটুকুও উদ্ধৃত করিবেন। ইতি.....”

শ্রীনিরদরঞ্জন মজুমদার [বি-এ]

মিঃ হুজ্জুয়াফের তাঁত

পৃষ্ঠ ২৩শে চৈত্রের সঞ্জীবনীতে নিম্নলিখিত সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশিত হয় :—

“শ্রীরামপুত্র উইডিং স্কুল খন্দর বা দোহতি তৈয়ারের এক নতুন তাঁত পাঠাইয়াছেন। পূর্বাতন প্রণালীর তাঁতে প্রতিদিন ১০ হইতে ১৫ গজ দোহতি তৈয়ারী করা যাইত। কিন্তু উইডিং স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ হুজ্জুয়াফ্ এক নতুন তাঁত প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা গ্রাম্য সূত্রধরেরাই নির্মাণ করিতে পারিবেন। উহাতে প্রতিদিন যিশুণ কাপড় তৈয়ারী হইবে। একজন তাঁতি রোজ ৫ টাকা উপার্জন করিতে পারিবে।”

কলিকাতার আপার সার্কুলার রোডস্থ ২৭-এ সংখ্যক ভবন নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতকুমার মিত্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন, যে, তিনি এই তাঁত সম্বন্ধে মিঃ হুজ্জুয়াফের সহিত মৌখিক আলোচনা করেন, এবং তাঁহাকে কতগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে অনুরোধ করেন। এই প্রশ্নগুলি ইংরেজী দৈনিকে ছাপা হয়। উত্তরগুলি বেশ বিশদ ও সমস্তোপজনক না হওয়াব ললিতবাবু হুজ্জুয়াফ্ সাহেবকে পুনর্ব্যার চিঠি লিখিয়াছেন। ললিতবাবু উত্তরগুলিও বিস্তৃত আলোচনা করিয়া আমাদিগকে একটি চিঠি লিখিয়াছেন। স্থানাভাব বশতঃ এবং উহাও সব কথা সাধারণ পাঠকবর্গের বোধগম্য হইবে না বলিয়া আমরা চিঠি-খানি আদ্যোপান্ত ছাপিতে পারিলাম না। ললিত-বাবুর শেষ মন্তব্যটি উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি শ্রীরামপুত্র বয়ন-বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল বয়ন

শিক্ষা করিয়াছেন, এবং এবিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ। “সঞ্জীবনী” যে তাঁতের কথা লিখিয়াছেন তাহা “বেরী তাঁত” নামে পরিচিত।

“প্রথমতঃ—হস্তচালিত বিলাতী বা বেবী ভারী তাঁতে এদেশীয় সাধারণতঃ অল্পকিষ্ট ও ভগ্নস্বাক্ষ্য একটি কারিকরকে প্রতি অর্ধঘণ্টা পরি-ক্রমে পর কিছু বিশ্রাম করিয়া হিসাবমত ৯ ঘণ্টার বেশী সময়-কার্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রতিদিন গড়ে ৬ ঘণ্টার বেশী কাজ করিতে পাবে না। আর তাহার এই প্রমোৎপন্ন দৈনিক বস্ত্রের পরিমাণ আধুনিক উন্নত প্রণালীর fly-shuttle loomএ কম্পপট্ট একজন অভিজ্ঞ তাঁতীর দৈনিক-পরিশ্রমজাত বস্ত্রের অপেক্ষা অধিক নহে। তাহা হইলে ফলে উভয়প্রকার লুমে তৈয়ারী বস্ত্রের পরিমাণ সমান হইতেছে। কিন্তু সাধারণতঃ স্বাধীনতা বশতঃ অত্যন্ত ভারী লুমে অধিক পরিশ্রমের জন্ত প্রতি অর্ধঘণ্টার পর কিছু বিশ্রাম—কর্মীর ক্রমশঃ সামর্থ্যক্ষয়ের সূচনা করিতেছে।

“দ্বিতীয়তঃ—বেবী লুমের দাম ৫৫০ টাকা, ইহার অস্বাভাবিক সাজ-সরঞ্জামের দাম কমপক্ষে আরও ৩০ টাকা, মোট ৫৮০ টাকা। দৈনিক ২০১০ গজ খন্দর কাপড় পাওয়া যায়, একখানা উন্নত প্রণালীর fly-shuttle loom সাজ-সরঞ্জাম সমেত মূল্য মাত্র ১০০ টাকা। তাহাতে খন্দর অর্থাৎ ১০০০ হস্তাঘ ৫০ হইতে ৬০ বার প্রতি মিনিটে মাকু ছুড়িয়া (অর্থাৎ পোড়েন দিয়া) একজন তাঁতি দৈনিক প্রায় ২০ গজ কাপড় বুনিতে পারিবে। অতএব এই ৫৮০ টাকা বেবীর লৌহ-নির্মিত তাঁতের পরিবর্তে খানি fly-shuttle loomএ (অত্যন্ত-খানি ১০০ টাকা হিসাবে) প্রত্যাহ কমপক্ষে ১০০ গজ কাপড় তৈয়ার করা যাইবে।

“তৃতীয়তঃ—অধিকন্তু দেশী সূত্রধরেরাই ঐ সকল fly-shuttle তাঁত মেরামত বা তৈয়ার করিতে পাবে। কিন্তু বেবী তাঁতেব অস্ব-বিধা এই যে গ্রাম্য কাবিকরদ্বারা লৌহনির্মিত তাঁত মেরামত হওয়া একান্ত অসম্ভব। প্রকৃত খন্দর কাপড় হাতে কাটা সূতার টানা ও পোড়েনে তৈরী। কিন্তু হাতে কাটা টানাব সূতা বুনবার পক্ষে কম মজুত হওয়ার ও বয়নকালীন অস্ববিধা বিষয় আজকাল দেশী মিলে কাটা সূতা টানা করা হয় ও চরকার সূতা পোড়েন করা হয়।”

*

“মাছির ডিম হইতে পুদিনার উৎপত্তি”

আমরা একজন অপরিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের নিকট হইতে অবগত হইলাম, যে, মাছির ডিম হইতে পুদিনার চাষের যে যুক্তান্ত বৈশাখের প্রবাসী বক্তাদের বৈঠকে বাহির হইয়াছে, তাহা অসম্ভব ও মিথ্যা। সহজ জ্ঞানেও বলে, যে, ইহা অসম্ভব ও মিথ্যা।

—প্রবাসীর সম্পাদক

বিহুক

“অন্তে যতই দামী জিনিস বিহুক”,
সাগবতীরে বল্চে পড়ি’ বিহুক,—

“লক্ষ্মী মায়ের সোনার কাঁপি
হীরা চুনীর নামেই কাঁপি,
ধনী যারা এসব তারা বিহুক।”

“আমি র’ব পড়ি’ সাগর-কিনার,
বালুর পরে গাঁথ’ব আশার মিনার।

রামধনু-রঙ হৃদয় খুলি’
যে-দিন দিব মুক্তাগুলি,
বিশ্ব সে-দিন জাহ্নব আমায় চিহ্নক।”

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র



বিদেশ

জেনোয়া বৈঠক—

হতশ্রী ইউরোপের পুনরুদ্ধার-সাধনই জেনোয়া বৈঠকের উদ্দেশ্য, প্রকাশ্যভাবে সকলে ইহা স্বীকার করিলেও পরোপকার-প্রবৃত্তি হইতে এই বৈঠকের ব্যবস্থা হয় নাই। সম্মিলনোন্মুখ জাতিবৃন্দ গোপনে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির উপায় ঝঁজিতেছিলেন। ইউরোপের রাষ্ট্র-কুশল দেশপ্রধানদিগের বুদ্ধিব পবীক্ষা তাই জেনোয়াতে বেশ ভাল রকমেই চলিতেছে। ক্ষতমুর দেশা যাইতেছে, প্রথম হইতেই রাশিয়ার বোলশেভিকরাই জিতিবা চলিয়াছেন। কুটনীতির যে পরিচয় বাশিয়াব প্রতিনিধিগণের নিকট পাওয়া গিয়াছে তাহা বাস্তবিক মিত্রশক্তিবর্গকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিয়া ফেলিয়াছে। বাশিয়ার প্রতিনিধিবর্গ জেনোয়ায় আসিবার পথে বাস্টিক-উপকূলস্থ বিগা সহবেই প্রথম সন্ধি জিতিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা বাস্টিক রাজ্য-সমূহের সহিত একটি সন্ধি করিয়াছেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রতন্ত্রের রাষ্ট্র এ-যাবৎ-কাল কোনও রাজ্য স্বীকার করেন নাই। এই রিগা সন্ধির একটি সর্ভ অমুসারে পোলাণ্ড, এসথোনিয়া ও ল্যাটভিয়া রাজ্য সোভিয়েট-শাসনতন্ত্রকে বাশিয়ার নিয়মসম্মত এবং হুপ্রতিষ্ঠ রাষ্ট্রতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বৈধ রাষ্ট্রতন্ত্ররূপে সোভিয়েট শাসনপ্রণালী এই প্রথম স্বীকৃত হইল। জেনোয়ার জন্ম বণ্ডনা হইবার পূর্বে সোভিয়েট প্রতিনিধি চিচেরিন বলিয়াছিলেন যে, রাশিয়াতে বিদেশী ব্যবসারীকে ব্যবসা করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার পূর্বে রাশিয়ার সোভিয়েট শাসনতন্ত্রকে আইনসম্মত ও হুপ্রতিষ্ঠ শাসনতন্ত্র বলিয়া মিত্রশক্তিবর্গকে স্বীকার করিতে হইবে।

ব্রিটিশ প্রতিনিধি, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ জেনোয়ার আসিবার পথে পারিতে ফরাসী প্রতিনিধি পরাকারের সহিত দেখা করিয়া স্থিৎ করেন যে মুদ্রার মূল্য, বিনিময়ের হার, শুল্ক প্রভৃতি সঠিক ভাবে নিকূপণ করিয়া বাহাতে অর্থসাম্য সাধিত হইয়া ইউরোপের সর্বোপেক্ষা হিত সাধিত হব তাহাব উপায় নির্ধারণ করিবার চেষ্টা জেনোয়া বৈঠকে করিতে হইবে।

এপ্রিল মাসে প্রথম সপ্তাহে জেনোয়া সহরে বৈঠক আরম্ভ হয়।

দ্রুৎ এক-একটি ভিন্ন ভিন্ন সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্ম এক-একটি কমিটি গঠিত হয়। ইউরোপেব হুপ্রিম কাউন্সিলের পবিবর্গে রাষ্ট্রনৈতিক ভাণ্ডা-নির্ধারণের জন্ম একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটির সভ্যরূপে *নির্বাচিত হইয়াছেন ইটালীর পক্ষে সিনর স্কান্ৎসার (সভাপতি), জার্মানীর হার বির্থ, ইংলণ্ডের লয়েড জর্জ, রাশিয়ার চিচেরিন, ফ্রান্সের বাখু, সুইজারল্যান্ডের মোট্টা, বেল্জিয়ামের থিউনিস, সুইডেনের ব্রান্টিং, জাপানের ইসি, ক্রমানিয়ার ব্রাটিলানো ও পোলাণ্ডেব স্ক্রিমন্ট। ইহাবা রাষ্ট্রনৈতিক বিবাদগুলির

বিচার-পক্ষাঘেৎ হইলেন। এই একাদশমণ্ডলেব বিচাব শেষ-বিচাব বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

বৈঠকের আলোচনা একপ্রকার চলিতেছিল। কিন্তু হুচতুৰ রাশিয়ান প্রতিনিধিবা এক চাল চালিয়া সকলকে হারাইয়াছেন। সন্ধ্যা বসিবার সময় জেনোয়া সহবে চিচেরিন জার্মান মন্ত্রী ব্যাঠেনোর সহিত একটি রক্ষা নিশ্চিন্তি করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহার সর্ভাশুসারে রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে পুনরায় রাষ্ট্রনৈতিক সন্ধি স্থাপিত হইল, এবং উভয়ে পরস্পরের যুদ্ধংজ্ঞাস্ত সকল ঘেনা-পাওনাব দাবী পরিত্যাগ করিলেন। জার্মানী সোভিয়েট রাষ্ট্রতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া লইলেন এবং উভয় রাজ্য পবপ্পরের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য আবস্ত করিবার আয়োজন কবিতে লাগিলেন। রাশিয়া ও জার্মানী সহসা এইরূপ সন্ধি করিয়া বসিবেন এ কথা কেহই কল্পনাও করেন নাই। তাই এই সন্ধিব এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে অস্তান্ত বাজ্যেব প্রতি-নিধিরা অত্যন্ত আশ্চর্য হইবা গেলেন। কাজেকাজেই রাশিয়া ও জার্মানীকে ভয় দেখাইয়া এইরূপ স্বতন্ত্র সন্ধি হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা চলিয়াছিল। ফ্রান্স চোখ রাঙাইয়া বলিলেন যে, রুশ-জার্মান সন্ধি ভাঙ্গাই সন্ধি-হুত্র ও কান্ প্রস্তাবেব বিপরীত হওয়াতে উহাব মূলনীতিকে আঘাত করিয়াছে; ফ্রান্স তাহা কখনই সহ্য করিতে পারে না। কাজেকাজেই ফ্রান্সকে জেনোয়া বৈঠক পরিত্যাগ কবিতে হইবে। জার্মান প্রতিনিধিরা ইহাব উত্তরে বলিলেন যে, তাঁহাবা মিত্রশক্তিবর্গের অন্তায় ব্যবহাব সহিতে না পাঁবাতে ও অসম্ভব আদ্যাব রক্ষা কবা সম্ভব না হওয়াতে রাশিয়াব সহিত সন্ধি কবিতে একপ্রকার বাধ্য হইয়াছেন। মিত্রশক্তিবর্গে অর্থশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণ জার্মানীর নিকট যে-সকল আর্থিক দাবী-দাওয়া করিয়াছেন তাহা এতই কঠোর ও জদযহীন যে জার্মানী তাহা নীববে পালন কবিতে পারে না। তাই বিস্তহীন জার্মানী অর্থনৈতিক দুর্দশা হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার জন্য বাশিয়াব সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধন-সম্পদ সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত কবিতে বাধ্য হইয়াছেন। বাশিয়ার সোভিয়েট শাসনতন্ত্রকে রাশিয়াব প্রকৃত শাসনতন্ত্ররূপে স্বীকার জার্মানী বহদিন পূর্বেই করিয়াছেন। এই সন্ধি অমুসারে রাষ্ট্রনৈতিক নূতন কোনও বন্দোবস্ত হয় নাই; কেবল কতকগুলি অর্থনৈতিক নূতন বকা-নিশ্চিন্তি করাই এই সন্ধির উদ্দেশ্য।

অনেক বাকবিতণ্ডাব পরে ফ্রান্স একটু নরম হইলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে বাশিয়াব সহিত অর্থনৈতিক মীমাংসা করিবার কমিটিতে জার্মানী প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন।

বাশিয়ান প্রতিনিধিগণ জানাইলেন যে মিত্রশক্তিবর্গের সাহায্য পাইয়া রুশ বিদ্রোহীরা সোভিয়েট রাশিয়াব ঘে ক্ষতি করিয়াছে তাহা পুরণ করিবার দারিদ্ধ মিত্রশক্তিবর্গ স্বীকার কবিয়া রাশিয়াব যুদ্ধ-ংগ হইতে তাহা বাদ না দিলে পুরাতন রুশ সর্বাচারের ঞ্ণ সোভিয়েট সর্বাধ স্বীকার কবিবেন না। কিন্তু বিদ্রোহীদিগের দাবা যে দক্তি

হইয়াছে তাহাব দায়িত্ব মিত্রশক্তিবর্গ গ্রহণ করিলে সোভিয়েট পূর্ব স্বর্ণ স্বীকার কবিবেন বটে, কিন্তু শীঘ্র সে স্বর্ণ পরিশোধ করিবার অবস্থা সোভিয়েট স্বকাবের না থাকাতে মিত্রশক্তিবর্গ রূপ স্বকাবকে দেউলিয়া বিবেচনা কবিয়া কয়েক বৎসর মূল স্বর্ণ আদায় কবিতে চেষ্টা করিবেন না এবং ঐ কয়েক বৎসরের জন্ত কোনও স্বদ চাহিতে পাবিবেন না। বাশিয়াব ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি সাধনের জন্তও মিত্রশক্তিবর্গ নূতন স্বর্ণ দিবার ব্যবস্থা কবিবেন। সোভিয়েট শাসনতন্ত্র ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি স্বীকার করেন না। সকল সম্পত্তিই মালিক স্বকাব। কাজেকাজেই বিদেশী সম্পত্তি মালিকদিগকেও সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে তাহারা পাবিবেন না, তবে সম্পত্তির ন্যায্য মূল্য মালিকদিগকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে সোভিয়েট স্বকাব অঙ্গীকার কবিবেন।

মিত্রশক্তিবর্গের অনেকেই জার্মানী ও বাশিয়াব ব্যবহাবে বিবস্ত্র হইলেও বিশেষ কিছুই কবিয়া উঠিতে পাবিতেছেন না। কারণ জেনোয়া বৈঠক কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত না হইলে আবার ইউরোপে নূতন যুদ্ধক্ষেত্রের সৃষ্টি হইবে। একেই ইউরোপ যুদ্ধে অবসর তাহার উপর অর্ধেক অনাটন এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য লুপ্তপ্রায়; একপ অবস্থায় নূতন যুদ্ধ বাধিয়া উঠিলে ইউরোপের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিবে। মিত্র-শক্তিবর্গের পক্ষে বিগত যুদ্ধে প্রধান সহাব ছিল আমেরিকা। কিন্তু ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক গুণগোলে আমেরিকা আর লিপ্ত হইতে প্রস্তুত নয়। বরং জার্মানীর সহিত সখ্যতা-স্বত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য বালির্নের মার্কিন দূত মিঃ হাক্‌টন যথেষ্ট চেষ্টা কবিতেছেন।

যুদ্ধে হাবিয়াও জার্মান-শক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নাই। তাহাব পর বহি রাশিয়াব জনবল জার্মানীর সাহায্য কবিতে থাকে তাহা হইলে জার্মানীর সহিত আঁটিয়া উঠা সহজ হইবে না। তাই ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, ক্ষুধার্ত রাশিয়া ও ক্রোধাধিত জার্মানীকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা হইলে ইউরোপে যে ভীষণ বহি জালিয়া উঠিবে তাহাতে ইউরোপের সর্বনাশ হইবে। যে-প্রকাবেই হোক এই সর্বনাশ হইতে ইউরোপকে বাঁচাইতে হইবে। ফ্রান্স স্বার্থপর মত জার্মানীকে চাপিয়া বাধিতে চেষ্টা কবিলে ইংলণ্ড তাহাতে সম্মত হইতে পাবে না।

ফ্রান্সে জেনোয়া বৈঠক লইয়া অত্যন্ত তীব্র সমালোচনা চলিতে লাগিল। ফরাসী প্রতিনিধিবা বিবস্ত্র হইলেও নিকপায় হইয়া বৈঠকে পুনর্বার যোগ দিলেন।

রাশিয়াব সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য না আবদ্ধ করিলে ইউরোপের নষ্ট-শিল্পের পুনরুদ্ধার অসম্ভব। সেইজন্য বাশিয়াব ব্যবহাবে মিত্র-শক্তিবর্গ বিরক্ত হইলেও বৈঠক ভাঙিয়া দিবার সাহস কাহারও নাই। বোলশেভিক শাসনতন্ত্রকে বান্ধসী শাসনতন্ত্র বলিয়া প্রচার করিয়া আসা হইলেও স্বার্থের খাতিরে ফরাসী, জার্মানী, ইংলেজ ও আমেরিকানবা বহুদিন হইতেই বাশিয়াব সহিত বাণিজ্য আবদ্ধ কবিবার, স্বযোগ খুঁজিতেছিলেন। এবং নিজেদের জন্ত স্ববিধা কবিয়া অপর জাতিব উপর চেষ্টা দিবার চেষ্টা সকলেই কবিতেছিলেন, এমন কি বাষ্ট্রাব ভাবে আদান-প্রদান আবদ্ধ না কবিলেও রাষ্ট্রতন্ত্রের ক্ষতিসাধে ব্যবসায়ীবা একটু গোপনে ব্যবসা আবদ্ধ রবিয়াছিলেন। তাই বাশিয়া ও জার্মানীর সম্মুখে মিত্র-শক্তিবর্গ এত দূর হইয়াছেন।

কিন্তু মিত্র-শক্তিবর্গের এই একান্ত নিকপায় অবস্থাব কথা হুচতুব বাশিয়ানগণ প্রবর্ত্ত থাকাতে তাহাব প্রকৃত ব্যবসায়ী মত আপনাদের স্ববিধাই বোল-আদা আদায় কবিয়া লইবার চেষ্টা আছেন। বৈঠকের পূর্বে লেনিন এক বস্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে ইউরোপীয়

শক্তিবর্গের সহিত বাষ্ট্রাব ব্যাপাবে বহা-নিষ্পত্তি কবিবার উদ্দেশ্যে জেনোয়া বৈঠকে বাশিয়া উপস্থিত হইতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা ভুল; কেননা, সোভিয়েট রাষ্ট্রনৈতিক মত ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতিব সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে বাশিয়া প্রকৃত ব্যবসায়ী মত জেনোয়া বৈঠকে উপস্থিত হইবে। স্ববিধাব আদান-প্রদান কবিয়া সোভিয়েট শাসনতন্ত্র যাহাতে শক্তিসংকষের সুযোগ পায় তাহাব উপায় আবিষ্কার কবিবার উদ্দেশ্যেই বাশিয়ান প্রতিনিধিগণ জেনোয়াতে উপস্থিত হইবেন।

বিবেচী স্বার্থের সংঘাতে মিত্র-শক্তিবর্গ অনেকদিন হইতেই দুর্বল হইয়া পড়িতেছিলেন। তাই স্বযোগ বুঝিয়া জার্মানী ও বাশিয়া মাথা তুলিয়াছেন। মিত্র-শক্তিবর্গ পবপবেব প্রতি এতই সন্দেহ যে এতকাল কোনও রকমে একযোগে কাজ করিয়া আসিলেও আব বেনীদিন তাহাবা যে একযোগে চলিবেন তাহাব সম্ভাবনা অতি অল্প। কাজেকাজেই দেখা যাইতেছে, যুদ্ধে হাবিয়াও কূটনীতির বলে জার্মানীই শেষে স্ববিধা কবিয়া লইতেছেন। বুদ্ধিব যুদ্ধে জার্মানীই জয়লাভ করিলেন।

কান ও পারি বৈঠক বেকপ নিষ্ফল হইয়াছে, উপায় থাকিলে জেনোয়া বৈঠকের ফলও সেইরূপ হইত। কিন্তু ইউরোপের ভবিষ্যতের কথা স্মরণ কবিয়া লয়েড জর্জ ফ্রান্সকে কোনপ্রকারে নবম কবিয়াছেন। বৈঠক আবাব বেশ ভালরকমেই চলিবার ব্যবস্থা হইতেছিল। এমন সময় বেলজিয়াম আব-একটি গুণগোলের হুত্রপাত আবদ্ধ কবিয়াছেন। বেলজিয়ামের পর্বরাষ্ট্র-সচিব জাম্পাব বলেন,—সোভিয়েট স্বকাব ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি স্বীকার কবিয়া মালিকদিগের আর্থিক ক্ষতিপূরণের যে ব্যবস্থা কবিয়াছেন তাহাকে মানিয়া লইতে বেলজিয়াম বাজী নহে। তাই বেলজিয়ান প্রতিনিধি বাশিয়ান অর্থনৈতিক রক্ষা-নিষ্পত্তি কমিটি ত্যাগ কবিয়াছেন। ফরাসী প্রতিনিধি বাবের বেলজিয়ান প্রতিনিধি জাম্পারকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেন, এবং বলিতেছেন যে, মিত্রশক্তিব প্রস্তাবে সহি কিছুদিন স্থগিত রাখিতে ফ্রান্স-স্বকাব তাহাকে আদেশ কবিয়াছেন। ফ্রান্স-স্বকাব সমস্ত সর্ভস্বলি বিচাব কবিয়া তাহাকে সহি করিবার আদেশ না দিলে তিনি প্রস্তাবে সহি করিতে পারেন না। জাম্পাব বলেন যে, সোভিয়েট স্বকাব যখন দেউলিয়া তখন সম্পত্তির বিনিময়ে তাহাব ক্ষতিপূরণরূপ যে চেক দিবেন তাহা সম্পূর্ণ মূল্যহীন একখানি কাগজের টুকরা মাত্র। তাহা লওয়া না-লওয়া একই কথা। কাজেকাজেই এই প্রস্তাব তাহারা গ্রাহ্য করিতে পারেন না।

এইরূপ গুণগোলে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে আবাব মতান্তর হইয়াছে। লয়েড জর্জ ও বাথুর মধ্যে অনেক তর্কাতর্কি চলিয়াছিল। তাহার ফল এখনও সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু তর্কবিতর্ক শেষে যে বচসাব দাঁড়াইয়াছিল এবং মতান্তর ঘনান্তরে পরিণত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। টাইমস পত্রিকা সম্পাদক মিঃ উইক্‌হাম ষ্টিভ সংবাদপত্রের প্রতিনিধি স্বরূপে জেনোয়া বৈঠকে উপস্থিত আছেন। তিনি বলেন যে, লয়েড জর্জ ফ্রান্সের সহিত মিত্রতাবন্ধন ছিন্ন কবিয়া জার্মানীর সহিত সখ্যতা কবিবার সংকল্প জ্ঞানহইয়াছিলেন। লয়েড জর্জ সেই কথা অস্বীকার করার পূর্ব ষ্টিভ সাহেব পুনরায় সেই কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া ঘোষণা কবিয়াছেন। ফরাসী পত্রিকাস্থলি হবের উহাব প্রতিফলি শুনা যাইতেছে। ব্যাপাব অতদূর না গড়াইলেও যে বিশেষ রকম একটা বচসা হইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

পশ্চিম-প্রান্তিক প্রাচ্য—

পশ্চিম-প্রান্তিক প্রাচ্যের সমস্যা নিবাকরণের জন্য পাবি বৈঠকের স্থষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু যতদূর বুঝা যায় তেছে সেভাস্টোপলি সন্ধির যে-সকল পবিবর্তন পাবি বৈঠকে স্থির হয় তাহা তুবস্কেব জাতীয়দলের আকাঙ্ক্ষিত পবিবর্তনের অনুরূপ না হওয়াতে বৈঠকের সিদ্ধান্ত-সকল নিষ্ফল হইবে। কামাল পাশার দল বলেন, যে, তাঁহারা যে-সকল দাবী বৈঠকে উপস্থিত করিয়াছিলেন সেইগুলি তাঁহাদের সবচেয়ে কম দাবী; এইগুলি না পাইলে তাঁহারা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। তাঁহারা তুবস্কেব বর্তমান অবস্থা অগ্রণ করিয়াই এত অল্পে সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু মিত্র-শক্তিবর্গ যদি ইহাও দিতে অস্বীকৃত হন তাহা হইলে জাতীয়দল বকানিপ্পত্তি কণা বন্ধ করিয়া নিজ বাহুবলের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইবেন। হুল্তানেনব অধীন তুবস্ক-সব্কার মিত্র-শক্তিবর্গকে জানাইলেন, গ্রীস সৈন্য এসিরামাইনর পরিত্যাগ করিলে সন্ধিসন্ধি আলোচনা করিবার জন্য তুবস্ক-প্রতিনিধি মিত্র-শক্তিবর্গের প্রতিনিধি সহিত দেখা মাস্তাং করিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক কারণে জামুলে বৈঠক বসিবার প্রস্তাব তুবস্ক-সব্কার গ্রহণ করিতে পারেন না। কাবণ শুধু বৈঠক বসিলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা আছে। মিত্রশক্তিবর্গ, জানাইলেন, যে, সন্ধি-সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বে গ্রীসকে এসিয়া মাইনর পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করা মিত্র-শক্তিবর্গের পক্ষে সম্ভবপর না হওয়াতে তাঁহারা তুবস্ক-প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কামালের দলও তুবস্কের অনুরূপ প্রস্তাব প্রেরণ করেন; তদুত্তরে মিত্র-শক্তিবর্গ বলেন যে কামালের দল যদি পাবি বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলি মোটামুটিরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে গ্রীক সৈন্য এসিয়া মাইনর হইতে সবাইয়া লণ্ডা যাইতে, পাবে; কিন্তু ইহার পূর্বে সৈন্য সবাইয়া লইতে গ্রীস কিছুতেই স্বীকৃত হইবেন না। এবং এসিয়া মাইনর-হইতে সৈন্য সরাইয়া লইলেও গ্রীস থেমে সৈন্য-সমাবেশ করিবেন। কেননা থেস সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিতে গ্রীস রাজী নহেন এবং মিত্র-শক্তিবর্গ থেসের অধিকাংশের উপর গ্রীসের দাবী জার-সম্মত বলিয়া মনে করেন। কামালের দল এই-সকল কথা জানিয়াও যদি প্রতিনিধি প্রেরণের ইচ্ছা করেন তাহা হইলে প্রতিনিধিদিগের নারের তালিকা মিত্র-শক্তিবর্গের নিকট প্রেরণ করিলে কোন স্থানে নূতন বৈঠক বসিবে তাহা জ্ঞাপন করা হইবে। কামালের দল জানাইলেন, যে, যুদ্ধ স্থগিত রাখা সম্ভব হইবে। এসিয়া মাইনর পরিত্যাগ করিবার বন্দোবস্ত করিতে আবশ্য করিতে হইবে। তাহা না হইলে কামালের দলের পক্ষে যুদ্ধ স্থগিত রাখা অসম্ভব। কেননা সময় পাইলে গ্রীস নিজ অধিকাংশ স্বরক্ষিত করিবার স্বযোগ পাইবেন। জাতীয়দল এতদিন যুদ্ধ করিয়া যে হুবিধা করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে।

এইরূপ কথাবার্তা চলিবার সময় আর-একটি গুপ্তগোল বাধিয়া উঠিল। এসিয়া মাইনরে ইতালী যে ভূমিখণ্ডটুকুর উপর খবদারী করিবার ভাব পাইয়াছিলেন তাহার খবদারীতে ইতালী ব্যয় যথেষ্টই হইতেছিল কিন্তু হুবিধা কিছুই বড় ছিল না। কোনও বিশেষ স্বার্থ না, থাকাতে বুঝা যায়ভার বহন করিতে ইতালী নাবান্ন হইয়া উঠিলেন। কাজে কাজেই ইতালী সৈন্য-সামন্ত এবং শাসকদলকে এসিয়া মাইনর হইতে সবাইয়া লইতে আরম্ভ করিলেন। ইতালী স্থান পরিত্যাগ করিবার মাত্র সেই-সকল স্থানে গ্রীক সৈন্য প্রবেশ করিয়া সেই-সকল স্থানকে গ্রীসের অধিকারভুক্ত করিয়া লইল। এই-সব নানা কারণে বিরক্ত হইয়া কামালের দল মিত্রশক্তিবর্গের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন।

অবস্থা গুরুতর হইতেছে দেখিয়া ব্রিটিশ প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিজ করাসী প্রতিনিধি পুরাকাবে ও ইতালী প্রতিনিধি স্কাল্লারেব সহিত আলোচ-পবিচয় করিয়া নূতন স্বেত্রব আবিষ্কারের চেষ্টা পাইলেন। ববাসী পূর্বেই-আন্দ্রোবাব সহিত একটা বকানিপ্পত্তি করিয়া লইয়া-ছিল, ইতালীও সেইরূপ একটা নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিবার চেষ্টা দেখিতেছিল। কাজে কাজেই লর্ড হার্ডিজ বড় হুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এখন ব্রিটিশ বাষ্ট্রনীতি-বুবন্ধবোব জেকো-স্কোভাকিয়া, বার্মেনিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার সহিত একযোগে পশ্চিম-প্রান্তিক প্রাচ্য সমস্যাব সীমাংসা করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। ইহাদের চেষ্টার তুবস্কেব হুল্তানেনব দব্ভাব পাবির সিদ্ধান্ত-সকলকে মোটামুটি বকমে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কিন্তু জাতীয়দল পাবি-সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় তুরস্ক-দব্ভাবের সম্মতি অসম্মতিব বিশেষ কোনও মূল্য নাই। ইতালী যদি ফ্রান্সের অনুরণ করিয়া আন্দ্রোবাব-সব্কারেব সহিত একটা বকানিপ্পত্তি করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে মিত্র-শক্তিবর্গ একযোগে কাজ করিবার সংকল্প একেবারে ব্যর্থ হইবে এবং তুরস্ক-সমস্যাব সমাধানের ভাব একা ইংলণ্ডের উপরেই আসিয়া পড়িবে।

চীনের রাষ্ট্র-বিপ্লব—

উত্তর ও দক্ষিণ চীনের মধ্যে প্রাধান্য লইয়া বিবাদ বহু পুরাতন। উত্তর চীন ও দক্ষিণ চীনের ভাষাও ভিন্ন। উত্তর চীনের সভ্যতাব কেন্দ্র হইল পিকিং ও দক্ষিণ চীনের সভ্যতাব কেন্দ্র ক্যান্টন। চীনের মাঝে বাজ্যকে ধ্বংস করিয়া যখন সান-ইয়াট্ সেন চীন সাধারণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন দক্ষিণ চীনের এই মহামনা স্বদেশ-সেবক চৈনিক ঐক্য বজায় রাখিবার জন্য উত্তর চীনের দেশনাথক ইয়ান-সি কাইকে সাধারণ-তন্ত্রের সভাপতিরূপে বরণ করিয়া নিজে বাষ্ট্রীয় জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। যদিও দক্ষিণ চীনের অধিবাসীদিগের চেষ্টাতেই চীনে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তথাপি উত্তর চীনের শক্তি-সামর্থ্যকে চীনের এই নবীন গণতন্ত্রের সেবাতে যাহাতে নিয়োজিত করা সম্ভবপর হয় তাহাবই জন্য সান-ইয়াট্ সেন দক্ষিণ চীনের দাবীকে অগ্রাহ্য করিয়া উত্তর চীনের প্রাধান্যকেই বজায় রাখেন।

সান-ইয়াট্ সেনের তাগ চৈনিক ঐক্য বজায় রাখিতে অতি অল্পদিন মাত্র সমর্থ হইয়াছিল। উত্তরের উচ্চতর ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষিণ চীনের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। উত্তরও মাঞ্চুরিয়া বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। উত্তর-চীন জাপানের সাহায্যে চীন সাম্রাজ্যকে প্রবল করিয়া তুলিবার পক্ষপাতী। জাপানের সহিত মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য উত্তর চীনে আলফু সম্প্রদায় আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। দক্ষিণ চীন বরাবরই জাপান-বিদ্বেষী। উত্তর-চীন জাপানের ইচ্ছিতে চলিতে ফিরিতে লাগিলেন, কাজে কাজেই জাপান-বিদ্বেষী দক্ষিণ চীন উত্তরের প্রাধান্যকে একেবারেই অস্বীকার করিয়া ক্যান্টনে আপনাদের ভিন্ন একটি বাষ্ট্রতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন। উত্তর চীনের রাষ্ট্রতন্ত্রের কেন্দ্র হইল পিকিং আব দক্ষিণ চীনের ক্যান্টন।

ক্যান্টন ও পিকিং সরকারের বিবাদ বাড়িয়া উঠিয়া ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে উভয় পক্ষে খণ্ড-যুদ্ধও চলিতে লাগিল। এই সময়ে পিকিং সরকারের পরিচালক হইয়া উঠিলেন হুবিধাত চীন-সেনাপতি উ-পাই-ফু। ইহাব গণতন্ত্রে আস্থা নাই; সেইজন্য ইনি চীনে রাজ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিবার

অভিলাষী। ইনি ইয়ান-সি কাইকে চীনের সিংহাসনে বসাইয়া নূতন রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চেষ্টা পাইয়াছিলেন উত্তর চীনের অধিনায়ক হইয়া ইনি দক্ষিণ চীনের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র কবিতো আরম্ভ কবিলেন। দক্ষিণের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের চতুর্ন অর্থাৎ সামবিক শাসনকর্তৃদিগকে হস্তগত করিয়া ইনি দেশসমর অরাজকতা বৃদ্ধি কবিতো দক্ষিণ চীনকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন।

ক্যান্টন সরকারের এই মহা বিপদ দেখিয়া সান-ইয়াট সেন্ জিওর থাকিতে পারিলেন না। তিনি অবসর হইতে পুনরায় কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার একান্তিক বন্ধ ও চেষ্টায় বিদ্রোহী চতুর্নগণ পবাস্ত হইয়াছেন। মাংকুরিয়ার সামবিক শাসনকর্তা মার্শাল চাঙ্ক সো লিন্ আবার উত্তর চীনের প্রাধিকার স্বীকার করিয়া মুকুডেন সহরে এক নূতন মাংকু-বাস্তবতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কবিতো ছিলেন। সান-ইয়াট সেন্ গণতন্ত্রের সেবক হইবাও উ-পাই ফুর ফ্রংস-সাধনের নিমিত্ত চাঙ্ক সো লিনের সহিত একটি সন্ধি স্থাপন করেন। চাঙ্ক সো লিন পিকিং আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু সমর-কুশলী উ-পাই ফুর কোশলে চাঙ্ক সো লিন সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইবা-ছেন। চাঙ্ক কোন রকমে পলাইয়া আন্ত-রক্ষা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সৈন্তের অধিকাংশই ফ্রংস হইয়াছে। চাঙ্কের পতনেরও সান-ইয়াট সেন্ নিরাশ হন নাই। তিনি উ-পাই ফুর বিরুদ্ধে এক বিবটি অভিযানের আয়োজন করিতেছেন। রণকুশলী উর সহিত যশে চতুর রাজনীতিক সান-ইয়াট সেন্ কিরূপ সফলতা লাভ করিবেন তাহা বলা যায় না। তবে তাঁহার মত ত্যাপী মহাপুরুষের প্রেরণায় দক্ষিণ চীন যে অমিতবিক্রমে চীনের স্বত্বলব্ধ জন্ত লড়িতে থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। জীবন-মরণের এই সন্ধিক্ষণে চীন যে কোন্ পথে চলিবে তাহা দেখিবার জন্ত সমগ্র ইউরোপের লোকপুঞ্জ সজাগ রহিয়াছে।

ঐপ্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায় [বি-এল]

ভারতবর্ষ

সংবাদপত্রের প্রতি জুলুম—

প্রেস-আইন উঠিয়া গেল বলিয়া অনেক সংবাদপত্রের মহলে বেশ একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আইন উঠিয়া গেলেও আইন করিবার বাঁহা মালিক, তাঁহার যে ইচ্ছা করিলেই জবরদস্তি অনারাসেই চালাইতে পারেন তাহার নজিরের অভাব নাই। প্রেস-আইন উঠিয়া দেওয়ার অর্থ যদি এই হয় যে সংবাদপত্রকে সত্য কথা নির্ভাকভাবে বলিতে দেওয়া হইবে, তবে এই উঠাইবা দেওয়ার প্রাকালে কতকগুলি কাগজের উপর আর জুলুম চালানোর কোনোই আবশ্যক ছিল না। গত বৈশাখের প্রবাসীতে আমরা সংবাদপত্রের প্রতি জুলুমের কতকগুলি উদাহরণ দিয়াছি। এখানেও আরো দুইটির উল্লেখ করিতেছি।

‘ফ্রি বার্মা’ রেজুনেব সংবাদপত্র। ইহার সম্পাদক ও প্রিন্টার রাজকোহের দ্বারা দণ্ডবিধির ১২৪ (এ) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই পত্রিকাতে ‘দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাই অভিযোগের কারণ। প্রবন্ধটি ‘ফ্রি বার্মা’ নিম্নব সম্পাদক নহে, অন্য একজন ইংবেজী সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত বস্তু। সম্পাদক এবং প্রিন্টারের প্রত্যেকের ছয় মাস করিয়া সজম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। তাঁহার এই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

লাহোরের সংবাদপত্র ‘বন্দেশমাতবমের’ মামলার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। সম্পাদক লাল শাস্ত্রিবর্মের এক বৎসর, প্রকাশক লাল কেদারনাথের ছয় মাস এবং প্রবন্ধ-লেখক ফজল দীনের প্রতি দুই বৎসর বিনাপ্রসমে কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটি—

গত ২২শে এপ্রিল কলিকাতার নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটির কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। সভার যে-সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার ভিতর নিম্নলিখিত প্রস্তাব-গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

(১) যে-সকল আইনব্যবসায়ী অসহযোগ-নীতি গ্রহণ করিয়া আইন ব্যবসায় ত্যাগ করিবেন তাঁহাদের সাহায্যের জন্ত শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজ যে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, তাহা এই কার্য-নির্বাহক সমিতি গ্রহণ করিতেছেন। এই টাকা শ্রীযুক্ত বাজাজের নেতৃত্বেই ব্যয় করা হইবে। এই তহবিল হইতে যে-সকল ব্যক্তি সাহায্য প্রার্থনা করিবেন তাঁহাদিগকে স্ব স্ব প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শ্রীযুক্ত বাজাজের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) কংগ্রেসকে প্রকৃতপক্ষে সমগ্র জাতির প্রতিনিধি-স্থানীয় করিবার উদ্দেশ্যে অবনত ও প্রমিত শ্রেণীর ভিতর হইতে অধিকতর সংখ্যায় সদস্য গ্রহণ করা উচিত।

(৩) কংগ্রেস-পরিচালিত কোনও দোকানে এদেশীয় তাঁত-নির্মিত ধন্দর ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের বস্ত্র থাকিতে পারিবে না এবং চানা ও পোড়েন দুই দিকেই চুকা-কাটা খুতা ব্যবহৃত না হইলে কংগ্রেস হইতে কোনো অর্থও তাহাতে ব্যয় করা হইবে না।

(৪) কার্যনির্বাহক সমিতি জানাইতেছেন, খুব জরুরী এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার ভিন্ন কংগ্রেস-কমিটি প্রাদেশিক কংগ্রেস-গুলিকে কোন অর্থসাহায্য করিতে পারিবেন না। প্রাদেশিক কমিটিগুলিকে নিজেদের ব্যয়-সঙ্কলনের জন্ত নিজেদের তহবিল সংগ্রহ করিতে হইবে। নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটি তিলক স্বরাজ্য-ভাণ্ডারের সংগৃহীত অর্থের এক-পঞ্চমাংশের বেশী দাবী করিবেন না।

(৫) যে পর্যন্ত না মহাত্মা গান্ধী কারাসমুক্ত হন সে পর্যন্ত প্রতি-মাসের ১৮ই তারিখে গান্ধীপুণ্যাহ প্রতিপালন করিতে হইবে। এই দিনটা প্রার্থনা, ত্যাগ প্রভৃতি সংকল্পে ব্যয় করিতে হইবে। তাহা ছাড়া এই দিনের আরও সকলকে তিলক স্বরাজ্য-ভাণ্ডারে অর্পণ করিতে অনুরোধ করা বাইতেছে।

আপু পাঞ্জাব মেল—

গত ৩রা এপ্রিল রাত্রি বিশ্রাহর পর ১নং আপু পাঞ্জাব মেল ট্রেন মধুপুর স্টেশনের কাছে লাইন চ্যুত হইয়াছিল। সাঁওতাল গবর্ণার ডেপুটি কমিশনার মিঃ এ সি ডেভিস এই বিষয়ে তদন্ত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কয়েকজন অজ্ঞাত লোক ট্রেন ফ্রংসের উদ্দেশ্যে অস্ত্রতঃ তিনখানি রেল আপু লাইনের উপর আড়াআড়ি ভাবে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। এ সম্বন্ধে তিনি যে বিসোর্ট দিয়াছেন এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

“বখন এই প্রকারেব কোনো বিপদ ঘটে তখন স্বতঃই এই তিনটি সম্ভাবিত কাণ মনোমধ্যে উদ্ভিত হয় :—

(১) লাইন ধাবাগ ; মেরামতের জন্ত বেল স্থানান্তরিত করিবার পরে হয় তো ট্রিক স্থানে তাহা স্থাপন করিতে মেরামতকারীরা ভুলিয়া গিয়াছিল।

(২) ট্রেন বাকিব মুখে অত্যধিক বেগে বাইতেছিল।

(৩) হয় তো কেহ বিবেচনাপরবশ হইয়া লাইন খারাপ করিয়া দিয়াছিল ।

আমি এই তিনটি বিষয় একে একে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি :—

সাক্ষীপত্রের সমগ্র এজাহার লইয়া আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কয়েকজন লোক রেল স্থানান্তরিত করিয়া আপু লাইনের উপর তাহা আড়াআড়ি ভাবে কেঁদিয়া রাখিয়াই এই দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছিল । কতজন লোক এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিল সাক্ষীদের এজাহার হইতে তাহা নির্ণয় করা যায় না । দুইখানা রেল ফিঙ্গেট দিয়া সংযুক্ত থাকিলে পারীকিক বলের সাহায্যে সাবাইতে অসম্ভবতঃ পনেরো-কুড়িজন লোকের আবশ্যক । তবে যত্নেব সাহায্যে অবশ্য মাত্র চাবিজন লোকও সে কার্য সমাধা করিতে পারে । কোন্ সময়ে বেল তুলিয়া ফেলা হইয়াছিল তাহাও সঠিক বলা সম্ভবপর নহে । রাত্রি সাড়ে-দশটার সময় ঐ লাইন দিয়া একখানি মালগাড়ী চলিয়া গিয়াছে । সে সময় লাইনটি সম্পূর্ণ ভাল অবস্থাতেই ছিল । ডাউন পাঞ্জাব মেল ঐ স্থান অতিক্রম করিবার আধ ঘণ্টা পবে এই দুর্ঘটনা ঘটে । এই আধ ঘণ্টার ভিতরে অবশ্য এতটা ক্ষতি কবা সম্ভবপর নহে । সুতরাং মনে হয় দুর্ভাগ্যেরা ডাউন মেল আসিবার আগেই কাজ আরম্ভ ও শেষ করিবা ফেলিয়াছিল । অথবা পূর্বে কাজ আরম্ভ করিয়া ডাউন মেল আসিবার সময় পুলের নীচে লুকাইয়াছিল এবং মেল চলিয়া গেলে আবার কাজে লাগিয়াছিল । সে ঘাহাই হোক, আদালতের তদন্ত-কল এই কয়েকজন অজ্ঞাত লোক টেনে ধরস করিবার উদ্দেশ্যে অসম্ভবতঃ তিনখানি রেল আড়া-আড়ি ভাবে আপু লাইনের উপর কেঁদিয়া রাখিয়া দুর্ঘটনাটি ঘটাইয়াছে ।”

আমরা এই সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ও সন্মত হইতে পারিলাম না ।

প্রাক্তো উদার-নীতিক মত—

গত ২৭শে এপ্রিল লক্ষ্যে সহরে উদারনৈতিক সঙ্ঘের একটি অতিরিক্ত অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । সভাপতিব আসন অধিকার করিয়াছিলেন ব্যারিষ্টার মিঃ অভুলপ্রসাদ সেন । তিনি তাঁহার বক্তৃতা বলিয়াছেন :—

“বর্তমানে অসহযোগ আন্দোলনের গঠনমূলক কার্যগুলি মাত্র অবশিষ্ট আছে । এগুলির সহিত অসহযোগের কোনো সম্বন্ধ নাই এবং ইহা বস্তুর ভিতর কতকগুলির সহিত তাঁহাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে । তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, মহাত্মা গান্ধী আন্দোলনের কলে দেশের লোকের মনোবৃত্তি অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে । বহু লোক মহাত্মার ত্যাগেব আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন । সকলেই আড়ম্বরশূন্য জীবন-যাপনের পক্ষপাতী হইয়াছেন । মহাত্মার সহজ সাধারণ জীবনযাত্রা ও তাঁহার পবিত্র আদর্শ এই আন্দোলনের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া আছে । কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক মত সম্বন্ধে সন্দেহ না করিবা থাকা যায় না । কারণ উহা নিরাপদ নহে ।

“অসহযোগ আন্দোলন হ্রাস হইবার সঙ্গেসঙ্গেই মিঃ মর্টেমোর পদ-ত্যাগের কলে বিলাত সংস্কার-বিরোধী দল আবার মাথা উঠু করিয়াছে । পাঞ্জাবের কাণ্ডে বাঁহারা লিপ্ত ছিলেন তাঁহাদের কার্য সমর্থনের চেষ্টাও পালমেটে চলিতেছে । কিন্তু সময় থাকিতেই তাঁহাদের সাবধান হওয়া উচিত । তাঁহারা শাসন-সংস্কার পবিবর্তন করিয়া পুরাতন শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তনের চেষ্টা যেন না করেন । স্বায়ত্ত-শাসন কেবলমাত্র কথার কথা করিয়া রাখিলে চলিবে না । একটা যুক্তিসঙ্গত সময়ের ভিতর স্বরাজ-লাভেব বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেই হইবে । মধ্য-পশ্চীম দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেন্টের

আইনসঙ্গত বিধিব্যবস্থা অনুমোদন করিলেও, স্বরাজ সম্বন্ধে ভাবতসম্রাট যে অস্বীকার উচ্চারণ করিয়াছেন তাহার লজ্জন সহ্য করিবেন না । এই ব্যাপার লইয়া কথার মারপ্যাচ যে তাঁহারা ব্যবহার করিবেন তাহাও মনে হয় না । স্বরাজ সম্বন্ধে কোনো অনিশ্চয়তা নাই । আমলাতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে ।”

মধ্যপশ্চীম এখন যে-সব কথা বলিতেছেন এবং যে ভাবে তাঁহাদের কর্মপন্থা নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিতেছেন, তাহাব সহিত কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতির যে বিশেষ তফাৎ আছে তাহা মনে হয় না । সুতরাং এই দুইদল এখন সহজেই একত্রে মিলিত হইবা কাজে অবতীর্ণ হইতে পারেন । এ দুবিধা সম্বন্ধে ইঁহারা মিলিত হইবা দেশের কাজে কেন যে আশ্রয়নিয়োগ করিতেছেন না তাহাও একটি রহস্য বলিয়া মনে হয় ।

সভাপতির বক্তৃতার পর সভার নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পবিগৃহীত হইয়াছে :—

(১) এলাহাবাদ কংগ্রেস-কমিটি যে ৫৫জন সভ্যকে কাবাদেও দণ্ডিত কবা হইয়াছে তাঁহাদিগকে মুক্তি দিবার জন্য এই সভা গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিতেছেন ।

(২) রাজনৈতিক চাকল্যের জন্য গবর্ণমেন্টের স্থানীয় কর্মচারীগণ অনেক সময় অকাবণে লোককে অভিযুক্ত করেন । সভা ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি করিতেছেন । দেশের লোকের অত্যাচার-অভিযোগ দূর না করিয়া কেবল পুলিশেব সংখ্যা বাড়াইলে শান্তি সংস্থাপিত হইবে না, ইহাও সভার অভিমত ।

(৩) ব্যরসকোচের জন্য প্রথমতঃ, সামরিক ব্যয় হ্রাস করিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ, সামরিক বিভাগ ভারতবাসীদের দ্বাৰা পূর্ণ করিতে হইবে । তৃতীয়তঃ, ইম্পিরিয়াল পার্টিসেব কর্মচারীদের বেতন কমাইতে হইবে । ব্যরসকোচের জন্য কমিটি নিযুক্ত করার সভা আনন্দ-প্রকাশ করিতেছেন ।

(৪) প্রদেশের শাসনকর্ত্তা অবসর গ্রহণ করিলে পর সিভিল পার্টিসেব কর্মচারীগণকে সেই পদে নিযুক্ত না করিয়া বিখ্যাত বাজ-নীতিকগণকে সেই কার্যে নিযুক্ত করা উচিত । সভা বর্তমান গবর্ণমেন্টের কার্যকাল বৃদ্ধি কবা সমর্থন করেন না ।

নিখিল-ভারত শ্রমজীবী সভা—

বোম্বাই সহরে সম্প্রতি নিখিল-ভারতীয় শ্রমজীবী উন্নতি-বিধায়িনী সভার অধিবেশন হইবা গিয়াছে । সভায় শ্রমজীবীগণের স্বাস্থ্য ও শরীর সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে । নিখিল-ভারতীয় শ্রমজীবী উন্নতি-বিধায়িনী সভা নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত করা য়ম্ভ মিঃ জোষী একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়া-ছিলেন । এই সভাব নিময়াদি প্রণয়নেব জন্যও একটি কমিটি গঠনেব প্রস্তাব তোলা হয় । প্রস্তাব-দুইটি সভার গৃহীত হইয়াছে । ইহা ছাড়া শ্রমজীবীদের শিক্ষা, বাসস্থান, মাদকদ্রব্য বর্জন, সমবায়-ভাণ্ডার স্থাপন প্রভৃতি বিষয়েও দুআরো কতকগুলি প্রস্তাব সভার গৃহীত হইয়াছে ।

ব্যবসকোচ কমিটি—

ভাৰত-সব্কাবেব ব্যবস্তাব অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছে । কোন্ পথ ধরিবা চলিলে এই ব্যবস্তাব লঘু করিয়া তোলা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন । ভারতসচিবের সহিত পরামর্শ

করিয়া এল্লা বিলাত হইতে একজন বিশেষজ্ঞকে আনাইবার প্রস্তাব চলিতেছে। বিলাতের গেডিস কমিটির মত এ কমিটিও এমন হওয়া দরকার যে সামরিক ও অসামরিক উভয় বিভাগে ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ খতাইখা তাহার সম্বোধন সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টকে উপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিতে পারেন।

এই প্রস্তাবিত কমিটি নাকি গবর্ণমেন্টকে কেবলমাত্র ব্যয়সম্বোধন সম্বন্ধেই উপদেশ দিবেন না, বর্তমান কার্যপদ্ধতিব কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আবশ্যক সে সম্বন্ধেও মত প্রকাশ করিবেন।

পুলিশ কনফারেন্স—

ইষ্টারের অবকাশে ভাগলপুরে বিহাব-উড়িয়া পুলিশ কনফারেন্সের অধিবেশন বসিয়াছিল। সভার পুলিশ-দলের নৈতিক উন্নতি সাধনের উপায় সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব পরিকল্পিত হইয়াছে। সভার কয়েকজন কনষ্টেবল জোব-জুগুম, অবরুদ্ধত্ব ত্রী প্রতিবাদ কবিগোছেন। জনসাধারণের প্রতি আশা জুগুম কবি হইবে না—এখন হইতে ভালো ব্যবহার কবি হইবে—সভায় অনেকেই এই মর্মে শপথও গ্রহণ করিয়াছেন। পুলিশের জুগুম এদেশে ছোট-বড় সকলের পক্ষেই অতিশয় বিভীষিকার বস্তু। সেইজন্য বিপদে পড়িয়াও অনেক সময় এদেশবাসী পুলিশের সাহায্য লইতে চায় না। সেই পুলিশ যদি জুগুম ছাড়ে তবে সেটা যে খুব বড় রকমের সুখের তাহাতে সন্দেহ নাই। সভার চৌরীচৌবা তহবিলের জন্ত ২০০ টুইশত টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে।

রমণীচাৰ্যের বিচার—

এলাহাবাদের ‘লিডার’ পত্রিকায় কর্তৃপক্ষের একটা নূতন ধরণের বিচার-ব্যবস্থার ধর প্রকাশিত হইয়াছে। খবরটি হইতেছে এই—

শ্রীযুক্ত বেঙ্গল রমণীচাৰ্য কাশীধামের একজন সংস্কৃত-বিদ্যার্থী। তিনি গত ১২ই এপ্রিল নিজেব দেহে একখানা বিজ্ঞাপন আঁটিয়া রাস্তার বাহির হইয়াছিলেন। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল—‘১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালা বাগের স্মৃতি-রক্ষার জন্ত সকলকেই কাজ কর্তৃক বন্ধ রাখিতে হইবে।’ কথা কহিয়া তিনি কাহাকেও হুতালেব জন্য উত্তেজিত করেন নাই—তাঁহার সমস্ত অপরাধ এই বিজ্ঞাপন দেহে আঁটিয়া রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো ছাড়া আর কিছু নহে। পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায়। রমণীচাৰ্য তাঁহার এজোহাবে বলিয়াছেন, কিছুক্ষণ পরে থানার আসিয়া তাঁহার গালে কয়েকটা চড় মারেন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি ১৪৩ ধারা অনুসারে অবৈধ জনতা কবাব জন্য চালান দেন। ১৫ই তারিখে রমণীচাৰ্যের বিচার শেষ হয়। জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার একশত টাকা জরিমানা করিয়াছেন। টাকা না দিলে অ-রাজনৈতিক কয়েদীর মত তাঁহাকে ছয় সপ্তাহ কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। ঘটনার সময় আবেদন একজন লোক এই আদায়ীৰ সঙ্গে ছিলেন। তাঁহাকেও ঐ দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

আসামে অত্যাচার—

আসাম হইতে সংবাদপত্রের মাধ্যমে যেসব খবর প্রচারিত হইতেছে, তাহা সত্য হইলে ইহাই প্রমাণিত হব যে, জনসাধারণই কেবল অবাকৃত্যব সৃষ্টি করে না, অনেক সরকারী কর্মচারীও অরাজকতার সৃষ্টি করেন এবং অত্যাচারের মাগকাটি দিয়া ঘাটাই করিয়া লইলে এই-সব অরাজকতার ভিতরকার গুরুত্ব জনসাধারণের অরাজকতাব গুরুত্ব অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে।

‘সিলেট ট্রান্সকেন’ সংবাদ দিয়াছেন, গত ২৮শে মার্চ পুলিশ

প্রায় ৩০জন গুর্খা লইয়া ফুলবাড়ী নামক গ্রামে গমন করে। এই দলের অধিনায়ক ছিলেন, ই-এ-সি মৌলবী মহম্মদ চৌধুরী। ইহা বা নয়-দশখানি বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিয়াছিলেন। এক বাড়ীতে তাঁতে একখানি কাপড় বোনা হইতেছিল। সব ইন্সপেক্টরের হুকুমে কাপড়খানি টুকরা টুকরা কবিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা হয়। ইহা ব্যতীত গ্রামের লোকদের মাটির হাঁড়ী কলসী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ভিটা-মাটি খুঁড়িয়া ইহারা তখন কবিয়া দিয়াছে।

২৫শে এপ্রিলের ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’ প্রকাশ, গোপালগঞ্জ থানায় একদল গুর্খা বাধা হইয়াছে। গত ১৭ই এপ্রিল তাহার। ভদ্রেব গ্রামে গিয়া কয়েকটি বাড়ীতে খানাতল্লাসী ও আত্মত্যাগিক রকম জুলুম করিয়াছে। ইহাদের কাজে গ্রামের ভিতর ভীষণ ভয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। গ্রামবাসীদের কেহ কেহ উচ্চপদস্থ বাজ-কর্মচারীদিগকে তাঁহাদের বিপদের কথা তাবযোগে জ্ঞাপন করিয়াছেন। আদায়-গবর্ণমেন্টের চীফ সেক্রেটারীকে আবহুল নুযাঈ বাহাদুর নামে এক ব্যক্তি টেলিগ্রাম কবিয়া জানাইয়াছেন, গোপালগঞ্জের পুলিশ গুর্খা লইয়া তাঁহার পুত্রদেব প্রতি অবাধ্য অত্যাচার করিয়াছে। তাঁহাকেও গ্রহণ কবিতো চেষ্টা করিয়াছিল। তাহা বা আবেদন নানা রকমেব অত্যাচার কবিতোছে। প্রতিকার প্রার্থনীয়। সিরাজউদ্দিন নামক এক ব্যক্তি ডেপুটি পুলিশ কমিশনারকে টেলিগ্রাম কবিয়াছেন—গোপালগঞ্জের পুলিশ তাঁহার বাড়ীতে খানাতল্লাসী ও লুট-তরাজ করিয়াছে, আসাব-পত্র ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, গ্রহণ কবিতো কতর কবে নাই। মোদসিব আলি নামক আর-এক ব্যক্তিও ডেপুটি কমিশনারকে তার কবিয়া জানাইয়াছেন, গোপালগঞ্জের পুলিশ তাঁহার বাড়ীতে কেবলমাত্র খানাতল্লাসী কবে নাই জীলোকদিগকেও অপমান কবিয়াছে এবং তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে গ্রহণ করিয়াছে।

শ্রীহট্ট হইতে ‘ইন্ড ইন্ডিয়া’ পত্রিকার জনৈক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, শাস্ত্রিকার জন্ত কর্তৃপক্ষ শ্রীহটে প্রায় ছয়শত গুর্খা সেনার আমদানি করিয়াছেন। এই-সকল গুর্খা উদ্দামভাবে স্থানীয় ভদ্রলোকদিগকে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত করিতেছে। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দে, সুর্যকুমার দাস, কাশীচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন উকিল ছাড়া কাহার দিয়া যাইতেছিলেন, গুর্খা বা বলপূর্বক তাঁহাদের ছাড়া বন্ধ কবিয়া দেয়। চারুচন্দ্র ছাড়া বন্ধ কবিতো আপত্তি করায় গুর্খা বা বলপূর্বক তাঁহার ছাড়া কাড়িয়া লইয়া দুবে নির্যাস কবে। কেবল ইহাই নহে, গাড়ী কবিয়া বালিকা বা বিন্যালে যাইতেছিল, গুর্খা বা গাড়ী আটকাইয়া বাসিকদিগকে ভয় দেখায় এবং বন্ধক বাট দিয়া গাড়ীর উপর আঘাত কবিতো থাকে। এবিষয়ে ডেপুটি কমিশনার মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ কবা হইয়াছিল। তিনি নাকি বলিয়াছেন, স্থানীয় লোকেরা অসহযোগিতা কবিয়া গুর্খার আমদানি অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের লাঞ্ছনা অবমাননাব জন্ত ব্যাকুল হইলে চলিবে কেন? সত্য কথা। ডেপুটি কমিশনার জুলিয়া দিয়াছেন, এইকপ অপমান, লাঞ্ছনা, অত্যাচারেব ভিতর দিয়াই জাতি মানুষ হইয়া উঠে।

মহাত্মা সম্বন্ধে গুজব—

মহাত্মা গান্ধী বর্তমানে জেলে আছেন। তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ গুজব বাহির হইতেছে। একটি গুজব উঠিয়াছিল, জেলের ভিতর মহাত্মাকে বেজাঘাত করা হইয়াছে। বোম্বাই হইতে গবর্ণমেন্টের ডিরেক্টর অব ইন্সপেকশন জানাইয়াছেন, এ গুজব মিছক মিথ্যা। ইহার ভিতর কিছুমাত্র সত্য নাই।

মহাত্মা সম্বন্ধে আব-একটি জনবব হইতেছে এই, তাঁহাকে

জীবনের জেল হইতে অন্য আর-একটি জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। কিন্তু কোথায়—কোন জেলে, সে খবর পর্বর্মেট কাহাকেও জানিতে দেন নাই।

পর্বর্মেটের প্রচার-বিচাপ এ গুরুত্ববৎ প্রতিবাদ করিয়াছেন।

মহান্নাকে বিনা প্রহরীতে খোলা মাঠে ভিতর বাধিয়া দিলেও তিনি পল্লারন কবিরেব একপ কোন আশঙ্কা নাই। স্বতবাং তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিবাবও প্রয়োজন নাই। তবু যে লোক এই-সব সম্বন্ধে কবে তাহার কারণ, 'পর্বর্মেটের অনেক কাজ এমন আছে যাহা লোককে চমকাইয়া দেব অতি নাজায়, অথচ কারণ খুঁজিলে তাহার কোনো কারণও পাওয়া যায় না।

আইন-ব্যবসায়ী প্রতিবাদ ৭ অত্যাচারের নমুনা—

রাজনৈতিক কারণে পাঞ্জাবে বেজায় বকম ধবপাকড চলিতেছে এবং অনেককে অমধ্য কাবাদগেও দণ্ডিত করা হইতেছে। এই খেচ্চাচাবে প্রতিবাদ স্বরূপ সম্প্রতি পাঞ্জাব হাইকোর্টের একজন আইন-ব্যবসায়ী এক ইস্তাহার বাহিব করিয়াছেন। এই ইস্তাহাবে তাঁহার সিদ্ধিবাছেন,—

“সভ্যদেশ মাত্রেই জনসাধারণের জন্মগত অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা অনায়াস বলিয়া বিবেচিত হয়। সে অধিকারকে ইচ্ছা করিয়া ধর্য করিলে তাহা ফল ভালো হয় না—তাঁহাতে বাস্তব বিপদ আবে আসন্ন হইয়া উঠে। কিন্তু পাঞ্জাবে এই নিয়ম অনুসৃত হইতেছে না। এখানে লোককে বে-আইনী ভাবে গ্রেপ্তার করা হইতেছে। তাহা চাড়া খাঁহাঙ্গিক দণ্ড দেওয়া হইতেছে, নিঃসন্দেহ রূপে অপরাধী প্রমাণিত হইয়া তাঁহা সাক্ষ্যে যে কাবাদগেও দণ্ডিত হইতেছেন তাহাও নহে। এই-সমস্ত ব্যবস্থার দ্বারা শাস্তি এবং শৃঙ্খলার ব্যাঘাতই ঘটে, তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত কথা যাব না। পর্বর্মেটের ব্যবস্থার জন-সাধারণ যে কেবলমাত্র ভীত হইয়া পড়িতেছে তাহা নহে, বিচার-

বিভাগের সৌবৎ প্রচুর পবিস্মাণে ক্ষুণ্ণ হইতেছে। অথচ এই বিচার-বিভাগের বিশুদ্ধতা ও শক্তি সকল সময়েই সম্বোধের অতীত অবস্থায় থাকা উচিত। দণ্ড-প্রয়োগের আবশ্যকতা প্রমাণিত কবিবার জন্য এমনভাবে দণ্ড প্রয়োগ করা কর্তব্য যে, সে-সমস্ত ব্যাপারের সহিত এই-সব ব্যাপারের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, অন্ততঃ তাঁহা সেন দণ্ড প্রয়োগ সমর্থন কবিত পাবেন। পাঞ্জাব পর্বর্মেটের বর্তমান নীতিতে তাহা যে সম্ভবপর নহে তাহা বলাই বাহুল্য।”

কেবলমাত্র পাঞ্জাবে নহে, ভারতবর্ষের সর্বত্রই কর্তৃপক্ষের এই জুলুম একান্ত ভাবেই স্থাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং এ জুলুম কেবলমাত্র কাবাদগেই নিঃশেষ হইতেছে না, আবে নানা বকম অন্ততঃ ব্যাপারের স্থষ্টি কবিত্তেছে। চুই-একটি নমুনা দিতেছি।

সম্প্রতি বেঙ্গুরেব কমিসনার আদেশ দিয়াছেন, বেঙ্গুরে কেহ বিদেশী কাপড় পোড়াইতে পাবিব না। বিদেশী কাপড় দগ্ধ করা অবশ্য সকলে সমর্থন না কবিত পাবেন। কিন্তু এদম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের কোনো-রূপ হস্তক্ষেপ কবিবার অধিকার আছে তাহা স্বীকার করা অসম্ভব।

কাপড় আসাব, আমি পোড়াই বা পবি সে-সম্বন্ধে পুলিশ যদি ধবদ্বারী কবিত আসে তবে তাহা কেবল মাত্র অশোভন হয় না, তাহা অন্তায় হয়, অনধিকারচর্চা হয়, দেশবাসীর চিরন্তন অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়। কোনো নাগরিক (citizen) তাহা সহ্য কবিত পাবে না, করা উচিত নহে।

চট্টগ্রামের প্রাদেশিক কন্সটারেবের সময় শোভাযাত্রা বা বন্দেমাতবম্ ফানি উচ্চারণ কবিত দেওয়া হয় নাই। যেখানে জনসাধারণের সভা কবিবার অধিকার আছে, সেখানে তাহাদের শোভাযাত্রা

কবিবার অধিকার যে কেন নাই, তাহা বোঝা কঠিন। ব্যাক্ষিষ্ট মুশারেব সময়ে বন্দেমাতবম্ উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তাহার পবে ভারতবর্ষ অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছে, ইহাই সাধারণ বিশ্বাস। এই যদি আগাইয়া যাইবাব নমুনা হয় তবে সে আগাইয়া যাওয়া যে বিশেষ আকাজ্ঞাব জিনিষ নহে তাহা বলাই বাহুল্য।

আসাম ডোবাঙেব ডেপুটি কমিশনার নোটিশ দিয়াছিলেন, সেখানকার কোনো বাড়ীওঘাশাই কোনো অসহযোগীকে আশ্রয় দিতে পাবিবেন না। ইহা যে কেবলমাত্র তাঁহার শাসন-বাক্য নহে, ইহা পিছনে যে উদাত শাসন-ইচ্ছাও রহিয়াছে তাহাও প্রকাশ পাইতে বিশেষ বিলম্ব হয় নাই। তাহুলবাড়ী চা-বাগানের অন্ততঃ স্বত্বাধিকারী ঐকান্ত পবমানন্দ আগবওয়ালা এই আদেশ অমান্ত কবিত্তেছেন বলিয়া আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাই যথেষ্ট রকমেব খামখেয়ালী। কিন্তু এই খামখেয়ালীবে শেষ এইখানেই হয় নাই। আসামী-পক্ষ মোকদ্দমা স্থানান্তরিত কবিবার জন্য হাইকোর্টে আবেদন কবিবেন বলিয়া সময় চাহিয়াছিলেন। ডেপুটি কমিশনার সময়ও দিয়াছিলেন এক মাস। কিন্তু পেগানীদের পেয়া-লেব সীমা পাওয়া যায় না। আসামীর লোকেরা আদালত হইতে বাহিব হইয়া যাইবার সঙ্গেসঙ্গেই তিনি মোকদ্দমা সিনিয়র একটু এ্যাসিস্টাণ্ট কমিশনারের আদালতে স্থানান্তরিত করিয়া দিয়াছেন।

এমনি আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়।

রায়কটের অত্যাচার—

পাঞ্জাব কংগ্রেস-কমিটিব নির্দেশ অনুসারে ব্যাবিষ্টাব সৈয়দ আতাউল্লাহ বায়কটের ব্যাপার সম্বন্ধে ‘সদস্ত হুজুর’ কবিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার তদন্ত শেষ কবিতা রিপোর্ট পেশ কবিয়াছেন। এই রিপোর্টের মর্ম্ম নিয়ে প্রদত্ত হইলঃ—

১৯২২ সালের ১লা এপ্রিল তাবিশে কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটিব প্রেসিডেন্ট মৌলবী ফজলুল হককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। মৌলবী সাহেবকে তাঁহার বাড়ী হইতে থানায় লইয়া যাওয়ার সময় পথেব লোকেরা তাঁহার প্রতি অশেষ সম্মান প্রদর্শন কবিয়াছিল। এই সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারটা ভাবপ্রাপ্ত পুলিশ-কর্ত্তাচারী কাছে ভালো লাগে নাই। তিনি সকলকে বলেন তাঁহাকেই সেলাম কবিত। কেহ তাহাতে রাজী না হওয়ার সকলের প্রতি নির্বাহন চলিতে থাকে। জন-সাধারণ তাহাতে কোনোরূপ উত্তেজনা প্রকাশ করে নাই। ইহাব পর ২৮ এপ্রিল সাহা সহবে হব্তাল হয়। এই তাবিশ সকল দোকানদারকে আহ্বান কবিতা পুলিশ জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার ২৮ হব্তাল কবিয়াছিল কেন। উত্তবে তাহা বলে, ১লা তাবিশেব কাও দেখিয়া আপনা হইতেই তাহা হব্তাল কবিয়াছিল, কাহাবো প্রবেচনার করে নাই। এই অপরাধে প্রত্যেক দোকানদারের প্রতি পাঁচ ঘা কবিতা বস্ত্রোদ্ধাতেব ব্যবস্থা করা হয়। বন্দন লাল নামক একজন দোকানদারকে দশ ঘা বেত মারা হইয়াছিল। মৌলবী ফজলুল হককে সেলাম করার জন্য ২০ বৎসরের এক বৃদ্ধাও প্রহৃত হইয়াছিল। আমি তাহা ভান হাতেব ফোলা দেখিয়াছি। পাঁচ বৎসরের একটি বালককেও এই নিমিত্ত মাংস সহ্য কবিত হইয়াছে। ১৮ বৎসর কপালে আমি স্বতচিহ্ন দেখিয়াছি। বিস্তর লোক প্রহৃত হইয়াছিল। তাহা ভিতর একজন কাশা ও বোঝা ব্যক্তিও ছিল। একজন দোকানদারকে পাঁচ ঘা টানিয়া বাহিব করা হইয়াছিল, আবে-একজনকে লাথি মাবিয়া ও অন্যান্য নানা ভাবে অপমান কবিতা সেলাম কবিত বাধ্য করা হয়।

পণ্ডিত মালবীরের প্রতি ব্যবহার—

সম্প্রতি লাহোবের ব্রাডল হলে একটি সভা কবার আয়োজন করা হইয়াছিল। স্থির ছিল, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীর উহাতে বক্তৃতা করিবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সংবাদ পাইয়া সভা বন্ধ করিবার আদেশ প্রদান করেন। পণ্ডিত মালবীর তখনকার মত সমাগত সকলকে সভাস্থান পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানান যে; সভা সাধারণ-সভা ছিল না এবং সেখানে কোনরূপ অশান্তি ঘটবারও সম্ভাবনা নাই। পরে তিনি একধারও উল্লেখ করিয়াছিলেন যে পূর্বের দিন তিনি আবার সভা করিতে চান, পুলিশ যেন তাঁহার সে চেষ্টায় কোনরূপ বাধাপ্রদান না করে। কিন্তু পণ্ডিত মালবীরের সে অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। পুলিশ তাঁহাকে পরের দিনও সভা করিতে দেখে নাই। ইহার পরে তিনি শিমালা-কোর্টে গমন করেন। সেখানেও কর্তৃপক্ষের জবাবদ্বারা তাঁহাকে পুরোমাত্রাতেই ভোগ করিতে হইয়াছে। সেখানে একটি সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। পণ্ডিত-জীব বক্তৃতা শুনিবার জন্য সর্দার গুরুবর্মা সিংহের বাড়ীর নিকট একটা খোলা মাঠে অসংখ্য লোক জমা হয়। কিন্তু সেখানেও তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে দেওয়া হয় নাই। পুলিশ সাহেব আসিয়া সভা ভাঙিয়া দেয়। এ সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট যে ইত্তাহার জারী করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা হইতেছে, “শোভা-যাত্রা এবং সভা-সমিতির কালে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে। হতভাগ্য ক্ষোভদায়ী কার্যবিধি ১৪৪ ধারা অনুসারে শিমালাকোর্ট মিউনিসিপালিটির এলাকার ভিতর ১৬ই ও ১৭ই এপ্রিল কোনো মিছিল বা সভাসমিতি হইতে পারিবে না। পুলিশ স্থপারিটেণ্টেণ্ট প্রয়োজন হইলে যে কোনো ব্যক্তির উপর এই আদেশ জারি করিতে পারিবেন।” জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সেদিন সভার উপস্থিত ছিলেন না। হতভাগ্য পণ্ডিত মালবীর পুলিশ স্থপারিটেণ্টেণ্টকেই লিখিয়া জানান, তিনি নিজেই শোভাযাত্রার পক্ষপাতী নহেন, হতভাগ্য শোভা-যাত্রা নহে, সেইদিন বিকালবেলা ষোড়শ সময় তিনি মিউনিসিপালিটির বাহিরে এক সভা করিবেন। তাহাতে পুলিশ যেন তাঁহাকে বাধা-প্রদান না করে। এবার অবশু পুলিশ তাঁহাকে দয়া করিয়া আর বাধা-প্রদান করে নাই। সভায় অসংখ্য লোক জমিয়াছিল। পণ্ডিত মালবীর প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। ব্যবসায় উপলক্ষে ভাবতে আসিয়া কিরূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশের মালিক হইয়া বসিয়াছে, তাহার ইতিহাস, ভাবতের রাজনৈতিক অবস্থা, স্বরাজ-লাভের পক্ষা, এ-সমস্ত কথাবই তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন।

হসুরং মোহানী—

কিছুদিন পূর্বে মোলানা হসুরং মোহানীকে গ্রেপ্তার করিয়া আহমদাবাদে চালান দেওয়া হইয়াছিল। গ্রেপ্তারের সময় তিনি বলিয়াছিলেন, মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতির অনুকরণ করাতেই তাঁহারিগকে সহজে গ্রেপ্তার করার সুবিধা গবর্নমেন্টের হইয়াছে। গবর্নমেন্টও দলে দলে লোককে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে পুরিতেছেন।

সম্প্রতি আহমদাবাদের দাঘরা জজের এজলাসে তাঁহার মামলায় বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। মামলার জুরী ছিলেন পাঁচজন ভারতবাসী। মোলানা সাহেব তাঁহার বর্ণনা-পত্রে বলিয়াছেন, “আমার রাজনৈতিক মতামত স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করাই আমার এই বর্ণনা-পত্রের উদ্দেশ্য। রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমি যেমন কাজ করিয়াছি এবং যেসব কথা বলিয়াছি, তাহা কিছুতেই ১২১ এবং ১২৪ (ক) ধারার অপবাদের গুণীর ভিতর আনিয়া ফেলা যায় না। হতভাগ্য এই-সমস্ত লাবা একটি অক্ষবণ্ড

আমার উপর প্রবোজ্য নহে। আমি পূর্বের ন্যায় এখনও কংগ্রেসের একজন সভ্য। কংগ্রেসের মতের উপর আমার বিশ্বাস আছে। বৈধ উপায়ে এবং শান্তি বজায় রাখিয়াই স্বাধীন লাভ করিব—ইহাই আমার ইচ্ছা। যদি কখনো নিরুপদ্রব নীতি লঙ্ঘন করিতেই হয় তবে তাহা সর্বকারের উপদ্রব-বহুল ধর্ষণ-নীতির বিনিময়ে আত্মবক্ষার জন্তই করিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বোধ্যা-বা তদ্রূপে জনসাধারণকে উত্তেজিত করার দায়ে দায়িত্ব আমি একেবারেই দায়ী হইব না। আমার বিরুদ্ধে কিছুতেই ১২১ ধারার অপরাধ আসিতে পারে না।

“তাহা ছাড়া গবর্নমেন্ট অপরাধীকে আইন-মত শাস্তি না দিয়া যখন কাসিকারি বা মেশিন-গানের সাহায্যে বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করিবেন, তখনই আমরা জোব-জুজুমের আশ্রয় গ্রহণ করিব, তাহার পূর্বে নহে—এই কথাই আমি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি। হতভাগ্য ১২৪ (ক) ধারার অভিযোগও আমার বিরুদ্ধে চালানো যায় না। স্বাধীনতার কামনা করা মানুষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক ও সহজ ধর্ম। স্বাধীনতা প্রযাসী হইলেই যে কাহাকেও ঘৃণা বা তাক্সিয়া করিতে হইবে, তাহার কোনো কারণ নাই। হতভাগ্য আমি গবর্নমেন্টকে ঘৃণা করি বলিয়াই স্বাধীনতা চাহিতেছি এরূপ মনে করা ভুল। স্বাধীনতার কামনা করিলেই সাক্ষা দিতে হইবে, ইহাই যদি গবর্নমেন্টের সক্ষম হয় তবে আব-একটি নূতন আইন-বহু করিতে হইবে, ১২৪ (ক) ধারার ফলাইবে না।”

জুরীগণ একবাক্যে মোলানা সাহেবকে দুই ধারাতেই নির্দোষ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বলেন, “হসুরং মোহানী স্বাধীনতাই চাহিয়াছিলেন, জনসাধারণের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করা বা রাজস্বোচিত প্রচার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না।”

জুরীদের এই অভিমত সত্ত্বেও বিচারপতি প্রথম অপরাধ, অর্থাৎ বক্তৃতার বিষয়ে প্রচার করার জন্ত মোলানা সাহেবের প্রতি দুই বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। দ্বিতীয় অপরাধে অর্থাৎ সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বোধ্যা করা অপরাধেও তিনি নিজে মোলানা সাহেবকে অপরাধী বলিয়াই মনে করেন। তবে তিনি এসম্বন্ধে হাইকোর্টের অভিমত না লইয়া কোনো দণ্ডপ্রদান করিবেন না।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

বাংলা

দেশের অবস্থা—

সমগ্র বঙ্গদেশের আয়তন ৮৪,০০০ বর্গমাইল। ইহাতে ৫ বিভাগ, ২৮ জেলা, ১২৫ সহব এবং ১,২৫,০০০ গ্রাম আছে। ১৯১১ খৃঃ লোক-সংখ্যা—৪৬৩০৫১৭০। ১৯২১ খৃঃ জনসংখ্যা—৪,৭৫,৯২,৪৬২ জন; তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা—২,৪৬,২৮,৩৪৪ আর নারীর সংখ্যা—২,২৯,৬৪,০১৭ জন। ইহার মধ্যে এক আনা লোক সহরে এবং বাকি পনের আনা লোক পল্লীগামে বাস করিতেছে।

বঙ্গদেশের মধ্যে ৫৪৮৩ বর্গ মাইল রক্ষিত বনভূমি, ২৩৩৭ বর্গমাইল গবর্নমেন্টের খাস পতিত জমি। বন্দোবস্তী ভূমির পরিমাণ ৩৫,২১১ বর্গমাইল। এতদ্ব্যতী ৬৩,৬৯৯ বর্গমাইল ভূমিতে বঙ্গীয় প্রজা-ভূম্য-ধিকারী আইন প্রচলিত।

বঙ্গীয় প্রজাপুঞ্জ বৎসরে প্রায় ১২৫ কোটি টাকা খাজনা দিয়া থাকে; গবর্নমেন্ট ইহার মধ্যে ২ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব শ্রাপ্ত হন।

বঙ্গদেশের মধ্যে সবমুদ্রাসংগ্রহ জেলা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার পরিমাণ ৬২৪২ বর্গমাইল। গ্রামের সংখ্যা ১২ হাজার এবং লোক-সংখ্যা ৪৮,৩৭,৭৩০ জন।

মেদিনীপুর জেলার আয়তন ৫১৪৫ বর্গমাইল। লোক-সংখ্যা ২৬,৬৬,৬৬০ জন। এই জেলা আয়তন হিসাবে বঙ্গদেশে দ্বিতীয় এবং লোক-সংখ্যা হিসাবে তৃতীয় বলিয়া গণ্য।

বর্তমান বিভাগে শতকরা ৮০, প্রেসিডেন্সী বিভাগে ৫২, বাঙ্গাসাহী বিভাগে ৩৭, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে ৩১ জন হিন্দু। জেলা হিসাবে মেদিনীপুরে হিন্দুর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক এবং চট্টগ্রাম পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কম। মেদিনীপুরের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৮৮ জন আর চট্টগ্রাম পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৯ জন হিন্দু। পূর্ব বাঙ্গালার মুসলমান সংখ্যা মোটের উপর হিন্দুর দ্বিগুণেরও বেশী, আর নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমান তিন গুণ অধিক।

বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যা ২,০২,৪৫,৫৭২ এবং মুসলমানের সংখ্যা ২,৪২-৩৭,২২৩ জন। লেখাপড়া-জানা হিন্দুর সংখ্যা ২৪,৭৫,২২৬ আর লেখাপড়া-জানা মুসলমানের সংখ্যা ১০,০৩,৭২৫ জন।

বঙ্গদেশে প্রত্যেক এক লক্ষ পুরুষের মধ্যে ৭১ হাজার লোক জিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই, ৮৫ হাজার লোক ৪০ বৎসর উত্তীর্ণ না হইতে এবং ২৩ হাজার লোক ৫০ বৎসরের পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বাঙ্গালার পল্লীতে যে-সকল লোক বাস করিতেছে, তাহাদের প্রায় মাত্র এক সহস্র চিকিৎসক আছেন।

বঙ্গদেশে গড়ে ৪০ কোটি টাকার পাট জন্মে। যে-সকল পাটের কল আছে, তাহার মূলধন ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ফলে অধুনা পাটের বাজারে শনিব স্তম্ভদৃষ্টি পড়িয়াছে।

—মোসলম-হিতৈষী।

সর্বকারের স্থবিচার—

ঘলা ও কালার পেটের বহর

ব্যবস্থাপক সভায় সার গড়ক্ষে সেদিন সওয়ারালের জবাবে দেখিয়েছেন যে, কালা ও ঘলা পশুনের খরচ পড়ে নীচেব হাবে :—

ঘলা	টাকা
সার্জেণ্ট বিবাহিত	২৬.০১
" অবিবাহিত	২০.৪৮
কার্পোরাল বিবাহিত	২২.৬৮
" অবিবাহিত	১১.৭৮
সিপাহী বিবাহিত	২০.৬৮
" অবিবাহিত	১৫.০৮

কালার বেলার কিন্তু মুড়ি-মিছুরি একদর, বিবাহিত কি অবিবাহিত খায় বোধ হয় সমান, যথা :—

কালা	টাকা
হারিলাদাব, পদাতিক	৫২
" তোপখানা	৫২
" ঘোড়সওয়ার	৫৮
নায়ক পদাতিক	৪৮
" তোপখানা	৪৮
" ঘোড়সওয়ার	৫২
সিপাহী পদাতিক	৪২
" তোপখানা	৪৪
" ঘোড়সওয়ার	৪৫

এই বাপার দেখে বিবি বাসন্তী অবধি বলেছেন, পোরা বিদেয় কবে কালা ঠাণ্ডাড়ে রাধলে পশুতনী বায় আধাআধি এখনি হয়। হয় তো, কিন্তু করে কে? —বিজলী।

বাধিকার ও স্বাধীনতা লাভের আয়োজন—

অসহযোগের প্রসাব।

মালদহ

সালিশী সমিতির সংখ্যা—	৯২
স্থানীয় কংগ্রেস-কমিটির সংখ্যা—	১০০২
চরকার সংখ্যা—	২০০০
কাটা হুতার পরিমাণ—	২৫/০ মণ
ভাতের সংখ্যা—	৩০২৭

ঢাকা

সালিশী সমিতির সংখ্যা—	২৭৫
সালিশে দেওয়ানী মোকদ্দমা নিষ্পত্তির সংখ্যা—	৫০৭
সালিশে কৌজদারী মোকদ্দমা নিষ্পত্তির সংখ্যা—	৮২৫
সালিশে দায়ের মোকদ্দমার সংখ্যা—	২২৫
কংগ্রেস-কমিটির সংখ্যা—	৫৩০
চরকার সংখ্যা—	৩০,০০০
ব্যবহৃত চরকার সংখ্যা—	২০,০০০
মাসিক কাটা হুতার পরিমাণ—	৬০/০ মণ
ভাতের সংখ্যা—	১৫,০০০

বীরভূম

চরকার সংখ্যা—	২০৭০
মাসিক কাটা হুতার পরিমাণ—	৭/০ মণ
ভাতের সংখ্যা—	২২,০০০
যত ভাতে বিদেশী হুতা ব্যবহৃত হয়—	১০,০০০
যত ভাতে ভারতীয় কলের হুতা ব্যবহৃত হয়—	১১০০
যত ভাত মসলীন তৈয়ারী করে—	৫০০
যত ভাতে মিশ্রিত হুতা ব্যবহৃত হয়—	৫০০
যত ভাতে চরকার কাটা হুতা ব্যবহৃত হয়—	২০০
যত ভাত বসিয়া আছে—	৩০০০
ভাতের সংখ্যা—	২৪০২০
আর যত চরকা প্রযুক্তি হইলে জেলাটি আত্মনির্ভর হইতে পারে	২০০০০
সালিশী সমিতি—	৭৩
সালিশে নিষ্পত্তি মামলার সংখ্যা—	৩৪৯
সালিশে দায়ের মামলার সংখ্যা—	১৪০

বাংখরগঞ্জ

সালিশী সমিতি—	৪৫
সালিশে নিষ্পত্তি মামলার সংখ্যা—	৪৮৫
সালিশে দায়ের মামলার সংখ্যা—	১৪৩
চরকার সংখ্যা—	৬০৪৯
যত ভাতে হাতে কাটা হুতা ব্যবহৃত হয়—	৮০
মাসে যত ধন্দর তৈয়ারি হয়—	৬৯৫ গজ
মাসে যত মিশ্রিত ধন্দর তৈয়ারী হয়—	৩৮০ গজ
মাসে কলের হুতার যে পরিমাণ কাপড় তৈয়ারী হয়—	৪০,০০০ গজ
স্থানীয় কংগ্রেস-কমিটির সংখ্যা—	১৯

বাঁকুড়া

গ্রাম্য-সমিতির সংখ্যা—
সালিশী সমিতির সংখ্যা—
চরকার সংখ্যা—

২৭০
১৪
২০,০০০

হাওড়া

চরকার সংখ্যা—
ভাত (বিদেশী সূতা ব্যবহার করে)—
ভাত (মিশ্রিত সূতা ব্যবহার করে)—
প্রাথমিক বিদ্যালয়—
মাসিক কাটা সূতার পরিমাণ—

১২১৪
৪০০০
৭৩
১০
দেড়মণ

ফরিদপুর

কংগ্রেস-কমিটির সংখ্যা—
সালিশী সমিতি—
সালিশে নিষ্পত্তি দেওয়ার নী মোকদ্দমা—
ঐ কোজদারী মোকদ্দমা—
ঐ বিচারার্থী মোকদ্দমা—
চালিত চরকার সংখ্যা—
ভাতী জাতিব সংখ্যা—
ভাত (চরকার সূতা ব্যবহার করে)—
ভাত (মিশ্রিত সূতা ব্যবহার করে)—
জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয়—
মাসিক কাটা সূতার পরিমাণ—

১২৪
৫৬
৮০১
৫০৮
১৮৩
২১২৪
২৪০০০
১৭
৪৭৬
১৫
১২ মণ
—নৌহার।

হুগলী

সালিশী বিচারালয়
মোকদ্দমা মীমাংসিত হইয়াছে
চরকা চলিতেছে
খাঁটি পদ্মের ভাত চলিতেছে
মিশ্রিত পদ্মের ভাত চলিতেছে
খাঁটি পদ্ম মাসিক তৈরী হইতেছে
মিশ্রিত পদ্ম মাসিক তৈরী হইতেছে
মাসিক চরকার সূতা তৈরী হইতেছে
পদ্মের মোকান আছে
সমগ্র জেলার ভাতী
বিদেশী সূতা ব্যবহারকারী ভাতী

৩৫
২২৫
৩০০০
১০
৯০
১২০০ গজ
১০০০ গজ
১০ মণ
১২
১২০০
১১০০

বগুড়া

সালিশী বিচারালয়
মোকদ্দমা মীমাংসিত হইয়াছে
চরকা চলিতেছে
মাসিক সূতা তৈরী হইতেছে
জেলার ভাতীর সংখ্যা
ভারতীয় মিলের ও চরকার সূতা ব্যবহারকারী ভাতীর সংখ্যা
জেলার ভাতের সংখ্যা
মিশ্রিত পদ্মের কাপড়ের দাম প্রতি গজা ৫১০ হইতে ৭০ টাকা পর্যায়।

৪৪৭
১০০০
৮০০০
১৫ মণ
৩০০০
৩০০০
১০০০

জলপাইগুড়ি

সালিশী বিচারালয়ের সংখ্যা
সহরের সালিশী বিচারালয়ে মীমাংসিত মোকদ্দমার সংখ্যা
এলাকাভুক্ত অধীমাংসিত মোকদ্দমার সংখ্যা
চরকা চলিতেছে
চরকার প্রস্তুত সূতা প্রতিমাংসে
জেলার ভাতীর সংখ্যা
ভারতীয় মিলের সূতা ব্যবহারকারী ভাতীর সংখ্যা

১০০
২০০
২০
১০০০
২ মণ
৮০০
২৫০

দিনাজপুর

চরকা চলিতেছে
ভাত চলিতেছে

১২০০
২০০

কংগ্রেস প্রচার বিভাগ
৭ই এপ্রিল, ১৯২৯।

—মোহাম্মদী

শিক্ষার ব্যবস্থা—

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার প্রস্তাবিত নিয়মাবলী (বহল পরিবর্তন)—
কিছুদিন পূর্বে প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থীদের সম্বন্ধে নানা পরিবর্তন করিবার
ক্ষমতাসিনেট হাউসে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের হেডমাস্টারদিগের একটি
ও এই-সমস্ত বিদ্যালয়বৎ কর্তৃপক্ষদিগের আবেদন-একটি সভার অধিবেশন
হইয়াছিল। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে বর্তমান শিক্ষা বিষয় সম্বন্ধে
দেশে যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে তাৎসম্বন্ধে প্রতীকার কবাও উহার
অন্ততম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই-সমস্ত সভায় যে মতামত প্রকাশ
পাইয়াছে তাৎসম্বন্ধে কতকগুলি নিয়মাবলী স্থির করা হইয়াছে। শীঘ্রই
এগুলি সমর্থিত হওয়ার ক্ষমতাসিনেট সভার উপস্থিত করা হইবে।
আমরা যে-সমস্ত নিয়মাবলীর মধ্যে নূতনত্ব আছে তাহা প্রকাশ
করিলাম :—

- (১) চৌদ্দ বৎসর বয়স হইলেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার
উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা হইবে।
- (২) ইংরেজী ছাড়া অল্প সময়েরই অধ্যাপনা এবং পরীক্ষা
মাতৃভাষায় নিক্ষেপ হইবে। সিণ্ডিকেট ইচ্ছা করিলে ব্যক্তিগত ভাবে
এই নিয়মের পরিবর্তনও করিতে পারেন।
- (৩) নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রত্যেক ছাত্রকে পরীক্ষা দিতে হইবে
—(ক) মাতৃভাষায় তিনটি পেপার (খ) ইংরেজীতে দুইটি (গ)
অঙ্কনাদ্বে একটি ও (ঘ) ফুগোলে একটি।
- (৪) নিম্নলিখিত বিষয়ের বে কোন একটিতে পরীক্ষা দিতে
হইবে।
- (ক) তৃতীয় ভাষারূপে—সংস্কৃত, পালী, তিব্বতীয়, আরবীয়,
পারসীক, হিব্রু, আর্মিনীয়ান, ল্যাটিন, গ্রীক, ফার্সী, জার্মান, অথবা
মাতৃভাষা ছাড়া অল্প যে কোন ভারতীয় ভাষার একটি।
- (খ) চিত্রবিদ্যা এবং ব্যবহারিক-জ্যামিতি।
- (গ) পরিমিতি এবং জরীপ-শাস্ত্র।
- (ঘ) পরীক্ষামূলক যন্ত্রবিজ্ঞান (Mechanics)।
- (ঙ) প্রাথমিক বিজ্ঞান (পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র)।
- (চ) শারীর-বিদ্যা, প্রাথমিক সাহায্য সম্বন্ধে (first aid)।
- (ছ) উদ্ভিদ-বিদ্যা।
- (জ) অথবা অল্প যে কোন বিষয় সিনেট উপযুক্ত বিবেচনা
করেন।

উক্ত যে-কোন বিষয়ে একটি পেপার হইবে। মাতৃভাষার পরীক্ষার

নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক থাকিবে এবং ভাবতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি পুস্তক পাঠ্য করা হইবে। এই ইতিহাসে বাঙ্গলার কথা বিশেষ ভাবে থাকিবে এবং ভাবতের শাসনশাণী ও ইংরেজ আমলে ভাবতের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা থাকিবে। ব্যাকরণ ও রচনা সম্বন্ধেও পরীক্ষা হইবে।

(৫) পরীক্ষার্থীকে নিম্নলিখিত যে কোন এক বিষয়ে নির্দিষ্ট পাঠ্য-তালিকা অনুসারে নির্দিষ্ট সময় শিক্ষা লাভ করিয়া তৎসম্বন্ধে সার্টিফিকেট উপস্থিত করিতে হইবে।

- (ক) কৃষিবিদ্যা ও উদ্ভান-তত্ত্ব।
- (খ) স্ত্রতারের কাজ।
- (গ) কামারের কাজ।
- (ঘ) টাইপ-রাইট।
- (ঙ) হিসাব-রক্ষা (Book-keeping)
- (চ) শট্‌হাও।
- (ছ) সূতা-কাটা ও বয়ন-বিদ্যা।
- (জ) দস্তারের কাজ ও সেলাই।
- (ঝ) সঙ্গীত।
- (ঞ) পারিবারিক অর্থনীতি।
- (ট) টেলিগ্রাফ।
- (ঠ) সিনেট কর্তৃক নির্দিষ্ট অস্ত্র যে কোন বিষয়।

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

সংকল্প ও সদহুষ্ঠান—

সমুদয় মহারাজা পূর্ণচন্দ্র ভট্টশালক বাহাদুর রাজ্যের জলাভাব দূরীকরণার্থে দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। উক্ত টাকার সুদ হইতে বৎসব বৎসর পুষ্কর ও কুপ ধনন করা হইবে। —যশোহর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দান।—আসামের মিঃ বি. বড়ুয়া এবং সাব পি. সি. রায় রাসায়নিক গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেকে দশহাজার টাকা দান করিয়াছেন। —বীরভূমবার্তা।

ফোর্ড কোম্পানীর উন্নয়ন।—মিঃ হেনরী ফোর্ডের পুত্র মিঃ ইন্ড্রেল ফোর্ড সাহেব যোগ্য করিয়াছেন, অতঃপর ফোর্ড কোম্পানীর কাৰখানা-গুলিতে ৫ দিনে সপ্তাহ ধবা হইবে।

তিনি বলিয়াছেন, শনিবার ও রবিবার কাৰখানা একেবারে বন্ধ থাকিবে। “আমার পিতার ও আমার মতে মানুষের পক্ষে সপ্তাহে একদিন বিশ্রাম পথ্যাপ্ত নহে। আমাদের কোম্পানীর উদ্দেশ্য হইল, কর্মচারীগণের পারিবারিক জীবনের জাদর্শ উন্নত করা।” অথচ এই পরিবর্তনে কাহারও বেতন কমিবে না। ফোর্ড কোম্পানীর মালিকগণের ঘনিষ্ঠ শ্রমজীবীদের প্রতি এই করুণার জন্য আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি, এবং আশা করিতেছি, কেবল পকেট বোকাইএর দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া অন্তান্ত কাৰখানার মালিকেরাও এইরূপ সংস্কারের অনুকরণ করিবেন। —আনন্দবাজার পত্রিকা।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন—

মেদিনীপুরের সম্মিলনে সাধারণ সভার সভাপতি হইছিলেন টাকীর জমিদার ঐযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়। বর্শন ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতি বাক্যক্রমে ঐযুক্ত পূর্ণেন্দ্রনাথ সিংহ ও ঐযুক্ত চন্দ্রলাল বহুমহাশয়, উভয়েই রায় বাহাদুর। এ ছাড়া অধ্যক্ষনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন ঐযুক্ত সুর্যনারায়ণ অগস্তী সাহেব—ইনি অবনব-প্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট। ইতিহাস শাখার সভাপতি ঐযুক্ত অমলাচরণ বিদ্যাবূষণ ও সাহিত্য শাখার ঐযুক্ত সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি ছিলেন। —বিজয়ী।

শক্তির উপদ্রব—

শ্রীহট্টে গুর্খা-জীলা (নিজস্ব সংবাদ)—সেদিন কয়েকটি সশস্ত্র গুর্খা কাষ্টবর হইতে কিবিরার সময় নেছোবাজীবের নিকট আসিয়াই পাঠী সাহেবের বালিকা-বিস্তারগণের চাপবানীকে চড়াও করিয়া ভুজালী দা দিয়া তাহাকে সাম্বাতিক আঘাত করে, তাহাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাহার পর আর-একটি লোককে আঘাত করে। একজন মুসলমান, অস্ত্রজন হিন্দু। চাপবানী মারা গিয়াছে।

গাইবান্ধা হবিপুর গ্রামে টেন্স নিয়ে কিছু গোলমাল হয়। তাই সেখানে ৪০ জন গুর্খা ও পুলিশ হৈ হৈ করে এসে পড়ে। যারা টেন্স দেয় নি তাদের নামে ওয়ারেন্ট নিয়ে এঁরা গ্রামে ঢোকে। গ্রামের লোক কি বলে জানা নেই, তবে এঁরা উত্তম-মধ্যম প্রহার আরম্ভ করে দেন। বন্দুকও চলে, নইলে ত চরম হয় না। এর ফলে একজন মারা পড়ে আর ৩ জন মারা পড়বার জোপাড়ে আছে। পুলিশের তরফ থেকেও ২ জন ঘাল হয়েছেন। মজা এই—ঘে-বাড়ীর লোক মরেছে ও যা খেয়ে এখনও বেঁচে আছে—তাদের কাছে টেন্স পাওনা ছিল না। —নবসঙ্গ।

প্রেসিডেন্সি জেলে হাসান।—গত বুধবার দিন কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে এক মহা হাসান হইয়া গিয়াছে। কয়েদীগণের বোধ হয় বহদিন হইতেই অনেক বিবরে অসন্তোষ বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। ঘটনার দিন একটি জমাদার নাকি কোন কয়েদীকে চপেটাঘাত করে। তাহাতে বহুসংখ্যক কয়েদী ক্ষেপিয়া উঠে। ক্রমে তাহার ঐ জেলের সংযুক্ত পাটের গুলাম ও কেরোসিনের গুলামে আগুন লাগাইয়া দেয় বলিয়া শুনা যায়। অস্ত্রধারী পুলিশগণ আসিয়া কয়েদীগণের উপর গুলি চালাইতে থাকে। এই গুলির চোটে অনেকে মারা যায়। এপর্যন্ত সাতজন কয়েদীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। পাটের গুলামের ও কেরোসিনের গুলামের আগুন নিবাইতে বহু বেগ পাইতে হইয়াছে। দমকলের চেষ্টা সত্ত্বেও কয়েকদিন পর্যন্ত আগুন সম্পূর্ণভাবে নিবায়-ছিল না। প্রচলিত রীতি অনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট যাইয়া এই বিষয়ে তদন্ত করিতেছেন। কয়েদীগণ নিজের জীবনের মাহা পরিত্যাগ করিয়াও কিংকল এই প্রকার হাঙ্গামার কারণ প্রবৃত্ত হইল তাহার কারণ এই অমুসন্মানে প্রকাশিত হইবে তাহা আশা করা বাইতে পারে না। যে অভিযোগের জন্য তাহার প্রাণকে তুচ্ছ করিয়াছে সে অভিযোগ সামান্য নহে। —চান্দমহির।

বঙ্গীয় রাষ্ট্র-সম্মিলন—

প্রাদেশিক সম্মিলনের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী বাজালীকে জাতির জীবনে যে অথও সত্য রয়েছে, তারই সন্ধান নিযুক্ত হতে অনুরোধ করেছেন। তিনি বলেন—“সেই সত্যের সন্ধান পাইতে হইলে আজ আমাদের সকল দিক দিয়া জাগিতে হইবে। শুধু রাজনীতি নয়, সমাজ-নীতি নয়, ধর্মনীতি নয়, জীবনের সমস্ত বিকাশের মূলধারার অমুসন্ধান করিতে হইবে।” কথাটা নূতন নয়, কিন্তু রাজনীতির হট্টগোলের মাঝে সমস্ত ‘বিকাশের মূলধারার অমুসন্ধান’ প্রবৃত্ত হবার আশান এমন স্পষ্ট করে কোন রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে করা হয়েছে বলে আমরা জানি। ‘বিকাশের’ সেই ‘মূল ধারাটি’ কি এবং কি করে’ তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে সভানেত্রী যদিও তা বলেন নি, তবুও আজকার এই উত্তেজনার দিনে বাহির-মুখে এই জাতিকে অন্তরের দিকে চাইতে বলে’ তিনি মাঝে মাঝেই করেছেন।

সভানেত্রীর অভিভাষণের আর-একটি বিশেষ এই যে, তিনি দেশ-প্রেমকে আর নূ-কো গতির ভিতরই আটক রেখে চেপে মারতে চান না। মেডে সভর আগে যে বক্তৃতা তাই তথ্যভিত্তিক ভাব বাহিরে এজেই যে

দেশের কাজ অ-কাজ অথবা কু-কাজ হয়ে কাঁড়াবে এ ধারণা তাঁর মোটেই নেই। দেশের চাইতে নন-কোঅপারেশনকে সভানেত্রী যে বড় করে' দেখেন না, তাঁর অভিসারণ পড়ে' এইটেই বোঝা যায়।

শুধু সভানেত্রীর নয়, সভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির বক্তৃতার মাঝেও এই ভাবটা প্রকাশ পেয়েছে। প্রতিনিধিদের মাঝেও অনেকে এই মতেরই পক্ষপাতী; কিন্তু এমন অনেকেও ছিলেন, এখনও ধাঁরা—“ভায়েন বিজ্ঞে ত বলেন পটল।”

—বিজ্ঞলী।

শোক-সংবাদ—

বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সোমবার সন্ধ্যায় দেহ-বন্ধা করেছেন।

তাঁর তিরোভাবে শুধু বেলুড় মঠ নয় সমস্ত দেশই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হল।

—বিজ্ঞলী।

অনুন্নতের উন্নতি-চেষ্টা—

বঙ্গীয় জনসম্ম (Bengal Peoples' Association)।

বিপত্ত এই ফেব্রুয়ারি ববিবার দিবস কলিকাতায় সিটিমুল-গৃহে

বঙ্গদেশের কয়েকটি অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ সমবেত হইয়া 'বঙ্গীয় জনসম্ম' গঠন করিয়াছেন। অনুন্নত সম্প্রদায়-সমূহের সর্বপ্রকার উন্নতি-বিধানের চেষ্টা করাই এই 'সম্মের' উদ্দেশ্য। অনুন্নত সম্প্রদায়-সমূহের সামাজিক, নৈতিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্ম-সম্বন্ধীয় ও অন্যান্য নানা বিষয়ের উন্নতি সাধন করিতে এই সম্ম অগ্রসর হইয়াছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় এতদ্বন্দ্বিত্তে পৃথকভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন বটে, কিন্তু তদ্বারা আশানুরূপ ফললাভ হইতেছে না ও অদূর ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনা নাই। সকল অনুন্নত সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টায় স্বেচ্ছা লাভের আশা করা যাইতে পারে। 'বঙ্গীয় জনসম্ম' আশা করেন যে, বঙ্গের বিভিন্ন অনুন্নত জেগীষ জনগণ সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া ইহাব পরিপুষ্টি-সাধনে সহায়তা করিবেন।

আপাততঃ রাজবাংলী (ক্ষত্রিয়), নমঃশূত্র, পৌণ্ড্র, ক্ষত্রিয়, শাহা, পাটনী, মাহিষ্য, মালী, ঝল্ল-মল্ল (ক্ষত্রিয়) ও ব্রজক-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ 'সম্মের' সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, এতদ্ব্যতীত আরও আর ২০টি সম্প্রদায়ের নেতাগণ 'সম্মের' যোগদান করিতে প্রতিক্রমিত হইয়াছেন।

শ্রীদামোদর দাস, বি-এ,

৩৯ হারিসন বোড,

কলিকাতা।

সেবক



উপকারের উপদ্রব

শ্রীচরুচন্দ্র রায় কণ্ঠক অধিত
আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে গৃহীত

[চৌঘট-হাজারী মন্ত্রী মোটরগাড়ী হইতে নামিয়া বেচারী গরুর গাড়ীর পাড়ারান্বেব মুখেব আসে ভাগ বসাইয়া নূতন ট্যাক্স আদায় করিতে ছুটিয়াছেন—তিনি স্বায়ত্তশাসন ও স্বাস্থ্য-সংরক্ষণের মন্ত্রী, দেশের হিত করিবেনই কবিবেন পণ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।]

কবিতা পাথর



বিদূষক

শেষ-বেলা

কাঞ্চীব রাজা কর্ণাট ঘর কব্ধে গেলেন। তিনি হলেন জয়ী।
চন্দনে, হাতির ঠাঁতে, আব সোনা-মাণিকে হাতি বোকাই হল।
দেশে ফেব্রুয়ার পথে বলেগরীব মন্দির বলিব বস্ত্রে ভাসিয়ে দিয়ে বাজা
পুজো দিলেন।
পুজো দিবে চলে আসছেন—গায়ে রক্তবস্ত্র, গলায় জবাব মালা, কপালে
বস্ত্র-চন্দনের তিলক—সঙ্গে কেবল মন্ত্রী আব বিদূষক।
এক জায়গায় দেখলেন পথের ধারে আমবাগানে ছেলেরা খেলা
কব্ধে।
রাজা তাব ছই সঙ্গীকে বললেন, “দেখে আসি, ওবা কি পেল্চে।”

২

ছেলেরা ছই সাপি পুতুল মাঝিয়ে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেল্চে।
রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, “কার সঙ্গে কাব যুদ্ধ?”
তারা বল্লে, “কর্ণাটের সঙ্গে কাঞ্চীব।”
বাজা জিজ্ঞাসা কবলেন, “কার জিৎ, কার হার?”
ছেলেবা বুক ফুলিয়ে বল্লে, “কর্ণাটের জিৎ, কাঞ্চীর হার।”
মন্ত্রী মুখ গম্ভীর হল, বাজাব চকু রক্তবর্ণ, বিদূষক হা হা করে হেসে

—উঠল।

৩

বাজা যখন তাঁব সৈন্ত নিয়ে ফিবে এলেন, তখনো ছেলেবা খেল্চে।
বাজা হুকুম করলেন, “একেকটা ছেলেকে গাছেব সঙ্গে বাঁধো, আর
লাগাও বেত।”
গ্রাম থেকে তাদের না-বাপ ছুটে এল। বল্লে, “ওরা অবোধ, ওরা
খেলা কবছিল, ওদের মাপ কর।”
বাজা সেনাপতিকে ডেকে বললেন, “এই গ্রামকে শিক্ষা দেবে, কাঞ্চীব
বাজাকে কোনোদিন যেন ভুলতে না পাবে।”
এই বলে শিবিরে চলে গেলেন।

৪

সন্ধ্যা বেলায় সেনাপতি বাজার সমুখে এসে দাঁড়াল। প্রণাম কবে
বল্লে, “মহাবাজ শূণ্যল কুকুব ছাড়া এগায়ে কাবো মুখে শব্দ শুনতে
পাবে না।”
মন্ত্রী বল্লে, “মহারাজেব মানরক্ষা হল।”
পুবোহিত বল্লে, “বিশেষত্ব মহারাজেব সহায়।”
বিদূষক বল্লে, “মহারাজ, এবার আমাকে বিদায় দিন।”
রাজা বললেন, “কেন?”
বিদূষক বল্লে, “আমি মাব্ধেও পারিনে, কাঠিতেও পারিনে,
বিধাতার প্রসাদে আমি কেবল হাসতে পাবি। মহারাজেব সভায় থাকলে
আমি হাসতে ভুলে যাব।”
(ভাবতী, বৈশাখ)

শ্রীবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পূর্বাচলব পানে তাকাই
অস্তাচলব ধাবে আসি।
ডাক দিবে যাব সাড়া না পাই
তার লাগি’ আজ বাজাই বাশি।
যখন এ কুল বাব ছাড়ি,
পাবের খেয়ায় দেব পাড়ি,
মোব ফাঙনের গানের বোঝা
বাঁশিব মাথে যাবে ভাসি’ ॥
সেই যে আমাব বনের গলি
বড়ীন ফুলে ছিল আঁকা,
সেই ফুলেবি ছিন্ন দলে
চিহ্ন তাহার পডল্ চাকা।
মাঝে মাঝে কোন্ বাতাসে
চেনা দিনেব গন্ধ আসে,
হঠাৎ বকে চমক লাগায়
আধ-ভোলা সেই কাগা-হাসি ॥

শ্রীবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিলাইদা, ১০ই চৈত্র, ১৩২৮।

বিতরণ

গাঙ্গা-বাগদার পথের ধাবে
গান পেয়ে মোব কেটেচে দিন।
যাবার বেলায় দেব কাঁবে
বুকেব কাছে বাজল যে বীণ ?
হবগুলি তার নানাভাগে
বেশে যাব পুষ্পবাগে,
মীডগুলি তাব মেঘেব বেধায়
স্বর্ণলেখায় করব বিলীন।
কিছু বা সে মিলন-মালায়
যুগল গলায় রইবে গাঁথা।
কিছু বা সে ভিক্ষিয়ে দেবে
ছই চাহনিব চোখেব পাতা।
একদা কোন্ চৈত্র মাসে
বকুল-ঢাকা বনের ঘাসে
হঠাৎ আমাব মনেব কথা
কুড়িয়ে পাবে কোন্ উদাসীন ॥

শ্রীবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিলাইদা, ১১ই চৈত্র, ১৩২৮।

অবলোষ

কার যেন এই মনেব বেদন
চৈত্র মাসেব উতন হাওয়াব ;
ঝুংকো লতা'ব চিকন পাতা
কাঁপে বে কা'ব চন্'ক-চাওয়াব ।
হাবিয়ে-বাওয়া কার সে বাঁশী,
কার সোহাগের অংশখানি,
আমেব বোলের গন্ধে মিশে
কাননকে আশ কালা পাওয়ায় ।
কাকন ছুটিব বিনিবিনি
কা'ব বা এখন মনে আছে ?
সেই কাকনেব ঝিকিমিকি
পিয়াল বনেব শাদায় নাচে ।
যাব চোখের ঐ আতান দোলে
নদী-চেউষের কোলে কোলে,
তাব সাথে মোব দেখা ছিল
সেই সেকালের তরী বাওয়ায় ।

শ্রী-বীজনাথ ঠাকুর

শিলাইদা, ১২ই চৈত্র, ১৩২৮ ।

নিদ্রাহারা

নিদ্রাহারা বাতের এ গান
বাঁব আমি কেমন হবে ?
কোন বজ্রনীগন্ধা হতে
আনব সে তান কণ্ঠে পুরে ?
সুবেব কাঙাল আমাব কথা—
ছায়াব কাঙাল বৌদ্র যথা,—
সাঁজ-সকালে বনের পথে
উদাস ভাবে বেড়ায় ঘুরে ।
ওগো সে কোন্ বিহান বেলার
এই পথে কা'ব পায়ের তলে
নাম-না-জানা তৃণকুহম
শিউবেছিল শিশি-ব-জলে ।
অলকে তার এবটি গুছি
করবীফুল রক্তকটি ;
নয়ন করে কি ফুল চয়ন
নীল গগনে দুবে দুবে ।

শ্রী-বীজনাথ ঠাকুর

শিলাইদা, ১৩ই চৈত্র, ১৩২৮ ।

চেনা

এক ফাগুনেব গান সে আমাব
আর ফাগুনেব বুলে কুলে
কার ধোঁজে আজ পথ হানাল
নতুন কালের ফুলে ফুলে ?
শুধায় তাবে বকুন হেনা,
“কেউ আছে কি তোমার চেনা ?”

সে বলে, “হায়, আছে কি নাই—
না বুকে তাই বেড়াই ভুলে,
নতুন কালের ফুলে ফুলে” ॥

এক ফাগুনেব মনের কথা
আব ফাগুনের কানে কানে
শুজবিয়া কেঁদে শুধায়,
“মোব ভাষা আজ কেউ কি জানে ?”
আকাশ বলে, “কে জানে সে
কোন ভাষা যে বেড়ায় ভেসে ।”
“হয়ত জানি, হয়ত জানি,”
বাতাস বলে ঢুলে ঢুলে
নতুন কালের ফুলে ফুলে ॥

(ভারতী, বৈশাখ)

শ্রী-বীজনাথ ঠাকুর

শিলাইদা, ১৪ই চৈত্র, ১৩২৯

উপসংহার

শোভাবাহুব দেশে মেঘটি ভোর বেলাতে দেবদাম্ভবে গান গাইতে
যায় । সে ছিল কুড়িয়ে-পাওয়া মেঘে ।

আচার্য্য বলেন, “একদিন শেষবাজে আমার কানে একখানি সুব
লাগল । তা'ব পরে যখন সাজি নিয়ে পাঠশালার ফুল তুলতে গেছি
তখন মেঘটিকে ফুলগাছ-তলায় বড়িয়ে পেলুম ।”

সেই অবধি আচার্য্য তাকে আপন তথুবাটির মত কোলে নিয়ে
মানুষ কবেছেন ; মুখে যখন কথা খোঁটেনি, এব গলায় তখন—
গান লাগল ।

আজ আচার্য্যের কণ্ঠ স্বীর্ণ, চোখে ভাল দেখেন না । মেয়েটি
তাকে শিশুর মত মানুষ কবে ।

কত যুবা দেশ-বিদেশ থেকে এব গান শুন্তে আসে । তাই
দেখে মাঝে মাঝে আচার্য্যের বুক কেঁপে ওঠে, বলেন,—“যে বোঁটা
স্বাঙ্গা হয়ে আসে, ফুলটি তাকে ছেড়ে যায় ।”

মেয়েটি বলে,—“তোমাকে ছেড়ে আমি একপলক বাঁচিনে ।”

আচার্য্য তা'ব মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে বলেন,—“বে গান আজ
আমাব কণ্ঠ ছেড়ে গেল, সেই গান তো'বই মধো কপ নিয়েছে ।
তুই যদি ছেড়ে বাস তাহলে আমাব চিবজন্মেব সাধনাকে আমি হারা'ব ।”

২

কানুন-পূর্ণিমায় আচার্য্যের প্রধান শিষ্য কুমার সেন গুরুর পায়ে
একটি আমেব মঞ্জরী বেখে প্রণাম করলে,—“মাধবী
হৃদয় পেয়েচি, এখন প্রভুর যদি সম্মতি পাই তাহলে দুজনে মিলে
আপনার চরণ-সেবা কবি ।”

আচার্য্য চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল । বললেন,—“আন
দেখি আমাব তথুবা । আর তোমরা দুইজনে রাজাব মত, বাণীব মত
আমার সামনে এসে বস ।”

তথুবা নিয়ে আচার্য্য গান গাইতে বসলেন । ঢুলহা-ঢুলহী'ব গান
সাহানাব হবে । বললেন, “আজ আমাব জীবনেব শেষ গান গাব ।”

এক পদ গাইলেন । গান আব এগোয় না, বৃষ্টির ফোঁটার
ভেত্রে-ওঠা জুঁই ফুলটির মত হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে খসে পড়ে ।

শেষে তম্বুবাটি কুমার সেনের হাতে দিয়ে বল্লেন,—“বৎস, এই লও আমার যন্ত্র।”

তাবপবে মাধবী হাতখানি তার হাতে তুলে দিয়ে বল্লেন,—
“এই লও আমার প্রাণ।”

তার পরে বল্লেন,—“আমার পানটি দুজনে মিলে শেষ করে দাও, আমি শুনি।”

মাধবী আব কুমার গান ধরলে—সে যেন আকাশ আব পূর্ণ-
চাঁদের কণ্ঠ মিলিয়ে গাওয়া।

৩

এমন সময দ্বাবে এল রাজকনুত, গান থেমে গেল।

আচার্য্য কীপুতে কীপুতে আসন থেকে উঠে জিজ্ঞাসা কব্লেন,—
“মহারাজের কি আদেশ?”

দূত বললে,—“তোমার মেয়ের ভাগ্য প্রসন্ন, মহাবাজ তাঁকে
ডেকেচেন।”

আচার্য্য জিজ্ঞাসা কব্লেন,—“কি ইচ্ছা তাঁর?”

দূত বললে,—“আজ বাত পোয়ালে রাজকনুত কাছোজে পতি-
গৃহে যাত্রা কব্বেন, মাধবী তাঁর সঙ্গিনী হয়ে যাবে।”

রাত পোয়াল, রাজকনুত যাত্রা কব্বল।

মহিষী মাধবীকে ডেকে বললে,—“আমার মেয়ে প্রবাসে গিয়ে
যাতে প্রসন্ন থাকে সে ভার তোমার উপবে।”

মাধবীর চোখে জল পড়ল না, কিন্তু অনাবুজ্জব আকাশ থেকে
যেন রৌদ্র ঠিকবে পড়ল।

রাজকনুত ময়ূরপংখী আপে যায়, আব তার পিছে পিছে যায়
মাধবীর পাখী। সে পাখী কিংখাবে ঢাকা, তাব ছুই পাশে পাহারা।

পথের ধাবে থলোব উপব ঝড়ে ভাঙা অশ্বখ ডালোব মত পড়ে
বইলেন আচার্য্য, আব স্থির হাঁড়িয়ে বইল কুমার সেন।

পাখীবা গান গাইছিল পলাশের ডালে, আমের বোলোব গঞ্চে
বাতাস বিহ্বল হয়ে উঠছিল। পাছে রাজকনুত মন প্রবাসে কোনো-
দিন ফান্সন-সন্ধ্যায় হঠাৎ নিমেয়েব জন্ত উতলা হব এই চিন্তাব
রাজপুত্রীর লোকে নিঃশাস ফেললে।

(ভারতী, বৈশাখ)

শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরীর পরিচয়

১

রাজপুত্রের বরস কুড়ি পার হয়ে যায়, দেশ-বিদেশ থেকে বিবাহের
সম্বন্ধ আসে। ঘটক বললে,—“বাহ্যীক রাজের মেয়ে রূপসী বটে, যেন
শাদা গোলোপের পুষ্পবৃষ্টি।”

রাজপুত্র মুখ কিরিয়ে থাকে, জবাব কবে না।

দূত এসে বললে,—“গাফার-রাজের মেয়ের অঙ্গে অঙ্গে লাঘব
কেটে পড়ে, যেন ড্রাকুলতার আঙুরেব শুচ্ছ আর ধবে না।”

রাজপুত্র শিকাবের ছলে বনে চলে যায়। দিন যায়, সপ্তাহ যায়,
কিরে আসে না।

দূত এসে বললে,—“কাছোজের রাজকনুতকে দেখে এলেম; ভোর
বেলাকার দিগন্ত-বেখাটির মত তাব বীকা চোখের পল্লব, শিশিবে ব্রিক,
আলোতে উজ্জ্বল।”

রাজপুত্র ভক্তৃহরির কাব্য পড়তে লাগল, পুঁথি থেকে চোখ তুলল
না।

রাজা বললে,—“এর কারণ? ডাক দেখি মন্ত্রীপুত্রকে।”

মন্ত্রীব পুত্র এল। বাজা বললে,—“তুমি ত আমাব ছেলের মিতা,
সত্য কবে বল, বিবাহে তাব মন নেই কেন?”

মন্ত্রীব পুত্র বলল,—“মহাবাজ, যখন থেকে তোমার ছেলে পরীহানের
কাহিনী শুনেচে সেই অবধি তাব কামনা সে পরী বিয়ে কব্ববে।”

২

রাজাব হুকুম হল পরীহান কোথায় ধবর চাই। বড় বড় পণ্ডিত
ডাকাল, যেখানে যত পুঁথি আছে তাবা সব খুলে দেখলে। মাথা
নেড়ে বললে,—“পুঁথিব কোনো পাতায় পরীহানের কোন ইসারা মেলে
না।”

তখন রাজসভার সওদাগরবের ডাক পড়ল। তারা বললে,—“সমুদ্র
পাব হয়ে কত ধীপই ঘুবলেম,—এলা ধীপে, মরীচ ধীপে, লবঙ্গলতাব
দেশে। আমবা গিয়েচি মলয় ধীপে চন্দন আনতে; যুগনাভির সন্ধানে
গিয়েচ কৈলাসে দেবদারুযনে, কোথাও পরীহানের কোনো ঠিকানা
পাই নি।”

রাজা বললে,—“ডাক মন্ত্রীব পুত্রকে।”

মন্ত্রীব পুত্র এল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, পরীহানের
কাহিনী বাজপুত্র কাব কাছে শুনেচে?”

মন্ত্রীব পুত্র বললে,—“দেই যে আই নবীন পাগুলা, বীশি হাতে বনে
বনে ঘুবে বেড়ায়, শিকাব করতে গিয়ে রাজপুত্র তারি কাছে “পরীহানের
গল্প শোনে।”

বাজা বললে,—“আচ্ছা ডাক তাকে।”

নবীন পাগুলা এক-মুঠো বনের ফুল ভেট দিয়ে রাজার সামনে
দাঁড়াল। বাজা তাকে জিজ্ঞাসা কবলে,—“পরীহানের ধবর তুমি কোথায়
পেলে?”

সে বললে,—“সেখানে আমি ত সদাই যাওয়া-আসা করি।”

বাজা জিজ্ঞাসা কবলে,—“কোথায় সে জায়গা?”

পাগুলা বললে,—“তোমাব বাজ্যের সীমানায় চিত্রগিবি পাহাড়ের
তলে, কাম্যক সরোবরের ধাবে।”

রাজা জিজ্ঞাসা করলে,—“সেইখানে পরী দেখা যায়?”

পাগুলা বললে,—“দেখা যায়, কিন্তু চেনা যায় না। তারা ছয়বেশে
থাকে। কখনো কখনো যখন চলে যায় পরিচয় দিয়ে যায়, আব
ধরবাব পথ থাকে না।”

রাজা জিজ্ঞাসা করলে,—“তুমি তাবের চেন কি উপায়ে?”

পাগুলা বললে,—“কখনো বা একটা হর শুনে, কখনো বা একটা
আলো দেখে।”

বাজা বিবস্ত্র হয়ে বললে,—“এর আগাগোড়া সমস্তই পাগুলামি,
এ’কে তাড়িয়ে দাও।”

৩

পাগুলা কথ্য রাজপুত্রের মনে গিয়ে বাজল।

ফান্সন মাসে তখন ডালে ডালে শালফুলে ঠেলাঠেলি, আব শিরীষ
ফুলে বনের প্রান্ত শিউবে উঠেচে। বাজপুত্র চিত্রগিরিতে একা চলে
গেল।

সবাই জিজ্ঞাসা কবলে,—“কোথায় যাচ্ছ?”

সে কোনো জবাব কবলে না।

সুহার ভিতব দিয়ে ধবনা ঝরে আসে, সেটি গিয়ে মিলেচে কাম্যক
সরোবরে; প্রাসের লোক তাকে বলে,—“উদাস ঝোঁবা।” সেই ঝরনার
তলার একটা পোড়ো মন্দিবে বাজপুত্র বাসা নিলে।

এক মাস কেটে গেল। পাছে পাছে যে কটি পাতা উঠেছিল
তাদের রঙ ধন হয়ে আসে, আর ঝরাফুলে বনপথ ছেয়ে যায়।

এমন সময় একদিন ভোবের স্বপ্নে রাজপুত্রের কানে একটি বাঁশির স্বর এল। জেগে উঠেই রাজপুত্র বললে, “আজ পাব দেখা।”

৪

তখনি ঘোড়ায় চড়ে কামাক্ সরোবরের তীর বেয়ে চলল, পৌছিল কামাক্ সরোবরের ধারে। দেখে, -দেখানে পাহাড়ের এক মেয়ে পদ্মবনের ধারে বসে আছে। ঘড়াষ তার জল ভরা, কিন্তু ঘাটের থেকে সে ওঠে না। কালো ঘেয়ে কানের উপর কালো চুলে একটি শিবীর ফুল পরেছে, পোখুলিতে যেন প্রথম তাবা।

রাজপুত্র ঘোড়া থেকে নেমে তাকে বললে, “তোমার ঐ কানের শিরীষ ফুলটি আমাকে দেবে?”

যে হরিণী ভয় জানে না এ বুঝি সেই হরিণী? ঘাড় বেকিয়ে একবার সে রাজপুত্রের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। তখন তার কালো চোখের উপর একটা কিসের ছায়া অথবা ঘন কালো হয়ে নেমে এল—ঘুমের উপর যেন স্বপ্ন, বিগলিত যেন প্রথম আবেগের সঞ্চার।

মেয়েটি কান থেকে ফুল খসিয়ে রাজপুত্রের হাতে দিয়ে বললে, “এই নাও।”

রাজপুত্র তাকে জিজ্ঞাসা করলে, “তুমি কোন্ পরী, আমাকে সত্য করে বল।”

শুনে একবার মুখে দেখা দিল বিষর, তার পরেই আঁধার মেঘের আঁচমুকা বৃত্তির মত তার হানির উপর হাসি, সে হাসি আব ধামুতে চায় না।

রাজপুত্র মনে ভাবল, “বধু বৃত্তি ফুল—এই হাসির স্বর যেন সেই বাঁশির স্বরের সঙ্গে মেলে।”

রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে ছুই হাত বাড়িয়ে দিলে, বললে, “এস।”

সে তার হাত ধরে ঘোড়ার উঠে পড়ল, একটুও ভাবল না। তার জলভরা ঘড়া ঘাটে রইল পড়ে।

শিরীষের ডাল থেকে কোকিল ডেকে উঠল, কুহ কুহ কুহ কুহ।

রাজপুত্র মেয়েটিকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করলে, “তোমার নাম কি?”

সে বললে, “আমার নাম কাজরী।”

উদাস স্তোভার ধারে ছুজনে গেল সেই পোড়ো মন্দিরে। রাজপুত্র বললে, “এবার তোমার ছদ্মবেশ কেলে দাও।”

সে বললে, “আমরা বনের মেয়ে, আমরা ত ছদ্মবেশ জানি নে।”

রাজপুত্র বললে, “আমি যে তোমার পরীর মূর্তি দেখতে চাই।”

পরীর মূর্তি। আবার সেই হাসি, হাসির উপর হাসি। রাজপুত্র ভাবলে, “এর হাসির স্বর এই স্বরগীর সঙ্গে মেলে, এ আমার এই স্বরগীর পরী।”

রাজার কানে খবর গেল, রাজপুত্রের সঙ্গে পরীর বিয়ে হয়েছে। রাজবাড়ি থেকে ঘোড়া এল, হাতি এল, চতুর্দোলা এল।

কাজরী জিজ্ঞাসা করলে, “এ-সব কেন?”

রাজপুত্র বললে, “তোমাকে রাজবাড়িতে যেতে হবে।”

তখন তার চোখ হলহলিয়ে এল। মনে পড়ে গেল, তার ঘরের আড়িনায় শুকোবার জন্মে ঘাসের বীজ মেলে দিয়ে এসেছে; মনে পড়ল তাব বাপ আব ভাই শিকারে চলে গিয়েছিল, তাদের ক্ষেত্বার

সময় হয়েছে; আব মনে পড়ল তাব বিয়েতে একদিন ঘোড়াক দেবে বলে তার মা গাছতলায় তাঁত পেতে কাপড় বুনছে, আর গুন গুন করে গান গাইছে।

সে বললে, “না, আমি যাব না।”

কিন্তু ঢাক ঢোল বেজে উঠল, রাজল বাঁশি, কাসি, দামামা,—ওর কণা শোনা গেল না।

চতুর্দোলা থেকে কাজরী যখন রাজবাড়ীতে নামল, রাজমহিণী কপাল চাপড়ে বললে, “এ কেমনতর পরী?”

বাজার মেয়ে বললে, “ছি, ছি, কি লজ্জা।”

মহিণীর দানী বললে, “পরীর বেশটাই বা কি রকম?”

রাজপুত্র বললে, “চুপ কর, তোমাদের ঘবে পরী ছদ্মবেশে এসেছে।”

৬

দিনের পর দিন যায়। রাজপুত্র জ্যোৎস্নাবাত্রে বিছানার জেগে উঠে চেয়ে দেখে কাজরীর ছদ্মবেশ একটু কোথাও ঘসে পড়েছে কি না। দেখে যে কালো মেঘের কালো চুল এলিয়ে গেছে, আর তার দেহখানি যেন কালো পাথরে নিখুঁৎ করে খোদা একটি প্রতিমা। রাজপুত্র চুপ করে বসে ভাবে, “পরী কোথায় লুকিয়ে রইল, শেষ রাতে অন্ধকারের আড়ালে উবার মত।”

রাজপুত্র ঘরের লোকের কাছে লজ্জা পেলে। একদিন মনে একটু রাগও হল। কাজরী সকাল বেলায় বিছানা ছেড়ে যখন উঠতে যায় রাজপুত্র শব্দ করে তাব হাত চেপে ধবে বললে, “আজ তোমাকে ছাড়ব না,—নিজরূপ প্রকাশ কর, আমি দেখি।”

এমনি কথাই শুনে বনে যে হাসি হেসেছিল সে হাসি আর বেরল না। দেখতে দেখতে ছুই চোখ জলে ভবে এলো।

রাজপুত্র বললে, “তুমি কি আমার চিরদিন কাঁকি দেবে?”

সে বললে “না, আব নয়।”

রাজপুত্র বললে, “তবে এইবার কার্তিকী পূর্ণিমায় পরীকে যেন সবাই দেখে।”

৭

পূর্ণিমার চাঁদ এখন মাঝ পগনে। রাজবাড়ীর নহবতে মাঝরাতেই স্বরে ঝিমঝিমি তান লাগে।

রাজপুত্র বরসজ্জা পবে হাতে বরণমালা নিয়ে মললে ঢুকল, পরী-বোয়ের সঙ্গে আজ হবে তার শুভদৃষ্টি।

শয়নঘরে বিছানার শাদা আস্তরণ, তাব উপর শাদা কুল ফুল বাশ-করা; আব উপরে জানলা বেয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে।

আর কাজরী?

সে কোথাও নেই।

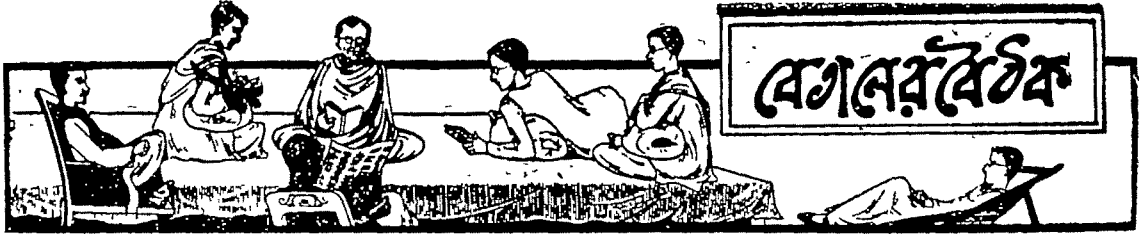
তিন প্রহরের বাঁশি বাজল। চাঁদ পশ্চিমে হেলেছে। একে একে কুঁড়ে ঘর ভরে গেল।

পরী কই?

রাজপুত্র বললে, “চলে গিয়ে পরী আপন পরিচয় দিয়ে যায়, আর তখন তাকে পাওয়া যায় না।”

(বঙ্গবাণী, বৈশাখ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন সংক্রান্ত প্রমোত্তব ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজননে মিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনার সর্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নাম প্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রমোত্তব ছাপা হইবে না। প্রশ্ন ও উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্সাইক্লোপিডিয়াব অভাব পূরণ করা নামময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত ; যাঁহাতে সাধাবণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত যাঁহার মীমাংসা বহুলোকেব উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা অবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাঁহাতে তাঁহা মনগড়া বা আলাদা নাই হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বার-প্রতিবার ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের স্বৈচ্ছাধীন—তাঁহাব সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে আমরা পাবিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন কবিতা সংযোগ্যনা আরম্ভ হয়। অতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন বৎসরের কত সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাঁহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(১৫)

ছত্রিশ জাতি কি কি ও কোথার উল্লেখ আছে ?

চক্র বন্দোপাধ্যায়।

(১৬)

হিন্দুধর্মে পৌত্তলিকতা কতদিনের ? ঐনরেসুলুমাঝ বোম্ব।

(১৭)

ইংরেজী 'Tea' শব্দের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ 'চা'। ইহার ব্যুৎপত্তি কোন ভাষা হইতে ? ঐশীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

(১৮)

দুধ সময় সময় টক হইয়া যায় কেন ? এমন কোন উপায় অবলম্বন করা যায় কি না যদ্বা বা দুধ টক হয় না ? ঐনলিলী ভদ্র।

মীমাংসা

গত বৎসরের মীমাংসা

(১১৬)

প্রাচীন ভারতে ঘড়ী ও সূচিকাভরণ

জ্যোতির্বিদ ভাস্করাচার্য্য একটি লোকের বলিয়াছেন যে, ১৩০৬ শকাব্দে (১১১৪ খৃঃ) তাঁহার জন্ম ও ৩৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে (১১৫০ খৃঃ) তিনি সিদ্ধান্ত-শিরোমণি গ্রন্থ রচনা করেন। ১২শ শতাব্দীতে ঘড়ির প্রচলন হওয়ার কোনও প্রকার সম্ভাবনা দেখি না।

সুশ্রুত অষ্টচিকিৎসা ৮ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—যথা—

- (১) ছেদ্যক্রিয়া—Incision.
- (২) ভেদ্যক্রিয়া—Puncturing.
- (৩) লেদ্যক্রিয়া—Scratching.
- (৪) বেদ্যক্রিয়া—Poring
- (৫) বন্ধনকার্য্য—Bandage.
- (৬) সীব্যক্রিয়া—Sewing.
- (৭) এব্যক্রিয়া—Probing.
- (৮) আহার্য্য—Extraction.

৪ নং বেদ্যক্রিয়া (Boring) অর্থাৎ শিবা কাটা, শিবার মধ্যে গুহ

প্রয়োগ ইত্যাদি (পক্ষানন নিয়োগী)। সুশ্রুত খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর লোক। সুতরাং ভাস্করাচার্য্যের যুগে সূচিকাভরণ প্রয়োগ প্রচলিত ছিল—ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ঐনগেন্ড্রচন্দ্র ভট্টশালী।

(১৩৭)

বর্তমান মাস-গণনাৰ আবস্ত-কাল।

কৃষ্ণ-যজুর্বেদে উক্ত হইয়াছে—

“মধুশ্চ মাধবশ্চ বাসন্তিকাবৃত্ত,
শুক্রশ্চ শুচিশ্চ গ্রীষ্মাবৃত্ত,
নভশ্চ নভশ্চ বার্ষিকাবৃত্ত,
ইবশ্চোজ্জ্বলশ্চ শাৰদাবৃত্ত,
সহশ্চ সহশ্চ হেমন্তিকাবৃত্ত,
তপশ্চ তপশ্চ শৈশবাবৃত্ত ॥”

তৈ—স—৪, ৪.১১০।

মধু ও মাধব (চৈত্র ও বৈশাখ) বসন্ত ঋতু, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম ঋতু, জ্যাবণ ও ভাদ্র বর্ষা ঋতু, আশ্বিন ও কার্তিক শরৎ ঋতু, অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত ঋতু এবং মার্গ ও ফাল্গুন শিশির ঋতু।

“প্রবাসী” ১৩১৫, ৪০৪ পৃঃ।

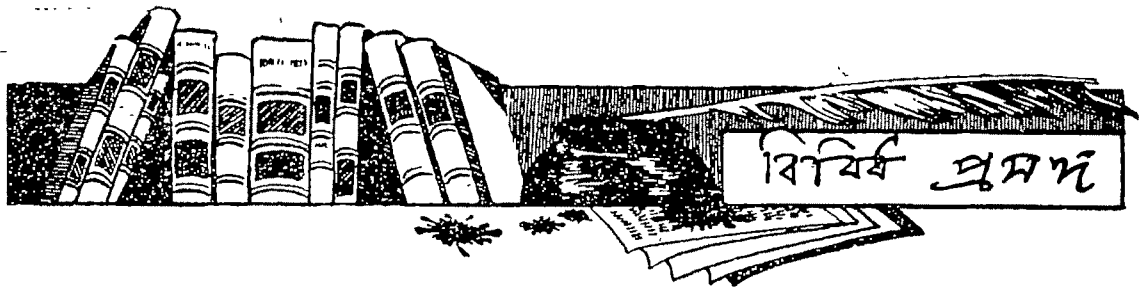
এখানে দেখা গেল—সেই বৈদিক সময়ের মাসগুলিও ও আঙ্গ-কালের মাস-গণনার মধ্যে পার্থক্য নাই বলিলেই চলে।

ঐনগেন্ড্রচন্দ্র ভট্টশালী।

(১৪০)

দুর্গা তুলসী বিষ প্রভৃতির পবিত্রতা

দুর্গা, তুলসী ও বিষ ইহাদের প্রত্যেকেরই উৎপত্তি এক-একটি আখ্যায়িকা পুরাণে দৃষ্ট হয়। দুর্গা বিষ্ণুর লোগ হইতে সমুদ্র-মন্ডনের সময় উৎপন্ন হইয়াছে। তুলসী নামী বন্যপত্র কেশবমুহু নারায়ণের ববে তুলসীনামক পুণ্যবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। লক্ষ্মী একদিন শিব-পূজাকালে এক স্থান ছিঁড়িয়া তাহার উপবসেন। শিবের ববে সেই স্থানেই বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। এই কাবণেই ইহার নাম ত্রীকুল বৃক্ষ। শিবের ইচ্ছা, ইহার পত্রের লোকে তাঁহার পূজা করুক। তাহাতেই তিনি প্রসন্ন হইবেন। এই বৃক্ষগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে আবও অনেক আখ্যায়িকা আছে। তাহাতে দেখান হইয়াছে যে লক্ষ্মী হইতেই ইহারা পবিত্র। ঐশ্বিন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী।



স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বৃহৎ ব্রিটিশ লাঠির যুক্তি

কথায় বলে মূৰ্খস্যা লাঠ্যোষধি। বঙ্কের লার্ড লর্ড লিটন বোধ হয় ভারতের লোকদিগকে মূৰ্খ মনে করিয়া তাহাদের মধ্যে ঘাহারা স্বাধীনতালাভেচ্ছা রোগে আক্রান্ত তাহাদিগকে ব্রিটিশ লাঠি দেখাইয়াছেন।

বিগত ১১ই এপ্রিল, ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশন লর্ড লিটনকে অভিনন্দিত করিয়া একটি অভিভাষণ পড়েন। তাহার উত্তরে বক্তৃতা করিয়া লর্ড লিটন অন্তান্ত কথার মধ্যে বলেন :—

I see in the task ahead of us—the task I mean of progressing towards self-government or *Swaraj*—two possible interpretations of *Swaraj*, two alternative lines of advance, one of which is clear and open, bright with hope and free from obstacles, the other is encumbered with the thickest of barbed wire entanglements, offers no field for co-operation, and is dark with the menace of racial storms.

The first interpretation of *Swaraj* is the constitutional independence of India. Self-government in the sense of government by the Indian Parliaments as distinct from Government by the British Parliament but in association with the other self-governing Dominions, and allegiance to our common King Emperor. This can be attained by building up a constitution suited to Indian conditions, by the establishment of an efficient administration in India in which Indians and Europeans are equally interested, in which they are both represented and work side by side freed from the necessity of reference to or control by a Secretary of State of the Imperial Parliament. The hallmark of such *Swaraj* would be the threefold requirements of efficiency in administration, racial co-operation and constitutional freedom. That is a goal towards which Indians and Europeans can advance together, the rate of advance towards which is practically in their own hands and the ultimate attainment of which will be good for India and good for Britain.

The second interpretation of *Swaraj* is racial independence, the Government of India by Indians as distinct from Government by the British, and it is sought to attain it by substituting Indians for Europeans in every branch of the administration and subordinating considerations of efficiency to considerations of race, with the ultimate goal of complete separation.

That is a goal which the British, whether in India or in Britain, can never accept—they cannot advance towards it with Indians, but must contest every inch of the way with them. To prevent its ever being reached the whole strength of our people would, if necessary, be used.

These two policies are in my opinion too often confused, because the policy of racial independence includes also constitutional independence and the policy of constitutional independence necessarily involves the consideration of many racial questions—the readjustment in many respects of the relationship between the two races and the provision of equal opportunities for both. But there is a fundamental difference between the two. They are in fact irreconcilable. They have a different starting point and a different objective. One is constructive and based upon love. It consequently strives to avoid racial controversies and, when they arise, to adjust them by consultation and agreement. The other is destructive and based upon hate. It seeks to make racial issues the main test of the sincerity of Government professions, and presses for their settlement by immediate legislation, whether agreement concerning them can be obtained or not. It is essential that these two should be kept distinct, and the difference between them understood. If the latter has to be stoutly resisted, the former should be sincerely encouraged.

এখানে লার্ডসাহেব দুইরকম স্বরাজের কথা বলিয়াছেন। প্রথম, ইংলণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া নিয়মতন্ত্র-প্রণালী-সম্মত স্বাধীনতা; দ্বিতীয়, ইংলণ্ড হইতে পৃথক হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ।

ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভকে তিনি যে কেন জাতিগত (racial) স্বাধীনতা আখ্যা দিলেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। এই প্রশ্নের মীমাংসার ভিতর জাতিগত ভাবকে টানিয়া আনিবার প্রয়োজন কি ছিল? ভারতবর্ষ যদি কখনও স্বাধীনতা লাভ কবে, তাহা হইলে সে স্বাধীনতাকে জাতিগত বলা চলিবে না, এমন নয়, তাহা জাতিগতই হইবে, কিন্তু কেবলমাত্র উহা জাতিগত বলিয়াই বা একমাত্র সেই কাবণেই ভারতবাসী স্বাধীনতা চায় না। স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করা মানুষের স্বভাব—শাসকসম্প্রদায় ও প্রজা যদি একজাতীয় হন তাহা হইলেও, এবং যদি ভিন্নজাতীয় হন তাহা হইলেও; সুতরাং যে-ক্ষেত্রে শাসকগণ ভিন্নজাতীয়, সেখানে তাঁহাদের ভিন্নজাতীয়তার উপর অত্যাচারের দেওয়া উচিত নয়; কেন-না তাহাতে ইহা মনে হইতে পারে, যে, কেবলমাত্র ঐ বিভিন্নতার জন্তই যেন শাসিত মানুষরা স্বাধীনতা প্রার্থনা করিতেছে। যে-সকল আমেরিকান ঔপনিবেশিক ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারা আপনাদের স্বজাতীয় শাসকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শাসনকর্তাদের দল যদি ভিন্নজাতীয় হইতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাঁহারা আরো পূর্বেই স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেন। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য অধীন দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ ও আংশিক স্বাধীনতা অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর কি না, ইহাই আসলে বিবেচনা করিবার বিষয়। ইতিহাসে আমরা ইহাই দেখিতে পাই, যে, বিজেতা ও বিজিত যেখানে ভিন্নজাতীয়, সেখানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবার ইচ্ছা অধিক প্রবল। কিন্তু ইতিহাস ইহাও বলে, যে, যেখানে বিজেতা ও শাসিত একই জাতীয়, সেখানেও স্বাধীনতা লাভ করিবার ইচ্ছা বর্তমান থাকে। সুতরাং ভারতবাসীরা অথবা একদল ভারতবাসী যদি স্বাধীনতা লাভ করিতে চান, তাহা হইলে সে ইচ্ছাকে কিছু-মাত্র অস্বাভাবিক বলা চলে না। তাঁহাদের শাসনকর্তারা যে ভিন্নজাতীয়, ইহাতে তাঁহাদের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইবারই কথা, হাস পাইবার

কথা নয়; ইতিহাস ও জীববিজ্ঞান ইহাই বলে। সুতরাং তাঁহারা স্বাধীনতা লাভ কবিত্তে চাহিলে সেটা জাতিগত (racial) স্বাধীনতাও হয় বলিয়া তাঁহাদের স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষাটাই মারাত্মক ঘোষ, এমন কথা বলা চলে না। বরং একটি ভিন্নজাতীয় শাসক দ্বারা শাসিত ও অল্পট সমাজাতীয় বিজেতা প্রভুব অধীন, এইরূপ দুইটি অধীন জাতির বিষয় বিবেচনা করিলে, ঐতিহাসিক ও জীববিজ্ঞানবিৎ নিঃশঙ্কিত রূপে এই মতই প্রকাশ করিবেন, যে, প্রথমোক্ত জাতিটির স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা শেষোক্তটির তরুণ আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা অধিকতর স্বাভাবিক ও দায়সঙ্গত।

গ্রীক বনাম তুর্ক, বুল্গেবিয়ান বনাম তুর্ক, সার্ডিয়ান বনাম তুর্ক, আর্মেনিয়ান বনাম তুর্ক, এই চারিস্থলেই দেখা যাইতেছে যে বিজেতা ও বিজিত ভিন্নজাতীয়। কিন্তু গ্রীক, বুল্গার, সার্ডিয়ান বা আর্মেনিয়ানকে তাহাদের জাতিগত স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে ইংরেজের ত কোথাও বাধে নাই? আমরা জানি, যে, তুর্কদিগকে অত্যাচারী ঘোষণা করিয়াই ইংরেজ ঐ-সকল অধীন জাতির পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু, ইংবেজদের মতে, ইংরেজ ত মিশরের উপর অত্যাচার করেন নাই, তবে তাঁহারা মিশরকে স্বাধীনতা দিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন কেন? উহা শুধু স্বাধীনতা নয়, আবার জাতিগত স্বাধীনতাও বটে। আবার এ দিকে দেখা যায়, ইংরেজ ক্রশীয়েদের বিরুদ্ধে পোলদের সাহায্য করিতেছেন, যদিও উভয়েই এক স্লাভজাতীয়। আমেরিকানবা ত ভিন্নজাতীয় ফিলিপিনোদের উপর অত্যাচার করে নাই, বরং স্বশাসনের জন্ত ফিলিপিনোরা তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ; তবে ফিলিপিনোরা স্বাধীন হইতে চায় কেন? ইহাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, বিজেতা এবং বিজিত সমাজাতীয় হউক বা না হউক, শাসকগণ শাসিতদের প্রতি অত্যাচার করুক বা না করুক, স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে জাগিয়া উঠিবেই। স্বাধীনতা যদি দেশবিশেষে জাতিগত স্বাধীনতাই হয়, সেইজন্ত তাহা নিম্নাই হইবে কেন? পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া বলি,

সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যেই আমরা দেখিতেছি, যে, ইংরেজ ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহারা মিশরকে স্বাধীনতা দান করিয়াছেন। মিশরবাসীগণ যে ইংরেজ হইতে ভিন্নজাতীয়, তাহাতে ত সন্দেহ নাই? মিশরকে যদি জাতিগত স্বাধীনতা দেওয়া চলে, তবে ভারতবর্ষকেই বা দেওয়া না চলিবে কেন?

অতরাং ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টার ভিতর জাতিগত বিভিন্নতার কথাটাকে অত বড় স্থান দিয়া লর্ড লিটন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

তিনি যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, তাহাও ঠিক হয় নাই। মডারেটগণ যে ‘নিয়মতন্ত্রাঙ্ঘ্যায়ী স্বাধীনতা’র পক্ষপাতী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অসহযোগীদের দলেরও সকলে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভকে লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। ইংরেজ-প্রভাব-মুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই যে কংগ্রেসের লক্ষ্য, আহ্মদাবাদ কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীই এই প্রস্তাব গ্রাহ্য হইতে দেন নাই। ‘ইয়ং ইণ্ডিয়া’ পক্ষে তিনি লিখিয়াছেন, যে, স্বরাজ অর্থে তিনি বুঝেন, ভারতবর্ষের পক্ষে স্বশাসনক ইংরেজ উপনিবেশের সমান অধিকারলাভ। ইহার সহিত লর্ড লিটনের ‘নিয়ম-তন্ত্রাঙ্ঘ্যায়ী স্বাধীনতা’র প্রভেদ কি? অবশ্য সম্পূর্ণ স্বাভাবিক-প্রণালী অসহযোগীও আছেন। অতএব আমাদের তিনটি রাজনৈতিক দলের কথা ভাবিয়া চলিতে হইবে, দুইটি নয়।

লর্ড লিটনের মতে, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বা দ্বিতীয় প্রকারের স্বরাজের মধ্যে ইংবেজ ও ভারতবর্ষীয়ের সহযোগিতার কোন স্থান নাই। কেন যে নাই, তাহা ত আমরা বুঝিতে পারি না। বোধ হয় আমবা সহযোগ অর্থে যাহা বুঝি, ইংরেজরা তাহা বোঝেন না, এই জন্তই এই সমস্তার উৎপত্তি। আমরা সহযোগ বলিতে যে কি বুঝি, তাহা মহাত্মা গান্ধী সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে, তাঁহার প্রার্থিত স্বরাজের ভিতর ইউরোপীয়েরও স্থান থাকিবে। তবে জাতিগতভাবে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত বা প্রভু না হইয়া তাঁহারা তখন হইবেন সমশ্রেণীস্থ বা সাহায্যকারী। জাপান ও অন্যান্য স্বাধীন দেশে ইংরেজবা এ ভাবে কাজ করিয়াছেন। কিন্তু সহযোগ বলিতে ইংরেজ সাধারণতঃ এট বুঝেন, যে, কাজের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য

ও নীতি এবং প্রণালী সকলই তাঁহারা নির্ধারণ করিয়া দিবেন এবং আমরা তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া অভিপ্রায়গুলি কার্যে পরিণত করিব। কিন্তু ইহা কি সহযোগ, না আত্মপালন? আমরা ত ইহাকে তাঁবেদারীই মনে করি। যদি স্বাধীন গ্রীকের সঙ্গে ইংরেজের সহযোগ করা চলে, যদি স্বাধীন জাপানী বা ফরাসীর সঙ্গে সহযোগ চলে, তবে স্বাধীন ভারতবাসীর সহিত না চলিবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ইংরেজের আন্তরিক ইচ্ছা যে আমরা চিরকাল তাঁহাদের কার্যসিদ্ধির যত্ন ও তৃত্য হইয়া থাকি এবং চিরদিন তাঁহাদের মন-ভুলান কথা দ্বারা মজ্জমুজ্জ হইয়া থাকি। ইহাকেই তাঁহারা সহযোগ বলেন। কিন্তু এইরূপ “শাক দিয়ে মাছ ঢাকা” চিরকাল চলিতে পারে না। বাস্তবিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়া, সমান পদে দাঁড়াইয়া সহযোগ করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের আছে কি না, তাহা বুঝিবার জন্ত আমরা দুইটি পরীক্ষার প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি। প্রথমটি এই; ভারতবর্ষে যতগুলি ইংরেজকে উচ্চপদে নিযুক্ত করা হইয়াছে, অন্ততঃ ততগুলি ভারতবাসীকে ইংলণ্ডে সেইরূপ উচ্চপদে নিযুক্ত করা হউক; দ্বিতীয়তঃ, সাম্রাজ্যের ভিতর ইংরেজের যেমন সর্বত্র অব্যাহত দ্বার, ভারতবাসীকেও সেইরূপ অবিকার দেওয়া হউক। লর্ড লিটন কি এই প্রস্তাব দুইটির সমর্থন কবিত্তে সম্মত হইবেন?

লর্ড লিটন বলিতেছেন, যে, শাসন বিভাগের প্রত্যেক অংশে ইংরেজের স্থানে ভারতবাসীকে নিযুক্ত করিয়াই এই দ্বিতীয় রকমের স্বরাজ অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা হইতেছে। এই কথায় ইহাই বুঝায়, যে, প্রথম শ্রেণীর স্বরাজ, যে স্বরাজ স্বশাসক উপনিবেশগুলি ভোগ করিতেছে, তাহার ভিতর এইরূপ নিয়োগ যেন হয় নাই বা হইতেই পাবে না। কিন্তু ইহা সত্য কথা নয়—অন্ততঃ আমরা যতদূর জানি, ইহা সত্য নয়। আমাদের মত সত্য কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্ত আমরা লাটসাংহেবকে দুই একটি প্রশ্ন করিতে চাই। কানাডা, নিউজিল্যান্ড ও অষ্ট্রেলিয়া তিনটিই স্বাধীনশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপনিবেশ। কানাডাতে যে-সকল ব্যক্তি উচ্চতম,

উচ্চতর ও উচ্চ রাজপদগুলি দখল করিয়া আছেন, তাঁহারা কি, ভারতবর্ষে যেমন তদ্রূপ, অবিকাংশই ইংরেজ না কানাডার অধিবাসী? অষ্ট্রেলিয়াতে ঐ-সকল কর্মচারী কি অধিকসংখ্যক অষ্ট্রেলিয়ান না ইংলণ্ডনিবাসী? নিউজিল্যান্ডেই বা তাঁহাদের কোন্ দল সংখ্যায় বেশী? আমরা যতটা জানি, তাঁহারা প্রায় সকলেই কানাডিয়ান, অষ্ট্রেলিয়ান এবং নিউজিল্যান্ডার। সুতরাং আমরা যদি ইউরোপীয়ের পরিবর্তে ভারতবাসীকে রাজকার্যে নিযুক্ত কবিত্তে চাই, তাহা হইলে কেন যে তাহা আমাদের পক্ষে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। উপনিবেশবাসীগণ ইউরোপীয়বংশোদ্ভূত মানুষ। তবুও তাহারা ইউরোপ হইতে মানুষ আমদানি করিয়া আপনাদের শাসন কাজ চালায় না। ইহাতে তাহারা অপরাধ করিতেছে বলিয়া কেহ মনে কবে না। কিন্তু আমরা ইউরোপীয়বংশোদ্ভূত নই; অথচ আমরা যদি ইউরোপ হইতে শাসক আমদানি না করিয়া আপনাদের কাজ আপনাই কবিত্তে চাই, তাহা হইলে সেটা এমন গুরুতর অপরাধ হইয়া দাঁড়ায় কেন? আমাদের ইচ্ছাটাই ত অধিকতর স্বাভাবিক।

স্বাধীনতালাভপ্রার্থী ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে লর্ড লিটনের দ্বিতীয় অভিযোগ এই, যে, তাঁহারা কে কত কাজেব লোক তাহা না দেখিয়া এবং সেই বিচার অনুসারে কর্মী নিয়োগ না করিয়া কে কোন্ জাতির লোক তাহাই বেশী করিয়া দেখেন ও তদনুসারে কর্মী নিযুক্ত করিতে চান। ইহা সত্য কথা নয়। ভারতবর্ষে ইংরেজেরা স্বয়ং এই দোষে দোষী। উপযুক্ত ভারতীয় থাকিতেও ইংরেজ রাজকার্যে ইংরেজ নিযুক্ত করে। এই দোষটা আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া লর্ড লিটন উন্টা চাপ দিতে চাহিয়াছেন।

কোন ভারতবাসীই, তিনি নরম বা চরম যে পক্ষী হোন, ইহা ইচ্ছা করিতে পারেন না, যে, শাসনযন্ত্র বাজের অযোগ্য হোক। আমরা সকলেই চাই, যে, বর্তমানে ইংরেজের হাতে শাসনযন্ত্র যেমন আছে, উহা তাহার চেয়ে কার্যকর হয়। আমরা বিশ্বাস করি, যে, ক্রমে ক্রমে উহাকে ইংরেজপ্রবর্তিত শাসনযন্ত্র অপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ কবা যায়, যদিও প্রথম প্রথম কিছু অযোগ্যতা প্রকাশ পাইতে পারে।

ভারতবর্ষে ইংরেজের শাসনদক্ষতার ইংরেজরূপ প্রাশংসা অত্যন্ত অত্যাধিক। কিন্তু উহার যথার্থ মূল্য যতখানি, তাহারও লাঘব করিতে আমরা চাই না। ইংরেজ শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছেন, সমগ্র দেশকে এক শাসনস্থলে গ্রহিত কবিয়াছেন এবং ভারতবাসীদের মধ্যে সমান ন্যায়-বিচার করা দিকে লক্ষ্য বাখিয়াছেন, এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু দেশের মূর্খতা শোচনীয়, কৃষি ব্যবসা ও পণ্যব্যা-উৎপাদন বিষয়ে উহা অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। ভারতবর্ষ দরিদ্র, অস্বাস্থ্যব আলস্য, মাঝীপাড়িত এবং পাশববলের ও বিভীষিকার দ্বারা শাসিত। একশত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ইংরেজ এদেশে রাজত্ব কবিয়াছেন। এখনও দেশের এই অবস্থা। ইহাকে কি শাসনদক্ষতা বলে?

কিন্তু লর্ড লিটনের অভিযোগ যদি আমরা সত্য বলিয়া মানিয়াই লই, তাহাতেই বা প্রমাণ হয় কি? ইয়োরোপের রাষ্ট্রীয় কর্মীরা কি সকল স্বাধীন দেশে সমান স্বযোগ্য? নিশ্চয়ই নয়। ইংরেজরা দাবী করেন, যে, তাঁহারাই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাসনকর্তা, জার্মানরা বলেন কাজের শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত খাড়া কবিয়া তুলিতে তাঁহারা সবচেয়ে ওস্তাদ। কিন্তু অত্যন্ত স্বাধীন ইউরোপীয় দেশ যে আপন আপন অপেক্ষাকৃত অযোগ্য রাষ্ট্রীয় কর্মী লইয়াই সন্তুষ্ট আছে, অতি উৎকৃষ্ট ইংরেজ শাসক দ্বারা শাসিত হইতে আকাঙ্ক্ষা মাত্রও করিতেছে না, ইহাতে ত ইংরেজ কোনই অপরাধ গ্রহণ কবেন না?

কোন শাসনযন্ত্র ও প্রণালী যে কতখানি যোগ্য, তাহাব পরখ করিবার উপায়টা কি? যে শাসনের অধীনে দেশেব সকল লোক শিক্ষা পায়, কুসংস্কারমুক্ত হয়, ভাল খাইতে পরিতে ও ভাল থাকিতে পায়, স্বস্থ সবল হয়, এবং সাহসী, স্বাধীন ও আত্মশাসনক্ষম হয়, তাহাকেই স্বযোগ্য শাসন বলা চলে। উপরোক্ত আদর্শ অনুসারে বিচার করিলে, ভারতবর্ষে ইংরেজের শাসনকে স্বশাসন বলা চলে কি?

লর্ড লিটনের সমস্ত যুক্তিগুলিই এইরূপ পক্ষপাত-দোষ-

দৃষ্টি। ইচ্ছাপূর্বক বা অনিচ্ছাক্রমে ও অজ্ঞাতসারে তিনি প্রথম শ্রেণীর স্বরাজকে সর্বপ্রকার গুণশালী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বরাজের অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীনতার ভাগ্যে জুটিযাচ্ছে সর্বপ্রকার কু-অভিসন্ধি ও দোষ। তাঁহাব মতে, প্রথম শ্রেণীর স্বরাজ পাইতে হইলে শাসনযন্ত্রকে কার্যদক্ষ করা চাই। যেন পূর্ণস্বাধীনতালিপ্সু ভারতবাসীরা রাষ্ট্রীয় কর্মদিগকে কার্যদক্ষ করিতে চান না। প্রত্যেক ভাবতবাসীই ইহা আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহার রাজনৈতিক মত যাহাই হোক না কেন। তাঁহারা সকলেই চান যে ইংরেজের অধীনে ভারতবর্ষের সরকারী কর্মচারীরা যতখানি কর্মকুশলতা দেখাইতেছেন, স্বাধীন ভারতের কর্মীরা তাহা অপেক্ষা অধিক দেখান। হইতে পারে যে প্রায় সকল ইয়ুরোপ-অধিবাসীই মত লর্ড লিট-রেনও ইহাই মত যে ইংরেজের কর্তৃত্ব ও পরিচালন ব্যতীত ভারতবর্ষের শাসনকার্য কখনও দক্ষতার সহিত চলিতে পারে না। কিন্তু সে হইল এক কথা এবং ভারতবাসীরা, কর্মীদের কে কত কাজেব তাহা না ভাবিয়া, কে কোন্ জাতির সেই কথাই বেশী করিয়া ভাবে, ইহা বলা আরেক কথা। আমাদের মনে হয় না, যে, ভারতবাসীর জাতিগত এমন কোন অক্ষমতা আছে যাহার জন্য তাহারা স্বদক্ষ শাসক হইতে পারে না। এমন কি মডারেট ধুবন্ধর শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়ও যে তাহা মনে করেন না, তাহা তাঁহার এক বক্তৃতা হইতে বুঝা যায়। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ যে-কোন সময়ে অল্প দেশেব লোকদেব সমকক্ষ লোক কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে পারেন।

লর্ড লিটন মনে করেন, যে, গঠন করিবার ইচ্ছা এবং গঠন-কার্যের ক্ষমতা নিয়মতন্ত্রাভ্যায়ী-স্বাধীনতা-প্রবাসীগণ অথবা সোজা কথায় মডারেটগণ একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। ইহা সত্য নহ। ভাবতবাসীদের সকলেই আমরা ভাই বলিয়া মনে করি, অতএব তাঁহাব এই ধারণার সমালোচনা করিব না। মডারেট বা চরমপন্থী বাহ্যিক যদি অল্পদল অপেক্ষা কোনও গুণ অধিক থাকে, তাহা সমানভাবেই দেশের কাজে লাগিবে। তাহা লইয়া আমরা গৃহবিবাদ জন্মাইব না।

লর্ড লিটন মনে করেন, যে, এই নিয়মতন্ত্রাভ্যায়ী উন্নতির প্রয়াসটির ভিত্তি জাতিতে জাতিতে প্রীতির উপর, এবং অল্পটির ভিত্তি জাতীয় বিদ্বেষ। আমাদের ভিতর কে অল্পের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভালবাসিতে পাবেন, বা বিদ্বেষ পোষণ করেন, সেখানকার আলোচনা আমবা করিব না। কাবণ, বিদেশীদের প্রশংসা বা নিন্দাকে উপলক্ষ্য করিয়া গৃহবিবাদের সৃষ্টি করা মূর্থতা। কিন্তু সাধারণ ভাবে কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করা চলে। মানবচরিত্রের উন্নতি অসীম, তাহার সীমা-নির্দেশ করা চলে না; তাহাব বিকাশও সীমাবদ্ধ নহ। কিন্তু এখনও উহা সর্বোচ্চ বিকাশ লাভ না করার জন্য, যে-কোন দেশে বা কালে আংশিক বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য যত প্রকার প্রচেষ্টার কথা আমরা জানি, কোনটাই অল্পবিস্তর বিদ্বেষ বা ঘৃণার ভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। লর্ড লিটন নিশ্চয়ই জানেন, যে, তাঁহার নিজের দেশে, যে-খানে জাতিগত স্বাধীনতা লাভের কথাই ওঠে না, সেখানেও নিয়মতন্ত্রাভ্যায়ী অধিকার লাভের চেষ্টা—সময় অনেকবাব যথেষ্ট রক্তপাত হইয়াছে, সকলে সকলের উপর গোলাপজল কেওড়া ছড়াই নাই, রক্তরাঙা হোলী খেলিয়াছে। এবং তাঁহাব দেশে রাজহত্যা পর্যন্ত হইয়াছে। কানাডা স্বায়ত্তশাসন লাভ করিবার পূর্বে সে দেশে অনেকগুলি বিদ্রোহ-বিপ্লব হইয়া গিয়াছে। ইংরেজ যে-মিশ্রবকে জাতিগত স্বাধীনতা দিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, সেই মিশ্রবই ত সম্প্রতিও রক্তপাত হইয়া গিয়াছে। লর্ড লিটনকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্ত্যন্ত অংশেব ইতিহাস বা জগতের অন্ত্যন্ত দেশেব ইতিহাস হইতে উদাহরণ আর বেশী বোধ হয় দেখানর প্রয়োজন নাই। হিংসা বা জাতীয় বিদ্বেষকে আমরা বিন্দুমাত্রও সমর্থন করি না। আমরা কেবল এইটুকু বলিতে চাই, যে, ইতিহাসে যখন দেখা যাইতেছে, যে, স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টার মধ্যে প্রায়ই জাতীয় বিদ্বেষ ও রক্তপাতের আবির্ভাব হইয়াছে, তখন যাহা যথার্থই অহিংসামূলক এমন একটা আন্দোলনের ভিতর যদি দুই-চার ক্ষেত্রে বিদ্বেষ বা হিংসার প্রকাশের পরিচয়

পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেইগুলি লইয়া অত বাড়াবাড়ি করার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন নাই বলি এই জ্ঞত, যে, ইহার প্রবর্তক মহাত্মা গান্ধী সর্বদাই সমস্ত শক্তির সহিত হিংসার নিন্দা করিয়াছেন, এবং হিংসার প্রকাশ যেখানেই তিনি দেখিয়াছেন, নিজে দোষী না হইয়াও তাহাব প্রাশস্তিত্বের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। কোন স্থানেই ইহা প্রমাণ করা যায় নাই যে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি, বা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, বা তাহা অপেক্ষা নিম্নস্থানীয় কোন কংগ্রেস কমিটি পূর্বে হইতে মংলব আঁটিয়া কোনও স্থানে দাঙ্গা বা বক্তৃপাত ঘটাইয়াছেন। ইহা ভুলিলে চলিবে না, যে, যদিও ভাবত-বর্ষে স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন সুবিশাল দেশব্যাপী, তবুও ইহার ভিতর হিংসার ভাব যত কম প্রকাশ পাইয়াছে, অন্য কোন অপেক্ষাকৃত জনবিরল ও ক্ষুদ্র দেশে এই ধবণেব কোনও আন্দোলনে তত কম প্রকাশ পায় নাই। লর্ড লিটনকে আমরা ইহাও স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, যে, কোন দলের কোন নেতাকেই মহাত্মা গান্ধী অপেক্ষা মানবপ্রেমিক বলিয়া কেহ মনে করে না। ভারতবর্ষে চরমপন্থীদের আবির্ভাবের পূর্বেও ইংরেজ ও ভারতবর্ষীয় বাজ্ঞনৈতিকগণ অনেক সময় তীব্র ভাষা ব্যবহার করিয়া আপনাদের অন্তঃকরণের বিদ্বেষের পরিচয় দিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ ইলবার্ট বিল লইয়া যে আন্দোলন হয় তখনকার এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময়কার বহু সংবাদপত্রের লেখার এবং অনেকগুলি বক্তৃতাও উল্লেখ করা যায়। যখন দমনমূলক প্রেস আইন (যাহা এখন উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে) প্রবর্তিত করা হয়, তখন উহাব যে প্রয়োজন আছে তাহা বুঝাইবার জন্য অনেক দেশীয় সংবাদপত্র হইতে নানাস্থান হইতে মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দেখান হয়। লর্ড লিটন যদি মনোযোগ পূর্বক সেই উদ্ধৃত অংশগুলি পাঠ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, যে, উদ্ধারকাবী সরকারী আমলার দল নরম এবং চরম কোন দলের কাগজকেই অগ্রহণ হইতে বঞ্চিত করেন নাই; দুই দলের কাগজ হইতেই তাঁহারা উত্তেজনা ও বিদ্বেষপূর্ণ লেখা সংগ্রহ কবিত্তে পারিয়াছিলেন। ভারতবাসীরা সবাই মুনি স্বয়ি

নয়, তাহাদের হৃদয় কেবলমাত্র ভালবাসারই আকর নয়। এবিষয়ে লর্ড-গাহেবের স্বদেশবাসীরা যে কিছুমাত্র শ্রেষ্ঠ তাগ মনে করিবারও কারণ নাই। তিনি যে দুই প্রকারের স্বরাজের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার ভিতর প্রথমটিকে কার্যে পরিণত কবিবার জন্য তিনি স্বীয় স্বদেশবাসীর সহায়তা প্রার্থনা কবিয়াছেন। যথা :—

I rely on the assistance of your Association in working out the first of these two policies which I have described and in advancing in close friendship and co-operation with Indians towards the attainment of constitutional self-government for India.

আমরা কি আশা কবিত্তে পারি, যে, ভবিষ্যতে তাঁহাদের মধ্যে আর কেহ তাঁহার জাতভাইদিগকে আমাদিগের প্রতি ভালবাসা বশতঃ দাঁত খিঁচাইতে অগ্ররোধ করিবেন না? একজন এমন অগ্ররোধ অল্পদিন আগে করিয়াছিলেন।

ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করিয়াও ভারতবাসী সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে। বর্তমানে ভারতবর্ষে ইংরেজ-শাসন যেমন আছে, ভবিষ্যতে যদি তাহাব অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্টও হয়, তাহা হইলেও আদর্শকামী এমন ভারতবাসী দেখা যাইবে যাহারা ইংবেজের প্রতি বিদ্বেষের বশবর্তী না হইয়াও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে চাওযাটা অগ্রাঘ মনে করিবেন না। ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইলে তাহাতে ইংবেজ ও ভাবতবাসী উভয়েরই মঙ্গল। লর্ড লিটন হয়ত ইহা বুঝিবেন না, কিন্তু ইহা সত্য কথা। অগ্রদেশ শাসন কবিলে, ও উহাকে কেবলমাত্র আত্মসুবিধার জন্য ব্যবহার করিলে, জাতীয় চরিত্রের অধোগতি হয়। আমরা ইংবেজী ইতিহাস পড়িয়া এবং ইংরেজচরিত্র অল্পশীলন করিয়া ইহাই বুঝিয়াছি, যে, যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেব সকল অংশ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়া পরস্পরের সহিত অনাগ্র স্বাধীন দেশের মতন সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে ইংবেজচরিত্রের যথেষ্ট উন্নতি হইতে পাবে। তখন পরিবর্তনের কিছুকাল কাটাইয়া উঠিলেই ইংরেজ বুঝিতে পারিবেন, যে, ইহাতে তাঁহাদের মারাত্মক আর্থিক ক্ষতি হইবারও সম্ভাবনা নাই। স্বাধীন ঐশ্বর্য্যশালী বঙ্গভাবাপন্ন ভাবতের সহিত বাণিজ্যে

তাহারা যতটা লাভ করিতে পাবিবেন, দরিদ্র বিধ্বস্ত বিকৃত-ভাবাপন্ন ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিয়া তাহা পাইতে পারেন না।

ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের বিপক্ষে লর্ড লিটনের সর্বাপেক্ষা প্রবল যুক্তির পরিচয় এই কথটি কথায় পাওয়া যায় :—

"That is a goal which the British... can never accept., but must contest every inch of the way with them. To prevent its ever being reached, the whole strength of our people would, if necessary, be used."

অগতের অতীত ইতিহাসে আমরা অনেক জাতিই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে বলিয়া পাঠ কবি। বিগত মহাযুদ্ধের মধ্যে এবং পরে, অনেক জাতিই স্বাধীন হইয়াছে। সত্য হউক বা না হউক, ইচ্ছা করিলে বলা যাইতে পারে, যে, স্বাধীনতা লাভের কল তাহাদের পক্ষে মন্দ হইয়াছে। বলা যাইতে পারে, যে, স্বাধীনতা বা আংশিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণ স্বাধীনতাব্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বলা যাইতে পারে, অল্প জাতির পক্ষে যেমনই হোক, স্বাধীনতা ভারতবর্ষের পক্ষে অকল্যাণকর। ইচ্ছা করিলে বলা যাইতে পারে, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ ও বক্ষা কবিবার শক্তিই ভারতবর্ষ নাই। কিন্তু লর্ড লিটন এই সকল বাদি গতের একটিও উচ্চারণ করেন নাই। তিনি সোজাছজি বলিতেছেন, "তোমরা বাহাতে স্বাধীনতা লাভ কবিতো না পার তাহার জন্ত আমবা আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিব।" ইহাকে 'মোটী লাঠির যুক্তি' বলা চলে, অর্থাৎ আমার যুক্তি যেমনই হোক, তাহা থাক বা না থাক, লাঠির দ্বারা তোমাকে আমার আদেশ মানিতে বাধ্য করিব। কিন্তু ভারতীয় স্বাধীনতা-প্রার্থী দল অহিংসাবাদী, তাহারা মোটা বা সর কোনপ্রকার লাঠি অস্ত্রের উপর প্রয়োগ করিতে চান না, হুতরাং মোটা লাঠি দেখিয়া ভয় না পাইতে পারেন। আদর্শকে লক্ষ্য কবিয়া যাহারা চলেন, পার্থিব ক্ষতি, পার্শ্ব শক্তি, ছুঃখ যন্ত্রণা, এমন কি মৃত্যু-ভয়ও তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে না। যে-পথে তাহারা চলিয়াছেন, তাহা অস্বাভাবিক, নীতিবিরুদ্ধ, ও

ধর্মবিরোধী, ইহা প্রমাণ করিতে পাবিলে তবেই তাহা-দিগকে বিরত করা যায়। তাহারা, হয় মৃত্যু নয় জয়, এই পণ কবিয়াই বাহির হইয়াছেন। মৃত্যুকে তাহারা বরণ করিতে প্রস্তুত; কিন্তু অত্ৰকে—মৃত্যুদণ্ড দিতে বা লঘুতর আঘাত করিতেও তাহারা চান না। জরাগ্রস্ত যাহারা, তাহাবা-বিপদের আশঙ্কা বর্জন করিয়া আরামে থাকা শ্রেয় মনে কবেন, ঐশ্বর্যলাভকে পুরুষত্ব ও আত্ম-সম্মানের উপরে স্থান দেন, কিন্তু এই আদর্শপন্থীব দল চিবনবীন অর্ধাচীন দল। অস্ত্রের কাছে যাহা উন্নাদের কল্পনাপ্রসূত আকাশকুহুম মাত্র, তাহারই অল্পসরণে তাহারা জীবন উৎসর্গ কবেন।

লর্ড লিটনের যুক্তিগুলিকে যদি স্বার্থপ্রসূত বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে উহা বোঝা সহজ হয়। কিন্তু ভাবতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের বিরুদ্ধাচরণ করিবার নৈতিক কি-কারণ থাকিতে পারে? ভবিষ্যতেও ভারত-বর্ষের স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টাকে বাধা দিবার এমন কি কারণ থাকিতে পারে যাহা শাস্ত-ধর্ম নীতি ও শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত?

কাঠবিড়ালকেও যেমন বিড়াল বলা যায়, লর্ড লিটনের কল্‌টিউশ্যন্স ইণ্ডিপেন্ডেন্স্‌ও তেমনি ইণ্ডিপেন্ডেন্স্‌ বা স্বাধীনতা। কাঠবিড়াল যেমন বিড়ালের মত ইঁদুর ধরে না, লাটসাহেবের নামিত ইণ্ডিপেন্ডেন্স্‌ও তেমনি প্রকৃত স্বাধীনতার কাজ করিতে পারে না। কথায় যেমন চিড়া ভিজে না, তেমনি শুধু নাম দিলেই আসল জিনিসের কাজ পাওয়া যায় না।

ভারতবর্ষের এক রাজনৈতিক দল যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চায়, তাহা বেঙ্গাল বা জাতিগত বলিয়া লাটসাহেবের পছন্দসই নহে, কিন্তু আমেরিকার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকেরা অষ্টাদশ-শতাব্দীতে যে স্বাধীনতা লাভ কবিয়াছিল, তাহা বেঙ্গাল বা জাতিগত ছিল না বলিয়া কি তাহা ব্রিটিশ জাতির খুব পছন্দসই হইয়াছিল?

বীরের সম্মান

আনন্দ-বাজার পত্রিকায় নিম্নমুদ্রিত "নিবেদন" প্রকাশিত হইয়াছে।

নিবেদন

“বাণী-ভবন”

গত ৬ই এপ্রিল জেজপুৰ জেলাৰ চিলবান্দা নিবাসী ৬ প্ৰিয়নাথ গোস্বামী মহাশয় মহিলাপণ্ডকে ক্ষিপ্ত মহিষেৰ হস্ত হইতে বক্ষা কৰিতে গিয়া প্ৰাণ বিসৰ্জন দিয়াছেন। এই বীৰ ব্ৰাহ্মণ দুইটি পুত্ৰ, একটি কন্যা ও স্বীয় সহধৰ্ম্মিণীকে দেশবাসীৰ হস্তে সমৰ্পণ কৰিষা গিয়াছেন। এই দুঃখ পৰিবাৰেব সাহায্যার্থ আমবা দেশবাসীৰ নিকট শিক্ষা-প্ৰার্থী। সংগৃহীত অৰ্থ জেজপুৰ ৱাষ্ট-সমিতিৰ হস্তে অৰ্পিত হইবে।

প্ৰাপ্তি স্বীকাৰ :—

শ্ৰীযুক্ত এস, এন, ধৰ—১,

শ্ৰীযুক্ত বিপিন বিহাৰী মিত্ৰ—১,

শ্ৰীমান শিশিৰ কুমাৰ মিত্ৰ

হিন্দুস্কুল, ষষ্ঠ শ্ৰেণী—১,

মোট—৩,

নিবেদক—আনন্দ-বাজাৰ সম্পাদক,

৭১১১ নং মিৰ্জাপুৰ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা।

৬প্ৰিয়নাথ গোস্বামীৰ অসহায় পৰিবার ও পোষ্যবৰ্গেৰ সাহায্য কৰা আমাদেব অবশ্য কৰ্ত্তব্য। অন্ধাৰ সহিত তাহাৰ স্বত্বতৰফা কৰাও আমাদেব কৰ্ত্তব্য। ইহাতে সমুদয় জাতি লাভবান হইবে।

“হিন্দুস্থান” ছুঃখ কৰিয়াছেন, যে, একুপ কাজেৰ সাহায্যার্থ এত কম টাকা উঠিয়াছে। [পরে আরো সামান্য কিছু উঠিয়াছে।] পঞ্জাব মেল দুৰ্ঘটনায় নিহত জুইভাৰ কুপাৰেব জন্ত ষ্টেট্‌সম্যান ইহা অপেক্ষা খুব বেশী টাকা তুলিয়াছেন, “হিন্দুস্থান” তাহাও বলিয়াছেন। ভাল কাজে আমবা ইংরেজের মত মুক্তহস্ত নহি, ইহা ছুঃখ ও লজ্জাৰ বিষয়। আমাদেব দাৰিদ্র্য ইহাৰ একমাত্র বা প্ৰধান কাৰণ নহে; কেননা, আমাদেব ধনীরাও ভাল কাজে ইংরেজ ধনীদেব মত টাকা দেন না। তবে, দেশেৰ লোকদেব পক্ষ হইতেও কিছু বলিবার আছে। ইংবেজ-মহলে ষ্টেট্‌সম্যানেব প্ৰচাৰ ও প্ৰতিপত্তি যেকপ, বাঙালী-মহলে কোন বাংলা দৈনিকেৰ প্ৰচাৰ ও প্ৰতিপত্তি তজপ নহে। আমাদেব মনে হয়, আনন্দ-বাজাৰ পত্ৰিকাৰ সম্পাদক যদি নিজেৰ নাম ও তাহাব সঙ্গ বাঙালীদেব পৰিচিত ও বিশ্বাস-ভাজন আৰু জুইচাৰিজন লোকেৰ নাম দিয়া “নিবেদন”টি বাহিৰ কৰিতেন, তাহা হইলে যাহা উঠিয়াছে তাৰ চেয়ে কিছু বেশী টাকা উঠিতে পাৰিত।

হিন্দু বিধবাবা নানা রকম কাজ শিখিয়া যাহাতে উপাৰ্জনক্ষম হইতে পারেন, সেইরূপ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নারী-শিক্ষা-সমিতি “বাণী-ভবন” নাম দিয়া একটি শিক্ষা-লয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিতে সঙ্কল্প কৰিয়াছেন। গত ১৭ই বৈশাখ ৱামমোহন লাইব্ৰেৰী গৃহে মহামহোপাধ্যায় কালীপ্ৰসন্ন ভট্টাচাৰ্য মহাশয়েৰ সভাপতিত্বে উহাৰ প্ৰাৰম্ভিক সভাব অধিবেশন হয়। সভাস্থলে আচাৰ্য প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ ৱায় মহাশয় এইরূপ বহু শিক্ষালয়েব আবশ্যকতা প্ৰদৰ্শন কবেন এবং বলেন যে বেনিয়াপুকুৰেৰ শ্ৰীমতী হৰিমতি দত্ত মহোদয়া এই কাৰ্যেৰ জন্ত দশ হাজাৰ টাকা দান কৰায নাবী-শিক্ষা-সমিতি উৎসাহিত হইয়া বাণী ভবন প্ৰতিষ্ঠায় উত্তোগী হইয়াছেন। তাহাৰ পর শ্ৰীযুক্ত স্বৰেন্দ্ৰনাথ মল্লিক, শ্ৰীযুক্ত সতীশচন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী, প্ৰভৃতি বক্তৃতা কৰেন। মহামহোপাধ্যায় কালীপ্ৰসন্ন ভট্টাচাৰ্য মহাশয় সভাস্থলে বলেন, যে, বাণী-ভবন অসাম্প্ৰদায়িক ভাবে পৰিচালিত হইবে, এবং মহিলা সভ্যদিগেৰ একটি কমিটিৰ তত্ত্বাবধানে ইহাৰ সমুদয় কাৰ্য নিৰ্বাহিত হইবে। ৱায় ৱাধাচৰণ পাল বাহাদুৰ বলেন, যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা “ভাৰতীয় শুশ্ৰূষাকাৰিণীদেব প্ৰতিষ্ঠানে” (Indian Nurses’ Institution) যে এক লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্জুৰ কৰিয়াছেন, বাণী-ভবন তাহা হইতে সাহায্য পাইতে পাবেন।

শ্ৰীমতী হৰিমতি দত্তেব প্ৰদত্ত দশ হাজাৰ টাকা ছাড়া আৰু আট হাজাৰ টাকা দানেব অঙ্গীকাৰ পাওয়া গিয়াছে। সংকল্পাৱুৰাগী পাঠকেবা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন, যে, নারী-শিক্ষা-সমিতি ইতিমধ্যেই বাণী-ভবনেৰ জন্ত বাড়ী ৰিখা খালি জায়গা ক্ৰয় কৰিবাব চেষ্টা কৰিতেছেন, ও জুই-একটিৰ সন্ধানও পাইয়াছেন। সকলেই এই কাজে সাহায্য কৰা উচিত—বিশেষত; সধবা ও বিধবা ধনশালিনী মহিলাদেব। সাহায্য ২০ নম্বৰ আপাৰ সাকুলার ৱোড্ ভবনে শ্ৰীযুক্তা অবলা বস্তু মহাশয়াৰ নিকট প্ৰেৰিতব্য।

খন্দর-পরিধান ও সংকল্পশীলতা

বাণী-ভবনেৰ প্ৰাৰম্ভিক সভা সন্মুখে একখানি বাংলা

খবরের কাগজ নিন্দা কবিতা সিখিয়াছেন, যে, সভাস্থলে যে মহিলাটি প্রবন্ধ পড়েন, তিনি বিলাতী কাপড় পরিয়া গিয়াছিলেন, আর-একজন বর্ষীয়সী মহিলা বিলাতী কাপড় পরিয়া গিয়াছিলেন, ইত্যাদি। এই-সব কথা অল্প একটি বাংলা কাগজ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সংবাদগুলি কিন্তু সত্য নহে। প্রবন্ধপাঠিকা খন্দর-পরিহিতা ছিলেন। বর্ষীয়সী মহিলা মহাশয়া দেশী গরদের থান পরিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকটে উপবিষ্টা অল্প একজন মাননীয় মহিলা দেশী রেশমী কাপড় পরিয়াছিলেন।

সংবাদের সত্যতা ত এইরূপ।

“বাণী-ভবনের” বিরুদ্ধে মাহুয়ের মনে মন্দ ধারণা যাহাতে না জন্মে, তাহার জন্য অসত্য কথার প্রতিবাদ করিলাম। নতুবা তাহা করিবার প্রয়োজন ছিল না।

প্রসঙ্গক্রমে আরও দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক।

যে খন্দর পরেন না, তাহার দ্বারা কি কোন ভাল কাজ হইতে পারে না? বর্তমান সময়ে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, ব্রাহ্ম অনেকে খন্দর পরেন, অনেকে পরেন না। এখন আমাদের মন উত্তেজিত ও অজ্ঞাতসারে পক্ষপাতগ্রস্ত রহিয়াছে। এখন তাঁহারা খন্দর পরেন, তাঁহারা, যাহারা উহা পরেন না, যাহাদিগের নিন্দা করিতে পারেন; যাহারা খন্দর পরেন না, তাঁহারা খন্দরপরিহিতদের নিন্দা করিতে পারেন। সেইজন্য গত দুই-তিন বৎসরের কথা ছাড়িয়া দিয়া, প্রত্যেক শ্রেণীর লোকদিগকে বলি, যে, আপনারা নিজের নিজের সম্প্রদায়ের সাধু ও সংকর্মশীল লোক বলিয়া যাহাদিগকে গণনা করেন, যত বা জীবিত সেই-সব লোক ১৯১৮ সাল বা তৎপূর্বে খন্দর পরিতেন কি না, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করুন। দেখিতে পাইবেন, যে, তাঁহারা খন্দর না পরিলেও চরিত্রে ও কর্মে প্রশংসাজনক ছিলেন। এখনও প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ বিস্তর লোক আছেন, যাহারা কোন সময়েই বা সব সময়ে খন্দর পরেন না, অথচ সংকর্মশীল। আমরা খন্দর পরা ভাল মনে করি, কিন্তু খন্দর যাহারা পরেন না, তাঁহাদিগকে ঐ কারণে হয় মনে করিয়া স্বয়ং অহঙ্কারে ক্ষীণ হই না। খন্দর পরিয়া দুর্বৃত্ত ও অহঙ্কৃত হওয়া যায়। সংকর্মশীল ও নম্রও

হওয়া যায়। খন্দর না পরিয়াও দুর্বৃত্ত ও অহঙ্কৃত কিম্বা সচরিত্র ও বিনবী হওয়া যায়। সহযোগিতা বর্জন এবং খন্দর পরিধান করিয়া যাহারা অহঙ্কৃত ও অল্প লোকদের সম্বন্ধে অসহিষ্ণু হয়, মহাত্মা গান্ধী তাহাদের মনের ভাব ও আচরণ নিম্ননীয় বলিয়া গিয়াছেন।

মৌলানা হুসরু মোহানীর শান্তি

মৌলানা হুসরু মোহানীর বিরুদ্ধে গবর্ণমেন্টের মোকদ্দমা ও তাঁহার শান্তির বৃত্তান্ত অল্প প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগে তাঁহার শান্তি হইয়াছে, অল্পটিতে শান্তি হওয়া উচিত কি না, তদ্বিষয়ে বিচারক বোম্বাই হাইকোর্টের মত জানিতে চাহিয়াছেন। এই কারণে এখন এই মোকদ্দমা ও শান্তি সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে আমরা অনিচ্ছুক। কিন্তু এইটুকু বলিয়া রাখি যে মৌলানা সাহেবের আত্মপক্ষ-সমর্থন আমবা ভ্রাতা ও যুক্তিসঙ্গত মনে করি।

চাল রপ্তানীর ফল

যখন ভারত-গবর্ণমেন্টের আদেশ অনুসারে বিদেশে চালের রপ্তানী বন্ধ ছিল, তখন উহার দাম কিছু কম ছিল। রপ্তানী আবার আরম্ভ হওয়ায় দাম ক্রমাগত বাড়িতেছে। তাহা আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি।

গত ১২ই মার্চ হইতে ১৭ই মার্চ পর্যন্ত মণবাহাতে আতপ চালের দর মণকরা ৬৯/১৫ হইতে ৭১/০ পর্যন্ত ছিল। গত ৫ই মে, অর্থাৎ রপ্তানী আরম্ভ হইবার দুমাসেরও কম সময়ের মধ্যে ৮৬/০ হইতে ৯০ পর্যন্ত দর উঠিয়াছে। আমরা ১০ই মে এই কথা লিখিতেছি। ইতিমধ্যে সম্ভবতঃ দর আরও চড়া হইয়াছে। ১১ই ১২ই নাগাদ ১০ টাকা মণ হইবে, ব্যবসাদারেরা এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। সিদ্ধ চালের বাজার মধ্যে খুব চড়িয়া গিয়াছিল; এখন কিছু নরম আছে।

গবর্ণমেন্ট যখন রপ্তানী করিবার অনুমতি দেন, তখন বলিয়াছিলেন, যে, চালের দাম বেশী বাড়িলে আবার রপ্তানী বন্ধ করিবেন। এখনও কি যথেষ্ট বাড়ে নাই? গবর্ণমেন্ট রপ্তানী অব্যবহিত পূর্বেব এক

সপ্তাহ হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত রালি ব্রাদার্স, শ ওয়ালেস্ কোম্পানী, পেট্রোকোচিনো ব্রাদার্স এবং গ্রেহাম কোম্পানীর প্রতিদিনের ক্রীত চাউলের ও তাহার দরের তালিকা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন। তাহা হইলে বুঝা যাইবে, দর খুব চড়িয়াছে কি না।

মালাবারে আৰ্য্যসমাজের কার্য

মোপ্লা হাক্কামায় মালাবার নানাপ্রকারে সাতিশয বিপন্ন হইয়াছে। ভারত-ভৃত্য সমিতি, স্থানীয় কংগ্রেস্ কমিটি, ইয়ং মেন্স্ ক্রিস্টিয়ান্ এসোসিয়েশন্, প্রভৃতি, বিপন্ন লোকদেব অন্নবস্ত্রের ক্লেণ নানা প্রকারে দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন। যে-সকল হিন্দু পুরুষ ও নারীকে বিক্রোহী মোপ্লারা জোর করিয়া মুসলমান করিয়াছিল, তাহারা ইচ্ছুক হইলে যাহাতে আবার নিজ নিজ পূর্ব ধর্মসমাজে স্থান পাইতে পারে তাহার চেষ্টাও অনেকে করিতেছেন। আৰ্য্যসমাজ তন্মধ্যে অন্যতম। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে পঞ্চাশজন লোক কালিকটে আৰ্য্যসমাজের কেন্দ্রে আসিয়া আবার হিন্দু হইতে চাওয়ায় তাহাদিগকে হিন্দুর পরিকল্পন দেওয়া হইয়াছে। পুরুষদিগকে রাস্তা-নির্মাণ কার্যে এবং নারীদিগকে চরুকাই হুতা কাটিতে দেওয়া হইয়াছে। একটি অনাখালয় ও একটি বিধবাশ্রম খোলা হইয়াছে।

সরকারী ব্যয় সংক্ষেপ

কিছুদিন পূর্বে ভারতবর্ষীয় বাবস্থাপক সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হয়, যে, এদেশের নানা রাষ্ট্রীয় কার্যের বিভাগে ব্যয়সংক্ষেপ হইতে পারে কি না, এবং যদি পারে, তাহা হইলে কোন্ কোন্ বিভাগে কি কি দিকে কি কি উপায়ে হইতে পাবে, তাহা নির্ধারণের জন্ত একটি কমিটি নিযুক্ত হউক। কয়েকদিন হইল লর্ড ইঙ্ক্বেপ্ এই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি কলিকাতা বোম্বাই ও করাচীর ম্যাকিনন্ ম্যাকেন্জী কোম্পানীর এবং কলিকাতার ম্যাকিনন্ কোম্পানীর প্রধান অংশীদার।

কমিটিকে কি কি বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে হইবে, তাহাব বিস্তারিত বিবরণ শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

কমিটির কার্যসম্বন্ধে একটা কথা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে—নানা স্থানে ঘুরিয়া সাক্ষ্য লইতে ও তথ্য অনুসন্ধান করিতে অনেক ব্যয় হইবে। ব্যয়ের ফলস্বরূপ শুধু জনকতক চাপ্রাসী পিয়াদার কান্না যাইবে, না বৃহৎ রকমের কিছু ব্যয়সংক্ষেপ হইবে, তাহা অনুমান কবিতে পারিলেও নিশ্চিত বলা যায় না।

ব্যয়সংক্ষেপের একটা প্রধান উপায়, ভারতবর্ষের সেনাদলে গোরা সৈনিক ও সৈনিকাধ্যক্ষ (military officers) কমান্ডি তাহাদের স্থানে ভারতীয় সৈনিক ও সৈনিকাধ্যক্ষ নিয়োগ। জাপান ভারতবর্ষ অপেক্ষা সৈনিক-প্রতি কম খরচ করিয়াও পৃথিবীর প্রবলতম জাতিদেব সমকক্ষ ও ভয়ের কারণ বলিয়া পরিগণিত; আর ভারতবর্ষ এত বড় দেশ ও এত লোকের বাসভূমি হইলেও তাহাকে ক্ষুদ্র আফগানিস্তানকে ভয় করিতে ইংরেজরা শিখাইয়া আগিতেছেন। অথচ ভারতবর্ষের এক কোণের শিখেরা এক সময়ে আফগানদিগকে ভয়বিহ্বল করিতে পারিয়াছিল। ভারতীয়দিগের প্রাণে সাহসের পরিবর্তে ভয়ের সঞ্চার করায় ইংরেজের লাভ আছে। কারণ, আমরা যতদিন বিশ্বাস করিব, যে, আমরা নিজে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিতে পারিব না, আমরাদিগকে সাহস দিবার ও যুদ্ধক্ষেত্রে হুকুম দিয়া চালাইবার জন্ত বিদেশী লোক চাই, ততদিন বিদেশীর প্রভুত্ব এবং বেতনাদি হইতে প্রভূত অর্থাগমের উপায় বজায় থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থা যতদিন থাকিবে, ততদিন ভারতের রাজ্যকাণ্ডে ব্যয়সংক্ষেপ ভাল করিয়া হইতে পারিবে না।

সামরিক বিভাগ ব্যতীত অন্ত-সব বিভাগেও ব্যয় কমানিতে হইবে। ইংরেজের পরিবর্তে যথাসম্ভব যোগ্য দেশী লোক রাখিতে হইবে এবং তাহাদিগকে জাপানের রাজকর্মচারীদের মত বেতন দিতে হইবে। স্বাধীন প্রবল-পরাক্রান্ত জাপানের প্রধান মন্ত্রী মাসে ১৫০০ টাকা বেতন পান, অন্ত্যস্ত মন্ত্রীরা পান ১০০০, এবং প্রধান বিচারপতি এক হাজারের চেয়েও কম পান। এদেশে ইংরেজ রাজভৃত্যেরা খুব মোটা মাহিনা আদায় করেন বলিয়া দেশী রাজভৃত্যদিগকেও প্রাদেশিক শ্রেণীর কোন কোন চাকরীতে জাপানী মন্ত্রীদের সমান বা তদপেক্ষা

বেশী বেতন দেওয়া হয়। এদেশের সবজন্মেরা জাপানের প্রধান বিচারপতি অপেক্ষা বেশী বেতন পান।

বাহিবে এইরূপ কৌচাচ পত্তন বলিয়াই আমাদের ভিতরে এরূপ ছুঁচোর কীৰ্ত্তন—দারিদ্র্য, দুৰ্ভিক্ষ, অজ্ঞতা, রোগ, মহামারী, চিকিৎসার অভাব লাগিয়াই আছে; তাহার সহচর কাপুরুষতা ও কুসংস্কারও লাগিয়া আছে। ব্যয়সংক্ষেপের মোটামুটি যে যে উপায় স্থচিত হইয়াছে, তাহা অবলম্বিত না হইলে, কখন ভারতবর্ষের উন্নতি হইবে না।

বাংলা দেশে ডাকাতী

মধ্যে মধ্যে দৈনিক কাগজে দেখিতে পাই, বঙ্গে কোন সপ্তাহে বা দশাহে ৬০, কোন সপ্তাহে ৫৪, কোন সপ্তাহে বা ৪৬টা ডাকাতী হইতেছে। এখন অসহযোগ আন্দোলনের কৃপায় বেসরকারী লোকেরা আর “রাজনৈতিক ডাকাতী” করিবার অভিযোগে ধৃত ও দণ্ডিত হয় না। কোথাও কোথাও পুলিশের লোকদের নামে লুটপাট করিবার অভিযোগ শোনা যায় বটে। কিন্তু তাহা অবশ্য রাজনৈতিক ডাকাতী নহে; কোনও প্রকাবের ডাকাতী বটে কি না, তাহাও বলা যায় না। যাহা হউক, উহার আলোচনা ছাড়াইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, যে, আজকালকার বেসরকারী ডাকাতীগুলির কারণ কি? উহা যখন রাজনৈতিক ডাকাতী নহে, তখন উহার কারণ দুমিকে ছুটি। এক দিকে অস্বাভাবিক লোকদের ‘মরিয়া’ হইয়া ডাকাত হওয়া, কিম্বা ছবৃত্ত লোকদের বে-পরোয়া হইয়া ডাকাত হওয়া, অত্রদিকে আক্রান্ত ও হতসর্কস লোকদের ভীকতা ও আত্মরক্ষার ক্ষমতার অভাব। এই দ্বিবিধ কারণ কি ইংরেজ-শাসনের সমধিক কার্য-সাধন-ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে?

জৈনিক মুসলমান মহিলার কৃতিত্ব

বেগম সুলতানা মুয়াজ্জিদ-জাদা বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর বি-এল পড়িতেছেন। তিনি বি-এলের প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। এবং

তদুপরি হিন্দু-আইনের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি হাবুলু মতীন নামক খবরের কাগজের সম্পাদকের কন্যা। ইহারা পারস্যদেশীয় মুসলমান।

বিদ্যাবত্তার জন্ত অনেক নারী প্রাচীন ও আধুনিক কালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; অনেকে গবেষণাধারা জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে নব নব বস্তু উপহার দিয়াছেন। তাহা হইলেও নারীদের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার পুরুষদের সমান এখনও না হওয়ায়, এখনও নারীদের এইরূপ কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। বেগম-সাহেবার কৃতিত্বের উল্লেখ করিবার আর-একটি কারণ আছে। সকল দেশেই আইনজ্ঞানের সঙ্গে রাজনীতিজ্ঞানের যোগ আছে। আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি যখন স্বাধীন হয়, তখন হইতে আরম্ভ করিয়া তৎকালকার আইনজ্ঞগণ দীর্ঘকাল রাজনৈতিক নেতৃত্ব করিয়াছেন। আমাদের দেশেও আইনজ্ঞগণ, অসহযোগ আন্দোলন সঙ্ঘে, অনেকস্থলে এখনও রাজনৈতিক নেতা বহিয়াছেন। কিছুদিন হইতে নারীদিগকে রাজনৈতিক অধিকার দিবার চেষ্টা হইতেছে। অনেক প্রদেশে তাহারা এই অধিকার পাইয়াছেন। বঙ্গে এখনও পান নাই। আপত্তিকারীরা বলেন, যে, বঙ্গে পদ্ধির প্রচলন থাকায় নারীদের রাজনৈতিক জ্ঞানও কম এবং তাহাদিগকে অধিকার দিলে তাহারা সেই অধিকার ব্যবহার করিতে পারিবেন না। এসব যুক্তির উত্তর অনেকবার দেওয়া হইয়াছে। পুনরুজ্জী না করিয়া, জিজ্ঞাসা করা যায়, যে, বেগম-সাহেবার মত পদ্ধীনশীল মহিলা যদি আইনজ্ঞান লাভ করিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে অন্তঃপুরিকা বা উহার সহচর রাজনৈতিক জ্ঞান লাভ করিতে নিশ্চয়ই পারিবেন না, একপ মনে করিবার কি কারণ আছে? নিরক্ষর কৃষক দোকানদার প্রভৃতি লোকেরা ভোট পাইতে পারেন, অথচ বিজ্ঞানী বিজ্ঞাবতী মহিলারা উহার অনুপযুক্ত বিবেচিত হন, ইহা বড় আশ্চর্যের বিষয়।

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ ও রাজদ্রোহ

অনেক রাজকর্মচারীর এবং ভারতীয় অনেক বে-সরকারী লোকের এইরূপ দাবী আছে, যে, পরাধীন

ভারতীয়দের রাষ্ট্রীয় আদর্শ পূর্ণ স্বাধীনতা ইওয়া উচিত, এই মত প্রকাশ করা, এবং পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা, আইনবিরুদ্ধ ও বাস্তবোচ্চক। আমরা কিন্তু এরূপ কোন আইনের অস্তিত্ব অবগত নহি। কাহারও জানা থাকিলে তিনি জানাইলে উপকৃত হইব।

স্থলবিশেষে যুদ্ধের উচিত্যামুচিত্য আলোচনা।

ভারতবর্ষের আইনসকল সম্বন্ধে যাহারা বিশেষজ্ঞ, তাহাদের নিকট আব-একটি জিজ্ঞাস্য আছে। ইংরেজ গবর্ণমেন্ট বা বিশেষ কোন গবর্ণমেন্টের নাম না করিয়া কিম্বা বিশেষ কোন গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্যে কিছু না লিখিয়া, কেহ যদি সাধারণ ভাবে আলোচনা করেন, যে, যে কোনও দেশের শাসকসম্প্রদায় বা শাসনতন্ত্র অতি অপকৃষ্ট কুশাসন বা ভীষণ অত্যাচার কবিলেও প্রজাদের সশস্ত্র বিদ্রোহ কবিবার জ্ঞাত্য ও নীতিসম্মত অধিকার আছে কি না, এবং থাকিলে কিরূপ কুশাসন ও অত্যাচারের পর কি অবস্থায় তাহা করা অমুচিত নহে, তাহা হইলে এরূপ আলোচনা ব্রিটিশ ভারতের আইনসম্মত কি না। অবস্থাবিশেষে যুদ্ধের পক্ষপাতী লোক হয়ত ভারতবর্ষে আছে; কিন্তু আমাদের রাজ-নৈতিক দলগুলি মধ্যে এখন এরূপ মতাবলম্বী কোন দল আছে কি না জানি না। এক দল, খুব বেশী অত্যাচারিত হইলেও অহিংসা অবলম্বন করিয়া মৃত্যু পর্যন্ত সহ্য করা উচিত, এই মত পোষণ ও প্রচার করেন; অন্য দল কোন অবস্থাতেই নিরস্ত্র প্রতিরোধ (passive resistance) করিতেও রাজী নহেন। স্বতরাং পূর্বে উল্লিখিত রকমের আলোচনার কার্যতঃ কোন আবশ্যক নাই। কিন্তু, যাহা প্রায় ঘটে না বা কঠিন ঘটে, এরূপ অবস্থা ও বিষয়ের আলোচনাও আইনজ্ঞেরা করিয়া থাকেন। এইজন্ত প্রায় নিতান্ত কাছে না হইতেও পারে।

বঙ্গে কারখানার সংখ্যা

দৈনিক অনেক কাগজে একটি তালিকা বাহির

হইয়াছে; তদনুসারে দেখা যায়, যে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের মধ্যে বাংলাদেশে কারখানার সংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী। পাটের কল; কাপড়ের কল; লোহা ও ইস্পাত ঢালাইয়ের কারখানা; সাবান, কাচ, চীনাবাসন, লেখাব ও ছাপাব কালী, এবং নানা রকম রাসায়নিক জিনিষের ও ঔষধের কারখানা; বড় বড় ছাপাখানা; সকলকেই কারখানা বলা যায়।

বাংলাদেশে কারখানার সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক হইলেও তাহাতে বাঙালীর আত্মশ্রমিত হইবার কারণ নাই, বরং দুঃখিত হইবারই কারণ আছে। কেননা অধিকাংশ কারখানাই ইউরোপীয় কিম্বা ভারতবর্ষের অন্তঃস্থ প্রদেশের লোকদের সম্পত্তি। সকলের চেয়ে বেশী টাকা ও লোক খাটে পাটের কলগুলিতে। কিন্তু সেগুলি ইউরোপীয়দিগের (অধিকাংশস্থলে স্বচ্ছ) সম্পত্তি। দেশী অংশীদার কোন কোনটির আছে বটে; কিন্তু তাহাবাও অধিকাংশস্থলে মাড়োয়ারী। কারখানাগুলির অধিকাংশ মজুর ও কারিগর অ-বাঙালী।

বাংলাদেশের মুটে মজুর, মুদী ময়দা মিল্লী গুজুদি মহাজন মাঝি মাল্লা প্রভৃতি যে কিরূপ অধিক পরিমাণে অ-বাঙালী তাহা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। পাহারা-ওয়াল, দারওয়ান, সইস্ কোচম্যান, গাড়োয়ান, মোটর গাড়ীর ড্রাইভারদের মধ্যেও অ-বাঙালী খুব বেশী। অন্তঃস্থ দেশ ও প্রদেশের লোকদের দ্বারা শোষিত প্রদেশ যেমন বাংলা, ভারতের আর কোন প্রদেশ তেমন নয়। অথচ অন্তঃস্থ সব প্রদেশের লোকেবা বলে, বাঙালী উত্তর ও মধ্য-ভারত লুটিয়া খাইতেছে। ইহাতে হাসি কান্না উভয়েরই কারণ আছে।

বঙ্গের ধন পরহস্তে যাওয়াটাই আমাদের একমাত্র দুঃখের কারণ নহে। ভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত মুটে-মজুর প্রভৃতি অল্প নিরক্ষর লোকেরা বঙ্গে অনেকটা সামাজিক ও পারিবারিক প্রভাবের বাহিরে বাস করে বলিয়া তাহাদের চরিত্রের অবনতি হয়, এবং তজ্জন্য বঙ্গের নৈতিক অবনতি ঘটে। একটা দৃষ্টান্ত দি। কলিকাতার রাস্তা-ঘাটে যত অশ্রাব্য অঙ্গুলী গালাগালি ও ঠাট্টাতামাসা শোনা যায়, তাহার খুব বেশী অংশ অ-বাঙালীর

মুখনিঃসৃত। বাঙালীরা সবাই সাধু বলিতেছি না। কিন্তু অস্বাভাবিক প্রদেশ হইতে দুর্নীতির ও অশ্লীলতার আমদানীও অব্যাহত। একেই ত কলিকাতায় শতশত অ-বাঙালী অল্প খল্প কুটুমি ডিখারী নিকটবর্তী প্রদেশসকল হইতে আসিয়া আমাদের স্বক্ষে চাপিয়াছে। তাহার উপর আবার পাপের আমদানীটা আরো অসহ্য।

বন্ধের কারখানাগুলির তালিকা পড়িতে পড়িতে একটু আশারও উদয় হয়। মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের গত অধিবেশনে বিজ্ঞানশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয়ের অভিভাষণে দেখিলাম, যে-সব কারখানা চালাইতে হইলে রসায়ন বা অল্প বিজ্ঞান জানা দরকার, দেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত একপ সব কারখানাই বাঙালী-দের দ্বারা চালিত। ইহাতে মনে হয়, বাঙালীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সহিত শ্রমশীলতা, উদ্যম ও ব্যবসা-বুদ্ধি মিলিত হইলে কল-কারখানার ক্ষেত্রে বাঙালী বেশীদিন পশ্চাৎপদ হইয়া থাকিবে না।

নির্লজ্জতা

অনেক খবরের কাগজে একটি মোকদ্দমার কথা পড়িয়া, আমরা যে সাতিশয় আধ্যাত্মিক জাতি, তাহা মনে পড়িয়া গেল। একজন জমিদারের এক রক্ষিতা ছিল। জমিদার ও রক্ষিতা উভয়েই মৃত। জমিদারের পুত্র রক্ষিতার ধনসম্পত্তি অধিকার করিয়াছে। কিন্তু জীলোকটির এক ভাই বলিতেছে, সে-ই উহার ধনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। এই উত্তরাধিকার লইয়া মোকদ্দমা। জমিদারটার পুত্র পিতাব্য অসচ্চরিত্রতা এবং জীলোকটির ভাই নিজের ভগিনীর অসচ্চরিত্রতা প্রকাশভাবে ঘোষণা করিতে লজ্জা পাইতেছে না। বক্তিতা জীবিতকালে সমাজ কর্তৃক পতিতা বলিয়া অবমানিত ও পরিত্যক্ত ছিল; কিন্তু এখন তাহার ধনটাকে কেহ পরিত্যক্ত বা অস্পৃশ্য মনে করিতেছে না। তাহার ভাই এবং জমিদারপুত্র কেহই সমাজে পতিত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। জীলোক ভ্রষ্টা হইলে, যতদিন তাহার হৃদয়ের ও জীবনের পরিবর্তন না হয়, ততদিন পতিত থাকিবে, ইহা সম্পূর্ণ সত্যসঙ্গত। কিন্তু যে-পুরুষ অস্বস্ত: তাহার সমান পাপী, এবং হয়ত যে

তাহার অধঃপতনের কারণ, সেই পুরুষকেও পতিত বলিয়া গণনা করা উচিত; অবশ্য যে পর্যন্ত সে অতুতপ্ত হইয়া আত্মসংশোধন না করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অনুপস্থিতি

আমরা শুনিলাম, কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত চার্লস বোমের পুত্র অস্বস্থতা বশত: বি-এসসি পরীক্ষায় এক দিন উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া, তৎসঙ্গেও তাঁহাকে পাস করা যায় কি না বিবেচনা কবিবার জন্য তাঁহার বিষয়টি মডারেটরদের নিকট পেশ করা হইয়াছে। ইহা সত্য হইলে, অল্প যে-সব পরীক্ষার্থী পীডাবশত: পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাহাদেরও বিষয় বিবেচিত হওয়া উচিত। আমাদের বোধ হয়, এই-সব ছাত্রকে মডারেটরদের কৃপার উপর ফেলিয়া না দিয়া আর-একবার পরীক্ষা করিলে, এবং তাহারা যোগ্য বিবেচিত হইলে কেবল পাস হইবে, বৃত্তি আদি পাইবে না, এইরূপ ব্যবস্থা করিলে মন্দ হয় না।

মিউনিশিয়ান বোর্ডের মামলা

যুদ্ধের জন্য আবশ্যক যাবতীয় সামগ্রীকে মিউনিশিয়ান বলে, এবং তাহা প্রাপ্ত ও সরবরাহ করাইবাব ব্যবস্থা সবুকাবী যে বিভাগ করে, তাহার নাম মিউনিশিয়ান বোর্ড। গত বৃহৎ যুদ্ধের সময় এই বোর্ড যে-সব লোকের সঙ্গে কারবার করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সবুকারের লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি করিয়াছে বা ঠকাইয়া লইয়াছে, এই অভিযোগে কয়েকজন ইংরেজ ও ভারতীয়ের নামে গবর্ণ-মেন্ট মোকদ্দমা করিতেছিলেন। প্রথমে জে, সী, ব্যানার্জি নামক একজন বাঙালী ও সুখলাল কার্ণানী নামক একজন মাদোয়ারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা তুলিয়া দেওয়া হয়। গবর্ণমেন্ট পক্ষ হইতে বলা হয়, “আমরা ইহাদিগকে দোষী বলিয়া প্রমাণ করিতে পাবিতাম, কিন্তু ইহাদের জেল হইলে অনেক স্বদেশী কারখানা ও কারবার নষ্ট হইবে বলিয়া ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিলাম।” তখন অনেক খবরের কাগজে এই কথা লেখা হইয়াছিল, যে,

আসল কারণ ত তা নয়; প্রকৃত কথা এই যে, সরকারী অনেক কর্মচারী লক্ষ লক্ষ (মোট ৮৯ কোটি) টাকা চুরি করিয়াছে, তাহারাও ধরা পড়িবে বলিয়া ঐ দুজন আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। উহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ায় ভারতে ও বিলাতে আন্দোলন হয়, এবং মিউনিশিয়ান বোর্ডের কর্তা স্মার টমাস্ হল্যাণ্ডের কাজ যায়। দেশী দুজন লোককে ছাড়িয়া দেওয়ায় এ্যাংলোইণ্ডিয়ান কাংগ্রেসলা খুবই উত্তেজিত হইয়াছিল। এখন কিন্তু ক্রমে ক্রমে প্রায় সব ইউরোপীয় আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল; তাহাতে ত কেহ টু শব্দ করিতেছে না। এখন ঐ-সব সম্পাদকের সাধুতাজনিত ক্রোধ (যার ইংরেজী নাম ইণ্ডিগ্লেসিয়ান) কোথায় গেল?

ওয়েট্ নামক একজন ইংরেজ আসামী বিলাতে ছিল। গবর্ণমেন্ট বহুবারে এখান হইতে বিলাতে কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী পাঠাইয়া তাহাকে নামে মাত্র গ্রেফতার করান। তাহার পর সে পীড়ার ওজুহাতে জামিনে খালাস ছিল। সে আর বাঁচিবে না, এইরূপ অল্পমানে এখন তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছে। মাহুষের মৃত্যুকামনা করিতে নাই; এবং ওয়েট্ বাস্তবিক দোষী ছিল কি না জানি না। অতএব আশা করা যাইতে পারে, যে, মোকদ্দমায় শাস্তির আশঙ্কা হইতে মুক্ত হওয়ায় সে নিরুদ্বেগ হইয়া আরোগ্য লাভ করিবে ও দীর্ঘজীবী হইবে। স্মার টমাস্ হল্যাণ্ড ও এখন বিলাতে। হল্যাণ্ড ও ওয়েট্ উভয়ে হল্যাণ্ড ওয়েট্ এণ্ড কোম্পানী নাম দিয়া যদি একটা কার্-বাব খোলে, এবং “সস্তা” ভারত-গবর্ণমেন্টকে সকল বকম যুদ্ধসামগ্রী ধোগায়, তাহা হইলে মিউনিশিয়ান বোর্ডের মামলায় যতলক্ষ টাকা অপব্যয় হইয়াছে, তাহা কাংগ্রেস আদায় দেখান যাইতে পারে! গবর্ণমেন্টের যে-সব আইন-কর্মচারীর পরামর্শে মোকদ্দমা দায়ের হয়, তাহাদের নিকট হইতে উহার ব্যয় আদায় করিবার উপায় নাই, কিন্তু তাহাদিগকে অস্ততঃ তিরস্কার করা উচিত। কিন্তু যত কোটা টাকা চুরি হইয়াছে, তাহা আদায় কাংগ্রেসে দেখাইবার উপায় নাই।

বস্তুতঃ মিউনিশিয়ান বোর্ডের সব উচ্চ-কর্মচারী এবং ভাবত-গবর্ণমেন্টের মন্ত্রীসভার ও বিলাতের ইণ্ডিয়া

কোর্সিলের যে-সব কর্মচারীর মিউনিশিয়ান বোর্ডের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল, সকলেরই চাকরী বাওয়া ও পেনশন্ বন্ধ হওয়া উচিত। অধিকন্তু, তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া অপহৃত কয়েক কোটা টাকার যতটা সম্ভব আদায় করা উচিত। কিন্তু কে তাহা করিবে এবং তাহার আইনই বা কোথায়? আইন বড় চমৎকার চীজ। উহার জালে চুনো পুঁটি ধরা পড়ে, কিন্তু অনেক সময় কই কাংলা ধরা যায় না।

গরীব দুঃখী অতি কষ্টে যে ট্যাক্স দেয়, তাহার বিনিময়ে তাহাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, জমীতে জল সেচন, প্রভৃতির যথোচিত বন্দোবস্ত হয় না; কিন্তু বিদেশী ও দেশী চোরে কোটা কোটা টাকা চুরি করিয়াও দণ্ডিত হয় না। যে-গবর্ণমেন্টের শাসনকালে ইহা ঘটে, তাহাকে কিন্তু খুব বেশী কার্যদক্ষ (efficient) বলিয়া মানিতেই হইবে!

কংগ্রেসের কর্মী কমিটির দুটি নির্দারণ

কংগ্রেসের কর্মী কমিটির দুটি আধুনিক নির্দারণ প্রশংসনীয়। একটিতে তাঁহারা বলিতেছেন, যে, কংগ্রেসকে আরও অধিক গণতান্ত্রিক ও দেশের প্রতিনিধিত্বান্বিত করিবার জন্ত “অস্পৃশ্য” ও অবনমিত শ্রেণীর খুব অধিক-সংখ্যক লোককে কংগ্রেসের সভ্যতালিকাত্ত্বিত করিতে হইবে। আব-একটিতে বলিতেছেন, যে, কংগ্রেসের কোন সমিতির ভাণ্ডারে সম্পূর্ণরূপে চরকার স্ততায় বোনা বন্দব ভিন্ন অল্প কাপড় রাখা হইবে না, এবং ঐপ্রকার বন্দব ভিন্ন অল্প কোন বকম কাপড় প্রস্তুত করিবার জন্ত কংগ্রেসের টাকা খরচ করা চলিবে না।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশনের মহামনা সভাপতি ব্রহ্মানন্দ স্বামীর মৃত্যুতে মিশন ত ক্ষতিগ্রস্ত হইলেনই, দেশও ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তিনি সন্ন্যাসী হইলেও গরীব দুঃখী বিপন্নের মা-বাপ স্ততায় অতি বৃহৎ পরিবাবের কর্তা ছিলেন। তিনি মানবপ্রেমিক ছিলেন, কিন্তু ভাববিলাসী ছিলেন না। তিনি হিসাবী ছিলেন এবং



শামী ব্রহ্মানন্দ ।

টাহাব কার্যপদ্ধতি স্বশৃঙ্খল ছিল বলিয়া তিনি সর্ব-সাধারণেব সাহায্যে দুর্ভিক্ষ জলপ্রাবন ঝড় ভূমিকম্পাদিতে বিপন্ন অগণিত লোকের সাহায্য কবিত্তে পাবিতেন ।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের কয়েকটি নির্দীারণ

চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের অবিবেশনে কতকগুলি উত্তম প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । বাঙালী হিন্দু-মসজিদ হঠতে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা করিবার প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে । প্রথমেই বলা হইয়াছে, যে, যাহাদের জল আচরণীয় নহে, তাহাদের হাতে জল পান যেন বাঙালী হিন্দুরা করেন । অহরোধটি খুব ভাল । এই প্রস্তাবে যাহারা মত দিয়াছেন, তাহারা ইহা অহুসাৰে কাজ করিতে না পারিলে যেন কংগ্রেসের সভ্য না থাকেন । কারণ, তাহা ভণ্ডাগি হইবে, এবং ভণ্ডামির দ্বারা ব্যক্তিগত বা জাতীয় উন্নতি হইতে পারে

না । জল দিবার জন্য সমুদয় কংগ্রেস-সম্পর্কীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সভাসমিতিতে কেবল “অস্পৃশ্য” ও “অনাচরণীয়” শ্রেণীর ভৃত্য রাখিলে কংগ্রেস-নেতাদের কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য হইবে । নিয়ন্ত্রণের লোকদেব সামাজিক মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবার নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদিগকে অহু-রোধ করা হইয়াছে । অহুৰোধ অহুসারে কাজ হউক ।

কংগ্রেসেব কোন সভাসমিতিতে কাহারও একাধিপত্য থাকিবে না, স্থিৰ হইয়াছে । ইহা ভাল । কেবল সৰ্ব্বট অবস্থায় অল্পসময়ের জন্য একাধিপত্য আবশ্যক ও স্বফলপ্রদ হইতে পারে, অথ অবস্থায় বা দীর্ঘকালের জন্য নহে ।

অহিংসার সহিত কর্তব্যপথে দৃঢ় থাকিবার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে । সালিসী আদালত ও পঞ্চায়েৎ সর্বত্র স্থাপন করিতে বলা হইয়াছে । কাহারো প্রতি কোন বিদ্বেষ পোষণ না করিয়া, কেবল চরক য কাটা স্বত্বের খন্দর উৎপাদনের ও বিক্রয়ের সুবিধার জন্য, বিদেশী কাপড় ক্রয় হইতে ক্রেতাদিগকে কেবলমাত্র যুক্তি দ্বারা নিবৃত্ত করিবার জন্য, কাপড়ের দোকানের সম্মুখে স্বেচ্ছাসেবকদের পাহারা রাখিতে অহুরোধ করা হইয়াছে । যদি কেবল যুক্তি-প্রয়োগই বাস্তবিক করা হয়, তাহা হইলে ইহা আপত্তিজনক নহে । কার্পাস ও খন্দর উৎপাদনের জন্য বিস্তারিত প্রণালী নির্দেশ করা হইয়াছে ।

বঙ্গে গত এক বৎসরের মধ্যে ষতপ্রকার জুলুম ও অত্যাচার হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির উল্লেখ কবিয়া কনফারেন্স বাঙালীদিগকে বলিয়াছেন, যে, এই অবস্থার আশু প্রতিকারের জন্য দেশে শীঘ্র স্বরাজ স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক ; তজ্জন্য সবিশেষ চেষ্টা করা হউক ।

সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে সন্ধান স্থাপন, এবং যে-সকল কাজে সকলে একমত তাহা একযোগে সম্পাদন, এই উভয় লক্ষ্য কনফারেন্স সমুদয় বাঙালীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন । লক্ষ্য মহৎ । দল নির্বিশেষে মানুষের স্বদেশ-প্রেমে ও সদিচ্ছায় বিশ্বাস থাকিলে লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে, নতুবা নহে ।

এবারকার মলাটের ছবি

স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের বৃহৎ পুস্তকালয়ে রাগরাগিণীর প্রাচীন চিত্রের একটি পুঁপি আছে। তাহার পোত্র শ্রীমান প্রমথলাল সরকারের সৌজশ্চে উহা হইতে একটি ছবি প্রস্তুত করাইয়া এবারকার মলাটে ছাপিলাম। ইহা শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নির্বাচিত।

“রশ্মি”

স্বর্ঘ্যরশ্মি বলিতে আমরা স্বর্ঘ্যের কিরণ বুঝিয়া থাকি। রশ্মির মানে রাশ বা বল্গাও হয়। স্বর্ঘ্যের রশ্মিকে যে ঠিক বৈজ্ঞানিক অর্থে স্বর্ঘ্যের বল্গাও বলা যায়, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের লিখিত “বৃক্ষের অঙ্গভঙ্গী” নামক প্রবন্ধ পড়িলে তাহা বুঝা যাইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রশ্নচুরি

অন্য অনেক বৎসরের জ্ঞান এবং সরল কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন কোন প্রশ্নপত্র চুরি হইয়া পরীক্ষার পূর্বেই বাহির হইয়া যাইবার গুজব রটিয়াছিল। আমরাও উহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও সময়ে নির্ভরযোগ্য তিনজন লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম। বাস্তবিক তাহার ঠিক সংবাদ পাইয়াছিলেন কি না, এবং স্যার দেবপ্রসাদ সর্কার-কারীকে অপদস্থ করিবার জন্য যে-যে সচেতন ও অচেতন কল কাধ্যে প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাহার কোন-কোনটা এখনও অসাবধানতা বশতঃ সক্রিয় রহিয়া গিয়াছে কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু বোম্বের মূল বিশ্ববিদ্যালয়ে নহে। “বিজ্ঞানভ হউক বা না হউক, চরিত্র যেমনই হউক, বিশ্ব-বিজ্ঞানদের ছাপ লইয়া বাহির হইতে পারিলেই কৃতার্থ হইলাম,” জাতীয় চরিত্রের অবনতির স্বচক এই ধারণাই যত “নষ্টের গোড়া”। এই অন্ত প্রশ্ন চুরি হয় এবং চোরের ছুপয়সা লাভও কখন কখন হয়। সভ্য ও স্বাধীন দেশসকলে জীবিকানির্ভারের যতপ্রকার পথ আছে, আমাদের দেশে তাহা নাই। এইজন্য চাকরীই এত মূল্য, এবং চাকরী পাইবার নিমিত্ত আবশ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটেবও এত মূল্য। রোগের প্রতিকাবেব জন্য যেমন চাষিত্রিক

উন্নতি প্রয়োজন, তেমনি জীবিকা-নির্ভারের নানা পথ খুলিয়া দেওয়াও আবশ্যক।

থাইবার গিরিসঙ্কট রেলওয়ে

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ভারতের বাহিরে থাইবার একটি পথ থাইবার গিরিসঙ্কট। উহা ভিতর দিয়া গবর্ণমেন্ট বহু কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৮ মাইল লম্বা এক রেলওয়ে প্রস্তুত করিতেছেন। উদ্দেশ্য ঐ পথ দিয়া ভারত আক্রমণ নিবারণ। কিন্তু আক্রমণ করিবে কে? আফগানদের সঙ্গে ত মিত্রতা-সূচক সন্ধি এই সেদিন স্থাপিত হইয়াছে। রাজনীতির কি সবটাই তুম্বো? এই গিরি-রেলওয়ে দ্বারা আক্রমণ নিবারিত হউক বা না হউক, উহা যে ভারত-আক্রমণের একটা কারণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ-নাই। কারণ, রেল যে ভূভাগ দিয়া যাইবে, তাহার অধিকাংশ আফ্রিদিদের। তাহারা স্বাধীনতায় অভ্যস্ত। তাহারা তাহাদের জাতির ভিতর দিয়া রেল চালাইলে এই অনধিকার-প্রবেশ নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা ভাবে সম্ব করিবে না।

রণকৌশলেব দিক দিয়াও রেলটা ঠিক মনে হইতেছে না। সম্ভাবিত আততায়ীর ও আমাদের মধ্যে যদি দুর্গম ভূরতিক্রম নদী পর্বত আদি বাধা কিছু থাকে, তাহা থাকিতে দিয়া, তাহা অতিক্রম করিবার ভারটা আততায়ীর উপর রাখাই ত ভাল। তা না করিয়া গবর্ণমেন্ট স্বয়ং তাহা অতিক্রম করিয়া আততায়ীর সহিত লড়িতে যাইতেছেন। তা ছাড়া, যদি কোন প্রকারে রেলটা আততায়ী হস্তগত হয়, তাহা হইলে ভারত-আক্রমণ খুব সোজা হইবে।

ভীলদের অসন্তোষ

ভীলরা, বাঁচিয়া থাকার জন্য, হিন্দু মুসলমান ইংরেজ কাহারও নিকট শ্রমী নহে। তাহারা স্বয়ং বনজঙ্গল কাটিয়া পার্বত্য জমী চাষিয়া হিংস্র জন্তুর সহিত লড়িয়া ও আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছে। কোন গবর্ণমেন্ট শাহাদিগকে রক্ষা করিয়া বাঁচাইয়া রাখেন নাই। সুতরাং তাহারা ববাবব রাজনা সামান্যই দিত, এবং তাহা তাহাদের গ্রামের

মণ্ডল বা প্রধান সংগ্রহ করিয়া সরকারকে দিত। কিন্তু যে-যে দেশী রাজ্যে বা ইংরেজ রাজ্যে তাহারা বাস করে, তাহার কোন কোন স্থানে কিছুদিন হইতে তাহাদের খাজনা বাড়িয়াছে এবং তাহা আদায় করিতেছে সরকারী লোক। ইহাতে তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছে, এবং তজ্জন্য কোথাও কোথাও খাজনা আদায় না হওয়ায় দাঙ্গাহাঙ্গামাও হইয়াছে। ফলে তাহাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রেরিত হইয়াছে, এবং অনেক গ্রাম দগ্ধ ও অনেক লোক হত ও আহত হইয়াছে। তাহাদের প্রতিনিধিদের সকলকে ডাকিয়া সভা করিয়া যদি বুঝাইয়া বলা হইত, যে, এখন আর সেকালের মত সম্ভায় যেমন গৃহস্থালী চলে না তেমনি রাজস্বার্থও চলে না, অতএব কিছু বেশী খাজনা দেওয়া চাই, এবং যদি তাহা আদায়ের ভার তাহাদের গ্রামনীদের হাতেই থাকিত, তাহা হইলে খুব সম্ভব গৃহদাহ ও মানুষবধ প্রভৃতি অপকর্ষ্য করিতে হইত না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাহাদের হাতে ক্ষমতা থাকে, তাহারা বুঝাইয়া-
[বুঝাইয়া কাজ করানকে দুর্বলতা মনে করে।

অকালী দলন

শিখেরা পরমেশ্বরকে যে-যে নামে অভিহিত করেন, তন্মধ্যে “অকাল” একটি। অকালের অর্থ, যিনি কালাতীত, কালে ধাহার আদি নাই, অন্ত নাই। এই অকালের উপাসকেরা অকালী। অকালী শিখেরা নির্ভাবান, সাহসী ও উৎসাহী। পঞ্জাব গবর্ণমেন্ট বলিতেছেন, তাহারা এখন বিদ্রোহপ্রয়াসী হইয়াছে, এইজন্য তাহারা দলে-দলে ধৃত ও দণ্ডিত হইতেছে। পুলিশ কর্তৃক তাহাদের অনেকের উপর কোন কোন স্থলে ভীষণ অত্যাচারও হইতেছে। অকালীদিগের পক্ষের লোকেরা বলিতেছেন, যে, তাহারা বাস্তবিক শিখ মন্দিরসমূহে, শিখ জীবনে ও শিখ সমাজে পবিত্রতা ও নিষ্ঠা পুনঃপ্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী ধর্মসংস্কারক।

জাতীয় মহামেলা

জাতীয় মহামেলায় নানাবিধ দেশী জিনিষ প্রদর্শিত হইতেছে। তাহাব মধ্যে কাপড়ই বেশী। তদ্বিষয় কলও

কয়েকটি প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে, হাতের তাঁতে কাপড় বুনবার জন্য “টানা” প্রস্তুত করিবার কলটি উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ এই কাজের জন্য অনেকখানি জায়গা দরকার হয়, শারীরিক পরিশ্রম খুব হয়, এবং এই কাজ খোলা জায়গায় করিতে হয় বলিয়া বৃষ্টির ও খুব বোজের সময় ইহা করা যায় না। প্রদর্শিত কলটি ঘরের মধ্যেই অল্প জায়গায় রাখা যায়, এবং অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে সকল ঋতুতে ইহার সাহায্যে টানা প্রস্তুত হইতে পারে। মূল্য ত্রিশ টাকা মাত্র। বগুড়ায় শ্রীরমণীকান্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট পাওয়া যায়।

সহযোগিতাবর্জন ও ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ

সম্প্রতি আলোচনা হইতেছে, যে অসহযোগীরা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা, কোমিলি অব্ ট্রেট ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে প্রবেশ করিতে পারেন কি না। কোন অসহযোগীই এ পর্যন্ত সরকারের সহিত সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন বা সম্ভব মনে করেন নাই। তাহারা সরকারকে কর দিতেছেন, সরকারী ডাকঘর, টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে, এবং সময় সময় রেজিস্ট্রেশ্যন্স আফিস্‌ও ব্যবহার করিতেছেন। অসহযোগ আন্দোলনের অনেক প্রসিদ্ধ নেতা আইন-ভঙ্গ অপরাধে জেলে যাইবার সময় পর্যন্তও সরকার-প্রতিষ্ঠিত মুন্সিপালিটির সভ্য ছিলেন। বহুসংখ্যক নেতা সরকারী আদালতে বিচারার্থ নীত হইবার পর তথায় প্রকারান্তবে আত্মপক্ষ সমর্থন কবিয়াছেন। স্তবরাং আমাদের মনে হয় যে কংগ্রেস ইচ্ছা করিলে অসঙ্গতিদোষে ছুট না হইয়াও ভবিষ্যতে তাহাদের কোন সাধারণ বা বিশেষ অধিবেশনে ইহাও স্থির করিতে পারেন, যে, ব্যবস্থাপক সভাগুলিকেও তাহারা অতঃপর আপনাদের কাজে লাগাইবেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কংগ্রেস এমন কোন প্রস্তাব গ্রাহ্য না করিতেছেন, ততক্ষণ ইহার সভ্যদের, সমবেতভাবে কাজ কবাব থাকিবে, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইবার চেষ্টা করা উচিত নয়। মহারাষ্ট্রে এবং ভারতের অন্যান্য কয়েক স্থানে পূর্বে হইতেই এমন যতাবলম্বী লোক আছেন, যাহারা ব্যবস্থাপক সভায়

প্রবেশ করিয়া লোকমাত্র টিলকের মতালুঘাণী কার্য করারই পক্ষপাতী। গবর্ণমেন্ট যখন দেশের উন্নতি-সাধনে যত্নশীল হন, তখন দেশবাসীর উচিত তাঁহাদের সহযোগ করা, কিন্তু যখন দেশের স্বার্থবিরোধী কোন ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করেন তখন লোকদের উচিত যথাশক্তি আপত্তি করা এবং বাধা দেওয়া, ইহাই ছিল টিলকের মত। দেশভক্ত অকপট মডারেট ঠাহারা, তাঁহাদের মতও প্রায় এইপ্রকার। কিন্তু এই কারণেই যে উপরোক্ত নীতিটি বর্জন করিতে হইবে, তাহা নয়—বর্জন করিবার অন্য কারণ থাক্ বা না থাক্।

কংগ্রেসের কার্যের সহিত আমরা যুক্ত না থাকিতে, এ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। কিন্তু ঐ একই কারণে আবার এ সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচে কথা বলিবার সুবিধাও আমাদের আছে। কারণ আমাদের মতামত কাহাকেও বাধা করিবে না, এবং কাহাকেও মুঞ্চিলে ফেলিবে না।

গহাঙ্গা গান্ধীর মত ঠাহারা বর্তমান গবর্ণমেন্টকে শয়তানী মনে করেন, তাঁহারা যদি ফলাফল বিচার না করিয়া উহার সহিত সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন, তবে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। আমরা জানি, যে, ঐ প্রকার বিশ্বাস থাকিলে সম্পূর্ণ অসহযোগই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পন্থা। আমরা ইহাও জানি, যে, যদি দেশের সকল অধিবাসী কিম্বা অধিকাংশ বা বহুসংখ্যক অধিবাসী এই পথ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে ইংরেজ জাতির প্রতিনিধিরা ভারতীয় নেতাদের সহিত মিলিত হইয়া অসহযোগীদের সঙ্গে সন্ধির সন্ধি আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করিবেন। কিন্তু যত দিন পর্যন্ত গবর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের মধ্যে সকল সম্পর্ক চুকিয়া না যায়, ততদিন একটা মাঝামাঝি রকম করিবার ও রাখিবার অধিকার কংগ্রেসের আছে। এখনও এই রকম রহিয়াছে। রফার সীমা আগাইয়া পিছাইয়া দিতে কংগ্রেস পারেন। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা করিবার অধিকার একমাত্র কংগ্রেসেরই আছে। অবশ্য, বর্তমান আন্দোলনের নেতা যখন গহাঙ্গা গান্ধী, তখন কোন নূতন পথ ধরিবার পূর্বে তাঁহার সহিত পরামর্শ করা উচিত।

নবপ্রবর্তিত ব্যবস্থাপক সভাস্থলির দোষগুণ বিচার করিবার আর এখন আবশ্যক নাই। যে-সব মডারেট নিজেদের ভাবনা নিজেরা ভাবিতে অভ্যস্ত আছেন, তাঁহারা অভিজ্ঞতার ফলে উহার মূল্য এখন বুঝিতেই পারিয়াছেন।

ব্যবস্থাপক সভার কদর বর্তাই হোক, কেহ যদি ইহাতে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে গবর্ণমেন্টের ভাল মন্দ সকল রকম ব্যবস্থাতেই বাধা দেওয়া তাঁহার পক্ষে উচিত হইবে না। নীতি হিসাবে উহার সমর্থন করা যায় না। বাস্তবিকই যদি রাজকর্মচারীরা কোনও রকমে দেশের উন্নতি করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে বাধা দেওয়াটাকে সমর্থন করা যায় কি করিয়া? এই ভাবে বাধা দেওয়ার দুইটি মাত্র কারণ থাকিতে পারে। কেহ যদি বিশ্বাস করেন, যে, গবর্ণমেন্ট যথার্থ দেশের উপকার করিতে চান না, তাঁহারা যখনই উক্ত প্রকাব ইচ্ছা প্রকাশ করেন—তাহা কেবল লোকের চোখে ধূলা দিবার জন্ত, তাঁহাদের সত্য উদ্দেশ্য আপনাদের স্বার্থসিদ্ধি,—তাহা হইলে তিনি ঐ প্রকার বাধা দিবার পথ ধরিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক যদি গবর্ণমেন্ট সম্বন্ধে কাহারও ঐ প্রকার বিশ্বাস থাকে, তবে তাঁহার কর্তব্য ঐ প্রকার গবর্ণমেন্টকে একেবারে পঙ্কু করিয়া ফেলিবার জন্ত ধর্মসম্বৃত ও অহিংসামূলক সর্বপ্রকার চেষ্টা করা, অন্ততঃপক্ষে তাহার সহিত সকল রকম সম্পর্ক বর্জন করা। কিন্তু ঠাহারা মনে করেন, গবর্ণমেন্ট কখনও কখনও নিঃস্বার্থ ভাবে দেশের উপকারও করেন, সরকারী হিতচেষ্টাকে বাধা দেওয়া তাঁহাদের উচিত নয়। গবর্ণমেন্ট সম্বন্ধে ব্যক্তিবিশেষের ধারণা যেমনই হোক, তাঁহাদের হিতচেষ্টাকে, অন্ততঃপক্ষে আপাত-দৃষ্টিতে যাহাকে হিত-চেষ্টা মনে হয়, তাহাকে, বাধা দেওয়া রাষ্ট্রনীতি বা ধর্ম-সম্বৃত হইবে না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। কোনও স্থানে হযত অত্যন্ত জলাভাব ঘটয়াছে। কৃপ খনন করিয়া, পুকুর কাটাইয়া বা দূরবর্তী স্থান হইতে পাইপসহযোগে জল আনিয়া এই অভাব দূর করা ভাল, সে বিষয়ে আলোচনা চলিতে পারে বটে। কিন্তু জল জোগানটাতে বাধা দেওয়া চলে না। বাধা দিলে তাহা অমাহুষেব কাজ

হইবে। অবশ্য, যদি কেহ বেসরকারী ভাবে ঐ অভাব দূর করিতে পারেন, তবে সে ভিন্ন কথা। রাজনীতি হিসাবেও এইরূপ অবিচারিত বাধা দিবার প্রণালী উৎকৃষ্ট নয়। কারণ, গবর্ণমেন্ট যাহা করিয়া দিতে চাহিতেছেন, তাহা নিজে কবিবার সাধ্য যদি না থাকে, তবে কেবলমাত্র বাধা দেওয়ার জন্ত যিনি বাধা দিয়াছেন, তাঁহার প্রতি দেশের লোক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হারাইবে।

দেশের ছোট বড় অনেক অভাবই গবর্ণমেন্ট মোচন করিতেছেন। কি উদ্দেশ্যে করিতেছেন, বলা কঠিন হইতে পারে। কিন্তু দেশে কি এমন বে-সরকারী লোক আছেন, উক্ত সব অভাব মোচন করিবার উপযুক্ত আর্থিক বল, বন্দোবস্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্মী যাহার বা যাহাদের হাতে আছে? এমন লোক আছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। স্বতরাং ব্যবস্থাপক সভায় বসিয়া নির্দিষ্টকালে সব তাতে বাধা দিলেই কাজ হইবে না। কেবল যদি দলের জয়লাভের কথাই ভাবা যায়, তাহা হইলেও এই নীতি খুব সফল হইবার কথা নয়। কারণ গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলেই ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধীয় আইন পরিবর্তন করিতে পারেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে-সকল আইরিশ সভ্য ছিলেন বা আছেন, তাঁহারা বাধা দিবার নীতি অবলম্বন করিয়া যে আয়ারল্যান্ডের প্রভূত উপকার সাধন করিতে পারিয়াছিলেন, এমন নয়।

কোন কোন অসহযোগীর মনে এই ভয় থাকিতে পারে, যে, তাঁহারা যদি ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া গবর্ণমেন্টের ষড়ার্থ বা আপাত-প্রতীক্ষমান হিতচেষ্টাব সহযোগী হন, তাহা হইলে লোকের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করা হইবে, যে, গবর্ণমেন্ট সম্পূর্ণ শয়তানী নয়, উহার ভিতর ভাল কিছুও থাকিতে পারে। এবং এইরূপ বিশ্বাস হইলে তাহাদের মনে পর-রাজের পরিবর্তে স্ব-রাজ পাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হ্রাস পাইতে পাবে। আমাদের কিন্তু এ প্রকার ভয় নাই। বিদেশী শাসন যতই উৎকৃষ্ট হোক না কেন, মানবজীবনের চরম লক্ষ্য সর্বাঙ্গীন আত্মকর্তৃত্ব-বিকাশ সম্বন্ধে তাহা কখনই স্বায়ত্ত-শাসনেব সমান হইতে পারে না। আমাদেরব বিশ্বাস এই, যে, উহার অভিপ্রায় যতই সং হোক না,

কোন বিদেশী গবর্ণমেন্টের পক্ষে শাসনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আদর্শানুরূপ হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য বিদেশী শাসকেরা যদি এই পণ করিয়া আসেন, যে, যতশীঘ্র সম্ভব তাঁহারা অধীন জাতিকে স্বায়ত্ত-শাসনে শিক্ষিত করিয়া তাহাদের হাতে শাসনভার সম্পূর্ণভাবে অর্পণ করিয়া বিদায় হইবেন, তাহা হইলে তাঁহারা সফল হইতে পারেন। ইংরেজ গবর্ণমেন্টের এমন কোন উদ্দেশ্য অপরিহার্য প্রকট হয় নাই। কিন্তু আমরা কাহাকে শাসনের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য মনে করি, তাহা এখনও বলা হয় নাই। জনসাধারণকে শরীর মন ও আত্মার সর্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধনের সুবিধা দেওয়া ও এই উন্নতির পথের সকল বাধা দূর করাই শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ লক্ষ্য হওয়া উচিত। সর্বাঙ্গীন বিকাশ বলিতে রাজনৈতিক ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশও অবশ্যই বুঝায়। স্বতরাং দেখা যাইতেছে, যে, গবর্ণমেন্ট যদি বিদেশী হন, তবে আপনার সদভিপ্রায় প্রমাণ করিতে হইলে, শাসিত লোকদের হাতে কোনও না কোন সময়ে তাহাদের দেশের কার্যভার সমর্পণ করিতে হইবে। বিদেশী গবর্ণমেন্টকে, প্রজারা স্বায়ত্ত-শাসনে যথেষ্ট শিক্ষিত হইলেই এইভাবে ভার সমর্পণ করিবার জন্ত প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং সে-দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। পক্ষাধীন জাতির শিক্ষানবীশীর সময় বড়-জোর এক পুরুষের জীবিতকাল পর্য্যন্ত; কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দীতেও যাহারা নিজেদের অধীন দেশকে স্বশাসক করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারে না, সেইসব বিদেশী শাসকদের সদভিপ্রায়ে বা স্বশাসনদক্ষতায়, কিম্বা উভয়েই সন্দেহান হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

আমাদের বিশ্বাস এই, যে, গবর্ণমেন্ট বিদেশী হইলেই তাহার মূল্য অনেক কমিয়া যায়, কারণ, শাসনতন্ত্র-বিশেষের শ্রেষ্ঠত্বের সার অংশ হইতেছে উহার স্বায়ত্ততা। বিদেশী শাসন আর যত সুখ-সুবিধাই দিক্ না কেন, তাহা যতই মূল্যবান হোক না কেন, তাহা স্বশাসন-শক্তির সমতুল্য হইতে পারে না। নিজেরাই নিজেদের নিয়ামক, পরিচালক ও রক্ষক হওয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সম্পত্তি মানুষের নাই। অধীন জাতিকে এই সাবধন হইতে বঞ্চিত না করিয়া কোন বিদেশী গবর্ণমেন্ট

টিকিতে পারে না। বিদেশী গবর্ণমেন্টের অস্তিত্বের মানেই এই, যে, তদ্বারা শাসিত জাতির এই পরম ধন নাই। এই কাবণে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ভবিষ্যতে ভারতীয় ইংরেজ গবর্ণমেন্ট যতই উন্নত হইয়া উঠুক না, আমরা সর্বদাই সম্পূর্ণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা রাখিব এবং এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করাই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইবে। আমাদের অন্তরে স্বাধীন হইবার প্রয়াস জাগ্রত রাখিবার জন্য ইংরেজ গবর্ণমেন্টকে শয়তানী হইতে হইবে বা তাহাকে সেইরূপ ভাবিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। উহা সাধুই হোক বা শয়তানীই হোক, আমরা স্বভাবতঃ চিরকালই স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষা করিব। বিদেশীর শাসনপাশ হইতে মুক্ত হইবামাত্রই যে অধিকতর স্বাধীন বা উন্নত হইবার ইচ্ছা লোপ পায়, এমন নয়। ইংরেজরা ত স্বাধীন, কিন্তু তাঁহারা কি মনে করেন, যে, তাঁহাদের শাসনযন্ত্র একেবারে উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে, না তাঁহাদের আর অধিকতর স্বাধীনতার প্রয়োজন নাই? পৃথিবীর বৃহত্তম সাধারণতন্ত্রে প্রকাশিত ‘নিউ মেক্সরিকি’ নামক কাগজের ১১ই মার্চের সংখ্যায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়, যে, কেটকী প্রদেশের নিউপোর্ট সহরের ইম্পাতের কারখানাগুলির ২০০০ ধর্মঘটী শ্রমীকে সাযেশ্তা করিবার জন্য অশারোহী ও পদাতিক সৈন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে, ও শ্রমীদের ঘববাড়াগুলিতে শতছিদ্র করা হইয়াছে, এবং তজ্জন্য তথায় বিভীষিকার রাজত্ব প্রবর্তিত হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে, আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটসেব শাসনযন্ত্রেরও এখন অনেক উন্নতি হইতে পাবে।

ব্যবস্থাপক সভা কাজে লাগাইবার উপায়

আমাদের ব্যবস্থাপক সভাগুলি কাজে লাগাইবার একটা উপায় এই;—সভ্যদের উপর যে-সকল ক্ষমতা ও অধিকার অর্পণ করা হইয়াছে, তাহা যতই সামান্য হউক, সেই অধিকার ও ক্ষমতাকে একেবারে শেষ সীমা অবধি খাটান। কিন্তু এইভাবে কাজ করার জন্ত সর্বাগ্রে প্রয়োজন অধিকাংশ সভ্যের অতি সাহসী, অতি

প্রত্যুৎপন্নমতি, অতি উৎসাহী, অতি জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনচেতা হওয়া। এইরূপ একদল মানুষকে নির্বাচনপূর্বক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে পাঠাইয়া না দেখিলে ব্যবস্থাপক সভাসমূহ কি করিতে পারেন বা না পারেন, তাহা বুঝিবার আর কোন উপায় নাই।

নিজামের রাজ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা

কয়েকটি দেশী রাজ্যে অনেক বৎসর ধরিয়া অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চলিয়া আসিতেছে। নিজামের রাজ্য হাযদরবাদ দেশী রাজ্যসকলের মধ্যে বৃহত্তম। সম্প্রতি নিজামের আদেশে ইহাতেও প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হইয়াছে। ইহার জন্য নিজাম নূতন ট্যাক্স স্থাপন করেন নাই।

মহিলা ম্যুনিসিপাল কমিশনার

মাদ্রাজ প্রদেশে মহিলাদের ম্যুনিসিপাল কমিশনার নির্বাচনে ভোট দিবার অধিকার আছে, কিন্তু তাঁহারা নিজে করদাতাদের দ্বারা ম্যুনিসিপাল কমিশনার নির্বাচিত হইতে পারেন না। নেলোরের মিউনিসিপাল কাউন্সিলে ও ডিক্কিট বোর্ডে মহিলা সভ্য মনোনীত করিয়া মাদ্রাজ গবর্ণমেন্ট সফল পাইয়াছেন। এবং সম্প্রতি মাদ্রাজ শহরের মিউনিসিপাল কাউন্সিলে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, যে, ঐ মিউনিসিপালিটির কাৰ্য্যপরিচালন হিতকর করিবার জন্ত—বিশেষতঃ নারী ও শিশুদের কল্যাণার্থ—গবর্ণমেন্ট উহার কোন্সিলে একজন মহিলা সভ্য মনোনীত করুন। তদনুসারে মাদ্রাজ প্রদেশের স্থানিক স্বাভ্যন্ত-শাসনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী একজন মহিলাকে মনোনীত করিবার উপায় অবলম্বন করিতেছেন।

সকলের অগ্রণী বলিয়া বাংলার একটা অহঙ্কার আছে। সেইজন্যই বোধহয় ভাল কাজ অল্প কোথাও হইয়া গেলে বাংলা তাহা করিতে চায় না।

তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রী

রেলের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর ভাড়াও বাড়িয়াছে, কিন্তু পশু ও মনুষ্যের যে-সব প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাধন আবশ্যক, সেইসকলের ব্যবস্থা উহাতে হয় নাই। যাত্রী-

দিগকে অত্যন্ত ঠাসাঠাসি করিয়া বসিয়া দাঁড়াইয়া (কখন কখন মালগাড়ীতেও) বাইতে হয়। ইউরোপের কোন কোন দেশের গাড়ীর মত রাত্রে শুইবার তাক (shelf) ঐ-সব গাড়ীতে প্রচলিত করা উচিত। যথেষ্ট পায়খানা ও জলের ব্যবস্থা, এবং সব সময়ে ভদ্রভাবে টিকিট পাইবার বন্দোবস্ত করা উচিত। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়াই রেলকোম্পানীর যাত্রীবহন-বিভাগের প্রধান আয়ের পথ। অথচ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদেরই কষ্ট লাঞ্ছনা ও অপমান সকলের চেয়ে বেশী। খবরের কাগজ-সকলে, ব্যবস্থাপক সভাসমূহে, এবং জনহিতকর সমিতিসকলের দ্বারা এই বিষয়ে অবিরত আন্দোলন হওয়া আবশ্যিক।

দমন ও নিগ্রহ নীতি

অসহযোগীতা কিছুদিন হইতে নিরস্ত্র প্রতিরোধ বা সর্বকারী আইন আদেশ লঙ্ঘন স্বগিত রাখা সত্ত্বেও গবর্ণমেন্টের দমন ও নিগ্রহ নীতি সকল প্রদেশে খুব জোরে চলিতেছে। গবর্ণমেন্ট দেখিতেছি দেশকে ঠাণ্ডা হইতে দিবেন না, এবং লোকদিগকে ভুলিতে দিবেন না, যে, তাহারা পর-রাজ্যে বাস করিতেছে।

শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার মন্ত্রী

মাক্জাজ গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি যখন একজন দেশী মন্ত্রীকে পুলিশ বিভাগের ভার দিয়া তাঁহাকে শৃঙ্খলা ও শাস্তি বক্ষার এবং আইনেব মৰ্যাদা রক্ষার ভার দেন, তখন একটা রব উঠে, যে, ঐ প্রদেশেই প্রথমে ওরূপ ভাব দেশী মন্ত্রীর হাতে গেল। অমনি আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশ হইতে সংবাদ আসিল, সেখানে আগে হইতেই এরূপ ব্যবস্থা ছিল। তাহাব পর ক্রমশঃ জানা গিয়াছে, যে, মধ্য প্রদেশ ও বেরারে এবং আসামেও এরূপ ব্যবস্থা অনেকদিন হইতে চলিতেছে। কিন্তু ঐ চারিটা

প্রদেশে কি জুলুম জবরদস্তি ও পুলিশের অত্যাচার লোপ পাইয়াছে, না আগেকার চেয়ে কমিয়াছে?

গৌরার জায়গায় কালা সর্দার আমলা নিয়োগ দ্বারা প্রতিকার হইবে না; পূর্ণ স্বরাজ চাই।

মাবলাদের সত্যাগ্রহ

মহারাজ্জে মূলধীপেটায় একটি নদীতে বাধ বাধিয়া তদ্বারা সঞ্চিত জল উচ্চ স্থান হইতে ছাড়িয়া তাহার স্রোতের শক্তি দ্বারা তাড়িত শক্তি উৎপাদনের জন্য বোম্বাইয়েব তাতা কোম্পানী বৃহৎ আয়োজন করিয়াছেন। সঞ্চিত জলে নিকটবর্তী গ্রামসকলের বিস্তার চাষের জমী ও বাসগৃহ ডুবিয়া যাইবে। কোম্পানী তাহা গবর্ণমেন্টের সাহায্যে ক্রয় করিয়াছেন। কিন্তু তথাকাব অধিবাসী মাবলারা গ্রাম ও চাষের জমী ছাড়িতে চায় না। ইহারা সেই মাবলা জাতির বংশধর শাহাদেব অদ্ভুত শৌর্য্যবলে শিবাজীর সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। তাহারা তাহাদের পূৰ্ব-পুরুষদের কীর্তিস্মৃতিমণ্ডিত প্রাচীন বাসভূমি, এবং পৈত্রিক চাষের জমী ছাড়িবে না। তাহাদিগকে টাকা ও অন্ত্র জমী দিবার অঙ্গীকার করাতেও তাহারা রাজী নহে। তাহারা আগে একবার সত্যাগ্রহ করিয়া যেখানে যেখানে বাধ দিবার জন্য ভিৎ ঝোঁড়া হইতেছিল, সেখানে শুইয়া থাকিত। আবার সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। তাহাদের পুরুষ-নারী-শিশু সকলকে প্রহারাদি নির্দয়ভাবে চলিতেছে।

লাভের আশায় নিষ্ঠুরতা ও মাছুষ ক্লেপান ভাল নয়। হইতে পারে, যে, মাবলাবা অবুঝ; কিন্তু অবুঝ লোকদেরও পৈত্রিক সম্পত্তি জোর করিয়া কিনিবার ধৰ্মসঙ্গত অধিকার কোন ব্যক্তির বা কোম্পানীর নাই।

প্রবাসীর বৰ্ত্তমান সংখ্যা ১৬০ পৃষ্ঠা পরিমিত। বৈশাখ-সংখ্যায় ছবির ফর্ম্বা বাদে ১৫৪ এবং ছবির ফর্ম্বা সমেত ১৬২ পৃষ্ঠা ছিল।



“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

২২শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩২৯

৩য় সংখ্যা

বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতবাসীর স্থান নির্ণয়

অনেক সময় অজ্ঞতাজনিত গবিমাবশতঃ আমাদের প্রকৃত অবস্থা আমবা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না; মাছুষের ইহা একপ্রকার দুর্বলতা যে সে নিজের দোষ বা ত্রুটি নিজে সহজে দেখিতে পায় না বা দেখিবাব চেষ্টা কবে না; এমন কি দেখিতে পাইলেও তাহা কৃত্রিম আবরণে ঢাকিয়া রাখিতে সচেষ্ট হয়। অনেক স্থলে দেখা যায় যে এই স্বাভাবিক দুর্বলতাই তাহার অবনতির একমাত্র কাবণ হইয়া দাঁড়ায়। যে নিজেকে বড় মনে করিয়া অহঙ্কারে ক্ষীণ হয়, সে কখনও বড় হইতে পারে না। পাশ্চাত্য জগতের অবস্থার সহিত আমাদের বর্তমান অবস্থার তুলনা করিলে এই বিষয়টি সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়।

রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন বলিয়া, আমরা মনে করি, বাঙ্গালা সাহিত্য পাশ্চাত্য জগতের যে-কোন প্রাদেশিক সাহিত্যের সমকক্ষ। বিষয়টি তলাইয়া দেখিলে, ইহা যে কত বড় ভ্রান্তি, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যে জগতের মধ্যে একজন প্রতিভাশালী লেখক সে বিষয়ে কোনও প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না। তাই

বলিয়া বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডার যে ইংরেজী কিম্বা ফরাসী সাহিত্য-ভাণ্ডারের শ্রাঘ বিপুল রত্নরাজিতে পবিপূর্ণ ইহা কি কখনও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে? বাংলাদেশে প্রতিবৎসব যে-সব সুপাঠ্য কাব্য ও পুস্তগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় তাহা ইংলণ্ড কিম্বা ফরাসী দেশের শতাংশেরও একাংশ কি না সন্দেহ, বিশেষতঃ বাংলাদেশের সাধারণ পাঠকের সংখ্যাও ঐ-সমস্ত দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম।

সেইরূপ পদার্থবিজ্ঞানের বা বসাবন-শাস্ত্রের চর্চায় ও গবেষণায় আমাদের দেশে মাত্র দুই-চারিজন একনিষ্ঠ সাধকের নাম কবা যাইতে পারে, যাহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছেন। তাই বলিয়া এই কথা বলা যায় না যে, বৈজ্ঞানিক জগতে ভাবতবর্ষ পাশ্চাত্য প্রদেশ-সমূহের সহিত সমান স্থান অধিকার করিয়াছে। ক্ষুদ্র একটি ইংলণ্ডে যত লোক বিজ্ঞানের অন্বেষণ করিতেছে, এই প্রকাণ্ড ভারতবর্ষে তাহার সহস্রাংশের একাংশ লোকও বিজ্ঞান-চর্চায় নিযুক্ত আছে কি না সন্দেহ! এমন কি ক্ষুদ্র জাপানের সমকক্ষ হইতেও আমাদের

অনেক সাধনা করিতে হইবে। এর পর ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও শিল্পবিজ্ঞানের তো কথাই নাই। যদি ইংলণ্ডের জার্মানীর কিংবা আমেরিকার রাসায়নিক পরিষদের মাসিক-পত্রের মুখপত্র খোলা হয়, এবং তাহাব বর্ণামূল্যমূলক সূচিপত্র দেখা যায়, তাহা হইলে সকলেই দেখিবেন পাশ্চাত্য দেশ-সমূহে ও আমেরিকায় মাত্র এক মাসের মধ্যেই কত শত-শত রাসায়নিক আবিষ্কার ঘটিতেছে এবং কত শত-সহস্র বিজ্ঞানী বিভিন্ন রসায়নাগারে অক্লান্ত পরিশ্রমে, চির-নূতন উৎসাহে, অনন্তমুখা হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় ধ্যানী বোগীর জায় নিবিষ্ট হইয়া আছেন। ইংলণ্ডের গত জাহুয়ারী মাসের রাসায়নিক পরিষদের মাসিক-পত্র (Journal) খুলিয়া গণনা করিলে দেখা যাইবে তাহাতে প্রায় ৪৫০টি নূতন তথ্য আবিষ্কারের প্রবন্ধ বহিয়াছে এবং ঐ মাসে ৭৫০জন রাসায়নিক ঐ সংখ্যায় তাঁহাদের অল্পসঙ্খ্যানেব খবর দিয়াছেন। ইহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে আমরা কোথায় পড়িয়া আছি? কবির জায় হুঃখের পীড়নে শুধু বলিয়া উঠিতে ইচ্ছা হইবে, “তুমি যে তিমিবে, তুমি সে তিমিরে।”

বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বিজ্ঞানমূলক সভ্যতা বলিলেও অত্যুক্তি হু না। এই সভ্যতার মূলমন্ত্র হইতেছে, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত অনন্তশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার পূর্বক তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া মানুষের সুখ ও সচ্ছোগে নিযুক্ত করা। ত্যাগের পন্থা অবশ্য আধ্যাত্মিক হিসাবে উচ্চ পন্থা সন্দেহ নাই; কিন্তু ভোগের ক্ষমতাব অভাবে যে ত্যাগ, সে ত্যাগকে তো সাত্ত্বিক ত্যাগ বলা যাইতে পারে না, কিংবা আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা এই-সব বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পবিত্র জ্ঞাত ছিলেন, এই বলিয়া কথার আবরণে আমাদের বর্তমান দৈন্তের লজ্জা নিবারণ করিলেও তো কোন ফললাভের আশা নাই। বর্তমান সভ্যজগতের সমকক্ষ হইতে হইলে আমাদের পক্ষেও তাহাদের মত সাধনা করিয়া শক্তি ও ক্ষমতা অর্জন করিতে হইবে, নতুবা ঐ বিপুল শক্তির প্রচণ্ড সংঘর্ষে আমরা যে অতলে ডুবিয়া যাইব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের আত্ম-

প্রবঞ্চনা করিবাব সম্বন্ধ অতীত হইয়াছে, আমাদের গকে জ্ঞান হিসাবে বাচিয়া থাকিতে হইলে পাশ্চাত্য জ্ঞান-সমূহের জায় আমাদের গকেও একনিষ্ঠ ভাবে বিজ্ঞানের অল্পসংবরণ কবিতে হইবে। কি বিপুল সাধনা ও শক্তি নিয়োগ করিয়া পাশ্চাত্য জগৎ শিল্প ও বিজ্ঞানে ক্রান্ত উন্নতি লাভ কবিতেছে, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে অনেক সময়ে বিশ্বাসে অভিভূত হইতে হয়। কি বিপুল উদ্যোগ ও আয়োজন পূর্বক তাহারা বিজ্ঞানের সাহায্যে নানাবিধ শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতেছে, তাহা আমাদের কল্পনার অতীত। কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি বেশ পরিষ্কার হইবে।

বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের জয়-পরাজয় শুধু সামরিক বিক্রম কৌশল ও একনিষ্ঠতার উপর নির্ভর করে নাই; বরঞ্চ উহাতে বিজ্ঞানের, বিশেষতঃ রসায়ন বিজ্ঞানের ব্যবহারই বিশেষ কার্যকারী হইয়াছিল। পাঠক-পাঠিকাগণ হৃদয় সংবাদপত্রে পড়িয়া থাকিবেন, যে, জার্মান গভর্নমেন্ট যুদ্ধের অনেক বৎসর পূর্ব হইতেই তাঁহাদের ষাণ্ঠীয় রাসায়নিক কারখানা-সমূহে যুদ্ধের আবশ্যকীয় নানা গোলাগুলি, বারুদ ও অস্ত্রাদি ভীষণ বিস্ফোরক পদার্থ ও বিষাক্ত দ্রব্যাদি এবং ঔষধ প্রভৃতি প্রস্তুতের রত ছিলেন, এই কারণে মহাযুদ্ধের প্রথম ভাগে জার্মান সৈন্যের বিজয়িনী শক্তির মুখে যুদ্ধ-শক্তিকে হটিয়া আসিতে হইয়াছিল। জার্মান সৈন্তেরা যে কত প্রকার বিষাক্ত বায়ু, তরল ও কঠিন পদার্থ বিপক্ষ সৈন্তের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিল তাহা ষাঁহারা রীতিমত যুদ্ধের বিবরণাদি পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের অবদিত নাই। ইহার প্রতিবিধান-কল্পে যুদ্ধ-শক্তির আওতা আপনাপন রাসায়নিক কারখানা-সমূহে ও রসায়নাগারে শত-সহস্র বিশেষজ্ঞ রসায়নবিদকে যুদ্ধের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই কার্যে যুদ্ধ-শক্তির এতই উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন যে এমন কি জার্মানীকেও নতজাহু হইয়া তাঁহাদের নিকট অচিবে সন্ধি প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। ফলে এই নৃশংস ও বীভৎস হত্যা-কাণ্ডের বিপুল আয়োজনের মধ্য হইতে কত নব নব অত্যাশ্চর্য্যকর রাসায়নিক আবিষ্কার ও নূতন শিল্পের

প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহার বিবরণ দিতে হইলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে, এবং কি পরিমাণ অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পবিত্রম সহকাৰে অপৰ্যাপ্ত-পরিমাণে নানাবিধ যুদ্ধের সরঞ্জাম তাঁহাদিগকে প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল তাহা কয়েকটি মাত্র উদাহরণের দ্বারা পরিস্ফুট হইবে। ইংলণ্ডে প্রতি সপ্তাহে ১৫০০ টন (এক টন = ২৮ মণ) Trinitrotoluene (ট্রিনিট্রোটোলুয়েন), ৩০০ টন Picric acid (পিক্রিক এসিড), ৩০০০ টন Ammonium nitrate (এমোনিয়াম নাইট্রেট) এবং ২০০০ টন Cordite (কর্ডাইট) প্রস্তুত হইত। এই-সমস্ত বিফোরক পদার্থ প্রস্তুতের জন্ত প্রতি সপ্তাহে নিম্নলিখিত দ্রব্য-সমূহের আবশ্যক হইত; ৬০০০ টন Pyrites (পাইরাইটস্), ২৭০০ টন Sulphur (সাল্ফার বা গন্ধক), ৮৩০০ টন Chili Saltpetre (চিলিসল্টপিটার), ৭২০ টন Toluene (টোলুয়েন, ৬০০,০০০ টন কয়লা হইতে প্রস্তুত), ১৬২ টন Phenol (ফেনোল;—কার্বলিক এসিড্ যাহা ১,০০০,০০০ টন কয়লা হইতে উৎপন্ন হয়—বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত), ৭০০ টন Ammonia (এমোনিয়া; ২৫০,০০০ টন কয়লা হইতে), ৩৭৪ টন Glycerine (গ্লিসেরিন্, ২৭০০ টন চর্বি হইতে), ৭০০ টন Cotton Cellulose (কটন সেলুলোজ্, ১০৬০ টন আবর্জনা হইতে) এবং ১২০০ টন Alcohol ও Ether (এ্যালকহল ও ঈথর; ৪২০০ টন শস্ত হইতে)।

আরও কয়েকটি বর্তমান যুগের আশ্চর্য্যকর রাসায়নিক আবিষ্কারের কথা এখানে বলিব, এই-সমস্ত নূতন আবিষ্কার শিল্প-জগতে এমন অদ্ভুত পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে যে মানুষ এখন আর পূর্বের মতন প্রকৃতির উপর তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনের জন্ত একান্ত নির্ভরশীল নহে। যেখানে প্রকৃতি বিরূপ, সেখানে মানুষ তাহার শক্তি-প্রভাবে প্রকৃতির নিকট হইতে তাহার আবশ্যকীয় কাঙ্ক্ষার করিয়া আদায় করিতেছে।

রক্তমাংস গঠনের ও উদ্ভিদ-দেহের একটি প্রধান সারবান উপাদান হইতেছে নাইট্রোজেন। মানুষ ও জীব-জন্তু এই নাইট্রোজেনটি উদ্ভিজ্জ-খাদ্য হইতে গ্রহণ করে, উদ্ভিদ পুনরায় ইহা প্রধানতঃ মাটি হইতে সাবরূপে গ্রহণ

করে। সত্য বটে নাইট্রোজেন আমাদের বায়ুমণ্ডলের একটি প্রধান উপাদান। কিন্তু মানুষ ও জীবজন্তু তাহাদের শরীর-পোষণের জন্ত ইহা বায়ু হইতে সোজা-স্বজি বা সাক্ষাৎ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। উদ্ভিদেও বেশীর ভাগ তাহাদের এই খাদ্য মৃত্তিকা-মিশ্রিত সার হইতে গ্রহণ কবে। সোরা, সোডিয়াম নাইট্রেট ও এমোনিয়া-ঘটিত লবণ, এই কয়টি সারই সাধারণতঃ মৃত্তিকায় বর্তমান থাকে এবং উদ্ভিদের জীবন ও পরিপুষ্টি ইহাদের উপর নির্ভর কবে। একই জমির উপর বারংবার কৃষিকার্য্যেব দ্রুপ এই প্রকৃতিগত মৃত্তিকাব সারের ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, এই হ্রাস পবিপূরণের জন্ত মাটিতে কৃত্রিম সার দেওয়ার প্রথা সর্বদেশে প্রচলিত আছে। চিলিদেশ-জাত সোডিয়াম নাইট্রেট ও কয়লা হইতে প্রস্তুত এমোনিয়া-ঘটিত লবণ—এই দুইই বহুকাল হইতে কৃত্রিম সাররূপে সর্বদেশে ব্যবহৃত হইতেছে। চিলির সমুদ্রতীরে অপৰ্যাপ্ত পরিমাণে এই সোডিয়াম নাইট্রেটের স্তর পড়িয়া আছে। ক্রমশঃ পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু ও বর্তমান সভ্যযুগে বিলাস-ভোগের বৃদ্ধির জন্ত খাদ্যদ্রব্যের অভাব বাড়িয়া উঠিতেছে, সুতরাং অধিক পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনের জন্ত সোডিয়াম নাইট্রেট ও এমোনিয়া-ঘটিত লবণ রূপ কৃত্রিম সারের ব্যবহার ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে। দেখা গিয়াছে, জমিতে রীতিমত সার দিয়া তাহার উৎপাদিকা শক্তি দ্বিগুণ বা তিনগুণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। নিম্নের দৃষ্টান্ত হইতে ইহা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাইবে।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে চিলি হইতে মাত্র ৩৩৫ টন নাইট্রেট রপ্তানি হইয়াছিল, ১৯১২ সালে ২,৪৭৮,০০০ টন রপ্তানি হইয়াছে। সুতরাং চিলির লবণস্তরে অপৰ্যাপ্ত নাইট্রেট থাকিলেও উহা অসীম নহে, এবং যে হারে এই নাইট্রেটের ব্যবহার বৎসর বৎসর বাড়িয়া চলিতেছে তাহাতে বিশেষজ্ঞদের হিসাব-মতে আগামী ২০ কিম্বা ২৫ বৎসরের মধ্যে চিলিস্তর নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

কয়লা হইতে উৎপন্ন এমোনিয়া-ঘটিত লবণের পরিমাণ বড় অধিক নহে। ১৯১০ সালে পৃথিবীতে সর্ব-সমেত ১,১০,০০০ টন মাত্র এমোনিয়া ও এমোনিয়া-

ঘটিত লবণ প্রস্তুত হইয়াছে, এবং এই সভ্যতার যুগে কয়লার ক্ষয় ধীরে ধীরে ক্রমশঃই বাড়িতেছে তাহাতে ধবিজীর কয়লার ভাণ্ডারও নিঃশেষ হইতে বেশী দেরী হইবে না বলিয়া মনে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে, যদি বিশ বৎসর পবে চিল্লির লবণস্তর নিঃশেষ হইয়া যায় তবে পৃথিবীর যে সে কি দুর্দিন উপস্থিত হইবে তাহা বর্ণনা করা যায় না। সারের অভাবে খাদ্যেব উৎপত্তি কমিয়া যাইবে, দেশে দেশে খাওয়ার অভাব ও ভীষণ সর্বগ্রামী হুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে। কিছু পূর্ব হইতেই বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ ইহা ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন এবং উহার প্রতীকার সাধন কল্পে গত ২০২৫ বৎসর হইতে তাঁহারা বিশেষ পরিশ্রম করিতেছেন। ইতিমধ্যেই এই অক্লান্ত পকিষ্মেব আশ্চর্য সফল ফলিয়াছে। তাঁহারা দেখিলেন, আমাদের বায়ু-মণ্ডল নাইট্রোজেনের এক অকুরস্ত ভাণ্ডার; বায়ুমণ্ডলে শতকরা ৭৭ ভাগ নাইট্রোজেন ও ২১ ভাগ পরিমাণ অক্সিজেন আছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে বায়ুমণ্ডলে প্রায় ৪,০০০,০০০,০০০,০০০ টন নাইট্রোজেন আছে, অর্থাৎ পৃথিবীর প্রত্যেক বর্গমাইলের উপরস্থ বায়ুতে ২০,০০০,০০০ টন নাইট্রোজেন বর্তমান। বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের অক্লান্ত ও বহু-বৎসর-ব্যাপী চেষ্টায় বায়ুমণ্ডলের এই নাইট্রোজেনকে সারে ও শিল্পে ব্যবহারোপযোগী নাইট্রোজেন-বহুল পদার্থে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই নাইট্রোজেনকে তাঁহারা নাইট্রিক এসিড ও তৎঘটিত লবণে পরিবর্তন করিয়াছেন। নানাবিধ বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুতের জন্ত ও কৃষিকার্যে সারের জন্ত ইহাদের প্রচুর ব্যবহার হইতেছে। এই নাইট্রোজেনকে আবার তাঁহারা এ্যামোনিয়া ও তৎঘটিত লবণেও পরিণত করিয়াছেন। এ্যামোনিয়া-ঘটিত লবণ একটি প্রধান সার ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং ভবিষ্যতে যদি কখনও প্রকৃতিদেবী আমাদের প্রতি বিরূপ হইয়া তাঁহাব খনির ভাণ্ডার বন্ধ করিয়া দেন বা তাহা শূন্য হইয়া পড়ে তখন এই বৈজ্ঞানিকগণের কৃপায় নিব্রাশ্রয়ভাবে আব আমাদের ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া মরিতে হইবে না।

গত ইউরোপীয় যুদ্ধে যখন অববোধেব (Blockade) দরুণ চিল্লি হইতে জার্মানীতে সোডিয়াম নাইট্রেটের রপ্তানী বন্ধ হইয়াছিল তখন জার্মানগণ তাঁহাদের কারখানা-সমূহে কৃত্রিম উপায়ে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন হইতে তাঁহাদের যুদ্ধ-পরিচালনের জন্ত বিস্ফোরক পদার্থ-সমূহেব উপাদান প্রস্তুত করিতেছিলেন। প্রায় ৪ বৎসরের উপর জার্মানগণ অবরোধ সত্ত্বেও যুদ্ধ পরিচালনে সমর্থ হইয়াছিলেন। বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে এ্যামোনিয়া বা নাইট্রিক এসিড ও তৎঘটিত লবণ এত অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে যে বাজারে ঐ-সব জিনিষের মূল্য পূর্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। জার্মানীতে Badische Anilin und Soda Fabrik কোম্পানীর বিরাট বাসাধনিক কারখানা বহিয়াছে। নূতন আবিষ্কার ও অল্পসঙ্কানব জন্ত তাহাদের বিভিন্ন কারখানায় বহুসংখ্যক বিখ্যাত বাসাধনিক অবিরাম নিযুক্ত রহিয়াছেন। এই কোম্পানী এতই ধনশালী ও তাহাদের কারখানা-সমূহ এতই প্রকাণ্ড যে তাহা অল্পমান করিতেও আমরা অসমর্থ।

ইহা বলিলে অত্যাশ্চর্য হয় না যে জার্মানীর উন্নতির ও যুদ্ধের পূর্বকালীন অর্থ-বাহুল্যের মূলীভূত কাবণ হইতেছে তাহার এই বিশাল রাসায়নিক কারখানা-সমূহ।

রঞ্জন-শিল্পের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুতের প্রণালী একমাত্র জার্মান কারখানা-সমূহের নিকট পরিজ্ঞাত। ইহা যুদ্ধের সময়ে সকলেই অল্পবিস্তর অনুভব করিয়াছেন। যুদ্ধের সময় যখন জার্মানদেশীয় দ্রব্যাদির রপ্তানী এক প্রকার বন্ধ করা হইয়াছিল তখন কাপড় রং কবিরার রংএব অভাব, এমন কি লিখিবার কালীর উপাদানেব অভাব পর্যন্ত সকলকেই অনুভব করিতে হইয়াছিল।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাই বর্তমান সভ্যজগতে উন্নতিলাভ কবিতে হইলে, পৃথিবীর অজ্ঞাত সভ্যজাতির সমকক্ষ হইতে হইলে, বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধনা কবিয়া বাবতীয় শিল্পবাণিজ্যেব উন্নতিসাধন ভিন্ন অন্য পথ নাই। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাই জাতিগঠনের এক প্রধান উপাদান, যতদিন পর্যন্ত এই পথে আমরা বিশেষভাবে অগ্রসর হইতে না পারিব, ততদিন আমাদের জাতি বলিয়া পরিচিত হইবার অধিকাব জন্মিবে না।

সত্য বটে, বিজ্ঞানের শক্তিতে বনীবান হইয়া মানুষ পরস্পরের ধ্বংসের জন্য নানাবিধ নূতন নূতন শক্তিশালী উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। গত ইউরোপীয় মহাসমবে বিমান-পোত (উড়ো-জাহাজ) ও বিষাক্ত বায়ু প্রভৃতির ব্যবহারেই ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাসায়নিকগণ এই-সমস্ত বিষাক্ত বায়ু প্রভৃতির প্রস্তুত-প্রণালীর অমূল্যফল ফলে Lewsite (লিউসাইট) নামক এমন একটি বিষাক্ত বায়ুর অবিকার করিয়াছেন যে তাহা যদি উপর হইতে উড়ো-জাহাজের সাহায্যে নিম্নে পৃথিবীর লোকের উপর বর্ষণ করা হয় তাহা হইলে বড় বড় সহবস্তুসমূহ তাহাদের যাবতীয় অধিবাসী সহ সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ভাবিলে সকলেরই আতঙ্ক উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিজ্ঞানের এই সংহার-শক্তিকে মানুষের ধ্বংসে নিযুক্ত না কবিয়া বিশেষ হিতকর কার্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। যেমন ডিনামাইটের সাহায্যে লোকধ্বংস না করিয়া পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি ভাঙিয়া মানুষের গতি-বিধির জন্য রাস্তা ও বেল-লাইন ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে।

ক্রোরোকরম নামক পদার্থটি বেদনাহীন অস্ত্র-প্রয়োগের জন্য চিকিৎসা-কার্যে যে কিপ্রকার ব্যবহৃত হইতেছে তাহা কাহারও অবদিত নহে। অনেকদিনের আগেকার কথা মনে পড়ে যখন আমাদেরই এই মেডিকেল কলেজে ইজিতমাত্রেরই যমদূতের মত কয়জন ডোম, রোগীকে জোর-জবরদস্তি করিয়া চাপিয়া ধরিত এবং ডাক্তার তাহাব শানিত করাত দিয়া হাত কাটিয়া অঙ্গচ্ছেদ করিতেন, রোগী তখন অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতে থাকিত। বর্তমানে ক্রোরোকরমের রূপায যে কোন কঠোর ও নিদারুণ অস্ত্রচিকিৎসা বিনা কষ্ট ও সহজে সম্পাদিত হইতেছে। বোগী এমন অচেতন হইয়া থাকে যে সে জানিতেও পারে না, যে, কখন তাহাব অঙ্গচ্ছেদ করা হইয়াছে। চোখের অস্ত্র-চিকিৎসায় ও দাঁত উৎপাটন ব্যাপারে “কোকেন” নামক জিনিষটিও সেইরূপ যুগান্তর আনয়ন কবিয়াছে। এখানে আরও কয়েকটি বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত রোগের ঔষধ উল্লেখযোগ্য মনে করি। ইহাদের

আবিষ্কারে মানবজাতির যে কি পরিমাণ কষ্টের লাভ হইয়াছে ও মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস হইয়াছে তাহা সকলেই অল্প-বিস্তর অবগত আছেন। “স্ট্রালভার্ন” নামক অব্যর্থ ঔষধটির বিষয় অনেকেই শুনিয়াছেন, ইহা injection বা সূচীবদ্ধ করিয়া শরীরের অভ্যন্তরে প্রয়োগ করান হয়; ইহা যে কত দ্রুতের দ্রুত জীবনকে শাস্তিময় করিয়াছে তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। ইহা ব্যতীত ম্যালেরিয়ায় কুইনাইন, ডিপথেরিয়ায় এন্টি-ডিপথেরিক সীরাম, আমাশয়ে এমেটিন ইত্যাদি আরও অনেক মহৌষধের নাম করা যাইতে পারে, যাহাব আবিষ্কারে মানবজাতিব প্রভুত কল্যাণ ও হিতসাধন হইয়াছে। বর্তমানযুগে অস্ত্রচিকিৎসার দ্রুত ও অদ্ভুত উন্নতিও বিজ্ঞানের কল্যাণশক্তির একটি প্রধান উদাহরণ। কত অল্প ব্যক্তি চোখের (কোটারাক্ট অপারেশনের) ছানি কাটাইবার পর পুনরায় কার্যকরী দৃষ্টিশক্তি লাভ করিতেছে। তত্পরি বর্তমানে যে কারণেই হউক বালক যুবক ও বৃদ্ধ সবাই ক্ষীণদৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছেন, চশ্মার অভাবে তাহাদের যে কি দুর্দশা ঘটিত তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বোধ হয়, অন্ততঃ শতকরা ৩০জন শিক্ষিত ব্যক্তিকে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়া গৃহে বসিয়া থাকিতে হইত!

অত্ৰদিকে এই বিজ্ঞানের চর্চাই আবার মানুষকে তাহার নানাবিধ স্বধসন্তোগের সামগ্রী জোগাইতেছে। কমলা হইতে সজ্জাত আলকাংরা নামক কাল দুর্গন্ধ পদার্থটি হইতে এমন-সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে, যাহা দ্বারা বিচিত্র বর্ণের রং, নানাবিধ মহৌষধ, ফুল ও ফলের কৃত্রিম গন্ধ ও বহুবিধ বিস্ফোরক পদার্থের সৃষ্টি হইতেছে। এই-সমস্ত জিনিষ জগতের বাজারে বিজ্ঞানের, বিশেষতঃ রসায়নের বিজয়-বার্তা প্রচার করিতেছে। নানাবিধ বিষাক্ত জিনিষ চিকিৎসা-কার্যে বিশেষ বিশেষ বোগের প্রধান ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। তবে মানুষ যখন স্ববুদ্ধি হারাইয়া ফেলে তখন ভাল জিনিষেরও প্রায় অপব্যবহার ঘটিয়া থাকে।

আরও-একটি বিষয় এখানে বলা আবশ্যিক মনে করি। অনেক বিবেচক পণ্ডিতেরা মনে করেন যে

ওয়াশিংটনে যতই বড় বড় শক্তিপুঞ্জের দরবার বহুক না কেন, প্যারিস লগুন কিম্বা ভিনিসে যতই লীগ অব নেশনসের অধিবেশন হউক না কেন, যুদ্ধ ব্যাপারটি পৃথিবী হইতে কিছুতেই লোপ পাইবার নহে। হইতে পারে, বর্তমান গোলাগুলি দুর্গ ও বড় বড় জাহাজের সংখ্যা, যাহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, প্রত্যেক জাতির মধ্যে কমিষা যাইবে; কিন্তু তাহার পরিবর্তে যে আরও অধিক শক্তিশালী নূতন নূতন যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতেছে বা সমন্বিত প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা চিন্তা করিলে মনে হয়, যে, যুদ্ধ-লোপের এই যে আয়োজন আড়ম্বর ইহা শুধু ফাঁকা আওয়াজ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যুদ্ধের এই নূতন সরঞ্জামের মধ্যে বিষাক্ত বায়ু ও তরল পদার্থ একটি প্রধান জিনিস। বর্তমানে আমেরিকায় এই বিষয়ে বিশেষ গবেষণা চলিতেছে। তাহাদের প্রস্তুত লিউসাইট বায়ু বেকিরূপ শক্তিশালী তাহার আভাষ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। গত যুদ্ধের প্রথমভাগে আমেরিকায় কোন বিষাক্ত রাসায়নিক যুদ্ধ-সামগ্রী প্রস্তুতের কারখানা বা আরোজন ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বোম্বার অতি অল্পদিনের মধ্যে যাবতীয় আমেরিকান রাসায়নিকগণকে (প্রায় সংখ্যায় ১২০০) দলবদ্ধ করিয়া বিষাক্ত বায়ু প্রস্তুতের জন্য আয়োজন করা হয়। কিরূপ দ্রুতভাবে তাঁহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া মনে হয় এই অদ্ভুত কার্য-কুশলতাই এই জাতির জয়লাভের কারণ, এবং এখনও এই বিষয়ে তাঁহারা যে নূতন নূতন গবেষণা করিতেছেন লিউসাইটের আবিষ্কারই তাহার প্রধান প্রমাণ। ভবিষ্যতে যুদ্ধ পরিচালনের ভার ও জাতির ভাগ্য-নির্ণয় যে একমাত্র রাসায়নিকগণের হাতেই ছুঁত হইবে, ইহা বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। স্তত্রাং রাসায়ন শাস্ত্রের বিশেষভাবে চর্চা করা শুধু জাতীয় ধনবৃদ্ধির হিসাবে যে একমাত্র প্রয়োজন তাহা নহে, জাতির অস্তিত্ব-সংরক্ষণেও ইহা প্রধান অঙ্গধরূপ

হইবে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে রাসায়ন-বিজ্ঞান চর্চা এখনও পর্যাপ্ত বিশেষভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই, এবং গভর্নমেন্টও দেশের রক্ষার জন্য রাসায়ন-শাস্ত্র-শিক্ষার ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রচলিত করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রায় উদাসীন। এমন কি যে কয়েকটি যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুতের রাসায়নিক কারখানা ভারতবর্ষে স্থাপিত হইয়াছে তাহাতেও ভারতবাসীর প্রবেশের দ্বার প্রায় একপ্রকার রুদ্ধ। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিতে হইলে ভবিষ্যতে রাসায়নিকগণের সাহায্যই যে প্রধান অবলম্বন হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

অনেকের মতে আবার, এই বিষাক্ত বায়ুরূপ রাসায়নিক দ্রব্যাদির সাহায্যে যে যুদ্ধ হইবে, তাহাতে হতাহতের সংখ্যা অনেক কমিষা যাইবে, স্তত্রাং যুদ্ধের নৃশংসতা ও বিধীষিকাও কমিষা যাইবে; কারণ বিষাক্ত বায়ুর সাহায্যে বিপক্ষীয় সৈন্যদলকে কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত ও জ্ঞানহীন করিয়া রাখা যাইবে মাত্র, তাহাতে তাহাদের কোন স্থায়ী অঙ্গহানি বা প্রাণহানির সম্ভাবনা কম। ইহা অমানুষিক হইলেও বর্তমান গোলাগুলিরূপ পাশবিক প্রথা হইতে শ্রেয়তর হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে,—জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া আমরা জাতিসংগঠন কার্যে কিছুতেই ফললাভ করিতে পারিব না। চারিদিকের শক্তি-মূলক সভ্যতার আগরণের মধ্যে আমরা কি নিষ্ক্রিয় হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারিব—না ঐ শক্তির কঠোর পেয়ণে লুপ্ত হইয়া যাইব? শক্তিহীন দুর্বল জাতিকে কে কবে সম্মানের চক্ষে দেখিষা থাকে? আজ যদি ভারতবাসী জ্ঞান-বিজ্ঞানে বলীয়ান হইয়া জগতের নিকট পরিচিত হইতে পারিত, তাহা হইলে আজ এই হীনতা বৈদ্য তাহাকে বহন করিতে হইত না, পৃথিবীর সমগ্র সভ্যজাতি আমাদের জাতীয় সম্মিলনে সম্মানে আহ্বান করিত।

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রী প্রিয়দারঞ্জন রায়

ধর্মপূজা

(ধর্মতত্ত্ব)

গতবারকাব প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করে, দেখিয়েছি যে বৌদ্ধমতেব সঙ্গে ধর্ম-সম্প্রদায়েব মতের কতকটা মিল আছে। ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে ধর্মপূজাব উপর মহাধানের প্রভাব আবও স্পষ্টতর হবে। মোটামুটি বলতে পাৰা যায যে প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম বা হীনযানেব সহিত মহাধানের মতের পার্থক্য হচ্ছে দৈশ্বরবাদ নিয়ে। মহাধানের মধ্যে আন্তিকতাই হচ্ছে পূর্বের মতের থেকে বড় রকমের প্রভেদ। ধর্মপূজায় আমবা পূবাপূবি আন্তিকতাই পাই। দেবতার নাম শূন্যমূর্তি, নিরঞ্জন ও ধর্ম। নিরঞ্জন হচ্ছেন হিন্দুদের পবত্রঙ্গ; ধর্ম হচ্ছেন ব্রহ্মা; একটি অব্যক্তি, অন্যটি ব্যক্তি। “ধর্মপূজা-বিধান” গ্রন্থে যে নিরঞ্জন ও ধর্মের পৃথক স্ততি আছে, তার মধ্যে একটাতে শূন্যমূর্তি ও নিবাকার পবমেশ্বরের উৎকৃষ্ট বর্ণনা পাই, নিম্নে তাব খানিকটা উদ্ধৃত কবে’ দিলাম—

ঐ ন স্থানং ন মানং ন চবর্ণাবিলম্বং
বেধং ন রূপং ন চ ধাতুবর্ণং ।
দৃষ্টা ন দৃষ্টিঃ প্রজ্ঞা ন প্রজ্ঞতি
স্তম্ভৈ নমস্তে নিবঞ্জনায় ১৩৫॥
ঐ ন বেতং ন পীতং ন বস্ত্রং ন বেতসং
ন হেমং স্বৰূপং ন বর্ণ-কর্ণং ।
ন চন্দ্রার্ক-বহ্নি উদয়ং ন অন্তঃ
তস্মৈ নমস্তেহস্ত নিবঞ্জনায় ১৩৬॥

ইত্যাদি ৪৪ শ্লোক পর্যন্ত সকলকে পড়তে অনুরোধ কবি। সমস্ত নেতি নেতি করে’ যা থাকে সেইটাই শূন্য নিরঞ্জন। যার অন্ত আদি মধ্য নেই,—যার কর চরণ কায শব্দ নেই,—যাব আকার আদিরূপ নেই,—যাব ভয় মবণ জয় নেই, ইত্যাদি রূপ হচ্ছে শূন্যমূর্তি। সেই শূন্য-মূর্তি নিবঞ্জনের ধ্যানমন্ত্র শূন্যপুরাণ ও ধর্মপূজাবিধানে আছে (পৃ: ৮২)। নিরঞ্জন ও ধর্মের ধ্যান ও মন্ত্র পৃথক ছিল; তার কারণ, নিরঞ্জন ছিলেন ভাব-রূপ, আর ধর্ম হচ্ছেন সাকার-মূর্তি। ‘দ্বার-ভেটে’র সময়ে পণ্ডিতদের কতকগুলি প্রশ্নের জবাব দিতে হতো। প্রশ্ন হচ্ছে—

বাড়ি কোথা পণ্ডিতের কোন দেব ভজ ।
কন্ মূর্তি ধ্যান কর কন্ দেবে পূজ ॥
কন্ মুখে পূজা কর কন্ বেদ পড় ।
সিদ্ধপতি কহিল্যাম চতুর্বাণি ছাড় ॥
কোথা পালে তাহু বালা কেবা দিল করে ।
কিরূপে জপিল তামা কহনা আমাবে ॥

প্রত্যুত্তর।—

বাড়ি মোব বনুকাব ।
পূজি ঐনৈরাকাব ॥
মুখ মূর্তি ধ্যান কবি ।
সাকার মূর্তি ভজি ॥
পূর্ব মুখে পূজা পঞ্চম বেদ পড়ি ।
সিদ্ধপতি কহিলাও চাতুরালি ছাড়ি ॥
বিশ্বকর্মা এই তাহু করিলা নির্দান ।
এ কথা কহিলাও আমি তব বিজ্ঞমান ॥ (১৩৫ পৃষ্ঠা)

এখানে স্পষ্টই রয়েছে, ‘শূন্যমূর্তি ধ্যান করি’, কিন্তু ‘সাকারমূর্তি ভজি’। তবে কি ধর্ম-পূজকদের কোন-প্রকার মূর্তি ছিল? বর্তমানে কোনো মূর্তি আছে বলে’ আমাদের জানা নেই। বীরভূম-বাঁকুড়াতে প্রতীক মাত্র ব্যবহৃত হয়। শূন্যপুরাণে কোনো মূর্তির রূপ পরিকল্পিত না থাকলেও, প্রতীক (symbol) যে ব্যবহৃত হতো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ধর্মপূজা-বিধানে ধর্মের বে ধ্যান-মন্ত্র আছে নিরঞ্জনের ধ্যান-মন্ত্রের সঙ্গে তার তুলনা হ’তে পারে না। ধর্মের ধ্যান—

ধবলকারিণং দেবং ধবলসিংহাসনে স্থিতং ।
উল্লুকবাহনং ধর্মসিংহমাবাহয়াম্যহং । (পৃ: ৪)

মাণিক গাঙ্গুলি তাঁর ধর্মমন্ত্রে নিরঞ্জন ও ধর্মের পৃথক বন্দনা করেছেন। ধর্মের বন্দনায় তিনি লিখেছেন—

উল্লুকবাহনং ধর্মং কামিন্দ্রা সহিত শিবং ।
ধৌতকুন্দলুধবলকাবং ধ্যাম্যেধর্মং নমাম্যহং ॥ (পৃ: ৪)

ধর্মপূজাবিধানে উপরিউক্ত শ্লোকের অনুরূপ একটি শ্লোক আছে (পৃ: ৭৭)। নিম্নে আর-একটি শ্লোক উক্ত গ্রন্থ থেকে পুনরায় উদ্ধৃত করছি; সেটি থেকে আরও স্পষ্ট বোধ হচ্ছে যে ধর্মের মূর্তি ছিল। শ্লোকটি ধর্মের নমস্কার।

ধৌতবর্ণং ধৌতমালাং ধৌতযজ্ঞোপবীতকং
ধৌতাসনং ধৌতকপাং নিরঞ্জন নমোস্তে । (পৃ: ৮৭)

মাণিক গাঙ্গুলি যে বর্ণনা দিবেছেন সেটিকে রূপক ভাবে নেওয়া হবে, না বর্ণে বর্ণে নেওয়া হবে, সেটা ভাববার বিষয়। তিনি লিখেছেন—

ধবল অঙ্গের জ্যোতি ধবল বর্ণের যুতি
ধ্যানপমা ধবল ভূষণ।

ধবল চন্দন গাথ ধবল পাছকা পাথ
ধবল বরণ সিংহাসন।

ধবল বর্ণের ফেঁটা ধবল উজ্জল জটা
ধবল বর্ণের চাঁদমালা।

ধবল চাঁদ্রা ঋতি ধবল নিধান পাতি
ধবল বরণে ধব আলা। ৪, ম ; ৫, ১৭-২২

ধর্মপূজাবিধানে আরও একটু স্পষ্ট করে' বলা হয়েছে; সেখানে ধর্মকে ষেতবজ্ঞোপবীতধারী চতুর্ভুজ পদ্মনেত্র মহাবাহু মহাবল আজ্ঞাচুলধিত-মালা-শোভিত কপূরশ্রদ্ধাধরধর ইত্যাদি বিশেষণ-যুক্ত করা হয়েছে (পৃ: ৮৭, ৯১)। এ-সব বিশেষণ নিতান্ত অবাস্তব বলে' মনে কবে' নেবার হেতু নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ধর্মের মূর্তি যদি এককালে পূজিত হয়েই থাকবে ত তা বর্তমানে দেখা যায় না কেন? বর্তমানে যা আছে সেটি হচ্ছে পাথর পূজা;—সেই পাথর হচ্ছে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে স্তুপের বিকৃত রূপ। সেটি লৌকিক ব্যবহারে কচ্ছপ নামেই পরিচিত; ধর্মের আর-এক নাম কচ্ছপবাহন। আমাদের প্রাণের উত্তর নিয়ে দিবার চেষ্টা করবো।

ধর্মপূজাকে এখন আমরা হিন্দুধর্মের মধ্যেই দেখছি; কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন দুই ধর্মের মধ্যে বেশ বিরোধ ছিল, এবং 'ভদ্রলোক' বা উচ্চবর্ণের কোনো লোক সাহস করে' ধর্মের গান গাইতে সাহস পেতো না। মাণিক গাঙ্গুলি ত স্পষ্টই বলেছেন—

জাতি ঘাষ তবে প্রভু যদি কবি গান।

অতিবাৎ অধ্যাতি হবক দেশে দেশে।

হৃপঙ্কের সম্ভাষ বিপক্ষ পাছে হাঁসে। পৃ: ৯

এখানে বেশ দেখা যাচ্ছে স্বপক্ষ বিপক্ষ বলে' দুটা দল, জাতি যাওয়ার ভয় ইত্যাদি রয়েছে। কিন্তু ধর্ম তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে তাঁর কোনো ভয় নেই—ধর্মের আদিকবি ময়ূরভট্টকে তিনি বৈকুণ্ঠে স্থান দিয়েছেন; তা ছাড়া

সপক্ষে বিপক্ষে আসি করিব সমান।

এই মহা-আদর্শ তিনি কবিদেব মনে জাগিয়ে-ছিলেন। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে দিবে যেমন এই হিন্দু-করণ কার্য চলতে লাগলো—ধর্মপূজা-বিধির মধ্যে হিন্দু প্রবেশ কবাবার চেষ্টা তেমনি চললো। শূদ্ধ-পূবাণকে আমরা পুরাণো পূজাবিধি বলে' মানতে পাবি। আর ধর্মপূজা-বিধান হচ্ছে ধর্মপূজাব পূবাপুরি হিন্দু-সংস্করণ। তার রচয়িতা হচ্ছেন জনৈক রঘুনন্দন। রঘুনন্দন হিন্দুদেব স্মৃতিকার বলে' এ পুঁথিকেও তাঁর রচনা বলে' চালাবাব চেষ্টা হয়েছে। ধর্ম-পূজাকে হিন্দু করবার আরও চেষ্টা হয়েছে। রমাই পণ্ডিত সঘঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখবো যে রমাইএর জন্ম উচ্চকূলে নয়; তিনি 'ছত্রিশজাতিকে' ধর্ম বিলান, স্তত্রাং শূদ্ধ বা নীচজাত্যেব প্রতি তাঁর রাগ হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ধর্মপূজাবিধানে রমাই ত নীচজাত্যদের উপর রেগেই খুন! ব্রাহ্মণজাতির গৌরব-বর্দ্ধনই তাঁর উদ্দেশ্য। ধর্মপূজা শূদ্রেবা করত। সেই পূজা ব্রাহ্মণেরা হস্তগত করবার চেষ্টা করেন। সেইজন্য ধর্মপূজাবিধান-বচয়িতা বলেছেন—

মোব নাম কবি শূদ্ধ জত সব ধায়।

পিতৃ মাতৃ স্বপুত্র তাব যোব নবক পায়।

আজ দেখিয়া যেন ধায় অতি হুখে।

চুসিতে চুসিতে যেন আঁটি লাগে বুকে।

তেমন আমার জব্য লোভেতে মরণ।

সবংশে তাহাবে নাগ করি জে নিধন।

যবে যবে দেবতা হল ভক্তি দেখিয়া।

দুই সন্ধ্যা ব্রাহ্মণেব নাগ পাবেক বসিয়া। (৬ পৃষ্ঠা)

আর-এক স্থানে ব্রাহ্মণদের ধর্মপূজা যে অগ্রায় নয়, ব্রাহ্মণ যে বড় জাতি ইত্যাদি প্রমাণ করিতে গিয়ে লেখক লিখেছেন :—

আমার ছায়াবে ষিঙ্গ-ব্রাহ্মণেব মানা নাঞি।

অন্নজল খায়বাইয়া স্বধাহ তাব ঠাঞি।

ব্রাহ্মণ কেবল তম্বু ব্রাহ্মণ ইধব।

ব্রাহ্মণেব ছঃখ হলো কাঁপি থব থব। (৫ পৃষ্ঠা)

ধর্মপূজার মধ্যে ব্রাহ্মণগণ প্রবেশলাভের যথেষ্ট চেষ্টা করেন; এবং সেই চেষ্টারই প্রমাণ ধর্মপূজা-বিধান। ধর্মপূজাবিধানখানির মধ্যে শিব ও সূর্যের প্রতিপত্তি খুব বেশী। অধিকাংশই সংস্কৃতে লেখা। শূদ্ধপুরাণ ছিল খাঁটি বাংলায়; ধর্মপূজা-বিধান তাকে

সংস্কার করে' সংস্কৃত ভাষায় চালাবাব চেষ্ঠা। ব্রাহ্মগণের চেষ্ঠা এইখানে ক্ষান্ত হয় নি; রমাই যে খাঁটি ব্রাহ্ম এ কথা প্রমাণ করবার জন্ত 'যাত্রাসিদ্ধিপদ্ধতি'কার যথাসাধ্য চেষ্ঠা করেছেন। ব্রাহ্মগণ তাঁদের হিন্দুভাব ধর্মের পূজার মধ্যে যথেষ্ট প্রবেশ করিয়েছেন; সেই সময়ই বোধ হয় কোনো প্রকার মূর্তি এর মধ্যে চালাবাব চেষ্ঠা হয়। ধর্মপূজাবিধানের একস্থানে প্রতিমা স্থাপনাদির কথাও উল্লেখ আছে। কিন্তু—সে প্রতিমা আমরা দেখতে পাই না কেন? আমার মনে হয় ব্রাহ্মগণ সম্পূর্ণরূপে বাংলাব নীচজাতদের বশ করতে পারেন নি। এটা বোধ হয় সকলেই লক্ষ্য করে' থাকবেন যে নীচজাতদের মধ্যে যে-সব পূজা হয় তার অধিকাংশই প্রতীকাত্মক (symbolical); মূর্তি-পূজা উচ্চবর্ণের মধ্যে একপ্রকার আবদ্ধ। যখন কোনো জাত 'ওঠে', তখন প্রতিমা-পূজা, বাগ্যবিবাহদান, বিধবা বিবাহ বন্ধ, স্পর্শা-স্পর্শ বিচার দেখা দেয়। হাড়ী ডোম বাউরী বাইতি প্রভৃতি জাত হিন্দুসমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে এসে পড়ল বটে; কিন্তু তারা ব্রাহ্মগণের প্রতিমা গ্রহণ করলে না। সেইজন্তই আমরা বর্তমানে ধর্মপূজার মধ্যে কোনো প্রকার মূর্তির সন্ধান পাই না।

ধর্মপূজাব মধ্যে আত্মযজ্ঞিক অনেক পূজা প্রবেশ করেছে; কিন্তু তার মধ্যে সবগুলিই যে হিন্দু উৎপত্তি তা নয়। শ্রুতপুরাণে প্রায় ৫০টি দেব দেবী, ঋষি মুনিব নাম আছে; তাব মধ্যে সবগুলি বৈদিক না হলেও পৌরাণিক হিন্দুধর্মে তাঁদের সকলেই চল আছে। কিন্তু দুই-একটি নাম অত্যন্ত অদ্ভুত পাই;—যেমন

ডাঠিনে ভূমরশাই বামে হুম্মান। (পৃ: ৯১)

ধর্মপূজা-বিধানে পাই—

ডামরশাকি মহাপাতাল পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ।

ও নমস্তি পাঠিনঃ সর্কে দেবতা দানবা নরাঃ।

কুজমূর্তিধ্বং দেবঃ ডামরশাকি নমাস্যহং ॥ পৃ: ১০৯

এ ছাড়া ঝর্কবীক, পড়িহার, লৌহজংহ, পণ্ডাহর প্রভৃতি নাম ধর্মপূজাবিধানে পাই। এরা সকলেই ক্ষেত্রপাল রূপে নমস্কার পেয়েছেন। এর মধ্যে পণ্ডাহর হচ্ছেন ইক্ষুক্ষেত্রের দেবতা, 'পাহি মামিক্ষুধ্বংসে স্বম্', 'গুড়-বুদ্ধিপ্রদায়িনে' 'ইক্ষুবাটি-নিবাসিনে' ইত্যাদি সোধোনে

তাঁকে নমস্কার করা হয়েছে (পৃ: ১১০)। এঁদের নাম ও কর্ম থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এরা অনার্য গ্রাম্য দেবতা। হিন্দুধর্মের স্বভাব হচ্ছে সমস্তকে সে শোধন কবে' নিজের করে' নিতে পারে। তাই এ সমস্ত অনার্য গ্রাম্য দেবতাকে শোধন কবে' হিন্দু করে' নেওয়া হয়েছে। এই রকম কবেই ভৈরোঁ ভৈবব হয়েছে, গ্রাম্যশিব ও মহাদেব এক হয়ে গেছেন।

গ্রাম্যদেবতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা প্রয়োজন। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলের একস্থানে আমরা ৮০টি স্থানের গ্রাম্য-দেবতার নাম পাই। এ ছাড়া সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলেও আমরা একটি তালিকা পাই। মাণিক গাঙ্গুলির তালিকায় যে-সব নাম পাই তাব কয়েকটি ধর্মরাজ্যাকুর। সেইসব গ্রাম্য-দেবতা এক-কালে অনার্যদেবতাই ছিল; ধর্মপণ্ডিতেরা সেগুলিকে ধর্মরাজ বলে' চালিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে বাঁকুড়া রায়, যাত্রাসিদ্ধি, জাড়াগ্রামের কালুরায় প্রভৃতি ধর্মরাজের প্রতাপ যথেষ্ট। ত্রিবেদী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় তাঁদের গ্রাম জেমোর গ্রাম্য-দেবতাব বর্ণনা প্রকাশ করে-ছিলেন। সেটি পূর্বে বুদ্ধমূর্তি ছিল, এখন শিব বলেই চলছে। অবিকাংশ গ্রাম্য-দেবতা এখন হিন্দু দেবদেবীর অন্তর্গত হয়ে পড়েছে; কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন এদের অনেকগুলি আবার ধর্মরাজ ছিল। ধর্মের গাঞ্জন পরে শিবের গাঞ্জনে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের কত জায়গায় এই গাঞ্জনের মেলা হয়—তা (Bentley) বেটলি সাহেবের Fairs and Festivals of Bengal পুস্তকের তালিকা খুলে দেখলেই বুঝা যাবে। ধর্মপূজার প্রভাব যে কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল এটা তার একটা প্রমাণ।

গতবাব একটা কথা স্মৃতি-তত্ত্ব প্রসঙ্গে বলা হয় নি। সেটা হচ্ছে স্মৃতিতত্ত্বের থিওরির প্রভাব। মধ্যযুগের এমন কোনো সাহিত্য নেই যারা এর প্রভাবের বাইরে ছিল। যুগী-সম্প্রদায়ের কথা ছেড়ে দিই—তাঁদের স্মৃতিতত্ত্ব ত মেলেই; মঙ্গলচণ্ডীকারগণও যে এর হাত এড়াতে পারেন নি—তা হরিদাস পালিত মহাশয় সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় খুব ভাল করেই দেখিয়েছেন। অল্পদিন পূর্বে বিশ্বভারতী

লভায় ধর্মপূজা সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময়ে আচার্য্য ববীজ্ঞনাথ লেখককে 'বোগীর কাচ' নামে এক-খানি খাতা পরীক্ষা করবার জন্ত দেন। এই গানের

মধ্যেও ধর্ম-পূজার সৃষ্টিতত্ত্বের প্রভাব দেখতে পাই। সেই গানগুলি সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করব। ধর্মপূজার প্রভাব কতদূর গিয়েছিল সেই গানগুলি হ'তে স্পষ্ট হবে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

চরকা ও খন্দর

চরকা সম্বন্ধে অনেক লেখা পড়া হইয়া গিয়াছে, প্রায় প্রত্যহ কোথাও-না-কোথাও ব্যাখ্যান চলিতেছে। তথাপি এখনও অনেকের সংশয় আছে।

সংশয়ের হেতু এই—(১) প্রচলিত সমাজ-সংস্কার বিপরীত কিছু ভাবিতে ও করিতে হইলে প্রযত্ন চাই; অনেকের প্রযত্ন করিবার শক্তি নাই। (২) কলের শত শত অশক্তির দ্বারা যে কর্ম সম্পন্ন হইতেছে, মানুষের দুইখান হাত দিয়া সে কর্ম হইতে পারে কি? (৩) যদি বা লক্ষ লক্ষ লোকের হাত লাগানা যায়, তা হইলেও হাতের কাম্বের দাম বেশী পড়িবেই পড়িবে। কারণ কলের কমলা খরচের চেয়ে মানুষের খোরাকের খরচ বেশী। (৪) বিলাতের সহিত যদি টঙ্কর দিতে হয়, বিলাতী কল বসাইতে হইবে। বিলাত যদি শতগুণ বাণ ছুঁড়িয়া লড়াই করে, আমাদিগকেও শতগুণ বাণ বাহির করিতে হইবে। কারণ শতগুণ মুখে সে-কলে ঢাল-তলোয়ার টিকিবে না। (৫) পেছ হটা নয়, আগে চল। নূতন থাকিতে পুরাতন কে চায়? কারণ পুরাতনে কুলায় নাই বলিয়াই নূতনের উৎপত্তি। ইত্যাদি।

“ইত্যাদি” পড়িয়া কেহ চমকাইবেন না। প্রবল বাধা “ইত্যাদির” মধ্যে লুকাইয়া আছে। (৬) চরকার সূতা মোটা। এত কাল সরু পরিয়া এখন এই বয়সে মোটা পরিতে পারা যাইবে না। অঙ্গে সহিবে না, সাজিবে না। গ্রীষ্মদেশে গায়ে সবু কাপড় রাখাই কষ্টকর। (৭) অঙ্গে মানাইবে না। চরকার পুঞ্জি ১০।১২ নম্বরের সূতা। সে সূতাব কাপড় যদি সকলকেই পরিতে হয়, উদ্ভলোকের উদ্ভতা রক্ষা হইবে না, কে ছোট কে বড়, চেনা যাইবে না। (৮) শুনিতছি, ঢাকা শাস্তিপুর ফরাস-

ডাক্তার রামজীবনপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আড়ম্বের তাঁতীরা মোটা সূতায কাপড় বুনিতে পারে না। সবু সূতায তাদের হাত। বিলাতী সবু সূতা বন্ধ হইলে তারা মারা যাইবে। তা ছাড়া, দেশের শিল্প সব ত গিয়াছে, এখন যেটুকু আছে, সেটুকুও নষ্ট কবিত্তে হইবে কি? (৯) যদি দেশে সূতা-কাটা ও কাপড়-বোনা কল বসাইতে পার, ভাল। না পার,—”

তিন বৎসর পূর্বে যখন বর্তমান স্বদেশীয় তরঙ্গ বহে নাই, কিন্তু বজ্রচিন্তা আরম্ভ হইয়াছিল, তখন “ভারতবর্ষে” (১৩২৫ কার্তিক) ও “প্রবাসীতে” (১৩২৫ কার্তিক) চরকার ও মোটা কাপড়ের অনেক গুণ গাহিয়াছি। তখন সে গান, অরণ্যে রোদন হইয়াছিল। তার পর দেড় বৎসরের মধ্যে এক যুগ চলিয়া গিয়াছে, যেন চিররুদ্ধ শ্বাসের কপাট খুলিয়া গিয়াছে। আশঙ্কাও হয়, শোকের উপশম হইলে চরকারও অবসান হইবে।

কারণ উল্লিখিত আপত্তিগুলি অসার নহে। বাদী বলিতেছে, পুরাতনে ফিরিয়া চল। প্রতিবাদী বলিতেছে, তা কি আর পারি। বাদী বলিতেছে, কলকারখানার কলহ লাগিযাই থাকিবে, সে অশান্তি হইতে মুক্ত হও। প্রতিবাদী বলিতেছে, আমি ইচ্ছা করিলেই কি মুক্ত হইতে পারি? আমি কি ইচ্ছা করিয়া ঘূর্ণিপাকে ঘোর খাইতে যাইতেছি? কল চলিবেই, ভাতে-মারা হইতে প্রাণে-মারা পর্য্যন্ত। বাদী বলিতেছে, সে কি, তুমি যে চিরমুক্ত, আপনাকে ভুলিতেছ কেন?

প্রতিবাদী এ-সব তত্ত্ব বুঝিবে না। তাই তাহাকে দেশের দারিদ্র্য ও অর্থনীতির উপদেশ স্বরণ করাইতে হইতেছে।

আমরা। নগরবাসী শূনি, বলিও, আমাদের দেশ গরীব। কিন্তু সবাই যে কথারটার মম হৃদয়ঙ্গম করি, তা নয়। যারা গ্রামে থাকেন না, গ্রামবাসীর স্বখ দুঃখের ভোগী নহেন, তাঁরা দারিদ্র্যের মাত্রা পাইবেন না। কথায় বলে, যা কষ্ট অন্ন-বস্ত্রের। এই কষ্টের তুল্য কষ্ট আর নাই। রোগের যন্ত্রণা, চিকিৎসার কষ্ট, ঔষধ অপ্রাপ্তির দুঃখ, প্রত্যহ পাই না। “পাই না” বলিতেও পারি না। দেশে যে উজাড় হইতে চলিয়াছে, লোকে যে অকালে মরিতেছে, সে কি কেবল আগন্তু মালেরিয়া ও কলেরার আক্রমণে? পথ্য বিনা লোকের আয়ু কমিয়া গিয়াছে, শরীর দুর্বল হইয়াছে, রোগও প্রবল হইয়াছে। দেশের ছয় আনা লোক দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় কি না সন্দেহ। আট আনা খাইতে পায়, কিন্তু বলকর ও পুষ্টিকর আহার পায় না। নুন-ভাত ও শাগ-ভাত দুই বেলা দুই খালা পাইলেই বীর্ষ ও আয়ু রক্ষিত হয় না। যাক, সে অনেক কথা।

এক রাজপুত্র অল্প কথিয়া আমাদের বার্ষিক আয় ২৮ টাকা স্থির করিয়াছিলেন। শূনিতেছি, এই আয় হইতে ৭ টাকা ইনকম টেক্স দিতে হয়। বাকি থাকে ২১ টাকা। চারানিতে আমাদের প্রত্যেকের আয় এই দাঁড়ায়। কিন্তু বাস্তবিক কাহারও আয় বেশী, কাহারও কম। যদি কাহারও আয় ২১০ টাকা হয়, তাহা হইলে অল্প দশজনের আয় ০। যদি ২১০০ টাকা হয়, শতজনের আয় কিছুই থাকিবে না। ব্যবসাই ধরি, বাণিজ্যই করি; হাকিমই হই, ওকালতি বেয়েটারি করি; ২১ টাকার উপর এক পয়সাও আসে না। যদি মাসে ২৪০ টাকাও ধরি, টাকায় ৬ সের দরে ১৫ সের চালের দাম। যার ভাতই এক সন্ধ্যা, আধ সের চালে তাব দিন চলে না। তথাপি দেখিতেছি, আমাদের মাত্র চালের পয়সা আছে। অপর কিছুই নিমিত্ত এক পয়সাও নাই। যদি কাপড় কিনিতে হয়, ঔষধ আনিতে হয়, নুন-তেলের জোগাড় করিতে হয়, মাথা গুঁজিবার একখান চালা তুলিতে হয়, বহুজনকে পেটে শুষাইতে হইবেই।

এই দুর্দশা লঘু করিবার উপায় কি? আয়-বৃদ্ধি। আয় বৃদ্ধির উপায় কি? শ্রম-বৃদ্ধি। অর্থাৎ লোকে

এখন যত শ্রম করিতেছে, যত জ্ঞান করিতেছে, তত থাকিলে দুর্দশা ঘুচিবে না, বরং বলহীন ও আয়ুহীন হওয়াতে দৈনন্দিন দিন দিন বাড়িতে থাকিবে। বস্তুতঃ অবস্থা সঙ্কটের। ধন নইলে বল ও আয়ু থাকে না, বল ও আয়ু নইলে ধন হয় না। মোজা দৃষ্টান্তে, টাকা না হইলে মালেরিয়া দূব হইবে না, মালেরিয়া দূব না হইলে টাকাও আসিবে না।

সে যাহা হউক, যদি ধনবুদ্ধি আকাজ্ঞা করি, লোকের শ্রম বৃদ্ধি করিতে হইবে, তাদিকে কর্ম দিতে হইবে। যদি তাদিকে মানুষ রাখিতে চাই, এমন কর্ম দিতে হইবে যে কর্মে স্বাধীনতা আছে আত্মতৃপ্তি আছে; এমন কর্ম যা স্ব স্ব গ্রামে থাকিয়া করিতে পারা যাইবে।

এই অতিরিক্ত কর্মের সময় আছে কি? আছে। দেশের বাব আনা কৃষি-জীবী। কিন্তু কৃষিকর্মে বাব মাস লাগে না, কিংবা লাগাইবার উপায় নাই। যারা বড় কৃষক, তাদেরও আট মাসের বেশী লাগে না। অধিকাংশের ছয় মাস তা-না-না-না করিয়া কাটে। পুরুষেরাই ৪।৫ মাস কর্ম পায় না, মেয়েদের কথা স্বধায় কে? গৃহস্থালীতে যদি যায় এক বেলা, আলস্যে কাটে আব এক বেলা। অর্থাৎ মেয়েরাও বছরে ছয়মাস কর্মহীন। শিশু ও আতুরের কথা নয়; যারা খাটিতে পারে, তারা কাল-বৈগুণ্যে ছয় মাস কর্মহীন হইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় কোনও দেশ এত রোজ্জগারী নয় যে আট আনা লোকের পরিশ্রমে সকলে স্বখে কাল যাপন করিতে পারে।

কৃষক যদি কাপাস চাষ করে, তাহারও তাহার পরিবারের কর্ম বাড়িয়া যায়। পাঁচ রকম চাষের মধ্যে একটা, কৃষকের পক্ষে কঠিন নয়। কিন্তু সুবিধা এই, ধানচাষের মধ্যে যে অবসর থাকিত, সেই অবসরে কাপাস চাষ হইয়া যায়। ফল পাकिবার সময় ছেলেদের কর্ম জোটে। কারণ সব ফল একদিনেই পাकिয়া কাটিয়া যায় না। তার পর কাপাস শুবানা, খাঅই দিয়া বীজ ছাড়ানা আছে। বীজ হেতু গ্রামের তৈলকার কর্ম পাইল, গোরু বাছুরে খইল খাইল, কৃষকপরিবারে কিছু তেলও আসিল। যে তুলা হইল, তাহাতে মেয়েদের কর্ম জুটিল। সুতাকাটা এমন কর্ম, যতক্ষণ ইচ্ছা যখন ইচ্ছা তখন করিতে পারা যায়।

যন্ত্র স্বল্পমূল্য, ছোট, পিঁড়ার এক কোণে পড়িয়া থাকে। সূতাকাটা অল্প অনায়ে আসে। পবে সন্ধ্যার পর অন্ধকারেও চলিতে পারে। এমন আর একটি কর্ম দেখিতে পাই না।

এই সোজা কথা, এমন করিয়া বলিতে হইতেছে, 'এই দুঃখ। কারণ কলিকাতাবাসী সংবাদপত্র-লেখক ও দেশানভিষক্ত দেশ-হিতৈষী দেশের অর্থ বৃদ্ধির উপদেশ দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা কাগজে-কলমেই থাকিয়া যায়। ইহারা ইংরেজী Cottage industry কথাটার তর্জমা করিয়া "কুটির-শিল্প" আনিয়াছেন। কিন্তু তর্জমায় যে বুদ্ধির উদয়, সে বুদ্ধি কাজের সময় অস্তহিত হয়। আমার বিশ্বাস, এই অস্তৃত নামটাতোই দেশের বুদ্ধিদিগকে দিশাহারা করাইয়াছে। "কুটির-শিল্প সমিতি", না "সভা", নাম ঠিক স্বরণ হইতেছে না; কিন্তু স্বরণ হইতেছে চরকার সূতাকাটা সে শিল্পের মধ্যে গণ্য হয় নাই। আশ্চর্য্য এই, এত বড় ব্যবসায় (industry), এত প্রয়োজনীয় কলা (manufacture), যাহাতে দেশের গ্রামে গ্রামে, পরিবারে পরিবারে, ধন বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ উপায় বর্তমান, তাহাতে চোখ পড়িল না।

কেতাবী অর্থনীতি জিজ্ঞাসা করিতেছে, উৎপন্ন সূতার দাম কত? কলের সূতার চেয়ে সস্তা, না আঁকা? চরকা কখনও কলের সঙ্গে ঘুঝিতে পারে?

যত গোল এই খানে। কিন্তু কেতাব রাখিয়া ভাবিয়া দেখিলে বৃদ্ধি, যে সূতায় পরিবারের বস্ত্রকষ্ট দূর হয়, তাহা অ-মূল্য। স্বর্ণপুরী লঙ্কায় সোনা সস্তা হইতে পারে, কৃষক-পরিবার সোনা চায় না, চায় পিতল। বাজারে কলের সূতা যত সস্তা হউক, কৃষকপত্নী কিনিতে যাইতেছে না, তাহার স্বোপার্জিত ক্ষুদ্রের জায় তাহার সূতাও বহুমূল্য। চরকার প্রত্যেক ঘুরণে তাহার চিত্ত ও শক্তি মিলিয়া গিয়াছে। পতি, পুত্র, কন্যা নূতন কাপড় পরিতে পাইবে; কেতাবী অর্থনীতি তাহার আনন্দের সংবাদ রাখে না। তাহার অবসর নাই। কিন্তু কর্মময় জীবনের একটানা স্রোতের মধ্যে যখন উৎসব আসে, পর্ব পড়ে, তখন সে-ই আনন্দ ভোগ করে; অবসাদ-গ্রস্ত নিষ্কর্মা নারীর উদাসমনে সে আনন্দ প্রবেশ করিতে পারে না।

গ্রামের অল্প নারীর সম্বন্ধেও সেই কথা। তফাৎ এই, তাহাকে তুলা কিনিয়া লইতে হইবে। কাপড় চাই, সূতা কাটিতেছে। ভাত চাই, রাঁধিতেছে। কেহ রাঁধুনির বেতন কষে না। কত ভাতে কত খরচ পড়ে, কেহ ভাবে না। ভাবিলে বৃদ্ধিত যত পরিবার তত হাড়ী না করিয়া এক হাড়ীতে সকলের রান্না হইলে কত কষ্ট কত পয়সা বাঁচিয়া যাইত। তবু ত লোকে মানে না। কেবল সূতা-কাটার বেলা তর্ক?

তথাপি বিজ্ঞ ঘাড় নাড়িতেছেন, কলের সূতা অনেক সস্তা। কিন্তু সে কথা কে অস্বীকার করিতেছে? যদি কেহ সূতাকাটনিকে বেতন দিয়া সূতা কাটাইয়া বিক্রির নিমিত্তে বাজারে আসে, সে দেখিবে তাহার সূতা বিকাইতেছে না; কারণ তাহার সূতা কলের সূতার মতন সমান-সরু নয়, সমান-পাকও নথ। যদি বা বিক্রি হয়, দেখিবে তাহার লাভের অঙ্ক শূন্য হইয়া মূলে টান পড়িয়াছে। কিন্তু এখানে সে কথাই যে নয়।

বাস্তবিক, উল্লিখিত নারীর কাটা সূতা সস্তা। কারণ কাটিবার বেতন বা বাণি লাগে না। যে সময়ে কাজ ছিল না, সে সময়ে কাটা। যে সময় বাঁচাইতে পারিয়াছে, সে সময়ে কাটা। তাহার একটা পয়সাও খরচ হয় নাই, তুলার দামে সূতা পাইয়াছে। এমন কোন্ কল আছে, যেখানে তুলার দামে সূতা পাওয়া যায়?

তথাপি বিজ্ঞ মানিতেছেন না। অতএব গ্রাম হইতে এক দৃষ্টান্ত দিই।—রামধন দেখিল, বর্ষা আসিতেছে, সে সময়ে আনাজ পাওয়া যায় না, এই কুমড়ার দিনে কিছু কুমড়া কিনিয়া রাখিলে ভাল হয়। গ্রামের নিকটের হাটে এক একটা ১০ আনা। কিন্তু পাঁচক্রোশ দূরে ৮০ আনা। সে সকালবেলা গোরু লইয়া পাঁচক্রোশ গেল, কুমড়া কিনিয়া গোরুর পিঠে ছালা ভরিয়া সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরিল। কুমড়া আনিলা দশটি, দশক্রোশ আনা-গনা করিয়া লাভ করিল ৮০ আনা। কিন্তু সে যখন খাটনি পায়, তখন নিজে পায় ১০ আনা, গোরু পায় ৮০ আনা। কেতাবী অর্থনীতি বলিতেছে, রামধন নির্বোধ, ৮০ খরচ করিয়া ১০ আনা পাইয়াছে।

অথচ এইরূপ ঘটনা গ্রামে অহরহ ঘটিতেছে। এই

বাঁকুড়ায় দেখিতেছি, যে কৃষকের গোবু কি মহিষের গাড়ী আছে, সে দুইদিনের পথ আনা-গনা করিয়া বন হইতে আলানি কাঠ আনিতেছে। সে পাড়ী বাহিয়া রোজ্জুগার করে প্রত্যহ দেড়টাকা, কিন্তু দুই দিনে তিনটাকা মারা করিয়া তিনটাকার কাঠ দুইটাকায় কিনিতে ঘাষ। কারণ, সব দিন গাড়ী চলে না।

দেশ-স্বল্প সবাই কি মুর্থ? সংশয়ী এই সোজা কথা কেন বুঝেন না, কলের সহিত চরকার প্রতিযোগিতা কেন মনে করেন, ভাবিয়া পাই না। তুলার দামে সূতা, তাঁতীকে বাণি দিয়া কাপড়। ফলে কাপড়ের দাম পড়িল, তুলার দাম+বুনিবার বাণি। কোন্ কলে এত সস্তায় কাপড় বেচিতে পারে? যে কৃষকের কাপাসচাষ আছে, তাহাকে তুলার দামও লাগে না। তাহার কাপড়ের দাম—তাঁতীর বাণি; দশহাত কাপড়ে ৯/০ আনা মাত্র। বাজারে সে কাপড়ের দাম আজকাল ২৯/০ টাকার কম নয়। দেশের লোক মুর্থ-ছিল না, মুর্থ হইয়াছি আমরা।

যে কাপড় চায়, সে সূতা কাটিয়া এত সস্তায় কাপড় পাইতে পারে। যে কাপড় চায় না, পয়সা চাষ? তারও লাভ। কলের সূতা যত সস্তা হউক, তুলার দাম ছাড়া কাটুনীর বাণি আছেই আছে। কলের স্বল্প বাণি পাইলেও সূতা-কাটুনীর লাভ। কারণ, এই বাণি যত কমই হউক, সেরে চারি-আনা মাত্র হউক, কাটুনীর এই চারি আনাই লাভ। যদি প্রত্যহ আধ পোয়া কাটে, ১০ নম্বরের আধ পোয়া সূতাকাটা কঠিন নয়, প্রত্যহ দুই পয়সা, মাসে এক টাকা, ঘরে বসিয়া পাইবে। এই এক টাকা অল্প কোনও উপায়ে আনিতে পারিত কি?

তাছাড়া, তাহাকেও ত কাপড় চাই, বছরে অন্ততঃ দুখানা। এক সের তুলার দাম একটাকা, দুখান কাপড় বুনিবার বাণি পাঁচ টাকা। এই নয় সিকায় কাপড় পাইবে। লাভ থাকিবে নয় টাকা। বাস্তবিক সূতা কাটার বাণি আজকাল আরও বেশী। সকল জিনিসের দাম চড়িয়াছে, সকল কর্মের বেতনও চড়িয়াছে।

মনে করুন, বঙ্গদেশে বার লক্ষ চরকা চলিতেছে। চরকা-প্রতি বৎসরে বার টাকা ধরিলে প্রায় দেড়কোটি টাকা বাঙ্গালাদেশের আয় বাড়িবে। এই আয় হেলায়

নিবৃত্তিতায় হারাইতেছি। আর বলি দেশ গরীব কেন।

আমরা বিদেশে কাপড় বেচিতে চাই না। নিজেদের প্রয়োজন-মতন কাপড় পাইলেই বাঁচিয়া যাই। আমরা সাড়ে চারি কোটি, বছরে হারাহারি দুইখানা, ১০ নম্বর সূতার এক সের পাইলেই চলে। প্রত্যহ আধপোয়া সূতা কাটা কঠিন নয়। অভ্যাস হইয়া গেলে চারিঘণ্টার কর্ম। অতএব চরকা-প্রতি বছরে একমণ সূতা স্বচ্ছন্দে পাইতে পারি। চাই আমাদের এগার লক্ষ মণ। অতএব বার লক্ষ চরকা চলিলে বঙ্গদেশ বস্ত্র-বিষয়ে স্বাধীন হইতে পারে। এমন দিন ছিল।

বঙ্গে প্রায় এক লক্ষ গ্রাম আছে। প্রতি গ্রামে বারটা চরকা বেশী কি? পুরুষ, ছেলে, মেয়ে, বুড়ী বাদ দিলেও বার লক্ষ সবল নারী অবশ্য আছে। শতকের মধ্যে ছয়জন নাই?

সমস্ত দেশের কথা ভাবুন। আমরা বৎসরে ৬০।৭০ কোটি টাকার বিলাতী কাপড় কিনিতাম; এখন চড়া দামে বোধ হয় ১০০ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এই কাপড়ের তুলার দাম বোধ হয় ৩০ কোটি টাকা। অতএব আমরা বিলাতী কাটুনী ও তাঁতিকে বাণি স্বরূপে ৬০।৭০ কোটি দিতেছি। অর্থাৎ জনাকি ২৮ টাকা, আয়ের ২১ টি টাকা হইতে ২৮ টাকা! এ যে এক-মাসের চালের খরচ! এক মাস উপোষ থাকা! আমরা নিজেই কর্মের উমেদার, পাঁচ ছমাস বসিয়া থাকি, পেট ভরিয়া থাইতে পাই না। দুই টাকা ন দেবায় ন ধর্মায় ব্যয় করিতে পারি কি? চরকা কিন্তু এই অপব্যয় রহিত করিতে পারে। কল্লনার কথা নয়, বেশী দিনের কথাও নয়, ৬০।৭০ বৎসর পূর্বে চরকা আমাদের কাপড় চালাইত। আরও পূর্বে স্বধু আমাদের নয়, পরেরও কাপড় যোগাইত।

চরকা যদি এমনই চক্র, উহার ঘূর্ণন রুদ্ধ হইল কেন? বিদেশী বণিক কুহক করিল, আমাদের মোহ জন্মিল, আমবা ইতর ভদ্র জ্ঞী পুরুষ সৌখিন হইয়া উঠিলাম। চরকার মোটা সূতার কাপড় মনে ধরিল না, বিলাতী কলের সর কাপড় সস্তায় পাইয়া চরকা ও তাঁত ফেলিয়া

দিলাম। বিদেশী বণিক পয়সা-মোড়ক ও পয়সা-পেয়লা চা দিয়া শহরের লোককে মাতাইয়াছে, এখন চা নইলে দিন চলে না। সরু কাপড়ও তেমনই মাতাইয়াছে। কারণ সরু পরিলে বুঝায় ধন আছে; এবং আজিকালি ধন দেখানাই ধরণ হইয়াছে। সেকালে উৎসবে ও নিমিত্তে টাকা খরচ হইত, এ কালে দেহের সুখসাধনে ও বিস্ত্র প্রদর্শনে হইতেছে। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে আমরা আর অসভ্য নই।

কলে বস্ত্র সরু কাপড় বোঁগাইতে, বস্ত্র সস্তায় চোখের সামনে ধরিতে লাগিল, চরকার সাধ্য হইল না তেমন সরু ও তত সস্তা কাপড় পরাইতে পারে। আমরা সবাই সরু ধরিলাম, 'বাবু' হইলাম। সমাজ প্রবৃত্তি পরিবর্তন সামলাইতে পারিল না, তাঁতীকুল গেল, চরকা বন্ধ হইল, কাপাস চাষ উঠিয়া গেল। এখন যদি বা ধনী ও ভদ্র মোটা পরেন, দরিদ্র ও ইতর কিছুতেই পরিতে চাহিবে না। যে যে জাতির মধ্যে মোটা পরন সুরুচি বিবেচিত হয়, তাহার রক্ষা পাইয়াছে, এখনও চরকা ঘুরাইতেছে।

যাঁহারা সেকালের চরকার সূতার কাপড় পরেন নাই, যাঁহারা সরু পরিয়া বড় হইয়াছেন, তাঁহারা কখন-কখনও জিজ্ঞাসা করেন লোকে কেমন করিয়া মোটা পরিত, নারী কেমন করিয়া মোটার বোঝা বহিত। জিজ্ঞাসার কথা বটে। কারণ ১০ নম্বর সূতার দশ হাত লম্বা আড়াই হাত বহরের ধুতি বা শাড়ী অষ্টপ্রহর বহিয়া বেড়ানা সহজ নহে। কিন্তু অভ্যাগে সবই সহ্য। তার সাক্ষী ইদানীর কোট পেট কিংবা শাড়ী সেমিজ। উক্ত প্রমাণের ধুতি বা শাড়ী ওজনে আধ সের মাত্র। কিন্তু সাহেবী পোষাক ওজনে তিনগুণ, শাড়ী সেমিজও আধ সেরের কম হইবে না। আসল কথা, তা নয়। তখন আট-পহর্যা কাপড় ছিল খা-দি, মোটা ও খাট। তোলা কাপড় সরু সূতার, লম্বে ও প্রস্থে বড়। ধনবানের এই দুই রকম কাপড় থাকিত, দরিদ্রেরও প্রায় তাই থাকিত। এই সরু কাপড়ও ৪০।৫০ নম্বরের সূতার উপর নয়।

একথা ঠিক, খা-দি পরিতে কেহই লজ্জা বোধ করিত না। আঁঠুর একটু নীচে নামিলেই প্রমাণ গণ্য হইত। পুরুষদের খাদি ৮ হাত X আট পোয়া, মেয়েদের খাদি

৯ হাত X নয় পোয়া, কিংবা ১০ হাত X নয় পোয়া। মেয়েদের কাপড় তত ছোট নয়। এই হেতু খাদি বলা হইত না। খা-দি আর খ-দ্দ-র একই সংস্কৃত ক্ষু-দ্ৰ শব্দের অপভ্রংশ। যাহা বৃহৎ নয়, উত্তম নয়, তাহা ক্ষু-দ্ৰ। অল্প ও অধম কাপড়, খা-দি। যে কাপড় পরিলে পা ঢাকা পড়ে, যে কাপড়ের সূতা মোটা হইলেও সমান, সে কাপড় খা-দি নয়।

পুরুষে খাদি পরিয়া গ্রামান্তরে ঘাইতে লজ্জা বোধ করিতেন না। কিন্তু খাদি পরিয়া সভায় ঘাইতে পারিতেন না। সমগ্র পা ঢাকিতে হইত, তাও নয়; কিন্তু যেখানে থাকুন, ঘরেই থাকুন, বাহিরেই বসুন, আঁঠু ঢাকিয়া খাদি পরিতে হইত। আমাদের সমাজে এখনও এই রীতি চলিয়া আসিতেছে। জাহ্নু-প্রদর্শন দূরে থাক, জাহ্নুসঙ্কি- (আঁঠু-) প্রদর্শন অশিষ্টের অসভ্যের লক্ষণ। আশ্চর্য এই আমাদের কোন কোনও দেশী ভায়া জাদিয়া পরিয়া বাড়ীর বাহির হইতে, রেল ঘাইতে, কদাচিৎ সভায় বসিতেও লজ্জা বোধ করেন না। এই বীভৎস বেশের উৎপত্তি প্রভুর মনস্তুষ্টি হইলেও আত্মতুষ্টিও কম নয়। এইটি সর্বনাশের কথা তথাপি সমাজেব চক্ষে হয়। কাবণ প্রাচ্য অসভ্য হইলেও বর্বর নয়। কোন কোন সাহেব—সব সাহেব কি না জানি না, বাড়ীতে জাদিয়া পরেন। সেটা তাঁহাদের খাদি, যদিও সেলাই-করা। কিন্তু বোধ হয় কোনও শিষ্ট সাহেব জাদিয়া পরিয়া শিষ্ট সমাজে উপস্থিত হইতে পারেন না। সে যাহা হউক, আমার বক্তব্য আটপহর্যা কাপড় সকল সমাজেই ক্ষুদ্ৰ, আর উদ্গমনীয় বস্ত্র দীর্ঘ। উদ্গমনীয় বস্ত্র, ধৌত বস্ত্র, যাহা হইতে ধু-তি। আমরা এখন ঘরে বাইরে ধুতি পরিতেছি।

বর্তমান কুলান্ননা ভাবিতেছেন, তাঁহাদিগের ঠাকুরমা ঠাকুরদিদী কেমন করিয়া ক্ষুদ্ৰ শাড়ী পরিতেন। তাঁহারা যখন গিম্বী, তখনকাব কথা নয়; যে গ্রামের বিয়ড়ী সে গ্রামেও নয়; যখন বউড়ী তখন শশুর-বাড়ীতে আগুলফল শাটীতে দেহ আবৃত করিতেন না। আঁঠুর কিছু নীচে, আঁঠুর ও গোড়ালীর মাঝামাঝি পংছিলেই শাড়ীর প্রমাণ বহর হইত। ইদানীর মেয়েদের পা ঢাকা

মেমদের অহঙ্করণে। আমাদের সমাজে পরজীবীর মুখ দর্শন পাপ বলিয়া গণ্য। অথচ কোনও অঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিলে কথোপকথন চলে না, অভিজ্ঞা জন্মে না। সে অঙ্গ, পা। কাছেই পা খোলা থাকিত। এই খোলা পায়ে অষ্ট অলঙ্কার শোভা পাইত। দেবী-প্রতিমা দেখিলেই প্রাচীন সাক্ষী পাওয়া যাইবে। মেমদের শ্রায় উদ্ভাস উন্মোচন ও নিম্নাঙ্গ আবরণ আমাদের চোখে শালীনতা নয়। বোধ হয় আমাদের চোখই ভাল।

এত কথা পাড়িবার হেতু আছে। দেশের হিতার্থে কেহ কেহ ‘খন্দর’ পবিত্রেছেন। কিন্তু সেটা নামে খন্দর, কাজে সেই ৫ হাত লম্বা ২১ হাত বহবের ধুতি বা শাড়ী। এমন আশ্র-প্রতারণা আর দেখি না। এ যে প্রাচীন শাঁখা, সোনায় গড়া। নামে শাঁখা, কিন্তু সোনা পরাই অভিপ্রায়। খন্দরের পঞ্জাবী ও জামা দেখিয়াছি, আঁঠুর নীচে পর্যন্ত ঝুলিতেছে। যিনি খাদি কি, খাদির প্রয়োজন কি, বুঝিলেন না, তিনি চরকা চালাইতে পারিবেন না। দেড় হাত সাতপোয়া বহরের মোটাকাপড় কি ছিল না? জিন কাপড় ত ছিল। ফলে দেখিতেছি, কলে খন্দর জন্মিতেছে, যেন খন্দর খাট-বহরের মোটা সূতার কাপড়। এই কারণেই বলিয়াছি, চরকার প্রতিবাদীর আপত্তি আমার নহে। চিত্তের পরিবর্তন না হইলে, মোহ না কাটিলে ঢাকঢোল বাজানা মিছা। মহাত্মা গান্ধী খাদি পরিয়া চিন্ত-শুদ্ধি করিতে বলিয়াছেন। চরকার খাদি (home-spun) সে তপস্যার উপকরণ বটে।

যে-সব কল চলিতেছে, সে-সব উঠিয়া যাউক, কাহার-কাহারও এমন অভিনাশ জন্মিলেও, কলগুলা উঠিয়া যাইবে না। কল বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহাও মনে করি না। কলের দোষ, কল নির্মম, দেশের প্রতি মমতাহীন। সম্প্রতি কল টাকায় টাকা ফলাইতেছে, কারণ দেশের কতক লোক এমন নিবোধ যে স্বদেশী কাপড় চায়। দেশের নিবুদ্ধিতায় একের পোষা-বার। প্রাচীন কালের দণ্ডনীতি থাকিলে অতিলোভের শাসন হইত। এখন কলির কাল; কলি অর্থে কলহ; এরূপ কলহ একমাত্র শাসন। কলে কলে বলি, দেশী ও বিদেশী কলে কলি, নইলে অতিলোভের শাসন হইবে না। চরকা ও তাঁতের সঙ্গে দেশী কলের

প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দেশী কলের সঙ্গে বিদেশী কলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বর্তমান কালে যখন ধর্ম এক পাদ, তখন কলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রেতাবৃ পক্ষে মন্দ নয়।

কলের নির্মমতা যদি একগুণ, কল ও ক্রেতাব মাঝে ব্যাপারীর যে পক্ষপাল আছে, তাহাদের নির্মমতা শতগুণ। পক্ষপালের স্বভাব এই—ধানগাছে একটু রস থাকিতে গাছ হইতে উঠে না। ক্রেতার পয়সার রস নিঃশেষ না করিয়া ব্যাপারী ছাড়ে না। কোথায় দয়া, কোথায় বা মায়া! মাল্লষের প্রতি মাল্লষের দয়া হয়; কিন্তু যেখানে ক্রেতাব সহিত সাক্ষাৎ নাই, সেখানে মমতাও নাই। এমন মজাব কথা, কাহারও দোষ দিবার জো নাই। তথাপি তুমি আমি যখন ৪৮ টাকার কাপড় ৫৮ টাকা দিয়া কিনি, তখন বুঝি কল ও ব্যাপারীর সংস্থা (co-partnership) না ঘটিলে ১৮ টাকা দণ্ড দিতে হইত না। চলিত কথায়, দুইই গলা-কাটা, তোমার আমার পয়সা লুটিয়া ধনী হইতেছে।

গ্রামিক কলায় এই সভ্য জুজ্বা-খেলা নাই। সেখানে কারু ও ক্রেতার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ; দয়া না থাকিলে সমাজের অলক্ষিত কিন্তু নিদারুণ অপযশের ভয় আছে। তাঁতী কাপড়ের বাণি বাড়াইতে পারে, কিন্তু গলা কাটিতে পারে না। কারণ সে যখন রামধনের কাছে আসিবে,—আর একদিন না একদিন আসিতেই হইবে,—রামধনও ছুরী শাণাইয়া রাখিবে। রামধন একা নয়, ক্রেতামাজেই রামধনের সহায়। এই কারণে মনে হয়, চরকা ও তাঁত চলিলে খাদি সস্তা হইবে। কলের খাদির চেয়ে সস্তা হইতেও পারে।

কিন্তু তখন অল্প এক বিপদ ঘটতে পারে। চরকার সূতা ও তাঁতের কাপড়, প্রত্যেকের অল্প বলিয়া, উল্লিখিত পক্ষপাল স্বেযোগ পায় না। কিন্তু যখন অনেক জন্মিতে থাকিবে, তখন সে পালও আসিয়া জুটিবে, অগ্রিম দান দিয়া বহুর পরিশ্রম হাত করিবে, তারপর পাঁচচামে চাবীর যে অবস্থা, সূতাকাটনীর ও তাঁতীর সেই অবস্থা হইবে। লাভ অশ্রুত থাকিবে, কাটনীর ও তাঁতীর যে কষ্ট সে কষ্ট ঘুচিবে না। তার সাক্ষী, এই স্বদেশীর দিনেও তাঁতী দিন-চলা ভার হইয়া

রহিয়াছে, সগোষ্ঠী পরিশ্রম কবিয়া কোনও রকমে বাঁচিয়া আছে। যে কারু নয়, সে দিনিকা (daily wages) যত পায়, তাঁতী কারু হইয়াও তত পায়, সময়ে সময়ে ততও পায় না। এই অবস্থা দেখিলে বলিতে হয়, কল তাহাকে পিষিয়া রাখিয়াছে, তাহার বাণি বাড়া ন্যায়।

কিন্তু যে তাঁতী সৌখিন কাপড় বোনে, তাহার অবস্থা নন্দ নহে। কারণ সখের জিনিসে দবের বাঁধাবাধি প্রায় থাকে না। তবে এই যে রব উঠিয়াছে,—আশ্চর্য কেবল বাঙ্গালা দেশে, যেন অন্য দেশে সব সূতার কাপড় হয় না!—ঢাকা ফরাসডাকার তাঁতীর হাত মোটা হইয়া বাইবে, সে রবের মূল সেই তাঁতী যে সর বুনিয়া ছু-পয়সা করিতেছে। শিল্পলোপ ভূআ কথা। শিল্প বস্তু এত ক্ষণবিধ্বংসী নহে যে দু-দশ বছর অস্থায়ীত্বের অভাবে লুপ্ত হইবে। সরু হাত মোটা করিতে, কিংবা মোটা হাত সবু করিতে প্রযত্ন লাগে বটে, কিন্তু প্রযত্ন শিল্প নয়। যে বাস্তবিক শিল্পী, সে সরুতে যেমন মোটাতেও তেমন নিপুণতা দেখাইতে পারে। আর দেশে শিল্পীই বা কোথায়, কয়জন? অধিকাংশই কারু, কিছু কলাবিৎ, দুইএক জন বা শিল্পী। এ-কথাও ত ঠিক, চরকার সূতা চিরদিন মোটা থাকিবে না। পূর্বে ছিল না, তখন মোটা ছিল, সরুও ছিল। সরুর কাটিতি হইলে দেশের কলও সরু কাটিতে শিখিবে।

চরকা ও তাঁতের এত গুণ যে এই প্রাচীন কলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা বাঞ্ছা করি। এনিমিত্ত কলের প্রতি বিমুখ না হইলে চলে না। জানি, পরিণামে বিষময় হইলেও নূতনের স্বাদ পাইয়া পুৰাতনে প্রত্যাবর্তন বহু তপস্যার ফল। আরও জানি, সংসারে যতি-তপস্বী চিরদিনই অল্প। কিন্তু ইহাও জানি, যুগে যুগে যত বি-নেতা আবির্ভূত হইয়াছেন, সকলেই যম নিয়ম প্রচার করিয়া বহু শিষ্যও রাখিয়া গিয়াছেন। বলিতে গেলে, আমাদের দেশ যম-নিয়মের দেশ, যতি-সম্মানসূচক দেশ। ইহাতেই, ভোগ্যের ত্যাগেই ভারতের গৌরব। সেটা ভাল কি মন্দ, কে জানে। কিন্তু দেশের প্রকৃতি যখন এই, তখন আশা হয় মোটা চলিবে। মোটার অনেক গুণও আছে। সে সব পূর্বে “প্রবাসীতে” ব্যাখ্যা করিবাছি।

এখন চরকা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া এই আলোচনা শেষ করি। কলিকাতায় দেখিলাম, চরকা নামে খেলানা বিক্রি হইতেছে। আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি কত ক্ষয় পাইয়াছে, কত বিকৃত হইয়াছে, তাহা এই-সব খেলানা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালীর মতি, কেন এমন হইল! যে শিল্পী চরকা নির্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি ছেলে-খেলা কবেন নাই, চক্রের উপরে পাশে চক্র বসান নাই। যে চরকা এতকাল চলিয়া আসিয়াছে, যেটা আধুনিক উদ্ভব কলের আদর্শ হইয়াছে, সেটা কেবল multiplying wheel নয়। আমার বিশ্বাস, তুলা পাইন্টের দোষে চরকার সূতা সমান হইতেছে না, চরকার দোষে পাক পাইতেছে না। আমায় একজন বলিয়াছিলেন, চবকার চক্র হাল্কা হইলে কোনও দোষ হয় না। তিনি বিজ্ঞ, ব্যবসায়ী, চরকা-নির্মাতা এবং স্বয়ং চালক। তথাপি আমার বিশ্বাস হয় না। পূর্বকালে মাঝে পাথরের পিণ্ড দিয়া চক্র ভারী করা হইত;—ওড়িয়ায় দেখিয়াছি, বাকুড়াতেও দেখিতেছি। চক্রকে flywheel করা কি বুধা কর্মভোগ? আমি চরকার শিল্পীকে নির্বোধ মনে করিতে পারিব না, সে কালের কোনও শিল্পীকে পারিব না।

সে যাহা হউক, প্রথমে খেলানা ফেলিয়া দিতে হইবে, পুরাতনে হাত পাকাইতে হইবে। তারপর দেখিতে হইবে সূতা কেন সবু মোটা হইতেছে, কেন টিলা পাক হইতেছে। এখন চবকার সূতা তাঁতী বুনিতে চায় না। কলের সূতা (বিশেষতঃ নাগপুরী) পাইলে হাত-প্রতি এক আনা বাণি, কিন্তু চরকার সূতায় কাপড় বুনিতে দুই আনাতেও পোষায় না। চরকার সূতা ধরিলে তাহাকে তাঁতও বদলাইতে হইবে। চলিত শানায় চলিবে না, চলিত-মাকুতেও চলিবে না। লোককে খাদি পরিতে বলিতেছি। কিন্তু ‘সে খাদি স্ফন্দর না হইলে তাহার পরিবে কেন? কোনও নূতন জিনিস স্ফন্দর না হইলে চলে না। সরু ধুতি ফেলিয়া মোটা খাদি ধরিবে, তবেই চেষ্টা সার্থক।

চবকা চালাইবার, চরকা কেন, যে-কোনও কল চালাইবার কৌশল আছে। চরকা বহিয়া বাড়ীতে

বাড়ীতে দিয়া আসিলেই চরকা চলিবে না। সূতা-কাটা শিখাইয়া দিতে হইবে। মাঝে মাঝে দেখিয়া আসিতে হইবে, বিগড়াইলে ঠিক করিয়া দিতে হইবে। এসব ছাড়া উত্তম রূপে ধোনা, স্নানর পীজ করা তুলা কাগজের পোয়া পোয়া মোড়কে বিক্রি করিতে হইবে। চরকা দিয়া কাপাস-গাছ দেখাইয়া চলিয়া আসিলে কোনও ফল হইবে না। কোথাও তুলা, কে পিজে, কে ধুনে, কে পীজ কবে, এসব চিন্তার অবকাশ হইলে চরকা চলিবে না।

সূতা কাটা মেয়েদের কর্ম। কিন্তু মেয়ে মুহলে পুরুষের অধিকার নাই। শিক্ষিকাও ছলভ। যে-সে শিক্ষিকা হইলেও চলিবে না। কুলাঙ্গনারও কর্ম নয়।

অগত্যা বালক; বুদ্ধিমান, সৌম্যমুষ্টি, ধীর ও মধুরভাষী বালককে শিখাইয়া গ্রামে গ্রামে বাড়ীতে বাড়ীতে পাঠাইতে হইবে। এক দিন একবার পাঠাইলেও চলিবে না। মেয়েদের সময় থাকে না, এক দিনে মনও ভিজে না। চরকা ও তুলাব পাইজ অবশ্য প্রথম বাবেই বাখিয়া আসিতে হইবে, মূল্যের কথাই নাই। তাব পর শেখা হইলে কাটা সূতা আনিবার পালা, তাঁতীকে দিয়া গামছা বুনাইয়া বাপি লইয়া দিয়া আসা, কাটা সূতা না কুলাইলে অন্তের সূতা, বাজাবেব সূতা দিয়া ভরতি করিয়া একটা কিছু বোনা কাপড় কর্তনীকে দিয়া আসিতে হইবে। ইত্যাদি।

লোককে খন্দর পরানা মুখের কথা নয়।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

দেৱাদুনে বাঙ্গালী

আমবা ইতিপূর্বে বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী গ্রহে দেৱাদুন-প্রবাসী কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙ্গালীর নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াছিলাম; তাহারা যে সংকারণের দ্বারা বিদেশে থাকিয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, অথ তাহারা কিছু কিছু পরিচয় প্রদত্ত হইল।

প্রায় ৩৭৩৮ বৎসর পূর্বে ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্র প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ দেৱাদুনে গ্রেট্‌ ট্রিপোনোমেটিকাল সার্ভে বিভাগে কর্ম করিতেন। তাহার পারদর্শিতা দেখিয়া বিভাগের কর্তা গণনা-কার্যের উপযোগী কর্মচারী মনোনয়নের জন্ত ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষের নিকট লিখিবার ভার তাহার উপর স্থাপন করেন। ডাক্তার বৃথ তখন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি রায় সাহেব ঈশানচন্দ্রকে মনোনীত করিয়া পাঠান। ঈশান-বাবু ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানু-য়ারী শ্রীহট্টের অন্তর্গত বখিনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা ৮গৌরকিশোর মুন্সী মহাশয় লক্ষরপুব মুন্সেফি আদালাতের সর্বপ্রধান উকীল ছিলেন। ঈশান-চন্দ্র অল্প বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া প্রতিকূলতার ভিতর দিয়া বিছাড্যাস করেন। কিন্তু শুদ্ধ স্বকীয় চেষ্টা ও

প্রতিভাব বলে সকল অভাব সকল বাধা অতিক্রম করিয়া অতি যোগ্যতার সহিত ছাত্রবৃত্তি, প্রবেশিকা, এফ-এ, এবং বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বৃথ সাহেবের মনোনয়নে ঈশান-বাবু ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর দেৱাদুনে পদার্পণ করেন। কর্মদক্ষতার গুণে তিনি অল্পদিনেই হেড কম্পুটারের পদে উন্নীত হন। আজ ৩৬ বৎসর তিনি দক্ষতার সহিত কর্ম করিয়া গবর্ণমেন্টের যেমন প্রশংসা-ভাজন হইয়াছেন বহু বৎসরের প্রবাসবাসে স্বীয় উন্নত চরিত্র এবং গুণগ্রামের জন্ত সে প্রদেশের সাধারণেরও সম্মানিত এবং সর্বজনপ্রিয় হইয়াছেন।

আঠার শ আটানব্বই খৃষ্টাব্দের পূর্ণ সূর্য-গ্রহণের সময় ইংলণ্ডের ববেল সোসাইটি হইতে প্রেরিত বহু জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত সূর্যপরিবীক্ষণের জন্ত ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাহাদের পর্যবেক্ষণাদি কার্যে সাহায্য করিবার জন্ত ঈশান-বাবু দেৱাদুন হইতে প্রেরিত হন, এবং অতি যোগ্যতার সহিত কার্য করেন। তিনি যথাসময়ে তাহার বিবরণ “প্রদীপ” নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষের তৎকালীন সার্ভেয়ার জেনারেল, কর্ণেল স্যার সিড্‌নী বারার্ড, কে-সি-এস-আই, আর-ই, এফ-আর-



রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র দেব

এস্ হিমালয় প্রদেশের ভূগোল ও ভূতত্ত্ব বিষয়ে Hima-
layan Geography and Geology নামে যে অতি-
প্রয়োজনীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ লেখেন, তাহার প্রকাশে ঈশান-
বাবু বিশেষ সহায়তা করেন। এই-সকল কার্যের জন্য এবং
তাঁহার অসাধারণ গণিতজ্ঞান ও কর্মকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া
১৯১৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে রায় সাহেব উপাধি দ্বারা
সম্মানিত করেন। রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র বেদান্ত যোগদর্শন
প্রভৃতি শাস্ত্রের সম্যক্ অন্বেষণ করিয়াছেন এবং নানা
মাসিক পত্রিকাষ তত্ত্ববিজ্ঞা আবহবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বহু
প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। বরাহ-মিহিরের বৃহৎসংহিতা
অনুসারে গণনা করিয়া বহুবর্ষ ধরিয়া প্রতিবৎসর প্রথম
ছয় মাসের বারিপাত সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ গণনা প্রকাশ করিয়া
তিনি Weather Prophet নামে পরিচিত হইয়াছেন।
তিনি সরকারী কার্যে যেরূপ সুনাম অর্জন করিয়াছেন,
জনহিতকর কার্যে যোগদান করিয়া তদ্রূপ সাধারণেরও
কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তিনি মাদকনিবারণ-কল্পে
স্বগঠিত ভজনমণ্ডলী সহ বহুদিন হইতে বহু চেষ্টা
করিয়া এরূপ কৃতকার্য হন, যে, নিম্নপ্রণেীর মদ্য-

পানাসক্তি ছাড়াইয়া দেন। তিনি ষিওজফিক্যাল সোসাইটী,
ব্রাহ্মসমাজ ও বঙ্গীয়সাহিত্য-সমিতিব সম্পাদক এবং
নৈশ বিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট রূপে বহু কার্য
করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র
ভিক্টোরিয়ান ক্লাবেব প্রেসিডেন্ট ও নর্থ ইণ্ডিয়া ক্লাবেব
ভাইস প্রেসিডেন্ট রূপে সাধারণের স্বাস্থ্য ও সামাজিক
উন্নতির বিলক্ষণ সহায়তা করিতেছেন।

ঈশান-বাবুর দেহাদুর্ন আসিবার পাঁচ বৎসর পরে
অর্থাৎ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বাবু বিমলাচরণ সোম ট্রিগোনো-
মেট্রিকাল সার্ভের গণিত বিভাগে কর্ম লইয়া আসেন।
তিনিও ঢাকা কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।
সোম মহাশয় ১৮৬৮ অব্দের এপ্রেল মাসে বিক্রমপুরস্থ
কুমারভোগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা
৮রামচরণ সোম মহাশয় ঢাকা মুন্সীগঞ্জ মহকুমার এক-
জন বিখ্যাত উকীল ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ
মুর্শিদাবাদের নবাব মীরজাফরের নিজামতে চাকরি
করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া যান এবং স্বীয়
কর্মকুশলতার পুরস্কার স্বরূপ নবাব কর্তৃক “রায়রায়ান”
উপাধিতে ভূষিত হন। তদবধি তাঁহার বংশধরগণ
এই উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। বিমলা-বাবু
পিতার ক্ষেত্রপুত্র। তাঁহার কনিষ্ঠতম বাবু চপলাচরণ
ও বাবু ভূপেন্দ্রকুমার দেশে ওকালতি করিতেছেন।
বিমলা-বাবু নূতন কর্মস্থানে আসিয়াই স্বীয় অধ্যবসায়-
গুণে শীঘ্রই উন্নতি লাভ করেন। গবর্ণমেন্ট তাঁহার
কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ ট্রিগোনোমেট্রিকাল সার্ভের
হেড এসিষ্ট্যান্ট পদে তাঁহাকে উন্নীত করেন। ঐ পদ
ইতিপূর্বে সাহেবদিগেরই একচেটিয়া ছিল। বিমলা-
বাবুই ঐ পদে প্রথম ভারতবাসী। জনহিতকর সকল
কার্যেই তাঁহার অহুরাগ, সহযোগ এবং উৎসাহ আছে।
তিনি স্থানীয় বাঙ্গালা সাহিত্য-সমিতির প্রধান পরি-
চালক এবং প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম। তাঁহার
ঐকান্তিক যত্নে সমিতি বহু উন্নতি লাভ করিয়াছে।
এই সমিতির গ্রন্থাগারে এক্ষণে দুই সহস্র পুস্তক
সংগৃহীত হইয়াছে। এখানে দয়ানন্দ এংলো-বেদিক
হাইস্কুল স্থাপিত হইবার কালে বিমলা-বাবু বিশেষ

সাহায্য করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণে প্রতিষ্ঠাতা ৬ পূর্ণসিংহ নেগী মহাশয়ের অহরোধ রক্ষা কবিত্তে না পারিলেও, বিমলা-বাবু এই ~~স্কুলের~~ স্কুলের সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। তিনি প্রযোজনমত এখনও ছাত্রদিগকে গণিত শিক্ষা সম্বন্ধে সাহায্য করিয়া থাকেন। তিনি সম্প্রতি বীজগণিত সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। বিমলা-বাবু দেবাদুনে স্বাস্থ্যোন্নতিব জন্ত আগত নূতন বাঙ্গালীর প্রধান আশ্রয়স্থল। অমায়িক ব্যবহার ও বিমল চরিত্রের জন্ত বিমলাচরণ-বাবু স্থানীয় অধিবাসী ও প্রবাসী সকলেবই শ্রদ্ধা-ও সম্মানভাজন হইয়াছেন।

বিমলা-বাবু আসিবার দশ বৎসর পবে অর্থাৎ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বাবু রমাপ্রসাদ বায়, বি-এ, জরীপ বিভাগের প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া দেবাদুনে আগমন করেন। এখানে তিনি সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার এক্ট্রা এ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিণ্টেন্ডেন্ট পদে কর্ম করিতেছেন। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত গোলাবাড়ী হালি-সহর গ্রামে রমাপ্রসাদ-বাবুর পৈতৃক বাস। তিনি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং পুন্ডলিয়া হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৫ বৃত্তি লাভ করেন। পবে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে গণিত শাস্ত্রে সম্মানের সহিত বি-এ পাশ করেন। দেবাদুনে আসিবার পূর্বে তিনি দুই বৎসর কলিকাতা বেভেনিউ বোর্ডে কর্ম করিয়াছিলেন। দেবাদুনে তিনি ১৯০০ অব্দে আসেন, এবং সেই বৎসরই তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে দেবাদুনে বাঙ্গলা-শিক্ষা-সমিতি স্থাপিত হয়। জরীপ বিভাগের কার্য শিক্ষা শেষ হইলে তিনি ঐ বিভাগের ম্যাগেটিক পার্টিতে নিযুক্ত হন। এই কার্যে তিনি প্রায় সমস্ত উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করেন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বেলুচিস্তান ত্রক্ষের টেনাসেরিম উপকূল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এবং ভারতের মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বস্তার রাজ্য প্রভৃতি বহু বিপদসঙ্কুল প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া তত্ত্ব স্থানের কার্য সুচারুরূপে সম্পাদন করেন। রমাপ্রসাদ-বাবু ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ট্রিগোনো-মেট্রিকাল সার্ভে আফিসেব ডুইং বিভাগে হেড



বাবু বিমলাচরণ সোম,
দেবাদুনে

ড্রাফটস্ম্যানের পদে কার্য করিতেছেন। তিনি এক্ষণে দালানওয়ালা মহল্লায় “সাবদা-লজ” নামে একটি স্বরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া দেবাদুনেব স্থায়ী অধিবাসী হইয়াছেন।

বিগত জর্মন যুদ্ধাবসানে অবশবপ্রাপ্ত কাপ্তেন যতীন্দ্র-মোহন মিত্র, আই-এম-এস মহাশয় দেবাদুনে-প্রবাসী হইয়াছেন। তিনি এখানে অতিঅল্পদিনেই চিকিৎসা-ভিজ্ঞতা ও অমায়িকতার ফলে প্রবাসী ও স্থানীয় অধিবাসীদিগেব শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। স্থানীয় জরীপ বিভাগেব ম্যাগেটিক এনার্ভেটিংএর পরিচালক শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, মহাশয় অতিশয় দক্ষ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। তিনি এখানে চিকিৎসা করিয়া বহু লোকের উপকার করিতেছেন। ব্যারিষ্টার জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র সিংহ, এম-এ, ও শ্রীযুক্ত পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, এখানে বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। রায় বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল মহাশয়ের স্বযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র কাঞ্জিলাল, বি-এস-সি, এক্ট্রা



বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বি-এ
দেবাহন

এ্যাসিষ্ট্যান্ট কন্সার্টেটর অফ ফরেষ্টস্; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দে, এক্স্ট্রা এ্যাসিষ্ট্যান্ট কন্সার্টেটর অফ ফরেষ্টস্; শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জরঞ্জন মজুমদার এক্স্ট্রা এ্যাসিষ্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট, সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া, প্রমুখ বহু পদস্থ সরকারী কর্মচারী দেবাদুন-প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন।

স্থানীয় কালীবাড়ীৰ অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যো-

পাধ্যায়, সাধু শ্রীযুক্ত হরিনাথ দাস এবং জরীপ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত হেড্ কন্স্ট্রাক্টর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সোম মহাশয়গণ প্রমুখ প্রাচীন প্রবাসী বাঙ্গালীগণ এখানে বিশেষ সম্মানিত। এতদ্ব্যতীত জরীপ ও বন বিভাগের বিস্তার হওয়ায় দেবাদুনবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় দুইশত হইয়াছে।

ভারতের নানা স্থানে প্রবাসী এবং উপনিবেশিক বাঙ্গালীদের বহু স্বকীর্তির মধ্যে দেবাদুনের "Homeopathic Charitable Dispensary" হোমিওপ্যাথিক দাতব্য ঔষধালয় অন্যতম। ইহার প্রতিষ্ঠাতা বন্ধের স্মৃতিস্মান শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। এই ডিস্পেন্সারীর স্থায়ী সুপরিচালনার জন্ত তিনি প্রায় ৬০,০০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করিয়া মানবসমাজের কৃতজ্ঞতা, ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। তিনি কোন ঐশ্বর্যশালী জমিদার বা প্রভূত ধনের অধীশ্বর হইলে এই দান তাঁহার বিশেষত্ব স্বচিত করিত না; কিন্তু দেশে প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব-বাবুর সংস্কৃতশিক্ষার উন্নতিকল্পে লক্ষাধিক টাকা দানের জ্ঞান নিমক-বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী তারাচাঁদ-বাবু এই কার্যে তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় দিয়া বিদেশে বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন সন্দেহ নাই। সহস্র সহস্র দরিদ্র নরনারী এই চিকিৎসালয়ে ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ দে কর্তৃক বিনাব্যাঘ্রে চিকিৎসিত হইয়া প্রতিষ্ঠাতার নাম চিরন্তন করিতেছেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

রূপান্তর

আমাব মনের ব্যথা আছিল গোপনে,
কুঁড়ি যেন পর্ণপুটে আপনারে ঢাকি প্রাণপণে
কেবল একটি রাত; মলম ব্লায়ে হাত,
কোঁটা হুই অশ্রুপাত করি তার সনে
ফুল করি আজি তারে এনেছে আলোর পাবে,
স্বরভি মধুতে বিরে বরণ-বসনে।

অজ্ঞানার মত তারে আজি মনে হয়,
ভুলে যাই অকস্মাৎ একদিন সে কি পরিচয়,
স্মৃতি যার বেদনায় ব্যথা দেয় আপনায়,
আজি তারে চেনা দায়, পরম বিস্ময়।
দেখি যত বারে বারে মমতা ততই বাড়ে
যদি খসে যায় ভারে, এই শুধু ভয়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

পথ-মোচন

অনেক সময় দেখা যায় যে প্রশ্ন সহজ হওয়ায় পরীক্ষার্থীরা ফেল কবিত্তে থাকে। এক-একটি সহজ বিষয়ও নানা প্রকার কল্পিত রূপক অর্থের আবরণে চাপা পড়িয়া যায়, নিতান্ত সহজ কথা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আভির্ভাষে ঝাপসা বলিয়া মনে হইতে থাকে। ববীন্দ্রনাথের লেখা সম্বন্ধেও দেখা যায় যে একটি বিশেষ তত্ত্ব-কথা বা একটি বিশেষ রূপক অর্থ আবিষ্কার করিবার ঝোঁকে অনেক সময়ে লোকে মূল বিষয়টিকে ভুলিয়া যায়, আসল কথাটি সহজ বলিয়াই লোকে ভুল বুঝে। “মুক্তধারা” নাটকখানি সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটবার সম্ভাবনা আছে, সেইজন্য গোড়াতেই “মুক্তধারার” সহজ অর্থটিকে সহজ ভাবে বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করা দরকার।

(১)

নাটকখানির সম্মুখে সমস্ত মঞ্চ জুড়িয়া পড়িয়া বহিয়াছে নানা মাছের চলাচলের পথ; দূরে আকাশে একটা অভ্র-ভেদী লৌহযন্ত্রের মাথা অস্তরের মত হাঁ কবিয়া রহিয়াছে, অপব দিকে ভৈরব-মন্দির-চূড়াব ত্রিশূল; পিছনে বাঁধন-বাঁধা “মুক্তধারা”, জলের শব্দ আসিয়া পৌঁছিতেছে কিনা স্পষ্ট বুঝা যায় না; গায়ে গায়ে ভৈরব-মন্ত্র শুনা যাইতেছে—

জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর,
জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর,
শঙ্কর শঙ্কর।

আর এই সমস্তের মাঝখানে রহিয়াছেন উত্তরকূটের যুবরাজ অভিজিৎ।

অভিজিৎকে জয় রাজ-বাড়িতে হয় নাই, মুক্তধারা ঝরণা-তলা হইতে তাঁহাকে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল; তাঁহার কপালে রাজক্রবর্তীর চিহ্ন দেখিয়া তাঁহাকে যুব-রাজ করা হইয়াছে। অভিজিৎ এ খবর জানিতেন না, তবুও ঝরণার শব্দে পথের সুরে তাঁহার মন উতলা হইয়া উঠিত। গৌরীশিখরের দিকে তাকাইয়া যুবরাজ ভাবিতেন—“যে-সব পথ এখনো কাটা হয়নি ঐ দুর্গম

পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই ভাবী কালের পথ দেখতে পাচ্ছি—দূরকে নিকট করবার পথ।”

একদিন যুবরাজ শুনিলেন যে মুক্তধারার উৎসেব নিকটে কোন্ ঘরছাড়া মা তাঁহাকে জন্ম দিয়াছে। অভিজিৎ বুঝিলেন যে তাঁহার জন্মক্ষেত্রে গিরিরাজ তাঁহাকে পথে অভ্যর্থনা করিয়াছেন, ঘবের শব্দ তাঁহাকে ঘবে ডাকে নাই। ইহাব পর হইতে যুবরাজকে অনেক সময়েই আর রাজবাড়িতে দেখা যাইত না, তিনি রাজবাড়ি ছাড়িয়া ঝরণা-তলায় চলিয়া যাইতেন। জিজ্ঞাসা কবিলে বলিতেন—“ঐ জলের শব্দে আমি আমার মাতৃভাষা শুনতে পাই,” বলিতেন—“আমি পৃথিবীতে এসেছি পথ কাটবার জন্তে, এই খবর আমার কাছে এসে পৌঁছেচে।”

যুবরাজকে তখন শিবতরাইয়ের শাসনভাব অর্পণ করিয়া মুক্তধারার নিকট হইতে দূরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। অভিজিৎ কিন্তু মুক্তধারার মাতৃভাষা ভুলিতে পারিলেন না। শিবতরাইয়ের অন্নচলাচলের পথ বন্ধ করিবার জন্ত অনেকদিন হইল নন্দিসঙ্কটে গড় গাঁথিয়া তোলা হইয়াছিল, অভিজিৎ এই বহুদিনের পুরাতন গড় ভাঙিয়া নন্দিসঙ্কটের পথ খুলিয়া দিলেন। উত্তরকূটের স্বার্থে আধাত লাগায় উত্তরকূটের অধিবাসীরা উত্তেজিত হইয়া উঠিল, যুবরাজ অভিজিৎকে উত্তরকূটে কিবিয়া আসিতে হইল।

অভিজিৎ উত্তরকূটে কিবিয়া আসিয়া প্রথমেই দেখিলেন মুক্তধারার বাঁধ বাঁধা হইয়া গিয়াছে। শিবতরাইয়ের প্রজাদের কিছুতেই বাঁধা কবা যায় নাই। এতদিন পবে যজ্ঞ-রাজ বিহুতি মুক্তধারার জলকে আয়ত্ত করিয়া তাহা-দিগকে বশ মানাইবার উপায় করিয়া দিয়াছে, শিবতরাইয়ের প্রজাদের পিপাসার জল এইবার বন্ধ করা চলিবে, শিবতরাইয়ে দুর্ভিক্ষ আসন্নপ্রায়। এই অসামান্য কীটিকে পূর্বস্বত করিবার উপলক্ষ্যে উত্তরকূটের সমস্ত লোক উৎসব করিতেছে। যজ্ঞরাজ বিহুতির প্রশংসায়, যজ্ঞ-মহিমা-জয়-গানে সমস্ত নগরী মুখবিত।

কিন্তু এই বাঁধ ত সহজে বাঁধা হয় নাই। বাঁধ বারবার

ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কত লোক ধূলাবালি চাপা পড়িয়াছে, কতলোক বস্ত্রায় ভাসিয়া গিয়াছে। উত্তরকূটে যখন মজুর পাওয়া যায় নাই তখন রাজ্যব আদেশে প্রত্যেক ঘর হইতে আঠারো বৎসরের উপর বয়সের যুবককে জোর করিয়া ধরিয়া আনা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই ফিরে নাই। সেখানকার কত মায়ের অভিশাপের উপর যন্ত্র-শক্তি জয়ী হইয়াছে। মায়ের ক্রন্দন কিন্তু থামে নাই। জয়োৎসবের মধ্যেও শুন। যাইতেছে, জনাই গ্রামের অশ্বা কাঁদিয়া বেড়াইতেছে—“স্বমন! আমাব স্বমন! বাবা আমাব স্বমন এখনো ফিরুল না!.....তাকে যে কোথায় নিয়ে গেল। আমি ভৈরব-মন্দিরে পূজো দিতে গিয়েছিলুম—ফিরে এসে দেখি তাকে নিয়ে গেছে। বাবা স্বমন! সূর্য্য ত অন্ত যায়—আমার স্বমনত এখনো ফিরুল না!”

উল্কাখুঙ্কো-চুল হাতে বাঁকা ভালের লাঠি পাগল বটুক সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে—“সাবধান, বাবা, সাবধান। যেয়ো না ও পথে, সময় থাকতে ফিরে যাও। বলি দেবে, নরবলি। আমার ছুই জোয়ান নাতিকে জোর করে’ নিয়ে গেল, আর তারা ফিরুল না।..... সাবধান, বাবা সাবধান, যেওনা ও পথে।”

একদিকে নাগরিকদিগের উৎসবকোলাহল, অপর দিকে মায়ের ক্রন্দন, পাগলের অভিশাপ, তার মাঝে থাকিয়া থাকিয়া ধ্বনিত হইতেছে—

তিমির-জন্ম-বিদারণ

জলদগ্নি-নিদারুণ,

মরু-শ্মশান-সঞ্চর,

শব্দর শব্দর!

যুবরাজ ফিরিয়া আসিয়া এ সমস্তই দেখিলেন। পাগল বটুক আসিয়া তাঁহাকে খবর দিল—“জান না, যুবরাজ? ওরা যে আজ যন্ত্রবেদীর উপর তুষা-রাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা করবে। মাহুষ বলি চায়।” অশ্বা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—“স্বমন! বাবা স্বমন! যে পথ দিবে তাকে নিয়ে গেল সে পথ দিবে তোমরা কি কেউ যাওনি?”

যুবরাজ বুঝিলেন যে রাজপ্রাসাদের শাসন-নীতির সহিত তাঁহার জীবনের কোন সত্য মিলন ঘটা সম্ভবপর

নহে। মুক্তধারার উৎসব নিকট তাঁহার জন্ম, পথ খুলিয়া দিবার আশ্বানটিকে তাঁহার অন্তরতম চৈতন্যের মধ্যে ধারণ করিয়া তিনি জন্মলাভ করিয়াছেন, তাই অভিজিৎ স্পষ্ট বুঝিলেন যে রাজগৃহে তাঁহার স্থান নাই। ভাই-বোনেব সঙ্কল্পের গ্রাঘ অভিজিৎের সহিত মুক্ত-ধারার ধোগ ভিতবে বাহিরে; এই ভিতরকার যোগের পরিচয় তিনি বাহিরের ঘটনাব মধ্যেও দেখিতে পাইলেন, সেইজন্তই মুক্ত-ধারার বাঁধ-বাঁধার বেদনা অভিজিৎকে এমন কঠিনভাবে আঘাত করিল। অভিজিৎের মনে হইল—“মাহুষের ভিতরের রহস্য বিধাতা বাহিরের কোথাও না কোথাও লিখে রেখেছেন; আমার অন্তরের কথা আছে ঐ মুক্তধারার মধ্যে। তারই পায়ে ওরা যখন লোহার বেড়ি পরিয়ে দিলে তখন হঠাৎ যেন চমক ভেঙে বুঝতে পারলুম উত্তরকূটের সিংহাসনই আমার জীবন-শ্রোতের বাঁধ। পথে বেরিয়েছি তারই পথ খুলে দেবার জন্তে।” অভিজিৎ রাজকুমার সজয়কে বলিলেন—“আমার জীবনের শ্রোত রাজবাড়ির পাথব ডিঙিয়ে চলে’ যাবে এই কথাটা কানে নিয়েই পৃথিবীতে এসেছি।” অভিজিৎ বুঝিলেন প্রাণ দিয়াও মুক্তধারার বাঁধ তাঁহাকে ভাঙিতেই হইবে।

এমন সময় রাজাজ্ঞার ধৃত হইয়া যুবরাজ কারাগারে বন্দী হইলেন। তখন সূর্য্য ডুবিতেছে, যন্ত্রের চূড়াটা সূর্যাস্তমেঘের বুক ছুঁড়িয়া উদ্যতমুষ্টি দানবের মত দাঁড়াইয়া রহিল, আর রহিল ভৈরব-ত্রিশূল।

উত্তরকূটের উৎসব চলিতে লাগিল। উত্তরকূটের অধিবাসীরা জয়-গর্কে উন্মত্ত, সপ্তাহ পরেই শিবতরাইয়ের চাষেব ক্ষেত শুকাইয়া আসিবে। উত্তরকূটের পুরদেবজ্ঞ এতদিন পবে প্রসন্ন হইয়াছেন, তুষার শূলে বিদ্ধ করিয়া শিবতরাইকে এইবার তিনি উত্তরকূটের পদতলে ফেলিয়া দিবেন। উত্তরকূটের বালকদলও জানে যে উত্তরকূটের অধিবাসীরাই সকলের উপর জয়ী, তাহারাও জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। শিবতরাইয়ের প্রজাবা রাজ্যর নিকট তাহাদের দুঃখের কথা জানাইতে আসিয়াছিল, উত্তরকূটেব অধিবাসীরা তাহাদিগকেও জোর করিয়া টুটি টিপিয়া বলাইতে লাগিল—“জয় যুবরাজ বিভূতির জয়!”

স্বচ্ছায়া ও অনিচ্ছায়া উচ্চাষিত জয়ধ্বনির মধ্যে মাঝে মাঝে
শুনা গেল—

বজ্রঘোষ-বাণী

ক্লদ্র, শূল-পাণি

মৃত্যুসিদ্ধু-সম্ভর

শঙ্কর শঙ্কর !

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, আকাশ
অন্ধকাব, কিন্তু রৌদ্রের মদ খাইয়া যন্ত্রের চূড়াটা তখনও
লাল হইয়া জ্বলিতেছে, আর অন্তর্য্যয়ের আলো স্পর্শ
করিয়া রহিয়াছে ভৈরব-মন্দিরের ত্রিশূল ।

এমন সময় বন্দীশালায় আগুন লাগিল । এই সুযোগে
খুড়ামহারাজ বিশ্বজিৎ যুবরাজকে বন্দীশালা হইতে বাহির
করিয়া আনিয়া বলিলেন—“তোমাকে বন্দী করিতে
এসেছি । মোহনগড়ে যেতে হবে ।” অভিজিৎ জানেন যে
এবার সময় হইয়াছে, আর অপেক্ষা করা চলিবে না । তিনি
বলিলেন—“আমাকে আজ কিছুতেই বন্দী করিতে পারবে
না, না ক্রোধে, না স্নেহে । তোমরা ভাব্চ তোমরাই আগুন
লাগিয়েচ ? না, এ আগুন যেমন ক’রেই হোক লাগ্বে ।
আজ আমার বন্দী থাকবার অবকাশ নেই ।” অভিজিৎ
বলিলেন,—“জয়কালের ঋণ শোধ করিতে হবে । শ্রোতের
পথ আমাব ধাত্রী, তার বন্ধন মোচন করব ।” এই
বুলিয়া অন্ধকারের মধ্যে অভিজিৎ চলিয়া গেলেন—

“কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার
শিরে নিয়ে উন্নত দুর্দ্দিন,
চিস্তে নিয়ে আশা অন্তহীন,
হে নির্ভীক, দুঃখ-অভিহত !”

বাউল গাহিল—

“ও ত আর ফিরবে না রে, ফিরবে না আর,
ফিরবে না রে ।”

অমাবস্যার রাত্রি অন্ধকার হইয়া আসিল । যন্ত্রের
চূড়াটা অন্ধকাবে ভূতের মতন কালো দেখাইতেছে,
কিন্তু ভৈরব-ত্রিশূল আর স্পষ্ট দেখা যায় না । যুবরাজ
বন্দীশালায় নাই শুনিয়া উত্তরকূটের অধিবাসীরা ক্ষেপিয়া
উঠিয়াছে ; যুবরাজকে তাহারা রাত্রির অন্ধকার পথে পথে
খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল । নন্দিসঙ্কটের ভাঙা গড়

নতন করিয়া গাঁথিয়া তুলিবার যড়যন্ত্র চলিতেছে, যন্ত্ররাজ
বিকৃতির দলবল রাত্রির অন্ধকারে গোপনে শিবতরাইএ
যাত্রা করিয়াছে, পথে বাহাকে পাষ জোর করিয়া ধরিয়া
লইয়া চলিল । শিবতরাইয়ের প্রজারাও পথে বাহির
হইয়াছে যুবরাজকে খুঁজিবার জন্য ।

মশাল নিবিয়া গিয়াছে, বাতি জ্বলিতেছে না, রাত্রির
অন্ধকারে দলে দলে লোক পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কেহ
কাহাকেও চিনিতে পারে না, কে কোন্ দিকে চলিয়াছে
ঠাহর পাষ না, শুধু যন্ত্রের চূড়াটা তখনও যেন ইসারা
করিতেছে ।

অন্ধকাবে বৃদ্ধ বটুক ডাকিতেছে—“জাগো, ভৈরব
জাগো !” অম্বা পথে পথে কাঁদিয়া ফিরিতেছে—“সুমন !
বাবা সুমন ! অন্ধকার হয়ে এল, সব অন্ধকার হয়ে এল !”
বৈরাগী গান ধরিলেন—

প্রহর জাগে প্রহরী জাগে,
তারায় তাবাম কাঁপন লাগে ।

অন্ধকারে আবার শোনা গেল অম্বার ক্রন্দন—“মা
ডাকে ! মা ডাকে ! ফিরে আয়, সুমন, ফিরে আয় !”
এমন সময় ভৈরবের ডমরু বাজিয়া উঠিল । হঠাৎ শোনা
গেল মুক্ত-ধারার বাঁধন-ভাঙা জলোচ্ছ্বাস । বৈরাগী
গাহিলেন—

বাজে রে বাজে ডমরু বাজে
হৃদয় মাঝে হৃদয় মাঝে ।

কুমার সঙ্কম্ব আসিয়া খবর দিলেন যে যুবরাজ
অভিজিৎ মুক্তধারার বাঁধ ভাঙিয়াছেন, কিন্তু যন্ত্ররাজও
তাঁহাকে আঘাত ফিরাইয়া দিল, মুক্তধারা অভিজিতের
আহত দেহকে কোলে তুলিয়া চলিয়া গিয়াছে ।

অন্ধকাবে জলশ্রোতের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল
আব বাজিতে লাগিল ভৈরব-মন্ত্র—

জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর
জয় জয় জয় প্রায়শঙ্কর ।
জয় সংশয়-ভেদন,
জয় বন্ধন-ছেদন,
জয় সংকট-সংহর
শঙ্কর শঙ্কর !

(২)

যুবরাজ অভিজিৎ ছিলেন সকলেবই প্রিয়, উত্তরকূটের অধিবাসীরা তাঁহাকে সত্যি ভালবাসিত, উত্তরকূটের মেয়েরাও জানে যে “উনি ত সবারই হৃদয় জয় করে’ নিয়েছেন।” অথচ অভিজিৎকে নিজের দেশের লোকের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। মহাবাজ রণজিৎ দুঃখ করিয়াছেন—“এ-ধে নিজের লোকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।” যুবরাজ অভিজিৎ যখন বাঁধ ভাঙ্গিবার প্রস্তাব কবিয়া পাঠাইয়াছিলেন তখন যজ্ঞবাজ বিতৃতিও এই আক্ষেপই করিয়াছেন—“স্বয়ং উত্তরকূটের যুবরাজ এমন কথা বলেন ? তিনি কি আমাদেরই নন ? তিনি কি শিবতরাইয়ের ?”

কিন্তু শুধু শিবতরাইয়ের দুঃখ দূর করিবার জন্য যুবরাজ প্রাণ দিয়াছেন বলিলে তাঁহার আত্মোৎসর্গকে ছোট করিয়া দেখা হইবে। এক হিসাবে শুধু অভি-জিৎকে নহে, প্রত্যেক মানুষেরই জন্ম মুক্তধারা ঝরণাতলায় পথের ধারে। মানুষ জন্মলাভ কবে মুক্ত অবস্থায়, জন্মকালে তাহার কোন বন্ধন থাকে না, ক্রমে সে নিজের বন্ধন নিজেই সৃষ্টি করে। প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষ নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করে, নানাপ্রকার ব্যবস্থার আয়োজন কবে। কিন্তু উপায় যখন উদ্দেশ্যকে ছাড়াইয়া যায়, প্রয়োজন যখন আনন্দকে অতিক্রম করে, ব্যবস্থামাত্রই তখন যান্ত্রিক হইয়া উঠে। যান্ত্রিক-ব্যবস্থা জীবনের গতিকে অবরুদ্ধ করে, সমস্ত মানুষের চলাচলের পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়ায়। যান্ত্রিক-বন্ধন শুধু যে আলাদা আলাদা করিয়া এক-একটি মানুষকে আঘাত কবে তাহা নহে, সমস্ত মনুষ্যজাতিকে পীড়িত করিয়া তুলে। যেখানে বন্ধন সেইখানেই সমস্ত মানুষের বেদনা সঞ্চিত হইয়া উঠে। অভিজিৎকে মতন যে মানুষ নিজের জন্ম-কথার অর্থ জানিয়াছে সেই বুঝিতে পারে এই বেদনা কি দুঃসহ, এই বন্ধন কি বীভৎস !

মানুষের হাতে বিধাতা প্রচণ্ড শক্তি দিয়াছেন, বস্ত্র-পিণ্ডের দ্বারা, উপায় উপকরণ ব্যবস্থা আয়োজনের দ্বারা কাজ করািহা লইবার শক্তি মানুষের ব্রহ্মাঙ্গ। এই ক্ষমতা কল্যাণের পক্ষে প্রয়োগ করিলে মঙ্গল। কিন্তু

স্বার্থ যখন প্রবল হইয়া উঠে, লোভ যখন দুর্বলকে হিংসা কবে, জাতীয় অহমিকা যখন প্রচণ্ড হইয়া উঠে, মানুষ তখন নিজেব অমোঘ ব্রহ্মাঙ্গ মানুষকে পীড়ন করিবার জন্য ব্যবহার কবে, বিশ্বপাপ তখন বিকটমূর্ত্তি ধারণ করে—

“ভীকর ভীকৃতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অগ্নায়,

লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,

বঞ্চিতের নিত্য চিন্ত-ক্ষোভ,

জাতি-অভিমান,

মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,

বিধাতার বশ্ম আজি বিদীর্ণিয়া,

ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়াই ফিরিয়া !”

কিন্তু যান্ত্রিক-ব্যবস্থার বেদনা কোথায় গিয়া লাগে ? যে অত্যাচার কবে, যাহার হৃদয় কঠিন সে ত বেদনা অনুভব কবে না। যে নিবপরাধ যে দুর্বল তাহাকেই বেদনা সহ্য করিতে হয়। কত মা পুত্রকে হাবায়, কত স্ত্রী স্বামীকে হাবায়, কত ভাই ভাইকে হাবায়, কত নিবপবাদের সর্বনাশ হইয়া যায়। এইজন্যই ত পাপের আঘাত এমন নিষ্ঠুর। যেখানে পাপ, শাস্তি সেখানে আসে না। কিন্তু উপায়নাই, মানুষের সমাজে একজনের পাপের ফলভোগকে অপর সকলকেই ভাগ করিয়া লইতে হয়, কাবণ অতীতে ভবিষ্যতে দূরদূরান্তে হৃদয়ে হৃদয়ে মানুষ পরস্পরের সহিত গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। মানুষের মধ্যে আসলে কোন বিচ্ছেদ নাই। সেইজন্য পিতার পাপ পুত্রকে বহন করিতে হয়, বন্ধুব পাপে বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, প্রবলেব উৎপীড়ন দুর্বলকে সহ্য কবিতে হয়।

একথা বলিলে চলে না যে অন্তের কর্তৃফল আমি ভোগ করিব কেন। কবি বলিয়াছেন—“হাঁ, আমিই ভোগ করুব এই কথা বলে’ প্রস্তুত হও। নিজের জীবনকে শুচি কর, তপস্যা কব, দুঃখকে গ্রহণ কব ! তোমার নিজের জীবনকে যদি পরিপূর্ণ রূপে উৎসর্গ না কব তবে পৃথিবীর জীবনের ধারা নির্মল থাকবে কেমন কবে’, প্রাণবান হয়ে উঠবে কেমন করে’ ? ওরে তপস্বী, তপস্যায় প্রবৃত্ত হতে হবে—সমস্ত জীবনকে আহুতি দিতে হবে, তবেই যদন্তঃ তৎ—যা ভদ্র তাই আসবে।”

যাহাবা দুর্বল যাহাবা অক্ষম তাহারা অত্যাচারিত

হয়। এই অত্যাচার, এই অবিচার, অক্ষমের অপমান, ভীত ত্রস্ত দরিদ্রের বেদনার পবিত্রাঙ্গ বড় নিদারুণ। কিন্তু এই দুঃখকে জয় করা যায়। শিবতরাইয়ের প্রজারা মার খাইয়াছিল, অবিচলিত সহ্যশক্তির দ্বারা ধনঞ্জয় বৈরাগী দেখাইলেন যে মাবের উপরেও জয়ী হওয়া যায়। বৈরাগী ধৈর্যের দ্বারা দুঃখকে জয় কবিত্তে শিখাইয়াছেন, এ শিক্ষা সত্য শিক্ষা। যাহারা দুর্বল, যাহারা অত্যাচারিত তাহাদের পক্ষে এ শিক্ষা শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

কিন্তু আরেক প্রকার দুঃখও আছে, সমস্ত মানুষের দুঃখকে একত্র করিয়া যে একটি পরম বেদনা, পরম প্রেম রহিয়াছে তাহাও সত্য। সেইজন্তই এক জাগরণ বেদনায় অপর জাগরণ আঘাত লাগে, পাপের বেদনায় সমস্ত বিশ্ব কাঁপিয়া উঠে, সমস্ত মানুষের প্রাণশক্তি সকল মানুষকেই করিতে হয়। যে হৃদয় প্রীতিতে কোমল, দুঃখেব আশ্রিত তাহাকেই প্রথম দৃষ্ট করে। সমস্ত মানুষের বেদনাকে যে লোক হৃদয়ে অন্বেষণ করিয়াছে সহ্যশক্তি দ্বারা শুধু দুঃখনিবৃত্তি করিয়া তাহার নিকৃতি থাকে না—

“ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে

সঙ্কট-আবর্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত!.....

... শুনিষাছি তারি লাগি

রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কঙ্কা, বিষয়ে বিবাগী
পথের ভিক্ষুক! মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহর কুশাকুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস
মৃত বিজ্ঞানে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতিপরিচিত অবজ্ঞায়, গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরবে করুণনেত্র—অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
সৌন্দর্য্য-প্রতিমা!”

উক্তবক্তৃতির অধিবাসীরা স্বার্থেব উত্তেজনা কত মানুষকে পীড়া দিয়াছে। শিবতরাইয়ের প্রজারা দুঃখ পাইয়াছে, বটুক দুঃখ পাইয়াছে, হৃদয়েব মা দুঃখ পাইয়াছে, এ সকল দুঃখ সামান্য নহে—কিন্তু এ সমস্ত দুঃখ কিবিধা

আসিয়া আঘাত করিল সকলের প্রিয় বেদনায় সঙ্করণ নীরব নম্র মহাপ্রাণ যুবরাজ অভিজিৎকে।

বাহার চিত্ত-তন্ত্রীতে আঘাত করিলে সব চেয়ে বেশি বাজে তাহাকেই সমস্ত পৃথিবীর বেদনা অধিক করিয়া আঘাত কবে। তাহার চক্ষে তজ্জা ছুটিয়া যায়, বেদনার আঘাতে বন্ধন খসিয়া পড়ে, দূরদিগন্তে সে গুণিতে পায় রক্তের ভৈরব-মন্ত্র তাহাকে আহ্বান করিতেছে।—

“তোমার পথের পরে তপ্ত রৌদ্র এনেচে আহ্বান

রক্তের ভৈরব গান।

দূর হ’তে দূরে

বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান হয়ে,

যেন পথ-হারা

কোন বৈরাগীর একতারা।”

সেইজন্তই, কুমার সঞ্জয় আসিয়া যখন মনে করাইয়া দিলেন “সকালে যে আসনে তুমি পূজায় বস, মনে আছে ত সে-দিন তার সামনে একটি শেত পদ্ম দেখে তুমি অবাক হয়েছিলে? তুমি জাগ্রবার আগেই কোন ভোরে ঐ পদ্মটি লুকিয়ে কে তুলে এনেচে, জানতে দেয় নি সে কে—কিন্তু ঐ টুকুর মধ্যে কত স্নর্ধাই আছে সে কথা কি আজ মনে করবার নেই? সেই ভীষণ যে আপনাকে গোপন করেছে, কিন্তু আপনার পূজা গোপন করতে পারেনি, তার মুখ কি তোমার মনে পড়ে না?” যুবরাজ অভিজিৎ বলিলেন—“পড়ে বই কি! সেইজন্তই ত সহিতে পাচ্চিনে ঐ বীভৎসটাকে যা এই ধরণীর সঙ্গীত রোধ করে’ দিয়ে আকাশে লোহার দাঁত মেলে হাস্য করচে। স্বর্গকে ভালো লেগেচে বলেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে যেতে দ্বিধা করিনে।” সমস্ত মানুষের জন্মন যুবরাজ শুনিষাছেন, কে তাহাকে ঘরে ধরিয়া রাখিবে?

“না রে না রে হবে না তোমার স্বর্গসাধন

সেখানে যে মধুর বেশে

ফাঁদ পেতে রয় স্নর্ধের বাঁধন।”

কুমার সঞ্জয় আসিয়া আবার বলিলেন—“যা কঠিন তার গৌরব থাকতে পারে, কিন্তু যা মধুর তাবও মূল্য আছে।” অভিজিৎ উত্তর করিলেন—“ভাই, তাবি মূল্য দেবার জন্তেই কঠিনেব সাধনা। আমি কঠোরতার অভিমান রাখিনে।—চেয়ে দেখ ঐ পাখী দেবদারু-গাছের চূড়ার ডালটির উপর

একলা বসে আছে; ও কি নীড়ে যাবে, না, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূর প্রবাসের অবশ্যে যাত্রা করবে জানিনে; কিন্তু ও যে এই সূর্য্যাস্তের আকাশের দিকে চুপ করে চেয়ে আছে সেই চেয়ে থাকার সুরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজছে। হৃন্দব এই পৃথিবী, যা-কিছু আমার জীবনকে মধুময় করেছে সে সমস্তকেই আজ আমি নমস্কার কবি।... ঐ দেখ সঞ্জয়, গৌরীশিখরের উপর সূর্য্যাস্তের মূর্ত্তি। কোন আশ্বনের পাখী মেঘের ডানা মেলে বাজিব দিকে উড়ে চলেছে। আমার এই পথযাত্রার ছবি অন্তঃসূর্য্য আকাশে এঁকে দিলে।”

“ওবে যাত্রী

ধূসর পথের ধূলা সেই তোর ধাত্রী;
চলার অঞ্চলে তেঁব ঘুরাপাকে বক্ষেতে আবাবি’
ধরার বন্ধন ত’তে নিয়ে যাক হরি’
দিগন্তের পারে দিগন্তেরে।
ঘরের মঙ্গল শব্দ নহে তোর তরে,
নহে বে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেমসীর অশ্রু-চোখ।”

বটুক যখন কাছে আসিয়া চুপে চুপে জিজ্ঞাসা কবিল—
“তবে শুনেচ বুঝি? ভৈরবের আহ্বান শুনেচ?”
অভিজিৎ বলিলেন—“শুনেচি।” বটুক—“সর্ব্বনাশ! তবে ত তোমার নিকৃতি নেই?” অভিজিৎ—“না, নেই।”
বটুক—“সইতে পারবে কি যুবরাজ, যখন বন্ধ বিদীর্ণ হবে যাবে?” অভিজিৎ—“ভৈরবের প্রসাদে সইতে পারব।”
বটুক—“চারিদিকে সবাই যখন শত্রু হবে? আপন লোকে দিক্কার দেবে?” অভিজিৎ—“সইতেই হবে।” বটুক—“তা হলে ভয় নেই।” অভিজিৎ—“না, ভয় নেই।”

যুবরাজ অভিজিৎ জানিতেন যে ক্রমের প্রসাদ তাঁহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে।

“পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ,

শ্রাবণরাত্রির বজ্র-নাদ।

পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা

পথে পথে শুষ্ক সর্প গৃঢ়দণ্ডা!

নিম্না দিবে জয়শব্দনাদ

এই তোর ক্রমের প্রসাদ।”

যুবরাজ অভিজিৎ বেশি কথা বলেন নাই, কারণ তাঁহার মনে কোন বিধা ছিল না। তিনি কাহাকেও ডাকেন নাই; কাহাকেও তিনি সঙ্গে লইলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন—“আমার উপর যে কাজ পড়েচে সে একলা আমারই।”

কুমার সঞ্জয় অনুরোধ করিলেন—“যুবরাজ, আমাকেও তোমার সঙ্গী করে’ নাও!” যুবরাজ সঞ্জয়কে কঠোরভাবে বাধা দিয়াছেন, বলিয়াছেন—“না ভাই, নিজের পথ তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমার পিছনে যদি চল তাহলে আমিই তোমার পথ আড়াল করব।” কুমার সঞ্জয় যুবরাজকে ভালবাসিতেন; নিজের ভালবাসাকে চরিতার্থ কবিবার জন্তই তিনি যুবরাজকে অনুসরণ কবিতো চাহিলেন। যুবরাজ একথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি জানিতেন যে সঞ্জয়ের নিকট মুক্তধারার বহুস্তর কোন অর্থ নাই, সঞ্জয়ের কানে মুক্তধারার আহ্বান পৌঁছায় নাই, তাই সঞ্জয়কে তিনি ঠেকাইয়া বাপিলেন। যুবরাজের কক্ষের পুনরাবৃত্তিমাত্র কবিয়া কোন ফল নাই, যুবরাজ যেমন নিজের পথে চলিয়াছেন সঞ্জয়কেও সেই রকম নিজের পথ খুঁজিয়া চলিতে হইবে, যুবরাজের জীবনের ইহাই চবম শিক্ষা।

অভিজিৎ জানিতেন যে প্রত্যেক মানুষকেই নিজের পথ খুঁজিয়া চলিতে হইবে; এইজন্তই তিনি দল গড়িবার চেষ্টা কবেন নাই। দলের মধ্যে নিজের পথ খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। যাহারা দলে ভিড়িয়া পড়ে তাহারা উপলব্ধি করিবার অবসর পায় না যে সত্যকে অন্তরে অনুভব করিয়াছে কি না। দেশের ইচ্ছা অভিজিৎ হইয়া বুঝিতে পাবে না যে দলের আদর্শ সত্যই নিজের আদর্শ নহে। দলেব মোহ ক্রমে অসত্যকে প্রশ্রয় দেয়, বাধা বুলি আবৃত্তি করিয়া সত্যকে বাধাগ্রস্ত করিতে থাকে, সকলতা মাত্রকেই বাহিরের দিক দিয়া পাইবার চেষ্টায় সত্যকে খর্ব্ব করে।

অভিজিৎ বুঝিয়াছিলেন যে সংখ্যাবাহুল্য অথবা আয়তন-বিশালতার দ্বারা সত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ হইতে পারে না, তিনি জানিতেন যে বিন্দুপরিমাণ সত্যের মূল্যও অসীম, তাই তিনি বারংবার বলিয়াছেন নিজের অন্তরের মধ্যে যে সত্যবোধ তাহাকেই জাগ্রত কর,

অন্তের মুখের দিকে তাকাইও না, বাহিরের সফলতার দিকে তাকাইও না। বিশ্বজিৎ যখন জানাইলেন—“তোমার শিবতরাইয়ের ভক্তদল যে তোমার কাছে হাত দেবার জন্তে অপেক্ষা কবে” আছে, তাদের ডাকবে না?” অভিজিৎ বলিলেন—“যে ডাক আমি শুনেছি সেই ডাক যদি তারাও শুনত তবে আমার জন্তে অপেক্ষা করত না। আমার ডাকে তারা পথ ভুলবে।”

নিজের সম্বন্ধে যুবরাজের মনে কিন্তু কখনও সন্দেহ মাত্র হয় নাই, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাঁহার সংকল্প স্থির, তাঁহার বিশ্বাস অচঞ্চল। অম্বাকে বলিলেন, “হুমেন যে পথে গিয়াছে তিনি নিজেও সেইপথেই যাইবেন। অম্বা বলিল—“যখন তার দেখা পাবে, বোলো মা তার জন্তে পথ চেয়ে আছে।” পরিপূর্ণ ভরসায যুবরাজ শুধু একটি কথা বলিলেন—“বল্‌ব।” যাইবার সময়ে বিশ্বজিৎ যখন বড়ই ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—“কেবল একটি আশ্বাসের কথা বলে যাও যে, আবার মিলন ঘটবে।” অকম্পিত চিন্তে যুবরাজ উত্তর দিলেন—“তোমার সঙ্গে আমাব বিচ্ছেদ হবার নয় এই কথাটি মনে বেধো।” হৃদয়ে অপরিমিতা শাস্তি লইয়া যুবরাজ চলিয়া গেলেন।

কুমার সঞ্জয় মুক্তধারার নিকটেও অভিজিতের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু অভিজিৎ কুমারকে আর অগ্রসর হইতে দিলেন না, একা চলিয়া গেলেন। সমস্ত হুঃখ সমস্ত পাপের সম্মুখে যেন একাই দাঁড়াইতে চাহিলেন।

“হুঃখেই দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে;
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে;
মৃত্যু করে লুকাচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।

ভেসে যায় তা’রা সরে’ যায়
জীবনেবে করে’ যায়
ক্ষণিক বিক্রপ।

আজ দেখ তাহাদের অভভেদী বিরাট স্বরূপ।
তা’র পরে দাঁড়াও সম্মুখে,
বল অকম্পিত বৃকে,—

‘তোরে নাহি করি ভয়,

এ সংসারে প্রতিদিন তোরে কবিয়াছি জয়।

তোব চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ!

শাস্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক!’”

যুবরাজ অভিজিৎ জীবনের চরম মূল্য দিয়া সমস্ত মাহুষের জন্ত পথ মোচন করিয়া দিলেন, নিজের প্রাণ উৎসর্গ কবিয়া ভৈরবকে জাগাইলেন।*

এইকপ করিয়াই ভৈরবের জাগরণ হয়। স্বার্থের বন্ধনে জর্জর হইয়া, রিপুব আঘাতে আহত হইয়া মাহুষ যখন প্রত্যেকে পাশের লোককে আঘাত কবে ও আঘাত পায়—সেই প্রত্যেক আমার ক্রন্দনধ্বনি ভয়ানক বিশ্বব্জের মধ্যে সকল মাহুষেব প্রার্থনাকপে প্রলয়-নৃত্যে গজ্জন করিয়া উঠে।

“মরণের গান

উঠেছে ধনিষা পথে নবজীবনের অভিসারে

ঘোর অন্ধকারে—

যত হুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল

যত অশ্রুজল,—

যত হিংসা হলাহল

সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়া

কূল উল্লসিয়া,

উর্দ্ধ আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।”

মাহুষ বলে, “জাগো, ভৈরব জাগো! কঠিন আঘাতে সকল আঘাতকে নিরস্ত কর। সমস্ত বিশ্বের পাপ হৃদয়ে হৃদয়ে ঘরে ঘরে দেশে দেশে পুঞ্জীভূত—তুমি আজ সেই পাপ মার্জনা কর!”

সকিত বিশ্বপাপ যখন বিকটমূর্তি ধারণ করে, প্রেমিকের আত্মনিবেদনে ভৈরব তখন জাগিয়া উঠেন।

* সে মাসের Modern Review পত্রিকার “মুক্তধারার” ইংরেজি অনুবাদের পবিশিষ্টে ববীন্দ্রনাথ নিজে লিখিয়াছেন—“I must ask my readers to treat it as a representation of a concrete fact of psychology” এবং যুবরাজ অভিজিৎই যে নাটকখানির প্রধান পাত্র একপ আভাস দিয়াছেন। এইজন্মই এককণ আমবা যুবরাজ অভিজিতের কথা আলোচনা করিয়াছি। “মুক্তধারা” নাটকখানির মধ্যে অবশ্য অস্বাভাবিক অনেক কথা আছে, হুঃখ হইলে পরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা বহিল।

“স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে । অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ ক্ষীতিমাঝে দারুণ আঘাতে
বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি’ চূর্ণ করে তা’বে
কাল-ঝড়ঝঞ্ঝারিত দুর্ঘ্যোগ-আধারে ।
একের স্পর্শে কভু নাহি দেখ স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরূঢ় বিধান ।”

যে জাতি আপন শক্তি ও ধনসম্পদকেই সর্বাপেক্ষা
শ্রেয় জানে জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড কবিতা তুলিয়াছে,
প্রলয়-মূর্ত্তে তাহার সেই উদ্ধত ঐশ্বর্যের বিদীর্ণ প্রাচীর
ভেদ করিয়া রুদ্ধের মার্ক্কনা নাগিয়া আসে—

“গর্জমান বজ্রাগ্নিশিখা
সূর্যাস্তের প্রলয়লিখা

রক্তের বর্ষণে,

অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে ।”

যে জাতি আপন শক্তি ও সম্পদকে অবিশ্বাস করিয়া
জড়তা, দৈন্ত ও অপমানের মধ্যে নিষ্কীর্ব অসাড় হইয়া

পড়িয়াছে, দুর্ভিক্ষ ও মারী, প্রবলের অবিচার, আঘাতের
পব আঘাতের দ্বারা তাহাকে অস্থিমজ্জার কম্পাদিত
করিয়া ভৈরবের আবির্ভাব হয়। অন্ধকার রাত্রে রক্তের
বধচক্রের বজ্রগর্জনে মেদিনী বলির পঙ্খর হৃৎপিণ্ডের মত
কাঁপিয়া উঠে—প্রলয়দাহের রক্ত-আলোকে স্তূপাকার
পাপের দহনদীপ্তিতে ভৈরব আপনাকে প্রকাশ করেন । †
সমস্ত বন্ধন ভাঙ্গিয়া যায়, চলাচলের পথ জুড়িয়া বাজিতে
থাকে—

জয় ভৈরব জয় শঙ্কর

জয় জয় জয় প্রলয়ধর !

শ্রী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

† উদ্ধৃত অংশগুলি বলাকা (পৃঃ ৪৫, ৯৬, ৯৭, ১১৬, ১১৭),
চিত্রা (“এবার কিবাও মোবে”, পৃঃ ১৯), গীতালি (পৃঃ ৫০) ও নৈবেদ্য
(৬৫, পৃঃ ৭৪) হইতে এবং অস্ত্র কতকগুলি অংশ শান্তিনিকেতন, ১৭শ
খণ্ড, (“মা মা হিংসী”, পৃঃ ৪৭ ও “পাপের মার্ক্কনা” পৃঃ ৫৭-৫৯),
ধর্ম (“জুঃখ”, পৃঃ ১০৮) হইতে সামান্য পরিবর্তন করিয়া লওয়া
হইয়াছে ।

রবীন্দ্র-পরিচয়

[রবীন্দ্রনাথের শৈশব-রচনা একপ্রকার লোপ
পাইয়াছে বলিলেই চলে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা ঘাইতে
পাবে উনিশ কুড়ি বৎসর বয়সের পূর্বে লেখা বার হাজার
লাইন কাব্যসাহিত্যের মধ্যে প্রায় কিছুই আক্ষকালকার
প্রচলিত সংস্করণে পাওয়া যায় না । কিছুদিন হইল
রবীন্দ্র-সাহিত্য-সূচী (Bibliography) সংকলন করিতে
আরম্ভ করিয়াছি । এই সূচী-সংকলন কার্যের সঙ্গে সঙ্গে
রবীন্দ্র-সাহিত্যের কালানুক্রমিক পরিচয় দিবার ইচ্ছা
আছে । নিদর্শন-স্বরূপ বাগ্য-রচনা হইতে কোন কোন
অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিব । এই সময়ের অধিকাংশ লেখা
স্বাক্ষর নাই । এখন কিছু কিছু উদ্ধার করিয়া না
রাখিলে পরে আব কোন চিহ্ন মাত্র থাকিবে না । সংকলন
যেমন অগ্রসর হইবে রবীন্দ্র-পরিচয়ও তেমনি বাহিব
হইতে থাকিবে ।* এইরূপ খণ্ড খণ্ড ভাবে কার্যে

অগ্রসর হওয়ায় সমালোচনার ধারাবাহিক ঐক্যমুদ্রগুলি
বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবারই সম্ভাবনা । তাই মনে রাখা
আবশ্যক যে “রবীন্দ্র-পরিচয়” সাহিত্য-সমালোচনা
নহে, সমালোচনার পূর্বাভাস মাত্র ।]‡

কবিকাহিনী

চতুর্থ সর্গ

চতুর্থ সর্গে নলিনী বয়স্ক কবির শোকোজ্জ্বল,
ক্রমে শান্তিলাভ ও পবে বুদ্ধবয়সে কবির স্থখ-দুঃখ ও

‡ শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় প্রবাসী-সম্পাদকের নিকট
লিখিয়াছেন যে “বনফুলের” পরিচয় পড়িয়া তাহার মনে হইয়াছে যে
বনফুলে “বন্ধিম-বাবুর কপালকুণ্ডলাব প্রভাবও বেশ অনুভূত হয় ।”
তিনি অনেকগুলি উদাহরণ দিয়া নিজের কথা সমর্থন করিয়াছেন ।
লেখক মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে আমার কোন মতভেদ নাই ।

রবীন্দ্রনাথের উপর সমসাময়িক বাংলা লেখকদিগের প্রভাব সন্ধ্যা
পবে আলোচনা কবিবাব ইচ্ছা আছে তাহা পূর্বেই বলিয়াছি,
(প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২৮, পৃ ৭৫১) । পত্রলেখক মহাশয় কপালকুণ্ডলা
ও বনফুল সন্ধ্যা বাহা লিখিয়াছেন তাহা দেই সময় ছাপাইয়া দিবার
ইচ্ছা বহিল ।

* পূর্বে প্রকাশিত ; “দেশ বিদেশের প্রভাব” প্রবাসী, মাঘ, ১৩২৮ ।
“বনফুল” বাস্তব, চৈত্র, ১৩২৮ । “কবি-কাহিনী”, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ ।

আশার কথা এবং কবির মৃত্যু বর্ণনা করিয়া কাব্য শেষ হইয়াছে। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

ইহাব মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে—তরুণ কবির পক্ষে এইট বড় উপাদেয়, কাবণ, ইহা শুনিতে খুব বড় এবং বলিতে খুব সহজ। নিজেব মনেব মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরেব মুখের কথাই যখন প্রবান সম্বল তখন বচনাব মধ্যে সবলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। তখন, যাঁহা স্বতই বৃহৎ, তাহাকে বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ কবিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায় তাহাকে বিকৃত ও হান্তকর করিয়া তোলা অনিবার্য। (১)

ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের কথা খুব ঘটা কবিয়া বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজের পরিণত বয়সেব লেখার সহিত তুলনা কবিয়া ইহাকে যতটা হাস্যকর মনে করিতেছেন আমবা সেকপ মনে কবি না।

নলিনীর মৃত্যুর পব কবির মনে প্রথমই এই প্রশ্ন উঠিল যে সত্যই কি সমস্ত ফুরাইয়াছে? যে মাহুষ এমন একান্ত সত্য ছিল সে কি একমুহূর্তেই সম্পূর্ণ মিথ্যা হইয়া গেল? মৃত্যুব পবে কি আর কিছুই থাকিবে না?

কালের সমুদ্রে এক বিষেব মতন
উঠিল, আবার গেল মিলায়ে তাহাতে ?

এই ভালবাসা। যাঁহা ক্ষণে মনে
অবশিষ্ট বাখে নাই এক তিল স্থান,
একটি পার্শ্বব ক্ষুদ্র নিঃশ্বাসেব সাথে
মুহূর্তে হবে কি তাহা অনন্তে বিলীন? (২)

শোকাচ্ছন্ন কবি তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া দেখিল কালশ্রোতে সমস্তই ডাসিয়া চলিয়াছে কিছুই স্থির নাই।

হিন্দুস্ত্রির এই শুদ্ধ আঁধার গহ্বরে
সময়ের পদধ্বনি গণিতেছি বসি,
ভবিষ্যৎ ক্রমে হইতেছে বর্তমান,
বর্তমান মিশিতেছে অতীত সমুদ্রে।
অন্ত যাইতেছে নিশি আসিছে দিবস,
দিবস নিশার কোলে পড়িছে দুমায়ে।
এই সময়ের চক্রে ঘুরিয়া নীরবে
পৃথিবীবে মানুষেবে অলঙ্কিত ভাবে
পরিবর্তনের পথে যেতেছে লইয়া। (৩)

কবি বুঝিল কালশ্রোতে সমস্তই চলিয়াছে কিন্তু কিছুই বিলীন হইতেছে না, অনন্ত কালের মধ্যেই

থাকিয়া যাইতেছে। প্রকৃতির দিকে চাহিয়া কবি দেখিল পাখীরা গান করিতেছে, কাননে বায়ু বহিতেছে, উপত্যকায় ফুল ফুটিতেছে, কেহ চূপ করিয়া বসিয়া নাই। প্রকৃতিব প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া কবি নিজেব শোক তুলিল।

ধীবে ধীবে দুব হতে আসিছে কেমন
বসন্তেব অবশিষ্ট বাতাসেব সাথে
মিশিয়া মিশিয়া এই সবল বাগিণী।

* * *
কখনো মনে হয় পুরাতন কাল
এই বাগিণীব মত আছিল মধুব,
এমনি স্বপনময় এমনি অশ্রুট;
তাই শুনি ধীবি ধীবি পুরাতন স্মৃতি
প্রাণেব ভিতর যেন উধলিয়া উঠে। (১)

কবির বার্কক্য

ক্রমে কবির বার্কক্য উপস্থিত হইল। শ্বেতজটা-সমাকীর্ণ গম্ভীরমুখশ্রী বৃদ্ধ কবি হিমালয়ের পাদদেশে বসিয়া গান করিতেছেন।

কি সুন্দর সাজিয়াছে ওগো হিমালয়,
তোমার বিশালতম শিখরেব শিবে
একটি সজ্জাব তাবা। স্বনীল গগন
ভেদিয়া তুমারশুভ্র মস্তক তোমাব।

* * *
শিখরে শিখরে ক্রমে নিভিয়া আসিল
অন্তর্যাম তপনের আবৃত্তি কিবণে
প্রদীপ্ত জ্বলমচূর্ণ। শিখরে শিখরে
মলিন হইয়া এল উজ্জল তুমাব,
শিখরে শিখরে ক্রমে নামিয়া আসিল
আঁধারের যবনিকা ধীবে ধীবে ধীবে।
পর্কতেব বনে বনে গাঢ়তব হল
ঘুমরষ অন্ধকার, গম্ভীর নীবব।
সাড়ানক নাই মুখে অতি ধীবে ধীবে
অতি ভরে ভরে যেন চলেছে তটিনী
স্বপ্নস্তীর পর্কতের শতল দিবা। (২)

কবির মনে পড়িল এই হিমালয় যুগের পর যুগ মানব-সভ্যতার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কত পাপ কত রক্তপাত কত অত্যাচার তাহার চোখে পড়িয়াছে, স্বাধীনতা হারাইয়া মাহুষ কিকপ হীনতায় নিমজ্জিত হয় তাহা দেখিয়াছে—

(১) জী.স্মৃ পৃ ১০৭।

(২) ক.-কা পৃ ৩৮-৩৯। ভা. চিত্র. ১২৮৪, ৩৯৩ পৃ।

(৩) ক.-কা ৪০ পৃ। ভা. ৩৯৪ পৃ।

(১) ক.-কা ৪৩ পৃ। ভা. ৩৯৫ পৃ।

(২) ক.-কা ৪৪-৪৫ পৃ। ভা. ৩৯৫ পৃ।

দাসত্বের পদধূলি অহংকার কোরে
মাধায় বচন করে পরপ্রত্যাশীয়া ॥
যে পদ মাধায় করে হৃদায় আঘাত
সেই পদ ভক্তিভরে কবে পো চূষন ।
যে হাত জাতিবে তার পরায় শৃঙ্খল,
সেই হাত পরশিলে স্বর্গ পায় করে ।
স্বাধীন সে স্বাধীনের দলিবার তরে,
স্বাধীন, সে স্বাধীনের গুলিবারে শুধু ।
সবল, সে দুর্বলের পীড়িতে কেবল,
দুর্বল, বলের পদে, আস্র বিসর্জিতে । (৬)

অন্ত দিকে সভ্যতার নামে কি অত্যাচারই চলিয়াছে ।

সামান্স নিজের স্বার্থ করিতে সাধন
কত দেশ করিতেছে শ্রমণ অরণ্য
কোটি কোটি মানবের শাস্তি স্বাধীনতা,
রক্তময় পদাঘাতে দিতেছে ভাঙ্গিয়া,
তবুও মানুষ বলি গর্ব করে তাবা,
তবু তাবা সভা বলি কবে অহংকার ! (৭)

এইসব কথা শ্রবণ কবিয়া কবির মন অত্যন্ত পীড়িত
হইয়া উঠিল, কিন্তু তথাপি তিনি বিশ্বাস হারাইলেন না,
আসন্নমৃত্যু কবি ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া শাস্তিলাভ
করিলেন—

কবে দেব, এ বড়নী হবে অবসান ?
মান করি প্রভাতের শিশির-সলিলে
তরুণ রবির কবে হাসিবে পৃথিবী ।
অমৃত মানবগণ এক কণ্ঠে দেব,
এক গান পাইবেক স্বর্গ পূর্ণ কবি ;
নাহিক দক্ষিণ, ধনী, অধিপতি, প্রজা ;
কেহ কারো কুটাম্বতে করিলে গমন
মর্যাদার অপমান কবিবে না মনে,
সকলেই সকলেব করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নব, নহে কাবো দাস ।

* * *

সে দিন আসিবে গিরি এখনই যেন
দুব ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবন্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানব-হৃদয় । (৮)

কবি কিন্তু জানেন সে দিনেব এখনো দেরি আছে—

প্রকৃতির সব কাণ্ড অতি ধীরে ধীরে,
এক এক শতাব্দীর দোপানে দোপানে,
পৃথ্বী সে শাস্তির পথে চলিতেছে ক্রমে,
পৃথিবীর সে অবস্থা আসিনি এখনো,
কিন্তু একদিন তাহা আসিবে নিশ্চয় । (৯)

পনেরো মৌল বৎসর বয়সের লেখাষ বিশ্বপ্রেমেব যে
আদর্শ ফুটিয়াছে তাহা খুব গভীর না হইতে পারে, কিন্তু
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে তাহা বিশ্বপ্রেমেরই আদর্শ
বটে । বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ যখন আদর্শ কবিকীবনেব
কথা কল্পনা করিয়াছেন তখন জগৎজোড়া শাস্তি, সমস্ত
মানবজাতিকে লইয়া বিশ্বপ্রেমের আদর্শ দিয়াই কবি-
চরিত্রের শেষ পরিণতি দেখাইয়াছেন, স্বাদেশিকতার
আদর্শ বা স্বাধীনতাবোধের চরম অভ্যুদয়কে উজ্জল
করিয়া তুলেন নাই ।

কাব্যের পক্ষে অনাবশ্যক হইলেও এই চতুর্থ সর্গটিকে
আমরা সম্পূর্ণরূপে একটি আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে
করি না । আমাদের বিশ্বাস বনফুলের স্নায় কবিকাহিনীর
বিষয় নির্বাচনের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্তর্নিহিত
সত্য আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে । বালক রবীন্দ্রনাথ
যখন কবিকাহিনী লিখিয়াছিলেন তখন হয়ত নিজেরই
জানিতেন না যে সেই লেখাষ মধ্যে তাহার নিজের
পরবর্তী জীবনের ছায়া পড়িয়াছে । ছেলেমানুষী হইলেও
এই বয়সের লেখাষ বিশ্বপ্রেমেব কথাকে একেবারে
হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না ।

রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই বলি—

“কেহ যদি মনে করেন এ সমস্তই কেবল কবিতা, তাহা
হইলে ভুল কবিবেন । পৃথিবীর একটা বয়স ছিল যখন তাহার ঘন
ঘন ভূমিকম্প ও অগ্নি-উজ্জ্বলতার সময় । এখনকার প্রবীণ পৃথিবীতেও
মাঝে মাঝে সেরূপ চাপল্যেব লক্ষণ দেখা দেয়, তখন লোকে আশ্চর্য
হইয়া যায় ; কিন্তু প্রথম বয়সে তাহাব আবরণ এত কঠিন ছিল না
এবং ভিত্তবকার বাষ্প ছিল অনেক বেশি, তখন সর্বদাই অস্তাবনীর
উৎপাতের তাণ্ডব চলিত । তরুণ বয়সের আবর্তে এও সেই রকম
একটা কাণ্ড । (১০)

শ্রী প্রশান্তচন্দ্র মতলানবিশ

(৬) ক.-কা. ৭৭ পৃ। ভা. ৩৯৬ পৃ।

(৭) ক.-কা. ৪৮ পৃ। ভা. ৩৯৬-৩৯৭ পৃ।

(৮) ক.-কা. ৪২-৪৩ পৃ। ভা. ৩৯৭ পৃ।

(৯) ক.-কা. ৪১ পৃ। ভা. ৩৯৮ পৃ।

(১০) জী.-স্ব. ১০৬ পৃ।

কণ্ঠ পাথর



প্রথম চিঠি

বধূর সঙ্গে তার প্রথম মিলন, আর তার পবেই সে এই প্রথম এসেচে প্রবাসে।

চলে' যখন আসে তখন বধূর লুকিয়ে-কান্নাটি ববের আঁখনার মধ্যে দিয়ে চকিতে গুর ফোঁড়ে পড়ল। মন বললে, “কিবি, দুটো কথা বলে আসি।” কিন্তু সেটুকু সম্ভব ছিল না।

সে দুবে আসচে বলে' একজনের দুটি চোখ বেয়ে জল পড়ে, তার জীবনে এমন সে আর কখনো দেখেনি।

পথে চলবার সময় তার কাছে পড়ন্ত বোদ্ধা বে এই পৃথিবী প্রেমের ব্যথার ভরা হয়ে দেখা দিল। সেই অসীম ব্যথার ভাঙাবে তার মত একটি মানুষেরও নিমন্ত্রণ আছে সেই কথা মনে কবে' বিস্ময়ে তার বুক ভরে উঠল।

যেখানে সে কাজ করত এসেচে সে পাহাড়। সেখানে দেবদারুণ ছায়া বেয়ে বাঁকা পথ নীরব মিনতির মত পাহাড়কে জড়িয়ে ধরে, আর ছোট ছোট ঝর্ণা কাঁকে বেন আড়ালে আড়ালে খুঁজে বেড়ায় লুকিয়ে চুপিয়ে।

আঁখনার মধ্যে যে ছবিটি দেখে এসেছিল আজ প্রকৃতির মধ্যে প্রবাসী সেই ছবিটিই আশাস দেখে, নববধূর গোপন ব্যাকুলতা ছবি।

২

আজ দেশ থেকে তার স্ত্রীর প্রথম চিঠি এল।

লিখেচে, “তুমি কবে ফিরে আসবে? এসো এসো, শীত্র এসো। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।”

এই আসা-যাওয়ার সংসারে তারও চলে' যাওয়া তারও ফিরে আসাও যে এত দাম ছিল একথা কে জানত? সেই দুটি আঁখুর চোখের চাউনিব সামনে সে নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেখলে, আর তার মন বিস্ময়ে ভরে উঠল।

ভোর-বেলায় উঠে চিঠিখানি নিয়ে দেবদারুণ ছায়ায় সেই বাঁকা পথে সে বেড়াতে বেরল। চিঠির পরশ তার হাতে লাগে, আর কানে যেন সে শুনতে পায়, “তোমাকে না দেখতে পেয়ে আমার জগতের সমস্ত আকাশ কান্নায় ভেসে গেল।”

মনে মনে ভাবতে লাগল, “এত কান্নার মূল্য কি আমার মধ্যে আছে?”

৩

এমন সময় সূর্য উঠল। পূর্বদিকের নীল পাহাড়ের শিখরে দেবদারুণ শিশির-ভেজা পাতার ঝলরেব ভিতর দিয়ে আলো ঝিলঝিল কবে' উঠল।

হঠাৎ চাবিটি বিদেশিনী মেয়ে দুই কুর সঙ্গে নিয়ে বাস্তাব বাঁকের মুখে তার সামনে এসে পড়ল। কি-জানি কি ছিল তার মুখে, কিছা তার মাঝে, কিছা তার চাল-চলনে।—বড মেয়ে-দুটি কোঁকুকে মুখ একটুখানি ঝাঁকিয়ে চলে' গেল। ছোট মেয়ে-দুটি হাসি চাপ্‌বাব

চেঁটা কবলে, চাপ্তে পাবলে না; দুজনে দুজনকে তেঁতাঁলি কবে' খিলখিল কবে' হেসে ছুটে গেল।

কটিন কোঁকুকেব হাসিতে ঝর্ণাগুলিরও হুব দিবে গেল। তাবা হাততালি দিয়ে উঠল। প্রবাসী মাথা ঝেঁট করে' চলে আর ভাবে—“আমার দেখার মূল্য কি এই হাসি?”

সেদিন রাত্তার চলা তার আর হল না। বাসায় ফিরে গেল; একলা ঘরে বসে' চিঠিখানি খুলে পড়লে, “তুমি কবে ফিরে আসবে?” এসো এসো, শীত্র এসো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।”

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, বৈশাখ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী,

আমের মঞ্জরী,

আজ হৃদয় তোমার উদাস হবে

পড়চে কি কবি?

আমার গান যে তোমার গঞ্জে মিশে

দিশে দিশে

ফিরে ফিরে কেবে গুল্লবি।

পূর্ণিমা-চাঁদ তোমার শাখায় শাখায়

গন্ধ সাপে আগুন আলো মাখায়,

(ঐ) দখিন বাতাস গঞ্জে পাগল

ভাঙল আগল

যিবে যিবে ফিরে সঞ্চরি।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮শে কানুন, ১৩২৮।

তোমার হৃদের ধারা বয়ে যেথায়

তারি পাবে

দেবে কি গো বাসা আমায়

একটি ধাবে।

আমি শুনব ধনি কানে,

আমি ভুব ধনি প্রাণে,

সেই ধনিত্তে চিন্তাবীণায়

তার বাঁধিব বাবে বাবে।

আমার নীরব বেলা সেই তোমারি

হুয়ে হুবে

ফুলের ভিতর মধুর মত

উঠবে পুরে।

আমার দিন ফুরাবে যবে

বাজি আঁধার হবে,

সদয়ে মোব গানের তারা

উঠবে ফুটে সাবে সাবে।

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, বৈশাখ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাস্তব-পূর্ণিমা, ১৩২৮।

ভারতবর্ষের প্রভাব

এ্যাসিরিয়ান ও ব্যাবিলোনীয়নবা যে অক্ষব ব্যবহার কৃত, পাশ্চাত্যরা তাব নাম রেখেছেন কিউনিকবুম্ । পেবেকের মত মোটা আরম্ভ থেকে এর সব অক্ষব ক্রমে সৰ্দ্ধ হয়ে গেছে বলেই এই নাম । প্রাচীনকালে দ্রুবকম অক্ষরের সাফাং পাওয়া যায়—এক-রকম ভাবেব চিত্র, অষ্টটি শব্দ-বিশেষ প্রকাশ কবে । কিন্তু হিতাইতদের যে-সব লেখা পাওয়া যাচ্ছে—এই দুই-রকমেব সম্মিলন থেকে তাবা হয়েছে ।

এ্যাসিরিয়া-বাবিলনের কোথাগাবেব দপ্তবেব মধ্যে প্রাপ্ত নানা বিদেশের নাম এবং সেই-সব ভাষাব শব্দেব মধ্যে একটি কথা হচ্ছে দানতে (বহুবচনের রূপ), তাব মানে দান করা । তেমনি সংখ্যাবাচক শব্দও পাওয়া গেছে এক, তিন, পাঁচ, প্রভৃতি ।

হিতাইতদের অনেক কথা যে আৰ্য্য-ভাষা থেকে পাওয়া তা নিঃসন্দেহ, কিন্তু তা থেকে প্রমাণ হয় না যে তাবা আৰ্য্য ছিলেন । এসিয়া-মাইনর তৎকালেব সম্ভ্রাজ্যতিদেব মিলনেব ক্ষেত্র ছিল । এখানে যেমন সংস্কৃত দেবতাব নাম পাওয়া গেছে, তেমনি গ্রীক প্রভৃতি আৰ্য্য-ভাষাব সঙ্গেও তাদেব অনেক কথাব ঘনিষ্ঠ যোগ আছে ।

তা হলে বলতে হবে, আৰ্য্য-সভ্যতাব দুই প্রবাহ,—এক ধাব পূর্বে, অষ্ট ধাব পশ্চিমে ধাবার সময়, এ্যাসিরিয়া ব্যাবিলন ককেশস প্রভৃতি যে-সব দেশ দিয়ে গেছে, তাব সঙ্গে তাদের যোগ হয়েছে । কিছু তাবা নিয়েছে, কিছু দিয়েছে । খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ শতাব্দীতে এসিয়া-মাইনরে প্রাচীন জাতিদেব সঙ্গে এই দুই ধাবাব যে ঘনিষ্ঠ যোগ হইছিল তার প্রমাণেব অভাব নেই ।

ভাবতবর্ষে আৰ্য্যজাতি যে খৃষ্টপূর্ব সহস্র বৎসবেব পূর্বে প্রবেশ কবেছিলেন, তা মনে করাব মত প্রমাণ নেই ।

খৃঃ পূঃ চতুর্দশ শতাব্দী মানব-ইতিহাসেব একটি আশ্চর্য্য সময় । হঠাৎ সে সময়ে আৰ্য্য-জাতিব মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল । ফুলেব মত ফুটে উঠে তার সভ্যতা চারিদিকে তখন ছড়িয়ে পড়ছে, তাব একটি পরিণতিব বিকাশেব পরিচয় পাওয়া যায় । গ্রীকের আইয়েনিয়াতে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইবে উঠেচে । আৰ্য্য-জাতিব এক শাখা,—ইটলিয়রা, বোমে গিয়ে বাস করছে । গ্রীক অক্ষবে এই সময়ে লেখা ১৫০০ শ্লোক মমিব মধ্যে পাওয়া গেছে । ইউফ্রেটিসেব ধাবে ধাবে আৰ্য্য-জাতিব একটি বিপুল দান তখন পূর্বদিকে গড়িয়ে চলেছে ; সমস্ত পৃথিবীতে অকস্মাৎ সভ্যতা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল । ইতিহাসে এ একটা মস্ত ঘটনা ।

মিতানি রাজ্যের ইতিহাসেব মধ্যে বৈদিক যুগেব একটা ইতিহাস জড়িয়ে আছে । মানচিত্রে ইউফ্রেটিস নদীব বাকের মধ্যে এই জায়গাটি পার হইবে সেকালে লোকে ইয়েবোপ থেকে এসিয়া-মাইনরে আসত । —সমুদ্র-পথে বেল্লীদুর কোথাও যাওয়া তখন সম্ভবপর হব নি—ডাঙ্গাপথে ক্রমে ক্রমে আর্মিনিয়া মিতানি হয়ে পাবস্ত-উপসাগরে আসাবাব সহজ পথ মিতানিব ভিতর দিয়ে ছিল—ক্রমে সেখান থেকে বোলান পাস পার হয়ে ভাবতবর্ষে আসা যেত । ২২০ খৃষ্টাব্দে যে বংশ চীনদেশে রাজত্ব কবতেন তাঁদের কথা-প্রসঙ্গে রোমক সাম্রাজ্যের পথেব বর্ণনা আছে—মকছুমি পাব হয়ে এই পথ মিতানিব ভিতর দিয়ে গেছে । এই জায়গাটি সকলেব মিলন-ক্ষেত্রেব মত ছিল । পশ্চিম-পূর্বেব এই চৌমাথা পথ, বৈদিক ভাবতীয়দেব আগমনের প্রবাহ-পথ নিঃসন্দেহ একদিন ছিল । এ্যাসিরিয়া ভারতীয় আৰ্য্যদেব কাছে কিছু পেয়ে থাকলে এখানেই তা পাবাব সম্ভাবনা ছিল । আবও অনেক প্রাচীন যাত্রীদের সঙ্গে এদেব মিলন হইবে থাকবে । বৈদিক ভাবতবর্ষ

পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিব সংস্পর্শেই এই বকম ক’রে এসেছিল এবং নিঃসন্দেহে নানা দিক থেকে তাদেব আদান-প্রদান হয়ে থাকবে । এ্যাসিরিয়া ও ব্যাবিলোনিয়াব ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ভারতবর্ষ কি ক’বে এসেছিল, এই আলোচনা থেকে কতকটা আমরা বুঝতে পারি ।

খৃঃ পূঃ ৭৮০ অব্দে ভারতবর্ষ ও ব্যাবিলনের মধ্যে বাণিজ্যের যোগ ছিল ।

খৃষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীতে ৮ খৃষ্টাব্দে ২য় মস্ত্রে “মনহিরবা” এক পাওয়া যায় । এখন “মন” শব্দটি সংস্কৃত বলে মনে করলে, এব কোন মানেই হয় না । এটি মূল আসিরীয় শব্দ, একে এখানে এ্যাসিরীয় ভাবে ‘পরিমাণ’ অর্থে ধরতে হবে । এ বকম দৃষ্টান্ত নানাদিকে আছে । ভাবতীয়বা যেমন বিদেশীয়দেব দান কবেছে, তেমনি গ্রহণ করতেও তাদেব কৃতা ছিল না ।

শতপথ-ব্রাহ্মণে যে জলদানবের কাহিনী আছে সেটি আসিরীয় প্রলয়-দানবের অনুরূপ বলে মনে হয় । কাবণ যদিও আসিরীয় সাহিত্যে এ কাহিনী নানাক্রমে দেখা যায়, বৈদিক সাহিত্যে একবার মাত্র একে দেখতে পাই । এই-বকমে দুই দেশেব সভ্যতাব আদান-প্রদানের ইতিহাসটা স্পষ্ট হয়ে আসে ।

পাবস্তেব সঙ্গে ভারতের যে যোগ তাব আবস্ত হচ্ছে সাইবাসের সময় থেকে (৫৪২-৬২৯ খৃঃ পূঃ) । তিনি ভাবতেব পশ্চিম প্রান্তে কপিষ (Kapissa) বলে এক নগর অধিকার কবে’ ধ্বংস কবেন । এব উল্লেখ আমবা সংস্কৃত সাহিত্যে পাই ।

তাব পূর্ব ভাবতীয়বা পাবসিকদেব সংস্পর্শে আসে দাবিয়াসেব সময়ে । ব্যাবিলন জয় কবে’ তিনি Archosia অধিকার করেন । এটিকে অনেকে সম্বতী বলে থাকেন । তাব বড় কাজ হচ্ছে—সিঙ্কুনদী আবিষ্কার কববার ক্ষেত্রে একটি অভিযান পাঠান । সে অভিযানের নায়ক ছিলেন—Seylex বলে এক গ্রীক ।

দাবিয়াসেব অনেক অশুশাসন আবিষ্কৃত হইছে, অনেকে মনে করেন তারই অমুকরণে অশোক তাঁব লিপি বাব কবেন । তবে দাবিয়াস কেবল রাজদেব কথাই বলেছেন, অশোক জ্ঞান-ধর্মের কথা ঘোষণা কবেছেন । তাঁর অশুশাসনে আমবা গাঙ্কাব ও হিন্দুকুশেব উল্লেখ পাই ।

বস্তক-জাতক থেকে আমরা জানতে পাবি যে ভাবত থেকে কতকগুলি বণিক প্রথমে কাক ও পরে ময়ূব বিক্রয় কবতে বস্তক-বাষ্ট্রে যায় ।

বস্তক অর্থে ব্যাবিলনকেই বোঝায় । জাতকের লেখক এশমটি বোধ হয় পাবসিকদেব কাছ থেকে পেয়েছিলেন, কাবণ পাবসিক ভাষায় “জ” স্থানে “ব” হয় ।

অমুমান ৪৫০ খৃঃ পূঃ অব্দে গ্রীসে ময়ূবেব কথা শোনা যায় । সে সময় Pericles-এব এক বন্ধুই প্রথম ময়ূব গ্রীসে আমদানী কবেন—সম্ভবত পারস্য থেকেই । প্রাচীন আসিরীয় সাহিত্যে ময়ূবেব কোথাও উল্লেখ নেই । সীসীবোর সময়ে (খৃঃ পূঃ) কেবল ধনী গ্রীকরা ময়ূবেব মাংস আহাব কবতে পাবত । অশোকের সময়েও ভারতে ময়ূবেব মাংস আহাৰ্য্যরূপে ব্যবহৃত হত । সনে হব পাবস্ত থেকেই ক্রমশঃ ময়ূব গ্রীসে প্রচলিত হয়েছিল ।

(শান্তিনিকেতন পত্রিকা, বৈশাখ) শ্রী নিল্‌ড্য নেভি

মাটির গান

কিরে চল মাটির টানে ;
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে
মুখের পানে ।
যাব বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেচে,
হাসিতে যাব ফুল ফুটেচে যে,
ডাক দিল যে গানে পানে ।
দিক্ হতে ঐ দিগন্তরে
কোল রবেচে পাতা,
জন্মমরণ ওরি হাতেব
অলখ হুতোয় পাঁখা ।
ওব জন্ম-পলা জন্মের ধারা
মাগব পানে আশ্রয়বাণে,
প্রাণের বাণী বয়ে আনে ॥

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, বৈশাখ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর .
২৩শে কাশ্বিন, ১৩২৮

মাতৃদেব কার্যক্ষেত্র

জগতে পুরুষদিগের মধ্যে ঐহারা মহত্তম বলিয়া বিদিত, তাঁহারা পারিবারিক কোন-না-কোন সম্বন্ধে আদর্শস্থানীয় ছিলেন বলিয়াই মনুষ্যসমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেন নাই । তাঁহাদের সাধনা ও সিদ্ধি ক্ষেত্র পরিবারের গভীকে অতিক্রম করিয়াছিল ।

পুরুষজাতীয় মানুষেরা প্রধানতঃ পিতা, পুত্র, পতি, বা জ্ঞাতা রূপে বিচাৰিত হন না, মানুষ বলিয়াই বিচাৰিত হন । তাঁহারা পারিবারিক জীবনের কর্তব্য কবিয়াই জনসমাজের দাবী হইতে নিষ্কৃতি পান না । মানুষেরা তাঁহাদের নিকট হইতে আবও কিছু চায় । তাঁহারা বিশ্বনিয়ন্তা ও বিশ্ব-নিয়মকে কি পরিমাণে জানিবা পরব্রহ্মের সহিত কি সম্বন্ধ স্থাপন কবিত্তে পারিয়াছেন, নিজেদের ও অপরের আত্মার কি উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, দেশকে জাতিকে জগৎকে তাঁহারা কি চুঃখ-চুঃখিত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, কাব্য চিত্র প্রভৃতি বচনা কবিয়া তাঁহারা মানুষকে কি আনন্দ অমুপ্রাণনা ও শিক্ষা দিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবিক আবিষ্কার দ্বারা কি বহুস্ত উদ্ভেদ কি তত্ত্ব নিষ্কাশন কি সন্দেহের সীমাংসা কবিয়াছেন, মানুষ তাহা জানিতে চায় ।

আমরা আমাদের শিক্ষা ও জ্ঞানের জন্ত সভ্যতাব জন্ত কেবলমাত্র পিতা মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের নিকটেই স্বণী নহি ; সমুদয় সমাজ, সমুদয় জগৎ, সাক্ষাৎ বা পর্বোক্ত ভাবে আমাদের শিক্ষক ও আনন্দদাতা । হুতবাং আমরা সকলেই নবনাবী-নির্ধ্বিশেষে সমাজের, দেশের, জাতির ও জগতের স্বণ শোধ করিতে বাধ্য । ঈশ্বরদত্ত সমুদয় শক্তির সুব্যবহার কবিলে আমরা কিংব পরিমাণে এই স্বণ শোধ করিতে পাৰি ।

পারিবারিক জীবনের বাহিরে নাবীবও কীৰ্ত্তি আছে । তথাপি, নাবীবা প্রধানতঃ তাঁহাদের পারিবারিক জীবন দ্বাবাই বিচাৰিত হন । কিন্তু তাঁহারা ঐহাদের সহিত পারিবারিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ তাঁহাদের প্রতি কর্তব্য সমাপন করিয়াও তাঁহারা মানবসমাজের জন্তও কিছু করিতে পারেন । অনেক নাবী তাহা কবিয়াছেন । পুরুষদের মত তাঁহারাও তাঁহাদের শিক্ষা, জ্ঞান, সম্ভাভা ও আনন্দের জন্ত পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন ভিন্ন জগতের নিকটেও সাক্ষাৎ ও পর্বোক্তভাবে স্বণী ; এবং এই স্বণ শোধ করা তাঁহাদেরও কর্তব্য । তন্ত্ৰিন, ভগবান্

নাবীদিগকেও আত্মা দিয়াছেন এবং নানা গুণ ও শক্তি দিয়াছেন । হুতবাং আত্মাব উৎকর্ষ-সাধন ও এই-সকল গুণ ও শক্তির সুব্যবহার করা তাঁহাদেরও কর্তব্য । জগৎকে আনন্দ, অমুপ্রাণনা ও শিক্ষা দিবাব জন্ত, মানবের চুঃখ-চুঃখিত মোচনের জন্ত পুরাণেরা যত-বকম কাজ কবেন, মহিলারাও তাহা করিতে পারেন, এবং তাহা কবা তাঁহাদের উচিত ।

নাবীব মাতৃদেব তাঁহাব একটি প্রধান বৃত্তি, ধৰ্ম্ম, ও স্বরূপ ; কিন্তু তাহাই তাঁহাব একমাত্র বৃত্তি, ধৰ্ম্ম ও স্বরূপ নহে । পুরুষ যেমন আত্মা, নাবীও তেমনই আত্মা । পুরুষ যেমন মানুষ, নাবীও তেমনই মানুষ । আমরা নাবীব নিকট অবগুই এই আশা কবিব, যে, তিনি হুঃখতা, হুঃখপিনী, হুঃপত্নী ও হুঃমাতা হইবেন ; অবগুই এই আশা কবিব, যে, তিনি নাবীপ্রকৃতির সমুদয় সদগুণে ভূষিত হইবেন । কিন্তু এ আশাও কবিব, যে, তিনি মহৎ মানুষ হইবেন, শ্রেষ্ঠ মানুষ হইবেন, সেই-সব গুণ ও শক্তির বিকাশ তাঁহাতে হইবে বাহা নাবী ও পুরুষ উভয়েই সাধাবণ সম্পত্তি, সেই-সব কাজ তিনি কবিবেন বাহা লোক-শ্রেয়ঃ সাধনার্থ ও জগতের স্বণ পৰিশোধার্থ পুরুষ ও নাবী উভয়েই করিতে পাবেন এবং উভয়েই কর্তব্য, সেই-সব আধ্যাত্মিক সাধনা ও সিদ্ধি তাঁহাব হইবে বাহা মহিলা ও পুরুষ উভয়েই হয় ও হইতে পাবে, কেন-না উভয়েই জীবাত্মা এবং উভয়ের সহিতই পরমাত্মাব একই প্রকার সম্বন্ধ ।

পরিবারের মধ্যে হুঃমাতৃদেব চাই, পরিবারের বাহিরে হুঃমাতৃদেব চাই । শিশুর কল্যাণের জন্ত বাহা-কিছু প্রয়োজন, তাহার ব্যবস্থা কবাব নাম হুঃমাতৃদেব । আমরা যদি নিজের বর বাড়ী খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখি, কিন্তু পাড়া গ্রাম নগর দেশ মহাদেশ অস্বাস্থ্যকর বা মহা-মাবীগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে বোগের বীজ আমাদের বাড়ীতেও আসিতে পাবে । হুঃমাতৃদেব কার্যক্ষেত্রে গৃহস্থালীব বাহিবেও বিস্তৃত না হইলে গৃহস্থালীর মধ্যে উহা ব্যর্থ হইবাব সম্ভাবনা আছে ।

ইহা যে কেবল শারীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধেই সত্য তাহা নহে । হৃদয়-মনের পক্ষেও ইহা সত্য ।

শিশুর সমুদয় মানসিক পৰিবেষ্টন তাহার জ্ঞান ও হুঃগুণলাভের অমুকুল হওয়া আবগুক । এই দিকে দৃষ্টি রাখা ও তাহার ব্যবস্থা কবা হুঃমাতৃদেব কাজ ।

সবাই স্বপ্নী না হইলে কেহ সম্পূর্ণ স্বপ্নী হইতে পারে না, সকলে জ্ঞানী না হইলে কেহই মূৰ্খতা ও কুসংস্কারের হাত হইতে পূর্ণ মুক্তি পাইতে পারে না, সকলে নীবোপ না থাকিলে কেহই সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ সম্বন্ধে নিরুদ্বেগ হইতে পারে না, সকলে যথেষ্ট ভোজনে পুষ্ট না হইলে অতি-ধনীও দাবিজাজনিত সংক্রামক বোগের কবলে পড়িতে পারে, সকলে নীতিমান্ সচবিদ্র এবং চিন্তা ভাব কল্পনা কথা কাজ ও ভক্তিতে গুচি না হইলে সাধু ব্যক্তিদেবও গুচিভা মান হইয়া যায় । এই-সব কথা প্রাপ্তবয়স্কদের অপেক্ষা শিশুদের জীবনে অধিকতর সত্য । এইজন্ত সম্ভবনৈব জননীবা কেবল নিজের শিশুগুলির দেহ মন আত্মার কল্যাণের নিমিত্ত ব্যস্ত থাকিলে, সে উদ্বেগ সিদ্ধ হইবে না । তাঁহাদিগকে নিজেব গৃহস্থালীতে মা হইতে ত হইবেই, পাড়ার সমাজের জীবিত দেশের জগতের হুঃমাতৃদেব কাজ তাঁহাদিগকে নিজেদের মধ্যে ভাগ কবিয়া লইবা কবিত্তে হইবে ।

এই ব্যাপক, ব্যাপকতর ও ব্যাপকতম মাতৃদেব নানাবিধগত জ্ঞান শিক্ষা এবং সাধনা সাপেক্ষ ।

মাতৃদেব ব্যাপকক্ষেত্রে কাজ করিতে হইলে মাতৃজাতীয়দিগকে দলবদ্ধ হইতে হয় । পৃথিবীর নানা দেশের মহিলা সত্য লইয়া

অনেকগুলি মহিলা-সমিতি আছে। পৃথিবীর সকল দেশ হইতে স্বরূপান দূর কবা এইরূপ একটি সমিতির উদ্দেশ্য।

জননীবা নিজেব নিজেব শিশুসেব শরীরমন আশ্রায় পুষ্ট স্বাস্থ্য পরিভ্রজা ও আনন্দ বিধানের জন্ত যাহা যাহা চান, হাতেব কাছেব আরও যতগুলি সম্ভব শিশুসেব জন্ত তাহার আয়োজন কবিতে চেষ্টা করুন। এইরূপ কবিলে মাতৃদেব আলোক জীবন-পথ আলোকিত করিবে। সেই আলোকে চলিতে চলিতে মাতৃ-শক্তি বাড়িবে। তাহাতে নিজেব এবং অশ্বেব শিশুদের মঙ্গল হইবে।

মাতৃ কেবল যে শিশুদের জন্য তাহা নহে, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্তও বটে। যেখানে দুঃখ দাবিত্র্য বোগ তাপ মলিনতা, মায়েব মঙ্গল-হস্ত সেখানেই কাজ করিবে।

আপনা ভুলিবা ঐতি-দয়া-সেবা দিয়া অতি ক্ষুদ্র অতি নগণ্য অতি উপেক্ষিতকেও বক্ষা কবা মাতৃহৃদয়ের কার্য। এই মাতৃহৃদয়ের কাজ গৃহে ও গৃহেব বাহিরে রহিয়াছে। মাতৃ-জাতীয়রা যাহাদিগকে জন্ম দিয়াছেন, কেবল যে তাহাদেরই মাতৃত্ব করিতে পারেন, তাহা নহে; অপরেরও পাবেন। আবার তাহারা দৈহিক অর্থে সাতা হন নাই, তাহারাও বহু শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নবজীবনের কারণ হইয়া প্রকৃত মাতৃপদবাচ্য হইতে পারেন।

(নব্যভারত, বৈশাখ)

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

নিরঞ্জনের সেবা

আবহমান কাল হইতে আমাদের এতদকালের যোগিসমাজে নিরঞ্জনের সেবা বা নিরঞ্জনের প্রসাদ দিবার রীতি প্রচলিত আছে, ইহার আর-একটি নাম ঠাকুর-সেবা বা ঠাকুর-প্রসাদ। শিবপূজা কি অন্ত্যস্ত বাবতীর দেবতার পূজাব সঙ্গেও নিরঞ্জনের সেবা দেওয়া যায়। এই নিরঞ্জনের সেবাতে অনেকগুলি জাতীয়-ইতিবৃত্ত-মূলক মূল্যবান গ্রন্থ (জাতীয় সাহিত্য) চাওড়াইতে হয়, ইহার সাধারণ নাম রয়বাস বা যোগি-ঘষেব কথা।

নিরঞ্জনের পূজাতে নিরঞ্জন দেবতাব ধ্যান—

“সর্বজ্ঞাপিপিপাসাস্ত সর্বতোক্ষি-শিরঃ-মুখঃ।

সর্বজ্ঞে ক্রতিমাল্লোকে সর্বম্ লেলাযুতম্ তিষ্ঠতি।”

মূলমন্ত্র প্রণব (ঐ)।

হরিনাবারণ নামক (হুশ) চাউলের গুড়া ১/২ সের, এক পোয়া (লাসায়ুস্ত) বিরইন চাউলের গুড়া, লবঙ্গ ১ তোলা, গোল মরিচ ১ তোলা, জায়কল ২ টি, কর্পূর দুই চাকা, পৃথক পৃথক ভাজিয়া কুটিয়া একত্র করিয়া ১/২০ সেব নরম গুড় কিছু পবিশান জলে সিদ্ধ করিয়া, উপবোক্ত হুশ ছাতু-সমূহ এই জল দ্বারা মাড়িয়া পিণ্ডাকৃতি করিয়া সিলেই প্রসাদ ভৈরব হয়। অন্ত্যস্ত নানা প্রকার প্রসাদের সঙ্গে এই প্রসাদটি অবশ্যই দেয়।

পূজাতে কর্তৃকর্তা কোন-কিছুতে এই প্রসাদটি লইয়া মন্ত্রকের উপর রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার পর রয়বাস বলিতে আরম্ভ করা হয়। বতস্কণ পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিতে কষ্টবোধ না হয়, ততস্কণ পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। পরে এবম্প্রকারে থাকিতে যখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া দাঁড়ায় তখন সম্মুখে প্রসাদের ডালাটি রাখা করিয়া গলবজ্রে কবজোড় হইয়া বসিয়া থাকা যায়।

পূর্বকালে রয়বাসের গ্রন্থ-সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। সমাজে বৈষ্ণবধর্ম-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রয়বাস বলার প্রণাও কমিয়া

যাওয়ার জাতীয় সাহিত্যগুলিও লোপ হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে রয়বাস বলিতে প্রাচীন যোগদাব, কুলাগ্রি পটল, সিদ্ধাব আলাবা, ব্রহ্মবৃন্দ, যোগাস্ত, আগমসাব নামক গ্রন্থ-সমূহের কতক-অংশ বলা হয় মাত্র।

প্রাচীনকালে প্রায় সকল-স্বজাতিকেই রয়বাস শিক্ষা করিতে হইত, কিন্তু বর্তমানে দুই-চাষিজন গৃহী ব্যতীত আমাদের সম্মানীগণ (বোণী সম্মানী) ও গুরু-পূর্বোহিতগণের মধ্যেই উহা শিক্ষা করিয়া বলাব প্রথা প্রচলিত আছে। উহা গ্রন্থ-জ্ঞানকে লিখিয়া রাখা বা শিক্ষা কবা নিয়ম-বিকল্প বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস থাকায়, আমাদের গুরু-পূর্বোহিত ও সম্মানীগণ মুখে মুখে শিক্ষা-লাভ করিতেন। তাহাদের ইহা শিক্ষা করা অবশ্যকর্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। সতবাং তাহাদের মধ্যে ইহাব সমধিক প্রচলন ছিল। আমাদের কাছাড়ের বোণীদের গুরু-পূর্বোহিতগণ স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত।

বহুকাল অবধি আমাদের মধ্যে শিক্ষা ও তত্ত্বজ্ঞানের অভাব বশতঃ তত্ত্বমূলক বচন-সমূহ অনেকটা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে অনেক হিম্মি কথারও সমাবেশ আছে। হিম্মি বচনের অর্থও বধায়ণ বৃষ্টিতে না পাবায় তাহাও অনেকাংশে বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

নীলকণ্ঠ-নির্বাপ-তন্ত্র, আগমসাব-তন্ত্র, নির্বাপ-তন্ত্র, যোগাস্ত নামক গ্রন্থ বড় মূল্যবান ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন কালে কাছাড়ীয় যোগিসমাজের মধ্যে পূর্ব-পুরুষের সংযত অনেকগুলি বৈবাগ্য-ও তত্ত্ব-মূলক গান ও প্রবাস-বচন ছিল। তাহাও বর্তমানে লোপ হইয়া গিয়াছে।

পূণ্যনাথের রচিত অজ্ঞানগীতা। দশ-বাব বৎসর পূর্বে পর্যন্ত সমাজে উক্ত গ্রন্থখানি বহুল বিস্তার ছিল।

যোগসিদ্ধ মাটির তলেব বাবা, ফাল্গুনী বুড়ো, বাণী বাজাওয়া বাবা, কার্তিক মাঘ, আগুন-ধাওয়া বাবা, খেদল বুড়ো, শ্রীনাথ, গুরু মহারাজ বাবা প্রভৃতি সিদ্ধগণ উক্ত যোগসাহিত্যরূপ বৃক্ষেবই পক ফল।

কেহ কেহ আরও অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোকের উল্লেখ করেন। শ্লোকগুলি কোন্ গ্রন্থেব জিহ্বাসা করিলে ষট্শ্লোক-পুরাণের শ্লোক বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত হস্ত-লিখিত ষট্শ্লোক-পুরাণ অমুদ্রিত করিয়া পাওয়া গেল না। শ্লোকগুলি ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের স্নেহব্যঞ্জক। একটি শ্লোকের অর্থ এইরূপ—

কলিকালে তিন দেবতা প্রধান, এক তুলসী, দ্বিতীয় গো, তৃতীয় ব্রাহ্মণ। তুলসীব পত্র, জল, মৃত্তিকা, ব্যবহারে লাগে। গরুরও চোনা গোবরাদি পক্ষপা ব্যবহারে লাগে। কিন্তু ব্রাহ্মণ এমনই যে তাহার কোন-কিছু কাজে লাগে না।

পূর্বকালে নাথ-যোগিগণ সকলেই যে যোগাভ্যাসাদি করিতেন, তাহাদের মধ্যে যে সিদ্ধতত্ত্বেব বহুল আলোচনা হইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যোগাভ্যাসাদি সাধন দ্বারা অশ্ববহু কুলকুলিনী শক্তি লাগত হইলে সাধক অনাহত ধ্যান, ওকার-ধ্যান বা একপ্রকার অব্যক্ত শব্দ শুনিতে পান। “আচাক্ষুয়া” বাণীকেই শব্দ, শব্দ, হৃদয়, নাদ প্রভৃতি শাস্ত্রিক অর্থসম্পন্ন বাক্যে অভিহিত করা হইয়াছে, এবং ইহা দ্বারাই বুঝা যায় তাহাদের মধ্যে অনেকেরই শক্তিনীয জালে মহারস বন্দী করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতেন।

(যোগিসংখা, বৈশাখ)

শ্রী পুরুষচন্দ্র নাথজী

বিদ্যাপতির অপ্রকাশিত পদ

এ হরি জনি (১) করহ মোহে বোধ (২) ।
আজু মেবি বিলম্বন দৈবকি দোষ (৩) ।
তেজি নিজ মন্দির পদ দুই চারি ।
যন মেহ (৪) ববিধয়ে (৫) মহি ভরি বারি ॥
এক গুণ তিমির লাখ গুণ ভেল (৬) ।
দিগবিদিগ ভাহু বহি গেল (৭) ॥
পথ পিছরই (৮) অস্তি গকর (৯) নিতম্ব ।
থসেত কবরি না কছু অবলম্ব ॥
ধনে দরশাই বিজবি বরেহ (১০) ।
উঠয়ে গাহিয়ে জলধারয় (১১) সেহ ॥
জনমে বিদ্যাপতি হরবর নারী ।
ধনকে দোখবি হৃদয় বিচারি ॥

(রিদ্দাৎ, বৈশাখ)

শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ রায়

শ্রীশ্রী ৬গন্ধেশ্বরী দেবী

প্রতিবৎসর বৈশাখী পূর্ণিমাতে প্রাত্যেক গন্ধবণিকের গৃহে শ্রীশ্রী ৬গন্ধেশ্বরী দেবীর পূজা হয়।

এই গন্ধেশ্বরী দেবী সাক্ষাৎ ভগবতী দুর্গা । চতুভূজা সিংহবাহিনী মূর্তিতে ইনি গন্ধেশ্বরী দেবী রূপে আবিভূতা হইয়া গন্ধাত্মকে বধ করেন । সেই কাবণে ইঁহার নাম গন্ধেশ্বরী হয় ।

হুত্বতর ভবসে ও তপতী-নারী রাক্ষসীর গর্ভে গন্ধাত্মর মহাদেবের বরে ক্রিষ্টবনবিজয়ী ও মহাবলশালী হইয়া জন্মগ্রহণ করে । হুত্বতি বৈশ্বকৃষ্ণা স্বরূপকে হরণ কবিত্তে গিয়া বৈশ্বগণ কর্তৃক অপমানিত তিরস্কৃত ও হতসর্ববধ হয় । পিতাব সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য গন্ধাত্মব বৈশ্ববংশ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হয় । তাহার অমুচরগণ একদিন স্ববর্ণট নাসক এক বৈশ্বকে বধ কবিলে, তাহাব পূর্ণগর্ভা পত্নী চন্দ্রাবতী গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করেন । পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া তিনি অরণ্য-মধ্যে একটি কস্তা প্রসব করিয়া গতাহ হন । সর্বজ্ঞ মহর্ষি কস্তাপ্রাণবোধে চন্দ্রাবতীর গর্ভে দেবী বহুধারাব অংশাবতার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অবগত হইয়া তাঁহাকে স্বকীয় আশ্রমে আনয়নপূর্বক কস্তানির্বিংশেষে প্রতিপালন কবিত্তে লাগিলেন । গুণজ্ঞ মহর্ষি সেই দিব্য সৌরভময়ী কস্তাব গন্ধ-বতী নাম রাখিলেন ।

“যৌবনোদ্ধৃতি গন্ধবতী পিতার নিধন ও অরণ্য-মধ্যে মাতার শোচনীয় মৃত্যুর কারণ অস্ববর্ণগণে বিনাশকামনায় মহামাথাব তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন ।”

গন্ধাত্মর গন্ধবতী বৈশ্বকৃষ্ণ রূপলাবণ্যে কথ্য জানিয়া গন্ধবতীকে স্নান কবিবার নিমিত্ত সন্দেশে তাঁহার আশ্রমে উপনীত হইল । কিন্তু অহবের চাঁটুবাণ বা ভীতিপ্রদর্শনে সেই তপানিমগ্না গন্ধবতী বধ্যান-ভঙ্গ হইল না । তখন ক্রুদ্ধ অহর সবলে গন্ধবতীর কেশাকর্ষণ করিল,

কিন্তু অহরতেজ পরাক্রান্ত হইল, গন্ধাত্মব সেই তপঃকৃশা পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকাকে যোগাসন হইতে বিচলিত করিতে পাবিল না ।

“গন্ধবতী বিচলিত হইলেন না বটে, কিন্তু তদীয় হোমকুণ্ডস্থ বহি-রাশি বিচলিত হইল । সহসা সেই বিচলিত বহিরাশি হইতে এক দিব্য তেজ সমুখিত হইয়া সমস্ত তপোবনকে ছর্গিবীক্ষ্য প্রভাপুঞ্জে উদ্ভাসিত করিল । অহুবপতি বিস্মিত ভীত ও মুগ্ধপ্রায় হইয়া সভয়ে কেশমুষ্টি পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রাৎবেগে হৃদয়ে গিয়া দণ্ডায়মান হইল । অত্যাৎকট জ্যোতির প্রভাবে সন্দেশে অহররাজ স্বর্ণকালের জন্ত অকীভূত হইলেন । অনন্তর দৃষ্ট প্রসন্ন হইলে দেখিলেন বিদ্রাৎ-তুল্য প্রভাময়ী সিংহবাহিনী চতুভূজা এক নারীমূর্তি হোমকুণ্ড-সন্নীপে গন্ধবতীর পূর্বোভাগে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন । আর গন্ধবতী স্বকীয় গলদেশে উত্তরীয়-বন্ধল অর্পণ করিয়া আনতনয়নে সেই দেবদলভ ত্রিপাদপদ্মের অপরূপ সৌন্দর্য্যরাশি দর্শন করিতেছেন ।”

অহব তৎক্ষণাৎ দেবীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । ঘোরতর যুদ্ধের পর দেবী শূলাঘাতে অহরের প্রাণ বিনাশ কবিলেন ও তাহাব প্রকাণ্ড দেহ সমুদ্র-মধ্যে নিক্ষেপ কবিলেন । দেবীর ইচ্ছায় সেই দেহ গন্ধাত্মবোব আকর-ভূমি গন্ধবীপরূপে পবিত্র হইল ।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণেব সহিত মিলিত হইয়া দেবী বধাবিধি পূজা করিলেন । গন্ধাত্মর-নাশিনী গন্ধেশ্বরী নামে বিখ্যাত হইলেন । বৈশাখী পূর্ণিমা বদনে ভগবতী গন্ধেশ্বরী-মূর্তিতে প্রকাশিত হইয়া গন্ধাত্মকে বিনাশ করিয়াছিলেন । সেই হেতু গন্ধবণিকগণ অদ্যাপি বৈশাখী পূর্ণিমা বদনে গন্ধেশ্বরীর পূজা কবিয়া থাকেন ।—“মহানন্দীধর পূবাৎ” ।

গন্ধেশ্বরী দেবীর আবে-একটি উপাখ্যান আছে, তাহা ভবপূবাণে দেখিতে পাওয়া যায় । তাহাতে গন্ধবতীর কোনও উল্লেখ নাই এবং গন্ধাত্মবেব বধের কাবণও অন্তরূপ বর্ণিত আছে । সেই উপাখ্যান-ভাগ এইরূপ :—“গন্ধাত্মব নারদের মূখে দেবীর অলৌকিক রূপ-লাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া মোহিত হয় এবং তাঁহাকে পত্নীরূপে লাভেব আশা ছবাশা ভাবিয়া আশুতোষেব কৃপাপ্রার্থী হইয়া কঠোব তপস্তা কবে । ভগবান্ প্রসন্ন হইলে, গন্ধাত্মর শিবধারারূপ-বর প্রার্থনা করে । আশুতোষ অহর-রাজেব অভিলষিত বরই অর্পণ কবিলেন । অহর বরপ্রাপ্তিমাত্র রজতপিরিনিভ চারুচন্দ্রাবতম দিব্য শৈব মূর্তি পবিগ্রহ কবিল । কিন্তু প্রকৃতিতে সেই অহর-ভাবই অশুদ্ধ রহিল । তখন অহর মহাদেবের পরোক্ষে কৈলাসে গমন পূর্বক দাক্ষারণীকে প্রার্থনা কবিল । দেবী অহবেব ছবাশা দেখিয়া মনে মনে হান্ত করিয়া যুদ্ধে তাহার প্রাণ বিনাশ কবিলেন । দেবীর ইচ্ছায় গন্ধাত্মরের দেহ গন্ধ-মাদন পরিতকরূপে পরিণত হইল । দানবেব ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হইতে ভিন্ন ভিন্ন গন্ধদ্রব্যেব উৎপত্তি হইয়াছিল । অনন্তর দেবগণ কর্তৃক দেবী পূজিত হইয়া গন্ধেশ্বরী নামে বিখ্যাত হইলেন ।”

তারকাহবের বধের নিমিত্ত হরগৌরীর বিবাহেব প্রযোজন হইলে, তারকাহব মায়াবলে সমস্ত গন্ধ-দ্রব্য অপহরণ করে । ভগবান্ শিব—দেগদাস, শঙ্খভূতি, ও বিষ্ণুগুপ্ত এই গন্ধবণিক্ সোহাদর ভ্রাতাদিগকে গন্ধদ্রব্য-সংগ্রহেব জন্ত আদেশ কবেন । সতীশ আশ্রমেব আদিপুরুষ বিষ্ণুগুপ্ত পবম শিবভক্ত ছিলেন । নাবদেব উপদেশে তিনি ভগবতী গন্ধেশ্বরীর পূজা কবিলে, দেবী তাঁহার প্রতি অতুলকম্পা প্রদর্শন পূর্বক তাঁহাকে দর্শন দেন ও অপহৃত গন্ধদ্রব্যগুলি দেখাইয়া দেন । বিষ্ণুগুপ্ত দেবী গন্ধেশ্বরীর দর্শন লাভ কবিয়া তাঁহাব স্তোত্র কবেন ।

(গন্ধবণিক, বৈশাখ)

১ জনি (জানিয়া) ২ বোধ (বোধ) ৩ দোষ (দোষ) ৪ মেহ (মেঘ) ৫ ববিধয়ে (ববিধয়ে) ৬ ভেল (হইল) ৭ বহি গেল (চলিয়া গেল) ৮ পিছরই (পিছল) ৯ গকর (গদাপতি) ১০ বিজবি করেহ (বিদ্রাৎরেখা) ১১ জলধারয় (মেঘ) ।

কলিকাতার কথা

সেকালে কলিকাতা সোনার লত্বা হইয়াছিল। যে লত্বাষ আসিত সেই বাণ হইত। সেকালে বিলাতের বাজা, রাণী, ও সভ্যগণ কলিকাতার গবর্ণর-জেনারেলের উপর চিঠি দিয়া উমেদারগণকে পাঠাইয়া দিতেন। লর্ড ক্লাইবকে একজন উমেদারকে এক লাখ টাকা দিয়া বিদায় করিতে হইয়াছিল। ইহা লর্ড সেকলে ইণ্ডিয়া বিলের বক্তৃতা সময় বলিয়াছিলেন। হেষ্টিংসকেও তাহা কবিত্তে হইত, না করিলেই সর্বনাশ।

কর্ণওয়ালিস উমেদারের দলের বিলাত হইতে কলিকাতায় আসা বন্ধ করিয়াছিলেন। কোম্পানির কর্মচারীদের নজর লগ্না বন্ধ কবিত্তা-ছিলেন। ক্লাইব ও ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমল হইতে যে-সকল কুশ্রী অবাধে চলিয়াছিল তাহা একে একে বন্ধ হইয়াছিল।

সুন্দরবন পবিষ্কার, ব্যবসার সুবিধার জন্য খাল কাটবা ভৈরব ও কপোতাক্ষী নদী এক কবিবার হকুম ঈলম্যান হেফেনকে দেওয়া হইয়াছিল।

কর্ণওয়ালিসের জন্য কলিকাতায় চাঁদা তুলিয়া প্রথম স্মৃতিবন্ধার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাঁহার প্রস্তুত-মুস্তি বিলাত হইতে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিলে উহা খোলা জায়গায় রাখিলে খারাপ হইয়া যাইবে বলিয়া ঐক্লপ স্মৃতি-সকল বজায় রাখিবার জন্য টাউন-হল প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল ও লটারী কবিত্তা কর্ণেল জে গাব্‌লিন্ ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে তাহা শেষ কবিত্তাছিলেন। কর্ণওয়ালিস দেশের ও দেশের মঙ্গলের জন্য নৌকা ও ঘোড়ায করিয়া যখন যেখানে দরকার হইত যাইতেন। তিনি নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতেন ও সংস্কারের দিকে তাঁহার সম্পূর্ণ লক্ষ্য ছিল, তাই তিনি স্বদেশী সৈন্তের নিম্না কবিত্তা এ-দেশী সীপাহীদের সুখ্যাতি কবিত্তাছিলেন। এবং সেই-জন্মই ৬ই মে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে গমাদি-তীর্থধাত্রী হিন্দু সীপাহীদের নিকট কব আদায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

তিনি কলিকাতার সম্রিকট দক্ষিণেব অনাথ বালক-বালিকাদের থাকিবার জায়গা নিবার হকুম দিয়াছিলেন।

বাজা নবকৃষ্ণের সহিত চূড়ামণি দত্তের বেশ দলদলি ছিল। ঐ চূড়ামণি দত্তের পুত্র কালিপ্রসাদ দত্তের নামে কলিকাতায় একটি রাস্তা আছে। তাঁহাকে জন্ম কবিবার জন্য তাঁহার পিতার প্রাণের সময় শোভাবাজারের রাজবাটী হইতে ব্রাহ্মণ কায়স্থ আদি ঘাঘাতে উপস্থিত না হব তাহা বন্ধ এই কথা রটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, কালীবাবু মুসলমান বাইওয়ালী বাখিয়াছিলেন। বুদ্ধিমান দত্ত মহাশয় ব্রাহ্মণ বিদ্যায়ের পটিশ হাজাব টাকা দিয়া কালীঘাটের বর্তমান মন্দির কবিত্তা দিয়াছিলেন।

সেকালের লোকেবা বসিকতা ও স্পষ্ট কথাব খুব আদব কবিত্ত।

১৭৮০ খৃঃ হইতে কলিকাতায় ঘোড়দোড়ের উল্লেখ দেখা যায়। উহা তখন সেকালে হইত ও লোকে খড়ের উপর কার্পেট পাতিয়া বসিয়া দেখিত, তিন চাবি ষটাব উহা শেষ হইয়া যাইত। লর্ড ওয়েলেসলি বর্তমান লাইট সাহেবেব বাড়ী বস্ত্র-পত্তন মহাসমারোহে ১৭৯৯ খৃঃ ৫ই ফেব্রুয়ারী কবিত্তাছিলেন। উহার জমি খনি কবিত্তে আলী হাজাব টাকা ও বাড়ী ভৈবা কবিত্তে তের লক্ষ টাকা ও উহা সাজাইতে পঞ্চাশ হাজাব টাকা লাগিয়াছিল। বিলাতের কেডল-টোন হলেব নয়াব উহা ভৈবা কবিত্ত হইয়াছিল। ৪ঠা মে ১৮০২ খৃঃ শ্রীবজ্রপত্তনের বিজয়োৎসব ও ঐ নতুন বাড়ীতে প্রথম প্রবেশ একজনে মহাসমারোহে হইয়াছিল। কলিকাতার প্রণামান্য সকল অধিবাসিগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

বাজা রাজবল্লভের বিধবা পত্নী আপনাব দুর্দশাব কথা উল্লেখ কবিত্তা কোম্পানির নিকট পেশন চাহিয়াছিলেন। রাজা রাজবল্লভ সিংহের যুদ্ধ-বিভাগেব প্রধান দেওয়ান ছিলেন ও ইহারই পবামর্শে সিংহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়াছিলেন ও রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। এই-সকল দাবী কপাও নাকি তাঁহার পত্নী দব্বাশে লিখিয়া-ছিলেন। ইহাতেই সেকালের বাঙালী জাতিব কতদূর অধঃপত্তন হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝা যায়।

কলিকাতার কল্টোলায় রামজয় দত্তের স্মৃতে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রামকমল সেন ইংরেজি শিখিতেন। তাহাই বোধ হব বাঙালীব প্রথম বিদ্যালয় ছিল।

(সুবর্ণবণিক-সমাচার, ৬৫) শ্রী প্রমথনাথ মল্লিক

সাঁওতাল পুরাণ

সাঁওতালদিগেবও একটি পুরাণ আছে। তাহাদের এই অলিখিত পুরাণাশ্রেয় যষ্টিতত্ত্ব আছে, তাহাদের ধর্মবিধানের একটি ধারা আছে এবং তাহাদের সভ্যতা ও চিন্তা-প্রণালীর অমুরূপ নানা প্রাচীন কাহিনী আছে।

যষ্টিকাণ্ড

অতি প্রাচীনকালে ঠাকুর-বাবা (বাবা যেমন একটি সংসারের স্বামী বা গৃহস্বামী তেমনি ঠাকুর-বাবা এই বিশ্বসংসারের স্বামী বা কর্তা ; বিমানবিহারী স্বর্গদেবই সাঁওতালদের ঠাকুর বাবা) মানুষ যষ্টিকরিয়া তাহাদের সুবিধা, সুখ-খাচ্ছন্দ্য ও আবাসের জন্য নানা প্রকার বিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষ নিজের দোষে ঠাকুর-বাবাকে চটাইয়া সেই-সমস্ত সুবিধা হারাইয়াছে।

তখন সাঁওতালেরা চম্পারাজ্যে কিছু-রাজ্যদিগেব অধীনে পরম সুখে বাস করিত।

সাঁওতালদিগেব মধ্যে পৌরাণিক যুগে দ্বাদশ শ্রেণী বা বর্ণ ছিল। স্বশ্রেণীতে ইহাদের বিবাহ হইত না। 'কিছু' ইহাদের অন্ততম ; কিছুগণই পৌরাণিক যুগে রাজত্ব কবিতেন। তাঁহাদের রাজত্ব আমাদের 'রাম-রাজত্বের' জায় সর্ব স্বথের হেতুভূত ছিল। ধান-গাছে একেবারে ভূষিহীন চাউল ধরিত ; কাপাস পাছে একেবারে সাঁওতালদিগের পরিধানোপযোগী বস্ত্র কার্পাস-বৃক্ষের ফল-স্বকপে জন্মাইত ; মাধাব উরুন তুলিবার জন্য যিহীন ব্যস্তির সাহায্য আবশ্যক হইত না, কারণ মাধার খুলি তখন জোড়া ছিল না, আবশ্যকমত খুলিয়া লইয়া পরিষ্কার কবিত্তা পুনরাব পাণ্ডীভ্য ছায় মাধার বদাইয়া দিলেই চলিত।

সাঁওতালদিগের এই পৌরাণিক স্বধনসম্পদের অন্তরায় হইয়াছিল একটি হীন-স্বভাবা দাসী অপরিত্র আচার।

প্রাচীনকালে আকাশ পৃথিবী গারে জাগিয়া থাকিত এবং ঠাকুর-বাবা আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া সাঁওতালদিগের ঘর-বাড়ী দেখিয়া যাইতেন। ঠাকুর-বাবা সাধাবণতঃ ব্যতিকালেই পৃথিবী পবদর্শনে আগমন করেন। তিনি যদি কোনও গৃহে উচ্ছিষ্ট বাসন দেখিতেন পান, তাহা হইলে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতেন। ফলে অভিশাপ ও অমঙ্গল অবশ্যজারী। একদিন এক বর্মণী রাজ্যকালে আহর্ষের পর উচ্ছিষ্ট শাল-পত্র-সমূহ ঘবেব বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছিল। বাতাসে উড়িয়া সেই পাতা আকাশে চলিয়া যায়। তাহাতে ঠাকুর-বাবা অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া পৃথিবী হইতে আকাশটাকে বহুদূরে সরাইয়া

দিখাছেন ; কাবণ মানুষের এত অপবিজ ব্যবহার তিনি সন্ত কবিতে পাবেন নাই।

সাঁওতালদিগের ঠাকুর-বাণী হইতেছেন ‘সিং চন্দো’ বা ‘স্বর্ঘ্যদেব’ ; এবং ‘নিন্দ চন্দো’ বা চন্দ্রদেব তাঁহাব পত্নী। সাঁওতালদিগের অপবিজ ব্যবহারে ঠাকুর-বাণী বা ‘সিং চন্দো’ অত্যন্ত কষ্ট হইয়া পৃথিবীর সমস্ত সাঁওতাল বা মানুষকে ধ্বংস কবিস্থ কষ্ট কৃতসঙ্কল হইলেন। তারা বা নক্ষত্র ‘সিং চন্দো’ ও ‘নিন্দ চন্দোর’ পুত্র-কন্যা।

হিব হইল ‘পিলু-হাবাম’ ও ‘পিলু-বুধি’ নামে যুবক ও যুবতীকে বাদ দিয়া সমস্ত মনুষ্যজাতি ধ্বংস হইবে। সুতরাং ঐ যুবক ও যুবতীর প্রতি সিংচন্দোর আদেশ হইল, “এই গহ্বরে প্রবেশ কর।” তাহা ভয়-বিহ্বল চিত্তে গর্ভে প্রবেশ করিল। তাহাব পর ঐ গহ্বর কাঁচা চামড়া দিয়া সিংচন্দো স্বয়ং ঢাকিয়া দিলেন।

তাব পর ধ্বংসকার্য্য আরম্ভ হইল। স্বর্ঘ্যেব দাহিকা শক্তি অগ্নিরূপে বর্ধিত হইতে লাগিল। পাঁচ দিন পাঁচ বাজি এই অগ্নিবর্ষণ চলিল।

পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রিব অবসানে তাহাবা গহ্বরের বাহিরে আসিল, সেই যে দুইজন মানুষ বাঁচিল—‘পিলু-হাবাম’ ও ‘পিলু বুধি’—তাহাদের ষাণ্ঠ পুত্র ও ষাণ্ঠ কন্যা জন্মে। তাহাদের দ্বারা ক্রমশঃ মনুষ্যজাতির বৃদ্ধি হইয়া সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ হইয়াছে। তার পর সেই বাবো জন হইতে ক্রমে খাদ্যের বিভিন্নতা অনুসারে সাঁওতালদিগের বারো জাতি হইয়াছে।

* * * *

একদিন ‘চন্দো’ বনে কাঠ কাটিতে গিয়াছেন। ফিরিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তাঁহাব পত্নী কতকগুলি মশা হুটি করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। উদ্দেশ্য—মশার কামড়ে অস্থির হইয়া চন্দো গৃহে ফিরিবেন। কিন্তু ‘চন্দো’ কতকগুলি ডাঁস হুটি কবিলেন, তাহারা মশা ধরিয়া খাইতে লাগিল। তখন নিন্দ চন্দো আবও অনেক জানোয়ার হুটি কবিয়া পাঠাইলেন। সিংচন্দো তাহাদের মাঝিয়া ফেলিলেন। অবশেষে নিন্দ চন্দো একটি ব্যাঘ্র হুটি করিয়া পাঠাইলেন। সিংচন্দো কতকগুলি কাঠের কুচো ছুঁড়িয়া মারিলেন। কাঠের কুচোগুলি বৃক পবিণত হইয়া ব্যাঘ্রের অনুসরণ করিল। ব্যাঘ্র পলাইল। সেই অবধি ব্যাঘ্র বৃককে ভয় করে।

চন্দো যেরে ফিবিলে তাঁহাব পত্নী তাঁহাকে তিরস্কার কবিয়া বলিলেন, “তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তোমাব হুটির এত জীবন্তকে খাইতে দেখ কে?”

চন্দো বলিলেন, “আমি সকলকে খাইতে দিয়াছি।”

তাঁহার পত্নী একটি পতঙ্গ লুকাইয়া বাখিয়াছিলেন। দেখাইলেন লোহার পাত্রেব মধ্যে পতঙ্গ ঘাস খাইতেছে। চন্দো লজ্জিত হইলেন।

জন্মান্তরবাদ।

সাঁওতালেরা আত্মার দেহান্তর-পরিগ্রহ বিশ্বাস করে। ইহাদেব ঠাকুর জল, স্থল, আকাশ, যাবতীয় প্রাণী ও বৃক্ষাদি এক-কালে নির্দিষ্ট সংখ্যায় হুটি কবিয়াছেন। সে সংখ্যা কমেও না, বাড়েও না। যতদিনে দেহ-মধ্যে তাহারা বাড়িয়া পূর্ণাঙ্গ হইবে, ঠাকুর তাহাও ঠিক কবিশা দিয়াছেন। তাহাব ফলে এই হইয়াছে যে মানুষের শরীরেও কুকুব বিভাল প্রভৃতি ইতর প্রাণীর আত্মা প্রবেশ করে আব কুকুব প্রভৃতির শরীরেও মানুষের আত্মা প্রবেশ করে। যদি কোনও মানুষের শরীরে মানুষের আত্মা থাকে, তবে তাহাব আচাব-ব্যবহার ভজোচিত হইবে। বিভাল-কুকুবের আত্মা পাইলে মানুষ কলহপ্রিয় হয়। ভেকের আত্মা পাইলে মানুষ নির্জনতাপ্রিয় ও মুখ-চোবা হয়। বাবেব আত্মা হইলে মানুষ অত্যন্ত ক্রোধী হয়।

পরলোক।

মৃত্যুর পর পরলোকে গিয়া মানুষকে অতি কষ্টে কালরাপন কবিতে হয়। ‘চন্দো বোংগা’ তাহাদিগকে অত্যন্ত খাটাইয়া লয়। সেখানে মেয়েরা এবং ফল খলে ভাদিয়া তৈল শ্রম্ভত করে। বীজ হইতে চন্দো বোংগা মানুষ গড়ে। যে-সকল জীলোকের ছেলে আছে, তাহারা ছেলেকে শুশ্রূদান কবিবাব জন্ত কিঞ্চিৎ অবসর পাব। আর যে-সকল পুরুষ তামাক-পাতা চিবাইয়া খায়, তাহারা সেই কার্য্যেব জন্ত কিঞ্চিৎ অবসর পায়। এই কারণে সাঁওতালেরা তামাক-পাতা চিবাইয়া খাইতে শিখে। হঁকার তামাক পোড়াইয়া খাওয়ার কোনও লাভ নাই। কাবণ সেজন্ত পরলোকে ছুটি পায় না। এখানে কেহ জল খাইতে পায় না। পুষ্কবিল্লি বা সবাবরে যে-সকল ভেক গ্রহণী আছে, তাহাবা কাহাকেও জলে নামিতে দেয় না। এইজন্ত সাঁওতালদের মৃত্যুকালে তাহাদের সঙ্গে জলপানের পাত্র দেওয়া হয়, কারণ পাত্র থাকিলে তাহাতে কবিয়া জল তুলিয়া লইয়া তাহারা খাইতে পারে। জীবিতকালে অথবা বৃক বোপণ করিলে সাঁওতালেরা পরলোকে জল খাইবাব সুবিধা পাব। পূণ্যেব ফলে নহে, পাণের শাস্তিধরূপে। অথবা বৃক্ষের পত্র পুষ্কবিল্লিবে জলে পড়িয়া জল কলুণিত কবে বলিয়া বৃকবোপণকারীকে জলে নামিয়া পাতা কুড়াইয়া ফেলিতে হয়। তাহাতে তাহার জল খাইবাব সুবিধা হয়।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, বৈশাখ) শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পৌরাণিক ভূগোল

পার্ব্বিটাব সাহেব বলেন, মংস্ত বায়ু বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ তৃতীয হইতে চতুর্থ ধুঃ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল। বর্তমান ভবিষ্য পুরাণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও অধুনা দুপ্ত এক ভবিষ্যপুবাণ ছিল, তাহা হইতে বহু বিবরণ মংস্ত, বায়ু, বিষ্ণু প্রভৃতি পুবাণে গৃহীত হইয়াছে। এই পুরাণগুলিব মধ্যে প্রথমে মংস্ত, তৎপরে বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড এবং সর্বশেষে ভাগবত ও বিষ্ণুপুবাণ বচিত হয়। এই মংস্ত, বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুবাণ প্রথমে প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা বচিত হয়, পরে তাহা সংস্কৃতে তরুজনা করা হইয়াছিল। প্রায় সমস্ত পুবাণগুলিরই বক্তা হুত। পুবাণগুলিতে প্রথমে কেবল ক্ষত্রিয় বাজগণেব প্রাচীন কাহিনী ব্রাত ছিল, পবে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত ম্লেচ্ছ জয়লাভ কবিবাব জন্ত ব্রাহ্মণেরা ইহার মধ্যে নানা দার্শনিক তথ্য সম্বলিত কাহিনী সংযোজিত করেন। পুরাণগুলির রচনাব জান মগধ।

সমস্ত পুবাণেই পৃথিবীকে ৭টি দ্বীপে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথমে জম্বু দ্বীপ, তাহার চতুর্দিকে তাহারই বিস্তৃতির অনুকূপ লবণ সমুদ্রেব বিস্তৃতি ; তাহার চতুর্দিকে মন্স দ্বীপ, মন্স দ্বীপেব বিস্তার জম্বুদ্বীপের বিস্তাবেব বিস্তার। তাহাব চতুর্দিকে ইক্ষু সমুদ্র, তাহার চতুর্দিকে শাল্মলী দ্বীপ। এই রূপে ক্রমে ক্রমে সুবা, যুত, দধি, ও ক্ষীৰ সমুদ্রে ও মারে মাঝে কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কব দ্বীপ। প্রায় প্রত্যেক দ্বীপে ৭টি করিয়া বর্ষ পর্বত, ৭টি করিয়া নদী ও ৭টি করিয়া বর্ষ আছে। এই সাত সংখ্যাটি মঙ্গলকর সংখ্যা বলিয়া সর্বত্র প্রযুক্ত হইয়াছে।

ভাগবতবর্ষ এই জম্বু দ্বীপেব ৭টি (২৮৩৪ অধ্যায়) বর্ষেব অন্ততম বর্ষ। বেদে এক ভাবতবংশের নাম পাওয়া যায়। ম্যাকডনেল ও কীথ সাহেবরা বলেন, যে-প্রদেশে ভারতবংশ রাজত্ব করিত পবে তাহাই কৌরবদের অধিকৃত হয়। চন্দ্রবংশীয় রাজা চন্দ্রসেনেব পুত্রের নাম ভবত, আবাদ প্রিয়ব্রত যে সাত পুত্রকে সাত দ্বীপের অধিপতি কবেন সেই সাত

পুত্রের মধ্যে অগ্নীত্রের প্রপৌত্রের নাম ভরত। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের এক মতে হিমালয় নামক বর্ষ, ভরতের নামে ভারতবর্ষ নাম পাইয়াছে (৪৪।৩৩), আবার অন্ত্র মতে ব্রহ্মাণ্ডের ভরণ কবেন বলিয়া যমু ভবতনামে অভিহিত হইয়া থাকেন, তজ্জন্ত এই বর্ষের নাম ভাবতবর্ষ (১০।৪৮)।

ম্যাকডনেল ও কীথ সাহেবের মতে যখন কুরু-বংশীয়রা ভারতরাজ্য অধিকার করেন, তখনও পাঞ্চাল, কোশল, বিদেহ, কাশী প্রভৃতি রাজ্য পৃথক ছিল। হুতরাং বৈদিক যুগে হিমালয় বর্ষ বা ভারতবর্ষ পশ্চিম হিমালয়েব অন্তর্গত ও সম্মিলিত কিয়দংশে আবদ্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয়। জৈন হরিবংশ মতে অম্বুধীপ ঐষ্ট ক্ষেত্রে বিভক্ত ছিল, যথা, বিদেহ ক্ষেত্রে, শুভত ক্ষেত্রে, ধাতকী খণ্ড, পুন্ডরীক ও ঐরাবত ক্ষেত্রে। ভরত ক্ষেত্রে চম্পা, কোশাধী, হস্তিনাপুত্র ও অযোধ্যা এই কয়টি পুরীর নাম আছে। হুতরাং বর্তমান সমগ্র ভারতবর্ষ যে পূর্বে ভাবতবর্ষ নামে অভিহিত হইত না, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আলেক্সান্ডারের ভাবতবর্ষ আক্রমণ-সময়ে বা মেগাস্থেনেসের পাটলীপুত্রে অবস্থান-কালে বা তৎপূর্বে ভারতবর্ষ নাম প্রচলিত থাকিলে “ইণ্ডিয়া” নাম প্রচলিত হইত না।

প্ৰক্ষ, শালবী, জম্বু ও শাক বৃক্ষ হইতে দ্বীপগুলির নামকরণ হইয়াছে। তিব্বত দেশে ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তিস্থলে ইহার নাম “চাম্পু”। “চাম্পু” অর্থে তিব্বতী ভাষায় বৃহৎ নদী। চাম্পু কথাটির চ প্রায় স এর উচ্চারণের কাছাকাছি। জম্বু বা চাম্পু কথাটির অর্থ বৃহৎ নদী। এই চাম্পু নদীতে পূর্বে সামান্য খুঁড়িলেই সোনা পাওয়া যাইত, তাই এই সোনার নাম ছিল জাম্বুনদ।

বর্তমান ভারতবর্ষের উত্তরাংশে দুইটি বৃহৎ নদ আছে, একটি সিঙ্ঘু অপরাষ্ট ব্রহ্মপুত্র। দ্বীপ কথাটির মূল অর্থ দুইজনের মধ্যস্থ স্থান। দ্বীপ কথাটির আর এক রূপ দ্বী-দ্বা-ব। বর্তমান ভারতবর্ষের উত্তর সিঙ্ঘু হইতে কোন জাতি বিশেষ দুই বৃহৎ জলের বা নদীর মধ্যস্থ স্থানের নাম অম্বুধীপ রাখিয়াছিল।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে একস্থলে অম্বুধীপের ছয়টি বর্ষ পর্বত ও সাতটি বর্ষের নাম করা হইয়াছে, যথা হৈমবত বা ভারতবর্ষ, হৈমকূট-সংযুট কিম্পুরুষবর্ষ, নিম্ব-সংযুট হরিবর্ষ, মেরু-সংযুট ইলাবৃত বর্ষ, তৎপরে যথাক্রমে নীল, রম্যক ও হিরণ্য বর্ষ। কিন্তু ইহার পবেই খেতবর্ষ ও কুরুবর্ষের নাম আছে (২৪-২৮।৩৪)।

ইলাবৃত বর্ষ পামীর মালভূমি—ইলা বা ইরা কথাটির অর্থ জল, পঞ্জাবের ইলাবতী ও ব্রহ্মদেশের ইরাবতী নামেই তাহা প্রকাশ। পামীর চির-ভূত্বাবে আবৃত বলিয়া বোধ হয় ইহার নাম ইলাবৃতবর্ষ।

যে পর্বত-শ্রেণী সাইবিরিয়ার উত্তর-পূর্ব কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজী মানচিত্রের স্তানোভোই, ইয়ালোই, সাংঘান, পামীরের মধ্যভাগ, আলাইতাগ, হিন্দুকুশ, কাপেত দাগ ও এলবুর্জ নামে অবস্থিত ভাবে কাশ্মিরান সাগরের দক্ষিণ দিক দিয়া এসিয়া-মাইনর পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং সমস্ত এসিয়া দুইভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই পৌরাণিকের মেরু বা মহামেরু।

আবার পুরাণের বর্ণনায় (৩৪-৩৯।৩৪) (১৭-২২।৩২) নিম্ব, নীল, মাল্যবান ও গন্ধমাদন পর্বতের যে অবস্থান লিখিত আছে, তাহার সহিত যথাক্রমে পামীরের নিকটস্থ মৃত্তাগ বা কাবাকোবান, থিয়ানশান, আলতিনতাগ ও হিন্দুকুশের অবস্থানের সঙ্গে মিলিয়া যায়।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ৫০ অধ্যায়েই ভুবন-বিস্তারের একটি বিবরণ আছে। বামদিকে হিমালয় পর্বতের পার্শ্বে কৈলাস পর্বত, সেখানে শ্রীমান কুবের রাক্ষসগণের সহিত বাস করেন (১।৫০)। কৈলাসের উত্তর-পূর্ব কোণে চন্দ্রপ্রভ নামে এক শিবি আছে (৪-৫।৫০)। কৈলাসের

দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পিশঙ্গ পর্বতের পাদদেশে লোহিত নামক এক পর্বত আছে। তাহার পাদদেশস্থিত লোহিত সরোবর হইতে লোহিত্য নামক এক মহানদ উৎপন্ন হইয়াছে (১০-১২।৫০)। কৈলাসের দক্ষিণ পার্শ্বে অগ্নেন নামক পর্বতের নিকট বৈজ্য নামক পর্বত আছে। তাহার পাদস্থিত মানস-সরোবর হইতে সরস্ব নদী উৎপন্ন হইয়াছে (১৪-১৫।৫০)। কৈলাস পর্বতের পশ্চিমে মহাদেবের প্রিয় মুগ্ধবান পর্বত অবস্থিত। ইহা হিমপ্রধান বলিয়া অতিশয় চূর্ণম (১৮-২০।৫০), ইত্যাদি।

সপ্তদ্বীপের অবশিষ্ট দ্বীপগুলি অম্বুধীপের নিকটেই ছিল এবং অম্বুধীপের কোন কোন বর্ষ এই-সকল দ্বীপের অন্তর্গত। কাম্বীর প্রদেশই কিম্পুরুষবর্ষ। ইহার উত্তরস্থিত কারাকোরাম বা নিম্বের চতুর্দশ বর্ষের নাম হরিবর্ষ। নীল বা থিয়ানশান পর্বতের পার্শ্ব বর্ষের নাম নীলবর্ষ। নীল পর্বতের উত্তরে ও খেত পর্বতের দক্ষিণে রম্যক নামক বর্ষ আছে। আলতাই পর্বতশ্রেণী পৌরাণিকের খেত পর্বত।

আলতাই পর্বতের উত্তরে সাংঘান পর্বতমালা বা শৃঙ্গবান পর্বত। এই দুই পর্বতের মধ্যস্থ ভূভাগ সম্ভবতঃ হিরণ্য বা হিরণ্যকবর্ষ। আবার উত্তর সমুদ্রের নিকটে ও দক্ষিণাংশে উত্তর-কুরুবর্ষ (১২।৪৭)। সাইবিরিয়ার উত্তরভাগই উত্তর কুরু। ভাবতবর্ষের কুরুবংশীয়দের সহিত উত্তরকুরু অধিবাসীদের সম্পর্ক ছিল।

গন্ধমাদন বা হিন্দুকুশ পর্বতের নিকটেই কেতুমালবর্ষ এবং মাল্যবানের পূর্বে ভদ্রাবর্ষ (৩।৪৫)। তিব্বতের উত্তর-পূর্ব ও চীনের উত্তর-পশ্চিমস্থ আধুনিক কানহু প্রদেশই একদিন ভদ্রাবর্ষ বলিয়া অভিহিত হইত। বর্তমান আমুরিয়া বা ওক্সুস (Oxus) বা পুরাণের চক্ষু বা অক্ষি নদীর উত্তরস্থ ভূভাগ গ্রীকদের লিখিত বিবরণে সগদিয়ানা নামে অভিহিত হইয়াছিল। শকদ্বীপ নাম হইতেই যে সগদিয়া(না) নামের উৎপত্তি, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। সম্ভবতঃ চক্ষু বা অক্ষি শব্দে জল বা নদী বুঝাইত। বাঙ্গালার সেনে ময়ূবাকি ও কপোতাক নামে সেই অর্থই বুঝাইতেছে।—অর্থাৎ যে নদ বা নদীর জলের বর্ষ ময়ূব বা কপোতের বর্ষের মত।

শকদ্বীপ আমুরিয়া নদীর উত্তরবর্তী। সিঙ্ঘু ও আমুরিয়ার মধ্যস্থ স্থানের নাম একদিন শকদ্বীপ ছিল। জৈন হরিবংশের মতে ঐরাবত-ক্ষেত্রের পূর্বে ধাতকীখণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে পুন্ডরীপের দুইটি বর্ষের মধ্যে একটির নাম ধাতকীখণ্ড। জৈন হরিবংশের ক্ষেত্র পঞ্জাব বলিয়া অনুমিত হয়। আকপানিস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমস্ত দ্বীপগুলিই ক্রমে ক্রমে উত্তর পর্য্যন্ত অবস্থিত ছিল।

পুন্ডরীপ ব্যতীত অন্ত্র সমস্ত দ্বীপেই বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোন কোন পুরাণের মতে শাকদ্বীপ ব্যতীত অন্ত্র কোথাও চতুর্দশ ছিল না। কেতুমালবর্ষে বঙ্গ, রাঢ়, ক্রৌঞ্চ জনপদ এবং শাকবতী, কুশাবতী, পুন্ডলা, রূপা প্রভৃতি পরিচিত নাম পাইতেছি। বঙ্গ ও রাঢ় নাম এই পশ্চিম হইতেই কি বাঙ্গলার আসিয়াছে?—

৪৮ অধ্যায়ে দক্ষিণদিকে ভারতবর্ষের ৯টি ভাগ বলা হইয়াছে—ইহার এক ভাগ হইতে অন্ত্র ভাগে—যাওয়া অতিশয় চূর্ণমায়া। সাগর-বেষ্টিত দ্বীপ, যাহা কুমারিকা হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহাই নবম দ্বীপ বা ভারতখণ্ড। অপর দ্বীপ-কণ্টের নাম ইন্দ্রদ্বীপ, কসেল, তাম্রবর্ণ, পশ্চিমবান, নগদ্বীপ, সোমা, গান্ধর্ব ও বাঙ্গণ। ইন্দ্রদ্বীপ ব্রহ্মদেশ এবং তাম্রবর্ণ সিংহল।

ভারতখণ্ডের পূর্ব প্রান্তে কিরাত, পশ্চিমপ্রান্তে যবন ও মধ্যভাগে

চতুর্ভূজ বাস করে। এই ভারতখণ্ডে বা নবম দ্বীপে ৭টি কুলাচল পর্বত আছে, যথা, হিমালয়, বিষ্ণু, পারিপাত্র, শুষ্টি, মহাদ্রি, মহেন্দ্র, মলয় ও স্বর্ক। এতোক কুলাচল হইতে নির্গত কতকগুলি নদীর নাম দেওয়া আছে। যাহা বর্তমানে বিষ্ণু তাহা পুরাণের পাবিপাত্র, এবং পুরাণের বিষ্ণু মধ্যপ্রদেশের মহাদেও পর্বতশ্রেণী ; স্বর্ক অমরকণ্টক মালভূমি, মহাদ্রি পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেণী। মহেন্দ্র উড়িষ্যার নীলগিবি এবং মলয় দাক্ষিণাত্যের আনামলৈ পর্বত।

ভারতের জনপদ ও রাষ্ট্রগুলির নাম এইরূপ,—মধ্যজনপদের নাম কুরু, পাঞ্চাল, শুরসেন, কুন্তল, কাশী, কোশল প্রভৃতি ; উত্তরে বাস্কীক, আভীর, পঞ্চাব, গান্ধাব, যবন, সিদ্ধসৌবীর, মজ্জক, শক, হুণ, পাবদ, কেকয প্রভৃতি জাতি এবং কাশ্মীর, চুলিক প্রভৃতি দেশ অবস্থিত। ইহাতে গুজ্জবদেব নাম নাই। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে হুণেরা ভারতে প্রবেশ করে, কিন্তু এখানে তাহাদের উত্তরের ক্ষত্রিয় জনপদের মধ্যে নাম পাইতেছি। তাই মনে হয় হুণেরা পঞ্চম শতকে ভারতের মধ্যে প্রবেশের পূর্বে যখন ভারতের উত্তরে ছিল তখনই তাহাদের নাম পুরাণে লিখিত হইয়াছে। রাজপুতানার ছত্রিশ বাজকুলের মধ্যে হুণদেরও নাম আছে। এখানে চীন জাতি ভারতের উত্তরে আছে বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আবার গন্ধাব সমুদ্রাবার মধ্যে চক্ষুঃ নদী চীন, তুবার, শক, প্রভৃতি জনপদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে বলা হইয়াছে (৪৬।৫০)। চীনেদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, তাহারা পশ্চিম এশিয়া হইতে আসিয়াছে। চীনজাতি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে পার্শ্বীয় পর্য্যন্ত দখল করিলে, ইহাভা ভারতবর্ষের উত্তরস্থ জাতি বলিয়া পুরাণে পরিগণিত হইয়াছে। পূর্বের জনপদের নাম—অন্ধ্রবাক, প্রবঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র, বিদেহ, মাল, তাম্রলিপ্তক, নগধ, প্রাগজ্যোতিষ, ইত্যাদি।

অন্তঃপর্ব দাক্ষিণাত্যের জনপদের নাম আছে,—পাণ্ড্য, চোল, কেরল, বনবাসক, মহারাষ্ট্র, আভীর, কুন্তল, বিদর্ভ, অথক, মাহিষক, কলিঙ্গ, অন্ধ্র প্রভৃতি। বিষ্ণু-পর্বতস্থ দেশে মালব, কুরুব, উৎকল, দর্শার, ভোজ, কিবিক্কক, নিম্ব, অবন্তি, প্রভৃতি জনপদের নাম পাইতেছি। উৎকলকে বিষ্ণু-পর্বতস্থ দেশে ধরা হইয়াছে। মনে হয়, বর্তমানে যেখানে উৎকল আছে, পূর্বে সেখানে ছিল না, মধ্য-ভারতে ছিল। বিষ্ণুপুরাণে দাক্ষিণাত্যে অশ্বত্থ নামে একটি জনপদের নাম পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের মাহিষক জনপদ হইতে আগত জাতি মাহিষ ও অশ্বত্থ দেশ হইতে আগত জাতি অশ্বত্থ নাম ধারণ করিয়াছিল। বাঙ্গলার বৈদ্যজ্যোতিষ মধ্য বহুকাল হইতে সংস্কৃত-চর্চা দেখিয়া মনে তয়, তাহারা এই অশ্বত্থ দেশের ব্রাহ্মণ ছিলেন।

সমস্ত প্রাচীন কুলাচার্যগণই বলিয়াছেন, বাঙ্গলার পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ কোলাঙ্ক দেশ হইতে আসিয়াছিলেন। নৃত্যবিদ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, কাঞ্চকুলের ত্রিণীমানয় যে-সকল লোক বাস করে, তাহাদের সহিত বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের আকাংক্ষা সাদৃশ্য নাই। আসামের লোকে ভারতবর্ষের কলিঙ্গ প্রদেশকেই কোলাঙ্ক বলে। তাহা হইলে বাঙ্গলার পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ কলিঙ্গ দেশ হইতে আসিয়াছিলেন। বাঙ্গলার সেন রাজবংশ যে দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়াছিল, তাহাতে আব কাহারও সন্দেহ নাই। শুর বংশের সহিত সেন বংশের সম্বন্ধ ছিল। মক্ষিপ রাঢ়ে শুর বংশের অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং মনে হয়, শুর বংশ ও সেন বংশ উভয়েই দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়াছিল—তাই দাক্ষিণাত্যগত ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের তাহারা আদর করিত। আনাইয়াছিলেন এবং সম্মানের সহিত রাখিয়াছিলেন। বাঙ্গলার

সামাজিক ইন্সিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বাঙ্গলা দেশে বহুকাল ধরিয়া দাক্ষিণাত্য হইতে দলে দলে লোক আসিয়া বাস করিতেছিল, এবং তাহারা অনেকাংশে হুমত ছিল।

ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল বাঙ্গলাদেশের লোকেই নামের পূর্বে ঐ ব্যবহার করে এবং ভাত্র, পৌষ ও চৈত্র এই তিনমাসে লক্ষ্মীপূজা করে। আবার কেবল অন্ধ্র রাজবংশের রাজাদের নামের পূর্বে “সিবি” বা ঐ-কথা ব্যবহার আছে। ইহা হইতে মনে হয় বাঙ্গলার পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সঙ্গে সঙ্গে অথবা সেন ও শুর রাজবংশের সঙ্গে বাঙ্গলা দেশে এই লক্ষ্মীপূজা ও ঐ-প্রায়োপের প্রচলন হইয়াছে।

প্রাচীন বিখ্যাত স্থান প্রতিষ্ঠান-পুরী (বর্তমান পইঠান)। পূর্বাণ-কাবেরা এই প্রদেশেই বাস করিতেন।

(মানসী ও মন্মথাবানী, বৈশাখ) শ্রী রাণালরাজ রাঘ

দৃষ্টি ও সৃষ্টি

চোখ, কান, হাত, পা, রসনা সবকটাই হল কণ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ধরে' বিশেষ চারিদিকে বুকে নেবার জন্য। মানুষ নিজের চোখ, কান, হাত, পা ইত্যাদিকে অস্বাভাবিক বকমে অসাধারণ শক্তিমানে করে' তুলে। ছেলেকে অঙ্গর চেনাতে দেখালে, বই পড়তে দেখলে তবে সে আস্তে আস্তে চোখে দেখতে পায়—কি লেখা আছে, বুঝতে পারে পড়াগুলো, এবং ক্রমে নিজেই বচনা করার শক্তি পায় একদিন হয়ত বা। যে মানুষ কেবল অঙ্গর পরিচয় করে' চলে, আর যে অঙ্গবগুলোর মধ্যে মানে দেখতে লাগল, আবার যে রচনার নির্মাণ-কৌশল ও রস পছন্দ করতে লাগল এদের তিন জনের দেখা-শোনার মধ্যে অনেকখানি করে' পার্থক্য আছে। কাজেই দেখি—শিল্পই বল আর যাই বল কোন কিছুতে কুশল হয় না চোখ, হাত, কান ইত্যাদি, যতক্ষণ এদের স্বাভাবিক কার্যকরী চেষ্টাকে নতুন করে' হুশিষ্কিত করে' তোলা না যায় বিশেষ বিশেষ দিকে—বিশেষ বিশেষ উপায় আর শিল্পার রাস্তা ধরে'। এই শিল্পার তাবতম্য নিয়ে আমাদের সচবাচর মোটামুটি দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ইত্যাদির সঙ্গে শিল্পীর ও গুণীর দেখাশোনার সঙ্গে পার্থক্য ঘটে। ছবি, কবিতা, সুর-সার প্রভৃতি অনেক সময়ে যে আমাদের কাছে ইয়ালীর মতো ঠেকে তা দুই দলের মধ্যে এই পরখ ও পরশের পার্থক্য বশতঃই হয়।

এইজন্যেই কবিতা, সঙ্গীত, ছবি এ-সবকে বুঝতে হলে আমাদের চোখ-কানের সাধারণ দেখাশোনার চাল-চলনের বিপর্যয় কতকটা অস্ত্যাস ও শিল্পার দ্বারা ঘটতে হয়, না হলে উপায় নেই। কোন বিষয়ে পটুতা হয় না, হতে পারে না ততদগ, যতক্ষণ নানা ইঞ্জিয়ারে নিত্য এবং স্বাভাবিক ক্রিয়াব কতকটা অদল-বদল ঘটিয়ে না তোলা যায়। সাবাজীবন বারে বারে একই জিনিষ দেখে শুনে গরশ করে' পরখ করতে করতে কাজের দক্ষতা বেড়ে যায়, হাত পা চোখ কানেব। শরীর-যন্ত্র, নিত্য ব্যবহারের নিত্য কাজের বস্তু ও ঘটনাগুলোর সম্বন্ধে এই অজান্ত বস্তু-পরিচয়ের পাঠ সাজ করে'ই ঘেমে বইল এই হলো সাধারণ মানুষ হিসাবে আমরা দর্শন স্পর্শন শ্রবণ দিয়ে যতটা এসোতে পারি তার চবম পরিণতি। মানুষের দেখা শোনা ছোঁয়া সমস্তই কাজ ও বস্তু এবং বাস্তবিকতার সঙ্গে লিপ্ত হয়ে রইল, নিপুত করে চিনে নিতে পারলে, অজান্তভাবে ধরতে পাবলে বাইরের এটা ওটা সেটা, এ ও তা, এমন তেমন ইত্যাদি

বস্তু ও ঘটনা ;—এই যে জ্ঞান একে বলা যেতে পারে বস্তু-বুদ্ধি বা বাস্তব বুদ্ধি—কিন্তু কিছুতেই একে বলা চলে না, বস্তুর রসবোধ শিল্পবোধ সৌন্দর্য্যবোধ অথবা অর্থবোধ! মানুষের এই বস্তুগত দৃষ্টি চিরদিন তার স্বার্থ-বুদ্ধির সঙ্গেই জড়ানো থাকে। নিত্য জীবনযাত্রার সঙ্গে আশপাশ থেকে বারাসে এসে মিলছে তাদেরই খবর আমবা। দিন-রাত অজান্তেভাবে নিয়ে চলেন এই বস্তুগত দৃষ্টি দিবে। ময়রা যেমন চমৎকার মিঠাই গড়ে' চলো মিঠাইয়ের রসবোধ করার কোন অপেক্ষা না বেশেও। বস্তু-জগতের সঙ্গে পবিচয় বুদ্ধির দিক দিয়ে ঘটরে দর্শন স্পর্শন শ্রবণ মাহুযকে খুব দক্ষতা চাতুর্য্য বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতা দিয়ে পাকা মানুষ কাজের মাহুয করে' দেয় এটা যেমন সত্যি, আবার শুধু এই গুণগুলি নিয়েই মাহুয গুণী কবি ও শিল্পী হয় না এটাও তেমনি সত্যি। কাজের সংস্পর্শ থেকে কিছুকে বিচ্ছিন্ন করে' নিবে চেয়ে দেখা, শুনে দেখা, ছুঁয়ে দেখা অস্ত্যাস চোখ কান ও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে যেমনায় ক্ষমতা অনেকখানি সাধনার অপেক্ষা রাখে, তবে মানুষের শিল্পজ্ঞান বসবোধ জন্মায়। মানুষ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে কখন? প্রাণের সঙ্গে বাক্যকে, চক্ষুর সঙ্গে মনকে, স্তোত্রের সঙ্গে আত্মাকে যখন সে মিলিত করে। যে-সব শরীরযন্ত্রের কাজই ছিল বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাহিরের প্রেরণায় চটপট সাড়া দেওয়া নির্দিষ্টারে; অন্তর্ব্যবহার সঙ্গে মানুষ যেমন তাদের যুক্ত করে' দিলে অমনি ভিতরকার প্রেরণায় তারা ধীরে হুহু একটুখানি যত্নের সঙ্গে একটু কৌতুহল নিবে যেন আত্মীয়তা পাঠাতে চলো বাচিরের এটা ওটা সেটার সঙ্গে, একটু দবদ পৌঁছল দেখা শোনা ছোঁয়ার মধ্যে।

ভাবুকের শোনা দেখা বলা কওয়ার মধ্যে শিশুহলন্ত সরলতা ও কল্পনাব্যবসায় থাকে। ভাবুকদৃষ্টি এত অপক্লপ অসাধারণভাবে দেখে শোনে দেখায় শোনায় যে কাজের মাহুযের দেখা শোনা ইত্যাদি সঙ্গে তুলনা করে' দেখলে ভাবুকের চোখে দেখা ছবি কবিতা সমস্তই ইয়ালী বা ছেলেমানুষির মতই লাগে।

শিশুর হৃদয় যে ভাবে গিরে স্পর্শ এবং পরখ করে' নেব বিশ্ব-চবাচরকে, একমাত্র ভাবুক মানুষই সেই ভাবে বিশ্বর হৃদয়ে আপনায় হৃদয় লাগিয়ে দেখতে পারেন শুনতে পাবেন, এবং অবোলা শিশু যেটা বলে' যেতে পাবলে না সেইটেই বলে' যায় ভাবুক কবিতায় ছবিতে,—রেখা বহু লেখা বহু হরের ছন্দে অবোলা শিশুর বোল, হারানো দিনগুলির ছবি। অক্ষরস্ত্র আনন্দ আর খেলা দিয়ে তারা শিশুকালের দিন-বাতগুলোর জন্তে সব মাহুযেরই মনে যে একটা বেদনা আছে সেই বেদনা-ভরা বাজছে কিরিয়ে নিয়ে চলেন মাহুযের মনকে থেকে থেকে কবি এবং ভাবুক, যারা শিশু মতো তরুণ চোখ কিরে পেয়েছেন। শিশুকাল বধার্থই ভাবুক এবং আপনায় চারিদিকে সে সত্যই হৃদয় দিয়ে ধ্বতে চায় বুঝতে চায় এবং বোঝাতে চায় ও ধবে' দিতে চায়; শুধু সে যা দেখে শোনে সেটা ব্যস্ত করা বসল এত অল্প, যে, খানিকটা বোঝায় নানা ভঙ্গী দিয়ে, খানিক বোঝাতে চায় নানা আঁচড় পোঁচড় নথতো ভাঙ্গা ভাঙ্গা বেথা লেখা ও কথা দিয়ে; এইখানে কবির সঙ্গে ভাবুকের সঙ্গে পাকা অভিনেতার সঙ্গে শিশু বতকাং। দৃষ্টি দুজনেই তরুণ, কেবল একজন সৃষ্টি করার কৌশল একেবারেই শেখেনি আব-একজন সৃষ্টির কৌশলে এমন স্পষ্ট যে কি কৌশলে যে তাঁরা কবিতা ও ছবির মধ্যে শিশু বতকাং দৃষ্টি আব অস্পষ্ট ভাষাকে ফুটিয়ে তোলেন তা পর্যন্ত ধরা যায় না।

স্বাক্ষর দিয়ে শিশুর আবোল তাবোল আঁধ-ভাঙ্গা কতকগুলো বুলি সংগ্রহ করে', অথবা শিশুর হাতের অপবিপক ভাঙ্গাচোরা

টানটোন আঁচড়-পোঁচড় চুরি করে' বসে' বসে' কেবলি শিশু-কবিতা শিশু-ছবি লিখে চলেনই মানুষ কবি শিল্পী ভাবুক বলাতে পারে নিজেকে এবং কাজগুলোও তাব মন-ভোলানো হয় এ ভুল যাবা করে' চলে তাবা হয়তো নিজেকে ভোলাতে পাবে কিন্তু শিশুকেও ভোলার না, শিশুর বাপ-মাকেও নয়। ছেলে-ভুলানো ছড়া একেবারেই ছেলে-মানুষি নয়, তরুণ দৃষ্টিতে দেখা-শোনা ছবি ও ছাপ সেগুলি।

কাজের দৃষ্টি মাহুযের স্বার্থের সঙ্গে সৃষ্টির জিনিষকে জড়িয়ে দেখে, আব ভাবুকের দৃষ্টি অনেকটা নিঃস্বার্থ ভাবে সৃষ্টির সামগ্রী স্পর্শ করে। দিন-বাতের মধ্যে যে-সব ঘটনা হঠাৎ ঘটে কিম্বা আকস্মিক ভাবে উপস্থিত হয় প্রতিদিনের বাঁধা চালের মধ্যে সেগুলোকে মাহুয খুব কাজে ব্যস্ত থাকলেও অন্ততঃ এক পলকের জন্তেও মন দিয়ে না দেখে থাকতে পাবে না—সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপারে আকৃষ্ট হবার একটা চেষ্টা থেকে থেকে জাগে আমাদের সকলেরই, কিন্তু বাইবে থেকে প্রেরণাসাপেক্ষ চোখ কান ইত্যাদি এই কৌতুহল সব সময়ে জাগিয়ে রাখতে পারেন কেবল ভাবুকেরাই। বিশ্ব-জগৎ একটা নিত্য-উৎসবের মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন রসের সরঞ্জাম নিয়ে জাবুকের কাছে দেখা দেয় এবং সেই দেখা ধরা থাকে ভাবুকের বেখা টানে, লেখা ছাঁদে, বর্ণে ও বর্ণনে; কাজেই বলা চলে বুদ্ধির নাকে চড়ানো চল্টি চশমা ঠিক উল্টো এবং তাব চেয়ে ঢেব শক্তিমান চশমা হল মনের সঙ্গে যুক্ত ভাবের চশমা-খানি।

অভিনিবেশ করে' বস্তুতে ঘটনাতে নিবিষ্ট হবার শিক্ষা ও সাধনায় আপনায় কার্যকরী ইন্দ্রিয়-শক্তি-সকলকে নতুনভাবে শক্তিমান করে' তুলেন যে মুহূর্তে ভাবুক—সৌন্দর্য্যে অর্থে সম্পদে সৃষ্টির জিনিষ ভরে উঠল, জগৎ এক অপক্লপ বেশে সেজে দাঁড়ালো মাহুযের মনেব দুয়ারে, বাবমহল ছেড়ে অভ্যাগত এল যেন অন্যরের ভিতর ভালবাসাব রাজত্ব। রনের স্বাদ অনুভব করলে মাহুয—যেটা সে কিছুতে পেতে পারতো না যদি সে—ইন্দ্রিয়-সমস্তকে কেবলি প্রস্তুত ও সজ্জী কাজ দিয়ে বসিয়ে রাখত বুদ্ধির কোঠার দেউড়িতে। এই নতুন শিক্ষা নতুন সাধনা যখন মাহুযের ইন্দ্রিয়গুলো লাভ কবলে, তখন মাহুযের কণ্ঠ শুধু বলা-কওয়া হাঁক-ডাক করেই বসে' রইলো না, সে গেয়ে উঠল, হাতের আঙুলগুলো নানা জিনিষ স্পর্শ করে' নরন গরম কঠিন কি মুহু ইত্যাদির পবখ করে'ই ক্ষান্ত হল না, তাবা সংযত হয়ে তুলি বাটালি হুঁচ হাতুড়ি এমনি নানা জিনিষকে চালাতে শিখে নিলে, বীণা-যন্ত্রের উপরে হুব ধ্বতে লাগল হাত, আঙুলের আঁগা, শুধু লোহার তাবকে তাব মাত্র জেনেই ক্ষান্ত হল না, হুয়ের তাব পেয়ে যন্ত্রের পর্দায় পর্দায় বিচরণ করতে থাকল আঙুলের পরশ শুন্ শুন্ করে ফুলের উপরে ভ্রমবের মতো, কোলের বীণার সঙ্গে যেন প্রেম কবে' চল হাত, কান শুনতে লাগল প্রেমিকের মতো কোলের বীণার প্রেমালোপ। সঙ্গ হুঁচের, সোনার হুতোব, রংএ ভরা তুলির সজীব ছন্দ ধবে' তালে তালে চল আঙুল। হাতুড়ি-বাটালীর ওঠা-পড়াব সঙ্গে সঙ্গে তাণ্ডব নৃত্য কবতে শিক্ষা নিলে শিল্পী হাত, কাজের ভিড় থেকে মাহুযের চোখ-হাত সেই সঙ্গে মনও ছুটা পেয়ে খেলাবার ও ডানা মেলাবার অবসর পেয়ে গেল।

সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সৃষ্টির দিকে এই অভিনিবেশ দৃষ্টি এইটুকুই ভাবুকের সাধনার চরম হল তা তো নয়, সৃষ্টির বাইবে যা তাকেও ধরবার জন্তে ভাবুক আরো এক নতুন নেত্র খুলেন—পুবই প্রথর দৃষ্টি ধার এমন দুববীকণ-যন্ত্রকেও হার মানালে মাহুযের এই মানস-নেত্র। চোখের দৃষ্টি বেখানে চলে না, দুববীকণের দুবদৃষ্টিরও অগম্য যে স্থান, মাহুয এই আব-এক নতুন দৃষ্টির সাধনায় বলীমান

হয়ে নিজেব মনের দেখা নিয়ে বিশ্বজ্যোত্সব পবপাবেও সন্ধান বেরিয়ে গেল—সেই রাজস্বে—যেখানে সৃষ্টিব অবশুর্গনে নিজেকে আবৃত করে' শ্রষ্টা রয়েছে গোপনে।

এই ব্রহ্মলোক যেখানে ছায়াতপে সমস্ত প্রকাশ পাচ্ছে, গন্ধর্ব্ব-লোক যেখানে রূপ ও সুর উভয়ে জগেব উপবে যেন তবদ্বিত হচ্ছে, এবং আকাশ মধ্যে যেখানে নিখিলেব সমস্তই দর্পণের মতো প্রতিবিম্বিত দেখা যাচ্ছে—সমস্তই দিব্য-দৃষ্টিতে পরশ ও পরধ করে' নিলে মানুষ। দর্শকের ও শ্রোতার জাষণায় বসে' মানুষ দেখাব মতো কবে' দেখলে, শোনাব নত করে' শুনে নিলে নিখিলের এই রূপেব লীলা সুরের খেলা, এবং এবও ওপাবে যে লীলাময় মানুষকে সমস্ত পদার্থ সমস্ত বস্তুব সঙ্গে একত্রে বেঁধে একই নাট্যশালায় নাচিবে গাইবে চলেছেন তাঁকে পর্যন্ত ছুঁয়ে এল মানুষ নেপথ্য সরিয়ে।

দেখা শোনা পরশ করার চরম হয়ে গেল, তাব পব এল দেখানোব পালা। মানুষ এবাবে আব এক নতুন অজুত অনিয়ন্ত্রিত অজুতপূর্ণ দৃষ্টি সাধন কবে শুধী শিল্পী হয়ে বসল। এই দৃষ্টি-বলে আপনাব কল্পনালোকের মনোবাজ্যেব পোষনতা থেকে মানুষ নতুন নতুন সৃষ্টি বাব কবে' আনতে লাগল। যে এতদিন দর্শক ছিল সে হল প্রদর্শক, দেষ্টা হয়ে বসল বিতীয শ্রষ্টা। অরূপকে রূপ দিয়ে, অসম্ভবকে সম্ভব করে' অথোলাকে সুর দিয়ে, ছবিকে প্রাণ, বঙ্গদীনকে বং দিয়ে চল মানুষ।

(বঙ্গবাণী, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ) শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলার নবযুগের কথা

ইংবেজী শিক্ষাব প্রথম দল—যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য।

বাজা বামমোহন বাংলাব এই নবযুগেব প্রবর্তক হইলেও বাজাব আদর্শটি বহুদিন পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীবা ধবিত্তে পাবেন নাই। এখনও পাঁচিয়াছেন কি না, সন্দেহ। তামসিকতাকে দূব কবিবাব জন্যই বাজা দেশেব ধর্ম্ম-কর্ম্মকে লোকের অগুস্তবেব উপরে গড়িয়া তুলিতে চাষ্টিয়াছিলেন।

বাজা দেখিয়াছিলেন যে ভাবতবর্ধকে যদি এযুগে সত্যভাবে বাচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে ভাবতবাসীদিগকে নিজেদের সনাতন সভ্যতা ও সাধনা লইয়া আধুনিক সভ্য-সমাজেব সাংখ্যানে যাইবা মাথা উঁচু করিবা দাঁড়াইতে হইবে; আব কূপমণ্ডুক হইবা থাকিলে চলিবে না। ভাবতবর্ধ যখন বড় ছিল, তখনও সে কূপমণ্ডুক ছিল না। এই কারণেই বাজা ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত কবিবাব জন্ত এতটা আগ্রহাষিত হইয়াছিলেন। এদেশে ইংবেজী শিক্ষা প্রচলনের জন্ত ইংবেজ গবর্ণমেন্ট আদিত্তে কোনও চেষ্টাই কবেন নাই, বরঞ্চ নানাদিকে বাধা দিতে চাষ্টিয়াছিলেন।

কলিকাতা-সমাজে এই নতুন শিক্ষাব কলে একটা প্রবল ধর্ম্ম-ও সমাজ-বিপ্লবেব বান ডাকিয়াছিল। রাজা বামমোহন প্রাচীন বেবাস্তাদি প্রাচী কবিবা প্রচলিত সংস্কারেব সঙ্গে যে বিবোধ জাগাইতে চাষ্টিয়াছিলেন, হিন্দু কলেজেব প্রতিষ্ঠায বুঝাপেব জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে সে বিবোধটা সম্ভবই আর-এক দিক দিয়া পাকিয়া উঠিতে লাগিল।

বিরোধটা পাকিল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বাজা যে সমন্বয়েব পথটা দেখাইয়াছিলেন, তাহাব সম্ভান লোকে পাষ্টল না। কলে ইংবেজী শিক্ষার প্রথম চেউ শিক্ষিত বাঙ্গালীকে একেবারেই স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনাব কোল হইতে তুলিয়া লইয়া আধুনিক

যুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার দিকে প্রবল বেগে ঠেলিয়া দিল। আব উহার মূল কারণ ছিল—এই নতুন শিক্ষা ও সাধনাব অতিশয় বলবতী স্বাধীনতা ও মানবতাব প্রেরণা। ইহাই বাঙ্গালীবা অন্তর্নিহিত চিরন্তন কিন্তু সম্প্রতি-বিভূত স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শকে জাগাইয়া, কলকাতা-যুগকে যেমন নিজেব নাস্তিগন্ধে মাতাইবা চাবিদিকে ছুটাইয়া থাকে, বাঙ্গালীকেও সেইরূপ নিজেব আদর্শের গন্ধেই যুরোপেব দিকে ছুটাইয়া দিল।

এ দেশে উচ্চ ইংবেজী শিক্ষাব প্রচলন ইংবেজেব বঙ্গার জন্তই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সে যুগটাই বুঝাপে এক অভিনব স্বাধীনতা এবং মানবতার প্রেরণায মাতিয়া উঠিয়াছিল।

যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ইংবেজীতে বাহাকে Rationalism এবং Individualism কহে, ফরাসী বিপ্লবেব মূল ভিত্তি ছিল; বাহাবা হিন্দু কলেজে লেখাপড়া শিখিতে গেলেন, এই যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাঁহাদের জীবনেরও মূলমন্ত্র হইবা উঠিল। এই নতুন আদর্শেব প্রেরণায় ইঁহারা প্রচলিত ধর্ম্মের এবং সমাজেব সকল বন্ধনকে ভাঙিতে আবস্ত করিলেন। এইরূপে বাঙ্গালাব ইংরেজীনবীশদিগেব প্রথম দলের মধ্যে একটা তীব্র ধর্ম্মমোহিতা এবং সমাজমোহিতা জাগিয়া উঠিল। এই-সকল শিক্ষার বলে প্রাচীন সমাজে এবং পবিবাদের জ্যেষ্ঠগণের সম্ভব নব্যবুদ্ধিকগেব বিবোধ বাধিয়া উঠিল। ইংরেজী শিক্ষাব প্রভাবে বাংলার ইংরেজীনবীশেরা প্রাচীনকে ভাঙিয়া-চুরিবা বুঝাপের হাঁচে নিজেদের সমাজকে নতুন কবিবা গড়িয়া তুলিবাব জন্ত ব্যাকুল হইবা উঠিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর যুরোপীয় যুক্তিবাদের বা Rationalismএব উপরেই আমাদের প্রথম দলের ইংরেজীনবীশদিগেব এই সমাজ-ও-ধর্ম্মমোহিতা প্রতিষ্ঠালাভ কবিত্তে চাষ্টিয়াছিল। এই যুক্তিবাদ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকেই সত্যেব বা বস্তব একমাত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ কবে।

উনবিংশ শতাব্দীর যুরোপীয় চিন্তা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের অপূর্ণতা অনুভব কবিয়া, ইন্দ্রিয়ের প্রমাণেব দ্বাবা মানুষেব সকল অভিজ্ঞতায সীমাসংসার হর না দেখিবা, Intuition বা আত্মপ্রত্যক্ষের আশ্রয় লইয়াছিল। আমাদের নতুন ইংরেজীনবীশেবাও কেহ কেহ এই পথেই নাস্তিক্যের হাত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপে আমাদের প্রথম দলের ইংবেজীনবীশদিগের মধ্যে মোটেব উপবে দুইটা দল গড়িয়া উঠিতে আবস্ত করে। এক দল প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মেব উপব আস্থা হাবাইয়া নাস্তিক্যেব দিকে মুঁকিয়া পড়িলেন। কেবল লোকশ্রেয়: অর্থাৎ জনসাধারণেব বাহাতে কল্যাণ হয় এবং বাহা তাহাদের স্বধনমুষ্টি সাধন কবে, ইহাকেই সমাজ-নীতিব মূলমন্ত্ররূপে অবলম্বন কবিবাছিলেন। বাহাতে লোকের স্বধনমুষ্টি নষ্ট কবে, তাহাই অধর্ম্ম, বাহা দ্বারা ইহ-লৌকিক স্বধনমুষ্টি তাহাই ধর্ম্ম, ইহাই ইঁহাদের চরিত্রের বুনীবা হইবা উঠে। আব-এক দল প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মেব বিশ্বাস হাবাইয়াও সকল ধর্ম্মবিশ্বাস হাবাইলেন না। ইঁহাদের প্রকৃতিব মধ্যেই একটা বলবতী আন্তরিক্যবুদ্ধি বিভ্রাম ছিল। ইঁহাবা হিন্দুধর্ম্মেব বিরুদ্ধে বর্ধগহস্ত হইয়াও প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মমোহী হইতে পাবিলেন না। ভাবতের প্রাচীন সাধনাতেও যুক্তি এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেব একটা স্থান আছে। গতানুগতিক ধর্ম্মেব সাধনে কেহ ইহাব সম্ভান লইত না। এইজন্তই আমাদের যে-সকল ইংরেজীনবীশেবা এই যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেব প্রেরণায় হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজকে অধৌক্তিক এবং মানবের স্বাভাবিক স্বাধীনতায পরিপন্থী বলিয়া বর্জন কবিয়াছিলেন, তাহাবা অটোষ্ট্যান্ট্ খৃষ্টীয় ধর্ম্মেব আশ্রয় গ্রহণে কুঠিত হন নাই।

কি করিবা ছেবেবা ইংবেজীও শিখিবে, যুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনাব শাস্ত্র-সাহিত্যও অধ্যয়ন কবিবে, অথচ ইহাব যে অপবিহার্য পরিণাম,

যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিব্যক্তির প্রভাব, তাহাব হাতও এড়াইয়া থাকিবে, এই অসাধ্য-সাধনায় হিন্দুসমাজের নেতৃগণ প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু তত্ত্বমন্দের দ্বারা শাস্ত্র ও কিম্বদন্তীর দোহাই দিয়া কিম্বা সমাজ-শাসনের ভাব দেখাইয়া নূতন ভাবের ও আদর্শের মনে মাতোয়ারা যুবকের দলেব—সমাজ-এবং ধর্মপ্রোহিতাকে ঠেকাইয়া বাধিতে পারিলেন না।

এরূপ অবস্থায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রামমোহনের আধ্যাত্মিক দায়িত্বকালের দাবী করিয়া তাহাব প্রতিষ্ঠিত মুমূর্ষু ব্রহ্মসভাতে নবচেতনা সঞ্চার কবিয়া নব্যশিক্ষিত বাদ্দালীদিগের উপরে পুণ্ড্রধর্মের প্রভাব নষ্ট কবিত্তে আবিস্কৃত করিলেন।

(বঙ্গবাণী, জ্যৈষ্ঠ) -

শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

প্রাণশক্তির রসশ্রোত

অনেকের ধারণা আছে যে বুদ্ধি লড়াই কবে' স্বল্পসংঘর্ষের মধ্য দিয়েই শক্তি প্রকাশিত হয়। তাহা একথা স্বীকার করে না যে সৌন্দর্য্য মানুষের বীর্যের প্রধান সহায়। বসন্তকালে গাছপালাব যে নবকিশলয়ের উদ্যম হয়, তা যেমন তাব অনাবশ্যক বিলাসিতা নয়, বাস্তবিক পক্ষে সে যেমন তার বড় সৃষ্টির একটি প্রক্রিয়া, তেমনি বড় বড় জাতির জীবনে যে রসসৌন্দর্যের বিস্তার হয়েছে তা তাদের পরিপুষ্টিরই উপকরণ জুগিয়েছে। এই-সকল রসই জাতির জীবনকে নিত্য নবীন কবে' রাখে, তাকে জবাব আজ্ঞা থেকে বাঁচায়, অমরাবতীর সঙ্গে মর্ত্যলোকের যোগ স্থাপন করে, এই রসসৌন্দর্য্যই মানবচিহ্নে আধ্যাত্মিক পূর্ণতায় বিকশিত হয়। কেবল দেহেরই নয়, মনেরও জীবন আছে, সঙ্গীত হচ্ছে তারই তৃষ্ণাব একটি পানীয়, এই পানীয়ের দ্বারা মনের প্রাণশক্তি সতেজ হয়ে ওঠে।

জীবন নীচ হলে সঙ্গে সঙ্গে তা নির্বীর্ণ হয়ে পড়ে। কিন্তু শুদ্ধতাব কঠোরতাই যে বীর্য এমন কথা আমাদের দেশে প্রায়ই শুনে পাওয়া যায়। অবশ্য বাহিরে বীর্যের যে প্রকাশ সেই প্রকাশের মধ্যে একটা কঠিন দিক আছে, কিন্তু অন্তরে যে পূর্ণতা সেই কাঠিন্যকে রক্ষা কবে সেই পূর্ণতার পরিপুষ্টি কোথা থেকে? এ হচ্ছে আনন্দরস থেকে। সেইটে চোখে ধরা পড়ে না বলে' তাকে আমরা অপ্রাণী করি, তাকে বিলাসেব অঙ্গ বলে' কল্পনা করি।

গাছেব শুভিবা কাঠ-অংশটাকে দিয়েই ত গাছের শক্তি ও সম্পদেব হিসাব করলে চলবে না। সেটাকে খুব স্থূলরূপে স্পষ্ট কবে' দেখা যায় সন্দেহ নেই; আর গুঢ়ভাবে তার অণুতে অণুতে যে রস সঞ্চারিত হয়, যে বসেব সঞ্চারণই হচ্ছে গাছের গর্ভার্ধ প্রাণশক্তি, সেটা স্থূল নয়, কঠিন নয়, বাহিরে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ নয় বলেই তাকে ধর্ম করা সত্য-দৃষ্টির অভাব বশতই ঘটে। শু'ড়ির সত্যটা বসেব সত্যেব চেয়ে বড় নয়, শু'ড়ির সত্য রসেব সত্যের উপরেই নির্ভব কবে, এই কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে।

যখন দেখতে পাব যে আমাদের দেশে সঙ্গীত ও সাহিত্যেব ধারা বন্ধ হয়েছে, তখন বুঝব দেশে প্রাণশক্তির স্রোতও অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। সেই প্রাণশক্তিকে নানা শাখা-প্রশাখায় পূর্ণভাবে বহমান কবে' রাখাব জন্তেই, বিশ্বের গভীর কেন্দ্রে থেকে যে অমৃতবস-ধাবা উৎসারিত হচ্ছে তাকে আমাদের আবাহন করে' আনতে হবে। ভগীরথ যেমন ভগ্নীভূত সগর-সম্মানদেব বাঁচাব জন্তে পুণ্যতোবা পদ্মকে মর্ত্যে আমন্ত্রণ কবে' এনেছিলেন তেমনি মানসলোকের ভগ্নীবেষেব প্রাণহীনতাব মধ্যে অমৃতত্ব সঞ্চারিত কবাব জন্তে আনন্দরসেব বিচিত্র ধাবাকে বহন কবে' আনবেন।

সমস্ত বড় বড় জাতির মধ্যেই এই কাজ চলছে। চলছে বসেই তাহা বড়। পার্লামেন্টে, বাণিজ্যেব হাটে, যুদ্ধের মাঠে তাঁরা বুক ফুলিয়ে ভাল বৃক্ষে বেড়ান বলেই তাঁরা বড় তা নয়। তাঁরা সাহিত্যে সঙ্গীতে কলা-বিদ্যায় সকল দেশের মানুষেব জন্তে সকল কালের বসন্তোত নিত্য প্রবহমান করে' রাখ'চেন বলেই বড়।

(নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ)

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাদেশিক দেবতত্ত্ব

একাচুরা পূজা।

মহম্মদসিংহেব পূর্বাংশে এবং জিণুবাব উত্তরাংশে এই দেবতাব অত্যন্ত সমাদর। ছেলেনেদের উৎকট ব্যাধি হইলে, অথবা মৃতবৎসাব সম্মান বক্ষাব জন্ত এই দেবতার পূজা হইয়া থাকে। ইহাব পূজা মানসিক কবাব সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর পায়ে লোহার বালা অভাবে হুতা পবাইয়া দেওয়া হয়। সাধাবর্ণতঃ ইহাকে একাচুরার বেড়ী বলা হয়। কাহারও অন্নপ্রাণনেব সময়, কাহারও পৈতাব সময়, কাহারও কাহারও বা বিবাহেব সময়েও পূজা অমুষ্ঠিত হয়। পূজা সম্পন্ন হইলে পায়েব বেড়ী কাটিয়া ফেলা হয়। যাহার ধৃত বেড়ী কোন কারণে নষ্ট হইয়া যায়, তাহার পক্ষে পূজার সময় নূতন বেড়ী পায়ে পরাইতে হয়। এই দেবতাব নাম সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখা যায়।

কোন কোন পদ্ধতিতে ইনি “একচোর ভৈরব” নামে, কোন পুস্তকে একচুড় ভৈরব নামে, আবার কোথাও—“একচুড় শিব” নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইহাব ধ্যানের এবং মন্ত্রেবও পার্থক্য দেখা যায়।

(১) নীলজীমূতসঙ্কাশং একচোরং ত্রিলোচনম্।

মিভুজং শত্রুহস্তারং নানালঙ্কারভূষিতম্॥

(২) নীলজীমূতসঙ্কাশং একচোরং ত্রিলোচনম্।

গদাধরুগধরং দেবং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্॥

বিন্ধ্যাস্থং বিন্ধ্যানিলয়ং ভৈরবং ভৈববীপ্রিয়ম্॥

ঔ একচোর ভৈরব ইহাগচ্ছেত্যাবাহুঃ হুং ক্রৌ একচোরভৈববায় নমঃ ইত্যনেন পূজয়েৎ।

এই পূজার অঙ্গ ছাগবলিদান। কোন কোন স্থলে মহিববলিও হইয়া থাকে। শ্রীলোকে একাচুরার ব্রতও করিয়া থাকে।

বরকুমার।

ইনি একাচুরার নিম্নত সহচর দেবতা। যেখানে একাচুরাব পূজা হইয়া থাকে, সেখানে ইনিও অবশ্যই পূজা পান। মঙ্গল-ব্যাপাবেব পূর্বে একাচুরা বরকুমারের পূজা প্রারম্ভই হইয়া থাকে। কোন কোন পুরোহিত ঠাকুর মনে করিয়াছেন, ইনি বড় কুমার। বড় হইলেই বৃহৎ; অতএব কেহ ইহাকে বৃহৎ কুমারায় নমঃ, কেহ বা বৃদ্ধ কুমারায় নমঃ, আবার কেহ কেহ বড়কুমারায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা কবিয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ মনে করেন ইনি বরদাতা কুমার। বোঃ মন্ত্রে ষোড়শোপচারে ইহার পূজা হইয়া থাকে।

ধ্যান এইরূপ :—

“ঔ বড়কুমার মিভুজং শত্রুহস্তারং মদ্যঘটকপালকম্।

ব্যান্ধচর্ম্মাধবং নানালঙ্কারভূষিতম্।”

ইহার অঙ্গদেবতারূপে অষ্ট-ভৈববের পূজা কবিত্তে হয়। ইহার পূজাতেও ছাগাদি পশু বলি হইয়া থাকে।

বনচূর্ণা পূজা।

এই দেবতা পূর্ব-মহম্মদসিংহে অতীব প্রভাবশালিনী। প্রত্যেক

হিন্দুপ্রাচ্যের পত্নীতে পত্নীতেই ইহার অধিষ্ঠান শাকোট বৃক্ষ (শেওড়া গাছ) দেখিতে পাওয়া যায়। গাছের গোড়াতে পূজা অমুষ্ঠিত হয়, হুতরাং এই পূজার নাম গাছের শুড়ির পূজা। মেয়েরা দেবীকেও 'গাছের শুড়ি ঠাকুরাণী' বলিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে শেওড়া ভিন্ন উড়ুম প্রভৃতি গাছেও পূজা হইতে দেখা যায়। অনেক স্থলে পূজা বৃক্ষের গোড়া বাঁধান হইয়া থাকে। বিবাহ উপনয়ন চূড়াকরণ প্রভৃতি প্রত্যেক মঙ্গল ব্যাপারের পূর্বেই বনভূগার পূজা এবং তদঙ্গ বলিদান হইয়া থাকে। এই পূজার ৭, চিড়াভাজা, চাউলেব শুড়া, বীচে কলা প্রভৃতি নৈবেদ্যরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে। হংসভিষে সিন্দুর মাশাইয়া এই পূজার দেওয়া হয়। প্রত্যেক ছেলে হওয়ার পব অশোচাস্ত-দিনে বনভূগার পূর্বোক্ত ভোগ্যরাগ দেওয়া হয়। ইহাতে আর গোড়শোণচারে পূজার ব্যবস্থা নাই। ইহাকে গাছেব শুড়ির বাড়ান বলিয়া থাকে। কুমিল্লাপ্রদেশে এই পূজা কামিনীগাছের গোড়ার অমুষ্ঠিত হইয়া থাকে। হুতরাং ইহাকে কামিনীপূজা বলা হয়। পুরোহিত ঠাকুরগণ স্ব স্ব রুটি অমুসাবে কেহ শাকোটবাসিনীে দুর্গারৈ নমঃ, কেহ বা শাকোটবাসিনীে নমঃ, ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা কবিতা থাকেন। ধ্যানামুসাবে বনভূগার ত্রিবলীমুক্তা বনমাণ্যবিভূষিতা, শাকোট বৃক্ষে (শেওড়া-গাছে) ইহার অধিষ্ঠান।

ও বনভূগার (দুর্গা) বলীপেতাং (তা) বনমাণ্যবিভূষিতাং (তা) শাকোটবাসিনীং (নী) দেবীং (দেবী) হুতরক্ষাং কক্শ মে ॥

আমার পুত্র রক্ষা কব, দেবীর নিকট এইরূপ প্রার্থনা করা হয়। ধ্যানের পম্পট অশুদ্ধ আছে। "ও ব্রীং বনভূগারৈ নমঃ" এই মন্ত্রে দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

বনভূগার (র্গা) মহাভাগাং (গা)

শাকোটবৃক্ষবাসিনীম্ (নী)।

পট্টবস্ত্রপাণীনাং (না) হুতরক্ষাং সদা কুর্ক ॥

অম্যা: স্তুতি:—

উগ্রনংস্ত্রাং করালাস্যাং পীনোরতপমোঘরাম্।

দিশ্ববস্ত্রামভয়ং স্ত্রামাং লোচন-জিতসাম্বিতাম্ ॥

শাকোটবাসিনীং দুর্গাং সর্বকল্মষভারক্ষিণীম্।

সৌবর্ণাধ্বজ-মধ্যপাং জিনরনাং সৌদামিনীমন্ত্রিভাং

চক্রং শঙ্খবরাভয়ানি দধতীমিশ্রো: কলাং বিস্রতীম্।

ত্রৈবেদ্যাক্রম-হাব-কুণ্ডলধরামাখণ্ডলাদ্যৈরুভাং *

ধ্যারেক্ষিদ্ধানিবাসিনীং শশিমুখীং পাশ্ব-পক্ষাননাম্ ॥

এই ধ্যানটি নেপালীধর্মের প্রতাপসত্য সিংহের "পুরুষচর্যাবলি" নামক বিস্তৃত তন্ত্রনিবন্ধেও অবিকল দেখিতে পাওয়া যায়। হুতরাং বনভূগার প্রসার নেপাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। বনভূগার পূজার শুরুর বলি হইয়া থাকে। মুসলমানদিগের জবাই করার রীতি অনুসারে নাপিত ক্ষুণ্ণের দ্বারা শুরুর গলা কাটিয়া দেয়। অধিকন্তু এই পূজার অঙ্গরূপে ২১ একুশটি মোবগ উৎসর্গ করা হয়। ইহাদের হত্যা হয় না। একটি খাঁচার ভিতরে মোবগগুলিকে রাখিয়া পূজা-ভানের সুবে ঐ খাঁচা বাধা হয়, পুরোহিত দুব হইতে মোরগেব গার জল ছড়াইয়া দেন।

লালসা-বিশ্বেশ্বর পূজা।

এই পূজা ময়মনসিংহের এবং ত্রিপুরার অনেক স্থানে অমুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ লোকে ইহাকে টাকরা-টাকরীর পূজা বলে। মৃত-বৎসার সন্তানরক্ষার্থেই এই পূজার অমুষ্ঠান হইয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস এইরূপ যে, টাকরা-টাকরী দেবতা কচি ছেলেকে অপহরণ কবিতা লইয়া, সেই ছেলের রূপ ধারণ করিয়া দেবতাই ছেলের স্থান অধিকার করে। ভান কবিধা দেবতাই মবিয়া যায়, পবে মৃতদেহ মাটিতে প্রোথিত হইলে, সেখান হইতে দেবতা উঠিয়া যাব। আমবা বালাজীবনে এই বিষয়ের

অনেক চিকিৎসক দেখিয়াছি, এবং তাহাদের মুখে অনেক অদ্ভুত গল্প শ্রবণ করিয়াছি। বর্তমান সময়ে চিকিৎসক বিবল হইয়াছে।

লালসা-বিশ্বেশ্বর অর্জনারীধরের সঙ্গীতীয় দেবতা বলিয়া উল্লেখযোগ্য। কাবণ ধ্যানামুসারে এই দেবতা ব্রীপুরুষ-শরীবাঙ্কক, এবং একজাই পূজনীয়।

মেধাকীং জীর্ণবসনাং পশ্বহস্তাং ভূজঘরাম্।

বৃক্ষস্থিতাং বালক্রোড়াং মুক্তকেশীং ভবানকাম্।

দত্তহস্তাং ধৃতকটীং বনমাণ্যবিভূষিতাম্।

জটাম্বারসমায়ুক্তাং (জং) ভগ্নবর্ণাং (গং) ভূজঘরাম্ (য়ং)

দণ্ডপাশসমায়ুক্তাং (জং) কেশপিঙ্গললোচনাং (নং)

কটাকস্থানাং সন্ততং দস্তোষ্ঠাং (দস্তোষ্ঠং) কল্পিতং সদা।

বালকং ভক্তশাস্ত্রং দেবী-দেবমহং ভজে ॥

এই পূজা কুমিল্লাতন্ত্রোক্ত বলিয়া পদ্ধতি লিখিত আছে। "ও লালসা-বিশ্বেশ্বরায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা হইয়া থাকে। সাটের সোহং এই মন্ত্রে ভূতভক্তি করিতে হয়।

খলকুমারী পূজা

এই পূজা ময়মনসিংহ ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি প্রদেশে "ডরাই" পূজা বলিয়া প্রসিদ্ধ। মনসাপূজার সহিত এই পূজা অমুষ্ঠিত হয় বলিয়া সাধারণতঃ মেয়েরা ইহাকে "ডরাই বিবরী পূজা" বলে। ছবাবোধ্য বোগ হইতে মুক্তি পাওয়ার অভিলাষে এই পূজা মানসিক করা হয়। উপনয়ন ও বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে এই পূজার অমুষ্ঠান হইয়া থাকে। ইহার প্রধান পাণ্ডা "গুরমা" নামে প্রসিদ্ধ। জী-নপুংসক বা হিজড়া গুরমা নামে প্রসিদ্ধ। নপুংসকের পরিবর্তে পুরুষেই মেয়েলি কাপড় পরিয়া কপালে সিন্দুর ও হাতে শঙ্খ ধারণ করিয়া সারাজীবন অবিবাহিত অবস্থায় বাপন করে। গুরমার গানই খলকুমারী পূজার প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতে; কিন্তু বর্তমান সময়ে শুবমাব বিরল-প্রচাব ও সমাজের রুচিপরিবর্তন, এই উভয় কারণে অনেকস্থলে গুরমা ব্যতীতই পূজা হইতে দেখা যায়। শুবমার গান বৈষ্ণব অলীলতাপূর্ণ, সেরূপ অলীলতা অন্যত্র প্রায় দেখা যায় না। সাধারণতঃ এই ব্যাপার শুবমার "চৈতাল" নামে প্রসিদ্ধ। এই ব্যাপারের "চৈতাল" সংজ্ঞার কারণ অনুসন্ধান করিলে মনে হয়, চৈতমাসে অমুষ্ঠের কামদেবের পূজাঙ্গ অলীল গানের সহিত সাম্য নিবন্ধন ইহাব এই চৈতাল সংজ্ঞা হইয়াছে।

গুরমা মাধার চুল এলোথেলো কবিয়া জিহ্বা বাহির কবিয়া জুহুটি-পূর্ব মুখে অবিশ্রান্ত মাধা নাড়িতে থাকে, এবং তাহার নিকট উপস্থাপিত সাধারণতঃ শুভাশুভমুচক প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে, ইহার নাম শুবমার "বান করা"। লোকের বিশ্বাস, গুরমার শরীরে দেবীর অধিষ্ঠান হয়। হুতরাং ভান করার অপভ্রংশ "বান করা" হইতে পারে।

এই দেবীর পূজার অঙ্গরূপে প্রথম দিবস যথাবীতি অধিবাস করিতে হয়। পরদিবস পূজা কবিতে হয়।

বিশ্বপ্রকাশিনীং দেবীং গৌরবর্ণাং চতুর্ভুজাম্।

বিশ্বেশ্বরীং ভয়ত্রাতাং বিশ্বমাতাং কুপালরাম্ ॥

সর্বদেবময়ীং দেবীং বোররূপাং ভয়ঙ্করীম্।

গুণীরনদসংস্থানাং কুন্তারোপরিঃস্থিতাম্ ॥

নানামণিবিভূষিত্যাং নানালঙ্কারভূষিতাম্।

নবযৌবন-সম্পন্নাম্ কুমারীং কামরূপিণীম্ ॥

চিত্রবস্ত্রপরিধানাং কুম্ভমাতাং মনোহবাম্।

ধলরূপেন সন্তুতাং ত্রিনেত্রাং বদনাং ভজে ॥

এই দেবীর অঙ্গদেবতাক্রমে উগ্রকুমারী, ক্ষেমকরী, জলবাসিনী, হবপুত্রিকা, উগ্ররূপা, গঙ্গাপুত্রিকা ও নম্পুত্রিকা, এই অষ্টকুমারীর পূজা

কবিত্তে হয়। অনন্তর যদুনা, ব্রহ্মাণী, বিষ্ণুমায়া, পদ্মা, ছায়া, মায়ী, হুববাক্যা, বাহুদেব, মৎসাদি দশাবতার, ধর্ম, বৈবাগ্য, অবৈবাগ্য, অনৈবধ্য, শেষ, অক্ষরমণ্ডল, বক্ষিমণ্ডল, সোমমণ্ডল, আত্মা, পরমাশ্রী, জ্ঞানাত্মা, রজঃ, তমঃ ও অন্তরাশ্রী, ইহীদেবও পূজা করিতে হয়।

খলকুমারী পূজার অন্তে অঙ্গরূপে সন্ধ্যাকালে জলসমীপে ছায়া ও মায়াব পূজা কবিত্তে হয়।

ছায়াং তেজোময়ীং দেবীং শ্চিভুজাং শৌভদেহিকাম্।

বরাস্তমকরায় (দেবীং) বোবদংষ্ট্রাং ত্রিলোচনাম্ ॥

বামক্ৰোড়স্থিতং সোবিং দক্ষিণস্থং দিবাকরম্।

বসং চতুর্দিশো ভূত্বা ভয়দায়ং ক্রুরূপিণীম্ ॥

... ... মাতবং ব্রহ্মরূপাং বরদায়ং ভজ্যে।

মায়াদেবী ছায়াই কনিষ্ঠা ভগিনী।

ছায়া-রূপাং কুমারীং কৃষ্ণবর্ণাং চতুর্ভুজাম্।

ব্রহ্মস্তু তনুজাং দেবীং দিব্যালঙ্কারভূষিতাম্ ॥

কুমারীমমুজাং দেবীং ববদামভয়প্রদাম্।

শ্চিভুজাং বৈববর্ণাং পট্টবস্ত্রাদিভূষিতাম্ ॥

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ) শ্রী গিবীশচন্দ্র বেন্দ্যাস্ততীর্থ

কুড়ানো গান

(মতঙ্গ স্কেপা)

কত উঠে আজব কাবুখান

দিল-দরিয়া মাঝে।

ডুবলে পবে রত্ন পাখি,

ভাসলে পবে পাখি না।

দিলেব মাঝে ঝাহাজ আছে

ন-জনা তাব গুণ টানিছে,

ছ-জনা তাব দাঁড় টানিছে,

হাল ধবেছে একজন।

দিলেব ভিতব বাগান আছে,

তাতে নানা জাতির ফুল ফুটেছে,

দোরস্তে জগত মেতেছে,

আমার পৌসাই মাতুল না।

দিলেব ভিতর কমল আছে,

তাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রয়েছে।

সেই তিনকে যে এক করেছে

তার বা কিসেব ভাবনা।

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ)

রমলা

(৯)

এইরূপে রজতের কষেকদিন কাটিয়া গেল—সকালবেলা কাজী সাহেবের পোর্টেট আঁকিয়া ধোগেশ-বাবুর সঙ্গে ছবি আঁকা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কাটিয়া যায়; দুপুরের কিছুক্ষণ মাধবীকে ছবি আঁকা শেখানো হয়, বাকী সময়টুকু রজত নিজের ঘরে বসিয়া আপন খুসিমত ছবি আঁকে বা লাইব্রেরীতে গিয়া ছবির বই দেখে, অলসভাবে কাটায়; সন্ধ্যাবেলা ও রাত্রি একা বেড়াইয়া বাশী বাজাইবা নভেল পড়িয়া কাটিয়া যায়।

ছবি আঁকা শেখানোর সময় মাধবী অতি আড়ষ্টভাবে বসিয়া থাকে, প্রয়োজনেব অতিরিক্ত কোন কথাই বলে না। মাঝে মাঝে ছ'একবার পেন্সিল বা তুলির টানেব মাধ্যে তাহাব কাচের মত স্বচ্ছ চোখ রজতের অগ্নির মত দীপ্ত চোখের উপর গিয়া পড়ে, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। তৃতীয় দিন একবার ও চতুর্থ দিন দুইবার রজতের আঙ্গুলের সঙ্গে মাধবীব আঙুর-আঙ্গুল নিমিষের জন্য ঠেকিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে রজত কিছুই চঞ্চল হয় নাই।

মাঝে মাঝে রজতের কথা শুনিতে শুনিতে মাধবী ঘেন

তাহার স্বাভাবিক গাঙ্গীর্ষ হারাইয়া ফেলিত, মাঝে মাঝে মনে হইত ঘেন তাহার মাখায় কিছুই ঢুকিতেছে না। হঠাৎ সে অতি শ্রান্ত বলিয়া, তাহার ছবি রজত কিরূপভাবে সংশোধন করিতেছে তাহা না দেখিয়া উঠিয়া যাইত, আবার কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিত।

মাধবীর জন্য রজতের মনে বিশেষ কোন চাঞ্চল্য ছিল না; কিন্তু বমলা তাহাকে মাঝে মাঝে সত্যই চঞ্চল করিয়া তুলিত। রমলাব সহিত বেশী মেশা যে মাধবী পছন্দ করে না তাহা সে বেশ বুঝিতেছিল। ভদ্রতা-অমুসারে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, কি কথা বলা যায়, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না; সে যতই এটিকেটের পাহাড় তুলিয়া রমলার নিকট হইতে দূরে থাকিতে চাহিত, ততই সে গিরিবার্ণার মত কলগানে সব বাধা ভাসাইয়া দিত। রজত কাজীর ছবি আঁকিতেছে, সহসা সে ঘূর্ণীহাওয়ার মত কোথা হইতে আসিয়া কাজী-সাহেবের চেয়ার টানিয়া রজতের দিকে কটাক্ষ করিয়া

চলিয়া গেল; মাধবীকে ছবি আঁকা শিখাইতেছে, জান্না বা দরজার আড়াল দিখা তাহার ছুটু মিডরা চাউনি সহসা জলিয়া উঠিল, কখনও বা ঘরে ঢুকিয়া মাধবীর ঘাড়ে ঝুঁকিয়া ছবি সম্বন্ধে অফুরন্ত মন্তব্য অনর্গল বকিষা কোন কথা না শুনিয়া চলিয়া গেল। লাইব্রেরীতে রজত ছবি দেখিতেছে, সেও একখানি ছবিব বই টানিয়া লইয়া কোন সূত্র ধরিয়া কয়েকমিনিট গল্প করিয়া চলিয়া গেল। তাহার সহিত যে কিরূপে মেশা যায় তাহা রজতের সমস্তার ব্যাপাব হইয়া দাঁড়াইল। তাহার সহিত বেড়াইতে যাইবার সুবিধা বা একা থাকিবার সুযোগ সে দিত না, দিতে কেমন ভয় করিত।

এখানে আসিয়া রজত খুব ভোরে উঠিত। তাহার ঘরের সম্মুখেই দিগন্তভরা প্রান্তর, তাহার একদিকে পাহাড়, আব-একদিকে শালবন, এই উন্মুক্ত পার্বত্য-দেশে শিশির-ঝলমল উষ্ম অরুণোদয়ের শোভা তাহাকে প্রথম দিনেই মুগ্ধ করিয়াছিল।

সেদিন ভোবে উঠিয়া লালরংএব আলোয়ানটা গায়ে দিয়া সামনের মাঠে সে বেড়াইতেছিল, তখন সূর্য্য ওঠে নাই, কয়েকটি তারা পশ্চিমদিকের পাহাড়ের মাথায় জলিতেছে, রাত্রিশেষেব শিশিরাত্র অন্ধকার স্নিগ্ধ আবরণের মত চারিদিকে ছড়াইয়া। চারিদিক স্তব্ধ; একটা কিসের শব্দে পিছনে মুখ ফিরাইয়া রজত দেখিল, দোতোলার ঘরে জান্না খুলিয়া মাধবী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সেই আলোছায়ায় তাহাকে মূর্ত্তিমতী উষ্মার মত দেখাইতেছিল। ক্ষণিকের জন্ত তাহার দিকে চাহিয়া মুহু হাসিয়া রজত আবার পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। সেই উষ্মার আলোয় স্তব্ধ স্নিগ্ধ উদার প্রান্তরের মধ্যে রজতের দীর্ঘ রঙীন দেহ, তাহার বিপর্য্যস্ত কালো কেশ, দীপ্ত চাউনি মাধবীর সদ্যজাগরণফুল অন্তরে কি নেশার অল্পনিমা ধরাইয়া দিল; তাহার বিজ্ঞান ঘোবন-পথ এই প্রথম পুরুষের পায়ের স্পর্শে যেন উষ্মার আকাশের মত কাঁপিতেছে; ওই প্রান্তরের মত তাহার জীবন রক্ত, উদাস, স্তব্ধ, শুভ্রকুয়াসায় ভরা পড়িয়া-রহিয়াছে;—প্রেমাক্ষণের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাঙা-

আলোময় পুষ্পভরা গীতমুখর হইয়া উঠিবে। চকিতপদে সে ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

পূর্ব্বীষ্মের মত কথাগুলি রজতের কানে বাজিয়া উঠিল,—আপনি এত সকালে উঠেছেন যে?

মাধবীকে তাহার পাশে দেখিয়া একটু চমকিয়া উঠিয়া রজত বলিল,—ভারি ভাল লাগে ভোরবেলাটা।

মাধবীর সমস্ত দেহ বেলফুলের মত সাদা শালে জড়ানো, সন্তজাগরণফুল মুখখানি বিকচপদ্মের মত অকারণ আনন্দে রাঙা, বিপর্য্যস্ত মুক্ত বেণী সাদা শালের উপর ছলিতেছে, কয়েকটি অলক কপোলের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; দূব হইতে যাহাকে মূর্ত্তিমতী উষ্মার মত বোধ হইয়াছিল, নিকটে সে নবরূপে প্রকাশিত হইল।

মাধবী দীপ্তকণ্ঠে বলিল,—ভারি সুন্দর ভোর বেলাটা।

বজত মুহু হাসিয়া বলিল,—হাঁ, ভারি সুন্দর।

মাধবী কোন অজানা আনন্দের আবেগে বলিল,—চলুন না, ওদিকে একটু বেড়িয়ে আসি।

চলুন, বলিয়া রজত ধীরে তাহার পাশে পাশে চলিল। চারিদিক শান্ত, স্নিগ্ধ। এ পবিত্র স্তব্ধতা ভাঙিয়া কথা বলিতে কেহই পারিল না, দুইজনেই নীরবে চলিল। প্রান্তবেব মধ্যে তিনখানি খুব বড় কালো পাথরের নিকট আসিয়া দুইজনে থামিল; পাথরগুলি শিশিরে ডিজিয়া গিয়াছে, মনে হয় তাহাদের বুক হইতে জল ঝরিতেছে; মাধবী একটা ছোট পাথরের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল, রজত তাহার পাশে স্থির হইয়া দাঁড়াইল, দূরে পাহাড়ের সাবির পাশ দিয়া সূর্য্য উঠিতেছে। পূজার মুহূর্ত্তের পূর্বে পূজারী যেমন প্রতিমার দিকে চাহিয়া চূপ করিয়া দাঁড়ায় তেহি দুইজনে দাঁড়াইয়া রহিল। ধীরে ধীরে চক্রবাল রাঙা করিয়া সূর্য্য উঠিতে লাগিল, ঘাসে ঘাসে পাথরে পাথবে শিশিরবিন্দু ঝকঝক করিয়া উঠিল, পাহাড়ে পাহাড়ে শালবনের অন্ধকারে হাওয়া জাগিয়া মাতামাতি শুরু করিল। সূর্য্য যখন সম্পূর্ণ উঠিয়া দিনের যাত্রা শুরু করিল, মাধবী একবার দীপ্তনেত্রে রজতের দিকে চাহিল, রজত দেখিল তাহার স্থির শুভ্র নয়ন আজ কি স্বপ্নের বংএ রাঙিয়া উঠিয়াছে।

পাথর হইতে নামিয়া একটু অস্বাভাবিক স্বরেই সে বলিল,—আচ্ছা, ওই শালবনটা কতদূর ?

—মাইল তিনেক হবে বোধ হয়।

—আচ্ছা, ওখানে গেলে চায়ের আগে ফিরে আসা যায় না ?

—তা যায়, কিন্তু আপনার জুতোটা যে রকম শিশিবে ভিজে গেছে,—

—ও, চলুন না, ওই শালবনটায় যেতে এত ইচ্ছে কবে।

—চলুন—কিন্তু আসবার সময় রোদ লাগবে।

—লাগুক, কিছু হবে না।

ছুইজনে আবার নীরবে চলিল। মাঝে মাঝে ছ'চারিট অতি তুচ্ছ সামান্য কথাবার্তা; কিন্তু এ নীরবতা যে কি ভাষাভরা তাহা কে বলিবে।

অবশ্য শালবন পর্য্যন্ত যাওয়া হইল না, কিছুদূরে এক রক্তপদ্মভরা দিঘি ঘুরিয়া তাহারা বাড়ী ফিৰিল। মাধবীর খুব ইচ্ছা হইয়াছিল কয়েকটি পদ্ম লইয়া আসে, কয়েকটি পদ্ম তটের অতিনিকটেই ফুটিয়াছিল; কিন্তু রক্তকে তুলিয়া আনিতে বলা দূরে থাকুক, সে পদ্মগুলিও উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও কবিত্তে পারিল না, পাছে রক্ত তাহাকে তুলিয়া দেয়। ছুইজনে যখন বাড়ী ফিৰিল, তখন ঘাসে ঘাসে শিশিবে শুকাইয়া গিয়াছে, পাথরগুলি তাতিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহাদের চোখে আকাশের আলো তখনও পদ্মরাগে রঙীন।

সেদিন ছবি আঁকার সময় মাধবী বার বার চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল, আঁকা সম্বন্ধে তাহার অনেক প্রশ্ন করিবার ছিল, সমস্ত সকাল সেগুলি ভাবিয়া মনে মনে ঠিক করিয়াছিল, কিন্তু রক্তের সম্মুখে বসিয়া সব কথা গুলাইয়া গেল, প্রশ্নগুলি তুলিয়া গেল, মুখের কথাও আটকাইতে লাগিল। আর রক্তের কণ্ঠও মাঝে মাঝে কাঁপিয়া উঠিতেছিল, বিশেষতঃ যখন রমলা পাশের ঘরে কাজী সাহেবের সঙ্গে গল্প কবিত্তে করিতে হাসিয়া উঠিতেছিল। সেই হাসির স্বরে রক্তের তুলির অতর্কিত আঘাত খাইয়া মাধবীর হাতের সোনার চুড়ি ছুইবাব স্তম্ভুর স্ববে বাজিয়া উঠিল। সে দিন ছুইজনে বহুক্ষণ

খাটিল বটে, কিন্তু ছবি আঁকা বিশেষ কিছুই অগ্রসর হইল না।

(১০)

পূর্ণিমার রাত্রি। নীলাকাশের তট ছাপাইয়া জ্যোৎস্না জুইফুলের অশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মত ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। এই চন্দ্রালোক-উদ্বেলিত আকুল রাত্রির দিকে চাহিয়া রক্ত ঘরে থাকিতে পারিল না, পদ্মদিঘি তাহাকে যেন কোন্ যাদুমন্ত্রে টানিতে লাগিল। দীর্ঘ সে বাঁশী লইয়া চুপুট টানিতে টানিতে সম্মুখের প্রান্তর পাব হইয়া দিঘির দিকে চলিল।

দিঘির তীরে গিয়া রক্ত চুপ করিয়া বসিল। রক্তের মত রক্ত পদ্মগুলি লাল মণির মত জ্বলিতেছে, তাহার চারিদিকে জ্বল গলিত হীরকস্রোতের মত টলমল করিতেছে, বাতাসে কুলের ঝোপগুলি ছলিয়া ছলিয়া উঠিতেছে, শালবনে বাতাস আনন্দ-বাঁশী বাজাইতেছে, পাহাড়গুলি স্বপ্নমায়ার মত দাঁড়াইয়া। দীর্ঘ সে বাঁশী বাজাইতে আরম্ভ করিল, জ্যোৎস্না-আকুল রাত্রে বাঁশীর স্বর কোন্ জয়জয়ন্তের অনন্ত প্রেম-বেদনার মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল; কত লক্ষ যৌবনের কত লক্ষ আশা, কে তাহাকে ভাষা দিবে।

বাঁশী যখন থামিল, প্রকৃতির স্তব্ধতা অতি অপূর্ণ বোধ হইল। সহসা সেই স্তব্ধতার বুক হইতে উৎসের মত কাহার হাসি ও করতালির ধ্বনি উৎসারিত হইয়া উঠিল, যেন একটা বড় কালো পাথরকে ভাঙিয়া ছুড়িয়া কে চারিদিকে টুকরো টুকরো হীরা মণি মাণিক্য ছড়াইয়া দিল। অতি আশ্চর্য্য হইয়া বক্ত চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, এখানে কে হাততালি দিল? ক্ষণিকের মধ্যে যে তরুণীমূর্ত্তি জ্যোৎস্নার মত হাসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, নিমেষের মধ্যে তাহাকে সে চিনিলা,—সে রমলা। আর একটু দূরে চাহিয়া দেখিল, কাজীসাহেবের শাস্ত্রমূর্ত্তি; এত নিকটে তাহা, অথচ সে লক্ষ্যই করে নাই।

পূর্ণিমা-নিশীথে বিনোদিত কুহর মত রমলা বলিয়া উঠিল,—ও, কি স্বন্দর রাত, আর একটু বাজান না।

রক্ত নির্ণিমেষ নয়নে জ্যোৎস্নাধারায় ঝলমল নীল
সিঙ্কের শাড়ীতে মণ্ডিতার দিকে চাহিয়া রহিল।

আপনার সকালে এখানে বেড়াতে এসেছিলেন,
আমরা রাতে এলুম; ভাগ্যিস এসেছিলুম, তাই বাঁশী
শুনতে পেলুম। বা, বাঁশী থামালেন যে,—বলিয়া রমলা
একটা পাথরে বসিয়া পড়িল।

রক্ত বলিল,—অনেকক্ষণ বাজিয়েছি, তাব চেয়ে
আপনি একটা গান গান।

—আমার গান শোনেন নি, আমি মোটেই ভালো
গাইতে পারি না, কিন্তু এগ্নিরাতে গান গাইতে আপনিই
ইচ্ছে করে।

—বিনয় করাটা গায়িকাদের দস্তুর, অনেকক্ষণ
অহরোধ না করলে—

—না, না, সত্যি আমি ভালো গাইতে পারি না।

এ কয়দিন ধরিয়া ছুই জনের মনে যে স্নেহভাবের
শ্রোত জমিতেছিল, তাহা চঞ্জালোকের মত উজ্জ্বলিত
হ য়া উঠিল, কাজী সাহেব যে দূরে বসিয়া আছেন তাহা
তাহাদের লক্ষ্যই রহিল না।

গান গাহিতে জানে না বলিল বটে কিন্তু অতি যুৎস
কণ্ঠে রমলা গান ধরিল। একটি অতি পুরাতন হিন্দি গান,
সে গান কে রচনা করিয়াছিল তাহা কেহ জানে না,
শতাব্দীর পর শতাব্দী কত গায়কগায়িকার অন্তর-ব্যথায়
কত জ্যোৎস্না রাত্রির স্পর্শে মধুর করণ।

গান শেষ হইলে রক্ত বলিল,—আপনাদের কলেজে
হিন্দি গান শেখায়? বীঠোফেন বলুন আর বাথই
বলুন, এই হিন্দি গান কিন্তু কানে সবচেয়ে ভালো লাগে।

—এ গানটা কাজী সাহেবের কাছে শিখেছি।
কাজীকে দিয়ে একটা গজল গাওয়ালে হয়।

ছুইজনে ফিরিয়া দেখিল কাজীসাহেব কোথাও নাই,
তিনি এতক্ষণ ধ্যানরতের মত পাথরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া-
ছিলেন; এই আলো, ফুল, বাঁশী, গানে তাহার চোখ জলে
ভরিয়া আসিতেছিল, যৌবনের গীতমুখর স্নানরীতি
প্রেমলীলাময় রাত্রিগুলি উপন্যাসরাজ্যের নায়িকাদের মত
তাঁহার মনে পড়িতেছিল, নিশি-পাওয়া মাছুষের মত তিনি
সম্মুখের পথ দিয়া কোথায় যাইতেছেন।

রক্ত আশ্চর্য হইয়া বলিল,—কাজীসাহেব ওদিকে
কোথায় যাচ্ছেন?

যান না, ওপথ দিয়ে একটু ঘুরে গেলেই বাড়ী ঘাবার
বড় রাস্তা। কি সুন্দর পদ্মগুলো!—বলিয়া রমলা জলের
নিকট গিয়া কয়েকটি পদ্ম ছিড়িয়া সেইখানেই বসিয়া
পড়িল। রক্তও দীবে উঠিয়া জলের ধারে তাহার কাছে
গিয়া বসিল। এ কয়দিন ছুইজনের মনে যে কথাগুলি
জমিতেছিল, সেগুলি মুক্তধারার মত অস্তব হইতে বাহির
হইতে চাহিল।

রমলা পদ্মগুলি দোলাইতে দোলাইতে বলিল,—দেখুন
বইষে কত পদ্মের কথা পড়েছি, পদ্ম এঁকেছিও, কিন্তু সত্যি
পদ্ম ছেঁড়া জীবনে এই বোধ হয় প্রথম। কলকাতায় থাকলে
ফুলের নাম মুখস্থ করেই তৃপ্তি।—আপনার বাড়ীও ত
কলকাতায়?

—হ্যাঁ, সেইথেকেই জন্ম।

—আচ্ছা, আপনার বাবা আছেন?

—না।

—মা?

—না।

—ভাই বোন?

—একটি ছোট ভাই ছিলো মাঝা গেছে, বোনও নেই।

—তবে আপনি একা, আমাব মতনই কেউ নেই
আপনাব।

—কেউ না থাকারই মধ্যে।

ও!—বলিয়া রমলা সহসা থামিয়া পদ্মগুলির উপর
জলের ছিটা দিতে লাগিল। জলবিন্দুগুলি মুক্তার মালার
মত ঝকঝক করিতে লাগিল। তাহার মনে যে-কথাগুলি
কুঁড়ির মত জাগিতেছিল, রাঙাঠোঁটের বৃক্ষে তাহা বিকচ
হইল না। বস্তুতঃ, বিধাতা নারীকে ভাষা দিয়াছেন,
মনেব কথা বলিবার জন্ত নহে, প্রিয় মিষ্টি কথা বলিয়া
পুরুষের মনে আনন্দ সান্ধনা দিবার জন্ত। অবশ্য প্রতি-
নারী যদি তাহার মনের কথা স্পষ্টভাবে বলে তবে জীবনের
দুঃখের বোঝা বাড়ে কি কমে তাহা বলা শক্ত। সে যাহাই
হোক, রমলা তাহার মনের কথা বলিতে পারিল না। নানা
খুঁটিনাটি কথাবার্তা আবশ্য করিয়া দিল।

মধুব হাসিয়া রমলা জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা, আপনি কতদিন থেকে ছবি আঁকছেন ?

—মনে ত পড়ছে না কতদিন থেকে । এ বিষয়ে কেউ জিজ্ঞাসা করবেন জান্লে তারিখটা, মিনিট সেকেন্ডটা পর্যন্ত লিখে রাখতুম । বোধ হয় ন'বছর বয়সের সময়, আমার এক মামা আমার জন্মদিনে এক আঁকবাব বাক্স দেন, সেইদিন থেকেই—

—আমার কিন্তু ছবি আঁকতে মোটেই ভালো লাগে না, পারি না কিনা । আচ্ছা ওই পাঁচাড়াটাষ বেড়াতে গেছেন কোনদিন ?

—না, চলুন না, একদিন পিকনিক কর। যাক ওখানে ।

—আজকেব পুড়িটা কি বিচ্ছবি হয়েছিলো ! নয় ? যা পুড়ে গেলো !

—না, বেশ হয়েছিল ত, কিন্তু কালকেরটা চমৎকার হয়েছিল !

— কি চমৎকার রাত ! না ? কিন্তু বোধ হয় অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে ।

—জন্মের রাত, খুব বেশী রাত হয়নি, আচ্ছা চলুন, যেতে অনেকক্ষণ লাগবে ।

পদ্মগুলি নাচাইয়া কয়েকটি অলক মুখ হইতে সরাইয়া রমলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—না, মাঠ দিয়ে নয়, এদিকের রাস্তা দিয়ে যাবো, যে রাস্তায এলুম সে রাস্তা দিয়ে ফিরে যেতে ভালো লাগে না ।

দুইজনে নীরবে পাশাপাশি চলি। পথের দুই পাশের গাছের পাতার ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্নার আলো রাঙা-পথে-ছড়ানো অলগুলির উপর বিকিমিকি কবিতোছে, বাতাস মাতিয়া উঠিয়াছে । দুইজনেই প্রায় নীরবেই চলিল, মাঝে মাঝে দু'চারিটি ছোট ছোট কথা । সকালে মাধবীর সঙ্গে যাত্রার নীরবতাব সহিত, সে প্রভাতালোকদীপ্ত স্তব্ধতার সহিত, এ স্তব্ধতার অনেক প্রভেদ । এ স্তব্ধতা যেন কি কল্লোলমুখর, অক্ষতসঙ্গীতভরা, অসহনীয় স্বপ্নময়—সকল কথাগানের অবসান হইয়া শব্দের নীবব অতল পারাবারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে । এই জ্যোৎস্নাধারাদোত তরুছাষাশ্রিত মর্ম্মরমুখব রক্তিম মায়াপথ দিয়া তাহাবা দুইজনে যেন কত কাল চলিয়া আসিয়াছে, যেন কতযুগ

চলিয়া যাইতে পারে । কেহ কাহারও মুখে চাহিতে সাহস করিল না, হাতে হাত ধরিতেও ইচ্ছা হইল না, অন্তরে অন্তর স্পর্শ করিয়াছে । রক্তের কাছে এরূপ স্তব্ধতা নূতন নয়, কিন্তু রমলা এই অপূর্ণ আধ্যাত্মিক অল্পভূতিতে যেন পুষ্পভরা লতার মত নত হইয়া পড়িতেছিল ।

বাড়ীর সিঁড়িতে উঠিয়া জ্যোৎস্নার মত হাসিয়া রমলা বলিল, অনেক রাত হয়েছে, যান শুয়ে পড়ুনগে ।

ফুলগুলি দোলাইতে দোলাইতে সে সিঁড়ি দিয়া রজনী মেঘের মত তাহার ঘবে চলিয়া গেল । মাধবী তখন তাহার গরে আলো জ্বলাইয়া 'ব্রষ্টলয়' পড়িতেছিল—

“ফাগুন যামিনী প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে,

দখিন বাতাস মরিছে বুকের পরে ।”

হিন্দী গানটির সুর গুঞ্জন করিতে করিতে রমলা নিজের ঘরে ঢুকিল । এক কোণে আলো জ্বলিতেছে, এই ঘরটিকে এত অপূর্ণ কিন্তু এত ক্ষুদ্র তাহার কোনদিন বোধ হয় নাই । তাহার দেহের তট ভাঙ্গিয়া প্রাণ আনন্দের বস্তার মত এই জ্যোৎস্নালোকের সহিত মিশিয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতে চায়, এ ছোট ঘরে সে যেন থাকিতে পারিবে না । রমলা ড্রেসিংটেবিলের আয়নার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, নিজের মুখ চোখ কিছুক্ষণ ধরিয়া দেখিল, কবরী খুলিয়া চুলগুলি টানিতে লাগিল, ব্লাউসটা খুলিয়া আলো নিভাইয়া বিছানায় গিয়া বলিল । জ্যোৎস্না ঘরে প্রতীক্ষমানা ছিল, আলো নিভাইতেই ঘবে বর্ষার ধারার মত আসিয়া প্রবেশ করিল । রমলা উঠিয়া ঘরের সব জান্না একে একে খুলিতে লাগিল, বহুক্ষণ দিগন্তে তাকাইয়া রহিল । আপনাকে সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, দেহমনের এ অবস্থা তাহার সম্পূর্ণ অজানা, বিশ্বের কোন্ রহস্যময় অজ্ঞাত স্রোত তাহাকে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে । ভেল্‌ভেটিনের চটি-জুতো খুলিয়া আবার বিছানায় আসিয়া বলিল, এ রাতে যে ঘুম হইবে তাহার কোন আশা নাই, কি অজানা আনন্দময় বেদনা, দেহের রক্ত কোন্ ক্রান্তালে নৃত্য করিতেছে । সে বঙ্গী আলোয়ানটা আন্থা হইতে মাথার বালিসের কাছে রাখিয়া একটি পদ্মফুল গুঁকিতে লাগিল । এই বিকচ পদ্মটি আপন গন্ধবর্ণের আনন্দময় অল্পভূতিতে

জ্যোৎস্নালোকে ধেকপ শিহরিতেছিল তেমনি তাহাব দেহ-
মন শিহরিতেছে ।

রজত নিজের ঘরে ঢোকেই নাই । তাহার ঘবের
জান্নার ঠিক সামনে হান্সাহানার খুব বড় ঝাড় । এই
ঝাড়ের পাশ দিয়া দেয়াল বাহিয়া লতার কুঞ্জ রমলার ঘবের
জান্না পর্যন্ত উঠিয়াছে ; সেই হান্সাহানার ঝাড়ের সম্মুখে
আসিয়া সে দিগন্তের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ।
কোন অনন্তযৌবনা উর্দশীর সন্ধানে তাহার শিল্পীপ্রাণ
সাতরংএব-আলোছাষার রেখাব পথ দিয়া তুলির টানে
চলিয়াছে ; বিশ্বকমলের সেই সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী কি মূর্তিমতী
হইয়া তাহাকে একবার দেখা দিবে না ? সেই মানসসুন্দরী
যদি এখন তাহাব সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়—এই রংএর ছায়া
এই আলোর মায়া নয়, রক্তমাংসে অনিন্দ্যসুন্দরী নারী
হইয়া সে কি আসিবে না ? জ্যোৎস্নাসমুদ্র মণিত করিয়া
জলস্থলস্রাকাশের সব সৌন্দর্য্য ছানিয়া পৃথিবীর সব মাধুরী
চুরি করিয়া মধুর মূর্তি হইয়া দাঁড়াইবে না ? নদীর গতি
দিয়া ফলের গন্ধ দিয়া বসন্তের আনন্দ দিয়া তাহার তনু
সৃষ্টি, তারাবরা নীলাকাশ তাহারই নীলবাস, তাহারই
—স্বপ্ন-অঞ্চল বনে পর্বতে জ্যোৎস্নায় লুটাইতেছে, তাহারই
অঙ্গের হিল্লোল নানা ভঙ্গে লতার ঝাঁকিয়া পাতায় হেলিয়া
পড়িয়াছে, তাহারই দেহের সৌরভ পুষ্পে পুষ্পে আকুল
হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই চরণের চাকল্যে পথে পথে
বাতাসের নৃত্য, তাহার টলমল ললিত ঘোঁরিন নদী-
সরোবরে চলছিল করিতেছে, পদ্মে পদ্মে তাহার আঁখির
দৃষ্টি, এই শুক্ল রাত্রে নির্জনগগনে কুন্দকল্প অনন্তযৌবনা
একাকিনী দাঁড়াইয়া আছে—সে কি রক্তধারার ছন্দে
পুষ্পকোমলতনুতে মূর্তিমতী হইবে না ?

হান্সাহানার ঝাড় সিদ্ধতবন্ধের মত বাতাসে উদ্ভাস
হইয়া পড়িল, একটি কোকিল ডাকিয়া উড়িয়া গেল, রজত
ফিরিয়া দেখিল, ঝাড়ের পাশে তাহাব সম্মুখে রমলা
দাঁড়াইয়া ।

দ্রাক্ষাবসভরা পেখালার মত তাহার চোখহুঁটির
দিকে চাহিল, নবসৃষ্টির স্বপ্নরহস্যময় মুখের দিকে চাহিল,
রূপকথার রাজকন্যার মত তনুবল্লরীর দিকে চাহিল ।
এমনি উন্মুক্ত আকাশের তলে জ্যোৎস্নাতন্ত্র শ্রামল প্রকৃতির

মধ্যে পৃথিবীর আদিম মানুষ নারীকে যেকপে চাহিয়াছিল
তেমনি চাহিয়া রজত একটু অগ্রসব হইল ।

কিন্তু সে অসভ্যযুগের পর কত শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে,
কত সমাজ-গঠন, কত বিবাহপদ্ধতি, কত ধর্মব্যবস্থা
করিয়া প্রকৃতির বিদ্রোহী সন্তান মানুষ আপনগড়া নিয়ম-
শৃঙ্খলে আপনাকে বাধিতে বাধিতে কোন স্বপ্নদেশের
দিকে চলিয়াছে । যে সিংহ-সর্পের দোসর ছিল, সে
আজ শিল্পী । স্থির হইয়া রজত দাঁড়াইল, চিরবহু-
ময় তরুণী কালো চোখ তাহার দিকে চাহিয়া
আছে ।

হান্সাহানার গন্ধে বাতাস স্বধাব মত সৌরভময় হইয়া
উঠিল, ইউক্যালিপটসেব মন্থণ পাতায় আলো বাকমক
করিতে লাগিল, লাল পথ গলিত স্বর্ণধারার মত জলিয়া
উঠিল, রং-বেরংএর ক্রোটনের সারিতে বর্ণের হোলিখেলা
স্বরূপ হইল, শালের বনে ছুরন্ত বাতাসেব মাতামাতি
পড়িয়া গেল, উদার প্রান্তর ভরিয়া জ্যোৎস্না ধমধম কবিতা
লাগিল, গন্ধে বর্ণে গীতে আলোক-সম্পাতে ছুই তরুণ-
তরুণীর চারিদিকে মাষালোক সৃষ্টি হইল, ছুইজনেই
স্বপ্নমুগ্ধ দাঁড়াইয়া ।

সহসা গোলাপকুঞ্জ হইতে একটি পাখী ডাকিয়া উড়িয়া
গেল, একটি তারেব ঝাঁকার শোনা গেল । বহুদিন পরে
কাজীসাহেব তাহাব ধূলাভরা এশ্রাজ লইয়া বাজাইতে
বসিয়াছেন । সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা অশ্রুট আর্ন্ত-
নাদের ধ্বনি উপরের ঘরে উঠিল,—“ভট্টলয়” পাঠ শেষ
করিয়া মাধবী জান্নার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল,
একবার সে নির্মেষের জন্ত হান্সাহানাব ঝাড়ের দিকে
চাহিল, তারপর বাণবিদ্ধা হবিণীর মত ব্যথাষ বিছানায়
লুটাইয়া পড়িল ।

স্বপ্ন টুটিয়া গেল, সঞ্চারণী লতার মত রমলা চলিয়া
গেল । এক মুহূর্ত, কিন্তু সে নিমেষ অনন্ত ক্ষণ ।

মাধবীর অশ্রুট আর্ন্তনাদের সঙ্গে কাজীসাহেবের
এশ্রাজ বাজিতে লাগিল, রজতের রক্তধারার ছন্দে গন্ধে-
উদাস বাতাস বহিতে লাগিল, রমলার এই অজানা
হর্ষশঙ্কা-ঝঙ্কত অন্তববীণাব মত তরঙ্গায়িত রক্তবর্ণ
প্রান্তবে জ্যোৎস্নার ধারা অশ্রুত সঙ্গীত বাজাইতে

লাগিল। আর ঘরের অন্ধকারে বৃদ্ধ যোগেশচন্দ্র দুঃস্বপ্নেব
অত্যন্ত মাঝে মাঝে শিহরিষা উঠিতে লাগিলেন।

গভীর রাত্রে রজত তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া
দেখিল সাদা মার্কেলের টেবিলের উপর একটি রক্তপদ্ম।
চন্দ্রের চাহনিতে, পদ্মের পাপড়িতে পাপড়িতে যে
আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়, পদ্ম গন্ধে বর্ণে বিকসিত
হইয়া উঠে, সেই সৃষ্টিব বিকাশের আনন্দ সে তাহার
দেহে মনে অন্তর্ভব করিতে লাগিল।

(১১)

পরদিন প্রভাতে চায়ের টেবিলে নিশিঙ্গাগরণক্লাস্ত-
নয়ন তিনজনেই স্তব্ধ হইয়া রহিল, শুধু রমলা একবার
রক্ততের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, এ মুখ তাহার যেন নূতন
দেখা। সকলেরই চায়ের কাপের সংখ্যা বাড়িয়া গেল।
সবাই চুপচাপ দেখিয়া যোগেশ-বাবু কণ্ঠ স্বর করিলেন।

রক্ততকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কাজীরা পোট্টেট
শেষ হয়ে গেছে?—

আজ আধ ঘণ্টা বসলেই হয়ে যাবে।

—তারপর, মাধু-মায়ের?

না, বাবা, আমার নয়, বলিয়া মাধবী চুপ করিয়া
বসিয়া রহিল। করুণকণ্ঠের সহিত এরূপ বিদ্রোপেব
দীপ্তস্বর জড়ানো ছিল যে যোগেশ-বাবু তাহার প্রতিবাদ
করিতে পারিলেন না। ধীবে বলিলেন—তা হলে রমলা-
মায়?

রমলা কিছু উত্তর দিবার শক্তি পাইল না, শুধু
ধীবে অসম্মতির ঘাড় নাড়িল। কাজীসাহেব একটু
মুচকিয়া হাসিলেন। রক্ততের গণ্ড তরুণীর মত রাস্তা
হইয়া উঠিল। সে ধীরে বলিল—আমি এক দিন বিশ্রাম
নিযে আপনার ছবিই আঁকতে আরম্ভ করব।

যোগেশ-বাবু একটু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—আচ্ছা।

আবার সব চুপচাপ।

তৃতীয় কাপ চা শেষ করিয়া মাধবী বলিল—বাবা,
আমি আর ছবি আঁকব না।

—কেন মা?

—ভাল লাগে না।

—বেশ, ভাল না লাগে শিশো না।

কাজীসাহেব দাড়িতে আঙ্গুল সঞ্চালন করিতে করিতে
আবার মুহূ হাসিলেন, সে হাসি তাহার দাড়ির তলায়
চাপাই পড়িল। সেদিন চা খাওয়া খুব শীঘ্র শেষ করিয়া
সকলে উঠিয়া গেল।

গেটের কাছে যে জামগাছ-তলায় রজত প্রথম
মাধবীকে দেখিয়াছিল, সেই স্থানটি মাধবীর বসিবার
অতি প্রিয় স্থান ছিল। কত উদাস দ্বিপ্রহরে, কত
রত্নীন সন্ধ্যায় সে ওই জামগাছটার একখানি বই হাতে
করিয়া বসিয়া সুদূর-হাবা লালপথের দিকে চাহিয়া
থাকিত। সেদিন সকালে সে একখানি টুর্গেনিভের নভেল
লইয়া গাছের ছায়ায় এক সাদা বেতের চেয়ারে গিয়া
বসিল। সম্মুখে চেউ-খেলানো মাঠে আলো প্রথর, লাল
রাস্তার দুইধারে সবুজ গাছের সারি বাতাসে করুণ স্বরে
হুলিতেছে; দূরে ধূসর পাহাড়, একটি গরুর গলার ঘণ্টার
ক্লাস্ত করুণ ধ্বনি কানে আসিতেছে, চারিদিকে পতঙ্গ-
দলের গুঞ্জরণ, রক্তকঙ্করময় ভূমিতে মাঝে মাঝে ঘাসের
সবুজ প্রলেপ—চারিদিকে শব্দে বর্ণে প্রভাত উদাস
হইয়া উঠিয়াছে। গত প্রভাতে কি চাঞ্চল্য তাহাকে
পীড়িত করিয়াছিল, আজ মাধবী তাহার স্বাভাবিক—
অবস্থা অপেক্ষা স্থির গম্ভীর। ধীবে সে বইয়ের পাতা
উন্টাইতেছিল।

ভ্যাক্—ভ্যাক্—ফট্—ফট্—ফটাস্।

এক প্রচণ্ডশব্দে মাধবীর দিবাস্পন্ন টুটিয়া গেল। দেখিল
ঠিক তাহাদের গেট হইতে একটু দূরে একটি মোটর-
কারের পিছনের টায়ার ফাটিয়া গেল। পাশে শিকারীর
গুলি খাইয়া বাঘ যেমন গঞ্জিয়া ওঠে, তেমনি কয়েক
বার গঞ্জন করিয়া মোটরটা স্থির হইয়া দাঁড়াইল।
কোট-প্যান্ট-পরিহিত একটি যুবক একা গাড়ী চালা-
ইয়া আসিতেছিল। সে গাড়ী হইতে নামিল, এবার
গেটের দিকে অগ্রসর হইল। গেট পার হইয়া—
তাহারই দিকে আসিতে লাগিল।

মাধবী ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। যতীন মাধবীর
সম্মুখে আসিয়া একটু হতভম্ব হইয়া গেল, সে গুডমর্নিং
করিবে, না নমস্কার করিবে, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল
না। থাকী-রংএর হ্যাটটা একটু তুলিয়া মাথা একটু নত

করিয়া বলিল—Excuse me, এটা কি যোগেশচন্দ্র ঘোষের বাড়ী ?

তাহার টুইড্ স্ফটের দিকে চাহিয়া মাধবী বলিল—
হাঁ।

—রজত রায় কি আছেন ?

—আছেন, আসুন।

—ও থ্যাঙ্কস্।

ধীরে যতীন মাধবীর পিছন পিছন চলিল। সে এই সৌন্দর্য্যময়ীর সঙ্গে একটু মুগ্ধিলে পড়িল। নারীর জগৎ তাহার প্রায় অজানা; নারী সম্বন্ধে কোনরূপ চিন্তা করা সে নিষ্প্রয়োজন মনে করে, নারীদের কর্তব্য বা অধিকার সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণা বা মত নাই, আর নারীদের বুঝিবার দুরূহ চেষ্টা সে কোনদিন করে নাই। এ তরুণীর সঙ্গিত অকারণ আলাপ করিবার তাহার কোন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এরূপ চুপচাপ ঘাইতেও অসোয়াস্তি বোধ হইতেছিল। তীক্ষ্ণ চক্ষু দিয়া বাড়ীখানির গঠনপ্রণালী দেখিতে দেখিতে সে অগ্রসর হইতেছিল, সহসা দোতালার জান্নাঘর আর—
একটি তরুণীর হাসি-ভরা মুখ দেখিয়া তাহার বুকের রক্ত ঘেন ছলিয়া উঠিল।

রমলা আজ সকালে রান্নাঘরে ঘাষ নাই, সে আপন ঘরে বসিয়া এক বন্ধুকে চিঠি লিখিবার ব্যর্থ প্রয়াসে নিমুক্ত ছিল। চিঠিখানি সচিত্র,—কাজীসাহেব, মাধবী, এমন কি মনিয়ারও ছবি ও কথা বাদ যায় নাই; সে ইংবেঙ্গীভাষায় লিখিতেছিল বটে কিন্তু বাংলা অক্ষরে। তাহার কতকগুলি কথা পড়িলেই চিঠির ভাবটা বোঝা যাইবে—মোরিয়াস্ নাইট, সিম্প্রি রিপিং, ডে ড্রিমিং, নাইন্স কাজী, ইন্টারেস্টিং ইত্যাদি। চিঠিখানি লিখিয়া তাহার উপর হিজিবিজি কাটিতে শুরু করিল, হিজিবিজির রেখাগুলো মিলিয়া অনেকটা রজতের মুখের মত হইয়া উঠিল দেখিয়া সে কাগজখানিকে শতছিন্ন করিয়া জান্নাঘর দিয়া লতাকুণ্ডের উপর ফেলিয়া দিতেছিল, আব সচিত্র ছিন্নপত্রের লেখাগুলির ভাষা ভাবিয়া আপন খুসিতে হাসিতেছিল। যতীন তাহার ঐ হাসি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গেল।

যতীনের মধ্যের ইঞ্জিনিয়ার মানুষটি এতক্ষণ বাড়ীখানি দেখিতেছিল, কিন্তু তরুণীর হস্ত ও বস্ত্রের ললিত গতি-ভঙ্গিতে মধুর হাস্যে তাহার অন্তরের প্রেম-তৃষিত মানুষটি জাগিয়া উঠিল। বাতায়নবর্তিনী যখন অদৃশ্য হইল, তাহার সম্মুখবর্তিনীর সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য সম্বন্ধে সে সজাগ হইয়া সচকিত হইয়া উঠিল।

রজত ঘরে বহুক্ষণ বহু বিষয়ে মন দিবার চেষ্টা করিয়া অকারণেই বারাতায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, মাধবীকে ধীরে অচল গান্ধীধো আসিতে দেখিয়া সরিয়া যাইবে ভাবিতেছে, এমন সময় দেখিল যতীন পিছনে আসিতেছে। যতীন এত আনমনা হইয়া আসিতেছিল যে রজতকে দেখিতেই পায় নাই। মাধবী যখন রজতের দ্বার দিয়া চলিয়া গেল, তখন রজতের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল।

—হ্যালো রজত !

—আরে, এসো, এসো। তারপর ?

—তারপর আর কি ? আসব বলে আসছি না দেখে নিশ্চয় গালাগাল দিচ্ছিলে, না হলে টায়ারটা ঠিক তোমার বাড়ীর সামনে এসেই কাটবে কেন ?

রজত যতীনকে নিজের ঘরের দিকে লইয়া গেল। যতীনের দিকে এক গদিওয়ালা চেয়ার ঠেলিয়া দিয়া নিজে জ্যোতনের সারির সম্মুখে এক চেয়ারে বসিল। যতীন পকেট হইতে সিগারেটের বাক্স বাহির করিয়া নিজে এক সিগারেট ধবাইয়া রজতের দিকে চেয়ার টানিয়া রজতকে আব-একটা দিয়া টুপিটা খুলিয়া মেঝেতে রাখিয়া বলিল—তারপর রজত, তোমায় বেশ improved দেখাচ্ছে হে ! গাল দুটো গোলাপফুল হয়ে উঠেছে, বাড়ীখানা বেশ suit করেছে বলা ?

—হাঁ, ভারি সুন্দর জায়গাটা। তারপর তুমি ?

—ও, আমি ডাকবাংলায় আছি। কাল রাত একটাব সময় এসেছি, আজ সকালে এক সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে বেরুলুম, ঘোষের বাড়ীটা এই দিকেই গুলুম, মোটরটা কি ঠিক জাবগাং থামলো !

—গুপ্তধনের সন্ধানে বড্ড বেশী ছুটোছুটি করছ, বাতারাতি লাখপতি হবে ?

—ভাই, তুমিই আমার চেয়ে সাঁচ্চা জ্বরী, রক্তের সন্ধান আগে থেকেই পেয়েছিলেন! একেবারে দুই হীরে, সাত রাজার ধন কোনটি?

—ও, আস্তে-না আস্তেই খোঁজ পেয়েছো! তুমি বোঝ না করেই খনির সন্ধান পাও বলো?

—না ভাই! এখানে একটু বোরিং করতে হচ্ছে, তা বুড়োর টাকাকড়ির সন্ধান কিছু পেলে?

—কি করে' জানি বল, retired I. C. S. কিছু বিশেষ নাও থাকতে পারে, আব ছবি আঁকতে এসেছি—

—বন্ধুর কাজটা একটু কর না। দেখ, তুমি একবার বলেছিলেন, আমি যদি লাখপতি হই, আর তুমি যদি তোমার মানসীকে খুঁজে পাও, তবে আমি তোমার হিংসা করব—কথাটা কিছু সত্য আছে মনে হচ্ছে।

একটু অবাক হইয়া রক্তত বলিল—তাই নাকি, ওটা ত আমি তর্কের মুখে নিছক কবিত্ব করেছিলুম।

যতীনের মনে আজ কি রপ্তের রং ধরিয়া গিয়াছে। সে বলিতে লাগিল—না হে, এই যে ভূতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি, সেটা ঠিক টাকার জ্ঞান নয়, ভাবতে বসলে এমন কি স্বপ্ন! কি জ্ঞান, কি প্রাণের আগুন দেহে জ্বলছে, ষ্টিম পাওয়ার তৈরী হচ্ছে, তার টানে কোথায যে চলেছি—হাঁ, কি কথাটা বলেছিলে—?

—The girl of my heart's desire.

—হাঁ, সেই right girlকে না পেলে, বুঝলে—

—তুমি কি বুঝতে আরম্ভ করছ নাকি?

এই দুই তরুণীর কণিক দর্শনে বাস্তবিক যতীনের মনে কি নেশা লাগিয়া গিয়াছিল। এ যেন ইঞ্জিন-বয়লারের ভিতর কয়লা পুবিয়া আগুন জ্বলাইয়া ষ্টিম তৈরী করিতে স্বপ্ন না করিয়া কে সোনার তার জুড়িয়া সেতার বাজাইতে বলিল। একটা অক্ষুট 'ছ' করিয়া যতীন সিগারেট টানিতে লাগিল।

অর্দ্ধদশ সিগারেটটা ক্রোটন-গাছগুলির তলায় ফেলিয়া রক্তত বলিল—তুমি এই ছোটনাগপুরে সোনার খনি পেতে পার, কয়লার খনি খুঁড়তে খুঁড়তে হীরের খনি পেতে পার। কিন্তু right girl, বুঝলে, ওটা

কপাল, জীবনের সব চেয়ে বড় সৌভাগ্য। বিয়ে করাটা জানই ত জুয়াখেলায় মত—

—না ভাই, এখনও জানিনি,— বলিয়া যতীন উঠিয়া দাঁড়াইল।

—কি উঠলে যে?

—ভাই, সময় ত বেশী নেই, স্মিথের সঙ্গে engagement আছে, আধ ঘণ্টা বাদে। আবাব মোটরটা ঠিক করতে হবে।

—তা হলেও যোগেশ-বাবুর সঙ্গে একবার দেখা কবে' যাও।

—চলো।

ডুধিঃক্রমে কার্সীপাঠ চলিতেছিল।

যতীন সশব্দে প্রবেশ করিতেই যোগেশ-বাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

রক্তত বলিল—ইনি আমার বন্ধু, যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

যোগেশ-বাবু বলিলেন—বন্ধু আপনারা, আপনার মোটরটাই—কি—?

—হাঁ, আমার মোটরকার—আপনাদের এসে disturb করলুম, না?—বলিয়া যতীন বক্রদৃষ্টিতে কাজী সাহেবেব দিকে চাহিল। কাজীও এই বাঙ্গালী সাহেবটির দিকে প্রশ্ন নেত্রে চাহিলেন না।

না, না, একটু কবিতা পাঠ হচ্ছিলো, শুনবেন? বলিয়া যোগেশ-বাবু বাঁধানো দাঁতগুলি বাহির করিয়া হাসিলেন।

কাজীসাহেব যোগেশ-বাবুর কথায় একটু বিরক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, এই লোকটিকে কবিতা শোনাইতে তিনি মোটেই রাজী নন।

যতীন বলিল—না, না, কবিতা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, ও রক্ততই ঠিক বুঝবে, আমরা কাজের লোক—

সহসা তাহার মুখের কথা ধামিয়া গেল, সম্মুখের দরজা দিয়া মাধবী প্রবেশ করিল, নিমেষের জ্ঞান মাধবীর চোখের কালো তারার উপর তাহার চোখ গিয়া পড়িল। মুষ্টিমতী কবিতা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। মাধবী কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া পিতার চেয়ারের নিকট আসিয়া অতি মৃদুকণ্ঠে বলিল,—বাবা, রক্তত-বাবুব বন্ধু কি চা খাবেন?

কথাগুলি কিন্তু যতীনের কানে পৌঁছিল। অতি সাধারণ কয়েকটি কথা, কিন্তু প্রতি কথা গানের সুরের মত তাহার কানে বাজিয়া উঠিল।

যোগেশ-বাবু যতীনের মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু যতীনের মুখে কোন কথাই যোগাইল না। সে বোধ হয় হতবাকই থাকিত। গুমোট আকাশে হঠাৎ ফুরফুরে বাতাসের মত রমলা ঘরে প্রবেশ করিল, কাহারও দিকে যেন না চাহিয়া সে বলিল,—একখানা মোটরকার আমাদের বাড়ীর সামনে খালি পড়ে' রয়েছে, দেখানার চড়ে' বেড়িয়ে এলে হয় না কাজী সাহেব?

যতীন একটু আশ্চর্য হইয়া নবাগতার মুখের দিকে চাহিল, এ মুখ যেন তাহার পরিচিত। রমলাও তাহার চপলদৃষ্টি দিয়া যতীনকে বুঝাইয়া দিল তাহাকে সে চিনিয়াছে, কিন্তু তাহাদের পরিচয় এখন সবাইয়ের সম্মুখে জানাইতে সে মোটেই রাজি নয়। রমলার মনে পড়িল এই ছেলেটিই ত তাহার দাদার ছেলেবেলার বন্ধু ছিল, কতদিন তাহার দাদা ইহাকে তাহাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ পাওয়াইয়াছে, সে পরিবেষণ করিয়াছে। তাহার দাদার বিলাত-বাজার পর যতীন রমলার কোন্ সন্ধান লয় নাই। কাজেই তাহাদের আর দেখা হয় নাই।

মুহু হাসিয়া রমলা আবার বলিল,—আচ্ছা, রাস্তায় কুড়ানো unclaimed property ল' অহুসারে কার হয় কাকাবাবু? যে প্রথম পাষ তার ত?

রজত মুহু হাসিয়া বলিল,—ওটা unclaimed নয়, ওর স্বত্বাধিকারী এই শরীরে, আমার বন্ধু—

—তাই নাকি, আমি ভেবেছিলুম দিব্যি লাভ হল, বিকেলে বেড়াতে যাওয়া যাবে—

যতীন বিনীতস্বরে বলিল,—তা ওটা আপনারই disposalএরইলো। আপনি কোথায় বেড়াতে যেতে চান?

আপাততঃ এ ছপুর রোদে কোথাও যেতে চাই না, বলিয়া রমলা পিয়ানোর পাশে একটা ইংরেজী ম্যাগাজিন টানিয়া লইয়া বসিল, এই সওয়া পাঁচ ফুট দীর্ঘ গাট্রোগেট্টা গোলগাল-মুখ বাঙ্গালীসাহেবটির প্রতি আর কোনরূপ মনোযোগ দিবার আবশ্যক বোধ করিল না।

যোগেশ-বাবু ধীরে যতীনকে বলিলেন,—আপনি কোথায় আছেন?

—ডাক-বাংলোয়।

—ছপুরে এইখানেই থেবে যাবেন, মোটরটা ত অচল হবে পড়ে' রয়েছে।

মাধবী রজতের দিকে কণিকের জন্ত চাহিয়া বলিল,—আপনার বন্ধু এখানে থেবে যাবেন না?

রজত যতীনের দিকে কিরিয়া বলিল,—যতীন, বেলা ত অনেক হয়েছে, আবার মোটর সারাবে—ছপুরে আমাদের এখানেই থেয়ে যাও।

রমলা দূর হইতে কৌতুকভরা চোখে চাহিয়া বলিল,—আপনি এখানে থেয়ে গেলে মিস ঘোষ ভারি খুসি হবেন।

এইরূপ বলার ভঙ্গীটা মাধবীর মোটেই পছন্দ হইল না, তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

কাজী সাহেব ঠোট মুচ্কাইয়া হাসিয়া বলিলেন,—আপনার কি কোন কাজ আছে?

এরূপ অবস্থায় এরূপ ভাবে অতুলক হইলে কেহ খাইয়া যাইতে অসম্মত হইতে পারে কি না জানি না, যতীন অসম্মতি জানাইতে পারিল না। সে মাধবীর রাঙা মুখের দিকে নিমেষের জন্ত তাকাইয়া বলিল,—না, কাজ আর কি, kindly যদি একটা চাকীর দেন মোটরটা ঠিক করে' পথ থেকে সরিয়ে রাখি।

মাধবী ধীরে বাহির হইয়া গেল, যতীন সম্মুখের দরজার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে দুইজন কুলী লইয়া মনিয়া হাজির হইতেই যতীন উঠিয়া চলিয়া গেল। যোগেশবাবু স্নান করিতে বিদায় লইলেন, কাজীসাহেবও উঠিলেন।

সকলে চলিয়া গেলে, জানুয়ার পাশে রমলাকে একা দেখিয়া রজতের হৃদয় ছলিয়া উঠিল, তাহার কেমন ভয় হইল, ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও যাইতে পারিল না। রমলার মরালগ্রীবীর উপর ক্রীমুরংএর ব্লাউজের প্রান্তরেখা কি সুন্দর, ঠিক তাহার উপর কালোচুলের ঝোঁপা সন্ধ্যাকাশে বিদ্যুৎভরা মেঘস্তূপের মত জমিয়াছে, সেই কবরীর রহস্যময় দিব্যশ্রীর প্রতি তাহার চোখ বার বার গিয়া পড়িতেছিল।

রমলাব মনে গতবাত্তের স্বপ্নের বেশ কয়েকখানি চিঠির পাতা ছিঁড়িয়া প্রাঘ কাটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আবার রজতের নিঃসঙ্গ আবির্ভাবে কি মায়ী যেন তাহাকে অভিভূত করিতে লাগিল। দুইজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসিয়া রহিল। ধীরে দুইজনে দুই বিভিন্ন ছয়ার দিয়া দুইদিকে বাহির হইয়া গেল।

সেদিন বিকাল বেলায় লাইব্রেরীতে আর্ট সম্বন্ধে আলোচনা-সভা বসিয়াছিল। আর্টের ধারার সহিত ধর্মের ধারা মানব-ইতিহাসে কিরূপ মিশিয়া গিয়াছে; ভাবতে বোদ্ধযুগে, ইয়োরোপে মধ্যযুগে, এইরূপ এক এক যুগে এক এক দেশে ধর্মের শিক্ষায় আর্টের আরতি-প্রদীপ কিরূপ জ্বলজ্বল হইয়া উঠিয়াছে; তারপর অমিতাভ বুদ্ধমূর্তিতে ভারতের আর্ট গ্রীক রোমক আর্ট অপেক্ষা কোন্ উচ্চস্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছে—এইসব নানা কথা রজত তাহার স্নিগ্ধমধুর কণ্ঠে বলিয়া যাইতেছিল। অজ্ঞতা, সূর্য্য মূর্তি, তাজমহল, এক একটি কথা উচ্চারণ করিতেই তাহার মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। মাধবী পিতার ডানপাশে এক কুশন-চেয়ারে বসিয়া চুপ করিয়া রজতের কথা শুনিত-ছিল, শিল্পীর আনন্দোন্মাদিত কমনীয় মুখের উপর তাহাব চোখ বার বার গিয়া পড়িতেছিল। যোগেশ-বাবু মাঝে মাঝে একটু মন্তব্য দিয়া আলোচনাকে অগ্রসর করিয়া দিতেছিলেন। রমলা কিছুক্ষণ সে ঘবে ছিল। ছবি দেখিতে সে ভালোবাসে, কিন্তু ছবি সম্বন্ধে আলোচনা, সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার সে বোঝে না, ভালোবাসে না। কিছুক্ষণ শুনিয়া শান্ত হইয়া একতলায় ড্রিং-রুমে সে পিয়ানো বাজাইতে গেল।

পিয়ানো বাজান কিছু বেশীক্ষণ হইল না। কিছুক্ষণ পরে যতীন আসিয়া ঘরে ঢুকিতেই রমলা গান শেষ না করিয়াই পিয়ানো বন্ধ করিল। টুইড স্ট্রট বদলাইয়া মুর্শিদাবাদ-তসরের স্ট্রট গাথে উঠিয়াছে। শ্বিত-হাস্যে রমলা যতীনকে অভ্যর্থনা কবিল বটে, কিন্তু এই ফটপুষ্ট ইঞ্জিনিয়ারটিকে পিয়ানো শোনাইবার ইচ্ছা তাহার মোটেই হইল না। বলিল,—আপনার বন্ধু ওপরে আছেন, ডেকে দিচ্ছি।

—না, না, আপনি কেন উঠছেন—আপনার দাদা ভাল আছেন? অনেকদিন দেখা হয়নি।

ভালই,—বলিয়া রমলা চুপ করিল। পুরাতন পরিচয়েব স্ত্রী ধরিয়া আলাপ করা তাহাব মোটেই ইচ্ছা নয়।

মুহূ হাসিয়া রমলা বলিল,—এর মধ্যে কাজ হয়ে গেল? আপনার ত অনেক কাজ, এত শীগগীর ছুটি?

—হাঁ, মোটরটা নিয়ে এলুম, কোথায় বেড়াতে যাবেন বলেছিলেন?

—মোটর থাকলে এখানে খুব বেড়াতে সুবিধা, আপনার বন্ধুকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

মনিয়া ঘরের কোণে ফুলদানিতে নূতন ফুল সাজাইয়া রাখিতেছিল, রমলা তাহাকে বলিল,—এই, ওপরে গিয়ে খবর দিয়ে আস ত।

মনিয়া বলিল,—কাকে?

রমলা অতর্কিতে বলিয়া ফেলিল,—দিদিমণিকে।

লাইব্রেরীতে আলোচনা-সভার সম্মুখে গিয়া মনিয়া তাহার নিজের বুদ্ধির অনেকখানি খরচ করিয়া বলিল,—দিদিমণি, আজকের সকালের সাহেব এসেছেন, ছোটদিদি-মণি আপনাকে বেড়াতে যাবার জন্ত ডেকে পাঠালেন।

মাধবীর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, সে তীক্ষ্ণস্বরে বলিল,—স্বল্ গে, এখন সময় নেই।

মনিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিল। বহুক্ষণ ওপরে ড্রিং-রুমে গিয়া খবর দিল, সবাই এখন গল্পে ব্যস্ত, কেউ আসতে পারবে না।

বহুক্ষণ বসিয়াও রজত যখন নীচে আসিল না, তারপর উত্তর শুনিয়া রমলার কেমন রাগ হইল, সে ঝোঁকের মাধ্যমে বলিল,—চলুন, আমবাই বেড়িয়ে আসি।

অতি অনিচ্ছুক হইলেও কাজী-সাহেবকে টানিয়া লইয়া রমলা যতীনের সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। কাজী-সাহেব পিছনে বসিলেন, রমলা যতীনের পাশে সামনে বসিল। এ যন্ত্র টানিলে কি হয়, ও যন্ত্র টিপিলে কি হয়, steering wheel কিরূপে ঘোরাইয়া মোটর কোনদিকে ঘোরাইতে হয়, ইত্যাদি নানা প্রশ্নে হাস্তে পরিহাসে সে যতীনকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। মোটরের বেগ যতই বাড়িতে লাগিল কাজী-সাহেবের মুখ ততই গম্ভীর হইতে লাগিল আব রমলাব দেহ-মন ততই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

মোটরের গতি কুড়ি হইতে ত্রিশ মাইল হইতে ষাট মাইল উঠিতে লাগিল, কাজী-সাহেব ঘন ঘন দাড়িতে হস্তসঞ্চালন করিতে লাগিলেন, রমলার দেহ গতির আনন্দে নাচিয়া উঠিতে লাগিল।

টারুনারের রংএর হোলিখেলা, ছইস্লামের বর্ণের কুছাটিকা, ডুলাকের রংয়ের-রূপ-কথালোকের মধ্যে যখন এক তরুণ ও এক বৃদ্ধ বর্ণরসিক ডুবিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের পাশে তরুণীটির মন বাব বার উদাস হইয়া উঠিতেছিল, এক মোটরের ভক্ ভক্ শব্দ বার বার বিজ্রপের মত বাজিতেছিল।

ঝিল পার হইয়া বহুদূর ঘুরিয়া যখন রমলা বাড়ী ফিরিল, তখন রাত হইয়া গিয়াছে; গেটের নিকট রমলা ও কাজীকে নামাইয়া যতীন ডাকবাংলায় ফিরিল। কত জ্যোৎস্না রাত্রে কত বিজন দীর্ঘ-পথ-প্রান্তর পার হইয়া তরুর ছায়ায় ছায়ায় হাওয়ার সহিত পাল্লা দিয়া সে মোটরকাব হাঁকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু মোটর চালানোয় এমন মাধুরীর স্বাদ সে কখনও পায় নাই। এই জ্যোৎস্না-বিজড়িত সুখ-স্বপ্নকে সে বহুদূর সহিত দেখা কবিয়া ভাঙিতে চাহিল না।

ডাকবাংলায় গিয়া যতীন ইঞ্জিনেরটা বারান্দায় বাহির করিয়া জ্যোৎস্না রাত্রির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল; গভীর রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া কাটাইল। প্রাণ আঁকিতে, এষ্টমেট কষিতে, যন্ত্র ফিট করিতে, মোটরে ঘুরিতে তাহার অনেক রাত জাগিয়া কাটিয়াছে, কিন্তু অকারণে জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া রাত কাটানো তাহার জীবনের ইতিহাসে এই প্রথম। হান্সাহানার সৌরভ-ভরা বাতাস বড় মিঠা লাগিল। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি সে উদাসীন, আজ হৃদয়ের কোন্ নিভৃত পথ মুক্ত হওবাতে সৌন্দর্য-লক্ষ্মী তাহার সমস্ত হৃদয় জয় করিয়া জুড়িয়া বসিল। তাহার বিরুদ্ধে বাধা দিবার শক্তি বা ইচ্ছা তাহার রহিল না। ছইখানি মুখ বার বার জ্যোৎস্নায় ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে কে তাহার প্রেমিক-হৃদয় জাগাইয়াছে তাহা তর্ক করিয়া বিচার করিবার ইচ্ছা নাই। অপরিসীম সুখ, অজানা বেদনা—বিশ্বের যে

সৃষ্টি-শক্তি প্রজাপতির পাখা রঙীন করিয়া, ফুলের বুকে মধু ঢালিয়া, পাখীর কণ্ঠে গান ভরিয়া, নারীর নয়নে মায়ার ফাঁদ পাতিয়া নব নব জন্মের ধাবা প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছে, তাহারই রূপ-মায়ার জালে আজ সে ধরা পড়িয়াছে। ইহা হইতে ত্রাণ কোথায়? নলিত গতি, চকিত চাহনি, দীপ্ত সৌন্দর্য, কথার সঙ্গীত, শাড়ীর খসখস, আঁঙ্গুর-আঁঙ্গুরের স্পর্শ, কেশের সৌরভ—এ মায়াজাল হইতে সে মুক্তি চায় না। ইঞ্জিনের ঝকঝক, লোহার ঝন্ঝন্, কল-দেবীর সঙ্গীতই এত দিন তাহার কাছে মধুর লাগিয়াছে, তরুণীর সামান্য কথাই এত মাধুর্য কোথায় লুকানো ছিল!

যতীন যখন মাধবী ও রমলার কথাগুলি ভাবিতেছিল, রক্তও তাহারই মত জ্যোৎস্না রাত্রির দিকে চাহিয়া বারান্দায় বসিয়া ছিল। তাহার কবিরূপ কথা মনে পড়িল, সে একবার বলিয়াছিল, যে বলে আমি তোমাকে আজীবন ভালবাসব, সে ভাবের ঘোরে মিথ্যে কথা বলে। চিরকাল ভালবাসব, এমন প্রতিজ্ঞা কেউ করতে পারে না। মানসীর যে রূপ দেখে প্রেমের পদ্ম পাপড়ির পব পাপড়ি মেলে বিকশিত হয়, সে রূপ ম্লান হলে, অমৃতের ভাঙার ফুরিয়ে গেলে পদ্ম শুকিয়ে ঝরে' পড়ে। ফুলকে চির অম্লান রাখবার হুঃসহ চেষ্টা করে বলে' চারিদিকে দেখ ভালোবাসার ভগামি। আমি অবশ্য সত্যি প্রেমিকের কথা বলছি, সে বলতে পারে না আমি তোমাকে সবচেয়ে বেশী ভালো-বাসি, কেননা সে প্রেমের হিসাব রেখে তুলনা দিয়ে কথা বলতে জানে না। প্রেমের পদ্মই আমাদের ভাগ্যে জোটে, চির অম্লান পারিজাতের সন্ধান কে পেয়েছে?

রক্ত ভাবিতেছিল, সত্যিই প্রেম এমন ফাঁবি এ চির-চঞ্চল ক্ষণভঙ্গু প্রেম লইয়া সে কি করিবে?

কাজীসাহেব তখন তাঁহার ঘরে পড়িতেছিলেন—

সাকী বেয়ার বাদহ্ কে আমদ্ জমান্-ই-গুল্।

তা বশ্-কুনীম্ তোবাহ্ দিগবু দব্-মিয়ান-ই-গুল্ ॥

(ক্রমশ)

শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু

স্বাস্থ্য-সংস্কার



বাংলাদেশের জ্ঞানশিক্ষা-সংস্কার

জ্ঞানশিক্ষা ও গার্হস্থ্য জীবন

জ্ঞানশিক্ষা, আমাদের দেশে, একটি প্রকাণ্ড ভাস্কর্য উপর প্রতিষ্ঠিত। বাস্তব জীবনের সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ, কিন্তু জ্ঞানশিক্ষায় বালিকাদিগের বাস্তব জীবনের দিকে লক্ষ্য রাখা হয় না। আমাদের দেশে বালক ও যুবকদিগের দৈনন্দিন জীবনের সহিত বালিকা ও যুবতীদিগের দৈনন্দিন জীবনের একটা বিশিষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। জ্ঞানশিক্ষায় সেটি অস্বীকার করিয়া, পুংশিক্ষার অন্তর্ভবণে জ্ঞানশিক্ষা ও শিক্ষায়তনগুলি পরিচালিত হয়। এরূপ চেষ্টার ফলে জ্ঞানশিক্ষা অল্পমাত্র ও কুপথে পরিচালিত। বালিকাদিগকে তাহাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন যথার্থ ভাবে যাপন করিবার যোগ্যতা দিবার নিমিত্ত, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি উক্ত উদ্দেশ্যের অল্পকালে গঠন করিয়া তুলিতে হইবে।

এই দৈনন্দিন বাস্তব জীবনটি কি, তাহার বিস্তৃত আলোচনা বাহ্যিক মাত্র। বাংলা দেশের বর্তমান অবস্থায় মাতৃহই যে কামিনীকুলের সর্বোৎকৃষ্ট বিশিষ্টতা, গৃহই যে তাহাদের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র, এবং গার্হস্থ্যজীবনের সর্বোচ্চ উন্নতিসাধনই যে তাহাদের যথার্থ জীবনদর্শন, —বাংলাদেশের জ্ঞানশিক্ষা পরিচালনে, এই কয়টি কথা, বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে।

শিক্ষাসংস্কার।

আমাদের দেশে জ্ঞানশিক্ষার আমূল সংস্কার আবশ্যিক। শিক্ষার উদ্দেশ্য, যে উপায়গুলি অবলম্বন কবিলে এই উদ্দেশ্য কার্যে পবিণত করা যাইতে পারে, এবং কি বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বিত হইলে স্থিরীকৃত উপায়গুলির ভিতর দিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে,—এই-সমস্ত সমস্তাই নূতন করিয়া ভাবিয়া লইতে হইবে। জ্ঞানশিক্ষার প্রসার খুব কম। যাহাতে অল্প আয়াসে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়, সেই নিমিত্ত, জ্ঞানশিক্ষা-বিধানে আমাদের

দেশীয় জীবনের সনাতন বিশিষ্টতাব সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা কবিয়া, উন্নততম দেশের উৎকৃষ্টতম প্রণালীগুলি ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া, জ্ঞানশিক্ষার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে।

দেশীয় জীবনের বিশেষত্ব।

ধর্ম, শাস্তি ও সংযম আমাদের জাতীয় জীবনের বিশিষ্টতা। ত্যাগ, প্রীতি ও ভক্তিই ধর্মের বিশিষ্ট লক্ষণ, কর্মময় শাস্তি-পূর্ণ নিরুদ্বেগ জীবনই গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ, এবং সংযমের দ্বারা অভাব নিরাকরণই হিন্দু সভ্যতার মূল ভিত্তি। যেখানে পাশ্চাত্য জগৎ নীতি নূতন অভাব সৃষ্টি করিয়া, এই অভাব মোচনের অনায়াস-সাধ্য উপায়-উদ্ভাবনই সভ্যতার মূল লক্ষণ বলিয়া শিরোধার্য করিয়া লইয়াছে, সেইখানেই দেশীয় শিক্ষায় তাহার বাহ্য অল্প-করণের ফলে বিলাসিতা বর্জিত হইয়া সমাজ-বন্ধন শিথিল হইতেছে, এবং জাতীয় জীবন অশান্তি ও ধ্বংসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। বালক ও যুবকদিগের শিক্ষায়, আমরা এই দিকে এতটা অগ্রসর হইয়াছি, যে পশ্চাৎ-অবলোকনের সময় আসিয়াছে। এই বিষয়ে বিধ জ্ঞানিয়া জ্ঞানশিক্ষায় পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং শিক্ষকে ভক্তি ত্যাগ ও সংযমের পবিত্রতায় মহীয়সী করিয়া তুলিতে হইবে। এই কারণে পোষাক-পরিচ্ছদ বেশ-ভূষা ইত্যাদি বিলাসিতার বাহ্য বাহনগুলির সম্বন্ধে প্রত্যেক মহিলা-বিদ্যালয়ে কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম থাকা বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষায় স্বাধীনতা।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা বর্তমান সময়ে বিভিন্ন বর্গের (class) শিক্ষা, এবং বর্গের শিক্ষা সমষ্টির শিক্ষা। কিন্তু রোগ-নিরাকরণে চিকিৎসা যেমন ব্যক্তিগত, বৈজ্ঞানিক শিক্ষাও সেইরূপ ব্যক্তিগত শিক্ষা। ইহাই শিক্ষা বিষয়ে বিংশ শতাব্দীর সর্বোৎকৃষ্ট আবিষ্কার। প্রত্যেক বালক ও প্রত্যেক বালিকাকে পৃথকভাবে শিক্ষা দিতে হইবে। কিন্তু শিক্ষায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষাধিগীর সম্পূর্ণ

স্বাধীনতা। না থাকিলে, ব্যক্তিগত শিক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠে। সকল বালক-বালিকা শিক্ষা-ক্ষেত্রে নিজেব শিক্ষা নিজেই পরিচালিত করিবে, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা

হইয়া দাঁড়ায়, বর্গের নির্দিষ্ট পাঠ-সমাপ্তি বিষয়ে তাহারা কোন সময়ে তাহাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিবার সুযোগ পায় না।

এ বিষয়ে প্রয়োজন-মত সাহায্য প্রদান করিবেন। এক কথায়, স্বশিক্ষাই (auto-education) শিক্ষার একমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালী, এবং সার্থক শিক্ষাব সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।

বর্তমান সময়ে, আমাদের দেশে, ধেরূপে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বর্গ সংগঠিত হয়, তাহাতে শিক্ষাব স্বশিক্ষা-তত্ত্ব প্রয়োগ করিয়া ব্যক্তিগত শিক্ষাব ব্যবস্থা করা অসম্ভব। বিভিন্ন বর্গের বিষয়-নির্ঘণ্ট (curriculum) ও পাঠ-সূচী (syllabus) প্রস্তুত করিবার সময় আমবা কতকটা অভিজ্ঞতা, এবং বেশীর ভাগ কল্পনার সাহায্যে, ভিন্ন ভিন্ন বর্গের জ্ঞান ছাত্র-ছাত্রীর একটা নির্দিষ্ট বয়স অনুমান করিয়া লই। মনে করি যে এই বয়সের সাধারণ-শক্তি-সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীরা নির্ধারিত বিষয়-নির্ঘণ্ট ও পাঠসূচী এক বৎসরের ভিতরই সমাপন করিতে সমর্থ হইবে। এইরূপে বর্গগুলি গঠিত হয়। কিন্তু একপ বর্গ-বিভাগ (classification) কেবল সমষ্টিগত শিক্ষার উপযোগী। ইহা দ্বাৰা সাধারণ-শক্তি-সম্পন্ন ছাত্রদিগের ততটা অপকার হয় না, কিন্তু যাহারা অসাধারণ অর্থাৎ যাহারা স্বল্পবুদ্ধি অথবা উৎকৃষ্ট-বুদ্ধি-সম্পন্ন, তাহাদের প্রভূত অপকারের সত্তাবনা রহিয়া যায়।

এইরূপে গঠিত এক-একটি বর্গ পাঠোন্নতির দিক দিয়া পরবর্ত্তী বর্গ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। সকল প্রকার ছাত্র-ছাত্রীর এক বৎসরের ভিতর নিজ নিজ বর্গের পাঠ সমাপ্ত হইবার কথা, কিন্তু যাহারা স্বল্প-শক্তি-সম্পন্ন, তাহারা এক বৎসরে সমস্ত বিষয়ের পাঠ সমাপন করিতে পারে না। সেই কারণে তাহাদিগকে সময় সময় এক-এক বর্গে একাধিক বৎসর যাপন করিতে হয়। অপব পক্ষে যাহারা উৎকৃষ্ট-বী-শক্তি-সম্পন্ন, তাহারা অনায়াসে এক বৎসরের ভিতর বর্গের পাঠ সমাপন করিতে পারে। এরূপ ছাত্র যদি সুযোগ পায় তাহা হইলে এক বৎসরের কম সময়ের মধ্যেও নির্দিষ্ট পাঠ শেষ করে। প্রচলিত সমান্তরাল পরস্পর-বিরোধী বর্গ-বিভাগ (parallel classification) তাহাদের শক্তি-সামর্থ্যের প্রতিকূল

বর্গগুলি একপ সমান্তরাল ভাবে গঠিত থাকিলেও, শিক্ষাব সময় যদি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনপূর্বক ইহাদিগকে পাশাপাশি বাখিষা সমস্ত বিদ্যালয়ের জ্ঞান লব্ধভাবে নূতন বকমে বর্গগুলি গঠিত হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিগত শিক্ষার পথ সুগম হয়। এরূপ বর্গ-বিভাগকে পার্শ্ব-অথবা লম্ব-অভিমুখীন বর্গ-বিভাগ (lateral or vertical classification) বলা হয়। এইরূপে বিভক্ত বিভিন্ন বর্গে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে; এবং একই বর্গে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন বয়সের ছাত্র একই সময়ে নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ্যের অনুযায়ী একই বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ আয়ত্ত করিবার সুযোগ লাভ কবে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা-কর্ম সম্পাদিত হইবার সুযোগ থাকিলে ব্যক্তিগত শিক্ষা এবং বিভিন্ন শক্তি-সামর্থ্যের অনুযায়ী স্বশিক্ষা সম্ভব হয়। শ্রীমতী মন্তেসরী তাহার শিশু-আশ্রমে (Children's House) অল্পরূপ প্রণালীতে শিক্ষাকার্য সম্পাদন করেন এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শ্রীমতী পার্ক হাউস্ নিউইয়র্কের অনেকগুলি বিদ্যালয়ে এরূপ বর্গবিভাগ পরীক্ষা করিয়া আশাতিরিক্ত সফল লাভ করিয়াছেন। ইংলণ্ডেও অনেকগুলি বিদ্যালয়ে এরূপ পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। শিক্ষক সমাজে প্রণালীটি ডাল্টন-প্রণালী অথবা ডাল্টন-বীক্ষণাগার প্রণালী (Dalton Laboratory Plan) নামে পরিচিত।

নব-সংগঠন।

প্রকৃতির লীলাভূমিতে ব্যক্তিব বিশিষ্টতা একটি বিশেষ ধর্ম। জীব জীব, মানুষে মানুষে, শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়া পার্থক্য খুব স্পষ্ট। এই পার্থক্য স্বীকার করিয়া লইয়া শিক্ষা পরিচালন করা উচিত। এরূপ পার্থক্য-বশতঃই সকল বালিকা ও সকল যুবতী সকল স্তরের শিক্ষার উপযুক্ত হইতে পারে না। শিক্ষা বর্তমান সময়ে নামে শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীদিগের শক্তি-সামর্থ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও এবিষয়ে অনুমান কল্পনা ও “আন্দাজ”ই শিক্ষার নিয়ামক। গত বিশ বৎসরে এবিষয়ে মনো-

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা শিক্ষা-ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবার উপযুক্ত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংস্কৃত, বিনে-সাইমনের বুদ্ধি-পরীক্ষার (Intelligence Tests) প্রণালীর সাহায্যে, এখনই বৈজ্ঞানিক উপায়ে বালক-বালিকাদিগের বুদ্ধিমত্তার স্বরূপ, বস্তু-তত্ত্ব-পরিমাপক্রমের (Objective Measuring Scale) সহায়তায় বুদ্ধি লইবার উপায় হইয়াছে। এই প্রণালীর সাহায্যে তাহাদের বুদ্ধিমত্তার পরিমাণ করিয়া, শিক্ষা-ক্ষেত্রে কে কতদূর অগ্রসর হইবার উপযুক্ত তাহা নির্দ্ধারিত হইতে পারে। নির্ণীত হইয়াছে যে, যে-সকল বালক-বালিকার বুদ্ধির গুণ্য (Intelligence Quotient) ৭০ হইতে ৮০র ভিতর তাহারা স্বল্পবুদ্ধি—তাহাদের জ্ঞান সাধারণ শিক্ষার পৃথক বন্দোবস্ত করিয়া কৰ্ম বা বৃত্তি শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা আবশ্যিক; যাহাদের বুদ্ধির গুণ্য ৮০ হইতে ৯০এর ভিতর তাহারা নির্মোহ—তাহারা বিশেষভাবে কেবল নিম্ন-শিক্ষার উপযুক্ত; যাহাদের বুদ্ধির গুণ্য ৯০ হইতে ১১০এর ভিতর তাহারা সাধারণ-বুদ্ধি—তাহারা মধ্য-শিক্ষার চরম সীমায় উপনীত হইবার উপযুক্ত; এবং যাহাদের বুদ্ধির গুণ্য ১১০এর অধিক তাহারা উৎকৃষ্ট-বুদ্ধি—কেবল তাহারা উচ্চস্তরের প্রশস্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারে।

বর্তমান সময়ে জ্ঞানীশিক্ষার প্রসার যখন খুব অল্প, তখন মস্তেসরীর প্রণালী, ডাল্টন-প্রণালী, বুদ্ধি-পরীক্ষা, ইত্যাদি উপায়ে যাহাতে অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে অধিকতর স্বফল লাভ হয় তাহার বন্দোবস্ত করা আবশ্যিক। আমাদের দেশে শিক্ষার একরূপ উন্নতি-সাধনে সমর্থ শিক্ষক ও শিক্ষাপরিচালকের সংখ্যা খুব নগণ্য বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। এই নিমিত্ত ইটালীতে শ্রীমতী মস্তেসরী নিকট এবং যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টার্মান ও নিউ ইয়র্কের শ্রীমতী পার্কহাউসের নিকট, কএকজন উচ্চশিক্ষিতা বঙ্গমহিলাকে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-প্রণালী, শিক্ষা-পরিচালন, বুদ্ধি-পরীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনেব জন্ত প্রেরণ করিলে, তাহারা দেশে ফিরিয়া জ্ঞানীশিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইবেন।

জ্ঞানীশিক্ষার স্বরূপ।

আমাদের জ্ঞানীশিক্ষা সাধারণতঃ উপার্জননের জন্ত নয়। মানসিক উৎকর্ষ এবং গৃহকার্যে দক্ষতালাভ—এই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু মানসিক উন্নতি ও সাংসারিক কৰ্মে দক্ষতা-লাভ দেশীয় জ্ঞানীশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, চিত্তবিনোদন, এবং সৌন্দর্য উপলব্ধি উপযুক্ত শিক্ষা বাদ দিলে চলিবে না। একরূপ চেষ্টায় জ্ঞানীশিক্ষার মূল উদ্দেশ্যও পণ্ড হইবে। প্রযোজনীয় শিক্ষা এবং পরিপূর্ণ শিক্ষাই দেশীয় জ্ঞানীশিক্ষার ষথার্থ স্বরূপ। এই কারণে অন্যান্য শিক্ষার সহিত প্রাত্যহিক ব্যায়াম, ক্রীড়া, নীতিশিক্ষা, ধর্মো-পদেশ, ধর্মগ্রন্থপাঠ, ধর্মসঙ্গীত, এবং চিত্রাঙ্কন সাধারণতঃ জ্ঞানীশিক্ষার সকল স্তরের বাধ্যতামূলক বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দৈহিক শিক্ষা।

এই তালিকার একটি বিষয় সম্বন্ধে একটু আপত্তি উঠিবার কথা। মুগুর ভাঁজা, ডাম্বেলের কন্সং, ফুটবল, ক্রিকেট, ইত্যাদি জ্ঞানীশিক্ষার অঙ্গ হইতে পারে না, এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। একরূপ ব্যায়াম ও ক্রীড়া দেশীয় জ্ঞানীলোকেব উপযোগী করিয়া তুলিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে; এবং একরূপ চেষ্টার ফলে, নৈস্তিক সমাজে জ্ঞানীশিক্ষার উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে অনেক কাল্পনিক ও ভ্রান্ত ধারণা অহুগিত হইতে থাকিলে, জ্ঞানীশিক্ষার প্রতি আমাদের একটা বিজ্রোহেব ভাব আসার সম্ভাবনা খুব অধিক। কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্ত, মানসিক উন্নতির জন্ত এবং এমন কি চরিত্র ও আচরণের উৎকর্ষ সাধনে, ব্যায়াম ও ক্রীড়ার খুব প্রয়োজন। আমাদের দেশের বালিকারাও নানাপ্রকার দেশীয় ক্রীড়ায় যোগদান কবে; এবং বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায়, যে-সকল বিভিন্ন প্রকার গ্রাম্য ক্রীড়া প্রচলিত আছে, তাহার বিবরণ সংগৃহীত হইলে, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইবে, এইসকল দেশীয় ক্রীড়া দেশীয় জীবনের সহিত বেশ খাপ খায়। কপাটি, বুড়ীবসা (বোঁছি), নৃত্যধাতা (লবণ-কোট), কাণামাছি, কাগের ঠেং, গম্ গম্, বুড়ী বুড়ী, ইত্যাদি গ্রাম্য ক্রীড়া কিছু কিছু সংস্কৃত করিয়া, জ্ঞানীশিক্ষার

সহিত নিয়মিতভাবে সংযোগ করিয়া দিলে, মেয়েদের অশেষ কল্যাণের কারণ হইতে পারে। বিদেশী ক্রীড়ার মধ্যে, ব্যাডমিন্টন, কিছু কিছু লন্টেনিস ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমের ক্রীড়াগুলি স্থল-বিশেষে জ্ঞানীশিক্ষার সহিত সংযুক্ত হইতে পারে, এবং বোধ হয় একপ সংযোগ আপত্তিকর হইবে না।

নীতি শিক্ষা ও ধর্মাচরণ।

নীতি শিক্ষা, ধর্মোপদেশ, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, এবং ধর্মাচরণ সবগুলিই ধর্মশিক্ষার অন্তর্গত। জ্ঞানীশিক্ষার বিষয়-নির্ঘণ্টে এইটিকে প্রধান স্থান প্রদান কবিত্তে হইবে, এবং প্রথম হইতেই ব্যবহারিক শিক্ষার দিক দিয়া ধর্মাচরণের উপব ঝোক দিতে হইবে। শৈশব-শিক্ষায় রামায়ণ, মহাভারত, পুবাণ, কোরান প্রভৃতি গল্পছলে বালিকাদিগের নিকট উপস্থাপিত হইবে এবং সময় সময় সহজ ভাষায় লিখিত এইসকল বিষয়ের গদ্য ও পদ্য গ্রন্থ তাহাদিগকে পড়িয়া শুনাইতে হইবে। ধর্মোৎসব, পার্বণ ইত্যাদিতে যাহাতে তাহাদিগের ভিতর আচরণের সাহায্য অতর্কিতভাবে ধর্মভাব জাগ্রত হয়, তাহার দিকে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য, এবং সহজ সহজ নৈতিক উপদেশগুলি যাহাতে রীতিমত প্রতীপালিত হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। নিয়মিত পূজা, স্তোত্র পাঠ, ধর্মসঙ্গীত, এবং বিভিন্ন বয়সোপযোগী ব্রত আচরণ—ধর্মশিক্ষার বিশেষ সহায়। সেই নিমিত্ত এদিকেও বিদ্যালয়ের দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। মনে রাখা উচিত, যে, গৃহের সহিত বিদ্যালয়ের সহযোগিতা ব্যতিবেকে ধর্মশিক্ষা সম্পূর্ণ সার্থক হইতে পারে না। যাহাতে এই সহযোগিতা লাভ হয়, পরীক্ষা দ্বারা তাহার উপায় উদ্ভাবন করা কর্তব্য। ধর্ম ও নীতিশিক্ষা খুব সহজসাধ্য নয়। এবিষয়ে ভ্রান্তি ও ব্যর্থতার ভিতর দিয়া, ধারাবাহিক পরীক্ষার সাহায্যে সফলতা ও সিক্তির দিকে অগ্রসর হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

চিত্তবিনোদনের উপযোগী শিক্ষা।

মৌলিক উপভোগ কবিবার শক্তি মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায় হয়, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু চিত্তবিনোদনের ও অবসর সময়ের সদ্ব্যবহারে এই

শক্তির পরিপূর্ণ সার্থকতা। গৃহই আমাদের অবসর-নিবাস;—আমাদের সমাজ-সংস্থানে ইহা যেমন সত্য, বোধ হয় অন্য কোন দেশে সেকপ নয়। অবশ্য গৃহে আমাদের মজলিস্ আছে, কিন্তু গৃহের বাহিরে আমাদের ক্লাব নাই। এই গৃহে লক্ষ্মীস্বরূপা ললনাকুলই একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাহারা যদি চিত্তবিনোদনের উপায়গুলির কোন-একটি আয়ত্ত কবিত্তে পাবেন, তাহা হইলে তাহাদের ব্যক্তিগত উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে, সংসারাত্মম ভূষর্গে পরিণত হয়। সমাজ-সংস্থানে এবং জাতীয় জীবন গঠনে, এরূপ শাস্তি-বিধানের সার্থকতা কম নয়। এই কারণে সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কন জ্ঞানীশিক্ষার অন্তর্গত একটি অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা।

শিক্ষার অবলম্বন।

খুব চুঃখের বিষয় যে নানা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কারণে বাংলা দেশের শিক্ষা-বিধানে ইংরেজি ভাষাকে কেন্দ্র করিয়া পাঠ্য-তালিকা গঠিত হয়। উক্ত ভাষা জ্ঞানীশিক্ষাতেও একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন প্রয়োজন। জ্ঞানীশিক্ষার সকল স্তরে,—আদ্য, মধ্য, ও অন্ত্য শিক্ষায়, মাতৃভাষা ও সাহিত্যের কেন্দ্রস্থান অধিকার করা উচিত। এই মাতৃভাষাই সকল বিষয়েই এবং জ্ঞানীশিক্ষার সকল স্তরেই শিক্ষার আলম্বন (medium of instruction) হইবে। যদি অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে, যথোপযুক্ত মানসিক উৎকর্ষ ও কর্মকুশলতা লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে বাংলায় বালিকা ও কুমারীদিগকে বাংলা ভাষায় ভিতর দিয়া, চিন্তা কবিত্তে শিখাইয়া, যথার্থ উন্নতিলাভের অবসর দিতে হইবে। প্রফেসর রবীন্দ্রনাথ তাহার “দি সেন্টার অব ইণ্ডিয়ান কালচার” (The Centre of Indian Culture) নামক পুস্তিকায় মাতৃভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষালাভ সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাই সংশিক্ষার চরম তত্ত্ব। সম্প্রতি ইংলণ্ডে মাতৃভাষা সম্বন্ধে একটি রাজকীয় কমিশনের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও এই সারগর্ভ সত্য তত্ত্বটি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। মাতৃভাষাই যেমন শিশুর পুষ্টি, মাতৃভাষাতেও তেমনি জাতীয় অন্তরের পরিপূর্ণ বিকাশ। আমাদের জ্ঞানীশিক্ষায় এই ভাষাকে খুব

প্রথম হইতেই উচ্চস্থান প্রদান কবিতে হইবে। স্কুলপাঠ্য “ফরমাসে” সাহিত্যের হাত হইতে যত শীঘ্র মুক্তিলাভ হয়, ততই মঙ্গল। এই মাতৃভাষা ও সাহিত্য, শিক্ষার মধ্য ও অন্তর্য স্তরে, সর্বপ্রধান শিক্ষণীয় বিষয় থাকিবে, এবং শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরেও ইহার ভিতর দিয়াই উচ্চতর ও উচ্চতম জ্ঞানসঞ্চয়ের পন্থা সুপ্রশস্ত করিয়া দিতে হইবে। প্রথম প্রথম কোন কোন স্তরে পুস্তক ও শিক্ষকের অভাব অস্বীকার্য হইতে পারে। কিন্তু এই অভাব তীব্র ও সত্য না হইলে অভাব পূরণ কোনকালেই পর্যাপ্ত হইবে না।

প্রশস্ত শিক্ষা এবং জীশিক্ষার নানা অন্তরায়।

মাতৃভাষা ও সাহিত্য মানসিক উৎকর্ষ লাভের উৎকৃষ্ট উপায় হইলেও, এরূপ উন্নতির জন্য জ্ঞানমূলক শিক্ষার বিষয়গুলি বহুবিস্তৃত। বিষয়গুলির নির্বাচনে জীশিক্ষা ও পুশিক্ষার সাধারণত বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। মাতৃভাষা, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রাচীন ভাষা, আধুনিক ভাষা, প্রভৃতি বিষয় উভয় প্রকার শিক্ষার অন্তর্গত। কিন্তু বাংলাদেশের বালিকাদিগের শিক্ষাব জন্ত বিষয়-নির্ঘণ্ট একটু ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে মানসিক উন্নতি, স্বাস্থ্যরক্ষা, সম্ভান প্রতিপালন, বোগ শূন্যতা এবং গৃহস্থালীর নানা কর্মে দক্ষতালাভই জীশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, পদ্মা বাঙালি মহিলাদিগের জীবনের সঙ্গী, খুব অল্প বয়সেই তাঁহাদের বিবাহ হয়, এবং বিবাহ হইলেই শিক্ষায় নানা ব্যাঘাত জন্মে। সাধারণতঃ বিবাহের বয়স দশ হইতে বারো বৎসর। কলিকাতার মত স্থানে এবং পল্লী-অঞ্চলের কোন কোন শিক্ষিত পরিবারে এই বয়স নানা কারণে বর্ধিত হইলেও, ইহা সমাজের সর্বত্রই পুরোক্ত রূপ। এই অন্তরায়গুলি স্বীকার করিয়া লইয়া, জীশিক্ষা সমস্তার সমাধান করিতে হইবে।

জীশিক্ষার বিভিন্ন স্তর।

জীশিক্ষার উপবি-উক্ত অন্তরায়গুলি এবং আত্মযজ্ঞিক অপরাপর সমস্যা আলোচনা করিয়া, শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের পাঠ্য-তালিকার সংস্থার করিতে হইলে, আলোচনা জটিল হইবার কথা। সেই কাবণে জীশিক্ষার বিয় ও আত্ম-

যজ্ঞিক অপরাপর সমস্যা মনে রাখিয়া, বিভিন্ন স্তরের বিষয়-নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া, বিষয় নির্বাচন সংক্ষেপে আলোচনা করাই সুবিধাজনক। সবে সবে আবশ্যিক-মত অন্তরায় সমস্যাও আলোচিত হইতে পারে। কিন্তু এরূপ চেষ্টার পূর্বে জীশিক্ষার বিভিন্ন স্তরগুলি সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। এই স্তরগুলি বালিকাদিগের শক্তিসামর্থ্য এবং মহিলাদিগের সামাজিক জীবনের অস্বকূল হওয়া আবশ্যিক।

জীশিক্ষার বিভিন্ন স্তর পাঁচভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

(ক) শৈশব-শিক্ষা।

গৃহ অথবা বিন্যালয়ের শিক্ষা। চার বৎসরের জন্য। বয়স চার হইতে আট বৎসর পর্য্যন্ত।

(খ) আদ্যশিক্ষা।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা। চার বৎসরের জন্য। বয়স আট হইতে বারো বৎসর পর্য্যন্ত।

(গ) মধ্যশিক্ষা।

বিদ্যালয় অথবা অন্তঃপুরের শিক্ষা। চার বৎসরের জন্য। বয়স বারো হইতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত।

(ঘ) অন্ত্যশিক্ষা।

বিদ্যালয় অথবা অন্তঃপুরের শিক্ষা। দুই বা তিন বৎসরের জন্য। বয়স ষোল হইতে আঠারো অথবা উনিশ বৎসর পর্য্যন্ত।

(ঙ) উচ্চতম শিক্ষা।

বিদ্যালয় অথবা অন্তঃপুরের শিক্ষা। এক বা দুই বৎসরের জন্য। বয়স আঠারো অথবা উনিশ হইতে কুড়ি অথবা একুশ বৎসর পর্য্যন্ত।

আমাদিগের বালিকাদিগের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সমবয়স্ক বালকদিগের অপেক্ষা দ্রুত বলিযাই বোধ হয়। ইহাব স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক নানা কারণ থাকিতে পারে; কিন্তু প্রচলিত ধারণাই এইরূপ। এবিষয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ আবশ্যিক। প্রচলিত ধারণা অনুসারে জীশিক্ষা পরিচালিত হইলে বালিকাদিগের শিক্ষা বালকদিগের শিক্ষা অপেক্ষা কিছু দ্রুত হওয়া উচিত। নারীদিগের বর্তমান সামাজিক

আবেষ্টন মনে রাখিয়া এই প্রচলিত অসুস্থ্যমান অসুস্থ্যসারেই জীশিক্ষার স্তরগুলি বিভক্ত হইয়াছে। জীশিক্ষার ধারাবাহিক আলোচনায় এই বিভিন্ন স্তরগুলির উপর সম্যক দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

শ্রী মণীন্দ্রনাথ রায়

“বাণী-ভবন”

অন্নবস্ত্রের চিন্তা সব মানুষেরই সর্বপ্রথম চিন্তা। যেখানে এই চিন্তাই জীবনের প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে মানুষের আত্মার অন্ত্যস্ত ধর্মের বিকাশ পদে পদে বাধা পাচ্ছে। তার সমস্ত মন-প্রাণ যখন কেবল “হা অন্ন হা অন্ন” বলে কাদে, তখন জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য শিল্পের অর্চনা করবে কে? বিশেষ করে আমাদের এই বাঙালীর ঘবে আদিম মানুষের এই প্রধান চিন্তাটি তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে এখনও এমনভাবে আধিপত্য করছে যে মনোমন্দিরে আর কোনও দেবতার আসন প্রতিষ্ঠা করবার আর আমাদের অবসর হয় না। অর্থচিন্তাকে তুচ্ছ বলে দূরে সরিয়ে উচ্চ-চিন্তায় মনোনিবেশ কর্তে মানুষকে আমরা যতই উপদেশ দিই না কেন, প্রকৃতিকে ভোলাতে পারব না। প্রকৃতির ক্ষুধা আমরা যতক্ষণ না মেটাচ্ছি ততক্ষণ আর কারও পাওনার কথা শোনবার আমাদের ক্ষমতা নাই। অথচ সভ্য মানুষ আমরা বলি যে দৈহিক অভাব নিবৃত্তির চিন্তাটা মানুষের চিন্তাসৌধের নিম্নতম সোপান মাত্র; এখানেই যদি আমরা আজীবন পড়ে থাকলাম তবে আমাদের মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা কিসে? পশুতে আর মানুষে তবে প্রভেদ কোথায়? বাস্তবিক সে-কথা খুবই সত্য; আজীবন এখানে পড়ে থাকলে আমাদের চলবে না, আমাদের অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু অগ্রসর হব আমরা খানিকটা পথ বাদ দিয়ে ত নয়, সবটা হেঁটে পার হয়ে। অন্নবস্ত্রের চিন্তা যাতে আমাদের সমস্ত মনোবাক্য জুড়ে বসতে না পারে, সেই জন্ত সর্বপ্রথমে তাব পাওনা আমাদের মিটিয়ে দিয়ে ভার-মুক্ত হয়ে পথে বেরোবার অধিকার অর্জন করতে হবে। মুক্তি অর্জন করবার এই যে উপায়, আজ আমাদের জী-

পুরুষ সকলকেই এইটি অবলম্বন করতে হবে। উপার্জনে জীপুরুষের সমান অধিকার আছে কি না, উপার্জনে জীজনোচিত কার্য কি পুরুষোচিত কার্য সে-সব বিচার না করে দেখতে হবে যে উপার্জনের সাহায্যে আমরা আমাদের নিশিদিনের ক্রমদ্রবীভূত অশ্রহীন চোখে জগতের দিকে তাকাবার অধিকার পাব।

জীজাতিকে আমরা অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী কত নামেই অভিহিত করি। কিন্তু চোখের সামনে আমরা কি গৃহহীনা নিরন্ন অন্নপূর্ণার মূর্তি অহরহ দেখছি না? অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী নাম ভারতবাসী বুধাই দেয় নি। জগৎকে লালন করা অন্নদান করা ত নারীজাতিরই কাজ। যতক্ষণ তাঁর ভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকে ততক্ষণ সন্তানকে আশ্রিতকে অন্নদান করায় তাঁর যেমন আনন্দ তেমন আবহুত কিছুতে নয়। কিন্তু ধীর শূন্য ভাণ্ডারে সন্তানের ক্ষুধা মিটাবার জন্ত একমুঠা অন্নও নেই, নিজের দিনাস্তরের আহা রেব জন্ত যিনি পরের দরজায় কাড়ানিনী, অন্নপূর্ণা নামে তাঁকে অভিহিত করার চেয়ে বড় পরিহাস আর কি করা যেতে পারে?

নারীশিক্ষা-সমিতি নারীজাতির সর্বোচ্চ কল্যাণ কামনা করেন। তাঁরা চান বাঙালী মেয়ের এই অন্নপূর্ণা নাম সার্থক করতে। বাঙালী ঘরে ঘবে অন্নপূর্ণার আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে আনন্দে অন্ন বিতরণ করুন, এই তাঁদের ইচ্ছা। তাই গৃহহীনা জগদ্ধাত্রী ও নিরন্ন অন্নপূর্ণাদের কল্যাণ-কামনা এই বাণীভবন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও বলা দরকার যে নারী-মাত্রেই কল্যাণ-কামনা আমাদের উদ্দেশ্য। মানুষের ঘরে অন্ন থাকলেই তার সকল কামনার অবসান হয় না; তার অন্ত অভাব থাকতে পারে। উপার্জনক্ষম মানুষের যে আত্মপ্রসাদ আছে, তার স্বাদ যিনি পেয়েছেন, তিনিই জানেন অবসরকালে সছুপায়ে ঘরে বসেই অর্থ উপার্জন করতে পারলে মানুষের অন্নবস্ত্রের অভাবই যে কেবল দূর হয় তা নয়, তার মনেরও একটা যন্ত অভাব মেটে। ভগবান তাকে যে হাত পা মস্তিষ্ক দিয়েছেন তাব ব্যবহারেব ক্ষেত্র যত প্রসারিত হয়, মনও তত মুক্তি পায়। তৃতীয় আর-একটা জিনিষ এতে লাভ হবে, সেটা

হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক স্বজনী শক্তির সার্থকতা। মানুষ-মানুষের মধ্যেই সৃষ্টি করবার একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা থাকে। এই ইচ্ছার সার্থকতা আমরা জগতের শিল্প সাহিত্য স্থাপত্য বিজ্ঞান দর্শন সব-কিছুর নিদর্শনে মধ্যস্থ দেখতে পাই। শুধু এইখানেই এর পবিসমাপ্তি মনে করলে চলবে না। মাটির ঘরের মেঝেয় পাতা কাঁথা, চালে টাঙানো শিকে, পিড়িতে আঁকা আল্পনা, মাঘের হাতে গড়া পিঠে পরমান্ন সবই সেই এক শক্তির পরিচয়। এই সব ক্ষেত্রেই নানারূপে মানুষ তার সৃষ্টি করবার ক্ষমতাকে সার্থক করতে চায়।

বাঙালীর ঘরের মেঝেবা সচরাচর ঘরের বাইরে বেরোন না। ষাঁরা বাইরে আসতে পাবেন তাঁদের শক্তির ব্যবহার করবার নানী ক্ষেত্র ত তাঁরা পাবেনই; ষাঁরা আসেন না তাঁরাও যাতে গৃহশিল্পের চর্চা করে' অর্থ ও আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারেন, এবং আপন-আপন প্রতিভাকে সার্থক করে' তুলতে পারেন, বাগী-ভবন সেই চেষ্টাও যথাসাধ্য করবেন।

মেঘেদের সর্বাঙ্গীন-কল্যাণ-কামনায় তাঁদের আর্থিক ও মানসিক উন্নতিব জ্ঞাত এই যে ভবনটির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার শুভ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সার্থক হোক, সকলে এই কামনা করুন।

শ্রী শান্তা দেবী

নিউজিল্যান্ডের নারী

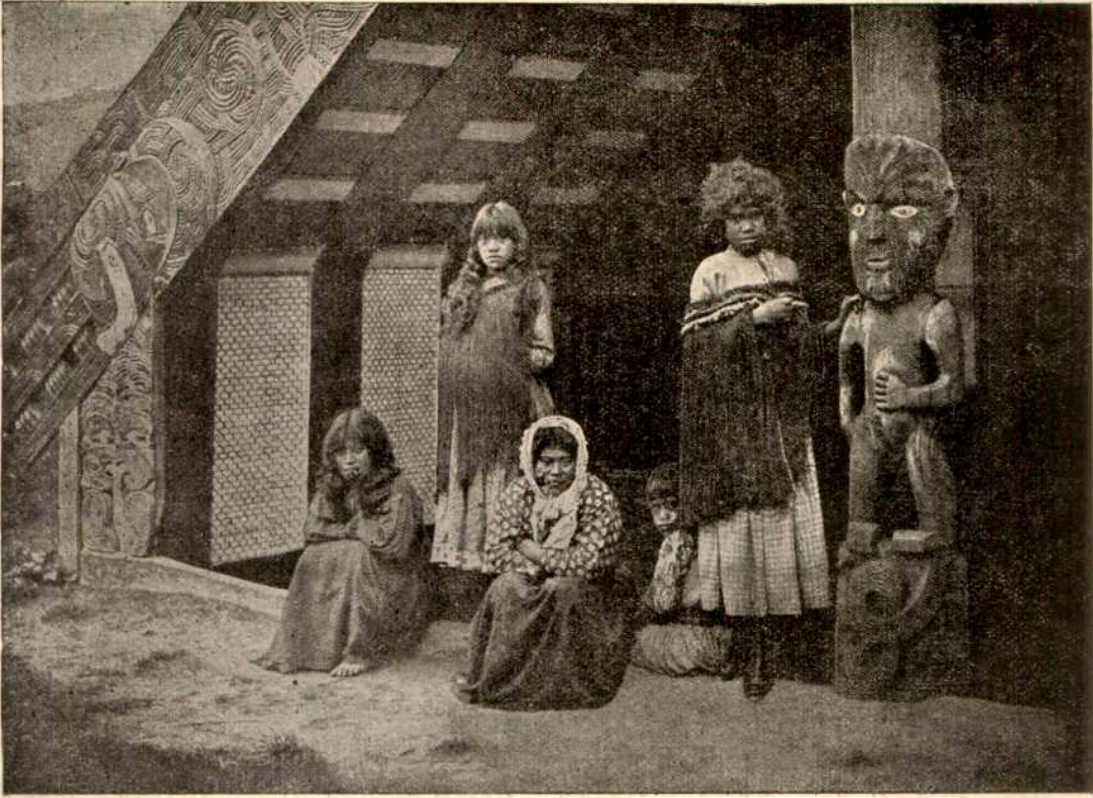
নিউজিল্যান্ডে বর্তমানে যে জাতি বাস করে, তাহা বা মাওরি। শ্বেতাঙ্গ সহবাসের ফলে ইহারা এখন প্রায় পুরামাত্রায় সভ্য হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহাদের পিতা-পিতামহদের আচার-ব্যবহার প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। বিগত কালে পুরুষ এবং নারীর জীবন এমন ভাবে জড়িত ছিল যে কেবল নারীর বিষয় বলিতে হইলে অনেক কিছু বাদ পড়িয়া যায়, এবং বর্ণনা অসম্পূর্ণ হয়। কাজে কাজেই নিউজিল্যান্ডের নারী সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে পুরুষদেরও অনেক কথা বলিতে হয়।

নিউজিল্যান্ডের প্রাচীন অধিবাসীরা পলিনেশিয়া হইতে প্রথম এই দেশে আগমন করে। নিউজিল্যান্ডবাসীরা

মাওরি নামেই বিশেষ ভাবে পরিচিত। পলিনেশিয়ার লোকদের সহিত এই মাওরি জাতির অনেক বিষয়ে আশ্চর্য্য রকম মিল আছে—এক জাতির লোক না হইলে এই মিল থাকা সম্ভবপর হইত না। কিন্তু মূল পলিনেশিয়া জাতির সহিত এই শাখা জাতির এমন কতকগুলি বিশেষ প্রকার অনৈক্য আছে যাহাতে বর্তমানে তাহাদিগকে পলিনেশিয়া জাতি বলিলে ঠিক হইবে না।

কোন সময় যে পলিনেশিয়ার একদল লোক এই দেশে আগমন করে তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। তবে একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অনেক প্রমাণাদিৰ উপর ভব করিয়া স্থির করিয়াছেন যে নিউজিল্যান্ডে ৮৫০ খৃঃ অব্দে পলিনেশিয়াদের প্রথম আগমন ঘটে। এই তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা এক-প্রকার নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে ১২৫০ খৃঃ অব্দ হইতে পলিনেশিয়ার এই দেশে বাস করিতে আরম্ভ করে। ১৩৫০ খৃঃ অব্দে ইহারা নিউজিল্যান্ডে পাকা রকমে বসবাস আরম্ভ কবে। এই সময় ইহারা দলে দলে নৌকায় করিয়া পলিনেশিয়া ত্যাগ করে এবং নিউজিল্যান্ডে পদার্পণ কবে। এই সময় হইতে ইউরোপীয়দের নিউজিল্যান্ডে আগমন পর্যন্ত এই মাওরি জাতি বাহিরের জগতের সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া নিউজিল্যান্ডে বাস করে। এমন কি তাহাদের জন্মভূমি পলিনেশিয়ার সহিতও তাহাদের কোন প্রকার যোগ ছিল না।

মাওরিদের চুল কৌকড়া। পলিনেশিয়াদের অপেক্ষা মাওরিরা বেশী শক্ত এবং পেশীবহুল। পলিনেশিয়ার সর্বাঙ্গের সাহসী এবং বলবান লোকদের বংশধর এই মাওরিরা। পলিনেশিয়া অপেক্ষা নিউজিল্যান্ডের মাটা শক্ত এবং এখানকার আবহাওয়া ভিন্ন প্রকারের। মাওরিদের এইখানে অধিক পরিশ্রম করিয়া চাষবাস করিতে হইত। যুদ্ধবিগ্রহও এখানে কম হইত না। ইহাদের মাওরিদের রক্তলোলুপ লোপ পাইবার অবসর পায় নাই। মাওরিদের ভিতর বংশগৌরব যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। বড় ঘরের নরনারীর চরিত্রে এমন সমস্ত গুণ দেখা যাইত যাহা সভ্যসামাজিক উন্নততম স্তরের লোকদের মধ্যেও অনেক সময় দেখা যায় না।



মাওরি মহিলা—দণ্ডায়মানা ছইজনের গায়ের পোষাক গাছের আঁশ দিয়া তৈয়ারী

মাওরি জাতি সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইতেছে তাহা সমস্তই অতীতের। কারণ বর্তমানে পরকীয় সভ্যতার প্রভাবে তাহাদের পূর্বকালের রীতিনীতি সমস্তই একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। বর্তমান সময়ের প্রায় প্রত্যেক মাওরির মধ্যেই খেতাদরক্ত কিছু না কিছু আছে। তাহাদের প্রাচীন ব্যবসাবাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন কালের নাচিবার ধরণ-ধারণ বদলাইয়াছে। তাহাদের মধ্যে এখনো যেটুকু মাওরি বর্তমান আছে, তাহাও খুব তাড়াতাড়ি বিদেশী সভ্যতার প্রভাবে লুপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। মাওরি পুরুষেরা পার্লামেন্টে সভ্য পাঠাইবার অধিকার লাভ করিয়াছে; নারীরা এখনো এই অধিকার লাভ করে নাই।

মাওরি সমাজে নারীর স্থান খুব উচ্চ এবং সম্মানের ছিল। নারী পুরুষের সমস্ত কাজেই সহায়তা করিত। নাচে গানে, শাসনে ব্যবস্থায়, এমন কি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ

করিবার জন্তও তাহারা পুরুষদের সাহায্য করিত। বড় ঘরের মেয়েদের সমাজে খুব আদর ছিল। তাহারা স্বামীর ধন এবং গৌরব দুইই বৃদ্ধি করিত। কোন সর্দারের পুরুষসন্তান না থাকিলে কন্যা-সন্তান পুরুষ-সন্তানের সমস্ত অধিকার লাভ করিত। সে-ই দলের সর্দার হইত। তাহার মৃত্যুর পর তাহার ছেলে বা মেয়ে সর্দার হইত।

মাওরি নারীদের অন্তঃকরণ স্নেহে পরিপূর্ণ। পুরাকালে স্বামী বা ভ্রাতার মৃত্যু হইলে, মাওরি নারীর আত্মহত্যার কথা শোনা যায়। মাওরি নারীর প্রতিহিংসা গ্রহণের প্রবৃত্তির কথাও শোনা যায়। শোনা যায় অনেক রমণী স্বামীকে জব্দ করিবার জন্ত নিজের শিশুসন্তানকে হত্যা করিত।

মাওরি জাতির মধ্যে “তাপু” বলিয়া একটি বিশেষ অলুষ্ঠানের প্রচলন ছিল। “তাপু”র অর্থ কোন লোক

বা দ্রব্যকে কিছুকালের জন্ত বিশেষভাবে পবিত্র এবং বৈদ্যাতিক শক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া রাখা। যতদিন পর্যন্ত ‘তাপু’ থাকিবে ততদিন অন্য কোন লোক তাহাকে ছুঁতে পারিবে না, ছুঁলেও সেও ‘তাপু’ হইয়া যাইবে। যদি কোন নীচু ঘরের লোক এই তাপু-করা লোকটিকে ছোঁয়, তবে হয় সে মরিয়া যায়, নয় সেও “তাপু” হইয়া যায়। প্রাচীনকালে বড় বড় সর্দারেরা সবাই তাহাদের ধনসম্পত্তি সমেত “তাপু” হইয়া থাকিত। তাহাদের শরীর কিম্বা জিনিষ-পত্র কাহারো ছুঁইবার জো ছিল না—তাহা হইলে মরণ কেহ ঠেকাইতে পারিত না। সাধারণ লোকদের মনে ‘তাপু’ সম্বন্ধে ভয় এত বেশী ছিল যে অনেক সময় ভুল-ক্রমে যদি কেহ কোন তাপু-করা লোকের কিছু স্পর্শ করিয়া ফেলিত এবং কিছু পরে সে যদি তাহার ভুলের কথা জানিতে পারিত, তবে সে মরিয়া যাইবার ভয়েই মরিয়া যাইত। এত বড় ভয়ানক প্রতাপ ছিল “তাপু”র। কাহাকেও “তাপু”-মুক্ত করিতে হইলে একজন বিশেষ পুরোহিত আসিয়া নানা রকম মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া ব্যক্তি বা দ্রব্য বিশেষকে ‘তাপু’-মুক্ত করিত।

পুরোহিতরা ইচ্ছামত যে-কোন ব্যক্তি বা দ্রব্যকে তাপু করিয়া রাখিতে পারিত। শস্য যখন কাঁচা থাকিত তখন তাহা তাপু করা থাকিত। কাঁচা শস্য পাছে কেহ নষ্ট করে সেই ভয়েই এইরূপ করা হইত। শস্য পাকিলে, পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিয়া তাহাকে তাপু-মুক্ত করিলে লোকে সেই শস্য কাটিতে পাবিত। যে-সমস্ত লোক বিশেষভাবে চাষবাসের কাজে, শীকারের কাজে বা মাছ ধরিবার কাজে নিযুক্ত থাকিত, তাহারা সবাই “তাপু” হইয়া থাকিত। তাহারা সেই আরক্ত কাষ্ঠ শেষ না করিয়া এবং পুরোহিত কর্তৃক তাপু-মুক্ত না হইয়া অন্য কোন কাজে যোগ দিতে পারিত না। দেশ-শাসন-কার্যে “তাপু” পদ্ধতি বিশেষ ভাবে কাজে লাগিত। “তাপু” লঙ্ঘন করিবার সাধ্য কাহারো ছিল না। ‘তাপু’-করা ব্যক্তিকে কোন একজন তাপু-না-করা লোক খাবার খাওয়াইয়া দিত। কারণ তাপু-

করা ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলে তাহা তাপু হইয়া যাইবে এবং সেই খাবার মুখে দিলে তাহা প্রাণ-সংহারক হইতেও পারে। অনেক সময় তাপু-করা ব্যক্তি গরুর মত মাটি হইতে মুখে করিয়া খাবার ভুলিয়া খাইত। মোটের উপর এই “তাপু” পদ্ধতি মাগুরি দেশে সকল ক’য়েই নিয়োজিত হইত।

মাগুরি-সমাজে কল্যা-সন্তানের আগমন খুব বেশী আনন্দের হইত না। পুরুষ-সন্তান হইলে মাগুরি সংসারে একটা আনন্দের সাড়া পড়িত। এমন কি অনেক সময় কল্যা বাঁচা অপেক্ষা মরাই ভাল মনে হইত এবং তাহার জন্ত শিশু-কল্যাকে হত্যা করা হইত। যদি তাহাকে হত্যা করা না হইত, তবে তাহাকে এবং নব প্রসূতিকে গ্রামের বাহিরে “পবিত্র” নদীতে চোবান হইত। চোবানর পর কয়েক দিনের জন্ত শিশু-কল্যা এবং তাহার মাতা তাপু হইয়া থাকিত। এই কয়েকদিন মাতা তাহার শিশুকে লইয়া গ্রামের বাহিরে একটা পাতা-দিয়া-ছাওয়া ঝুঁড়ে ঘরে বাস করিত। তাহার পর একটা বিশেষ অস্থান করিয়া শিশুকে এবং তাহার মাতাকে পুরোহিত তাপু-মুক্ত করিতেন। তারপর আর-একবার শিশুর নাম-করণের সময় মাগুরি-গৃহে একটি বিশেষ উৎসব হইত।

জন্মের পরই কল্যাসন্তান নিহত না হইলে বাল্যকালে এবং যৌবনের ২০২১ বৎসর পর্যন্ত বড় স্বখে লালিত হইত। বাবা-মা এবং ঘরের অগ্রাঙ্গ সবাইকার কাছে সে বড় বেশী আদর পাইত। আদরের মাত্রা সময় সময় এত বেশী হইত যে মেয়েরা তাহাতে নষ্ট হইয়াও যাইত। বাল্যকালে এবং কৈশোরে মেয়েরা ছেলের সঙ্গে খেলা করিয়া বেড়াইত। কতকগুলি খেলা আমাদের দেশের লুকোচুরি, কপাটি, ইত্যাদি খেলার মতই ছিল। দু-একটি খেলা আবার বিশেষ সঙ্গীতের তালে তালে খেলা হইত। এই রকম একটি খেলার নাম ছিল “পোয়”। “পুনি-পুনি” খেলাও গান করিতে করিতে খেলা হইত।

সর্দার বংশের এবং অল্প বড় ঘরের মেয়েদের একটু বয়স হইলেই আর তাহারা খেলা-ধুলা করিয়া দিন কাটাইতে পারিত না। একটু বয়স হইলেই তাহাদের উকি পরিতে হইত। পলিনেসিয়ার উকি দেওয়ার প্রণালী

এই—কোন সূচাল অস্ত্র দ্বারা গায়ে চিত্র কাটিয়া তাহাতে এক রকম গাছের রস লাগাইয়া দেওয়া হয়। নিউ-জিল্যান্ডের লোকেরা তাহা করিত না। তাহারা যে প্রথায় উক্তি পরিত তাহা ভয়ানক কষ্টদায়ক। হাড়ের তৈরি এক রকম অস্ত্র দ্বারা (অনেকটা ছুতোরের বাটালির মত দেখিতে), হাতুড়ির সাহায্যে শরীরের মাংস কাটিয়া নানা রকম দাগ এবং ছবি আঁকা হইত। শরীর হইতে কত রক্ত যে পড়িত তাহার ঠিক নাই। গাছের ছালের আঁশ দিয়া তৈরী একরকম কাপড় দিয়া এই রক্ত মুছান হইত। তাহার পর একরকম কাল গুঁড়া সেই-সমস্ত কাটা স্থানে লাগাইয়া দেওয়া হইত। মেয়েরা ঠোটে এবং চিবুকে উক্তি পরিত। উক্তি পরাতে ছেলেরাই বেশী কষ্ট পাইত! উক্তি কাটিবার পূর্বে সেই ব্যক্তিকে তাপু করা হইত এবং উক্তি পরাইবার সময় নানা প্রকার মন্ত্র পাঠ হইত। কখন কখন কোন সর্দারের কন্টার উক্তি পরিবার সময় একজন ক্রীতদাস বা দাসীকে বলি দেওয়া হইত। এক একটি পরিবার বা বংশের একটা বিশেষ ভাবে উক্তি কাটিবার নিয়ম ছিল। উক্তির দাগ দেখিয়া কে কোন বংশের লোক তাহা বলা যাইত।

মেয়ের শিক্ষা মায়ের হাতেই থাকিত। কোন একটি বিশেষ বিষয়ে মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইত। বয়ন-শিক্ষাকে মাওরির একটি পবিত্র কার্য বলিয়া মনে করিত। নিউজিল্যান্ডে এক রকম গাছ জন্মে, তাহার আঁশ সূতার মত সূক্ষ্ম। সেই আঁশ বুনিয়া মাওরি মেয়েরা নানা রকমের বস্ত্র তৈরী করিতে পারে। একবার একজন মাওরি সর্দার ইংলণ্ডে গিয়া এই বিশেষ গাছ দেখিতে না পাইয়া বলে, “হায়! হায়! কেমন করিয়া এই হতভাগ্য দেশে লোক বাস করে।” অতি প্রাচীনকাল হইতে মাওরিদের মধ্যে এই গাছের আঁশ হইতে বস্ত্র বোনার পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। একটি প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে “সর্দারের বাড়ীর লোকেরা এই আঁশের তৈয়ারী এমন বস্ত্র পরিধান করিত, যাহা রেশম অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।”

পুরুষরাও এই বস্ত্র-বয়ন-কার্য শিক্ষা করিত, কিন্তু



উক্তিপরা মাওরি নারী।

তাহারা খুব কম সময়ই বয়ন-কার্যে লাগিয়া থাকিত। ইহা একপ্রকার নারীদেরই কাজ ছিল। শীতকালে বিশেষ গাছ হইতে পাতা তোলা হইত, এবং তাহা চাছিয়া চাছিয়া শিরাগুলিকে বাহির করা হইত। শাঁখ বা বড় ঝিল্লুর খোলা দিয়া পাতা টাছা হইত। তার পর এইগুলিকে স্রোতের জলে ধোয়া হইত এবং আরো পরিষ্কার করিবার জন্ত চাছা হইত। তারপর রৌদ্রে টান্ধাইয়া ইহাদের শুকান হইত। নানা রকম গাছের ছাল এবং পাতা হইতে নানা রকমের বয়নোপযোগী সূতা বাহির করা হইত। আঁশ রং করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ গাছের ছালের রং বাহির করিয়া লাগান হইত। কাল রং করিতে হইলে গাছের পাতার আঁশকে এক প্রকার কাল রঙের কাদায় চোবান হইত। তারপর এই আঁশগুলিকে পায়ের উপর রাখিয়া হাত দিয়া সূতা পাকান হইত। মোটা সূতা করিতে হইলে এই রকম দুইটি আঁশের সূতাকে এক সঙ্গে পাকান হইত।

পুরোহিত বয়ন কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিদিগকে মন্ত্রপুত করিয়া দিত, পাছে তাহাদের কোন প্রকার অনিষ্ট হয়, বা কেহ তাহাদের কোন ক্ষতি করে।

মাগুরি পোষাকের বিশেষ আড়ম্বর ছিল না। মাগুরিরা এই পাতার আশের বোনা দুখানি বস্ত্র (এগুলিকে পাতলা মাদুর বলাও চলে) ব্যবহার করিত। একখানা কোমরে জড়ান থাকিত, আর একখানা গলায় জড়ান থাকিত, তাহা দেখিতে কতকটা আশাদের দেশের অ-সংসারী বাবাজীর আলখাল্লার মত। কোন কাজ করিবার সময় এই গলার বস্ত্র খুলিয়া ফেলা হইত। পুরুষ এবং নারীর পোষাকের মধ্যে প্রভেদ কিছুই ছিল না। পুরুষ তাহার গলার বস্ত্র ডান পাশে কাঁধের উপর বাঁধিত, নারী বাঁধিত বাঁ পাশের কাঁধের উপর। আট বছর বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত বালক-বালিকারা কোন প্রকার বস্ত্র পরিধান করিত না।

মহিলারা চুল খোলা রাখিত। ছোট ছোট বালিকারা কপালের সামনের চুল ঠিক ক্রুর সমান রেখায় কাটিয়া ফেলিত। বড় ঘরের মেয়েরা মাথার দুইপাশে লুইয়া পাখীর লেজ ঝুলাইত।—

মাগুরি মেয়েরা কানে নানা প্রকারের গহনা পরিধান করিত। আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়ের মত তাহারা কান ফুঁড়িয়া এইসব গয়না পরিত। কানের গহনার মধ্যে জেড্ পাথরের গহনা সবচেয়ে দামী এবং আদরের ছিল। তাহার একমাত্র কারণ—এই পাথর কাটিয়া গহনা করিতে অনেক সময় লাগিত। জেড্ পাথর সবচেয়ে শক্ত পাথর। এই পাথর তাহারা অল্প পাথরে ঘসিত বা জেড্ পাথরের ধার দিয়া কাটিত। ষ্ঠেতাঙ্গদের শুভাগমনের পূর্বে মাগুরিরা কোন প্রকারের ধাতুর সহিত পরিচিত ছিল না। অস্ত্রাস্ত্র গহনার মধ্যে নানা প্রকার পাখীর পালক, জন্তুর দাঁত, হাঙ্গরের দাঁত, ফুল, এবং প্রিয়জনের বা স্বামীর দাঁত সারি সারি গাঁথিয়া গলায় ঝোলান হইত।

সবচেয়ে দামী এবং আদরের গহনা ছিল “টিকি”। ইহার অর্থ জেড্ পাথরের তৈরী মাছঘের মুণ্ডমালা। এই মুণ্ডগুলি দেখিতে অতি কুৎসিত। ইহা তৈরী করিবার

আবার বাঁধা পদ্ধতি ছিল, যেমন-তেমন করিয়া তৈয়ারী করিলেই হইত না।

পুরুষেরাই এই ‘টিকি’ বেশী পরিত। তবে মেয়েদের গলাতেও ইহা দেখা যাইত। একটি “টিকি” বংশাঙ্কুরে চলিয়া আসিত। অনেক সময় এই টিকি মানুষের মাথার খুলির একটা দিক ভাঙ্গিয়া তৈরী করা হইত। তবে এই রকম “টিকি” আজকাল নাই বলিলেই হয়।

ষ্ঠেতাঙ্গ-আগমনের পূর্বের মাগুরি-জীবন :—সকাল বেলায় পাহাড়ের উপর হইতে সকলে দল বাঁধিয়া নীচে নামিয়া আসিত। নীচে তাহাদের চাষ-আবাদের জমি ছিল। তাহারা ‘পা’ অর্থাৎ পাহাড়ের উপর কেলা হইতে যুদ্ধের বেশে অবতরণ করিত। এক হাতে বর্শা বা মুগুর, আর এক হাতে চাষবাসের দ্রব্যাদি থাকিত। মেয়েরা পিছনে আসিত। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইবার পূর্বেই, তাহারা আবার পাহাড়ে উঠিত। নারীরা এবং ক্রীতদাসেরা খাণ্ড এবং কাঠের বোঝা লইয়া সামনে থাকিত। যখন চাষের কার্য একপ্রকার বন্ধ থাকিত, তখন তাহারা কোন দূরের দেশে চলিয়া যাইত; সেখানে মাছ ধরিত, শীকার করিত, নানা রকম অস্ত্র নির্মাণ করিত; এই সময় নারীরা বস্ত্র-বয়ন-কার্যে লাগিয়া থাকিত। সকলেই নিদ্রার সময় ছাড়া কোন না কোন কাজ করিত। কাহাকেও অলস বলিলে, তাহাকে বড় অপমান করা হইত।

রান্না-বান্নার কাজ নারীদেরই করিতে হইত। মাগুরিদের প্রধান খাদ্য ছিল মাছ এবং শাক-সবজী। কিন্তু তখনকার দিনে কুকুর ছাড়া কেবল ইঁদুর নিউ-জিল্যান্ডে পাওয়া যাইত। ক্যাপ্টেন কুক প্রথমে এই দেশে শূকর এবং ছাগল আমদানি করেন। ছাগমাংস মাগুরিদের খুবই সখের খাদ্য ছিল। তাহারা সকল প্রকার পাখীর মাংসই ভক্ষণ করিত। কয়েক রকমের পাখীর মধ্যে মৃত আত্মীয়দের আত্মা থাকে বলিয়া তাহারা রক্ষা পাইত। কোন রকমের মাছ তাহাদের খাদ্য-তালিকা হইতে বাদ পড়ে না। কত রকমের শাক-সবজী যে খাইত তাহার বর্ণনা করা যায় না। তাহারা এক রকমের ফার্ণ গাছের গোড়া খাইতে খুবই

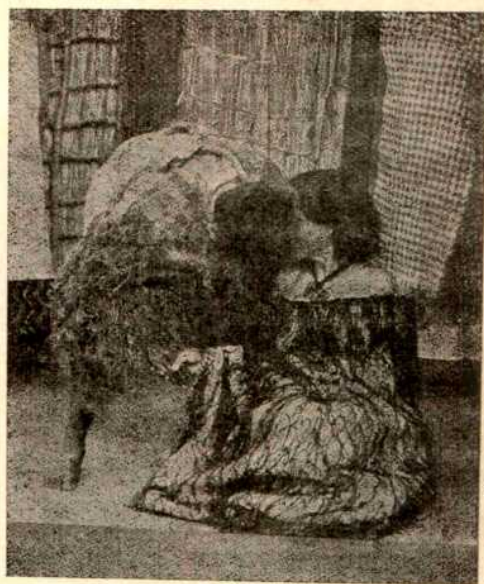
ভাল বাসিত। প্রথম যখন তাহাদের দেশে গম লাগান হয়, তখন তাহারা অপেক্ষা করিতে করিতে অবীর হইয়া শেষে গম গাছ উড়াইয়া তাহার গোড়ায় ফলের সন্ধান করে।

রান্না বাষ্পের সাহায্যেই হইত। গোল করিয়া গর্ত করিয়া তাহাতে আগুন ধরান হইত। তাহার উপর পাথরের কুচি ফেলিয়া দেওয়া হইত। পাথর গরম লাল হইয়া উঠিত। তখন তাহার উপর গাছের পাতা ছড়াইয়া দেওয়া হইত এবং পাতার উপর জল ছিটাইয়া দেওয়া হইত। পাতার উপর খাদ্য রাখিয়া পাতা চাপা দেওয়া হইত। খুব ভাল করিয়া পাতা চাপা দেওয়া হইলে পর বাষ্পের পলায়ন-পথ বন্ধ করিবার জন্ত তাহার উপর মাটি চাপা দেওয়া হইত। লোকে ছবার খাইত, সকালে এবং সন্ধ্যায়। মধ্যে মধ্যে তিনবার খাওয়াও চলিত। রান্না করিতে এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগিত না। রান্না হইতে হইতে মেয়েরা খাইবার জায়গায় পাতার ঝুড়ি রাখিত। এই ঝুড়িতে খাবার রাখিয়া খাওয়া হইত। সন্দের একলা একটা ঝুড়িতে খাইত। অন্যান্য সকলে ৪।৫ জন করিয়া একটা ঝুড়িতে খাইত। সকলে চূপচাপ থাকিয়া কোন কথা না বলিয়া খাইত। মেয়েরা আলাদা খাইত। দাসেরা তাহাদের প্রভুর সামনে বসিয়া খাইত না। অভ্যাগতদের জন্য আলাদা স্থানে খাবার দেওয়া হইত। একসঙ্গে বসিয়া খাইলে অতিথিদের অপমান করা হইত। খাইয়া হাত মুছিবার দরকার হইলে পাশের কুকুরটার লোম বেশ কাজে লাগিত।

মাছ এবং পাখীর মাংস অনেক সময় সমুদ্রের জলে বেশ করিয়া ধুইয়া রৌদ্রে বা আগুনের ধোঁয়ায় শুকাইয়া রাখা হইত। অকালে তাহা খাওয়া হইত। যে-সব স্থানে গরম জলের ঝরণা ছিল, সেখানের লোকে মাংস মাছ সিদ্ধ করিয়াও খাইত। তবে ঝলসাইয়া খাওয়ার পদ্ধতিই বেশী চলিত ছিল।

গরম ঝরণা জলে মাগুরিদের স্নানের খুব সুবিধা হইত। গরম জল পাইলে তাহারা আর অন্য কোথাও স্নান করিতে ভাল বাসিত না।

এক দলের লোক অল্প দলকে দূত পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ



মাগুরি মহিলাদের নাকে নাক ঘসিয়া অভ্যাস—ইহাদের পোষাক গাছের আঁশ হইতে তৈয়ারী।

করিত। নিমন্ত্রিতের দল স্ত্রী পুরুষ ক্রীতদাস সব লইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিত। অবশ্য শত্রুদলকে কেহ নিমন্ত্রণ করিত না। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে একটা এই রকম ভোজের কথা জানা যায়। সেই ভোজে ৮০০০ ঝুড়ি আলু, ৫ লক্ষ মাছ, ৮০০ শূকর এবং ১৫ পিপা তামাক খরচ হয়।

অতিথির দল কেবল প্রবেশ করিবার পূর্বে নারীরা একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়াইয়া গাছের ডাল নাড়িত এবং চীৎকার করিয়া তাহাদের অভিনন্দিত করিত। তাহার পর সকলে খোলা ময়দানে গিয়া একসঙ্গে বসিত। এই থানে “টান্দি” করা হইত। “টান্দি” অর্থাৎ বিলাপ করা। যুদ্ধ হইতে যখন পুরুষরা ফিরিয়া আসিত তখন এই “টান্দি” একটি অবশ্যকর্তব্য ছিল। “টান্দি” করিতে করিতে অনেক সময় মেয়েরা পাথরের টুকরা দিয়া নিজেদের শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিত। “টান্দি” নাকি তাহাদের খুব একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল।

টান্দি শেষ হইলে পর অতিথিরা নাকে নাক ঘসিয়া কোলাকুলি করিত। অতিথিদের খুব আদর করিয়া খাওয়ান হইত। নারীরাই অনেক সময় খাদ্য বিতরণ

করিত। নানা রকমের দামী উপহার অভ্যাগতদের দেওয়া হইত। তবে তাহা একেবারে নিঃস্বার্থ দান হইত না। ভবিষ্যতে প্রতিদানের আশাতেই এত দান করা হইত।

এই রকম ভোজে অনেক সময় মাওরি রাজনৈতিক বৈঠক বসিত। তখন সর্দারেরা দাঁড়াইয়া দাঁড়ি ঢুলাইয়া, নানা প্রকার অল্পভঙ্গী করিয়া লম্বা লম্বা বক্তৃতা করিত। ভোজে নানাপ্রকার নাচ হইত। স্ত্রী পুরুষ একসঙ্গেও নাচিত, তফাতে তফাতেও নাচিত। নাচের পা ফেলার কায়দা আশ্চর্য ছিল। কোন রকমে একটু তাল তুল হইত না। নাচ দেখিতেও খুব ভাল ছিল। নাচের সঙ্গে সঙ্গে গান চলিত। নানা প্রকার অভিনয় নাচের সঙ্গে সঙ্গে চলিত।

সন্ধ্যা বেলায় গ্রামের যুবক-যুবতীরা “হাকা” বা নাচের গান করিতে করিতে নাচিত। নানা রকমের ফুল এবং পালক পরিয়া সকলে দল বাঁধিয়া বসিত, তাহার পর স্ত্রকণ্ঠ এবং স্ত্র-কণ্ঠীরা গান ধরিলে বাকি সকলে নাচ শুরু করিত।

এক সময় মাওরিরা নরখাদক ছিল। তাহারা যুদ্ধে বন্দী হত্যা করিয়া খাইত। ইহাতে শত্রুপক্ষকে নাকি ভয়ানক অপমান করা হইত। মেয়েরা প্রায়ই এই হত্যা ব্যাপারে যোগ দিত না বা নরমাংস ভক্ষণ করিত না। তবে প্রধান-মহিলাকে যোগ দিতেই হইত।

শত্রুপক্ষ যুদ্ধে বিপক্ষদলের কেবল্য গরম পাথর ছুড়িয়া আগুন ধরাইয়া দিতে চেষ্টা করিত। মেয়েরা এই সময় জলপাত্র লইয়া তৈরী থাকিত, কোথাও আগুন ধরিলে জল ঢালিয়া নিবাইয়া দিত। তবে সময় এবং স্ত্রবিধা হইলে নারীদিগকে যুদ্ধস্থান হইতে দূরে পাঠাইয়া দেওয়া হইত।

যুদ্ধে কোন নারীর যদি কোন আত্মীয় নিহত হইত, তবে সে বন্দীদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে হত্যা করিতে পাইত। ইহাতে নিহত ব্যক্তির আত্মার পরম আনন্দ লাভ হইত! একবার একজন সর্দার যুদ্ধে নিহত হয়। তাহার স্ত্রী নিজহাতে ১৬ জন বন্দীর মাথা কাটিয়া ফেলে!

বিবাহ ব্যাপারে পুরোহিতদের কোন হাত ছিল না। বালিকাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। বিবাহিত স্ত্রীলোক

স্বামীর কাছে কোনদিন অবিখ্যাসিনী হইবে না, লোকের এই রকম ধারণা ছিল। সর্দারেরা বহুবিবাহ করিত। লোকে অনেক সময়ে দাসীদের বিবাহ করিত। তাহাতে লজ্জার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু কোন নারী যদি কোন দাসকে বিবাহ করিত তবে তাহা বড়ই লজ্জার কথা হইত। বিবাহে নারীর অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হইত না। অনেক সময় পুরুষ বড়-ঘরে বিবাহ করিয়া বড় হইত। নারীরা যেমন ঘরের মেয়ে সেই ঘরেই বিবাহিত হইত। মেয়েরা নিজের দলের বা জাতির কাহাকেও বিবাহ করিত। অন্য দলে বা জাতির কাহাকে বিবাহ করিতে হইলে উভয় জাতির মত দরকার হইত। ভাবী স্ত্রীর ভ্রাতাদের খুব তোয়াজ করিতে হইত। বিবাহের প্রকৃষ্ট উপায় ছিল, কন্টার ঘর হইতে কন্টাকে ছিনাইয়া লইয়া যাওয়া। অনেক সময় ছিনাইবার প্রয়োজন না থাকিলেও লোক-দেখানি ছিনাইয়া লইয়া যাওয়া হইত। অনেক সময় এই গোলমালে বেচারী কন্টা মারা যাইত। অনেক সময় কন্টার পিতা বিবাহে ইচ্ছুক পাত্রকে কন্টার সঙ্গে আসিয়া বাস করিতে বলিত। বর তখন কন্টার ঘরে আসিয়া কন্টার জাতির লোক হইয়া যাইত। যে কোন উপায়েই হোক কন্টাকে পুরুষ আপন ঘরে একবার লইতে পারিলেই বিবাহ হইয়া যাইত। আর কোন গোলমাল হইত না।

শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

হাউস অফ লর্ডসের প্রথম নারী সভ্য

ভাইকাউন্টস্ রোডা ইংলণ্ডের হাউস অব লর্ডসের প্রথম নারী সভ্য। ইনিই সর্বপ্রথম হাউস অব লর্ডসে পুরুষ ও নারীর সম-অধিকার নীতির প্রতিষ্ঠা করেন। ইংলণ্ডের অনেক সম্পাদকের অভিমতে নারী যদি হাউস অব কমন্সের সভ্য হইতে পারেন, তবে হাউস অব লর্ডসে বসিতে তাঁহাদিগকে কেহ ঠেকাইতে পারিবে না। এখন সর্বসম্মত ২৪ জন পিয়ারেস্ হাউস অব লর্ডসে আসন দাবী করিতে পারেন।

হেমন্ত



ভাইকাক্টেন্স রোণা, ইংলণ্ডের লর্ড সভার প্রথম মহিলা-সভ্য।

মিউনিসিপ্যালিটির মহিলা কমিশনার

মাস্ত্রাজের মিউনিসিপ্যালিটিতে নারী কমিশনার নির্বাচনের প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। ফলে বিচারপতি শ্রীযুক্ত এম ডি দেবদাসের পত্নী মাস্ত্রাজ মিউনিসিপ্যালিটির সর্বপ্রথম নারী কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। এই ব্যবস্থা মাস্ত্রাজের অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটিতেও অনুসৃত হইতেছে। নালেম মিউনিসিপ্যালিটি প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন, যে, সদস্যের পদ পালি হইয়াছে, অতঃপর তাহাতে মহিলাদিগকে মনোনীত করিতে হইবে। তালুক বোর্ডেও মহিলা সভ্য নির্বাচিত হইতেছেন। মাস্ত্রাজ হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত রঘুনাথ রাওয়ের পত্নী চেলারী তালুক বোর্ডের সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। ভারতবর্ষে মাস্ত্রাজ প্রদেশই সর্বাপ্রথম নারীদের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচনের অধিকারও প্রদান করিয়াছে। স্বতরাং দেখা যাইতেছে, নারীদের অধিকার সম্বন্ধে মাস্ত্রাজ ভারতের আর-সকল প্রদেশকে পাছে রাখিয়া ক্রমাগতই আগাইয়া চলিয়াছে। এ সম্বন্ধে সকলের পিছনে পড়িয়া আছে আমাদের এই বাংলা। অথচ এই বাংলা গর্ব করে—শিক্ষায় এবং সহবতে সেই নাকি ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

গিরিডি বালিকা-বিদ্যালয়

গিরিডির উচ্চশ্রেণীর বালিকা-বিদ্যালয়টির এবং তাহার

বোর্ডিংয়ের উন্নতির জন্ত বিশেষ চেষ্টা করা যাইতেছে। সম্প্রতি কুমারী সুনীতি গুপ্ত বি-এ, (এবার বি-টি পরীক্ষা দিয়াছেন) স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ও বোর্ডিংয়ের কত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি এই কাণ্ডের বিশেষ উপযুক্ত পাত্রী। তাঁহার যত্ন, পরিশ্রম, ও জীবনের স্মৃষ্টান্তের জন্ত স্কুল ও বোর্ডিংয়ের ছাত্রীদিগের উন্নতি হইবে বলিয়াই আশা করিতেছি।

সকলেই জানেন, গিরিডি একটি স্বাস্থ্যকর স্থান এবং উহার প্রাকৃতিক দৃশ্যও অত্যন্ত সুন্দর। বর্তমান সময় বাংলা দেশের মেয়েদের স্বাস্থ্যের যেরূপ অবস্থা, সেজন্য গিরিডির ত্রায় উৎকৃষ্ট স্থানে বালিকাদিগের একটি স্কুল ও বোর্ডিং থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখানে শিক্ষয়িত্রীদিগের সঙ্গে ও তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে বালিকাদের বেড়াইবার যথেষ্ট সুবিধা। তন্নিম্ন বাংলা দেশে বালিকা-দিগের যে-সকল উচ্চশ্রেণীর ইংরেজি স্কুল আছে, তাহার অধিকাংশ স্কুল ও বোর্ডিংয়ে ছাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। অনেক সময় বিস্তর চেষ্টা করিয়াও উহাতে বালিকাদিগকে ভর্তি করানো অসম্ভব হইয়া উঠে। এজন্য স্ত্রীলোকদিগের উচ্চশিক্ষার অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই গিরিডির স্কুলটির উন্নতির সহায়তা করা কর্তব্য। এ বৎসর হইতে এ প্রদেশের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাও পূর্বাপেক্ষা সহজ হইয়াছে। আমাদের সহৃদয় বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ অল্পগ্রহপূর্বক তাঁহাদের শিক্ষার উপযুক্ত কল্যাণ ও আত্মীয়দিগকে গিরিডি বোর্ডিংয়ে পাঠাইয়া স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলে স্কুলটির যথেষ্ট সাহায্য করা হয়। বোর্ডিং ফি: মাসিক ১১/ এগার টাকা। স্কুলের বেতন ক্লাস অনুসারে ৫০ আনা হইতে ৩/ টাকা।

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলায় মনসা-পূজা

সর্প-পূজা নানা আকারে সারা জগৎ জুড়িয়াই আছে। বাংলায় অনেক লোক মনে করেন আমরাই বৃষ্টি শ্রাবণ মাসে মনসার ভাসান শুনি এবং নাগ-পঞ্চমীতে নাগ-পূজা করি। কিন্তু আসলে প্রায় সব দেশেই এই প্রথা ছিল বা আছে। মেদিন *Encyclopædia of Religion and Ethics* পুস্তকখানির ১১শ খণ্ডে সর্প-পূজা প্রকরণটি দেখিতেছিলাম। দেখিলাম ইলিয়াট স্মিথের মতে এহঁ সর্পপূজা সব প্রথমে ছিল মিশর দেশে খৃষ্ট-জন্মের ৮০০ বৎসর পূর্বে। তারপর তাহা নানা দেশে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু সাপের পূজা বিশেষ কোনো এক দেশ হইতে অন্য সব দেশে ছড়াইয়াছে ইহা নাও হইতে পারে। সর্প সব দেশেই আশ্চর্য্য জীব। তার অদ্ভুত আকৃতি, তীব্র বিষ, ক্ষিপ্ত গতি, ছয় মাস না খাইয়া অন্ধকারে পড়িয়া থাকা, খোলস ছাড়িয়া নবজীবন লাভ করা, দুইভাগ-করা জিহ্বার লকলকানি, এই সবই সব দেশে বিশ্বয় ও পূজা আদায় করিয়া ছাড়িয়াছে। কাজেই দেখিতে পাই আফ্রিকার আদিম জাতিদের মধ্যে, আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের কাছে, মেলা-নেসিয়ায় (Melanesia), মেক্সিকোতে, চীনে, জাপানে, ক্রীটে, মিসরে, বাবিলোনিয়ায়, হিব্রুভাষী জাতিদের মধ্যে, ফিনিসিয়ায়, গ্রীসে, রোম দেশে, কেল্টিক (Celtic), বাল্টো-স্লাভিক (Balto-Slavic) ও টিউটন জাতিদের মধ্যে সর্বত্রই কোনো না কোনো যুগে, কোনো না কোনো আকারে সর্পজাতি পূজা পাইয়াছে এবং বহুস্থানে নানা আকারে এখনও পাইতেছে। মিশর ও দ্রবিড় জাতির ঐক্য ধারা মানেন তাঁরা ভারতের দক্ষিণে দ্রবিড় দেশে সর্প-পূজার বাহুল্যে বিচারের একটি নূতন ক্ষেত্র পাইবেন।

সর্পের প্রতি শ্রদ্ধা বা পূজার ভাব এক এক দেশে এক এক রকম। কোনো দেশে সাপ মৃত্যুলোকবাসী পিতৃগণের প্রতিনিধি, কারণ সর্প খোলস ছাড়িয়া মৃত্যু জয় করিয়া নবজীবন লাভ করে; কোনো দেশে সর্প ভবিষ্যৎ বংশ ও সন্তান বৃদ্ধির চিহ্ন। এই বাংলা দেশেও লোকের বিশ্বাস আছে যে সর্প স্বপ্নে দেখিলে বংশবৃদ্ধি

হয়। পৃথিবীর বহু স্থানে সন্তান-কামনায় সর্পপূজার পদ্ধতি আছে। গুজরাত, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিমে এই উদ্দেশ্যে কুমারীরা সর্পপূজা করে। কাজেই সন্তান-কামনায় শিবপূজায় যাহারা লিঙ্গ-পূজা অলুষ্ঠানের পরিচয় পাইয়াছেন, সর্প ও শিবের একত্র পূজায় তাঁহাদের বিস্মিত হইবার হেতু নাই। শিবের সঙ্গে নাগের নিত্য যোগ অথচ মনসার সঙ্গে মহাবিরোধ, কাজেই মনসারূপিণী সর্প ও প্রাচীন নাগ এক নহে।

অভিচারাদি কশ্মে, বাহুবিন্যাস, পুরাণ ও ইতিকথায় সর্পের উল্লেখ ও সর্পের নানা ভাবে ব্যবহার ও পূজা এদেশে ও নানা দেশে আছে। নারীধর্ম, সন্ততি-লাভ ও ইন্দ্রিয়-সন্তোগের সঙ্গে সর্পের ধারণা নানা দেশেই ছড়াইয়া আছে। আমাদের দেশেও আছে (তুঃ— অষ্টাদশঃ ভাষা-বারবিলাসিনী-প্রোট-ভূজঙ্গ ইত্যাদি)।

এই ভারতবর্ষেও বিভিন্নপ্রদেশে সর্পপূজার বিভিন্ন নাম ও বিভিন্ন পদ্ধতি। কাশ্মীরে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, পঞ্জাবে, মধ্য ভারতে, কাশী কোশল মগধে, দাক্ষিণাত্যে দ্রবিড় জাতিদের মধ্যে, আসামে খাসিয়া পর্বতে, মণিপুর ও উত্তর-পূর্ব-সীমান্তবাসী জাতিদের মধ্যে সর্বত্রই সর্প-পূজা আছে। নেপাল, ভোটাণ প্রভৃতি পর্বতবাসীদের মধ্যেও আছে। নাগের নামে, তক্ষকের নামে, সর্পের নামে কত মন্দির, পুর ও শিলা এখনও ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া আছে। নাগপত্তন, নাগপুর, তক্ষশিলা, অহিচ্ছত্র, অনন্তপুর ইত্যাদি নামে সে পরিচয় পাই।

কিন্তু বাংলা দেশের যে মনসা পূজা তাহাতে একটু বিশেষত্ব আছে। আমরা তার মূলের একটু সন্ধান লইতে চাই।

কাশীতে ভারতের সব প্রদেশের লোকই আসা-যাওয়া করেন—তাঁরা সবই প্রাচীন ভাবের লোক। তাঁদের আচার ও পদ্ধতি লক্ষ্য করিলে প্রাচীন কালের ভাল পরিচয়ই পাওয়া যায়। আমার জন্মভূমি কাশীতে, তাই ছেলেবেলায় লক্ষ্য করিতাম—সব জাতিই নানা ভাবে

সর্প-পূজা করে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন প্রকারের পূজার সঙ্গে মনসা-পূজার ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিত্ব ?

নব প্রদেশেই দেখিলাম সর্পকে কোনো না কোনো বিশেষ জাতিব মানুষেরা আপনাদের আদি-পুরুষ ও প্রধান দেবতা ও উপাস্ত দেবতা বলিয়া বিশ্বাস কবে। নাগা জাতিব কোনো কোনো শাখা ও অগ্রবাল জাতি নাগেব বংশ বলিয়া খ্যাত। সর্প মারিলে নরহত্যা হয়, এমন কি ব্রাহ্মহত্যাও হয়। তাহাব হেতু বোধ হয় মহা-ভারতের আন্তিক পর্কটি দেখিলে বুঝিতে পারি। বৈদিক যুগের সর্পপূজার উল্লেখ আজ করিব না। বেদেও বিস্তর সর্প-পূজন ধর্মের পরিচয় আছে। নাগরা তখন এক পরাক্রমশালী জাতি। তাহাদের সঙ্গে আর্ঘ্য ও ব্রাহ্মণাদির বিবাহ হইত। জনমেজয় যখন সবম-দন্ত শাপ নিবারণের জন্ত যোগ্য পুরোহিত অন্বেষণ করিতেছেন, তখন তাঁহাব যজ্ঞের পৌবোহিত্যে উপযুক্ত দেখিয়া তিনি ঋতশ্রবা ঋষির পুত্র সোমশ্রবাকে বরণ করিলেন। তাহাতে ঋতশ্রবা বলিলেন—আমার এই পুত্র “সর্পকন্টার গর্ভে-জাত মহাতপস্বী স্বাধ্যায়সম্পন্ন মন্তপোবীর্ঘ্যসমুত” (মহাভারত, আদিপর্কে পৌষ্যপর্ক ১৭ শ্লোক); যদিও এই ক্ষেত্রে ঠিক বিবাহ হয় নাই। কিন্তু জরৎকার ছিলেন মহাতপা উর্করেতা তপস্বী (মহাভারত, আদি, ৪৫ অধ্যায়)। তিনি একদিন এক বিজন বনে তাঁহার পিতামহ শংসিত-ব্রত ঋষিদের দেখিতে পাইলেন যে তাঁহারা জরৎকার সন্ততির অভাবে অধোলোকে ঘাইতে বসিয়াছেন। হেতু জিজ্ঞাসা করিলে অধোগামী পিতামহগণ বলিলেন—“জরৎকার নামে আমাদের এক বংশধর আছে। সে তপশ্রাই কবিবে, বিবাহ করিবে না। তবে আমরা অধোগতি হইতে রক্ষা পাই কেমন করিয়া?” তখন জরৎকার আত্মপরিচয় দিয়া কহিলেন, “আমি অতি দরিদ্র, আমাকে কে কন্টা দিবে?” পিতৃগণের মুখে তিনি শুনিলেন তাঁহাদের রক্ষার জন্ত জরৎকারের বিবাহ ও সন্ততি লাভ করাই চাই। তিনি সর্বদেশ ঘুরিয়াও পাত্রী না পাইয়া, একদিন অরণ্যে মনের দুঃখে উঠেচাশ্বরে কহিলেন, “আমি দরিদ্র। এককাল আমি উগ্র তপশ্রায় রত ছিলাম। আজ পিতৃগণেব নির্দেশে বিবাহ করিতে

চাই। কেহ আমাকে কি কন্টা দিবে?” তখন নাগরাজ বাহুকী স্বীয় ভগিনীকে তাঁহার হস্তে দেন (মহা, আদি, ৪৬ অধ্যায়)। এই বিবাহ বৈধভাবে সম্পন্ন হয়, এবং এই বিবাহই সফল হইয়া জরৎকারের পিতৃগণকে অধোগতি হইতে রক্ষা কবে। এই বিবাহে মহাতপস্বী আন্তিকের জন্ম হয়। তিনি জনমেজয়ের যজ্ঞে গিয়া প্রার্থনা কবেন যে সর্পসজ্ঞের বিরাম হউক। ইহা বলিয়া তিনি আপনাব পরিচয় দেন। আন্তীক বলিলেন যে “মাতুল-বংশ আমাব নাগকুল, তাই তাঁহাদের রক্ষার জন্ত এই বর প্রার্থনা করি।” জনমেজয় কহিলেন, “হে ঋজবরোত্তম, অল্প বর প্রার্থনা করুন” (মহা, আদি, ৪৬ অধ্যায়)। তখন যজ্ঞের বেদ-বিং সদশ্রুগণ সকলে একবাক্যে কহিলেন, “এই ব্রাহ্মণকে নিজ প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত কবিবেন না। এই যজ্ঞ নিবৃত্ত হউক” (৪৬ অধ্যায়)। তখন আন্তীককে নানাবিধ দান দিয়া বাক্স বিদায় করিয়া কহিলেন, “এই যজ্ঞ তো নিবৃত্তই হইল, তবে আমার পুত্রীতে পুনরায় আপনাব আদিত্যে হইবে। আমাব মহাবজ্ঞ অশ্বমেধ করিবার ইচ্ছা আছে। তাহাতে আপনিই সদশ্রু হইবেন” (মহাভারত, ৪৮ অধ্যায়, ১৬ শ্লোক)। নাগকন্টার গর্ভে জন্ম হইলেও ইহার বিপ্রত ও ঋষিও কিছুমাত্র দোষগ্রস্ত হয় নাই।

মহাভারতের আদিপর্কের অন্তর্গত পৌষ্য, পৌলোম ও আন্তীক পর্কগুলি আগাগোড়া নাগদের বৃত্তান্তে পরিপূর্ণ। পৌষ্যপর্কে তক্ষশিলার উল্লেখ আছে (মহাভারত, আদি, পৌষ্য পর্ক, ১৭১ শ্লোক); সেখানে দেখিতে পাই ঋষি শৃঙ্গী রাজা পবীক্ষিতের উপর রুষ্ট হইয়া নাগরাজ তক্ষকে শত্রু-দমনে নিযুক্ত করিতেছেন (মহাভারত, আদিপর্ক, ৪০, ৪২ অধ্যায়)। ব্রাহ্মণ কাশ্রপ পবীক্ষিত রাজার বিপদেব প্রতীকার করিতে আসিতেছিলেন। তাহাতে তক্ষক তাঁহাকে বলিলেন, ব্রাহ্মণেব বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ হইয়া আপনি দাঁড়াইবেন? কাশ্রপ অর্থাভিলাষী ছিলেন। কাজেই তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ দিয়া তক্ষক নিবৃত্ত করিলেন (মহাভারত, আদিপর্ক, ৪৩ অধ্যায়)। ইহাতে দেখিতে পাই ব্রাহ্মণের স্বার্থরক্ষায় নাগরাজ কেমন সচেষ্ট!

সর্পসজ্ঞে ক্ষত্রিয় রাজারা নাগকুল নিষ্পুল কবিতো

চাহিয়াছিলেন, পারেন নাই। নাগকন্তার গর্ভজাত ব্রাহ্মণ তপস্বী তাঁহাদের রক্ষা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, দেবতা ও নাগদের মধ্যে বেশ ঐক্য ও প্রীতির ভাব আছে।

খাণ্ডবদাহনে কৃষ্ণার্জুন তক্ষকাদি নাগগণকে ও দানব প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণীকে নিঃশেষ করিতে চাহেন। তখন দেখিতে পাই তক্ষক ইন্দ্রের সখা (আদিপর্ব, ২২৪ অধ্যায়, ৬ শ্লোক)। নাগেরা (হস্তীরা) শুণ্ডে জল আনিয়া বনকে দাহ হইতে বাঁচাইতে চাহে, কিন্তু পারিয়া উঠে নাই (আদি, ২২৫, ৭৩)। তখনও খাণ্ডবদাহে দেখা যায় ইন্দ্র নাগদেব সহায় (আদিপর্ব, ২২৭, ২৯)। অগ্নি জীবকুলকে ধ্বংস করিতেছেন আর কৃষ্ণার্জুনের অস্ত্রে পলায়মানেরাও রক্ষা পাইতেছে না (মহাভারত, আদিপর্ব, ২২৮ অধ্যায়)। কেবল অরণ্য দধ্ব করিয়া জন-বসতি বৃদ্ধি করিতে হইলে এক্ষণে নিষ্ঠুর হইবার প্রয়োজন ছিল না। কৃষ্ণার্জুন যে নাগলোক ধ্বংস করিয়া অগ্নির তৃপ্তি করিতে চাহেন। কিন্তু তক্ষককে তো মারা গেল না। পূর্বে হইতেই কুরুক্ষেত্রে পালাইয়া তিনি বক্ষা পান। তাঁহার পত্নী আপন পুত্র অশ্বসেনকে রক্ষা করিতে গিয়া স্বয়ং মারা যান। অশ্বসেন অতি কষ্টে অগ্নিদাহ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত ধূমের মধ্য দিয়া অলক্ষিত ভাবে পালায়। বহু অন্বেষণ করিয়াও যখন কৃষ্ণার্জুন তাহাকে পাইলেন না তখন তাহাকে শাপ দিলেন—“তুমি আশ্রয়-হীন হইবে” (মহাভারত, আদিপর্ব, ২২৯ অধ্যায়, ১১ শ্লোক)। সত্যই তো, তাহাদের আশ্রয় ছিল যে বন, তাহা দধ্ব হইলে তাহার আশ্রয় আর রহিল কোথায়? মনসা-পুরাণাদির মতে এই জন্তাই অর্জুন-বংশের সঙ্গে নাগদের চিরশত্রুতা এবং পরীক্ষিতকে নাগেরা বিনষ্ট করে (বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, ১২৮পৃঃ)।

সেই বনেই দেখিতে পাই মন্দপাল নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি বিবাহ ও অপত্য উৎপাদন না করিয়া ক্রুদ্ধ তপ সাধন করিতে গেলেন। ফল হইল না। পিতৃলোকের গতি হইল না। দেবতার বলিলেন, বিবাহ করিয়া অপত্যলাভ কর (মহাভারত, আদিপর্ব, ২৩১ অধ্যায়, ৫—১৪ শ্লোক)। মহর্ষি মন্দপাল সহজে বহু সম্ভূতি চান। তিনি খাণ্ডবে তির্ঘ্যকুয়োনিজাত কন্যা

জ্বিতাকে বিবাহ করিয়া চারিজন ব্রহ্মবাদী পুত্র প্রাপ্ত হন। তখন আবার তিনি লপিতাকে বিবাহ করেন। মন্দপাল অগ্নিকে স্তব করিয়া তাঁর বংশধরেরা খাণ্ডবে অগ্নিদাহে রক্ষা পাইবে এইরূপ অভয় পান (মহাভারত, আদি, ২৩১ অধ্যায়, ২৩—৩৩ শ্লোক)। বনদাহ-কালে ঋষি-পত্নী, পক্ষিকণ্ঠা জ্বিতা যখন তাঁর চারি পুত্র লইয়া বিব্রত তখন তাঁর মনে হইল—“গমন-কালে তো মহর্ষি কহিয়া গিয়াছেন, ‘জ্যেষ্ঠ পুত্র জরিতারি কুল-প্রতিষ্ঠা হইবে। সারিস্বক পিতৃগণের জন্ত কুলবর্দ্ধন করিবে। তৃতীয় পুত্র স্তম্ভমিত্র তপস্বী করিবে। চতুর্থ ভ্রোণ ব্রহ্মবিদগণের শ্রেষ্ঠ হইবে’” (আদি, ২৩২ অধ্যায়, ৯, ১০ শ্লোক)। কিন্তু এখন ইহাদের রক্ষা হয় কিসে? শেষে পুত্রেরা মাতাকে বলিল, “আমরা মারা যাইবই। তবে তুমি আমাদের ত্যাগ করিয়া আত্মবক্ষা কর। এখনও সম্ভানলাভের বয়স তোমার যায় নাই। তোমাব আরও সুন্দর সম্ভূতি হউক” (আদিপর্ব ২৩৩ অধ্যায়, ১৪ শ্লোক)। যাহা হউক পরস্পরবিস্মৃত হইয়াও ইহারা রক্ষা পান। যখন মহর্ষি মন্দপাল স্বীয় পুত্রদেব খুঁজিতে জ্বিতাব কাছে যাইতে চাহেন, তখন লপিতা কহিলেন, “তুমি তো পুত্রের জন্ত যাইতেছ না। তাহা বা সব নাকি ঋষি, তুমি নিজেই এসব কথা বলিয়াছ। তাহা তো তব দধ্ব হইবার ভয় কিছুই নাই। (আদি, ২৩৫ অ, ৮ শ্লোক)। আসল কথা তুমি আমার সপত্নী জরিতাকে ভুলিতে পার নাই। এখন আব আমার প্রতি তোমার স্নেহ নাই। তবে তুমি তারই কাছে যাও যার জন্ত তোমার মন কাঁদে, আমি না হয় অন্যথের মত ঘুরিয়া বেড়াই” (ঐ, ১১-১৩ শ্লোক)।

মন্দপাল কহিলেন, “আমাকে সেকপ মনে কবিও না। আমি দেহ-স্বখ চাই না, অপত্যই আমার একমাত্র লক্ষ্য কাবণ তাহাবাই বংশের আশ্রয় ও পিতৃগণের গতি” (ঐ, ১৪-১৫ শ্লোক)।

মন্দপাল জরিতার কাছে গেলে তাঁহা বা কেহ কথা কহিলেন না। পুত্রদের বিষয় প্রশ্ন করিলে জরিতা কহিলেন—“সে-সব খববে কাজ কি? তরুণী চারুহাসিনী লপিতার কাছেই যাও” (ঐ, ২৫ শ্লোক)। তখন মন্দপাল ঋষি পুত্রগণকে কহিলেন, “আমি অগ্নির সঙ্গে পূর্বেই

তোমাদের কথা বলিয়া রাখিযাছি। তোমাদিগকে বেদবিৎ ঋষি জানিয়া তিনিও দম্ভ করিবেন না বলিযাছেন। তাই এতক্ষণ আমি আসি নাই” (আদিপর্ব, ২ ও ১-৩ শ্লোক)।

কাজেই খাণ্ডবদাহেও মাঝে মাঝে কেহ কেহ রক্ষা পাইয়াছে। তক্ষক ও তার পুত্র স্থান ত্যাগ করিয়া বাঁচিয়া গিয়াছে।

স্বপর্ণ-কন্যার গর্ভে গন্দপানের চারি ঋষিপুত্র ও নাগরাজ তক্ষকের পুত্র অশ্বাসেন রক্ষা পান। ময়দানব শরণাগত হইয়া রক্ষা পায়। কাজেই খাণ্ডবে ছয় জন মাত্র বক্ষা পায় (মহাভারত, আদিপর্ব, ২৩০ অধ্যায়, ৪৫ শ্লোক)। বাহুকি পূর্বেই সমুদ্র চলিয়া গিয়াছিলেন।

এখন এই স্বপর্ণ বা পক্ষীজাতির লোক কাহারো ঠাণ্ডাদেব কন্যার গর্ভে উৎপাদিত ঋষির পুত্রবা বেদবিৎ ঋষি এবং বংশ-প্রতিষ্ঠাতা। অগ্নিও তাহাদের ভয় করেন। ঋষির পিতৃকুল এই সম্ভানের দ্বারা রক্ষা পায়। দ্রৌপদীর বিবাহ-সভায় দেখি মনুষ্যের সঙ্গে নাগ ও স্বপর্ণরাও উপস্থিত আছেন (মহা, আদি, ১৮২, ৭ম শ্লোক)।

এই স্বপর্ণদেব বিষয় আজ বেশী বলিবার কিছু নাই। কারণ আজকার বিষয় ইহা নহে। পুরাণাদিতে ঈহাদের সম্বন্ধে বহু বহু উল্লেখ আছে। তবে খাণ্ডব বনে উভয় দলই বাস করিতেছিল এবং কৃষ্ণার্জুনের হাতে সমান ভাবে মারা পড়িয়াছিল। এখনকার পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের মতে এই-সব পশু—যথা নাগ, পক্ষী প্রভৃতি—পৃথিবীর নানা দেশেই নানা জাতির পবিত্র চিহ্ন (tolem) ছিল। স্বপর্ণজাতিরা তাহাদের মাথাতে পক্ষীর স্তম্ভর পালক ব্যবহার করিত।

আমার মনে হয় স্বপর্ণ ও নাগগণ অনার্য্য পরাক্রান্ত দুইটি জাতি। এইজন্তই ইহাদিগকে দুই সতীনের সম্ভান বলা হইয়াছে। মানবের আদিপুরুষ কশ্যপই ইহাদের জনক, তবে তাঁর জী কল্প নাগমাতা, বিনতা স্বপর্ণমাতা। সূর্যের স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় কল্প বিনতার দলকে দাস্ত্রে পরিণত করেন। ইহার সহিত প্রাচীন আর্য্যদের নিকট হইতে সৌর পূজা গ্রহণের কিছু ইঙ্গিতও থাকিতে পারে। বিনতার সম্ভান জন্মিয়াই এক গজ আহাণ করিল।

এখানে বলা উচিত নাগ অর্থে গজ ও সর্প দুইই। হস্তীর গুঁড়টি সাপেরই মত। আর নাগদের মধ্যেও হস্তীর বংশধর ছিল। উলুপী আপনাকে ঐরাবতের বংশ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

বিনতার পুত্র গরুড় (সূর্যেরই পরিণত রূপ) বিষ্ণুকে স্বীকার করিয়া আপনি তাহার বাহন হন। তাহাতে কল্পবংশীয় নাগের কাছে দাস্ত্র মোচন হয় (মহাভারত, সভাপর্ব, ২য় অধ্যায়)। ইহাতে বেশ মনে হয় আর্য্যদের পূর্বতন সূর্য্য-দেবতাকে গ্রহণ করিয়া নাগরা পরাক্রম-শালী হন (মহাভারত, পৌষ্যপর্ব, ৩ অধ্যায়) ও বিষ্ণুকে গ্রহণ করিয়া স্বপর্ণ অর্থাৎ গরুড়ের দল নাগদের দাস্ত্র হইতে মুক্ত হন। এ বিষয়ে অনেক ভাবিবার কথা আছে। এখন ভাবিবার কথা এই যে অর্জুন কেন নাগবংশের উচ্ছেদ করিতে চান। তিনি নিজেই তো উলুপীকে বিবাহ করেন। এখানে মনে হয় নাগেরাও নানা শ্রেণীতে বিভক্ত (মহাভারত, পৌষ্যপর্ব ৩য়, ৩৬ অধ্যায়, ৬৭ অধ্যায়, ১২৩ অধ্যায়, ইত্যাদি)। যাহারা ইন্দ্রকে মানিয়াছে তাহাদের সঙ্গেই কৃষ্ণার্জুনের বিরোধ। অথচ যে-সব নাগেরা অগ্নিদেবতার সেবা করে তাহাদের সঙ্গে অর্জুনের বিরোধ নাই। ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের বিবোধ আরও নানা স্থলে দেখিতে পাই। গোবর্দ্ধন পর্বতে গোকুলবাসীর ইন্দ্র-পূজা নিষেধ করিয়া কৃষ্ণ মহা অনর্থের সৃষ্টি করেন। ভীষণ বারিপাতে সব যখন নষ্ট হয় তখন গোবর্দ্ধন পর্বত দাবণ করিয়া ইন্দ্রের হাত হইতে কৃষ্ণ গোকুল বক্ষা করেন (শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ২৫ অধ্যায়)। নাগরা অনেকেই ইন্দ্রের শবণাপন্ন। জনমেজয়ের সর্পসঙ্গে নাগরাজ ইন্দ্রের সিংহাসনের নীচে আশ্রয় লইয়াছেন দেখিতে পাই। নাগদের সঙ্গে ক্ষত্রিয়দের মাঝে মাঝে বিরোধ লাগে। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই নাগদের সহায় ও তাহাদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে সংযুক্ত। যদিও দেখিতে পাই পুরুবংশীয় ঋক্ষ প্রভৃতি রাজা, অর্জুন স্বয়ং, কুন্তীর পিতা কুন্তিভোজ রাজা প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজারা নাগদের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে বদ্ধ হইলেও ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই নাগদের সম্বন্ধ বেশী। যেমন পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণেরা শক্তিব প্রয়োজন অনুভব করিয়া শক, কুষাণ, রাজপুত, জাঠ

প্রভৃতি বাহিরেব দলকে সমাজের মধ্যে ক্ষত্রিয় নামে চালাইয়া লইয়াছেন, তেমনি মহাভারতের পূর্বযুগে ক্ষত্রিয় রাজাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্ষত্রিয়দের দমনার্থ নাগদের নিযুক্ত করিয়াছেন। ধনলোভে যদি কোনো ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সহায়তা কবিত্তে চাহিয়াছেন, তবে নাগরাই অর্থ দিয়া তাহাকে ক্ষত্রিয়ের দল হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়াছেন (মহাভারত, আদিপর্ব, ৪৩ অধ্যায়)। ব্রাহ্মণদের দেবতা স্বীকার কবিত্ত নাগরা শক্তিশালী হইয়াছেন। তাই বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতি ইন্দের সেবা করেন। ইন্দের বাহন ঐরাবতও এক নাগেবই নাম মহা, আদিপর্ব, ২১৬ অধ্যায়, ১৮-২০ শ্লোক ও মহাভারত, পৌষ্য পর্ব, ৩ অধ্যায়)। কৃষ্ণ যখন ইন্দ্রপূজার বিবোধী, তখন তিনি ইন্দের শরণাগত নাগদেব রক্ষা করেন নাই। যে কারণে জরাসন্ধ শিশু-পালাদিব সঙ্গে কৃষ্ণের বিরোধ হয়, সেই কারণেই নাগদেব সঙ্গে খাণ্ডববাসিগণের সঙ্গে কৃষ্ণার্জুনের বিরোধ হয়। কৃষ্ণ ইন্দ্র-বিবোধী হইলেও অগ্নির বিবোধী নন। অগ্নি-দেবতার তৃপ্তির জন্তই খাণ্ডবের দাহ হয়। এবং যে নাগ-কন্তা উলুপীকে অর্জুন বিবাহ করেন তাহাব গৃহে পবিত্র অগ্নি বক্ষিত ছিল। সেই অগ্নিতে অর্জুন দৈনিক অগ্নি-হোতাদি করেন (মহাভারত, আদিপর্ব, ২১৬, ১৫)। নানা কারণে বৈদিক দেবতার সহিত কৃষ্ণের বিরোধ হইয়াছিল। যাগযজ্ঞের বৈদিক বাণীকে তিনি গীতায় “পুন্পিতা বাক্” বলিয়াছেন, যাগযজ্ঞের নিন্দা করিয়াছেন এবং খুব সম্ভব এইজন্তই ভৃগুমুনির পদাঘাত লাভ কবিয়াছেন।

মনসা-পূজার প্রসঙ্গে নাগদের কথা বলিতে হয়। কারণ যখন মনসা দেবী বাংলাতে আসিলেন তখন প্রাচীন জরৎকারুপত্নীর সঙ্গে ও বাসুকির ভগ্নীর সঙ্গে তাঁকে এক করা হয়। আবার মনসাব হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত গরুড়ের স্মরণ করা হইত। তাই সূপর্ণদের কথাও বলিলাম। এই নাগ ও সূপর্ণ দুইই অনার্থ জাতি। দুইই পরস্পর বিবাদের রত। নাগের দল ইন্দের শরণাপন্ন। নাগেব দল সূর্য্যের স্বরূপ লইয়া তর্ক করিয়া সূপর্ণের দলকে (অর্থাৎ পক্ষী যাহাদের totem) বশীভূত করিয়া আধিপত্য করেন। আর্ধ্যদের দেবতা গ্রহণ করিয়া নাগরাও

প্রবল হইয়া উঠেন (পৌষ্যপর্ব, ৩য় অধ্যায় ও আন্তীক পর্ব, ২৫ এবং ৩৬ অধ্যায়)।

এই নাগদের হাত হইতে মুক্তি পাইতে গিয়াই সূপর্ণের আর্ধ্যদের নূতন দেবতা বিষ্ণুকে স্বীকার করেন। বিষ্ণু সূর্য্যেরই পববর্তীকপ। তবে ইন্দের পর ইনিই প্রধান হইয়া উঠিলেন। কাজেই বিষ্ণুব নাম হইল “ইন্দ্রা-বরজ্জ”। গরুড় বিষ্ণুর বাহন হইয়া শক্তিশালী—তাই নাগদের সর্প-শাখা ও হস্তী-শাখা দুই দলকেই বশীভূত কবিলেন। পুরাণে আছে গরুড় হস্তীকে খাইলেন ও নাগদের খাইলেন। এই হস্তী ও নাগ দুই দলেব totem অর্থাৎ পবিত্র চিহ্ন। গরুড়ের দলের কাছে হারিয়া নাগেরা বিষ্ণুকে স্বীকার করে এবং গরুড়ের ভয় হইতে রক্ষা পায় (ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ১৬ এবং ১৭ অধ্যায়। দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, ৩০৯ পৃষ্ঠা)।

গরুড়ের ভাড়াই নাগরা সমুদ্রের নীচে আশ্রয় নেয় (আন্তীক পর্ব, ২৫ অধ্যায়, ২৬ অধ্যায়, ২৭ অধ্যায়)। সেখানে অনন্ত ও কালীয় নাগ স্বীয় বক্ষে ও মস্তকে নারায়ণকে গ্রহণ করেন (ভাগবত, ১৬, ১৭, দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, ৩০৭-৩০০ পৃষ্ঠা)।

বিনতানন্দন গরুড় অর্থাৎ পুরাণ-মতে যিনি পক্ষী তিনি বিষ্ণুর বাহন হইয়া শক্তিশালী হইয়া ইন্দের রক্ষিত অমৃত হরণ করিতে গেলেন। ইন্দ্র বজ্র মারিলেন। বজ্র ব্যর্থ হইল। গরুড় একটি পক্ষের পালক উপহার দিয়া বজ্রের মান রাখিলেন (মহাভারত, আন্তীক পর্ব, ৩৩ অধ্যায়)। এসব কথা বেশ চিন্তা করিয়া দেখিবার মত।

মোটকথা খাণ্ডবে নাগকুল ধ্বংস হয় নাই। কাজেই নাগ-পূজাও লোপ হয় নাই। অবশ্য আশ্রয়হীন হইতে হইতে ইহারা দুর্বল হইতে লাগিল। খাণ্ডববন-নাহে ইহাই কৃষ্ণ অর্জুন ও অগ্নির শাপ ছিল (আদি, ২২৯ অধ্যায়, ১১ শ্লোক)। অহিচ্ছত্রও নিশ্চয় সর্পদেরই দেশ ছিল। পরে ভ্রোণ তাহা পান। মহাভারতের প্রথমই আন্তীক পর্ব। তাহাতে আর্ধ্য ও নাগদের বিরোধই চলিয়াছে দেখিতে পাই। সূপর্ণ ও নাগদের সঙ্গে আর্ধ্যদের এমন কি ব্রাহ্মণদেরও বিবাহ হয়। সেই-সব বিবাহের সম্ভাবিতাও ঋষি, ব্রহ্মবিদ ও বেদবিদ্যম পুরোহিত হইয়া থাকেন।

নাগরা দেবতাদের শরণ লন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় রাজাকে নাগদের দিয়া দণ্ড দেওয়াইয়াছেন। রাজা পৌষ ইহাদিগকে ভয় করেন, কারণ ইহারা বন হইতে লুকাইয়া আসিরা কখন কি লইয়া পালায় তার ঠিক নাই (মহাভারত আদি, পৌষ পর্ব, ১১২ শ্লোক, ইত্যাদি ইত্যাদি)।

তারপর নাগেরা খুব ধনী ও তাহাদের স্থানের নাম ভোগবতী। ইক্ষুগ্রন্থের ঐশ্বৰ্য্যের পরিচয় দিতে গিয়া ব্যাস বলিয়াছেন—নাগের দ্বারা ভোগবতী যেমন শোভাপ্রাপ্ত, পঞ্চ পাণ্ডবের দ্বারা ইক্ষুগ্রন্থ সেইরূপ (আদিপর্ব, ২০২, ৫০ শ্লোক), নাগরা পুর-ও মন্দির-নিৰ্মাণপটু। আৰ্য্যরা তেমন নিৰ্মাণপটু ছিলেন না। ময়দানব যে সভানিৰ্মাণ করেন তাতে চূৰ্ণাধনও বোকা বনিয়া যান। তিনিও খাণ্ডববনবাসীদের ও আৰ্য্যদের সহায়তা করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া রক্ষা পান।

গন্ধা বাহিয়া আরও পূৰ্ব মুখে দেশের অর্থাৎ পৃথিবীর অভ্যন্তরে গেলে নাগ-লোক। এইজন্য ভীমকে গন্ধায় ভাসাইলে তিনি নাগলোকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কারণ সেইখানে গন্ধাজলের স্রোত গিয়া শেষ হইয়াছে (মহা, আদিপর্ব, ১২৮, ৫৫)। সেখানে গিয়া বাহুকির সঙ্গে ভীমের পরিচয় হইল। কুন্তীর পিতা কুন্তিভোজ রাজা বাহুকির দৌহিত্র—কাজেই দৌহিত্রের দৌহিত্রকে বাহুকি খুব আদর করিলেন (মহা, আদি, ১২৮, ৬৫), তার পর নাগলোকে জলভ নানা রত্নাদি ভীমকে দিলেন (ঐ, ১২৮, ৬৬)। স্বপ্নদেব তাড়াতেই নাগরা সমুদ্রের দিকে পলায়ন করে (আন্তীক পর্ব, ২৫, ২৬, ২৭ অধ্যায়)। সেখানকার নিষাদেরাও গন্ধার দলের কাছে পরাজিত হয় (আন্তীক পর্ব, ২৮ অধ্যায়)।

নাগদেরই পূর্বে সব রত্নের অধিকার ছিল। এই দেশের সব গুহা ধনের সম্ভান তাঁরাই জানিতেন। তাই আৰ্য্যরা ভারতে আসিয়া যখন সবই অধিকার করিতে লাগিলেন, তখন নাগেরা স্বযোগ পাইলেই তাহা চুরি করিয়া লইত, তবে অশ্বসেনের দ্বায় আশ্রয়হীন হওয়ায় ভোগ করিতে পাইত না। তাই আমাদের দেশে যে ধন হাৰায় তাহাই নাগের কবলে আসিয়াছে বলিয়া লোক

মনে করে। প্রোথিত ধনের কলসীতে নাগেরা বাস করে ও নাগেরা যক্ষের মত সব ধনই আগ্লাইয়া রাখে। এই বিশ্বাস এখনও প্রাকৃত জনের মধ্যে অতি সাধারণ।

অৰ্জুন যখন যুদ্ধিষ্ঠির সহ বিরাজমানা দ্রৌপদীর ঘরে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইলেন তখন তিনি পূর্ব অন্ধী-কার মত দ্বাদশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যত্রত গ্রহণ করিয়া বনে গেলেন। তখন গন্ধার দ্বারে গিয়া অৰ্জুন স্নানে নামিলে নাগকন্তা উলুপী তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। (আদি, ২১৬, ১৩)। নাগকন্তা অৰ্জুনের রূপে মুগ্ধা। সেই নাগরাজ-ভবনে যে অগ্নি ছিল সেই পবিত্র অগ্নিতেই অৰ্জুন যজ্ঞ করিলেন (ঐ, ২১৬, ১৫)। অৰ্জুনও তাঁহাব রূপে মুগ্ধ হইয়াই তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন (ঐ, ২১৬, ১৭)।

উলুপী কহিলেন—আমি ঐরাবতের বংশের কোরব নাগরাজের কন্তা তোমার রূপে মুগ্ধা, আমাকে বিবাহ কর (ঐ, ২১৬, ১৮-২০)। অৰ্জুন কহিলেন—হে জলচারিণী, আমি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছি (ঐ, ২১৬, ২২)। উলুপী তখন চমৎকার যুক্তিতে বুঝিয়া দিলেন যে অৰ্জুন বিবাহ করিতে অধিকারী (ঐ, ২১৬, ২৩, ৩২)। উলুপীকে তিনি বিবাহ করিলেন। উলুপী আবার তাঁহাকে গন্ধাদ্বারে ফিরাইয়া দিয়া গেলেন, বর দিলেন সমস্ত জলচর তোমার বশ হইবে (ঐ, ২১৬, ৩৬), অর্থাৎ সব জলচারী নাগেরা তোমার বশীভূত হইবে। এই জলচারিণী কথাটি উপেক্ষণীয় নহে। নাগেরা বাস্তবিকই জলাশয়ের তীরে, নদীর তীরে বাস করিত, তাহারাই জলের মালিক। বেদেও পাই—নাগেরা জলধারা অবরুদ্ধ করিয়া আৰ্য্যদের মুষ্টিলে কেলিতেছেন। নৌদ্রসাহিত্যেও দেখি ইহারা সব নদীব উপর প্রভুত্ব করেন। ইহারা নৌকাযোগে সর্বত্র গমনা-গমন করিতে পটু ছিলেন। এই কথা পুরাণেও পাই। এবং তাঁহারা সমুদ্রের দ্বীপে গিয়াও বাস করিতেছিলেন। ইহার কারণ পূর্বেই দেখান হইয়াছে। ভারতসমুদ্রের দ্বীপে ইহারা ভারতের পরিচয় বহন করেন। মহাযান লঙ্কাবতাব গ্রন্থে দেখি সমুদ্রদ্বীপে নাগলোকে বৃদ্ধ গেলেন।

উলুপীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া অজ্ঞান হিমালয়ের পার্শ্ব দিয়া অগস্ত্যবট বশিষ্ঠপর্বত প্রভৃতি তীর্থ দেখিয়া অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ দেশ দেখিলেন (আদি, ২১৭ অধ্যায়; ১-২)।

এ তো কেবল মহাভারতের আদিপর্ব হইতে দেখান গেল। এইরূপ সমস্ত পুরাতন ইতিহাস খুঁজিলে নাগদের পরিচয় নানা ভাবেই পাওয়া যায়।

বৌদ্ধসাহিত্যেও নাগদের বহু উল্লেখ আছে। তার মধ্যে মহাবান শাখা হইতে দুই একটি স্থান দেখান যাক। বৌদ্ধ রাজা অশোকের বংশপ্রবর্তক শিশু-নাগ (বিষ্ণুপুরাণ)। মহাবংশ-মতে শিশুনাগ ছাড়া নাগ-দশক নামেও রাজা আছেন (রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র কৃত নেপালের সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য ৭৮ পৃষ্ঠা)। স্বয়ম্ভু-পুরাণ-মতে গোড়রাজ প্রচণ্ডদেব দেবী বীরবতীব ভক্ত ছিলেন। তিনি স্বয়ম্ভু ক্ষেত্রের মহিমা শুনিয়া ভিক্ষু হইয়া শাস্তিকর নাম লন। তিনি ৫টি দেবস্থান প্রতিষ্ঠিত করান। তার পঞ্চমটিব নাম নাগপুরী। নাগ-পুরী বরুণ নাগের অধিষ্ঠিত। সেখানে পঞ্চগব্য দিয়া পূজা করিলে বৃষ্টি লাভ হয় (স্বয়ম্ভু-পুরাণ, ৭ম)।

একবার নেপালে ৭ বৎসর অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ মহামাবী হয়। দুঃখ শাস্তির জন্ত শাস্তিকর অষ্টদল পদ্ম আঁকিয়া অষ্ট নাগকে আহ্বান করেন। নাগেরা আসিলেন। বরুণ নাগ পদ্মের মধ্যস্থলে বসিলেন। তিনি স্বেতবর্ণ, দ্বিভুজ সপ্তকণ। পূর্বদলে নীলবর্ণ অচণ্ড নাগ বসিলেন। দক্ষিণ দলে মৃণালবর্ণ পঞ্চকণাধিত পদ্মক নাগ। পশ্চিম দলে নবকণাধিত কুঙ্কমবর্ণ তক্ষক নাগ। উত্তর দলে সপ্তকণাযুক্ত হরিদ্বর্ণ বাহুকি। দক্ষিণ-পশ্চিম দলে হরিদ্বর্ণ শঙ্খ নাগ। উত্তর-পূর্ব দলে ত্রিকণাধিত স্বেতবর্ণ কুঙ্কনাগ। উত্তর-পূর্বে স্তবর্ণবর্ণ মহাপদ্ম নাগ—সব আসিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব দলের অধিকারিণী নীলবর্ণ কর্কট নাগ আসিলেন না। গন্ধাবতীব দক্ষিণে আধার হ্রদ হইতে শাস্তিকর তাঁহাকে বলপূর্বক আসিতে বাধ্য করিলেন। নাগদের পূজায় প্রচুব বৃষ্টি হইল। এই নাগদেব বক্ত লইয়া শাস্তিকর পদ্মদলানীন নাগদেব চিত্র কবাইয়া নাগপুং বঙ্গা করিলেন। তাহাতে দুর্ভিক্ষ

ও অনাবৃষ্টিব প্রতিবাহ হইল (স্বয়ম্ভু পুরাণ, ৮৮) পূর্ববঙ্গেও প্রবচন আছে—“নম নাগের ঘরে জয়কার হইল”; ইহা বৌদ্ধ-আখ্যান-জাত। (তুঃ—বিজয়গুপ্তদেব পদ্মপুরাণ, ৩০ পৃষ্ঠা, ১০৫ পৃষ্ঠা)।

ভগবান ক্রকুচ্ছন্দ নেপালের বাগমতী নদীর তীর্থ বর্ণনায় বলেন—বাগমতীতে রত্নাজ্ঞ নামে নাগ আছে। কেশবতী নদীব সঙ্গে বাগমতীর সঙ্গমে চিন্তামণি তীর্থ। সেখানে বরুণ নাগ সর্বকামফলপ্রদ। বাগমতী-রত্নবতী সঙ্গমে রামোদক তীর্থ। সেখানে পদ্ম নাগ কাম ও ভোগ পূর্ণ করেন। বাগমতী-চাক্রমতীর সঙ্গমে স্তলক্ষণ তীর্থ। সেখানে পদ্মনাগ সর্বমৌভাগ্যপ্রদ। তার পর দ্বাদশ পুণ্যস্থানের বিবরণে ক্রকুচ্ছন্দ বলেন যে সেখানে নৈমিত্তিক যোগ-জ্ঞান হয়। যোগ বিশেষে অনন্ত হ্রদে অনন্ত নাগের পূজায় ধনলাভ হয় (স্বয়ম্ভু পুরাণ ৫৮)। মহাভারতের বনপর্বে ৮৩ হইতে ৮৫ অধ্যায়ে কথিত নাগ-তীর্থের বর্ণনা আছে।

লঙ্কাবতারের মতে বৃদ্ধ মহাসমুদ্রে নাগদের রাজ-ধানীতে যান, তার পর লঙ্কায় মলয় পর্বতে যান। রাবণ তাঁর অর্চনা করেন।

কাশ্মীর, চাম্বা প্রভৃতি হিমালয় প্রদেশে অতি প্রাচীন নাগপূজা দেখিয়াছি, তাহাতে শিবের সঙ্গে কোনো বিরোধই নাই। সে-সব স্থলে নাগেরা জলধাবা বা জলাশয়ের বক্ষক। বেদেও জলপ্রবাহের উপর নাগেব হাত আছে দেখিতে পাই। জলেব গতিই সর্পের মত। বৃজও সর্পেরই স্বরূপ।

কিন্তু মনসা নামে যে নাগদেবতার নূতন রূপ বাংলা-দেশে আসিল তাহার মূল কোথায়? ইহা নূতন, কারণ মনসার পূর্ববর্তী শিব প্রভৃতি দেবতার পূজার সঙ্গে ইহাব ভয়ঙ্কর বিরোধ।

বাংলাদেশের মনসা-পূজাব এই আত্মীক স্তরটি সব নীচেব স্তব। কারণ আমাদের মনসার প্রণাম-মন্ত্রটি এই—“তুমি আস্তিক মূনির মাতা, বাহুকি নাগের ভগিনী, জগৎকার মূনির পত্নী, তোমাকে নমস্কার।” কিন্তু এই প্রাচীন নাগপূর্বের কথা লইয়া মনসা ও চাঁদসদাগবেব বিবাদ ও শিবপূজাব সঙ্গে নাগপূজার

এত বিরোধ হইতে পাবে না। এই পরের অংশটুকু নিশ্চয়ই অন্তর্ভুক্ত হইতে আসিয়াছে।

Ethnological Survey Central Provinces এ দেখিতে পাই যে মধ্য ভারতেও সর্পের ওষাকে বাইগা বলে—ইহারা বাংলার বেদে ও পূর্ববঙ্গের বাইদার মত। সেখানেও পান-সতার কৃষি যারা কবে তারা “বারই”। তারা সর্প-পূজা করে। সিদ্ধুদেশের ও কচ্ছের লোকেরা বিষবী পূজা করে—ইহা বাংলাদেশের বিষহরী। বাংলা প্রাচীন কোনো কোনো কাব্যে বিষবী রূপও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলাদেশের মনসা-পূজার সঙ্গে ইহাদের পূজার মিল তত নাই যত আছে দ্রবিড়দের সর্প-পূজার সঙ্গে।

কাশীতে বাল্যকালে দেখিতাম মালাবারের লোকেরা সর্প-পূজাতে আলপনা আঁকিয়া পূজা করিত। বাংলা দেশেরই মত পঞ্চবর্ণ গুড়িকায়, তুষপোড়া; হরিদ্রা-চূর্ণ, বিষ্ণপত্র গুঁড়া, কুসুম-ফুলের গুঁড়া ও চালের গুঁড়া দিয়া বাংলাদেশের মতই আলপনা করিত। (দ্রষ্টব্য Thurston, Epigraphic Notes on Southern India, 290 page.)

বাংলার মত সে দেশেও বিশ্বাস আছে ওঝা মন্ত্র পড়িয়া সাপকে টানিয়া আনিয়া বিষ চুষাইয়া বাহির করা হইতে পারে (ঐ, ২৮৫ পৃষ্ঠা)।

মহীশূবে দেবীরা “মরী” নামে খ্যাত। তাঁদের মধ্যে একজন আছেন বিশাল দেবী। নামটা আমাদের বাঙালির কাছাকাছি। আমাদের দেশের মারীভয় কি দেবীদের প্রকোপকে বুঝায় না? সেখানে মরী অর্থই দেবী।

বানান্ডা ও তেলেগু প্রদেশের পূজা-পদ্ধতি অনেকটা মেলে। কানাড়াতে যেমন বিশালদেবী আছেন, তেমনি “মনে মাক্ষী” দেবী আছেন। ইনি নাগদেবী। বঙ্গীক-স্তূপেই প্রায় জাতি-সাপ থাকে। তাই বঙ্গীক-স্তূপেই কানাড়াতে ও তেলেগুদেশে সাপের পূজা হয়। বৎসরে একবার মাত্র “মনে মাক্ষীব” পূজা। বিশালদেবীর পূজার সঙ্গে এই মাক্ষীব পূজা জড়িত। এই “মাক্ষী” দেবীকে সেখানে “মক্ষাম্মা” বা “মন্চা অম্মা” অর্থাৎ

মন্চা মাতা বলে। ইহাও “চ”কে প্রায় “স”এর মতন উচ্চারণ করে। কাজেই “মন্সা অম্মা” মন্সা মাতা গিয়া দাঁড়াষ। বাল্যকাল হইতেই এই কথাটি জানি। তবু কোনো পুস্তকে পাই নাই বলিয়া এই বিষয়টি লিখি নাই। কেবল নানা পুস্তকে খোঁজ করিতেছিলাম। সেদিন শ্রীযুত Henry Whitehead রচিত “The Religious Life of India” গ্রন্থের ৮৫—৮৭ পৃষ্ঠায় “মনে মন্চি” বা “মন্চা অম্মার” বিষয় লিখিত হইয়াছে দেখিলাম। বিশাল দেবীর সঙ্গেই ইহার সম্বন্ধ, আব ইনি সর্পেরই দেবতা।

এখন কথা—ঐ দেশ হইতে মন্সা পূজা আসে কেন? একথাও বহুকাল হইতেই হয়তো অনেকের মনে মনে আছে, প্রকাশ করিয়া বলা হয় নাই। সেন রাজ্যবাণে দক্ষিণ হইতে আসিয়াছেন, বহু কাল হইতেই তাহার প্রমাণ দিন দিন বাহির হইতেছিল। অনেকের সঙ্গে এ বিষয়ে মুখে কথাবার্তা বলিয়াছি, তবে কখনও লিখি নাই। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহা সম্বন্ধে কবিতাছিলেন; তাঁর প্রশ্ন হইল—মুক্তবোধ পাণিনিব গ্রাম বৈজ্ঞানিক বা কাতকের গ্রাম সবল নয়। তবে সুদূর দক্ষিণের এই পুঁথি বাংলাতে আসিল কেন? সেন বংশীয় রাজাদের জাতিটা ঠিক বাংলা দেশে কেন ঠাণ্ড হইতেছে না। এমন সময় বাহির হইল যে সামন্ত সেন কর্ণাট রাজবংশ হইতে আসিয়াছেন। Epigraphic প্রমাণে বাহির হইল দক্ষিণ হইতে আগমন। শ্রীযুক্ত বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ে অনেক প্রমাণাদি দিয়া বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। তার পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় দেখাইলেন বল্লাল নামে একটি পুর্বোহিত শ্রেণী দক্ষিণে ছিল। তার পর ভিন্সেন্ট স্মিথ তাঁর ভারতের ইতিহাসে বনুতন গ্রন্থে সেন রাজাদের পবিত্র আরও স্পষ্ট কবিতা দিয়া কহিলেন যে ইহাও দক্ষিণ হইতে আগত ব্রাহ্মণ। সেদিন দেখিলাম অব্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার সেন রাজাদের বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে এই বিষয়টির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। তিনি বলেন সেন বংশীয়বা কর্ণাটের জৈন আচার্য সম্প্রদায়।

ক্রমশঃ আরও বেশী প্রমাণ সংগ্রহ হইতে থাকিবে, কারণ আরও অনেক প্রমাণ আছে। সেখান হইতে দেব দেবী ও পূজা-পদ্ধতি আসা খুবই স্বাভাবিক।

আরও অনেক প্রমাণ মিলিবার সূত্র আছে। বাংলা দেশের শিব-পূজাতে হিমালয়ের শিবও আছেন, দক্ষিণ দেশেব শিবও আছেন। দেবীর মধ্যে উত্তরের দেবী ও শক্তি আছেন, দক্ষিণ দেশের গ্রাম-দেবীও আছেন। বাংলা দেশে প্রচলিত বহু তন্ত্র রাবণ-প্রোক্ত। রমায়ন ও চিকিৎসা গ্রন্থের তন্ত্রাংশগুলি রাবণ-প্রোক্ত ও দক্ষিণ-বিদ্যা বলিয়া খ্যাত। আমাদের মঙ্গলকাব্যেব গল্পগুলিও সব যোগ দক্ষিণ দেশের সঙ্গে। শ্রীমন্ত গেলেন দক্ষিণে সিংহলে। ধনপতি গেলেন সিংহলে। কমলে কামিনী দর্শন দক্ষিণে। বিদ্যা-সুন্দরেব সুন্দর কাঞ্চীপুর হইতে আসিলেন; তাঁর চোর-পঞ্চাশং চোল কবির পঞ্চাশটি স্তব শ্লোক। রাঘবমঙ্গল শীতলামঙ্গল ও মনসামঙ্গলেও দক্ষিণের সম্পর্ক প্রবল। আমাদের গল্পগুলি বরাবর কলিক, দ্রবিড় বাহিয়া সিংহল তক্ গিয়াছে। গঙ্গা বাহিয়া বড় যায় নাই। এসব দেখিবার মত, ভাবিবার মত বিষয়।

সমস্ত উত্তর ভারতের মেয়েদের আঁচল ডান কাঁধেব উপর ফেলা হয়। তাগিল তেলেগু প্রভৃতি দেশেব মেয়েদের আঁচল বাম কাঁধের উপর ফেলা হয়। বাংলা দেশের নারীরা উত্তর ভাবতে থাকিয়াও উত্তর ভারতের স্ত্রীদের মত আঁচল ডানদিকে ফেলেন না, বাঁ কাঁধে ফেলেন। ইহা সামান্ত কথা নয়। বেশভূষাতেও অঙ্গ দেশের নারীর সঙ্গে বাংলার নারীর বেশী যোগ। উভয়েই জামা পরিতে অভ্যস্ত নহেন এবং দেহ প্রায় অনাবৃতই থাকে। উত্তর ভারতের নারীও এই রীতি নয়। প্রাচীন সংস্কৃত কবিরাজ অঙ্গ, নারীর আবরণহীনতার কথা বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলায় নারীদেব বোঁপা দক্ষিণের প্রণালীতেই বাঁধা (দ্বিজ বংশীদাস—পদ্মাপুবাণ, ২৮২ পৃষ্ঠা)।

পুরুষের বেশেও দেখি উভয় দেশেই না আছে পাগড়ী, না আছে জুতা। অবশ্য সভ্যতার সংস্পর্শে উভয় দেশেই কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তবে প্রাকৃত অবস্থাটা একরূপই।

চোল ও কাঁশীর সঙ্গে সানাই উত্তর ভারতে কোথাও নাই, অথচ তৈলঙ্গ তামিল দেশে ইহাই জাতীয় বাজনা। কাঁশীতে বাংলা দেশেব “চোল ও সানাই” বাদ্য নাই। মাদ্রাজ দেশের নাটকোটের শ্রেষ্ঠীদের নিত্য পূজা যখন রাজিতে বিশ্বনাথ-মন্দিরে যায় তখন সে বাজনা শুনিয়া বাজালীর কান জুড়ায়। উত্তর ভারতের সানাইর খুব চমৎকার একটি কেমন মুক্ সুর। কিন্তু বাংলায় সানাইর ধরণ তৈলঙ্গেব সানাইর মত। তাই বাংলায় সানাইর আওয়াজকেও সে দেশে তেলেঙ্গা আওয়াজ বলে (দ্রষ্টব্য দ্বিজ বংশীদাস—পদ্মাপুবাণ, ২৭৪ পৃষ্ঠা)। এইরূপ যে দিক দিয়া দেখা যায় দেখিতে পাই বাংলার সঙ্গে দক্ষিণের অতি ঘনিষ্ঠ যোগ।

তারপর মনসার সঙ্গে শিবের ঝগড়া ও লখিন্দরের লোহাব বাসরের মত গল্প দ্রবিড় দেশীয় মনসাপুজকদের কাছে কাঁশীতে শুনিয়াছি, খোঁজ করিলে মিলিবে। বিশপ হোয়াইটহেডের গ্রন্থেও একটি গল্প আছে।

বিশপ মহাশয় বলেন যে তৈলঙ্গ উপকূলে এক পূজারীর কাছে এক প্রাচীন তালপাতার পুঁথী পান। তাতে দেবী অম্মাবরু বা অম্মাম্মার গল্প আছে। তাহাতে আছে—শিব-সৃষ্টির, ব্রাহ্মণ-সৃষ্টির, জন ও জ্যোতি ও যুগ সৃষ্টির পূর্বে দেবী অম্মাবরু ছিলেন। তিনি তিনটি অণ্ড প্রসব করিলেন। প্রথমটি নষ্ট হইল; দ্বিতীয়টি বায়ুতে পূর্ণ (বাংলাতে বাওয়া ডিম—বার্থ ডিম); তৃতীয়টিতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হইলেন, পৃথিবী অন্তরীক্ষ হইল। দেবী দেবতা তিনটিকে পালন করিয়া তিনটি পুর তাঁদের দিলেন। দেবী নিজের পুর তামা পিতল সোনা দিয়া বেষ্টিত করিলেন। তাতে ধোঁপা নাপিত কুস্তকার বাস করিল।

দেবী শুনিলেন যে তিন রাজা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাঁর পূজায় অবহেলা করিতেছেন। বিশেষ, শিব তাঁকে অবজ্ঞা করায় তাঁর ক্রোধেব সীমা রহিল না। তাব উপর শিবের আদেশে তাঁর ভৃত্য অম্মাবরুর নগরে গিয়া আবার তাঁকে গালি দেন। দেবী শুনিয়া আগুন হইলেন। তিনি এক হাতে যুগ, এক হাতে শঙ্খ, এক হাতে ডিঙিম ও নাগের উপবীত গলায় দিয়া এক সভা ডাকাইয়া বলিলেন

যে তাঁর অপমান হইয়াছে। তখন তিনি শূগাল (শিবা) বাহনে চড়িয়া শিবপুরে চলিলেন। অম্বাবরু নিজে এক দুর্গ সৃষ্টি করিয়া তাহা পরিখাবেষ্টিত ও শঙ্খকণ্টকিত ও এক শত শক্তিদেবী দ্বারা রক্ষিত করিয়া দ্বাদশকণায়ুক্ত নাগকে পুরীবেষ্টন করাইয়া রাখিলেন। নাগ নগর-তোরণের উপর বিষ-ফুৎকার করিতে লাগিল। অম্বাবরু সৃষ্টি তোলপাড় কবিয়া জগৎ চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের ও সাতরাজার মাথা কাটা গেল ও আবার ছোড়া দেওয়া হইল। রাজারা নিজেবা কাটাকাটি কবিয়া মরিতে বসিল।

কিছুদিন যায়। আবার নম্বরাজা অম্বাবরুর পূজা ছাড়িয়া তিলক ধারণ করিল। দেবী দেবগিবিপুরে চলিলেন। গ্রহরী বাধা দেয়। অম্বাবরু ফলেব পসবা-ধারিণী হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি সকলকে নিদ্রায় অচেতন করিলেন। তখন তিনি পসরা লইয়া হাঁকিলেন—“হে পূর্বপাড়ার শূদ্রা ভয়ীগণ, ও পশ্চিম পাড়ার ব্রাহ্মণ ভয়ীগণ, দক্ষিণ পাড়ার কাম্মা ভয়ীগণ, ফল চাই? অপূর্ণ ইহার শক্তি।” গ্রহরী আসিয়া তাঁকে বেত মাবিল। তিনি পসরা মাটিতে ফেলিতেই ভূমিকম্প হইল। তখন তিনি শৈব লিঙ্গায়েৎ (লিঙ্গপূজক) মূর্তি ধরিয়া ভয় মাখিবা শঙ্খঘণ্টা বাজাইয়া “নমঃ শিবাঃ” বলিতে বলিতে পুরীতে প্রবেশ করিলেন। তারপর অনেক কথা। অবশেষে শুকপক্ষী হইয়া তিনি নগরের তোরণের উপর বসিলেন। নবজন শিবপূজক শিবপূজা করিতেছিলেন। হাতের শিব তপ্ত আগুনপ্রায় হইয়া উঠিল। শৈবেরা বলিলেন—“তোমার পুরী দগ্ধ হইতে চলিল, হে শিব, আমাদের ছাড়িয়া দাও, আমরা ঘরে ফিবিব। ঢের হইয়াছে, তোমার পূজা করিবা আর ফল নাই। এখন মহা বিপদ উপস্থিত।” শিব গ্রহরীদের বলিলেন—“বাহিরের কেহ কি আসিয়াছে?” গ্রহরীরা বলিল—“এক শিবভক্ত নারী আসিয়াছে মাত্র।” শিব এক প্রমথকে বলিলেন—“তাঁকে বাহিব কর।” দেবী অনেক কষ্টে ধরা পড়িলেন। শিব তাঁকে তপ্ত দণ্ডে বাধিয়া মারিতে গেলে দণ্ড শীতল হইল। নবজন শৈব আঘাত করিতে গেলে তাহাদেব হাত স্তম্ভিত হইল। দেবীকে দলিতে গিয়া হস্তী স্তম্ভিত হইল। তপ্ত

খোলায় দেবীকে ভাস্কিতে গেলে খোলা জুড়াইয়া গেল। দেবী প্রচণ্ড হইয়া শুকমূর্তি ধরিয়া কহিলেন—“হে শিব, আমার শক্তি বুঝাইয়া ছাড়িব। হে রাজা ও রাজপুত্রেরা, আমাকে পূজা করিবে কি?” রাজা ও রাজপুত্রেরা কহিলেন—“হে অম্বাবরু, আমরা জীলোক দেবতা পূজা করিব না। নারীদেবতাকে হাত তুলিয়া প্রণাম করিতে পারিব না। ‘নমঃ শিবাঃ’ ছাড়া অন্য নমস্কার উচ্চারণ করিব না। তারপর তুমি আবার দেবী নাকি?” দেবী তাঁদেব শাসাইলেন, রাজারা ভয় পাইলেন না। দেবী ক্রোধে কহিলেন পুং ধ্বংস করিবেন। শিব কহিলেন—“অম্বাবরু যা খুসী করুন, তাঁকে দেবী বলিয়া পূজা কবা হইবে না।” তখন অম্বাবরু ঘোর নির্ধ্যাতন শুরু করিলেন। নানা দুর্নিমিত্ত রোগ বিপৎ সব উপস্থিত হইল, সব ধ্বংস হইতে লাগিল, জল ও উত্তান শুকাইল, ঝড় চলিল, গাড়ী গাড়ী মৃতদেহ বহিয়া নেওয়া কঠিন হইল। তখন নম্বরাজা হুঃখে কষ্টে শিবকে অভিসম্পাত কবিলেন—“তোমার জটার গন্ধা রক্তধারা হউক, পাত্র ফাটুক, মালা ছিঁড়ুক”, ইত্যাদি। শিব ভয় পাইলেন না, তিনি সকলকে আবাব প্রাণ দিলেন। তখন অম্বাবরু দেবগিরিতে ফুল বেচিতে গেলেন। রাজারে মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন “সোনাব ওজনে ফুল বেচিব।” রাজারা শিবপূজার জন্ত অম্বাবরুর পুরীতে সেই মহার্ঘ ফুল চুরি করিতে গেলেন। অম্বাবরু তখনি রাজাদিগকে ধরিয়া শূলে পুতিয়া মারিলেন। শক্ররা পরাজিত হইল। (Village Gods of South India, pp. 124-137.)

এই তো সেই পুঁথির গল্প। ইহাতে মনসা ও শিবের ঝগড়ার মত কথা আগাগোড়া পাই। শৈব রাজারা চান্দসদাগরেরই মত। উত্তর-ভারতে বাংলায় বাহিরে এরূপ গল্প শুনি নাই।

মালাবার-উপকূলের দিকে প্রতি বাড়ীর একটি অংশ নাগের বাসস্থল বলিয়া পবিত্র রাখা হয়। সেই স্থানটি খুবই স্তম্ভরূপে গাছপালায় ঢাকিয়া স্থলী কবিয়া রাখিতে হয়। এক শ্রেণীর নম্বজি ব্রাহ্মণ নাগ-পূজাব বিশেষ পুরোহিত। তাঁরা ছাড়া সে নাগ-বাস-স্থানে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। (Ethno-

graphical Notes on Southern India—Thurston, p. ২৪৭.)

পূর্ববঙ্গেও প্রায় প্রতি প্রাচীন ধরণের বাড়ীতে এইরূপ কয়েকটি গাছ লইয়া মনসা-খোলা রাখার রীতি আছে। খোলা অর্থ যেখানে জ্বলা গাছ কাটিয়া একটু মুক্তজায়গা করা হইয়াছে, অথচ বনস্পতির ছায়া বেশ আছে। বরিশাল, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তর একরূপ মনসা-খোলা আছে। তাবপর বাংলায় চাঁদসদাগরের মুখে মনসাব নাম (অবশ্য অবজ্ঞার অর্থে) দেখিতে পাই “চেংমুড়ী”। চাঁদসদাগর “চেংমুড়ী কানী” ছাড়া মনসাকে বড় অন্ত নামে অভিহিতই করেন নাই। সেদিন প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় বনৌষধির নামের নানা দেশীয় প্রতিশব্দ খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ দেখিলাম মনসা-গাছেরই তেলঙ্গা নাম “চেংমুড়” (ভাবপ্রকাশ, ভাবমিশ্র বিরচিত, কলুটোলা সংস্করণ, পূর্ব খণ্ড, প্রথম ভাগ,— গুড়ুচাদি বর্গ, ৭৫, ৭৬ শ্লোক, অল্পবাদ টীকা) (দেবেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ সেনের দ্রব্যগুণ ১৬৪ পৃষ্ঠা)। শ্রেণী বর্তমান অভিধানে আছে “চেংমুড়” বা “জেংমুড়” শব্দ। এই শব্দটি পাইয়া আমার ধোঁকা আরও অনেকটা কাটিয়া গেল। মনসা নাম পূর্বেই পাইয়াছিলাম—“মন্চা অম্মা” বা “মনসা অম্মা”, অর্থাৎ মনসা মাতা। শিব ও মনসার ঝগড়ার গল্প পাইলাম। পূজার পদ্ধতির ঐক্য পাইলাম। মনসা-খোলা রাখার নিয়মের সাম্য পাইলাম। মনসা-গাছ বাহাতে মনসা দেবীর পূজা হয় তাহাব নামটিও পাইলাম “চেংমুড়” বা “চেংমুড়ী”।

বাংলাতে “চেংমুড়ী” কথাটির মানে হয় না। তখন সকলে মনে করিলেন “চ্যাং” অর্থাৎ “লেঠা” মাছের মত মাথা ঘর সেই মনসা দেবী। বাংলার মনসা-ভাসান-লেখকরাও তখন দক্ষিণ হইতে এই পূজার আসিবার ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন মনসারই নাম “চেংমুড়” পাইয়া আগাগোড়া সবটা স্বসঙ্গত হইয়া গেল।

আবার তা ছাড়া চাঁদসদাগর যে বাংলার লোক নহেন তাহার প্রমাণ যে বহু জেলাই তাহাকে দাবী করিতে চায়। তাঁর নির্দিষ্ট কোনো স্থান নাই। ত্রিপুরা জেলায় বর্তমানের চম্পকনগরে, ধুবড়ীতে, বগুড়া জেলায় মহাস্থানে,

দিনাজপুরের সনকাগ্রামে, ত্রিবেণীতে, ইহা ছাড়া বিহারের বহু তীর্থে ও আরও অনেক জায়গায় চাঁদসদাগরের বাড়ী আছে। এর গোলমাল দেখিয়া ক্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে চাঁদসদাগর নামে কেহ ছিলেন না, গল্পটি কল্পনামূলক। বেহুলা পরমা সতী হইলেও বাঙালী নববধূর সঙ্গে তাঁর কিছু প্রভেদ দেখিতেছি। বিবাহ হইতেই তাঁর একটু স্বাধীন নির্ভীকতা ও আত্মশক্তির পরিচয় পাইতেছি। তিনি নৃত্যগীত-নিপুণ। সমুদ্র বাহিয়া দক্ষিণ দিকে দেবপুত্রীতে যখন তিনি লখীন্দ্রকে লইয়া বাইতে প্রস্তুত তখন ভাই বলিতেছেন—“কেমনে ছাড়িয়া দিমু সাগর ভিতরে।

বিষম সাগরের ঢেউ তোলপাড় করে।”—

নারায়ণ দেব কৃত পদ্মাপুরাণ।

কিন্তু বেহুলা নির্ভীক। “অম্মাবরু” যেমন দেব-পুরীতে গিয়াছেন বেহুলা, মনসা, এমন কি মনসার মাতা চণ্ডীও ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ দাবী সাব্যস্ত করিতে দেবপুরীতে যান। “অম্মাবরু”র সঙ্গে মনসার মাতা চণ্ডীর বেশী মিল। আসলে চণ্ডী অম্মাবরুর ত্রায় গ্রামদেবী। তাঁরই পরবর্তী আমদানী যেসব দক্ষিণের দেবী, মনসা তার অন্ত-তম। কাজেই মনসা চণ্ডীর কন্যা। একথাটা একেবারে যুক্তি-হীন নয়। বিজয় গুপ্তের ও অন্যান্য মনসার কথা লেখকের পুস্তকেও দেখিতে পাই যে চণ্ডী শিবের পত্নী হইলেও মনসাকে লইয়া বড় গোল লাগিয়া গিয়াছে। শিব চণ্ডীকে স্বীকার করিলেও মনসার দাম্পত্য গ্রহণ কবিত্তে নারাজ। তাই মনসার বিবাহ চণ্ডী নিজেই দিতেছেন। শিব সেখানে নাই। ইহা লইয়া বহু ঝগড়া চলিতেছে। কাজেই তখন চণ্ডী যদিও গোলেমালে পার্শ্বতীর স্থান লইয়াছেন তবু মনসার স্থান হইতেছে না। তবে চণ্ডী-কাব্যে দেখি চণ্ডীও ভাল করিয়া গৃহীত হইতে পাবিতেছেন না। আর বেহুলাও কলিঙ্গ দেবীর কাছে কলিঙ্গ বালিকার মত স্বাধীনতা ও তেজ লাভ করিয়াছেন। তাঁর মধ্যে রস-বোধটুকুও বেশ আছে। লখীন্দ্রকে জিয়াইয়া ডোম ও ডোমকন্নার বেশে স্বপ্ন-বাড়ী যাওয়ায় তাহার প্রমাণ। আব অম্মাবরুকেও দেখি নীচ জাতীয়া কন্যা সাজিয়া অপূর্ব চূপড়ী লইয়া বেচাকেনাথ বাহির হইয়াছেন।

ভারতের কোন সতীই এই পদ্ধতিতে ঘর ছাড়েন নাই। তাই চাঁদ বেহুলাকে ঘাইতে মানা কবেন (দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, ৩২৫ পৃষ্ঠা)। আমাদের দেশের সতীলক্ষ্মীদের মধ্যে এত বড় তেজ প্রায় দেখিতে পাই না। বেহুলার তেজ ও নির্ভীকতা বিবাহকাল হইতে। তাঁহার স্বামীসহ সমুদ্রে ভাসিয়া পড়াও কম সাহসের কথা নয়। তারপর খণ্ডরবাড়ী স্বামী-সহ ডোম সাজিয়া যাওবাব মধ্যে যে একটি পরিহাসপ্রিয়তা আছে তাহা খুব স্বাধীন ভাবে চল-ফেবা করার অভ্যাস না থাকিলে আশা করা যাব না। দেবপুরীতে নৃত্য কবিয়া দেবতা প্রসন্ন ববা দেবদাসীর কাজ। তাহা বাংলা দেশের প্রথা নয়। তাহা তৈলদেরই বস্তু।

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণেও দেখি শিবপুত্র দক্ষিণে, (২১১, ২১২, ২১৮, ২০০ পৃষ্ঠা) দেবপুরীও দক্ষিণে (২০৩, ২৪ পৃষ্ঠা)। তাব গ্রন্থেও কর্ণাটরাজ নরসিংহের কথা আছে (পদ্মাপুরাণ, ৭২ পৃষ্ঠা)। মনসা-পূজা সমুদ্রের হাবমাদ দ্বীপে [পৰ্তুগীজ ডাকাতদেব দ্বীপ (তু: Armada)] হইত (পদ্মাপুরাণ, ১২২ পৃষ্ঠা)। বহাই হালুয়া অর্থাৎ চাষা প্রথম পূজক (তথা বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, ৭২ পৃঃ)। সমুদ্রের দ্বীপে চাঁদ মনসা-মন্দির দেখিতে পান (বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, ১৮৪ পৃষ্ঠা)।

আজ যে-সব প্রমাণ বলিলাম ইহার জন্ত তা বিশেষ কিছু পরিশ্রম করা হইবে নাই। আমাদের দেশের একদল তরুণ বিদ্যার্থীরাও একদল জ্ঞানতপস্বীর উচিত এইসব দেশে থাকিয়া তাদের রীতিনীতি, গ্রামদেবতা, গ্রামদেবী, পূজা-পদ্ধতি, আল্লনা, ত্রতের কথা, দেবদেবীর কথা, প্রবচন, শিশুভুলান ছড়া, গল্প, রূপকথা প্রভৃতি, দেবদেবীর মূর্তি, মন্দিরের গঠন, নিত্যব্যবহার্য বস্তুর গঠন, পাক করিবার

প্রণালী, শিশুদেব খেলনা, নানাবিধ Decoration (মণ্ডন), বিবাহ প্রভৃতিতে স্ত্রী-আচার, নারীশিল্প প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া দেখা ও আলোচনা করা। এ বিষয়ে আমি আরও কিছু কিছু ভবিষ্যতে বলিব। বক্তব্য সব কথা আজ বলা হয় নাই।

বাংলাতে মনসা-পূজাতে মহাভাবত ও পুবাণাদিতে উল্লিখিত বাহুকি ও তক্ষকেব নাম আছে বটে এবং মনসাকে বাহুকির ভগ্নী ও জ্বরংকারুব পত্নীও বলা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি এই মনসা সেই যুগেব নহেন। তখনকার নাগলোকেব কথা বাংলায় নাগপূজার মনসার প্রভাবে তলাইয়া গেছে। বৌদ্ধ বাহুকি, অনন্ত, পদ্ম প্রভৃতিও নামেই আছেন। আসল চিত্রটি দেখি চেংমুড়ী মনসায় এবং তাহাকে ঠেকাইতে গিয়া শৈব চাঁদসদাগর হেঁতাল হাতে দাঁড়াইয়াছেন। এতবড় বাঙ্গালী বীৰও নারীব চক্ষুর জলে হার মানিয়া মনসাকে অগত্যা বামহাতে পূজা কবিতো বাধ্য হইলেন।

বাংলা দেশ যেমন দক্ষিণের রাজাদের ঠেকাইতে পারে নাই, তেমনি দক্ষিণের দেবতাদের ঠেকাইতে পারিল না। চাঁদসদাগর খুব কঠিন রকমের শৈব, কিন্তু গ্রাম-দেবীর কাছে তাঁকে মাথা নোওবাইতে হইল। কারণ গ্রাম-দেবীও ভয় ও লোভ দেখাইয়া প্রথমে নারীদের বশ করে; কাঙ্ছেই তখন পুরুষবা দীর্ঘকাল তাহাদিগকে ঠেকাইয়া বাধিতে পারে না। *

শ্রীক্ষতিমোহন সেন

* প্রবন্ধট ১০ই বৈশাখ ১০২৯ শাস্তিনিকেতনে সাক্ষ্য আলোচনা-সভায় পঠিত। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতি ছিলেন। তিনিও ছই-এক হলে কিছু কিছু নির্দেশ করিয়াছেন।

কাপড়ে তসরের ত্রায় পাকা রং করিবার উপায়

আধপোষা-হিবাকস, একসের জলে মিশাইয়া এক-পোয়ার কিছু কম বাবুলার আঠা তাহাতে গুলিয়া দিবে। তারপর খানিকটা গেবিমাটি-চূর্ণ উহাতে দিয়া কাপড় ভিজাইবেন। কাপড়খানা খুব ভিজিলে—ভুলিয়া

ভুজ করিয়া চূর্ণের জলে ভিজাইয়া, জলে ধোঁত করিয়া লইবেন। ইহাতে কাপড়ে তসরের ত্রায় স্নন্দর পাকা ছোপ লাগিয়া যাইবে।

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

মানের দায়

নন্দীহাটির বড়বাবুর তিনটি মেয়ে আর একটিমাত্র ছেলে। মেয়েদের বিবাহের সময় বড়বাবু যত হাজার টাকার দান-সামগ্রী দিবার অঙ্গীকার করেছিলেন তার চেয়ে পাঁচ-দশ হাজার বেশীই প্রত্যেককে দিয়েছিলেন। শুধু দিয়েছিলেন বললে ধপেট হবে না, দেওয়াটা যে তাঁর কাছে কতখানি সামান্ত ব্যাপার তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন একথাও বলা দরকার। বড়বাবু গহনা কাপড় বাসন আসবাব সব কিছুর দামের রসীদগুলি বরকর্তাদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং ভাল জিনিষ দিতে হলে টাকার মায়া করা যে কতখানি দীনতার পরিচায়ক সে কথা অতিথি অভ্যাগত বরযাত্রী কন্ঠাযাত্রী সকলকেই কোন না কোন অছিলায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। নন্দীহাটির বাবুদের মেয়েদের খাট কতখানি উচু, কত হাত লম্বা, কতখানি চওড়া না হলে তাঁদের ঘুমের ব্যাঘাত হয় একথা জানতে এই-সব বিবাহ সভায় কম লোকে-রই বাকি ছিল। কত ওজনের কয় গ্রন্থ গহনা না হলে সে বাড়ীর মেয়েরা ভদ্র-সমাজে মুখ দেখাতে লজ্জা বোধ করেন, এবং কত শ' টাকা দামের কথখানা সাঁচা জরির বুটদার বেনারসী শাড়ী বাস্কে না থাকলে তাঁরা স্বস্তরবাড়ীর চেয়ে ঘরের বাড়ীর পথই শ্রেয় মনে করেন এ-সকল তথ্যও প্রতি কন্ঠার বিবাহে নিমন্ত্রিতা অন্তঃপুরিকারা সযত্নে সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

নন্দীহাটির বাবুদের অনেক-কালের বনিয়াদী ঘব। তাঁদের পাঁচমহল বাড়ীর পাকা ভিত আর গাধুনি ঘেমন এতকাল ধরে অচল অটল হয়ে আছে, তেমন অচল অটল হয়ে আছে তাঁদের সংসারের আইন-কানুন রীতিনীতি। ছেলে-মেয়ের বিবাহে বর্তমান বড়বাবুর প্রপিতামহ যে-সব নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন আজ পর্যন্ত সে সব নিয়মের একচুল পরিবর্তন করাতে বড় কেউ সাহস করেনি। বড়বাবুও কোনোদিন করতেন কি না সন্দেহ যদি না দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর জীবনকালে স্নেহলতা মৃত্যু-স্বয়ম্বরী হয়ে শাস্ত বাংলাব বৃকে এমন একটা ঝড় তুলে দিতেন।

স্নেহলতা যখন প্রাণের চেয়ে মানকেই মাহুয়ের কাছে বড় বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, সেই সময় নন্দীহাটির বড়বাবু ছিলেন তাঁদের সমাজের সমাজপতি। স্নেহলতার তিতিব আগুনের আলোষ বড়বাবুরও চোখ কণিকের মত ঝলসে গিয়েছিল; তাই তিনিও বংশ নিয়মের দিকে না তাকিয়ে বাংলাদেশের আর দশজন মত কতকগুলো প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছিলেন। বড়বাবুর কপাল খুব মন্দ ছিল না; কারণ তাঁর তিন মেয়েরই তখন বিবাহ হয়ে গিয়েছে; বাকি ছিল কেবল ছেলেটির।

সাধারণ গৃহস্থ হত মনে করতে পারেন এরকম সময় ছেলের বিয়ে বাকি থাকারাই ত মন্দ ভাগ্যের কথা! কিন্তু নন্দীহাটির বাবুরা তা মনে করতেন না। তাঁদের টাকার অভাব ছিল না—ছিল ঐশ্বর্য দেখবার লোকেব অভাব। সুতরাং এরকম দিনে ছেলের বিবাহ দেওয়াতে তাঁদের নাম-বশও বাড়বার বেশী সম্ভাবনা থাকবে, এবং ঐশ্বর্য দেখবার পথেও কোন বাধা পড়বে না। বড়বাবু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন মেয়েদের বিবাহে পণ দেবেন না এবং ছেলের বিবাহে পণ নেবেন না। পণ না দিলে তাঁর মেয়েদের যে কি রকম স্বামীভাগ্য হত, তা বড়বাবুর খুব ভাল করেই জানা ছিল, কিন্তু একথাও সেই সঙ্গেই তাঁর জানা ছিল যে তাঁর তিনটি কন্ঠাই বিবাহিতা। পুত্রের বিবাহে পণ না নেবার প্রতিজ্ঞাটা করা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ ছিল, কারণ যে-সব ঘরের সঙ্গে নন্দীহাটির বাবুদের কাজ-কর্ম চলত সে-সব ঘরে পণের দাবী না করলেও পাওনা কিছুমাত্র কম হয় না। আর যদি তা কম হয়ও তাতে নন্দীহাটির ঐশ্বর্য-সমুদ্রের জলে জোয়ার-ভাঁটার খেলা দেখা যায় না।

বড়বাবু বাঘ মোহিনীমোহন চৌধুরী বাহাদুরের পুত্র কিশোরীমোহন কলেজে-পড়া ছেলে। পিতার প্রতিজ্ঞার কথা শুনে সে মাঝে বললে, “বাবা, যদি সত্যি এ-রকম কথা বলে থাকেন, তবে কিন্তু মা

তোমরা কুসুমটি কি লোহাগড়ে আমার সম্বন্ধ করতে পাবে না।”

মা ছুই চোখ কপালে তুলে গালে হাত দিয়ে বললেন, “শোন একবার কলির ছেলের কথা! কথায় বলে বরটি না চোরটি। আমরা কি করব না-করব তার ভাবনা তোকে এখন থেকে কে ভাবতে বলেছে বে? তুই যা নিজের চরকাধ তেল দিগে যা।”

ছেলে বললে, “নিজের চরকার তেল দিতে চাই বলেই ত চোরটি থাকতে পারছি না। সভা ডেকে প্রতিজ্ঞা করে তারপর লাখ টাকার জিনিষ ঘরে তুলে যে বলবে বিনাপণে ছেলের বিয়ে দিয়েছি, ও-সব জ্ঞাকামো আমাকে নিষে আমি করতে দেব না।”

মা বললেন, “ওরে আমার শাক্যমুনি বে! কি কবতে হবে শুনি! হাড়ীবে মেয়েকে ছেলের বউ করে আনতে হবে? ভদ্রলোকের মেয়ে যে কোথায় দশ বিশ হাজার সঞ্চে না নিয়ে শুধু হাত নাড়তে নাড়তে শশুঘ ঘব করতে যার এও ত কখন শুনি নি।”

ছেলে বললে, “এইবার তাহলে শোন। তোমরা যখন নেব না বলেছ তখন যে ভদ্রলোক না চাইলেও দিতে পাবে তাব মেয়েকে বউ করতে পাবে না। এ আমি বলে দিচ্ছি; একথার আব নড়চড় নেই।”

মা ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, “কথার মারপ্যাচ না করে সোজা-সুজি বলনা কোন্ ছোটলোকের জামাই হবার সখ হয়েছে?”

বিশেষ কোনো ছোটলোকেব জামাই হবার সখ যে কিশোরীমোহনেব হয়েছিল তা নয়। কুসুমটি আর লোহাগড়ের জামাই না-হবার সখটাই আপাতত তাব খুব বড় হয়ে উঠেছিল।

মোহিনীমোহন ছেলের কথা শুনে প্রথমটা একটু ক্ষুব্ধ আঁব বিবস্ত্র হয়েছিলেন, কিন্তু সে কেবল ক্ষণিকের জন্ম। লোহাগড়ের মেয়ে না এনেও যে ছেলের বিয়েতে সংসারকে তাক লাগিয়ে দেওয়া যায় এই তথ্যটা প্রমাণ করবার দিকে অকস্মাৎ তাঁর সমস্ত খোঁক গিয়ে পড়ল, তিনি বললেন, “শাচ্ছা তাই হবে। কাঙালের ঘবের মেয়েই আমি আনব। নন্দীহাটির পবন-পাখব বে

মাটিকেও সোনা করে তুলতে পারে এবার আমি তাই দেখাব।”

মেয়ে খোঁজার ধুম লেগে গেল। নন্দীহাটির বাবুদেব এ এক নুতন খেয়াল! এ বাড়ীর বধূদের নাক মুখ চোখ রং সব চিরকালই এদের মাপকাঠিতে মেপে নেওয়া হয় ঘটকদেব তা জানা ছিল, কিন্তু বধূব পিতার দাবিত্য মেপে নেবার কোনো মাপকাঠির খবর তাদের জানা ছিল না। এবাব একথা বেচারীরা প্রথম শুনলে। বড়বাবুর ভাবী বৈবাহিকের দীন মুক্তি কল্পনা করতে তাদের মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে আসছিল কিন্তু বড়বাবুর মাথাটা গর্ভভরে যেন আকাশে গিয়ে ঠকতে চাইছিল।

অনেক খুঁজে-পেতে বাবুর মনের মত দরিদ্র একটা বৈবাহিক পাওয়া গেল। মেয়েটিও রূপের পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হল। মেয়েব বাপেব ভিটেমাটি কিছুই ছিল না। স্বাবর এবং অস্বাবর সম্পত্তি বলে যে ছুটে। কথা আছে তাও তাঁর ভাল কবে জানা ছিল না, স্বতরাং কোনো রকম সম্পত্তি বে ছিল না সে ত বলাই বাহুল্য। একথানা মাত্র ভাড়াটে ঘর এবং রাশা কববার মত একটুখানি ঘেবা বারান্দা নিয়ে কলিকাতার কোন সহরতলীর একটি একতলা বাড়ীতে ভদ্রলোকের দিন কাটত। এমন বড় ঘর একে তাঁব মেয়েব সম্বন্ধ এসেছে শুনে বেচারীর ছুই চোখে হু হু করে জল এসে পড়েছিল। অনেকে বলে আনন্দেই তাঁর চোখে জল এসেছিল, অনেকে বলে ভয়ে। মেয়ের বিয়ে দিতে তিনি একটু ইতস্ততঃ করবার উপক্রমও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর উপক্রমপিকাব আগেই মোহিনীমোহন তাঁকে এমন চেপে ধরলেন যে দরিদ্র হরিনাথ আব কোনো কথা বলতে সাহস পেলেন না। অগত্যা বিবাহেব সম্বন্ধ পাকা-পাকিই হয়ে গেল।

বিবাহ হয়ে গেল। পাকা-দেখা, গায়ে-হলুদ, অধিবাস প্রভৃতি নানা অলঙ্কারের নামে মোহিনীমোহন চাল, ভাল, ঘি, তেল, ময়দা থেকে স্কন্ধ করে টাকা, মোহর, অলঙ্কার বেণারসী শাড়ীর এমন প্লাবন স্কন্ধ কবলেন যে কারুর আর বুঝতে বাকি রইল না হরিনাথের কন্টার বিবাহেব পরচটা কোথা থেকে হবে। বিবাহটা যে ঘট করেই হল তা বলাই বাহুল্য। তবে বিবাহ-সভায় হরিনাথ ছাড়া

আর সকলকেই সেদিন কল্লাকল্লি বলে মনে হগেছিল এই যা একটু ক্রটি।

নন্দীহাটির বাবুদের বাড়ীতে নিয়ম ছিল বউ আনবার সময় বাড়ীর পুরানো দাসীর হাতে তাঁরা বধুর জন্ত এক-প্রস্থ গহনা ও পোষাক পাঠিয়ে দেন। দাসী বধুর পিতৃ-গৃহের বস্ত্র অলঙ্কার সবে বদলে শশুর-গৃহের আভরণে নববধুর আপাদ-মস্তক আচ্ছন্ন করে তার পর পাক্ষীতে বউ তোলে। বধু পিতা ধনীই হোন কি দরিদ্রই হোন তাঁর ঘরের কোনো অলঙ্কার কি বেশভূষা অঙ্গে নিয়ে নন্দীহাটির কোনো বধু কখনও শশুরের পাক্ষীতে পা দিতে পায় নি।

কিশোরীমোহনের বউ আনতে বেতে হবে। কিশোরীমোহনের মাহুষ-করা বুড়ো ঝি দেখলে শুভক্ষণ বয়ে যায় কিন্তু মাঘের ত বউ আনবার আয়োজনের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। কিশোরীমোহনের জননী উঁচু পালঙ্কের উপর রূপোব পানের বাটা কোলের কাছে নিয়ে শুয়ে আছেন, দাসীরা তাঁর অঙ্গসেবা করছে আর মাঝে মাঝে গৃহিণীর বামহস্তের দক্ষিণা একটি করে পাম গালে পুরছে। খাটের নীচে মেঝেতে গালিচার উপর কুটুন্নিরা কেউ শুয়ে কেউ বসে গৃহিণীর মন খুসী করবার জন্ত তাঁর রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্য, দয়া, দাক্ষিণ্য, সব কিছু সাত-মুখে প্রশংসা করছেন। কি জানি কোন্ পথে গৃহিণীর হৃদয় জ্বর করে ফেলা যায়। এইবেলা সব কটা পথেই ঘুরে ফিরে দেখা ভাল। এ সময়ে স্নানজলে পড়তে পারলে ছেলের বিয়ে বদক্ষিণা ভাল রকমই পাওয়া যাবে। খাটের গোড়ায় হাঁটু গেড়ে বসে গৃহিণী ভাগ্নে-বউ তাঁর কঙ্কণ-শোভিত হাতখানা নাড়তে নাড়তে সবে বলতে শুরু করেছেন, “ঢের ঢেব রূপসী দেখলাম কিন্তু আমাদের মামীমাব—” এমন সময় বুড়ী ঝি এসে বললে, “বলি, হ্যাঁগা মা, নোতন বোয়ের গয়না কাপড় কি আর আজকে বার করে দেবে না? বেলা কি মানুষের মুখ চেয়ে বসে থাকবে?”

গৃহিণী কিছু বলবার আগেই কিশোরীমোহনের দিদি বললেন, “সে-বাড়ী গিয়ে বলিস্ কনের মাকে, তোমাদের বাড়ীর গয়না-গাটি খুলে দাও, তাবপর যদি

খুলে নেয় কিছু ত লোক পাঠিয়ে দিস্ আমরা গহনা পাঠিয়ে দেব।”

ঘবে হাসির বন্থা বয়ে গেল। গৃহিণী হাই তুলে বললেন, “নে থাম্ সরি, বাস্তব থেকে ময়ূরকল্লি বেণারসীটা বের কবে দে, একটা ত কিছু নুন্ন পরিয়ে আনতে হবে।”

ভাগ্নে-বউ বললেন, “যা বললে মামীমা, হলই বা এ বাড়ীর কাপড়, তা বলে নুতন কনে বউ আসছে, পবা কাপড় পরিবে কি আর পাক্ষীতে তোলা যায়?”

শুভক্ষণে বউ এসে নামূল। গড়ের বাজনা, রত্নন চৌকী, শাখের ফুংকার, মাহুষের চীৎকাব, উলুধনি, ছেলের কান্না, সব ঘেন পরস্পরকে হাব মানাবার জন্তে সপ্তমে চড়ে উঠল। বধুবরণের আর অভ্যর্থনার পূর্ণাঙ্গ অমুষ্ঠান কবে নন্দীহাটির বড়বাবুর একমাত্র পুত্রের বধুকে ঘরে তোলা হল।

* * * *

হরিনাথের কন্যা ইন্দিরার ভাগ্যে ভাগ্যবিধাতা ধন জন, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য সবই লিখেছিলেন কিন্তু সুখ কথাটা লিখতে বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলেন। আজ্ঞা তার অভ্যাস একতালার একখানা ঘর আর বারাণ্ডায় দু-চারজন মাহুষের মধ্যে থাকা, অকস্মাৎ এই বিপুল পাঁচমহলা বাড়ীখানার অন্দরে এসে পড়ে সে নিজেকে ঘেন সম্পূর্ণ-রূপে হারিয়ে ফেলেছিল। শশুরের বাড়ীর অভ্যভেদী মহিমা যত সে অনুভব করত ততই তার নিজের অস্তিত্বটা তুচ্ছ হতে তুচ্ছতর হয়ে আসত। পিতার দীন আবাসের ছোট চারটি দেয়ালের মধ্যে সে নিজের অস্তিত্বের মহিমায় মহিমাষিত ছিল কিন্তু এখানে তাব মনে হত যেন একটা দৈত্যের যোজন-জোড়া হাঁয়ের মধ্যে সে সামান্য এক-গ্রাস আহাধের মত এসে পড়েছে। এখানকার মাহুষ-গুলোর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক ছিল না, তাদের খাওয়া-দাওয়া বসবাসের ভাবনার সঙ্গে তার ভাবনার কোনো যোগ ছিল না, তাদের কোনো কাজের ছায়া তার জীবনযাত্রার পথে পড়ত না, তার কাজের কর্মের ভাবনা-চিন্তার ছায়াও তাদের স্পর্শ করত না। একটা বাড়ীর মধ্যে এই যে এতগুলো প্রাণী, এবা যে শুধু বাহিবের দিক থেকে নিজের নিজের আলাদা

মহলে থাকত তা নয়, এদের বনিয়াদী বাড়ীর পাঁচিলের মত এদের মনের মধ্যেও মস্ত মস্ত পাঁচিল তোলা ছিল। এদের স্বামীজীর ঘরকন্নাও ছিল আলাদা। বাবুর খাস খানসামা আর গৃহিনীর খাস ঝির এলাকায় যে কাপড়-চোপড় বাসন আসবাব থাকত তা কখনও পরস্পরের গাণ্ডী অতিক্রম করত না। বাবুর বাহিব-মহলেব মনের মধ্যে অন্দব-মহলের জীর অনধিগার প্রবেশ সেবাড়ীতে অতিবড় হাস্যকর ব্যাপাব ছিল। হরিনাথের জী পুত্র কন্তাব মন আত্মীয়-কটুখের সঙ্গে স্থখ-দুঃখের ছোটখাট তুচ্ছ কণা বলা সে বাড়ীর লোকের অভ্যাস ছিল না। তাদের পদ-গৌরবের মর্যাদার কাছে স্থখদুঃখ লজ্জায় মুখ দেখাতে পারত না।

ইন্দিরার কাছে তাব শব্বরের প্রাসাদেব এত-গুলি মাহুয ছিল কেবল এত জোড়া চোখ। তাদের তীক্ষ্ণ চোখের সমালোচনা সে পদে পদে অল্পভব করত কিন্তু তাদের মুখের কথায় ভুল সংশোধনের কোনো উপায় সে খুঁজে পেত না। এখানে পরীক্ষক ও সমালোচক ছিল অসংখ্য কিন্তু পরীক্ষার্থী মাত্র একজন, তার না ছিল কোনো নোটের খাতা না ছিল কোনো প্রাইভেট টিউটার।

প্রথম দিন যখন ইন্দিরা শব্বর বাড়ীতে খেতে বসল, তখন তার খালার চারিপাশের বাটিগুলো তার চোখে ঠিক মোচাকের অসংখ্য খোপের মতই লেগেছিল। মধুর সঙ্গে সেখানে হলের দেখা পাবারও আশঙ্কা তার যথেষ্ট ছিল। একলাই সে খেতে বসেছিল, চারিদিকে দরজা, জানালা, চোকাঠ ঘিরে কুতুহলী আত্মীয়া আর কুটুন্নির দল নীরবে নতদৃষ্টিতে তার আহারের পর্যবেক্ষণ করতে বসেছিলেন। তার একলার হাত আর-মুখের উপর অতগুলো মাহুযের একাগ্র দৃষ্টি অল্পভব করে সে কেঁপে উঠছিল, হাত বাড়াতে পারছিল না। তাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে কে একজন বলে উঠল, “বোমা, লজ্জা কোরো না। হাতখানা বের কর।” অতি কষ্টে সে আড়ষ্ট হাতখানা খালার দিকে অগ্রসর করল। ইন্দিরার পাতের চারপাশে যে অসংখ্য ব্যঞ্জন সাজানো হয়েছিল তার অধিকাংশের সঙ্গেই তার চিবকালের অপরিচয়। স্বতরাং কোনটা যে আগে জ্বল করত হবে তা সে ভেবে পাচ্ছিল না। বাড়ীব যদি

কেউ তার সঙ্গে বসত তবে তার দেখাদেখি অনায়াসে এ পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হতে পারত, কিন্তু তেমন কেউই ছিল না। দুচারজন কেউ যদি বা ছিল, তারা আজ যেন সবাই ভ্রায়নিষ্ঠ পরীক্ষকের মত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল। ইন্দিরা ভয়ে ভয়ে হাত বাড়িয়ে যে বাটিটা সর্বাগ্রে ধরুল সেটা প্রায় শেষ পর্যায়ের অঙ্গ। তিনচারজন এক সঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠল, “ওকি বো মা, এ-সব কি মুখেও একবার দেবে না?” লজ্জায় ইন্দিরার সর্বাক শিউরে উঠল। সে হাতখানা সরিয়ে নিষে আর-একটা ভুল পাত্রেই হাত দিল। মনে হল খুক খুক করে একটা চাপা হাসির শব্দ ঝরণার জলের মত লীলাভরে একদিক থেকে আর-এক দিকে গড়িয়ে চলে গেল। চকিতের জন্তে মুখ তুলে ইন্দিরা দেখলে অধিকাংশেব মুখেই কোনোরকম বিকারের চিহ্ন নেই, কেবলজন ঘাড়টা ফিরিয়ে মুখটা শুঁজে আড় হয়ে বসেছে কিন্তু হাসির একটা স্পন্দন তাদের অঙ্গে তখনও খেলে যাচ্ছে। ইন্দিরা আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। দর্শক-দের কাছে যেটা হাস্যকর ঠেকেছিল অধিকাংশের অটল গম্ভীব মুখ দেখে ইন্দিরা সেটাকে তার পক্ষে একটা মারাত্মক অপবাদ মনে করে নিয়েছিল। অপবিচয়ের রহস্য তার বিভীষিকা আরো শতগুণে বাড়িয়ে দিচ্ছিল। হয়ত নন্দীহাটির এটাও কোনো একটা অল্পষ্ঠান, যার অঙ্গ-হানির জন্তে একমাত্র ইন্দিরাই দায়ী। এই সবে সে একটা অপরাধ করে এসেছে আবার এ তার কি হল? ঘরে ঢুকবার পর যখন প্রণাম আর আশীর্বাদেব পালা চলছিল, তখন গৃহিণী একজন বর্ষীয়সীকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে-ছিলেন, “এই আমাদের বামুন ঠাকুরণ।” ইন্দিরা চিরকাল জান্ত ব্রাহ্মণ মাত্রেই প্রণাম, তাই সে-তাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়েছিল। বিদ্যাস্পৃষ্টের মত ব্রাহ্মণঠাকুরাণী ইন্দিরার স্পর্শে শিউরে সবে গেলেন, সমস্ত ঘরখানায় সাড়া পড়ে গেল, ছরস্তু লজ্জা আর অপমানের একটা বহিঃপ্রকাশ অসংখ্য ক্রুদ্ধ সর্পের গর্জনের মত ঘরের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত শোনা গেল। কিন্তু তার পর এক মুহূর্তেই সব আবাব নীবব। খুব যে একটা বড় অপরাধ হয়েছে, পাচিকাকে প্রণাম কবে সে যে নন্দীহাটির মুখ হাসিয়েছে একথা তাকে কেউ

না বলে দিলেও সকলের আরক্ত মুখ আর অপমানের শিরণেই সে বুঝেছিল। কিন্তু কেউ যে তাকে কোনো কথা বলে দিচ্ছে না, ভুল হলে কঠিন শাস্তি না দিয়ে কেবল মর্ম্যাহত মুখ করে তার দিকে চেয়ে দেখছে এইটেই তার সব চেয়ে বড় দণ্ড হয়েছিল। বেচারীর বুকের ভিতরটা যেন পাথর হয়ে জমে আসছিল। যে ব্রাহ্মণীকে ইন্দ্রিয়ার প্রণাম করেছিল, সে এতক্ষণ পরে বললে, “বৌদিদির বাপের বাড়ীতে কি টক ঝাল মিষ্টি সব সমান?” গৃহিণী বধুর উপর অত্যন্ত চটেছিলেন, ব্রাহ্মণী স্বত্র ধরিয়ে দেওয়াতে তিনি বলে ফেললেন, “তা যেমন বাপের বাড়ীর ছিরি-ছাঁদ তেমন ত আচার-বিচার হবে।”

ঝি-চাকরের সামনে হঠাৎ ঘরের কথা তুলে ফেলায় গৃহিণীর মর্ম্যাদার যেটুকু হানি হল, তার জন্মে পর মুহূর্তেই আবাব ব্রাহ্মণঠাকুরাণীর উপরে চটে উঠে তিনি বললেন, “দেখ বামুন ঠাকুর, দাসী-বান্দী হলে দাসী-বান্দীর মত হাল-চাল শিখতে হয়, বড়ঘরের কথায় মুখ সামলে কথা বলবে।” গৃহিণীর কথায় ব্রাহ্মণী নীরব হলেন, সভাও অসময় বুঝে ভেঙে গেল, কিন্তু ইন্দ্রিয়ার বুকের ভিতর আরো ছুঁক ছুঁক করে কাঁপতে লাগল। তার গৃহপ্রবেশের উপক্রমণিকা তার সমস্ত ভবিষ্যতের রস-ভাণ্ডার যেন নিঃশেষে নিঙড়ে ফেলে দিল। তারপর দিনে দিনে ইন্দ্রিয়ার আরো অনেক খুঁৎ বাহিব হতে লাগল। বউ ছুধের বাটির তলশেষানিটুকুও জ্বল দিয়ে খায়, বউ সকালের কাপড় বিকালে পবে, বউ ভাত খেয়ে উঠে খালার উপর বাটিগুলো তুলে রাখতে যায়, বউ যাকেতাকে বলে বসে তার মা কেমন রাঁবে কেমন মশলা বাঁটে। এই রকম ছোট বড় অসংখ্য দীনজ্ঞানোচিত ক্রটি ইন্দ্রিয়ার প্রত্যহ ধরা পড়ত, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তখনকার মত তাকে সাক্ষাৎভাবে কেউ এসম্বন্ধে সাবধান করে দিত না। তারা স্বেদনদৃষ্টিতে তার দোষ ক্রটি সব দেখে বেখে মনে গঁেখে তুলে রাখত, কখন বা বক্রহাসিতে চকিতের জল্প ওঠে অবজ্ঞা ছুটিয় তুলত, আর ছুয়াস ছুয়াস পরে অকস্মাৎ সেই-সব খোঁটার খোঁচা দিত।

কিশোরীমোহনের মামার বাড়ীতে ছেলে-বউকে মাস দুই পরে নিয়ন্ত্রণ কবেছিল। যাবার সময় বউকে

সাজিয়ে গুজিয়ে দিয়ে কিশোরীর মেজ বোন বললে, “দেখ ভাই বৌদি, সেখানে গিয়ে যেন জমাদার কি ঝাড়ুদারকে প্রণাম করে বোলো না। দাসী চাকর তারা সবাই সাফ কাপড় পরে, তোমার যদি চিনতে কষ্ট হয় দাদাকে জিজ্ঞেস করে নিও।” বড় বোন সরষু বললে, “আর ভাই, কিছু মনে কবো না, কিন্তু তোমার মা যে খুব ভাল ঘুঁটে দিতে পারেন সে খবরটুকু মামীমাকে না দিলেও চলবে।” গৃহিণী বললেন, “আচ্ছা, আচ্ছা ওর বাপের বাড়ীর শিক্ষা-দীক্ষা যদি ওটুকু ঘটে না আসে ত বা খুসী করবে। তোরা থাম ত।” সরষু বললে, “হাঁ থামলেই হলো কি না? বাবার ত একটা মান মর্ম্যাদা আছে, সেখানে গিয়ে বৌছেলে যদি এঁটো পাত চাটে আর তেলীর ন্যাকড়া পরে পেত্নী সেজে সাত দিন কাটায় তাহলেই নন্দীহাটির জয়-জয়কার পড়ে যাবে।” শান্তডী মুখের হাসি টিপে মুখখানা কিরিয়ে নিলেন।

নিষ্ঠুর কথাব বাণে ইন্দ্রিয়ার সর্বাঙ্গ বিদ্ধ হয়ে আসছিল, তার ব্যথা বোঝবার মত একটি মানুষও এখানে ছিল না, কারণ স্বামী বড়ঘরের ছেলে, তাকে এ-সব কথা বলতে সাহস হত না। বাস্তবিকই ত তার শত ক্রটির হিঙ্গ্র দিয়ে তাব অতীতের দারিদ্র্য নগ্ন মূর্তিতে অহরহ দেখা দেয়। হৃদয় তার অভাব-পীড়িত দীন মনের পরিচয় পেয়ে স্বামীও অবজ্ঞায় নাসিকা কুঞ্চিত করবে। কিন্তু যেচে সে অবজ্ঞার পথ করে দিতে ইন্দ্রিয়ার কিছুতেই পারবে না। ওই ঝাঁক হাসির বিষ এ বাড়ীর সকলের কাছেই সে পেয়েছে, বাকি আছে একটি মানুষের কাছে, তাকে নিজের হাতে গড়া সিংহাসন থেকে নিজের হাতে নামিয়ে ফেলবার ভয় ইন্দ্রিয়ারকে মুক করে বেখেছিল। অথচ কাঙালের মেয়ে বলে তাকে সকলে অবজ্ঞা কবে বলেই বে সে শ্বশুরের রাজক্ৰোধটা রাজোচিতভাবে ভোগ করতে সঙ্কুচিত হয় একথাটাও তার জানিঘে দিতে ইচ্ছা করত।

এমনি কবে দৈন্য আর ঐশ্বর্যের যুগল লাহন। সন্ধ্যা যখন ইন্দ্রিয়ার দিন কাটছিল তখন হরিনাথ এক দিন ভয়ে ভয়ে মেয়েব খোঁজ নিতে এলেন। ইন্দ্রিয়ার

বাপের কোলে মুখ রেখে অনেকদিনের জমানো দুঃখের কান্না কেঁদে বললে, “বাবা আমাকে এখান থেকে তুমি নিয়ে চল, এখানে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে।” হরিনাথ সাহসে বুক বেঁধে অন্তরে বেমানের কাছে আঞ্জি পেশ করলেন। ইন্দিরার নন্দ সরষুর শব্দ-বাড়ী গেলেই ম্যালেরিয়া ধবত, তাই আজ বছর দুই-তিন তিনি বাপের বাড়ীতে আছেন, হরিনাথের আঞ্জি শুনে সবার আগে সরষু বললেন, “অবাক করলে মা! ছোটঘরে বিয়ে দিয়ে বাবার মান-সম্মান আর কিছু রইল না। নন্দীহাটির বাবুদের কোন্ বউ আজ চার পুরুষের মধ্যে কবে বাপের বাড়ী বাত কাটিয়েছে তা ত শুনি। আমার জ্যেষ্ঠিমা, ঠাকুমা সেই বিবেক কনে ঘরে ঢুকেছিলেন, তার পর এ দেউড়ির সীমানার বাহিরে প্রথম শুয়েছেন চিতায়।” মোহিনীমোহনের দেউড়ির বাহিরে কতটা জন্তু এমন স্থখশয্যার ব্যবস্থা করতে হরিনাথ মোটেই ব্যস্ত ছিলেন না। তিনি উড়ুনির আঁচলে চোখ মুছে বাড়ী কিরে গেলেন।

* * * *

তার পর অনেক দিন কেটে গিয়েছিল; বাইরে সংসারের লোকের চোখে ইন্দিরা নন্দীহাটির বড়বাবু একমাত্র পুত্রবধূর উপযুক্ত চাল-চলনই রক্ষা করত; তাব দারিদ্র্যের অহঙ্কারটা সংসারের হাটে উচু করে ধরে বেড়াবার বয়স তার কেটে গিয়েছিল; এখন অন্তরেই হয়েছিল সে-সবের স্থান। তার পিতা প্রথম দিন ফিরে যাবার পর আর কোনোদিন এ দেউড়ীতে ঢুকতে সে তাঁকে নিষেধ করে দিয়েছিল; এ দেউড়ীর বাইরে প্রথম রাজি চিতায় কাটাবার জন্তে সে সম্পূর্ণই প্রস্তুত হয়েছিল। নন্দীহাটির আত্মীয়-কুটুম্বের কাছে তার পিতা-মাতার কোনো পরিচয়ও আজকাল আর সে দিত না, শশুরকুল পিতৃকুল আর স্বামীর মাতুল-কুলের তিন পুরুষের বাইরে কাউকে যে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে নাই একথাও সে আর ভুলত না, সকাল বিকাল সন্ধ্যায় এবং অন্ন-প্রাশন আব বিবাহ-সভায় কখন যে কোন-রকম বেশ-ভূষা করতে হয় তাও ইন্দিরার কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল; কোন্ বাড়ীর মানুষের সামনে কি ওজনে হাসি ও মিষ্ট

কথা বিতরণ করতে হয় তার মাপেও আজকাল আর ইন্দিরার ভুলচুক ছিল না; মোটের উপর বলা যেতে পারে নন্দীহাটির আদর্শ বধু বলেই আজকাল বাইরের সংসার ইন্দিরাকে জানত।

কিন্তু পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার ঝোঁকে যে-সমস্ত পাঠ ইন্দিরা এতদিন ধরে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছিল, তা তার পবীক্ষার পাঠই রয়ে গেল, অন্তবে সে তা গ্রহণ করতে পারেনি। দাস দাসীকে আজ পর্যন্ত হাতে তুলে সে একটা কিছু দেখনি বলে গৃহিণী ব বলে কাছে তারা অহরহ অহুযোগ করত; গৃহিণী দুই হাতে তাদের দান করে হাস্যমুখে নীববে বুঝিয়ে দিতেন “কাঙালের মেয়ে দিতে জানলে ত দেবে?” বিবাহের ঘোঁতুক আর মাসিক হাতখরচের টাকা যোগ করলে ইন্দিরার তহবিলে টাকার কিছু কমতি ছিল না, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কড়া-ক্রান্তি সবই খাজাঞ্চির খাতায় জমা ছিল! হাত-খরচের টাকা প্রতি মাসে যখন এসে আবার সেই খাতায় যোগ হত তখন মোহিনীমোহনের জানতে বাকী থাকত না যে এ জমা দেবার অর্থ কি! গৃহিণীর কানেও অবশ্য কথাটা উঠত। তিনি আশা কবেছিলেন বোনদের বিবাহের সময় ইন্দিরা এই অর্থে বড়বাকম কিছু ঘোঁতুক করবে, কিন্তু ফলে দেখা গেল পিঠোপিঠি দুই বোনের এক মাসের মধ্যেই বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও ইন্দিরা মোটে ঘোঁতুকই করল না। বড়ঘরে বিয়ে হয়ে মেয়ে যে কেমন পর হয়ে যেতে পারে হরিনাথ আত্মীয়-বন্ধুকে সর্বদা তাই বলে বেড়াতে লাগলেন এবং মোহিনীমোহন আর তন্ত্র গৃহিণী বিস্মিত হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। বধূব স্তমতির আশায় তাঁদের জলাঞ্জলি দিতে হল।

* * *

কিশোরীমোহনেরও পিতার মত যশের আকাঙ্ক্ষা ছিল; কিন্তু পিতা-পুত্রের পথ ছিল ভিন্ন। রায় বাহাদুর পিতা যখন রাজা বাহাদুর হবার চেষ্টায় ব্যাকুল, পুত্র তখন দেশভক্তের সপ্তম স্বর্গের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। পিতাপুত্রের এই ভিন্নমুখী পথ পরস্পরের জানা ছিল, কিন্তু পিতার স্বর্গটাকে পুত্র যে অবজ্ঞার চোখে দেখেন এবং পুত্রের স্বর্গের প্রতি পিতার যে কতখানি বিদ্বেষ তাও

উভয়েরই জ্ঞানা ছিল। তাই কিশোরীমোহনের কাছে আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা জ্ঞানাতে মোহিনীমোহনের একটা প্রচণ্ড লজ্জা ছিল, আর মোহিনীমোহনের কাছে আপনার ছুবাশার কথা জ্ঞানাতে কিশোরীমোহনের ছিল বিষম ভয়। কারণ পিতার বিষয়ে তার এখনও কোনো অধিকার জন্মায়নি। পুত্র পিতাকে এবং পিতা পুত্রকে আপন আপন প্রাণেব কথা লুকাবার আগ্রহে বাড়ীর আব কাউকেও বলতে সাহস পেতেন না।

স্বামী যে একটা বিরাট ব্যাপার নিয়ে মহা ব্যস্ত একথা ইন্দিরার জ্ঞানতে বাকি ছিল না। গবরের কাগজ, বাড়ীর প্লান, পথ-ঘাটের নক্সা, আর হাজার বকম খসড়া নিয়ে কিশোরীমোহন সর্বদাই গম্ব, কিন্তু ইন্দিরার চোখের সামনে সব থাকলেও ইন্দিরাকে সে কোন কথা বলত না। ইন্দিরাও জিজ্ঞাসা করত না। কারণ সে-সব ত বাবুদের কথা। কিন্তু তবু দরিত্রের মেয়ে ইন্দিরার নন্দীহাটির এত সম্পদের চেয়ে বেশী লোভ ছিল ওই ছেঁড়া খাতা আর কাগজের কথাগুলোর উপরেই। তার স্বামীর সম্পদ ত সকলেই দেখছে কিন্তু স্বামীর মন জুড়ে যে জল্পনা-কল্পনা দিবারাজি চলেছে, যার কথা দশজনে জানে না, সেইটা স্বামীর মুখের কথায় উপহার পেতেই তার ছিল সবচেয়ে আগ্রহ।

এমন সময় এক নূতন পরিবর্তন দেখা গেল। অতীতের মধ্যে পিতৃগৃহের স্থিতি চাপা দিয়ে ফেলবার চেষ্টায় ইন্দিরা যখন সমগ্র মনটা নিয়োগ করছিল সেই সময় তার বড় ভাই শীর্ণ দেহ আর জীর্ণ বেশের উপর একমুখ হাসি নিয়ে এসে হাজির। বিবাহের সময় ইন্দিরা তাকে যেমন দেখে এসেছিল, আজ তাকে তেমন মোটেই মনে হল না। তার সে উজ্জল স্বন্দর চোখের আলো আজ নিভে গেছে, দুই চোখে আছে শুধু ভিক্ষুকের নিল্লজ দীনতা। তার দীর্ঘ কৃশ তরুণ দেহাটুকু আজ অভাবের নিষ্পেষণে শুকনো আখের মত নীরস ককাল মাত্র, তার মুখেব সলজ্জ হাসি চাটুকাবের বাক্যচ্ছটার মত প্রগল্ভ। ইন্দিরা ভাইকে এতকাল পরে দেখে খুশী হবে কি, লজ্জায় তার কান্না আসছিল। ভিক্ষু-ঢাকা আগুনের মত যার বালমুখের দীপ্তি এতদিন তাদের

কুঁড়ে ঘব আলো করে রেখেছিল, দারিত্র্যের তাড়না আর ঐশ্বর্যের লোভ যে তাব এমন বিকার করেছে তা ইন্দিরা একদৃষ্টিতে বুঝে নিল। বালকের কল্পলোক তাব অনন্ত ঐশ্বর্য নিয়ে ধোবনের আগমনে বিদায় নিয়েছে।

অল্পম ভগিনীর এতদিনের অবহেলার জন্ত তাকে অহুগোণ করলে, বড়বেবে মেয়ের বিবাহ দিয়ে পিতামাতার স্থখেব পরিবর্তে ছঃখই যে বেশী হয়েছে তাও বললে। সে বললে, “গবীবের ঘরে যদি তোব বিষে হত তবে আব কিছু লাভ হোক আব না হোক যে বজ্রে জন্মেছিস সে রক্তের টান এমন কবে কাটাতে পারতিস্ না। শেষকালে চিঠি লেখাও বন্ধ করলি! তুই স্থখে আছিস্ স্থখে থাক্, না-হয় বাপ-মার ছঃখ না ঘুচাতে চাস্ নাই ঘুচালি, কিন্তু একবার কি মনেও করতে নেই?”

ইন্দিরা বললে, “দাদা মনের কথাও কি তোমরা টেব পাও?”

অল্পম বললে, “মনে কি মাহুযে শুধু মনে মনেই কবে?”

ইন্দিরা বললে, “মাহুযে না করতে পারে, কিন্তু মেয়েমাহুযকে তাই করতে হয়।”

অল্পম বোনের সে কথা হেসে উড়িয়ে দিল, বললে, “আচ্ছা, মেয়েমাহুযকে যা করতে হয়, তাই না-হয় কর। এতখানি পথ এলুম, মাহুযটার তেষ্ঠা পেয়েছে কি না তাও কি একবার খোঁজ নিতে নেই।”

ইন্দিরা রূপার গেলাসে জল এনে ধবল। অল্পম বললে “ইন্দিরা, বড়মাহুযের বাড়ীতে কি রূপার গেলাস দেখেই পেট ভরে?”

ইন্দিরা হাসলে আর বললে, “আমাধ বলছ কেন? আমি ত তোমারি বোন।”

অল্পমের আশা-বাওয়া চলতে লাগল। বোনকে নূতন করে আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধবাব চেষ্টাটা সফল হল তাব অল্প দিক দিয়ে। সে কিশোরীমোহনের স্বনজরে পড়ে গেল। হুতরাং ভগ্নী শুধু মনে মনে তাকে চাইলেও ভগ্নীপতির দৌলতে তার আদত চাওয়ার বিশেষ অভাব হত না। অল্পমের আত্মীয়তার তলে তলে যে অভিলাষ

সংরক্ষণ বইত, তাকে ঠিক অন্তঃসলিলা তটিনীর সঙ্গে তুলনা দেওয়া চলে না। অল্পদিনেই সে অভিল্যম এমন স্পষ্ট হয়ে বাইবে দেখা দিল যে ইন্দিরা সরমে মরে যেতে চাইত। কিন্তু অল্পপমের এই বুদ্ধি ভাবই কিশোরীবা কাছে তাকে প্রিয় করে তুলল। কিশোরীর জন্মগত অভিজ্ঞাতোব অহঙ্কার অল্পপমেব মধ্যে একটা মস্ত আশ্রয় পেল; যেটা ইন্দিরার মধ্যে সে মোটেই পেত না। এবং সেইজন্যই অল্পপম আর কিশোরীর আত্মীয়তার যে মূলস্থল সেই ইন্দিরাই এদের মাঝে-ধান থেকে সরে গেল। কিশোরীর সঙ্গে অল্পপমের বন্ধুত্ব ক্ষেত্রে ইন্দিরার কোনো স্থান ছিল না। তবু অল্পপম ইন্দিরার আশা ছাড়েনি। মাঝে মাঝে নানা ছুতায় কিশোরীর আড়ালে সে ইন্দিরার কাছে হাত পাতেতে আরম্ভ করল। কাবণ কিশোরীবা সামনে তার ভিক্ষাকে যে ইন্দিরা অতি বড় অপমান রূপে নেবে তা তারা দুজনেই বুঝত। কিন্তু অল্পপমেব সকল ছুতাই বিফল হত। ইন্দিরার হাত থেকে এক পয়সাও সে বার করতে পারত না।

দেশের কাছে কিশোরীমোহন আজকাল এত মেতে উঠেছিল যে তার সারাদিনব মধ্যে বাড়ী ফেরবার অবসর হত না। একলা ঘবে ইন্দিরার দিন কাটত স্বামীর পরিত্যক্ত এলোমেলো বই কাগজ চিঠিপত্র সহস্রবার গুলিয়ে, আর তাব ফেরার আশায় পথ চেয়ে।

সেদিন রাত্রি দশটা বেজে গেছে, দেউড়িতে দবোয়ানদের রামায়ণ-গান থেমে গেছে, পাশেব মহলে সরসুর ছেলের কান্নাও আর শোনা যায় না, ভিতব মহলের বাবান্দার দাসীদের আলাপ আব কলহের গুঞ্জন মূহু হতে মূহুতর হয়ে আসছে, পথে পথিকদের পায়ের ধ্বনির একটানা শ্রোতে মাঝে মাঝে বিরাম পড়ে যাচ্ছে, তবু কিশোরীমোহনের দেখা নাই। শোবার ঘরের জানালার গরাদেতে মুখ চেপে পথের দিকে চেয়ে ইন্দিরা দাঁড়িয়ে ছিল। জগতে পথে মানুষের ভাগ্য-যত রকম দুর্ঘটনা ঘটেছে সেইগুলো সব পালা করে করে তার মনের ভিতর আসা-যাওয়া করছিল। পায়ের

কাছে একটা দৈনিক কাগজ অসংখ্য জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত দাতার ছোট-বড় দানের তালিকা বুকে করে থস থস করে উড়ে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় বাহির-বাড়ীর রাঙা পথে কাব মূহু পায়ের ধ্বনি শোনা গেল! ইন্দিরা দেখলে অল্পপম পা টিপে টিপে তারি দরজার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বিরক্ত-মুখে সে জানলা ছেড়ে ফিরে দাঁড়াল। বার বার কতবার এই একই পালার অভিনয়? এর কি আর শেষ নেই? ঘরের সমস্ত উজ্জল আলো তার মুখের উপর পড়ে তার মুখের বিবস্তিটাকে যেন আগুনের মত দীপ্ত করে তুলল। সে বললে, “এতরাজে এখন তুমি কি চাও? দাদা, ভদ্রলোকের ছেলে তুমি—অসময়ে পরের বাড়ী চোবের মত চুকতে কি তোমার একটু লজ্জাও করে না?”

অল্পপমের ভীত লুঙ্গ মুখে কণিকের জন্ত একটা লজ্জার লালিমা ছড়িয়ে পড়ল। তার পরেই সামলে নিয়ে একটু রুদ্ধ স্ববে সে বললে, “ইন্দিরা, জানি তুই বড়মানুষের বউ, কিন্তু আমি যে তোর বড় ভাই, একথাটাও কি ঐশ্বর্যের অহঙ্কারে ভুলে যেতে হয়? আমাকে তুই শুধু আজ একবার নয়, সহস্র দিন সহস্রবার যা মুখে আসে তাই বলেছিস।”

ইন্দিরার আগুনভরা চোখের উপর এক-ঝলক জল এসে তাব দীপ্ত মুখশ্রী মুহূর্তে করুণ করে তুললে। সে বললে, “ছোট বোনকে দিয়ে সহস্র বার এ পাপ করিয়েও যে তোমার আশ মেটে না এই ত আমার সকলের চেয়ে লজ্জা। যে মানুষ একবারের বেশী ছবার এ বাড়ীতে পায়ের ধূলো দেননি, তাঁর ছেলে হয়ে তুমি আমার এ অপমান কেন বার বার কর আমি ভেবে পাই না।”

অল্পপম হঠাৎ নরম হয়ে গেল। যে পথে কথাব গতি ফিরেছিল, সে পথে আর বেশীক্ষণ চললে তার কার্য সিদ্ধির কোনোই সম্ভাবনা ছিল না। তাই সে বললে, “আজ পর্যন্ত এক পয়সা তোর কাছে পাইনি, সে কথা ভুলে যাসনে ইন্দিরা। আজ আমার শেষ অহরোধ, আব আমি কোনোদিন ও কপা মুখে আনব না, আজকে আমার শেষ ভিক্ষা তোকে দিতেই হবে। রোগ, শোক, অনাহার কোনো কথাতেই তোকে টলাতে

পাবিনি, আজ তোর পায়ে হাত দিয়ে বলছি না দিলে আমার নরকনাশ হয়ে যাবে।”

ইন্দিরা সর্পাহতের মত চমকে সরে গিয়ে বললে, “দাদা, এ তুমি কি করলে?”

অহুপম বললে, “তুই যে পাষণী, মাহুষের কথায় ত তোর মন কোনোদিন গলবে না, তাই অমন কাজটা আমায় করতে হল। আমার কথা রাখ, তোর পাপ কেটে যাবে।”

ইন্দিরা বললে, “কার টাকা তুমি চাইছ জান? একি সত্যি-আমাব যে তোমায় দেব! তুমি কি জান না যে আমি শুধু বড়মাহুষের ঘব-সাজানো একটা আসবাব?”

অহুপম বললে, “স্বামীর ঘনে জীলোকের চিরকালের অধিকার; তার উপর এ ত তোর নিজের নামেবই টাকা।”

ইন্দিরা বললে, “কিন্তু জীর ভাষেরও কি তাতে অধিকার আছে? তোমায় পরের টাকার পাপে আমি কেন ভোবাতে যাব? আমার বাপের নামে কালি দিতে আমি তোমায় সাহায্য করতে পারব না।”

কিছুক্ষণের জ্ঞান অহুপমের বাক্যশ্রোতে বাধা পড়ে গেল। তার যুক্তির এমন উত্তর সে মোটেই আশা করেনি। কিছুক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে সে চূপ করে দাঁড়িয়ে রইল, কি একটা কথা বার বার তার ঠোঁটের আগায় এসে যেন ফিরে ফিরে যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ ইতস্তত করে অহুপম বললে, “কিন্তু ইন্দিরা, জগতে কি ওই একটা মাহুষের নামই কেবল তুমি নিষ্কলঙ্ক দেখতে চাও? ওর বাড়া কি তোমার আর কেউ নেই?”

কি একটা ভয়ে ইন্দিবার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল; সে বললে, “দাদা তুমি কি বলছ, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।”

অহুপম ইন্দিরার কানে কানে কয়েকটা কথা বললে। তারপর নীরবে তারা কতক্ষণ চূপ কবে বসে রইল। নিস্তব্ধতায় ছুজনের নিশ্বাসের শব্দ ছুজনে শুন্তে পাচ্ছিল। ইন্দিরার স্বপ্নের মুখখানা খেতপাথরের মত শাদা হয়ে গিয়েছিল, তাতে রক্তের লেশমাত্র দেখা যাচ্ছিল না। অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে সে বললে, “এখন যাও, কাল স্বপ্ন করবার তা আমি করব।”

অহুপম বললে, “কিন্তু ইন্দিরা, আমাকে—”

ইন্দিরা দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, “বলছি আমি ব্যবস্থা করব, তুমি এখনি যাও, নইলে টেঁচামেটি লাগিয়ে দেব।”

উঠে দাঁড়িয়ে ভীতমুখে অহুপম বললে, “ইন্দিরা, আমি যে তোর জন্তে এত করলাম আমার একটা কথা—”

ইন্দিরা দরজার দিকে এগিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, “আমি ডাকছি দরওয়ানকে।”

ভিক্সাভরা চোখদুটি ইন্দিরার মুখের উপর রেখে অহুপম দরজার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। ইন্দিবার চোখ জলে ভরে আসছিল, সে মুখ ফিরিয়ে অল্প দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সত্যি, যে তার জন্তে অত করল, তার একটা ভিক্ষা শোনবারও তার ক্ষমতা নেই। ভগবান, কেন তাকে ভিক্ষার উর্দ্ধে করলে না। ভাইকে উপহার সে দিতে পারত, কিন্তু ভিক্ষা কেমন করে দেবে?

সে রাত্রে কিশোরীমোহনের সঙ্গে ইন্দিরার কোন কথা হয়নি। পরদিন সকালবেলা কিশোরীমোহন যখন বিছানা ছেড়ে মোটে ওঠেন-নি তখনই ঝিকে ডেকে ইন্দিরা বললে, “খাজাফি মশায়কে একবার ভিতরে ডাক।”

ঝি অবাক হয়ে বধূঠাকুরাণীর মুখের দিকে চাইলে। ইন্দিরা তাকে কোনো প্রস্তাব করবার অবসর না দিয়ে বললে, “যাও, এখনি সোজা গিয়ে তাঁকে ডেকে আন, পথে দাঁড়াবে না, তাঁকে ও দাঁড়াতে দেবে না।”

বৃদ্ধ খাজাফি-মহাশয়ের সঙ্গে বাড়ীর সব মেয়েই কথা বলত। ইন্দিরার ডাকে বিস্মিত হয়ে এসে তিনি চিকের বাইরে দাঁড়ালেন। ঝি বললে, “কি বলতে হবে বল বউমা।”

ইন্দিরা বললে, “আমার মুখ আছে আমিও কথা কইতে জানি, তুই যা নীচ থেকে আমার পানের বাটা ছুটো মেজ্জু আন।”

ঝি চলে গেল। ইন্দিরা বললে, “খাজাফি-মশায়, আমার নামে কত টাকা জমা আছে, বলতে পারেন কি?”

খাজাফি বললে, “ইয়া মা পারি, পঞ্চাশ হাজার আছে।”

ইন্দিরা বললে, “সে সব টাকাই কি আমার? আমি ইচ্ছা করলেই কি খরচ করতে পারি?”

খাজাঞ্চি বললে, “মা আপনি মালিক, ভৃত্যকে লজ্জা দিচ্ছেন কেন? আপনি আজ্ঞা করুন, আমি কড়া-ক্রান্তি সব আপনার পায়ে ঢেলে দিয়ে যাচ্ছি!”

ইন্দিরা বললে, “আমার এখনি পঁচিশ হাজার টাকা চাই।”

খাজাঞ্চি স্বপ্নেও মনে করেনি যে ইন্দিরা এক কথায় অকস্মাৎ অতগুলো টাকা চেয়ে বসবে।

সে বললে, “একবার বাবুকে বলে দেবুলে—”

ইন্দিরা ব্যস্ত হয়ে বললে, “না, না, বাবুকে বলবার এখন সময় নেই। টাকা আমার এখনি চাই, তার পর বাকি বলবাব পরে বললেই হবে।”

খাজাঞ্চিকে অগত্যা যথাসম্ভব শীঘ্র টাকার ব্যবস্থা করতে হল। আঁচলে টাকা, নোট, মোহরের পুঁটলি বেধে ইন্দিরা ঘরে ঢুকল।

কিশোরীমোহন তখনও বিছানায় শুয়ে। ইন্দিরা

তাকে ডেকে তুলে বললে, “কতগুলো টাকা এক জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে।” কিশোরীর সঙ্গে কথা বলতে তার কণ্ঠে যে মাধুর্য্য হবে পড়ত, তাব উৎস ঘেন আজ শুকিয়ে গিয়েছিল।

বালিশের মধ্যে মুখটা গুঁজেই কিশোরী বললে, “কোথায়?”

ইন্দিরা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর শুষ্ককণ্ঠে বললে, “কাল রাত্রে দাদা আমার কাছে পঁচিশ হাজার টাকা চাইতে এসেছিল, সেই টাকা তোমাষ দিছি।” কিশোরী কোনো উত্তর দেবাব আগেই ইন্দিরা আবার বললে, “কাকে দিতে হবে দাদার কাছে জেনে নিও।”

কিশোরী তখনও চোখ বুজে উপুড় হয়ে শুয়েছিল।

সে কেবল বললে, “আচ্ছা।” টাকার পুঁটলিটা তার মাথার কাছে রেখে দিয়ে ইন্দিরা বাইরে বেরিয়ে গেল। কিশোরী কথা বলবার জন্ত কোনো ব্যস্ততা না দেখালেও ইন্দিরা ঘেন তার প্রশ্নেব ভয়েই দ্রুত পলায়ন করল।

রোজকার মত জীকে কিছু না বলেই আজও কিশোরী-মোহন যথা সময় দেশেব কাজে বেরিয়ে গেল। এ দিকে ঘুম থেকে উঠেই বড়বাবু যথাকালে পঁচিশ হাজার টাকার

কথা শুনলেন; তারপর শুনলেন গৃহিণী, তারপর শুনলেন সরযু, তারপর যমুনা সরস্বতী মানদা কেমদা, ইত্যাদি ইত্যাদি। বাবুদেব বাড়ীর কাক-পক্ষীও সে-কথা নিয়ে আলোচনা শুরু করল। মনটা ইন্দিরার আজ ভাল ছিল না। কিন্তু মন ভাল নেই বলে ত আব চন্দ্র-সূর্যের কাজে অবহেলা করা চলে না। নন্দীহাটির বাবুবাও এ বিষয়ে চন্দ্র-সূর্যের গোত্রভুক্ত। মৃত্যুব পরোয়ানা দরজায় এসে দাঁড়ালেও সে বাড়ীর লোকের চুলের সিঁথি কাটতে কি সর ময়দা বেগমের প্রসাধন করতে কোনো ভুলচুক হয় না। ইন্দিরা যখন সকালবেলাব সাজসজ্জার পর যথারীতি দ্বিপ্রহরের সজ্জার আয়োজনে ব্যস্ত তখন তার ঘরে আত্মীয়্য কুটুম্বিনীরা মিছিল কবে এসে উপস্থিত হলেন। - গৃহিণী বধূর ঘরে বড় যেতেন না, তিনি শাশুড়ী, বধূর কিছু দরকার পাকলে ত সেই তাঁর কাছে আসবে, এই ছিল তাঁর নিয়ম। হুতরাং আজ তাঁকে দূত পাঠিয়ে ঘরেই থাকতে হল।

ঘরে ঢুকেই সর্বাগ্রে সরযু বললে, “বৌ আমাদের একেবাবে নির্ধিকার পরমহংস, অতগুলো টাকা যে গেল ত গ্রাহ্যই নেই, কেমন আপন মনে সাজসজ্জা হচ্ছে।” অবশ্য সরযুর নিজের সাজসজ্জার যে কোন ক্রটি হয়েছিল তা নয়।

ইন্দিরা চুপ করে আলনা থেকে গিলে দিয়ে কোঁচান শান্তিপুরে শাড়ীটা তুলে খাটের বাজুর উপর রাখলে। তারপর রূপার খড়কে দিয়ে গন্ধ তৈলের সঙ্গে সিঁদুর গুলতে শুরু করল।

কথার উত্তর না পাওয়াতে সরযু অত্যন্ত চটেছিল। সে বললে, “হাঁ বউ, তুমি না-হয় বড়মাছুষ আছ, তা আমরা গরীব হলেও ত ঘরের লোক; অতগুলো টাকা দিয়ে কোন্ কান্দালের পেট ভরালে তা জানতেও কি আমাদের অপরাধ হবে?”

অপমানে ইন্দিরার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল। সে তবু বললে, “আমার টাকা আমার বাকে খুসী তাকে দিয়েছি, সভা ডেকে তার কৈফিয়ৎ দেবার ত আমার কথা নয়।”

যমুনা বললে, “ইস, বৌদিব যে আজ বড় তেজ।”

সরস্বতী কায়দা-মাস্কিক কথা বলতে জানত না বলে এ বাড়ীতে তার চিরকাল বদনাম ছিল। সে বলে বসল, “তবু যদি না চিংড়ি-মাছ চচ্চড়ি খেয়ে দিন কাটত। বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলো পারা চক্র।”

তার গ্রাম্য রসিকতার আজ আব কেউ খুঁৎ ধরল না, বরং তার এই একটা বিক্রপের খোঁচায় বনিয়াদী বাড়ীর সমস্ত সভ্যতার অভরণ এক নিমেষে খসে পড়ল। মনের অমার্জিত কোণে যার যত আবর্জনা ছিল, একটা উত্তেজনার নেশায় পড়ে সব কখন যে বাইরে বেরিয়ে এল, তা তারা নিজেরাই বুঝতে পারলে না। মানদা বললে, “একেই বলে—তোর শিল তোর নোড়া, ভাঙি তোরাই দাঁতের গোড়া।”

ক্ষেমদা বললে, “রোসো আমাদের কিশোরীর ঘুঁটে-কুড়ুনীর জামাই হবার সখ হয়েছিল তার জের কি অমনি মিটেবে? এখন কপালে আরো কত হা-ঘবের বাঁ-পায়েব লাগি আছে তাই দেখ, এই ত সবে কলির আরম্ভ।” ক্রমে সুর আরো চড়তে লাগল, ইন্দিরার পিতৃ-পিতামহকে নানা অভদ্র সম্ভাষণের পর যখন নন্দীহাটির অস্ত্রঃপুরিকাদের পোষাকী সভ্যতাটা অকস্মাৎ সচেতন হয়ে উঠল, তখন তারা মুখ সামলে নিতেই লজ্জা বোধ করছিল। এতক্ষণ তারা যে অসভ্য ও অভদ্র ব্যবহার করেছে সেটা নিজেদের কাছে স্বীকার করতেই তাদের গর্বে আঘাত লাগছিল। তাই নিজেদের লজ্জা ঢাকবার জন্তে তারা অভদ্রতাটাকে অজ্ঞানের প্রতিবাদরূপে নিজেদের মনের কাছে খাড়া করে নিয়ে সেই পথেই আরো উৎসাহে এগিয়ে চলল। কিন্তু আসল সমস্যাটা যেখানকার সেখানে রইল।

মাছুষেব কথার বিষে মাছুষকে যতখানি জর্জরিত করা যায়, ততখানি করে তারা গৃহিণীর দরবারে হাজির হল। সেখানে যে ইন্দিরার ডাক পড়ল তা বলাই বাহুল্য। গৃহিণী বললেন, “কাকে টাকাগুলো দিয়েছ বল। অমন করে লুকিয়ে রাখা কি ভদ্রঘরের বোয়ের উপযুক্ত কাজ? এখন দাসীচাকর-মহলে জানাজানি হয়ে যাবে। ছোটলোকে আমাদের কথায় কথা বলবে সেই কি ভাল হবে?”

ইন্দিরা অমানবদনে বললে, “আমাব আপনার লোককেই দিয়েছি।”

সরস্বতী বললেন, “ওই যে সেই ছুঁচমুখো ভাইটা কাল বাস্তব বেলা স্টু স্টু করে ঘবে ঢুকছিল তাকেই সব ধরে দেওয়া হয়েছে, বুঝলে না?”

বেদনা-ক্লিষ্ট মুখ যথাসম্ভব শাস্ত করে ইন্দিরা বললে, “না আমার ভাইকে আমি একটা কানা-কড়িও দিইনি।”

ক্ষেমদা বললেন, “বউ যাহোক সাফাই জানে! ভাইকে দাঙনি, ভেঁয়ের হাতে বাপকে পাঠিয়েছ বুঝি?”

ইন্দিরা বললে, “আমার বাবা মেয়ের টাকা পা দিয়েও ছোঁন না।”

কে যেন বললে, “কি নবাব বাদশারে!”

সরস্বী বললে, “তবে তোমাব কোন আপনার লোককে দিলে তাই বল না।”

শ্রেয় বিক্রপে আবার চাবিদিক ভরে উঠল।

ইন্দিরা বললে, “বলব না।”

গৃহিণীর মুখে আর কথা আসছিল না। দাসদাসীর দল সাবাক্ষণ দালানে বারাণ্ডায় ঘুরছিল। তাদের মুখের ভাব কি চলার গতিতে কোতুল ধরা না পড়লেও তারা যে-সব কথা সাগ্রহে সংগ্রহ করছিল গৃহিণীর তা বুঝতে বাকি ছিল না। তিনি রুদ্ধ রোষ অনেক কষ্টে চেপে বললেন, “বৌমা, আজ তুমি একবার বাপের বাড়ী আসতে যাও। অনেকদিন তাঁদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি।”

ইন্দিরা বললে, “তাই যাচ্ছি।” ইন্দিরা ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল। পিছনে তার “আপনার লোক” সম্বন্ধে তখনও সরবে বহু মন্তব্য চলছিল।

গাড়ী চড়ে ইন্দিরা যখন বাপের বাড়ীর পথে বেরুল, তখন একবারও সে চোখ তুলে চাইতে সাহস করেনি। যে বাড়ীর বউ চিত্তায় শোবার আগে কখনও শব্দরবাবাড়ীর বাহিরে ঘুমোয় না, তার এমন অসময়ে পিতৃদর্শনে যাত্রার অর্থ যে দাস-দাসী আত্মীয়-কুটুম্ব সবাই কি বুঝেছে তা ভাবতেও ইন্দিরার মাথা কাটা যাচ্ছিল।

যতক্ষণ সে গাড়ীতে ছিল ততক্ষণ চোখ বুজেই সে কাটিয়েছে। নিজেব মুখ দেখানোর লজ্জাটা পরের মুখ না দেখে সে ভুলতে চাইছিল।

সহরতলীতে সেই একতলা বাড়ীর দরজায় গাড়ী গিয়ে থামল। বাড়ীর জীর্ণ দেওয়াল আরও জীর্ণ হয়ে গিয়েছে, কেরসিনের টিনে ঘেবা রান্না বারান্দা কত বর্ষাব জল লেগে শতছিন্ন হয়ে এসেছে, তার গাষের মর্চে খসে খসে চারধারে পড়েছে, তারি পাশে তেল হলুদের দাগে ভরা তার মাঘের ময়লা শাড়ীখানা একটা দড়ির উপর শুকোচ্ছিল। পুরোনো দিনের ছবিগুলি ইন্দিরার চোখে ভেসে উঠল; কিন্তু ভাল করে সেগুলো তখন আর সে দেখতে পারছিল না।

ঘরের মধ্যে ইন্দিরার মা শুধু মেঝেতে শুয়ে পড়ে-ছিলেন, তাব পায়েব শব্দে চোখ চেয়ে ইন্দিরাকে দেখে তিনি কেঁদে উঠলেন, “ওরে আমাব অহু কোথা গেল বে!” ইন্দিরার বৃকের ভিতর ছম্ ছম্ করে উঠল। দবজা ধরে সে চূপ করে দাঁড়িয়ে রইল, কোন কথা জিজ্ঞাসা করুতেও তার সাহস হচ্ছিল না। সমস্ত বাড়ীটার শোকার্ত

মুষ্টি তার মনটা আরো অন্ধকার করে তুলেছিল। কান্নার শব্দে তাব বাবা এসে দাঁড়ালেন। ইন্দিরা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চোখ ভুলে একবার তাঁর মুখেব দিকে তাকাল। হবিনাথ বললেন, “আপিসে দু হাজার টাকার গোলমালের জন্তে আজ সকালে অহুপমকে পুলিশে নিয়ে গেল। কাল বাত্রে নাকি তোমার কাছে তার দুহাজার টাকা পাবার কথা ছিল, তুমি তা দাওনি বলে আজ তাকে জেলে যেতে হচ্ছে—এই কথা সে যাবাব সময় বলে গেল। সন্তানের মঙ্গলের জন্তে তাকে চোখে দেখবার অধিকার-টুকুও বিদর্ভন দিয়ে বড়ঘরে তাকে বিয়ে দিয়েছিলাম, ভগবান এই তার পুরস্কার দিলেন।”

ইন্দিরার মাথার ভিতবে সমস্ত গোলমাল হবে গেল। একথা ত-কাল অহুপম তাকে বলেনি। তবে বৃষ্টি যাবাব সময় বার বার এই কথাই সে ইন্দিরাকে বলতে চেয়েছিল। সে নিষ্ঠুর, অপমানের ভয় দেখিয়ে তাকে বিদায় করে দিয়ে-ছিল। হায় ভগবান! আজ কে বিশ্বাস করবে যে তাব মান বন্ধাব জন্তেই এত বড় বিপদকে সে বরণ কবে নিয়েছে।

যে পিতা তাকেই আজ সবচেয়ে বড় দোষী ঠিক করেছেন, তাঁরই মান বন্ধার জন্তে যে সে আজ কতদিন ধরে কত রুদ্ধ বেদনা বয়ে বেড়িয়েছে তা কে বিশ্বাস করবে? কিন্তু আর একজনের মানের কথা যে অহুপম কাল তাকে বলেছিল এর সঙ্গে তার সম্পর্ক কি?

সাবারাত ইন্দিরা ঘরের মধ্যে চূপ করে বসে রইল। বেড়া আঙনের মত দারিদ্র্য আব ঐশ্বর্য যেন তাকে দুই দিক দিয়ে ঘিরে ধরেছিল। কোনদিকে তার নিস্তার নেই। সেখানে ছিল দাবিদ্র্য তার অপরাধ, এখানে ঐশ্বর্যই তার অভিশাপ। তার বাপ মা অপরাধিনী কন্যাকে একটা প্রশ্নও করলেন না, কুশলও জিজ্ঞাসা করলেন না। পুত্রের বিচ্ছেদ ও অপমানের ব্যথায় ইন্দিরার স্মৃতি যখন ইন্ধন, তখন তার দিকে কে ফিরে চাইতে পাবে?

খোলা দরজার গোড়ায় বসন্ত দিনেব ভোরের বাতাসে ইন্দিরা বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। মেঝের উপর অশ্রুসিক্ত মুখে এলোচুলে তার মাও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। বাহিরের বারান্দায় হরিনাথও নিদ্রাতুর। সাবারাত্তির জাগরণেব পর সকালের বোদও তাদের ভোবের নিদ্রা ভাঙতে পাবেনি! এমন সময় দরজায় গাড়ীব শব্দে তাদের ঘুম ভেঙে গেল। কিশোরীমোহন গাড়ীর থেকে লাফিয়ে নেমেই ঘরে এসে ঢুকল। ইন্দিরা তাকে দেখে মাথায় কাপড় দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই কিশোরীমোহন মান হাসি হেসে বললে, “বাড়ী চল। এত অভিমান ভাল নয়।”

ইন্দিরা বললে, “চল, যেখানে নিয়ে যাবে বাই, এবাড়ীব কাছে আমি বা অপরাধ কবেছি তাতে আমাব সকল অপরাধ তুচ্ছ। এখানের চেয়ে বেশী অপমানের ভয় সেখানে আর আমাব নেই।”

কিশোরী বললে, “কি কবেছ তুমি?”

ইন্দিরা বললে, “আমার দাদার মান বাঁচবে ভেবে আমি তাকে জেলের আসামী করে ছেড়েছি।”

কিশোরী বললে, “তার জন্তে আমিই দায়ী। তোমাব কাছ থেকে টাকা আদায় করতে আমিই তাকে পাঠিয়ে-ছিলাম। আমি ভীক, দেশ উদ্ধারের জন্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে দেবাব প্রতিজ্ঞা কবেছিলাম, কিন্তু তুলতে ত

পারিহিনি, ভিক্ষাব লজ্জাও সহিতে পারিনি বলে অস্ত্রের শরণ নিবেছিলাম। ভয় ছিল পাছে আমার এ অপরাধ বারবার গোচরে পড়ে আব লজ্জা ছিল জীবর কাছে চেয়ে নেবার দীনতার। নিজের কথা বেশী ভাবতে গিয়ে পরের কথা ভাবতে ভুলে গিয়েছিলাম।”

ইন্দিরা বললে, “সে-সবই আমি জান্তাম।”

কিশোরী বিস্মিত হয়ে বললে, “তবে সে-কথা কাউকে বলনি কেন?”

ইন্দিরা নতমুখে বললে, “তুমি যে কাউকে বলতে চাও নি। আর পৰ্য্যন্ত তোমাব ওই একটিমাত্র গুপ্তধন ত আমি পেবেছি, তাও তোমার অজ্ঞাতে, কি করে তা সবাইকে দি?” তার পব অত্যন্ত সঙ্কচিত হয়ে ইন্দিরা বললে, “কিন্তু যেটুকু আমি জান্তাম না, সেইটুকু ত বললে না।”

কিশোরী বললে, “ওই টাকা আদায় করে দিলে তাকে ছ হাজার কমিশন দেব বলেছিলাম। অনেকদিন ধরেই সে আপিসেব তহবিলে হাত দিতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু ভরসা ছিল তোমার রূপাষ তরে যাবে। তাই তার সেই ছিদ্রটুকুর পথে আমি নিজের কার্য্যউদ্ধার করবার ব্যবস্থা করেছিলাম।”

ইন্দিরা বললে, “কিন্তু তুমি ভুল বুঝেছিলে। নিজের এ অপমানের কথা ত সে আমায় বলেনি।”

কিশোরী বললে, “পারেনি বোধহয়। মানুষকে যে সব মানি সব ক্ষুদ্রতা নীচতার উপরে দেখতে চায়, তার কাছে নিজের মানি ক্ষুদ্রতা নীচতার লজ্জা স্বীকার করা যে কত শক্ত তা আমি বুঝেছি।”

শ্রী শান্তা দেবী

নিশীথে

গভীর শান্তি এনেছে নিশীথ রাত্তি,
শয়ন-আগারে নিবিয়া আসিছে বাতী।
আমার স্তম্ভি আমার নয়ন হতে
কে করিল চুবি, করিল কেমন মতে?
খোলা বাতায়নে স্থাপিয়া দুইটি আঁধি,
আনমনা পারা বাহিরে চাহিয়া থাকি।
দু'একটি তারা একটু আলোক দানে,
যেন ভয়ে ভয়ে নিরখে ধরার পানে।
স্বদূর নীড়ের একটি একক পাখী,
ঘুমহীন চোখে কখনো উঠিছে ডাকি।
পাণ্ডুর চাঁদ জ্যোতিহীন খোলা চোখে,
চাহিছে কখনো কৃষ্ণ মেঘেব ফাঁকে।

ক্লান্ত বাতাস সারাদিন ঘুরে ফিরে,
ঘুমায়ে পড়েছে শুদ্ধ তরুর শিরে।
দু'একটি পাতা উঠিছে কোথাও হলে,
কুসুম কলিকা বরিছে বিটপী-মূলে।
বিপুল আঁধার ছেয়েছে ধরার কায়া,
ঘনায়ে আসিছে অদেহী কিসের মায়া।
কি যেন শান্তি, কি যে গো অতল স্থখ,
ভরিয়া তুলিছে একটি আকুল বুক।
আজি এ নিশীথে ঘুমেব রাবিয়া দূবে,
এ আঁধার রূপ বাধিব নয়নে পুরে।
যৌন ঘামিনী—একাকী সাধীর সম,
চাহিয়া রহিবে, নিকটে রহিবে মম!

শ্রীঅমিয়া চৌধুরী

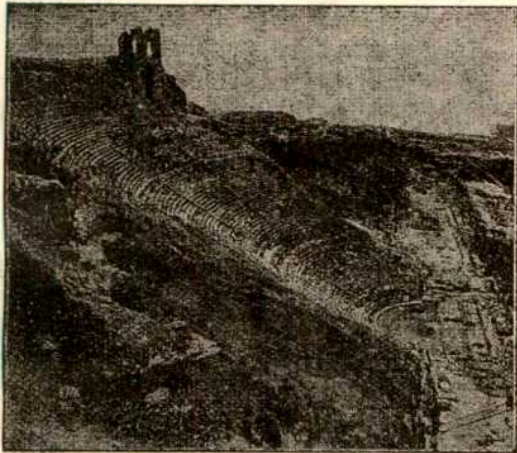


গ্রীস দেশের প্রাচীন কীর্তি আবিষ্কার—

১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরিয়া গ্রীস দেশের প্রাচীন কীর্তি খননের চেষ্টা চলিতেছে। লণ্ডনের বার্কবেক্ কলেজের অধ্যাপক মিঃ এক্ এইচ্ মার্শাল সম্প্রতি একটি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সেই চেষ্টার ফলে কি কি প্রাচীন কীর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে চিত্রের সহিত তাহার পরিচয় দিয়াছেন।

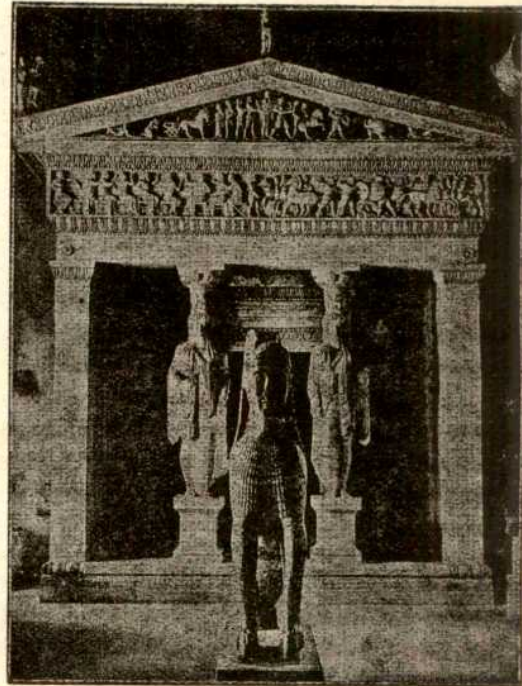
উত্তর গ্রীসে, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে, এথেন্সের কাছাকাছি জায়গায় খনন-কার্য আরম্ভ হয়। প্রায় কড়ি বছর ধরিয়া এই কাজ চলে। ধ্বংসাবশেষে যে-সব জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা অনৈতিহাসিক যুগের খৃষ্টপূর্ব প্রায় ১০০০-৭০০ শতাব্দীর। ১৮৭০-৭৪ খৃষ্টাব্দে টানাগ্রা নামক স্থানে যে-সব জিনিষ আবিষ্কৃত হয় তাহাতে বিশেষজ্ঞ লোকেরা চমৎকৃত হইয়া যান। এখানে একটি আখটি নয়, একেবারে অনেকগুলি মূর্তি পাওয়া যায়; সেগুলি মাটি ও বালি দিয়া তৈয়ারী আর আধুনিক পুতুলের মত চক্চকে ও স্বক্সকে। মূর্তি-গুলি ছোট ছোট মাত্রের। যে-গুলি মেয়েদের মূর্তি তাহাতে আবার পোষাক-পরিচ্ছদের বাহার অতি চমৎকার। চারিদিকে কবরের সন্ধান করিতে করিতে যে-সব কবর দেখিতে পাওয়া গিয়াছে তাহার আবার সব এক আকারের নয়, নানা আকারের। কোথাও পাহাড়ের গা কাটিয়া কবর করা হইয়াছে, কোথাও বা ইট-পাথর দিয়া তৈয়ারী। যে-সমস্ত মূর্তির উল্লেখ করিলাম, তাহার মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত প্রাচীন, কবেকার ঠিক ধরা যায় না। তবে অধিকাংশই খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ডোডোনা নামক স্থানে খনন আরম্ভ হয় এবং ১৮৯২ সালে উত্তর গ্রীসের ডেল্ফি নামক স্থানে। অর্কোমেনস্ নামক স্থানে একটি অদ্ভুত মৌচাকের মত কবর দেখিতে পাওয়া যায়।



পারগামনের প্রাচীন থিয়েটার গৃহ।

ইতিমধ্যে ইউলিসিসের মন্দিরের অবস্থান নির্ণীত হয়। এই জায়গায় কতকগুলি মূল্যবান ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। মন্দিরটির চারিদিকে প্রচুর জায়গা, সামনে একটি প্রকাণ্ড দালান, তাহাতে বোধ হয় রোগীরা রোগ সারাইবার জন্য স্বপ্নলক ওষধের আশায় হত্যা দিষ্টা পড়িয়া থাকিত। এথেন্সের কাছে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে একটি প্রকাণ্ড প্রাচীর পাওয়া গিয়াছে। একটি এক-শত ফুট লম্বা মন্দিরও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মন্দিরের অধিকৃত অনেক সুন্দর ভাস্কর্য-বুদ্ধ জিনিষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, এগুলি আগে রঙিন ছিল বলিয়া বোধ হয়। বিণ্ডিয়া নামক পাহাড়ের উপর আর-একটি মন্দিরের অবস্থান জানিতে পারা গিয়াছে। শিলালিপি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে মন্দিরটি এপোলোর (সূর্য) পূজার জন্য নির্মিত। মন্দিরে একটি আশ্রম সংলগ্ন ছিল। আর দৈববাণী শুনিবার জন্যও একটি গৃহ ছিল। এখানকার কবিগিরি মন্দিরও নূতন আবিষ্কৃত। এ মন্দিরটি প্রাচীন, মাঝে মাঝে সারানো হইয়াছিল মাত্র। এটির গঠন স্বতন্ত্র। গ্রীসের অগ্রাঙ্ক মন্দিরে দেখা যায় ভিতরে তিনটি ভাগ; কিন্তু এই মন্দিরটির ভিতরে চারটি ভাগ। এ মন্দিরের উপাস্ত্র দেবতা ভূগর্ভস্থ জীবাদির মত। সামোথেস নামক দ্বীপে ও বিণ্ডিয়াতে এই রকম দেবতার পূজা আরম্ভ হয়। থিবস্-এ আবার এই দেবতার পিতাপুত্র



ডেল্ফির এক ধনভাণ্ডারের বহির্ভাগ—সামনে শিব্-স্-এর মূর্তি।

মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মাটির জিনিষপত্রে সূক্ষ্মতার পরিচয় নাই, সেগুলি ব্যঙ্গপূর্ণ। ঘণ্টা, চক্র, গরুর মূর্তি প্রভৃতি দেবতার স্তুতিগানের সহিত খোদাই করা আছে।

ডেল্ফি-তে গ্রীসের সর্বপ্রধান দৈববাণীর মন্দির ছিল। এখানে পর পর অনেক জায়গা খুঁড়িয়া অনেক জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মন্দিরে বাইবার পথের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নানা স্থানের রাজা-রাজ্ঞীদের উৎসর্গ-করা অনেক জিনিষের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। করসিরীয়ানরা এক ধাতুনির্মিত বলদ উৎসর্গ করিয়াছিল এবং স্পার্টার অধিবাসীরা এক জয়লাভের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে আটত্রিশটি ধাতু-মূর্তি মন্দিরে প্রদান করে,—এ সমস্তই আবিষ্কৃত হইয়াছে। আরো পাওয়া গিয়াছে অনেক ছোট ছোট ধনভাণ্ডার। এগুলি গ্রীসের নানা সহরের অধিবাসী কতৃক প্রদত্ত বা নির্মিত। এই সমস্ত ধনভাণ্ডারের উপর ভাস্কর্যের কৌশল অনেক আছে। এই-সব ভাস্কর্য আবার গ্রীসের কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত করিতেছে—দেবতাদের অধিপত্য-লাভের যুদ্ধ, হোমরের কাব্যে বর্ণিত যুদ্ধ, প্রেম-কাহিনী, ইত্যাদি। নাক্সস্ দ্বীপের লোকেরা যে ধনভাণ্ডার নির্মাণ করিয়াছিল তাহার সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড ফিক্সস্-এর মূর্তি। এ ধনভাণ্ডারটির কার্যকাণ্ড অতি চমৎকার। পূর্বে এ মূর্তিটি ছিল এ্যাপোলোর মন্দিরের দক্ষিণ দিকে। এই বিখ্যাত এ্যাপোলো-মন্দিরের অল্প অবশেষই এখন দেখিতে পাওয়া যায়। ধারুমস্, মেগারা, ইজিনা, রিটসোনা প্রভৃতি স্থানেও অনেক ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এতদূর গেল উত্তর গ্রীসের কথা।

এইবার পেলোপেনেসস্-এর আবিষ্কারের কথা। ইহাদের মধ্যে মাইসিনি ও অলিম্পিয়া নামক স্থানের আবিষ্কারসমূহই বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। মাইসিনির এক নগরের মধ্যে কতকগুলি কবর পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের উপরটা ঠিক মোচাকের মত দেখিতে। আরো যে-সমস্ত জায়গা খোঁড়া হইয়াছে ও অনেক উল্লেখযোগ্য জিনিষ পাওয়া গিয়াছে তাহাদের কয়েকটির নাম আমরা দিলাম, সবগুলির দেওয়া অসম্ভব :—টিজিয়া, এপিডরাস্, ভ্যাকিও, মোগালো-পলিস্, আরগস্, লাইকোথ্রা, টিরিন্স্, ম্যানটিনিয়া, করিন্থ্ ও স্পার্টা। ইহা ছাড়াও ট্রয় এবং অজ্ঞাত অনেক দ্বীপে এবং এশিয়া মাইনরের অনেক জায়গায় অনেক প্রাচীন কীর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনু-সন্ধিৎসু ব্যক্তি মার্শাল সাহেবের পুস্তক পড়িলে উপকৃত হইবেন।

অদ্বুত সামুদ্রিক জানোয়ার—

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা আধুনিক কালে লুপ্ত ইক্টিওসরাস্ নামে এক প্রকাণ্ড সামুদ্রিক জানোয়ারের সন্ধানে ব্যাপৃত আছেন। জন্তুটির ছবি আমরা দিলাম। ছবি দেখিয়া মনে হয় জীবটি সামুদ্রিক সরীসৃপ বিশেষ। জার্মানি প্রভৃতি জায়গায় যে-সব জীবকঙ্কাল সংগৃহীত হইয়াছে তাহা হইতেই বৈজ্ঞানিকেরা এই সরীসৃপের ধারণা করিয়াছেন। আর এখনও ইক্টিওসরাস্ এর মত যে-সব সামুদ্রিক জীব দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের গতিবিধি ও খাদ্য-রুচি দেখিয়া বৈজ্ঞানিকেরা ইক্টিওসরাসের গতিবিধি ও খাদ্য প্রভৃতি নির্ণয় করিতেছেন। বৈজ্ঞানিকেরা আরো বলিতেছেন যে, এই জীব খুব সম্ভব ডাক্সার কোন জানোয়ারের বংশধর। কিন্তু ইহাদের শরীরের গঠন দেখিয়া বোধ হয় ইহার ডাক্সার চলিতে একেবারে অক্ষম। জলে সাঁতার দিবার মতই এদের ক্ষেত্রের গঠন। ইক্টিওসরাসের মুখ ছিল গাংদাড়া মাছের মত লম্বা ঠোঁট-ওয়ালা। গলা ছিল না বলিলেই চলে, এইজন্তু জলে সাঁতার দিবার ইহার খুব সুবিধা। এমন কি বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান



ইক্টিওসরাস্—অধুনা লুপ্ত প্রকাণ্ড সামুদ্রিক জীব।

করেন, যে, জলে যত জীব সাঁতার দিয়া বেড়ায় সকলের মধ্যে ইক্টিওসরাস্ই বেশী দ্রুতগামী। এদের লম্বা দাড়ার উপর ছোট ছোট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দাঁত। তিনি মাছের সঙ্গে ইহার এক জায়গায় মিল আছে, সেটি হইতেছে ভাসিয়া উঠিয়া আবার সমুদ্রের অতলে ডুবিয়া চলিয়া যাওয়া। তিমির খাদ্য মাছ, ইহারও খাদ্য মাছ। ইহার গা কোন ঝাঁপ বা শক্ত চামড়ায় ঢাকা নয়। কিন্তু ইহার সামনের ও পিছনের পাখা বেশ শক্ত চামড়ায় ঢাকা। ইহার মাথার আকার এরূপ যে ইহাকে দেখিলেই এক ভীষণ কদাকার জীব বলিয়া মনে হয়। ইহাদের দুই পাশের পাঞ্জরার আকার এরূপ যে জলে ডুবিলার সময় অনেকটা বায়ু ইহার টানিয়া লইয়া যায়। গভীর সমুদ্র ছাড়াও অপেক্ষাকৃত কম গভীর উপসাগর প্রভৃতিতেও ইক্টিওসরাসের সন্ধান মিলে। এখনও ইহাদের নাতিপুত্রদের কেহ বাঁচিয়া আছে কি না কে জানে! বৈজ্ঞানিকেরা ছাড়িবার পাত্র নন। তাঁদের অক্লান্ত অনুসন্ধান চলিয়াছে।

প

তারহীন টেলিগ্রাফ—

গুপ্তলিএন্সো মার্কনি ইহার আবিষ্কর্তা। ইহার জন্ম ইটালীর বোলোনা সহরের নিকট এক স্থানে, ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ২৫শে এপ্রিল। জগতের অজ্ঞাত বিখ্যাত আবিষ্কর্তাদের অবস্থা প্রায়ই ধারাপ দেখা যায়, সেই দিক হইতে মার্কনির ভাগ্য ভাল ছিল। তাঁহার পিতা এবং মাতা উভয়েই বড়লোক ছিলেন। বাল্যকালে মার্কনির শিক্ষার জন্ত কোনদিন কোন রকমের কষ্ট হয় নাই। তিনি স্বথের কোলে মানুষ হন।

তার পাঁচ বছর বয়সের সময় তিনি বনের ফলের রস হইতে একপ্রকার কালি আবিষ্কার করেন। এই কালি দিয়া কাপড়ে নাম লিখিলে কোন রকমেই তা উঠিত না। মায়ের কাছে কোন উৎসাহ না পাইয়া ১১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তার অজ্ঞ কোন আবিষ্কারের দিকে মন যায় নাই।

১৬ বছর বয়সের সময় তিনি বিনা তারে বৈদ্যুতিক শ্রোত এক স্থান হইতে অজ্ঞ স্থানে পাঠাইতে চেষ্টা আরম্ভ করেন। কিছুকাল পূর্বেই অধ্যাপক হার্জ এই বিনা-তার বিদ্যুৎ-শ্রোত-প্রবাহ আবিষ্কার করেন। বালক মার্কনি তাহার সাহায্যে গবর আদান-প্রদানের চেষ্টা শুরু করিলেন।

১৮৯৫ সালে মার্কনি প্রথম তাঁহার বিনা-তারে খবর-পাঠান-কলের পেটেট বা স্বক্স রেজেষ্টারি করেন। তখন এই বেতারে মাত্র দু' মাইল খবরের আদান-প্রদান হইত। কিছুকাল পরে যখন তিনি বলিলেন যে ইহাতে নয় মাইল পর্য্যন্ত খবর পাঠান চলিবে, তখন লোকে তাহাকে উপহাস করে, কেহ কেহ আবার তাহাকে পাগল বলে।

গেয়ো বোগী ভিখু পায় না—তাই দেশের লোকের কাছে আদর এবং উৎসাহ না পাইয়া তিনি তাঁহার কলকজা লইয়া ১৮৯৬ সালের মে মাসে ইংলণ্ডে চলিয়া যান। সেই সময় ইংলণ্ডের পোষ্টাপিস বিভাগের বড় কর্তা স্তার ডাব্লিউ এইচ পিয়ামের নিকট মার্কনি খুব উৎসাহ এবং অভ্যর্থনা পান।

ইংলণ্ডে প্রথমে টেমস্ নদীর উপর বেতার খবর পাঠান হয়। টেমস্ নদী মাত্র ৭৫০ ফুট চওড়া। ১৮৯৭ সালের জুন মাসে ১২ মাইল পর্যন্ত বেতারের খবর পাঠান হইতে লাগিল। পরের বছর ১২ মাইলের স্থানে ৩২ মাইল হইল। সেই বছর রাণী ভিক্টোরিয়া

হইতেছে। বেতার টেলিফোনের অদ্বুত উন্নতি হইতেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৫০,০০০ লোকে বেতারে খবর প্রেরণ ও গ্রহণের কাজে লাগিয়া আছে।

মাথার খুলির শক্তি—

সিগ্‌মন্ট ব্রেইটবার্ট নামক একটি লোকের নাম “লোহারাজ” হইয়াছে, তাহার মাথার খুলির অসামান্য জোরের জন্ত। একটা ও



গুগ্লিয়েল্মো মার্কনি, তারহীন টেলিগ্রাফের
অস্বতম উদ্ভাবক।

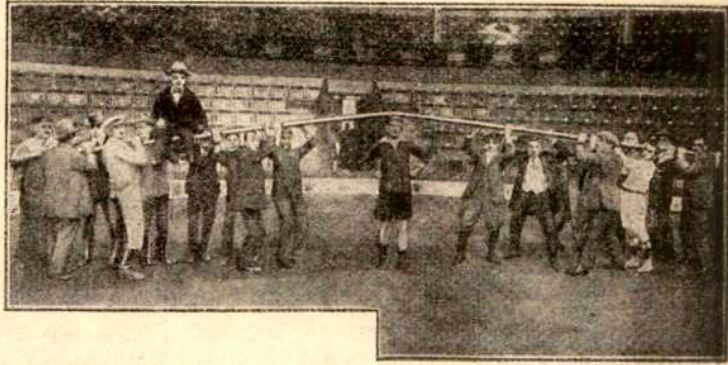
এবং যুবরাজের মধ্যে বেতারের সাহায্যে ১৫০ টি খবর দেনা-পাওনা হয়। যুবরাজ তখন সমুদ্রে এক জাহাজে ছিলেন। প্রায় ৭০০ খবর আয়লণ্ডে ডাব্লিন সহরে বেতারের সাহায্যে পাঠান হয়।

২৪ বৎসর বয়সে মার্কনি জগৎবিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কাছে সম্ভ্রাজত্ববাদীর প্রশংসা ক্রমাগত আসিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু এই প্রশংসা-বাণী তাঁহাকে গর্বে পূর্ণ করিতে পারে নাই। তিনি কম কথা বলিতেন, সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং বেশ ভাল পোষাক পরিয়া থাকিতেন। তাঁহার টাকার ভাবনা ছিল না। বেতারের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল।

বেতারের সর্বাপেক্ষা গৌরবের ক্ষণ ১৯০১ সালের ১২ই ডিসেম্বর রাজি সাড়ে বারেটা। সেই সময় মার্কনি নিউফাউন্ডল্যান্ডের সেন্ট জন্স নামক স্থানে নিজের পরীক্ষাগারে বসিয়াছিলেন। এ্যাটলান্টিক মহাসাগরের পরপার হইতে কর্ণওয়ালের পোলধু নামক স্থান হইতে আর-এক জন তাঁহার কাছে বেতারে ইমারা করিতে লাগিল। মার্কনির রিসিভারে (সংবাদ-গ্রাহক যন্ত্রে) ক্রমাগত S অক্ষরটি বাজিতে লাগিল। মার্কনির আনন্দ এবং উৎসাহ আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। ১৯০৮ সালে ব্যবসার সুবিধার জন্ত এ্যাটলান্টিকের এপার হইতে ওপারে সংবাদের আসা-বাওয়া হইতে লাগিল।

১৯১৪ সালে পৃথিবীর বড় বড় জাতিরা প্রত্যেক সমুদ্র-যাত্রী জাহাজে বেতার রাখিবার নিয়ম করিলেন। ১৯১৬ সালে আমেরিকার ওয়াশিংটন সহর হইতে পারি সহরে বেতার টেলিফোনে কথাবার্তা হইল—৩৭০ মাইল তফাতে বসিয়া দু'টি লোক কথাবার্তা বলিতেছে! কিছুকাল পরেই ওয়াশিংটন হইতে হনোলুলুতে বেতার টেলিফোন চলে—ইহার দূরত্ব ৫০০০ মাইল!

বর্তমান সময়ে জগতের শতকরা ১৫ ভাগ খবর বেতারে পাঠান



মাথার খুলির তাগদ।

ইকি মোটা লোহার ডাণ্ডা তাহার মাথায় রাখিয়া সেই ডাণ্ডা ধরিয়া কুড়িজন লোক কুলিতে থাকে। “লোহারাজ” না নড়ন্ না চড়ন্ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। এই লোহার ডাণ্ডার উপর প্রতি বর্গইঞ্চিতে ১৫০ পাউণ্ড ওজনের চাপ পড়ে।

দাড়িতে মোমাছির চাপ—

মোমাছির যখন উড়িয়া আসিয়া কোন জিনিষের উপর বসে,



মোমাছির দাড়ি।

তখন সে কামড়ায় না। এই কথার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য একজন 'মফিওয়াল' তাহার চিবুকে ছোট একটা তারের খাঁচায় রাণী-মাছিকে বসাইয়া রাখে। তাহার পর মৌমাছির দল তাহার চিবুকের উপর দাড়ির আকারে আসিয়া বসে। ছবিতে দেখিলে আরো ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।

ফুল তাজা রাখিবার উপায়—

ফুলদানিতে অনেক ফুল রাখেন। খালি ফুলদানিতে ফুল খুবই তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যায়। ফুলদানিতে জল ভরিয়া দিলে ফুল আরো কিছু বেশী সময় তাজা থাকে। আর-একটি নূতন উপায় আবিষ্কার হইয়াছে তাহাতে ফুল আরো বেশী সময় তাজা থাকে। একটি বড় আলুর গায়ে কাঁটা দিয়া গর্ত করিয়া তাহাতে ফুলের বোঁটাগুলি ঢোকাইয়া দিতে হয়। আলুটিকে ফুলদানির মধ্যে রাখিতেও পারা যায়।

মোটরকারের কথা—

পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মোটরকারের ব্যবসা এবং তাহার উন্নতি যত বাড়িয়াছে, এমন আর কোন নূতন আবিষ্কারের ভাগ্যে হয় নাই। ৩৩ বছর পূর্বে, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে গটফ্রায়েড্ শোলেমের (Gottfried Schloemer) সিলওয়াকী সহরে প্রথম মোটর গাড়ী রাস্তায় চালান। গাড়ীখানির কলকজা এবং অক্ষাচ্ছ সমস্ত অংশ তাহার স্বহস্তে তৈরী। সেই অভুত-দেখিতে মোটরকার হইতে বর্ধমানের হৃদয় এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মোটরকার জন্মলাভ করিয়াছে।



মোটর-গাড়ীর অতিবৃদ্ধ প্র-পিতামহ।

বর্তমানে এক আমেরিকাতেই মোট ১২০৪৩৭৮৬৪২ ডলার অর্থাৎ ইহার প্রায় সাড়ে তিন গুণ টাকা মোটর ব্যবসায় খাটিতেছে।

হেমন্ত

কৃত্রিম স্বর্ণ—

যে পরশ-পাথরের স্পর্শে লোহা সোনা হইয়া যায়, যাহার

সন্ধানে মানব-সভ্যতার মধ্যযুগে রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম জন্ম, এতদিনে তাহার ঠিকানা মিলিয়াছে। এই পরশ-পাথর প্রতীচ্য মানবের বুদ্ধি।

এই বুদ্ধি বলিতেছে, যদিও এখনই লোহাকে সোনাতে রূপান্তরিত করিবার মতো এতখানি শক্তির অহঙ্কার তার নাই, তবুও এ ব্যাপার যে অসম্ভব তাহা সে মোটেই স্বীকার করে না; এমন কি, কোন প্রণালী ধরিয়া কি উপায়ে এতদিনকার এই অসম্ভবকে সম্ভব করা যাইবে তাহাও সে স্বীকৃত করিয়া হিসাব খতাইয়া নিঃসংশয়িত যুক্তির বলে দেখাইয়া দিতে পারে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার এই নিশ্চয়তার মূল্য সামান্য নহে। যুক্তিতে যাহাকে পাওয়া গিয়াছে, কর্ম্মে তাহার প্রতিষ্ঠা হইতে বেশী দেরী না হইতেও পারে।—

প্রধানতঃ দুইটি বৈজ্ঞানিক সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া কৃত্রিম স্বর্ণ নির্মাণকে সম্ভব বলিয়া মনে করা হইতেছে। তাহার প্রথমটি হইতেছে এই, যে, বিদ্যে বাস্তবিক একটির বেশী মূল পদার্থের অস্তিত্ব নাই; এতদিন যে বহু মূল পদার্থ কল্পনা করা হইত তাহা সেই এক এবং অদ্বিতীয় পদার্থটিরই বহু-রূপান্তর মাত্র। সেইজন্য মূলতঃ সোনা এবং লোহা একই পদার্থ, সম্ভাবনার দিক দিয়া একের অন্ত্রে রূপান্তরিত হইতে কিছুমাত্র বাধা নাই। দ্বিতীয়তঃ Radio activity বা বস্তুপথ্যায়ের উপর অধুনা-আবিষ্কৃত (১৮৯৯-১৯০৩) অদৃশ্য রশ্মি-তরঙ্গের ক্রিয়ার সম্পর্কে দেখা গিয়াছে, অনেক গুরুভার পদার্থ আপনা হইতেই লঘুভার অপর পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। বহুকালব্যাপী নিবিষ্ট পর্যবেক্ষণের ফলে এই রূপান্তরের প্রক্রিয়া মানুষের অধিগত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

চলন্ত ফুটপাথ—

আমেরিকার শহরের পথে লোকজন ও গাড়ী-খোড়ার ভিড় কমািবার জন্য পথগুলিকে দ্বিতল ত্রিতল করিয়া নির্মাণ করিবার



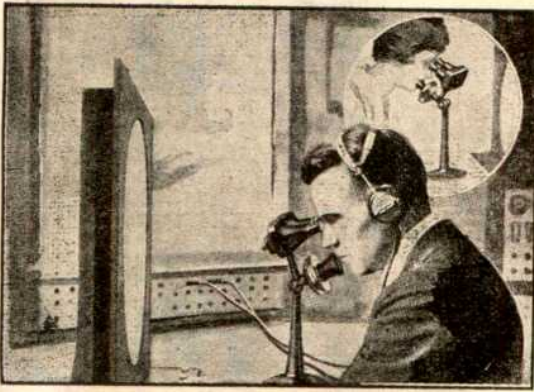
দ্বিতল রাস্তা। উপরের রাস্তার ফাঁকে নীচের তলার রাস্তা দেখা যাইতেছে।

কল্পনা চলিতেছে। শহরের বড় বড় বাড়ীগুলির ছাতে ছাতে জড়িয়া এরোপ্লেন প্রভৃতি বিমান-পোতের অবতরণের স্থান করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। নিউ ইয়র্কে ঘণ্টায় দুই, চার ও ছয় মাইল বেগের সচল ফুটপাথ সম্ভবত শীঘ্রই নির্মাণ করা হইবে। পথের দুইদিকের ফুটপাথ বিপরীত মুখে চলিবে। উল্টা দিকের ফুটপাথে কোনও বন্ধুর দেখা পাওয়া গেলে উভয়ে মাঝখানকার অচল পথে নামিয়া পড়িয়া

কথাবর্তী কথা চলিবে। পথের দুধারে বসিবার জন্ত সারি সারি বেকিও থাকিবে।

দূর-দর্শন—

টেলিফোনে এখন কেবল দূর হইতে কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। নিকোলা তেসলা নামক বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত “টেলি-ভিস্যান” বা দূর-দর্শন নামক যন্ত্রের নির্মাণ প্রায় শেষ করিয়াছেন, উহার সাহায্যে বহু দূরে বসিয়া দুইজন লোক কথাবর্তী বলিতে বলিতে পরস্পরের মুখও দেখিতে সমর্থ হইবে। মানুষের দর্শনেন্দ্রিয়ের নির্মাণপ্রণালীর অনুসরণে



দূর-দর্শন যন্ত্রের পর্দায় দূরস্থ বন্ধুর ছায়ার সঙ্গে কথা কওয়া চলিতেছে।

এই যন্ত্র নির্মিত হইতেছে। টেলিফোনের কলের সম্মুখে একটি কাচের পর্দার উপর দূরস্থ ব্যক্তির তড়িৎবাহিত ছায়া আসিয়া প্রতিকলিত হইবে। কেবল যে তারের টেলিফোনে কলেই ইহা হইবে তাহা নহে; অ-তার টেলিফোনেও হইবে। স্বস্বরাং “টেলিভিসানের” চলন হইলে কলিকাতায় বসিয়া কেশ্বজ বা শিকাগো-প্রবাসী বন্ধুর মুখের প্রতি-দিনকার প্রত্যেকটি ভাবান্তর এবং তাহার প্রতিদিনকার কুশল তাহার মুখ হইতেই জানা সম্ভব হইবে।

ধ্বনিস্পন্দন—

এক ছিলেন রাজা। একদিন সারেঙা হাতে এক বৃদ্ধ বাউল তাহাকে গান শুনাইতে আসিলে তিনি বিরক্ত হইয়া তাহাকে প্রাসাদ হইতে ছুড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দেন। প্রাসাদের বাহিরে পরিখার উপর বাতায়নের যে পুল ছিল, বাউল তাহার নিকটে বসিয়া সারেঙা বাজাইতে আরম্ভ করিল। সারেঙার শব্দ পুলটা সহিতে পারিল না, চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল।

এপলোর সঙ্গীতে আপনা হইতে পাথর গাঁথিয়া উঠিয়া টুয় সঙ্গর নির্মিত হইয়াছিল। ইস্রায়েলবাসীদের সমবেত চীৎকার ও শিক্সা-নিম্নাদে জেরিকোর দুর্গ-প্রাচীর ধসিয়া পড়িয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর শব্দে যমুনা-নদীর জল উজান বহিত।—এ-সমস্তই পুরাণ-কথা।

কিন্তু জড়বস্তুর উপর সঙ্গীতের প্রভাব আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত

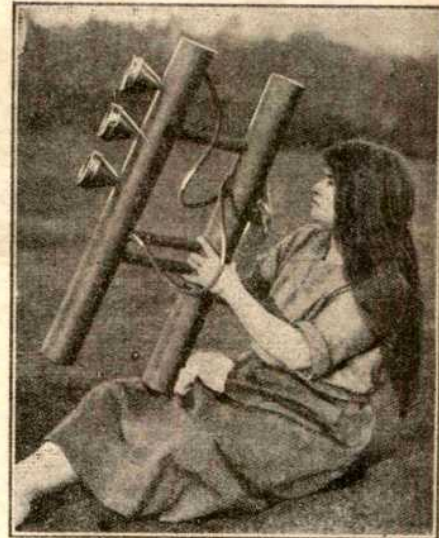
সত্য। বিধের প্রতিটি বস্তু কোনো-না-কোনো বিশেষ স্বরগ্রামের পর্দায় বাঁধা আছে। তাহাকে আঘাত করিলে সেই স্বরে সে বাজে, এবং তাহার কাছে সেই স্বর বাজাইলে সে সহানুভূতিতে কম্পিত হয়।

এই কম্পন বড় সামান্য ব্যাপার নহে। মনে করুন একটি ত্রিতল অটালিকা স্বরগ্রামের মৃদারার পঞ্চম পর্দায় বাঁধা আছে। সেই অটালিকায় কেহ যদি ক্রমাগত মৃদারার পা—এই পর্দাটিই বাজাইতে থাকে তবে এতবড় সেই বাড়ীটি এমন ভাবে কম্পিত হইবে যে তাহা বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। যদি অনেকে মিলিয়া একসঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই স্বরটিই বাজাইতে থাকে তবে কম্পন এমন প্রচণ্ড হইতে পারে যে তাহার ফলে সমস্ত বাড়ীটি ধসিয়া পড়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

কোনো বস্তুর এই ধ্বনিতরঙ্গ একটি ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটে ধরিয়া জমা করিয়া লইয়া ক্যানাডার এক ব্যক্তি তাহার সাহায্যে মোটরগাড়ী, সেলাইয়ের কল প্রভৃতি চালাইতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহার শক্তি খুব বেশী নহে, তবু অল্পব্যয়সাধ্য ও অল্প-স্থান-সাপেক্ষ বলিয়া হয়ত কিছু-দিনের মধ্যেই ব্যাপকভাবে ইহার ব্যবহার আরম্ভ হইবে। ধ্বনিস্পন্দনকে আরও নানা ভাবে কাজে লাগাইবার চেষ্টা নানা স্থানে হইতেছে।

বাতাসে-বাজা বাঁশী—

ধর্মের ঢোল সতাই বাতাসে বাজে কি না তাহা লইয়া তর্ক উঠিবে। কিন্তু এমন একটি ফ্লুট-বাঁশী তৈরি হইয়াছে, বাতাসে ধরিলে যাহা আপনি-আপনি বাজিতে থাকে। একদিক-বোজানো বাঁশের চোঙ বা ফুটোওয়াল অল্প জিনিসের মধ্যে জোরে বাতাস চুকিলে যে



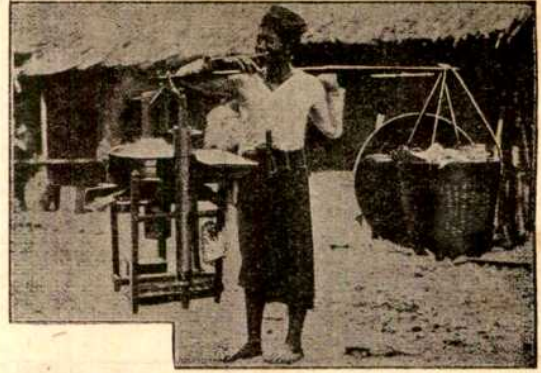
বাতাসে-বাজা বাঁশী।

কারণে শিশু দেওয়ার মতো শব্দ হয়, এই ফ্লুটও ঠিক সেই কারণেই বাজে, কেবল ইহার কুঞ্জির মতো মুখ থাকে তিনটি, আর সেই তিন-মুখওয়ালা বাঁশীটিকে জোরোলা বাতাসের মুখে ধরিয়া খুব সহজেই যে-কোনো গানের গৎ আদায় করিয়া লওয়া যায়।

চামড়া ভরাট করা—

আমাদের দেশেও অনেকেই বাঘের চামড়ার মাথার দিকটা ও হরিণের শিংওয়ালা মাথার চামড়া প্রভৃতিকে কোনো শক্ত জিনিষ দিয়া ভরাট করিয়া লন। জানোয়ারের চামড়াকে এই প্রকারে ভরাট করিয়া মূর্তি-নিৰ্ম্মাণকে ইংরেজীতে stuff করা বলে। কলিকাতার যাদুঘরেও কুমীর, পানী প্রভৃতি কোনো কোনো প্রাণীর এই প্রকারের পূর-দেওয়া প্রতিমূর্তি আছে।

এতকাল এই ভরাট করার কাজটি যে-পদ্ধতিতে হইত তাহাতে মূর্তিগুলি হৃদয় ও স্বাভাবিক হইত না। হাতীর পা হইয়া যাইত পাশ-বালিশের মতো, হরিণের শিংয়ের তলায় ছাগলের মুখ বিরাজ করিত। তাই নিউ-ইয়র্কের যাদুঘরে এই কাজের জন্য বাছা বাছা ওস্তাদ ভাস্করদের নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহারা প্লাষ্টার, মাটি ও কাগজের মণ্ড প্রভৃতির সহায়ে জন্তুদের কাঠামো জীবন্ত মডেল বা ফোটোগ্রাফের অনুকরণে হৃদয় নিখুঁত করিয়া গড়িতেছেন। তারপর তাহার উপর চামড়ার আস্তরণ লাগানো হইলে সেগুলিকে জীবন্ত বলিয়া ভ্রম হইতেছে। জন্তুগুলির আস্থান-ভঙ্গী যাহাতে খুব স্বাভাবিক ও হৃদয় হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হইতেছে। একলা একটি জন্তুকে আলাদা করিয়া স্থাপন করিলে এই ভঙ্গী দেখাইবার সুযোগ কম পাওয়া যায় বলিয়া একেবারে এক-একটি হস্তী-যুথ বা শূওরের পাল বা পানীর ঝাঁক নির্মাণ করিয়া তাহা দেখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইরূপ এক-একটি যুথ বা দল নির্মাণ শেষ

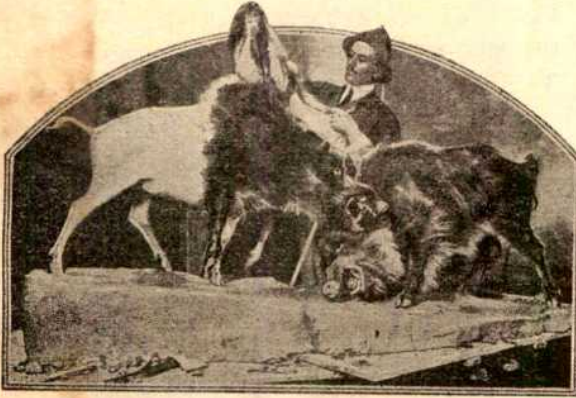


বাতাবিয়ার হোটেল-ফিরিওয়াল।

বাসি বা ভেজাল বা নোংরা থাকিবার জো নাই। ইহার রক্ষন-বিজ্ঞাতেও নাকি ওস্তাদ।

তিন হাজার টাকা দামের ফুলগাছ—

আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কোর এক ব্যক্তি একটি অর্কিড বা পরগাছা ফুলের গাছ ৩০০০ টাকাতো বিক্রয় করিয়াছেন। এই ধরণের অর্কিড



নিউ-ইয়র্কের যাদুঘরে জন্তুর চামড়া ভরাট করিবার ভাস্কর্য।

হইতে পাঁচ বৎসরেরও বেশী সময় লাগিতে পারে। আমেরিকার যাদুঘরগুলি এবারে একাধারে যাদুঘর ও শিল্প-প্রদর্শনী হইয়া উঠিবে।

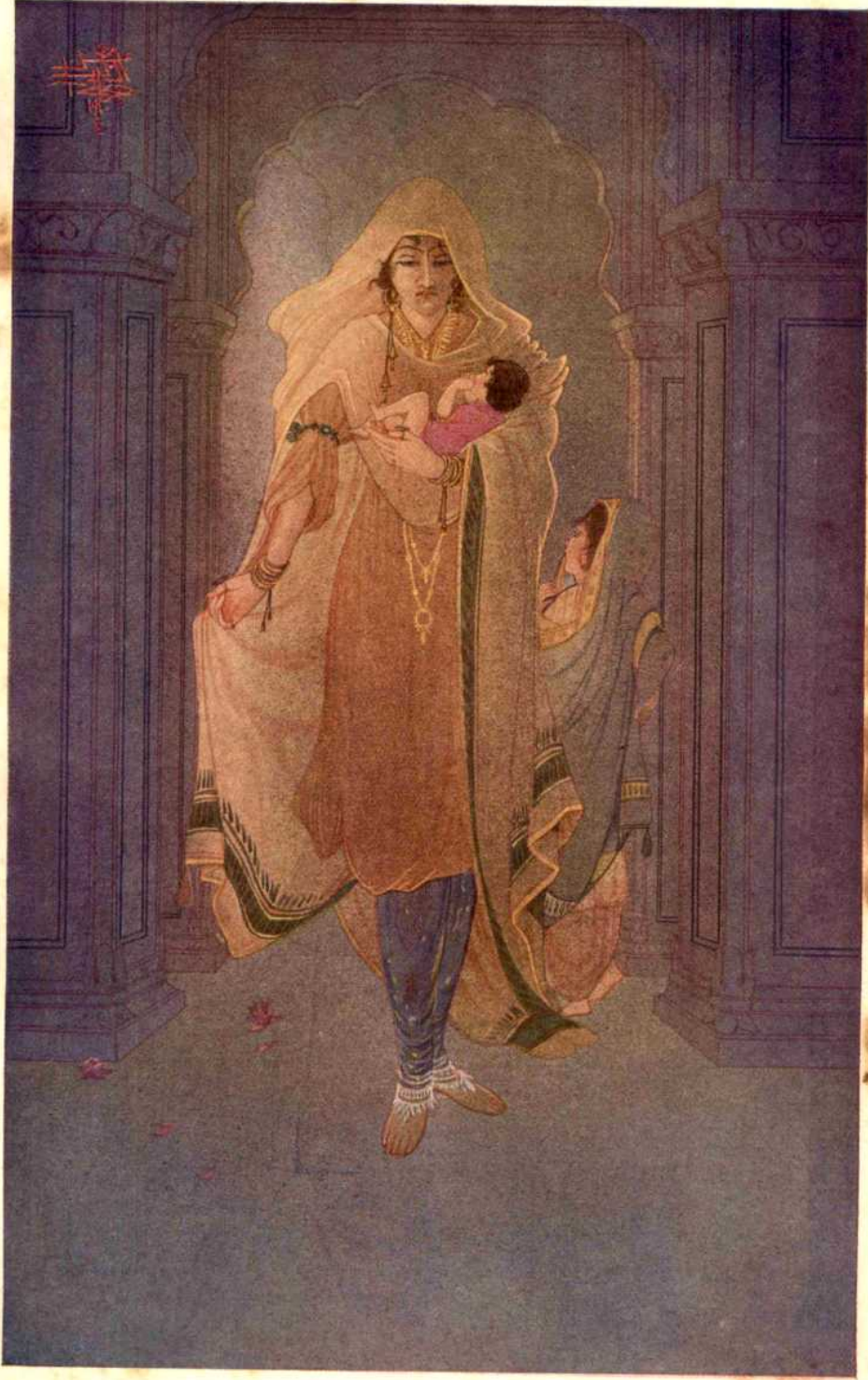
হোটেল-ফিরিওয়াল—

বাতাবী লেবুর আদি জন্মস্থান বাতাবিয়াতে হোটেলওয়াল। হোটেল কিরি করিয়া বেড়ায়। কাঁটা চামচে টেবিল চেয়ার খালা বাটি গেলাস তোয়ালে, মায় উছুন ও কাঁচা মাছ-মাংসের চাঙাড়ি পর্যন্ত সে কাঁধে করিয়া শহরের রাস্তায় বহিয়া ফেরে। পয়সা পাইলেই আহাৰার্থীকে যে-কোনো জায়গায় টেবিলে বসাইয়া গরম গরম খাবার চটপট তৈরী করিয়া সে পরিতোষ-পূৰ্ব্বক আহাৰ করায়। খাবারে



তিন হাজার টাকা দামের ফুলগাছ।

পৃথিবীতে আর একটিও নাই। অনেক প্রকার অর্কিডের সাহায্যের ফলে এই নূতন ধরণের অর্কিডটির জন্ম হইয়াছে, এজন্য যে অধ্যবসায় ও পরিশ্রম আবশ্যক হইয়াছে দামটা নাকি তাহার তুলনায় এমন কিছু বেশী হয় নাই।



দর্গা হইতে

চিত্রকর শ্রীযুক্ত মুহাম্মদ আবদার-রহমান চাঁদতাই মহাশয়ের সৌজন্যে ।



প্রকৃতির পাঠশালা

সূর্যের মত পৃথিবী কিরণ দেয় না কেন ?

জগৎ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা ঠাণ্ডা, তার কারণ পৃথিবীর চেয়ে সে ছোট।

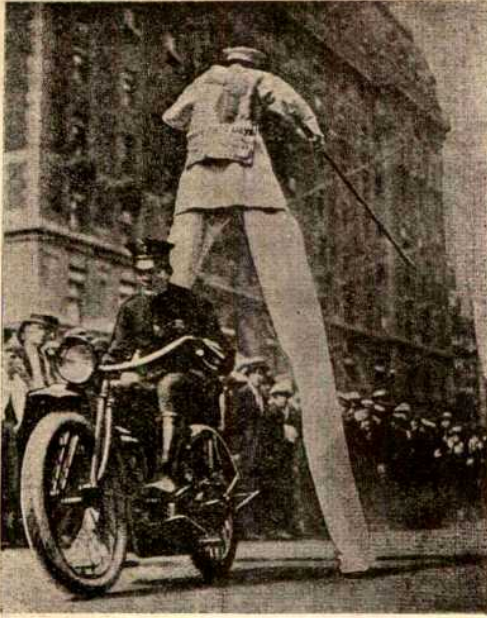
বালক সম্পাদক

সূর্য চন্দ্র ও পৃথিবী প্রভৃতি এক-একটি গ্রহ, অনবরত শূন্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অথচ সূর্য্যে এত আলো আছে আর পৃথিবীতে মোটে আলো নাই কেন? যে জিনিস হইতে গ্রহগণ তৈয়ারী হইয়াছে তাহা উত্তপ্ত মেঘরাশি মাত্র। এই যে উত্তপ্ত মেঘ হইতে তৈয়ারী পৃথিবী তাহা এখন এমন ঠাণ্ডা হইয়া গেল কিরূপে? সূর্য্য ত এখনো ভীষণ গরম। ইহার একটি কারণ এই যে যে-জিনিস যত ছোট তার উত্তাপ তত কম এবং তার উত্তাপ বড় জিনিসের উত্তাপের চেয়ে শীঘ্র চলিয়া যায়। যে কারখানায় কাচ তৈয়ারী হয় সেখানে গিয়া আমরা যদি তিনটি কাচের বল তৈয়ারী করিতে বলি—একটি বড়, একটি আর-একটু ছোট ও অপরটি খুব ছোট,—তাহা হইলে আমরা দেখির যে তিনটি বল এক সঙ্গে তৈয়ার হইয়া বাহির হইলেও সর্বাপেক্ষা ছোটটিই আগে ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, তার পরে ঠাণ্ডা হইবে তার চেয়ে বড়টি ও সব-শেষে ঠাণ্ডা হইবে সকলের চেয়ে বড়টি। এখন সূর্য্যের আকৃতি হইতেছে সব-চেয়ে বড় বলটির মত, তাই তার উত্তাপ এখনো এত তীব্র রহিয়াছে আর তার আলোও এত জল্জল্ করিতেছে। পৃথিবী ঠিক ছোট বলটির মত, তাই এখন তার গা ঠাণ্ডা, অতএব সে আলোও দেয় না। শীতকালে হুটপুট বড় জোয়ান লোকের চেয়ে ছোট ছেলেদের গায়ে বেশী গরম কাপড় দিতে হয়। তার কারণ ছোট ছেলের গা বড় লোকদের চেয়ে শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়া যায়। শরীর যার যত বড় তার উত্তাপ তত বেশী ও তত বেশীক্ষণ থাকে। মোটা শরীর হইতে উত্তাপ চলিয়া যাইতে সময় লাগে। সৌর-

আমেরিকার এক প্রদেশে রিজ্‌ফিল্ড্‌ পার্ক নামক স্থানে স্কুল ও কলেজের ছাত্র এবং অনেক বয়স্ক লোকদের লইয়া একটি জাতীয় সমিতি আছে। এই সমিতিতে সভা আছেন প্রায় চার বা পাঁচ শত। ইহাদের একটি কাগজ আছে, তাহা মাসে দুইবার বাহির হয়। এই কাগজের আগে যে-সব সম্পাদক ছিলেন তাহাদের সকলেরই বয়স পঁচিশের বেশী। এখন এই কাগজের সম্পাদক একটি বালক, তাহার বয়স চোদ্দ বছর, নাম জন্‌মিলটন্‌ হিন্স্‌। কাগজটির জন্ত লেখা বাছিয়া লওয়া, লেখা দেখিয়া দেওয়া, সমস্ত লেখার নাম ঠিক করিয়া দেওয়া ও সমস্ত ছাপা দেখা প্রভৃতি কাজ জন্‌কে করিতে হয়। সে আবার ছাপাখানার কাজও অনেক শিখিয়াছে এবং নিজের একটি ছাপাখানা করিয়াছে। কাগজটির সম্পাদকীয় বিভাগের সবই জন্‌কে লিখিতে হয়। এত অল্প বয়সে সে জাতীয় সমিতির সহকারী সভাপতি হইয়াছে। বারো বছর বয়স হইতেই কাগজ কি করিয়া চালাইতে হয় তাহা সে শিখিয়াছে। আমাদের দেশে এত অল্পবয়সের এমন বুদ্ধিমান ছেলে আছে কি?

লোকের মাথা ডিঙিয়ে হাঁটা

ছেলেবেলায় আমরা অনেকেই লম্বা লম্বা গাঁটওয়ালা বাঁশ লইয়া তাহার গাঁটে পা দিয়া খটাখট হাঁটিয়া বেড়াই-
যাছি। কোন কোন ছেলে বাঁশের খুব উঁচু গাঁটে পা দিয়া অসীম সাহসে ঘুরিয়া বেড়ায়। আমেরিকার নিউইয়র্ক



৭

ফ্রেড্ উইলসন্ মোটর-সাইকেলের উপর দিয়া চলিতেছেন।

সহরে ফ্রেড এইচ উইলসন্ নামে এক ভদ্রলোক নিজের দুই পায়ে দুই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠের পা জুড়িয়া দিয়া জনতার মাথার উপর দিয়া মাঝে মাঝে হাঁটিয়া বেড়াইতেছেন। আর তাঁহার নীচে দিয়া মোটর-সাইকেলগুলা অনায়াসে গলিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। উইলসন্ লোকটির চেহারা খুব লম্বা চওড়া; তাহার উপর এই বৃহৎ পা,—সর্বসমেত তিনি পনেরো ফুট উঁচু হইয়াছেন। এই রকম ভাবে চলিবার সময় উইলসনের হাতে একটি লাঠি থাকে। অবশ্য এ লাঠি তিনি লোকের মাথায় ব্যবহার করেন না, দেহের সমতা রাখিবার জন্ত ইহা নাড়াচাড়া করেন মাত্র। এই রকম হটরঠ্যাংকে আমাদের দেশে আগে রণ-পা বলিত; ডাকাতেরা এই রকম রণপায় চড়িয়া ঘোড়ার চেয়েও দ্রুত চলিয়া দূর গ্রামে ডাকাতি করিয়া রাতারাতি বাড়ী ফিরিত। এই রকম রণপা পরিয়া ডাকাতির বিবরণ স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বিখ্যাত নামক উপন্যাসে আছে।

চোখ বেঁধে ছবি আঁকা

একটি কাঠের পুতুল বা ঘোড়া সামনে রাখিয়া সেটা বেশ করিয়া দেখিয়া লইয়া তারপর কাপড় দিয়া চোখ বাঁধিয়া কাগজের উপর সেই পুতুল বা ঘোড়ার ছবি আঁকিয়া যাওয়া খুব শক্ত কাজ। কিন্তু কিগোরগার্টেন শিক্ষায় আজকাল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এই রকম ভাবে ছবি আঁকানো শেখানো হইতেছে। আগে আঁকিবার জিনিষটিকে প্রায় দশ মিনিটের জন্ত তাহাদিগকে ভালো করিয়া দেখিতে দেওয়া হয় ও পরে তাহাদের চোখ বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই চোখ-বাঁধা অবস্থায় তাহারা ছবিটিকে যেমন দেখিয়াছে মন হইতে সেইরকম আঁকিয়া যায়। কিগোরগার্টেন শিক্ষকেরা বলেন এইরূপে ছবি আঁকিতে শিখিলে ছেলেদের আঙুলের কৌশল আয়ত্ত হয়, স্মৃতিশক্তি খেলিতে পায় ও বাড়ে এবং মনে মনে তাহারা জিনিষের ধারণা করিতে শিখে।

প

আষাঢ়ের গান

বর্ষা এলো রে ঐ,

চেয়ে ত্যাখ আকাশে—

ছোট বড় কত মেঘ,

শাদা, কালো, ফ্যাকাসে।

সঁয়াংসেতে চারিদিক ;

ঘন-ঘোর আষাঢ়ে

কি যে গাই ভেবে ভেবে

নাহি পাই ভাষা রে।

টুপ্ টাপ্ ঝুপ্ ঝাপ্

দিন রাত বৃষ্টি ;

হায় হায়, গেল বুঝি

ধুয়ে মুছে সৃষ্টি।

দম্কায বায়ু চলে,

চম্কায বিদ্যুৎ।

জল বাড়ে সারা বেলা

একি খেলা অদ্ভুত !

মেঘে মেঘে ঠোকাঠুকি,
কড় কড় শব্দ ।
ভয় পেয়ে থোকা খুকী
নির্ঝাঁকু, শুদ্ধ ।
গাছগুলো এলোমেলো,
বাতাসের ছটপাট ॥
ঝুরুঝুরু পাতা ঝরে
ডাল ভাঙ্গে ফুট ফাট ।
ঝোপে ঝাড়ে, ডোবা-ধারে
গলাফুলো কোলা ব্যাং
বিটকেল উৎসাহে
গান গায় গ্যাং গ্যাং ।
মরা গাঙ্গে এল বান
ছুটি তীর ছাপিয়ে—
তবুতবু ছোটো নদী
আশপাশ কাঁপিয়ে ।
হাটে মাঠে নাহি লোক,
নাহি লোক রাস্তার,
এত জল-ঝাড়ে তবু
কেন আসে মাষ্টার ?
হায় হায় কি আপদ—
জল ঝড় সন্ধ্যায়
থোকা-বাবু চূপচাপ
নিজ পাঠে মন দায় ।

শ্রী সুনির্মল বসু

চাকার খেলা

আমাদের দেশে মোটর-টায়ারের অবস্থা খারাপ
হলে, তা ফেলে দেওয়া হয়। অনেকে কেটে তা দিয়ে
জুতার তলাও করেন। কিন্তু মোটরের বড় বড় ফাঁপা
টায়ার দিয়ে মজার খেলাও খেলা যায়। টায়ারকে
একটু জোর দিয়ে ফাঁক করে তার মধ্যে ছোট ছেলে-
মেয়েরা বেশ গোল হয়ে বসতে পারে। তার পর
একজন সেটাকে গড়িয়ে দিলে শরীরের চাপ দিয়ে দিয়ে

তাকে অনেক দূরে গড়িয়ে নেওয়া যায়। যারা একটু
তাল ঠিক করে চালাতে পারবে, তারা ২০০।৩০০ গজ
ডিগবাজি খেতে খেতে গিয়েও টায়ারকে দাঁড় করিয়ে



টায়ারের ভিতর বসিয়া গড়াইতেছে ।
রাখতে পারে। ছেলেরা এই নূতন খেলাটাকে একবার
চেষ্টা করে দেখতে পারে ।

সর্বকনিষ্ঠ র‍্যাডিও অপারেটর

রবার্ট গার্সিয়ার বয়স সাত বৎসর। এই বালক,
বিখ্যাত ভাঁড় চার্লি চ্যাপ্লিনের দলের অধিকারী এ্যালেন
গার্সিয়ার পুত্র। সে এই বয়সেই তারহীন খবর-দারের
কাজ করে। বেতারের কাজে ঢুকিতে হইলে কিছুদিন
শিক্ষানবিশী করিয়া তারপর পরীক্ষায় পাস করিতে হয়।
রবার্ট এই পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হইয়া বেতারের
কাজে ঢুকিয়াছে। সে শতকরা ৯২ নম্বর পাইয়াছে।

বালক রবার্ট প্রথমে পিতার নিকট হইতে বেতারের
কাজ শিখিতে আরম্ভ করে। সে পিতাকে মাঝে মাঝে
এমন সকল প্রশ্ন করিয়া বসিত, তাহার পিতার পক্ষে
যাহার উত্তর দেওয়া সহজ হইত না। ছেলের নিকট
সম্মান নষ্ট হইবার ভয়ে পিতা সমস্ত রাত্রি ধরিয়া
বেতারের বিষয়ে হৃদয় হৃদয় তথ্যগুলি আলোচনা করিতেন।
কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রবার্ট বেতারের কলকজা এক-
রকম বেশ আয়ত্ত করিয়া ফেলে। বেতারের কলকজা
বুঝা বেশ শক্ত ব্যাপার—কিন্তু বালক রবার্ট একবার
যাহা দেখে তাহা আর দ্বিতীয় বার দেখিতে হয় না।



রবার্ট গাসিয়া ।

রবার্টের সঙ্গে অনেক বয়স্ক পরীক্ষার্থী ছিল। তাহারা সাত বছরের বালককে দেখিয়া হাসিয়াছিল, এবং পরে পরীক্ষায় ফেল করিয়া নিজেরা কাদিয়াছিল। দুইজন বেতারের কলকজাওয়ালা রবার্টকে বেতারের অনেক কলকজা উপহার দিয়াছেন। বালক কোন পাকা মিস্ত্রির সাহায্য না লইয়া নিজ হাতে সেই-সব কল বসাইবে।

হেমন্ত

কাঁছনে পুতুল

বাজারে সচরাচর যে-সমস্ত পুতুল দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে সব সময় একটুখানি সিঁছরে হাসি লাগিয়াই থাকে। খুকী-মায়েদের হাতে একটু অঙ্গবিধা হয়। ছুটামি করিয়া মার খাইয়াও পুতুল যখন দিবি মুখ ভরিয়া হাসিতে থাকে, তখন সেটা কেমন বেশ থাপছাড়া লাগে। তাই এবার এক রকমের পুতুল তৈরি হইয়াছে, তার পিঠে একটু চাপ দিলেই তার দুচোখ বাহিয়া টসটস করিয়া জল পড়িতে থাকে। পুতুলটির পিঠের কাছে একটি ছোট রবারের খলেতে জল ভরা থাকে, সেইখানে চাপ পড়িলেই সেই জল ছুটি নল বাহিয়া



কাঁছনে পুতুল।

চোখের কোণে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই খলে, নল, প্রভৃতি পোষাকের নীচে থাকে বলিয়া বাহির হইতে দেখিয়া মনে হয়, মার খাইয়া পুতুল নিজে হইতেই কাদিতেছে। আমাদের দেশের হাটে বাজারে এই পুতুল এখনও পাওয়া যায় বলিয়া আমরা গুনি নাই। তাই প্রবাসীর অল্পবয়স্ক পাঠকপাঠিকারা এই কাঁছনে পুতুলের নামে নিজেরা কান্না স্ক্র না করিলেই আমরা স্থখী হইব।

স চ

কাকাতুয়া-পাখী সাত-রাজপুত্র

এক রাজরাণী। আগে ত তাঁর ছেলেপিলেই হয় না, এখন হলো—একে একে জন্মালো সাত-সাতটি ছেলে। রাণীর কিন্তু মনের সাধ—‘একটি মেয়ে হয় তো বেশ হয়!—গৌরীদান ক’রে টুকটুকে ছোট জামাইটি নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করি।’ সাত ছেলে পাওয়ার পর রাণী তাই নিত্য ব্রত-পূজা করেন, আর দেবতার দ্বারা কামনা জানান—‘ঠাকুর, আমায় ফুটফুটে একটি মেয়ে দাও।’

কিছুদিন পরে ঠাকুর-দেবতার দয়া হলো।—কোথা থেকে ইয়া-লম্বা-জটা হাঁটু-সমান-দাড়ি নিয়ে এক ফকির এসে রাজবাড়ীর দ্বারে হাজির। রাণী চুপি-চুপি দাসীকে পাঠিয়ে ফকিরকে অন্দের-মহলে ভেকে আনালেন। রাজ-রাণীর মনের সাধ জেনে ফকির একটা লাল টুকটুকে ফুল বের ক’রে বললেন—‘মা, সারাদিন উপোষী থেকে

পূর্ণিমার রাতে ভেজা চুলে গোপনে এ ফুলটি বেঁটে থেয়ে—কোলে মেয়ে পাবে; কিন্তু সাবধান, এক ফোঁটাও যেন মাটিতে না পড়ে!—পড়লে, মেয়ে কোলে আসার সঙ্গে সঙ্গে আগের ফল আকাশে উড়ে যাবে।..... আগের ফল তো সাতটি ছেলে,—মাহুশ আবার আকাশে উড়ে যাবে কি?—রাণী ফকিরের কথা ঠিক বুঝতে পারলেন না; তবু দু'হাত পেতে ফুলটি নিয়ে মহাযত্নে রেখে দিলেন।

সারাদিন উপোষী থেকে পূর্ণিমার রাতে রাজরাণী নেয়ে এলেন; তারপর ভেজা চুলে আপনার হাতে ফুলটি বেঁটে মুখে দিতে যাচ্ছেন,—হটাৎ বানাৎ করে' একশো বাতির ঝাউটা মেজের পড়ে' ভেঙ্গে গেল। হটাৎ চমকে উঠতে বাঁটা ফুলের রসভবা সোনার ঝিকু-খানি রাণীর হাত থেকে ছিটকে পড়ল। এ কি হ'ল?—ভেবে রাণী তাড়াতাড়ি চেষ্টা পুঁছে ঝিকুর রসটুকু তুলে মুখে দিলেন; কিন্তু মার্কেলপাথরের মেঝের জোড়ের এক ফাঁকে সাত ফোঁটা রস যে নীচে গড়িয়ে গেছে তা তাঁর নজরে পড়ল না।

* * * *

দশমাস দশদিন পরে রাণীর সত্যি-সত্যি; একটি মেয়ে হলো—মেয়ে না ত যেন স্কীরের পুতুলটি! মা মেয়েকে কোলে তুলেই চাঁপাফুলের মত তুলতুলে গাল দু'খানিতে ছুটো চুমো দিলেন। এ দিকে—সে-ই যে সাত ফোঁটা রস মাটিতে পড়েছিল তারই ফলে—বোনের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সাত ভাই সাত রাজপুত্র সাতটি কাকাতুয়া পাখী হয়ে উড়ে গেল।

সাত-সাত রাজপুত্র—কোলে-কাঁথের ছেলে তো নয়—কোথায় গেল সব?—কেউই খুঁজে পায় না। রাণী শুনে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। ফকিরের কথা তাঁর মনে হ'লো—হায় হায়, আগে বুঝলে কি ছেলে হারাতে মেয়ে গান!.....কিন্তু এ যে তাঁর গোপন কথা,—মুখ ফুটে বলতেও পারেন না, বুকে চেপে থাকতেও পারেন না।

* * * *

রাজকন্যা সাত আট বছরের হয়েছে। মেয়েকে আদর করতে গেলেই রাণীর ছেলেদের কথা মনে পড়ে, আবার যাকে পেতে সাত-সাতটি সোনার ছেলে খুঁয়েছেন তাকে

আদর না ক'রেও কি থাকা যায়?—এ সোনার চাঁদের দিকে চোখেই তবু রাজরাণী বুকের আগুন চেপে রাখেন।

বড় হয়ে রাজকন্যা দাস-দাসীর মুখে শোনে—তার যে সাতটি ভাই ছিল; তারা তার জন্মের দিন যে কোথায় গেছে কেউ খুঁজে পায়নি। শুনে রাজকন্যার ভাইদের খবর জানতে ভারী সাধ; তাই প্রত্যাশী সে রাণীকে বলে—‘মা, আমার নাকি সাত দাদা ছিল, তারা কোথায় গেছে বলনা?’ মেয়ের মুখে একথা শুনে রাণী কেঁদে-কেটে আরো অস্থির হন।

* * * *

রাজপুত্রেরা কাকাতুয়া-পাখী হয়ে ফুকত ফুকত ক'রে ঘরে বাইরে উড়তে লাগল—কেউ যদি চেনে! কিন্তু রাজবাড়ীতে রঙ-বেরঙের কত পাখীরই মেলা—কাকাতুয়ার দিকে তাকায় কে! তিন দিন তিন রাত উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরেও যখন তারা বাড়ীতে ঠাই পেল না, তখন ছি—ছি—ছি ক'রে চাঁচাতে চাঁচাতে সাত ভাই আকাশে উড়াও হ'লো।

* * * *

মনের দুঃখে কাকাতুয়া-পাখী সাত-রাজপুত্র গহন বনে বাসা নিয়েছে। এগার মাস ঊনত্রিশ দিন বনে-বনেই তারা ঘুরে বেড়ায়; শ্রাবণ-মাসে পূর্ণিমার রাতে মেঘের ফাঁকে গোল চাঁদটি দেখে কদম-ফুলের কথা মনে পড়ে; আর তখনই মনে হয় তাদের মায়ের ঘরের জানলার গোড়ায় যে কদম-গাছটি আছে তাতে তো এমন হাজার হাজার চাঁদ-কদম ফুটে রয়েছে! তাই বছরের এই একটা দিন কিসের টানে তারা রাজ্যে ফিরে যায়। গহন বন থেকে রাজপুরীতে পৌঁছতে রাত দুপুর হয়; রাজপুত্রেরা নিশুতরাতে কদমগাছের ফোঁটা-ফুলের পাশে মুখ লুকিয়ে বসে থাকে; আর জানলার ফাঁকে সারারাত ধরে মায়ের মুখখানি আর ঘুমন্ত বোনটিকে দেখে দেখে—ভোরের চাঁদ না ডুবে আবার বাসায় ছোটে। শ্রাবণ মাসের চাঁদের আলো—একবার মেঘে ঢাকা পড়ে, ফের মেঘের ফাঁকে উকি মেরে লতা-পাতার জোছনা ছড়িয়ে দেয়; আধার-আলোর এ ফিকে রঙে ফোঁটা কদম-ফুল দেখে বোধ হয় যেন আকাশের ছোকরা চাঁদরা নীচে

নেমে এসেছে ; আর, সে ফোঁটা-ফুলের আড়ালে কাকা-তুয়ার সাদা ডানা নড়তে দেখে মনে হয় যেন চাঁদ-পরীর হাট মিলেছে ।

* * * *

যায়—এভাবে কয়েক বছর যায় । রাজরাণী ছেলেদের জন্তে প্রায় রাতই কঁদে কাটান ; মায়ের হুঃখে রাজকন্যাও মন-মরা ।

শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা-রাত্রে মায়ের-মেয়েতে ঘুমিয়ে । রাজকন্যা স্বপ্ন দেখে—কদম-ফুলের মুখোস প'রে কাকাতুয়ার ডানা পিঠে বেঁধে তার দাদারা যেন চাঁদ-পরী সেজেছে ; তারা যেন তাকে ডেকে বলছে—

‘বোনটি মোদের বোনটি,

মায়ের গলার কঙ্গি,

সাত ভায়েরে আছে ভুলে’ কেমনে তোর মনটি ?’

রাজকন্যা যেন বললে—‘ভুলে’ থাকব কেন, দাদা ?—আমি তো তোমাদের কথা রোজই ভাবি, কিন্তু তোমরা যে কোথায় আছ কেউ বলতে পারে না । এই তো দেখ,—এলেই যদি তা কিনা আবার চাঁদ-পরী সেজে ! কেন ? ও ছাই কদম ফুলের মুখোসগুলো ফেলে দাও না কেন ?—আবার কাকাতুয়ার ডানাই বা পিঠে বেঁধেছ কেন ?’—

বলতেই যেন চাঁদ-পরীদের মুখ থেকে ঝুঝুঝু ক’রে কদমফুলের হলুদে রোঁয়াগুলো বা’রে পড়ল, আর তার বদলে মুখে বেরুলো এক-একটা এ্যা—স্তো বড় কাকাতুয়ার লাল ঠোঁট । রাজকন্যা যেন চৈতন্যে উঠল—‘এ কি হলো, দাদা ?—তোমরা যে কাকাতুয়া পাখী হয়ে গেলে !’

সাতভাই যেন ডেকে বলল—

‘কাকাতুয়া ! কাকাতুয়া !—কোথায় কি রে গেছে খোয়া ?

কেন বনের পাখী ?

—মাছুষ কে রে ক’রে দেবে ?

মনের হুঃখে গহন বনে থাকি ।’

রাজকন্যা বললে—‘না না, আর গহন বনে যেতে হবে না,—বল, কি করলে তোমরা মাছুষ হও, আমিই করব ।’

...‘পারবে ?’...‘পারবো ।’...‘ঠিক ?’... ‘ঠিক ।’...

সাতভাই যেন তখন ঠোঁটে ক’রে এক-একটা বন-কাপাসের ফল এনে রাজকন্যার হাতে দিল ; আর বলল—সাত মাস কিন্তু কথা না কয়ে থাকতে হবে—এ সাত মাসের মধ্যে এ বন-কাপাসের তুলোয় সূতা কেটে গাল্চে বোনাতে হবে ; গাল্চের উপর কদম-ফুলের বৃটি তুলে’ আঙ্গুলের রক্ত মাথিয়ে যদি সাত ভাইয়ের গায় ছুঁড়ে দিতে পার তবেই আমরা মাছুষ হই । সাত মাসের মধ্যেই কিন্তু কাজ শেষ হওয়া চাই, আর এ কয় মাস মুখে হা-টিও করতে পারবে না ; করলে আর কিছুতে আমাদের মুক্তি নেই ।’ এই না বলেই যেন সাত ভাই কাকাতুয়া পাখী ঠি-হ্ ঠি-হ্ ক’রে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল ।

স্বপ্ন দেখেই রাজকন্যার ঘুম ভেঙে গেল । ধড়মড় ক’রে সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল । জানালার নীচে কদমগাছটার দিকে তাকাতেই দেখে সত্যিই তো ! কদম-ফুলের আড়ালে যে সাদা পাখীর ডানা ! রাজকন্যা ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এল । এদিকে তখন ভোরও হয় হয় । কাকাতুয়া পাখী সাত রাজপুত্র ডানা নাড়া দিয়ে আকাশে উড়বে, রাজকন্যা দেখে—তাই তো ! এ যে সত্যিই সাতটি কাকাতুয়া ! আনন্দে রাজকন্যার আর তর সয় না—পাখী সাতটি কোথায় যায়, দেখতে সেও ছুটল ।

পাখীরা ওড়ে আকাশে, রাজকন্যা পাখীর দিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে চেয়ে হেঁটে ছুটে চলেছে,—কোথায় যায় হিসেব নেই । যেতে যেতে, এক রাজার রাজ্য ছাড়িয়ে আর-এক রাজার রাজ্যে এসে গহন বনে ঢুকবে,—কাকাতুয়া পাখী সাত-ভাই রাজপুত্রেরা চেয়ে দেখে—বোনটিও যে এসেছে । দেখে তাদের আনন্দের আর সীমা নেই—তারা শোঁ ক’রে নীচে নেমে এসে রাজকন্যাকে ঘিরে দাঁড়াল ; তারপর কেউ তার হাতে ঘসে ঠোঁট, কেউ বা কাঁধে উঠে নাচে, কার বা ঠি-হ্ ঠি-হ্ ডাক আর থামে না । এসব দেখে শুনে রাজকন্যার মনে হ’লো—সত্যি সত্যি এরাই তার সাত-ভাই । সে ভাবলে—ভোরের স্বপ্ন মিছে হয় না ; ভাইরা পাখী হয়েছে এ স্বপ্ন যখন মিলে গেল, তখন যা করলে তারা মাছুষ হবে সে স্বপ্ন কি মিথ্যা

হয়? আমি ভাইদের মানুষ না ক'রে ঘরে ফিরব না— তাতে খালি সাতমাস কথা না ক'য়ে কেন যা করতে হয় সবই করব।—এই না ভেবে রাজকন্যা ভাইদের সাথে গহন বনেই র'য়ে গেল।

কাকাতুয়া-পাখী রাজপুত্ররা ঠোঁটে ঠোঁটে খড়কুটা ব'য়ে বোনের জন্ত এক কুঁড়ে তৈরী করলে। এক ভাই ফল আনে, এক ভাই মূল আনে, এক ভাই নরম নরম পাখীর পালকে শেজ পেতে দেয়—রাজকন্তার খাওয়া-শোওয়ার কষ্ট নেই। দুবেলা চরার পর ঘরে ফিরুবাব সময় সবাই এক-একটা বন-কাপাসের ফল ঠোঁটে কামড়ে নিয়ে আসে—রাজকন্তা কাপাসের তুলোয় স্নতো কেটে গাল্চে বোনে।

সাত মাসের ছয়মাস যায় রাজকন্তা হাঁও করে না হ'ও করে না, মুখ বুজে একমনে গাল্চেই বুনছে। এক দিন কাকাতুয়া-পাখী রাজপুত্ররা বিকেল বেলা চব্বতে গেছে, রাজকন্তা একলা ঘরের দরজায় বসে স্নতা কাটছে, হঠাৎ সে রাজ্যের রাজার ছেলে মৃগয়ায় এসে গহন বনে উপস্থিত। গহন বনে এ কুঁড়ে কিসের?—রাজার ছেলে এগিয়ে দেখেন ছয়ারে এক পরম সুন্দরী মেয়ে।...রাজপুত্র এ কথা সে কথা নানান কথা শুধান, রাজকন্তার মুখে কথা নেই—সে আপন মনে স্নতাই কাটে আর গাল্চে বোনে। রাজার ছেলে আর বেশী কিছু না ব'লে কয়ে রাজকন্তাকে নিজের পাশে ঘোড়ায় উঠিয়ে রাজ্যে ফিরলেন।

মায়ের কোল ছেড়ে রাজকন্তা ভাইদের জন্তে বন-বাস নিয়েছে—সে ভাইরাই বা কোথায় আর কেইবা কোথায়, তাকে নিয়ে চলল—সুধাবারও উপায় নেই—রাজকন্তা কেঁদেই অস্থির। সাতমাসের মধ্যে গাল্চে বনে বৃটি তোলা চাই, ভাই সে কাদতে কাদতেও গাল্চে টৈরীই করচে, কিন্তু চোখের জলে হাত ভিজে আঙ্গুল যে আর চলে না।

রাজার ছেলে আদর ক'রে রাজকন্তাকে রাজপুরীতে তুললেন। এমন সুন্দরী মেয়ে!—রাজার ছেলের মনের সাধ একেই রাজরাণী করেন। কিন্তু রাণী মা চটেই আঙুন—কোন বন-জঙ্গলের মেয়ে, তার উপর হাবা

না বোবা, এমন বৌ হ'লে রাজপাট মানাবে কেন! রাজপুত্রের মন কিন্তু মায়ের এ কথায় প্রবোধ মানে না।

* * * *

গাল্চে বোনা হয়ে গেছে, এখন বৃটি তোলা চাই; কিন্তু স্নতো যে সব ফুরিয়ে গেল! সাত মাসও তো যায় যায়;—রাজধানীতে বনকাপাস কোথায় পাই?—রাজকন্তা দুদিন ধ'রে ভাব্চে। উপায় না পেয়ে তিনদিনের দিন নিশুত রাতে কাপাসের খোঁজে চুপিচুপি রাজপুরী হতে বেকল। রাজকন্তা এদিকে যায় দেখে দালান কোঠা, ও-দিকে যায় দেখে দীঘি পুকুর—বনকাপাস তো কোথাও মেলে না। হাঁটতে হাঁটতে শেষে সে নদীর পাড়ে শ্মশানে গিয়ে উপস্থিত। শ্মশানের নীচে বনকাপাসের মগুন বন; রাজকন্তা আঁচল ভ'রে কাপাসের ফল কুড়োতে লাগল।

এই মেয়েই ছেলেকে পাগল করেছে—এই না ভেবে, একেই রাণীমা রাজকন্তার উপর চটা, তার উপর যখন টের পেলেন দুপুররাতে একলা সে কোথায় বেরিয়ে যায়, তখুমি তার পেছন পেছন ছজন দাসীকে পাঠিয়ে হুকুম দিলেন 'কি করে মেয়েটা, দেখা চাই।' রাজকন্তা শ্মশানে ঢুকে কাপাস তুলতে নীচে নামবে, দাসীরা দূর হতে দেখেই—'ওমা!' ব'লে টেচিয়ে দে ছুট; হাঁপাতে হাঁপাতে রাজপুরীতে ফিরে খবর দিল—'রাজপুত্র একটা ভাইনী রাজ্যে এনেচেন, সে শ্মশানে গিয়ে মড়া খায়।' রাণীমা হুকুম দিলেন—'ভাইনীটাকে বেঁধে গারদে রাখ, জ্যাস্ত পুড়িয়ে মারবি।' হৈ চৈ ক'রে লোকজন গিয়ে রাজকন্তাকে বেঁধে আনল।

তিনদিন পরে রাজকন্তার আয়ু ফুরোবে। সাত মাসের তো এই তিনটি দিনই বাকি। ভাইদের সাথে দেখা নেই—দেখা হবে কি না কে জানে? তবু খাওয়া নেই শোওয়া নেই—রাজকন্তা গাল্চের উপর বৃটিই তুল্চে; আর চোখের জলে বুক ভাসিয়ে প্রার্থনা কর্চে—'দয়াল ঠাকুর, আমার মরার আগে ভাইদের একবার যেন কাছে পাই।'

চারদিনের দিনে রাজকন্তাকে শ্মশানে নিয়ে মশালচরী আঙুন ধরাচ্ছে, বৃটিতোলা গাল্চে হাতে রাজকন্তা

চোক বুজে দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ কোথা হতে শোঁ। শোঁ। ক'রে উড়ে এসে সাতটা কাকাতুয়া পাখী মাথার উপর থম্কে দাঁড়াল; তারপরে তারা হস ক'রে নীচে নেমে প'ড়ে রাজকন্যাকে ঘিরে ঘুরতে লাগল। রাজ-কন্যা চোখ মেলে চেয়েই নিজের আব্দুল কামড়ে বুটির উপর রক্ত মাখিয়ে লাল গালুচেখানি ভাইদের গায় ছুঁড়ে দিল। সকলে অবাক হয়ে দেখে—কোথায় গেল কাকাতুয়া!—এ যে সাত রাজপুত্র!

রাজকন্যা সকলকে সব কথা খুলে বললে। সাত ভাই রাজপুত্ররা বলল—বোন, একমাস ধ'রে তোমার খোঁজে কত দেশই যে ঘুরেছি!—ভাগ্যিস এ পথে যেতে আজ তোমায় দেখতে পেয়েছিলাম!

রাজ্যের রাজপুত্র সব শুনে মহাখুসী। রাণীমারও

ভুল ভাবল। রাজার ছেলের সাথে রাজকন্যার বিয়েতে আর বাধা কিসের?

রাজকন্যা বললে—‘আমি না ব'লে মায়ের কোল হতে এসেছি, আগে মায়ের কোলে ফিরে যেতে চাই। ভাইদের মত আমাকেও হঠাৎ হারিয়ে মা আমার বেঁচে আছেন কি না জানি না।’

সাত ভাইয়ের সঙ্গে রাজকন্যা বাপের রাজ্যে ফিরুল। মেয়ের সাথে ছেলেদের ফিরে পেয়ে আনন্দে রাজারানীর চোখের জল আর থামে না।

কিছুদিন পরে সেই যে রাজকন্যাকে-বিয়ে-করতে-চান-রাজপুত্র তিনিও এসে হাজির। দু'রাজার লোক মহা ধুমধামে তখন রাজপুত্র আর রাজকন্যার বিয়ে দিল।

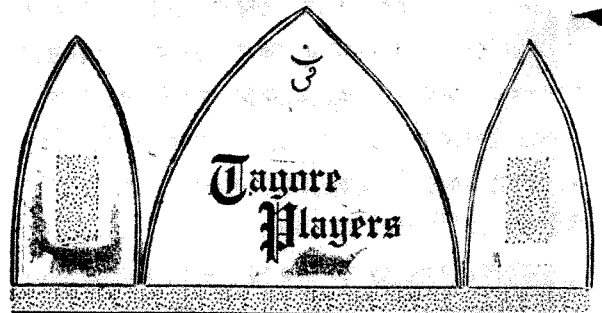
শ্রী কালিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের নাটক

কিছুদিন আগে আমেরিকার লস এঞ্জেলস নামক সহরে গ্যামুট ক্লাব থিয়েটারে মহা সমারোহে রবীন্দ্রনাথের চিত্রা নাটক অভিনীত হয়ে গিয়েছে। অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন শ্রীযুত স্বরেন্দ্রনারায়ণ গুহ। প্রোগ্রাম অথবা নির্ঘণ্ট-পত্র থেকে আরম্ভ করে দৃশ্যপট অভিনয় ইত্যাদি সমস্তই ভারতীয় আদর্শের অনুকরণে করা হয়েছিল। অর্জুনের ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার ঘোষাল। প্রফুল্লকুমারের বাড়ী কলিকাতায়। অভিনয়ের যে বিবরণ পাওয়া গেছে তাতে প্রকাশ যে প্রফুল্ল-বাবু অর্জুনের ভূমিকা বেশ চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। চিত্রার ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন কুমারী ব্রনসন। “চিত্রা” নাটক অভিনয়-কালে নট-নটীরা যে বেশভূষা করেছিলেন তাতে ঠিক ভারতীয় আদর্শের মর্যাদা রক্ষা হয়েছে বলে মনে হয় না।

স্বরেন্দ্রনারায়ণ গুহ আমেরিকায় বায়স্কোপ মহলে সুপরিচিত। তিনি নিজে একজন বায়স্কোপ-অভিনেতা। “চিত্রা” নাটক অভিনয় হবার পূর্বে তাঁর চেষ্টায় সেখানে আরও কয়েকটি হিন্দু নাটক অভিনীত হয়েছে। শোন।

যাচ্ছে যে গুহ-মহাশয় সম্প্রতি আমেরিকা থেকে দেশে



Premier Production of Rabindra Nath Tagore's

Masterpiece

“Chitra”

Produced by

SURENDRA NARAYAN GUHA
with Marion Frances Bronson and
Profulla Kumar Ghosal

Gamut Club Theatre

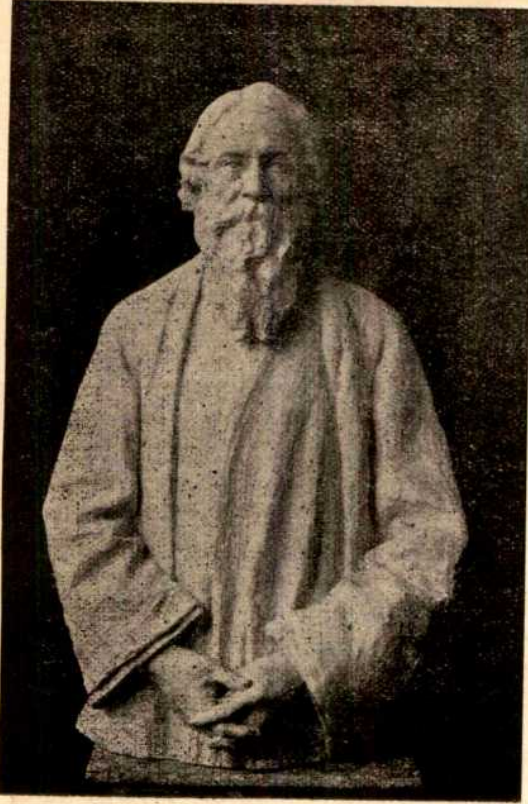
Thursday, September 15

8:15 P. M.

আমেরিকায় চিত্রা নাটকের অভিনয়ের বিবরণ-নির্ঘণ্ট।



চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় কুমারী জন্সন।



কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ম্যাসিয় পোল্যা নামক ফরাসী ভাস্করের গঠিত প্রতিমূর্ত্তি
পারী-মগরীর সালোঁ দ্য লা সোসিয়েতে নাশিয়োনাল্ দে বোজ-আর্—
ললিতশিল্পের জাতীয় সমিতির প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে।



শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার বোম্বাল।

ফিরে এসেছেন এবং কলিকাতায় একটি বায়স্কোপ
কোম্পানী খোলবার চেষ্টা করছেন।

সম্প্রতি পারী মহরেও রবীন্দ্রনাথের “চিত্রা” নাটক
অভিনীত হয়েছে।

শ্রী প্রেমাক্ষর আতর্কী

বর্ষা

বর্ষা এল ছুঁছুঁ মেয়ে
উড়িয়ে এলো-চুল,
চঞ্চল অঞ্চলের থেকে
ছড়িয়ে জুঁইয়ের ফুল।

বর্ষা এল ছুঁছুঁ মেয়ে,
ঢাক্‌চে সে মুখ—দেখ্‌চে চেয়ে,
মিশিয়ে হাসি-ক্রকুটী সে
হান্‌চে এক অদ্ভুত—
অপূর্ব বিহ্বাং।

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্তী



ধ্বংসাবশিষ্ট ইউরোপ

বিপরীত স্বার্থের সংঘাতে যে বিরোধ জাগিয়াছে তাহা সভ্য-জগতকে এমনই আলোড়িত করিতেছে যে, কোনও দেশে রাষ্ট্রনীতির গতি একই পথে বেশীদিন চলিতে পারিতেছে না। রাষ্ট্রনীতির ধারা এত দীর্ঘ দীর্ঘ ভিন্নপথমুখী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে যে তাহার ভবিষ্যৎ গতি ও প্রকৃতি সঠিক নির্ধারণ করা এক রকম অসম্ভব বলিলেও চলে। তবে মোটামুটিভাবে দেখিতে গেলে দেখা যায় যে ইউরোপের ধ্বংসোন্মুখ ব্যবসাবাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা যে প্রতিযোগিতা জাগাইয়াছে এবং অর্থনৈতিক প্রাধান্যলাভের জন্য যে চেষ্টা চলিতেছে তাহাকেই আশ্রয় করিয়া রাষ্ট্রনীতির গতি পরিবর্তিত হইতেছে। কাজে কাজেই রাষ্ট্রনীতির ধারাকে সম্যক বুঝিতে হইলে ইউরোপের অর্থনৈতিক সমস্যাকে বুঝিতে হইবে।

বিগত যুদ্ধের পর ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ উন্টাইয়া গিয়াছে। এখন কেবলমাত্র স্বদেশজাত জব্যের সংরক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই চলিতেছে না, সঙ্গে সঙ্গে বিধের হাটে তাহা প্রচলনের জন্য নতুন করিয়া চেষ্টা করিতে হইতেছে। ইংলণ্ড বাণিজ্যক্ষেত্রে পূর্ব আধিপত্য বজায় রাখিবার চেষ্টায় অবাধ-বাণিজ্যের (free trade) পরিবর্তে উপনিবেশগুলির সহিত সম্মিলিত হইয়া এক শুষ্ক-সমবায় (Tariff Union) গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা পাইতেছেন। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশও ক্যানোডা উপনিবেশের সহিত শুষ্ক-সন্ধি করিয়া বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বেশী সুবিধা করিয়া লইয়াছেন। মধ্য-ইউরোপের নবীন রাজ্যগুলিও জেকো-গোষ্ঠাক্রমের মন্ত্রী বেনিসের প্রচেষ্টায় এক শুষ্ক-সমবায় গড়িয়া বাণিজ্যের হাটে প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন।

সাম্রাজ্য-লোভ ও যুদ্ধের অবশুষ্ঠাবী ফলরূপে এই-সকল বিপরীত ধারার সৃজন হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে জার্মানী বাণিজ্য-ক্ষেত্রে যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, সমগ্র মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে যে অর্থনৈতিক খাদ (Economic Trench) কাটিয়া অল্প-দেশজাত পণ্যের প্রবেশ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, তাহাকে বিনষ্ট করিয়া একটি সার্বজাতিক ধনিক-মণ্ডল (International Capitalist Trust) গঠন করিয়া অবাধ-বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দেওয়া বিশ্বযুদ্ধের একটি প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মিত্রশক্তিগণ ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ-শেষে জাতিসমূহের সংঘ গঠিত হইল শুধু নামে—প্রবল শক্তিগুলিই সংঘের সর্বনয় কর্তা হইয়া উঠিলেন এবং দুর্বল জাতিগুলি প্রবলের স্বার্থের নিকট পরাভব মানিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু এ অবস্থা বেশীদিন রহিল না। প্রবলে প্রবলেও স্বার্থের সংঘাত বাড়িয়া উঠিল, জার্মানীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাধান্য লাভের জন্য আবার জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ চলিতে লাগিল। পূর্বে বিধের হাটে জার্মানীর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ইংরেজ; জার্মানীর তিরোডাঘের পর মার্কিনের আবির্ভাব হইল, তাই প্রতিযোগিতা চলিতে লাগিল ইংরেজ আর মার্কিনে। যুদ্ধের অবকাশে আমেরিকা বিধের হাটে আপনাকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ পাইয়াছিল; যুদ্ধাবসানে তাহা বজায় রাখিবার

জন্ত সে প্রাণপণ চেষ্টা পাইতে লাগিল। কাজেই ইংরেজের সহিত মার্কিনের স্বার্থের সংঘাত আরম্ভ হইল।

যুদ্ধের সময় ঋণদান ও মাল-সববরাহ করিয়া প্রভূত ধনবৃদ্ধির সুযোগ আমেরিকার হইয়াছিল। ইউরোপের মুদ্রার মূল্যনিষ্কাশন অনেকটা আমেরিকার ইচ্ছার অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। অল্প দিকে ইংরেজের ধনসাম্য বজায় রাখা দায় হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজের একটা মস্ত বড় সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে এই যে, তাহার কাঁচা মাল বিক্রয় করিবে কাহাকে? যুদ্ধের পূর্বে জার্মানী এক বড় ক্রেতা ছিল। কিন্তু পৌঁটলা-পুঁটলি সমেত যাহাকে রাস্তার বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে সেই পথের ভিখারীকে ক্রেতা করা তো সম্ভব-পর নয়। জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, তুর্কী ও রুশিয়ার অবস্থা রাস্তার ভিখারীর মত; ইহাদের অর্থ-নৈতিক চরুদর্শা সমস্ত ইউরোপকে চরুদর্শাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের বাণিজ্য নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্য-সংহতি নষ্ট হইয়াছে, ফলে লক্ষ্মী চঞ্চলা হওয়াতে প্রসারের শক্তি ক্ষীণ হইয়াছে। অপরদিকে এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে অবাধে বাণিজ্য-বিস্তারের সুবিধা পাইয়া আমেরিকা ও জাপানের বাণিজ্যভিত্তি আরও সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে। আমেরিকা এতই ধনশালী হইয়া উঠিয়াছে যে মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপের রাজ্যসমূহকে ধারে মাল সববরাহ করিয়া তাহাদের নষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধারে সহায়তা করিবার সামর্থ্য আমেরিকার আছে। ইংরেজ কিম্বা অল্প কাহারও ঋণ দিবার শক্তি নাই। যুদ্ধের ফলে আমেরিকা বিধের হাটে প্রবল হইয়াছে, ইউরোপীয় শক্তিসমূহের মধ্যে ইংরেজ প্রাধান্যলাভ করিয়াছে এবং জাপান প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া একচ্ছত্র অধিপতিরূপে পূর্বে বিরাজ করিতেছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পাচো জাপানের এই প্রাধান্যকে খর্ব করিতে উৎসুক; ইংরেজ আমেরিকার ধনপ্রাবল্য সহ্য করিতে নারাজ; ইউরোপে ইংরেজের রাষ্ট্রনৈতিক প্রাধান্য আবার ফ্রান্সের চক্ষুশূল। এই পরস্পর-বিরোধী শক্তিসমূহের ঈর্ষা পরস্পরকে এমনই ক্ষতবিক্ষত করিতেছে যে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। তবে যতদূর দেখা যাইতেছে ইংরেজ আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপানকে প্রবল রাখিতে চেষ্টা পাইবেন এবং ইংরেজ ও জাপানের সখ্যতার বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও আমেরিকার মিত্রতা জমিয়া উঠিবে বেশ ভালরকমই। ইংরেজের পক্ষে আবার ফ্রান্সের শক্তিকে বাহত করিবার জন্য জার্মান-শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাওয়া বিচিত্র নহে। ইতিহাসের গতিকে বিগত যুদ্ধ যে পথে চালাইয়াছে তাহাকে ফিরাইয়া অন্ত্রপথে চালান সহজ নহে। তাই মনে হয় যে বিগত যুদ্ধ শেষ যুদ্ধ নহে; আবার এক নূতন কুরক্ষেত্রে বুঝিবা বাধিয়া উঠে।

মার্কিন রাজ্য খনিজ ধন-সম্পদে ইংলণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর খনিজ তৈলের শতকরা ৬০ ভাগ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া যায়। এই খনিজ তৈলের প্রাধান্য হইতে আমেরিকা কলকারখানার জন্য সস্তার শক্তি ব্যবহার করিবার উপায় লাভ করিয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে মার্কিনের পণ্যবাহী জাহাজ ছিল না। পৃথিবীর পণ্য-বহন কারবার

ইংরেজের একচেটিয়া ছিল। যুদ্ধের পর এক বিরাট পণ্যবাহী নৌবহরের সাহায্যে মার্কিন পণ্য সরবরাহে ইংরেজের সহিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করিতেছে। ইংরেজ তাই মার্কিন রাষ্ট্রের গতিকে অশ্রু ক্ষেত্রে পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিনের ঘরের পাশে জাপানকে প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবল রাখিতে উৎসুক। ক্যালিফোর্নিয়া, মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আমেরিকায় প্রতিযোগিতা বাড়িয়া উঠিলে সেই-সকল স্থানেই মার্কিনের শক্তির অধিকাংশই ব্যয়িত হইয়া যাইবে, ইউরোপের হাটে মার্কিনের হুবিধা করিয়া উঠা বড় সম্ভবপর হইবে না।

জাপান, যুদ্ধের অবকাশে, প্রশান্ত মহাসাগরে নিজের শক্তিকে যথেষ্ট বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। অবাধ-বাণিজ্য করিবার সুযোগ পাইয়া প্রচুর হাটে বেশ দৃঢ়ভাবে আস্তানা গাড়িয়া বসিবার সুযোগ পাইয়াছেন। কিন্তু প্রথম-শ্রেণীর ব্যবসায়ী জাতি হইয়া উঠিবার এক অন্তরায় উপস্থিত হইয়া জাপানের বাণিজ্যের প্রসার তেমন হইতে দেয় নাই। জাপানে কয়লা ও লৌহের উৎপাদন সম্ভায় সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু কয়লা ও লৌহ ভিন্ন সম্ভায় পণ্য প্রস্তুত ও সরবরাহ সম্ভব-পর নহে। যুদ্ধের অবকাশে জাপান তাহার এই অভাবটিকেও মিটাইয়া ফেলিবার সুযোগ পাইয়াছেন। নবীন চীন-সাধারণতন্ত্র ও মাইবেরিয়ার গণতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া তথাকার কয়লা ও লৌহের খনিগুলিকে সম্ভায় ইজারা লইয়া জাপান নিজের অভাব অনেকটা পূরণ করিয়া লইয়াছেন। মার্কিন ওয়াশিংটন-বৈঠকে চীনের সহিত জাপানের এই পণ্যসন্ধি নষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা ছিলেন। কিন্তু ইংরেজ নিজের স্বার্থের খাতিরে জাপানের অন্তকূলতা করেন।

ইংরেজ উপনিবেশগুলি কিন্তু জাপানকে বিশেষ ভাল নজরে দেখেন না। ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রমজীবী-সম্প্রদায় জাপানী শ্রমিকের সহিত প্রতিযোগিতায় হারিয়া জাপানের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন; তাই পীতাতঙ্কে আতঙ্কিত এই উপনিবেশগুলিই ইংরেজ জাপানে মিত্রতার বিরুদ্ধে যোরতর আপত্তি তুলিয়াছেন, তথাপি ইংরেজ সরকার দায়গ্রস্ত হইয়া জাপানের সঙ্গে সখ্যতা করিতেছেন। ইংরেজ যেমন জাপানকে খেলাইয়া মার্কিনকে দুর্বল করিতে চাহিতেছেন তাহার পাটা চালে মার্কিনও ফ্রান্সকে ইংরেজের বিরুদ্ধে এক চাল খেলাইয়া লইতেছেন। ইংলণ্ডের এত সরিকটে একটি বিরুদ্ধ-স্বার্থ-বিশিষ্ট শক্তিকে বাড়াইয়া তুলিতে পারিলে মার্কিনের হুবিধা। মার ও রুসের কয়লার খনি ও লংউইর লৌহের কারবার ফ্রান্সের হাতে আসাতে ফ্রান্স, হলান্ড, সুইডেন, স্পেন প্রভৃতি রাজ্য ইংলণ্ডের সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছেন। ইংরেজ কয়লার খনির মালিক ও ইস্পাতের কারবারীর ইহাতে সমুহ ক্ষতি। তাই ইংরেজ ব্যবসায়ীগণ জার্মানীর রাটেনো ও ষ্টাইনিসের ব্যবসায় যাহাতে ফ্রান্সের সহিত

প্রতিযোগিতা করিতে পারে তাহার সুযোগ করিয়া দিতে উৎসুক। জার্মান কয়লা ও লৌহের কারবার যাহাতে প্রবল না হইয়া উঠে ফ্রান্স আবার তাহার চেষ্টা পাইতেছেন। পূর্বে প্রসিয়ার কয়লার খনিগুলি যাহাতে পোলাণ্ডের হাতে আসে তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা ফ্রান্স করিয়াছিলেন। পোলাণ্ড, জেকোভোভাকিয়া ও রুমেনিয়ার সহিত নানা প্রকার ব্যবসায়-সম্পর্কিত বন্দোবস্তও ফ্রান্স করিয়াছেন। ইহাতে তাহার লাভ দু'রকমে হইয়াছে। প্রথম লাভ প্রায় ইউরোপে জার্মান পণ্য-প্রাধান্য নষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় লাভ জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে একটি রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে যাহা প্রয়োজন হইলে জার্মানীর প্রতিকূলে ফ্রান্সের অহুকূলতা করিবে। এনিয়া মাইনরের লৌহ-খনিগুলির ইজারা পাইয়া ফ্রান্স তুরস্কের জাতীয়দলের সহিত এমন অনেকগুলি রফানিস্পত্তি করিয়াছেন যাহা ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতিকূল। এই-সব নানা কারণে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ও জার্মানীর অহুকূলে ইংরেজ রাষ্ট্রনীতির ধারা বর্তমানে প্রবাহিত হইতেছে। কালে এই স্বার্থের সংঘর্ষে আর-একটি কুরুক্ষেত্র বাধিয়া উঠিবে কি না কে বলিবে? Communist Reviewএ Karl Radekএ সম্বন্ধে বলিতেছেন, "English American competition is a capitalist fact of post-war world politics. Naturally competition does not mean immediate war. Fifteen years elapsed between the day when the Saturday Review wrote 'Germaniam dellam esse' and Scapa Flow. But the danger of a resort to war exists."

* * * The question is how and when the clash between Anglo-American interests will arise. Eastern Asia and East Europe will play a leading role in the coming conflict. * * * The British Foreign Office wants to use its relation with Japan as a card in the diplomatic game against U. S. A. If Japan can be played off as an English card against the U. S. A., then France may be used as an American card against England. The last three years have witnessed an uninterrupted Anglo-French struggle for European Hegemony." যতদূর দেখা যাইতেছে বর্তমান রাষ্ট্রনীতির অন্তরালে রহিয়াছে অর্থনৈতিক কতকগুলি সমস্যা। এবং বিশ্বের হাটে যে রেবারেসি চলিতেছে তাহার মূলে রহিয়াছে কয়লা ও লৌহের প্রতিযোগিতা। এই কয়লা ও লৌহের মালিকানা লইয়া শেষে একটা যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধিয়া উঠা কিছুই বিচিত্র নহে।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

কমলা মিঠে করা

প্রথমে কিছু চূণ পচিয়ে কয়েকদিন সাঁতায়েতে মাটিতে ছড়িয়ে রেখে দিতে হবে। তারপর ঐ গাছের ফল মিঠে করতে হবে তার গোড়ার চারদিকে একটি নাতি-গভীর খাল এমন ভাবে কাটতে হবে যে কোন শিকড় যেন কাটা না যায়। পরে সেই পচানো চূণ দিয়ে

সেই খাল ভর্তি করে মাটি দিয়ে চেপে দিলেই সেই গাছে খুব মিঠে কমলা হবে। সিলেট জেলার ছাতকের আর খামিয়া জেলার চেরাপুঞ্জীর কমলা মিষ্টি বলে' প্রসিদ্ধ, কারণ এই দুই জায়গায় চূণাশাখ খুব বেশী। এই উপায়ে আম-কাঁটালও বেশী মিঠে করা যেতে পারে।

শ্রী মহিউদ্দীন আহমদ চৌধুরী

রোএরিক

এক শতাব্দীরও আগেকার কথা, টুর্গেনিভের গল্প উপন্যাস হঠাৎ রুশিয়াকে পৃথিবীর গুণী-ও রসজ্ঞ-সমাজের দৃষ্টির সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে। সাহিত্য ও ললিতকলায় তারপর হইতে বিশেষ একটি গৌরবের স্থান রুশিয়া বরাবরই অধিকার করিয়া আসিয়াছে। টুর্গেনিভের উপন্যাসরাজির পর শায়কোভেস্কির সঙ্গীত, তারপর এক-সঙ্গে ডষ্টয়েফ্‌স্কির উপন্যাস ও রুশীয় নৃত্যকলা সমস্ত ইউরোপ জুড়িয়া যে রসের প্রাবন বহাইয়াছিল আজও পর্যন্ত তাহাতে বিন্দুমাত্র ভাঁটা পড়ে নাই।

কিন্তু এ-সমস্ত ছাড়া রুশিয়া যে চিত্রসম্পদেও সমৃদ্ধ এ কথাটা হয়ত অনেকেরই জানা নাই।

রুশীয় চিত্রকলার একটি বড় বিশেষত্ব এই, যে, উহাতে শিল্পপদ্ধতির দিক দিয়া একদিকে স্কেপিনেভিয়ার ও অগ্নিদিকে বাইজেন্টীয় তাতার ও ভারতীয় প্রভাব এক-সমানভাবে ছায়াপাত করিয়াছে, কিন্তু তার মধ্যেই রুশিয়ার চির-রহস্যভরা চিরন্তন সত্যটি, তাহার তরুণ-হীন কালোকষ্টির পাহাড়, তার স্নান পাণ্ডুর বসন্ত, তার তড়িচ্ছল সূদীর্ঘ কোজাগর রাত্রি, তার ইতিহাস, তার কিম্বদন্তী সর্বত্র সুস্পষ্ট সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রুশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত এই তরুণ রুশীয় শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নিকোলাস্ কন্‌ষ্টান্টিনোভিক্ রোএরিকের চিত্র। নিকোলাস্ রোএরিক্ ছাড়া রুশীয় শিল্পকলার পূজারীদের মধ্যে ভোরবেল্ সোমোফ, সেরোফ, বেনোয়া প্রভৃতি আরও অনেক শক্তিশালী শিল্পীদের নাম করা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই শিল্পে রুশিয়ার যে প্রকাশ তাহা অনেকখানিই বাহিরের বস্তু। রুশিয়ার জীবনের যেটা ভিতরের দিক, সত্য সুন্দর শিবের যে আত্মপ্রকাশ তার নিত্যই অন্তরের বস্তু, তাহাকে পাই আমরা একমাত্র রোএরিকের চিত্রে। এই হিসাবে রোএরিকই প্রথম রুশীয় শিল্পকলায় সেই জিনিষটির পরিচয় দিয়াছেন যাহাকে বলিতে পারা যায় রুশীয় শিল্পের আত্মা। কিন্তু এই আত্মা বস্তু শাস্ত, দেশে দেশে কালে কালে নানা প্রকাশের মধ্য দিয়াও ইহার

চিরন্তন ভাবমত্তা সর্বত্র সর্বমানবেরই বোধগম্য, আদর ও সন্তোষের সামগ্রী। তাই রোএরিকের শিল্প রুশীয় হইয়াও রুশীয়দের অতীত। উহা শাস্ত ও সর্বমানবিক।



নিকোলাস্ কন্‌ষ্টান্টিনোভিক্ রোএরিক্।

বর্তমান রুশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবুক চিত্রকর,
বিখ্যাত চিত্রসমালোচক ও কবি।

ভাবাত্মক হইলেও রোএরিকের চিত্র হুর্কোধ্য নহে। বরঞ্চ সহজবোধ্যতাই তাঁহার শিল্পের বিশেষত্ব। তাঁহার যে-কোনো চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই তার অন্তর্নিহিত সত্যটি অতি অলক্ষিতে আসিয়া মনকে স্পর্শ করে। আপাত-দৃষ্টিতে বেঙলিকে অদ্ভুত কিন্তু তকিমাকার বলিয়া মনে হয়, এমন একটি সহজ অনুভূতি ও প্রকাশের জ্যোতিতে সেগুলি দেদীপ্যমান যে তাহাদিগকে সত্য ও জীবন্ত বলিয়া ভাবা ছাড়া উপায় থাকে না। বাহিরে



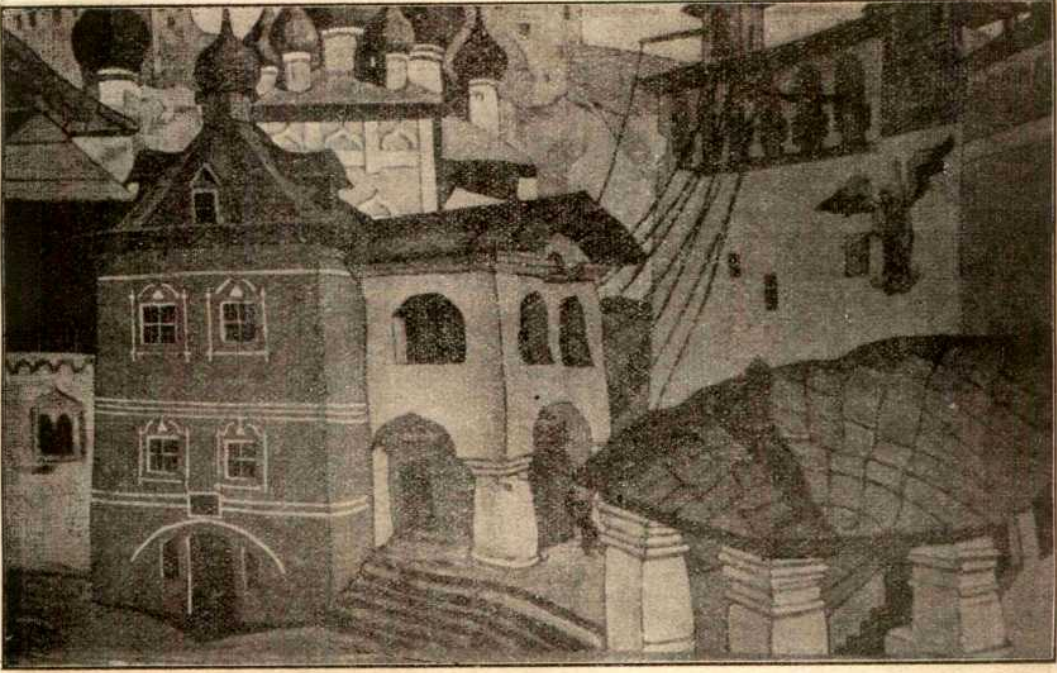
সূর্যাবন্দনা ।

চির-তুঘারের দেশে প্রথম সূর্যোদয়ে সে-দেশবাসীর উল্লাস, ঘরের চালে-চালে জোড়া দড়ির উপর শুকাইতে দেওয়া মোটা কাপড়ের সারি, দূরের পাহাড়গুলি পর্য্যন্ত যেন কুমারীর আবরণ ঠেলিয়া বাল-সূর্যের স্নেহতপ্ত স্পর্শ বুকে লইতে বাস্তু।—সব-কিছুতে মিলিয়া আলোক-ও-তাপ-বিকিত মেরুদেশের সূর্যোদয়ের মধ্যকার মর্ম্মস্পর্শী করণতটুকু হৃন্দের উপভোগ্য হইয়া ফুটিয়াছে।

তাহাদের অস্তিত্ব নাই, কিন্তু প্রতি মানুষেরই অন্তরের কোন্ গভীরতার স্থানটিতে চিরকাল যেন স্বপ্নের রূপে তাহারা বিরাজ করে, পলকের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে চিরপরিচিত বলিয়া মনে হয়।

মিষ্টিক ভাবের স্বভাবই এই যে উহা সহজ। তর্ককে বিচারকে পুঙ্খানুপুঙ্খ-অনুশীলনকে অস্বীকার করিয়া মানুষের অন্তরের সহজ অনুভূতির অনির্দেশ্য পথে যে বিজয়যাত্রা—mysticism বলিতে আমরা তাহাই বুঝিয়া থাকি। রোএরিকের mysticism এই ধরণেরই। উহা চেষ্টাকৃত সূক্ষ্ম ভাববিশিষ্ট সমাবেশ বা অনাবশ্যক জটিলতা নহে। ইহা ব্যতীত ভিতরের দিক হইতে সমগ্রভাবে রোএরিকের শিল্প সঙ্ঘর্ষে আর বিশেষ কিছু বলিবার

থাকে না। শিল্প সঙ্ঘর্ষে তাহার নিজের কোনও থিওরী নাই, তিনি নিজেও সকল থিওরীর বাইরে; তিনি বিশেষ কোনও শিল্পপদ্ধতির ধার ধারেন না; তাঁর শিল্পের ভিতর তাঁর নিজস্ব কোনো একটি বিশেষ ভঙ্গী বা ষ্টাইলেরও পরিচয় মেলে না—যাহা দেখিয়া তাহার আঁকা ছবিকে তাহারই ছবি বলিয়া ধরিয়া দেওয়া যায়; এবং যদিও কেহ কেহ মনে করেন, গোঁগ্যা, ব্লেক ও ভোরকবেলের প্রভাবে তিনি প্রভাবান্বিত, তবু ইহা নিঃসংশয়িতরূপেই বলা যাইতে পারে যে তিনি কোনও শিল্পীকে নিজের শিল্পগুরু রূপেও গ্রহণ করেন নাই। এক কথায় রোএ-রিকের শিল্প যেন বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্রকৃতির আত্মার সহজ এবং স্বকীয় প্রকাশ, উহা যেন অপৌরুষেয়!



আরতির বেলা।

রোএরিকের আঁকা "প্রাচীন রুশীয় স্থাপত্যকলা" পর্যায়ের একখানি ছবি। আরতির বণ্টা বাজিতেছে ; - গির্জার দেওয়ালে আঁকা দেবদূতের মূর্তিটির মধ্যে সেই আল্লান যেন মূর্তি-পরিগ্রহ করিয়াছে।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে রোএরিকের জন্ম হয়। ১৮৯৩ হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি পেট্রোগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, ঐ সময়েই তিনি সেখানকার এ্যাকাডেমীতে চিত্রবিদ্যাও অধ্যয়ন করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রুশিয়াতে রোএরিকের শিল্পজীবনের পঞ্চবিংশ বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ধরিয়া হিসাব করিলে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শিল্পজীবনের আরম্ভ। কিন্তু বস্তুত চিত্রশিল্পে রোএরিক প্রথম খ্যাতি অর্জন করেন তাহারও পাঁচবৎসর পরে, পেট্রোগ্রাড এ্যাকাডেমীতে একটি চিত্র প্রদর্শন করিবার ফলে। তখন হইতেই রুশিয়ার শিল্পী- ও শিল্পরসজ্ঞ-সমাজের দৃষ্টি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে। তাঁহার এই প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর দ্রুত বাড়িতে থাকে।

রোএরিকের শক্তি ও সাধনা এবং তাঁহার ব্যক্তিত্ব নানা বিরুদ্ধদলেরও শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উদ্রেক করে। শিল্পে যদিও তিনি নবযুগের একজন বড় বার্তাবহ

তথাপি গবর্ণমেন্টের পরিচালিত প্রাচীনতার পরিপন্থী অনেক এ্যাকাডেমী ও ইন্সটিটিউটে তিনি বহুকাল ধরিয়া সভ্য মনোনীত হইয়া, এমন কি শিক্ষকতা পর্য্যন্ত করিয়া আসিয়াছেন। অতীতকে প্রাচীনতার ও গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতেও তাঁহাকেই সকলের আগে দেখা গিয়াছে। সেরোফ, ভোরবেল, সোমোফ, বাকুষ্ট ও বেনোয়া প্রভৃতি বিখ্যাত রুশীয় চিত্রশিল্পীরা "শিল্পজগৎ" নামে শিল্পীসমাজ গঠন করিয়া যে বিদ্রোহের ধ্বজা উড্ডীন করিয়াছিলেন, সেই নূতন-প্রাণের যজ্ঞে রোএরিকই ছিলেন বড় পুরোহিত, এবং সেই শিল্পী-সমাজের প্রথম প্রেসিডেন্ট।

রোএরিক একজন অসাধারণ কর্মী। নিজের অদ্ভুত কর্মপ্রবণতায় তিনি তাঁহার জীবন-চরিত লেখক ও সমালোচকদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। হয়ত তাঁহার চিত্রকলার ব্যাখ্যা সমন্বিত তাঁহার একটি শিল্পজীবনী রচিত হইয়া ছাপা হইতে গিয়াছে। হঠাৎ এমন আরও



মাধু প্রোকোপিয়াস অচেনা পথযাত্রীদের আশীর্বাদ করিতেছেন।

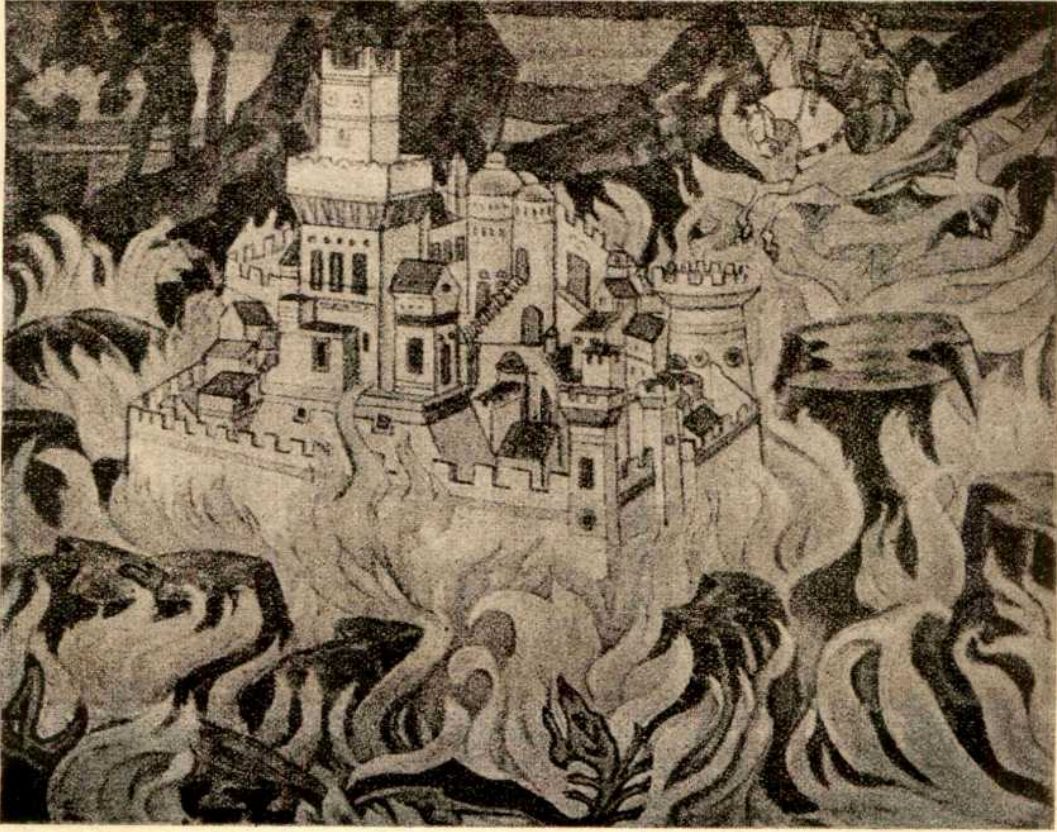
রোএরিকের আঁকা “কিশদন্তী” পর্যায়ের একখানি ছবি। মাধু প্রোকোপিয়াস অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। একবার আশ্রয়প্রার্থী হইয়া তিনি কোনও ভিক্ষকের আড্ডায় উপস্থিত হন। ভিক্ষকেরা তাঁহাকে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দেয়। সেই হইতে গির্জায় ঢুকিবার এক পাথর-বাঁধা পথে মুক্ত আকাশের তলে তাঁহাকে বাস করিতে হইত। সেই জায়গার বাতাস থাকিয়া থাকিয়া কেমন উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়া প্রচণ্ড শীতের হাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিত। একবার প্রস্তর-বৃষ্টিতে তিনি যে শহরে বাস করিতেন সেই শহর ধ্বংস হইবার উপক্রম হয়। মাধু প্রোকোপিয়াস প্রস্তর-বৃষ্টির পথে ছুটিয়া গিয়া আকুল হইয়া প্রার্থনা করিতে থাকেন।—মেঘেরা তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া ভিন্ন পথে চলিয়া যায়।

প্রোকোপিয়াসের অন্তরের পরিপূর্ণতার সঙ্গে রাশিরাশি মেঘে পরিপূর্ণ আকাশ, কূলে কূলে পূর্ণ নদী, বাতাসে ভরা পাল ও পূর্ববন্ধ পর্বতমালা যেন এক স্তরে বাঁধা।

গুটি-দশ-বারো ছবি আঁকা হইয়া বাহির হইয়া গেল, যাহাতে পূর্বতন ব্যাখ্যার আগাগোড়া পরিবর্তন ও সংশোধন প্রয়োজন। এ পর্য্যন্ত রোএরিক যত ছবি আঁকিয়াছেন তাহার সংখ্যা কম করিয়া ধরিলেও ৭০০র নীচে হইবে না! পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এই ছবিগুলি ছড়াইয়া রহিয়াছে। ছবি আঁকার অবসরে তিনি শিল্প-সম্বন্ধে তাঁহার নানা মতবাদ প্রভৃতি ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন, প্রকৃত প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রভৃতিও রচনা করিয়া থাকেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে কবি বলিয়াও তাঁহার প্রচুর খ্যাতি আছে।

বাহির হইতে দেখিলে রোএরিকের চিত্র সম্বন্ধে সকলের আগেই যাহা চোখে পড়ে তাহা এই,—তিনি

কোথাও পরিপার্শ্ব বা backgroundকে অবহেলা করেন নাই। বস্তুতঃ এইখানেই সাধারণ ভাবাত্মক চিত্রের সঙ্গে তাঁহার চিত্রের পার্থক্য। স্বর্গের দেবদূতকেও দিগন্তব্যাপী ঘননিবিড় মেঘাবেষ্টন বা কুজাটিকার অস্পষ্টতা দিয়া ঘিরিয়া আঁকিয়া তাঁহার তৃপ্তি হয় না; এই মাটির পৃথিবীর যে রূপটি তাঁহার মনশ্চক্ষে ধরা পড়ে তাহারই মধ্যে কোনো-একটি বিশেষ অর্থের দ্যোতনায় তিনি তাহাকে স্থাপন করেন। মানুষকে কেবলমাত্র মানুষ হিসাবে আঁকিয়াও তাঁহার মন ভরে না; বিশ্বের সঙ্গে তাহার সত্যকার সম্বন্ধের ক্ষেত্রটিতে তিনি তাহাকে ধরিয়া দেখিতে চান। রোএরিকের মতে বিশ্বের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া মানুষের যে জীবন তাহা ধর্মব্যবস্থার মধ্যেই নহে, বিশ্ব-



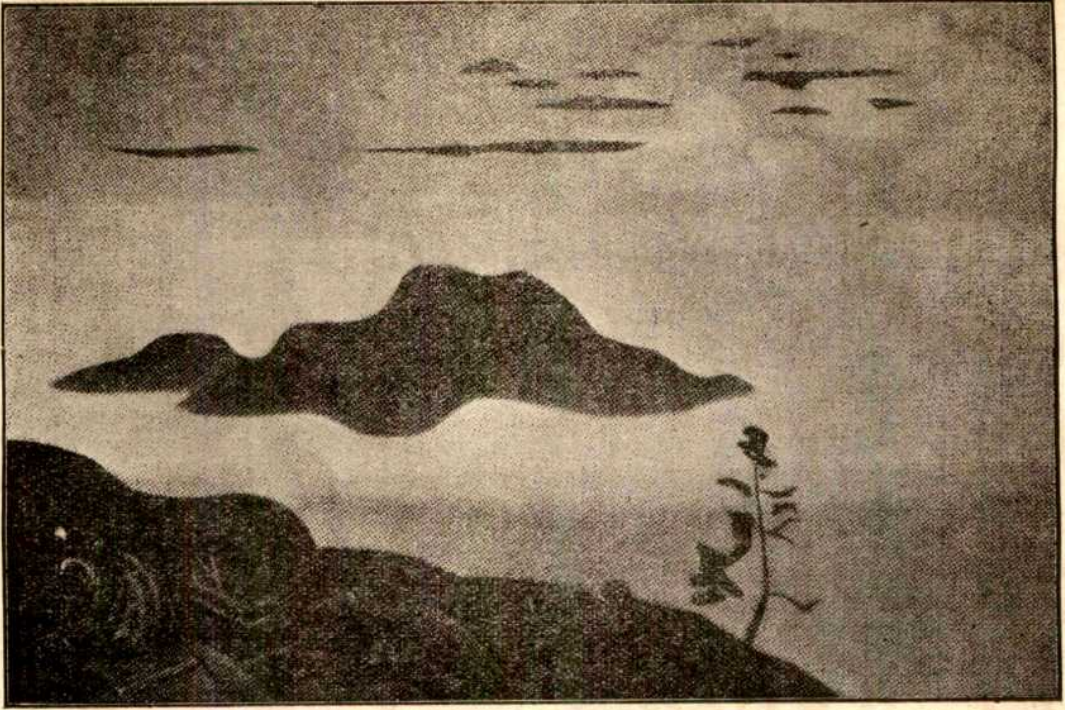
মায়াপুরী ।

রোএরিকের আঁকা “রুশিয়ার মায়ামন্ত্র” পর্যায়ের একখানি ছবি । অথারোহী রাজপুত্র মুক্ত তরবারি হস্তে প্রেত-পিশাচের আক্রমণ হইতে নগর রক্ষা করিতেছেন । নগর ঘিরিয়া ধৈর্য ও অটলতার দুর্ভেদ্য পর্বত-প্রাচীর ও শুচিতার অগ্নি-পরিখা ।

সম্পর্কে মানুষ এবং মানব-সম্পর্কে বিশ্ব—ইহাই তাঁহার শিল্পসাধনার বস্তু । তাঁহার চিত্রে এই বিশ্ব সর্বত্র স্বভাবতই মানুষকে অনেকখানি ছাড়াইয়া গিয়াছে, চলতি অর্থে শিল্পের যাহা বিষয়বস্তু পরিপার্শ্ব তাহা হইতে স্বাধিকারের বলেই যেন বড় হইয়া উঠিয়াছে । কেননা, রোএরিকের মতে বিশ্বের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ; প্রকৃতির উপর মানুষ যত রকম করিয়াই জয়ী হোক, তাহাকে সম্পূর্ণভাবে কোনোদিনই সে করতলগত করিতে পারিবে না, শেষ পর্যন্ত তাহার শক্তি ও সম্পদের অসীমতার কাছে মানুষকে হার মানিতেই হইবে, রহস্তের নাগাল মিলিবে না । রোএরিকের অনেকগুলি চিত্রে এই ভাবটিই জাজল্যমান হইয়া পরিস্ফুট হইয়াছে ।

যদিও আপাত-দৃষ্টিতে রোএরিকের অনেক চিত্রে মানবের এই স্থান নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, তবু তার সম্পর্কে এই বিশ্ব সর্বত্রই অর্থপূর্ণ । গিরি নদী বন উপবন মেঘ বিদ্যাৎ সমস্তই যেন সেই ক্ষুদ্র মানুষটিরই সত্তার এক-একটি অংশ । এককে ছাড়িয়া অল্প উদ্দেশ্যহীন ও নিরর্থক । পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের পরিপূর্ণতা ।

এই উদ্দেশ্য ও সম্পর্ক সর্বত্র সুপরিস্ফুট নহে, তবু ইহাকে চিনিয়া লইতে বিলম্ব হয় না । হৃদের তীরে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী কি রহস্তময় কাজে ব্যাপৃত আছেন তাহা আমরা জানি না ; কিন্তু দৃষ্টিমাত্রে সেই কাজটির গুরুত্ব আমাদের মনকে আসিয়া স্পর্শ করে, আমরা দেখিতে পাই সেই কাজকে ঘিরিয়াই মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার আকাশ যেন স্তব্ধ হইয়া আছে, দিগন্তপ্রসারী হৃদের জল কাঁপিতেছে না ।



গুপ্তধন।

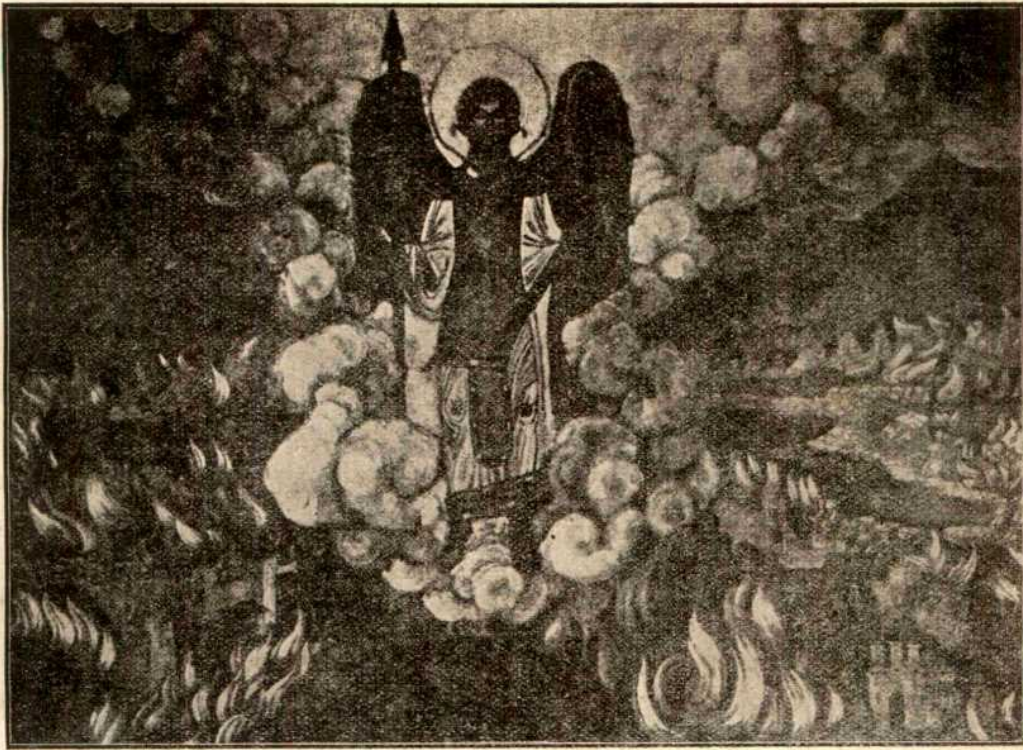
রোএরিকের আঁকা “রুশীয় মায়ামন্ত্র” পর্য্যায়ের আর-একখানি ছবি। রুশিয়ার আদিম অধিবাসী একটি লোক পাহাড়ের গুহায় তাহার ধন-সঞ্চয় লুকাইয়া রাখিয়া যাইতেছে। নিকটের মেঘখানি তাহার মনের ভয়বাকুল চঞ্চলতার ছোঁয়াচ লাগিয়াই যেন কাঁপিয়া নড়িয়া উঠিয়াছে। সঞ্চিত ধনসম্পত্তি লুকাইয়া রাখা চিরবিপ্লবের-দেশ রুশিয়ার আবহমানকালের রীতি। এজন্ম নানা যাজ্ঞবিষ্ঠা ও মন্ত্র-তন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল। ধন গোপন করিবার সময় ও গুপ্তধন আবার খুঁজিয়া বাহির করিবার সময় সেইসব মন্ত্র আওড়াইতে হইত।

নীরস পাহাড়ের কোল ঘেঁসিয়া কাটা আঁকা-বাঁকা পথটি মুহূর্তে যেন সজীব হইয়া উঠে, প্রত্যেকটি পাথরের বকের মধ্যের কোন্ এক ঔৎসুক্যের হৃৎস্পন্দন আমরা যেন স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি।—কিছু বুঝিলাম না, এ কথা বলিবার প্রবৃত্তি মন হইতে তখন কোথায় চলিয়া যায়।

বাস্তবিক সহজ-দৃষ্টিতে ঐ যেটুকু আমরা বুঝি, তাহার বেশী বুঝাইবার অভিপ্রায় রোএরিকের নিজেরও কোথাও থাকে কি না তাহাও অত্যন্তই সন্দেহের বিষয়। তিনি জীবনকে কোথাও ব্যাখ্যা করিতে বসেন নাই, টীকা ও অর্থ-কারের কাজ তাহার নহে,—তিনি দ্রষ্টা এবং শ্রষ্টা; সেই হিসাবে জীবনের যে রহস্যরূপ তাহার একান্তই সত্যরূপ,—সেই সত্যকে এমন সাহসের সঙ্গে ও সুস্পষ্টরূপে তাহার চিত্রগুলিতে তিনি আঁকার দিয়াছেন,

যে, এক কথায় তাহার পরিচয় দিতে গেলে বলিতে হয়, তিনি শিল্পজগতের এক ঋষি।

জীবনের বিপুল রহস্য। রোএরিকের কাছে মৃত্যু হইতেও সে জীবন বেশী অদ্ভুত ও বিস্ময়াবহ। সেইজন্যই রোএরিকের চিত্রে জীবনকে যেন জীবনাতীত রূপে আমরা পাই, মৃত্যুকে প্রতি-মুহূর্তে আমরা অতিক্রম করি। শুক্রমাত্র grotesque বা অপ্ৰাকৃত অদ্ভুত-কিছুর মধ্যে দিয়া এ জিনিষটি হইতেই পারিত না। রোএরিকের চিত্রও অদ্ভুত, বিস্তৃত তাহা জীবন্ত। সৃষ্টিপ্রেরণার এমন একটি নিবিড়তার প্রত্যেকটি চিত্র দেদীপ্যমান, যে, রসজ্ঞের চোখে সেগুলি বাস্তব ছাড়া আর কিছুই নহে। রোএরিকের চিত্রের মৃত্যুর মতন শুদ্ধ বিষয় গাভীর্ঘোর উল্লেখ করিয়া জ্ঞবিষ্ঠাত রুশীয় সাহিত্যিক এ্যাণ্ড্রেয়েফ বলিয়াছিলেন,—“মৃত্যুর সাম্নিধাই যেন রোএরিকের সৃষ্ট রহস্যজগতের জীবন।”



সর্বশেষ দেবদূত ।

রোএরিকের আঁকা “দেববাণী” পর্ধ্যায়ের একখানি ছবি। ছবিটির প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির অর্থ রোএরিক নিজেও জানেন না। এই দেবদূত কেনই যে সর্বশেষ দেবদূত, হতভাগ্য দুঃখজর্জরিত পৃথিবীর কানে কি তাঁহার বাণী, তাঁহার হাতের বর্শাকলকটিরই বা কি অর্থ, এসমস্ত কথার কোনও সন্ধানই তিনি দিতে পারিবেন না। সমস্ত ছবিটি তার একটুখানি একটি ব্যাখ্যা সমেত অকস্মাৎ তাঁহার মনের মধ্যে ঝলসিয়া উঠিয়াছিল। সেই ব্যাখ্যাটি এই—

“স্বন্দর চির-স্বন্দর, ভয়ঙ্কর চির-ভয়ঙ্কর, সর্বশেষ দেবদূত পৃথিবীর উপর দিয়া পক্ষবিস্তার করিয়া চলিয়া গেলেন।”

অনেকে এই দেববাণীর মধ্যে বর্তমান যুগের স্বন্দর মানবসভ্যতার ধ্বংসোন্মুখীন ভবিষ্যৎকে নাকি প্রতিকলিত দেখিতেছেন।

মৃত্যুর সঙ্গে মৈশামেশি এই জীবন, মৃত্যুর খোলা ভাবাত্মক চিত্রে প্রাচীনতার একাধিপত্য লক্ষ্য করিয়া বাতায়নে ওপারের আলো যাহার উপর পরিপূর্ণ ভাবে আদিয়া পড়িয়াছে। “পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্যের অবসান ত মৃত্যুতেই; প্রতিটি মেঘখণ্ড মৃত্যুর পথেই যাত্রা করিয়া চলে, প্রতিটি স্রোতদায় মৃত্যুতেই পর্যাবসিত হয়। কেবল সেই তৃণপুঞ্জই রোএরিকের তৃণপুঞ্জের মতো সতেজ এবং সবুজ, যাহা জানে—শীত এবং মৃত্যু তাহার জীবনের পুরোভাগে রহিয়াছে।”

জীবনের এই রহস্যকে আকার দিতে গিয়া রোএরিককে সর্বত্র প্রাচীন ইতিহাস কিম্বদন্তী পুরাণ উপকথার শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। আধুনিকতার এই অভাব তাঁহার চিত্রের আর-এক বিশেষত্ব।

ভাবাত্মক চিত্রে প্রাচীনতার একাধিপত্য লক্ষ্য করিয়া অনেক মনে করিয়া থাকেন, মানুষের আধুনিক জীবন-যাত্রা তার আধুনিক সভ্যতা, হাব-ভাব, পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যে বৃষ্টি শিল্পের সেই উপাদানটি নাই, যাহা ছিল বৌদ্ধযুগের ভারতবর্ষে, ইলিয়াডযুগের গীসে, খৃষ্টীয় যুগের ইস্রায়েলে, ক্রিওপেট্রাযুগের ইজিপ্টে। এ ধারণার মূলে তুল আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। মানুষের প্রতিদিনকার বাস্তব জীবন হইতে তাহাকে একটুখানি বিচ্ছিন্ন করিয়া না লইলে সাধারণত ভাবাত্মক বস্তুর পরিপূর্ণ রসগ্রহ করা তাহার পক্ষে কঠিন হয়। কেননা বিশ্বয় এই রসের একটি প্রধান উপাদান; এবং পরিচিত নিকটের বস্তু হইতে অপরিচিত দূরের বস্তু

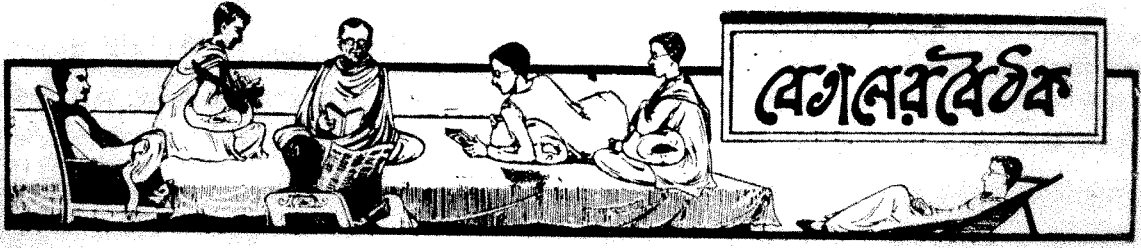
সহজে আমাদের বিশ্বয় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। তাই আজ বৌদ্ধযুগের ভারতবর্ষ যে ভাবে আমাদের কল্পনাকে উদ্ভুদ্ধ করে, স্বদূর ভবিষ্যতে বর্তমানের এই ভারতবর্ষও আমাদের অনাগতবংশীয়দের কল্পনাকে ঠিক তেমনই ভাবে উদ্ভুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি। তাহা ছাড়া, বর্তমানকে মানুষের মনে ধরে না, ভবিষ্যৎকে সে সন্দেহ করে ভয় করে, একমাত্র অতীতকেই সে ভালো করিয়া ধরিতে পারে বলিয়া তাহাকে সে বিশ্বাস করে এবং অন্তরের মধ্যে সহজেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, এইজন্যও শিল্পকৃষ্টির বিষয়বস্তু অনেক শিল্পী অতীত হইতে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু এসমস্ত ছাড়াও রোএরিকের শিল্পে অতীতের প্রধাত্তের আর-একটি বড় কারণ আছে, তাহা তাঁহার অতীতের প্রতি অহুরক্তি। শৈশব হইতে রুশিয়ার, বিশেষত উত্তর রুশিয়ার অতীত ইতিহাসকে তিনি ভালবাসেন। তখন হইতেই উত্তর রুশিয়ার, নানা অদ্ভুত বীরত্বের কাহিনী, গুপ্ত-সম্পদের নানা রহস্যময় তথ্য, উপাখ্যান, কিম্বদন্তী তাঁহার শিশুকল্পনাকে ঐশ্বর্যশালী করিয়াছে। তাঁহার নিজের শরীরে রাজ-রক্ত প্রবাহিত, তাঁর সেই অভিজাত-বংশীয় পূর্বপুরুষদের স্মৃতির গৌরব তাঁহার শিশুচিত্তকে উদ্বোধিত করিয়াছে। বয়সের সঙ্গে তাঁহার এই অহুরক্তি বৃদ্ধি পাইয়াই চলে। সমগ্র রুশিয়ার অতীত ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন করিয়াই কেবল তিনি তৃপ্ত হন নাই, স্বয়ং বহু সময় ও উচ্চম ব্যয় করিয়া প্রত্নতত্ত্বের চর্চা করিতে আরম্ভ করেন। দীর্ঘকাল রুশিয়ার পল্লীতে পল্লীতে পর্যটন করিয়া যেখানে যাকিছু প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন, বাড়ী, গির্জা, দেবায়তন, মঠ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পান সব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ফিরিতে থাকেন। বুদ্ধ, ফকির, সন্ন্যাসী ও কৃষকদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের সঙ্গে গল্পগুজবে তাহাদের অভাব-বেদনার কথার সঙ্গে সঙ্গে রুশিয়ার গৌরবময় অতীত জীবনেরও পরিচয় গ্রহণ করিতে থাকেন। পরবর্তী জীবনে তাঁহার

শিল্প-চর্চায় এইসব অভিজ্ঞতা হইতেই তিনি অনুপ্রাণনা লাভ করিয়াছেন। ইতিহাস হার মানিয়া গেলে কিম্বদন্তীর শরণ লইয়াছেন, তাহাতেও যখন চলে নাই তখন অবলীলায় উপকথা-রূপকথার রাজ্যের দ্বারস্থ হইয়াছেন, তাহাও উত্তর রুশিয়ারই একান্ত নিজস্ব জিনিষ।

এই উত্তর রুশিয়াতে একদিকে রোএরিকের চিত্রের মতোই জীবন ও মৃত্যু যেন পরস্পরের প্রতিবেশী হইয়া বাস করিতেছে, শান্তিপূর্ণ স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের সঙ্গে হিমালীয়স্তক কালো-কষ্টির বিকটতার যেন পরিণয় ঘটয়া গিয়াছে। আর-একদিকে ইহার অতীত ভরিয়া পতন-অভ্যুদয়ের কত সহস্র বিচিত্রতা; এশিয়াবাসী যাবাবর ও তাতার দস্যুরা কতবার ইহার বৃকের উপর দিয়া ঝড়ের মতো বহিয়া গিয়াছে; দেশবিদেশ হইতে কতবার নূতন নূতন ধর্ম-আন্দোলনের শ্রোত আসিয়া ইহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত প্রাবিত করিয়াছে; চলোখি-মুখর সমুদ্রের বৃক মথিত করিয়া বীরগর্ভী ভাইকিংদের বারংবার হানা, ভলকফ্ নদী বহিয়া ক্ষীতপাল মণিখচিত তরীবহরের কত বিজয়যাত্রা, স্বপ্নের অগোচর বহুল্য উপলোকনসহ কত বিদেশবাসী রাজঅতিথির আগমন, কত যুদ্ধ কত সন্ধি, কত বীরত্বের শৌর্যের অক্ষয় কীর্তি ইহার অতীতের স্তরে স্তরে স্বপ্নের মতো সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। লিওনিড্ এণ্ড্রেয়েভ বলিতেছেন, “রোএরিক উত্তর রুশিয়ার একমাত্র কবি। উহার রহস্যময় আত্মাটিকে তাঁহার মতো করিয়া আর কেহই প্রকাশ করিতে পারে নাই, যে আত্মার পরিচয় প্রকাশ পায় উহার ধ্যানগম্ভীর কালো-কষ্টির পাহাড়ে, উহার স্নিগ্ধ স্তিমিত ফলপুষ্পহীন বনস্তে, দীর্ঘ মেরুপ্রান্ত্রের জাগরণে। ইহা বস্তুতাত্ত্বিক শিল্পীদের সেই নিরানন্দ উত্তর রুশিয়া নহে, যেখানে সব আলোর এবং সব জীবনের অবসান। ভগবানের সঙ্গে মানুষের সকলের চেয়ে সত্য সম্বন্ধের বাণীটিই এখানে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে,— ‘চিরন্তন প্রেম ও চিরন্তন সৃষ্টি’।”

শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী



জিজ্ঞাসা

(১৯)

মহাভারতে লিখিত দ্বৈতবসের বর্ধমান অবস্থান কোথায় এবং উহার বর্ধমান নাম কি ?

শ্রী বিজয়কৃষ্ণ রায়

(২০)

পূর্ববঙ্গে নৌকা ছাড়িবার সময় মাঝিরা “গাজী বদর” বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকে কেন ? গাজী বদর কে ?

শ্রী বীরেন্দ্রনাথ সাহা

(২১)

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞান অধ্যাপনা হইত কি না ? উক্ত বিদ্যালয় সম্বন্ধে বিশেষ খবর কোন পুস্তকে পাওয়া যাইবে ?

শ্রী বীরেন্দ্রমোহন সেন

(২২)

ধর্মদাসকৃত রত্নাকর-উদ্ধারে দৃষ্ট হয় যে রত্নাকরের স্ত্রীর নাম মঞ্জরা, তিনি শূদ্রকন্যা ; ইহার কোন পৌরাণিক মূল আছে কি ? যদি থাকে তবে কোথায় পাওয়া যায় ?

শ্রী মনোরমা দাস

(২৩)

২৪ পরগণার ২৪টি পরগণার নাম কি কি ?

শ্রী জ্যোতিষ্মল্ল হর

মীমাংসা

গত বৎসরের প্রশ্নের মীমাংসা

(৬৭)

“কাগজ হইতে কালীর দাগ তোলা”

গত মাঘ মাসের প্রবাসীতে উপরি-উক্ত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত লাল-গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লেখেন :—

“পি, এম, বাগ্‌চীর শিল্প-প্রস্তুত-প্রণালীতে এইরূপ লেখা আছে—সোডা, সোহাগা ও নিশাদল একত্র পেষণ করিয়া কাগজে মাখাইলে লিখিত অক্ষর উঠিয়া যায়।”

কত পরিমাণ সোডা, সোহাগা ও নিশাদল একত্র পেষণ করিতে হইবে, উত্তরদাতা তাহার উল্লেখ করেন নাই। আমি সমপরিমাণে পেষণ করিয়া লিখিত অক্ষরে মাখাইয়া দেখি দাগ উঠে না। অনেকক্ষণ যস্যার পর অক্ষর উঠে বটে, কিন্তু কাগজ ছিঁড়িয়া যায়। ছুরি দিয়া টাটিলেও সেইরূপই হয়। এসম্বন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কিছু বলিবার থাকিলে, আগামী বৈঠকে তাহা পেশ করিলে বাঞ্ছিত হইব।

শ্রী অমিয়কান্ত দত্ত

(১৪০)

বেলপাতা, তুলসী প্রভৃতি পবিত্র কেন ?

বিষপত্র—“একতঃ সর্বপুষ্পং স্যাদ্বিজপত্রং তথৈকতঃ

মণিমুক্তা-প্রবালশ্চ স্বর্ণপুষ্পাদিতিস্তথা

ন তথা জায়তে প্রীতিবিশ্বপত্রৈর্যথা মম”—

—ভবিষ্যপুরাণধৃত শিববচন।

তুলসী—দেবগণের সন্নিহিত যুদ্ধে অশ্বরাজ জলন্ধর, পত্নী বৃন্দার একাংশ বিষ্ণু-আরাধনার বলে, শিবপ্রমুখ সমস্ত দেব এমন কি স্বয়ং বিষ্ণুরও অবধ্য হইল। তখন বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধারণ করিয়া বৃন্দার তপো-ভঙ্গ করাতে জলন্ধর নিহত হইল। তখন সতী বৃন্দা বিষ্ণুকে অভিশাপ দিতে উদ্ধত হইলে বিষ্ণু বলিলেন, “তুমি পতির অমৃত্যু হও, তোমার ভগ্নে যে বৃক্ষ জন্মিবে উহার পূজা করিলে আমার তুষ্টি হইবে।” বৃন্দার শরীর ভস্মীভূত হইলে তাহা হইতে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ ও অখথ এই চারি বৃক্ষ উৎপন্ন হইল।

—বিষ্ণু-পুরাণ ও গয়পুরাণ।

সত্যস্বরে—

তুলসী অশ্বরাজ শঙ্খচূড়ের পত্নী। দেবগণের সহিত শঙ্খচূড়ের যুদ্ধ বাধিলে তুলসীর সতীত্বের প্রভাবে স্বয়ং মহাদেবও শঙ্খচূড়কে বিনাশ করিতে অক্ষম হন। তখন দেবগণের একান্ত অমরোপে বিষ্ণু শঙ্খচূড়-রূপ পরিগ্রহ করিয়া তুলসীর অবমাননা করিলে শঙ্খচূড় নিহত হয় এবং পতিশোকাকূলা তুলসী বিষ্ণু-পদে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাহার শরীর হইতে গণ্ডক শিলা এবং কেশ হইতে তুলসী বৃক্ষের উদ্ভব হয়। তদবধি তুলসী বৃক্ষ বিষ্ণু-পূজায় প্রশস্ত।

—ব্রহ্মপুরাণ।

দুর্বা—সমুদ্রমন্থনকালে বিষ্ণু মন্মথর পর্বত ধারণ করিলে পর্বত-যর্ষণে তাহার অঙ্গের রোমরাজী ঝলিত হইয়া তরঙ্গবেগে তীরে সংলগ্ন হইলে দুর্বাক্রপ ধারণ করে। তজ্জন্মই দুর্বা দেবপূজায় প্রশস্ত।

(১৪১)

Human Magnetism

বাস্তবায় আমরা বাহ্যিক মনুষ্য-শরীরের ওজঃশক্তি বলি ইংরেজীতে তাহাকেই বলে Human Magnetism। ইহাকে সাধারণতঃ ব্রহ্মতেজ আখ্যা দেওয়া হয়। এই ওজঃ দেহরক্ষার একমাত্র পদার্থ।

“ওজস্ত তজ্জো বাতুনান্ শুক্লস্তানান্ পরম্ স্মৃতম্

হৃদয়স্থমপি ব্যাপিদেহস্থিতিনিবন্ধনম্”—সুশ্রুতঃ॥

কোন কোন মানুষের যে অসামান্য চিন্তাশক্তিতে অপরে স্বেচ্ছায় তাহার নিকট অবনত হয় তাহা এই ওজঃশক্তির ফল। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাত্মা গান্ধীর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রহ্মচর্যসাধন করিলে এই ওজঃশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহার উৎকর্ষসাধনের জন্য বাবহারিক উপায় পাতঞ্জলোক্ত যম ও নিয়মে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

তাহা সংক্ষেপে এই—অহিংসা, সত্য, অস্ত্রের, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রশিধান।

শ্রী চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

বর্তমান বৎসরের মীমাংসা

(১)

পুষ্করিণীর জলে তুঁতে দেওয়া

পুষ্করিণীর জলে তুঁতে ব্যবহার করিলে মৎস্যের কোন হানি হয় না।
(পরীক্ষিত ।)

শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য্য

(২)

ব্রহ্মক্ষত্র শব্দের অর্থ

শাস্ত্রে ব্রহ্মক্ষত্র শব্দটি দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাই।

১। “ব্রহ্মক্ষত্রস্য যো যোনিবংশো রাজর্ষি সংকৃতঃ।

ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থানং প্রাপ্যতে কলৌ ॥”

৪।১১ অ।

৪র্থ অংশে বিষ্ণুপুরাণ। এবং ভাগবত ৯ স্কন্দ ২২ অ ৪৪ শ্লোক।

এখানে “ব্রহ্মক্ষত্রিয়” শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ভেদে জাত “মূদ্ধাবসিত” জাতি।

২। ব্রহ্মক্ষত্রমহিসেনস্তম্ভে কোশং সমপূরয়ন।

১৩।৭ সর্গ শালকাণ্ড, রামায়ণ।

৩। পঞ্চ পঞ্চ ন বা ভক্ষ্যা ব্রহ্মক্ষত্রং রাঘব।

শল্যকঃ স্বাবিধো গোধা শশঃ কূর্শ্শচ পঞ্চমঃ ॥

৩৯।১৭ সর্গ, কচ্ছিকাকাণ্ড, রামায়ণ।

(২) অর্থাৎ “ইক্ষ্বাকুর অমাত্যগণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের কোন হিংসা না করিয়াই রাজকোষ পূর্ণ রাখিতেন।”

(৩) “হে রাঘব, শল্যকাদি পঞ্চ নথ-পঞ্চ-বিশিষ্ট জন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের ভক্ষ্য।”

এখানে “ব্রহ্ম” ও “ক্ষত্র” দুইটিই স্বতন্ত্র শব্দ; উহার অর্থ “ব্রহ্ম” অর্থাৎ ব্রাহ্মণ এবং “ক্ষত্র” অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বা “রাজা” এরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, পরন্তু “মূদ্ধাবসিত” অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই।

শ্রী ললিতমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ

প্রফেসর কিয়লহর্গ বিজয়সেনের প্রদ্ব্যম্বের-মন্দির-প্রশস্তির ব্যাখ্যা-কালে “স ব্রহ্মক্ষত্রিয়ানামজনি কুলশিরোদাম সামন্তয়োঃ” লাইনটির অর্থ করিয়াছেন head garland of the clans of the Kshatriyas and Brahmanas. (Ep. Ind., Vol. I, 35.)

কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা অযৌক্তিক বিবেচনা করিয়া প্রফেসর ডাক্তার ভাণ্ডারকার বলিয়াছেন যে ঐ লাইনটির ব্যাখ্যা হইবে “head garland of the Brahma-Kshatra family”। আবার চাণ্য-লিপিতেও

ভট্টভট্টকে ব্রহ্মক্ষত্রাধিত বলা হইয়াছে, এবং ইহার অর্থ ভাণ্ডারকার possessed of both priestly and martial energy করিয়া ফুটনোটে পুনরায় বলিয়াছেন যে ভট্টভট্ট ব্রহ্মক্ষত্রিয় জাতি ছিলেন ইহাও বুঝায়। উক্ত দুই স্থল এবং বল্লাল-চরিতেও সেনবংশীয় রাজাদিগকে ব্রহ্মক্ষত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে দেখিয়া ইহা অনুমান করা বোধ হয় অসম্ভব হইবে না যে ইহারা পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিল এবং হিন্দু-বর্ণাশ্রম-সংস্কারযুক্ত সমাজগঠনের পূর্বে ক্ষত্রিয় হইয়াছিল; তাহার কারণ হয়ত তাহারা ব্রাহ্মণ পদবী অপেক্ষা ক্ষত্রিয় পদই উচ্চতর বিবেচনা করিত।

প্রফেসর ডি স্মিথ্ মিবারের রাজবংশকে ব্রহ্মক্ষত্র-জাতিভুক্ত বলিয়াছেন এবং প্রমাণস্বরূপ ভাণ্ডারকার লিপিত ‘Guhilots’ শীর্ষক প্রবন্ধ (J. and Proc. A. S. B. (N. S.), Vol. V, 1909) দাখিল করিয়াছেন এবং তাহাতেই উক্ত অনুমানের সারবত্তা দৃষ্ট হইবে। রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে টড্ প্রভৃতি মনীষিগণ নানাবিধ গবেষণা করিয়াছেন এবং আধুনিক কালেও বহু মতের সৃষ্টি হইয়াছে; এই-সকল হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয়—রাজপুতনায় কতকগুলি শাখার (clan), দাক্ষিণাত্য-বাসী অনাথ্য কোল গও প্রভৃতি নীচ জাতির উচ্চস্তরে আরোহণ-জনিত শিষ্ট-সমাজের সহিত একাকী-করণ নিবন্ধন, সৃষ্টি হইয়াছে এবং আর কতকগুলির পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির উচ্চ বর্ণের অধঃপতন-জনিত মধ্যপথে সংরক্ষণ নিবন্ধন সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই শেষোক্ত প্রকার শাখার মধ্যেই পড়ে মিবারের রাজবংশ।

অধ্যাপক ভাণ্ডারকার বলিয়াছেন যে মিবারের রাণাগণ নাগর ব্রাহ্মণ-কুল হইতেই উৎপন্ন এবং প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করেন যে বোধপুরের বন্ধারা তন্তবায় ও রজক জাতি পূর্বে নাগর ব্রাহ্মণ ছিল এবং সেইরূপেই রাজপুতের গুহিলোট শাখার উৎপত্তি—তাহার পূর্বে বৈদেশিক ব্রাহ্মণ ছিল এবং পরে অর্থাৎ বিভিন্ন জাতির ঘাত-প্রতিঘাত-জনিত হিন্দু সমাজের একাকীকরণের পূর্বেই তাহারা ব্রাহ্মণত্ব ত্যাগ করিয়া ক্ষত্র-ধর্মোচিত গুণাবলী বরণ করিয়া লয়।

ডি স্মিথ্ এই-সকল প্রমাণ উল্লেখ পূর্বক উক্তপ্রকার অনুমান যৌক্তিক বিবেচনা করিয়াছিলেন।

শ্রী লালমোহন মুখোপাধ্যায়

(৩)

ভারতবাসীর জামা পরা

ভারতবাসীর জামা পরার কথা বেদেও পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে—“হুচ্য বাসঃ সন্দধিয়াৎ।” ইহা হইতে সত্যব্রতসামগ্রামী মহাশয় স্থির করিয়াছেন ছুঁচ দ্বারা সেলাই করা জামার ব্যবহার তখনও ছিল। (Asiatic Society of Bengal কর্তৃক প্রকাশিত সত্যব্রত-সামগ্রামী প্রণীত “ঐতরেয়ালোচনম্” ১০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ‘কঙ্কক’ ‘বাণবার’ প্রভৃতি শব্দও প্রাচীনকালে কোন-না-কোনরূপ জামার অস্তিত্ব প্রমাণিত করে। গৌতমদহিতার দশম অধ্যায়ে কুব্ (কোব্তা বা জামা) বলিয়া একপ্রকার পরিচ্ছদের উল্লেখ আছে। মেগাস্থিনীসের সময় একপ্রকার দীর্ঘ পোষাকের (জামা) উল্লেখ পাওয়া যায়। (ক্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বসুর ‘প্রাচীন ভারতে বস্ত্রালঙ্কার’ শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য; ‘মানসী ও মর্ম্মবাণী’, কাষ্টিক, ১৩২৮)। কাদম্বরীতে চাণ্ডালকস্তার বর্ণনাকালে তাহার জামার উল্লেখ করা হইয়াছে। ‘কঙ্ককেন সমং নারী ভট্ট-সঙ্গং সমাচরেৎ। ত্রিভির্ধর্ব্বশে মধ্য বা বিধবা ভবতি ধ্রুবম্ ॥’ এই কঙ্কক কি সেমিজ অথবা সেইরূপ কিছু ?

শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

জামার ভারতীয় নাম ‘অঙ্গরক্ষা’। এখনও পশ্চিমারা বলিয়া থাকে ‘আণ্ডরাখা’। ঠিক কোন সময় হইতে ইহার প্রবর্তন তাহা বলা যায় না, তবে যখন রামায়ণ-মহাভারতের যুগে লৌহ প্রভৃতি খাতব পদার্থের অঙ্গাবরণ কবচ প্রভৃতি নির্মিত হইত, তখন সে যুগে জামাও প্রস্তুত হইত এরূপ অনুমান বোধ করি অসম্ভব হইবে না।

অমরকোষে পাওয়া যায় বস্ত্রাদিনির্মিত সেনার জামার নাম “কঙ্ককো বারবাণোহস্ত্রী” বস্ত্রাবৃত সেনার নাম “আমুক্তঃ, প্রতিমুক্তঃ, পিনাক্ষা-পিনাক্ষবৎ”। নারীরা যে প্রাচীনকালে কাঁচুলী ব্যবহার করিতেন তাহা

প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। এই কাচুলীকে আমরা বলা হইয়াছে
“চোল, কুর্পাসিক।”

শ্রী চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

(৫)

শয়ান অবস্থায় বেশী শীত

এই প্রকার উত্তর ১৩২৮ বৈশাখের প্রবাসীর “পঞ্চশস্ত্র” আছে।

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

নিদ্রিতাবস্থায় আমাদের শরীরের সমুদয় ক্রিয়ার বেগই কমিয়া যায়। জাগ্রতাবস্থায় অপেক্ষা নিদ্রিতাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন আস্তে আস্তে হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস ধীরে ধীরে হয় এবং মাংসপেশীগুলিও কতকটা শিথিল হইয়া থাকে। এইজন্য জাগ্রতাবস্থায় আমাদের শরীরে যে পরিমাণে উত্তাপ (Heat) উৎপত্তি হইয়া থাকে নিদ্রিতাবস্থায় তদপেক্ষা কম হয় এবং আমরা শৈত্য অনুভব করি।

শ্রী হরেন্দ্রলাল বসু

আমাদের শরীরে যে উত্তাপ আছে বাহিরের বায়ুর উষ্ণতা তাহা হইতে বেশী হইলে আমরা গরম অনুভব করি, আর শরীরের উত্তাপের চেয়ে বায়ুর উষ্ণতা কম হইলেই আমরা শীত অনুভব করি। আমাদের শরীর হইতে সর্বদাই উত্তাপ বাহির হইয়া চলিয়া যাইতেছে। যেমন একটি উত্তপ্ত পদার্থ উষ্ণ স্থানে রাখিয়া দিলে শীতল হইয়া তাহার তাপ কমিয়া যায় সেইরূপ বাহিরের বায়ু যতই বেশী শীতল হইবে আমাদের শরীর হইতে উত্তাপের অপচয়ও ততই বেশী হইতে থাকিবে। যদিও আভ্যন্তরীণ তাপ সাধারণতঃ একই ভাবে থাকে। আমরা শীত নিবারণের জন্য যে-সকল কাপড়-চোপড় ব্যবহার করি তাহার উদ্দেশ্য শরীর হইতে বিহীনত যে তাপ তাহা যেন শরীরের চত্বারপাশে চারিদিকেই বদ্ধ থাকে এবং বাহিরের শীত-বায়ুও যেন আমাদের শরীর স্পর্শ না করে। শরীর হইতে উত্তাপ বাহির হইবার আর-একটা মান এই, যে, শরীরের উপরিভাগের (surface) যতটা অংশ বায়ুতে উন্মুক্ত থাকে তাহারই উপরে নির্ভর করে শরীর হইতে কতটা তাপের অপচয় হয়। উপবিষ্ট অবস্থায় শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কতকটা গুটান অবস্থায় থাকে। শয়ান অবস্থায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি উপবিষ্ট অবস্থায় চেয়ে অনেকটা উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে; কাজেই শীতবোধও শয়ান অবস্থায়ই বেশী হইয়া থাকে।

ইহার আনুষঙ্গিক আর-একটা কারণও আছে। আমরা বৃদ্ধিতে পারি আর না পারি আমাদের শরীরের ভিতরে সর্বদাই একটা কার্য্যকরী শক্তি (motor activity) কাজ করিতেছে; তাহার ফলে আমাদের ধমনীতে রক্তসঞ্চালন হইতেছে। এই কার্য্যকরী শক্তি যত বেশী, ফলে ধমনীতে রক্তসঞ্চালন যত দ্রুত হয়, শরীরের উত্তাপের সৃষ্টিও ততই বেশী পরিমাণে হইতে থাকে। দণ্ডায়মান অবস্থায় আমাদের শরীরের কার্য্যকরী শক্তির বায়ু যতটা, উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁর চেয়ে অনেক কম, শয়ান অবস্থায় আরও কম; তাহার প্রমাণ আমরা দেখিতে পাই যে শরীর-সঞ্চালনে আমরা শ্রান্ত হইলে আমরা ঠাণ্ডাইয়া না থাকিয়া বসিয়া থাকিতে চাই, শুইয়া থাকিতে পারিলে আরও আরাম পাই। কাজেই উপবিষ্ট অবস্থায় চেয়ে শয়ান অবস্থায় শরীরে উত্তাপের সৃষ্টিও কম হয়—শীত বেশী বোধ হইবার ইহা আর-একটা কারণ।

শ্রী সত্যভূষণ সেন

(৬)

ভারতের প্রথম মুদ্রায়ন্ত্র

মুদ্রায়ন্ত্র সর্বপ্রথম অর্থাৎ ১৫শত খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে গোয়া নগরে

তৎপরে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে এবং ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে দৃষ্ট হয়। ইতিহাসে দেখা যায় যে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিসনারী মাঠেব লেফটন্যান্ট লি উইলকিন্স ঐস্থানের পক্ষানন কর্দমকারকে অক্ষর প্রস্তুত শিক্ষা দেন। এবং পক্ষানন পরে এক সেট কাঠের বাংলা হরফ প্রস্তুত করিয়া মিসনারীদিগকে দায়।

শ্রী অমূল্যগোবিন্দ মৈত্র

(৭)

রাণা উপাধির অর্থ

টডের রাজস্থান হইতে এই উত্তর সংগৃহীত হইল :—

We...shall commence with the annals of Mewar and its princes. These are styled Ranas and are the elder branch of the Suryavansi or the children of the sun.

অর্থাৎ মেবারের সূর্য্যবংশীয় রাজগণ “রাণা” এই উপাধি ধারণ করিতেন।

Rahup obtained Cheetore in S. 1257 (A. D. 1201) and shortly after sustained the attack of Shemsudin whom he met and overcame in a battle at Nagore. Two great changes were introduced by this prince, the first in the title of the tribe to Sesodia; the other in that of its prince, from Rawul to Rana. ...The cause of the latter is deserving more attention. Amongst the foes of Rahup was the Purihar prince of Mundore: his name was Mokul with the title of Rana. Rahup seized him in his capital and brought him to Sesodia, making him renounce the rich district of Godwar and his title of Rana, which he assumed himself, to denote the completion of his feud.

অর্থাৎ ১২৫৭ সংবতে (খৃঃ ১২০১ অব্দে) রাহুপ চিতোরের রাজা হন। অল্পদিন পরেই সমুদ্রদ্বীপের সহিত তাঁহার নাগোর নামক স্থানে যুদ্ধ হয়; তাহাতে তিনি জয়লাভ করেন। তিনি দুইটি বিশেষ পরিবর্তন প্রবর্তিত করেন। তন্মধ্যে প্রথমটি তাঁহাদের জাতির অভিধান “শিশোদিয়া” করা, দ্বিতীয় তাঁহাদের রাজ্যোপাধি রাউলের পরিবর্তে “রাণা” লওয়া। রাহুপের শত্রুদলের মধ্যে মন্দুবা-ধিপতি পুরীহররাজ মকুল রাণাই প্রধান। রাহুপ তাঁহাকে বন্দী করিয়া শিশোদিয়ায় লইয়া আসেন এবং গদবার প্রদেশ ও রাণা উপাধি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। অতঃপর তিনি স্বয়ং রাণা উপাধি ধারণ করেন।

শ্রী বিজয়কৃষ্ণ রায়, শ্রী স্নেহাংগভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাকৃত ব্যাকরণের মতে রাণা এবং রাজা একই শব্দ। রাণার স্ত্রী রাণী; রাজার স্ত্রী রাজ্ঞী। টড সাহেবের মতে চিতোরের প্রমাদের ‘রাণা’ এই উপাধি ছিল। রাও বাঙ্গা তাহা কাড়িয়া লন।

শ্রী মনোমোহন ভট্টাচার্য্য

(৯)

টক দেখিলে জিবে জল আসে কেন

Reflex secretion বা প্রতিক্রিয়া-জনিত নিঃসরণ হেতু টক

ও মিষ্টি উভয় দেখিলেই বা উভয়ের ভ্রাণ পাইনেই জিহ্বায় সাধারণতঃ জল আসে। কিন্তু টক দেখিলেই শুধু জিহ্বায় জল আসে, মিষ্টি দেখিলে আসে না ইহার বোধ হয় কোন বিশেষ কারণ নাই। এইটুকু বলা যাইতে পারে যে টক বস্তুর তীব্র স্বাদ ও ভ্রাণ আমাদের salivary glands বা লাল-নিঃসারক গ্রন্থির উপর মিষ্ট বস্তু অপেক্ষা হয়ত অধিক পরিমাণে প্রতিক্রিয়া করিয়া থাকে।

শ্রী হরেন্দ্রলাল বসু

জিহ্বায় জল আসা মানে জিহ্বার তলদেশস্থিত গ্রন্থিসমূহ (Glands) হইতে লালারস (Saliva) নিঃসৃত হওয়া। এখন এই লালারস একরূপ পরিমাণে নিঃসৃত হইবে যে-পরিমাণে আমাদের জিহ্বা কোন রস সম্বন্ধে বোধশীল (Sensitive)। স্বতরাং 'মিষ্টি দেখিলে জিহ্বায় জল আসে না' কথাটা ভুল। বলা উচিত ছিল যে মিষ্টিতে জিহ্বায় ততটা জল বা লাল আসে না যতটা টক রসে আসে।

এখন দেখিতে হইবে যে কেন টক রসে অধিক লাল নিঃসৃত হয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে, জিহ্বা যে রস সম্বন্ধে যত অধিক বোধশীল, লাল তত অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইবে।

জিহ্বার যতখানি অংশ টক রস সম্বন্ধে বোধশীল, অশু কোন রস সম্বন্ধে বোধ হয় ততখানি নয়। সেইজন্য টক রসে জিহ্বার গ্রন্থি হইতে যত অধিক পরিমাণে লাল নিঃসৃত হইবে, অশু কোন রসে তাহা হইবে না। কারণ,

"The tastes are not excited equally all over the surface of the tongue. Thus the tip is most sensitive to sweet substances, and back the bitter, while the sides of the tongue most readily respond to acids."—Huxley's Physiology.

শ্রী কালিদাস ঘোষাল

শ্রী শচীনাথ বোষ

(১০)

প্রাচীন ভারতে সূচ

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে কিরূপ সূচের প্রচলন ছিল তাহা বলা কঠিন। কিন্তু সূচ যে ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে রচিত স্ক্রুত নামক বিখ্যাত আয়ুর্বেদ-গ্রন্থে—সীবৎ ক্রিয়া (sewing) নাম পাওয়া যায়।

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

ঋক্ সংহিতায় সূচিকার্য-বিশিষ্ট বস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। সে-প্রাচীনযুগেও আখ্যায়িক বস্ত্র কাটিয়া সূচের সাহায্যে উচ্চ অঙ্গের পরিচ্ছদ প্রস্তুতের প্রণালী অবগত ছিলেন। যাহারা উড়িষ্যার দেবমন্দির-গাত্রে অঙ্কিত মূর্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহারা অবগত আছেন, অধিকাংশ মূর্তিই নানাবিধ সূন্দর সূদৃশ্য পরিচ্ছদে সজ্জিত। উদয়গিরির রাণী-গুপ্তায় একটি মূর্তির গাত্রে বর্তমান সময়োপযোগী চাপকান দেখা যায়। ভুবনেশ্বরের মন্দিরগাত্রে কতিপয় মূর্তির পাদদ্বয় চর্ম-নির্মিত পাছকায় আচ্ছাদিত দেখা যায়। অজন্তার গিরিগাত্রে বহু চিত্রে সূন্দর পরিচ্ছদের বিস্তার দেখা যায়। অমরকোব হইতে অবগত হওয়া যায় যে ভারতে সূচিকার্য্যযুক্ত-বস্ত্র-প্রস্তুতকারী দৌচিক নামে অভিহিত হইত। বারাণসী ধামে অস্ত্রাপি এইরূপ একটি স্বতন্ত্র জাতি দৃষ্ট হয়।

সাধারণ পরিচ্ছদ হইতে পৃথক করিবার জন্য সূচী-পরিচ্ছদের কতিপয় বিশেষ নাম অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারতের নানাস্থানে রাজপরিচ্ছদ জাপনার্থ দেই-সকল শব্দ

ব্যবহৃত হইয়াছে। স্বতরাং ভারতে যে বহু পূর্বে সূচী-পরিচ্ছদের প্রচলন ছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

রামায়ণ-যুগের আলোচনা ত্যাগ করিয়া আমরা যদি বৌদ্ধযুগের ঘটনাবলী সম্যক রূপে আলোচনা করি, তবে আমরা দেখিতে পাই, বৌদ্ধযুগেও ভারতে সূচী-শিল্পের প্রচলন খুব উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। Samuel Beal-এর Chinese Sanscrit-এর ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করিলে "The Story of the Nobleman who Became a Needle-maker গল্পে একস্থানে দেখিতে পাই, বুদ্ধদেব যখন সূচ প্রস্তুত করিয়া বুদ্ধ সূচ-বিক্রেতার কুটারের দ্বারে উপস্থিত হইলেন তখন সূচ-বিক্রেতা এবং বুদ্ধদেবের মধ্যে সূচ-প্রস্তুত সম্বন্ধে এই-সকল কথাবার্তা হইয়াছিল।

"The old man asked him and said, 'O well, sir ! and is it true that you are able to make beautiful needles ?' He replied, 'I am able.' The old man then added, 'Let me see some of your ware, that I may have an idea of your skill.' Then the noble youth took out of his bamboo case a needle to show him. The old man, having examined it, replied, 'Respectable youth ! You are skilful in making needles ; you drill the holes well.' Then the noble youth answered, 'This needle is nothing. I have others in my case far superior to these.' On which he took another out of his bamboo case and showed it to the old man. Having examined it, he again began to praise the workmanship and said, 'Very well made and drilled indeed !' Then the youth said, 'Oh ! This is nothing. I have others better than that.' So he took out a third and showed to the old man who, having looked at it, cried out, 'Beautifully made, beautifully drilled indeed.' Then the youth said, 'Oh ! I have better needles than that.' On which he took out another.....taking that needle in his hand placed it gently in a vessel of water, and lo ! it floated on the surface.

বুদ্ধদেবের এবং সূচ-বিক্রেতার কথাবার্তা হইতে ইহা সম্যকরূপে প্রতীয়মান হয় যে বৌদ্ধযুগে সূচীশিল্প খুব প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

শ্রী সুধীরচন্দ্র দাশদত্ত

(১২)

শিখা রাখার প্রথা কত কালের

ঋগ্বেদের সংহিতা-গ্রন্থেও শিখার উল্লেখ পাওয়া যায়। 'যত্র বাধাঃ সম্প্রতি কুমারী বিশিখা ইব' (ঋগ্বেদ, ৬।৭৫।১৭)। পরবর্তী গৃহ-সূত্রাদিতে ইহার যথেষ্ট উল্লেখ আছে।

শ্রী চিত্তাহরণ চক্রবর্তী

শিখা না থাকিলে ক্রিয়া-কর্ম শুদ্ধ হয় না। প্রমাণ যথা, "শিখী-তিলকী কর্ম কুর্ঘ্য।" পূজাদির প্রারম্ভে "শিখায়াম্ বস্ত্রে বা গ্রন্থি বদীয়াৎ।"

শ্রী ফণলাকান্ত ভট্টাচার্য

মস্তকে শিখার উদ্দেশ্য

শুদ্ধিতত্ত্ব-যুক্ত একটি 'ব্রাহ্মণ'-বচনে দেখিতে পাওয়া যায়,—“এব

রিক্তোবানপিহিতস্তস্যৈতদপিধানং যং শিখেতি” অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আবরণ-শূন্য হইয়া থাকিলে রিক্ত (তুচ্ছ) হয়, একারণ শিখাই উহার অপিধান। পূর্বকালে ব্রাহ্মণগণ কৌপিনধারী থাকার দরুণ আবরণ-শূন্য ছিলেন, একারণ আতপতাপাদি হইতে মস্তকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা মস্তকের আবরণরূপে শিখা ধারণ করিতেন। অধুনা মাল্লাজ দেশীয় ব্রাহ্মণগণ মস্তকে ঘেরাপ কেশ ধারণ করিয়া থাকেন, উহাই শাস্ত্র-নির্দিষ্ট প্রকৃত শিখা।—

আপস্তম্বের একটি বচন আছে—“ন সমাবৃত্তা বপেয়রন্তত্র বীহা-রাদিতোকে।” অর্থাৎ ‘বীহার’ ভিন্ন অল্প সময় সমাবৃত্তগণ বপন (শিক্ষা বর্জন) করিবে না। “বীহারাদর্শপৌর্ণমাসাঙ্গবাগবিশেষঃ।” বীহার অর্থে দর্শ-পৌর্ণমাস বাগের অঙ্গীভূত বাগ বৃদ্ধায়। দর্শ-পৌর্ণমাস একটি বৈদিক যজ্ঞ। উপরন্তু ‘ব্রাহ্মণে’ শিখা-ধারণের উল্লেখ আছে। মাধবাচার্য্য ‘ব্রাহ্মণ’ শব্দের অর্থ করিয়াছেন, “ব্রাহ্মণং মন্ত্রেতরবেদভাগঃ”, মন্ত্র ভিন্ন বেদভাগই ‘ব্রাহ্মণ’। অতএব দেখা যাইতেছে, যে, বৈদিক সময় হইতেই শিখা ধারণের নিয়ম প্রকাশিত আছে।

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(১৩)

সজারু, শশক, প্রতিকূল বায়ু ইত্যাদি অযাত্রা কেন

‘জ্যোতির্বিদ্যভরণ’ গ্রন্থে পঞ্চম বর্ষে কর্ণবেধের কথা আছে। “বর্ষে ত্রিভিঃ প্রদরকাণ্ডমিতে বা সন্তঃ শিখোঃ অবগবেধবিধানমাহঃ”—প্রদর-কাণ্ডমিতে (প্রদর=বাণ=পাঁচ) পঞ্চম বর্ষে। অর্থাৎ পঞ্চম বর্ষে অথবা তৃতীয় বর্ষে কর্ণবেধ কর্তব্য। মদন-পারিজাতে বলা হইয়াছে, কুলক্রমাগত প্রথা অনুসারে কালনির্ণয় করিতে হইবে। কোন কোন গ্রন্থে অযুগ্ম বর্ষ মাত্রে ইহার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। জন্মন মাত্রেই অযাত্রা। যথা—‘রোদনং ন শুভং যানে বাহনস্য পলায়নম্’ (জ্যোতির্বিবাক)। অনুকূলবায়ু শুভহৃৎক একুপ কথা পাওয়া যায়।

“বামে মধুরবাকৃপক্ষী বৃক্ষঃ পল্লবিতোঃপ্রত্যঃ।

অনুকুলো বহন বায়ুঃ প্রয়াণে শুভশংসিনঃ॥”

অনুকূল বায়ু শুভ, হুতরাং প্রতিকূল বায়ু অশুভ।

শশক যাত্রায় অশুভ, যথা—“গোধা-সর্পঃ শাশকোজাহকশচ যানে দৃষ্টঃ কুকলাসোহপি নেষ্ঠঃ” জ্যোতির্বিবাকে শ্রীপতি।

শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কর্ণবেধের সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত সময় হইতেছে জন্মকাল—“জাতমাত্রস্ত বালস্ত মাতুরুৎসঙ্গবর্দিনঃ শলল্যা ভেদয়েৎ কর্ণং সূচ্যা দ্বিগুণসূত্রয়া”—জ্যোতির্বিবাক্ত্রে বলে।

রুদ্রাধ্যায়-মহিমা—ইহা রুদ্রের স্তুত করিয়া রচিত কতগুলি শ্লোক। বর্তমানে যাহা পাওয়া যায় তাহাতে শ্লোক-সংখ্যা ৬৬। যজুর্বেদী বৃহোৎসর্গ শ্রাঙ্কে বৃষের দক্ষিণ কর্ণে সমগ্র রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিতে হয়। যজুর্বেদীয় দশকর্মপদ্ধতির পুস্তকে বৃহোৎসর্গের হোমের পর এই রুদ্রাধ্যায় আছে।

উপযুক্ত মীমাংসায় কর্ণবেধ এসঙ্গে উল্লিখিত শ্লোকটি হইতে প্রাচীন ভারতবর্ষে কিরূপ সূত্রে প্রচলন ছিল তাহারও আভাস পাওয়া যায়। শললী অর্থাৎ শজাকর কঁটায় সূতা পরাইয়া সূত্রে কার্য্য করা হইত। এবং ইহাতে যখন সদ্যোজাত শিশুর কর্ণবেধ সম্ভবপর হইত তখন অস্ত্রাঙ্ক নীবনকর্ণও যে ইহার দ্বারা চলিতে পারিত তাহাতে সন্দেহ কি?

শ্রী চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

রুদ্রাধ্যায় রুদ্রের উপদেশ-কৃত যজুর্বেদীয় সূক্ত; শ্রাঙ্ক কাষ্যে পঠনীয় গ্রন্থাংশ-ভেদ; ইহা যজুর্বেদীদের বৃহোৎসর্গে পঠিত হইয়া থাকে।

(বিশ্বকোষ)

শ্রী বিজয় কৃষ্ণ রায়

শশক যে অযাত্রা তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে :—

সর্পকৃতনরং সর্পং গোধাক শশকং বিবম্।

শ্রাঙ্কপাকক পিণ্ডক মোদকক তিলাংস্তথা॥

(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)

‘প্রতিকূল বায়ু অযাত্রা’ এমনকি বিশেষভাবে কোন নির্দেশ নাই, তবে “বজ্রাবাতং রক্তবৃষ্টিং বাদ্যক নৃপঘাতকম্”—এইগুলি অশুভ লক্ষণ বলিয়া ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লিখিত হইয়াছে। আরও বায়ুকে যদি দেব বস্ত্র বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে প্রতিকূল বায়ু অযাত্রা। কারণ নিম্নোক্ত শ্লোকে যাত্রাকালে দৈবানুকূল্য একান্ত প্রার্থনীয় বলিয়া গণিত হইয়াছে।

নিজদৈবানুকূল্যে হি প্রাতিকূল্যে পরস্য চ।

যায়াদ ভূপা যতো দৈবং বলমেতৎ পরং মতম্॥

(যুক্তিকল্পতরুঃ)

“মুক্তকেশীং ছিন্ননাশং রুদন্তীক দিগম্বরীম্” এই বাক্যে নারীর ক্রন্দন অযাত্রা বিবেচিত হইয়াছে।

রুদ্রাধ্যায় রুদ্রসর্গ নামক পর্বের অংশ বলিয়া বোধ হয়। রুদ্রসর্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় :—

কথিতস্তমসঃ সর্গো ব্রহ্মস্তুয়ঃ মহামুনে।

রুদ্রসর্গং প্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতং শৃণু॥

(বিষ্ণুপুরাণ)

ইতি তে কথিতো রাজন্ রুদ্রসর্গঃ প্রজাপতে।

যং শ্রদ্ধাপি নরঃ ম্যন্তোঃ জহ্যাদ ভূতকৃতং ভয়ম্॥

(পদ্মে স্বর্গখণ্ডে রুদ্রসর্গঃ ৮ অধ্যায়ঃ)

শাস্ত্রে কর্ণবেধ কেবল পঞ্চম বর্ষেই করিতে হইবে এরূপ কোন অনুজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে অযুগ্মবর্ষে কর্ণবেধ করিতে হইবে এইরূপ বিধান আছে।

প্রমাণ—

ন জন্মমাসে ন চ চৈত্রপৌষে ন বর্ষধ্বংসে ন হরৌ প্রহুপ্তে।

(দীপিকায়াম্)

কিন্তু বিদ্যারন্ত পঞ্চম বর্ষে করাইতে হয় :—

“অপঠনদিনবর্জ্ঞাং পাঠয়েৎ পঞ্চমহুকে।”

“সম্প্রাপ্তে পঞ্চমে বর্ষে অপ্রহুপ্তে জনাদিনে॥”

(বিষ্ণুস্মৃত্তরে)

শ্রী বিজয়কৃষ্ণ রায়

(১৬)

হিন্দুধর্মে পৌত্তলিকতার ইতিহাস

এই জিজ্ঞাসার যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত উত্তর পূজাপাদ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

“আর্য্যদের ... স্বর্গের প্রাচীনতম স্মৃতিগুলিতে ধর্মের যে মূর্তি আমরা দেখিতে পাই—উহাই ধর্ম-ভাবের সনাতন আদিম মূর্তি। আর্য্যের জাতির মধ্যেও যখনই ধর্ম-ভাব প্রথম দেখা গিয়াছে—তখনই এই মূর্তি ...। এই মূর্তিটি—জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, অগ্নিতে, বায়ুতে, বাহা-কিছুর সঙ্গে দৈনিক জীবন-যাত্রায় মানবের পরিচয় হয়, তাহাতেই একটি দেহাতিরিক্ত সূক্ষ্ম চিন্ময় সত্তার কল্পনা এবং তাহাতে মানবের শক্তির অতীত শক্তির অর্থাৎ দেবত্বের আরোপ। ধর্মের এইরূপ দেবতার অভাব নাই। অগ্নি দেবতা, বায়ু দেবতা, ইন্দ্র দেবতা, সূর্য দেবতা, বিষ্ণু দেবতা ইত্যাদি। ধর্মের এই পন্থান্ত প্রকাশ সমস্ত

আদিম ধর্মেরই এক। কিন্তু বেদীন আর্গ্য ধর্মিগণ জ্ঞান-নেত্রে সহসা এই সত্য দেখিতে পাইলেন যে, অগ্নি বায়ু বরুণ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দেবসত্তা নহে,—এক মহাদেবমত্তারই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র, জগতের ধর্মের ইতিহাসে তাহা এক অরূপীয় দিন।

সেই দিন হইতে আর্গ্যধর্মের শ্রোত এক সম্পূর্ণ নূতন পথে প্রবাহিত হইল। খৃঃ পূঃ হইতে মিশর আইসিস-ওসাইরিসের মূর্তি গড়িয়া পূজা আরম্ভ করিয়াছিল, আসিরিয়া কেলডিয়াও তাহার কিঞ্চিৎ পরেই নামাস ইস্টর, মিসিটার মন্দির গড়িয়া তুলিয়াছিল। ... খৃঃ পূঃ ৪র্থ ও ২য় শতাব্দীতে ভারতে ধর্মের অবস্থা এই— বৈদিক দ্ব্যর্থজ্ঞের প্রভাব কমে নাই, দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ উপনিষদের ঐশ্বর্যতত্ত্বও আলোচনা করিতেছেন,—এদিকে দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে নীচে বা বৌদ্ধিতে পূজাও আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের সর্বপ্রাচীন ভাস্কর্য-নিদর্শন বরহাট স্তূপে এই ব্যাপারের মনোরম নিদর্শন রহিয়াছে।

মৌর্যবংশ-পতনের পর খৃষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীর প্রারম্ভে হুঙ্গদের অধিকার কালে বরহাট স্তূপ নির্মিত হয়। এই স্তূপে দেখা যায়—বুদ্ধের মূর্তি এখনও গঠিত হয় নাই, কিন্তু বুদ্ধের আসন, বুদ্ধের পদচিহ্ন, বুদ্ধের দেহের ভঙ্গাবশেষের উপর নির্মিত স্তূপ, যে বুদ্ধ-তলে বসিয়া তিনি বুদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন সেই বটবৃক্ষ, এই-সমস্তই দেবতার মত পূজা পাইতেছে। ... পীপরাহা হইতে যে-সব প্রাচীন জিনিষ সংগৃহীত হইয়াছে—তাহাদের মধ্যে দুইখানা স্বর্ণপাতের উপর পৃথিবী-দেবীর মূর্তি অঙ্কিত দেখা যায়। পরলোকগত ডাক্তার ব্রকের মতে—এই প্রাচীন জিনিষগুলি ৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে কুষাণ রাজা কনিষ্ক আসিয়া ভারতের পশ্চিমার্দ্ধ অধিকার করিয়া বসেন। কনিষ্ক তাহার সঙ্গে গ্রীস, পারস্ত, আসিরিয়া, মিশর ইত্যাদি দেশের মূর্তি-পূজা লইয়া আসেন। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াই বাস্কর্য ও বৌদ্ধ ধর্মের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। ইহার পর হইতেই দেশ মন্দিরে এবং মন্দির দেবমূর্তিতে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। বুদ্ধদেবের শূন্য আসনে অচিরাৎ বুদ্ধমূর্তির আবির্ভাব হইল এবং দেখিতে দেখিতে কার্তিক, গণেশ, শিব ও পার্শ্বতীর মূর্তি নির্মিত হইয়া পূজা পাইতে লাগিল।

“প্রতিভা,” ১৩২১, ২৩—২৯ পৃঃ।

উপরোক্তরূপেই হিন্দুধর্মে পৌত্তলিকতা সংক্রামিত হইয়াছে।

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

(১৭)

‘চা’ শব্দের উৎপত্তি

‘চা’ শব্দ ও ‘Tea’ শব্দ চীনা ভাষা হইতে উঠিয়াছে। দুই প্রদেশের বিভিন্ন উচ্চারণ। চা চীনা Chá ও Tea চীনা T’u শব্দ হইতে হইয়াছে। জাপানী উচ্চারণ দুইটি Ta, Cha।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন

(১৮)

দুধ সময় সময় টক হইয়া যায় কেন ?

শীতকালে দুধ ঘোটেই টক হয় না। গ্রীষ্মকালে গন্ধমের আধিক্য বশতঃ সময় সময় দুধ টক হয়। এই সময়, দুধ সকালে এক-বার মাত্র ফুটাইয়া রাখিলে, সন্ধ্যার মধ্যে তাহা টক হইয়া যায়। দুধ টক না হইবার জন্ত সময় দিনে অন্ততঃ চার-পাঁচবার দুধ ফুটাইয়া রাখা আবশ্যক।

শ্রী অমিয়কান্ত দত্ত

বিনা জালের দুধে শুকনা মরিচ দিলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভাল থাকে। “৫৬ সের দুধে ১৪ সের খেতশর্করা এবং ছোট এক চামচ বাইকার্বনেট অব সোডা দিতে হয়। ঐ মিশ্রিত দ্রব্য পরে এনামেল-মণ্ডিত লৌহ-কটাে চালিয়া বাষ্প-তাপে দিষ্ট করিতে হয় এবং ক্রমাগত উহাকে বাতাস করিতে হয় এবং নাড়িতে হয়। এইরূপ করিতে করিতে সমস্ত জল শুকাইয়া দুধ শুঁড়ার মত হইবে। এই-সকল চূর্ণই পরে এক পাউণ্ড লইয়া চাপ দিয়া ইষ্টকাকারে বিকৃত হয়। আবার ব্যবহার-কালে ঐ ইট শুঁড়াইয়া জল গুলিলেই দুধ হয়।”

শ্রী অমল্যগোবিন্দ মৈত্র

ও

শ্রী স্ববীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

দুধ টক হইবার কারণ ফার্মেন্টেশন Fermentation। দুধে দুগ্ধশর্করা Lactose নামে শর্করা-জাতীয় এক পদার্থ আছে। ফার্মেন্টেশনে এই Lactose, Lactic acidএ পরিণত হয়, এবং এই পরিবর্তন সংঘটিত হয় এক বিশেষ-প্রকার জীবাণুর সাহায্যে। এই Bacillus যে দুধের মধ্যে স্বতঃই উৎপন্ন হয় না তাহা স্বপ্রজনন মতবাদের পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার স্থির হইয়া গিয়াছে। স্বতরাং বাতাসেই এই জীবাণুর বাস একরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। দুধের পাত্রকে চতুর্দিক বায়ু-সংস্পর্শশূন্য করিয়া বন্ধ (Hermetically seal) করিতে পারিলে জীবাণুর প্রবেশ-পথ রোধ হয়। কিন্তু তৎপূর্বে দেবা আবশ্যক যে দুধ হইতে সম্পূর্ণরূপে জীবাণু তাড়িত হইয়াছে কি না। জীবাণুর কাণ্ড তথা বংশবৃদ্ধি সর্বাপেক্ষা দ্রুতভাবে সম্পন্ন হয় আমাদের দেহতাপের সান্নিধ্যে; অধিক উত্তাপে জীবাণু বিনষ্ট হয়, অধিক শৈত্যে ইহাদের কণ্ঠের শক্তি ক্ষীণ হয়, কিন্তু জীবনীশক্তি অব্যাহত থাকে। জলীয়ভাগের উপস্থিতিও কোন কোন Fermentationএর বিশেষ আনুকূল্য করে। স্বতরাং দুধ জাল দিয়া শুকাইয়া ফেলিলে Fermentation বন্ধ হইতে পারে—সাধারণভাবে জাল দিয়া রাখিলে অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টার জন্ত Fermentation বন্ধ থাকে। জীবাণুর পক্ষে বিদ্যাক্ত এমন কোন বস্তুর সাহায্যেও Fermentationএর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে—কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে এইরূপ পদার্থ মনুষ্যদেহের অনিষ্টসাধন না করে। অতি সামান্য পরিমাণে Formaldehyde বা ফর্মালিন কোন কোন দুগ্ধ-ব্যবসায়ী পাশ্চাত্যদেশে দুগ্ধ-সংরক্ষণের জন্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু এইরূপ ভাবে ফর্মালিন ব্যবহার করা নিতান্ত অবৈধ। Fermentation-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের জন্ত আমরা ফরাসী রাসায়নিক পাণ্ড্যের নিকট ধণী।

শ্রীহরবোধকুমার মজুমদার



ফাউন্টেন পেন সাফ করা

বৈশাখ মাসের “প্রবাসীতে” “ফাউন্টেন পেন সাফ করা” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ দেখিলাম (পৃঃ ৫৮)। কিন্তু চুখের বিষয় এই যে, যে প্রণালীর কথা ইহাতে লিখিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভুল। ফাউন্টেন পেনের পক্ষে ইহা অনিষ্টকর—মারাত্মক।

“কলমের মধ্যে গরম জল” ভরিলে কলম ফুলিবেই, এবং ইহার গর্ত বড় হইবেই—বেশী না হউক সামান্য হইবেই। ইহার ফল এই হইবে যে কলমের জু-এর ঘরও বড় হইবে, এবং nib-holder আর আঁট হইয়া বসিবে না—কালী চুষিবে। কলমের feederটিও অল্পবিস্তর ফুলিবে এবং তাহা হইলে কালি ঠিক আসিবে না। এইরূপে কলমের প্রত্যেক অংশটি অল্প-বিস্তর বড় হইয়া কলমটিকে একেবারে পদার্থহীন, অকর্মণ্য করিয়া দিবে। বাল্যকালে অনেকগুলি ফাউন্টেন পেন গরম জলে ধুইয়া একেবারে নষ্ট করিয়াছি বলিয়া শ্রীযুক্ত হেমন্তবাবুকে প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলাম।—

ফাউন্টেন পেন সাফ করার একটি অতি সোজা ও সুন্দর উপায় আছে। কলমটির কালি ফেলিয়া দিয়া দু-একবার ঠাণ্ডা জলে ধুইতে হইবে। পরে কলমটিকে methylated spiritএ কয়েক বটা ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। Spiritএ কলমের ভিতরকার প্রত্যেক অংশের “কালির দানা” গলিয়া বাহির হইয়া বাইবে, এবং কলমটি একেবারে সাফ হইবে। তাহার পর কলমটি মুছিয়া কালি ভরিলেই কলমটি ব্যবহার-যোগ্য হইবে।

শ্রী বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

একেবারে ফুটন্ত জল কলমে ভরিলে কলম নষ্ট হইবেই। গরম জল অর্থাৎ ঠাণ্ডা জলকে কিঞ্চিৎ গরম করিয়া লইয়া কলমে ভরিয়া ধুইতে হইবে। তাহাতে কলম নষ্ট হইবে না। আমি নিজে এই প্রকারে কলম ধুইয়া ব্যবহার করিতেছি। কলম একটুও ধারাপ হয় নাই। আমেরিকা এবং ইউরোপেও এই প্রকারে বরণা-কলম পরিক্ষার করা হয়।

শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

হারামণি ?

প্রবাসী বৈশাখ (১৩২৯) সংখ্যায় প্রকাশিত ‘হারামণি’র সকল গানগুলি প্রকৃত হারামণি নয়,—ইহার তৃতীয় গানটি ৮ রজনীকান্ত সেন প্রণীত “কল্যাণী” পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে “স্বস্ত্যুজ্জি” নাম দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রী নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উচ্ছে উড্ডয়ন

“প্রবাসী”তে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র ভট্টশালী মহাশয় পক্ষশস্যে লিখিয়াছেন যে ল্যারি-বর্জেস ২১,৯০৯ ফুট উঠিয়াছেন, ইহার বেশী কেহ কোনদিন উঠেন নাই। কিন্তু “বোমবান” নামক প্রবন্ধে দেখিতে পাই যে James Glacier ২৯০০০ ফুট উঠিয়াছিলেন।

নগেন্দ্র গুপ্ত

আমেরিকান বিমান-বীর শ্রোয়েডার (Schroeder) গত ১৯২০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ৩৩,১৩৩ ফুট উচ্ছে উঠেন। তিনি Lepere biplaneএ চড়িয়া এই আশ্চর্য কাজটি করেন।

শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

দেবী কৃষ্ণভাবিনী দাস

বর্তমান সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে “কৃষ্ণভাবিনী-স্মৃতি-সভায়” প্রবন্ধে দেখিলাম যে “দেবী কৃষ্ণভাবিনী দাস চুয়াডাঙ্গার এক সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।”

কিন্তু স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাস মুর্শিদাবাদ জেলার চোয়া গ্রামে প্রসিদ্ধ সর্কাধিকারী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বর্গীয় জয়নারায়ণ সর্কাধিকারী মহাশয়ের কন্যা ছিলেন।

শ্রী নৃপেন্দ্রনারায়ণ সর্কাধিকারী

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অনুপস্থিতি

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অনুপস্থিতি’ সম্বন্ধে যে কয়টি লাইন লেখা হইয়াছে তাহার ভিত্তি নিতান্তই অমূলক। প্রথমতঃ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত চার্লস বোমের যে পুত্রের বিষয় উল্লেখ করিয়া উক্ত লাইন কয়টি লেখা হইয়াছে সে পুত্র এ বৎসর ‘বি-এসসি’ পরীক্ষা দেয় নাই। দ্বিতীয়তঃ সে পরীক্ষার প্রত্যেক দিবসই উপস্থিত ছিল কোনও দিনও অনুপস্থিত ছিল না। কেবলমাত্র একদিন পরীক্ষার সময় বিশেষ অসুস্থতা বোধ করাতে ১ ঘণ্টা প্রায়ের উত্তর করিয়া ‘হলু’ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসে। আমি যতদূর তাহার বিষয় জানি তাহাতে মনে হয় সে কোনও বিষয়ে এক পেপার পরীক্ষা দিতে অক্ষম হইলেও পাস করিবার বিশেষ সম্ভাবনা। তাহার পর “তাহাকে পাস করা যায় কি না বিবেচনা করিবার জন্ত তাহার বিষয়টি মডারেটরদের নিকট পেশ করা হইয়াছে”—এ সংবাদের ভিত্তি সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কারণ, আমার যতদূর জানা আছে তাহাতে মনে হয় পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকিয়াও কেহ পাস করিয়া দিবার জন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মীণ্ডিকেটের নিকট আবেদন-পত্র পাঠাইতে পারে না। আপনি এ সংবাদ বাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছেন, আমার মনে হয় তাহার সংবাদ ঠিক নহে। অতএব আপনার শ্রায় বিষয় ও বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে এ সামান্য বিষয় লইয়া

আলোচনা করা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। আশা করি আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ে আপনি সত্যের আদর করিতে ভুলিবেন না।

ভবানীপুর,

শ্রীশুগেন্দ্রনাথ মুগোপাধ্যায়

২৪, পদ্মপুরুর রোড

সম্পাদকের মন্তব্য।—আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাতে একটি ভুল ছিল; “বি-এসসী”র পরিবর্তে “আই-এসসী” হইবে। আর যাহা লিখিয়াছি, অর্থাৎ আসল কথাগুলি, সমস্তই ঠিক। প্রমাণ, মৌখিকের গত এই যে তারিখের অধিবেশনের কার্যবিবরণ হইতে নীচে উদ্ধৃত কথাগুলি:—

“85. Read an application from Satyendra Chandra Ghosh, a candidate at the recent I. Sc. Examination, bearing Roll Cal. No. 767, praying that he may be re-examined in Physics, as he was slightly ill, while he sat for the first paper on the 22nd April, and as he had to be carried away due to illness before he could answer any question of the Second Paper on the 24th April,

RESOLVED—

“That the matter be referred to the Board of Moderators in Arts and Science.”

বিষয়টি সামান্য নহে। কারণ, পরীক্ষার সময় অনেক ছাত্র পীড়িত হয়। একজনের সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে, সকলের সম্বন্ধেই করা উচিত।

বেরির চরখা ও তাঁত

“ভারতবর্ষের” বিশ্বকর্ষ্মকে তাঁহার ভুল সংশোধনের জন্য আমি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তিনি আমাকে পরিস্কার বলিয়াছেন, “ভারতবর্ষে” এই প্রতিবাদ তিনি বাহির করিবেন না। এজন্যই আপনার নিকট প্রতিবাদ-পত্রখানা পাঠাইতে বাধ্য হইলাম।

ভারতবর্ষ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ (৮ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা), ৭৩৭ পৃষ্ঠা, সম্পাদকের বৈঠক।

“ভারতবর্ষ” ৭৩৭ পৃষ্ঠার চিত্রটির নিম্নে লিখিয়া দিয়াছেন, “বেরির ইমপ্রভুড ফোন্টিং স্পিনিং মেশিন” তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে এই যন্ত্রটি বেরির স্পিনিং মেশিন; ইহা সম্পূর্ণ ভুল। এই যন্ত্রটি বেরির অটো-ম্যাটিক হাওলুম।

“ভারতবর্ষ” ৭৩৮ পৃষ্ঠায় বেরির অটোমেটিক হাওলুম চিত্রটির যে নাম লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ হইতেছে, এই যন্ত্রটি বেরির হাওলুম, ইহা সম্পূর্ণ ভুল। এই যন্ত্রটি মাত্র স্পিনিং মেশিন (চরকা)। উন্নত প্রণালীর চরকা কাহাকে বলিতে চান? যদি সাধারণ চরকা হইতে উহাতে অধিক পরিমাণে সূতা কাটা যাইত তাহা হইলে স্বীকার করিতে পারিতাম, উন্নত প্রণালীতে বেরির চরকা তৈয়ারী হইয়াছে। সাধারণ চরকাতে (পুরাতন প্রণালীর) দৈনিক ১০ সের তুলা কাটা যায়। ৩ টাকা মূল্যের চরকাতে ৭৫ কাজ হয় ১৫ টাকা মূল্যের চরকাতে সেই কাজ হইলে লোকে ১৫ টাকা দিয়া বেরির চরকা কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কেন?

বেরির তাঁত সম্বন্ধে ১৩২৮ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের “ভারতবর্ষে” সম্পাদকের বৈঠকে লিখিয়াছেন, তাঁতের কোন যন্ত্র ইহাতে চালাইতে হয় না, সমস্ত কাজ আপনাআপনি হয়। এই তাঁত মানবশক্তি-চালিত একটি যন্ত্র মাত্র, যে-সকল তাঁত বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলে, তাহারও অনেক কাজ হাঁতের সাহায্য ছাড়া চলিতে পারে না। মানবশক্তি-চালিত হাওলুম যন্ত্রে হাঁতের সাহায্য লাগে না, ইহা হইতে পারে না।

কাঠের তৈয়ারী বেরির তাঁতের মূল্য ২৫০। উহা উন্নত প্রণালীর ফ্লাই-শাটল তাঁত (মূল্য ৭০) হইতে কিছুমাত্র অধিক কাজ দিতে পারে না। কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, মিঃ হুজুয়াফের তৈয়ারী তাঁত, যাহা বেরী তাঁত নামে পরিচিত, এই তাঁতে ১০ নং অর্থাৎ ২২০ নং সূতাতে ১৬ নং পড়েন দিয়া দৈনিক ২০ গজের অধিক খন্দর তৈয়ারী হয় না। তাহা হইলে ৭০ টাকা মূল্যের ফ্লাই-শাটল লুম না কিনিয়া ২৫০ টাকা দিয়া মিঃ হুজুয়াফের নির্মিত বেরী তাঁত লোকে কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কেন? (গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীর ২৭৬ পৃষ্ঠা দেখুন।) ভারতবর্ষ-সম্পাদকের লেখা সংবাদ নিয়া আমি প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছি। বেরির তাঁতের দোষ এই যে ডবল সূতা পাকান টানায় ব্যবহার ভিন্ন উপায় নাই। এক ছাড়া সূতা হইলে এত ছিঁড়িয়া যায় যে তাহাতে কাজ চালান খুবই কষ্টসাধ্য, একপ্রকার অসম্ভব।

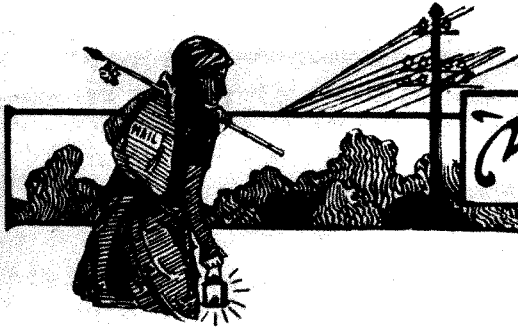
শ্রী ললিতকুমার মিত্র

প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯, ২২ ভাগ, ১ম খণ্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠায়

“তিনি শ্রীরামপুর বয়ন-বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল বয়ন শিক্ষা করিয়াছিলেন” এই সংবাদটি ভুল ছাপা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার মিত্র শ্রীরামপুর গভর্ণমেন্ট বয়ন-বিদ্যালয়ে দক্ষতার সহিত দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করিয়াছেন।

শ্রী নৃপেন্দ্রমোহন ঘোষ



দেশ-বিদেশের কথা

বিদেশ

ইংলণ্ডের বহির্বাণিজ্য—

ইংলণ্ডের বাণিজ্য-বিভাগের আয়বায়ের খসড়া হিসাব কমন্স সভায় দাখিল করিবার সময় বাণিজ্যমন্ত্রী মিঃ স্ট্যানলে বাল্ডউইন (Stanley Baldwin) বিখ্যে হাটে ইংরেজি পণ্যের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন উপনিবেশগুলি, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ আমেরিকা, হল্যান্ড, সুইডেন, নরওয়ে, এবং স্পেনের আর্থিক অবস্থা এতটা সচ্ছল আছে যে তাহারা প্রভূত পরিমাণে ইংলণ্ড-জাত দ্রব্য কিনিতে পারে। কিন্তু ফ্রান্স, ইতালী স্পেন ও যুক্তরাজ্য বিদেশ-জাত দ্রব্যের শুদ্ধ অত্যন্ত বৃদ্ধি করাতে সেই-সকল দেশে বৃষ্টি বাণিজ্যের প্রদার কমিয়া যাওয়া খুবই সম্ভব। উপনিবেশ-গুলিতে অবাধ-বাণিজ্য প্রচলিত থাকিলে অস্বাস্থ্য দেশের প্রতিযোগিতায় ইংরেজ কতটা আঁটিয়া উঠিতেন বলা যায় না, তবে সুবিধাজনক শুদ্ধহার নির্ধারিত হওয়াতে উপনিবেশে ইংরেজের বাণিজ্যের সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু অপর পক্ষে ইংরেজ-চালিত মাল-সরবরাহের জাহাজের বিপক্ষে অনেকগুলি রাজ্য মার্কিন ও জাপানী জাহাজের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করাতে পণ্যবহন-ব্যবসায়ে ইংরেজের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। ইউরোপের নষ্ট ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের যথেষ্ট দেরী আছে। ততদিন ইংরেজকে প্রাচ্যের হাটে ও দক্ষিণ আমেরিকায় বাণিজ্য-বিস্তারের সুযোগ খুঁজিতে হইবে এবং উপনিবেশ-গুলির সহিত আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক জাপাইয়া তুলিতে হইবে। যুদ্ধের পরে ব্যবসা-বাণিজ্যে হঠাৎ একটা মাড়া পড়াতে অনেক মাল প্রস্তুত হইয়া বাজারের অভাবে গুদামজাত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, সেগুলির কষ্টটি বাড়াইবার চেষ্টা দেখিতে হইলে পণ্যবাহ্যের উপর কর কমাইতে হইবে।

একমাত্র কয়লার ব্যবসায় যুদ্ধের পূর্বের অবস্থা ফিরিয়া পাইয়াছে এবং কয়লার রপ্তানী আবার পূর্বদিকে চলিতেছে। কিন্তু লোহা ও ইস্পাতের কারবারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং যতদূর দেখা যাইতেছে—অনেকদিন পর্যন্ত তাহার অবস্থা ভাল হইবারও সম্ভাবনা নাই।

পশমের স্ত্রা ও কাপড়ের ব্যবসায় বেশ সন্তোষজনক-রূপেই চলিত যদি বিদেশী রাজ্যগুলি শুদ্ধের হার অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি না করিতেন; তথাপি পশমের কারবারের অবস্থা মন্দ নহে। ভারতের সহিত ল্যাঙ্ক-শায়ারের বাণিজ্যের অবস্থা মোটেই আশাশ্রয় নহে। তাহার উপর বিদেশী কাপড়ের উপর শুদ্ধের হার ভারতে ইংলণ্ডজাত কাপড়ের ব্যবসায়ে অস্ত্রায় স্বরূপ হইয়াছে। চীনের অন্তর্দ্রোহে চীনের সহিত বাণিজ্য অনেক কমিয়া গিয়াছে, কেননা বর্তমান অবস্থায় চীনের সহিত ব্যবসায় বিপজ্জনক। মোটামুটি ইংলণ্ডের বাণিজ্যের অবস্থা এইরূপ। এক দক্ষিণ আমেরিকা ও উপনিবেশগুলির সহিত বাণিজ্যের অবস্থা খুবই আশাশ্রয়।

হেগ বৈঠকের সূচনা—

কান্ ও পারী বৈঠকের জায় জেনোয়া-বৈঠকেও ইউরোপ-সমস্তার বিশেষ কোনও মীমাংসা হইল না। অথচ রাশিয়া ও জার্মানীর সহিত মিত্রশক্তিদের একটা বৃথাপড়া না হইয়া গেলে ইউরোপের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিত, তাই আবার আর-একটি বৈঠকের সূচনা হইতেছে। জেনোয়া-বৈঠক ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের স্বার্থের খাতিরে ভাসিয়া যায় দেখিয়া ইংরেজ মন্ত্রী লয়েড জর্জ আবার একটি বৈঠকের প্রস্তাব করিলেন। রাশিয়ার অবস্থা প্রথমে করিয়া একটি বন্দোবস্তের উপায় উদ্ভাবনের জন্য ১৫ই জুন তারিখে হল্যান্ডের হেগ সহরে অভিজ্ঞদের একটি সভা করিবার প্রস্তাব লয়েড জর্জ জেনোয়া-বৈঠকে উপস্থিত করেন। বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিদল হেগ-বৈঠকে উপস্থিত হইয়া এই অভিজ্ঞের দরবারের গঠন স্থির করিয়া দিবেন। অভিজ্ঞের মণ্ডলী তিন মাসের মধ্যে তাহাদের নির্ধারণ জাতিসমূহের সংঘে পেশ করিবেন। আমেরিকা কিন্তু হেগ-বৈঠকে উপস্থিত থাকিতে অসম্মত হইয়াছেন। আমেরিকান সিনেট সভায় সিনেটর বোরা বলেন, যে, “ইউরোপের বর্তমান দুর্দশার কারণ ভাস্তাই সন্ধি। সেই সন্ধিতে আমেরিকার কোনও হাত নাই; কাজেকাজেই ইউরোপের দুর্ভাগ্যের জন্য আমেরিকার কোনও দায়িত্ব নাই। আমেরিকা মোভিয়েট দরবারের সহিত নিজের সুবিধা-ও ইচ্ছা-মত সন্ধি করিবার অধিকার থক্ক করিবে না।” তাহার প্রস্তাবানুসারে আমেরিকা হেগ-দরবারে উপস্থিত হইবেন না। রাশিয়া হেগ-বৈঠকে উপস্থিত থাকিতে সম্মত হইয়াছেন এই সত্ত্বে, যে, ইতালী সুইডেন ও জেকোগ্রোভাকিয়ার সহিত মোভিয়েট সরকারের যে সন্ধিগুলি পূর্বেই হইয়া গিয়াছে তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। হেগ-বৈঠকে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধপত্র জেনোয়া-বৈঠকের সভাপতির স্বাক্ষরিত হইয়া প্রেরিত হইয়াছে এবং হল্যান্ড-সরকার সভার বন্দোবস্ত আরম্ভ করিয়াছেন।

ইজিপ্ট জাহাজ ও ভারতীয় লক্ষর—

অনেক যাত্রী ও বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভার সমেত পি এণ্ড ও কোম্পানীর ডাক-জাহাজ “ইজিপ্ট” ব্রেট বন্দরের নিকটে একখানি ফরাসী জাহাজের সহিত ধাক্কা লাগিয়া ডুবিয়া গিয়াছে। আঘাতের ফলে একটি বৃহৎ ছিদ্র হইয়া যখন জল উঠিয়া জাহাজটি ডুবিবার উপক্রম হইল তখন প্রাণভয়ে যাত্রীর দল ও জাহাজের কর্মচারীরা যেরূপ ব্যাকুল হইয়া প্রাণরক্ষার প্রয়াসে পাগলের মত ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার ফলে অনেকে অক্ষরণে প্রাণ হারাইয়াছেন। একটু দীরতর সহিত আশ্রয়-রক্ষার চেষ্টা পাইলে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিত না। ব্যাপারটি অত্যন্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ঘটনাটিকে আশ্রয় করিয়া ভারতীয় লক্ষরদিগের প্রতি যে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিবার প্রয়াস দেখা গিয়াছে তাহা অত্যন্ত অস্বাস্থ্য। ভারতীয় নাবিকেরা যুদ্ধের সময় ডুবোজাহাজের আক্রমণকে উপেক্ষা করিয়া যেরূপ নির্ভয়ে সমুদ্রবন্দে

বিচরণ করিয়াছে তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। এই নির্ভীক নাবিকদিগের নামে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপের মূলে অশ্রু কাহারও স্বার্থ বিজড়িত আছে বলিয়া মনে হয়। লক্ষ্মরদিগের নামে অপবাদ এই নূতন নহে। ইংলণ্ডে এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা সুবিধা পাইলেই ভারতীয় লক্ষ্মরদিগের সম্বন্ধে কলঙ্ক প্রচার করিয়া থাকে।

ইংরেজ নাবিকেরা ভারতীয়দিগের স্থায়ী এত অল্প বেতনে কাজ করিতে পারে না এবং ইহাদের স্থায়ী কর্মঠও নয়। ভারতীয় লক্ষ্মরেরা আবার ইংরেজ নাবিকের তুলনায় অত্যন্ত মদ্যপায়ীও নহে। সেইজন্য ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় ইংরেজ নাবিক আঁটিয়া উঠিতে পারে না। বর্তমান কালে ইংলণ্ডে অনেক নাবিক বেকার বসিয়া আছে এবং দুর্শ্বল্যাতার জন্য তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। ভারতীয় নাবিকের নামে এই মিথ্যা অপবাদ তাহাদের স্বার্থের খতিরে হয় নাই তো? ভারতীয় নাবিকদিগের নামে অপবাদটি বেশ চতুরতার সহিতই প্রচার করা হইয়াছিল। একটুখানি ক্রটির জন্য সব ধরা পড়িয়া গিয়াছে। অপবাদকারীরা বলিয়াছিল যে ভারতীয় লক্ষ্মরেরা নারীদিগের প্রতিও বন্দুক ছুড়িয়াছিল। কিন্তু লক্ষ্মরের নিকট বন্দুক থাকে না; তাহাদের বন্দুক বহন করিবার লাইসেন্স নাই। কাজেকাজেই তাহারা বন্দুক ছুড়িবে কি করিয়া?

এই একটি ফাঁক হইতেই অপবাদের প্রকৃত মূর্ধি বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

তুরস্ক ও হত্যাকাণ্ড—

তুরস্ক-চরিত্রকে মমীলিপ্ত করিলে যখন ইউরোপের সুবিধা হয় তখনই খৃষ্টান প্রজাদিগের প্রতি তুরস্কের অত্যাচার-কাহিনীর কথা প্রচার হইতে দেখা যায়। Turkish Atrocities অর্থাৎ তুরস্কের নৃশংস-বাবহারের অছিলায় যেতকায় জাতির সুবিধার্থ ইউরোপের অনেক রাষ্ট্রনৈতিক বন্দোবস্ত হইয়াছে।

কিছুদিন পূর্বে তুরস্কের জাতীয়দলের সহিত সখ্যত্বে আবদ্ধ হইবার জন্য ব্যগ্রতা ইউরোপের সর্বত্রই দেখা গিয়াছিল। ফ্রান্স ও ইতালী রক্ষানিষ্পত্তি করিয়া ফেলিলেন, এবং অনেক আলোচনা ও তর্কবিতর্কের পর ইংলণ্ডের সহিত মিলনের কথাবার্তা আপাতত জাঙ্গিয়া যায়। যতদিন পর্যন্ত ইংরেজ দরবারের সহিত ইউরোপ কামালের কথাবার্তা চলিতেছিল ততদিন পর্যন্ত তুরস্কের অত্যাচারের কথা বড় একটা শুনা যায় নাই। কিন্তু হঠাৎ সেদিন প্যারিসেট মহাসভায় চেম্বারলেন ও কার্জন প্রমুখ ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিবিদগণ খ্রীষ্টান প্রজাদিগের দুঃখে আকুল হইয়া তুরস্কের অত্যাচারের কথা প্রকাশ করিয়া এসিয়া-মাইনরে মিত্রশক্তিবর্গের একটি কমিশন (মিলিত অনুসন্ধান-সভা) প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। শুনা যায় খ্রীষ্টান প্রজাপুঞ্জের প্রতি অত্যাচার সাত-আট বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাহা সত্য হইলে, এতদিন তাহাদিগকে রক্ষা করিবার কোনও বন্দোবস্ত না করিয়া তুরস্কের সহিত রক্ষানিষ্পত্তি করিবার চেষ্টা চলিতেছিল কেন?

তুরস্কের জাতীয়দলের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী বলেন যে খারপুট সহরে আর্মেনিয়ানদিগের হত্যা করার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। একজন তুরস্কবিশেষী আমেরিকান ধর্মজাজক মার্কিন সাহায্য-ভাণ্ডারের কর্তা হইয়া আসিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়াতে তিনি এই-সব মিথ্যা অভিযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন। অস্বাস্থ্য আমেরিকান কর্মীরা এই-সকল অভিযোগ মিথ্যা বলিয়াই স্বীকার করেন।

পররাষ্ট্র-মন্ত্রীর কথা সম্পূর্ণ সত্য কি না জানিবার উপায় নাই।

তবে ১৬ই মে তারিখের রয়টারের তারে দেখা যাইতেছে যে অনুসন্ধান করিবার জন্য মিত্রশক্তিবর্গের সহিত এসিয়া-মাইনরে উপস্থিত থাকিতে আমেরিকা রাজী নহেন। ফ্রান্স উপস্থিত থাকিতে প্রস্তুত আছেন বটে কিন্তু তাহারা স্বার্থায় গ্রীক অত্যাচারের সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন। ইতিপূর্বে গ্রীক অত্যাচারের সম্বন্ধে অনুসন্ধানের প্রস্তাব আরও হইয়াছিল, কিন্তু সে প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা হয় নাই। এবারকার প্রস্তাব সম্বন্ধেও ইংলণ্ডের অভিমত কি তাহা এখনও জানা যায় নাই।

যুদ্ধের সময় কলঙ্ক আরোপ নূতন নহে—বোলশেভিকগণ নারীদিগকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিরূপে ব্যবহার করিতেছেন বলিয়া সোভিয়েট সরকারের সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ, মৃত-নরদেহ হইতে জার্মান রাসায়নিকের নানা দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুতের মিথ্যা জনরব, রাশিয়াতে শিশুহত্যার মিথ্যা গল্প, অভূতি, অনেক মিথ্যা কলঙ্কের স্বজন রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেই হইয়াছিল। তুরস্কের সম্বন্ধে এই-সব অভিযোগের মূলে কোনও রাষ্ট্রীয় অভিসন্ধি আছে কি না কে বলিবে?

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ

অস্পৃশ্যতার আপদ—

কামরূপের মহাদেব-মন্দিরে অস্পৃশ্যতার অজুহাতে নমঃশূদ্রদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। ইহাতে কিছুদিন হইল নমঃশূদ্রদিগের ভিতর চাকল্য অনুভূত হইতেছিল। গত ১১ই জানুয়ারী তাহার মন্দিরে প্রবেশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া একদল ভলেটিয়ার প্রেরণ করে। এই ভলেটিয়ার-দল বলপূর্বক মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিল। পরের দিন ভলেটিয়ারদের সংস্পর্শে মন্দির অপবিত্র হইয়াছে মনে করিয়া মোহন নমঃশূদ্র নেতাদিগকে ডাকিয়া ভণ্ড দমন করেন ও মন্দিরের শুদ্ধিক্রিয়া সম্পাদন করেন। ইহাতে নমঃশূদ্রেরা আপনাদিগকে অধিকতর অপমানিত মনে করিয়া পৌষ-সংক্রান্তির দিন আবার মন্দিরে বলপূর্বক প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু মোহন পূর্বাঙ্কেই পুলিশের সাহায্য লইয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন। হতরাং নমঃশূদ্রদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই ব্যাপারে ২৬জন নমঃশূদ্রের নামে মামলা দায়ের করা হইয়াছিল। বিচারে ১৪জনের প্রত্যেকে ছয় মাসের হিসাবে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। দণ্ডিত ব্যক্তিরা হাইকোর্টে আপিল করিয়াছিল। প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি মিঃ প্যাটন কামরূপের ডেপুটি কমিশনারের উপর এক কলজারী করিয়াছেন এবং দরখাস্তকারীদের দণ্ড হ্রাস করা কেন হইবে না তাহার কারণ দেখাইতে আদেশ দিয়াছেন।

দেশ হইতে অস্পৃশ্যতার আবর্জনা দূর করাইবার জন্য যখন বিশেষ ভাবে চেষ্টা চলিতেছে তখন এরূপ একটা ঘটনা যথেষ্টই লজ্জার কথা। ছোট-বড়র মাপকাঠি দিয়া মানুষকে মাপা চলে না—বিশেষতঃ দেবতার দ্বারা এ বৈষম্য একেবারেই অচল।

বিচারের শেষ ফল দ্বারা নমঃশূদ্র নেতার অবনমিত জাতিদের অধিকার সম্বন্ধে ইংরেজ-রাজের মনের ভাব বুঝিতে পারিবেন কি? পুলিশ কেন মোহনের সাহায্য করিয়াছিল?

শাস্ত্রী-মহাশয়ের স্পষ্টকথা—

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে প্রবাসী ভারতবাসীদের অধিকার খেতাবদের সমান করিয়া লইবার জন্য বিদেশ-

যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাকে বিদায় দেওয়ার উপলক্ষে সেদিন বড়লাট শিমলায় এক ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই যে আমলাতন্ত্রের এত বিখ্যাতী লোক—ইনিও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, “আজকার দিনে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের যোগা ও প্রতিশ্রুতিতে ভারতবাসীর একেবারে আস্থা হইয়া পড়িয়াছে। শাসনযন্ত্রের প্রতি এই অবস্থাসের মত এমন শোচনীয় ব্যাপার ভারতের ইতিহাসে আর কখনো ঘটে নাই।”

সরকারী কর্মচারীদের গলদ—

ভারতীয় সরকারী কর্মচারীদের ভিতর নৈতিক অবনতি অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই অবনতির কথা কর্তৃপক্ষের যে অজানা আছে তাহাও নহে। এই সম্পর্কে অজ্ঞাত প্রদেশ অপেক্ষা পঞ্জাব গবর্নমেন্ট অনেকটা সংস্কারের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা কর্মচারীদের দোষ জানিয়া তাহা চাপা দিতে চেষ্টা করেন নাই, সে-সম্বন্ধে ভালো করিয়া অনুসন্ধান করিবার জন্ত একটি কমিটি গঠন করিয়া তাহার উপর তদন্তের ভার প্রদান করিয়াছিলেন। এই কমিটি সম্প্রতি পঞ্জাবের পুলিশ-বিভাগ সম্বন্ধে তাহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, পুলিশের ভিতর যে সাধু ব্যক্তির একান্ত অভাব, তাহা নানাবিধ সাক্ষ্য-প্রমাণ, এমন কি সরকারী কর্মচারীদের সাক্ষ্য হইতেও বুঝিতে পারা গিয়াছে।

একটি অবস্থা যে পঞ্জাবেরই একচেটিয়া সম্পদ তাহা নহে, ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশেই পুলিশের অবস্থা প্রায় এইরূপ। বাংলা দেশে ত বৃষের চোটে এবং অত্যাচারের দাপটে পুলিশের দারোগা সাধারণের চোখে এমন ভীতির বস্তু এবং শক্তির অবতারণা যে বাংলার অশিক্ষিত জনসাধারণ লট-সাহেবকেও আশীর্বাদ করিবার সময় বলে, ‘সাহেব তুমি দারোগা হও।’ অথচ এই পুলিশ বিভাগটাই যে সরকারী সাক্ষ্য সাধু হওয়া দরকার তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সাঁওতাল পরগণায় জুলুম—

গত ২১শে মে খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্র প্রসাদ পাটনা হইতে লিখিয়াছেন,—
সাঁওতাল পরগণার নানা স্থানে, বিশেষতঃ রাজমহলে, যেরূপ জুলুম চলিয়াছে তাহা বিশেষভাবেই আক্ষেপজনক। স্থানে স্থানে লোকেরা এতই ভীত হইয়া পড়িয়াছে যে, সেখানে অসহযোগীকে গৃহে স্থান দেওয়াও অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। আদালতে এই মর্মে একটা রায়ও বাহির হইয়া গিয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনে সহানুভূতি বোধানোর ফলে কীর্তন রক্ষিত নামে এক ব্যক্তি গৃহ ও জমী হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। এই ধরণের আরো কয়েকটি মামলা হইয়া গিয়াছে এবং এখনও আরো কয়েকটি মামলা দায়ের আছে। ফৌজদারী সংস্কার আইন অনুসারে বহু লোককে কঠোরতম দণ্ড প্রদান করা হইয়াছে। অথচ আইনটি এই প্রদেশের উপর জারি করা হয় নাই ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। কোনো কোনো মহকুমায় বড় বড় সরকারী কর্মচারীরা পর্যন্ত লোকদের প্রতি যেরূপ অকথ্য ভাষায় গালাগালি বর্ষণ করিতেছেন, তাহা ভয়ঙ্কর মুখ হইতে বাহির হওয়া অসম্ভব। বহু নিরীহ লোককে হাতে পায়ে বাঁধিয়া প্রথর রোদে বাহিরে ফেলিয়া মারা হইয়াছে। কিল, ঘুঁষি, ঘটি-প্রহার এ-সমস্তের তো কথাই নাই। অনেকের ভাগ্যে ফুটবলের মত লাখিও প্রচুর জুটতেছে। সাঁওতাল পরগণা জেলা সাধারণ আইনের নহিভূত। কিন্তু তাই বলিয়া সরকারী কর্মচারীগণ শাসনের মূলনীতি লঙ্ঘন করিয়া যথেষ্ট ব্যবহার করিতে পারেন না।”

বিহার গবর্নমেন্ট অনুসন্ধানের পর এই-সব অভিযোগ সম্বন্ধে রিপোর্ট বাহির করিলে কর্তব্য করা হইবে।

পেন্সন বন্ধের কারণ—

‘সার্ভেট’ পত্রিকার জনৈক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, অবসরপ্রাপ্ত ‘জেলার’ খ্রীষ্টান নীলকণ্ঠ বড়ুয়ার পেন্সন গবর্নমেন্ট বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন কেহ অসহযোগ-আন্দোলনে যোগদান করিবেন না, এই মর্মে একখানা অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দিবার জন্ত গবর্নমেন্ট তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টান বড়ুয়া তাহাতে স্বীকৃত হন নাই—এই তাঁহার অপরাধ। খ্রীষ্টান বড়ুয়ার একমাত্র পুত্র গোহাটী কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতে অসহযোগ-আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। পুত্রটি সাড়ে চারি মাস কাল কারাদণ্ড ভোগ করিয়া সম্প্রতি অব্যাহতি পাইয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় জামাতা অসহযোগ-আন্দোলনে আইন ব্যবসা ত্যাগ করিয়া জেলা কংগ্রেস-কমিটির এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর কাজ করিতেছেন। ইনিও নয় মাস কাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহার তৃতীয় জামাতাও অসহযোগী উকিল এবং আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির সহকারী প্রেসিডেন্ট। ইহার প্রতিও এক বৎসরের জন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। খ্রীষ্টান বড়ুয়ার তৃতীয় কন্যাও স্বামীর মৃত্যুর কংগ্রেসের একজন অতি উৎসাহী কর্মী। যাহার পরিবারের সকলেই অসহযোগমন্ত্রে দীক্ষিত—তাঁহাকেই শায়েস্তা করিবার জন্ত গবর্নমেন্ট পেন্সনের কয়েকটা টাকা বাজেয়াপ্ত করিবার ভয় দেখাইয়াছেন।—চমৎকার!

জেল-সংস্কার—

জেলের সাজা যে কয়েদীদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারে না একথা আজ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। হুতরাং আমেরিকা প্রভৃতি দেশে জেলটা যাহাতে ঠিক কয়েদখানা হইয়া না দাঁড়ায় তাহার জন্ত নানারকম ব্যবস্থা চলিতেছে। কিন্তু এ-সব ব্যবস্থা ছাড়াও আমেরিকায় যে-সব কয়েদী জেলের ভিতর বেশ ভ্রমভাবে চলাফেরা করে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়াও হয়। এই ভ্রম-ব্যবহারের মাপকাঠিতে মাপিয়া বাহাদুর গুজরাদ হইয়াছে তাহাদের দণ্ড লব্ধ করিয়া দিবার ব্যবস্থাও সেখানে আছে। এদেশেও জেলের সংশোধন লইয়া আলোচনা চলিতেছে। এই আলোচনার ফলে ইণ্ডিয়ান জেল কমিটির অনুরোধে বোম্বাই গবর্নমেন্ট একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। সেই কমিটির উপর বোম্বাই-এর জেল-সমূহ পরিদর্শন ও উহাদের সংস্কারের উপায় নির্ধারণের ভার অর্পিত হইয়াছিল। সম্প্রতি বোম্বাই হইতে সংবাদ আসিয়াছে, এই কমিটির নির্দেশ অনুসারে বোম্বাই গবর্নমেন্ট সাত শত কয়েদীকে মুক্তি দিয়াছেন এবং যাহারা দীর্ঘকালের জন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে তাহাদেরও দণ্ডভোগের কাল কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এদেশে এ ব্যবস্থাটা কিরূপ ফল দেয় তাহা পরীক্ষা করিবার যে প্রয়োজন আছে তাহা বলাই বাহুল্য।

দেশী শিল্পের নমুনা সংগ্রহ অনাবশ্যক!—

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভারত-গবর্নমেন্ট ‘কমার্শিয়াল ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট’ বা ‘বাণিজ্য সম্বন্ধে জাতব্য বিভাগ’ নামে একটি নূতন বিভাগের সৃষ্টি করেন। ভারতের আন্তর্জাতিক-বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিবিধ তথ্য প্রকাশ করাই ঐ বিভাগের কাজ। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড কারমাইকেলের উদ্যোগে এই বিভাগের সংশ্লিষ্ট একটি মিউজিয়াম বা সংগ্রহালয় খোলা হয়। ভারতের অশিল্প-জাত দ্রব্যাদির নমুনা ঐ সংগ্রহালয়ে সংগৃহীত হইয়া থাকে। সম্প্রতি গবর্নমেন্টের আর অপেক্ষা ব্যয় অধিক হওয়ায় বায়-সঙ্কোচের দিকে গবর্নমেন্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে। শোনা যাইতেছে, গবর্নমেন্ট এই সংগ্রহালয়টি অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছেন, এবং ইচ্ছা করিয়া কমিটির কাছে তাহারা এটি তুলিয়া

দিবার জন্তই অভিমত প্রকাশ করিবেন। যখন বিলাতে অজ্ঞ অর্থ-ব্যয় করিয়া ভারত-শিল্পপ্রদর্শনী খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে তখনই দেশের বাস্তববট ব্যয়-বাহ্যল্যের ভয়ে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে—এ ব্যবস্থা অদ্ভুত।

শ্রমজীবীদের ক্ষতিপূরণ-ব্যবস্থা—

ভারতীয় শ্রমজীবীদের ভিতর কেহ কাজ করিতে করিতে অক্ষ বা অকর্মণ্য হইয়া পড়িলে বর্তমান নিয়মে তাহাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থ-দান করিতে নিয়োগকারী বাধ্য নহেন—অর্থদান করা না-করা তাহার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ও অনুগ্রহ-সাপেক্ষ। গবর্মেণ্ট এই ধরণের দুর্ঘটনা-গুলিতে ক্ষতিপূরণ বাধ্যতামূলক করিতে চাহেন। ভারত-গবর্মেণ্ট এ সম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আগামী সেপ্টেম্বর মাসে এক পাণ্ডুলিপি পেশ করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। আপাততঃ এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্ত এক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। এই কমিটির কর্তা মনোনীত লইয়াছেন মিঃ সি এ ইজেন্স।

যাহার কাজ করিয়া শ্রমজীবী অক্ষ বা অকর্মণ্য হইবে, তাহার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের দাবী করিবার স্ফায়সঙ্গত অধিকার শ্রমজীবীদের আছে। তাহা দিতে নিয়োগকারীও স্ফায়তঃ এবং ধর্মতঃ বাধ্য।

গবর্মেণ্টের অমিতব্যয়—

এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্স নামক ইউরোপীয় বণিক-সমিতির সমষ্টি ভারত-গবর্মেণ্টের অর্থ-সঙ্কট সম্বন্ধে সম্প্রতি বড়-লাটের কাছে এক ডেপুটেশন প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বলিয়াছেন, দেশের অর্থ অনুচিতভাবে ব্যয়িত হইলে শিল্প-বাণিজ্য কিছুই উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। ভারত-গবর্মেণ্টের কর্মচারী-বিভাগের খরচ অত্যন্ত বেশী, সামরিক ব্যয়ভার গুরুতর, নুশন দিল্লীর গঠন ব্যাপার একটা বিবম ভ্রম, এই-সমস্ত দিক হইতে খরচ কমানো আবশ্যক। অতিরিক্ত ট্যাক্স বসানোতে বিপদ আছে। জনসাধারণ উহা বহন করিয়া উঠিতে পারিবে না। ব্রিটিশ জাতির একটা প্রাচীন কথা আছে—শান্তি, বায়-সঙ্কোচ এবং সংস্কার। এই তিনটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই গবর্মেণ্টের কাজ করিতে হইবে।

কবিরাজের ক্ষাত্তারী শিক্ষা—

আসাম গবর্মেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন, কবিরাজ পরিবারের একজন এবং হকিম পরিবারের একজন—এই দুইজন ছাত্রকে চারি বৎসর কাল মাসিক কুড়ি টাকা হিসাবে বৃত্তি দিয়া ডিব্রুগড়ের বেরী হোয়াইট মেডিক্যাল স্কুলে রোগ-নির্ণয়-বিদ্যা শিক্ষা দিবেন। মেডিক্যাল স্কুলের বিদ্যা শেষ করিয়া এই-সমস্ত ছাত্র কবিরাজী ও হকিমী পদ্ধতিতে চিকিৎসা করিবেন, ইহাই গবর্মেণ্টের অভিপ্রায়। পাটনাতেও কবিরাজ-দিগকে গুলজারবাগের স্যানিটারী স্কুলে রোগ-প্রতিষেধ সম্বন্ধে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বহুসংখ্যক কবিরাজ এই স্কুলে ভর্তি হইতেছেন। গবর্মেণ্ট তাহাদের জন্তও রেল-ভাড়া ও কিছু কিছু ভাতার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে ভারতবর্ষ একদিন যথেষ্টই উন্নতিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু উন্নতি ক্রমবিকাশের জিনিষ—কোনোখানেই তাহার সীমা-রেখা টানা যায় না। তাহাকে চরম এবং পরম মনে করিয়া বসিয়া থাকিলে তাহার অধঃপতন স্বকৃৎ হইয়া যায়। আয়ুর্বেদেরও উন্নতির প্রয়োজন আছে। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান বাধির যে-সব নূতন রহস্য প্রকাশ করিতেছে, কবিরাজী শাস্ত্রকে উন্নত করিতে হইলে তাহার

সহিত পরিচিত হওয়া দরকার। এই হিসাবে গবর্মেণ্টের এ চেষ্টা প্রশংসার।

মহিলার আয়ুর্বেদ-শিক্ষা—

কাশীর মহিলা-শিক্ষাসমিতি মহিলাদের জন্ত আয়ুর্বেদ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সম্প্রতি এই বিদ্যালয়ের প্রাথমিক পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দেবী ও শ্রীমতী শিবানী দেবী এবং দ্বিতীয় বিভাগে শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেবী, শ্রীমতী প্রতিভাময়ী দেবী ও শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বাংলায় শিশুমৃত্যুর হার যেরূপ প্রবল তাহাতে নারীদের চিকিৎসা-শাস্ত্রে দখল থাকা বিশেষভাবেই প্রয়োজন। বাংলার কি এরূপ কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা হইতে পারে না?

দেবদাস গান্ধী—

গত ১২ই মে এলাহাবাদে কারাগারের ভিতর শ্রীযুক্ত দেবদাস গান্ধীর বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ—তিনি সভায় সমবেত জনসম্মুখে খেলাফৎ ও কংগ্রেসের জন্ত স্বেচ্ছাসেবক হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বিচারে তাঁহার প্রতি দেড় বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত দেবদাস তাঁহার বর্ণনা-পত্রে বলিয়াছেন,—“দেশের কাজে আমার ডাক পড়িয়াছে এবং সেইজন্য আমি কারাগারে যাইতেছি, ইহা আমার পক্ষে নিতান্ত গৌরবের বিষয়। এদেশীয় যুবকবৃন্দের পক্ষে জেলে বাইয়া স্বাধীনতালাভের সহায়তা করা ছাড়া আর কোনো পথ নাই। আমি যাহা করিয়াছি তাহা জানিচ্চা-শুনিয়া এবং কর্তব্য-বোধেই করিয়াছি। যাহারা বুদ্ধিমান তাহাদিগকেই আমি স্বেচ্ছাসেবক হইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম।”

মহান্নার পুত্র মহান্নার মতই নিরাপত্তিতে নিজের কল-কাজ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—কোনোক্রপ আড়ম্বর বা অত্যাতিরিক্ত আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই।

এই পুত্রের কারাদণ্ডে শ্রীমতী গান্ধী ‘নবজীবন’ পত্রিকাতে লিখিয়াছেন,—“আমার তো মাত্র দুইটি পুত্র জেলে গিয়াছে। কিন্তু ভারত-মাতার বিশ হাজার পুত্র আজ জেলে। স্বতরাং আমি দুঃখ করিব কেন? ভারতমাতার যুবক সম্ভানগণ, তোমরা বিশেষ উৎসাহ সহকারে গবর্মেণ্টের কাজে আত্মনিয়োগ কর। তাহাতে হয় তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃগণকে ফিরিয়া পাইবে, অথবা তোমরাও জেলে গিয়া তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইবে।”

দেবদাস গান্ধীর অভিযোগ—

যুক্তপ্রদেশের বস্তি জেলার অন্তর্গত সারাংগঞ্জের হাক্কামা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া শ্রীযুক্ত দেবদাস গান্ধী লিডার পত্রিকাতে একটি রিপোর্ট বাহির করিয়াছিলেন। রিপোর্টে চারিটি স্পষ্ট অভিযোগ ছিল—(১) পুলিশ কংগ্রেস-আফিসে আগুন লাগাইয়া দেয় এবং খাতাপত্র সমস্তই অগ্নিতে নিক্ষেপ করে; (২) ভলেন্টিয়ারদের উপর প্রহার চলে; (৩) আঘাতের ফলে একজন ভলেন্টিয়ার পরদিন মৃত্যুমুখে পতিত হয়; (৪) আহতগণের চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করা হয় নাই, তাহাদিগকে তিন দিন আচ্ছাদন-শূন্য স্থানে ভীষণ রৌদ্রতাপ সহ্য করিয়া পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল।

সম্প্রতি গোরক্ষপুরের কমিশনার এই রিপোর্টের প্রতিবাদ করিয়া এক কমিউনিক বাহির করিয়াছেন। কমিউনিক তিনি বলিয়াছেন,

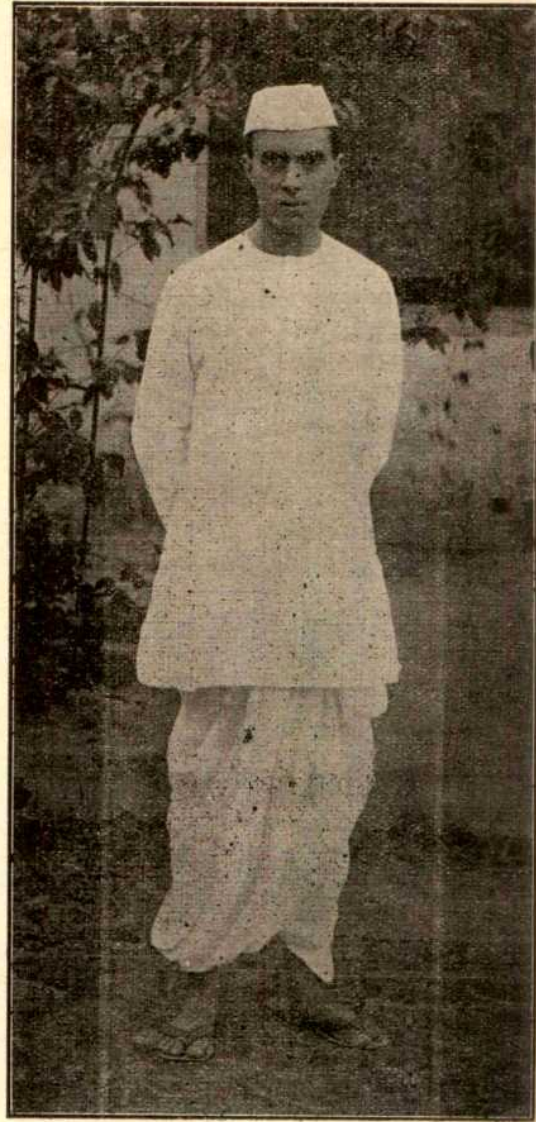


শ্রীমতী কপ্তরী বাদি গাঙ্কী
মহাত্মা গান্ধীর পত্নী

ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত করিয়া জানাইয়াছেন, উক্ত লোকটির মৃত্যু স্বাভাবিক কারণেই ঘটিয়াছে। পিকেটারগণকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য পুলিশ যে কার্য্য করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ সমর্থনীয় এবং ছত্রভঙ্গ করিবার সময় কেহ কোনোরূপ গুরুতর আঘাত পায় নাই। কমিউনিকে কংগ্রেস-আফিসে অগ্নিসংযোগ এবং খাতাপত্র পোড়ানোর কোনো উল্লেখ নাই, আহতগণকে আচ্ছাদনশূন্য স্থানে ফেলিয়া রাখা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দেবদাস গাঙ্কী যে অভিযোগ আনিয়াছেন তাহারও তেমন কোনো প্রতিবাদ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভলেন্টারিগণ প্রহৃত হইয়াছিল কি না সে সম্বন্ধেও কমিউনিক নীরব। সুতরাং কমিউনিক এগুলি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, একথা বলিলে সম্ভবতঃ কিছু অন্তায় করা হইবে না।

আহিরলাল নেহরুর শাস্তি—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোতিলাল নেহরুর পুত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আহিরলাল



শ্রীযুক্ত আহিরলাল নেহরু

নেহরু গত ১১ই মে অপরাহ্নে লক্ষ্ণৌ-জৈলে তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সেইখানেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহার সহকর্মী শ্রীযুক্ত কেশবদেও মালবীর, শ্রীযুক্ত অনাদি-প্রসাদ, মিঃ খুদা ইয়ার খাঁ এবং শ্রীযুক্ত বেঙ্কট রাও প্রভৃতিও ধৃত হইয়াছেন। পণ্ডিত আহিরলালের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইতেছে, (১) বস্ত্র-ব্যবসায়ীগণ আইনভঃ বিদেশী বস্ত্র আমদানী করিতে পারে, পণ্ডিত আহিরলাল তাহাদের এই আইনসম্মত কার্য্যে পিকেটিংএর দ্বারা বাধা দিয়াছেন; (২) তিনি পিকেটিং করিবেন বলিয়া সাধারণ সভায় ভয় দেখাইয়াছেন; (৩) তিনি এলাহাবাদ কংগ্রেস-কমিটির সদস্য, কংগ্রেসের এক সভায় বক্তৃতা-কালে দেশবাসীকে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া তিনি কংগ্রেসের বে-আইনি কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কেশবদেও মালবীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ



শ্রীমতী স্বরূপরাণী দেবী
পণ্ডিত মোতীলাল নেহরুর সহধর্মিণী
ও
শ্রীযুক্ত আহিরলাল নেহরুর জননী

তিনি বিদেশী-বস্ত্র-ব্যবসায়ীগণের ব্যবসার ক্ষতি এবং অবৈধ উপায়ে টাকা আদায় করিবার জন্ত ভীতি-প্রদর্শন করিয়াছেন। অস্বাস্থ্য আত্মসমীক্ষণের বিরুদ্ধেও অভিযোগ ছিল, পিকেটিং করা ও ভয়প্রদর্শন করা। এলাহাবাদের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ নক্সের এজলাসে গত ১৯শে মে ইহাদের বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রথম দুই দফার জন্ত পণ্ডিত আহিরলালকে দেড় বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে এবং তৃতীয় দফার জন্ত ভোগ করিতে হইবে ছয় মাস। ইহা ছাড়া জরিমানা দিতে হইবে একশত টাকা। টাকা না দিলে আরো তিন মাস তাঁহাকে জেলে পচিতে হইবে। শ্রীযুক্ত কেশবদেও এবং খুদা ইয়ার খাঁর প্রতি দেড় বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং একশত টাকা

করিয়া জরিমানার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বাকী ছয়জন আসামীর প্রত্যেককে ছয় মাস করিয়া কারাদণ্ড এবং ৫০ টাকা হিসাবে জরিমানা দিতে হইবে।

পণ্ডিত আহিরলালের জননী পুত্রের এই কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ শুনিয়া বলিয়াছেন, “আমার প্রাণাধিক পুত্রের দণ্ডের কথা শুনিয়া বেদনায় আমার বুক ভরিয়া গিয়াছে। কুসুম-শয্যায় লালিত পুত্র আমায় কিরূপে জেলের কঠোরতা সহ্য করিবে তাহা ভাবিলে আমার চোখে জল আসে। আমার ‘আনন্দভবন’ আজ নিরানন্দ বলিয়া মনে হইতেছে। আমি সর্বাস্থঃকরণে আশীর্বাদ করিতেছি, আমার পুত্র যেখানেই থাক, কষ্ট পাইবে না। রামচন্দ্র বনে গমন করিলে শোক-সম্প্রদা কোশলা যেভাবে সংসারে ছিলেন আমিও সেইভাবেই থাকিব। আশীর্বাদ করিতেছি, আমার পুত্রও রামচন্দ্রের মত শত্রুদলন করিয়া বিজয়ীর বেশে বাড়ী ফিরিয়া আসিবে।”

সামন্তরাজ্যে রাজদ্রোহ-আইন—

বোম্বাই গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি রাজদ্রোহের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া এক নোটিশ জারী করিয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশের সামন্ত-রাজ্য-সমূহও এই নোটিশের আওলে আসিবে। ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেন্টের সমর্থন ছাড়া সম্ভবতঃ এ নোটিশ বাহির হয় নাই। স্তরাতঃ এই নোটিশের কবল হইতে অস্বাস্থ্য প্রদেশের সামন্ত-রাজ্যগুলি যে অব্যাহতি পাইবে একরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই। ব্রিটিশ ভারতে আজ যে জাগরণের সাড়া দেথা দিয়াছে, সামন্ত-রাজ্যগুলিতেও তাহার আভাস স্পষ্ট। সম্ভবতঃ এই জাগরণকে গলা টিপিয়া নিঃশেষ করিবার জন্তই এ অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু আইন করিয়া জনশক্তির জাগ্রত প্রবাহকে বন্ধ করা যায় নাই। বাধা পাইলে তাহা বরং কুল ছাপাইয়া বিপ্লব-বল্লভরূপেই সৃষ্টি করিবে। গবর্ণমেন্টের এই কথাটা এখন বিশেষ ভাবে বুঝিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

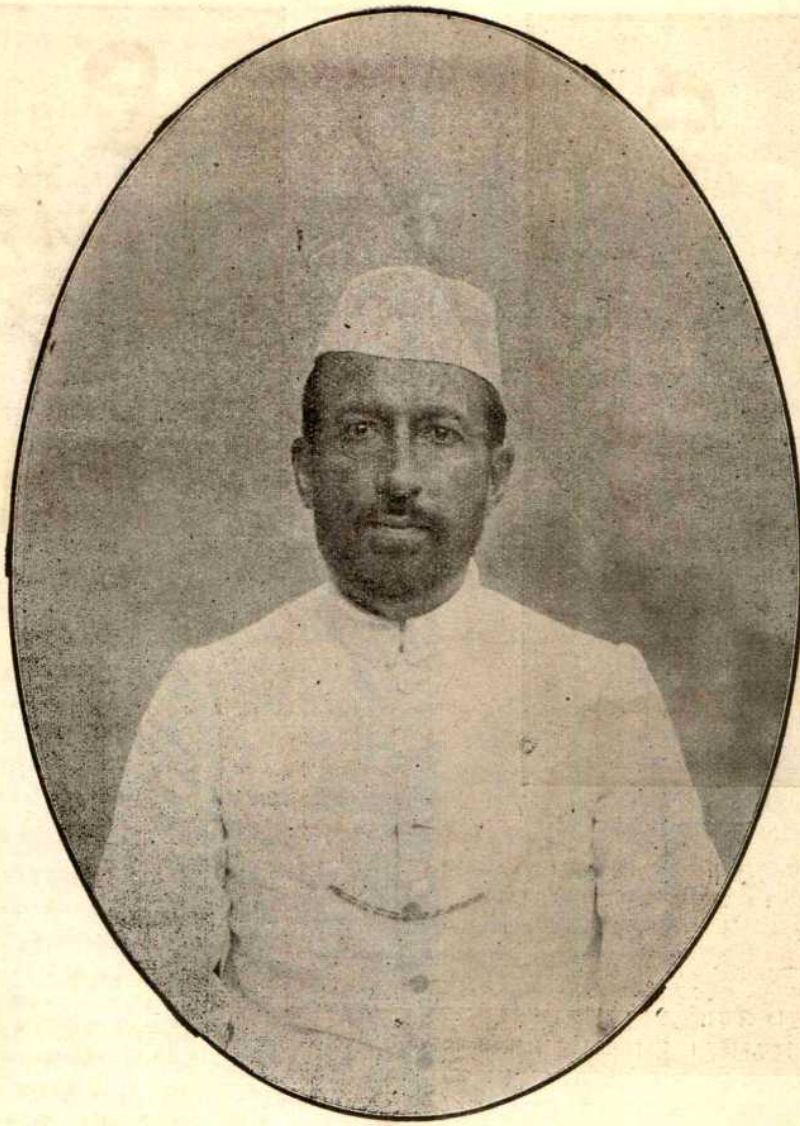
শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

নিখিল-ভারত বর্ষীয় কংগ্রেস-কমিটি—

হাকিম আজমল খাঁ সাহেবের সভাপতিত্বে এবার লক্ষ্ণৌ সহরে নিখিল-ভারতবর্ষীয় কংগ্রেস-কমিটির অধিবেশন বসিয়াছে। এবারকার অধিবেশনের প্রধান আলোচনার বিষয়ই হইয়াছে, সর্বসাধারণের আইন অমান্য করা। মহাত্মা গান্ধির কারাবাসের পর ইহাই প্রথম অধিবেশন। মহাত্মার কারাবাসে ও দেশমধ্যে পুনরায় দমন-নীতির প্রসারে লোকের মন খুব ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেসের বহু ব্যক্তিই গবর্ণমেন্টের এই বর্তমান দমন-নীতির বিরুদ্ধে একটা কিছু করিতে চান। তাই মহাত্মার আইন-অমান্য সম্বন্ধে আদেশ অনেকেরই এখন মনোতে চাহিতেছেন না। যাহা হউক, কংগ্রেস-কমিটি অনেক বাণবিত্তগণের পরে ঠিক করিয়াছেন যে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেশের তখনকার অবস্থা দেখিয়া ব্যবস্থা করা হইবে। লোক পাঠাইয়া দেশের অবস্থা বুঝিবার জন্ত হাকিম-সাহেবের উপর ভর দেওয়া হইয়াছে। মতিলাল নেহরু মহাশয় কারামুক্ত হইয়া এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

অস্পৃশ্যতা নিবারণের স্বব্যবস্থা করিবার জন্ত একটি কমিটি নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

ডাক-হরুকরা



হাকিম আজমল খা

নবরীমঙ্গল—

রাজস্থান-রমণীর তেজ । সম্প্রতি মেবারের বেজোলিয়া নামক স্থানে পুলিশ পাঁচজন পুরুষ ও এগারজন স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করে । ইহাতে লোকেরা উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং ঘটনা-স্থলে অনেক নরনারী আদিয়া জমা হয় । রাজস্থান সেবা-সজ্জের সেক্রেটারী এই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন । তিনি পুরুষদিগকে বুঝাইয়া সেখান হইতে সরাইয়া দেন, কিন্তু রাজপুত নারীরা তাঁহার কথা না শুনিয়া সেখানে জড় হইতে থাকে । প্রায় পাঁচশত রাজপুত নারী পুলিশকে ধরা দিতে প্রস্তুত হয় । শ্রীমতী অনা দেবী চৌধুরাণী এই দলের নেত্রী হন । অবশেষে পুলিশ যত লোক গ্রেপ্তার করিয়াছিল, তাহাদের

ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয় । প্রকাশ যে খন্দর লইয়া গৌলমাল বাড়িয়াছিল ।—মেদিনীপুরহিতৈষী

পরলোকে বীর রমণী—দক্ষিণ আফ্রিকার নেটালের “হিন্দু” পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবানীদয়ালের মহীয়সী সহধর্মিণী শ্রীমতী জগদাণী দেবী সম্প্রতি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন । তাঁহার মৃত্যুতে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় প্রবাসীগণের বিশেষ ক্ষতি হইল । দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সময় ভারতীয়দিগের প্রতি ঘোর নিষেধাজ্ঞা চলিতেছিল, সেই সময় নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ-ব্রত-ধারিণী এই পুণ্যশীলা বীর রমণী মহাত্মা গান্ধীর সহধর্মিণীর সহিত পুনঃ পুনঃ সানন্দে কারাগারকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন । দেড় বৎসরের শিশু-সন্তানের



স্বর্ণায়া জগন্নাথী দেবী

মমতাও তাঁহাকে স্নেহচোষিত করিতে পারে নাই। ইহার মৃত্যুতে ভারতবাসীমাত্রেই দুঃখিত হইবেন, সন্দেহ নাই।—নীহার

অদ্ভুত দৌড়দার—

মাদ্রাজের একটি যুবক দৌড়বাজিতে অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিতেছেন। ইহার নাম এন বরদারাজুলু নাইডু। ইহার বয়স মাত্র বাইস বৎসর। কিন্তু এই বয়সেই সাতারে, লাফানোয়, ভার তোলায় ও দৌড়ে ইনি যথেষ্ট কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালার এবং মহীশূরে ইয়ং মেন্স ক্রীড়ান এসোসিয়েশনের নানা রকম ক্রীড়ায় ইনি বহুবার জিতিয়াছেন। কিন্তু ইহার সবচেয়ে সুনাম রটিয়াছে দৌড়-প্রতিযোগিতায়। ১৯২১ সালে ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গালোরে একটি নিখিল-ভারত ব্যায়াম-প্রতিযোগিতা হয়। ইহাতে ইনি এই কয়টি দৌড়ে জিতিয়াছিলেন—

প্রথম—এক মাইল দৌড়—৪ মিনিট কুড়ি সেকেন্ড লাগিয়াছিল—
প্রথম পুরস্কার।

দ্বিতীয়—পাঁচ মাইল দৌড়—২৫ মিনিট—প্রথম পুরস্কার।

তৃতীয়—২২ মাইল দৌড়—১ ঘণ্টা ৫২ সেকেন্ড—প্রথম পুরস্কার।

তৃতীয় বারের দৌড়ের সময় কয়েকজন লোক বাইসাইকেলে চড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে গিয়াও বরাবর তাঁহার সঙ্গে চলিতে পারে নাই। এই দৌড়ে মহীশূরে যুবরাজ উপস্থিত ছিলেন। তিনি যুবকটিকে ইংলণ্ডের ম্যারাথন রেসে পাঠাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। যুবকটি বাস্তবিকই ভারতবর্ষের গৌরব। যুবকটি নিরামিমাশী।



এন বরদারাজুলু নাইডু—দেড়বিজেতা

বাংলা

পল্লীর কথা—

জলাভাবের জন্য কুপ খনন।—বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থলেই বিঘম জলাভাব উপস্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে গত এক শতাব্দীর মধ্যে নদ-নদীগুলির অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রাকৃতিক কারণে ও চতুর্দিকে রেলওয়ে লাইন বিস্তৃত ও ছোট ছোট নদীগুলির উপর সেতু নির্মিত হওয়াতেও এক্রূপ ব্যাপার অনেকটা ঘটিয়াছে। দেশের সহস্র সহস্র দীঘি-পুকুরিগীর অবস্থা শোচনীয় পূর্বে বড়লোকেরা দীঘি-পুকুরিগী কাটিয়া লোকের জলাভাব দূর করা সহ্য পুণ্যস্থান বলিয়া মনে করিতেন, সেইঃ তাঁহার দীঘি-পুকুরিগী কাটিয়া পুণ্য লাভ করিতেন। এক্ষণে বড়লোকেরা বিলাসিতার কাটিয়া পুণ্য লাভ করিতেন। তাঁহাদের মতি-গতি আর সেরূপ নাই। সমুদ্রে নীতীর দিতেছেন। তাঁহাদের মতি-গতি আর সেরূপ নাই। আবার আজকাল মজুরীর দাম অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি হওয়াতে, দীঘি-পুকুরিগী খননও অনেকের সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্গের বহু জমীদার, প্রজাকে পুকুরিগী-খননের অনুমতি দেন না, ইহা যোর অবিচার। যাহা হউক, বঙ্গের যে যে জেলায় কুপ খননের সুবিধা আছে, সে-সব অঞ্চলের সর্বসাধারণ কুপ খনন করিয়া জলাভাব দূর করিতে যত্নপর হও। নিম্ন বঙ্গের যে-সকল জেলা বর্ধাকালে জলে ডুবিয়া যায়, ঐ সকল জেলায় কুপ খননের সুবিধা হইবে না। উচ্চ ভূমিতে কুপ খননের সুবিধা আছে। সাধারণ কুপ খননে বোধ হয় প্রচণ্ড বেশী নয়। ১৫-২০ টাক হইতে ৩০-৪০ টাকায় স্থানবিশেষে কুপ খনন করা যাইতে পারে। ক্ষেত্রে জলসেচনের জন্তও স্থানে স্থানে এক্রূপ কুপ-খননের প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়-জঙ্গল, পানী ও শৈবালাদি-পূর্ণ পুকুরিগীগুলিও গ্রামবাসিগণ পরিষ্কার করিয়া লইলে জলাভাব অনেক পরিমাণে দূর হইতে পারে।—নবযুগ

পল্লীর জলকষ্ট ও স্বাস্থ্য।—চারিদিক হইতেই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে এবার জলকষ্টের জন্ত লোকে দূষিত পানীয় ব্যবহার



রহস্যময়ী প্রকৃতি

চিত্রকর শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয়ের সৌজন্যে

করিয়া কলেবর প্রাপ্তাপ করিতেছে। গবর্ণমেন্টের তহবিল শূন্য বলিয়া লোকের প্রতি অত্যাচার কবিবার অস্ত্র পুলিশ-খবচা বুদ্ধিব কোন বাণ্য হইতেছে না, কিন্তু লোককে বাঁচাইবার প্রতি কোন দৃষ্ট পড়ে না। অলকষ্টে প্রজাকুল মরিয়া গেলেও জনবহুল দেশে ঘাহাঁবা অবশিষ্ট থাকিবে তাহারাই গবর্ণমেন্টের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। ভাবতে একপ হইতে দিলে কোন দোষ হয় না সত্য; কিন্তু বিলাত হইলে আর একপটি হইতে পাবিত না। এ যে পবানুগ্রহজীবী জাতিব কপালে বিধাতার কলমেব খোঁচা। উঠাইবে কে?—জাগবণ

মার্কিনে কচুবি-পান-নাগের এক হুম্ব উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কচুরি-দ'মেব উপব যদি অত্যন্ত গবম জলীষ বাপ ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা তৎক্ষণাৎ মবিষা বাধ। মার্কিনেব লাইসিয়েনা এবং ফ্রোবিভা অঞ্চলেব জলপথগুলি কচুবি-পানায় পূর্ণ হইয়া নৌকা-যাতায়াতের পথ আটক কবিয়া কেলিয়াছিল। এই উপায় অবলম্বন কবিয়া তথায় সেই জলপথ পবিদ্রুত হইয়াছে। আমাদেব দেশে প্রজাদেব পক্ষে এই উপায় অবলম্বন করা অসম্ভব। তবে সব্কার যদি এই বিষয়ে সহায়তা কবেন, তাহা হইলে এই উৎপাতের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পাবে।—নবযুগ

আমাদের অক্ষমতা ও বিদেশীর লাভ—

চিনিব কথা—ভারতে যত চিনি উৎপন্ন হয় এত আব কোথাও হয় না; আখ্যার ভারতের লোক যত চিনি খায় পৃথিবীর অস্ত্র কোন দেশেব লোক তত চিনি খায় না। সকল রকম খাজদ্রব্যেব মধ্যে একমাত্র চিনিই কেবল বিদেশ হইতে আমদানি কবা হয়।

নিম্নলিখিত কয়েক বৎসরে ভারতে কত-পরিমাণ জমিতে আধেব চাষ হইয়াছিল ও কত-পরিমাণ কাঁচা ইক্ষুজাত চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার হিসাব নিয়ে প্রদত্ত হইল—

চিনিব পরিমাণ জমিব পরিমাণ
টন একর

১৯১১-১২—২৪,৫০,৮০০—২৩,৮২, ৫০০

১৯১০-১৪—২২,৯৭,৫০০—২৫,৩৬,৯০০

১৯১৫-১৬—২৬,৩৩,০০০—২৩,৯১,০০০

১৯১৭-১৮—৩৪,৩৪,০০০—২৮,৫২,০০০

১৯১৯-২০—৩০,৩৬,০০০—২৬,৮৬,০০০

১৯২০-২১—২৪,৬৫,০০০—২৫,৫০,০০০

১৯১৩-১৪, ১৯১৯-২০, এবং ১৯২০-২১ এই তিন বৎসরে বিদেশ হইতে ভারতে যে চিনি আমদানি হইয়াছিল তাহার পরিমাণ যথাক্রমে ৮ লক্ষ ৩ হাজার, ৪ লক্ষ ৮ হাজার ৭ শত এবং ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯ শত টন। অর্থাৎ বিদেশ হইতে আমদানি চিনিব পরিমাণ দেশজাত চিনির ষষ্ঠাংশ। এই হিসাব হইতে বুঝা যাইতেছে যে ভারতে বৎসব বৎসব যৎ-পরিমাণ চিনি খরচ হয় তাহার অধিকাংশ ভারতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা হইলেও বিদেশী চিনি কিনিবার অস্ত্র ভারতকে বৎসর বৎসর ১৪ কোটি হইতে ১৭ কোটি টাকা খরচ কবিত্তে হয়। এই ১৪ হইতে ১৭ কোটি টাকার সমস্তটাই বিদেশের ইক্ষুচাষী চিনি-প্রস্তুতকারক ও বিদেশী সওদাগরদের উদবনাং হইয়া থাকে। এই অবস্থাটা আমাদের, বিশেষতঃ আমাদের দেশের ইক্ষুচাষকারীদের পক্ষে একটুও আনন্দের কথা নহে। যদি এইভাবে বিদেশী চিনিব আমদানী বাড়িয়া যায় তাহা হইলে কালে যে আমাদের শ্রম-শিল্প বিলুপ্ত হইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।—মোহাম্মদী

অলসের বিলাস-ব্যয়—

আফিংএর খরচ ও উহার পরিমাণ—প্রত ১৯১৯২০ সালে ভারত-

বাসীরা ১০৯৪৬ মণ আফিং উদরস্থ কবিয়াছে। ১৯২০-২১ সালে ভারত হইতে ১৪২১৫ মণ আফিং বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে এবং উহার মূল্য বাবদ আদায় হইয়াছে ৩০৪৩৭৭৫০ টাকা।—নবযুগ

হর্ষ-বিষাদের সংবাদ—

প্রত এপ্রিল মাসে বাঙ্গলা দেশে ৩৮টি নূতন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের মূলধন দেড় কোটি টাকা। ইহা স্বপ্নেব বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু উক্ত এপ্রিল মাসে নাকি ২৩টি কোম্পানী ফেল হইয়াছে। তাহাদের মূলধন ৭ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা।—যথোহব

বস্ত্র-কথা—

দেশে যাতে বস্ত্র উৎপাদন ভালো ভাবে হতে পাবে তাব জন্ত কংগ্রেস-কমিটি শেঠ যমুনালাল বাজাজের হাতে ১৭ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। এই টাকা বয়ন-শিল্প শিক্ষা, খন্দ তৈরি আর তাব বিক্রয়েব ব্যবস্থাব জন্ত ব্যয়িত হবে

এই সত্বে লক্ষ টাকা কি ভাবে খরচ কবা হবে তাবও একটা আঁচ দেওয়া হয়েছে।

বয়ন-শিল্প শিক্ষাব জন্ত	২৫,০০০\
বিক্রয়-বিভাগ	২,০০,০০০\
উৎপাদন-বিভাগ	২০,০০০\
প্রচাব-বিভাগ	১,০০,০০০\
বিভিন্ন প্রদেশে ধাব	১,৩৫,৫০১\

—জাগবণ

সুতাব চাষ।—চট্টগ্রাম কাষ্টম-অফিসেব উত্তর দিকে মাদাববাড়ী গ্রামে মুঙ্গী আবচ্ছল লতিফ কেবাণীব বাসায় একশতক সুতাব গাছ আছে। এই গাছ ৮১০ বৎসব বাঁচিয়া থাকে ও শুব বড় হয়। চট্টকাষ কাটিলে অত্যন্ত সুগন্ধ সুতা বাহিব হয়। এই সুতা পাহাড়িয়া সুতা হইতে অনেক শক্ত।—সম্মিলনী

স্বাধীন জীবিকাব আয়োজন—

নূতন দেশলাইব কল—কলিকাতা বেঙ্গল স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ কোম্পানীব শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দেশলাই তৈয়ারী নূতন একরূপ কল আবিষ্কার কবিয়াছেন। এই কলে প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা কাজ করিলে এক দিনে ২০ লক্ষ কাঠি প্রস্তুত হইবে এবং দৈনিক ৮ ঘণ্টা হিসাবে কল চালাইলে প্রত্যাহ কাঠি-সমেত বায় ৫০ গ্রেস পরিমাণ প্রস্তুত হইতে পাবিবে। অল্প মূলধনে এই কলে কাজ চলিবে। আবিষ্কার উদ্যম প্রশংসনীয়। দেশে এইকপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির-শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হইলে এই পব-প্রত্যাশী দেশেব যে অনেক উপকার হইবে, তাহা বলাই বাহ্য। —নৌহার

দেশলাই-বল স্থাপন।—বাণাঘাটের বেল-ষ্টেশনের সম্মুখিত রেলের অপর পাশে একট ছোট-রকমেব স্বদেশী কোম্পানী দেশলাই কল কিনিয়া দেশলাই প্রস্তুত কবিয়া বিক্রয় আবস্ত কবিয়াছে। ইহা একটী সুসংবাদ। —বঙ্গবন্ধু

সদচরিত্র—

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ—বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ কলিকাতা হইতে পাঁচ মাইল দূরে, বালিগঞ্জ ষ্টেশনের নিকটবর্তী বাদবপুরে ১০০ বিঘা জমি ৯৯ বৎসবেব জন্ত লিজ লইয়াছেন। এই জমির উপব পাঁচ শ জন ছাত্র থাকিবার সত একটী ছাত্রাবাস, একটী কলেজ, এবং পদার্থবিদ্যা, রাসায়নিক-বিদ্যা ও বৈদ্যুতিক-বিদ্যা সংক্রান্ত পরীক্ষাগার এবং কাবখানা তৈয়াবি করা হইবে। ইহা করিতে পাঁচ ছয় লক্ষ

টাকা ধরত পড়িবে। বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট এইখানে স্থানান্তরিত করা হইবে। স্বর্ণায় বাসবিহারী ঘোষের দানের উপর নির্ভর কবিয়া এই পরিবর্তন এত বৃহৎ অনুষ্ঠানের আরোজন কবিত্তে সাহস করিয়াছেন। —বল্লভমিত্র

রাজসাহীতে আজ পর্যন্ত সাতটি অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঁহাণী লোকচক্ষুর অন্তরালে সুপ্ত নব-নাট্যধর্মকে জাগাইতে চেষ্টা করেন তাঁহাবাই ধন্ত। —যশোহর

দেশবন্ধু শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের প্রেস্তাবের পব তাঁহাব সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী, পুত্রবধূ, কস্তাগণ এবং শ্রীযুত দাশের ভগ্নী মহোদবা প্রভৃতি দেশের জন্ত অর্থসংগ্রহ কবিত্তে ত্রুতী হন। ফলে তাঁহারা মোট ৭৪৬.১১/৬ সংগ্রহ কবিত্তে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশ্য এই ফণ্ডে শ্রীযুক্ত দাশ ও ২৮১২ টাকা দান করিয়াছিলেন, এই মোট ৮৪৪.৭৩/৬ হইতে ২৩২.১১ টাকা বঙ্গীয় প্রাদেশিক বংগ্রেস সমিতিতে এবং ৩০০০ টাকা বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতিতে এবং বে-সমস্ত খেজারসবক কাব্যবর্ণ করিয়াছে তাহাদের নিবন্ধ পবিবাবের সাহায্যের জন্ত ৫০০০ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। বর্তমানে শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর হাতে মোট ৫২২.৭৩/৬ আছে। তিনি সাধাবর্ণকে জানাইয়াছেন যে উক্ত টাকা কংগ্রেস ও খেলাফতের জন্ত ব্যয় করা হইবে। —যশোহর

দান।—কলিকাতার তালতলাব পান-বংশীয় স্বর্ণায় বাইচরণ পাল মহাশয় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্ত দেড় লক্ষ টাকার সম্পত্তি উইল করিয়া গিয়াছেন। দাতাব কবপোরেশন ষ্ট্রিটস্থ বাসভবনে অগাধ বাবু গিরীশচন্দ্র বসু'র সভাপতিত্বে স্কুলের উদ্বোধন-কার্য সম্পন্ন হইয়াছে। সভাপতি মহোদব কার্যকরী শিক্ষা প্রবর্তন করিতে সনির্বন্ধ অনুবোধ করিয়াছেন। —স্মিলনী

দান।—‘সার্ভেট’ প্রকাশ জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি বাষ্ট্র-সমিতির সম্পাদকেব নিকট গত শনিবার ৫০০০ টাকা তিলক স্বাক্ষর-ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। ইনি বাঙ্গালী এবং নিজেব কোন পবিচয় প্রদান করেন নাই। এমন নিঃস্বার্থ দানের দৃষ্টান্ত বাঙ্গলা দেশে বিবল।

—এডুকেশন গেজেট

প্রবলের অত্যাচার—

শ্রীহট্ট পুলিশের অত্যাচার—“বলিতে লজ্জা হয়, পুলিশ যেরে চুকিয়া মেয়েদের বলিতেছে কোমরে কাপড় বাঁধিয়া মাটি খোঁড়ো। বব আমবা আবও শুনিয়াছি যে একটি পূর্ববর্তী স্ত্রীলোক পর্যন্ত এই আদেশ হইতে অব্যাহতি পায় নাই।”

“অস্ত্রাঘ্ন স্থান হইতে আর প্রত্যহ সংবাদ আসিতেছে যে

অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের অন্তরবাড়ীতে, যেখানে আগে পুলিশ চুকিতে দ্বিধা বোধ কবিত, সেখানে এখন ঘোড়ার চড়িয়া বাইয়া নানারূপ অত্যাচার কবিত্তেছে। সাধারণ লোক বড়ই ভয় পাইয়াছে। শ্রীহট্ট জেলায় অত্যাচারের মাত্রা ধেরূপ বাড়িত্তেছে তাহাতে পল্লীবাসী বোনেরদের সম্মানে থাকাই দায় হইয়া উঠিয়াছে। একবা দূরতর সহিত বলিতে পারি, বঙ্গের কোথাও এরূপ অত্যাচার হইতেছে না।”

নিবেদিকা

—মোহাম্মদী

—

সমাজের অত্যাচার—

বধু-নির্ধ্যাতন—আহিবীটোলাব বধু-নির্ধ্যাতন মামলায় বধু-নির্ধ্যাতনের যে কুদর্শ চিত্র লোকপোচর হইল, তাহাতে যাহাব অত্যাচার কবিয়াছে তাহাদের এতটুকু লজ্জা হইয়াছে কি না বলিতে পাবি না, কিন্তু ইহাতে যে সমগ্র বাঙ্গালী-সমাজেব মাথা নত হইল তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ইহাও বলি, বাঙ্গালার অন্তঃপুরে যে বালিকা-বধূবা কিরূপ অত্যাচারে লক্ষিত হয়, সে সংবাদের আভাসও ইহাব সহিত প্রকাশ হইয়া পড়িল। একপ অত্যাচার কেন হয়? দুর্বলকে অসহায়কে গড়ান কবিবাব যে মুখ, সেই মুখ-লাভই কি ইহাব কাবণ? আহিবীটোলার বালিকা বধুব উপর অত্যাচারের কাহিনী পড়িবা বাঙ্গালী শিহবিয়া উঠিয়াছে—ইহা সত্য। কিন্তু আজও গৃহে গৃহে যে-সকল বধু নির্ধ্যাতিত হইতেছে, তাহাদের নির্ধ্যাতন কমিবে কি? বালিকা বধুব নির্ধ্যাতনের দুইটি কাবণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য—প্রথমতঃ তাহাদের অসহায় অবস্থা, দ্বিতীয়তঃ বরপক্ষীর এবং কস্তাপক্ষীর মধ্যে তত্ত্ব-তাবাস লইয়া অর্থের সম্পর্ক। আহিবীটোলাব বধু-নির্ধ্যাতনের ব্যাপারে হয়ত অর্থ লইয়া কোন গণ্ডগোল হয় নাই, কিন্তু আনন্দময়ী একান্ত অসহায় বলিয়াই পাষণ্ডেরা তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে পারিয়াছে। বাঙ্গালীর সমাজ-বন্ধন আজ এতই শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, সমাজের আজ এতই অধঃপতন ঘটয়াছে, যে, চন্দ্রের সম্মুখে অত্যাচার দেখিয়াও অত্যাচারেব কোনও প্রতিবাহই করিতে পাবিতেছে না। —বল্লভমিত্র

দেশহিতবর কাজ—

শো-বধ—কবিদপুব সহবের মিউনিসিপালিটির সীমাব মধ্যে শো-বধ হইতে পাবিবে না, কবিদপুব মিউনিসিপালিটি এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ কবিয়াছেন।—কাশীপুরনিবাসী

সেবক

ভারতে মদের আমদানী

(স্পিরিট সহ)

সন	মূল্য (টাকা)	সন	মূল্য (টাকা)
১৯১৫—১৬ ইং	১৮৭৩৪০০০	১৯১৮—১৯ ইং	৩৩০২১০০০
১৯১৬—১৭ ইং	২৩৩০১০০০	১৯১৯—২০ ইং	৩৩৭৪১০০০
১৯১৭—১৮ ইং	২৪৯৯৬০০০	১৯২০—২১ ইং	৪২০০২০০০

শ্রী যতীন্দ্রমোহন সিংহ চৌধুরী

ঘাস

(গান)

কখন বাদল-ছোঁওয়া লেগে
মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি
সবুজ মেঘে মেঘে ।
ঐ ঘাসের ঘন ঘোরে
ধবলীতল হল শীতল
চিকন আভাষ ভরে ;
ওরা হঠাৎ-গাওয়া গানের মত
এল প্রাণের মেঘে ॥

ওরা যে এই প্রাণের রণে
মরু-জয়ের সেনা ।
ওদের সাথে আমার প্রাণের
প্রথম যুগের চেনা ।
তাই এমন গভীর স্বরে
আমার আঁখি নিল ডাকি
ওদের খেলাঘরে ।
ওদের দোল দেখে আজ প্রাণে আঘাৎ
দোলা ওঠে জেগে ॥

বর্ষা-প্রাতে

(গান)

আজি বর্ষাবাতের শেষে
সজল মেঘেব কোমল কালোয়
অরুণ-আলো মেঘে ।
বেণুবনের মাধায় মাধায়
রং লেগেছে পাতাষ পাতায়,
রঙের ধাবায় হৃদয় হারায়
কোথা যে যায় ভেসে ॥

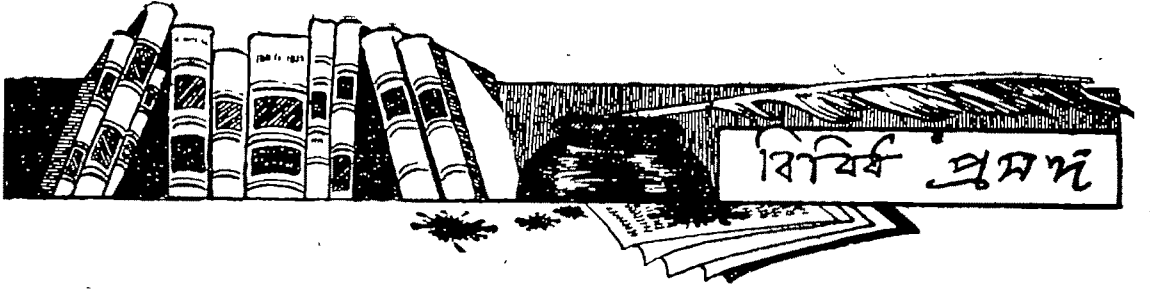
এই ঘাসের ঝিলিমিলি,
তার সাপে মোর প্রাণের কাঁপন
এক তালে যায় মিলি ।
মাটির প্রেমে আলোব বাগে,
রক্তে আমাব পুলক লাগে,
বনের সাথে মন যে মাতে,
ওঠে আকুল হেসে ॥
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাটির তলায় আগুন

গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ঢাকা জেলায় পাঁচদোনা গ্রামে
যাইয়া জানিতে পারিলাম যে সেখান হইতে কয়েক
মাইল দূবে একটি মাঠে কৃষকের তামাক খাবাব আগুন
হইতে একটি মাঠের মাটির নীচে আগুন লাগিয়াছে ।
আমরা ১৮ই জ্যৈষ্ঠ আমদিয়া গ্রাম হইতে শ্রীব্রজ বোগেজ-
চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সহ সেই মাঠে যাই । গিয়া দেখি
বহু বহু বিঘা স্থান ব্যাপিয়া মাটির নীচে দিবারাজি আগুন
জলিতেছে ; কত বৃষ্টি গেল, মাঠের উপর দিয়া জলের
প্রবাহ বহিয়া গেল, তবুও আগুন জলিতেছে । ক্ষেত্র রক্ষার
জন্য গভীর পরিখা কাটা সত্ত্বেও আগুন ৩০০১৪০০

হাত দূবে মাটি ভেদ কবিয়া বহু বহু ছিদ্র দিয়া ধূম
উদ্গার করিতেছে । বহু বহুদূর ব্যাপিয়া কেবলি অসংখ্য
ছিদ্রপথে ধূম উদ্গিরণ করিতেছে । বাছুর, শিয়াল, সাপ,
প্রায়ই আগুনে পড়িয়া মারা যায় । স্থানীয় কৃষকেরা
বড় ভয় পাইয়াছে । এখানে কি কোন-প্রকারের কয়লা
আছে ? স্থানটি বিল, তার চারিদিকে লাল টিলা, কঙ্কবে
ভরা মাটি, স্থানটির নাম সাতগাঁয়ের বিল । ঢাকা হইতে
জিনায়দী ষ্টেশন (A. B. Ry.), তথা হইতে ৭ মাইল ।
বা ষ্টীমার ষ্টেশন ভাঙ্গা হইতে ৫ মাইল । এখানে অল্পসঙ্কান
হওয়া প্রয়োজন ।

শ্রী ক্ষিতিমোহন মেন



স্বাধীনতার ফল

আগে বীজ না আগে গাছ, আগে ডিম না আগে পাখী, একরূপ প্রাণের উদ্ভব দেওয়া যেমন কঠিন, তেমনি মানুষের কোন্ সদ্গুণ স্বাধীনতার কাবণ বা স্বাধীনতার ফল, কোন্ দোষ পরাধীনতার কারণ বা তাহারই ফল, তাহা বলাও কঠিন। একরূপ প্রাণের উদ্ভব দিতে চেষ্টা না করিয়া দুই-একটি বিষয়ে স্বাধীন ও পরাধীন জাতিদের মধ্যে প্রভেদের উল্লেখ কবিব।

ইংবেজরা, বিশেষতঃ ইংবেজ খৃষ্টীয়ান মিশনারীরা, আমাদের কোন দোষ দেখাইয়া তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করিলে, আমাদের মধ্যে অনেকে পাশ্চাত্য সমাজের, বিশেষতঃ ইংরেজ সমাজের, নানা দোষের উল্লেখ করিয়া বলেন, “তোমরা নিজের দেশে এত দুর্নীতি থাকিতে আমাদের জন্য এত মাথা ঘামাও কেন? আগে নিজের দেশের দোষ শুদ্ধাও, তাহার পর বিদেশে আসিয়া পরের দোষের চর্চা কবিও।” উত্তেজিত হইয়া একরূপ কথা বলা কতকটা স্বাভাবিক বটে, কিন্তু এখন ইহার ন্যায্যতা বা অত্যাচারের আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা এখানে ইহাই বলিতে চাই, যে, পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা নিজের দেশের সমাজের দোষের প্রতি অন্ধ হইয়া যে পরচর্চা করে, একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ইংলণ্ড বা পাশ্চাত্য দেশ-সকলে যে-সব দোষ আছে, তাহার প্রত্যেকটিই সেই-সব দেশের লোকদের কাহাবো না কাহাবো চোখে পড়িয়াছে, এবং তাহার দোষ দেখিয়াছেন, তাহার সংশোধনের প্রবল চেষ্টাও তাহারা কেহ না কেহ করিতেছেন। পাশ্চাত্য জাতির লোকেরা সকলেই ঘবেব দোষে অন্ধ হইয়া পর-ছিন্ন অঘেষণে ব্যস্ত, ইহা সত্য নহে।

স্বাধীন জাতি-সকলের অনেকের মধ্যে একরূপ শক্তি ও

মহাপ্রাণতা আছে, যে, তাহারা পরের দুঃখ-দুর্গতির খবর রাখিতে পাবে, এবং তাহা মোচনের জন্ত আত্মোৎসর্গ করিতে পাবে। পেশাদার মিশনারী ও জনহিতসাধক যে নাই, তাহা নহে, কিন্তু খাটি দার্শনিক প্রচাবক ও জন-হিতসাধকও স্বাধীন জাতি-সকলের মধ্যে অনেকে জন্মিয়াছেন। পরাধীন-জাতীয় কয়জন লোক কুষ্ঠ বোগের সেবার জন্ত আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, কয়জন কতগুলি কুষ্ঠ হাস্পাতাল ও আশ্রম, অক্ষাশ্রম প্রভৃতি স্থাপন ও পরিচালন করেন, কয়জন নরখাদক অসভ্যজাতিদের উপকার করিতে গিয়া প্রাণ দিয়াছেন? ইহা নিশ্চিত, যে, স্বাধীনতা মানুষের শক্তি, মহাপ্রাণতা, এবং জীবনের উদারতা, মানস দৃষ্টিব প্রসার ও বৃদ্ধি করে।

স্বাধীন ফ্রান্সের লোকেরা আমেরিকানদিগের স্বাধীনতা-যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিল, গ্রীসের স্বাধীনতা-সমরে স্বাধীন ইংলণ্ডের কবি বায়বন্ ও অন্ত ইংবেজরা সহায় হইয়াছিল। একরূপ সাহায্য করিবার শক্তি ও স্বযোগ পরাধীন জাতিদের নাই।

জনহিতসাধন ব্যাপাবেই স্বাধীন জাতিদের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নহে। অগ্ৰবিধ নানা দুঃসাধ্য কাণ্ড সাধনেও তাহারা অগ্রণী। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার স্বাধীন জাতীয় লোকেই করিয়াছে। হিমালয় আমাদের দেশের পর্বত; কিন্তু তাহার উচ্চতম শৃঙ্গ-সকল আবিষ্কার করিতেছে স্বাধীন পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা; কিন্তু এই দেশেই কুলিরা তাহাদের সঙ্গে ভাববাহী হইয়া যাইতেছে।

জ্ঞানরাজ্যেও স্বাধীনতার জয়। বিজ্ঞানে, দর্শনে, ইতিহাসে, শিল্পে, আজ ইউরোপ-আমেরিকার স্বাধীন জাতিবাই অগ্রণী। এশিয়ার জাপানও ভারতবর্ষের একশত বৎসরেরও অধিক কাল পবে পাশ্চাত্য সংস্পর্শে আসিয়াছে।

কিন্তু স্বাধীনতাও শুধু সেই জাপান জ্ঞানবাজ্যে অল্প সব এশিয়াবাসীকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছে।

পরাদীন জাতিসকলের শক্তিহীনতাও অল্প সব কারণেব আলোচনা না করিয়া একটাও উল্লেখ এখানে সহজেই করিতে পারি। আমরা নিজেদের দুঃখ-হৃদশায় একরূপ অভিভূত, তাহা দূর করিবার ক্ষীণ চেষ্টায় আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি এতটা ব্যথিত হয়, যে, আমবা পরেব ভাবনা ভাবিতে পারি না। তা ছাড়া, একথা ত আছেই, যে, যে নিজে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই, সে কেমন কবিয়া অপরের সিদ্ধি লাভের সহায় হইবে ?

কয়েক বৎসর পূর্বে বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে শ্রমজীবীদের অন্ততম প্রতিনিধি (এখন পরলোকগত) মিঃ কেমার হার্ডিকে “শ্বেত কুলি সর্দার” বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। কেমার হার্ডি ব্রিটিশ শ্রমজীবীদের অন্যতম নেতা ছিলেন বটে। কিন্তু ইংলও স্বাধীন দেশ, সেখানকার প্রধান মন্ত্রী পর্যন্ত শ্রমজীবীদের সঙ্গে আপোষে মিটমাট করিবার জন্য তাহাদের সহিত ভদ্রভাবে নানা সর্ষেব আলোচনা কবিতে বাধ্য হন। পরাদীন দেশের রাজা মহারাজা ত দূবে থাক, জগন্মান্য নেতা গান্ধীও সে ভদ্রতা গান্ধী-বেডিং-সংবাদ উপলক্ষ্যে বড়লাটের নিকট হইতে পান নাই।

স্বাধীন দেশ-সকলের অজ্ঞাতনামা অতি সামান্য লোকেরও যে তেজ, যে স্বাধীনতাপ্রিয়তা, ন্যায়ের ও সত্যের পক্ষে ঝাড়াইবার যে ক্ষমতা, সকল বিষয়ে যে মনুষ্যত্ব অনেক সময়ে দেখা যায়, তাহা পবাদীন দেশেব খ্যাতনামা ধর্ম- ও সমাজ-সংস্কারক, রাজনীতিজ্ঞ, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, অধ্যাপক, সম্পাদক, বক্তা প্রভৃতিদের মধ্যেও দৃষ্ট হয় না। পবাদীনতা আমাদেরকে মনুষ্যহীন করিয়াছে, না, মনুষ্যত্ব না থাকতেই আমবা পরাদীন হইয়াছি, তাহাব গীমাংসা নাই বা হইল ? আমাদের মনুষ্যত্ব নাই, মনুষ্যত্ব চাই, এই কথাই অতি সামান্য অখ্যাতনামা লোকদের যেমন প্রাণিধানযোগ্য, তেমনি কৃতীতম ও প্রসিদ্ধতম ব্যক্তিদেরও প্রাণিধানযোগ্য।

পাশ্চাত্য দেশের লোকদের হাজাব দোষ থাকিলেও, তাহাবা আমাদের যে যে দোষ দেখায়, তাহা সত্য সত্যই

আমাদের আছে কি না, তাহাই আমাদের বিচার্য্য ; যে যে দোষ আমাদের আছে, তাহাব সংশোধনই আমাদের প্রথম ও প্রধান কার্য্য।

রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর

বায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলায় আলমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে বৈকুণ্ঠনাথকে দারিদ্র্যের দাতনা সহ্য করিতে হইয়াছিল।



রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে আইন পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। সেই বৎসব ১৯শে মার্চ তিনি ওকালতী আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়ে তাঁহাব অসাধারণ সাফল্যের কথা অনেকেবই জানা আছে। ১৯১৪ সালে এই ব্যবসায়ে তাঁহাব ৫০ বৎসব পূর্ণ হয়। জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও শ্রবণশক্তি সকলকে বিস্মিত করিত। তিনি গত ১৩ই মে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ৭৯ বৎসব বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

বহরমপুর তাঁহাব কৰ্মক্ষেত্র ছিল। তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। যখন গবর্ণমেন্ট বাংলাব জেলা বোর্ডে বেসরকারী চেয়ারম্যান নিয়োগ করেন, বৈকুণ্ঠনাথই প্রথম বেসরকারী চেয়ারম্যান হন। তাঁহাব কার্যেব সাফল্যে সমগ্র বাংলায়

সেই প্রথা প্রবর্তিত হয়। তিনি দুইবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে রাঘ বাহাদুর কবেন এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধি দেন।

কংগ্রেসের আরম্ভ হইতে বৈকুণ্ঠনাথ সেই অল্পটানে যোগদান করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের যে যে স্থানে অধিবেশন হইয়াছে, তাহার প্রায় সর্বত্রই বৈকুণ্ঠনাথ যোগদান করিয়াছিলেন। মিসেস্ বেসান্ট, যখন কংগ্রেসের সভানেত্রী হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির ষ অধিবেশন জগলিতে হইয়াছিল, তিনি তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতিতে মফঃস্বলে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তাহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।

জন্মস্থানের প্রতি বৈকুণ্ঠনাথের অসাধারণ অমুরাগ ছিল। পূজার অবকাশে যখন দকলে দার্জিলিং দিমলা প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু-পরিবর্তনে গমন করেন, তিনি প্রতি বৎসর সেই পাড়াগাঁতে সপরিবারে যাইতেন এবং বিপুল আয়োজনে শারদীয় পূজা করিতেন। গ্রামে জলকষ্ট নিবারণের জন্য তিনি ৩৪টি পুষ্করিণী খনন করিয়াছেন। হিন্দুধর্মপ্রাণ গ্রামবাসীদের জন্য পিতামাতার নামে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ছাত্রদিগের পাঠের জন্য স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। রুগ্ন ও ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত লোকদিগের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত করিয়াছেন।

তিনি চিরদিনই স্বদেশী ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের বহুপূর্ব হইতে তিনি স্বদেশী পণ্য ব্যবহার করিবার কথা বলেন। আজ যে কলিকাতা পটারি ওয়ার্কস্ দেশে খ্যাতি লাভ করিয়াছে, তিনিই সেই পটারির মূল ভিত্তি। তিনি দেশীয় আরও অনেক ব্যবসায়ের ডিরেক্টর ছিলেন, এবং স্বদেশী আন্দোলনের পরে তাঁহার জন্মস্থানে তাঁতের ব্যবস্থা করেন।

বৈকুণ্ঠনাথ অতিশয় দয়াশীল ছিলেন। হুংখী তাঁহার দ্বাব হইতে রিক্ত-হস্তে কখনও ফিরে নাই। ২০ জন ছাত্রের পড়িবার ব্যবস্থা এবং তাহাদিগের আদ্যোপান্ত খরচ ৪০

বৎসর ধরিয়া বৈকুণ্ঠনাথ দিয়া আসিয়াছেন। আজ তাঁহার দয়া ৭০০।৮০০ বাদশালী পরিবার খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তাঁহার মত গৃহকর্তা বর্তমান যুগে বিরল। অভ্যাগত তাঁহার বাড়িতে আসিলে তিনি কৃতার্থ মনে কবিতেন। ভোজন করাইয়া ও অতিথির সেবা করিয়া তাঁহার আকাজ্জা যেন মিটিত না।

শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী আশ্রম ও হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয়

কোন মানুষের কেবল একটা হাত, একটা পা, একটা চোখ, একটা কান কার্যক্ষম থাকিলে তাহাকে সমর্থ মানুষ বলা যায় না, কাবণ বস্তুতঃ সে সমর্থ নহে। জ্ঞাতি ও



শ্রীশ্রী গোবীপুত্রী দেবী

শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী আশ্রম

ও হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী

সমাজেও কেবল পুরুষের শিক্ষা ও শক্তি বাড়িলেই জাতি ও সমাজ উন্নত, বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। মহিলা-কুলেরও শিক্ষা ও শক্তি বৃদ্ধি একান্ত আবশ্যক। স্বপ্নের বিষয় ইহা এখন আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোক বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং তদনুসারে কাজ করিতে কেহ কেহ অগ্রসর হইয়াছেন। “শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী আশ্রম ও হিন্দুবালিকা-বিদ্যালয়” এইরূপ একটি চেষ্টাবল। ইহাব একটি বিবরণপত্রী হইতে জানা যায়, যে, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শিষ্যা আবাল্যসন্ন্যাসিনী শ্রী গোবীপুবী দেবী অন্যান্য ত্রিশবৎসর কাল হিমাচলের নিভৃত প্রদেশে তপস্যার পর ভারতবর্ষের সর্বত্র পর্যটন কালে মাতৃজাতির অবনতি এবং দুর্বলতা স্বক্ষে দেখিয়া ব্যথিত হন। তাঁহার গুরুদেবের আদেশে তপোবনের অনাবিল শাস্তি ত্যাগ করিয়া প্রায় পঁচিশ বৎসর হইল তিনি মাতৃজাতির উন্নতিকল্পে এই আশ্রম ও বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তদবধি একমনে অক্লান্তভাবে ইহাব জ্ঞপ্ত পবিত্রম করিতেছেন।

“বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, গীতা উপনিষৎ প্রভৃতি এবং হিন্দি ও ইংরেজী সাহিত্য শিক্ষা প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। শিল্পচর্চার মধ্যে বর্তমানে সেলাইকার্য, সূতাকাটা এবং বস্ত্র-বয়নের উপযুক্ত বন্দোবস্ত বহিয়াছে, ক্রমে অন্যান্য গৃহশিল্প শিক্ষার বন্দোবস্তও হইবে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে স্বশিক্ষিতা ব্রহ্মচারিণীগণই বিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিয়া থাকেন।”

চিরকোমার্যব্রতধারিণী জনসেবিকা এবং সুগৃহিণী, উভয় প্রকার আদর্শ নারীর উপযোগী শিক্ষা এখানে দিবার চেষ্টা করা হয়। ইহার কয়েকটি ছাত্রী সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

আমরা এই বিদ্যালয়ে নির্মিত তোয়ালে দেখিয়া প্রীত হইয়াছি।

আশ্রম ও বিদ্যালয় সংক্রান্ত কোন বিষয় জানিতে হইলে ৫ বি রাধাকান্ত জিউ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় শ্রীশ্রী গোবীপুবী দেবীর নিকট পত্র দ্বারা অথবা সাক্ষাৎ

করিয়া জানিতে হইবে। উহার সাহায্যার্থ টাকাকড়িও ঐ ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন।

গিরিডি বালিকা-বিদ্যালয়

গিরিডি বালিকা-বিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা “মহিলা মজলিস” বিভাগে মুদ্রিত হইয়াছে। গিরিডি স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে বালিকারা প্রবেশিকা পর্যন্ত শিক্ষা পাইতে পারে। বাংলাদেশে নারীশিক্ষার এই একটি অস্ত্রবায় আছে, যে, বালিকাদের বয়স একটু বাড়িলেই তাহারা আর স্বচ্ছন্দে খোলা জায়গায় চলাফেরা করিতে পারে না; তাহাতে তাহাদের মস্তিষ্ক-চালনার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনমত অঙ্গচালনা না হওয়ায় দৈহিক ক্ষতি হয়। গিরিডিতে এই ব্যাধাত নাই। তথাপি বালিকা ও মহিলারা স্বচ্ছন্দে সর্বত্র যাতায়াত করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন; ইহা তথাকার রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নারীশিক্ষা-সমিতি

বাংলাদেশে বালিকা ও মহিলাদের শিক্ষার নিমিত্ত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নারীশিক্ষাসমিতি স্থাপিত হয়। বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, এই-সব বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষয়িত্রী প্রাপ্ত করণ, মাতাদিগকে শিশুপালন ও শিশুশিক্ষা শিখাইবার ব্যবস্থা করা, গৃহশিল্প শিখাইবার বন্দোবস্ত করা, এবং অসহায় বিধবা ও অন্তঃস্থ জীলোকদিগকে উপার্জনক্ষম করিবার মত শিক্ষা দিবার জন্য আশ্রম ও শিক্ষালয় স্থাপন, এই সমিতির উদ্দেশ্য। এপর্যন্ত সমিতি দশটি নূতন স্কুল স্থাপন এবং একটি পুরাতন স্কুলকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে চারিটি কলিকাতায়, এবং বাকীগুলি চব্বিশ-পরগণা ও হুগলী জেলায় স্থিত। সাড়ে ছয় শতের উপর ছাত্রী এই-সব স্কুলে শিক্ষা পাইতেছে। সমিতি কলিকাতার ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়ে প্রস্তুতি ও শিশুর কল্যাণ-সাধন বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা সচিব বক্তৃতা দেওয়াইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু, বামনদাস মুখোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, নিবারণচন্দ্র মিত্র, ও



শ্রীমতী অবলা বহু
আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের
(তৈলচিত্র হইতে)

তেজেন্দ্রনাথ রায় ভাস্কর মহাশয়েরা বারটি বক্তৃতা দিয়াছেন। এই প্রকাব শিক্ষা দিবার নিমিত্ত আহিরী-টোলা ও ভবানীপুরে আরো দুটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়ে দুঃস্থ মহিলাদিগকে উপাৰ্জনকম করিবার নিমিত্ত কোন কোন শিল্প শিখাইবার উপযোগী শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সেখানে আপাততঃ চরকাব সূতা কাটা, হাতের তাঁতে কাপড় বোনা, সেলাইয়ের কাজ, এবং মোরঝা জেলী ও চাটুনী তৈয়াব করিতে শিখান হয়। কলিকাতাব নিকটবর্তী চব্বিশ-পরগণা, হুগলী, হাবড়া ও নদিয়া জেলায় সমিতি অনেকগুলি স্কুল স্থাপন করিতে ইচ্ছা

করেন। যে-যে গ্রামে স্কুল স্থাপিত হইবে, তথাকার স্কুল তত্ত্বতা বালিকা ও মহিলাদের সর্ববিধ কল্যাণ-সাধন-চেষ্টার কেন্দ্র হয়, সমিতির এইরূপ ইচ্ছা। গ্রামের লোকেরাই স্থানীয় স্কুল-কমিটির অধিকাংশ সভ্য মনোনীত হন।

সমিতি দুঃস্থ নারীদের, বিশেষতঃ বিধবাদের, সাধারণ শিক্ষা ও অর্থ-কর শিল্প আদি শিক্ষার জন্ত একটি আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। প্রাচীন-স্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম অনুসারে ইহার নাম রাখা হইয়াছে—

বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন।

এই বাণী-ভবনের কিছু বিবরণ গত মাসের প্রবাসীতে দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে ইহাও লেখা হইয়াছে, যে, শ্রীমতী হরিমতি দত্ত ইহার জন্ত দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই দানশীলা মহিলা কলিকাতা ইটালী বেনিয়াপুকুর নিবাসী ৮ পরাণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পত্নী। তিনি কাশীর রামকৃষ্ণ

সেবাশ্রমে তাঁহাব স্বামীর নামে একটি অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন, এবং দুটি রোগীর শয্যার ব্যয় নির্বাহ করেন। তন্নিম্ন এলবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতালে (বেল-গাছিয়ার কারুমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে) দশহাজার টাকা দিয়াছেন।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী অবলা বসু মহাশয়া নারীশিক্ষা-সমিতির ও বিদ্যাসাগর বাণীভবনের সম্পাদিকা। সমিতির ও বাণীভবনের কার্যের জন্ত বিস্তর টাকার প্রয়োজন। বাণীভবনের জন্ত জমী বা বাড়ী ক্রয় করিতে হইবে, এবং কেবল



শ্রীমতী হরিমতী দত্ত

জমী কিনিলে সমুদয় ঘর বাড়ী, ও জমীসহিত বাড়ী কিনিলে বাড়ীও কিছু নির্মাণ করিতে হইবে। টাকাকড়ি সম্পাদিকার নামে ১০৫ নং আপার সাকুলার বোড্ কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দান সাদরে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

শ্রীমতী কস্তুরী বাদে গান্ধীর অভিভাষণ

মহাত্মা গান্ধী যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভাবতীয়দিগের প্রতি অবিচার দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পত্নী শ্রীমতী কস্তুরী বাদে গান্ধী পতিব্রতা সহধর্মিণীর কার্য্য গৃহে ও বাহিরে উভয়ত্রই করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে পতির প্রতি একান্ত অহু-র্য্যাদা সাধুশীলা পত্নী লক্ষ লক্ষ আছেন। অধিকাংশ স্থলে তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র গৃহের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। এক্ষণে ক্রমে ক্রমে অন্তঃপুরিকারাও বাহিরের কাজের খবর লইতেছেন এবং কেহ কেহ কর্ম্মও হইতেছেন। শ্রীমতী কস্তুরী বাদে গৃহে ও বাহিরে স্বামীর সহকর্ম্মী বহু-

বৎসর পূর্ব্ব হইতেই হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী যেমন জাতীয় সম্মান বজায় রাখিবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় জেলে গিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নীও তদ্রূপ ভারতনারীগণের সম্মান রক্ষার্থ জেলে গিয়াছিলেন; কারণ তখন দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেন্ট ভারত-প্রচলিত হিন্দু বা মুসলমান ধর্ম্ম অমুসারে অনুষ্ঠিত বিবাহকে বিবাহ বলিয়া গণ্য না করায় দক্ষিণ আফ্রিকান্নিত বিবাহিতা ভারতনারীরা তথাকার আইনের চক্ষে বিবাহিতা পত্নী বলিয়া স্বীকৃত হইতেছিলেন না।

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিবিয়া আসিয়া শ্রীমতী কস্তুরী বাদে গান্ধী গৃহে ও বিস্তীর্ণতর ক্ষেত্রে সহধর্ম্মিণীর কার্য্য করিতেছেন। সম্প্রতি গুজরাটের প্রাদেশিক কনফারেন্সে তিনি সভানেত্রীর কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভি-ভাষণে গান্ধী মহাশয়ের নির্দিষ্ট তিনটি কর্তব্যের উপর তিনি জোর দিয়াছিলেন; যথা—খন্দের বধন ও ব্যবহার, কায়মনোবাক্যে অহিংসা নীতির অমুসরণ, এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ। যাহাদিগকে সমাজ অস্পৃশ্য মনে করে এবং তাহাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহাব কবে, তাহারা যে লোক-লয়ের একান্ত আবশ্যক কাজ করিয়া সমাজের কি মহৎ উপকার সাধন করে, এবং তাহার বিনিময়ে তাহারা যে কীদৃশ গর্হিত দুর্ব্যবহার পায়, শ্রীমতী কস্তুরী বাদে মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় তাহা বর্ণনা করেন।

কক্সবাজারের বিপন্ন লোকদের সাহায্য

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজ কক্সবাজারের বিপন্ন লোকদিগকে সাহায্য দিতে চেষ্টা করিতেছেন। টাকা কড়ি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নামে, ২১১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট্ কলিকাতা, ঠিকানায় প্রেরিতব্য। তত্ত্বিন্ন নিম্নমুদ্রিত আবেদন অমুসারেও সকলে চাদা পাঠাইতে পারেন।

চট্টগ্রাম জিলাস্থ বয়বাজার সব-ডিভিজননের গত ২৪শে এপ্রিল তারিখে বাতাপাড়া, দুঃস্থ, পুহুহীন নরনারীর সাহায্যকল্পে, কলিকাতাস্থ চট্টগ্রাম-সম্মিলনীর আনুকূল্যে এক কমিটি গঠিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে চাদা সংগ্রহের ভাব প্রসঙ্গ হইয়াছে। বর্ধা সমাগত, সহায়ক দেশবাসীকে অবিলম্বে এই মহৎকার্য্যে সাহায্য দান করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ কবিতেছি। যিনি যাহা কিছু দান করিবেন, নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে যে কাহারও নিকট প্রেরণ করিলে, অতীব কৃতজ্ঞতাব সহিত শ্রান্তি স্বীকার করা হইবে। ইতি সন ১৩২২ বাং, তাবিশ ২১শে জ্যৈষ্ঠ।

১। ডাক্তার জে, এম, দাস, এম, বি, সি এইচ, বিঃ (এডিন) সভাপতি, ২২ নং হাবিসন বোড, কলিকাতা। ২। কবিবাহু চুর্গাদাস ভট্ট, এম, এ, বিভাবহু, ৪৪ নং হাবিসন বোড, কলিকাতা। ৩। অধ্যাপক গঙ্গাচরণ দাস স্তম্ভ, ডেভিড হোয়াব ট্রেনিং কলেজ, কলিকাতা। ৪। শ্রীযুক্ত বাবু পবনচন্দ্র সেন, এম-এ, বি-এল, কার্ধ্যাধ্যক্ষ, ১০ নং নবীন কুতুব লেন, কলিকাতা। ৫। অধ্যাপক বিভূতিভূষণ দত্ত, ডি, এস-সি, ১৫ নং নবীন কুতুব লেন, কলিকাতা। ৬। শ্রীযুক্ত বাবু রমণীবল্লভ সেনগুপ্ত, বিদ্যাবিনোদ, সহকারী কার্ধ্যাধ্যক্ষ, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। ৭। কবিবাহু মণীন্দ্রলাল কাব্যদীর্ঘ, যোগেন্দ্র ঔষধালয়, ছোড়াসাঁকো, আগার চিংপুর বোড, কলিকাতা। ৮। ডাক্তার এস, সি, সেনগুপ্ত, এম, ডি, ৮২২ গ্রে স্ট্রিট, কলিকাতা।

সিভিলসবল গুহা-মন্দিরের চিত্রাবলী

অজ্ঞাটাগুহার চিত্রাবলী বহু বৎসর হইতে জনসমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ছবিগুলির নকলও তাহার সম্বন্ধে বহিঃ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পর মধ্য-ভারতে বামগড় গুহাব ছবি জ্ঞান পড়ে। তাহাবও কিছু কিছু নকল করা হইয়াছে। অতঃপর খালিয়ব



পঞ্চব যুগের গুহা-মন্দিরের প্রাচীর-চিত্র

রাজ্যেব বাবগুহাব চিত্রাবলীব নকল শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার ও শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ কর করেন। কিছু দিন হইল, মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর পুডু-কোটাইর নিকটবর্তী সিভিলসবল নামক স্থানেব মন্দিরে

কতকগুলি চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মন্দির পাহাড়ের পাথর কাটা নিৰ্ম্মিত। ইহাকে গুহা-মন্দির বলা যাইতে পারে। পণ্ডিচেবির ফরাসী অধ্যাপক দুব্রৈ বলেন, তথাকার চিত্রগুলি অজ্ঞাটাগুহা চিত্রাবলী মত প্রকৃিয়া! অমুসাৰে অঙ্কিত হইয়াছিল। মন্দিরের ছাদের ভিতরের পিঠ, স্তম্ভ, প্রাচীরেব ভিতবেব দিক্, প্রভৃতির উপর ছবিগুলি অঙ্কিত। অনেক ছবি নষ্ট হইয়াছে। যেগুলি এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহার মধ্যে একটি কমল-সরোবরের দৃশ্য প্রধান। তাহাতে পদ্মফুল ছাড়া মৎস্ত, হংস, মহিষ, হস্তী ও তিনটি মাছুষেব ছবি আছে। কমল-সরোবরেব চিত্র নানা বর্ণে রঞ্জিত। ফরাসী অধ্যাপক চিত্রকর নহেন বলিয়া তাহাব প্রতিলিপি লইতে পারেন নাই। একটি স্তম্ভেব গাথের এক নৃত্যবতা নারীমূর্তির কিয়দংশেব বেগচিত্র মাত্র তিনি প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। তাহাব নকল আমরা ছাপিলাম।

কংগ্রেসের অনুমোদিত কাজের সংবাদ

বঙ্গের কোন্ জেলায় কত চরকা চলিতেছে, কত হাতের তাঁত চলিতেছে, কত তাঁতে কেবল চরকার সূতা ব্যবহৃত হয়, কত জাতীয় বিজালয় খোলা হইয়াছে ও তাহার ছাত্রসংখ্যা কত, ইত্যাদি সংবাদ বঙ্গের কংগ্রেস কমিটি প্রকাশ করিয়া ভালই কবিত্তেছেন। এই-সব খবর জানিবার জন্ত লোকের কৌতুহল আছে। খবর ভাল হইলে উৎসাহ বাড়ে, মন্দ হইলে নিরুৎসাহ না হইয়া থাকে বেশী চেষ্টা করা কর্তব্য। খবরগুলি যাহাতে নিভুল হয় সেদিকে খুব বেশী নজর রাখা উচিত। বাংলা দেশে টিলক স্ববাস্ত্য ফণে কত টাকা উঠিয়াছিল, সে বিষয়ে যেকোন ক্রেশকর বাদ প্রতিবাদ হইয়াছে, তাহা মনে রাখিয়া সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

বাঁকুড়ার দারিদ্র্য নিবারণের চেষ্টা

বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষে বিপন্ন লোকদের নিমিত্ত সাহায্য ভিক্ষা করিবার জন্ত দেশের লোকদের কাছে বাব বাব উপস্থিত হইতে হইয়াছে। তাহা হইতে সকলে

জ্ঞানেন, ঐ জেলা কিরূপ গরীব। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত লোকদেব অর্থাগমের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। বাঁকুড়া জেলায় অনেক হাজার পুকুর ও বাঁধ আছে। বছ বৎসর পঙ্কোদ্ধার না হওয়ায় তদ্বারা জলকষ্ট নিবারিত হয় না, চাষের সুবিধা হয় না, মাছও পাওয়া যায় না। যৌথ স্বর্ণগ্রহণ-সমিতি গঠন কবিয়া জলাশয়গুলি আবার ব্যবহারের উপযোগী কবিবার চেষ্টা হইতেছে। উন্নত আধুনিক প্রণালীতে চামড়া বস কবিবার প্রক্রিয়া স্থানীয় মুচিদিগকে দেখান হইতেছে। খেজুর রসের মত তাল গাছের বস হইতে গুড় প্রস্তুত কবিবার পরীক্ষা হইতেছে। ঝাড়ুয়ায় তসরের কাপড় আগে খুব হইত, এখনও হয়। বিষ্ণুপুরে গবদের কাপড় আগে হইত, এখনও হয়। গালা বাঁকুড়াব একটি প্রধান পণ্যদ্রব্য। এই-সকলের দিকে এবং তুলার চাষের দিকে দস্ত-মহাশয়ের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বাঁকুড়ার কয়েক জায়গায় উৎকৃষ্ট কাঁসাব বাসন হয়।

সকল জেলায় এইরূপ চেষ্টা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিপ্লব রুশীয় মনস্বীদের জন্ত সাহায্য প্রার্থনা

খবরের কাগজ যাহারা পড়েন, তাঁহারা সকলেই রুশিয়ার ভীষণ দুর্ভিক্ষের কথা জানেন। বিপ্লব লোকদের ছবিও আমরা মডার্ন বিভিন্ন কাগজে ছাপিয়াছিলাম। তথাকার সাধারণ লোকদেব অবস্থা ত খুব শোচনীয়ই হইয়াছে; অধ্যাপক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ললিতকলাবিদ প্রভৃতি মানসিক শ্রমী মনস্বীদের অবস্থা আবশ্য শোচনীয়। কারণ, যখন বিপ্লবে রুশিয়ার সম্রাট সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন, তখন দৈহিক শ্রমজীবীদের অব্যাহত প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। তাহারা মূলধনী এবং মস্তিষ্কজীবী শ্রেণীর লোকদের উচ্ছেদসাধনে বত হয়। তাহাব পব যখন দেখা গেল, যে, দৈহিক শ্রমে সব কাজ হয় না, তখন মস্তিষ্কজীবীদিগকেও অতি সামান্য মজুরীতে শ্রমজীবী-গবর্ণমেন্ট নিযুক্ত কবিয়াছিল। এখন তাঁহাদের সেবক কাজও গিয়াছে। তাঁহাদের কেহ কেহ অনাহারে মারা পড়িয়াছেন। কেহ কেহ সামান্য খাট বিছানা বাসনাদিও বিক্রী কবিয়া কিছু খাণ্ডদ্রব্য সংগ্রহ কবিয়া-

ছিলেন; তাহা নিঃশেষ হওয়ায় অস্থিচর্মসার দেহে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই-সকল মস্তিষ্ক-জীবীদের জন্ত সাহায্য চাহিয়া পৃথিবীর সর্বত্র আবেদন যাইতেছে। আমাদের দেশে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট এই আবেদন অক্ষরভূত বিশ্ববিদ্যালয়ের রুশীয় অধ্যাপক ভিনোগ্রাডফ্ পাঠাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বিনীতভাবে এই কার্যে নিজের অযোগ্যতা জানাইয়া, তাহা সত্ত্বেও দৈনিক কাগজগুলিতে অধ্যাপক ভিনোগ্রাডফের চিঠির সাবাংশ সমেত নিজের আবেদন ছাপাইয়াছেন। তাঁহাব নিকট শাস্তিনিকেতন ডাকঘরের ঠিকানায যিনি যত অর্থ পাঠাইবেন তিনি তাহার প্রাপ্তি স্বীকার কবিয়া যথাস্থানে পাঠাইয়া দিবেন।

“মেরে লড়্কে কী গিরফ্তারী”

বিদেশী কাপড়ের দোকানের সামনে পাহারা দিয়া ক্রযেছুদিগকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত কবিবার চেষ্টার অভিযোগে এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত জাহিরলাল নেহরুর কারাদণ্ডের সংবাদ অল্প পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার মাতা শ্রীমতী স্বরূপবাণী দেবী এই উপলক্ষে দেশবাসীদিগকে অনুরোধ ও মনোবেদনা জানাইয়া হিন্দীতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হাজার হাজার খণ্ড মুদ্রিত ও বিতরিত হইতেছে। তাহাব শীর্ষদেশে লেখা আছে—“মেরে লড়্কে কী গিরফ্তারী” “আমার পুত্রের গ্রেপ্তারী।” যে-সব কাপড় বিক্রেতা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কবিয়া আবাব বিদেশী কাপড়-বেচিতেছিল, তাহাদের এই কুকার্য্যেব জন্তই ত জাহিরলালকে জেলে যাইতে হইয়াছে। জননী স্বরূপবাণী বলিতেছেন :—

“যে-সব ব্যাপারী ভাইদের কাজে আমাব ছেলের জেল হইল, তাঁহাদের এখন কর্তব্য কি? তাঁহাদেরই ত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কবাইবাব জন্ত সে জেলে গেল। আমি আশা কবি, প্রত্যেক ব্যাপারী নিজের নিজের পূর্ব-প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় থাকিবেন, এবং এলাহাবাদের বাজারে আর বিদেশী কাপড় চুকিতে দিবেন না। আমাব এই ভবসা আছে, যে, এলাহাবাদবাসীরা এখন হইতে কেবল শুদ্ধ ধর্মের পাবিবেন, এবং যে বিদেশী কাপড়ের জন্ত আমাদের ছেলেরা জেলে যাইতেছে, তাহা গৃহ হইতে বাহির কবিয়া দিবেন। বিশেষ কবিয়া আমার ভগিনী-দিগের নিকট প্রার্থনা কবি, তাঁহারা যেন বিদেশী কাপড় স্পর্শ করাও পাপ মনে কবেন।”

মাতা স্বরূপবাণী সর্বশেষে বলিতেছেন :—

“জবাহির লাল পিকেটিং কী বজ্জ্ সে জেল্ গয়া। মৈ আণা করতী হ, অপর किसी बज्ज् (कापडुबिक्केता) ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, अब व्यापारी मण्डल की बाय हई तो उसकी हुकान् पव् किंव से पिकेটিंग अवज्ज होगी, अब ईलाहाबादके रहनेवाले अपना कर्ज समझ कर वह पिकेটিंग ज़रूर करेगा। अगव् ज़रूर हई, तो हमारी बहिनी को भी साथ देना आवश्यक है। मै भी चाहती ह कि मुझे उव मेरी बहू की भी पिकेটিंग कवने का अवकाश मिले। जिस कान् को करने के लिये ज़वाहिरलाल जेल गया, वह तो एक मिनट भी नहीं कक् सकता। अगर मर्दों ने उसमें हिम्मत हावे, तो और करेगी। क्या हिन्दुस्तान के जेल सिक् मर्दों ही के लिये है? क्या हमारे देश की औरतो में देश का प्रेम नहीं है?”

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়া চাকরী লাভ

অল্পগ্রহ, এবং মুক্খি ও সুপারিশের জোরে চাকরী লাভ বরাবর রীতি ছিল। মধ্যে কয়েক বৎসর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা বাছাই করিয়া ডেপুটি ও সব-ডেপুটি নিযুক্ত হইত। তাহার পর তাহা উঠিয়া যায়। এখন আবার ডেপুটি সব-ডেপুটি এবং পুলিশ ও আবকারী বিভাগের কতকগুলি চাকরী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা লইয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু সচরাব্রত ও স্বস্থ-দেহ নির্দিষ্টবয়স্ক যে কোন গ্রাজুয়েট পরীক্ষা দিতে পারিবে না। দরখাস্তকারীদের মধ্যে ২৬৩ জন পরীক্ষার্থীকে তাহাদের কলেজের অধ্যক্ষগণ বাছিয়া দিবেন; ১৩ জনকে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মনোনীত করিবেন। এই ২৭৬ জনের নাম সরকার-নিযুক্ত এক কমিটির কাছে যাইবে। কমিটি তাহার মধ্যে ২০০ জনের নাম মনোনীত করিবেন। ইহাবাই পরীক্ষা দিতে পারিবে। স্তরায় পরীক্ষার আগেই দুইবার বাছাই হইবে।

কোন কোন কলেজ কতজন ছেলেকে মনোনীত করিতে পারিবে, তাহার তালিকাটি বেশ উপভোগ্য। কয়েকটি কলেজ ২৪ জন কবিয়া, কয়েকটি ১৩ জন করিয়া, এবং বাকী কয়েকটি ৬ জন করিয়া ছেলেকে মনোনীত করিতে পারিবে। কি কারণে যে কোন কলেজ কোন শ্রেণীতে পড়িল, ঠিক বুঝা যায় না। কোন কলেজে কত ছাত্র পড়ে, কোন কলেজে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় ও লাইব্রেরী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি শিক্ষার সরঞ্জাম কোথায় কিরূপ আছে, এবং কোথা

হইতে কত ছাত্র পাঠ হয়, এই-সব দেখিয়া শ্রেণী বাধা মুক্তিসম্ভব। কিন্তু, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ধরুন, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি। সিটি কলেজ ও বিদ্যাসাগর কলেজ প্রথমশ্রেণীভুক্ত। বঙ্গবাসী কলেজ ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ দ্বিতীয়শ্রেণীভুক্ত। প্রথম শ্রেণীর কলেজগুলি ২৪ জন করিয়া ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি তের জন কবিয়া ছাত্র মনোনীত করিবে। শিক্ষার উৎকর্ষ, ছাত্রসংখ্যা, ইত্যাদিতে প্রথম শ্রেণীর কলেজগুলি কি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি অপেক্ষা দ্বিগুণ উৎকৃষ্ট? দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি (যেমন রঙ্গপুরের কলেজ) তৃতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি (যেমন বাঁকুড়া কলেজ) হইতে কি দ্বিগুণ উৎকৃষ্ট? একেই ত শ্রেণীবিভাগ করাই কঠিন; তাহাব পর, তাহা করিলেও অধিকারের ন্যূনাদিক্য একেবারে আধাআধি না করিয়া অল্পধল করিলেই ঠিক হইত। যেকপ কবা হইয়াছে, তাহাতে সুবিচার হয় নাই।

ছবার ছাকরীর পর প্রতিযোগিতা খাটি-প্রতিযোগিতা নহে। যাহা হউক, খোশামোদ ও মুক্খিব জোরে ধেরকম লোক চাকরী পায়, এরূপ প্রতিযোগিতাতেও তাব চেয়ে যোগ্য লোক পাওয়া যাইবে। বিদেশী গবর্ণমেন্টের পক্ষে ইহা ভাল। কিন্তু দেশের দিকটাও দেখা দরকার।

পুস্তকাজ্জিত-বিদ্যা-সাপেক্ষ চাকরী ও বৃত্তিব দিকে বাঙালীর ঝাঁক বেশী। ভাল ছেলেরা সহজে চাকরী না পাইলে কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের দিকে ক্রমে ক্রমে যাইত;—ইতিমধ্যে অনেকে গিয়াছিলও। কিন্তু এই পরীক্ষা দিবার লোভ সম্মুখে উপস্থিত হওয়ায় অনেক ছেলে এই দিকেই ঝুঁকিবে। ইহা দেশের পক্ষে ভাল নহ। দ্বিতীয় কথা এই, যে, ছুবাব ছাকরীতে সর্বাগ্রে সাহী তেজস্বী দেশভক্ত দেশহিতবত ছেলেদের বাদ পড়িবার সম্ভাবনা বেশী। এই কারণে অনেক ছেলে সার্বজনিক কাজ ও তাহার আলোচনা ও তাহাতে যোগদান হইতে দূরে থাকিয়া গোবেচারী হওয়াটাই সুপছন্দ মনে করিতে পাবে। ইহাও দেশের পক্ষে কল্যাণকর নহে। সরকারী চাকরী যত উচ্চ হউক, তাহাতে

খুব বেশী প্রতিভা মনস্বিতা প্রভৃতির দরকার হয় না ; ডেপুটীগিরি প্রভৃতি সামান্য চাকরীতে ত হয়ই না। অথচ দারিদ্র্যবশতঃ দেশের অনেক প্রতিভাবান যুবক পৰীক্ষা দিবে ; এবং চাকরী পাইয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ সমর্থিত্বী ডিম্মীস্ আদি কবিয়াই অপব্যয় করিতে বাধ্য হইবে। আমাদের দেশে বেকপ বৃদ্ধি ও প্রতিভা লইয়া লোকে সামান্য চাকরী কবে, স্বাধীন কোন দেশে সেকপ কবে কি না সন্দেহ। ইহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। বক্ষ্যমাণ পরীক্ষায় এই দুর্ভাগ্য বাড়িবে।

খেজুর গাছের উঠা-নামা

কাখিব নীহাব কাগজে এই সংবাদ বাহির হইয়াছে যে,

বাহুদেবপুর থানার রাণীবসান গ্রামে বামকৃষ্ণ নায়কের খিড়কীর পুকুরের পাড়ে প্রায় ১০ বৎসর হইল একটি খেজুর গাছ আছে। গাছটি লম্বা ৭ হাত ; কিন্তু গোড়া হইতে তিন হাত উচুতে একটা গাঠের মত আছে এবং ঐ গাঠের উপরের অংশটি একটু হেলান ভাবে আছে। আজ প্রায় মাসখানেক হইল, গাছের ঐ উপরের অংশটি প্রত্যহ বেলা ৯।১০ টার সময় হইতে ক্রমে ক্রমে নীচের দিকে মুড়িয়া আনিয়া পুকুরের ধ্বলের সহিত গাছের কাণ্ডটি সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যায়। সম্ভাব্য পর্ব হইতে উহা ক্রমেই জল হইতে উঠিয়া কষেক ঘণ্টা পবে পুনরায় পূর্বের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। গাছটিতে অনেক ফুল ধবিয়াছে, সেগুলি ক্রমেই শুকাইয়া দাইতেছে। প্রত্যহই গাছটির অবস্থা পূর্বোক্তরূপে পরিবর্তিত হইতেছে। ইহাব কাবণ কি বুঝিতে না পারিয়া লোকে এ সম্বন্ধে নানা গুজব বটাইতেছে। অবশ্য ইহাব মূলে যে কোন বৈজ্ঞানিক কাবণ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ফরিদপুর জেলার একটি গাছ এইরূপ উঠিত নামিত। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু তাহাব বৈজ্ঞানিক কারণ নির্ণয় করেন। তিনি আগাদিগকে ঐ গাছের দুই অবস্থার ফোটোগ্রাফ প্রকাশ করিতে দিয়াছিলেন ও আমবা তাহা ছাপিয়াছিলাম। তাহাব কোন ছাত্র তাহার উদ্ভাবিত যন্ত্র লইয়া গেলে বাণীবসান গ্রামের গাছটিরও উঠা-নামার কারণ নিরূপণ কবিত্তে পারিবেন।

বঙ্গে ডাকাতি

প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বঙ্গে ২০।৩০।৪০।৫০টা ডাকাতির সংবাদ কাগজে বাহির হয়। অনেক ডাকাত বাঙালী নয়, বাংলার বাহির হইতে আসে। তাহারা বাণাদানে অসমর্থ অসহায় সম্প্রদলোকদের যথাসর্ব্বশ্ব হরণ কবে।

কোনও দেশের গবর্ণমেন্ট, খুব বেশী ইচ্ছা থাকিলেও, আত্মরক্ষায় অসমর্থ প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী পাহারা দিতে পারে না। আত্মরক্ষা প্রত্যেকেব কর্তব্য। অহিংসা অতি উচ্চ ধর্ম্ম। কিন্তু বিপন্ন ও লাক্ষিতের রক্ষা এবং আত্মরক্ষাও ত করিতে হইবে? চোখের সম্মুখে বাড়ীর মেয়েদের লাক্ষনা দেখা ও প্রতিকার করিতে না পাবা প্রশংসনীয় নহে। অবশ্য, পবাধীন দেশে আত্মরক্ষার জ্ঞান প্রস্তুত হওয়াও নিরাপদ নহে। অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া দুর্ঘট, ব্যবহার করিতে শেখারও স্বযোগ বেশী নাই। যে-সব যুবক ব্যায়াম করে, লাঠি খেলা জিউজুংহ্ শেখে, তাহাদের উপর কর্তাদের দৃষ্টি পড়ে। তা পড়ুক ; কিন্তু অসহায় হওয়া বড় লজ্জাব বিষয়,—বিপদের কাবণ ত বটেই।

ব্যয়-সংক্ষেপ কমিটি

এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্ট যত কমিশন কমিটি বসাইয়াছেন, তাহাতে প্রত্যাশিত ফল ফলে নাই। অনেকে মনে করেন, যে, তাহাতে সরকারী লোকের সংখ্যাধিক্য ও প্রাধান্য থাকাত্তেই ব্যর্থতা ঘটিয়াছে। ভারত গবর্ণমেন্টের ব্যয়সংক্ষেপ কি প্রকারে হইতে পারে, সে-বিষয়ে পবামর্শ দিবার জন্ত লর্ড ইঞ্চকেপের সভাপতিত্বে যে কমিটি গঠিত হইয়াছে, তাহার সভাপতি ও সভ্য সকলেই বেসরকারী লোক। কেবল বোম্বাইয়ের মিঃ দালাল বিলাতে কিছুকালের জন্ত ভারতসচিবের কৌন্সিলের সভ্য হইয়াছেন। এইজন্ত কেহ কেহ মনে করিতেছেন, যে, হয়ত বা এবাব এই কমিটির দ্বারা কিছু কাজ হইবে। কিন্তু বিশেষ কিছু হইবে বলিয়া আমরা মনে কবি না।

কমিটির ইংবেজ সভ্যরা বণিক ; তাহাবা, ইংবেজেব স্বার্থে যা লাগে, এমন কিছু করিবেন না। সভাপতি পী-এণ্ড-ও কোম্পানীর সভাপতি। এই জাহাজ-কোম্পানী বিলাতী ডাক বহিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে অনেক টাকা পায। দেশী তিনজন সভ্যের বাণিজ্য, এঞ্জিনিয়ারিং ও অর্থনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলেও ভারতীয় শাসন-যন্ত্রের তেমন জ্ঞান নাই। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু নাম অনেক কাগজে করা হইয়াছিল। তাহার

রাষ্ট্রীয় নানা ব্যাপারের জ্ঞান অল্প সব দেশী সভ্যদের চেয়ে বেশী। তাঁহাকে সভ্য কবিলে ভাল হইত।

প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট-সকলেরও ব্যয়সংক্ষেপ আবশ্যক এবং তাহা করা অসাধ্য নহে।

মোট কথা, বিদেশী দ্বাৰা চালিত গবর্ণমেন্টের ব্যয় দেশী শাসনযন্ত্রের ব্যয় অপেক্ষা বেশী হইবেই। অতএব, ব্যয়সংক্ষেপের গোড়ার কথাই এই, যে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কার্য ভারতীয়দের দ্বারাই নির্বাহিত হওয়া চাই। নতুবা মঙ্গল নাই।

বঙ্গে অ-বাঙালী

ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের লোক বাংলাদেশে আসিয়া রোজ্জগার করিয়া খায় ও ধনী হয়; এখন নাকি স্ত্রী ও তির্যতীরাও অনেকে আসিতেছে। যে পরিশ্রম করিতে পারে, যাহার বিষয়বুদ্ধি আছে, যাহার ব্যবসা ও শিল্পের জ্ঞান আছে, সে ত করিয়া খাইবেই এবং ধনীও হইবেই। অস্ত্রের শ্রীবুদ্ধি দেখিয়া হিংসা কবা ও তাহাদের নিন্দা করা ভাল নয়; তাহাতে কোন লাভও নাই। কিন্তু বাঙালী যে নিজের দেশে দরিদ্র, রুগ্ন, জীর্ণ-শীর্ণ ও অমালুষ থাকিতেছে ও হইতেছে, ইহাই দুঃখের বিষয়। সকল শ্রেণীর বাঙালীকেই অবিলাসী, পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু ও উপার্জনক হইতে হইবে। বিলাসিতা ও আরামলোলুপতা ছাড়িতে হইবে। মালুষের দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক যত প্রকার উৎকর্ষ সম্ভব, তাহার প্রত্যেকটির দৃষ্টান্ত বাঙালী জাতির মধ্যে পাওয়া যায়। সুতরাং আমাদের সমুদয় জাতিটিরই যে সর্ববিধ উন্নতি হইতে পারে, এরূপ বিশ্বাস অমূলক নহে। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই অপরকে উপদেশ দিব, নিজে কিছু করিব না, এরূপ হইলে চলিলে না। যিনি যে অবস্থারই লোক হউন, তাঁহাকে নিজের শক্তির ও সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। যিনি গৃহী নহেন, তাঁহাকে সম্ভবতঃ নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়ের সমান মূল্যের কাজ দেখাইতে হইবে। যিনি গৃহী তিনি ত ধর্মতঃ পরিবার প্রতিপালন করিতে, পরিবারস্থ সকলকে সুস্থ সবল রাখিতে, শিক্ষা দিতে, জ্ঞানে ধর্মে উন্নত করিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য। ইহা অর্থব্যয়-সাপেক্ষ। অতএব

অর্থোপার্জন গৃহীর কর্তব্য। অর্থ উপার্জন না করা গৃহীর পক্ষে অধর্ম। কোন প্রকারে জন্তুর মত প্রাণ-ধারণের পক্ষে যথেষ্ট আয় হইলেই তাহাকে যথেষ্ট মনে করা উচিত নয়; কেননা, তাহার দ্বারা সকলের সুস্থ-সবল থাকার ও জ্ঞান-উপার্জনের ব্যয় নির্বাহ হইতে পারে না। নানা প্রকারে দেশেব ও সমাজেব হিতসাধন করিতেও আমরা বাধ্য। কিন্তু তাহাও অর্থব্যয়-সাপেক্ষ।

“আমৃত্যোঃ শ্রিয়মন্নিচ্ছেদ্নৈনাং মন্ত্রেত দুর্লভাম্”।

“আমরণ ধনসম্পত্তিব চেষ্টা কবিবে, তাহা দুর্লভ মনে করিবে না।”

“শ্রাঘপথে থাকিয়া পরিশ্রম করিবে এবং চিরজীবন আপনাকে ধনোপার্জনের অধিকারী জানিবে। পৃথিবী হইতে দারিদ্র্যত্যাগ দূর করা আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের শ্রিয়-কার্য জানিবে।”

“খন্দের পরিধান ও সৎকর্মশীলতা”

চরখায় সূতা কাটিয়া হাতেব তাঁতে তাহা হইতে কাপড় বুনিয়া, দেশেব বস্ত্রের অভাব মোচন যত কবা যায়, ততই মঙ্গল, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। যাহাদের অধিকতর লাভজনক কোন কাজ নাই, এই উপায়ে তাহাদের আয় হইতে পারে। এই আয় যদি খুব কম হয়, তাহা হইলেও ইহা, দুর্ভিক্ষে গবর্ণমেন্ট শ্রমীদিগকে যে মজুরীদেন, তাহা অপেক্ষা কম হইবে না। বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস যাহারা চাষ আদি কাজ করে, ও বাকী সময় বেকার অবস্থায় আলস্তে কাটায়, চরখায় সূতা কাটিলে তাহাদের কিছু আয় হয় এবং আলস্ত নিবারিত হয়। চরখায় সূতা কাটিয়া হাতের তাঁতে কাপড় বুনিয়া দেশেব বস্ত্রাভাব যত দূর করিব, ততই, যে-টাকা বিদেশী সূতা ও কাপড় ক্রয়ে ব্যয়িত হইত, তাহা দেশে গাফিবে। অতএব খন্দব প্রচলন দেশেব ধনের অপচয় নিবারণের একটি উপায়। ভিক্ষাপঞ্জীবী হইলে, পবেব গলগ্রহ হইলে, নৈতিক অধোগতি হয়, আত্ম-মর্যাদা লোপ পায়। আলস্ত স্বয়ং একটা মহৎ দোষ; তন্নির উহা অল্প অনেক দোষের জনক। এইহেতু চরখা ও তাঁতের প্রচলন দ্বাৰা যে পরিমাণে লোকের আলস্ত দূর হইবে, সেই পরিমাণে দেশের নৈতিক উন্নতিও হইবে।

বন্ধাভাব দূরীকরণ বিষয়ে সকল অবস্থার ও সম্প্রদায়ের লোকেরা বিলাসিতা ও আরামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না ববিয়া খুব মোটা খন্দর পরিলে, চরুখা ও তাঁতেব গরীব কর্মীদের প্রতি কাঁথ্যতঃ যে মমতা দেখান হইবে, তাহাতে জাতীয় একতা খুব বাড়িবে। সকল শ্রেণীর লোকে খন্দর পরিলে সকলের পরিচ্ছদ সাদাসিধা হওয়ায় গরীবের ধনীতে একটা পার্থক্য দূর হইয়া ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে পাবে। আমরা স্বাবলম্বী হইতে পারিলে, আমাদের আত্মশক্তিতে যে বিশ্বাস জন্মিবে, একজোটে হইয়া কাজ কবিরাব যে অভ্যাস ও ক্ষমতা জন্মিবে, তদ্বারা এবং পূর্বোক্ত একতা দ্বারা আমাদের স্বাভাৱ্য লাভের সুবিধা হইবে।

এবস্থিধ নানা কারণে আমরা খন্দর উৎপাদন ও পরিধানের পক্ষপাতী। অনেকে বলেন, সূতাৰ কল ও কাপড়ের কলের সহিত চরুখা ও হাতের তাঁত প্রতি-যোগিতায় শেষ পর্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। এত বড় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা না কবিয়া আমরা বলিতে চাই, যে, যতদিন টিকিয়া থাকিতে পাবে, ততদিনই টিকুক না, যে-সব তাঁতি-পরিবার আবহমান কাল হইতে এখন পর্যন্তও হাতের তাঁত চালাইতেছে, তাহাতে ত তাহাদের ও দেশের কোন অমঙ্গল হয় নাই। তাহারা কাপড়ের কলের মজুব হইলে কি তাহাদের ও দেশের অধিকতর কল্যাণ হইত ?

খন্দর প্রচলনের জন্ত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা সর্বথা প্রশংসনীয়। কিন্তু তিনি খন্দর পরিধান ও সংকল্পাভুষ্ঠান সম্বন্ধে দৈনিক বহুমতীতে নিম্নোক্ত যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সাধ দিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন :—

“দেশের সেবা কবিত্তে যে-সকল নবনাবী আত্মনিয়োগ কবিয়াছেন, তাহাদের পবিষেয় খাদি ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পাবে, ইহা কল্পনা করা যায় না। মহারাজার সহিত সর্বোপায়ে মতেষ মিল নাই, এমন লোক দেশের সেবায় অনেক স্থলে নিযুক্ত আছেন। দেশের সেবক সকলেই ননকোঅপাৰেটর না হইতে পাবেন, কিন্তু খাদি না পরিয়াও দেশের সেবা করা যায়, ইহা আমার কাছে আজকাল অসম্ভব মনে হয়। কোনও সেবা-সংগঠানে খাদি পরিধান না করিলে সেবা সম্পূর্ণ হইতে পারে না, ইহাই আমি বুঝি।”

আচার্য্য রায়-মহাশয় যে আদর্শ মনে রাখিয়া লিখিয়া-

ছেন, তাহা আমরা বিস্তৃততরূপে প্রয়োগ করিয়া বলিতে পারি, “যিনি যে-কোন প্রকাৰে মানবের হিতসাধন করিতে চান, তিনি আত্মায়, মনে, দেহে, আহায়ে ও পরিচ্ছদে নিখুঁত হইলে ভাল হয়।” আদর্শটি একরূপ ব্যাপক পরিবার কাৰণ এই, যে, আদর্শ পরিচ্ছদ অপেক্ষা আদর্শ দেহ, এবং আদর্শ দেহ অপেক্ষা আদর্শ আত্মা অধিক আবশ্যক। তদনুসারে অহিংসাবাদী, নিরামিষ-ভোজী, খন্দর-অম্লবাগী কোন ব্যক্তি বলিতে পারেন, “কোনও প্রকার লোকহিত কবিত্তে হইলে কর্মীর শুদ্ধাশ্রা, সচ্চরিত্র, স্বস্থ-সবল-দেহ, নিরামিষ ভোজী, নগ্নপদ কিম্বা কাষ্ঠপাছুকা বা অন্তবিধ উত্তীক্স পাছুকা-পরিহিত, এবং খন্দর-পরিহিত হওয়া উচিত।” কেহ একরূপ কথা বলিলে তাহার সহিত আমরা তর্কবিতর্ক কবিব না। কিন্তু যদি কেহ বলেন, যে, ঠিক একরূপ না হইলে তাহার দ্বারা কোন লোকহিত বা সেবার কাজ হইতে পাবে না, তাহা হইলে আমরা একরূপ উক্তি অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না। কারণ, মৃত লোকহিতসাধকদিগের কথা ছাড়িয়া দিয়াও, আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে, ধর্ম, নীতি, সামাজিক ব্যবস্থা, জ্ঞানবিস্তার, চিকিৎসা, জলদান, অন্নদান, শিল্পবিস্তার, প্রভৃতি নানা লোকহিতসাধনক্ষেত্রের বহু জীবিত কর্মী আত্মা, মন, দেহ, আহাৰ ও পরিচ্ছদ, প্রত্যেক বিষয়ে, উল্লিখিত আদর্শের অনুসরণ না করিলেও তাহাদের দ্বারা কোন-না-কোন প্রকাৰ কল্যাণ সাধিত হইতেছে। খন্দর পরিধান করেন না, এমন অবৈতনিক চিকিৎসকের বোগী নীবাগ হইতেছে, এমন অবৈতনিক শিক্ষকের ছাত্রেরা জ্ঞানলাভ করিতে পারিতেছে, এমন জনহিতৈষীর অর্থে খনিত পুষ্করিণী ও কূপে জল সঞ্চিত হইতেছে ও তাহাতে স্নান ও তাহা পান করিয়া লোকে উপকৃত ও তৃপ্ত হইতেছে ও জমীতে তাহা সেচন করিলে ফসলও হইতেছে, এমন ধর্মোপদেশ্যের উপদেশে লোকে জীবনপথে নূতন আলোক পাইতেছে, এমন গবেষক আবিষ্কার করিতে পারিতেছেন ও সেই আবিষ্কাৰে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার পুষ্ট হইতেছে ও কার্য্যলৌকিক্য বাড়িতেছে, এবং এমন কবি কবিতা লিখিতে পারিতেছেন ও তাহা

পড়িয়া লোকে আনন্দ পাইতেছে ও অল্পপ্রাপিত হইতেছে।

আচার্য্য রায়-মহাশয় “সেবা সম্পূর্ণ” হওয়া কি অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, বলিতে পারি না। যদি ইহার অর্থ এই হয়, যে, সেবার যে কাজটি করা হইতেছে,—যথা চিকিৎসা, জলদান, অন্নদান, বিদ্যাদান, জগত্তের জ্ঞানভাণ্ডার পোষণ, ইত্যাদি,—তাহা সম্পূর্ণ হওয়া, তাহা হইলে আমরা বিশ্বাস করি ও দেখাইয়াছি, যে, খাদি না পরিলেও তাহা হইতে পারে। কিন্তু যদি ইহার অর্থ এই হয়, যে, সেবার কার্য্যবিশেষ দ্বারা সেবিত ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের ঐহিক পারত্রিক আত্মিক মানসিক দৈহিক সর্ববিধ কল্যাণ যুগপৎ সাধিত হইয়া সর্ববিধ অভাব দূরীভূত হইবে, তাহা হইলে, আমাদের ধারণা এই, যে, খাদিপরিহিত বা অন্ত্রবিধ-বস্ত্র-পরিহিত কোন জনসেবক জগতে এপর্য্যন্ত এরূপ “সম্পূর্ণ সেবা” কোন একটি প্রকারেব হিতকার্য্য দ্বারা সাধন করিতে পারেন নাই।

খাদির ব্যবহার আমরা মন বাক্য ও কার্য্য দ্বারা সমর্থন করি, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে অত্যাতিরিক্ত সমর্থন করিতে পারি না। তাহা পরিণামে অনিষ্টকর বলিয়া মনে করি।

অসহযোগে প্রবাসী বাঙালী

প্রবাসী বাঙালীদের খবর দেওয়া “প্রবাসী”র অন্যতম উদ্দেশ্য। উদভূদায়ী একটি সংবাদ দিতেছি।

গবর্ণমেন্ট যখন কংগ্রেসের সম্পর্কে ভলান্টিয়ার বা স্বেচ্ছাসেবক হওয়া আইনবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন, তখন এই ঘোষণা অন্ত্যায় বোধে হাজার হাজার লোক ভলান্টিয়ার-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন এবং কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে প্রবাসী বাঙালীর নামও পাওয়া যায়। “প্রবাসী”র জন্মস্থান এলাহাবাদে ইহাদের জেল হয়, তাহাদের মধ্যে বাঙালী ছিলেন শ্রীমান রণেন্দ্রনাথ বসু। ইনি বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ জেলা-জজ স্বর্গীয় রায়বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানব মহাশয়ের পুত্র। রণেন্দ্রনাথ এলাহাবাদের একজন প্রধান মিউনিসিপ্যাল কমিশনার



রণেন্দ্রনাথ বসু

ছিলেন, জল-সর্ববরাহ বিভাগ (Water Works Department) ইহার অধীন ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভে তিনি হাইকোর্টের ওকালতী ত্যাগ করেন। স্থানীয় কংগ্রেস-কমিটির সম্পাদকরূপে, অন্যান্য কাজের মধ্যে, বৃদ্ধ উৎপাদন ও তাহার ব্যবহারের বিস্তারে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন, এমন সময়ে স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার বিরুদ্ধে গবর্ণমেন্টের ঘোষণাপত্র জারী হইল। তখন স্বেচ্ছাসেবক হইয়া দৃঢ় থাকায় অন্যান্য অসহযোগীর সঙ্গে রণেন্দ্রনাথের জেল হয়। এখন তিনি খালাস পাইয়াছেন। তাহার পিতা জীবিত থাকিলে পুত্রের দৃঢ়তাও সন্দেহ হইতেন।

রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি

গত ২২শে এপ্রিল তারিখের লণ্ডন টাইমসেব শিক্ষা-বিষয়ক প্রাপ্তিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ আছে। তাহার শেষ তিনটি বাক্য উদ্ধৃত কবিত্তেছি।

"A pleasing feature of the Convocation was the first presentation of the gold medal endowed by the Vice-Chancellor to be bestowed biennially upon the individual deemed by the syndicate to be the most eminent for original contribution to letters or science written in the Bengali language. The medal was awarded to Dr. Rabindranath Tagore, the most brilliant Bengali writer of our day. It is an interesting coincidence that the distinguished poet has accepted within the last few weeks the chairmanship of an organization for improving the economic outlook of the educated middle classes in Bengal."—*The Times Educational Supplement*, April 22, 1922, p. 188.

সম্রাটের প্রদত্ত নাইট উপাধি পরিত্যাগ করিবাব পর একজন রাজভৃত্যেব প্রদত্ত একটি পদক অথবা এক রাজভৃত্যের হস্ত হইতে রবীন্দ্রনাথ কেন গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কারণ আমরা অবগত নহি। কিন্তু তাঁহাকে কন্ভোকেঞ্চারে আনিবার জন্য কেন ঝুলাঝুলি হইয়াছিল, তাহা আমরা কতকটা অনুমান করিয়া মর্মান্তিক ভাবে ভাবিতে লিখিয়াছিলাম। এখন অনুমানটা নিতান্ত ভ্রান্ত মনে হইতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবো অধিকতর দায়ী পুরস্কার ও পদক বর্ষে বর্ষে প্রদত্ত হয়, কিন্তু তাহা দেশ-বিদেশে ঘোষিত হয় না; কিন্তু বক্ষ্যমাণ পদকটি রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করায় বিজ্ঞাপন উদ্ভব হইল। ইহাতে তাঁহার গৌরব বাড়িয়াছে কি না, তাহা কাহাবও বিবেচনার বিষয়ীভূত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার খ্যাতি জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া, কিসে তাঁহার গৌরব বাড়ে কমে, তাহা বিবেচনার যোগ্য মনে কবি।

টাইমস্ হইতে উদ্ধৃত শেষ বাক্যটিতে উল্লিখিত কমিটি-টি কি এবং কাহার দ্বারা নিযুক্ত, তাহা আমরা অবগত নহি; স্তরাং সে বিষয়ে কিছু বলিতে পারিলাম না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট্ গ্রাজুয়েট বিভাগ

টাইমসের উল্লিখিত সংখ্যার প্রবন্ধটিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব পোস্ট্ গ্রাজুয়েট বিভাগ সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে :—

".....These truths, we are sure, are not denied by men of position and influence who severely criticize the working of the post-graduate department.....But their complaint is that under his [Sir Asutosh Mookerjee's] dominating influence the Senate has allowed an *imperium in imperio* to be built up, and to be an excessive drain upon the University resources, so that it cripples the ordinary work. They also hold that the aggrandisement of the department has become an obsession with its distinguished head (i. e. Sir Asutosh), and that a Geddes axe should be applied to its administration.

"The farewell speech of Lord Ronaldshay, while studiously judicious in tone, shows that these criticisms are not altogether baseless. He admitted that in a poor country there are obvious limits to the extent to which post-graduate studies can reasonably be financed by public funds.....He suggested for the consideration of the Senate the question whether it is bound to provide post-graduate teaching in every subject in which it is prepared to examine and confer awards, or whether, following the precedent set by such Universities as Oxford in this country, it should not expect students of very special subjects to make their own arrangements for the greater part of their studies." (P. 188)

গৃহশিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ম আছে,

"No person who takes pupils privately in any subject or subjects shall be eligible for appointment as a member of the Board of Examiners in that subject or those subjects, or as a paper-setter or Head Examiner in the Examination for which he has prepared pupils privately."

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ কোন নিয়ম আছে কি? থাকিলে, কেহ তাহা আমাদের কাছে পাঠাইয়া দিলে ছাপিব। পরীক্ষক-সমিতি প্রশ্নকর্তা নির্বাচন ও প্রশ্নপত্র আবশ্যকমত সংশোধন পবিবর্তন করেন। তাঁহারা এই প্রকারে পরীক্ষা আরম্ভ হইবার অনেক পূর্বে প্রশ্নগুলি

জানিতে পারেন। প্রধান পরীক্ষক যে-কোন পরীক্ষার্থীর কাগজ পুনর্বিবেচনা করিয়া নম্বর কম বেশী করিতে পাবেন। পাটনার নিয়মের কাণ্ড এই সব। একরূপ নিয়ম না থাকিলে পরীক্ষার বিন্যস্ততা বন্ধিত হয় না।

লন্ডোনে নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির বৈঠক

অনেক তর্কবিতর্কের পর লন্ডোনে নিখিলভারতীয় কংগ্রেস কমিটি স্থির করিয়াছেন, যে, নিরস্ত্র আইন অমান্য করিবার সম্বন্ধ এখন স্থগিত থাক; আগে দেখা যাক, দেশ ইহার জন্ত প্রস্তুত কি না, এবং অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ, চরকা ও তাঁতের প্রচলন প্রভৃতি কাজ কোথায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাও দেখা যাক। খিলাফত কনফারেন্সের কর্তৃপক্ষও এইরূপ স্থির করিয়াছেন। ইহা সমীচীন হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট সব প্রদেশে যেকরূপ জোরে নিগ্রহনীতি চালাইতেছেন, তাহাতে সাম্প্রতিকভাবে আইন-অমান্য প্রচেষ্টার আবশ্যকতা ও, গবর্ণমেন্টের নীতি ও ব্যবহার আমূল পরিবর্তিত না হইলে, প্রচেষ্টাটির কালক্রমে অবশ্যস্তাবিতা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু একটু অপেক্ষা করা দরকার। যাহারা বীরত্ব ও উদ্বেজনা ভাল বাসেন, তাহারা অপেক্ষা করিতে সম্মত না হইতে পারেন; কিন্তু আইন অমান্য করিবার প্রচেষ্টা আরম্ভ হইলে যে আইন-সম্মত ও বেআইনী নিগ্রহ ও অত্যাচার আরম্ভ হইবে, তাহার প্রতিশোধ না দিয়া সাম্প্রতিকভাবে অক্ষুণ্ণ ও অটল দৃঢ়তার সহিত তাহা সম্বন্ধ করিবার ক্ষমতা জাতির জন্মিয়াছে কি না, ভাল করিয়া বিবেচনা করা উচিত। একরূপ প্রচেষ্টার জন্ত জাতীয় একতাও খুব দরকার; নতুবা এক শ্রেণী দল বা সম্প্রদায়কে অস্ত্র শ্রেণী দল বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহজেই লাগান যাইতে পারিবে। সকল রকমের ভেদ ও ভাগ দূর করা সম্ভবপর নহে; কিন্তু প্রধান প্রধান জনসমষ্টির মধ্যে মনোমালিন্য বিদূরিত হওয়া দরকার। যেমন, হিন্দুসমাজের “অস্পৃশ্য” ও “অনাচরণীয়” জাতিদের অপমানবোধ ও মনের জ্বালা বিনাশ করা দরকার। অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা বোধ করুণ অববিবেচনা ও

নিষ্করতা হইতে জ্ঞাত, তাহা স্পৃশ্য ও আচরণীয়েরা স্থির-চিন্তে ভাবিলেই বুঝিতে পারিবেন। শ্বেতকাষেবা যে আমাদিগকে ঘৃণা কবে, তাহা কেমন মিষ্ট লাগে?

স্বরাজ্যলাভের জন্তই যে অস্পৃশ্যতা দূর করা দরকার, তা নয়। দেশ যদি সম্পূর্ণ স্বাধীন হইত, তাহা হইলেও মনুষ্যত্বের, জাতির, প্রেমের, ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত অস্পৃশ্যতা দূর করা আবশ্যক হইত।

শ্বেত-অশ্বেতের পরস্পর ভালবাসা

বিলাতে “কলিকাতা ভোজ”র বক্তৃতায় লর্ড রোনাল্ডশে বলিয়াছেন, “Non-co-operation mistook hatred of Britain for love of India and acted accordingly.” “সহযোগিতা-বর্জকেরা ব্রিটেনের প্রতি বিদ্বেষকে ভারতের প্রতি প্রেম বলিয়া ভুল করে এবং তদনুসারে কাজ করে।” এবিধ গল্পনা বা তিরস্কার খাইয়া অমনি, “ব্রিটেন, তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি,” সত্য বা মিথ্যা একরূপ কথা বলিতে অপমান বোধ হওয়া স্বাভাবিক।

একটা কথা ইংরেজদের বুঝা উচিত। ছাগলের বাচ্চাকে যে ব্যক্তি ভোজন করে, সে সম্পূর্ণ সত্যবাদিতার সহিত বলিতে পাবে, “হে ছাগশিশু, তোমাকে আমি বড় ভালবাসি।” ছাগলের বাচ্চাও রসিক হইলে সম্পূর্ণ সত্যবাদিতার সহিত স্বীকার করিতে পারে, “ম’রে যাই, বড় ভালবাসি”; কিন্তু সেইরূপ সত্যবাদিতার সহিত সে কখনই বলিতে পারে না, “হে ভোজনার্থী মহাশয়, তোমাকেও আমি বড় ভালবাসি।”

কংগ্রেসের সভাপতিত্ব

আগামী কংগ্রেসে কে সভাপতি হইবেন, তাহার আলোচনা হইতেছে। আলীভাতাদের প্ররোদ্ধা জননীর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহাকে সভানেত্রী করিলে ভালই হয়।

অসহযোগ আন্দোলনের আগেও নারীরা রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় অস্বাভাবিক পরিমাণে বোঝা দিয়াছেন; কিন্তু অসহযোগ প্রচেষ্টা অধিকসম্মত নারীকে কার্যক্ষেত্রে নামাইয়াছে,

এবং তাঁহারা অনেকে উৎসাহ সাহস ও দক্ষতার সহিত অক্লান্তভাবে কাজ করিতেছেন। বার্লিকাসমূহও আলীদেব জননী তাঁহাদের অন্ততম।

বাঙালী লস্করদের প্রশংসা

ইজিপ্ট জাহাজ জলমগ্ন হওয়াব পূর্ব লস্কর অর্থাৎ ভারতীয় নাবিকদেব খুব নিন্দাবাদ আরম্ভ হয়। তাহাদের অপরাধ বোধ হয় এই, যে, সমুদ্রতরঙ্গ বাছিয়া বাছিয়া কেবল কালা আদমিদিকেই কেন গ্রাস করিল না। বাহা ইউক, নিন্দার দ্বিতীয় সর্গে বলা হইল, পূর্ববঙ্গের লস্কররা কোন দোষ করে নাই, বোম্বাই অঞ্চলের নাবিকেরা করিয়া থাকিবে। তৃতীয় সর্গে বলা হইল, যারা দোষ করিয়াছিল, তারা লস্করই নহে, গোয়াব খানসামা সর্দার-খানসামা প্রভৃতি। শেষে বলা হইতেছে, বাঙালী লস্করেরা বরাবর খুব সাহস ধৈর্য দক্ষতা আত্মোৎসর্গ ও মিতাচাবের পরিচয় দিাচ্ছে। যারা গোরা নাবিকদেব সমান কাজ তাদের চেয়ে ঢের কম বেতন লইয়া এবং অপকৃষ্ট ও কম জায়গায় থাকিয়া করে, তাদের নিন্দা ফণকালেব জন্তুও করা ঘোর অকৃতজ্ঞতা।

একজন জাপানীর আত্মবলিদান

রবার্ট্‌স্‌ন স্ট্র সাহেবের লিখিত “জাপানের ভিত্তি” (The Foundation of Japan) নামক পুস্তকে একজন জাপানী কৃষকের আত্মোৎসর্গের একটি আখ্যান আছে। একবার ছুর্ভিক্ষের সময় ঐ চাষার গ্রামে কেবল তাহারই পূরা এক বস্তা ধান ছিল। বস্তাটি খোলাই হয় নাই। তাহারও অন্নকষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সে অপরের মঙ্গলেব জন্তু নিজেকে বলি দিতে গনস্থ করিল। সে ঐ ধান খাইবাব জন্তু ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে নাই, কারণ তাহা হইলে আগামী বীজ বপনের সময় গ্রামে আর বীজ থাকিবে না। ফলে একদিন দেখা গেল, যে, সে তাহার কুটারে ধানের বস্তাব উপর মাথা রাখিয়া অনশনে মরিয়া আছে।

ভারতীয়ের বিলাতী নিন্দা

দি লেডিজ্‌ ওয়ার্ল্ড্‌ নামক একখানা বিলাতী কাগজে ভাবতের খোকাখুদীদের সম্বন্ধে একটা খুব আজগুবি বকমের প্রবন্ধ কয়েক মাস পূর্বে বাহির হয়। তার সবটাই উপভোগ্য নহে; কারণ কতকগুলি মিথ্যা নিন্দাও তাহাতে আছে। গোটা দুই নমুনা দিতেছি। এক জায়গায় বলা হইতেছে—

In after life these sedate infants develop into patriots, who take pot-shots at the hated white man. “ভবিষ্যৎ জীবনে এই শান্ত শিশুরা ‘দেশভক্ত’ হইয়া উঠে এবং বিদ্বেষ-ভাজন শেতকার মানুষদের উপর গুলি ছোঁড়ে।”

যেন ঐটাই আমাদের সব ছেদে দেব নিত্যকর্ম! রামদীন ও মোতী নামক দুই কাল্পনিক ভাইবোনের বিষয় লিখিতে লিখিতে লেখক বলিতেছে :—

The twain seldom have more than two or three little brothers and sisters to help them in the daily task; for father and mother—being wise in their generation—do not burden themselves with larger families than they can afford to bring up. Indeed, to such an extent do they push their economy, that new arrivals sometimes mysteriously disappear within a few minutes of their birth, arrangements being made whereby wild animals and snakes relieve the callous parents of superfluous hostages of fortune. Occasionally the perpetrators of infanticide are brought to book by the limbs of the law. But as the black policeman is ready to compound the gravest felony in return for a rupee, the innocents are slaughtered with impunity.—The Ladies World, November, 1921, p. 129.

তাৎপর্য। “এদেব দুজনকে রোজকাব কাজে সাহায্য কবিবার জন্তু দুতিনটির বেশী ভাইবোন থাকে না; কারণ তাদের বাপ না খুব চালাক, যত বড় পরিবার পালন করিতে পারে, তাব চেয়ে বড় পরিবারের বোকা ভাবা ঘাড়ে রাখে না। বাস্তবিক, তাদের সিতব্যমিটাটার তাবা এত বাড়াবাড়ি করে, যে, নবাপত্ত শিশুবা কখন কখন জন্মেব কয়েক মিনিটেব মধ্যেই অন্তর্হিত হয়;—এরূপ বন্দোবস্ত করা থাকে, যাতে বস্ত্র জন্তু বা সাপে নিম্নম বাপমাাকে তাদের অতিরিক্ত সন্তানের বোকা হইতে মুক্ত করে। কখন কখন শিশুহত্যাকাবীবা আইনবঙ্গকদের চেষ্ঠায় শাস্তি পায়। কিন্তু কালা পাহাবাওয়াল একটা টাকাব বিনিময়ে খুব গুরুতব অপবাণীব সঙ্গেও বকা কবিতে প্রস্তুত বলিয়া, নিদোষ শিশুবা অবাধে হত হয়।”

নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা

উপরে একজন ইংরেজ লেখকের ভারতীয় সমাজের মিথ্যা নিন্দাব নমুনা দিলাম বটে ; কিন্তু তা বলিয়া ইহা বলা চলে না, যে, আমাদের দেশে নিষ্ঠুরতা নাই। রাজপুত্রদের মধ্যে আগে খুব কষ্ট্রাহত্যা প্রচলিত ছিল। এখনও একেবারে নির্মূল হইয়াছে কি না, বলা যায় না। তা ছাড়া, শিশুদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার আছে, এবং বালিকা ও নারীদের প্রতি তদপেক্ষাও নিষ্ঠুর (কখন কখন পৈশাচিক) ব্যবহার আছে। আমরা আগে-ছুই-একবার সরকারী রিপোর্ট হইতে দেখাইয়াছি, যে, আমাদের দেশে শতকরা ষত স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে, আর কোথাও তত করে না। ইহার কারণ নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকদের দুঃখ ও দুঃবস্থা। কিন্তু সেই কারণ দূর করিবার দিকে দৃষ্টি কই? তাহা না করিয়া আমরা করি কি, না, পাশ্চাত্য দেশের নিন্দা রটনা করিতে থাকি, তাহাদের দেশের কুৎসিত বিবাহচ্ছেদ মোকদ্দমার বৃত্তান্ত কাগজে উদ্ধৃত করিতে থাকি। আচ্ছা, ধরা যাক প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, যে, পাশ্চাত্য সমাজ নারকীয়। তাহা হইলেই কি ইহাও প্রমাণ হইয়া যাইবে, যে, আমাদের দেশের অবস্থা স্বর্গীয়?

আমাদের দেশের মেয়েবা কেন আত্মহত্যা করে, তাহাব কারণ স্থির হইল এই, যে, উপন্যাস ও নাটক পড়িলে এই প্রকাব হয়। কাল্পনিক গল্প পড়িলে যদি আত্মহত্যা কবিবার প্রবৃত্তি বাড়িত, তাহা হইলে আমাদের দেশের পুরুষদেব মধ্যে আত্মহত্যাকারী সংখ্যা মেয়েদেব চেয়ে শতকরা অনেক বেশী হইত; কারণ নারী অপেক্ষা লিখনপঠনক্ষম ও উপন্যাসপাঠক পুরুষের সংখ্যা আমাদের দেশে অনেকগুণ বেশী। পাশ্চাত্যদেশ-সকলে আমাদের দেশের চেয়ে অনেক বেশী উপন্যাস ও গল্প প্রকাশিত ও পঠিত হয়। তথায় নারীদের মধ্যে শিক্ষার ও উপন্যাস পাঠের চলন এদেশের চেয়ে ঢের বেশী। অথচ এদেশের মত এত বেশী নারী তথায় আত্মহত্যা কবে না।

কেহ হয়ত বা বলিবেন, ঘবে বসিয়া বসিয়া উপন্যাস পড়িয়া মাথা খারাপ হয়, খোলা বাতাসে চলিয়া ফিরিয়া অঙ্গচালনা না করায় মস্তিষ্কে বিকৃতি জন্মে। যদি তাই

হয়, তাহা হইলে খোলা বাতাসে নড়িবার-চড়িবার বন্দোবস্ত করুন না কেন?

আব-একটি কথা শোনা গিয়াছিল, যে, আমাদের দেশে যে-সব নারী আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহাদের কাহারো কাহারো শবব্যবচ্ছেদে দেখা গিয়াছে, যে, তাহাদের জরায়ুর পীড়া ছিল। ইহা সত্য হইলে, অতঃসন্ধান হওয়া উচিত, যে, কেন এদেশেই নারীদের এত জরায়ুর ব্যাধি হয়।

আমাদের দোষে বাংলা দেশ অভিষপ্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্নেহলতা কেবোনীন তেলে পরণের শাড়ী ভিজাইয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া মরিল; তাহার মড়ক বাংলা দেশেই বিস্তৃত হইল ও আবদ্ধ রহিল। অল্পত দুইএকজন নারী মাত্র এইভাবে আত্মহত্যা করিল। বঙ্গের এই কুপ্রাধান্তের কারণ কি?

বঙ্গে শব্দবাবড়ীতে বধুর উপর অত্যাচাব কি কম হয়? দু-এক স্থলে ব্যাপাব আদালত পর্য্যন্ত গড়াই বলিয়া জানা পড়ে; কিন্তু অজানা তার চেয়ে অনেক বেশী থাকিয়া যায়। আনন্দময়ী নামে এক বালিকাকে তাহার স্বামী শান্তডী ও নন্দ দুহাত লম্বা চোড়া ও উঁচু ঘবে দীর্ঘকাল আবদ্ধ রাখিয়া তপ্ত লোহার ছেঁকা দিবা মৃতপ্রায় করিয়া ফেলিয়াছিল, যে জঘন্য উদ্দেশ্যে, তাহা খবরের কাগজে বাহিব হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য অল্পত বিদ্যমান থাকে না, কিন্তু ছেঁকা দেওয়াটা মোটেই বিরল নহে। প্রহার, অনাহার, গল্পনা, গালাগালি ত আছেই। আমাদের লজ্জা রাখিবার স্থান কোথায়? একেই ত সামাজিক কুপ্রথা ও দারিদ্র্যের জন্ত কষ্টাব অনাদর অপমান বহু পিতৃগৃহে হয়, ততুপরি মেয়ে যদি পরের মেয়ে হইল, যদি সে পুত্রবধূরূপে অপরের ঘরে গেল, অমনি ধরিয়া লইতে হইবে, যে, তাহার হৃদয় হৃদয় নয়, তাহার শরীর শরীর নয়। সে সর্বসংসার পাশাণে গড়া।

পাশ্চাত্য সমাজের যতই দোষ থাক, সেখানে নারী অত্যাচারিত হইলে আদালতে স্বয়ং প্রতিকাবপ্রার্থী হইবাব সাহন শক্তি ও স্বযোগ তাহার আছে। এদেশে কত নারী নরকযজ্ঞনা ভোগ করে; সমাজ তাহাকে রক্ষা কবে না, আদালত পর্য্যন্ত তাহাব অশ্রুট ক্রন্দনধ্বনি

পৌছে না। তাহাদের উপর অত্যাচারী পুরুষ, অত্যাচারী বলিয়া জ্ঞাত হইলেও, আত্মীয়বন্ধুগণে ও সমাজে তাহাদের পাতিত্যা ঘটে না, তাহারা অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় হয় না।

ধিক্ আমাদিগকে !

শিক্ষা দিবা, সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্তিত করিয়া, নারীদিগকে আত্মরক্ষা সমর্থ না করিলে তাহাদের দুর্দশার প্রতিকার হইবে না।

ইতরপ্রাণীদের মধ্যেও অনেক শ্রেষ্ঠজাতীয় জীব আছে, যাহারা দাম্পত্য সম্বন্ধে একনিষ্ঠ। আর আমাদের দেশে বহুরাণীসম্বন্ধিত বহু তথাকথিত দাসী দ্বাৰা পরিবৃত মানবদেহধারী শত শত জন্তু, বাজা মহারাজা নামে অভিহিত এবং লোকসমাজে ও ব্রিটিশ রাজদরবারে সম্মানিত হয়। ‘উচ্চতম’ শ্রেণীর মধ্যে নারীর সম্মান এইরূপ। এমন দেশ অধঃপতিত থাকিবে না ?

কেম্ব্রিজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়

লণ্ডন টাইমস্‌বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্তিস্থিতে (The Times

Educational Supplement, April 22, 1922, page

187) কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে একটি

প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় ১৯২০-২১

সালে উহার আয় ১০১৫৭১ পাউণ্ড ১০ শিলিং ৮ পেনী

অর্থাৎ ১৫২৩৫৭৩ টাকা হইয়াছিল। ব্যয় ইহা অপেক্ষা বেশী

হওয়ায় কৃতি পড়িয়াছিল ৩২৭৫ পাউণ্ড ২ শিলিং ২ পেনী

অর্থাৎ মোটামুটি ৬০০০০ টাকা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২১-২২ সালের আনুমানিক

আয়ব্যয়ের হিসাব বা বজেট হইতে উহাব আয়েরও

একটি আন্দাজ দিতেছি। উহাব প্রধান আয়

পরীক্ষার ফী হইতে। ইহাকে বলে ফী ফণ্ড।

ফী ফণ্ডের সমস্ত আয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

আয়ের সমষ্টিব মধ্যে ধরিলে কলিকাতার আয় কেম্ব্রিজ

অপেক্ষা অনেক লক্ষ টাকা বেশী হয়। এই হেতু আমরা

ফী ফণ্ডের কেবল সেই পরিমাণ টাকা আয়ের মধ্যে

ধরিব, যাহা উহা হইতে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষা-বিভাগকে

দেওয়া হয়। ফী ফণ্ডের কেবল এই টাকাটিই আয়েব মধ্যে

ধরিবাব আর-একটি কারণ আছে। আসবাব যদি ফী

ফণ্ডের সমস্ত টাকা আয়ের মধ্যে ধরিয়া তুলনায় দেখাই,

যে, কেম্ব্রিজ অপেক্ষা কলিকাতার আয় ঢের বেশী,

অমনি উত্তর দেওয়া হইবে, যে, কেম্ব্রিজ অপেক্ষা

কলিকাতার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ঢের বেশী হওয়ায় খরচও

খুব বেশী হয়। সেই জন্ত আমরা ফী ফণ্ড হইতে পোষ্ট-

গ্রাজুয়েট বিভাগে প্রাপ্ত টাকাটাই উহার আয় বলিয়া

ধরিলাম। অবশ্য কেম্ব্রিজের পরীক্ষার্থীদের ফী হইতে প্রাপ্ত

সব টাকাটাই আয় ধরা হইয়াছে। তাহা হইতে পরীক্ষার

ব্যয় বাদ দিলে কেম্ব্রিজের আয়ও কিছু কম দেখান যায়।

কিন্তু তাহা করা হয় নাই।

এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের

আয় ও মোট আয় দেখান যাইতেছে।

পোষ্টগ্রাজুয়েট বিভাগ

(ফী ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত টাকা সমেত)

বিজ্ঞান কলেজ

আইন কলেজ

হার্ডিং হস্টেল

ইন্সপেক্ট্যান্ট আদি ফণ্ড

পাথের ফণ্ড

রামতল্লাহ লাহিড়ী ফেলোশিপ ফণ্ড

ছাত্রাবাস ফণ্ড

রীডারশিপ ফণ্ড

মিষ্টো অধ্যাপক ফণ্ড

হার্ডিং অধ্যাপক ফণ্ড

পঞ্চম জর্জ অধ্যাপক ফণ্ড

কার্মাইকেল অধ্যাপক ফণ্ড

পালিত বিদেশী বৃত্তি ফণ্ড

খয়রা ফণ্ড*

মোট

* বাদ, খয়রা ফণ্ড হইতে বিজ্ঞান

কলেজে প্রদত্ত

৫৬৪৭৪৫

২৮৫১২০

২৪৭০৫৫

৬৪২২৮

৩৩৪২০

৭৬১৭

১২৭১৩

৭৫৪৫৭

১৫০৩৯

১৮২৪৪

১৫২৪২

৩২০৬৫

২৮৩৭৩

১০৬৮০১

২২২৫০

১৫৩৭৫৪৬

১১৫০০

১৫২৬০৪৬

ইহা হইতে দেখা যাইবে, যে, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় (১৫২৩৫৭৩) অপেক্ষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

আয় (১৫২৬০৪৬) কিছু বেশী। পালিত বিদেশী বৃত্তি ফণ্ডের আয়ের ২৬০৬২ টাকা আবার হুদে খাটান হইবে। তাহা বাদ দিলেও কলিকাতার আয় কেম্বিজের কাছাকাছি হয়। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, কেম্বিজের পরীক্ষার্থীদের ফীর সব টাকা উহাব আয়ের মধ্যে ধরা হইয়াছে, কিন্তু কলিকাতার ফীর ফণ্ডের অংশ মাত্র উহার আয়ের মধ্যে ধরা হইয়াছে। কেম্বিজের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হওয়ায় ষাট হাজার টাকা কমতি পড়িয়াছিল। কলিকাতায় শুনিয়াছি পাঁচ লক্ষ টাকা কমতি পড়িয়াছে। বজেট হইতে দেখা যায়, সাড়ে চারি লক্ষের উপর বটে।

কেম্বিজের ১৯১৯-২০ সালে ৪৬৬০ জন ছাত্র পড়াশুনা করিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টগ্রাজুয়েট ও আইন শ্রেণীগুলিতে কত ছাত্র শিক্ষা পায় জানি না। পাঠকেরা মনে রাখিবেন, বিলাতে জীবনধারণের ব্যয় কলিকাতা অপেক্ষা অনেক বেশী। অবশ্য কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের আয় ছাড়া উহাব কলেজগুলির স্বতন্ত্র আয় আছে। তদ্রূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলিরও স্বতন্ত্র আয় আছে। কোন বিশ্ববিদ্যালয়েরই কলেজগুলির আয় আমরা ধরলাম না। যাহা হউক উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় যখন প্রায় সমান সমান, অথচ কলিকাতায় কমতি পড়িয়াছে কেম্বিজ অপেক্ষা প্রায় চারি লক্ষ টাকা বেশী, তখন দেখা যাইতেছে, কেম্বিজ অপেক্ষা কলিকাতা প্রায় চারি লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় করিয়াছে। কেম্বিজ ও কলিকাতা তাহাদের প্রত্যেকের ব্যয়ের বিনিময়ে জগতের জ্ঞানভাণ্ডার বৎসরে কি পরিমাণে বৃদ্ধি করে, কিরূপ দরের কত ছাত্র প্রতি বৎসর সংসারের কার্যক্ষেত্রে প্রেরণ করে, এবং উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি পৃথিবীতে কিরূপ, তাহা ভাবিবার বিষয়। “আমরা বিশ্বের সব বিদ্যা শিখাইতে চাই, বা শিখাইতে প্রস্তুত,” বলিলে চলিবে না, কোন্ কোন্ বিদ্যা কেমন শিখাইতেছেন, তাহাই বিবেচ্য।

কলিকাতা বিদ্যাপীঠ

কলিকাতা বিদ্যাপীঠের মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার

কতকগুলি প্রশ্নপত্র আমরা দেখিয়াছি। অধিকাংশ প্রশ্ন একপ, যে, তাহার দ্বারা পরীক্ষার্থীদের চিন্তা ও বিচারশক্তি পরীক্ষিত হয়, মুখস্থ করিয়া তাহার উত্তর দেওয়া যায় না। সাহিত্যবিষয়ক প্রশ্নগুলির দ্বারা কাব্য-রসগ্রাহিতা পরীক্ষিত হয়। প্রশ্নপত্রে যে-সব বাংলা ও ইংরেজী কবিতা ও গদ্য বাক্যাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার কোন কোনটি হইতে অনেক উপদেশ পাওয়া যায়।

বাংলা প্রশ্নপত্রগুলির আর-একটি বিশেষত্ব এই, যে, উহা কেবল সে-কালের সাহিত্য সম্বন্ধেই নহে, দুই মাস আগে প্রকাশিত “মুক্তধারা” সম্বন্ধেও উহাতে প্রশ্ন আছে।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক কয়েক সপ্তাহের জন্য কলিকাতা মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ার প্রধান বিশিষ্টত্ব এই যে, তিনি বেসরকারী লোক। পরে তিনি বা তাহার মত অন্ত কোন যোগ্য বেসরকারী ব্যক্তি স্থায়ীভাবে চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইলে ভাল হয়। আমরা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও নির্লোভ ভাবে, কেবল সুনিয়ম প্রবর্তনের খাতিরে, এই কথা লিখিতেছি। আমরা যে বাড়ীতে ভাড়া দিয়া বাস করি, তাহার পাশের খোলা কীটাকীর্ণ ও দুর্গন্ধ নর্দমা ও দুটা খোলা পাখানা সংস্কারের জন্য অনেক লেখালেখি এবং স্থায়ী চেয়ারম্যানের স্বচক্ষে দর্শন সত্ত্বেও পাঁচমাসে যাহা হয় নাই, সুরেন্দ্র-বাবুর নিকট হইতে তাহার প্রতিকারের আশায় কিছু লিখিতেছি না। এখানে মশা আগেও খুব ছিল; তাহার বিষয় মিউনিসিপালিটিকে জানাইয়াছিলাম; উহার এক কর্মচারী বলিয়া গিয়াছিলেন, মাণিকতলা মিউনিসিপালিটি হইতে মশারা আসিয়া থাকে। তাহা বা খুব এণ্টারপ্রাইজিং সম্ভেদ নাই। কিন্তু এখন সম্ভার সময় হইতে মশার আধিক্য লেখাপড়া করা কষ্টকর হইয়াছে। অস্থায়ী চেয়ারম্যান মহাশয়ের নিকট হইতে যরজোড়া একটা মশারি পাইবার লোভে তাহাব প্রশংসা করিতেছি না—মশার কামড় একান্ত অসহ্য হইলে ওরূপ একটা মশাখি কোন উপায়ে নিজেই সংগ্রহ করিব। সুরেন্দ্র-

বাবু বেসবকারী লোক ও যোগ্য লোক বলিয়া তাঁহার নিয়োগের অহুমোদন করিলাম, কোন প্রকার লোভের বশবর্তী হইয়া নহে।

বঙ্গীয় নমঃশূদ্র কনফারেন্স

গত ২রা ও ৩রা জ্যৈষ্ঠ পিষোজপুরে বাব রজনীকান্ত দাস বি-এলের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় নমঃশূদ্র কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। বঙ্গের নানা জেলা হইতে প্রায় ৮০০০ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিব বক্তৃতায় অনেক ভাবিবার বিষয় আছে। দুই-চারিটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

আবহমান কাল এক দেখে, এক জল-বাধু মধ্যে বাস কবিয়া নমঃশূদ্র সমাজ তাহাদের উচ্চ শ্রেণীর জাতাপদের নিকট হইতে প্রাণের ভালবাসা, শ্রমচন্দ্রা, অচলা ভক্তি, অক্লান্ত সেবা ইত্যাদি পরিবর্তে যে অবজ্ঞা, নির্ণমতা, অস্পৃহতা, হিংসা, অত্যাচার, অবিচার ইত্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারই কলে ইহাদের কোন কাজেই নমঃশূদ্র সমাজের কোন আস্থা বা বিশ্বাস নাই। ইহা বা নমঃশূদ্র সমাজকে ইহাদের প্রতি অবিশ্বাস কবিবার যথেষ্ট কারণ ও পথ প্রদর্শন করিয়াছে। ইহাদের সঙ্গে অসহযোগ করাকেই নমঃশূদ্র সমাজ তাহাদের সম্মল বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছে। যে কোন কাজে ইহাদের প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হইবে, তাহা হইতেই নমঃশূদ্র সমাজ সম্প্রদেয় সহিত দুবে থাকাকেই নিরাপদ মনে করে। স্মরণীয় কাল হইতে একত্রে বসবাস কবিয়া ইহা বা জানে, গরিমার, শিক্ষা-দীক্ষায় বড় হইয়াছে, কিন্তু অনুরত সমাজসমূহের প্রতি একবার তাকাইয়াও দেখে নাই। পরন্তু বহু শতাব্দীর পরে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সংস্পর্শে নমঃশূদ্র সমাজ আলোব একটু আভাস পাইয়াছে। কে জানে এদেশে ব্রিটিশের পদার্পণ না হইলে নমঃশূদ্র সমাজ আরও কতকাল তাহাদের এই দুর্ভাগ্য বোকা শিবে বসন কবিত? দক্ষিণ ভাবতের অস্পৃহ পাবিয়া জাতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের সঙ্গে এক বাস্তব গমনাগমন করিতেও পারে না। কে জানে অস্পৃহতা ক্রমোন্নতিতে নমঃশূদ্র সমাজও এই উন্নতি লাভ না কবিত? একমাত্র ব্রিটিশের উদারতাব দৃষ্টান্ত ও সাম্যবাদী ছায়াই বাঙ্গলাকে এই অবস্থা হইতে রক্ষা কবিয়াছে।

বক্তার মতের আলোচনা করা আমাদের অভিপ্রায় নহে। কেবল ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে একটা কথা বলিতে চাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট দক্ষিণ ভারতেও আছে, বঙ্গও আছে। যদি “একমাত্র ব্রিটিশের উদারতার দৃষ্টান্ত ও সাম্যবাদী ছায়া বাঙ্গলাকে” ভীষণ অস্পৃহতা ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়াছে, তাহা হইলে দক্ষিণ ভারতেও বিদ্যমান ঐ জিনিস হুটি দক্ষিণ ভারতকে ঐ ব্যাধি হইতে কেন রক্ষা করিতে পারে নাই? ব্রিটিশ জাতি ও গবর্ণমেন্টকে তাহাদের ছায়া প্রশংসা হইতে আমরা

বঞ্চিত করিতে চাই না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বক্তাব ঐতিহাসিক ভ্রম হইয়াছে। তিনি অহুমোদন করিলে দেখিতে পাইবেন, ভারতবর্ষের যে-যে অঞ্চলে মুসলমান প্রভাব বেশী হইয়াছিল, সেই-সেই স্থানে জাতিভেদ ও অস্পৃহতার প্রকোপ অন্তান্ন অঞ্চল অপেক্ষা কমিয়াছিল। বঙ্গ বৈষ্ণব প্রভাব ও তৎপূর্বে বৌদ্ধ প্রভাব এ বিষয়ে কিছু প্রশংসাব দাবী করিতে পারে।

খন্দর ও চরকা সম্বন্ধে বক্তা ঠিক কথা বলিয়াছেন।

অনেকে চরকা ও খন্দরের নামেই চমকিয়া উঠেন, কিন্তু বাস্তবিকই কি চরকা ও খন্দরের মধ্যে ভয়ের কিছু আছে? এদেশেই এক শতাব্দী পূর্বে প্রতি ঘর ঘরেই চরকার প্রচলন ছিল। এইগুলিকে সহযোগিতা-বর্জন আন্দোলনের জন্ম মনে করা ভুল। অসহযোগিতার অর্থ—গবর্ণমেন্টের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করা। চরকা দিয়া হুতা কাটায়া কাপড় প্রস্তুত করার সঙ্গে অসহযোগিতার কোনই সংশ্লিষ্ট নাই। কেবল অসহযোগিতার দ্বারা এই আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র। অসহযোগিতা * * * দেশের দরিদ্রতা ও লোকের কষ্ট কতক পরিমাণে দূরীকরণের মানসে চরকা দিয়া হুতা কাটা ও তাহা হইতে কাপড় তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করার আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছেন। অসহযোগিতা কর্তৃক সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াই কি ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে? আমাদের নিজের পরনোপযোগী কাপড় যদি আমি নিজে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে পারি, তাহাতে কি কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে? অনেক জীলোক ও বিধবা-সমূহ এবং গুরুতর ও অনেক সময় বিনা কাজে প্রমত্ত করিয়া কাটায়া। এই সমস্ত হুতা কাটাতে ব্যয় হইলে কোন আপত্তি থাকিতে পারে কি? দরিদ্র সমাজ নিজেদের কাপড় নিজেরা তৈয়ার করিয়া ব্যবহার কবিলে একদিকে অসমতা দূরীভূত হইবে, অপরদিকে দরিদ্রতার কতক পরিমাণে লাঘব হইবে। নমঃশূদ্র সমাজে চরকার বহল প্রচলন ও তাহা হইতে প্রস্তুত হুতা দ্বারা নিজের কাপড় তৈয়ারি করিয়া ব্যবহার অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। অবশ্য কাপড় কিনিবার আবশ্যক হইলে, বাহা নিজেদের অর্থের বলে ফুলায় তাহাই ক্রয় করিতে হইবে। কিন্তু বিলাসিতা বর্জন এক কপর্দক খরচ করাও নমঃশূদ্র সমাজের অনুচিত, কারণ আজ ভারত যে বিলাসিতা বর্জনের জন্ত কঠিন চেষ্টা করিতেছে, আমাদেরও সেই পাপ হইতে দূরে থাকিতে হইবে।

কনফারেন্সের অনেকগুলি প্রস্তাবের, যেমন সামাজিক প্রস্তাবগুলির, সম্পূর্ণ সমর্থন করা যায়। কনফারেন্স যে-প্রস্তাবে, গবর্ণমেন্টকে জমীর চাষী প্রজাকে তাহার স্থায়ী মালিক বলিয়া স্বীকার করিতে এবং তাহা দান-বিক্রয়াদি করিতে ও বিনা বাধায় তাহাতে কুপ পুষ্করিণী খনন করিতে গাছ বাটিতে গৃহ নির্মাণ করিতে অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে অছরোধ করিয়াছেন, আমরা তাহার সমর্থন কবি।

মূলশীপেঠায় সত্যাগ্রহ ।

তাতা কোম্পানী মহাবাষ্ট্রে জলস্রোতের শক্তিতে তাদ্ভিত শক্তি উৎপাদন করিবার নিমিত্ত এক বৃহৎ কারখানা স্থাপন করিতে চান। এইজন্ত তাঁহা বা মূলশীপেঠায় গবর্ণমেন্টের সাহায্যে বহুবিস্তৃত স্থান ক্রয় করিয়াছেন। উহাতে ৫৪টি গ্রাম আছে; অধিবাসীব সংখ্যা ১২০০০। তাহা বা ছত্রপতি শিবাজীর বিখ্যাত মাঝা সৈনিকদের বংশধর। তাহারা পূর্বপুরুষদের গৌরবশ্রুতিমণ্ডিত গ্রামগুলি ছাড়িয়া যাইতে নারাজ। তাহারা সত্যাগ্রহ করিয়াছে। নিখিল-মহারাষ্ট্র কনফারেন্স তাহাদের কার্যের সমর্থন করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, ধনাগম যাহার উদ্দেশ্য এরূপ কোন ব্যক্তির বা কোম্পানীর কোন কাজেব জন্ত আইনের জোবে মালিকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন জমী গবর্ণমেন্ট কিনিয়া দিলে তাহা ভ্রাসঙ্গত হয় না।

শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজেব উৎসাহী প্রচারক শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বাল্যকালে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে সামান্ত লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন।

তাঁহার দ্বিতীয় সহোদর পরলোকগত শ্রীযুক্ত হরিমোহন ঘোষাল ব্রাহ্ম ধর্ম অবলম্বন করিবার পর তিনিও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তাহার পর তিনি জ্ঞান উপার্জনে মনোনিবেশ করেন। অল্পবাদের সাহায্যে তিনি প্রধান প্রধান হিন্দুশাস্ত্র-সমুদয় অধ্যয়ন করেন। বাংলা উৎকৃষ্ট সমুদয় পুস্তক ও মাসিক পত্র পড়িয়া তিনি এরূপ বিস্তৃত জ্ঞান লাভ করেন, যে, শুধু বাংলাব সাহায্যে এত জ্ঞান লাভ করা যায় লোকে তাহা সহজে বিশ্বাস করিতে পারিবে না। পুস্তক পড়িয়া ও জ্ঞানী লোকদের সহিত আলোচনা করিয়া তিনি কঠিন দার্শনিক বিষয়-সকলও বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি পবিত্র বয়সে চলনসই ইংরেজী শিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানের প্রধান ও উৎকৃষ্ট অংশ বাংলাভাষার সাহায্যেই লক্ষ। তিনি কয়েকটি পুস্তক ও অনেকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। সংগীতবিদ্যায় তাঁহার অধিকার ছিল। তিনি প্রচার কার্যে পরম উৎসাহী ছিলেন, এবং তদুপলক্ষে বাংলা ও আসামের সমুদয় অঞ্চলে এবং উত্তর ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। দেহমনস্বাদ্যার সমগ্রসীদুত উৎকর্ষ সাধনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন, এবং দৈহিক উৎকর্ষ সাধন তাঁহার বহুতর অন্ততম বিষয় ছিল। তিনি কল্যাণ ও পুত্রদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

চিত্রপরিচয়

কৌতুহল

অন্তঃপুরিকা বধু বাতায়ন-বলভিতে এক-বাটি খাবার রাখিয়া গাছের পাখীকে প্রলুব্ধ করিয়া থাকিয়া কাছে আনিতে পাবে কি না তাহাই কৌতুহলী হইয়া দেখিতেছে।

জলসত্র

গ্রীষ্মকালে যখন জলশয় শুষ্ক হইয়া যায়, তখন পথিকদের তৃষ্ণা মোচনৈব জল পথের ধারে ছায়াশীতল গাছের তলে কোনো কোনো পুণ্যকামী জলসত্র দিয়া থাকেন; শ্রান্ত পথিককে চারখানা বাতাসা বা চারটি শুড়ছোলা খাইতে দিয়া জল দিবার ব্যবস্থা করা হয়। জলেব ঘটা কাহাকেও ছুঁইতে দেওয়া হয় না; জল হাতে ঢালিয়া দেওয়া হয়, পিপাসার্ত্ত অঞ্জলি ভরিয়া জলপান করে। কিন্তু মুখের সঙ্গে ঘটার সঙ্গে জলধারার সংস্পর্শে সংযোগ ঘটিলেও পাছে ঘটাতে ছুত লাগে, এই ভয়ে একটা

বাঁশের চোড়া মধ্যস্থকপে টাঙানো হয়; চোড়াব এক প্রান্তে ঘটার জল ঢালা হয় ও অত্র প্রান্তের নীচে অঞ্জলি পাতিয়া ছত্রিশ জাতের লোক জাত ও ছুত বাঁচাইয়া জল পান করে। এই ছবিখানিতে বালিকা জলদাত্রী সাক্ষাৎ করুণা-রূপিণী তৃপ্তি-মুগ্ধি; পত্রল ঝাঁপালো গাছটি শান্ত শীতল আশ্রয়ের প্রতিকৃপ।

দর্গা হইতে

ফার্সী দর্-গাহ্ মানে মসজিদ, ধর্মমন্দির, উপাসনা-গৃহ। উপাসনা-মন্দিরের সম্মুখে স্নেহশব্দাতুর মাতারা অহুস্ সন্তানদের লইয়া উপস্থিত থাকেন, সদ্য-ভগবৎপূজা-সমাপ্ত পুণ্যাত্রাদের আশীর্বাদ কুড়াইয়া সন্তানের সকল অমঙ্গল দূর করিবেন এই আকাঙ্ক্ষায়। এই পঞ্জাবী মহিলাটি সন্তানের জন্ত ধর্মপরাণ ধর্মপ্রেমিকদের আশীর্বাদ আহবণ করিয়া মন্দির হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন।

চিত্রল



“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

২২শ ভাগ

১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩২৯

৪র্থ সংখ্যা

ভোগের অনাচার

এক-ফসলের দেশে লোকে কর্ম্মভাবে বসিয়া থাকে। কিন্তু যেখানে চাষারা সমস্ত বৎসর ধরিয়াই কাজ পায় সেখানেও তাহারা মহাজনের ঋণ শোধ কবিয়া উঠিতে পাবে না। শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতবর্ষেই এমনি। এই যে মাড়োয়াড়ী বণিক কলিকাতার ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিশাল ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, যাহাদের ব্যবসা স্বদূর মফঃস্বলেও চলিতেছে, রেল ষ্টেশনের ধারে যাহাদের কুশী করোগেটের গুদাম ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠার পরিচয় দিতেছে, তাহাদেরও দেশ রাজপুতানা মাড়বাড়ে গেলে দেখা যাইবে যে সেখানকার জনসাধারণও দারিদ্র্য-দুঃখে পীড়িত।

ভাদ্র মাসের শেষ ভাগে ঋাহারা বি এন আর রেল-পথে পূর্বে উপকূল দিয়া গিয়াছেন তাঁহারা হই দেখিয়াছেন কলিকাতার রেল ষ্টেশনের সীমা পার হইলেই চারিদিক সবুজ শস্তে ভরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রেন দ্রুত চলিতেছে, বাংলাব সমতল ছাড়িয়া উড়িষ্যার বন ও পাহাড় দেখা দিল, কিন্তু পাহাড়ের কোলে, চিঙ্কার লবণ-জলের ধারে, গজামেব প্রান্তরে কোথাও সবুজের বিচ্ছেদ নাই। রাত্রি গেল। ইতিমধ্যে ট্রেন কত পথ অতিক্রম করিয়াছে; সকালে উঠিয়াও দেখি সবুজ শস্যের নিববচ্ছিন্ন পূর্ণতা। তারপর মাজাজের দিকে শস্যের রকম বদলাইয়া কোথাও

বা হলুদেব ছাপ, কোথাও বা পাকা শস্যের সোনার রং, আবার কোথাও বা চষা ক্ষেতের ফিকা রং। সবুজের নেশায় যখন পাইয়া বসিয়াছে, পূর্ণতার আনন্দে যখন মন ভরা, তখন শস্তের পূর্ণতার পাশেই উৎপাদকের রিক্ততার কথা মনে পড়িল। চোখ মেলিয়াও দেখি তাহাই। মাঠে মাঠে লোক ভরা। কোথাও বা নিড়াইবার সময় বলিয়া সমস্ত গ্রাম বাহিব হইয়া পড়িয়াছে; ছেলে মেয়ে স্ত্রী পুরুষ এমন কি কুজ-দেহ বৃদ্ধ পর্য্যন্ত। গায়ে কাপড় নাই, পরণে নেংটি, কালো কালো মুক্তিগুলি মানুষ বলিয়া চেনা যায় কি না-যায! কেবল মেয়েদের শাড়ীতে রৌদ্র পড়িয়া দূর হইতে মালুষের দল বলিয়া বোধ হইতেছিল। কোথাও বা লাদল দেওয়া হইতেছে, গরুগুলির চেহারা মালুষের অপেক্ষা কতক ভাল। শীর্ণ লোকগুলি হয়ত নিজেরা না খাইয়াও গরুগুলিকে সবল রাখিয়াছে; না হইলে যে, যাহা-কিছু খাইতে পায় তাহাও বন্ধ হইবে। জলভরা গোদাবরী দুই পার সিক্ত করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। তুতিকোরিনের খাল বড় বড় প্রান্তর জল দিয়া উর্বর করিয়াছে। ফসলে ভরা ক্ষেত। কিন্তু লোকের চেহারা ঐ এক—গায়ে কাপড় নাই, পেটে ভাত নাই। এ কি বিপুল পরিহাস! বাংলায় চাষার দুর্দশা, মাজাজে বুঝি আরো বেশী। এই যে ফসল

হইয়াছে ইহাতে উহাদের ভাত জুটিবে না, কাপড় জুটিবে না, ইহা বা সকলে স্বপ্নে জড়িত। ফসল সংগ্রহ করিবার সময় হইলেই সাউকার আসিয়া মাঠে দাঁড়াইবে। অসমান বিনিময়ে সে তাহার প্রাপ্য অর্থের মূল্য শস্ত লইয়া ধাইবে। যে সামান্ত শস্ত চাষার ঘরে থাকিবে তাহাতে বীজ রাখিবে, দুই বেলা বা এক বেলা অন্নের সংস্থান করিবে ও কোনও রকমে লজ্জা নিবারণ করিবে, এমন দুরাশা কোনও চাষার নাই। যে ফসল চাষার স্বপ্ন শোধ করিয়া ঘরে আইসে তাহা দুই দিনেই ফুরাইয়া যায়। তারপর আবাব মহাজনেব দ্বারস্থ হইতে হয়। ইহারা নেশা করে না, জমি অনাবাদী ফেলিয়া রাখে না, বিলাতী বিলাসের জিনিষ একপ্রকার কেনেই না বলিলেই হয়, তথাপি উহাদের অবস্থা এত হীন। সেখানে এতটুকু জমি আছে, নালার ধার, আনাচ, কানাচ, কোথাও বাদ নাই, শস্ত শস্ত। ভাবিতেছিলাম যদি চেষ্টা করিয়া, কারখানায় যেন করিয়া কাজ করে তেমনি করিয়া যদি হিসাব রাখিয়া সুপার-ভাইজার রাখিয়া এই শস্ত উৎপাদন করিতে হইত! কি প্রচণ্ড আশ্বাসে কত কম ফল হইত! চাষার কাজ দেখিয়া মনে হইতেছিল যে লোকগুলি যেন একেবারে মরিয়া হইয়া শেষ ও একমাত্র অবলম্বন বলিয়া চাষ আবাদ করিয়া থাকে। যদি কোনও একজন বা এক দল মালিকের জন্ত লোকে চাষ আবাদ করিত, তবে এ জমি ভাল নয়, সে জমিতে সম্ব-মত বীজ পাই নাই, ওখানটাতে লাঙ্গল চলে না, এমনি করিয়া হয়ত অর্ধেক জমি বাদ যাইত। কিন্তু তাহাও দেখিতে পাওয়া যায় না। একটা নিষ্ঠার ভাব সমস্ত ক্ষেতের কাজেই স্পষ্ট হইয়া উঠে। আমি কেবলি ভাবি যাহারা এমন কবিয়া ফসল তুলিয়াছে, যাহারা নেশা করে না, আলস্বে সময় কাটাব না, তাহাদেরও কেন দুই বেলা খাওয়া জুটিবে না; তাহারা কেন খাইতে পরিতে পাইবে না?

এই কেনর জবাব অতি নির্দাক্ষণ। সমস্ত উদ্ধতন সমাজ একযোগে ইহাদিগকে ইহাদের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। দশজন শতজন শ্রম করিয়া বাহা উপার্জন করিবে,—একজন জমিদার, উকীল, ডাক্তার, বা ব্যবসাদার বড় লোক হইয়া তাহার উৎপন্ন এবং শ্রমলব্ধ

ফলে ভোগলালসা তৃপ্ত করিবে। যখন মজুরের অভাব, চাহিবারাত্র পাওয়া দুষ্কর, তখনও দিন-মজুরকে দশ আনা মজুরী দিই। একজনর উপর চার-পাঁচজনর অন্ন জোগাইবার ভার, অস্থখ আছে, বৃষ্টি বাদল আছে, অজন্মা আছে। এমনি করিয়াই না গড়পড়তা ভারতবাসীর দৈনিক একআনা মাত্র আয় হিসাবে দাঁড়াই।

তাহার ফল কি তাহা চক্ষুর সম্মুখেই দেখিতেছি। বয়স্ক নরনারী অর্ধজন্য অবস্থায় থাকে, শিশুগুলি অধিক সংখ্যায় মাঝা মাঝ। তাহা বা অন্ন-বস্ত্র-অর্থ-হীন। কিন্তু প্রত্যেক গাছঘেরই ত বাঁচিয়া থাকিবার একটা সামাজিক দাবী আছে। সমাজে যখন শ্রমজীবীর আবশ্যক, তখন তাহাকে ও তাহার উপর নির্ভবশীল স্ত্রী-পুত্রকে বাঁচাইয়া রাখা সমাজের কর্তব্য। জনসাধারণ যতই অশিক্ষিত ও অকর্ম্ম হউক, মোটের উপর যে জীবিকা অর্জনের যথেষ্ট চেষ্টা আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু এই অবস্থাব প্রতিকার কি? প্রতিকার ব্যবসা বাণিজ্য নহে। বড় বড় কলকারখানা করিয়া সম্ভাব্য পণ্য উৎপন্ন করিলে ইহার প্রতিকার হইবে না। প্রতিকার কেবল মাত্র শিক্ষায়ও নহে। শিক্ষা তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থা আবেগে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারে এই পর্যন্ত, কিন্তু খাটিবার ও খাটাইবার পরস্পর অবস্থা-গত সম্পর্ক পরিবর্তন করিতে পারে না। শিক্ষা সকলের পাওয়া আবশ্যক, তাহাতে পরোক্ষভাবে জীবিকা-অর্জন-পটু জন্মিতে পারে। কিন্তু যে পর্যন্ত জ্ঞান থাকিলে আত্মরক্ষার কথা ভাবিতে পারে, সেটুকু শিক্ষা আমাদের জনসাধারণের সংস্কারগত ভাবে আছে। তারপর লোকসংখ্যার আধিক্যও এই দুর্দশার হেতু নহে। যত লোক ভাবতবর্ষে আছে, তাহাদের আবশ্যক পরিমাণ শস্ত উৎপন্ন হয়, অনেকটা বিদেশেও চলিয়া যায়। Supply and demand অর্থাৎ যোগান ও চাহিদার যে অমোঘ যুক্তি সচরাচর শোনা যায় তাহাও এ হীনতার হেতু নহে। কলকারখানা, চা-বাগান ও কয়লার খনিতে শ্রমিকের চাহিদা খুবই আছে। তবুও তাহাদের অবস্থার হীনতা অপরিণীম। জনসাধারণের দুর্দশা যদি বাণিজ্য-ব্যবসায়ের অভাবে না হইয়া থাকে, যদি অশিক্ষাও ইহার মূলে নাই, যদি

লোকাধিক্য ও চাহিদার অভাবও ইহার হেতু না হয়, তবে তা কি? কোন্ সে দানব আমাদের সাধাবর্ণকে পীড়িত করিয়া এমনি প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে যে তাহাকে সহজে ধরিতেও জানি না?

আমার মনে হয় এই ছদ্মবেশী দানব struggle for existence—জীবন-সংগ্রাম। ভোগলিপ্সার ইহা নামান্তর মাত্র। জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমের জয় হইয়া থাকে। যোগ্যতমের জয়ই যে চরম লাভ তাহা আমরা জানিতাম না, আব এই জয়ই যে শেষ পর্যন্ত জয় তাহাও আমাদের প্রাচ্য সভ্যতা বলে না। বিলাতী সভ্যতার শক্তির মদ যখন আমাদের যুক্তিক ঘোলাইয়া দিয়াছে, সেই সময় হইতে এই নৃশংস মন্ত্রগুলি এদেশে উচ্চারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই কথাগুলিতে আমরা এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে উহার কদর্যতা অল্পভব করাও মত শক্তিও আমাদের নাই। যখন এই ধবণেব চলিত কথা লোকের মনকে পক্ষ করিয়া হীন কবিতা থাকে, তখন তাহার প্রতিবাদও অসহনীয় হয়। শক্তিবাদী বলিবেন struggle for existence জীবনসংগ্রাম বৈজ্ঞানিক সত্যবাদ। গাছের নীচে যদি ২৫টা চারা হয়, তবে দুই চারিটি জোরাল চারা বাকীগুলিকে আবছায়ায় আঁতায় ফেলিয়া অপুষ্ট করিয়া স্বচ্ছন্দে বড় হয়। তারপর মাইক্রো-স্কোপে এক বিন্দু জলকণার মধ্যে দেখা যায় কত শত সহস্র প্রাণী একে অন্তরে গেলিয়া মরিয়া নিজে বাঁচিতে চেষ্টা করিতেছে। বাহাবা যোগ্যতম তাহারাই বাঁচিতেছে, বাকীগুলি মরিতেছে। এ ক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমের জয় একবারে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতেছে। ইহার উপর আর যুক্তিপ্ৰয়োগ অসম্ভব। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই এই বড় বড় বিলাতী বৈজ্ঞানিকবাদের নৃশংসতা ধরা পড়ে। শক্তিবাদী বলিবেন মজুব দশ আনার পাই বলিয়াই রোজ দশ আনা দিয়া থাকি, তাহাতে যদি তাহার পরিবারস্থ লোক খাইতে না পায় তবে সে ভাবনা নিষোক্তার নহে। মজুবের যদি সাধ্য থাকে তবে বেশী আদায় করিয়া লউক—যদি আদায় করিতে পাবে ভাল কিন্তু নিষোক্তা বিধিমত বাধা দিবে, আর

যদি চেষ্টা করিয়া দলবদ্ধ হইয়াও আদায় করিতে না পাবে তবে নিষোক্তা এবং শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত নিষোক্তাব সমাজ পরাজিত শত্রুর সাজা দিবে। কিন্তু খাস বিলাতেও ইহার কদর্যতা ও অমাহুষিকতা উপলব্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মানুষ ত আর গাছপালা বা জলবিন্দু সহস্র প্রাণীর একটি নয়। মানুষের বুদ্ধি আছে, বিবেক আছে, সমাজ আছে, মানুষ বলিবে বাঁচাও, দশজনকে বাঁচিতে দাও। মানুষ বলিবে অহিংসা পবমধর্ম। মানুষ বলিবে সমাজ প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি তাহাই না হয় তবে সম্ভান পালনের বিড়ম্বনা লই কেন? মৎস্তের মত, বিড়ালের মত, সরীসৃপের মত আত্মজকে হত্যা করি না কেন? অসহায় শিশু ত যোগ্যতমের বিপরীত। আর যত জীব আছে তাদের তুলনায় মানুষের শিশু ত সর্বাপেক্ষা অসহায়। এমন বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া আগুনে দেকিয়া কাপড়ে ঢাকিয়া কাহাকেও বড় করিতে হয় না। এমন অসহায় জীবকে মারিয়া না ফেলিয়া বাঁচাইয়া রাখিবার জন্ত চেষ্টা কোথায় হইতে আসিতেছে? ইহার কাণে মানুষের সমাজ বিলাতী নৃশংসবাদ অপেক্ষা অনেক পুর্বাতন। যে প্রেম সম্ভানে প্রকাশ হয় তাহাই দশে বিতরণের জন্ত মানুষের অন্তরাঙ্গা চিরকাল আকাজ্জা করিয়া আসিতেছে। তাহাকে বিলাতী নৃশংসতায় আচ্ছন্ন করিতে পারে না।

সামাজিক জীবনে এই নৃশংসবাদ আমাদেরকে কেমন কঠিন করিয়াছে তাহা যদিও সর্বত্র অল্পভূত হইতেছে এবং উহাই স্বাভাবিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি, তথাপি দুই এক জায়গায় নিতান্ত নিম্নিত সমাজের নিকটেই উহা বিসদৃশ বলিয়া ধরা পড়ে। যুদ্ধের সময় কাঁচা পাটের রপ্তানি বন্ধ হয়। চুঁ বা থলে বিক্রয়ের অল্পমতি সর্বকাব দিয়াছিলেন। যুদ্ধের জন্ত পাটের বস্তার চাহিদা খুব বাড়িয়া গিয়াছিল, তা ছাড়া সাধারণ ব্যবহারের জন্যও পাটের বস্তা ভারতবর্ষ হইতে মিত্রশক্তির জন্ত যোগান হয়। যুদ্ধের মাল যোগাইয়া কিছু লাভ করাও কথা। কিন্তু এই ব্যাপারে বাংলাদেশের চাষাদের সর্বনাশ হইয়া গেল। তাহারা দারিদ্র্য ও তজ্জনিত অনাহারে কদাহাবে রোগগ্রস্ত হইয়া দলে দলে মরিতে লাগিল। পাটের

দাম কমিয়া যাওয়ায় কত যে চাষা মবিষাছে তাহাব ঠিক নাই। আর সেই পাটের কাজে কলঙালাবা একশত টাকা খাটাইয়া এক বছবে ছয়শত টাকা লাভ করিয়াছে। ইহা যে সম্ভবপর হইল, যদি পাটের কলগুলি বিদেশী লোকের হাতে না থাকিয়া দেশী লোকের হাতে থাকিত তবেই কি ইহার কিছু ব্যতিক্রম আশা করা যাইত? সুযোগ পাইলে টাকা রোজগার কবিবার পথ, অতিবিক্ত লাভ করিবার পথ, দেশী বিদেশী কেহই ছাড়িত না। এই যে ব্যাপারটি ঘটিল, পাটের দব তিনটাকা মণ মাত্র দাঁড়াইল, একমণ পাট বিক্রয় কবিয়া আধমণ ধানও পাওয়া গেল না, আর তাব সঙ্গে-সঙ্গেই পাট-কলে একশত টাকায় ছয়শত টাকা মুনাফা দেওয়া হইল,—এই অবস্থা কোন্ শিক্ষায় অসম্ভব হইত? প্রাথমিক শিক্ষা চাষারা পাইলেও এই ঘটনা ঘটিত। মাড়বাড়ী মধ্যবর্তী না থাকিয়া সবটা হাত-ফেরতের কাজ হাটখোলার বাজালী মহাজনদের হাতে থাকিলেও এই দুর্ঘটনা বন্ধ হইত না। কুটীর-শিল্পের প্রচলন থাকিলেও এই দুর্দশার নিবারণ হইত না, কেননা পাটে নিযুক্ত শ্রমেরই মূল্য পাওয়া যায় নাই। সাধাবণের শিক্ষা, কুটীর-শিল্প প্রতিষ্ঠা কিছুতেই এই ব্যাপারের সংঘটন বন্ধ কবিতো পারিত না। ইহা যুদ্ধেরও ফল নহে, কেননা পাটের কাজেই আবার একদল লোক লক্ষ লক্ষ টাকা জমায়েৎ করিয়াছিলেন। পাটের ক্ষেতে কাজ করিয়া, কোমর অবধি পচাজলে ডুবাওয়া পাট ধুইয়া, রোঁদ্রে পুড়িয়া পাট শুধাইয়া যে হতভাগ্য পাট ব্যবহারোপযোগী করিল, সে অন্নভাবে, দারিদ্র্যে, সংক্রামক ব্যাধিতে মবিল; আর সেই পাটে গুটিকতক মাত্র লোক, তাদের দেশ যেখানেই হউক, চামডাব রং সাদা বা কালোই হউক, চাষার অনাহার ও অকাল-মৃত্যুর হেতুভূত পাটে লক্ষ লক্ষ টাকা করিল। Supply and demand, “চাহিদা ও সরবরাহের” মত্রে সমস্ত জিজ্ঞাসা মুখ হইয়া রহিলেন। কেহই ভেদ করিলেন না যে চাষাদেরও বাঁচিবার অধিকার আছে। বাঁচিবার অধিকার Right to live এক দিন সমাজকে মানিতেই হইবে। যে সমাজ মানব-ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ তুলিয়া আছে, সেই অনিচ্ছুক ও স্বার্থান্ধ সমাজেবও

একদিন প্রেমের শাস্ত্র মত্রে নয় ত ধ্বংসের গর্জনে স্বীকার করিতেই হইবে যে চাষাদেরও বাঁচিবার অধিকার আছে।

যদি চাষা সজ্জবদ্ধ হইয়া বলিত যে বারো টাকার কমে পাটের মণ বেচিব না, তবে কলঙালাকে হয়ত ঐ দরেই পাট কিনিতে হইত। কিন্তু সজ্জবদ্ধ হইবার শিক্ষা অল্প রকম। লোকে ঠেকিয়া শিক্ষা করে। ধর্মান্ধ্রিত সমাজ উহা মানিয়া লব, আর স্বার্থান্ধ সমাজ, যে সমাজ ভোগ কবাই পরম লাভ বলিয়া জানিয়াছে, সে সমাজ সজ্জবদ্ধ হইবার চেষ্টার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়; তখন বিরোধ সংঘর্ষ ও প্রাণহানি আরম্ভ হয়। সজ্জ নানা রকমের ও নানা ছোট ও বড় স্বার্থ রক্ষার জন্য সৃষ্ট হয়। আত্মকাল আমাদের দেশে নির্বিসংবাদী একপ্রকার সজ্জ দেখা দিয়াছে। এইগুলি সমবায়-সমিতি নামে পরিচিত। মহাজনদেব হাত হইতে কৃষক ও শিল্পীকে বক্ষা কবিয়া তাহার ব্যবসায়ের উপযুক্ত মূলধন যোগানই এইসকল সমিতির কাজ। কোনও কোনও স্থানে জোলা তাঁতী ও মুচিদের এই সমিতিতে বেশ কাজ হইতেছে। আবশ্যক-মত অল্প স্বদে ধার পাইতেছে। স্বদও শতকরা সাড়েবারো টাকার বেশী নয়। টাকা শোধের ও প্রত্যেক সভ্যের মূলধনের অধিকারী হইবার ব্যবস্থা আছে।

তথাপি এইসকল সমিতির দ্বারা চাষাদের দুঃখ দূর হইবাব অনেক অন্তরায় আছে। যখন এই সমিতিগুলি শক্তির কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইবে, যখন কৃষকেরা সমবায়-সমিতিকে কেবলমাত্র ঋণ লইবার আকিস বলিয়া ব্যবহার কবিবে না, তখন ধনিক-শীর্ণ সমাজ ইহাকে কি চক্ষে দেখিবেন সে বিষয়ে আশঙ্কা আছে। গবর্ণমেন্ট ও ধনিক-সমাজ আজ যে সমিতিগুলি অর্থ দ্বারা লোক দ্বারা গঠন করিবার চেষ্টা ও সাহায্য করিতেছেন সেই সমিতিগুলি চাষাদের স্বার্থরক্ষার সজ্জরূপে সত্যি ব্যবহৃত হইলে, বিষাক্তজ্ঞানে এখনকার পৃষ্ঠপোষকবা এইসকল সমিতি দমন ও ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিবেন ইহা স্বাভাবিক মনে হয়।

এইপ্রকার সমবায়-সমিতিগুলির মূলে ক্ষুদ্র কেন্দ্রের স্বার্থ থাকায় ইহারাও অপর অর্থাধিকারী বা স্ত্রায় পবপীড়ক হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধবায়াউক, কোনও গ্রামের

কৃষকেরা দেখিল ধান না বিক্রয় করিয়া চাল বিক্রয় করিলে অধিক লাভ হয়। তাহারা সকলে মিলিয়া সমবায় সমিতির অর্থে একটি ধান-কল বসাইল, নিজেদের ধান ভানিয়া লইল এবং উৎকৃষ্ট ধান লাভে বিক্রয় করিল; তাহাতে নিজেদের ধান ভানার ব্যয় কমিল কিম্বা আরও লাভ হইল। কিন্তু ঐ কলে যে-সমস্ত মজুর দিন-মজুরী খাটিবে তাহাদের অবস্থা অঃ কলের মজুরদের অপেক্ষা একটুও ভাল না হইবার কথা। এই কেন্দ্রভূত সমিতির স্বার্থই হইতেছে যত সম্ভাব্য পারা যায় ধান ভানা। অস্বাস্থ্য মূলধনের অধিকারীর যে দোষ,—অপরকে বঞ্চিত করিয়া কলের বা ব্যবসায়ের লাভ বাড়ান,—সে লোভ বা প্রচেষ্টার জড় ইহাতে মরিবে না। সমবায়-সমিতি দ্বারা ছোট ছোট কেন্দ্রের ইষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সমাজের গোড়ায় যে অবিচার নির্ধনকে পিষ্ট করিতেছে তাহার প্রতিকার ইহাতে হইবে না। সমবায়-সমিতি একজাতীয় শ্রমিককে ধনিক করিতে পারে এই পর্য্যন্ত। সমবায়ের সম্ভাব্য চেষ্টায় কোনও একদল শ্রমিক ধনী হইলেও অগ্র ধনীর সহিত আর তাহার প্রভেদ থাকে না।

দেশা যাইতেছে যে কোনও এক দল চাষা বা শিল্পীর যদি ধনবান হইবার পথ মুক্ত হয় তাহা হইলেও সমষ্টি হিসাবে সমাজের বিশেষ হিত হইবে না। প্রথমে যে কথা আরম্ভ করা হইয়াছিল যে ক্ষেত-ভরা শস্ত থাকিতেও উৎপাদক চাষারা অনাহারে থাকে তাহার প্রতিকার হয় না। ধনী ও নির্ধন, যাহারা খাটে ও খাটায়, তাহারা সকলেই একই সমাজের অঙ্গ। যদি এই ব্যষ্টির ভিতর পরস্পর প্রেমের সম্পর্ক থাকে তবেই সমষ্টির মঙ্গল। আর যদি একে অপরকে পীড়ন করিয়া সম্পদ সংগ্রহ করিবে এই ইচ্ছাই থাকে এবং তাহা কর্ষে প্রকট হয় তবে সে সমাজের অহিত কিছুতেই ঠেকান যাইবে না। দেশের জনসাধারণ এখন চরকায কিছু কিছু রোজগার করিতেছে। নিষ্কর্ম্য কর্ম্ম পাইয়া ইহাতে কিছু অতিরিক্ত উপার্জন করিবে। কিন্তু বেশীদিন এই অবস্থা যে স্থায়ী হইবে তাহাই বা কেমন করিয়া বলা যায়। পাটের বেলায় পাটের চাষীর অবস্থা যাহা হইয়াছিল, চরকার স্ত্রীত কাপড়ের বেলায় তাহাই যে আংশিকভাবে হইবে না তাহা বলা যায় না।

বস্তুতঃ কোনও অর্থনৈতিক নিয়মে উহা না হইবার পথ নির্দেশ করে না। দেশের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য যাহাদের হাতে, সমাজের আর্থিক ব্যবস্থার চাবিটিও তাহাদের হাতে। তাহারা যতই আর্থিক অসমতা সৃষ্টি করিতে থাকিবেন ততই দেশের অহিত হইবে, বৃত্তফুর সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে। সমাজের এক অংশেব পক্ষে শত চেষ্টাতেও মানুষের মত বাস করা অসম্ভব হইবে। অবস্থা ইহা বরাবর চলিতে পারে না। ভৈরব একদিন ডমরুর তালে তাণ্ডব নৃত্যে মাতিয়া উঠেন, অত্যাচারে অবিচারে জর্জরিত সমাজ বিধ্বস্ত হইয়া ধ্বংস হইয়া শিবের মঙ্গলাশীর্বাদ লইয়া নূতন কবিশা জন্মগ্রহণ কবে। মহাকালের এই লীলা পৃথিবীর বুকের উপর কতবার প্রলয়-নৃত্যে অভিনীত হইয়াছে।

সমাজের ভিতর যে এতবড় একটা অবিচার চলিতেছে, তাহার জ্ঞাত কেবল মাত্র ধনী ও ব্যবসাদার সম্প্রদায়ই দায়ী আর সাধারণ শিল্পী ও কৃষক মেয়ের মত শাস্ত ও নিরপরাধ এমন কথা আমি মোটেই বলিতেছি না। অত্যাচারিত স্বযোগ-মত অত্যাচারীর উপর অত্যাচার করিতেছে। একই অবিচার-অত্যাচারের শৃঙ্খল সমাজ-শীর্ষ হইতে আরম্ভ হইয়া নিম্ন স্তর পর্য্যন্ত পঁছিয়াছে। কিছুকাল হইতে ভারতবর্ষ আপন সভ্যতা ও শিক্ষা ত্যাগ করিয়া পশ্চিমের স্ত্রায় আপাতস্বপ্নের অভিলাষী হইয়া পড়িয়াছে।

“শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতন্
তৌ সম্প্রীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
প্রয়ো হি ধীরোহভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥”

“শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে আশ্রয় গ্রহণ করে। জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাদের বিষয় সম্যক আলোচনা করিয়া ইহাদিগকে পৃথক বলিয়া জানেন। জ্ঞানী ব্যক্তি প্রেয় অপেক্ষা উত্তম বলিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, আর অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি যোগক্ষেম অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তু রক্ষণ অভিলାষে প্রেয়কে গ্রহণ করে।”—(কঠোপনিষৎ ১২।২)। আমাদের দেশ পশ্চিমের ক্ষমতাদৃষ্ট রূপের মোহে অভিভূত হইয়া শ্রেয়কে ত্যাগ করিয়া প্রেয়ের পশ্চাৎ গমন করিতেছে। কেবল কেমন করিয়া ভোগ করিব ইহাই সমাজের আবা-

ধনার বিষয় হইয়াছে। ভোগলিপ্সা সমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ভোগ করিতে পারিতেছে অল্প লোকেই, কিন্তু আকাজ্জব পীড়ন প্রত্যেক স্তরেই অনুভূত হইতেছে। যাহারা বাণিজ্যে লিপ্ত তাহারা দুই হাতে দেশের মঙ্গল চেষ্টা করিয়া অপ্রয়োজনীয় আয়েসের দ্রব্য আনিয়া ফেলিতেছেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ তাহারা ধন-সম্পদের অধিকারী হইতেছেন। অপব দশজনও তাহাদেরই আদর্শে অধিকতর উপার্জনের পথ খুঁজিতেছে। ইহাতে কদাচ সমষ্টির মঙ্গল হইতে পারে না। মোটের উপর হিসাব করিলে দেশ দরিদ্র হইতেছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা বহুবিধ জড় উপকরণ আমাদেরকে অনেক দিয়াছে বটে, কিন্তু যাহা দিয়াছে তাহার অধিক মূল্য লইয়াছে। ক্ষুদ্রগামী যান বাহন, সংবাদবাহী টেলিগ্রাফ যন্ত্রাদি, কলমের চারার মত দেশে বসিয়াছে। এগুলি দেশের মাটিতে গড়াই উঠে নাই, তৈরী হইয়া বাহির হইতে আসিয়া বসিয়াছে। তাহার মূল্য স্বরূপ আমরা কি না দিয়াছি। আমাদের দেশের স্বাস্থ্য ও স্থল দারিদ্র্যের ফোড়ে বিসর্জন দিয়াছি। ধন সম্পদ দুই-এক জায়গায় বিশেষতঃ সহরেব বণিকের নিকট স্তূপীকৃত করিয়া সর্বত্র দৈন্তের দুর্দশা বিতরণ করিয়াছি। আর সর্বোপরি আমাদের চরিত্রের ও সভ্যতার সম্পদ অবহেলা করিয়া যে-সকল জড়বস্তু বিলাতী সভ্যতার ফল বলিয়া এদেশে আমদানী করিয়াছি তাহার প্রভাবে জড়েই পবিত্র হইতেছি! চিত্তের সে সন্তোষ নাই যাহাতে ধনী ও দরিদ্র একজায়গায় দাঁড়াইতে পারে।

আমাদের দেশে সামাজিক অসমতা কাঁটার মত সমাজকে বিধিয়া ছিল, এখনো আছে। তথাপি একটা দিকে উদারতা ছিল যাহা সমাজের প্রাণ ও স্বাস্থ্য রক্ষণে বজায় রাখিতে পারিয়াছিল। ভোগ করাই পরম এবং চবম ইহা সমাজ স্বীকার করিত না। কোন কালেই সমাজস্থ সকলে ত্যাগের আদর্শে জীবন যাপন করিত না, তবুও সমাজের শীর্ষে যাহারা তাহারা ত্যাগের সম্মান করিতেন বলিয়া সাধারণ লোকও ঐ আদর্শের বলে সমাজকে স্থায়ী রাখিতে পারিত। অল্প দিন পূর্বেও দারিদ্র্য-ব্রত পণ্ডিতেরা অধ্যাপনা কার্য করিয়া এবং পাণ্ডিত্যে

দীক্ষায়ী হইয়াও দরিদ্রোচিত অশন-বসনে অতি শ্রদ্ধা জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের কাহারও কাহারও সঙ্কীর্ণতা ছিল, তথাপি সরল জীবন যাপন করিয়া বিক্রতার মর্যাদা বক্ষা করিয়া তাহারা এক প্রকারের পাপ সমাজে দৃঢ়বদ্ধ হইতে দেন নাই। স্বদেশে পূজ্যতা বাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতা এই উচ্চ আদর্শ ভারতবর্ষে পৃথিবীর সমক্ষে খাড়া করিয়াছিল। রাজা বিদ্বানের সম্মানে দৈন্তেরই সম্মান করিয়া গিয়াছেন। ত্যাগের সম্মান করা ভাবতবাসীর পক্ষে মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল। আজও ত্যাগী সম্মানসীরা যে সম্মান পাইতেছেন তাহার মূলে পুরাতন সংস্কার রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে আর প্রাণ নাই। ধর্মগত ও সাম্প্রদায়িক শত মতে বিচ্ছিন্ন বর্ণাশ্রমে বিভক্ত এবং অস্পৃশ্যতা দোষে দুই সমাজের শেষ প্রাণবায়ু ভোগের মোহে বহির্গত হইয়াছে। এতটুকুও যদি সত্য পরার্থ সমাজের জীবনে না থাকে তবে কিসে আর তাহা বাঁচিতে পারে? আমরা জন্মগত জ্ঞাতিগত অসমতা বর্জন করি নাই, উপরন্তু ধনগত অসমতাও সমাজে স্থান দিয়াছি। আধুনিক সমাজস্থ ধনী নির্ধন সকলে নিজের ও বংশপবম্পরার ভোগের জন্ত সমিধ সংগ্রহে আজীবন ব্যস্ত। শিশুকালে পাঠশালায় শিখি “লেখা পড়া করে যেই গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই”—কেহ গাড়ীঘোড়া চড়িতে পাই, কেহ পাই না, কিন্তু সমান অসন্তোষ লইয়া দেহত্যাগ করিয়া যাই। ইংরেজীতে ভাষা শিক্ষার পথে প্রথমেই কণ্ঠস্থ করি “Honesty is the best policy”, আর সেই পলিসি বা চালই বজায় রাখিতে জীবন ও কর্ম শেষ করি। “জীবনে ও মিথ্যা আচরণে শেষ আর ভেদ নাই রম!”

ভোগলিপ্সাই আমাদের অধোগতি ও মৃত্যুর প্রধানতম হেতু। যিনিই যে পরিমাণে ভোগ করিতেছি, সেই পরিমাণে দুইটাকা মাসিক আয়ের চাষার অল্প ভাগ বসাইতেছি। আমার ভোগের সহিত চাষার দুর্দশা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যতদিন না আমরা এই ভোগসর্বস্ব মনোবৃত্তির পরিবর্তন করিতেছি, ততদিন চাষারা যতই ক্ষেতে খাটুক, দেশে যতই চরকা তাঁত চলুক, দুর্দশার বাস্তবিক পরিবর্তন হইবে না। প্রথমে যে প্রাণ তুলিয়া-

ছিলাম, যে, কেন চাষারা এত খাটিয়াও অন্নবস্ত্রের অভাব মিটাইতে পারে না এইখানেই তাহার জবাব।

বিলাতী পণ্যের আমদানী ও দেশী মালের রপ্তানীর হিসাব দেখিলেও একই উত্তর পাওয়া যাইতেছে। আমরা বিদেশ হইতে তৈরী মাল আনি, আর কাঁচা মাল পাঠাই। আমদানী যে-সকল দ্রব্য করি তাহার মূল্য রপ্তানী দ্বারাই দিয়া থাকি। ১৯১৮-১৯ সালে ভারতবর্ষ হইতে আড়াই-শত কোটি টাকার মাল রপ্তানী করিয়াছি। এবং তাহা দ্বারা ভাবতবর্ষের নিকট প্রাপ্য ইংলণ্ডের শ্বণের সূদ ও পেন্সন্স আদি শোধ দিয়াও একশত শতক কোটি টাকার মাল আমদানী করিয়াছি। যাহা আমদানী করিয়াছি তাহার অর্ধেকই হইতেছে বিলাতী সূতা, বিলাতী কাপড় ও বিলাতী চিনি। বাকী কতক প্রয়োজনীয় দ্রব্য, আর কতক অপ্ৰয়োজনীয় দ্রব্য, খেলনা, আয়েসের বস্ত্র। আমরা তুলা রপ্তানি করিয়া কাপড় আমদানী করিয়াছি, পাশ্চাত্য দ্রব্যের বিনিময়ে বিলাতী সখের জিনিস কিনিয়াছি; যাহারা কৃষি-ক্ষেত্রে ও বনে জঙ্গলে শ্রম করিয়া এই রপ্তানীর মাল জন্মাইতেছে আমদানীর মালের সামান্য অংশই তাহাদেব নিকট পছন্দিতেন। এক দিক হইতে দেখিতে গেলে এই রকম দেখা যাইবে যে ভারতবর্ষের ধনী-সমাজ চাষার শ্রমলব্ধ ফল গ্রহণ করিতেছে এবং বিনিময়ে নিজের ভোগস্পৃহা বিলাতী পণ্যে মিটাইতেছে। যদি এই ভোগের উপকরণ দেশেই সংগৃহীত হইত, তবুও মন্দের ভাল হইত; টাকাটা দেশের মধ্যেই চলাফেরা করিত; কিন্তু বিলাতে যাইতেছে বলিয়া ইহাতে দেশের দৈন্য ক্রমশঃই বাড়িতেছে। বৎসরের পর বৎসর দৈন্য বাড়িয়াই চলিতেছে। স্বব্যবস্থা না হইলে বিপর্যয় অবশ্যস্বাবী।

যে পরিমাণে লোকের মজুরী বাড়িতেছে তাহাব তুলনায় খাদ্যদ্রব্য অধিক দুর্মূল্য হইতেছে। সাধারণতঃ মনে হয় খাদ্য দ্রব্য দুর্মূল্য হইলে যাহারা উৎপন্ন করে তাহাদেব অবস্থা ভাল হইবে। কিন্তু স্বাভাবিক বেলায় তাহার বিপরীত হইতেছে। সমাজে ভোগের স্পৃহাই এই অবদান ঘটাইয়াছে। বিশেষতঃ বিলাতী দ্রব্যে ভোগস্পৃহা মিটাইবার ব্যবস্থাতেই এই সর্বনাশ হইয়াছে।

একটি চাষার যদি কতকগুলি গরু থাকে তবে তাহাদিগকে খাটাইয়া চাষা স্ত্রী স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে পাবে, ইচ্ছা করিলে গরুগুলিকে অল্লাহারে কদম্ব অবস্থায় রাখিয়াও চালাইতে পারে, যতদিন না তাহার ফসল কমিতে কমিতে ভাতের উপর টান পড়ে। দেশের শতকরা দশজন লোক অপর নব্বই জনকে এই ভাবেই ব্যবহার করিতেছে। এই দশজন লোক যেন চাষা, আর নব্বই জন গরু। তাহারা খাটিতেছে কিন্তু অনাহাবে কদাহারে কেবল কোন-মতে প্রাণ রাখিয়াছে। আর নাম মাত্র গোলমালেই মরিতেছে।

দেশের আবশ্যকীয় দ্রব্য রপ্তানী করিয়া, অনাবশ্যকীয় বিদেশী মাল আমদানী করিয়া, শেয়ারের জুয়া খেলিয়া, পাট তুলা বস্ত্র শস্যাদি পণ্য একচেটিয়া (কর্ণার) করিয়া পীড়াদায়ক সর্বো ও সূদে টাকা খাটাইয়া অস্বাভাবিক ও অধর্ষোচিত উপায়ে আমরা অর্থ একদিকে পুঞ্জীভূত করিয়া ফেলিতেছি। ইহা শিক্ষিত ও সভ্য সমাজের অন্ত্যম মনে হইতেছে না। আর সেই পুঞ্জীভূত অর্থ এমন সকল ভোগোপকরণে ব্যয় করিতেছি যে তাহা দেশের বাহির হইয়া যাইতেছে। সহরের অনেক লোকেব হাতে হাতে একটা রিষ্ট্ ওয়াচ দেখা যাইবে, এই অনাবশ্যক আভরণ দুই মণ চাউলের মূল্যে পাওয়া যায়। চাউল কত আক্রা হইয়াছে যে তাহার দুইমণের বিনিময়ে এমন সুস্বাদুকাঁককার্য্যকর দ্রব্য পাওয়া যাইতেছে! বিলাতী সৌখীন ও অনাবশ্যক পণ্য যত দিন আমাদের উর্দ্ধতন সমাজে ব্যবহার হইবে তত দিনই শতকরা নব্বই জন দেশবাসী, যাহারা কৃষি ও শ্রমজীবী, তাহাদের অবস্থা হীন হইতে হীনতর হইবে। কোন কঠিন শ্রমেই তাহাদিগকে জীবিত রাখিবার পথ করিয়া দিবে না। যদি কৃষকের গরুগুলি বলে যে আমরা না খাইতে পাইলে কাজ করিব না, গুঁতাইব, তাহা হইলে হয়ত তাহাদের বাঁচিবার পথ হয়। কিন্তু কৃষকেব সঙ্গে লড়াই করা দুইটি মাত্র শিং সঞ্চল লইয়া গরুর পক্ষে যেমন অসম্ভব, আমাদের শতকরা নব্বই জনেরও ধনী-সম্প্রদায়ের সহিত লড়াই করা তেমন অসম্ভব। ধনীরা হাতে নিজের গড়া আইন আছে। আর ধনীরা পরস্পর লড়াই করিয়া

ও-বিজ্ঞাতে পারদর্শী হইয়া আছে। সাধ্য কি যে নির্ধন-সমাজ ভয় দেখাইয়া কিছু করে। তবে সজ্জবদ্ধ হইলে বিপ্লব আনিতে পারে, তাহাতে দশ ও নব্বই সমান ধ্বংস হইবে। এ অবস্থায় দশেব কর্তব্য নব্বইয়ের দিকে দেখা, যাহাতে তাহারা থাইতে পাষ তাহাব ব্যবস্থা করা, অর্থাৎ বিদেশী ভোগেব অনাচার ত্যাগ করা।

ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ১৯২০ সালের ভারতবর্ষ নামক পুস্তকে খাদ্যব্যয়ের দুর্খল্যতা সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহা প্রাধান্যযোগ্য।

"On the whole it may be said a rise in prices tends to emphasize the economic differences throughout the rural population of India, those who are well to do becoming more well to do, those who are poor becoming poorer."—India in 1920. Page 134.

"জিনিষেব মূল্য চড়িলে গ্রাম্য লোকেব আর্থিক অবস্থার অসমতা বাড়িয়া দেয়। যাহাদের অবস্থা ভাল তাহারা আরও ধনী হয়, আর যাহারা দরিদ্র তাহারা আরও দরিদ্র হয়।"

অথচ দব চড়ার অল্প সেটেল্‌মেন্টেব বেলায় খাজনা বাড়ান হয় যাহাতে দরিদ্র আরও পীড়িত হয়। এই-সকল কাৰণে ভারতবাসী শতকরা নব্বই জন গ্রাম্যলোক অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন শতকরা দশজনেব নিকট পরোক্ষভাবে গবাদি পশুব মতই হইয়া পড়িয়াছে। সর্বত্র ত পরোক্ষভাবে এই সম্পর্ক আছে, কোথাও কোথাও আবার সাক্ষাৎ ভাবেও এই সম্পর্ক দেখা যায়। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন সিংহের উড়িষ্যা-চিত্রে কয়েক জায়গায় এই কথাটি কৃষক মহাজনকে বলিতেছে যে "আমি গরু চবাই, আপনি মনুষ্য চরান।" কথাটা কতদূর কল্পিত তাহা গ্রন্থকার বলিতে পারেন, কিন্তু সরকারী বিবরণে এই অবস্থাটির অস্তিত্ব নির্দ্বন্দ্ব ভাবে সমর্থিত হইয়াছে।

"সারা ভারতবর্ষেরই চাষাব অবস্থা সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে যে তাহারা এত দরিদ্র, এত অসহায় যে ইউরোপে তাহারা তুলনা মিলে না। তাহারা অল্প ও অসমর্থ বলিয়া তাহাদের অপেক্ষা একটু সম্মতি-পন্ন লোকের পীড়ন সহ্য করিয়া থাকে। গত বৎসরের ছোটনাগপুরের সেটেল্‌মেন্টের বিবরণে জানা যায় যে

ওখানকার কৃষক মজুরেরা কষ্টে পড়িয়া সময় সময় নিজের স্বাধীনতা বন্ধক রাখিয়া দাসত্ব লিখিয়া দিতে বাধ্য হয়। সামান্য মাত্র সাময়িক অর্থের আবশ্যক মিটাইতে না পারিয়া তাহারা এই সস্তে ধার করিতে বাধ্য হয় যে গাষ খাটিয়া ঐ টাকা শোধ দিবে। নিয়ম এমন, যে ব্যক্তি চাকর খাটিবে সে বাৎসরিক দুই হইতে চারি টাকা পাইবে এবং বৎসবে দুইখানা কাপড় পাইবে। তাহার মহাজনই তাহাব শ্রমফলের স্বত্বাধিকারী। এই বকম ঋণ সন্তানাদিতে বর্তে এবং তাহারাও ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব সস্তে বাঁধা থাকে। যদিও দাসপ্রথা অনেক দিন হইতেই আইন-বিরুদ্ধ, তথাপি এই প্রকাবে ছোটনাগপুর প্রদেশে এক শ্রেণী লোক আছে যাহারা পুরুষাভুজের উত্তরাধিকার-স্বত্রে দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্বীয় বংশপরম্পরাকে সেই দাসত্ব দিয়া যাইতেছে।"

* * * The general condition of the peasantry up and down the country can only be described by saying that the average cultivator is poor and helpless to a degree to which Europe can afford little parallel. Ignorant and without resources he is always liable to be oppressed by those richer and more influential than himself. Mention was made in last year's report of certain settlement operations in Chotanagpur which have disclosed the fact that agricultural labourers in that region are not infrequently compelled in time of stress to mortgage their personal liberty. In return for a small some of money which they happen to need at the moment, they agree to serve the individual from whom they borrowed. The rule is that a man who has so bound himself gets from two to four rupees a year as pocket money and two pieces of cloths. His labour belongs to his creditor. The debt extends to the children, who remain bound till it has been discharged. There are therefore in Chota Nagpur people who have inherited servitude and who in turn have passed it on to their children although slavery has long been illegal in India."—India in 1920. Page 159. "The Indian Peasant."

এই হইল সাক্ষাৎ কৃষকের দাসত্ব। ইহা ছোটনাগপুরেই বন্ধ নহে। বাংলা বিহাব ও অন্যান্য প্রদেশের

পল্লীজীবন অল্পসঙ্কান করিলে কোন না কোন প্রকারে এই অবস্থা বিদ্যমান দেখা যাইবে। যাহারা সাক্ষাৎ দাসত্ব করে তাহারা ছাড়া যাহারা বাকী রহিল তাহারা সকলেই পরোক্ষভাবে উর্দ্ধতন শতকরা দশজনের সমাজের দাসত্ব করিতেছে। বাহ্যিক আবরণ ঠিক আছে বলিয়া এবং কোনও ব্যক্তিবিশেষ এই দাসত্বের ফল গ্রহণ করিতেছে না বলিয়া এই দশজন্য নববৈজ্ঞানিক দাসত্ব ভাবে ব্যবহাব কবার কদর্যতা ও দোষ চোখের আড়াল আছে। ক্ষেত্রে যতই শস্ত হউক, কৃষক যতই খাটুক, তাহার অমফল টানিয়া লইবার ব্যবস্থা বেশ ভাল রকম আছে। মহাজনের ঋণেব স্তূদে, বদ্ধিত খাজনা ও ট্যাক্সে, কাপড় ছুন-তেলের চড়া দামে সে শ্রমেব ফল তাহার হাতছাড়া হইয়া, তাহার অন্নবস্ত্রের অভাব হইবেই।

কৃষকের অমলক ফল ধনী সমাজের হস্তগত হইয়া তাহা যে প্রকারে ব্যয় হয় তাহাতে তাহা আর ঐ নববৈজ্ঞানিক মধ্যে ফিরিয়া যায় না। বড় লোকেরা বেশী ইনকম ট্যাক্স দিতেছেন, তাহাতে সরকারের আয় বাড়িতেছে। কিন্তু সরকারের আয়ের সামান্য অংশই লোকহিতে ফিরিয়া আইসে। সরকার এই দরিদ্র দেশকে, চাষীর দেশকে শাসন করিতে আর সাময়িক ঠাট বজায় রাখিতে এত ব্যয় করেন যে আর বিশেষ কিছু লোকহিতকর কাজে ব্যয়ের জন্ত থাকে না। আর ভারতের আয়ের অধিকাংশ অর্থ রকম-বেরকমে বিলাতে চলিয়া যায়। ওদিকে আবার অর্থ ধনী বরে আসিয়াই বিলাতী ভোগের বস্তুর প্রচুর পরিমাণে বিলাতে চলিয়া যায়। কাগজ-পেন্সিলে, বিষ্ট-ওষাচে, মোটরকাব-সাইকেলে, কাপড়ে, সূতা, রঙে, চিনিতে তাহা দ্রুত দেশের বাহির হইতেছে। বন্দরে বন্দরে ঘুরিয়া দেখুন জাহাজেব খোল ভরিয়া কি যাইতেছে, আর তাহার খোল খালি কবিয়া কি দ্রব্য উদ্ধার করিয়া যাইতেছে।

আমাদের ভোগলিপ্যার “প্রতীক” কৃষকের সোনার ক্ষেত শুষিয়া লইতেছে। বিদ্যাচর্চায় জ্ঞান লাভ করিয়া মানুষ প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনিতে পারিতেছে, কিন্তু সেই বিদ্যা যে-পরিমাণে মানুষে মানুষে অসমতা সৃষ্টি করিতেছে

সেই পরিমাণেই ব্যর্থ হইতেছে। যদি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে এই হয় যে এক দেশ আর-এক দেশের স্বাধীনতা হরণ কবিয়া সেদেশের লোককে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে দাসত্ব ব্যবহার করিবে, যদি বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ দ্বারা মানুষের সমাজ জ্ঞানে চরিত্রে ও ধর্মে উন্নতিলাভ না করে, যদি তাহার ফলে এই হয় যে কে কাহার অন্ন কাড়িয়া লইয়া নিজের ভোগলিপ্য চরিতার্থ কবিত্তে পাবে সেই পথে সমাজের অধিকাংশ লোক চেষ্টা করিতেছে, তবে দিক্ সে বিদ্যাচর্চায়, বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে। আলো বাতাস আর নদীর জল যেমন সাধারণ সম্পত্তি, কাহাকেও মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না, বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে তেমনি মানুষের সাধারণ সম্পত্তির প্রসার হওয়াই ত আবশ্যক। মানুষ সমাজে জন্মিলেই সে খাদ্য ও পরিধেয় প্রাপ্ত হইবার অধিকার লইয়া জন্মিয়াছে, উন্নতির যুগে সমাজ ত হইয়া মানিয়া লইতে পারে। সহজ উপায়ে পণ্য চলাচল দ্বারা, অল্প পরিশ্রমে প্রভূত দ্রব্য গড়িবার ব্যবস্থা করিয়া, বাষ্প বিদ্যুৎকে কাজে লাগাইয়া যে সুবিধা সমাজের হইয়াছে, তাহা ধনীর ভোগ-চরিতার্থতায় আবদ্ধ না রাখিয়া সাধারণের ব্যবহারে আনাই ত মানুষের কাজ। কিন্তু ফলে দেখা যাইতেছে সমস্ত সুবিধাই ধনীর ভোগ-চরিতার্থতায় নিয়োজিত হইতেছে। আমাদের দর্বিদ্রের দেশে আমরা জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে ভোগের পথে পা দিয়া কেবল দরিদ্রকে তাহার বাঁচিবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও নিশ্চয়-মৃত্যুব দিকে ঠেলিয়া দিতেছি।

হিন্দুগণ তাঁহাদের সম্ভ্যা-বন্দনাতে, মুসলমানগণ তাঁহাদের নমাজে যে সংকথা প্রত্যহই উচ্চারণ করিয়া থাকেন, সেগুলি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া জীবনে তাহার কথঞ্চিৎও আচরিত হইলে ভোগলিপ্য কমিয়া আসিবে। অর্থোপার্জন করাই কাম্য না করিয়া সচুপায়ে উপার্জন করিয়া লোকহিতে অর্থব্যয় করাই কাম্য বলিয়া গৃহীত হউক।

দেশেব যে অবস্থা তাহাতে সাময়িক প্রয়োজনে সকলকেই চরকা কাটিয়া খাদি পরিয়া গৃহে গৃহে স্ততা তৈয়ারীর ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা আবশ্যক। তাহাতে

নিতান্ত দৈন্যে পীড়িত নরনারীর আপাততঃ অরসংস্থান হইবে। কিন্তু তাহা ছাড়া আরো বড় কাজ এই হইবে, যে, চরুকাই কার্যিক শ্রম কবিয়া দশজনের নবহইজনকে দাস করিবার প্রবৃত্তি নষ্ট হইবে। চরুকা ও খাদি সেই মনোবৃত্তির অহুশীলনে সমাজকে পাপ-নিমুক্ত ও নির্মল করিবে, পবিত্র করিবে। সেই পথেই স্বরাজ্যের শুভাগমন হইবে।

কোনও সম্প্রদায়ে উৎসবে, শোকে ও উপাসনায় এই সুন্দর মন্ত্রটি কতবার উচ্চারিত হইয়া থাকে—

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়;
রুদ্র যন্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যং।

যদি জীবনে ইহার কিছুও আচরণ করা হয়; বিদেশী জিনিস ব্যবহারের দ্বারা আমরা দেশে অভাব ও দারিদ্র্যের প্রতিষ্ঠা করিতেছি, যদি এই কথাটি আমবা বুঝিতে পারি,

তবে অঙ্গ হইতে স্বাস্থ্য বিদেশী বস্ত্র আপনি খসিয়া পড়ে, বৈদেশিক ভোগ-বিলাসের উপকরণ তিক্ত মনে হয় এবং যে ভোগের প্রেত দেশকে শাসন করিতেছে সে প্রেত আলোকের আগমনে অন্ধকারের দ্বায় তৎ তৎ সমাজ হইতে প্রস্থান করে।

“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

হবিষা কৃষ্ণবজ্রৈব ভূয় এবাভিবর্জতে॥”

সাজসজ্জা আস্বাব্ধনবাশির স্তূপ প্রভৃতি উপকরণে পীড়িত হওয়াই কি জীবনের চবম লক্ষ্য? বিলাসেব তাণ্ডবনৃত্যে মত্ত হইয়া ভুলিয়া যাই কোনদিকে বহিমুখ পতঙ্গের দ্বায় নিজেকে আহুতি দিবার জন্ত উর্দ্ধ্বাসে ছুটিতেছি। উদ্ভ্রান্ত মনকে স্থস্থি বরাধিতে পারি না। হায়! যে ভারতে অন্যান্য তিন সহস্র বৎসর পূর্বের রমণীকণ্ঠ হইতে বজ্রগন্তীর নিনাদ উঠিয়াছিল “ঘেনাহং নামুতা স্যাম্ কিমহং তেন কুধ্যাম্”, আজ কোন পথে সেই ভারত ধাবিত হইতেছে!

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

রমলা

ইহার পর তিনদিন ঘটনাব শ্রোত এত রুদ্ধ তালে বহিয়া গেল যে তিনদিনের শেষে বিরূপে এত ওলট-পালট হইয়া গেল তাহা কেহ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। চারিটি জীবনের স্ততা লইয়া বুনিতে বুনিতে শিল্পী যেন অধীর হইয়া উঠিয়াছে, স্ততার সহিত স্ততা গেরো দিয়া অথবা ছিড়িয়া কোনরূপে শেষ করিতে পারিলেই যেন সে বাঁচিয়া যায়। যতীন জীবনের লীলায়িত ছন্দে চলিতে পারে না, সব সমস্তাব সমাধান অতি শীঘ্র দারিয়া ফেলিতে চায়, তাই ঘটনাগুলিব বেগ বাড়িয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে চা না খাইয়াই যতীন মোটর হাঁকাইয়া যোগেশ-বাবুর বাড়ীতে হাজির হইল। পেটের কাছে তাহার প্রিয় স্থানে মাধবী ঘুরিতেছিল। ক্রীম-রংয়ের শাড়ীর উপর সদ্যস্নাত মুক্তকেশ প্রভাতের আলোয় ঝলমল করিতেছে, পামগাছের তলায় দীপ্ত আননে

বনদেবীর মত দাঁড়াইয়া। সে মধুব মূর্তি দেখিয়া ধীরে যতীন তাহার সম্মুখে মাথা নত কবিল, কি কথা বলিবে খুঁজিয়া পাইল না।

মাধবী বাগানেব দিকে চলিয়া গেল, যতীন তাহার বন্ধুব ঘরের দিকে চলিল।

রজত কাজীসাহেবেও ছবিখানিতে রং দিতেছিল। যতীন ঘরে ঢুকিতেও কোনরূপ লক্ষ্য না করিয়া রং দিতে লাগিল। যতীন তাহার ঘাড়ের উপর ঝুঁকিয়া ছবিখানি দেখিতে দেখিতে বলিল—কি হে, ভারি ব্যস্ত?

কাচের এক চতুষ্কোণ বৃহৎ খণ্ডের উপর লাল রং ঘসিতে ঘসিতে রজত বলিল,—হাঁ ভাই, ব্যস্ত।

কিছুক্ষণ বজ্রতের রং দেওয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া “তোমাকে আর disturb করুব না” বলিয়া যতীন বাহিরে আসিয়া বারান্দায় ঘুবিতে লাগিল। পূর্বদিকের বারান্দা পার হইয়া ড্রয়িংরুমের সম্মুখে গিয়া পড়িল। ঘরে

কাজী সাহেব ঘোগেশ-বাবুকে জেব্বেন্দার পদ্য পড়িয়া
শোনাইতেছিলেন—

গরুচে মন্ লায়েলি হন্তম্

দিল চুঁ মজ্জ দর হওযান্ত্ ।

সবু ব-সহ্ বা মী-জ্ঞনম্

লেকিন হাযা-ই-জ্জেল্লির পান্ত্ ।

অর্থাৎ, প্রেমিক লায়লি যেমন প্রিয়তম মজ্জুর জন্ত
পাগলিনী হইয়া মস্তপ্রান্তবে ছুটিয়া বেড়াইতেছিল আমার
ইচ্ছা হয় আমিও তেমনি করিয়া ছুটিয়া বেড়াই ; কিন্তু
আমার পা যে সরমসম্মের শৃঙ্খলে বাঁধা !

ড্রিঃক্লম পাব হইয়া যতীন পশ্চিমদিকের বারান্দায়
আসিল। অদূবে ইউক্যালিপ্টাসের গাছগুলির ফাঁক দিয়া
মাধবীর শাড়ীটা একটুখানি দেখা যাইতেছে। ঘুরিতে
ঘুরিতে দক্ষিণদিকের বারান্দায় একেবারে রামাঘরের
সম্মুখে-আসিয়া যতীন বড় অপ্রস্তুতে পড়িয়া গেল। মনিয়া
বামাঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল। সে এক সেলাম করিল।
ঘরের ভিতর রমলা রামার শব্দ সহিত তাহার কণ্ঠ
মিশাইয়া চাবিদিক গীতমুখব করিয়া তুলিয়াছিল। সেই
কলগানে যতীনের বুক তুলিয়া উঠিল, সে স্তব্ধ হইয়া দ্বারের
কাছে দাঁড়াইয়া রমলাব জাপানী ফ্যানানে বাঁধা ধোঁপার
দিকে চাহিয়া বহিল।

মনিয়া ছুটামির হাসি হাসিয়া ডাকিল,—দিদিমণি !

“কি,” বলিয়া প্যান্টা উনানের উপর হইতে
তুলিয়া ফিরিয়া চাহিয়া রমলা দেখিল, যতীন দ্বারে
দাঁড়াইয়া।

কালো চোখে হাসিব বিদ্যুৎ ঠিকরাইয়া রমলা
বলিল,—এই যে, আসুন।

যতীনের রৌদ্রদগ্ধ শব্দ মুখ তরুণীব গণ্ডের মত রাঙা
হইয়া উঠিল। রমলা একটি দেশী শাড়ী পরিয়াছিল,
জুইফুলেব মত সাদা কাপড়ের উপর লালপাড় রক্তের
ধারার মত, দীর্ঘ আঁচল কোমরে জড়ানো, গেরুয়া
রংএর ব্লাউজে উনানের আঁভা আসিয়া জলিতেছে, স্বপ্নভবা
মুখ, রহস্যভরা কালো চোখ—সেই তরুণী মূর্তির সম্মুখে
যতীন সত্যি হতবাক হইয়া গেল।

সোনার চুড়ির ঝঙ্কার দিয়া বমলা বলিল,—বন্ধুর

দেখা পেলেন না বুঝি ? কিছু খাবেন ? একখানা কাটলেট
গরম গরম ?

যতীন ধীরে বলিল,—না, আপনার সঙ্গে একটা কথা
আছে।

রহস্যের সুরে রমলা বলিল,—কথা ? কি কথা ?

যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া কিছু বুঝিতে পারিল
না, প্যান্টা টেবিলে রাখিয়া বলিল,—আচ্ছা একটু
দাঁড়ান, এই প্লেটটা ধুয়ে নি, আলুগুলো কুটে নি,
মাংসটা চড়িয়ে দি—

যতীন বিনীতস্বরে বলিল,—একা হলে ভাল হয়।

ঠোট মুচ্কাইয়া হাসিয়া রমলা বলিল,—বেশ, এই
মনিয়া, আমার ঘরে টেবিলের উপর একখানা চিঠি আছে,
একুনি ফেলে দিবে আয়। আর থান্সামা, তোমার
আর ত কোন কাজ নেই, বাজার যাও ত, একসের ভাল
চাল নিয়ে আসবে পোলাওর জন্ত, আজ রাতে হবে,
যত শীগগীর পার এসো—যাও—

মনিয়া ও থান্সামা চলিয়া গেলে, উনানে চাপানো
ভাতের হাঁড়ি হইতে একহাতা ভাত তুলিয়া এক
প্লেটে ফেলিয়া ভাতগুলি হাত দিয়া টিপিতে টিপিতে
বমলা হাসিভরা সুরে বলিল,—তাবপর কি বলছিলেন ?

“বল্ছিলুম,—” বলিয়া যতীন থামিয়া গেল, তাহার
চোখমুখ বাঙা হইয়া উঠিল।

ছুটামিভরা চোখে তাহার দিকে চাহিয়া রমলা বলিল,
—কি ?

যতীনের মুখে কথা বাহির হইতে চাহিল না, সে
চুপ কবিয়া দাঁড়াইয়া টেবিল হইতে এক চামচ লইয়া
প্লেটে টুং টুং শব্দ করিতে লাগিল।

বমলা যতীনের দিকে একখানা চেয়ার অগাইয়া দিয়া
বলিল,—বসুন না, কষ্ট হচ্ছে, টুপিটা খুলে ফেলুন, যা গরম
রামাঘরে—কি, এক পেয়ালা চা তৈরী কবে দেব ?

টুপিটা খুলিয়া টেবিলের উপর একটা চিনিভরা
পিরিচের ওপব রাখিয়া যতীন কোনরূপে বলিল,—না,
থ্যাক্স, দেখুন আপনাকে সে কথা ঠিক বলতে পারছি না,
কিন্তু কিছু যদি মনে না করেন—

হাঁড়ির মুখে সবা চাপা দিয়া বমলা বলিল,—বল্তে না
পারেন, লিখে আনলেই পারতেন—মনে আবার করব কি ?

চামচ ছাড়িয়া ছুরী নাড়িতে নাড়িতে রমলার পায়েব সাটিনের চটছুরের উপর চোখ রাখিয়া যতীন বলিল,— দেখুন আপনাকে প্রথম দিনেই দেখে মনে হয়েছে—

সে আবার থামিয়া গেল, ছুরী ছাড়িয়া প্যাটের পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘাম মুছিতে লাগিল। রমলা রহস্যকৌতুকভরা মুখে চাহিয়া টেবিলে ঠেসান দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—গবম হচ্ছে, চলুন বাইরে।

রুমালটা হাত দিয়া পাকাইতে পাকাইতে যতীন মরিয়া হইয়া বলিল,—দেখুন, কাল রক্তের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, সে বন্ধে তুমি কি বনির সন্ধানে ফিরছ, আমি যদি আমাব জীবনের সত্যিকার সঙ্গিনীকে খুঁজে পাই—right girl—

হঁ, বলিয়া রমলা অতি ক্ষীণ মধুর করণ হাসিল। সে হাসি রমলাই হাসিতে পারে।

মরিয়া হইয়া যতীন বলিয়া যাইতে লাগিল,—কাল বিকেলে আপনাকে পেয়ে মনে হল আমার জীবনের সঙ্গিনীকে খুঁজে পেয়েছি, তোমাকে আমি সত্যি খুবই—

রমলার মুখের দিকে চাহিয়া সে থামিয়া গেল। ভাতের জল ফুটিয়া হাড়ির গা বহিয়া উনানের আগুনে পড়িল। সেই জ্বলের ছিটার স্পর্শে জলন্ত অঙ্গারের মত চোখ কাঁপাইয়া যতীনের উদ্দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রমলা গম্ভীর কণ্ঠে বলিল,—দেখুন, আপনি—

ধতমত খাইয়া যতীন বলিল,—হাঁ—

রমলা গম্ভীর স্বরে বলিল,—আপনি আমায় একদিন মাত্র দেখেছেন, কয়েক ঘণ্টা জানেন মাত্র।

অতি বিনীতকণ্ঠে যতীন বলিল,—কিন্তু একদিনেই আমার বোধ হচ্ছে—at first sight—

তীক্ষ্ণস্বরে রমলা বলিল,—হুদিন বাদে সে বোধ নাও হতে পারে।

অল্পনয়ের স্ববে যতীন বলিল,—আমি সত্যি বলছি, আমার মনে হচ্ছে—

তিরিক্তকণ্ঠে রমলা বলিল,—আমাব মনে নাও হতে পারে।

প্রার্থনার স্বরে যতীন বলিল,—দেখুন, যদি কোন দোষ করে থাকি ক্ষমা করবেন।

ব্যথিতকণ্ঠে রমলা বলিল,—দোষ আর কি? তবে একদিনের আলাপেই—

যতীন ধীরে বলিল,—তাই যথেষ্ট বোধ হয়েছিল!

সহজস্বরে রমলা বলিল,—তা যথেষ্ট নয়, এক জীবনের জানা-শোনাও যথেষ্ট হয় না। আমি ভেবেছিলুম আপনি বুদ্ধিমান, কাজের লোক—

সে মনে মনে হাসিয়া বলিল,—কিন্তু দেখছি একটা ইডিয়ট।

যতীন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল,—তাই যা মনে হয় তাড়াতাড়ি সেরে ফেলি, কলে রাখে পাঁচ না।

রমলা হাসিমাখা স্বরে বলিল,—অতটা তাড়াতাড়ি ভাল নয়। দেখুন—আমার সঙ্গে এমন ক্লার্ট্ কর্ণাটা আপনার উচিত হচ্ছে না।

ব্যথিত হইয়া যতীন রুমালে আর-একবার মুখ মুছিয়া ভীতকরণনেত্রে চাহিয়া বলিল,—আমি আপনার বন্ধু হতে চাই।

রমলা এতক্ষণে যেন নিজের সহজ অবস্থা ফিবিয়া পাইল। সে আবার কৌতুকভরা চোখে চাহিয়া বলিল,—বেশ, আমার কোন আপত্তি নেই।

হ্যাটটা টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া বিনীতস্বরে যতীন বলিল,—ক্ষমা করবেন, কিছু মনে করবেন না।

অতি মিষ্টিগলায় রমলা বলিল,—না, না। আর দেখুন রাতে আপনার নেমস্তন্ন রইল, আপনার জন্তই খান-সামাকে পাঠাতে হল চাল আনবার জন্তে—বিকলে কিন্তু ঠিক আসবেন, শালবনটার কাছে যাওয়া যাবে।

টুপি তুলিয়া যতীন ধীরে ধীরে দাঁড়াইল।

রমলা একটু ব্যথিত কণ্ঠে বলিল,—আপনাকে না জেনে ব্যথা দিলুম, ক্ষমা করবেন। আসবেন ঠিক।

ধীরে নমস্কার করিয়া যতীন বাহির হইয়া গেল। তাহার চাষনা-সিকের স্ট্রটটা যখন গাছের আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গেল, রমলা টুলটা টানিয়া উনানের আগুনের দিকে অনিমেঘনমনে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মাংস চড়াইল না, আলুও কুটিল না। রান্নাঘর স্তব্ধ, শুধু জ্বলের টগবগ শব্দ আব রান্নাঘরের মাথায় শালগাছ-গুলির মুছ মর্ষবধ্বনি। রমলা আগুনের দিকে চাহিয়া

চূপ করিয়া বসিয়া মাঝে মাঝে পাশেব ছাইগুলি চটি দিয়া গুঁড়াইতে লাগিল।

দুপুরে সহসা রমলার মনে হইল হযত একপভাবে নিমন্ত্রণ করা ঠিক হয় নাই, বজ্রতকে জানান প্রকার। রজতের ঘরের সম্মুখে আসিয়া দেখিল, দবজা বন্ধ, দুইবার মুছ করাবাত করিয়াও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। মাধবীকে খানিকক্ষণ জ্বালাতন করিয়া সে পিয়ানো বাজাইতে গেল।

সন্ধ্যার সময় রজত যখন দরজা খুলিয়া বাহির হইল তখনও পিয়ানোর টুং টাং শোনা যাইতেছে। ড্রিং-রুমের কাছে আসিয়া দেখিল পিয়ানোর সম্মুখে এক চেয়ারে যতীন বসিয়া। তাহাকে কেহই দেখিতে পাইল না, পিয়ানো বাজান থামিয়া গেল।

ধীরে রজত আপন ঘবে কিবিয়া আসিয়া আলো জ্বালাইয়া দবজা বন্ধ করিল। রজত কিন্তু ভুল ভাবিতেছিল। যতীন সেইমাত্রই আসিয়াছিল, সে ঘরে ঢুকিতেই রমলা পিয়ানো বন্ধ করিয়াছিল।

ঘণ্টাখানেক পরে তাহার দরজায় সজোবে করাবাত হইল। রমলা ও যতীনের কর্ণশ্রবণ শোনা গেল।

যতীন বলিতেছে,—হ্যালো রজত, এখনও দরজা বন্ধ কবে কি করুছ !

রমলা বলিল,—সারাদিনই দরজা বন্ধ ছিল, চিচিং ফাঁক !

রজত ধীরে দরজা খুলিল।

রমলা বলিল,—ছবি আঁকছিলেন এখন !

হাঁ, বলিয়া একখানি সাদা কাগজে ঢাকা ছবি বিছানার আড়ালে রাখিয়া দিল। রমলা উৎসুক হইয়া বলিল,—দেখতে পারি না ?

রজত ধীরে বলিল,—শেষ হলে দেখবেন।

রমলা হাসিয়া খুসে বলিল,—আপনার বন্ধুকে আজ আমি নিমন্ত্রণ করেছি, জানেন ?

তাহার চকল কালো চোখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর কর্তে রজত বলিল,—ও।

যতীন রজতের হাত ধবিয়া এক ঝাঁকুনি দিয়া বলিল—সারাদিন ত ঘরে বন্ধ ছিলে, চলো না একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

রমলা কৌতুকভরা মুখে বলিল,—জ্যোৎস্না এখনও ওঠেনি, না হলে সেই পদ্মদ্বিধিতে যাওয়া যেত।

রজত যেন একটু উদাস স্বরে বলিল,—আপনারা বেড়িয়ে আসুন, আমার ভাল লাগছে না।

রমলা একটু ব্যথিত হইয়া বলিল,—দেখুন—

যতীন তাহার দিকে চাহিয়া বলিল,—আমায় বলছেন !

রমলা বজ্রতের দিকে ফিরিয়া বলিল,—না, দেখুন—

রজত যেন একটু আশ্চর্য হইয়া বমলাব কালো-চোখের দিকে স্নিগ্ধ উজ্জল নবনে তাকাইয়া বলিল—আমাকে !

রমলা নম্রকণ্ঠে বলিল,—হাঁ।

রজত মুহূ হাসিয়া বলিল,—কি বলছিলেন ?

রহস্যমাখানো মুখে রমলা বলিল—হাঁ, ও কি মনে হল, ভুলে গেলুম।

যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া সে চূপ করিল। তিন-জনেই চূপচাপ। একটু পরে রমলা বলিয়া উঠিল—রান্নাঘরে চলুন, দেখে আসি পোলাওটা কতদূর।

রমলা চলিয়া গেল। দুই বন্ধু বারান্দায় আসিয়া বসিল।

যতীন ধীরে বলিল,—আরও কিছুদিন এখানে আছ ত ?

রজত বলিল,—ঠিক নেই, দু'একদিনের মধ্যেও চলে যেতে পাবি।

যতীন আশ্চর্য হইয়া বলিল,—কেন হে ?

রজত চূপ করিয়া রহিল। যতীন বলিল,—আমার ত সেই দিনই চলে যাবার কথা ছিল, কিন্তু তোমার পান্নায় পড়ে—কাল কিন্তু যেতেই হচ্ছে।

দুইজনে নীরবে চুপট টানিতে লাগিল।

সহসা মাধবীকে তাহাদের দিকে আসিতে দেখিয়া দুইজনেই চুপট ফেলিয়া নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইল, যতীন তাহাব চেয়ারটা একটু অগসব কবিয়া দিল ; কিন্তু মাধবী তাহাদের নিকট না আসিয়া পাশেব সিঁড়ি দিয়া উপবে চলিয়া গেল। দুইজনে একটু বিস্মিত হইয়া আবার চেয়ারে বসিয়া চুপট ধবাইল। একটু পরে মনিয়া আসিয়া

তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল,—আপনাকে সাহেব ভাক্ছেন উপরে।

রজত ফিরিয়া বলিল,—আমাকে ?

মনিষা যতীনের দিকে চাহিয়া বলিল,—না, আপনাকে।

বজ্রত বিস্মিত হইল না, ধীরে বলিল,—আচ্ছা, যতীন যাও।

যতীন চলিয়া গেল। সম্মুখে শালবনের মাথার উপর দিয়া চন্দ্র উঠিতেছে তাহার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রজত বসিয়া রহিল।

রাজে খাবারের টেবিলে সবাই প্রায় চুপচাপ কাটাইল। রজত এত কম খাইল যে রমলাও আশ্চর্য হইল। যতীন শুধু মাঝে মাঝে রান্নার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া, শিল্পীর আহাবেব সহিত ইঞ্জিনিয়ারের আহারের তুলনা করিয়া টেবিল স্রব্ধরম রাখিয়াছিল। রমলার প্রসন্ন মুখের দিকে মাঝে মাঝে তাহার চোখ পড়িতেছিল বটে কিন্তু মাধবীর স্থির দামিনীর মত পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের প্রতি তাহার মুগ্ধ নয়ন বার বার আকৃষ্ট হইতেছিল। রজত শুধু একবার পোলাওএর প্লেট হইতে রমলার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। দেখিল তাহার মুখে চোখে আজ যেন আনন্দের বান ভাকিয়া আসিয়াছে। রজত ঠিক দেখিয়াছিল, কিন্তু ভুল বুঝিল। রমলাব আজিকার আনন্দ শুধু যতীনের খাওয়ানার আনন্দ নয়, নিজের হাতে বাঁধিয়া পরিবেষণ করিয়া যে কোন পুরুষকে খাওয়াইতে প্রতি নারীর বুকেব যে সেবিকা মা পরম সুখ পান—এ সেই আনন্দ।

খাওয়া শেষ হইবামাত্র যতীন প্রত্যেকটি রান্নাব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া, খাবার ঘবেই সকলের নিকট বিদায় লইয়া অতি ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া গেল।

রজত ধীরে নিজের ঘরে গিয়া চুকিল; ঘরে থাকিতে ভাল লাগিল না। বারান্দা ঘুরিতে ঘুরিতে ড্রয়িংরুমের সামনে আসিয়া পড়িল, বারান্দার ধারে সাজানো ফুলগাছের টবগুলির পাশে এক কোণে চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল।

দেখিল, যতীনের মোটরকাবটা রাজপথের গাছের সারিব মধ্য দিয়া আলেয়াব আলোব মত দূর হইতে

দূরান্তরে সবিধা যাইতেছে। সহসা পূর্বাঙ্গের গাছের সারিব দিকে চোখ গেল। দেখিল, একটি ছায়া-মূর্তি অতি দ্রুতবেগে পামগাছগুলির আড়ালে আড়ালে উঠিয়া আসিতেছে। মূর্তিটি একটু নিকটে আসিলে বুঝিল, নারীমূর্তি। স্নানজ্যোৎস্না গাছের ছায়ায় অন্ধকারে তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল না। শুধু শাড়ীব ঝলমলানি, সাপের কণার মত উদ্যত বেণী আর হাতে একখানি সাদা কাগজ।

ব্যথিত ক্ষুদ্র স্বরে আপন মনে, O the flirt, coquette! বলিয়া, হাতের সিগারেটটা টবে ছুড়িয়া ফেলিয়া সে সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। দীর্ঘাঘম্মম চোখে কেহ ঠিক দেখে না, রজতও ভুল দেখিল।

রাজি গভীর হইয়াছে। রমলা বহুক্ষণ নিজের ঘরে চঞ্চল হইয়া ঘুরিল। চেয়াবে বসিয়া বিছানায় শুইয়া আয়নায মুখ দেখিয়া জানালায মুখ বাড়াইয়া এটা ওটা নাড়িয়া হু'একটা গজলের স্বর গাহিয়া কি আনন্দে উল্লসিত হইয়া সে আপন ঘর হইতে বাহির হইল। পাশের ঘরে গিয়া মাধবীর সহিত গল্প করিবার বৃথা চেষ্টা কবিয়া নীচে নামিয়া আসিল। ড্রয়িংরুম মহারহস্যময় অন্ধকারে ভরা, শুধু পিয়ানোর কাছটা জ্যোৎস্নার আলোয় একটু উজ্জ্বল হইয়াছে। সে ধীরে গিয়া পিয়ানো খুলিয়া বাজাইতে বসিল। এ যেন নিশীথ রাতের অন্ধকারে ধীবে ধীবে আসিয়া প্রিয়ের কানে চূপে চূপে কি কথা বলিতেছে। বড় মধুব, বড় করুণ সে স্বর, অনন্তকালের বিবহবেদনায় ভরা।

রজত চেয়াবে সোজা হইয়া বসিল, উঠিয়া যাইতে চাহিলেও পারিল না, তাহার চারিদিকে স্বরের স্বপ্নজাল স্রষ্টি হইল।

যখন তাহার চমক ভাঙ্গিল, দেখিল কাজীসাহেব তাহার পাশে আসিয়া বসিয়াছেন। সজীত কখন থামিয়া গিয়াছে, পিয়ানো-বাদিনী কখন চলিয়া গিয়াছে তাহা তাহার খেয়ালই হয় নাই। কাজীসাহেবের শ্রমশ্রমশ্রিত মুখেব দিকে চাহিল। এ লালমার সুখা-হলাহল-ময় নদী পাব হইয়া ভোগবতীব শেষে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, অতৃপ্ত অবসন্ন এই শ্রোত স্বরশিল্পীর পাশে বসিয়া

তরুণ চিত্রশিল্পীর নিবট এই স্নান জ্যোৎস্না রজনী বড়
করণ লাগিল।

ব্যর্থ বোঁবন, ব্যর্থ সব আশা, জীবনের মর্মস্থলে
যেন মায়াবিনীর বাসা, সে ভোলায়, মাতায়, হাসায়,
তারপরে কাদায়, ধরা কিছুতেই দেয় না। প্রাণ যদি
একটুকু কাহারও প্রেম হৃদয়-পেয়ালায় ভরিয়া নিজের তপ্ত
তৃষিত ওষ্ঠে ধবিতে চাষ অমনি পাত্র নিমেষে ভাঙ্গিয়া শত-
ধান হয়।

একটি পাখী জ্যোৎস্নায় মাতোষাধা হইয়া ডাকিতে
ডাকিতে উড়িয়া গেল। কীটসেব মত বজ্রতেব প্রাণ কোন
চিরব্যর্থতার বেদনায ভবিষ্য উঠিল—

O for a draught of vintage, that hath been
Cooled a long age in the deep-delved earth.
ধীরে রজত ডাকিল,—কাজীসাহেব।

স্নিগ্ধধরে কাজী বলিলেন,—কি ?

—আপনার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে জানি না,
আপনি সেই গানটা একবার আমায় শোনান।

—কোনটা ?

—মীরার যে গানটা সেদিন পড়ছিলেন।

দ্বিতীয়বার বলিতে হইল না। কাজী তাঁব ভাঙা
গলায় তপস্বিনীর ভক্তিপূত সঙ্গীত ধরিলেন।—

মুহানে চাকর রাখো জী।

চাকর রহস্‌, বাগ লগাস্‌, নিত উঠি দরশন পাস্‌,
বৃন্দাবন-কী কুঙ্ক-গলিন্-মেঁ তেরী লীলা গাস্‌ ॥

মুহানে চাকর রাখো জী।

হরে হরে সব বন বনাঁউ, বিচ বিচ রাখু বারী,
সাবলিয়াকে দর্শন পাঁউ পহির কুসুমী সারী ॥

মুহানে চাকর রাখো জী।

গান শেষ হইলে রজত ধীরে বলিল,—কাজীসাহেব,
আব আপনাকে জাগিয়ে রাখব না, ঘুমোতে যান,
কালই আমি বোধ হয় চলে যাছি।

—কালই ! কেন ?

—হা, তাই ঠিক করলুম।

—না না, আমরা ছাড়লে ত।

—না, কাজীসাহেব।

তাহাব গলার ব্যাধরা সুরে চমকিয়া কাজী ধীরে
তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন,—অত অধীর হলে চলবে
কেন, আর আপনার বন্ধুটিকে আনুলেন কেন, ওকে
আমার মোটেই পছন্দ হয় না—গোলযোগ বাধাতে উনি
মজবুৎ—কিন্তু আমার কথা যদি শোনেন, যাবেন না।
রজত একবার কাজীসাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া
কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া গেল।

মধ্যরাত্রি। কাজীসাহেবেব ঘুম বাব বার ভাঙ্গিয়া
যাইতেছিল, বুকের সব রক্ত ঘেন মাথায গিয়া উঠিয়াছে।
তিনি ধীরে বারান্দায় বাহিব হইলেন। বজ্রতের ঘবে
তখনও আলো জ্বলিতেছে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।
অবারিত দ্বার দিয়া ধীরে ঢুকিয়া দেখিলেন, রজত নিবিষ্ট
মনে রমলার ছবি আঁকিতেছে, সে ঘেন চোখ বুজিয়া
তুলি বুলাইয়া চলিয়াছে। ক্ষীণদৃষ্টি কাজীসাহেবের নিকট
এ মূহু বাতির আলোয় ছবি আঁকা অসম্ভব বলিয়া বোধ
হইল। কাজীসাহেব স্তব্ধ মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া দাড়িতে
হাত বুলাইতে লাগিলেন।

রজত ফিবিয়া তাকাইল, কাজীসাহেবের ভাবে-ভরা
ভাসা ভাসা চোখের উপর তাহাব দীপ্ত চক্ষু চশ্মাব
কাচ ভেদ করিয়া গিয়া পড়িল। তাঁহার জটীর মত
কেশ, গৈরিক বেশের উপর চোখ বুলাইয়া মূহু হাসিয়া
রজত আবার ছবিতে মন দিল।

কাজীসাহেব একটি গান মূহু গুঞ্জরণ কবিত্তে করিতে
ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। বাকী রাতটুকু আর
তাঁহার ঘুম হইল না।

পরদিন প্রভাতে চায়ের টেবিলে যখন রজত যোগেশ-
বাবুকে জানাইল, সে আজই চলিয়া যাইতে চায়, রমলা
কিন্তু মাধবী কোন কথা বলিল না, কেহ কাহাবও মুখের
দিকে তাকাইতে সাহস করিল না, আশ্চর্য্যাস্থিতও হইল
না, যেন এ ঘটনা ঘটিবে তাহা তাহারা জানিত। যোগেশ-
বাবুও বিশেষ কিছু আপত্তি করিলেন না। বলিলেন,
যদি সুবিধা-বোধ না হয় তিনি জোর করিয়া রাখিতে
চান না। গতবাত্রির মদের ঝোঁকটা তখনও তাঁহার ঘাঘ
নাই। রজত বলিল—কলিকাতায় যাইয়া আর-একজন ভাল
আর্টিষ্টকে পাঠাইয়া দিবে।

রজত তাহার জিনিষগুলি গোছাইতেছিল, চামড়ার ব্যাগ খুলিয়া ছোটখাট জিনিষগুলি সাজাইতেছিল। নিঃশব্দে রমলা ঘরে প্রবেশ করিল, অর্ধেক ভেজান দরজার কাছে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া তাহার চিরবহস্তভরা সুরে বলিল,—আপনি সত্যিই চলে যাচ্ছেন ?

ক্ষণিকের জন্ত রমলাব লোঞ্জেরণুর মত রাঙা মুখের দিকে চাহিয়া রজত রংএর বাক্সটা শেভিংএর সরঞ্জামের পাশে রাখিল।

চুলগুলি দোলাইতে দোলাইতে রমলা বলিল,—কেন ভাল লাগল না ?

রজত রমলার অন্তঃস্পর্শ কালো চোখের দিকে একটুখানি চাহিয়া বলিল,—অনেক সময় খুব ভাল লাগলেই চলে যেতে হয়।

হাসির সুরে রমলা বলিল,—পালিশে যাচ্ছেন বুঝি !

রজত নীরবে তাহার ক্রমালগুলি গুছাইয়া রাখিতে লাগিল।

দরজাটা দোলাইতে দোলাইতে রমলা বলিল,—বা ! আমাদের ছবিগুলো ঝাঁকা হল না ?

ওই আপনাদের ছবি, বলিয়া বিছানার কোণ হইতে দুখানি ছবি রমলার সম্মুখে টেবিলে রাখিল। একখানি মাধবীর, আর-একখানি রমলার ছবি। প্রথমে আসিয়াই মাধবীকে যে রূপে দেখিয়াছিল,—সেই পামগাছের তলায় পাঠনিরতা মাধবী। আর রমলার ছবিখানি ডুলাক-অঙ্কিত ওমার খৈয়ামের সাকীর মত—জ্যোৎস্নার স্বপ্নভরা আলোয় হান্সাহানাকুঞ্জের পাশে সে দাঁড়াইয়া।

ছবিখানি টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া একটু দেখিতেই রমলার মুখ শরৎ-উষার আকাশের মত রাঙা হইয়া উঠিল। রজত তখন ধীরে ব্যাগেব উপর ঝুঁকিয়া কাপড় জামাগুলি কোনমতে গুঁজিয়া রাখিতেছিল। সেই নত দীর্ঘ দেহ বিপর্যস্ত কেশভরা স্তম্ভমুখের দিকে রমলা ক্ষণিক চাহিয়া রহিল। তাহার ইচ্ছা হইল, রজতের হাত হইতে ব্যাগটা টান মারিয়া কাড়িয়া লইয়া সমস্ত জিনিষ ঘরে ছড়াইয়া ফেলিয়া আবার ভাল করিয়া গুছাইয়া দেয়। রমলার রাঙা মুখের দিকে কটাক্ষ করিয়া রজত বলিল,—কেমন হয়েছে ?

দৃষ্টান্তে রমলা বলিয়া উঠিল,—এ কাকাবাবুকে দেবেন না।

বাঁশীগুলি ব্যাগে রাখিতে রাখিতে রজত বলিল,—তবে দিন, ব্যাগে পুরে নি, এখনও জায়গা আছে।

ভীতলজ্জিতভাবে হুকুমের ভঙ্গিতে রমলা বলিল,—না, এ কক্ষনো কাউকে দেখাতে পাবেন না।

রমলার প্রদীপ্তমুখের দিকে চাহিয়া রজত বলিল,—তবে দিন আমি নিয়ে যাই।

রজতের দিকে স্নিগ্ধ কটাক্ষ করিয়া—না আমি নিয়ে চল্লম, বলিয়া রমলা ছবিখানি ঝাঁচলে ঢকিয়া ছুটিতে ছুটিতে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আপনার ঘরে ঢুকিয়া দরজায় খিল দিল।

বাকী জিনিষগুলি যে-কোনপ্রকারে তাড়াতাড়ি পুরিয়া রজত বাক্সটা কোনমতে বন্ধ করিয়া বাঁচিল। চেয়ারটায় যেন অতি শ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে মাধবী আসিয়া দরজার গোড়ায় দাঁড়াই-তেই সে ধীরে দাঁড়াইয়া উঠিল।

ধীরকণ্ঠে মাধবী বলিল,—আপনি আজ যাচ্ছেন ?

নম্রকণ্ঠে রজত বলিল,—হাঁ।

মাধবী একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, কেন চলে যাচ্ছেন, কয়েকদিন বাদে গেলে হত না ? মনে মনে যাহা ভাবা যায় তাহার সবই যদি বলা যাইত তবে জীবনে স্তব্ধ বাড়িত কি কর্মিত বলিতে পারি না, তাহাই বোধ হয় ভাল হইত। সে যাহাই হউক, মাধবী কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পাবিল না, স্থির মূর্তির মত দাঁড়াইয়া ধীরে বলিল—পুস্পু ঠিক করিতে হবে কি ?

—না ; মোটরেই যাব।

আচ্ছা, আগি মনিয়াকে দিয়ে চিঠি লিখে পাঠাচ্ছি। সঙ্গে কি খাবার দেব ?

—কিছু দেবার দরকার নেই।

—না, রমু কোথায় গেল, সে কি রোষ্ট আর পুড়িত করবে বলছিল—আপনার থাকতে অনেক অসুবিধে হল, ক্ষমা করবেন।

স্নিগ্ধ বিনীতকণ্ঠে রজত বলিল,—না, না, আমারই যদি কোন দোষ হয়ে থাকে, আমায় ক্ষমা করবেন

হির হইয়া মাধবী দাঁড়াইয়া রহিল। এই পদ্যরাগের মত রাঙা মুখ, নিখুঁত সৌন্দর্য্যভরা দেহ, এ যেন কত রাত্রির অশ্রু জমাট হইয়া দীপ্ত শুভ্র হইয়াছে, এ যেন মুষ্টিমতী বেননা, ওই শুভ্র স্তন্যের কপোলে কত ব্যথাময় দুঃখরাত্রি আঘাত করিয়াছে, কিন্তু কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই, এ যেন কত ব্যথা সহিয়াছে, কত ব্যথা সহিবে। এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যময় বেননার দিকে চাহিয়া রজতের মাথা নত হইয়া আসিল।

বারান্দার শেষপ্রান্তে যতীনের টুপি দেখা যাইতে মাধবী ধীরে সরিয়া গেল।

—হ্যালো রজট, এ কি, এত বিমিস্বে পড়েছ, cheer up old boy!—life—struggle—energy,—বলিয়া রজতের পিঠ চাপড়াইয়া হাতে ঝাঁকুনি দিয়া হাত পা ছুড়িয়া যতীন সমস্ত ঘর যেন কাঁপাইয়া তুলিল।

রজত ধীরে হাসিয়া বলিল,—আমি ত আর তোমার মত একটা machine of money-making নই যে দিন-রাত সমানবেগে ঘুরছি আর ঘুরছি।

—তা বটে, তোমরা আর্টিষ্ট।

—হাঁ, আমরা ভাই, গ্রীষ্মে জলি, বর্ষায় কাঁদি, শবতে হাসি, বসন্তে উদাস হয়ে বেরিয়ে পড়ি।

—ভাগ্যবণ্ড আর কি—তোমার চেয়ে আমাব কলে যে কুলীটা খাটে সমাজে তার বেশী প্রয়োজন, জ্ঞান? আরে packing? তাই বল, so sorry, কি হল?

—এই ত বল্লে, ভাগ্যবণ্ড, এক জামগা বেশী দিন সহিবে কেন?

—তা বটে, যেখানে যাবে একটা গোলযোগ বাধাবে, নিজে টিকবে না, আর কাউকে টিকতে দেবে না।

—তুমিও কি আজ যাচ্ছ?

—তা বলতে পারছি না, that depends,—বলিয়া যতীন থাকিয়া গেল।—আচ্ছা, তুমি শুছোও, স্থিথের কাছে ঘুরে আসছি, cheer up—বলিয়া রজতকে আব-এক ঝাঁকুনি দিয়া সে চলিয়া গেল।

যতীন কিন্তু সত্যিই স্থিথসাহেবের কাছে গেল না। সে গেটের নিকট আসিয়া এক পামগাছের কাছে দাঁড়াইল। একখানি চিঠি গাছের তলায় তীব্রত পাখীর

মত আসিয়া পড়িল। দৃঢ়হস্তে খামখানি তুলিয়া ছিঁড়িয়া পড়িল। আইভারি-ফিনিস কাগজের এককোণে এক লাইন লেখা। তাহার চোখ নাচিতে লাগিল, মুখ দৃঢ় একটু ক্রম্ব হইল। কাগজখানি হাতের মুঠায় পাকাইতে পাকাইতে প্যাণ্টের পকেটে পুবিয়া সে একবার লালবাড়ীটার দিকে চাহিল, তারপর একটু টলিতে টলিতে মোটরের দিকে অগ্রসর হইল। মোটবে উঠিয়া আব-একবার বাড়ীটার লাল পথের দিকে চাহিল। ইউক্যালিপ্টাস্ গাছের সারিব পাশ দিয়া মাধবীর শাড়ীর লাল পাড় লাল কাকরের উপর লুটাইয়া অদৃশ হইয়া গেল। সেই সময় রজত যদি ড্রইংরুমের সম্মুখে বারান্দার কোণে থাকিত তবে সে ছয়ত তাহার স্টুটকেন্সে বংএর বাক্সটা তখনও ভবিত না, কিন্তু তখন সে একটা সিন্ধের রুমালের মধ্যে রমলার একটি ছোট ছবি রাখিয়া বাক্স বন্ধ করিতেছিল। আর তাহার উপরের ঘরে রমলা তাহার বাক্স খুলিয়া শাড়ীগুলির তলায় নিজের ছবিখানি রাখিতেছিল।

যতীনের মোটরের পেছনে-ওড়ানো লালধূলি দেখিতে দেখিতে মাধবী ধীরে ধীরে গেটের দিকে অগ্রসর হইয়া তাহার প্রিয় পামগাছের তলায় আসিল। মোটরের শব্দ যখন দূরে মিলাইয়া গেল, সে কাকরের উপরই যেন অতি পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। শূন্যমনে বৌদ্ধভবা প্রান্তরের দিকে চাহিয়া রহিল। আকাশ-আলোক অতি উদাস, চারিদিক নিয়ুম, যেন বৌদ্ধময়ী রাত্রি।

কাজী সাহেব তখন ধোঁগেশ-বাবুকে জেবুয়েসাব কবিতা-শুনাইতেছেন—

গুণ্ণতম্ আজ্ ইশ্কে বুতা

আয়্ দিল্ চে হাসিল কর্দাই।

গুণ্ণত্ মাবা হাসিলে জুজ

নালাহয়ে হাম্ নিস্ত্ ॥

ভালবাসার অনেক কথাই ত বলা হইল, কিন্তু ওরে আমার মন, তুই কি লাভ কবিলি? মন উত্তর করিল,— অশ্রুমালা ভিন্ন আর কিছুই নশ।

পর ক্রোশ, ক্রোশেব পব ক্রোশ। অনন্তের চিরচঞ্চল চিরকল্লোলময় স্নিগ্ধনীল রূপের পাশে চিরস্থির বিবাত শূন্যতাময় উদাস স্তব্ধ ধূসর রূপ—তাহার উপর চিব-জ্যোতির্ধ্বংসেব গমনাগমনের পদরেণু জ্যোতিষ্কমণ্ডলেব নর্তনমঞ্চ অনন্তব্যোম।

রাত্রির রহস্যময় অন্ধকারের ভিতর ধূসর বালুভূমির উপর দিয়া একখানি জীর্ণ খর্জুরপত্রাচ্ছাদিত গরুর গাড়ী চলিয়াছে। কথেকথানি কালো মেঘে দশমীর চাঁদ ঢাকিয়া গিয়াছে, ছোট ছোট দৈত্যের মত ছিন্নকালো মেঘভরা আকাশের তারাগুলি পথহারা শিশুদেব মত করুণ নয়নে তাকাইয়া আছে—পথহীন জনহীন ভূমি অন্ধকারের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, চারিদিকে তিমির-রাত্রির মায়া, তাহার মধ্য দিয়া মানবেব এই অতিপ্রাচীন যানটি রাত্রির পবপারে কোন অরুণ-লোকেব যাত্রী।

গরুর গাড়ীটি একটু বেগে চলিতেছে, তাহাব কেবো-সিনের লঠনের যুঁহু আলো বালুকারাশির উপর ঝকঝক করিতেছে, শীর্ণ গরু দুইটি মাঝে মাঝে ঝিমাইয়া পড়িতেছে, আর বিঁড়ি টানিতে টানিতে উড়িয়া গাড়োয়ান তাহাকে পুছ মলিখা ঠেলা দিয়া জাগাইয়া দিতেছে; তারাগুলিব মত করুণ চোখে চাহিয়া গরু দুইটি মেঘাচ্ছন্ন পথের দিকে অগ্রসর হইতেছে, গলাব ঘণ্টাগুলি বাজিয়া উঠিতেছে,—কতদূর আর কতদূর?

গাড়ীর ভিতর বহুক্ষণ নিদ্রা যাইবার বুঝা চেষ্টা করিয়া যে বুঝকটি মাথাব চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে উঠিয়া বসিল, সে রজত। পিছনের ঝাঁপি তুলিয়া দিয়া ছাউনির গায়ে এক বালিশ রাখিয়া তাহাতে হেলান দিয়া বসিয়া সে একটা চুরুট ধরাইল। চারিদিক যুহুপুহুীর মত নির্জন, ছায়াব ভরা, সমুদ্রের কল্লোল হৃদবদেশেব অগ্নের মত, বুকচাপা দীর্ঘনিশ্বাসের মত অতি যুঁহু বাতাস বহিয়া বালুকারাশি কাঁপাইয়া সিরসির করিয়া বহিতেছে, একটি তারা মাথার অতি নিকটে জ্বলিতেছে, তাহা নিশ্বাস যেন গায়ে লাগিতেছে। রজতের গা সিবসিব করিতে লাগিল, কিন্তু পায়ের কাছেব চাদরটা টানিয়া লইতেও কুঁড়েমি ধরিল। এই তৃণহীন জীবহীন পথহীন বালু-সমুদ্রের উপর দিয়া রাত্রির অন্ধকারে কোথায় তাহার

যাত্রা! কোনারকের যে শিল্পসৌন্দর্য তাহার মনকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, প্রাতিপ্রভাতে তাহার ত দেখা মিলিবে। কিন্তু? ধীরে সে চাদরটা তুলিয়া লইয়া পায়ের জড়াইল, চিররহস্যময় আজন্ম-ঈপ্সিত দুইটি কালোচোখ তাহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। এই অসীম স্তব্ধ শূন্যতা ছাড়াইয়া অন্ধকাব ছাড়াইয়া সে চলিয়াছে;—পথের কোন সঙ্গিনীর জ্ঞাত, কোন কণ্ঠেব কথাগীতের জ্ঞাত, কোন মুখের দীপ্ত আলোর জ্ঞাত প্রাণ ভূষিত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে।

একটি ছোট নদীর তীরে গাড়ী আসিয়া পৌছাইল। অন্ধকাব রাত্রির চোখের জলের মত নিবাখিয়া নদী মরুভূমির বুক হইতে উৎসারিত হইয়া অতি ধীরে বহিয়া যাইতেছে। কয়েকটি পাখীর ডানার শব্দে আকাশ শিহরিয়া উঠিল, মেঘ সবিয়া গিয়া চাঁদের আলো দেখা দিল, বাতাস জোবে বহিতে লাগিল। নদীজলের ছল-ছল শব্দে রজত যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল। অন্ধকাবের বৃকে কোন জাঁখির আলোর জ্ঞাত প্রাণের কান্নার মত এই নদীটি!

ধীরে ধীরে রজত গাড়ী হইতে নামিয়া লোহা-বাঁধানো পাহাড়ে লাঠিটি লইয়া নদীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে কালো ছায়ার মায়া, চাঁদ হইতে ঝরিয়া-পড়া আলো সে অন্ধকারে যেন পথ হারাইয়া কেলিয়াছে। নদীর পবপারে কয়েকটি মানুষের কণ্ঠ শোনা যাইতেছে, কয়েকটি উড়িয়া পাকীবেহারাদের গুঞ্জন, দুইটি আলো মিটিমিটি জ্বলিতেছে।

এই জল, আলো, মানুষের কণ্ঠ শুনিয়া রজতের মন যেন সচেতন হইয়া উঠিল। ধীরে নদীর তীরে বসিল। সহসা পরপাবের মাথালোক আগুনের রংএ রঙীন হইয়া উঠিল। উড়িয়া বেহারাগুলি আগুন জ্বলাইয়া তামাক খাইশে বসিয়াছে। আগুনের রাজা শিখার চারিদিকে গোল হইয়া তাহারা বসিয়াছে। তাহাদের কালো মুখ হলুদের রঙে ছোপানো। নিকটে পাকীর উপর হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া এক তরুণী মূর্তি, ঠিক একখানি ছবির মত, মুখ ঠিক দেখা যাইতেছে না শুধু তাহার শাড়ীর ঝলমলানি আব কথার স্বর আর তাহার সুতীক্ষ্ম সুস্পষ্ট ছায়া অগ্নিশিখাময় পটে ছবির মত ঝাঁকা।

গরুরগাড়ীখানি যখন নদী পার হইয়া অপর তীরে আসিয়া পৌঁছিল তখন পাক্কী সম্মুখে বহুদূর পথ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। রক্ত দূরে মরীচিকাব মত পাক্কীর আলোর দিকে চাহিয়া রহিল। গাড়ী মুহূর্ত্তে আন্তনাদে চলিতে লাগিল।

দূবে অন্ধকারে গাছের ছায়ায় একটি ছোট গ্রাম সুস্পষ্ট, মাঝে মাঝে এক-একটা গাছ যেন পথের ধার হইতে মুখ বাড়াইয়া আবার অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছে, অন্ধকারের ভিতরে হরিণের পাল কোথায় ছুটিয়া গেল। যাত্রাপথের বিভীষিকা যেন কাটিয়া যাইতেছে, বিরাট শূন্যতা প্রাণের হিল্লোলে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে,—লক্ষ-কোটি তারার গমনাগমনের ছন্দ, কত শত কীটপতঙ্গের রিনিঝিনি। এ পৃথিবী জুড়িয়া যাত্রার সহিত রক্ততও চলিয়াছে।

ধীরে বাঁশীটি লইয়া বজ্রত একটি গানের সুর বাজাইতে লাগিল, পিছনে-ফেলা নদীর কালো জল যেন বালুতটের কানে কানে তাহারি গানের কথা কহিয়া যাইতে লাগিল,—

“আমি তোমায যত শুনিয়েছিলাম গান

তার বদলে আমি চাইনি কোন দান।”

সম্মুখপথে পাক্কীতে বসিয়া রমলা পাক্কীবেহারাদের করুণ গুঞ্জরধ্বনিব সুরে সুরে গাহিতেছিল—

“এইটুকু মোব শুধু রইল অভিমান,

ভুলতে সে কি পার ভুলিয়েছ মোর প্রাণ।”

পাক্কী ও গরুর গাড়ী চলিয়াছে, আলো-অন্ধকারের স্রোতের ভিতর দিয়া। দুই যাত্রী পরস্পর হইতে বহু-দূরে, তবু তাহারা পবস্পরেব সঙ্গ অল্পভব করিতেছে।

একে একে তারা নিভিয়া যাইতেছে, জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া আসিতেছে, বাতাস থামিয়া গিয়াছে। আসমুদ্র চন্দ্রভাগা উষার আলোক-আধারে শুক। জ্যোতির্ষ্ময় সন্তান জন্মের প্রসববেদনার মত সমস্ত আকাশ কাঁপিতেছে।

পূর্বাকাশে রক্তবিন্দুর মত এক অগ্নিস্থলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, ধীরে ধীরে দিকে দিকে অগ্নিশিখা নাচিয়া উঠিতেছে।

রক্ত গাড়ী হইতে নামিয়া লাঠি হাতে কবিয়া

পূর্বাকাশে অনল-ভবা মেঘস্বূপের দিকে চাহিয়া গাড়ীর আগে আগে চলিল। কাঁধ বদলাইতে সম্মুখে পাক্কী একবার থামিল, তাহার তরুণী আরোহিণী নামিল, উষার বক্তমায়াব রক্ত তাহার স্বপ্নমূর্ত্তি আবার দেখিতে পাইল।

হাজিবিবাহেব পথের সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়িল। সেই যে অন্ধকার রাত্রির দিকে ঝুঁকিয়া-পড়া তীর-বৈধা নীড়-হাবা পাখী যাত্রা করিয়াছিল, সে যেন জ্যোতির্ষ্ময় লোকের দ্বাবে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সমুদ্রের জলে স্নাত নির্মল দুই পাখা মেলিয়া আবার নব আলোকেব যাত্রা শুরু করিয়াছে।

আকাশবীণার স্বর্ণতন্ত্রীতে আলোকের জয়গান বাজিয়া উঠিল; পৌঁছিয়াছে, অন্ধকার রাত্রি পার হইয়া জ্যোতির্ষ্ময়ের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তিমিবহুধার উন্মুক্ত করিয়া তিনি আবিস্কৃত হইয়াছেন। গলিত সোনাব মত আলোব ধাবা পূর্বাকাশ হইতে ঝরিয়া পড়িয়া সমুদ্রতরঙ্গে রক্ত-তরঙ্গের মত গড়াইয়া আসিতেছে, রাত্রির কালো পাথরের উপর রাঙা আলোর তরঙ্গ আছাড়ি-পিছাড়ি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া ধূলিসম চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া যাইতেছে, বালুভূমি স্বর্ণরেণুব মত ঝিকিমিকি কবিত্তেছে, চন্দ্রভাগার তীর্থজল রক্তচন্দন-স্রোতের মত দেখাইতেছে।

কোনাকের মন্দির পূজাপ্রদীপের শিখার মত জ্বলিতেছে। তাহার ভগ্নচূড়ায়, তাহার মকশয্যানিমগ্ন পাথরগুলিতে তাহাব বনশিখরে আতপ্তরক্তেব প্রলেপ মাখানো, রাঙা আকাশের পটে পূজারত সাধক-মূর্ত্তিব মত আঁকা। সূর্য-দেবতার প্রতি মানব-অস্তরের চিরন্তন বন্দনা, শিল্পীর এই মানস-কমল ধরণীর বুক হইতে উচ্ছসিত জয়গানের মত এই জনশ্রুত সমুদ্রকূলে বালুভূমে শতাব্দীর পর শতাব্দী জাগিয়া আছে, দিনের পর দিন নব নব যাত্রীদলেব কানে কানে পাথরের বন্দনাগান বাজিয়া উঠিতেছে,—জয়, আলোর জয়, সূর্যদেবতার জয়!

রাঙা আলোর মায়া ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইতেছে। ছুধেব মত সাদা আলো, চারিদিকে প্রথর প্রদীপ্ত আলো।

তরুণী পাক্কীর ভিতর উঠিয়া বসিয়াছে, ছয় বেহারার

কাঁধে পাকী ঘেন উড়িয়া চলিয়াছে। দুবে মিলাইয়া গেল।

বজ্রত ধীরে গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী চলিতে লাগিল।

সেইদিন সন্ধ্যায় মৈত্রীবনেব স্বিকৃষ্টাধায় এক বটগাছের নির্জন কোণে রজত ও রমলা পাশাপাশি আসিয়া বসিল। সমস্ত দিন ধরিয়া তাহাবা কোনাবকের মন্দির ঘুরিয়াছে, প্রতি শিলা, প্রতি মূর্তি বেন প্রদক্ষিণ করিয়াছে। রজত রমলাকে সব বুঝাইয়া দিয়াছে—এই উড়িয়ার শিল্পধারার সঙ্গে ভাবতের অন্ত শিল্পধারার যোগাযোগ, ইহাব শিল্পপ্রণালীর কৌশলগুলি, সূর্য্যমূর্তি সম্বন্ধে কোন্ পণ্ডিত কি বলিয়াছেন, রাজহস্তীর স্ববিপুল গাভীর্ঘ্যময় মূর্তি, অক্ষণ-অশ্বে গতির ভাবাত্মক মূর্তি, ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া মালাঙ্গুল নরসিংহের এই আশ্চর্য্য শিল্পকীর্ত্তিব ব্যাখ্যা করিয়াছে।

সমস্ত দিন বাহিবের কথাই হইয়াছে, দুই জনেব মনে যে কথাগুলি কানায় কানায় ভরা ছিল, সে মনের কথা কেহ কিছুই বলে নাই।

দুইজনে পাশাপাশি বসিল, চারিদিকে আলোছায়ার শায়া, সম্মুখে একাদশীর চন্দ্র উঠিতেছে।

রমলা ধীরে বলিল—আচ্ছা, তুমি অমন করে' চলে' গেলে কেন ?

ধীরে রমলাব হাত নিজের হাতে টানিয়া রজত বলিল—সে আর-একদিন বল্ব, আজ থাক—আচ্ছা তুমি যতীনের বিয়েতে গিয়েছিলে ?

রমলা বলিল—না যাইনি। তুমিও যাওনি ?

আঙ্গুলে আঙ্গুল জড়াইয়া ধরিয়া রজত বলিল—আমি ত কল্‌কাতায় ছিলুম না; চিঠিটা কল্‌কাতা ঘুরে আগ্রা যাব, সেদিন তাজমহল দেখে ফিরছি, ঘরে এসে দেখি একখানা লাল চিঠি, সমস্ত রাত সেখানা খুলতে সাহস হয়নি।

ও,—বলিয়া রমলা হাসিয়া উঠিল, গাছের পাতাগুলিও সে হাসিতে নাচিয়া উঠিল।

রজত বলিল,—হাঁ, পবেব দিন যখন খুলে পড়লুম মাদবীর সঙ্গে বিয়ে—

তারপর, কি করলে ?—বলিয়া রমলা ছুটামিভাবে চোখে চাহিল।

তাহাব হাতের সোনার চুড়িগুলি নাড়িয়া টুং টুং মিষ্টি শব্দ করিতে করিতে রজত বলিল,—তখন 'প্যাক্ করে' ষ্টেশনেব দিকে ছুটলুম।

—বিয়েতে যেতে ?

—না।

—তবে ?

বমলার মুখের দিকে বিছাৎ-বটাক করিয়া রজত বলিল—তোমার সন্ধানে। ভাবলুম সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী যখন বাঁধা পড়েন নি, একবার ত দেখা পেয়েছিলুম এই পাথরের রাজ্যে, কবর ঘুরে শিল্পমন্দিরীর সন্ধান করে' আর কি হবে।

—শিল্প দেখার নাম করে' বেশ দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান হয়েছে ! কোথায় কোথায় গিয়েছিলে ?

—দিল্লী, আগ্রা, অমৃতসর।

—বেশ, দিব্যি একা একা বেড়িয়ে আসা হল !—জান, তোমার জন্তে এবার আমার পরীক্ষা দেওয়া হল না ?

হাতে হাত জড়াইয়া বজ্রত বলিল,—আর তোমার জন্তে আমাব একখানাও ছবি আঁকা হয় নি, আব কিছুদিন হলে starve করিয়ে ছাড়তে।

কাঁধে কাঁধ ঠেকাইয়া দুইজনে বসিয়া রহিল।

রমলা ধীরে বলিল—আচ্ছা, জীবনটা কি মজার, নশ ? পৃথিবীটা মাঝে মাঝে এমন অদ্ভুত লাগে, যখন ভাবতে বসি কিছুই বুঝতে পারি না।

তাহার চুলগুলি লইয়া খেলিতে খেলিতে রজত বলিল—বুঝতে না চেষ্টা করাই সবচেয়ে ভাল, ততক্ষণ পিয়ানো বাজালে—

রমলা ধীরকণ্ঠে বলিয়া যাইতে লাগিল—আচ্ছা ধবো, সাত মাস আগে, তুমি কোথায ছিলে, আমিই বা কোথায ছিলুম, কেউ কাউকে জানতুম না ত, মাঝে মাঝে ভাবি কে যেন টেনে নিয়ে যায়, সে কি ঘটাবে, কি দেখাবে, কোন্ পথে নিয়ে যাবে, কত লোক তাকে কত কি বলে, কেউ বলে Fate, কেউ circumstances, কেউ God, কেউ Life force, আমি কিছুই বুঝতে পারি না।

ধীবে রমলার কাঁধে হাত রাখিয়া রজত বলিল,—কি দরকার বুঝে? চেখে দেখ কি সুন্দর রাতটা—এই সাগর আর মরুভূমির মাঝে মন্দিরটা—এর দিকে চাইলেই যেন মনে হয় মাছুষ শুধু সাগর ডিঙায়নি, মরুভূমি পার হয়নি, বারুদ কামান তৈরী কবেনি, সে মনের আনন্দে সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে।

অতি মিষ্টি গলায় রমলা ডাকিল,—এই!

রজত ধীরে উত্তর দিল,—কি?

একটু ঘেন ভীত হইয়া রমলা বলিল,—ওদিকে কিসের শব্দ হচ্ছে।

রজত একটু হাসিয়া বলিল,—সাপটা প হবে।

রমলা একটু গম্ভীর স্বরে বলিল,—আচ্ছা, যে এমন সুন্দর রাত, এমন চাঁদের আলো সৃষ্টি করেছে, তার সাপ সৃষ্টি করবার কি দরকার ছিল, যদি সাপকে সুন্দর করেই তৈরী করলে, তার মুখে বিষ ভরে' দিলে কেন—

রজত বলিল,—এক হাতে প্রাণ আর এক হাতে মৃত্যু, এক হাতে ফুলের মালা আর এক হাতে বস্ত্র—ধাক্ ও সব কথা। দেখ, ওটা সাপ নয়—একটা হরিণ, কি সুন্দর চোখ দুটো! নয়?

রমলা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—lovely!

রজত হাতের সহিত হাত জড়াইয়া বলিল,—তোমার সেই The moon shines bright in such a night as thisটা আরম্ভ করনা।

রমলা রজতকে একটু ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া বলিল,—যাও।

বজ্রত আবার সরিয়া বসিল, রমলার আঙ্গুর-আঙ্গুল-গুলি ধরিল। রমলার মনে হইল রজতের দেহ যেন একটি বাঁশী, রক্তধারার ছন্দে কি সুর বাজিতেছে তাহা তাহার দেহের স্পর্শে অনুভব করিতে লাগিল। আর রজতের কাছে রমলা মুষ্টিমতী সঙ্গীত, পথহারা সমস্ত রাগরাগিনী যেন তাহার মধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। হাতে হাত জড়াইয়া দুইজনে বসিধা রহিল।

তাহাদের ঘেরিয়া পিছনে বনের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, মন্দিরের প্রতি শিলায় মৃদঙ্গের মত জীবনকল্লোলময় কোন্ নীবে সঙ্গীত বাজিতে লাগিল। সম্মুখে একে একে তারা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, সোনালী বালুচরে জ্যোৎস্না ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু

উপনিষদে শিক্ষা-প্রণালী ও ব্রহ্মবিদ্যায় ব্রাহ্মণের প্রভাব

আশ্রম বিভাগের উদ্দেশ্য ও প্রাচীনত্ব।

পূর্বের দ্বিজাতিগণের জীবন চারি আশ্রমে বিভক্ত হইত এবং তাহার প্রথম আশ্রম কেবল বিদ্যাশিক্ষার জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। গ্রন্থাকর-জ্ঞানেই এ শিক্ষার পর্যাবসান হইত না, ইহা বিদ্যার্থীর সমগ্র জীবনকে নিয়মিত করিয়া তাহাকে ভবিষ্যতের দুঃখকষ্ট সঙ্ক করিবার উপযোগী করিয়া তুলিত। একজন ইহার নাম হইয়াছিল ‘আশ্রম’ [শ্রম্ তপসি খেদে চ]। এক্ষণে আশ্রম-বিভাগ পববর্তী কালের প্রবর্তন নহে; উপনিষদ গ্রন্থেই আমরা

ব্রহ্মচর্য (১), গৃহস্থ (২), বানপ্রস্থ (৩) ও সন্ন্যাস (৪) এই চতুরাশ্রমের স্পষ্ট নির্দেশ দেখিতে পাই।

ঋকসংহিতা (৫), তৈত্তিরীয় সংহিতা (৬), অথর্ব-সংহিতা (৭),-ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৮), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৯),

(১) ছান্দোগ্য ২, ২৩, ১। ৮, ১৫।

(২) ছান্দোগ্য ৫, ১০, ২। ৮, ১৫

(৩) ছান্দোগ্য ৫, ১০, ১।

(৪) বৃহ ৪, ৪, ২২, ছান্দোগ্য ২, ২৩, ১। বেতা ৬, ২১।

(৫) ঋক্ সং ১০, ১১৯, ৫।

(৬) তৈত্তি সং ৬, ৩, ১০, ৫।

(৭) অথর্ব ৬, ১০৮, ২। ৬, ১৩৩, ৩। ৭, ১০৯, ৭। ১১, ৫, ১।

(৮) ঐত ব্রা ৫, ১৪। ২২, ৯।

(৯) তৈত্তি ব্রা ৩, ৭, ৬, ৩।

* মেদিনীপুবে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে পঠিত।

শতপথ ব্রাহ্মণ (১), গোপথ ব্রাহ্মণ (২) প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে সর্বত্রই বিশেষ ভাবে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উল্লেখ পাওয়া যায়।

উপনয়নের সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ।

সাধারণতঃ অষ্টম হইতে ষোড়শ বর্ষের মধ্যে উপনয়ন সংস্কারে দীক্ষিত হইয়া (৩) ব্রাহ্মণ বিত্তার্থীকে প্রথম আশ্রমে প্রবেশ করিতে হইত। প্রাচীন যুগে বিত্তাশিক্ষার সহিত উপনয়নের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা প্রাচীনত আধুনিক ব্যবস্থা দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই। উপনিষদে দেখা যায়—সকল প্রকার উপদেশের প্রারম্ভেই উপনয়নের আবশ্যকতা ছিল (৪)।

ইহা নিশ্চয়ই আধুনিক উপনয়নের মত বৃহৎ অমুষ্ঠান ছিল না। ধর্মশাস্ত্রে প্রত্যেক বেদ অধ্যয়নের জন্ত পৃথক উপনয়ন ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে (৫)। বেদজ্ঞার সারস্বত গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ায় একবার সংস্কারেই ঋক্, সাম, ও যজুঃ এই তিন বেদের অধ্যয়ন চলিতে পারিত ও অথর্ববেদ পাঠের জন্ত পুনরুপনয়ন আবশ্যক হইত (৬)। পূর্বে কেবল বিত্তাশিক্ষার জন্তই এই সংস্কারটির প্রয়োজন হইত; তন্নিম্ন ইহার অল্প কোন মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না (৭)।

প্রাচীন যুগেও অধ্যয়ন ব্রাহ্মণের আবশ্যক ছিল।

দেখা যাইতেছে—বেদাধ্যয়নের জন্তই উপনয়ন সংস্কারের প্রয়োজন; সুতরাং এ সংস্কার যেদিন হইতে দ্বিজাতিগণের অপরিহার্য অমুষ্ঠান রূপে প্রবর্তিত হইল (৮), বেদাধ্যয়নও সেদিন হইতে তাঁহাদিগের অবশ্যকর্তব্য রূপে নির্দিষ্ট হইল। ইহার প্রাচীনত্ব কোন সন্দেহই নাই। অল্পপনীত ব্রাহ্মণের কল্পনাই যেন অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। সংহিতা (৯) ব্রাহ্মণ (১০) প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে

উপনয়নের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং “ছান্দোগ্যোপনিষদের সময়েও অধ্যয়ন ব্রাহ্মণের অবশ্যকর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয় নাই” এরূপ সিদ্ধান্ত (১) সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। “আমার বংশে কেহ লেখাপড়া না কবার দ্রষ্টা নিন্দাভাজন হন নাই” আরাগির এই উক্তি (২) হইতে কেবল ইহাই জানিতে পারা যায় যে তখনও কোন কোন বংশে অবিদ্যান ব্রাহ্মণ ছিলেন। কোন মুখকে দেখিয়াই তাহার দেশে অধ্যয়নের বিধান নাই, এমন কথা বলা যায় না; কাবণ বিধান থাকিলেও সবলেই মেধাবী হইতে পাবে না। বরং আরাগির উক্তি হইতে ইহাই মনে হয় যে পরবর্তী কালের মত (৩) সে যুগেও বিত্তাহীন ব্রাহ্মণ বিশেষ নিন্দাভাজন ছিলেন।

গুরুকরণ।

পিতা স্বয়ং অধ্যাপক হইলে কখন কখন পুত্র স্বগৃহেই উপনীত হইয়া পাঠারম্ভ করিতেন (৪); কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ত্রতনিয়মাদির সম্যক পরিপালনের জন্ত বালক অল্প গুরু নিকট প্রেরিত হইত (৫)। প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ আরাগির পুত্র শ্বৈতকেতুকেও সংযম-অভ্যাসের জন্ত গুরুগৃহে যাইতে হইয়াছিল। যথারীতি কঠোর ব্রহ্মচর্যের পর গৃহে ফিরিয়া তিনি পিতার নিকট গভীরতর বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন (৬)। বিদ্যার্থিগণ নানা স্থান পর্যটন করিয়া একাধিক গুরুর নিকটও অধ্যয়ন করিতে পারিতেন (৭)। বেদ প্রভৃতি সাধারণ পাঠ্য বিষয়গুলি গুরু নিকট অধ্যয়ন করিয়া ধর্মজিজ্ঞাসা, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসার জন্ত ব্রহ্মচারিগণ আবশ্যক হইলে অল্প কোন বিশেষজ্ঞের নিকট যাইতেন।

মন্ত্রদেশে পতকলে যজ্ঞবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ কাপ্যা নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। ঐ বিদ্যা অধ্যয়নের জন্ত বহু

(১) শত ব্রা ১১,৩,৩,১। ১১,৩,৩,৭।

(২) গো ব্রা ১,২,১-৮।

(৩) আষ পৃ ১,১২।

(৪) ছান্দো ৫,১১,৭। কোষী ৪,১৮।

(৫) আপ ধর্মসূত্র ১,১,১,৮-৯।

(৬) ৭বতানসূত্র ১,১, ৫।

(৭) উপনয়নঃ বিদ্যার্থস্ত্রুতিঃ সংস্কারঃ (আপসুত্র ১,১,১,৮)।

(৮) “যজ্ঞোপবীত্যেবাবীষীত” তৈত্তি আর ২,১,৩।

(৯) অথর্ব ১১,৫,৩।

(১০) শত ব্রা ১১,৫,৪।

(১) Phil. of the Upanishads, Deussen, p. 369.

(২) “ন বৈ সোম্যাস্মৎকুলীনোহননুচ ব্রহ্মবক্ষুরিব ভবতি”

(ছান্দো ৬,১,১)

(৩) “তপঃক্রতাভ্যাং যো হীনোজ্ঞাতিব্রাহ্মণ এব সঃ”

(২,২,৬। পাতঞ্জল মহাভাষ্যোক্ত তলোক।)

(৪) বৃহ ৫,১,১।

(৫) ছান্দো ৬,১,১। ৮,১৫। বৃহ ৬,৩,৬।

(৬) ছান্দো ৬,১।

(৭) যদেথ তেন মোপসীদ তত্তত্ত উচ্চং বদ্যামি (ছান্দো ৭,১,১)।

বিদ্যার্থী তাঁহার নিকট যাইতেন (১)। অশ্বপতি বৈশ্বানর বিদ্যায় অভিজ্ঞ থাকায় ঐ বিষয় জানিবার জন্য ছয়জন ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন (২)। অশ্বাখীয গুরুর নিকট অধ্যয়ন প্রাপ্ত হইলেও বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন পণ্ডিতের পক্ষে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারিত। যজুর্বেদবিন্ যজ্ঞবল্ক্য যজুর্বেদ ব্যতীত সামবেদেরও অব্যাপনা করিতেন (৩)।

গৃহস্থ গুরু ও শিক্ষার কেন্দ্র।

গুরুগণ সকলেই বনরাসী সম্মানী ছিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পরিবারবর্গের সহিত গ্রামে বা নগরে বাস করিতেন (৪)। বিদেহ, কাশী, পঞ্চাল, মদ্র, প্রভৃতি স্থান বিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। উপনিষদ ও ব্রাহ্মণে এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় যে কুরুপঞ্চালে বহুপণ্ডিত বাস করিতেন (৫) এবং বিদ্যার্থীগণ মদ্রদেশে (৬) ও উত্তর ভারতে (৭) অধ্যয়ন করিতে যাইতেন।

বিদ্যার্থীর কর্তব্য

গুরুগৃহে বাসকালে ব্রহ্মচারী সর্বদা গুরুর নিদেশবর্তী থাকিতেন। ভিক্ষা আহরণ (৮), গৃহ অগ্নির রক্ষণাবেক্ষণ (৯), গোপালন (১০) প্রভৃতি কর্তব্য শিষ্যকে করিতে হইত। এ-সকল কর্তব্য প্রথম অবস্থায়ই চলিতে পারিত। পরে শিষ্য যখন গভীরতর বিষয় অধ্যয়নের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেন, তখন তাঁহাকে নিজের ব্রতানুষ্ঠান ও অধ্যয়ন লইয়াই সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে হইত, এ সময়ে অবশ্যই আর পূর্বের মত গৃহকর্মাদি সম্পাদন কবা শিষ্যের পক্ষে সম্ভবপর হইত না।

ব্রহ্মচর্যকাল।

ব্রাহ্মণে (১) ও উপনিষদে (২) নানাবিধ পাঠ্য বিষয়ের উল্লেখ আছে; সাধু চতুর্বেদ এবং অপরাপর বিষয় অধ্যয়ন করিতে হইলে বহুসময় আবশ্যক হইত।

উপনিষদে বার বৎসর, বত্রিশ বৎসর বা তদুর্দ্ধকাল অধ্যয়নের উল্লেখও পাওয়া যায় (৩), গৃহস্থত্বে আটচল্লিশ বৎসর অধ্যয়নকাল নির্দিষ্ট আছে (৪)।

গুরুগৃহে থাকিয়া দ্বাদশ বৎসর অধ্যয়নই সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল (৫)।

কোন বিদ্যার্থী ইহা অপেক্ষাও অল্প সময়ে অধ্যয়ন শেষ করিতে সমর্থ হইলে তখনই তিনি গুরুর অনুমতি লইয়া গৃহস্থশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিতেন (৬)।

অর্থ না বুঝিয়া কেবল মুখস্থ বিদ্যা নিন্দনীয় হইলেও সে যুগেও অর্থজ্ঞানহীন অথচ কল্পকুশল একশ্রেণী যাত্নিকের সত্তা লক্ষিত হইত (৭)। ইহারা উত্তমরূপে বেদাধ্যয়ন না করিয়াই সমাবর্তন করিতেন। ষাঁহারা গুরুগৃহ হইতে ফিরিয়া গৃহী হইতেন তাঁহাদিগকে স্নাতক বলা হইত। স্নাতক তিন প্রকার—বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক, এবং বিদ্যাব্রতস্নাতক (৮)। ষাঁহারা অধ্যয়নের সহিত পালনীয় ব্রতগুলি সম্যক অনুষ্ঠান না করিয়াই সমাবর্তন করিতেন তাঁহারা বিদ্যাস্নাতক, ষাঁহারা যথাবিধি ব্রত পালন করিয়াও বেদ অসমাপ্ত রাখিয়া গৃহস্থশ্রম অবলম্বন করিতেন তাঁহারা ব্রতস্নাতক এবং ষাঁহারা বেদাধ্যয়ন ও ব্রতানুষ্ঠান এই দুইটিই পালন করিতে সমর্থ হইতেন তাঁহারা বিদ্যাব্রতস্নাতক (৯)। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠোক্ত স্নাতকগণই শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত হইতেন (১০)।

(১) বৃহ ৩,৩,১। ৩,৭,১।

(২) ছান্দো ৫,১১।

(৩) বৃহ ৩,১,২।

(৪) ছান্দো ৪,১,২। বৃহ ৩,৩,১। ৩,৭,১।

(৫) বৃহ ৩,১,১।

(৬) বৃহ ৩,৩,১। ৩,৭,১।

(৭) কোষী ব্রা ৭,৬।

(৮) ছান্দো ৪,৩,৫। শত ব্রা ১১,৩,৩,১।

(৯) ছান্দো ৪,১০,১। শত ব্রা ১১,৩,৩,১।

(১০) ছান্দো ৪,৪,৫।

(১) পো ব্রা ১,২,৯।

(২) ছান্দো ৭,১। বৃহ ২,৪,১০।

(৩) ছান্দো ৬,১,২; ৮,৭,৩।

(৪) পার গৃ ২,২।

(৫) ছান্দো ৬,১,২। আশ গৃ ১,২২,৩।

(৬) আশ গৃ ১,২২,৪।

(৭) পার গৃ ২,৭। নিরুক্ত ১,১৮।

(৮) পার গৃ ২,৮। মহাভাষ্য ৪,২,৫৯।

(৯) গোষ্ঠি গৃ ৩,৫,২২।

(১০) গোষ্ঠি গৃ ৩,৫,২২।

(১১) গোষ্ঠি গৃ ৩,৫,২৩।

বিদ্যার্থীর পালনীয় বেদব্রত ।

গুরুগৃহে থাকিয়া বেদের বিভিন্ন অংশ পাঠকালে বিভিন্ন ব্রত পালন করিতে হইত। সামবেদের আগ্নেয়, ঐন্দ্র, ও পাবমান পূর্ব পাঠের জন্ত গোদানিক ব্রত, আরণ্যকের শুক্রিয় ভিন্ন অন্য অংশ পাঠের জন্ত ত্রাতিকব্রত, শুক্রিয় পাঠের জন্ত আদিত্যব্রত, উপনিষদব্রাহ্মণ পাঠের জন্ত উপনিষদব্রত এবং আত্মদোহ পাঠকালে জ্যৈষ্ঠ-সামিকব্রত পালন কবিত্তে হইত (১), এবং সমাবর্তনের পূর্বে ব্রহ্মচারী মহানামী, মহাব্রত প্রভৃতি আরও কয়েকটি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন।

অরণ্যে বসিয়া ব্রহ্মচারীর অধ্যয়ন।

ব্রতস্নাতক বা যাজ্ঞিকগণও অধ্যাত্মবিজ্ঞান সন্ধানের ক্ষেত্রে উপদেশ না লইয়া সমাবর্তন করিতে পারিতেন না। বেদের অন্তর্ভাগ প্রত্যেক স্নাতককে পাঠ করিতে হইত, আরণ্যক-বিজ্ঞান অধ্যয়ন না করিয়া কেহই স্নাতক হইতে পারিতেন না (১)। অরণ্যে বসিয়া ব্রতানুষ্ঠান করিতে কবিত্তে এই বেদান্তভাগ পড়িতে হইত। অংশ-বিশেষ পাঠের জন্ত সময় নির্দিষ্ট ছিল। ঐ সময়ে অবিকল্পিতভাবে অরণ্যবাস সকলের পক্ষে সম্ভব-পর নয় বলিয়া কেবল দিব্যভাগে অধ্যয়নকালে অরণ্যবাসের ব্যবস্থাও দেখিতে পাওয়া যায় (২)। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, স্বাধ্যায়-পাঠ যেমন অচ্ছদিত অর্থাৎ যে স্থান হইতে গৃহে ছাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না একপ স্থানে যাইয়া সম্পাদন করিতে হইত (৩), তেমনই বেদের রহস্যভাগও গ্রাম হইতে অল্পমাত্র দূরেও অধীত হইতে পারিত। এই অধ্যাত্মবিজ্ঞান শিক্ষার সময়ে সতীর্থবহুল গুরুপরিবারের মধ্যে থাকিলে চিত্তবিক্ষেপের আশঙ্কা থাকায় গ্রামের বাহিরে যাইয়া অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল এবং বোধ হয় ঐ কারণেই গুরু এক সময়ে একজন মাত্র শিষ্যকে আরণ্যক বিজ্ঞান শিখাইতেন (৪), সাধারণ

পাঠের মত এক সময়ে বহুবিজ্ঞার্থীকে উপদেশ দিতেন না (১)।

আবণ্যক যেমন বানপ্রস্থীর আলোচ্য তেমনই

ব্রহ্মচারীরও পাঠ্য।

বেদের যে অংশ অরণ্যে থাকিয়া পাঠ করিতে হইত তাহা ‘আরণ্যক’ নামে পরিচিত। অনেকের ধারণা যে তৃতীয়াশ্রমী বনবাস-কালে পাঠ করিতেন বলিয়াই এই গ্রন্থের ঐদৃশ নামকরণ হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে অরণ্যস্থ ব্রহ্মচারীও ইহা পাঠ করিতেন—আরণ্যক নামকরণের ইহাও একটি কারণ। আরণ্যক বিজ্ঞান বালক বা যুগ্মকে প্রদান করিবে না (২) একপ স্পষ্ট বিধান হইতে জানা যায়—যুবক ব্রহ্মচারীই ইহা পাঠ করিতেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে মেধা, খ্যাতি ও ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্ত অনুষ্ঠানের উপদেশ আছে (৩); তাহাতে অনুষ্ঠান প্রার্থনা করেন যে তাঁহার মেধা বৃদ্ধি হউক, তিনি যেন খ্যাতিলাভ করেন, এবং বিজ্ঞানিগণ যেন স্রোতোবারির মত তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসে। একপ অনুষ্ঠান ও প্রার্থনা ব্রহ্মচারীর পক্ষেই সম্ভব; সংসার-বিরক্ত প্রৌঢ় বানপ্রস্থীর পক্ষে নহে। ব্রহ্মচারী আরণ্যক অধ্যয়ন করিতেন এবং বানপ্রস্থীশ্রমে উহার উপদেশগুলি বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইত। বানপ্রস্থী অরণ্যে বসিয়া সমাগত বিজ্ঞানিগণকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিতেন অথবা কৃতবিদ্যা গৃহস্থ গুরু শিষ্যের সহিত গ্রামের বাহিরে যাইয়া আরণ্যক সন্ধান উপদেশ দিতেন।

সমাবর্তন।

এইরূপ বহু কষ্টকর অনুষ্ঠানের পর স্নাতকগণ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন। বিদ্যাকালে আচার্য্য শিষ্যকে তাঁহার ভাবী জীবনের কর্তব্য সন্ধানের কতকগুলি উপদেশ প্রদান করিতেন (৪)। ইহাতে অর্থোপার্জন, বিবাহ, ধর্ম-শিক্ষা, নীতিশিক্ষা, অধ্যাপনা, গুরুভক্তি, অতিথিসেবা

(১) আশ্বিন নারায়ণবৃত্তি ১, ২২, ৪। নেদমধীন স্নাতকো ভবতি যদ্যপ্যন্যদ্বয়দ্বয়ান্নেদমধীন স্নাতকো ভবতি। ঐত আর ৫, ৩, ১২।

(২) পৌষ্টি গৃ ৩, ২, ৩৬।

(৩) তৈত্তি আর ২, ১১, ১।

(৪) ঐত আর ৫, ৩, ৩। এক একস্মৈ প্রক্ৰয়াৎ।

(১) ঋকপ্রতিশাখা ১৫, ৩। একঃ শ্রোতা দক্ষিণতো নিধীদেশো বা ভূবাংসন্ত যথাবকাশম্।

(২) ন বৎসে ন চ তৃতীয়ে (ঐত আর ৫, ৩, ৩)।

(৩) তৈত্তি আর ৭, ৪।

(৪) তৈত্তি উপ ১, ১১।

প্রভৃতি অনেক বিষয়েরই উল্লেখ থাকিত। এই উপদেশে আমরা প্রাচীন ভারতীয় জীবনের প্রকৃত আদর্শ দেখিতে পাই। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বেও বৃহৎ পণ্ডিতগণ অধ্যয়ন সমাপ্তির পর একবার মিথিলা, নবদ্বীপ প্রভৃতি বিহার কেন্দ্রগুলি ভ্রমণ করিয়া আসিতেন। এইসকল স্থানে নাম না পাইলে পণ্ডিতগণের বিজ্ঞা সম্পূর্ণ বলিয়া স্বীকৃত হইত না। উপনিষদের যুগেও নবীন স্নাতকগণ এইরূপ বিদ্যার পরিচয় দিতে ব্যগ্র হইতেন। সে কালে রাজ-সভাগুলি বিদ্যার অত্যন্ত কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। তথায় নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইতেন। স্নাতকগণ এই রাজসভায় বিদ্বান্ রাজা বা সভাসদগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যাতুশীলন করিতেন (১)। এরূপ বিদ্যা-চর্চার জগুই উশীনরবাসী গার্গ্য বালাকি মংস্ত্র কুরুপঞ্চাল কাশী এবং বিদেহ দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন (২)।

স্নাতকের জীবিকা

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বিজ্ঞালোচনার জগু রাজার সাহায্য পাইতেন (৩) এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ যজ্ঞস্থলে যাইয়া পৌরোহিত্য গ্রহণ করিতেন—ঋত্বিক কৰ্ম্মে তাঁহার জীবিকা নির্বাহিত হইত (৪)। ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষায়ে জীবনধারণ করিতে হইত; কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে ভিক্ষাহরণ নিষিদ্ধ ছিল (৫)। গুরু স্নাতককে বলিয়া দিতেন যে তখন হইতে ধনোপার্জনের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে (৬); আর কেবল অপরের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করা চলিবে না।

অধ্যাপনা আরম্ভ

সমাবর্তনের সময় গুরু শিষ্যকে গৃহস্থাশ্রমে যাইয়া অধ্যাপনা করিতে বলিতেন (১) এবং কোন কোন বিদ্যা গ্রহণের সময়ই ব্রহ্মচারীকে প্রতিশ্রুত হইতে হইত যে তিনি পরে সে বিষয় অপরকে শিখাইবেন (২)। স্মৃতিরূপ কিছু প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিলেই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ অধ্যাপনা আরম্ভ করিতেন। তিনি বিদ্যার্থীগণকে পুত্রনির্কিংশেষে পালন করিতেন। সর্বদাই তাঁহাকে মনে রাখিতে হইত যে ছাত্রগণের সমগ্রজীবনের শুভাশুভের জগু তিনিই দায়ী।

বেদ ও বেদাঙ্গপাঠের বিভিন্ন কাল

শাস্ত্রে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার জগু বিভিন্ন সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে। বৎসরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগে বেদ পাঠ ও অপরভাগে অগ্ন্যুক্ত বিষয়ের অধ্যাপনা হইত। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসের কোন এক নির্দিষ্ট দিবসে উপাকর্ষ নামে একটি অগ্ন্যুষ্ঠান হইত (৩)। এই দিন গুরু শিষ্যদিগকে বেদারম্ভ করাইতেন। পৌষ বা মাঘ মাসে উৎসর্গ নামক আর-একটি অগ্ন্যুষ্ঠান করিয়া বেদ পাঠ বন্ধ করিতে হইত (৪)। বৎসরের অবশিষ্ট সময়ে বেদের রহস্তভাগ এবং বেদাঙ্গ প্রভৃতি অগ্ন্যুক্ত বিষয়ের অধ্যাপনা চলিত (৫)। এইরূপে নিয়মিতভাবে গুরু শিষ্যকে শিক্ষা দিতেন।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রী নরেন্দ্রনাথ লাহা

(১) ছান্দো ৫, ৩।

(২) কোবী উপ ৪, ১।

(৩) ছান্দো ৫, ১১, ৫। বৃহ ২, ১, ১। ৩১, ১।

(৪) ছান্দো ১, ১০। ঐত ব্র ২২, ৯।

(৫) শত ব্র ১১, ৩, ৭।

(৬) তৈত্তি উপ ১, ১১, ১।

(১) তৈত্তি উপ ১, ১১, ১।

(২) ঐত আর ৩, ২, ৬।

(৩) শাখা গৃ ৪, ৫। আষ গৃ ৩, ৫, ২। পারস্বর গৃ ২, ১০, ২।

(৪) শাখা গৃ ৪, ৬। পারস্বর গৃ ২, ১২, ১। ঐত আর ৫, ৩,

৩, ৫।

(৫) খাদির গৃ ৩, ২ ২২। আষ গৃ নারায়ণীবৃত্তি ৩, ৫, ২৩।



“প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে”
শ্রীমতী শান্তা দেবী কর্তৃক অঙ্কিত।

একটি বাঙালী ভাস্কর

ভারতবর্ষের ভাস্করেরা পাথরের বুক চিরে একদিন যে ভাবের সুর বইয়ে দিয়েছিল, সে সুরে আজ জগৎ মোহিত ও স্তম্ভিত। কিন্তু তারা যাবার সময় যাদের হাতে বাটালি দিয়ে গিয়েছিল তারা তাদের মর্যাদা রাখতে পারে নি; কাজেই এই শিল্প ভারতবর্ষ থেকে একরকম

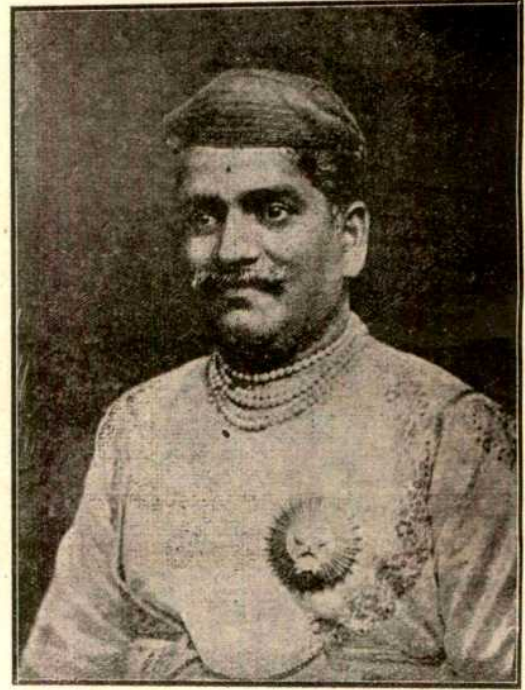
বাইরে একজন বাঙালী ভাস্কর আছেন যার কথা আমরা তেমনভাবে শুনতে না পেলেও তাঁর সম্বন্ধে যতটুকু জানতে পারা গেছে তাতেই বোঝা যায় যে, তাঁর প্রতিভা এঁদের চেয়ে কম নয়।

আমরা যার কথা বলতে যাচ্ছি তাঁর নাম শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু। ইনি স্কটল্যান্ডের এডিনবরা সহরে বাস করেন, এবং সেইখানেই তাঁর নিজের কারখানা ইত্যাদি করেছেন। ফণীন্দ্রনাথ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা



শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু।

লোপ পেয়ে গিয়েছিল বলেই হয়। ভারতের এই স্নকুমার শিল্পটিকে এখন আবার যারা বাঁচিয়ে তোলাবার চেষ্টা করছেন তাঁদের মধ্যে মহাত্মা, দেবল, কর্মকার প্রভৃতি ভাস্করের নাম শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের



বড়োদার মহারাজ।

মার্চ তারিখে পূর্ববঙ্গের কোনও এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শ্রীযুক্ত তারানাথ বসু। ছেলে বেলা থেকেই ছবি আঁকার দিকে ফণীন্দ্রের বিশেষ ঝোঁক ছিল। তারানাথ ছেলের এই ছবি আঁকার খেয়ালে কোনও বাধা না দিয়ে বরং উৎসাহ দিতেন। চোদ্দ বছর বয়সে ফণীন্দ্র কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে এসে ভর্তি

স্বতঃস্ফূর্তি

গাছ জানে না কখন তাকে ফুল কোটাতে হবে।
পাখী জানে না কখন দস্তরমততার গান গাওয়া চাই।
সমগ্র প্রাণশক্তির ভিতর থেকে তাদের উদ্যম জাগে,
এজগ্রে তাদের বুদ্ধিবিচারের দরকার হয় না। স্ননয়নী
দেবীও এমনি করেই তাঁর ছবিগুলি ফলিয়ে তোলেন।
কি করে' আঁতে হয় তিনি কখনো শেখেন নি, তাই তাঁর
অশিক্ষিত সহজপটু অনায়াসেই রঙে রঙে ফোটে এবং
রেখায় রেখায় গান করে' উঠতে থাকে।

তাঁর ছবির মধ্যে কোনো পূর্বকল্পিত আদর্শ নেই,
তারা যেন নিজে নিজে বেড়ে উঠেছে। তাতে রেখা-
গুলির ধারা অভিন্ন এবং স্ননিশিত; যেহেতু তারা তাঁর
প্রকৃতির ভিতর থেকে উৎসারিত সেইজগ্রে কোনো
দ্বিধায় নিজের পথ হতে তাদের বিক্ষিপ্ত করে নি; তারা
প্রশান্ত গম্ভীরতায় ব্যাপ্ত হয়ে এক-একটি আকৃতিকে বা
আকৃতি-সমবায়কে বেঁধেন করে' ধরে; তারা একইকালে

বেগবান এবং মন্থর, যেমন তাদের আত্মবোষণ তেমনি
আত্মসম্বরণ, বায়ুহিল্লোলিত ভরা ফসল-ক্ষেতের মত
তাদের আকৃষ্টনতা, আর সেই ভরা ফসল-ক্ষেতের মতই
যেন এই বেথাগুলির চারিদিক থেকে আতপ এবং আভা
বিকীর্ণ হতে থাকে।

তাঁর আঁকা বালিকাদের মুখগুলির চারদিকে পূর্ণ
পরিণত প্রাণশক্তির উদ্যম এবং বিরাম গাঢ় লাল গাঢ়
সবুজ বর্ণে আবিষ্ট হয়ে আছে। তাদের সাড়িগুলির
মধ্যে এমনি একটি ব্যঙ্গনা, যেন তারা কাপড়ে তৈরী নয়,
যেন তারা একটি কোমল ভাবের ভঙ্গিমা গড়া। সেই
সাড়ি যেন ঐ মেয়েগুলিকে একটি উদার প্রবাহে বেঁধেন



গ্রাম-বধূ
শ্রীমতী স্ননয়নী দেবীর অঙ্কিত



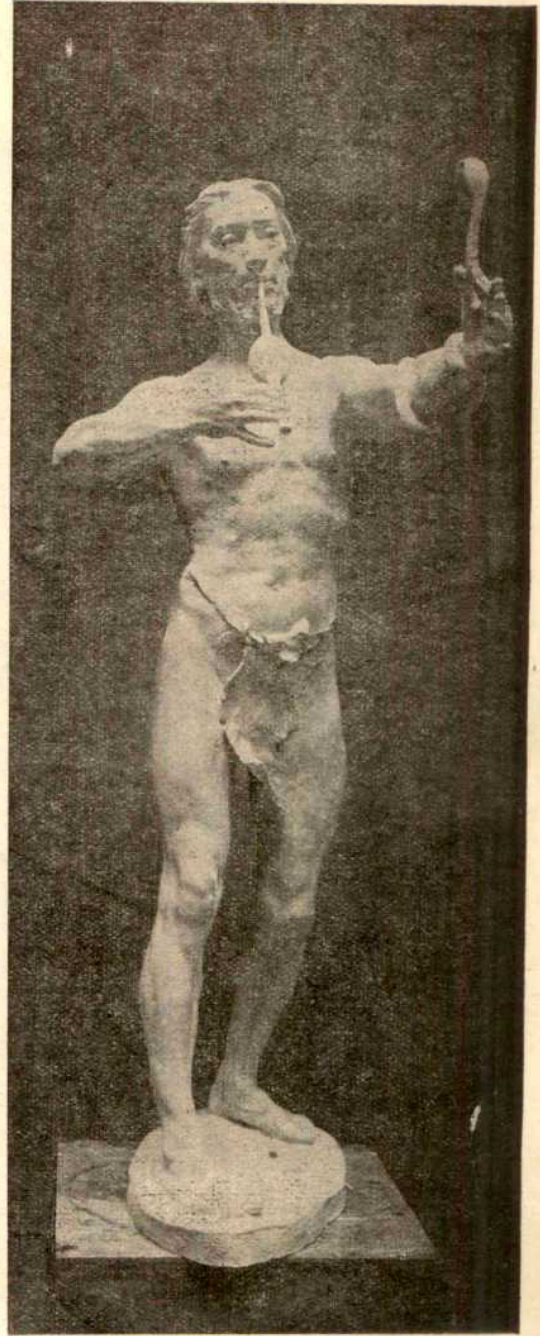
বাউল
শ্রীমতী স্ননয়নী দেবীর অঙ্কিত



শিকারী

শ্রীযুক্ত দ্বিজেননাথ বসু কর্তৃক গঠিত।

হন। এইখানে কিছুকাল শিক্ষালাভের পর তিনি এডিন্‌বরাহ রয়েল ইনস্টিটিউশনে গিয়ে ছবি-আঁকা ও মূর্তি খোদাই করার কাজ শিখতে আরম্ভ করেন। এডিন্‌বরাহ (Percy Portsmouth A. R. S. A.) পার্সি পোর্টসমাউথ নামক ওস্তাদ শিল্পীর কাছে তিন বছর পাথর খোদাই করার কাজ শেখেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি অনেকগুলি বৃত্তি ও মেডেল পেয়েছিলেন। এইখান থেকে শিক্ষা শেষ কোরে বেরোবার পর



সাপুড়ে

শ্রীযুক্ত দ্বিজেননাথ বসু কর্তৃক গঠিত।

অতঃপর দেশের মূর্তি পরিদর্শন ও শিল্পীদের কাছে শেখবার জন্য তাকে একটি বৃত্তি (Travelling



পূজারতা

শ্রীমতী সুনয়নী দেবীর অঙ্কিত

করে' রক্ষা কর্চে। এইসব তরুণী, যৌবনের গোপনবার্তা যাদের কাছে কেউ প্রকাশ করে নি, অথচ যারা আপনিই তা বুঝে নিয়েছে, তাদেরই ভাবাকুল রহস্যময় সত্তাকে এই সাড়িগুলি যেন বড় আদরের দোলায় দোলাচ্ছে। এই মেয়েদের চোখে চাঞ্চল্য নেই, তারা আত্মপ্রতিষ্ঠিত; তারা সেই অন্তরলোকের দূতী যে লোক লাল এবং সবুজ সাড়ির বিলুপ্তিত অবগুণ্ঠনে আবৃত। তাদের ঐ দীর্ঘ এবং স্থির অথচ পাখীর মত উদ্যত চোখ-ছুটির ভিতর দিয়েই তাদের মনের চিন্তা এবং হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ পেয়ে এই ছবিটিকে জীবনপূর্ণ করে' তুলেছে।

এমনি করে' ছবিগুলির মধ্যে দুই ধারার ছন্দ দেখা দিয়েছে। একটি হচ্ছে, শস্যক্ষেতের ভিতরকার বায়ু-মুচ্ছনার মত শান্ত এবং ব্যাপক, এমন একটি গাভীঘোর বিস্তার যেটি সমগ্র ছবিকে ঐক্য এবং ধ্রুবত্ব দান করেছে। আরেকটি হচ্ছে ঠিক এর বিপরীত, সেটি চঞ্চল, তীক্ষ্ণ, লঘু; সূক্ষ্ম বিশুদ্ধ গতিমাত্র, প্রশস্ত বর্ণপুঞ্জের উপর দিয়ে সে



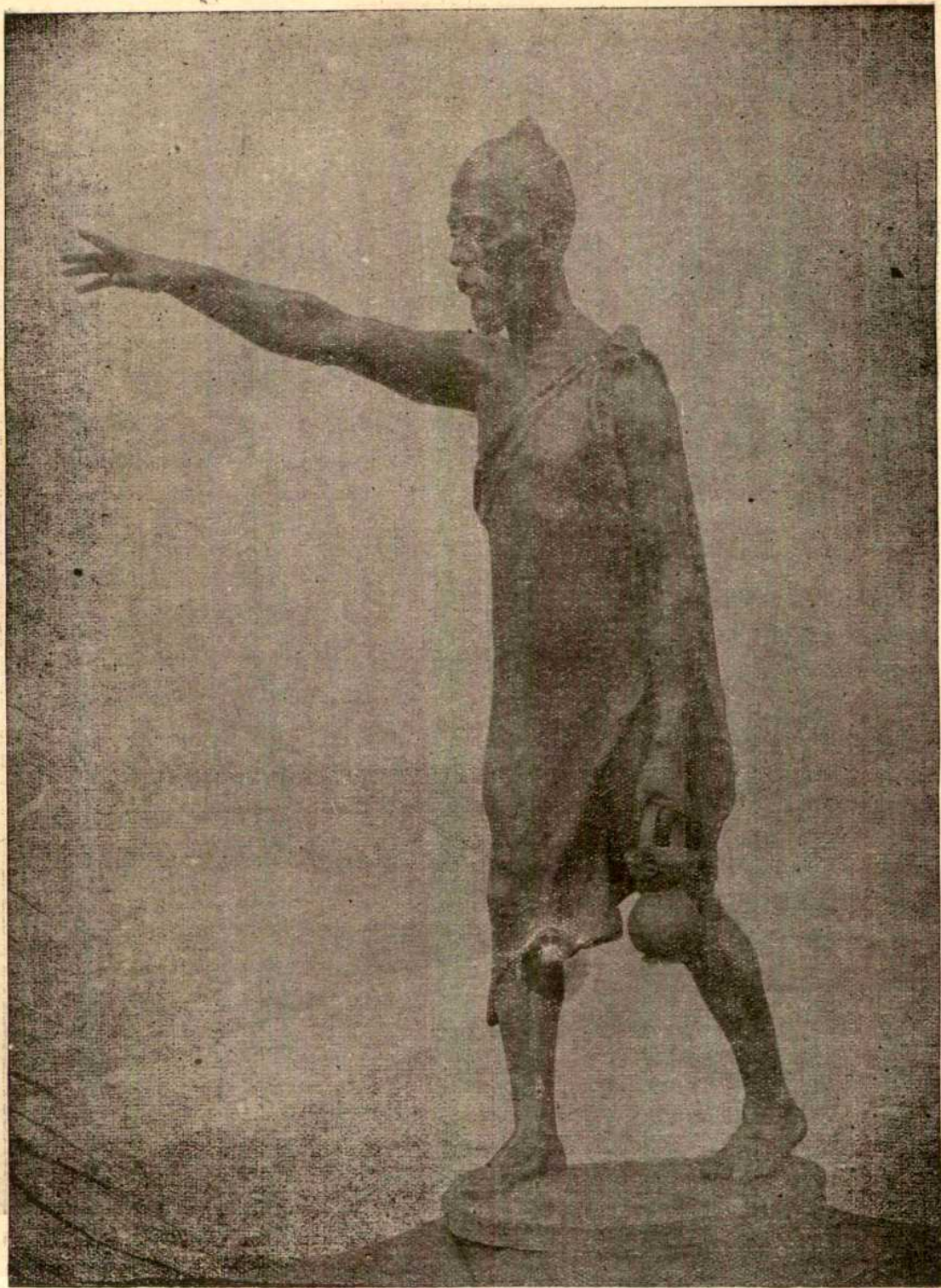
অর্দ্ধনারীধর

শ্রীমতী সুনয়নী দেবীর অঙ্কিত

ক্রান্ত ধেয়ে চলে। এমনি করে' চোখ, ঠোঁট, এবং হাত ছুটি মিলে একখানি ভাবব্যঞ্জনার ভঙ্গিতে পরিণত হয়ে পাখীর ওড়ার মত হরিত বেগে রচনাটির সূক্ষ্মযত প্রবাহের উপর দিয়ে চলে যায়।

এমনি করে' খণ্ডকালের চঞ্চলতা এবং অন্তরাঙ্গার চিরন্তন স্থিতি উভয়ে একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের ভঙ্গিমা দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। সুনয়নী দেবীর আঁটের মূলতত্ত্বই হচ্ছে জীবনের ভিতরকার এই দ্বৈত, যা একইকালে অনিত্য এবং ধ্রুব। এই ত সেই ভারতীয় প্রকৃতির প্রকাশ, যার গুণে ইনি অজন্তার অথও প্রবাহিত কলারীতিকে এমন অনায়াসে গ্রহণ করতে পেরেছেন। মোগল চিত্রকলা ভারতীয় আঁটকে আয়তনে প্রাণশক্তিতে এবং জীবনের অভিজ্ঞতায় যে খর্ব করে' ফেলেছিল, এই ছবিতে সেই ক্রটি বিস্মৃত এবং মার্জ্জনাপ্রাপ্ত হয়েছে। রচয়িত্রীর অজ্ঞাতসারে অথচ নিশ্চিত নৈপুণ্যে এই ছবিতে বিশুদ্ধ ভারতীয় রেখার আকৃষ্টন-ভঙ্গী (curvature) আপনার শান্ত সাক্ষর সুরটিকে প্রকাশ করেছে।

যে কলারীতি দুই হাজার বছরের পূর্বেকার জিনিষ, তারই সঙ্গে এত সহজে সুর মিলিয়ে বোধ হয় আজকাল-



সাঁধ
শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক গঠিত।

কার দিনের কোনো পুরুষ চিত্রকর এমন করে' চিত্র রচনা করতে পারত না। মেয়েদের হাতের স্বাভাবিক সূক্ষ্মচেতনা, এবং নারীর নিজের মধ্যে অন্তর্গত জাতীয় জীবনের অথও ধারাবাহিকতার সহজ-বোধের দ্বারাই এটা সম্ভবপর হয়েছে। সেইজন্মেই এখনকার কালের অশিক্ষিত গ্রাম-বধূরা তাদের অল্পনায় যেসব মোলায়েম গোল রেখার দ্বারা আঁকে, তার মধ্যে আমরা সনাতন ভারতকলা-প্রচলিত প্রাণের গতি-রেখা দেখতে পাই।

সুনয়নী দেবী আর্টিস্ট পরিবারের মেয়ে। তাঁর কোনো কোনো ভাই বহুকাল পূর্বে অজন্মার গুহায় ছবি এঁকেছিলেন, আবার তাঁর কোনো কোনো ভাই আর কিছুকাল পরে ইটালিতে জন্মেছেন, যেমন, মার্গারিটোনে ডারেজ্জো এবং গুইডোডা সিয়েনা। এইসব ভাইদের মধ্যে কেউ কারো অনুকরণ করেন নি, এমন কি পরম্পরের অস্তিত্ব তাঁদের জানাই ছিল না। কিন্তু সৃষ্টির এমনই আশ্চর্য্য নিয়ম যে, মানুষের অন্তরের অভিজ্ঞতা যখন একটি বিশেষ ক্ষেত্র অবলম্বন করে' চলে তখন দেশকাল নির্বিশেষে তা একই রূপ ধারণ করে। এই জন্মেই ত সকল কালের সকল দেশের বোগীদের জীবন ও উক্তি সম্বন্ধে এমন সাদৃশ্য দেখা যায়।

যে একটি বিধাহীনতার জোরে সুনয়নী দেবী তাঁর তুলিতে রেখার টান দেন, সেই নিঃসংশয় বোধশক্তির অনুসরণ করেই তিনি রঙের মধ্যে লাল আর সবুজ বেছে নিয়েছেন। তাঁর বৈচিত্র্যহীন বর্ণ-সমাবেশের মধ্যে একটি

গাভীর্ঘ্য আছে। সোনালি আর কালো রং পরিমিতভাবে বাটোয়ারা করে' দিয়ে তাঁর ছবিতে তিনি ঘনতা দেখিয়েছেন; আর মেয়েদের মুখের, দেয়ালের, পর্দার কোমল ধূসর (grey) এবং পিঙ্গল (brown) রঙের এক সমতলে তিনি লাল আর সবুজ রঙ মেনে ধরেছেন।

এই রকম চিত্রকলার মধ্যে যে নিবিড়তা আছে সে নিজের মধ্যেই নিজেকে বদ্ধ থাকে, কেননা শিল্পীর অন্তর্নিহিত রীতিধারাই তার আশ্রয়। কোনো শিক্ষা, বাইরের কোনো প্রভাব তাকে পোষণ করতে পারে না; বরঞ্চ তাকে মূলভ্রষ্ট করে' দিয়ে নষ্টই করতে পারে। আরও একটি বিপদ আছে, মাঝে মাঝে সুনয়নী দেবীকে তা আক্রমণ করে' থাকে, সে হচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রা ও গল্পের সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য। তাঁর নিজের সৃষ্টি যে-সমস্ত উপাদানকে ব্যবহার করে সেইগুলি যদি তাঁর দৃষ্ট বা কল্পিত পদার্থের অন্তর্কৃতি-চেতায় পাটাতে হয় তাহলে তাঁর সহজ সৃজনশক্তির উৎস এইসব জঞ্জালে রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে, তাহলে তাঁর দৃষ্টির ও লেখনী-চালনার ক্ষিপ্ততাই প্রবল হয়ে উঠবে এবং হৃদয়াবেগ ও ঘটনা-বর্ণনার ব্যস্ততায় তাঁর রচনার স্বাভাবিক শাস্তি চলে' যাবে।

সুনয়নী দেবীর নিজের অন্তরের মধ্যেই আর্টিস্টের সমস্ত ঐশ্বর্য্য আছে। তাঁর আর কিছু দরকার নেই। তিনি যদি তাঁর সেই ঐশ্বর্য্যভাণ্ডারের অধিদেবতার গোপন সঙ্গীতে কান পেতে থাকেন, তাহলেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা আপনিই প্রকাশিত হতে থাকবে।

ষ্টেলা ক্রামরিশ্

আমা-বাওয়ার মাঝখানে

আমা-বাওয়ার মাঝখানে

একলা আছ চেয়ে কাহার

পথ-পানে !

আকাশে ঐ কালোয় সোনায়

শ্রাবণ-মেঘের কোণায় কোণায়

আধার-আলোয় কোন্ থেলা যে

কে জানে,

আমা-বাওয়ার মাঝখানে !

ভুকনো পাতা ধুলায় বারে,

নবীন পাতায় শাখা ভরে।

মাঝে তুমি আপন-হারা,

পায়ের কাছে জলের ধারা

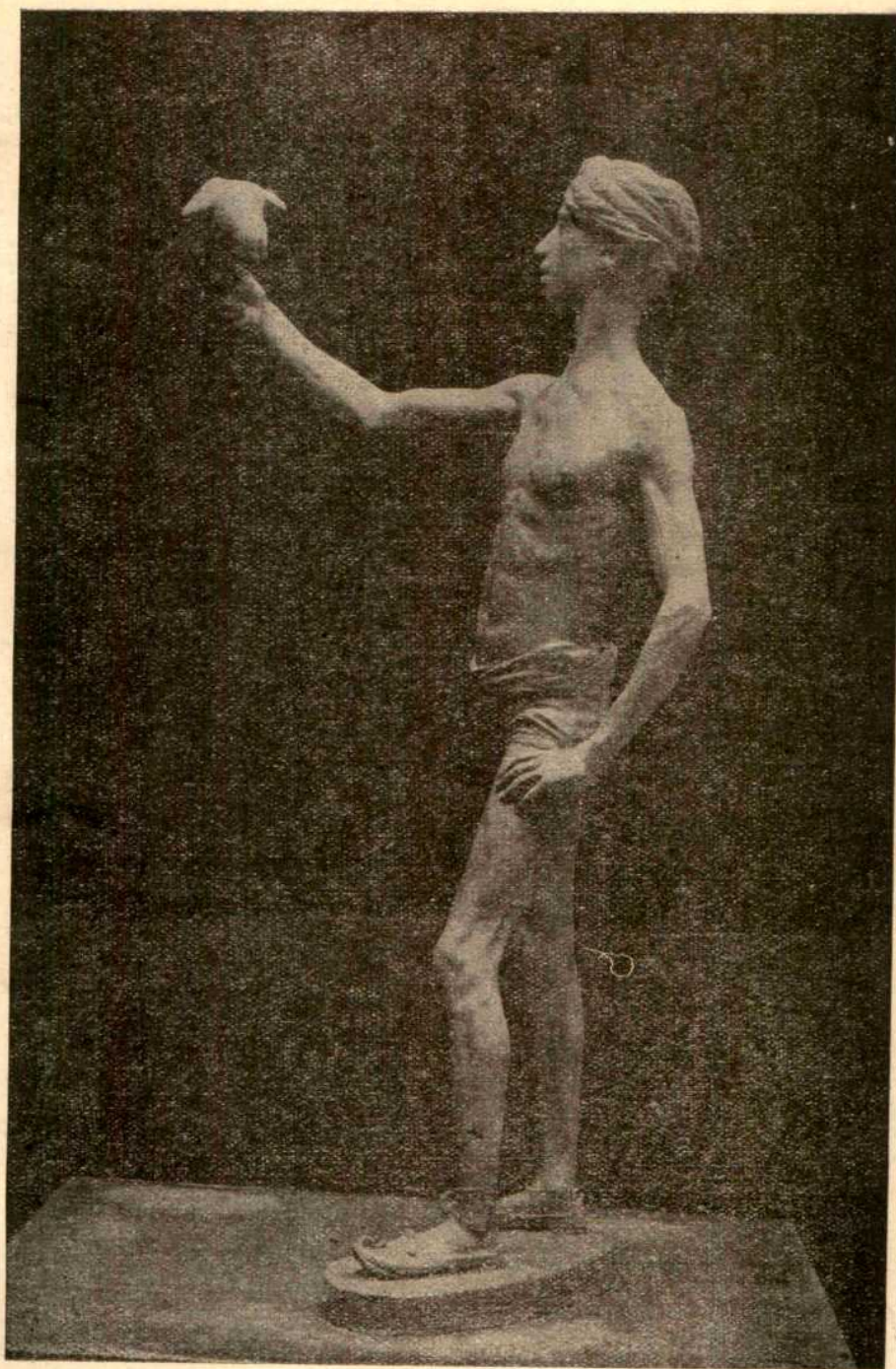
যায় চলে' ঐ অশ্রুভরা

কোন্ গানে,

আমা-বাওয়ার মাঝখানে !

১৮ আষাঢ়, ১৩২২

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বাজ-খেলোয়াড়
শ্রী ব্রজ ফণীন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক গঠিত।

সন্তান-সন্তান



পারশুর নারী

পারশুর দেশে যখন কোন সম্পন্ন-গৃহস্থের ঘরে পুরুষ-সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, গৃহে আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। কত রকমেই যে তাহার আগমন-বার্তা লোককে জানান হয়, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু সন্তান যদি স্ত্রী হয়, তবে আনন্দের পরিবর্তে নৈরাশ্র এবং গভীর দুঃখ গৃহবাসীদের ছাইয়া ফেলে। পুরুষ-সন্তানের আগমনে বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী ভোজ পায়, স্ত্রী-সন্তান জন্ম লইলে তাহার অনেককাল পর্যন্ত সে খবর জানিতেও পারে না।

সন্তানের জন্ম হইবার পূর্বে জননীর ঘরে দুটি দোলনা থাকে, একটি চমৎকার গদিওয়ালা, নানা-রকমের রং-বেরঙের ঝালর দেওয়া এবং আর-একটি নেহাৎ কম-দামী—কোন-রকমে-কাজ-চলা গোছের। দুটি ভাল পোষাক থাকে। একটি রেশম সাটিন বা অল্প কোন বহুমূল্য বস্ত্রের তৈয়ারী, অল্পটি দ্বিতীয় দোলনাটির মতই যা তা। ভাল দোলনা এবং ভাল পোষাকটি পুরুষ-সন্তানের জন্ম এবং খারাপ দুটি কত্তা-সন্তানের।

সন্তান জন্ম লইলে পর, ধাত্রী তাহাকে বা হাতে ধরিয়া তাহার সর্বদেহে জল ছড়াইয়া দেয়। তারপর তাহাকে বেশ করিয়া ধুইয়া পুছিয়া পোষাক পরানো হয়। পোষাক পরা হইলে একটা চোকা বালিশে শিশু বাঁধা থাকে। কেবল হাত আর মাথা খোলা অবস্থায় থাকে। শিশু যদি বড় বেশী কাঁদে তবে তার পৃথিবী-আগমনের প্রথম সপ্তাহ আফিমের নেশাতেই কাটিয়া যায়। আফিমের নেশার ঘোরে সে এক-রকম বেহুশ হইয়া পড়িয়া থাকে।

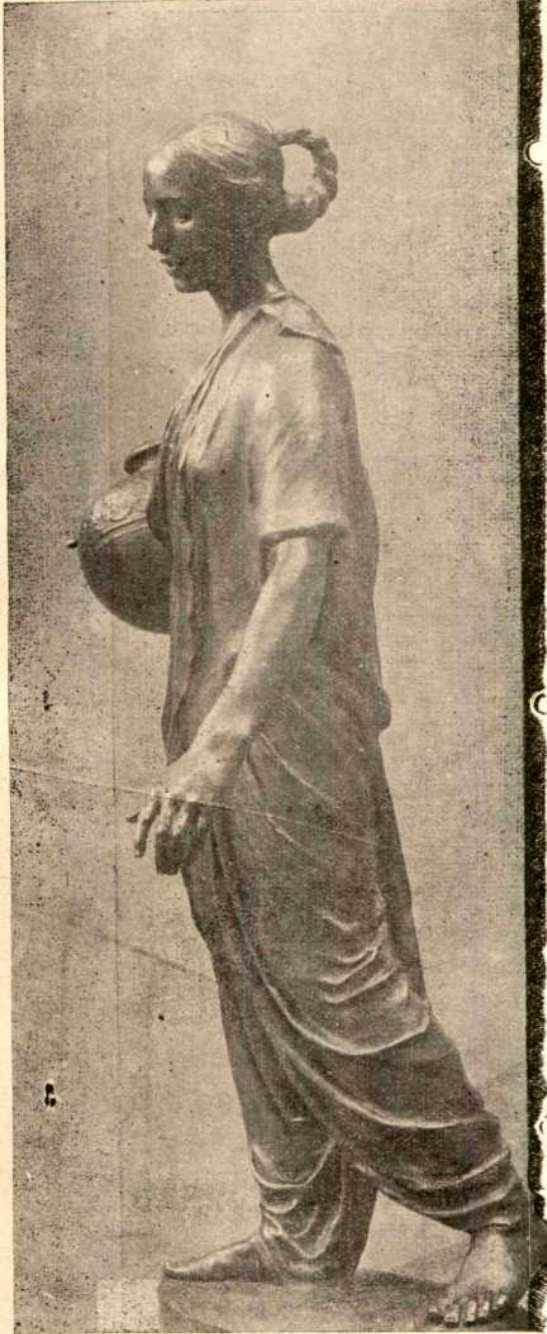
ধাত্রী এবং সন্তানের জননী সন্তানকে “দূষিত স্কন্ধর আক্রমণ” হইতে রক্ষা করিতে সর্বদাই চেষ্টা করে। নীল রঙ নাকি শিশুকে এই-সব আক্রমণ হইতে বাঁচায়। তাই জন্ম শিশুর বক্ষের উপর অনেক-সময় নীল কাপড়ের

ফালি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই-সমস্ত ফালির সঙ্গে মন্ত্রপূত মাছলি ঝুলানো থাকে। মক্কা হইতে আনীত বলির ভেড়ার চোখের মধ্যে নীলা পাথর বসাইয়া বা পশম দিয়া ছোট একটি উষ্ট্রমূর্তি তৈরী করিয়া শিশুর গলায় পরাইয়া দিলেই শিশু “শনিদৃষ্টি”র প্রকোপ হইতে রক্ষা পায়।

শিশুকে আপদ হইতে বাঁচাইবার আর-একটি উপায় তাহাকে ধোকড়-ধাকড় জামা-কাপড় পরানো। তাহা হইলে শিশুকে কেহ প্রশংসা করিবে না। ভাল-পোষাক-পরা শিশুকে লোকে প্রায়ই ভালবাসে এবং উচ্ছৃঙ্খিত প্রশংসা করে, কিন্তু প্রশংসা-বাক্যের শেষে “মসাহ্লা” (ঈশ্বরই সর্বশক্তিমান)—এই কথাটি বলিতে ভুলিয়া যায়। তাহাতে শিশুর অদৃষ্টদেবতা অপ্রসন্ন হন এবং শিশুর ভাগ্য-লিপিতে অকল্যাণ-বাণী লেখেন।

শিশুর যা-কিছু অস্থব্ধ হয় সবেমাই কারণ নাকি মন্দ-চোখের-দৃষ্টি। একবার একটি শিশুর মস্তিষ্কে নাকি জলাধিক্য হইয়াছিল। হাকিম আদিয়া বলিলেন, শিশুকে একটা দানাতে পাইয়াছে। তাহার জন্ম ব্যবস্থা হইল এইরূপ—শিশুর পিতা-মাতাকে একটা নূতন কবর খনন করিতে হইবে এবং রাত্রে শিশুকে ঐ কবরে শোয়াইয়া রাখিতে হইবে। প্রাতঃকালে দানা হয় শিশুকে ত্যাগ করিয়া যাইবে, নয় তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে। সমস্তই যথাযথ করা হইল। সকালে দেখা গেল, শিশু বেশ ঘুমাইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাকে দানা ত্যাগ করিয়া যায় নাই। তাহার অস্থব্ধের কন্ঠি হয় নাই, বাড়তিও হয় নাই।

শিশু-কত্তার পিতা প্রায় ক্ষেত্রেই কত্তাকে আদর করেন না। তবে যদি পিতার অল্প পুরুষ-সন্তান থাকে তবে তিনি “অন্দারুনে” তাহাকে দয়া করিয়া কোলে করেন, বছরে গোটা-দুয়েক চুমাও দিয়া থাকেন। শিশু-কত্তা বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গেই একসঙ্গে বাড়িয়া ওঠে এবং তার



জলাকে

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক গঠিত।

Scholarship) দেওয়া হয়েছিল। ফণীন্দ্র বৃত্তি পেয়ে এক বৎসর ইটালি ও ফ্রান্সে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন।

পার্সী সহরে বিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর রোদ্যার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। রোদ্যা তাঁর কাজ দেখে খুব প্রশংসা করেন এবং তাঁকে এ সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। এখান থেকে স্কটল্যান্ডে ফিরে গিয়ে ফণীন্দ্র নিজের কারুখানা খুলে ব্যবসা শুরু করেছেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রয়েল স্কটিশ একাডেমীতে তিনি প্রথমে তাঁর মূর্তি পাঠিয়ে দেন। পরে রয়েল একাডেমীতে তিনি দুটি ছোট ছোট মূর্তি পাঠিয়েছিলেন। এই দুটি মূর্তির মধ্যে শিকারীর (Hunter) মূর্তিটির ছবি এখানে দেওয়া হলো। রাজশিল্পী সার্ উইলিয়াম গাসকোম্ভ জন (Sir William Gascombe John, R. A.) এই শিকারীর মূর্তিটি কিনেছিলেন। এই মূর্তিটি দেখে বড়োদার মহারাজার এত ভাল লেগেছিল যে, তিনি ফণীন্দ্রনাথকে বড়োদার আর্টগ্যালারির জগু ঐ মূর্তিটির আর-একটি নকল কোরে দিতে অনুরোধ করেন। শুধু তাই নয়, পরে তাঁর লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদের বাগানে সাজিয়ে রাখবার জগু আরো আটটি ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্তি তৈরী কোরে দিতে বলেন। প্রতিমূর্তিগুলি বড়োদাতে বসেই তৈরী করবার মনস্থ কোরে ফণীন্দ্র স্কটল্যান্ড থেকে বড়োদায় এসেছিলেন। কিন্তু সেখানে ব্রোঞ্জ ঢালাই করা ইত্যাদির অসুবিধা হওয়াতে তাঁকে আবার এডিনবরা ফিরে যেতে হয়। বড়োদায় অবস্থান কালে তিনি সেখানের 'কলাভবনে' কিছুকাল পাথর খোদাই করা সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

ফণীন্দ্রনাথের কতকগুলি প্রতিমূর্তির ছবি এখানে দেওয়া হলো। সাপুড়ে ও সাধুর মূর্তি দুটো ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এডিনবরার (Royal Scottish Academy) রয়েল স্কটিশ একাডেমীর প্রদর্শনীতে দেওয়া হয়েছিল। পরে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সাপুড়ে প্রতিমূর্তিটি (Royal Academy) রয়েল একাডেমীতে দেখানো হয়। এই সময় অনেক সমালোচক এই মূর্তিটির প্রশংসা করেন এবং ঐ মূর্তির নিম্নাতা যে ভবিষ্যতে একজন বড় ভাস্কর হয়ে উঠবেন অনেক সমালোচক একথাও প্রকাশ করেন।

ফণীন্দ্রনাথ শিল্পকলার কোনও একটা বাধাধরা

আট বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত সে পাঠশালে পড়িতেও পায়। আট বছর পূর্ণ হইলেই শিশু-কন্ডার পাঠ সাদ হই, তবে বড়-ঘরের মেয়েদের আলাদা কথা। পারস্তের যে-সব নারী লিখিতে এবং পড়িতে জানেন—তাহারা অতি বিদ্বয়ী বলিয়া জনসমাজে পরিচিত, এবং লোকে তাহাদের দেখিয়া অবাক হইয়া যায়। আট বছর বয়স পূর্ণ হইলেই মেয়েকে তাহার খেলার সাথীদের সঙ্গ প্রায় ত্যাগ করিতে হয়।

পারস্তের ঘর-বাড়ীর বিষয় কিছু না বলিলে মেয়েদের জীবনের কথা সব বুঝা যাইবে না, সেইজন্ত তাহাদের ঘর-বাড়ী কেমন ধরণের হয় তাহার বিষয় কিছু বলিব।

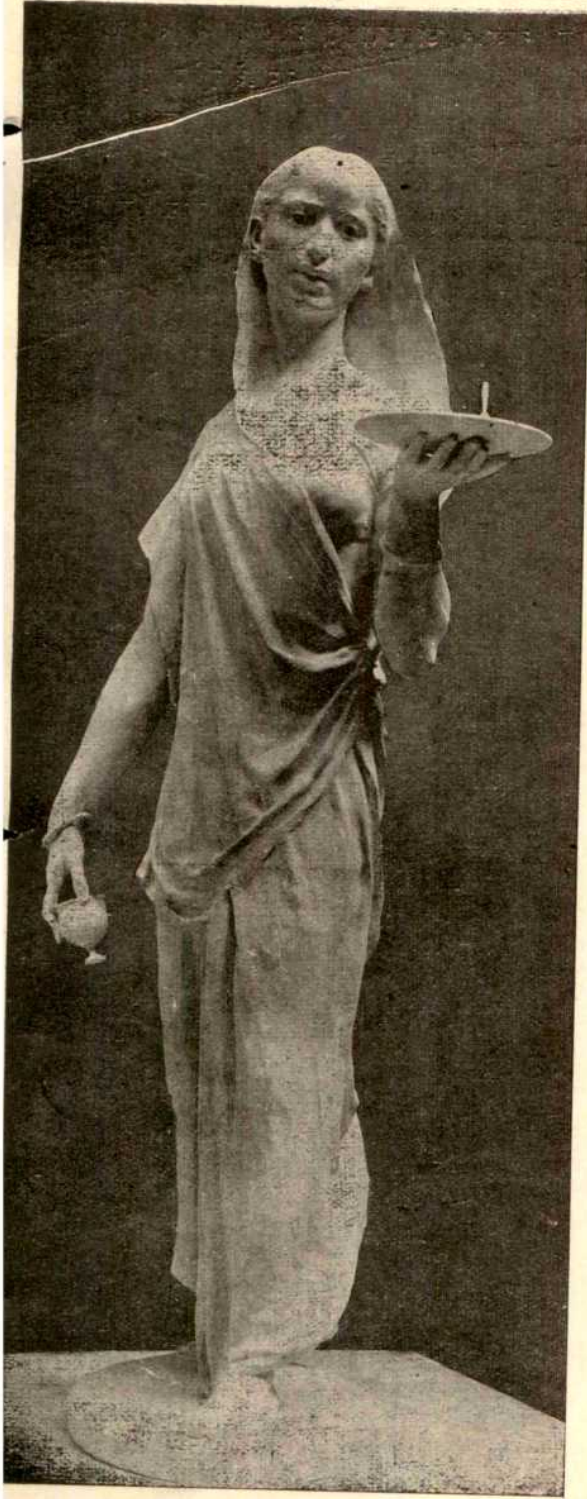
বাড়ির চারিদিক উঁচু দেওয়ালে ঘেরা এবং বাড়ীর মাঝখানে উঠান। বাহির হইতে অন্তরের কিছুই দেখা যায় না। সদর দরজা প্রকাণ্ড, এবং এই দরজা দিয়া “বাইরুন”এর (বাহির মহলের) প্রবেশ পথ। বাহির মহল কেবল পুরুষেরাই ব্যবহার করে। বন্ধু-বান্ধব আসিলে এইখানেই বসে। বাহির মহল খুব সামান্য রকমে সাজান থাকে। এইখানে বাড়ির কর্তা তাহার কাজকর্ম করেন এবং অবসর সময়ে নানা রকমের বাজে গল্প করিয়া কাটান। বাড়ীর ছেলেরাও বাইরুনে বসিয়া মোল্লার কাছে কোরাণ পড়িতে এবং লিখিতে শিখে। কোরাণের মানে বুঝিবার কোন দরকার হয় না। চাকরেরা সব-সময় ছেলেদের কাছে কাছে থাকে। মেয়েরা বাইরুনে আসিতে পায় না। অন্তরুনে ঘাইবার পথটি সরু এবং অন্ধকার, শেষে একটি দুয়ার আছে। অন্তরুনের ব্যবস্থা সব দিক হইতেই বাইরুন অপেক্ষা ভাল। অন্তরুনের কোঠা-গুলি হইতে উঠানের ছোট ফুলের গাছগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট গাছে নানা রকমের রঙিন এবং সুগন্ধি ফুল ফুটিয়া আছে। ঘরগুলিও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মেঝেতে গালিচা পাতা, নীচু চৌকি, ছবি ইত্যাদি দ্বারা সাজান ঘরগুলি দেখিতে বেশ চমৎকার লাগে। কিন্তু অন্তরুনের এই-সব যতই চমৎকার হউক—বাইরুনের কারো সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। অবশ্য বাড়ীর পুরুষ এবং গিন্নির আত্মীয়দের সঙ্গকে এ ব্যবস্থা নয়। কর্তার সবচেয়ে



পারস্তের নারী—অন্তঃপুরে

অন্তরুদ বন্ধুও কখনো অন্তরুনে আসিতে পায় না। তাহারা বন্ধুর স্ত্রী-পরিবার সঙ্গকে কোন কথাও খোলা-খুলি জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। কোন কথা জানিতে হইলে—বাড়ীর সব কেমন—এই বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হয়। এইজন্ত পারস্ত দেশের নারী-মহলের কথা যতই ভাল করিয়া বলা হউক না কেন, সব নিতুল এবং সম্পূর্ণ হয় না।

পারস্তের স্নানাগার—এইখানে নারীদের মজলিস বসে। আমাদের দেশের পুকুর-ঘাটে দুপুর বেলা যেমন গ্রামের ললনাকুল জমা হন—পারস্তের দেশের স্নানাগারও ঠিক তেমনি। মাঝে মাঝে এইখানে তারা সমস্ত দিন কাটায়—থাবার বন্দোবস্ত এখানে আছে। যত রকমের বাজে গল্প চলে। মেয়েরা বাড়ী হইতে আসিবার সময় ছোট ছোট বালিস আনে এবং একটি সুন্দর ছোট বাস্কে নানা রকমের সুগন্ধি তেল, তোয়ালে ইত্যাদি স্নানের জিনিষ আনে। গরম এবং ঠাণ্ডা উভয় প্রকার জলেরই আয়োজন থাকে। প্রথমে গরম জলে অবগাহন করিয়া তারপর ঠাণ্ডা জলে গা ধোয়ার নিয়ম। স্নানের পর চুলে নীল এবং



মন্দির-পথে
শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক গঠিত।



দিনের শেষে
শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক গঠিত।



পারস্ত্রের নারী—বাহিরে

হেনা লাগান হয়। আঙ্গুলের নোখেও হেনা দেওয়া হয়। চোখে স্ফুমা সকলেই লাগায়।

পারস্ত্রে জলাভাব বড় ভয়ানক, সেইজন্ত স্নানাগারের জল প্রত্যহ বদলান হয় না। বড়লোকদের স্নানাগারের জল দু-এক দিন অন্তর নূতন করিয়া ভরা হয়, কিন্তু যেগুলি গরীবদের স্নানাগার, সেগুলির জল ভয়ানক দূষিত হইয়া থাকে। নানা রকমের রোগের বীজে জল পূর্ণ থাকে। সেখানে স্নান করা ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার।

শুক্রবার ছুটির দিন। সেইদিন সকলেই স্নানাগারে যায়। কারণ মসজিদে যাইবার পূর্বে তাহাদের স্নানাদি করিয়া পবিত্র হইতে হইবে। কিন্তু মুসলমান ধর্ম-মতে নারীদের কোন আত্মা নাই বলে—সেইজন্ত খুব কম নারীই মসজিদে যায়। মসজিদে অবশ্য নারীদের জন্ত বসিবার ঘন-পর্দাওয়ালা স্থান আছে। এইখানে বসিয়া তাহারা সব দেখিতে পায় কিন্তু বাহিরের কেহ তাহাদের দেখিতে পায় না।

নারীদের পোষাক।—ঘরের ভিতর নারীরা ভেলভেটের

জ্যাকেট ব্যবহার করে এবং খুব আঁট, হাঁটু পর্যন্ত পায়জামা পরে। পায়ে শাদা মোজা থাকে। শাহ নাসীরউদ্দীনের সময় হইতেই এইরূপ পোষাকের চলন। তিনি নর্তকীদের এই রকমের পোষাকে দেখিতে বড় পছন্দ করিতেন। কিন্তু পারস্তের গরীব গৃহস্থ-ঘরের মেয়েরা গোড়ালী পর্যন্ত আঁট পায়জামা ব্যবহার করে। ঘরের বাহিরে সকল নারীই আপাদমস্তক কালো চাদর মুড়ি দিয়া বাহির হয়, কেবল মুখের কাছে রেশমের লেস দেওয়া ঘোমটা থাকে। লাল বা সবুজ রঙের পায়জামা পরিয়াই অধিকাংশ নারী বাহিরে যায়। ঘরের বাহিরে যদি কোন পুরুষ তাহার মাতা বা স্ত্রীকে চিনিতেও পারে, তবুও কোন কথা বা অঙ্গভঙ্গী না করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। ঘরের মেয়েদের সঙ্গে বাহিরে কথা বলা বেয়াদবী। যদি কোন লোক কোন মেয়ের ঘোমটা তুলিয়া দেখে তবে তাহার শাস্তি হয় প্রাণদণ্ড।

মেয়ে বিবাহযোগ্য হইলেই (প্রায় মেয়ের খুব কম বয়সেই বিবাহ হয়) পিতা-মাতা উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করেন। বিবাহ ব্যাপারে মেয়ের মতামতের বিশেষ কোন দাম নাই। অনেক মেয়ের বিবাহ ১৫-১৬ বছর বয়সেও হয়।

মেয়েদের মুখ তাহাদের আত্মীয় ছাড়া আর কেহ দেখিতে পায় না, সেইজন্ত ঘটকরাই প্রায় সব বিবাহ স্থির করে। পারস্তে মামতুত পিস্তুত খুদ্দুত বোনকে অনেকেই বিবাহ করে। ঘটকেরা বিবাহযোগ্য পাত্রী এবং বয়স্ক পাত্রের পিতামাতার নিকট যথেষ্ট আদর-অভ্যর্থনা লাভ করে। কারণ ঘটক খুসী থাকিলে সে সুন্দর পাত্র বা পাত্রী জোগাড় করিয়া দিতে পারে।

কোন পাত্রের জন্ত পাত্রী স্থির হইলে পর পাত্রের মাতা এবং আরো দু-একজন আত্মীয় কন্ঠার বাড়ী বেড়াইতে যান। কন্ঠা হয়ত পথে আপাদমস্তক মণ্ডিত হইয়া, পাত্রকে কোনদিন দেখিয়া থাকিবে, এবং তাহার হয়তবা ঐ পাত্রকে পছন্দ হয় নাই। তখন তাহার বিবাহ হইতে অব্যাহতি পাইবার একটিমাত্র উপায় আছে। পাত্রের মাতা ইত্যাদি তাহার বাড়ীতে আসিলে, কন্ঠা খুব অনাদর এবং তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাহাদের চা কেক ইত্যাদি পরি-

প্রথা অহুসরণ কোরে চলেন না। তবে তাঁর মূর্তির মধ্যে প্রাচ্য-শিল্পের আদর্শের আভাষই বেশী কোরে পাওয়া যায়। মূর্তির মধ্যে ভাব ও ভাষাকে ফুটিয়ে তোলাই তাঁর আসল কাজ—কোনো একটা আদর্শ বিশেষের খাতির রাখতে গিয়ে এ ছোটো জিনিষকে তিনি নষ্ট করেন না।

সাপুড়ের মূর্তি—ভারতবর্ষের সাপুড়ীদের দেখেই তৈরী করা হয়েছে। সাপুড়ে বাণী বাজিয়ে সাপকে মুগ্ধ করেছে। সাপকে মুগ্ধ করার কাজে সাপুড়ে নিজেই মুগ্ধ হোয়ে গিয়েছে। তার চোখের ভাবে, তার বাণী বাজাবার কায়দায় এই ভাবটা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

সাধুর মূর্তি—সাধু একহাত বাড়িয়ে আশীর্বাদ করছেন আর একহাতে তাঁর কমণ্ডলু। মুখের উপর শান্ত ও সৌম্য ও সহানুভূতির ছবি। তীর্থে তীর্থে পর্যটন কোরে তাঁর হাত পা দৃঢ় ও কষ্টসহিষ্ণু। সাধু

বলে সাধারণ ভারতবাসীর মনে যে ছবি ফুটে উঠে, কণীন্দ্রনাথ এই মূর্তির মধ্যে তা সমস্তই ফুটিয়ে তুলেছেন।

দিনের শেষে—মূর্তির কল্পনাও ভারতবর্ষের। দিন-মজুর সারাদিন খেটে দিনান্তে কাজ থেকে ছুটি পেয়ে ক্লান্ত দেহে বাড়ীর দিকে চলেছে। তার চলন, তার কোদাল ধরার ভঙ্গী দেখলেই বুঝতে পারা যায় সে ক্লান্ত, কিন্তু এই ক্লান্তি সত্ত্বেও তার মুখে একটা শান্তি ও প্রসন্নতা বিরাজ করছে—এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে অন্তরের প্রসন্নতা সে হারায় নি।

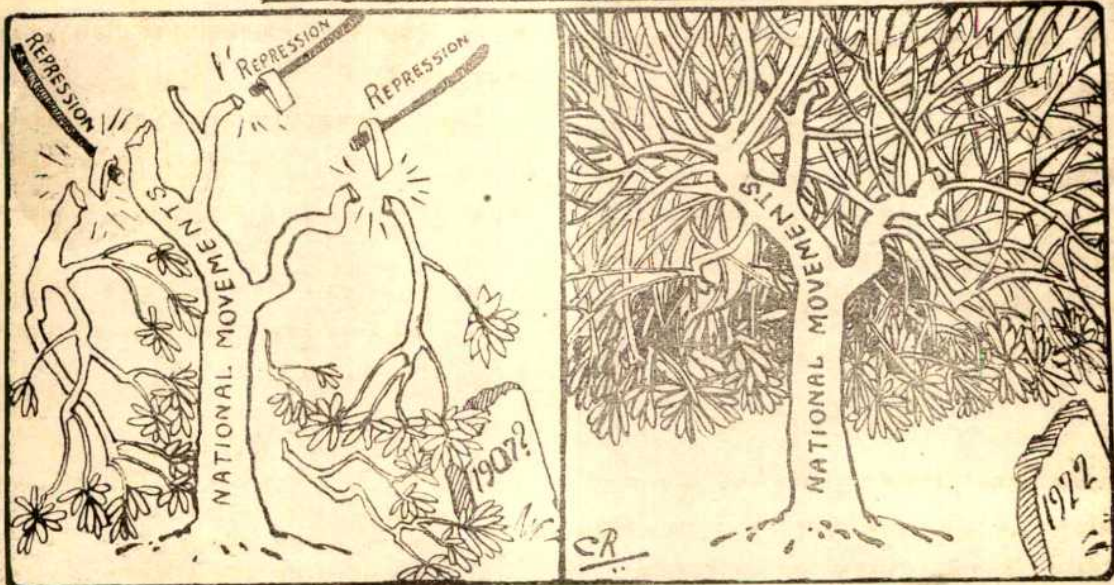
“জলকে”—মূর্তিটিতে গতির ব্যগ্রতা বেশ ফুটেছে।

মন্দির-পথে—মূর্তিটি মহাত্মা-রচিত এই নামের প্রসিদ্ধ মূর্তিটির অঙ্কন হলেও পূজারিণীর ভাবটি বেশ প্রকাশ পেয়েছে।

বাজ-খেলোয়াড়—মূর্তিটি সম্পূর্ণ ভারতীয়।

শ্রী প্রেমানন্দুর আত্মা

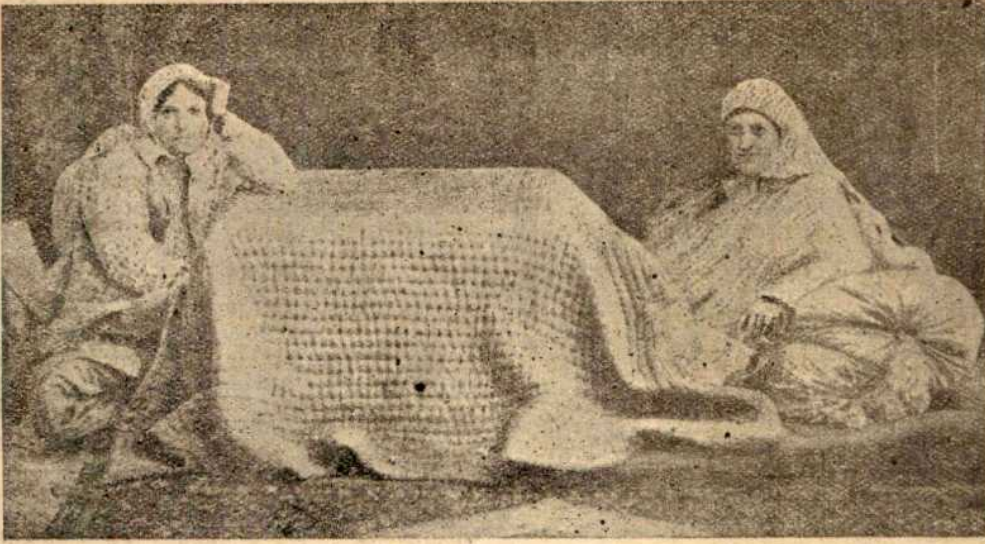
A SIMPLE FACT OF NATURE



স্বাভাবিক ঘটনা

স্বদেশী-ভাব-বৃক্ষের শাখা যতই ছেদন করা হইতেছে ততই তার প্রশাখা-বৃদ্ধি ঘটিতেছে।

চিত্রকর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় মহাশয়ের সৌজন্যে।



পারস্তের নারীর আগুন পোহানো—

বালাপোসে ঢাকা টেবিলের তলায় আগুনের আগু লুকানো আছে।

বেষণ করে। এইরূপ ব্যাপার হইলে বিবাহ সম্বন্ধে আর কোন কথা হয় না। আর পাত্রী যদি খুব যত্ন করিয়া পরিবেষণাদি করে, তবে বিবাহের সব পাকা বন্দোবস্ত হইয়া যায়। পাত্রের মাতা, পাত্রী এবং তাহার মাতাকে চা-খাইবার নিমন্ত্রণ করেন। বিবাহের পূর্বে পাত্র ভাবী স্ত্রীর মুখ দেখিতে পায় না—কিন্তু কন্ডা যেদিন তাহাদের বাড়ী আসে, সে আনাচে-কানাচে গোপন থাকিয়া ভাবী পত্নীর স্বন্দর মুখখানা একবার দেখিয়া লয়। পুরোহিতের সামনে পাত্র এবং পাত্রী বাগদত্ত হয়। পাত্র ইচ্ছা করিলে এই সময় বিবাহ বাতিল করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে কিছু দণ্ড দিতে হয়। দণ্ডের পরিমাণ—পাত্র যৌতুক হিসাবে স্বস্তর বাড়ী হইতে যাহা পাইত, তাহার অর্দ্ধেক। এই রকম করিয়া যে বিবাহ ভঙ্গ করে, সমাজে তাহাকে নানা প্রকার অপমান সহিতে হয়। বাগদত্ত হইবার সময় একটা জালান মোমবাতি, একখানি কোরাণ এবং একটি আয়না, আর একটা ট্রের উপরে নানা-প্রকার গন্ধদ্রব্য, শুকান বীজ, এবং খেজুর কন্ডার কাছে রাখা হয়। কন্ডা একটা সবুজ চাদরে আবৃত থাকে এবং কাহারো সঙ্গে কথা বলিতে পায় না। তারপর একটা জালান মোমবাতি একটা পিকলের

গামলা দিয়া ঢাকা দেওয়া হয়। কন্ডা এই দ্রব্য-সমষ্টির ওপর একবার বসে। ইহার অর্থ, সে স্বামীর বশতা স্বীকার করিল।

বিবাহের সময়েও কন্ডার দেহে এই সবুজ চাদরটি থাকে। বিবাহের পর তাহার দৌভাগ্য কামনা করিয়া এক-টুকরা সোনা দেওয়া হয়। তাহার ভাবী সংসারে প্রাচুর্য প্রার্থনা করিয়া তাহার সঙ্গে একটুকরা কটি এবং একটু ছুন দেওয়া হয়। তারপর কন্ডা পিতৃগৃহ ত্যাগ করিবার সময় উনানের পাথরটাকে চুষন করিয়া যায়। বিবাহ ব্যাপার খুবই ব্যয়সাধ্য। অনেকে বিবাহের সময় প্রচুর ঋণ করে। বিবাহের সময় বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন ভিক্ষুক ইত্যাদি সবাইকেই খুব ভোজ দেওয়া হয়। নাচ-গানেরও বন্দোবস্ত থাকে।

স্ত্রীর জুখ-ছুঃখের সমস্ত ভার স্বামীর উপরেই থাকে। স্বামীর মজ্জি হইলে স্ত্রী রাগীর মত থাকে, আবার স্বামীর খেলালে স্ত্রী গোলামের মত দিন কাটায়। বিচারের জ্ঞান স্ত্রী একমাত্র স্বামীর কাছেই নালিস করিতে পারে। তবে স্ত্রীর যদি ধনী এবং প্রতাপশালী আত্মীয় তাকে, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে ছুঃখ দিতে সাহস করে না।

স্বামী ইচ্ছা করিলেই স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে।

রবীন্দ্র-পরিচয়

রুদ্রচণ্ড

[রবীন্দ্রনাথের শৈশব-বচন। একপ্রকার লোপ পাইয়াছে বলিলেই চলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, উনিশ কুড়ি বৎসর বয়সের পূর্বে লেখা বার হাজার লাইন কাব্যসাহিত্যের মধ্যে প্রায় কিছুই আজকালকার প্রচলিত সংস্করণে পাওয়া যায় না। কিছুদিন হইল রবীন্দ্র-সাহিত্য-সূচী (Bibliography) সংকলন কবিত্তে আবস্ত কবিষাছি। এই সূচী-সংকলন কার্যের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্যের কালানুক্রমিক পবিচয় দিবার ইচ্ছা আছে। নিদর্শন-স্বরূপ বাল্য-বচন। হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত কবিষা দিব। এই সময়ে অধিকাংশ লেখায় স্বাক্ষর নাই। এখন কিছু কিছু উদ্ধার কবিষা না বাধিলে পবে আর কোন চিন্তা মাত্র থাকিবে না। সংকলন যেমন অগ্রসর হইবে রবীন্দ্র-পবিচয়ও তেমনি বাহির হইতে থাকিবে। এইরূপ ধণ্ড ধণ্ড ভাবে কার্যে অগ্রসর হওয়ায় সমালোচনার ধাবাবাহিক ঐকান্ত্রিকুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবারই সম্ভাবনা। তাই মনে বাধা আবশ্যক যে “রবীন্দ্র-পবিচয়” সাহিত্য-সমালোচনা নহে, সমালোচনার পূর্বাভাস মাত্র।]

কবিকাহিনীর সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা রীতিমত প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথের ষোল হইতে আঠারো বৎসর বয়সের লেখা প্রায় সাড়ে তিন হাজার লাইন গীতিকবিতা ১২৮৪—১২৮৭ সালের (ইংরেজী ১৮৭৭—১৮৮০) ভাবতীতে বাহির হইয়াছিল। গীতিকবিতা সম্বন্ধে আমরা পবে আলোচনা করিব। “রুদ্রচণ্ড” নামক নাটিকাখনিও এই বয়সেই লেখা, ইহা প্রথমে কোন মাসিকপত্রে বাহির হয় নাই, ১২৮৮ সনে (ইংবেজি ১৮৮১, শকাব্দ ১৮০৩, সম্বৎ ১৯৩৫) একেবাবে গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রন্থ-পবিচয়

“রুদ্রচণ্ডের” আকার ৭৫ ইঞ্চি × ৪৫ ইঞ্চি (১৮.৫ মিমি × ১১.৫ মিমি) ১পৃষ্ঠা উপহাব + ৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উপহার ১৩ লাইন, চতুর্দশ সর্গে ৭৮৭ লাইন, মোট ৮০০ লাইনে গ্রন্থ সম্পূর্ণ। নার্ম-পত্র (title-page) এইরূপ :—

রুদ্রচণ্ড

(নাটিকা)

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত

কলিকাতা

বাল্মিকি যন্ত্রে

শ্রীকালীকঙ্কর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দ। ১৮০৩।

প্রথম সংস্করণে ১০০০ কপি ছাপা হয়, মূল্য ১০ (আট আনা)। পরে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই; গ্রন্থখানি এখন দুস্তাপ্য। দুইটি গান কাব্য-গ্রন্থাবলীর ১৩০৩ সনের সংগ্রহে “কৈশোরকের” মধ্যে ছাপা হইয়াছিল; প্রচলিত সংস্করণে কিছুই নাই।

বেঙ্গল লাইব্রেরী তালিকা—No. 1268 (3rd quarter of 1881)। ইংরেজিতে সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। *

উপহাব

গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অগ্রজ শ্রীযুক্ত জ্যোতিবিন্দু-নাথ ঠাকুর মহাশয়কে উপহার স্বরূপ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উপহার কবিতাটি এইরূপ :—

ভাই জ্যোতিদাদ,

যাহা দিতে আসিয়াছি কিছুই তা' নহে ভাই।
কোথাও পাইনে খুঁজে যা তোমারে দিতে চাই।
আগ্রহে অধীর হ'য়ে, ক্ষুদ্র উপহাব ল'য়ে
যে উচ্ছ্বাসে আসিয়াছি ছুটিয়া তোমার পাশ,
দেখিতে পাবিলে তাহা সিঁটিত সকল আশ।

* শিক্ষা বিভাগের ডিবেস্তাব মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি।

স্ত্রীর পুত্রসন্তান না হইলে স্বামী পুনরায় বিবাহ প্রায় ক্ষেত্রেই করিয়া থাকে। অনেক সময় এই নবাগতার সেবাও প্রথম পত্নীকে করিতে হয়। দ্বিতীয় স্ত্রীর আগমনে প্রথম স্ত্রীর দাম অনেক কমিয়া যায়, তাহাকে সংসারের দাসী বলিলেও কিছু অগ্নায় বলা হয় না।

কারমান সহরের এক পাহাড়ের গা হইতে একটা ঝরণা বাহির হইয়াছে। পাহাড়ের গায়ে আঘাত করিয়া আলি নাকি এই ঝরণা বাহির করিয়াছিলেন। যে-সমস্ত নারীদের সন্তান হয় না, তাহারা এই ঝরণার জলে স্নান করে, নানা রকম পূজা অর্চনা এইখানে করে। পারশু দেশে এই রকমের আরো স্থান আছে। সন্তান থাকিলেও নারীরা সন্তানের মঙ্গল-কামনায় এইখানে আসে।

বাল্যকাল হইতেই পারস্যের লোকেরা স্ত্রীলোকের কথায় কান না দিবার শিক্ষা পায়। নারীর নাকি কোন আত্মা নাই। দেহের শেষ হইলেই নারীর সব শেষ হইল। মৃত্যুর পরে পুরুষ স্বর্গে যায়, সেখানে সে ক্ষীর-মাগরের তীরে থাকে। হরীর দল তাহার সেবা করে। সেখানে গাছে গাছে নানা রকমের সুখাশু ভারে ভারে ফলিয়া আছে। দিবা-রাত্রি হরীর সঙ্গীতে মন মাতো-য়ারা হইয়া থাকে। নারীর মৃত্যুর পর নরক ছাড়া আর গতি নাই। তবে কোন নারী যদি খুব পুণ্যের কাজ কিছু করে তবে তাহার স্বর্গে স্থান হইতে পারে। কিন্তু এই স্বর্গও পুরুষদের স্বর্গ হইতে অনেক খারাপ।

পারশুে শ্বৈশ্ব পুরুষ প্রায় দেখা যায় না। নারী সব সময়েই তাহার স্বামীর ভয়ে থাকে। একবার এক পারশু-নারী একজন খেতাজ নারীকে পারশু-পুরুষ বিবাহ করিতে নিষেধ করেন।

একবার এক নারীর গালে, তাহার পুত্রের অসাবধানতায় একটা বন্ধুকের গুলি লাগে। সাহেব-হাসপাতালে তাহার চিকিৎসা হয়। যখন সে আরোগ্য লাভ করিল, তাহার স্বামী আসিয়া হুকুম করিল, “নারী, তোমার ঘোমটা খোল, আমি তোমায় দেখব।” তার পর সে যখন দেখিল তাহার মুখ দেখিতে বড় খারাপ হইয়া গিয়াছে, সে স্ত্রীকে তাহার পুত্র সমেত ত্যাগ করিল।

তাহার পর এই নারীকে পরের ঘরে দাসীর কাজ করিয়া দিন কাটাইতে হয়।

পারশুে বহু-বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও লোকে এখন ক্রমে এক-বিবাহের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে। দারিদ্র্যই বোধ হয় ইহার কারণ। অনেক লোক আজকাল পারশুর নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্ত চিন্তা করিতেছেন। নারীদের অবস্থা সব দিকেই যে খারাপ তাহা নয়। তাহাদের মধ্যে যাহারা একটু ভাল অবস্থার, তাহাদের বন্ধুবান্ধব আসিলে তাহারা বেশ আনন্দে দিন কাটায়। শনিবারে কোন বন্ধু আসিলে সে সোমবারের পূর্বে যাইতে পারে না, মঙ্গলবারে আসিলে বুহম্পতিবার, এবং বুহম্পতিবারে আসিলে শুক্রবারে তাহারা গৃহ ত্যাগ করিতে পায়। এই নিয়ম পালন না করিলে নাকি গৃহের অকল্যাণ হয়। স্ত্রীর বন্ধু যতদিন বাড়ীতে থাকে, বেচারী স্বামীকে বাহিরে বাহিরেই থাকিতে হয়।

পারশুর নারীরা প্রায়ই ভোজ দেয়। এই সময় তাহারা খুব জম্কালা পোষাক পরিয়া বন্ধু-বান্ধবদের আদরে অভ্যর্থনা করে। “তোমার স্থান অনেকদিন খালি আছে, তোমার ছায়া যেন ক্ষীণ না হয়, তোমার নাক যেন মোটা হয়”—এই রকমের অনেক প্রকার অতি-বাদন-বাণী প্রচলিত আছে। সকলে কার্পেটের উপর উপবেশন করে। কোন বড়-ঘরের নারী আসিলে, সকলেই তাহাকে খুব সম্মানের সঙ্গে স্থান করিয়া দেয়। আবার গরীব ঘরের কেহ আসিলে, তাহার দিকে কেহ বিশেষ নজর দেয় না।

চাকরে চা, মিষ্টান্ন ইত্যাদি বিতরণ করে। গেলাসে করিয়া দুধ-বিনা চা দেওয়া হয়, তাহাতে ডেলা ডেলা চিনি ফেলিয়া দেওয়া হয়। আরো অনেক রকমের খাবার এবং ফল দেওয়া হয়।

নারীদের ভূতপ্রেত দানা ইত্যাদিতে অত্যন্ত বিশ্বাস আছে। ভূতেরা নাকি নির্জনে কবরস্থানে পোড়ো বাড়ী ইত্যাদিতে বাস করে। তাহারা পথিকদের পথ ভুলাইয়া দেয়, এবং তারপর তাহাদের হত্যা করিয়া ভোজন করে। ভূতের ভয়ে, কোন নারী একলা শোয় না, বা বাসি খাবার খায় না; বাসি খাবার ভূতে দেখিতে পাইলে

ছেলেবেলা হ'তে ভাই ধরিয়া আমারি হাত
 ললনরূপ তুমি মোবে রাখিয়াছ সাধে সাধ।
 তোমার স্নেহের ছায়ে কত না কতন কোবে
 কঠোর সংসার হ'তে আবারি বেধেছ মোরে।
 সে স্নেহ-আশ্রয় তাজি' যেতে হবে পরবাসে,
 তাই বিদায়ের আগে এসেছি তোমাব পাশে।
 মন্তপানি ভালবাসি, তাব মত কিছু নাই,
 তবু বাহা সাধ্য ছিল যতনে এনেছি তাই।

প্রবাসে ঘাইবার কথা উল্লেখ থাকায় মনে হয় যে
 ইহা বিলাত যাত্রা করিবার পূর্বে লেখা। রবীন্দ্রনাথ
 যখন প্রথমবার বিলাত যাত্রা করেন তখন তাঁহার বয়স
 সতেরো বৎসর, তাহার পূর্বে লেখা হইয়া থাকিলে,
 “রুদ্রচণ্ড” নাটিকাটিকে বোল সতেরো বৎসর বয়সের
 লেখা বলা যায়।

আখ্যানভাগ

রুদ্রচণ্ড হস্তিনাপুর-অধিপতি পৃথ্বীরাজের প্রতিনন্দী,
 যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজ্য হারাইয়াছেন। এখন অবশ্যে
 অরণ্যে রুদ্রচণ্ডের দিন কাটিতেছে, একমাত্র প্রতিশোধ-
 স্পৃহা রুদ্রচণ্ডকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ২ নাটিকা আরম্ভ
 হইয়াছে রাজ্যের অন্ধকারে কালভৈরব-প্রতিমার সম্মুখে।
 নিজ সংকল্প-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে রুদ্রচণ্ড ভৈরব-পূজায় আসীন।

মহাকাল ভৈরব মূর্তি,
 শুন, দেব, ভজ্যেব মিনতি।
 কটাক্ষে প্রলয় তব, চরণে কাঁপিছে ভুব,
 প্রলয়-পুণনে অল দীপ্ত ত্রিলোচন,
 তোমার বিশাল কায়া কেলেছে আঁধার ছায়া,
 অমাবস্তা রাজিরূপে ছেয়েছে ভুবন।
 জটায়ু জলদরাশি চরচর ফেলে গ্রাসি,
 দশন-বিদ্যুৎ-বিভা দিগন্তে খেলায়।
 তোমার নিশাসে খসি, নিভে রবি নিভে শশী,
 শতলক্ষ তারকার দীপ নিভে যাব।
 প্রচণ্ড উল্লাসে মেতে, জগতের গুণানেতে
 প্রেত-সহচরণ অমে ছুটে ছুটে,
 নিদাকন অট্টহাসে প্রতিধ্বনি কাঁপে জ্বাসে,
 ভগ্ন ভূমণ্ডল তারা লুকে কবপুটে।
 প্রলয়-মূর্তি ধর, ধরহর হুব নব,
 চাবিপাশে দানবেবা করুক বিহার,
 মহাদেব শুন শুন, নিবেদিত পুনঃ পুনঃ,
 আমি রুদ্রচণ্ড, চণ্ড, সেবক তোমার। (১)

রুদ্রচণ্ডের মনে শুধু এক চিন্তা—প্রতিহিংসা। রুদ্রচণ্ডের
 কল্পা অমিয়ার মনে কিন্তু এসব কোন ভাবনা নাই, সে
 ফুল তুলিয়া আনিয়া মালা গাঁথে, আপন মনে গান করিয়া

যায়, তাহার এসমস্ত ছেলেখেলা রুদ্রচণ্ড একেবারেই
 দেখিতে পারে না। চাঁদকবি পৃথ্বীরাজের সভাসদ। তিনি
 অনেক সময়ে অরণ্যে আসিয়া অমিয়ার সহিত গল্প
 করিতেন, অমিয়াকে গান শিখাইতেন। পৃথ্বীরাজ-
 সম্পর্কিত কোন ব্যক্তি অমিয়ার সহিত আলাপ করিবে
 এ ধৃষ্টতা রুদ্রচণ্ডের নিকট অসম্ভব। রুদ্রচণ্ড অমিয়াকে
 কঠোরভাবে তিরস্কার করিয়া বলিয়া দিল, যে, চাঁদকবিকে
 পুনরায় অমিয়ার নিকটে দেখিতে পাইলে চাঁদকবির আর
 নিস্তার নাই। রাজ্যের অন্ধকারে কুঠারহস্তে অরণ্যের
 পাদপ কাটিতে কাটিতে রুদ্রচণ্ড ভাবিতে লাগিল পৃথ্বী-
 রাজকে নিজে হস্তে ধর্যা দিয়া অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ
 কিরূপভাবে গ্রহণ করিবে। এইরূপ চিন্তায় অনেক সময়
 রুদ্রচণ্ডের সারারাত ঘুম হইত না, সে রাজ্যেও রুদ্রচণ্ড
 ঘুমাইতে পারিল না।

পরদিন প্রাতঃকালে রুদ্রচণ্ড আবার দেখিল যে চাঁদ-
 কবি অমিয়াকে গান শুনাইতেছে। তখন আর তাহার
 সহ হইল না, রুদ্রচণ্ড চাঁদকবিকে আক্রমণ করিল।
 রুদ্রচণ্ডের শরীরে আর পূর্বের জ্বালা বল নাই, দম্ভযুদ্ধে
 তাহার পরাজয় হইল। কিন্তু রুদ্রচণ্ডের সংকল্প এখনও সিদ্ধ
 হয় নাই, রুদ্রচণ্ডের প্রতিহিংসা-ভূষণ এখনও গিটে নাই,
 রুদ্রচণ্ড চাঁদকবির নিকট প্রাণ-ভিক্ষা চাহিল। কিন্তু এই
 প্রাণ-ভিক্ষা চাওয়াব অপমান রুদ্রচণ্ডের মনে দারুণ শেলের
 জ্বালা আঘাত করিল।

জীবন মাগিতে হল তোর কাছে আজ,
 শতাব মৃত্যু এই হইল আমার।
 রুদ্রচণ্ড যে মুহূর্তে ভিক্ষা মাগিয়াছে
 রুদ্রচণ্ড সে মুহূর্তে পিয়াছে মবিষা।
 আজ আমি মৃত সে কবীর নাম ল'বে
 কেবল শরীব তা'ব, কহিতেছি তোবে—
 এখনো জীবনে মোব আছে প্রয়োজন। (২)

চাঁদকবি প্রাণ-ভিক্ষা দিয়া চলিয়া গেল। রুদ্রচণ্ড
 কিন্তু অপমান ভুলিতে পারিল না।

অমুগ্রহ ক'বে মোরে চল গেল চাঁদ।
 গৃহে ব'সে ভাবিতেছে প্রসন্ন-বদনে
 রুদ্রচণ্ডে বাঁচালেন অমুগ্রহ ক'রে?
 অমুগ্রহ। রুদ্রচণ্ডে অমুগ্রহ করা

নাকি বিধে পরিণত করিয়া দেয়। পারসীকরা কুকুর বিড়াল হত্যা করে না, কারণ অনেক সময় তাহাদের মধ্যে জিন এবং আফ্রিটসরা বাস করে। তাহারা দেহ-ছাড়া হইলে হত্যাকারীর অমঙ্গল হয়। কারমান সহরে লোকের বিশ্বাস যে, সোমবার সাপ মারিলে পাশের বাড়ীর কেহ না কেহ মরিয়া যাইবে। চড়ুই পাখীরা গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করে। পেঁচা বড় খারাপ। নারীরা স্বপ্নেও খুব বিশ্বাস করে। নারীদের এই রকমের অনেক কু-সংস্কার আছে।

বুধবার বড় অশুভ দিন। এই দিন নাকি পৃথিবীর শেষ বিচার হইবে। এই দিনে সবাই গৃহের বাহিরে কাটায়। বুধবারে তাহারা কাহারো সঙ্গে কলহ করে না। পারস্যের শাহের যাহাকে ইচ্ছা ঘোমটা খুলিয়া দেখিবার অধিকার আছে। যে নারীকে তিনি দেখেন, তাহার ভাগ্য নাকি বড়ই ভাল।

দূরে যাত্রা করিবার পূর্বে নারীরা দান করে, তাহাতে পথের বিপদ নাকি কাটিয়া যায়। ভৃত্য প্রভুপত্নীকে আয়না দেখায়, জলে ভাসা ফুল দেখায়, বা এক-রকমের লতা পোড়ায়। এই-সব করিলে নাকি পথে কোন বিপদ ঘটে না।

যাত্রার পূর্বে হাঁচি হইলে, অনেক ক্ষেত্রেই সেই দিনের মত যাত্রা বন্ধ করা হয়। কিন্তু হাঁচির ভাল গুণও আছে। কেহ কোন কিছু মনে মনে কামনা করিতেছে, এমন সময় যদি কেহ হাঁচে, তবে তাহার সে কামনা পূর্ণ হয়।

পারস্য দেশে রোগকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। “গরম ব্যাধি” এবং “ঠাণ্ডা ব্যাধি”। গরম রোগের (যেমন জ্বর) ঔষধ—রোগীকে বরফের মত ঠাণ্ডা জলে চোবান। নানা প্রকার মস্তাদির দ্বারাও রোগ দূর করিবার ব্যবস্থা আছে।

মেয়েদের একটু বয়স হইলেই তাহারা স্বর্গ-লাভের

উপায় চিন্তা করে। সমস্ত গয়নাদি বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ জোগাড় করিয়া স্বামীর অমুমতি লইয়া, মক্কা বা কারবালা তীর্থে যাত্রা করে। যাহাদের অতদূর যাইবার সামর্থ্য নাই, তাহারা মেসেদের ইমাম রেজা মন্দিরে তীর্থ করিয়া আসে। এই তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিলে তাহার নাম হয় মাহসুতাদি। যাহারা মক্কা বা কারবালা ঘুরিয়া আসে তাহাদের লোকে হাজ্জি এবং কারবালা বলে।

তীর্থ-যাত্রীকে পথে অনেক কষ্টভোগ করিতে হয়। খচ্চরের পিঠে এক-রকমের ঝুড়ির মত বসিবার বন্দোবস্ত থাকে। ইহাকে কাজ্জাভেহ্ বলে। যাত্রীকে আপাদ-মস্তক কালো চামরে ঢাকিয়া যাইতে হয়। চোখের কাছে একটু খোলা থাকে। পথে যে-সমস্ত সবাই আছে, সেখানে থাকার কষ্ট অসীম। ঘরের বন্দোবস্ত এক-প্রকার নাই বলিলেই হয়। পথের নানা-রকম কষ্ট পার হইয়া যখন যাত্রী তীর্থে উপস্থিত হয়, তখন সে সেখানে বছর-খানেকের মত থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া লয়। এই এক বছর সে রোজ মসজিদে যায়, দান-ধ্যান করে, কোরাণ-পাঠ শোনে। দিনের অল্প সময় নিজের দেশের আগত বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্পগুজব করিয়া কাটায়। তীর্থে মরণ হইলে তাহার স্বর্গ লাভ হইবেই। তাহাকে ঘরের ভাবনা ভাবিতে হয় না, কারণ স্বামীই সেখানের সব কাজের কর্তা। ছেলে-মেয়েরাও দাসদাসীদের কাছে বেশ সুখেই থাকে। গৃহিণী মারা গেলেও পরিবার যেমন তেমনই থাকে। তীর্থস্থানে মরণ হইলে একটা যার-তার পুরানো কবরে তাহাকে গোর দেওয়া হয়। দেশে ফিরিয়া মরণ হইলে বেশীর ভাগ লোকেরই কুমের মসজিদের নিকটেই গোর-স্থানে কবর দেওয়া হয়। পারস্য দেশের অনেক স্থান হইতেই এখানে মৃতদেহ সমাধি বাস করিতে আগম করে।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

* * * * *
ভিক্ষা-পাওয়া এ জীবন না বাখিলে নব।
এ হীন প্রাণের কাজ যখন ফুঁবে
তখন ধূলায় এবে কবির নিদেপ,
চরণে দলিয়া এবে চূর্ণ করে দেব। (৩)

প্রতিশোধপূহা চরিতার্থ কবিবাব জন্ত বধুপতিও
একদিন মহাবাজ গোবিন্দমাণিক্যের নিকট ভিক্ষা চাহিয়া-
ছিল, এবং ভিক্ষা-লব্ধ দুইদিনের কলঙ্কে বধুপতির সমস্ত
গর্ভ সমস্ত তেজ নিভিয়া গিয়াছিল। রুদ্রচণ্ডের মধ্যে
বধুপতি-চরিত্রের পূর্বাভাস দেখিতে পাই।

যাহা হউক অমুগ্রহ-ক্ষুদ্র রুদ্রচণ্ড বোষে অপমানে
জ্বলিতে লাগিল। অমিষাব জন্তই এই অপমান, রুদ্র-
চণ্ডের নিকট অমিষাও দুই চক্ষের বিষ হইয়া উঠিল।
অমিষা পায়ে পড়িয়া কাদিয়া কমা চাওয়াতেও কোন
ফল হইল না।

রুদ্রচণ্ড। শিশুর হৃদয় একি পেরেছি তুই।
দুই কোঁটা অঙ্গ দিবে গলাতে চাহিস্।
এখনি ও অঙ্গজল মুছে কেন তুই।
অঙ্গজলধারা মোর দুই চক্ষে বিষ।
আব নয়, শোন্ শেষ আদেশ আমার
দুব হ' বে—

অমিষা। ধব' পিতা, ধব গো আমার—

রুদ্রচণ্ড। ছু' স্নেহ, ছু' স্নেহ মোরে, রাকসি, ছু' স্নেহ। (৪)

অমিষা বিষম-হৃদয়ে চাঁদকবির সন্মানে বাজধানীতে
গেল।

সমাধা মহম্মদ-বোবী হস্তিনাপুর আক্রমণ করিবার
যাত্রা কবিষাছে। এক দূত রুদ্রচণ্ডের সন্মানে
সিঁদা উপস্থিত। রুদ্রচণ্ডের কুটার এমন
দূত পথ দেখিতে পায় না।

যে যোব স্তব্ধ বন, একি অন্ধকার।
যে দিকে ঝোপঝাপ পথ নাহি কোথা।
যেই বুঝি হবে তার আঁধার কুটার,
যেখানে রুদ্রচণ্ড বাস করে বুঝি। (৫)

যাহুব সহ্য কবিত্তে পাবে না, দূতকে
হইয়া উঠিল।

যে ভুলে বুঝি তুই এসেছিস্ হেথা ?
আমি রুদ্রচণ্ড, এই অবগোব রাজা।

নগর-নিবাসী তোবা হেথা কেন এলি ?
ঐশ্বর্য মাঝাবে তোবা প্রাসাদে থাকিস্,
ননীব পুঁতুল যত ললনাবে ল'য়ে
আবেশে মুদিত আঁখি, পদপদ ভাষা,
ফুলের পাণ্ডি পবে পড়িলে চরণ
ব্যথাব অধীব হ'বে উঠিস্ যে তোবা
নগর-ফুলের কীট হেথা তোবা কেন ?
আসি পৃথীবাজ নই, আসি ব্রহ্মচণ্ড।
মুছ মিষ্ট কথা শুনি' আহ্লাদে গলিয়া
বাজ্য-ধন উপহার দিইনাক আসি। (৬)

দূত বুঝাইয়া বলিল যে সে কোন অপকার কবিত্তে
আসে নাই।

দূত। ব্রহ্মচণ্ড। মিছে কেন করিতেছ রোষ।
উপকাব কবিত্তেই এসেছি হেথা। (৭)

উপকাবের কথা শুনিয়া রুদ্রচণ্ড আরও জ্বলিয়া উঠিল।

ব্রহ্মচণ্ড। বটে বটে, উপকাব করিতে এসেছ।
তোমরা নগরবাসী স্বীত-দেহ সবে
উপকাব কবিবারে সদাই উদ্ভত।
তোমাদের নগরের বালক সে চাঁদ
উপকার করিতে আসেন তিনি হেথা,
উপকাব ক'বে মোরে বেখেছেন কিনে। (৮)

দূত তখন জানাইল যে মহম্মদবোবী পৃথীবাজের
বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কবিষাছেন, বোবী রুদ্রচণ্ডের
সাহায্য প্রার্থনা কবিত্তেছেন, প্রতিশোধ গ্রহণের উপযুক্ত
সময় উপস্থিত। রুদ্রচণ্ড এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত
উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এতদিন ধরিয়া সে পৃথীবাজকে
নিজহস্তে শাস্তি দিবার সংকল্প কবিষা আসিয়াছে,
আজ মহম্মদবোবী বুঝি রুদ্রচণ্ডের মুখেব গ্রস কাড়িয়া
লয়! অপরের হস্তে পৃথীবাজ নিহত হইলে রুদ্রচণ্ডের
প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হইবে না। রুদ্রচণ্ড দূতকে
দুব কবিষা দিল এবং বোবীর আক্রমণ-বার্তা প্রচার
কবিবার জন্ত বাজধানী যাত্রা করিল।

বাজধানীতে আসিয়া রুদ্রচণ্ডের প্রাণ অস্থির হইয়া
উঠিয়াছে, এত লোক এত কোলাহল তাহার সম্মুখে হয় না।

রুদ্রচণ্ড। একি যোব কোলাহল নগরের পথে
সম্মুখে, দক্ষিণে বামে, সহস্র বর্ষব
গায়ের উপব দিবা যেতেছে চলিয়া।

* * *

(৬) রুদ্রচণ্ড, ৭ম দৃষ্ট, পৃ ২২-৩০।

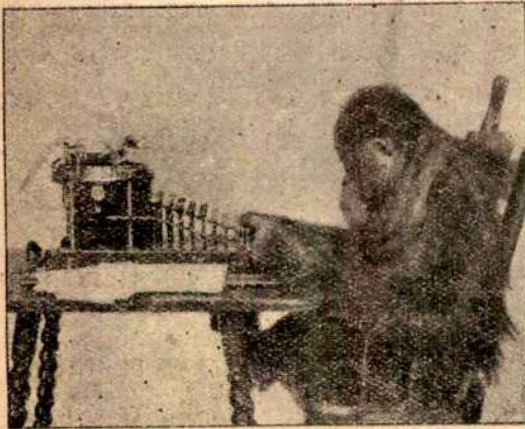
(৭) রুদ্রচণ্ড, ৭ম দৃষ্ট, পৃ ৩১।

(৮) রুদ্রচণ্ড, ৭ম দৃষ্ট, পৃ ৩১।



বনমানুষের কথা

বনমানুষই নাকি মানুষের পূর্বপুরুষ। অনেক পণ্ডিত এই মত সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, যদিও এই কথাটা বিশ্বাস করিতে আমাদের অনেকের ইচ্ছা হয় না, কারণ ভাল লাগে না। বনমানুষের বুদ্ধি পশুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। শিম্পাঞ্জী অপেক্ষা বনমানুষ অনেক স্থির এবং ধীর। শিম্পাঞ্জীর ছটফটানিকে বনমানুষ ছেলে-মানুষী বলিয়া তত বেশী পছন্দ করে না। বনমানুষ যখন জঙ্গলে থাকে, সে বড় একটা মাটিতে নামে না। অবশ্য যখন শীকারীর বন্দকের গুলি খায় তখন আহত হইয়া অনেক সময় তাহাকে বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া মাটি আশ্রয় করিতে হয়। যখন জল-তৃষ্ণা পায়, সে জলের ধারের কোন একটা গাছের ডালের একেবারে আগায় গিয়া বসে। ভারের চোটে ডালটা ছুইয়া যখন জলের খুব স্কাছাকাছি যায়, তখন বনমানুষ জলপান করে। বনমানুষ বন্দী হইবার পর, গভীর মনের ছুখে খাঁচার



কাজের সময় কাজ

একটা পাশে চোখ বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তাহাকে দেখিলে, আমাদের হয়ত কষ্ট হইবে না, কিন্তু স্বাধীনতা-পিয়াসী লোকের সত্যই কষ্ট হয়। তবে বাচ্চা অবস্থায় তাহাকে বন হইতে বন্দী করিয়া আনিলে সে বন্দীশালাতেও বেশ থাকে। তাহাকে যে যত্ন করে, খাওয়ায় পরায়, তাহার সঙ্গে বনমানুষ-বাচ্চার বেশ ভাব হয়।

মিং শিকু নামে এক ভদ্রলোক এক জন্তু-দলের সঙ্গে সহরে সহরে ঘুরিয়া পশু-পক্ষী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। একদিন তিনি বক্তৃতা শেষ করিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া আছেন। এমন সময় হটাৎ কে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। তার পরেই দেখিলেন, একটা বনমানুষ বাচ্চা তাহার খাঁচার দুয়ার খুলিয়া বাহির হইয়া, তাঁহার কোলের উপর আয়েস করিয়া বসিল।

নিউ ইয়র্ক জন্তুশালায় দেখা যায়, বনমানুষ তাহার পালকের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছে। পালক হয়ত দৌড়াইয়া তাহার কাছ হইতে দূরে পলাইতে চায়, বনমানুষও লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ডিগ্বাজি খাইতে খাইতে তাহার সঙ্গে দৌড়াইতেছে। অনেক বনমানুষকে টেবিলে বসিয়া ছুরি কাঁটার সাহায্যে খাইতে দেখা যায়, বোতল হইতে মদ গেলাসে ঢালিয়া খাইতেও অনেক সময় দেখা যায়।

১৯০৮ সালের নিউ ইয়র্ক পশু-প্রদর্শনীতে একটি ছ-বছরের বনমানুষ বাচ্চা আনা হইয়াছিল। সে তাহার সহবাসী শিম্পাঞ্জীটাকে বড় ভয় করিত। শিম্পাঞ্জীটা তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁত খিঁচাইলেই সে দৌড়াইয়া গিয়া, তাহার পালকের গলা জড়াইয়া ধরিত। এমন করিয়া তাকাইত যাহাতে মনে হইত, সে যেন বলিতেছে—“ওগো, আমাকে ঐ অসভ্য কুৎসিত জানোয়ারটার হাত হইতে রক্ষা কর।”

যেথা বাই শত আঁখি মোব মূখ চেখে
আঁখিগুলো বুঝি মোবে পাগল করিবে।
যেথা হেবি চারিদিকে সূর্য্যের আলোক
নখন বিধিছে মোবে বাণেব মন্তন। (৯)

কিন্তু পৃথ্বীরাজের সংবাদ না পাইলে ত চলিবে না।
ভিক্ষা-চাহিয়া-পাওয়া জীবন রুদ্রচণ্ডের নিকট দুঃসহ
হইয়া উঠিয়াছে, পৃথ্বীরাজকে না পাইলে রুদ্রচণ্ডেব
জীবনেব অভিনায পূর্ণ হইবে না। রুদ্রচণ্ড রাজধানীব
পথে পথে খবর লইয়া বেড়াইতেছে যে পৃথ্বীরাজ
বাঁচিয়া আছেন কি না, এমন সময়ে একজন দূত
আসিয়া সংবাদ দিল যে পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন।
রুদ্রচণ্ডের এ কথা শুনিয়া তাহাব নিকট সমস্ত পৃথিবী
ঘুরিতে লাগিল, দূতকেই সে আক্রমণ করিতে উদ্ভূত
হইল।

রুদ্রচণ্ড। হত ? সেকি কথা ? মিথ্যা বলিসনে মূঢ়।
মরেনি সে, মরেনি, মরেনি পৃথ্বীরাজ।
এখনো আছে এ ছুরি, আছে এ ছদয়,
বল্ তুই, এখনো সে আছে পৃথ্বীরাজ।
কোথা যাস, বল্ তুই এখনো সে আছে। (১০)

দূত চলিয়া গেলে রুদ্রচণ্ড বুঝিল পৃথ্বীরাজ সত্যই
মরিয়াছে। প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার জন্তই
রুদ্রচণ্ড বাঁচিয়া ছিল, পৃথ্বীরাজের মৃত্যুতে রুদ্রচণ্ডের
জীবনের একমাত্র অবলম্বন ভাঙ্গিয়া পড়িল, রুদ্রচণ্ডের
জীবন শূন্য হইয়া গেল।

রুদ্রচণ্ড। মুহুর্তে জগৎ মোর ধ্বংস হয়ে গেল।
শূন্য হ'য়ে গেল মোব সমস্ত জীবন।
পৃথ্বীরাজ মবে নাই, মরেছে যে জন
সে কেবল রুদ্রচণ্ড, আর কেহ নয়।
যে ছবস্ত দৈত্য-শিশু দিন রাত্রি ধ'রে
ছদয় মাঝাবে আমি করিখু পালন,
তা'রে নিয়ে খেলা শুধু এক কাজ ছিল,
পৃথিবীতে আর-কিছু ছিল না আমার,
তাহারি জীবন ছিল আমার জীবন—
তাবি নাম রুদ্রচণ্ড, আমি কেহ নই। (১১)

রুদ্রচণ্ডের পক্ষে জীবন ধারণ করিবার আর কোন
হেতু রহিল না, সে নিজেব বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিল।

যদিও রুদ্রচণ্ড এই নাটিকাথানির প্রধান পাত্র, তথাপি

(৯) রুদ্রচণ্ড, ২ম দৃশ্য পৃঃ ৩৮।

(১০) রুদ্রচণ্ড, ১২শ দৃশ্য, পৃঃ ৪৪-৪৫।

(১১) রুদ্রচণ্ড, ১২শ দৃশ্য, পৃঃ ৪৫-৪৬।

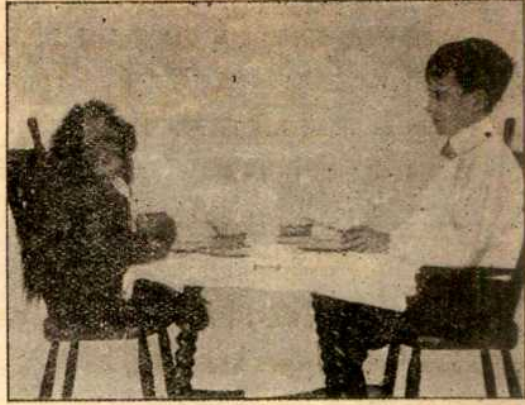
অমিয়ার করণ কাহিনী নাটিকায মধ্যে একটি সামান্য
জিনিষ নহে। অমিয়ার মনে প্রতিহিংসার কোন ভাব
ছিল না, সে আপন মনে ফল তুলিয়া মালা গাঁথিত,
তরুদেহে লতা জড়াইয়া দিত, আনন্ডে গান গাহিত।
পিতাকে সে অত্যন্ত ভয় করিত; কিন্তু পিতা যে কেন
তাহাকে তিবন্ধার কবিতেন তাহা সে কিছুই বুঝিতে
পারিত না। চাঁদ-কবিকে সে এত ভালবাসে অথচ
পিতা যে চাঁদ-কবিকে কেন দু'চক্ষে দেখিতে পারেন
না তাহা সে ভাবিয়া পায় না। রুদ্রচণ্ড যখন
চাঁদকবির সহিত দেখা পর্যন্ত করিতে নিষেধ করিয়া
দিলেন, অমিয়ার মন তখন ভাঙ্গিয়া পড়িল, সে একা
বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

বড় সাধ যার এই নক্ষত্রমালিনী
সুখ যামিনীর সাথে মিশে যাই যদি !
মুহুর্ত সন্ন্যাস এই, চাঁদেব জ্যোৎস্না,
নিশাব ঘুমন্ত শান্তি, এর সাথে যদি
অমিয়ার এ জীবন যার মিলাইয়া। (১২)

আধার-ভ্রুকুটীময় অরণ্যে কঠোব শাসন-শৃঙ্খলে
আবদ্ধ হইয়া তাহাব আরো কতদিন কাটিবে, কে জানে !
একমাত্র চাঁদকবিকে দেখিয়া নিজেব সঙ্গীর্ণ অবরুদ্ধ
জীবনের কথা সে ক্ষণকালের জগৎ তুলিয়া থাকিলে
পারিত, এখন তাহাও বদ্ধ হইল—

পরদিন প্রাতঃকালে চাঁদকবি অমিয়ার
আসিয়া বলিলেন, “তোমার জন্ত দুইটি গান রচনা
আনিয়াছি।” অমিয়ার হৃদয় তখন ভয়ে
সে চাঁদ-কবিকে চলিয়া যাইতে বলিল।
হইল তবে ত চাঁদ-কবির সহিত আর
হইবে না। তাহার পর আবার ভাবিল
যাহা ঘটবার ঘটুক, চাঁদকবি যেন নিরা
অমিয়ার তখন চাঁদ-কবিকে চলিয়া যাইবার
অনুরোধ করিতে লাগিল, চাঁদকবি কিন্তু
হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। অমিয়ার একবার
যে তাহার পিতাকে ভাল করিয়া বুঝাই
তিনি কিছুই বুঝিবেন না ! অমিয়া চাঁদকবিকে

বনমানুষের হাসি মানুষের হাসির মতই। শিম্পাঞ্জীর মত বিকট শব্দ করিয়া তাহারা হাসে না। বনমানুষের স্বভাব-প্রীতি বড় বেশী আছে। একসঙ্গে দুটি বনমানুষ থাকিলে তাহারা বেশ হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটায়, তবে শিম্পাঞ্জীর মত বীভৎস রকমের টেচামেচি করে না। বনমানুষ ভ্রাতা-বনমানুষের জন্ত প্রাণ দিতেও কসুর করে না। দু-একটি বনমানুষ আবার অল্প ছোট জন্তুদের বড় স্নেহের চোখে দেখে। প্রিয় ছোট জন্তুটির অনেক আব্দার সে সহ করে। এক চিড়িয়া-খানায়



ছুরীকাটা না হলে খাওয়া হয় না



সিগারেটটাও চলে

একটি বনমানুষের একটা পোষা বানর ছিল। বানরটা বনমানুষটিকে কত রকমে যে জ্বালাতন করিত তাহার ঠিক নাই।

বনমানুষ নিজের প্রয়োজনের জন্ত আশ্চর্য্য বুদ্ধি-কৌশল দেখায়। এক ভদ্রলোকের পোষা বনমানুষটি সস্তুরটি কথার মানে বুঝিতে পারিত। নানা রকমের মুদ্রা চিনিতে পারিত। কোন একটি বিশেষ মুদ্রা একগাদা মুদ্রা হইতে তুলিতে বলিলে সে বাছিয়া ঠিক মুদ্রাটি তুলিত, কোন প্রকার ভুল হইত না। একবার একটা আলোর তেল গরম হইয়া, আলোটা ফাটয়া যায়। তাহাতে বন-

মানুষ বেচারী আহত হয়। সেই হইতে সে আলোর কাছে ঘেঁসিত না। একটু জ্বরে আলো জ্বলিলে সে চীৎকার করিয়া অস্থির করিত। আলো কমাইলে তবে সে শান্ত হইত। এই বনমানুষটির নাম ছিল জো। একদিন তাহার খাঁচার বাইরে একটা বাদাম পড়িয়াছিল, জো অনেক চেষ্টা করিয়াও কোনরকমেই হাত দিয়া ঐ বাদামটার লাগাল পাইল না। অথচ বাদাম থাইতেই হইবে। তখন সে যা কাণ্ড করিল তা অদ্ভুত। তাহার গায়ে যে জামা ছিল, তাই খুলিয়া বাদামটার উপর ছুড়িয়া বাদামটাকে খাঁচার নিকট টানিয়া লইল। তারপর বাদাম খাওয়া হইলে পর সে আবার জামা পরিল।

জো কোনরকমের ঔষধ খাইতে ভালবাসিত না। একবার তাহাকে কয়েকটা ঔষধের বড়ী কলার মধ্যে পুরিয়া খাইতে দেওয়া হয়। সে হঠাৎ পিল দেখিয়া কলাটা ফেলিয়া দেয়। এবং তারপর তাহার রক্ষকের মুখের দিকে এমন করিয়া তাকায়, ঠিক যেন বলিতেছে—“পৃথিবীতে তোমার কাছে এমন বিশ্বাসঘাতকতা প্রত্যাশা করি নাই।” তারপর হইতে জোকে কলা দেওয়া হইলে সে ভাল করিয়া দেখিয়া খাইত, বা ফেলিয়া দিত। জো মারা যাইবার পূর্বে তাহার ভয়ানক অসুখ করে। ডাক্তার সাহেব আসিলেন। তিনি জোকে দেখিয়া তাহাকে ইনজেক্সন্ দিবেন স্থির করিলেন। ছুটারবার ইনজেক্সন্ দিবার পর তৃতীয়বার যখন ডাক্তার আসিলেন, তখন

একটি গান শিখাইয়া দি", বলিয়া তিনি গাহিতে লাগিলেন—

বাগিনী—মিশ্র গৌড় সাবঙ্গ ।
তরুতলে ছিন্ন-বৃন্ত মালতীর ফুল
সুদিশা আসিছে আঁধারি তার,
চাহিয়া দেখিল চারিধার ।
শুক ভূপবাশি মাঝে একলা পড়িয়া—
চাবিদিকে কেহ নাহি আঁধার ।
নিরদয় অসীম সংসার ।
কে আছে পো' দিবে তা'র তৃপ্তি অধরে
একবিন্দু শিশিরের কথা ?
কেহ না—কেহ না ।

মধুকর কাছে এসে বলে—
“মধু কই, মধু চাই চাই ।”
ধীরে ধীরে নিঃশাস ফেলিয়া
ফুল বলে—“কিছু নাই নাই ।”
“ফুলবালা! পরিমল দাঁও”
বাবু আসি কহিতেছে কাছে,
মলিন বদন ফিরাইয়া
ফুল বলে—“আর কিবা আছে ?”
মধ্যাহ্ন-কিরণ চারিদিকে,
ধব দৃষ্টি চেয়ে অনিগিধে,
ফুলটির মুখ আঁধার হায়
ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায় । (১৫)

এমন সময়ে রুদ্রচণ্ড আসিয়া উপস্থিত । অমিয়া কি করিয়া চাঁদকবিকে বক্ষা করিবে তাই ভাবিয়া আকুল ; সে সমস্ত দোষ নিজের মাথাষ পাতিয়া লইল ।

অমিয়া । পিতা, পিতা, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর সোরে ;
আপনি এসেছি আমি চাঁদকবি কাছে,
চাঁদের কি দোষ তাহে বল পিতা, বল !
এসেছি, কিছুতেই পাবিনি থাকিতে,
নিজ্রে এসেছি আমি, চাঁদের কি দোষ ? (১৬)

চাঁদকবির সহিত রুদ্রচণ্ডের যখন দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়, অমিয়া তখন মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল । রুদ্রচণ্ড যখন চাঁদকবির নিকট প্রাণভিক্ষা কবিলেন অমিয়ার মুচ্ছা তখনও ভাঙে নাই । ইতিমধ্যে রাজধানী হইতে দূত আসিয়া চাঁদকবিকে জানাইল যে রাজ্যেব সমুহ বিপদ, রাজসভাষ চাঁদকবির উপস্থিতি এখনই আবশ্যক, নিমেষ কেলিবাব অবসর নাই । অমিয়ার সহিত

চাঁদকবি বড়,
এখন থাকুক,
দিয়াছি সেই গা
ধীরে গাহিতে
বসন্ত রাখিবেন
বলিব । কিন্তু ও কথা
দিন যে গানটি শিখাইয়া
দেখুন নাও ।” অমিয়া ধীরে

গিত ।
ব ফুল
ব,
র ।
ধীরে চোখে
সহ
প্রভা
বসন্ত-র
একি হর্ব-
গিল,
সিল—
গা ;
জ গো ।

উদারাগি দাঁড়াইয়া শিরেব তাহাব
দেখিছে ফুলেব ঘুম-ভাঙা,
হরষে কপোল তার রাঙা !
আকাশ হুণীল আঁজি কিবা
অরুণ নবনে হান্ত-বিস্তা,
বিমল শিশির-ধোত তনু
হাসিছে কুহুম-বাজি গো ;
একি হর্ব—হর্ব আঁজি গো !

মধুকর গান পেয়ে বলে—
“মধু কই, মধু দাঁও দাঁও ।”
হরষে স্বদয় ফেটে গিয়ে
ফুল বলে—“এই লও, লও ।”
বাবু আসি কহে কানে কানে—
“ফুলবালা, পরিমল দাঁও ।”
আনন্দে কাঁদিয়া কহে ফুল—
“বাবা! আছে সব ল'য়ে যাও ।”
হবষ ধ'র না তার চিতে,
আপনাবে চাষ বিলাইতে—
নূতন জগৎ দেখি বে
আজিকে হবষ একি রে । (১৮)

গান শেষ হইলে চাঁদকবি বলিলেন, “এইবার আমি

(১০) রুদ্রচণ্ড, ৩য় দৃষ্ট, পৃ: ১৩ ।

(১৪) রুদ্রচণ্ড, ৩য় দৃষ্ট, পৃ: ১৪-১৫ । কাব্য-গ্রন্থাবলী (১৩০৩)
কৈশোরক, পৃ: ৪-৫ ।

(১৫) রুদ্রচণ্ড, ৩য় দৃষ্ট, পৃ: ১৭-১৮ । কাব্য-গ্রন্থাবলী (১৩০৩),
কৈশোরক, পৃ: ৫ ।

(১৬) রুদ্রচণ্ড, ৩য় দৃষ্ট, পৃ: ১৮ ।

জো পিচ্কারী দেখিবামাত্র আপনা হইতে গায়ের জামা খুলিয়া তৈয়ারী হইয়া বসিল। ডাক্তার সাহেব বলিয়াছিলেন একটা বনমাহুঘের এত বুদ্ধি তিনি কোনদিন কর্ত্তনাও করিতে পারেন নাই। অনেক মাহুঘের বুদ্ধি অনেক বনমাহুঘের অপেক্ষা কম।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

সাইকেলে বিপদ

ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং ! সবে সরে' যাওনা,
চড়িতেছি সাইকেল, দেখিতে কি পাও না ?
ঘাড়ো যদি পড়ি বাপু, প্রাণ হবে অন্ত,
পথ মাঝে রবে পড়ে' ছিবুকুটে দন্ত।
বলিয়া গেছেন তাই মহাকবি সাইকেল—
“যেও না যেও না সেথা, যেথা চলে সাইকেল।”
তাই আমি বলিতেছি তোমাদের পষ্ট—
মিছে কেন চাপা পড়ে' পাবে খালি কষ্ট ?
ভাল যদি চাও বাপু, ধীরে যাও সরিয়া।
কি লাভ হইবে বল অকালেতে মরিয়া ?
সকলেই দিবে দোষ প্রতিদিন আমারে ;
গালি দিবে চাষা, ডোম, মুচী, তেলি, কামারে।
এত আমি বলিতেছি—ওরে পাজী রাসকেল—
ঘাড়ো যদি পড়ি তবে হবে বুঝি আক্কেল ?
রঘুনাথ একদিন না সরার ফলেতে
পড়েছিল একেবারে সাইকেল-তলেতে।
সতরই বৈশাখ—(রবিবার দিন সে)
চাপা পড়ে' মরেছিল বুড়ো এক মিন্সে।
তাই আমি বলিতেছি পালানা রে এখনি,
বাঙালী হয়েছ বাপু পলায়ন শেখনি ?

শ্রী সুনির্মল বসু

বৌ কথা কও

তোমরা বোধ হয় বৌ-কথা-কও পাখী দেখেছ। এই পাখী বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে, অর্থাৎ কাঁটাল পাকার দিনে বের হয় বনে' আমাদের সিলেটের দিকে ওকে “কাঁটাল

পাখী” বলে। কাঁটাল পাখী ডাক্তে শুরু করার পর থেকেই কাঁটালও পাক্তে আরম্ভ করে, তারপর শ্রাবণ মাস পর্যন্ত ‘কাঁটাল পাখী’কে ডাক্তে শুনা যায়। এ পাখীটার ডাকার মধ্যে একটা মন্ত মজা আছে। তুমি মনে মনে যাই ভাববে, শুন্বে যেন পাখীও তাই বলে' ডাক্তে। যেমন তুমি মনে মনে ভাবলে ‘বৌ কথা কও’, অমনি তুমিও শুন্বে যেন পাখীও বলছে বৌ কথা কও। আমার কথা তোমার বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে' দেখতে পার।

সিলেটের দিকে কচি কচি ছেলে-মেয়েরা “কাঁটাল পাখী” ডাক্তেই বলতে শুরু করে' দেয়—

“কাঁটাল পাখী, ‘নাইওর’ যাইতে,

ভাইকে খাইল, বনের বাঘে—।”

ছড়াটার একটা সুন্দর মানেও আছে :—

অনেকদিন আগে কাঁটাল পাখী (বৌ কথা কও) নাকি মাহুঘ ছিল। এক গেরস্তের ঘরে ছিল একটি মেয়ে আর একটি ছেলে। মেয়েটি ছিল বয়সে বড়। সেই গেরস্তের বাড়ী থেকে অনেক দূরে মেয়েটির বিয়ে হয়। বিয়ের পর অনেকদিন আর তা'দের ভাই-বোনের দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। তারপরে এক বছর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে আম কাঁটাল পাক্তে সেই ছেলে একজন লোকের সঙ্গে তার বোনের বাড়ীতে তত্ত্ব নিয়ে যায়। কচি বোন এত-দিন পরে ভাইকে দেখে যে কত খুসী হল, তা ত বুঝতেই পার। সেও তার বাপ-মাকে দেখবার জন্তে একবার বাপের বাড়ী আসতে চাইলে। বোনের শশুর-শাশুড়ীর অহুমতি নিয়ে ভাই বোনকে নিয়ে বাড়ীর পথে রওয়ানা হল। বোন চলল পাখী চড়ে, আর ভাই সেই পাখীর ধারে ধারে হেঁটে চলল।

পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে পথ ; পথের দুই ধারে নিবিড় বন। সে বনে লোক-জন নেই, কেবল পশু, পাখী, আর গাছপালা। চারিদিকে কোন গায়ের নাম-গন্ধও নাই, কেবল বন ধু ধু করছে। হঠাৎ জঙ্গল থেকে মন্ত একটা বাঘ বেরিয়ে এল। পাখী বেহারারা নিজের নিজের প্রাণ নিয়ে পালান, সেই ছোট ছোট ভাই-বোনদুটির দিকে একবার ফিরেও চাইলে না। কিন্তু ভাই

কথা বলিবার আর অবসর ঘটিল না, চাঁদকবি চলিয়া গেলেন।

তাহার পর অমিয়া বৃন্দ চাঁদকবিকে খুঁজিবার জন্ত রাজধানীতে আসিল, চাঁদকবি তখন মহম্মদঘোরীর সহিত যুদ্ধ কবিবার জন্ত শিবিরে চলিয়া গিয়াছেন। অমিয়া সাতদিন পথে পথে ঘুরিয়া চাঁদকবির দেখা পাইল না। রাত্রির অন্ধকারে ঝড় উঠিয়াছে, দিকে দিকে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে;—এই ভীষণ দুর্ঘ্যোগে অমিয়া হতাশ-হৃদয়ে পথের ধারে বসিয়া পড়িল। সৌভাগ্যক্রমে বনের এক কাঠুরিয়া তাহাকে আশ্রয় দেওয়ায় অমিয়াব প্রাণরক্ষা হইল।

এদিকে চাঁদকবি অমিয়ার জন্ত ভাবিয়া আকুল, শিবিরে বসিয়া শুধু অমিয়াব কথা মনে পড়িতেছে।

সহস্র খাকু কাক, আজ একবার
অমিয়ারে না দেখিলে নাবিব থাকিতে।
না জানি সে অভাগিনী কি করিছে আশা।
হরত সে সহিছে বিপ্লব অত্যাচার।

* * *

প্রজ্ঞাতের ফুল ভুই, দিবসেব পাখী,
কবে এ আঁধার রাত্রি ফুটাইবে তোর ?
ওই মুখখানি নিয়ে প্রকৃত নয়নে
গান গাতি খেলাইবি প্রাণান্ত হবধে। (১৭)

আবাব দূত আসিয়া খবর দিল যে শত্রুসৈন্য রাত্রিযোগে অলক্ষ্যে আসিয়া তিন কোশ দূরে শিবির ফেলিয়াছে, এখনি যুদ্ধসজ্জা করিতে হইবে। চাঁদকবি সৈন্যদলকে প্রস্তুত কবিবার জন্ত চলিয়া গেলেন, অমিয়ার সহিত আর দেখা কথা হইল না।

বেলা দ্বিপ্রহরে রাজধানীর পথে দলে দলে লোক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চলিয়াছে, সৈন্যদল যুদ্ধযাত্রা করিতেছে। নেপথ্যে অমিয়া গান গাহিয়া চলিয়াছে, বিদায়ের পূর্বে চাঁদকবি যে গান তাহাকে শিখাইয়াছিলেন সেই গানটি।—

তরন্তলে হিম-বৃন্ত মালতীর ফুল
মুদিয়া আসিছে আঁধি তাব।
চাবিদিকে কেহ নাহি তার—
নিরদম অসীম সংসার।”

চাঁদকবি একদল সৈন্যকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাই-
তেছিলেন, হঠাৎ মনে হইল যেন অমিয়ার কণ্ঠ

ভুলিলেন, কি
পথে সে কি কাকুলেই—
আসিয়া সংবাদ দিল যে—হিন্দুসৈন্য
ক্রান্ত, সাহা—
হইলে তাহারা হত
লেন “তবে চল, চল তরা, আঁধার।”
সময়ে অমিয়া আসিয়া ডাকিল—

অমিয়া। চাঁদ, চাঁদ—ভাই মোর—
সৈন্যপণ। কে ভুই। দুব
সেনাপতি। স’রে পাড়া, পথ ছাড়, চল সৈন্য
চাঁদকবি। (স্তম্ভিত হইয়া) অমিয়া বে—
সেনাপতি। চাঁদকবি, এই
আনাদের মুখ চেয়ে সমস্ত ভারত,
ছেলেবেলা পেলে একি পথের ধারে
চল’ চল’ রাজাও রাজাও রণ-ভের
চাঁদকবি। (যাইতে যাইতে) অমিয়া বে, ফিরে
সেনাপতি। রাজাও চুন্মুখি।
[বর্ণবাদ্য। সে
চাঁদকবির প্রস্থ

চুন্মুখি শব্দে চাঁদ-কবির কথা ডুবিয়া গেল
কানে কোন কথা পৌছিল না। অমিয়া আব সহ্য ক
পারিল না, অবসন্নহৃদয়ে পথপ্রান্তে বসিয়া পড়িল।
বাক্সি হইয়া আসিল, রাজধানীর পথ নিতুঙ্গ। অমিয়ার
মনে শুধু এক কথা—

চলে গেল।—সকলেই চ’লে গেল গো।
দিনরাত্রি পথে পথে করিয়া অন্ন
এক যুদ্ধের তরে দেখা হ’ল যদি,
চ’লে গেল ? একবার কথা কহিল না ?
একবার ডাকিল না অমিয়া বলিয়া ?
অন্নের মতন সব চ’লে গেল গো ? (১৯)

চলিতে চলিতে অমিয়া সেই অরণ্যেব পথে আসিয়া
উপস্থিত হইল। অমিয়া ভাবিল আর কোথাও যখন
আশ্রয় মিলিল না পিতার নিকটেই ফিরিয়া যাই, সে অরণ্যে
ফিরিয়া চলিল। তাব হৃদয় কিন্তু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

মা গো মা, সন্ধ্য বুরি ঝেটে গেল মোর।
প্রাণের বন্ধন বুরি ছিঁড়ে গেল সব।
চাঁদ, চাঁদ, ভাই মোর, দেখা হ’ল যদি,
একবার ডাকিলে না অমিয়া বলিয়া ? (২০)

আপন বোনকে ফেলে ত আর পালাতে পারে না ; তারা ভাই-বোনে গলাগলি করে দাঁড়িয়ে রইল। বাঘ এসে বোনের বুক থেকে ভাইকে কেড়ে নিয়ে মেরে ফেলল, কিন্তু বোনকে ছুল না। বোন সেই মরা ভায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কাদতে কাদতে সেইখানেই মরে গেল।

বোনের সেই হৃদয়ভেদী কান্না শুনে ভগবান তাকে পৃথিবী বানিয়ে দিলেন আর সে আজ পর্যন্ত সেই মরা ভায়ের শোকে পাগল হয়ে গেয়ে বেড়ায়—

“কাঁটাল পাখী নাইওর ঘাইতে
ভাইকে খাইল বনের বাঘে—”

আমাদের এ অঞ্চলে এখনো এমন অনেক মেয়ে আছেন, যারা ‘কাঁটাল পাখী’র ডাক শুনেই সেই মরা ভায়ের কথা মনে করে’ চোখের জল রাখতে পারেন না।

শ্রী জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জিনিষ নষ্ট হয়ে যায় কোথা ?

আমরা বলি জিনিষ নষ্ট হয়। কিন্তু নষ্ট হওয়ার মানে কি তা আমরা অনেক সময় বুঝি না। আমরা চোখে দেখি একটা গাছের পাতা, কাগজের টুকরা বা ছেঁড়া ন্যাকড়া পচে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু নষ্ট হয়ে তারা কি একবারে লোপ পায় ? না, তারা অল্প আকারে পৃথিবীর মধ্যেই থাকে। কি রকম করে থাকে তা বলছি।

বর্ষাকালে নদী, খাল, পুকুর সমস্তই বৃষ্টির জলে পূর্ণ হয়ে যায় কিন্তু আবার গ্রীষ্মকালে সেই-সব জল যায় কোথা ? সেই জল সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে আকাশে মেঘের সৃষ্টি করে। বর্ষাকালে আবার সেই মেঘ জল হয়ে যায়। বরফ গলে জল হয়ে গেল আবার জলই বাষ্প হয়ে গেল। কিছুই নষ্ট হল না।

ধান থেকে চাল করে’ আমরা খেলাম। দেখতে গেলে ধানগুলি নষ্ট হল বটে, কিন্তু সেগুলি আবার প্রকারান্তরে আমাদের শরীরের পুষ্টি সাধন করলে। গাছের পাতা মাটির উপর ঝরে’ পড়ল, ছ’দিন পরে পচে গেল—আর দেখা গেল না। কোথায় গেল ? সেই পাতা প্রকারান্তরে আবার গাছেই গেল।—

পাতা যখন পচল তখন তা থেকে তিনটে জিনিষ হল :—(১) বাষ্পীয়, (২) জলীয় এবং (৩) কঠিন।

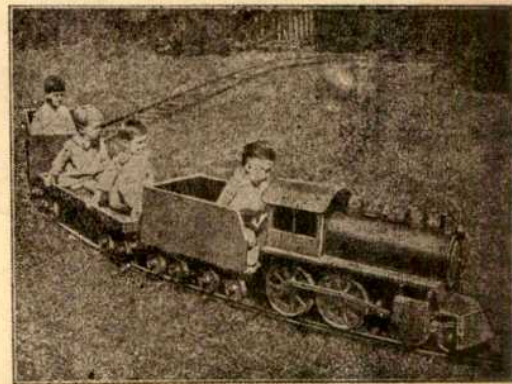
বাষ্পীয় পদার্থটি গেল হাওয়ায় মিশে। হাওয়া থেকে গাছ তাকে পুনরায় পাতার সাহায্যে আহরণ করলে ; জলীয় পদার্থটি মাটিকে ভিজিয়ে দিলে, কতকটা তার হাওয়ায় শুকিয়ে গেল আর কতকটা গাছের শিকড় শুষে নিলে ; এবং শেষের ঐ কঠিন অংশটুকু মাটির উপর রইল পড়ে ; তা আবার সময়-ক্রমে জলে গলে গিয়ে অবশেষে সেই গাছেই শিকড় দিয়ে চলে গেল। এরা সবাই মিলে আবার পাছের পাতা তৈরী করতে সাহায্য করলে।

এই রকম ভাবে দেখতে পাই যে প্রকৃতির ভিতর একই জিনিষ অবস্থা-বিভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করছে। একই লোক যেমন থিয়েটারে, বাজায়, বিভিন্ন সাজে সেজে এসে নানা রকমের অভিনয় করে, প্রকৃতির নানা জিনিষও তেমনি নানা আকারে নানা কাজ করে’ চলেছে। কেউই ব্যর্থ হচ্ছে না, নষ্ট হচ্ছে না।

শ্রী ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

ছেলেদের বেড়াবার রেলগাড়ী

ছেলেদের খেলার রেলগাড়ী অনেকদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। চাবি ঘুরাইয়া দম দিয়া ছাড়িয়া দিলে সে গাড়ীর ইঞ্জিন থানিকটা খুব ছুটিত। আজকাল



ছেলেদের বেড়াবার রেলগাড়ী

আমেরিকায় বড়-লোকরা অনেক বাগানে সৰু রেল পাতিয়া ছেলেদের জন্ত গাড়ীর প্রচলন করিয়াছেন।

অরণ্যে ক্রিয়া আসিয়া অভাগিনী দেখিল যে পিতা
নিজবক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়াছেন। অগিয়া পিতার
পায়ের উপর কাঁদিয়া পড়িল।

অমিয়াকে দেখিয়া রুদ্রচণ্ড চমকিয়া উঠিল। এতদিন
পরে আজ মরিবাব সময় তাহার মনে পড়িল যে তাহার
কন্যা আছে। প্রতিহিংসা-বৃত্তিব কঠিন আবরণ ভেদ
করিয়া রুদ্রচণ্ডেব পিতৃস্নেহ উদ্বেল হইয়া উঠিল।

রুদ্রচণ্ড। আশ মা অমিয়া মোর, কাছে আর বাছা।
এতদিন পিতা তোব ছিল না এ দেহে,
আজ সে সহসা যেথা এসেছে কিবিয়া।
অমিয়া, মলিন বড় মুখখানি তোব,
আহা বাছা, কত কষ্ট পেলি এ জীবনে।
আব তোবে ছুঃখ পেতে হবে না, বালিকা,
পাষণ্ড পিতাব তোর ফুবায়েছে দিন।

এতদিন পরে অমিয়া এই প্রথম পিতৃস্নেহের পবিচয়
পাইল, সে পিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—

অমিয়া। ও কথা বোল না পিতা, বোল না, বোল না।
অমিয়ার এ সংসারে কেহ নাই আব।
তাড়াবে দিচ্ছে মোবে সমস্ত সংসার,
এসেছি পিতার কোলে বড় শ্রান্ত হইবে।
যেথা তুমি যাবে পিতা বাব সাথে সাথে,
যা তুমি বলিবে মোরে সকলি শুনিব,
তোমাবে ভিলেক তরে তাড়িব না আব।

আসন্ন-মৃত্যু রুদ্রচণ্ড কন্যাকে বুকে টানিয়া লইল।

রুদ্রচণ্ড। আশ মা আমার তুই থাক বুকে থাক।
সমস্ত জীবন তোবে কত কষ্ট দিহু।
এখন সময় মোব ফুবায়ে এসেছে,
আজ তোবে কি কবিয়া স্থগী কবি বাছা ?

* * * *
অমিয়া মা, কাঁদিসনে, থাক বুকে থাক। (২১)

এদিকে মহম্মদ-ঘোঁরা হস্তিনাপুর অধিকার করিয়াছে,
পৃথীবাজের সাম্রাজ্য বিলুপ্ত। চাঁদকবি ধ্বংসস্থ পু ছাড়িয়া
চলিয়াছেন।

চাঁদকবি। পৃথীবাজ, রাজদণ্ড, দোদীও প্রতাপ,
হাসি-কান্না-লীলামব নগ্ন নগ্নী,
অচল অটল কাল ছিল বর্তমান,
আজ তাব কিছু নাই। চিরস্বাত নাই।
এই যে চৌদিকে হেরি গ্রাম দেশ যত,
এই যে মানুষগণ কবে কোলাহল,
এ কি সব অশানেতে মরীচিকা জাঁক। (২২)

এ সমস্তের মধ্যেও কিন্তু চাঁদকবির মনে পড়িতেছে
অমিয়ার কথা। চাঁদকবি আর থাকিতে পারিলেন না,
অমিয়ার সন্ধানে অরণ্যে চলিলেন। কুটারেব নিকট
আসিয়া দেখিলেন যে সমস্ত নিস্তর, কোন সাড়াশব্দ নাই।
পদশব্দে প্রতিধ্বনি কাঁদিয়া উঠিতেছে, হাহা করিয়া বায়ু
বহিতেছে। সন্তর্পণে কুটারের দ্বাব উদ্ঘাটন করিয়া
চাঁদকবি দেখিলেন রুদ্রচণ্ডের মৃত-দেহেব পাশে মুমুর্ষু
অমিয়া। আকুল কণ্ঠে অমিয়াকে ডাকিলেন—

অমিয়া, অমিয়া, স্নেহের প্রতিমা,
চাঁদকবি ভাই তোর এসেছে হেথায়।

শ্রী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

(২১) রুদ্রচণ্ড, ১২শ দৃশ্য, পৃঃ ৪৬-৪৭।

(২২) রুদ্রচণ্ড, ১৩শ দৃশ্য, পৃঃ ৪৮।

রণরঙ্গ

আজি গগনে গগনে ঘন-গরজনে বণঝঞ্ঝনা বাজে,
তড়িত চমকে অসির ফলক ঝলকে জ্বলদ মাঝে।
ভূবিমানে আজি জীমূতমস্ত্রে বাজিল তুমুল রণ,
কাপিল বিশ্ব, কি ষোর দৃশ্য, ভয়াতুর জীবগণ।
মহা ব্যোম ঘিরি' নিকষকৃষ্ণ নীবধর নিনাদিল,
বাত্যাতাড়িত ধূলায় অন্ধ ধরা আঁখি নিমীলিল।

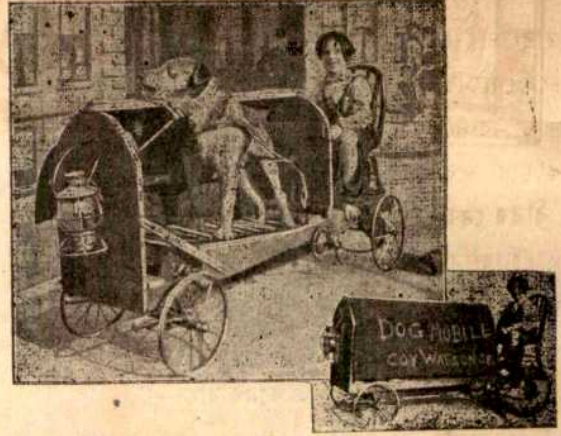
বিহগ কুলাঘে আশ্রয় নিল, নরনারী নিল যবে,
জননীব ক্রোড়ে লুকাইল শিশু বিপুল শব্দা ভরে।
ধারাধর-ধারা ধরণীব গলে অব্যত অজ্ঞহার,
বজ্রর গরজে ? নাকি অসংখ্য অনীকিনী-ছকার ?
বৃক্ষ ভাঙিল, ব্রততী ছিড়িল, বাধিল গণ্ডগোল,
মুক্ত প্রকৃতি-বুকে আজ একি পরলয়-কলরোল ?

শ্রী গোপেন্দনাথ সরকার

সে-রকম একখানি গাড়ীর ছবি আমরা এখানে দিলাম।
এ গাড়ীর ইঞ্জিনের ভিতর বৈদ্যুতিক মোটরের কলকজা
থাকে।

কুকুর-চালিত গাড়ী

আমরা যেমন মোটর চালাই, সাইকেল চালাই,
জন্তুদের দ্বারাও কি সে-রকম কাজ পাওয়া যায় না?
কয় ওয়াটসন্ নামে আমেরিকার লস্ এঞ্জেলসের একটি
দশ বছরের ছেলে বেলজিয়ামের একটি বড় কুকুরের দ্বারা
এক চার-চাকার গাড়ী চালাইতেছে। কুকুরটি গাড়ীর
ভিতরে থাকিয়া পা দিয়া কল টিপিতে থাকে আর তাহাতে
চাকা ঘুরিয়া গাড়ীটি চলিতে থাকে।



কুকুর-চালিত গাড়ী

প

শুক্র বাদল

ঐ নীল-গগনের নয়ন-পাতায়
নাম্নো কাজল-কালো মায়া;
বনের ফাঁকে চমকে বেড়ায়
তারি সজল আলো-ছায়া ॥
ঐ তমাল-তালের বুকের কাছে
ব্যথিত কে দাঁড়িয়ে আছে—
দাঁড়িয়ে আছে,
ভেজা পাতায় ঐ কাঁপে তার
আতুল ঢলঢল কায়া ॥

যার শীতল হাতের পুলক-ছোঁয়ায়
কদম-কলি শিউরে ওঠে,
যুঁই-কুঁড়ি সব নেতিয়ে পড়ে,
কেয়া-বধূর ঘোমটা টুটে,

আহা, আজ কেন তাব চোখের ভাষা
বাদল-ছাওয়া ভাসা-ভাসা?
জলে ভাসা?
দিগন্তরে ছড়িয়েছে সেই
নিতল আঁখির নীল আব্ছায়া ॥
ও কার ছায়া দোলে অতল-কালো
শাল-পিয়ালের শ্যামলিমায়া?
আম্লকী-বন থাম্নো ব্যাথায়,
ঘাম্নো কঁদন গগন-সীমায়া।
আজ তার বেদনাই ভরেছে দিক,—
ঘর-ছাড়া হায় এ কোন্ পথিক,
এ কোন্ পথিক?
এ কি শুক্র তারি আকাশ-জোড়া
অসীম রোদন-বেদন-ছায়া ॥
কাজী নজরুল ইসলাম

উমারানী

বসন্ত পড়ে গিষেচে না? দখিন হাওয়া এসে শীতকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। আকাশ এমন নীল, যে মনে হচ্ছে, উড়ন্ত চিলগুলোর ডানায় নীল রং লেগে যাবে। এই সময় আমার তাব কথা বড় মনে পড়ে। তাব কথাই বলবো।

মেডিকেল কলেজ থেকে বার হয়ে প্রথম দিন কতক গবর্ণমেণ্টের চাকরী নেবাব বুখা চেষ্টা করবার পর যে মাসে আমি একটা চা-বাগানের ভাঙ্গারী নিয়ে গোহাটীতে চ'লে গেলুম, সেই মাসেই আমাব ছোট বোন শৈল তার খুশ-বাড়ীতে কলেরা হয়ে মাঝা-গেল। এই শৈলকে আমি বড় ভালবাসতুম, আমার অন্তান্ত বোনদের সঙ্গে ছেলেবেলায় অনেক মারামারি কবেছি, কিন্তু শৈলর গায়ে আমি কোনোদিন হাত তুলিনি। শৈলর বিয়ে হয়েছিল ২শোর জেলার একটা পাড়ারগায়ে। শৈল কখনো সে গ্রামে যায় নি, তার স্বামী তাকে নিয়ে কলকাতায় বাসা ক'রে থাকতো। তার স্বামী প্রথমে পাটের দালালী করতো, তার পর একটা অফিসে ইদানীং কি চাকরী করতো। যেখানে শৈলর স্বামী বাসা করেছিল, তার পাশেই আমার মামার বাড়ী,—একটা গলির এপার ওপার। এই বাসায় ওরা শৈলর বিয়েও মামাব বাড়ী থেকেই হয়।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে বাগানের ম্যানেজারের বাংলা থেকে একটা ঘা ড্রেস ক'রে ফিরছি, পিণ্ডন খান-কতক চিঠি আমার হাতে দিখে গেল। আমার বাসায় ফিরে এসে তারি একখানাতে শৈলর মৃত্যুসংবাদ পেলুম। বাংলাব চারি পাশেব ঝাউ কুমুড়ো ও সরল গাছগুলো সন্ধ্যার বাতাসে সন্ সন্ করছিল। আমাব চোখের সামনের সমস্ত চা-বাগানটা, দূরের ঢালু পাহাড়ের গাটা, মারঘেরটা ২নং বাগানের ম্যানেজারের বাংলার সাদা রংটা, দেখতে দেখতে সবগুলো মিলে একটা জমাট অন্ধকার পাকিয়ে তুললো।

আলো জালিয়ে চুপ ক'রে ঘরের মধ্যে ব'সে রইলুম।

বাইবের হাওয়া খোলা ছায়াব জানালা দিখে ঘবে ঢুকতে লাগলো। অনেক দিনের শৈল যে! কলিকাতা থেকে ছুটি পেয়ে ষখন বাড়ী যেতুম, শৈল বেচাবী আমায় তৃপ্তি দেবার পদ্দা খুঁজে ব্যাকুল হয়ে পড়তো। কোথায় কুল, কোথায় কাঁচা তেঁতুল, কার গাছে কথ্বেল পেকেছে, আমি বাড়ী আসবার আগেই শৈল এসব ঠিক ক'রে বাধতো; নানা রকম মসলা তৈরী ক'বে কাগজে কাগজে মুড়ে রেখে দিত, আমি বাড়ী গেলেই তার আনন্দ-জ্ঞানো ব্যস্ততা আব ছুটাছুটির আব অণ থাকতো না। গ্রীষ্মে ছুটিতে আমি বাড়ী গেলে আমায় বেলের সবৎ খাওয়াবার জন্তে পরের গাছে বেল চুবি কর্ত্তে গিয়ে ঘবেব পবেব কত অপমান সে সহ করেছে; আমারই জুতো বুনে দেবে ব'লে তার উলবোনা শেখা। সেই শৈল তো আজকের নয়, যতদূর দৃষ্টি যায় পিছন ফিবে চেয়ে দেখলুম কত ঘটনার সঙ্গে কত তুচ্ছ স্বথ-তুঃখের স্মৃতির সঙ্গে শৈল জড়ানো রয়েছে। কত খেলা-ধূলোয় সে আজ ঐ আকাশের মাঝখানকার জলজলে সপ্তমি-মগুলের মত দূরের হয়ে গেল, ঝাউ-গাছের ডাল-পালার মধ্যকার ঐ বাতাসেব শব্দের মতই ধরা-ছোয়ার বাইরে চলে গেল।

তার পরদিন ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেলুম। বাড়ীর সকলকে সান্ধা দিলুম। আহা, দেখলুম আমার ভগ্নীপতি বেচারী বড় আঘাত পেয়েছে। শৈলর বিয়ে হয়েছিল এই মোটে তিন বৎসর, এই সময়ের মধ্যেই সে বেচারী শৈলকে বড় ভালবেসে কেলছিল। তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলুম। শৈল প্রথম বুনতে শিখেই আমার ভগ্নীপতির জন্তে একটা গলাবন্ধ বুনছিল, সেটা আধ-তৈরী অবস্থায় প'ড়ে আছে, ভগ্নীপতি সেইটে আমার কাছে দেখাতে নিয়ে এল। সেইটে দেখে আমার মনের মধ্যে কেমন একটু হিংসে হোলো, আমার জুতো বুনে দেবার জন্তে উল বুনতে শিখে শেষে কিনা নিজের স্বামীর গলাবন্ধ আগে বুনতে যাওয়া! তবুও তো সে আজ নেই!



বীবর-ছেদিত-প্রকাণ্ড বৃক্ষ—

বীবররা গাছের ডাল ইত্যাদি দিয়া বাসা তৈয়ারী করিয়া বাস করে। তাহারা একসাথে অনেক মিলিয়া বস্তু তৈয়ার করে। গাছের ডাল দাঁত দিয়া কুরিয়া কুরিয়া কাটিয়া ফেলে, তাহার পর সেইগুলিকে তাহাদের বস্তুর দিকে টানিয়া লইয়া যায়। সাধারণত তাহারা ছোট ছোট গাছই কাটে। কিন্তু মেক্সিকোতে সম্প্রতি একটা প্রকাণ্ড আম্রগণে গাছ বীবররা দাঁত দিয়া কাটিয়া মাটিতে ফেলিয়াছে। গাছটাকে যেখানে ছেদন করা হইয়াছে, সেখানের পরিমাণ ৩০' ২৬"। এত বড় গাছ তাহারা প্রায়ই কাটে না, কারণ প্রকাণ্ড গাছের কাণ্ড তাহারা টানিয়া



বীবর-ছেদিত বৃক্ষ

লইয়া ঘাইতে পারে না। এই গাছটাকে মাটিতে ফেলিবার একমাত্র উদ্দেশ্য তাহার উপরের ডালগুলিকে সংগ্রহ করা। গাছটা পুত্রের দিকেই পড়িয়াছে, তাহাতে বীবরদের ডালপালাগুলিকে বেশীদূর বহন করিবার কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না।

পকেট বিশ্বকোষ—

মার্কিন দেশের 'রিয়ার অ্যাডমিরাল' ব্র্যাডলি এম ফিল্ডে সম্প্রতি একপ্রকার নতুন বই ছাপিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পদ্ধতিতে মুদ্রিত হইলে যে কোন ব্যক্তি পকেটে করিয়া ২০ খণ্ড এনসাইক্লোপিডিয়া লইয়া পথে বাটে বেড়াইতে পারিবে। এই পদ্ধতির মুদ্রণে বইএর দামও নাকি তাহার বর্তমান মূল্যের ১/১০ হইবে। টাইপ, বই বাঁধান ইত্যাদির কিছুই প্রয়োজন হইবে না। ছাপা বইএর অক্ষরগুলি ফটো-এন্থ্রোপিক্সের সাহায্যে এক-একটি অক্ষর যা আছে তাহার ১০০ গুণ ছোট হইয়া যাইবে। এই ১০০ গুণ ছোট অক্ষরগুলি দুই-ইঞ্চি চওড়া এবং ৫ ইঞ্চি লম্বা কাগজের উপর ছাপা হইবে। কাগজের দুই পিঠেই ছাপা চলিবে। এই রকম পাঁচখানা কাগজে একটা মাঝারি গোছের উপস্থান ছাপা খুবই সহজ। আডমিরাল ফিল্ড বলেন যে মাত্র ৪ পয়সা খরচে ১০০,০০০ কথাওয়ালা বইএর ১০,০০০ খণ্ড ছাপা হইতে পারে।

এই মুদ্রিত কাগজগুলিকে বালি চোখে পড়া যায় না। পড়িতে হইলে ইহাদের একটি আলুমিনিয়ামের তৈরী ছোট হালুকা ফ্রেমে বসাইতে হয়। এই ফ্রেমে খুব জোরাল লেন্স বসান আছে। এই লেন্সটিকে ইচ্ছামত এবং সুবিধাজনক করিয়া নাড়ান যায়।



পকেট-বিশ্বকোষ ও তাহা পাঠের প্রণালী

এই কলটি বাজারে আসিলে অনেকের খুব সুবিধা হইবে। দু-পয়সার টিকিটের সাহায্যে যথেষ্ট বই পাঠান চলিবে। ৫০ হইতে ১০০০ খানা বই একটা সিগার কেসের মধ্যে অনায়াসে লইতে পারা যাইবে।

বন্দী অক্টোপাস—

নিউ-ইংল্যান্ডের কয়েকজন মৎস্যজীবী একটা প্রকাণ্ড আট-শুঁড়-ওয়ালা অক্টোপাস ধরিয়াছে। এক-একটা শুঁড়ের জোরও ভয়ানক। সে শীকারকে এই আট পা দিয়া জড়াইয়া ধরে, এবং তারপর তার টিরাপাখীর মত প্রকাণ্ড ঠোঁট দিয়া তাহার দেহ টুকরাইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলে।

পরে আবার গোহাটা ফিরে গিয়ে যথারীতি চাকরী করতে লাগলুম। দেশ থেকে এসে আমার ভগ্নীপতির সঙ্গে প্রথম প্রথম খুব পত্র লেখালেখি ছিল, তারপরে তা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। তার আবে বিশেষ কোনো সংবাদ রাখতুম না, তবে মাঝে মাঝে আমার বাড়ীর পত্রে জানতে পারতুম, সে অনেকের অনেক অসুখবোধ সত্ত্বেও পুনরায় বিবাহ করতে রাজী নয়। বিবাহ সে আর নাকি করবে না।

এই রকম ক'বে বিদেশে অনেক দিন কেটে গেল, দেশে যাবার বিশেষ কোনো টান না থাকতে দেশে বড় যেতুম না। আমার মা বাবা অনেক দিন মারা গিয়েছিলেন, বোনগুলির সব বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, আমি নিজেও তখন অবিবাহিত, কাজেই আমার পক্ষে দেশ বিদেশ চুই সমান ছিল। চা-বাগানের কাজেব কোন বৈচিত্র্য ছিল না, সকাল-বেলা ডাক্তারখানায় ব'সে নীরস একঘেয়ে ভাবে কুলীদের হাত দেখা, কলেব পুতুলেব মত ঔষধ লিখে দেওয়া। রোগ তাদের ঘেন বড় একঘেয়ে রকমের, সাদাজ্বর, হিল্-ডায়েরিয়া, বড় জ্বর — কালাজ্বর, কালে ভত্রে এক-আধটা টাইফয়েড বা শক্ত রকমের নিউমোনিয়া। যখন হাতে কাজকর্ম বিশেষ থাকতো না, তখন পড়তুম, না হয় আমার একটা খেয়াল আছে—অপটিক্সের বা আলোকতত্ত্বের চর্চা করা—তাই করতুম। বাংলার একটা ঘর এই উদ্দেশ্যে আধার ঘর বা ডার্ক-রুম পবিগত করে নিয়েছিলুম। কলিকাতা থেকে প্রতি মাসে অনেক ভাল ভাল লেন্স ও অপটিক্সের বই সব আনাতুম।

বছর তিনেক এই ভাবে কেটে গেল। এই সময় আমার বাড়ীর পত্রে জানলুম, আমার ভগ্নীপতি আবার বিবাহ করেছে। সকলের সনির্বন্ধ অসুখবোধ ও পীড়া-পীড়ির হাত সে নাকি আর এড়াতে পারলে না। এতে মনে মনে আমি তাকে কোন দোষ দিতে পারলুম না, শৈলর প্রতি তার ভালবাসা অকৃত্রিমই, তাই বলে সে এতদিন যুঝলো তো?

সেবার বৈশাখ মাসের প্রথমে দেশে গিয়ে আমার বাড়ী উঠলুম। আমার এমন কতকগুলো কথা অপটিক্স

সম্বন্ধে মনে এসেছিল যা একজন বিশেষজ্ঞেব নিকট বলা নিতান্ত আবশ্যিক ছিল। আমার এক বন্ধু সেবার বিলাত থেকে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে বস্তুবিজ্ঞানেব অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিল, তার সঙ্গে সে-সব বিষয়ের কথাবার্তা কইবাব জন্যেই আমার একরকম কলিকাতায় আসা। তার ওখানে যাতায়াত আরম্ভ করলুম, সেও খুব উৎসাহ দিল, আমি অপটিক্স নিয়ে একেবাবে মেতে উঠলুম।

এই অবস্থায় একদিন সকাল-বেলা বাবান্দায় ব'সে পড়ছি, হঠাৎ আমার চোখ পড়ে গেল সামনের বাড়ীর জানলাটা। সেইটেই আমার ভগ্নীপতির বাসা। দেখলুম কে একটি অপরিচিতা মেয়ে ঘরের মধ্যে কি কাজ করছে। আমার দিক থেকে শুধু তাব জুপুই হাত ছুটি দেখা যাচ্ছিল, আর মনে হচ্ছিল তার পিঠেব দিকটা খুব চওড়া।

একটু পরেই সেই ঘরের ভিতর ঢুকলো আমার ভগ্নীপতির বোন টুনি। টুনিব বিষে হয়ে গিয়েছে, বোধ হয় সম্প্রতি শব্দবাবড়ী থেকে এসেছে। আমি গোহাটা থেকে এসে পর্যন্ত ওদের বাড়ী ঘাই নি। টুনিকে দেখে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—টুনি, ঐ মেয়েটি কি নতুন বউ?

—হ্যাঁ, দাদা।

—দেখি একবার।

টুনি মেয়েটিকে ডেকে কি বল্লো, তাকে জানালার কাছে নিয়ে এসে তার ঘোমটা খুলে দিলে। ভাল দেখা গেল না। গলির এপারে আমাদের মামাদের বাড়ীটা উঠে গলির ওপারের বাড়ীর ঘরগুলোকে প্রায় অপটিক্স চর্চার ডার্ক-রুম ক'বে তুলেছিল, দিনমানেও তার মধ্যে আলো যায় না। ভাল না দেখতে পেয়ে বল্লুম, “হাঁ রে, কিছুই তো দেখতে পেলুম না?”

টুনি হেসে উঠলো, বল্লো, “আপনি ওখান থেকে যে দেখতে পাবেন না তা আমি জানি। তার ওপর তো আবার চশমা নিয়েচেন।” তারপর কি ভেবে টুনি একটু গম্ভীর হোলো, বল্লো, “আপনি এসে পর্যন্ত তো এবাড়ী একবারও আসেন নি, দাদা। আজ দুপুর-বেলা একবার আসবেন?”

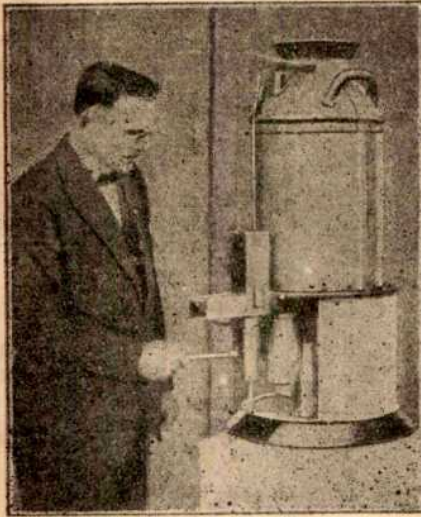
দুপুর বেলায় ওদেব বাড়ী গেলুম। বাড়ী ঢুকতেই মনে



তট্টোপান

ছুধের কল -

রাস্তার মোড়ে মোড়ে ছুধের কল দাঁড়াইয়া আছে। কলের মুখের কাছে ক্রেতা একটি খালি বোতল রাখিয়া, একটি মুত্রে রাখিয়া কল টিপিলেই উপযুক্ত পরিমাণ ঠাণ্ডা ছুধ বোতলে আসিয়া পড়িবে। ছুধের পাত্রের চারিদিকে বরফ থাকিতে ছুধ ঠাণ্ডা থাকে এবং নষ্ট হয় না।



ছুধের কল

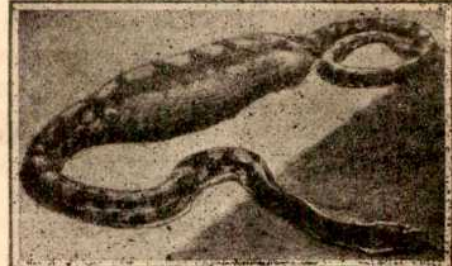
বোতল সরাইবা মাত্র উপরের ট্যাঙ্ক হইতে জল পড়িয়া নল সাফ হইয়া যায়। আমাদের দেশেও এই রকম করিয়া খাঁটি ছুধের ব্যবসা চালান যাইতে পারে।

জাপানী সৈন্যের দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধি—

জাতের সঙ্গে মানুষের বন্ধোবশ্ত হইবার পর হইতেই গড়পড়তা প্রত্যেক জাপানী সৈন্য ২ ইঞ্চি করিয়া লম্বা হইয়াছে।

সাপের শূকর গেলা—

জৈক-কদ্দো রাজ্যে একটা বোড়া সাপ একটা শূকর আস্ত গিলিয়া ফেলে। গিলিবার পূর্বে সে শূকরটাকে জড়াইয়া ধরে এবং জোর দিয়া তাহার হাড় গুঁড়া করিয়া দেয়। তারপর গিলিবার সময় তাহার



শূকর-গেলা সাপ

বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। কিন্তু গেলা শেষ হইবার পর শূকর পেটে গিয়া সাপটাকে নিশ্চল করিয়া ফেলে। অবশেষে সাপটা পেট ফাটিয়া মরিয়া যায়।

আমেরিকার সব-চেয়ে বড় হীরা—

উইলিয়াম জে লা-ভারে নামক এক ২৪ বছরের যুবক আমেরিকার সব-চেয়ে বড় হীরা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই মহামূল্য রত্নটি পাওয়া গিয়াছে ব্রিটিশ গায়ানাতে এক জঙ্গলের মধ্যে। হীরাটি এক ইঞ্চি লম্বা এবং ১ ইঞ্চি মোটা, চওড়াতে ইহা এক ইঞ্চি। ইহার ওজন ৩১ ক্যারিট।

লা-ভারে যখন এই মহামূল্য হীরাটি লইয়া নিউইয়র্কে আসিলেন, তখন তাহার পেছনে একদল লোক লাগে, হীরাটিকে বেহাত করিবার মতলবে। পুলিশ ব্যাপার বৃদ্ধিতে পারিয়া হীরাটিকে এক ব্যাঙ্কের সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিলে।

যে জঙ্গলে এই হীরা পাওয়া গিয়াছে, সেখানের আবহাওয়ার কথা বলিয়া কাজ নাই। ম্যালেরিয়া-পীড়িত বাংলা দেশেও এমন কোন স্থান নাই যে তাহার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। সেখানে রত্নের সন্ধানে অনেকেই গিয়াছেন, কিন্তু সেই অনেকেই ফিরিবেন কি না বলা যায় না। লা-ভারে প্রথম ফিরিয়া আসিয়াছেন।

১৮ বছর বয়সে লা-ভারে প্রথম ঐ স্থানের ম্যাজারুনি নদীতে সোনা তুলিতে যান। প্রথম তিন মাসে তিনি প্রায় ৬০,০০০ টাকার

হোলো, ৪।৫ বছর আগে ভাই-ফোঁটা নিতে শৈলর নিমন্ত্রণে এবাড়ী এসেছিলুম, তার পর আব এবাড়ী আসিনি। দালান পাব হয়ে ঘরে যেতে বাড়ীর মেয়েরা সব আমায় ঘিরে দাঁড়ালেন। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হয়ে গেলে টুনি বলে “দাদা, বৌ দেখবেন আসুন।” ঘরের মধ্যে গেলুম। টুনি নতুন বউয়ের ঘোমটা খুলে দিয়ে বলে, “ওঁব সাম্নে ঘোমটা দিতে হবে না, বৌদি। উনি তোমার দাদা।”

মেয়েটি আধ-ঘোমটা দিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে আমাব পায়েব কাছে প্রণাম করলে। দিব্যি মেয়েটি তো। রং খুব গৌরবর্ণ, ভারি সুন্দর মুখখানির গড়ন। একরাশ কৌকড়া কৌকড়া ঠাস-বুনানি কালো চুলে মাথা ভর্তি। বেশ মোটা-সোটা গড়ন। বয়স বোধহয় ১৪।১৫ হবে। টুনির মা বললেন, মেয়েটির বাপ পশ্চিমে চাকরী করেন, সেখানেই বরাবর থাকেন। ওই এক মেয়ে, অল্প ছেলেপিলে কিছু নেই। তাঁদের সঙ্গে কি জানাস্তনো ছিল, তাই এখানেই সম্বন্ধ ঠিক করে দিয়েছেন।

মেয়েটি প্রণাম ক’রে উঠে দাঁড়ালে আমি তার হাত ধরে তাকে কাছে নিয়ে এলুম। বাঁহাতে তাব ঘোমটা আব-একটু খুলে দিয়ে বল্লুম, “আমার কাছে লজ্জা কোরো না, খুকী, আমি যে তোমার দাদা। তোমার নামটি কি?”

তাব চোখের অস্ফোট দৃষ্টি দেখে বুঝলুম, মেয়েটি সেই মুহূর্তেই আমার বোন হয়ে পড়েচে। সে খুব মুহূর্তে উদ্ভব দিল, “উমারাগী”।

আমি বল্লুম, “আচ্ছা, আমরা আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো? এস উমারাগী, এই চৌকিটায় ব’সে তোমার সঙ্গে একটু কথা কই।” আমি চৌকিতে তাকে কাছে নিয়ে বসালুম, খানিকক্ষণ তার সঙ্গে একথা সেকথা নানা কথা কইলুম।

জিজ্ঞাসা করলুম, “বাড়ী ছেড়ে এসে বড় মন কেমন করছে, না?”

উমারাগী একটু হেসে চুপ ক’রে রইল।

আমি বল্লুম, “তোমার বাবা থাকেন কোথায়?”

—মাউ।

আমি মাউএর নাম কখনো শুনিনি। জিজ্ঞাসা করলুম, —মাউ, সে কোন্‌খানে বল দেখি?

—সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়ায়।

—তোমার বাবা সেখানে কি কাজ করেন?

—কমিসারিয়েটে।

—তোমার আব কোন ভাই বোন নেই, না?

—না। আমাব পব আমার আর এক বোন হয়, সে আঁতুড়েই মারা যায়। তার পব আর হয় নি।

বাড়ী ছেড়ে অনেক দূর এসেছে, ভাবলুম হয়তো বাপ-মায়ের কথা বলতে মেয়েটিব মনে কষ্ট হচ্ছে। কথার গতি ফিরিয়ে দেবার জন্তে জিজ্ঞাসা করলুম,—তুমি লেখাপড়া জান, উমাবাগী?

—আমি সেখানে মেয়েদের স্কুলে পড়তাম, বাংলা পড়া হতো না বলে বাবা ছাড়িয়ে নেন। তাব পব বাড়ীতে বাবাব কাছে পড়তাম।

—বাংলা বই বেশ পড়তে পাবো?

—পারি।

আমি উমারাগীর কথাবার্তা কইবার ভাবে ভারী আনন্দিত হলুম। এমন সুন্দর শাস্ত্রভাবে সে কথাগুলি বলছিল, মাটির দিকে চোপছটি রেখে, যে আমার বড় ভাল লাগলো। আমি তার মাথায একটা আদবের ঝাঁকুনি দিয়ে বল্লুম,—বেশ, বেশ। ভাবী লক্ষ্মী মেয়ে। আচ্ছা, অল্প আর এক সময়ে আসবো, এখন আসি।

দাঁড়িয়ে উঠেচি, উমাবাগী আবার সেইরকম গলায় আঁচল দিয়ে আমার পায়েব কাছে প্রণাম করলে। আমি তাকে বল্লুম,—খুব শাস্ত্র হয়ে থেকো কিন্তু উমারাগী। কোনো দুইমি যেন কোরো না। তাহলে দাদার কাছে,—বুঝলে তো?

উমারাগী হেসে ঘাড় নীচু ক’বে রইল।

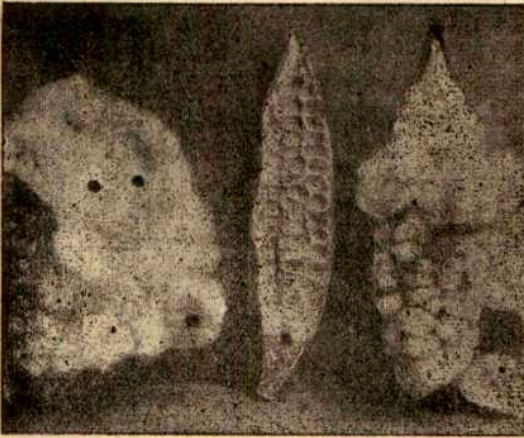
* * *

এব ৫।৬ মাস পরে পূজাব সময় আবাব আমাব বাড়ী এলুম। অষ্টমী পূজার দিন দিনব্যাপী পরিশ্রমের পর একটা বড় ক্লান্তি বোধ হওয়াতে সন্ধ্যার আগে একটা ঘরের ভিতর পাটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। আমার মামার বাড়ী পূজা হোত। সমস্তদিন নিমজ্জিত-

দোনা পান। জঙ্গলে মশার আক্রমণ ভয়ানক। দূর হইতে মশার পালকে কালো মেঘের মত মনে হয়, তাহাদের গুঞ্জন-ধ্বনি কর্ণে অমৃত বর্ষণ না করিয়া অন্তরে অশ্রু-কিছুর সঞ্চার করে। লা-ভারের সঙ্গে চারজন সঙ্গী ছিল, তাহাদের তিনজন জঙ্গলী-অরে মারা গিয়াছে। চতুর্থ-জন হান্‌পাতালে মরিবার অপেক্ষায় আছে। লা-ভারের মতে ঐ-সব নিবিড় জঙ্গলে কোন লোক একটানা ৫ মাসের বেশী থাকিতে পারে না। লা-ভারের তিনবার জ্বর হয়—এবং একবার তিনি মরমরও হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার প্রতিজ্ঞা ছিল যে “মরি আর বাঁচি—হীরার সন্ধান করে’ তবে লোকালয়ে ফিরবো।” তাহার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট সার্থক হইয়াছে। লা-ভারের কার্যে ঐ স্থানের আদিম অধিবাসীরা অনেক সাহায্য করিয়াছে।

আকন্দের তুলা—

আকন্দের তুলাকে ইংরেজিতে ক্যাপক বা সিক্‌ কটন বলে। এই তুলা ভারতবর্ষে, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ, স্টেট্‌ স্টেটল্‌মেণ্টে, ইউকেডারে, ব্রাজিলে এবং ফিজিতে পাওয়া যায়। এই তুলার আঁশ খুব মসৃণ এবং লম্বা। আঁশের মধ্যে হাওয়া ভর্তি থাকে। জাভা দ্বীপেই এখন সর্বাপেক্ষা বেশী অর্ক বা আকন্দ তুলা উৎপন্ন হয়। অস্ট্রাছ দেশ হইতে যে পরিমাণ পাওয়া যায়, তাহা খুবই সামান্য এবং খারাপ ধরণের। ভারতবর্ষের আকন্দ তুলা ভারী এবং মোটা। তাহা ছাড়া ইহাতে বড় বেশী বাঁচি থাকে। ভারতবর্ষের আকন্দ তুলা জাভার অর্ক তুলার মত শক্ত এবং চকচকে হয় না। ব্রাজিল এবং ইউকেডারে আকন্দ তুলার উন্নতি করিবার খুবই চেষ্টা চলিতেছে।



আকন্দের ফল ও তুলা

বাজারে ইহার আদরও ক্রমে বাড়িতেছে। জাভাতে পথে বাটে আকন্দ গাছ দেখা যায়। জাভার লোকেরাই বেশীর ভাগ এই তুলার চাষ করে, যেতদ্রুপে দু-একজন আছে। একই জমিতে কফি এবং কোকো গাছের সঙ্গে অর্কের চাষ করা হয়। জাভার লোকেরা লাঠির সাহায্যে আকন্দ ফল পাড়ে। মেয়েরা এবং ছোট ছোট ছেলেরা ফল ভাঙ্গিয়া তুলা বাহির করে। তুলা বায়বন্দী করিবার সময় খুব সাবধানে করিতে হয়। বেশী চাপ পড়িলে তুলা নষ্ট হইবার আশঙ্কা।



আকন্দের তুলার জামা

উৎকৃষ্ট আকন্দ তুলা মার্কিনে চালান হয়, ইউরোপে যায় মাঝারি গোছের এবং সবচেয়ে খারাপ আকন্দ তুলা যায় অস্ট্রেলিয়াতে। ১৯২০ সালে অর্ক তুলার চালান (জাভা হইতে) :—

মার্কিনে—৫৫৪৫ টন

অস্ট্রেলিয়াতে—৩৪১৫ টন

ইংলণ্ডে এবং ইউরোপে—২৫২৮ টন।

রেডিওর খেলা—

প্যারিস হইতে একজন খবর দিয়াছেন—মেয়েদের রং-বেরঙের ছাতায় বেতার-বাস্তা গ্রহণের সব কলকজা লাগান হইয়াছে। এখন হইতে মেয়েরা আর ভীড়ের মধ্যে প্রকাণ্ড হলে বসিয়া গান-বাজনা শুনিবেন না—তাহারা উদ্যানে ছাতা খুলিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সঙ্গীত এবং বাদ্য উপভোগ করিবেন। এমন কি বাগানে বসিয়া বসিয়া বাড়ীতে রান্নার কতদূর হইল, মাংসের ঝোলে যেন লম্বা বেশী না হয়—এই-সব কথাও আদান-প্রদান চলিবে।

ছাতার সাহায্যে বেতার সংবাদ গ্রহণ এবং প্রদান প্রথমে একজন মার্কিন বালক আবিষ্কার করে। সম্প্রতি নিউ জার্সি সহরের এ্যালফ্রেড জি রাইনহার্ট নামক এক বালক অঙ্গুলের একটি আঙুর উপর বেতার-সংবাদ-গ্রহণী কল স্থাপন করিয়াছে। সে ছাতা ব্যবহার করে—সংবাদ ধরিবার জন্ত। কেনেথ আর হিন্‌মান নামে আর-একজন জার্সির বালক একটি ছোট দেশলায়ের বাজের মত বাজে বেতার-সংবাদ-গ্রহণী-প্রদানী সব কলকজা স্থাপন করিয়াছে। এই ছোট বাজের তুলনায় ছাতার বেতার-কলকে একটা প্রকাণ্ড বাজে জিনিষ বলিয়া মনে হয়। ইহাতে আশেপাশের (৩২ মাইল স্থান ব্যাপিয়া) চারিদিকের বেতার আড্ডা হইতে যাহা-কিছু শব্দ পাঠান হয়, সবই ধরা যায়। গান বাজনা বক্তৃতা ইত্যাদি সবই বেশ স্পষ্টই শুনিতে পাওয়া যায়। এই বালক তার শিশুকাল হইতেই

দের অভ্যর্থনা করা, পরিবেশন করা প্রভৃতি নানা কাজে বড় খাটতে হয়েছিল। অনেক রাত্রে উঠে খেতে গেলুম। আমার ছোট ভাই খাবার সময় বলে, “অনেক-কণ ঘুমিয়ে ছিলেন তো দাদা? দিদি এসেছিলেন, আরতির সময় আপনাকে দেখবার জন্তে আপনার ঘরে গেলেন। আপনি ঘুমিয়ে আছেন দেখে আপনার পাশে হাত দিলেন আপনাকে ওঠাবার জন্তে। আপনি উঠলেন না। তার পর তাঁরা সব চলে গেলেন। তিনি নাকি পরশু বাপের বাড়ী চলে যাবেন। আপনি অবিশ্টি একবার ওবাড়ী যাবেন, কাল। আপনার সঙ্গে দেখা না হওয়ায় দিদি বড় দুঃখ ক’রে গিয়েছেন।”

আমি ঘুমের ঘোরে কথাটা তলিয়ে না বুঝে বললুম, —দিদি মানে?

—ও বাড়ীর।

—উমারাণী?

—হ্যাঁ। দিদি, টুনিদি, এঁরা সব আবতির সময় এসেছিলেন কি না।

উমারাণীর কথা আমার খুব মনে ছিল। তাব সেই ভক্তিনন্দ্র মধুর ব্যবহারটুকু আমার বড় ভাল লেগে-ছিল। তাই তাকে ভুলি নি, এবাব চা-বাগানে গিয়ে মেয়েটির কথা কয়েকবার ভেবেছি। তার পর-দিন সকালে উঠে কান্ডাকর্মের পাশ কাটিয়ে এক ফাঁকে ওদের বাড়ী গেলুম। বাইরে কাউকেও না দেখতে পেয়ে একেবারে ওদের রান্নাঘরের মধ্যে চ’লে গেলুম। টুনির মা বললেন, “এস এস বাবা। তা এতদিন এসেছ, এ বাড়ী কি একবারও আসতে নেই?”

আমি সমঝোচিত কি একটা কৈফিয়ৎ দিলুম। উমারাণী মাছ কুটছিল, আমি যেতেই তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে চ’লে গেল। একটু পরেই হাত ধুয়ে এসে আমার পায়ের কাছে প্রণাম করলে। টুনির মা বললেন, “বৌমা, সতীশকে দালানে নিয়ে গিয়ে বসাত গে। এখানে এই ধোঁয়ার মধ্যে—”

দালানে যেতেই, টুনি কোথায় ছিল, এসে ব’লে উঠলো, “একি! দাদা যে? কি ভাগ্যি! বৌদিদি দাদা দাদা ব’লে মবে ফি দিন আমার জিজ্ঞাস বরে—দাদা পূজোর

ছুটিতে বাড়ী আসবেন তো? দাদার দায় প’ড়ে গিয়েছে খোঁজ করতে! ৪৫ দিন এসেছেন, এ বাড়ীর চৌকাঠ মাড়ালে চণ্ডী কি অন্তর হয়ে যায় শুনি?”

আমাকে একটু অপ্রতিভই হতে হলো। উমা-রাণীর কোঁকড়া চুলে ভরা মাথাটিতে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম, “হ্যাঁ রে রাণী, দাদার কথা তা হলে ভুলিস্ নি?”

টুনির কথাষ মেয়েটির খুব লজ্জা হয়েছিল, সে মুখ নীচু ক’রে আমার কোঁচার কাপড়ের কোণ হাতে নিয়ে চুপ্ ক’রে নাড়তে লাগলো—আমি দালানে একটা খাটের উপর বসে ছিলাম, উমারাণী নীচে আমার পায়ের কাছটিতে বসে ছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, “শচীশ বলছিল, দিদি চলে যাবে সোমবারের দিন। সে কথা কি ঠিক?”

উমারাণী নতমুখেই উত্তর দিল, “বাবা পত্র দিয়ে-ছিলেন একাদশীর দিন নিয়ে যাবেন। কিন্তু আজও তো এলেন না।”

ওর গলার স্বরটা যেন একটু কঁপে গেল।

তার বিরহী বালিকা-হৃদয়টি মা-বাপের জন্তে তৃষিত হয়ে উঠেচে বুঝে শাস্ত্রনার স্বরে বললুম, “আসবেন; আজ তো গোটে নবমী। আচ্ছা, কলকাতা কেমন লাগলো, রাণী?”

উমারাণী উত্তর দিল, “বেশ ভালো।”

আমি তাব নতমুখখানির দিকে চেয়ে বললুম, “তা নয় রে, রাণী। ভালো কখনই লাগেনি, দাদার খাতিরে ভাল বললে চলবে না। কোথায় পশ্চিমের অমন জল হাওয়া, আর এই ধুলো ধোঁয়া—ভালো লাগতেই পাবে না।”

উমারাণী একটুখানি হেসে চুপ ক’রে রইল।

জিজ্ঞাসা করলুম, “পশ্চিমে পূজো হয় রে রাণী?”

সে বললে, “ঠিক এদেশের মত হয় না। হিন্দু-স্থানীরা কি একটা কবে, সেও অনেকটা এই রকমের। আর সেখানে এ সময় রামলীলার খুব ধুম হয়।”

আমি উঠে আসবার সময় উমারাণী আবাব একবার আমার পায়েব কাছে নত হয়ে প্রণাম করলে।



ছাতার গায়ে রেডিও

কলকজা নিদ্রাণে অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দিতেছে। শিশুকালে সে কাগজ কাটিয়া একটি এয়ারোপ্লেন তৈয়ার করে। এয়ারোপ্লেনের স্থূল স্থূল সমস্ত কলকজা ঠিক জায়গা-মাকিক বসানো হইয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় শিশু হিন্মান কাগজের এয়ারোপ্লেন তৈয়ার করিবার পূর্বে এয়ারোপ্লেনের কল-কজা কখনো দেখে নাই। আর-একবার সে কাগজ কাটিয়া একটি ছব্ব মোটরকার তৈয়ার করিয়াছিল। আমেরিকার এখন প্রায় প্রত্যেক বালকই রেডিও সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু আলোচনা করিতেছে। তাহারা হয়ত ভবিষ্যতে রেডিও-জগতে কত আশ্চর্য আবিষ্কার করিবে।

হেমন্ত

তলোয়ারের ফলার উপর নাচ -

পশ্চিমী বাজিকরদের অনেক সময় দেখা যায়, তারা একেবারে খোলা তলোয়ারের পর পর উপর দিকে ফলা রাখিয়া সাজাইয়া তার

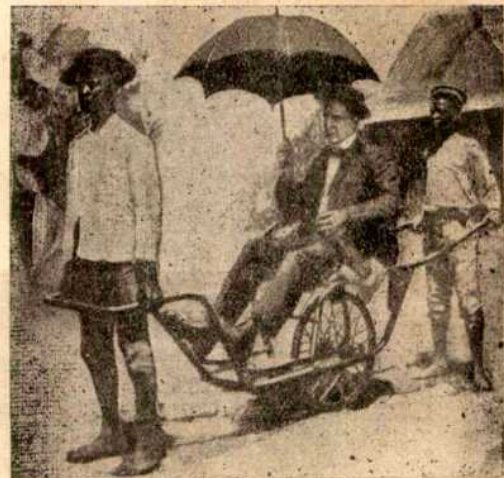


তলোয়ারের ফলার উপর নাচ

উপর বাজনার তালে তালে নাচিতে থাকে, অথচ তাদের পায়ের তলা মোটেই কাটে না। এমন ধারালো তলোয়ারে পা না কাটিবার কারণ কি? অপরীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে খুব ধারালো তলোয়ার প্রভৃতির ফলাও একেবারে মসৃণ নয়, একটু কব্বকরে, অনেকটা কব্বাকের মত। তার উপর পা বা হাত চাপিয়া রাখিলে তাহা কাটে না। কিন্তু হাত পা একটু এদিক ওদিক সরাইলেই কাটিবে। বাজিকররা ফলার উপর পা চাপিয়া রাখে, এবং মনে হয় তারা নাচিবার সময় পা নাড়িতেছে, কিন্তু পা যেখানে পড়ে সেখান হইতে মোটেই নাড়ে না; তাই পাও কাটে না।

একচাকার আরাম-গাড়ী—

পূর্ব-আফ্রিকার পূর্ব-গীজ-অধিকৃত স্থানে ধনী লোকেরা এক রকম আরাম-গাড়ী ব্যবহার করেন, তার একটি নমুনা চাক। গাড়ীটিকে চাকা-ওয়ালা চেয়ার বলিলেও চলে। সামনে ও পিছনে দুইটি



একচাকার আরাম-গাড়ী

চাকরে গাড়ী লইয়া যায়। খারাপ রাস্তায় বা বন-পথে এই গাড়ী আবার চাকররা কাধে করিয়া পাকীর মত বহিয়া লইয়া যায়।

সাগরিকা—

সাগরে জাহাজ চালাইবার কাজ আজ অবধি পুরুষেরাই করিয়া আসিতেছে। কিন্তু আমেরিকায় সম্প্রতি একটি নারী দক্ষতার জোরে জাহাজে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ পাইয়াছেন। ইহার নাম মিসেস কার্লিয়া এন্স ওয়েষ্টকট, বাড়ী ওয়াশিংটনে সিয়াটলে। বর্তমানে তিনি প্রবাসী ইঞ্জিনিয়ারের পদে আছেন। ইনি বলেন—বাপ্প-যন্ত্র-চালনার কাজ মেয়েদের পক্ষে কষ্টকর নয়, ইহাতে কেবল সতর্কতা ও মনোযোগের প্রয়োজন।

প

আমি বল্লুম, “রাণী, আমি যতবার আসবো যাবো ততবারই কি আমায় একটা ক’রে প্রণাম করতে হবে?”

উমারাণী বোধ হয় এই প্রথমবার আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বসে, “কাল বিকেলে আসবেন, দাদা।”

এর আগে উমারাণী কখনো আমায় দাদা ব’লে ডাকেনি। আমি ওব মুখে দাদা ডাক শুনে বড় আনন্দ পেলুম। বল্লুম, “কাল তো বিজয়া দশমী, আসবো বৈ কি।”

তার পরদিন বিজয়া দশমী। সন্ধ্যার পর ওদেব বাড়ী গেলুম। সকলকে প্রণাম করলুম। টুনি এসে বসে, “আপনি দালানের পাশে ঘরে যান। ওখানে বৌদি আছেন।”

আমি সে ঘরের দোর পর্যন্ত গিয়ে ঘরের মধ্যে একটা বড় সুন্দর দৃশ্য দেখলুম। তাতে ঘরের মধ্যে যাওয়া বন্ধ ক’রে আমায় দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে হোলো।

দেখি, ঘরের মধ্যে খাটের উপরে ব’সে আমার ছোট ভাই শচীশ, তাব বয়স বাব তেব। তার পাশে উমারাণী দাঁড়িয়ে খাটের পাশের একটা টেবিলের উপরকার একখানা বেকাবী থেকে খাবার নিয়ে শচীশের মুখে তুলে দিখে তাকে খাওয়াচ্ছে। ওদের চুজনকারই পেছন আমার দিকে।

এমন কোমল স্নেহের সঙ্গে উমারাণী শচীশের কাধের ওপর তার বা. হাতটি দিখে স্নেহময়ী বড়দিদির মত আপন হাতে তার মুখে খাবার তুলে দিচ্ছে, যে, আমার মনে হোলো আজ শৈল বেঁচে থাকলে সে এব বেশী করতে পারতো না। উমারাণীর প্রতি এতদিন অনন্তরূপ একটা স্নেহরসে আমার মন সিক্ত হয়ে উঠলো। আমি খানিকক্ষণ দোরের কাছে চুপ ক’বে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের ভিতর ঢুকে প’ড়ে উমারাণীকে বল্লুম, “লুকিয়ে লুকিয়ে ছোট ভাইকে খাওয়ালে শুধু হবে না। দাদাকে কি খেতে দিবি রে, রাণী?”

বেচারী উমারাণীর মুখ লাল হয়ে উঠলো লজ্জায়। সে এমন ধতমত খেয়ে গেল হঠাৎ, যে, খামকা যে

এত প্রণাম করে, আজ বিজয়ায় প্রণাম করতে সে ভুলে গেল। একটা কি কথা অস্পষ্টভাবে বার দুই ব’লে সে মাথা নীচু ক’রে বইল। আমিও তার দিকে চেয়ে চুপ ক’রে দাঁড়িয়ে রইলুম, আজ যে তাকে ধ’রে ফেলেছি, তার ভাই-বোন-বিহীন নিষ্কিন প্রাণটি কিসের জন্তে তৃপ্তিত হয়ে আছে, তা যে আজ বার ক’বে ফেলেছি। আজ অনুভব করছিলাম, জগতের মধ্যে ভাইবোনের একটুকু স্নেহ পাবার জন্তে ব্যাকুল, এমন অনেক হৃদয়কে আজ আমি আমার বড়-ভাইয়ের উদার স্নেহছায়াতে আশ্রয় দিয়েছি। একটা বুক-জুড়ানো তৃপ্তিতে আমার মন ভ’রে উঠল।

সেই সময় টুনি সেই ঘরে ঢুকে আমার সামনেব টেবিলে থালা-ভরা মিষ্টান্ন রেখে বসে, “দাদা, একটু মিষ্টি-মুখ করুন।”

আমি টুনিকে বল্লুম, “আমি টুনি, সকলে মিলে—”
উমারাণীকে খাটের উপর বসালুম। খাবার সকলকেই দিলুম। উমারাণী লজ্জায় একেবারে আড়ষ্ট, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে’ গেল তার, লজ্জার চোটে। বেচারী লজ্জায় আর ঘামে হাঁপিয়ে মারা যায় দেখে তার ঘোমটা বেশ ক’রে খুলে দিলুম।
বল্লুম, “আমি দাদা, আমার কাছে লজ্জা কি রে, রাণী? আমার লক্ষ্মী ছোট বোনটি—,”

জলযোগ পরে সমাধা ক’রে বাইরের দালানে এসে টুনির মায়েব সঙ্গে গল্প কর্তে আরম্ভ করলুম। একটু পবে তিনি উঠে রান্নাঘরে চ’লে গেলেন। আরও খানিক পরে আমি উঠতে যাচ্ছি, উমারাণী এসে কাছে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করলুম, “রাণী, আজ ঠাকুব-বিসর্জন দেখলি নে?”

সে বসে, “ওপরের ঘরের জানালা থেকে দেখছিলাম, বেশ ভালো।”

বল্লুম, “অনেক রকমের প্রতিমা, না?”

সে বসে, “হাঁ, কত সব বড় বড়।” তার পর একটু চুপ ক’রে থেকে আমার দিকে চেয়ে বসে, “দাদা, কাল আসবেন না?”

আমি বল্লুম, “সে কি বলতে পারি? সময় পাই তো



কালিয়া এন্ড ওয়েষ্টকট্—জাহাজের মহিলা ইঞ্জিনীয়ার

তিমি-তুণ্ড পক্ষী—

বৈজ্ঞানিকের নিকটে ইহা “Whale-head” নামে পরিচিত এবং যে বিশিষ্ট বিহঙ্গ-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ইহাকে তাহার গণ্য করেন তাহার বৈজ্ঞানিক নাম “Balenicipitidae”। পাখীটার আর-



তিমি-তুণ্ড পক্ষী

একটা নাম আছে “Shoe-bill” বা “Shoe bird”—জুতা-ঠোঁট পাখী। ইহা ইহার আরবী নামের তরজমা বলিলেই হয়। ইহার একটি রঙ্গিন চিত্র ১৮৫১ খৃঃ Zoological Societyর proceedingsএ প্রদত্ত আছে। ১৮৬০ খৃঃ অর্কে দুটি জীবন্ত পক্ষী ইংলণ্ডের চিড়িয়াখানায় প্রদর্শিত হইয়াছিল।

মিশর দেশের নীল নদের সমীপবর্তী শরতৃণাকীর্ণ জলাভূমিতে ইহাকে দেখা যায়। সাধারণতঃ ইহাকে হাড়গিলা এবং বক জাতীয় বিহঙ্গগণের মধ্যবর্তী বৈজ্ঞানিক সংযোগ-বিধায়ক “শৃঙ্খল” বলিয়া গণ্য করা হয়।

দেখিতে স্বন্দর নহে ; বর্ণ ধূসর ; দাঁড়াইলে পাঁচ ফুট হয়, ইহার বৃহৎ চঞ্চু তিন মাসের মাথার স্থায় দেখায়, চঞ্চুর অগ্রভাগ বক ও ভীতিপ্রদ।

মার্কিন দেশের বাদ্বরে যে এটি এই প্রকার পাখী সংগৃহীত হইয়াছে তন্মধ্যে পঞ্চমটি সম্প্রতি নিউইয়র্কে আনীত হইয়াছে। ইহার হাড়গিলা বা মদনটাক শ্রেণীর পাখী।

সত্যচরণ লাহা

পৃথিবীর বয়ঃক্রম—

ত্রিশ বৎসর আগে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন বলিয়া-ছিলেন,—পৃথিবী যে রকম দ্রুতগতিতে ঠাণ্ডা হইয়া চলিয়াছে তাহার অনুপাত ধরিয়া হিসাব করিলে মনে হয়, দুই কোটি বৎসর আগে ইহার প্রচণ্ড তাপ কোনোপ্রকার জীববাসের অনুপযুক্ত ছিল। এই একই যুক্তির বলে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন, যে, আর দুই কোটি বৎসর পরে সূর্য্যপিণ্ডও জ্যোতিহীন তাপহীন হইয়া যাইবে, তখন আলোক ও তাপের জন্ত গ্রহপুঞ্জকে হয় অথবা কোনও জ্যোতিষ্কের দ্বারস্থ হইতে হইবে, নতুবা গ্রহ উপগ্রহ সমেত সমস্ত সৌরমণ্ডল মরিয়া গিয়া চির অন্ধকারে সমাধি লাভ করিবে।

কিন্তু অধুনা Radio-activity বা অদৃশ্য রশ্মি-তরঙ্গের ক্রিয়ায় আবিষ্কারের পর বৈজ্ঞানিকদের অনেক ধারণাই আমূল পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। যে পরমাণু বা atomকে এককাল অবিভাজ্য বলিয়া মনে করা হইত, তাহারও মধ্যে এমন এক অদৃশ্য শক্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহা স্বল্পাধিক ক্ষয় এবং সমস্ত পদার্থেরই মূল উপাদান-বস্তু। অদৃশ্য রশ্মি-তরঙ্গের ক্রিয়ায় ইউরেনিয়াম নামক পদার্থ বহু পরিবর্তনাদির মধ্য দিয়া সীসাতে রূপান্তরিত হয় দেখা গিয়াছে, এই রূপান্তর-প্রক্রিয়ার সময় বহু হেলিয়াম ‘খণ্ড’ (পৃথিবীর সব চেয়ে লঘু গ্যাস) ভীষণবেগে চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়িতে থাকে এবং তাহা হইতে উত্তাপের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীতে এক বৎসর পরিমাণে ইউরেনিয়াম বিদ্যমান আছে, যে, এই তথ্য আবিষ্কৃত হইবার পরে পৃথিবীর জুড়াইয়া যাইবার ভয় একেবারে ঘুটিয়া গিয়া পণ্ডিতদের ভয় হইয়াছে পাছে অত্যধিক হেলিয়াম গ্যাসের মুক্তিলাভের ফলে পৃথিবী উত্তরোত্তর উষ্ণ হইয়া উঠিয়া ক্রমে জীববাসের অযোগ্য হইয়া পড়ে।

ইউরেনিয়ামের এই সীমায় রূপান্তরকে অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর বয়সও নুতন করিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর কি পরিমাণ ইউরেনিয়াম এই উপায়ে সীসাতে রূপান্তরিত হয় তাহার হার নির্দ্ধারিত মাপে জানা আছে।—যে কোনো-একটি নির্দ্ধিষ্ট পরিমাণ ইউরেনিয়াম-খণ্ডের ১০০০ কোটির এক ভাগ মাত্র সীসাতে রূপান্তরিত হয়। ইউরেনিয়াম-সীসা-সম্বন্ধিত কোনো একটি ধনিজ পদার্থ লইয়া তাহার মধ্যে ঐ দুটি পদার্থ কি অনুপাতে আছে তাহা স্থির করিতে পারিলেই ঐ ধনিজ পদার্থটির বয়সও আপনা হইতেই বাহির হইয়া পড়ে। এই উপায়ে দেখা গিয়াছে যে পৃথিবীর সর্বপ্রধান প্রস্তরখণ্ড-

আসবো। আবার শীগগির চলে যাবো কিনা, অনেক কাজ আছে।”

সে বললে, “আপনি কি খুব শীগগির যাবেন, দাদা?”

আমি বল্লুম, “হ্যাঁ, বেশী দিন তো ছুটি নেই, পূর্ণিমার পরেই যেতে হবে।”

উমারাণী নতমুখে চুপ ক’রে রইল।

বল্লুম, “তা তোকেও তো আর বেশী দিন থাকতে হবে না রে।”

উমারাণী বললে, “বাবা বোধ হয় কাল আসবেন।”

ওকে একটু সাহসনা দেবার জন্ত বল্লুম, “তবে আর কি? এই দুটো দিন কোন রকমে কাটলেই তো—”

সে একটু চুপ ক’রে থেকে তার পর যেন ভয়ে ভয়ে বললে, “যাবার আগে একবারটি এবাড়ী আসতে পারবেন না, দাদা?”

বল্লুম, “খুব খুব। আসবো বৈকি। নিশ্চয়।”

এর ৬৭ দিন পরে গোঁহাটী রওনা হলুম। এই ৬৭ দিন নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে চারিদিক ঘুরতে হয়েছিল। শচীশের মুখে শুনেছিলুম উমারাণীর পশ্চিম যাওয়া হয় নি। কি কাবণে তাব বাবা তাকে নিতে আসতে পারেন নি। শচীশ মাঝে মাঝে বলতো, “দাদা যাবার আগে একবার দিদির সঙ্গে দেখা ক’রে যাবেন। তিনি আপনার কথা প্রায়ই বলেন।”

ইচ্ছা থাকলেও গোঁহাটী যাবার আগে উমারাণীর সঙ্গে দেখা করা আর আমার ঘটে ওঠে নি।

গোঁহাটী গিয়ে এবার অনেকদিন রইলুম। উমারাণীর কথা প্রথম প্রথম আমার খুব মনে হোত, তারপর দিন-কতক পরে তেমন বিশেষ ক’রে আর মনে হোত না, ক্রমে প্রায় ভুলেই গেলুম। কিছু দিন পরে গোঁহাটীর চাকরী ছেড়ে দিলুম। শিলচর, দার্জিলিং, নানা চা-বাগান বেড়ালুম। দু-একটা হাসপাতালেও কাজ করলুম। সব সময় নিরুজ্জ্বল কাটাছুম। একা বাংলায় থেকে থেকে কেমন হয়েছিল, অনেক লোকের ভিড়, অনেক লোকের একসঙ্গে কথাবার্তা, সহ্য করতে পারতুম না। এখানে সন্ধ্যায় পাহাড়ের দেওয়ালের গায়ে কুসুম-ছড়ানো সূর্যাস্ত, চা-ঝোপের চাবিপাশ-ঘেবা গোবুলিব অন্ধকাব,

গভীর রাত্রির একটা স্তব্ধ গভীর ধম্‌ধম্‌ ভাব, আর সরল গাছের ডালপালার মধ্যে বাতাসেব বিচিত্র স্বব, ওই আমার কাছে বড় প্রিয়, বড় স্বস্তিকব বলে মনে হোত।.....বসবার ঘরটিতে সাজিবে রেখেছিলুম জগতের যুগ-যুগের জ্ঞানবীবদের বই—Gauss, Zollner, Helmholtz, Giekie, Logan, Dawson; যাদের অলোক-সামান্য প্রতিভা আমাদের হৃদয় বহুস্তরার অতীত শৈশবের, তাঁর রহস্যময় বালিকা-জীবনের তমসাম্পন্ন ইতিহাসেব পাতা আলোকোজ্জ্বল ক’রে তুলেছে, যাদের মনীষার যোগ-দৃষ্টি অসীম শূন্যের দূরতা ভেদ ক’রে বিশাল নক্ষত্রজগতের তত্ত্ব অবগত হচ্ছে, তাঁদের সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত কাটাছুম। জগতেব রহস্যভাবা অক্লিসন্ধি তাঁদেরই প্রতিভার তীব্র সার্চ-লাইট পাতে উজ্জ্বল হয়ে তবে তো আমাদের মত সাধারণ মানুষেব দৃষ্টির সীমার মধ্যে আসছে।

এই রকম প্রায় ৭৮ বছর পরে আবার কলকাতাও গেলুম। ভাবলুম কলকাতাতেই প্র্যাক্টিস্ আরম্ভ করবো। মামার বাড়ী গিয়ে উঠলুম। শুনলুম, সামনের বাড়ীটাও আমাব ভগ্নীপতিবা আর থাকে না, তারা বছর পাঁচ ছয় হোলো দেশে চলে গিয়েছে। কয়েক মাস কলকাতায় কাটলো। প্র্যাক্টিস্ যে খুব জমে উঠেছিল, এমন নয়, বা অদূর ভবিষ্যতেও যে খুব জমে উঠবে, এমন মনে করবার কোন কারণও দেখতে পাচ্ছিলুম না। এমন অবস্থায় একদিন সকালে মামার বাড়ীর ওপরের ঘরে বসে পড়ছি, এমন সময় কে ঘরে ঢুকলো। চেয়ে দেখে প্রথমটা যেন চিন্তে পারলুম না, তাবপর চিনলুম—টুনি। অনেক দিন তাকে দেখিনি, তার চেহারা খুব বদলে গিয়েছে। আমি তাকে হঠাৎ দেখে যেমন আশ্চর্য্যও হলুম, তেমনি খুব আনন্দিতও হলুম।

টুনি বললে, সে তার স্বামীর সঙ্গে আজ ৫৬ দিন হোলো কলকাতায় এসেছে, শিম্লেতে তাদের কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে এসে আছে, আজ এবাড়ীও সকলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। অত্যাশ্চর্য্য কথাবার্তার পর তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, “হুৱেন এখন কোথায়?”

স্ববন আমাব ভগ্নীপতির নাম।

জুলির বয়স নান পক্ষে ৯২ কোটি বৎসর। কিন্তু পৃথিবী-পৃষ্ঠের মাটির আন্তরগণের বয়স প্রাচীনতম প্রস্তরপিণ্ডটি হইতেও অনেক বেশী। পৃথিবীর মোট ইউরেনিয়াম ও সীসার পরিমাণ ও তাহাদের অনুপাত ধরিয়া বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে এই বয়স ৬০০ কোটি বৎসরও হইতে পারে।

ঘূর্ণী—

ঘূর্ণী-বায়ুর কেন্দ্রবিন্দুকে ঘিরিয়া সমুদ্রের ঢেউ সবদিকে সমান জোরালোই হওয়া উচিত, সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাই মনে হয়। কিন্তু সম্ভ্রুতি বহু পর্যবেক্ষণের ফলে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, ঘূর্ণীবায়ুর গতিমুখের সম্মুখে কেন্দ্রবিন্দুর ডানদিকের ঢেউগুলি অত্যধিককার ঢেউ হইতে অনেক বেশী বড় ও জোরালো হয়। সম্ভব হইলে এই কথা মনে রাখিয়া অতঃপর ঝড়ের সময় কাপ্তানেরা জাহাজের গতি নিয়মিত করিবে।

রেডিও-বার্তাবহ—

আমেরিকার ডাক-বিভাগকে রেডিও-বার্তাবহে রূপান্তরিত করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। এই রেডিও বার্তাবহের সহায়তায় সমস্ত দেশ জুড়িয়া গৃহে গৃহে কথাবার্তা চলিবে। কাজ করিতে করিতে রেডিও-কোনের মুখে পৃথিবীর রোজকার খবর শুনিয়া লইতে পারা যাইবে। রেডিওফোনের উন্নতির সম্ভাবনা অসামান্য ও বহুবিস্তৃত। অতি মৃচ্ছনকটকট ইহার সহায়তায় এক মহাদেশ জুড়িয়া শুনিতে পারা যাইবে। কলিকাতায় কোথাও একটি আল্পিন পড়িয়া গেলে কলম্বো বা পেশোয়ারে বসিয়া তাহা বলিয়া দিতে পারা যাইবে। ইহা কবিকল্পনা নহে, দ্রুতগতিতে সত্য হইয়া উঠিতেছে। আমেরিকার ঘরে ঘরে রেডিওফোন স্থাপিত হইবে। শ্রেষ্ঠ গায়কের গান, শ্রেষ্ঠ অভিনেতার অভিনয়, শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকের বক্তৃতা, শ্রেষ্ঠ পুরোহিতের উপাসনা,

শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের অধ্যাপনা, একসঙ্গে সমস্ত মহাদেশের লোকের মিলিয়া শুনিবার উপায় হইতেছে। আমরা সহরবাসীরা কজন টেলিফোন ব্যবহার করি?

(গত বৎসরের চৈত্রের প্রবাসীর ৮২২ পৃষ্ঠা দেখুন।)

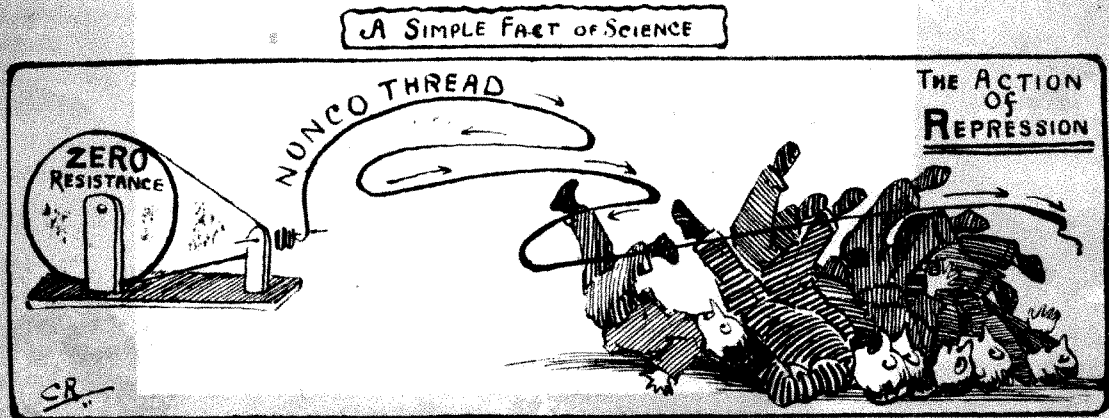
ভবিষ্যতের এয়ারপ্লেন—

আজকালকার গেসোলিন-মোটরে চলা যে মোনও এরোপ্লেন ঘণ্টায় ১৫০ মাইল চলে। ঘণ্টায় ২০০ মাইল চলিতে পারে এরূপ এরোপ্লেন নির্মাণের চেষ্টা নানা স্থানে হইতেছে। সম্ভবত বিমান-বিহারে গেসোলিনের ব্যবহার উঠিয়া গিয়া চাপ-দেওয়া বাতাসের চালন হইবে। চাপ-দেওয়া বাতাস গেসোলিন-ইঞ্জিনের মত এত স্থান জুড়িবে না, উহাতে চলার বেগও এখনকার অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে।

সচল চিত্রের অভিনয়ে প্রভুতত্ত্ব—

ইতিহাস, প্রভুতত্ত্ব, বিভিন্ন-দেশীয় শিল্পরীতি, প্রভৃতির ছাত্রদের ঐ ঐ বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য এতদিন নানাদেশ পর্যটন করিতে হইত। জাদুগীতে সচল-চিত্রের অভিনয়-সজ্জায়, রোস, গ্রীস, ইজিপ্ট প্রভৃতি দেশের নানা প্রসিদ্ধ স্থান ও নানা প্রকার শিল্প-রীতির এমন যথাযথ ও হৃদয়ের অনুকরণ করা হইয়াছে, যে, বার্লিন হইতে দলে দলে ছাত্রেরা শিক্ষালাভের জন্য এইগুলি আসিয়া দেখিয়া যাইতেছে। বায়স্কোপের এই টিউগুলি ইতিহাস-ছাত্রদের তীর্থস্থান হইয়া উঠিয়াছে। বিখ্যাত শিল্প-উদাহরণগুলির প্রতিটি রেখার টান, প্রতিটি রঙের ছোপ পর্যন্ত ভ্রব নকল করা হইয়াছে। ছাত্রদের বিনা পয়সায় ইজিপ্ট, গ্রীস, চীন প্রভৃতি দেশ বেড়ানোর কাজ হইয়া যাইতেছে।

স ৮



একটা বৈজ্ঞানিক সূত্র—টানের উল্টা টান না থাকিলে ফল পিঠটান।

চিত্রকর—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় বি.এসি মহাশয়ের সৌজন্যে

টুনি বললে, “ছোড়না এখন ঝাবাদে কোথায় চাকরী করেন, সেখানেই থাকেন।”

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, “উমারানী কোথায়?”

টুনি একটু চুপ করে রইল। তার পর বললে, “দাদা, সে অনেক কথা। আপনি এখানে আছেন, তা আমি জানতুম। সেসব কথা আপনাকে বলবো বলেই আমাব একরকম এখানে আসা।”

আমি বললুম, “কি ব্যাপার শুনি? সে ভাল আছে তো?”

টুনি বললে, “সে ভাল আছে কি, কি আছে, সে আপনিই শুনুন না।। সেই যে বছর পূজোব সময় আপনি এখানে ছিলেন, বৌদির বাপের নিতে আসবার কথা ছিল, সে তো আপনি জানেন। তখন তিনি ছুটি পান নি ব’লে আসতে পারেন নি, পত্র দিয়েছিলেন পরের মাসে নিয়ে যাবেন। তার বৃষ্টি মাসথানেক পরে খবর এল তিনি কলেরায় মাঝা গিয়েছেন। বৌদি সেই বিয়ের কনে বাপের বাড়ী থেকে এসেছিল, এমনি তার অদৃষ্ট, আর সে-মুখো হস্তে হোলো না। তারপর—”

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, “উমারানীর মা?”

টুনি বললে, “শুনুন না। মা আবার কোথায়? তিনি তো বৌদির বিয়ে হবার আগেই মাঝা গিয়েছিলেন। তাবপর এদিকে দাদা তার সঙ্গে বিশেষ কোনো সম্বন্ধ রাখেন না। তিনি সেই যেখানে চাকরী করেন, সেখানেই থাকেন, বৌদি থাকে চাপাপুকুরের বাড়ীতে প’ড়ে। দাদা চিঠিপত্রও দেন না। বৌদি বড় শাস্ত, বড় চাপা মেয়ে, সে মুখ ফুটে কখনো কিছু বলে না, কিন্তু তাব মুখের দিকে চাইলে বুক ফেটে যায়। মেবেমাহুশের ও কষ্ট যে কি, সে আপনি বুঝবেন না, দাদা। যতদিন মা ছিলেন, বৌদিকে কষ্ট জানতে দেননি, তা তিনিও আজ ছবছর মারা গিয়েছেন। বাড়ীতে আছেন শুধু পিসিমা।”

সেই শাস্ত ছোট মেয়েটির উপর দিয়ে এত ঝড় বয়ে গিয়েছে শুনে আমার মনে বড় কষ্ট হোলো। জিজ্ঞাসা করলুম, “স্বরেনের এমন ব্যবহারের মানে কি?”

টুনি বললে, “তা তিনিই জানেন। তবে তিনি নাকি বলেন, জোর ক’রে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিয়ে

করার তাঁর কোন ইচ্ছা ছিল না, এই সব। বড় দাদাও দেশের বাড়ীতে থাকেন না। বাড়ীতে থাকেন শুধু পিসিমা। কাজেই বৌদিদির মুখের দিকে চেয়ে তাকে একটু যত্ন করে, দুটো কথা বলে, এমন লোকটা পর্যন্ত নেই। পিসিমা আছেন, কিন্তু সে না থাকারই মধ্যে।”

সে খানিকক্ষণ চুপ ক’বে বইল, তাব পব বললে, “আপনাকে একটা কথা বলি দাদা। আপনি একবার তাব সঙ্গে দেখা ক’রে আসুন। আপনাকে সে যে কি চোখে দেখে তা বলতে পারি নে দাদা। সেবার চাপাপুকুর গিয়েছিলাম, বৌদি বললে, আমাব দাদার কথা কিছু জানো, ঠাকুরঝি? আপনি এদেশ ওদেশ ক’রে বেড়াচ্ছেন শুনে সে কেঁদে বাঁচে না। মাঝে মাঝে যখনই তার কাছে গিয়েছি, আপনাব কথা এমন দিন নেই যে সে বলেনি। বলে, ভগবান আমাব ভাইবের অভাব পূর্ণ করেছেন, দাদা আর শচীশকে দিয়ে। এখনও পর্যন্ত কি চিঠিতেই আপনাব ঝোঁক নেয়। তা বড় পোড়াকপালী সে, কারুর কাছ থেকে কোন স্নেহই সে কোনোদিন পেল না। আপনাব পায়ে পড়ি, দাদা, আপনি তাকে একবার গিয়ে দেখা দিয়ে আসুন, আপনি গেলে সে বোধ হয় অর্ধেক দুঃখ ভোলে।”

ছাদের আলিসাব উপর থেকে রোদ নেমে গেল, পাশের বাড়ীব ছাদের চৌবাচ্চাব উপব বসে একটা কাক একঘেষে চীৎকার করছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, “স্বরেন কি মোটেই বাড়ী যায় না?”

টুনি বললে, “সে এক রকম না যাওয়াই দাদা। বছরে হয় তো দুবার, তাও গিয়ে এক আধ দিন থাকেন। তাও যান সে কি জন্তে, কিস্তী না কি, —সেই সময় যার কাছে বা খাজনা পাওয়া যাবে তাই আদায় করতে।”

তারপব অন্তান্ত এক আধটা কথাবার্তার পব টুনি চলে গেল। সেদিন বিকালে সেনেট-হলে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতা ছিল, তিনি কেদ্রিজ থেকে এসে-ছিলেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে। বক্তৃতার বিষয়টি ছিল যেমনই চিন্তাকর্ষক,—বক্তৃতার তথ্যাংশও

গুলো? ব'লে আবার বিছানা হাতড়াতে লাগলো। দাদা বিয়ের পর প্রথম প্রথম যেসব চিঠি তাকে লিখেছিলেন, সে সেগুলো যত্ন ক'রে ওর বাসে তুলে রেখেছিল, আমি তা জানতাম। আমি সেগুলো বাস থেকে বের করে নিয়ে এসে তার আঁচলে বেঁধে দিলাম—তখন থামে। তারপর সেই রাত্রেই সে মারা গেল। যখন তাকে বার করে নিয়ে গেল তখনও তার আঁচলে সেই চিঠিগুলো বাঁধা।”

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, “স্মরেন সে সময় ছিল না?”

টুনি বললে, “ছোড়দাকে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল, তিনি যখন এসে পৌঁছলেন, তখন বৌদিকে দাহ করা হয়ে গিয়েছে।”

* * * *

অনেক বছর হয়ে গিয়েছে।

এখনও শীতের অবসানে যখন আবার বাতাবী-লেবুর ফুল ফোটে, সজ্জনে-তলায় ফুল কুড়োবার ধুম পড়ে যায়, পাড়ারগায়ের বন ঝোপ ঘেঁটু-ফুলে আলো ক'রে রাখে, পুকুরের জলে কাঞ্চন-ফুলের রাঙা ছায়া পড়ে, কাঞ্চন-চুপুরের আবেশ-বিভোর রোদ আকাশ বাতাসে খরখর ক'রে কাঁপতে থাকে, তখন আপন মনে ভাবতে ভাবতে কার কথা যেন মনে প'ড়ে যায়, মনে হয় কে যেন অনেক দূর থেকে এলোমেলো-চুলে-ঘেরা কাতর মুখে একদৃষ্টে চেয়ে আছে, তখন মন বড় কেমন ক'রে ওঠে, হঠাৎ যেন চোখে জল এসে পড়ে.....

শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোরিয়ায় জাপানী শাসন

আর্থার ব্রিস্বেন্ নামে একজন আমেরিকাবাসী বলেন,— “একজন এসিয়াবাসী অপর একজন এসিয়াবাসীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে বলিয়াই ইউরোপ এসিয়াকে পেষণ করিবার সুবিধা পাইতেছে। একজন চীনা অঃ লোক অপেক্ষা একজন জাপানীকে হত্যা করিতে পারিলে বেশী তৃপ্ত হয়। এবং জাপানীরা কোরিয়াবাসীকে খরগোসমারা করিতে নিযুক্ত।”

আধুনিক এসিয়ার ইতিহাসে মাহুষকে খরগোস-মারা করিবার দৃষ্টান্ত এক শোচনীয় ঘটনা। জাপানীরা কোরিয়া দেশের স্বাধীনতা কাড়িয়া লইয়াছে, সেখানকার লোকদের একেবারে দাস করিয়া রাখিয়াছে এবং সেখানে কঠোর শাসন-প্রণালী স্থাপিত করিয়াছে। একেবারে খোলা তলোয়ার তাদের সেখানকার শাসনের প্রতীক। কোরিয়ার বিতালয়ে জাপানী পুরুষ শিক্ষকরা তলোয়ার সঙ্গে রাখে। প্রকৃতপক্ষে কোরিয়ার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। এসিয়ার মানচিত্র হইতে কোরিয়ার ছবি বোধহয় বা উঠিয়া যায়। জাপানীরা কোরিয়ার নাম রাখিয়াছে—চো-শেন।

কোরিয়ার প্রাচীন ইতিহাস গৌরবপূর্ণ। কোরিয়া প্রাচীন দেশ। চার হাজার বৎসর ধরিয়া কোরিয়া স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করিয়া আসিতেছে। এই সুদীর্ঘ কালের ভিতর কোরিয়ার স্বাধীনতা কোন বিদেশী শক্তির দ্বারা কলুষিত হয় নাই। প্রাচীনকালে কোরিয়া-বাসীরা সভ্যতার উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল। তাদের সাহিত্য ও শিল্প যথেষ্ট উন্নত ছিল। জাপান যখন মাত্র কতকগুলি বিভক্ত দ্বীপে, কতকগুলি যুদ্ধপ্রিয় জাতির কলহে বিক্ষুব্ধ হইতেছিল, কোরিয়া তখন সভ্যতায় অগ্রসর। তাছাড়া এই কোরিয়াদেশই জাপানকে এসিয়া মহাদেশের সভ্যতার প্রাথমিক নীতি ও সাহিত্য, শিল্প ও দর্শন প্রদান করিয়াছিল। কোরিয়ার ধর্মপুরোহিতরাই অধিকাংশস্থলে জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি আবার কোরিয়ায় যে দেশাত্ম-বোধ জাগিতেছে তার প্রেরণায় সেখানকার বৌদ্ধ ধর্মও অল্পপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছে। কোরিয়ার রাজধানী শিউল নগরে একটি বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষালয় আছে।

রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় হইতেই জাপান কোরিয়াকে

বক্তার যুক্তিপ্রণালী ছিল তেমনই দুর্বোধ্য। বক্তৃতা আরম্ভ হবার সময় ছাত্রের দলে হল ভরা থাকলেও বেগতিক বুঝে বক্তৃতার মাঝামাঝি তারা প্রায় স'রে পড়েছিল। কেবল জনকতক নিতান্ত নাছোড়বান্দা রকমের ছাত্র তখনও হলেব বিভিন্ন অংশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসে ছিল। বক্তা খ্যাতনামা অধ্যাপক, রয়েল সোসাইটির ফেলো। তাঁর ব্যাখ্যায় মৌলিকতার মোহে সকলেই তাঁর বক্তৃতায় অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ পোষাক পরা সৌম্যমুষ্টি ঋজুদেহ অধ্যাপককে সত্যদ্রষ্টা ঋষির মত বোধ হচ্ছিল। বক্তৃতা শুনতে শুনতে কিন্তু আমার মন ভেঙ্গে যাচ্ছিল বক্তৃতার বিষয় থেকে অনেক দূর, কলিকাতার ইট-পাথরের রাজ্য থেকে অনেক দূর, আমার অভাগিনী বোনটি যেখানে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছে সেইখানে। মাঝে মাঝে হলের খোলা দুয়ার দিয়ে জ্যোৎস্না-ওঠা বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে উমারানীর বালিকা-মুখখানি বড় বেশী ক'রে মনে পড়ছিল। আর মনে পড়ছিল তাব সেই গিনতিভরা দৃষ্টি, অনেক দিন পরে বাবাকে দেখতে পাবার জন্তে তার সে করুণ আগ্রহ। তাব আগ্রহ-ভরা দাদা ডাকটি অনেক দিন পরে আবার বড় মনে পড়লো। ভাবলুম সত্যিই কান্নার কাছ থেকে কোনো স্নেহ সে কখনো পায় নি। আজ বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্বকথার রস আমায় স্নায়ুশূলী বেয়ে সমস্ত দেহে যখন পুলক ছড়িয়ে দিচ্ছে, তখন আমার মনের উন্নত আনন্দের অবস্থাব সঙ্গে আমার অভাগিনী স্নেহবঞ্চিতা বোনটির নিঃসঙ্গ জীবনের অবস্থা কল্পনা ক'বে আমার মন বেন কঁদে উঠলো। বাইরের জগতে যখন এত বিচित्र স্রোত বয়ে যাচ্ছে, তখন সে কি শুধু ঘরের কোণে ব'সে দিনরাত চোখের জলে ভাসবে? জগতের আনন্দবার্তা তার কাছে বহন ক'রে নিয়ে যাবাব কি কেউ নেই?...

বাইরে যখন এলুম তখন গোলদীঘীর জলের উপর চাঁদ উঠেছে, কিন্তু ধোঁয়া-ভরা আকাশের মধ্যে দিয়ে জ্যোৎস্নাব শুভ্রমহিমা আত্মপ্রকাশ করতে পারছে না। আমার মস্তিষ্ক তখন বক্তৃতার নেশায় ডরপুর, পুকুরের জলেব ধারে সবুজ ঘাসেব মাঝে মাঝে মশুমী ফুলের

ক্ষেতগুলো আমার চোখের সামনে এক নতুন মূর্তি ধরেছে। কিন্তু ত্রয়োদশীর অমন রুষ্টি-ধোয়া যুঁইফুলের মত জ্যোৎস্নাও ধোঁয়ার জাল কাটিয়ে বাইরে আসতে না পেরে ব্যর্থতাব ছুখে কেমন বিবর্ণ হয়ে গেছে লক্ষ্য ক'রে আমার একটা কথাই কেবল মনে হতে লাগলো— এই জ্যোৎস্না, এই ফুলের ক্ষেত, এই ত্রয়োদশী, এবার-কাবের মত সব মিথ্যা, সব ব্যর্থ। ও জ্যোৎস্না প্রতীক্ষায় থাকুক সেই শুভ বাতটির, যে বাতে আকাশ-ভরা সার্থকতা গুকে বরণ ক'বে নেবে ফোটা-ফুলের ঘন স্তম্ভের মধ্যে দিয়ে, তরুণ-তরুণীদের অনুরাগ-নয় দৃষ্টি-বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে, গভীর রাতের নীরবতাব কাছে পাপিষাব আকুল আত্মনিবেদনের মধ্যে দিয়ে।...

বাড়ী এসে ভাবতে ভাবতে একদিন নানা কাজেব ভিড়ে আমার যে বোনটিকে আমি হারিয়ে বসেছিলুম, তারই কাছে স্নেহের বাণী ব'য়ে নিয়ে যেতে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

এরি কয়েকদিন পরে কলকাতা ছেড়ে বাব হলুম উমারানীর কাছে যাব ব'লে। শীত সেদিন নরম পড়ে এসেছে, ফুটপাথ বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে দখিন হাওয়া অতকিত ভাবে গাঘের উপর এসে পড়ে উৎপাত কবা স্বপ্ন করে দিয়েছে।

পরদিন বেলা প্রায় ২টার সময় গুদের ষ্টীমার-স্টেশনে নেমে শুন্‌গুম গুদের গাঁ সেখান থেকে প্রায় ৪ কোশ। হেঁটে যাওয়া ছাড়া নাকি কোন উপায় নেই, কোন রকম যান-বাহনের সম্পূর্ণই অভাব।

কখনো এদেশে আসিনি, জিজ্ঞাসা করতে করতে পথ চলতে লাগলুম। কাঁচা রাস্তাব হুধাবে মাঠ, মাঝে মাঝে লতাপাতায় তৈরী বড় বড় ঝোপ। কোনো কোনো ঝোপের মাথায় আলোক-লতার জাল, কোনো কোনো ঝোপের তাজা সবুজ ঘন-বুনানি মাথা আলো ক'রে ফুটে আছে সাদা সাদা মেটে-আলুব ফুল। মাঠে মাঠে মাটীব ঢেলার আড়ালে ঝুপসি গাছে জোণ-ফুলেব খই ফুটে আছে। মাঠ ছাড়ালে গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে মাটীব পথের উপর অভ্যর্থনা বিছিয়ে বেথেকে রাশি রাশি সজ্জনে-ফুল। গ্রামের হাওয়া আমের বোলের আব বাতাবী-নেবু-ফুলেব গন্ধে মাতাল। বুনো কুলে আর



কোরিয়ার রাজধানী শিউলে কেংবুক নামক রাজপ্রাসাদের তোরাণ।

কবলিত করিতে আরম্ভ করে। জাপান কোরিয়ার নিকট এক সন্ধিপত্র উপস্থাপিত করে। তার মর্ম এই, যে, জাপান গভর্নমেন্ট কোরিয়ার বৈদেশিক কর্মভার গ্রহণ করিয়া তাহা পরিচালনা করিবে। কোরিয়া এই সন্ধি-সর্ত্তে আবদ্ধ হয়। ১৯০৭ সালে জুলাই মাসে আবার কোরিয়ার ঘাড়ে যে সন্ধিসর্ত্ত চাপান হইল তাহা হইতেই সব কথা স্পষ্ট হইবে। তার মর্ম এই—

(১) কোরিয়ার রাজ-সরকার শাসন-কার্যে জাপানী রেসিডেন্ট-জেনারেলের অনুজ্ঞা ও অনুমোদন অনুসারে কার্য করিবেন।

(২) কোরিয়ার রাজ-সরকার যাহা কিছু আইন গঠন করিবেন বা যাহা কিছু অভিনব শাসনপ্রণালী প্রবর্তন করিবেন—সমস্ত কাজেই পূর্বে হইতে জাপানী রেসিডেন্ট-জেনারেলের সম্মতি ও অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) কোরিয়ার রাজ-সরকারের বিচার-কার্য এবং সাধারণ শাসন-কার্যের মধ্যে পার্থক্য রক্ষিত হইবে।

(৪) কোরিয়ার রাজ-সরকারে ব্যক্তি নিয়োগ-কার্যে রেসিডেন্ট-জেনারেলের দ্বারা সম্পন্ন হইবে।

(৫) রেসিডেন্ট-জেনারেল অনুমোদন করিলে যে-কোন জাপানী কোরিয়ার রাজকার্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে।

(৬) রেসিডেন্ট-জেনারেলের বিনা অনুমতিতে কোরিয়ার রাজ-সরকার কোন বিদেশীকে রাজকার্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না।

কোরিয়াকে সমগ্রভাবে গ্রাস করা বা এই সন্ধি-সর্ত্ত তার ঘাড়ে চাপানো প্রায় একই কথা। ইহা সত্ত্বেও ১৯০৮ সালে রেসিডেন্ট-জেনারেল প্রিন্স ইতো ঘোষণা করিলেন যে, কোরিয়াকে জাপানরাজ্যভুক্ত করিবার ইচ্ছা তাঁদের নাই! অবশেষে ১৯১০ সালে আগষ্ট মাসে জাপান-গভর্নমেন্ট কোরিয়াকে জাপানরাজ্য-ভুক্ত করিল! এইরূপেই জাপান তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করিল!

কোরিয়ার বিচারালয়-সমূহে বিচারকার্যের দুই রকম ব্যবস্থা আছে। একজন জাপানী অপরাধ করিলে সে

বৈচি গাছের বনে কোনো কোনো মাঠ ভরা। পড়ন্ত রোদে গাছপালার তলায়, ঘন ঝোপের মধ্যকার ফাঁকা জায়গায় ছোট ছোট পাখীর দল কিচ্ কিচ্ করছে, মাঝে মাঝে কোনো কোনো জঙ্গলের কাছ দিয়ে যেতে যেতে কোনো অজ্ঞাত বনফুলের এমনি সুগন্ধ বেরুচ্ছে, যে, তার কাছে খুব দামী এসেন্সের গন্ধও হার মানে। পায়ের শব্দ পেয়ে শুকনো পাতার রাশির উপর খস খস শব্দ করতে করতে ছ একটা ধরগোস কান খাড়া করে রাস্তার এ পাশের ঝোপ থেকে ওপাশের ঝোপে দৌড়ে পালাচ্ছে। মাঠের মাঝে মাঝে দূরে দূরে শিমুল-ফুলের গাছগুলো দখিন হাওয়ার প্রথম স্পর্শেই আবেশ-বিধুরা তরুণীর মত রাগ-রক্ত হয়ে উঠছে।

অনেকগুলো গ্রাম ছাড়িয়ে যাওয়ার পর একজন দেখালে মাঠ ছাড়িয়ে এবাব পড়বে চাঁপাপুকুর। গ্রামের মধ্যে যখন ঢুকলুম, তখন গ্রামের পথ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, আশপাশের নানাবাড়ী থেকে পল্লী-লক্ষীদের সাজের শাঁখের রব নিস্তর্র বাতাসে মিশছিল।

কোন ঘরটি আলো করে আছে আমার স্নেহের বোনটি? কোন গৃহস্থের আত্মনার আধার আজ দূর হোলো তার হাতে জ্বালা সন্ধ্যা-দীপের আলোয়? কাদের গৃহতল আজ মুখর হয়ে উঠলো তার সেবা-চঞ্চল চরণের শাস্ত-মধুর-ছন্দে?

রাস্তার মধ্যে একজায়গায় কতকগুলো ছেলেকে দেখতে পেয়ে তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে তাদের মধ্যে একজন বলে, “আমুন, আমি সে বাড়ী আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।” খানিক রাস্তা এগিয়ে গিয়ে সে পাশের একটা সরু পথ বেয়ে চললো। তার পর একটা বড় পুরোনো বাড়ীর সামনে গিয়ে বলে, “এই তাঁদের বাড়ী। আপনি একটু দাঁড়ান, আমি বাড়ীর মধ্যে বলি।” একটু পরে একজন বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে সে বাড়ীর মধ্যে থেকে বার হয়ে এলো। বৃদ্ধাকে বলে, “ইনি কল্কাতা থেকে আসছেন, জেঠাই মা, আপনাদের বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে আমি ওপাড়া থেকে নিয়ে আনছি।”

বৃদ্ধা আমাব দিকে একটু এগিয়ে এসে আমায় ভাল করে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমায় তো চিন্তে

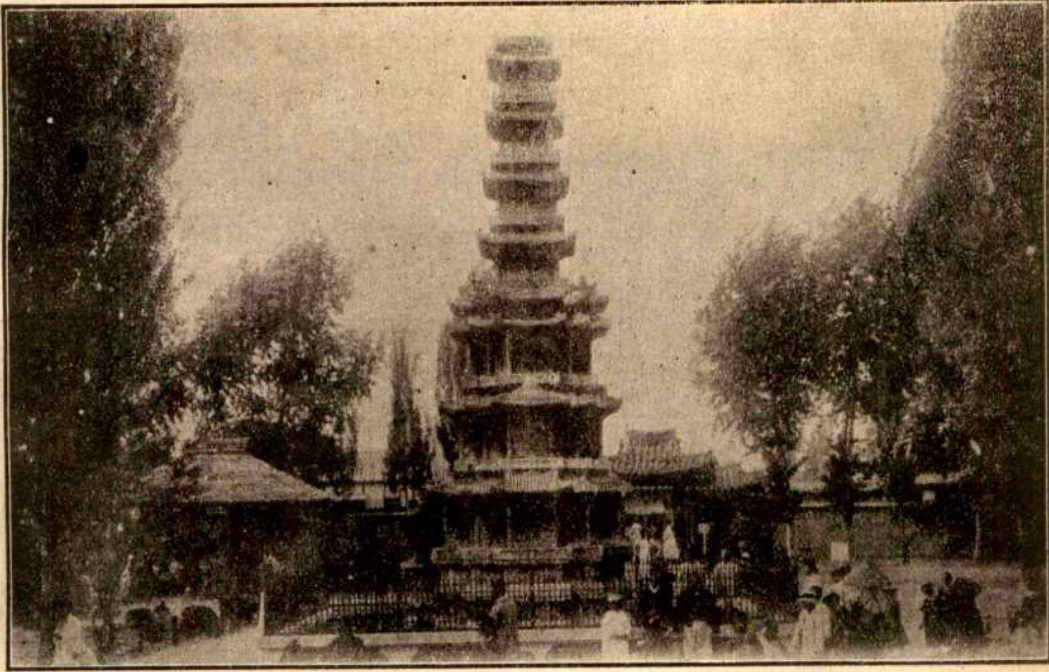
পারছিনে, বাবা, কোন জায়গা থেকে তুমি আসচো?”

আমি আমাব নাম বল্লুম, পরিচয় দিতেও উত্তর হলুম। বৃদ্ধা বলে উঠলেন যে আমাষ আর পরিচয় দিতে হবে না, আমার আসা যাওয়া নেই বলে তিনি কখনো আমাষ দেখেন নি, তাই চিন্তে পারছিলেন না। আমি বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছি এতে তিনি খুব দুঃখিত হলেন। আমি কেন একেবারে বাড়ীর মধ্যে গেলাম না, আমি তো ঘরের ছেলেব বাড়া, আমাব আবার বাইবে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি কি, ইত্যাদি।

তার সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলুম। কেবল মনে হতে লাগলো, আট বছর—আজ আট বছর পরে। কি জানি উমারানী কেমন আছে, সে কেমন দেখতে হয়েছে। আজ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে আমায় দেখে সে যে আনন্দ পাবে, সে আনন্দের পরিমাণ আমি একটু একটু বুঝি, আমার বুকের তাবে তার প্রতিধ্বনি গিয়ে বাজছে। আজ এখনি তার স্নেহমধুর ক্ষুদ্র হৃদযটির সংস্পর্শে আসবো, তার কালো চুলে ভরা মাথাটিতে হাত বুলিয়ে আদব করতে পারবো, তার মিষ্টি দাদা ডাকটি শুন্বো, এ কথা ভেবে আনন্দ আমার মনের পাত ছাপিয়ে পড়ছিল।

দেখলুম এদের অবস্থা একসময় ভাল ছিল, খুব বড় বাড়ী, এখন সবদিকেই ভাঙ্গা ঘর-দোর, দেওয়াল কেটে বড় বড় অশ্বখ-চারি উঠছে। বাইরের উঠান পার হয়ে ভিতর-বাড়ীর উঠানের দরজায় পা দিয়েই বৃদ্ধা বলে উঠলেন, “ও বোমা, বার হয়ে দেখ, কে এসেছে।”

“কে, পিসিমা?” বোলে প্রদীপ হাতে যে ওদিকের একটা ঘর থেকে বার হয়ে এল, সম্প্রতি আলোয় দেখলুম, তার মুখখানি আধ-ঘোমটা দেওয়া, ঘোমটার পাশ দিয়ে চুলগুলো অসংযত ভাবে কানেক পাশ দিয়ে কাঁধের ওপর পড়েছে, পবনে আধ-ময়লা শাড়ী, চেহারা রোগা-রোগা একহারা। এই সেই উমারানী! তাকে দেখে প্রথমেই আমার মনে হোলো এ আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছে, আর মাথাষও অনেকটা বেড়ে গিয়েছে।



শিউলে প্যাগোডা উদ্যান।

কয়েকদিন মাত্র কয়েদ ভোগ করিবে, কিন্তু সেই পরিমাণের অপরাধে একজন কোরিয়াবাসীর ফাঁসি হইতে পারে। একজন জাপানী কোন কোরিয়াবাসীকে প্রতারিত করিলে জাপানীর বিরুদ্ধে বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত করা কোরিয়াবাসীর পক্ষে এক দুর্লভ ব্যাপার। যদিও সে কোনক্রমে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিতে সক্ষম হয়, ত্রায়-বিচার লাভ তার ভাগ্যে অসম্ভব। আর, সব বিচারালয়ের হর্তা কর্তা বিধাতা একজন করিয়া জাপানী থাকেন। তাঁর রূপা স্বজাতীয়ের প্রতিই বর্ষিত হয়।

অত্যাচার এবং দমননীতি কোরিয়ায় জাপানী শাসনের মূলমন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী আমেরিকাবাসীর কথায় কোরিয়ার অবস্থা এই :—“পুলিশের বিশেষ অনুমতি ব্যাতিরেকে এক স্থানে পাঁচজনের বেশী লোক কোন প্রকারের সভা করিতে পারিবে না—সামাজিক নয়, অগ্র বিষয়েও নয়। কোরিয়ার মুদ্রাধ্বস্তের স্বাধীনতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে অর্থাৎ বই সংবাদ-পত্র প্রভৃতি প্রকাশ বন্ধ করা হইয়াছে। কোন কোরিয়াবাসী সাহস করিয়া স্বাধীনতা বা নেতৃত্বের ভাব পোষণ করিলে

তার ভাগ্যে অনেক লাজ্জনা। উচ্চ রাজপদ লাভ করা কোরিয়াবাসীর পক্ষে সুদূরপরাহত।”

কোরিয়াবাসীদের সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র করা হইয়াছে। তারা কোন প্রকারের আগ্নেয় অস্ত্র (বন্দুক প্রভৃতি) ব্যবহার করিতে পারে না। তিনটি গৃহস্থ মিলিয়া রাষ্ট্র-কার্যের জন্ত একটি ছুরি বা বাঁটি ব্যবহার করিতে পারে। এবং কাজ হইয়া গেলে সেই ছুরিটি আবার এমনিভাবে ঝুলাইয়া রাখিতে হয় যে জাপানী পুলিশ বাহির হইতে যেন তাহা স্পষ্ট দেখিতে পায়।

জাপানীরা কোরিয়াবাসীদের পিছনে তীব্র গোয়েন্দা পাহারা লাগাইয়া রাখিয়াছে। এই গোয়েন্দা-শাসন সম্বন্ধে একজন আমেরিকাবাসী প্রত্যক্ষদর্শীর কথা আমরা তুলিতেছি।—“কোরিয়ার প্রত্যেক লোককে রেজিষ্ট্রি করিয়া একটি নম্বর দেওয়া হয়; সেই নম্বরটি পুলিশের কাছে জানানো থাকে। যতবার লোকটি গাম বা নগর ছাড়িয়া বাহিরে যাইবে ততবার তাকে থানায় গিয়া স্পষ্টরূপে লিখাইয়া যাইতে হইবে সে কোথায় যাইতেছে এবং কি কাজে যাইতেছে। তারপর পুলিশ তার গন্তব্য স্থানে

কয়েক সেকেন্ড উমারাণী আমায় চিন্তে পারলে না, তার পরই যেন হাঁপিয়ে ব'লে উঠল—“দাদা! -”

অন্ত কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বেরুল না, প্রদীপটা কোনো রকমে নামিয়ে রেখে সে এসে আমার পাশে উপব উপড় হয়ে পড়লো।

আমি তাকে ওঠালুম, তার মুখে দেখলুম এক অপূর্ণ ভাব। মনে হোলো—আনন্দ বিশ্বয় আশা অভিমান সব ভাবের রংগুলো একসঙ্গে গুলে তাব প্রতিমার মত মুখে কে মাখিয়ে দিয়েছে। বুঝা বললেন, “বাবা, তুমিই আস না, বোমা দাদা বলতে অজ্ঞান। কত ছুঃখ হবে, বলে, কল্‌কাতায় থাকলে দাদার মাঝে মাঝে দেখা পেতাম, এ তেপান্তরের পুর, তিনি আসবেন কেমন ক’রে। বোমা, সতীশকে আগে হাত মুখ ধোবার জলটল দাও, বাছা একটু ঠাণ্ডা হোক, যে পথ!”

হাত মুখ ধোয়ার পব উমারাণী একটা ঘবের মধ্যে আমায় নিয়ে গেল। আমি যে এখানে এ অবস্থায় হঠাৎ আসবো তা সম্ভাবনাব সীমার সম্পূর্ণ বাইরের জিনিষ, অন্ততঃ তার কাছে। তাই বেচারীর মুখ দিয়ে কথা বার হচ্ছিল না। তার আবেগকে স্বাভাবিক গতিলাভের সুযোগ দেবার জন্তে আমিও কোনো কথা বলছিলাম না। একটুখানি ছুজনে চুপ ক’রে থাকার পর উমারাণী বললে, “দাদা, এতদিন পরে বুঝি মনে পড়লো?”

আমি আগেকার মত তার মাথার ছপাশের চুলগুলোয় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম, “রাণী, আসতে পারিনি হয়তো নানান কাজে। কিন্তু এ কথা মনে ভাবিসনি যে ভুলে গিয়েছিলুম। চেহারা যে একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে বে, বড্ড কি অস্বস্ত-বিস্ময় হয়?”

আট বছর আগেকার সেই ছোট্ট মেয়েটির মত মুখ নীচু ক’রে একটুখানি হেসে সে চুপ করে রইল।

জিজ্ঞাসা করলুম, “আচ্ছা রাণী, আমি আসবো একথা ভেবেছিলি?”

তার দুই চোখ জলে ভ’রে এল, বললে, “কি ক’রে ভাববো দাদা? আমি আপনাদের আবার দেখতে পাবো,

আদর যত্ন করতে পারবো, এমন কপাল যে আমার হবে, তা কি ক’রে ভাববো?”

এলোমেলো যে-সব চুল তার বোমটার আশে পাশে পড়েছিল, সেগুলো সব ঠিক-মত সাজিয়ে দিতে দিতে বললুম, “সেইজন্তেই ত এলুম বে। আব তোদের দেখবাব ইচ্ছে বুঝি আমার হয় না? ভাবিস্ বুঝি দাদাদের মন সব সানবানো।”

সে বললে, “তাই আজ ২৩ দিন থেকে আমার বাঁ চোখের পাতা অনবরত নাচছে দাদা। আজ ওবেলা যখন ঘাটে যাই তখন বড্ড নেচেছে। পিসি-মাকে বলতে পিসিমা বললেন, মেয়েমানুষের বাঁ চোখ নাচলে ভাল হয়।”

আমি বললুম, “আমার কথা তোর মোটেই মনে ছিল না, না রে রাণী?” সে একথার কোনো উত্তর দিল না, তার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। জিজ্ঞাসা করলুম, “হ্যাঁ রে, সুবেন বাড়ী থেকে গিয়েছে কতদিন?”

সে নতমুখে উত্তর দিল, “প্রায় ৮ মাস।”

বললুম, “চিঠি পত্র দেয়?”

উত্তরে সে ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ।

তার মুখের ভাবে বুঝলুম যে তার বড় ব্যথার স্থানে আমি যা দিচ্ছি, ছুঃখিনী বোনটির এলোমেলো চুলে ঘেরা মুখখানির দিকে তাকিয়ে স্নেহে আমার মন গ’লে গেল। রুমাল বের ক’রে তার চোখের জল মুছিয়ে দিলুম। কত রাত তার এই রকম চোখের জলে কেটেছে, তার খোঁজ তো কেউ রাখেনি, তার সাক্ষী আছে কেবল আকাশের ঐ গহন অন্ধকার, আর চাবিপাশের গাছপালাব মধ্যেকাব ঐ ঝাঁঝি পোকাব বব।

উমারাণী জিজ্ঞাসা করলে, “দাদা, এখন আপনি কোথায় থাকেন?”

আমি বললুম, “আগে নানাজায়গায় ঘুরছিলাম, এখন ঠিক করেছি কল্‌কাতাতেই থাকবো।”

সে বললে, “আপনি বিয়ে করেছেন, দাদা?”

বললুম, “না রে। বিয়ের তাড়াতাড়ি কি? সে এক দিন কোরলেই হবে।”



কোরিয়ার একজন শাসনকর্তা।

টেলিফোন করিয়া জানিবে তার কথা সত্য কি না। যদি তার কথা কোন অংশে মিথ্যা বলিয়া জানা যায় তাহা হইলে তার ভাগ্যে গ্রেপ্তার এবং নির্ধ্যাতন। শিক্ষা, সামাজিক পদ এবং প্রতিপত্তি ও প্রভাব অনুযায়ী লোকের শ্রেণী বিভাগ করা হয়। যেমনি কোন লোক দক্ষতা বা নেতৃত্ব-গুণের পরিচয় দিতে আরম্ভ করে অমনি তাকে “A” শ্রেণীর সন্দেহ-দাগীর মধ্যে ফেলা হয়, তার পিছনে গোয়েন্দা নিযুক্ত করা হয় এবং তখন হইতেই সে “দাগী” লোক হইয়া থাকে। এমন কি বালকদের উপরেও তীব্র দৃষ্টি রাখা হয়, এবং খবর বাহির করিয়া লইবার জগু তাহাদের

ঘূম দেওয়া হয়। যদি কোন লোক দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায় তাহা হইলে খুঁজিয়া দেখা হয় তার নম্বর কত, এবং তার পরিবারবর্গ বা আত্মীয়স্বজনকে গ্রেপ্তার করিয়া পীড়ন করা হয়, যতক্ষণ না তারা লোকটির সন্ধান বলে। ইঠাৎ একদিন হয়ত কোন লোককে দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না এবং পরেও তার আর কোন সন্ধানই মিলে না।”



কোরিয়ার উচ্চশ্রেণীর লোক।

কোরিয়াতে শিক্ষাকাব্য গভর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীন। কোরিয়া স্বাধীনতা হারাইবার আগে তার যে-সব উচ্চ-শিক্ষালয় ছিল সে-সমস্তই জাপানীরা লুণ্ঠ করিয়াছে। কোরিয়ার একটি মহৎ জাতীয় গৌরবের জিনিস আছে,— সেটি তার জাতীয় ভাষা। কোরিয়ার ভাষা ও অক্ষর চীনা ও জাপানী ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। কোরিয়ার জাপানী গভর্ণমেণ্ট এক্ষণে কোরিয়ার বিদ্যালয়-সকলে দেশীয়

ছোট মেয়েটির মতন তার ঠোঁট দুটি অভিমানে ফুলে উঠলো, বললে, “তাই বৈকি? আপনি বুঝি ভেবেচেন চিরকাল এই রকম ভেসে ভেসে বেড়াবেন? তা হবে না দাদা, আমি এই বছবেই আপনার বিয়ে দেবো।”

আমাব হাসি পেলে, বললুম, “দিবি তুই?”

সে বললে “দেবোই তো, এই আষাঢ়মাসের মধ্যেই দেবো।”

আমি বললুম, “তা যেন হোলো। কিন্তু আমার তো বাড়ী ঘর দোর নেই, বিয়ে ক’বে রাখবো কোথায়?”

সে বললে, “কেন দাদা, রাখবার জায়গার বুঝি ভাবনা? আমি বৌকে এখানে রাখবো। দুজনে মিলে বেশ ঘর-সংসার করবো।”

আমি একটু গম্ভীর ভাবে বললুম, “তা হোলো পাঞ্জিখানা আবার যে ফেলে এলুম রাণী, সামনের মাসে দিনটিন যদি থাকে—”

উমারাণী বললে, “পাঁজি ত ওপরের ঘরে রয়েছেন দাদা। আপনি এখন খাওয়া দাওয়া করুন, কাল সকালে দেখলেই হবে।”

অবশ্য খুব আশ্বস্ত হলুম। কি বলতে যাচ্ছিলুম, উমারাণী বলে উঠলো, “আপনাকে খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করিগে, কাল থেকে ভাত পেটে যায় নি, আপনার মুখ একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে, দাদা।”

তার পরদিন ভোরে উঠে দেখি উমারাণী সেই ভোরে নাইতে যাবার উদ্যোগ করছে। শীত সেদিন সকালে একটু বেশী পড়েছে। উমারাণীর শরীরের দিকে চেয়ে দেখি, তার শরীরে আব কিছু নেই। বাত্রে ভালো টেব পাইনি, আট বছর আগেকার সেই স্বাস্থ্যক্রীড়াম্পন্ন মেয়েটির সঙ্গে বর্তমানের এই নিতান্ত রোগা মেয়েটির তুলনা ক’রে আমার বুকের মধ্যে কেমন ক’রে উঠলো। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, “এত সকালে নাইতে যাবার কি দরকার রে রাণী?”

সে বললে, “একটু সকাল-সকাল না নেয়ে এলে কখন রান্না চড়াবো, দাদা? কাল রাত্রে তো আপনার খাওয়াই হয় নি এক রকম।”

আমি বললুম, “তা হোক। আমাকে যে আটটার মধ্যেই খেতে হবে তার কোনো মানে নেই। এত সকালে নাইতে যেতে হবে না তোব।”

উমারাণী ঘড়া নামিয়ে রাখল।

পিসিমা বললেন, “তোমার কথা, তাই শুনে বাবা। নৈলে ও কি তেমন পাগলী মেয়ে নাকি, ছাদশীর দিনে মাঘ মাসের ভোরে নাইতে যাবে। শোনে না, বলি, বৌমা তোমার শরীর ভাল নয়, এত সকালে জলে নেবো না। শোনে না, বলে, পিসিমা কাল গিয়েচে আপনার একাদশী, একটু সকালে সকালে কাজ না সেয়ে নিলে, আপনাকে দুটো খেতে দেব কখন?”

সেদিন দুপুরে ওদের উপরের ঘরে শুয়ে শুয়ে কি বই পড়ছিলুম। উমারাণী এসে চুপ ক’রে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। বললুম, “কে, রাণী? আয় না ভেতরে।”

আমি উঠে বসলুম। সে দেওয়াল ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দেখলুম তার শরীর আগেকার চেয়ে খুব রোগা হয়ে গিয়েছে, তার মুখখানি কিন্তু প্রতিমার মত টল-টল করছে। বয়স যদিও ২২।২৩ হোলো, তাব মুখ কিন্তু তের বছরের মেয়েটির মতই কচি। কথা আরম্ভ করবার ভূমিকাস্বরূপ বললুম, “আজ বড় গরম পড়েছে, না?”

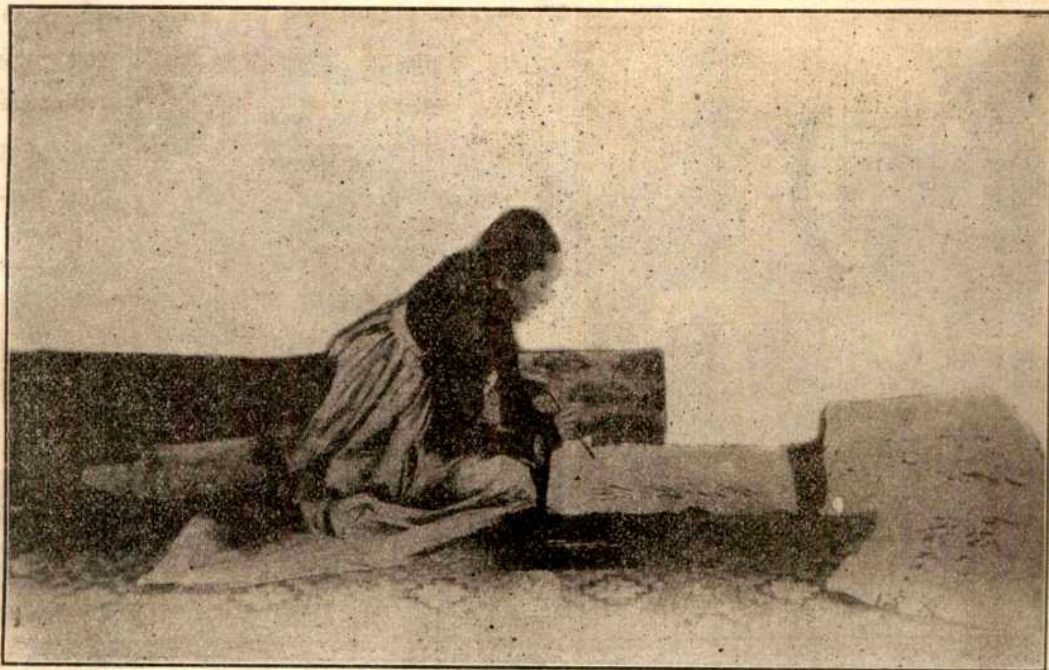
উমারাণী বললে, “ই্যা দাদা। আমি ভাবলাম আপনি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছেন, আপনি দিনমানে ঘুমোন না বুঝি দাদা?”

বললুম, “মাঝে মাঝে হয়তো ঘুমুই। আজ আর ঘুমোব না। আষ এখানে বোস, গল্প করি।”

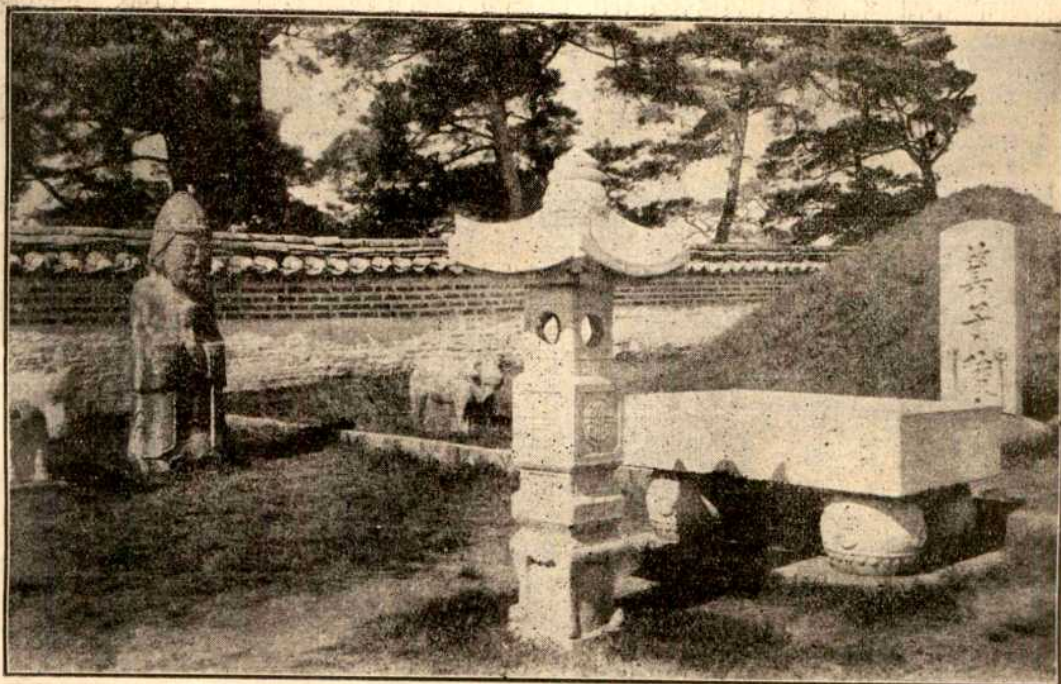
তাকে কাছে বসালুম। তাব চুলের অবস্থা দেখে বললুম সে চুলের যত্ন করে না। মুখের আশে পাশে কৌকড়া চুলের রাশ অযত্নবিস্তৃত ভাবে পড়ে ছিল, চুল-গুলোর রঙ একটু কটা হয়ে পড়ছিল। রাত্রে মত চুল-গুলো কানের পাশ দিয়ে তুলে দিতে দিতে বললুম, “তোমার শরীর তো খুব খারাপ হয়ে গেছে? বিয়ের পর সেই সময় কেমনটি ছিলি। খুব কি জ্বর হয়?”

একটু হাসি ছাড়া সে একথার কোনো উত্তর দিলে না।

আমি বললুম, “না, একথা ভালো না রাণী। আমি



কোরিয়ান নারী—লিখনরতা



কোরিয়ান প্রথম রাজার সমাধি-মন্দির ।

গিয়ে একটা ওষুধ পাঠিয়ে দেব, সেইটে নিয়ম মত খেতে হবে। না হোলে এ যে মহা কষ্ট।”

একটু পবে সে বললে, “তা হলে সত্যি, দাদা, আমি কিন্তু বিয়ের চেষ্টা করবো। বলুন।”

আমি তার কথার মনে বড় কৌতুক অনুভব করলুম। এই অবোধ মেয়েটা জানে না যে সে এমনি একটা প্রস্তাব উত্থাপন করে বসেছে, যাকে কার্যে পরিণত করা তার ক্ষুদ্র শক্তির বাইরে।

বল্লম, “বকিস্ নে, রাণী।”

খানিকক্ষণ হয়ে গেল, সে আর কথা কষ না দেখে পেছন ফিরে দেখি, ছেলোমামুষে হঠাৎ ধমক খেলে যেমন ভরসা-হারা চোখে তাকায়, তার চোখে তেমনি দৃষ্টি। মনে হোলো, একটা ভুল করেছি, উমারাণী সেই ধবপের মেয়ে যারা নিজেকে জোর করে কখন প্রচার করতে পারে না, পরের ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলিয়ে দিয়ে শ্রোতের জলের শেওলার মত যারা জীবন কাটিয়ে দিতেই অভ্যস্ত। স্নেহ-স্নেহে সে আবোল-তাবোল বকছিল, এর সঙ্গে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে ব্যবহার করতে হবে, বাতাস লজ্জাবতী-লতার সঙ্গে যতটা সতর্ক হয়ে চলে তার চেয়েও। কথাটা যতটা পাবি সামলে নেবাব জ্ঞান বললুম, “তোরা যদি সত্যি সত্যি বিয়ে দেবাব ইচ্ছে থাকতো, তা হলে তুই পাঞ্জিখানা আনতিস্। দিন কোন্ মাসে আছে না-আছে সেগুলো সব দেখতে হবে তো, না শুধু-শুধু তোরা কেবল বকুনি।”

উমারাণীও মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, চোখের সে ভয়-ভয় দৃষ্টিটা কেটে গেল। আমার কথার মধ্যে সে আমার বকুনির একটা কারণ খুঁজে পেল। বোধ হয়, বিয়ে করবার জন্তু-নিতান্ত উৎসুক দাদাটির উপর তাব একটু কৃপাও হোলো। সে বললে, “পাঁজি আপনাকে দিয়ে আজ দেখিয়ে নেব, সে তো ভেবেই বেখেচি, দাদা। আপনি বসুন, আমি ওঘর থেকে পাঞ্জিখানা নিয়ে আসি।”

দালানের ওপাশে একটা ঘর ছিল, উমারাণী সেই ঘর-টার মধ্যে উঠে গেল। সেই সময় পিসিমা নীচে থেকে ডাক দিলেন, “বৌমা, নেমে এস, বেলা যে গেল, চাল-গুলো আবার কুটতে হবে তো।”

উমারাণী ঘরটার বার হয়ে এসে আমার হাতে পাঞ্জি-খানা দিয়ে বললে, “আপনি দেখে রাখুন দাদা, আমার বলবেন এখন। আমি এখন আস্চি।”

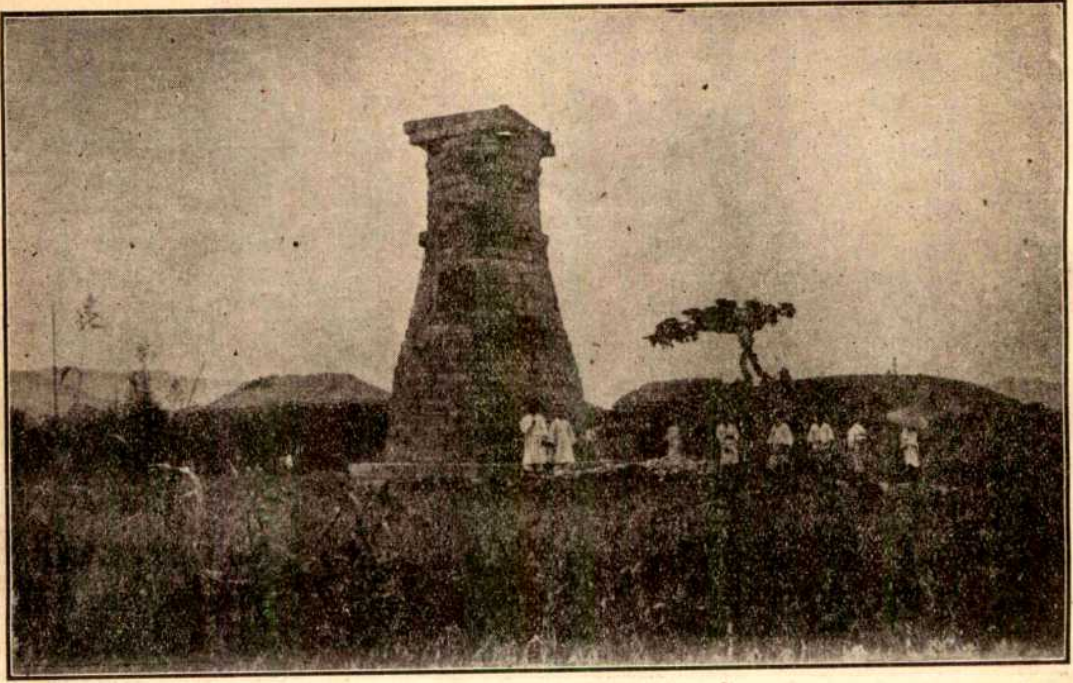
সে নীচে নেমে গেল।

তখন বেলা একটু পড়ে এসেছে, নীচের বাগানের সজ-ফোটা-বাতাবী-নেবু-ফুলের গন্ধে ঘরের বাতাস ভুরভুর কচ্ছে, বাগানের পথের পাশের সজনে-গাছগুলো ফুলে ভর্তি। পড়ন্ত রোদ ঝিরঝিরে বাতাসে পেঘারা-গাছেব সাদা ডাল গুলো বুটি-কাটা বাংতার সাজে মুড়ে দিয়েছে।

উমারাণী কাজে গিয়েছে, এখন আর আসবে না ভেবে মাঠের দিকে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে হোলো। উঠতে গিয়ে লক্ষ্য করলুম পাটের পাশে একটা কাঠের হাত-বাক্স রয়েছে, সেটা অনেক কালের, রং-গুটা, তাতে চাবির কলটাও নেই। সেই কাঠের বাস্কাটাও ডালা খুললুম। দেখি তার মধ্যে কতকগুলো টাটকা-তোলা নেবু ফুল, কতক গুলো গাঁদা ফুল, আর কতকগুলো আধ-শুকনো ঘেঁটু ফুল। ফুলগুলোর তলায় একটু আধ-ময়লা নেকড়ায় যত্ন করে জড়ানো কি জিনিষ। নেকড়ায় এমন কি জিনিষ যার সঙ্গে এতগুলো ফুলের কার্যকারণ সম্পর্ক, এই নির্ণয় করতে কৌতুহলবশতঃ নেকড়ার ভাঁজ খুলে ফেলে দেখলুম তার মধ্যে খানকতক খামের চিঠি। চিঠিগুলোর উপর উমারাণীর নামে ঠিকানা লেখা, হাতেব লেখা আমার ভগ্নীপতি সুরেনের। তার পোষ্ট অফিসের মোহর দেখে বুঝলুম চিঠিগুলো ৫৬ বছরের পুরোনো, একখানা কেবল এবছর আগে লেখা।

কৃপণের ধনের মত উমারাণী যার পুরোনো চিঠি-গুলো এমন সযত্নে রক্ষা করছে, তার মধুর স্বদয়েব স্নেহছায়াগহন যুধীবনে যার স্থতির নীরব আবতি এমনি দিনের পর দিন প্রতি সকাল-সাঁঝে চলছে, কেমন সে অভাগা দেবতা, যে এ উপাসনা-গন্নিবের ধূপগন্ধকে এড়িয়ে চিরদিন বাইরে বাইবেই ফিরতে লাগলো!

মাঠ থেকে বেড়িয়ে যখন আসি, তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, ওদের রান্নাঘরে আলো জ্বলছে। আমাব পাখের শব্দ শুনে উমারাণী বললে, “দাদা! এলেন?” আমি উত্তর দেবার পূর্বেই সে হাসিমুখে রান্নাঘর থেকে বার



কোরিয়ার প্রাচীন মানমন্দিরের অবশেষ।

ভাষার প্রচলন বন্ধ করিয়াছে। জাপানী ভাষা সেখানে “জাতীয় ভাষা” বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে এবং ছাত্রদিগকে জাপানী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আর বিদ্যালয়ের ধাৰ্য্য (text) বই জাপান হইতে প্রকাশিত এবং জাপানী গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে অচল। সেখানে ইউরোপ ও আমেরিকার ইতিহাসের স্থান নাই। এমন কি কোরিয়ার ইতিহাসও পড়ানো হয় না। তার বদলে জাপানী ইতিহাস পড়ানো হয়। আর জাপানী ইতিহাস এমন ভাবে রচিত হয় যে তাহাতে কোরিয়াবাসীদের মনে এই ভাব অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয় যে, তারা জাপানীদের অপেক্ষা হীন এবং নীচ জাতি।

সেখানে জাপানের রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য কোরিয়াবাসীদের দেশাত্মবোধ বিলুপ্ত করা এবং তাদের সার্বজনিক নৈতিক উন্নতি থর্ব করা। এ সম্বন্ধে কোরিয়ার অবস্থাভিজ্ঞ লোকের কথা এই—

“কোরিয়াকে নিজরাজ্যভুক্ত করার কিছুদিন পরেই জাপানী গভর্ণমেণ্ট কোরিয়াতে লোক পাঠাইয়া আফিওর

প্রচলন করে এবং কোরিয়াবাসীদের মধ্যে ইহা খাওয়ার অভ্যাস প্রবর্তিত করে। তারপরেই বারবনিতার প্রচলন আরম্ভ হয়। বর্তমানে জাপান হইতে হাজার হাজার বারাদনা কোরিয়াতে আনা হইয়াছে। আর তারা কোরিয়ার জন-সমাজকে ঘৃণ্য মারাত্মক পাপে ও রোগে কলুষিত করিতেছে। এখানে স্থানে স্থানে সাধারণ স্নানাগার স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে মেয়ে-পুরুষে এক সঙ্গে স্নানের নিয়ম। এই প্রথাও কোরিয়াবাসীদের প্রভূত নৈতিক অবনতি ঘটতেছে, এবং পরিণামে পরবর্তী বংশীয়দের জীবনে ইহা ভীষণ কুফল ফলাইবে, সন্দেহ নাই। বারাদনা, সাধারণ স্নানাগার এবং জুয়াখেলার প্রভাবে কোরিয়ার নৈতিক আদর্শ আজ ধ্বংসোন্মুখ।”

জাপানীরা বলে তারা কোরিয়ার অনেক হিত করিয়াছে। অবশ্য কয়েক বিষয়ে তারা যে কোরিয়ার উন্নতি সাধন করিয়াছে তা অস্বীকার করা যায় না। জাপানী গভর্ণমেণ্টের সুদীর্ঘ রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, তারা কোরিয়াতে ডাক-বিভাগের প্রবর্তন করিয়াছে, টেলিগ্রাম ও টেলিফোন বসাইয়াছে, বড় বড় রাস্তা তৈরী করিয়াছে

হয়ে এলো। বল্লে, “দাদা বুঝি আমাদের দেশ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, কোন দিকে বেড়িয়ে এলেন, নদীর ধারে বুঝি?” তার পর সে বল্লে, “দাদা, আপনি রান্নাঘরে বসবেন? আমি আপনার জন্মে পিঁড়ি পেতে বেথেছি।”

পিসিমা বল্লে, “বৌমাব যত অনাছিষ্ট, এখানে বাছাকে ধোঁয়ার মধ্যে বসিয়ে রাখা।”

আমি বল্লাম, “আমার কোনো কষ্ট হবে না, এখানেই বসি পিসিমা।”

রান্নাঘরের মধ্যে গিয়ে বসলুম, উমারাণী খাবার তৈরী ক’বে রেখেছিল আমায় খেতে দিল, তার পর কাজ করতে ব’সে গেল। দেংলুম সে অনেকগুলো চালের গুঁড়ি ময়দা প্রভৃতি উপকরণ নিয়ে খুব উৎসাহের সঙ্গে পিটে তৈরী শুরু কবেচে। পিসিমা খুবই বুদ্ধা, তিনি কাজকর্ম বিশেষ কিছু করতে পারেন না, খাটতে সবটাই হচ্ছিল উমারাণীর। বোঁগা মেয়েটির অবস্থা দেখে বড় কষ্ট হোলো ভাবলুম কেন অনর্থক পিটে কর্তে বসে মিথ্যে কষ্ট পাওয়া? সেবার আনন্দে উমারাণী যা করতে বসেচে তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বল্লাম না অবশ্য।

জিজ্ঞাসা করলুম, “বাণী, আমায় পিটে গড়তে শিখিয়ে দিবি?”

উমারাণীর বড় লজ্জা হোলো। মুখটি নীচু ক’রে সে বল্লে, “দাদা, আমরা বেঁচে থাকতে পিটে খাওয়ার ইচ্ছে হলে আপনাকে কি পিটে গ’ড়ে নিতে হবে, যে আপনি পিটে গড়তে শিখবেন?”

পিসিমা বল্লে, “না, তোমার দাদাব পিটে খাবাব ইচ্ছে হলে এই সাত লস্কো পাড়ি দিয়ে এসে তোমার এখানে ধেয়ে যাবেন।”

উমারাণী চুপ ক’রে বইল।

আমি বল্লাম, “তা কেন, পিসিমা। ও তার আর-এক উপায় বাব করেছে, শোনেন নি বুঝি?”

পিসিমা বল্লে, “কি বাবা?”

আমি বল্লাম, “ও এই আষাঢ় মাসের মধ্যেই ওর দাদার বিয়ে দেবে।”

পিসিমা বল্লে, “তা বৌমা তো ঠিক কথাই বলেচে

বাবা। এত বড়টি হয়েছ, আর কি বিয়ে না করা ভাল দেখায়? সংসারী হতে হবে তো।”

উমারাণী ব’লে উঠলো, “ভালো কথা, দাদা। দিন তখন তো আব দেখা হোলো না পাঁজিতে, আমি আর ওপরে যেতে পারলাম না। অবিশ্বাস ক’বে বলবেন খাওয়ার পর রাত্রে।”

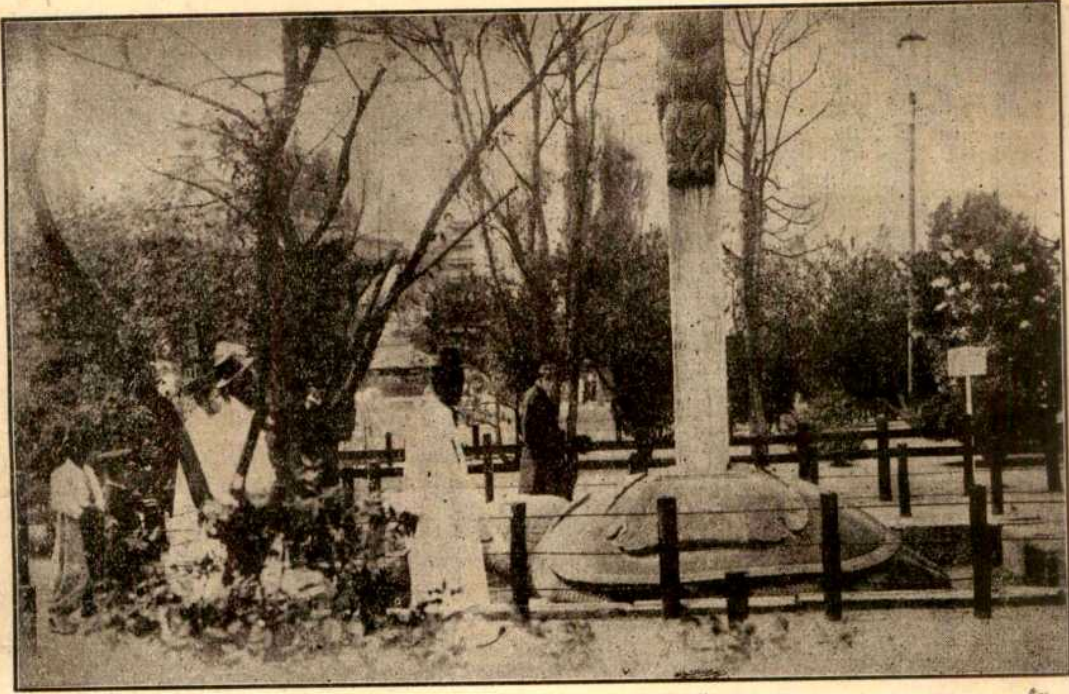
আমি বল্লাম, “বল্বে রে বল্বে। এতদিন তো মনে ছিল না তোর, এখন সাম্নে পেয়ে বুঝি দাদার ওপর ভারি মায়া।”

পিসিমা বল্লে, “ও তোমার তেমন পাগলী বোন নষ বাবা। সে কথা বুঝি বৌমা বলেনি তোমায়। আজ ৩৪ বছর হোলো, ওরা যখন প্রথম কলকাতা থেকে এখানে আসে, তখন বৌমা এক জোড়া পশমের জুতো বুনে রেখেছে, তোমার জন্মে। বশে, দাদা ছুঁখু করেছেন যে আমার বোন আমার জুতো বুনে দেবার জন্মে উলবোনা শিখে, প্রথম কিনা জিনিস বুন্লো তার স্বামীব। তা আমি এবার দাদাকে পশমের জুতো পবাবো। তার পর ওদের আর কলকাতায় যাওয়া হোলো না, স্থরেনের অস্ত্র জায়গায় চাকরী হোলো। ভূমিও আব কখনো এদিকে আসনি। কাল ভূমি আসতেই বৌমার যে আফ্লাদ, আমায় বল্লে, পিসিমা, আমার সাধ এইবার পূরলো, এতদিন পরে দাদাকে পশমের জুতো পরাতে পারবো।”

উমারাণীর চোখ ছুটি লজ্জায় নীচু হয়ে রইল, প্রদীপের আলোয় উজ্জল তার মুখখানি কিশোরীর মুখের মত এমন লাবণ্যমাখা অথচ কচি মনে হচ্ছিল, যে, বোধ হল নোলক পরলে তাকে এখনও বেশ মানাষ।

তার পর নানা কথায় আর খেতে দেতে সেদিন অনেক রাত হয়ে গেল। সেদিন অনেক রাত্রে যখন উপবের ঘরে শুতে গেলুম, তখন চাঁদ উঠেছে। গভীর বাতের মৌন শান্তি সেদিন বড় করুণ হয়ে বাজলো আমার মনে। আজ অনেককাল উমারাণীর নিকটে ব’সে থেকে একটা জিনিস বেশ বুঝতে পেয়েছি—উমারাণীর থাইসিস্ হয়েছে।

মৃত্যু ওর শাস্ত লগাটে তার তিলক পবিযে ওকে



শিউলের প্যাগোডা উদ্যান।

এবং রেল-লাইনও বসাইতেছে। কিন্তু জাপান তাদের রিপোর্টে পটুতার সহিত তাদের অর্থ-গৃহুতার ভাব চাপা দিয়া রাখিয়াছে। তাদের অর্থ-লোভ কিন্তু কোরিয়ার জাতীয় জীবনের বহু বিভাগে হাত বাড়াইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখা যায় যে, কোরিয়ার বড় বড় ব্যবসা-কেন্দ্র জাপানীরা নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে আনিয়াছে। কোন ব্যবসার কাজে যদি কোন কোরিয়াবাসী নামিতে চান তবে তাঁকে রাজ-সরকারের ছকুম লইতে হইবে। রাজ-সরকারে তিনি যে আবেদন করিবেন তাহা তাগাদা সত্ত্বেও দিনের পর দিন কেলিয়া রাখা হয়, মঞ্জুর আর হয় না। ইতিমধ্যে যদি কোন জাপানী সেইরূপ কাজের জন্ত আবেদন করে তবে, আশ্চর্য্য এই, তার আবেদনই মঞ্জুর হয়!

কোরিয়ার নিত্যব্যবহাৰ্য্য সমস্ত দ্রব্যই জাপান হইতে আমদানি করা হয়। সেখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য নামে মাত্র কোরিয়াতে হয়, তার পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে জাপানীদের হাতে। এ সম্বন্ধেও একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির কথা এই—

“কোরিয়াতে কোন পরিদর্শক উপস্থিত হইলে তাঁকে জানানো হয় জাপান কেমন করিয়া কোরিয়াতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার করিয়াছে। কিন্তু তাঁকে এ-কথা বলা হয় না যে কোরিয়ায় জিনিসের আমদানি ও রপ্তানি ব্যাপারের শতকরা পঁচাত্তরটি জাপানীদের হাতে, এবং জাপানীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যবসা চালাইবার কোন সুবিধাই কোরিয়াবাসীদের নাই। সম্পূর্ণরূপে জাপানী এবং আধা-সরকারী ওরিয়েণ্টাল ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী যে অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমির সমস্ত ধানের ক্ষেত কিনিয়া লইয়া কোরিয়াবাসীদের অধিকৃত নীচেকার জমিসকলের জলসংযোগ কাটিয়া দিয়াছে এবং কোরিয়াবাসীদেরকে জলাভাবে সে-সমস্ত জমি যৎকিঞ্চিৎ মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য করাইয়াছে—তাহা পরিদর্শকের গোচর করা হয় না।”

ব্যবসা ও বাণিজ্যের সমস্ত লাভ জাপানের ঘরে গিয়া উঠিতেছে। এবং এইরূপে কোরিয়ার অর্থ শোষিত হইতেছে। কোরিয়ার অবস্থা যখন এই, তখন জাপানের মুখে কোরিয়ার সমৃদ্ধি-সাধনের কথা শোভা পায় না।

বরণ ক'রে রেখেছে, শীগগির ওকে বেরিয়ে পড়তে হবে
অনন্তের পথের তীর্থধাত্রী। উমারানী এক গ্লাস জল
দিতে আমার ঘরে ঢুকলো। জল নামিয়ে রেখে বললে,
“কৈ, দাদা, সে পাঞ্জিখানা?”

তার মুখখানির দিকে চেয়ে বড় মন কেমন ক'বে
উঠলো। বললুম, “রাণী, এদিকে আয়।” একথা আমার
মনে উঠলো না যে উমারানী আমার আপন বোন নয়
বা আমাদের দুজনেরই বয়স কম। আমিও যেমন
নিঃসঙ্কোচে বললুম, সেও তেমনি নিঃসঙ্কোচে এসে আমার
পাঘের কাছে খাটের নীচে মাটিতে ব'সে পড়ল। আট
বছর আগের মত আশ্রম ওকে আদর ক'রে তাব
বিদ্রোহী চুলগুলো কানের পাশ দিয়ে তুলে দিতে দিতে
বললুম, “রাণী, জুতোব কথা কে বলেছিল রে তোকে?”

উমারানী অসীম নির্ভরতার সঙ্গে ছোট্ট মেয়েটির মত
খাট থেকে ঝোলানো আমার পাঘের উপর তার মুখটি
লুকিয়ে রাখলে। ওরে, স্নেহ যদি রোগ সারানোর ওষুধ
হতো। তা হলে আমি বড় ভাইয়ের স্নেহ তোকে
শিশি ভ'বে দাগ কেটে ডাক্তারী ওষুধের মত দিয়ে
যেতাম।

আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর তার কাছ থেকে পেলুম
না। কেন পেলুম না, তাও একটু পরেই বুঝলুম।
একমাত্র শোক যে ঐ জুতোর কথা জানে বা ঘাব কাছে
আমি এক-সময় এ কথা বলেছিলুম, সে হচ্ছে—স্বরেন।
স্বরেনই বোধ হয় বিয়ের পর কোনো সময় উমারানীকে
এ কথা বলে থাকবে। বড় ভাইয়ের কাছে ছোট বোনটি
তো আর সে কথা বলতে পারে না?

বললুম, “রাণী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। টুনি
বলছিল—মানে—স্বরেন কি ঠিক পত্রটুকু দেয়? বাড়ী-
টাড়ী আসে?”

উমারানী বড় জড়সড় হয়ে গেল। আমার কথার
কোনো উত্তর দিলে না, মুখও তুলে নিলে না, আগের মত
আমার পাঘের উপর মুখটি লুকিয়ে চুপ ক'বে রইল।

অনেকক্ষণ কেটে গেল, তাব পব বুঝলুম সে কাঁদছে।

তাকে সাহসনা কি ব'লে দেব ঠিক বুঝতে পারলুম না,
শুধু তার মাথার চুলগুলোর উপর পরমস্নেহে হাত বুলিয়ে

দিতে লাগলুম। বেশীদিন না রে, সোনার বোনটি
বেশীদিন না। তোর মেঘাদ ফুরিয়ে এসেছে।

ব্যর্থ নারী-হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগ পরম নির্ভরতার সঙ্গে
তার দাদার বুকে নিঃশেষে ঢেলে দিবে যখন সে নীচে শুতে
নেমে গেল, চাঁদের আলোব তলাষ ঘুমন্ত বাতাস সজ্জনে-
ফুলের মিষ্টি গন্ধে তখন স্বপ্ন দেখছে।

এর ২১৩ দিন পবে তাদের গুথান থেকে চলে আসবাব
জন্তে প্রস্তুত হলুম। এর আগেই চ'লে আসতুম,
কলকাতায় অনেক কাজ ছিল আমার, কিন্তু উমারানীর
করণ মিনতি এড়াতে না পেয়ে কিছু দেবী হয়ে গেল।

কাপড় প'রে তৈরী হয়েছি, উমারানী কান্দো-কান্দো
মুখে এসে নিকটে দাঁড়াল। আমাব বললে, “আবার
কবে আসবেন, দাদা?”

বললুম, “আসবো রে আবার পূজোর সময় আসবো।”

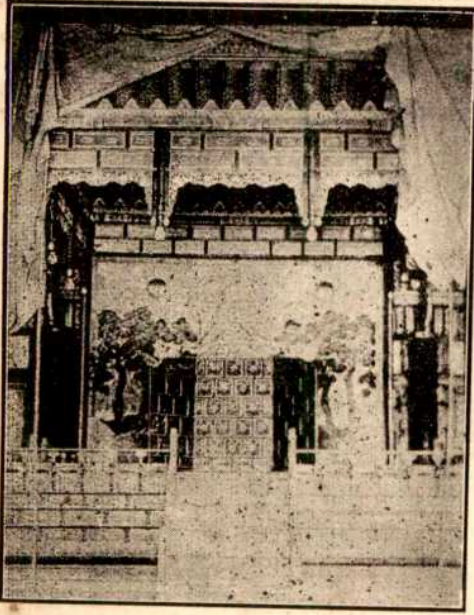
সে বললে, “সে যে অনেকদিন!—না দাদা, আপনি
আষাঢ় মাসে রথের সময় আসবেন। আমাদের এখানে
রথের বড় জাঁক হয়, দাদা। আর কিন্তু আমি আপনার
বিয়ে দেবোই এই বছরে, লক্ষ্মী দাদামণি, আপনার পাঘে
পড়ি, আপনি অমত করবেন না।”

তার পর সে সেই পশমের জুতো জোড়া বের ক'রে আমার
সামনে মাটিতে রাখলে; বললে, “আমি আন্দাজে বুনেছি,
আপনি পায়েদিয়ে দেখুন দেখি, দাদা, হবে এখন বোধ হয়।”
জুতো জোড়াটা পায়ে ঠিক হয়েছে দেখে উমারানী
বড় খুসী হোলো, তাব সমস্ত মুখখানা সার্থকতার আনন্দে
উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

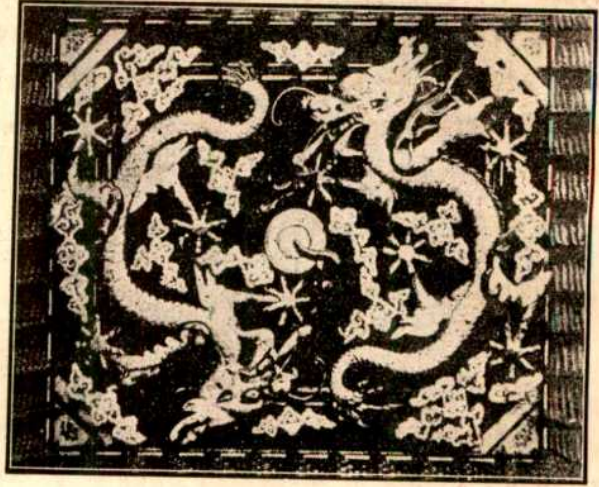
তাব পর সে আবার বললে, “দাদা, আমি আপনার
গরীব বোন, কখনো আসেন না এখানে, যদি বা এলেন,
না পারলাম ভাল ক'রে খাওয়াতে মাখাতে, না পারলাম
তেমন আদর যত্ন করতে। এসে শুধু কষ্টই পেলেন, কি
করবো, আমার যেমন কপাল।”

অনেকদিন আগেব মত সেইরকম গলায় আঁচল দিয়ে
সে আমাব প্রণাম করলে, তাব চোখের জল আমাব
পাঘের উপর টপ্ টপ্ ক'রে বা'রে পড়তে লাগলো।

আমি তাকে উঠিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে
দিতে বললুম, “রাণী, তুই আমার মাযের পেটের বোনই।



কোরিয়ার রাজসিংহাসন।



কোরিয়ার রাজপ্রাসাদের সিংহাসন-গৃহের ছাদতলের কারুকার্য।

জমি-জমার বন্দোবস্ত, বিদেশে যাওয়া-আসার আইন, দেশ-শাসনের আইন, যাহা কিছু কোরিয়ার উন্নতি-বিধানের সহিত সংশ্লিষ্ট—সমস্তই জাপানীরা নিজেদের সুবিধামত গঠন করে, কোরিয়াবাসীদের তাতে যতই অহিত হউক না কেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, জাপানীরা দস্যুর মত কোরিয়ার অর্থ লুটিয়া লইতেছে। এই লুটে এবং ব্যবসাবিষয়ে দাসত্বের পীড়নে কোরিয়া নির্ধাতিত।

১৯১৯ সালের মার্চ মাসে কোরিয়া আপনাকে সাধারণতন্ত্র দেশ বলিয়া ঘোষিত করে। জাপান অপেক্ষা কোরিয়া দেড়গুণ বড় দেশ। এই দেশ আজ জাপানের পদতলে পড়িয়া অশান্তি ও আত্মঘাতিতে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কোরিয়া অস্ত্রহীন; পদে পদে সে জাপানীদের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ-নীতি প্রয়োগ করিতেছে। আর জাপানীরা সে প্রতিরোধ দমন করিবার জন্ত কোরিয়ার দেশভক্ত সন্তানদের উপর ভীষণ অত্যাচার করিতেছে। সে পাশবিক অত্যাচারের কয়েকটি নমুনা এই :—হাতের ও পায়ের আঙুলের নখ উপড়াইয়া লওয়া, দেহের শিরা ছিঁড়িয়া বাহির করা এবং গরম লোহা দিয়া দেহের মাংস পুড়াইয়া দেওয়া। এত অত্যাচারেও

কিন্তু তারা কোরিয়াবাসীদের স্বাভাৱ্য-বোধ-চাক্ষু্য দমন করিতে পারে নাই। কোরিয়াবাসীরা অহিংস প্রতিরোধ-প্রথা চালাইতেছে। কোরিয়াবাসীদের নির্ভীক আচরণে জাপান বিক্ষুব্ধ, ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আজ তারা কোরিয়ার নেতাদের মনস্তপ্তির জন্ত স্বায়ত্তশাসন দিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোরিয়াকে স্বাধীনতা দিতে জাপানের আদৌ ইচ্ছা নাই। কোরিয়ার উপর যে-সমস্ত অত্যাচার আচরিত হইয়াছে তার জন্তও জাপান দুঃখিত বা লজ্জিত নয়।

কোরিয়ায় যে-সব অত্যাচার সাধিত হইয়াছে তার জন্ত জাপান গভর্ণমেন্ট মাঝে মাঝে দুই-একজন কক্ষ-চারীকে একটু-আধটু ভৎসনা করিতেছে মাত্র। অত্যাচার ও কু-শাসন নিবারণ করিতে হইলে রাজনীতির বা শাসন-নীতির মূলতঃ পরিবর্তন আবশ্যক। কোরিয়ায় জাপানী শাসন তরবারিশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সে শাসনে প্রজাদের মতামত বা স্ব-ইচ্ছার কোন প্রয়োজনই বোধ হয় না। ‘রিকম্’ বা শাসন-সংস্কার যাহা প্রদত্ত হইতেছে তাহা চতুর নীতি ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহা পিঠ চাপুড়াইয়া ঠাণ্ডা রাখার মত। ইহার দ্বারা তীব্র সমালোচকদের মন থানিকটা পথভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা হইতেছে।

জাপান কোরিয়ায় দমন, পীড়ন ও অত্যাচার

একথা ভুলে যাস্নে কখনো যে তোর বড় ভাই এখনও বেঁচে আছে।”

যখন চ’লে আসি তখন সে তাদের বাইরের বাড়ীর দোর খ’রে দাঁড়িয়ে রইল, আসতে আসতে পিছন দিবে দেখলুম সে কাতর চোখে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

যখন পথের বাঁক ফিরেচি, তখনও তাকে দেখা যাচ্ছিল, বেলা-শেষের হৃদে-রোদ সুপারি গাছের সারির ফাঁক দিয়ে তার রুম্ম কৌকড়া চুলে ঘেবা বিষম মুখখানির উপব গিয়ে পড়েছিল।

* * * *

বছর খানেক পরে আমি আবার চাকরী নিয়ে গেলুম ময়ূরভঞ্জ রাজ্যষ্টেটে। সেখানে থাকতে সুরেনের এক পত্রে জানলুম উমারানী মাঝা গিয়েচে।

যাবেই, তা জানতুম। সেবার যখন তার কাছ থেকে চ’লে আসি তখনই বুঝে এসেছিলুম, এই তার সন্ধে শেষ দেখা। সুরেনকে এসে পত্র লিখেছিলুম, উমারানীর অবস্থা সব খুলে, কোনো একটা ভাল জায়গায় তাকে কিছুদিন নিয়ে যেতে। সুরেন লিখেছিল, জমিদারের কাজ, আদায়পত্র হাতে, পূজোর সময় বরং দেখবে, এখন যাবার কোনো উপায় নেই, ইত্যাদি। উমারানী মারা গেল সেই ভাদ্র মাসে।

তারপর আরও বছর খানেক কেটে গেল। সেবার কিছুদিন ছুটি নিয়ে কল্কাতা এসে দেখলুম ওদের সেই বাড়ীতে ওরা আবার বাস করছে। আমি এসেছি শুনে টুনি দেখা করতে এল। খানিক একথা সেকথা পর টুনি কাগজে মোড়া একটা কি আমার হাতে দিল, খুলে দেখি মেয়েদের মাথায় দেবার কতকগুলো রূপোর কাঁটা। টুনি বললে, “বৌদি যে ভাদ্র মাসে মারা যায়, আমি সেই শ্রাবণ মাসে চাঁপাপুকুর গিয়েছিলাম। বৌদি আপনার কত গল্প করলে, বললে, মায়ের পেটের ভাই যে কি জিনিস, ঠাকুরবি, তা আমি দাদাকে দিয়ে বুঝেচি। আমার বড় ইচ্ছে আমি দাদার বিয়ে দিয়ে তাঁকে সংসারী করে দেব। দাদা আমার ভেসে ভেসে বেড়ান, কেউ একটু যত্ন করবার নেই, ওতে আমার বড় কষ্ট হয়। ওই রূপোর কাঁটাগুলো সে গড়িয়েছিল আপনাব বিয়ে হলে

আপনার বোকে দেবাব জন্তে। সে আষাঢ় মাসে গুপ্তলো গড়িয়েছিল, আমি গেলে আমাষ দেখিয়ে বল্লে, ইচ্ছে ছিল সোনার চিকনী দিয়ে দাদার বৌএর মুখ দেখবো, কিন্তু এখন অত পয়সা কোথায় পাবো, এই বছরেই দাদার বিয়ে না দিলে নয়। বিয়ে হোক, তার পর চেষ্টা ক’রে গড়িয়ে দেব। কাঁটা গুর বাক্সে তোলা ছিল, তার পর ভাদ্র মাসে বৌদি মারা গেল, আমি তার বাক্স থেকে কাঁটাগুলো বের ক’রে এনেছিলাম, আপনাকে দেব ব’লে। কোথায় পয়সা পাবে, সারা বছর জমিয়ে যা করেছিল, তাতেই ঐগুলো গড়েছিল। দাদা তো এক পয়সাও তার হাতে দিতেন না, সংসার-খবচ ব’লে যা দিতেন, তাতে সংসার চলাই ভার, তা তো আপনি একবাব গিয়ে দেখেই এসেছিলেন।”

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, “তা হলে তার হাতে পয়সা জমল কোথা থেকে?”

টুনি বললে, “বৌদি বাজারের খাবার বড় ভালবাসতো। ওরা পশ্চিমে থাকতো, সেখানে ওসব বোধ হয় তেমন মেলে না, সেইজন্তে ঐ বাজারের কচুরী নিম্‌কির ওপর তার কেমন ছেলেমানুষের মত একটা লোভ ছিল। বৌদি কর্তো কি, নার্কোল পাতা চঁচে কাঁটার কাটি ক’রে রাখতো, লোকে পয়সা দিয়ে তা কিনে নিয়ে যেতো। এই রকম ক’রে যে পয়সা পেত, তাই দিয়ে গোপালনগরের হাট থেকে পাড়ার ছেলে-পিলেদের দিয়ে খাবার আনাতো, নিজেকে খেতো, তাদের দিতো। আপনি সেবার চ’লে আসবার পর থেকে সেই পয়সায় আর খাবার না খেয়ে তাই জমিয়ে জমিয়ে ঐ রূপোর কাঁটাগুলো গড়িয়েছিল।”

আমি বললুম, “সে মারা গেল কোন্‌ সময়ে?”

টুনি বললে, “শেষ রাত্রে, প্রায় রাত ৪টার সময়। রাত্রে বৌদির ভয়ানক অর হোলো, সেই অরে একেবারে বেহুঁশ হয়ে গেল। তার পরদিন বিকালবেলা আমি ওর বিছানার পাশে ব’সে আছি, দেখি বৌদি বালিশের এপাশ ওপাশ হাতুড়াচ্ছে, কি যেন খুঁজছে। আমি বললুম, বৌদি, লক্ষ্মীটি, ও রকম কর্তো কেন? তখন তার ভাল জ্ঞান নেই, যেন আচ্ছন্ন মত। বললে, আমার চিঠিগুলো কোথায় গেল, আমার সেই চিঠি-

অবলম্বন করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। নানাদিক হইতে
প্রতিবাদ ও অভিযোগ আসা সত্ত্বেও এবং স্বায়ত্তশাসন
দিবার প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও জাপানীরা বীভৎসতার সহিত
তাদের দমন-নীতি চালাইয়া চলিয়াছে এবং চালাইবেও।
কিন্তু দেশাত্মবোধ এবং স্বাধীনতার প্রেরণায় যখন সমস্ত

জগৎ উদ্ভূত হইয়া উঠিতেছে তখন কতদিন জাপান
কোরিয়াকে পদদলিত করিয়া রাখিতে পারিবে?
এসিয়ারই এক জাতি আর-এক জাতির উপর এমন নির্দয়
অত্যাচার আর কতদিন করিবে?

গুপ্ত

বিশ্বদরদী

কত জন দ্বারে আসে,
চেয়েও দেখি না, ফিরে যায় তারা গভীর হতাশাসে।
তাদের দীর্ঘশ্বাস
হা হা করে' ফেরে পৃথিবীর বৃক্ষে, ছেয়ে ফেলে নীলাকাশ।
আমি যদি চাই করে
আকুল পরাণে আঁচলটি পেতে বসে' থাকি তার দ্বারে,—
পাই না ভিক্ষা-মুঠি,
ব্যর্থবাসনা চাপিয়া বক্ষে ধূলার উপর লুটি ;
আমার বেদনারাশি
সাগরের মত চেউ তুলে উঠে আমাকেই ফেলে গ্রাসি।
এমনই করিয়া হয়
সারাটি ভুবন কৈদে কৈদে মরে, পায় না যা-কিছু চায়।
হুঃখ-দহনে জলে'
বিদ্যাতারে সবে দোষ দিই শুধু ক্রন্দন-কলরোলে ;
ভাবি অবোধের প্রায়
আমাদের এত হুঃখে বিধির কিছু নাহি আসে যায়।
জানি না ভিখারী-সাজে
তিনিও ফেরেন হৃদয় মাগিয়া নিখিল-মানব মাঝে।
বিমুখ হইয়া যবে
কিরাই তাঁহারে, কত ব্যথা পান, হিসাব কে রাখে কবে ?

যতেক বেদনা যার
এক সাথে জমে' অচল-মুকুট গড়েছে মাথায় তাঁর।
যত আশা হল ছাই,
সেসব তাঁহার অঙ্গবিভূতি,—চিরসন্মাসী তাই।
মানব-মনের বিষ
তিল তিল করে' কণ্ঠে তাঁহার জমিছে অহর্নিশ।
ব্যথিত বেদন বয়ে
সবাঁকার সাথে ফিরিছেন পথে সবাঁকার বোঝা লয়ে।
ওগো রাজ-অধিরাজ !
তোমার ব্যথার সমুখে আমার এ কান্না পায় লাজ।
আমার নয়ন-বারি
বিরাট অশ্রু-সাগরে হারায় াজ নাহি পাই তারি।
মানুষেরে দিয়া হাসি
দরদী ! তোমার কাছেতে শুধুই কান্নাটি নিয়ে আসি।
কম সেই অপরাধ,
মোর বৃকে আজ প্রেমের লীলায় মিটাও তোমার সাধ।
পরম-প্রেমিক জন !
কাদিয়ে তোমায় কাদাব না আর, এই হল মোর পণ।
বক্ষে মিলায়ে থাক,
হে দরদী বঁধু ! আমায় তোমার শাস্তি-আঁচলে ঢাক।

শ্রী সুনীতি দেবী



“প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে”
শ্রীমতী শান্তা দেবী কর্তৃক অঙ্কিত।



শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত

ও

অনুগ্ৰহ পুস্তক

ভাগবতাচার্য শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয়ের রচিত নিম্নলিখিত কয়েকখানি পুস্তক ও পুস্তিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি :—

১। শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত, প্রকাশক শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ বোষাল, ১৪২।১, বাহিরমির্জাপুর রোড, গড়পার, কলিকাতা। পৃঃ ২১৯। মূল্য ১।০ টাকা।

২। শ্রীকৃষ্ণরাসলীলামৃত, প্রকাশক শ্রী হরেন্দ্রনাথ সাধু, ১৮, অষ্টমতল্লেন মল্লিক লেন, কলিকাতা। পৃঃ ৮/০ + ৪১৩ + ৩। মূল্য ২.০ টাকা।

৩। পঞ্চরত্ন শ্রীশ্রীগৌরগতক, প্রকাশক শ্রী শৌরীন্দ্রমোহন দাস, ৪৩।১ মাণিকতলা রোড, কলিকাতা। পৃঃ ১০১ + ২৬ + ২১। মূল্য ৮/০ আনা।

৪। পতিব্রতা, প্রকাশক শ্রী হরেন্দ্রনাথ সাধু। পৃঃ ৩১। মূল্য ১।০ আনা।

৫। শিষ্টোত্তম, প্রকাশক শ্রী হরেন্দ্রনাথ সাধু। পৃঃ ১২ + ১৫। মূল্য ১।০ আনা।

৬। সত্যমেব জয়তি, প্রকাশক শ্রী হরেন্দ্রনাথ সাধু। পৃঃ ৩১। মূল্য ১।০ আনা।

উল্লিখিত পুস্তক ও পুস্তিকাগুলি সংস্কৃতে রচিত, এবং কয়েকখানায় সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদ ও অপর কয়েকখানায় তাহার বাংলা বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে শ্রীকৃষ্ণের গোলোক, অবতার, জন্ম, অহুসংহার, চৌর্ধ্য, যুদ্ধক্ষেত্র, দামোদর, ব্রহ্মমোহন, কালিয়দমন, বস্ত্রহরণ, অন্নভিক্ষা, গিরিধারণ, নন্দোদ্ধার ও রাস এই চতুর্দশ লীলার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে রাসলীলার যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণরাসলীলায় তাহাই আরো বিস্তারিত করা হইয়াছে। ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ীর (১০।৩১-১৫) প্রথমে প্রত্যেকটি শ্লোক লইয়া পরে যথাক্রমে তাহার সংস্কৃত অর্থ, শ্রীধর স্বামীর টীকা, শ্লোকের বঙ্গানুবাদ ও বাঙ্গালায় তাহার তাৎপর্য দেওয়া হইয়াছে। পুস্তক দুইখানি পড়িয়া গ্রন্থকারের উপর আমাদের আস্থা হইয়াছে। বৈষ্ণব-দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণলীলাকে যেক্ষণ দেখা যাইতে পারে তিনি তাহা দেখিয়াছেন, এবং আমাদের বিশ্বাস যিনি ঐ দৃষ্টিতে এই পুস্তক দুইখানি পড়িবেন তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন। আমরা দেখিয়াছি গোস্বামী মহাশয় সর্বত্র কেবল পূর্বাচাৰ্যগণকে অনুসরণই করেন নাই, নিজের নূতন চিন্তা করিয়াছেন, নূতন নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন, এবং তাহা স্বন্দর ও হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। দৃষ্টান্তরূপে আশ্চর্য-বাক্য সৌরভঃ (৫.২৬) ও ভেজিয়াসং (৫.২৯) শব্দের ব্যাখ্যা উল্লেখ করিতে পারা যায়। পূর্বাচাৰ্যের মতকে স্থান বিশেষে ত্যাগ করিতেও হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও তাহার বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের অভাব কোথাও লক্ষিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা স্বপ্নলীল কি অলীল, শুকদেব তাহাতে সাদা চুন-কাস করিয়াছেন কি না, ইহা তর্ক করিয়া লাভ নাই।

দেখিয়াছি কৃষ্ণলীলা শ্রবণে কাহারো কাহারো হৃদয় গলিয়া গিয়াছে ও অশ্রুধারা নির্গত হইতেছে; কামের গন্ধ মাত্রও তাঁহাদের নিকট অনুভূত হইতেছে না, ইন্দ্রিয়ও চাকল্য ত্যাগ করিয়া শান্ত হইয়া আসিয়াছে; এক কথায়, কেবল বৈষ্ণবের শাস্ত্রে নহে, বিশ্বের শাস্ত্রে ভক্ত বলিতে যাহা বুঝায় তাহা তাঁহাদের মধ্যে দেখা গিয়াছে। অপর পক্ষে আবার ইহাও দেখিয়াছি কাহারো কাহারো নিকট ইহার উল্লেখ মাত্রও অসহ্য। মনের ভাবের ভেদে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হয়। একটা প্রাচীন কথা আছে, আচার্য্যেরা বলিয়া থাকেন (সর্বদর্শন-সংগ্রহ, বৌদ্ধ দর্শন) একই স্ত্রী শরীর দেখিয়া পরিব্রাজক, কামুক, ও কুকুর এই তিনের তিন রকম কল্পনা হয়; পরিব্রাজক তাহা শবের স্ত্রায় ত্যাজ্য বলিয়া মনে করেন, কামুক তাহা উপভোগ্য মনে করে, আর কুকুর তাহা ভক্ষ্য বলিয়া ভাবে। সাধুবিদেরা বলিবেন—বস্তুরই এমনি স্বভাব যে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকটে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে, একই বস্তু কাহারো সুখ কাহারো দুঃখ কাহারো বা মোহ উৎপাদন করে। কেন? কারণ, বিশেষ বিশেষ লোকের প্রতি তাহার বিশেষ বিশেষ রূপটা প্রকাশ পায়। তাই যাহা নিজের নিজের অনুভবের বিষয় সেখানে তর্ক করা চলে না; অথবা তর্ক চলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে কোনো লাভ হয় না। আমাদের অনেক সময় বিরোধ হওয়ার একটা কারণ এই যে, যে ভাবে এই জাতীয় গ্রন্থসমূহ লিখিত হইয়াছে ঠিক সেই ভাবে না পড়িয়া অশ্রু ভাবে পড়া। কোনো মহাত্মা বলিয়াছেন, Every Holy Scripture ought to be read with the same spirit wherewith it was written. আর একটা কারণ হইতেছে অর্থের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অন্ধরের উপর অতিরিক্ত বোঁক দেওয়া। তাই বুদ্ধদেব বলিতেন, ভিক্ষুকগণ তোমরা ব্যঞ্জন গ্রহণ করিও না, উপদেশের কথা দিকে তোমরা অভিনিবিষ্ট হইও না, অর্থকে অনুসরণ কর। Truth is to be sought for in the Holy Scriptures, not eloquence, এবং We ought not to believe every saying or suggestion, but ought to warily and patiently to ponder the matter with reference to God. তাই যদি কেহ রাসলীলার প্রত্যেকটি অঙ্কের ব্যাখ্যা করিয়া তাহা বৃষ্টিতে চান তাহা হইলে ঠিক বুঝা হইবে না। চিত্ত বিদ্রোহে মলিন হইয়া থাকিলে বৈষ্ণবভাব ও বৈষ্ণবদৃষ্টিতে তাহা কি ইচ্ছাও বৃষ্টিতে পারা যাইবে না। কেহ সামনে মাটি রাখিয়া উপাসনা করে। সে যদি মাটিকেই উপাসনা করে তবে সমস্ত বার্য হইয়া যায়। কিন্তু যিনি মাটির মধ্যে আছেন, যিনি মাটির অন্তরতম, যিনি মাটিকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং মাটি বাহ্যকে জানে না, সে যদি সামনে মাটিকেই রাখিয়া ইহাকেই উপাসনা করে, তাহার উপাসনা ঠিকই হয়। কিন্তু সে যে বস্তুত মাটির অথবা মাটির অন্তরতমকে উপাসনা করে, অস্ত্রের পক্ষে তাহা জানা সব সময় সম্ভব হয় না। অপর পক্ষে যে মাটির অন্তরতমকে উপাসনা করে, অথচ সামনে মাটি রাখে না, তাহারো উপাসনা ঠিক এইরূপে সার্থক হয়, যদিও অস্ত্রের পক্ষে ইহা বুঝা সব সময় সম্ভব হয় না। উভয় উপাসনার মধ্যে ভাবই প্রধান, সেই ভাবকেই উপেক্ষা করিলে

উভয়ই নিরর্থক হয় । তেমনি অশ্রুত্বও ভাবকেই দেখিতে হইবে, ভাবকে বর্জন করিলে প্রাণকে বর্জন করা হয়, এবং প্রাণ না থাকিলে কেবল দেহটা তো শব । যাঁহারা এই ভাবে, বিশেষত বৈষ্ণব ভাবে, এই পুস্তক দুইখানি পাঠ করিবেন, অবৈষ্ণব হইলেও, মনে হয়, তাঁহারা আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন, অশ্রুত বৈষ্ণবদৃষ্টিতে কৃষ্ণলীলা কি তাহা বুঝিতে পারিবেন । গ্রন্থকার কিন্তু বলিয়াছেন, এবং ইহা তিনি ঠিকই বলিয়াছেন—“আর-একটি বক্তব্য, যাঁহাদের স্বাভাবিক সংকীর্ণ কৃষ্ণভক্তি আছে অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা এই পুস্তক সংগ্রহ করিবেন, অশ্রুত অনর্থক অর্থ ব্যয় করিয়া পুস্তক ক্রয় করিবার প্রয়োজন নাই ।” গ্রন্থকারের শেণ নিবেদনে আর কয়েকটি পঙ্ক্তি এই, ইহা ভক্তের উক্তি :—“আমার কৃষ্ণভক্তি নাই, আমি পণ্ডিত নহি, এবং আমার ভাষাজ্ঞানও নাই, একথা আমি স্বীকার করিয়াছি । কেবল শিষ্টাচারের অনুবোধে মোখিক দৈন্ত দেখাইবার জন্য স্বীকার করিয়াছি, তাহা নহে, প্রকৃতই আমি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলার সমাধানে সর্বাংশেই অযোগ্য । তবে যে-কোন কারণে অত্যন্ত কাল কৃষ্ণকথার আলোচনা করিলেও জীবন পবিত্র হয় ইহা আমার বিশ্বাস । এই বিশ্বাসকে এখনকার মতে যদি কেহ অন্ধ বিশ্বাস বলিতে চাহেন, বলুন, আমি তাহা আশীর্বাদ মনে করিব । কেননা, আমার বিশ্বাস, যে দিন যাঁহার ভগবানে প্রকৃত অন্ধ বিশ্বাস হইবে সেই দিন তিনি কৃতার্থ হইয়া যাইবেন । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রকৃত অন্ধ বিশ্বাস নাই ; অন্ধবিশ্বাসের গন্ধ থাকিলেও থাকিতে পারে । সেই বিশ্বাস-গন্ধের প্রয়োচনায় আমি কৃষ্ণ ভালবাসি, কৃষ্ণনাম ভালবাসি, এবং কৃষ্ণলীলা ভালবাসি । যে বাহাকে ভালবাসে সে তাহার গুণ গাহিতেই চাহে, ইহা মানবের অজন্মসিদ্ধ স্বভাব । সে স্বভাব আপন মনেই প্রিয়জনকে গুণ গাহিয়া যায়, কাহারো মুখের দিকে তাকায় না । আমি,—ভক্তিহীন আমি,—জ্ঞানহীন আমি,—শব্দসম্পত্তিহীন আমি—সেই মানবোচিত স্বভাবের বশীভূত হইয়া কেবল অভীষ্ট কৃষ্ণনাম আলোচনায় কিঞ্চিৎ আনন্দলাভের লোভে ‘শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা’ নামক পরম রসের লীলা আলোচনা করিলাম ।”

শ্রীমদভাগবতে শ্রীরাধার নাম আছে কি না ইহা লইয়া একটা বিবাদ আছে । সত্য বলিতে গেলে তাহা নাই । কিন্তু বৈষ্ণবগণ ইহাতে কষ্ট পান । তাই যে-কোন প্রকারে হউক তাঁহারা শ্রীমদভাগবত হইতে তাহার উল্লেখ বাহির করিবার জন্য প্রয়াস করিয়া থাকেন । শ্রীমদভাগবত শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রধান গ্রন্থ, তাহাতে উহা না পাইলে তাহা তাঁহাদের পক্ষে বড় অশোভন । রাসলীলার একটি শ্লোকের (২.২৮—১০.৩০.২৮) প্রথমংশ হইতেছে—“অনয়ারাধিতো নুনম্” । এখানে আরাধিত শব্দেরই দ্বারা রাধা শব্দ সূচিত হইতেছে, ইহাই ইহাদের মত । শ্রীধরস্বামী এসম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই, কিন্তু শ্রী সনাতন গোস্বামী, শ্রী জীব গোস্বামী ও শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ইহাই বলেন । আমাদের ভাগবতাচার্য্য মহাশয়ও ইহাই অনুসরণ করিয়াছেন । কিন্তু ইহা অতি কষ্টকল্পনা, ইহা সমর্থন করা যায় না । আমার মনে হয় শ্রী রাধার নাম ভাগবতে না থাকিলেও তাঁহাদের চক্কল হইবার কোন কারণ নাই ; কেননা, তাঁহারা কৃষ্ণলীলাকে বাহার উপর স্থাপন করিয়াছেন তাহা পুরাণ । শ্রী জীব গোস্বামী বটমন্ডলে পুরাণের যেকোন প্রামাণ্য স্থির করিয়াছেন, বৈষ্ণবগণের তাহা অকাটা । অতএব, যদি তাহাই হয়, তবে ভাগবতের স্রষ্টা অশ্রুত পুরাণও যখন কৃষ্ণলীলার সমর্থন করে, তখন তাহা হইতেই শ্রী রাধার নাম পাওয়া গেলে তাহাতে তো কোনো ক্ষতি দেখা যায় না ।

ঐতিহাসিক দিক হইতে দেখিতে গেলে বৈষ্ণবগণের সম্মুখে এখন একটি গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে । শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

আমাদিগকে শুনাইয়াছেন তিনি শ্রীমদভাগবতের দুইখানি অতিপ্রাচীন পুঁথি পাইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে রাসপঞ্চাধারী নাই ।

আলোচ্য শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা পুস্তকে এই কমটি বাক্য বা অনুচ্ছেদ একবারে তুলিয়া দেওয়া ভাল, ইহা অঙ্গীল :—“আমাদের পাঠক-দিগের...” (পৃ-১৪৬), “কামিনীকে...” (পৃ-২০০), “ছি, ছি, ছি.....” (পৃ ২০৪) ।

“কামং ক্রোধং জয়ং স্নেহম্...” (পৃ ৬৯) এখানে ‘স্নেহ’ শব্দের অর্থ ‘যত্ন’ করা হইয়াছে । ইহা ঠিক হয় নাই, কোন টীকাকারও ইহা সমর্থন করেন না । ইহার অর্থ এখানে ক্রমসম্পর্কের মতে ‘বাৎসল্য’ (“স্নেহং পিত্রোঃ”) আর বৈষ্ণবতোষিণী ও বীররাঘবের মতে ‘সখ্য’ (“স্নেহং বৃক্ষিপাণ্ডবানামিব”) । “যে নানা বস্তু দেখে সে মৃত্যুর পর মৃত্যু দেখে” (পৃ ৬০), ইহা নিশ্চয়ই “মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্রোতি য ইহ নানৈব পশ্যতি” এই উপনিষদ-বাক্যের অনুবাদ । এখানে তদনুসারে “মৃত্যুর পর” স্থানে “মৃত্যু হইতে” হওয়া উচিত । “ন হি বস্তুশক্তিবৃদ্ধিমপেক্ষতে” (পৃ ৬৪), এখানে “ন হি বস্তুশক্তিবৃদ্ধিমপেক্ষতে” হইবে ।

ভাগবতাচার্য্য মহাশয়ের তৃতীয় পুস্তক পঞ্চরত্ন ও শ্রীশ্রী গৌরান্দ্র-শতকে (১) মাতৃস্তোত্র, (২) গুরুস্তোত্র, (৩) ধর্মস্তোত্র, (৪) বিবেক-প্রশংসা (অথবা অজ্ঞান-নিন্দা), (৫) হরিনাম-প্রশংসা ও (৬) শ্রীগৌরান্দ্র-স্তোত্র রহিয়াছে । যথাক্রমে প্রকরণগুলির প্রতি শ্লোকের শেষচরণ-গুলি এই—(১) “তস্যৈ মাত্রে নমো নমঃ”, (২) তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ”, (৩) যতো ধর্ম স্ততো জয়ঃ, (৪) কিমজ্ঞানমতঃপরম্, (৫) হরেণামৈব কেবলম্, এবং (৬) স গৌরঃ শরণং মম । আশা করা যায় ইহার দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির বর্ণনা-প্রণালী অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে । শ্রদ্ধার সহিত এগুলি পাঠ করিলে হৃদয়ে একটা পবিত্রভাবের সঞ্চার হয় সন্দেহ নাই । শ্রীগৌরান্দ্রশতকে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবনের অনেক কথা বলা হইয়াছে । এ পুস্তকখানির অশ্রুত কোনো বিশেষত্ব নাই ।

ইহার মধ্যে মাতৃস্তোত্র আছে, কিন্তু পিতৃস্তোত্র না থাকায় দুঃখিত হইয়া ভাগবতাচার্য্য মহাশয় পিতৃস্তোত্র—নামে পুস্তিকাখানি পৃথক-ভাবে প্রণয়ন করিয়াছেন ।

পতিত্রয়—পুস্তিকায় পতিত্রয়ের ধর্ম ও গুণের প্রশংসা করা হইয়াছে । প্রসঙ্গক্রমে দেশান্তরের নারীদের অপকর্ষও দেখান হইয়াছে । গ্রন্থকার অশ্রুত বহু কথা আলোচনা করিয়াছেন । সবগুলি উপস্থিত করার সময়ও নাই, সাধ্য নাই, স্থানও নাই, করিয়াও বিশেষ লাভ নাই । দুই একটা বলি । ভাগবতাচার্য্য মহাশয়ের একটি শ্লোক এইরূপ—

অমূর্খঃ কো বদেন নারী ভারতীয়াবংশজা ।

পর্যাবেনতি হীনেতি দীনেতি দুঃস্থিতেতি চ ॥

ইহার অর্থ হইতেছে যে, এমন কোন অমূর্খ ব্যক্তি আছেন যে, তিনি বলেন যে, ভারতের আখ্যাবংশসমুদ্ভূত নারীরা পরাধীন হীনা দীনা ও দুঃস্থিতা । তিনি যদি আমাদিগকে অ-মূর্খের মধ্যে না ধরিয়া মূর্খেরই শ্রেণীতে গণ্য করেন, করুন, মাথা পাতিয়া তাহা সহিয়া লইব, কিন্তু আমাদিগকে বলিতেই হইবে, নারীর দুর্দশা ভারতে খুবই আছে । আমরা যে স্থানে থাকিয়া এই পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়াছিলাম, তাহার চারিদিকে নারীদের দুর্দশার চিত্রগুলি চোখের উপর ফুটিয়া উঠিতেছিল, বিশেষত বিধবাদের কথা তো বলিবারই নহে । ইহাদের দৈন্ত-দুর্গতির সীমা পরিসীমা নাই । প্রথমে এসব কাহিনী অশ্রুর মুখে শুনিয়া বিশ্বাস করিতাম না, মনে করিতাম তাহা অতিরঞ্জিত । কিন্তু যখন চোখ ফুটিল, দেখিতে পাইলাম তাহার এক বিন্দুও মিথ্যা নহে । তাই ভাগবতাচার্য্য মহাশয়ের কথাগুলিকে একবারে উল্টাইয়াই বলিতে হয় । তাঁহার আর-

গুলির বয়স নান পক্ষে ৯২ কোটি বৎসর। কিন্তু পৃথিবী-পৃষ্ঠের মাটির আস্তরণের বয়স প্রাচীনতম প্রস্তরপিণ্ডটি হইতেও অনেক বেশী। পৃথিবীর মোট ইউরেনিয়াম ও সীসার পরিমাণ ও তাহাদের অনুপাত ধরিয়া বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে এই বয়স ৬০০ কোটি বৎসরও হইতে পারে।

ঘূর্ণী—

ঘূর্ণী-বায়ুর কেন্দ্রবিন্দুকে ঘিরিয়া সমুদ্রের ঢেউ সবদিকে সমান জোরালোই হওয়া উচিত, সাধারণ বন্ধিতে ইহাই মনে হয়। কিন্তু সম্প্রতি বহু পর্যবেক্ষণের ফলে নিদ্বারিত হইয়াছে যে, ঘূর্ণীবায়ুর গতিমুখের সম্মুখে কেন্দ্রবিন্দুর ডানদিকের ঢেউগুলি অঙ্গদিককার ঢেউ হইতে অনেক বেশী বড় ও জোরালো হয়। সম্ভব হইলে এই কথা মনে বাখিয়া অতঃপর ঝড়ের সময় কাপ্তানেরা জাহাজের গতি নিয়মিত করিবে।

রেডিও-বার্তাবহ—

আমেরিকার ডাক-বিভাগকে রেডিও-বার্তাবহে রূপান্তরিত করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। এই রেডিও বার্তাবহের সহায়তায় সমস্ত দেশ জুড়িয়া গৃহে গৃহে কথাবার্তা চলিবে। কাজ করিতে করিতে রেডিও-ফোনের মুখে পৃথিবীর রোজকার খবর শুনিয়া লইতে পারা যাইবে। রেডিওফোনের উন্নতির সম্ভাবনা অসামান্য ও নব্বিস্তৃত। অতি মুহূ শব্দটিও ইহার সহায়তায় এক মহাদেশ জুড়িয়া শুনিতে পারা যাইবে। কলিকাতায় কোথাও একটি আলপিন পড়িয়া গেলে কলম্বো বা পেশোয়ারে বসিয়া তাহা বলিয়া দিতে পারা যাইবে। ইহা কবিকল্পনা নহে, দ্রুতগতিতে সত্য হইয়া উঠিতেছে। আমেরিকার ঘরে ঘরে রেডিওফোন বসিতেছে। শ্রেষ্ঠ গায়কের গান, শ্রেষ্ঠ অভিনেতার অভিনয়, শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকের বক্তৃতা, শ্রেষ্ঠ পুরোহিতের উপাসনা,

শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের অধ্যাপনা, একসঙ্গে সমস্ত মহাদেশের লোকে মিলিয়া শুনিবার উপায় হইতেছে। আমরা সহরবাসীরা কখন টেলিফোন ব্যবহার করি?

(গত বৎসরের চৈত্রের প্রবাসীর ৮২২ পৃষ্ঠা দেখুন।)

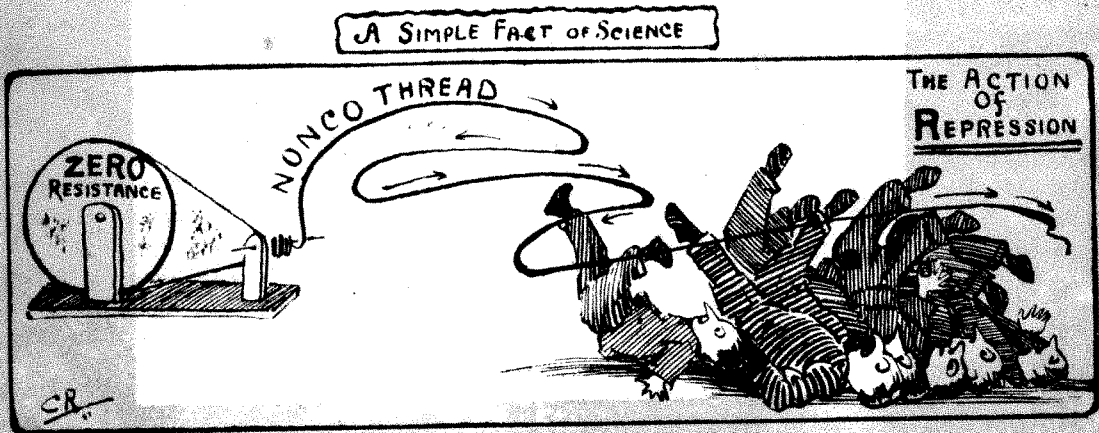
ভবিষ্যতের এয়ারপ্লেন—

আজকালকার গেসোলিন-মোটরে চলা যে মোনো এরোপ্লেন ঘণ্টায় ১৫০ মাইল চলে। ঘণ্টায় ২০০ মাইল চলিতে পারে একপ এরোপ্লেন নির্মাণের চেষ্টা নানা স্থানে হইতেছে। সম্ভবত বিমান-বিহারে গেসোলিনের ব্যবহার উঠিয়া গিয়া চাপ-দেওয়া বাতাসের চলন হইবে। চাপ-দেওয়া বাতাস গেসোলিন-ইঞ্জিনের মত এত স্থান জুড়িবে না, উহাতে চলার বেগও এখনকার অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে।

সচল চিত্রের অভিনয়ে প্রভুত্ব—

ইতিহাস, প্রভুত্ব, বিভিন্ন-দেশীয় শিল্পরীতি, প্রভৃতির ছাত্রদের ঐ ঐ বিষয়ে সাফাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্ত এতদিন নানা দেশ পর্যটন করিতে হইত। জার্মানিতে সচল-চিত্রের অভিনয়-সজ্জায়, রোম, গ্রীস, ইজিপ্ট প্রভৃতি দেশের নানা প্রসিদ্ধ স্থান ও নানা প্রকার শিল্প-রীতির এমন বখাযখ ও স্মরণ অসুকরণ করা হইয়াছে, যে, বার্লিন হইতে দলে দলে ছাত্রেরা শিক্ষালাভের জন্ত এইগুলি আসিয়া দেখিয়া যাইতেছে। বায়স্কোপের এই টু ডিওগুলি ইতিহাস-ছাত্রদের তীর্থস্থান হইয়া উঠিয়াছে। বিখ্যাত শিল্প-উদাহরণগুলির প্রতিটি রেখার টান, প্রতিটি রঙের ছোপ পর্যন্ত হুবহু নকল করা হইয়াছে। ছাত্রদের বিনা পয়সায় ইজিপ্ট, গ্রীস, চীন প্রভৃতি দেশ বেড়ানোর কাজ হইয়া যাইতেছে।

স ৮



একটা বৈজ্ঞানিক সূত্র—টানের উণ্টা টান না থাকিলে ফল পিঠটান।

চিত্রকর—শ্রীযুক্ত চাকচল্য রায় বি.এসসি মহাশয়ের সৌজন্দ্যে

একটা কথা বড় সাম্ভাব্যিক—“ভারত আজ নাস্তিকপ্রায়। হায়! হায়! আজ এখানে সতীপ্রথাকে নিষ্ঠুর বলা হয়। আমাদের সে-সব দিন গিয়াছে।”—

“অধুনা নাস্তিকপ্রায়ে ভারতে সা সতীপ্রথা।

জাতা নিষ্ঠুরতা হা হা, তে হি নো দিবস গতাঃ ॥”

খুব ভাল হইয়াছে যে, সেসব দিন গিয়াছে। এ শ্লোকটা অবিলম্বে ছিঁড়িয়া ফেলিলে **ভাগবতাচার্য্য**—মহাশয়ের উপযুক্ত কাজ করা হইবে। পতির প্রতি নারীর কর্তব্য সম্বন্ধে পূর্বে পূর্বে অনেক বলা হইয়াছে, নূতন করিয়া আর-কিছু না বলিলেও চলিত। তিনি যদি স্বাভাবিক প্রতি পুরুষজাতির কর্তব্যের কথা কিছু শুনাইতেন, তবে তাহা সব দিকে কাজে লাগিত। প্রকাশকের কথায় জানিতে পারা যায় ভাগবতাচার্য্য মহাশয় অতি হৃদয় কথক। তিনি যদি কথকতার দ্বারা নারীদের প্রতি পুরুষদের ধর্ম সম্বন্ধে শ্রোতাদিগকে কিছু কিছু উপদেশ প্রদান করেন, তবে তাহা সমাজের প্রভূত কল্যাণ করিবে।

আমাদের আলোচ্য শেষ পুস্তিকা **সত্যমেব জয়তি**,—নামেই পার্থক্য বৃদ্ধিতে পারিবেন ইহাতে সত্যের মহিমা বর্ণনা করা হইয়াছে। ভাগবতাচার্য্য মহাশয়ের সংস্কৃত রচনা সরল ও প্রাঞ্জল এবং বর্ণনীয় বিষয়ের অক্ষুণ্ণ, কিন্তু ইহা সর্বত্র সংস্কৃত বাক্যপদ্ধতিকে (idiom) অনুসরণ করে নাই, স্থানে স্থানে খুবই বাঙ্গলা গন্ধ পাওয়া যায়; আর ব্যাকরণ-দোষও লক্ষিত হইল অনেক এবং ছন্দোদোষও আছে। আলোচনা দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, তাই সংক্ষেপে কেবল একখানি মাত্র পৃষ্ঠক হইতে কয়েকটি ক্রটি দেখাই :—

ঐক্যলীলামতে দিদ্গম্ভি (পৃঃ ১৫, শ্লোক ১২) হয় না, দিদ্গম্ভে লেখা উচিত ছিল। প্রে য়ি ত্বা (পৃঃ ৪৭, শ্লোক ২৬) স্থলে প্রে বা লিখিতে হইত। উপ চ ক্র মুঃ (পৃঃ ৪৮ শ্লোক ২৬) এখানে ক্রম পাতুর আশ্রয়পদে প্রয়োগ করিতে হইত। স ম্ম ত্য স্তি (পৃঃ ৪৮ শ্লোক ৩০) হয় না স্পষ্টই, স ম্ম তি র স্তি লিখিতে হইত। অস্ত প্রকারেরও সন্ধিদোষ আছে—বা ধ স্তে ইতি (শ্লোক ৬৬ পৃঃ ৫২), জায়ন্তে অধর্ম্ম-

নিরতাঃ—(৫২ পৃঃ শ্লোক ৬৭), একরূপ স্থানে সন্ধি না করা দোষ। একরূপ দোষ (অসন্ধি) আরো অস্ত্রজ আছে [পৃঃ ৬৮, শ্লোক ৪; পৃঃ ১১১, শ্লোক ৬৯ দুইবার; পৃঃ ১২৭, শ্লোক ২৭; পৃঃ ২০১ শ্লোক ৪৯৮]। প্র থি তুং (পৃঃ ৮০ শ্লোক ৪০) দ শি তুং (পৃঃ ১০৮ শ্লোক ৪১) না লিখিয়া প্র থ যি তুং দ শ যি তুং লিখিতে হইত। ক্র হ্য স্তি হ্যেক হ স্তা রং (পৃঃ ৯৯ শ্লোক ২৬) এখানে ০ হ স্তে লিখিয়া চতুর্গী বিভক্তি দেওয়া উচিত ছিল। বি স্ত রং তত্র জ ষ্ট ব্যং (পৃঃ ১২৫ শ্লোক ১৪), কিন্তু বি স্ত র শব্দ পুংলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ নহে। বি হিং স স্তী (পৃঃ ১৩৯ শ্লোক ৩৯) ও ক দ স্তী ভ্যঃ (পৃঃ ১০৮ শ্লোক ৪২) যথা-ক্রমে বি হিং স তী ও ক দ তী ভ্যঃ হওয়া উচিত ছিল। বস্ত অর্থে বা স শব্দের পরিচর্চা বা স শব্দের প্রয়োগ (পৃঃ ১০৪ শ্লোক ১, পৃঃ ১১৫ শ্লোক ১০২, ১০৩) ঠিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। স্ত ত রাং (পৃঃ ১১০ শ্লোক ৮৭) শব্দের প্রয়োগটা বাঙালীর মতে কাজে-কাজেই হইয়াছে। সংস্কৃতে তার একরূপ অর্থ নয়।

“বৎপাদপদ্মপরাগনিষেবৃষ্টা...” (পৃঃ ১৯০ শ্লোক ৪০১) ইহা ভাগবতের (১০.৩৩.৩৪) শ্লোক। কিন্তু ইহা তুলিতে একটু ভুল হইয়াছে—“বৎ পাদপদ্ম” না হইয়! “০ প দ্ব জ—” হইবে।

শ্রী বিদুশেখর ভট্টাচার্য্য

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ—শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় এম-এ বিদ্যানিধি বিজ্ঞান-

ভূষণ রায় বাহাদুর। প্রকাশক—সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী, ৮/৯ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১১৬+১৪ পৃষ্ঠা। বোর্ডে বাঁধা। বারো আনা।

বিবিধ প্রবন্ধের বই। ১০ টি বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ আছে—(১)

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ,—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যে আপেক্ষিক শব্দ তাহা সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবী নক্ষত্র ও অণু প্রভৃতির সংস্থান ও আকারের তারতম্য তুলনা দ্বারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে; (২) কলাগাছ—কলাগাছের সম্বন্ধে উদ্ভিদ-বিদ্যার ও কৃষিবিদ্যার অনেক তথ্য বিবৃত হইয়াছে; (৩) কবিকঙ্কণ-চণ্ডী—গ্রন্থের আখ্যায়িকা ও কবিত্ব, তথ্য ও বিশেষত্ব অতি নিপুণ ভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে; (৪) তেলেশু দেশ—ভ্রমণের সরস বিবরণ; (৫) ফুলের বাগান—ফুলের বাগান কোথায় কেমন হওয়া আবশ্যক ও এখনকার বাগানে কি কি অভাব ও ক্রটি আছে তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে; (৬) কুম্ভাঙ্ক—কুম্ভার উদ্ভিদতত্ত্ব সমস্ত আলোচিত হইয়াছে; (৭) ধূলা—পদার্থটুকি ও তাহা না থাকিলে সংসারের অবস্থা কিরূপ হইত ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোচনা; (৮) খণ্ডগিরি—ওড়িয়ার প্রসিদ্ধ খণ্ডগিরি দর্শনের বর্ণনা; (৯) দধিবীজ—দধায় বা দইয়ের সাজা বস্তুর স্রবণ নির্ণয়, দই পাতার প্রণালী ও দধির উপকারিতা বর্ণনা; (১০) অগ্নিমহুস—প্রাচীন কালে অগ্নি উৎপাদনের উপায় বর্ণনা। পরিশিষ্টে টীকা আছে।

যোগেশ-বাবু বাস্তবিকই বিদ্যা-নিধি ও বিজ্ঞানভূষণ; তাঁর লেখা প্রবন্ধগুলি যে নিখুঁৎ তথ্যবহুল ও সরস সুখপাঠ্য ও জ্ঞানগর্ভ তা বলাই বাহুল্য; যারা তাঁর নাম জানেন তাঁরাই তাঁর বিদ্যাবজ্ঞানও পরিচয় জানেন; স্ততরাং ইহা যোগেশ-বাবুর বই বলিলেই যথেষ্ট বলা হইল।

মিতা—সম্পাদক শ্রী অজরচন্দ্র সরকার, ১৭২ বোঁবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা, বার্ষিক মূল্য পাঁচ সিকা; প্রতি সংখ্যার মূল্য ছয় পয়সা।

জৈষ্ঠ সংখ্যায় বাহির হইয়াছে—শ্রী দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়ের লেখা “রাজা রামমোহন”। মাত্র ১৬ পৃষ্ঠার মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহনের বিচিত্র ঘটনা-ও কর্ম্মবহুল জীবনের পরিচয় অতি দক্ষতার সহিত দেওয়া হইয়াছে। লেখা শিশুদের উপযোগী সরল ও সরস এবং জয়গ্রাহী হইয়াছে। বাঙ্গালী শিশুদের সঙ্গে এই মহৎ জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটাইবার চেষ্টার জন্য সম্পাদক ও লেখক উভয়েই ধন্যবাদ-ভাজন।

আষাঢ় সংখ্যায় বাহির হইয়াছে—সাহিত্যচার্য্য ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের লেখা একটি গল্প—মিলন। দুই পরিবারের মধ্যকার পক্ষাশ বৎসরের “বিবাদ দুইটি সরল বালকের অকৃত্রিম ভালবাসায় সহজে মিটিয়া” যাওয়ার গল্প। গল্পের পরে একটি কবিতা আছে—“রাক্ষসের হাতে ক্ষুদ্রমণি।” ছোট ছেলেদের পাখীর বাচ্চা পাড়ার বদ অভ্যাসের প্রতিকারক উপদেশমূলক রূপক কবিতা।

আমেরিকানভ্রমণ—শ্রী সত্যশরণ সিংহ। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন, ৬৫ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দুই টাকা।

আমেরিকার অনেক খবর এই বইএ আছে। কিন্তু লেখকের লেখায় কোনো মূল্যায়ন নাই, ভাষার উপর দখল নাই; সাহিত্যে কোন কথা চলে আর কি চলে না সে বোধ নাই। এমন অনেক জুগুপ্সিত বিষয় লেখা হইয়াছে যাহা পড়িতে লজ্জা যুগ্ম বিরজি জন্মে।

প্রশ্রবণ—শ্রী নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়। অতুলশিব ব্রাব, লাবপুর। বারো আনা।

কবিতার বই—৩৯টি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। মিল ছন্দ নিখুঁত—কিন্তু কোনো বিশেষত্ব নাই।



কালিয়া এম ওয়েষ্টকট্—জাহাজের মহিলা ইঞ্জিনীয়ার

তিমি-তুণ্ড পক্ষী—

বৈজ্ঞানিকের নিকটে ইহা “Whale-head” নামে পরিচিত এবং যে বিশিষ্ট বিহঙ্গ-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ইহাকে তাহার গণ্য করেন তাহার বৈজ্ঞানিক নাম “Balenicipitidae”। পাখীটার আর-



তিমি-তুণ্ড পক্ষী

একটা নাম আছে “Shoe-bill” বা “Shoe bird”—জুতা-ঠোঁট পাখী। ইহা ইহার আরবী নামের তরজমা বলিলেই হয়। ইহার একটি রঙ্গিন চিত্র ১৮৫১ খৃঃ Zoological Societyর proceedingsএ প্রদত্ত আছে। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে দুটি জীবন্ত পক্ষী ইংলণ্ডের চিড়িয়াখানায় প্রদর্শিত হইয়াছিল।

মিশর দেশের নীল নদের সমীপবর্তী শরতৃণাকীর্ণ জলাভূমিতে ইহাকে দেখা যায়। সাধারণতঃ ইহাকে হাড়গিলা এবং বক জাতীয় বিহঙ্গগণের মধ্যবর্তী বৈজ্ঞানিক সংযোগ-বিধায়ক ‘শৃঙ্খল’ বলিয়া গণ্য করা হয়।

দেখিতে হ্রস্ব নহে; বর্ণ ধূসর; দাঁড়িহলে পাঁচ ফুট হয়, ইহার বৃহৎ চকু তিমি মৎস্যের মাথার স্ফায় দেখায়, চকুর অগ্রভাগ বক ও ভীতিপ্রদ।

মার্কিন দেশের বাহুবরে যে এটি এই প্রকার পাখী সংগৃহীত হইয়াছে তন্মধ্যে পঞ্চমটি সম্প্রতি নিউইয়র্কে আনীত হইয়াছে। ইহার হাড়গিলা বা মদনটাক শ্রেণীর পাখী।

সত্যচরণ লাহা

পৃথিবীর বয়ঃক্রম—

ত্রিশ বৎসর আগে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন বলিয়া-ছিলেন,—পৃথিবী যে রকম দ্রুতগতিতে ঠাণ্ডা হইয়া চলিয়াছে তাহার অনুপাত ধরিয়া হিসাব করিলে মনে হয়, দুই কোটি বৎসর আগে উহার প্রচণ্ড তাপ কোনোপ্রকার জীববাসের অনুপস্থিত ছিল। এই একই যুক্তির বলে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন, যে, আর দুই কোটি বৎসর পরে সূর্য্যপিণ্ডও জ্যোতিহীন তাপহীন হইয়া যাইবে, তখন আলোক ও তাপের জন্ম গ্রহপুঞ্জকে হয় অল্প কোনও জ্যোতিষ্কের দ্বারস্থ হইতে হইবে, নতুবা গ্রহ উপগ্রহ সমেত সমস্ত সৌরমণ্ডল মরিয়া গিয়া চির অন্ধকারে সমাধি লাভ করিবে।

কিন্তু অধুনা Radio-activity বা অদৃশ্য রশ্মি-তরঙ্গের ক্রিয়ায় আবিষ্কারের পর বৈজ্ঞানিকদের অনেক ধারণাই আমূল পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। যে পরমাণু বা atomকে এককাল অবিভাজ্য বলিয়া মনে করা হইত, তাহারও মধ্যে এমন এক অদৃশ্য শক্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহা স্বত্বাদপি সূক্ষ্ম এবং সমস্ত পদার্থেরই মূল উপাদান-বস্তু। অদৃশ্য রশ্মি-তরঙ্গের ক্রিয়ায় ইউরেনিয়াম নামক পদার্থ বহু পরিবর্তনাদির মধ্য দিয়া সীসাতে রূপান্তরিত হয় দেখা গিয়াছে, এই রূপান্তর-প্রক্রিয়ার সময় বহু হেলিয়াম ‘খণ্ড’ (পৃথিবীর সব চেয়ে লঘু গ্যাস) ভীষণবেগে চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়িতে থাকে এবং তাহা হইতে উত্তাপের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীতে এত বেশী পরিমাণে ইউরেনিয়াম বিদ্যমান আছে, যে, এই তথ্য আবিষ্কৃত হইবার পরে পৃথিবীর জুড়াইয়া যাইবার ভয় একেবারে দূচিয়া গিয়া পণ্ডিতদের ভয় হইয়াছে পাছে অত্যধিক হেলিয়াম গ্যাসের মুক্তির ফলে পৃথিবী উত্তরোত্তর উষ্ণ হইয়া উঠিয়া ক্রমে জীববাসের অযোগ্য হইয়া পড়ে।

ইউরেনিয়ামের এই সীসায় রূপান্তরকে অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর বয়সও নূতন করিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর কি পরিমাণ ইউরেনিয়াম এই উপায়ে সীসাতে রূপান্তরিত হয় তাহার তার নিশ্চিত্র মাপে জানা আছে।—যে কোনো-একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ইউরেনিয়াম-খণ্ডের ১০০০ কোটির এক ভাগ মাত্র সীসাতে রূপান্তরিত হয়। ইউরেনিয়াম-সীসা-সম্বন্ধিত কোনো একটি ধনিজ পদার্থ লইয়া তাহার মধ্যে ঐ দুটি পদার্থ কি অনুপাতে আছে তাহা স্থির করিতে পারিলেই ঐ ধনিজ পদার্থটির বয়সও আপনা হইতেই বাহির হইয়া পড়ে। এই উপায়ে দেখা গিয়াছে যে পৃথিবীর সর্বপ্রধান প্রস্তরখণ্ড-

তুলা—শ্রী শরচ্চন্দ্র রায়। চক্রবর্তী চার্টার্ড কোম্পানী, কলেজ স্টোর, কলিকাতা। দেড় আনা।

তুলার শ্রেণী বিভাগ, চাব, পাইট, তুলার ব্যাধি ও প্রতিকার, তুলা চেন, বীজ ছাড়ানো প্রভৃতি তুলা উৎপাদনের বহু জ্ঞাতব্য তথ্য এই পুস্তিকায় চিত্র সহ বিবৃত হইয়াছে। ইহা তুলা-চাষীদের বিশেষ কাজে লাগিবে।

ব্রহ্মসির উপদেশমালা ও সেবকের পুষ্পাঞ্জলি—

শ্রী অক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হুতরাগড়, শান্তিপুর, নদিয়া। বারো আনা।

হাওড়ার নিকটবর্তী বাটার গ্রামের শীতলাতলার শ্রী নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বা ব্রহ্মসি স্রষ্টা মানন্দের কতকগুলি উপদেশ ও তাঁর শিষ্য গ্রন্থকারের কতকগুলি তত্ত্বমূলক গান ও কবিতা এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে।

অথও আলোক—

সত্যশ্রয়ী লিখিত। প্রকাশক শ্রী হুশীল-চন্দ্র বহু, “সংসঙ্গ”, হিমাইতপুর, পাবনা। তিন আনা।

এই চটি বইএ ধর্ম্য কর্ম শিক্ষা আলোচনা চার বিভাগ নির্দিষ্ট হইয়াছে। অন্তর-বাহিরের সামঞ্জস্য করিয়া লোকহিত ধর্ম্য; পল্লীর উন্নতি কর্ম; সকল বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞানলাভের উপায় শিক্ষা; এবং আলোচনার কয়েকটি বিষয় প্রশ্ন ও উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।

নালন্দা—শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বহু এম-এ, বিশ্বভারতী, শান্তি-নিকেতন। প্রকাশক—কর মজুমদার কোম্পানী, কর্ণওয়ালিস বিল্ডিং, কলিকাতা। আট আনা।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে বহু তথ্য একটি গল্পাকারে বিবৃত হইয়াছে; আখ্যায়িকায় সেই প্রাচীন যুগের একটি ছবি সুন্দর ফুটিয়াছে। এই প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় গ্রন্থকারের লিখিত নালন্দা প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত হইয়া প্রবাসীর এই সংখ্যারই কটিপাথর বিভাগে প্রদত্ত হইয়াছে—কোতুলনী পাঠক তাহা হইতে জানিতে পারিবেন পুস্তকে কি আছে। আমরা আগ্রহের সহিত এক নিম্নসে বইখানি পড়িয়া ফেলিয়াছি। রচনার ভাণ্ড ও ভঙ্গী সুন্দর; পুস্তকখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে।

গয়াতীর্থ ও বরাবর পাহাড়—

৩ কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব। প্রকাশক—লগুন লাইব্রেরী, ১৩০ বোবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

গয়াতীর্থ ও গয়ার সম্বন্ধিত বৌদ্ধ পর্বতগুহার জন্ত প্রসিদ্ধ বরাবর পাহাড় দর্শনের বিশদ ও সরস বর্ণনা।

রূপরেখা—শ্রী গোবিন্দচন্দ্র নাগ। এম সি সরকার এণ্ড সন্স, হারিসন রোড, কলিকাতা। এক টাকা।

গল্পের বই। গোবিন্দ-বাবু গল্প রচনায় খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ফুলের গন্ধের মতন অতি সুস্বাদু মুহূ একটু ভাবকে তিনি ভাণ্ডায় রূপ দিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন—এই তাঁর গল্পের বিশেষত্ব। বিনি-মৃত্যুর ফুলের মালার মতন সেই কথাই রাখুন বড় পল্কা, বড় ভঙ্গুর—তাহা আনতো ভাবে দরদ দিয়া সম্ভোগ না করিলে তার সব বাহার সব সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। যারা স্থূল রকমের কোনো গল্প শ্রুজিবেন তাঁরা একটু হতাশ হইবেন। একে তাই গদ্য-কবিতা নাম দেওয়াই সঙ্গত মনে করি।

সুনীলা—শ্রী হৃদ্যাকান্ত রায় চৌধুরী। প্রান্তিস্থান—বিশ্বাসভবন

আনান্দসোল, ও ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কলিকাতা। বারো আনা।

গল্পের বই—তিনটি গল্প আছে।

কাঞ্চনতলার কাপ—শ্রী নলিনীকান্ত সরকার। চেম্বী প্রেস, কলিকাতা। এক আনা।

কাঞ্চনতলা মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার অন্তর্গত গ্রাম। সেখানে ফুটবল খেলা জিতিয়া কাপ পাওয়ার ঘটনা একজন গ্রাম্য লোক বর্ণনা করিতেছে—নিজের জেলার প্রভাবায়; সেই বর্ণনা লেখক ছড়ায় গাঁথিয়াছেন।

ফেঞ্চালের খেলে শিখু লয়া লয়া বোল,—

শালিসকে রাণারী কহে, আর চাঁদকে কহে গোল।

চাঁদিকুপার বাহন আকটা কাপ কহছে আকে,

খেলু জিৎলে তিন মাসের লেগ্যা বক্সিস দিবে তাকে,

কাঞ্চনতলা জিৎলে বাজী, বাহাল থাক্‌লো গোঁ,

তিনটা গোল খেয়া পোকোড় কর্‌লে দেলা বৌ।

সংরোটা দল হায়রান হোলো আরে বাপরে বাপ।

কাঞ্চনতলায় রোহা গ্যালো কাঞ্চনতলার কাপ।

এই রঙ্গ-রচনার তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে—ইহাতেই বুঝা যায় যে ইহা পাঠকসাধারণের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে।

পল্লীচিত্র—শ্রী দীনেন্দ্রকুমার রায়। প্রকাশক—রায় এণ্ড রায়চৌধুরী, ২৪ নং কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ২৫২ পৃষ্ঠা। উত্তম বাঁধানো। আড়াই টাকা।

দীনেন্দ্রকুমার-বাবু পল্লীর চিত্রাঙ্কন করিয়া যশস্বী হইয়া বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে নিজের জন্ত একটি শ্রেষ্ঠ আসন রচনা করিয়া লইয়াছেন। পল্লীচিত্র প্রথম যখন প্রকাশিত হয় তখন এক বৎসরে বইয়ের দুই সংস্করণ ছাপিতে হইয়াছিল; এখন এই তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পল্লীগ্রামের উৎসবের শব্দচিত্র নয়টি ও গ্রামাশ্রমের অর্থ-পরিশিষ্ট এই পুস্তকে আছে। পল্লীর উৎসবের এমন সুন্দর বর্ণনা এই পুস্তকে আছে যে সেইগুলি ছবির মতন সুস্পষ্ট ও মনোহারী। যারা এ বই পড়েন নাই—তাঁরা বঙ্গসাহিত্যের একটি সুন্দর রত্নের সঙ্গে অপরিচিত আছেন; যারা পড়িয়াছেন, তাঁরাও ইহা আবার পাঠে বিমল আনন্দ পাইবেন।

জী-নের ভ্রম শ্রী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ নিয়োগী-পাড়া রোড, বরাহনগর। ছয় আনা।

মাতৃস্নেহ শৈশব যৌবন প্রৌঢ় বার্দ্ধকে যত রকম ভ্রম ঘটিতে পারে তাহার প্রতীকার কি, তাহারই উপদেশমূলক সন্দর্ভপুস্তক। উপদেশ-গুলি মহাভারত প্রভৃতির আখ্যায়িকা দিয়া সমর্থন ও বিশদ করা হইয়াছে।

ধর্ম্যপুরী—শ্রী হরেন্দ্রচন্দ্র বহু (ভিখারী নীরানন্দ) রচিত ও প্রকাশিত, ৬ গোপাল বহু লেন, কলিকাতা। আট আনা।

ব্রহ্মানন্দাশ্রম ও অন্তর্পুরী-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিবার অনুষ্ঠান-পুস্তক। কি প্রণালীতে ও উপায়ে আশ্রম ও ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা হইবে তার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য সাধু।

তুলসী-প্রতিভা—শ্রী প্রসাদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন প্রণীত। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা।

ভক্ত কবি তুলসীদাস গোস্বামীর আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত নাটক—গৌরিশঙ্কর লিখিত।

প্রাবন—শ্রী প্রবোধচন্দ্র বাক্টি প্রণীত, গৌরীপুর আমাম। পাঁচ আনা।



ছাতার গায়ে রেডিও

কলকজা নির্মাণে অদ্বুত দক্ষতার পরিচয় দিতেছে। শিশুকালে সে কাগজ কাটিয়া একটি এয়ারোপ্লেন তৈয়ার করে। এয়ারোপ্লেনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সমস্ত কলকজা ঠিক জায়গা-মাস্কিক বনানো হইয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় শিশু হিন্দুমান কাগজের এয়ারোপ্লেন তৈয়ার করিবার পূর্বে এয়ারোপ্লেনের কল-কজা কখনো দেখে নাই। আর-একবার সে কাগজ কাটিয়া একটি ছব্ব মোটরকার তৈয়ার করিয়াছিল। আমেরিকার এখন প্রায় প্রত্যেক বালকই রেডিও সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু আলোচনা করিতেছে। তাহারা হয়ত ভবিষ্যতে রেডিও-জগতে কত আশ্চর্য আবিষ্কার করিবে।

হেমন্ত

তলোয়ারের ফলার উপর নাচ -

পশ্চিমী বাজিকরদের অনেক সময় দেখা যায়, তারা একেবারে খোলা তলোয়ার পর পর উপর দিকে ফলা রাখিয়া সাজাইয়া তার

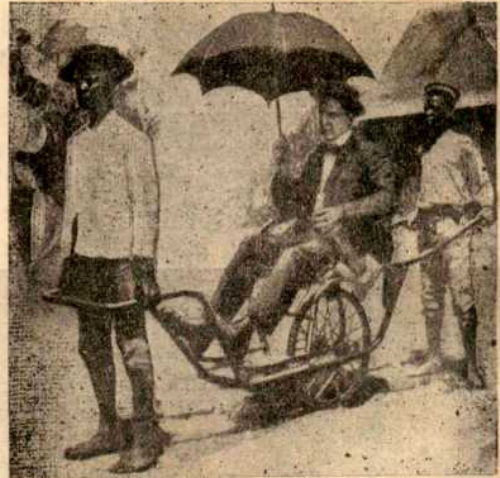


তলোয়ারের ফলার উপর নাচ

উপর বাজনার তালে তালে নাচিতে থাকে, অথচ তাদের পায়ে তলা মোটেই কাটে না। এমন ধারালো তলোয়ারে পা না কাটিবার কারণ কি? অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে খুব ধারালো তলোয়ার প্রভৃতির কলাও একেবারে মসৃণ নয়, একটু করকরে, অনেকটা করাতের মত। তার উপর পা বা হাত চাপিয়া রাখিলে তাহা কাটে না। কিন্তু হাত পা একটু এদিক ওদিক সরাইলেই কাটিবে। বাজিকররা ফলার উপর পা চাপিয়া রাখে, এবং মনে হয় তারা নাচিবার সময় পা নাড়িতেছে, কিন্তু পা যেখানে পড়ে সেখান হইতে মোটেই নাড়ে না; তাই পাও কাটে না।

একচাকার আরাম-গাড়ী—

পূর্ব-আফ্রিকার পূর্বগীজ-অধিকৃত স্থানে দনী লোকেরা এক রকম আরাম-গাড়ী ব্যবহার করেন, তার একটি মাত্র চাকা। গাড়ীটিকে চাকা-ওয়াল চেয়ার বলিলেও চলে। সামনে ও পিছনে দুইটি



একচাকার আরাম-গাড়ী

চাকরে গাড়ী লইয়া যায়। খারাপ রাস্তায় বা বন-পথে এই গাড়ী আবার চাকররা কাঁধে করিয়া পাকীর মত বহিয়া লইয়া যায়।

সাগরিক—

সাগরে জাহাজ চালাইবার কাজ আজ অবধি পুরুষেই করিয়া আসিতেছে। কিন্তু আমেরিকায় সম্প্রতি একটি নারী দক্ষতার জোরে জাহাজে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ পাইয়াছেন। ইহার নাম মিসেস কারলিয়া এন্স ওয়েষ্টকট, বাড়ী ওয়াশিংটনে সিয়াটলে। বর্তমানে তিনি প্রধান এঞ্জিনিয়ারের পদে আছেন। ইনি বলেন—বাষ্প-যন্ত্র-চালনার কাজ মেয়েদের পক্ষে কষ্টকর নয়, ইহাতে কেবল সতর্কতা ও মনোযোগের প্রয়োজন।

সামাজিক নাটক। জলধাবনে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত ; কৃপণ ধনীর স্বভাব পরিবর্তনে গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। নাট্যকার উদ্দেশ্য—“সুখিতের মুখে অন্ন দেব, ক্রোধের সেবক হব, অনাথকে আশ্রয় দেব, ওরে ওরে পিতৃহারা পিতা হব।” এই নাট্যকায় শ্রীচরিত্র নাই—বিদ্যালয়ের বালকদের পরোপকার শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে রচিত।

পুণ্ডরীক—শ্রী শ্রীশচন্দ্র বহু ব্যারিষ্টার। আর ক্যাষে এও কোম্পানী, ৯ হেষ্টিংস স্ট্রিট, কলিকাতা। সচিব।

নাটক। ভিক্টর হিউগোর নট্র দাম দ্য প্যারী গল্লের ছায়া অবলম্বনে ভারতীয় ঘটনার আকারে রচিত।

পরিত্যক্ত—শ্রী নারায়ণচন্দ্র ঘোষ। বঙ্গবাণী সমবায়, ৩৭ ওয়েলিংটন স্ট্রিট, কলিকাতা। এক টাকা।

নাটক। গ্রন্থকার ভূমিকায় নাটকের উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন—
“আমাদের অন্তঃপুরের সব দরজা-জানালাগুলি বন্ধ করে রেখেছি বলেই, চিরন্তন আজ পরিত্যক্ত, শুধু যা’ ক্ষণকালের, তাই দিয়েই ঘর ভরে রেখেছি। হৃদয়ের নিভৃতের সব তারগুলি টান করে বাঁধেই চিরন্তন তাদের ওপর তার অফুরন্ত অনাহত রাগিণী বিচিত্র করে বন্ধার দিয়ে দিবে। পথের ধলাকে যেদিন চিন্তে পারব, সেই দিনই ধলা আমাদের চোখে সোনা হয়ে উঠবে।”

মুদ্রারক্ষক

হিন্দী

১। বিশ্বনাথ কবিরাজ কৃত সাহিত্য-দর্পণ—

১ম ও ২য় খণ্ড—সাহিত্যচার্য্য শ্রী শালগ্রাম শাস্ত্রী কর্তৃক বিমলাখা হিন্দীব্যাক্যাবিবৃত্তি। প্রকাশক—শ্রী শ্যামসুন্দর শাস্ত্রী ভিষ্ণুপুর, শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ঔষধালয়, ৩২৬ আমিনাবাদ, লক্ণৌ। পৃঃ ৩১২ + ২৩২ + পূর্বপটিকা ১৬ পৃষ্ঠা। মূল্য—৩ + ২। ১৯৭৮ সংবৎ।

কবিরাজ বিশ্বনাথের এই সাহিত্য-দর্পণ গ্রন্থ সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের একটি অলঙ্কার। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি নিজেকে ‘সাক্ষিবিগ্রহিক’ ও ‘মহাপাত্র’ বলিয়াছেন। তাঁহার নিজের প্রতি নিজের যে প্রশংসা

(‘আলংকারিকচক্রবর্তী’) তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে পঠিত ও আলোচিত হইতেছে। সংস্কৃত টোলে ও ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার আদর সমান ভাবেই হইয়াছে। কাশীর ‘আচার্য্য’, বাংলার ‘তীর্থ’, পঞ্জাবের ‘বিশারদ’ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ‘এম-এ’ পরীক্ষায় এই গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তক রূপে নির্ধারিত।

পণ্ডিত শালগ্রাম শাস্ত্রী এই উপযোগী গ্রন্থের একটি ভাল সংস্করণ বাহির করিয়া সংস্কৃতবিদ্যার্থীদের উপকার করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর রামচরণ তর্কবাগীশের টীকা এবং তাঁহার নিজের কৃত ‘বিমলা’ টীকা এই গ্রন্থের নোঙর বাড়াইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থের প্রচলিত সংস্করণগুলির দোষ অনেক স্থলে দেখাইয়াছেন। বাংলা দেশে ইহার আদর হইলে সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দীও শিক্ষা করা হইবে। এই গ্রন্থের আরম্ভে যে বিবৃতি “বিষয়ানুক্রমণী” এবং শেষে যে “উদাহত-শ্লোকানুক্রমণিকা” দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই সংস্করণের একটি বিশেষত্ব। শাস্ত্রী-মহাশয়ের এই উদ্যম সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। এই গ্রন্থের ছাপাও বেশ ভাল হইয়াছে।

২। **সরল হিন্দী শিক্ষা**—শ্রী গোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী। প্রাপ্তিস্থান—শ্রী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বি-এ, ৩৪নং গোবিন্দ ঘোষালের লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য ১।০। ১৯২১।

৩। **হিন্দী শব্দ ও অনুবাদ-মালা** শ্রী গোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী ও শ্রী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এ প্রণীত। ‘হিন্দীপ্রচার কার্যালয়’। ১৩২৯। পৃঃ ১২০। মূল্য ১।০ আনা।

পণ্ডিত গোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী নিজে বাঙ্গালী এবং বাঙ্গালীর হিন্দী শিক্ষার জন্য এই ছুইখানি বই বাঙ্গলাভাষায় লিখিয়াছেন। তিনি নিজে হিন্দীতে বিশেষ ব্যাংগর এবং হিন্দী পত্রিকার সম্পাদকতাও করিয়াছেন। বাঙ্গালীর হিন্দী শিক্ষায় যে-সকল বিষয়ে অসুবিধা হয়—যথা বানান, উচ্চারণ, লিঙ্গ, ক্রিয়া—তাহা তিনি নিপুণভাবে সরল-ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই ছুইখানি বই দ্বারা প্রথম-হিন্দী-শিক্ষার্থীর বিশেষ উপকার হইবে।

শ্রী রমেশচন্দ্র বসু

বাদল দিনে

মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে সমস্ত আকাশ
—ঝন্ ঝন্ করে জল। নাহি অবকাশ
অশ্রান্ত বর্ণনে তার। বেগুনে আজি
উঠিয়াছে মাতামাতি,—বাঁশী ওঠে বাজি
কোথা কোন্ পথ দিয়ে বেদনা-সঞ্চারে ?
জমে উঠে কোন ব্যথা ঘন অন্ধকারে ?
উড়ে চলে পিউ কাঁহা ঝাপটিয়া ডানা
আয়কুঞ্জ হতে ; কেউ জানে না ঠিকানা

আকাশের কোন্ তীরে হয়ে যাবে পার !
গুরু গুরু ডাকে দেয়া—কোন্ বেদনার
দিতে অশ্রুট প্রকাশ ? ছিন্ন ভিন্ন মেঘে
যে বাণী জেগেছে আজ তারি স্পর্শ লেগে
মন মোর হয়েছে উদাস। কে বোধিবে তারে ?
নিরুদ্দেশ হবে সে যে আধারের পারে !

শ্রী প্রবোধচন্দ্র বসু

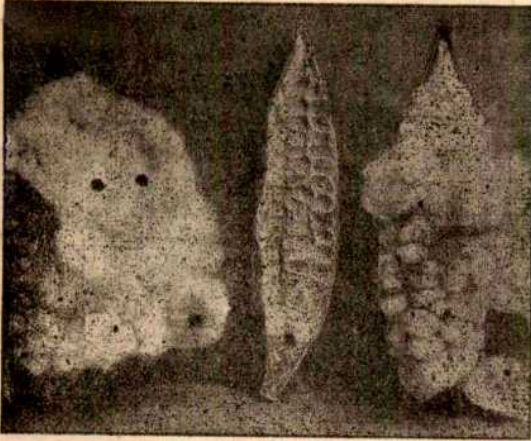
সোনা পান। জঙ্গলে মশার আক্রমণ ভয়ানক। দূর হইতে মশার পালকে কালো মেঘের মত মনে হয়, তাহাদের গুঞ্জন-ধ্বনি কর্ণে অমৃত বর্ষণ না করিয়া অস্তুরে অস্ত-কিছুর সঞ্চার করে! লা-ভারের সঙ্গে চারজন সঙ্গী ছিল, তাহাদের তিনজন জঙ্গলী-জরে মারা গিয়াছে। চতুর্থ-জন হাসপাতালে মরিবার অপেক্ষায় আছে। লা-ভারের মতে ঐ-সব নিবিড় জঙ্গলে কোন লোক একটানা ৫ মাসের বেশী থাকিতে পারে না। লা-ভারের তিনবার জ্বর হয়—এবং একবার তিনি মরমরও হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল যে “মরি আর বাঁচি—হীয়ার সন্ধান করে” তবে লোকালয়ে ফিরবো।—” তাঁহার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট সার্থক হইয়াছে। লা-ভারের কার্যে ঐ স্থানের আদিম অধিবাসীরা অনেক সাহায্য করিয়াছে।



আকন্দের তুলার জামা

আকন্দের তুলা—

আকন্দের তুলাকে ইংরেজিতে ক্যাপক বা সিক্ কটন বলে। এই তুলা ভারতবর্ষে, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ, স্টেট সেটেলমেন্টে, ইউকেডারে, ব্রাজিলে এবং ফিজিতে পাওয়া যায়। এই তুলার আঁশ খুব মৃদু এবং লম্বা। আঁশের মধ্যে হাওয়া ভর্তি থাকে। জামা ধীপেই এখন সর্বাপেক্ষা বেশী অর্ক বা আকন্দ তুলা উৎপন্ন হয়। অত্যন্ত দেশ হইতে যে পরিমাণ পাওয়া যায়, তাহা খুবই সামান্য এবং খারাপ ধরণের। ভারতবর্ষের আকন্দ তুলা ভারী এবং মোটা। তাহা ছাড়া ইহাতে বড় বেশী বাঁচি থাকে। ভারতবর্ষের আকন্দ তুলা জামার অর্ক তুলার মত শক্ত এবং চকচকে হয় না। ব্রাজিল এবং ইউকেডারে আকন্দ তুলার উন্নতি করিবার খুবই চেষ্টা চলিতেছে।



আকন্দের ফল ও তুলা

বাজারে ইহার আদরও ক্রমে বাড়িতেছে। জামাতে পথে বাটে আকন্দ গাছ দেখা যায়। জামার লোকেরাই বেশীর ভাগ এই তুলার চাষ করে, যেতাপ্রণ্ড দু-একজন আছে। একই জমিতে কফি এবং কোকো গাছের সঙ্গে অর্কের চাষ করা হয়। জামার লোকেরা লাঠির সাহায্যে আকন্দ ফল পাড়ে। মেয়েরা এবং ছোট ছোট ছেলেরা ফল ভাঙ্গিয়া তুলা বাহির করে। তুলা বায়বন্দী করিবার সময় খুব সাবধানে করিতে হয়। বেশী চাপ পড়িলে তুলা নষ্ট হইবার আশঙ্কা।

উৎকৃষ্ট আকন্দ তুলা মার্কিনে চালান হয়, ইউরোপে যায় মাঝারি গোছের এবং সবচেয়ে খারাপ আকন্দ তুলা যায় অষ্ট্রেলিয়াতে।

১৯২০ সালে অর্ক তুলার চালান (জামা হইতে) :—

মার্কিনে—৫৫৪৫ টন

অষ্ট্রেলিয়াতে—৩৪১৫ টন

ইংলণ্ড এবং ইউরোপে—২৫২৮ টন।

রেডিওর খেলা—

প্যারিস হইতে একজন খবর দিয়াছেন—মেয়েদের রং-বেরঙের ছাতায় বেতার-বার্তা গ্রহণের সব কলকজা লাগান হইয়াছে। এখন হইতে মেয়েরা আর ভীড়ের মধ্যে প্রকাণ্ড হলে বসিয়া গান-বাজনা শুনিবেন না—তাঁহারা উদ্যানে ছাতা খুলিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সঙ্গীত এবং বাদ্য উপভোগ করিবেন। এমন কি বাগানে বসিয়া বসিয়া বাড়ীতে রান্নার কতদূর হইল, মাংসের ঝোলে যেন লম্বা বেশী না হয়—এই-সব কথাও আদান-প্রদান চলিবে।

ছাতার সাহায্যে বেতার সংবাদ গ্রহণ এবং প্রদান প্রথমে একজন মার্কিন বালক আবিষ্কার করে। সম্প্রতি নিউ জার্সি সহরের এ্যালক্লেড জি রাইনহাট নামক এক বালক আঙ্গুলের একটি আংটির উপর বেতার-সংবাদ-গ্রহণী কল স্থাপন করিয়াছে। সে ছাতা ব্যবহার করে—সংবাদ ধরিবার জন্ত। কেনেথ আর হিন্‌মান নামে আর-একজন জার্সির বালক একটি ছোট দেশলায়ের বায়ুর মত বায়ু বেতার-সংবাদ-গ্রহণী-প্রদানী সব কলকজা স্থাপন করিয়াছে। এই ছোট বায়ুর তুলনায় ছাতার বেতার-কলকে একটা প্রকাণ্ড বাজে জিনিষ বলিয়া মনে হয়। ইহাতে আশেপাশের (৩২ মাইল স্থান ব্যাপিয়া) চারিদিকের বেতার আড্ডা হইতে বাহা-কিছু শব্দ পাঠান হয়, সবই ধরা যায়। গান বাজনা বজুতা ইত্যাদি সবই বেশ স্পষ্টই শুনিতে পাওয়া যায়। এই বালক তার শিশুকাল হইতেই



খন্দর—খাদি—ক্ষুদ্র

গত আধাশতাব্দীর “প্রবাসী”তে শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় লিখিত “চরকা ও খন্দর” প্রবন্ধে দেখিলাম, পা চাকিয়া কাপড় পুরা মেমদের অমুকরণ ; ইহা ঠিক নয়। মুসলমান শাস্ত্র অনুসারে পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত না চাকিলে ত্রীলোকের উপাসনা শুদ্ধ হয় না ও পাপ হয়। সর্ব্বদা পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত চাকিয়া রাখাই মুসলমান মহিলাব অবশ্য কর্তব্য। তবে কি বিলাতি কাপড় পয়সা উপাসনা করিতে হইবে ?

বিজিয়া বেগম

‘দাসবিক্রয়ের প্রাচীন দলীল’ প্রবন্ধ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

জ্যেষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে “দাসবিক্রয়ের প্রাচীন দলীল” নামীয়, একখানা দলীল সহযোগে, একটি প্রবন্ধ বাহিব হইয়াছে। কিন্তু ঐ দলীলের লিখিত ব্যক্তিগণ ও সাক্ষী সম্বন্ধে যে ভুল বিবরণ রহিয়াছে, উহা নির্দেশ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

লেখক বলেন, বিক্রমপুর সিমুলিয়াবাসী নবসিংহ দত্ত ক্রেতা এবং শ্রীবামপুরনিবাসী বামধন দত্ত বিক্রেতা,—বিষয় দাসবিক্রয়। বিক্রমপুরের মধ্যে কোন শ্রীবামপুর গ্রাম না পাইয়া লেখক গঙ্গাতীরের শ্রীমাগপুর অবস্থান করিয়া বাহিব করিলেন, এবং ক্রেতা নবসিংহ দত্তকেও একেবারে শ্রীবামপুরের লোক বলিয়া ঘোষণা করতঃ রাঢ়ী কায়স্থে সন্নিবেশ করিতে বিলম্ব করিলেন না। লেখক বাড়ীর চতুঃসীমা একবারও নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবার অবসর পাইলেন না, যে, বিক্রমপুরের মধ্যে না থাকুক উহার নিকটে কোন স্থানের নাম শ্রীবামপুর আছে কি না।

ইংরেজ লেখক বা বাঙ্গালী লেখকগণ বহু অমুসন্ধানে বাঙ্গালার দেশসমূহের যে যে ইতিহাস বা ভূগোল প্রকাশিত করিয়াছেন, লেখক যদি তাহা অমুসন্ধান লইতেন, তবে উহার আব এই ক্রটি ঘটতে পারিত না। তখন তিনি অবশ্যই অবগত হইতেন, শ্রীবামপুর বলিয়া একটি স্থান বিক্রমপুরের দক্ষিণ দিকে, ইদিলপুর পর্ব্বগণার সহিত সংযুক্ত হইয়া বহিয়াছে,—বাহার পরিচয় আইন-ই-আকবরীর লিখিত বাক্যের সত্যকারে স্পষ্ট দেখা যায়। অতঃপর, নিম্নারিষ্ট-কৃত বাধবপ্লবের ইতিহাস পাঠ করিলেও উহাকে এজন্ত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের ধারস্থ হইয়া প্রকৃতদের দোহাই দিতে হইত না।

বিক্রমপুরের সংলগ্ন দক্ষিণদিকে ইদিলপুর ; এই ইদিলপুর নয়া-ডাঙ্গালী নদী কর্তৃক দুইভাগে বিভক্ত হইয়া ফরিদপুর ও বাধরগঞ্জ জেলায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। উহা ঠিক মধ্যস্থানে শ্রীবামপুর বলিয়া একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বগণা দৃষ্ট হয়। বিশেষ কোন প্রসিদ্ধ গ্রাম উহা মধ্যে না থাকায় তত্রত্য অধিবাসিগণ পরিচয়স্থলে শ্রীবাম-নিবাসী বলিয়াই উল্লেখ করিয়া থাকে। উহা ঠিক মেঘনার উপর সন্নিবেশিত এজন্ত, বহু জমি জলসাৎ হইয়া গিয়াছে, অল্পমাত্র বর্তমান আছে।

এই শ্রীবামপুরের সংলগ্নই মহেশ্বরদি বলিয়া একটি তপ্পা ছিল, তত্রত্য অধিবাসীরাও সাং মহেশ্বরদি বলিয়া পবিত্র্য দিত। তৎপব গুণানন্দী, উহা দক্ষিণ বিক্রমপুরের কতকস্থান ও চাঁদপুরের অন্তর্গত, আজিও বিদ্যমান আছে। যদি গুণানন্দী না হইয়া রামানন্দী হয়, তবে, উহাও সাহাবাজপুর পর্ব্বগণার একটি গ্রামের নাম। মূলকথা এই স্থানগুলি একই কেন্দ্রস্থলে অতি নিকট নিকট সন্নিবেশিত। বিক্রেতার বাড়ী শ্রীবামপুর, সাক্ষী কালীচরণের বাড়ী মহেশ্বরদী, অপর সাক্ষী শ্রীবাম, বাড়ী গুণানন্দী। এইরূপ অবস্থায় আমরা কি বলিব যে হুগলী শ্রীবামপুরের কবেলাতে, এই গুণানন্দী ও মহেশ্বরদী হইতে সাক্ষী সংগ্রহ করিয়া লওয়া হইয়াছিল ? হুগলী শ্রীবামপুরের হইলে তথাকার বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের সাক্ষী থাকাই সম্ভবপর হইত। একজন মাত্র সাক্ষীর নিবাস দেখা যায় শ্রীবামপুর, উহা আমাদের নির্দেশিত ভারতপুর হওয়াই সম্ভবপর, কারণ উহার নিকটবর্ত্তী মহেশ্বরদী ও গুণানন্দীর নাম অস্ত্র ছই সাক্ষীর সহিত জড়িত বহিয়াছে। হুগলী শ্রীবামপুরের মধ্যে কি নিকটে ঐ ছই নামীয় কোন স্থানের পরিচয় আছে কি ? অতএব এই কবেলাখানা যে বরিশাল শ্রীবামপুরেই সম্পাদিত হইয়াছিল উহাতে কোন সন্দেহ নাই। শুধুশীলা মেঘনার তটবর্ত্তী এই শ্রীবামপুরেই বোধহয় ক্রেতার বাড়ী ছিল, বাড়ী বিক্রয় হইলে তাহার বিক্রমপুর চলিয়া যায়।

হুগলী দাদবাবসাহেব এক প্রধান কেন্দ্র হইলেও পূর্বে ও উত্তর-বঙ্গের ভায় রাঢ়ীয় সমাজে যে দাস খরিদের বিশেষ প্রচলন ছিল, উহা আমবা অবগত নই। থাকিলেও বিবল প্রচাষ ছিল।

শ্রী আনন্দনাথ বায়

জ্যেষ্ঠের প্রবাসী ১৮৭ পৃষ্ঠায় যে দলীলখানি ছাপা হইয়াছে, তাহাও পার্সী ও বাঙ্গলা অংশে অল্প প্রভেদ আছে। অর্থাৎ

১। মোহরের কাছে “মোহর নং ৯” না হইয়া “মেহর মাসে সন ৯” হইবে। মোগল কালে সৌর ও চান্দ্র দুই প্রকার মাসই প্রচলিত ছিল। হাম্মদাবাদ বাজ্যে এখন মেহর মাস ৭ই আগষ্ট আবস্ত হয়। দলীলখানি ১৬ই শ্রাবণ অর্থাৎ ১লা আগষ্টের লেখা। তখন বোধ হয় ১লা আগষ্টের পূর্বেই মেহর মাস আরম্ভ হইত, কেননা ঐ সৌর গণনাতে পূর্বা ৩৬৫ দিন ধরা হইত।

২। বিক্রেতা ও তাঁহার পিতা ও পিতামহর নাম পার্সীতে দত্ত-স্থানে “দেও” লেখা হইয়াছে। সম্ভব লেখকের ভুল।

৩। পার্সী অংশে আছে যে নববের জী ও সন্তানাদি হইলে তাহাদেরও লওয়া জমা (নিদ্ধাবিত নিয়ম) মত ধোরাক ও পোদাক দিতে হইবে ও তাহাদের কাছে নকবি কর্ত্ত লইতে পারিবে।

৪। নকবকে বিক্রয় করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ক্রেতার বহিল। কিন্তু তাহার জী ও সন্তানদের বিক্রয় করিবার ক্ষমতা আছে কি না স্পষ্ট লেখা নাই।

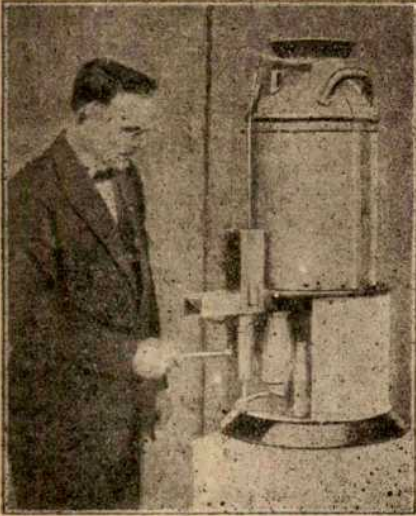
৫। ১২ টাকাতো বিক্রয়। প্রত্যেক টাকা ১০ আনা ওজন অর্থাৎ ১২০ মাশা ষাঁটি রূপা নব্বরের মূল্য। এখনকার ইংরেজি টাকা ১১২ মাশা অর্থাৎ ১০২০ ভবি রূপা।



কট্টোপান্দ

ছুধের কল -

রাস্তার মোড়ে মোড়ে ছুধের কল দাঁড়াইয়া আছে। কলের মুখের কাছে ফ্রেতা একটি খালি বোতল রাখিয়া, একটি মুদ্রা রাখিয়া কল টিপিলেই উপযুক্ত পরিমাণ ঠাণ্ডা ছুধ বোতলে আসিয়া পড়িবে। ছুধের পাত্রের চারিদিকে বরফ থাকিতে ছুধ ঠাণ্ডা থাকে এবং নষ্ট হয় না।



ছুধের কল

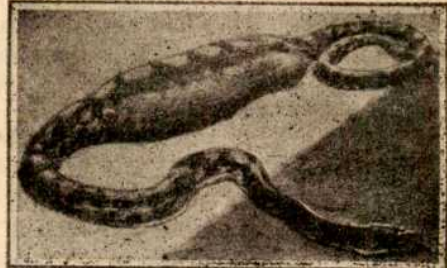
বোতল সরাইবা মাত্র উপরের ট্যাক্ হইতে জল পড়িয়া নল সাক হইয়া যায়। আমাদের দেশেও এই রকম করিয়া খাঁটি ছুধের ব্যবসা চালান যাইতে পারে।

জাপানী সৈন্যের দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধি—

ভারতের সঙ্গে মান্দের বন্দোবস্ত হইবার পর হইতেই গড়পড়তা প্রত্যেক জাপানী সৈন্য ২ ইঞ্চি করিয়া লম্বা হইয়াছে।

সাপের শূকর গেলা—

ফ্রেন্স-কন্সো রাজ্যে একটা বোড়া সাপ একটা শূকর আঁতু গিলিয়া ফেলে। গিলিবার পূর্বে সে শূকরটাকে জড়াইয়া ধরে এবং জোর দিয়া তাহার হাড় গুঁড়া করিয়া দেয়। তারপর গিলিবার সময় তাহার



শূকর-গেলা সাপ

বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। কিন্তু গেলা শেষ হইবার পর শূকর পেটে গিয়া সাপটাকে নিশ্চল করিয়া ফেলে। অবশেষে সাপটা পেট ফাটিয়া মরিয়া যায়।

আমেরিকার সব-চেয়ে বড় হীরা—

উইলিয়াম জে লা-ভারে নামক এক ২৪ বছরের যুবক আমেরিকার সব-চেয়ে বড় হীরা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই মহামূল্য রত্নটি পাওয়া গিয়াছে ব্রিটিশ গায়ানাতে এক জঙ্গলের মধ্যে। হীরাটি এক ইঞ্চি লম্বা এবং ১ ইঞ্চি মোটা, চওড়াতে ইহা এক ইঞ্চি। ইহার ওজন ৩১ ক্যারাট।

লা-ভারে যখন এই মহামূল্য হীরাটি লইয়া নিউইয়র্কে আসিলেন, তখন তাহার পেছনে একদল লোক লাগে, হীরাটিকে বেহাত করিবার মতলবে। পুলিশ ব্যাপার বৃদ্ধিতে পারিয়া হীরাটিকে এক ব্যাঙ্কের সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিলে।

যে জঙ্গলে এই হীরা পাওয়া গিয়াছে, সেখানের আবহাওয়ার কথা বলিয়া কাজ নাই। মালেরিয়া-পীড়িত বাংলা দেশেও এমন কোন স্থান নাই যে তাহার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। সেখানে রক্তের সন্ধানে অনেকেই গিয়াছেন, কিন্তু সেই অনেকেই ফিরিবেন কি না বলা যায় না। লা-ভারে প্রথম ফিরিয়া আসিয়াছেন।

১৮ বছর বয়সে লা-ভারে প্রথম ঐ স্থানের ম্যাজারুনি নদীতে স্নান তুলিতে যান। প্রথম তিন মাসে তিনি প্রায় ৬০,০০০ টাকার

৬। পানী অংশেব শেষে কেবল শওষাল মাস আছে। তাবিখ পড়া যায় না। ১৬ শ্রাবণ ১১৯৪, ২৯ শওষাল ১২০২ হিজরী ছিল।

শ্রী অমৃতলাল শীল

সূর্যের মত পৃথিবী কিরণ দেয় না কেন ?

গত আশাচ মাসের 'প্রবাসী'র ৪১৫ পৃষ্ঠায় 'সূর্যের মত পৃথিবী কিরণ দেয় না কেন' এই প্রশ্নের যে সীমাংসা বাহিব হইয়াছে, তাহা লগাতরক বলিয়াই আমার মনে হইতেছে। লেখকের ধারণা এই যে বিকিরণের দ্বারা সূর্যেব তাপ (quantity of heat) ক্রমশঃ ক্ষয় হইতেছে এবং তাহাব উত্তপ্ততা (temperature) ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে, কেবল সূর্য অনেক বড় বলিয়াই উত্তপ্ততা এখনও এত কমিয়া যায় নাই, যে, তাহাব আলোকদানের ক্ষমতা লোপ পাইয়া যাইতে পারে। এই ধারণা হইতেই ছোট বড় কাচের বল ও ছোট এবং জোয়ান মানুষের উদাহরণের সাহায্য তিনি লইয়াছেন।

লেখক ভুলিয়া গিয়াছেন যে সূর্য এখনও কঠিন বা তরল অবস্থায় আসিয়া উপনীত হয় নাই, এখনও তাহা বেশীভাগই বায়বীয় অবস্থায়। উত্তাপ সম্বন্ধে বায়বীয় পদার্থের একটি বিশেষ ধর্ম আছে, যাহা কঠিন বা তরল পদার্থের নাই; এবং সূর্যেব উত্তপ্ততা হ্রাস না হইবার কাণ্ড সেই বিশেষ ধর্ম,—তিনি যে কাণ্ড নির্দেশ করিয়াছেন তাহা নয়।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ওয়াশিংটনের বৈজ্ঞানিক লেন সাহেব প্রদর্শন করেন যে যদি কোনও সম্পূর্ণ বায়বীয় পদার্থ বিকিরণের দ্বারা তাপ হারাইতে থাকে এবং আপনাব মাধ্যাকর্ষণের টানে সঙ্কুচিত হইতে থাকে, তবে বিভিন্ন অণুব পবস্পেব মধ্যে দুবদ্বের হ্রাস হেতু যে শক্তি (energy) তাপ আকাষে দেখা দিবে, বিকিরণে তাপক্ষয় হইলেও, তাহাতে ঐ পদার্থেব উত্তপ্ততা (temperature) পূর্বোপেক্ষা বাড়িয়াই যাইবে। তরল বা কঠিন পদার্থেব বেলা এই নিয়ম খাটে না। স্তম্ভতঃ সম্বন্ধে নীহাবিকা-বাদ স্বীকার কবিয়া লইলে, আমাদিগকে বলিতে হয় যে আদিতে সূর্য সম্পূর্ণ বায়বীয় আকাষে সমগ্র সৌর-জগৎ ব্যাপিয়া বর্তমান ছিল, এবং তখন হইতেই আপনাব আকর্ষণের বশে তাহাব আকাষেব সঙ্কোচন ঘটতেছে ও বিকিরণের দ্বারা তাপক্ষয় হইতেছে। হুতরাং অন্ততঃ কিছুকাল লেনেব নিয়ম অনুসারে সূর্যেব উত্তপ্ততা বাড়িতেছিল। কিন্তু পৃথিবীতে জ্যোতিষচর্চা আবস্ত হইবার হয়ত বহু পূর্বেই উপরোক্ত সঙ্কোচন হেতু এতটুকু অন্ততঃ বায়ু অংশ জরীভূত হইয়া গিয়াছে যে এখন বায়বীয় অংশের দক্ষ উত্তপ্ততা বৃদ্ধি ও জলীয় অংশের দক্ষ উত্তপ্ততা হ্রাস, উভয়ে মিলিয়া সূর্যেব উত্তপ্ততা আজ পর্যন্ত আর না বাড়িতেছে না কমিতেছে। হয়ত লক্ষ লক্ষ বৎসর পবে সূর্যেব মধ্যে জলীয় অংশের অনুপাতই বাড়িয়া যাইবে এবং (সঙ্কোচন হেতু) সূর্য প্রথমে জরীভূত এবং পবে তাপ-বিকিরণ হেতু তাপক্ষয় এবং তজ্জনিত উত্তপ্ততা হ্রাসে ঘনীভূত হইয়া যাইবে। জলীয় অংশের আধিক্যের সময় হইতেই সূর্যেব উত্তপ্ততা-হ্রাস আরম্ভ হইবে এবং সম্পূর্ণরূপে জরীভূত হইয়া যাওয়ার পর হইতে কাচের বলেব যে ধর্ম লেখক উল্লেখ কবিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিবে। হুতবাং বহু বহু যুগ পরে সূর্যেব উত্তপ্ততা এত হ্রাস পাইবে যে, তাহাব আর আলোকদানের ক্ষমতা থাকিবে না। বর্তমান সময়ে কাচের বলেব ধর্ম সূর্যে আরোপ করা ভুল।

পূর্বোক্ত সঙ্কোচনের জন্ত যখন সূর্যেব আকাষ-হ্রাস হইতেছিল,

তখন আকার-হ্রাসের জন্ত তাহাব ঘূর্ণনবেগ বাড়িয়া যাইতেছিল এবং কেন্দ্রাপসারক বলও ক্রমশঃ বাড়িতেছিল। হুতরাং মাঝে মাঝে equator-এ অবস্থিত পদার্থের উপর মাধ্যাকর্ষণেব বল অপেক্ষা কেন্দ্রাপসারক বল অধিক হওয়াতে, তাহা সূর্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অঙ্গুরীয়াকাষে ঘূর্ণিতে থাকে। এই অঙ্গুরীয়গুলি মাধ্যাকর্ষণ ও অভ্রাস্ত্র বলেব বশে সঙ্কোচন হেতু জরীভূত এবং পরে তাপ-বিকিরণ ও তজ্জনিত উত্তপ্ততা হ্রাস হেতু ঘনীভূত হইয়া বর্তমান গ্রহগুলির সৃষ্টি করিয়াছে। জরীভূত হইয়া যাওয়ার পর হইতে উত্তপ্ততা হ্রাসের আর কোনও বাধা থাকে না। এবং উচ্ছলতাব গভী পাব হইতে দেবী হয় না।

কিন্তু সূর্যেব বহুপূর্বেই এই অঙ্গুরীয়গুলি কিরূপে জরীভূত হইয়া গিয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসা করা যায়। ইহাব উত্তর এই যে এক-একটি অঙ্গুরীয়কে বর্তমান বাষ্পাংশি পবিমাণ (mass) সূর্যেব বাষ্পাংশি পবিমাণেব তুলনায় এত সামান্য ছিল, এবং নানাকারণে তাহাদের সঙ্কোচন এত দ্রুত ঘটিতেছিল যে শীঘ্রই বাষ্পীয় অংশের অনুপাত অপেক্ষা জলীয় অংশের অনুপাত বেশী হইয়া উঠে। সূর্যেব বর্তমানাকৃতি এবং ইহাদের অঙ্গুরীয়াকৃতি এর একটি কাণ্ড।

কোনও কোনও পণ্ডিতের এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় একটি মত আছে। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে বেডিয়ামেব শক্তি-বন্ধার সমতা একরকম অপরিমিত। একটুকু বেডিয়াম বহু বহু কাল আলো ও তাপ বিকিরণ করিয়া ও অনুচ্ছল হইয়া যায় না, তাহার শক্তি (energy) কোনও ইতববিশেষ লপিত হয় না। সূর্যে নাকি এই বেডিয়ামেব খুব বেশী প্রাচুর্য্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, গ্রহগুলিতে তাহার তুলনায় বেডিয়াম নাই বলিলেও চলে। হুতবাং গ্রহগুলিবে আলো ও তাপেব ভাণ্ডার শীঘ্রই ফুটাইয়া গিয়াছে; সূর্যেব ভাণ্ডার বেডিয়ামেব কল্যাণে অক্ষয় হইয়া বিরাম কবিতোছে এবং করিতে থাকিবে।

দ্বিতীয়তঃ লেখক কঠিন পদার্থেব তাপ ও তাপক্ষয়েব নিয়মটি এত-সংক্ষেপে এবং এত অসাবধানে উল্লেখ কবিয়াছেন যে তাহাতে বালকদের তরুণ মনে একাধিক ভ্রান্ত ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা আছে।

তিনি লিখিয়াছেন 'যে জিনিষ যত ছোট, তাব উত্তাপ তত কম এবং তাব উত্তাপ বড় জিনিষেব উত্তাপেব চেয়ে শীঘ্র চলিয়া যায়।' যে জিনিষ যত ছোট, তাব উত্তাপ তত কম না হইতেও পারে, কথটা সত্য তহিবে কেবল তখন যখন জিনিষগুলি হইবে একই উপাদানে নির্মিত এবং সমান উত্তপ্ত। 'ছোট জিনিষেব উত্তাপ বড় জিনিষেব উত্তাপেব চেয়ে শীঘ্র চলিয়া যায়,' ইহাও সত্য নয়, সত্য এই যে 'ছোট জিনিষেব উত্তপ্ততা বড় জিনিষেব উত্তপ্ততা অপেক্ষা শীঘ্র কমিয়া যায়।' প্রকৃতপক্ষে সম-উপাদানে নির্মিত, সমান উত্তপ্ত দুইটি জিনিষের ভেটিটি হইতে কোনও সময়ের মধ্যে যতটুকু তাপ বিকিরণ-দ্বারা বাহিব হইয়া যায়, বড়টি হইতে তদপেক্ষা অনেক বেশী তাপ বাহিব হয়; কাণ্ড বড়টির বহির্দেশ (area of the surface) ছোটটির বহির্দেশ অপেক্ষা বৃহত্তর। তথাপি বড়টির উত্তপ্ততা কমে যেতে, কাণ্ড এক দিকেও তাপবিকিরণের দ্বারা ছোটটির উত্তপ্ততা যত ডিগ্রী কমিয়াছে, বড়টিরও তত ডিগ্রী কমাইতে হইলে, যতটুকু তাপ বড়টি হইতে এই সময়ে বাহিব হইয়া গিয়াছে, তদপেক্ষা অনেক বেশী তাপ বাহিব হইয়া যাওয়ার প্রয়োজন ছিল।

শ্রী ক্ষীরোদবিহাবী গুপ্ত



বীবর-ছেদিত-প্রকাণ্ড বৃক্ষ—

বীবররা গাছের ডাল ইত্যাদি দিয়া বাসা তৈয়ারী করিয়া বাস করে। তাহারা একসঙ্গে অনেকে মিলিয়া বস্তু তৈয়ার করে। গাছের ডাল দাঁত দিয়া কুরিয়া কুরিয়া কাটিয়া ফেলে, তাহার পর সেইগুলিকে তাহাদের বস্তুর দিকে টানিয়া লইয়া যায়। সাধারণত তাহারা ছোট ছোট গাছই কাটে। কিন্তু মেক্সিকোতে সম্প্রতি একটা প্রকাণ্ড আম্রপেন গাছ বীবরদের দাঁত দিয়া কাটিয়া মাটিতে ফেলিয়াছে। গাছটাকে যেখানে ছেদন করা হইয়াছে, সেখানের পরিমাণ ৩০' ২৬"। এত বড় গাছ তাহারা প্রায়ই কাটে না, কারণ প্রকাণ্ড গাছের কাণ্ড তাহারা টানিয়া



বীবর-ছেদিত বৃক্ষ

লইয়া যাইতে পারে না। এই গাছটাকে মাটিতে ফেলিবার একমাত্র উদ্দেশ্য তাহার উপরের ডাল-গুলিকে সংগ্রহ করা। গাছটা পুকুরের দিকেই পড়িয়াছে, তাহাতে বীবরদের ডালপালাগুলিকে বেশীদূর বহন করিবার কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না।

পকেট বিশ্বকোষ—

মার্কিন দেশের 'রিয়ার অ্যাডমিরাল' ব্র্যাডলি এম ফিল্ডে সম্প্রতি একপ্রকার নূতন বই ছাপিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পদ্ধতিতে মুদ্রিত হইলে যে কোন বাক্তি পকেটে করিয়া ২০ খণ্ড এনসাইক্লোপিডিয়া লইয়া পথে ঘাটে বেড়াইতে পারিবে। এই পদ্ধতির মূদ্রণে বইএর দামও নাকি তাহার বর্তমান মূল্যের ১/১০ হইবে। টাইপ, বই বাঁধান ইত্যাদির কিছুই প্রয়োজন হইবে না। ছাপা বইএর অক্ষরগুলি ফটো-এনগ্রেভিংএর সাহায্যে এক-একটি অক্ষর বা আছে তাহার ১০০ গুণ ছোট হইয়া যাইবে। এই ১০০ গুণ ছোট অক্ষরগুলি দুই-ইঞ্চি চওড়া এবং ৫ ইঞ্চি লম্বা কাগজের উপর ছাপা হইবে। কাগজের দুই পিঠেই ছাপা চলিবে। এই রকম পাঁচখানা কাগজে একটা মাঝারি গোছের উপস্থান ছাপা খুবই সহজ। অ্যাডমিরাল ফিল্ডে বলেন যে মাত্র ৪ পয়সা খরচে ১০০,০০০ কথাওয়ালা বইএর ১০,০০০ খণ্ড ছাপা হইতে পারে।

এই মুদ্রিত কাগজগুলিকে খালি চোখে পড়া যায় না। পড়িতে হইলে ইহাদের একটি আলুমিনিয়ামের তৈরী ছোট হালুকা ফ্রেমে বসাইতে হয়। এই ফ্রেমে খুব জোরাল লেন্স বসান আছে। এই লেন্সটিকে ইচ্ছামত এবং সুবিধাজনক করিয়া নাড়ান যায়।



পকেট-বিশ্বকোষ ও তাহা পাঠের প্রণালী

এই কলটি বাজারে আসিলে অনেকের খুব সুবিধা হইবে। ছ-পয়সার টিকিটের সাহায্যে যথেষ্ট বই পাঠান চলিবে। ৫০ হইতে ১০০০ খানা বই একটা সিগার কেসের মধ্যে অনায়াসে লইতে পারা যাইবে।

বন্দী অক্টোপাস—

নিউ-ইংল্যান্ডের কয়েকজন মৎস্যজীবী একটা প্রকাণ্ড আট-শু ডু-ওয়াল অক্টোপাস ধরিয়াছে। এক-একটা শুড়ের জোরও ভয়ানক। সে শীকারকে এই আট পা দিয়া জড়াইয়া ধরে, এবং তারপর তার টিয়াপাখীর মত প্রকাণ্ড ঠোঁট দিয়া তাহার দেহ টুকরাইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলে।

বদরপুরের দুর্গ

বিগত চৈত্র সংখ্যা প্রবাসীতে ‘বেতালের বৈঠকে’র ১৩৪ নং মিস্ত্রীদ্বার উত্তরে এবং বৈশাখ সংখ্যার ১৩৪ নং মাসামাসার প্রতিবাদ স্বরূপ আনন্দের বদরপুর দুর্গের জীর্ণ-প্রাচীর-সংলগ্ন একখানি শিলালিপি পাঠ উদ্ধৃত কবিয়া দিতেছি। ইহা হইতে ঐ দুর্গের ঐতিহাসিক তথ্য যথাসম্ভব জ্ঞাত হওয়া যাইবে। লিপিখানির পাঠ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিবজাকান্ত ঘোষ, বি-এ, মহাশয়ের সহায়তায় শিলচর নর্মাল স্কুলে উদ্ধার করা হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ উক্ত বিবজা-বাবু লিখিত “বদরপুরের কেল্লা ও শিলালিপি” প্রবন্ধে ১৩২৮ বাঙ্গালার “রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা”র কাইলে দ্রষ্টব্য।

বিগত বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত স্নেহাঙ্কুশ্বর বন্দী উক্ত দুর্গ ছাতকের রাজা দেবীদাস কিংবা তদবধীয়া কাহারও নির্মিত বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি উহা কোন প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই। প্রমাণের অভাবে উহা গ্রহণীয় নহে।

ছাতকের স্মরণসিদ্ধ “ইংলিস কোম্পানীর” সহিত বদরপুর দুর্গের কিঞ্চিৎ সম্পর্ক থাকার সম্ভব। কারণ, ঐ দুর্গ—প্রকৃতপক্ষে শেলখানা (অস্ত্রাগার)—তৎকালীন পটনের গবর্নর জোন ইংলিস সাহেবের সময়ে, ১৮০১ খৃষ্টাব্দে, নির্মিত হইয়াছিল। তখন আমল ছিল শ্রীযুক্ত মেন্ডর (Mr.) জর্জ বাপস্টেব অর্থাৎ সম্ভবত তিনি তখন ব্রিটিশ অঞ্চলের শাসনকর্ত্ত ছিলেন। নিম্নাইবাম দাসের তত্ত্বাবধানে (বস্তুতঃ তদ্বিধানে under the direct supervision of) সর্বস্বত্বকারী নিত্যানন্দ ও নীলমণি ভদ্রের সাহায্যে ধনীবাম রাজমেশুরি ঐ শেলখানা প্রস্তুত করেন। বদরপুর দুর্গের প্রবেশ-দ্বারের উপবিভাগে, ইষ্টক-প্রাচীর-সংলগ্ন একপাশে প্রস্তবে, পুর্বাতন বাংলা অক্ষরে যে লিপি খোদিত আছে, তাহা হইতে এই তথ্য সংকলিত হইল। লিপিখানির যে পাঠ বন্ধুবর বিবজাকান্ত ঘোষ মহাশয়ের সহায়তায় শিলচর নর্মাল স্কুলে উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। উহা একখানা উত্তম ফোটো ঐ স্কুলে আছে।

“ইংরাজি ১৮০১ সাল সন ১২০৭ সাল বাঙ্গালা পবগনে চাপখাট মুকাস বদরপুর আমলে শ্রীযুক্ত মেন্ডর জর্জ রিপট সাব গবর্নর পটন শ্রীযুক্ত মেন্ডর জোন ইংলিস সাব বস্তুতঃ তদ্বিধানে নিম্নাং বামদাস ছরবাবা শ্রী নিত্যানন্দ

নীলমণি ভদ্র দওয়ার সেলখানা বানাএ শ্রী ধনীবাম রাজমেশুরি ইতি”

শ্রী জগন্নাথ দেব

“মাটির তলায় আগুন”

ক্ষতিমোহন-বাবু “মাটির তলায় আগুন”—এব বিবরণটি পড়িয়া খুবই মনে হয় যে ঐ স্থান কয়লা আছে। এই কয়লা অবশ্য ঠিক পাথুরে কয়লা (coal) নয়। ইংরেজীতে যাহাকে ‘পীট’ (peat) বলে সেই শ্রেণীর কয়লা থাকার খুব সম্ভাবনা। কেননা, ক্ষতিমোহন-বাবু লিখিয়াছেন, স্থানটি একটি বিল। বিল বা জলায় বৎসরের পব বৎসব শুষ্ক জাতীয় যে-সমস্ত উদ্ভিদজাত মাটিচাপা পড়িয়া যায়, সময়ে, চাপে পড়িয়া তাহার অঙ্গাণু পবিণত হয়। মাটি গিশান এই অঙ্গাণু-চাপকেই ইংরেজীতে “পীট” (peat) বলে। পাথুরে কয়লার মত ইহা শুষ্ক ও কঠিন নয়; খাঁটি অঙ্গাণুভাগও পাথুরে কয়লার অপেক্ষা কম। গরীব লোকের জ্বালানীর জন্ত এই “পীট”—এব ব্যবহারও

ব্যবসায় বিলাতে বেশ চলিত আছে। মাটির মত “পীট” দেখানে চাপ কবিয়া কাটিয়া তোলা হয়।

আমাদের এই বিলটি কত গভীর ছিল, কত বৎসবে কতখানি “পীট” ইহা বলি কোলে সংগৃহীত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। তবু শত-ক্ষেত্র নষ্ট করিয়া “পীট” কাটা সম্ভব হইবে কি না জানি না। চেষ্টা কবিলে গভীর গড়খাই কাটিয়া আগুনকে বেড়-বন্দী কবিয়া মাঝে যাইতে পাবে। গভীর গর্ত কাটিলে মাটির নীচে অবস্থাতাও ঠিকমত জানিতে পাওয়া যায়।

শ্রী স্ববাবিন্দু বিশ্বাস

খাদ্যকথা

খাদ্যকথা নামক একখানি পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে করা হইয়াছে। উপন্যাস-প্রাবৃত বঙ্গদেশে একম বৈজ্ঞানিক বিষয়ের বত বহি প্রকাশিত হয়, ততই ভাল। কিন্তু, এ পুস্তকখানি পড়িয়া লোকের খাদ্যভ্রমের উপাদান সম্বন্ধে যতটা জ্ঞান হওয়া সম্ভব, উহাদেব প্রাত্যহিক কার্যে ততটা কার্যকরী হইবে বলিয়া বোধ হয় না। পুস্তকে ৬১ হইতে ৬২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বাঙ্গালীদেব নানাপ্রকার খাদ্যভ্রমের বিশ্লেষণ কবিয়া শতকরা উপাদানের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সংখ্যা-গুলি ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। শতকরা সংখ্যা যোগফল ১০০ হওয়া উচিত, কিন্তু (৬৩ পৃঃ) গম ৮২.২৮, ময়দা ৮.৮৪, আটা ৯১.৫৫, হুজি ৭৫.২১, যাঁতাব আটা ৮১.৫৬ যোগফল হয়। অবশ্য কোন-কোনটা ১০০ আছে।

ইহা ছাড়া, চাউলে (৬২ পৃঃ) শতকরা আমিষ ৬৩.৫ ও শালি ৭৮.৮ লেখা হইয়াছে। অর্থাৎ যদি ১০০ ভবি চাউল লওয়া যায়, তবে তাহাতে ৬৩.৫ ভবি আমিষ ও ৭৮.৮ ভবি শালি আছে বুঝিতে হইবে। এই ১০০ ভরি চাউল জল দিয়া সিদ্ধ কবিলে (১২ পৃঃ) তিনশত ভবি ভাত হয়। অতএব তিনশত ভরি ভাতে ৬৩.৫ ভরি আমিষ ও ৭৮.৮ ভবি শালি উপাদান থাকা উচিত। কেনে কিছু নষ্ট হইলে ইহাদেব পরিমাণ কমিতে পারে কিন্তু কোনও কারণে বাড়িতে পারে না। কিন্তু ভাতে (১২ পৃঃ) শতকরা ২৮ আমিষ ও ৫৭.২ শালি লেখা হইয়াছে অর্থাৎ তিনশত ভবি ভাতে ২৮×৩=৮৪ ভবি আমিষ ও ৫৭.২×৩=১৭১.৬ ভবি শালি আছে। মোজা কথা, একশত ভরি চাউল খাঁটি জলে সিদ্ধ কবাত ৮৪-৬৩.৫=২০.৫ ভবি আমিষ (বা শতকরা ৩২.২) ও ১৭১.৬-৭৮.৮=৯২.৮ ভরি শালি (বা শতকরা ১১৭.৮) উপাদান বাড়িয়া গেল। পুস্তকে এ বৃদ্ধির কোনও কারণ দেখান হয় নাই।

আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্যের মধ্যে আমিষ, শালি, ইত্যাদি পবিমাণ নিকৃপণ কবিয়া দিলে কার্যতঃ কোনও ফল হয় কি না সন্দেহ। পেরাজে (৩৪ পৃঃ) শতকরা ৩.৫৮ শালি ও ১.৫৭ আমিষ আছে। অতএব আধপোয়া (১০ ভরি) পেরাজে মাত্র ৩.৫৮ শালি ১.৫৭ আমিষ আছে। কিন্তু আবি গরীকা কবিয়া দেখিয়াছি (ও ইচ্ছা কবিলে যে কেহ গরীকা কবিত পাবেন) যে একজন সাধাবণ পকিষনী লোক সমস্তদিন অল্পেব পরিবর্তে দণ্ড ভরি কাঁচা পেরাজ খাইলে শুম্ভার কষ্ট পায় না ও কোনও রূপ দুর্বলতা বোধ করে না। যাহা বা শারীরিক পবিশ্রম কবিয়াই জীবিকা অর্জন করে তাহাদেবও আধপোয়া বাঁচা পেরাজ খাইয়া সমস্ত দিন অল্পেব কাঁচ কবিত দেখিয়াছি।

মুগের ডালে (৬২ পৃঃ) শতকরা ২৩.৬২ আমিষ ও ৫০.৪৫ শালি,

সে-রকম একখানি গাড়ীর ছবি আমরা এখানে দিলাম।
এ গাড়ীর ইঞ্জিনের ভিতর বৈদ্যুতিক মোটরের কলকজা
থাকে।

কুকুর-চালিত গাড়ী

আমরা যেমন মোটর চালাই, সাইকেল চালাই,
জন্তুদের দ্বারাও কি সে-রকম কাজ পাওয়া যায় না?
কয় ওয়াটসন্ নামে আমেরিকার লন্ এঞ্জেলসের একটি
দশ বছরের ছেলে বেলজিয়ামের একটি বড় কুকুরের দ্বারা
এক চার-চাকার গাড়ী চালাইতেছে। কুকুরটি গাড়ীর
ভিতরে থাকিয়া পা দিয়া কল টিপিতে থাকে আর তাহাতে
চাকা ঘুরিয়া গাড়ীটি চলিতে থাকে।



কুকুর-চালিত গাড়ী

প

স্তব্ধ বাদল

ঐ নীল-গগনের নয়ন-পাতায়
নাম্নো কাজল-কালো মায়া;
বনের ফাঁকে চম্কে বেড়ায়
তারি সজল আলো-ছায়া ॥
ঐ তমাল-তালের বৃকের কাছে
ব্যথিত কে দাঁড়িয়ে আছে—
দাঁড়িয়ে আছে,
ভেজা পাতায় ঐ কাঁপে তার
আছুল ঢলঢল কায়া ॥
যার শীতল হাতের পুলক-ছোঁয়ায়
কদম-কলি শিউরে ওঠে,
যুঁই-কুঁড়ি সব নেতিয়ে পড়ে,
কেয়া-বধূর ঘোমটা টুটে,

আহা, আজ কেন তাব চোখের ভাষা
বাদল-ছাওয়া ভাসা-ভাসা?
জলে ভাসা?
দিগন্তরে ছড়িয়েছে সেই
নিতল আঁখির নীল আব্‌ছায়া ॥
ও কার ছায়া দোলে অতল-কালো
শাল-পিয়ালের শ্যামলিমায়?
আম্লকী-বন থাম্নো ব্যথায়,
ঘাম্নো কঁ.দন গগন-সীমায়।
আজ তার বেদনাই ভরেছে দিক,—
ঘর-ছাড়া হায় এ কোন্ পথিক,
এ কোন্ পথিক?
এ কি স্তব্ধ তারি আকাশ-জোড়া
অসীম রোদন-বেদন-ছায়া ॥
কাজী নজরুল ইসলাম

অড়হব দালে ২১'৬৭ আশ্বিন ও ২৩'২৭ শালি আছে। আমিষ অপেক্ষা শালি খাদ্য সহজপাচ্য, অতএব যুগ অপেক্ষা অড়হব সহজ-পাচ্য হওয়া উচিত। কিন্তু সকলেই জানেন যে অনেকে যুগেব দাল সহজে স্বীর্ণ করিতে পাবেন কিন্তু সেই পরিমাণে বা তাহাপেক্ষা কিছু কম অড়হব দাল খাইলেই বুক জ্বালা, চোয়া ঢেঁকুর ইত্যাদি অন্ন রোগের নানানিহ প্রকাশিত হয়। অতএব আমাদের সেই পোষণ করিতে প্রত্যহ আমিষ, শালি, লবণ ইত্যাদি কি পরিমাণে প্রয়োজনীয় জানিতে পারিলেও সেই অভাব কোন্ কোন্ খাদ্যদ্রব্যে দূর হয় বা হওয়া সম্ভব, নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন, কার্যতঃ অসম্ভব। অতএব তালিকা দেখিবা খাদ্যদ্রব্যের ওজন স্থির করিলে কার্যতঃ ভ্রমে পড়িতে হয়।

শ্রী অমৃতলাল শীল

ভাতের ফেন গালা হয় কেন ?

'খাদ্যকথা'র সমালোচক জ্যেষ্ঠ মাসেব প্রবাসীতে বলেছেন “..... ফেন গালা চলিত হইল কেন?.....ফেন গালার মধ্যে আহাব-বিদ্যা আছে।” জানিতে পারি কি কেন চলিত হ'ল, আব কি আহাব-বিদ্যা আছে ?

শ্রী প্রভাতনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর

আমরা কেন পাই না, খাই ভাত। ভাতের ফেন না গালিয়া গতি কি? ভাত যেমন রান্না হয়, তাতে ভাত সিদ্ধ কবিত্তে জল বহু আবশ্যক, তাব চেয়ে বেশী দেওয়া হয়। না দিলে ভাত চুইয়া যাইতে পারে, হাঁড়ির তলায় লাগিয়া যাইতে পারে, চোল উপর নীচে হইতে না পারিয়া কিছু কাঁচা থাকিয়া যাইতে পারে। তা ছাড়া, ভাত চড়াইয়া কে জাগিয়া বসিয়া থাকিতে চায়? এক দেব চোলে প্রায় ২৫০ সের জল খায়। কিন্তু শূন্য ও বসা, পুতনা ও নূতন, সব ও ঘোটা, এই সব ভেদে জলের ভাগ কম বেশী করিতে হইত। এত বিচারে না গিয়া রান্না ৩৪ সের জল দিয়া ভাত রাখে। কাজেই ফেন থাকে।

এখন কথা, সে ফেন গালিয়া ফেলা হইবে, না, বাখিয়া ফেন-ভাতে খাওয়া হইবে। দরিদ্রে ফেন ফেলিয়া দেয় না, হয় ফেনে-ভাতে খায়, কিংবা ফেন গালিয়া বাখিয়া পবে নূন-জল দিয়া নিজে খায়, ছেলেপিলেকে খাইতে দেয়। আমাদের মিষ্টান্ন জলপানের মতন তাহাদের ভাতের মাঁড়-পান। যাহা বা আবও দরিদ্র, যাহাদের অনেক-গুলি ছেলেপিলে, তাহারা এক দেব চোলে ৪৫ দেব জল দেয়, ফেন গালিয়া রাখিয়া সেই জ্বালো মাঁড় বাটি বাটি খাইতে দেয়। ক্ষুধার সময় জল খাইলে ক্ষুধা যেমন শান্তি হয়, এই দুঃখীদিগেরও তাই হয়। কিন্তু কৃষিক; কাবণ, ফেনে ভাতের অন্নই থাকে। তাই আমরা ফেলিয়া দিতে পারি। কিন্তু, হাব, এই দুঃখীদিগের নিকট এই অন্নও বহু-মূল্য।

আমরাও ফেন খাইতে পারি; ফেন খাদ্য, কিন্তু ভোজ্য নয়। অভ্যাস কবিলে ফেন-মাখা ভাত, অর্থাৎ ফেন না গালিয়া ভাত খাইতে পারি। কিন্তু প্রচুর নূন চাই, লজ্জা পাইলে আবও ভাল। কিংবা শুড় বা চীন চাই, কাবণ ফেন-মাখা ভাত বাহু নয়, জ্বালো। যে ভাতের স্বাদ নাই, সে ভাত কে কতদিন খাইতে পারে?

একথা কিন্তু অনেকে জানেন না। ভাতের সঙ্গে কাঁচা নূন খাইবার অভ্যাস অনেকের আছে। আমার বিবাস, তাঁহারা যে ভাত খাইয়া

থাকেন, কিংবা প্রথম প্রথম খাইতেন, সে ভাতের স্বাদ নাই। সকল চোলেব ভাতের স্বাদ সমান নয়। নূতন চোলেব ভাতের স্বাদ সবাই জানেন। কিন্তু এমন চোলও আছে, যাঁহা চুই-এক বছরের পুতনা হইলেও স্বাদহীন হয় না। এখানে একটু নিজেব কথা বলি। শ্রীমতীবা হাসিবেন না, একবার তাঁহাদের রন্ধন-কলা শিখিবার আমার প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু কোনও কলা চুই-একদিনে শিখিতে পাওয়া যায় না। বাব বার করা চাই, অভ্যাস চাই। আমাব সময় কই? কাঁকি দিয়া কলাটা শিখিয়া লটবাব কিকির করিলাম। সে কিকির আর কিছু নয়, রন্ধন-কলাব মধ্যে যে দিয়া আছে, সেই দিয়া আমাব লক্ষ্য হইল। বেড়ী ধবিত্তে পাওয়া যাইবে না, দেখি রান্নার স্ত্রীটা ধবিত্তে পারি কি না। প্রথমে ভাত বাঁধিতে গিয়া ঠেকিলাম। কত জল দিব? জল গরম হইলে চোল, না গরম হইবার পূর্বেই চোল? কখন জ্বাল মুদ্র করিব, কখন বা প্রবল কবিব? ইত্যাদি হাজার প্রশ্ন ঘেরিয়া ফেলিল। সে সময়ে আমার বহুবর্গকে সিজাসা করিতাম, “বলুন ত কোন্ চোল ভাল?” অর্থাৎ উত্তম চোলেব লক্ষণ কি? তাইবা “কি চোল”, “কি চোল” করিতেন। কেহ বলিতেন, যে চোল সব ও শাদা; কেহ ঘোষণা করিতেন, যে চোল গোটা গোটা, ভাজা নয়; কেহ আব-একটু বলিতেন, যে চোল লম্বা। আব-একটু বলিতে পারিতেন, কিন্তু কি আশ্চর্য, কাহাবও মনে হইত না, যে চোলেব ভাত খই-ফাটা হয় না, যে চোলের ভাত কোমল ও মিষ্ট। আব একটু উঠিলে বলিতে হয়, যে চোলেব ভাত পুষ্টিকর ও বলকর। যে চোলের ভাত লঘুপাক। চোল শাদা না হইলেও উত্তম হইতে পারে; চোল হু-বর্ণ হইবে, সে বর্ণ শাদা হটক, আগীত হটক, আরক্ত হটক। ভাতে সুস্বাদ হইবে, সে ভাণ রাঁধনী-পাগল প্রভৃতির মতন পাগল-করা ভাণ নহে। আমাদের দেশে এমন উত্তম চোল আছে। বহুস্মি হু-কলাই বটে। হু-ফলা না হইলে কি দণ্ড হইত, জানি না। প্রত্যহ যে ভাত খাইতে হয়, সে ভাত উত্তম না হইলে অরুচি জন্মিত। লোকে কিন্তু এত কথা ভাবে না; চোল ত চোল। যদি বন্ধন-কলায় রস পাইত, তাহা হইলে বৃষ্টি ভাত বৃটিকর কবিত্তে হইলে কত স্বস্তি আবশ্যক। আমি পাই নাই, কিন্তু দুব হইতে দেখিয়াই বৃষ্টিয়াছি, ভাত বামা সোজা নয়। কাবণ উত্তম চোল ত সর্বদা পাই না।

উপরে উত্তম চোলেব যে যে লক্ষণ দিলাম, সব চোলে সে-সব একত্র পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রত্যেক লক্ষণ আহাব-বিদ্যার বিচার। সে-সবের ব্যাখ্যার সময় কই? আব, এমন কোন্ বিদ্যা আছে, যাব গোড়া ছাড়িয়া আগাধ চড়িতে পাওয়া যায়? কাজেই লাকাইয়া উঠিতে হইতেছে। ফেন গালার কি কি গুণ? (১) ভাত ধৌত হইয়া নি-মল হয়, হু-স্বাদ হয়; (২) গোটা গোটা থাকে, জড়-জড় হয় না; (৩) চোলেব উগ্রতা নষ্ট হয়। তিনই আহাব-বিদ্যার অন্তর্গত।

কিন্তু চোলেব উগ্রতা কি?

চোলে দেহেব অহিতকর উগ্রবীর বস্তু বিশেষ আছে।

প্রমাণ কি?

১। আমাদের দেশে তিন জাতের ধানের চাষ হয়। ধান পাকিবার কালানুসারে এই তিনেব নাম,—বার্ষিক অর্থাৎ বর্ষাকালে পাকে, শারদ শবৎকালে পাকে, হৈমন্তিক হেমন্তকালে পাকে। বার্ষিক ধান, আশু বা আউণ নামে খ্যাত। শারদ ধান, লঘুধান নামে খ্যাত। হৈমন্তিক, চলিত ভাষায় হৈমন্ত, বাঁকুড়ায় বলে ‘বড়ান’ (অর্থাৎ বড়ধান, লঘু নহে গুরু, প্রবান বা উত্তম), আয়ুর্বেদে নাম শালি। এই তিন ছাড়া, বোয়ো ধান আছে, সকলে জানেন না। সে ধান ত্রৈমন্তিক, আউণেব রূপান্তর। সে যাঁহা হটক, উত্তম তিন ধানের মধ্যে আউণ (যদিও ভাত মিষ্ট) অধম, লঘু মধ্যম, হৈমন্ত উত্তম (এই হেতু নাম

আপন বোনকে ফেলে ত আর পালাতে পারে না ;
তারা ভাই-বোনে গলাগলি করে দাঁড়িয়ে রইল। বাঘ
এনে বোনের বুক থেকে ভাইকে কেড়ে নিয়ে মেরে ফেলে,
কিন্তু বোনকে ছুল না। বোন সেই মরা ভায়ের গলা
জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে সেইখানেই মরে গেল।

বোনের সেই হৃদয়ভেদী কান্না শুনে ভগবান তাকে
পৃথ্বী বানিয়ে দিলেন আর সে আজ পর্যন্ত সেই মরা
ভায়ের শোকে পাগল হয়ে গেয়ে বেড়ায়—

“কাঁটাল পাখী নাইওর যাইতে

ভাইকে খাইল বনের বাঘে—”

আমাদের এ অঞ্চলে এখনো এমন অনেক মেয়ে
আছেন, যারা ‘কাঁটাল পাখী’র ডাক শুনেই সেই মরা
ভায়ের কথা মনে করে’ চোখের জল রাখতে পারেন
না।

শ্রী জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জিনিষ নষ্ট হয়ে যায় কোথা ?

আমরা বলি জিনিষ নষ্ট হয়। কিন্তু নষ্ট হওয়ার মানে
কি তা আমরা অনেক সময় বুঝি না। আমরা চোখে
দেখি একটা গাছের পাতা, কাগজের টুকরা বা ছেঁড়া
ন্যাকুড়া পচে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু নষ্ট হয়ে তারা কি
একবারে লোপ পায় ? না, তারা অল্প আকারে পৃথিবীর
মধ্যেই থাকে। কি রকম করে থাকে তা বলছি।

বর্ষাকালে নদী, খাল, পুকুর সমস্তই বৃষ্টির জলে পূর্ণ
হয়ে যায় কিন্তু আবার গ্রীষ্মকালে সেই-সব জল যায়
কোথা ? সেই জল সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে আকাশে
মেঘের সৃষ্টি করে। বর্ষাকালে আবার সেই মেঘ জল
হয়ে যায়। বরফ গলে জল হয়ে গেল আবার জলই বাষ্প
হয়ে গেল। কিছুই নষ্ট হল না।

ধান থেকে চাল করে’ আমরা খেলাম। দেখতে গেলে
ধানগুলি নষ্ট হল বটে, কিন্তু সেগুলি আবার প্রকারা-
স্তরে আমাদের শরীরের পুষ্টি সাধন করলে। গাছের
পাতা মাটির উপর ঝরে’ পড়ল, ছুঁদিন পরে পচে গেল
—আর দেখা গেল না। কোথায় গেল ? সেই পাতা
প্রকারান্তরে আবার গাছেই গেল।—

পাতা যখন পচল তখন তা থেকে তিনটে জিনিষ
হল :—(১) বাষ্পীয়, (২) জলীয় এবং (৩) কঠিন।

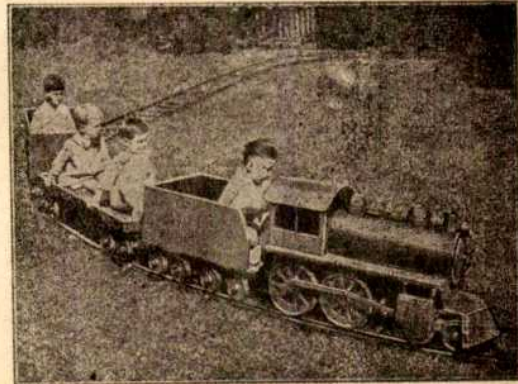
বাষ্পীয় পদার্থটি গেল হাওয়ায় মিশে। হাওয়া থেকে
গাছ তাকে পুনরায় পাতার সাহায্যে আহরণ করলে ;
জলীয় পদার্থটি মাটিকে ভিজিয়ে দিলে, কতকটা তার
হাওয়ায় শুকিয়ে গেল আর কতকটা গাছের শিকড় শুষে
নিলে ; এবং শেষের ঐ কঠিন অংশটুকু মাটির উপর রইল
পড়ে ; তা আবার সময়-ক্রমে জলে গলে গিয়ে অবশেষে
সেই গাছেই শিকড় দিয়ে চলে গেল। এরা সবাই
মিলে আবার গাছের পাতা তৈরী করতে সাহায্য করলে।

এই রকম ভাবে দেখতে পাই যে প্রকৃতির ভিতর
একই জিনিষ অবস্থা-বিভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ
করছে। একই লোক যেমন থিয়েটারে, যাত্রায়, বিভিন্ন
সাজে সেজে এসে নানা রকমের অভিনয় করে, প্রকৃতির
নানা জিনিষও তেমনি নানা আকারে নানা কাজ করে’
চলেছে। কেউই ব্যর্থ হচ্ছে না, নষ্ট হচ্ছে না।

শ্রী ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

ছেলেদের বেড়াবার রেলগাড়ী

ছেলেদের খেলার রেলগাড়ী অনেকদিন হইতেই
চলিয়া আসিতেছে। চাবি ঘুরাইয়া দম দিয়া ছাড়িয়া
দিলে সে গাড়ীর ইঞ্জিন থানিকটা খুব ছুটিত। আজকাল



ছেলেদের বেড়াবার রেলগাড়ী

আমেরিকায় বড়-লোকরা অনেক বাগানে সরু রেল
পাতিয়া ছেলেদের জন্ত গাড়ীর প্রচলন করিয়াছেন।

শা-লি—শল ধাতু প্রথমে)। কি লক্ষণে অধম বা উত্তম? আহাবে, গুব লবু পরিপাক। অর্থাৎ কোন কোনও চালে এমন কিছু উগ্রবস্ত্র, দোজা কথায়, বিব আছে, যেজন্য সে সে চাল গুব পাক হয়।

২। ধান সিঁঝাইলে সে দোষ দূর হয়। যেহেতু দেখি, সিঁদ্ধ চালের ভাত যত লবু, আলো চালের ভাত তত নয়।

৩। ভাত রাঁখিলে ফেনেব সঙ্গে অবশিষ্ট দোষ দূর হয়। যেহেতু দেখি, নূতন চালের ভাত গুরুপাক হইলে বেশী জল দিয়া রান্না হইয়া থাকে। ভাতে আঠা-আঠা ধবিবাব শব্দ হইলে, ফেন গালিবাব পূর্বে ভাতে জল ঢালা হয়। ইহাতে ভাত বুইয়া সড়-সড়া হয়; আব গোটা গোটা ভাতই উত্তম। কিন্তু শূদ্র এই অভিপ্রায় নহে। যে চাল হটক, চতুর্গুণ, ষষ্ঠগুণ, অষ্টগুণ জল দিয়া রাঁখিলে ভাত উত্তমোত্তম লবু হয়। আঁবুবেদে বোড়গুণ জল দিয়াও বোগীব পথ্য ভাত রাঁখিবাব উপদেশ আছে।

বেগুন ও বিলাতী আলু বান্নার অগ্রবৃৎ দৃষ্টান্ত আছে। বেগুনই ধবি। বেগুনে একটা উগ্র বস্ত্র বা বিব আছে। কাঁচা বেগুন অখাদ্য হইবার হেতু এই। পোড়াইয়া, ভাজিয়া, কিম্বা জলে সিঁঝাইয়া সে বিব নষ্ট করি। বান্ননের বেগুন কুটিবার সময় কুটিগুলি জলে ফেলা হয়। অভিপ্রায় বিঘটা বুইয়া ফেলা। বুইলে সব যায় না, ভাজিয়া অন্ততঃ সীতলাইয়া লইতে হয়। ভাজা-পোড়াবি বিব বত সহজে নষ্ট হয়, সিঁঝা বত সহজে হয় না। সব বেগুন সমানও নয়। বেগুনের আদিম বিব চাষের ভ্রমে অনেক গিষাছে। বুনো ওল ও চাষের ওলে কত তফাৎ, আমবা জানি। দেখি, আউণ চালের ভাত খাইয়া জীর্ণ করা যার-তার কর্ম নয়। কিন্তু আউণ চালের মুড়ি হুপচ না হইলেও ভাতের মতন ছুপচ নয়। আউণ চালে এমন কিছু আছে, যে জন্ত উহার ভাত সকলের সয না। সেটা শালিতে নাই, কিংবা ভাগে অত্যন্ত আছে। এই যে উগ্র বস্ত্রব সত্তা অনুমান কবিতেনি, মনে হইতেছে এক জাপানী কৈমিতিক সেটা পৃথক্ করিয়াছেন। (অনেক কালের কথা, সবিশেষ মনে পড়িতেছে না।) আমাদের দেশে এখন কৈমিতিকের অভাব নাই। এই বিষয়ে তাঁহার গবেষণা কবিতেনি। তিন ভাতের ধানের চালে, নূতন ও পুরানো ধানের চালে, নূতন ও পুরানো চালে গণ্যস্তব দেখি, কিন্তু নিগূঢ় কাষণ জানি না।

কেহ কেহ তর্ক তুলিতে পারেন লোকে কেন ত খায়। তা ত খায়। দেশেব কয়-আনা লোক খায় না, গণিখা ববং তাহাই বাহিব করা দোজা। যখন দেশেব এই দুর্দশা মনে পড়ে, যখন কারী (কুলি) ও কামিনদিগের অস্থিরচর্ম্মনা কৃণ ও দুর্দশ দেখেব অতি দৃষ্টি পড়ে, তখন বুঝি ফেনে সাবাণ কিছুই নাই। কলিকাতার শ্রীমতীবা শূনিয়াছেন কি না, জানি না; বাঙ্গালা ভাষায় 'ফেন চাটা' শব্দ আছে। দারিদ্র্যের শেষ সীমায় জীবন-মরণের সন্ধি-স্থলে ফেন-চাটা হইতে হয়। তখন অশ্বেব অখাদ্য, অন্নক্লিষ্টের ভোজ্য হয়। ফেন ত উপাদেয়। দুর্ভিক্ষে নয়, স্বভিক্ষের সময়েও কাঁচা বেগুন খাইতে দেখিয়াছি, খেড়িবে তেলে বান্নর বান্না হয় শুনিয়াছি। আউণ চাল দরিদ্রের খাদ্য। তাহাদের জঠরাগ্নিতে কুপথ্যও ভগ্নীভূত হয়। ধনীভোজ্যে কেবল বসনাব তৃপ্তি নয়, সমস্ত দেহেব তৃপ্তি হয়। ধনী যাহা ফেলিয়া দেয়, নিধনের তাহাই ভোজ্য। ফেনে লবণীষ পদার্থ চলিয়া যায়, কিন্তু শাগে-আনাজে তাহার পুণ হয়। লবণীষেব মধ্যে কৃন্দকরিক লবণ একটা। চালে এই লবণ অত্যন্ত। ফেন গালিয়া ফেলিলে আবও অন্ন হয়। ফেন গালায় এই ক্ষতি। কিন্তু সে ক্ষতি কতটুকু? অন্নেব অন্ন পেলে জানিতে পাঁবা যায় না। যিনি এই অল্পকেও বাঁচাইতে চান, তিনি অবশ্য ফেন গালিতে দিবেন না। কিন্তু আবও দোজা উপায় আছে। সব চালে কৃন্দকরিক লবণ ভাগে সমান নয়। যে চালে বেশী আছে, সে চালের

ভাত খাইলে ফেন বাঁচাইতে হইবে না। আমবা ফেন পাইতে পারি, অতএব কেজা কর্তব্য নহে, এ মুক্তি ঠিক নহে। ফেন নহে, তাহা আহার-বিদ্যার প্রধান কথা। কাষণ সে আহাবই শ্রেষ্ঠ, সে আহারে শরীরের প্রয়োজন সিঁদ্ধ হইবে, আব—এইখানে বিশেষ—পরিপাকঘন্ত্রেব ক্রিয়া লবু হইবে। আহাবেব উদ্দেশ্য উন্নত-পুষ্ণ নয়; উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য-বিধান। স্বাস্থ্য কি, তাহা না বুঝিলে উদ্দেশ্য বুঝিতে পাঁবা যাইবে না। এটুকু বলা যাইতে পাবে, দেহেব কেবল আবোগ্য স্বাস্থ্য নহে, অবোগিতা ও স্বাস্থ্য এক নহে। গালিলে যদি অন্ন-পরিপাক লবু হয়, ফেন অবশ্য ফেলিতে হইবে।

আরও তর্ক আছে। পোড়ের ভাতে ও বাপ্পে সিঁদ্ধ ভাতে ফেন থাকে না, সে ভাত খাইলে অহং করে না, ববং লবুপাক বলিয়া অজীর্ণ বোগীব পথ্য বিবেচিত হয়। দুই ভাতই সুসিদ্ধ। সিঁঝাইলে বেগুনের বিব নষ্ট হয় বলিয়া বান্ননে কাঁচা বেগুন ফেলিয়াও রান্না হয়। সুসিদ্ধ ভাতও তেমন। কিন্তু সুসিদ্ধ হইতে সনয় লাগে। পাণবা কয়লার জালে রান্না ভাত কাঁচা কাঁচাবও সয না, খাইলে নাকি অশল হয়। কিন্তু সেটা কয়লার দোষ নয়, দোষ বান্নাব। বান্নাব কুটনা কোটা, বাটনা বাটা শেষ হয় না, উনানে কয়লা ধরিলেই ডোল ভাত চড়াইয়া দেয়। তখন কয়লার প্রচণ্ড আগুন ভাত শীঘ্র কুটিয়া উঠে, ফাটিয়া যায়, কিন্তু ভিতবে ভিতবে কাঁচা থাকে। কাঁচা ভাত খাওয়াতেই অশ্বলেব উৎপত্তি।

শ্রীমতীদিগেব মধ্যে নিশ্চয়ই পাকা রান্না আছেন। তাহাদের নিকট এসব জ্ঞান কথা। আনাড়ীরা রান্না কিরূপ, তাহা ভাতের এই ফেন গালাতেই বুঝিতে পারিবেন। ইতি

শ্রী যোগেশচন্দ্র বায়

‘খাদ্যকথা’র সমালোচনায় শূদ্র-অশুদ্ধি

এই সমালোচনা (প্রবাসী, ২৩৪ পৃঃ) ‘পেপটোন’ না হইয়া ‘পেপটোন’ এবং ‘তবস্তা কোম্পানী’ না হইয়া ‘তাঁতা কোম্পানী’ হইবে।

শূদ্র

গত জ্যোত্বেব প্র বা সী তে প্রজ্ঞেব বজু মৌলবী শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ সাহেব আমার আলোচিত শূদ্র পদের ব্যুৎপত্তি-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা কবিয়াছেন দেখি। আনন্দিত হইয়াছি। আশা করা যায়, একপ আলোচনায আলোচ্য শব্দটির আসল ব্যুৎপত্তিট একদিন বাহির হইয়া পড়িবে—যদি আমার প্রদর্শিত ব্যুৎপত্তিটি ঠিক হইয়া না থাকে। মৌলবী সাহেব বাহা লিখিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নীচে লিখিলাম।

ক্ষ স্থানে যে একটা উদঘর্ষ হয় ইহাই আমি হিন্দ-ইবানীর (১) ভাব।

(১) হিন্দী গুজরাতি ও মরাঠী খববেব কাগজে দেখিয়াছি ‘India’ বা ‘ভাবত’ বুঝাইতে তাহাতে হিন্দ (হিন্দু নহে) শব্দ প্রযুক্ত হয়। তাই তাহার সহিত ই রা ন শব্দ জুড়িয়া দিয়া বিশেষণ কবিয়া লইয়াছি হিন্দ-ই রা নী য়। মৌলবী সাহেব বলিতে চান হিন্দু-ই বা নী য়, কিন্তু হিন্দু বলিতে ‘হিন্দুস্থান’ বা ‘India’ বুঝায় কি? উহা ধারা ‘হিন্দু জাতি’ ই বুঝায়। আর, ই রা ন শব্দে মূর্ত্যুগ লিখিবার যুক্তিও নাই,

জো পিচ্কারী দেখিবামাত্র আপনা হইতে গায়ের জামা খুলিয়া তৈয়ারী হইয়া বসিল। ডাক্তার সাহেব বলিয়া- ছিলেন একটা বনমানুষের এত বুদ্ধি তিনি কোনদিন কল্পনাও করিতে পারেন নাই। অনেক মানুষের বুদ্ধি অনেক বনমানুষের অপেক্ষা কম।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

সাইকেলে বিপদ

ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং ! সবে সবে' যাওনা,
চড়িতেছি সাইকেল, দেখিতে কি পাও না ?
ঘাড়ে যদি পড়ি বাপু, প্রাণ হবে অন্ত,
পথ মাঝে রবে পড়ে' ছিব্বুটে দন্ত।
বলিয়া গেছেন তাই মহাকবি সাইকেল—
“যেও না যেও না সেথা, যেথা চলে সাইকেল।”
তাই আমি বলিতেছি তোমাদের পটে—
মিছে কেন চাপা পড়ে' পাবে খালি কষ্ট ?
ভাল যদি চাও বাপু, ধীরে যাও সরিয়া।
কি লাভ হইবে বল অকালেতে মরিয়া ?
সকলেই দিবে দোষ প্রতিদিন আমারে ;
গালি দিবে চাষা, ডোম, মুচী, তেলি, কামারে।
এত আমি বলিতেছি—ওরে পাজী রাস্কেল—
ঘাড়ে যদি পড়ি তবে হবে বুদ্ধি আক্কেল ?
রঘুনাথ একদিন না সরার ফলেতে
পড়েছিল একেবারে সাইকেল-তলেতে।
সতরই বৈশাখ—(রবিবার দিন সে)
চাপা পড়ে' মরেছিল বুড়ো এক মিন্সে।
তাই আমি বলিতেছি পালানা রে এখনি,
বাঙালী হয়েছ বাপু পলায়ন শেখনি ?

শ্রী সুনির্মল বসু

বৌ কথা কও

তোমরা বোধ হয় বৌ-কথা-কও পাখী দেখেছ। এই
পাখী বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে, অর্থাৎ কাঁটাল পাকার দিনে
বের হয় বনে' আমাদের সিলেটের দিকে ওকে “কাঁটাল

পাখী” বলে। কাঁটাল পাখী ডাক্তারে শুরু করার পর
থেকেই কাঁটালও পাক্তে আরম্ভ করে, তারপর শ্রাবণ
মাস পর্যন্ত ‘কাঁটাল পাখী’কে ডাক্তে শুনা যায়। এ
পাখীটার ডাকার মধ্যে একটা মন্ত মজা আছে। তুমি
মনে মনে যাই ভাববে, শুনবে যেন পাখীও তাই বলে’
ডাকছে। যেমন তুমি মনে মনে ভাবলে ‘বৌ কথা কও’,
অমনি তুমিও শুনবে যেন পাখীও বলছে বৌ কথা
কও। আমার কথা তোমার বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা
করে’ দেখতে পার।

সিলেটের দিকে কচি কচি ছেলে-মেয়েরা “কাঁটাল
পাখী” ডাকলেই বলতে শুরু করে’ দেয়—

“কাঁটাল পাখী, ‘নাইওর’ যাইতে,
ভাইকে খাইল, বনের বাঘে—।”

ছড়াটার একটা সুন্দর মানেও আছে :—

অনেকদিন আগে কাঁটাল পাখী (বৌ কথা কও)
নাকি মানুষ ছিল। এক গেরস্তের ঘরে ছিল একটি মেয়ে
আর একটি ছেলে। মেয়েটি ছিল বয়সে বড়। সেই
গেরস্তের বাড়ী থেকে অনেক দূরে মেয়েটির বিয়ে হয়।
বিয়ের পর অনেকদিন আর তা’দের ভাই-বোনের দেখা-
সাক্ষাৎ হয়নি। তারপরে এক বছর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে
আম কাঁটাল পাক্তে সেই ছেলে একজন লোকের সঙ্গে
তার বোনের বাড়ীতে তত্ত্ব নিয়ে যায়। কচি বোন এত-
দিন পরে ভাইকে দেখে যে কত খুসী হল, তা ত বুঝতেই
পার। সেও তার বাপ-মাকে দেখবার জন্তে একবার
বাপের বাড়ী আসতে চাইলে। বোনের শশুর-শাশুড়ীর
অহুমতি নিয়ে ভাই বোনকে নিয়ে বাড়ীর পথে রওয়ানা
হল। বোন চলল পাক্কী চড়ে, আর ভাই সেই পাক্কীর
ধারে ধারে হেঁটে চলল।

পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে পথ ; পথের দুই ধারে নিবিড়
বন। সে বনে লোক-জন নেই, কেবল পশু, পাখী,
আর গাছপালা। চারিদিকে কোন গাঁয়ের নাম-
গন্ধও নাই, কেবল বন ধূ ধূ করছে। হঠাৎ জঙ্গল থেকে
মন্ত একটা বাঘ বেরিয়ে এল। পাক্কী বেহারারা নিজের
নিজের প্রাণ নিয়ে পালাল, সেই ছোট ছোট ভাই-
বোনদুটির দিকে একবার ফিরেও চাইলে না। কিন্তু ভাই

হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কেমন করিয়া হব তাহা আমি তখন অনাবশ্যক ভাবিণা দেখাই নাই। শহীদুল্লাহ সাহেব এই দিকেই স্কোঁ দিঘাছেন বেশী ; ভালই কবিয়াছেন।

আমার বিরুদ্ধে তাঁহার একটা কথা হইতেছে “আবেস্তার শব্দতত্ত্ব (Phonology) বৈদিক ভাষাও খাটিবে তাহার প্রমাণ কি?”

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই :—যখন অবস্থা ও বৈদিক ভাষার এতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে যে, প্রাচীন অংশে উভয়েই প্রকৃতি এক প্রকার, তখন যদি একেব শব্দতত্ত্ব অনুসরণে অস্ত্রের কোনো শব্দেব ব্যাখ্যা করা যায়, আর তাহাতে যদি কোনোকণ বিরোধ না থাকে, তবে তাহার দ্বারা কোনো অস্ট্রায় কথা হয় বলিয়া আমার মনে হয় না।

আমাব অবস্থার প্রমাণ প্রদক্ষে মৌলবী সাহেব ক্ষ-য়েব মূল সম্বন্ধে একটা অবাস্তব কথা তুলিয়াছেন; ইহা না তুলিলেও পাবিতেন, কারণ ইহাতে আমার সিদ্ধান্তের সপক্ষে বা বিপক্ষে কিছুই বলা হয় নাই। আব প্রকৃত আলোচনাতেও ইহাব কোনো আবশ্যকতা দেখা যায় না। ক্ষুত্র শব্দের ক্ষ (কৃ-ন্) মূল কৃ-ন্ হইতে, না শৃ-ন্ হইতে, ইহা আমাব মোটেই বিচার্য ছিল না; আমাব বিচার্য ছিল ক্ষ-ব কৃ-টার লোপ তা এই কৃ-টা মূলত কৃ-ন্-ব, অথবা শৃ-ন্-ব শৃ-ই হটুক, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। যাহাই হটুক, কথাটা যখন উঠিয়াছে তখন একটু আলোচনা করা ভাল।

সংস্কৃতের যে আমাব ক্ষ (কৃ-ন্) দেখিতে পাই, পণ্ডিতেরা বলেন, তাহার মূল বা প্রকৃতি একটামাত্র নহে; বিচার করিবা দেখিলে বলিতে হয়, তাহার দুইটি মূল আছে। একটি হইতেছে শৃ-ন্; যেমন, দি শৃ + হ্র = দি কৃ বু; √র শৃ + মি = র কৃ মি; ইত্যাদি। আর অঙ্কটি হইতেছে কৃ-ন্; এই মূল আদি কৃ-টা আবাব অঙ্কান্ত অক্ষর হইতে ফুটিয়া বাহির হয়; যেমন, √র চ্ (>র কৃ) + স্ত + তি = র কৃ য় তি; √দ হ্ (<দ য্) + স্ত + তি = দ কৃ য় তি; ইত্যাদি। কিন্তু যেখানে এইরূপ ধাতু-প্রত্যয়াদি নাই যাহাতে কৃ-ব মূল প্রকৃতি শৃ-ন্ অথবা কৃ-ন্ স্থির কবিতো পাবা যায়, সেখানে তাহা জানিবার উপায় কি? পণ্ডিতেরা (Jackson, Pichel, Hubschmann, Macdonell) বলেন ইরানী ভাষাব সাহায্যে সর্বত্রই ইহা ঠিক কবিতো পারা যায়। তাহার দৈখিয়াছেন, মূলত যেখানে শৃ-ন্, অবস্থায় দেখানে বৃ; আব যেখানে মূলত কৃ-ন্, অবস্থায় দেখানে ষ-বৃ। মহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব এই মতে অতিবিস্তৃত বিবাস স্থাপন কবিয়াছেন, মনে হইল।

বস্তুত, ইরানী ভাষাব সাহায্যে সংস্কৃত কৃ-ব মূল নির্দেশেব এই মতটি আংশিক সত্য হইলেও, আমাব মনে হয়, সম্পূর্ণ সত্য নহে; ইহাব বহু বহু ব্যক্তিচাব আছে। কয়েকটি দেখাই :—

স. (=সংস্কৃত) √ কৃ য় নৃ (ক্ষন্), অ. = অবস্থা √ খৃ য় নৃ ‘আঘাত কবা,’ ‘পীড়ন কবা,’ ইহা হইতে অ. খৃ য়া নৃ ‘দুঃখ,’ ‘সম্বৃত্তি’; আবাব যত, স. কৃ য় ত (ক্ষত); অ. হ য় ত, স. সূ কৃ য় ত (সূ ক্ষত); অ. য য় ও য ‘ক্ষত,’ ‘কাটা’ ‘অস্ত্রের আঘাত’। এখানে সংস্কৃতের কৃ-ব স্থানে অবস্থায় খৃ-ব ও বৃ দুই-ই দেখা যাইতেছে। পুরোক্ত মত অনুসরণ করিলে এখানে সংস্কৃতের কৃ-ব দুইটি মূল ধবিতো হয়, কৃ-ন্ ও শৃ-ন্, কিন্তু বস্তুত তাহা বলিতে পারা যায় না, অসম্ভব। নিম্নলিখিত উদাহরণ-গুলিতেও এইরূপ বৃদ্ধিতে হইবে।

স. √ কৃ য়ি (ক্ষি), অ. √ খৃ য়ি ‘বাস কবা’। ইহা হইতে অ. খৃ য় এতী(২), স. কৃ য়ে তি; অ. ব য় ন ‘বাসধানী,’ ‘প্রবাস নগর,’ স. কৃ য় ন, ‘বাসস্থান’; অ. যি তি, স. কৃ য়ি তি।

স. √ কৃ য়ি, অ. √ খৃ য়ি ‘ক্ষয় কবা’ ‘ক্ষয় হওয়া’। ইহা হইতে অ. খৃ য় এ ন, স. (* কৃ য়ে ন =) কৃ য়ি ন; আবাব অ. ব এ ত, - স. * কৃ য়ে ত ‘গর্ভপাতের ঔষধ বিশেষ’।

স. √ অ কৃ য়, অ. √ অ খৃ য় ‘দেখা’ (তুল : স. √ দ্র কৃ য়)।

ইহা হইতে অ. অ ই ত্যা খৃ য়ে ই স্থি, স. অ ত্যা কৃ য় স্থি (= অ ভি + অ + অ কৃ য়) ; আবাব অ. অ য়ি, স. অ কৃ য়ি।

এইরূপ আবো উদাহরণ দিতে পারা যায়। অতএব বলিতেই হইবে ইরানী সাহায্যে সংস্কৃত ক্ষকাবের মূল প্রকৃতিকে (অর্থাৎ শৃ-ন্, অথবা কৃ-ন্-কে) সর্বত্র নির্ণয় করা যায় না। তাই ঐ মতটির উপর নির্ভর করিয়া কোনো সিদ্ধান্ত কবিলে তাহা অজ্ঞান হইতে পাবে না।

মহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের দ্বিতীয় কথা হইতেছে “যদিও পঞ্চাবী ও আধুনিক পাবনীতে (৩) মূল শৃ-ন্ ও কৃ-ন্ উভয় স্থানে য (শীন) হয়, কিন্তু প্রাচীন অবস্থায় ভাষায় কিংবা প্রাচীন পাবনীতে এইরূপ দেখা যায় না।” প্রাচীন পাবনীর সম্বন্ধে এখন কিছু বলিতে পারিতেছি না, কিন্তু প্রাচীন অবস্থা বলিতে যদি তিনি অবস্থাব গাথা অংশকে (Gatha Avesta) মনে কবিয়া থাকেন (পাখা-অংশই অবস্থাব সর্বপ্রাচীন), তবে তাহার সেকথা ঠিক বলিতে পাবি না। পরবর্তী অবস্থার (Younger Avesta) কাজ নাই, গাথা হইতেই কয়েকটি উদাহরণ দিই :—

বহিঃস্থোইশতি গাথায় (যন্ত্র, ৪৩-৮) “মো বৃ (চা অন্ত),” স. ম কৃ বৃ (চ অন্ত)।

শেষস্তমইম্ম গাথায় (যন্ত্র, ৪৮-১১) “হ যি তি শৃ,” স. হ কৃ য়ি তি।

অননবইতি গাথায় (যন্ত্র, ৩৮-৩) “মো উ রু চ ব নে,” স. উ য় চ ক্ষ নে।

উশ্চাবইতি গাথায় (যন্ত্র, ৪৬-৪) “মো ই থু হা,” স. কৃ য়ে ত্র শু (< √ খৃ য়ি = √ কৃ য়ি)।

এইরূপ আরো উল্লেখ কবিতো পারা যায়।

দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের (অর্থাৎ আলোচ্য স্থলে আমাব প্রদর্শিত মবাসী-প্রভৃতি) শব্দবিকােরেব দ্বারা প্রথম স্তরের (অর্থাৎ আলোচ্য স্থলে বৈদিক) শব্দেব ব্যাখ্যা ঠিক নহে। ইহা অনেকটা সত্য। কিন্তু আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আমাব এই জাতীয় শব্দগুলি উল্লেখেব একমাত্র উদ্দেশ্য ইহাই দেখান যে, প্রথম হইতে পরবর্তী কাল পর্যন্ত ভাষার এইরূপ একটা ধাবা চলিয়া আসিয়াছে। যদি সর্বনিম্নস্তর পর্যন্ত ভাষার একটা ধাবাবাহিক গতি দেখা যায়, তবে প্রথম স্তরের শব্দেব আলোচনায় তাহার উল্লেখ দোষবহ মনে হয় না। যদি কেবলমাত্র নিম্নস্তরেরই শব্দবিকােরেব দ্বারা ঐ আলোচনা করা যায়, তবে তাহা খুবই আপত্তিজনক, সন্দেহ নাই। তবুও, এ স্থলে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, পৈতৃক গুণ-দোষ যেমন কখনো মধ্যবর্তী কোনো পুরুষে অক্ষুট থাকিয়াও পরবর্তী কোনো পুরুষে আবাব ফুটিয়া উঠে, শব্দবিকাের সম্বন্ধেও সেইরূপ কোনো নিয়ম মধ্যবর্তী স্তরে তিরোহিত থাকিলেও কোনো পরবর্তী স্তরে পুনর্বার তাহার আবির্ভূত হইবার সম্ভাবনা আছে।

মবাসীতে সংস্কৃত ক্ষ স্থান-বিশেষেব স বা শ হয়, ইহা আমি বলিয়াছি,

প্রয়োজনও নাই। ঈকারটাই বা কেন? আমাদেব উচ্চারণেও ইহা পাওয়া যায় না। তাই আমাব মনে হয় Indo-Iranian স্থলে হি দ্-ই বা নী য় লিখিলে ভাল হয়।

২। এ স্থানে বলা আবশ্যক এই শব্দটির অনেক পাঠভেদ আছে, খৃ শ এতী, য এতী, ইত্যাদি।

৩। প্রচলিত দ্বার সী লিখিতে আপত্তি কি?

বনমানুষের হাসি মানুষের হাসির মতই। শিম্পাঞ্জীর মত বিকট শব্দ করিয়া তাহারা হাসে না। বনমানুষের স্বজাতি-প্ৰীতি বড় বেশী আছে। একসঙ্গে দুটি বনমানুষ থাকিলে তাহারা বেশ হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটায়, তবে শিম্পাঞ্জীর মত বীভৎস রকমের চোঁচামেচি করে না। বনমানুষ ভাতা-বনমানুষের জন্ত প্রাণ দিতেও কসুর করে না। দু-একটি বনমানুষ আবার অল্প ছোট জন্তুদের বড় স্নেহের চোখে দেখে। প্রিয় ছোট জন্তুটির অনেক আবদার সে সহ করে। এক চিড়িয়া-খানায়



ছুরীকাটা না চলে পাওয়া হয় না



সিগারেটটাও চলে

একটা বনমানুষের একটা পোষা বানর ছিল। বানরটা বনমানুষটিকে কত রকমে যে জ্বালাতন করিত তাহার ঠিক নাই।

বনমানুষ নিজের প্রয়োজনের জন্ত আশ্চর্য্য বুদ্ধি-কৌশল দেখায়। এক ভদ্রলোকের পোষা বনমানুষটি সত্তরটি কথার মানে বুঝিতে পারিত। নানা রকমের মুদ্রা চিনিতে পারিত। কোন একটি বিশেষ মুদ্রা একগাদা মুদ্রা হইতে তুলিতে বলিলে সে বাছিয়া ঠিক মুদ্রাটি তুলিত, কোন প্রকার ভুল হইত না। একবার একটা আলোর তেল গরম হইয়া, আলোটা ফাটিয়া যায়। তাহাতে বন-

মানুষ বেচারী আহত হয়। সেই হইতে সে আলোর কাছে ঘেঁসিত না। একটু জোরে আলো জ্বলিলে সে চীৎকার করিয়া অস্থির করিত। আলো কমাইলে তবে সে শান্ত হইত। এই বনমানুষটির নাম ছিল জো। একদিন তাহার খাঁচার বাইরে একটা বাদাম পড়িয়াছিল, জো অনেক চেষ্টা করিয়াও কোনরকমেই হাত দিয়া ঐ বাদামটার লাগাল পাইল না। অথচ বাদাম খাইতেই হইবে। তখন সে ঘা কাণ্ড করিল তা অদ্ভুত। তাহার গায়ে যে জামা ছিল, তাই খুলিয়া বাদামটার উপর ছুড়িয়া বাদামটাকে খাঁচার নিকট টানিয়া লইল। তারপর বাদাম খাওয়া হইলে পর সে আবার জামা পরিল।

জো কোনরকমের ঔষধ খাইতে ভালবাসিত না। একবার তাহাকে কয়েকটা ঔষধের বড়ী কলার মধ্যে পুরিয়া খাইতে দেওয়া হয়। সে হঠাৎ পিল দেখিয়া কলাটা ফেলিয়া দেয়। এবং তারপর তাহার রক্ষকের মুখের দিকে এমন করিয়া তাকায়, ঠিক যেন বলিতেছে—“পৃথিবীতে তোমার কাছে এমন বিশ্বাসঘাতকতা প্রত্যাশা করি নাই।” তারপর হইতে জোকে কলা দেওয়া হইলে সে ভাল করিয়া দেখিয়া খাইত, বা ফেলিয়া দিত। জো মারা যাইবার পূর্বে তাহার ভয়ানক অসুখ করে। ডাক্তার সাহেব আসিলেন। তিনি জোকে দেখিয়া তাহাকে ইনজেক্সন্ দিবেন স্থির করিলেন। দুচারবার ইনজেক্সন্ দিবার পর তৃতীয়বার যখন ডাক্তার আসিলেন, তখন

এবং এ বিষয়ে তিলদ্বারাও সন্দেহ নাই ; কিন্তু কিরূপে হয় তাহা আমি বলি নাই। মহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব ইহা বলিয়া ভালই করিয়াছেন। আমাব এখন মনে হইতেছে, মবাসীর উদাহরণটা না দিলেই ভাল হইত। কিন্তু পরবর্তী সাহিত্যের শি প্রা শব্দ যে ক্ষি প্রা হইতে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। ইহা তাঁ হা বো নিকটে “সন্দেহজনক” হইবে বলিয়া মনে হয় নাই, সংস্কৃতের ক্ষ মবাসীতে স হয়, ইহা তিনি জানেন, স্বীকারও করিয়াছেন। ভালব্য বা কষ্টতালব্য স্ববৎস যোগ হইলে এই সকারই শকার হয়। যেমন, স. ম ক্ষী, ম. মা শী ; স. ক্ষে ত্র, মবাসী শে ত। এই নিয়মেই ক্ষি প্রা > শি প্রা। ইহাতে সন্দেহ কোথায় জানি না। তাহা ছাড়া, বৃহৎসংহিতা ও ব্রহ্মপুরাণ হইতে শি প্রা ব পাঠান্তরে যে ক্ষি প্রা শব্দের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাব কি কোনো মূল্য নাই? আমাব বঙ্গকে আমি একবার ঐ মূল বই দুইখানি (উল্লিখিত সংস্করণের) দেখিতে অনুবোধ করি। তবুও তিনি যদি সন্তুষ্ট না হন, তবে অসন্তোষের কারণটা জানিতে চাই, উত্তর দিবার চেষ্টা কবির—যদি কিছু উত্তর থাকে।

শ্রী বিদুশেখর ভট্টাচার্য্য

গত জ্যৈষ্ঠমাসের প্রবাসীতে মহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের লিখিত “শূদ্র” নামক “আলোচনা” চোখে পড়িল। তিনি স্থানবাচক Sudrai হইতে শূদ্র শব্দের উৎপত্তি অনুমান করেন। পণ্ডিতপ্রবর বিদুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে নাকি “সুদ্র” হইতে “শূদ্র” শব্দের উদ্ভব হইয়াছে—আমি তাহাব মূল প্রবন্ধ দেখি নাই।

আমার মনে হয়, যে দেশে যে শব্দের প্রচলন, এবং যে সময়ে ঐ শব্দ প্রচলিত ছিল, সেই দেশের এবং সেই সময়ের না হউক, অন্ততঃ তাহাব নিকটবর্তী সময়ের প্রচলিত ব্যুৎপত্তি জানিতে পারিলে আব সেই শব্দের ব্যাখ্যার ক্ষমতা বিদেশীয় ভাষা বা শব্দের আশ্রয় গ্রহণ সম্ভব নহে—তাহাতে অনেক সন্দেহই ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে।

গ্রীষ্মের জন্মের বহুপূর্বে পাণিনির ব্যাকরণের উপাদি প্রকরণে গুণ শব্দের ব্যুৎপত্তি লিখিত হইয়াছে। উপাদির তৃতীয় পাদেব ১৯ সংখ্যক বৃত্ত—“শুচেরক”। বৃত্তানুবাদ—শুচধাতু ব অর্থাৎ শুচ ধাতু ব অন্ত্যবর্ণের স্থানে ‘দ’ও হইবে। “বক্” প্রত্যয় প্রসঙ্গে এই নৃত্য রচিত হইয়াছে এবং তদুপলক্ষে এই বৃত্তের পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অদ ধাতু ব হ্রস্ববর্ণ দীর্ঘ হইবে। সুতরাং “চ” বা “ও”এব অর্থাৎ বক্ প্রত্যয় হইলে শুচ এর উ স্থানে উ হইবে আর চ স্থানে ‘দ’ও হইবে। তত্ত্ববোধিনী টীকা এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“শুচ শোকে, তদ্রূপক, দশ্যাস্তাদেশঃ, ধাতোদীর্ঘশ্চ। গুত্রো—বৃষলঃ।”

সারস্বত ব্যাকরণেও শুচ ধাতু হইতেই নিম্নলি ‘শুচ’ শব্দের দ্বারা শূদ্র শব্দ সাধন করা হইয়াছে। সারস্বতের ব্যাখ্যা—“শুচঃ দ্রবতীতি শূদ্রঃ” (শুচ + দ্র + ড)—যে শোকগ্রস্ত সেই শূদ্র। বৃত্ত “শুচঃ শূদ্রে” —শুচঃ শূদ্রদেশো ভবতি ত্রেপবে (শুচঃ + ত্রেপ = শুচ্ প্রথমার এক বচনে শুক্)।

শোক বা তমোভাবের প্রাবল্যের ক্ষমাই যে শূদ্র আখ্যাব সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ব্যাসদেবের উত্তরতন্ত্র পঞ্চালিখিত বৃত্ত হইতে আবও সম্ভব হয়—“শুগস্য তদনাদরশ্রবণং”, ইহার শোক আছে, তন্নিমিত্ত (ধর্মো-পদেশাদি?) অনাদরের সহিত শ্রবণের ক্ষমতা এ “শূদ্র”।

স্রুতিতেও “অহা হা রে ঙ্গা শূদ্র” এই প্রয়োগ আছে। এখানে শূদ্র শব্দের অর্থ ঋচি অর্থাৎ প্রচলিত জাতার্থবাচক নহে—এখানে শূদ্র যৌগিক শব্দ (তত্ত্ববোধিনী)। সুতরাং মানসিক অবস্থা বা গুণ বিশেষের অধীনস্থ বৃদ্ধিই বাব জন্যই যে এই শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা আবও সমর্থিত হইতেছে।

আমাব মনে হয়, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের অশৌচের সময়-পরিমাণও এই মাপকাঠি দ্বাৰাই নিৰূপিত হইয়াছে, যে তমোভবে সর্কাপেক্ষা অধিক অভিস্কৃত তাহাব অশৌচের কালও তদমুপাতে সর্কাপেক্ষা অধিক। “চাতুর্বিধ্যং যথা সৃষ্টং গুণকল্পবিশাগণঃ” গীতার এই উক্তিও এই ব্যুৎপত্তির আব-একটি অনুকূল প্রমাণ।

শ্রী দীনেশচন্দ্র কবিরত্ন

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় আমাদের শূদ্র শব্দের আলোচনায় যোগ দিয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, আমাব মূল প্রবন্ধটি তিনি দেখেন নাই; দেখিলে ভাল কবিতেন, এবং দেখা খুবই উচিত ছিল; ইহা দেখিলে, তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা লিখিবাব প্রয়োজন হইত হইত না। তাহার লিখিত ছান্দোগ্য, ব্রহ্মসূত্র ও পাণিনির উপাদি বৃত্তের কথা আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। সারস্বত ব্যাকরণের কথা ব্রহ্মসূত্রে দেখিবার লেখা হইয়া থাকিবে। ভাষাতত্ত্বকে অনুসরণ না করিলে শব্দের ঠিক ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে পাণিনি হইতে আবস্ত কবিয়া যত ব্যাকরণ আছে তাহাব কোনো একখানিতেও সর্কা ব্রহ্মসূত্রের ভাষাতত্ত্বকে অনুসরণ করা হয় নাই। তাই এক-একটা শব্দের ব্যুৎপত্তিতে এত কষ্ট-কল্পনা করা হইয়াছে যে, তাহা বলিবার নহে; ইহাতে দুঃখও হয়, হাসিও পায়। ব্যাকরণগুলি বহুল্যে যেমন-তেমন কবিয়া যেরূপই হউক একটা ব্যুৎপত্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছে। অত্যন্ত প্রসিদ্ধ অর্থটী ছাত্রের কাছে ধরিয়া দিয়াছে, কিন্তু কিরূপে সেই অর্থটা হইল তাহা দেখাইতে পারে নাই, তাহা তাহাদের লক্ষ্যও ছিল না। এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, ইহা তাহাব স্থান নহে। একটা মাত্র উদাহরণ দিই :—

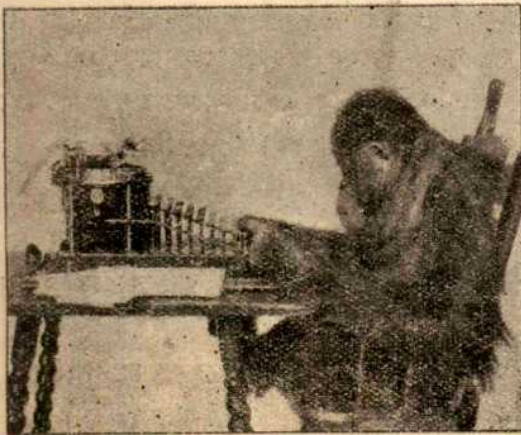
পাণিনি হইতে আবস্ত কবিয়া সমস্ত ব্যাকরণকারী বলিয়াছেন √দৃশ ধাতু স্থানে প শ্য আদেশ হয়। কিন্তু কিরূপে ইহা হইতে পারে? √দৃশ ধাতুর দ স্থানে এখানে প কিরূপ হইবে? কখনো ইহা হইতে পারে না। আসল কথাটা হইতেছে প শ্য তি প্রভৃতি পদ √দৃশ হইতে মোটেই হয় নাই। ইহাবা হইয়াছে √স্পশ্ ‘দর্শন করা’ হইতে। যেদে প স্প শে, প স্প শা ন প্রভৃতি পদ প্রসিদ্ধ। লৌকিক সংস্কৃতেও ইহাব তিনটি পদ পাওয়া যায় (—যদিও ক্রিয়াক্রমে ব্যবহার নাই) :—প স্প শা ‘ব্যাকরণ-মহাভাষ্যের প্রথম আধিক্যের নাম’, স্প শ ‘চব’, ও স্প ষ্ট। পাণিনি লৌকিক সংস্কৃতে √স্প শের সাধারণতঃ অপ্রচলন, ও √দৃশে ব বহুল প্রচার দেখিয়া বলিয়াছেন √দৃশে ব স্থানে প শ্য আদেশ হয়। শব্দের আদিতে সংস্কৃত উষ বর্গের উচ্চারণ হ্রস্ব নহে বলিয়া ভাবতীষ ভাষা তাহাব পরিত্যাগের দিকে প্রবণতা দেখা যায়, যেমন √স্প ল্ হইতে প স্প ল্মে (স্প স্প ল্মে নহে)। এখানেও সেইরূপ √স্প শে ব আদিস্থিত সকারটি লোপ হওয়ায় প শ (প শ্য) হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ‘চব’ অর্থে আমাদের স্প শ ও ইংরেজী Spy একই, এবং একই ধাতু হইতে (Cf. Lat. Spicio, Germ. Spehon)। একমাত্র ভাষাতত্ত্বকে অনুসরণ কবিলেই এই তথ্যটা জানা যাইতে পারে, কেবল আমাদের প্রচলিত ব্যাকরণের দ্বাৰা ইহা পাওয়া যাইবার উপায় নাই, ব্যাকরণ যদি ভাষাতত্ত্বের অনুসরণে লিখিত না হয় তবে বহুল্যে ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। ব্যাকরণের যে নিয়ম ভাষাতত্ত্বের অবিকল তাহা নিশ্চয়ই প্রমাণ, কিন্তু বিরুদ্ধ হইলে তাহা মানিতে পারা যায় না। এইজন্যই আমি আমাব মূল প্রবন্ধে কবিরত্ন-মহাশয়ের প্রদর্শিত ব্যুৎপত্তি দুইটিকে পবিত্যাগ করিয়াছি, তিনি ইহা দেখানে দেখিতে পাইবেন।

শ্রী বিদুশেখর ভট্টাচার্য্য



বনমাহুঘের কথা

বনমাহুঘই নাকি মাহুঘের পূর্বপুরুষ। অনেক পণ্ডিত এই মত সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, যদিও এই কথাটা বিশ্বাস করিতে আমাদের অনেকের ইচ্ছা হয় না, কারণ ভাল লাগে না। বনমাহুঘের বুদ্ধি পশুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। শিম্পাঞ্জী অপেক্ষা বনমাহুঘ অনেক স্থির এবং ধীর। শিম্পাঞ্জীর ছটকটানিকে বনমাহুঘ ছেলে-মাহুঘী বলিয়া তত বেশী পছন্দ করে না। বনমাহুঘ যখন জঙ্গলে থাকে, সে বড় একটা মাটিতে নামে না। অবশ্য যখন শীকারীর বন্দুকের গুলি খায় তখন আহত হইয়া অনেক সময় তাহাকে বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া মাটি আশ্রয় করিতে হয়। যখন জল-তৃষ্ণা পায়, সে জলের ধারের কোন একটা গাছের ডালের একেবারে আগায় গিয়া বসে। ভারের চোটে ভালটা হুইয়া যখন জলের খুব স্কাছাকাছি যায়, তখন বনমাহুঘ জলপান করে। বনমাহুঘ বন্দী হইবার পর, গভীর মনের ছুখে খাঁচার



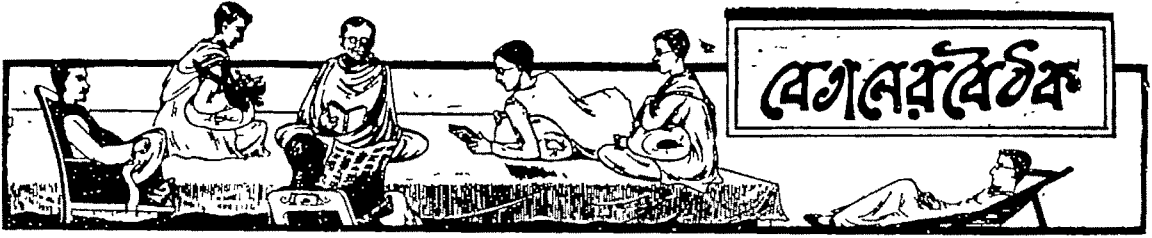
কাজের সময় কাজ

একটা পাশে চোখ বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তাহাকে দেখিলে, আমাদের হয়ত কষ্ট হইবে না, কিন্তু স্বাধীনতা-পিয়াসী লোকের সত্যই কষ্ট হয়। তবে বাচ্চা অবস্থায় তাহাকে বন হইতে বন্দী করিয়া আনিলে সে বন্দীশালাতেও বেশ থাকে। তাহাকে যে যত্ন করে, খাওয়ায় পরায়, তাহার সঙ্গে বনমাহুঘ-বাচ্চার বেশ ভাব হয়।

মিঃ শিক্ নামে এক ভদ্রলোক এক জন্তু-দলের সঙ্গে সহরে সহরে ঘুরিয়া পশু-পক্ষী সংগ্রহে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। একদিন তিনি বক্তৃতা শেষ করিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া আছেন। এমন সময় হটাৎ কে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। তার পরেই দেখিলেন, একটা বনমাহুঘ বাচ্চা তাহার খাঁচার দুয়ার খুলিয়া বাহির হইয়া, তাঁহার কোলের উপর আয়েস করিয়া বসিল।

নিউ ইয়র্ক জন্তুশালায় দেখা যায়, বনমাহুঘ তাহার পালকের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছে। পালক হয়ত দৌড়াইয়া তাহার কাছ হইতে দূরে পলাইতে চায়, বনমাহুঘও লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ডিগ্বাজি খাইতে খাইতে তাহার সঙ্গে দৌড়াইতেছে। অনেক বনমাহুঘকে টেবিলে বসিয়া ছুরি কাঁটার সাহায্যে খাইতে দেখা যায়, বোতল হইতে মদ গেলাসে ঢালিয়া খাইতেও অনেক সময় দেখা যায়।

১৯০৮ সালের নিউ ইয়র্ক পশু-প্রদর্শনীতে একটা ছ-বছরের বনমাহুঘ বাচ্চা আনা হইয়াছিল। সে তাহার সহবাসী শিম্পাঞ্জীটাকে বড় ভয় করিত। শিম্পাঞ্জীটা তাহার দিকে কিরিয়া দাঁত খিচাইলেই সে দৌড়াইয়া গিয়া, তাহার পালকের গলা জড়াইয়া ধরিত। এমন করিয়া তাকাইত যাহাতে মনে হইত, সে যেন বলিতেছে—“ওগো, আমাকে ঐ অসভ্য কুৎসিত জানোয়ারটার হাত হইতে রক্ষা কর।”



জিজ্ঞাসা

(২৪)

সন্ধ্যার তৈল জ্বলে ফেলিলে নানা বকম রং দেখা যায়। ইহাব কারণ কি ?

শ্রী

(২৫)

মানুষের দাঁত পড়িয়া যায় কেন ? বালকের দাঁত পড়িয়া গিয়া আবার হয়, কিন্তু বৃদ্ধের হয় না কেন ?

শ্রী নরেশচন্দ্র দে

(২৬)

শীতকালে নারিকেল তৈল জ্বমে, সন্ধ্যার তৈল জ্বমে না কেন ?

শ্রী মেঘমালা সেন

(২৭)

বিশালে নানা রকমের ধাতুই উৎপন্ন হয় ; কিন্তু ববিশাল হইতে আমদানী চাউল মাত্রই “বালাম” বলিয়া প্রসিদ্ধ। কোন একটা স্বল্প রকমের ধাতু হইতে যে চাউল হয় তাহাই “বালাম”, না ববিশাল হইতে আমদানী যে কোন রকমের চাউলের নামই “বালাম” ?

শ্রী গিবীন্দ্রনাথ চন্দ্র

(২৮)

“কতকাল পবে, বল ভাবত বে” শীর্ষক প্রসিদ্ধ কবিতাটির অন্তর্গত নিম্নলিখিত দুই চরণের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি ?

“ঘুচি কাকিন-ভাজন সোঁধ-শিরে,
হ’লে ইক্ষন কাচ প্রচার ঘরে।”

শ্রী—

(২৯)

একটি পাত্রে জল বাধিলে তাহার তলাটা অপেক্ষাকৃত উঁচু দেখায কেন ?

মনোবজ্ঞন সেনগুপ্ত

(৩০)

১। “Sinn Fein” ও “Bolshevik” বা “Bolshevism” কোন্ ভাষার কথা ? তাহাদের প্রকৃত (root) অর্থ কি ?

(৩১)

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে নিম্নলিখিত ছত্র কথটি পাইয়াছি। অর্থ কি ?

বনেতে জনম তার নহে ত হবিণী ।
অনেক আহার করে নাহি ষায় পানী ॥
বুঝিয়া চলিয়া বার্তা দেয় আসি কানে ।
বীবের কিস্কর নহে বুঝি সিয়ানে ॥

শ্রী অমলাবালা ঘোষদ্বায়

(৩২)

প্রাগ্জ্যোতিষপু ব কোষাধ ?

১। সাহেবেবা বলিয়াছেন আসাম প্রদেশের কামরূপ বা ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী গোহাটীকে পূর্বকালে প্রাগ্জ্যোতিষপু বলিত। আমবাও তাহাই অমরবণ কবি। প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অধিপতি ছিলেন ভগদত্ত । ইনি নবকাহ্নবেব পুত্র ।

২। মহাভারতের সভা-পর্বে দেখা যায় অজুর্ন দিগ্বিজয় কবিত্তে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে উত্তরদিকে যাইয়া প্রাগ্জ্যোতিষপুবাধিপতি ভগদত্তকে জয় কবিয়া আবার উত্তরে কাশ্মীরও জয় কবিয়াছিলেন (২৬ অঃ ৭—৯ শ্লোক)। কর্ণও দিগ্বিজয় করিতে হস্তিনাপুর হইতে উত্তর দিকে যাইয়া ভগদত্তকে জয় করেন (বনপর্ব—২৫৩ অঃ ৪১ শ্লোক)। এই ইন্দ্রপ্রস্থ এবং হস্তিনাপু হইতে কামরূপ এবং গোহাটী পূর্ব দিকে ।

৩। মহর্ষি বাণীকিব বচিত বামায়ণেব কিক্কিয়া কাণ্ডে দেখা যায় সীতাব অন্বেষণার্থ পশ্চিমদিকে প্রেবিত বানরসেনাকে হুগ্রীব বলিয়াছিলেন—

যোজনানি চতুঃষষ্টিবরাহো নাম পর্বতঃ ।

হুবর্ণপুঙ্গবঃ স্রমহানগাধে বরুণালয়ে ॥ ৩০

তত্র প্রাগ্জ্যোতিষ নাম জাতকুপময়ঃ পুত্রম্ ।

তস্মিন্ বসতি দুষ্টান্না নরকে নাম দানবঃ ॥ ৩১

(৪২ সর্গ)

হুগ্রীব মন্কিণ ভাবতের ষষ্ঠমুক পর্বত-শিখর মালাবান হইতে এই কুখা বলিয়াছিলেন। এই পর্বত হইতে আসাম প্রদেশ উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত। এবং ইন্দ্রপ্রস্থ ও হস্তিনা উত্তর দিকে। অতএব বামায়ণে নির্দিষ্ট প্রাগ্জ্যোতিষপু ইন্দ্রপ্রস্থ ও হস্তিনাপু হইতে পশ্চিমোত্তর কোণে অবস্থিত। এবং ভগদত্তের পিতা নরকাহ্নব ইহার অধিপতি ।

সাহেবেবা বলেন, প্রাগ্জ্যোতিষপু পূর্বদিকেব আসামে। মহাভারত বলেন উত্তরদিকে এবং বামায়ণ বলেন পশ্চিমদমুদ্রে, অতএব কোন্ট প্রকৃত প্রাগ্জ্যোতিষপু ?

শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ দেব

মীমাংসা

পুরুষে ভূতে দেওয়া

আধাডেব প্রবাসীতে শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন যে “পুষ্করিণীর জলে ভূতে ব্যবহারে মৎস্যেব কোন হানি হয় না।” আমি কিন্তু স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে ভূতে দিলে মাছ মবিয়া যায়। পোনের ষোল বৎসর গত হইল ঐহট্টেব পুলিস লাইনের একটা বড় পুষ্করিণীতে

নাকি বিষে পরিণত করিয়া দেয়। পারসীকরা কুকুর বিড়াল হত্যা করে না, কারণ অনেক সময় তাহাদের মধ্যে জিন এবং আফ্রিটস্‌রা বাস করে। তাহারা দেহ-ছাড়া হইলে হত্যাকারীর অমঙ্গল হয়। কারমান সহরে লোকের বিশ্বাস যে, সোমবার সাপ মারিলে পাশের বাড়ীর কেহ না কেহ মরিয়া যাইবে। চড়ুই পাখীরা গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করে। পেঁচা বড় খারাপ। নারীরা স্বপ্নেও খুব বিশ্বাস করে। নারীদের এই রকমের অনেক কু-সংস্কার আছে।

বুধবার বড় অশুভ দিন। এই দিন নাকি পৃথিবীর শেষ বিচার হইবে। এই দিনে সবাই গৃহের বাহিরে কাটায়। বুধবারে তাহারা কাহারো সঙ্গে কলহ করে না। পারস্যের শাহের যাহাকে ইচ্ছা ঘোমটা খুলিয়া দেখিবার অধিকার আছে। যে নারীকে তিনি দেখেন, তাহার ভাগ্য নাকি বড়ই ভাল।

দূরে যাত্রা করিবার পূর্বে নারীরা দান করে, তাহাতে পথের বিপদ নাকি কাটিয়া যায়। ভৃত্য প্রভুপত্নীকে আয়না দেখায়, জলে ভাসা ফুল দেখায়, বা এক-রকমের লতা পোড়ায়। এই-সব করিলে নাকি পথে কোন বিপদ ঘটে না।

যাত্রার পূর্বে হাঁচি হইলে, অনেক ক্ষেত্রেই সেই দিনের মত যাত্রা বন্ধ করা হয়। কিন্তু হাঁচির ভাল গুণও আছে। কেহ কোন কিছু মনে মনে কামনা করিতেছে, এমন সময় যদি কেহ হাঁচে, তবে তাহার সে কামনা পূর্ণ হয়।

পারস্য দেশে রোগকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। “গরম ব্যাধি” এবং “ঠাণ্ডা ব্যাধি”। গরম রোগের (যেমন জ্বর) ঔষধ—রোগীকে বরফের মত ঠাণ্ডা জলে চোবান। নানা প্রকার মন্ত্রাদির দ্বারাও রোগ দূর করিবার ব্যবস্থা আছে।

মেয়েদের একটু বয়স হইলেই তাহারা স্বর্গ-লাভের

উপায় চিন্তা করে। সমস্ত গহনাাদি বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ জোগাড় করিয়া স্বামীর অমৃত্যু লইয়া, মক্কা বা কারবালা তীর্থে যাত্রা করে। যাহাদের অতদূর যাইবার সামর্থ্য নাই, তাহারা যেসেদের ইমাম রেজা মন্দিরে তীর্থ করিয়া আসে। এই তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিলে তাহার নাম হয় মাহসুতাদি। যাহারা মক্কা বা কারবালা ঘুরিয়া আসে তাহাদের লোকে হাজি এবং কারবালা বলে।

তীর্থ-যাত্রীকে পথে অনেক কষ্টভোগ করিতে হয়। খচ্চরের পিঠে এক-রকমের ঝুড়ির মত বসিবার বন্দোবস্ত থাকে। ইহাকে কাজাভেহ্ বলে। যাত্রীকে আপাদ-মস্তক কালো চাদরে ঢাকিয়া যাইতে হয়। চোখের কাছে একটু খোলা থাকে। পথে যে-সমস্ত সরাই আছে, সেখানে থাকার কষ্ট অসীম। ঘরের বন্দোবস্ত এক-প্রকার নাই বলিলেই হয়। পথের নানা-রকম কষ্ট পার হইয়া যখন যাত্রী তীর্থে উপস্থিত হয়, তখন সে সেখানে বছর-খানেকের মত থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া লয়। এই এক বছর সে রোজ মসজিদে যায়, দান-ধ্যান করে, কোরাণ-পাঠ শোনে। দিনের অল্প সময় নিজের দেশের আগত বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্পগুজব করিয়া কাটায়। তীর্থে মরণ হইলে তাহার স্বর্গ লাভ হইবেই। তাহাকে ঘরের ভাবনা ভাবিতে হয় না, কারণ স্বামীই সেখানেই সব কাজের কর্তা। ছেলে-মেয়েরাও দাসদাসীদের কাছে বেশ সুখেই থাকে। গৃহিণী মারা গেলেও পরিবার যেমন তেমনিই থাকে। তীর্থস্থানে মরণ হইলে একটা ঘর-তার পুরানো কবরে তাহাকে গোর দেওয়া হয়। দেশে ফিরিয়া মরণ হইলে বেশী ভাগ লোকেরই কুমের মসজিদের নিকটেই গোর-স্থানে কবর দেওয়া হয়। পারস্য দেশের অনেক স্থান হইতেই এখানে মৃতদেহ সমাধি বাস করিতে আগম্য করে।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

তুঁতে দেওয়া হইয়াছিল। প্রায় দুই ঘণ্টা পরেই ছোট বড় মাছ মুমূর্ষু হইয়া চিং হইয়া ভাসিয়া উঠিল।

শ্রী বীরেশ্বর সেন

(২০)

“বদর বদর”

শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত বদরপুর নামক স্থানে শাহ বদর নামে খুব বড় এক গীর ছিলেন। তাঁহার নামেই স্থানের নাম বদরপুর হয়। বদরপুরের ধারে বরাবর নদীতে তখন প্রায়ই নৌকা মারা পড়িত। গীর শাহ বদরের নাম লইয়া নৌকা ছাড়িলে নাকি কোন বিপদপাত হইত না। তাই মাঝিরা “বদর” “বদর” বলিয়া নৌকা ছাড়িত। পুণ্ড্রবর্ষে অনেক লোক শ্রীহট্টের এই অঞ্চলে ব্যবসাবাণিজ্যে আসে। সম্ভবতঃ তাহাদের ঘাবাই ইহা পূর্ববঙ্গে নীত হইয়াছে।

মহিউদ্দীন আহমদ চৌধুরী

মোহম্মদ আব্দুল বারী

শ্রীহট্ট অমৃত পালিত

(২১)

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞান

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। উক্ত বিদ্যালয়ের খবর শ্রীযুক্ত ক্ষণিকনাথ বসু, এম-এ, প্রণীত “নালন্দা” পাঠে পাওয়া যাইবে।

শ্রী মেহাশুভ্রবর্ণ বক্সী

শ্রী মনোরঞ্জন ভৌমিক

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হইত :—

- ১। চিকিৎসা-বিজ্ঞান।
- ২। বসু-বিজ্ঞান।
- ৩। ব্যাকরণ-শাস্ত্র।
- ৪। ধর্ম-শাস্ত্র।

“নালন্দা” সম্বন্ধে বিস্তৃত খবর নীচের বইগুলিতে পাওয়া যায় :—

1. The tradition about the origin of the Vikramasila Monastery.

2. Hiouen Thsang's—

“Si-yu-Ki” (up to 625 A. D.)

3. I-Tsiang's Account of the Buddhist Religion as practised in India.

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

(২৩)

২৪ পরগণা

সিরাজদৌলার সিংহাসন-চ্যুত করিতে ইংরেজ কোম্পানিকে সাহায্য করিবার জন্য পুরস্কার স্বরূপ মিরজাফর “মাবহাটা” খাতে’র অন্তর্ভুক্ত ভূখণ্ড চিরদিনের জন্য নিষ্কর প্রাপ্ত হন। সেই দিনই (১৭৫৭ খৃঃ, ২০শে ডিসেম্বর) পৃথক দলিলে নিম্নলিখিত ১৪টি সম্পূর্ণ ও ১০টি আংশিক পরগণার জমিজমা স্বত্ব বার্ষিক ২২২,-২৫০ টাকা করে ইংরেজ কোম্পানিকে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়।

(১) আকবরপুর (২) আমীরপুর (৩) আজিমাবাদ (৪) বেলিয়া (৫) বদৌলহাটী (৬) বসনধাণি (৭) কলিকাতা (৮) দক্ষিণ সাগর (৯) গড় (১০) হাতিয়াপড় (১১) ইক্সিমাবপুর (১২) খড়িছড়ি (১৩) ধামপুর (১৪) মোদনমল (১৫) মাণ্ডরা (১৬) মানপুর (১৭) ময়রা (১৮) মুড়াগাছা (১৯) পাইকান (২০) পৌঁচাকুলি (২১) সাতল (২২) সাহানগর (২৩) সাহাপুর (২৪) উত্তর পরগণা।

ইহাব ৬টি এখন হাবড়া ও হুগলী জেলা ভুক্ত। নদীয়া ও যশোহর হইতে অপর ২০টি আসিয়া এখনকাল ২৪ পরগণা জেলায় মোট ৪৭টি পরগণা আছে।

প্রতি ১৩২৬ সালের আধিন সংখ্যা “পল্লী-বাণী”তে জেলা ২৪ পরগণা—নামের ইতিহাস শীঘ্র প্রবন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পাবিবেন।

শ্রী বিজ্ঞাননাথ রায় চৌধুরী

২৪ পরগণার পরগণাসমূহের নাম :—

(১) কলিকাতা (২) আকবরপুর (৩) আমীরপুর (৪) আজিমাবাদ (৫) বেলিয়া (৬) বদৌলহাটী (৭) বসনধাণি (৮) দক্ষিণ সাগর (৯) গড় (Garh) (১০) হাতিয়াপড় (১১) ইক্সিমাবপুর (১২) খড়িছড়ি (১৩) ধামপুর (১৪) মোদনমল (১৫) মাণ্ডরা (১৬) মানপুর (১৭) ময়রা (১৮) মুড়াগাছা (১৯) পাইকান (২০) পৌঁচাকুলি (২১) সাতল (২২) সানগর (২৩) সাপুর (২৪) উত্তর পরগণা।

শ্রী গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী

শ্রী হুগলীভূষণ পুরকায়স্থ

সত্য

সত্য শুধু কল্প নহে শাস্ত্র কারাগারে
দীপ্ত হয়ে রাজ্যে নিত্য অন্তর মাঝারে;
কর্তব্য স্বধা’য়ে যে বা চলে তার ঠাই
তাহার লক্ষ্যের পথে কোন বাধা নাই।

শ্রী জানকীনাথ দত্ত

ত্ৰায়ের সেবক

ত্ৰায়ের সেবক সেই, উন্মুখ যে জন
বিশ্ব হতে দাসত্বের দিতে নির্বাসন;
ত্ৰায় পাশে কেহ উচ্চ কেহ নহে হীন,
সবাই সমান সেথা সবাই স্বাধীন।

শ্রী জানকীনাথ দত্ত

জীব পুত্রসন্তান না হইলে স্বামী পুনরায় বিবাহ প্রায় ক্ষেত্রেই করিয়া থাকে। অনেক সময় এই নবাগতার সেবাও প্রথম পত্নীকে করিতে হয়। দ্বিতীয় জীব আগমনে প্রথম জীব দাম অনেক কমিয়া যায়, তাহাকে সংসারের দাসী বলিলেও কিছু অজ্ঞায় বলা হয় না।

কারমান সহরের এক পাহাড়ের গা হইতে একটা ঝরণা বাহির হইয়াছে। পাহাড়ের গায়ে আঘাত করিয়া আলি নাকি এই ঝরণা বাহির করিয়াছিলেন। যে-সমস্ত নারীদের সন্তান হয় না, তাহারা এই ঝরণার জলে স্নান করে, নানা রকম পূজা অর্চনা এইখানে করে। পারশু দেশে এই রকমের আরো স্থান আছে। সন্তান থাকিলেও নারীরা সন্তানের মঙ্গল-কামনায় এইখানে আসে।

বাল্যকাল হইতেই পারস্যের লোকেরা জীলোকের কথায় কান না দিবার শিক্ষা পায়। নারীর নাকি কোন আত্মা নাই। দেহের শেষ হইলেই নারীর সব শেষ হইল। মৃত্যুর পরে পুরুষ স্বর্গে যায়, সেখানে সে ক্ষীর-সাগরের তীরে থাকে। হরীর দল তাহার সেবা করে। সেখানে গাছে গাছে নানা রকমের স্নাত্ত ভারে ভারে ফলিয়া আছে। দিবা-রাত্রি হরীর সঙ্গীতে মন মাতো-য়ারা হইয়া থাকে। নারীর মৃত্যুর পর নরক ছাড়া আর গতি নাই। তবে কোন নারী যদি খুব পুণ্যের কাজ কিছু করে তবে তাহার স্বর্গে স্থান হইতে পারে। কিন্তু এই স্বর্গও পুরুষদের স্বর্গ হইতে অনেক খারাপ।

পারশুে দ্বৈগুণ পুরুষ প্রায় দেখা যায় না। নারী সব সময়েই তাহার স্বামীর ভয়ে থাকে। একবার এক পারশু-নারী একজন খেতাব নারীকে পারশু-পুরুষ বিবাহ করিতে নিষেধ করেন।

একবার এক নারীর গালে, তাহার পুত্রের অসাবধানতায় একটা বন্ধকের গুলি লাগে। সাহেব-হাসপাতালে তাহার চিকিৎসা হয়। যখন সে আরোগ্য লাভ করিল, তাহার স্বামী আসিয়া হুকুম করিল, “নারী, তোমার ঘোমটা খোল, আমি তোমায় দেখব।” তার পর সে যখন দেখিল তাহার মুখ দেখিতে বড় খারাপ হইয়া গিয়াছে, সে জীকে তাহার পুত্র সমেত ত্যাগ করিল।

তাহার পর এই নারীকে পরের ঘরে দাসীর কাজ করিয়া দিন কাটাইতে হয়।

পারশুে বহু-বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও লোকে এখন ক্রমে এক-বিবাহের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে। দারিদ্র্যই বোধ হয় ইহার কারণ। অনেক লোক আজকাল পারশুর নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্ত চিন্তা করিতেছেন। নারীদের অবস্থা সব দিকেই যে খারাপ তাহা নয়। তাহাদের মধ্যে যাহারা একটু ভাল অবস্থার, তাহাদের বন্ধুবান্ধব আসিলে তাহারা বেশ আনন্দে দিন কাটায়। শনিবারে কোন বন্ধু আসিলে সে সোমবারের পূর্বে যাইতে পারে না, মঙ্গলবারে আসিলে বুধস্পতিবার, এবং বুধস্পতিবারে আসিলে শুক্রবারে তাহারা গৃহ ত্যাগ করিতে পায়। এই নিয়ম পালন না করিলে নাকি গৃহের অকল্যাণ হয়। জীব বন্ধু যতদিন বাড়ীতে থাকে, বেচারী স্বামীকে বাহিরে বাহিরেই থাকিতে হয়।

পারশুর নারীরা প্রায়ই ভোজ দেয়। এই সময় তাহারা খুব জম্‌কাল পোষাক পরিয়া বন্ধু-বান্ধবদের আদরে অভ্যর্থনা করে। “তোমার স্থান অনেকদিন খালি আছে, তোমার ছায়া যেন ক্ষীণ না হয়, তোমার নাক যেন মোটা হয়”—এই রকমের অনেক প্রকার অভি-বাদন-বাণী প্রচলিত আছে। সকলে কার্পেটের উপর উপবেশন করে। কোন বড়-ঘরের নারী আসিলে, সকলেই তাহাকে খুব সম্মানের সঙ্গে স্থান করিয়া দেয়। আবার গরীব ঘরের কেহ আসিলে, তাহার দিকে কেহ বিশেষ নজর দেয় না।

চাকরে চা, মিষ্টান্ন ইত্যাদি বিতরণ করে। গেলাসে করিয়া দুধ-বিনা চা দেওয়া হয়, তাহাতে ডেলা ডেলা চিনি ফেলিয়া দেওয়া হয়। আরো অনেক রকমের খাবার এবং ফল দেওয়া হয়।

নারীদের ভূতপ্রেত দানা ইত্যাদিতে অত্যন্ত বিশ্বাস আছে। ভূতেরা নাকি নিজে কবরস্থানে পোড়ো বাড়ী ইত্যাদিতে বাস করে। তাহারা পথিকদের পথ ভুলাইয়া দেয়, এবং তারপর তাহাদের হত্যা করিয়া ভোজন করে। ভূতের ভয়ে, কোন নারী একলা শোয় না, বা বাসি খাবার খায় না; বাসি খাবার ভূতে দেখিতে পাইলে

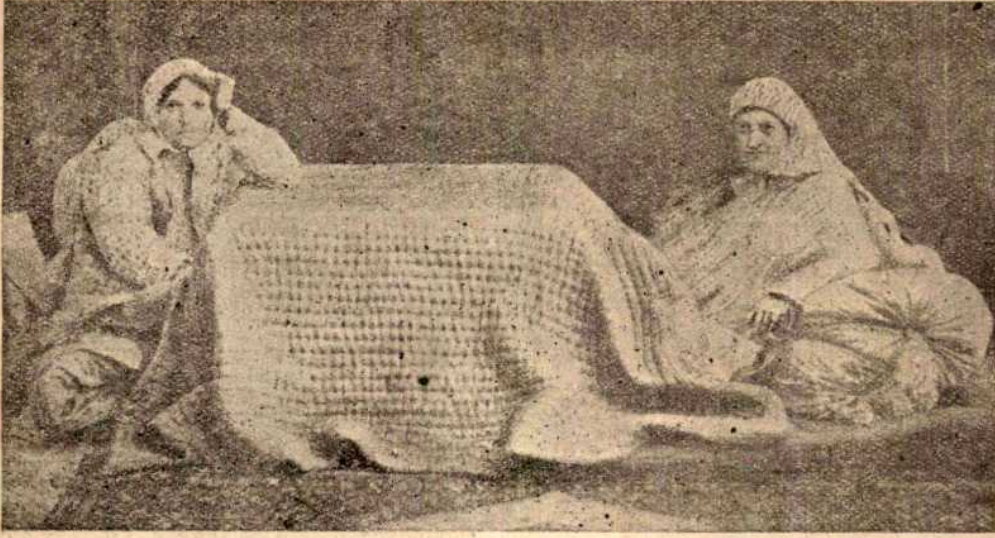
রাজপুতানায় বাঙ্গালীর স্মৃতি

পরিব্রাজক ৮ ধর্মানন্দ মহাভাবতী মহাশয় যিবার ভ্রমণ করিয়া ১৩০৯ সালে “নবগ্রভা” পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে, চিতোর-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্যামল-দাসকে এ রাজ্যে বাঙ্গালীর বাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কবাষ পণ্ডিতজী বলেন, “এখানে বাঙ্গালী নাই এবং না থাকাই ভাল।” * * * “পঞ্চানন-বাবু নামে একজন অশিক্ষিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ যুবা অজমীঢ় সহরে বড় চাকরি করিতেন। সাহেবদিগের অহুবোধে তাঁহাকে উদয়পুরের ফৌজদারের (পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট) পদ প্রদত্ত হইয়াছিল। কয়েকমাস পরে তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়া এখানকার লোকে মারিয়া ফেলে। সন্দেহযুক্ত মৃত্যুর জন্য ব্রিটিশ রেসিডেন্টের আদেশে মৃতদেহের শবাস্তক পবীক্ষা (Post-Mortem Examination) পর্য্যন্ত হইয়াছিল, কিন্তু কেহই অপরাধী বলিয়া সন্দিগ্ধ হয় নাই। মৃত বাবুর পরিবারকে মাসিক ত্রিশ টাকা পেন্সন দিবার জন্য মহারাজা আদেশ করিয়াছেন।” ধর্মানন্দ মহাভাবতী মহাশয়ের প্রদত্ত এই সংবাদ আমরা ইতিপূর্বে “বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী” গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। দুই-তিন বৎসর হইল এলাহাবাদে অবসরপ্রাপ্ত কেবোলীব ভূতপূর্ব মন্ত্রী রাওসাহেব ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এই বিষয়ের উল্লেখ করিলে তিনি পঞ্চানন-বাবু ও তাঁহার পিতা স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে তাঁহার দিনলিপি ও পুরাতন স্মারক বহি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা প্রবাসীর পাঠকপাঠিকার গোচর করিলাম।

সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্বে স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদেশ হইতে প্রথম উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে আগমন করেন। পরে তিনি রাজপুতানায় নিমচের (Southern Malwa State) এজেন্টস্ অফিসে কর্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজপুতানায় কেবোলীর গোস্বামীগৃহে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ে থাকিয়া নিমচের কর্মের জোগাড় করিয়াছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তিনি তথা হইতে পলায়ন করিয়া কেবোলী প্রত্যাবর্তন করেন। কেবোলীব

মহাবাজা মদনপাল তাঁহাকে অল্পত্র কর্মগ্রহণ করিতে না দিয়া কেবোলী স্কুলেব হেডমাষ্টার করিয়া এবং ৫০ বিঘা ব্রহ্মোত্তব জমী দান করিয়া আপনার কাছেই রাখেন। কেবোলীতেই মাধব-বাবুর দেহান্ত হয়। সে সময় কেবোলীতে গোস্বামীদের এরূপ প্রতিপত্তি ও সম্মান ছিল যে মাধব-বাবু গোস্বামীদের ঘরে বিবাহ করাষ, মোহস্তের ভগিনীপতি—এই সম্পর্কে, মহারাজাও তাঁহাকে ভগিনী-পতিব্রতায় মাত্র করিতেন। অধিকতর কৌতুকেব কথা এই যে শ্রালক ও ভগিনীপতির মধ্যে বেরূপ কৌতুকামোদ হওয়া স্বাভাবিক ততদূর পর্য্যন্ত ইহাদেব উভয়ের মধ্যে চলিত। মাধব-বাবুর পুত্র বাবু পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় পূর্বে রাজপুতানা বেল্গুয়েব মালওয়া এজেন্সিয়ার অফিসে কার্য করিতেন। এই অফিস পবে উঠিয়া অজমীঢ়ে গেলে তাহার নাম হয় Chief Engineer's Office। রাজপুতানা-মালওয়া রেলওয়ে অফিসে তিনি প্রায় পনের বৎসর কার্য করিয়াছিলেন। যদিও তিনি অজমীঢ়ে থাকিতেন তথাপি পিতার বিবাহ-সূত্রে কেবোলীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। তাঁহার প্রতি কেবোলীর রাজপরিবারের অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল। মহারাজা অর্জুনপালের বিধবা পত্নী ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে* শ্রীক্ষেত্রাদি দর্শন মানসে যাত্রা করিলে, তাঁহার সঙ্গে একজন ইংরেজী-জানা লোকের আবশ্যক হওয়ায়, তিনি পঞ্চানন-বাবুকে সঙ্গে লইয়া যান। ইতিপূর্বে পঞ্চানন-বাবু মহাবাজ মদনপালের পত্নীর সহিত তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন। তিনি বিলক্ষণ বাক্পটু ছিলেন। “সভাচতুর” বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি রাজপুত সর্দারদিগেব সহিত খুব মিশিতে পারিতেন। একদময় উদয়পুরের বর্তমান মহারাজার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহারাজ গজসিংহ অজমীঢ়ে আগমন করেন। তিনি পঞ্চানন-বাবুর আতিথেয়তায় ও বাক্পটুতায়

* এক বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৮৬ অব্দে রাও বাহাদুর ৮ ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কেবোলী আগমন করেন এবং ৮ মাধব-বাবুর স্থলে কেবোলীব হেডমাষ্টারি কবিত্তে থাকেন।



পারস্তের নারীর আগুন পোহানো—

বালাপোলে ঢাকা টেবিলের তলায় আগুনের আঁটা লুকানো আছে।

বেষণ করে। এইরূপ ব্যাপার হইলে বিবাহ সম্বন্ধে আর কোন কথা হয় না। আর পাত্রী যদি খুব যত্ন করিয়া পরিবেষণাদি করে, তবে বিবাহের সব পাকা বন্দোবস্ত হইয়া যায়। পাত্রের মাতা, পাত্রী এবং তাহার মাতাকে চা-খাইবার নিমন্ত্রণ করেন। বিবাহের পূর্বে পাত্র ভাবী স্ত্রীর মুখ দেখিতে পায় না—কিন্তু কত্যা যেদিন তাহাদের বাড়ী আসে, সে আনাচে-কানাচে গোপন থাকিয়া ভাবী পত্নীর স্বন্দর মুখখানা একবার দেখিয়া লয়। পুরোহিতের সামনে পাত্র এবং পাত্রী বাগদত্ত হয়। পাত্র ইচ্ছা করিলে এই সময় বিবাহ বাতিল করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে কিছু দণ্ড দিতে হয়। দণ্ডের পরিমাণ—পাত্র যৌতুক হিসাবে স্বস্তুর বাড়ী হইতে যাহা পাইত, তাহার অর্দ্ধেক। এই রকম করিয়া যে বিবাহ ভঙ্গ করে, সমাজে তাহাকে নানা প্রকার অপমান সহিতে হয়। বাগদত্ত হইবার সময় একটা জালান মোমবাতি, একখানি কোরাণ এবং একটি আয়না, আর একটা ট্রের উপরে নানা-প্রকার গন্ধদ্রব্য, শুকান বীজ, এবং খেজুর কন্ডার কাছে রাখা হয়। কত্যা একটা সবুজ চাদরে আবৃত থাকে এবং কাহারো সঙ্গে কথা বলিতে পায় না। তারপর একটা জালান মোমবাতি একটা পিতলের

গাম্ভা দিয়া ঢাকা দেওয়া হয়। কত্যা এই দ্রব্য-সমষ্টির ওপর একবার বসে। ইহার অর্থ, সে স্বামীর বশ্বতা স্বীকার করিল।

বিবাহের সময়েও কন্ডার দেহে এই সবুজ চাদরটি থাকে। বিবাহের পর তাহার সৌভাগ্য কামনা করিয়া এক-টুকরা সোনা দেওয়া হয়। তাহার ভাবী সংসারে প্রাচুর্য্য প্রার্থনা করিয়া তাহার সঙ্গে একটুকরা রুটি এবং একটু ছুন দেওয়া হয়। তারপর কত্যা পিতৃগৃহ ত্যাগ করিবার সময় উনানের পাথরটাকে চূষন করিয়া যায়। বিবাহ ব্যাপার খুবই ব্যয়সাধ্য। অনেকে বিবাহের সময় প্রচুর ঋণ করে। বিবাহের সময় বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন ভিক্ষুক ইত্যাদি সবাইকেই খুব ভোজ দেওয়া হয়। নাচ-গানেরও বন্দোবস্ত থাকে।

স্ত্রীর স্বখ-দুঃখের সমস্ত ভার স্বামীর উপরেই থাকে। স্বামীর মর্জি হইলে স্ত্রী রাণীর মত থাকে, আবার স্বামীর খেয়ালে স্ত্রী গোলামের মত দিন কাটায়। বিচারের জন্ত স্ত্রী একমাত্র স্বামীর কাছেই নালিস করিতে পারে। তবে স্ত্রীর যদি ধনী এবং প্রতাপশালী আত্মীয় থাকে, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে দুঃখ দিতে সাহস করে না।

স্বামী ইচ্ছা করিলেই স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে।

এতদূর মোহিত হন, যে তিনি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মহারাণাকে বলিবা উদয়পুবেব ম্যাজিস্ট্রেট কবিয়া দেন। তথায় প্রায় সাত বৎসর কর্ম করিবার পব তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি হয়।

মহারাণা পঞ্চানন-বাবু বিদ্যাবুদ্ধি ও চরিত্রমাধুর্য্যে এতদূর সমৃদ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার বিধবা পত্নী ও নাবালক পুত্রের শিক্ষা এবং পালনার্থ ত্রিশ টাকা মাসহারা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। পঞ্চানন-বাবুর পুত্র, বাবু প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মহারাণা তাঁহাকে Residencyর উকীল—এই দায়িত্ব-

পূর্ণ উচ্চপদ প্রদান করেন। পরে তাঁহার কার্যে সমৃদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আবুপূর্ব্বতে Agent to Governor Generalএর উকীল অর্থাৎ মহারাণার Representative করিয়া দেন।

পঞ্চানন-বাবু জনহিতৈষণা (public spirit) যথেষ্ট ছিল। দেশহিতকর অমুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি অজমীর প্রবাসে একসময় "Rajputana Herald" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র পরিচালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণের উৎসাহের অভাবে বৎসর-কাল পরে উক্ত পত্র বন্ধ হইয়া যায়।

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস



“ঐ আসে ঐ আসে ঐ ঐ ঐ বে!”

চিত্রকর শ্রী বীণেশবল্লভ দাশ মহাশয়ের বোধস্বপ্নে।



পারস্তার নারী—বাহিরে

হেনা লাগান হয়। আঙ্গুলের নোখেও হেনা দেওয়া হয়। চোখে সুরমা সকলেই লাগায়।

পারস্তা জলাভাব বড় ভয়ানক, সেইজন্ত স্নানাগারের জল প্রত্যহ বদলান হয় না। বড়লোকদের স্নানাগারের জল দু-এক দিন অন্তর নতুন করিয়া ভরা হয়, কিন্তু যেগুলি গরীবদের স্নানাগার, সেগুলির জল ভয়ানক দূষিত হইয়া থাকে। নানা রকমের রোগের বীজে জল পূর্ণ থাকে। সেখানে স্নান করা ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার।

শুক্লাবার ছুটির দিন। সেইদিন সকলেই স্নানাগারে যায়। কারণ মসজিদে যাইবার পূর্বে তাহাদের স্নানাদি করিয়া পবিত্র হইতে হইবে। কিন্তু মুসলমান ধর্ম-মতে নারীদের কোন আত্মা নাই বলে—সেইজন্ত খুব কম নারীই মসজিদে যায়। মসজিদে অবশ্য নারীদের জন্ত বসিবার ঘন-পর্দাওয়ালা স্থান আছে। এইখানে বসিয়া তাহারা সব দেখিতে পায় কিন্তু বাহিরের কেহ তাহাদের দেখিতে পায় না।

নারীদের পোষাক।—ঘরের ভিতর নারীরা ভেল্‌ভেটের

জ্যাকেট ব্যবহার করে এবং খুব আঁট, হাঁটু পর্যন্ত পায়জামা পরে। পায়ে শাদা মোজা থাকে। শাহ নাসীরউদ্দীনের সময় হইতেই এইরূপ পোষাকের চলন। তিনি নর্তকীদের এই রকমের পোষাকে দেখিতে বড় পছন্দ করিতেন। কিন্তু পারস্তের গরীব গৃহস্থ-ঘরের মেয়েরা গোড়ালী পর্যন্ত আঁট পায়জামা ব্যবহার করে। ঘরের বাহিরে সকল নারীই আপাদমস্তক কালো চাদর মুড়ি দিয়া বাহির হয়, কেবল মুখের কাছে রেশমের লেস দেওয়া ঘোমটা থাকে। লাল বা সবুজ রঙের পায়জামা পরিয়াই অধিকাংশ নারী বাহিরে যায়। ঘরের বাহিরে যদি কোন পুরুষ তাহার মাতা বা স্ত্রীকে চিনিতেও পারে, তবুও কোন কথা বা অঙ্গভঙ্গী না করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। ঘরের মেয়েদের সঙ্গে বাহিরে কথা বলা বেয়াদবী। যদি কোন লোক কোন মেয়ের ঘোমটা তুলিয়া দেখে তবে তাহার শাস্তি হয় প্রাণদণ্ড।

মেয়ে বিবাহযোগ্য হইলেই (প্রায় মেয়ের খুব কম বয়সেই বিবাহ হয়) পিতা-মাতা উপযুক্ত পাত্রের অস্থ-সন্ধান করেন। বিবাহ ব্যাপারে মেয়ের মতামতের বিশেষ কোন দাম নাই। অনেক মেয়ের বিবাহ ১৫।১৬ বছর বয়সেও হয়।

মেয়েদের মুখ তাহাদের আত্মীয় ছাড়া আর কেহ দেখিতে পায় না, সেইজন্ত ঘটকেরাই প্রায় সব বিবাহ স্থির করে। পারস্তে মাসতুত পিস্তুত খুড়তুত বোনকে অনেকেই বিবাহ করে। ঘটকেরা বিবাহযোগ্য পাত্রী এবং বয়স্ক পাত্রের পিতামাতার নিকট যথেষ্ট আদর-অভ্যর্থনা লাভ করে। কারণ ঘটক খুসী থাকিলে সে সুন্দর পাত্র বা পাত্রী জোগাড় করিয়া দিতে পারে।

কোন পাত্রের জন্ত পাত্রী স্থির হইলে পর পাত্রের মাতা এবং আরো দু-একজন আত্মীয় কটার বাড়ী বেড়াইতে যান। কত্না হয়ত পথে আপাদমস্তক মণ্ডিত হইয়া, পাত্রকে কোনদিন দেখিয়া থাকিবে, এবং তাহার হয়তবা ঐ পাত্রকে পছন্দ হয় নাই। তখন তাহার বিবাহ হইতে অব্যাহতি পাইবার একটিমাত্র উপায় আছে। পাত্রের মাতা ইত্যাদি তাহার বাড়ীতে আসিলে, কত্না খুব অনাদর এবং তাক্ষিল্যের সঙ্গে তাহাদের চা কেক ইত্যাদি পরি-

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তা'রে
তোমার নবীন ছন্দে ? আজিকার কাজবী গাখায়
ঝুলনেব দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায় ;
বর্ষে বর্ষে এ দোলাঘ দিত তাল তোমার যে বাণী
বিদ্যুৎ-নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি'
বিধবার বেণে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলিপরে ?
আখিনে উৎসব-সাজে শরৎ সুন্দর শুভ করে
শেফালিব সাজি নিষে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে ;
প্রতি বর্ষে দিত সে যে শুক্লরাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে
ডালে তব বরণের টীকা ; কবি, আজ হ'তে সে কি
বারে বাবে আদি' তব শূন্যক্ষে, তোমারে না দেখি'
উদ্দেশে ঝরাঘে যাবে শিশির-সিক্ত পুষ্পগুলি
নীরব-সঙ্গীত তব দ্বারে ?

জানি তুমি প্রাণ খুলি'

এ সুন্দরী ধবনীবে ভালবেসেছিলে। তাই তারে
সাজিয়েছ দিনে দিনে 'নিত্য নব সঙ্গীতের হারে।
অগ্ন্যব অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ'
কুটিল কুংসিত জ্বর, তাব পরে তব অভিগাপ
বধিবাছ ক্ষিপ্ৰবেগে অর্জুনের অগ্নিবাণ সম,
তুমি সত্যবীর, তুমি স্বকঠোর, নির্মল, নির্দম,
করণ কোমল। তুমি বঙ্গ-ভাবতীর তন্ত্রী-পবে
একটি অপূর্ণ তন্ত্র এসেছিলে পঁরাবার তবে।
সে তন্ত্র হযেছে বাঁধা ; আজ হতে বাণীব উৎসবে
তোমাব আপন স্বর কখনো ধনিবে মন্ত্রববে,
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে। বর্ষের অঙ্গনতলে
বর্ষা-বসন্তেব নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উথলে ;
মেখা তুমি একে গেলে বর্ষে বর্ষে বিচিত্র বেণায়
আলিঙ্গন ; কোকিলের কুহববে, শিখীব কেকায়
দিবে গেলে তোমার সঙ্গীত ; কাননেব পল্লবে কুহুমে
রেখে গেলে আনন্দের হিল্লোল তোমার। বঙ্গভূমে
যে তরুণ যাত্রিদল রুদ্ধদ্বার-রাত্রি অবসানে
নিঃশব্দে বাহিব হবে নব জীবনেব অভিযানে

নব নব সঙ্কটের পথে পথে, তাহাদেব লাগি'
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি'
জয়মাল্য বিরচিয়া, রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহিতেছে পূর্ণ কবি' ; অনাগত যুগের সাথে
ছন্দে ছন্দে নানাহুত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর,
গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পূজারি !

আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে,
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখাব অতীত রূপে আপনারে করে' গেলে দান
দূরকালে। কিন্তু যাবা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ, তাবা যা হাবাল তাব সন্ধান কোথায়,
কোথায় সাস্থনা ? বন্ধু-মিলনের দিনে বারম্বার
উৎসব-রসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্তে, শ্রদ্ধায়,
আনন্দের দানে ও গ্রহণে। কথা, আজ হ'তে, হাথ,
জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি উঠিবে মোর হিয়া
তুমি আগ নাই বলে', অকস্মাৎ এহিয়া রহিয়া
করণ স্মৃতির ছায়া ম্লান করি' দিবে সভ্যতলে
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছন্ন গভীর অশ্রুজলে।

আজিকে একেলা বসি' শোকেব প্রদোষ-অন্ধকারে,
মৃত্যুতবঙ্গিনীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধাবে
তোমাবে শুধাই,—আজি বাধা ক গো ঘুচিল চোখের,
সুন্দর কি ধবা দিল অনিন্দিত নন্দন-লোকের
আলোকে সম্মুখে তব, উদয়-শৈশবের তলে আজি
নবসুখ্যবন্দনায় কোথায় ভরিলে 'তব সাজি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দগানে ? সে গানের স্বর
লাগিছে আমার কানে অশ্রুপাথে মিলিত মধুব
প্রভাত-আলোকে আজি, আছে তাহে সমাপ্তিব ব্যথা,
আছে তাহে নবতন আরম্ভেব মঙ্গল-বারতা ;
আছে তাহে ভৈরবীতে বিদ্যাবের বিষল মুচ্ছনা,
আছে ভৈরবেব স্বরে মিলনের আসন্ন অর্চনা।

আট বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত সে পাঠশালে পড়িতেও পায়। আট বছর পূর্ণ হইলেই শিশু-কন্ডার পাঠ সাঙ্গ হয়, তবে বড়-ঘরের মেয়েদের আলাদা কথা। পারস্তের যে-সব নারী লিখিতে এবং পড়িতে জানেন—তাহারা অতি বিদূষী বলিয়া জনসমাজে পরিচিত, এবং লোকে তাঁহাদের দেখিয়া অবাক হইয়া যায়। আট বছর বয়স পূর্ণ হইলেই মেয়েকে তাহার খেলার সাথীদের সঙ্গ প্রায় ত্যাগ করিতে হয়।

পারস্তের ঘর-বাড়ীর বিষয় কিছু না বলিলে মেয়েদের জীবনের কথা সব বুঝা যাইবে না, সেইজন্ত তাহাদের ঘর-বাড়ী কেমন ধরণের হয় তাহার বিষয় কিছু বলিব।

বাড়ির চারিদিক উচু দেওয়ালে ঘেরা এবং বাড়ীর মাঝখানে উঠান। বাহির হইতে অন্তরের কিছুই দেখা যায় না। সদর দরজা প্রকাণ্ড, এবং এই দরজা দিয়া “বাইরুন”এর (বাহির মহলের) প্রবেশ পথ। বাহির মহল কেবল পুরুষেরাই ব্যবহার করে। বন্ধু-বান্ধব আসিলে এইখানেই বসে। বাহির মহল খুব সামান্য রকমে সাজান থাকে। এইখানে বাড়ির কর্তা তাঁহার কাজকর্ম করেন এবং অবসর সময়ে নানা রকমের বাজে গল্প করিয়া কাটান। বাড়ীর ছেলেরাও বাইরুনে বসিয়া মোল্লার কাছে কোরাণ পড়িতে এবং লিখিতে শিখে। কোরাণের মানে বুঝিবার কোন দরকার হয় না। চাকরেরা সব-সময় ছেলেদের কাছে কাছে থাকে। মেয়েরা বাইরুনে আসিতে পায় না। অন্তরুনে ঘাইবার পথটি সরু এবং অন্ধকার, শেষে একটি দুয়ার আছে। অন্তরুনের ব্যবস্থা সব দিক হইতেই বাইরুন অপেক্ষা ভাল। অন্তরুনের কোঠা-গুলি হইতে উঠানের ছোট ফুলের গাছগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট গাছে নানা রকমের রঙিন এবং সুগন্ধি ফুল ফুটিয়া আছে। ঘরগুলিও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মেঝেতে গালিচা পাতা, নীচু চৌকি, ছবি ইত্যাদি দ্বারা সাজান ঘরগুলি দেখিতে বেশ চমৎকার লাগে। কিন্তু অন্তরুনের এই-সব যতই চমৎকার হউক—বাইরুনের কারো সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। অবশ্য বাড়ীর পুরুষ এবং গিন্নির আত্মীয়দের সন্মুখে এ ব্যবস্থা নয়। কর্তার সবচেয়ে



পারস্তের নারী—অন্তঃপুরে

অন্তরঙ্গ বন্ধুও কখনো অন্তরুনে আসিতে পায় না। তাহারা বন্ধুর স্ত্রী-পরিবার সন্মুখে কোন কথাও খোলা-খুলি জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। কোন কথা জানিতে হইলে—বাড়ীর সব কেমন—এই বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হয়। এইজন্ত পারস্ত দেশের নারী-মহলের কথা যতই ভাল করিয়া বলা হউক না কেন, সব নিভুল এবং সম্পূর্ণ হয় না।

পারস্তের স্নানাগার—এইখানে নারীদের মজলিস বসে। আমাদের দেশের পুকুর-ঘাটে ছপুর বেলা যেমন গ্রামের ললনাকুল জমা হন—পারস্তের দশের স্নানাগারও ঠিক তেমনি। মাঝে মাঝে এইখানে তারা সমস্ত দিন কাটায়—খাবার বন্দোবস্ত এখানে আছে। যত রকমের বাজে গল্প চলে। মেয়েরা বাড়ী হইতে আসিবার সময় ছোট ছোট বালিস আনে এবং একটি সুন্দর ছোট বাক্সে নানা রকমের সুগন্ধি তেল, তোয়ালে ইত্যাদি স্নানের জিনিষ আনে। গরম এবং ঠাণ্ডা উভয় প্রকার জলেরই আয়োজন থাকে। প্রথমে গরম জলে অবগাহন করিয়া তারপর ঠাণ্ডা জলে গা ধোয়ার নিয়ম। স্নানের পর চুলে নীল এবং

যে খেয়ার কর্ণধার তোমাবে নিয়েছে সিঁদুপারে
 আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে
 হয়েছে আমার চেনা ; কতবার তারি সারি-গানে
 নিশাস্তের নিদ্রা ভেঙে ব্যাখায় বেজেছে মোর প্রাণে
 অজানা পথের ভাক, স্বর্ধ্যাস্তপারের স্বর্ণরেখা
 ইঙ্গিত করেছে মোরে । পুন আজ তার সাথে দেখা
 মেঘে ভরা বৃষ্টিঝরা দিনে । সেই মোরে দিল আনি,
 -ঝরে'-পড়া কদম্বের কেশর-সুগন্ধি লিপিকানি
 তব শেষ বিদায়ের । নিয়ে যাব ইহার উত্তর
 নিজ হাতে কবে আমি, ওই খেয়াপরে করি' ভর,
 না জানি সে কোন্ শাস্ত শিউলি-ঝরাব গুল্লরাতে ;
 দক্ষিণের দোলা-লাগা পাখী-জাগা বসন্ত-প্রভাতে ;
 নব মল্লিকার কোন্ আম্রপল্লব-দিনে ; শ্রাবণের
 ঝিল্লিমস্ত-সবন সন্ধ্যায় ; মুখরিত প্রাবনের
 অশাস্ত নিশীথ রাত্রে ; হেমস্তের দিনাস্ত বেলায়
 কুহেলি-গুণ্ঠনতলে ?

ধরণীতে প্রাণের খেলায়

সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে,

সুখে দুঃখে চলেছি আপন মনে ; তুমি অহুরাগে

এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিখানি লয়ে হাতে,
 মুক্ত মনে দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমালা মাথে ।
 আজ তুমি গেলে আগে ; ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন
 তোমা হতে গেল খসি', সর্ব আবরণ করি' লীন
 চিরন্তন হ'লে তুমি, মর্ত্য কবি, মুহূর্তের মাঝে ।
 গেলে সেই বিশ্বচিত্রলোকে, যেথা স্নগস্তীর বাজে
 অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সঙ্গীতধারায়
 ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে স্বর্ঘ্যে তারায় তারায় ।
 সেথা তুমি অগ্রজ আমার ; যদি কভু দেখা হয়,
 পাব তবে সেথা তব কোন্ অপরূপ পরিচয়
 কোন্ ছন্দে, কোন্ রূপে ? যেমনি অপূর্ব হোক নাকো,
 তব আশা করি যেন মনের একটি কোণে রাখো
 ধরণীর ধুলির স্মরণ, লাজে ভয়ে দুখে সুখে
 বিজড়িত,—আশা করি, মর্ত্যজন্মে ছিল তব মুখে
 যে বিনম্র স্নিগ্ধ হাস্ত, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা,
 সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শাস্ত কথা,
 তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা
 অমর্ত্যলোকের দ্বাবে,—বার্ষ নাহি হোক এ কামনা ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সত্যেন্দ্র-তর্পণ

আজি স্বর্ঘ্য মেঘে-ঢাকা, দিবস ঘনিমা-মাখা, অন্ধকার ঘিরেছে ভুবন,
 এ স্নিগ্ধ বাদল-দিনে পুলক-পূরিত মনে কাব্য-ছবি করিতে অঙ্কন ;
 যত মেঘে ভিড় করে, যত বারি বরবরে, তত তোমা মনে পড়ে আজ—
 মনে পড়ে সৌম্য মৃষ্টি, আঁখি-যুগ স্নিগ্ধ-কান্তি, কল্পনার ওহে পক্ষিরাজ !
 বরষারি মেঘ সম ছিলে শাস্ত সৌম্য কম, তারি মত করেছ বর্ষণ—
 অজস্র ডাবের ধারা—কী শীতল জ্বালাহরা, কী প্রশান্ত আনন্দ-ভাষণ !
 এ বরষা আঁখিয়ার কেঁদে মরে আরবার কোথা তুমি ছলল-সন্ধান,
 এস পূর্ণ সত্য কবি, গাও গান আঁক ছবি কল্পনায় করিয়া সন্ধান ।
 সাহিত্য-সমাজ হতে যে কেহ কালের স্রোতে ভেসে গেছে লভিয়া মরণ,
 তাহারি কল্যাণ তরে ভক্তিশ্রদ্ধাভরা স্বরে তুমি নিতি করেছ তর্পণ ;
 আজি তুমি স্বর্গলোকে, রুদ্ধ বুক তব শোকে, কে তোমাতে করিবে অর্চন,
 কে তোমার স্নিগ্ধ গীতি উচ্ছল স্বদেশ-প্রীতি পিয়ে তোমা করিবে বন্দন



পারশুর নারী

পারশুর দেশে যখন কোন সম্পন্ন-গৃহস্থের ঘরে পুরুষ-সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, গৃহে আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। কত রকমেই যে তাহার আগমন-বার্তা লোককে জানান হয়, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু সন্তান যদি স্ত্রী হয়, তবে আনন্দের পরিবর্তে নৈরাশ্য এবং গভীর দুঃখ গৃহবাসীদের ছাইয়া ফেলে। পুরুষ-সন্তানের আগমনে বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী ভোজ পায়, স্ত্রী-সন্তান জন্ম লইলে তাহারা অনেককাল পর্যন্ত সে খবর জানিতেও পারে না।

সন্তানের জন্ম হইবার পূর্বে জননীর ঘরে দুটি দোলনা থাকে, একটি চমৎকার গদিওয়ালা, নানা-রকমের রং-বেরঙের ঝালর দেওয়া এবং আর-একটি নেহাং কম-দামী—কোন-রকমে-কাজ-চলা গোছের। দুটি ভাল পোষাক থাকে। একটি রেশম সাটিন বা অল্প কোন বহুমূল্য বস্ত্রের তৈয়ারী, অণুটি দ্বিতীয় দোলনাটির মতই যা তা। ভাল দোলনা এবং ভাল পোষাকটি পুরুষ-সন্তানের জন্ম এবং খারাপ দুটি কণ্ঠা-সন্তানের।

সন্তান জন্ম লইলে পর, দাত্রী তাহাকে বা হাতে ধরিয়া তাহার সর্বদা জল ছড়াইয়া দেয়। তারপর তাহাকে বেশ করিয়া ধুইয়া পুছিয়া পোষাক পরানো হয়। পোষাক পরা হইলে একটা চোকা বালিশে শিশু বাঁধা থাকে। কেবল হাত আর মাথা খোলা অবস্থায় থাকে। শিশু যদি বড় বেশী কাঁদে তবে তার পৃথিবী-আগমনের প্রথম সপ্তাহ আফিমের নেশাতেই কাটিয়া যায়। আফিমের নেশার ঘোরে সে এক-রকম বেহুশ হইয়া পড়িয়া থাকে।

দাত্রী এবং সন্তানের জননী সন্তানকে “দূষিত স্ক্রু আক্রমণ” হইতে রক্ষা করিতে সর্বদাই চেষ্টা করে। নীল রঙ নাকি শিশুকে এই-সব আক্রমণ হইতে বাঁচায়। তাই জন্ম শিশুর বক্ষের উপর অনেক-সময় নীল কাপড়ের

ফালি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই-সমস্ত ফালির সঙ্গে মন্ত্রপূত মাহুলি ঝুলানো থাকে। মক্কা হইতে আনীত বলির ভেড়ার চোখের মধ্যে নীলা পাথর বসাইয়া বা পশম দিয়া ছোট একটি উষ্ট্রমূর্তি তৈরী করিয়া শিশুর গলায় পরাইয়া দিলেই শিশু “শনিদৃষ্টি”র প্রকোপ হইতে রক্ষা পায়।

শিশুকে আপদ হইতে বাঁচাইবার আর-একটি উপায় তাহাকে ধোকড়-ধাকড় জামা-কাপড় পরানো। তাহা হইলে শিশুকে কেহ প্রশংসা করিবে না। ভাল-পোষাক-পরা শিশুকে লোকে প্রায়ই ভালবাসে এবং উচ্ছৃঙ্খলিত প্রশংসা করে, কিন্তু প্রশংসা-বাক্যের শেষে “মসাহলা” (ঈশ্বরই সর্বশক্তিমান)—এই কথাটি বলিতে ভুলিয়া যায়। তাহাতে শিশুর অদৃষ্টদেবতা অপ্রসন্ন হন এবং শিশুর ভাগ্য-লিপিতে অকল্যাণ-বাণী লেখেন।

শিশুর যা-কিছু অসুস্থ হয় সবেমত কারণ নাকি মন্দ-চোখের-দৃষ্টি। একবার একটি শিশুর মস্তিষ্কে নাকি জলাধিক্য হইয়াছিল। হাকিম আদিয়া বলিলেন, শিশুকে একটা দানাতে পাইয়াছে। তাহার জন্ম ব্যবস্থা হইল এইরূপ—শিশুর পিতা-মাতাকে একটা নূতন কবর খনন করিতে হইবে এবং রাত্রে শিশুকে ঐ কবরে শোয়াইয়া রাখিতে হইবে। প্রাতঃকালে দানা হয় শিশুকে ত্যাগ করিয়া যাইবে, নয় তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে। সমস্তই যথাযথ করা হইল। সকালে দেখা গেল, শিশু বেশ ঘুমাইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাকে দানা ত্যাগ করিয়া যায় নাই। তাহার অসুস্থের কন্ঠি হয় নাই, বাড়তিও হয় নাই।

শিশু-কণ্ঠার পিতা প্রায় ক্ষেত্রেই কণ্ঠাকে আদর করেন না। তবে যদি পিতার অল্প পুরুষ-সন্তান থাকে তবে তিনি “অন্দারুনে” তাহাকে দয়া করিয়া কোলে করেন, বছরে গোটা-দুয়েক চুমাও দিয়া থাকেন। শিশু-কণ্ঠা বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গেই একসঙ্গে বাড়িয়া ওঠে এবং তার

* * * *
 সমাজের অবিচার, শাসকের অত্যাচার মর্মে তব তুলেছে জনন—
 তাই শত কবিতায় তীব্রতম বেদনায় সে কলুষ করেছ ছেদন।
 মনে পড়ে সেই দিন স্নেহলতা স্নেহহীন হয়ে যবে ববিল মরণ—
 তুমিই ব্যথিত বুকে নির্দয় লেখনী-মুখে ঢেলেছিলে তীব্র ছত্যাশন।
 আজো কত স্নেহলতা নির্ধ্যাতন-অবনতা কত বধু করে আর্ন্তনাদ,
 তাদের হৃদয়-ক্ষত কাহারে কাদাবে তত, বেদনায় কে দিবে সংবাদ ?
 'ভগামি ও ক্ষুদ্র কথা তোমারে দিবেছে ব্যথা, তীব্রতম দেছ প্রতিবাদ,
 জ্বাঘের নির্ভীক বাণী তোমাব শায়ক হানি' কত ভণ্ডে দিলে অবসাদ।
 স্বদেশের অকল্যাণ যে করেছে ক্ষুদ্র-প্রাণ তুমি তারে শাসিয়া কঠোর
 কর্তব্য দেখায়ে দেছ, সত্য-পথ চিনায়েছ, হে তেজস্বী হে সত্য-বিভোর !
 ভাষারের অপকীর্তি পঙ্খাবে সে দস্যবৃত্তি, তুমি তার দিলে পবিচয়—
 ছাড় নাই 'ধুনীটারে পলাইতে অহঙ্কারে, শিক্ষা দিলে নির্ধম নির্ভয়।

* * * *
 মহাক্রম বনস্পতি যে আজ সাহিত্য-পতি, পেলে তাঁর স্নেহছায়া দান,
 সে রবি ভুবন-জ্যোতি, তুমি যেন নিশাপতি আহরিলে তাঁরি আলো প্রাণ ;—
 সে স্নেহে অন্তর ভরি' নিজ শির উচ্চ করি' নিজ শক্তি করিলে প্রকাশ,—
 অফুরন্ত সে কবিত্ব, অফুরন্ত মল্লযুদ্ধ, অফুরন্ত বিচিত্র বিকাশ !
 বাজাইলে বেণুবীণা, জাগাইলে ক্ষুদ্রমনা হতাশাস বাঙালী-সন্তান,
 কোমলে গেয়েছ গান, বজ্রেব তুলেছ তান, হে কুসুম-কুলীশ-পর্যাপ !
 উজাড়ি আপন শক্তি ঢেলেছ সাহিত্য-ভক্তি, তবু তব মিটেনিক আশ,
 দেশ-দেশান্তর ছুটে মধুপের মত লুটে আহরিলে মধু বারো মাস ;
 ছন্দে তব চিত্ত নাচে, বেণু বীণা বৃহ বাজে, যাচুক মোহে যেন মন—
 কত লঘু কত গুরু কত বাজে ছুঁছুঁ মাদল মৃদঙ্গ অগণন।
 অক্ষয় অক্ষয়কীর্তি, তাঁরি তুমি শক্তি-পুষ্টি, আজি তোমা করি হে বন্দন,
 হে বাংলার ভক্ত ছেলে, স্বর্গ হস্তে হস্ত-মেলে; ক্ষুদ্র পূজা কর হে গ্রহণ।

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ

কামা হুয়ে ভরল বাতাস, আকাশ ঢালে নেত্র-সলিল,
 মৌন হল মুখব বীণার তান,—

কবুতে পুত সবার শিরে চালবে কে আর 'তীর্থ-সলিল'—

কে শুনাবে 'বুছ-কেকার' গান ?

'ফুল-ফসলে'র পসরা নিষে, আনবে কে আজ গৌরবে,

দেশের লাগি 'তীর্থরেণু' আর ;—

বাণী দেউল ভরবে কে আর 'চীনের ধূপের' সৌরভে,
 কে বাজাবে 'বেণু-বীণা'র তার।

কে চলাবে ভাষাবে আব, নৃত্য-দোহল ছন্দে গো—

কে গাবে আব দেশ-বিদেশের কথা,—

বীরেব গাথা, প্রাচীন ঋষিব জ্ঞানের কুসুম-গন্ধে গো

কে ঘুটাবে হিয়ার মলিনতা ;—

কার দিনের কোনো পুরুষ চিত্রকর এমন করে চিত্র রচনা করতে পারত না। মেয়েদের হাতের স্বাভাবিক সৃষ্টিচেতনা, এবং নারীর নিজের মধ্যে অন্তর্গত জাতীয় জীবনের অথও ধারাবাহিকতার সহজ-বোধের দ্বারাই এটা সম্ভবপর হয়েছে। সেইজন্মেই এখনকার কালের অশিক্ষিত গ্রাম-বধূরা তাদের আল্পনায় যেসব মোলায়েম গোল রেখার দ্বারা আঁকে, তার মধ্যে আমরা সনাতন ভারতকলা-প্রচলিত প্রাণের গতি-রেখা দেখতে পাই।

সুনয়নী দেবী আর্টিস্ট পরিবারের মেয়ে। তাঁর কোনো কোনো ভাই বহুকাল পূর্বে অজন্মতার গুহায় ছবি একঁকেছিলেন, আবার তাঁর কোনো কোনো ভাই আর কিছুকাল পরে ইটালিতে জন্মেছেন, যেমন, মার্গারিটোনে ডারেজ্জো এবং গুইডোডা সিয়েনা। এইসব ভাইদের মধ্যে কেউ কারো অনুকরণ করেন নি, এমন কি পরস্পরের অস্তিত্ব তাঁদের জানাই ছিল না। কিন্তু সৃষ্টির এমনই আশ্চর্য্য নিয়ম যে, মানুষের অন্তরের অভিজ্ঞতা যখন একটি বিশেষ ক্ষেত্র অবলম্বন করে চলে তখন দেশকাল নির্বিশেষে তা একই রূপ ধারণ করে। এই জন্মেই ত সকল কালের সকল দেশের যোগীদের জীবন ও উক্তি সম্বন্ধে এমন সাদৃশ্য দেখা যায়।

যে একটি বিধাহীনতার জোরে সুনয়নী দেবী তাঁর তুলিতে রেখার টান দেন, সেই নিঃসংশয় বোধশক্তির অনুসরণ করেই তিনি রঙের মধ্যে লাল আর সবুজ বেছে নিয়েছেন। তাঁর বৈচিত্র্যহীন বর্ণ-সমাবেশের মধ্যে একটি

গাভীর্ষ্য আছে। সোনালি আর কালো রং পরিমিতভাবে বাঁটোয়ারা করে দিয়ে তাঁর ছবিতে তিনি ঘনতা দেখিয়েছেন; আর মেয়েদের মুখের, দেয়ালের, পর্দার কোমল ধূসর (grey) এবং পিঙ্গল (brown) রঙের এক সমতলে তিনি লাল আর সবুজ রঙ মেলে ধরেছেন।

এই রকম চিত্রকলার মধ্যে যে নিবিড়তা আছে সে নিজের মধ্যেই নিজেকে বদ্ধ থাকে, কেননা শিল্পীর অন্তর্নিহিত রীতিধারাই তার আশ্রয়। কোনো শিক্ষা, বাইরের কোনো প্রভাব তাকে পোষণ করতে পারে না; বরঞ্চ তাকে মূলভ্রষ্ট করে দিয়ে নষ্টই করতে পারে। আরও একটি বিপদ আছে, মাঝে মাঝে সুনয়নী দেবীকে তা আক্রমণ করে থাকে, সে হচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রা ও গল্পের সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য। তাঁর নিজের সৃষ্টি যে-সমস্ত উপাদানকে ব্যবহার করে সেইগুলি যদি তাঁর দৃষ্ট বা কল্পিত পদার্থের অনুকৃতি-চেষ্টায় খাটাতে হয় তাহলে তাঁর সহজ সৃজনশক্তির উৎস এইসব জঞ্জালে রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে, তাহলে তাঁর দৃষ্টির ও লেখনী-চালনার ক্ষিপ্ততাই প্রবল হয়ে উঠবে এবং হৃদয়বেগ ও ঘটনা-বর্ণনার ব্যস্ততায় তাঁর রচনার স্বাভাবিক শান্তি চলে যাবে।

সুনয়নী দেবীর নিজের অন্তরের মধ্যেই আর্টিস্টের সমস্ত ঐশ্বর্য্য আছে। তাঁর আর কিছু দরকার নেই। তিনি যদি তাঁর সেই ঐশ্বর্য্যভাণ্ডারের অধিদেবতার গোপন সঙ্গীতে কান পেতে থাকেন, তাহলেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা আপনিই প্রকাশিত হতে থাকবে।

ষ্টেলা ক্রামরিশ্

আসা-যাওয়ার মাঝখানে

আসা-যাওয়ার মাঝখানে

একলা আছ চেয়ে কাহার

পথ-পানে !

আকাশে ঐ কালোয় সোনা

আবণ-মেঘের কোণায় কোণায়

অঁধার-আলোয় কোন্ খেলা যে

কে জানে,

আসা-যাওয়ার মাঝখানে !

শুকনো পাতা ধূলায় ঝরে,

নবীন পাতায় শাখা ভরে।

মাঝে তুমি আপন-হার,

পায়ের কাছে জলের ধারা

যায় চলে' ঐ অশ্রুভরা

কোন্ গানে,

আসা-যাওয়ার মাঝখানে !

১৮ আষাঢ়, ১৩২২

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাণাপাণি অন্ধখানি সাজাবে কে নূতন সাজে ;—

‘হোম-শিখা’ কোন জাল্বে সাধক বীর ;

‘অভ্র-আবীর’ কে ছড়াবে আজকে বাণী কুঞ্জমাঝে—

দেশের গর্বে করবে উচ্চ শির !

বাণী-দেউল পূর্বে কে আর অতুল ‘মণি-মঞ্জুষা’য়—

কে গাঁথিবে ‘রক্তমল্লী’ আর ;

‘তুলির লিখন’ হাতে নিয়ে কে ভরাবে স্বয়মায়

‘হসন্তিকা’য় পূজার অর্ঘ্যভার !

আজকে সে যে গেছে চলি গেছে চলি কোন স্বদূবে—

সেখায় কি সে শুন্ছে মোদের বাণী ,

ভাসিয়ে মায়ে অশ্রু-ধারে কোথায় গেল সে কোন্ পুরে,

পত্নীপ্রাণে বজ্র কঠোর হানি’ ?

মৃত্যু যদি নে যায় তাকে কেড়ে মোদের কাছ থেকে

মরণের আজ ঘটেবে পরাজয় ;

অমর সে যে মোদের কাছে—গেছে যে সে কীর্তি রেখে--

করেছে সে হৃদয় সবার জয় ।

নিভল আজি একটা তারা ; থামাল গান একটি পিক্—

‘হিয়া সবার উঠল ব্যথায় ভরে’ ;

শাস্তি লভ, অমর কবি, মৃত্যু,—সে তার প্রাণ্য নিক,

বজ্র আজি ভাঙ্ক নয়ন-গোরে ।

শ্রী দেবীদাস মুখোপাধ্যায়

সত্যেন্দ্র-স্মরণে

জীবন-নাট্য অকালে সাক্ষ করি’

আষাঢ়ের মেঘ-মুকুট মাথায় পরি’

ললাটে আঁকিয়া জয়চন্দন-টীকা

করিলে প্রয়াণ যেন গো বহুশিখা ।

মেঘলোকে যেথা নন্দনবনছায়ে

স্বচ্ছ সরসী আকুল দখিনা বায়ে,

শ্বেত সরসিজ ফুটায়েছে মায়াছবি,

সবুজ সায়রে উকি দায় শিশু-রবি,

মৃণাললুঙ্গ মরালের মত তুমি

সেথা কি গো গেলে ত্যজিয়া মর্ত্যভূমি ?

ধূলিধূমে ভবা মহানগবীর প্রাণ

নারিল কি দিতে তব পূজা-অবদান ?

চলে গেলে যেথা চিরবসন্ত রাজে,

নূপুরের ধ্বনি নিয়ত বাতাসে বাজে ?

‘মেঘদূত’-কবি হাতে নিয়ে মালাগাছি

তোমারে বরিতে রয়েছে দাঁড়ায়ে আজি !

স্বরধুনী তব ভঙ্গ্য বৃকতে ধরি’

জলধির শিরে দিল সে উজাড় কবি’,

ফেনপুষ্পের অঞ্জলি ধরি’ তুলে’

জয়গাথা তব গাহিল কর্ণমূলে !

দাঁড়াইয়া এই কঠিন মর্ত্যভূমে

দীনহীন এক বঙ্ধু তোমারে নমে !

নাই তাঁর হাতে নন্দনফুলহার,

অশ্রুর মালা দিতেছে সে উপহার !

সাম্বনা পাক অশাস্ত তব হিয়া.

মেলে যেন সেথা মনের মতন-প্রিয়া !

স্বরপতি-সভা উজ্জলি’ রহ কবি,

নয়নে ফুটুক অলোক-আলোক-ছবি !



পূজারতা

শ্রীমতী সুনয়নী দেবীর অঙ্কিত

করে' রক্ষা কর্চে। এইসব তরুণী, যৌবনের গোপনবার্তা যাদের কাছে কেউ প্রকাশ করে নি, অথচ যারা আপনিই তা বুঝে নিয়েছে, তাদেরই ভাবাকুল রহস্যময় সত্তাকে এই সাড়িগুলি যেন বড় আদরের দোলায় দোলাচ্ছে। এই মেয়েদের চোখে চাঞ্চল্য নেই, তারা আত্মপ্রতিষ্ঠিত; তারা সেই অন্তরলোকের দূতী যে লোক লাল এবং সবুজ সাড়ির বিলুপ্তিত অবগুণ্ঠনে আবৃত। তাদের ঐ দীর্ঘ এবং স্থির অথচ পাখীর মত উদ্যত চোখ-ছুটির ভিতর দিয়েই তাদের মনের চিন্তা এবং হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ পেয়ে এই ছবিটিকে জীবনপূর্ণ করে' তুলেছে।

এমনি করে' ছবিগুলির মধ্যে দুই ধারার ছন্দ দেখা দিয়েছে। একটি হচ্ছে, শস্যক্ষেতের ভিতরকার বায়ু-মুচ্ছনার মত শান্ত এবং ব্যাপক, এমন একটি গাঙ্গীয্যের বিস্তার যেটি সমগ্র ছবিকে ঐক্য এবং ধ্রুবত্ব দান করেছে। আরেকটি হচ্ছে ঠিক এর বিপরীত, সেটি চঞ্চল, তীক্ষ্ণ, লঘু; স্বল্প বিস্তৃত গতিমাত্র, প্রশস্ত বর্ণপুঞ্জের উপর দিয়ে সে



অর্দ্ধনারীধর

শ্রীমতী সুনয়নী দেবীর অঙ্কিত

জরত ধেয়ে চলে। এমনি করে' চোখ, ঠোঁট, এবং হাত ছুটি মিলে একখানি ভাবব্যঞ্জনার ভঙ্গিতে পরিণত হয়ে পাখীর ওড়ার মত ত্বরিত বেগে রচনাটির সূক্ষ্মতম প্রবাহের উপর দিয়ে চলে যায়।

এমনি করে' খণ্ডকালের চঞ্চলতা এবং অন্তরাঙ্গার চিরন্তন স্থিতি উভয়ে একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের ভঙ্গিমা দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। সুনয়নী দেবীর আঁটের মূলতত্ত্বই হচ্ছে জীবনের ভিতরকার এই দ্বৈত, যা একইকালে অনিত্য এবং ধ্রুব। এই ত সেই ভারতীয় প্রকৃতির প্রকাশ, যার গুণে ইনি অজন্তার অথচ প্রবাহিত কলারীতিকে এমন অনায়াসে গ্রহণ করতে পেরেছেন। মোগল চিত্রকলা ভারতীয় আঁটকে আয়তনে প্রাণশক্তিতে এবং জীবনের অভিজ্ঞতায় যে ধর্ম করে' ফেলেছিল, এই ছবিতে সেই ক্রটি বিস্মৃত এবং মার্জনাপ্রাপ্ত হয়েছে। রচয়িত্রীর অজ্ঞাতসারে অথচ নিশ্চিত নৈপুণ্যে এই ছবিতে বিস্তৃত ভারতীয় রেখার আকৃশন-ভঙ্গী (curvature) আপনার শান্ত সঞ্চরণ সুরটিকে প্রকাশ করেছে।

যে কলারীতি দুই হাজার বছরের পূর্বেকার জিনিষ, তারই সঙ্গে এত সহজে সুর মিলিয়ে বোধ হয় আজকাল-

কবি সত্যেন্দ্রনাথ

সত্য তুমি, ইন্দ্র তুমি, রচতে স্বরের ইন্দ্রজাল,
বেঙ্গুরা এই মিথ্যা ধরা আর কি ভাল লাগলো না,
ফুল ফুটিবে কোথায় গেলে চক্রবালের অস্তরাল,
মঞ্জরিত বক্স-পাদপ ফল ধরাতে থাকলো না।

সবুজ পরী অলকপুরী বন্ধ আজি করলে ঘর,
ধামলো অঝোর মূলা-ঝরা পাগুলা-ঝোরার মুখ থেকে ;
কোন সে দারুণ জহুমনি গঙুয়েতে ভরলে তার
সত্ত্বাবা গন্ধাধাবা রুক্ষ ধরাব বুক থেকে !

নওকো বেলী, নও চামেলী, সত্য তুমি গন্ধরাজ,
পীষ্মভরা প্রাণটি গড়া ভালবাসার বিশ্বাসে,
ভোম্বা তোমার নিত্য চারণ কাঁদছে শোনো বন্ধু আজ,
পারিজাতের জ্ঞাত যে তুমি, শুকাও ধরার নিশ্বাসে।

পাহাড় কেটে আনলে নদী প্রেমিক ফরহাদ ভাই তুমি,
পান না করি' স্নিগ্ধ বাবি করলে পয়ান কোন দবে,

হেথায় তোমার শিরিন্ কাঁদে কোথায় সখা কই তুমি,
হায়বে মানস-যাত্রী মরাল চায় না ফিরে বন্ধুরে।

বিশ্ববাণীর নৃপুরুষনি বাজতো তোমার স্বরটিতে
বর্ণে আলোয় গন্ধে নৃতন স্বর মিশাতে জানতে গো,
তোমার বকের সাত-মহলায় পরিমলের পুরটিতে
দিল-দরদী তোমাব দয়া দীনের লাগি কাঁদতো গো।

তুচ্ছ সে দীপ আলাদীনের, তোমার সখী আদম্মানী
আদম্মানেতে গড়তো তুলে অমর-পুৰী তাজমহল,
তাঞ্জামেরে ছাড়তো যে পথ সূর্য-ভুরগ রাশ মানি,
আনতো ছরী নিংড়ে আঙুর দূর সিরাজের আলকহল।

ফুলের কবি পালিয়ে গেলে আজকে ফলের মরুস্রমে
এই ধবাকে তরুণ করে' করুণ কোমল সঙ্গীতে,
হায় যুবরাজ কাঁদছে যে আজ ভাইটি তোমার কর চুমে,
সাম্বনা দাও শান্তিকামী মুক্ত আখির ইঙ্গিতে।

শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১

যে চোখে আসে না জল, সে আঁখি পাষণ
আজি সিক্ত অশ্রুধারে, চাহি চারি ভিতে
ভাবি যবে, আর কভু পাব না দেখিতে
সেই শাস্ত্র স্বগম্ভীর মুরতি মহান।
বাংলার কবি তুমি, মধুবাণী তার
কি অমৃতছন্দস্বরে বাঁধিয়া গাঁথিয়া
বিবচিত্তে ইন্দ্রজাল, সে মধু ঝঙ্কার
নিত্য নব নব তানে আর গুঞ্জরিয়া
উঠিবে না এ আশান। বিহ্বলের দল
গাবে কুঞ্জে সেই স্বরে, কুসুমের বাশি
ফুটাবে সে বর্ণগন্ধ, সেই শ্রামাঞ্চল
প্রসারিবে দিগঙ্গনা, শুধু সেই বাঁশি
যার স্বরে বয়ে যেত বাংলার প্রাণ,
সে বাঁশবী চিতানলে ভস্ম-অবসান।

২

মৃত্যু আসি দেহ হতে মুক্তি দেয় যারে
জানি না সে নব দেহে নৃতন জীবনে
নব জন্ম লভে কি না। এ মর ভুবনে
জানি এক মৃত্যুঞ্জয় অমর আত্মাবে
প্রাণ হতে প্রাণান্তবে নিত্য যে বিলায়
আপনারে প্রতি কর্ম চিন্তা আচরণে।
সেই মৃত্যু বিজয়িনী অমৃত-ধাবায়
ঢেলেছিলে কলধনে প্রাণের প্রাবনে,
তাই আজি ঘবে ঘরে কত নরনারী
বক্ষে বক্ষে ধরে তব প্রাণরসধারা।
ভেঙেছে সে পূর্ণ ঘট যার পুণ্যবারি
অভিষিক্ত করেছিল উষর সাহারা ;
অলি উড়ে গেছে রাধি মধুচক্রে তার
কাব্যরস-পিয়সীর অমৃত-ভাণ্ডার।

স্বতঃস্ফূর্তি

গাছ জানে না কখন তাকে ফুল কোটাতে হবে।
পাখী জানে না কখন দস্তুরমততার গান গাওয়া চাই।
সমগ্র প্রাণশক্তির ভিতর থেকে তাদের উদ্যম জাগে,
এজ্ঞে তাদের বুদ্ধিবিচারের দরকার হয় না।
স্বনয়নী দেবীও এমনি করেই তাঁর ছবিগুলি ফলিয়ে তোলেন।
কি করে? আঁকতে হয় তিনি কখনো শেখেন নি, তাই তাঁর
অশিক্ষিত সহজপটু অনায়াসেই রঙে রঙে ফোটে এবং
রেখায় রেখায় গান করে' উঠতে থাকে।

তাঁর ছবির মধ্যে কোনো পূর্বকল্পিত আদর্শ নেই,
তারা যেন নিজে নিজে বেড়ে উঠেছে। তাতে রেখা-
গুলির ধারা অভিন্ন এবং স্থনিশ্চিত; যেহেতু তারা তাঁর
প্রকৃতির ভিতর থেকে উৎসারিত সেইজন্মে কোনো
দ্বিধায় নিজের পথ হতে তাদের বিক্ষিপ্ত করে নি; তারা
প্রশান্ত গম্ভীরতায় ব্যাপ্ত হয়ে এক-একটি আকৃতিকে বা
আকৃতি-সমবায়কে বেঁধে ধরে; তারা একইকালে

বেগবান এবং মন্থর, যেমন তাদের আত্মবোধণ তেমন
আত্মসম্বরণ, বায়ুহিল্লোলিত ভরা ফসল-ক্ষেতের মত
তাদের আকৃষ্টতা, আর সেই ভরা ফসল-ক্ষেতের মতই
যেন এই খেঁখাগুলির চারিদিক থেকে আতপ এবং আভা
বিকীর্ণ হতে থাকে।

তাঁর আঁকা বালিকাদের মুখগুলির চারদিকে পূর্ণ
পরিণত প্রাণশক্তির উদ্যম এবং বিরাম গাঢ় লাল গাঢ়
সবুজ বর্ণে আবিষ্ট হয়ে আছে। তাদের সাড়িগুলির
মধ্যে এমনি একটি ব্যঙ্গনা, যেন তারা কাপড়ে তৈরী নয়,
যেন তারা একটি কোমল ভাবের ভঙ্গিমায় গড়া। সেই
সাড়ি যেন ঐ মেয়েগুলিকে একটি উদার প্রবাহে বেঁধে



গ্রাম-বধূ
শ্রীমতী স্বনয়নী দেবীর অঙ্কিত



বাউল
শ্রীমতী স্বনয়নী দেবীর অঙ্কিত

সত্যেন্দ্রনাথের কথা

সমাপ্তি নাই কিসের? দুঃখের না শোকের? অথবা দুঃখেরই?

দুঃখ মাহুষ সহিতে পাবে—দুঃখ যে নিশ্চয়নৈমিত্তিক। শোক অসহ—স্বর্গসুন্দর যাতনায় অস্থিপঙ্কর ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়।

শুধু তাহাই নয়। দুঃখের পর স্থখ—স্থষ্টির পর রৌদ্র, আশায় মাহুষ বুক বাঁধে। কিন্তু শোক?—সর্বগ্রাসী, সর্ববিধ্বংসী, জীবনব্যাপী—সে যে পাগল করিয়া ছাড়ে।

মানসপটে জাজ্জল্যমান যাহা, মুছিবে তাহা কেমন করিয়া? মনের ভার লাঘব করিতে চাও,—কাদো বন্ধের নরনারী, বাঙ্গালার তরুলতা, পদ্ম অপরাঙ্জিতা, সেই সঙ্গে স্বব গিলাইয়া দাও তোমরাও হে দোয়েল জামা ফিড়া। তোমরা বে তার প্রাণের প্রাণ—তোমাদের সেই সত্যেন্দ্রনাথের।

না, নাই, সত্যেন্দ্রনাথ সত্যই নাই! আষাঢ়ের পহিলা বাদলে সেই মহাপ্রাণ অমরধামে যাত্রা করিয়াছে। গত ১০ই আষাঢ়, শনিবার, রাত্রি আড়াইটায় তাহার শেষ নিশ্বাস ধরিত্রীর বাতাস স্পর্শ করিয়াছে।

শৈশবে

আজ মনে পড়ে চল্লিশ বৎসর পূর্বের কথা। ১২৮৮ সালের ২৯এ মাঘ, শনিবার, অমনই বাদল রজনীতে দ্বিপ্রহর রাত্রে শীর্ণ শিশু প্রথম বিশ্বয়ের চাহনি চাহিল। কে জানিত নিম্নতা গ্রামে মাতুলালয়ের স্মৃতিকাগারে দেণমান্য ঋষি-কবির আবির্ভাব হইল।

তাহার পর উপর্যুপরি কয়দিন কেবল ঝড়। সকলেই তাই নাম রাখিল—“ঝড়ি”। নামে ‘ঝড়ি’ কিন্তু প্রকৃতি কি শাস্ত সংযত! শিশু আপন মনে হাসিত খেলিত, কাদিতে যেন জানিত না। ভগ্নশাস্ত্র, নিত্য পীড়া সারা-জীবন কুগ্রহের মত তাহাকে বেড়িয়া ছিল। শারীরিক যন্ত্রণার বাহ পরিচয় কিন্তু কেহ কোনদিন পায় নাই—সহিষ্ণুতা এমনই অসাধারণ।

স্নেহাত্মক পিতা পূজ্যপাদ ৮-রজনীনাতথ রাশি রাশি মেওয়া ও সুপক ফল নিত্য আনিতে। পুত্র দশজনকে

বিলাইয়া কি আনন্দই না অল্পভব করিত। রসনার তৃপ্তিদানে মুক্তহস্ত শিশু কে জানিত ঘোবনে কবিশ্বের বিচিত্র রস সৃষ্টি করিয়া সমগ্র বাঙ্গালাকে মাতাল কবিতা তুলিবে।

বাল্যে

গল্প শুনিতে বালকের আনন্দের অবধি ছিল না। অশ্রুতিবর্ষবয়স্কা ঠাকুরমাতা কাহিনী ও ছড়া বলিতে বলিতে মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেন, বালকও তন্মগ্ন হইয়া যাইত। পবদিন সকল কাহিনী সকল ছড়া যথাযথ আবৃত্তি করিত। স্মৃতিশক্তি এমনই তীক্ষ্ণ।

খেলার প্রতি বিতৃষ্ণা বালকের একটা বিশেষত্ব ছিল। ধর্মবীরগণের প্রতি অহুরাগ কিন্তু পূর্ণ প্রকট। ঋব, প্রহ্লাদ সাজিয়া “বল মাধাই মধুর স্বরে” কি আন্তরিকতার সহিতই গাহিত। বে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া যাইত, পুনঃ পুনঃ শুনিতে চাহিত।

কবিতা শুনিতে, ছবি দেখিতে বালকের কি বিপুল আগ্রহ! আত্মীয় শ্রী পূর্ণচন্দ্র ও প্রকাশচন্দ্র ঘোষ মসজীদ-বাড়ী ষ্ট্রীটের বাটীতে থাকিয়া তখন পড়াশুনার সঙ্গে-সঙ্গে সাহিত্যচর্চাও করিতেন। বালকের অহুরোধে প্রকাশচন্দ্রকে নিত্যই হয় একটা নূতন ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়া, নয় একখানা ছবি আঁকিয়া দিতে হইত। নিজস্ব সম্পত্তি ভাবিয়া বালক তাহা লইয়া গৃহপ্রাঙ্গণ আনন্দ-মুগ্ধরিত করিয়া তুলিত। পূর্ণচন্দ্র বালক সত্যেন্দ্রের প্রথম শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। বালক একমাসে প্রথম ভাগ শেষ করে।

পঠদশায় পাঠে অহুরাগ পূর্ণ মাত্রায় ছিল, কিন্তু পাঠ্য-পুস্তকে নয়। অমনোযোগের জন্ত মন্দ ভৎসনার দু-একবার প্রযোজন হয়। হস্তাক্ষর সম্বন্ধেও তাই। মার কাছে গোপনে অহুরোগ করিতে শুনিয়াছি—“মামা বকিয়াছেন লেখা বেশী করিয়া লিখি না বলিয়া। কিন্তু আমি ত কেমনী হইব না।”

প্রবন্ধ-লেখক তখন সংবাদপত্র সম্পাদনে ব্যস্ত। ইংরেজী বাঙ্গালা সংবাদপত্রে গৃহ পরিপূর্ণ, লেখক সর্বদাই

সম্পাদকীয় মন্তব্যরচনায় বা প্রক সংশোধনে ব্যাপৃত।
তের বৎসরের বালক সতৃষ্ণ নয়নে তাহাই দেখিত,
অসাক্ষাতে কিছু কিছু প্রক সংশোধন কবিত, দু'একটি
শব্দও যোগ্যতাব সহিত পবিবর্তন কবিষা রাখিত।
প্রত্যহ পড়া লইবার সময় কিন্তু দেখিষা বিন্মিত হইতাম
যাহা একবার বলিষা দেওয়া হইয়াছে তাহা কঠস্থ
হইয়াছে।

এই সময় বায়ুপরিবর্তনের জন্ত সত্যেন্দ্রের পিতা পুত্রকে
লইষা মধুপুবে যান। যাত্রার দুই দিন পূর্বে বালক
ছাপাখানা হইতে নিজ্ঞনামের অক্ষর কয়টা আনিষা বাটীতেই
কালী দিষা নিজ্ঞ নাম ছাপিষাছিল সমুদায় পুস্তকে, ছবিতে,
দেওয়ালে। পরদিন সনির্বন্ধ অল্পবোধ তাহার নামটা
সংবাদপত্রে ছাপিষা দিতে হইবে। যখন উত্তর পাইল
যে মধুপুব হইতে একটা সংবাদ লিখিষা পাঠাইলেই নাম
ছাপা হইবে, তখন উল্লাসেব আর সীমা বহিল না।
মধুপুব হইতে দিন কয়েক পরেই বালক সত্যেন্দ্র একটি
সংবাদ লিখিষা পাঠায়। লিখন-ভঙ্গী অতি সুন্দর হইয়াছিল।
সেই প্রথম রচনা প্রেরকের নাম সহ যথাবীতি সাপ্তাহিক
“হিতৈষী” পত্রে প্রকাশিত হয়।

ইহার এক বৎসব পরে কবি শেলির Skylark সঙ্গন্ধে
আমার কোন বন্ধুর সহিত আলোচনা হইতেছিল।
হেমচন্দ্রের অল্পবাদের কথা উঠিল। অল্পবাদে যে মূল্যেব
সৌন্দর্য্য সর্বত্র সংরক্ষিত হয় নাই ইহাই সাব্যস্ত হইল।
দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র বালক সত্যেন্দ্র বলিষা উঠিল, আমি
ঐ কবিতা অল্পবাদ কবিব। বালকের আগ্রহাতিশয্য
দেখিষা কোতুহল জন্মিল। কবিতা ব্যাখ্যা কবিষা
দেওয়া হইল। পরদিন সুন্দর অল্পবাদ পাঠে চমৎকৃত
হইলাম। সম্ভষ্ট হইষা O. W. Holmesএর “The
Old Man Laughs” কবিতা অল্পবাদ কবিতে দেওয়া
হইল। অল্পবাদে মূল্যেব সৌন্দর্য্য যথাযথ সংরক্ষিত
হইয়াছিল, পড়িষা মনে হইল যেন সম্পূর্ণ মৌলিক
কবিতা। দুইটি কবিতাই পরে সাময়িক পত্রে প্রকাশ
করা হয়। তাহার পর প্রতি মাসেই কিছু কিছু উৎকৃষ্ট
কবিতার অল্পবাদ চলিতে লাগিল, দু'এক স্থানে সংশোধনের
প্রয়োজন হইত মাত্র।

যৌবনারম্ভে

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া
সত্যেন্দ্রনাথ স্কটিশ চার্চেস কলেজে ভর্তি হয়। এই সময়ে
আমি ছোট গল্প রচনায প্রবৃত্ত হই। পরলোকগত বন্ধু
সুরেশচন্দ্র সমাজপতিব “সাহিত্রি” ও আমাব “যুথিকা”
একই মাসে প্রকাশিত হয়। তখন ছোটগল্পেব বহি
বাঙ্গালা সাহিত্যে ছিল না বলিলেই চলে। একদিন
দেখি, বোগ সংক্রামক হইয়াছে, সত্যেন্দ্রনাথ অঙ্কের
ধাতাষ একটা ছোট গল্প ফাঁদিয়াছে। ইহা কলেজের
পাঠের বিশেষ অন্তবায় হইবে ভাবিষা অসন্তোষ প্রকাশ
করি। সেই অবধি সত্যেন্দ্র গল্পরচনার চেষ্টা বোধ হয় আর
তত কবে নাই। ইউরোপীষ নানা ভাষা হইতে অনূদিত
বিখ্যাত গ্রন্থকারগণের গল্পসাহিত্য পাঠে তখন আমার নেশা
ছিল। আমার অজ্ঞাতসারে সত্যেন্দ্রনাথও সেগুলি সম্বন্ধে
পড়িত। কথা-প্রসঙ্গে একদিন তাহাব বিশিষ্ট পরিচয়
পাইষা পুলকিত হইলাম। তদবধি নিতাই অনেক বাত্রি
পর্যন্ত দুইজনে সাহিত্যালোচনা হইত। সত্যেব বৎসরের
বালকেব সঙ্গে সাহিত্যালোচনা মনে হইলে অনেক সময়
হাসি পাইত, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ এমন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-
শক্তিব পরিচয় দিত, করাসী, ক্ষয়ীষ প্রভৃতি নানা
গ্রন্থ এত যোগ্যতার সহিত তুলনায সমালোচনা কবিত
যে বিষয়-বিমুক্ত হইতে হইত।

অল্পবাস্ত্রে সত্যেন্দ্রনাথ বীতস্পৃহ ছিল। ইংবেজী
সাহিত্য প্রত্যহ নিজে পড়াইতাম। অল্পপুস্তকেব প্রতি
মনোযোগ দিতেছে কি না একদিন পবীক্ষা কবিতে গিষা
দেখি যে তাহা সম্পূর্ণরূপে অবহেলা কবিতেছে।

বিরক্ত হইয়াছি বুঝিষা সত্যেন্দ্র বলিল, “উহা অনর্থক
পণ্ডশ্রম মাত্র, ভালও লাগে না, বুঝিতেও পারি না।”
তাহার পব স্বযোগ্য শিক্ষক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত তারকনাথ
সরকাবের প্রতি অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষার ভার
সমর্পিত হয়। তাহারই যত্নে ছাত্র এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
হয় এবং পদার্থবিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে।
ইহারই ফলে “সবিতা” কবিতা। এই কবিতা অতঃপর
হোমশিখার প্রারম্ভে সংযোজিত হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু (উকীল) শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ মিত্রের

ব্যয়ে গোপনে “সবিতা” গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। কয়েকমাস পরে উহা সত্যেন্দ্রের পিতার ও আমার গোচরে আসে। পাঠান্তে আনন্দিত হইলেও উভয়কেই বাস্তবতঃ অসন্তোষ প্রকাশ করিতে হয়। আশঙ্কা, পাছে উৎসাহিত হইয়া সত্যেন্দ্র কলেজের পাঠ সম্পূর্ণ অবহেলা করে।

এক-এ পরীক্ষার পর সত্যেন্দ্রের পিতার একান্ত ইচ্ছা হইল পুত্র ডাক্তারি পড়ে। এক্ষণে সকল ব্যবস্থাই হইল, মেডিক্যাল কলেজে আবেদনপত্রও প্রেরিত হইল। সত্যেন্দ্রনাথ প্রথমতঃ তাহাতে সম্মত হইয়া পরে বিরক্তি প্রকাশ করিল। তাহার মনোবৃত্তি কোন্ দিকে রজনীনাথকে তাহা বুঝাইলাম। তিনি নিজে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, পুত্রের ডাক্তারি পড়া হইবার নয় বুঝিয়া মর্মান্বিত হইলেন। অবশেষে বি-এ পড়াই সাব্যস্ত হইল।

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় সত্যেন্দ্রের বিবাহ স্থির হয়। কিন্তু হায়! রজনীনাথকে পুত্রের উদ্বাহকিয়া সম্পন্ন করিতে হইল না। পিতা মনস্বী অক্ষয়কুমার দত্তের “প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা” পুস্তক পরিবর্দ্ধিত আকারে লিখিয়া ৪৫ বৎসর মাত্র বয়সে রজনীনাথ লোকলীলা সম্বরণ করিলেন।

বৎসরান্তে সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ হইল। বিবাহেব মাস কয়েক পরেই বি-এ পরীক্ষায় সত্যেন্দ্র অমুত্তীর্ণ হইল। তাহার কারণ মনোবিজ্ঞানের চর্চিতচর্কণ তাহার আদৌ ভাল লাগিত না। পুনর্বার বি-এ পরীক্ষা দিতেও সে অসম্মত হইল। পীড়াপীড়ি করায় আমাকে বলিল, “আপনার export import ব্যবসাতে যোগদান করিব। তাহাতে দেশের এবং দশেরও কাজ হইবে।”

যেবেনে

সত্যেন্দ্র প্রতিশ্রুতি রক্ষাও করিল। কিন্তু অল্প দিন পরেই সে কার্যে বিরত হইল। শিরঃপীড়াই তাহার প্রধান কাবণ। তাহার পর বহুবাব এ কার্যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু কার্যতঃ কর্মক্ষেত্রে আর অবতীর্ণ হইতে পাবে নাই। গত বৎসরেও বায়ু পরিবর্তনের জন্ত জৌনপুরে যাইবার পূর্বে বলিয়াছিল, “গুনিলাম, বোম্বাই সহরে সাহেবদেব আধিপত্য নাই, তাহার কাবণ সেখানকার

অধিবাসীরা বড় ব্যবসায়ী। আমাদেরও একটা আদর্শ খাড়া করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ফিরিয়া আসিয়া আফিসেব কার্যে যোগ দিব ভাবিতেছি।” ফিরিয়া আসার পর আর এই উৎসাহ ছিল না। কথা-প্রসঙ্গে বলিল—“ব্যবসায় ত অর্থোপার্জনের জন্ত, অর্থে আমার এমন কি প্রয়োজন!”

আফিস ত্যাগের পর সত্যেন্দ্রনাথ প্রবল উৎসাহে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করে। নূতন নূতন গ্রন্থ ক্রম করিয়া সত্যেন্দ্র পিতামহের লাইব্রেরী সমৃদ্ধ করিতে থাকে এবং সর্বদাই অধ্যয়নে মগ্ন থাকিত। ইহার পর স্বদেশী আন্দোলনের নূতন যুগে সে স্বদেশপ্রেমে অল্পপ্রাপিত হয়। “সঙ্কীর্ণ” কবিতা লিখিয়া আমাকে দেখিতে দেয়। সামান্য পবিতর্জন ও পরিবর্তনের পব উহা মুদ্রিত ও বহু সভায় বিনামূল্যে বিতরিত হয়। “সঙ্কীর্ণ” কোন পববর্তী গ্রন্থেব অন্তর্ভূত হয় নাই। একটি স্থান উদ্ধৃত হইল—

“বৎসরান্তে ভাদ্রশেষে শুধু একবার

কুল প্রাণি’ আসে যে জোয়ার,

তাহাব তুলনা নাই, সমস্ত বৎসরে

সে জোয়ার আসে একবার!

সে জোয়ার এসেছে বে

আমাদের ঘরে ঘরে,

এসেছে বে নূতন জীবন!

বাকালী পেয়েছে আজ সামর্থ্য নূতন।”

ইহার পর সত্যেন্দ্রের সাহিত্যিক জীবন রীতিমত আরম্ভ হয়। “বেণু ও বীণা” “হোমশিখা” “তীর্থসলিল” “তীর্থরেণু” “ফুলেব ফসল” “জন্মভূমি” “কুছ ও কেকা” “তুলির লিখন” “মণিমঞ্জুষা” “অল্প আবীব” “হসন্তিকা” “রঙ্গমল্লী” “চীনের ধূপ” পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়। জীবনের এই অংশ তাহার বন্ধুগণের সম্যক পরিচিত। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সহৃদয়গণ সে সময়ে সর্বশেষ আলোচনা করিবেন আশা করি।

প্রকৃতি

সত্যেন্দ্রের প্রকৃতি কোমল মধুর ও নীরব ছিল।

অর্থে আসক্তি নাই, বেশভূষার পারিপাট্য নাই, আহার বিহার আমোদ-আহ্লাদের প্রতি আদৌ লক্ষ্য নাই, নিরোড, নিরহঙ্কার, স্তিতেজ্জিব, পুতচরিত্র, সত্যোদ্ভবনাথের তুলনা মিলে ভাব। বালকস্বলভ সবলতা তাহার ভূষণ, অতি বৃদ্ধ প্রাজ্ঞ হইতে বিদ্যালয়ের স্বল্পবয়স্ক ছাত্র পর্য্যন্ত সকলেই তাহাকে সমবয়স্ক বন্ধু জ্ঞান করিত।

পুস্তকপাঠ ও কবিতা রচনা সত্যোদ্ভব জীবনের কেন্দ্র ছিল। রচনার জন্ত চেষ্টা বা কষ্টকল্পনা আদৌ ছিল না। বাগ্দের স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া যাহা লিখাইতেন মন্ত্রমুগ্ধের স্তায় ঘেন তাহাই লিখিত। অর্থাগম হয় এমন কোন গ্রন্থ—বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক বা শিশুরঞ্জন কবিতাপুস্তক—লিখিবার জন্ত কতবার পরামর্শ দিয়াছি, কোন ফল হয় নাই। বৈষয়িক ব্যাপাব যাহা কিছু তাহাতেই তাহার বিষম বিরক্তি ছিল। সংসারের কোলাহল ও সাংসারিকতা হইতে সর্বদাই সে দূরে থাকিতে চাহিত।

সত্যোদ্ভব স্বল্পভাষী এবং অপবের অল্পগ্রহ প্রার্থনার প্রতি খণ্ডাহস্ত ছিল। অধিক লোকের সহিত মিশিতেও সে চাহিত না। বাল্যবন্ধুর মধ্যে বোলপুর বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব শিক্ষক শ্রীযুক্ত ধীবেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত আজীবন সৌহার্দ্য দেখিতে পাই।

স্বদেশপ্রেম

স্বদেশপ্রেমে কবি উদ্বুদ্ধ ছিল—“সন্ধিক্ষণে” তাহার উন্মেষ, পরবর্তী রচনায পূর্ণ বিকাশ। মেকির প্রতি, নকলের প্রতি, দোকানদারি বেনিমাগিরির প্রতি, তাহার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি সে বিশিষ্টরূপে আকৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে এত শ্রদ্ধা আর কাহাবও উপর তাহার ছিল না।

খন্দর প্রচলনের পর হইতে আত্মীয়-স্বজনকে সে জানাইয়াছিল যে, খন্দর ভিন্ন অন্য কোন বস্ত্র কেহ ঘেন তাহাকে উপহার না দেন। নিজেও সে সকলকেই খন্দর দিত।

সমাজ-সংস্কার

আজীবন প্রকৃতপক্ষে সংসারের বা সমাজের বাহিবে থাকিলেও সত্যোদ্ভব সামাজিক কুপ্রথা নিবারণের যত্ন কবিতা ক্রটি করে নাই। ভ্রাক্ষণেব আধিপত্য ও অত্যাচার,

অস্পৃশ্য জাতির প্রতি ঘৃণা প্রভৃতির বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতে সর্বদাই সে বন্ধপরিকর ছিল। সে কায়স্থ জাতিব মধ্যে চাষি সম্প্রদায়ের মিলনের সহায়তা করিয়াছিল।

দানশীলতা

সত্যোদ্ভবনাথের দান অতি সংগোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে হইত। বহু দুঃস্থ ছাত্রকে বিদ্যালয়ের মাহিনা ও পাঠ্য পুস্তক প্রতি মাসে যোগাইত, পাছে কেহ জানিতে পাবে এজ্ঞা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিত। দরিদ্র, আতুর দেখিলে তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত, যাহা নিকটে থাকিত তাহাই দিবা ফেলিত। কয় বৎসর পূর্বের কথা, তখন সত্যোদ্ভব দুইশত টাকা মূল্যেব একখানি নূতন শাল ব্যবহার করিতেছিল; সপ্তাহকাল তাহা আব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না দেখিয়া সত্যোদ্ভবের জননী তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন—সেখানা কি হইল। অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করায় সত্যোদ্ভব বলিল—“সেদিন এক বুড়ী কলেজ স্কোয়ারের মোড়ে শীতে খুব কাঁপিতেছে দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করায় বলিল, কাশেল হাঁসপাতাল হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। শীতান্তকে তাহা দিয়াছি।”

মাতৃভক্তি

মাতৃভক্তি সত্যোদ্ভবনাথের অসাধারণ ছিল। সাংসারিক কোন কিছুই প্রতি আসক্তি ছিল না, মাতৃভক্তি কিন্তু হৃদয়ে ওতঃপ্রোত। কয়েক বৎসর পূর্বে কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিলাত যাত্রার সময় সত্যোদ্ভবনাথকে সঙ্গে লইয়া যাইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। জননীর পরেই যাহার প্রতি সম্যক শ্রদ্ধা তাহার সঙ্গলাভ এবং তাহার সহিত পৃথিবী ভ্রমণেব আশায় সত্যোদ্ভবনাথ আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠে। বিধবা জননী অন্ধের যষ্টিস্বরূপ পুত্রকে দূরদেশে পাঠাইতে আতঙ্কিত হইলেন। পাছে মাব প্রাণে ব্যথা বাজে এই আশঙ্কায় সত্যোদ্ভবনাথ বিলাত যাত্রাব বাসনা পবিত্যাগ করিল। হায়! সেই জননীকে বৃদ্ধবয়সে একা ফেলিয়া আজ সে কোন্‌ স্বদূরের যাত্রী!

ব্রহ্মচর্য

বিবাহিত হইলেও সত্যোদ্ভবনাথ আজীবন ব্রহ্মচর্য

অবলম্বন করিয়া গিয়াছে। এমন তাগ, এমন সংঘম, ধীর স্থির প্রশান্ত্যাব যোগিজনেও দুলভ। ভীষ্মের মত তাহার প্রতিজ্ঞা, ভীষ্মের মতই চরিত্র-বল,—অচল অটল।

যাও সত্যেন্দ্রনাথ যাও, অমর লোকে সোনার সিংহাসন আলো করিয়া বস। জ্ঞানানুশীলনে ও কবিতারচনায়

যে পবিত্র জীবন যাপন করিয়াছ সেই পুণ্যকলে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া থাক। আমরা সে লোকে যেদিন পৌছিব, নিকটে যাইবার অধিকারী না হই, দূর হইতে দেখিয়াও ধন্য হইব।

শ্রী কালীচরণ মিত্র

সত্যেন্দ্র-পরিচয়

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে মানুষ হিসাবেও ঘনিষ্ঠভাবে জানবার আমার স্বযোগ হয়েছিল তাঁর বন্ধুত্ব-লাভের সৌভাগ্যে। এক মাঘোৎসবের বিকালে আদি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীতে যেতে যেতে পথে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় করে' দেন কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী। সে বোধ হয় ইংরেজী ১৯০৩ সালে বা তারও কিছু আগে। তার পর বহুকাল আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি—আমি কল্কাতা-ছাড়া হয়ে নানা দেশে ঘুরছিলাম। ১৯০৮ সালে আমি এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের তরফ থেকে কল্কাতায় এসে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস নামক বইএর দোকান খুলি। কল্কাতায় এসে একদিন মিউজিয়াম দেখে ফিরছি, সিঁড়ির বাঁক ঘুরে নামতেই দেখলাম সত্যেন্দ্র উপরে উঠছেন। নমস্কার ও কুশল-প্রশ্নের পর সত্যেন্দ্র আমার বাসার ঠিকানা জেনে নিলেন। একদিন রাত্রি প্রায় আটটার সময় সত্যেন্দ্রনাথ এক-তাড়া প্রুফ হাতে করে' আমাদের পাবলিশিং হাউসের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন—আমি তখন ঘুমোবার জোগাড় করছি। ভদ্রতার খাতিরে উঠে বসতে হল, কিন্তু মনে মনে বিরক্ত হয়ে। তার পর যখন সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর প্রুফের গুটানো কাগজ মেলতে মেলতে কিছু কবিতা পড়ে' শোনাবার প্রস্তাব করলেন, তখন ভাবলাম—সাবলে এবার! অসহ্য কবিতার উপদ্রব শিষ্ট হয়ে সহিতে হবে! তার আগে সত্যেন্দ্রনাথের কোনো কবিতা পড়িনি। সে ১৩১৫ সালের গোড়ার দিকের কথা—তখন সত্যেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুস্তক 'তীর্থ-সলিল' ছাপা হচ্ছে। দু-একটা কবিতা শুনতেই আমার

ঘুম ছুটে গেল, উৎসাহে আনন্দে সোজা হয়ে বসলাম—একজন খাঁটি কবির সন্ধান পেয়ে মনটা খুসী হয়ে গেল। একে নানা দেশের কবিদের ভাবসম্পদ, তায় সত্যেন্দ্রের মধুর ভাষায় নিখুঁত ছন্দে রূপান্তরিত; আমি কবিতার রসমাধুর্যে মজে' গেলাম। আমাদের উৎসাহী দেখে



সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সত্যেন্দ্র রোজ সন্ধ্যাকালে আমার কাছে আসতে লাগলেন। আমি বড় ঘুম-কাতুরে, আটটা বাজতে না বাজতে

ঘুমিয়ে পড়তাম, সত্যেন্দ্র আমার বিছানায় চূপ করে বসে থাকতেন ন'টা পর্যন্ত। আমি লজ্জিত হয়ে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম—‘আমি ঘুমিয়ে পড়লেও আপনি একলাটি চূপ করে বসে থাকেন কেন?’ তার উত্তরে সত্যেন্দ্র বললেন—‘রোজ সাড়ে নটার সময় আমি বাড়ী ফিরি—এই আমার নিয়ম; তার আগে বাড়ী ফিরলে মা ভাববেন যে আমার হয়ত কিছু অসুখ করেছে, তাই রোজ ঠিক সময়ে বাড়ী ফিরি।’ এই নিয়মটি তিনি মৃত্যুর অন্ত্যে শয্যাগত হবার আগে পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন; যদি সঙ্গী না পেয়েছেন তবু একলা চূপ করে হেঁদোয় বসে থেকে নটা বাজিয়ে তবে বাড়ী ফিরতেন।

এই-রকমে সত্যেন্দ্রের সঙ্গে আমার যে ঘনিষ্ঠতা ঘটে তা বুদ্ধি হয় ছুজনেরই চৌ চৌ করার স্বভাব থেকে; আমরা ছুজনে ছুপুর বেলা বেড়িয়ে পড়তাম বেড়াতে—চিড়িয়াখানা, ঘাছুর, বোটানিকেল গার্ডেন, পবেশনাথের মন্দির, বায়স্কোপ, ফেরি-সীমারে উত্তরে শিবুতলা ও দক্ষিণে রাজ-গঙ্গা আমাদের ভ্রমণ-পর্যায়ের অন্তর্গত ছিল। বারো মাসের তেরো পার্কণ উপলক্ষ্যে কল্‌কাতার কোন্ পাড়ায় কবে কোথায় মেলা হয় সত্যেন্দ্রের সব জানা ছিল ও দেখারও সখ ছিল। আমি হতাম তাঁর সহচর।

তার পর আমি এলাহাবাদে চলে যাই। সেখান থেকে আমি সত্যেন্দ্রকে এক চিঠিতে তুমি বলে’ সন্ধান করি। তার উত্তরে সত্যেন্দ্র যে চিঠি লেখেন তার আরম্ভ—‘আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান!—তুমি আমাকে তুমি বলেছ।’ সাক্ষাতের যে সন্ধান বাধা হয়ে ছিল, চিঠিতে সেটা ছুজনেই কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করতে লাগলাম।

আবার কল্‌কাতায় ফিরে এলাম ‘প্রবাসী’র সেবার ভার পেয়ে। সাক্ষাতে আবার আপনি সন্ধান চলতে লাগল।

এই সময় পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের বয়স পঞ্চাশ পূর্তি হব-হব হয়ে আসছে। সত্যেন্দ্র প্রস্তাব করলেন, রবীন্দ্র-সম্বন্ধনা করতে হবে। এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন মণিলাল ও যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতি। আমরা চারজনে

মেতে উঠলাম এর আয়োজনে। এই সময় আমরা পরস্পরে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবার স্বযোগ পেয়েছিলাম। আপনি বলে’ সন্ধান করলেই সম্বন্ধনা-তহবিলে এক আনা করে’ জরিমানা দিতে হবে, সত্যেন্দ্র ও যতীন্দ্রের এই প্রস্তাবে আমরা সকলেই কিছু কিছু জরিমানা দিয়ে আপনি বলার দায় থেকে নিষ্কৃতি পেলাম।

সত্যেন্দ্র রবীন্দ্র-সম্বন্ধনা ঘটিয়ে তুলে আমাদের দেশের—বিশেষ করে’ সাহিত্যপরিষদের—মুখরক্ষা করেছিলেন, তা না হলে যুরোপ নোবেল-প্রাইজ দিয়ে ভারতের যে অপমান করত তাতে আর লোকালয়ে মুখ দেখাবার জো থাকত না।

সত্যেন্দ্র যে রবীন্দ্রনাথকে কত বড় মনে করতেন তার পরিচয় আমি পাই তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পরেই তাঁর প্রথম বই ‘বেণু ও বীণা’র উৎসর্গ পড়ে।

যিনি জগতের সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন,

যিনি স্বদেশের সাহিত্যকে অমর করিয়াছেন,

“যিনি বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক,

সেই অলোকসামান্য শক্তিসম্পন্ন

কবির উদ্দেশে

এই সামান্য কবিতাগুলি সমস্তম্বে অর্পিত হইল।”

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—‘এ আপনি কাকে উৎসর্গ করেছেন?’ সত্যেন্দ্র বললেন—‘আপনিই বলুন না।’

আমি বললাম—‘হয় রবীন্দ্রনাথকে, নয় শেক্সপীয়ারকে।’

তখন সত্যেন্দ্র বললেন—‘যদি থাকতে পরকে দিতে যাব

কেন?’ এই কথা শুনে আমার মন উল্লাসে নৃত্য করে’

উঠেছিল; যুরোপের জহুরীদের কষ্টিপাথরে ঘাচাই হবার

আগে রবীন্দ্রনাথকে বড় কবি বলে’ স্বীকার না করাটাই

ছিল ক্যাশান। যারা রবীন্দ্রনাথকে জগতের সাহিত্যের

ইতিহাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম লেখক বলে’ স্বীকার করবার

ছুঃসাহস রাখে সেইরকম স্বজন্ম লোকের মধ্যে সত্যেন্দ্র

একজন, এই পরিচয় জেনে আমি সত্যেন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত

শ্রদ্ধা হইতে উঠি। সত্যেন্দ্র যদি রবীন্দ্রনাথকে অতই

শ্রদ্ধা করেন, তবে কবিগুরু নাম প্রকাশ করবার সাহস

হয়নি কেন তার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সত্যেন্দ্র বলে-

ছিলেন—‘আমার সঙ্গে ত তাঁর পরিচয় নেই; অপরিচয়ে

তঁার অল্পমতি চাইতে সাহস হয়নি।” পরে সত্যেন্দ্র তঁার নিজের গুণের জোরে বিশ্ববরেণ্য কবীন্দ্রের স্নেহভাজন হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

সত্যেন্দ্র যে রবীন্দ্রনাথকে কত বেশী ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন তার পরিচয় আমি বারবার পেয়েছি। সেবার রবীন্দ্রনাথ বিলাতে গিয়ে গীতাঞ্জলির অল্পবাদ করে’ খুব নাম করেছেন। কবি-স্বলভ দূরদৃষ্টির অল্পভাবে সত্যেন্দ্র প্রায়ই বলতেন—“এবার রবি-বাবু নোবেল প্রাইজ পান ত ঠিক হয়।” একদিন আমি প্রবাসী-আপিসে প্রফের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে আছি; বেলা তখন তিনটে হবে; সত্যেন্দ্র হঠাৎ আমার ঘরে ঢুকেই বলে’ উঠলেন—“আমি তোমায় মার্ব।” প্রফ থেকে হঠাৎ মুখ তুলে দেখি উল্লাসে সত্যেন্দ্র যেন উপচে পড়ছেন—সেই আনন্দ যে কিসে প্রকাশ করবেন তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না। আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—“কি এমন স্বথবর যে আমায় মার্বতে ইচ্ছে করছে?” সত্যেন্দ্র বললেন—

“আন্দাজ করো!” সত্যেন্দ্রের হাতে একখানা এম্পায়ার খবরের কাগজ দেখে বললাম—“রবি-বাবু নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন?” এ আন্দাজ আমি করতে পেরেছিলাম সত্যেন্দ্রের কাছে এর আগে বছবার এই ঘটনার সম্ভাবনার উল্লেখ শুনেছিলাম বলে’। সত্যেন্দ্র কাগজখানা টেবিলের উপর মেলে ধরে’, শুধু খবরটা দেখালেন, কিছু বলতে পারলেন না। তার পর বললেন—“আজ আর কিছু কাজ নয়, আজ ছুটি! ছুটি বেরিয়ে পড়!” আমি



ত্রয়ী

৮ অজিতকুমার চক্রবর্তী ৮ সতীশচন্দ্র রায় ৮ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বললাম—“রবি-বাবুকে টেলিগ্রাম করেছ?” সত্যেন্দ্র বললেন—“আমি (রবিবাবুর জামাই) নগেন গাঙ্গুলীর কাছে এস্প্রানেডে শুনেই কাগজ কিনে নিয়ে তোমাকে খবর দিতে ছুটে এসেছি। টেলিগ্রাম ত আমি করতে জানি না,—তুমি যা হয় করো।” তখন আমরা দুজনে কান্তিক প্রেসে গিয়ে মণিলালকে খবর দিলাম, আর তিনজনের নামে রবি-বাবুকে টেলিগ্রাম করলাম আমাদের সানন্দ প্রণাম জানিয়ে—Nobel prize, our

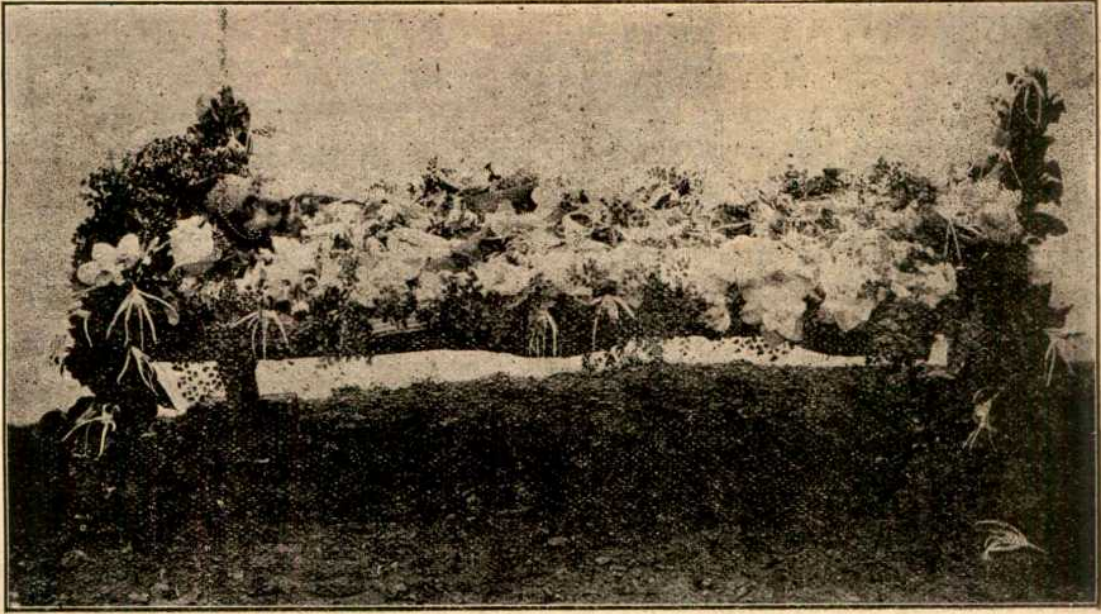


নিজের লাইব্রেরীতে রচনারত সত্যেন্দ্রনাথ

pranams। আমাদের টেলিগ্রামটা নগেন-বাবুর টেলিগ্রামের পরে রবি-বাবুর কাছে পৌঁছেছিল, তাতে সত্যেন্দ্র ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন—“আমি টেলিগ্রাম করতে জান্লে আমিই আগে খবর দিতে পারতাম।”

সত্যেন্দ্র বড় অসহায় রকমের লোক ছিলেন, করিতকশ্মী কাজের লোক মোটেই ছিলেন না। কেমন করে টেলিগ্রাম

করতে হয়, মনিঅর্ডার করতে হয়, তা তিনি জানতেন না। তাঁর গোপন দান ছিল দ্ব্যর্থ; সেজ্ঞা কোথাও মনিঅর্ডার করতে হলে পোষ্টাধিসের ফর্ম-লিখিয়েকে পরমা দিয়ে লিখিয়ে নিতেন; তারা একজন শিক্ষিত লোকের আশ্চর্য্য খেয়াল মনে করে’ বিশ্বয়ে চক্ষু বিস্ফারিত করত। আমি বিজ্ঞপ করলে সত্যেন্দ্র হেসে



অস্তিম-শযায় সত্যেন্দ্রনাথ

বলতেন—‘আরে অত ছকের গোলক-ধাঁধার মধ্যে কোথায় কি লিপ্ত হ’বে তা কি করে জানি?’ কোথাও যাবার কথা হলেই সত্যেন্দ্র আমাকে বলতেন—‘তুমি যাও যদি ত যাই।’ আমার উপর তাঁর অসীম নির্ভর ছিল; আর ছিল তাঁর মার উপর।

মার প্রতি সত্যেন্দ্রের অসাধারণ ভক্তি ছিল। সত্যেন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয় সত্যেন্দ্রের কিশোর বয়সেই; সেই অল্প বয়সেই সত্যেন্দ্র মার সঙ্গে নির্জলা একাদশী কববার চেষ্টা করেছিলেন। এবং সেই কষ্ট স্বয়ং অনুভব করেই তিনি লিখেছেন—

সুজলা এই বাংলাতে হায় কে করেছে সৃষ্টি রে,
নির্জলা ওই একাদশী—কোন দানবের দৃষ্টি রে।
শুকিয়ে গেল, শুকিয়ে গেল, জলে গেল বাংলা দেশ,
মায়ের জাতির নিশ্বাসে হয় সকল শুভ ভ্রমশেষ।

মায়ের অস্থখ হলেই সত্যেন্দ্র অত্যন্ত ব্যস্ত হতেন; তিনি বলতেন—“মা নেই, আমি আছি,—এ অবস্থা আমি কল্পনা করতে পারি না।”

কোথাও বেড়াতে যাবার জন্তে সত্যেন্দ্রকে ডাকতে গেলে প্রায়ই শুনতে হত—“আমার কাপড় বড় ময়লা।”

আমরা বলতাম—“করুসা কাপড় পরে’ নাওনা।” উত্তর শুনতাম—মার কাছে চাবি। মাকে দিয়ে বাক্স খুলিয়ে কাপড় বার করাতে হলে মাকে যে একটু কষ্ট দেওয়া হ’বে সেটুকুও সত্যেন্দ্র সহ করতে পারতেন না। আজ মার একাদশী কিংবা—মা এখন শুয়ে আছেন, বা এমনি কিছু মার বড় অস্থবিধার কারণ থাকলে ত কথাই থাকত না।

সত্যেন্দ্রের পছন্দ-অপছন্দের মধ্যে কোন রফা বা চলনসই ভাব ছিল না। যা তাঁর পছন্দ হত তা—‘ভালো’। আর যা ভালো নয়, তা একেবারেই—‘ছাই’। ‘মন্দ নয়’ ‘মারকারি’, এসব তাঁর কাছে ছিল না। যা তাঁর মতে ‘ছাই’ তা তিনি কিছুতেই সহ করতে পারতেন না, সেটার তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা হত—Hang it! এ ব্যবস্থায় বস্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধে কোনই পক্ষপাত ছিল না।

সত্যেন্দ্র অস্থন্দের কিছু সহ করতে পারতেন না—তা সে ব্যক্তি হোক বা বস্তু হোক বা বাক্যই হোক। তাই তিনি কঠোর সমালোচক ছিলেন; মেকি বা অনধিকারচর্চা তাঁর কাছে রেহাই পেত না। এজন্য তাঁকে অনেক লোককে রুঢ় কথা বলতে হয়েছিল ও লোকের

বিরাগভাজন হতে হয়েছিল। সত্যেন্দ্রের মেজাজের একটি আশ্চর্য্য সংঘম ছিল; অতি রুচি তিরস্কারও অতি ধীরভাবে অন্তর্ভুক্তিত্ব স্বরে সাদর সম্ভাষণের মতন বলে যেতে পারার অসাধারণ শক্তি তাঁর ছিল।

কিন্তু যার মধ্যে একটুও কিছু গুণ আছে বলে তিনি মনে করতেন তাঁকে তিনি সম্মান করতেন। এই শ্রদ্ধালু স্বভাব থেকেই তিনি দেশ-বিদেশের ধার্মিক ও সাহিত্যিক ও দেশসেবকদের ছবি সংগ্রহ করে নিজের পাঠাগারে সাজিয়ে রাখতেন। এই সংগ্রহের মধ্যেও সত্যেন্দ্রের কবি-উপযোগী দৌলদারবিজ্ঞাসের পরিচয় পাওয়া যেত; ছবিগুলি স্মৃষ্টিলায় মণ্ডলাকারে সূক্ষ্মকিত করে তা থেকে বড় ফটো তুলিয়ে সত্যেন্দ্র লাইব্রেরী সাজিয়েছিলেন, সাহিত্যপরিষংকে উপহার দিয়েছিলেন। মৃত্যুর পনেরো দিন আগেও তিনি স্বর্গীয় মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের ফটোগ্রাফ সংগ্রহের জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন। এই শ্রদ্ধার মধ্যে তাঁর কিছুমাত্র ভেদবুদ্ধি বা সাম্প্রদায়িকতা ছিল না—রাজা রামমোহন, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিজ্ঞানাগর, মধুসূদন, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, রমেশ, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ; বিবেকানন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, গিরিশ, অমৃতলাল, প্রভৃতি এক মণ্ডলে স্থান পেয়েছিলেন। অথচ যখন সত্যেন্দ্রের শ্রদ্ধে কোনো কবি অপর এক ভক্তিভাজন কবির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন তখন সত্যেন্দ্রনাথ সেই শ্রদ্ধাভাজন কবিকেও রেয়াৎ করেন নি—কঠোর সমালোচনা দ্বারা সেই কবির ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ করেছিলেন। কোনো বিদেশিনী মহিলার ভারতপ্রেম দেখে মুগ্ধ হয়ে সত্যেন্দ্র তাঁর একটি মূর্তি কিনবার জন্তে ব্যস্ত হয়েছিলেন। আমি তাকে বাধা দি। পবে সেই মহিলার মত পরিবর্তন হয়েছে দেখে সত্যেন্দ্র প্রায়ই বলতেন—“তুমি আমার পাঁচটা টাকা ঝাঁচিয়ে দিয়েছ, নইলে সেই মূর্তি এখন ভাঙতে হত।” আমাদের অন্ত কোনো স্বদেশ-হিতৈষীর আচরণেও তিনি এই রকম ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্র সত্য কথা অপ্রিয় হলেও দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারতেন। একদিন রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন—‘সে যে সত্যেন্দ্র!’ সত্যেন্দ্রের

চরিত্রের দৃঢ়তাও অসাধারণ ছিল। তার বিস্তৃত বিবরণ দেবার স্থান হবে তাঁর জীবনচরিতে; এইটুকু এখন বলতে চাই যে তিনি বিবাহিত হলেও গৃহস্থ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ছিলেন। আমি তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা ও সংঘম দেখে মুগ্ধ হয়ে একদিন বলেছিলাম—“সত্যেন, আমি তোমায় ভাই একদিন প্রণাম করব।”

সত্যেন্দ্রের চরিত্রে তেজস্বিতা ও নম্রতার সমন্বয় হয়েছিল। তিনি যার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হতেন তাঁর বাড়ীতে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করায় তিনি আনন্দ পেতেন; এইজন্য তিনি রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি কবি ও সাহিত্য-রসিকদের সঙ্গে কামনা করতেন, কিন্তু কোথাও শ্রদ্ধার খাতিরের নিজস্ব মত ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি।

সত্যেন্দ্রের এই গুণ ছিল বলে সত্যেন্দ্র তাঁর বন্ধুদের ছিলেন প্রধান মন্ত্রী। কোনো রচনা সত্যেন্দ্রকে দেখিয়ে তাঁর পছন্দ না হলে কেউ ছাপতেন না। সত্যেন্দ্র বন্ধুত্বের খাতিরের ও চক্ষুলাজ্জায় কখনো সত্য সমালোচনা করতে বিরত হতেন না। বন্ধুদের বইএর নাম, ছেলেমেয়েদের নাম রাখবারও ভার ছিল সত্যেন্দ্রের উপর। আমার অধিকাংশ বইএর নাম সত্যেন্দ্রের দেওয়া।

সত্যেন্দ্রের তীর্থমলিল বই হয়ে বেরোনো পর্যন্ত তিনি কোনো কাগজে লেখেন নি এক ‘সাহিত্য’ ছাড়া। আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সত্যেন্দ্র বলেছিলেন—“সমাজপতি আমাদের পাড়ার লোক, আমার বন্ধু, আমাকে ছেলেবেলা থেকে চেনেন, তিনি আমার কবিতা চেয়ে নিয়ে ছাপেন। যখন অপর কাগজের সম্পাদকেরা আমাকে চিনে আমার লেখা চাইবেন তখন তাঁদের দেবো, নিজে যেচে দেবো না।” ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসে আমি তখন কাজ করি; একদিন দোকানে সত্যেন্দ্র আমার কাছে এসেছিলেন, তখন রামানন্দ-বাবুও এলেন। আমি তাঁদের ছুজনের পরিচয় করে দিলাম। সেই মাসের মডার্ণ রিভিউ পত্রে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের To the Sea বলে একটি কবিতা ছাপা হয়, রামানন্দ-বাবু সেই কবিতাটি অনুবাদ করে প্রবাসীতে দিতে অনুরোধ করেন। সত্যেন্দ্রের

সেই অমূল্য কবিতা 'সমুদ্রের প্রতি' প্রবাসীতে প্রথম ছাপা হয়।

সত্যেন্দ্রের সমস্ত জীবনযাত্রাটাই কবিত্বময় হৃদয় স্পর্ষিত ছিল। তাঁর আচরণ ছিল হৃদয়, তাঁর রচনা হৃদয়, তাঁর আলাপ হৃদয়, তাঁর গান-গাইবার শক্তি ছিল হৃদয়, তাঁর গৃহ গাছপালায় সজ্জিত হৃদয়, তাঁর লাইব্রেরী হৃদয়। তিনি হৃদয় আলমারীতে সবচেয়ে হৃদয় সংস্করণের বই কিনে সাক্ষিবে রাখতেন; বৈদিক সাহিত্য, দেশবিদেশের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য ও ইতিহাস তাঁর খুব ভালো পড়া ছিল। জ্যোতিষের চর্চা তাঁর অবসর-বিনোদন ব্যসন ছিল। অখ্যাত অবজ্ঞাত জাতির মধ্যেও কোনো কবির সন্ধান পেলে সত্যেন্দ্র তাঁর কবিতা পড়বার জন্তে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন; সেই কবিতা অশেষ চেষ্টায় সংগ্রহ করতে পারলে আগ্রহে তা সেই কবিরই ছন্দে অমূল্য করে' বঙ্গবাণীর ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতেন। নানা দেশের কবিত্বরস বিশেষ ভাবে সম্ভোগ করবার সুবিধা হবে বলে' তিনি নানা দেশের ভাষা শেখবার চেষ্টা করতেন। তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান তাঁর রচনায় প্রকাশ পেত; এক-একটা কবিতা ইতিহাস বা পুরাণের বিশ্বকোষ হয়ে উঠত। সত্যেন্দ্র যে বিষয়ে কবিতা লিখতেন, সে বিষয়ের হাটহুদ জ্ঞানে লিখতেন। কাজরী, গরবা সম্বন্ধে কবিতা লিখবেন বলে' তিনি চেষ্টা কবে' এসব সুরের গান শুনেছিলেন; ফুলের কবিতা লিখতে বহু ফুলের নাম ও প্রকৃতি সংগ্রহ করেছিলেন; মেঘঘটাকে বুদ্ধ আয়োজনের রূপক দেবার জন্তে তিনি বহু পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। আমি তাঁকে বলতাম—“এসব শব্দের মানে কেউ বুঝবে না।” সত্যেন্দ্র বলতেন—“না বোঝে খোঁজ করে' বুঝবে।” এমন বহুবিদ্য লেখক এখন রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ আছেন বলে' আমি জানি না।

সত্যেন্দ্রনাথ দেশ-বিদেশের বহু ভাষা জানতেন বলে' তাঁর ভাবসম্পদ ছিল প্রচুর এবং বাংলাভাষার উপাদান সংস্কৃত পালি ফার্সী হিন্দি বাংলা যথেষ্ট পড়া ছিল বলে' তাঁর শব্দ-সঞ্চয় ও তথ্য-সংগ্রহ ছিল অফুরন্ত। সত্যেন্দ্র আমার কাছে ছ মাস ফার্সী পড়েছিলেন, রোজ ছপু

বেলা তাঁর বাড়ীতে তাঁকে পড়াতে যেতাম। এই নিত্য সাহচর্যে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা প্রগাঢ় হয়। সত্যেন্দ্র একেবারে কলকাতার মধ্যে চির-আবদ্ধ থাকলেও বাংলা দেশের অন্তরেব সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ও পরিচয় ছিল; তিনি এত অপভ্রংশ গ্রাম্য দেশজ প্রভাষার শব্দ জানতেন যে তাঁর জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হত। বহু শব্দ জানা ছিল বলে' ও কবিতার মিল করা খুব অভ্যাস ছিল বলে' সত্যেন্দ্র কথা নিয়ে ওলট-পালট করে' বা এক কথা বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে' শব্দকীড়া (pun) করতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। এর একটি উদাহরণ পাওয়া যায় 'হস্তিকা' বইয়ে 'অমূল্য-সম্বর কাব্যে'। শব্দচর্চার জন্য তিনি মজলিশী রসিকতায় সিদ্ধবাক্ত ছিলেন। আর-একটি কল হয়েছিল তিনি ভাষাতত্ত্ব শব্দতত্ত্ব ব্যাকরণতত্ত্ব আলোচনাতেও আনন্দ পেতেন। তিনি বাংলা ব্যাকরণের ও শব্দতত্ত্বের ব নূতন মৌলিক নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন; আমি তাঁকে প্রায়ই সেগুলি লিখে ফেলতে অনুরোধ করতাম, বলতাম—“Grimm's Law এর মতন 'সত্য-নিয়ম' সকলের কাছে সমাদৃত হবে।” সত্যেন্দ্র বলতেন—লিখব। লিখব লিখব করে' তাঁর আর সেইসব অমূল্য নিয়মগুলি লেখা হয়নি; তাঁকে এত শীঘ্র হারাতে হবে স্বপ্নেও ভাবিনি বলে' আমিও সেগুলো লিখে রাখিনি—তাঁর মৃত্যুতে ভাষাতত্ত্বের দিক থেকেও একটা মহৎ ক্ষতি হয়ে গেল আমি মনে করি। সাধারণে তাঁকে কেবল কবিরূপেই জানতেন, তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও হৃদয় অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় তাঁর বন্ধুরা বিশেষ-রূপেই জানতেন। সাহিত্যের আদর্শ সত্যেন্দ্রের খুব উঁচু ছিল। তিনি বলতেন—“বাংলা দেশে আড়াই জন সত্যিকার কবি জন্মেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র এক, রবীন্দ্রনাথ এক, আর মাইকেল আধ।” আমাদের দেশের কবি বলে' তিনি স্বীকার করতেন দু'জনকে—কালিদাস, তারপর রবীন্দ্রনাথ। যুরোপেও তিনি তিন-চার জনকে মাত্র শ্রেষ্ঠ কবি বলে' স্বীকার করতেন—গ্যোটে, হিউগো, শেক্সপীয়ার, শেলী। ওয়ার্ডসওয়ার্থকে তিনি কবি বলে' মানতেনই না; এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রকে অনেক বোঝাবার

চেষ্টা কবেছিলেন, কিন্তু সত্যেন্দ্রের ধারণার পরিবর্তন ঘটে নি। আমেরিকার উপর তিনি বড় চর্চা ছিলেন সে দেশে একজনও খাঁটি কবি জন্মেনি বলে। তিনি বলতেন—“ওদের দেশের ছুটি মাত্র ত কবি, এক লংফেলো আব হুইটম্যান; একজনের ছন্দ মিল জুটেছিল ত ভাব জ্যোটেনি, অপরের ভাব জুটেছিল ত ছন্দ মিল জ্যোটে নি। ছয়ের সময় না হলে কি কবি?” এই ছয়ের সময় থাকলেও তিনি ব্রাউনিংকে বড় কবি বলে স্বীকার করতেন না, বলতেন—“ওসব কবিতা নয় ত হেঁয়ালি।” আমাদের বাংলা সাহিত্যে একমাত্র নাটক-রচয়িতা বলে দীনবন্ধু মিত্রের প্রতি সত্যেন্দ্রের অসীম আস্থা ছিল।

এই উচ্চ আদর্শ ছিল বলে সত্যেন্দ্র নিজের সম্বন্ধে একটুও অহঙ্কার পোষণ করতেন না, নিন্দা প্রশংসায় তিনি সমান অবিচলিত থাকতেন। তাঁর কবি-গুরু তাঁর কোনো কবিতার প্রশংসা করলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হতেন, কিন্তু সে আনন্দ তাঁর অন্তরেই গোপন থাকত। রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রের চম্পা কবিতাটি ইংবেজীতে অনুবাদ করাতে সত্যেন্দ্র আপনাব সাহিত্য সাধনার চরম পূর্বস্কার পেয়েছেন মনে করেছিলেন।

সত্যেন্দ্রের চিন্তা এমন সজাগ ছিল যে জগতের যে-কোনো স্থানে অসাধারণ মহৎ ঘটনা কিছু ঘটলেই তাঁর অন্তর সাড়া দিয়ে উঠত। টাইটানিক জাহাজ ডোবা, গ্যাক্সইনীব প্রায়োপবেশন, টলষ্টয়ের গৃহত্যাগ, ভারতের স্বাধীনতা লাভের জ্ঞাত চেষ্টা—সবই তুল্যভাবে সত্যেন্দ্রকে বিচালিত করত।

সত্যেন্দ্রের কবিত্বের বিশেষত্ব ছিল তাঁর অন্তরের দবদের ব্যাপকতায় এবং সেই কবিত্বের প্রকাশক ছন্দের বৈচিত্র্যে। ঝড়ের গাছ, গুটিপোকা, মেঘের, কুলী থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ গঙ্গী পর্যন্ত জগৎবরেণ্য মহাপুরুষ-দিগের প্রতি সত্যেন্দ্রের সমান টান দেখা যায়। সত্যেন্দ্রের যুগ যখন ১২।১৩, তখনকার অনেক কবিতা তাঁর প্রথম বই ‘বেণু ও বীণা’তে সংগৃহীত আছে; সেই অল্প বয়সেই সত্যেন্দ্র ঝড়ে ভাঙা গাছের ছর্দিশায় ব্যথা বোধ করেছিলেন, লক্ষ গুটিপোকায় মৃত্যু দিয়ে তৈরী রেশমী কাপড় পরা

অর্থ বলে প্রচার করেছিলেন। এই কবিতাটি পড়ার পর থেকে আমি রেশমী কাপড় পরতে পারি না—এ কবিতাটি আমার মনে এমনই ছাপ বেধেছে। এই অল্প বয়সেই তিনি একদিকে স্বদেশকে সকল দেশের সেরা বলে প্রচার করতেন—

কোন দেশেতে তরুলতা

সকল দেশের চাইতে শ্রামল ?

কোন দেশেতে চলতে গেলেই

দলতে হয় রে দুর্কী কোমল ?

কোথায ফলে সোনার ফসল,

সোনার কমল ফোটে রে ?

সে আমাদের বাংলা দেশ,

আমাদেরই বাংলা রে।

আবার সেই স্বর্গাদপি গবীরসী মাতৃভূমির দীনতার কাতর হয়ে প্রশ্ন করতেন—

কে মা তুই বাবেব পিঠে বসে আছিস বিবস মুখে ?

শিরে তোর নাগেব ছাতা, কমল-মালা ঘুমায় বুকে ?

ঢলঢল নয়ন-যুগল জলভরে পড়ছে চুলে,

কাল মেঘ মিলিয়ে গেল তোর ওই নিবিড় কাল চুলে।

শিথিল মুঠি—ত্রিশূল কেন ধরার ধূলা আছে চুমি ?

কে মা তুই, কে মা শ্রামা—তুই কি গোদেব বঙ্গভূমি ?

এই-সব কবিতা তাঁর ‘বেণু ও বীণা’র আছে—

কবিতাগুলি ১৩০০ থেকে ১৩১৩ সালের মধ্যে লেখা। সত্যেন্দ্রের জন্ম হয় ১২৮৮ সালের ২৯ মাঘ বসন্ত-সংক্রান্তির দিন। স্বতরাং কবিতাগুলি ১২ থেকে ২৫ বৎসর বয়সে লেখা।

এই যৌবনকালেই সত্যেন্দ্র জগৎব্যাপী সাম্য-সামের বজ্জে হোমশিক্ষা প্রজ্জলিত করেছিলেন—

এ বিপুল ভবে কে এসেছে ববে উপবীত ধরি গলে ?

পশুর অধম, অস্ত্র-দস্তে গাছঘেরে তবু দলে !

* * *

কর্মে যাদের নাহি কলঙ্ক, জন্ম ধেমনি হোক,

পুণ্য তাদের চরণ পরশে ধস্ত এ নরলোক।

হোক সে তাহার বরণ কৃষ্ণ, অথবা তাম্রকটি,

নির্মল যার হৃদয় সেজন শুভ হতেও শুচি।

জননীর জাতি দেবতার সাথী নারীরে বোলো না হয়,
অর্দ্ধজগতে কোরো না গো হীন, জগতের মুখ চেয়ো।

দেবতার ঘরে গণ্ডী রেখো না,—খোল মন্দির-দ্বার,
দেবতা কাহারো নহে তৈজস, দেবভূমি সবাকার।

সমীরে যাহার নিখাস আছে, সে আছে আমারি বৃকে;
সলিলে যাহার আছে আধিজল সে আমার হৃদে স্থখে;
কুসুম-সরস ধরণী যাদের বহিছে পরশখানি,
জীবনে মরণে কাছে কাছে তারা, মনে মনে তাহা জানি।
জাগো জাগো ওগো বিশ্বমানব! বারতা এসেছে আজ।
তোমার বিশাল বপু হতে ছিঁড়ে ফেল ভূতের সাজ।

ভাই সে আবার আশুক ফিরিয়া ভাইয়ের আলিঙ্গনে,
ভ্রম হউক বিবাদ বিবাদ যজ্ঞের ছত্ৰাশনে।
সমান হউক মানুষের মন, সমান অভিপ্রায়,
মানুষের মত, মানুষের পথ, এক হোক পুনরায়,
সমান হউক আশা অভিলাষ, সাধনা সমান হোক,
সাম্যের গানে হউক শাস্ত ব্যথিত মর্ত্যলোক।

এই ছন্দটিতে সত্যেন্দ্রের কবিত্ব বিশেষ ক্ষুণ্ণি লাভ
করত। প্রায় সমস্ত ভাবময় কবিতা তাঁর এই ছন্দে
লেখা।

এই কবিতা লেখার ৯ বছর পরে সত্যেন্দ্র এই কথাই
আবার বলেছিলেন—

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে,
সে জাতির নাম মানুষ জাতি;
এক পৃথিবীর স্তম্ভে লালিত;
একই রবি শশী যাদের সাথী।

সত্যেন্দ্র হিন্দুমুসলমানের মিলনকামী ছিলেন—

“হিন্দু-মুসলমানের মিলনে তিনি প্রসন্ন হন।”

মুসলমান ধর্মে সাম্য আছে বলে’ তিনি ঐ ধর্মের
পক্ষপাতী ছিলেন।

এই সাম্যভাব তাঁর মধ্যে ছিল বলে’ সত্যেন্দ্র শূদ্রকে
বলতে পেরেছিলেন—

শূদ্র মহান্ গুরু গরীয়ান্,

শূদ্র অতুল এ তিন লোকে,

শূদ্র রেখেছে সংসার, ওগো,

শূদ্রে দেখো না বক্র চোখে।

এবং তিনি শূদ্র হওয়াকে গৌরবের কারণ মনে
করতেন—

“দেশের সেবায় শূদ্র হওয়াই পরম বিজয়!”

এবং তিনি মেথরকে বলেছিলেন—

কে বলে তোমারে বন্ধু অস্পৃশ্য অন্তি?

শুচির্তা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে;

তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,

নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।

এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,—

কল্যাণের কর্ম করি লাঞ্ছনা সহিতে।

যেখানেই কেউ লাঞ্ছনা সয়ে কল্যাণের কর্ম করেছেন
সেখানেই সত্যেন্দ্রের চিন্ত একদিকে কল্যাণ-কর্মীর প্রতি
শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়েছে আর অন্যদিকে অশ্রায়-
লাঞ্ছনাকারীর বিরুদ্ধে উজ্জত হয়ে উঠেছে—স্নেহলতার
মৃত্যুতে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর শাস্তিক প্রতিরোধে
তিনি যে কবিতা লেখেন তাতে তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া
যায়।

সত্যেন্দ্র বিশ্বপ্রেমিক হলেও স্বদেশ তাঁর সর্বাধিক
প্রিয় ছিল। ‘আমরা’, ‘গঙ্গাহ্রদ বঙ্গভূমি’ প্রভৃতি কবিতা
তার সাক্ষী। সত্যেন্দ্রের কাছে “বাংলা ভাষা সকল
ভাষার সেরা” ছিল; এবং

“মধুর চেয়েও আছে মধুর—

সে এই আমার দেশের মাটি,

আমার দেশের পথের ধূলা

খাটি সোনার চাইতে খাটি।”

স্বদেশ-সেবায় যিনি যিনি মহৎ ত্যাগের ছুঃখ বরণ
করেছেন তাঁদের প্রতি সত্যেন্দ্রের শ্রদ্ধাসম্মত চিন্তের
কবিত্ব-পুষ্পাঞ্জলি বর্ষিত হয়েছে। দেশের আত্মপ্রতিষ্ঠার
চেষ্ঠার দিনে উদাসীন থাকার জ্ঞান রা তাঁর মতের সম্পূর্ণ
অনুকূল মত পোষণ না করার জন্য বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধাভাজন

কয়েকজন মহাশয় ব্যক্তির প্রতিও সত্যোজ্ঞ অপ্রসন্ন হয়ে
উঠেছিলেন।

সত্যোজ্ঞ যেমন দেশ-বিদেশের প্রয়াগিত মহত্বকে সম্মান
ও বন্দনা করে' গেছেন, তেমনি মহত্ব-সম্ভাবনাকেও তিনি
অভিনন্দন করেছেন—

হস্তা করে' ছুটির পরে ওই যে ঘারা যাচ্ছে পথে,—
হাস্তা হাসি হাসছে কেবল, ভাসছে যেন আলগা শ্রোতে,—
কেউ বা শিষ্ট, কেউ বা চপল, কেউ বা উগ্র, কেউ বা মিঠে ;
ওই আমাদের ছেলেরা সব, ভাবনা যা সে ওদের পিঠে।
ওই আমাদের চোখের মণি, ওই আমাদের বৃকের বল,—
ওই আমাদের অমর প্রদীপ, ওই আমাদের আশার স্থল,—
ওই আমাদের নিখাদ সোনা, ওই আমাদের পুণ্যফল,—
আদর্শে যে সত্য মানে—সে ওই মোদের ছেলের দল।

সত্যোজ্ঞনাথ এই-সব কবিত্বমণ্ডিত উচ্চ ভাব প্রকাশ
করেছেন ছন্দের বিচিত্রতায় স্বন্দরতর করে'। তিনি
বিদেশী বহু ছন্দ বাংলা কবিতায় আমদানী করেছিলেন ;
বহু সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কবিতা লিখেছিলেন ; বহু ছন্দ
নিজে সৃষ্টি করেছিলেন ; এবং বাদ্যের বা যন্ত্রের স্বর
পর্যন্ত কথার ছন্দে ধরে' তিনি বন্দী করে' গেছেন। পাক্ষী-
বেহারার পাক্ষী-বহনের কলরবের যে ছন্দ, তা সত্যোজ্ঞ
প্রকাশ করেছিলেন 'পাক্ষীর গান' কবিতায়।—পাক্ষী
চলেছে—

পাক্ষী চলে,
পাক্ষী চলে—
হুল্কি চালে
নৃত্য-তালে !

পাক্ষী বইতে বইতে বেহারাবা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে,
পঞ্চও ফুরিয়ে এসেছে, তখনকার সে ভাব ছন্দে প্রকাশ
পেয়েছে—

পাক্ষী চলে রে !
অঙ্গ চলে রে !
আর দেবী কত ?
আরো কত দূর ?
আর দূর কি গো ?
বুড়ো শিবপুর

ওই আমাদের ;
ওই হাটতলা,
ওরি পেছুখানে
ঘোষেদের গোলা।

কাঁধ বদল করে' বেহারারা আবার ছুটল—

পাক্ষী চলে রে,
অঙ্গ টলে বে ;
স্বর্ঘ্য চলে,
পাক্ষী চলে।

'পিয়ানোব গান' কাটা কাটা ছাড়া ছাড়া ছন্দে
পিয়ানোর স্বরকে কথায় ধরেছে—

তুল তুল টুক টুক
টুক টুক তুল তুল,
কোন্ ফুল তার তুল,
তার তুল কোন্ ফুল ?
টুক টুক রঙ্গন,
কিংশুক ফুল,
নয় নয় নিশ্চয়
নয় তার তুল্য। ইত্যাদি।

যখন চারিদিকে চরুকা চালাবাব চেষ্টা চলেছে, তখন
একদিন সত্যোজ্ঞকে বললাম—'একটা চরুকায় গান লেখ।'
সত্যোজ্ঞ বলেন—'কেউ যদি আমাকে চরুকা-কাটাব স্বর
শোনাতে পারে ত চেষ্টা করতে পারি।' আমাদের বন্ধু
স্ববেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বাড়ীতে সত্যোজ্ঞকে নিয়ে
গিয়ে চরুকায় স্বর ও ছন্দ শোনালেন এবং সত্যোজ্ঞ সেই
স্বর কানে বসে বাড়ী গিয়ে কথায় প্রকাশ করলেন—

ভোম্‌রায গান গায় চরুকায়, শোনু ভাই !
খেই নাও, পাঙ্ক দাও, আমবাও গান গাই !
ঘর-বা'র করবার দরকার নেই আর,
মন দাও চরুকায় আপনার আপনার।
চরুকায় ঘরঘর পড়শীর ঘর ঘর !
ঘর ঘর ক্ষীর-সর,—আপনায় নির্ভর !
পড়শীর কণ্ঠে জাগল সাড়া,—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া !

নৈসর্গিক ব্যাপারকেও সত্যেন্দ্র ছন্দে রূপ দিতে

পারতেন—

ইলশে-গুঁড়ি! ইলশে-গুঁড়ি!

ইলিশ-মাছের ডিম।

ইলশে-গুঁড়ি ইলশে-গুঁড়ি

দিনের বেলার হিম।

কেয়াফুলে ঘুণ লেগেছে—

পড়তে পরাগ মিলিয়ে গেছে,

মেঘের সীমাঘ রোদ জেগেছে,

আলতা-পাটি শিম।

ইলশে-গুঁড়ি হিমের কুঁড়ি

বোদুৱে রিমঝিম।

সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় প্রবর্তনে সত্যেন্দ্র বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। সংস্কৃত ছন্দের প্রাণ হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণে; বাংলায় আমরা সংস্কৃত হ্রস্ব স্বরকে সর্বত্র হ্রস্বই উচ্চারণ করি না, এবং দীর্ঘকেও দীর্ঘ করে উচ্চারণ করি না। সত্যেন্দ্র এই তথ্যটি ধরতে পেরে বাংলার আভাবিক হ্রস্ব দীর্ঘ ও হ্রস্ব অকারান্ত উচ্চারণ অমূল্যসারেই সংস্কৃত ছন্দে কবিতা রচনা করেছিলেন, কোণাও কৃত্রিম উচ্চারণের সাহায্য নেন নি। সংস্কৃতের ছন্দ-শাস্ত্রে পঞ্চচামর ছন্দ একটি কঠিন ছন্দ; সত্যেন্দ্র তাকে বাংলা রূপ দিয়েছিলেন—

মহৎ ভয়ের মূরং সাগর

বরণ তোমার তমঃশ্রামল;

মহেশ্বরের প্রলয়-পিনাক

শোনাও আমায় শোনাও কেবল।

বাজাও পিনাক, বাজাও মাদল,

আকাশ পাতাল কাঁপাও হেলায়,

মেঘের ধ্বজায় সাজাও ছালোক,

সাজাও ভুলোক চেউয়ের মেলায়।

সংস্কৃত মালিনী ছন্দের উদাহরণ—

উড়ে চলে গেছে বুলবুল,

শূন্যময় স্বর্ণ-পিঞ্জর;

ফুরায়ে এসেছে ফাস্তন,

ঘোবনের জীর্ণ নির্ভর।

রাগিণী সে আজি মম্বর,

উৎসবের কুঞ্জ নির্জন;

ভেঙে দিবে বুদ্ধি অস্তর

মঞ্জীরের ক্লিষ্ট নিকর।

মেঘদূতের মন্দাকিনী ছন্দের উদাহরণ—

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যপিত নভতল, কই গো কই মেঘ উদয় হও,

সন্ধ্যার তন্ত্রার মুরতি ধরি আজ মঙ্গ-মম্বর বচন কও;

সূর্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ, দাঁও হে কজ্জল,

পাড়াও ঘুম,

বৃষ্টির চূষন বিথারি চলে' যাও—অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধুম।

কচিরা ছন্দের নমুনা—

তখন কেবল ভরিছে গগন নূতন মেঘে,

বদম-কোরক হুলিছে বাদল-বাতাস লেগে;

বনাস্তরের আসিতেছে বাস মধুর মৃদু,

ছড়ায় বাতাস বরিষা-নারীর মুখের সীধু;—

তখন কাহার ঝাঁচলে গোপন যুথীর মালা

মধুর মধুর ছড়াইত বাস—কে সেই বালা?

বিদেশী বা সংস্কৃত ছন্দের বাংলা রূপ একটি ছুটি শ্লোকে নয়—৪৫ পৃষ্ঠা জোড়া গোটা গোটা কবিতায় তিনি প্রকাশ করিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

সত্যেন্দ্রের সম্পূর্ণ পরিচয় অল্প-পরিসরে দেওয়া কঠিন।

আর একটি কথা বলে' আমার তর্পণ সমাপ্ত করব।

সত্যেন্দ্র নিজেকে লোকের কাছে নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী

রূপে প্রকাশ করতেন। কিন্তু তিনি সে কত বড়

বিশ্বাসী ভক্ত ছিলেন তার পরিচয় তাঁর প্রথম পুস্তক

'বেণু ও বীণা' থেকে পরবর্তী পুস্তকের মধ্যে সর্বত্র পাওয়া

যায়। বয়েক বৎসর থেকে সত্যেন্দ্রের দৃষ্টি অন্ধতার

অন্ধকারে আবৃত হয়ে আসছিল; সেই উপলক্ষে তিনি

যে কবিতা লেখেন তা যখন আমি প্রথম পড়ি তখন

আমি চোখের জল রাখতে পারিনি—

অকুল আকাশে

অগাধ আলোক হাসে,

আমারি নয়নে

সন্ধ্যা ঘনায় আসে।

পর্যণ ভরিছে আসে।

১১

সহসা আধাবে

পেলাম পরণ কার?—

কে এলে দোসব

দুঃখ কবিত্তে পার?

ঘুচাতে অন্ধকার।

১২

কার এ মধুব

পরশ সান্ধনার?

এতদিন যারে

করেছি অস্বীকার।—

আত্মীয় আত্মার।

১৩

এলে কি গো তুমি

এলে কি আমাব চিতে?

পুজা যে করে'নি

বৈকালী তাব নিতে?

এলে কি গো এ নিভৃত্তে?

১৬

বাহিরে তিমিব

ঘনাক এখন তবে,

আজ হতে তুমি

রবে মোর প্রাণে রবে,—

হবে গো দোসর হবে।

২৩.

জয়! জয়! জয়!

তব জয় প্রেমময়!

তোমার অভয়

হোক প্রাণে অক্ষয়।

জয়! জয়! তব জয়!

অন্তঃসত্যের প্রার্থনা এমনি ব্যাকুল ও নির্ভরতায়
ভরা—

জাগিয়ে রেখ একটি তারার আলো,

একটু দয়া রেখ আমার পরে,—

চোখে যখন দেখতে না পাই ভালো,

হু চোখ যখন চোখের জলে ভরে,—

গহন আধাব, অকুল পাথার, আবিল-কুস্কটিকা,

জালিষে রেখ তোমাব প্রেমের শিখা।

* * *

—একটি তারার একটি গুহ্র আলো

জাগিয়ে বেখ আমার যাত্রা-পথে,

ঘিরবে যেদিন মৃত্যু-আধার কালো,

ফিরতে যেদিন হবে নীরব রথে,

যম-নিয়মের নিমে যখন সকল তছু তিতা;—

দয়া রেখ পিতা আমার পিতা!

সত্যোজ্জের এই অকালে-মহাযাত্রার পথে তিনি যে বিশ্বপিতার দয়া থেকে বঞ্চিত হন নি তা দয়াময়ের দয়াই একমাত্র কারণ নয়। মৃত্যুর মাস-খানেক আগে আমি সত্যোজ্জকে বলছিলাম—“বিধাতা মানুষকে নিয়ে একটু রঙ্গ কবেন—হাইকোর্ট যাব বলে’ ট্রাম ধরতে গেলে আগে আসে এস্প্রানেড, আর এস্প্রানেড যাব মনে করে’ গেলে আগে আসে হাইকোর্ট; কোনো মাসে কিছু বেশী অল্প হলে সে মাসে পরিবারের কারো অস্থখ দ্বিগুণ ব্যয় হয়ে যায়।” এতে সত্যোজ্জ প্রতিবাদ করে’ বললেন—“যিনি মঙ্গলময়, যিনি দয়াময়, তাঁর বিধান এ হতেই পারে না; ওগুলো Chance, Fate বা সহজানের কাণ্ড বলতে পার—বিধাতার নয়।” বিধাতার দয়া ও মঙ্গলময়ত্বে তাঁর এমনি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

সত্যোজ্জ আমার বাড়ীতে একবার ধাবার-জন্তে বছর দুই থেকে অত্যন্ত উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। শহুরে ধনী বন্ধুকে পাড়াগাঁয়ের গরিবের কুঁড়েঘরে নিয়ে যেতে আমার সঙ্কোচ হত; আমি এখন নয় তখন করে’ বছর দুই বিলম্ব করি। এবার তাঁর আগ্রহ এত প্রবল হয়ে গেল যে আর মূলতুবি রাখতে পারলাম না। আমার বাড়ীতে জ্যোৎস্নারাত্রির উষাকালে নানা পাখীর বিচিত্র ঝঙ্কারে জাগ্রত হয়ে খানিকক্ষণ পরে সত্যোজ্জ বলেছিলেন—“এমন প্রভাত আমি জীবনে কখনো সন্তোষ করিনি।” আমার বাড়ী থেকে ফিরেই তিনি শয্যাগত

হয়ে পড়েন। যখন তাঁর চেতনা বিকারগ্রস্ত রোগবিষে মুচ্ছাহত, তখনও তিনি একটু চেতনা পেয়েই আমাকে খুঁজছেন; মা, স্ত্রী ও ভাইয়েরা যখন তাঁকে ঔষধ-পথ্য ঝাওয়াতে পারেন নি, আমি তাঁকে অহরোধ কর্তেই হাসিমুখে যুক্ত-করে 'নমস্কার করে' আমার প্রতি তাঁর অসীম প্রীতি নির্ভর ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাব অহরোধ পালন করেছেন। তাঁর অকাল-তিরোধানে একপুত্রা মাতার ও পতিব্রতা পত্নীর বে ক্ষতি তার ত তুলনা নেই; কিন্তু সত্যেন্দ্র কেবল পরিবারের আত্মীয় ছিলেন না—তিনি ছিলেন সমস্ত দেশের আত্মীয় বন্ধু, নিকংসাহীর উৎসাহদাতা, সংকর্মীর যশোগায়ক, অন্তায়ের প্রতিরোধী। সত্যেন্দ্রের অভাবে দেশের লোকের ও সাহিত্যের বে ক্ষতি হয়েছে তাও পূরণ হবার নয়।

সত্যেন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৯১৫ সালে কাশ্মীরে গিয়ে আমাকে চিঠি লিখেছিলেন—

চার,

হয়েছে ভূষগ-প্রাপ্তি হঠাৎ আমার,
স্বর্গীয় হয়েছি আমি, তুল নাই তার।

ভূ-পূর্ব স্বর্গীয় কবি অঁচ তাই sings

নিসর্গের জয়! আর বিজয়া Greetings।

সত্যেন্দ্র ঘে এত শীঘ্র ভূত-পূর্ব স্বর্গীয় কবি হবেন তা স্বপ্নেও ভাবি নি। আজ ভূত-পূর্ব স্বর্গীয় কবিকে তাঁর শোকসন্তপ্ত বন্ধু শ্রদ্ধাতর্পণ নিবেদন করছে।

ছন্দ-সরস্বতীর প্রিয় ছুলাল, মাতৃভূমির বন্ধের ধন, বন্ধুবৎসল কবি আমাদের এই বিচ্ছেদদুঃখ অহুভব করে'ই সাহস দিয়ে গেছেন—

যেদিন আবার ফুটবে মুকুল

সেদিন আমায় দেখতে পাবে,

কাণ্ড-হাওয়া বইলে ব্যাকুল

ধাক্কা দূরে কোন্ হিসাবে?

আসব আমি স্বপন ভরে

গভীর রাতে ভুবন পরে;

হাসব আমি জ্যোৎস্না সাথে,

গাইব যখন কোকিল গাবে।

৭৬১—১৬

তোমরা যখন কইবে কথা

শুনব আমি শুনব গো তা,

আমার কথা হরষ ব্যথা

হায় গো হাওয়ায় ভেসেই যাবে!

কবির এই বিশ্বসত্তা আমরা যেন অহুক্ষণ অহুভব করতে পারি বিশ্বকর্তার কাছে এই প্রার্থনা। ১৯০২ সালের আগষ্ট মাসে সত্যেন্দ্র তাঁর বন্ধু সতীশচন্দ্র রায় ও অজিতকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে একছাতার তলে দাঁড়িয়ে ফটো তোলা। এই তিনজনই অল্প বয়সে নিজের নিজের প্রতিভাচ্ছটায় বঙ্গদেশ উজ্জাসিত করেন এবং তিন-জনেই অল্প বয়সেই পরলোকে যাত্রা করলেন। অজিত-কুমারের মৃত্যুর পূর্বে সত্যেন্দ্র প্রায়ই বলতেন—“তিন জনের দুজন গেল, এবার আমার পালা।” কবি সত্যেন্দ্র শীঘ্রই “মৃত্যুর যাত্রী” হবেন জেনে সকলের কাছে বিদায় চেয়ে গেছেন—

আজ আমি তোমাদের জগৎ হইতে

চলে' যাই ভাই।

জনের চেনা মুখ কাল যদি ধোঁজ

দেখিবে সে নাই।

* * *
আমি যদি কারো প্রাণে ব্যথা দিবে থাকি

আজ ক্ষমা চাই;

স্বচ্ছায় বেদনা মোরে দাও নাই কেহ,

আমি জানি ভাই।

* * *
মনে থাকে মনে কোরো; আমি তোমাদের
ভুলিব না হায়!

তোমাদের সঙ্গহারী সঙ্গী তোমাদেরি—

বিদায়! বিদায়!

সত্যেন্দ্র পরলোকের আনন্দলোকে আমাদের পূর্বজ হয়ে অপেক্ষা করছেন; আমরা ইহলোকের কর্ম সমাপ্ত করে' বিদায় নিলে আবার তাঁর সঙ্গস্থ পেয়ে ধন্য হব, তাঁরই আশ্বাসবাণী আমাদের আশাষিত করে' তুলেছে। সর্বলোকাক্রম্য ভগবান আমাদের সেই আশা পূর্ণ করবেন—এই প্রার্থনা।

চার বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যেন্দ্র-নামা

সবে আজ বর্ষাব খুলে গেছে বোবোকা,
ওড়না ঘে ওড়ে তার বন্দাব দোরোখা,
পদ্মার ফাঁক থেকে আপনি তাব চম্কাষ,
সর্দাব বাজ দেপে বেআবুক ধম্কাষ !

বাউরিয়া সংসাব,—সেই স্বরে কবি আজ
তুলেছিল বাক্যে বেঁধে নিয়ে এশ্রাজ্,
ধাম্কা এ কি আঘাত—বীণ্ ভেঙে চৌচিব,
বারে আপনি একসাধ্ বাগ্গেবী লছ্ মীব !

আল্লাব জয়গান শুনে ন৷ ফেরিদুন
শমনের শয়তান করলে কি তাই খুন—
ছুনিয়ার দেল-খোস্, বাঙলার দিল্দার ?
হাষ ! হায ! আফ্শোস্ ! মিল্বে কি মিল্ তার ?

সে যে ছিল ফুল-কবি চর্চিত চন্দনে,
মন্দাব মুখ-ছবি পারিজাত নন্দনে ;
কল্লনা-কালোয়াং, পাসা ভাষা-কাবিকর,
শব্দেব শাহান্সা, ছন্দেব ঈশ্বব !

ছুষ্ গন্ চুম্ দিয়ে লুটে নিল দোস্তি,
নয়নের ঘুম নিয়ে আবামের স্বস্তি !
দিচ্ছিল বুলবুল্ গশ্গল্ মিঠে শিশ্,
মরণেব একি ভুল তাব মুখে দিলে বিষ ?

সে ছিল যে মছলন্দ্, হিম্পানী গালচে,
জড়োয়ার গুল্বন্দ্ মিনেদাব লালচে,
সিবীয়াব কিআপ, সমর্গা মখমল্
চুম্কাব চিক্-টাপ্ জৌলসে জল্জল্ !

কীমাম্ সে কপ্তরী, কাশ্মীরী জাফবান্,
দরগার তন্তেরি, ফকীরের আলোয়ান্,
জরিদার জামেয়ার্ মল্মল্ মসলীন,
বাঙলার জান্-এয়ার্ লুটে নিল কোন্ জিন ?

গজল্ সে আলাপের, গুজরাটি গার্কী,
বস্রাই গোলাপের গাজিপুরী কার্কী,

কাম্বা সে আমখাস্ মর্মর পাথরের,
চামেলীব নির্ধাস্, খোস্বাই আতরের ;

জম্কালা মজলিশ্, জল্সা সে আসরের,
নমাজের কুর্দীশ্, দিল্লীগী বাসরেব ,
হোলী-খেলা, নওবোহ্ বারোয়ারী দেশেরা,
হাসি-খুসি নাচ্ ভোজ্ খেয়ালের পসেরা !

জেহাদের ঝাণ্ডা সে —কোরানের কল্মা,
অভেদের পাণ্ডা সে সত্যের শল্মা ;
শত্রু সে হারামের কাম্ তাব সাক্ষা,
বিক্রোহী আরামের, মরদের বাচ্চা !

লাগাম সে সোয়ারের, ছব্লার নির্ভর,
চারুক সে গোঁয়ারের, বে'কুফের মুদগর !
ইজ্জৎ বাঙলার, বাঙালীর ইমান্ সে,
দৌলত ছুনিয়ার কৈমার ধীমান্ সে !

বেগমের তাঞ্জাম্, বাদশার হাওদা,
দরবারী আঞ্জাম্, তারিফের বাহোবা ,
কিতাবের জল্তান্, কাবোব নবাবটি,
সব-সেরা ফুল-দান টুটে গেল হঠাৎ কি ?

হামাম্ সে হারেমের, নারগিস্ বাগিচার,
ওস্তাদ্ সারেঙের, সেলামের ভাগিদার,
বেলকুড়ি, জু'ই ফুল, গুল্শান্ খোস্বাই,
মণিহার, মোতিছল, দেওয়ালীর বোশ্ নাই !

পান্নার পিলবুজ্, মাণিকের জেল্লা,
জড়োয়ার গম্বুজ্, জহবতী কেল্লা,
খাটেনি সে খেদমৎ—নোকব্ না বান্ধা,
ভোগেনি সে বদখৎ ছুখের ধাক্কা !

মুদক সজ্জত্, বংশী সে বধুয়ার,
কলেজার মুহবত্ দিলভরা মধু তার,
মেহ্দীব মিহি রং, সুরমার রূপ-টান,
কাজলের কালো ঢং, কবরীর ধূপ-দান !

আরু সে আঙুরের, কমলার ফুল-মদ,
মিঠে বোল্‌ ঘুড়ুরের, চাটুনি সে গুলকন্দ,
সর্ব্বৎ শরদার, মোরঝা আমলকী,
মিঠে-খিলি-বর্দ্ধার আজ থেকে থামল-কি ?

মোহর সে হিন্দুর, আসুরফী মোগলের,
দানা রেস্‌ সিকুর, মোথেল্‌ সে চোগলের,
অকপট ইন্কার, নেক্‌ অনবদ্য,
ভারতীর বীণ্‌কার, কমলার পদ্ম !

তোজ্‌ দানে ভরপুর মুক্তির মশলা,
আরতিব কপূর্, জ্যোৎস্নার পশলা !
ধূপ ধূনা গুগুন্ডল, লবানের গন্ধ,
ধস্‌ধস্‌, কেশাফুল, থাকবে কি বন্ধ ?

চেয়েছে যে ছনিয়াতে মোবারক হৃদয়,
নেই যার শরীয়তে গোড়ামীর কর্দম,
বন্দেগী মন্থর, সত্যেন্‌ সৎ-নবী !
জিন্দেগী বাহাছুব, মরে না হে সর্ব্‌ কবি ।

হাম্‌জ বা জাগী, রুগী, সেৎ সাদী, ফার্দোসী,
এ যুগের কেউ তুমি, আশ্‌মানে যাব্‌ শশী—
গায়েব্‌ কি হয় তার জৌলস্‌ কবরে ?
অমর সে বরাবর বেহেস্তী সফরে !

শ্রী নরেন্দ্র দেব

ভস্মেরি = প্রণামীর পাত্র । জিন্‌ = অপদেষতা ।
গুনসান্‌ = মুকুল । মুহবত্‌ = ভালবাসা ।
দানা = ছানী । বেস্‌ = সমতুল্য ।
মোথেল্‌ = প্রতিবন্ধক । চোগলের = মিলুকের ।
নেক্‌ = সৎ । মোবারক = কল্যাণ ।
শরীয়ত্‌ = ধর্মপথ । মন্থর = মহাপুরুষ ।
নবী = প্রচাবক । গায়েব্‌ = লুপ্তারিত ।

মহাপ্রস্থান

বঙ্গবাণীর বীণারব আজি থামিয়া গিয়াছে হাথ !
উদার ললাট ঢেকেছে বিবাদ-আধার-কালিমা-ছায় !
বিমল আশ্রয় মধুর হাস্ত আর নাহি আজ ফুটে,
শোকের সাগর উথলি' নয়নে অশ্রুব ধারা ছুটে !
নয়নের মণি গিয়াছে হারায়ে দারুণ মবণ-ঘাতে,
ঐবতারা আজ খসি' পড়ি' গেল নীরবে আধাব বাতে ।
হুবাছ বাড়াবে কাবে খোঁজ আর ? নাই আলো নাই হাসি,
“ফুলের ফসলে” ফুটাতে তাহার আব বাজিবে না বাঁশী !
সে যে চলে' গেছে কোন্‌ সে স্বদূর জীবনের পরপারে,
গহন আধারে আপনাকে ঢাকি' কোন্‌ প্রেম-অভিসারে ?
স্বপন-বালিকা তারার মালিকা পরিঘা আকুল কেশে
গেল লয়ে' তারে বাঁধি বাহুপাশে কোন্‌ স্বপনের দেশে ?
ওগো কবি, তুমি বাংলার ছবি এঁকে দিয়ে গেলে গানে,
“ফুলের ফসলে” ধবলী হাসালে, ভাসালে স্ববভি-বানে ।
“অত্র-আবীবে” সাজালে মায়েরে চির-অপরূপ রূপে,
“তীর্থ-সলিলে” করায়ে সিনান্‌ বন্দিলে চীনা-ধূপে ।
“বেণু ও বীণা”র সুরে ঝঙ্কারে নিখিলেব মন হর,
শতেক “তীর্থ-রেণু-”কণা' আনি ছুয়ায়ে করিলে জড়,

“মণি-মঞ্জুসা” ভরিয়া মাঘেরে রত্ন করিলে দান,
“হোমশিখানলে” যে দীপ জ্বালালে সে চির জ্যোতির্মান্‌ ।
হে কবি কলাপী, ‘কেকা’রবে তব চির-বিরহীর প্রাণে
প্রিয-স্মৃতি জাগে, নয়নের আগে অশ্রু ঘনায় আনে ।
বসন্ত-রাজ, ‘কুছ’রবে তব ধরা-চিত উত্তরোল,
তারায় তারায় কম্পন লাগে জ্যোছনার ফুল-দোল ।
ছন্দেব দোলে ভাষারে দোলালে, ভাবেতে ভোলালে মন,
অকপেবে তুমি রূপ দিলে ওগো ঘটাইলে অঘটন ।
বালক কিশোর যুবক বৃদ্ধ সকলেরি তুমি কবি,
সকলের তরে বহু প্রেম ভরে আকিলে মোহন ছবি ।
সতাই তুমি সত্যের রাজা, উদার মহান্‌ ধীর,
মিথ্যাহৃদন নির্ভয় ছিলে, চির-অনলস বীর ।
অভব মস্ত্রে নিরাশ হৃদয়ে জাগাইলে তুমি আশা,
দশের পবাণে দেশের কারণে জাগাইলে ভালবাসা ।
তুমি চলে' গেলে, ছ'হাতে কবিধা করে' গেলে তুমি দান
হৃদয়-সাগর-মহন-কবা অমিয়-মাধান গান ।
যাবার বেলায় বেধে গেলে তুমি দীপ্ত-অনল-জ্বালা,
“দুখ-তবণেব, সুধাকরণেব উদাহরণেব মালা ।”

তুমি মর নাই, আছ আছ বেঁচে বাঙ্গলার গেহে গেহে,
বাঙ্গালীর বৃক্ষে, বাঙ্গালীর মুখে, তার স্বথে-দুখে-স্নেহে ।
অক্ষয়-স্মৃতি, অক্ষুরাণ-গীতি তোমার কি আছে শেষ ?
মানস-নয়নে উদ্ভবে গো তুমি পরি' নিতি নব বেশ ।

আসিবে এখনো কত উৎসব, কত আলো, কত হাসি,
তুমি কি আড়ালে লুকায় তখন বাজাবে অলোক-বাঁশী ?
দুর্গমপথে গহন আধারে যেইজন পথহারা
তার তরে তুমি উঠিবে ফুটিয়া আকাশেতে ক্রবতারা ?

শ্রী সুবোধচন্দ্র রায়

কবিবন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ

হে দীর্ঘ পথের বন্ধু, হে কবি সচ্ছন্দ ছন্দরাজ !
একি অভিনব ছন্দে মৃত্যুমুখে বরি' নিলে আজ
আপন মর্ষের মাঝে, সহসা পথের মধ্যখানে ?
অতৃপ্ত ভ্রমণের মত স্বরে শুধু ঘুরে' মরে কানে !
রিক্ত-আশা বঙ্গভাষা—বিস্ময়িনী কাঁদিয়ে করুণ
দুর্ভাগ্য দেশের বৃক্ষে ;—মধ্যপথে মুদিত অরুণ !
বিবহের মন্দাকিনী আঁচলের মেঘমল্ল মাঝে
শুধুরি' শুধুরি' তাই বাঙ্গলার বক্ষে আজি বাজে !
শুনেছি বরুণ-মন্ড্রে বিনামেঘে বৃষ্টিধারা ঝরে,
প্রমুর্ষ দীপক রাগে কলাবিন্ধু নিজে পুড়ে' মরে ;
জানিনাকি কোন্ স্বরে বন্ধু তুমি সেধেছিলে বাঁশী—
কত পরিণাম যার মূর্ত্তিমাম দেখা দিল আসি'
সমস্ত দেশের বৃক্ষে অকস্মাৎ বজ্রব্যথা হানি'—
বঙ্গ সারস্বত কুঞ্জে মুচ্ছা'তুর নিজে বীণাপাণি !
যাজ্ঞিকের হোমশিখা সমারদ্ধ যজ্ঞ-মুচনায
লাগিল কেবল গৃহে ; যজ্ঞ শেষ হ'ল না'ক হায় !
ভূঙ্গারে শুকায়ে গেল সমাহৃত পুণ্যতীর্থবারি,
ভক্তের নয়নে শুধু রাখি' তার শেষ অশ্রু-ঝারি ;
কাব্যের নিকুঞ্জ থেকে কুহ-কেকা লভিল বিদায়,
চোখ গেল—চোখ গেল ভগ্ন কুঞ্জে আজি বাহিরায় !
তুলিখানি অশ্রুজলে অন্ধে তুলি রাখিলা ভারতী—
কে লিখিবে লেখা আব, কে করিবে একান্ত আরতি
নিত্য নব নব ছন্দে মন্দিবেতে তুলিয়া ঝঙ্কার,—
কত সহজিবা ভাষা, কত সাম, কত বা ওঙ্কার !
আর কেন ছন্দ গাঁথি ? বন্ধু গেছে ছন্দ'লয়ে' সাথে ;
মোরা শুধু মন্দভাগ্য, পড়ে' আজি চাহিয়া পশ্চাতে
শুধিতে হুঃখের ঋণ ! নেত্রপথ বন্ধ অশ্রুজলে—
কবে মিলাইবে তার দৃশ্যপট জবনিকা-তলে !

শুধু থেকে থেকে আজ এক কথা ছেগে উঠে মনে,
কেন তুমি চলে গেলে অকস্মাৎ হেন অকারণে ।
যাবার সময় তা যে শুধাবার দিলে না সময়,
শুধাবার দূরে থাক—হ'লনাক দৃষ্টি বিনিময় ।
দুর্ভাগিনী বন্ধুত্বমি—ছিল যে প্রাণের চেয়ে প্রিয়,—
যার নাম জপমালা, নামাবলি যার উত্তরীয়
ছিল তব অহুদিন, সে বঙ্গ তেমনি ভাগ্যহীন,
লাহিত বিশ্বের দ্বারে, পায়ে পায়ে পবের অধীন ;
তারে কি বলিয়া আজি ছেড়ে গেলে, তাই ভাবি মনে—
সিংহাসন কৈ দিলে ?—লুটায় সে কটক-আসনে ।
রাণী বলে' ডেকেছিল—এই কি রাণীর যোগ্য সাজ,
জননী বলিয়া ডাকি' ঘূচালে না জননীর লাজ !
হে দেশবৎসল, তবু সত্যসন্ধ তোমারি সন্ধান
আজি আরো হানে মর্ষে—তব সত্য কত বড় দান
যাহা তুমি রেখে গেছ ; মূর্ত্তি যত পশ্চাতে লুকায়,
অভাবের অন্ধকার বলি' উঠে দীপ্ত প্রতিভায় ।
তাই চোখে পড়ে যত ধরণীর ধূলি আর বালি,
দেশজোড়া অসত্যের পুঞ্জীভূত কলঙ্কের কালী ।
তবু যে তোমারে চাই—ভাব নিষে ভরে না জীবন,
মাটির মাহুয মোরা—মাটি যে একান্ত প্রয়োজন !
কি ফল বিফল বাক্যে ? গেছ যদি, যাও কবি যাও—
ফুলের কসল ফেলি' এ ধবার, যদি স্থখ পাও
নবীন নন্দনে আজি—অগ্নান মন্দারে ভরি' ভাল
গাঁথিতে নূতন ছন্দে বরদার বর কণ্ঠমালা ।
হেথা সব পুরাতন, ধূলিমান দৈত্যভারতুর
চিত্ত নিত্য অশ্রুনেত্রে চায় হেথা বিয়োগবিধুর !
নিম্পলক মাতৃনেত্রে ঝরে সেথা যে প্রসন্ন হাসি,
তারি স্পর্শে ধৌত হোক ধরণীর সর্ব ধূলিরাশি ।
শ্রী যতীন্দ্রমোহন বাগচী

কণ্ঠ পাথর



সিদ্ধি

স্বর্গের অধিকাংশ মানুষ বাধা পাবে না এই তাব পণ। তাই কঠিন সন্ধানে অমর হবার সন্ধান সে শিখে নিয়েছে। এখন একলা বনের মধ্যে সেই মন্ত্র সে সাধনা করে।

বনের ধারে ছিল এক কাঠকুড়নি মেয়ে। সে মাঝে মাঝে আঁচলে করে' তাব জন্তে ফল নিয়ে আসে, আর পাতার পাত্রে আনে স্বপ্নাব জল।

ক্রমে তপস্তা এত কঠোর হল যে, ফল সে আর ছোঁব না, পাখীতে এসে তুঁকরে খেয়ে যায়।

আরো কিছুদিন গেল। তখন স্বপ্নাব জল পাতার পাত্রেই শুকিয়ে যায়, মুখে ওঠে না।

কাঠকুড়নি মেয়ে বলে, “এখন আমি কব্ব কি? আমার সেবা যে বৃথা হতে চলল।”

তাবপথ থেকে ফুল তুলে সে তপস্বী পায়েব কাছে বেধে যায়, তপস্বী জানতেও পাবে না।

মধ্যাহ্নে রৌদ্র যখন প্রখর হয় সে আপন আঁচলটি তুলে' ধবে' ছায়া করে' দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু তপস্বীর কাছে বোধও যা ছায়াও তা।

কৃষ্ণপক্ষেব বাতে অন্ধকার যখন ঘন হয় কাঠকুড়নি দেখানে জেগে বসে' থাকে। তাপসের কোনো ভয়েব কাবণ নেই, তবু সে পাহারা দেয়।

২

একদিন এমন ছিল যখন এই কাঠকুড়নির সঙ্গে দেখা হলে নবীন তপস্বী রেহ করে' জিজ্ঞাসা কব্ব, “কেমন আছ?”

কাঠকুড়নি বলত, “আমাব ভালই কি আর মন্দই কি। কিন্তু তোমাকে দেখাবা লোক কি কেউ নেই? তোমাব মা? তোমাব বোন?”

সে বলত, “আছে সবাই, কিন্তু আমাকে দেখে হবে কি? তাবা কি আমার চিরদিন বাঁচিয়ে রাখতে পাববে?”

কাঠকুড়নি বলত, “আপ থাকে না বলেই ত প্রাণেব জন্ত এত দরদ।”

তাপস বলত, “আমি খুঁজি চিরদিন বাঁচাব পথ। মানুষকে আমি অমর কব্ব।”

এই বলে' সে কত কি বলে' যেত, তাব নিজের সঙ্গে নিজের কথা, সে কথাব মানে বুঝবে কে?

কাঠকুড়নি বুঝত না, কিন্তু আকাশের নব সেখের ডাকে মন্থবীও যেমন হয় তেমনি তাব মন ব্যাকুল হয়ে উঠত।

তার পবে আবে কিছু দিন যায়। তপস্বী মৌন হয়ে এল, মেয়েকে কোনো কথা বলে না।

তার পবে আরো কিছুদিন যায়। তপস্বীর চোখ বুজে এল, মেয়েটিব দিকে চেয়ে দেখে না।

মেয়ের মনে হল সে আব ঐ তাপসের মাঝখানে যেন তপস্তাব লক্ষ যোজন কোশের দূরত্ব। হাঙ্গাব হাঙ্গাব বছরেও এতটা বিচ্ছেদ পাব হয়ে একটুখানি কাছে আসবার আশা নেই।

তা নাই বা বইল আশা। তবু ওর কামা আসে, মনে মনে বলে, দিনে একবার যদি বলেন, কেমন আছ, তাহলে সেই কথাটুকুতে দিন কেটে যায়, একবেলা যদি একটু ফল আব জল গ্রহণ করেন তাহলে অল্পজল ওর নিজের মুখে বোচে।

৩

এরিকে ইল্ললোকে ধবব পৌঁছল, মানুষ মর্ত্যকে লঙ্ঘন করে' বর্গ পেতে চায়—এত বড় সম্পর্ক।

ইল্ল প্রকাশে রাগ দেখালেন, গোপনে ভয় পেলেন। বললেন, “দৈত্য স্বর্গ জয় করতে চেয়েছিল বাহবলে, তাব সঙ্গে লড়াই চলেছিল; মানুষ স্বর্গ নিতে চায় ছুঁখের বলে, তাব কাছে কি হার মানতে হবে?”

মেনকাকে মহেল্ল বললেন, “যাও তপস্তা ভঙ্গ কব্বা।”

মেনকা বললেন, “স্ববরাজ, স্বর্গেব অস্ত্রে মর্ত্যেব মানুষকে যদি পরাস্ত করেন তবে তাতেও স্বর্গের পরাস্তব। মানবের মরণবাণ কি মানবীর হাতে নেই?”

ইল্ল বললেন, “সে কথা সত্য।”

৪

কাস্তন মাসে দক্ষিণ হাওয়ার দোলা লাগতেই মর্দনিত মাধবীলতা প্রফুল্ল হবে ওঠে। তেমনি ঐ কাঠকুড়নির উপরে একদিন বন্দন-বনেব হাওয়া এসে লাগল। আর তার দেহ মন একটা কোন্ উৎসাহক মানুষের উদ্দেশে উদ্দেশে ব্যাধিত হয়ে উঠল। তার মনেব ভাবনাগুলি চাক্ষুড়া মোমাছির মত উড়তে লাগল, কোথা তারা মধুগন্ধ পেয়েছে।

টিক সেই সময়ে সাধনার একটা পালা শেষ হ'ল। এইবার তাকে যেতে হবে নির্জন গিরিগুহার। তাই সে চোখ মেলল।

সামনে দেখে, সেই কাঠকুড়নি মেয়েটি খোঁপায় পবেচে একটি অশোকের মঞ্জরী, আর তাব গায়েব কাপড়খানি কুহুম ফুলে রং-করা। যেন তাকে চেনা যায় অথচ চেনা যায় না। যেন সে এমন জানা হয় যাব পদগুলি মনে পড়চে না। যেন সে এমন একটি ছবি যা কেবল রেখার টানা ছিল—চিত্রকর কোন্ ধোলালে কখন এক সময়ে তাতে রং লাগিয়েছে।

তাপস আসন ছেড়ে উঠল। বললে, “আমি দূর দেশে যাব।”

কাঠকুড়নি জিজ্ঞাসা করলে, “কেন প্রভু?”

তপস্বী বললে, “তপস্তা সম্পূর্ণ কব্বার জন্ত।”

কাঠকুড়নি হাত জোড় করে বললে, “দর্শনের পূর্ণ্য হতে আমাকে কেন বঞ্চিত কব্বা?”

তপস্বী আবার আসনে বসল, অনেকক্ষণ ভাবল, আর কিছু বলল না।

৫

তাব অনুরোধ যেমনি রাখা হল অমনি মেয়েটির বুকের একধাব থেকে আর একধাবে বাবে বাবে যেন বজ্রহুচি বিধ্বংস লাগল।

সে ভাবলে, “আমি অতি সামান্য, ভবু আমার কথায় কেন বাধা ঘটবে?”

সে রাতে পাতার বিছানায় একলা জেগে বসে’ তাব নিজেকে নিজেব ভয় করতে লাগল।

তার পরদিন সকালে সে বল এনে দাঁড়াল, তাপস হাত পেতে নিলে। পাতার পাঁজ্রে জল এনে দিতেই তাপস জল গান কব্লে। হুখে তার মন ভরে উঠল।

কিন্তু তাব পবেই নদীর ধারে শিরীন গাছের ছায়ায় তাব চোখের জল আর ধামতে চায় না। কি ভাবলে কি জানি।

পরদিন সকালে কাঠকুড়নি তাপসকে প্রণাম কবে’ বললে, “প্রভু, আশীর্বাদ চাই।”

তপস্বী জিজ্ঞাসা কব্লে, “কেন?”

মোরট বললে, “আমি বহুবু বদেশে যাব।”

তপস্বী বললে, “যাও, তোমার সাধনা সিদ্ধ হোক।”

৬

একদিন তপস্বী পূর্ণ হল।

ইন্দ্র এসে বললেন, “স্বর্গের অধিকার তুমি লাভ কবেছ।”

তপস্বী বললে, “তা হ’লে আব স্বর্গে প্রয়োজন নেই।”

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা কবলেন, “কি চাও?”

তপস্বী বললে, “এই বনের কাঠকুড়নিকে।”

(সবুজ পত্র, মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩২৮)

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৈশাখ

বৈশাখ হে, মৌনী তাপস,

কোন অতলের বাণী

এমন কোথাব খুঁজে পেলে?

তপ্ত ভালের দীপ্তি ঢেকে’

মস্তুর মেঘখানি

এল পক্ষীর ছায়া কেলে।

রক্ততপের সিদ্ধি একি

ঐ যে তোমাব বক্ষে দেখি?

ওরি লাগি আসন পাতে।

হোম-হুতান ধ্বলে?

নিঠুর, তুমি তাকিয়েছিলে

মৃত্যু-ক্ষুধার মত

তোমাব বস্ত্র নবন মেলে।

ভীষণ তোমার প্রলয় সাধন

প্রাণের বাধন যত

যেন হাসবে অবহেলে।

হঠাৎ তোমাব কণ্ঠে এ যে

আশাব ভাষা উঠল বেজে,

দিলে তরুণ শ্রায়লগ্নপে

ককণ স্বধা ঢেলে।

(ভারতী, আষাঢ়)

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৈশাখী ঝড়

হৃদয় আমাব, ঐ বৃষ্টি তোর

বৈশাখী ঝড় আসে।

বেড়া-ভাঙাব মাতন নামে

উদ্দাম উল্লাসে।

মোহন এল ভীষণ বেশে,

আকাশ-ঢাকা জটিল কেশে,

এল তোমাব সাধন-ধন

চরম সর্বনাশে।

বাতাসে তোব হৃব ছিল না,

ছিল তাপে স্তরা।

পিপাসাতে বুক-কাটা তোব

শুক কঠিন ধরা।

জাগু রে হতাশ, আব বে ছুটে

অবসাদের বাধন টুটে,

এল তোমার পথের সাধী

বিপুল অটহাসে।

(ভারতী, আষাঢ়)

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যৈষ্ঠী-মধু

আহা,

ঠুকরিরে মধু-কুলকুলি

পালিরে গিরেছে বুলবুলি;—

চুলুচুলে তাজা কলের নিটোলে

টাটকা ফুটিয়ে ঘুলঘুলি।

হেব,

কুল কুল কুল বাস-স্তরা

স্বপ্ন হ’বে গেছে রস্ সবা,

ভোমুরাব ভিড়ে ভীমকলগুণে।

মউ খুঁজে ফেরে বিলুকুলি।

তাবা

সাঁক বেঁধে ফেরে চাক্ ছেড়ে

মুপুনের হবে ডাক্ ছেড়ে,

আঙুরা-বোলানো বাতাসেব কোলে

ফেরে বোবে ঝালি চুলুচুলি।

কত

বোলতা মেনেলা রোদ পিরে

বুঁদ হ’বে ফেরে রোদ্দি দিয়ে;

কলস বনের জলসা ফুরলো

মৌমাছি এলো বোল তুলি।

ওই

নিখুঁত নিধর বোদ ঝাঁ ঝাঁ

শিরীষ-ফুলের কাগ্ মাধা,

চুলুচুলে কাব চোখ ছুটি কালো

রাঙা ছুটি হাতে লাল কলি।

আজ

ঝড়ে-হানা ডাঁটো ফজলি সে

মেশে কাঁচামিঠে ঝঞ্জলিসে;

‘রং-চোবা ফলে রস কি জোপালো’—

কুহ কুহ পুছে কার বুলি।

ওগো,

কে চলেছে টেলা-বন তেলে

বুলবুলি-ঝোঁঝা চোখ মেলে;

জাধকলী-মিঠে টোট ছুটি কাঁপে

তাপে কাঁপে ভুঁইফুলী।

মরি, ভোম্বা ছুটেছে তার পাকে
হাওয়া ক'বে ছুটো পাখ'নাকে,
ফলের মধুর মব্বহম ঘাপে
ফুলের মধুর দিন ভুলি'।

(ভারতী, আষাঢ়)

৮ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ঋণা

ঋণ। ঋণ। হৃদয়ী ঋণ।
তবলিত চম্ভিকা। চম্ভনবর্ণা।
অঞ্চল সিক্তি গৈরিক ঋণে
সিরিমল্লিকা ঘোলে কুন্তলে কর্ণে,
তমু ভবি' যৌবন তাপসী অপর্ণা।

ঋণ।

পাষাণের স্নেহধারা। তৃণাবের বিন্দু।
ডাকে তোবে চিত-লোল উত্তরোল সিদ্ধ।
মেঘ হানে জু'ইফুলী বৃষ্টি ও অঙ্গে,
চুম চুম্বকীর হারে চাঁদ ঘেরে বঙ্গে,
ধূলা-ভরা স্নায় ধরা তোর লাগি ধর্ণা।

ঋণ।

এস তৃষ্ণার বেশে এস কলহাস্ত্রে,
সিরি-সবী-বিহারিণী হরিণীর লাঞ্চে,
ধূসরেব উববের কর তুমি অন্ত,
জামলিয়া ও পরশে করণো শ্রীমন্ত,
ভবা ঘট এস নিয়ে স্তরসার ভর্ণা।

ঋণ।

শৈল্যেব পৈঠার এস তনুপাত্রী।
পাহাড়ের বুক-চেরা এস প্রেমদাত্রী।
পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আঁধ গো,
হরিচরণ-চাতা গজার প্রায় গো,
স্বপ্নের হৃদ্য আনো মর্ত্যে হৃদপর্ণা।

ঋণ।

মঞ্জুল ও হাসির বেলোয়ারি আওরাজে
ওলো চঞ্চলা। তোর পথ হল ছাওয়া যে।
মোতিমা মোতির কুঁড়ি মুরছে ও অলকে,
মেথলাষ, মবি মরি, বামধরু স্বলকে।
তুমি স্বপ্নের সখী বিদ্যাংগর্ণা।

ঋণ।

(ঋণা)

৮ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

শিল্প ও ভাষা

ছবি-না বোঝা ঘটতে পারে—হয় যে ছবিটা লিখেছে সেই
আর্টিষ্টের ছবিব ভাষায় বিশেষ জ্ঞান না থাকায়; অথবা যে ছবি
লেখকে, চিত্রের ভাষায় দৃষ্টিটা তার যদি মোটেই না থাকে। ছবিব
ভাষা অনেকটা সার্কজানীন ভাষা। ছবিব ভাষাব মধ্যে অপরিচয়ের

প্রাচীর-এত কম উঁচু যে সবাই; এমন কি ছেলেতেও, সেটা উল্লম্বন
সহজেই করতে পারে। কিন্তু ঐ একটু চেষ্টা বাব নেই তার কাছে
ঐ এক হাত প্রাচীর দেখায় একশো হাত দুর্গপ্রাকার, ছবি ঠেকে
সমস্ত। কবিব ভাষা চলেছে শব্দ-চলাচলের পথ কানের বাস্তা ধরে'
মনের দিকে; ছবিব ভাষা, অভিনেতার ভাষা, এরা চলেছে রূপ-
চলাচলের পথ আব চোখের দেখা অবলম্বন করে' ইঙ্গিত কব্বেতে
করতে। শব্দের সঙ্গে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে বাক্য যদি হল উচ্চাচিত
ছবি, তবে ছবি হল রূপের রেখাব রংএব সঙ্গে কথাকে জড়িয়ে
নিষে—রূপ-কথা। অভিনেতার ভাষাকেও তেমনি বন্ধে পায়ে
রূপের চলা বলা নিয়ে চলন্তি ভাষা।

ছবিব বেলাতে স্তরসার কথাবার্তা। এসবের সূত্রে রূপকে না
বোধে, আঁকা রূপগুলো অমনি যদি ছেড়ে দেওয়া যায় পটের উপরে,
তবে তারা একটা একটা বিশেষ্যের মতো নিজের নিজের রূপের
তালিকা ত্রুটির চোখেব সাম্মান ধরে' চূপ করে' হাঁড়িয়ে থাকে,
বলে না, চলে না—পিছন, ফুল, ফুলদানি, বাবু, রাজা, পণ্ডিত, সাহেব,
কিছা অমুক অমুক, এর বেশী নয়। কিন্তু প্রদীপ আঁকলেম,
তাব কাছে ফেলে দিলেম গোড়া সপ্তে, ঢেলে দিলাম তেলটা
পটের উপরে—ছবি কথা কয়ে উঠলো, “নির্বাপ-দীপে কিমু তৈল-
দানম্।” ছবিকে ইঙ্গিতেব ভাষা দিয়ে বলানো গেল, চলানো গেল।

কথার ব্যাকরণে যাকে বলে ‘ধাতু’, ছবিব ব্যাকরণে তার নাম
‘কাঠামো’ (form), ধারণ কবে' বাখে বলেই তাকে বলি ধাতু।
ধাতু ও প্রত্যয় একত্র না হলে কথিত ভাষায় শব্দরূপ পাই না,
ছবিব ভাষাতেও ঠিক ঐ নিয়ম—মাথা হাত পা ইত্যাদি রেখা দিয়ে
একটা কাঠামো বা ফর্ম বাধা গেল, কিন্তু সেটা বানর বা নর এ
প্রত্যয় বা বিশ্বাস কিসে হবে যদি না ছবিতে নর-বানরের বিশেষ
বিশেষ প্রত্যয় দিই। শুধু এই নয়। বিস্তৃতি, যিনি ভাগ করেন, ভক্তি
দেন, তাঁর চিত্র লেজ ইত্যাদি নানা ভঙ্গিতে কাঠামোর জুড়ে দেওয়া
চাই, বানরের সঙ্গে গাছের কি বনেব, নরের সঙ্গে ঘরের কি আর
কিছুর সন্ধি সমাস সন্ধান করা চাই। সংকীর্ণিত ভাষা যেমন তেমনি
সংকীর্ণিত ভাষাও একটা ভাষা, ছবি দেখা শুধু চোখ নিয়ে চলে না,
ভাষাজ্ঞানও থাকে চাই ত্রুটির, ছবি-প্রদীপ। শুধু অক্ষর কিংবা কথা
অথবা পদ কিছা ছত্রের পর ছত্র লিপ্তে পারলে, অথবা চিনে চিনে
পড়তে পাবলেই হৃদয় ভাষার গল্প কবিতা ইত্যাদির লেখক বা পাঠক
হবে ওঠা যায় একথা কেউ বলে না। ছবি অভিনয় নর্দন গান
ইত্যাদিব বেলায় তবে সে কথা ষাটবে কেন? যেমন চিঠি লিপ্তে
পারে অনেক, তেমনি ছবিও লিপ্তে পারে একটু শিল্পে প্রায়
সবাই; কিন্তু লেখার মতো লেখার ভাষা, আঁকার মতো আঁকাব
ভাষার উপর দখল কল্পনে পার? কাবেই বলি, যে ভাষাই হোক তাতে
প্রদীপ যেমন অল্প, তেমনি ত্রুটিরও কটিং মেলে ভাষা-জ্ঞানের অন্তাব-
বশতঃ। ফলকে দেখারূপে আঁকা এক, ফুলের ভাষা শুনে নিজের
ভাষায় ফুলকে বর্ণন করার তথ্য আছে কে না বলবে?

বাংলা দেশে অপ্রচলিত সংস্কৃত ভাষা। কিন্তু সেই অপ্রচলিত ভাষা
চলিত বাংলার সঙ্গে মিলিয়ে একটা অদ্ভুত ভাষা প্রচলিত যেমনি
হল অমনি, বাংলার পণ্ডিত-সমাজে খুব চলন হল সেই ভাষাব, সবাই
লিখলে কইলে বুঝলে বুঝলে সেই মিশ্র ভাষায়, চলিত বাংলার ষাট
বাংলার লেখা অপ্রচলিত হয়ে পড়লো; ‘কল হ'ল—এক কালেব
চলিত ভাষা সহজ কথা সমস্তই দুর্লভা হয়ে পড়লো, এমন কি
কথার অক্ষর-মুদ্রিটা নোখে স্পষ্ট দেখলেও কথটার ভাব-অর্থ ইত্যাদি
বোঝা শক্ত হয়ে পড়ল। বাংলা অর্থ অপ্রচলিত কথাকুলোর বেলায়
যদি এটা ষাটে, তবে ছবিব ভাষার বেলায় সেটা ষাটবে না কেন?

ছবির মুষ্টি অপ্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাষা বোঝাও চূড়ান্ত হয়ে যে পড়ে তার প্রমাণ দেশেব ইতিহাসে ধরা থাকে, আর সেই-গুলোর নাম হয় অক্ষয়ুগ। এই অক্ষয় মধ্য দিয়ে আমাদের মতো পৃথিবীর অনেকই চলেছে সময় সময়।

আটের ভাষা যথা—শাস্ত্রীয় শিল্প Academic art, লোকশিল্প Folk art, পরশিল্প Foreign art, মিশ্রশিল্প Adapted art লোকশিল্পের ভাষা হল—পটপাট। গহনাগাটি ঘটগাটি কাপড়-চোপড় এমনি যে-সব art শাস্ত্রের লক্ষণের সঙ্গে না মিললেও গন হরণ করে। ‘যত্র লগ্নং হি হৃৎ’ হৃদয় ধার সঙ্গে যুক্ত আছে, শুক্রাচার্য্যের মতে তাই হল লোকশিল্পের ভাষার রূপ। আব বা ‘পতিতানাম্ মতম্’, যেমন দেবমূর্তি-রচনা শিল্পশাস্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত অথবা বাজ্র বা পণ্ডিতগণের অভিমত শিল্প, সেই হ’ল শিল্পের সংস্কৃত ভাষা। পরশিল্প হ’ল যেমন পাঞ্চাবেব শিল্প, একালেব অফেলপেক্টিং। মিশ্রশিল্প চীনের বৌদ্ধশিল্প, জাপানের নারা মন্দিরের শিল্প, এসিয়াব ছাচে ঢালা এখনকার ইউরোপীয় শিল্প, গ্রীসের ছাচে ঢালা স্থান-বিশেষের বৌদ্ধশিল্প, এবং এখনকার বাংলাব নবচিত্রকলাপদ্ধতি। সুতরাং শিল্পের ভাষা-রহস্য ‘বড় জটিল হয়ে উঠেছে ক্রমেই, কাকে বাধি কাকে ছাড়ি এও এক সমস্যা। ছবিগুলো সমস্ত। হয়ে উঠলে তো বড় গিপদ। ছবিটা যে সমস্তাব মতো ঠেকে সেটা ছবির বা ছবি-লিখিয়েব দোবে অথবা ছবি-দেখিয়েব দোষে। ছবিকে মুষ্টিতে শুধু ছবি বা মুষ্টির দিক দিয়ে বুঝতে পাবলে আব-সব দিক সহজ হয়ে যায়, কিন্তু একাজটাও যে সবাই সহজে দখল করতে পারে,—হঠাৎ ছবিমুষ্টি দেখেই তাদের সমস্তাব দিক দিয়ে তাদের ধরা চট করে’ যে হয় তা নয়, সেই ঘুরে ঘিরে আসে পরিচয়ের কথা।

স্ববের ভাষা-যে না বোঝে সঙ্গীত তার কাছে শ্রকণ্ড গ্রহেলিকা, দুর্লভ শব্দ মাত্র। সুতরাং এটা ঠিক যে মানুষ কথা কয়েই বলুক অথবা স্বব গেয়ে কি ছবি বটে’ কথা হাতপায়েব ইশাবা দিয়েই বলুক, সেটা বুঝতে হলে যে বোঝাতে যাচ্ছে তার যেমন, যে বুঝতে চলেছে তারও তেমনি, ভাষা ইত্যাদিবি জটিলতা ভেদ করা চাই। কথায যেমন ছবি ইত্যাদিতেও তেমনি যখন কিছু বাচন করা হল তখন সবাই সেটা সহজে বুঝলে সার্থক হল, না বুঝলে বাচন বার্থক হ’ল। বাঁধা দস্তব বা styleএর মধ্যে এক এক সময়ে একটা একটা ভাষা ধবা পড়ে যায়। কথিত ভাষা, চিত্রিত বা ইঙ্গিত করা ভাষা সবাই এই পতিক। যেমনি style বেঁধে গেল, জমনি সেটা জ্ঞানে জ্ঞানে কালে কালে একই ভাবে বর্তমান রয়ে গেল—নদী যেন বাঁধা পড়লো নিজের টেনে আনা বালির বাঁধে। নতুন কবি নতুন আঁট্ট এরা এসে নিজের মনের গতি ভাষার স্রোতে যখন মিলিয়ে দেন, তখন style উলটে পাটে ভাষা আবার চম্ভি: রাস্তার চলতে থাকে। এ যদি না হতো তবে বেদের ভাষাই এখনো বল্তেম, অজস্রাব বা মোগলের ছবি এখনো লিপ্তেম এবং যাত্রা করেই বসে থাক্তেম সবাই। ভাষা সকল গোলকধাঁধার মধ্যেই ঘুরে বেড়াতো, অথচ দেখে মনে হতো ভাষা যেন কতই চলেছে।

(বঙ্গবাণী, আষাঢ়)

শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলার নবযুগের কথা

ব্রাহ্মসমাজ ও দেবেন্দ্রনাথ

(১)

বাংলার নবযুগেব ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজ একটা খুব বড় স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

স্বাধীনতা এবং মানবতাব আদর্শ বৃকে লইয়াই ব্রাহ্মসমাজ ভূমিত হন। এই ব্রাহ্মসমাজ বাংলার নিজস্ব বস্তু।

প্রবল সংশয়বাদ বা নাস্তিক্য, ঘেচ্ছাচার ও অনাচার, স্বদেশের প্রচলিত ধর্মে শ্রদ্ধা হাবাইয়া খৃষ্টধর্মের আশ্রয় গ্রহণ—এই ত্রিবিধ অমঙ্গলের হস্ত হইতেই দেশকে রক্ষা কবেন ব্রাহ্মসমাজ।

আমাদের এই [ত্রিবিধ] আশ্রয়বিস্তৃতি দূর কবির আশঙ্কাজনক প্রশ্ন উদ্ভূত করেন ব্রাহ্মসমাজ। আব এই কর্মে প্রথম এবং প্রধান নায়ক ছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। বাজ্র বামমোহন ইহাব স্ত্রপাত কবিযা যান, দেবেন্দ্রনাথ বাজ্রাব সিদ্ধান্ত ও সাধন দুইই বর্জন কবেন। তব-সিদ্ধান্তে বাজ্র। অবৈতমতাবলম্বী ছিলেন। মহর্ষি ভক্তিবাদী ছিলেন। রাজা শান্ত-প্রামাণ্য বীকাব করিয়াছেন। মহর্ষি এই প্রামাণ্য বর্জন কবেন।

সন্দেহ—বিচার—সঙ্গতি—এবং সময়ব, ইহাই সত্যের সনাতন পথ। কি কবির নিবন্ধন যুক্তিবাদের আক্রমণ হইতে ধর্মের সত্য প্রাণবন্তকে বাচাইয়া বাধিতে পারা যায়, মহর্ষিব নিকট ইহাই সর্বপ্রধান সমস্তাব বিদ্য হইল। এ অবস্থায় মহর্ষি গুরু শাস্ত্র বর্জন কবির ও গুরু যুক্তিব উপবে ধর্মসিদ্ধান্ত ও ধর্মসাধনকে পড়িয়া তুলিবাব যে চেষ্টা কবির ছিলেন, তাহা অত্যন্ত সন্দীহন ও সম্বোধনযোগী হইয়াছিল। বাংলার নবযুগেব নবীন সাধনাব ইতিহাসে ইহাই মহর্ষিব শ্রেষ্ঠতম কীর্তি।

কিন্তু এখানে মহর্ষিও একটা সমস্বয়েরই চেষ্টা কবিরিছিলেন। তিনি যুক্তি মানিয়াও ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই যে যুক্তির একমাত্র প্রতিষ্ঠা, ইহা স্বীকার কবিলেন না। আমাদের মধ্যে জ্ঞাত যে আশ্রা তাহাতে জ্ঞানের কতকগুলি নিত্যসিদ্ধ হাঁচ আছে। যতক্ষণ না ইন্দ্রিয়ামুভূত বস্তুসকল আশ্রয় এই জ্ঞানের ছাচে ঘাইয়া চালাই হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ইন্দ্রিয় কোনও বস্তুজ্ঞান দিতে পারে না। জ্ঞানের এই ছাঁচগুলি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ধবা যায় না। ইহার অতীন্দ্রিয় যে আশ্রা তাহারই বৃত্তি। মহর্ষি জ্ঞানের এই নিত্যসিদ্ধ ছাঁচগুলিকে ‘আশ্রপ্রত্যয়’-করিয়াছেন। আধুনিক যুগোপীষ দর্শনে ইহাকে Intuition কহে।

স্বদেশেব প্রাচীন এবং সর্বজনপূজ্য শাস্ত্রের পরিভাষার সাহায্যেই মহর্ষি নিজের স্বাক্ষুতিশীল ধর্মসিদ্ধান্ত লোকসমাজে প্রচার করেন। ইহাব ফলে মহর্ষিব নবযুগের নবীন সাধনা প্রাচীনেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠনুজ্ঞে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই ভাবে ব্রাহ্মসমাজ আমাদের বর্তমান স্বদেশাভিমানেরও প্রথম শিক্ষাগুরু হইয়া উঠেন। মহর্ষিব সুযোগ্য শিষ্য এবং সহকর্মী ৮ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ই সর্বপ্রথমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কষ্টপাথরে কবিযা হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। এই বিষয়েও ব্রাহ্মসমাজ বর্তমান যুগেব যুগ-সাধনার প্রথম গুরু হইয়া আছেন।

এই শিক্ষা ও সাধনাব প্রাণবন্ত যে স্বাধীনতা এবং মানবতা তাহাকে বাংলা যেমন স্বীকড়াইয়া ধবিযাছে, অত্যন্ত প্রদেশ সেক্ষপ ধরে নাই। ইহাও ব্রাহ্মসমাজেবই কার্য। ব্রাহ্মসমাজ সত্য-প্রতিষ্ঠায় শাস্ত্র গুরু বর্জন কবিযা প্রত্যেক মানুষের সহজ বিচারবুদ্ধিকেই একমাত্র প্রামাণ্য বলিযা প্রচার করিলেন। এই স্বাধীনতাব আদর্শেব অনুসরণ কবিতে ঘাইয়া বাজ্রাবী যে সংসারহর্ষেব পবিচয় দিয়াছে এবং অন্নানবদনে যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, অল্প কোনও প্রদেশের লোকে সেক্ষপ কবে নাই। এবং এই তাগেব সাধনাব ব্রাহ্মসমাজই আমাদের প্রথম গুরু হইয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই সাধনার প্রথম দীক্ষাগুরু। কিন্তু এ সাধনা অসাধারণ শক্তি লাভ কবে, দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য ব্রাহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনেব নেতৃত্বাধীনে।

(বঙ্গবাণী, আষাঢ়)

শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম সেনরাজ ও তাঁহার সময়

প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণেরা বা বৌদ্ধ ভিক্ষুবাই বিদ্যাদান করিতেন। নালন্দার বর্তমান নাম “বডগাঁও”—ইহা পাটনা জেলার বিহাব মহবুদাব মধ্যে অবস্থিত। এখান পাটনা হইতে বেলপথে নালন্দাতে বাওয়া যায়। নালন্দা মঠটি একটি আশ্রুকুলে অবস্থিত ছিল। সেই কুলেব পুঙ্খবিগীতে নাকি একটি নাগ বাস করিত। সেই নাগের নাম হইতেই আশ্র-কুলটির নাম হয় “নালন্দা”। আবার কেহ কেহ বলেন, ভগবান তথাগত পূর্বজন্মে এখানে তপস্যা করিতেন। জীবের দুঃখকষ্টে তাঁহার হৃদয়ে ব্যথা লাগিত, তাই তিনি দুই হাতে সব জিনিষ দীন দুঃপীকে বিলাইতেন। সেইজন্য তাঁর নাম হয় “না—জলম্ দা” অর্থাৎ “নালন্দা”—যাব সর্বদা বিলাইয়াও তৃপ্তি হয় না।

সম্ভবতঃ ঐশ্বর্যমুগ্ধেই ইহা প্রাচুর্য্যবান হয়। চতুর্থ শতাব্দীতে বাহিধান মগধ ভ্রমণকালে নালন্দার উল্লেখ করেন নাই। নালন্দা একটি প্রসিদ্ধ মঠ ছিল। সেই মঠে অনেক ভিক্ষু থাকিতেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি বিদ্যাধি জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, তিনি মঠের অধ্যক্ষের পদ পাইতেন।

বাল্লভ্যার পাল রাজ্যের যখন মগধ জয় করেন, তখন নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ও তাঁহাদের অধীনে আসে। অনেক সময় পাল-রাজাই স্থির করিতেন কে সর্বাধ্যক্ষ হইবেন। এইসকল জ্ঞানতপস্বীদের পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হইয়া দেশ-বিদেশ হইতে ছাত্রেরা এখানে অধ্যয়ন করিতে আসিত। ৭ম শতাব্দীতে জয়নগর যখন এখানে সংস্কৃত শিখিতেছিলেন, তখন ছাত্র ও ভিক্ষু লইয়া সর্বসম্মত দশহাজার লোক ছিল। যেসকল ছাত্র এখানে পড়িত, তাঁহাদের সমস্ত পুখ পুখ বাসগৃহ দেওয়া হইত। নালন্দাতে পনন করিয়া এখান আশ্রিত হইয়াছে যে এক-একটি ঘর ১২ ফুট দীর্ঘ ও ৮ ফুট প্রস্থ ছিল।

এখানে ছাত্রদের নিকট হইতে কোন বকম বেতন লওয়া হইত না।

তৎকালিণ বিশ্ববিদ্যালয়েও লওয়া হইত না। সকল ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য ব্রাহ্মণের নানাবকম দান ছিল। প্রত্যেক ছাত্রের সমস্ত প্রত্যেক দিন ১২০ টি অধিব, ২০ টি জাযল, ২০ টি পেজুব, আড়াই তোলা কপূর্ব, এক পোষা মহাশালী খান্যের চাউল দেওয়া হইত; আর মাসে তিন রাশি তৈল ও প্রত্যহ কিছু মাপন দেওয়া হইত। প্রতিদিন প্রাতে ঘণ্টাখানি হইলে ভিক্ষুবা ও ছাত্রেরা পুঙ্খবিগীতে স্বানে বাটতেন। অধ্যয়নের সময় নানাতরনে অধ্যাপকগণ ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। সন্ধ্যার সময় ভিক্ষুবা এক গৃহ হইতে অল্প গৃহে সন্ধ্যাগীত গাহিয়া বেড়াইতেন।

নালন্দাতে সর্বসম্মত ৬টি মহাবিদ্যালয় বা কলেজ ছিল। মানুষের জ্ঞান যত কিছু বিদ্যা আবিষ্কার করিতে পারিযাছে, সেইসকল বিদ্যার শিক্ষা এই আশ্রমে দেওয়া হইত। সেইজন্য হেতুবিদ্যা, চিকিৎসা-বিদ্যা—সকল শাস্ত্রেরই অধ্যাপনা এখানে হইত। ইহা ব্যতীত বৌদ্ধদর্শন, ত্রিপিটক, মাতক ও বাস্তবশাস্ত্রেরও অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল। হিন্দু শাস্ত্র—সংখ্যা, বেদান্ত ও অষ্টাঙ্গ দর্শনের আলোচনাও এখানে যথেষ্ট হইত।

প্রথমে এখানকার ছাত্রদিগকে কোন বকম উপাধি বিতরণ করা হইত না। পরে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি বিতরণের প্রথা প্রবর্তিত হয়। তাঁরা যে প্রতিষ্ঠাপত্র দিতেন, তাহাতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শীল মোহর থাকিত। সেই শীল মোহরে লেখা থাকিত—“শ্রীনালন্দা-মহাবিহারী আর্ঘ্য-ভিক্ষু-সংসদ্যা”। তাহাতে একটি ধর্মচক্র তাঁকা থাকিত, আর ধর্মচক্রের দুইপার্শ্বে দুইটি হরিণ উপবেশ দিকে মূণ করিয়া থাকিত।

(মানসী ও মর্মবাণী, জ্যৈষ্ঠ)

শ্রী বদীন্দ্রনাথ বসু

বৈরা বল্লাল সেন ও সেনরাজ বল্লাল সেন, উভয়ে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। সেনরাজগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। ইহাদের পূর্বপুরুষ কর্ণাট হইতে বঙ্গে আগমন করেন। আদিশূর পালবংশীর রাজা দেবপালের পূর্ববর্তী। ৮৮৫ হইতে ৯১৮ খ্রীষ্টাব্দেব মধ্যবর্তী সময় দেবপালের রাজত্বকাল। সামন্ত সেনের পিতা বিশ্বসেনই বঙ্গের প্রথম সেন রাজা এবং ১০৫৫ সংবৎ হইতে ১০৮০ সংবৎের মধ্যে ইহার স্থিতিকাল।

(মানসী ও মর্মবাণী, জ্যৈষ্ঠ) শ্রী বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন জীব-বলি প্রথা

পশুপলি অতি প্রাচীন কাল হইতে পৃথিবীর আশ্রয় সমস্ত দেশেই প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলেণ্ডে ডিভনসায়ারে মে মাসের প্রথম ভাগে জনদেবতার উদ্দেশ্যে মেঘ-বলি একটি উৎসব হইত। বলিব পব পশুটির এক টুকু মাংসের সমস্ত জনসাধারণের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া বাইত, কাবণ তাঁহাদের এই বিশ্বাস ছিল যে উহা একখণ্ড মাংস খাইতে পারিলে সমস্তসব তাঁহাদের কোন অমঙ্গল হইবে না। বুথিট নামক মঙ্গোলীয় এক জাতি সাধবেবিধা বৈকাল হুদেব নিকট বাস করে। তাঁহারা এখনও কোন ব্যক্তির মৃতদেহ সংকার বা মৃত্তিকাধ প্রোথিত কবিরার সময় তাঁহা প্রিয় অশ্বটিকে বলি দেয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের বাৎসরিক অশ্ব-মেঘ প্রথা আছে। দেবতা-অধ্যুষিত পবিত্র পাহাড়ে বলিব অশ্বটিকে লইয়া যাওয়া হয় এবং তাঁহা পাঁচচতুষ্টয় বন্ধন করতঃ ভূতলে কেলিলে পুরোহিত পেট চিবিয়া তাঁহাকে বধ করেন। ইহা মাংস বন্ধন কবিয়া তাঁহা বকত কটা যজ্ঞার্থিতে নিষ্পেদ করা হয় এবং তৎসঙ্গে সোমবসেব ছায়া একপ্রকার মাদক দ্রব্যও ঐ অগ্নিতে ঢালিয়া দেওয়া হয়। বলিব কতকাংশ আকাশদেবতাদের উদ্দেশ্যে শূন্ডে নিষ্পেদ করা হয় এবং পুরোহিত পশুটির অস্থিসকল যজ্ঞার্থিতে প্রদান করেন। তখন সকলে অবশিষ্ট মাংস দেবতাদিগের প্রসাদরূপে ভক্ষণ করে এবং এইরূপ সমস্ত উচ্চারণ করিতে থাকে—“আমাদের গ্রাম সমৃদ্ধিশালী হউক, বহু সম্ভান-সম্ভতি হউক, অসংখ্য গো-অশ্ব প্রভৃতিতে দেশ পবিপূর্ণ হউক, দেশে প্রচুর পবিমাণ শস্য উৎপন্ন হউক,” ইত্যাদি। যজ্ঞাবশেষ বাহাতে কুকুর প্রভৃতি কোন অশুশ, পশু ভক্ষণ না করে, তৎসমস্ত অগ্নিতে পুড়াইয়া দেলা হয়।

বুথিটদের এই বাৎসরিক যজ্ঞ প্রাচীন আর্ঘ্যদের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সম্ভান-লিপ্সা পাপ-খালন বা দিক-বিজয় প্রতিষ্ঠা আর্ঘ্যদের অশ্বমেধ যজ্ঞের কাবণ বলা বাইতে পারে।

গ্রীক ও রোমকজাতিদের মধ্যেও অশ্বমেধ প্রথা বিদ্যমান ছিল। বর্ধাধকুর অশ্ব গ্রীকদের একটি উৎসব হইত। এই সময় কয়েকটি খেত অশ্ব সূর্য্যদেবতার অর্ঘ্য স্বরূপ সমুদ্রে ভাসাইয়া দেওয়া হইত। গ্রীকদের বিশ্বাস ছিল যে এইরূপ পুঙ্খাশ্র দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া প্রচুর শস্য উৎপাদন করিবেন। স্পার্টানগণও, বুথিটদের মত, গিবি-শিখরে অশ্বমেধ কবিয়া দেবতার তুষ্টি সাধন করিতেন। রোমকগণও শবৎ ঋতুতে মাংস দেবতার নিকট খেত অশ্ব বলিদান করিতেন। ইহা বস্তুক বাস্তবপুরোহিতের ভবনে আনয়ন করতঃ স্নসজ্জিত কবিয়া বাপা হইত। দেবালয়ের কুমারীগণ ইহার বস্ত্রের সহিত গোশাবকের বস্ত্র মিশ্রিত কবিয়া পশুপালকগণকে প্রদান করিতেন এবং তাঁহারা পশুর বংশ বৃদ্ধির জন্য ইহা গ্রহণ করিত। ইখাশ্রদের ইতিহাসেও গো, অশ্ব প্রভৃতি পশুদিগের উল্লেখ আছে।

শকগণও কৃষিদেবতার উদ্দেশ্যে এবং মৃতব্যক্তির আত্মার সুখ-ও শাস্তি-বিধানার্থে অশ্ব বলিদান করিতেন। ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকাও বহু জাতি বৃষদেবতার পূজার পশুকে বৃক্ষে বন্ধন করতঃ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা উহার বধসাধন করিত। তৈত্তিরীয় সংহিতায় দেখিতে পাই যে সন্তান কাগনা করিয়া লোকে বৃষদেবতার নিকট পশুবলি দিত। বুরিটপণ অশ্বমেধের সময় পর্বতোপরি একটি বৃষশাখা বহন করিয়া লইয়া যাইত এবং তাহাতেই অশ্বকে বন্ধন করিত। আর্ধ্যহিন্দুদেব মধ্যেও বলি পশু পূপকাঠে বন্ধন করা হইত।

ব্রাহ্মণযুগে আর্ধ্যদের মধ্যেও পশুবলি প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু ইহার পূর্বে যে নববলি সংগঠিত হইত, ইহাও প্রমাণ ব্রাহ্মণগ্রন্থে স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে লিপিত আছে যে, দেবতাগণ পূর্বে যথাক্রমে মানুষ, অশ্ব, বৃষ, মেঘ, ছাগ বলি দিতেন এবং উচ্চস্তরের জন্ত হইতে যজ্ঞের সাব নিম্নস্তরের জন্তব মধ্যে গমন করিল এবং অবশেষে মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করিল; সেইজন্ত 'বলি অর্থে তুল ও ধব' বুঝায়।

ব্রাহ্মণগ্রন্থে আরও দেখিতে পাই যে পূর্বে অগ্নিবেদী নির্মাণের সময় বেদী দৃঢ় কবিরাজ জন্ত ইহা মনুষ্য-মন্তকে উপর নির্মিত হইবার রীতি ছিল। ভিত্তি দৃঢ় কবিরাজ মান্দে ইহা নিয়ে মনুষ্য-

মন্তক রাখিয়া তদুপরি প্রাসাদ, দুর্গ বা দেতু নির্মিত হইবার বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসে দৃষ্ট হইবে। কথিত আছে যে বোমসহবে Capitol-এর নিম্নে মনুষ্য-মন্তক পাওয়া গিয়াছিল। ত্রিবিড় ঋগ্বেদজাতির মধ্যে যে নববলি প্রচলিত ছিল তাহা মক্কাবীর বুরিটপণের অধ্যায় প্রমাণ অগ্ররূপ। রোমান সেনেট হুটপূর্ব ৭৫ অব্দে আইন কবিরাজ নববলি প্রথা উঠাইয়া দেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে জীববলির প্রতিকূল সম্প্রদায়ও বিদ্যমান ছিল। একজন বিহদী ধর্মসংস্কারক জীববলি-প্রথার বিরুদ্ধে মত প্রচার করিয়াছিলেন—“What purpose is the multitude of your sacrifices unto me?” Saith the Lord, “I am full of burnt sacrifices of the rams and the fat of fed beasts, and I delight not in the blood of bullocks or of lambs or of goats.” (Isaiah, i. 11.) ভারতবর্ষে বৃদ্ধ ‘অহিংস’ মূলমন্ত্র কবিরাজ পশুবলির বিরুদ্ধে ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এখনও শাস্ত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায় দুইটি ভিন্ন মতের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।

(প্রভাতী, জ্যৈষ্ঠ)

শ্রী হেমচন্দ্র রাধাচৌধুরী, এম-এ



ঠাকুরমাব পাঠশালা

চিত্র কব—ঈশ্বরদাসের উকীল মহাশয়ের সৌজন্যে



বিদেশ

ইউরোপের হত্যা-নীলা—

হাব র্যাটেনো ও হিউগো ষ্টাইনিসের প্রবন্ধে বর্ণনাস্থ জার্মানী তাহার পূজ্যকৃত অবসাদ-ভার সমাইয়া ফেলিয়া আবার নব উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল। র্যাটেনো ও ষ্টাইনিস উভয়েই প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী এবং যুদ্ধেব পূর্বের কাব্বারে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে ইহঁরা স্বদেশের কল্যাণের জন্য ইহঁদের অর্থ ও শক্তি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। জার্মানীতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যখন হইল তখন ধনকুবের র্যাটেনো আপনাব সম্পদের কথা ভুলিয়া গিয়া সাম্যবাদীদের সহিত একযোগে কাজ করিতে আবদ্ধ কবিনেন। কিন্তু জার্মান গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা খুব দূত ভিত্তি উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কাইজার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিলে সন্ধিব সম্ভাবনা অতি অল্পই দেখিয়া জার্মান প্রজাপুঞ্জ গণতন্ত্রের পক্ষপাতি কবিরাহিল। কিন্তু শান্তি-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই আবার অনেকেই জার্মানীতে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। বিশাখ ঘোষা হিগেনবার্গ ও লুডেনডর্ফের পবিচালনার জার্মানীর জাতীয়তাবাদী ক্রমশই শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল। গণতন্ত্রের বিপক্ষে গোপনে বড়বস্ত্র চুপিতে লাগিল। হাব র্যাটেনোব পরিচালনা-গণতন্ত্র দূত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া জাতীয়তাবাদী র্যাটেনোব বিরুদ্ধে পক্ষহস্ত হইলেন। র্যাটেনোকে মারিয়া কেলিবার জন্য চক্রান্ত হইতে লাগিল। বিগত ২৪শে জুন বার্লিনেব এক নিষ্ঠুর রাস্তায় গুলুগতাকের হস্তে হাব র্যাটেনো প্রাণ হাবাইয়াছেন। গুলুগতাকেরা একটি মোটরগাড়ী কবিয়া আসিয়া রিভলবারের গুলি ছুড়িয়া ইহঁকে হত্যা করে। ইহঁর মৃত্যুতে জার্মানী এমন একজন কৃতী পুণ্যকে হারাইলেন যিনি হয়তো একদিন সমস্ত ইউরোপকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে পাবিতেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে ইনি জার্মানীৰ পুনরুদ্ধারের জন্য যে অসাধারণ ব্যবস্থা কবিরাহিলেন তাহাতে একমাত্র রাশিয়ার লেনিন ভিন্ন আর কোনও শক্তির পুঙ্খ কৰ্ম্মসংগত তাহার প্রতিদ্বন্দী ছিলেন কি না সন্দেহ। মৃত্যু সময়ে র্যাটেনোর ৫২ বৎসব বয়স হইয়াছিল। ইহঁর পিতা ডাক্তার এমিল র্যাটেনো জার্মান বৈজ্ঞানিক কারখানাব মালিক ছিলেন। ইহঁর কারবার এত সুবৃহৎ যে জার্মানীতে এক কুপেব কারখানা ভিন্ন এতবড় কারখানা আর নাই। র্যাটেনো পৈতৃক কাব্বাবের মালিক হইয়া তাহার অনেক উন্নতি সাধন কবেন।

ভেদান্ত কাব্বাবেও ইনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে ও পূর্ববিদ্যায় ইহঁর অনন্তসাধারণ প্রতিভা ছিল। বহু পুস্তক বচনা কবিরাহি জার্মান সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন। যুদ্ধের সাথে যখন জার্মানীতে কাঁচা মাল সংরক্ষণ এবং

অপচয়-বর্জনের একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিল তখন সংরক্ষণ ও অপচয়-বর্জন বিভাগেব ভার গ্রহণ করিয়া ব্যাটেনো রাজনৈতিক আসরে দেখা দিলেন। বিশেষভাবে উপব সম্পূর্ণরূপ নির্ভর কবা জার্মান রাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র। র্যাটেনোব জ্ঞান বিশেষভাবে উপর অপচয়-বর্জনের সম্পূর্ণ ভাব অর্পণ করিয়া জার্মান রাষ্ট্রনৈতিক নেতারা নিশ্চিত রহিলেন।

মিত্রশক্তিবর্গ যখন জার্মানীতে মাল আগ্রাসনী বন্ধ কবিরাহিলেন তখন র্যাটেনোব চেষ্টায় জার্মানী আপনাব পূর্বজাত ব্যবসায়কে সুব্যবহার করিয়া নিজের অভাবও অনেক পবিমাণে মিটাইতে পারিয়াছিল। যুদ্ধের সময় ৭০.০৮ কাব্বারের পবিচালক হইয়া ইনি জার্মান ব্যবসায়কে ধ্বংস হইতে রক্ষা করেন। নানা কার্যবাবের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকতে ইনি বার্তা-শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। বিগত ক্ষেত্রমারী মাসে ইনি জার্মানীৰ পবরাষ্ট্র-সচিব নির্বাচিত হন এবং যুদ্ধ-ক্লম শোধের ব্যবস্থা করিবাব ভাব ইহঁর উপর স্তম্ভ হব। অল্পদিনের মধ্যেই যুদ্ধ-ক্লম শোধের সুব্যবস্থা কবিরাহি মিত্রশক্তিবর্গের নিকট হইতেও সুখ্যাতি অর্জন করেন। বিগত জেনোয়া-বৈঠকেব সময় সোভিয়েট রাশিয়ার বোলশেভিক প্রতিনিধিবর্গের সহিত ব্যবসায়-সংক্রান্ত সন্ধি কবিরাহি ইনি সমস্ত অর্পণকে বিস্তারিত করিয়া দেন। ইহঁর রাষ্ট্রনৈতিক বিচক্ষণতার প্রেক্ষাপট এই রূপ-জার্মান সন্ধি।

বড় বড় যুদ্ধেব উপব যদিও ইহঁর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত তথাপি ইনি যান্ত্রিক সভ্যতাব বিপক্ষে ছিলেন। যান্ত্রিক কার্যবাবের দোষে জনসাধারণের মধ্যে দুর্গতি ও অশান্তি বাড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া ইহঁর বিশ্বাস ছিল। ইনি বলেন যে যন্ত্রসাহায্যে বাহা নির্মিত হয় তাহাব নির্মাণে নির্মাতাব কোনও স্বপ্নের আনন্দ না থাকতে উহা জদয়হীন, শুষ্ক, কাজ মাত্র। উহাতে জদর ও মনের কোনও প্রসার হয় না এবং নির্মাতাব মন ক্রমেই শুকাইয়া যায়। কৰ্ম্মকুশল শিল্পী আনন্দের অভাবে ক্রমেই অলস এবং অসংপ্রযুক্তিবে লোক হইয়া উঠে। কাজেকাজেই কাব্বারে ক্রমশই কম-সময় দিবাব প্রযুক্তি হইতে দৈনিক কৰ্ম্ম-সময় কমাইবার আন্দোলন দেখা গিয়াছে। কিন্তু বর্তমান কালে কল-কারখানা একেবাবে ভুলিয়া দেওয়া অসম্ভব। সেইজন্য র্যাটেনো বলেন যে যন্ত্র-সাহায্যে নির্মাণ-কার্য যেখানে চলে তাহার মধ্যেও স্বপ্নের আনন্দ বাহাতে কারিকরের মনে জাগিতে পারে তাহার ব্যবস্থা বাধিতে হইবে। র্যাটেনোব মনে এইটিকেই সার্থক কবিরাহি ভুলিবাব কল্পনা সব-চেয়ে বেশী কাজ কবিতেছিল। ইহঁর র্যাটেনোর জীবনের আদর্শ ছিল বলিলেও অসত্য কবা হয় না। ইহঁর মৃত্যুতে বাস্তব-পন্থী-গব অভীষ্ট-মিদ্ধির কিঞ্চিৎ হয়তো সুবিধা হইতে পারে কিন্তু এত বড় কৰ্ম্মাব অকাল-মৃত্যুতে অগৎ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহাব সন্দেহ নাই।

অবদ্যন্ত ইংবেজ সেনাপতি শ্রাব হেনরি উইল্ফন আততায়ীর হস্তে লগনের বাজপণে নিহত হইয়াছেন। শ্রাব হেনরী ইংবেজ সেনাবিভাগে উচ্চপদস্থ কৰ্ম্মচারী ছিলেন। ইনি ব্রহ্ম-যুদ্ধে ও দক্ষিণ-আফ্রিকাব যুদ্ধে

কৃতিত্ব প্রদর্শন করাতে সৈন্য-পরিচালন বিভাগে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। বিগত বিষয়ক্ষে প্রধান সেনাপতি জাব জন ফ্রেঙ্কের প্রধান সহকারীরূপে যে দক্ষতা প্রদর্শন করেন তাহা পুরস্কার স্বরূপ সৈন্য-সমাবেশ ও পরিচালনার সর্বময় কর্তা (Director of Military Operations) নিয়োজিত হন। লর্ড ফ্রেঙ্ক অবসর গ্রহণ করিলে জাব হেনরী তাহা পদে অভিযুক্ত হইয়া ইংরেজ সামরিক বিভাগের কর্তা হইয়া উঠেন। ইনি আলষ্টার দলের সহিত একযোগে আইরিশ জাতীয় দলকে ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প করেন। ব্রাক ও ট্যান সম্প্রদায়ের অত্যাচারের জন্য আইরিশ জাতীয় দল ইহাকেই প্রধানতঃ দায়ী বলিয়া মনে করেন। এইজন্য স্বাধীনতা-প্রয়াসী আইরিশগণ অনেকদিন হইতেই ইহাকে হত্যা করিবার যুগোপ খুঁজিতেছিল। সেইজন্য প্রথমে অনেকেই সম্মত করিয়াছিলেন যে এই হত্যাকাণ্ড আইরিশ জাতীয় দলের দ্বারা ই সংঘটিত। কিন্তু এখন যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে জাতীয় দলের সহিত ইহার কোনই সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায় নাই। বরং ইংরেজ মন্ত্রী চেম্বারলেন বলিয়াছেন যে জাতীয় দলের সহিত এই হত্যাকাণ্ডের কোনই সম্পর্ক নাই। জাতীয় দলের নেতা ডি ভ্যালেরাও হত্যাকাণ্ডটিকে অত্যন্ত হীন ও ক্ষমতাকান্ড বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলেন শুণ্ড হত্যা কাপুরুষের কাজ; এইরূপ হেয় ও ক্ষমতাকাজির দ্বারা কখনও কোন মহৎ কার্য সম্পাদিত হয় না। আইরিশ জাতি কখনই এইরূপ নীচ ও ভীক-জনোচিত কার্য দ্বারা নিজেদের স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপনের প্রয়াস পাইবে না। হত্যাকারী দুইজন ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু তাহারা যেক্ষণ স্থিতিভাবে এই পৈশাচিক কাণ্ড সম্পাদন করিয়াছে তাহাতে; বীভৎস ব্যাপার স্থিতিভাবে সম্পাদন করিবার ক্ষমতা যে ইহাদের অসাধারণ, তাহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইয়াছে। হত্যা ব্যাপারের পর ইহারা বেশ দীর্ঘকালই পলায়নের চেষ্টা পাইয়াছিল এবং বহু লোকে ইহাদের ধরিবার প্রয়াস পাইলেও ইহারা বুদ্ধি স্থির বাধিবা পশ্চাদ্ধাবনকারীদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। অনেককণ ধরিয়া যুঝিয়া পরিশেষে ইহারা ধরা পড়ে। প্রথমে পুলিশে ইহাদের নাম কেনোলি ও ম্যাকব্রাউন বলিয়া স্থির করে। পরে জানা গিয়াছে যে ইহাদের প্রকৃত নাম বেঞ্জামিন ডান ও জোসেফ ওসলিভান। ইহাদের চেষ্টাতেই পুলিশ প্রথমে ইহাদের প্রকৃত পরিচয় জানিতে পাবে নাই। হত্যাপ্রাণে ইহাদের বিচার আদেশ হইয়াছে; কিন্তু সে বিচারের প্রতি ইহাদের কোনই জ্ঞাপন নাই। পুলিশ যখন ইহাদের চাতুরীর কথা বর্ণনা কবিত্তেছিল, কেমন করিয়া ইহারা পুলিশের চক্ষে ধুলি দিয়া আত্মপরিচয় গোপন কবিত্তে সমর্থ হইয়াছিল, কেনই বা পুলিশে নিজেদের জন্ম নামে পরিচয় দিয়াছিল, সেই-সকল কাহিনী প্রকাশ কবিত্তেছিল তখন ইহারা বেশ আনন্দ অনুভব কবিত্তেছিল। ইহাদের ব্যবহারে সকলেই অবাক হইয়াছেন। কেন যে ইহারা এই পৈশাচিক কাণ্ড করিয়া বলিল সে রহস্যজ্ঞান এখনও ভেদ হয় নাই। তবে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবা অনুমান করেন যে ইহাৰ অন্তর্ভালে নিশ্চয়ই কোনও গুঢ় রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিহিত আছে।

আয়াবুল্যাণ্ডের অন্তর্ভোগ—

মাইকেল কলিন্স, আর্থার গ্রিকিন্স প্রমুখ জননায়কগণের সহিত ইংরেজ সরকারের যে বন্ধানিহিত হইয়া গিয়াছে তাহাকে স্বীকার করিয়া ঔপনিবেশিক স্বাভ্যোব আদর্শে আইরিশ শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে যাহারা উদ্যোগী তাহারা স্বাভ্যপস্ট্রীদল (Free Stater) নামে অভিহিত। জাব যাহারা ডি ভ্যালেরা, ক্যাথাল ক্র্যা, কাউন্টেন্স মার্কেভিচ ও মিস ম্যানুইলিনের আত্মানে ইংরেজ শাসন হইতে

সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিবা পূর্ণমতের উপর আইরিশ শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলষী তাহারা গণতান্ত্রিকদল (Republican) নামে পরিচিত। স্বাভ্যপস্ট্রীদল ও গণতান্ত্রিকদলের মধ্যে বিবাদ একপক্ষে বুদ্ধি পাইতেছিল যে, উভয়দলের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। ডি ভ্যালেরা ও কলিন্সের চেষ্টায় তাহা কোনও ক্রমে এতদিন পর্যন্ত ঘটনা উঠিতে পাবে নাই। কিন্তু আইরিশ শাসন-পরিষদের নির্বাচন ফল প্রকাশিত হওয়াতে গণতান্ত্রিকদল নিজেদের সর্বত্র পরাজিত হইতে দেখিয়া আব সংঘত রহিতে পারিলেন না। তাই আয়াবুল্যাণ্ডে বিদ্রোহের আশঙ্কন অসিয়া উঠিয়াছে। এতদিন যাহা ধীরে ধীরে প্রধুমিত হইতেছিল হঠাৎ তাহা ভীষণ দাবদাহে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আইরিশ মহাসভার নির্বাচনফল প্রকাশিত হইলে দেখা গেল সন্ধিপক্ষীয় স্বাভ্যপস্ট্রীদলের ৫১ জন, সন্ধিবিরোধী গণতান্ত্রিকদলের ৩১, স্বাভ্যবিদলের ১৪, স্বাধীনমতাবলম্বী ১০, ক্যাথাল-দলের ৩ জন মহাসভার নির্বাচিত হইয়াছেন। লায়াম মেমোস প্রভৃতি সুবিখ্যাত গণতান্ত্রিক নেতা নির্বাচিত হইতে পারিলেন না। গণতান্ত্রিকদল নির্বাচনে হারিয়া যাইতেছেন দেখিয়া গণতান্ত্রিকদলের সেনাপতি রডারিক ওকোনব ডাবলিন সহবেব আইন-বিদ্যালয়ের কোব-কোর্টস্ নামক গৃহগুলি অধিকার কবিবা সৈন্য-সমাবেশ এবং পবিখা-খনন কার্যে লাগিয়া গেলেন। ইহাই বিদ্রোহের প্রথম হুচন। আইরিশ গণতান্ত্রিক সেনা (Irish Republican Army) কর্তৃক কোব-কোর্টস্ অববোধ ইংরেজ সরকার সহ করিতে পারেন না বলিয়া ইংরেজ মন্ত্রী চার্চিল সাহেব ঘোষণা করিলেন। স্বাভ্যপস্ট্রীদল গণতান্ত্রিক-দলকে আইনসম্মত বৈধ আন্দোলন কবিত্তে অনুরোধ করিবা একটী ইস্তাহার জারি কবিলেন এবং উহাৰ সহিত ঘোষণা কবিলেন যে গণতান্ত্রিক সেনাগণের বধেচ্ছ ব্যবহার আইরিশ স্বাধীন-রাজ্য সহ করবেন না। গণতান্ত্রিকদলকে কোব-কোর্টস্ পরিত্যাগ করিতে হইবে। গণতান্ত্রিকদলের বেলফাষ্ট সহবের নেতা হেণ্ডাংগনকে স্বাভ্যপস্ট্রীদল বেলফাষ্টে অবজ্ঞাক্রমে কাবণ বলিবা ঘেচ্ছ কবেন। তাহাৰ প্রতিশোধস্বরূপ গণতান্ত্রিকদল স্বাভ্যপস্ট্রীদলের প্রধান সেনাপতি মেজব ব্রেনাবেল ওকোনলকে বন্দী করেন। ২৬শে জুন তাবিধে সরকার-পক্ষের সেনাপতি ইনিস স্বাভ্যপস্ট্রী সেনার সহ কোব-কোর্টস্ অক্রমণ করেন। রোবি ওকোনব অমিত বিক্রমে আত্মবক্ষার প্রবৃত্ত হইলেন। ওকোনব ইস্তাহার জাবি কবিবা ঘোষণা কবিলেন, “আয়াবুল্যাণ্ডেৰ যুবকেরা আপনাদের জাতীয় মর্যাদা বক্ষাকল্পে আত্মদান করিবে তথাপি অধীনতাশূন্যল ঘটিয়া পাবে পবিবে না। আমরা যতক্ষণ জীবিত থাকিব ততক্ষণ পর্যন্ত গণতন্ত্রের জন্ত যুদ্ধ কবিবা।” আয়াবুল্যাণ্ডের কম্যুনিষ্ট সম্প্রদায় গণতান্ত্রিকদলের সহিত গোপ দিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা কবিলেন। ডি ভ্যালেরা, ক্যাথাল ক্র্যা, লায়াম মেমোস, মিস ম্যানুইলিন, কাউন্টেন্স মার্কেভিচ প্রভৃতি আইরিশ স্বাধীনতাকাজী নেতৃবৃন্দ আসিয়া বিদ্রোহে যোগ দিলেন। লিমাবিক, কর্ক, টিপাবেরি প্রভৃতি স্থানেও বিদ্রোহের আশঙ্কন অসিয়া উঠিল। কিন্তু ডাবলিনের বিদ্রোহ একটু বেবন্দোবস্ত হঠাৎ আরম্ভ হইয়াছিল বলিবা বিদ্রোহীবা বেশীদিন আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। লায়াম মেমোস ও বোবি ওকোনব কোব-কোর্টসের পতনের সহিত বন্দী হইলেন। কিন্তু ডি ভ্যালেরা, ক্যাথাল ক্র্যা প্রভৃতি বিদ্রোহী জননায়ক ম্যাকভীল স্ট্রীটে নতুন আশ্রানা স্থাপন কবিবা যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। ফলে ক্যাথাল ক্র্যা নিহত হইয়াছেন; ডি ভ্যালেরা, রেনব এবং কাউন্টেন্স মার্কেভিচ পলাইয়া আত্মরক্ষা কবিয়াছেন। ডাবলিনের বিদ্রোহীবা পরাজিত হইয়াছেন কিন্তু দক্ষিণ আয়াবুল্যাণ্ডে এখনও বিদ্রোহীবা বীর-বিক্রমে লাড়িতেছে। ডনিগ্যাল, স্লিগো, সিকোবিন, লিষ্টোয়েল-প্রভৃতি স্থানে তাহারা ইস্তা হইয়াছে।

লর্ড টেম্পলমোরেব আবাসভূমি গ্লেনভিয়ে. ক্যাম্বল্ অধিকার কবিয়া তাহার্য্যেণ দৃঢ়ভাবে নিজেদেব প্রতিষ্ঠা কবিয়াছে। লিঙ্ক নামক এক ব্যক্তি ইহাদেব নেতৃত্ব করিতেছেন। খুব সম্ভব ডি ভ্যালোবা, ও মার্কে-ভিচ ইহাদেব সহিত যোগ দিয়া ডাব্লিন অববোধের প্রবাস পাইবেন। সংবাদ আসিয়াছে যে দক্ষিণ আয়ারল্যান্ডেব কর্ক প্রদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা কবিয়া ফ্রি ষ্টেট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া। এশটি নুতন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কবিয়াছেন। আয়ারল্যান্ডে যে বিদ্রোহেব আশুন অলিয়াছে সহজে যে তাহা নির্বাপিত হইবে তাহা মনে হয় না। যদিও ডাব্লিন সহবেব বিদ্রোহীবা সহজেই হারিয়া। পিষাছে তথাপি দক্ষিণে গণতান্ত্রিকদলের প্রতাপ দেখিয়া মনে হয় যে এই বিদ্রোহ সহজে ধামিবে না।

চীনের গোলযোগ—

চীনের অন্তর্বির্ভবের প্রকৃত তথ্য এখনও প্রকাশ পায় নাই। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে পিকিঙ্গ্ সর্বকাবই ক্রমশ আপন প্রভুত্ব বিস্তার কবিতেছেন। চাঙ্গ-সো-লিন যখন বণকুশলী যোদ্ধা উপাই-ফুকে বিধ্বস্ত কবিয়া ফেলিবার জোগাড় কবিয়াছিলেন তখন সুবিধায়াত চীন-সেনাপতি ফেঙ্গ-উ-সিয়াঙ্গের অপূর্ব কৌশলে চাঙ্গ-সো-লিন সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন। সেনাপতি ফেঙ্গ একজন অসাধারণ ব্যক্তি। ইনি ধর্ম্মে শৃঙ্খলিত এবং মেধাভিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহাব অধীন সেনাদল কোনরূপ মাদক দ্রব্য সেবন কবিতে পায় না, এমন কি খুপান পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইনি চীনদেশ হইতে জুয়া পেলা ও মাদকদ্রব্য-সেবন নির্বাসিত কবিবার সক্ষম কবিয়াছেন। দক্ষিণে মান-ইয়াট-সেনেব অধীন একদল সেনা বিদ্রোহী হইয়া মানকে বন্দী কবিয়া ফেলিবার চেষ্টা পায়। মান পলাইয়া একটি জাহাজে আশ্রয় লইয়াছেন। সেনাপতি ফেঙ্গ দক্ষিণচীনকে উত্তরে আনিবার জন্য দক্ষিণাভিমুখে বণনা হইয়াছেন। আমেরিকার চৈনিক প্রতিনিধি ওয়েলিংটন কু ও অ্যালক্লেড সূত্রি চীনেব এই বিপদকালে চৈনিক বাই-ফেংব পতি মঙ্গলেব পক্ষে নিরস্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছেন। সান্বেব সহিত ষাহাতে উভয়ে-বিবোধ মিটাইয়া ফেলিয়া একযোগে চীনেব মঙ্গলসাধনের জন্য আত্মনিবেশে সমর্থ হন। তাহাই ইহাদেব একান্ত অভিলাষ। এই উদ্দেশ্য সফল, কবিয়া তুলিবার মান্দে ইহাবা চীন অভিমুখে রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু দক্ষিণ-চীনেব প্রতিনিধি মা-সু কথ্য শুনিয়া মনে হয় উত্তরেব সহিত দক্ষিণেব মিলন সহজে সম্ভবপ নহে। মা-সু বলেন যে, “পেকিঙ্গ্ সর্বকার সামরিক বলেব উপব প্রতিষ্ঠিত। চীনেব জনসাধারণেব প্রতিনিধি ইহাবা নহেন। জনসাধারণ দক্ষিণ-চীন সর্বকাবই অসুযোগী। চীনেব ভবিষ্যৎ মঙ্গলেব জন্যই উত্তর-চীন সর্বকারেব বিনাশ একান্ত প্রয়োজন। দক্ষিণ-চীন সেই উদ্দেশ্যে আপনাব সমস্ত শক্তি নিয়োজিত কবিবে।” মান-ইয়াট-সেন চীননৌবহবেব সাহায্য লাভ কবিয়া ক্যান্টন সহব আক্রমণ করিবার উদ্যোগ কবিতেছিল। কিন্তু সে উদ্যোগে আমেরিকা ও ইংরেজ-সর্বকার বাধা দিতেছেন এই অজুহাতে যে ক্যান্টন সহব ধ্বংস হইলে বিদেশী ব্যবসায়িকগেব যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। ইহাদিগেব স্বার্থের দিকে তাকাইয়া ইংরেজ ও মার্কিন সর্বকার মানকে ক্যান্টন আক্রমণ কবিতে দিতে পাবেন না। ইংরেজ-সর্বকারেব প্রশান্ত মহাসাগরস্থ নৌবহব ক্যান্টন সহবে আসিয়া পৌছিযাছে। সান্বেব আক্রমণ উদ্যোগ ইহাতে ব্যর্থ হইয়াছে। মান নিরুদ্যম হইয়া তাহাব নৌবহবেই আপাতত অবস্থান কবিতেছেন। সান্বেব এই অকস্মাৎ বিপদেব পব কি দক্ষিণ-চীন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে?

হেগ-বৈঠক—

কান, পাবা ও জেনোয়া-বৈঠকেব স্তায় হেগ-বৈঠকেও কোনও

লাভ হইল না। ইউরোপেব সমস্যা পূর্বেব স্তায়ই সঙ্কটাপন্ন অবস্থাতেই রহিল। একটা বুঝাপড়া না হইয়া গেলে একপ গণগোল্বেব ভিতব দিয়া যে পুনর্গঠন অসম্ভব তাহা বুঝিও ইউরোপেব রাষ্ট্রনৈতিক ধ্বংসেরা স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া নিজেদেব পাণ্ডনা কড়ায গড়ায বুঝি। লইতে চাওরাতে একটা বন্ধ-নিষ্পত্তি ঘটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। যতদিন পর্যন্ত একপ স্বার্থের সংঘাত চলিবে ততদিন পর্যন্ত গোলযোগেব আর মীমাংসা হইয়া উঠিবে না এবং ধ্বংসোন্মুখ ইউরোপ ধ্বংসেব মুখেই চলিতে থাকিবে।

বাশিয়ার সহিত ব্যবসাবাণিজ্য আবস্ত না হইলে ইউরোপেব নষ্ট শিল্পেব পুনরুদ্ধার অসম্ভব। সেই দায়ে টেকিয়া মিত্রশক্তিবর্গ বোল্-শেভিকদিগেব সহিত বন্ধানিপত্তির চেষ্টা পাইয়াছিলেন। মিত্রশক্তিবর্গের এই দাষ-ঠেকা অবস্থা রাশিয়ার অজানা ছিল না। তাই সুযোগ বুঝিয়া বাশিয়া মিত্রশক্তিবর্গের নিকট যুদ্ধ বাশিয়ার যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহাব অধিকাংশই আদায় করিয়া লইবার সুবিধা বুঝিতে লাগিলেন। বাশিয়ার কৃষিবাণিজ্যেব অবস্থা আবার বাহাতে পূর্বেব স্তায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পাবে তাহাব জন্য তাহাব মিত্রশক্তিবর্গেব নিকট বহুকোট টাকা স্বপ চাহিলেন। বলিলেন, এই স্বপ না পাইলে তাহারা মিত্রশক্তিবর্গের সহিত কোনও প্রকার বন্দোবস্তে আসিতে প্রস্তুত নহেন। ক্রম-প্রতিনিধি লিটভিনকেব এই দাবী শুনিয়া হেগ-বৈঠকে মিত্রশক্তিবর্গেব প্রতিনিধিবা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। এত কোটি মুদ্রা তাহারা কোথা হইতে দিবেন? বোলশেভিক প্রতিনিধিবা কিন্তু বলেন যে ইহাব কসে তাহাদেব কৃষি বাণিজ্য বন্ধা করা অসম্ভব। যদি রাশিয়াকে দুর্ভিক্ষেব হাত হইতে রক্ষা কবিতে হয় তবে ওই স্বপেব ব্যবস্থা মিত্রশক্তিবর্গকে কবিতেই হইবে। রাশিয়ার যদি ক্ষম না হয় তবে সমস্ত ইউরোপে ধান্যান্ধাব হইবে। অতএব সমস্ত ইউরোপেব মঙ্গলেব জন্য রাশিয়াকে স্বপ দিবার ব্যবস্থা করা হটক।

মিত্রশক্তিবর্গেব প্রতিনিধিবর্গ কিন্তু এত বৈঠক টাকা স্বপ দেওয়া অসম্ভব মনে করেন। তাই হেগ-বৈঠক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন ইউরোপের এই সমস্তাব মীমাংসা কিরূপে সম্ভব হব দেখা বাড়িক।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ

দেবপূজার স্বাদেশিকতা—

পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরেব পুৰোহিতগণ সম্প্রতি প্রচাব কবিয়াছেন, জগন্নাথদেবেব পূজাব জিনিষ-পত্র সমস্তই বিদেশী হওয়া সঙ্গত। সুতরাং বাঁহাবা দেব-দর্শনে আসিবেন তাহাবা বেন ধন্দব পবিয়াই আসেন এবং এই রথযাত্রা উপলক্ষে বাঁহাবা জগন্নাথদেবেকে উপহাব দিবেন তাহারা বেন দেশী জিনিষ এবং ধন্দরই প্রদান করবেন। ইহাব পব ভুবনেশ্বরেব পাণ্ডাবাও এই মত প্রচাব কবিয়াছেন।

ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুবা কি করিবেন, বলা যায় না; কিন্তু জগন্নাথেব পাণ্ডাবা দৃঢ় থাকিলে, অস্ত্র হিন্দুদেব মধ্যে স্বদেশী জ্রব্যেব ব্যবহাব বাড়িতে পাবে, এবং তাহারা ই সংখ্যায বেশী।

অস্পৃশ্যদেব সহিত ভোজন—

গত ২৫ জুন লাহোর আধ্যামাত্র এবং স্ববাজ্য সভার সভাপতি এবং সভ্যগণেব উদ্যোগে একটা ভোজ-সভাব আয়োজন করা হইয়াছিল। এই ভোজের উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত জাতিব একত্র ভোজনেব দ্বারা হিন্দুদেব ভিতব হইতে অস্পৃশ্যতাব আবর্জনা ঘুচাইব চেষ্টা করা। ভোজ-সভাতে হাজিরা হাজিরা অস্পৃশ্য এবং পতিতমস্ত্র জাতিকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। আধ্যামাত্রী, ব্রাহ্ম, সনাতনী

ও অস্পৃশ্যমণ্ডিত জাতির লোকেরা পাশাপাশি বসিয়া সেদিন আহাব করিয়াছেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ভিতর প্রায় ৩০০ ভ্রমরহিলাও উপস্থিত ছিলেন। এই ভোজের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন তাই ব্রহ্মানন্দ। অস্পৃশ্যতাকে দূর করিবার জন্য বস্তুতঃ যথেষ্টই হইয়াছে। এখন বস্তুতঃ অপেক্ষা হাতে-কলমে কাজ করা দরকার। এই ধরনের ভোজের অনুষ্ঠান সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইলে কিছু কাজ হয়, সঙ্গে সঙ্গে অনেক যদেশীর পাণ্ডাকেও ঘাটাই করিয়া লইবার সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা যথেষ্ট নহে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ আলোচনাব সমর বাংলা দেশে একপাশে ভোজ হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে অস্পৃশ্যতা দূর হয় নাই। দৈনন্দিন জীবনে এবং বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে যে-সব ভোজ হয়, তাহাতে সকল জাতির লোক প্রকাশ্যভাবে একত্র ভোজন করিলে, তবে বুঝা যাইবে, যে, অস্পৃশ্যতা দূর হইতেছে। সমুদয় কংগ্রেস অফিসে “অস্পৃশ্য” ও “এনাচরমীয়” জাতির লোকদিগকে জল দিবার জন্ত ও অল্প কাজের জন্ত চাকর রাখা হউক।

সরকারী ইস্তাহার—

সরকারী ইস্তাহারগুলির ভিতর সত্যের মাত্রা যে কতটুকু থাকে বহু ব্যাপারে তাহার হিসাব-নিকাশ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি রাজপুতানার শিরোহী-রাজ্যের ভীল হান্সমা ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ যে ইস্তাহার বাহির করিয়াছেন তাহাও অনেকটা এই ধরনের। তাহাতে তাহার বলিয়াছিলেন, শিরোহী রাজ্যের ভীলগণ রাজা-সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছে; সেখানে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই সম্পর্কে রাজস্থান সেবাসম্বল প্রতিনিধি শ্রী জ্ঞানকামলাল গুপ্ত লিখিয়াছেন—“আমি এই ইস্তাহারের সত্যতা নির্ণয়ের জন্ত আজমীরের শ্রীযুক্ত বি. এম. পথিকের নিকট তথ্য করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি জানাইয়াছেন, সরকারী বর্ণনা সম্পূর্ণ ভুল। সেবাবের নইপুবে পূর্বে দিনে গুলি চলিয়াছে।”

রাজস্থান সেবাসম্বল সেক্টরী গত ১৭ই জুন আজমীর হইতে জানাইয়াছেন “শিরোহী এবং অন্যান্য স্থানের নির্ধারিত ভীলদের সাহায্যের জন্ত জনসাধারণের নিকট হইতে আড়াই হাজার টাকা উঠিয়াছে। এক গাইট কাপড়ও সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু শিরোহী রাজা এইসব অর্থ এবং বস্তাদি বিতরণের জন্ত কন্সালিগকে রাজ্যের ভিতর প্রবেশ করিতে দিতেছেন না। সুতরাং আপাততঃ টাকা সংগ্রহ বন্ধ রাখা হইবে।”

গৌরীশঙ্কর অভিযান—

গত বৎসর হইতে গৌরীশঙ্করের চূড়ায় পহুঁছিবাব জন্ত চেষ্টা চলিতেছে। গত বৎসর কপ্তেন হাওয়ার্ড বেরী খানিকটা উঠিয়া বহা আসিয়া পড়ায় গৃহে ফিরিয়াছিলেন। এবারে কপ্তেন বেরী আসিতে পারেন নাই। তাহাব পরিত্যক্ত অভিযানটিব ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন জেনারেল ক্রস। দুনিয়ার বাহা আব কের করিতে পারেন নাই, জেনারেল ক্রসের এই দল তাহাই করিয়াছেন—তাহারা শ্রবণীর্থে ২৭,২০০ ফুট পর্যন্ত নান্নদের চরণ-চিহ্ন আঁকিয়া আসিয়াছেন। এর আগে পাহাড়ের সব চেয়ে বেশী উঁচুতে উঠিয়াছিলেন ইটালীর ভিক্টর অব আবরজ্জি। কাবাকেরাম পর্বতের ২৪,৬০০ ফুট উঁচু স্থানটির প্রায় বারো বৎসর পূর্বে তিনি তাহার সাফল্যের নিশানা রাখিয়া আসিয়াছেন। এই

ব্যাপারটায় বিশেষ কবিরাজ লক্ষ্য কবিরা দেখিবার মত জিনিষ হইতেছে—এই পাক্তা জাতিবিদ দুজ্জয় সাহস, প্রতিজ্ঞাব দৃঢ়তা, অনর্থক বিপদকে আলিঙ্গন কবিবার মত নিষ্ঠারূপতা। জাতি ফাঁকি দিয়া বড় হয় না, দুনিষাকে হাতেব মুঠাব ভিতর আনিয়া জেবেব শ্রেষ্ঠ মাল্যটি গলার পবিত্রে হইলে শ্রেষ্ঠ মূল্যই তাহান—জন্য দিতে হয়।

মহারাষ্ট্র মূলসী কনফারেন্স—

বোম্বাই সহরে মহারাষ্ট্র মূলসী কনফারেন্সেব অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্রেব সব স্থান হইতেই প্রতিনিধিবা কনফারেন্সেব বোগ দিয়াছিলেন। মাঝা প্রতিনিধিও আসিয়াছিলেন অনেক। কনফারেন্সেব সভাপতি হইয়াছিলেন ডাঃ মুন্সে এবং অধ্যক্ষনা সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ কবিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত সি. সি. বৈদ্যা। ইহাব মূলসী সভাপ্রের ইতিহাস আলোচনা করিবা বলেন—মাঝাগণ নরনারী নিরীশেবে তাহাদের পৈত্রিক বাসভূমিবা জন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল ও আছে। কাহাকেও বাস্তবিতা হইতে উচ্ছেদ কবিবার জন্ত আইন প্রয়োগ করা একান্ত ভাবেই অস্বাভাবিক। কারণ ইহাতে জনসাধারণের ব্যক্তিগত অধিকারকে ধর্ম কবা হয়। একটা কোম্পানীবা লাভেব পথ প্রশস্ত কবিবার জন্তই এই জমী সংগ্রহেব চেষ্টা চলিতেছে। আব এই ব্যাপারে ৪৪ খানা গ্রামেব প্রাণ বাবে হাজাব প্রজাকে পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ কবিবা গৃহহীন হইতে হইবে। গবর্নমেন্ট ইহাব ভিতরে না থাকিলে এতদিন এ গোলবোগ কবে আপোনে মিটিয়া যাইত। মূলসী সভাপ্রেরী সম্প্রদায়কে জয়লাভ কবিত্তেই হইবে এবং জয়লাভের একমাত্র উপায় সর্বথা নিষেধপ্রব-নীতি অবলম্বন কবিয়া চলা।

এই ব্যাপারটায় গবর্নমেন্টের ক্ষেদ যে কেন এত বাড়িবা উঠিয়াছে তাহা আমবা বুঝিতে পারিতেছি না। একটা ব্যবসায়ী কোম্পানীর স্বার্থ অপেক্ষা এতগুলি প্রজাব স্বার্থই যে গবর্নমেন্টের চোখে বড় হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই।

শিব রাজনৈতিক কনফারেন্স—

গত ২৬ জুন প্রজাব ব্যবস্থাপক সভাব ভূতপূর্ব ডেপুটি প্রেসিডেন্ট সর্দার মহাত্মা সিংহের সভাপতিত্বে গুজবানওয়ালার শিব রাজনৈতিক কনফারেন্সের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বহুসংখ্যক শিব এই সভায় বোগদান করিয়াছিল। গুজবান—প্রবন্ধক কমিটি শিব সম্প্রদায়েব হিতের জন্ত যে-সব কাজ কবিয়াছেন সভায় প্রথমে তাহারই আলোচনা চলে। তাহার পর আলোচনা কবা হয় স্বাধীনতা লাভ এবং গুজবানবের সংস্কার সম্পর্কীয় বিষয়গুলি লইয়া। ইহা ছাড়া সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব-গুলি পরিসূহীত হইয়াছে।

(১) তাহার যে কোনো ত্যাপ স্বীকার করিয়া কুপাণ ব্যবস্থাবের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

(২) পচের জন্ত বাহারি কারাকষ্ট ভোগ কবিত্তেছেন, তাহার মুক্তিলাভ না করা পর্যন্ত ইহারাই তাহাদের সংগ্রাম দৃঢ়ভাবে পরিচালিত কবিবেন।

(৩) খন্দব প্রস্তুত ও ইহাব প্রচাৰ স্বরাজ্যলাভের অস্বতর প্রধান উপায়।

(৪) মহাত্মা গান্ধী তাহাব কার্যের জন্ত সমগ্র দেশেব কৃতজ্ঞতাৰ প্রকাশ।

(৫) শিব প্রতিনিধিক সম্বন্ধে কোনোক্রপ সিদ্ধান্ত না হওয়ার

কংগ্রেসের কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে না। সুতরাং ঐ সময়ে সভার সিদ্ধান্ত হওয়া আবশ্যিক।

শেষোক্ত প্রস্তাবটিতে হাঁহা পাঞ্জাব কংগ্রেস কমিটির দৃষ্টিই বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন।

সৈনিকের কারাদণ্ড—

কানপুরের শিখ বেজিয়েন্টের কেশব সিংহ নামক একজন সিপাহী স্বাক্ষরের চাকরী করিতে অস্বীকার করার রেজিয়েন্টের কর্তা বিচার করিয়া তাঁহার প্রতি ১৪ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। এই শিখ সৈন্যদল কয়েক মাস পূর্বে যখন স্কিলামে ছিল, তখন আবেতিন জন এই অপরাধে ১০ বৎসর, ৮ বৎসর এবং ৬ বৎসরের ক্ষমতা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। এই অল্প দিনের ভিতর এই শিখ সৈন্যদলের চাবিজন সিপাহী চাকরীর বদলে দীর্ঘ কাবাবাসেব ব্যবস্থা স্বরণ করিয়া লইল কেন তাহা অসুসন্ধান হওয়া দরকার। কয়েকজন সিপাহী ব্যাবাকের বাহিবে খন্দব পবিয়া বেড়াইত। দলেব কর্তা হুকুম দিয়াছেন—ব্যাবাকের ভিতবে তো নহেই, বাহিবেও কোনো সিপাহী খন্দব কিংবা অকালীদের কালো উকীয় ব্যবহাব করিতে পারিব না। চাকরীর ষাতিরে যেখানে ব্যক্তিগত জীবনের স্বাধীনতাকে ধরু কবিবাব ব্যবস্থা করা হয় সেখানেই অসন্তোষ এবং অশান্তি বিশেষ করিয়া বিস্তার লাভেব সুবিধা পায়।

গোপবন্ধু দাসেব কারাদণ্ড —

উৎকলেব জন-নাথক শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু দাস এবং শ্রীযুক্ত ভাগীরথী মহাপাত্রের বিরুদ্ধে দুই দফা অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল। বিচারে এক দফায় তাঁহাদেব এক মাস এবং আর এক দফায় দুই বৎসর অশ্রম কারাদণ্ডেব আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

পণ্ডিত গোপবন্ধু দাস ও শ্রীযুক্ত ভাগীরথী মহাপাত্রকে বালেশ্বর হইতে কটক জেলে স্থানান্তরিত কবিবাব সময় তাঁহাদেব হাতে হাত-কড়ি ও কোমরে দড়া বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। জেলে আহার সম্বন্ধেও তাঁহাদেব কোনরূপ সুব্যবস্থা করা হয় নাই। মোটা চাউলেব ভাত ও কলখী শাকের পাতাব তৎকালী পাইতে পাইতে হাঁহা ক্রমেই অসুস্থ ও দুর্বল হইয়া পড়িতেছেন।

মদনমোহনের আইন অমান্য—

গোবন্ধপুবেব জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং দেউড়িয়া-কাসিয়াব মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট পণ্ডিত মদনমোহনের প্রতি ১৪৪ খাবাব নোটিশ জারি কবিয়া গোবন্ধপুবে জেলার ভিতর সব স্থানে তাঁহাব বক্তৃতা বন্ধ বাধিবাব আদেশ প্রদান কবিয়াছিলেন। আজমগড়ের সংবাদে প্রকাশ, পণ্ডিত মালবীষ এই আদেশ অগ্রাহ্য কবিয়া একটু দুইটি নহে, একেবারে পাঁচ পাঁচটি সভায় বক্তৃতা কবিয়াছেন। অনববত যা দিতে দিতে গবর্ণমেন্ট যে কেমন কবিয়া স্থির হীব মাহুয়কেও অসহিষ্ণু কবিয়া তুলিতেছেন, আইন ভঙ্গের নীতি গ্রহণে বাধ্য কবিত্তেছেন, পণ্ডিত মালবীষের এই ঘটনাটিই তাহার প্রমাণ। পণ্ডিত মদনমোহন কংগ্রেসেব নেতাদের ভিতর বিশেষ ভাবেই মধ্য পথেব পশিক। তিনি গবর্ণমেন্টকে অগ্রাহ্য না করাব দিকেই, আইন অমান্য নীতি গ্রহণের বিরুদ্ধেই এতদিন ওকালতি করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ খোঁচাইতে খোঁচাইতে তাঁহাকেও এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছেন যে, তিনিও আইনের বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহাব অশাস ধর্মের বাঁও ভাবিয়া গিয়াছে।

নারী শিল্পাশ্রম—

কাছাড় জেলার শিলচর সহরে 'নারী শিল্পাশ্রম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইতেছে। জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সাহিত্যসব্বতী মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী সুরবালা দেবী এই আশ্রমেব ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গালার মহিলাগণকে আত্মনির্ভরশীল কবিয়া তুলিবাব জন্য হুতা কাটা এবং বস্ত্রের প্রচলন করাই এই আশ্রমের উদ্দেশ্য। একখণ্ড ক্ষুদ্র জমি ইজারা লইয়া আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাঁচ জন মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা এই আশ্রমে যোগদান করিবাব জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। আশ্রম-বাসিনীগণকে আশ্রমেব আইন-কাহুন সব মানিয়া চলিতে হইবে। বিধবাগণকে আহার্য এবং বস্ত্রাদি প্রদান করা হইবে। যাঁহাবা আশ্রমে থাকিবেন আশ্রম তাঁহাদেব ভরণ-পোষণের ভাব গ্রহণ কবিবেন। কিন্তু যাঁহাবা কেবল মাত্র হুতা কাটা বা কাপড় বোনা শিখিবেন তাঁহাদিগকে এক বৎসর কাল আশ্রমের জন্য খাটিয়া দিতে হইবে।

গুজরাটে স্বদেশীব অবস্থা—

সম্প্রতি গুজরাট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত বল্লভ ভাই পটেল। তিনি তাঁহাব বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—গুজরাটেই অসহযোগ নীতির জন্ম। কাজেই আইন অমান্য আরম্ভ কবিবার পূর্বে গুজরাটে গঠনকার্যগুলি সম্পূর্ণ হওয়া উচিত। গুজরাটে দেড় লক্ষ চব্বা চলিতেছে এবং প্রচুর খন্দব জমা আছে। সেখানে বিলাতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং না কবিয়াও লোককে খন্দব ব্যবহাবে উদ্বুদ্ধ করা হইতেছে।

শ্রীযুক্ত পটেলের কথা ঠিক হইলে গুজরাটে যে যথেষ্ট কাজ হইয়াছে সে কথা স্বীকার কবিত্তেই হইবে। পিকেটিং ছাড়াও লোকে যদি খন্দব ব্যবহার করে তবে বুঝিতে হইবে আলোচনের ফল দেখানো ব্যর্থ হয় নাই। প্রাণের ভিতর যখন স্বদেশের জন্য, স্বদেশেব দ্রব্যেব জন্য সত্যকার দবদ লাগে, তখন স্বেচ্ছা-জবরদস্তিবে প্রয়োজন হয় না—উপরোধ অমুবাধ পিকেটিং তখন অনাবশ্যক হইয়া পড়ায়।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

বাংলা

বাঙ্গালার বাণিজ্য—

১৯২১—২২ সনেব স্বকারী হিসাবে দেখা যায়—এ বৎসর বঙ্গদেশে আমদানীবি পরিমাণ শতকরা ১৪ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। বিপত বৎসর—অর্থাৎ ১৯২০—২১ সনে বাঙ্গালার ১২২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকাব মাল বিদেশ হইতে আসিয়াছিল। আলোচ্য বৎসবেব আমদানীবি পরিমাণ মাত্র ১০৫ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা।

গত বৎসর কাপড় বাবদ ৩৭ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা আমদান্যেব ঘব হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। বাংলা হইতে এককালে ১৫ কোটি টাকাব কাপড় বিদেশে রপ্তানী হইত।

এবাব বিলাতী কাপড়ের আমদানী ৩৩ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার স্থলে কমিয়া গিয়া ২৭ কোটি ২৩ লক্ষ টাকাব দাঁড়াইয়াছে ইহা শুনিলে

সত্যই এখানে আশার সঞ্চার হয়। মনে হয় মহাশয়ার কাতব প্রার্থনা হয়ত বিফল হয় নাই। গত বৎসর একমাত্র গেল্লি মোজা প্রভৃতির দরুণই আমাদিগকে ১০৯ লক্ষ টাকাব্যয়ের কড়ি পকে বাহির করিয়া দিতে হইয়াছিল। হুয়ের বিষয় এ বৎসর উহা কমিয়া মাত্র ২৮ লক্ষ টাকার ঝাঁড়াইয়াছে। পোনে সতর লক্ষ টাকাব্যয় জুতার স্থানে মাত্র ৩ লক্ষ টাকার জুতা বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে। আবাব ইহার মধ্যে বেশীর ভাগ ইংরেজ বা আণ্ডা-ইংবেজেরাই ব্যবহার করিয়াছেন। কারণ তাঁহারা মূল্যবত পার্থক্যই থাকুক না কেন, কখনও নিজেব দেগেব তৈয়ারী জিনিষ পাইলে অপবেব জিনিষ ব্যবহার কবেন না।

মাদক দ্রব্যের আমদানীও খুব কমিযাছে। এ বৎসর মাত্র ৪৩.৭১ গ্যালন ত্রাণ্ডি আমদানী হইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় উহা অর্ধেকেরও কম। বিলাত হইতে আমদানী মদ্যের পরিমাণ ৪২.৫৯ গ্যালন কমিয়া ৫১.০২৭ গ্যালনে ঝাঁড়াইয়াছে। ইহাও নিতান্ত শুভ চিহ্ন। এই বিধপানে আত্মরক্ষাভিগকে মাযধান করিয়া দিতে বাইয়া যে-সব মহাপ্রাণ কর্ম্ম আজ কাব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের আত্মরক্ষা নিতান্ত ব্যর্থ হয় নাই।

১৯২০—২১ সনে ৫০০০ খানা মোটর পাড়ী আমেরিকা হইতে কলিকাতায় আমদানী হইয়াছিল। এবার উহাব ভোগের একভাগও আসে নাই। এ সংবাদও আমবা স্থখী হইয়াছি।

আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে বস্তানীও কমিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে উহা আমাদের লোকদান। কাণ বাহিব হইতে টাকা আনিতে না পারিলে, শুধু পবেব জিনিষ কিনিতে গেলে, আমাদের ঘবেব টাকাই বাহিব হইয়া যাইবে। বাজার বাবস্তানীর মধ্যে পাট, চা ও চামড়াই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পাটের ব্যবসায় সম্পূর্ণ বিদেশী হাতে। চামড়ারও এই একই অবস্থা। কাঁচা চামড়া নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করি; কিন্তু সেইগুলিই আবার আমরা বিদেশ হইতে “ট্যান” করিয়া বহুমূল্যে খরিদ করি। যে পর্যন্ত একদেশের কাঁচামাল আমরা পশাশিল্পে পরিবর্তিত না করিতে পারিব, সে পর্যন্ত বিদেশী বণিকের ধোলালমত দরেই আমাদিগকে উহা বিক্রয় কবিতে হইবে। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে না পারিলে, শুধু স্তায়ধর্মেব দোহাই দিলে কেহ শুনিবে না, দুঃখ-জর্দখার কবণ কাহিনীতেও বিদেশী মহাজনের চোখ ভিজিবে না। তাহার লুটিতে আসিয়াছে, হুবিধা পাইলেই লুটিয়া লইয়া যাইবে। আমরা যদি নিরীহ ছাপলেব মত আমাদের গায়েব লোম কাটিতে দিই, তবে তাহা ছাডিবে না। হুতবাং বাহাতে বাজার শিল্পবাণিজ্য বাজারী হাতে আসে, তাহাই এখন আমাদের কবিতে হইবে। —আনন্দবাজার পত্রিকা

তুলাব উপকারিতা—

১। যবে যবে তুলাব চাষ হইলে আমবা বিনামূল্যে আমাদের আবশ্যকীয় লেপ তৈরিক ইত্যাদি প্রস্তুত কবিতে পারিব।

২। সরের তুলায় তৈয়ারী হুতার উৎপন্ন কাপড় বিদেশী কাপড়ের চেয়ে সম্ভা ও টেকসই। একসের তুলায় এক ডোড়া কাপড়ের হুতা হয়।

৩। ঘরের তুলায় হুতার কাপড় প্রস্তুত কবিলে ঘবেব পয়সা ঘরে থাকিয়া যাইবে, ঐ পয়সায় আমাদের অল্প অভাব পূরণ হইতে পারে।

৪। তুলা ও তুলার বীজ বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট টাকা পাওয়া যায়। বিদেশে উহা চালান দিতে পারিলে বিদেশ হইতে অনেক অর্থ এদেশে আসিবে; উহাতে দরিদ্র দেশবাসীর অন্নসংস্থান হইবে।

৫। তুলার বীজ হইতে উৎকৃষ্ট তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল সরিষাব পরিবর্তে ডাল তরকারীতে ব্যবহার করা যায়। উহা পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। এক মণ বীজে ৫৬ সেব তৈল পাওয়া যায়।

৬। তুলার বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া যে খইল পাওয়া যায়, উহা দ্বারা ক্রমিতে সার দেওয়া যায়। তৈল এদীপে পোড়ান যায়।

৭। ঐ খইল গরুর একটি পুষ্টিকর খাদ্য। উহা খাইলে গরুর শরীর ভাল হয় এবং বেশী দুধ দেয়। এক মণ বীজে আধ মণের উপর খইল হয়।

৮। পাটের চাষেব পরিবর্তে তুলাব চাষ করিলে দেশেব যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি লাভ হয়।

৯। কার্পাস অনেক বোগেব শাস্তিদায়ক ঔষধ।

১০। তুলার পাছ আলানী কঠি রূপে ব্যবহৃত হয়।

পল্লীবার্তা।

—নীহার

বাজার শিক্সা—

বাজার শিক্সার সন্ধানী শিক্সা-বিভাগেব রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে গত ১৯২০—২১ সালে সমগ্র বাজার দেশে বিভাগের সংখ্যা ১০৮৯টি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং মোট ৫০৬৮টিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা গত বৎসরের তুলনায় ৮৭৬৪ জন কমিয়া গিয়াছে। এ বৎসরের শেষভাগে বঙ্গদেশেব বিভাগ সমূহের ছাত্রসংখ্যা ছিল মোট ১৯৪৫১৪ জন বিভাগ-সমূহে বালিকাব সংখ্যা ১৬৫৪৪ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মোট ৩৫.৫৩৬তে পরিণত হইয়াছে। ইহা প্রাথমিক বিভাগসমূহে মূল্যমান ছাত্রী-সংখ্যাই ১৩৮.২ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। —যশোহর

বঙ্গে জাতীয় বিদ্যালয়—

বঙ্গে ১৫০ জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এইসকল বিদ্যালয়ে কোথায় কোথায় স্থাপিত হইয়াছে ও তাহাতে ছাত্র-সংখ্যা কত তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ঢাকা	৪০১৬
ফরিদপুর	১৬৮১
ময়মনসিংহ	১৪০১
কলিকাতা	১২০১
বরিশাল	৯১২
ত্রিপুরা	৮৫২
মেদিনীপুর	৫২০
শ্রীহট্ট	৪৭৬
যশোহর	৪২৯
পাবনা	৩৯৪
নোয়াপালি	৩৫০
মুর্শিদাবাদ	৩৪৬
খুলনা	৩০৫
হুগলী	২৩৫
বর্ধমান	১৪০
চট্টগ্রাম	১৩০
বাঁকুড়া	১০০
বগুড়া	১২০
বীরভূম	১০০
রাঙ্গামাঠী	৯৮

হাবড়া	৮০
নদীয়া	৭৫
কাহার	৬০
মালদহ	৬০

বিলেতের লোক কলকাতায় এসেছে ৮ হাজার, ফরাসী আছে ১৮৮, জার্মান ২৫, ৪২ গ্রীক, ৬৯ ইতালীয়, ৫১ স্প্যানীয় ও ৫২ জন মার্কিন।

—নবসম্মত

স্বার্থত্যাগী আদর্শ কর্মী—

সর্বসম্মত ১৪১১১ ছাত্র জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে।

—বীকটমবাসী

সাহিত্য-সংবাদ—

শান্তিপুত্র বাবু নট্যসমাজ (সাহিত্য-বিভাগ) বর্তমান বর্ষে বচনাবলি কয়েকটি পদক বিতরণ করিবেন। বচনাবলি আগামী ৩০শে ডিসেম্বর মধ্যে সম্পাদকের নিকট পৌঁছান দরকার।

স্বর্ণ পদক—বিষয় “মহাকাব্য গিরিশচন্দ্র”

রৌপ্য পদক—বিষয় “ধর্ম ও স্বদেশ-সেবা”

প্রৌপ্য পদক—বিষয় “মানবজীবনের সার্থকতা”।

শেখর রচনায় কেবল স্কুলের ছাত্রগণ প্রতিযোগিতা কবিতা পাবিবেন।

—শ্রী মুকুন্দকৃষ্ণ বাগচী

সম্পাদক, শান্তিপুত্র বাবু নট্যসমাজ,

শান্তিপুত্র (নদীয়া)

সংকল্প ও সদচরিত্র—

দান—হেমাৎ স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বাবু নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চন্দ্রনগর পুস্তকাগারে শতকরা সাড়ে পাঁচ টাকা হ্রদেব ৫০০ টাকা কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। বাবু পুলিনবিহারী শেঠ এবং বাবু বামকৃষ্ণ পাল যথাক্রমে ৫০০ ও ১০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

—চুঁচুড়া-বার্ভাবহ

পয়সা ভাণ্ডার।—মেরিনীপুত্র টাউন স্কুলের ছাত্রদের প্রতিষ্ঠিত পয়সা ভাণ্ডার হইতে গত বৎসর মেরিনীপুত্রের ১০৯ জন, খড়্গাপুরের ১৪ জন, পিঙ্গলার ১০৫ জন ও চট্টগ্রামের ৩ জন দক্ষিণ ও নিম্ন ব্যক্তিকে বস্ত্র সাহায্য করা হইয়াছে।

—সম্মিলনী

কলিকাতার কথা—

হিন্দুস্থানে খবর পাওয়া গেছে কলকাতার লোকসংখ্যা হচ্ছে ১৩০ লক্ষ—তার মধ্যে আর ৮৭ লক্ষ বাঙালী, আর বাকি ৪৩ লক্ষ বাঙালী।

বেহার ও উড়িষ্যা থেকে এসেছে ২০ লক্ষের ওপর, যুক্তপ্রদেশ থেকে ১০ লক্ষের কিছু ওপর, বাঙ্গালীরা থেকে ৩০ হাজার, মডোয়ারী ৩০ হাজার, পাঞ্জাব হতে ১০ হাজার। কলকাতায় কাবুলী সংখ্যা হচ্ছে ৬১১।

শরৎকুমারের প্রাণোপবেশন—বরিশালের স্বনামধন্য কর্মী শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয়ের উপর ১১৪ ধারা প্রয়োগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই আশ্রয় আদেশের প্রতিবাদ স্বরূপ শরৎ-বাবু গত ২৯শে জুন হইতে প্রাণোপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা বললে তাঁহার বক্তব্য যে কাজ হইত, তাহা অপেক্ষা চতুগুণ কাজ হইতেছে। বরিশালের সাতজাতি শরৎকুমারের এই লাঞ্ছনার জন্য কংগ্রেস-কার্যে বিশেষ সনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। চরকা ও খন্দরের কার্য বিশেষ উৎসাহের সহিত চলিতেছে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দেব ভগিনী শব্দ মঠের সন্ন্যাসিনী শ্রীযুক্তা সর্বোজ্জিনী দেবী মহাশয় শরৎকুমারের স্থলবস্তিনী হইয়া বিশেষ ভাবে কার্য করিতেছেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

সত্যেন্দ্রনাথের প্রাণোপবেশন।—পটুয়াখালীর কর্মী শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথ জেলে প্রাণোপবেশন করিতেছেন শুনিতে পাইয়া বরিশালবাসী ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।—বরিশাল-হিতৈষী

পণ্ডিত বামরক্ষা রাজনৈতিক অপরাধে আনন্দামানে নির্দাসিত হইয়াছেন। সেখানে তাঁকে পৈতা পরতে দেওয়া হয় না। পণ্ডিতজী বলেন যে ব্রাহ্মণের ছেলে যজ্ঞোপবীত ছাড়া জলগ্রহণ কবৃত্তে পাবে না। সে কথা কর্তৃপক্ষ কানেই তোলেন না—কলে বামরক্ষাকে অনশনে থাকতে হয়।

নব্বই দিন না খেয়ে থেকে পণ্ডিত বামরক্ষা আনন্দামানে প্রাণত্যাগ করেন। সবকাবেব জেদ বজায় থাকে।—বিজলী

* * *

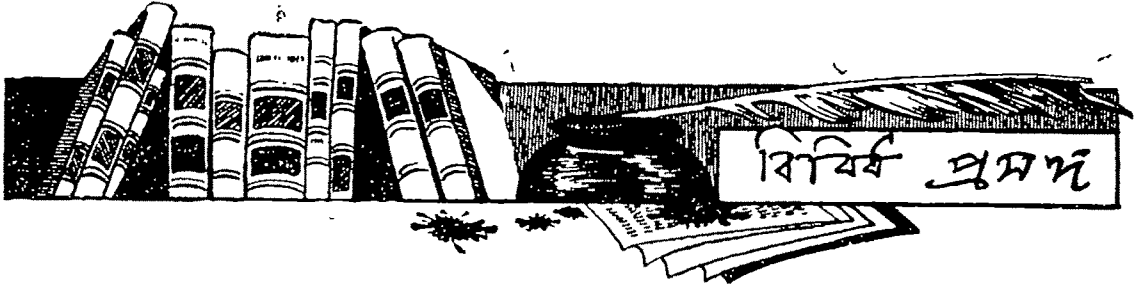
অধঃপতিত বাঙালী সমাজ—

দিনাজপুরের এক ভ্রমসম্মত জী বর্তমানে পুনরায় বিবাহ করে। সে পূর্বে হইতেই প্রথমা জীর উপর অত্যাচার করিত। কিন্তু সম্রাতি উক্ত ভ্রমসম্মত অবলা গৃহলক্ষ্মীর পৃষ্ঠদেশে উত্তপ্ত লৌহদণ্ডের দ্বারা আঘাত করিয়া দক্ষ স্থানে লঙ্কাবাটাব প্রলেপ দিয়াছে। বধুর শব্দ-শাস্ত্রী গুণধর পুত্রের কার্যে ববাবর উৎসাহ দিয়াছেন। পুলিশ এই ঘটনায় সন্ধান পাইয়া স্বামীকে চালান দিয়াছে।—এডুকেশন গেজেট

বাজলায় মেয়েদের আত্মহত্যার সংখ্যা পুনরায় দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে শাস্ত্রীদের দুর্ব্যবহারের জন্য।—পাকায়ৎ

দিনাজপুরেও এক বধূনিষ্ঠাতনের মামলা দাখিল হইয়াছে। এবার এই তৃতীয় দফা।—আমবা পূর্বেই বলিয়াছি আদালতে দোঁড়াদোঁড়িতে এসব আপদ দূর হইবে না—অল্প দিক হইতে সায়েস্তা করা চাই—সমাজদেহে তেমন শক্তি বক্ষা কবিত হইবে।—শখ

সেবক



বাঙালীর আলস্য

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়. কোন কালেই বেশ সুস্থ সবল ছিলেন না। এখন তাহার উপর তাঁহার বয়স ঘাটের উপর হইয়াছে। এই বয়সে শারীরিক অসুস্থতা ও অবসাদ, রোগ বৃষ্টি ও কাদা, সবই অগ্রাহ্য কবিয়া তিনি যে দেশের কল্যাণার্থ নানা স্থানে গিয়া দেশের লোককে জাগাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্ত শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতে হয়। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত প্রশংসা করিবার জন্ত আমরা লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। তাঁহার একটি কথা ও তাঁহার দৃষ্টান্তের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমাদের উদ্দেশ্য। তিনি অনেকবার লিখিয়াছেন ও অনেক জায়গায় বলিয়াছেন, যে, আলস্য বাঙালীর দারিদ্র্যের এবং নানাদিকে বাঙালীর অধঃপতনের একটি প্রধান কাবণ। বাঙালীর চেয়ে পৃথিবীর কোন জাতি বেশী বুদ্ধিমান নয়। বাঙালীর মধ্যে খুব বলবান লোকও ছিল এবং আছে। তথাপি বাঙালী গরীব কেন, বাঙালীর পেটে অন্ন নাই কেন, বাঙালী একটি একটি করিয়া রোজ্জগারের সকল ক্ষেত্র হইতে তাড়িত হইতেছে কেন? তাহার একটি কাবণ আলস্য। অল্প কাবণও আছে—বেমর, বাঙালীর পরস্পরকে অবিশ্বাস এবং নিজেদেব মধ্যে পরশীকাতরতা। এই অবিশ্বাসের কারণও আমরা। জাতির মধ্যে সত্যনিষ্ঠা স্বেচ্ছাপবতা ও কর্তব্যপরায়ণতা যথেষ্ট পরিমাণে না থাকিলে, পরস্পরের উপর বিশ্বাস কেমন করিয়া জন্মিবে? যাহা হউক, আমাদের সব দোষের কথা না ভাবিয়া কেবল আলস্যের কথাই এখন ভাবি। দোষ-ক্ষালন ও আত্মপক্ষ-সমর্থন করিবার প্রবৃত্তি থাকিলে বলা যায়, আমাদের দেশের জলবায়ু পবিত্রমেব অল্পকূল নহে, এখানে বড় ম্যালেরি-

য়ার প্রাদুর্ভাব, ইত্যাদি; এইজন্ত আমরা এত অলস। কিন্তু আগেও এদেশে এমনি গরম, এমনি বর্ষা, এমনি কাদা ছিল; অথচ তখন ত আমাদের দৈহিক পরিশ্রমের সব কাম্ব ওড়িয়া, বিহারী, হিন্দুস্থানী, সাঁওতাল প্রভৃতির কবিয়া দিত না। আমরাই করিতাম। ম্যালেরিয়াতে শরীর অবসাদগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা উৎপাদন করে বটে; কিন্তু আলস্য ম্যালেরিয়াব জনকও বটে। কারণ, দারিদ্র্য ম্যালেরিয়ার একটি কারণ; যাহারা পরিশ্রমী ও উপার্জক এবং যাহাদের শরীর পুষ্ট তাহাদের চেয়ে অনশনক্লিষ্ট লোকদিগকেই ম্যালেরিয়া অধিক আক্রমণ করে। যাহারা নিজে পরিশ্রম কবিয়া গ্রামের আগাছা উদ্ধার কাটিয়া ফেলে, অনাবশ্যক খানা ডোবা বুদ্ধাইয়া ফেলে, পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করে, তাহাদের গ্রামে ম্যালেরিয়া অপেক্ষাকৃত কম হয়। পূর্ব বঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিম বঙ্গে ম্যালেরিয়া বেশী; লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুতে কমিয়াছে পশ্চিম বঙ্গের জেলা-সকলে। কিন্তু ধান কাটিবার জন্ত পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা স্থানান্তর হইতে তত মজুর আমদানী কবে না, যত পূর্ব বঙ্গের লোকেরা করে। বিহারের অনেক জেলায় অনেক বৎসর হইতে ম্যালেরিয়ার খুব প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কিন্তু সেই-সব জেলা হইতেও হাজার হাজার লোক বঙ্গে আসিয়া দৈহিক শ্রম দ্বারা বিস্তর টাকা রোজ্জগাব করে। অতএব ম্যালেরিয়ার জন্তই আমরা অলস হইয়া পড়িয়াছি, ইহা সত্য নহে। আলস্যের প্রধান কারণ এই, যে, আমাদের স্বভাব খারাপ হইয়াছে। আমরা পরিশ্রম, বিশেষতঃ শারীরিক পরিশ্রম, কবিতো চাহি না; আমরা কষ্টসহিষ্ণু নহি, আমরা বাবু। ষষ্টিপদ বুদ্ধ আচার্য্য রায়ও ত ক্ষীণজীবী বাঙালী; তিনি সঙ্গতিপন্ন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান; নিজেও বৎসবে রোজ্জগার কবেন অনেক হাজার টাকা। তিনি

মানসিক ও দৈহিক পরিশ্রম করিয়া বেড়াইতেছেন,
তুমি আমি কেন করি না ?

বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি। আমরা সহজেই উত্তেজিত
—হই, ভাবের আবেগে আমরা কখন কখন দেশের জন্ত মহা-
বিপদকে আলিঙ্গন করিয়াছি। বাড় ভূমিকম্প বন্যা দুর্ভিক্ষে
বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ দৈহিক শ্রমও কিছুদিনেব জন্ত
আমরা করি। কিন্তু সাবাজীবন পরিশ্রমের অভ্যাস
আমাদের কেমন করিয়া জন্মিবে, বুঝিতে পারিতেছি না।
এমন কোন অল্পপ্রাণনা কি আসিবে, যাহার প্রভাবে
আমরা স্থায়ীভাবে পরিশ্রমে অভ্যস্ত হইয়া যাইতে
পারি ?

“ভঙ্গলোক” শ্রেণীর লেখক বক্তা কর্মী প্রভৃতিগণের
একটি কর্তব্য আছে, বাহা তাঁহারা পালন করিলে,
তাঁহাদের দৃষ্টান্তে দরিদ্রশ্রেণীর লোকেরা দৈহিক শ্রমে
অভ্যস্ত হইতে পারে। এখন সকলেই বাবু হইতে চায়।
বাবুর লক্ষণ এই, যে, তিনি দৈহিক শ্রমসাধ্য কাজ করিবেন
না। বাবু যদি নিজেব ছোট বাজ, গাঁটুরী বা হাঙ্গা
বিহানা-কমলও বহন না করেন, তাহা হইলে গবীব চামা-
ভুসারাই বা তাঁহার এই “উচ্চ” দৃষ্টান্তের অনুকরণ কেন
না করিবে ? রেলওয়ে ষ্টেশন ধীরঘাট বঙ্গের কত কত
গ্রামের নিকটে। এই-সব গ্রামে অতি গরীব ঋণগ্রস্ত
লোক বাস করে। তাহাদের অনেকে দুর্ভিক্ষের সম্মুখ
এবং অল্প সময়েও লোকের নিকটে হাত পাতিতে
লজ্জা বোধ করে না; কিন্তু তাহারা ট্রেনের সময়
ষ্টেশনে আসিয়া মোট বহিয়া ছুএক আনা বোজ্‌গার
করিতে চায় না। কেননা, মোট ঘাড়ে করাটা বাবুলোকদের
কাজ নহে! অতএব বাবুবা যদি উপদেশ দেন এবং
কাজেও যিনি যত বড় পারেন নিজেদের মোট নিজে
বহন করেন, তাহা হইলে কিছু সফল হইতে পারে।
অগ্রান্ত দৈহিক শ্রমের কাজও বাবুদের করা একান্ত কর্তব্য।
পরিচ্ছদে এবং দৈহিকশ্রমে বাবু ও অবাবু শ্রেণীর মধ্যে
পার্থক্য দূর বাবুরা চেষ্টা না করিলে হইবে না। কিন্তু
পার্থক্য দূর হওয়া চাই-ই চাই।

বঙ্গে অবাঙালী

সেদিন ছুথানা এংলোইণ্ডিয়ান কাগজে লিখিল,
যে, অবাঙালীতে বাংলাব সব বোজ্‌গারের ক্ষেত্র দখল
করিয়া ফেলিতেছে, অমনি বাংলা কাগজওয়ালারা এ
বিষয়ে খুব কলম চালাইতে আরম্ভ করিলেন,—যেন এটা
একটা ভারি নূতন আবিষ্কার, আগে কেউ একথা বলে
নাই! আমরা স্বাভাবিকতার যত বড়াই-ই করি না
কেন, ইংরেজ একটা কথা বলিলে তবে সেটা আমবা
শুনি।

আমবা অনেক বৎসর হইতে বাব বাব বলিয়া
আসিতেছি, যে, আমরা নিজ বাসভূমে প্রবাসীর মত
নানা কার্যক্ষেত্র হইতে বেদখল ও তাড়িত হইতেছি।
কোন কাগজওয়াল তাহাতে কান দেন নাই; কারণ
কথাগুলো লিখিয়াছি আমরা এবং বাংলায় লিখিয়াছি!
যাহারা আমাদের পুরাতন গ্রাহক এবং “প্রবাসী”
বাঁধাইয়া রাখেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, আমরা
“প্রবাসী”তে নিম্নলিখিত বৎসর, মাস ও পৃষ্ঠা এই
বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, হয়ত অগ্রতও করিয়াছি :—
১৩১১ বৈশাখ ৪২ পৃষ্ঠা, ১৩১১ আশ্বিন ৩১২ পৃষ্ঠা, ১৩১৫
জ্যৈষ্ঠ ১০২ পৃষ্ঠা, ১৩১৮ চৈত্র ৬১৭ পৃষ্ঠা, ১৩২১ ভাদ্র
৫০১ পৃষ্ঠা, ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ ১৮৫ পৃষ্ঠা, ১৩২৫ পৌষ ২৮০ পৃষ্ঠা,
প্রভৃতি। বঙ্গীয়হিতসাধনমণ্ডলী অনেকবার স্বীয
প্রদর্শনীতে একটি ছবি দেখাইয়াছেন, তাহাতে নানা-
কার্যক্ষেত্রে অবাঙালীর প্রতিষ্ঠা চিত্রের সাহায্যে দেখাইয়া
নীচে লেখা হইয়াছে, “বাঙ্গালী কোথায় ?” এইছবি ১৩২৭
সালের বৈশাখ মাসের “প্রবাসী”র ৬৮ পৃষ্ঠায় ছাপা
হইয়াছিল। তন্নিম্ন আচার্য্য রায় মহাশয় “প্রবাসী”তে প্রকা-
শিত তাঁহার বহু প্রবন্ধে এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু
তিনিও যে বাঙ্গালী, এবং বাংলাতেই বলিয়াছেন। আর
কোন কাগজে কেহ এ কথা ইতিপূর্বে লেখেন নাই,
ইহা বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। আমরা যাহা
করিয়াছি, কেবল তাহারই উল্লেখ করিলাম এইজন্ত,
যে, ইহা আমবা ভাল করিয়া জানি। বাঙালী বাংলায়
কিছু বলিলে লিখিলে তাহা “মামুলগণ্য” লোকেবা দেখেন
না, শুনে ন না, ইহা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য।

যাহা হউক, কথাটা যেই বলুক, ইহা সত্য, যে, বাংলা দেশে বাঙালী ছাড়া আর সবাই পেট ভরিয়া খাইতে পায় এবং অনেকে খুব ধনীও হয়। এজ্ঞ অবাঙালীদের প্রতি দীর্ঘাশ্রিত হওয়া উচিত নয়, এবং তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার ব্যর্থ বল্পনা, ইচ্ছা ও চেষ্টা করা উচিত নয়। অবাঙালীরা কি গুণে কি উপায়ে বাংলায় আসিয়া বোজ্জগার করে, তাহাদিগকে দেখিয়া তাহা শিক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য। আমরা অলস, আলস্য ত্যাগ করিতে হইবে; আমরা বাবু, কণ্টসহিষ্ণু হইতে হইবে।

আমরা দৈনিক শ্রমের কাজকে ছোট লোকের কাজ মনে কবি, এবং আলস্যকে বাবু লক্ষণ মনে কবি। এই ভ্রান্ত ধারণা পরিহার করিয়া সব রকমের সং কাজকে প্রয়োজন মত সব মানুষের করণীয় মনে কবিত্তে হইবে, ও তদনুসারে আচরণ করিতে হইবে। যাহাতে মিথ্যা, বঞ্চনা, চুরি, জাল বা অন্তবিধ দুর্নীতি নাই, তাহাই সং কাজ।

আমাদের আর-একটা দোষ এই আছে, যে, আমরা মনে করি, বাংলা দেশে যে কাজের যে রীতি, উপায় বা যন্ত্র চলিত আছে, তাহাই চালাইয়া যাইতে হইবে। বাস্তবিক কিন্তু অন্যান্য প্রদেশ ও দেশের কুমার, কামাধ, তাঁতি, ছুতাব, রাজমিস্ত্রী, প্রভৃতি কারিকরদিগের বীতি উপায় ও যন্ত্র হইতে অনেক শিথিলতা ও অসুস্থকরণ করিবার আছে। তাহা আমাদের করা উচিত। তাহাব প্রচলনে শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদেরও চেষ্টা করা কর্তব্য। কাবণ, দেশ-বিদেশের খবর তাঁহারা যত সহজে লইতে পাবেন, অস্তুরা তত সহজে পারে না।

খন্দরের প্রচলন

চরখা সূতা কাটায়া সেই সূতা হইতে হাতের তাঁতে কাপড় বুনিয়া ব্যবহার কবিলে আমাদের দেশের আর্থিক ও নৈতিক প্রভূত উন্নতি হইতে পারে, তাহা অনেক মনীষী বারবার দেখাইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত বৈজ্ঞানিক

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়ও শুধু ভাবের দ্বারা চালিত হইবাব লোক নহেন। তিনি বহুপূর্বে ঘরবুনা-মোটা কাপড় পরিবার ঐচ্ছিত্য ও উপকারিতা সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ সাববান প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। গত আষাঢ় মাসের প্রবাসীতেও তিনি দেখাইয়াছেন, যে, খন্দর-চালান অসাধ্য বা দুঃসাধ্য নহে, এবং উহাব প্রচলন দ্বারা আমাদের দারিদ্র্য অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে। যাহারা ঐ প্রবন্ধ পড়েন নাই, তাঁহারা একবার পড়িয়া দেখুন। কলের সূতা ও কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতাব কথা তুলিবাব কোন প্রয়োজন নাই। যে সময়টির কোন সম্ভাব্যহাব দেশের অধিকাংশ লোক করেন না, যাহা আলস্যে যাপন করেন, তাহারই সম্ভাব্যহার দ্বারা দারিদ্র্য-দুঃখ কিয়ৎপরিমাণে নিবাবণের উপায় চিন্তা করিলে দেখা যায়, কাপাস গাছ লাগাইয়া তুলা উৎপাদন, চরখায সেই তুলা হইতে সূতা কাটা এবং হাতেব তাঁতে ঐ সূতা হইতে কাপড় বুনা সকলের চেয়ে সহজ ও সুসাধ্য উপায়। তিন রকম কাজই কেহ একা না করিতে পারেন। যিনি যাহা পারেন, করুন। খন্দর প্রচলনের জন্য চাই আলস্য-ত্যাগ, এবং মোটা কাপড়, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য, পরিতে বাজী হওয়া। কিছুদিনের জন্ত বসিতেছি-এইজন্ত, যে, চরখায বেশ সরু সূতাও নিপুণ হাত হইতে বাহির হয়। বহু শত বৎসর পূর্বে যে মসলিন হইত, তাহা ত কলের সূতায় নয়—তখন কল ছিল না, চরখায কাটা সূতাতেই তাহা বোনা হইত। এখনও স্থানে স্থানে চরখায মিহি সূতা হইতেছে। অতএব, কিছুকাল পবে হাত পাকিলেই সরু সূতাও হইবে, মিহি কাপড়ও হইবে। যদি না হয়, তাহাতেই বা কি আসে যায়? আগে ত আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক মোটা কাপড়ই পরিত, এখনও অনেকে পরে। তা ছাড়া, এখন অনেক এই-দেশী লোকের পোষাক ইংরেজদের মত, এবং এই-সব পোষাকের কাপড় খন্দরের চেয়ে কম পুরু বা কম ভাবী নহে। এ দেশে গ্রীষ্মকালে পবিহিত বিলাতী ধরণেব পোষাকেব পাজামা, কোর্ট,

ওয়েব কোর্ট, কামিজ, গেঞ্জি, কলার, নেকটাই এবং মোজার সম্মিলিত ওজন, খন্দের ধুতি, চাদর ও পঞ্জাবীর সম্মিলিত ওজন অপেক্ষা কম নহে। শীত-কালের বিলাতী ধরণের পোষাকের ওজন ত খুবই বেশী।

রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সকল দলের লোকদের চরপায় কাটা স্নাত হইতে হাতের তাঁতে প্রস্তুত কাপড়ের সমর্থন করা উচিত। খন্দর নামে আপত্তি থাকে ত তাহা না হয় ব্যবহার নাই করিলেন।

সাধারণ লোকেরা ও গরীব লোকেরা বাবুদের অলঙ্করণ করে। এইজন্য বাবুদেরই সর্বপ্রথমে খাঁটি খন্দর ব্যবহার করা উচিত। এবং, খন্দরে দাম বেশী লাগিলে, তাঁহারাই বেশী দাম দিয়া উহা কিনিতে অধিক সমর্থ।

ভারতের ও বঙ্গের ব্যয়সংক্ষেপ

বিদেশী গবর্ণমেন্ট বহুব্যয়সাধ্য হইবেই। বিদেশী গবর্ণমেন্টের মানে, একপ লোকদের দ্বারা দেশশাসনের প্রধান প্রধান কাজগুলি নির্বাহ, যাহারা বিদেশী এবং কার্যকাল অতীত হইয়া গেলে যাহারা নিজের দেশে চলিয়া যাইবে। এই-সব লোক যে নিজের দেশ ছাড়িয়া আসিবে, কেন আসিবে? স্বদেশে তাহারা যত বেতন পাইত বা পাইতে পারিত, তাহা অপেক্ষা বেশী বেতন না পাইলে তাহারা কেন দূর দেশে কাজ করিতে আসিবে? অতএব, ইহা খুবই সহজবোধ্য, যে, দেশী লোকদের দ্বারা কাজ চালান অপেক্ষা বিদেশী লোকদের দ্বারা কাজ চালান অধিক ব্যয়সাধ্য হইবে। সেইজন্য রাষ্ট্রীয় কার্যের ব্যয় কমাইতে হইলে, গবর্ণমেন্টটাকে দেশী গবর্ণমেন্ট করিতে হইবে। দেশী গবর্ণমেন্ট দুই প্রকারে করা যায়। সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারিলে গবর্ণমেন্ট সম্পূর্ণ দেশী হয়; আবার, ভারতীয়েরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াও আভ্যন্তরীণ আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিতে পারিলে গবর্ণমেন্ট অনেকটা দেশী হইতে পারে। ভাল করিয়া ব্যয়-সংক্ষেপ করিতে হইলে এই দুটি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। তবে ইহা ঠিক বটে, যে, বিদেশী গবর্ণমেন্ট বেশী

অপব্যয়ী ও কম অপব্যয়ী দুই প্রকারের হইতে পারে। সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেন্ট ও বাংলা গবর্ণমেন্টের ব্যয়-সংক্ষেপের জন্ত যে দুটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা যদি কিছু কাজ হয়, তাহা হইলে এই দুটি গবর্ণমেন্ট এখনকার চেয়ে কিছু কম অপব্যয়ী হইবে মাত্র, যথেষ্ট মিতব্যয়ী তাহারা হইবে না, হইতে পারে না। বিদেশী গবর্ণমেন্টের অপব্যয়ী হইবার আরো কতকগুলি কাবণ আছে। অধীন দেশ ও জাতিকে বেশে রাখিবার জন্ত উঁহার সেনাদল ও পুলিশ বৃহৎ হওয়া চাই এবং বিদেশী কর্মচারীদের অধীনে থাকা চাই, গোয়েন্দা বিভাগ বড় হওয়া চাই, জেলগুলা বড় হওয়া চাই, ইত্যাদি।

কিন্তু ইহা মনে করাও তুল, যে, জাতীয় গবর্ণমেন্ট হইলেই তাহা মিতব্যয়ী হইবে। জাতীয় গবর্ণমেন্ট মিতব্যয়ী হইতে পারে, অপব্যয়ীও হইতে পারে। জাতীয় গবর্ণমেন্ট ভাল হইলে তাহা মিতব্যয়ী হইবে, মন্দ হইলে অপব্যয়ী হইবে। তাহার প্রমাণ হাতের কাছেই রহিয়াছে। গবর্ণমেন্ট সম্পূর্ণ দেশী হইলে বড় বড় সব সরকারী কর্মচারী দেশী হইবে, গবর্ণমেন্ট অংশতঃ দেশী হইলে বড় অনেক কর্মচারী দেশী হইবে। কিন্তু এখন যাহারা দেশী মন্ত্রী বা শাসনপরিষদের দেশী সভ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায়, যে, দেশী লোক হইলেই যে তাঁহারা বিদেশীদের চেয়ে কম বেতনে দেশের সেবা করিতে সম্মত হইবেন, তাহা নহে। অল্প দিকে ইহাও শোনা গিয়াছে, যে, দেশের কাজ করিবার জন্ত সংগৃহীত টাকা (অর্থাৎ কংগ্রেসের ও খিলফৎ কন্ফারেন্সের অনুমোদিত কাজ করিবার জন্ত সংগৃহীত টাকা) কোথাও কোথাও স্বাভাৱিক (nationalist) দলের কোন কোন লোকেব দ্বারা নিজেদের আরাম ও ব্যসনের জন্ত অপব্যয়িত হইয়াছে। সেইজন্য বলিতেছিলাম, জাতীয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত লোক রাজনৈতিক যে দলেরই হউন, তাঁহারা অর্থগৃহ হইতে পাবেন। এই হেতু জাতীয় গবর্ণমেন্ট ভাল অর্থাৎ প্রকৃত গণতান্ত্রিক হওয়া চাই, নতুবা সরকারী কাজে মিতব্যয় হইতে পারে না। প্রকৃত গণতান্ত্রিক মতিগতি ও রীতি কি, তাহা এবটু খুলিয়া বলা দরকার।

আসল গণতন্ত্র রাষ্ট্র তাহাই, যাহাতে সমুদয় প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও রমণীর ভোট আছে ও রাষ্ট্রীয় অধিকার আছে। এইরূপ গণতন্ত্র দেশের গবর্ণমেন্ট লোকমত অমুসারে কাজ করিতে বাধ্য হয়। ঠিক এই আদর্শ অমুসারী গণতন্ত্র কোথাও না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার কাছাকাছি যায় একরূপ গণতন্ত্র আছে। গণতান্ত্রিক মতে সরকারী কর্ম-চাষীরা দেশের লোকের মনিব নহে, তাহারা সেবক। গণতান্ত্রিক মতে সরকারী চাকরী দেশের লোকদের উপর প্রভুত্ব কবিরার নিমিত্ত অভিপ্রেত নহে, তাহাদের সেবা করিয়া তাহাদের কল্যাণসাধনের জন্ত অভিপ্রেত। গণতান্ত্রিক মতে সরকারী চাকরী ধনী হইবার উপায় নহে;—গণতান্ত্রিক দেশে যাহারা ধনী হইতে চায় তাহারা কারখানায় পণ্যাদ্রব্য প্রস্তুত করে, নতুন নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করে, ব্যবসাবাগি জয় করে, উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষাবাস করে, জাহাজ চালায়, ও এইপ্রকার অগ্রগতি নানা কাজ করে। অনেকে আইনজীবী, চিকিৎসক, এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি হয়। গণতান্ত্রিক দেশের ব্যবস্থা একরূপ হয় না, যে, তাহার ফলে উচ্চপদস্থ সরকারী চাকরীবিলাসিতা করে ও টাকা জমাখ এবং নিম্নপদস্থ চাকরীরা খাইতে পরিতে পায় না। আমাদের দেশে লাটসাহেব পান আড়াই লক্ষ টাকা বার্ষিক বেতন ও তত্বপরি নানাবিধ ভাতা, নিম্নতম কর্মচারীরা কিন্তু বৎসরে আড়াই শত টাকাও পায় না। এত বেশী তফাৎ কোন গণতান্ত্রিক দেশে থাকিতে পারে না, নাই। খুব সামান্য মানুষ যে, তাহারও ঘরবাড়ী, খাওয়াপরা, পরিবার-প্রতিপালন, শিক্ষা, বিমল আনন্দ, জ্ঞান, ও অসময়ের জন্ত সঞ্চয়ের দরকার। কিন্তু যে দেশে উচ্চতম কর্মচারী নিম্নতমের দুই হাজার গুণেরও বেশী বেতন এবং ভাতা পায়, সে দেশের গবর্ণমেন্টের ও লোকদের মত যেন কতকটা এইরূপ, যে, উচ্চতম কর্মচারী দেবতা এবং নিম্নতম কর্মচারী ও তাহার সমশ্রেণীস্থ লোকেরা পশুরও অধম। ইহা বাজে কথা নয়। গ্রাম্য চৌকিদার ও গুরুমহাশয়দিগকে যে বেতন দেওয়া হয়, গুরুঘোড়া বাখিবার খরচও তাহা অপেক্ষা অধিক।

নিম্নতম কর্মচারীরাও যাহাতে মানুষের মত জীবন

ধারণ করিতে পাবে, তাহার মত বেতন তাহাদিগকে দিতে হইলে উচ্চপদগুলির বেতন আমাদের দেশের মত নবাবী রকমের করিলে চলে না। জাপানের দৃষ্টান্ত লউন। উহা স্বাধীন দেশ, আমাদের চেয়ে ধনী দেশ, এবং সেখানকার জীবনধারণ-ব্যয় ভারতের চেয়ে বেশী। এ হেন শক্তিশালী স্বাধীন ও ধনী দেশে প্রধান মন্ত্রীর বেতন মোটামুটি মাসিক দেড় হাজার বা বার্ষিক ১৮০০০ টাকা মাত্র। জাপানের সিভিল সার্ভিসের পদগুলির সর্ব-নিম্ন শ্রেণীর নাম হান্-নিন্। এই হান্-নিন্ শ্রেণীর নিম্নতম কর্মচারীরা মাসিক ষাট টাকা বেতন পান। ১৯২০-২১ সালের জাপানী বর্ষপুস্তক অমুসারে জাপানী প্রাথমিক বিদ্যালয়-সকলে সাধারণ শিক্ষকদের গড় বেতন মাসিক চল্লিশ টাকা। পরাধীন জার্মানির দরিদ্র বাংলাদেশের গুরু মহাশয়দের বেতন যদি দশ টাকাও ধরা যায়, তাহা হইলে তাহা বা বছরে ১২০ টাকা পান, এবং এক-একজন মন্ত্রী পান ৬৪০০০ টাকা, অর্থাৎ পাঁচশত গুণেরও অধিক। স্বাধীন শক্তিশালী ধনী জাপানের প্রধান মন্ত্রী জাপানী গুরুমহাশয়দের গড় বেতনের পঞ্চাশ গুণ বেশী বেতনও পান না।

আমাদের দেশেও বেতনের ফর্দ জাপানী ধরণের কবিত হইবে। তাহাতেও নিশ্চয়ই যোগ্য লোক পাওয়া যাইবে। ভারতশাসনে অপব্যয়ের অন্ত নাই। সৈনিক বিভাগ, যত শীঘ্র সম্ভব, নেতা হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ সিপাহী পর্যন্ত, দেশী লোকে পূর্ণ হওয়া দরকার। তাহা হইলে ব্যয় অন্যান্য টাকায় দশ আনা কমিয়া যাইবে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সার্ব গড্‌ফ্রি ফেল্ কর্তৃক প্রদত্ত ফর্দ হইতে জানা যায়, যে, একজন অবিবাহিত সার্জেন্টের মাসিক প্রাপ্য ২০৪, বিবাহিতের ২৬০ টাকা। অল্পদিকে একজন দেশী হাবিলদারের মাসিক প্রাপ্য ৫২, অশ্বারোহী হইলে ৫৮। সাধারণ গোরা সৈনিকের প্রাপ্য অবিবাহিত পক্ষে ১৫০, বিবাহিত হইলে ২০৬। সাধারণ সিপাহীর প্রাপ্য ৪২, অশ্বারোহী হইলে ৪৫ টাকা। বিদেশীর সব কাজ দেশী দ্বারা চলিতে পারে। তাহা চালাইলে কত ব্যয়সংক্ষেপ হইবে, এই সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যাইবে।

সিভিল অর্থাৎ অসৈনিক সমুদয় বিভাগে উচ্চ সমুদয় পদগুলির বেতন-কমাইয়া, জাপানের তুলনায় আমাদের দেশের আয় যেকপ সেইরূপ কবিত্তে হইবে; এবং নীচের পদগুলির বেতন বাড়াইতে হইবে। বাড়াইলেও, উচ্চ বেতনগুলির ত্রাস দ্বারা ব্যয়সংক্ষেপ হইতে পারিবে। তা ছাড়া, অনেক অনাবশ্যক পদ আছে, যাহা উঠাইয়া দেওয়া চলে ও দেওয়া উচিত। যেমন ভিবিজনের কমিশনার। সব প্রদেশে এই পদ নাই। যেখানে যেখানে নাই, তথাকার কাজ বাংলা দেশ অপেক্ষা ধারাপ হয় না। পুলিশ-বিভাগে পরিদর্শক কর্মচারীর এত বাহুল্য অনাবশ্যক। তাহা ছাটিয়া ফেলা উচিত। শিক্ষা-বিভাগেও এত পরিদর্শক কর্মচারীর আবশ্যিক নাই। আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া দাইতে পারিত।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অপব্যয় বাড়িয়াছে, অকারণ প্রদেশবৃদ্ধির জন্ত। বহুপূর্বে আসাম, বাংলা, বিহার, ছোটনাগপুর, ওড়িশা, এক-প্রদেশ-ভুক্ত ছিল। এক লার্টিসাহেব, এক সেক্রেটারিয়েট, এক-একটি শিক্ষা, পুলিশ, আবগারী, প্রভৃতি বিভাগে কাজ চলিত। এখন হইয়াছে তিনটি প্রদেশ, তিন লার্ট, তিন সেক্রেটারিয়েট, তিনতিনটি শিক্ষা, পুলিশ, প্রভৃতি বিভাগ। রাজধানীও শীত-গ্রীষ্ম-ভেদে দুটা দুটা করিয়া ছুট্টা এবং তদনুযায়ী প্রাসাদ আফিসাদি হইয়াছে। তাহাতে অনেক কোটি টাকা গিয়াছে। তাহাতে দেশের স্বাস্থ্য, ধন, জ্ঞান, শাস্তি, শক্তি বাড়িয়াছে কি?

দিল্লীতে রাজধানী লইয়া গিয়া উহার বহুযোজনব্যাপী সাম্রাজ্যসমাধিক্ষেত্রে যে কোটি বোটি টাকা ঢালা হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহার মত স্বাস্থ্য সমৃদ্ধি জ্ঞান শাস্তি শক্তি আমাদের বাড়িয়াছে কি?

ভারত-গবর্ণমেন্ট দেশের স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের জন্ত যথেষ্ট ব্যয় করেন না। দেশের উপর ট্যাক্সের বোঝাও খুব বাড়ান হইয়াছে। তথাপি তিন বৎসরে ভারত-সরকারের আয় অপেক্ষা ব্যয় নব্বই কোটি টাকা বেশী হইয়াছে। এই টাকা উদ্ধহারে স্তদ দিয়া ধার করিতে হইতেছে। অপব্যয় এই অকুলান ও ঋণের কারণ। ঋণ পাওয়াও ক্রমশঃ কঠিন হইয়া

আসিতেছে। ব্যয়সংক্ষেপ কমিটি বসাইবার ইহা একটি প্রধান কারণ বলিয়া মনে করি।

আমাদের প্রধান বক্তব্য সংক্ষেপে আবার বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করি। গবর্ণমেন্ট বিদেশী থাকিতে যথাসম্ভব মিতব্যয় হইতে পারে না। গবর্ণমেন্ট দেশী বা জাতীয় হইলেও, আমাদের মতিগতি গণতান্ত্রিক না হইলে জাতীয় গবর্ণমেন্টও যথাসম্ভব মিতব্যয়ী হইবে না। অতএব, প্রথমতঃ চাই স্বরাজ স্থাপন; দ্বিতীয়তঃ চাই, আমাদের তজ্জপ মতিপরিবর্তন যাহার ফলে সরকারী চাকরীকে আমরা সাধারণ লোকদের উপর মনিবগিরির ও ধনী হইবার উপায় মনে না করিয়া উহাকে বৈতনিক দেশসেবা বলিয়া মনে কবিত্তে পারি। গবর্ণমেন্ট বিদেশী থাকিলেও কতকটা ব্যয়সংক্ষেপ হইতে পারে। তাহা হইলেও মন্দের ভাল।

আশঙ্কার কথা

যখনই ব্যয়সংক্ষেপের কথা উঠে তখনই চাপ্‌বাসী পিয়াদা প্রভৃতিদের সংখ্যা ও বেতনের উপর দৃষ্টি পড়ে, কিম্বা শিক্ষার জন্ত মঞ্জুর সামান্ত টাকাও কমাইয়া দেওয়া হয়, অথবা এইরূপ শোচনীয় ও হান্ধকর আর-কিছু ঘটে। এ বারেও তাহা হইতে পারে। সিন্ধুদেশে ও বিহারে ইতিমধ্যেই শিক্ষার উপর হাত পড়িয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান-বিভাগ

নানাদিকে নানাপ্রকারে কোটি কোটি টাকা অপব্যয় হইয়া আসিতেছে। তাহার নিন্দা আমবা বরাবরই করিয়া আসিতেছি। কিন্তু মানবদেহেব কঠিন পীড়াব যেমন চিকিৎসার দরকার, সামান্ত ব্যাধিরও তেমন চিকিৎসা হওয়া ভাল, কারণ অবহেলিত হইলে তাহাও কঠিন হইতে পারে। যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়াছে বলিয়া পল্লীগ্রামের একটা খুন অবহেলার যোগ্য নহে। মিউনিশন্ বোর্ডের কয়েক কোটি টাকা চুরি গিয়াছে বলিয়া, গবর্ণমেন্ট, মফঃস্বলেব সামান্ত কোন আফিসের কেরাণী অল্পটাকা চুরি করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দেন না,

তাহাকেও কৌজ্জাবী সোপর্দ করেন। অতএব সামান্য অমিতব্যয় বা অপব্যয়ও মার্জ্জনীয় নহে।

অপব্যয়ের প্রশ্ন কোথাও দেওয়া উচিত নহে বলিয়া আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের প্রতি গবর্ণমেন্টকে এবং শিক্ষিত সাধারণকে দৃষ্টি দিতে বলিয়া আসিতেছি। অপব্যয় কিম্বা চিন্তাহীনভাবে ব্যয় না হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক লাখ টাকা অকুলান পঙ্কিত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট বড় নানা কথার এত আলোচনা আমাদের বাংলা ও ইংরেজী মাসিকে কবিবার আরো কারণ এই, যে, ইহা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ অবৈতনিক ও বৈতনিক কর্মীদের শিক্ষার কেন্দ্র; ইহার নৈতিক হাওয়া বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর না থাকিলে দেশের কল্যাণ কখনও হইতে পারে না। অনির্ঘমিত ব্যয়, অপব্যয়, চিন্তাহীনভাবে ব্যয় করিবার ক্ষমতা যেখানে থাকে, সেখানকাব নৈতিক হাওয়া ভাল থাকিতে পারে না। এই কারণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয় নাই। এখানে স্থলবিশেষে অমুগ্রহে এবং তদ্বিবের জোবে পাস হওয়া যায়, উচ্চশ্রেণীতে পাস হওয়া যায়, প্রথমশ্রমণীয় হওয়া যায়, বৃত্তি পাওয়া যায়, চাবরী পাওয়া যায়, চুরি করা বিদ্যার জোবে প্রশংসিত হওয়া যায়, এইরূপ ধাবণা লোকের জন্মিয়াছে। কোন বুদ্ধিমান চিন্তাশীল লোকই একপ মনে করেন না, যে, যাহারা পাস করে, ভাল পাস করে, বৃত্তি পায়, ইত্যাদি, তাহাদের সকলেরই কৃতিত্ব অমুগ্রহ- ও তদ্বিব জাত; অধিকাংশেরই কৃতিত্ব স্ব স্ব যোগ্যতা অমুগ্রহাযী। কিন্তু অল্প কয়েকজনের দোষে অনেককে সন্দেহভাজন হইতে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থখটিত কার্য পরিচালন অতীতে যে শোচনীয় হইয়াছে, তাহা শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র তাঁহার গত ১লা মার্চের বক্তৃতায় বলিয়াছেন ("the financial management of the Calcutta University in the past was deplorable")। এই অর্থখটিত কার্য পরিচালনা কিরূপ হইয়াছে ও হইতেছে, শ্রীযুক্ত স্বাধীনায় সরকারের প্রস্তাবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, অধিকাংশ সভ্যের মতে, তাহার তদন্ত করিবার

নিমিত্ত গবর্ণমেন্টকে এক কমিটি নিযুক্ত করিতে অমুগ্রহ করেন। প্রজাদিগের প্রতিনিধিদের নিকট দায়ী গবর্ণমেন্ট (Responsible Government !) তাহা করেন নাই। যদি ঐরূপ কমিটি নিযুক্ত হইত, এবং তাহাতে কৃষ্ণ-লাল দত্ত, চারুচন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতির মত লোক নিযুক্ত হইতেন, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ কতটা সমূলক বা অমূলক বুঝা যাইত।

আমরা আপাততঃ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত একটি রিপোর্ট হইতে উহার শিক্ষাদান-বিভাগের (Post-graduate Departmentএব) প্রধান ব্যয় সম্বন্ধে কিছু বলিব। এই পুস্তিকার নাম Post-graduate Teaching in the University of Calcutta, 1920-21। ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানায় এই বৎসর ৮ই জুন ছাপা হইয়াছে।

ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই, যে, পোস্টগ্রাজুয়েট বিভাগে ১৯২০-২১ সালে মোট ছাত্র ছিল ১১৯৬জন। বৎসরের শেষে যাহা ছিল তাহাই ধরিয়াছি। বৎসরের গোড়াষ আরো ৫০জন ছাত্র বেশী ছিল। এই ১১৯৬জনেব শিক্ষাব জ্ঞাত মোট ২৩৮টি শিক্ষকের পদ ছিল। কলিকাতায় কয়েকটি কলেজ আছে, যাহাদের প্রত্যেকের ছাত্রসংখ্যা ১১৯৬ অপেক্ষা বেশী কিম্বা তাহার কাছাকাছি। তাহারা পোস্টগ্রাজুয়েট বিভাগের সমানসংখ্যক বিষয় শিক্ষা দেয় না; কিন্তু খুব কমও দেয় না। তাহাদের প্রত্যেকটিতে কতজন করিয়া শিক্ষাদাতা আছেন তাহা চিন্তনীয়। গড়ে ৫০ জন করিয়াও আছেন কি? প্রেসিডেন্সী কলেজেও ৫০১৬ জনের বেশী অধ্যাপক নাই। পোস্টগ্রাজুয়েট বিভাগের কয়েকজন শিক্ষককে বাদ দিলে অবশিষ্টের প্রথম শ্রেণীর কলেজের অধ্যাপকদিগের চেয়ে বেশী যোগ্য লোকও নহেন।

১১৯৬জন ছাত্রের শিক্ষার জ্ঞাত শিক্ষাদাতাদিগকে মোট বেতন মাসিক ৫৩১৩০ (তিপায় হাজার এক শত ত্রিশ) টাকা অর্থাৎ বার্ষিক ৬৩৭৫৬০ (ছয়লক্ষ সাইত্রিশ হাজার পাঁচ শত ষাট) টাকা দিতে হইয়াছে। ইহার উপর ক্যাপ্টেন পেটার্ডেলকে বার্ষিক ১০০০ টাকা, অর্থাৎ মোট খরচ, ৬৩৮৫৬০ টাকা বার্ষিক শিক্ষাদাতাগণকে দিতে

হইয়াছে। তাহার উপর লাইব্রেরীর খরচ, কেরাণীদিগের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির খরচ, ইত্যাদি আছে। অর্থাৎ শিক্ষাদাতাদিগের বেতনের জন্তই ছাত্রপ্রতি বার্ষিক প্রায় ৫৩৭ টাকা খরচ হইয়াছে। যদি কেহ এই খরচের সহিত অন্য কোন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যয়ের তুলনা করিতে চান, তাহা হইলে, তাঁহাকে ইহাও দেখাইতে হইবে, যে, সে দেশের লোকদের জনপ্রতি গড়পড়তা আয় কত, এবং আমাদের দেশের লোকদেরই বা গড়পড়তা জন-প্রতি আয় কত।

উপরে যে মোট মাসিক বেতন ব্যয় ৫৩১৩০ টাকা দেখাইয়াছি, তাহার মধ্যে ১৩৩৭৫ টাকা মাত্র অর্থাৎ প্রায় নিকি বিজ্ঞান-বিভাগের জন্ত!

ভারতবর্ষে যে এখন সমুদয় সভ্য-দেশের পশ্চাতে পড়িয়া আছে, তাহার একটি কারণ বিজ্ঞানের চর্চাব অল্পতা। ভাবতবর্ষের সাবেক শিল্প-কল প্রায় লোপ পাইয়া তাহার জায়গায় যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কারুখানায় নানা পণ্যত্রব্য যথেষ্ট রকম ও পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে না, তাহার কারণও বিজ্ঞানের চর্চার অল্পতা। ইংরেজ গবর্ণমেন্ট আমাদের দেশে যে-প্রকারের পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আরম্ভ হইতে সাহায্য ও উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন, তাহা প্রধানতঃ কেতাবী ও অবৈজ্ঞানিক। তাহার কাবণ, গবর্ণ-মেন্ট আদালতের ও আফিসের কর্মচারীর এবং আইন-জীবীর আবশ্যিকতা যত অল্পভব করিয়াছেন, ভারতবর্ষকে বিজ্ঞানে শিল্পে কল-কারুখানায় ব্যবসা-বাণিজ্যে অল্প সব সভ্য-দেশের সমকক্ষ করিবার প্রয়োজন ও ইচ্ছা তেমন করিয়া অল্পভব করেন নাই। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ঠিক ইংবেজ আমলাতন্ত্রের অল্পমত নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, বলা যায় না। কিন্তু উহা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এমনও বলা যায় না। গত ১লা মার্চের বক্তৃতায় শিক্ষামন্ত্রীও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগের প্রতি আংশিক বিরূপতা প্রমাণ করিয়া বলেন, "I am pointing out these facts with the hope that they will induce the Calcutta University to revise their way of dealing with the science side."

এখন এক-একটা বিষয়ে ছাত্র ও অধ্যাপকের সংখ্যা এবং অধ্যাপকদের মাসিক বেতনের পরিমাণ দেখাই।

বিষয়। অধ্যাপকসংখ্যা। ছাত্রসংখ্যা। মাসিকবেতন।

ইংরেজী	২১	৪৪২	৪৪০০ টাকা
সংস্কৃত	২১	৪৪	২৮৫০
পালি	২	৬	১৪৭৫
আববী ও ফারসী	৬	১৬	১১৫০
তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান	৩	৫	২৭৫
ভাবতীয় আধুনিক ভাষা	২৫	৩৮	২১৭৫
দর্শন	১৫	১১৬	৪৭৭৫
পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান	৭	২	১৫৫০
ইতিহাস	৩৮	১২৮	২১৭৫
নৃতত্ত্ব	৮	২	১৩৫০
অর্থবিজ্ঞান	১৬	১৩৮	৪৪০০
বিশুদ্ধ গণিত	১২	৮৮	৪৪০০
আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষা	১	অজ্ঞাত	১৫০
ফ্রেঞ্চ	১	"	২০০
তিব্বতী	৩	"	৭৩০
ফলিত গণিত	২	৩১	১৮২৫
পদার্থবিজ্ঞান	১৫	৪৩	৪১২৫
রসায়নবিদ্যা	১২	৩৭	৩৫০০
ফলিত ঐ	উল্লেখ নাই	১০	উল্লেখ নাই
উদ্ভিদবিজ্ঞান	৫	৫	১২২৫ টাকা
শাবীরবিজ্ঞান	২	১২	২০০
প্রাণিবিজ্ঞান	৫	৩	১২৭৫
ভূবিজ্ঞান	৩	২	৫২৫

পাঠকেরা দেখিবেন, যে, কতকগুলি বিষয়ে ছাত্রসংখ্যা খুব কম, এবং তাহার তুলনায় অধ্যাপকসংখ্যা ও তাঁহাদের মোট বেতনব্যয় খুব বেশী, যেমন, পালি, তুলনা-মূলক ভাষাবিজ্ঞান, পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, তিব্বতী, উদ্ভিদবিজ্ঞান, ও প্রাণিবিজ্ঞান। কোন বিদ্যাই অনাবশ্যক নহে। কিন্তু মাহুষের আয়ের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ও পবিমিত। সেই আয় কোন্ কোন্ বিষয়ের শিক্ষার জন্ত ব্যয় করা উচিত, তাহা স্থির করিতে হইলে খুব চিন্তা করা দরকার।

প্রথম চিন্তনীয় বিষয় দেশের অবস্থা। মানুষ বাঁচিয়া থাকিলে, তবে ত তাহার কল্চার (culture) হইবে। এইজন্য পরিমিত আয়ের কথা মনে রাখিয়া, আমরা পালি, তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ও তিব্বতীভাষাকে প্রয়োজনীয় মনে করিলেও, ভূবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানকে কিছুকালের জন্য ভারতবর্ষের পক্ষে বেশী প্রয়োজনীয় মনে করি। এ বিষয়ে মতভেদ হইবে। আমাদের মত আমরা বলিলাম। অন্ততঃপক্ষে, অতি অল্পদংখ্যক ছাত্রের জন্য পূর্বোক্ত বিষয়-সকলের অধ্যাপনার নিমিত্ত এত বেশী টাকা খরচ করিয়া এত অধ্যাপক রাখা কর্তব্য মনে করি না। যদি ঐ বিষয়গুলি পড়াইতেই হয়, তাহা হইলে অধ্যাপকসংখ্যা খুব কমাইয়া দেওয়া উচিত। ধনীলোক একটি ছেলেকেও বিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন শাখা শিখাইবার জন্য দশজন গৃহশিক্ষক বাথিতে পাবেন। কিন্তু বাংলাদেশ সেই ধনীলোক নহে। নৃতত্ত্ব এত বিস্তারিত করিয়া শিখাইবার বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু ভূবিজ্ঞানের মত একুপ দরকারী ও বহুশাখাসম্বন্ধিত বিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা পিত্তরক্ষার উপযোগী কেন? তাহাতে এত কম অধ্যাপক নিয়োগ করিয়া এত কম খরচ কেন করা হয়? উহা উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান অপেক্ষা কিসে কম? পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ শারীর-বিজ্ঞানের (Physiology) জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। অথচ শারীর-বিজ্ঞানের শিক্ষার ব্যবস্থা যেন তাচ্ছিল্যের সহিতই করা হইয়াছে। উহার অধ্যাপক দুইজন খুব ঘোণ্য লোক। কিন্তু অন্ত্যন্ত কয়েকটি বিদ্যার ৬টি, ৫টি, ৯টি, ৯টি, ০ (১)টি, ৫টি ও ৩টি ছাত্রকে শিক্ষা দিবার জন্য যদি বহু বেতনে যথাক্রমে ৯জন, ৩জন, ৭জন, ৮জন, ৩জন, ৫জন ও ৫জন অধ্যাপক রাখা দরকাব হয়, তাহা হইলে শারীর-বিজ্ঞানের ১২জন ছাত্রের জন্য এক-এক শত টাকা দুইজন মাত্র অধ্যাপক কেন যথেষ্ট বিবেচিত হইল? তিব্বত দেশের মত তিব্বতী ভাষাটির অধ্যাপন, ছাত্রসংখ্যা প্রভৃতি রহস্যবৃত। উহা ছাড়িয়া দিলে, সর্বাপেক্ষা চমৎকার ব্যবস্থা প্রাণিবিজ্ঞানের; ছাত্র তিনটি, অধ্যাপক পাঁচটি এবং তাঁহাদের বেতন মাসিক

১২৭৫। উদ্ভিদবিজ্ঞানের ব্যবস্থাও থাসা; ছাত্র ও অধ্যাপকের সংখ্যা সমান সমান—পাঁচ; বেতন মাসিক ১২২৫। পালিরও ছাত্রসংখ্যা ৬জন, কিন্তু অধ্যাপক ৯জন এবং তাঁহাদের বেতন ১৪৭৫। উদ্ভবে, পালিতে—লিখিত নানা শাস্ত্র ও বিদ্যাব উল্লেখ করা যায়; কিন্তু ঘরে যে টাকা কম এবং শিখিবার মানুষও কম। নৃতত্ত্বও বড় কম যান না। ছাত্রসংখ্যা অধ্যাপকদের চেয়ে এক বেশী। ৪৪টি ছাত্রের জন্য ২ জন সংস্কৃত অধ্যাপক বড় বেশী মনে হয়। জানি, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নানা বিদ্যা আছে; কিন্তু বিভাগ এবং শাখাবও ত একটা আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী সীমা থাকা উচিত। নতুবা শুধু ব্যাকরণ শিখাইবার জন্যই ত পাণিনির একজন, মুণ্ডবোধেব একজন, সংক্ষিপ্তসারের একজন, কলাপের একজন,.....এইরূপ অধ্যাপক নিযুক্ত করুন না?

আরবী-ফারসী সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থায় দেখিলাম, অধ্যাপক আছেন ছয়-জন। (আর-এক জায়গায় আছে সাত-জন।) তার মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী বেতন পান লেফটেন্যান্ট কর্নেল জর্জ র‍্যাঙ্কিং—৫০০ টাকা। কিন্তু তিনি যে কি কাজ করিয়াছেন, কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। অধ্যাপনা করিয়াছেন, অপর পাঁচ জন। র‍্যাঙ্কিং কোন গবেষণা করিয়াছেন বা সর্বসাধারণের হিতার্থে কোন বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাও কোথাও লেখা নাই। এমন কি, কলমবাজ গুণ্ডার কাজও তাঁহার দ্বারা হয় নাই। অথচ তিনি বৎসরে ৬০০০ টাকা পাইয়াছেন। এই টাকায় গ্রাম-নিরক্ষর বাংলা দেশে ১২০০ ছাত্র-ছাত্রীর প্রাথমিক শিক্ষা হইতে পাবিত। এই ছয় হাজার টাকা কি সম্পূর্ণ অপব্যয় হইতেছে না? শিক্ষামন্ত্রী ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরা কি বলেন?

পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের অনেক অধ্যাপক কলেজের অধ্যাপকদের চেয়ে সপ্তাহে অনেক কম ঘণ্টা অধ্যাপনা করেন। তাহার কারণ এই দেখান হয়, যে, বাহারা গবেষণা করেন, তাঁহাদিগকে পড়াইবার কাজ বেশী দেওয়া উচিত নয়। তথাস্ত। আমরা সমস্ত রিপোর্টটি ঘাঁটিয়া

দেখিলাম, আলোচ্য বৎসরে ইংরেজীর কোন অধ্যাপক কোন গবেষণা করেন নাই বা বহি প্রকাশ করেন নাই।

সুতরাং তাঁহাদের অধ্যাপনার কালের পরিমাণের সহিত তাঁহাদের সমান দরের কলেজ-অধ্যাপকদের অধ্যাপনা-কালের পরিমাণের তুলনা করা অশ্রদ্ধ হইবে না।

৫ তাঁহাদের কেহ কেহ নিজেই কলেজ-অধ্যাপক। তাঁহারা কত কাজ করিয়া কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কত বেতন পান, শিক্ষামন্ত্রী ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ তাহার অনুসন্ধান করুন। যদি কেহ কাজের তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অপেক্ষাকৃত কম বেতন পান, তাহা হইলে কলেজে কেন বেশী লয়ন, তাহারও অনুসন্ধান প্রয়োজন। এইকপ অনুসন্ধান সকল বিষয়ের অধ্যাপকদের সম্বন্ধে হওয়া উচিত। অতিবিস্তৃতির ভয়ে আমরা অধ্যাপকদের কাজের ও বেতনের তালিকা দিলাম না।

ইংরেজীর ছাত্র ৪৪২ জন। তাহার তুলনায় অধ্যাপক-সংখ্যা খুব বেশী নয়, যদিও আমাদের বিবেচনায় আরো কম অধ্যাপক দ্বারা কাজ চলিতে পারে; কারণ, এই অধ্যাপকেরা দেখিতেছি গবেষক নহেন। যাহা হউক, ইংরেজীর কোন্ অধ্যাপক কত কাজ করেন, তাহা বুঝিবার উপায় আছে; এবং তাঁহাদের কেহ র‍্যাঙ্কিংয়ের মত বসিয়া বসিয়া ৫০০ টাকা করিয়া বেতন পান না। কিন্তু সংস্কৃত, পালি, নানা ভারতীয় ভাষা, তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, আরবী ও ফারসী, পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থবিজ্ঞান, এবং আরো কোন কোন বিষয়ে ইংরেজীর মত কাঙ্ক্ষ-তালিকা দেওয়া হয় নাই বলিয়া কে কত কাজ করিতেছেন, বুঝিবার উপায় নাই। সুতরাং, র‍্যাঙ্কিংয়ের আরবী-ফারসীর অধ্যাপকতার মত পুরা ফাঁকি না হইলেও, কিছু কিছু আংশিক ফাঁকি আরো আছে কি না, সম্বন্ধে বুঝিবার জো নাই। তা ছাড়া, রিপোর্টে কাজ যাহা লেখা আছে, কোনও কোনও অধ্যাপক তাহাতেও ফাঁকি দিয়া থাকেন, এরূপ খবর ত অনেকের মুখেই শুনা গিয়াছে। তাহা না-হয় নাই ধরিলাম।

পালির চারিটা গ্রুপ্ (group) এবং ছয়টি ছাত্র; অর্থাৎ গড়ে দেড় জন ছাত্র এক এক শাখায় বিদ্যার্থী

আছেন। ইহাদের দ্রুত ২ (নয়) জন অধ্যাপক মাসে ১৪৭৫ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে কোন কলেজে বা কলেজের বাহিরে বাংলা দেশে বা বাঙালীর দ্বারা কোন গবেষণা হয় নাই বা হইত না, এমন নহে। এখনও কোন কোন কলেজের কোন কোন অধ্যাপক এবং কলেজেব সহিত অসংস্পৃষ্ট অনেক লোক গবেষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ স্থাপিত হওয়ায় গবেষণায় উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং গবেষণা-কার্যে ও নানা-বিদ্যার উচ্চতম শাখার অধ্যাপনায় দেশী অধ্যাপকদের কৃতিত্ব দেখাইবার স্বযোগ বাড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন কোন বিষয়ে পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের কোন কোন অধ্যাপক ও ছাত্র খাটি গবেষণা করিয়াছেন। খাটি জিনিষকে মেকি হইতে পৃথক্ করিয়া রাখা সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই উচিত। যখন কয়েকটা মেকি নমুনা দেখিয়া লোকেব একপ সন্দেহ হইবার কারণ হয়, যে, বুদ্ধি বা সবই মেকি, তখন মেকিটাকে আরও ভাল করিয়া দাগিয়া পৃথক্ করিয়া দেওয়া বেশী আবশ্যক হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তাহা করেন নাই; বরং, কেবল একজনের বেলায় ছাড়া, যাহাদের গবেষণার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের প্রমাণ উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহাদিগকেই তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। উক্তর গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “Hellenism in Ancient India” এবং “India as Known to the Ancient World” বহি দুখানিতে যে পূর্বতন বহু গ্রন্থ হইতে অনেক দীর্ঘ দীর্ঘ অংশ ঋণ-স্বীকার না করিয়া জবজব নকল করা হইয়াছে, তাহা ভারতীয় ও ব্রিটিশ কাগজে প্রদর্শিত হওয়া সত্ত্বেও একটিকে “valuable and erudite work” এবং অল্প-টিকে “illuminating and interesting book” বলা হইয়াছে। উভয় গ্রন্থই যে “plagiarism”-পূর্ণ, তাহা এই প্রকারে চাপা দেওয়া হইয়াছে, এবং গ্রন্থকারের পদোন্নতি হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের নানা বিভাগে কোটি কোটি টাকা

অপব্যয় হয়, তাহা অস্বাভাবিক। কিন্তু টাকার অপব্যয় সর্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর জিনিষ নহে। যাহা বিদ্যা-মন্দির এবং যেখানে উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে দেশের ভবিষ্যৎ ভরসা ছাত্রদের চরিত্র গঠিত হইবে, তাহার বিশ্বদত্ত সর্বপ্রকারে রক্ষিত হওয়া উচিত। তাহা রক্ষিত হইতেছে না। এইজন্য অনেকে যাহাকে চিন্তাহীনভাবে সামান্য ব্যাপার মনে করিতে পারেন, তাহাও সর্বসাধারণের জ্ঞানগোচর হওয়া আবশ্যিক। ঝুড়ি ঝুড়ি পাস এবং রাশি রাশি গবেষণা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়, তাহা হইলেও তাহা দ্বারা চারিত্রিক অধোগতির, দূষিত নৈতিক হাওয়ার, চবিত্তহীনতার প্রশ্রয়-প্রাপ্তির প্রতিকার হইতে পারে না। টাকার অপব্যয়ে, আশ্রিত কুটুম্ব, বা তোষামোদকারীদিগকে দুই-চারিটা চাকরী প্রদানে এবং সহজ পরীক্ষা দ্বারা অনেক ছাত্র পাস করায় অনিষ্ট হইলেও তত অনিষ্ট হয় না, যত অনিষ্ট হয় অচুগ্রহ বা তদ্বিব দ্বারা পরীক্ষার বিশ্বদত্ত নাশে, কোন কোন অধ্যাপকের কাজে অবহেলা করায় বা সম্পূর্ণ ফাঁকি দেওয়াতে, সাহিত্যিক চুরি ও তোষামোদ-কাবিতায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘরাও বন্দোবস্ত

বিশ্ববিদ্যালয়ে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও কুটুম্ব প্রতি অন্ত্য পক্ষপাতের অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। আগে আগে সেকপ দৃষ্টান্ত কিছু দিয়াছি। এখন আর একটি দিতেছি। বিদেশে ছাত্র পাঠাইবার জন্য গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি আছে। কিরূপ ছাত্রেরা এই বৃত্তি পাইতে পারে, তাহা ক্যালেণ্ডারে মুদ্রিত প্রার্থীদের যোগ্যতা সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত নিয়ম হইতে বুঝা যাইবে।

If an applicant has not already passed the Intermediate Examination in Science of this University or the final examination of a recognised School of Arts or Technical or Agricultural College, he must produce with his application proof that he has attained a knowledge of English and Mathematics up to the standard of the Matriculation Examination and of Physics and Chemistry up to the standard of the Intermediate Examination in Science."

অর্থাৎ, প্রার্থীরা যদি আর্ট স্কুল বা কৃষি কলেজ বা টেকনিক্যাল কলেজে পাস করা ছাত্র না হন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়া দরকার, এবং তাঁহাদের দিগকে দেখাইতে হইবে, যে, তাঁহারা বিজ্ঞানে ইন্টার-মীডিয়েট পাস করিয়াছেন বা ততুল্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা মুদ্রিত বর্ণনা-পত্র হইতে দুজন প্রার্থীর যোগ্যতার বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। কাহার নাম দিব না। প্রথমে বৃত্তিপ্রাপ্ত একজনের যোগ্যতার বিষয় উদ্ধৃত করিতেছি।

1. Passed the Matriculation Examination in 1912 in the First Division from a Hare School, obtained a Second Grade Scholarship and stood first in that grade.

2. Passed the I.Sc. Examination in 1914 from the Presidency College with Mathematics, Physics and Chemistry as his optional subjects. Stood ninth in order of merit and first in Physics and obtained the Duff Scholarship and Saradaprasad prize in the subject.

3. Passed the I.A. Examination in History in 1915 as a non-collegiate student and obtained 140 marks out of 200.

4. Passed the B.A. Examination in 1916 from the Presidency College with First Class Honours in Economics.

5. Passed the M.A. Examination in 1918 in Economics, Group B, stood First in the First Class and obtained the University Gold Medal and Prize in the subject.

6. Has been serving as a Professor of Economics in the Scottish Churches College since November, 1918.

ইনি বৈজ্ঞানিক ছাত্র হিসাবে বৃত্তিটির দাবী করেন,

কারণ, ইনি আর্টস্কুলের বা কৃষি বা টেকনিক্যাল কলেজের ছাত্র নহেন। কিন্তু ইনি বিজ্ঞানে ইন্টারমীডিয়েট পাস করার পর বিজ্ঞানের চর্চা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং বৈজ্ঞানিক ছাত্র হিসাবে ইহার দাবী ও যোগ্যতা সমুদয় বি-এসসী ও এম-এসসী পাস কবা প্রার্থীদের চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল। অথচ ইনি বৃত্তি পাইলেন, কিন্তু প্রার্থী অনেক বি-এসসী, এম-এসসী পাইলেন না। তন্মধ্যে, না. বাছিষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণনাপত্রের গোড়াতেই যে প্রার্থীর নাম আছে, তাঁহাব যোগ্যতার বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

Passed Matriculation in the 1st Division (1910)^১

Passed I.Sc. (1912) standing 5th and obtained a Govt. Scholarship, a Duff Scholarship and an S. C. College Scholarship.

Passed B.Sc (1914) with Honours in Physics.

Passed M.Sc. in Physics (1916) standing 2nd in Class I and was awarded the University Silver Medal in Physics and a prize of books worth Rs. 100.

Was awarded a Sir R. B. Ghose Research Scholarship and worked for 2 years in the University College of Science. At present employed as a Lecturer and Demonstrator in Physics in the S. C. College.

এখন, বৈজ্ঞানিক প্রার্থী হিসাবে যোগ্যতাব কে ছিলেন, তাহা সহজেই স্থির করা যাইবে। অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস হইতে যোগ্যতা ঠিক বুঝা যায় না, প্রতিষ্ঠিত লোকদের সাক্ষাৎ পরিচয়-লব্ধ জ্ঞান হইতে বুঝা যায়। অতএব, এরূপ লোকদের সার্টিফিকেটও বিবেচিত হউক। যিনি বৈজ্ঞানিক প্রার্থী হিসাবে বৃত্তি পাইলেন, তাঁহাকে সার্টিফিকেট দিয়া-ছিলেন, রেভারেণ্ড ওয়াট, বেভাবেণ্ড কিড, অধ্যাপক ব্যাবো, অধ্যাপক কষাজী, অধ্যাপক জাকারিয়া, অধ্যাপক গিলক্রিষ্ট, এবং অধ্যাপক ষ্টার্লিং। বেভাবেণ্ড ওয়াট ছাড়া ইহার কেহই বৈজ্ঞানিক নহেন ও কাহাবও

বৈজ্ঞানিক যোগ্যতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে অধিকারী নহেন। যিনি বৃত্তি পান নাই, তাঁহাকে সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন, ডাক্তার স্তার নীলবতন সবকার, অধ্যাপক ও রেজিষ্টার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক পীক, বেভারেণ্ড ওয়াট, অধ্যাপক এম্ সি মহলানবীস, অধ্যাপক এম্ এন্ মৈত্র, অধ্যাপক পী মহলানবীস, এবং অধ্যাপক এন্ সী রায়। ইহার সকলেই বৈজ্ঞানিক।

পাঠকেরা লক্ষ্য করিবেন, যে, যিনি বৃত্তি পাইয়া-ছিলেন, তাঁহার যোগ্যতার প্রত্যেক দফা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণনাপত্রে আলাদা আলাদা নম্বর দিয়া ছাপা হইয়াছে, এবং যাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাহা বাঁকা ইটালিক অক্ষরে ছাপা হইয়াছে;—উদ্ভেদ, যাহাতে এইগুলি সহজেই নির্বাচকদের চোখে পড়ে। এই প্রার্থীদের যোগ্যতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন্ কর্মচারীর আদেশে এবং কেন একপ করিয়া ছাপা হইল? আর কাহারও যোগ্যতার বর্ণনা ত বর্ণনাপত্রে এমন করিয়া ছাপা হয় নাই?

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থপ্রাপ্তি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২২ সালের জুন পর্যন্ত ৫১০ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে বলিয়া ঐ টাকা গবর্ণমেন্টের নিকট প্রার্থনা করেন। শিক্ষামন্ত্রী ২১০ লক্ষ মঞ্জুব করিয়াছেন। তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয় কি প্রকারে অক্ষম হইবে বুঝা গেল না। তবে, এরূপ শুনা গিয়াছিল বটে, যে, আসল ঘাটতি ৫১০ লাখ নহে, বেশী টাকা পাইবার আশায় তাহাকে ফাঁপাইয়া ৫১০ করা হইয়াছিল; কারণ, যোল আনা চাহিলে আট আনা পাইবার আশা থাকে।

যাহা হউক, বাবস্থাপক সভার সভ্যরা যদি এমন কোন প্রমাণ পাইবা থাকেন, যে, এই ২১০ লাখের দ্বারা সকল ঋণ শোধ হইয়া যাইবে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে অপব্যয় নিবন্ধন আবার ঋণ না হয় তদন্তরূপ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা হইলে আড়াই লাখ টাকা মঞ্জুরে তাঁহাবা সম্মত হইয়া ভালই করিয়াছেন। এরূপ কোন প্রমাণ আমরা এখনও দেখি নাই, সুতরাং এ বিষয়ে কিছু বলিতে পারিলাম না।

ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যরাও ঐরূপ প্রমাণ পাইয়াছেন বলিয়া স্পষ্ট ধারণা জন্মিতেছে না। বরং এইরূপই মনে হয়, যে, তাঁহারা কেহ কেহ যেন মনে করিয়াছিলেন, যে, বিশ্ববিদ্যালয় গর্বোদ্ধত, অভাব তাহার দর্প চূর্ণ করা উচিত; এবং এক্ষণে তাহাব মাথাটা নীচ হওয়ায় তাঁহারা খুসি হইয়া দয়া করিয়া কিছু টাকা দিতেছেন। একপ মনোভাবের প্রেরণায় টাকা মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর কিছুই করা উচিত নয়। টাকার অমিতব্যয় বা অসদ্ব্যয় না হইয়া মিতব্যয় ও সদ্ব্যয় হইবে, এইরূপ প্রমাণ লইয়া ও পাইয়া টাকা মঞ্জুর করা উচিত, এবং তাহা না পাইলে মঞ্জুর করা উচিত নয়, সকল বিষয়ে এই নিয়ম অঙ্গসরণীয়।

পূর্বে যে মনোভাবের কথা বলিয়াছি, সকল সভ্যের তাহা ছিল বলিয়া মনে হয় না। দুখানা দৈনিক কাগজ হইতে কাহারও কাহারও কথা উদ্ধৃত করিতেছি। দুঃখের বিষয় অনেক বক্তৃতা একেবারে বাহির হইয়াছে; কয়েকটি অত্যন্ত সংক্ষেপে রিপোর্ট করা হইয়াছে।

Babu Rishindra Nath Sarkar submitted a motion proposing to refuse the grant to the University. In view of the charges of bad administration which had been brought against the University, he declared, the Council were not justified in approving a grant of Rs. 2,50,000 without inquiring into the reasonableness of the demand.

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, বাবু স্বয়ীন্দ্রনাথ সরকারের মনের ভাব একপ ছিল না। রাঘ মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুর বলেন :—

It would have been gracious for Government to form a committee to make an enquiry as to the financial condition of the University. But that was not done and the House felt this as an insult to it. Further, the question arose what guarantee was there that future liabilities would not be again incurred.

ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্রের কথায় মনে হয়, যে, কাহাবো কাহাবো, মনের ভাব পূর্বোক্তিরূপ ছিল। যথা—

Dr. Jatindra Nath Moitra said it seemed to be the desire of some of the members of the Council to see the Vice-Chancellor of the University, who had been referred to as the "autocrat of autocrats", humbled down at their feet.

ইহার আভাস কাহাবো কাহারো কথায় পাওয়া যায়। যথা—

Babu Kishori Mohan Chaudhuri said that since the University authorities had come down and were willing to submit accounts they should also reconsider the situation.

Mr. S. N. Mullick said there was much in the present activities of the Calcutta University which he deplored. He was sorry Mr. Haq raised a question which he ought not to have raised. The University had come down and it was time that they should show that they were relenting. He was sorry to see his dear *alma mater* in the hands of people who did not know how to conduct the University. He would support the grant on the condition that the University behaved better in future and that the Minister would take steps towards its democratisation.

অভিধানে দেখিলাম, to come down এর মানে to be humbled or abased। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের এই অবস্থা হইয়াছে কি না, তাহার প্রমাণ ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যরা পাইয়া থাকিবেন।

শিক্ষামন্ত্রী বাহা বলিয়াছেন, তদনুসারে কাজ হইলে ভবিষ্যতে স্বকল কলিতে পারে। তিনি বলিয়াছেন :—

The University has also informed the Government that it is willing to place financial information before the Government. This decision was first arrived at by the Syndicate and was then confirmed by the Senate. Further, the auditing of the accounts of the University up to June, 1921, is, I understand, almost ready for submission to the Government, and I am informed by the Accountant-General that the audit officers propose to make certain suggestions about the current year's accounts as well. This information, I hope, satisfy the Council that the Government very shortly will be in possession of valuable materials—the audit report and other suggestions of the Accountant-General, and also the views of the Senate—to deal with the matter.

Mr. Mitter concluded by once again assuring the Council that when the views of the University and the audit reports and notes were before him, he would stand by every word that he had uttered in the Council in this connection



নন্দোৎসব

চিত্রকর—আচার্য্য শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডি-লিট, সি-আই-ই

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন সংস্থিতি

শিক্ষামন্ত্রী আরো বলিয়াছেন, যে, দুটি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া আছে; তাহার একটিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থিতি (constitution) পরিবর্তনের ব্যবস্থা আছে। শীতকালে এই আইন ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইবে। আইন যাহাতে ভাল হয়, খসড়া প্রকাশের পর সে চেষ্টা সকলকেই করিতে হইবে। কিন্তু ভাল আইন হইলেই আপনা হইতেই সফল কলিবে ও অকল্যাণ নিবারিত হইবে, এরূপ আশা কেহ করিবেন না। শিক্ষাদান কার্য যাহারা বুঝেন কিম্বা তৎসম্বন্ধে জ্ঞান উপার্জন করিবার জন্ত পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত আছেন, বুদ্ধিমান, কন্দিষ্ট, নিঃস্বার্থ, নিভীক ও স্বাধীন প্রকৃতির এরূপ লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ত খাটিতে রাজী হইলে সফল কলিবে। বর্তমান সময়েও, কেবল চালাকী ও প্রসাদ-বিতরণ দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেহ ক্ষমতাশালী হয় নাই। চিন্তা করিতে, খাটিতে, সময় দিতে হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ

শিক্ষামন্ত্রীর ১লা মার্চের বক্তৃতায় দেখিতে পাই, যে, ১৯২০-র জুনে যে বৎসর শেষ হয়, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের হাতে ৬৮৬২৩ টাকা উদ্ধৃত ছিল এবং অগ্রান্ত বৎসরেও থোক টাকা উদ্ধৃত থাকে। অথচ এই কলেজ বৎসর বৎসর অনেক হাজার টাকা গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে লইয়া থাকে। কিন্তু বিজ্ঞান কলেজের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের তেমন স্নেহ নাই। সেই জন্ত শিক্ষামন্ত্রী বলিতেছেন, যে, তিনি আইন কলেজের জন্ত বরাদ্দ বার্ষিক ৩০০০০ টাকা তাহাকে না দিয়া বিজ্ঞান কলেজকে দেওয়া উচিত কি না বিবেচনা করিবেন।

আইন কলেজে অধ্যাপকের অভাব নাই। কিন্তু ইহাতে আইনজীবীদের কার্য-নির্বাহের পক্ষে আবশ্যক সব রকম শিক্ষা দেওয়া হয় না। তাহা দেওয়া উচিত। সিনিয়রদের এটর্নীদের কাজ ইহাতে না শিখাইবার কোন কারণ নাই। এলাহাবাদের আইন কলেজের মত ইহাতে

অনগ্রকর্তব্য অধ্যাপক নিযুক্ত করা উচিত এবং ইহার অধ্যাপনার সময়ও অগ্রান্ত কলেজের মত করা কর্তব্য।

বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

বাংলা দেশে পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় গ্রন্থকার বলিয়া, শিক্ষাদাতা বলিয়া, দয়ার সাগর বলিয়া, মানুষের মত মানুষ বলিয়া এবং বিধবা-বিবাহের প্রবর্তক বলিয়া পরিচিত। ১৩ই শ্রাবণ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। ঐ দিন প্রতি বৎসর নানাস্থানে নানা সভায় তাঁহার গুণকীর্তন করা হয়। কিন্তু অনেক বক্তা বিধবাবিবাহের কথা একেবারে বাদ দেন, কোথাও বা সামান্যভাবে উহার উল্লেখ হয়। বিধবাবিবাহের প্রচলন বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা কম হইয়াছে। অথচ মনুষ্যোচিত দয়াদর্শের ও জীপুক্রম-নির্কির্শেষে সমান জাতি সামাজিক ব্যবস্থার অনুরোধে উহার প্রচলন আবশ্যক, সহস্র সহস্র নারীর ঐহিক পারত্রিক শারীরিক আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্ত উহার প্রচলন আবশ্যক, সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত উহার প্রচলন আবশ্যক, এবং বঙ্গে হিন্দুজাতির সংখ্যা হ্রাস নিবারণের জন্ত উহার প্রচলন আবশ্যক।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ প্রচলন দ্বারা, বহু-বিবাহ নিবারণ দ্বারা, জীশিক্ষা-বিস্তার দ্বারা এবং আরো কোন কোন উপায়ে নারীজাতির হিতসাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহা অত্যন্ত ক্ষোভ ও লজ্জার বিষয় যে বাঙালীরা বিধবা বিবাহের জাঘাত ও একান্ত আবশ্যকতা বুঝিলেন না। কিন্তু যদি বাঙালী জাতি অগ্র নানা উপায়ে নারী জাতির হিতসাধনে যত্নবান হন, তাহা হইলেও কিছু মঙ্গল হয়, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়।

বিদ্যাসাগর বাণীভবন বিধবা ও অগ্র দূরবস্থাপন্ন মহিলাদের শিক্ষা দ্বারা হিতসাধনের জন্ত স্থাপিত হইয়াছে। ১৩ই শ্রাবণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিসভা যত জায়গায় যতগুলি হইবে, তথায় বিদ্যাসাগর বাণীভবনের জন্ত অর্থসাহায্য সংগৃহীত এবং ১০৫ নং আপার সাকুলার রোড ঠিকানায় সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা অবলা বহু মহাশয়ের নামে

প্রেরিত হইলে, শ্রাদ্ধস্থান সার্থক হইবে। বাণীববনের
জন্ত বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছে। ছাত্রীও পাওয়া গিয়াছে।
অবিলম্বে কার্য আরম্ভ হইবে।

বঙ্গে শিক্ষার জন্ত নূতন সর্বকারী সাহায্য

শিক্ষামন্ত্রী বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্ত
নূতন করিয়া টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। তদ্বিত্ত, বালিকাদের
শিক্ষা; মুসলমানদের শিক্ষা; অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের মধ্যে
শিক্ষার বিস্তার; ব্যায়াম ও ক্রীড়াদি শিক্ষার দ্বারা
দৈহিক উন্নতি; মফঃস্বলে বেসরকারী কলেজসমূহের
কার্যক্ষেত্রের, বিশেষতঃ বিজ্ঞানশিক্ষার দিকে, বিস্তার;
বেআইনী দুর্কার্য করিবার দিকে যাহাদের প্রবৃত্তি,
এরূপ বালকবালিকাদের শিক্ষা; এই-সকলের জন্তও
টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বাঙালী কবিদের মধ্যে ঐহাদিপক্ষে নবীন বলা যাইতে
পারে, তাঁহাদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত চিন্তা ভাব ও
ভাষার সম্পদে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বিদেশী কবিতার
অনুবাদে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার অনুবাদগুলি
মূল কবিতা বলিয়া মনে হয়। সকল প্রকার রস ও সকল
প্রকার ভাবের চিত্তার ও ঘটনার অনুরূপ ছন্দের সৃষ্টি ও
ব্যবহারে, এবং শব্দচয়ন ও শব্দবিছাসে তাঁহার
অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার কবিতায় তাঁহার
অনাড়ম্বর নির্ভীক মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। গদ্য
রচনাতেও তিনি সুদক্ষ ছিলেন। তিনি যত বড় কবি
ছিলেন, মানুষ ছিলেন তাহা অপেক্ষাও বড়। শাস্ত্র
সংঘত পৌরুষ তাঁহার প্রকৃতিতে নিহিত ছিল। যশের
জন্ত ভীড় ঠেলিয়া জনতার সামনে দাঁড়াইবার প্রবৃত্তি
তাঁহার ছিল না; আত্মগোপন তাঁহার চরিত্রের সৌন্দর্য
বৃদ্ধি করিয়াছিল। কিন্তু যশ তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল।
তিনি যে বহুভাষাবিং পণ্ডিত ছিলেন, তাহা অল্প লোকেই
জানিত। তাঁহার জাতি স্বাধীন হয়, মানুষের সর্ববিধ
সদৃশ্যে অলঙ্কৃত হয়, সোজা হইয়া মাথা উচু করিয়া



সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মানব-সমাজে দাঁড়াইতে পারে, ইহা তাঁহার জ্ঞানত বাননা ছিল। তাঁহার জীবিতকালে এই ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। কিন্তু তাঁহার কবিতায় যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির সাহায্য হইবে।

তাঁহার প্রবল স্বাভাৱিকতা তাঁহাকে সংকীর্ণমনা করে নাই; তাঁহার নানা দেশের কবিতার অনুবাদেই বুঝা যায়, যে তিনি সকল দেশের লোকের সহিত কিরূপ আত্মীয়তা অহত্ব করিতেন!

তাঁহার অকালমৃত্যুতে তাঁহার অসম্পূর্ণ ও বন্ধুগণ মর্শ্মহত হইয়াছেন, এবং তাঁহার স্বদেশবাসীগণ ব্যথিত হইয়াছেন।

মৃত্যুর ঠিক এক মাস আগে তাঁর বাড়ীতে শ্রীমুক্ত চাকচন্দ্র রায়ের তোলা সত্যেন্দ্রনাথের জীবিত অবস্থার শেব ফটোগ্রাফ হইতে প্রস্তুত একটি ছবি আমরা এখানে মুদ্রিত করিলাম।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ভাষা ও শিক্ষণীয় বিষয়

স্থির হইয়াছে, যে, অতঃপর প্রবেশিকা পরীক্ষার শিক্ষণীয় ইংরেজী ছাড়া আর সব বিষয় দেশভাষার সাহায্যে শিখিতে হইবে, এবং সেই-সকল বিষয়ে পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দেশভাষায় দিতে হইবে। ইংরেজীও একটি অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয় থাকিবে।

এইরূপ পরিবর্তন ভাল হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজী খুব ভাল করিয়া শিখাইতে হইবে, তাহা শিখাইবার উৎকৃষ্টতম প্রণালী শিক্ষকদিগের শিখিতে হইবে। যে-সব জ্ঞানগায় ইংরেজী উচ্চারণ ও ইংরেজী কথোপকথন ভাল করিয়া শিখিবার অল্প উৎকৃষ্ট উপায় নাই, তথায় কোনো-গ্রাম বা গ্রামোঞ্চানের সাহায্যে তাহা শিখাইতে হইবে। ইহার উপযোগী বেকর্ড চেষ্টা করিলেই পাওয়া যাইবে। যে-সকল শ্রেণীতে ইংরেজী শিখান হইবে, তাহার প্রত্যেকটিতে ইংরেজী পড়া ও ইংরেজী বলার পরীক্ষা লইতে হইবে। আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি, যে, বাঙালী ছাত্র শিক্ষক ও অধ্যাপকদের চেয়ে অল্প অনেক প্রদেশের ছাত্র শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা অবাধে তাত্তাতিড়ি শুদ্ধ ও শুদ্ধ ইংরেজী বলিতে পারে।

মাতৃভাষায় নানাবিধ শিক্ষা দিবার চেষ্টায় আপাততঃ অনেক অসুবিধা ও অনিষ্টও হইতে পারে। কিন্তু এই প্রণালীই যখন স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত, তখন ইহার প্রবর্তন করিয়া অসুবিধা ও অনিষ্ট পরিহার করিবার চেষ্টাই করা কর্তব্য। বাংলা পাঠ্যপুস্তক-সকলের বিষয়-বিস্তার, লিখন-প্রণালী, ছাপা ও কাগজ, চিত্র, মাপ্ প্রভৃতি ইংরেজী উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক সকলের মত কবিতা হইবে। তা ছাড়া, যাহা লেখা হইবে, তাহা যেন সেকলে না হইয়া, হালনাগাদি লব্ধ জ্ঞান অনুযায়ী হয়, তাহা দেখিতে হইবে। আগ্রা সাধারণতঃ কেবল ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক-সমূহ দেখি। আমেরিকান, ফ্রেঞ্চ ও জার্মেন পাঠ্যপুস্তক-সকলও আনাইয়া দেখা কর্তব্য। ফরাসী হইতে অনুবাদিত গ্যানোর পদার্থবিজ্ঞান ও ডেশনেলের পদার্থবিজ্ঞান আগ্রা অনেকে পড়িয়াছি। ঠিক ওরূপ বহি ইংবেজীতে ছিল না। নানা বিষয়ে বাংলা পাঠ্যপুস্তক এখন চলিবে। স্বজনপোষণ, আশ্রিতপোষণ, উৎকোচের বিনিময়ে নিকৃষ্ট পুস্তক নির্বাচন, প্রভৃতি কি প্রকারে নিবারণ করা যায়, এখন হইতে তাহার উপায় চিন্তা করিতে হইবে।

দৈনিক কাগজ-সকলে প্রবেশিকার অবশ্য-শিক্ষণীয় ও বৈকল্পিক বিষয়-সকলের যে তালিকা বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইতিহাস নাই। ইহা কি কাগজগুলির ভুল, না ইতিহাস সত্যসত্যই বাদ পড়িয়াছে? ভূগোল বাদ দিলে মানুষকে স্থান সম্বন্ধে সংকীর্ণমনা কুপমগুণ করা হয়, ইতিহাস বাদ দিলে মানুষকে কাল সম্বন্ধে সংকীর্ণমনা ও কুপমগুণ করা হয়। জাতীয় নৈরাশ্রের প্রধান প্রতিবেদক ও ঐশ্বর্য ইতিহাস। ব্যক্তিগত ও জাতীয় আচরণ সম্বন্ধে অমূল্য উপদেশ ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়। অতীতের ভ্রম, কুপ্রথা, কুসংস্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে সুপথে চলিতে হইলে ইতিহাস আমাদের প্রধান সহায়। মিথ্যা ইতিহাসের অনিষ্টকারিতা জানি, কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত অনেক ইতিহাসের ভ্রম যে সংশোধন করা যাইবেই না, ইহা কেন মানিয়া লইব?

একটি প্রস্তাব উঠিয়াছিল, যে, প্রবেশিকা পরীক্ষার

দিগকে এই সার্টিফিকেট দেখাইতে হইবে, যে, তাহার নিয়মিতরূপ দৈনিক শিক্ষা লাভ করিয়াছে। ইহা গৃহীত হয় নাই। কলিকাতার জন্ম ব্যবস্থা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া মকঃস্বলের সকল স্কুলের জন্ম এই নিয়ম এখন করিলে ভাল হইত। জানি, দেশের দারিদ্র্য নিবারণ দ্বারা পুষ্টিক যথেষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা এবং ম্যালেরিয়া বিনাশ না করিলে ছাত্রদের স্বাস্থ্যের সম্যক উন্নতি হইবে না, কিন্তু নিষমিত অঙ্গচালনের ব্যবস্থা থাকিলে কিছু উন্নতি হইত। এবং শরীর পটু হইলে মনের জোব ও সাহসও কিছু বাড়িত।

দমন নীতি

আইনভঙ্গ নিবারণ করা গবর্ণমেন্টের একটি কাজ। এইজন্ম দমননীতি অবলম্বন করা কখন কখন আবশ্যক। গবর্ণমেন্ট যে জাতিব যে মানুষগুলির সমষ্টি, তাহাদের চরিত্র ও প্রয়োজন অনুসারে আইন ভাল হয়, মন্দও হয়। সুতরাং কোন কাজ আইনসম্মত হইলেই তাহা নির্দোষ, এবং আইনবিরুদ্ধ হইলেই তাহা মন্দ হয় না। তথাপি খুব খারাপ আইন অনুসারেও যদি দমন ও দলন কার্য চলে, তাহা তত অনিষ্টকর ও ভীষণ হয় না, শাসকদের স্বেচ্ছাচারিত ও বেআইনী দলন ও দমন কার্য যত অনিষ্টকর ও ভীষণ হয়। কারণ আইন খুব খারাপ হইলেও তাহাতে শাস্তির প্রকার ও পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু রাজকর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারিত প্রকার, মাত্রা, প্রণালী, পরিমাণ, কিছুই নির্দিষ্ট নাই, থাকিতে পারে না।

বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে আইনসম্মত ও বেআইনী উভয় প্রকার দলন ও দমন কার্য চলিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এক প্রকার দলন কার্যের উল্লেখ করিতেছি। কংগ্রেসকে গবর্ণমেন্ট কোন আইন দ্বারা বা অহুজ্জা দ্বারা বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করেন নাই; এই হেতু এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টের ব্যবহার সভ্যজগতের নিকট লোফাকাঙ্ক্ষণ আছে। চব্বা ও হাতের তাঁতের দ্বারা ধন্দ্র উৎপাদন, এবং তাহা বিক্রয় ও পবিধান গবর্ণমেন্ট কর্তৃক আইনবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হয় নাই। তাহাতেও গবর্ণমেন্টের আচরণের বহিরা-

বরণের শোভনতা রক্ষিত আছে। কিন্তু রাজকর্মচারীরা নানাস্থানে কংগ্রেস-কমিটির আফিস অন্বেষণ ও লণ্ডভণ্ড করিয়া, ধন্দ্র উৎপাদন প্রচলন আদি সম্পূর্ণ আইনসম্মত কাজের ব্যবস্থাপকদিগকে কোন-না-কোন অছিলায় দণ্ডিত করিয়া, কংগ্রেস-পক্ষের খবরের-কাগজওয়ালাদিগকে কোন-না-কোন প্রকারে দণ্ডিত করিয়া, এবং আরও কোন কোন উপায়ে কংগ্রেসকে ও উহাব জাতিগঠনমূলক আইনসম্মত কার্যাবলীকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অপ্রতিহত ক্ষমতা-শালী শাসকদের রীতি অবস্থা-বিশেষে পৃথিবীর সর্বত্র এইরূপ হইয়া আসিতেছে বটে। দুঃখের বিষয়, রাজকর্মচারীরা ইহাব অনিষ্টকারিতা এবং পরিণামে ব্যর্থতা বুঝিতে পারেন নাই। তদপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই, যে, আমাদের স্বদেশবাসী বহু রাজনৈতিকও ইহার প্রতিবাদ করেন না, এবং বহু দৈনিক কাগজও এসকলের সংবাদ পর্যন্ত মুদ্রিত করেন না।

দলন ও দমনের এই পথ বিপ্লব উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহা সম্ভবতঃ কর্তৃপক্ষের অগোচর নহে। কিন্তু তাহারা বোধ হয় ইহা জানিয়াও এই পথ এই কারণে পরিত্যাগ করেন নাই, যে, সশস্ত্র বিপ্লবের সামর্থ্য ও যথেষ্ট প্রবল প্রবৃত্তি ভারতবর্ষের নাই, এবং শান্ত্র বিপ্লব-চেষ্টা তাহারা সহজেই দমন ও নিফল করিতে পারিবেন। আমাদেরও ধারণা সেইরূপ বটে। অধিকন্তু আমরা বিশ্বাস করি, যে, শাসকদের জাতির, শাসন-যন্ত্রের ও শাসনপ্রণালীর আমূল পরিবর্তনের নিরঞ্জ ও সাত্তিক চেষ্টা ব্যর্থ করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে তত সহজ নয়। এইজন্ম মনে করি, দেশের লোক এই পথে অটল থাকিলে সিদ্ধকাম হইবেন।

কিন্তু তাহার জন্ম সর্বাপ্রাণে কোন কোন জাতি শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা চিন্তায কল্পনায় কথায় ও কাজে ত্যাগ করিতে হইবে। পবম্পরের প্রতি হিংসা ঘেঘ ছাড়িতে হইবে, ইহাও সত্য। কিন্তু তাহারও আগে অবজ্ঞাকে ছাড়িতে হইবে। শত্রুতা মারামারি কাটাকাটি অপেক্ষাও অবজ্ঞা মর্মে মর্মে বেশী বিধে। শত্রুতা মারামারি কাটাকাটি সমানে সমানে হয়, কিন্তু

যাহাকে অবজ্ঞা কর, তাহাকে যে মানুষ বলিঘাই মনে কর না। এই ভাব অসহ্য।

আর এক প্রকারের জাতিভেদ রাজনৈতিক জাতিভেদ; তাহাও বর্জন করিতে হইবে। সরল আন্তরিক বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া মানুষ অসহযোগী হইতে পারে, সহযোগী মডারেটও হইতে পারে, কিম্বা ঠিক কোন দলেরই না হইতে পারে। এই তিন প্রকার মানুষের দ্বারাই কোন-না-কোন রকমের লোকহিত হইতে পারে। দলেব ছাপ্ দেখিয়া মানুষের বিচার করা উচিত নয়; আচরণ দেখিয়া বিচার করা উচিত। স্বার্থপর নীচাশয় তোষামোদকারী লোকেরা নিন্দার যোগ্য। অস্ত্র সকলেরও কথার ও কাজের সমালোচনা অবশ্যই হইতে পারে ও হওয়া উচিত; কিন্তু দল বা দলবহির্ভূততা লক্ষ্য করিয়া কাহারও অবিচারিত নিন্দা অমুচিত।

মনে রাখিতে হইবে, অহিংসার মানে শুধু এ নয়, যে, আমরা অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা ইংরেজকে তাড়াইতে বা তাহার অনিষ্ট করিতে চাহিব না; অহিংসার অর্থ ইহাও বটে, যে, স্বদেশবাসী ও বিদেশী কাহারও প্রতি মনেও হিংসার ভাব পোষণ করিব না। এই আদর্শের অমুসরণ অসম্ভব মনে হইতে পারে। কিন্তু সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রকৃতিই এইরূপ, যে, মানুষ ক্রমে ক্রমে সাধনা দ্বারা অধিকতর পরিমাণে তাহাদেব অমুগামী হয়।

“মুক্তধারা”র জার্মেন সমালোচনা

ভারতবর্ষেব বাহিরে কোন কোন দেশে “প্রবাসী”র গ্রাহক ও পাঠক আছে। বৈশাখ মাসেব “প্রবাসী” এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে বিদেশে প্রেরিত হয়। উহা মে মাসে জার্মেনী পৌছে। ২৬শে মে তারিখের বার্লিনের প্রধান সংবাদপত্র “Vossische Zeitung” নামক কাগজে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ততম অধ্যাপক ডাক্তার হেন্সুথ ফন্ প্রাসেনাপ্ “প্রবাসী”তে প্রকাশিত “মুক্তধারা”র দীর্ঘ সমালোচনা করেন। তিনি সংস্কৃতের অধ্যাপক, বাংলা জানেন ও পড়েন। স্বপূর্ব বাংলাদেশের একখান

মাসিক কাগজে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেব একটি নাটক বাহির হইয়া তাহা জার্মেনীতে পৌঁছিবার কয়েকদিন পরেই জার্মেনীর একখানি প্রধান কাগজে তাহার বিস্তৃত সমালোচনা বাহির হওয়া একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির পরিচায়ক, অন্যদিকে তেমনি জার্মেন জাতিয় জাতিবর্গভাষানির্কিশেষে বিশ্বনাহিত্যাহু-রাগেরও পরিচায়ক। অধ্যাপক প্রাসেনাপের জার্মেন সমালোচনার ইংরেজী অনুবাদ মর্ডান রিভিউয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এখানে মূল জার্মেন সমালোচনাব প্রথম কয়েক পংক্তির ছোট ফোটোগ্রাফিক প্রতিলিপি মুদ্রিত করিতেছি।

Mukta-dhārā.

Das neue Drama Rabindranath Tagores.

Von

Dr. Helmuth v. Glasenapp,

Privatdozent an der Universitt Berlin.

Ueber ein neues Werk des indischen Dichters, das bisher noch in keiner europischen Sprache vorliegt untersucht unser als Angore-Ubersetzer bekannter Mitarbeiter:

Die in Kalkutta erscheinende Monatszeitschrift „Prabsi“ (Der Wanderer) verffentlicht in ihrer April-Mai-Nummer den bengalischen Originaltext eines neuen Dramas von Rabindranath Tagore. Das Stck fhrt den Namen „Mukta-dhārā“, d. h. der „Frei-Strme“, nach der symbolischen Bezeichnung eines groen Wasserfalls, der im Mittelpunkt der Handlung steht und vor dem sich alle Szenen abspielen.

Die zugrundeliegende Fabel des Dramas ist kurz folgende: Vishv, der Baumeister des Knigs Ranabsi von Uttarakt, hat nach funfunzwanzigjhriger Arbeit eine groe Clauanlage fertiggestellt, welche es ermglicht, die Wsser der Mukta-dhār aufzuhalten, so da diese nicht nach dem Uttarakt freibeweglichen, aber oft aufwssigen Gebiete von Schwatara gelngen knnen. Der Knig hofft durch Vorenthaltung des Wssers die Bewohner von Schwatara in Zukunft zum Gehorsam zu zwingen. Die Unbefriedigung der Wsserleute soll durch eine Einweihungsfeier in dem unmittelbar in der Nhe des Wasserfalls gelegenen Schwatara-Tempel festlich begangen werden. Whrend die Wsserleute des Tempels einen Lobgesang zu Ehren ihres Gottes rben lassen, tanzen die per-

“মুক্তধারা” পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়

মনসী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনে বাংলাদেশ একজন অনাড়ম্বর উদারপ্রকৃতি জ্ঞানী সেবকেব সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। তিনি এডুকেশন গেজেট সম্পাদন করিতেন। এবং তাহাতে দলেব বিচার না

করিয়া, উদারভাবে নানা পত্রিকা হইতে প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিতেন। তিনি সাতিশয় পিতৃভক্ত ছিলেন এবং পিতার আদর্শ অনুসারে জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দু আদর্শ যে মহিলাদের উচ্চশিক্ষার বিরোধী নহে, তাহার প্রমাণ তিনি নিজের জীবনে দিয়া গিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ও শ্রীমতী অম্বরূপা দেবী তাঁহার কন্যা। তাঁহার যত্নে তাঁহারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম ও বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতীর সংস্থিতিপত্র (constitution) ছাপা হইয়া রেজিষ্ট্রি হইয়া গিয়াছে। ইহার কাজ আগে হইতেই চলিতেছিল। এখন সংস্থিতি অনুসারে চলিতে থাকিবে।

“জাতীয় শিক্ষা” কথা দুটি নানা জনে নানা অর্থে ব্যবহার করেন। কিন্তু যিনি যে-অর্থেই করুন, সে শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা নামের যোগ্য হইতে পারে না, যাহাতে অন্ততঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি লক্ষণ না থাকিবে।

আমাদের দেশের বাবু লোকেরা জাতির প্রধান অংশ নহে, কেবল তাহাদিগকে লইয়াই জাতি গঠিত নহেই। যাহারা চাষ করিয়া কুলি-মজুরের কাজ করিয়া বা কোন প্রকার কারিগরী মিস্ত্রীগিরি করিয়া ধায়, তাহারাই জাতির প্রধান অংশ। তাহাদিগকে বাদ দিয়া জাতি বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। এই যে অধিকাংশ শ্রমী ও অপেক্ষাকৃত দুঃখী ও গবীব লোক, তাহাদের জীবনের ও জীবিকার উপায়ের সহিত যে শিক্ষার সম্পর্ক নাই, তাহা জাতীয় শিক্ষা নহে। ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম ও বিশ্বভারতীতে চতুষ্পার্শ্বের গ্রাম্য জীবনের ও জীবিকার সহিত সম্পর্ক আছে। এখানে চাষ ও কষেক প্রকার কারিগরীর কার্যগত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আবার “শান্তিনিকেতন” পত্রিকা হইতে তাহার কিছু দৃষ্টান্ত দিতেছি। স্বরূপে বিশ্বভারতীর কৃষি বিভাগে চন্দ্রশিল্প আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

“ছাত্রদের মধ্যে শ্রীমান কুলদাপ্রসাদ সেন এই বিষয়ে বিশেষভাবে

পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। নিকটবর্ত্তী মৌদপুর গ্রামের তিনজন মুণ্ড ও বিশেষ আগ্রহের সহিত এক মাস শিক্ষালাভ করিয়া এই কাজে পাকা হইয়াছে। বর্ত্তমানে কৃষিবিভাগে বারোটি ছাত্র আছে। তাহাদের প্রত্যেককে নিজের স্বতন্ত্র জমি দেওয়া হইয়াছে। সেই জমি তাহারা নিজের হাতে প্রস্তুত করিয়া তাহাতে চিনে বাদাম, বিলাতি বেগুন, বববটি, ও মুলার বাঁচ লাগাইয়াছে।.....ছুতাবেব কাজেরও ক্রমোন্নতি হইতেছে। সম্প্রতি ছাত্রেরা নুতন বৃষ্টি পাইয়া কয়েক দিন চাষের কাজে ব্যস্ত আছে। তাহাদের জমির কাজ একটু কমিলেই তাহারা অন্যান্য কাজ আরম্ভ করিতে পারিবে।”

ছাত্রেরা পার্শ্ববর্ত্তী সাঁওতাল ও অগ্রান্ত সাধারণ লোকদিগকে লেখাপড়া ও অগ্রান্ত শিক্ষা দিয়া থাকে, এবং তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা করে।

ভারতবর্ষের লোকদের সাধনাশ্রমে ও প্রতিভায় যে যে বিজ্ঞা ও ধর্মরূপ সভ্যতার জন্ম ও উন্নতি হইয়াছে, তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ না থাকিলে কোন শিক্ষা-প্রণালী জাতীয় হইতে পারে না। বিশ্বভারতীতে এরূপ যোগ আছে।

আমাদিগকে সমুদয় মানবজাতির সহিত যোগ রাখিয়া তাহাদের নিকট হইতে শিখিতে হইবে ও তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে। বিশ্বভারতীতে এই আদান-প্রদানেরও ব্যবস্থা আছে। ইহা এই প্রতিষ্ঠানের যেমন জাতীয় দিক, তেমনি আন্তর্জাতিক দিকও বটে। ভারতবর্ষকে বাহির হইতে এখন বিশেষ করিয়া বিজ্ঞান এবং তাহার ব্যবহারিক প্রয়োগ শিখিতে হইবে। শৈবোক্ত বিষয়েও যে দৃষ্টি আছে, তাহার একটাদৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি।

গ্রীষ্মকালে এখানে বড় জলাভাব হয় বলিয়া আশ্রমে দেড় শ’ ফুট এবং হকলে আর দু’ শ’ ফুট মাটি মৃত্তিকাভেদন যন্ত্রের সাহায্যে খনন করা হইয়াছে। বিস্তৃত নীচে, পাথরের মত শক্ত মাটি বলিয়া কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। খনন করিবার বস্ত্রটি দিব্যরাজি চালাইবার জন্য বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও ছাত্র অনেকেই অন্তর্য্যস্তভাবে দিনরাত্রি কাজ করিয়াছিলেন।

নানা দেশের ও নানা ভাষার পুস্তক সংগ্রহ বিশ্বভারতীতে যেমন হইতেছে, এমন ভারতের আর কোথাও হইতেছে কি না সম্ভেদ। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আনাসাকী কয়েকখানি বহুমূল্য ছলভ চীনা ও জাপানী পুস্তক প্রত্যাগারে দান করিয়াছেন। সাংহাই হইতে আমবা সমগ্র চীন জিপটিক (আর চাবণত গ্রন্থ) উপহাব পাইয়াছি। করানী দেশ হইতে বিশ্বভারতী বহুপুস্তক বর্ত্তমান করানী সাহিত্য সঙ্কলীর বহু পুস্তক পাঠাইয়াছেন। জাপানীতে গুরুদেবের জন্মদিনের উৎসবে যে-সব পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল, সেগুলিও হাপুর্গ হইতে প্রেরিত হইয়াছে।

বিশ্ভারতীতে জৈন সাহিত্য ও ধর্ম আন্দোলনের জন্য জিয়াপরের শ্রীযুক্ত অমরচাঁদ বোধরা, কলিকাতার শ্রীযুক্ত পুরণচাঁদ নাহার ও তদীয় পুত্র শ্রীমান পৃথ্বী সিং এবং ভাণ্ডনগর, কাটিবাকের ‘ষশোবিক্রম গ্রন্থমালায়’ প্রকাশক অনেকগুলি জৈন গ্রন্থ দান করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন।

তত্পরি অধ্যাপক সিল্ভা লেভি, ডক্টর কুমারী টেলা ক্রামরিশ, অধ্যাপক ভিক্টরনিট্‌স্ প্রভৃতি বিদ্বয়গুলীর সমাবেশ।

এখানে অন্তান্ত স্কুল-কলেজের মত সাধারণ শিক্ষিতব্য বিষয়ও শিখান হয়। অধিকন্তু সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা শিখান হয়।

সংবাদ প্রকাশে বিপদ

“অসমিয়া” কাগজে যে অত্যাচারের সংবাদ বাহির হয়, ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ তদন্ত না করিয়াই তৎসম্বন্ধে তদন্তের এই রিপোর্ট দেন যে উহা মিথ্যা। সুতরাং ঐ সংবাদ প্রকাশ অপরাধে যে ঐ কাগজের সম্পাদক অন্তায়রূপে দণ্ডিত হইবেন, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে।

রুশিয়ার কে একজন লোক বলিল, যে, সে বহু লক্ষ টাকা ভারতবর্ষে বিদ্রোহ ঘটাইবার জন্য পাঠাইয়াছে, অমনি, যুল টেলিগ্রামে গান্ধীর নাম না থাকে সত্ত্বেও, অনেক এংলোইণ্ডিয়ান কাগজ লিখিল, যে, ঐ টাকা গান্ধী কিংবা তাঁহার দলের লোকদিগকে দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে কোন দোষ হইল না। কিন্তু ডেপুটী কমিশনার কিড্‌ মীটিং ভাঙ্গিতে গিয়া শ্রীমতী হেমলিনী ঘোষকে প্রহার করিয়াছেন, অহুসঙ্কানের পর সার্ভেণ্ট্‌ এইরূপ সংবাদ প্রকাশ করায় উহার সম্পাদক ও প্রিন্টারের দণ্ড হইল। বিচারকের মতে সার্ভেণ্ট্‌ যথেষ্ট অহুসঙ্কান করেন নাই ও সাবধান হন নাই। কিন্তু পৃথিবীর কোথাও কোন কাগজ নিজের নিজের আদালত বসাইয়া উভয়পক্ষে উকীল লাগাইয়া অনেক দিন সপ্তাহ বা মাসের পর সংবাদ ছাপেন না। সকলে যাহা করে, সার্ভেণ্ট্‌ তাহা অপেক্ষা তাড়াতাড়ি করেন নাই বা অসাবধান হন নাই। কিডের বিরুদ্ধে তাঁহার কোন বিদ্রোহও ছিল না। কিডের কথা যে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নহে, বিচারকও স্বয়ং তাহা বলিয়াছেন। সার্ভেণ্টের শাস্তি ত্রায়সঙ্গত হয় নাই, এবং কিড্‌ যে-মানের হানি হইয়াছে বলিয়া নালিশ করিয়াছিলেন, তাহাও প্রতিষ্ঠিত বা বর্জিত হয় নাই।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

ব্যবস্থাপক সভার অনেকে বেতন চান। অনেক দেশে এরূপ রীতি আছে বটে। কিন্তু সে-সব স্বাধীন দেশ, তথায় প্রতিনিধিদের বাস্তবিক ক্ষমতা আছে, এবং অনেক শ্রমজীবীও তথায় প্রতিনিধি হয়। বাংলা দেশ আগে এরূপ হউক, তখন বেতনের কথা উঠিবে। এখন জৈন করিলে আমরা মেকি পাল্‌মেণ্টের মেকি প্রতিনিধি-দিগকে আমাদের দেশের লোকদের গড়পড়তা আয়ের অনুপাতে অল্প কিছু বেতন মেকি টাকায় দিবার ব্যবস্থা করিতে বলিব। যেখানে মুখে ছিপি আঁটিয়া দিয়া হাত তুলাইয়া এতগুলো প্রস্তাবের ভিজ্জী ডিসমিস্‌ হয়, সেখানে এই গুরুতর কর্তব্য করিবার জন্য বেতনের দাবী কেন করা হয়? উত্তর বোধ হয় এই, যে, কর্তারাও ত বেশী কিছু না করিয়া বহু টাকা পান, আমরা কিছু না পাইব কেন?

“সঞ্জীবনী”র ভ্রম

গত সপ্তাহের “সঞ্জীবনী” কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মচারীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, যে, “তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সংবাদ প্রবাসী-সম্পাদককে জানাইয়া ছিলেন। প্রবাসীতে তৎসম্বন্ধে খুব প্রদাহকারী প্রবন্ধ প্রকাশিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের নিন্দা ঘোষিত হইয়াছিল।” ইহা মিথ্যা কথা। ইহাও সত্য নহে, যে, প্রবাসীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা অল্প কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সম্বন্ধে “খুব প্রদাহকারী” প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, বা হইয়াছিল। “খুব প্রদাহকারী” প্রবন্ধ প্রকাশ করা প্রবাসীর রীতি নহে। “প্রবাসী”তে প্রকাশিত কোন প্রবন্ধটিকে “সঞ্জীবনী” “খুব প্রদাহকারী” বলিয়াছেন, তাহা তিনি নির্দেশ করেন। “প্রদাহকারী” বলিতে আমরা “ইনফ্লামেটরী” (inflammatory) বুঝিয়া থাকি। “সঞ্জীবনী” কি অর্থে ঐ কথা ব্যবহার করিয়াছেন, জানিতে ইচ্ছা করি। উক্ত কর্মচারী মহাশয়ের “পদচ্যুতি” হইয়াছে, কিংবা তিনি আমাদের দিগকে কোন সংবাদ দিয়াছিলেন, ইহাও সত্য নহে।

জৈলে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি ব্যবহার

রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত অনেক ব্যক্তির প্রতি

নিষ্ঠুর ও বর্বর ব্যবহারের যে-সব বৃত্তান্ত কাগজে বাহির হয়, তাহার তুলনায় মহাত্মা গান্ধীর প্রতি ব্যবহার ভাল হইতেছে বলিতে হয়। কিন্তু উননের আগুনের চেয়ে তপ্ত খোলা ঠাণ্ডা বলিয়া বাস্তবিক উহা ঠাণ্ডা নয়। খবরের কাগজে সম্প্রতি এই খবর বাহির হইয়াছে, যে, মহাত্মা গান্ধীকে খবরের কাগজ পড়িতে দেওয়া হয় না, এবং তাঁহাকে রাজ্যে প্রদীপ দেওয়া হয় না। তাঁহার বিনাশ্রমে কারাদণ্ড হইয়াছে। তাহার মানে এই যে, তাঁহাকে কেবল আটক করিয়া রাখা হইবে, যাহাতে তিনি বক্তৃতা, কথোপকথন বা লেখা দ্বারা দেশের লোকদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে না পারেন। তাঁহাকে কোন প্রকার মানসিক বা শারীরিক দণ্ড দিবার কথা নাই। গবর্ণমেন্ট তাঁহার শরীরের খোরাক দিতে যেমন বাধ্য, মনের খোরাক দিতেও তেমন বাধ্য। জগতের সংবাদ না পাইলে সভ্য লোকদের মন ঠিক থাকিতে পারে না; বিশেষতঃ গান্ধীর মত লোকের। সুতরাং তাঁহাকে খবরের কাগজ দেওয়া উচিত। সেকালে অনেক দেশে রাজনৈতিক বন্দীদের চোখ তুলিয়া ফেলা হইত। গান্ধীকে রাজ্যে প্রদীপ না দেওয়ায় ইণ্ডিয়ান সোসাইল্ রিফর্মারস সেই কথা মনে পড়িয়াছে। অন্ধ করিয়া দেওয়া ও প্রদীপ না দেওয়া এক জিনিষ নহে, কিন্তু প্রত্যহ কিছু সময়ের জন্ত উভয়ের ফল কতকটা এক রকম হয় বটে।

শহরের চাকর-চাকরানী

কলিকাতার মত বড় শহরের হাজার হাজার চাকর বামুন চাকরানী বামনীর নৈতিক অবস্থা কাহারো অবিদিত নাই। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে যে ইহাদের প্রভূত মঙ্গল হয়, সমাজের হাওয়া পবিত্রতর হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদের মধ্যে অবৈধ সম্বন্ধ ঘটিতেছে, কিন্তু বৈধ সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে যে উত্তম সাহস ও লোক-হিতৈষণার প্রয়োজন, বঙ্গে তাহা নাই।

মুক্তধারা

(জার্মান সমালোচনা)

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নবতন নাটক মুক্তধারার একটি সমালোচনা জার্মানীর সদর শহর বার্লিন হইতে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র 'ফোদিশ্ ট্‌সাইটুং' এর ১৯২২ সালের ২৬

হসরৎ মোহানী

বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারে স্থির হইয়াছে যে মোহানী হসরৎ মোহানী রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে কাহাকেও উত্তেজিত বা উৎসাহিত করেন নাই। সত্য—ও জায়ের জয় হইয়াছে, স্থূপের বিষয়।

কলিকাতায় খানাতল্লাসী

কয়েকদিন পূর্বে কলিকাতার কয়েকটি খবরের কাগজের আফিস ও বহির দোকানে পুলিশ খানাতল্লাসী করিয়া কিছু পায় নাই। সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা স্বাধীনতালাভ-প্রয়াসী ভারতীয়দের কোন কোন পুস্তিকা ও কাগজ বিদেশ হইতে এদেশে ডাকে আসিয়া থাকে। পুলিশ তাহার খোঁজ করিতেছিল। মজা গন্দ নয়। খবরের কাগজ-ওয়ালারা ও পুস্তকবিক্রেতারা এসব জিনিষ অর্ডার দিয়া আমদানী করে না, তাহাদের নিজের জাহাজে ও রেল ও নিজের ডাক বিভাগ দ্বারা এগুলি আসে না। গবর্ণমেন্ট না জানিয়া এগুলি বহন করিয়া আনা ইথা বিতরণ করেন, এবং তাহার পর আবার খানাতল্লাসীও করিতেছেন। গোয়েন্দারা লোকের ঘরে গোপনে আফিস রাখিয়া দিয়া তাহার খানাতল্লাসী করায়। ইহা তাহারা ইচ্ছাপূর্বক জানিয়া গুলিয়া করে। পুলিশ অবশ্য ঐ বিদেশী কাগজ-সকল ইচ্ছা করিয়া কাহাবো ঘরে ফেলিয়া দেয় না; কিন্তু সেগুলি আসে ত সরকারী ডাক বিভাগের মাধ্যমেই? আসাটাই বন্ধ কর না কেন?

বেথুন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল

মিস্‌ জেনো ও মিস্‌ রাইট বেথুন কলেজের কাজ ভাল করিয়া চালাইতে পারেন নাই। মিস্‌ রাইট চলিয়া যাইবেন, শেনো যাইতেছে। তিনি গেলে যোগ্যতম বাঙালী মহিলাকে এই কাজ দিয়া শিক্ষামন্ত্রী পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ঠিক কাজ হয়।

“বালিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ববীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলীর জ্ঞানান অম্ববাদক বলিয়া বিখ্যাত ডক্টর হেলমুট ফন্ গ্লাসেনাপ্ আমাদের পত্রিকার লেখক। তিনি আমাদের সংবাদ দিচ্ছিলেন যে ভারত-কবির একটি নতুন নাটক প্রকাশিত হইয়াছে যাহা এ পর্যন্ত কোনো যুরোপীয় ভাষায় অম্ববাদিত হয় নাই। তিনি সেই নাটক সম্বন্ধে আমাদের কাছে নিম্নলিখিত বিবরণটি পাঠাইয়াছেন—

“রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নতুন নাটক

“কলিকাতা হইতে প্রকাশিত মাসিকপত্র প্রবাসী (অর্থাৎ বিদেশবাসী) তার এপ্রেল (বৈশাখ) সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত মূল বাংলা একখানি নতুন নাটক প্রকাশ করিয়াছে।

“নাটকখানির নাম মুক্তধারা—অর্থাৎ বাধাহীন স্রোত, —ইহা একটি বড় ঝরনার রূপক নাম; সেই ঝরনাটাই নাটকের ঘটনার কেন্দ্র এবং উহারই চারিদিকেই নাটকের সকল দৃশ্য সম্মিলিত।

“কবির নাটকের ভিত্তীভূত গল্পটি এই—

“উত্তরকূটের রাজা রণজিতের ইঞ্জিনিয়ার (যন্ত্ররাজ) বিব্রুতি ২৫ বৎসব চেষ্টার পর মুক্তধারার জলস্রোত বন্ধ করিয়া একটি বাধ বাধিয়াছে, তাতে নাবাল দেশ শিবতরাইএর জলের যোগান বন্ধ হইয়াছে। শিবতরাইএর লোকেরা উত্তরকূটের অধীন, কিন্তু প্রায়ই তাহার বিদ্রোহী ও অবশীভূত হইয়া উঠে।

“রাজা রণজিত আশা কবিতেন যে মুক্তধারার জলস্রোত বন্ধ করিয়া তিনি শিবতরাইএর লোকদের বশে রাখিতে পারিবেন। মুক্তধারার বাধ সম্পূর্ণ হওয়ার উৎসব অম্বষ্ঠিত হইবে। মুক্তধারার সম্মিলিত ভৈরব-মন্দিরে সেইদিন এক মহৎ উৎসবের অম্বষ্ঠান হইবে।

“ভৈরব-মন্দিরের পূজারী ভৈরবপন্থী সন্ন্যাসীরা যখন তাদের ইষ্টদেবতা শিবের স্তোত্র গান করিয়া বেড়াইতেছে, তখন বিভিন্ন পাত্র পাত্রী রন্ধনমিতে উপনীত হইয়া যন্ত্ররাজ বিব্রুতির ও তার যন্ত্র সম্বন্ধে বিবিধ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে।

“কেউ কেউ তাকে মহৎ প্রতিভাশালী স্থির করিয়া প্রশংসা করিতেছে এবং তার যন্ত্রের মহিমা গান করিতেছে। অত্যাচার আবার তাকে তুচ্ছ করিতে চেষ্টিত, এবং বাধ বাধিতে যে কত লোক প্রাণ দিয়াছে তাহা স্বরণ করিয়া ক্ষুদ্র। রাজবাড়ীর কেউ কেউ বিব্রুতিকে শিবতরাইএর লোকদের সর্বনাশ করিয়া মুক্তধারা একেবারে বন্ধ করা হইতে বিবত করিতে চেষ্টিত। কিন্তু এদের চেষ্টা তেমন বিফল হইল, যেমন

নিফল হইয়াছিল রাজার কাছে ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে আগত শিবতরাইএর লোকদের আবেদন।

“কিন্তু রাজা সবচেয়ে বড় বাধা পাইলেন যুবরাজ অভিজিৎ হইতে। এই কুমার বিশ্বমানবের বিচক্ষণ বন্ধু। তিনি এই কথা কিছুতেই স্বীকার কবিতেন পারিলেন না যে উত্তরকূট রাজ্যের বাষ্ট্রনীতির কাছে শিবতরাইএর সকল প্রজাকে বলি দেওয়া হইতে পারে।

“যুবরাজ অভিজিৎকে তাঁর পিতা রাজা রণজিত এই অধীন দেশ শিবতরাইএব শাসক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। অভিজিৎ যখন বিজ্ঞতা রাজার প্রতিনিধি রূপে সে দেশে ছিলেন, তখন তিনি স্বদেশবাসীর স্বার্থ অপেক্ষা সেই দেশবাসীর হিতসাধনই অধিক চেষ্টিত ছিলেন। এজ্ঞা নন্দীসকলের অবরুদ্ধ পথ খুলিয়া দিয়া তিনি বাণিজ্য চলাচলের সুবিধা করিয়া দেন। এই পরাধীন দুর্ভিক্ষপীড়িত রাজ্যের তাহাতে সুবিধা হইয়াছিল যথেষ্ট, কিন্তু বিজ্ঞতা উত্তরকূটের তাতে পবন অপহরণে অস্ত্রব্যব উপস্থিত হইয়াছিল।

“অভিজিৎ যন্ত্ররাজের যন্ত্র ভগ্ন করিবার জন্ত যে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছিলেন তার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র মানবহিত নয়, তার মধ্যে আধ্যাত্মিক কিছুও ছিল। যুবরাজ অকস্মাৎ জানিতে পারিয়াছিলেন যে তিনি বাস্তবিক রাজা রণজিতের পুত্র নন; রাজা তাঁকে মুক্তধারার নিকট সদ্যোজাত শিশু অবস্থায় কুড়াইয়া পাইয়া পালন করিয়াছেন, কারণ রাজা এই শিশুর সঙ্গে রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ ও চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলেন।

“যুবরাজ এই সংবাদ জানার পর অতুভব করিতে লাগিলেন তিনি যেন অবাধ ব্যগ্রগতি মুক্তধারার সন্তান। সেই জলধারা তাঁকে মুক্ত আকৃষ্ট করিল। সেই জলধারা ও নিজের মধ্যে একটি আত্মিক সম্পর্কের টান তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলেন। সুতরাং মুক্তধারার প্রাণ ও স্রোতগতি যেন তাঁর নিজেরই জীবনধারা বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। এবং সেই মুক্তধারার অবাধ জলস্রোতের আশীর্বাদ সর্বমানবের উপভোগ্য করিয়া রাখাই তাঁর পবিত্র কর্তব্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

“রাজা রণজিতের আদেশে যুবরাজ বন্দী হইলেন; রাজা মনে করিয়াছেন যে শাস্তির ভয়ে অভিজিৎকে স্বভাব সংশোধিত হইবে। এদিকে উত্তরকূটের জনসমাজ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; যুবরাজ অভিজিৎ শিবতরাইএর লোকদের পক্ষ হইয়া স্বদেশের বিপক্ষতা আচরণ করিতেছেন বলিয়া কেউ কেউ তাঁকে শাস্তি দিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে; কেউ কেউ তাঁকে মুক্তি দিতে ইচ্ছুক।

অবশেষে বন্দীশিবিরে আগুন লাগাইয়া কুমার অভিজিতের মুক্তির সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল। মুক্তি পাইয়া কুমার নিজের সঙ্কল্পিত কর্তব্য পালনের জন্ত যাত্রা করিলেন।

“তিনি গোপনে বাঁধের উপব যন্ত্রকে আঘাত করিয়া রুদ্ধ জলধারা মুক্ত করিয়া দিলেন; মুক্তিপ্রাপ্ত জলধারা বেগে প্রবাহিত হইয়া যন্ত্রকে ভাঙিয়া ভাসাইয়া লইয়া গেল। যুবরাজ ও তাঁর এই বীরত্বের উদ্‌ঘাপনে মৃত্যু লাভ করিলেন—তিনি মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলেন। রুদ্ধ জলধারা মুক্ত করিয়া তিনি নিজের মুক্তি লাভ করিলেন, তিনি আপনাব জননী মুক্তদারার কোলে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

“যুবরাজ অভিজিতের শোচনীয় পরিণাম সমস্ত নাটকটির রূপক বৃত্তিবাব চাৰি। মানবের প্রগতি ও উন্নতি তখনই সম্ভব যখন মানুষ সঙ্গীর্ণতা ও স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়াইয়া যাইতে পারে, যখন মানবসমাজের নেতৃস্থানীয় অসামান্য লোকেরা বৈষয়িকতা বর্জন করিয়া নিজেদের আদর্শের জন্ত প্রাণপাত পর্যন্ত করিতে ইতস্ততঃ করেন না। এই নাটকটির মধ্যে কয়েকটি ঘটনাতেই একটি সঙ্গীর্ণ পরপীড়ক ক্ষণিকস্থকর স্বাদেশিকতার সঙ্গে বিশ্বমৈত্রী ও মানবভ্রাতৃত্বের দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

“যথা, স্থলত স্বাদেশিকতাব প্রতিভূ স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই রক্তভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছে এক গুরুমশায় ও তাঁর ছাত্রদল। গুরুমশায় তার পোড়োদের এক বিকট বাগাড়ম্বরপূর্ণ রাজপ্রশস্তি মুখস্থ করাইয়াছে, উদ্দেশ্য রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া কিছু বেতন বৃদ্ধি করিয়া লওয়া। সে ছাত্রদের মনে শিবতরাইএর লোকদের ‘সম্মুখে একটা ঘুণার ও বিরাগের ভাব সঞ্চার করাইয়াছে, কারণ,— ‘ওদের ধর্ম খুব খারাপ’ এবং মানবসমাজের উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত উত্তরকূটের লোকদের মতন তাদের নাক

উঁচু নয়। অতএব তারা নিশ্চয়ই ‘খুব খারাপ।’ অতি আগ্রহের বশে গুরুমশায় ছাত্রদিগকে শিখাইয়াছে যে জগতের সকল ইতিহাসের উদ্দেশ্য হইতেছে সমস্ত জগতে উত্তরকূটরাজবংশের চক্রবর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা। সে ইহাও বুঝাইয়াছে যে রাজা রণজিতের রাজবংশের নিজের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত অন্যের উপর অত্যাচার করার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা আছে এবং উহা বৈজ্ঞানিক সত্য।

“এর বিপরীত মত প্রকাশ করেন ধনঞ্জয় বৈরাগী। তাঁর শিক্ষা তেমন সফলও হয় নাই, লোকে ভালো করিয়া বুঝেও নাই; কিন্তু তিনি ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে অন্তত অকল্যাণ সহ্য করিয়াই প্রতিকার করিতে হইবে যাহাতে তাহা আপনা হইতেই নষ্ট হইয়া যায়; অন্তর্ভুক্ত প্রতিরোধে অন্তত অল্পটানে, অত্যাচারের প্রতিরোধে অত্যাচারে নূতন নূতন অকল্যাণেরই সৃষ্টি হইতে থাকে।

“ধনঞ্জয় বৈরাগীব চরিত্রে ভারতের বর্তমান জাতীয় নেতা সম্প্রতি-বন্দী মহাত্মা গান্ধীব চরিত্রের কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু কবি নিজে একটি টীকা উল্লেখ করিয়াছেন যে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র ও তাঁর উক্তি কবির ১৫ বৎসরের পুরাতন নাটক প্রায়শ্চিত্ত হইতে পুনর্গৃহীত।

“রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নূতন নাটকখানি এইরূপ গভীর-ভাব-দ্যোতক ঘটনায় ও আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতে পূর্ণ ঐশ্বর্য-শালী। নাটকের পাত্রপাত্রীদের গল্প কথার মধ্যে কবিরময় পঞ্চচ্ন্দ্রের গানও ছড়ানো আছে।

“ভারতীয় জীবনের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় মুক্তদারা নাটক ভারতে সম্প্রতি আগ্রহের সহিত পরিগৃহীত হইবে নিশ্চয়। বঙ্গদেশে এর সফলতা কতদূর হইবে তাহা কেবল অনাগত ভবিষ্যৎই নির্ধারণ করিতে পারিবে।”

চিত্র-পরিচয়

প্রচ্ছদপটে দশমহাবিহার কমলা-মূর্তি।

মুখপাতের “রহস্যময়ী প্রকৃতি” ছবিটিতে চিত্রকর এই বোঝাতে চেয়েছেন যে বিশ্বপ্রকৃতিব অর্দ্রে এক গুপ্ত অর্দ্রে এক সুপ্রকাশ। এই চিত্রটি অবলম্বন করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা রচনা করেছেন চিত্রের অঙ্কনিত অর্থ প্রকাশ করবার জন্তে; সেই কবিতাটি এই মাসের প্রবাসীতে ৫৩৫ পৃষ্ঠায় “আসা-যাওয়ার মাঝখানে” নামে ছাপা হইছে।

“প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে” ছবিটিতে ভারতের একটি প্রাণা অঙ্কিত হয়েছে। মেঘেরা সমুদ্রের শুভাশুভ নির্ণয়ের জন্তে নদীতে সমুদ্রে পুকুরে জলন্ত প্রদীপ ভাসিয়ে ছাড়ে—সেই প্রদীপ যদি ডুবে বা নিবে না গিয়ে ভেসে চলে তবে শুভ সূচিত হয়।

চাকর



“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নাম্নমাঙ্ঘ্রা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

২২শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩২৯

৫ম সংখ্যা

ভাসে

(গান)

জলে-ডোবা চিকণ শ্রামল
কচি ধানের পাশে পাশে,
ভরা নদীর ধারে ধারে
হাঁসগুলি আজ সারে সারে
ছুলে ছুলে ঐ যে ভাসে ।
অম্নি করেই বনের শিরে
মুহু হাওয়ায় ধীরে ধীরে
দিক্-রেখাটির তীরে তীরে
মেঘ ভেসে যায় নীল আকাশে ॥
অম্নি করেই অলস মনে
একলা আমার তরীর কোণে
মনের কথা সারা সকাল
যায় ভেসে আজ অকারণে ।
অম্নি করেই কেন জানি
দূর মাধুরীর আভাস আনি'
ভাসে কাহার ছায়াখানি
আমার বুকের দীর্ঘশ্বাসে ॥

৩১ আষাঢ়, আজাই নদী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গোপন-বাসী

(গান)

কান পেতে রই আমার আপন
আধার হৃদয়-গহন-ঘারে,
গোপন-বাসীর কান্না-হাসির
গোপন কথা শুনিবারে ॥
ভ্রমর সেথায় হয় বিবাগী
কোন নিমৃত্ত পদ্য লাগি',
রাতের পাখী গায় একাকী
সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে ॥
কে যে সে মোর কেই বা জানে,
কত তাহার দেখি আভা,
কিছু বা পাই অহমানে,
কিছু তাহার বুঝি না বা ।
মাঝে মাঝে তার বারতা
আমার ভাষায় পায় কি কথা ?
সে যে জানি পাঠায় বাণী
গানের তানে লুকিয়ে তারে ॥
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঙ্গলার স্বাধীন জমিদারদের পতন

১। বাঙ্গলার বিশেষত্ব

মুসলমান যুগে বঙ্গদেশ কয়েকটি কারণে নিজের বিশেষত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছিল,—তাহার মধ্যে ভাষা ধর্ম ও জমিদার এই তিনটি প্রধান। বাঙ্গলার বাতাস ভেজা ও গরম, জমি অসংখ্য নদী-খাল-নালায় কাটা, গম ও বুট জন্মে না, লোকে উর্দু, এমনকি হিন্দী পর্য্যন্ত বলে না। সুতরাং উত্তর-ভারতের ভদ্রশ্রেণীর হিন্দু মুসলমান সকলেই বাঙ্গলায় কাজ করিতে নারাজ ছিলেন। তাঁহারা এই প্রদেশকে “কটীপূর্ণ নরক” বলিতেন; রাজকর্মচারীদের অনেক সময় শাস্তির জন্ত এখানে পাঠান হইত এবং তাঁহারাও শীঘ্র বদলি হইবার জন্ত বাদশাহের দরবারে সুপারিশ খুঁজিতেন। ভারত-বাহিরের ভদ্র মুসলমান এখানে পুরুষাঙ্কমে বসতি করিতে চাহিতেন না। কয়েকজন মাত্র জমিদারী পাইয়া এখানে আবদ্ধ হইয়া যান।

সুতরাং উর্দুভাষা-ভাষী উত্তর-ভারতীয় মুসলমান-সভ্যতার কেন্দ্র বাঙ্গলায় স্থাপিত হইতে পারে নাই। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করিতেন, তাহাই ভাবের আদান-প্রদানের, মানসিক আয়োদ ও শিক্ষার, সামাজিক মিলনের, উপাদান ছিল। তাহার পাশে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী উর্দু সাহিত্য, বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যেও, গড়িয়া উঠে নাই।

আর, বৌদ্ধ ধর্মের অবসানের পর চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম অতিদ্রুত সমস্ত প্রদেশকে, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, সকলকে এক করিল। শাক্তও যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এই দুই ধর্ম পাশাপাশি শাস্তিতে বাস করিত, ইচ্ছামত এক ভাই শাক্ত আর-এক ভাই বৈষ্ণব হইতেন। কোটি কোটি বাঙ্গালী হিন্দু ও বৌদ্ধ তিনশতাব্দীতে (১২০০-১৫০০) মুসলমান হইয়াছিল, কিন্তু উপযুক্ত পুরোহিতের অভাবে এবং বাহিরের মুসলমান জগতের সহিত কম সংশ্রব থাকায় তাহারা ইসলামের প্রাথমিক পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে নাই। প্রথমতঃ, তাহারা আরবী ও ফারসী জানিত না বলিলেই হয়; তাহাদের পুরোহিতগণের

দশাও প্রায় সেইমত,—কুরান ও হাদিস পড়িবার ও ব্যাখ্যা করিবার মত জ্ঞান ছিল মাত্র। সুতরাং—
— দুই গ্রন্থ ভিন্ন পশ্চিম-ভারতের ও আরব পারস্যের বিরাট মুসলমান ধর্ম-সাহিত্য তাঁহাদের অপঠিত অজ্ঞাত ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, নানা কারণে ইংরেজ যুগের পূর্বে বাঙ্গলা হইতে অতি কম যাত্রী মক্কা যাইত এবং মক্কা হইতে কম শিক্ষক ও সাধু বঙ্গদেশে আসিতেন—পশ্চিম-ভারত হইতে আববে ইহার অনেক বেশী যাত্রায়াত ছিল। সুতরাং বাহিরের বৃহৎ মুসলমান জগৎ হইতে নূতন ভাবের স্রোত আসিয়া বঙ্গের মুসলমান সমাজের পুরাতন আবদ্ধ জলকে বিশুদ্ধ সতেজ করিতে পারিত না। যুগে যুগে ইসলামের অনেক সংস্কারক উঠিয়াছেন; কালক্রমে যে-সব কুসংস্কার পাপ কদাচাব, প্রেরিত-পুরুষের ধর্মকে পরিবর্তিত ব্যাধিগ্রস্ত করে, তাহারা তাহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া সেই প্রাথমিক যুগের পবিত্রতা ফিরাইয়া আনিবার জন্য যুদ্ধ করেন। কিন্তু বৃটিশযুগে ওয়াহাবী ও ফরাজী সম্প্রদায় ভিন্ন, মুসলমানযুগে বঙ্গের ইসলামে যে কোন সংস্কার-চেষ্টা হইয়াছিল তাহা ইতিহাসে পাই না। সুতরাং বঙ্গীয় গ্রামবাসী ও সাধারণ মুসলমানগণ হিন্দুদের আমোদ আশ্বাদ গান কথকতা ব্রত প্রভৃতিতে যোগ দিত, পূজা-পর্বে দেখিত; গ্রাম্য-দেবী, ব্যাধি-দেবীকে মানত কবিত, মেলায়, প্রতিমা-ভাসানে যাইত। এসব কাজ বে ইসলামের কঠোর পবিত্রতাব বিবোধী এ কথা তাহাবা জানিত না; কখন কখন একজন তেজীয়ান মুন্না বা গোঁড়া নবাব তাহাদিগকে ধর্মভ্রষ্ট বলিয়া ধমকাইতেন, কিন্তু তাঁহাদের উপদেশ কোটি কোটি লোকের জীবন পরিবর্তন করিতে পারিত না, তাহারা তাহা ছুদিনে ভুলিয়া যাইত। [অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী মুসলমানগণ, এবং শহরবাসী কর্মচারীদের দোভাষী হইতে হইত; তাঁহারা অস্তঃপুরে হাট-বাজারে বাঙ্গলা বলিতেন, আর কাচারীতে বৈঠকখানায় এবং সরকারী চিঠিতে

ফারসী (বা উর্দু) ব্যবহৃত করিতেন,—যেমন, উড়িষ্যায় দীর্ঘকালবাসী মুসলমানেরা ঘরে গুড়িয়া বলে ।] এইরূপে বাঙ্গলাদেশে সামাজিক জীবন হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রায় একমত ছিল, এবং ইহা পশ্চিমাঞ্চল হইতে বিস্তৃত । সেই যুগে বাঙ্গলায় ধর্ম হিন্দু হইতে মুসলমানকে পৃথক করিতে পারে নাই, কিন্তু ভাষা ও সামাজিক রীতি বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানকে পশ্চিম-ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান হইতে পৃথক রাখে । (আমি এখানে আমলা-বর্গের কথা বলিতেছি না ; মুঘলযুগে আমলাবা প্রায় সব প্রদেশেই ‘জাতভাট’ ছিল ।)

২। বাঙ্গলার জমিদারদের গৌরব

তাহাব পর্ব, বাঙ্গলার জমিদারগণ অন্য প্রদেশের জমিদার হইতে অনেক অধিক ধন জন-ক্ষমতাশালী,—প্রায় সামন্ত রাজাদের মত স্বাধীন ছিলেন । পাঠান-যুগে স্থলতানদের এবং মুঘলযুগে বাদশাহী সুবাদারদের এত লোক-বল ছিল না যে জমিদারদের সম্পূর্ণ বশ ও শক্তিহীন কবেন । এই অসংখ্য নদীর ভাঙ্গন-গড়নের দেশে জমির জরীপ ও সীমাচিহ্ন রক্ষা করা অসম্ভব ছিল । উত্তর-ভারতীয় মুসলমান বিজ্ঞেতাদের প্রধান বল ছিল শিক্ষিত সর্বল অশ্বাবোহী ; তাহা এই বন্যা বিল খালের দেশে কাজ করিতে পারিত না, খোড়া শীঘ্র মরিয়া যাইত । এইজন্য বাঙ্গলার পদাতিক-গণের (পাইক) যুদ্ধে এত মূল্য ছিল । এই উর্বর দেশে ভূস্বামীর টাকার অভাব হয় না ; জমিদারগণ সহজেই পাইক সংগ্রহ করিয়া নৌকা লইয়া, স্থলগামী মুঘল অশ্বারোহীকে বাধা দিতে পারিতেন । আর, পশ্চিম ভারতে যেমন সম্রাটের বক্স ও স্বজাতী মুসলমান জমিদার অনেক ছিলেন, স্থানীয় বিদ্রোহী-জমিদারের দমনে সাহায্য করিতেন, বঙ্গদেশে সেরূপ লোক অত্যন্ত কম । দিল্লীশ্বরের পূর্বেরকার বঙ্গীয় মুসলমান শাসকগণ অন্তর্দেশ হইতে বলিষ্ঠ সৈন্য খুব কম আনিতে পারিতেন, বাঙ্গালীর বা বাঙ্গালীপ্রাপ্ত আক্বানেব সাহায্যে লড়িতে হইত । সুতরাং বিদ্রোহী-জমিদারের সৈন্য অপেক্ষা স্থলতানের সৈন্যগণ জাতি বল ও শিক্ষায়

শ্রেষ্ঠ ছিল না, বঙ্গবিদ্রোহ-দমন কঠিন সমস্যা ছিল । আর, বাঙ্গলা দেশ দিল্লী-সাম্রাজ্যের অধীন হইবার পরেও যখনই কোন বাদশাহ মবিতেন এবং তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ বাধিত, অমনি বাঙ্গলার জমিদারগণ খাজনা বন্ধ করিতেন ও আশপাশে লুণ্ঠ আরম্ভ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেন ; কারণ বঙ্গদেশ দিল্লী-সাম্রাজ্যেব এক সুদূর কোণে । এরূপ দূরবর্তী সীমান্ত-প্রদেশে কেন্দ্রস্থ রাজশক্তির প্রভাব স্বভাবতই ক্ষীণ থাকে ।

বাঙ্গলার জমিদারগণের প্রতিপত্তি ও স্বাধীনতার ইহাই স্থায়ী কারণ ; তাহার উপর, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীব্যাপী পাঠান রাজশক্তির অবনতি ও পতন এবং মুঘল সাম্রাজ্যের নানা বাধা-বিদ্রোহ ঠেলিয়া প্রথম প্রতিষ্ঠার সময়ে বঙ্গে জমিদারগণ একেবারে প্রতুহীন স্ব স্ব কর্তা হইয়া উঠিয়া যথাসাধ্য রাজ্য-বিস্তার করিবার মহা স্বযোগ পান । এই স্বযোগে প্রতাপাদিত্য ও বারতুইয়াদের উত্থান ।

আকবর বাঙ্গলা জয় করিলেন বটে, কিন্তু ইহা বশ করিতে তাঁহাকে বিশ বৎসর ধরিয়া শ্রম করিতে হয় । তাহাব বঙ্গীয় সুবাদার ও সেনাপতি রাজা মানসিংহ বাঙ্গলার জলবায়ুকে ভয় করিতেন, রাজমহলে বাস করিতে ভালবাসিতেন । তিনি বাঙ্গলায় প্রথম বিদ্রোহ দমন করিয়া জমিদারের নিকট হইতে নামেমাত্র বশতা স্বীকার ও খাজনা লইয়া তাঁহাদের ছাড়িয়া দিলেন, একেবারে নষ্ট করিলেন না । তাঁহাদের শক্তিহীন দাসেব মত করিতে হইলে অনেক বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ করা আবশ্যক হইত । সুতরাং বাঙ্গলার জমিদারগণ বাদশাহেব বিপদের কারণ থাকিয়া গেল ।

তাঁহাদের সম্পূর্ণ পরাস্ত পদানত ও ধোঁড়া সাপেব মত নিস্তেজ করেন পরবর্তী সুবাদার ইসলাম খাঁ (১৬০৮—১৬১৩ খৃ) । ইহার বয়স অল্প, কিন্তু একদিকে যেমন অহঙ্কার অপর দিকে তেমন তেজ, সাহস, দূরদর্শিতা এবং কর্ণে আগ্রহ ও শ্রমশীলতা । তাঁহার বঙ্গশাসন এবং জমিদার-ধ্বংসেব সুদীর্ঘ ও সমসাময়িক বিবরণ তদীয় কর্মচারী শিতাব খাঁ (মির্জা সহন) বচিত ফারসী

হস্তলিপি বহাবিস্তানে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ হইতে প্রতাপাদিত্য ও উসমানের পতনের কাহিনী অগ্রে “প্রবাসী”তে প্রকাশ করিয়াছি। আজ পাবনার জমিদার-গণ ও বিক্রমপুরের মুসাখাঁর যুদ্ধ ও পরাভব বর্ণনা করিব।

৩। প্রতাপাদিত্য

প্রথমে একটি কথা বলিবার শেষ করি। ইতিহাস পড়িয়া আমার মনে হয় যে প্রতাপাদিত্যের বীর-কীর্তি-গুলি আকবরের রাজত্বে মানসিংহের সময়ে ঘটে। তখন তাঁহার ঘোবন-কাল, শরীর ও মনের শক্তি অটুট, নৌবল অদম্য। কিন্তু প্রায় ২০ বৎসর পবে যখন ইসলাম খাঁ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন তখন প্রতাপ বৃদ্ধ, জীর্ণদেহ, হয়ত পারিবারিক শোকে ত্রিষ্ণু। তাঁহার আব পূর্বেতেজ নাই, পুত্রগণের দ্বাৰা যুদ্ধ চালাইলেন, আব যখন তাহার পরাজিত হইল, তখন প্রতাপ নিজে হতাশায় অবসন্ন মনে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। (১৮০১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত) রামরায় বসু রচিত ‘প্রতাপাদিত্য-চরিতে’ লেখা আছে যে এই আত্মসমর্পণের সময় ইসলাম খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন কি তোমার কর্তব্য, লড়াই কি কয়েদ?” রাজা বহিলেন, “না, আমবা আব লড়াই করিব না। আমার আসন্নকাল এই। অতএব আমি কয়েদ হইব।”

আমার বিশ্বাস যে এই নিবাস উক্তি ও অবসাদ ঐতিহাসিক সত্য।

৪। ইসলাম খাঁর বঙ্গশাসন

২৬ এপ্রিল ১৬০৮ জাহাঙ্গীর ইসলাম খাঁকে বিহাব হইতে বাঙ্গলাব স্ববাদের পদে নিযুক্ত করিলেন।

৫ জুন” বঙ্গের নূতন দেওয়ান আবুল হসন্ আগ্রা হইতে বাঙ্গমহল পৌঁছিলেন। এখানে ইসলাম খাঁ অগ্রেই আসিয়াছিলেন।

১০ জুন „ ইহতাম্ম খাঁ তোপ ও নওয়াবা লইয়া আগ্রা হইতে বঙ্গের দিকে বণ্ডা হইলেন।

৭ ডিসেম্বর „ ইসলাম খাঁ সৈন্যে নৌকাযোগে গঙ্গা বহিয়া বাঙ্গমহল হইতে নিম্নবঙ্গের দিকে বণ্ডা হইলেন।

২ জানুয়ারি ১৬০৯, ইসলাম খাঁ মুর্শিদাবাদের গোয়াশ পরগণার ধাবে গঙ্গা পার হইলেন, এবং নৌরঙ্গাবাদ সর্বকাবে আলাইপুর গ্রামে শিবির স্থাপন করিয়া প্রায় দুই মাস বাস করিলেন।

২ মার্চ „ ইসলাম খাঁ আলাইপুর হইতে নাজিরপুরের দিকে [উত্তরে] কুচ আরম্ভ করিলেন।

৫ বা ৬ মার্চ „ ইসলাম খাঁ কতেপুরে থামিলেন।

৩০ মার্চ „ ইসলাম খাঁ কতেপুর হইতে কুচ করিয়া রাণা টাঙাপুরে পৌঁছিলেন।

২৬ এপ্রিল „ বঙ্গপুরে প্রতাপাদিত্য ইসলাম খাঁর সহিত দেখা করিলেন।

৩০ এপ্রিল „ ইসলাম খাঁ আত্রেয়ী নদীর ধাবে শাহপুরে পৌঁছিলেন, এবং এখানে শিবির রাখিয়া নাজিরপুরে নয় দিনের ক্ষুদ্র গিয়া খেদা করিয়া ৩২টি হাতী ধরিলেন।

২ জুন „ ইসলাম খাঁ শাহপুর হইতে নদীতে পুল বাধিয়া ঘোড়াঘাট পৌঁছিলেন।

১৫ অক্টোবর „ ইসলাম খাঁ ঘোড়াঘাট হইতে করতোয়া বহিয়া পূর্ববঙ্গের দিকে রওনা হইলেন। জমিদারদের সঙ্গে যুদ্ধ।

১৮ ডিসেম্বর „ ইসলাম খাঁ পাবনা জেলার শাহজাদপুরে। পরে মুসাখাঁর সহিত যুদ্ধ।

জুন ১৬১০, ইসলাম খাঁ বারভুঁইয়াকে পরাজয় করিয়া ঢাকায় প্রবেশ করিলেন।

মার্চ ১৬১১, মুসাখাঁর সহিত দ্বিতীয় বার যুদ্ধ।

নবেম্বর „ উসমান বোকাইনগর হইতে শ্রীহটে তাড়িত হইলেন।

৭ জানুয়ারি ১৬১২, প্রতাপাদিত্যের পতন।

২ মার্চ ১৬১২, উসমানের যুদ্ধে মৃত্যু।

১১ আগষ্ট ১৬১৩ ভাওয়ালের জঙ্গলে ইসলাম খাঁর মৃত্যু।

৫। পাবনা জেলার জমিদারদের দমন

ইসলাম খাঁ রাজমহল পৌঁছবার পূর্বে উসমান মঘমসিংহ হইতে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া পশ্চিম দিকে আসিয়া মুঘলদের আলপসিংহ খানা দখল করিয়া, থানা-

দার স্বজ্ঞাওল খাঁ নিম্নোক্তাইকে হত্যা করেন। ইসলাম খাঁ তৎক্ষণাৎ অনেক সৈন্ত সহ ইনাং খাঁকে ঐ থানা উদ্ধার করিতে পাঠাইলেন [৩ খ]।

মুঘল তোপ ও নৌবিভাগের সেনাপতি ইহতমাম খাঁকে সোনাবাজু ভাটুরিয়া-বাজু কেলাবাড়ী প্রভৃতি পরগণা জাগীর দেওয়া হইল। ভাটুরিয়া-বাজুর অন্তর্গত চিলা-ছোয়ার নামক পরগণা হইতে তাঁহার শিকদার (অর্থাৎ তহসিলদার ও শাসন-কর্তা) সৈয়দ হবিব তাঁহাকে তেঁতুলিয়াতে * লিখিয়া জানাইল যে তাহার সঙ্গী দিলির বাহাদুর ও লুৎফ আলিবের সোনাবাজুতে গিয়া চাটমহবে বাস করিয়া পরগণা শাসন করিতে লাগিয়াছিল এমন সময় মাহুম খাঁর পুত্র মির্জা মুনীন্ খাঁ, আলমের পুত্র দরিয়া খাঁ, ও খলশীর জমিদার মধু রায়—যাহারা এতদিন সোণাবাজু পরগণা ভোগ করিতেছিল—একত্র হইয়া, ৪ হাজার অশ্বারোহী ৪ হাজার পদাতিক ও ২০০ কোসা নৌকা লইয়া আসিয়া ঐ দুইজনকে এক দুর্গে আবদ্ধ করিয়া সব সৈন্ত সহ হত্যা করিল। শুধু ছজন অসুচর আহত হইয়া চিলা-ছোয়াতে পলাইয়া আসিল। এইরূপে সোণাবাজু শত্রুর হস্তে পড়িল।

সুবাদাবের অল্পমতি লইয়া ইহতমাম খাঁ নিজ পুত্র মির্জা সহনকে এই যুদ্ধের নেতা করিয়া পাঠাইলেন। সহন আলহিপুর হইতে দুই দিনের কূচে চিলা এবং তথা হইতে দুই দিনে চাটমহর পৌঁছিলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদে শত্রুরা আগেই চাটমহর ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সহন তথায় থাকা নিরাপদ মনে না করিয়া দুই দিনের কূচে আত্রৈয়ী নদীর তীরে শাহপুর † গ্রামে গেলেন, এবং সেখানে মাটির তিনটি দুর্গ গড়াইয়া তোপ দিয়া রক্ষা করিলেন। কিছু পরে ইসলাম খাঁর আজ্ঞায় তাঁহার নিকট হইতে একদল সৈন্ত নাজিরপুর

হইয়া একদন্তে * পৌঁছিল, এবং সহনও শাহপুর হইতে তথায় আসিয়া যোগ দিলেন। কিন্তু সুবাদার তাহাদের যুদ্ধ-যাত্রা নিষেধ করিয়া নাজিরপুর গিয়া খেদা করিয়া হাতী ধরিতে বলিলেন। ৩২টি হাতী ধরা হইল।...তাহার পর সুবাদার ঘোড়াঘাটে গিয়া সৈন্তসহ খড়্গে ঘর বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

কিন্তু করতোয়ার জল কম বলিয়া ইহতমাম খাঁ নৌকা লইয়া তথায় যাইতে পারিলেন না, তাঁহাকে নিজ জাগীর কেলাবাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তিনি আম্ফল পরগণা অতিক্রম করিয়া ইব্রাহিমপুর এবং তথা হইতে উদিবুড়ায় (†) পৌঁছিলেন, সঙ্গে তিন শত বাদশাহী নৌকা। তাহার পর কেলাবাড়ী পরগণা দিয়া ঘোড়াঘাট আসিলেন (১০ ক)।

এদিকে বর্ষার আগমনে ইসলাম খাঁর আজ্ঞায় তুন্মাক খাঁ আলপসিংহ হইতে উঠিয়া নিজ জাগীর শাহজাদপুরে † আসিলেন। এই শাহজাদপুরের জমিদার রাজা-রাঘ তুন্মাকের সঙ্গে দেখা করিয়া নিজ পুত্র রাঘু (রঘু বা রাঘব) রায়কে খাঁর দরবারে রাখিয়া বিদায় লইলেন। কিন্তু বর্ষার মধ্যে বিজোহী হইয়া অনেক নৌকা লইয়া আসিয়া শাহজাদপুরের দুর্গ তিন দিনরাত্রি অবরোধ করিলেন, অবশেষে কিছু করিতে না পারিয়া রণভঙ্গ দিলেন। তখন তুন্মাক খাঁ রাগিয়া রঘুরায়কে জোর করিয়া মুসলমান করিলেন, এবং নিজ খিদ্মৎগারের (ভৃত্যের) কাজ করিতে বাধ্য করিলেন। এ সংবাদে ইসলাম খাঁ অসন্তুষ্ট হইলেন।

চাঁদপ্রতাপ ‡ থানায় মুঘলপক্ষে মিরক বাহাদুর ছিলেন। কিন্তু ঐ চাঁদপ্রতাপের জমিদার নবুদ (‡= বিনোদ) রায়, সঙ্গে মির্জা মুনীন, দরিয়া খাঁ ও মধু রায়কে লইয়া, ঐ থানা ঘেরাও করিলেন এবং তাহা ব্যতিবস্ত

* একদন্ত—পাবনা শহরের ৭ মাইল উত্তর-পূর্বে, ইচ্ছামতীর উত্তর পাশে।

নাজিরপুর—মালদহের ৩৮ মাইল পূর্বে, আত্রৈয়ী নদীর তীরে, E. B. R.-এর ১৭ মাইল পশ্চিমে।

† শাহজাদপুর—পাবনা শহরের ২৫ মাইল উত্তর-পূর্বে।

‡ চাঁদপ্রতাপ, পূর্বে চাঁদবাড়ী, এই পরগণা ভাওয়ালের জমিদার ফজল হাজারি বংশের অধীন ছিল।

* তেঁতুলিয়া—মালদহ শহরের ২৩ মাইল পূর্বে।

খলশী—জাফরগঞ্জের ৪ মাইল উত্তর পূর্বে।

চাটমহব—পাবনা শহরের ১৫ মাইল উত্তরে, বক নদীর ধারে।

† শাহপুর—বাজশাহী নদীর ৬ মাইল উত্তরে।

কবিয়া তুলিলেন। কিন্তু তুক্রমাক খাঁ শাহজাদপুৰ হইতে সাহায়ে আসাৰ শত্ৰুৱা পলাইয়া গেল।

এইৰূপে ১৬০৯ সালৰ বৰ্ষাকাল নিৰ্দ্ধিষ্ট কৰি দিয়া গেল। বৰ্ষাৰ শেষে ১৫ই অক্টোবৰ স্বৰ্গদাতাৰ ও সৈন্তগণ বোডাঘাট হইতে “ভাটী” অৰ্থাৎ ঢাকার দিকে কৰতোয়া বহিয়া রওনা হইলেন। তিন দিনের কূচে তিনি শিখালগড় পৌঁছিলেন এবং ইহতমাম খাঁ আত্মীয় নদী হইতে নৌকা লইয়া যোগ দিবেন এই আশায় এক সপ্তাহ এখানে রহিলেন। কুদিয়া-খালের জল কম বলিয়া নৌকা আসিল না, তখন তিনি শাহজাদপুৰে গিয়া অপেক্ষা কৰিতে লাগিলেন। এদিকে মিৰ্জা সহন অসীম পৰিশ্ৰমে নৌকাগুলি ঠেলিয়া শিখালগড়ে আসিলেন, এবং তথা হইতে ইহতমাম খাঁ সাত কূচে (নৌকায়) শাহজাদপুৰে পৌঁছিলেন। এখানে সকলে ঈদ পৰ্বৰ বাপন কৰিলেন (১৮ ডিসেম্বর ১৬০৯)। এখানে বাদশাহী নওয়াবর মহলা (review) হইল।

৬। কাটাসগড়ার মোহানায় যুদ্ধ

এখান হইতে ইসলাম খাঁ স্থলপথে ‘বলিয়া’য় * রওনা হইলেন, এবং তিন দিনে তথায় পৌঁছিয়া বেপারীদের নৌকায় পুল বাঁধিয়া নদী পার হইলেন। নদীর পৈচৈব জন্ত নওয়াবা আসিতে অনেক দিন লাগিল। স্বৰ্গদাতার আজ্ঞাক্রমে ইহতমাম ও সহন খাল-যোগিনীৰ ত্রিমোহানীতে গিয়া তিনটি দুৰ্গ নিৰ্মাণ কৰিয়া রহিলেন। ইসলাম খাঁ দুই কূচে কাটাসগড়ার মুখে পৌঁছিলেন, এবং তথায় ইহতমাম নৌকা সহ আসিয়া যোগ দিলেন। ‘বলিয়া’ হইতে একদল অগ্রগামী সৈন্ত, শেখ কমাল, তুক্রমাক খাঁ ও মিরকু বাহাদুরের অধীনে ছয়দিনে ঢাকা পৌঁছিল, ইহাতে মুসা খাঁ ও অন্যান্য জমিদারগণ দুই দিকে আত্মরক্ষা কৰিতে বাধ্য হইলেন।

কাটাসগড়ার মুখে ইহতমাম খাঁর নিকট পীর মুহম্মদ লোদী আফ্গান এবং তাঁহার ভ্রাতাগণ শত্ৰুপক্ষেব এই সংবাদ আনিয়া : মুসা খাঁর আদেশমত তাঁহার তিন জন সহযোগী, মিৰ্জা মুমীন, দরিয়া খাঁ এবং মধু রায়, যাত্রাপুৰে ইচ্ছামতীর মোহানায় গড় কবিয়া পাহারা দিতেছিল, এমন সময় দরিয়া খাঁর কোন পাণেব জন্ত মিৰ্জা মুমীন তাহাকে নিমন্ত্ৰণ কৰিয়া খুন কৰিল। ইহাৰ কলে মধু রায় সন্দেহ কবিল যে মুমীন গোপনে মুঘলদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে, সুতরাং যাত্রাপুৰের জমিদারদের নওয়াবায় একতা ও সাহস রহিল না। ইহতমাম এই সুযোগে নৌকাসহ যাত্রাপুর আক্রমণ কৰিতে চাহিলেন, কিন্তু ইসলাম খাঁ তাহাতে সম্মত না হইয়া স্বস্বের রাজা রঘুনাথের পরামর্শে এই রণনীতি অবলম্বন কৰিলেন :—

মুঘলেবা প্রথমে কাটাসগড়া হইতে যাত্রাপুর পর্যন্ত সমস্ত নদীর তীর দেওয়াল ও তোপে সুরক্ষিত কৰিবে ; পবে তাহার আড়ালে আড়ালে বাদশাহী নওয়াব নদী ভাটাইয়া গিয়া যাত্রাপুৰের মোহানা দখল কবিবার চেষ্টা কৰিবে।

এদিকে দরিয়া খাঁব হত্যা-সংবাদ পাইয়া মুসা খাঁ শশব্যস্তে অনেক জমিদার * এবং সাত-শত নৌকা সহিত যাত্রাপুৰে গেলেন এবং মুমীন ও মধু রায়কে সঙ্গে লইয়া ইচ্ছামতী হইতে বাহির হইয়া বাদশাহী শিবিরে তোপ চালাইতে লাগিলেন। নৌকাগুলি এই কষ শ্রেণীর—কোসা, জলবা, ধুবা, সন্দরা, বজ্জা এবং খেলনা।

রাত্রি হইলে মুসা খাঁর দলবল সবিয়া গিয়া পদ্মাব বাম তীরে—অৰ্থাৎ যেদিকে বাদশাহী সৈন্তরা ছিল—ডাকছাড়া নামক গ্রামে মাল্লাদের দ্বারা অতিক্রুত একটি মাটির দুৰ্গ প্রস্তুত কৰাইল, তাহার দেওয়াল উচু, পরিখা গভীর, এবং মধ্যে অনেক তোপ।

* ‘বলিয়া’—Bowleeah, বেনেলের ম্যাপে, শাহজাদপুৰের ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে।

খাল-যোগিনী—মুল্লীগঞ্জের নিকট বৰ্তমান ইচ্ছামতীর মোহানায় ‘যোগিনী ঘাট’ এই স্থান হইতে পারে না।

যাত্রাপুৰ—ঢাকার ২৫ মাইল পশ্চিমে।

* আলাওল খাঁ (মুসা খাঁর পিতৃব্যপুত্র), আবুজ্জা খাঁ ও মহম্মদ খাঁ (মুসা খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতৃস্বয়), বাহাদুর খাঁজী, সোনা খাঁজী, আনওয়ার খাঁজী, শেখ বাবর (হাজী শাকলেব পুত্র), বিনোদ রায় (চাঁদপ্রতাপের জমিদার), পালোয়ন (মটংএব জমিদার), এবং হাজী শম্ভুদীন বোব্দাদী। [১৯ খ]

পরদিন প্রাতে বাদশাহী সৈন্য নিজ নিজ স্থানে মাটি কাটিয়া গড়খাই ও দেওয়াল গড়িতে লাগিল। ইসলাম খাঁ খানায় বসিয়াছেন এমন সময়ে মুসা খাঁর তোপের গোলা আসিয়া সেখানে পড়িতে লাগিল; প্রথম গোলায় তাঁহার সমস্ত ভোজন-পাত্রগুলি পড়িয়া গেল এবং বিংশ ত্রিশ জন চাকর মরিল, দ্বিতীয় গোলায় তাঁহার হাতীব উপরেব পতাকার বাহক হত হইল। মহা গোলমাল উঠিল, কিন্তু দুপুর পর্যন্ত এইকপ তোপের যুদ্ধ চলিল। উঁচু পাড় হইতে দাগা বাদশাহী গোলায় শত্রু নওয়ারায় অনেক লোক (মধু রায়ের পুত্র এবং বিনোদ রায়ের ভ্রাতা) মারা গেল এবং কয়েকখানি কোমা ডুবিয়া গেল। তখন জমিদারগণ অপব পারে ফিরিয়া গেল। ইসলাম খাঁ মাটির দুর্গ হইতে তাম্বুতে আসিলেন।

পরদিন প্রাতেও সেইমত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পুত্র ও ভ্রাতার মৃত্যুব প্রতিশোধ লইবার জন্য মধু রায় ও বিনোদ রায় নৌকায় এ পারে আসিয়া মাটিতে নামিয়া বাদশাহী সৈন্যদেব সহিত হাতাহাতি যুদ্ধ করিলেন। একবার এ-পক্ষ অগ্রসর হয়, আবার ও-পক্ষ। অবশেষে জমিদারদের সৈন্য পরাস্ত হইয়া পলাইল, অনেকে নৌকায় পৌঁছিবাব আগে জলে ডুবিল, হাতীগুলি অনেক সৈন্য ও নৌকা পিষিয়া ধ্বংস করিল। বাদশাহী সৈন্য জয়-ডঙ্কা বাজাইল।

ইতিমধ্যে ইসলাম খাঁ শেখ হবিবুল্লাহর অধীনে অপর একদল সৈন্য মজলিস কুতবের জমিদারী ফতেহাবাদ (অর্থাৎ ফরিদপুর) আক্রমণে পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা মাটিভাঙ্গাব মোহানা দখল করিয়া ঐ জেলা লুটপাট করিয়া মজলিস কুতবের ফতেহাবাদ দুর্গে ঘেরাও করিল। মুসা খাঁ ২০০-নৌকা-পূর্ণ সৈন্য পাঠাইয়া কুতবকে সাহায্য করিলেন, কিন্তু এই সাহায্যকারী সৈন্যদল পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

৭। যাত্রাপুর ও ডাকছাড়া অধিকার

এখন প্রশ্ন হইল মুসা খাঁর দুর্গ কিরূপে আক্রমণ করা যায়। স্থলপথে সেখানে পৌঁছান অসম্ভব। অসম্ভব রাজা রঘুনাথ পরামর্শ দিলেন যে নদীর পাড়ে মূলদের

অদীর্ঘ গড়খাই এবং (trench) মধ্যে একটি পুঁবান গুল নালা আছে, তাহার মোহানা উঁচু বালিতে বদ্ধ হইয়া গিয়াছে; এই নালা কাটিলে বাদশাহী নৌকা ইহার ভিতরে গিয়া অতি সহজে ইচ্ছামতীতে ঢুকিতে পারে; তখন বিনা যুদ্ধে মুসা খাঁ-দুর্গ ও যাত্রাপুর দখল হইবে।

বাদশাহী নওয়ারায় বার হাজার মান্না ছিল। সহন তাহাদের দশ হাজারকে লইয়া, স্বয়ং চার প্রহর দাঁড়াইয়া থাকিয়া ছয় প্রহরে নাজার মুখের পর্বত-প্রমাণ চর কাটিয়া ফেলিলেন। মান্নাদের উৎসাহ দিবার জন্য অনবরত পয়সা চাউন ভান্স ও আফিম বিতরণ করিতে লাগিলেন।

এমন সময় মুসা খাঁ ভয়ে আসিয়া ইসলাম খাঁ সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহিলেন। কিন্তু তৃতীয় দিন একটা বগড়া বাধিয়া গেল। ইসলাম খাঁ এক নর্তুকীর স্বামী মুসা খাঁর চাকরী করিত, এবং তাঁহার কাছে মার খায়। নর্তুকীর নালিশে ইসলাম খাঁ মুসা খাঁকে ধমকাইলেন, এবং তিনি অপমানে চলিয়া গিয়া আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

মুসা খাঁর দুর্গ আক্রমণের উপায় স্থির হইল। স্ববাদারের আজ্ঞায় ঢাকা হইতে তুসুমাক খাঁ কোদালিয়ার * মোহানায় আসিয়া বসিল এবং মিরক বাহাদুর বিশখানা নৌকা লইয়া কুঠাকুইয়ার মোহানায় পৌঁছিল। এদিকে ইসলাম খাঁ নিজে কাটাসগড়ার মোহানার অপর পার হইতে আব্দুল ওয়াহিদকে সঙ্গে লইয়া কুচ করিয়া এক প্রহর রাজি থাকিতে কুঠাকুইয়ার মোহানায় পৌঁছিলেন, এবং মিরক বাহাদুরের নৌকা লইয়া সৈন্যদের ইচ্ছামতী নদী পাব করাইতে লাগিলেন। অনেকে হাতীর পিঠে নদী পার হইল। তাহার পর যাত্রাপুরের দুর্গের দিকে কুচ হইল। শত্রুরা নৌকাযোগে পদ্মার অপর তীরে পলাইয়া গেল।

তাহার পর স্ববাদারের আজ্ঞায় আব্দুল ওয়াহিদ

* নাবায়ণগঞ্জের ২৪০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে যে কোদালিয়া গ্রাম আছে তাহা এস্থান হইতে পারে না। “পদ্মা ও যবুনার সঙ্গমস্থল, বাইশকোদালিয়ার মোহানা” [যতীন্দ্র রায়, ঢাকার ইতিহাস, ১—৩৯, ৪৬] কুঠাকুইয়া—কাথারিয়া, কীর্তিনাশার পূর্ব নাম [যতীন্দ্র, ১—৪২]

ইচ্ছামতী পার হইয়া ডাকছাড়ার মোহানায় মুসা খাঁর দুর্গ এক দিক হইতে অবরোধ করিল।

সাত দিবারাত্রি পবিশ্রম করিয়া মির্জা সহন সেই শুষ্ক নালা কাটিয়া তাহাতে ইচ্ছামতীর জল আনিলেন। জ্যোতিবীরা বলিল যে ৯ জুন ১৬১০ রাত্রি দুই ঘড়ির সময় নৌকা লইয়া নালায় প্রবেশ করিবার শুভ মুহূর্ত্ত। তাহাই করা হইল। শত্রুগণ নদীর মধ্যে নৌকা হইতে গোলা চালাইয়া বাধা দিতে চেষ্টা করিল; বাদশাহী নৌকা ঠেলিতে মাল্লাদের খুব ভিড় হইয়াছিল, কাজেই তাহাদের অনেকে মারা পড়িল। কিন্তু রাজ্যে সব নওয়ারা মধ্যে প্রবেশ করিল।

তখন মির্জা সহন শত্রুদুর্গ আক্রমণ করিবার ভার চাহিয়া লইলেন। পরদিন প্রাতে দুর্গের কাছে ছুটিয়া গেলেন। শত্রুগণ দুর্গ-প্রাচীর এবং পদ্মার বক্ষ হইতে গোলাগুলি চালাইতে লাগিল। অনেক বাদশাহী সৈন্য মরিল; কিন্তু মির্জা সহন মাটির উপর তিন হাজার টাঁকার স্তুপ করিয়া তাহা হইতে মুঠে মুঠে টাকা নিজের আহত সৈন্য ও মৃত সৈন্যের আত্মীয়দের দিয়া উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাহার সৈন্যগণ “আল্লাহ আকবর!” এবং “ইয়া মুইন!” ধ্বনি করিয়া মুখের সামনে ঢাল ও তরবার ধবিয়া ছুটিল। তাহার পর আত্মরক্ষার জন্ত দুর্গের বাহিরে অধিকৃত জমীতে গড়খাই (trench) খুঁড়িতে লাগিল। এখান হইতে আবার ছুটিয়া গিয়া বাকী জমীর অর্ধেক অধিকার করিয়া, দম লইবার জন্য ঢালের আড়ালে বসিয়া পড়িল। দুর্গ ও নদীবক্ষ হইতে তীর, বল্লম, গোলা-গুলি বর্ষণ হইতে লাগিল।

তখন সহন হুকুম দিলেন যে রণ নৌকার সামনে পুলের মত * ঘে-সব গাড়ী [গঙ্গুন=চাকা, বথ] রাখা ছিল তাহা আনিয়া নিজ সৈন্যদের পাশে খাড়া করা হউক এবং মাল্লারা ঘাসের আঁটা ও মাটির বুড়ি মাধায় করিয়া আনিয়া ঐ কাঠের গাড়ীর পশ্চাতে ক্ষুদ্র দেওয়াল গড়িয়া তুলুক। তাহাই করা হইল। সৈন্যগণ পরে এই আশ্রয় হইতে ছুটিয়া বাহির হইল,

* Gangway ৭ লম্বা পাটাতন, নীচে চাকা।

কিন্তু অশেষ পরিশ্রমেও দুর্গ নিতে পারিল না, কারণ আর কোন সেনাপতিই সহনের সাহায্য করিলেন না, শত্রুর সমস্ত বল তাহার উপর পড়িল।

এদিকে পাঁচ হাজার মাল্লা প্রত্যেকের মাধায় বাসের আঁটা এবং আব পাঁচ হাজার মাটির বুড়ি লইয়া প্রস্তুত রাখা হইল। মুসা খাঁ নিজ দুর্গের চারিদিকে পরিখা খুঁড়িয়া তাহাতে চোখালো বাঁশ * পুতিয়া রাখিয়াছিলেন। সন্ধ্যা হইবামাত্র সহনের মাল্লাগণ ছুটিয়া গিয়া ঘাস ও মাটি কেলিয়া পরিখা পুরাইতে লাগিল। তৃতীয় ঘড়িতে এ কাজ শেষ হইল। তখন হাতী পাঠাইয়া দুর্গ আক্রমণ করা হইল। দুই ঘড়ি ধবিয়া মহা যুদ্ধ হইল, অনেক হাতী ও মাহত তোপে আহত হইল; কিন্তু অবশেষে পঞ্চম ঘড়ির শেষে মির্জা সহন দুর্গে প্রবেশ করিলেন। “আল্লাহ আকবর” ও “ইয়া মুইন” ধ্বনি উঠিল, ভেরী হু হু শব্দ করিল, ডকা শুড়ুম শুড়ুম করিয়া বাজিয়া উঠিল।” শত্রুগণ অনেকে মরিল, বাকীরা পদ্মাপারে আশ্রয় লইল। তখন আর-সব বাদশাহী সেনাপতি দুর্গে ঢুকিলেন। এই জয়লাভের পর ইসলাম খাঁ ঢাকার দিকে অগ্রসর হইলেন।

প্রথমে কুঠারুইয়ার মোহানায় থামিলেন; এখানে মুসা খাঁর ভ্রাতা ইলিয়াস খাঁ আসিয়া মৃগল পক্ষে যোগ দিলেন। পরদিন “বলরা”য় কুচ হইল। ইসলাম খাঁ সৈন্য পাঠাইয়া কেলাকুপাতে [নবাবগঞ্জের এক মাইল উত্তরে] শত্রু দুর্গ দখল করিলেন এবং নিজে তথায় পৌঁছিলেন। নওয়ারার এক অংশ ত্রিপুরে পাঠান হইল। এদিকে মঘমনসিংহ হইতে উসমান আসিয়া ঘোড়াঘাট অঞ্চল আক্রমণ করিতে না পারেন এজন্য ইক্ষুতিখার খাঁ শেরপুর মুর্চায় ৭ নিযুক্ত রহিলেন।

কেলাকুপা হইতে ইসলাম খাঁ ঢাকায় পৌঁছিলেন। নওয়ারা পাথরঘাটার মোহানায় পৌঁছিয়া থামিল;

* কাপ্ত বা কাপ্ত। আসামে গড় বক্ষাব প্রধান উপায়।

+ বগুড়া জেলায়, ২৪-৪০ ডিগ্রীর উত্তর, ৮৯-২৯ পূর্ব। পাথর-ঘাটা—ঢাকার ৬ মাইল দক্ষিণে ধলেশ্বরীর দক্ষিণ তীরে।

পরে গোয়াধবী * নালা দিয়া ঢাকা পৌছিল। সৈ গণ স্থলপথে আসিল।

ঢাকার কাছে দোলাই নদী দুই শাখাতে বিভক্ত হইয়াছিল, একটি খিজিরপুরে যায়, অপরটি ভূমরা খালে পড়ে। ভূমরা খালের মোহানায় দুধাবে বেগ মুরাদ খাঁর ছুটি দুর্গ ছিল। তাহা ইহতমাম ও সহনের হাতে রাখা হইল।

৮। মুসা খাঁর সহিত দ্বিতীয়বার যুদ্ধ

পরাজিত মুসা খাঁ কাত্রাবু পৌছিয়া, আবার যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এবার লক্ষ্মী নদী তাঁহার আশ্রয়স্থান হইল। শ্রীপুর ও বিক্রমপুরে সামন্ত ছুটি চৌকি (ছোট থানা) রাখিয়া তিনি পদ্মার নালার এই দিকে বহিলেন, তাঁহার পশ্চাতে মির্জা মুনী, নালাব অপর পারে আলাওল খাঁ; কদম বহুলে [নবাবগঞ্জের সামনে লক্ষ্মীর অপর পারে] আব্দুল্লা খাঁ, কাত্রাবুতে দাযুদ খাঁ, ভূমরা খালে মহম্মদ খাঁ, এবং চূড়াতে † বাহাদুর খাঁ মৌতায়েন হইল।

ইহাদের বিরুদ্ধে ইসলাম খাঁ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সহন ও শেখ কমাল খিজিরপুর ও কুমারসর দখল করিবার আজ্ঞা পাইলেন। রওনা হইয়া প্রথম দিন সহন ও শেখ কমাল কুপার [ধাপার?] মোহানায় থামিলেন। রাত্রি চারি ঘড়ি থাকিতে সৈন্যগণ লক্ষ্মীর পাড় দিয়া ছুটিয়া চলিল। প্রভাত হইলে সহন খিজিরপুরে ‡ এবং শেখ কমাল কুমারসরে পৌছিয়া গড়

* গোয়াধবী বা কতিয়াধবী?

দোলাই—“এই খালের একটি শাখা ঢাকা সহরের মধ্য দিয়া বাবুর বাজারের নিকট বুড়ী গঙ্গা নদীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কামারনগরের উত্তর প্রান্ত হইতে ইহা একটি শাখা বংশালের মধ্য দিয়া টঙ্গী নদীতে মিলিত হইয়াছিল।” [যতীন্দ্র, ১—৭৬]

পদ্মাব—“বঙ্গের” পড়া যায়।

† চূড়া—নবাবগঞ্জের † মাইল পূর্বে চূড়ন ঝিলের উত্তরে চূড়ন নামে এক গ্রাম আছে।

কুমারসর—নারায়ণগঞ্জ হইতে দেড় মাইল দক্ষিণে এবং ফিবিঙ্গী বাজারের উত্তরে রেনেলের ম্যাপে Coblenesser নামে একটি স্থান আছে।

‡ “খিজিরপুরের মোহানায় দোলাই নদী লক্ষ্মীতে পড়িয়া নিজ নাম ত্যাগ করে।” এখানে নদী দুই সহন কটারী ও মানকী নৌকা দিয়া এক পুল বাধিলেন এবং দুই পাড়ে সৈন্য সাজাইলেন। নিজে খিজিরপুরের মসজিদে কেতল লইয়া রহিলেন।

বানাইতে লাগিলেন। শত্রুরা নৌকায় আসিয়া তোপ চালাইয়া বাধা দিতে লাগিল। অনেক লোক মরিল, নৌকা ডুবিল, কিন্তু দিন-শেষে সহনের দুর্গ সম্পূর্ণ হইল। এক দিন পবে ইহতমাম খাঁকে খিজিরপুরে এবং সহনকে কাত্রাবু সম্পূর্ণ (অর্থাৎ দাযুদ খাঁর বিরুদ্ধে) পাঠান হইল। এইরূপে ১২ মার্চ ১৬১১, নও-রোজ উপস্থিত হইল।

মির্জা সহন স্থির করিলেন যে হাতীর পিঠে লক্ষ্মী পার হইয়া কাত্রাবু দুর্গ আক্রমণ করিবেন। সেই রাত্রে দুই ঘড়ির সময় একজন বেপারির খেলনা নৌকা (—আধ কোসা) বধা পড়িল; সে বলিল যে শত্রুপক্ষে জনরব উঠিয়াছে যে চূড়ায় বাহাদুর খাঁ মূল সেনাপতি আব্দুল ওয়াহিদেবের সহিত সন্ধি করিয়াছে, এবং সে যেন বাদশাহী সৈন্যকে নদী (দোলাই) পার করিয়া না দিবে পারে একজন মুসা খাঁ সেই দিকটা সাবধানে পাহারা দিতেছেন। সহনও মহা স্তব্ধ হইল; তাঁহাকে বাধা দিবার শক্তি নাই।

সেই রাত্রেই এক গ্রহর থাকিতে তিনি কয়েকপানি ছোট ভিক্ষিতে ১৪০ অশ্বারোহী ও ৩০০ বর্কআন্দাজ পার করিয়া দিলেন, তাহাদের নেতা শাহবাজ খাঁ। তখনও দুই ঘড়ি রাত্রি ছিল। সহন, ঢালী পাইকদের (তরবালধারী পদাতিক) ডাকিয়া বলিলেন, “তোমরা দাঁড়াইয়া আমার মুখ দেখিতেছ! তোমাদের হাজার জনকে পার করিবার জন্য কোথায় নৌকা পাইব? যাও প্রত্যেকে একটি কলাগাছ লইয়া ভাসিয়া পার হও।” তাহাই করা হইল। ইতিপূর্বে তিনি শাহবাজ খাঁকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে যখন তিনি হাতী লইয়া নদীতে সাঁতার দিবেন, যাঁ যেন তুরী বাজাইয়া দাযুদ খাঁর দুর্গের দিকে ধাইয়া যায়, তাহা হইলে শত্রুগণ নদীবক্ষে সহনকে আক্রমণ করিতে অবসর পাইবে না। এখন এ পারে নিজ গড়খাইয়ে সেনাদের বলিলেন, যে, শত্রু-নৌকা নদীতে দেখা দিলে তাহারা যেন তোপ মাগিয়া তাড়াইয়া দেয়।

তাহার পর “বিস্মিল্লা” বলিয়া নিজ বাছা বাছা বীর সৈন্য সহ কয়েকটি হাতীতে চড়িয়া নদীতে সাঁপাইয়া

পড়িলেন, এবং সাত্ত্বাইয়া পরপারের দিকে গেলেন। তখন শাহবাজ খাঁর দল দায়ুদ খাঁর দুর্গ আক্রমণ করিল এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ করিবার পর মধ্যে প্রবেশ করিল। শত্রু পলাইল।

ইতিমধ্যে ইহতমাম খাঁ সগস্ত নওয়ারা লইয়া দোলাই নদী হইতে বাহিব হইয়া লক্ষিয়া ছাড়িয়া কদমরস্থলের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সংবাদে রণশাস্ত্র সহন পুনর্বার নদী পার হইয়া দুতিন শত অশ্বারোহী এবং অনেক পদাতিক বর্কান্দাজ ও তীরান্দাজ লইয়া শীঘ্র কদমরস্থলে পিতার সঙ্গে ধোঁগ দিলেন।

এখানে নদীতে ভীষণ জলযুদ্ধ বাধিল, কাবণ বাদশাহী নওয়ারা বিনা আজ্ঞা এবং সেনাপতিকে না লইয়া শত্রু নৌকার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, এবং এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় শত্রু নওয়ারা দ্বারা খুব আক্রান্ত হইল। শত্রুদের দৃষ্টি অন্যদিকে লইয়া গিয়া বাদশাহী নৌকাকে বিশ্রাম দিবার জন্য মির্জা সহন হাতীর পিঠে ছুটিয়া মুসা খাঁর দুর্গ আক্রমণ করিলেন। মুসা ও মুমীন নৌকাধোগে পলাইয়া গেল। তখন সহন কয়েকজন সৈন্য লইয়া পদব্রজে বন্দরের [বন্দর?] নালা পার হইয়া অপর পাড়ের শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। আলাওল খাঁও নিজ দুর্গ খালি করিয়া পলাইল। পরে জোয়ার আসায় এই নালা জলে পূর্ণ হইল, সহনের ফিবিয়া আসায় বাধা পড়িল, তাঁহাকে শত্রু নওয়ারার সহিত কঠিন যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে হইল। অবশেষে শত্রু পবাস্তিত এবং শত্রু নওয়ারা ধৃত হইল।

মুসা খাঁ নিজ ভ্রাতৃগণ ও জমিদারগণ সহিত বেকুলীয়াচর হইয়া নিজ রাজধানী সাম্রাজ্যে আশ্রয় লইলেন।

৯। মুসা খাঁর শেষ চেষ্টা

মুসা খাঁ ইব্রাহিমপুরের চবে পলাইয়া গিয়া মির্জা মুমীনকে সাম্রাজ্য হইতে তাঁহার ধন-দৌলত লইয়া এখানে আসিতে আজ্ঞা পাঠাইলেন। মুসা খাঁর প্রধান কর্মচারী হাজী শমসুদ্দীন বোঘাদদী ইসলাম খাঁব সহিত

দেখা করিয়া পরিত্যক্ত সাম্রাজ্য নগর মুঘলদের হাতে সমর্পণ করিলেন।

কিন্তু মুসা খাঁর ভ্রাতা দায়ুদ খাঁ তখনও ফিরিজীদের* পথ বন্ধ করিয়া বেশ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ফিরিজী—জলদস্যুগণ রাত্রি দায়ুদ খাঁর বাড়ী আক্রমণ করিল এবং যেই দায়ুদ খাঁ বীরের মত মাচানের উপর হইতে নামিলেন, তাহার তাঁহাকে না চিনিতে পারিয়া এক জুলিতে মারিয়া ফেলিল, এবং মুসা খাঁর লোক-জন আসিবার আগেই পলাইয়া গেল।

তখন মুসা খাঁ ভাবিলেন যে নদীতীরে দুর্গের পর দুর্গ গড়িয়া সহনেব গড়ে পৌছিয়া তাহা আক্রমণ করিবেন। মানসিংহের শাসনকালে মগ-রাজা বঙ্গ আক্রমণ করিয়া নদীতীরে যে গড় করিয়াছিলেন তাহা পুর্বাতন ভগ্নদশায় ছিল। মুসা খাঁ নৌকা-ধোগে সেখানে পৌছিয়া দেওয়াল তুলিতে লাগিলেন। কিন্তু সহনের আক্রমণে পরাস্ত হইয়া ইব্রাহিমপুরে পলাইয়া আসিলেন।

কোদালিয়া মোহানার দুর্গে তুর্কমাক খাঁর স্থলে শেখ রুকন নিযুক্ত হইল। সে সর্বদা মদ খাইয়া বিভোর থাকিত। এক সপ্তাহ পবে এই সংবাদ পাইয়া মুসা খাঁ ঐ দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সহন বন্দরের (বন্দর?) নালা হইতে তাঁহাব উপর তোপ চালাইলেন; বাদশাহী নওয়ারাও নদীবক্ষে আসিয়া মুসা খাঁর নৌকা আক্রমণ করিল। অনেকক্ষণ এবং বারবার যুদ্ধ করিয়া শত্রুরা অবশেষে পরাস্ত হইয়া পলাইল,—অনেকে হত হইল, অনেকে জলে ডুবিয়া মরিল।

এইসব সংবাদে বাহাদুর ঘাজী আসিয়া ইসলাম খাঁর বশ্যতা স্বীকার করিল। মজলিস কুতবও অধীন হইল। বর্ষা-আগমনে ইসলাম খাঁ বন্দরের নালা হইতে থানা তুলিয়া কুমারসরে আনিলেন।.....অবশেষে মুসা খাঁ নিজ জ্ঞাতভাই লইয়া ইসলাম খাঁর নিকট আসিয়া ধরা দিলেন, এবং ঢাকায় নজরবন্দী হইয়া

* মুঘলেরা কি ফিরিজীদের মুসা খাঁর বিরুদ্ধে উৎসুকইয়া দিয়াছিল? কণ্টকেনৈব কণ্টকং?

রহিলেন, কারণ স্বাধীন শীঘ্রই উসমানকে আক্রমণ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, এমন সময় অপর শত্রুকে ছাড়িয়া দিলে বিপদ বাড়িলে ।*

ষট্ঠাংশ সরকার

* অবাসীর পাঠকেরা যদি এই প্রবন্ধে উল্লিখিত নদী শাল ও গ্রামের স্থান-নির্দেশ ও বর্ণনা কবির পাঠান তাহা সাধবে বিচার করিব।* কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে আক্রেখী, ইছামতী, করতোয়া ও তিস্তা নদীর পতি ও তেজ এখন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। বেনেলের ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত বেক্সল এট-লাসেও ভিন্ন।

—ষট্ঠাংশ সরকার।

আলাইপুর—পদ্মার পূর্বতীরে, বামপূর্ব-বোয়ালিয়া হইতে প্রায় ১৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত।

ফতেপুর—পদ্মার পূর্বতীরে, রামপুর-বোয়ালিয়া হইতে প্রায় ২৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।

ঘোড়াঘাট—রংপুর জেলায় ঢাকলে ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত, কবতোয়ার তীরবর্তী। নিলকামাতি হইতে প্রায় ১৬ মাইল পূর্বে।

শাহজাদপুর—পাবনা হইতে প্রায় ২৫ মাইল উত্তরপূর্বে।

বোকাইনগর—ময়মনসিংহ জেলায়। কিশোরগঞ্জের প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত।

আলাপসিংহ—ময়মনসিংহ জেলায় একটি পূর্ণগণা, ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

সোনাবাঙ্গু—সবুকার বাজুহাব অন্তর্গত একটি পূর্ণগণা। ঢাকা হইতে প্রায় ২৫ মাইল পশ্চিমে সোনাবাঙ্গু নামে একটি স্থান আছে।

ভাতুরিয়াবাঙ্গু—তাহেবপুর সহ সমুদ্র উত্তর রাজসাহী ভাতুরিয়া-বাঙ্গু অন্তর্গত ছিল। ভাতুরিয়া পূর্ণগণা উত্তরে দিনাজপুর ও ঘোড়াঘাট, পশ্চিমে মহানন্দা ও পুনর্ভবা নদীর, পূর্বে কবতোয়া নদী, দক্ষিণে বাঙ্গসাহীর কিংবদন্তি। আক্রেখী নদী ভাতুরিয়া পূর্ণগণার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত।

কেলাবাড়ী—করইবাড়ী? কবইবাড়ী ময়মনসিংহ জেলায় একটি পূর্ণগণা।

চিলজোয়াব—ভাতুরিয়াবাঙ্গুর অন্তর্গত একটি পূর্ণগণা।

আমরুল—রাজসাহী জেলায় একটি পূর্ণগণা। সরকার ববকাবাদের অন্তর্গত।

চন্দ্রপ্রতাপ—ঢাকা জেলায় একটি পূর্ণগণা।

ভাটি—মেঘনাদ ও হুগলী নদী এতদুভয়ের মধ্যবর্তী ভূভাগ পূর্বকালে ভাটি নামে পরিচিত ছিল। সাধারণতঃ এই ভূভাগের দক্ষিণ এবং সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থানই ভাটি নামে প্রসিদ্ধ। মোসলমান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই ব্রহ্মপুত্রের সহিত পদ্মাব এবং লক্ষ্যার সহিত ব্রহ্মপুত্রের সম্ম পর্বাঙ্গ স্থানকে ভাটি নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহা ১৮ ভাটি নামে পরিচিত ছিল। এক্ষণে বাধবগঞ্জ ও হুলনাব অন্তর্গত দক্ষিণবর্তী স্থানগুলিই ভাটি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (ঢাকার ইতিহাস ১ম—৪২২ পৃঃ।)

শিয়ালগড়—বেনেলের মায়ে জাকবগঞ্জ হইতে প্রায় ৫ মাইল দক্ষিণে শিবানো নামক একটি স্থান দেখা যায়। নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত জরকুপুবেব অনতিদূরে শিয়ালজলা নামক একটি গ্রাম আছে।

হুমিখাল—শাহজাদপুরের প্রায় ৫ মাইল পূর্বে হুবাঙ্গাবের মিলিত হইয়াছে। বেনেলের মায়ে কদি নামক স্থানের নিকটে একটি শাখা-নদী অঙ্কিত আছে, উহা কবতোয়া হইতে বাহিব হইয়া ইছামতীতে পতিত হইয়াছে।

কাটাসগড়—কাডাসিন? ইছামতী নদীর তীরে, সাতার হইতে প্রায় ২৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

যাজাপুর—ইছামতী নদীর তীরে, সাতার হইতে প্রায় ১৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। (ঢাকার ইতিহাস ১ম—৪২৭ পৃঃ।)

ইছামতী নদী—সাহেবগঞ্জের নিকট ধলেশ্বরী হইতে উৎপন্ন হইয়া মদনগঞ্জের পূর্বদিকে পুনর্বার ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে। পূর্বে এই নদী জাকবগঞ্জের দক্ষিণে হুবাঙ্গাবের মোহানার বিপবীত দিকে নাথপুবেব ক্যাস্টারীর নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্তী ঘোপিনীঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (ঢাকার ইতিহাস ১ম—৪৮ পৃঃ।)

ডাকহাড়া—যাজাপুর হইতে প্রায় ৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে ঢাকজেরা নামক একটি স্থান আছে।

ফতেহাবাদ—ফরিদপুর।

মাটিভাঙ্গা—মাধাভাঙ্গা? পদ্মার বে স্থান হইতে জলঙ্গী বাহির হইয়াছে, তাহাব প্রায় ৫ ক্রোশ নিম্ন দিয়া মাধাভাঙ্গা নদী বহির্গত হইয়া প্রথমে দক্ষিণপূর্ব মুখে পবে কিয়দূর আসিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম-বাহিনী হইয়া কৃষ্ণগঞ্জের তলদেশে স্থিতি-বিস্তৃত হইয়াছে। এই দুই প্রোভেব একেব নাম চূর্ণা, অপরেব নাম ইছামতী।

বলুয়া—ইছামতীর তীরে, ঢাকা হইতে প্রায় ২৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

কলারুপা—কলারুপা?—ইছামতীর তীরে, ঢাকা হইতে প্রায় ১৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

পোলাই নদী—বালু নদী হইতে বহির্গত হইয়া ঢাকা ফরিদাবাদের নিকট বুড়িগঙ্গাব সহিত মিলিত হইয়াছে। (ঢাকার ইতিহাস ১ম—৭৬।)

ঐপুর—সোনাবর্ণা হইতে ২ ক্রোশ দূরবর্তী স্থানে কালীগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। অথবা পদ্মা-গর্ভে বিনীন হইয়াছে। (ঢাকার ইতিহাস ১ম—৫১ পৃঃ।)

বিজিবপুর—নাবাবগঞ্জের ১ মাইল উত্তরপূর্বদিকে, ঢাকা হইতে প্রায় ২ মাইল অন্তরে, লক্ষ্য নদীর তীরে অবস্থিত। (ঢাকার ইতিহাস ১ম—৪৫৩ পৃঃ।)

ছমবা—ডেমবা? ঢাকার উত্তর-পূর্বে বালু ও লক্ষ্য নদীর সম্মিলনে প্রায় ৬ মাইল অন্তরে অবস্থিত। (ঢাকার ইতিহাস ১ম—৪৬২ পৃঃ।)

লক্ষ্য নদী—এই নদীর উত্তরাংশ বানাব বলিয়া পরিচিত। ইহা এলাবিস্কু নামক স্থানের পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে উৎপন্ন হইয়া নারায়ণগঞ্জের দক্ষিণে ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে। (ঢাকার ইতিহাস ১ম—৪৪ পৃঃ।)

কদমরহুল—নারায়ণগঞ্জের অপর তীরে লক্ষ্য নদীর পূর্বতটে নবীগঞ্জস্থিত কদমরহুল দুর্গ মোসলমানগণের একটি তীর্থস্থান। (ঢাকার ইতিহাস ১ম—৪২২ পৃঃ।)

কড়াবু—কর্ডাভু বা কড়াপুর—লক্ষ্যনদীর তীরে থিজিরপুরের বিপবীত দিকে অবস্থিত, অথবা কাটারব নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে ঈশাবীর অগ্রাগাব ছিল। (ঢাকার ইতিহাস ১ম—৪৪৮ পৃঃ।)

কুমারসর—কুমারহুল? সহব সোনারগাঁয়ের অনতিদূরে অবস্থিত, বেনেলের মায়ে ইহা Coblenesser নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

ভেকুলিয়া চর—কাপাসিয়া থানাব অন্তর্গত কালীগঞ্জের অনতিদূরে ভেকুলিয়া নামক একটি স্থান আছে।

সাজকাম—সাজনগাঁও? একজালব প্রায় ৭ মাইল উত্তরে বানার নদীর অনতিদূরে সাজনগাঁও নামক একটি স্থান আছে।

ঐ যতীন্দ্রমোহন রায়

উপনিষদে শিক্ষা-প্রণালী ও ব্রহ্মবিজ্ঞায় ব্রাহ্মণের প্রভাব

ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি অল্পনায়ে ব্রহ্মচাৰী নানারূপ ক্রিয়া-কলাপের মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে বিস্তৃত ব্রহ্মবিদ্যায় উপস্থিত হইতেন। অগ্নি-চর্যা, গো-রক্ষা, ভিক্ষাহরণ প্রভৃতি কায়িক শ্রমের সহিত শিক্ষার আরম্ভ হইত, এবং আরণ্যক ও উপনিষদ অধ্যয়ন দ্বারা মানসিক বিকাশে এ শিক্ষার শেষ হইত।

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের সম্বন্ধ।

বেদের ব্রাহ্মণভাগেব ন্যায় আরণ্যকেও নানারূপ কর্ম্মমুহূর্ত্তানের উপদেশ আছে; কিন্তু এ সকল অমুহূর্ত্তানে প্রয়োগ অপেক্ষা চিন্তনের অংশই অধিক। উপনিষদ ও ব্রাহ্মণের উপদিষ্ট জ্ঞান ও কর্ম্মের ব্যবধান লোপ করিয়া আরণ্যক পরম্পরের মধ্যে সম্বন্ধের সূচনা করিয়া দিত।

ব্রহ্মবিজ্ঞায় ক্ষত্রিয়প্রভাব সম্বন্ধে অমূলক ধারণা।

আপাতদৃষ্টিতে যজ্ঞ ও ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে পরম্পর বিরোধ দেখিতে পাইয়া কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন—একই ব্রাহ্মণ জাতি এই দুই মার্গের প্রবর্ত্তক হইতে পারেন না; তাঁহাদের মতে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছেন। বোধ হয়, দুই কারণে ইহা বা একরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহাদের ধারণা বেদে তাঁহারা সর্বদাই অমুহূর্ত্তান-বহুল যাগ-যজ্ঞে মগ্ন থাকিতেন, তাঁহাদের চিন্তার দ্বারা কখনই ব্রহ্মবিদ্যা স্থান পাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ উপনিষদের মধ্যেই দুই-একটি আখ্যায়িকা পাওয়া যায়, যাহাতে ক্ষত্রিয়েব নিকট ব্রাহ্মণের উপদেশ-লাভের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

কর্ম্ম হইতে জ্ঞানের পরিপূর্ত্তি।

কিন্তু সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে উপবাস্তব মত নিতান্ত অর্থোক্তিক বলিয়া মনে হয়। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড যথাক্রমে ‘আরুহন্তু’ ও ‘আরুহেব’ অর্থাৎ জ্ঞানেচ্ছু ও লব্ধজ্ঞানের আশ্রয়ণীয় একই পথের আদি ও অন্ত। চতুরাশ্রমেব ক্রম হইতেই আমবা কর্ম্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ এবং পৌরোপাধ্য লক্ষ্য কবিত্তে পাবি; প্রথম দুই

আশ্রমে কর্ম্মের অমুহূর্ত্তান এবং শেষ দুই আশ্রমে কর্ম্ম-সম্যাস করিতে হইত। যাগ প্রয়োগেই ব্রহ্মবিজ্ঞার অঙ্কুর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রজাপতি যজ্ঞের প্রধান দেবতা, সমস্ত কর্ম্মের অধীশ্বর; কালক্রমে এই প্রজাপতি, বিশ্বকর্মা বা যজ্ঞপুরুষের ব্রহ্মরূপে পরিণতি অতি স্বাভাবিক। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বহু দেবতা এক সঙ্গে বিশ্বদেব নামে অভিহিত হইয়াছেন, উপনিষদে তাঁহারা ই আবার সম্পূর্ণরূপে বহুব্রহ্মবিহীন হইয়া ব্রহ্ম লাভ করিয়াছেন।

যজ্ঞেই ব্রহ্মবিজ্ঞার অঙ্কুর দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদ (১), শতপথ ব্রাহ্মণ (২), প্রভৃতি গ্রন্থে ব্রহ্মের স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। সূতরাং উপনিষদের যুগে ক্ষত্রিয়গণেব মধ্যেই ব্রহ্মবিজ্ঞা উদ্ভূত হইয়াছিল একরূপ কল্পনা করিবার কোন হেতু নাই। ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানকাণ্ড বা কর্ম্ম-সম্যাসের বিরোধী ছিলেন একরূপ উক্তি ভিত্তিহীন। কোন কোন যজ্ঞামুহূর্ত্তানেই সম্যাসের আরম্ভ হইত, কর্ম্মের মধ্যে ভাগ, আসক্তির মধ্যে বিরাগের সূচনা হইত। সর্বমেধযজ্ঞের যজমান, পার্শ্বের সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া যজ্ঞান্তে সম্যাস গ্রহণ করিতেন (৩)। ক্ষত্রিয়গণও যজ্ঞেব বিরোধী ছিলেন না। ব্রহ্মিষ্ঠ জনক যজ্ঞসভায় বসিয়াই ব্রহ্মেব আলোচনা করিয়াছিলেন (৪)। ব্রাহ্মণগণ যখন বৈশ্বানর-বিদ্যায় উপদেশ লাভের জন্য রাজা অশ্বপতির নিকট গিয়াছিলেন, তিনিও তখন যজ্ঞামুহূর্ত্তানের আয়োজন করিতেছিলেন (৫)।

ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষত্রিয়েব বিজ্ঞা-গ্রহণ।

উপনিষদে ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণের বিদ্যাগ্রহণের আখ্যায়িকা দেখা যায় বটে, কিন্তু আবাব উপনিষদেই ক্ষত্রিয় অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক অধিক ব্রাহ্মণ উপদেষ্টার নামেরও উল্লেখ দেখিতে পাই।

জনক ও তাঁহার আচার্য্যগণ।

ক্ষত্রিয়গণেব মধ্যে রাজা জনকেরই ব্রহ্মবিদ্যায় সর্বা-পেক্ষা অধিক খ্যাতি। কিন্তু এই জনকও ব্রাহ্মণ যজ্ঞ-বন্ধেব নিকট ব্রহ্মোপদেশ লাভ করিয়াছিলেন (৬)। ইহাব পূর্বেও তিনি ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভের জন্য জিহ্বা, উদচক, বর্ক,

গন্ধীবিপীত, সত্য-কাম এবং বিদগ্ধ এই পাঁচজন
আচার্যের শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন (৭)।

রাজা জ্ঞানশ্রুতি ও ব্রাহ্মণ রৈক্য।

রাজা জ্ঞানশ্রুতি বহুক্ষেপে ব্রাহ্মণ রৈক্যের সম্মান করিয়া
তাঁহার নিকট উপদেশ লইতে গিয়াছিলেন (৮)।

রাজা বৃহদ্রথ ও শাক্যন।

ইক্ষাকু-বংশীয় রাজা বৃহদ্রথ ব্রাহ্মণ শাক্যনের চরণে
নত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন (৯)। এইরূপে
বহু ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষত্রিয়ের উপদেশ লাভের আখ্যায়িকা
পাওয়া যায়।

ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণের শিক্ষা।

ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণের উপদেশ লাভের আখ্যায়িকা-
গুলি একে একে পর্যালোচনা করিলে উহা দ্বারা কিছুতেই
বলা যায় না যে, ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মবিদ্যার জনক ও শিক্ষক
ছিলেন।

কর্মকাণ্ড বিষয়ে ক্ষত্রিয় উপদেষ্টা। তিনজন ব্রাহ্মণ ও

রাজা জনক। তিনজন ব্রাহ্মণ ও রাজা প্রবাহণ।

শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায় যে, ক্ষত্রিয় জনক অগ্নি-
হোত্র সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ ঋতকেতু, সোমশস্য, এবং যাজ্ঞবল্ক্য
অপেক্ষা অধিক কথা বলিয়াছিলেন (১০)। ইহাতে ব্রহ্ম-
বিদ্যার সংস্পর্শও নাই। কারণ অগ্নিহোত্র একটি যজ্ঞ
বিশেষ। উপনিষদে প্রবাহণ জৈবলি নামক একজন ক্ষত্রিয়
চুই স্থলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন।
প্রথম আখ্যায়িকা হইতে এইমাত্র জানা যায় যে, শিলক,
দাল্ভ্য, ও প্রবাহণ এই তিনজন সতীর্থ বিদ্যার্থীর স্বরসম্বন্ধে
আলোচনাকালে ক্ষত্রিয় প্রবাহণই অধিক মেধাবিত্বের
পরিচয় দিয়াছিলেন (১১)। এই স্বরবিদ্যাও কর্ম-
কাণ্ডেরই অন্তর্গত।

ব্রাহ্মণ উদ্ধালক ও রাজা প্রবাহণ।

এই ক্ষত্রিয়ই পরে পঞ্চালের রাজা হইলে রাজসভায়
সমাগত ঋতকেতুকে প্রশ্ন করিয়া অমৃতের করেন এবং
ঋতকেতুর পিতা উদ্ধালক ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইয়া
আসিলে বলিয়াছিলেন যে, এ বিদ্যা কোন ব্রাহ্মণ জ্ঞানেন
না (১২)। ইহার নাম পঞ্চাশিবিদ্যা। মৃত্যুর পর
জীব যে-সকল পথ দিয়া পবলোকে গমন কবে এবং

পুনরায় ঋতকেতু বৃষ্টির জলের সহিত পৃথিবীতে পতিত হইয়া
জন্মগ্রহণ করে, তাহার বর্ণনাই এই বিদ্যার বিষয়। এই
আখ্যায়িকাই ব্রহ্মবিদ্যার ক্ষাত্রত্ববাদীদিগের প্রধান
অবলম্বন; কারণ এই স্থানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে বিষয়টি
ব্রাহ্মণের অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু ইহাও প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা
নহে। স্মরণ্য ইহা না জানিলেও ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মবিদ্যায়
অজ্ঞ ছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। বিশেষতঃ এই
আখ্যানটিতে প্রবাহণের নিজের কথাতেই পরস্পর-বিরোধ
দেখা যায়। ঋতকেতুর নিকট উত্তর পাওয়া যাইবে
এরূপ আশা করিয়াই বোধ হয় তাঁহাকে রাজা প্রবাহণ প্রশ্ন
করিয়াছিলেন; কারণ ঋতকেতু উত্তর দিতে অসমর্থ
হইলে তিনি বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যে
ব্যক্তি এই প্রশ্নগুলির উত্তর জানে না তাহার শিক্ষাই
সম্পূর্ণ হয় নাই (১৩)। অথচ যে বিদ্যা তৎপূর্বে কোন
ব্রাহ্মণই জানিতেন না, তাহা ঋতকেতুর জানিবার সম্ভা-
বনাই ছিল না। 'এই-সকল দেখিয়া মনে হয়, উপাখ্যানে
অক্ষবাক্য মাত্র প্রমাণ নহে, কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্যসাধনই
ইহার উদ্দেশ্য। ভারতীয় প্রাচীনমতেও বেদের উপাখ্যান-
ভাগ অর্থবাদ মাত্র।

ছয়জন ব্রাহ্মণ ও রাজা অশ্বপতি।

আর-একটি আখ্যায়িকা এইরূপ (১৪) :—ব্রাহ্মণ আকুণি
বৈশ্বানর-বিদ্যার আলোচনা করিতেছেন শুনিয়া প্রাচীন-
শাল, সত্যযজ্ঞ, ইন্দ্রদ্রাঘ, জন এবং বৃড়িল এই পাঁচজন
ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট উপদেশ লইতে আসিলেন;
আকুণি আবার তাঁহাদিগকে লইয়া কৈকেয় অশ্বপতির
নিকট উপস্থিত হইলেন; কারণ সে সময়ে অশ্বপতিও এই
বিদ্যার আলোচনা করিতেছিলেন। এখন দেখা যাইতেছে
ব্রাহ্মণ আকুণি এবং ক্ষত্রিয় অশ্বপতি উভয়েই স্বতন্ত্রভাবে
একই বিষয়ের অমূল্যশীলন করিতেছিলেন, কিন্তু আকুণি
তখনও কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইহা
হইতে বলা যায় না যে ক্ষত্রিয়গণই এ বিদ্যার উদ্ভাবক ও
শিক্ষক ছিলেন।

ব্রাহ্মণ বাল্যকি ও রাজা অজাত-শত্রু।

অপর একটি আখ্যায়িকায় (১৫) কাশী-বাস অজাত-
শত্রু ব্রাহ্মণ বাল্যকিকে ব্রহ্মের স্বরূপ শিক্ষা

দিয়াছেন। রাজা প্রথমেই বলিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়ের নিকট শিক্ষা বিপরীত ব্যবহার (১৬)। যদি তখন ক্ষত্রিয়গণই ব্রাহ্মবিদ্যার শিক্ষক হইতেন, তবে, ঐ কথার কোন অর্থই হয় না। বিশেষতঃ বাল্যকি উপদেশ লইবাব জন্ত অজ্ঞাতশত্রুর নিকট যান নাই। বরং সভায় উপস্থিত হইয়াই বাল্যকি বলিয়াছিলেন যে তিনি রাজাকে ব্রাহ্মের স্বরূপ শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন। পরে যখন দেখিলেন—অজ্ঞাতশত্রু তাঁহার অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী, তখন লজ্জিত হইয়া রাজার নিকটই ব্রাহ্মের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করিলেন। সুতরাং এই-সকল উপাখ্যান হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে ক্ষত্রিয়েবা ব্রাহ্মবিদ্যাব উদ্ভাবক এবং ব্রাহ্মণেবা যখন এই বিদ্যালভের জন্ত ব্যগ্র হন, তখন তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়েরা শিক্ষা দান করিয়া- ছিলেন।

রাজগণের বিজ্ঞাবজ্ঞাব কাবণ।

আমরা উপাখ্যান-ভাগ হইতে জানিতে পারি যে, সে যুগের রাজগণ জ্ঞানী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। লক্ষ-প্রতিষ্ঠ ব্রাহ্মগণ তাঁহাদিগের সভায় থাকিয়া বিদ্যাশু-শীলন করিতেন। মধ্যে মধ্যে রাজসভায় বিবাত বিদ্বৎ-সম্মিলন হইত (১৭)। প্রত্যেক রাজাই ইচ্ছা করিতেন যে, তাঁহার সভায় অধিক-সংখ্যক পণ্ডিতের সমাগম হউক, এবং আগন্তুক পণ্ডিতগণের সংখ্যার হ্রাস হইলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন (১৮)। রাজারা পণ্ডিতগণের বিচার শুনিতে শুনিতে বহু কঠিন সিদ্ধান্তে জ্ঞান লাভ করিতেন। যে ব্রাহ্মণ যাহা জানিতেন, তাহাই রাজ-সভায় প্রচারিত হইত; সুতরাং বিভিন্ন দেশের পণ্ডিত-গণের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত রাজা সভায় বসিয়া জানিতে পারিতেন। এইরূপে রাজার পক্ষে জ্ঞানলাভের অনেক সুযোগ ছিল। এইজন্যই বোধ হয় উপনিষদে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে কেবল কয়েকজন রাজাই ব্রাহ্মবিদ্য রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন; কোন সাধারণ ক্ষত্রিয়ের নামে ঐক্য উল্লেখ পাওয়া যায় না। রাজা একজন ব্রাহ্মণের নিকট কোন সিদ্ধান্ত শুনিয়া সে বিষয়ে প্রশ্ন দ্বারা অপর একজন ব্রাহ্মণকে পর্বাস্ত করিতে পারিতেন; সুতরাং কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারিলেই প্রমাণিত

হয় না যে সে বিষয়টি সকল ব্রাহ্মণের অজ্ঞাত ছিল। কোন কোন রাজা ব্রাহ্মবিদ্যার আলোচনা করিতেন, ইহা দেখিয়া কেবল ক্ষত্রিয়গণই ঐ বিদ্যার শিক্ষক ছিলেন এরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, তাহা হইলে কোন কোন রাজা কর্মকাণ্ডে পারদর্শী (১৯) ছিলেন বলিয়া আমরা ইহাও মনে করিতে পারি যে কর্মকাণ্ডেও ক্ষত্রিয়গণই ব্রাহ্মণদিগকে শিক্ষা দিতেন।

উপনিষদের আখ্যায়িকা কৰ্ম্মী ও জ্ঞানী মধ্যে

বিরোধ নাই।

উত্তরকালে ক্ষত্রিয় শাক্যসিংহ ও মহাবীর ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম এবং কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে মত প্রচার করায় এবং তাঁহাদের শিষ্যগণের মধ্যে অনেকে ক্ষত্রিয় ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে উপনিষদের যুগেও ক্ষত্রিয়গণ কর্মকাণ্ডের বিরোধী ছিলেন এবং তাঁহারা ইচ্ছা-প্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে জ্ঞানমার্গ দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এ ধারণা অমূলক। স্বজাতির মধ্যে দুইজন মহাপুরুষ পাইয়া বহু ক্ষত্রিয় তাঁহাদিগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া- ছিলেন, এবং স্বজাতীয় রাজগণ তাঁহাদিগের গোষকতা করেন।

ক্ষত্রিয়গণ জ্ঞানমার্গের উদ্ভাবক বা পোষক ছিলেন বলিয়াই বুদ্ধ বা মহাবীর যে উত্তরাধিকাবশ্রেণে উহা তাঁহাদের নিকট হইতে পাইয়া উহার পবিত্রতন বা পরিবর্জন করেন এরূপ মত ভ্রান্ত। যদি তাঁহারা তাঁহাদের মতের কোন উপকরণ পূর্ববর্তী সময়ের চিন্তা-শ্রোত হইতে লইয়াই থাকেন তাহা হইলে সেই চিন্তা-শ্রোত যে ব্রাহ্মণ হইতে প্রবাহিত হয় নাই এমন কথা বলা যায় না। উপনিষদের আখ্যায়িকা কৰ্ম্মী ও জ্ঞানীর মধ্যে বিরোধ নাই।

আমরা উপনিষদের আখ্যায়িকার মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের কোন বিরোধ দেখিতে পাই না। যদি ব্রহ্মজ্ঞ ক্ষত্রিয়গণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়েব সহিত স্পর্ধা করিয়াই স্বতন্ত্র মত প্রচার করিতেন, তাহা হইলে, তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে এত সম্মান করিতেন না। যেখানেই কোন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিয়াছেন, সেখানেই উপদেষ্টা অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন।

বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। উপনিষদের আখ্যান হইতে জানা যায় ব্রাহ্মগণ বিছালোচনা করিতেন, রাজারা তাঁহাদিগকে পোষণ করিতেন এবং আলোচনায যোগ দিতেন, পক্ষান্তরে রাজারা যজ্ঞ করিতেন, ব্রাহ্মণেরা তাহাতে শ্রদ্ধা করিতেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সর্বদা পরস্পরের সহায় হইতেন (২০)। তাঁহাদিগের মধ্যে জাতিগত মতবিরোধের কল্পনা নিতান্তই অযৌক্তিক।

আখ্যায়িকার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

উপনিষদের আখ্যানগুলি ধীরভাবে পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, অক্ষরার্থ ছাড়া এগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্দেশ্য আছে। আখ্যায়িকা হইতে আমরা নানারূপ উপদেশ পাইয়া থাকি।

অতীতে ‘সুত’ ‘অনুচানমানী’ খেতকেতু পিতার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই (২১)। জনকের সন্যাস বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতগণ সকলে যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন (২২)। ‘দৃষ্ট’ বাল্যকি অজাতশত্রুকে উপদেশ দিতে যাইয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট উপদেশ লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন (২৩)। পরমব্রহ্মজ্ঞ জনকও যখন ভাবিয়াছিলেন যে যাজ্ঞবল্ক্য বোধ হয় তাঁহার নিকট উপদেশ লইতেই আসিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে শ্রমের নিকট নত হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল (২৪)। এই-সকল আখ্যানের তাৎপর্য এই যে বিদ্যাভিমানী প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

ঋগ্বেদাদি বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াও নারদ আত্মবিদ্য হইতে পারেন নাই (২৫)। ইহা হইতে জানা যায় যে অধ্যয়ন করিলেই পরাবিদ্যা লাভ করা যায় না।

মহানশালী রাজা জ্ঞানশ্রুতি অতি দীন রৈকের নিকট ঐশ্বর্যের বিনিময়ে বিদ্যা গ্রহণ করিতে যাইয়া প্রথমবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন (২৬)। এই আখ্যায়িকা দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে যে বিদ্যা-সম্পদের নিকট পার্থিব ঐশ্বর্য তুচ্ছ।

ব্রাহ্মণ্য-গর্বিত খেতকেতু পঞ্চালরাজ প্রবাহণের প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া পিতাকে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, তিনি একটা নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়ের

নিকট পবাস্তিত হইয়াছেন (২৬)। এই আখ্যায়িকার স্পষ্ট উপদেশ এই যে, সামাজিক বিধান নিয়ন্ত্রণের ব্যক্তিও উচ্চজাতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক জ্ঞানশালী হইতে পারেন। এইরূপে উপনিষদের প্রত্যেক আখ্যায়িকার মধ্যে কোন না কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত দেখা যায়।

কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মগণের ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তিব কথা এতই সত্য যে ব্রাহ্মণ-রচিত উপনিষদেও সে কথা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও নিবন্ধ করিতে হইয়াছে। কিন্তু উপনিষদেই বহুস্থলে বিদ্যাসম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে; বৃহদাব্যাক্যের চারিটি প্রকরণের শেষে (২৭) চারিটি বংশ ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়। ঐ তালিকায় জনক, অজাতশত্রু, অশ্বপতি, প্রবাহণ প্রভৃতি কোন ক্ষত্রিয়ের নাম নাই। মণ্ডুকোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তির কথাতেও কেবল ব্রাহ্মগণের নামই পাওয়া যায়। “প্রথমে ব্রহ্মা অথর্বাকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন। অথর্বা আবার তাহা অঙ্গিরাকে দিলেন, অঙ্গির ভরদ্বাজ সত্যবাহকে এবং সত্যবাহ অঙ্গিরাকে প্রদান করিলেন (২৮)।”

জাতিবিশেষের বশবর্তী হইয়াই যদি ব্রাহ্মগণ এ-সকল তালিকা হইতে ক্ষত্রিয়ের নাম বাদ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা উপাখ্যান-ভাগেই বা ক্ষত্রিয়ের নিকট স্বজাতির অপমানের কথা লিপিবদ্ধ করিবেন কেন, তাহা বুঝা যায় না।

শঙ্করাচার্য্য “রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্” এই গীতাবাক্যের (২৯) অর্থ করিয়াছেন “এই উত্তম পবিত্র জ্ঞান বিদ্যার রাজ্য, এবং রহস্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।” স্বাভিপ্রায় সাধনের জন্য ‘রাজবিদ্যা’ শব্দের রাজ্য বিদ্যা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-প্রচারিত বিদ্যা এরূপ অর্থ করিলে ‘রাজগুহ্যের’ কিরূপ অর্থ হইবে, তাহা ভাবিবার বিষয়।

উপসংহার।

এই আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে,— (১ম) অতি প্রাচীন কাল হইতেই অধ্যয়ন ব্রাহ্মণের অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত; উপনিষদের যুগ পর্যন্ত অধ্যয়ন ব্রাহ্মণের অপরিহার্য্য কর্তব্য ছিল না—

এরূপ সিদ্ধান্ত অমূলক। (২য়) কেবল যে বানপ্রস্থী বনবাস-কালে আবণ্যক আলোচনা কবিতেন বলিয়া উহার ঐরূপ নাম হইয়াছে, তাহা নহে; ব্রহ্মচারী অরণ্যে বসিয়া উহা পাঠ করিতেন বলিয়াও এই বেদাংশের নাম আবণ্যক। এবং (৩য়) যজ্ঞবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা একই আকর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, যাহারা কৰ্ম্মকাণ্ডের উদ্ভাবক বা প্রচারক, জ্ঞানকাণ্ডও তাঁহাদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল।

শ্রী নরেন্দ্রনাথ লাহা

- (১) স্বক্ মং ২, ২, ১০। ২, ৩৬, ৭। ৬, ৭৫, ১৯। ৮, ৩, ৯।
 (২) শত ব্রাঃ ১২, ৮, ৩, ২২। ১০, ২, ৪, ৬। ১১, ২, ৩।
 (৩) শত ব্রাঃ ১৩, ৭, ১। শাখা শ্রৌ ১৬, ১৫, ৫-৬। ১৬, ১৫, ২৩।
 ১৬, ১৬, ৩-৪।
 (৪) বৃহ ৩, ১, ১।
 (৫) ছান্দো ৫, ১১, ৫।
 (৬) বৃহ ৪, ২।
 (৭) বৃহ ৪, ১।
 (৮) ছান্দো ৪, ১।
 (৯) সৈজায়গ্যপনিষদ্ ২।

- (১০) অতি বৈ নোহমং রাজস্ববন্ধুবাসী—শত ব্রাঃ ১১, ৬, ২, ৫।
 বৃহ ৪, ৩, ১।
 (১১) ছান্দো ১, ৮, ৮।
 (১২) ছান্দো ৫, ৩, ৭।
 (১৩) ষোহীমানি ন বিজ্ঞাৎ কথং দেহশিষ্টো ক্রবীত, ছান্দো ৫, ৩, ৪।
 (১৪) ছান্দো ৫, ১১।
 (১৫) বৃহ ২, ১।
 (১৬) প্রতিলোমকৈতদ্ যদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মুপেযাৎ—বৃহ ২, ১, ১৫।
 (১৭) বৃহ ৩, ১, ১।
 (১৮) বৃহ ২, ১, ১।
 (১৯) শত ব্রাঃ ১১, ৬, ২, ৫। ছান্দো ১, ৮, ৮।
 (২০) শত ব্রাঃ ৪, ১, ৪, ৬।
 (২১) ছান্দো ৬, ১।
 (২২) বৃহ ৩, ১।
 (২৩) বৃহ ২, ১।
 (২৪) বৃহ ৪, ২, ১।
 (২৫) ছান্দো ৪, ১।
 (২৬) ছান্দো ৫, ৩।
 (২৭) বৃহ ২, ৬। ৪, ৬। ৩, ৫। ৬, ৬।
 (২৮) বৃহ ১, ১।
 (২৯) গীতা ১১, ২।

কুপণের শাস্তি

(Monsieur de la Motte এর গল্প অবলম্বনে)

সে ছিল বড় কুপণ। আজীবন গতর-ভাঙা থাটুনি খেটে শুধু টাকা রোজ্জগার করেছে, পয়সাটি তার খরচ করেনি। সবাই বলে সকাল বেলা তার নাম করলে গৃহস্থের হাঁড়ি ফেটে যায়—এমনি তার স্বভাব।

একদিন যমবাজেব কাছ থেকে বুড়োর তলব এল—তাকে তখনই বুকের বক্ত দিয়ে সজ্জিত সিন্দুক-ভরা টাকাকড়ি ছেড়ে উঠতে হল—কড়া তলব অমান্য করার জোটি নাই।

‘আধার, জমাট আধার—তারই ভিতর দিয়ে বুড়ো চলছে চলছে। যেতে যেতে ঝড় উঠল, কড় কড় মেঘ ডাকতে লাগল, আর তারই মাঝে বিদ্যুৎ চমকতে লাগল। সেই বিদ্যুতের আলোকে বুড়ো দেখতে পেল সামনে রৈতরগী নদী—পাহাড়ের মত তার ঢেউ-গুলি, দৃষ্টিতে তার কূল-কিনারা মেলে না। বুড়ো দেখলে নদীর উপর পারের সেতু নাই, শুধু খেয়াঘাটের মাঝি সেই ঝড়েও নৌকায় করে’ যাত্রীদের পারাপার করছে।

বুড়ো বললে, ‘ওগো খেয়া ঘাটের মাঝি, আমায় পার করিতে পারবে?’

‘ঐ ত হ’ল আমার ব্যবসা। তা পারের কড়ি কিন্তু এক কড়া কাণা কড়ি। দেখছ না কি ঝড়ে হাওয়া।’

ও বাপ! এক কড়া কাণা কড়ি! বুড়ো আর কথাটি না বলে সেই ঢেউয়ের মাঝে লাফিয়ে পড়ল।

যমপুরীতে মহা হলুদুল, বুড়ো কিনা খেয়া ঘাটের মাঝিকে ঠকিয়েছে। অমনি সভা বসে’ গেল বুড়োর অপরাধের বিচারের জন্য। কেউ বললে—‘ওকে গরম তেলের কড়াইয়ের ওপর চাপিয়ে দাও।’ কেউ বললে—‘কষাই দিয়ে ওর গায়ের চামড়া তুলে ফেল, শবুনি দিয়ে চোখ উপড়ে দাও, আর শেয়াল কুকুর দিয়ে নাড়িভূঁড়ি ছিঁড়ে ফেল।’ এমনি সব যন্ত্রণা হতে লাগল।

বুড়ো এক বিচক্ষণ বিচারক এক কোণে চুপটি করে’ বসে’ ছিল, সবার শেষে সে বললে,—‘না হে, না, ও-সবে হবে না। ওকে আবার পৃথিবীতেই পাঠিয়ে দাও। সেখানে যেয়ে একবার দেখুক পুত্রপৌত্রেরা ওর সজ্জিত অর্থ কিরূপে ব্যয় করছে। সেই ওর যোগ্য শাস্তি।’

শ্রী প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত

স্বদেশীর দ্বিতীয় যুগ

পুরাতন সমস্যা

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে জাতীয় জীবনকে সবল স্বাবলম্বী করিবার চেষ্টা দেশে প্রথম দেখা গিয়াছিল। তাহাব পর আর-এক যুগ ও আন্দোলন আসিয়াছে। মধ্যে ইউরোপীয় মহাবুদ্ধের ব্যবধান। এই যুদ্ধ আমাদের বৈষয়িক জীবনেব দোষ ও দুর্গতি আরও প্রকট করিয়াছে। তাই আবার আমরা পূর্বেকার মত পল্লীসেবা শিল্পপ্রতিষ্ঠা বাণিজ্যপ্রসারের দিকে মন দিয়াছি।

কিন্তু এই যুগে আমাদের পরনির্ভরতা আরও অধিক হইয়াছে। অনেক স্বদেশী কারবার ফেল হওয়াতে একটা ভয় ও সন্দেহ আসিয়াছে। কুটিবশিল্প আরও অবনতির দিকে গিয়াছে। যুদ্ধেব পব বর্ধমান দুর্খল্যতা আবও কষ্টকব ও অনিষ্টজনক হইয়াছে। পাট ও তুলাব বস্ত্রানি বন্ধ হওয়াতে কিছুকাল কৃষকের দুর্গতিব অবধি ছিল না। বণিকের আধিপত্য কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধিব কারণ হইয়া দেশ-বাসীকে অকারণ কষ্ট দিয়াছে। যুদ্ধেব সময় মালিক ও স্বত্বস্বামীদিগের অন্ত্যায় লাভেব আয়োজন আমাদের বৈষয়িক জীবনেব অসহায় ও বিমুঢ় অবস্থার সাক্ষী।

পল্লী-স্বরাজ

উপায় কি? উপায় এক। উপায় সহজও,—কাবণ তাহা দেশের যুগপরম্পরার্জিত সমাজ-শাসন-শক্তিকে আশ্রয় ও আধাররূপে পাইবে। তাহাই নূতন শিল্পের রাষ্ট্রের ও সমাজ-ব্যবস্থাব এবমাত্র সুদৃঢ় পুরাতন কাষেমী ভিত্তি। জীবনোপাযেব পরনির্ভরতা ও বণিকের কূটনীতি হইতে আশ্রয়লা করিবার একমাত্র উপায়—সমবায়। গ্রামের জীবনোপাযের ব্যবস্থা—কৃষি শিল্প ব্যবসা—সমবেত প্রণালীতে কর, জলসেচন, নদনদী সংস্কাব, বনজঙ্গল পরিষ্কার সংঘবদ্ধ হইয়া কব। দুর্ভিক্ষেব অনাহার নিবারণেব জন্ত যৌথ শস্তগোলা স্থাপন কর; গোজাতির উৎকর্ষ ও বীমার ব্যবস্থা কর; শিক্ষা, ধর্ম, আমোদ-প্রমোদ, বিবাদ নিষ্পত্তি সবই পূর্বেকার মত গ্রাম্য পঞ্চায়েতের শাসনে ব্যবস্থা কব; বিলাসের দ্রব্য বর্জন কর; আর যদি কলকারখানা

দরকার হয় স্থইজারলণ্ড, ডেনমার্ক জার্মানীর মত ছোট ছোট তেল ও বাষ্পের কল অথবা তাড়িত শক্তির সাহায্যে কুটিরে তাঁত চালাও, লোহা পিটো, কাঠ চেরো। এই উপাযে এমন এক কর্মঠ ফলপ্রদ সমবায়-সমাজ গড়িয়া উঠিবে যেখানে আমবা একটা নীরব নিরীকবাদ আত্মনির্ভর জীবনের নূতন সম্পদে ধনী হইব, সর্বগ্রাসী সভ্যতার ভিতবে থাকিয়াও আমরা তাহার শোষণ হইতে আশ্রয়লা করিতে পাবিব, এবং নবীন ও প্রাচীন সভ্যতার সম্মিলনে জড়বিজ্ঞান ও ধর্মের একটা চূড়ান্ত মীমাংসার দিকে অগ্রসর হইব। ইহাতে যাহা আমাদের পল্লীসমাজেব বিশেষত্ব,—সমূহেব উন্নতিসাধনের জন্ত একতা ও সমবেত কার্যাত্মকতা—তাহা সর্কীর্ণ গ্রাম ও জাতি পঞ্চায়েতে ও ব্যবসাযে আবদ্ধ না থাকিয়া জাতীয়তার বলবৃদ্ধি কবিবে, এবং পল্লীর কৃষক একটা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সামাজিক ও কার্যকরী প্রণালীর সঙ্গে সহজ ও সামাজিক ও ব্যক্তিগত পরিচয় লাভ করিয়া মাতুষ হইয়া উঠিবে।

নূতন সমস্যা

কিন্তু এই যুগের নূতন সমস্যা আসিয়াছে মজুরেব জীবনযাত্রা লইয়া। কলের কারখানায়, নীল ও চা-বাগানে, কয়লার খনিতে মালিকরা অপ্রত্যাশিত লাভ করিয়াছে, কিন্তু মজুরের দুঃখেব সীমা নাই। এদিকে যুদ্ধেব ফলে আহাৰ্যাদির মূল্য প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে, কিন্তু মজুরী সে অনুপাতে কিছুই বাড়ে নাই। একদিকে লোভের হঠকারিতা, অপবদিকে প্রতিঘাতের বিমুঢ়তা। তারন্ত হইয়াছে এমন এক তুমুল সংঘর্ষ যাহার ফলে আমাদের যুগপরম্পবালক সামাজিক শাস্তি একবাবে সুদূরপবাহত।

তাই নূতন কথা উঠিয়াছে—কাজ নাই কারখানায় ব্যবসা বাণিজ্যে, যে কলকারখানা ব্যবসা বাণিজ্য মাতুষকে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব ও কৃত্রিমতার দিকে লইয়া যায়,—সভ্যতাব সে-সব ত বিকার। এই বিকারের কথাই আজ যেন সব অপেক্ষা বড় কথা বলিয়া প্রতীযমান।

কিন্তু কল কারখানা ব্যবসা বাণিজ্য মানুষের অন্ত, মানুষের সৃষ্ট সব জিনিষের মত জীবনযাত্রায় টিকিয়া থাকিবার সমাজের হাতিয়াব। অজ্ঞের যে যেমন ব্যবহার করে। মানুষ যদি কলের নিষ্ঠুর ব্যবহার কবে, সে দোষ কলের নহে, মানুষেরই। কিন্তু কথা উঠিয়াছে—বুঝি এই কলের সহিত ভারতের মানুষের কোন সামঞ্জস্য হইবার নহে। তাঁত, পুঁজী, হাতল, সেও ত কল এবং এই কলেরই সাহায্যে ভারতবর্ষ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত জগতের শিল্পব্যবসায়-ক্ষেত্রে একাদিপতা বিস্তার কবিয়াছিল। পুরাতন কালের কলে ভারতবর্ষ একদিকে তাহার শিল্পী বুদ্ধিশক্তি ও সৌন্দর্য্যবোধের অবাধ বিকাশসাধন করিয়াছে, অপরদিকে বিভিন্নশ্রেণীর মধ্যে একটা সম্ভাব ও ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, অটনৈক্য ও অত্যাচারের বিষবৃক্ষ রোপণ করিতে দেয় নাই।

নূতন কলের সহিত তাহাব যোগাযোগ কি অসম্ভব? নূতন কলের নিকট সে কি আত্মবিক্রমের সম্বন্ধ ছাড়া অন্য কোন সম্বন্ধ স্থাপন কবিত্তে পারিবে না? এ কল হাতে না হইয়া বাশে বা তাড়িতে চলে বলিয়া ইহার কি এমন ‘অ-মানুষিক’ প্রভাব!

মজুরের কাহিনী

এটা ঠিক, বর্তমান কালে যে-সকল স্থানে কল-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে সেখানে আমাদের নূতন ও পুরাতনের কোন সামঞ্জস্যের চিহ্ন দেখা যায় না। কল এখানে সমাজের গোড়াপত্তন ভাঙিতেছে। মানুষেরও হাড় মাস পিষিতেছে। স্বাস্থ্য, চরিত্র, মনুষ্যত্ব—সবই বলি প্রদত্ত। সে দৈন্ত, সে ক্রেশের ইতিহাস অতি নিদারুণ এবং সে ইতিহাস এখনও গোপন। খনির মালকাটা ও তাহার জী খাদে নামিল—সেখানে এক-ইটু জলে দাঁড়াইয়া সে অহোরাত্র কাজ করিতেছে। অনেক সময় উপযুক্ত পরিমাণে কাজ জুটিল না, তখন তাহার মজুরীতে পেট ভরে না। মেট ও সর্দার-মেট বকুশীস না পাইয়া টবগাড়ির বোঝাইয়ের হিসাব লইয়া গোলমাল করিল। সেখানেও নিস্তাব নাই,—আফিসে গিয়া হযত হিসাবের দেবী হওয়াতে সে সেদিন মজুরীই পাইল না। তখন হিসাব-কাগজ জামিন

রাখিয়া অতি বেশী দামে সে মুদির কাছে আবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইল। কারখানার সর্দাররাও অত্যাচার করিতে ক্রটি করে না। কাজের হিসাব দিবার সময় কিছু ঘুস চাই, না দিলে কাজের পরিমাণ অল্প দেখানো হইবে। ‘ওভার-টাইম’ কাজ চলিতেছে, কিন্তু তাহার উপযুক্ত হিসাব নাই। কেহ কলে কাজ করিতে করিতে দুর্ঘটনায় মারা পড়িল, তাহার পরিবারের কোন দাবী গ্রাহ্য নহে। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে করিতে মজুরগীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইল, চিকিৎসকের ব্যবস্থানাই। কারখানার ভিতর ১২০ ডিগ্রী গরম, কিন্তু হাওয়া যাওয়া-আসার দরজা জানালা নাই। মজুররা কাজের মধ্যে মাঝে মাঝে বসিতে পাইলে অধিক পরিমাণ কাজ দিনের শেষে দেখাইতে পারে, কিন্তু বসিবার টুল বা পিঁড়ি নাই। সর্দারের সহিত ঝগড়া হইল, মজুরের কাজ গেল—মালিসীর ব্যবস্থা নাই। কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যের বাজার মন্দা, অনেক মজুরের কাজ হঠাৎ গেল, বাকী মজুরের পুরা-পুরি কাজ জুটিল না। দলে দলে মজুর গ্রামেব দিকে ফিরিল, কিন্তু সেখানে উপযুক্ত পরিমাণে জমি বন্দোবস্তের উপায় নাই। রোগে, শোকে, আপদ বিপদে মালিক মজুরের স্বার্থ দেখেন না, অথচ তিনি খুব টাকা উপার্জন করেন এবং দেশের অংশীদারেরা লাভের অংশ পাইয়া খুব খুসী থাকে। আইনের অতিরিক্ত সময় কাজ কর, বেগার কাজ কর, বকুশীস দাও, আধ ঘণ্টার মধ্যে পরিবার স্বচ্ছ খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া বাশী বাজার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া আসিয়া পুনরায় কাজে লাগ, ছেলে-মেয়েদের বয়স বেশী করিয়া লিখিয়া দাও, এমন কি সতীত্ব বিসর্জন কর—খনিতে কারখানায় বাগানে সর্দার আড়কাটা মালিকের অবিচারের কাহিনী এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। তাহা ছাড়া কল পুরুষ-স্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটাইতেছে, কারণ কল হযত স্ত্রী-শ্রমজীবীর কাজ দিতে পারে না, শুধু পুরুষেরই সমাগম চাহে। তাই কলের সহব অনেক সময় স্ত্রীবর্জিত সহব। মজুরের পরিবাব মজুরের সঙ্গে আসিতে পায় না,—সে থাকে একা এবং তাহার অসংবত আমোদ বা আসক্তি বাধা দিবার জন্ত না আছে তাহার পরিবারের

নীরব ভৎসনা, না আছে পঞ্চায়েতের অলঙ্ঘ্য বিধান।
আবার এই মস্ত আমোদ বা আসক্তি না থাকিলে
সে বাঁচে না, কারণ কল যে তাহার চোখ কান হাত
পা অবশ্য করিয়া দেয়। একটা উৎকট স্নায়বিক উত্তেজনা
ভিন্ন সে পরিশ্রমের পর বিশ্রাম বা আনন্দ পায় না।
তাহার পর ক্ষুদ্র সোঁতসোঁতে বসিতে বাস,—খড়, খোলা,
কখনও বা শুধু হোগলাপাতার ঘর, অথচ ঘরের ভাড়া
অত্যন্ত অধিক। সেখানে দিনের বেলায় আলো না জালিলে
কিছুই দেখা যায় না। সন্ধ্যা জায়গায় কোন রকমে পুরুষ
স্ত্রী নির্বিশেষে মাথা শুষ্কিয়া থাকা, না আছে লজ্জা,
না স্ত্রী-সম্মুখেই অপরিষ্কার গলি, আবর্জনারাশির মত
সেখানে সব সময়েই কুৎসিত আলাপ ও অকথ্য গালা-
গালির বিনিময়। নিকটে মদের দোকানে মজুর
তাহার মজুরীর অর্ধেকের উপর ব্যয় করিয়া সমস্ত
দিনের কঠোর পরিশ্রমের ক্লেশ তুলিতে চেষ্টা করে।
দলবদ্ধ হইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া আপনাকে দলের
মধ্যে ঠিক রাখে। মদের দোকানে তাহার শিশুর
অনাহার নাই, তাহাব ঘরের অন্ধকাব পুতিগন্ধ নাই,
সেখানে আছে একটু আরাম আমোদ ও আলো।

কারখানাব মালিকরা উপযুক্ত বাসস্থান নির্মাণ, বিপুল
আমোদ প্রমোদ বা শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে
কোন দায়িত্ব স্বীকার করেন না। মালিক লাভ করিতেছে
শতকরা ৫০০, কিন্তু মজুরের পারিশ্রমিক অতি অল্প হাবে
বৃদ্ধি পাইতেছে, শতকরা ১০। কুলিদের মাহুস করিবার
কোন চেষ্টাই নাই। শ্রমজীবী-সংঘ ও সম্মিলন গঠিত
হইতেছে, কিন্তু চিকিৎসা শিক্ষা ধর্মঘট প্রভৃতির জন্ত
চাঁদার ব্যবস্থা নাই, নিয়মকানুন নাই, শিক্ষিত ধুবন্ধর
নাই, সংহতি-কার্যসাধন-ব্যবস্থা নাই। শ্রমিক ও
মালিকের বিরোধে ধর্মঘট ও দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটতেছে,—
সঙ্গে সঙ্গে অনাহার ও ক্লেশ। বিরোধ মিটে খুব কষ্টে এবং
শেষ মীমাংসার কোন আয়োজন নাই।

কল তুলিয়া দেওয়া

মজুরদিগের বর্তমান কার্যরীতি আমূল পরিবর্তন না
কবিলে, নূতনভাবে শিল্পপ্রণালী না গড়িয়া তুলিতে
পাবিলে আমবা ইউরোপেব গত শতাব্দীর ধনী ও শ্রম-

জীবীর সংঘর্ষ ও সমূহ-তন্ত্রের নিদারুণ ইতিহাস এদেশে
পুনরাবৃত্তি করিব। কলের সহিত মাহুসের নূতন স্বয়ং-
স্থাপন একান্ত প্রয়োজন—কল মাহুসেব ভৃত্য, কলকে যদি
আমবা আয়ত্ত করিতে পারি, ধনী ও শ্রমজীবী মিলিয়া
কলকে সমাজ-সেবায় নিয়োজিত করিতে পাবি, তবেই
কলেব জীবন সার্থক হয়। তাহা করা যায়। অধিকন্তু ইহা
অসম্ভব মনে করিয়া যদি আমরা রুশিয়ার সমূহবাদীদিগের
মত কল তুলিয়া দিই, তাহা হইলে আমাদের দুর্গতির সীমা
থাকিবে না। শুধু চরকা, তাঁত, কামারশালা, ঢেঁকিশালা,
জাঁতা, উদুখল লইয়া থাকিলে আমরা আর বাঁচিব না,
কারণ জাহাজে রেলগাড়িতে চড়িয়া বণিক যে তুলাদগু
হাতে লইয়া আসিয়াছে একবারে গ্রামের হাটের
মাঝখানে। সে তুলাদগু প্রাচীন ও নবীনের বিভিন্নতা
বিচার করে না, সে ওজনে কম বেশী ছাড়া আর কিছু
জানে না, তা জিনিষ-বিজ্ঞানের দ্বারাই হউক বা অজ্ঞানের
দ্বারাই হউক! তাহাতে দেশের অশান্তি উপসর্গ আসুক
বা না আসুক, তার জিনিষ বিক্রয় হইলেই হইল।

কল আয়ত্ত করা

কলকে আয়ত্ত করিবার একমাত্র উপায় তাহাকে
মালিক ও বণিকের লোভ হইতে রক্ষা করা। কল-
কারখানা ও ব্যবসায়ে মালিক মজুরের সমবেত স্বায়ত্ত,
অন্তত সমবেত দায়িত্ব, চাই। তাহা নির্বিশেষে ও
স্বাভাবিক ভাবে আসিবে যদি আমরা দিন দিন অধিকতর
তাড়িতশক্তি কলকল্লা-চালনে লাগাই। বাষ্প ও তাড়িত
শক্তির শিল্পে নিয়োগে তদ্যৎ এই—তাড়িত শক্তির
ব্যবহারে ব্যবসায় কেন্দ্রীভূত ও এক কেন্দ্রে ক্রমশঃ বিরাট
হইতে বিরাটতর হয় না। ব.দূর পর্যন্ত তাড়িত শক্তি
লইয়া যাওয়া সহজ, তাহাতে গড় খরচ কমিবে, বাষ্প-
চালিত কলের মত বাড়িবে না। এইরূপে তাঁতীদের গ্রামে,
কামারশালায়, লোহাব কারখানায়, তেলের কলে, দূরে
চিনির বা চাউলের কলে তাড়িত শক্তি পৌঁছাইয়া দিয়া
পল্লীগ্রামকে ক্রমশঃ আধুনিক বিজ্ঞান ও ব্যবসায়ের ধর্মে
দীক্ষিত করা যায়। নগরে বা কলকারখানায় বহু লোক
একত্রে বাস ও কাজ করিবার জন্ত যেসব অমঙ্গলের সৃষ্টি
কবে তাহাব প্রতিবোধ হইবে। তাড়িতেব সাহায্যে

কুটিরশিল্প অধিকতর ফলপ্রসূ হইলে তাহাব অনেক স্বাভাবিক সুবিধাহেতু কারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় সে সক্ষম হইবে। অপরদিকে জার্মানী বেলজিয়াম সুইজারলণ্ডের মত ছোট ছোট কলকাজি চালাইলে এখানে সমাজব্যবস্থার সমূহ-আদর্শের প্রাবল্যহেতু কারখানার কার্যপ্রণালীতে শ্রমজীবীগণের দায়িত্ব ও শাসন এবং কারখানার মূলধনে ও লাভে অবশেষে তাহাদেব স্বামিত্ব স্থাপনও খুব অসম্ভব নহে। তখন ব্যবসায়ের লাভ লোকসান বণিক ও মালিক শ্রেণীতে কেন্দ্রীভূত না হইয়া প্রসার লাভ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্ব বহুল পবিমাণে হ্রাস পাইবে। বর্তমান সময়ে দেশে মজুর ও মালিক, মালিক ও ব্যবসায়ীর মধ্যে স্বার্থবিনিময়ের ও সম্ভাব স্থাপনের নূতন প্রকাব ভাবুকতা চাই।

কলচালনে সমূহের দায়িত্ব

সে ভাবুকতা আসিলে দেশে গ্রামে গ্রামে তাড়িত অথবা তেল ও বাষ্প-চালিত এঞ্জিনের সাহায্যে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেখানে মালিকের অপেক্ষা সমূহেরই কর্মকুশলতার মহিমা প্রকটিত হইবে। দেশেব নানাস্থানে—নদীর ধারে, চাউলের হাটের কাছে, আকের ক্ষেতে—এখন এইরূপ শিল্পব্যবস্থার পরীক্ষার অভিনব প্রণালী চাই। এইরূপ আয়োজন হইলে ক্রমে পল্লীগ্রাম হইতে স্ববাস্য নগরের কারখানার আবহাওয়া বদলাইবে। এখন যেমন সেখানে মালিকের দুর্দমনীয় লোভ ও মজুরের দায়িত্ববোধহীন বিদ্রোহ দেখা গিয়াছে, তাহার পরিবর্তে উভয়ের দায়িত্বজ্ঞান, আদান প্রদান রীতি ও ভবিষ্যৎ বিচার দেখা যাইবে। ক্রমে আসিবে মালিক ও মজুর শ্রেণীর ব্যক্তিগত অথবা সংঘবদ্ধ স্বার্থ-পরতাকে দমন করিবার জন্ত লাভ-লোকসানেব দায়িত্বে ও কারখানা পরিচালনে সকলের পাকা অধিকার,— কারখানায় স্বায়ত্ত শাসন। সকল শ্রেণী বাহাতে পরস্পরের ব্যাধার ব্যাধী হয় তাহাব জন্ত বর্তমান শ্রমিক ও মালিকের সম্বন্ধ এইরূপে নূতন করিয়া গড়া চাই। শুধু শিল্পপ্রণালীতে নহে, উপযুক্ত বাসস্থান, উপযুক্ত খাদ্য, উপযুক্ত আমোদ

প্রমোদ ও শিক্ষাবও ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে কল মজুর ও মালিকের মধ্যে ব্যবধান দূর করিবে।

শিল্প-স্বরাজ

ইহাই ধনবিজ্ঞানেব সহজ পথ এবং ইহাই সিদ্ধি ব পথ। মানুষ আজ কলের সাহায্যে মানুষকে অত্যাচার করিতেছে বলিয়া, মানুষ ও শিল্পব্যবস্থার দোষ না দিয়া এবং কলের দোষ মনে করিয়া আমরা যদি শুধু হাতুড়ী বেত নেহাই লইয়া সঙ্কট থাকি তাহা হইলে ইহা নিতান্ত হান্তকব, দেশকালকে অগ্রাহ্য করার কাজ হইবে। তাহা আধ্যাত্মিকেরও বিপরীত হইবে। কারণ যে অধিকতর বিশ্রামের অবসর কলের ব্যবহার সাপেক্ষ তাহা না পাইলে জীবনটা শুধু জীবনযাত্রাব গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে, উচ্চতর জীবনের কোন সুযোগই ঘটবে না।

ভাবতবর্ষের একাধিক শ্রেণী পবিবারভুক্ত ভূমি-ব্যবস্থায়, তাহার জাতি পঞ্চাশেতে ও ব্যবসায়, তাহার গ্রাম্য-শাসনে, তাহার সমাজ দল ও শ্রেণীর সমবায়ে, তাহার ধর্ম ও সমাজবন্ধনে একটা স্বাবলম্বী সমূহভাব আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এদেশে আমবা কলকারখানা এমন ভাবে আমাদের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি যাহা আমাদের সমাজ-গ্রন্থি ছিড়া দূবে থাক তাহাকে নূতন কবিষা বৃনিষা ধনবিজ্ঞানেব অব্যর্থ নিয়মা-নুসারে একটা সরল আত্মনির্ভর সমবায়-জীবনের সূত্রপাত কবিবে। আমাদের গ্রাম্য সমাজে ভূমির ব্যক্তিগত স্বত্বভোগ সমূহেব কল্যাণে নিযুক্তিত। আমাদের পুঙ্খরিণী বাঁধ সাধারণেব, আমাদের জলসেচন-নালী ও গোচারণ-ভূমির উপব সাধাবণের অধিকার। বিদ্যালয় ও মন্দিরের কার্যকলাপে, গ্রাম্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থায়, বৃত্তি ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর দান প্রতিষ্ঠায়, আমরা সেই একই সমূহভাবেব কার্যকারিতা দেখি। তাহাকে কি আমরা বর্তমান শিল্পপ্রণালীব ব্যবস্থায় নিয়োজিত কবিতে পারিব না, যাহাতে শিল্প অত্যাচারী না হইয়া সমাজের সেবক হয়?

শিল্পপ্রণালীতে মজুর ও মালিকের সম্বন্ধ সমগ্র সমাজের কল্যাণকল্পে নূতন কবিষা গড়িয়া তুলাই

স্বদেশীর এই দ্বিতীয়যুগের আমাদের প্রধান দায়িত্ব। ব্যবসায় চালন ও শাসনের দায়িত্ব ও অধিকার সকলের মধ্যে বাঁধিয়া দেওয়ার একটা সুদূর ফলপ্রসূ ব্যবস্থা যদি আমাদের শিল্পপ্রণালী হইতে আমরা আবিষ্কার করিতে পারি, তাহা হইলে শুধু আমাদের নহে, পাশ্চাত্যেরও মঙ্গল। কারণ পাশ্চাত্য জগৎ শ্রেণী-সংঘর্ষে ভীষণ ঘূর্ণীপাকে পড়িয়া এখন চারিদিকে আলোক-বেধা খুঁজিতেছে। সংঘবাদী রুশিয়ার শিল্প ও সমাজ-ব্যবস্থায়

সাম্য স্থাপনের বিভীষিকা বৃদ্ধি সব আলোকই নিবাইয়া দিয়া সমগ্র ইউরোপের উপর এখন একটা ছুর্ভিক্ষ ও ধ্বংসের করাল ছায়া ক্রমশঃ বিস্তার করিতেছে। প্রাচ্য গ্রাম্য সমাজ যে যুগপরম্পরাহুস্তিত জীবনোপায়ের ব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতা দমন ও সঙ্গে সঙ্গে সমূহেরও অত্যাচার প্রতিরোধ করিয়াছে তাহা বহু শতাব্দীর মধ্য দিয়া প্রথম অরুণপাতেব মত দেশ-দেশান্তরে প্রতিভাত হইয়া নবজীবনের পথ দেখাইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রী রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

ধর্মপূজা

(পণ্ডিত-তত্ত্ব)

ধর্ম-পূজার পুরোহিতকে পণ্ডিত বলে। সংস্কৃতে পণ্ডিত শব্দে যা বুঝায় এদের সে আখ্যা দেওয়া যায় না। ধর্ম-পূজার আর-এক নাম হচ্ছে পণ্ডিত-পদ্ধতি; তার কারণ হচ্ছে রমাই পণ্ডিত নামে কোনো ব্যক্তি এই ধর্মমত প্রচার করেছিলেন বলে' কিম্বদন্তী চলে' আসছে। এ ছাড়া ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিশ্বাস চার যুগে চার পণ্ডিত ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচার করেছিলেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে শেতাই পণ্ডিত, নীলাই পণ্ডিত, কংসাই পণ্ডিত, রমাই বা রামাই পণ্ডিত। শূন্তপুরাণ ও ধর্মপূজাবিধানই এঁদের নাম পাওয়া যায়; ধর্ম-মঙ্গলগুলিতে এক রামাই পণ্ডিত ছাড়া আর কারো নাম আছে বলে' মনে হয় না। শূন্তপুরাণের মতে এই চার পণ্ডিতকে পূজার স্থানের চার দিকে স্থাপন করা হতো। কিন্তু সর্বত্রই যে চার পণ্ডিত দেখা যায় তা নয়, কয়েক জায়গায় পাঁচ জন-পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু তখন দিকের বদলে দ্বারের উল্লেখ দেখা যায়। পাঁচ পণ্ডিত পাঁচ দ্বারে অধিষ্ঠিত। এই পঞ্চম পণ্ডিতের নাম গৌসাই পণ্ডিত।

নগেন্দ্রবাবু শূন্তপুরাণের ভূমিকায় লিখেছেন যে ময়নাপুর ও জামালপুরেব বিখ্যাত ধর্মের গাজনে পণ্ডিতদের স্থাপন করার বিধি এখনো প্রচলিত আছে।

তবে তিনি সে সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেননি বলে' বেশী কিছু জানা যায় না। আবার এই পণ্ডিত সাজানোর অতুলরূপ পদ্ধতি মধ্যযুগের বৌদ্ধদের বিদ্যা-আয়তনে দেখা যায়। বিক্রমশিলার বিদ্যা-আয়তনে ছয়টি দ্বারে পণ্ডিত-দ্বারপাল থাকতেন; প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁদের নিজ নিজ শিষ্য থাকতো। যে-সব ভিক্ষু জানে বিদ্যায় নাম করতেন তাঁরাই সেই-সব দ্বারে থাকতে পেতেন।* সেটা ছিল সম্মানের পদ; আমাদের চোখে দোবে তেওয়ারীব পদের সঙ্গে তাদের পদ মিলিয়ে দেখলে চলবে না। আমার মনে হয় ধর্মপূজায় পণ্ডিতদেব দ্বারে রাখার প্রথাটা বৌদ্ধদের সম্মারামের দ্বার-পণ্ডিতের অতুলরণেই করা হয়েছিল। তবে এ ছাড়া আরও কিছু যে ছিল তা আমরা এখনি দেখবো।

বুদ্ধিমান পাঠকমাত্রই শূন্যপুরাণ পড়তে গিয়ে একটা জিনিষ লক্ষ্য করবে' থাকবেন যে উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত পণ্ডিতদের নামকরণের মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে। একটা কোনো অভিপ্রায় বা অর্থ বোঝাবার জন্ত যে একটা কপক নাম সৃষ্ট হয়েছিল তা স্পষ্টই বোঝা যায়। শেতাই, নীলাই, কংসাই, রামাই এই চার

* পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ লিখিত "Indian Medieval Logic," p. 151, বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে উদ্ধৃত।

নামের সঙ্গে চারটি রঙের যোগ আছে। যথা—
শ্বেত, নীল, কাংস ও রাক্ষ। রামাই শব্দ রাঙাই
শব্দ থেকে হয়েছে, এ কথা গ্রন্থেই লিখা সাহেব
আমাকে বলেন। সুতরাং এই চার পণ্ডিতের সঙ্গে
চারটি রঙের যোগ অবশ্যস্বাবী। এখন দেখা যাক
এই চার রঙের উৎপত্তি কোথায়।

নেপালে যে বৌদ্ধধর্ম আছে সেটিকে বেশ একটি
স্বম্পষ্ট প্রণালীতে পরিণত করবার চেষ্টা হয়েছিল।
আদি-বুদ্ধ তাঁদের পরব্রহ্ম। তিনি সৃষ্টিকার্য্য চালাবার
জন্য পঞ্চ ধ্যানী-বুদ্ধ সৃষ্টি করেন। এই পঞ্চ ধ্যানী-
বুদ্ধের নাম হচ্ছে বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব,
অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি। এঁদের তিনজন গত হয়েছেন;
চতুর্থ ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ হচ্ছেন বর্তমান জগতের
নিয়ন্তা। অমোঘসিদ্ধি হচ্ছেন পঞ্চম ধ্যানীবুদ্ধ যিনি
আসবেন। বৌদ্ধদের ত্রিকায়-তত্ত্ব অনুসারে প্রত্যেক
বুদ্ধের তিনটি করে কায় আছে। সেগুলি তিনটি
স্তরের জিনিষ। পৃথিবীতে সেই বুদ্ধ আছেন মাহুঘী
বুদ্ধরূপে—তাঁদের মধ্যে যে তিনজন গত হয়েছেন,
তাঁদের নাম হচ্ছে ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ।
বর্তমান মাহুঘী বুদ্ধের নাম হচ্ছে শাক্যসিংহ; আর
ভবিষ্যতের বুদ্ধের নাম হচ্ছে মৈত্রেয়ী। ত্রিকায়ের এই
স্তরকে দার্শনিকগণ নাম দিয়েছেন নির্মাণ-কায়। এর পব
হচ্ছে ধ্যানীবুদ্ধ, যারা নির্মাণ লাভ করেছেন;—তাঁদের
অবস্থাকে বলা হয়েছে ধর্মকায়। আর তৃতীয় অবস্থায়
যারা আছেন, তাঁদের নাম দেওয়া হয়েছে বোধিসত্ত্ব।
তাঁরা আছেন সন্তোষ-কায়। (A. Getty—Northern

Buddhism, p. 10)। মোটামুটি সংক্ষেপে এই হচ্ছে
বৌদ্ধদের বুদ্ধতত্ত্ব (Buddhalogy)।

এই-সব ধ্যানীবুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের মূর্তি উপাসকেরা
কল্পনা করেছেন, চিত্রীরা পটে আঁকেছেন, ভাস্করেরা
পাথরে কুঁদেছেন, ছাঁচে ঢেলেছেন। নেপালে, তিব্বতে,
চীনে, জাপানে এঁদের মূর্তি পাওয়া যায়। প্রত্যেক
ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তি বা চিত্রকে বুদ্ধবার জন্ত পৃথক পৃথক
চিহ্ন আছে। প্রথম চেনা যায় মুদ্রা দিয়ে; তারপর
জানা যায় সহচর দিয়ে; আর চেনা যায় রঙ দিয়ে।
নেপালে তিব্বতে ধ্যানীবুদ্ধদের যে-সব চিত্র পাওয়া
যায়, সেগুলির বর্ণের মধ্যে বিশেষ চিহ্ন আছে। যেমন
বৈরোচনকে তাঁরা শ্বেত বর্ণ দিয়ে ও অক্ষোভ্যকে নীলবর্ণ
দিয়ে, রত্নসম্ভবকে পীত বা স্বর্ণ বর্ণ দিয়ে, অমিতাভকে রক্ত
বর্ণ দিয়ে ও অমোঘসিদ্ধিকে হরিৎ (সবুজ) বর্ণ দিয়ে
ছাঁকতেন। এখন যদি আমরা বলি যে ধর্ম-পূজার পণ্ডিতগণ
সাবেকী আমলের ধ্যানীবুদ্ধের নূতন সংস্করণ, তবে বোধ
হয় ভুল বলা হবে না। তার কারণ হচ্ছে এই—

প্রথমে দেখুন, ধ্যানীবুদ্ধ ও পণ্ডিতদের পর্য্যায়
টিক রয়েছে। ১ বৈরোচন (শ্বেত বর্ণ) এদিকে শ্বেতাই;
২ অক্ষোভ্য (নীলবর্ণ) এদিকে নীলাই পণ্ডিত; ৩ রত্ন-
সম্ভব (স্বর্ণবর্ণ বা পীত) এদিকে কংসাই পণ্ডিত।
কাংস বর্ণ ও স্বর্ণ বা পীতবর্ণের মধ্যে বেশী তফাৎ নেই।
৪ অমিতাভ (রক্তবর্ণ) এদিকে রামাই পণ্ডিত। রামাই
শব্দ রাঙাই থেকে হয়েছে নিশ্চিত। বর্ণের মিল করবার
জন্ত এ নামের সৃষ্টি। আরও অধিক বলবার আসে
নীচে ছুটি ছক দিয়ে বিষয়টা স্পষ্ট করবার চেষ্টা করবো।

বুদ্ধ-তত্ত্ব

ধ্যানীবুদ্ধ	মাহুঘীবুদ্ধ	বোধিসত্ত্ব	তারা	স্থান	ইন্দ্রিয়	ভূত	বর্ণ
১। বৈরোচন	ক্রকুচ্ছন্দ	সমস্তভদ্র	বজ্রধাতুধারী	মধ্য	শব্দ	ব্যোম	শ্বেত
২। অক্ষোভ্য	কনকমুনি	বজ্রপাণি	লোচনা	পূর্ব	স্পর্শ	মরুৎ	নীল
৩। রত্নসম্ভব	কাশ্যপ	রত্নপাণি	মামকী	দক্ষিণ	দৃষ্টি	তেজ	স্বর্ণ বা পীত
৪। অমিতাভ	শাক্যমুনি	পদ্মপাণি	পণ্ডরা	পশ্চিম	স্বাদ	অপ	রক্ত
৫। অমোঘসিদ্ধি	মৈত্রেয়ী	বিশ্বপাণি	তাবা	উত্তর	গন্ধ	ক্ষিত্তি	হরিৎ

পণ্ডিত-তত্ত্ব

পণ্ডিত	কোটাল	আমিনী	স্থান	যুগ	গতি (অনুচর)
১। বেতাই	চন্দ্র	বসুয়া	পশ্চিম	সত্য	৪০০ গতি
২। নীলাই	হুম্মান	চরিত্রা	দক্ষিণ	দ্বাপর	৮০০ „
৩। কংসাই	সুখ্য	গঙ্গা	পূর্ব	ত্রেতা	১২০০ „
৪। রামাই	গরুড়	দুর্গা	উত্তর	কলি	১৬০০ „
৫। গৌসাই	উলুক	অভয়া	—	শুভ	অনেক গতি

এখন এ বিষয়ে দুই-একটা ঐতিহাসিক অনুমান করাটা খুব ভূগোলিক কার্য বলে' নাও প্রতিপন্ন হতে পারে। ধর্মপূজার প্রবর্তক যিনিই হউন না কেন, তিনি একটা মতলব বা প্ল্যান থেকে এটা করেছিলেন বলে' মনে হয়।

প্রথমে ধর্মপূজা হুবহু বৌদ্ধধর্ম যে নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য; এবং এটাও ঠিক যে ষে রূপ আকারে ধর্মপূজাকে দেখতে পাই, সেটা স্বাভাবিক অধোগতির স্বস্বাভাবিক নয়। এর মধ্যে বাংলাদেশের একদল লোকের একটা কিছু গড়ে' তোলবার চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। রামাই বলে' কোনো লোক এইটাকে সৃষ্টি করেছিলেন কি? বৈরোচন, অক্ষোভ্য প্রভৃতি বুদ্ধের বর্ণের সঙ্গে মিল করে' একটা প্রণালী বা পদ্ধতি খাড়া করে' তোলার ইচ্ছা তাঁর ছিল। অমিতাভ বুদ্ধ যেমন চতুর্থ বুদ্ধ, তেমনি রামাইও চতুর্থ পণ্ডিত। তিনজন বুদ্ধ পূর্ব পূর্ব যুগে গত হয়েছেন—তিনজন পণ্ডিত সত্য দ্বাপর ত্রেতা যুগে ছিলেন। বর্তমান জগৎ অমিতাভ-শাক্যমুনির পূজক, কলিযুগে রামাই পণ্ডিত ধর্মপূজার প্রবর্তক। পঞ্চম বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধি মৈত্রেয়ী; এদিকে গৌসাই পণ্ডিত; তাঁর সম্বন্ধে সবই অস্পষ্ট—তাঁর যুগ শুভ, ও গতি 'অনেক'। এ-সবের মধ্যে বেশ একটা উদ্দেশ্যগত প্রণালী রয়েছে সেটা সহজে বুঝা যায়।

তার পর হচ্ছে বোধিসত্ত্বদের কথা। সেখানেও মিল রয়েছে।

"The five Dhyani Bodhisattvas correspond with the five Dhyani-Buddhas and differ in many respects from the other celestial Bodhisattvas. * * * Each Bodhisattva in the group of five

is evolved by his Dhyani Buddha. He is a reflex, an emanation from him; in other words, his spiritual son. Certain northern Buddhist sects that interlink the dogmas of the *Trikaya* and the *Tri-ratna* look upon the Dhyani-Bodhisattva as the active creator. * * * According to the system of Adi-Buddha, the Dhyani-Bodhisattva receives the active power of creation from the Adi-Buddha through the medium of his spiritual father, the Dhyani-Buddha." (A Getty—Gods of Northern Buddhism, p 44).

শূন্যপুরাণ ও ধর্মপূজাবিধানে আমরা 'কোটাল' * নামে এক শ্রেণীর উপ-দেবতার উল্লেখ পাই। এঁদের কাজ অনেকটা বোধিসত্ত্বদের মত। 'দুআরে' কোটাল সভ জাগে নিরস্তর'; সৃষ্টি কাজে তাঁদেরই হাত বেশী। উলুক হচ্ছেন একজন কোটাল, সৃষ্টি ব্যাপারে তাঁর হাত যে কতখানি তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। আবার হুম্মানকে না হলেও ধর্মঠাকুরের এক দণ্ড চলে না। তার নিদর্শন ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে বিস্তর পাওয়া যায়। ধর্মঠাকুর ত নির্বিকার হয়ে বসে' আছেন, মাঝে মাঝে তাঁর আসন টলছে, আর তিনি চোখ খুলে হুম্মানকে জিজ্ঞাসা করছেন—'বাছা ব্যাপার কি?' হুম্মানই বুদ্ধি পরামর্শ সব দিচ্ছেন। 'বীর হুম্ম বলে তবে ব্যাজ অকারণ। চল প্রভু বলি সঙ্গে চলে দেবগণ' (ঘনরাম, পৃ: ৩৬)। 'বীর হুম্মানে প্রভু স্থান বচন। মন উচাটন করে কিসের কারণ' (ঘনরাম পৃ: ১২২) ইত্যাদি। স্মরণ্য কোটালদের কল্পনা করা হয়েছিল বোধিসত্ত্বদের দেখে এ কথা বলা খুব অযৌক্তিক নাও

* কোটাল শব্দটি কোটপাল হইতে হইয়াছে—অর্থ 'guarding the fort', the titular deity of a fort.—Vastuvidya, XI, 23, 53 (Monier Williams' Dict.).

হতে পারে। পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর যত পূজা পেয়ে থাকেন, তত পূজা অমিতাভ পান কি না সন্দেহ। বোধিসত্ত্বদেব পূজা না করে' যেমন উপায় নেই, তেমনি ধর্মের মন্দিবে প্রবেশ লাভ করতে হলে কোটালদের রীতিমত তুষ্ট করার আয়োজন করতে হতো। চন্দ্র কোটালের কাছে সোনার কড়ি, হুমান কোটাল যিনি নীলাই পণ্ডিতের ঘর রক্ষা করছেন তাঁকে দিতে হতো রূপার কড়ি, ইত্যাদি কবে' সকলকে কিছু দিতে হতো। তবে 'কপাট ঘু এ দিল চন্দ্র মহাসএ।' 'কপাট ঘুচা এ দিল হুমান মহাসএ।' 'কপাট ঘুচা এ দিল সুরজ মহাসএ।' ইত্যাদি।

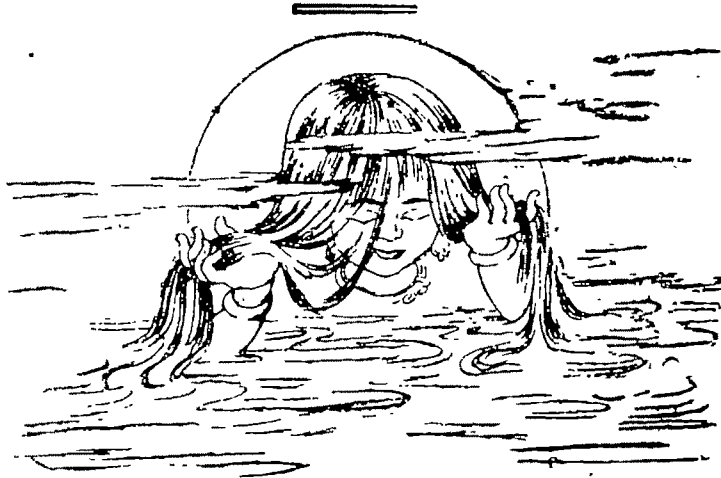
বুদ্ধ-তত্ত্ব ও পণ্ডিত-তত্ত্বের তৃতীয় মিল হচ্ছে - শক্তি। পূর্বের ছকে দেখানো গিয়েছে যে মহাযান-বুদ্ধতত্ত্বের মধ্যে পঞ্চতারা বা শক্তির কল্পনা হয়েছিল—যেমন, আদিবুদ্ধের সঙ্গে আত্মা-শক্তির কল্পনা। পণ্ডিত-তত্ত্বের মধ্যেও দেখা যায় যে পাঁচজন 'আমিনী' পঞ্চ পণ্ডিতের সঙ্গে আছেন—বহুয়া, চরিত্রা, গঙ্গা, দুর্গা, অভয়া; আর ওদিকে হচ্ছেন বজ্রধাতবরী, লোচনা, মামকী, পণ্ডরা, তারা। পঞ্চ আমিনীর নাম দেখে মনে হয় তাঁরা বাস্তব কামিনী ছিলেন এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক পূজার শক্তির কাজ করতেন। তাই তাঁদের নাম ধর্মপূজার সঙ্গে রনে গেছে। ধর্মপূজার মধ্যে তান্ত্রিকতার স্থান সন্দেহে বিস্তর কথা বলবার ও ভাববার আছে। সে সম্বন্ধে আলোচনা পবে হবে।

তিনটা বড় বড় মিল ছাড়া ছোটখাটো আরও দুই-একটা মিল খুঁজলে পাওয়া যায়। বুদ্ধদের স্থান নির্দেশ, পণ্ডিতদেরও স্থান নির্দেশ করা হতো। রীতিটা ঠিক আছে, বিস্তৃতিতে গোল ঢুকেছে। ঐতিহাসিকক্ষেত্র দিক থেকে ক্রকুচ্ছন প্রভৃতি মানুষী বুদ্ধেরা হয় তো অতীত কালের লোক ছিলেন। পণ্ডিতদের মধ্যে যেতাই, নীলাই, কংসাই সত্য ঘাপর ত্রেতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন।

এই মিল কেন হলো এ সম্বন্ধে অনেক বকমের কল্পনা চলতে পারে। কিছু পূর্বেই একটা কল্পনা করা হয়েছে। রমাই বা রামাই নামে কোনো ব্যক্তি নিজে 'কেজ' করে' এই পদ্ধতিটাকে গড়ে তুলেছেন। আবার কেউ বলতে পারেন যে সবটাই কাল্পনিক অথবা রূপক, রামাই বলে' কেউ ছিল না, 'রাডাই' কথাটাই ঠিক। এসব কথার পরিষ্কার জবাব দিতে হলে 'রামাই' সম্বন্ধে একটা তর্ক তুলতে হয়। সেটা আর-একবার করা যাবে, এ প্রবন্ধের সঙ্গে তাকে জুড়ে দেওয়া যাবে না।*

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

* প্রবন্ধগুলির অনেক জায়গায় বাহ্যিকভাবে সিদ্ধান্তের মূল তথ্যের উল্লেখ করা নেই। ইংরেজীতে লিখিত Social History of Bengal during the middle ages নামক গ্রন্থের কয়েকটি পরিচ্ছেদ হইতে চূষক করিয়া প্রবন্ধগুলি লিখিত হইতেছে। সেই পরিচ্ছেদ কয়টি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে।



সন্ধ্যা

চিত্রকর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিল মহাশয়ের সৌজন্যে।

চরকার সূতা

গত মাসেব 'প্রবাসী'তে "চবকা ও খন্দর" পড়িয়া কেহ কেহ কিছু জিজ্ঞাসা কবিয়াছেন, কেহ কেহ কিছু ভুল দেখাইয়াছেন। আমি ত্রুতকর্তন দিবা বস্ত্রবয়ন কলা জানি না। সামান্য বুদ্ধিতে যাঁহা মনে হইতেছে, তাহাই লিখিতেছি। এবার চবকাস সূতা দেখি। আগামী বারে খন্দর দেখিব।

(১) কেমন চরকা চাই।

(১) চবকা এত ভারী হইবে যে সূতা কাটিবার সময় নড়িবে না। সূতা কাটা, তুলী দিয়া কাগজে বা লেপা নয়। চবকা ঘুবাইতে ধামাইতে, উল্টা ঘুবাইতে হয়। তখন চবকাস মাথা (টেকোব দিক) নড়িতে থাকিলে কাজ হইবে না। এই হেতু চবকার বৈঠন (base) বড় হওয়া চাই। (২) চবকা এমন মজবুত হইবে যে ছেলেপিলেব পরে কিছুকাল টিকিবে। সেকালের চরকা তিন পুরুষ দেখিত, এমন চবকা দেখিবাছি যাহাব হাতার গোল ছিদ্র আঙ্গুল লাগিয়া লাগিয়া লম্বা হইয়া গিয়াছে। সে কালে চরকা সখেব জিনিস ছিল না, কাচের আলুমাবীতে সাজাইয়া রাখা হইত না। ছেলেপিলে হাত দিবেই, ঘুবাইবেই। (৩) ভারী চবকা ঘুবাইতে একটু জোর অবশ্য লাগে। একটু জোর লাগা দৃষ্কার, নচেৎ যথা-সময়ে ধামাইতে পাবা যায় না। হালকা চবকাস বিশেষ দোষ, ইহাব বেগ সমান থাকে না। বেগ সমান না হইলে সূতাব পাক সমান হয় না, সমান মোটা হইয়া সূতা টানা হয় না। চক্রের মাঝে পাগুরেব পিণ্ড আঁটিবাব হেতু এই। চক্র কেবল বেগবর্ধক (multiplying wheel) নয়, বেগ-সমীকাকও (flywheel) বটে, পাক সমান বাখে। (৪) চক্রের 'দাঁড়া' (অক্ষদণ্ড) কাঠেরই ভাল, একটু জোর ধবে। একটু জোর চাই। বেশী হইলে তেল দিতে হয়। "নিজের চবকাস তেল দেওয়া"—কেবল টেকোব নয়, চক্রের আধাবেও (bearing) বটে। যে-সব নব্য চরকা হালকা কবা হইতেছে, লোহার বা পিতলের 'দাঁড়া' ও আধাব কবা হইতেছে, দে-সব আনাড়ীর গড়া। তা ছাড়া, একটা ইচ্ছাপূর্ণ খসিধা গেলে যে-দেশেব লোক অন্ধকার দেখে, সে দেশে লোহা পিতলের চরকা গড়িবাব আগে কামাব গড়া আবশ্যক। (৫) টেকো দিকি ইঞ্চি মোটা লোহার (ইস্পাতের উত্তম) শিক দুই দিকে সূচসা। মাঝে মোটা, মাল-সূতাব টানে বাঁকে না, মাল-সূতাও বেড়িয়া ধবিবার একটু জায়গা পাব। কিন্তু আধারের অংশে সব হওয়াতে ঘর্ষণ কম হয়। টেকোর মুখ সব হওয়াতে কাটা সূতা আঁটকাইয়া যায়, খুলিয়া লইতেও পাবা যায়। (৬) টেকোর আধাব এক টুকরা দোড়ীবা ফাঁশ। কিন্তু যে-সে দোড়ী ভাল নয়। মুঞ্জ (পূর্ববঙ্গে বলে মুন্ড) নামে এক তৃণ আছে। ইহা শব গাছের তুল্য; এমন কি শর ও মুঞ্জ পৃথক কি না, তাহাই বলিতে পাবা যায় না। সে যাহা হউক, এই মুঞ্জ হইতে দোড়ী হয়। শর-গাছের মঞ্জবী বন্ধ হইতেও হয়। ইহাব নাম শব-মীজা। এই দোড়ী মসৃণ ও স্থিতি-স্থাপক, অথচ ঘর্ষণে শীঘ্র ক্ষয় পায় না। বেতের পাতলা জুক দিয়াও টেকোব আধাব হইতে পারে। (৭) মাল-সূতা টেকো ও চক্রকে মালাকারে বেড়িবা থাকে। ইহা বরাবর সমান টানে থাকে চাই। ঢিলা হইলে টেকো সমান যোবে না; কখনও বা আদৌ যোবে না, পিছলাইয়া পড়ে। তখন সূতা সমান মোটা বাহিব হয় না; সমান পাকও পায় না। টেকো ধামাইবাব কিংবা উল্টা ঘুবাইবাব সময় চক্রের সঙ্গে সঙ্গে ধামে না,

যোবে না। টেকোটি ডান হাতের বশে থাকা চাই; চক্ৰী চক্র দ্বাৰা টেকোকে ঘুৰাব, থামাব প্রথমে চক্র ছিল না, ছিল তর্ক; অপভ্রংশে টা-কু, টা-কু-বা বা টেকো। যখন চক্রের সহিত যুক্ত হইল, তখন ইহার নাম তর্কু বহিয়া গেল, সূত্রকর্তন-শলাব নাম হইয়া গেল ত-কু-টি, অপভ্রংশে তা-কু-ডী, তা-কু-ড। তাকুডেব পিণ্ড (তর্কু-পিণ্ড) চক্রে চলিয়া গেল, এবং চক্রটি এমন কার্যোপযোগী হইল যে সামান্য তর্কু উঠিয়া গেল। কার্য-সমর্থ (efficient) হইবাব কাবণ দুইটি, টেকো লঘুভাবে ঘুরিতে পাবে, চক্র স্থিতিস্থাপক হওয়াতে টেকোকে বশে বাধে। বস্তুতঃ চক্রটি দোড়ীবা; স্থিতিস্থাপক পাখীবা (পক্ষ, spokes) যোগে চক্রের বেড় বা নেমি স্থিতিস্থাপক। এইবূপ বস্তু-চক্রে উদ্ভাবনার নিমিত্ত শিল্পীকে শতাব্য ধন্য বলি। কি সোজা উপায়ে মাল-সূতায় সমান টান বাধা হইয়াছে, টেকোব সমবেগ সম্পাদিত হইয়াছে। এখানে নিজের একটা কথা বলি। একবাব আগার, বাড়িতে এক ছোট কামাবশাল বসাইতে হইয়াছিল, চামড়াব যাঁতা (ভত্ৰা) পাওয়া গেল না। অগত্যা কাঠেব পাতলা পাটার ছোট ছোট পাখা দিয়া এক 'বাত-প্রেরক' যন্ত্র (fan-blower) কবাইতে হইল। ইহাকে বেগে ঘুবাইতে হইবে, কাঠেব পাটার একটা বড় চাকা কবাইতে হইল। ইহাব যেরের পিঠে নালী কাটিবা এবং তাহাতে দোড়ী দিয়া বাত-প্রেরকের ছোট চাকাস সহিত যুক্ত কবা গেল। দেখিতে বেশ, কিন্তু বিশপচিণ বাব ঘুবাইলে মালদোড়ী ঢিলা পড়িতে লাগিল। টান রাখিবাব সোজা উপায় করিতে পাবিলাম না। শেষে পাটার চাকা ফেলিয়া দিয়া, চরকার শিল্পীকে নমস্কাব করিয়া দোড়ীবা চাকা কবি। তাহাতেই কাজ হইতে লাগিল। চবকাস মাল-সূতা ঢিলা হয় বটে, কিন্তু শীঘ্র হয় না। কাবণ চবকাস দোড়ীবা গায়ে টান কবিয়া ফাঁশ (পাইট নয়) দিতে পাবা যায়। তাবপব মাল-সূতা যত লম্বা হয়, পাখীগুলিও বাহিব দিকে সোজা হইয়া চাকাস ডেড (পবিধি) বড় কবে। পাটার চাকাস স্বয়ং-সমাবধান (self-adjustment) অসম্ভব। (৮) চবকাস দোড়ী অবশ্য শণের হইবে। তিনভাং (ভত্ৰা) কবিয়া পাকাইয়া বুজিষা (পাক বসাইয়া মসৃণ কবিয়া) লইলে বহুকাল দেখিতে হয় না। মাল-সূতা অবশ্য কাপাস সূতা; কিন্তু ইহা পাকাইবা তেল ধনার চিট দিয়া রঞ্জিতে হইবে। (ধনা-গুড়া অল্প তেল দিয়া আগুনে ফুটাইয়া এই চিট হয়)। ইহাতে দুইটি ফল হয়, সূতাব পাক খুলিয়া যায় না, চিট হেতু মসৃণ টেকোকে ঈবং জড়াইবা ধবে। মাল-সূতাব ফাঁশও এমন যে চবকা ঘুরিতে ঘুরিতে সূতা বুঝ টান হইতে থাকে, অথচ যখন ইচ্ছা তখন খুলিতে পাবা যায়। (৯) শেষে দেখিতে হইবে, কি বকম বসিষা-কিমে বসিয়া চবকা চালাইতে হইবে। সূতা কাটিবাব সময় ডান হাত চবকাস হাতাব মাঝে মাঝে আশ্রয় পায়, কিন্তু বাঁ হাত কখনও পায় না, অর্ধেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। সোজা পায় হাত আড়ষ্ট না কবিয়া সূতা কাটিতে পাবা চাই। মাদুরে বসিলে টেকোর খুঁটা নীচু কবিতো হইবে, উঁচু আসনে বসিলে উঁচু কবিতো হইবে। কাটনিব বয়স অনুসারে টেকো ও চবকাস ব্যবধান কমবেশী হইবে। বড় মেয়েব নিমিত্ত যে ব্যবধান, ছোট মেয়েব নিমিত্ত সে ব্যবধান চলিবে না, কম কবিতো হইবে। সূতা কাটা এক বকম যোগসাধনা; এমন আসন চাই, এমন যন্ত্র চাই, বাহাতে দেহ সজ্জল থাকিতে পাবে। একথা সত্য, দুবস্ত চঞ্চল ছেলে-মেয়েকে চবকা ধরাইতে পাবিলে তাহাদের চাকলা দুব হয়।

(২) চরকার কাঠ।

উল্লিখিত চরকা গড়িতে ২০ খানি কাঠ চাই। যথা,
২টা বৈঠনা—একটা টেকোর ১৪"×৩"×২৮", অপরটা চক্রের
২০"×৩"×২৮"।

২টা পা-মেলা ২৪"×২"×১"। ইহার সমুখে পা থাকে। এই
হেতু এই নাম।

১টা খুঁটা ২"×১" কাঠ। ২টা চক্রের ২১"; ২টা টেকোর ও
১টা মাল-সুতা ৯" লম্বা। টেকোর খুঁটের মাথা চিবিয়া চেবার মধ্যে
টেকোর দোড়ীর ফাঁপ পরাইয়া দিলে আব কিছুই করিতে হয় না।
বাকুড়াষ দেখিবাছি, খুঁটের বা পাশে টুকরা কাঠ দিয়া 'কান' করা হয়।
এই কানে ছিদ্র করিয়া দোড়ী পরান হয়। এই কান অনাবশ্যক, দোড়ী
আঁটিবার ধরণ অবৈজ্ঞানিক।

১টা দাঁড়া (অক্ষদণ্ড) ১৮"×১"×১"। ইহার দুই মুখ কুঁদিয়া
গোল কবিত্তে হইবে।

৮টা পাখী ১৮"×২"×১০"। পানীগুলি মাঝে ২", পবে ক্রমশঃ
১"। বাকুড়াষ চরকার পাখী ঝাঁজ কাটা কাটা। হুম্বব করিবার
চেঁচ। কিন্তু ভাল নহে, কারণ দোড়ী টান করিতে পাঁবা যায় না।

১টা হাতা ৮"×১০"×১০"। এই হাতার নীচের দিকে গোল
ছিদ্র করিয়া কেহ তাহাতে আবুল পরাইবা চরকা ঘুয়ায়, কেহবা
পেন্সিলেব মতন কাঠি পরাইয়া তাহাকে বাঁট করিয়া ঘুয়ায়। এই
কাঠিয পেছ দিকে মাথা থাকে, সে জন্ত কাঠি ধসিয়া পড়ে না। এই
বুদ্ধি মন্দ নয়। আঁটা বাঁটেব প্রয়োজন দেখি না, লাভের মধ্যে
ভাঙ্গিয়া ধসিয়া যায়।

মোট কাঠ লাগে প্রায় ৫ ঘন ফুট। মোটা কাঠ চিবিয়া চরকার
কাঠ বাহিব করিতে গেলে ঘাম বেশী পড়ে। যেখানে জানালা দরজা
গড়া হয়, সেখানে বেজা কাঠ অনেক জমে। সেই সব কাঠ হইতে
চরকা গড়িলে কাঠেব দাম কম পড়ে। এই রূপ, একটা চরকা
গড়িতে দুই দিন লাগে, কিন্তু অনেক গড়িতে হইলে হারাহারি দেড়
দিন যায়। চাকার মাঝের পাথরের পিণ্ড সকল জায়গায় পাওয়া
যায় না। তখন চবকা ভাবী কাঠের করাইতে হইবে, মাঝে কাঠের
পিণ্ড দিলে দুই পাশের পাখী কাছে চলিয়া আসিবে না। মাল কাঠে
প্রশস্ত। মালের অভাবে পিরমালের ও আসনের। সেগুলেব কর্ত্ত নয়।
গ্রামেব কাঠের মধ্যে তাল কাঁড়ীর দাঁড়া ও পাখী, বাবলার বৈঠনা,
খুঁটা। অজুন, শিরীষ ও নিম, কুল ও বেল, শাওড়া ও কবজা,
চালতা ও তেঁতুল প্রভৃতি হইতে এক এক রকমেব কাঠ বাছিয়া লইতে
পারা যায়। মটল কাঠ ভারী। ইহার পিণ্ড হইতে পাবে চাটিগাঁ,
নোয়াখালী ও আসামে চবকার যোগ্য অনেক বকম কাঠ পাওয়া
যায়।

(৩) তুলার পাইট।

তুলাব পাইট ভাল না হইলে সূতা কাটিতে সমস্যা লাগে, সূতা
সর মোটা হয়, জায়গাষ জাবগাষ গোলভা হয়। সব জায়গায় পাক
বেশী লাগে, সেখানটা ছিড়িয়া যায়। তুলাব পাইট তিনটি। তুলা
বস্তা-বাঁধা হইয়া পড়িয়া থাকিলে চাপ বাঁধিয়া যায়। তখন দুই
হাতেব আবুল দিয়া চাপ ভাঙ্গিতে, তুলা পৃথক কবিত্তে হয়। এই
কমেব নাম পে-জা (সং পিজ্জন)। বোলে দিয়া ময়ূণ ছড়ী দিয়া
আছড়াইবা পর তুলা পিঞ্জিতে হইবে। পিঞ্জিতে সময় ও বৈধ
লাগে। তাব পর, কো-ডা (ক্ষুটিত করা), তুলাব বোঝা পরস্পর
আলুপা করা। ইহানী শব্দে ঘুনাবী পাওয়া যায়। ইহার তুলা
ঘুনিয়া দেয়। গ্রামে মেয়েরাই ছোট ধড় দিয়া তুলা কোড়ে। এই

ধমুর নাম আ-ছা-ড়। অবশ্য ইহাতেও তাঁতের (জাম্বব তন্তু) পূর্ণ
মিতে হয়। বোঝা পৃথক পৃথক হইবা পর পীজ পাঁকান।
পীজ (সং পঞ্জি), তুলাব নল বা শূদ্রপর্ড বর্তিকা। একটা কাঠের
ময়ূণ পীড়ীর উপবে কোড়া তুলা অল্প লইয়া সমান করিয়া বিছা-
ইতে হইবে। এই স্তবেব এক ধারে এক টুকরা ময়ূণ শব
(অভাবে পেন্সিল) রাখিয়া তুলা পুটাইয়া লইতে হইবে। তখন পীজ
পাঁকান শেষ। এই রূপ, পীজ করিয়া কাগজের মোড়কে বিক্রি
কবিত্তে বলিয়াছি। এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, এক দিনেব আবশ্যক
পীজ কবিত্তে ২ ঘণ্টা সময় লাগে। বোধ হয়, তিনি বাজাবেব চাপ-
বাঁধা তুলা না ঘুনিয়া কেবল পিঞ্জিয়া পীজ কবেন। বস্তুতঃ ইহা
অবিধি। ধোনা তুলার পীজ পাকাইতে বেশী সময় লাগে না। এক
দিন পীজ পাকাইলে এক মাস চলিয়া যায়। সে কালে সূতাকাটায়
বিশ্রাম ছিল; একাদশী, এবং পবদিনে (যেমন অমাবস্তা পূর্ণিমা)
দিনে চরকা ঘুনান হইত না, পীজ পাকান হইত। দেব-কাপাসেব
তুলাব বোঝা লম্বা ও নবর। এই তুলা ঘুনিত্তে পায়া ঘাঘ না,
ধমুর তাঁতে জড়াইয়া ঘাঘ, আছাডেও হবিধা হয় না। তখন হাতে
করিয়া একটু পিঞ্জিয়া লম্বা লম্বা বাতিব মতন করিয়া লইতে হয়।
সস্ত্র বীজ ছাড়ান তুলা, এমন কি বীজ হুছ কাপাস ধবিয়া সূতা
কাটিতে পারা যায়। কারণ বীজ হইতে তুলা সহজে ধসিয়া আসে।
দশ পনবটা দেব-কাপাসের গাছ রাখিতে পারিলে কাপড়ের জন্ত
সূতা চিন্তা থাকে না। অপর বিশেষ হবিধা, ষা-অ-ই (সং ষাদক)
দিয়া ষাওয়ানা পরে পেঁজা, কোড়া পাইজ পাঁকান কিছুই দরকার
হয় না। সদ্য ষাওয়ানা তুলার অনেক গুল, পিঞ্জিতে হয় না। অতএব
নতন কাপাস জয়িলে ষা-অ-ই দিয়া তুলা পৃথক করিয়া সঙ্গে
সঙ্গে ঘুনিয়া পীজ পাকাইয়া রাখা কতব্য। বোআগলি পরস্পর
আলুপা করা ধোনা, এবং সেই অবস্থায় রাখা পীজ পাকাইবা
উদ্দেশ্য।

(৪) সূতা কাটার পরিমাণ।

আমি লিখিয়াছিলাম, ৪ ঘণ্টায় ১০ নম্ববেব আধপোয়া সূতা কাটিতে
পায়া যায়। বাকুড়া জেলার কোনো কোনো গ্রামে পূর্বাধি চরকা
কিছু কিছু চলিয়া আসিতেছে। এক কাটনী এই সংবাদ দিয়াছিল।
ওড়িষাতেও শুনিয়াছিলাম, এক এক নারী আধ পোয়া সূতা কাটিতে
পারে। এখন বোধ হইতেছে, সে সূতা দেশের নয়, আরও মোটা;
চারি ঘণ্টায় নয়, ছয় ঘণ্টায় কাটা। সাধারণতঃ দিনে এক ছটাক
ধবা যাঁতে পাবে। অবশ্য পৃহ্বালীর কাজ সারিয়া দিনেও সম্ভার
পূব। আজিকালির বাজারে সূতার দর চড়া। এই চড়া দরের সহিত
মিলাইয়া বাণি পাইলে এক ছটাক কাটিবা মাসে ২ টাকা উপার্জন
হইতে পাবে।

(৫) সূত্র-পরীক্ষা।

লোকে জিজ্ঞাসা করে, সূতা সব না মোটা। কোন্ সূতা ভাল,
কোন্ সূতা মন্দ, তাহাও সকলে জানে না। কতকগুলি বোঝা
পাকাইয়া সূতা। সূতবাং বোঝা যত কম হইবে, সূতা তত সব
হইবে, এবং পাক যত বেশী হইবে সূতা তত সব হইবে। অর্থাৎ
অল্প বোঝা, বেশী পাক। কিন্তু ধর পাকেব দোষ আছে। সূতা
সব মোটা না হইয়া সমান হইলে তত দোষ হয় না। কিন্তু সর
মোটা হইলে সবতে পাক বেশী যায়, পবে সহজে ছিড়িয়া যায়।
প্রথম চরকা ধবিবা সময় তাড়াতাড়ি অনেক সূতা কাটিবার ইচ্ছা হয়।
কিন্তু এই সময়ে সংযম আবশ্যক, নইলে হাত আর শোধরাইবে
না। বরং অল্প কাটা হটক, কিন্তু সূতা অসমান হইবে না।

উনিশ বিশ, আঠার বিশ, পনের বিশও চলে ; কিন্তু দশ বিশ, পাঁচ বিশ অচল। মোটা বর ভাল, কিন্তু মোটা-সর ভাল নয়। মনে রাখিতে হইবে সূতা-কাটা একটা কলা, দুই চাবি দিনেই হাত হয় না।

যদি পাক যথা-উচিত পাইয়া থাকে তাহা হইলে নব্বয় দ্বারা সে সূতা সর কি মোটা বুঝিতে পারা যায়। নব্বয় নিরপূর্ণের নিমিত্ত একটা নিস্তি, একটা দুয়ানি, একটা গজ চাই। নিস্তির এক পাল্লার দুয়ানিটি বাধিয়া অপর পাল্লার সূতা দিয়া সমান কর। সে সূতা গজে মাগিয়া দেখ। ১০ নব্বয়ের সূতা, দুয়ানি-ওজনে ২৭ গজ হয়। ইহা হইতে অল্প সূতার নব্বয় কথিতে পারা যায়। দুয়ানির ওজনে সে সূতা যত গজ হইবে, তাহাকে ১০ দিয়া গুণ করিয়া ২৭ দ্বারা ভাগ করিলে ফল হইবে নব্বয়। যথা, সূতা ৩২ গজ হইল। $32 \times 10 = 320$ । অতএব সে সূতার নব্বয় ১২। এই সূতা কলের ছিল।

কিন্তু সহজেই বুঝা যায়, একই নব্বয়ের সূতা সর হইতে পারে, মোটাও হইতে পারে। ওজনে লম্বায় সমান, কিন্তু যেটার পাক বেশী সেটা সর দেখাইবে। সব কলের সূতা সমান সর নয়। চরকার সূতার ত কথাই নাই। যদি সূতা সর মোটা না হয়, তাহা হইলে পাক গণিয়া দেখা কর্তব্য। এক ইঞ্চি মধ্যে কত পাক আছে জানিতে হইবে। এক চুঁকু বা ধড়িকার এক প্রান্ত একটু চিরিয়া তাহাতে সূতা পরাইবা আঁঠিয়া দেও। দেখিবে পাক গুলিয়া না যায়। তার পর ধড়িকাটি ডাইন হাতে ধরিয়া, সূতা মোটা হইলে দুই ইঞ্চি তিন ইঞ্চি, সর হইলে এক ইঞ্চি মাগিয়া সে স্থানে বা হাতের দুই আঙুল দিয়া টিপিয়া ধর। এখন ধড়িকাটি পাকের উল্টা দিকে ঘুরাইতে থাক। ক্রমে তুলার রোমার পাক গুলিতে থাকিবে। এক ইঞ্চিতে কত পাক আছে, এখন জানিতে পারা যাইবে। দেখিতে পাইবে, সর স্থানে অনেক মোটা ব স্থানে অল্প পাক আছে। এমন সূতাব পাক জানিয়া ফল নাই যদি সূতা সমান হয়, তাহা হইলে জানিয়া ফল আছে। তাঁতের টানার সূতায় কিছু বেশী পাক থাকে। যদি ১০ নব্বয়ের সূতায় ১২১০ পাক থাকে, তাহা হইলে তাহাতে টানা হইতে পারিবে। যদি ১১০ পাক থাকে তাহা হইলে গড়ান হইতে পারিবে। যদি আরও কম থাকে, তাহা হইলে তাহাতে কাপড় বোনা চলিবে না, মোজা বোনা চলিতে পারে। ৬ নব্বয় সূতায় ১০ পাক, ১২ নব্বয়ের সূতায় ১৪ পাক, টানার নিমিত্ত কলের সূতায় এইরূপ ধরা হইয়া থাকে।

চরকার সূতা কাটিবাব সময় পাক ঠিক হইতেছে কি না জানা সম্ভব নয়। বা হাতকে ক্রান্ত না করিয়া একবারে ২ ফুট সূতা কাটিতে পারা যায়। চরকার চক্র ১৭০ এবং টেকো সিকি ইঞ্চি হইলে, চক্রের প্রতি ঘূর্ণনে টেকো ৭০ বাব ঘুরিবে। যদি কাটা সূতা ৬ নব্বয়ের হয়, তাহা হইলে ২ ফুট বা ২৪ ইঞ্চি সূতার ২৪০ পাক চাই। অতএব চরকা ৩০ বাব ঘুরাইতে হইবে। ১০ নব্বয়ের সূতা হইলে ঠিক ৪ বাব ঘুরাইতে হইবে। খব পাক বর ভাল, উন-পাক ভাল নয়।

যে সূতা টান সহিতে পারে না, তাহাতে কাপড় বোনা চলে না। চলিলেও কাপড় টেক-সই হয় না। অতএব টান পরীক্ষাই কাজেব পরীক্ষা। টানিয়া দেখিলেই কোন্ সূতা কেমন তাহা বুঝিতে পারা যায়। প্রথম প্রথম অল্প উপায়ে পরীক্ষা কর্তব্য। এ নিমিত্ত দাঁড়ী পাল্লা ও বাঁটখারা চাই। হাত খানেক সূতার এক খুঁট এক পাল্লার, অপর খুঁট নীচে পোল কিছুতে বাধিয়া সূতার উপর দাঁড়ী ধর।

অপর পাল্লার এক ছটাক এক ছটাক করিয়া বাঁটখারা চাপাও। দেখিবে সূতার একটু টান পড়িয়া দাঁড়ী সমান রহিয়াছে। কদেরক ছটাক পরে সূতা ছিঁড়িয়া বাইবে। এইরূপ আরও চারি পাঁচ স্থানের সূতার টান মাগিবে। পরে হারাহারি কত দাঁড়ায় বুঝিতে পারিবে। কলের ১০ নব্বয়ের সূতা প্রায় আধসের ভার সহিতে পারে।

এখন চরকার সূতা লইয়া দেখি। ক সূতা ১০ নব্বয়ের বলিয়া ২২ টাকা সেরে বিক্রির নিমিত্ত আসিয়াছিল। ঐ সূতা এক বাড়ীতে কাটা, উত্তম বলিয়া প্রশংসাপত্র পাইয়াছিল। দেখিলাম ক সূতা তেমন সর মোটা নয়, দেব-কাপাসের মতন লম্বা রোমার কাটা। নব্বয় কিন্তু ৬৪০। প্রধান দোষ পাক কম হইয়াছে, পোরাটাক ভারে ছিঁড়িয়া যায়। ঐ সূতা দেখিতে সব মনে হয় ২০১২ নব্বয়ের হইবে, কিন্তু বাস্তবিক ১২৪০ নব্বয়ের। পাক-বেশী হইয়াছে, ইঞ্চিতে ২০। কিন্তু মাঝে মাঝে যে সর আছে, তাহাতে সূতাব টান এক পোয়াব অধিক উঠিল না।

(৬) চরকার সূতা বিকায় না কেন ?

শ্রুতিতেই এক এক স্থানে সূতা জমিয়া যাইতেছে, বিক্রি হইতেছে না। সূতা যে বকম দেখিতেছি, যে দায় শ্রুতিতেছি, তাহাতে না বিক্রাইবাব কথা। পোহড়া সূতার কাপড় পরিবার লোক থাকিলে, দায় সস্তা হইলে বিক্রাইত। এখন মোটা-বোনা তাঁতীও চরকার সূতার নামে পিছাইয়া যায়। কারণ, একে কিনিবাব লোক নাই, তার উপর তাঁত না বদলাইলে বুঝিতে পারা যায় না। সূতা ভাল কব, মোটা হটক সমান কর, পড়িয়া থাকিবে না।

অর্থনীতির কথা স্বতন্ত্র। বোধ্য হয় এমন নির্বোয় কেহ নাই যে মনে কবে চরকা দ্বারা কলকে হারাইতে পারা যায়। কলের সূতা সস্তা হইবেই ; চবকাব সূতা তত সস্তা কখনও পাওয়া যাইতে পারে না। চবকার সূতাব কেনা বেচা চলিবে না। পূর্বে চলিত, তখন কল ছিল না। এখন সামনে সস্তা কেলিয়া কে আক্রমণ যাইবে ? কাটনার বাপি না লাগিলে অবস্থা সস্তা। এই কথা মনে বাধিয়া চরকা ধরিতে হয়, ধর ; সূতা বিক্রির আশার ধরিও না। অর্থাৎ নিজের কাপড়ের তরে চরকা ধর, ইহাতে তোমার পরমা বাঁচিবে, দেশের পরমাও বাঁচিবে।

সূতা বেচা কাটনীও চাই। কাবণ সকল বাড়ীতে চরকা ঘুরিবে না, ঘুরিতে পারিবে না। দেখানে হয় কলের সূতা নয় চরকার সূতা লইতে হইবে। কলের সূতাব, স্বদেশী কলের সূতার দর সমুদ্রিতি অত্যন্ত চড়া। অনেক দিন হইতে চড়া চলিতেছে। কেন চড়া বলিতে হইবে কি ? কারণ কল-আলাদিসেব দেশের লোকগণা অ-জ্ঞান, তাহারা দেশী চায়। সে বাহা হটক, কলের সূতার চড়া দরে চবকা চলাইবাব সুবিধা হইয়াছে। এখন সেরে ১২ টাকা বাশিও দিতে পারা যায়। কিন্তু এটা প্রকৃত অবস্থা নহে। কলের সূতার দর কিছু কমিলেই চরকা কাটার বাপিও কমাইতে হইবে। তখন কাটনী পাওয়া যাইবে না। তবে যদি চবকা একবার চলিয়া যায়, সূতা কাটার নিম্মা বুঝিয়া যায়, তাহা হইলে কম বাপিতে কাটনী কাটিতে থাকিবে। এখন মানে ২২ টাকা, তখন ১২ টাকা হইলেও কাটা বন্ধ হইবে না। কারণ একটা টাকা অল্প নয়, অস্ত্রতঃ ভিটার জিনিসমানার মধ্যে পাওয়া যায় না।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

আরোগ্য-দিগদর্শন

(সমালোচনা)

গুজরাটী ভাষায় লিখিত মহাত্মা গান্ধী প্রণীত “আরোগ্য-দিগদর্শন” নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক শ্রী কিরণচন্দ্র চক্রবর্তী। বাবাণসী হইতে শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা।

পুস্তকখানি ৮৪ পৃষ্ঠার সমাপ্ত এবং দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে স্বাস্থ্যবক্ষার নিয়মাবলী এবং দ্বিতীয় ভাগে “জল চিকিৎসা” প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ চিকিৎসা-প্রণালী, বসন্ত, ধেনু প্রভৃতি কতিপয় সাধারণ বোগ এবং জলে ডুবা, অগ্নি-দাহ প্রভৃতি আকস্মিক দুর্ঘটনার চিকিৎসা-প্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথমধ্যে স্বাস্থ্যবক্ষা, স্বতন্ত্রাঙ্গের পুনরুদ্ধার এবং দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক উন্নতি সাধন সম্বন্ধে অনেক হিতকথা সম্মিলিত হইয়াছে। বোগের চিকিৎসা অপেক্ষা বোগ বাহাতে দেহমধ্যে আদৌ সঞ্চারিত হইতে না পাবে, মহাত্মা গান্ধী তদ্বিধায়ে বহুল সাধ্যায়ত্ত সঙ্গপন্থে প্রদান করিয়াছেন। একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য পালনেই শরীর ও মনের পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ হইয়া থাকে, এই প্রব সত্য তিনি প্রথমধ্যে প্রতিপন্ন করিবার সবিবেশে চেষ্টা করিয়াছেন এবং শৈশবকাল হইতে আত্মবন প্রত্যেক নবনাবীকে ইহা অবশ্যই লন করিতে সনির্বন্ধ অনুবোধ করিয়াছেন। আমবা আশা করি যে তাঁহার এই সঙ্গপদেশ বর্ষমাংস কালের ভোগসম্বন্ধে নবনাবীব জন্মে চেতনা সঞ্চার করিয়া তাহা-দিগকে সংযমেব পথে পরিচালিত করিতে সক্ষম হইবে।

মহাত্মা গান্ধী “জল” ও “বায়ু” কিরূপে চুড়িত হয় এবং কি উপায়েই বা তাহাদিগকে পরিশোধিত করিয়া স্বাস্থ্যবক্ষার অঙ্গকুল করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে স্বাধীন অভিজ্ঞতাগ্রন্থ এবং বিজ্ঞানানুসৃত অনেক হিতোপদেশ প্রথমধ্যে নিবন্ধ করিয়াছেন। খাদ্য সম্বন্ধে তিনি স্বকীয় জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই অনেক কথা লিখিয়াছেন। মধুরের পক্ষে ফলাহাবই প্রশস্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং মাছ, মাংস, তরিত-ব-কাবি, দাল, এমন কি, দুগ্ধ পর্যন্ত পবিত্রাত্মা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এবিধে আমবা তাঁহার মতেব পোষকতা করিতে পারি না। ফলাহার তাঁহার মত ঋষিকল্প লোকের পক্ষে প্রশস্ত হইতে পারে, কিন্তু সর্ব-সাধারণের পক্ষে উহা উপযোগী নহে। বাবমাংস শুদ্ধ ফল ভোজন করিয়া সাধারণ লোক কখনই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না এবং তাহা দ্বারা তাহাদের স্বাস্থ্যও বক্ষা হইবে না। কারণ যে প্রকাব এবং যে পরিমাণে ফল ভোজন করিলে তাহা হইতে শরীর-গঠনের সমস্ত উপাদান উপযুক্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সংগ্রহ করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, স্বতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে তাহার সংগ্রহ অসম্ভব। অতএব মহাত্মা গান্ধী এই উপদেশ- কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োজ্য বলিয়া আমরা মনে করি না।

মহাত্মা গান্ধী দাল একটি “স্বাস্থ্যাহানিকর পদার্থ” বলিয়া দালের ব্যবহার নিষেধ করিয়াছেন। আমরা এই উপদেশের সারবস্তা স্বীকার করি না। ভারতবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই আর্থিক অবস্থা বা সামাজিক ব্যবস্থা হেতু আদিব ভোজন সম্ভবপর নহে, তাঁহাদের খাদ্য দালই মাছ-মাংসের অভাব পূরণ করিয়া থাকে। “দাল ভাত” বা “দাল রুটি” ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য; পরীত ভারতবাসীর পক্ষে দালই একমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য। এখন পৃথিবীর সর্বত্রই পরীত লোকের খাদ্যের মধ্যে “দাল” যাহাতে অধিক পরিমাণে আদর লাভ

করে, তাহাও চেষ্টা হইতেছে। কোন শাবীরতত্ত্ববিদ চিকিৎসক বা অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিত মহাত্মা গান্ধীর এই উপদেশের সমর্থন করিবেন না।

আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মহাত্মা গান্ধী দুগ্ধ ব্যবহার করিতেও নিষেধ করিয়াছেন। দুগ্ধ চিরদিনই আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট সাবান ও সাস্থিক খাদ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। দুগ্ধ ও তদুৎপন্ন নানাবিধ সামগ্রী ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য। আজ দেশে দুগ্ধ দুস্ত্রাপ্য হইয়াছে বলিয়াই ভারতবাসী দিন দিন স্বাস্থ্যহীন ও বীর্ধ্যহীন হইয়া পড়িতেছে। দুগ্ধের সহিত নানাবিধ মলিন জব্য মিশ্রিত হয় এবং দুগ্ধবতী গাভীপূর্ণ সকল সময়ে বোগশূন্য নহে বলিয়া তিনি দুগ্ধে ব্যবহার নিষেধ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে তাঁহার এই নিষেধ কেহই পালন করিয়া চলিবে না। বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও ঘৃত দেশে বাহাতে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং সর্ব-সাধারণে উহা সহজে পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত; দুগ্ধ ব্যবহারের নিষেধ সমীচীন নহে। ঘৃতের পরিবর্তে তিনি তিলতৈল ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, কোন উত্তীর্ণ তৈলই ঘৃতের জ্যব-সুপাচ্য ও পুষ্টিকর নহে। মাখন হইতে ঘৃত প্রস্তুত হয়। মাখনে ভাইটামিন (Vitamines) যথেষ্ট আছে। কোন উত্তীর্ণ তৈলে স্বাস্থ্যরক্ষার সহায় এই উপাদান নাই। মহাত্মা নিজে ফলাহারী, কাজেই তিনি সকল লোককে তদবলম্বিত পথ অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু এরূপ একদেশ-দর্শী উপদেশ সর্বসাধারণে গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে।

মহাত্মা গান্ধী খাদ্যে, সহিত লবণ-ব্যবহারের পক্ষপাতী নহেন। তিনি রন্ধন দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করাবও বিরোধী। বলা বাহুল্য যে তাঁহার এই উদ্ভট উপদেশ কোনকালেই জগতের কোন সমাজেই গৃহীত হইবে না। বন্ধন একটি কলাবিদ্যা; উহা সভ্যতার প্রধান নিদর্শন। প্রাগৈতিহাসিক যুগে অসভ্য মনুষ্য শিকাবল্লভ আমমাংস ও যথেষ্ট-হরিত বনজ ফল মূল খাইয়া জীবন ধারণ করিত। কৃষিকার্য্য ও রন্ধন হইতেই মানব-সভ্যতার সূত্রপাত। অবশ্য মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা সকলে ফলাহারী হইলে খাদ্যে সহিত লবণের পৃথক ব্যবহারের প্রয়োজন না হইতে পারে, কিন্তু যতদিন মনুষ্য সাধারণ খাদ্য গ্রহণ করিবে, ততদিন তাহার বন্ধনের এবং খাদ্যে সহিত যথাপরিমাণ লবণ মিশ্রিত করিবার প্রয়োজন হইবে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে “মসলাব দ্বারা লবণ পরিত্যাগ। লবণ একটি বিদ্যাক্ত জিনিষ। অতএব সর্বপ্রথমে ইহা পরিত্যাগ করাই ‘বিষেধ’।” অবশ্য অধিক মসলা বা অধিক লবণ ব্যবহার করিলে অনিষ্ট হইয়া থাকে এবং বোগ-বিষেধে লবণের ব্যবহার নিষিদ্ধ। কিন্তু হুহু শরীরে কি লবণ, কি মসলা, উভয়েরই পরিমিত ব্যবহার স্বাস্থ্যরক্ষার অঙ্গকুল। মহাত্মা গান্ধী জ্ঞানী ও পণ্ডিত হইলেও অনেক সময়ে অনেক অপ্রযোজ্য (Unpractical) মত প্রচার করিয়া থাকেন।

মিতাহার ও ব্যায়াম সম্বন্ধে যে-সকল উপদেশ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা পালন করিলে স্বাস্থ্য, দেহোন্নতি এবং দীর্ঘজীবনলাভ সম্বন্ধে যথেষ্ট উপকার হইবে।

পরিচ্ছদ-বাহুল্য এবং অলঙ্কার-ব্যবহার সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী যে-সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে প্রশংসনযোগ্য। ইহা দ্বারা অর্থের অপব্যয়, অনেক অশুবিধা ও বিপদের হস্ত হইতে আমবা বক্ষা পাইতে পারি। তবে জুতা ব্যবহার নিষেধ করিয়া যে মত

প্রচাব কবিরাজেন, তাহা সমাজেব বর্তমান অবস্থার সর্বসাধারণের
প্রাণ হইতে পারে না।

সংঘ সম্বন্ধে তিনি অতি যুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ উপদেশ প্রদান
কবিয়াছেন। আহার, বিহার, নিদ্রা প্রভৃতি আমাদের প্রাত্যহিক
প্রত্যেক কার্যেই সংঘ পালনের বিশেষ আবশ্যিকতা ও সকল প্রদর্শন
করিয়াছেন। জ্বর সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী নিজ অভিজ্ঞতা
হইতে যে-সকল উপদেশ প্রদান কবিয়াছেন, তাহা প্রাচীন আৰ্য
ঋষিগণের প্রচারিত এবং তাহার পালন প্রাচীন হিন্দু সমাজে অবশ্য-
কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। আজ সংঘের অভাবে আমাদের
সমাজ বিবিধ ব্যাধি, শোক ও দরিদ্রতার প্রবল চাপে নিম্নীড়িত।
মহাত্মা গান্ধী যথার্থই বলিয়াছেন যে স্বাস্থ্যবন্ধার বহু উপায় থাকিলেও
ব্রহ্মচর্যই তন্মধ্যে সর্বপ্রধান। জীই হটন, আব পুরুষই হটন,
ব্রহ্মচর্য ব্যতীত কাহারো স্বস্থ থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই।
তিনি বলিয়াছেন—“বালক পিতা ও বালিকা মাতার সন্তান জন্মিলে
আমরা কত মঙ্গলগীত গান কবি, কত উৎসবের অনুষ্ঠান ও ভগ-
বানের জয়গান করিয়া থাকি। কি জীবন মূল্য! চিন্তা করিলে
বিস্ময়গম্য হইতে হয়। এ পাপ ঘুর করিবার উপায় কি?”.....

আমরা সর্বাস্থ্যকরবে মহাত্মার এই মহাবাক্যের সমর্থন করিতেছি।
সর্ব প্রকারে ইন্দ্রিয়-সংযম প্রত্যেক নরনারীর অবশ্যপালনীয়।
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় মূলে এই সনাতন সত্য অবস্থিত। ইহাই
যে কোন জাতির শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের
একমাত্র উপায়।

সকলেই জানেন যে মহাত্মা গান্ধী যে-কোন-প্রকার মাদক
দ্রব্য ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি মাদক-সেবনের বিরুদ্ধে
পুস্তকে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সমাজহিতৈষী নীতিপরায়ণ
ব্যক্তি মাত্রেই তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করিবেন।

“বায়ু চিকিৎসা,” “জল চিকিৎসা,” “মুত্তিকা চিকিৎসা” প্রভৃতি
বিবিধ প্রণালীর চিকিৎসা সম্বন্ধে তিনি অল্প বিস্তার লিখিয়াছেন।
“মুত্তিকা চিকিৎসা” একটি অস্তিনব ব্যাপার; এবিষয়ে আমাদের কোন
অভিজ্ঞতা নাই বলিয়া ইহার সম্বন্ধে কোন প্রকার মত প্রকাশ করা
সঙ্গত নহে। জল ও বায়ু চিকিৎসার প্রকরণ সম্বন্ধে সকল স্থলে
তাঁহার সহিত একমত না হইলেও এবং মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং চিকিৎসক না
হইলেও, তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যে বিশেষ মূল্য আছে, তাহা
আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য।

বসন্ত রোগে টীকা লইবার বিরুদ্ধে তিনি যে-সকল যুক্তি-তর্কের
অবতারণা করিয়াছেন, তাহা ইংলণ্ডেব সম্প্রদায়-বিশেষের অশ্রুমোদিত
হইলেও আমরা তাহা জাতি বলিয়া প্রতিবাদ করিতে বাধ্য এবং
প্রয়োজন হইলে ঐ জাতি মতেব বিরুদ্ধে বশেষ বিবস্ত্র প্রমাণ
প্রদর্শন করিতে সমর্থ। মহাত্মা গান্ধী টীকা লওয়া সম্বন্ধে যে-সকল
অমুদার মত প্রচাব করিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস যে ভারতবর্ষেব
মত দেশে উহা প্রচারিত হইলে সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা,
তজ্জন্ত আমরা ইহার তীব্র প্রতিবাদ কবিতেছি। তিনি বলিয়াছেন
যে “টীকা লওয়া নেহাত খালী প্রথা। ইহা এমনই একটি কুসংস্কার
যে বাহাদিপক্ষে আমরা বস্ত্র অসভ্য বলি, তাহাদেব মধ্যেও একপ

প্রথা নাই। টীকা লইয়া ত আমরা অস্ত্র জীবন রক্ত পান করিয়া
থাকি, তাহাও আবার পটা রক্ত। বাহারা বাস্তবিক ঈশ্বর-ভক্ত,
তাহারা যদি সহস্র বার বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং যদি মৃত্যু-
মুখেও পতিত হন, তথাপি এই পটা রক্ত পান কবিত্তে স্বীকৃত হইবে
না। টীকা লওয়ার ধর্মভ্রষ্টও হইতে হয়।”

বসন্ত রোগ নিবারণেব একমাত্র উপায় ইংরেজী টীকা লওয়া। এ
দেশেব সাধারণ লোকে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার হেতু টীকা লইতে চাহে না
বলিয়া ভাবতর্কে বসন্তের এত প্রাদুর্ভাব এবং এত অধিক সংখ্যক লোক
এই রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে অথবা তাহাদের
চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। মহাত্মা গান্ধীর মুখ হইতে টীকার বিরুদ্ধে এই
জাতি মত প্রচারিত হইলে মহা অনিষ্ট সংঘটিত হইবার কথা।

“প্রদব” সম্বন্ধে তিনি যে-সকল হিতোপদেশ দিয়াছেন, তাহা
প্রত্যেক সমাজহিতৈষী ব্যক্তির প্রশ্রয়প্রদায়ক। সহরের জীলোকগণ
অস্বাভাবিক ও অলস জীবন বহন কবে, বলিয়া তাহারা প্রদব-কালে
অনেক সময়ে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে তাহাদের
জীবন-সংগ্ৰহ হয়। মহাত্মা গান্ধী বলেন যে অস্বাভাবিক ভাবে জীবন-
যাত্রা নির্বাহ ব্যতীত প্রদব-কষ্টের স্বাভাবিক কারণ বিদ্যমান
রহিয়াছে।

“অল্প বয়সেই গর্ভধারণ এবং প্রসবান্তে পুনর্বার গর্ভধারণ ব্যাপার
যে পর্য্যন্ত দেশ হইতে বিদূষিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত স্থখ-প্রদবেব আশা
হৃদয়পরাণত।”

আমরা বলি যে কেবল স্থখ-প্রদব নহে, যতদিন পর্য্যন্ত এই
অনাচারের নিবারণ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এই পতিত জাতির মধ্যে
বলবীর্ঘশালী দীর্ঘজীবী সন্তানসম্প্রতি জন্মগ্রহণ এবং দারিদ্র্য ঘুর কবিবাব
আশা হ্রাসশায় পর্য্যবসিত হইবে।

সন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে “শিক্ষা
বালকের জন্ম হইতেই-আবস্ত হইয়া থাকে, একথা সর্বদা স্মরণ
রাখিতে হইবে। মাতা-পিতাই বালকের উত্তম শিক্ষক। মাতা-
পিতাব স্বভাবের অনুযায়ীই বালকের স্বভাব হইয়া থাকে।
বিদ্যালয়ে পাঠাইলেই যে সন্তান সচ্চরিত্র হইবে, এ আশা করা বুধা।
সদাসর্বদা সংস্কার কবাই সচ্চরিত্রতালাভের একমাত্র উপায়। গৃহের ও
বিদ্যালয়ের শিক্ষা যদি বিভিন্ন প্রকারের হয়, তাহা হইলে কখনই
বালকের চরিত্র সংশোধিত হইবে না।”

এই গ্রন্থে এমত কতিপয় মত প্রচারিত হইয়াছে, যাহা বিজ্ঞান-
সম্মত নহুে, হতবাং তাহাদের অশ্রুমোদন করিতে পারা যায় না। আরও
এমন কতকগুলি মত আছে যাহা সমাজেব বর্তমান অবস্থার উপযোগী
নহে, হতবাং তাহাবিশেষেব সমর্থন কবিত্তে পারা যায় না। কিন্তু
অধিকাংশ উপদেশই স্বাস্থ্যরক্ষা এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন-
লাভের পক্ষে অগুণ্ডন, স্বাভাবিক তাহাদেব আলোচনায় দেশের মহত্বপূর্ণতার
সাধিত হইবে। পাঠক পাঠিকা গ্রন্থ পাঠে উপকার লাভ করিবেন।

অমুদারের ভাষা সল ও হুবোধ্য। গ্রন্থের কাগজ ও ছাপা সুবিধার
নহে। গ্রন্থে অনেক ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে, আশা করি দ্বিতীয়
সংস্করণে এসকল ত্রুটির সংশোধন হইবে।

শ্রী চুণীলাল বসু

মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালী

থাণ্ডোয়া

খ্রীষ্টীয় ১৩১১ অব্দেব দেশদাস্ গণনাহুসারে মধ্যপ্রদেশে ও বেরারে ২৫৪০ জন বঙ্গীয় নরনারী সংখ্যাত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে নাগপুর বিভাগে ছিলেন ৭৭২ জন, জবলপুর বিভাগে ৫৭৬, ছত্রিশগড় বিভাগে ৪৫৮, নর্মদা বিভাগে ৩৮৩, বেরার বিভাগে ১২৭ এবং ফরা মহলে ১৫৪ জন। অর্ধাদিক শতাব্দী পূর্বে নর্মদা বিভাগে থাণ্ডোয়া নামে একটি জেলা গঠিত হয়, এক্ষণে উহা নিম্নার জেলার অন্তর্ভুক্ত। জেলা গঠনের প্রায় কুড়ি বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৮০ অব্দে এখানে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হয়। ইতিপূর্বে নাগপুর প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালীর উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। মধ্যপ্রদেশে প্রথমগত বাঙ্গালীদের প্রধান ও প্রসিদ্ধগণের মধ্যে যাহারা পরবর্ত্তীগণের পথপ্রদর্শক ছিলেন, তাঁহাদের এদেশে আগমনের কালাহুসারে তিনটি দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সর্বপ্রথমগত বা প্রথম দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোম্পর্গরনিবাসী স্বর্গীয় বাবু বিহারীলাল বসু, কলিকাতার বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু, সার্বু বিপিনকৃষ্ণ বসু, বাবু কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, স্বর্গীয় বায় ভূতনাথ দে বাহাদুর, স্বর্গীয় রায় ভারদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, নৈহাটি-নিবাসী স্বর্গীয় বাবু হরিদাস ঘোষ, কলিকাতা হেডুয়ানিবাসী বাবু অধিকাচরণ দে এবং স্বর্গীয় বাবু শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী। ইহারা নাগপুর, নসিংপুর, জবলপুর, সাগর ও হোসানাবাদ প্রবাসী হন। ইহাদের পর আসেন বাবু হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, এবং তাঁহার সহযোগী স্বর্গীয় বাবু প্যারীলাল গঙ্গোপাধ্যায়। এই দুইজনেই থাণ্ডোয়ার সর্বপ্রথম বাঙ্গালী এবং সর্বপ্রথম উকীল। ইহাদের পরবর্ত্তী অর্থাৎ তৃতীয় দলের মধ্যে ছিলেন বেলঘরিয়া-নিবাসী স্বর্গীয় বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার ডি, ঘোষ। ইহারা সাগর ও জবলপুর প্রবাসী হন। ইহাদের পর মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালীর বাস ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

খৃঃ ১৮৮০ অব্দের পূর্বে থাণ্ডোয়ার আদালতে বাদী-

প্রতিবাদীর স্ব স্ব পক্ষ-সমর্থন ও সাক্ষ্যসাবুদ দ্বারা মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইত। লোকের ধারণা ছিল এখানে ওকালতি ব্যবসায় চলিবে না, থাণ্ডোয়ার উকীলের অল্প নাই। ১৮৮০ অব্দের ৭ই জাহুয়ারী শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখানে আসিয়া সে ধারণা ঘুচাইয়া স্বীয় কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার নিকট আমরা শুনিয়াছি, তিনি এখানে প্রথম বৎসরেই মাসিক চারিশত টাকা এবং পরবৎসরে মাসিক ছয়শত করিয়া উপার্জন আরম্ভ করেন।



শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে হুগলির গৌদাই-মালপাড়া গ্রামে নিতান্ত দরিদ্র পিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। যে-বংশে তাঁহার জন্ম, তাহা “অবসখী গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের বংশ” বলিয়া খ্যাত। অবসখী গঙ্গানারায়ণের সন্তানগণ দেশময় এক স্থান ত্যাগ করিয়া অন্তর প্রভ্রমণ করায় এই নামে

পরিচিত হন। তাঁহাদের মধ্যে ষাঁহার স্বামী বাস স্থাপন করিয়া “অবসরী” নাম লোপ করিয়াছেন, শ্রদ্ধাস্পদ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা ভবানীপুর ল্যান্ডভাউন রোডে ভদ্রাসন, খাণ্ডোয়া (মধ্যপ্রদেশ) ও ইন্দোরে (মধ্যভারত) প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্মাণ, এবং এই দুই প্রদেশেই ভূসম্পত্তি করিয়া, তাঁহাদের অন্ততম স্থান অধিকার করিয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত ঔপন্যাসিক স্বনামধন্য মনীষী বঙ্কিম-বাবুর প্রপিতামহ এবং হরিদাস-বাবুর প্রপিতামহ সহোদর ভাই ছিলেন। এই বংশে ষাঁহার পাশ্চাত্য-উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া কীষ্টি রাখিয়াছেন, বঙ্কিম-বাবু তাঁহাদের অগ্রদূত এবং স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আই-সি-এস মহাশয় তাঁহাদের অন্ততম।

হরিদাস-বাবুর পিতৃদেব স্বর্গীয় তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতায় শিপ-সরকারি করিয়া যে দশ পনের টাকা মাসে উপার্জন করিতেন, তাহাতে অতি কষ্টে সংসার প্রতিপালন করিয়া পুত্রকে মানুষ করিয়া ছিলেন। তিনি স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া কলিকাতার বাসায় সামান্তভাবে জীবনযাপন করিতেন, কারণ এই সামান্য আয়ে মালপাড়া হইতে পরিবারবর্গকে আনিয়া কলিকাতায় রাখিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। কিন্তু হরিদাস-বাবু পিতার একপ দৈন্য সত্ত্বেও আশ্রয়স্থল হুশিয়ার বঞ্চিত হন নাই। তিনি হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং প্রতিভাবান ছাত্র বলিয়া সর্বত্র আদৃত হন। তাঁহার সময় সাটক্রিক্ এবং পেড্ডলার সাহেব কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন এবং শিক্ষক ছিলেন স্বনামধন্য স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার। তাঁহার তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন। তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে অসমর্থ মেধাবী ছাত্রকে অল্প বেতনে ভর্তি করিয়া লইবার নিয়ম ছিল। এই অধিকারে হরিদাস-বাবু অল্পবেতনে উক্ত কলেজে অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রত্যেক পরীক্ষাই স্বনামের সহিত উত্তীর্ণ হন, এবং এম-এ পর্যন্ত বৃত্তি পান। তাঁহার গুরুভ্রাতৃদ্বয় নগেন্দ্র এবং বোগেন্দ্রনাথ সরকার, নাগপুরবাসী সার্ব বিপিনকৃষ্ণ বসুর সহোদর স্বর্গীয় নন্দকৃষ্ণ বসু, ভূতপূর্ব

‘সময়’-সম্পাদক বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এবং বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁহার সহপাঠী ছিলেন।

এম-এ পাশ করিবার পর বার্ষিক্যবশতঃ পিতা অসমর্থ হইয়া পড়িলে, হরিদাস-বাবুকে বাধ্য হইয়া কলেজ ত্যাগ করিয়া উপার্জনের চেষ্টা করিতে হয়। তিনি প্রাইভেট টিউশনী ও গবর্নমেন্টের পূর্ববিভাগে অল্পবেতনে চাকরি গ্রহণ করিয়া তাহাতেই কষ্টে-সুখে সংসার পরিচালন এবং আইন অধ্যয়নের ব্যয় নির্বাহ করিতে থাকেন। ১৮৭৮ অব্দে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সেই বৎসরই আলিপুর ও পরে পাবনায় ওকালতি আরম্ভ করেন। সেই সময় মধ্যপ্রদেশের আদালতে শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ বসু মহাশয় ওকালতি করিতেছিলেন। তখন নাগপুরে তাঁহার প্রসার খুব জমিয়া উঠিতেছিল। তাঁহার দিন দিন উন্নতি হইতেছে শুনিয়া হরিদাস-বাবু তাঁহাকে দেখিতে যান এবং তাঁহারই সাহায্যে মধ্যপ্রদেশে ওকালতি করিবার লাইসেন্স পান। বিপিন-বাবুই তাঁহাকে, যেখানে উকীল বেশী নাই এবং বাঙ্গালী নাই, সেইখানে গিয়া কার্যারম্ভ করিতে পরামর্শ দেন। তাহার পরামর্শ-মতে বাঙ্গালী-ও উকীল-হীন খাণ্ডোয়ায় গিয়া তিনি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাঁহার সঙ্গে যান নদীয়া কুড়ুলগাছির বিখ্যাত গাঙ্গুলী পরিবারের ৮ প্যারী-লাল গাঙ্গুলী মহাশয়। তিনি হরিদাস-বাবুর প্রবর্তিত জনহিতকর প্রত্যেক কার্যেই সহযোগিতা করিতেন এবং সম্পূর্ণ তাঁহার পথানুবর্তী হইয়া চলিতেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে হরিদাস-বাবু খাণ্ডোয়ায় আসিয়া অবধি ওকালতি ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি দেশের ৪০০ টাকা বেতনের কেরানীগিরি ত্যাগ করিয়া ৪০০ এবং শীঘ্রই ৬০০ টাকা মাসিক উপার্জন করিতে থাকিলে, তাঁহার সংসার-প্রতিপালনের চিন্তা দূর হয় এবং তাঁহার স্বাভাবিক সঙ্কল্পগুলি ক্ষুণ্ণি পাটতে থাকে। তিনি দেখিলেন খাণ্ডোয়া অতিশয় অল্পমত স্থান। ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহও তদ্রূপ। দেশীয় লোকের মধ্যে শিক্ষার অভাব এবং সামাজিক কুসংস্কার অতিশয় প্রবল। নাগপুর জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালীর সংস্রবে যদিবা শিক্ষার অবস্থা ও সংস্কারের অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে,

খাণ্ডওয়ার স্তায় স্থানসমূহের অধিবাসীবৃন্দ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন, আত্মোন্নতিতে উদাসীন, রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারে অনভিজ্ঞ এবং সমাজ-ও ধর্ম-সংস্কারী বহুবিধ কুসংস্কারের নিত্যশ্রবণ বশীভূত। খাণ্ডোয়ায় গবর্নমেন্ট-প্রতিষ্ঠিত একটি অতি ক্ষুদ্র মাধ্যমিক স্কুল ছাড়া ছেলেদের ও সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের আর কোনই অন্বেষণ নাই। দেশেব এইরূপ অবস্থা অনলোকন কবিয়া তিনি প্রথমেই একটি সাধাবণের পাঠাগারের প্রয়োজন বোধ করেন এবং অচিরেই একটি লাইব্রেরী স্থাপনে যত্নপর হন। এই কার্যে প্যাবীলাল গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁহার অদ্বিতীয় সহায় হন। তাঁহার প্রভূত ক্লেণ স্বীকার করিয়া সাধাবণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করেন এবং দেশীয় ও সাহেব-দিগের নিকট হইতে প্রায় চারি সহস্র টাকা প্রাপ্ত হন। মধ্য-প্রদেশের ভূতপূর্ব চীফ কমিশনার সাব্ব জন মবিস কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাতে ছিলেন। সর্বসাধারণের সহায়ভূতি আকর্ষণের জন্ত হরিদাস-বাবু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নাম দিলেন মরিস মেমোরিয়াল লাইব্রেরী। ইহাতে ইংরেজী হিন্দী ও অল্প উর্দু পুস্তক এবং সংবাদপত্র রক্ষিত হইল। এই সময় হইতে এখানে সাধারণের শিক্ষার সূত্রপাত হইল। অতঃপর এখানে স্কুলের শোচনীয় অভাব দূর করিবার জন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৯৫ অব্দে স্বকীয় ভবনে একটি হাই স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুলে প্রথমে তিনি এবং প্যাবীলাল-বাবু ছাত্রগণকে দেড় বৎসর কাল পড়াইতে থাকেন। ১৮৯২ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ও উপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের পুত্র ব্যারিষ্টার হেমেন্দ্রনাথ মিত্র খাণ্ডোয়ায় যান। তিনিও ইহাদের সহিত যোগ দিয়া স্কুলে শিক্ষকতা করিতে থাকেন। বলা বাহুল্য এই স্কুলের ষাবতীয় ব্যয় হরিদাস-বাবুই নির্বাহ করিতেন। ছাত্রগণ এই স্কুলে একরূপ সুন্দরভাবে শিক্ষা পাইতে থাকে যে প্রথম বৎসবেই ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং পর বৎসব হইতে এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় তাহার বেশ স্থানমেব সহিত উত্তীর্ণ হয়। এই বিদ্যালয়ের নামও বিস্তার লাভ

করে। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হরিদাস-বাবুর মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত কুহুমকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৮৯৮ অব্দে এখানে হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ এবং মধ্য-প্রদেশে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরীক্ষার ফলে সন্তুষ্ট হইয়া প্রাদেশিক গবর্নমেন্ট মাসিক ৩৮ টাকা সাহায্য দেন এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ইহাকে শাখা স্বরূপ পরিগ্রহণ করেন। মধ্য-প্রদেশের জেলায় জেলায় হাই স্কুল স্থাপনার ইহাই সূত্রপাত। এই সময় প্যাবীলাল গাঙ্গুলী মহাশয় এ প্রদেশের খেজুর-গাছ-পূর্ণ জঙ্গলগুলির প্রতি হরিদাস-বাবু দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হরিদাস-বাবু দেখিলেন সত্যই এতদঞ্চলে এত অধিক গাছ আছে যে তাহা হইতে রস লইয়া গুড় এবং চিনি প্রস্তুত করিতে পারিলে একটি বিস্তৃত ও প্রভূত লাভজনক ব্যবসায়ের পথ উন্মুক্ত হয়। এদেশের লোককে গুড় ও চিনি প্রস্তুত করিতে শিখাইতে পারিলে তাহার উপার্জনের একটি নূতন পথ পায় এবং এই শিল্পেব বিস্তাবে অল্প দিনের মধ্যেই আপনাদের দৈন্য ঘুচাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি পরীক্ষা-কার্য আরম্ভ করেন এবং পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়া এই বিষয়ে বিশেষভাবে আন্দোলন করিতে থাকেন। খেজুর-গাছ হইতে রস লইয়া এদেশে মদ তৈয়ারী করে বলিয়া এ ব্যবসায়ে দেশেব লোকের শ্রদ্ধাব অভাব এবং গবর্ন-মেন্টের উদাসীনতা দর্শন কবিয়া হরিদাস-বাবু বাঙ্গালীদের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার জন্ত আহ্বান করেন এবং অমৃতবাজার-পত্রিকা, বেঙ্গলী, বাঙ্গালী, সঞ্জীবনী, বহুমতী, হিতবাদী, প্রবাসী প্রভৃতি ইংরেজী ও বাঙ্গালী সংবাদ-ও সাময়িক-পত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। তিনি নিজেই এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত ১৮৯৩ হইতে ১৯১৮—১৯ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় বিশ পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ১৯০২ অব্দে ইন্দোর গবর্নমেন্ট ইন্দোরের তদানীন্তন ডিষ্ট্রিক্ট জজ্ এবং বর্তমান প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত কীর্ত্তনেব হাতে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া এই শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধে অল্প-সন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া গবর্নমেন্টকে রিপোর্ট পেশ করিতে বলেন। কীর্ত্তনে মহাশয় যদিও এ সম্বন্ধে খুব

অমুকুল রিপোর্ট দাখিল করেন এবং বলেন যে, এই ব্যবসায় গবর্ণমেন্টের যেমন লাভজনক হইবে দেশের লোকের তদ্রূপ আশু হিতকর হইবে, তথাপি মধ্য-ভারতীয় রেসিডেন্টের গবর্ণমেন্ট এবং দরবার তাহাতে উৎসাহ না দেওয়ায় হরিদাস-বাবু এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একাকী পড়িয়া যান। তিনি দেবাস (Dewas, C. I.), উজ্জৈন (Gwalior State) ও নাগপুরে (C.P.) এবং ১৯০৮-৯ অব্দে নাগপুরে মহাপ্রদর্শনীতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা দেখান কিরূপ রস হইতে গুড় এবং গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই উপলক্ষে হরিদাস-বাবু মধ্য-প্রদেশের জনসাধারণ ও গ্রামবাসীদের হিতার্থ একটি নূতন অংশিল্লের প্রথম পথপ্রদর্শক (Pioneer of a new industry for the benefit of the people and villagers of C.P.) বলিয়া ১৯০৯ অব্দে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট হইতে একটি বোঁপ্যপদক এবং প্রশংসাপত্র পাইয়াছিলেন। এই শিল্প-প্রবর্তনের জন্ত তিনি গবর্ণমেন্টকে অমুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেন্ট সে প্রস্তাব এখনও পর্যন্ত গ্রহণ করেন নাই।

তিনি মধ্য ভারতের সকল দরবারেই এই প্রস্তাব উপাধন করিয়াছেন, কিন্তু কেহই ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হয় নাই। ১৯২০ অব্দের ১৩ই জুলাই তিনি গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া “ভারতবর্ষীয় চিনি কমিশনে” সাক্ষ্য দান করেন। কিন্তু কমিশন থেঙ্গুর চিনিকে লাভজনক ব্যবসায় মনে করেন নাই। হরিদাস-বাবু অবশেষে পাঁচ লক্ষ টাকার লিমিটেড কোম্পানী করিয়া ইন্দোর রাজ্যে এক কৃষিক্ষেত্র ও ঘোঁষ কারুবাব প্রতিষ্ঠা করেন। এই ক্ষেত্রে এক হাজার বিঘা চাষের জমি ও পনের হাজার থেঙ্গুর গাছ আছে। তিনি এই কারুবাবে নাম দেন “Date and Cane-Sugar Company”। কিন্তু Date অর্থাৎ থেঙ্গুর এই নাম সংযুক্ত থাকায় এদেশবাসী ইহাতে ঘোঁষদানে বিরত হয়। এজন্ত তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা ইহাতে ফেলিয়া ইহার ম্যানেজিং এজেন্সী নিজের হাতে রাখিয়া এবং পুত্রগণের অনুরাগ ও কল্যাণ ইহার সহিত চিরজড়িত থাকিবে বলিয়া “হরিদাস চ্যাটার্জী এণ্ড কোম্পানী” এই নাম দিয়া

কারুবাব পরিচালন করিতেছেন। এক্ষণে উদ্যোগী ও কৃতকর্মী বাঙ্গালীরা যদি এই ঘোঁষ কোম্পানীতে ঘোঁষদান করেন তাহা হইলে সকলেই বেশ লাভবান হইতে পারেন এবং ইহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়। যখন এই অংশিল্ল-প্রবর্তনের কল্পনা মাত্র হইতেছিল সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দ হরিদাস-বাবুর গৃহে এক মাস অবস্থিতি করেন। স্বামিজী তাঁহাকে এই কার্যে নামিতে যথেষ্ট উৎসাহ দেন। স্বামিজীর ইংবেজী জীবন-চবিতের চতুর্থ ভাগে তাঁহারই জনৈক শিষ্য কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধে একথাও উল্লেখ দৃষ্ট হইবে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আজীবন যেমন এই কার্যে তাঁহার সময় শক্তি ও অর্থ নিয়োগ করিতেছেন, তিনি আশা করেন, বংশধরগণ এবং তাঁহার দেশবাসিগণ তাঁহাব এই চিরপোষিত আশা ফলবতী করিবেন।

খৃষ্টীয় ১৮৮৫ অব্দে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। ১৮৮৬ অব্দে হরিদাস-বাবু প্রথম ডেলিগেট হইয়া যান এবং তদবধি তিনি একজন পাকা কংগ্রেসওয়াল। থাকিয়া প্রতি বৎসর তাহাতে যোগ দিয়া আসিতেছেন। বার্লিকোর জন্ত তিনি এক্ষণে পরিশ্রমের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও জনহিতকর কার্য মাঝেই তাঁহার উৎসাহ এবং সহায়ভূতি কাহারও অপেক্ষা কম নহে। সাধারণ অসুস্থানাদিতে বক্তৃতা দেওয়া তাঁর খুবই অভ্যাস। তিনি খাণ্ডোয়া ও তাহার বাহিরে নানাস্থানে সামাজিক ও রাজনৈতিক বহু বক্তৃতা করিয়াছেন। ১৯১৭ অব্দে মধ্য-প্রদেশের ৬ষ্ঠ প্রাদেশিক কন্ফারেন্সে তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এবং তাহাতে যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দান করেন,—স্বায়ত্ত-শাসন, সর্বকারের দমননীতি ও শিক্ষা বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যে-সকল সার উক্তি করেন তাহা শাসকবর্গ ও দেশবাসী উভয়েরই প্রশিধানযোগ্য। তিনি বাধ্যতা-মূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন, ও উচ্চ নিম্ন সর্বশ্রেণীর ছাত্রগণকে তাহাদের দেশ-ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষাদানের পক্ষপাতী। দেশে শিক্ষা-প্রচারের এবং যুবকগণকে উচ্চশিক্ষা দানের জন্ত ষাহারা দেহ মন উৎসর্গ করিয়াছেন ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রদূত। প্রাদেশিক

সভায় তাঁহার বক্তৃতায় শিক্ষা সম্বন্ধে বহু মূল্যবান কথা আছে। তিনি শিক্ষার প্রতি প্রোত্বব্ধেব মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলেন—“Brother Delegates, the question of education is extremely important, and no time or space could be said to have been wasted over it.” তিনি উচ্চশিক্ষাব জন্ম নিজের প্রথম তিন পুত্রকে বিলাত পাঠান। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রাজকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি-এ, ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন। মধ্যম পুত্র কুশমকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি-এ, এ-এম, আই-সি-ই, এ-সি-এফ, কুপাসহিল কলেজ হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করিয়া বিহার প্রদেশের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছেন। তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায় বি-এস-সি (লণ্ডন), এ-এম, আই-ই-ই, ইলেকট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ার হইয়া আসিয়া বম্বে পাওয়ার হাউসের কর্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। হরিদাস-বাবু তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শিব-বাবুকে কৃষিবিদ agriculturist করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে খাণ্ডোয়ার স্থায়ী বসবাসী করিয়া কৃষিক্ষেত্রেব সকল ভার তাঁহার হস্তে স্তম্ভ করিয়াছেন। হরিদাসবাবু রাজ-নৈতিক বিষয়ে চরমপন্থী হইলেও একজন প্রকৃত রাজভক্ত প্রজা। খাণ্ডোয়া এবং শুদ্ধ খাণ্ডোয়া কেন, জব্বলপুর মো এবং ইন্দোবে তাঁহার অপ্রতিহত প্রসার ও প্রতিপত্তি। তিনি উকীল-সম্প্রদায়ের সম্মানিত নেতা এবং এতদঞ্চলে এই ব্যবসার পথপ্রদর্শক। মধ্য-প্রদেশের সর্বত্রই তাঁহার প্রখ্যাতি আছে। তিনি চরিত্রবলে এবং পরার্থপরতাদি-সঙ্গুণ-প্রভাবে রাজপুরুষ এবং দেশ-বাসী জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। তিনি যে এদেশে জনপ্রিয় এবং প্রজামিত্র বলিয়া স্বীকৃত তাহার নিদর্শন স্বরূপ আমরা তাঁহাকে হোলকাব রাজ্যের প্রজাপরিষদের সভাপতির আসনে দেখিতে পাই।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহিত্যিক প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়। এ পর্য্যন্ত তিনি যে-সকল বক্তৃতা দান করিয়াছেন

তৎসমুদয় সংগ্রহ করিলে প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া যায়। এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি তাঁহার Law of Legal Necessities and Obligation নামক গ্রন্থেব দ্বিতীয় সংস্করণ করিয়াছেন। উহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ঐ পুস্তক প্রণয়ন কবিয়া— তিনি বশস্বী হইয়াছেন। পুস্তকখানি নমস্ত আদালতে আদৃত হইয়াছে। তিনি হিন্দু আইন বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থখানি তাহারই সফল। বহু বৎসবেব প্রবাসবাসে থাকিয়াও তিনি মাতৃভাষা ভুলেন নাই। তিনি বঙ্গের বিবিধ সাময়িক ও সংবাদ পত্রে ভুরি ভুরি প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যেব অঙ্গ পুষ্ট কবিয়াছেন। গত দশ বৎসব হইতে তিনি পবিচিত বা অপরিচিত উচ্চশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রকেই পত্র লিখিতে মাতৃভাষাই ব্যবহার কবিতেছেন।

খাণ্ডোয়াব তাঁহার ভবন দেশ- বা বিদেশ-আগত বাঙ্গালী-মাত্রেরই একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল। এক্ষণে খাণ্ডোয়ার পাঁচ ঘরে প্রায় জন-কুড়ি বাঙ্গালীর বাস হইয়াছে। হরিদাস-বাবুর গৃহে প্রধান প্রধান আইনব্যবসায়ীগণ মধ্যে মধ্যে আতিথ্য গ্রহণ কবিয়া থাকেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রায়ই ইহার আলয়ে আগমন করিয়া আনন্দিত হইতেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহযোগী ও খাণ্ডোয়া-যাত্রায় প্রথম সঙ্গী প্যারীলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ১৯২২ অব্দে মার্চ মাসে তাঁহার কর্মক্ষেত্র খাণ্ডোয়ায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক খাণ্ডোয়াবাসী আর-একজন বাঙ্গালীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি কাশীনিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র গাঙ্গুলি। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় মির্জাট হইতে বদলি হইয়া খাণ্ডোয়ায় জেলা জজ হইয়া আসেন। তাঁহার আগমন হইতে খাণ্ডোয়ায় ৬ কালীব পূজা আরম্ভ হয়। মাধব-বাবু কালীব মণ্ডল-মুষ্টি গঠিত কবিয়া প্যারীলাল-বাবুর গৃহে পূজা করেন। সেই সময়েই স্বামী বিবেকানন্দ হরিদাস-বাবুর গৃহে অবস্থিতি করিতে ছিলেন।

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

কবিতা পাঠ্য



গান

এই সকাল বেলাব বাদল-আঁধারে
আজি বনের বীণাষ কি সুব বাঁধা বে।
ঝব ঝব বৃষ্টি কলরোলে
তালের পাতা মুখর কবে' তোলে,
উতল হাওয়া বেগুনাখা লাগাষ ধাঁধা বে।
ছায়াব তলে তলে জলের ধাঁধা ঐ
হের দলে দলে নাচে তটৈ ধৈ।
মন যে আমার পথ-হারানো হরে
সকল আকাশ বেড়ায় ঘুবে ঘুবে,
শোনে ঘন কোন ব্যাকুলের কণক কীদা বে।

২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

শ্রী ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

এস এস হে তৃষ্ণার জল,
ভেদ কবি কঠিনের ক্রুব বক্ষতল
কল কল ছল ছল।

এস এস ঐশ্বর্য শ্রোতে
গুচ অন্ধকার হ'তে
এস হে নির্দল,
কল কল ছল ছল।

বরিকব বহে তব প্রতীক্ষা
তুমি যে খেলাব সাধী সে তোমাতে চায়।
তাহাবি সোনার তান
তোমাতে আঁগাষ গান,
এস হে উন্মুল,
কল কল ছল ছল।
ইকিছে অশান্ত বাষ
“আষ, আষ, আষ”, সে তোমাষ খুঁজে যাষ।
তাহাব মুদ্র রবে
কবতালি দিতে হবে,
এস হে চঞ্চল,
কল কল ছল ছল।

মরুদৈত্য কোন মায়াবলে
তোমাতে কবেছে বন্দী পাঁচাণ শৃঙ্খলে।
ভেঙে বেলে দিয়ে কাবা
এস বন্ধহীন ধাবা,
এস হে প্রবল,
কল কল ছল ছল।

৪ বৈশাখ, ১৩২৯

(শান্তিনিকেতন পত্রিকা, আষাঢ়) শ্রী ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দাঁতের কথা

“দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্যাদা বুঝা যায় না”। দাঁত এক বকম
হাড় বিশেষ। হাড়ে প্রধানতঃ দুইটি জিনিষ আছে—লবণ ও জিলেটিন।
জিলেটিনের সঙ্গে যদি চূণ-জাতীয় পদার্থ যথেষ্ট না থাকে, তবে হাড়
তেমন শক্ত হয় না। যে শিশুর হাড় শক্ত হয় না, অল্প বয়স হইতেই
তাহারিগের পা বাঁকিয়া যায। আবার, যে কাবণে শিশুদিগের হাড়
শক্ত হয় না (অর্থাৎ বস্তু চূণ জাতীয় পদার্থ কম হইলে), সেই
কাবণেই সেই-সেই শিশুর দাঁত তেমন মজবুত হইতে পায় না।
কাজেই, গর্ভকালীন মাতার স্বাস্থ্য ও খাদ্যাভ্যাসের উপরে জন্মের বা
ভবিষ্যৎ বালকের দাঁতের হিতাহিত নির্ভব করে।

দাঁত ভাল রাখিবার উপায়

প্রথম কথা।—যদি ভাল (সুস্থ, সবল, হৃদয় ও দীর্ঘকালস্থায়ী)
দাঁত পাইতে চাও, তবে গর্ভবতী ও গুস্তদাত্রী মাতার আহারের দিকে
দৃষ্টি রাখিবে।

দ্বিতীয় কথা।—যদি দাঁত ভাল কবিয়া রাখিতে চাও, তবে কখনো
মুখ দিয়া নিঃশ্বাস ফেলিও না।

তৃতীয় কথা।—দাঁতকে সুস্থ রাখিতে হইলে, প্রত্যহ এবং প্রত্যেক
মুহুর্ত্তে দাঁতকে পরিষ্কার রাখা চাই। প্রাতে শয্যাভ্যাগের পব একবার
এবং বাত্রে নিজা ঘাইবার ঠিক পূর্বেই আবার একবার সকলেরই
বীতিমত দাঁত মাজা উচিত। ইহা ছাড়া অতি সামান্য কিছু খাইলেও,
তৎক্ষণাৎ এবং পানহুপাবি ঝাইবার পবেও খুব ভাল কবিয়া
‘কুলকুচি’ কবিয়া মুখ ধোওয়া উচিত। দাঁত পরিষ্কার রাখিবার
আব একটু উৎকৃষ্ট উপায়—প্রত্যেক গ্রাস খুব ভাল কবিয়া চর্বণ করা।

চতুর্থ কথা।—মুখ যেন কখনো টকিয়া না যায়। আহাবেব এতটুকুও
কণা মুখে থাকিলে, তাহা হইতেই সেখানে অম্লবস উৎপন্ন হয়।
দাঁতের পাঁথবের মত এনামেলে এই অম্লবস লাগিলেই এনামেল ক্ষয়
হইতে থাকে। পান বা মুখশুদ্ধি ব্যবহার করিলে, মুখে প্রচুর ক্ষাব-
ধর্মী লালা ক্ষয়িত হয়—তাহার ফলে মুখ কুলকুচি কবাব কাজ হয়
বলিবা। মুখশুদ্ধি এত আবাব। কিন্তু যে মুখশুদ্ধিই ব্যবহার কব না
কেন, উহা ব্যবহারেব পবেই মুখ বেশ কবিয়া দুইয়া ফেলা চাই।

পঞ্চম কথা।—মুখে জীবাণুব চাষ আবাব করিও না। দাঁত ও
মাড়ি—এই দুইয়ের ফাঁক দিয়া অথবা দাঁতের পাঁথবের মত এনামেলের
গা ভেদ কবিয়া যদি কোনও জীবাণু প্রবেশ কবে, তবে সে কি-কি
কবিতো পাবে?

(১) দাঁত ও দাঁতের মাড়ির মাঝে পুঁথ নির্গত হওয়া। (২)
দাঁতের পাঁথবের ভিতরে কন্কনানি সৃষ্টি করা। (৩) দাঁতের শাঁস
ভেদ কবিয়া, চোষালের যে গর্তে দাঁতটি বসান আছে, সেখানে পুঁথ
সৃষ্টি কবিয়া, দাঁতের গোড়াষ ফোটক উৎপাদন করা। (৪) অল্প
অল্প কবিয়া জীবাণুপ্রাণ বিধ দাঁতের শাঁসেব অসিকা শিবা দ্বাৰা
সমস্ত সেহে ছড়াইয়া পড়া।

আমাদিগের কর্তব্য

প্রথম কর্তব্য।—দাঁত পবিত্র রাখিবে। দাঁতের সকল পিঠই ঘষিবা মাজিবে—যতবার কিছু খাইবে ততবার সযত্নে মুখ ধুইবে। পান, দোস্তা, “হুখা”, “ধৈনি”, জবদা, সুস্থি প্রভৃতি ত্যাগ করিবে।

দ্বিতীয় কর্তব্য।—খুব নবম কোন জিনিষ প্রত্যহ খাইবে না। হুপাখি, চাল-কড়াই প্রভৃতি চিবানব অভ্যাস রাখিবে।

তৃতীয় কর্তব্য।—মিষ্টান্ন কম খাইবে। খাইয়াই খুব ভাল করিয়া মুখ ধুইবে।

চতুর্থ কর্তব্য।—সময়ে, সহজপাচ, হুখাচ্ছ খাইবে; পরিশ্রম সীতিমত করিবে; মুস্ত বায়ু নিত্য সেবন করিবে—অর্থাৎ সর্বদা শরীর-পালনে যত্নবান হইবে।

পঞ্চম কর্তব্য।—কখনো মুখ হাঁ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিবে না।

ষষ্ঠ কর্তব্য।—দাঁতের কোথাও ব্যথা হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহার চিকিৎসা করাইবে। টিচার আইয়োডিন করে কণ্ঠটা জলে গুলিয়া কুল্লি করিলে, এবং যে দাঁতে ব্যথা, সেই দাঁতের যেখানে কাল দাগ হইয়াছে সেইখানে, দাঁত ও মাড়ির সংযোগ স্থলে, এই দুই জায়গায় টিচার আইয়োডিন লাগাইলে, অনেক সময়ে অতি সহজেই দাঁতের বোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। এই ঔষধ ছ-দশ ফোঁটা পেটে গেলেও কোন অনিষ্ট হয় না।

কচি ছেলেবা অতি ভয় বয়ন হইতেই দাঁত মাজিতে আবস্ত করিবে। যাহাদের অত্যন্ত মিষ্ট খাওয়া, অভ্যাস, তাহাদিগকে মাঝে মাঝে বা প্রত্যহ সোডা বাই-কার্বনেটের কুল্লি করাইলে বেশ হকল পাওয়া যায়। পান, দোস্তা, চুকাট ও তামাকে—দাঁতের শূলব্যথায় সামান্য উপকার হইলেও আধেবে তাহাদের দ্বাৰা দাঁতের অপকারই বেশী হইয়া থাকে।

(স্বাস্থ্যসমাচার, আষাঢ়)

শ্রী রমেশচন্দ্র রায়

গান

বহুগুণের ওপাখ থেকে

আষাঢ় এল আমার মনে।

কোন সে কবির হৃদয় বাজে

স্ব-স্ব বরিষণে।

যে মিলনের মালাগুলি

ধূলার মিণে হল ধূলি,

গন্ধ তাবি ভেসে আসে

আজি সম্রাট সমীরণে।

সেদিন এমনি মেঘের ঘটা

বেবানদীর্ঘ জীব,

এমনি বাধি ঝরেছিল

শ্রামল শৈলশিবে।

মালবিকা অনিমিষে

চেয়েছিল পথের দিকে,

সেই চাহনি এল ভেসে

কাল মেঘের ছায়াব সনে।

বহুগুণের ওপাখ থেকে

আষাঢ় এল আমার মনে।

(অলকা, আষাঢ়)

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিল্পের সচলতা ও অচলতা

ছবি কবিতা অভিনয় ঘাই বল সেটা চলো কি না এই নিয়ে কথা। মন দিয়ে লেখা তীরের মত সোজা হুজি চল ; ভাবকেও গতি দেই পরিস্ফুটাব দিকে মানুষের অন্তর বা মনের গুণ। মনে যেখানে ছবি কি ছাপ পবিত্র নই সেখানে ছবির রেখাপাত বর্ণবিশ্বাস সমস্তের মধ্যে একটা আবলা আলস্ত অক্ষুটতা আমরা দেখতে পাই ; কবিতার বেলায়ও এটা দেখি কথার মধ্যে যেন কোঁক নেই, কিমিবে আছে, আবোল তাবোল বকে' চলেছে ভাষা।

যদি আর্টিষ্টের মনের হাতে পড়ে' চলিত ভাষাও বিনা সাধুভাষার সাহায্যেই হৃদয়বভাবে চলতে পারে, তবে কালীঘাটের পটের ভাষাকে চলতি বলে তুচ্ছ করা তো যায় না—আর্টিষ্টের হাতে এই পটের ভাষা যে-হৃদয় হয়ে উঠতে পারে না তা কেমন কবে' বলা যায়? জাপানের প্রসিদ্ধ চিত্রকর হকুসাই এই পটের ভাষাতে যে চমৎকার চিত্রনব লিখে গেছেন তা আশ্চর্যের ইউরোপ দেখে অবাক হচ্ছে! তাই বলি, যে ভাষাই ব্যবহার করি না কেন, মনের হাতে তার লাগাম না তুলে দিয়ে তাকে চালিয়ে যাওয়া শক্ত। শব্দ স্বর হ্রস্ব, ব্যাক্য রূপ ইকিত-ভঙ্গী—এরা ভাষাকে চালাবার, মনকে বেঁধবার, মহাজ্ঞ বটে, কিন্তু মনের হাতে এগুলো তুলে দেওয়া তো চাই!

খালি ক্রিয়াপদ দিয়ে কখন পদ্য লেখা যায় না, কিন্তু এই ক্রিয়াপদ ছবিতে মুষ্টিতে অভিনয়ে চেব বেশি কাজ কবে, কিন্তু এর সয্যবহার খুব পাকা। আর্টিষ্টের দ্বারা ই সম্ভব। রাফেলএর মুখ পুবোনো ইতালীর আর্টিষ্টরা ছবিতে বাবু বইছে দেখাতে হলে আগে আগে—ছবির আকাশ-পটে গোটা কতক গালফুলো ছেলে কুঁড়িয়ে ঝাঁটা ব মতো খানিক ঝড়, কি দক্ষিণ হাওয়া বইয়ে দিচ্ছে এইটে আঁকতো, কিন্তু বাবুর যথার্থ রূপ এমন চালাকি দিয়ে ধরা না-ধরা সমান, ওটা ছেলেমানুষি ছাড়া কিছু নয়। ভাবত-শিল্পের বাবু-দেবতার মুষ্টি তাও আমাদের ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণের মতোই ছেলেমানুষি পুতুল মাত্র। একই মুষ্টি, একই হাবভাব, ভাবনার ভাবতম্য নেই! দেবমুষ্টিগুলো তেজিল কোটি হলেও একই ছাঁচে একই ভঙ্গীতে প্রাণবশ: গড়া, তারতম্য হচ্ছে শুধু বাহন মূল্য ইত্যাদি। একই মুষ্টি যখন গরুর উপরে তখন হলেন বিষ্ণু, সাতটা ঘোড়া জুড়ে দিয়ে হলেন সূর্য। একই দেবীমুষ্টি মকবে চড়া হলেই হলেন তিনি গঙ্গা, কচ্ছপে বসিয়ে হলেন যমুন। বেদের ইন্দ্র চন্দ্র বাবু বরুণের রূপ-কল্পনার মধ্যে যে রকম বকম ভাবনার ও মহিমা পার্থক্য; গ্রীক মুষ্টি আপোলো, ভিনাস, জুপিটার, জুনো ইত্যাদি মুষ্টির মধ্যে যে ভাবনাগত তারতম্য;—তা ভাবতের লক্ষণাক্রান্ত মুষ্টিসমূহে অল্পই দেখা যায়। একই মুষ্টিতে একটু আস্তাব রং আসন বাহন বদলে বকম বকম দেবতার রূপ দেওয়া হয়ে থাকে। বাবু আব বরুণ, জল আর বাতাস,—ছোট এক নব, চুরের ভাষা ও ভাবনা এক হতে পাবে না। এ পর্যন্ত একজন গ্রীক ভাস্কর ছাড়া আব কেউ বায়ুকে হৃদয় কবে' পাথরের বেখার ধবেছে বলে' আমার জানা নেই।

সারথির মানস রাসের মধ্যে দিয়ে যেমন ঘোড়াতে গিয়ে পৌছয়, তেমনি মনের ভাবনার সামান্য ইঙ্গিত ভাষার মধ্যে গিয়ে চলাচল কবে, তা সে ছবিব ভাষা কবিতা ভাষা বা অভিনেতার কি গায়ক বা নর্তকের ভাষা যে ভাষাই হোক। “The art of Painting (নিরূপণ ও বর্ণন শিল্প সমস্তই) is perhaps the most indiscreet of all arts”—বাচন করা চলে চেকে চুকে আসল মনোভাব গোপন রেখে, কিন্তু বর্ণন করা চলে না সে ভাবে। কথার বেটুকু বা বাচন কব্বার কাক আছে, ছবির তাও নেই—ছবির বর্ণন, নয় মিথ্যা বর্ণন, দুই

রাস্তা ছাড়া ছবির গতি নেই। তেমনি মন যেখানে নেই, কথা সেখানে থেকেও নেই। মনে বেদন এল, নিবেদন হ'ল তবে ছবিতে কবিতার নাট্য। মন কার নেই? কিন্তু মনের কথা শুহিরে বলার ক্ষমতা যার-তার নেই এটা ঠিক। ছাত্র পরীক্ষার দিনে খুব মনের আবেগ ও মনঃসংযোগ দিয়ে লিখেছে—সে মন এক, আব সেই ছাত্রই দেশে গিয়ে বাত্মা জুড়েছে, কি মাঠে বসে' মন দিয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে—সে মন অস্ত্র প্রকার। তেমনি সাধারণ মন, আব রসায়িত মন, কবির মন আর্টস্টের মন আর তাদের হৃকোবদ্ব্যয়ের মন ও মনের আবেগে তকাং আছে। খুব খানিক মনের আবেগ নিয়ে লিখে কিছা বলে' করে' চল্লই কবি চিত্রকাব অভিনেতা হয় না। অভিনেতা যদি অত্যন্ত মনের আবেগে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো রুদ্রমুর্ছিতে বেরিয়ে সত্যিই দ্বিতীয় অভিনেত্রী গলা কেটে বসে, তবে তাকে নট কলবে, না পাগল মুখ এসব সম্বোধন করবে দর্শকরা? কিছা দূর্শকদের মধ্যে রঙ্গমঞ্চের নাচে মুগ্ধ হয়ে কেউ যদি হঠাৎ কোমর বেঁধে নানা অঙ্গভঙ্গী মনের আবেগে হরু করে' দেয় তবে তাকে নটরাজ বলে' ডাকে কেউ? অভিনেত্রী বেশ ভাল লয় হরু দিয়ে কেঁদে চলছে, হঠাৎ উপবের বস্ত্র থেকে আবেগভরে ছেলে কাঁদা ও ঘুমপাড়ানো হরু হ'ল, তার বেলায় জ্যোতার ধাক্কে ওঠে কেন ছেলেকে ও ছেলের মাকে?—মনের আবেগ তো ধখেই সেখানে ভাষা প্রকাশ হচ্ছিল, কিন্তু আর্ট বলে তো চল্ল না সেটা? তবেই দেখ, শিল্পের অমুকুল মনের পরশ আর তাব প্রতিফল—এই দুবকম মনের পরশ রয়েছে। মালী যেমন বেছে বেছে ফুল নেয়, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফুলের তোড়া ফুলেব হার পাঁখে, শিল্পীর মনের পরশ ঠিক সেই ভাবে কাজ করে' যার বাক্য রং বেধা ভঙ্গী ইত্যাদিকে ভাবে হুয়ে ধরে' ধরে'। নিছক আবেগেব উচ্ছৃঙ্খলা আছে, সংযম নির্বাকচন এসব নেই। ছেলে-কাঁদার ঠিক উল্টো যে পাকা নটীর কান্নাব হরু, কৃত্রিম হরে হলেও সেটা মনোদ্রম হয় শিল্পীর বর্ণনভঙ্গী নির্বাকচন ইত্যাদি নিয়ে। বাপের মতো শুধু খানিক আবেগের সঞ্চয় নিয়ে ছবি বল আর লেখাই বল শিল্প বলে' চলে না।

কাঁচা অভিনেতা Realism এর পথে গিয়ে নাটকের বিষয়টাকে তর্জন পর্জন করে' যেন দর্শকের নাকের উপরে ছুঁড়ে কেলে' দিতে চলে, আর পাকা অভিনেতা শিল্পীর সংযম নিয়ে সেই বিষয়টাই দিয়ে যার অখচ ফল হয় তাতে বেশি দর্শকের উপরে। এইজন্তই ছবির বলেছেন বাক্যকে মনের সঙ্গে যুক্ত কর বা 'কায়েন মনসা বাচা' ছবি লেখ, কথা বল, অভিনয় কর, সাফল্য লাভ করতে বিলম্ব হবে না। কথা তো বলতে পারে সবাই, চলেও সবাই রঙ্গে ভজে, ছবিও লেখে অনেকে; কিন্তু ভাষাকে পায় না সবাই।

ছবিতে কেবলি দেখা ও ভোগ করার রাজত্ব থেকে কথা ও ভাষার কোঠায় টেনে আনার সম্বন্ধে সবার মত হবে না। তাঁরা বলেন—কথা বল, কবিতা বল, উপকথা বল, তার তো স্বতন্ত্র রাস্তা, art-বর্ণমালায় পুস্তক, নীতিশাস্ত্র কিছা কথামালা হতে বাধ্য নয়, একে সৌন্দর্য ও তাব অমুভূতির রাস্তাতে চালানোই ঠিক। এ কথা মান্তেন যদি রূপেব জগতে এমন বিশেষ পদার্থ একটা থাকতো যে নির্বাক নিশ্চল। বিনু সে বলে আমি চোখের জল, শিশির-কোঁটা, কত কি। যত্না সেও বলে আমি এই দেখ চলছি আর কিরবো না, পত্নীবা সাঙ্ঘনা আমি, নিরাকণ আমি, সক্রপণ আমি। ফুলেব সঙ্গে ফুলদানিটাও যদি কথা না কইতো তবে কি তারা মানুষের মনে ধরতো? নির্বাক যে সেও ইঙ্গিতে বলে—আমি বলতে পারছি মন কি করছে। অবোধ বাবা তারাই কেবল বাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন এক অজুত আর্টের কল্পনাজাল বুনে বুনে

নিজেকে ও নিজের শিল্পকে গুটির মধ্যে গুটিপোকাকার মতো বদ্ধ করে' রাখতে চায়। শিল্প বে আনন্দ দেয় সেই আনন্দই তার ভাষা—আনন্দ-কাকলী, আনন্দের দোলা—

“কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ

বিবারাজি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ”

মহাশূন্য—তার নিজের বাক্য দিয়ে সেও পরিপূর্ণ রয়েছে।

চটক্ এবং চাকচিক্যময় ক্ষণিক পদার্থটাব উপভোগের অনিত্যতার উপবে, কিছা ক্ষণিক ক্রতিস্থখ দৃষ্টিস্থখ ইত্যাদির উপবে শিল্প-রচনার ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করলে বাণীকে নামিয়ে দেওয়া হয় আকাশ থেকে বসাতলে।

চতুরশীতি লক্ষ জন্মেব তপস্তালক জীবনটা নিয়েই মানুষ যখন জিনিমিনি খেলে বেড়াচ্ছে তখন যুগ-যুগান্তরের তপস্তা দিয়ে কত মহৎ জীবনের ব্যর্থতার ছঃখ থেকে সার্থকতার আনন্দ দিার লাভ করা ভাবাসমূহকে নিয়ে মানুষ যে নয় ছয় করে' খেলা করবে তার বাধা কি? শিল্পরাপিনী হুম্মরী ভাষাকে পেতে তপস্তার ছঃখ আছে—
“Art interprets the mightier speech of nature. It is a poetical language, for it is an utterance of the imagination addressed to the imagination and to rouse emotion.”—(Gilbert.)

অন্যহতের ধ্বনি ব্যক্ত কবে যে ভাষা, অল্পের ইঙ্গিত ও রূপ দর্শন করার যে ভাষা, নিশ্চল নির্বাক পাষাণকে চলায় বলার যে ভাষা, তাকে বিনা সাধনায় মনে করলেই কি কেউ পেরে থাকে? ভাষার তপস্যায় বলীরান মানুষ পাখবের কারাগাব থেকে বার করে' নিয়ে এল যে ভাষাকে চিবহৃদায়রী রসেব নির্বাকী—তারি চতুঃষষ্টি ধারা হল—কথা, ছবি, মূর্তি, নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি কলা বিদ্যা।
(বঙ্গবাণী, শ্রাবণ) শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পঁচিশে বৈশাখ

রাজি হ'ল ভোর।

আজি ঘোর

জন্মের অরপপূর্ণ বাণী,

প্রভাতেব বোধে লেখা লিপিখানি

হাতে করে' আমি,

ধারে আসি দিল ডাক

পঁচিশে বৈশাখ।

দিগন্তে আবস্ত রবি;

অরণ্যেব ঘান ছাত্রা বাজে যেন বিবর ভৈরবী।

শাল তাল শিরীষেব মিলিত মর্দরে

বনান্তের ধ্যানভঙ্গ কবে।

বস্ত্র পথ শুষ্ক মাঠে,

যেন তিলকেব রেখা সম্ভারীর উদ্যাব ললাটে।

এই দিন বৎসরে বৎসবে

নানা বেশে আসে ধরণীর পরে,—

আতাত্র আত্মের বনে ক্ষেপে ক্ষেপে মাড়া দিয়ে,

তরুণ তালেব শুচ্ছে নাড়া দিয়ে,

মধ্যদিনে অকস্মাৎ শুষ্কপড়ে তাড়া দিয়ে,

কখনো বা আপনাতে ছাড়া দিয়ে

কাল-বৈশাখীর মস্ত মেঘে
বন্ধহীন বেগে ।
আব সে একান্তে আসে
মোব পাশে
পীত-উত্তরীয়-তলে লয়ে মোব প্রাণ-দেবতার
স্বহস্তে সজ্জিত উপহাব
নীলকান্ত আকাশেব ধালা,
তাঁবি পবে ভুবনেব উজ্জলিত স্রাব পেয়ালা ।

এই দিন এল আজ প্রাতে
যে অনন্ত সমুদ্রের শব্দ নিরে হাতে,
তাহাব নির্দোষ বাজে
ঘন ঘন মোব বক্ষোমার্কে ।
জন্ম-মরণেব
দিবলয়-চক্ররেখা জীবনেব দিয়েছিল ঘের,
সে আজি মিলালো ।
শুভ্র আলো
কালের বাঁশরী হ'তে উজ্জ্বলি যেন বে
শুভ্র দিল ভরে' ।

আলোকের অসীম সজ্জীতে
চিত্ত মোব ঝঙ্কারিছে হবে হবে রণিত তন্ত্রীতে ।
উদয়-দিক্-প্রান্ত-তলে নেমে এগে
শান্ত হেসে
এই দিন বলে আজি নোর কানে,
“অমান নূতন হবে আগন্তোর মাঝখানে
একদিন তুমি এসেছিলে
এ নিখিলে
নব মল্লিকার গন্ধে,
সপ্তপর্ণ-পল্লবের পবন-হিলোল-বোল ছন্দে,
শ্রামলের বৃকে
নির্নিমেব নীলিমার নয়ন-সমুখে ।
সেই যে নূতন তুমি,
তোমাতে ললিচি চুমি’
এসেছি জাগাতে
বৈশাখের উদ্দীপ্ত প্রভাতে ।

হে নূতন,
দেখা দিক্ আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ ।
আচ্ছন্ন করেছে তারে আজি
গীর্ণ নিমেঘের যত বুলিকীর্ণ জীর্ণ পত্রবাজি ।
মনে রেখো, হে নবীন,
তোমাব প্রথম জন্মদিন
ক্ষয়হীন ;—
যেমন প্রথম জন্ম নিকরৈব প্রতি পলে পলে ;
তরঙ্গে তবঙ্গে সিন্ধু যেমন উছলে
প্রতিক্ষেপে
প্রথম জীবনে ।
হে নূতন,
হোক্ তব আগরণ
ভঙ্গ হতে দীপ্ত হতাশন ।

হে নূতন,
তোমাব প্রকাশ হোক্ কুজ্-কটিকা করি উদ্ঘাটন
স্বর্ঘ্যের মতন ।
বসন্তের জয়ধ্বজা ধবি’,
শুভ্র পাখে কিশলয় মুহূর্তে অরণ্য দেয় ভবি’—
সেই মত, হে নূতন,
রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে কর উন্মোচন ।
ব্যস্ত হোক্ জীবনের জয়,
ব্যস্ত হোক্, তোমা মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিশ্বাস ।”

উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্র শব্দ বাজে ।
মোব চিত্ত-মাঝে
চির-নূতনেরে দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ ।
(সবুজপত্র, চৈত্র-বৈশাখ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলার নবযুগের কথা

ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মানন্দ

বাংলার নবযুগের মূলমন্ত্র স্বাধীনতা ও মানবতা । ব্রাহ্ম-সমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্মসাধনের ক্ষেত্রেই এই স্বাধীনতা ও মানবতা আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, জীবনের সকল বিভাগে সর্বতোভাবে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যান নাই । এ কাজটা কবেন কেশবচন্দ্র । এইজন্তই বাংলাব নবযুগের ইতিহাসে কেশবচন্দ্র একটা অতি উচ্চ-স্থান অধিকার কবিয়া আছেন । ইংরেজী শিক্ষা যে ব্যক্তিগতজীব্য আদর্শ জাগাইয়া তুলে, কেশবচন্দ্র তাহারই মধ্যে একটা প্রবল ধর্মের প্রেরণা সঞ্চারিত করেন । আমাদের নবাসমাজে ইংরেজী শিক্ষা ও যুরোপীয় সাধনাব সম্পর্কে যে স্বাধীনতার আদর্শ ফুটিয়াছিল, তাহাব মধ্যে ধর্মের প্রেরণা সঞ্চার কবিয়া কেশবচন্দ্রই বিশেষভাবে একটা অসাধারণ ত্যাগের শক্তি জাগাইয়া তুলেন । এই ত্যাগের ভাবাই বাংলাব নবযুগের সাধনা মণীষনী হইয়া আছে । ইংরেজী শিক্ষা ও ইংবেজী শাসনের ফলে আমাদের প্রথম যুগে ইংবেজীনবীণদিগের মতি-পতি নিতান্ত উচ্ছ্বাস হইয়া উঠে ; এবং ইহাবা স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনাব প্রতি অন্ধাশুস্ত হইয়া বিদেশী সভ্যতা ও সাধনাব দিকে ছুটিতে আবিস্ত করেন । মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইহাদের মতি-পতিকে সংযত কবিয়া কিয়ৎপরিমাণে স্বদেশাভিমুখীন করেন । বাংলাব নবযুগের ইতিহাসে ইহাই মহর্ষিব প্রধান কীর্তি । মহর্ষির প্রকৃতিব মধ্যে একদিকে যেমন একটা বলবতী আন্তরিক্য-বুদ্ধি ছিল, অন্যদিকে সেইরূপ একটা দুর্জয় বর্ণশীলতাও ছিল ।

কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে মহর্ষি নানাদিক দিয়া তাহাব প্রকৃতিনিহিত রক্ষণশীলতার বাঁধনকে পর্যাপ্ত আলগা কবিয়া দেন । তখন পর্যাপ্ত আদি ব্রাহ্ম-সমাজের বেদীতে ব্রাহ্মণ ছাড়া আব কাহাবও বসিবাব অধিকার ছিল না । কেশবচন্দ্রের প্রতিভা ও গুণে মোহিত হইয়া মহর্ষি ইহাকে ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্যপদে বরণ করেন । কিন্তু মহর্ষির সঙ্গে কেশবচন্দ্রের এই প্রগড় স্নেহের সম্বন্ধ সবেও উভয়ের মধ্যে ক্রমে গুরুতব মতভেদ দাঁড়াইয়া পেল । মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজকে কেবল একটা ধর্মসাধনের কেন্দ্র করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সমাজে কোনও প্রকারের সাংঘাতিক বিপ্লব আনয়ন কবিতে চাহেন

নাই। কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার অমুচবেণা জীবনের সকল বিভাগে এই নূতন সাধনকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ইঁহার সকলের আগে প্রচলিত জাতিভেদ তুলিয়া দিতে চান। জাতিভেদেব চিহ্নধারণ উপবীতধারণ এই সংস্কৃত ধর্মের বিবোধী বলিয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ উপবীত পরিত্যাগ কবিত্তে আরম্ভ কবেন।

এইসকল আলোচনাব ফলে দলে দলে ব্রাহ্ম যুবকেরা প্রাচীন সমাজের সঙ্গে সকল প্রকারের সম্বন্ধ কাটতে আরম্ভ করিলেন। অনেকে পরিবার পবিত্রন এবং বিষয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া গৃহেব ভিত্তি হইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা অশেষ প্রকারের পারিবারিক নিষ্ঠাতন সম্বন্ধ কবিত্তে আব্রম্ভ কবিলেন। এতদিন পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ কেবল ব্যক্তিগত ভাবেই ব্রাহ্মোপাসনা কবিত্তেছিলেন। এখন অদম্য উৎসাহ সহকায়ে সমাজ-সংস্কারব্রত গ্রহণ কবিলেন। জ্ঞানিকা প্রচাৰ, বিধবা বিবাহ এবং অনবর্ণ বিবাহ প্রচলন কবিবার জন্য যত্ন কবিত্তে লাগিলেন। নবীন ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মসমাজেব কার্যকে ব্রাহ্মনাধিবর্ণেব মতামুযাযী পবিচালনা কবিবার জন্য এক ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সম্ভার প্রতিষ্ঠা কবিলেন। ছোট বড়, যুবক ও বৃদ্ধ, ব্রাহ্মসমাজে কার্যপরিচালনার প্রত্যেক ব্রাহ্মের সমান অধিকাৰ, এই ঐক্যতন্ত্র আদর্শেব উপবে ইঁহার ব্রাহ্মসমাজকে গড়িয়া তুলিবার জন্য উদ্যত হইলেন। উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য থাকিত্তে পারিবেন না, নবীন ব্রাহ্মণা এই প্রস্তাব আনিলেন। মহর্ষি সম্পূর্ণভাবে ইঁহাতে - সায় দিতে পাবিলেন না। উপবীতধারী ব্রাহ্মণকে তিনি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে বরণ কবিলেন। ইঁহার ফলে কেশবচন্দ্রপ্রমুখ নবীন ব্রাহ্মণ আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে সরিয়া পড়িয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে এক নূতন সমাজেব প্রতিষ্ঠা কবিলেন।

মহর্ষি চরিত্র, সাধনা এবং বৈষয়িক পদমর্যাদার প্রভাবে আদি ব্রাহ্মসমাজে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ভাল কবিষা মাথা তুলিবার অবসর পায় নাই। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ কবিল। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আভিযোব প্রতি লক্ষ্য কবিয়াই সে সময়েব খুদ্রিধান পাদরী ডাইসন (Dyson) সাহেব কহিষাছিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম আর কিছুই নহে, কেবল Conjugation of the verb to think মাত্র, অর্থাৎ I think; We think; Thou thinkest; You think; He thinks; They think—ইঁহারই নাম ব্রাহ্মধর্ম। এক কথায় প্রত্যেক ব্যক্তির বিচার-বুদ্ধি ব্যতীত এই ধর্মের আব কোনও প্রামাণ্য নাই।

কথাটি সম্পূর্ণরূপেই সত্য ছিল বটে। কিন্তু যে কালে জগত্তের সকল ধর্মই মানুষেব বিচার-বুদ্ধিকে শাস্ত্রেব বন্ধনে একেবারে বাঁধিষা রাখিষাছিল, সে সময়ে ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধির স্বাধীনতা প্রচাৰ করা অত্যাৱশ্যক হইষা। দাঁড়াইষাছিল, ইঁহাও মানিত্তেই হইবে। এদেপে এই শাস্ত্রানুগত্যেব ফলে ধর্মসাধনের সঙ্গে সাধকের

আন্তরিক অমুভবেব একটা বিরট ব্যবধান প্রতিষ্ঠিত হইষাছিল। এই ব্যবধান নিবন্ধন লৌকিক ধর্মের শক্তি ও সম্ভাবিতা নষ্ট হইষা গিরাছিল। ধর্ম মানুষকে মনুষ্যত্বেব উচ্চতম শিখবে তোলা দূরে থাকুক, নানা দিক দিয়া মনুষ্য হইতে বন্ধিত্তেই কবিত্তেছিল। একপ অবস্থায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যে কাজটা কবিত্তে উদ্ভূত হন, তাহা অত্যাৱশ্যক হইষা। গড়িষাছিল সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নবীন ব্রাহ্মদিগেব জীবনে ধর্মকে কেবল একটা খেলালরূপেই গড়িয়া তুলে নাই, জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাধ্য-রূপেই প্রতিষ্ঠিত কবিত্তেছিল। ইঁহাৰা নিজে যাঁহা সত্য বলিয়া মনে কবিত্তেন তাঁহাৰ জন্য ঐগ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। কত দারিত্র্য, কত নিষ্ঠাতন, আত্মীয়-স্বজনবর্গেব সঙ্গে কি দুর্বিষহ বিচ্ছেদ-যাতনা, ইঁহাদিগকে নিজের মতবাদেব জন্ত সম্বন্ধ কবিত্তে হইষাছিল, তাহা মনে কবিলে এই-সকল স্বাধীনতাৰ সাধকের প্রতি অস্তুব শ্রদ্ধাভবে অবনত হইষা পড়ে। এ খেলা ছিল না। ইঁহাৰাই বাংলা দেশে স্বাধীনতাৰ জন্য অসাধাবণ ত্যাগেব শক্তি জাণাইষা তুলেন।

(বঙ্গবাণী, আবণ)

শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

গান

আজ নবীন মেঘেব হর লেগেচে
আমার মনে,
আমাব তাবনা যত উত্তল হল
অকারণে।
কেমন কবে' যায় যে ডেকে
বাঁহিব কবে ঘরেব ধেকে,
ছাৰিতে চোখ কেলে ছেবে
ক্ষণে ক্ষণে।
বাঁধনহাৰা জলধারাব
কলরোলে
আমারে কোন্ পথেব বাণী
যায় যে বলে।
সে পথ গেছে নিরুদ্ধেপে
মানস লোকে গানের গেমে,
চিবধিনেব বিরহিণীব
কুঞ্জবনে।

২রা আষাঢ়, ১৩২২
“বৃধাবাব”

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রেম

প্রেম সে ফুটে কাটার কেবা হৃদ্বিনেরি দীক্ষণ দেয়া

নিরিড় যখন বৃকে;

তার স্বরভি হবি যদি,

সইবি কাটার কাটার ক্ষতি

চক্ষে আকুল অশ্রু-নদী—

ফুটেবে হাসি মুখে।

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্তী

মাদ্রাজের আড্ডার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়টি দামোদর উত্তানের ভিতর অবস্থিত। ভিতরে ঢুকিয়া প্রথমেই বিদ্যালয়ের কৃষিক্ষেত্র দেখিলাম। এখানে যে প্রকার ধান দেখিলাম তাহা মাদ্রাজের সহরতলীতে যে শস্য হয় তাহা অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ। বোধ হয় কোনপ্রকার বিশেষ সার ব্যবহার করাই এই ঐকর্ষের কারণ। তাহার পর একটি ছোট্ট হলদে বঙের বাড়ীর পাশ দিয়া গেলাম। ইহা ছাত্রাবাসেরই একটি অংশ; এখানে অনেকগুলি ছাত্রকে দেখিতে পাইলাম। সবাই ব্যস্ত; কেহ ঘরের ভিতরে রহিয়াছে, কেহ কুয়ার ধারে। সকালে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া তাহার দিনের কাজের জন্ত প্রস্তুত হইতেছে। বিদ্যালয়ের প্রধান অংশগুলি এখন দেখিতে পাইলাম। শাদা ধুতি ও জামা পরা ছেলে দলে দলে বাড়ীগুলির ভিতর ঢুকিতেছে এবং বাহির হইতেছে। প্রত্যেক গাছের গায়েই তাহার নামধাম বড় বড় অক্ষরে লেখা, পড়িতে পড়িতে চলিলাম। উদ্ভিদবিদ্যা শিখিতে হইলে এইপ্রকার বাগানের ভিতর থাকাই সুবিধাজনক, মধ্যে মধ্যে দূরের কোন একটা বাগানে গিয়া ছুচারটা গাছ দেখিয়া আসা অপেক্ষা ঢের ভাল। এতক্ষণে আমি একেবারে কলেজের দরজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ভিতবে ঢুকিয়া দরওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম আমার পরিচিত একজন অধ্যাপক তখন আসিয়াছেন কিনা। দরওয়ান আমাকে উপরে লইয়া গেল। আমার বন্ধুকে সেখানে দেখিলাম, তিনিও কলেজের জাতীয় পোষাক পরিয়া আছেন। তিনি আমাকে বিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপকের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার ল্যাবরেটোরিতে লইয়া গেলেন। তিন-চারটি ছাত্র মাইক্রোস্কোপ, স্ক্রু, ছুঁচ, প্রভৃতি লইয়া কাজ করিতেছে দেখিলাম। মাইক্রোস্কোপ, ছাত্রদের বসিবার বেঞ্চ প্রভৃতি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বশৃঙ্খলভাবে রক্ষিত। ঘরে আলোর ব্যবস্থা সুন্দর। ছাত্রদের মুখ বেশ প্রফুল্ল, অধ্যাপকগণও এমন আনন্দের সহিত তাহাদের কঠিন বিষয়ে সাহায্য করিতেছেন

যে দেখিয়া আমার ভারি ভাল লাগিল। এখানকার অন্তর্নিহিত ভাবটিকে যেন বুঝিতে পারিলাম। আমার অধ্যাপক বন্ধু আমাকে যেখানে যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় সব দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু সব দেখা হইবার আগেই আমরা উপাসনার ঘণ্টা শুনিতে পাইলাম। আমবা তাড়াতাড়ি একটি খড়ে ছাওয়া বড় ঘরের দিকে চলিলাম। ঘরখানি একটি আমগাছের তলায়। ঢুকিয়া দেখিলাম ইতিমধ্যেই সেখানে ছাত্র ও অধ্যাপকগণ সমবেত হইয়া সশ্রদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের সকলের সম্মুখে তাঁহাদের অধ্যক্ষ। ইনিও সকলের সহিত উপাসনায় যোগদান করেন। আমবা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া পিছন দিকে দাঁড়াইলাম। শঙ্করাচার্য্যের একটি বিখ্যাত স্তোত্র আবৃত্তি করিয়া তাঁহার উপাসনা আরম্ভ করিলেন এবং উপনিষদের মন্ত্র পাঠ কবিয়া শেষ করিলেন। তাহার পর পরে পরে একটি পার্শ্বী প্রার্থনা, একটি মুসলমান ও একটি বৌদ্ধ প্রার্থনা উচ্চারিত হইল এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দে মাতরম্’ সঙ্গীতটি সর্বশেষে গাওয়া হইল। এই ব্যাপারটি জাতীয় বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ অঙ্গ।

একজন ভদ্রলোকের উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় চিন্তার ইতিহাস বিষয়ে কয়েকটি বিশেষ বক্তৃতা দিবার কথা ছিল। আমরা তাঁহার জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। শুনিলাম অনেকেই এইরূপ বক্তৃতা দিবার ভার লইয়াছেন। এই উপায়ে অনেক জনহিতৈষী মানুষ শিক্ষা-বিস্তারের সাহায্য করিতেছেন। বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র ছাত্রবা নিজে নিজে ক্লাশের ঘরে চলিয়া গেল। যে-সকল বিষয় শিক্ষা দিতে হইলে যন্ত্রাদির সাহায্যে কোনকণ পরীক্ষা করিতে হয় না, সেই-সকল বিষয় ছাত্রগণ গাছের তলায় বসিয়াই শিক্ষা করে। উপরে একটুখানি খড়ের ছাউনি থাকে, কিন্তু চারিপাশ খোলা। মাটি হইতে একহাত উঁচু করিয়া বাঁধানো বসিবার স্থান। দেয়াল-ঘেরা বন্ধ গৃহের কোনও অসুবিধা ইহার মধ্যে নাই, উপরন্তু সুবিধা এই যে ছাত্রগণ প্রকৃতিব



আড্ডিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিকার্যে-রত ছাত্র

সাহচর্য অনেকখানি লাভ করে।

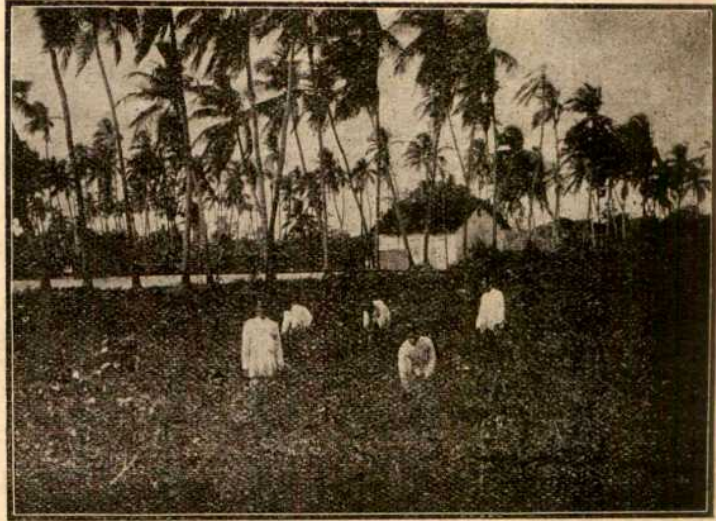
আমার বন্ধুর এই সময় একটি ক্লাশ ছিল, অগত্যা তিনি আমাকে একলা রাখিয়া চলিয়া গেলেন। আমি লাইব্রেরীতে গিয়া ঢুকিলাম। শুনিলাম লাইব্রেরীটি সাধারণ রকমের নয়। কয়েকটি আলুমারি দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিলাম। বিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদবিজ্ঞা, শিক্ষাপ্রণালী, মনস্তত্ত্ব ও কৃষি বিষয়ে অনেক উৎকৃষ্ট বই রহিয়াছে। টেবলের উপর আধুনিক বৈজ্ঞানিক পত্রিকা অনেকগুলি দেখিলাম, হাতে লেখা একখানি পত্রিকাও রহিয়াছে, মৌলিক চিন্তা ও গবেষণার

উৎসাহ দিবার জন্তই ইহা সংস্থাপিত হইয়াছে। আর একটা টেবলে দৈনিক ও রাজনৈতিক সংবাদপত্র রক্ষিত আছে। এইগুলি উন্টাইয়া দেখিবেছিলাম, এমন সময় ঘণ্টা পড়িল এবং আমার অধ্যাপক বন্ধু আসিয়া জুটিলেন।

তখন প্রায় ১১টা। থাইবার স্থান হইয়াছে শোনা গেল। ছাত্ররা সার দিয়া বসিয়া গেল। সব শ্রেণীর ছাত্রই একসঙ্গে বসিল। খাদ্য পরিবেশন করা হইবা-

মাত্রই একটি প্রার্থনা হইল। ভগবদগীতা হইতে একটি শ্লোক পাঠিত হইল, এবং একটি বৈদিক সঙ্গীত সকলে সম্মুখে গান করিল। এই সময়ে ছাত্ররা সকল বিষয়ে আলোচনা করিবার অবকাশ পায় এবং পুস্তকাগার বা ক্রীড়া বিভাগের সম্পাদকগণের কোন কথা সকলকে জানাইবার থাকিলে তাহারা এই সময় তাহা বলেন।

খাওয়া শেষ হইবামাত্র আমার বন্ধু আমাকে ছাত্রদের থাকিবার ঘরে লইয়া গেলেন। ছোট ছোট ঘর, মেঝেগুলি বাধানো। একটি প্রাঙ্গণের



আড্ডিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিকার্যে-রত ছাত্র

চারিদিক ঘিরিয়া এই ঘরগুলি নির্মাণ করা হইয়াছে। প্রাঙ্গণটি খেলার জন্ত ব্যবহার করা হয়। ঘরে বৈজ্ঞানিক আলোর ব্যবস্থা আছে। ছাত্রগণ ইচ্ছামত ঘরগুলিকে সজ্জিত করিয়াছে। প্রত্যেক ঘরেই কোন-না-কোন বিখ্যাত রাষ্ট্রীয় নেতা বা ধর্মবীরের চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। টেবল বা চেয়ার নাই, একটি করিয়া নীচু ডেস্ক আছে, তাহারই সামনে বসিয়া ছেলেরা পড়াশুনা করে। এক



আড়িয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিকার্যে রত-ছাত্র

ঘরে কতকগুলি পেন্সিল কলম দাঁতমাজন সাবান প্রভৃতি দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম উহা ছাত্র-সমবায়-ভাণ্ডার। এক-একজন ছাত্র এক-এক বৎসর উহা পরিচালনের ভার গ্রহণ করে। আর-একটি ছাত্রের উপর ডাকঘরের ভার। সে পোষ্টকার্ড খাম টিকিট প্রভৃতি জোগাড় করিয়া রাখে ও ছাত্রদিগকে দরকার-মত বিক্রয় করে। চিঠি বিলি করা ও ডাকে পাঠানোর কাজও সেই করে।

ছুইটার সময় আবার ঘণ্টা শোনা গেল। ছেলেরা ঘর হইতে বাহির হইয়া বিজ্ঞানাগারগুলির দিকে চলিল। সন্ধ্যা বেলায় যন্ত্রাদি সহযোগে কাজ করা হয়, তখন আর বই পড়া নয়। ছয়-নাতিজন ছাত্র জৈব রসায়ন বিভাগে আছে, তাহারা আপনাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া কাজ আরম্ভ করিল। অগ্রাগ্র ছাত্রেরাও যে যাহার কাজে নিযুক্ত হইল। দুইটা আড়াইটার সময় সমস্ত বিদ্যালয় জুড়িয়া কাজের সাড়া পড়িয়া যায়। বন্ধুর সঙ্গে আমি ঘরে ঘরে ঘুরিতে লাগিলাম। ফিজিক্সের একটি নতুন বিজ্ঞানাগার হইতেছে দেখিলাম। নির্মাণ শেষ হইলে উহা খুব উৎকৃষ্ট হইবে বলিয়া মনে হইল। রাতে

ছাত্রদের আলোচনা-সভা হয় শুনিলাম। নানা বিষয় আলোচনা হয় ও সকলেই তাহাতে যোগদান করে। সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা ছাত্রদিগকে ধর্মের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া হয়।

চারটার মধ্যে আমার সব দেখা শেষ হইয়া গেল, আমি সাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সকলের কাছে বিদায় লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। যাহা দেখিয়া গেলাম তাহার চিন্তাতেই মন ব্যাপৃত হইয়া রহিল। এই বিদ্যালয়টি কেমনভাবে আপনার জাতীয়তা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে ও অগ্রাগ্র বিদ্যালয় অপেক্ষা উন্নতিলাভ

করিতেছে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। এই বিদ্যালয়টির প্রধান উদ্দেশ্য সকলকে জাতীয়তার এক ক্ষেত্রে ডাকিয়া আনিয়া দাঁড় করানো, কিন্তু প্রত্যেকের ধর্মসংক্রান্ত যে বিশেষত্ব আছে তাহা মুছিয়া ফেলিতে ইহারা চান না। কার্যক্ষেত্রে এক হইয়া থাকা এবং অন্তের ধর্মকে সহ্য ও শ্রদ্ধা করা—এই দুই শিক্ষা দেওয়া হয়। ভারতীয় নিয়ম ও প্রতিষ্ঠানাদিকে ভালবাসিতে ইহারা নানা উপায়ে শিক্ষা দেন। প্রত্যহ জাতীয় সঙ্গীত গান, নানা ধর্মের প্রার্থনা উচ্চারণ করা, সাদাসিধা ভারতীয় পরিচ্ছদ পরা, এই-সকলের ভিতর দিয়া তাহারা নিরাড়ম্বর জীবন যাপন ও উচ্চচিন্তা করার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে। আধুনিক ভারতবর্ষের সকল রকম অবস্থা সম্বন্ধেও তাহাদের জ্ঞান আছে। সর্বাপেক্ষা শিক্ষা লাভ করে তাহারা অধ্যাপকদের মহৎ আদর্শে। তাঁহারা সকলেই বিশেষজ্ঞ এবং পূর্ব ও পশ্চিমের জ্ঞান একত্রে তাঁহাদের আশ্রয় করিয়াছে। ইহারা শিক্ষা-বিস্তার কার্যেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহারাই যথার্থ গুরু হইবার ও মানুষ্য গড়িবার উপযুক্ত।

শ্রী—



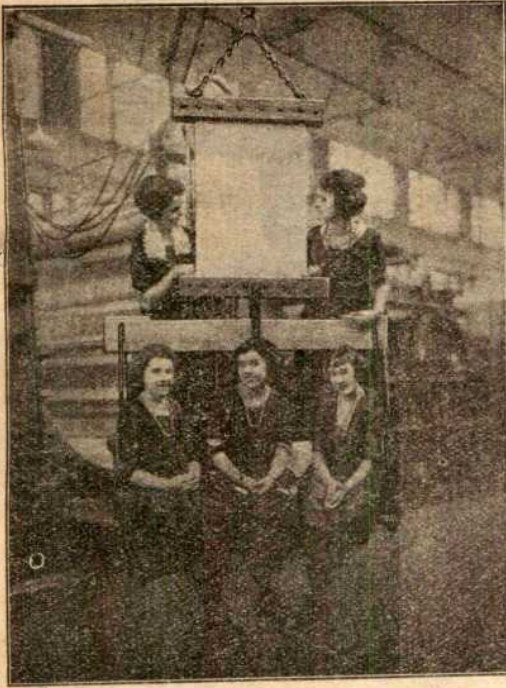
গাণ-পিস্তল—

এই পিস্তল দিয়ে চোর তাড়ান যায়, এবং ছোটখাট আশুন নেবানো যায়। একটা চোঙ্গার মধ্যে গ্যান ভরা থাকে। হাতনটা ঠিক পিস্তলের হাতলের মত। পিস্তলের ঘোড়া টিপ্তামাত্র চোঙা ফেটে গ্যান বেরিয়ে আসে। চোরের নাকে সেই গ্যান ঢুকলে অনেকটা “কাদন গ্যানের” কাজ করে। চোরকে থানিকক্ষণের জন্তে অজ্ঞান করে রাখবে—কোন চিরস্থায়ী ক্ষতি করে না। গ্যান পেছন দিকে যায় না, কাজেই যে পিস্তল চালাবে তার বিশেষ কোন ভয় নেই। আশুন-লাগা স্থানে পিস্তল ছুড়লে—আমাদের “বেঙ্গল কেমিক্যাল” থেকে তৈরী ফায়ারকিং যা কাজ করে—এতেও ঠিক সেই কাজ হবে।

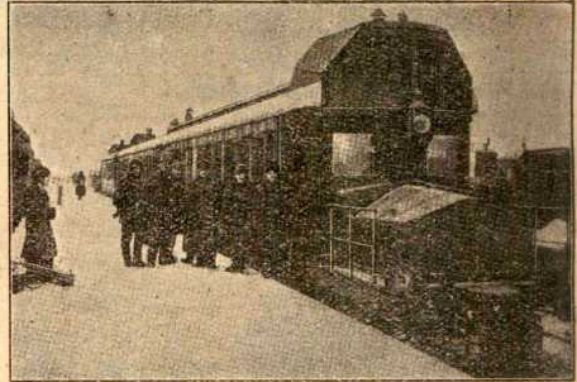
থাকেন। কাগজখানি মোট ৭৬৯ পাউণ্ড (সাড়ে নয় মণের উপর) ওজন বহন করিয়াছে, তবুও ইহা ছিঁড়িয়া যায় নাই বা কোন রকমে নষ্ট হয় নাই।

ইলেকট্রিক ট্রেন—

রাশিয়াতে এখন বৈদ্যুতিক রেলগাড়ির চলন হইয়াছে। এই গাড়ি একবারে না থামিয়া ৫০০ মাইল ছুটিয়া যাইতে পারে। মোটরের শক্তি ৩০০০ ঘোড়ার জোর। সোভিয়েট সরকার ইহার গঠনে সাহায্য করিয়াছেন এবং এখনো কল-কজা ইত্যাদির গঠন-প্রণালী গোপন রাখিয়াছেন।



কাগজের তাগৎ



ইলেকট্রিক ট্রেন

কাগজের জোর—

কাগজের শক্তি-পরীকার এক নতুন উপায় করা হইয়াছে। একখানা পাতলা কাগজের ওজন একখানা সাধারণ চিঠির কাগজের সমান। এই রকম একখানা কাগজকে একটা ক্রেমে আঁটা হয়। এই ক্রেমের গায়ে কয়েকটা পিঁড়ি লাগান ছিল। তাহাতে কয়েকজন লোক বসিতে পারে। তিনজন নারী এই সকল পিঁড়িতে বসেন। এবং দুইজন বাড়িয়া

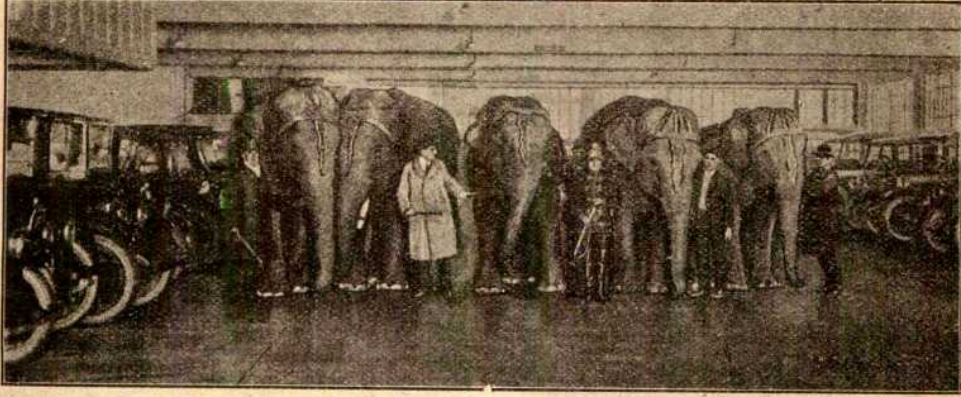
আগুনের হাত হইতে তুলা বাঁচানো—

তুলাতে বড় তাড়াতাড়ি আগুন ধরে। পোড়া বিড়ি বা সিগারেট যদি কোন রকমে তুলার পিঁঠে লাগে তবে সমস্ত গুদামের লক্ষ লক্ষ টাকার তুলার বস্তা ছাই হইয়া যায়। জাহাজে বা রেলগাড়িতে করিয়াও যখন তুলা চালান হয়, তখনও অনেক সময় ইঞ্জিনের ধোঁয়াতে আগুনের ফুল্কি আসিয়া তুলার গাদায় পড়িয়া আগুন ধরিয়া যায়। বছরে এক তুলা পুড়িয়াই যে কত কোটি টাকা নষ্ট হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সম্প্রতি আমেরিকাতে এক প্রকার রাসায়নিক জ্বরণ বাহির হইয়াছে, তাহাতে তুলাকে আগুনের হাত হইতে বাঁচানো চলিবে। একটা চৌবাচ্চাতে এই জ্বরণ পদার্থ দুই ইঞ্চি ভরা থাকে। একটা নল দিয়া ঐ রাসায়নিক পদার্থ চৌবাচ্চায় আসিয়া পড়ে। তুলার গাইটকে ঐ চৌবাচ্চায় চোবান হয়। প্রত্যেক পাশ দুই মিনিট করিয়া ভিজিতে পায়, তাহাতে তুলার গাইটের ভিতর দুই ইঞ্চি পর্যন্ত ভিজিয়া যায়। চারি পাশ উপর-নীচু ভিজান হইলে পর রোজে তুলার গাইট ২০ দিন শুকান হয়। গাইট শুকাইয়া গেলে পর চালান দিতে পারা

যায়। এইরূপ এক গাঁইট তুলার গায়ে অনেক চেষ্টা করিয়াও আঙুল লাগানো যায় নাই। এই প্রকারে তুল ভিজাইয়া লইলে তুল অনেক দিন পর্য্যন্ত বেশ ভাল অবস্থায় থাকে। তিন বছরে এইরূপ এক গাঁইট (৫০০ পাউণ্ড) তুলার মাত্র ২ পাউণ্ড নষ্ট হইয়াছিল। আর এমনি এক গাঁইটে (৫০০ পাউণ্ড) কয়েক মাসের মধ্যে ৮০ হইতে ৪০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত তুল নষ্ট হয়।

ছোট রেলগাড়ী—

লণ্ডনের এক রাস্তায় একদিন, কথা নেই বার্তা নেই, বেজায় লোকের ভিড় জমে' গেল। সবাই ভিড় ঠেলে সামনে আসতে চায়—একটা ছোট ইঞ্জিন—তার সঙ্গে তেমনি ছোট একটা ঠেলা গাড়ী জোতা। ইঞ্জিনটা বাষ্পে জোবেই চলছে। একটি ক্ষুদ্রে ডাইভার সেটাকে



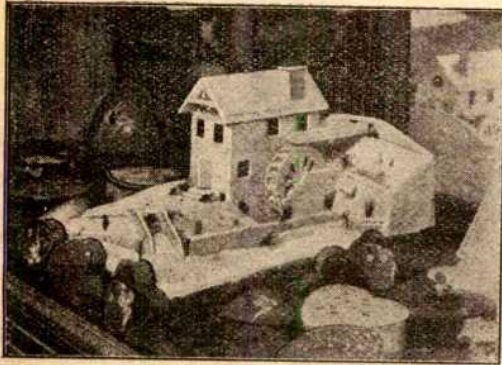
হাতীর সাহায্যে মেঝের শক্তি পরীক্ষা।

হাতীর সাহায্যে মেঝের দৃতা পরীক্ষা—

কথায় বলে হাতী নাকি কাঁচা ইমারত বা পল্কা স্থানের ওপর কখনো যায় না। আমেরিকার ওহিওতে এক ভদ্রলোক একটা মোটা গ্যারেজ নির্মাণ করেন—গ্যারেজের মেঝে কতখানি শক্ত হ'ল জানবার জন্তে তিনি একটা সারকানের দল থেকে পাঁচটা হাতী এনে তার ওপর চালান। তাতে বেঞ্চের মাঝখানে ৪০৫ মণেরও বেশী চাপ পড়ে।

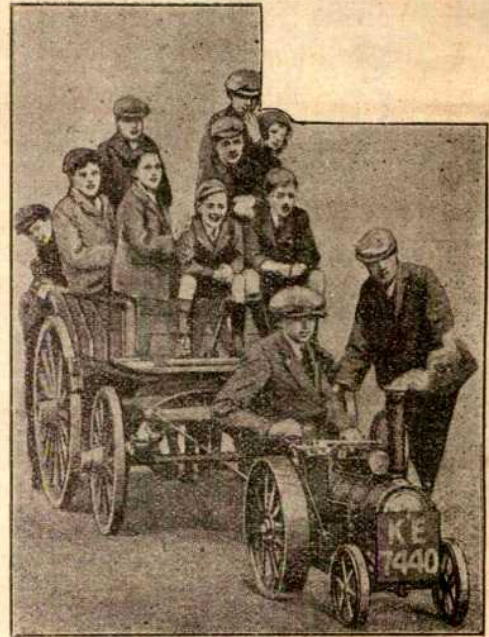
মিষ্টি বাড়ী—

নীচে যে একটি বাড়ীর ছবি দেওয়া হয়েছে—ঐ বাড়ীটি পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্টি। ঐ ছোট বাড়ীটি একটি বড় বাড়ীর জানুলায় দেখানো



মিষ্টি বাড়ী

হয়। বাড়ীটি মিশুর তৈরী। ওহিওর দিনসিনাটি সহরের এক মিষ্টিওয়ালার এর করুন-ওয়াল।

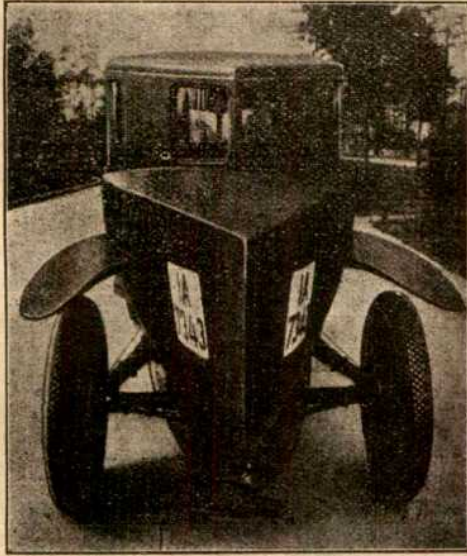


ছোট রেলগাড়ী

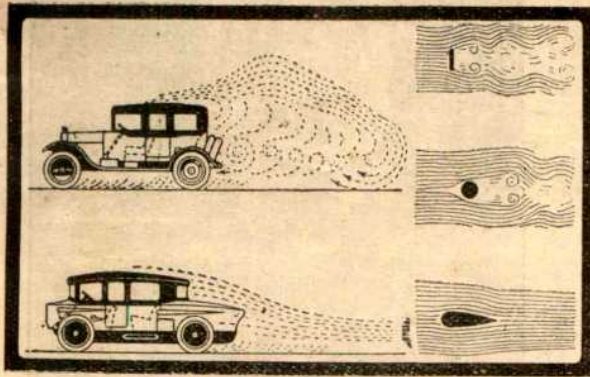
পৌ পৌ করে' সিটি মার্ভে মার্ভে চালাচ্ছে। ঠেলা গাড়ীতে অনেক গুলি কচি কচি হাদিমুখ বদে' আনে। এক মাহেব এই বাচ্চা রেলগাড়ী তৈরী করেছেন।

বৃষ্টি-বিন্দু মোটরকার—

কত রকমের যে মোটর গাড়ী হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। সম্প্রতি জার্মেনিতে একটা অদ্ভুত-রকমের মোটরকার তৈয়ারী হইয়াছে। বার্লিন সহরের এক মোটর প্রদর্শনীতে এই অদ্ভুত গাড়ীখানাকে দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া গিয়াছেন। এই গাড়ীখানি যখন চলে



বৃষ্টি-বিন্দু মোটরকার



বৃষ্টি-বিন্দু মোটর-গাড়ীর অবাধ গতি

সাধারণ মোটর-গাড়ী যখন চলে তখন বাতাসের মধ্যে একটা মোটা দণ্ড বা চেপ্টা থালা ঘুরাইলে বাতাসে যেমন ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয় তেমনি ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হইয়া মোটর-গাড়ী চলায় বাধা জন্মায় ; কিন্তু বৃষ্টি-বিন্দু মোটর-গাড়ী বৃষ্টি-বিন্দুরই মতন বিনা বাধায় বাতাস ভেদ করিয়া চলে বলিয়া গতি দ্রুততর হয়।

তখন হাওয়াতে ইহাকে কোন রকম বাধা দেয় না বলিলেই হয়। কারণ ইহাকে একবিন্দু বৃষ্টির জলের ছাঁচে তৈয়ার করা হইয়াছে। চালক সামনে বসে। অগ্ন্যস্ত্র আরোহীরা চালকের পিছনে গাড়ীর মাঝখানে বসে। কলকজা গাড়ীর তলায় পিছন দিকে থাকে। গাড়ীর

শক্তি মাত্র ১০ ঘোড়ার জোর। কিন্তু হাওয়ায় বাধা না পাওয়ায় এই সামান্য শক্তির বলে গাড়ীখানি ঘণ্টায় ৭৫ মাইল দৌড়াইতে পারে।

দেশলাই এর কাঠির বেহালা—

বেহালা সাধারণতঃ খুব ভাল কাঠেরই হয়। যে বেহালাখানির কবি দেওয়া হইল, উহা দেশলাই এর কাঠি এবং দাঁত-খুঁটা খড়্কে-কাঠি



দেশলাই এর কাঠির বেহালা

শিরিব আঠার সাহায্যে গোড়া লাগাইয়া তৈয়ার করা হইয়াছে। ইহার আওয়াজ খুব মিষ্ট এবং উচ্চ। কয়েকবার বাজানো সত্ত্বেও ইহা কাটিয়া যায় নাই।

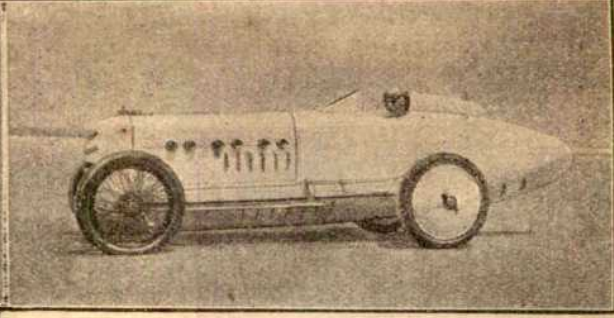
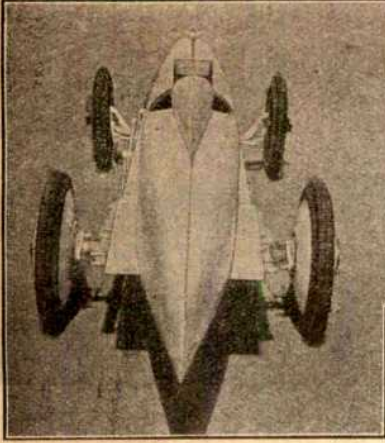
পাহাড় থেকে কাঠ নামানো—

আমেরিকার পাহাড়ে-জঙ্গল থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ কেটে নীচে নামানো হয়। তারপর তার থেকে তক্তা ইত্যাদি অনেক কিছুই হয়। কাঠ, পাহাড়ের গা বেয়ে নামানো খুবই সহজ বলে মনে হয়, কিন্তু কাজটা শুনতে যত সহজ, কাজে তার চেয়ে অনেক পরিমাণে শক্ত। পাহাড়ের গা স্থানে স্থানে এত বেশী ঢালু যে কাঠের গুঁড়িগুলোকে নীচের দিকে না ঠেলে উপরের দিকেই ঠেলে রাখতে হয়। মাঝে মাঝে মোটর-ট্রাকে করে কাঠ নামান হয়। মোটরের জন্তে তক্তা বিছিয়ে রাস্তা তৈরী করা আছে। এই তক্তার রাস্তার মাঝখানটা ফাঁক—যেখানে ঢাকা চলে সেখানে একা-বঁকা করে তার বিজান আছে। মোটর চালায়, ধোঁয়ায় এবং ধামায় একজন লোক। কেবল ব্রেক নিয়ে বন্ধ থাকে আর-একজন। এই টাক ছ'ঢাকা-ওয়ালা। ঢাকার দু-পাশে ভিতরের দিকে উঁচু করে কাঠের চকর বসান আছে। তাতে মোটরখানা বাধা রাস্তা ছেড়ে নীচে পড়ে না।

মিটার-যুক্ত টেলিফোন—

আমাদের দেশে টেলিফোনের একটা বাধা দূর আছে। কেহ ব্যবহার করুক বা না করুক, তাহাতে টেলিফোনের জন্ত বছর শেষে সেই বাধা হারে টাকা দিতে হয়। আমেরিকাতে এখন হইতে গ্যাস এবং ইলেকট্রিক লাইটের মত মিটার টেলিফোনেও বসাইতে হইবে। ইহাতে নাকি গ্রাহকদের খরচা শতকরা ৮৫ টাকা কমিয়া যাইবে—অথচ কোম্পানীর লাভও কম হইবে না। এই মিটারের কাজ টেলিফোনোমিটারের (telechronometer) সাহায্যে হইবে। কে কতক্ষণ

টেলিফোন ব্যবহার করিল ইহাতে সব ধরা পড়িবে। আমাদের দেশেও কর্তারা ঐ রকম একটা কিছু করিলে পারেন। তাহাতে লাভ অনেক আছে, কারণ তাহা হইলে টেলিফোনে বাজে এবং যা-তা কথা বলা অনেক কমিয়া যায়।



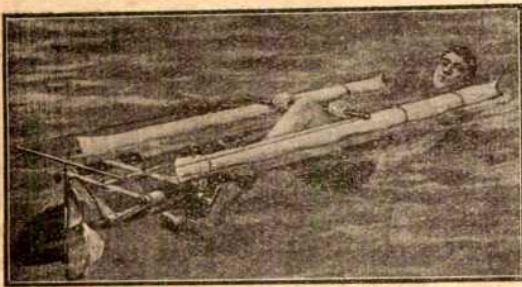
মিনিটে-তিন-মাইল মোটরকার

মিনিটে-তিন-মাইল মোটরকার—

গত ৬ই এপ্রিল আমেরিকাতে ফ্লোরিডা সহরে সিগ্‌হগ্‌ডাহ্‌ল নামক এক ব্যক্তি একখানি রেসিং কারে করিয়া ১৯৯৭ সেকেন্ডে এক মাইল করিয়া দৌড়াইয়াছেন। পূর্বে এই স্থানে যে ব্যক্তি মোটর-দৌড়ে বাজি জিতিয়াছিলেন তিনি ষটায় সিগ্‌হগ্‌ডাহ্‌ল অপেক্ষা ২৪ মাইল কম দৌড়াইয়াছিলেন। হগ্‌ডাহ্‌লের গতি ষটায় ১৮২'৭ মাইল। হগ্‌ডাহ্‌লের মোটরখানি ২৫০ ঘোড়ার জোর, কিন্তু মাত্র ২০ ইঞ্চি চওড়া। গাড়ীখানির ওজন ৬১০ পাউণ্ড এবং এলুমিনিয়ামের তৈরী।

জলো-মাইকেল—

আমেরিকার উইসকনসিনের এক ভ্রমলোক জলে চালাইবার জন্য এক প্রকার মাইকেল আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে করিয়া এমনি জলে ভ্রমণ করাও যায়, আবার দরকার হইলে ডুবন্ত ব্যক্তিকে জল হইতে উদ্ধার করাও যায়। এই যন্ত্রের ফ্রেম এলুমিনিয়ামের তৈরী।



জলো-মাইকেল

বাইসাইকেলের মত পেডাল বা পা দান আছে, তাহা পা দিয়া চালাইলেই প্রপেলার বা চৈলা-দাঁড় ঘোরে; তাহার সাহায্যে যন্ত্রটি জল কাটিয়া অগ্রসর হয়। যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলিকে প্রয়োজন মত ছোট বড় করিয়া লাগান যায়, তাহাতে লম্বা এবং বেঁটে যে-কোন লোকেই ইহা ব্যবহার করিতে পারে। এই জলো-মাইকেলকে খুলিয়া পাট করিয়া একটা পোর্টম্যান্টের ভিতর অনায়াসেই রাখা যায়, ওজন মাত্র

কাঠের ঘড়ি—

আমেরিকার পেওরিয়া (Peoria) শহরে এক পাকা ওস্তাদ একটি নূতন ধরণের ঘড়ি তৈয়ার করিয়াছেন—তার কলকজা ঢাকনা

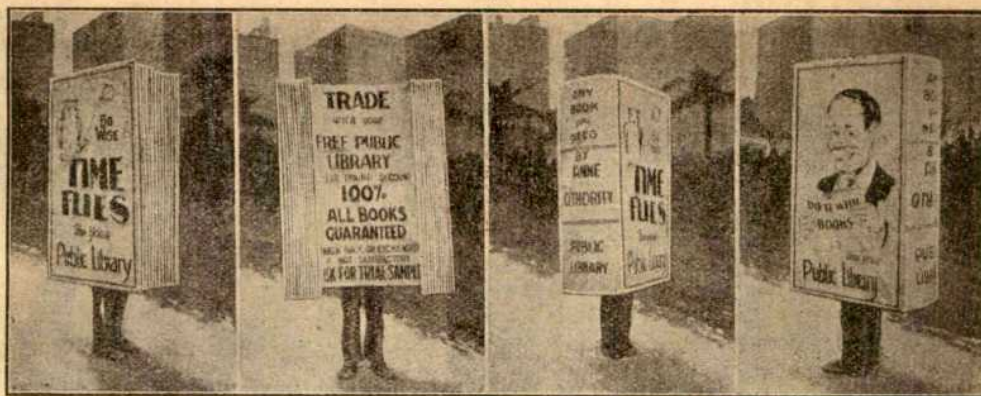


কাঠের ঘড়ি

খোল ইত্যাদি সবই কাঠের। ঘড়িটি তৈয়ার করিতে তিন বছর লাগিয়াছে। ঘড়ি সময়, দিন, মাস এবং আবহাওয়ায় পরিবর্তন সবই বলিতে পারে। ঘড়িটি কতদূর কাজের হইবে তাহা এখনও বলা যায় না।

কিছু কাল পরে তাহা বলা

সম্ভবপর হইবে।



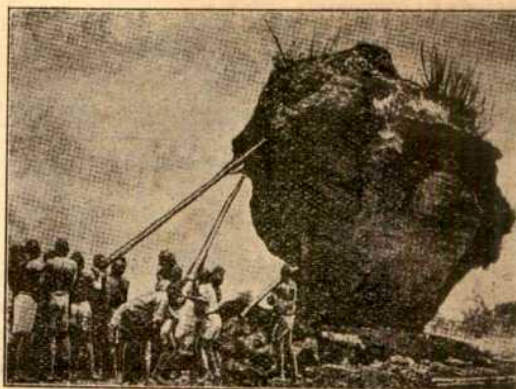
লাইব্রেরী ফেরি—

লাইব্রেরী ফেরি—

ক্যালিফোর্নিয়ার ষ্টকটন পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ জনসাধারণের কাছে লাইব্রেরীর ব্যবহার বাড়ানোর জন্য এক মজার উপায় ঠাওরাইয়াছেন। একটা কাঠের বাস ৪ ফুট লম্বা, ২ ফুট চওড়া এবং ১৫ ফুট গভীর, দেখিতে একটা বইয়ের মতন। তার গায়ে লাইব্রেরীর সম্বন্ধে অনেক কথাই লেখা থাকে। ভাল ভাল বইয়ের নাম ইত্যাদি অনেক কিছু লোকে জানিতে পারে। এই কাঠের 'বই'টাকে ছোট ছোট জেলেরা রাস্তায় রাস্তায়, লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

রাস্তা-খোয়া মোটর গাড়ী—

আমাদের দেশে রাস্তায় জল দেয় লোক হাতে করিয়া কাষিশের পাইপ ধরিয়া, বা খচ্চরে টানা জল-দেওয়া গাড়ীতে করিয়া। লগুনে আজকাল রাস্তায় জল দিবার জন্য এক রকমের মোটর-কার তৈয়ার



উইচিপি

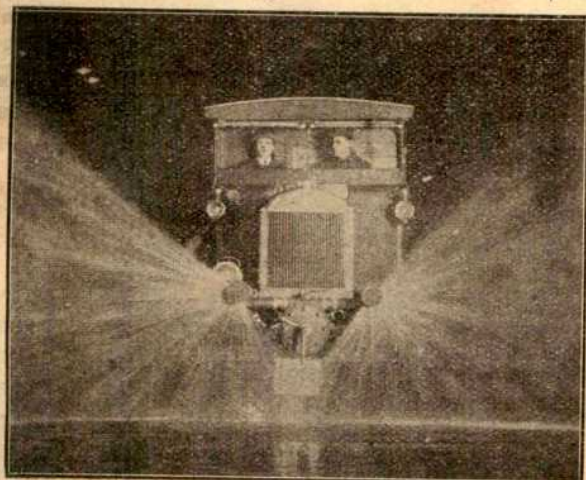
দেওয়া হয়, এই জন্য যে তাতে পথিকদের অসুবিধা হইবে না। কোথাও আগুন লাগিলে এই গাড়ী অনেক কাজে লাগে। জল ৫০ ফুট পর্যন্ত বেশ জোরে যায়।

পাহাড়ের সমান উইএর টিপি—

দক্ষিণ আফ্রিকাতে এক-একটা উইএর টিপি কি ভয়ানক প্রকাণ্ড এবং উচু হয় তাহা শুনিলে অবাক হইয়া যাইবার কথা। উইএরা কাদার সাহায্যে এই টিপি তৈয়ার করে, কিন্তু রৌদ্রের তেজে কাদা পাথরের মত শক্ত হইয়া যায়। চাল-বাসের সুবিধার জন্য মাঝে মাঝে এই-সব টিপি ভাঙিতে হয়। একটা পুরা সহর ধ্বংস করিতে যে শক্তির অপব্যয় হয়, এই টিপি ধ্বংস করিতেও ঠিক তাই লাগে।

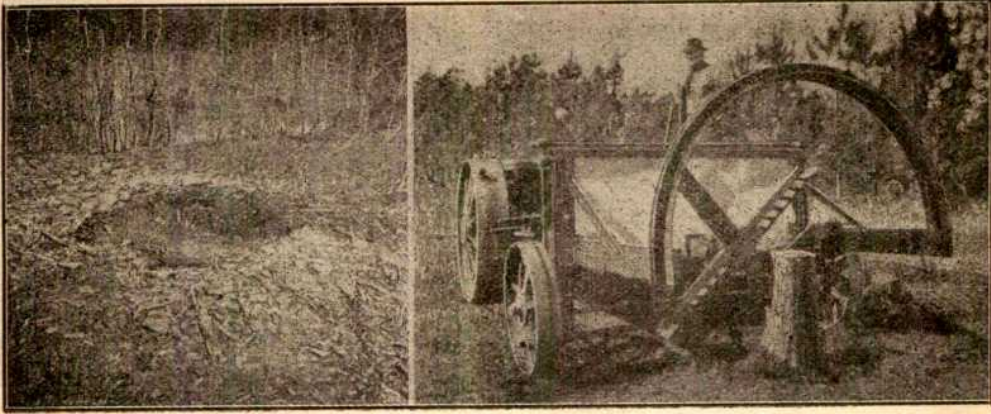
গাছ-কাটা কল—

বড় বড় গাছের গুড়ি কাটিতে হইলে আমাদের দেশে কুড়াল দিয়া ১৫ দিন ধরিয়া লোকে কাটে। এক প্রকার কল হইয়াছে,—তাহার সাহায্যে খুব কম সময়ে গাছের গুড়িকে টুকরা টুকরা করিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলা যায়। একটা ইঞ্জিনের সাহায্যে



রাস্তা-খোয়া মোটর গাড়ী

হইয়াছে। রাত্রি বারোটার পর এই মোটর পথে পথে জল ছড়ায়। গাড়ী যত জোরে চলে জলের বেগও তত বাড়ে। রাত্রি বারোটার পর জল

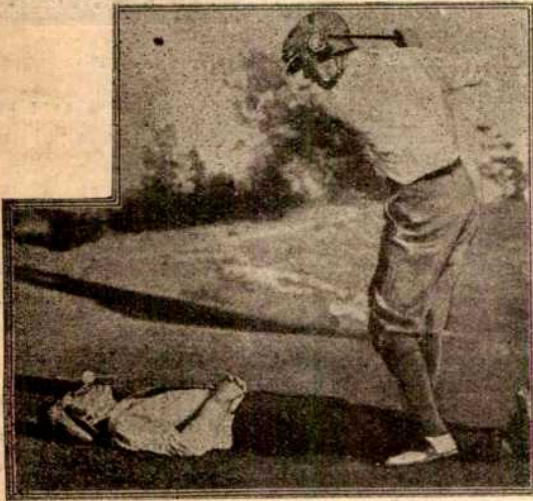


গাছ-কাটা কল

৪টি ফলা যুক্ত একটি চাকা ঘোরে। এই ফলাগুলি খুব ধারাল। গুঁড়ি ব যে অংশে এই ফলা লাগে সেপানের খানিকটা অংশ তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যায়। ইঞ্জিনও সঙ্গে সঙ্গে একটু করিয়া আগাইয়া যায়। এই রকমে খুব কম সময়ে গাছের গুঁড়ির স্থানে কতকগুলি কাঠের টুকরা মাত্র পড়িয়া থাকে।

পাকা গল্ফ খেলোয়াড়—

আমেরিকাতে একজন এমন পাকা গল্ফ খেলোয়াড় হইয়াছেন যিনি আর-একজন লোকের নাকের ডগাতে বল রাখিয়া প্রাণপণ



পাকা গল্ফ খেলোয়াড়

জোরে মারিতে পারেন—অথচ গল্ফ খেলবার লোহার ডাঙা নাকে স্পর্শমাত্র করে না। এনি অভূত তাহার হাতের টিপ।

হেমন্ত

আলুর গুণ—

আমাদের দৈনন্দিক তরিতরকারীর মধ্যে আলু একটি প্রধান আহাৰ্য্য। ইহাতে অধিক পরিমাণে ‘স্টার্চ’ বা ‘Starch’ থাকায় ইহা আমাদের দেহের পুষ্টি সাধন করে। তাহা ছাড়া ইহা আমাদের আরও অনেক কাজে আসে। ইহা হইতে নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুত হয়। ইহা হইতে যে ‘শর্টী’ প্রস্তুত করা যায়, তাহা অনেকই হয়ত ‘ভারতবর্ষের’ “বিশ্বকর্মা” ইঞ্জিতে” পড়িয়া থাকিবেন। আজকাল সচরাচর যে “কৃত্রিম হস্তি-দন্তের” জিনিষ দেখা যায়, তাহাও এই আলুর তৈয়ারী। অতি সহজ উপায়ে ইহা আলু হইতে প্রস্তুত করা যাইতে পারে—কতকগুলি উৎকৃষ্ট গোল আলু লইয়া উত্তমরূপে খোসা ছাড়াইতে হয়। তৎপরে উহার ময়লাযুক্ত অংশগুলি সযত্নে বার দিয়া কয়েকদিন নিষ্কল জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। একটি পাত্রে পবিত্র জল ও ‘Sulphuric Acid’ মিশাইয়া রাখিতে হয়। পরে জল হইতে আলুগুলি তুলিয়া উক্ত পাত্রের ‘Sulphuric Acid’ মিশ্রিত জলে ফেলিয়া দিগ্ধ করিতে হয়, শেষে অগ্নিতাপে কঠিন মণ্ডের স্থায় হইলে আঙুন হইতে নামাইয়া ইহা পর্যায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা জলে উত্তমরূপে ধুইতে হয়। তখন নরম থাকিতে থাকিতে বেকোন বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইলেই হইল। প্রস্তুত জিনিষ দেখিতে হাতির দাঁতের স্থায় সাদা ও দৃঢ় হইবে। আলু শেষে ‘Ivory’ হইবে বিজ্ঞানের বলে।

“রঞ্জন”

মোটর সেন্সাস—

সম্প্রতি পৃথিবীতে কতগুলি মোটর গাড়ী আছে তাহা গণনা করিয়া স্থির করা হইয়াছে। পৃথিবীতে ১১০০০০০০ খানা মোটর আছে, তন্মধ্যে শতকরা ৮৩ খানা আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটসেই আছে। ইউনাইটেড স্টেটসে প্রত্যেক ১১ জন, গ্রেট ব্রিটেনে ১১ জন, ফ্রান্সে ২০ জন ও রাশিয়ার সাইবেরিয়ায় ২৫০০০০ জন লোক পিছু একখানি মোটর গাড়ী আছে।

রাফুসে পিপীলিকার দ্বারা গৃহ পরিষ্কার—

দক্ষিণ আমেরিকার কতক অংশের অধিবাসীরা তাহাদের গৃহ পরিষ্কার করে না। বিনা ষরচে ও খাটুনীতে তাহারা নিজেদের গৃহ পরিষ্কার করিয়া লয়। প্রতিবৎসর বসন্তকালে সাউবা নামক (Sauba)

একজাতীয় বৃহদাকার রাক্ষুসে পিপীলিকা তাহাদের গৃহ পরিষ্কার করিয়া দিয়া সাহায্য করে। সমস্ত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গ্রীষ্মকালে পোকামাকড়ের ভীষণ প্রাচুর্য্য হইতে দেখা যায়। ঐ সব অঞ্চলের অধিবাসীরা এই সাউবা পিপীলিকার সাহায্যে নিজেদের গৃহ পরিষ্কার করার শ্রম ও পোকামাকড়ের উৎপাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। সাউবা পিপীলিকা দেখিতে ঠিক ক্রোলের মত, ও উহাদের ক্ষুধাও বড় ভীষণ। বৎসরের মধ্যে ২৩ বার উহারা দলে দলে খাদ্য অন্বেষণে বহির্গত হয়, লক্ষ লক্ষ পিপীলিকা সারি বাধিয়া যায় ও সম্মুখে ছোট গাছপালা ঘাস বাহা দেখিতে পায় খাইয়া নিঃশেষ করে। গ্রামের অধিবাসীরা এই পিপীলিকার আগমন-বার্তা জানিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি নিজেদের জিনিষপত্র সরাইয়া ফেলে ও নিজেরা গ্রাম হইতে পলায়ন করে। সাউবা পিপীলিকা-বাহিনী গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে ও দলে দলে বিভক্ত হইয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে যায় ও সম্মুখে পোকা মাকড় বাহা পায় এমন কি ইঁদুর পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলে। শেষে গৃহের ভিতরে ও বাহিরে দেওয়ালে যে ময়লা লাগিয়া থাকে তাহাও খাইতে ছাড়ে না। যখন খাইবার আর কিছুই থাকে না তখন অস্ত্র খাদ্যের চেষ্টায় গমন করে। গ্রামের অধিবাসীরা গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পায় তাহাদের গৃহ-নুতনের স্তায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পোকামাকড়মুক্ত হইয়া রহিয়াছে। এইরূপে বিনা খরচে তাহারা গৃহ পরিষ্কার করিয়া লয় ও পোকামাকড়ের উৎপাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করে।

অলক

প্রাচীন কালের ঐশ্বর্য্য—

- (ক) মিশর-রানী ক্রিওপেট। তাহার প্রণয়ীকে ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি মুক্তা চূর্ণ করিয়া, নদে মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেন।
 (খ) নাটককার ইমোপাসের পুত্র ক্রোদিয়স্ ৮০ হাজার টাকা মূল্যের একটি মুক্তা চূর্ণ করিয়া গিলিয়া ফেলেন।
 (গ) ক্রোদিয়সের এক "ভিদ্" খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ছিল ৮ লক্ষ টাকা।
 (ঘ) সম্রাট কালিগুলাও একটাবারের ভোজনে ৮ লক্ষ টাকা খরচ করেন।
 (ঙ) হিলিওপলস্ একটাবারের ভোজনে ব্যয় করেন ২ লক্ষ টাকা।
 (চ) লকুলস্ একটাবারের জলখাবারে খরচ করেন ২ লক্ষ টাকা।

(ছ) লকুলসের মৎস্ত-পুষ্করিণীর সংস্কারের মূল্য ছিল ৩০ লক্ষ টাকা।

(জ) সিজারের রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্বে ষণ্ণ ছিল—২ কোটি, ৯৯ লক্ষ, ৫০ হাজার টাকা।

(ঝ) সিজার ৫০ লক্ষ টাকা দিয়া কিউরোর বন্ধুতা ক্রয় করেন।

(ঞ) সিজার, লুসিয়াস পল্‌সের বন্ধুতা ক্রয় করেন—৩০ লক্ষ টাকা মূল্য।

(ট) সিজার, অপব্যয় করেন—১৫৭,০০,০০,০০০ (একশত সাতচল্লিশ কোটি) টাকা।

(ঠ) এপায়াস্ অপব্যয় করেন—৫০ লক্ষ টাকা। যখন তিনি দেখিলেন ৮ লক্ষ টাকার অধিক সম্বল নাই, তখন আশ্চর্য্যতায় করেন।

(ড) সিজার, ক্রটাসের মাতা সার্ভিলিয়াকে একটি মুক্তা প্রদান করেন—যাহার মূল্য ৫ লক্ষ টাকা।

(ঢ) ক্রিসসের ভূসম্পত্তির মূল্য ছিল ১ কোটি, ৭০ লক্ষ টাকা। তাহার দ্রব্যসামগ্রী এবং দাস-দাসীগণের মূল্যও ঐরূপই ছিল।

(ণ) বিজ্ঞানবিদ "সেনেকার" ঐশ্বর্য্য ছিল—৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও ইনি বিজ্ঞানের চর্চা করিতে ভালবাসিতেন।

(ত) রোমসম্রাট টাইবেরিয়স্ তাহার মৃত্যুকালে রাখিয়া যান—২৩ কোটি, ৬২ লক্ষ, ৫০ হাজার টাকা। নিকোথ সম্রাট কালিগুলাও ঐ টাকা এক বৎসরের মধ্যেই ব্যয় করিয়া ফেলেন।

(থ) সম্রাট ভেস্পাসিয়ান্ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাহার আনুষ্ঠানিক ব্যয় নির্ধারণ করেন—৩৫ কোটি টাকা।

(দ) মিশরের পিরামিড্ নির্মাণ করিতে ব্যয় হইয়াছে—৪৫ কোটি টাকা।

(ধ) পত্নী "মুক্তাজের" সমাধির উপর 'তাজমহল' তৈয়ার করিতে সম্রাট সাজাহান ব্যয় করেন—৩,১৭,৪৮,০২৪ (তিন কোটি, ১৭ লক্ষ, ৪৮ হাজার, চব্বিশ টাকা)। পসিদ্ধ পর্য্যটক টাভানিয়ের তাজমহল নির্মাণের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়াছিলেন।

(ন) সাজাহান 'ময়র সিংহাসন' নির্মাণে ব্যয় করেন—২ কোটি, ৭৫ লক্ষ টাকা।

(প) কোহিনূরের মূল্য আজ পর্য্যন্তও স্থির হয় নাই। মোগলবীর বাবর বলেন—“সমগ্র জগতের দৈনিক ব্যয়ের অর্ধেক ইহার মূল্য।” সমগ্র জগতের দৈনিক ব্যয় কত?

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

সন্ধ্যাছায়া

নদীতীরে দেখি আজ সন্ধ্যার স্নানিমা
 অম্পষ্ট করিয়া নেয় দিগন্তের সীমা
 কোন্‌ মৌন ছায়ালোকে? ধীরে ধীরে ধীরে
 দূর হতে দূরান্তরে, গ্রামান্তরের তীরে
 মিলে গেল শেষ স্বর্ণরেখা। পল্লীঘরে,
 শান্তক্ষেতে,—উৎকণ্ঠিতা বধুর অন্তরে
 ঘনায় সন্ধ্যার ছায়া বেদনার গানে।
 দিনের বিদায়-বাণী সস্রুণ তানে

পাটল মেঘের পুঞ্জ চলে ঘুরি ফিরি
 পথহারা পথিকের মত। বিশ্ব ভরি'
 শুনি যেন বাজে এক নিস্তব্ধ রোদন
 অসীম ছায়ায় তলে। যেন কোন্‌ ধন
 হারিয়ে গিয়েছে তার,—চঞ্চলতা তারি
 তীরে-তীরে সন্ধ্যালোকে গিয়েছে সঞ্চারি'।

শ্রী প্রবোধচন্দ্র বসু

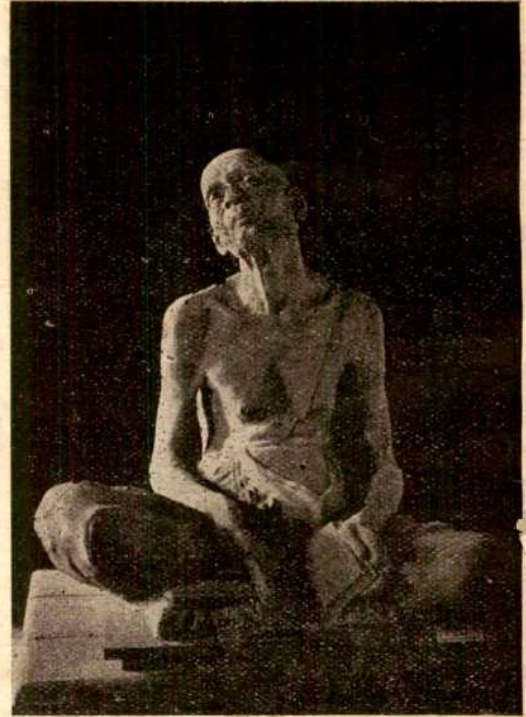
রঘুনাথ কৃষ্ণ ফড়কে

ভারতে বর্তমান যুগের ভাস্করদের মধ্যে বোম্বাইয়ের রঘুনাথ কৃষ্ণ ফড়কে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। দশ বারো বছর আগে এই শিল্পীটির নাম সাধারণের কাছে অপরিচিত তো ছিলই, যারা ভাস্কর-কলার আলোচনা করেন তাঁরাও এঁর কথা জ্ঞাতেন না। এই অল্প সময়ের মধ্যে ফড়কে তাঁর গুণের যে রকম পরিচয় দিয়েছেন তাতে আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে তিনি একজন উচ্চদরের ভাস্কর হয়ে উঠবেন।

নি বলেই বোধ হয় তাঁর হাতের কাজে পাশ্চাত্য আদর্শের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না; এটিই ফড়কের বিশেষত্ব। ফড়কে বেসিন ইংলিশ স্কুলে লেখাপড়া শিখেছিলেন; স্কুলের পড়া শেষ করেই তাঁকে অর্থো-পার্জনের চেষ্টায় ছুটতে হয়েছিল, কাজেই কলেজে পড়ার সুযোগ্যতা তাঁর কখনো হয় নি। বালক অবস্থায় ফড়কে মাটি দিয়ে গণপতি পার্শ্বতী শিব প্রভৃতি দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি করতেন। স্কুলের পড়া শেষ করে



শ্রী রঘুনাথ কৃষ্ণ ফড়কে



প্রসূচন

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহর থেকে কুড়ি মাইল উত্তরে এক গ্রামে রঘুনাথ দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। এই বিজ্ঞা শেখবার জন্ত তিনি কখনো কোনো স্কুলে যান নি, কিম্বা কোনো লোকের কাছেও এ সম্বন্ধে শিক্ষা পান নি। ছেলে বেলা থেকে নিজে চেষ্টা করে' তিনি এই কাজ শিখেছেন। কোনো জায়গায় শিক্ষা পান

তিনি মাটি আর মোমের দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি করে' বিক্রি করতে আরম্ভ করেন। তাঁর মূর্তি অত্যন্ত কারিকরদের হাতে তৈরি মূর্তির চেয়ে অনেক ভাল হোতো বলে' দেখতে দেখতে তাঁর খরিদারও অনেক জুটে গেল। শেষে তিনি কয়েকটা ভাল ভাল মূর্তি তৈরি করে' বেসিন ও বোম্বাই সহরে মধ্যে মধ্যে প্রদর্শনী



আনন্দের সপ্তম স্বর্গে

খুলতে আরম্ভ করেন। ১৯১১ অব্দে প্রথমে তিনি এই রকম প্রদর্শনী খোলেন। এই প্রদর্শনী খোলার পর থেকেই লোকে একটু একটু করে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেতে আরম্ভ করে। ১৯১৪ অব্দে বঙ্গে আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনীতে তিনি “প্রবচন” নামে একটি প্রতিমূর্তি পাঠিয়ে দেন। সাধারণ প্রদর্শনীতে ইতিপূর্বে তিনি কখনো কোনো মূর্তি পাঠান নি। এই প্রদর্শনীতে অনেক নামজাদা লোকেব আঁকা ছবি ও প্রতিমূর্তি এসেছিল, কিন্তু বিচারকেরা ফড়্কে “প্রবচন” মূর্তিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন এবং তাঁকেই সে বৎসরের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার স্বর্ণ পদক উপহার দেওয়া হয়। বোম্বাইয়ের এই সোসাইটি প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু এপর্যন্ত কোনো ভাস্করকে তাঁরা স্বর্ণ পদক পাবার উপযুক্ত মনে

করেন নি। এই পুরস্কার পাবার পরই ফড়্কে নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো, এবং সেই থেকে তাঁর গুণের আদর হোতে শুরু হলো। “প্রবচন” মূর্তিটির কল্পনা—একটি ব্রাহ্মণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে করতে তন্ময় হোয়ে গিয়েছেন। এই তন্ময়তা ফড়্কে বাটালির আঘাতে এমন ফুটে উঠেছে যে, মূর্তিটি দেখতে দেখতে বাস্তবিকই দর্শককেও তন্ময় হোয়ে যেতে হয়। বোম্বাই সহরের এই প্রদর্শনীর পর “প্রবচন” মূর্তি আসল ও নকল মহীশূর বড়োদা প্রভৃতি অনেক জায়গার প্রদর্শনীতেই দেখান হয়েছে। বড়োদার মহারাজা তাঁর রাজ্যের আর্ট গ্যালারীর জন্ত এই মূর্তিটি কিনেছেন। ফড়্কে পরে কৃষকের বিলাসিতা, শ্রীকৃষ্ণ, বংশীবাদক, আনন্দের সপ্তম স্বর্গে, অন্ধজনে দয়া কর, ইহকাল ও পরকাল (His Heart and Soul), শিবাজী, ঘড়িওয়ালা প্রভৃতি অনেকগুলি ভাল মূর্তি তৈরি করেছেন। ১৯১৪ অব্দের প্রদর্শনীর পর বঙ্গে আর্ট সোসাইটির অনেকগুলি প্রদর্শনীতে তিনি তাঁর তৈরি মূর্তি পাঠিয়েছেন এবং কয়েকবার পুরস্কারও পেয়েছেন, কিন্তু স্বর্ণ পদক তাঁকে আর দেওয়া হয় নি। সোসাইটির নিয়ম অনুসারে কোনো শিল্পীকে দু-বার স্বর্ণ পদক দেওয়া হয় না। কোনো কোনো সমালোচক বলেন যে ফড়্কে যতগুলি মূর্তি তৈরি করেছেন তার মধ্যে কৃষকের বিলাসিতা (Farmer's Luxury) নামক মূর্তিটিই সর্বশ্রেষ্ঠ; দুই-একজন বিদেশী সমালোচকও এই মতের পোষকতা করেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ফড়্কে যতগুলি মূর্তি তৈরি করেছেন তার মধ্যে ঘড়িওয়ালার মূর্তিটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই মূর্তিটি তিনি অতি অল্পদিন হোলো শেষ করেছেন।

ফড়্কে কারুর কাছে শিক্ষানবিশী করেন নি বলে একদিকে তাঁর যেমন স্ববিধা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি বিপদেরও সম্ভাবনা আছে। তাঁর মূর্তির মধ্যে ভাব-ভঙ্গীর অদ্ভুত ওতাদী দেখতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কোনো কোনো সমালোচক বলেন যে শরীরবিজ্ঞা (Anatomy) জানা না থাকার জন্ত তাঁর মূর্তিতে এই দিক দিয়ে গোল থেকে যাবার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু



অক্ষজনে দয়া কর



শিবাজী মহারাজ



ইহকাল ও পরকাল



যশোদা ও কৃষ্ণ—(মোমে তৈরি)



যত্নী-সারা সিন্ধী

কড়কে এপঘাস্ত দে রকম কোনো ভুল যখন করেন নি, কোনো ভুল করবেন এ-সব কথা বলা ঠিক সমালোচকের তখন শরীরবিদ্যা তাঁর জানা নাই কিংবা ভবিষ্যতে কাজ নয়।

শ্রী প্রেমাস্কুর আত্মা

তরুণী

ও তরুণী, তোর ঐ ছুটি স্মৃতি-পিচ্ছল চোখ,
তিমির-ভরা মন-বাসরে যোতির প্রদীপ হোক !
ও তরুণী, তোর ঐ লালিম আলতা-বরার হাসি,
কোন স্বপনের তুবুড়ি-জালা' ফুল্কি প্রেমের রাশি !
ও তরুণী, তোর ঐ বকের হাওয়া-উছল শ্বাসে,
কোন পূরবীর কান্না-করণ স্রটি ভেসে আসে !
ও তরুণী, ডালিম-লালিম তোর ঐ তরল ঠোটে,
কোন প্রভাতের সোনার লিখন কাগ মেখে' সে জোটে !

ও তরুণী, তোর ঐ কোমল আঙুর-সরস আল,
কুসুমেরই কোন লেপনে নিতুই নিটোল লাল !
ও তরুণী, রঙের শিখা সূচল আঙুলগুলি,
দমকা-কাঁপন চমকা-লহর স্পর্শে যে দায় বুলি' !
ও তরুণী, তোর ঐ ভালের আবছা-নীলের টাপ,
মেঘলা নভের সাজ-সায়রে কোন তারকার দীপ !
ও তরুণী, সব শেষে তোর এই যে হৃদয়-খানি,
কোন পীযুষে উল্লে-ওঠা, কোন প্রণয়ের বাণী !

শ্রী নোহারিকা দেবী

শুকতারা

অবিনাশদের বাড়ীতে প্রতি রবিবার আমাদের যে আড্ডা বসত—তাকে সভা বললে অভ্যুক্তি করা হয়—তাকে ক্লাব বললেও তার প্রতি অবিচার করা হয়, আসলে সেটা ছিল একটা পুরোপুরি আড্ডা। অবিনাশ জমীদারের ছেলে। হেলেবেলায় তার বাপ মারা যাওয়াতে সেই ছিল বাড়ীর কর্তা এবং বাড়ীর লোকের মধ্যে আর ছিলেন তার মা। অতএব তার বসবার ঘরে অথবা কখনো তাদের দোতলার খোলা ছাদে আমাদের যে সভা বসত তার তর্কে বা গানে বাধা দেবার কোন লোক ছিল না। আমরা সকলেই তখন কেউ পঙ্খি, কেউ বা স্তম্ভ পাশ করে বেরিয়েছি। সংসারের সঙ্গে তখনও আমাদের ভাল করে পরিচয় হয়নি। সভায় আমরা যে-সকল বিষয় সাধারণতঃ আলোচনা করতাম সে-সকল বিষয় ছিল নিতান্ত অসার, যথা প্রফেসরের পড়বার রীতি, কলেজ স্কোয়ারের বস্তাদের মধ্যে কার বক্তৃতা ভাল, ফুটবলের শিল্প পাবার সম্ভাবনাই বা কার, ইত্যাদি। তাই বলে গভীর বিষয় আলোচনা যে হতই না এমন নয়,—কিছুদিন পূর্বে সুরেশের সঙ্গে মদন-দার পাটের উপর ট্যান্ড বসান উচিত কি না এই নিয়ে যে তর্ক হয়েছিল তার ফলে মদন-দা দিন কয়েকের জন্তে আমাদের সভায় আসাই বন্ধ করেছিলেন। মদন-দা আমাদের মধ্যে বয়সে সব চেয়ে বড় ছিলেন। মানুষের মুখে যে-অরসিকেরা ‘বদন’ আখ্যা দিয়েছিল তাদের প্রতি মনে মনে আমার একটা রাগ ছিল; কিন্তু মদন-দাকে দেখলে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হতাম যে তাঁর মুখটা ছিল শুধু বদন নয়, একেবারে বদনমণ্ডল। সাদাসিধে, মোটা, গম্ভীর, প্রশান্ত লোকটি, জুলুপির উপর চশ্মার নিকেলের ডাঁট দুটো একেবারে বসে যেত। এলোমেলো খামখেয়ালিভাবে খানিকটা গালে, বেশীর ভাগ চিবুকের নীচে দাড়ি উঠেছিল, মদন-দা কেটে ছোট্ট সেগুলোকে সমানও করতেন না, বা কামাতেনও না। লোকে সচরাচর যাকে ধার্মিক বলে, তিনি ছিলেন তাই—অর্থাৎ ভক্তির বিহীনতা বা অনন্তের প্রতি একটা ব্যাখ্য ভরা সূক্ষ্ম আকর্ষণ এ-সব

কখনও তিনি অনুভব করেন নি, কিন্তু গীতা রাজযোগ কর্মযোগ প্রভৃতি বই তিনি পড়েছিলেন এবং চুকট খাওয়া, থিয়েটার দেখা, নাটক-নভেল পড়া, কি জীব-স্বাধীনতার তিনি বিশেষ বিরুদ্ধে ছিলেন। পাঁচ বছর হল তাঁর বিয়ে হয়েছিল, শুনেছি এর মধ্যে তাঁর চারটি ছেলেপিলে হয়েছে! বলা বাহুল্য সচ্চরিত্র বলে মদন-দার বিশেষ খ্যাতি ছিল। অর্থনীতিতে তিনি বিশেষ সম্মানের সঙ্গে এম-এ পাশ করেছিলেন এবং দেখেছি এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলে শেষ পর্যন্ত একটা গোলযোগ না হয়ে যেত না। আমরাও তাঁকে ও বিষয়ে ঘাটাতাম না। কিন্তু সুরেশের তো কোন কাণ্ড-জ্ঞান ছিল না,—তার পাঠ্যবিষয় ছিল Physics, সে-বিষয়ে তাকে কোন দিন একটা কথা বলতে শুনি নি, কিন্তু রুশ-সাহিত্য বল, ইণ্ডিয়ান আর্ট, বল, গ্রীকদর্শন বল, চীনদেশের ভাষাতত্ত্ব বল, যে-কোন বিষয়ে কথা উঠলেই সুরেশকে তর্কে পরাস্ত করা সোজা ছিল না। পূর্বেই বলেছি আমাদের সভার হালচাল ছিল অত্যন্ত চিলেচালা রকমের। কিন্তু যেদিন থেকে মদন-দা আমাদের আসার অবতীর্ণ হলেন সেদিন থেকেই সভার প্রকৃতি বদলাতে লাগল। সভার আইন-কানুন ঠিক হল, রিপোর্ট লেখা হ’ল। মদন-দার উপদেশ অনুসারে ঠিক হ’ল যে এক-এক দিন এক-এক জন সভ্য একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখবেন এবং তার পর আলোচনা হবে। সভার একটা নাম দেওয়া হল—আত্মোন্নতিবিধায়িনী সভা বা ঐ রকম একটা কিছু। কোথায় গেল আমাদের হাসি, উড়ো তর্ক, গান, বাজে গল্প; এবার একেবারে রীতিমত সভা। আমাদের দলে ধারা কবি বৈজ্ঞানিক বা সমালোচক ছিল তাদের কথা জানি না, কারণ তারাই ছিল পাঠক; কিন্তু আমরা ছিলাম শ্রোতা—তাই আমাদের অবস্থা ক্রমশঃ অত্যন্ত করুণ হয়ে উঠেছিল। কিছু পরিমাণ আড্ডার লোভে, কিছু পরিমাণ কাটলেট চা’র লোভে এসে আমরা একেবারে উন্নতির জাঁতাকলে পড়ে গিয়ে-ছিলাম। কিন্তু ভগবান যাকে রক্ষা করেন তাকে মারা

মদন-দারও কর্ষ নয় সেই কথাই প্রমাণ হল। হঠাৎ এক বর্ষাসঙ্কায় আমাদের সমস্ত ভাল সঙ্কল উড়ে গিয়ে আবার আমরা নিতান্ত অসার আলোচনা নিয়ে দিন কাটাতে লাগলাম এবং মদন-দাও আমাদের ত্যাগ করলেন। কি করে' আমাদের এই অধঃপতন হল তাই নিয়েই এই গল্প।

তিনটে প্রবন্ধ পড়া হয়েছিল। প্রথম প্রবন্ধ পড়ল অবিনাশ—বিষয় “আধুনিক ইওরোপীয় সাহিত্যের সহিত বাংলা সাহিত্যের তুলনামূলক সমালোচনা”। দ্বিতীয় প্রবন্ধ পড়ল আমাদের ঐতিহাসিক শ্রীপতি—বিষয় ছিল “চন্দ্রগুপ্তের নাম চন্দ্রগুপ্ত ছিল কি না?” তন্ত্র, পুরাণ, বেদ, উপনিষদ, এমন কি সন্ধির নিয়মগুলি মন্বন করে' শ্রীপতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে চন্দ্রগুপ্তের নাম চন্দ্রগুপ্তই ছিল। তৃতীয় প্রবন্ধ পড়ল স্বরেশ—বিষয় ছিল—“Economic-Biological Background of Euro-American Civilisation”। তারপর পালা ছিল মদন-দার, কথা ছিল তিনি Bimetallism সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়বেন—কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। সে দিনটা ছিল আষাঢ়ের একটা বর্ষণমুখর দিন। সমস্ত দিন বৃষ্টির পর যদিও সন্ধ্যার পূর্বে বৃষ্টি ধরেছিল, তবু আসন্ন বৃষ্টির ভাবটা আকাশ থেকে যায় নি। মদন-দার আসতে দেরি হচ্ছিল—কিন্তু সেজ্ঞা আমরা বিশেষ দুঃখিত ছিলাম না।

একবার সেই বর্ষাসঙ্ক্য-টার কথা ভেবে দেখো—মেঘভরা আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে দিগন্তের গাছ এবং ছাদগুলোর ঠিক মাথার উপরে মেঘের ফাটল দিয়ে বারে'-পড়া সূর্য্যাস্তের রঙীন আভা তখনও একেবারে মিলিয়ে যায় নি। আমরা ছাদে কেউবা চেয়ারে কেউবা চাতালের উপর খবরের কাগজ পেতে বসে' ছিলাম। ছাদের পাশে কুম্ভচূড়া-গাছের বৃষ্টি-ধোয়া পাতাগুলো ঝলমল করছিল। পাতার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে রাস্তায় চলন্ত ট্রামের আলো দেখা যাচ্ছিল। ছাদের টবে অনেকগুলো বেল-ফুল ফুটেছিল, দক্ষিণের মাতাল বাতাস হঠাৎ এসে এসে তার মাঝখানে লুটিয়ে পড়ছিল। সত্যি বলছি—সেদিন অর্থনীতি শোন্বার মত মনের অবস্থা আমাদের ছিল না।

কি সব কথা যে এলোমেলো ভাবে মনের মধ্যে আনাগোনা করছিল—বোঝাতে পারব না। সেদিনকার হাওয়ার মত আমাদের কথাবার্তাও হঠাৎ এসে অমনি এলিয়ে পড়ছিল। সত্যেন গুনগুন করে' গান ধরেছিল “এমন দিনে তারে বলা যায়।” সত্যেন গানের সব কথাগুলো জানত না, কিন্তু আমরা তাকে খামুতে দিলাম না। সে ফিরে ফিরে ছুয়ার কলি গাইতে লাগল। কথার অসম্পূর্ণতা অথবা স্বরের যেটুকু মিষ্টতার অভাব ছিল, আমাদের মনের উত্তেজনা সেটুকু পূরণ করে' নিচ্ছিল। তখনও জীবনে কোন বিশেষ নারীর আবির্ভাব হয় নি বটে, তবু যে যেটুকু জেনেছিলাম—চলন্ত স্থলের গাড়ীর জানালার ফাঁক দিয়ে নিমিষের দেখা এক জোড়া চোখ—অথবা এমনি কিছু—তারই অস্পষ্ট স্মৃতির চারিদিকে আমাদের মন ঘুরে ঘুরে গুনগুন করে' সেই কথাই বলতে চাচ্ছিল—যার ইঙ্গিত ছিল গানে, ছিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়ে বারে'-পড়া সূর্য্যাস্তের স্বর্ণ আভায়, দখিন-হাওয়ার গন্ধ-বিভোর মত্ততায়। যাদের সঙ্গে মিলন হয় নি—সাক্ষাৎও হয় নি—তাদের বিরহে ব্যথিত হয়ে উঠেছিলাম।

অমল আমাদের দলের মেম্বর ছিল বটে, কিন্তু অনেক দিন তার সাথে আমাদের দেখাশুনা ছিল না, কারণ প্রায় এক বছর হল সে তাদের গ্রামে গিয়ে বাস করছিল। সে সম্প্রতি সেখান থেকে ফিরেছে। একটা ইজিচেয়ারে অর্ধেক শোওয়া অবস্থায় সে বসে' ছিল। সে বলছিল—“আমাদের এই মাটির পৃথিবীর সঙ্গে আকাশের যে কি প্রেমলীলা চলে সে আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। গ্রীষ্মের দুপুরে দেখেছি আকাশের নিবিড় আলিঙ্গনে মূচ্ছিত ধরণী। ঝড়ের দিনে দেখেছি উন্মাদ কালো আকাশ অন্ধরোষে পৃথিবীর উপর কি অত্যাচারটাই না করে—বেন সে ঈর্ষায় পাগল, সবুজ অঞ্চলের নীচে পৃথিবীর বুকটা হুলে হুলে ফুলে ফুলে ওঠে—তারপর চোখের জলে পৃথিবীর বুক ভাসিয়ে তবে তার সে রাগ শান্ত হয়। আবার দেখেছি শরতের ভোরের বেলায় আকাশ কি মধুর করুণ ব্যাকুল স্বরে যে আহ্বান করে—সমস্ত গৃহ-কর্মের মাঝখানে থেকে থেকে পৃথিবীর মনটা বেন উদাস হয়ে যায়, তার বুকটা অকারণে দীর্ঘশ্বাসে ভরে' ওঠে—

কখনও মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে, কখনও বা চোখ জলে ভরে' আসে। বর্ষার গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে দেখেছি মেঘাচ্ছন্ন স্তব্ধ আকাশ পৃথিবীর মুখের উপর অবনত, স্নান পৃথিবী মৌন—একটা “বৌ কথা কও” পাখী উড়ে উড়ে কেবলি বলছে—“কথা কও” “কথা কও”—তারপর অকস্মাৎ আকাশ থেকে ঝর ঝর চোখের জল—সে চোখের জলের যেন আর শেষ ছিল না। এই রকম কত রূপে কত বর্ণে কত ভাবে মায়াবী আকাশ যে পৃথিবীকে তার প্রেম জানাত সে তোমাদের কি বলব। ভোরের বেলায় দেখেছি তার চাপারঙের উত্তরীয়, সূর্য্যাস্তে দেখেছি তার স্বর্ণভূষা, সন্ধ্যায় দেখেছি তার চাঁদের কিরীট, তারার মালা। পৃথিবীকেও দেখেছি—বৈশাখে সে ধূলিশয্যায় নিরাভরণা মানিনী, বর্ষায় সে পত্রপুষ্পসজ্জিতা অভিসারিকা। আমাদের এই পৃথিবী—কখন কোন্ আদিম কালে কে তাকে ঘরছাড়া করেছে—সেই থেকে রাত্রি-দিন সে কার উদ্দেশ্যে চলেছে সে নিজেই জানে না। আর আকাশ তার চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারা নিয়ে আলো-অন্ধকার নিয়ে পৃথিবীকে বলছে—প্রিয়া, প্রিয়া, সে যে আমি, সে যে আমি।” এমনি করে' অমল কখন থেমে, কখন চুকটটা মুখ থেকে হাতে বা হাত থেকে মুখে নিয়ে আপন মনে বলেন যাচ্ছিল। আমরা কখনও শুনছিলাম, কখনও বা তার কথায় আমাদের মনে বহুদিনকার ভুলে-যাওয়া দু'একটা ঘটনার স্মৃতি ভেসে আসছিল। তার পর কোন প্রসঙ্গে আকাশ পৃথিবী বর্ষা শরৎ ছেড়ে অমল কি সূত্রে যে নিজের কথা তুলল তা আমাদের মনে নেই, তবে যেই সে নিজের কথা আবৃত্তি করল অমনি আমরা সজাগ হয়ে বসলাম।

অমল বলল—দেখ, আমি যখন প্রথম প্রেমে পড়ি তখন আমার বয়স তের কি চোদ্দ—না—তারও আগে স্ত্রীবৈশাখারী একটি যাত্রাদলের ছোকরাকে বিয়ে করবার ইচ্ছা হয়েছিল, তবে সেটা বিশেষ গুরুতর হয় নি। তের বছর বয়সে প্রেমের কথা শুনে বুঝতে পারবে একটু অল্প বয়সেই পেকেছিলাম—

সুরেশ বলল—ওহে গল্পটা সত্যি ত ?

অমল বলল—আগে শোনো, তার পর প্রশ্ন কোরো—

মদন-দা এসে পড়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ শোন্বার কারও কোনরূপ আগ্রহ না দেখে গভীর হয়ে বসে' ছিলেন। তিনি বললেন—“দেখুন অমলবাবু, আমি যতদূর বুঝি, বিয়ের পূর্বে অল্প স্ত্রীলোকের প্রতি যে অনুরাগ হয়—”

সুরেশ বলল—“মদন-দা, Freud ও-সদৃশ্যে কি বলেছে সে ত—”

মদন-দা বললেন—“সুরেশ, আমার কথাটা আগে শেষ করতে দাও, আমি বলি ও-সব বিলেতে হয়ে থাকে, আমাদের দেশে—”

সুরেশ আবার একটা কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু আমরা বাধা দিলাম, বললাম—“আঃ সুরেশ, আজ আর তর্ক কোরো না—মদন-দা, আজ আমাদের ক্ষমা করুন।”

আবার আমরা চুপ করে' বসলাম—আমাদের চারিদিকে রাত্রির নিস্তরতা ঘনিয়ে এল। মদন-দাও গভীর হয়ে বসে' রইলেন। অমল আবার বলতে লাগল—এবার আর গল্পে বাধা পড়ল না। আন্তে আন্তে, থেমে থেমে সে বলছিল—মনে হল যেন সেই মেঘাচ্ছন্ন সজল সন্ধ্যায় স্নান আলোতে বহুদিন আগেকার রাত্রে'-পড়া গোলাপের পাপড়িগুলো কুড়োবার জন্তে সে তার অতীত জীবনটা হাতড়ে খুঁজছিল।

অমল বলল—আশা করি মদন-দা ও ভগবান আমাদের ক্ষমা করবেন—কিন্তু সত্যি বলছি ভালবাসায় আমি অনেকবার পড়েছি। সে ভালবাসা হুদিনব্যাপীও হয়েছে, ছুবছরব্যাপীও হয়েছে। সেগুলো প্রেম কি না, আজ তা নিয়ে তর্ক করে' কোন লাভ নেই। কোথায় যেন পড়েছি যে মানুষ ফিরে ফিরে প্রথম প্রেমের কথাই মনে আনে। আজ অনেকদিন পরে আমারও সেই প্রথমবারের কথা মনে পড়ল। সেই কথা আজ তোমাদের বলব—তবে কতটা সত্যি ঘটেছিল কতটা বা আমার কল্পনা তা এতদিন পরে আমার পক্ষে বলা অসম্ভব। তখন পড়তাম গ্রামের ইস্কুলের থার্ড ক্লাসে' কি সেকেন্ড ক্লাসে, কিন্তু ক্লাসের পাঠ্যের চেয়ে অপাঠ্যের দিকে আমার মন ছিল বেশী। ঐ বয়সেই বন্ধিম, রবিবাবু, এমনকি উদ্ভাস্তপ্রেমও পড়েছিলাম। সব যে বুঝতে

পারতাম তা নয়, তবু এটা বৃষ্টিতে পারতাম যে চাপকা-
ল্লোকে গভীর তর যতই থাক না কেন রস কণামাত্র
ছিল না। তবে সাহিত্যের অন্তরসের চেয়ে বীররসের
প্রতিই আমার ঝোক ছিল বেশী। জগৎসিংহ, হেমচন্দ্র,
মোহনলালের আদর্শে জীবনটাকে গড়ে তুলব এই ছিল
তখন ইচ্ছা—অবশ্য যুদ্ধশেষে বিজয়লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে
গ্যাসের ঝাড় এবং ইংরেজীবাদ্যের সহকারে আরও কোন
লক্ষ্মীর সাথে মিলনের লোভও আমার না ছিল তা নয়।

সে সময়টা ছিল শীতকাল। তোমরা কখনও কলকাতা
ছেড়ে বড় একটা বেরও নি বলে' বাংলাদেশের কোনও
ঋতুর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় নেই; সেইজন্তে বসন্তকাল
সম্বন্ধে তোমরা কবিতা করে' থাক। সত্যি যদি বাংলা-
দেশ দেখতে চাও তবে শীতকালে পাড়াগাঁয়ে যেও।
সে সময় বাংলার পল্লী যে কি আশ্চর্য্য শ্রী ধারণ করে তা
না দেখলে বোঝান যায় না। আকাশ থাকে নীল—
গ্রীষ্মের আকাশ যেমন কঠিন পাথরের মত নীল তেমন
নয়—কোমল নীল, তারি মাঝে মাঝে স্বচ্ছ শাদা মেঘের
স্বচ্ছ রেখা টানা। কলকাতায় আকাশকে দূরে রেখেছে
কলের চিম্নী আর গির্জার চূড়ার খোঁচা দিয়ে; কিন্তু
গ্রামে আকাশের সঙ্গে বাঁশ-ঝাড়ের নারিকেল-গাছের
মাথামাথি চলেছে অবিভ্রাম। আকাশ নেমে এসে
ক্ষেতের উপর দূরগ্রামের গাছ-গুলোর উপর একেবারে
লুটিয়ে পড়েছে। শীতের ভোরের বেলা কুমাসা কাটিয়ে
যে রোদটুকু ওঠে চাপার মত তার রং।

এমনি একটা শীতের সকালবেলায় পড়ায় ভঙ্গ দিয়ে
আমাদের অন্ধরের বাগানের কুলগাছের উপর উঠেছিলাম।
তখন আমাদের ক্লাসের পরীক্ষা হয়ে গিছিল। ফল
তখনও বের হয় নি। কিন্তু দাদার শাসনে পড়া
কামাই করবার জো ছিল না। নতুন পড়া না থাক
পুরোনো পড়া তো ছিল, আর পুরোনো পড়ার এক মজা
দেখেছি যে তার আর শেষ নেই—যতবার খুসী ফিরে
ফিরে পড়া যায়। সেই পুরোনো পড়ায় ভঙ্গ দিয়ে কুল-
গাছে উঠেছিলাম, তাই বিশেষ সাবধান হবার প্রয়োজন
ছিল পাছে দাদা টের পায় যে পড়ার ঘরে আমি
নেই। কিন্তু ছোড়দিদি ছিল। সে আমার জাইতুত

বোন—আমার চেয়ে বছরখানেকের বড়। আমরা যে
মাষ্টারের কাছে পড়তাম সেও তাঁর কাছে পড়ত—কিন্তু
সে পড়া নিতান্ত তার খেয়াল-মত চলত। রবিবার
সকালেও সাড়ে নটার আগে আমাদের ছুটি ছিল না, কিন্তু
ছোড়দিদির পক্ষে সোমবার রবিবারে কখনও কোন প্রভেদ
দেখি নি। সে যখন খুসী আসত, যখন খুসী বেণী হুলিয়ে
ভিতরে চলে যেত। তার পর মাস ছয়েক হ'ল বোধোদয়
সাহিত্যপাঠ এবং সেকেন্ড বুক প্রভৃতি গ্রন্থ শেষ করে'
তার শিক্ষা সমাপ্ত হল। তার পর সে অন্ধরে ঢুকল, আর
বড় একটা বাইরে আসত না। তখন থেকে আমাদের উপর
সে ভারি মুকব্বিয়ানা করত। তার জালায় পড়া কামাই
করে' বাগানে ঘোরা কি বাড়ীর ভিতর থাকা একেবারে
অসম্ভব ছিল। স্থল থেকে ফিরে বাড়ীর ভিতর ঢোকা
মাত্র ছোড়দিদি প্রশ্ন করত—“কি? আজ ক্লাসে কত
ছিলে? লাষ্ট নাকি?” আমরা কোনদিন এমন কোন
কাজ করতে পারিনি যা ছোড়দিদি চোখ এড়িয়েছে
বা যে সম্বন্ধে সে কিছুমাত্র বাকসংযম দেখিয়েছে। সে-
দিনও কুলগাছে পাঁচমিনিট থাকতে না থাকতেই তার
গলা শুনতে পেলাম—“সকালবেলা কুলগাছে কে রে?”
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে' উত্তর না পেয়েও শাস্ত সঙ্কট থাকবে,
ছোড়দিদির প্রকৃতি সে রকম ছিল না। কোন প্রশ্ন
মনে উদয় হওয়া মাত্র তার মীমাংসা না করতে
পাবলে তার মানসিক যন্ত্রণা হত। অতএব গাছতলায়
তার আগমন আশঙ্কা করে' গাছের উপর আত্মগোপন
করবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু ধরা পড়লাম। ছোড়দি
বললে—“কে—অমলা বুঝি?” অত্যন্ত ছেলেবেলায়
সবাই যখন আমার নামটাকে বিকৃত করতেন তখন
তাতে আপত্তি করবার বয়স আমার ছিল না—কিন্তু
তেরো চোদ্দ বছর বয়সে ও-নাম শুনলে আমার ভারি
রাগ হত। বাড়ীতে সকলে যখন আমাকে অমল বলে'
ডাকতেন, ছোড়দি তখনও ‘অমলা’ বলা ছাড়ল না।
কিন্তু আমার নামমাধুর্য্য অথবা আমার বয়সের মর্যাদা
এর কোনটাই ছোড়দি রক্ষা করবে—এ আশা করা
বৃথা। যা হোক আমি তার অনাবশ্যক প্রশ্নের কোন
জবাব না দিয়ে বেছে বেছে কুল খাচ্ছিলাম। ছোড়দি

বলল—“দাদাকে বলে’ দেব যে সকালবেলা পড়াশুনা ছেড়ে কুলগাছে ওঠা হয়েছে।” মুখে বললাম “দাও গে না” কিন্তু মনটা দমে গেল। দেখলাম ছোড়দির অভিপ্রায় ঠিক তত খারাপ নয়—সে কুল চায়। তার পর আমি কুল দিচ্ছি—সে কুড়োচ্ছে।

এমন সময় বাগানের বেড়ার ওধার থেকে মেয়েলি গলায় ডাক শোনা গেল—“টুলি”। টুলি আমার ছোড়দির নাম। ছোড়দি বাগানের দরজার কাছে ছুটে গিয়ে তাকে ডাকল—“আয় না।” আমি তাদের দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু বললাম যে আমি থাকাতে মেয়েটি আসতে দ্বিধা করছে। ছোড়দি বলল—“আরে ও আমাদের অমলা।” সে এল। অপরিচিতা মেয়েদের সামনে আমার ভারি লজ্জা করত—তাই তার মুখের দিকে তাকান আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। ছোড়দি আমায় বলল—“ভাল দেখে পাড়।” প্রথমটা সে লজ্জায় দাঁড়িয়ে রইল, তারপর একটু একটু করে’ তার লজ্জা কেটে গেল। আমি কুল পাড়তে লাগলাম, তারা পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করে’ হাসাহাসি করে’ কুড়োতে লাগল। নিজের জন্তে বেছে বেছে যে-সব ভাল কুল পকেটে জমা করেছিলাম তাও পকেট শূন্য করে’ তাদের দিয়ে দিলাম। তার পর সে চলে’ গেল—বাগানটা হঠাৎ চূপ হয়ে গেল। দিদির জিজ্ঞাসা করলাম—“ও কে?” দিদি একটা কুলের অর্ধেকটাকে কামড়ে নিয়ে বাকিটার উপর চোখ রেখে অত্যন্ত সংক্ষেপে জবাব দিল—“তোরা বো।”

এক মুহূর্তের মধ্যে আমার ভিতর-বাহির বদলে গেল। মনে হল সে যেন একান্ত আমার আপনাত। আমি দেখতে পেলাম—সে বসে’ আছে বাসর-ঘরের পাটির উপর লজ্জাবনতা হয়ে আমার আগমনের প্রতীক্ষায়। সারাদিনের উপবাসে তার মুখটি শুকিয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি আলো জালিয়ে, বাজনা বাজিয়ে—আমার মাথায় মুকুট, গলায় ফুলের মালা। যুগে যুগে আমি তাকে পেয়েছি কখনও কাল ঘোড়ার উপর চড়ে’, মস্তপুত বাঁকা তলোয়ার হাতে করে’ দৈত্যপুরী থেকে তাকে উদ্ধার

করে’—আমার সন্ধ্যায় তেপান্তরের মাঠ ধু ধু করছে—সে যেন আর ফুরোয় না—সমস্ত দীর্ঘ পথটা তার চুই ক্ষীণ বাহু দিয়ে আমাকে সে জড়িয়ে ধরেছে। কখনও বা তাকে পেয়েছি স্বয়ম্বর-সভায় লক্ষ্য ভেদ করে’ সমস্ত রাজাদের যুদ্ধে হারিয়ে। কখনও বা ঝোড়ো রাতে ভগ্ন-মন্দিরে স্তিমিত আলোকে তার সঙ্গে আমার দেখা। যে-সকল কাব্য উপহাস পড়েছিলাম সে-সব যেন তারি সঙ্গে আমার মিলন হবার অপূর্ণ কাহিনী। আশ্চর্য হয়ে গেলাম নিজের দিকে তাকিয়ে—যে আনন্দ-লোকে চিরবসন্তের দেশে প্রতাপ, জগৎসিংহ বাস করে, আমি যেন সেই দেশের অধিবাসী—প্রতাপ হেমচন্দ্রের সহচর—এই আমি! কত ভুল মনে হল দাদার শাসন আর পুরোনো পড়ার অত্যাচার। কিন্তু আনন্দের মধ্যে কোথায় যেন ব্যথা লুকিয়ে ছিল। সেই ব্যথার স্পর্শে যে আকাশ যে গাছ যে ফুলের দিকে কখনও তাকাই নি—তা এত মধুর হয়ে উঠল। চেয়ে দেখলাম—অন্ধরের পুকুরের পাড়ে গাঁদাগুলো ফুটে ফুটে আপনাকে একেবারে নিঃশেষ করে’ দিচ্ছে। উত্তরে বাতাসে পুকুরের জলের গায় কাঁটা দিয়ে উঠছে এবং তোর বেলাকার রোদ তার উপর ঝিকমিক করছে। বাগানে আল বেঁধে বেঁধে কপির চারা লাগান ছিল—বুড়ো মালী কাঁকরায় করে’ তাতে জল দিচ্ছিল। সেই জলের ধারা, ভোরবেলাকার রোদের সেই ঝিকমিকি, শিশির-ভেজা সেই ঘাস, সেই গাঁদাফুল, এমন কি সেই বুড়ো মালীর জল আনা, জল ঢালা—সব স্বন্দ পৃথিবীটা যে এত স্বন্দর তা ইতিপূর্বে কখনও চোখে পড়েনি। যা দেখি অমনি মনে হয়—কি আশ্চর্য—কি আশ্চর্য!

ছোড়দি অনেকক্ষণ চলে’ গেছে। ঘরে ফিরে এসে হঠাৎ আয়নায় চোখ পড়ল। জগৎসিংহের কথা মনে হল—একবার নিজের চেহারা ও বেশভূষার দিকে তাকিয়ে নিলাম—দেখলাম জগৎসিংহের সঙ্গে মিলল না। কাণড়টা কোমরে বাঁধা—এজন্তে মার কাছে অনেকদিন বকুনি খেয়েছি—গায়ে স্ক্যানেলের একটা সার্ট, সেও বেশী পরিষ্কার নয়—বোতামও অধিকাংশই নেই—তা হোক, কিন্তু গর্কে মনটা একেবারে ভরে’ গিয়েছিল। মনে হল

এমন বিষয়কর ঘটনা পৃথিবীতে কখনও ঘটে নি। মনে মনে স্থির করলাম যে তাকে আমি বিয়ে করবই। বোধ হল সে আমার চেয়ে বছর খানেকের বড় হবে, কিন্তু তাতে আমার কিছু আপত্তি ছিল না।

কামিনী-দাদা গ্রাম-সম্পর্কে আমার কি-রকম যেন দাদা হতেন। খবর পেলাম মেয়েটি তাঁর শ্যালী। কামিনী-দাদার নবম না দশম সন্তানের অগ্রপ্রাশনে কামিনী-দাদার শ্যালী ও খাণ্ডভী এখানে এসেছিলেন। সেইদিন থেকে কামিনী-দাদার ছেলে রাখালের প্রতি আমার মনোভাব বদলে গেল। রাখালের মন্ত মাথা, পেটভরা পিলে, বড় বড় গোল গোল দুই চোখ, কিন্তু তার গলা জড়িয়ে ধরে' সত্যি একটা তৃপ্তি পেলাম। এর পূর্বে রাখালের প্রতি আমার এত স্নেহ বেউ কখনও দেখে নি। এমন কি সকলেই জানত যে তার উপর আমাদের বিশেষ রাগ ছিল। তার কারণ যদিচ রাখুর বয়স মাত্র দশ বছর ছিল, দুঃস্থবুদ্ধিতে তার জুড়ি সে গ্রামে ছিল কি না সন্দেহ। মিথ্যে কথা এবং চুরি-বিদ্যায় সে ওস্তাদ ছিল। আমাদের মার্কেল, নাটাই, ঘুড়ির স্বতো তার জন্যে রাখাই মুন্সিল হ'ত। তা ছাড়া গুরুজনের কাছে নালিশ করতে তার মত কেউ পারিত না। রোজ অন্ততঃ বারদশেক করে' সে আমাদের নামে নালিশ করত। তার উপর সে এমনি কাঁড়নে ছিল যে তাকে কোনো দিন একটা চড় মেরেছি কি সে এমনি জ্বোরে এবং এমনি ককণভাবে আর্জিনাদ করত যে লোকে মনে করত তাকে কেউ খুনই করছে বা সেইরকম একটা-কিছু। সেই রাখালকে অবাচিত হয়ে একটা নাটাই দিয়ে ফেলেছিলাম। তার প্রতি এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক স্নেহে কেবল যে দলের লোক বিস্মিত হত তা নয়—রাখালের গোল চোখ আরো গোল হয়ে উঠত। বোধ করি তার মনে আমার মতলব সন্দেহ যথেষ্ট সন্দেহ হত, তাই বলে' দেওয়া জিনিষ নিতে সে গরুরাজী হবে—রাখালের মন এত অহুদার ছিল না। কিন্তু রাখালের কাছে যে খবর পেলাম সে অতি সামান্য। সে শুধু এই যে—তার

দিন দশেক থাকবে—আর জেনেছিলাম তার নাম। তার নাম—তোমাদের তা শুনে লাভ নেই, কারণ তার মধ্যে তোমরা কোন মাধুর্যই দেখতে পাবে না—আর আমিও আজ তাতে হয়ত কোন বিশেষত্বই দেখব না। সে অতি গ্রাম্যধরণের নাম—সরলা কি অবলা কি এই রকমের একটা-কিছু। কিন্তু তবু এও সত্য যে একদিন ঐ নামটা আমার সমস্ত ভুবন স্বরে স্বরে রাঙিয়ে দিয়েছিল।

বিকেল বেলা খেলার মন লাগত না। যে পরমাশ্রম্য অহুভূতি পেয়েছিলাম তার কাছে খেলা-টোলা তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। মন আপন মনে কেবলি বলত—“ভালবাসি—আমি ভালবাসি,” এক-একবার ইচ্ছা করত কথাটা প্রকাশ করি। কিন্তু প্রকাশ করলে তার ফল শুভ হবে কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তাই করা হ'ল না। তবে একদিন খেলার শেষে নবীনদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম—মেয়েদের কোন্ নামটা তাদের ভাল লাগে। দেখলাম এ সম্বন্ধে তাদের কিছু-মাত্র ঔৎসুক্য নেই; অবলা, সরলা কি তরলা কারো প্রতি তাদের বিশেষ পক্ষপাত দেখলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম—কাকেও বিয়ে করতে ইচ্ছা করে কি না? কোন প্রকার চিন্তা বা বিধা না করে' নবীন বলল—তার দিদির ননদকে। সমস্ত পৃথিবীতে বিশেষ করে' কেন নবীন তার দিদির ননদকে নির্দোষ করল তার কোন সন্তোষজনক কারণ সে দেখাতে পারল না, এমন কি প্রকাশ পেল তাকে সে দেখেও নি। তার দিদির ননদকে বিয়ে করতে না পারলে নবীনের হৃদয়ভঙ্গ বা ঐরূপ কোন দুর্ঘটনা যে ঘটবে এরকম মনেই হ'ল না। যত্নকে জিজ্ঞাসা করলাম, দেখলাম পাত্রীসম্বন্ধে তার মন অতি উদার—তবে তার দাদা বিয়ে করে' একটা সাইকেল পেয়েছিলেন—সেই রকম একটা সাইকেলের প্রতি তার বিশেষ লোভ ছিল এবং গড়ের বাদ্যের জন্ত তার যতটা উৎসাহ দেখা গেল কোন বিশেষ পাত্রীর সম্বন্ধে ততটা উৎসাহ দেখা গেল না। বেশ বুঝলাম, আমি যে স্বপ্নলোকে ছিলাম নবীন সতীশ প্রভৃতি তার অস্তিত্ব পর্যন্ত জানে

না। শীতের একটা সকালবেলায় তাদের ও আমার মধ্যে একটা মন্ত ব্যবধান হয়ে গেছে—তাদের নেহাৎ ছেলেমানুষ বলে' মনে হল।

সমস্ত খেলা ও গল্পের মধ্যে তাকে দেখবার ক্ষুধা ভিতরে ভিতরে আমাকে পীড়া দিচ্ছিল। আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে, দাসদের কক্ষির-বেড়া-ঘেরা বেগুন-ক্ষেতের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা একেঁ বেকে গেছে সেই রাস্তায় খানহুয়েক বাড়ীর পরেই কামিনী-দাদাদের বাড়ী। ইতিপূর্বে কতদিন সে বাড়ীতে যে গেছি তার ঠিক নেই। কিন্তু সে বাড়ীতে যেতে আজ যেন বাধছিল। তবু রাখালের খোঁজে দু'একবার গেছি। যাওয়ামাত্র রাখালের দেখা পেয়েছি, কিন্তু তার মাসীর সাক্ষাৎ যেমন দুর্লভ ছিল তেমনি দুর্লভ হয়ে গেল। আর এক আশা ছিল সে যদি আমাদের বাড়ীতে আসে। বাড়ীর ভিতরের সঙ্গে আমার বিশেষ সম্পর্ক ছিল না এক খাবার সময়ে ছাড়া। আজকাল সেখানে খন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করলাম, কিন্তু সেখানে গেলেই ছোড়দি একেবারে তেড়ে আসত, বলত “বাও, যাও, বাইরে যাও—রাতদিন বাড়ীর ভিতরে কেন?” পাছে প্রেমিকের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে এই ভয়ে তার সঙ্গে তর্ক কর্তাম না—চলে আসতে হত। এমনি করে' তাকে দেখবার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি। এমন সময়ে একদিন বিকেলে জলখাবার খেতে অন্দরে গেছি,—সচরাচর লোকে যেমন করে' চলে তেমন করে' চলা আমার অভ্যাস ছিল না,—প্রথমতঃ বারবাড়ী থেকে বাড়ীর ভিতরের পথটা এবং বাড়ীর ভিতরকার উঠানটা কতকটা লাফিয়ে কতকটা ছুটে চলতাম, তার পর সেই বোঁকে উঠান থেকে বারান্দায় একবারে লাফিয়ে উঠতাম—সিঁড়ি ব্যবহার কর্তাম না। সেদিনও তেমনি করে' সশব্দে ঝুপ করে' মার কাছে উপস্থিত হয়েই থমকে দাঁড়িয়েছি। দেখি মার কাছে বসে' একটি গিন্নীগোছের মোটা-মোটা স্ত্রীলোক—তার একগাল পান এবং গোল মোটা হাতে লাল টকটকে অনন্ত, কপালে মস্ত একটা সিঁহুরের টিপ্। তার পাশে সেই মেয়েটি আর ছোড়দি। নিজেকে কোন রকমে সম্মলে নিয়ে বারান্দায় থামের আড়ালে দাঁড়িলাম। মা বললেন, “অমু, প্রণাম কর্।”

প্রণামটা আমার ভাল আসত না। কোন রকমে সেই গিন্নীকে প্রণাম করলাম। মোটা গলায় প্রশ্ন হল, “তোমার নাম কি?” আমি বললাম, “অমল।” মা বললেন, “ভাল করে' বল্।” আমি বললাম, “শ্রীঅমলচন্দ্র বহু।” পুনরায় প্রশ্ন হল, “কোন ক্লাসে পড়?” ছোড়দিদি ফস করে' বলল, “ও থার্ড ক্লাসে পড়ে—এবার যদি পরীক্ষায় পাশ করে তাহলে সেকেন্ড ক্লাসে উঠবে।” গিন্নী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমাদের নেপাও থার্ড ক্লাসে পড়ে—না?” মেয়েটি বললে, “তুমি কি বল মা! সে আজ দু'বছর কিঞ্চিৎ ক্লাস থেকে প্রমোশন পাচ্ছে না।” গিন্নী বললেন, “তা, তার শরীর অসুখ, কি করবে? তবে তার পড়াশুনায় মনোযোগ আছে।” পড়াশুনা থেকে আমার এবং নেপার বয়সের কথা উঠল। নেপার জন্ম বৈশাখের প্রথমে না শেষে তা নিয়ে গোল বাধল, তার পর গিন্নীর মনে পড়ল যে বৈশাখের সেই যে বড় ঝড়টা হয়েছিল যাতে তাঁদের চণ্ডীমণ্ডপের চালটা উড়ে গেছিল তারি দশ দিন না না—আট দিন পরে নেপার জন্ম হয় ঢেঁকিশালার পাশের ঘরটাতে ইত্যাদি। নেপালের জন্ম-তারিখের গোলমালে সেখান থেকে চলে' এলাম। যতক্ষণ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলাম মেয়েটি তার মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে—ছিল বলে' ভাল করে' জবাব দিতে পারছিলাম না; তা ছাড়া ওসকল প্রশ্নে ভিতরে ভিতরে অপমানিত বোধ করছিলাম। কিন্তু মানি রইল না। সে আমার পক্ষ নিয়েছে বুঝলুম, সেও আমায় ভালবাসে। মনটা আনন্দে ভরে' গেল, আমি নিজেকে আর সন্দেহ করতে পারছিলাম না।

কি করে' কোন বিষয়ে পারদর্শিতা দেখিয়ে সমস্ত গ্রামের দৃষ্টি এবং বিশেষ করে' তার দৃষ্টি যে আমার দিকে আকৃষ্ট করব তাই নিয়ে কল্পনা কর্তাম। যদি সকাল হত তবে নবীন সতু প্রভৃতিকে দম্ভযুদ্ধে হারিয়ে তার মন জয় করতে পারতাম, একালেও যদি পরীক্ষায় প্রথম হতে পারতাম অথবা ম্যাচখেলায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারতাম তা হলে হয়ত সে টের পেত যে আমি নিতান্ত সামান্ত লোক নই। লোকের মুখে আমার খ্যাতি শুনে নিশ্চয়ই সে আমার জন্তে গর্বি অহুভব কর্ত। কিন্তু আমি চিরকাল মাঝারি, পরীক্ষায় জীবনে কখনও

প্রথম হই নি, খেলাতেও এমন কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারি নি যাতে করে' আমার নাম লোকের মুখে মুখে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। মনে পড়ল কিছুদিন পূর্বে আমাদের গ্রামে একটা ম্যাজিকওয়াল এসেছিল। ম্যাজিক দেখাবার দিন সন্ধ্যাবেলা গ্রামের সমস্ত লোক কি প্রশংসমান চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল। তার পর সে যখন অসম্ভব জায়গা থেকে ডিম ঘড়ি প্রভৃতি বের করতে লাগল তখন আমরা ভেবেছিলাম তার অসাধ্য কোন কাজ নেই। তার পর যে দুয়েকদিন সে লোকটা ছিল আমরা তিনচার জন পড়াশুনা ছেড়ে তার পেছনে পেছনে ঘুরেছিলাম ম্যাজিক শেখবার আশায়, কিন্তু ম্যাজিক শেখা ত হলই না, মাঝখান থেকে পড়ায় কঁাকি দেওয়ার অপরাধে দাদার কাছে অপমানিত হতে হয়েছিল। অবশ্য সে লোকটা চলে' গেলে আমরাও একটা টিনের বাক্স, একটা ভাঙ্গা ঘড়ি, নবীনের সংগৃহীত একখণ্ড অস্থি—পিসিমা বলেছিলেন সেটা নিশ্চয়ই গরুর হাড়—এই-সব দিয়ে একটা ম্যাজিক দেখাবার দল তৈরি করেছিলাম, কিন্তু দর্শকদের ইচ্ছা এবং সহযোগ না থাকলে সে ম্যাজিক দেখিয়ে তাদের আশ্চর্য্য করে' দেবার কোন উপায় ছিল না। রস্তুত তিহু টেপি প্রভৃতি দর্শকেরা যা দেখে সব চেয়ে আনন্দ পেত সে হচ্ছে—নবীনকে ডিগবাজী। যা হোক পিসিমা সেই গরুর হাড়ের কথাটা অভিভাবকদের কানে তুলে দেওয়াতে আমাদের ম্যাজিকের দল ভেঙ্গে দিতে হল। আজ মনে হল যদি সেই ম্যাজিকওয়ালার মত ম্যাজিক দেখাতে পারতাম তবে সে আমাকে ভাল না বেসে থাকতে পারত না।

এমনি করে' কয়েকদিন গেল। তার পর রাখালের কাছে খবর পেলাম যে তাঁরা চলে যাচ্ছেন—পরের দিন সকাল বেলা। স্থির করলাম যাবার আগে কোনরকমে আর-একবার দেখা করে' বিদায় নিতে হবে। বিজয়া দশমীর ভোরের বেলায় সানাইয়ের করুণ স্বর শরৎ-আকাশকে যেমন করে' কানায় কানায় বিদায়-ব্যথায় ভরে' দেয়, মনটা তেমনি করে' ব্যথায় ভরে' গেল।

পরদিন খুব ভোরে উঠলাম। নবীনকে সঙ্গে নিলাম, বললাম “চল মর্গিঙয়াকে।” ইচ্ছা ছিল সেদিন

বেশভূষার যথাসাধ্য পারিপাট্য করব। কিন্তু বাজের চাবি ছিল মায়ের হাতে—সাজসজ্জার কোন সরঞ্জামই আমার আয়ত্তে ছিল না। তবে শিশিতে স্নগন্ধি তেল ছিল, তার অনেকটা মাথায় ঢেলে চক্চকে করে' তুললাম। মাথা আঁচড়ান আমাদের নিষেধ ছিল না বটে, কিন্তু সিঁথি করা নিষেধ ছিল; কিন্তু সেদিন কে কার শাসন বারণ মানে। অনেকক্ষণ ধরে' বেশ করে' সিঁথি করলাম। পরণের কাপড়টা ময়লা হলেও কৌচা দিয়ে পরলাম। গায় সেই ফ্যানেলের সার্টটা। সার্ট ধুতির অপ্রতুল থাক, মোজা ছিল দুজোড়া। এক জোড়া নিজের লম্বা মোজা, সেটা পায় দিয়ে তার উপর আল্‌নায় পরিত্যক্ত দাদার এক জোড়া ছেঁড়া সিল্কের মোজা ছিল, সেটাও পায়ে দিয়ে নিলাম। খিড়কী দরজা দিয়ে বাড়ী থেকে বেরোলাম। বাবার সময় কোন কিছু বিষ হল না বটে, কিন্তু নব্বুনেকে নিয়ে পড়লাম মুন্সিলে। একে ত তার কাপড়-চোপড় অতি অভদ্র রকমের, তার উপর তার ইচ্ছা ছিল যে যদি মর্গিঙয়াকে যেতেই হয় তবে নদীর ধারে না গিয়ে দাসদের পুকুরের ধারে যাওয়া যাক, কারণ সেদিকে ভোরের বেলায় খেজুরের রস পাবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বেচারী নবীন আমার কাছ থেকে অনেক ঘুড়ি, সিগারেটের ছবি পেয়েছে, আজ সে কি করে' নিমকহারামী করে—অতএব চলল সঙ্গে। কিন্তু পথের ধারে যতগুলো বুনো কুলগাছ ছিল, প্রত্যেকটাতে দুচারটে ঢিল ছুড়ল এবং দুচারটে কুল কুড়োল। এমনি করে' নদীর ধারে যেতে দেরি হয়ে গেল।

উঁচু সরকারি বাঁধা রাস্তা দিয়ে নদীর বাটের দিকে যাচ্ছিলাম। রাস্তার পাশে বাঁশ-ঝাড়ের মাথার উপর তখন সবেমাত্র একটুখানি রোদ এসে পড়েছিল, অন্ধধারে দূরবিস্তৃত মাঠের শেষে ভিন্ন গ্রামের গাছের সবুজ রেখা কুয়াসায় ঝাপসা। মাঠে কলাই-ক্ষেতের উপর বড় বড় ফোঁটা ফোঁটা শিশির তখনও শুকোয় নি। মাঠের মাঝখানে ইঁটের পাজার উপর গোটা কয়েক বাবুলা গাছ। একটা মরা খেজুর-গাছের উপর একটা ঘুঘু ক্রমাগত বুক আছড়ে আছড়ে ডাকছিল। হঠাৎ নবীন তার দিকে

একটা ঢিল ছুড়ে দিল, ঘুঘুটা পাখার শব্দ করে খাড়া আকাশে উঠল তার পর খানিকটা নেমে দূরে উড়ে গেল। ক্রমে বাঁশ-ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে অস্পষ্টভাবে নদীর ইস্পাতধূসর জল এবং দূরে শাদা বালির চরটা দেখা যেতে লাগল। এমন সময়ে একখানা পাকী এল। আমরা পথ ছেড়ে দিলাম, পাকীখানা নদীর দিকে চলে গেল। পাকীর দরজার ফাঁক দিয়ে খানিকটা মাড়ী ও খানিকটা চওড়া লাল পাড় দেখতে পেলাম। আর নদীর দিকে গেলাম না। ভাবলাম সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে আমি তারি জন্তে অপেক্ষা করছিলাম। ঠাঁড়িয়ে রইলাম—নবীন কি—একটা কথা বলছিল তা আমার কানেও পৌঁছল না। খানিকক্ষণ পরে দেখি রাখাল আসছে। এক হাতে একটা হারিকেন লঠন, আর-এক হাতে একটা মুখে-সরা-বাঁধা হাঁড়ি, পিঠে একটা ছোট পুটুলি। কোন রকমে মাঝে মাঝে থেমে, জিনিস নামিয়ে হাত বদলে এবং নিজের বারংবার খসে পড়া কাপড়ের বাঁধ বারবার এঁটে সে আসছিল। জিজ্ঞাসা করলাম—“রাখু—পাকীতে কে গেল রে?” সে বললে—“দিনিয়া।” “আর তোর মাসীমা?” “তিনি অনেকক্ষণ আগেই গেছেন।”

অমল চূপ করল।

আমি বললাম—তার পর?

সে বলল—তার পর আর কিছু নেই।

—সে কি হে?

সে বলল—তার দিন সাতেক পরে একটা ক্রিকেট ম্যাচ, নিয়ে এমন মেতে গিয়েছিলাম যে ও ঘটনা ভুলেই

গেলাম। এমন কি রাখালকে যে নাটাইটা দিয়েছিলাম সেটাও ফিরিয়ে নিলাম।

স্বরেশ জিজ্ঞাসা করল—আর কখনও তাঁকে দেখেছ?

অমল অনেকক্ষণ ধরে একটা চুফট ধরাল। দেশলাইয়ের আলোতে তার চশমার কাঁচ দুটো চক্ চক্ করে উঠল। তার পর থেমে বলল—“পরশু দিন দেখে এসেছি—ওজনে ছুমনের উপরে এবং চার পাঁচ ছেলের মা। আর স্বরেশ এবং মদনদা তর্ক আরম্ভ করবার পূর্বে আমি শুধু এই কথা বলে রাখতে চাই যে যে-মনোভাবের ইতিহাস তোমাদের বললাম—সেটা মোহ হতে পারে, কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারি সেটা রূপজ মোহ নয়, দ্বিতীয়ত আমি প্রথম থেকেই বিয়ে করতে প্রস্তুত ছিলাম অতএব ওটাকে অবৈধ বা অগ্নায় বলাও ঠিক হবে না।”

কিন্তু তর্ক করবার কারও প্রবৃত্তি ছিল না। যেমন চূপ করে বসে ছিলাম আমরা তেমনি বসে রইলাম। অমল গল্প শেষ করতেই খেয়াল হল যে সমস্ত পাড়া অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। দেখলাম সমস্ত আকাশ একেবারে নির্মল—কৃষ্ণচূড়া গাছটার ঠিক উপরে কৃষ্ণ-পক্ষের বাঁকা চাঁদ স্বপ্নের মত ক্ষীণ সুদূর আর আকাশময় ছড়ানো তারা। তার পর হঠাৎ সুনীল গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বলল—“সাড়ে দশটা বেজে গেছে আর ট্রাম পাবার আশা নেই—সমস্ত পথটাই হাঁটতে হবে।”

অমলের গল্পে আমরা সবাই বিরক্তি বোধ করছিলাম বটে, কিন্তু মদন-দা সত্যি সত্যি রাগ করলেন, তিনি সেই থেকে আমাদের ত্যাগ করলেন।

শ্রী কিরণশঙ্কর রায়

গোয়ালিয়র দুর্গ

“গোয়ালিয়র দুর্গ” কাতোয়ারের সূর্য্যসেন নামে এক রাজার দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল জানা যায় ; কিন্তু এই সূর্য্যসেন যে কোন্ সময়ে ইহা নির্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা নির্দ্ধারণ করা অতিশয় কঠিন। বিল্‌ফোর্ডের মতে গোয়ালিয়র দুর্গ ৭৭৫ খৃষ্ট-পূর্বের।^১ থজা রায় বলেন দুর্গটি প্রায় কলিযুগের প্রারম্ভের (৩১০১ পূর্ব খৃষ্টাব্দ)। ফজল আলির মতে ইহা বিক্রম ৩৩৯ অব্দে (২৭৫ খৃষ্টাব্দে) নির্মিত হইয়াছিল। হীরামনও ঐ সময়টি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।^২

আমরা দুর্গমধ্যস্থিত “চতুর্ভুজ” মন্দিরের শিলা-লিপিতে (খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী) ছনবংশীয় মিহিরকুলের নাম দেখিতে পাই। “শাশ-বহু”র মন্দিরে একটি একাদশ শতাব্দীর শিলালিপি আছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় গোয়ালিয়র দুর্গ ২৭৫ খৃঃ হইতে কচ্ছ-বাহাদিগের অধীনে ছিল। মাঝে মাঝে কিন্তু তাহাদেরও স্বাধীনতা-সূর্য্য অন্ত যাইত, কারণ, শিলা-লিপি হইতে জানা যায় তোমরবংশীয় রাজা ভোজ-দেব (বিক্রম ৯৯৩ অব্দ) ৮৭৬ হইতে ৯০০ খৃঃ অবধি ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। “গোয়ালিয়র-নামা” এই তোমর-বংশের ছত্রিশটি রাজার উল্লেখ করিয়াছেন।^৩ ১০২৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ গজনী ‘গোয়ালিয়র দুর্গ’ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিফলযত্ন হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন।^৪ তাহার পর ধোলারায়ের নাম পাওয়া যায় (বিক্রম ১১৯৩, খৃঃ ১০৩৬)। ইনিই এই বংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন। তিনি নিজের ভাগিনেয় পরমলদেব পরিহারকে দুর্গের ভার দিয়া বিবাহ করিতে যান। ভাগিনেয় মামাকে আর দুর্গটি প্রত্যর্পণ কবে নাই। সেই অবধি ১০৩ বৎসর পর্য্যন্ত ‘গোয়ালিয়র দুর্গ’ পরিহার-বংশীয় রাজার অধীনে ছিল। কচ্ছবাহা

বংশীয়গণ আর হৃত দুর্গ পুনরায় পাইলেন না। ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে কুতুবউদ্দীন আয়বগ “গোয়ালিয়র দুর্গ” অধিকার করিলেন।^৫

১২১০ খৃষ্টাব্দে হিন্দুদিগের সৌভাগ্যসূর্য্য পুনরুদিত হইল, তাঁহারা দুর্গটিকে পুনরায় অধিকার করিলেন এবং ১২৩২ খৃঃ অবধি আবার পরিহারগণই দুর্গের অধীশ্বর হইয়া রহিলেন। ১২৩০ খৃষ্টাব্দে আল্‌তামশ গোয়ালিয়র দুর্গের প্রতি অভিযান করিলেন ও অতি কষ্টে দুর্গ আক্রমণ করিতে সক্ষম হন।^৬

বন্ধুবার শ্রীযুক্ত বী আর ভালেরাও (Historical Researcher Gwalior State) একটি অতি পুরাতন



গোয়ালিয়র দুর্গের পথের বাটী

হস্তলিপি পাইয়াছেন।^৭ লিপিটি এখনও প্রকাশিত হয় নাই। কীটদষ্ট হইয়া লিপিটি অনেক স্থানে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পুস্তকটির নাম “গোপাচলাখ্যান”। এক স্থানে পড়িয়া দেখিলাম আল্‌তামশ দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন, দুর্গাধিপতি রাণা সারঙ্গদেব বাধাদানের চেষ্টা করিতেছেন,

১ Brigg's Ferishta, I., p. 202.

২ Cunningham's A. S. I. Vol. II, p. 381.

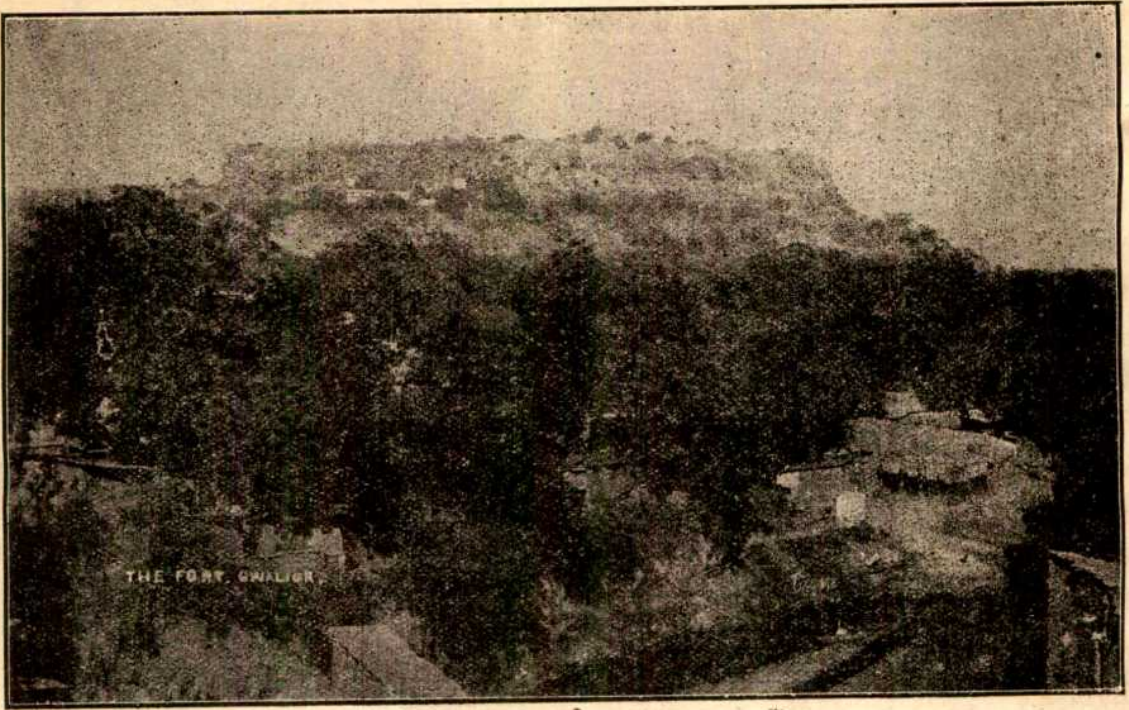
৩ এই অবধি সর্বস্বত্ব তিনটি হস্তলিপি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। প্রথমটি উর্দু ভাষায় “গোয়ালিয়র-নামা”, দ্বিতীয়টি পার্শী ভাষায় “কুন্নিয়াদ-গোয়ালিয়রী” এবং তৃতীয়টি হিন্দি ভাষায় “গোপাচলাখ্যান”।

১ Asiatic Society's Researches, IX., p. 213.

২ Cunningham's A. S. I., Vol. II., p. 371.

৩ “গোয়ালিয়র-নামা” এইটি উর্দু ভাষায় লিখিত হস্তলিপি।

৪ Hunter's Imperial Gazetteer of India



গোয়ালিয়র দুর্গ

কিন্তু ফল কিছুই হইতেছে না। তিনি যখন রাজাদিগকে পরাজয়বাস্তা জানাইতে গেলেন তখন ভারতের বীর নারীগণ বলিতেছেন :—

“পহিলে হামকো জোহর পারী,
তব তুম জুঝ কন্ত সস্তারী।”

রাণা ইহাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। তাঁহার রাজ্যীরা বিজৈতার হস্তে পতিত হইয়া সম্রাটের অন্তঃপুরে প্রেরিত হওয়া অপেক্ষা তাঁহাদের মৃত্যুই শ্রেয় মনে করিয়া রাজপুত্রের চিরগৌরব জোহর ত্রতের অহুষ্ঠান করিলেন; বিশালকায় মহাচিত্তা প্রজলিত হইল, কুলান্দনাগণ প্রফুল্ল আননে সেই দৃশ্যচিতায় প্রাণাহুতি দিলেন।

ইহার পর প্রায় দীর্ঘ একশত বৎসর কাল “গোয়ালিয়র দুর্গ” মুসলমানদিগের অধীনে ছিল। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে তৈমুরলঙ্গ ভারত লুণ্ঠন করিতে আসিলে হিন্দুরা নষ্ট দুর্গ পুনরুদ্ধারের উহাই পরম এবং চরম স্বযোগ বুঝিয়া নিরীক্সবাদে দুর্গ অধিকার করিলেন। তোমরবংশীয় বীর-

সিংহদেব স্বাধীনভাবে “গোয়ালিয়র দুর্গের” অধীশ্বর হইয়া রহিলেন।^৪

১৪০২ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেব দুর্গেশ্বর ছিলেন। ১৪২৪ খৃঃ দুর্গটি ডুঙ্গরসিংহের অধীনে ছিল। তিনি নরবরের দুর্গ জয় করিবার মানসে অভিযান করিলেন। নরবরের দুর্গ তখন মালবাধিপতি সুলতান মহম্মদের অধীনে ছিল। তিনি ফৌজ সহ ডুঙ্গরসিংহের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িলেন, নিজের দুর্গটিও হাতছাড়া হয় দেখিয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন।^৫

ডুঙ্গরসিংহ ভাস্কর্য্য (Rock-Sculptures) অতিশয় ভালবাসিতেন। “গোয়ালিয়র দুর্গে” পর্বতগাত্রে খোদিত মূর্তিগুলি তাঁহারই সময় নির্মিত হইতে আরম্ভ হয়। তাঁহার পর কিরণ সিংহ এবং তাঁহারও মৃত্যুর পর রাজা

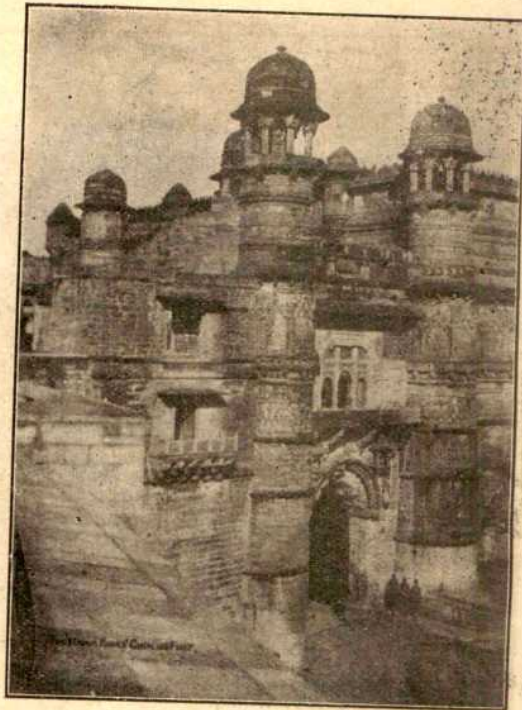
৪ Brigg's Ferishta., I., p. 502.

৫ Ibid., IV., 205.

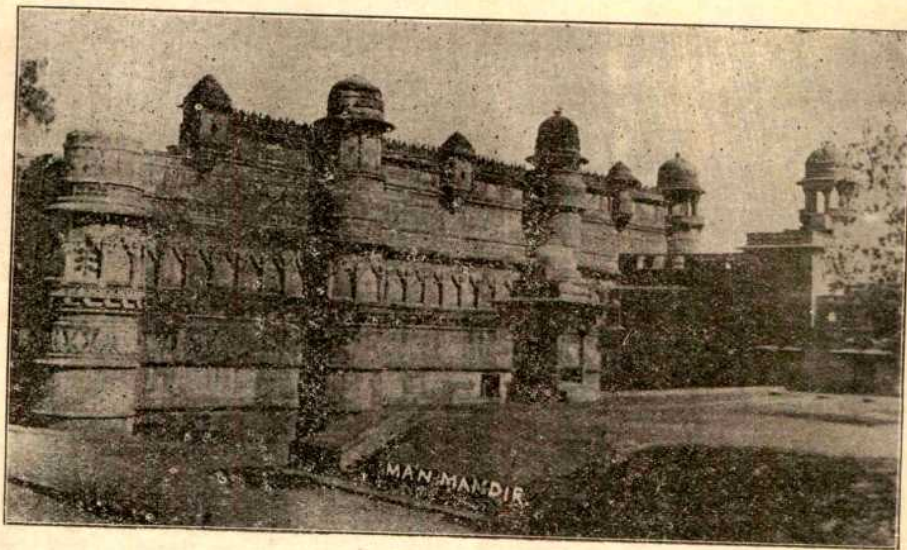
কল্যাণমল “গোয়ালিয়র দুর্গ” সাত বৎসর অবধি নিজ দখলে রাখেন।^{১০}

রাজা মানসিংহ কল্যাণমলের পুত্র। তিনি ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে দুর্গাধিপতি হইলেন। তিনিই “মান-মন্দির” ও “গুজরী মহল” নির্মাণ করাইয়াছিলেন—এখনও তাহা বর্তমান আছে। সেকেন্দর লোদী তাহার সেনাপতি আজীম হুমায়ুনকে “গোয়ালিয়র দুর্গ” জয় করিতে পাঠান। তিনি বহু কষ্টে ১৫২২ খৃষ্টাব্দে দুর্গটি জয় করিলেন।^{১১} এতদিন পরে “গোয়ালিয়র দুর্গের” স্বাধীনতাখ্য চিরদিনের জন্ত অন্তিমিত হইল।

খৃঃ ১৫২৬ অবধি “গোয়ালিয়র দুর্গ” লোদীবংশের অধিকারে ছিল। ১৫২৬ খৃঃ ২১এ এপ্রিল দিল্লীর উত্তরে পাণিপথ-ক্ষেত্রে, বিজয়-লক্ষ্মী মোগলদিগের উপর প্রসন্ন-হাস্ত বর্ষণ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে লোদীবংশ দিল্লীর সিংহাসন হইতে চিরদিনের জন্ত অপসারিত হইল,—মোগল সম্রাট বাবর সমগ্র হিন্দুস্থানের অধীশ্বর হইলেন। বিজয়গর্ভিত মোগল “গোয়ালিয়র দুর্গ” অধিকার করিল।



গোয়ালিয়র ফাটক ও হাওয়া পাহাড়



গোয়ালিয়রের মান-মন্দির

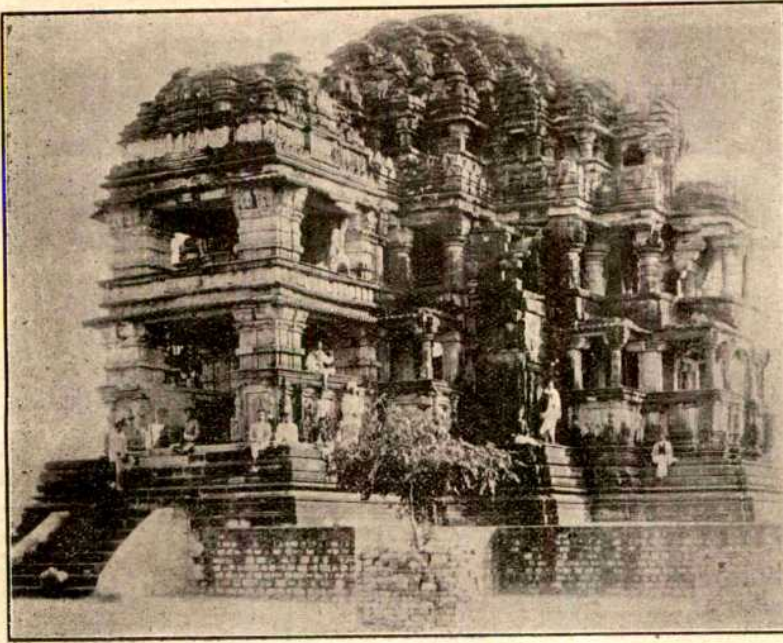
10. Niamatulla's History of the Afghans, by Doru, pp. 51-53 and Brigg's Ferishta, I., p. 557-559.

11. Fazl Ali's MSS. Niamatullah's Afghans, p. 74, and Brigg's Ferishta, I., p. 594

দেই অবধি দিল্লী হইতে যাহাদের নিকীচন করা হইত তাহারাই প্রতিনিধি স্বরূপ দুর্গাধিপতি হইতেন।^{১২}

মাকো শেরশাহ হুমায়ুনকে বিতাড়িত করিয়া ১৫৪২

12. Baber's Memoirs, by Erskine, p. 308.



গোয়ালিয়র দুর্গে শাশ-বহর মন্দির

খৃষ্টাব্দে দুর্গটি নিজের অধিকারে রাখিলেন। শেরশাহের স্ত্র-বংশীয় বাদশাহদিগেরও আধিপত্য অধিকদিনস্থায়ী হয় নাই,—১৫৭০ খৃষ্টাব্দে আকবর সাহ দুর্গটি আবার জয় করিলেন।^{১৩} মোগলদিগের জ্যোতি ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে গোহাদের জাট রাজা পুনরায় দুর্গ অধিকার করিলেন।^{১৪} তাহার পর “গোয়ালিয়র দুর্গ” মহারাট্টাদিগের অধীনে আসিল।

এখনও অনেকে জানেন না কবে এবং কেমন করিয়া “গোয়ালিয়র দুর্গ” প্রথমে মহারাট্টাদিগের করায়ত্ত হইল। “গোয়ালিয়র গেজেটিয়রে”^{১৫} যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা একেবারে ভিত্তিহীন। গেজেটিয়রের লেখক মহাশয় বলিতেছেন—“১৭৬১ খৃঃ গোহাদের রাণা লোকেন্দ্র সিংহ “গোয়ালিয়র দুর্গ” জয় করেন, কিন্তু তাঁহার প্রাধান্য অধিকদিন স্থায়িত্ব লাভ করিল না,—মহাদজী

সিদ্ধিয়া ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া বিতাড়িত করিয়া দিলেন। দুঃখের বিষয় মহাদজী সিদ্ধিয়া কিংবা লোকেন্দ্র সিংহ দুজনের মধ্যে সে সময় একজনও ছিলেন না। প্রিন্স্ বলবন্ত-রাও^{১৬} “গোয়ালিয়রনামা” অলুবাদ^{১৭} করিয়াছেন, তাহা হইতে যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাও বোধ হয় ঠিক নয়। ‘গোয়ালিয়রনামা’র কবি বলিতেছেন, পেশবার সেনাপতি বিনচুরকর গোয়ালিয়র হইয়া দিল্লী যাইতেছিলেন, পথে সহসা জাট-ফৌজ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া কতিপয় মহারাট্টা

সৈন্যকে দুর্গে রুদ্ধ করিয়া রাখে। বিনচুরকর দিল্লী না গিয়া “গোয়ালিয়র দুর্গ” আক্রমণ করিলেন, যুদ্ধে রাণার মৃত্যু হইল ও দুর্গে মহারাট্টাদিগের গেকর্য্যারঞ্জিত পতাকা উড়িল।’

“গোপাচনাখ্যান” পড়িয়া আমরা যাহা অবগত হইয়াছি তাহা বোধ হয় বিশ্বাসযোগ্য। ‘পেশবার সেনাপতি’ বিঠঠলরাও বিনচুরকর যখন গোয়ালিয়র দুর্গ অবরোধ করেন তখন দিল্লী-সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপ কসোরআলি খাঁ দুর্গের স্ববাদের ছিলেন। স্ববাদের মহাশয় গোহাদের রাণা ভীমসেনের সাহায্য প্রার্থী হইলেও কিছুই কাজ হয় নাই। রাণা যুদ্ধে হত হইলেন এবং মহারাট্টাগণ বিক্রম ১৭৮৪ আশ্বিন, ৬ই আগষ্ট ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে দুর্গ জয় করিলেন।

বিনচুরকর প্রায় সতের বৎসর অবধি দুর্গের প্রতিনিধি স্বরূপ অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কে একজন রঘুনাথ রাও বলিয়া দুর্গের মালীক হন। তাঁহারই সময় ‘গোয়ালিয়র দুর্গ’ গোহাদের রাণা হত

13. Cunningham's A. S. I., Vol II., p 394.

14. Ency. Brit, Vol. XII., p. 794.

15. Hunter's Imperial Gazetteer of India

16. Gwalior Gazetteer, By Captain, C. E. Luard, M. A.

17. ইনি বর্তমান মহারাজের অগ্রজ।

18. Translated in English.



মহাদজী সিন্ধিয়া

এই দ্বারা অবরুদ্ধ হয়, কিন্তু তাঁহাকে বিফল মনোরথ হইয়া পলায়ন করিতে হয়। অবশেষে কর্ণেল পোফামের সাহায্য লইয়া রাণা দুর্গ চড়াই করিলেন।^{১০} এবং কয়েকমাসব্যাপী যুদ্ধের পর ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগষ্ট দুর্গ অধিকার করিলেন। ১১ মাস পর্যন্ত ইংরেজ দুর্গটিকে নিজের হাতে রাগিয়া গোহাদের রাণাকে পুনরায় প্রত্যর্পণ করিলেন।

২২ মার্চ ১৭৭৭ খৃঃ মহাদজী সিন্ধিয়া পেশবার নিকট হইতে গোয়ালিয়র দুর্গ এবং ১০০ লক্ষ রোপা-মুদ্রা পাইলেন। দুর্গটি কিন্তু তখনও গোহাদের রাণার অধিকারে। মহাদজী সিন্ধিয়া নিজের সেনাপতিদ্বয় খাণ্ডেরাও হরি এবং আঘোজী ঈন্দ্রলেকে গোহাদে পাঠাইলেন।^{১১} অতি কষ্টে অবশেষে মহাদজী ৩১এ



দৌলতরাও সিন্ধিয়া



মহারাজ জিয়াজিরাও সিন্ধিয়া—(বর্তমান মহারাজার পিতা)

19. Cunningham's A. S. I., Vol. II., p. 395.

20. Gwalior Gazetteer, By Luard.

জুলাই ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে গোহাটের রাণাকে পরাজিত করিয়া দুর্গ অধিকার করিলেন। যে দিবস তিনি দুর্গটি নিজের অধীনে পাইলেন সেই দিবসই কোটেশ্বরে শিব-মন্দির স্থাপন করিলেন।^{২১}

১৭৮৩ খৃঃ হইতে ১৮০৪ খৃঃ পর্যন্ত দুর্গটি দিক্খিয়ার অধীনে রহিল। খাণ্ডেরাও হরির মৃত্যুর পর আশোজী ঈশ্বরে স্বাধার নির্বাচিত হইলেন। তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সেনাপতি হোয়াইটকে ১৮০৫ খৃঃ^{২২} নির্কিভাবে দুর্গটি অধিকার করিতে দেন। সেই বৎসরই দৌলতরাও দিক্খিয়া ইংরেজদের নিকট হইতে দুর্গ পাইলেন।^{২৩}

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গোয়ালিয়র দুর্গ মহারাট্টাদিগের অধিকারে ছিল। মহারাজপুর এবং পানহারের যুদ্ধের পর ইংরেজ অফিসারের অধীনে দেশীয় ফৌজ এই দুর্গে অবস্থান করিত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীদিগের হাতে দুর্গ পড়িল। সার্ব হিউ রোজ ১৮৫৭ খৃঃ ১৭ই জুন দুর্গ অধিকার করিলেন।^{২৪} পরে ১০ই মার্চ ১৮৮৬ খৃঃ ঝাঁসি ইংরেজদিগকে দিয়া তৎ-পরিবর্তে মহারাজা জিয়াজিরাও “গোয়ালিয়র দুর্গ” লইলেন। পরিশেষে দিক্খিয়াবংশ “গোয়ালিয়র দুর্গে” পুনরধিষ্ঠিত হইলেন।^{২৫}

ফনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

21. Life of Deo Maharaj—A famous and respected sanyasi of the “Koteswar” temple.

22. Baber's Memoirs, by Erskine, p 384.

23. Cunningham, A. S. I. Vol. II, p. 395.

24. H. N. S. I., Vol. I., p. 361.

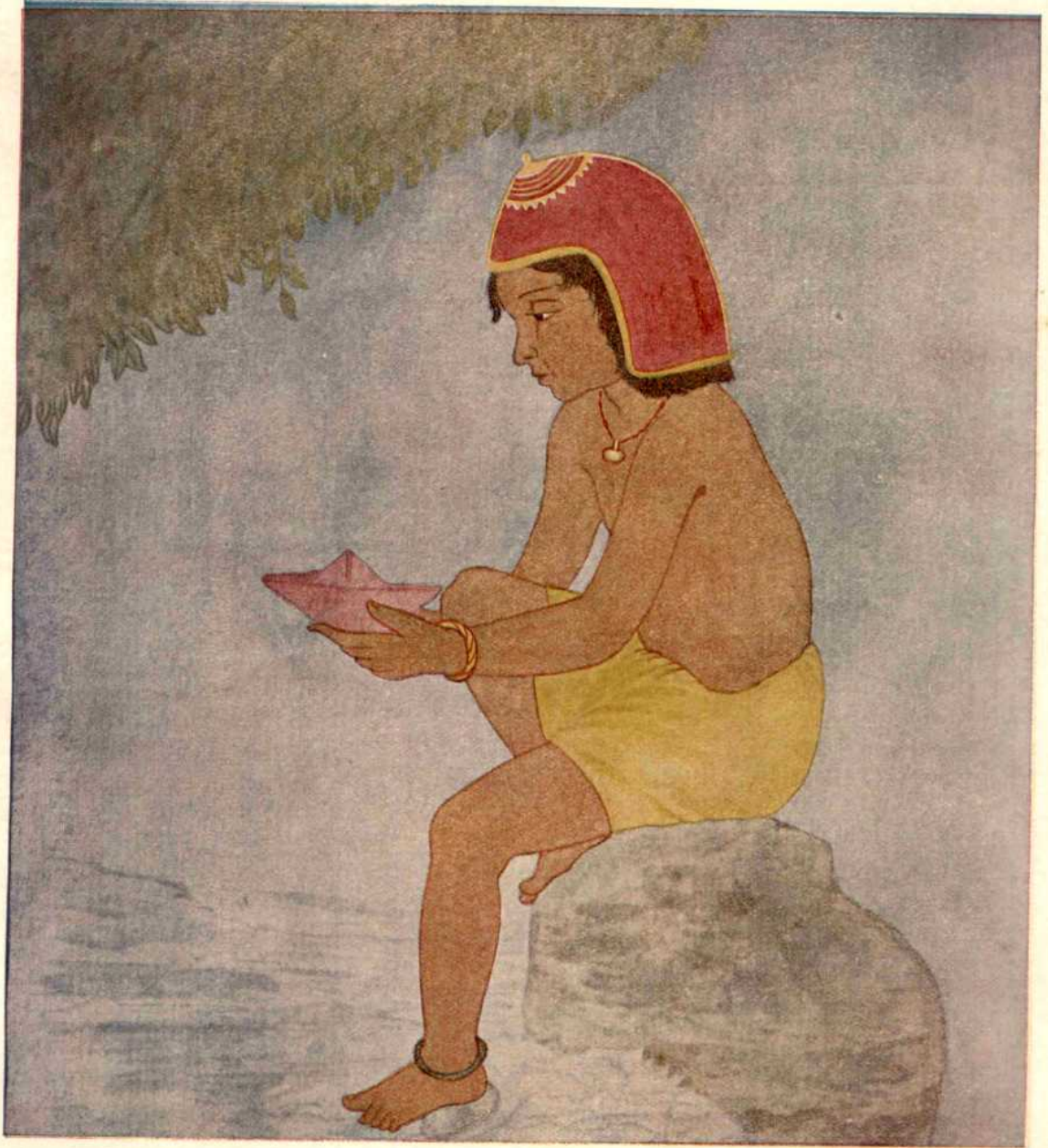
25. H. N. S. I., Vol. I., p. 363.

চিরন্তনী

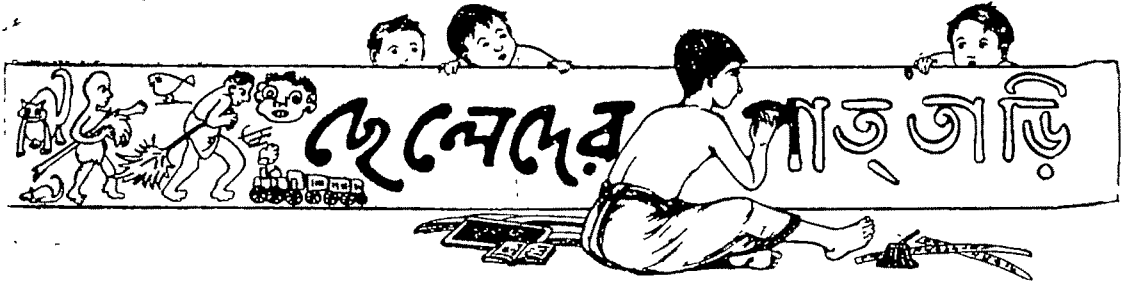
এই যে আমি,—এই যে জীবন, প্রতি নিমিষের,
পলে-পলে চলছে টেনে এই চলারি জের,
নিত্য-দিনের খণ্ডতারে রাংছে যে এ গেঁথে
সঞ্চয়েরি একটি পুরে,—একটি স্বরে বেঁধে ;
জীবনের এই ছন্দেতে হাম পড়বে কোথা যতি !
গ্রন্থি-কোথা এই মালিকার ? কোথায় পরিণতি !
লক্ষবছর আগের জীবন এই জীবনের বৃকে
এর চেতনায় কাঁপছে আজো, এরি স্বথে-দুখে !
মৃত্যু-মাঝে হয়নি'ক তার একটুখানি লয়,
মরণ, সে তার জীবনেরেই করেছে অক্ষয় ;
ফুলের ব্যথাই মরণপারে ফলের বৃকে জাগে,
ফল, সে মরে' ফুলের জীবন দেয় ফিরিয়ে তা'কে,—

এম্নিতর বিনিময়ের প্রেমের মেলা-মাঝে
নিত্যকালের জীবন যে গো অমর হয়ে' আছে ;
তাইত আজি মনের বনে যে-ফুল ফুটে মোর
গন্ধে সে তার, চির-যুগের সাধের স্বপন-ঘোর,
তাইত গো আজ আমার গানের স্বরের মঞ্জুঘাতে
পড়ল ধরা বিশ্ব আপন অনন্ত-প্রাণ সাথে !
আমার এ প্রাণ নয় একেলা,—সুদ্রতারি মাঝে,
বক্ষে এ মোর নিখিল-মেলা, অনন্ত প্রাণ রাজে !
চির-কালের এই আমি যে আদিম পুরাতন,
চিরন্তনী-লীলার মাঝে নিভুই গো নূতন !

শ্রী হরীকেশ চৌধুরী



কাগজের নৌকা
চিত্রশিল্পী—শ্রীমতী শান্তা দেবী



রাজাড়ে ভোর

রাজা-মশাইকে সমস্ত দিন বেজায় খাটতে হয়, রাত দুপুর পর্যন্তও তাঁব খাটনিব কমি নেই। এত খেটে খুটে অনেক রাস্তিরে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন, সে ঘুম ভাঙতে তাঁর অনেক বেলা হয়ে যায়। বোজ্ঞ তিনি যে সময়ে ওঠেন, ছেলেরা স্থল থেকে সে সময়ে কিরে আসে।

রাজা-মশাই দেখেন, দিনটা বেই ফুবিযে আসে, সূর্য্যদেব অম্নি আকাশের পশ্চিম দের দিয়ে কোথায চল' যান, তার পরেতেই চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। পরের দিন উঠে দেখেন সূর্য্য প্রায় মাথার কাছাকাছি! এ ব্যাপারটা তাঁব কাছে বড় আশ্চর্য্য ঠেকলো। আচ্ছা, সূর্য্য ত ডুবে যায়, কিন্তু আবার আসে বোথা থেকে? কখনই বা আসে? রাজা-মশাই ত কোন দিন সকালে ওঠেন নি, তিনি সূর্য্য উঠতেও দেখেন নি।

একদিন তিনি রাজসভায় মন্ত্রীদের ডেকে তাঁব মনের এই খট'ার কথা বলে' ফেলেন। মন্ত্রীরা শুনে বলেন, “মহারাজ, সূর্য্য-ঠাকুর বোজ্ঞ ভাব বেলা পূব দিক দিয়ে ওঠেন, তখন তাঁকে দুপুর বেলায় মত অত উজ্জ্বল দেখায় না, তখন তাঁর রংটি চমৎকার লাল, ঠিক সন্ধ্যা-বেলায় মত।”

শুনে রাজা-মশাই আরও আশ্চর্য্য হলেন। কই, তিনি ত কোন-দিন সূর্য্য উঠতে দেখেন নি! মন্ত্রীরা বলেন, “মহারাজ, আপনি যদি আব একটু সকালে ওঠেন, তবে সূর্য্যোদয় দেখতে পান।”

বেশ। রাজা-মশাই ঠিক করলেন যে, তার পবদিন খুব সকালে উঠবেন। কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না। তাঁর বেলায ওঠা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, তিনি কি আব ইচ্ছে করলেই ভাবে উঠতে পাবেন?

উপায়? মন্ত্রীরা বলেন, “মহারাজ, শোবার সময়ে বাড়ীর কাউকে বলে' দেবেন, যেন খুব সকালে আপনাকে জাগিয়ে দেয়।”

তাতেও হল না। তিনি সকাল বেলাটা এম্নি বেহ'স্ হয়ে ঘুমুলেন যে রাজবাড়ীর ঝি, চাকর, মেয়ে, ছেলে, কেউই তাঁকে জাগাতে পারলে না। সে-দিনও তাঁর ঘুম ভাঙতে অনেক বেলা হয়ে গেল।

রাজা-মশাই জেগে যখন দেখলেন যে সূর্য্য একেবারে মাথার উপর, তখন তাঁর ভাবী বাগ হ'ল। তাঁব মনে হ'ল মন্ত্রীরা তাঁকে মিথ্যে কথা বলেছে, সূর্য্য কখনও পূব দিক দিয়ে ওঠে না, আকাশের ওই মাঝখানটাতেই হঠাৎ ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ে!

বাড়ীর লোকেরা বলে, সকলেই চেঁচা কবেছিল, কিন্তু রাজামশায়ের ঘুম ভাঙতে পাবা যায় নি।

রাজা কাকর কথা বিশ্বাস করলেন না। সকলে মিলে কেন তাঁকে ঠকাচ্ছে, তিনি সকলের কাছে কৈকিযং চাইলেন।

রাজ্যে হলুস্থল পড়ে' গেল! মন্ত্রীদের বুদ্ধি গর্দান্ যায়! রাজবাড়ীব কারব কাঁধে বুদ্ধি আর মাথা থাকে না! অনেক ভেবে চিন্তে বুড়ো-মন্ত্রী রাজার কাছে গেলেন। তিনি ভয়ে ভয়ে রাজা মশাইকে বলেন, “রাজা-মশাই, এমন করে' হবে না। রাজ্যে ঢোল পিটিয়ে দিতে হুজুম দিন, যে আপনাকে সূর্য্যোদয় দেখাতে পারবে, তাকে হাজার আস্বকি পুস্কার, কিন্তু না পারলে তার গর্দান নেওয়া হবে।”

তখাস্ত। রাজ্যে ঢোল পিটানো হ'ল। কিন্তু কথা শুনে কাজটা করতে আসতে কাকর সাহসে কুলোল না। দু'দিন গেল। রাজা-মশায়ের সূর্য্যোদয় দেখা বুদ্ধি আর এ জীবনে হ'য়ে উঠলো না।

তৃতীয় দিনে একজন লোক এল। সে লোকটা নাকি বেজায় চালাক। সে রাজাকে জানালে, “মহারাজ, আমি আপনাকে সূর্য্যোদয় দেখাবই দেখাব।”

রাজার আহ্লাদ আজ আব দেখে কে? তিনি তোল শিটিয়ে রাজ্যে প্রচার কবে’ দিলেন যে তার পরদিন সূর্য্য উদয় হতে দেখে সমস্ত দুঃখীপ্রজাকে রাজবাড়ীর সামনে বস্তু দান করবেন। সমস্ত লোকে যেন ভোর বেলাই রাজবাড়ীতে এসে হাজির হয়।

লোকটা এক নতুন উপার ঠাউরেছিল। সমস্ত রাত সে মহারাজার বিহানাব কাছে বসে’ তাঁকে জাগিয়ে রেখেছিল। প্রথমতঃ নানান রকম গল্প করে’, পবে হাসির কথা বলে’ সে রাজাকে ঘুমোতে দেয় নি। ভাব প্রায় হয়ে এসেছে। লোকটা ভাবলে, আর ভয় নেই, এইবাব নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, আধ ঘণ্টাব মধ্যেই সূর্য্য উঠে পড়বে। সে খালি খালি পূব দিকে তাকাতে লাগলো—আর একটু হলেই হয়।

তার পরেতেই চতুর্দিক লাল রঙেতে ছুপিয়ে দিয়ে সূর্য্যদেব একটুপানি উকি মারলেন। বাস, শেষকালে সে সফল হ’ল।

কিন্তু ও কি? রাজা মশাই যে ঘুমে অচেতন! হায়! হায়! সমস্ত রাজ্যের খাটুনি বুঝি পণ্ড হ’ল! শেষেব দিকে সূর্য্যোদয় দেখবাব জন্তে একটু অন্তমনস্ক হতেই রাজামশাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। সে অনেক ভাকাডাকি করলে, “রাজা-মশাই, ও রাজা-মশাই, উঠুন, ওই যে সূর্য্য উঠছে।”

আর রাজা-মশাই! তিনি সমস্ত রাত জেগে ছিলেন, সে দিন আরও উঠতে বেলা হ’ল। লোকটাও ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে ঘরেব মেঝের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

এদিকে রাজ্যস্থল লোক রাজাব দান নেবাব জন্তে সকাল থেকে দেউড়ীতে এসে জড়ো হয়েছে। ক্রমে বেলা বেড়ে চল্ল দেখে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। তাবা আর অপেক্ষা করতে পারে না।

রাজাব যখন ঘুম ভাঙলো, তখন তিনি উঠে দেখেন, অনেক বেলা হয়ে গেছে। তিনি ভয়ানক বিবস্ত্র হয়ে

গেলেন। তার উপবে যখন দেখলেন যে, লোকটা মেঝের পড়ে’ খুব ঘুমুচ্ছে তখন তিনি রেগে ছকুম দিলেন, “একুনি লোকটার গর্দান নেওয়া হোক, এত বড় আশ্পর্দা!”

সেই-রাজ্যস্থল লোকেব সামনে বেঁধে নিয়ে গিয়ে জল্লাদ লোকটার মুণ্ড কেটে ফেলে। সমস্ত লোক ভয়ে ভয়ে কাণ্ডটা দেখে যে যাব ঘরে চলে’ গেল।

এব পবে কে আব সাহস কবে’ রাজাকে সূর্য্যোদয় দেখাবাব জন্তে জাগাতে আসবে? কিন্তু হাজার আসবাবের লোভ বড় কম নয়। তিন-চারদিন যেতেই কোথা থেকে আবাব একজন লোক এল।

রাজা-মশাই দুপূব বেলা রাজ-সভায় বসে’ আছেন, ভোরে উঠতে না পেয়ে বাগে তাঁব মুখানা হাড়ি-পানা। চারদিকে পাত্রমিত্ররা চুপচাপ বসে’ আছে, ভয়ে কাবো মুখে কথাটি নেই। সকলেই ভাবছে রাজা না জানি এইবাব কাব মুণ্ডটা কেটে ফেলে দিতে ছকুম দেন। এমন সমবে সেই দুঃসাহসী লোকটি এসে রাজ-সভায় দাঁড়াল। সে মহারাজকে প্রণাম করে’ বল্ল, “মহারাজ, আমি আপনাকে, সূর্য্যোদয় দেখাব। কিন্তু আমার দু-একটা কথা রাখতে হবে।”

সভাব সকল লোক এ ওব মুখের দিকে তাকাতে লাগলো। এ লোকটা কোথা থেকে এল? এ পাগল নাকি? না, এব মাথাটার আব নের্ন দরকার নেই?

শুধু রাজা-মশাই বলেন, “কি, কি কথা?”

সে বল্ল, “আমি রাত্তির বেলা, আপনি ঘুমুলে, আপনাব ঘবে যাবো, সে সময়ে আমার যেন কেউ বাধা না দেয়।”

“বেশ।”

“আব আপনাকে পূবদিকের ঘরখানাতে ঘুমুতে হবে, সে ঘরে আর কেউ থাকতে পারবে না, শুধু আপনি আর আমি থাকবো।”

“বেশ।”

“আপনাব বিছানার পূব শিওরের জানালাটা খোলা থাকা চাই—যাতে আপনি উঠেই সূর্য্যোদয় দেখতে পান।”

“বেশ। আর কোন কথা আছে?”

লোকটা বলল, “হাঁ, মহারাজ, আর এক কথা। আমার পুস্কারটা সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে, আস্বফি-গুলো কাছে রেখে ঘুমবেন।”

রাজা-মশাই রাজি হলেন। তার পরেতে সেই অদ্ভুত লোকটা যেমন এসেছিল, ঠিক তেমনি ভাবে বাজাকে প্রণাম কবে’ চলে’ গেল।

রাজ্যে গুজব রটে’ গেল, আবার একজন লোক এসেছে রাজাকে সূর্য্যোদয় দেখাতে। লোকটার বোকামি মনে কবে’ অনেকে হাস হাস করিতে লাগলো। আবার অনেকে বলতে লাগলো, “লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। লোভীকে দণ্ড কর্ত্তে নেই, সে পাপী।”

ভোব হতেই রাজবাড়ীর সিং-দরজার সামনে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। এবারে আর তাদের কেউ ডাকে নি। এবারে তারা নিজেবাই এসেছে—দান নিতে নয়, মজা দেখতে। তাবা ভেবেছে লোকটা রাজাকে সূর্য্য উঠতে দেখাতে ত নিশ্চয়ই পারবে না, আবার একটা লোকের গর্দান নেওয়া নিশ্চয়ই হবে। তাই দেখতে রাজ্যহুজ লোক ভোর না হতেই আপনা থেকে এসে জড়ো হলো।

ক্রমে বেলা বাড়তে লাগলো। রাজা মশায়েব ঘুম থেকে ওঠাব কোন লক্ষ্যই নেই। লোকেদের মনেও আর সন্দেহ রইল না যে, হতভাগা মাথাটা খোষালো।

প্রথমে বোদ বাঁ বাঁ করতে লাগলো। রাজা-মশাই রোজ যে সময়ে ওঠেন, সেই সময় এসে গেল। বাইরের লোকেরা গর্দান নেওয়া দেখবার প্রতীক্ষায় উদ্গ্রীব হয়ে উঠলো।

এদিকে ঘরের ভিতর সেই লোকটা রাজার দিকে তাকিয়ে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেলা অনেক-খানি হয়ে গেল, সে কিন্তু রাজাকে একবারও জাগাতে চেষ্টা করল না।

তারপরে যথাসময়ে রাজা-মশাই উদ্গুম করে’ নড়ে’ উঠলেন। তাই দেখে লোকটা আস্তে আস্তে বাজা-

মশায়েব মাথার কাছে গিয়ে তাঁকে ডাক দিল, “মহারাজ, উঠুন, ওই দেখুন সূর্য্যোদয়—সূর্য্য কেমন আকাশ রাজা করে’ উঠছে দেখুন।”

রাজা-মশাই ধড়মড়িয়ে উঠে জান্না দিয়ে চেয়ে দেখলেন। সত্যিই তো! ওই সন্ধ্যাবেলার মত—রাজা সূর্য্যদেব উঠছেন!

মহারাজ ভারী খুশী।

লোকটা বলল, “মহারাজ, এইবার আমার পুস্কার?” বিছানাতেই মোহবগলো ছিল। রাজা-মশাই তক্ষুনি হাজাব আস্বফি গুলে লোকটাকে দিলেন। সে প্রণাম করে’ চলে’ গেল।

বাইরে, এদিকে, লোকেদের মনে ভাবনার উদয় হ’ল। এত বেলা হ’য়ে গেল, আজ এখনও কি রাজা-মশাই উঠলেন না? মজার মনে খটকা লাগল। একজন বলেন, “তাই তো, সেই অদ্ভুত লোকটা রাগে রাজার ঘরে একলা ছিল, রাজা-মশায়েব কিছু অনিষ্ট করেনি তো?”

মজার চমকে উঠলেন, “ঠিক তো!” তখনই তাঁবা নৌড়ে রাজা-মশায়েব ঘবে ঢুক পড়লেন। গিয়ে দেখেন, রাজা একদৃষ্টে পূব দিকের জান্না দিয়ে কি দেখছেন। সে ঘবে আর কেউ নেই।

তাঁদের ঢুকতে দেখে রাজা ফিবে তাকালেন, হেসে বলেন, “আজ আমার ঘুম ভেঙেছে, ওই যে এখনও সূর্য্য লাল রয়েছে।”

তাঁরা জান্না দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, লাল সূর্য্যই বটে! কিন্তু—

কিন্তু কি? তাঁবা জিজ্ঞেস করলেন, “মহারাজ, সে লোকটা কোথা গেল?”

রাজা বলেন, “কেন, পুস্কার নিয়ে চলে’ গেছে,—তার কাজ করে’।”

মজার বলেন, “না, মহারাজ, তাব কাজ সে করেনি। এখন অনেক বেলা। তবে, সে আপনাকে ঠকিয়েছে। ওই দেখুন, জান্নাটার আগা-গোড়া একখানা পাতলা লাল রংএর কাচ আঁটা!”

আঁা, সত্যিই তো!

ঠগ! ঠগ! ভদানক ঠগ! চাবদিকে লোকটার খোজ

পড়ে' গেল। সে লোকটা অনেক আগেই দেউড়ীর লোকারণ্যে মিশে গিয়েছিল। তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

রাজ্যের লোককে নিঃশব্দ হ'য়ে ফিরে যেতে হ'ল, এত-খানি বেলা পর্যন্ত ঠাডিয়ে থেকেও তারা গর্দান্ নেওয়া দেখতে পেল না! তাদের বড়ই দুঃখ হ'ল!

কিন্তু রাজা-মশাই একটুও রাগলেন না। তিনি মন্ত্রীকে ডেকে বলেন, “তাকে খুঁজতে হবে না, সে ঠিকই কবেছে, সে আমাদের ‘রাজাডে ভোরে’ জাগিয়ে দিয়েছে।”

শ্রী কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

পুনর্মুখিক

(জাপানী গল্প)

জাপানের তোকিও সহরে এক খুব গরীব দিন-মজুর ছিল। তার কাজ রাত্তা-মেয়ামত করা। কি কষ্টেই না দিন তার কাটত! দুই এক টুক্বো পোড়া রুটি তাও মিলিত বহু কষ্টে।

রাত্রে সে একখানা ভাঙা ঘরে একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর শুয়ে শুয়ে ভাবত, ‘আমি যদি একটা মস্ত বড়লোক হতাম, তাহলে কি মজাটাই না হত। রাত্তার দুইধারে ঘে-সমস্ত স্থানর স্থানব পিটেব দোকান আছে, সেগুলো সব আমি কিনে নিতাম। আর, সারা দিনবাত একটা খুব মোটা নরম গদীর উপর শুয়ে থাকতাম। কোনো কাজ নেই, কেবল শুয়ে থাকা আব চাকর-চাকবাগীদের আদেশ করা।”

একদিন এক দেবদূত সেই ভাঙা কুঁড়েব পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি শুন্তে পেলেন তাব কথা। এই ম.স্থ জাতটাকে দেবদূত ভাল রকমই চেনেন কিনা, তাই ভাবলেন একে নিয়ে একটু রগড় করা যাক।

এই মনে করে' তিনি মজুরের উদ্দেশে বলেন যে “তোমার ইচ্ছা সফল হোক।”

দেবদূতের কৃপায় নিমেষের মধ্যে মজুর এক মস্ত ধনী। প্রকাণ্ড বাড়ী, যথেষ্ট দাস দাসী, তার আর কিছুবই অভাব নেই।

একদিন সে দেখলে তাব বাড়ীব সম্মুখ দিয়ে এক সম্রাট চলেছেন। খুব স্থানব চারটি হুধের মতো সাদা ঘোড়া তাঁব প্রকাণ্ড গাড়ীখানা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কি জম্‌কালো তাঁব জরিব পোষাকটা। তাঁর হীরার মুকুটটা এমন ঝকঝক করছিল যে সে মনে করলে যেন সেটা তাকেই উপহাস করছে। সম্রাটকে দেখে সবাই হাঁটুগেড়ে বসে' সম্মান দেখাচ্ছিল। এই সব দেখে সে ভাবলে ধনজন থাকলে কি হয়? আমাদের দেখে কি অমনি করে' কেউ জয়ধ্বনি কবে, না সম্মান দেবায়?”

এইবার সে দেবদূতের বরে একটা সাম্রাজ্যও লাভ করলে। একদিন মহা সমারোহে বহু সৈন্য-সামন্ত নিয়ে একটা পাথব-বাধানো বাস্তা দিয়ে সে চলেছে। সে চাব দিকে চেয়ে দেখলে যে আজ সবাই তাকে দর্শন করে' আনন্দধ্বনি করছে। সে ভারী খুশী হল। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল সেই পাথবের রাত্তাটাব উপর। সূর্য্যেব আলোতে বাস্তাটা এমন জলচ্ছিল যে সেদিকে চাইতে গিয়ে তার চোখছুটো ঝলসে গেল।

এবাব সে বুঝলে রাজ-ঐশ্বর্য্যও সূর্য্যেব কাছে কিছুই নয়। রাত্তাটার দিকে সে কিনা চাইতেই পারছিল না।

দেবদূত তাব দিকে একটু হেসে চাইতেই সে একেবারে সূর্য্যদেব হয়ে গেল। সে তাব প্রথর কিরণ পৃথিবীর সমস্ত জাধগাধ ছড়িয়ে দিল। তার অসহ প্রতাপে নদ নদী সাগর শুকিয়ে উঠল, গাছ-পালা সব মরে' যেতে লাগল। কিন্তু একদিন ছোট্ট একখানা কালো মেঘ তাকে ঘিবে এলো। এইবার সে জ্বল হলো। পৃথিবী হাপ ছেড়ে বাঁচল।

সে দেখলে যে একখানা সামান্য মেঘ তাব প্রচণ্ড তেজকে একেবারে ঢেকে ফেলল। এব চেয়ে যে মেঘ হওয়া ছিল ঢেব ভালো।

দেবদূত এ সাধও তার অপূর্ণ রাখলেন না। সে তার প্রকাণ্ড শরীবটা দিয়ে সূর্য্যকে আবৃত করে' রাখত। হঠাৎ একদিন সে বৃষ্টির জল হয়ে গলে' মাটিতে পড়তে লাগল। সেই জলরাশি একটা প্রবল শ্রোতের আকাব ধবে' তাব সম্মুখে যা পেল তাই ভাসিয়ে নিয়ে চলল।

সে ভাবল' এইবার সে আসল ক্ষমতার সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু এ কি!—এই ছোট্ট পাহাড়টাকেই যে সে সরাসরে পারছে না। তা হলে ভারী ত তার ক্ষমতা?

এখন হয়েছে কি—দেবদূত তাকে একটা পাহাড় করে' দিয়েছেন। এবার বুটিকেও তার ভয় নেই, রোদকেও সে একদম কেয়ার করে না। হঠাৎ তার মনে হল কি একটা যেন তার পাখের দিকে ঝা মাঝছে। সে তার পাখরের চোপ ছুটো দিয়ে অনেকক্ষণ দেখে দেখে ঠিক করলে যে একটা ছোট্ট মানুষ একথানা ভাঙ্গা কোদাল দিয়ে তাকে আঘাত করছে, আর তার পাখের পাখেরব আঙ্গুলগুলো একটি একটি করে' ধসে' যাচ্ছে।

তার ভারী রাগ হল। মানুষের এত আত্মপক্ষা— সে একটা পাহাড়কে ধ্বংস করতে চায়!

সে জোরে টেঁচিয়ে উঠল “আমি মানুষ হতে চাই।”

আবার সেই দিন-মজুর। কোদালখানা কোলের উপর ফেলে রেখে রাস্তার ধারে বসে! কিদের আলায় পেটটা তার চিঁচিঁ করছিল।

শ্রী হেমেন্দ্রনাথ সান্ম্যাল

চাতকের সৃষ্টি

এক সহরে বাস করত এক গয়লা। তার দুধ খেয়ে সে সহরের লোক তাকে চমৎকার চিনে নিয়েছিল। দুধে কেবল সাদা রঙটি রেখে সে ছেড়ে দিত। সহরের লোকে তার দুধের নাম দিয়েছিল—সাদা জল। তার একসের “সাদা জলে” ছটাক কি আধপোয়াটাক দুধ থাকত কি না সন্দেহ। কিন্তু দুধ খাঁটী দুধের দরে বিক্রী! কাজেই সহরের লোক তার কাছে ঘেঁসত না। তবে তার চলত কেমন করে? বিদেশী লোকের কল্যাণে। ঠিক সহরে ঢুকবার মুখেই সে তার শোকান খুলে বসেছিল। বিদেশী লোক ও মুসাফেরদের দৃষ্টি চট্টি করে' গুরই ওপর পড়ত। ব্যন, আর কি। তার দুধ বেশ চড়া দরেই বিক্রী হত। কিন্তু খানেওয়ালাদের. তা খেয়ে মোটেই যে তৃপ্তি

হত না, এটা ঠিক। কেউ তাকে মনে মনে গাল দিত,—কেউ ছুঁকথা শুনিতে দিত;—কেউ বা ধর্মের ভয় দেখাত—অত অধর্ম্য সহিবে না গয়লার পো, ওগরে ধর্ম্ম আছেন। কিন্তু গয়লার পো এসব মোটেই গ্রাহ্য করত না। জল বেচে লোকের বহুকষ্টে-রোজ্জগার-করা পয়সা (গায়ের রক্ত বললেও হয়) গয়লা দিব্যি শোষণ করে' নিতে লাগল। অনেক টাকা রোজ্জগার করলে—অনেক বিষয়-সম্পত্তি করলে—মনে করলে এ ধন-সম্পদ চিরদিন ভোগ করুব। যখন সুখেই থাকুব, তখন হলই বা পাপ। কিন্তু হঠাৎ একদিন কাগ এসে গয়লাকে তার অধর্ম্মোপার্জিত ধন-সম্পদ থেকে টেনে নিয়ে গেল। একটুও তার জোর খাটল না। কেউ—কোন জিনিষ তার সঙ্গে গেল না।

মৃত্যুর পর গয়লাকে হাঙ্গির করান হল ধর্ম্মরাজের দরবারে। তার বিচার হবে। পাপীর মন কেঁপে উঠল। এখানে ফাঁকি দেবার জো ত নেই। বিচারক অন্তর্ধ্যামী; তিনি পাপ-পুণ্য সবই জানছেন।

গয়লা শুকনো মুখ কাগ করে' বিচারকের সামনে হাত জোড় করে' দাঁড়াল। ধর্ম্মরাজ তার উপর ক্রোধ-কটাক নিক্ষেপ করে' বললেন—তোর কিছু বলবার আছে?

গয়লার মনে আশা হল। মনে করলে—স্বর্গেও বৃদ্ধি মিথ্যার জয় হয়। সে অমনি কান্দতে কান্দতে বলে' উঠল—হুজুর, ধর্ম্মাবতার, দোহাই আপনার—

চূপ!—বজ্রগম্ভীরস্বরে ধমক দিয়ে ধর্ম্মরাজ বললেন—তোর পাপের সীমা নেই—মিথ্যে কথা বলে পাপ আর বাড়িতে চাসনে। এই শোন্—এরা কি বলছে।

গয়লা চেয়ে দেখলে কতকগুলি মুসাফের যারা তার কাছে দুধ কিনেছিল। তার কালো মুখে কে যেন এক পোঁচ কালি মাখিয়ে দিলে। তারা বললে—হুজুর! এ আমাদের জল খাইয়ে দুধের পয়সা নিয়েছে। এর পাপের শেষ নেই। আমাদের বহুকষ্টের পয়সা গায়ের এক বিন্দু রক্ত এ চুষে নিয়েছে।

ধর্ম্মরাজ গয়লার প্রতি ক্রকুটী করে' বললেন—শুনহিস্—পাপিষ্ঠ! ছলভি মানব-জন্ম পেয়েছিলি। যুব তার সদ্যবহার করলি। এখন তোর কি শাস্তি

বিধান করি। এবার কোন্ জন্ম চাস ?—কুরুব, শিষাল,
গাধা, শূয়র—

গয়লা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাদতে কাদতে বলতে
লাগল—জজুর রক্ষা করুন—জজুর রক্ষা করুন—

ধর্মরাজ কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তার পর কঠোর
কণ্ঠে বললেন—তুই এবাব এক রকম পাখী হয়ে
জন্মাবি। মাহুষের রক্ত শোষণ করতে তুখের ব্যবসাতে
যত জল ব্যবহার করেছিলি—ভগবান তোর জন্তে যে
জল মেপে রেখেছেন, তত জল তার থেকে বাদ গেল।
তুই সামান্য জলই তোর ব্যবহারের জন্য পাবি।
কেবল বর্ষা মেঘের জল পান করে তুই জীবনধারণ
করবি। অল্প সময় বা কোন জলাশয়ে তোর জলপানের
শক্তি থাকবে না। তোর তেষ্ঠা কিছুতেই মিটবে না।
যখন দারুণ তেষ্ঠায় তোর প্রাণ ছটফট করবে, তুই
যন্ত্রণায় আকাশে ছুটে বেরোবি এবং একবিন্দু জলের
জন্যে করুণ স্বরে “ফটিক জল!” “ফটিক জল!” বলে
কঁদে বেড়াবি।—এই হল তোর শাস্তি!

সেই অবধি সে গয়লা চাতকপাখী হয়ে আকাশে
উড়ে বেড়াচ্ছে। সে কেবল মেঘের জল পান করে।
অসংখ্য জলাশয়ের দিকে চোখে থাকে—তেষ্ঠা পেলেও
তাদের জলপান করবার তার শক্তি নেই। গ্রীষ্মকালে
দারুণ তেষ্ঠায় যখন তার প্রাণ ভটাগত হয়, ছাতি ফেটে
যায়, তখন তাকে আকাশ ফাটিয়ে করুণ স্বরে কাদতে
শোনা যায়—ফটিক জল, ফটিক জল।

শ্রী দুর্গাপ্রসাদ মজুমদার।

সেয়ানা বোকা

বুষ্টি হলেও পাঠশালে যায়
মাথায় দিয়ে টোকা,
তাই খোকাকে চালাক হলেও
বলত সবাই বোকা।
সেনিনও সে হনুহনিমে
যাচ্ছে হেঁটে জোরে
বর্ষা-সজল-কাজল-ঘেরা
জীবন-ঘন ভোরে,

বাগিয়ে নিয়ে বগলদাবায়
পাততাড়ি আর জুতো,
ঝুলিয়ে হাতে মাটির দোয়াত
জড়িয়ে বাঁধা স্তুতো।
বাইবে বড় বেবোয়নি কেউ,
পথ ঘাট সব ফাঁকা,
জল-সপ-সপ জোবড়া মেঘে
আকাশ ঘেন ঢাকা!
বাজে গুড়গুড় মেঘের মাদল,
চমকে চিকুর হানে!
থাকছে না আর কানের পোকা
ব্যাঙের গলার গানে!
টাইটুখু পুতুরে জল,
শেওলা-পিছল ঘাট,
উঠছে বেড়ে আগাছা বন.
ঘাসে বোঝাই মাঠ!
গাছ-পালারা আছড় গায়ে
দাড়িয়ে ভেজে ঠায়,
বোকা তবু টোকা মাথায়
পাঠশালেতে যায়!
পথের মাঝে একটা গলি
পার হ’তে হয় তাকে,
গলিটা প্রায় জলে কাদায়
নোংরা হয়েই থাকে;
মাঝখানে তার যাওয়া-আসায়
লোকের পায়ে পায়ে
একটু সরু পথ হয়েছে
জমাট কাদার গায়ে;
তাবই উপর সাবধানে খুব
যাচ্ছে বোকা ছেলে,
হাঁটুর চেয়েও গুড়িয়ে কাপড়
সামলে পাটি ফেলে!
না এগোতেই অল্প দূরে
দেখলে—জালাতন,—
আজও গলির ওমুখ থেকে

আসছে আব-একজন !
 পথটা কিন্তু এতই সরু
 বাঁচিয়ে জুতোর তলা,
 পাশ কাটিয়ে ছ'জন লোকের
 হয় না মোটেই চলা !
 চলতে গেলে একজনকে
 নামতে হবেই জলে,
 কি করা যায় ভাবছে বোকা
 এগিয়ে যত চলে !
 যেই ছ'জনে মাঝ-পথে ঠিক
 পড়ল এসে কাছে,
 দাঁড়িয়ে গেল সামনে যে যার,
 কাদায় পড়ে পাছে !
 বোকা মোদের টোকা মাথায়
 বললে তখন হৈঁকে,—
 “কে তুমি হে সামনে এলে ?
 “সর’ এ পথ থেকে ।
 “নইলে আমি এখনই আজ
 “করুব জেনো তাই
 “কবেছিলাম কালকে যেমন,
 “পথ যদি না পাই !”

হঠাৎ শুনে এ-সব কথা
 ভড়কে গেল বড়
 যে ছেলেটি ওধার থেকে
 হয়েছিল জড় ।
 শুকিয়ে গেল মুখখানি তার
 উঠলো ভয়ে ঘেমে,
 পথ ছেড়ে সে নিঃশব্দে
 কাদায় এল নেমে !
 বোকা তখন বুক ফুলিয়ে
 এগিয়ে চলে দেখে
 জানতে চাইলে সেই ছেলেটি
 পিছন থেকে ডেকে—
 “পথ না পেয়ে কাল আপনি
 “করেছিলেন বেটা,
 “বলুন তো সে উপায়টা কি,
 “শিখে রাখবো সেটা !”
 হেসে ফেললে বোকা শুনেই,
 বললে ফিরে থেমে—
 “তোমার মতই কাদায় দাদা
 “দাঁড়িয়েছিলাম নেমে !”

শ্রী নরেন্দ্র দেব

রমলা

(১৪)

বিবাহের পব রজত ও রমলা পুরী হইতে কিছু দূরে
 নিবন্ধন সমুদ্রতীরে গ্রীষ্মেব বাকি মাসটা কাটাইল ।
 নবদম্পতী প্রথমপ্রেমগীলাম জগতের সব মাহুষ ও সব
 বস্তু ঘেন ভুলিয়া গেল । প্রতিজন প্রতিজনের নিকট
 অপরূপ মহাবিস্ময়কর পরমানন্দময় স্থিতি, নসজগৎ রূপে
 প্রকাশিত হইল । আর কোন মাহুষের সঙ্গে দরকার
 রহিল না, এমন কি বহিঃপ্রকৃতির শোভাও খিঁচোটোর

দৃশ্যপটের মত তাহাদেব নবজাগ্রত প্রেমের দীপ্তির নিকট
 মান হইয়া গেল ।

তরুণ ও তরুণীর প্রথম মিলনের দিনগুলি । সে কি
 বিস্ময়ঘন আনন্দময়, সে কি অন্ধ-আবেগময় মহারহস্যভরা,
 সে কি অনায়াসিত অমৃতের স্বাদে দেহে মনে চিরউন্মাদনা ।
 নটবাজ যে মন্ত আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে নীহারিকা-
 পুঞ্জ হইতে তারার মালা, অগ্নিপিণ্ড হইতে শ্রামলা পৃথিবী
 স্থিতি করেন, সেই স্থিতির আনন্দ প্রেমিক-প্রেমিকার চিত্তে

মৃত্যু করে। ধবণীর কিশোরী বয়সে যখন জলস্থলের বিভাগ হয় নাই, তখন অগ্নি জল হাওয়া যে অজানা বেদনার গোপন পুলকে মাতামাতি করিয়া বেড়াইত, সেইরূপ অসহনীয় ব্যথাময় স্থখে দম্পতীর দেহমন কাঁপিতে থাকে। সে কি স্বপ্নভরা দিন, সে কি গল্পভরা রাত!—শিশুর হাসির চেয়েও স্নন্দর, প্রসববেদনার চেয়েও ব্যথাময়, বন্ধুমিলনের চেয়েও সুখময়, ভাইবোনের ভালবাসার চেয়েও মধুর, মাতৃস্নেহের চেয়েও পবিত্র।

রজত ও রমলার প্রথমমিলনের দিনগুলি! দুইজনে দুইজনের মধ্যে ঘেন হারাইয়া গিয়াছে, প্রেমের নীহারিকা-পথে আপনাদেব খুঁজিয়া পাইতেছে না, প্রতিজন ঘেন কোন অপূর্ণ দেশে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে, পথের বাঁকে বাঁকে নব নব সৌন্দর্য আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছে। দেহের প্রতি অঙ্গ মনের প্রতি গোপন কক্ষ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত কৌতুক কত ঐংস্রক্য, প্রতিক্ষেপে নব নব অমৃত-ভাণ্ডারের রহস্য উদ্ঘাটন। কথা কওয়ায়, চুপ করায়, হাসায়, চোখের জলে, চাওয়ায়, না চাওয়ায়, ছোঁয়ায়, না ছোঁয়ায়, বসায়, চলায়, হাতের সঙ্গে হাতে বাঁধনে, কেশের সঙ্গে কেশের স্পর্শে, অধরের সঙ্গে অধরের মিলনে জগতের কোন অন্তর্নিহিত আনন্দময় চৈতন্যের সহিত দুইজনের চেতনা একাকার হইয়া যাইত।

এখন বাহিরের বিশ্ব যদি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায় কিছুই আসে যায় না; যে সোনালী বালুচর সঙ্ক্ষাষ মিলন-শয্যা পাতে, যে সিন্ধু মিলনগীত গায়, যে সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তের স্বর্ণ-চ্ছটা মিলনক্ষণ রঞ্জীত কবে, যে জ্যোৎস্না মিলন-মুহূর্ত্ত স্নিগ্ধ করে, সব যদি শূন্যে মিলাইয়া যায়, কিছুই আসে যায় না—দুইজন দুইজনের মধ্যে অনন্ত জগৎ খুঁজিয়া পাইয়াছে। রমলার অমল তত্ত্ব সমস্ত বিশ্বের চেয়েও আনন্দস্রষ্টি, অকলঙ্ক নীলাকাশের দিনগুলি তাহারই চোখের উন্নীলিত দৃষ্টি, তারান্ধরা সাজি তাহারই লজ্জাজড়িত আখির কক্ষ পল্লবের রহস্যময় ছায়া। তাহাদের দুইজনের মধ্যেই ত পুষ্প ফুটিতেছে, কুহু ডাকিতেছে, স্বর্ধ্য উঠিতেছে, সাগর গাহিতেছে, জ্যোৎস্না ঝরিতেছে—একটু মিলন ঘেন অনন্ত ক্ষণ, একটু বিরহ ঘেন অনন্ত যুগ—তাহাদের ঘেরিয়া মাধুর্য্যপ্রসরণ দিকে দিকে বহিয়া গাইতেছে।

মধু মধু, বাতাসে মধু বহিতেছে, আলোকে মধু ফরিতেছে, আকাশে মধু ঝরিতেছে, সাগরে মধু টলমল করিতেছে, প্রিধান দৃষ্টি মধু ও তাহার বাক্য মধু, এই দেহ মধু, এই আত্মা মধু।

কোন স্তব্ধরাত্রি সহসা ঘুম হইতে জাগিয়া রজত দেখিত রমলাব এলায়িত নিদ্রিত দেহ—গ্রহতারামণ্ডিত নিঃশব্দতিমিববেষ্টিত আকাশের তলে এই নিদ্রাটুকু কি স্নন্দর! কোন প্রভাতে রমলার আগে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে সে রজতের স্তম্ভ দেহের দিকে চাহিয়া থাকিত—এই বিশ্রু বিশ্রামের ছবি প্রভাতেব আলোয় কি মধুব! কোনদিন দুইজনেই এক সঙ্গে জাগিয়া উঠিত, সে কি স্নন্দর মধুর জাগরণ—দুইজনের চুপনে ঘেন পদ্মের মত প্রভাত ফুটিয়া উঠিত, দুইজনের মিলিত চোখের আলো দিয়া মধুব হাসি দিয়া দিনের আলোর স্রষ্টি হইত।

রোদ্র-উদাস কর্মহীন অলস ছপুয়ে ঘবের সব জান্না বন্ধ করিয়া শুধু সমুদ্রের দিকের দরজাটা খুলিয়া রাখিয়া সেই দরজার সামনে দুইজনে পাশাপাশি চেয়ারে বসিত। সমস্ত ছপুব হেলাফেলা করিয়া কাটিত। সমুখে উদাস জনহীন বালুচরে আলোর প্রথম দীপ্তি আর সাগরের একতবে কক্ষণ সঙ্গীত—কখনও দুইজনেরই অজ্ঞাতে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িত, মন উদাসী হইয়া উঠিত, কখনও রজত চুপচাপ বসিয়া রমলাব চুলগুলি লইয়া খেলা করিত আর রমলা স্তব্ধ পুলকেব বিদ্যুতে চকিত হইয়া উঠিত, কখনও রমলাব অপধ্যাপ্ত কৌতুকে তীব্র হাস্যদম্ব কথায় অলস মধ্যাহ্ন চকিত হইয়া উঠিত।

সঙ্ক্যার সময় সাগরতীরে দুইজনে বেড়াইত, ঢেউয়ের সহিত খেলা করিতে করিতে রমলা জুতা ভিজাইয়া ফেলিত আব রজত সেই ভিজা জুতা বহিত।

জ্যোৎস্নারাত্রি উদ্বেলিত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দুইজনে পাশাপাশি বসিত, রজতের কোলে রমলা মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িত, তারান্ধলির দিকে চাহিয়া সহসা অলক্ষ্যে যত্ন নিশ্বাস পড়িত—জীবন যদি চিরকাল এইরূপ সুখ-স্বপ্নের মত কাটিতে পারিত! রজতের স্নিগ্ধ চোখের উপর তাহার কালো চোখ গিয়া পড়িত—এইরূপ শাস্ত স্নিগ্ধ মধুস্বয় যদি সমস্ত দিনবাত্রি হইত! পবনস্র

বেশীক্ষণ চোখে চোখ রাখিয়া থাকিতে পারিত না, রক্ত সাগরের দিকে চাহিত, রমলা আকাশের দিকে ; সাগরের করুণ স্রের সঙ্গে ছইজনে চূপচাপ ভাবিত ।

রক্ত ভাবিত—কেন একে এত ভালবাসি ? এই কি সত্য ভালবাসা ?

রমলা ভাবিত—এই কি প্রেম, একেই লোকে বলে ভালবাসা ? না, সে আবণ্ড কিছু অপূর্ণ বিশ্বাসের মধুময় ?

ছইজনেরই সন্দেহ জাগিত, মনে হইত হয়ত এ ফাঁকি, এ প্রেম নয়, সে অমৃতের দ্বাবে এখনও তাহারা আসিয়া পৌঁছায় নাই ।

আবার ক্ষণিকের মধ্যে সন্দেহ দূর হইত—এই ত প্রেম । আঙ্গুলে আঙ্গুল জড়াইয়া মুখে মুখে চাহিত । আর পৃথিবীতে এই ছই তরুণ-তরুণীর প্রেমলীলা দেখিয়া সিন্ধু উদ্বেলহাস্যে কি বলিত ?

রমলা রক্তের কোলে মাথা দিয়া সাগরতীরে শুইয়া ছিল, কুড়ানো ঝিকুঙলি নাড়িতে নাড়িতে মেঘের লুকোচুবি খেলা দেখিতে দেখিতে অতি মিষ্টস্বরে রমলা ডাকিল—এই ।

চুলগুলি লইয়া খেলিতে খেলিতে রক্ত বলিল—কি ?

ছইজনে আবার চূপচাপ ।

কিছুক্ষণ পরে রমলা আবার ডাকিল—এই—কি বলছে ?

—আচ্ছা কবে যেতে হবে ?

—পর্তু ।

—এ জাঘগাটা ছাড়তে মোটেই ইচ্ছে করছে না—যেন মাথা পড়ে গেছে ।

—কিন্তু ছাড়তে ত হবে ।

—সেখানে এম্মি স্থখে থাকতে পারব, এম্মি তোমায় পাব, আগার কেমন ভয় করছে ।

—ভয় কি রমু, কলকাতায় এর চেয়েও স্থখে থাকবে ।

—এই দিনগুলোর মতই সেখানেও দিন কাটবে ?

—যে দিন যায সে ত আর ফিরে আসে না, একটা দিনেব মত কি আব-একটা দিন হতে পাবে ?

—তবে ?

—তবে, জগৎ যে চলেছে, জীবন যে চলেছে, পিছনে আঁকড়ে থাকতে চাইলে টেনে নিয়ে যাবে ।

—আচ্ছা পৃথিবীটা যদি মুহূর্ত্তে এসে থেমে যেতো, আমাদের বয়স না বাড়ত, জীবনের প্রতিদিন আজকের মত কাঁহিত !

—তা ত হয় না রমু, এগিয়ে যেতেই হবে, কৈশোর হতে যৌবনে, যৌবন হতে—

—না, বুড়ো বয়সের কথা ভাবতে আমার এত খারাপ লাগে, আমি যেন চুলপাকার আগে মরি, যখন হাসতে গাইতে পারব না, দেখতে ভালো থাকব না, ছইমি কবলে লোকে নিয়ে করবে—

—কিন্তু আমার কাছে তুমি চিরকাল—

—না, আমি বুড়ী হতে পারব না ।

তাহার গালে মুহূ আঘাত করিয়া রক্ত বলিল—তুমি কোন কালে বুড়ী হবে না, ভয় নেই, যতই বুড়ী হও তোমার বুড়ো তোমায় ছাড়বে না ।

—যাঃও ! আচ্ছা সেখানে গিয়ে—

—হাঁ, আমি বলছি ।

—আচ্ছা ।

রক্তের চোখের দিকে রমলা চাহিয়া রহিল ।

গভীর রাত্রে বমলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল । বিছানা হইতে ধীরে ধীরে উঠিল, রক্তের কোঁকড়ানো চুল নিদ্রিত মুখের দিকে স্নিগ্ধ করুণনয়নে চাহিল । দরজা খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল । জ্যোৎস্নার মায়ায় ধূসর বালুচর স্তম্ভ, সাগরের একটানা স্র বড় করুণ । আবার ঘরে ফিরিয়া বিছানার পাশে দাঁড়াইল, রক্তের মাথাটা বিছানা হইতে বালিশে তুলিয়া দিল । এই সমুদ্রগীত-মুখর নির্জন বালুচরে প্রেমলীলাময় দিনগুলি ছাড়িয়া যাইতে তাহার গোপন বেদনা বোধ হইতেছিল । চোখে জল ভরিয়া আসিল, বারান্দায় বাহির হইয়া গেল,—বহুবৎসর পূর্বে এক বাল্যবন্ধুর মৃত্যুতে সে কাঁদিয়াছিল, তারপর এই তার যৌবনজীবনের প্রথম ক্রন্দন । স্বখমিলনরাত্রি অশ্রুসিক্ত হইয়া পবিত্র হইয়া উঠিল ।

(১৫)

আমাদের প্রথম মেঘের সঙ্গে সঙ্গে নবদম্পতী কলিকাতায় আসিয়া পড়িল। রক্ততরঙ্গের মতো তাহার মামার বাড়ীতে আনিয়া তুলিল। বর্ধমানের তাহার কাকা মকেল চরাইয়া ও প্রতিবৎসর সংসার বৃদ্ধি কবিয়া পরম স্বখে বাস করিতেছিলেন। দেশের গ্রামে তাহার ক্ষেঠামশাই ভাঙ্গা ভিটে আঁকড়াইয়া সপরিবারে গ্যালেরিয়ায় ভুগিয়া গ্রামে প্রতিদিন দলাদলি বাধাইয়া জীবনের শেষদিনগুলি পরম শাস্তিতে কাটাঁইতেছিলেন—ইহাদের চিরন্তন বাঁধাপথের সংসারযাত্রার মধ্যে রমলাকে এক মূর্তিমতী কানুন-হাওয়ার মত লইয়া যাইতে রক্ততরঙ্গের সাহস হইল না। সুতরাং সে রমলাকে মামার বাড়ীতেই টুটাইল।

অবশ্য মামার বাড়ী বলিতে বাহা বুঝায়, এবাড়ী তাহা নহে—প্রোট ডিম্পেপ্‌সিয়ায় শীর্ণ অবিবাহিত এক প্রফেসর মামা আর তাঁর ছোট ভাড়াটে বাড়ী। রক্ততরঙ্গের মামা তার মার প্রায় সমবয়সী ছিলেন, দুইজনে ছেলেবেলা হইতেই খুব ভাব, আর এই সংসারে বৈরাগী ভাইটির ভার রক্ততরঙ্গের মাকে আজীবন বহিতে হইয়াছিল। তুলসী-বাবু কলিকাতায় ববাবর রক্ততরঙ্গের মা-বাবার কাছেই ছিলেন। তার পব তাঁরা যখন মারা গেলেন, মাতৃপিছুহীন রক্ততরঙ্গের তিনি বুকে তুলিয়া লইয়া স্বর্গগত বোনের এই মধুর স্মৃতিটিকে আজীবন পরমস্নেহে মাস্তুষ করিয়া আসিয়াছেন। নববধূ লইয়া রক্ততরঙ্গ তাঁহার কাছেই উঠিল।

তুলসী-বাবু কেন বিবাহ করেন নাই, তাহা লইয়া নানা লোকে নানা কথা বলিত। এখন তাঁর কাঁচাপাকা চুল, ছোট দাড়ি, তেলচুকুকে টাক আর তালপাতার মত পাংলা দেহ দেখিয়া, এ লোকটা বিবাহ করিল না কেন সে বিষয় কেহ ভাবে না। কিন্তু প্রথম যৌবনেই যখন তিনি কলেজের ডিমন্‌ষ্ট্রেটর হইতে প্রফেসর হইলেন অথচ সংসার পাতিলেন না, তখন তাঁর সম্বন্ধে নানা আলোচনা হইত। তুলসী-বাবু সম্বন্ধে যে-সব গল্প প্রচলিত ছিল, এখন সেগুলি প্রাচীন কথাসাহিত্যের মত নুষ্ঠ হইয়া গিয়াছে। শুধু একটি গল্প মাঝে মাঝে লোকের মনে জাগিয়া উঠে। ব্রাহ্মসমাজের নাম করিলেই তুলসী-বাবুর মুখে যেন বিদ্রুৎ খেলিয়া যায়। যৌবনে তিনি

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; কেশবচন্দ্র, শিবনাথ, আনন্দমোহন ইত্যাদি মহাপুরুষদের সহিত বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিলেন, দেশে ধর্ম ও সমাজের পুনরুত্থানের জন্য অদম্য উৎসাহে লাগিয়াছিলেন। সহস্রা তাঁহার মধ্যে আশ্চর্য্যকর পবিত্রত্ব ঘটিল। ব্রাহ্মসমাজের সব সংগ্রহ ছিড়িয়া তিনি ঘোব নাস্তিক হইয়া উঠিলেন। লোকে বলে তৎকালীন এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মবিবাহ নাকি এই ঘট পবিত্রত্বের কারণ। সে যাহাই হউক, তুলসী-বাবু এতদিন হেকেল, কোম্‌তের গ্রন্থাবলী, বৈজ্ঞানিক পত্রিকা, বিসার্চ-ওয়ার্ক, নতুন নতুন ছেলের দল, রক্ততরঙ্গের খেয়াল, জীবাণুতত্ত্ব আর অল্প অজীর্ণতা লইয়া পরম আনন্দে দিন কাটাঁইতেছিলেন। কলেজে বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া ছিল তাঁহার প্রাণ, আর মদের নেশার মত জীবাণুতত্ত্ব তাঁহার নেশা ছিল।

কলিকাতায় ভদ্রবাঙ্গালীপাড়ায় একটি ছোট গলিতে ছোট বাড়ী। গলিটি উত্তর হইতে দক্ষিণে গিয়া এক বড় রাস্তায় পড়িয়াছে। বাড়ীটি পূর্বমুখী। উপরে তিনখানি, নীচে তিনখানি ঘর। একতলায় সামনে বসিবার ঘরখানি বেশ বড়, সমস্ত পূর্বদিক জুড়িয়া, ঘরের পাশ দিয়া সিঁড়ি দোতলায় উঠিয়া গিয়াছে, সিঁড়ির পাশে উত্তরমুখো দুইখানি ছোট ঘর, একটিতে রান্না হয় আর-একটিতে চাকর-থাকে। বরগুলির সম্মুখে বারান্দা, তার পর সান-বাধানো ছোট উঠান। উত্তরদিকটা পাশেব বাড়ীর দেওয়াল দিয়া একেবারে চাপা, পশ্চিমদিকটা আর-একখানি পাশের বাড়ীর অন্দরমহলের দিকে মুঁকিয়া পড়িয়াছে। ঢুকিবাব দরজা সম্মুখের বড় ঘরের উত্তরদিকে এক কোণে। দোতলায় তিনখানি ঘর, পূর্বদিকের বড় ঘরখানিতে মামাবাবু থাকেন, ঘরের তিন দিক বৈজ্ঞানিক বইয়ে ঠাসা আলমারিগুলি দিয়া ভরা, আর-একদিকে তিনখানি লম্বা টেবিলে ভূতত্ত্ববিদ্যার নানা রংএর ছোট বড় পাথর, স্পিরিট বা ফর্মলে রঞ্জিত নানা প্রকার মৃত জন্তুর দেহ ভবা ছোট বড় শিশি, আব স্লাইড ভরা কাঠের বাস্ক সাজানো রহিয়াছে, ইহাদের মধ্যে শোবার ছোট তক্তা-যেন অনধিকার-শ্রবণ করিয়াছে। উত্তরমুখো ঘর দুখানির মধ্যে, একখানিতে রক্ততরঙ্গ থাকে আর-একখানিতে

তাহার আঁকার সরঞ্জাম আর মামাব ক্লাস, টেবুটিউবে ভরিয়া শিল্পীর শিল্পাগার আর রাসায়নিকের বীক্ষাগার এইরূপ একটি উভচর বস্তু হইয়া উঠিয়াছে।

প্রভাতে এক পশলা বুষ্টির পর মেঘ কাটিয়া কলিকাতার আকাশ কচি শিশুর হাসির মত নির্মল রৌদ্রে ভরিয়া উঠিয়াছে। বালিশমা হলদে বাড়ীর দেওয়াল জলে ভিজিয়া রৌদ্রে ঝিকিমিকি করিতেছে। বাড়ীখানিকে বাহির হইতে দেখিলে মোটেই মনে হয় না ইহার ভিতর এক বৈজ্ঞানিক তপস্বী তাহার জীবনের সাধনা করিতেছেন, এইখানে এক শিল্পী তাহার প্রিয়াকে লইয়া জীবনের নীড় বাধিতেছে।

ভাড়াটে গাড়ীটি যখন বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, বমলা যদি স্তব্ধ চোখে বাড়ীর সম্মুখভাগটা দেখিত তবে সে দুঃখিতই হইত, কিন্তু তাহার সব জিনিষই অনির্বচনীয় মধুর বলিয়া বোধ হইতেছিল, কে স্বন্দর আজ তাহাব চক্ষে মোহনমন্ত্র ব্লাইয়া দিয়াছে,—ষ্টেনের কুলি, পথের জনতা, দোকানের সাবি, গাড়ীর শব্দ, এই প্রভাতের মেঘ ও রৌদ্র, রঙের মূখ, সবই কি অপূর্ব স্বন্দর। সমস্ত পথ রজত তাহাকে তাহাব মামার গল্প, এই বাড়ীর গল্প বলিতে বলিতে আসিয়াছে, কথানি ঘব আছে, বাজাব করার রান্না কবার চাকরটির কি কি গুণ প্রকাশ পায়, কিরূপে এতদিন কাটিয়াছে, ইত্যাদি সব বলিতে বলিতে আসিয়াছে। বাড়ীটি রমলার কাছে রজতের কৈশোর জীবনের কত স্বপ্নময় দিনের স্মৃতিবিজড়িত হইয়া তাহার মামার কথার সহিত জড়াইয়া মহারহস্যরূপে দেখা দিল। গাড়ী দরজার সম্মুখে থামিতেই চাকর গোপাল তাড়াতাড়ি মুখের বিড়িটা কেলিয়া সম্মুখের দোকান হইতে ছুটিয়া আসিল এবং রমলা গাড়ী হইতে নামিতেই পথের ফুটপাথেই তাহার পদগুলি লইয়া নূতন গৃহকর্ত্রীর মনো-রঞ্জন করিতে শুরু করিয়া দিল।

রজত তাহার মামাকে কোন খবর দিয়া আসে নাই। চিঠি লিখিয়া আসিলে তিনি প্রতিঘরের ধূলা ঝাড়িয়া ঘর সাজাইয়া খাবার আনিয়া যে কাণ্ড করিয়া তুলিতেন তাহা ভাবিয়া সে কোন খবর দেয় নাই। মামাকে হঠাৎ আশ্চর্য করিয়া দিবার লোভও কম ছিল না।

তুলসী-বাবু দোতলায় তাঁহাব ঘরে মাইক্রস্কোপে একটা স্লাইড দিয়া অতি নিবিষ্ট মনে দেখিতেছিলেন, বহুক্ষণ দেখিলেন, কিন্তু তিনি বে জীবাণুর সন্ধান করিতেছিলেন তাহা পাইলেন না, একটু হতাশভাবে কচ হইতে চোখ তুলিয়া ঘরের চারিদিকে আর পাশের টেবুটিউবের দিকে চাহিলেন, তারপর টেবিলের উপর এক বড় খাতাখ লিখিলেন, ৪৯৯ বার, not found, তার পর এক-একটা স্লাইড দিয়া মাইক্রস্কোপে মনোযোগ দিলেন। তিনি এই পবীক্ষাটি তিন বহর পরিচা করিতে-ছেন, এখনও সিদ্ধিলাভ করেন নাই।

রজত ধীরে আসিয়া স্লাইড সরাইয়া লইল, তুলসী-বাবুর চোখ মাইক্রস্কোপে ছিল—তিনি একটু জরুজিত করিয়া উঠিলেন, তার পর মাথা তুলিয়া রজত ও রমলাকে দেখিয়া, ইউরেকা, ইউরেকা বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন। রজত ও রমলা একসঙ্গে তাঁর পায়ের ধূলো লইবার জ্ঞ নত হইতেই তিনি তাঁর শীর্ণ হাতে রজতের সিন্ধের পাঞ্জাবীর গলাটা আর রমলার ক্রীমরংএর শার্ডাব আঁচল টানিয়া দুহজনকে তুলিলেন। তাব পর রজতের দুইগালে দুই মুছ চড় পড়িল, আর রমলার গুণ ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন,—বা! এ যে খাসা বৌ হযেছে বে—আমি ভেবেই মবুছিলুম, যে রজতকে বাদব বানিয়েছে, না জানি সে কেমন দিগ্ধি! তারাব রমলাব গালে দুই আঙ্গুল দিয়া মুছ আঘাত করিয়া বলিলেন—মা-লক্ষ্মী, বেশ হয়েছে, আমি ভারি খুসি হয়েছি।

তার পর রজতের এক হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন—আচ্ছা, হতভাগা গাধা, একটা খবর দিয়ে আসতে নেই, আমি কোথাও বসাই, কি বা খেতে দি বুলত।

তাঁর পাংলা দেহ তালপাতার মত কাপাইয়া তুলসী-বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—তোব ঘরে ঘাস না, এখন এখানে বোস, গোপাল ছোঁড়াটা হয়েছে যেমন বাদব—বাবু নেই ত ঘর ঝেড়ে কাজ নেই,—না, ও গাবা, ওঘরে গেলেই অস্থব করবে, আমার ঘরটা তবু কিছু পরিষ্কার আছে। না, মা, তুমি এইখানে বোস,—বলিয়া রমলার হাত ধরিয়া টানিয়া নিজের বিছানার উপর

বসাইয়া দিলেন। রজত পিছনে দাঁড়াইয়া যুহু যুহু হাসিতে লাগিল।

রমলাকে বসাইয়া তুলসী-বাবু বারান্দায় বাহির হইয়া বাড়ী কাঁপাইয়া ডাকিতে লাগিলেন,—বাবু, বাবু। এ ডাক চাকর গোপালকে। গোপাল বস্তুতঃ তাঁহার পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল কয়েকবার ডাকিবার পর সাড়া দিতে মামা-বাবু বলিলেন,—যা বাবু, শীগগীর গিয়ে সামনের দোকান থেকে—যা গরম খাবার পাবি, গরম ঘেন হয়, একেবারে টাটকা, এখন ত জ্বিলপি ভাজে, আবার খাবার এনেই বাজার যাবি—ভাল মাছ, বুঝি দেখে নিবি, ঘেন একটু গন্ধ না হয়, পচা হলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন—আর বাবু বলছিলেন না দাদাবাবুর ঘর ঝেড়ে রাখতে? শীগগীর যা হতভাগা—চাকরের দিকে এক দশটাকার নোট ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তিনি নববধূকে যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিবার অস্ত্র ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, রমলা তাঁহার লাল নীল সব পাথরের টুকরোগুলি ঘাঁটিতেছে আর শিশিতে ভরা জীবজন্তুগুলির প্রতি বিস্মিত নয়নে চাহিয়া আছে। রজতকে ঘরে দেখিতে না পাইয়া মামা-বাবু বলিয়া উঠিলেন—কোথায় গেল উল্লুকটা, বল্লম ঘরে ঘাস না, ধুলোয় কিচিমিচি, একটা অস্থখ না বাধিয়ে ছাড়বে না। ধুলো, সে কি সামান্য জিনিষ মা, সব বীজাণুভরা, কত বোগের বীজাণু—ওই যদি দেহ একবার দখল করতে পারল, তার পব ডাক্তারই ডাকো আর যতই কাঁদ, ঈশ্বর ঈশ্বর বলে' চোঁচাও, ও রাজাও মানে না, উজীরও মানে না, বুদ্ধও মানে না, নেপোলিয়নও মানে না, একবার কল একটু ভেঙ্গে দিল ত, ব্যস—একবারে বন্ধ।—কোথায় গেল সে?—বলিয়া তিনি ঘরে অতি ব্যস্ত ভাবে ঘুরিতে লাগিলেন। রমলাকে কিরূপে যথোচিত অভ্যর্থনা করিবেন তাহা যেন খুঁজিয়া পাইতেছেন না।

রমলা যুহুহাস্যে বলিল—আপনি যদি এত ব্যস্ত হন—

রমলার পিঠে এক খান্নড় দিয়া মামা-বাবু বলিলেন—আপনি? বল, তুই।

এই সরল শিশুর মত মানুষটিকে রমলা দেখিয়াই ভালবাসিয়াছিল। সে যুহু হাসিয়া মামাবাবুর টুইল-

সার্টির পিঠের উপর ছেঁড়া অংশটার দিকে একবার চাহিয়া বলিল—আচ্ছা এই পাথরগুলো দিয়ে কি হয়?

শিশুর মত হাসিয়া মামাবাবু বলিলেন—বুড়ো ছেলে মা, এ হচ্ছে আমার খেলাঘর দেখছিস না, খেলা করি—কিন্তু বাবুটা কোথায় গেল?

আবার রমলার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন—ও বাবুটার গলায় মুক্তোর হার হলে, মা-লক্ষ্মী।

তাঁহার বিহানার পাশে মাথাব কাছে একটি ফটোর দিকে রমলা ভক্তিদীপ্ত নয়নে চাহিয়া আছে দেখিয়া মামা-বাবু থামিয়া গেলেন, ধীরে আবার বলিতে লাগিলেন—হাঁ, ওই হচ্ছে রজতের মা, ও বোনটা যদি আজ থাকত, তবে কি আজ—তাঁহার কথা আবার থামিয়া গেল, চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, কত স্মৃতি-বিক্রি়িত করুণস্নিগ্ধ নয়নে ফটোটর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

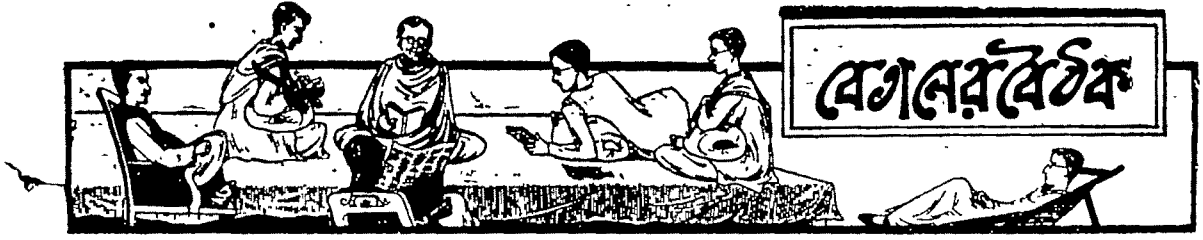
রমলা ধীরে ব্রোমাইড-এন্‌লার্জ্‌মেন্ট ফটোটর দিকে অগ্রসর হইল। ফটোটিতে প্রথমেই চোখে পড়ে স্নেহোজ্জ্বল নয়নের দৃষ্টি, চোখ দুইটির উপর প্রশস্ত ললাট প্রশস্ত শাস্তিতে ভরা, মুখখানি হইতে কি কল্যাণময় আনন্দ-দীপ্তি বাহির হইতেছে,—স্বচ্ছঃস্বচ্ছঃ সংসারের শাস্তি-মঙ্গলময়ী ভগবতী মহাশক্তির এ স্নেহসৌন্দর্য্যময় প্রতিকৃপ। সিঁথি সিঁদূব তেজোময় কল্যাণটীকার মত জলজল কারতেছে, হাতের সোনা দিয়া বাঁধানো শাঁখা তাঁহার নিষ্ঠা ও সেবার চিহ্ন।

রমলার মাথা আপনাই নত হইয়া আসিল, ধীরে সে করজোড়ে কাঠের ক্রেমে কপাল ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। যখন সে মাথা তুলিল, দেখিল, রজত তাঁহার পাশে আদিয়া দাঁড়াইয়াছে, ছবির চোখ ও ঠোঁট যেন নড়িয়া উঠিল। সেই স্নিগ্ধ চিরস্নেহময় মুখ হইতে স্নেহাশীর্ষাদ বসিত হইল।

আবার দুইজনে যুক্তকরে ছবির কাছে মাথা ঠেকাইয়া বার বার স্বর্গগত জননীর উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিল। মামা-বাবুর চোখ জলে ভরিয়া আসিল, তিনি এই চিরপ্রিয় মুখের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। বিশ্বজননীর আশীর্বাদের মত প্রভাতের আলো ঘরখানি উজ্জল করিয়া তুলিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু



[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাড়া হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজননে দিলে যাহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্বোত্তম হইবে তাহাই ছাড়া হইবে। যাহাদের নাম প্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাহারা লিখিয়া জানাইবেন। অন্যান্য প্রশ্নোত্তর ছাড়া হইবে না। প্রশ্ন ও উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। জিজ্ঞাসা ও সীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিবৃতি বা অনুসন্ধানাদি পিঠার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতিত ; যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিবন্ধনের সিদ্ধান্ত হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা একপ হওয়া উচিত যাহার সীমাংসায় বহুলোকের উপকাৰ হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা হুঁসিধাব জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির সীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আলাপী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবীর স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা সীমাংসা ছাড়া বা না ছাড়া সম্পূর্ণ আমাদের স্বেচ্ছাধীন—তাঁহাব সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে আমরা পাবিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতারের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন কবিধা সংখ্যাগণনা আবদ্ধ হয়। স্বতঃবা যাহা সীমাংসা পাঠাইবেন, তাহা বা কোন বৎসরের কত সংখ্যক প্রশ্নের সীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহাব উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(৩৩)

(১) রাত বা কলিকাতা অঞ্চলের যে কথ্য ভাষা এখন ক্রমশ লেখ্য ভাষা হয়ে উঠছে, তার ক্রিয়াপদের অতীতকালের রূপে শেষ-দ্বিকে কোখাও ল এবং কোখাও লে থাকে—সে কল্লে, সে বল্লে ; সে হাসলে, সে হাসল ; ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন এই—কোখায় লে হবে, আর কোখায় ল হবে ?

সাবধানী লেখকদের রচনারীতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়—

(ক) সাক্ষরক ধাতুর অতীত কালে লে, এবং অসাক্ষরক ধাতুর অতীত কালে ল হয় ; কেন ?

(খ) সাক্ষরক ধাতু মাজই অব্যক্তিচর্যরূপে যে অতীতকালে লে দিয়ে শেষ হয় তাও নয়। এই ব্যতিক্রমের কারণ কি কি ?

(গ) অসাক্ষরক ধাতুরও অতীতকালের রূপে অন্তে লে দেখা যায়—হাসলে, হাঁড়ালে, কাঁদলে, দ্বিলে, ইত্যাদি,—কেন ?

(২) এই লে হওয়ার কারণ কি ? সাক্ষরক ক্রিয়ার অতীতকালের রূপে প্রথম অক্ষর (syllable) যৌক দিয়ে (stress, accent) উচ্চারণ করার ফলে কি ল রূপান্তরিত হয়ে লে হয়ে যায় ?

যদি তাই হয় তবে—এস, উঠল, গেল, গুল প্রভৃতি পদান্ত ল কেন লে হবে আর না ?

(৩) অতীতকালের ক্রিয়ারূপে পদান্ত ল যে লে হয়, তা কি অসমাপিকা ক্রিয়ার লে রূপেই দেখা দেয়। সাদৃশ্য বজায় রাখার চেষ্টা ?

অসমাপিকা ক্রিয়ার সাক্ষরক ও অসাক্ষরক সকল ধাতুর শেষেই লে হয়—কল্লে, গেল, হাসলে, বল্লে, গুলে, মলে, ইত্যাদি ; কিন্তু অতীত কালের ক্রিয়ার বেলা বেশী ভাগ সাক্ষরক ধাতুর শেষে লে হওয়ার কারণ কি ?

বৈয়াকবশিক পণ্ডিতগণ এ বিষয়ের সীমাংসা জানালে উপকৃত হব।

ল, ব, রামস্বামী,

টীক কোর্টের টিকিল,

ত্রিচূড়, কোচিন টেট, দক্ষিণভারত।

২০১—১১

(৩৪)

শেক্সপীয়ার বিষয়ে

Tales of Old Japan (by Lord Redesdale, G. C. V. O., K. C. B.) নামক পুস্তক পড়িতে পড়িতে The Foxes' Wedding শীর্ষক গল্পে নিম্নলিখিত বাক্যটি পাইলাম—

"When the ceremonies had been concluded, an auspicious day was chosen for the bride to go to her husband's house, and she was carried off in a solemn procession during a shower of rain, the sun shining all the while." (আমি শেখের কথাগুলি ইটালিক করিয়াছি) অর্থাৎ—বিবাহসম্বন্ধীয় আচার শেষ হইয়া গেলে একটি ভাল দিন দেখিয়া কনেকে স্বামীঘর কবিত্তে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা হইল ; এবং পূর্ব সমারোহ করিয়া তাহাকে লইয়া যাওয়া হইল—তখন বৃষ্টি হইতেছিল, বোজাও ছিল।

বাক্সালা ও বিবাহ প্রদেশেও এইরূপ বিশ্বদস্তুর চলন আছে। একসঙ্গে রোজ ও বৃষ্টি হইলে প্রায়ই দেখি যে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা মহা উৎসাহে তাবন্ধরে বলিতে থাকে—

"বোধ হচ্ছে জল হচ্ছে।

শে' কশেয়ালীব বিয়ে হচ্ছে।

(ছপলী, বর্জমান, হাওড়া জেলা)

"বোধে বোধে জল হয়।

শিয়াল-শিয়ালীব বিয়ে হয়।

(বীরভূম জেলা)

অথবা—

"বোধ হচ্ছে জল হচ্ছে।

শিয়াল-কুস্তবের বিয়ে হচ্ছে।

অথবা—

"শিয়ালে বিবাহ হবে ছাতি সুবার দিয়া।

আইরোবা পান খায়.....দিয়া।"

(টাঙ্গাইল—সন্ন্যাসসিংহ)

এখানে (মুদ্রাবে) আমার পরিচিত কয়েকজন হিন্দু ও মুসল-
মানকে (এবং অস্ত্রাস্ত্র জারগায়, যথা—পাটনা, ও পাটনা হইতে
মুন্সের আসিতে টেনে) জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে এদেশের
ছেলে-মেয়েরাও এরূপ বলে—

- (১) “গিধব গিধরগী বিয়া হোয়”
- (২) “গিধবা গিধবাসে বিয়া হোয়।”
- (৩) বোদা উভে বাভানা।
মুবগী দেব চাবনা।
বিলাই দেব ঝোল।
এক পাইনা লোংটা।
গোঁদাই নাই নেংটা।
বাভানা কহে উগেল উগেল।
গিধড়া গিধড়ি বিয়া ভেল।

[আমার মনে হয় যে শেষ গ্লোকটির সহিত আমাদের—

আম বোদুব হেনে

ছাগল দেব মেনে” ইত্যাদি মিল আছে।]

জানি না ভাবতেও অস্ত্র কোনও অংশে এইরূপ প্রবাদ কিংবা
ছড়া চলন আছে কি না। যাহা হউক বাস্তব, বিবাহ ও জাপানে
একই প্রকার প্রবাদের চলন এখন আছে তখন তাহা যে একেবারে
আকস্মিক তাহা মনে হয় না। এরূপ সাদৃশ্যের কাবণই বা কি?
যুগপৎ বৌদ্ধবুদ্ধি-সম্প্রদায়ের সহিত শিখালিশিখালী আশুপুত্রি
বিবাহেবই বা সম্পর্ক আসিল কোথা হইতে? আশা করি এই প্রশ্নগুলি
উত্থাপন কবিরা ভেলেমামুদ্রী কবিতেনি না।

Lord Redesdale পাদটীকায় লিখিতেছেন—“A shower
during sunshine, which we call the ‘devil beating his
wife’ is called in Japan the fox’s bride going to her
husband’s house.”

একই ব্যাপার সম্পর্কে বিলাতে ও জাপানে (তথা ভারতে) দুই
রকম প্রবাদও বড় আশ্চর্যের। কোথায় শিখাল-শিখালী বিবাহ আর
কোথায় বা সন্ন্যাসের তার ত্রীকে ধরিয়া প্রহা? তবে মনে হয়
‘the devil beating his wife’-এবং একই মীমাংসা এইরূপে হইতে
পারে।—

Devil = German—Donner = Old Norse—Donar
= Thunder

অতএব Thunder strikes = Devil Strikes, কিন্তু কাহাকে?
Devilএবং বিপবীত কাজ। স্ত্রী ভিন্ন আর কাহাকেই বা হইবে?

যাহা হউক, ইহার ঠিক মীমাংসা কি জানিতে উৎসুক।

শ্রী কালীপদ মিত্র।

ডি. জে. কলেজের, প্রিন্সিপ্যাল, মুন্সের।

(৩৫)

মৌচাক হইতে যে সোম পাওয়া যায়, তাহা সাধারণতঃ কাল হয়।
উহা বিশুদ্ধ এবং সাদা করিবার সহজ উপায় কি—এবং ঐ কার্য
ভারতবর্ষের কোথায় হইয়া থাকে?

নীলাধর বিহারী ও কেশবলাল বিহারী

(৩৬)

‘দাদা’, ‘দিদি’ শব্দগুলি বাঙ্গালা শব্দ না অস্ত্র কিছু? “দাদী”
“পিসী”ই বা কেমন করিয়া অস্ত্র হোটে হইল?

শ্রী দামিনীকান্ত চৌধুরী

(৩৭)

কোন ধাতুর জব্যে কোন কঠিন জব্যের আঘাত লাগিলে ঝন্নাৎ
করিয়া শব্দ হয়; পরে হাত বা পা দিয়া স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ
শব্দটি বন্ধ হইয়া যায়। ইহাব কাবণ কি?

শ্রী শিবপ্রসাদ কুতি

(৩৮)

হিন্দুদিগের বিবাহ বাজেই হইয়া থাকে। দিনে না হওয়ার
কি কোনও নিষেধ-বিধি আছে? আর যদি এখন কোনও দেশে হিন্দুদের
বিবাহ দিনে হইবার প্রথা থাকে, তাহা হইলে সেই দেশ বা দেশগুলির
নাম কি? পূর্বে কোনও সময়ে দিনে বিবাহ রীতি ছিল কি না?
যদি থাকে তাহা হইলে কোন সময় হইতে এবং কেন উহা বন্ধ হইয়া
যায়? রাজ্যে বিবাহ প্রথা কোন সময় হইতে এবং কাহার দ্বারা
প্রথম প্রচলিত হয়?

শ্রী সুখাঙ্করুমা ঘোষ

(৩৯)

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে গুজুবাট জনবসতির বিবরণে ব্রাহ্মণদেব মধ্যে
পদবী পাই—

বিষ্ণু, বাগাকি, কুলিলাল, পাবীপাতি, মালখণ্ডী, বলাল, কুলিলাল,
কুলখাল, পিশাচখণ্ড, কর্ণাট, শীতলশাখী, মতিলাল।

এবং তাঁড়কুল আপনাকে কাষস্থ বলিয়া পবিত্র দিয়া বলিয়াছিল—
আমি আমলহীড়ার মন্ত।

এইসব পদবীর কুলপরিচয় কি?

হিন্দুদের যে জাতি-বিভাগ আছে তাতে হুজিরা জাতিব উল্লেখ
অনেক স্থানে দেখা যায়। সেই ৩৬ জাতি কি কি?

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪০)

বাণভট্ট “হর্ষচরিত” গ্রন্থারম্ভের প্রথম গ্লোকগুলিতে কথেকজন বড়
বড় গ্রন্থকারের নাম করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিয়ে কথেক জনের নাম
দিলাম :—

‘মহাভারত’-রচয়িতা “বাসুদেব”; ‘বাসবদত্তা’-প্রণেতা “সুবল্লু”; ‘গাথা’-
সংগৃহীতা-রচয়িতা “সাতবাহন”; “সাতবাহনের” নামোল্লেখ করিবার
পূর্বে বাণভট্ট “ভট্টার হরিচর্য” কবির গদ্য রচনা প্রশংসা করিয়াছেন।
‘ভট্টার’ শব্দ পূজার্থে প্রযুক্ত। এই “হরিচর্য” কে ছিলেন? কবি
হরিচর্য ‘ধর্ম্মশর্মাভূদয়-কাব্যম্’ গ্রন্থে “ধর্ম্মনাথ” নামক কোন রাজার
কথা বর্ণনা করিয়াছেন। এই কাব্যকর্তা “হরিচর্য” ও গদ্য-রচয়িতা
“হরিচর্য” কি একই ব্যক্তি?

নগেন্দ্র ভট্টশালী

(৪১)

আজকাল কেহ কেহ automatic বা স্বয়ংক্রিয় চবকা অর্থাৎ বাহাতে
হুতা পাকান এবং জড়ান এক সময়েই আপনা আপনি হয় এইরূপ চবকা
প্রস্তুত করিতেছেন। কিন্তু বিলাতে যখন Arkwright, Hargreaves
প্রভৃতি প্রথমে হুতা-কাটা কলের উদ্ভাবন করেন, তাহারা বোধ হয় কল
automatic কবা অপেক্ষা একসঙ্গে অনেক খে হুতা বাহাতে হয় সেই
বিষয়ে অধিকতর চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দেশে এইরূপ পাঁচ সাত
খে হুতা একজন লোক একত্রে কাটিতে পারে এমন চবকা কেহ কবিয়া-
ছেন কি? [Arkwright প্রভৃতির কলের বিবরণ Ency. Britt.,
9th Edn.এ পাওয়া যায়।]

শ্রী সতীশ

(৪২)

শৈব, শাক্ত কি বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই মালা জপের ব্যবস্থা আছে। জপের জন্ত যে মালা ব্যবহৃত হয় তাহাতে ১০৮টি দানা ও একটি সাক্ষী থাকে। দানা ১০৮টি হইবার কারণ কি এবং কখন হইতে উহার প্রথম উদ্ভব হইয়াছে? সাক্ষী উল্লেখন করিয়া মালা জপা নিষেধ; ইহার কি কোন যুক্তি আছে?

শ্রী আশুতোষ সরকার

(৪৩)

হরিনামের মালায় কুলিতে একটি ছিদ্র করিয়া তর্জনী আঙুলটি সেই ছিদ্র দিয়া বাহির করিয়া বাধিবাব কারণ কি? ইহার সহিত ধর্মবিজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ আছে কি না জানাইলে সুখী হইব।

শ্রীমতী কল্পনাময়ী বার

(৪৪)

মূল্যবান কাগজে কিংবা নোটের সন্নিবিষ্ট কিংবা অস্ত্র কোনও তৈলের দাগ লাগিলে, তাহা উঠাইবার উপায় কি?

শ্রী মূলচাঁদ মাঝাবা

(৪৫)

প্রদীপ নিবিবার পূর্বে উজ্জ্বল হইয়া নিবে কেন?

শ্রী

(৪৬)

প্রাচীনকালে রাজারানী ঋষিদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। পাচক দ্বারা পক্ষ অন্ন রাজারানী আনিয়া ঋষিদিগকে ভক্ষণ করিতে দিতেন। এই পাচকগণ কোন জাতীয় ছিলেন? প্রমাণ সহ কেহ দেখাইলে বাধিত হইব।

শ্রী বিনোদবিহারী রায় পুণ্ড্রবিশারদ

(৪৭)

কাপ্তানের ইতিহাস বাজতরঙ্গিনী নামক পুস্তকে অনেক স্থানে এইরূপ লেখা আছে, যে—অমুক বাজা এতগুলি অস্ত্রহার নির্মাণ করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। “অস্ত্রহার” শব্দের অর্থ কি?

শ্রী শুকলাল চক্রবর্তী

মীমাংসা

(২৪)

শুধু সন্নিবিষ্ট তৈল নয়, যে-কোন তৈল জলে ভাসিলেই নানারূপ রং দেখা যাইতে পারে, উহার স্তরটি খুব পাতলা হওয়া দৃশ্যবান মাত্র। ইংরেজিতে ইহাকে interference colour বলে।

প্রচলিত মত অনুসারে ঈশ্বরের স্পন্দনের জন্ত আলোব উৎপত্তি হয়। নির্দিষ্ট রংএর আলোব জন্ত এই স্পন্দনের বেগ নির্দিষ্ট। এই স্পন্দনের জন্ত ঈশ্বরে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য (wave length), আলোকালনের পরিমাণ (amplitude), বিভিন্ন রংএর আলোর জন্ত ভিন্ন। সাদা আলোতে সাত বকম রংএর আলো আছে। অর্থাৎ উহাতে সমস্ত বেগের স্পন্দন, সমস্ত দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ, সমস্ত রকমের আলোকালন-পরিমাণ একসঙ্গে আছে।

ঈশ্বরের তরঙ্গের প্রকৃতি আমাদের পরিচিত জলের ঢেউএরই মত। জলে একটা ঢিল কেলিলে উহার চারিপাশে ঢেউএব উৎপত্তি হয়। সেই ঢিলটার পাশে আর-একটা ঢিল বেগিলে উহার চারিপাশেও সেই রকম ঢেউএর সৃষ্টি হয়। উভয় ঢেউএর “গতিমুখ” (direction) যদি এক হয় তাহা হইলে উভয়ের “আলোকালন-পরিমাণ” মিলিয়া

বড় ঢেউএব সৃষ্টি হইতে পারে। ভিন্ন হইলে “আলোকালন-পরিমাণের” হ্রাস এবং অবস্থা-বিশেষে সম্পূর্ণ লোপও হইতে পারে। ইহা হইল মোটামুটি কথা। এই “আলোকালন-পরিমাণের” হ্রাসবৃদ্ধি ঢেউগুলির “অবস্থা” (phase) উপর নির্ভর করে। এই হইলে interference of waves ঘটে।

তৈলের উপর সাদা আলো পড়িলে এক অংশ “উপবিতল” (upper surface) হইতে প্রতিফলিত হয়; আব এক অংশ তৈলের সরে প্রবেশ করে। ইহাব এক ভাগ তৈলের নিম্নতল (lower surface) হইতে প্রতিফলিত হয়। প্রথমবাব ও দ্বিতীয়বাব প্রতিফলিত আলোর ঢেউগুলি “পরস্পর বিরোধ” (interfere) করে। উহাতে ঐ ঢেউগুলির “স্পন্দনের বেগ” “তরঙ্গের দৈর্ঘ্য” ও “আলোকালনের পরিমাণের” নানা বকম পরিবর্তন হয়। ইহাতেই নানা রকম রং দেখা যায়।

বিজয় বাহু

জলের উপর যখন কোন তৈল বা অমিশ্রণযোগ্য তবল পশার্থ দেওয়া যায়, তখন তাহার দুইরূপ অবস্থা হইতে পারে। পদার্থটি যদি জল অপেক্ষা ভাবি হয় তবে জলের তলায় ডুবিয়া যায়, অথবা যদি হালকা হয় তবে জলের উপর ভাসিয়া থাকে। তৈল প্রভৃতি পার্শ্ব জলে পড়িলে যে কেবল ভাসিয়া থাকে তাহা নহে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত হয় (droplets)। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৈলস্ফন্দ্র উপর সূর্যরশ্মি পতিত হইলে তাহার যৌগিকবর্ণ মৌলিক বর্ণে ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং সেইজন্মই পীত রশ্মি সম্ভবগ্নিতে (spectrum colours) বিভক্ত হইয়া নানাবর্ণ স্বরূপ করিয়া থাকে। আকাশস্থিত মেঘমালায় উপরে সূর্যালোক পতিত হইয়া এইরূপভাবেই রামধনুস্ব সৃষ্টি করিয়া থাকে। মেঘ ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলীয় বাষ্পবিন্দু মাত্র।

শ্রী ইন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(২৫)

প্রতি জীবজন্তুর দাঁতের চাচিপাশে মাড়ির বেটন আছে। চুরালের মধ্যে গর্ত আছে, সেই গর্তে দাঁতের শিকড় থাকে এবং ঠিক চুরালের হাড়ের উপর হইতে দাঁতের প্রায় গোণে একভাগ মাড়ির দ্বারা স্ফীত থাকে। বয়োবৃদ্ধির কাবণেই হটুক বা কোন পীড়ার কাবণেই হটুক উক্ত মাড়ি যদি দুর্বল বা শিথিল হইয়া পড়ে তাহা হইলে উহার টিপিয়া বাধিবাব শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। তদুপরি বর্ধণ প্রভৃতি কার্যের জন্ত দাঁতের শিকড় ও চুরাল হইতে দাঁত ক্রমে ক্রমে চ্যুত হইয়া পড়ে ও অবশেষে পড়িয়া যায়।

চুরালের হাড়ের মধ্যে যখন প্রথম দাঁত জন্মায় তখন তাহার দুইটি ভাগ থাকে। একটির বৃদ্ধি প্রায়ই শিশুর ৪ মাস বয়সকাল হইতে ১ বৎসরের মধ্যেই সম্পূর্ণ হইয়া যায় এবং ইহাকেই “ছুধে দাঁত” বলে। ছুধে দাঁতের পাশেই আর-এক ভাগ থাকে, তাহার বৃদ্ধি জন্মের প্রায় ৬৭ বৎসর পূর্ব হইতে আরম্ভ হয় এবং ইহাব বৃদ্ধি পূর্ণকাল ছুধে দাঁতের ভিতরে হইতে থাকে ও সেই সময়ে তাহাকে স্থানচ্যুত করিয়া দেয়, কাবণ ছুধে দাঁতের বাহিরের হাড় বা এনাটেলিট বয়োদাঁতের হাড় অপেক্ষা দুর্বল ও অধিকতর অপনিপুষ্ট। এই কারণেই মানুষের দাঁত দুইবার কথিয়া জন্মায়। অস্থায়ী বা ছুধে দাঁত এবং বয়োদাঁত বা স্থায়ী দাঁত—ইহাদের শিকড় একই। ছুধে দাঁত ছাড়াও বয়োদাঁত জন্মে। শিশুদিগের দাঁতের সংখ্যা কুড়িটি, কিন্তু বৃদ্ধব বত্রিশটি। কখন কখন আবার বৃদ্ধের আটশটিও হয়—যখন জ্ঞান-দন্ত বা আক্কেল দাঁত না উঠে। ইহা সকলেরই থাকে না।

শ্রী ইন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(২৬)

নারিকেল তেল সর্ব্বের তেল প্রভৃতি সমস্ত (রাসায়নিক) বস্তুই, তাদের উপরে চাপ (pressure) ও তাপ (temperature) - স্বেৰূপ দেওয়া হবে সেই অনুসারে, অবস্থা-বিশেষে, বাষ্পীয়, জলীয় ও কঠিন (gaseous, liquid, and solid) এ তিন অবস্থাতেই থাকতে পারে।

বায়বীয় চাপ (atmospheric pressure) নারিকেল তেল, সর্ব্বের তেল সমস্ত বস্তুর উপরেই সমান ভাবে পড়ছে; এই চাপে জলীয় নারিকেল তেলকে বাষ্পীয় হতে এত বেশী (একটা নির্দিষ্ট) তাপ দরকার, তেমনি কঠিন হতে এত কম (একটা নির্দিষ্ট) তাপ দরকার। একই চাপেই অবস্থাতে সর্ব্বের তেলের বাষ্পীয় বা কঠিন অবস্থা পেতে যে বেশী কম তাপ দরকার তা নারিকেল তেল বা অল্প সব বস্তুই থেকে তফাৎ। এটা প্রত্যেক বস্তুর একটা বিশিষ্ট গুণ (property)।

নারিকেল তেলের কঠিন হতে হলে যেতটা কম তাপ দরকার আমাদের দেশের শীতকালে ততটা কম-তাপ বা শীতলতা হয়। কিন্তু সেই একই বায়বীয় চাপেই অবস্থাতে, সর্ব্বের তেলের কঠিন হতে আবও ঢেব কম তাপ বা আবও অধিক শীতলতা দরকার, যেতটা শীতলতা আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। হয় ত অল্প কোনো অত্যন্ত শীতপ্রধান দেশে পাওয়া যেতে পারে। সেখানে সর্ব্বের তেল অবশ্যই জমেবে।

সর্ব্বের তেলকে আমবাণ জমাতে পারি। তাব উপবেব চাপ না বধলে তাকে আমবা ঠাণ্ডা কবে' যেতে পারি; তাব কঠিন হবার নির্দিষ্ট শীতলতার যেই আসবে সেই সে জমেবে। অথবা তাপ না বধলে, তার উপবেব চাপ যদি ক্রমশ বাড়িয়ে বাই, তখন একটা নির্দিষ্ট অধিক-চাপে সর্ব্বের তেল জমেবে। এরূপ অবস্থা পবিবর্তন করলে নারিকেল ও সর্ব্বের তেল প্রভৃতিকে গ্রীষ্মকালেও জমানো যেতে পারে।

অবশ্য কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন একই অবস্থাতে নারিকেল তেল জমাব ক্ষমতা কোথা থেকে গেলে বা সর্ব্বের তেল গেলে' না, তার কোনো সমস্ত আঙ্গণ বিজ্ঞান দিতে পারে নি।

ঐ প্রভাতনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

যেমন অনেক জিনিষ সহজে গলিয়া যায়, অনেক জিনিষ সহজে গলে না (যথা সীসা ও সোনা) সেইরূপ আবাব অনেক পদার্থ সহজেই জমিয়া যায়—আবাব কতকগুলি সহজে জমে না, যথা—নারিকেল তৈল ও সরিষার তৈল। জল সহজে জমিয়া যায়, কিন্তু দ্রুত সহজে জমে না।

পদার্থবিশেষের তারল্য এবং কঠিনতা তাহাদিগের আণবিক আকর্ষণ-শক্তির উপর নির্ভর করে। যে-সকল পদার্থের অণুগুলির মধ্যে আকর্ষণ-শক্তি খুব বেশী তাহা কঠিন পদার্থ এবং যাহাদিগের খুব কম তাহাবা বাষ্পীয়, আর যাহাদিগের মধ্যে খুব বেশীও নয় এবং খুব কমও নয় তাহারা তরল পদার্থ।

এই আকর্ষণ-শক্তির ভ্রাস বা বৃদ্ধি উত্তাপ-প্রয়োগে বা উত্তাপ-বিয়োগে হইয়া থাকে। কোন জিনিষ গলাইতে হইলে উহাতে উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হয় এবং এই উত্তাপ সেই জিনিষের অণু-গুলির মধ্যে যে আকর্ষণ-শক্তি আছে তাহা কমাইয়া দেয় এবং সেইজন্যই তবল হইয়া পড়ে। সেইরূপ উত্তাপ-বিয়োগে ঐ শক্তির বৃদ্ধি হয়। সেইজন্যই ঠাণ্ডা করিলে জিনিষ জমিয়া যায় বা কঠিন হইয়া পড়ে। প্রত্যেক পদার্থের এই অণুগুলির পব্ধাব আকর্ষণ-শক্তি একরূপ নহে—কাঁহাবও বা অধিক, কাঁহাবও কম। যাহাব অধিক তাহাকে জমাইতে বেশী দেরি হয় না, কিন্তু যাহাদিগের ঐ শক্তি

কম তাহাবা সহজে এবং অল্প ঠাণ্ডাতে জমে না; সেইজন্য সবিধার তৈল সহজে বা সাধারণ শীতকালের ঠাণ্ডার জমে না, কিন্তু নারিকেল তৈল শীতকালের ঠাণ্ডার জমিয়া যায়।

ঐ ইন্দুনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(২৭)

বিশিষ্টালের চাউলের মধ্যে কোন একটা স্বতন্ত্র রকম ধাতুর চাউলকে “বালাম” বলে না। পূর্বে যখন রেল-ষ্ট্রিমারের এত এচলন হয় নাই সেই সময় চট্টগ্রামের এক একাব নৌকাতে ববিশাল হইতে কলিকাতায় চাউল চালান হইত। ঐ নৌকাগুলিতে পোবেকের সম্বন্ধ ছিল না। নৌকাব ত্তলাগুলি বেভেব বাঁধন দ্বারা জোড়া হইত। এই নৌকাগুলিকে “বালাম” নৌকা বলিত বলিয়া কলিকাতা অঞ্চলে ববিশাল হইতে আমদানী চাউলের নাম “বালাম” বলিয়া পরিচিত।

আসাম প্রদেশের তেজপুৰ, ডিব্রুগড়, উত্তরলক্ষ্মীপুর, প্রভৃতি স্থানে ববিশালের চাউলকে “নলছিটা” চাউল বলে। কাবণ, আসামের এই-সকল স্থানে যে ষ্ট্রিমাবে এই চাউল আমদানী হয় তাহা নলছিটা ষ্ট্রিমার টেনন হইতে ষ্ট্রিমাবে চালান দেওয়া হয়।

ঐ হেমন্তকুমার সেন

ঐ বিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত

(২৮)

আলোক ও আলোকিত বস্তু হইতে নির্গত রশ্মিসকলের গতি সবল এবং পব্ধাব ক্রমশঃ দূর্যাপসবণশীল। একই পদার্থের মধ্যে রশ্মির গতি পরিবর্তিত হয় না। এক পদার্থের (যথা বায়ু) মধ্য দিয়া সরলভাবে গমন করিবার পব অল্প পদার্থের (যথা জল) মধ্য দিয়া ঘাইবাব কালীন বন্ধি নিজ গতি পরিবর্তিত করিয়া অল্প সরল পথে ধাবিত হয়। কম ঘন হইতে ঘনতব পদার্থে ঘাইবার কালীন বন্ধিসকলের পব্ধাব ক্রমশঃ দূর্যাপসবণশীলতাব হাব কমিয়া যাব; ঘনতব হইতে কম ঘন পদার্থে ঘাইবাব কালীন উক্ত হাব বাড়িয়া যায়। একই পদার্থের মধ্য দিয়া ঘাইবাব পূর বন্ধি চক্ষুর উপর পতিত হইলে, চক্ষু রশ্মিসকলের সন্ধিহলে বস্তুকে দেখিতে পায়; অর্থাৎ যেখানে বস্তু আছে ঠিক সেইখানেই তাহাকে দেখিতে পায়। কিন্তু বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন পথ দিয়া ঘাইবাব পব রশ্মি চক্ষুর উপর পতিত হইলে, চক্ষুর নিকট প্রতীবমান হইবে যে তাহার নিকটবর্তী রশ্মিগুলির সন্ধিহলে বস্তুটি অবস্থিত আছে; এবং সেইজন্য চক্ষু বস্তুটিকে নিজস্থানে না দেখিবা অল্প স্থানে দেখিবে। বিববটি উদাহরণ দ্বারা আবণ স্পষ্ট হইবে :—

পাত্রে জল আছে, এবং চক্ষু বায়ুগুণে আছে। পাত্রেব তলদেশ দেখিতে হইলে বায়ু ও জলের মধ্য দিয়া দেখিতে হইবে। পাত্রেব তলদেশের একটা বিন্দু হইতে ২টি বিন্দু লও। রশ্মি ২টি নিশ্চয় পরস্পর ক্রমশঃ দূর্যাপসবণশীল। মনে কর তাহাদের মধ্যের কোণ ১৪ ডিগ্রি। জল বায়ু হইতে ঘনতব। জল হইতে বায়ুতে আসিয়া রশ্মি ২টির পব্ধাব ক্রমশঃ দূর্যাপসবণশীলতাব হাব বাড়িয়া যাওয়াতে তাহাদের মধ্যের কোণও বাড়িয়া গিয়া মনে কর ১৮ ডিগ্রি হইল এবং পরে রশ্মি ২টি চক্ষুর উপর পড়িল। চক্ষুর নিকটবর্তী রশ্মি ২টিব সন্ধিহল স্পষ্টতঃ পাত্রেব তলদেশেব কিছু উপবে অবস্থিত। স্বতবাং পাত্রেব তলদেশের যে বিন্দুটি হইতে রশ্মি দুটি লওয়া হইয়াছিল সেই বিন্দুটিকে চক্ষু কিছু উপবে দেখিল। এইরূপে সমগ্র তলদেশটি একটু উপবে দেখা যাব। (পাত্রেব তলদেশ জলের গভীরতাব আব এক-চতুর্থাংশ উপরে দেখা যাইবে।)

ঐ আশুতোষ স্থানপতি

[শ্রী সলিতমোহন দাশগুপ্ত, শ্রী প্রভাতনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী নয়ন-রঞ্জন মিত্র—এই গ্রন্থের উক্তর দিয়াছিলেন ।]

(৩০)

Sinn Fein এর অর্থ Our own ইহা আয়ারল্যান্ডের নিজ ভাষা Erse এর কথা ।

Bolshevik, Bolshevism—ইহা রুশীয় ভাষার কথা । Bolshevik অর্থ যাহারা খুব বেশী চায়, অল্পে বাসি নয় । Bolshevism অর্থ উপরোক্ত তত্ত্ব বা মত । ইহার বিপরীত Menshevik, Menshevism—যাহারা কম পাইলেও সন্তুষ্ট এবং উক্ত পছন্দ বা মত । যখন রুশীয় বিপ্লববাদীরা প্রবল হইয়া উঠে, তখন প্রথম প্রথম ঐ ছুইটি কথা ল্যাটিন হইতে ব্যুৎপন্ন প্রতিশব্দ, Maximalist

Minimalist, ব্যবহার হইত । পবে বিশুদ্ধ রুশীয় কথা দুইটির প্রচলন হয় । উহার ইংরেজী প্রতিশব্দ Extremist ও Moderate বলা যাইতে পারে ।

শ্রী বিমলাচরণ দেব

Sinn Fein, গেইলিক (Gaelic, আয়ারল্যান্ডের নিজস্ব ভাষা) ভাষার কথা । মূল অর্থ Ourselves = আমরা ; যে পছন্দ লোক নিজস্বের উপর নির্ভর করিতে চায়, পরের অবাচিত মাষ্টাবি চায় না ।

Bolshevism, রুশ ভাষার কথা, অর্থ “For all”-ism, যে বিধান সবার জন্যে অর্থাত্ যে বিধান অনুসারে দেশের প্রাকৃতিক ধন-সম্পদে, শাসন ব্যাপারে, ভোক্তার অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে সকলের সমান অধিকার ।

প্রভাতনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীত

ধরণীব মর্মে মর্মে রসেব যে গোপন সঞ্চয়
সঞ্চারে পল্পবে পল্পে, নাহি অন্ত নাহি তার ক্ষয় !
কুসুম কুসুমে তাই কেঁদে মবে স্রবির শ্বাস,
অন্তরের বসরূপ গন্ধে তাই কবিছে প্রকাশ ।
হৃদয়-অরণ্য মাঝে পথহারা শুধু ঘুরে মবে
বাসনা কামনা কত—তাই বেদনায় আঁগি করে,
মহানন্দে হৃদয়েব মরা গাঙে ঢুই কূল ছাপি’
নানা বাণী নানা বর্ণে তরঙ্গিয়া উঠিতেছে কাঁপি ।
কত কাব্যে, কত ছন্দে সে আনন্দ ধরিছে মুরতি,
মন্দিরে মন্দিরে তাই বন্দনায় ধনিছে আরতি ।
কথা কত হল বলা সজ্জনের সেই আদি হতে
তবু যেন মনে হয় বলা নাহি হল কোন মতে ।
কণে কণে তাই সুরে অর্থহীন বেদনায় ভরি’
সেই কথা বলি—যাহা বলা নাহি হ’ল যুগ ধরি’ ।

শ্রী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার খোকার হাসি

আমাব খোকার হাসি,—

ডালিম-ভাঙা-রাঙা ফুলের

প্রথম বিকাশ-রাশী ।

ফাগুন-হাঁওয়ার পরশ পেয়ে

পাপড়ি মেলে পলাশ যে এ,

কৃষ্ণচূড়ার আঁচল যেন

আনন্দে উদাসী ।

আমার শোকার হাসি,—

আবীর-বাগের গুলাব যেন

স্বপন দেখায় আসি !

প্রভাত-রবির কিরণ লেগে

রক্ত-কমল উঠে জেগে,

সংসারের কাঁটায় কে নয়

‘কোমল’-অভিনাষী ?

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্তী



বৈষ্ণব যুগে নারীর শক্তি

বৈষ্ণবদিগের ভক্তমাল গ্রন্থখানি মধ্য য়ে সত্য ও কল্পনা উভয়ই মিশ্রিত হইয়াছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও ঐ বইখানি বিভিন্ন বৈষ্ণবযুগের সামাজিক ইতিহাসও একটু অবগত হওয়া যায়। তাহা ছাড়া আব-একটি কারণে উক্ত গ্রন্থখানি সকলের আলোচনার যোগ্য। তন্মধ্যে কয়েকটি মনস্বিনী ও ধর্মশীলা নারীর সাধনের, শাস্ত্রজ্ঞানের ও ভক্তির কাহিনী বর্ণিত আছে। উহা পড়িয়া যথার্থই হৃদয় আনন্দে-আপ্ত হইয়া যায়।

আমরা এ দেশের প্রসিদ্ধ কয়েকখানি পুঁথিতে বিস্তর পত্রিতা নারীর উল্লেখ দেখিতে পাই। তাঁহারা স্বামীকেই জীবনসর্ব্বধন দেবতা মনে করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্ত সর্বপ্রকার দুঃখকষ্টকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধযুগের ইতিহাস একটুকু পড়িলে দেখিতে পাওয়া যায়, বহু রমণী পুরুষের মতই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, ধর্মের জন্ত গৃহ স্বর্গ্য পাবে ত্যাগিয়াছেন, ভিক্ষুণী হইয়া কঠোর সাধন করিয়াছেন; তাহার পরে ধর্মপ্রচারের জন্ত কেহ কেহ দূর বিদেশে সাগর-পারের চলিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধযুগের পরে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে—অর্থাৎ মীরাবাইর সময় হইতে বৈষ্ণব লেখকদিগের পুঁথিকে কয়েকটি ভক্তিমতী ও তেজস্বিনী নারীর জীবনের কিছু নূতন রকমের কথা পাঠ করিয়া থাকি। তাঁহারা স্বামীকেও ভাল-বাসিয়াছেন, স্বামীকে সেবাও করিয়াছেন। কিন্তু সত্যের জন্ত, ধর্মের জন্ত, অন্তরস্থিত বিশ্বাসে অটল থাকিবাব জন্ত তাঁহারা স্বামীর কুসংস্কারপূর্ণ মতের বিরুদ্ধে চলিতে এবং অন্ত্যস্ত কার্যের প্রতিবাদ করিতে মোটেই ভয় পান নাই। এজন্য প্রথমে শত্রুর কুলের লোকেরা তাঁহাদের উপরে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন বটে; কিন্তু তাহা পরে ঐ-সকল সাধনী নারীদিগের মনের বল,

অন্তরের পবিত্রতা, আধ্যাত্মিক শক্তি ও ভগবানের প্রতি ভক্তি দেখিয়া, স্বামীরাও তাঁহাদের পদতলে মস্তক নত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আমি আজ ভক্তমাল গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া উক্তরূপ দুইটি মনস্বিনী ও ভক্তিমতী নারীর জীবনের কাহিনী বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

(১)

দেবকীনন্দন রায় কাটোয়ার নবাবের ফৌজদার। তাঁহার বিস্তর টাকা। তিনি মস্ত বড় ধনী। ধর্ম বলিলে ঠিক যাহা বুঝা যায়, এই ধনাঢ্য লোকটির ভিতরে তাহার কিছুই ছিল কি না তাহা বলা বড়ই মুশ্কিল। কিন্তু তাঁহার ভণ্ডামি যে পূর্ণ মাত্রায়ই ছিল, সে কথা সকলেই জানিত। আপনাকে ধনী এবং ধার্মিক বলিয়া জাহির কবিবার জন্ত বাহিবে তাঁহার পূজার আড়ম্বরই বা কত! ভক্তমাল-রচয়িতা বলিতেছেন—

“যমুনার তীরে যব নিকটে যমুনা।
স্বানাদি কবয়ে সদা সন্ধ্যাদি বন্দনা ॥
হস্তী যে বৃহৎ এক বৃহৎ দশন।
দশন উপরে করি চৌকিব আসন ॥
জলে দাঁড় করাইয়া তাহাতে বসিয়া।
দেবীপূজা কবে বড় বড়াই করিয়া ॥
রক্তচন্দনের কোঁটা সর্বাঙ্গে লেপিয়া।
সদা ভৈরবের শ্রাব আকার হইয়া ॥
রক্তচন্দন জবা পুষ্প তাত্র শেখো।
পূজয়ে বসিয়া—”

এই জাঁকজমকওয়ালা ধনীর প্রথম পত্নীর মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় বার তাঁহার বিবাহ হইল। এই বিবাহের জী গৃহস্থ বৈষ্ণবের কন্যা। বিবাহের সময়ে তাঁহার কত বয়স হইয়াছিল, ভক্তমাল গ্রন্থে সে বিষয়ে কোন কথাই উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু তিনি যে বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী ও ধর্মশীলা তরুণী নারী ছিলেন, তাঁহার বয়স যে নিতান্ত অল্প ছিল না, সে কথা ঐ গ্রন্থের বর্ণনা পাঠ করিয়া অতি স্পষ্টকপেই বুঝিতে পারা যায়। ভক্তমাল-রচয়িতা বলিতেছেন, এই বৈষ্ণবের কন্যা পিতৃগৃহে থাকিতেই

ভক্তিদর্শে দীর্ঘ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরম ভক্ত শ্রীনিবাস আচার্য তাঁহার গুরু ছিলেন। পিতৃগৃহে এই শক্তিশালিনী নারী শুধু যে লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন, তাহা নহে; পাশ্বে জ্ঞানলাভ করিয়া আপনার ধর্মমতে দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি পুরুষদিগের সঙ্গে রীতিমত ধর্মশাস্ত্রের বিচার করিতেও সক্ষম বোধ করিতেন না। কিন্তু বিচার কবিলে কি হইবে? এই শিক্ষিতা ও স্বাধীনভাবাপন্ন নারী স্বামীব গৃহে আসিয়া আপনার জীবনই ব্যর্থ বলিয়া মনে করিলেন; স্বামীব ব্যবহারে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া অদৃষ্টকে দিকার দিতে লাগিলেন। এমন কি, স্বামীর অজ্ঞায় কার্য্য দেখিয়া তাঁহার গৃহেব অন্নজল গ্রহণ করিতেই যুগা বোধ হইতে লাগিল। এ বিষয়ে ভক্তমাল গ্রন্থের বর্ণনার কিয়দংশ এই—

“বিবাহের পবে যবে নবধা গমনে।
ব্যবহার মতে আইল স্বামীর ভবনে।
আসিয়া দেখয় সব বিপর্য্য ভাব।
তমোপগম্য নাত্র প্রচণ্ড স্বভাব।
বক্তচন্দন অঙ্গে স্রবাপুস্পমালা।
দ্রুম দ্রুম কবি চলে দেখিতে করাল।
কাটা ছেঁড়া মদ্য মাংস সদা ব্যবহার।
মোপিনীচক্রেতে বসি কথয়ে আহাব।
এতক দেখিয়া কস্তা চমকিয়া চায়।
এই হয় বুলি মোব স্বপ্নব-আলয়।
হা হা বিধি হেন বিড়ম্বন কেন কৈলে।
কি দোষে আমাবে হেন পক্ষেতে ডারিলে।
পিতা মাতা না জানি কতক ধন পাইয়া।
অবলা আমারে দিল কূপেতে ডাবিয়া।
বিলাপ কবিয়া কালে ভূমে গড়ি যায়।
এখন আমার দশা কি হবে উপায়।

* * *
তবে কি আমার গতি হইবে এখন।
পালাবাব পথ নাহি অবলা-জনম ॥”

এই “অবলাজনম” শব্দটি যেন অসহায় নারীর সমস্ত প্রাণের বেদনাষ ভরিয়া উঠিয়াছে। কথাটি পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে করিতে এ দেশের অনেক দুঃখিনী নারীর মর্মান্তিক ক্লেশ মনের মধ্যে যেন কেমন এক ব্যথা জাগাইয়া তোলে। আমবা দেখিতেছি, চারিগত বৎসর পূর্ব্বের এই বৈষ্ণবত্বহিতা অন্তরেব যাতনায় এ কালের স্নেহলতার মতই একবার ভাবিয়াছিলেন—

“উপায় আছে এই নাত্র দেখি এবে।
অনাহারে শাক্তি শরীর ত্যজি তবে।

কিন্তু এই তরুণী ধর্মশীলা; শ্রীহরিকে লাভ করাই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। তাই তিনি আত্মহত্যা বংকল্প করিয়াই ভাবিতে লাগিলেন—

—“সত্য বটে এ কথা নিশ্চয়।
আত্মহত্যা হরি না হন সদয় ॥

হরি সদয় হন না বলিয়াই তিনি মৃত্যুর চিন্তা আব মনে স্থান দিতে পারিলেন না। তবুও তিনি স্পষ্ট কথাষই বাড়ীর মেয়েদের জানাইয়া দিলেন, এ গৃহের অন্ন আমি গ্রহণ করিব না। ভক্তমাল-রচয়িতা লিখিয়াছেন—

“এত শুনি নারীগণ হাসিয়া কহয়।
কেন গো ইহারা কিছু হাড়ি ডোম নয়।
অন্ন নাহি খাবে, ঘর করবে কেমনে।
এত বড় অসম্মত ভাব তব কেনে ॥
কেহ কহে আপো উনি বৈষ্ণবের ঝি।
না খান শাক্তের অন্ন হেনই বা বুদ্ধি ॥
ইহা শুনি হাসি নিন্দা করে মেয়েগুলা।
যা শুভী নন্দবর্ণ তিরস্বাব কৈলা ॥

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। মেয়েদের হাসি-ঠাট্টার এবং শাস্ত্রী-নন্দদের ভৎসনার যে কোনই কারণ ছিল না, তাহাও নহে। বউটির শিক্ষা ও ধর্মভাব থাকিলেও বৈষ্ণবধর্মের গোঁড়ামি যথেষ্টই ছিল। তিনি শুধুই বামাচারী, মদ্যপায়ী, মাংসখোর স্বামীর ভণ্ডামি ও ভ্রষ্টাচার দেখিয়াই ত আপনার অদৃষ্টকে দিকার দেন নাই; স্বপ্নরকুল যে শাক্ত, এজ্ঞাতও তাঁহাব অন্তরে অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিয়াছিল।

কিছুদিন পরে এই ধর্মশীলা নারী স্বামীর হৃদয়ের উপরে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে এবং তাঁহার মন অধর্ম হইতে ধর্মের দিকে ফিরাইয়া লইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। স্বামী তান্ত্রিক বামাচার ধর্মের স্রবাপান ও তাহার সঙ্গে আর সকল ব্যাপার ত্যাগ কবিয়া বাহাতে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন এবং ভক্তিলভের জন্ত ব্যাকুল হন, সেদিক্ত তিনি তাঁহাকে বিস্তার অল্পরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু—

“স্বামী তাহা শুনি বহু ভৎসনা করয়।
তুই মোব গুরু হইলি কহিয়া কহয় ॥”

তা, গুরু না হইয়া স্ত্রী হইলেও এই দৃঢ়চিত্ত তেজস্বিনী মেয়েটিকে তিনি আর বেশিদিন অগ্রাহ্য কবিয়া চলিতে পারিলেন না। অল্পদিনের মধ্যেই জীব চরিত্রের

প্রভাবে দেবকীনন্দনের মন বদলাইয়া যাইতে লাগিল।
ভক্তমাল বলিতেছেন—

“কিন্তু হরিভক্তের দেখহ কি বা গুণ।
ক্রমে ক্রমে তাহার কিছু তমঃ হৈল নুন ॥
জীর ভজনরীতি চরিত্র দেখিয়া।
মনেতে প্রশংসা কবে প্রবীভূত হৈয়া ॥”

এই সময়ে দেবকীনন্দনের সামনে আবাব এক
নিদারুণ শোক আসিয়া উপস্থিত হইল। অকালে তাঁহার
ছেলেটি মরিয়া গেল। গর্ষিত মানুষের মাথা নত করিয়া
দিতে এবং হৃদয়ের উপরে ঘা মাঝিয়া লোকের মনকে
দৈবের পানে লইয়া যাইতে, মৃত্যু যেমন পারে, এমন
ত আব কিছুই নহে। তাই এইবার মৃত্যুর আঘাতেই
দেবকীনন্দন শোকাচ্ছন্ন হইয়া জীর কাছে এবং দৈবের
কাছে মাথা নত করিলেন। ভক্তমাল লিখিয়াছেন—

“কতক দিবস পবে পুত্রটি মরিল।
শোকেতে আকুল হয়ে কাতর হইল ॥
ছঃখের সময় বিনা যথার্থ না বুঝে।
কৃষ্ণে নাহি লয় মন স্তনিলে না বুঝে ॥
তখন আছিল কিছু চিন্তা নিরমল।
জীব বচন কিছু মনে বিচারিল ॥
তবে কহে অযোগ্য তুমি যে করহ।
তোমাব মনস্থ কিবা কি কবির কহ ॥
তঁহে কহে কৃষ্ণপদ আশ্রয় করহ।
নতুবা সকল ব্যর্থ অনর্থক দেহ ॥”

শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন পত্নী ধর্মভাবে পূর্ণ হইয়া স্বামীকে
আরো অনেক তত্ত্বব্যাখ্যা শুনাইলেন; বৈষ্ণব পণ্ডিতদিগকে
ভাকিয়া তাঁহাদের ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিতে বিস্তর
অমুরোধ করিলেন। তাহা ছাড়া তিনি নিজেও স্বামীকে
বলিতে লাগিলেন—“একমাত্র হরি ভিন্ন আর কে মানুষের
অন্তরে শাস্তিদান করিতে পারে? সংসারে এমন শক্তি
আর কাহার আছে? আমি তাই একমাত্র হরিকেই
আশ্রয় করিয়াছি। তুমিও সেই হরির পাদপদ্মেই হৃদয়
অর্পণ কর। তাঁহাকে পাইলেই সব পাইবে। তাঁহাতেই
মনের শান্তি এবং সন্তোষ।”

ইহার পরেই দেবকীনন্দন বায়েব আশ্চর্য্য পবিত্র
হইল। তিনি তাঁহার জীর স্রায় শ্রীহরির শব্দপন্ন
হইলেন। অধর্ম ও পাপ আর তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ
করিতেও পারিল না। দিনের পরে দিন ধর্মভাবে তাঁহার
হৃদয় প্রাবিত হইতে লাগিল। তিনি আর সংসারে বাস

করিতে পারিলেন না। আপনার ধর্মার্থ্য ব্রাহ্মণ ও
বৈষ্ণবদিগকে দান করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন।
সেখানে তাঁহার বৈরাগ্য ও কঠোর সাধন দেখিয়া সকলেই
স্তম্বিত হইয়া গেল। ভক্তবৎসল ভগবানও তাঁহাকে
দেখা দিয়া এবং ভক্তিতে হৃদয় আপ্ত করিয়া, তাঁহার
মানবজন্ম সার্থক করিলেন। ভক্তমাল বলিতেছেন—

“দৌলত নুটারে দিল ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে।
বৃন্দাবন গেলা হরি-অমুরাগ ভাবে ॥
বসুনার তীবে বসি হরি নাম করে।
অযাচক বৃত্তি মাত্র রহে অনীহারে ॥
কতক দিবসে হরি-চরণ পাইলা।
কহা নাহি যায় হরি-ভক্তির কি নীলা ॥
যেই জীব সঙ্গে মহা মোহ উপলব্ধ।
সেই জী হইতে হৈল ভক্তির উদয় ॥
অন্ত আশর জীবহিংসা তেবাগিয়া।
ভাগবত হৈল হবিময় হৈল হিয়া ॥”

দেবকীনন্দনের পত্নী গৃহেই ছিলেন। গৃহই তাঁহার
ভক্তি-সাধনের ক্ষেত্র ছিল। তিনি যখন বর্ষায়সী রমণী,
তখন ভগবানের প্রেমে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল;
তাঁহার গভীর ভক্তি এবং উন্নত ধর্মজীবন দর্শন করিয়া
শত শত লোক তাঁহাব প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে
লাগিলেন।

(২)

দ্বিতীয় জীবনচরিত্রটি এই :—

জয়পুরের রাজার নাম মাদবসিংহ। তিনি খুব
সাহসী এবং মহা একজন বীর। তাঁহার স্বশাসনে
সকলেই খুব খুসী। জয়পুরের যিনি রাণী, তিনি পরমা
কপসী। রূপের মতই তাঁহার গুণ। রাজার উপবে
তাঁহার ভালবাসাও অত্যন্ত অধিক। একদিন তিনি
শুভ্র স্বকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন; দাসী
তাঁহার সুন্দর পা দুখানি টিপিয়া দিতেছে। এমন সময়ে
সেই পরিচারিকার মুখখানি কেমন এক আশ্চর্য্যভাবে
পূর্ণ হইয়া উঠিল। রাণী বিস্মিত নয়নে সেই মুখের
পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পরে পরিচারিকা
প্রেমোচ্ছ্বাসে কাঁদিতে লাগিল।

এই দাসী অভাবে পড়িয়া চাকরাণীর অতি ক্ষুদ্র
কার্য্যই করিয়া থাকে বটে; কিন্তু সে ধর্মশীলা নারী।
তাহাব অন্তরে ভক্তির স্ফূরণ হইয়াছে। সে তাহার

প্রাণের দেবতা শ্রীহরিকেই স্বামিরূপে বরণ করিয়া লইয়াছে। এখন সেই হরিই তাহার সর্বস্ব। সে ত হবির দর্শন ভিন্ন আর কিছুই চাহে না। তাই সে রাণীর পা টিপিতে টিপিতে শ্রীহরিরই স্মৃষ্টি নামটি মনে মনে জপ কবিতেছিল। নাম করিতে করিতেই তাহার হৃদয়ের প্রেম উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্তই বাহিরে এই ভাবোচ্ছ্বাস।

রাণীর বড় কোমল চিত্ত। তাই দাসীও ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া সেই চিত্ত আর্দ্র হইয়া গেল। দাসীও আবার তাঁহাকে ভগবানের প্রেমের রসপূর্ণ কাহিনীই শুনাইতে লাগিল। রাণী আব তাহাকে দাসী বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। তিনি শ্রদ্ধায় ও ভাবে পূর্ণ হইয়া বলিতে লাগিলেন—“বল, ঐ স্মধুর ভক্তির কথাই আমাকে বল। তোমার মুখ হইতে যে স্মধার ধাৰা ঝরিয়া পড়িতেছে। তুমি আমাব প্রাণে যে অমৃত বর্ষণ করিতেছ।” ভক্তমাল বলিতেছেন—

“কহ পুনঃ পুনঃ কহ আঁহা বল বল ।
শুনিতে শুনিতে রাণী মগন হইল ।
দাসীও প্রশংসা করি কহিতে লাগিল ।
তুমি ত আমার পদসেবা-যোগ্য নহ ।
দাসী যে তোমাবে বলি অপবাদ দেহ ।
অতএব তুমি মোর পদ ছাড়ি দেহ ।
শিষ্যব আসিয়া শিরে চরণ ধরহ ।
এতক বলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন কৈল ।
হুই জনে প্রেমানন্দে বিহ্বল হইল ।
দাসী কহে ঠাকুরানী দেখহ ভাবিয়া ।
ভুলিলে বিষয়-সুখ মোহিত হইয়া ।
এ অনিত্য সুখ তাতে কত বা আশা ।
কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তির কি স্মরণ আদ ।
অনিত্য বিষয়-সুখ হৈল আব গেল ।
কৃষ্ণপ্রেম পরাংপর নিত্য কবে আলো ।
বাণী কহে তোমার সঙ্কেতে তা বুঝিহু ।
আজি হৈতে স্তব্ধ কবি তোমারে মানিহু ।
আজি হৈতে বিষয়ের গুণ তেবাগিহু ।
কৃষ্ণ-প্রেম-ন লাগি বিষয় সপিহু ॥”

জয়পুরের রাণী ভক্তির জন্তই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি আর জাতির বিচার করিতেও পারিলেন না। নিম্নবর্ণের এই দাসীকেই গুরুরূপে বরণ করিলেন; তাহার কাছে ভক্তিদর্শনে দীক্ষা গ্রহণ কবিতেও কোনরূপ সঙ্কোচ-বোধ করিলেন না।

রাণীর ধনৈশ্বর্যের প্রতি যে আসক্তি, তাহা একে-

বারেই চলিয়া গেল। তাঁহার স্বর্ণখচিত বসন ও রত্নাদি ভূষণ কোথায় পড়িয়া রহিল। রাণী সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া নিরন্তর প্রাণের দেবতাকেই ডাকিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইল। প্রেমে ও পুণ্যে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। তিনি ভক্তির উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া, তাঁহার প্রেমের দেবতাকে লইয়াই অধিক সময় যাপন করিতে লাগিলেন। এতদিন রাণীকে অন্তঃপুরে পর্দার আড়ালেই বাস কবিতে হইত। এখন আর সে পর্দাও রহিল না, অন্তঃপুর এবং তাহার বাহিরের সন্ধেও তেমন একটা প্রভেদ বহিল না। রাণী ভক্ত বৈষ্ণবদিগের সঙ্কেই মিলিত হইয়া শ্রীহরির চরণ সেবা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে রাজা মাধব সিংহ রাজ্যে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি যুদ্ধের জন্য অন্ত জায়গায় গমন করিয়াছিলেন। দেওয়ানের হস্তেই রাজ্যের সমস্ত ভার অর্পিত হইয়াছিল। রাজা স্বয়ং রাজ্যে উপস্থিত থাকিলে, বৃষ্টি বা অন্তঃপুরে এমন একটা ব্যাপার হঠাৎ ঘটিয়া উঠিতে পারিত না। দেওয়ান মহাশয় রাণীর সব কাণ্ডকর্ম দেখিয়া ত অবাক! তিনি বাণীর কাছে লোক প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, “আপনি রাজ্যরাজেশ্বরী হইয়া এ-সব কি কবিতেছেন? অন্তঃপুরেই পর্দা তুলিয়া দিলেন কেন? কতকগুলি বৈষ্ণবের সঙ্কেই বা মিশিতেছেন কেন?”

রাণী দেওয়ানকে বলিয়া পাঠাইলেন, “দেওয়ান, তুমি আমাকে আব বাণী বলিয়া সম্বোধন করিও না। আমি যে এখন শ্রীহরির দাসী বলিয়াই আমার নাম লিপাইয়াছি। আমার পর্দাই বা কোথায়? জাতিই বা কোথায়? আমাব আর লজ্জা-সরমই বা কোথায়? কোথায় বা আমার ধনৈশ্বর্য? আমি শ্রীহরির প্রেমে পাগলিনী হইয়া সর্বস্বই যে তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়াছি।”—

“রাণী কহে রাণী বলি না কহিও মোরে ।
দাসী নাম লিখে দিহু যুগল-কিশোরে ॥
জাতি-পাতি তেয়াগিহু বৈষ্ণব সমাজে ।

* * *
এ-সব রিপূর হাত যদি ছাড়াইহু ।
তবে আর কারে ভয়, নির্ভীক হইহু ।
অতএব বিবরণ দেওয়ানে কহ ।
শ্রীচরণে সঁপিবাছি দেহ পর্দা সহ ॥”

দেওয়ান চিন্তা করিয়া দেখিলেন, রাণীর অবস্থা মোটেই সুবিধাজনক নয়, এইবার রাজাকে সব ঘটনা লিখিয়া পাঠানো প্রয়োজন। দেওয়ান তাই রাজাব নিকট পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। পত্র পাঠ করিয়া রাজাব মন ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি রাণীকে হত্যা করিবার জন্ত স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু রাজা রাণীর প্রেমোজ্জ্বল মূর্তি দর্শন কবিয়া এবং তাঁহার অমূল্য ভক্তির ও অদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইলেন। শুধু তাহাই নহে। পত্নীর অনেক বিস্ময়কর কার্য দেখিয়া রাজা ভাবিতে লাগিলেন, রাণী ত এখন আর মানবী নহেন—তিনি যে দেবী। এই দেবীর প্রতি রাজা কি ভক্তি প্রকাশ না করিয়া স্বস্থির থাকিতে পারেন? তাই—

“পাত্র মিত্র সম্ভাসদ সমস্তি ব্যাহাবে।
বাণীব নিকটে পেলা বিনীত অন্তরে।
নিকটে বাইয়া রাজা অষ্টাঙ্গে পড়িল।
নিজ স্ত্রী বলি অভিমান নাহি কৈল।
বোড়হস্তে স্তবস্তুতি অনেক করিল।
অপবাধ ক্ষম বলি কাতরে কহিল।”

পতিব্রতা রাণী রাজার অপরাধের কথা মনেও করিলেন না। তিনি নম্রবচনে রাজাকে কহিলেন, “আমি সম্পূর্ণরূপে তোমারই অধীন। তুমি কখনই তোমার দয়া হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না। এখন আমার একান্ত অস্থবোধ, তুমিও ভগবানের শরণাপন্ন হও এবং ভক্তির সহিত তাঁহারই নাম কীর্তন কর। তাহা হইলেই তোমার যথার্থ মঙ্গল হইবে।”

রাজা কহিলেন, “এখন আব তুমি কোন মানুষেরই অধীন নও। ঈশ্বরের অধীন এই জগৎসংসার, তুমি শুধু তাঁহারই অধীন। তুমি আগাব সহায় হও। আমি তোমার সাহায্যেই রাজ্য শাসন করিব”—

“তোমারে সহায় কবি রাজ্য মুই করি।”

এই-সকল বর্ণনা পাঠ কবিয়া মনে হয়, যথার্থই বৈষ্ণব যুগে এক শ্রেণীর নারীর অবস্থার একটু উন্নতি হইয়াছিল। হয় ত তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম। কিন্তু সংখ্যা কম হইলেও তাঁহাদের একটুকু শাস্ত্রজ্ঞানও ছিল, স্বাধীনতাও ছিল; তাঁহারা পুরুষের মতই সাধন কবিয়া ভক্তি এবং

আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ কবিয়াছিলেন। সেইজন্যই পুরুষেরা তাঁহাদিগকে অন্তরের শ্রদ্ধা অর্পণ কবিতো কুণ্ঠিত হন নাই।

শ্রী অমৃতলাল গুপ্ত

টরেন্স স্ট্রেট এবং নিউগায়েনার নারী

নিউগায়েনা এবং অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে টরেন্স স্ট্রেট (প্রণালী) এবং কতকগুলি দ্বীপ অবস্থিত। এই দ্বীপপুঞ্জকে কুইন্সল্যান্ডের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়, কিন্তু এইখানেব প্রাচীন অধিবাসীদের চেহাবার সহিত অষ্ট্রেলিয়ার আদিম কালের লোকদের চেহাবার কোনো প্রকার সাদৃশ্য নাই। টরেন্স স্ট্রেটের লোকেবা পাণ্ডুয়ান জাতির হইলেও নিউগায়েনাব লোকদের সহিত চেহাবাষ এবং আচার-বিচারে বিশেষ কোনো অমিল নাই। নিউগায়েনার লোকদের সহিত ইহাদের বিবাহাদিও চলিয়া থাকে। গত ৩০ বৎসর হইতে, মুক্তাব ব্যবসাব জন্ত পৃথিবীর নানাদেশ হইতে নানা জাতির লোক এই টরেন্স স্ট্রেটের দ্বীপগুলিতে শুলভাগমন কবিতোছে।

এই শুলভাগমনের ফলও ফলিতেছে, তবে তাহা শুভ কি অশুভ তাহা বলা শক্ত। বিদেশীর আগমনে এবং আধিপত্যে দেশবাসী তাহাদের প্রাচীন প্রথা-পদ্ধতি ক্রমে ত্যাগ করিতেছে বা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে। বিদেশীর নানা প্রকার কুশী ব্যাধির আমদানী হইয়াছে। প্রাচীন দ্বীপবাসীরা খুব তাড়াতাড়ি মোগ পাইতেছে। পঞ্চাশ বৎসব পূর্বে দ্বীপের যে অবস্থা ছিল, এখন সে অবস্থা নাই। সেই সময় কুকুবেব দ্বীপের হাবের যে নাম ছিল, একটা লোহার ছবি বা কাচের বোতলেরও ছিল সেই নাম। ঐ রকম যে-কোনো একটা জিনিষের বদলে একটা স্ত্রী ক্রয় করা যাইত। সেই-সব দিন গত হইয়াছে। কতকগুলি দ্বীপ লোকশুল্ক হইয়াছে। বাকী দ্বীপে প্রাচীন বুদ্ধ বুদ্ধা জন ছয় কবিয়া আছে। প্রাচীন দ্বীপবাসীরা মনে করিত তাহাদের এ ৬ এক বংশ এক এক জন্ত হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে। তাহারা নিজ নিজ বংশের আদি জন্মদাতা জন্তব মূর্তি পিঠে উদ্ধিতে আঁকিয়া লইত। বর্তমান বাল পিঠে ছবি-আঁকা স্ত্রীলোক নাই বলিলেও



নিউগায়েনার পিঠে-উকি-কাটা বৃদ্ধা বিধবা নারী।
এই উকি তাহার জাতির বংশচিহ্ন।

হয়। বৃকেও নানা রকমের উকি পরা হইত। প্রত্যেকটি দাগের এক এক রকম অর্থ করা হইত। কিন্তু এই-সমস্ত দাগেব যথার্থ অর্থ যে কি তাহা এই দ্বীপেব আদিকালের লোকেরাও বলিতে পারে না।

প্রাচীন বালের নারীরা সাঙু গাছের পাতাব তৈয়ারী এক বকম ঘাঘুবা পরিধান করিত। তাহারা এই বস্ত্রকে ধূসর বা কালো রঙে বঙ করিয়া লইত। কিন্তু বর্তমান কালে ঐ দ্বীপেব নারীরা এই পরিষ্কার এবং সহজপ্রাপ্য বস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে। তাহারা এখন বিলাতী কাপড়ের তৈয়ারী কিছুতকিমাকার দেখিতে একটা সেমিজের মত গাউন পরে। নূতন যখন এই সেমিজ তৈয়াবী হয়, তখনই ইহা পরিষ্কার থাকে, তার পর ইহার রূপ যে কি রকম হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। লোকদের অবস্থা ধারাপ বলিয়া বড় জোব দুইটা সেমিজ তাহারা এক সঙ্গে রাখিতে পারে। প্রত্যেক দিন এই সেমিজ পরা চাই, কাবণ এই সেমিজ এখন তাহাদের ক্যাসান হইয়া



নিউগায়েনার জাতীয় পরিচ্ছদে ও ভূষণে সজ্জিতা বালিকা।

দাঁড়াইয়াছে। অধিকাংশ সময় তাহারা সাঙু-পাতাব ঘাঘরা পরিয়া থাকে, দেহের উপরার্ক অনাবৃত থাকে।

পূর্বে বালিকা যখন নারীত্ব প্রাপ্ত হইত তখন টবেস দ্বীপপুঞ্জে এবং নিউগায়েনাতে একটি উৎসব করা হইত। এই সময় ঐ বালিকাকে একেবারে আলাদা স্থানে কয়েক দিনের জন্ত বাস করিতে হইত। ঘরের এক অন্ধকাব কোণে লতাপাতা ঘেরিয়া দেওয়া হইত, এই স্থানে বালিকা নানাপ্রকার দেশীয় অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া দিনের বেলায় বসিয়া থাকিত। বাত্রিকালে লতা পাতা নূতন কবিয়া বদলাইয়া দেওয়া হইত। রাত্রে বালিকা কিছুকণের জন্ত বাহিরের হাওবাতে আসিতে পাইত। এই ভাবে বালিকাকে তিন মাস কাল কাটাইতে হইত। দুইজন বৃদ্ধা নারী (তাহারা সম্পর্কে খুড়ী বা মাসী) তাহাব সমস্ত সেবা করিত। অবরুদ্ধা বালিকা-নারী এই সময় নিজের হাতে কিছুই করিতে পাইত না, এই দুইজন বৃদ্ধাই তাহাকে হাতে বরিয়া মুখে খাবার তুলিয়া দিত।

এই তিন মাস কাল সূর্যের আলো বালিকার লতা-ঘেবা স্থানে কোনো রকমেই প্রবেশ করিতে পাইত না। লোকেব ধারণা ছিল, যদি কোনো রকমে সূর্যের আলোর এক টুকরা বালিকার দেহে লাগে, তবে তাহাব নাক পচিয়া যাইবে। তিন মাস কাল পূর্ণ হইলে বালিকাকে নিকটের কোনো একটা ঝরণাতে লইয়া যাওয়া হইত। তাহাকে ঘাড়ে বরিয়া বা অশ্ব কোনো বকমে বহন করিবার প্রথা ছিল, কারণ বালিকার পা মাটি ছুঁইতে পাইত না। এইখানে বালিকার অঙ্গ হইতে সমস্ত বস্ত্র এবং গহনা খুলিয়া লইয়া পব, ঐ ছুই বৃদ্ধা এবং বালিকা ঝরণার জলে অবগাহন করিত। গ্রামেব অত্যাগ্ৰ নারীরা বালিকা এবং তাহাব সেবিকাদ্বয়ের গায়ে অঞ্জলি করিয়া জল ছিটাইত। স্নান শেষ করিয়া বালিকা নানা রকম লতা-পাতাব বস্ত্রে এবং দেশীয় অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া গ্রামের ভোজে আসিয়া যোগদান করিত। ভোজ শেষ হইলে পর বালিকা অশ্ব দশ জন নাবীব মত গ্রামের সব কাজে সমান অধিকার লাভ করিত। বালিকা যে নারীস্বে উপনীত হইয়াছে তাহার পরিচয়-স্বরূপ তাহার বৃকে ইংরেজী V অক্ষরের আয় উদ্ধি কাটা হইত।

বিবাহ করিবার পূর্বে যুবতী নারী প্রথমে তাহাব মনোমত কোন যুবকের সহিত প্রণয় করিত। অবশ্য কোনো যুবক যদি কোনো যুবতীব প্রেমে পড়িত তবে সে গ্রামের নাচে গানে ও অত্যাগ্ৰ নানা কাজে সব সময় বাহাছরী লাভের প্রয়াসে থাকিত। শাস্তিব সময় এই পদ্ধতিতে যুবক কোনো বিশেষ যুবতীব মনোরঞ্জন চেষ্টা করিত। কিন্তু অশান্তির সময় যুবক যদি কোনো রকমে একটা মড়ার মাথার খুলি জোগাড় করিতে পাবিত তবে তাহার ভালবাসার পাত্রী তাহাব প্রেমে না পড়িয়া আর থাকিতে পারিত না। কারণ মাথার খুলি জোগাড় করা যার-তার কর্ম নয়—প্রকাণ্ড বীর না হইলে কেহই তাহা পাবে না। যুবতীর মন হরণ করিবার আবে একটা উপায় ছিল—যুবক নারিকেল তেলের সঙ্গে নানা বকম গাছ-পালার বস মিশাইয়া এক রকম গন্ধ-তৈল প্রস্তুত করিত। এই গন্ধ-তৈল মাখিয়া সে যুবতীর সামনে ঘূষিত। তেলের চমৎকার গন্ধে যুবতীর মন একেবারে

পাগল হইয়া যুবকের দিকে ছুটিয়া যাইত। তাহার পবে সেই যুবতী একগাছা ফুলেব মালা যুবকের কাছে পাঠাইত—এই মালা দেওয়াব অর্থ যুবককে পাণিগ্রহণে আহ্বান করা। মালা বহন করিত যুবতীর বোন বা অশ্ব—কোনো নিকট সম্বন্ধীয়া আত্মীয়া। রাত্রে বন্ধু-বান্ধব সকলে নিদ্রিত হইলে পর-যুবক ধীবে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রেমিকা যুবতীব কুটীবে হাজির হইত। কিছুকাল এই রকম ভাবেই চলিত। দিনেব বেলায় যুবক নানা কার্যে যুবতীব পিতার সাহায্য করিত। কল্লার শিতা সমস্ত জ্ঞানিয়া শুনিয়াও কিছু না-জানিবার মত ভাব দেখাইত। তারপর যখন কথাটা পাকা রকমে কল্লাব পিতার কানে আসিত, সে রাগ করিত না। কিন্তু কল্লার মাতার প্রধান কর্তব্য ছিল একটা বিকট রকমেব গোলমাল করা। ক্রমশ বরপক্ষে এবং কল্লাপক্ষে বেশ একচোট ঝগড়ার মত হইত, তাহার পর সামান্য বস্ত্রপাত হইলেই কল্লার সম্মান বজায় থাকিত। এই-সমস্ত প্রাথমিক কাণ্ড শেষ হইলে পর বিবাহ পাকা রকমে হইত। বর এবং বস্ত্রা নানা ববস সাজে সাজিয়া একটা মাছুরে সামনা-সামনি বসিত। নানা প্রকার উপহারাদির আদানপ্রদান শেষ হইলেই বব-কল্লা আহাব করিত—বাস, তাহার পর হইতেই তাহাবা স্বামী-স্ত্রী।

টরেন্স স্ট্রেটে সেবাই (Saibai) দ্বীপে কোনো নাবীর প্রথম সন্তান হইবার পূর্বে একটি মজার অলুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। নারীর গলায় সাগু-পাতার তৈরী একটা পুতুল বা গুটিকা ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। বাঁশের কাঠামোর উপর এই পুতুল বা গুটিকা তৈরী হইত। যে ছটা স্ত্রী দিয়া গুটিকা বা পুতুল গলায় বাধা থাকিত, তাহা পুতুলেব হাত। আর যে ছটা নড়ি দিয়া কোমরে বাধা থাকিত তাহা পুতুলের পা। পুতুলটা ২০ ইঞ্চি লম্বা। এই পুতুল গলায় ঝুলাইয়া ভাবী মাতা গ্রামেব আর-সকল নারীদের সঙ্গে উৎসব করিতে করতে গ্রামেব চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহাতে গ্রামের সকলেই জানিতে পাবিত যে তাহাদের গ্রামে অচিরে একজন নূতন লোক আসিতেছে। গ্রামবাসীরা ইহাতে আনন্দিত হইয়া উঠিত।

টরেন্স ষ্ট্রেট তাপ করিয়া নিউগায়েনার যে অংশে পৌঁছানো যায়, সে স্থান অতি অস্বাস্থ্যকর এবং জলা-ভূমিতে পরিপূর্ণ। এই স্থানে লোকের বসতি নাই বলিলেই হয়, এবং যাহারা আছে তাহাদের সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। এই অংশের তুগেরি জাতি সম্বন্ধে কিছু বলিবার মত জানা যায়। নিউগায়েনার নাবাল দেশের কয়েকটি জাতির একটা সাধারণ নাম “তুগেরি”। ইহারা অনেক-কাল হইতেই ইংরেজ-অধিকৃত পশ্চিম গায়েনাতে মাঝে মাঝে আসিয়া লুটপাট করিয়া যায়। উপকূলের আদিম জাতিরা তুগেরিদের অত্যাচারে প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। ইংরেজ সরকার ইহাদের শাস্তি দিবার জন্য মাঝে মাঝে দলে দলে সৈন্য পাঠান। এই-সময় হইতে তুগেরিদের অস্ত্র শস্ত্র, নৌকাদির গঠন ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের আচার ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান লাভ হয় না। তবে এই জাতির নারীদের ছবি দেখিয়া মনে হয়, তাহারা বেশ শক্ত এবং কষ্টসহিষ্ণু, তাহারা চুল কাটে না, পাকাইয়া পাকাইয়া ঝুলাইয়া রাখে। এই জাতির নারীদের গহনার বহরও বেশ দেখিবার মত। নিউগায়েনার অস্ত্র অংশের নারীরা কোনো প্রকার গহনা পাবে না বলিলেই হয়, পুরুষেরাই বেশী গহনা পরে।

ফ্লাই নদীর কাছাকাছি যে-সব জাতি বাস করে তাহাদের গৃহ-নিৰ্মাণ-পদ্ধতি অদ্ভুত রকমের। গ্রামে মাত্র চার-পাঁচটি ঘর থাকে। এক-একখানি ঘর প্রায় ১০০ গজ করিয়া লম্বা এবং ৩ গজ করিয়া উঁচু। কটক জেলার তেলেকীদেব ঘর কতকটা এমনি ধারাব। অনেক গ্রামেই পুরুষ এবং নারীদের শুইবার এবং থাকিবার আলাদা বন্দোবস্ত। নাবীরা যেখানে বাস করে সেখানে পুরুষেরা ঘাইতে পারে না। এষ্ট-সব লম্বা ঘরের মধ্যে কতকগুলি অংশ ভাগ করা থাকে। সেখানে বিশেষ বিশেষ পরিবার রাখা করে এবং ভাঙাব রাখে। কোনো পুরুষের মরণকালে বা বেশী অসুস্থ হইলে সে তাহার স্ত্রীর কাছে আসিয়া থাকতে পায়।

ফ্লাই নদীর মুখ হইতে পূর্বদিকে আসিলে ঘোব

কালো এবং কাঁকড়া-কাঁকড়া-চুল-ওয়া এক রকম লোক দেখা যায়। কেপ্‌ শ্বেসনের পরে আর ইহাদের বড় একটা দেখা যায় না। ইহার পূর্বদিকে ১৫০ মাইল পর্যন্ত এক প্রকার মানুষ দেখা যায়, তাহাদের নিউ গায়েনার পশ্চিমের লোকদের সহিত বিশেষ কোনো মিল নাই। ইহাদের দেহের রঙ খুব কাঁলা নয়। মাথার চুল কোঁকড়া বা কাঁকড়া নয়, অনেকটা সোজা সোজা। এই অংশের অনেক বালিকার রঙ বেশ ফরসা বলা চলে।

পশ্চিমের কয়েকটি জাতি মানুষ খায়। আর তাহাদের অধিকাংশ জাতিই মানুষ মারিয়া তাহার মাথা খুলি সংগ্রহ করিতে খুবই ভালবাসে। এটা তাহাদের একটা নেশার মত। নিউগায়েনার পূর্ব অঞ্চলের লোকেবা মানুষ খায় না—এখানের মাত্র দু-একটি জাতি ছাড়া আর কোনো জাতি মাথার খুলি সংগ্রহও কবে না।

নিউগায়েনার সমুদ্র-উপকূলের নাবীরা সমস্ত অঙ্গেই উষ্ণি পরে। উষ্ণিতে নানা রকমের রঙ থাকে। খুব কম বয়সেই উষ্ণি পরা শুরু হয়। মেয়ের ছয় সাত বছর বয়সেই উষ্ণি দেওয়া আরম্ভ করিতে হয়। বিবাহের পূর্বে বৃকের মাঝখানে ইংবেজি ভি V অক্ষরের আকারে একটি দাগ কাটা হয়। ইহাকে উপকূলের মত জাতি ‘গাডো’ বলে। বরফা মেয়ের তলপেটের নীচেও উষ্ণি পরিতে হয়। কারণ এই স্থানে উষ্ণি না পরিলে কোনো মেয়ের ভাগ্যেই বর জুটে না।

মধ্য নিউগায়েনার অবিবাহিত নাবী এবং বিবাহিত নারী চিনিবার একমাত্র উপায় তাহার পোশাক পরিচ্ছদ, উষ্ণি এবং অলঙ্কারাদির বহর। অবিবাহিতা যে, তাহার চুল খোলা এবং লম্বা এবং সে অলঙ্কারে ভূষিত। সে যে “রামি” বা ঘাব্বা পরে, তাহাতে কান্ধাকাঁধ থাকে। নারী এই একমাত্র অঙ্গাবরণ ব্যবহার করে। ইচ্ছা হইলে কেহ বা ততোধিক “রামি” পরিভে পারে। একটার বেশী “রামি” পরিলে নাকি নারীর সৌন্দর্য বর্ধিত হয়। উৎসব উপলক্ষে তাহারা বিশেষভাবে তৈয়ারী ‘রামি’ পরে। ভালপাতাকে নানা বকম রঙে ছোপাইয়া এই ঘাব্বা তৈয়ার হয়। মধ্যে মধ্যে শাদা রঙ থাকে বলিয়া তাহা দেখিতে অতি সুদৃশ্য হয়।

ঘাঘ্বা কোমর হইতে হাঁটু অবধি। তাহার ডান দিক খোলা থাকে। নাচিবার সময় যখন ঘাঘ্বাব ডানদিক হাওয়াতে মাঝে মাঝে উড়িয়া যায় তখন ডান উরু জন্তা ও জাহুর নানা বকম উষ্ণি চোখে পড়ে।

মধ্য গায়েনার বিবাহ এবং বিবাহের পূর্বের আচার ব্যবহার এইরূপ—কোনো যুবক কোনো যুবতীর প্রেমে পড়িলে সে-দিন শেষের অঙ্ককারে তাহার পিতার বাড়ী যায়। সত্যিকারের কোনোরূপ লুকোচুরি নাই বটে, তবুও একটা লোকদেখানো লুকোচুরির ভাব থাকে। কাবণ বাড়ীর অন্ত্যন্ত সকলে ঘুমাইবার ভান না করা পর্য্যন্ত প্রেমিকবব প্রেমিকা'ব গৃহে প্রবেশ ববে না। তাব পর তাহাবা দুইজনে রাত্রি একসঙ্গে যাপন করে—বব মহাশয় বিবাহেব পূর্বে নানাপ্রকার কুকুরের দাঁতের হার, শামুকের খোলাব ও মুক্তা-খোলাব নানা রকমেব গহনা সংগ্রহ করে। এই সমস্ত দ্রব্যাদি ইহাদেব কাছে খুবই মূল্যবান এবং কন্ঠাব বদলে এই-সমস্ত তাহাকে দিতে হয়। বিবাহেব পূর্বে এই-সমস্ত দামী দামী যৌতুক বর তাহার শ্বশুরমহাশয়কে দেয়, তিনি নিজেব জন্ত বিশেষ কিছুই রাখেন না, জ্ঞাতি-কুটুম্বের মধ্যেই প্রায় সব বিলাইয়া দেন। এই প্রথাব ঘাবা বুঝায় যে কোনো কন্ঠা একমাত্র তাহাব পিতার সম্পত্তি নয়, সে তাহার জ্ঞাতির কতকটা সাধারণ ধনেব মত। বিবাহের কয়েকদিন পবে কন্ঠাব অঙ্গ হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া লওয়া হয়। বাপের বাড়ী'ব কোনো জিনিষই সে সঙ্গে লইতে পারে না। গহনাদি লওয়া'ব এক সপ্তাহ পর পর্য্যন্ত কন্ঠা তাহার উৎসবের “রামি” বা ঘাব্বা পবিয়া থাকে, তাহাব পর ইহাও তাহাকে তাহার পিতার বাড়ীতে ফেরৎ দিতে হয়। এইবাব তাহার মাথা মুড়াইবার পালা। ভাঙ্গা কাঁচ দিয়া এই কাজ চলে। তখন হইতে সাধারণ ঘাব্বা পরিতে হয় এবং বিবাহিত কন্ঠা আর কোনোদিনই নাচে যোগ দিতে পাবে না। বিবাহিতা নারী নাচে যোগ দিলে ষড় লজ্জাব কথা হইয়া পড়ে।

স্বামী'ব মৃত্যুব পব মৃত আত্মাকে খুসী রাখিবাব জন্ত নারীকে অনেক কিছুই করিতে হয়। আচাব-বিচারের কোনো প্রকাব অন্তথা হইলে মৃত আত্মা এত ক্ষেপিয়া

উঠেন যে বলা যায় না। মৃত্যুর পর প্রথমেই একটা ভোজ হয়। ভোজেব পূর্বে বিধবা নারীকে মাথা মুড়াইয়া সর্বাঙ্গে কালী লেপিতে হয়। পা পর্য্যন্ত ঢাকা পড়ে, এমন একটা ঘাব্বা পরে, আব-একটাতে কাঁধ হইতে কোমর অবধি আবৃত কবে। তাহার উপর একটা জালের বোনা ওয়েষ্ট-কোট সদৃশ আচ্ছাদিত পরে। কাঁধ হইতে কোমর পর্য্যন্ত জামা না পরিয়া এই বকম একটা ওয়েষ্ট-কোট পরিলেও হয়। মাথায় জালের বোনা একটা গোবশুচক টুপী পরা চাই। তাহাকে নানা রকমেব শামুকের গহনাও পবানো হয় এবং স্বামী'র গলার কোনো একটা অলঙ্কার কালো সূতা দিয়া বাঁধিয়া বিধবা গলায় ঝুলায়। এই বকমেব আরো খুঁচবা অনেক কিছু অঙ্গে ঝুলাইতে হয়। তাহার পব শেষ শোক-গোজ সমাধা হইলে পর মৃত স্বামী'র কোনো আত্মীষা (ভগিনী হইলেই ভাল) বিধবাব ঘাব্বা কাটিয়া ছোট করিয়া দেয়। তাহাব পর বিধবা দেহ হইতে কালী ধুইয়া ফেলিতে পারে এবং ইচ্ছা হইলে আবাব বিবাহ কবিতে পারে।

ঘব-সংসাবেব কাজেব জন্ত এই দেশের মেয়েদেব বড় বেশী খাটিতে হয়। সকালেই জলেব কলসী বাঁশের তৈরী) ভবে, তাবপব মেয়েবা খাবাবেব জোগাড় কবে। এই-সমস্ত কাজ শেষ হইলে পর ছেলিপিলেদেব সেবা আছে। ছেলেকে কোলে বা কাঁধে করিয়া মেয়েবা বাগান হইতে খাদ্য সংগ্রহ কবিতে যায়। শস্ত-বীজ বপনেব সময় মাটিকাটা এবং বেড়া দেওয়া ছাড়া আর সব কাজই নারীদের করিতে হয়। সংসাবেব জালানী কাঠও তাহাদের জোগাড় কবিতে হয়। নারী'বা সকালের দিকে বাগানে শায়, ফিরিতে তাহাদের ছুপুর পার হইয়া যায়, আবাব একটু পরেই চাষেব কাজে গিয়া বিকালে নারী'বা বাড়ী প্রত্যাগমন করে। বাড়ীতে আসিয়াই তাহাদের আবাব রাত্রেব ভোজ্য দ্রব্যেব আয়োজনে ব্যস্ত থাকিতে হয়।

মেয়েদেব জন্তই গ্রামের একদল লোকের সঙ্গে আর-এক দলের প্রায়ই তুমুল মারামারি হয়। সমুদ্র-তীরের হাটে কোনো নারী হয়ত মাছ কিনিতে বা বিক্রয় করিতে গিয়াছে, সেখানে যদি কেহ কোনো বকমে তাহার অপমান কবে—তবে সেই নারী গৃহে আসিয়া

তাহার স্ব-দলের লোকেদের এই কথা বলে। তখন দুই দলে বেশ একটা ঝগড়া বাধিয়া যায়। তাহাতে দুই পক্ষেরই অনেকে আহত হয়। এই স্থানে আহত ব্যক্তির উপর কোনো নারী যদি তাহাব ঘাঘরা ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়, তবে আর কেহ তাহাকে কোনো বকমে আঘাত করে না। যদি কোনো লোকের তাহাকে খুন কবিবার বাসনা থাকে তবে সে বাসনা ত্যাগ্য।

নিউগায়েনায় যত রকমের ভোজ্য হয়, তাহার মধ্যে “গাপা” ভোজ্যই সব চেয়ে বড়। প্রায় দুইমাস বাল ধরিয়া এই ভোজ্য চলে। সঙ্গে সঙ্গে নাচ ও গানের মজলিস হয়। এই সময়ে অনেক বিবাহ-ব্যাপারও হইয়া যায়। ভোজ্যের পূর্বে গ্রামের সব বাগানে প্রচুর ফল এবং ক্ষেত্রে শস্ত আছে কি না তাহার সন্ধান লইতে সকলেই ব্যস্ত থাকে। যথেষ্ট পবিমাণে খাণ্ড সংগ্রহ করা হয়। তাবপর এক গ্রামের লোক অন্ত গ্রামের লোকদের কাছে গিয়া শূকর ইত্যাদি চাহিয়া আনে। নারিকেল কলা ইত্যাদি বহুবিধ ভোজ্যদ্রব্যের আয়োজন হয়। সমস্ত আয়োজন শেষ হইলে পর গ্রাম-গ্রামান্তরের নারীদের নিমন্ত্রণ করা হয়। তাহাদের সঙ্গে একটা কবিয়া খালি ঝুড়ি থাকে। এই ঝুড়ি তাহারা বাড়ী ফিরিবাব সময় খাণ্ডসামগ্রীতে পূর্ণ করিয়া ছাঁদা লইয়া যায়। যে গ্রামে ভোজ্য হয় সেই গ্রামের চারিদিকে শস্ত বেড়া দেওয়াব প্রথা চলিত আছে। প্রত্যেক বাড়ীর বারান্দাতেও বেড়া দেওয়া হয়। নানা রকম লতা-পাতা দিয়া বেড়া সাজানো হয়। মাঝে মাঝে নারিকেল এবং কলা ঝুলিতে থাকে। গ্রামের চারিদিকের বেড়াতেও কলার কাঁদি এবং থোকা থোকা নারিকেল টাঙ্গানো থাকে। যে জাতির নামে এই ভোজ্য হয়, সেই জাতির প্রধান মোড়লের বাড়ীতে শস্ত করিয়া একটা মাচা রাখা হয়। এই মাচা ফুলে ফলে সাজানো হইলে, তাহার উপর বাঁধা হয় ভাবে ভাবে নারিকেল কদলী ইত্যাদি নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য।

এই-সমস্ত কাজ শেষ হইলে পর নানা গ্রাম হইতে দলে দলে লোক আসিয়া উৎসবে যোগদান করে। পূর্বে ভিন্ন গ্রামের লোকেরা অস্ত্র শস্ত লইয়া এই ভোজ্যে যোগদান করিত। যাহাদের সহিত শত্রুতা ছিল, তাহারা মাথা

আড়াআড়ি ভাবে একটা আঁক বহন কবিয়া আনিলে মিত্র বলিয়া পবিগণিত হইত। নারীদের উৎসবের পোষাক দেখিতে বড় চমৎকার। কত রকমের পালক, শামুকের খোলা গহনা করিয়া যে তাহাবা পরে তাহার ঠিক নাই। মাদী তোতাপাখীর রঙীন লেজ বেতে গাঁথিয়া ইহাবা এক প্রকাব মুকুট পরিধান কবে। তাহাতে নারীদের বড় চমৎকার মানায। অনেকে এষ্ট পালকের সঙ্গে সুগন্ধি ফুলের মালা জড়াইয়া লয়। মেয়েরা গলাতে শাঁখের গহনা পরে। অনেকে কুকুরের দাঁতের বা শূকরের দাঁতের হাবণ পরে।

নিউগায়েনাব ছড নামক অংশে এই ভোজ্য দুই দিন খুবই আঁকজ্ঞগকের সঙ্গে হয়। উৎসবের প্রথম দিন বিবাহযোগ্যা মেয়েদের বরণ করা হয়। যে মেয়েবা এই দিন বিবাহযোগ্যা বলিয়া ঘোষিত হয়, তাহাবা নূতন করিয়া উজ্জ্বল পরে—নূতন ঘাঘবা পবে। এই ঘাঘব ডান দিক একেবারে খোলা থাকে। তাহারা ডুব বা মঞ্চ আবোহণ কবিবাব পূর্বে “ইবোপি” নৃত্য করিয়া থাকে। ঢোলের তালে তালে কুমারীরা আগুপাছু পা ফেলিয়া যখন নৃত্য কবে দেখিতে বেশ লাগে। প্রায় কুড়ি মিনিট ধরিয়া এই নাচ হয়। তার পর অস্ত্র অনেক রকমের নাচ হয়, তাতে গ্রামের অন্তান্ত অনেকেই যোগদান করে। এই সময় লোকেরা খুব সুপাবি চিবাষ। দ্বিতীয় দিনই ভোজ্যের আসল দিন। এই দিন কুমারীদের বিবাহযোগ্যা বলিয়া সর্বসমক্ষে ঘোষণা কবা হয়। আগামী বৎসব যে গ্রাম বা জাতি এই ভোজ্যে ভাগ গ্রহণ কবিবে তাহাদের নামও এই দিন সকলকে বলিয়া দেওয়া হয়।

মেয়েবা বিবাহযোগ্যা বলিয়া গণ্য হইবাব পূর্বে “ডুব” মঞ্চ উঠিয়া দাঁড়াষ। তাহার পর ঢাকের শব্দ হইবা মাত্র তাহাবা তাদের ঘাঘরা ঝুলিয়া সামনে ফেলিয়া দেয়। মেয়েদের পিতারা সামনেই দাঁড়াইয়া থাকে, তাহারা ঘাঘরা লুফিয়া লয়। তার পর কয়েকজন বৃদ্ধা নারী প্রত্যেক মেয়ের সামনে একটা ঝুড়িতে করিয়া কিছু কলা, বাদাম এবং একটা ছুরি বাধিয়া দেয়। এই বিশেষ সময়ে যে-মেয়েব পিতা কোনো দিন মালুষ বধ কবিয়াছে, কেবল



নিউগায়েনাব “ইবোপি” নৃত্য—বালিকাব নাবীষ মাভের উৎসব।

মাত্র সেই মাথায় স্বর্গ-পক্ষীৰ পালক-নির্মিত টুপী পরিতে পারে। তাহার পব একজন বৃদ্ধা মেঘেদেব বৃকে শূকবের চৰ্খি বা নাবিকেল তেল ঘসিয়া দেখ। দুই তিন জন বিবাহিতা বা বিধবা নারী পিছনে বসিয়া থাকে, তাহারা ঢাক বাজাইতে আবস্ত কবিলে মেঘেবা ডান হাতে ছুরি এবং বাঁ হাতে কলা লইয়া কুচি কুচি করিয়া কাটিতে থাকে। গোটা ছয় কবিয়া কলা কাটা হইলে পব, ঢাক বাজান বন্ধ হয়, এবং মেঘেরাও সেই মুহূর্তেই সামনের জনতার উপর বাদাম বৃষ্টি কবে।

বিবাহিতা এবং বিধবা স্ত্রীলোকেরা এই বিশেষ ভোজের অত্যাশ্চর্য্য সমস্ত কাজই করে। ইহাদেব রান্না করিবার প্রথা অনেকটা নিউজিল্যান্ডের মত। মাটিতে গর্ত করিয়া, তাহাতে পাথর বিছাইয়া আগুন জ্বালাইয়া গরম করা হয়। পাথর গরম হইয়া লাল হইলে পব, তাহার উপর কলাপাতার মোড়া মাংস ইত্যাদি বাখা হয়, এবং উপর হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল ফেলা হয়। এমন

ভাবে খাবার বেশ সিদ্ধ হয়। মেঘেবাই এই খাবার পবিবেষণ করে।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

নারী-প্রগতি

ব্রহ্মদেশের নাবীরা লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভ্য নির্বাচন করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন।

* * * * *
ব্রহ্মদেশের সংশোধিত শাসন-ব্যবস্থায় ইহাও ধাৰ্য্য হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে কোনও নারীকে কাউন্সিলের ‘নির্বাচিত’ সভ্যরূপে গ্রহণ করিবার অল্পকালে বিধি-প্রণয়ন করিবার অধিকারও কাউন্সিলের রহিল। বর্তমানে কোনও নাবীব সভ্য ‘মনোনীত’ হইতে বঞ্চিত নাই।

* * * * *
মাদ্রাজ সহবে স্বপ্নোবেশনের ব্যবস্থায় বালিকাদেব প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করিবার প্রস্তাব চলিতেছে।

*

*

*

মাত্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সালেমে নারীদের দ্বারা পরিচালিত একটি সমবায় ব্যাঙ্ক গঠিত হইয়াছে। ইহাই ভারতবর্ষে নারীপরিচালিত প্রথম ব্যাঙ্ক। দুই বৎসর হইল এগারো-জন মহিলা মিলিত হইয়া এই ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন, ইতিমধ্যেই ইহার সভ্যসংখ্যা হইয়াছে ৪১; ১০ টাকা করিয়া ১১০টি শেয়ারে মোট মূলধনের পরিমাণ ১১০০ টাকা; ৪০০০ টাকা পর্য্যন্ত এই মূলধন বাড়ানো যাইতে পারিবে।

*

*

*

জাপানে নারীদের রাজনীতিক সভায় যোগদান এতদিন নিষিদ্ধ ছিল। অক্সান্ত আন্দোলনের ফলে নারীরা সম্প্রতি সেই অধিকার লাভ করিয়াছেন, এ সংবাদ প্রবাসীতে ইতিপূর্বেই আমরা দিয়াছি। গত ১০ই মে কোবে শহরে জাপানী নারীদের প্রথম রাজনীতিক সভার অস্থান হইয়া গিয়াছে।

*

*

*

মিস্ তোমি ওয়াদা নাম্নী একজন জাপানী মহিলা আমেরিকার ডক্টর অব্ ফিলজাফি উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইহার আগে আর কোনও নারী মার্কিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই সর্বোচ্চ সম্মানটি লাভ করেন নাই।

*

*

*

বিগত তিন বৎসরের সমাজহিতচেষ্টার ফলে আমে-

রিকার যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলি হইতে ৮৩টি সাধারণী-গল্পী উঠিয়া গিয়াছে, প্রায় ৮০০ শহরের নৈতিক আবহাওয়া ফিরিয়া গিয়াছে, সৈনিকদের মধ্যে দুর্নীতি-জাত ব্যাধি হাজারকরা ২০ হইতে ৬২তে নামিয়াছে। এই হিতচেষ্টার মূলে আমেরিকার নারীদের সাহায্য বিশেষভাবে আছে।

*

*

*

ডান্টসিকেব 'ডায়েট' বা প্রতিনিধি-সভা নারীদিগকে বিচাবাসনে বসিতে পুরুষদিগের সমান অধিকার দিয়া এক আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

*

*

*

নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের Hall of Fame বা যশো-মন্দিরে ইতিপূর্বে যশস্বী পুরুষ ও যশস্বিনী নারীদের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত প্রভৃতি আলাদা প্রকোষ্ঠে রক্ষিত হইত। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের এক অধিবেশনে সম্প্রতি এই প্রভেদ ঘুচাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

*

*

*

'সেনোরা' দোলোর আরিয়াগা নাম্নী একজন মহিলা মেক্সিকোর একটি ষ্টেটের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

*

*

*

নূতন গ্রীক বাস্তব্যবস্থা নারীদিগকে নির্বাচন প্রভৃতি প্রজাস্বত্ত্ব দিয়া একটি আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

স. চ.

ওষধি পর্য্যায় তাল-জাতীয় এক শ্রেণীর গাছ

অনেকেই বোধ হয় জানেন যে কলা, ধান, বাঁশ ও ঘাস প্রভৃতি অনেক উদ্ভিদের ফল পাকিলে গাছ মরিয়া যায়। এক্ষণে তাহাদিগকে 'ওষধি' বলে। তাল-জাতীয় গাছ—যথা নারিকেল, পেজুব, ওপারি, সাগু, গোলপাতা প্রভৃতি—সাধারণতঃ বহুবর্ষজীবী। আশ্চর্যের বিষয় এই তাল-জাতীয় গাছের মধ্যেও 'করিফা' (Corypha) নামক এক শ্রেণীর গাছ আছে যাহাদের জীবনে একবার মাত্র ফুল ফল হওয়ার পর তাহারা মরিয়া যায়। আশ্চর্য-ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর ৪ প্রকার গাছ দেখা যায়। যথা=Corypha Elata,

C. Umbraculifera, C. Talliera এবং C. Macro-poda। এতদ্ব্যতীত প্রথম তিন প্রকারের গাছ বাঙ্গলাব বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়। বাঙ্গলাদেশে প্রথমটি সাধারণতঃ 'বাজুর' ও দ্বিতীয়টি 'তালী' ও তৃতীয়টি 'তারীট' নামে পরিচিত। যদিও ইহাদের পাতা (ছবি দেখুন) দেখিতে তালের মত, কিন্তু উদ্ভিদবিদ্যাবিদগণ ইহাদের ফুল ও ফল পরীক্ষা করিয়া পেজুব শ্রেণীর নিকটে ইহাদের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। 'তালী' বাঙ্গলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বোপিত হয়।



বর্ষাষু তালগাছ।

এতদসঙ্গে ‘তালী’ বা কবিফা ‘আম্রেকিউলিফেবা’ (Corypha umbraculifera) গাছের যে ছবি প্রদত্ত হইল তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে যে ফুল ফল হওয়ার পর গাছগুলির কি ছয়বস্থা হয়। বা-দিকের গাছটিতে নবে ফুল ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে, আব ডানদিকের গাছটিতে ছোট ছোট ফুল দেখা দিতে আবম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই ডানদিকের গাছের পাতা শুকাইয়া যাওয়ায়

গাছটির অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই ইহার অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং ফল পাকিয়া মাটিতে পড়ার পূর্বে অক্লুরোদগমের কিছুকাল মধ্যেই বাকী অংশও ধ্বংস হইয়া যাইবে। প্রকৃতির এমনই ব্যবস্থা! প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে এ গাছের ফুল ফল হয়। কখন কখন এ গাছ প্রায় ১০০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়।

সিংহলে উপবোক্ত কবিফা আম্রেকিউলিফেবা (Corypha umbraculifera) গাছের পাতা ছত্ররূপে ও পুণ্ডি লিপিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়; গাছের মধ্যভাগেব কোমল অংশেব শুঁড়া আটার চ্যাম রুটী প্রস্তুতের জন্ত ব্যবহৃত হয়। সেই রুটী খাইতেও প্রাণ সাধারণ আটার রুটীবই মত। বীজের কঠিনাংশ মালা গাঁপিয়া ও (রঙাইয়া) নকল প্রবালরূপে ব্যবহৃত হয়, উহা হইতে সুন্দর ছোট ছোট বাটীও প্রস্তুত হয়। ইউরোপে এই বীজ হইতে সুন্দর সুন্দর বোতাম প্রস্তুত হয়। ব্যবসায়ীদিগেব নিকট ইহা ‘বাজার-বাটু’ (Bazar batu), ‘বাজুর-বাটু’ (Bajurbat) অথবা ‘বাজুর-বাটম্’ (Bajurbatum) বীজ নামে পরিচিত। বোম্বাই হইতে আববদেশীয় লোকগণ কর্তৃক এই বীজ প্রচুর পবিমাণে বিদেশে বপ্তানি করা হইয়া থাকে। উপরোক্ত জিনিষগুলি তৈয়াব করা ভেমন খুব কষ্টসাধ্য নয়। বাঙ্গালাদেশেও কেহ এগুলি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় কবিতে পারিলে বেশ হয়।

পি ধেম ডি

শিবানী

শিবের বৃকে শিবানীয়ে দেখেছি আজ প্রভাতকালে,
চন্দ্র যখন অন্ত গেল বনরাজিব অন্তরালে।
ধ্বল দেহেব অমল আলো মাঠের বৃকে ছড়িয়ে আছে,
তামা আমার শ্রামল বনের ছায়া হয়ে দাঁড়ায়েছে ॥

আলো-ছায়াব মেশামিশি সাদা-কালোব লুকোচুবি,
বিখে আমাব ছড়িয়ে দিলে রাত্রি-দিনের কি মাধুরী।
শ্যামল বনেব শতেক ফাঁকে শ্যামময়ীব হাসি জাগে,
তরুণ ভাষু অরুণ জাঁপির ভুবন-ভরা কিরণ ঢালে ॥

শ্রী প্রিয়স্বদা দেবী

আলোচনা



মনসা পূজা

আবাচের 'প্রবাসী'তে শ্রীমুক্ত ক্ষিত্তিমোহন দেন মহাশয়ের "বাংলায় মনসা পূজা" পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। এ সম্বন্ধে আমাদের সাংবাদী কিছু বক্তব্য আছে, নিবেদন করিতেছি।

১। বাঙ্গালায় মনসা পূজা প্রবন্ধে ক্ষিত্তিমোহন-বাবু মহাশয়ত হইতে নাগজ্ঞাতির বিষয়ে যাহা যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাব মধ্যে একটি বড় বিষয়কে উপেক্ষা করিয়াছেন। মহাভারতে বলদেবকে অনন্ত নাগের অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যদু বংশ ধ্বংসের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন রাম নিক্সনে যোগযুক্ত হইয়া বসিয়া আছেন, এবং তাঁহার বদনমণ্ডল হইতে সহস্রশীর্ষ মহানাগ নিঃসৃত হইয়া নাগবাতিমুখে প্রস্থান করিতেছে। ক্ষিত্তি-বাবু যে দিক দিয়া এই নাগ জাতির বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, সেইদিক হইতে ইহাও কিম্বদন্তি সিদ্ধান্ত হইতে পারে? বামাগণে লক্ষ্য অনন্তাবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন কি না মনে পড়িতেছে না। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থে শ্রীনিত্যানন্দ অনন্তের অবতার রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। অবতার-বাদে মধ্য অনন্তের স্থান প্রাপ্তির কারণ কি? নাগগণ ইন্ডের ভক্ত, পর্বত বিষ্ণুর ভক্ত, তাই এই দুই জাতি পরস্পর শত্রু, ইহাই ক্ষিত্তি-বাবুর সিদ্ধান্ত; শ্রীকৃষ্ণ ইন্ডের শত্রু, স্তব্ধ নাগগণও শ্রীকৃষ্ণের শত্রু, ইত্যাদিও ঐ সিদ্ধান্তের অন্তর্গত। এখন জিজ্ঞাস্য—বৌদ্ধ শত্রু নাগ জাতির একজন কি কবি। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজের স্থান অধিকার করিতে পারে? যদি বলা যায় পূর্বে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, তবে সম্যোজ্ঞাত শ্রীকৃষ্ণকে বাহকী নাগের সশা-ছত্রেব তলে ঢাকিয়া বৃষ্টি বস্ত্র হইতে বন্ধাব কি ব্যাঘাৎ হইবে?

২। মহাভারতে উক্তের উপাখ্যান হইতে ক্ষিত্তি-বাবুর সিদ্ধান্তের কোনো সমর্থন পাওয়া যায় কি না?

৩। "আমাদের দেশের মারীডম" "দেবীদের প্রকোপ"কে বুঝায় না। কেবল মনসা দেবীর "প্রকোপকে" বুঝায়। পাড়া-গায়ে ওলাউঠা হইলে এখনো মহা সমারোহে মনসা দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

৪। পূর্ববঙ্গে যেমন "মনসা খোলা" আছে, এদেশে তেমন কোনো কিছু নাই। তবে পশ্চিমবঙ্গে মনসা (সিঁড়) পাছেব ডাল পুতিয়া কয়েক মাস সেই ডালের পূজা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। দশহরার দিনে এই ডাল বাড়ীতে পুতিতে হয়। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে প্রায় প্রত্যহ, পুত্রের বাড়ীতে প্রতি পঞ্চমীতে সেই ডালের পূজা হয়। শাব্দ বিজ্ঞান দৃষ্টান্তে তাহা বিসর্জন। সেই দিন নবপত্রিকার সঙ্গে ঐ ডাল জলসই করিয়া দিতে হয়।

"চেংমুড়ী"র অর্থ মনসামঙ্গল-পায়কগণ বলিতে পারে না। তবে "কাণী"র একটা অর্থ তাহা বলা যায়। সে সম্বন্ধে মঙ্গল গ্রন্থে একটা উপাখ্যানও আছে। দুর্গার সঙ্গে মনসার বিবাদ ছিল, একটা কুশের পোতা দিয়া দুর্গা মনসার একটা চোপ কাটা করিয়া দিয়াছিলেন। মনসাও ইহা প্রতিশোধ লইয়াছিলেন—সমুদ্র মন্থনের সময় বিবপান করিয়া শিল অচেতন হইয়া পড়িলে অনন্তোপায় হইয়া দুর্গা মনসাকে আশ্রিতে কার্তিক-গণেশকে পাঠাইয়া দেন। মনসা বলেন, দুর্গা না

আশ্রিতে যাইব না। পূর্বে দুর্গা যান। মনসা বলেন, কোলে কব। দুর্গা তাহাকে কোলে লইলে মনসা চাপ দিয়া দুর্গার কটাদেশ বাঁকাইয়া দেন। দুর্গা হুং কবিনে, মনসা বব দেন, মহিষাসুরের কাঁধে পদ-অকুঠ দিয়া সিংহপুঠে যখন ঠাঁড়াইবে, তখন তোমাকে এইজন্তই মানাইবে ভাল, সেই দিন তোমার একজন্ত হস্তগোচনা আর থাকিবে না। (বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গল)

৫। চাঁদ সওদাগর যে এ দেশের শোক নষ্ট হইয়া এখনো উপযুক্ত ভাবে প্রমাণিত হয় নাই। চাঁদের বাণিজ্য ব্যাপদেশে দক্ষিণে বাতায়ত ছিল বটে। ইত্যাদের নডি (হিস্তাল, হেমতাল) চাঁদের বড় প্রিয় ছিল। হিস্তাল সম্ভবতঃ সমুদ্রকূলের পাছ। বাঙ্গালায় হিস্তাল জন্মাব কি না জানি না।

বেহলাকে দক্ষিণী মনে করিবার সম্ভব কারণ প্রবন্ধে নাই। ডোম সাজিয়া যশস্বতীতে সংবাদ জানিতে যাওয়া বাঙ্গালিনীর পক্ষেও সম্ভব হইতে পারে। বালিকা-ব্রতের সাজ-পুজারীর ছড়া "ডোমনা ডুমিনী"র উল্লেখ আছে। পল্লীবালাব পক্ষে এমন সাহসিনী হওয়া অসম্ভব নয়। কুবকবু ক্লেত আগলার, গান করে, সংস্কৃত সাহিত্যেও তাহার উল্লেখ আছে। খুলনাও যথেষ্ট মতে ছাপল চবাইয়া বেড়াইয়াছিল। খুঁজিলে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন সাহসিনী নারী অনেক মিলিতে পারে।

মনসার বিবাদ শিবের সঙ্গে ছিল বলিয়া মনে হয় না। বিবাদ প্রধানতঃ ছিল চণ্ডীর সঙ্গে। হস্তাং ক্ষিত্তি-বাবু যে বলিতেছেন "শিব চণ্ডীকে ধাক্কা করিলেও মনসার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে না পারিল", ইহাও মনে বোঝা যায় না। চাঁদ ছিলেন গন্ধেশ্বরের ভক্ত। বিষ্ণু-পালের মনসামঙ্গলে আছে—"গন্ধেশ্বরী হাতে কবিরীর ছাড়ে ছুঙ্কাব"। গন্ধেশ্বরী দেবী দুর্গার অংশ। হস্তাং চাঁদকে শাস্ত বলাই ঠিক।

৬। আর একটা কথা, "মনে মাকী" "মাকাত্মা" "মনসা মাকী" হইতে "মনসা মা" হওয়া স্বাভাবিক বটে। তেমন "মনসা" হইতেও কি "মাকাত্মা" হইতে পারে না? বাঙ্গালার কোনো জিনিষ দক্ষিণে যায় নাই, এ অসম্ভব নই বা কিরূপে করা যাইতে পারে? সবই যে বিশেষ হইতে বাঙ্গালার আশ্রিত হইতে তাহাবই বা মনে কি? আদান প্রদান তো পরস্পর হইতে পারে।

৭। ক্ষিত্তি-বাবুর নাগ ও পক্ষী জাতি বাঙ্গালার উপনিবাসী নহে ছোটনাগপুর অঞ্চলকেও পশ্চিমগণ নাগজ্ঞাতি, আদি বাসভূমি বলিয়া বর্ণনা করেন। পুরাণে বাঙ্গালীকে পট্টই পক্ষী বলিয়া উল্লেখ কর হইয়াছে। আমবা গিণ্ডার (গিণ্ড, গুণ্ড) অঞ্চলকে এই পক্ষী নামে কথিত জাতির আদি বাসভূমির একাংশ বলিয়া মনে করি। হস্তরা এই দুই জাতির বিবাদ ও সন্ধি হয় এবং মনসা পূজার মূল যোগ হয় বাঙ্গালাতেই অসম্ভবান করিলেই ভাল হয়।

শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

মুসলমান মেঘেদের আত্মা আছে কি নাই

গত শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে "পাবস্তো নারী" শীর্ষক প্রবন্ধে মোঃ হোসেন নারীর আত্মা সম্বন্ধে কয়েকটি ভুল মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে যেরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে :—

“কিন্তু মুসলমান ধর্ম-মতে (?) নারীদের কোন আত্মা নাই বলে—সেইজন্য খুব কম নারীই মসজিদে যায়।” (৪৪৮ পৃঃ)

দেখা যাক “মুসলমান ধর্ম-মতে” (অর্থাৎ কোরাণে) নারীর আত্মা সম্বন্ধে কি বলে :—

“এবং স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে কেহই সংকর্ষ করুক, এবং যদি সে বিষাদী হয়, তবে তাহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের প্রতি তিলার্দ্ধও অবিচার হইবে না।”

—(হুবা নেসা ১২৪ আয়েত)

“যে ব্যক্তি সংকর্ষ করিয়াছে, সে পুরুষই হউক বা নারীই হউক, এবং সে যদি বিষাদী হয়, তবে অবশ্য আমি তাহাকে বিশুদ্ধ জীবনে জীবিত রাখিব এবং অবশ্য তাহাদের সংকর্ষের বিনিময়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ দিব।” (হুবা নাহল, ২৭ আয়েত)

“অনন্তর তাহাদের আল্লাই তাহাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন (এবং বলিলেন) নিশ্চয়ই আমি অমুঠানকারীর অমুঠান বিকল কবি না, স্ত্রীই হউক, আর পুরুষই হউক, তোমাদের মধ্যে এক অস্ত্র হইতে জাত।”—(হুবা আল-এমবাণ, ১৯৪ আয়েত)

“তাহারা অনন্তকালের জন্য স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিবে—তাহাদের পিতা, মাতা, স্ত্রী ও সন্তানদিগের সহিত—যাহারা সংকর্ষ করিয়াছে—(হুবা আনু বাদ, ২৩ আয়েত)

“এবং আমি তাহাদিগকে (পবকালে) পবিত্রা স্মরণীগণের সহিত মিলিত করিব।”

—(হুবা কা’হাব, ৪৪ আয়েত)

নারী-পুরুষের সম্বন্ধ সম্বন্ধে কোবাণ বলিয়াছেন,—“তাহারা তোমাদের ভূষণ; এবং তোমরা তাহাদের ভূষণ। (হুবা বকব ১৮৭ আয়েত)

ইজরত মহম্মদ বলিয়াছেন—“স্বর্গ জননী চরণতলে অবস্থিত।”

ইহাই গেল “মুসলমান ধর্ম-মতে” কথা। লেখক মহোদয় এখানে বলিতে পারেন—তিনি পারস্তের প্রচলিত ধারণা কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও আমাদের সন্দেহ আছে। নানা কাবণে ওরূপ ধারণা বিদ্যমান থাক। সম্ভব বলিষা বোধ হয় না। যদি থাকে, তবে বলিতে হইবে পারস্তে কোবাণ নাই—অথচ তাহারা মুসলমান, আর মুসলমান হইলেই কোবাণকে মানিয়া লইতে বাধ্য। অতএব উক্ত মত প্রচলিত থাক। একরূপ অসম্ভব।

লেখক মহোদয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা খোলমেলেও বটে। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন—“তবে কোন নারী যদি পুণ্যে কাজ কিছু কবে, তবে তাহাব স্বর্গে স্থান হইতে পারে। কিন্তু এই স্বর্গও পুরুষদের স্বর্গ হইতে অনেক পাপ।” ইহা ঘাণাও অস্বতঃ এটুকু বুঝা যাইতেছে যে কোন কোন নারীর বেশ ভাল বকমই আত্মা আছে, কেন না তাহাব স্বর্গে যাইবে।

অন্যত্র লেখক বলিয়াছেন, “মেয়েদের একটু বয়স হইলেই তাহাব স্বর্গলাভের উপায় চিন্তা কবে।” যাহাদের আত্মাই নাই, তাহাব আবার স্বর্গচিন্তা করে?

শেষভাগে লেখক বলিতেছেন—“তীর্থে মরণ হইলে তাহাব স্বর্গলাভ হইবেই।”

উপবেদ কথাগুলি খুবই সামঞ্জস্যহীন বলিয়া বোধ হয়, এবং প্রকৃত অর্থে উপব সত্যের আলোক-পাত করে। এই-সমস্ত কারণে মনে হয়, লেখক মহোদয় যেন উপবৃত্ত পাত্র হইতে তাহার বিবরণ সংগ্রহ কবিবার হযোগ পান নাই।

গোলাম মোস্তফা

বর্তমান আবরণসংখ্যা প্রবাসীর “মহিলা মজলিসে” হেমন্ত-বাবু লিখিত “পারস্তের নারী” শীর্ষক প্রবন্ধে সাধারণ মুসলমানসমাজকে আশাত দেওয়া হইয়াছে। “কিন্তু মুসলমান ধর্মমতে নারীদের কোন আত্মা নাই বলে—সেইজন্য খুব কম নারীই মসজিদে যায়।” এই মতটি হেমন্ত-বাবু কোথায় পাইয়াছেন?

মোহাম্মদ বলিলবু রহমান

“পারস্তের নারী” নামক প্রবন্ধের প্রায় সমস্তই ইংবেজি বইএর সাহায্যে লেখা, তাহাব জন্য প্রবন্ধে অনিচ্ছাকৃত প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। “মুসলমান নারীদের আত্মা নাই”—এই কথা ভুল, তাহা স্বীকার কবিতেনি, তবে তাহা ইচ্ছাকৃত নহে এবং কাহাকেও আঘাত কবিবার ইচ্ছা ঘাণ প্রণোদিত হইয়া লিখিত হয় নাই। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুঃখিত।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

পাখী

আকাশেতে বেড়িয়ে বেড়াও পাখী,
আমরা তোমায় খাঁচায় পুবে বাধি!
সকল ছেড়ে তোমাব মত উড়তে জানি না,
আকাশ-পথে তোমার ওড়া তাই ত মানি না।
আমরা মানুষ তবু তোমায চাই,
তাই ত তোমায বন্ধ করি ভাই!

গহন বনে অনেক দূবে—দূবে
গান গেয়ে যাও আপন সুরে সুরে!
বাঁধন-হারা তোমাব মত গাইতে জানি না,
গহন বনে তোমার গাওয়া তাই ত মানি না!
আমরা মানুষ তবু তোমায চাই,
বাঁধা বুলি তাই ত শেখাই ভাই!

“বনফুল”

কান্তকবি রজনীকান্ত *

১৩১৭ সালের ভাদ্র মাসে কান্তকবি রজনীকান্ত দেন প্রায় একবৎসর কাল উৎকট বোগে ভুগিয়া দেহত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স পঁয়তাল্লিশ বৎসর। তিনি কুড়ি বৎসর ওকালতী করিয়াছিলেন এবং ওকালতীতে তাঁহার পসার ও প্রতিপত্তিও যথেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার যশ ও সুখ্যাতি উকীল বলিয়া নহে, তাঁহার নাম ও পদার কবিতায়, গানে, সদাশাপে, রসিকতায়, মৌজ্ঞে, ভালবাসায় ও দেশের প্রতি প্রাণেব টানে। তিনি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মিয়াছিলেন, সকলের সহিত ভদ্র ব্যবহার করিতেন এবং সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। তাঁহার লোক চিনিবার শক্তি খুব ছিল, তাই তিনি মৃত্যুশয্যায় শ্রী ভব বাবু নলিনীবরুণ পণ্ডিতকে আপনার জীবনচরিত লিখিবার ভার দিয়া যান। বার বৎসর পূর্বে তিনি যে নলিনী বাবুকে কেমন করিয়া চিনিলেন, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমরা এখন নলিনী বাবুকে বেশ জানি; তিনি যাহা ধরেন, প্রাণপাত করিয়াও তিনি তাহা করিয়া তুলেন। সে জন্ত শ্রমকে শ্রম জ্ঞান করেন না, কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করেন না; খরচকে খরচ জ্ঞান করেন না, দূর দূরাস্থব যাইতে তিনি কুণ্ঠিত হয়েন না। কোন কাজ হাতে লইলে তিনি তাহাতেই তন্ময় হইয়া যান। তাঁহার এই তন্ময়ত্ব রজনীকান্ত বৃত্তিতে পারিয়াছিলেন, তাই তাঁহার হাজার হাজার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, প্রেমিক ও ভক্ত থাকিলেও নলিনী বাবুকেই তাঁহার জীবনচরিত লিখিতে অগ্রবোধ করেন। নলিনী বাবুও বার বৎসর কাল অকাতবে পরিশ্রম করিয়া, নানা স্থান হইতে অনেক মসলা সংগ্রহ করিয়া, পিঞ্জিয়া পিঞ্জিয়া সেই সকল মসলা হইতে এই সুপাঠ্য জীবনচরিতখানি বঙ্গবাসীকে উপহাব দিয়াছেন।

রজনীকান্ত তাঁহার জীবন সুখেই কাটাইয়া গিয়াছেন। এমন একখানি জীবনচরিত যে ভাগ্যবানের অদৃষ্টে ঘটে মরণেও তাঁহার সুখ। নলিনীবরুণ একাধারে বঙ্গনী-কান্তের জীবনচরিত-লেখক ও তাঁহার কাব্যের টীকা-কার—একাধারে বসুওয়েল ও মল্লিনাথ। বসুওয়েল না থাকিলে জনসনের নাম এত দিনে সকলেই ভুলিয়া যাইত, মল্লিনাথ না হইলেও কালিদাসের কবিতা দুর্ব্যাখ্যা-বিষমুচ্ছিত হইয়া এত দিনে কোথায় তলাইয়া যাইত, খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে হইত। নলিনী বাবু তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বঙ্গনীকান্তের জীবনের সকল ঘটনা সুস্মারস্বস্মরুপে বাহির করিয়াছেন এবং তাঁহার ছোট ছোট পদ্যগুলি ও গানগুলি কোথায় কি ভাবে লেখা হইয়াছিল, তাহার পুরা ইতিহাস দিয়াছেন। খুঁজিয়া



কান্তকবি রজনীকান্ত
মৃত্যু পনের দিন পূর্বে

* শ্রী নলিনীবরুণ পণ্ডিত-প্রণীত। স্বরীকেশ সিরিজ প্রত্নাবলীর চতুর্থ গ্রন্থ। মূল্য চারি টাকা। বহু-চিত্র-শোভিত, আকার ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ৪০০ পৃষ্ঠা। কলিকাতা ৩০ নং কলেজ স্ট্রিট মার্কেট হইতে বেঙ্গল বুক কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত।

জিনিস বাহির করা এক কাজ, আর সেইগুলিকে সাজান আর-এক কাজ। নলিনী বাবু দুই কাজেই যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, আর যথেষ্ট কৃতিত্বও দেখাইয়াছেন।

গানগুলির ব্যাখ্যাও বেশ জমিয়াছে। কোথায় পুবাণ গানের দুই চারিটি কথা বদলাইয়া রজনীকান্ত গানের ভাব গাঢ় হইতে গাঢ়তর কবিয়াছেন, তাহাও দেখান হইয়াছে। আবার কোথায় একটি কথার একটি অক্ষর বদলাইয়া ব্যঙ্গরসেব চূড়ান্ত করা হইয়াছে, তাহাও দেখান হইয়াছে। স্তব্ধাং নলিনী বাবু একাধারে বসুণ্বেল ও মল্লিনাথ, এ কথাটা আমি যে বড় বাড়াইয়া বলিয়াছি, তাহা কেহ যেন মনে না কবেন।

একজন লোকের বালা, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ় অবস্থার সব ইতিহাস সংগ্রহ করা ত কঠিনই। সেই ইতিহাস হইতে তাঁহার জীবনের, প্রতিভার, চরিত্রের বিকাশ দেখান আরও কঠিন। এই বইখানিতে নলিনী বাবু দুইই খুব ভাল কবিয়া দেখাইয়াছেন। তাহার জ্ঞান তাঁহাকে যে কি পরিশ্রম কবিতে হইয়াছে, তাহা ভুক্তভোগীই বুঝিতে পারেন। রজনী বাবু আট মাস হাসপাতালে ছিলেন, এই সময় তাঁহার বাকবোধ হইয়া যায়। তিনি কথা একেবারে কহিতে পারিতেন না। কাগজের উপর পেন্সিল দিয়া লিখিয়া মনোনাথ ব্যক্ত কবিতেন। জলতৃষ্ণা লাগিলে লিখিয়া জল চাহিতেন। ক্ষুধা লাগিলে লিখিয়া খাবার চাহিতেন। কেহ আসিলে তাঁহার সঙ্গে লিখিয়া আলাপ কবিতেন, তাহাতে বাবু তাবিত বড় লেখা থাকিত না। কাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছেন, তাহারও সূচনা থাকিত না। তাহার উপর আবার কাগজ বাঁচাইবার জ্ঞান একবার লেখা কাগজের উপর মকুল করিতে হইত। একবার আড়াআড়ি লিখিয়াছেন, আবার লম্বালম্বি লিখিতে হইত। এইরূপে আট মাসে বাশি রাশি কাগজ জমিয়াছিল; কেহ সে সব কাগজ সাজাইয়াও রাখেন নাই। নলিনী-বাবু সেই কাগজগুলি পড়িয়া, কবে কাহার সহিত কি আলাপ হইয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে বাহির করিয়াছেন এবং “হাসপাতালের বোতামচা” নাম দিয়া কয়েকটি ছন্দবৎ অধ্যায় আমাদের উপহার দিয়াছেন। আমি

ত পড়িয়া বিম্বিত হইয়াছি। রজনী বাবুর বৈদ্য, প্রশান্ত ভাব, ঈশ্বর-প্রেম, ভগবানের উপর নির্ভর, এ সব ত বিশ্বাসের কথা; তাহার উপর এই দাক্ষণ ধন্যতার সমবেশ তিনি কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা ত আরও বিশ্বাসকর। তাহার উপর নলিনী বাবু খাটুনি আর-এক বিশ্বাসের কথা।

এই নিদাক্ষণ অবস্থায় রজনী বাবুর চরিত্রের অনেক সঙ্গুণ বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর নলিনী বাবু দেখাইয়াছেন যে, এই সঙ্গুণগুলি রজনীকান্ত তাঁহার পিতৃপিতামহ হইতে পাইয়াছিলেন। বাল্যে সেই সব সঙ্গুণের কেমন অঙ্কুর হইয়াছিল; কৈশোবে, যৌবনে, প্রৌঢ়াবস্থায় তাহা কেমন কবিয়া বাড়িয়াছিল এবং হাসপাতালে তাহা কেমন করিয়া পুষ্প-ফল-সুশোভিত হইয়াছিল। এইটুকুই ত জীবন-চরিত্রের বাহাদুরি। এই নাস্তিকতা বিনে, এই বোব স্বার্থপরতার দিনে, যে সময়ে যশ ও অর্থের জন্ত শিক্ষিত-সম্প্রদায় যে শুদ্ধ লালাষিত, তাহা নহে—অনেক অকাঙ্ক্ষ কবিতো কুন্তিত হইতেন না—বরং সেই অকুণ্ঠাব জ্ঞান গর্ভ ও অহঙ্কার কবেন, সেই সময়ে ভগবানের উপর এত নির্ভর, এত আত্মিকতা, এত বিনয়, এত আত্মত্যাগ রজনী বাবু কোথা হইতে পাইলেন?—এ কথা সহজেই লোকের মনে উদয় হয়। নলিনী বাবু দেখাইয়াছেন, এই আত্মিকতা রজনী বাবু তাঁহার পিতার নিকট পাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা যদিও গবর্ণমেণ্টের বড় চাকরি করিতেন, তিনি একজন পরম ভক্ত, স্নেহকবি ও পরম সাদক ছিলেন এবং ছেলেটিকেও উপদেশ দিয়া, আপনার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তিনি ভক্ত ও সাদক করিয়া তুলিয়াছিলেন। কবিত্বশক্তিও রজনী বাবু পিতার যথেষ্ট ছিল; যে শক্তিও রজনীকান্ত পিতার নিকট পাইয়াছিলেন। সে শক্তি বনেজে কেরানীকে ব্যঙ্গ কবিয়া, দু চারিটি ছোট ছোট কবিতা লিখিয়া ক্রমে বিকাশ হইতেছে, শেষ রোগশয্যায় তাঁহার সেই শক্তিই রহিল, আর সকল শক্তিই অন্তর্হিত হইয়া গেল। যে শক্তির বিকাশে শুদ্ধ বাজসাহী নহে, সমস্ত বাঙ্গালা মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। শুনিয়াছি, তুলসীদাস বিবেকিক যোগে পীড়িত হইয়া অসীম ধন্যতার মনো “হনুমানবাহক” নামক একটি

দীর্ঘ কবিতা লিখিয়া, ইষ্টদেবের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি দেখাইয়াছিলেন আর সমস্ত হিন্দুস্থান মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তুলসীদাসের সে যজ্ঞা চারি দিন মাত্র ছিল, পাঁচ দিনের দিন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। রজনী বাবুর ভীষণ যজ্ঞা আট মাস। একপ যজ্ঞায় লোকে অধীর হয়, আর রজনী বাবু তাহাতেই আমাদের অনেক “অমৃত” দিয়া গিয়াছেন এবং বঙ্গবাসীকে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কবিতা এই সময়েই অধিক জগিয়াছে। অল্প কথায় প্রগাঢ় ভাব এই সময়েই তিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার “অমৃত”, “আনন্দময়ী”, “অভয়া” এই সময়েরই লেখা। বঙ্গবাসী তাঁহার এই সময়ের কবিতার বেশ আদর করিয়াছিল।

নলিনী বাবু একটি ভাল কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুঃখ-দৈন্ত ও দুর্দশার সময় কিছুমাত্র সাহায্য না করিয়া বাঙ্গালী যে কলঙ্ক মাখিয়াছিল, তাহাব কতকটা রজনীকান্তের বোর বিপদে অকাতরে সাহায্য করিয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে। সকলেই রজনী বাবুর দুঃখে দুঃখিত ছিলেন, সকলেই তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন। বাক্যে, কার্ণাধে, অর্থে, সেবায়, নানাবিধ প্রকারে তাঁহার সাহায্য করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ইহার ত দানের পার নাই। কিন্তু দান অপেক্ষা ইহার আর এক বড় গুণ আছে, সেটা এই যে, ইনি সকলের ব্যাথা ব্যথী; একপ কোমল অন্তঃকরণের লোক জগতে দুর্লভ। তিনি যে রজনীকান্তের বিপদে তাঁহার ব্যাথা ব্যথী হইবেন, তাহা আর বেনী করিয়া বলিতে হইবে না। আর একজন রজনীকান্তের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বশবী হইয়াছেন, তিনি দীর্ঘপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়। ইনি হুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র, অশেষ গুণে গুণাবিত, তিনি স্বতঃ পবিত্র, পরমেশ্বরতঃ, অনবরত রজনী-বাবুর সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার একটি কথায় একটু ব্যথিত হইয়াছি, তিনি রজনী-বাবুকে “রাজসাহীর কবি” বলিয়াই সাহায্য করিয়াছেন। রাজসাহীতে জন্মিলে কি হয়, রজনী-বাবু যেমন সমস্ত বাঙ্গালার কবি, কুমার শরৎকুমারও সেইরূপ

সমস্ত বাঙ্গালার সম্পত্তি; তাঁহার এরূপ সঙ্গীর্ণতাটা ভাল দেখাব না।

কিন্তু যে বাঙ্গালী মাইকেলকে ও হেম-বাবুকে কষ্ট পাইতে দেখিয়াও কিছু করে নাই, সে বাঙ্গালী রজনী-বাবুর জন্ত এত করিল কেন? ইহার কারণ নলিনী-বাবু খুশিয়া দেখান নাই। মাইকেল ও হেম-বাবুর সময় বাঙ্গালী যে একটি জাতি, বাঙ্গালীর এ উদ্বোধনটা হয় নাই; তাঁহারাও তাঁহাদের বাক্যে, কার্ণাধে এবং কবিতায় সে উদ্বোধনটা জন্মাইয়া দিতে পারেন নাই। কিন্তু রজনী-বাবুর সময় বাঙ্গালার হাওয়া বদলাইয়া গিয়াছিল এবং সে বদলাইবার তোড়ের মুখে তিনি পড়িয়াছিলেন। বন্ধিমের “বন্দে মাতরম্” যখন লেখা হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালীরা উহা হইতে আমবা যে একটা জাতি, সেটা বোধ কবিতা পাবে নাই। স্তব্ধ প্রথম প্রথম উহার বড় আদর হয় নাই। ত্রিশ বৎসর পরে যখন জাতির উদ্বোধন হইল, তখন উগারা “বন্দে মাতরম্”র গভীর অর্থ বুঝিতে পারিল ও তাহার আদর করিল। রজনী-বাবু এই উদ্বোধনের সময়ের কবি এবং উদ্বোধনে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার “মাত্রেব দেওয়া মোটা কাপড়” গানটি এই উদ্বোধনের প্রাণ বলিলেও হয়। রজনী-বাবু যখন এই গান গায়িতে গায়িতে কলিকাতার পথে দলবল লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল—সে যে কিরূপ আশ্চর্য্য, তাহা রামেন্দ্র-বাবুর ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বর্ণনায় বেশ বুঝিতে পারা যায়, তাঁহারা ত একেবাবে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন।

নলিনী-বাবুও রজনীকান্তের বাল্য ও যৌবনের ইতিহাস দিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই গানেই রজনী-বাবুর কবিত্ব-শক্তির পূর্ণ বিকাশ, এই গানেই তাঁহার খ্যাতি, এই গানেই তাঁহার প্রতিপত্তি, এই গানের জন্ত লোকে তাঁহার উপাসনা করিয়াছে, এই গানের জন্ত তিনি সকল বাঙ্গালীর আত্মীয় ও স্বজন হইয়াছিলেন, এই গানের জন্ত সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা কবিত, ভক্তি করিত ও ভালবাসিত।

তাই বলিয়াই কি তিনি এক গানের কবি? একে-

বাবেই নহে। ওটা তাঁহার কবিত্বশক্তির একদিকেব
বিকাশ মাত্র, তাঁহার দেশভক্তির উদাহরণ মাত্র। কিন্তু
আমরা বলি, তাঁহার কবিত্বশক্তির পূর্ণ বিকাশ ভগবানের
প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তিতে। যখন তাঁহার সব গেল,
ব্যবসা গেল, তালুক মূলুক গেল, স্বাস্থ্য গেল, বাকশক্তি
গেল, তখনও তিনি লিখিতেছেন,—ভগবান্, তুমি আমার
সর্ব্বম্ব লইয়া, আমি যে কত ছোট আর তুমি যে কত
বড়, সেইটি বুঝাইয়া দিতেছ। আমার সব গর্ব্ব, সব
অহঙ্কার চূর্ণ কবিয়া দিয়াছ, এখন আমি কি বস্তু, তাহা
বুঝিয়াছি।

হাসপাতালের অধ্যায়টি পড়িলে এই সমস্ত বিষয়-
গুলিই আমরা দেখিতে ও বুঝিতে পাই। বাক্সালা
ভাষায় ত এ জিনিস পড়ি নাই, অল্প কোন ভাষায়ও
পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বাক্সালাব কোন জীবন-
চবিতে এ অপূর্ণ সম্পদের সমাবেশ দেখি নাই।
এই অপূর্ণ ও স্নন্দর জীবনচরিত্র প্রকাশে সাহায্যেব
জ্ঞান কুমার নরেন্দ্রনাথকে আশীর্বাদ করি, তিনি
দীর্ঘজীবী হইয়া এইভাবে সাহিত্য ও সাহিত্যসেবীর
সেবা করুন।

শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

লক্ষ্মী

ক্ষীৰ সাগরের বক্ষ হতে সোনার ঢুকল পবে'
কে আঙ্কিকে উদয় হল জাঁধাব ধরা 'পবে।
শঙ্খ-পরা হাত ছুথানি, সৌমন্তে সিঁদূর,
আলতা দিখে বরণ-করা চবণে নুপুৰ।
অরুণ চরণ যেথায় পড়ে
কমল কোটে থরে থরে ;
সবাই নমে ভক্তি-ভরে ;
সবাই ধবে পাবার তবে গাহে একই স্বব ॥
ঝাঁপি-ভরা রত্নমণি, চক্ষে ঝবে স্নেহ,
ধান্য হাতে নিয়ে আসেন পূর্ণ করি' গেহ,
কোমল কবেব পরণ পেয়ে জুড়ায় সবার দেহ।
আপন তারে কবে যে তাব কবে না সে দূৰ,
সদয় হলে সে জননী সদাই ভবপুৰ ॥

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী

কালো মেঘ

মেঘখানি সে বড়ই কাল দাঁড়িয়ে ছিল ঠাথ,
দেখতে পেলাম প্রত্যুষেবি পূৰ্ব-সীমা-তটে,
প্রভাত-আলোষ প্রাণেব কালী মুচ্ছ না তাব হায়,
মেঘখানি সে—হায় কালো মেঘ! অমনি কালো বটে!
আকাশ তাবে হাওয়ার ছলে বললে ঠেলে—সরো,
তুমি ত নও সূর্য্যদেবের সোনার দেশের কেহ।
মেঘ বলে,—হায়! কোথায় যাব, কোথায় পাব স্নেহ?
জাঁধার সারা রাতটি হেঁটে শ্রান্ত আমি বড়।
মাটির ধরা মর্শ্বরিয়া ডাকলে তারে কাদি,—
ও কালো মেঘ, হেথায় এস, আমিও আর-এক কালো,
আমার কালো মাটির হিয়া তোমায় দিলাম পাতি।
মেঘ কহে,—মোব মাটির দেবি, তোমায় বাসি ভালো।
বইল মলিন মেঘেব বুকে বিমল প্রীতির ধাবা,
আপ্নাকে সে বিলিয়ে দিখে শুভ্র হল খাঁটি;
দাঁড়াল দিক্-ছায়াব খুলে ছালোক-অঙ্গনারা,
উঠলো শত মল্লিকাতে ভরে' ধরার মাটি।

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্তী



বিদেশ

ইতালীতে বিপ্লবের সূচনা—

যুদ্ধের পূর্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহিত শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর্ব ইউরোপে যে অর্থ-নৈতিক পবিবর্তন হইয়াছে তাহাব ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহিত শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাত বীধিয়া উঠাতে উভয়ের মধ্যে উত্তরোত্তর বিরোধ বাড়িয়া উঠিতেছে। এই বিরোধটি সর্বাপেক্ষা অধিক দেখা দিয়াছে ইতালীতে; সেখানকার ফ্যাসিষ্ট সম্প্রদায়ের উদ্ভব এই দ্বন্দ্বের ফলে।

পূর্বে শ্রমজীবীদের বর্ষন দুর্দশাব সীমা ছিল না তখন তাহাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের দুঃখ মোচনের প্রয়াস পাইত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক ও ধনী বন্দে তাহাদের স্বার্থ বড় জড়িত ছিল না। শিক্ষক, লেখক, চিত্রকর, প্রভৃতি চিন্তাজীবী অথবা শিল্প-শ্রষ্টা লোকেরা যেমন ধনদে মত্ত হইবার হুবিধা পাইত না তেমনই অভাব-অনটনের তীব্র তাড়নাও তাহাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে নাই। তাই কর্মের অবকাশে তাহাদের ভরস্ব প্রাণ দীন-দুঃখীরা কষ্টে ব্যথিত হইয়া উঠিবার অবসর পাইত। তাই শ্রমজীবী আন্দোলন, সমতা আন্দোলন, গণ-তান্ত্রিক আন্দোলন প্রভৃতি যাবতীয় সামান্যজনের পুর্বাহিত হইতেন তাহাবাই। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণ-সম্প্রদায়ের মন ছিল সাম্যের আশ্বনে রঞ্জিত, তাই তাহারা সামাজিক ক্ষয়ের সন্ধানী ছিলেন, আব ছিলেন অস্ত্রাঘের প্রতিবোধী।

কিন্তু যুদ্ধের পর্ব অবস্থার অনেক পবিবর্তন ঘটয়াছে। প্রথম পবিবর্তন এই যে পূর্বে দেখানো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সত্তিত শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের দেখানে কোনও স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাত ছিল না দেখানে এখন পরস্পরের স্বার্থে আঘাত বাজিয়া উঠিয়াছে।

যুদ্ধের মধ্যে হুযোগ বৃদ্ধিয়া নির্মাতা (manufacturers) অসম্ভব রকম লাভ করিয়াছেন। যুদ্ধের পর্ব শ্রমজীবী-সম্প্রদায় সেই লাভের অংশ দাবী করিতে আবস্ত করিলেন। বোলশেভিক আন্দোলন বাহাতে না জাগিয়া উঠে সেই উদ্দেশ্যে ধনীবাও সহজেই শ্রমীর দাবী মানিয়া লইতে আবস্ত করিলেন। কিন্তু শ্রমীর দাবী মানিয়া লাভের গণ্ডা হইতে শ্রমীর কড়াটি বুঝাইয়া না দিয়া ধনী, ক্রেতার নিকট হইতে সেইটি আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা পাইলেন। ইহাতে লোকসান হইল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সব-চেয়ে বেশী। তাহাদের আয় বাড়িল না, অগচ নিত্য-ব্যবহার্য্য সমস্ত ব্রব্যের মূল্য বাড়িয়া গেল, তাহাতে তাহাদের কষ্টের আব সীমা বহিল না। শ্রমী ও মধ্যবিত্তের আয়ে মাপকাটি উঠাইয়া গেল। শ্রমীর আয়-ক্রান্ত-গতিতে বাড়িয়া চলিল, আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয় পূর্বের স্তার বহিষা গেল বটে কিন্তু ব্যয়ের অঙ্ক ক্রমশঃ বাড়িয়া যাওয়াতে অবস্থা-বিপর্য্য

যেকপ হইল তাহাতে শ্রমিকের হুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তুলনায় বুদ্ধিজীবীদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল।

ইহার উপর আবার শ্রমজীবী-সম্প্রদায় বুদ্ধিজীবীদের প্রতি অবিচার করিতে লাগিলেন। বোলশেভিকদিগের মূলমন্ত্র “অলসের অন্নপানের অধিকার নাই, কর্ম না করিলে অন্ন মিলা অমুচিত” তাহাদিগের জীবনের বীজমন্ত্র কবিয়া তুলিতে গিয়া তাহাবা বুদ্ধিজীবীদের প্রতি মহা অবিচার আবস্ত করিলেন। কর্ম অর্থে তাহারা একমাত্র দৈহিক শক্তির ব্যবহার বুলিলেন, চিন্তাশক্তির ব্যবহার যে অলসতা নহে, বুদ্ধিজীবীরাও যে কর্মপটু, একথা তাহাবা স্বীকার না করিয়া বুদ্ধিজীবীদেরকে গল্পনা দিতে আরম্ভ করিলেন।

ইতালীর হাটে ঘাটে মাঠে, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষক কেবানীর দল অপমানিত হইতে লাগিলেন। সস্তিক-পরিচালনার মূল্য এইরূপে অপমানের মালা হইয়া উঠিল।

এদিকে আবার দেশের আর্থিক দুর্গতির সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধের বিধময় ফল লোকে বুলিতে আবস্ত করিল। জাতীয় উন্নতির আকাঙ্ক্ষা যুদ্ধে যেমন সকলকে উৎসাহিত করিয়াছিল, ধ্বংসলীলার তাণ্ডব তেমনই আবার যুদ্ধের প্রতি ঘৃণা জাগাইয়া তুলিল। শ্রমিকের দল চতুর্দিকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন তুলিলেন।

দেশপ্রসে মাতোয়াবা হইয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই সৈনিক হইয়াছিলেন সব চেয়ে বেশী। শ্রমিকেরা সেই সকল যুদ্ধ-প্রত্যাগত সৈনিকদিগকেও ঠান্ডা-বিজ্রপ করিতে আবস্ত করিলেন। বাহাবা দেশের ভবিষ্যৎ সঙ্কলের জ্ঞান নিজের জীবনকে বিপন্ন করিতে কুঠিত হু নাই তাহাবা আদব-সম্মানের পরিবর্তে এইরূপে অভিনন্দিত হইয়া যে শ্রমিক-দিগের প্রতি ভিক্ত হইয়া উঠিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

এইরূপে নানা কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা শ্রমিকদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন।

সেই বিবর্তিকে আশ্রয় করিয়া সাম্যবাদীদের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলনের সূজন করিলেন ইতালী-দেশীয় বাট্রিষ্ট পণ্ডিত সেনন মুসোলিনি। এই আন্দোলনের নাম ফ্যাসিষ্ট (Facisti) আন্দোলন। সাম্যবাদকে ইতালী হইতে উৎখাত করিয়া ফেলা এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য—তাহা ছলেই হউক আব বলেই হউক।

কাজেকাজেই ফ্যাসিষ্ট ও শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তির দ্বন্দ্ব জাগিয়া উঠিল, স্থানে স্থানে সেই দ্বন্দ্ব বস্তপাতেও পর্য্যবসিত হইল। ব্যাপার এমনই গুরুতব আকার ধারণ করিল যে দেশে নিরাপদে বাস করা দায় হইয়া উঠিল।

একপ উৎপাত তো কোনও রাজশক্তি সহ্য করিতে পারে না। ইতালী স্বকাব তাই উভয় দলকে শাসন করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল যে ইতালী স্বকাব উভয়দলের কাহারও সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ইতালীর পণ্যসান্য বহু লোক, এমন কি মহাসম্ভাব অনেক সম্ভা, গোপনে গোপনে ফ্যাসিষ্ট সম্প্রদায়ের সহিত সহায়ুজ্জিত-সম্পন্ন থাকিতে তাহাদের

চেষ্ঠাতে ক্যাসিটি সম্প্রদায় প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। মন্ত্রী-সভায় এই ব্যর্থতার ক্ষুব্ধ হইয়া ইতালীয় জাতীয় মহাসভাতে বিপ্লব ১৯শে জুলাই, দেশে শান্তি-স্থাপনে মন্ত্রীসভার অক্ষমতার জন্ত, মন্ত্রীসভাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া একটি সমন্বয় গৃহীত হইল। ফলে প্রধান মন্ত্রী সেনর ফ্যাষ্ট। পদত্যাগ করেন। সেনর মুসোলিনি মহাসভাতে বক্তৃতা করিতে কবিত্তে বসিলেন যে যদি ভবিষ্যৎ মন্ত্রীসভা গণতন্ত্রের সহিত কোনও প্রকার সমানুভূতি প্রদর্শন করে তাহা হইলে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করিবেন এবং হৃদয় সাহসী ও সুপরিচালিত সেনারী পরিচালনা করিয়া তিনি ইতালীর ভাগ্যচক্র নিয়ন্ত্রিত করিবার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিবেন। ক্যাসিটি সম্প্রদায়-ভুক্ত লোক বোলোনা, মিলান, পিকাজা প্রভৃতি স্থানে শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের লোকদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী-সভার পতনের পব নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের চেষ্টা চলিতে লাগিল। সেনর অবল্যাণ্ডে মন্ত্রীসভা গঠনের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। বাহাতে সকল সম্প্রদায়ের লোক একযোগে কাজ করিতে পারে তিনি তাহাব উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু সম্মিলিত মন্ত্রীসভা গঠনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলেন সাধারণ ক্যাথলিক সম্প্রদায় (Catholic Popular Party)। মহাসভাতে এই দলের আধিপত্য বেশী। ইহাখা ক্যাসিটি সম্প্রদায়ের সহিত একযোগে কাজ করিতে সম্পূর্ণ নাবাজ। ফ্যাষ্টার পূর্বে বনোনি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাকে মন্ত্রীসভা গঠনের ভার দেওয়া হইল। কিন্তু তিনিও কৃতকার্য হইলেন না। ব্যাপার দেখিয়া ইতালীয় সুবিখ্যাত বাস্তব নেতা দিওলেটি বলিলেন, “ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। ভাগ্যে আমি মহাসভার সভ্য হইবার সুবিধা এইবার পাই নাই; তাহা না হইলে আমার প্রতি এই অসম্ভব কায়ের ভার অর্পিত হইত। অকৃত কর্মের হস্ত হইতে আমি ভগবানের কৃপায় নিস্তার পাইয়াছি।” কেহই মন্ত্রীসভা গঠনে কৃতকার্য না হওয়াতে সেনর ফ্যাষ্টাকেই পুনরায় সেই ভার দেওয়া হয়। তাঁহার পুরাতন মন্ত্রী-সভাই পুনর্নির্বাচিত হইল। ফ্যাষ্টা কার্য গ্রহণের পূর্বে মহাসভার বিশ্বাস তাঁহার প্রতি আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় তাঁহার প্রতি নির্ভর-জ্ঞাপক প্রস্তাব অধিকাংশ সভ্যের ইচ্ছায় গৃহীত হওয়াতে তিনি পদগ্রহণ করিয়াছেন। ফ্যাষ্টা বলিতেছেন, দেশের শাসন-ব্যয়-সংক্ষেপ ও দৃঢ়তার সহিত আবাজকতা নিবারণ তাঁহার প্রধান কর্তব্য হইবে। প্রশ্নোত্তর হইলে তিনি ব্যাসিটি-হাজারামা নিবারণ কল্পে বলপ্রয়োগেও কুণ্ঠিত হইবেন না। দেশের প্রকৃত হিতসাধন বর্তমান অবস্থায় এক প্রকার অসম্ভব। ধ্বংস দেখা যাইতেছে, রক্তের প্রোতে ইহাব একটা মীমাংসা হইবে—বাহুবলের সেই মীমাংসা প্রকৃত কল্যাণকর কি না তাহা কে বলিবে?

যুদ্ধরূপ ও ক্ষতিপূরণ-সমস্যা—

যুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিগণকে যুদ্ধোপকরণ ও আহাৰ্য্য-সামগ্রী পরস্পরের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করিতে হইয়াছিল এবং এক মণ্টিনিপ্রো ও মার্কিনী ব্যতীত অন্য কোনও রাজ্য অব্যাসস্তার জোগান দিয়া নগদ মূল্য পায় নাই। এই জোগানের সুত্রেই ফরাসী ও ইতালী ইংরেজ ও মার্কিনের নিকটে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং ইংরেজের মার্কিনের নিকট ঋণ অনেক কমিয়া উঠে। ফ্রান্স ইংলণ্ডের নিকট ইস্পাত ও আমেরিকা হইতে রাসায়নিক অব্যাসস্তার ও গস বহল-পরিমাণে ক্রয় করিতে বাধ্য হয় এবং ইহার মূল্য স্বরূপ ফরাসী মুদ্রা ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় প্রেরণ না করিয়া ইংরেজ ও মার্কিন বাজকোষ হইতে পাউণ্ড ও ডলার ধার করিয়া বিক্রয়াদিগেব মূল্য চুকাইয়া দেওয়া হয়। ফরাসীকে ক্রাঙ্কে দান দিতে না হওয়াতে সম্ভব পূর্বে ক্রাঙ্কের দায় কর্মে নাই। কিন্তু যুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিগণের বাজকোষ হইতে যে

ঋণ দান করা হইয়াছিল তাহা তো আর বহুকালেরে গ্রন্থ চলিতে পারে না? যুদ্ধ-শেষে যুদ্ধরূপেব একটা বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন হইয়া পড়িল। কিন্তু ঋণভার এত বেশী হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহা শীঘ্র শোধ করিবার বন্দোবস্ত করা অনেকগুলি রাজ্যের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল।

সময়-ব্যয় যে যুগ্মসম্রাজ্য-সমূহেব অধিকাংশকেই একেবারে দেউলিয়া করিয়া দিবে, বার্তাশাস্ত্র-বিশাবদ কিন্স বহ পূর্বেই ‘যুদ্ধের আর্থিক কুফল’ (Economic Consequences Of War) নামক পুস্তকে দেখাইয়াছিলেন।

ধার্মাশ্রুত রাজ্যগুলি আর্থিক দুর্গতি হইতে আত্মরক্ষা করিবার প্রয়াসে যে-সকল উপায় খুঁজিতে লাগিলেন তাহা নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থের দ্বারা কল্পিত থাকায় তাহাতে মঙ্গলের পরিবর্তে ইটরোপেব দুর্দশা আরও বাড়িয়া চলিতে লাগিল। ১৯৮ সালে নভেম্বর মাসে ফরাসী অর্থমন্ত্রী ক্লোজ (Klotz) বৃটিশ মার্কিন ও ফরাসী অর্থমন্ত্রী-গণকে লন্ডন-নগরীতে এক আলোচনা-সভায় যোগ দিয়া যুদ্ধরূপের একটা ব্যবস্থা করিবার জন্ত আহ্বান করিলেন। সেই সময়ে ইংরেজ মন্ত্রীসভা-নির্বাচন লইয়া ব্যস্ত থাকায় কোনও আলোচনা-সভা বসিবার সুযোগ হয় নাই।

নির্বাচনের পব অষ্টেন চেষ্টাবলেন অর্থমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তিনি যুদ্ধবান্ধেব সহিত একটা বন্দোবস্ত করা সম্ভবপব কি না জানিবার জন্ত মার্কিন অর্থমন্ত্রীর সহিত পত্র-ব্যবহার আবস্ত করিলেন। মার্কিন অর্থমন্ত্রী কর্ণেল হাউসের ব্যবহারে বুঝা গেল যে যুক্তরাজ্য সহজে কোনও বন্দোবস্তে আসিতে সম্মত হইবেন না। ফ্রান্সেব ঋণ তাঁহারা কিছুকাল পর্যন্ত আদায়ের চেষ্টা না করিতে পাবেন কিন্তু ইংরেজের ঋণ তাঁহারা বেশীদিন ফেলিয়া রাখিবেন না। কাবণ তাঁহারা বলেন, ইংরেজের বাজকের অবস্থা কোনওক্রমে শোচনীয় বলা যাইতে পারে না, বরং বেশ অবস্থাপন্নই বলিতে হয়। ইংরেজের ল্যাবদা-বাণিজ্যও ফ্রান্স বা মিত্রশক্তিগণের অন্ত্যস্ত রাজ্যের জাঘ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। ক্রাঙ্কেজাই ইংলণ্ডকে কিছুদিনেব জন্ত অব্যাহতি দিবার কোনও সম্মত কাবণ মার্কিন দেখিতে পাইলেন না।

মার্কিনেব মনোভাব বুঝিয়া ইংরেজও আপনাব স্বার্থেব প্রতি দৃষ্ট রাখিয়া ফরাসীকে চাপ দিবার চেষ্টা পাইলেন। ফরাসী জাতি বিপদ গণিয়া আত্মরক্ষার্থে তাঁহাদের ঋণভারের সমস্তটাই জার্মানীকে স্বক্কে চাপাইয়া দিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তাই জার্মানীকে নিকট হইতে যতশীঘ্র সম্ভব ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লইবার আগ্রহাতিশয্য দেখা যাইতে লাগিল।

ফ্রান্সের এই অত্যধিক দাবী চাপে জার্মানীর অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিতে লাগিল। জার্মান স্বকার নানাপ্রকারের নূতন কর স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। এদিকে জার্মান মার্কের দাম অসম্ভবরূপে কমিয়া বাওয়াতে জার্মানীকে প্রজাসাধারণের আপেক্ষিক আর কমিয়া গেল। কিন্তু আরকর পূর্বের জাঘ থাকতে অন্য আয়ের লোকদিগের কষ্ট অনেক বাড়িয়া গেল। দেশের দুর্দশা বাড়িয়া উঠাতে ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষতি হইতে লাগিল। পণ্যের ভিত্তারীকে মাল বিক্রয় করা সম্ভবপর নহে। তাই জার্মানীর এই দুর্দশায় ইংরেজ বিপদ পলিলেন। জার্মানী ইংরেজের একজন বড় খনিদার। তাঁহার অর্থ-নৈতিক দুর্দশা ইংরেজের বাণিজ্য-সংহতি ও অর্থনৈতিক চকল করিয়া তুলিল।

তাই দায়ে ঠেকিয়া ইংরেজ ফরাসীজাতিব নিকট প্রস্তাব করিলেন যে মিত্রশক্তিগণ পরস্পরের ঋণ কিছুদিনেব জন্ত ভুলিয়া থাকিবেন। ফরাসী যদি ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার সময় বেশ ধীর ভাবে

জার্মানীর ক্ষতিপূরণের সামর্থ্য বিচার কবিয়া চলেন তবে ইংরেজ ফরাসীর স্বার্থে জন্ত কোনও গোলযোগ কবিবেন না।

ইংরেজের আশাসে বিশ্বাস কবিয়া ফ্রান্স জার্মানীর প্রতি চাপ কিছুদিনেব জন্ত কমান্বিয়া দিয়াছিল। কিন্তু জার্মানীর প্রকৃত অবস্থা যে প্রকাশ পায় নাই, তাহার চূর্ণশাব অধিকাংশটাই যে লোক-দেখান, ভিতরে ভিতরে তাহার অবস্থা যে বেশ স্বচ্ছল এ বিশ্বাস ফ্রান্সের থাকিতে ফ্রান্স মধ্যে মধ্যে জার্মানীর প্রতি জোব করিতেও ছাড়িতে ছিল না।

মার্কিন ও ইংরেজ ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতা আবার অল্পদিকে বাড়িয়া উঠাতে পরস্পরের মধ্যে বিবোধ বাড়িয়া উঠিতেছে। তাই মার্কিন আবার ইংরেজকে স্বর্ণ শোধ কবিবার তাগিদ আরম্ভ কবিয়াছে। ইংরেজও আবার বাধ্য হইয়া ফ্রান্সকে তাগিদ দিতেছেন। ফ্রান্স আবার জার্মানীকে চাপ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কিন্তু ইউরোপের রাজ্য-সমূহের রাজস্বের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় তাহা দুইটি উদাহরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী আয়বাবের খসড়াতে (budget) জার্মানীর নিকট হইতে ক্ষতি পূরণের দাবী সম্পূর্ণরূপে আদায় হইলেও ১৩২৫০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক কাঙ্ক্ষিত (deficit) থাকে। কিন্তু জার্মানীর নিকট হইতে দাবীর সমস্ত টাকা আদায় হওয়া অসম্ভব। কাজেকাজেই অভাবের অঙ্ক আকণ্ড বাড়িয়া যাইবে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জার্মান রাজস্বের আয়বাবের যে খসড়া প্রস্তুত হয় তাহাতে দেখা যায় যে ৩৩০০০০ লক্ষ মার্ক কম পড়িতেছে, এবং সাত মাস শাসনকার্যপরিচালনাই দেখা গেল যে খসড়াতে যে আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ধরা হইয়াছিল প্রকৃতপক্ষে তাহা হইতে আবে অনেক কম হইয়াছে এবং ব্যয়ও বেশী হইয়াছে; কাজেকাজেই তহবিলে এই সাত মাসেই ৫২৫০০০ লক্ষ মার্ক কম পড়িয়াছিল। অতএব জার্মান জাতীয় স্বর্ণ ক্ষতিপূরণিতে বাড়িয়া চলিয়াছে।

জার্মানীর অর্থনৈতিক দুর্গতি এতদূর বাড়িয়া উঠিয়াছে যে কোনও পাওনা বর্তমান সময়ে কাহাকেও দেওয়া তাহার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসার না হইলে জার্মানী আবে কাহাকেও কোনও টাকা শোধ দিতে পারিবে না। তাই জার্মান সরকার মিত্রশক্তিবর্গকে অসুযোগ করিয়াছেন যে জার্মানীর কোষ শূন্য থাকায় জার্মানীর দেয় ক্ষতিপূরণের টাকা যেন আপাততঃ আদায় করা স্থগিত থাকে।

১৩ই জুলাই কমন্স সভাতে প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ বলিলেন, “জার্মান সরকারেব এই অসুযোগ মিত্রশক্তিবর্গের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। তবে এ সম্বন্ধে ইংরেজ সরকারের কর্তব্য কি তাহা না বলিয়া তিনি এই পর্যন্ত বলিতে পারেন যে জার্মান সরকারকে অর্থনৈতিক দুর্গতি হইতে রক্ষা কবিবার জন্ত মিত্রশক্তিবর্গের সাহায্য করা উচিত। এবং তজ্জন্ত ক্ষতিপূরণের দাবী আপাততঃ স্থগিত রাখা বিধের হইলে তাহাই কবিত হইবে।”

ফরাসী মন্ত্রী পরকারে বলিলেন যে, “জার্মানী যে পর্যন্তনা প্রমাণ করিতে পারিবে যে যতদূর সম্ভব চেষ্টা কবিয়া যাহা দেওয়া সম্ভব তাহা দেওয়া হইয়াছে, সে পর্যন্ত পাওনা স্থগিত রাখিবার কথা চিন্তা করা যাইতে পারে না। ফরাসী সরকার মনে করেন যে জার্মান সরকারেব দেনা কঁাকি দিবার প্রয়াস পাইতেছেন। কাজেকাজেই আপনাদিগের প্রাপ্য বুঝিয়া পাইতে ফরাসী সরকার চেষ্টা কবিবেন এবং প্রয়োজন হইলে বলপ্রয়োগও ফ্রান্স কুঠিত হইবে না।”

১লা আগষ্ট তারিখে ইংরেজ সরকারেব তবক্ষ হইতে লর্ড ব্যালফুর, ফরাসী, ইতালী, বেলজিয়াম, গ্রীস, রুমেনিয়া ও পর্তুগাল

সরকারের নিকট একটি প্রস্তাব প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, “ইংরেজ সরকারকে মিত্রশক্তিবর্গের পরস্পরের পাওনার দাবী কিছু না লইয়া চুকাইয়া ফেলিতে যে মিত্রশক্তিবর্গ অসুযোগ করিয়াছেন তাহা ইংরেজ সরকার প্রহণ করিতে পারেন না; কেননা মার্কিন ইংরেজ সরকারের স্বর্ণ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহে। মার্কিনের পাওনার সমস্ত টাকা ইংরেজ বুকাইয়া দিবেন আবে ইংরেজ তাহার পাওনা অনাদায় রাখিবেন, এরূপ সর্ব্ব ইংরেজ সরকার সম্মত হইবেন কি প্রকারে? ইংরেজের নিকট মার্কিনের পাওনা মোট ৮৫০০ লক্ষ পাউণ্ড, কিন্তু মিত্রশক্তিবর্গের নিকট ইংরেজ সরকারের পাওনা ৩৪০০০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ মার্কিনের পাওনার চারগুণ।” ব্যালফুর ফরাসী সরকারকে জানাইলেন যে, “ইংরেজ সরকার এতদিন পর্যন্ত দেনার টাকা কিংবা স্বর্ণের টাকার জন্ত কাহাকেও তাগিদ দেন নাই, কিন্তু এখন মার্কিনের চাপে বাধ্য হইয়া ফরাসী সরকারকে জানাইতেছেন যে তাহারা ইংরেজের নিকট ফ্রান্সের ধারের টাকা শোধ দিবার জন্ত ফরাসী সরকারকে তাগিদ দিতে বাধ্য হইতেছেন। ফরাসী সরকার শীঘ্র শীঘ্র এই টাকটি শোধ দিবার বন্দোবস্ত করুন।”

ফরাসী সরকার জার্মান সরকারকে জানাইলেন যে ফরাসীর ক্ষতি-পূরণের টাকা এবং ফরাসী অধিবাসীর নিকট জার্মান অধিবাসীর দেনার টাকা যদি জার্মানী পূর্ব্বের সর্ব্ব অমুদারে শোধ না করে তবে ফরাসী আলসেস ও লোরেনের জার্মান অধিবাসীদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া জার্মানদের তাড়াইয়া দিবেন এবং রাইন-প্রদেশের সম্পত্তি-সকলও বাজেয়াপ্ত করিবেন। ইংরেজ ও ফরাসী সরকারেব নিকট অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া জার্মানী এক সম্ভব্য প্রেবণ কবিয়াছেন।

জার্মানীর সহিত কোনও প্রকার বন্দোবস্ত সম্ভব কি না, ইংরেজ সরকারেব সহিত কিরূপ বন্দোবস্ত সম্ভবপর, এই-সব স্থির কবিবার জন্ত পরকারে লন্ডন জর্জেব সহিত দেখা করিতে লণ্ডনে গমন করেন। সেখানে এই আগষ্ট তাবিশ হইতে মিত্রশক্তিবর্গের বার্তাশাস্ত্রবিদ রাষ্ট্রীয় নেতাদের এক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে পরকারের প্রস্তাবেব আলোচনা চলিতেছে। জাপান, ইতালী, বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের প্রতিনিধিবা এই মিলিত বৈঠকে উপস্থিত আছেন। বেলজিয়ামেব প্রতিনিধি থিউনিস, পরকারেব প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু ইংরেজ ও ইতালী প্রতিনিধিবর্গেব এ প্রস্তাবে যৌবতব আপত্তি দেখা যাইতেছে। জার্মানীর ক্ষুদ্র-কব বাজেয়াপ্ত কবিবার প্রস্তাব এবং ক্রব-উপত্যকার কয়লার খনি এবং বনবিভাগের রাজস্ব আদায়ের প্রস্তাব ইংরেজ সমর্থন করেন না। ফ্রান্সের প্রস্তাবে ইহীদের যেকণ আপত্তি দেখা যাইতেছে এবং এই যুক্তি মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে যেরূপ কলহের সৃজপাত হইয়াছে তাহাতে তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ভাব বেশীদিন থাকা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না, এবং ইউরোপেব অর্থনৈতিক অবস্থা এখন যেরূপ তাহাতে কোনও একটা সুখীমাংসা সহজে হইবে আশা করা যায় না।

“ইজিপ্ট” জাহাজের সম্বন্ধে তদন্ত—

সরকারী বাণিজ্যবিভাগের (Board of Trade) তত্ত্বাবধানে ‘ইজিপ্ট’-জাহাজ-ডুবি সম্বন্ধে যে তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে তাহা হইতে সেই জাহাজ-ডুবির অনেক কথাই প্রকাশ পাইয়াছে। অসুস্থকালেব উপযোগী নৌকা এবং কোমরবন্ধ থাকা সম্বন্ধে এত বেশী লোকের প্রাণ নষ্ট হইল কেন? “সিন” নামক ফরাসী জাহাজেব সঙ্গ থাকা লাগার পব “ইজিপ্ট” জাহাজ হইতে ছয়খানি নৌকা নামানো হইয়াছিল; এই ছয়খানি নৌকাব যতগুলি আবোহী ধবে তাহাব

চেয়ে বেশী-সংখ্যক আরোহী জাহাজে ছিল না। 'পি এণ্ড ও' কোম্পানীর সামুদ্রিক বিভাগের কর্মকর্তা স্যার ফ্রাঙ্ক নোটলি সাক্ষ্য দিতে গিয়া বলেন যে গোয়ানিজ এবং ভারতীয় লঙ্করেরা ইংরেজ নাবিকদিগের মতই কর্মক্ষম ও উপযুক্ত—“Quite as good as British sailors”। তিনি আরও বলেন যে লঙ্করদিগের চেয়েও বেশী উপযুক্ত লোক কি হইতে পারে তাহা তিনি জানেন না। যুদ্ধের সময়ে বিপদকালে এই লঙ্করেরা যেকোন সংসাহস ও কর্মক্ষমতা দেখাইয়াছিল তাহা জগতে অতুলনীয়।

ডক বিভাগের কর্মী কাপ্তেন রায় বলেন যে তিনি একথা স্বীকার করেন না যে ইংরেজ নাবিকগণই দায়িত্বপূর্ণ পদগুলি পাইবার উপযুক্ত। দেশীয় লঙ্করেরা এতদসাধনে ইংরেজ নাবিকদিগের চাইতে অনেক ভাল কাজ করিতে পারে।

জাহাজের কাপ্তেন, কলিয়ার সাহেব, বলেন যে লণ্ডন হইতে বোম্বাই যাত্রার পথে লঙ্করেরা যেতকাল নাবিকদিগের চেয়ে বেশী কর্মতৎপর ও কৌশলী। বিপদকালে লঙ্কর ও যেতকারদিগের মধ্যে ব্যবহারের বিশেষ তারতম্য দেখা যায় না। যদি জাহাজের সমস্ত নাবিকই যেতকাল হইত তথাপি লোকসংখ্যা বড় কম হইত কি না সন্দেহ। কেবল যে ভারতীয় নাবিকেরাই ভয়ে আকুল হইয়াছিল তাহা নহে; যেতকার নাবিকেরাও বিশেষ ভয় পাইয়াছিল। এতোকই ভয়ে কাঁপিতেছিল।

ভারতীয় লঙ্করদিগের সম্বন্ধে একজন উজ্জি আরও কেহ কেহ করিয়াছেন বটে কিন্তু অপর একদল লোক ভারতীয় লঙ্করদিগের চরিত্রে মনীষ্যলোপন করিবার প্রয়াস পান। তদন্তের শেষে জবাবদায়ী-গুলির উপর এক এক পক্ষের লোকের বক্তৃতা হয়। ইংরেজ নাবিকদিগের পক্ষ হইতে নাবিকসম্ভার সভাপতি কটার সাহেব বক্তৃতা করেন। তিনি সমস্ত দোষ ভারতীয় লঙ্করদের স্বন্ধে চাপাইয়া দিয়া বলেন যে ‘পি এণ্ড ও’ কোম্পানী সম্ভার নাবিক পাইবার প্রলোভনে না ভুলিয়া যদি ভারতীয় লঙ্করদিগের পরিবর্তে ইংরেজ নাবিক লইতেন তাহা হইলে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিত না। তদন্তের ভারতীয়-দিগের পক্ষে মিঃ বাকনেল বলেন যে “ভারতীয় লঙ্করেরা ইংরেজি কাগজ না পড়িতে সম্মত হইত; কটারের বক্তৃতা পড়িবে না। কিন্তু যদি তাহারা এই বক্তৃতার কথা জানিতে পারে তবে নিশ্চয়ই ইংরেজ-জাতিকে অকৃতজ্ঞ মনে করিবে। যুদ্ধের সময় তাহারা যেকোন অসম্মানসিকতার পরিচয় দিয়াছিল মিঃ কটার তাহার উপযুক্ত পুনর্দর্শনই আজ দিলেন বটে। লঙ্করদিগের পক্ষে একমাত্র সাধুনা এই যে তদন্ত-কমিটি নিশ্চয়ই নিবপেক্ষ বিচার করিয়া ইহাদিগের দোষ স্থান করিবেন।”

‘পি এণ্ড ও’ কোম্পানীর তরফ হইতে বলা হয় যে জাহাজটি হঠাৎ ভয়ানক রকম কাতরাইয়া যাওয়াতে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটয়াছে। লঙ্করদিগকে কার্যে গ্রহণ করিয়া কোম্পানী কোনও অজ্ঞান কবে নাই। হঠাৎ বিপদ হইলে অনেক ধীর স্থির ও বীরেরও মস্তিষ্ক-বিস্ময় ঘটে। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। এবং শুধু লঙ্করদিগের দোষ দিলে অজ্ঞান হয়; যেতকার ব্যক্তিরাও বুদ্ধিজীবীর পরিচয় কম দেন নাই।

সরকার পক্ষে সলিসিটর জেনারেল বক্তৃতা দিবার সময় সমস্ত দোষ কোম্পানীর কর্মচারীদিগের প্রতি আর্ষোপ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে কুয়াশার মধ্যে জাহাজ যেকোন ক্রতগতিতে পরিচালিত হইয়াছিল তাহা অজ্ঞান এবং অতিবিক্ত বেগে পরিচালিত সন্দেহ নাই। জাহাজে অধীনস্থ নাবিকদিগকে সংযত রাখিবার ভাল বন্দোবস্ত না থাকায় গণ্ডগোল বেশী হইয়াছে। ডকবিভাগের কর্মী, জাহাজের

কাপ্তেন ও অস্ত্র দুই-একটি উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বেবস্ত্রাবস্ত্র জাহাজের নাবিকদিগকে হুমসংবদ্ধ রাখা যায় নাই। এজন্য প্রধানতঃ তাঁহারা দায়ী। নাবিকদিগকে কর্মক্ষমতা শিখাইবার বন্দোবস্তও ভাল নহে। ভারতীয় লঙ্করেরা কর্মী ও সাহসী। তাহাদিগকে প্রশিক্ষিত করিলে তাহারা খুব উপযুক্ততার সহিত এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিতে পারে। ইহাদেব বক্তৃতা শেষ হইলে তদন্তকমিটির সভাপতি জ্ঞাপন করেন যে অনুসন্ধানকল প্রকাশ করিতে তাঁহাদের কিছুদিন সময় লাগিবে। ফল এখনও বাহির হব নাই।

গ্রীসের আফালন ও তুরস্ক-সমস্যা—

তুরস্ক ও গ্রীসের যুদ্ধ মিটাইয়া দিবার প্রয়াস মিত্রশক্তিবর্গ অনেকদিন হইতেই করিয়া আসিতেছেন। এই মিটাইবার চেষ্টায় অবশ্য মিত্রশক্তিবর্গ গ্রীসের স্বার্থের দিকেই বেশী ঝুঁকিয়াছেন। তথাপি গ্রীস সেই-সকল চেষ্টায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া মিত্রশক্তিবর্গকে জানাইয়াছেন যে স্তাম্বুলকে গ্রীসের অধীনে রাখিবার ব্যবস্থা না করিয়া মিত্রশক্তিবর্গ যে তাহাকে সার্বভৌমিক বন্দবে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন তাহাতে তুরস্ক-শক্তির প্রতাপ অব্যাহত থাকিবার সুযোগ রহিয়া যাওয়াতে তুরস্ক এশিয়ামাইনরের খৃষ্টান প্রজাপুঞ্জের উপর অত্যাচার করিবার অবকাশ পাইবে। কাজেকাজেই গ্রীসকে বাধ্য হইয়া স্তাম্বুল দখল করিতে হইবে। মিত্রশক্তিবর্গ যেন তাঁহাদের সৈন্ত সরাইয়া লইয়া গ্রীসের স্তাম্বুল দখলের সুবিধা করিয়া দেন।

তদন্তের ইংরেজ সেনাপতি হারিংটন জানাইয়াছেন যে গ্রীসের স্তাম্বুল দখলের প্রচেষ্টায় মিত্রশক্তিবর্গ বাধা দিবেন এবং প্রয়োজন হইলে সশস্ত্র প্রতিরোধ করিতেও পৰ্যাপ্ত হইবেন না। এদিকে জাতি-সমূহের সংঘের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গ্রীস আইওনিয়া ও আর্গার স্বরাজ্য ঘোষণা করিয়া তাহা গ্রীসের শাসনস্থায়ী আনিবার সংকল্প জানাইলেন।

ফ্রান্স ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া মিত্রশক্তিবর্গকে জানাইলেন গ্রীসের এই সিদ্ধান্ত বিপত মার্চ মাসের সন্ধির বিপরীত হওয়ার ফলে ফ্রান্স কখনই গ্রীসের এই আদায় সন্তু কবিবেন না। ইংলণ্ডে অ্যাক্সোরা সরকারের প্রতিনিধি ফেখী বে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া জানাইয়াছেন যে যদি মিত্রশক্তিবর্গ আড্রিনোপল তুরস্ককে ফিরাইয়া দেন তবে জাতীয়দলের সহিত মিত্রশক্তিবর্গের মনোমালিন্য অতি সহজেই মিটিয়া যায়। লণ্ডন সম্মেলন এই প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিতে সম্মত হইয়াছেন।

গ্রীস কিন্তু এদিকে খুব ক্ষিপ্তপ্রাণ সহিত সমরসম্মা করিতেছে। বোডোষ্টোর সন্ধিতে প্রায় ৫০০০ হাজার লোক সৈন্তসংঘে হইয়াছেন। যুদ্ধের উদ্ভোগপূর্বক খুব জাঁকজমক হইতেছে। তবে গ্রীস যত পক্ষের কার্যকালে তত বর্ধায় না, এই যা সত্য। নতুবা ইউরোপ শীঘ্রই অস্ত্রের ঝড়নাথ কাঁপিয়া উঠিত।

আমারুল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্তি—

স্বাধীনতা-প্ররাসী দল ডাবলিনের যুদ্ধে হারিয়া দক্ষিণ আমারুল্যাণ্ডে আত্মনা পাতিয়াছিলেন। স্বরাজপন্থীর দল ক্রমে ক্রমে সেখানেও স্বাধীনতা-প্ররাসীদলকে হটাইয়া দিতেছেন। লিমাটিকের অধিকাংশই ইহাদের হস্তগত হইয়াছে। ডি ভ্যালেরাব বিশেষ অশুভ এবং আমেরিকাব ভূতপূর্ব আইনিশ প্রতিনিধি হ্যাভি বোলাও যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হইয়াছেন। কিন্তু কর্ক প্রদেশে এখন পর্যন্ত স্বাধীনতা-প্ররাসী দলই প্রবল আছেন। ইহা বা ব্লিফডেনের তাবহীন বার্ষিক

দখল করিয়া ধ্বংস করিয়াছেন এবং ওয়েস্ট পোর্ট ও রুশমেন সहर স্বরাজপন্থী দলের নিকট হইতে দখল করিয়াছেন। রুশমেনেই এখন ডি জ্যালেয়ার আড্ডা। কেরি প্রদেশেও স্বাধীনতাপন্থী দল দুই-এক জায়গায় জয়লাভ করিয়াছেন। ওয়াটারভিল সहर ইহীদের অধিকার-ভুক্ত হইয়াছে। এই সहर দখল হওয়াতে ভেলান্টিয়া তডিংবার্ত্তী কোম্পানীর, ওয়েস্টার্লি কেবল কোম্পানীরও স্বকায়ী তাব প্রেরণে বাধা হইতেছে। আমেরিকার সহিত আব সংবাদ আদানপ্রদান চলিতেছে না। তবে সংবাদ আসিয়াছে যে স্বরাজপন্থীরা কর্ক আক্রমণ করিয়াছেন। সেখানে তুমুল বৃদ্ধির আরোহণ চলিতেছে।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা

রোগ-নিবারণের অভাব—

বঙ্গদেশে প্রতি ৪২০০ হাজার লোকের মধ্যে একজন করিয়া শিক্ষিত ডাক্তার পাওয়া যায়, আর বিলাতে প্রতি ১২০০ হাজারে একজন ডাক্তার নিযুক্ত আছেন। কতকগুলি ব্যাধি অনিবার্য, হুতবাং শিক্ষিত চিকিৎসক অল্প-বস্ত্রের দ্বারা জীবনধারণের ক্ষমতা প্রয়োজন। শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক অভাবে যে দেশে কত দুঃখ ও বিপদ হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। পল্লীগামসমূহে চিকিৎসকের, বিশেষতঃ ডাক্তারের, একান্ত অভাব। তাই জল-পড়া ও তেল-পড়ার বহুল প্রচলন দেখা যায়। কৃষক-পল্লীসমূহে ডাক্তারবান্দা স্থাপন দ্বারা প্রকৃত উপকারসাধন হইতে পারে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ চেষ্টা ও আন্দোলন কই?

—খুলনা

সরকারের সর্ববিশেষ আয়—

আবগারী আয়—এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট বা মাদক-দ্রব্য বিভাগে—স্বাভাবিক-সরকারের বৎসরে বৎসরে প্রচুর আয় হইয়া থাকে। এই আয়ের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। আমবা নিয়ে গত দশ বৎসরের আয়ের একটি তালিকা দিলাম।

সন	আয়	পাউণ্ড
১৯১০—১১	৭০০.৩১৪	"
১৯১১—১২	৭৬.২২৫৩	"
১৯১২—১৩	৮২.৭৭১৯	"
১৯১৩—১৪	৮৮.৯৪০০	"
১৯১৪—১৫	৮৮.৫৬৮১	"
১৯১৫—১৬	৮৬.৩২২০৯	"
১৯১৬—১৭	৯২.১৫৫৯৯	"
১৯১৭—১৮	১০১.৬১৭০৬	"
১৯১৮—১৯	১১৫.৫৭৫১৮	"
১৯১৯—২০	১২৭.৫২৩৫০	"
১৯২০—২১	১৩৬.৭৪০০০	"

সেবমিল্লিবেস সত ভাবতের সর্বস্থানে এখন মাদক-দ্রব্যের দোকান-গুলি বিরাজ করিতেছে। মহাত্মা গান্ধীর আদেশ—এ পাপ ভাবত হইতে বিদূরিত করিতে হইবে। কিন্তু এক ধারার জাতি এখনও কান দেয় নাই। চীন গবর্নমেন্ট নিজেব দেশের পক্ষে অহিতকর জানিয়া অতকালের পুনাবনো আবিষ্কারের জাতিব আবিষ্কার এক মুহূর্ত্তে বন্ধ করিয়া দিলেন—চীন সরকারের অত বড় একটা বিবটি আবগারী আয় বন্ধ হইয়া গেল, আর আমাদের দেশে চন্দ্রাবতব এই পাপের বুদ্ধিই চলিয়াছে।

—মাস্তী

কেবল চীন কেন, আমেরিকাও মদ্য অপেক্ষ অগ্রাহ্য স্থিতি করিয়া তাহা বিক্রয় বন্ধ করিয়াছে।

দেশের অর্থের যথেষ্ট অপব্যয়—

বোড়িসওয়ারেব দর—কলকাতাব ঘোড়ে ঘোড়ে যে-সমস্ত বোড়ার চড়া পুলিস দেখতে পাও, তাদের জন্তে বছরে সরকারী তহবীল থেকে খরচ হয় ৪১৬১৫ টাকা।

—আশ্বপতি

পুলিশ-ব্যয়—পুলিশ-ব্যয় আবার বাড়িল। ভারত-সরকারেব সামরিক ব্যয় বাড়িতেছে, প্রাদেশিক সরকারেব পুলিশ-ব্যয় বাড়িতেছে। সামরিক ব্যয় এবং পুলিশ-ব্যয়েব যেন দৌড়বাজি চলিয়াছে—কে হারে, কে জেতে। না থাইতে পাইয়া দেশবাসী প্রাণত্যাগ করুক, ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া বিনা চিকিৎসা লাগে লাগে দেশবাসী দক্ষিণ দ্রুমারেব পথ প্রশস্ত করুক, অশিকার তিমিরাক্রমে ভুবিয়া থাকুক, তাহাতে কি আসিয়া যায়? পুলিশের ব্যয় বাড়িও।

—বন্দে মাতরম্

কাপড়ের কথা—

বিলাতী কাপড়ের আমদানী বন্ধ হইল কি না?—বিলাতী কাপড় ও হুতা কেহ কিনিব না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তবু ১৯২১-২২ সালে ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড হুতা বিলাত হইতে বাল্জালা দেশে আমদানী হইয়াছে। সহযোগী সস্ত্রীবনী হিন্দাব দেখাইবাহেন। গত-পূর্ব বৎসর অগেঞ্জা ১৫ লক্ষ পাউণ্ড হুতা বেশী হইয়াছে। কিন্তু দাম ৩ কোটি হইতে ২ কোটি ৭৫ লক্ষ হইয়াছে।

বিশেষ হইতে ১৯২০-২১ সালে ৩৭,১১,৩৬,৭৬১ কোটি টাকার বস্ত্র আমদানী হইয়াছিল, কিন্তু ১৯২১-২২ সালে ২৭,১২,২০,৪২৩ টাকার বস্ত্র আসিয়াছে। এক বৎসরে প্রায় ১০ কোটি কমিয়াছে। কিন্তু কোবা কাপড়ের আমদানী কম না হইয়া বেশী হইয়াছে। গতপূর্ব বৎসর ৩৮ কোটি ২০ লক্ষ গজ কোবা কাপড় আসিয়াছিল, গত বৎসর ৪৭ কোটি ৮০ লক্ষ গজ আমদানী হইয়াছে। রঙ্গিন কাপড়ের আমদানী ১১ কোটি ২০ লক্ষ গজ হইতে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ হইয়াছে। খোলাই কাপড়ের আমদানীর হ্রাসবৃদ্ধি হয় নাই। গতপূর্ব বৎসর ৩ কোটি ৭০ লক্ষ গজ আমদানী হইয়াছিল, গত বৎসরও তাহাই হইয়াছে।

বিলাতী কাপড়ের দাম সস্তা হইয়াছে এবং বঙ্গিন কাপড়ের আমদানী কমিয়াছে, তাই আমদানী কাপড়ের মূল্য প্রায় ১০ কোটি কম হইয়াছে। কিন্তু কোবা কাপড়ের আমদানী বাড়িয়াছে ও খোলাই কাপড়ের আমদানী সমান আছে, এতদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিলাতী-বর্জনের চেষ্টা বঙ্গদেশে সফল হয় নাই।

বিলাতী হুতার আমদানী বেশী হইতেছে, তদ্বারা বঙ্গর প্রস্তুত হইতেছে। বিলাতী কোরা ও খোরা কাপড়ের আমদানী কিছুমাত্র হ্রাস করা যায় নাই। হুতবাং স্বীকার করিতে হইবে যে, বাল্জালী চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

বার্ঘ হওয়াব প্রকৃত কারণ এই যে বঙ্গদেশে যত বস্ত্রের প্রয়োজন তত নিশ্চিত হইতে পারে নাই।

—কাশীপুরনিবাসী

বিশিষ্ট কলসকাঠি কংগ্রেস কমিটির অধীনে একটি হুতা-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। বাহাবা হুতা কাটিয়া পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, তাঁহাবিগকে মেডেল ইত্যাদি পুরস্কার দেওয়া হয়। শ্রীমতী শিশুবালা দেবী এক ঘণ্টায় ২২ নম্বরের ১০৮ হাত হুতা কাটিয়া একটি স্বর্ণ মেডেল পুরস্কার পাইয়াছেন। শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীও একঘণ্টায় ২২ নম্বরের ৭৭ হাত হুতা কাটিয়া একটি স্বর্ণ মেডেল পাইয়াছেন। শ্রীমতী মনোবদা দেবী এক ঘণ্টায় ৭০ হাত হুতা কাটিয়া একটি চরকা পুরস্কার পাইয়াছেন। কলসকাঠি এই উদ্যম অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

—প্রতিকাব

পাটের হিসাব—

এ বৎসর বাঙলা দেশের কোন্ জেলায় কি পরিমাণ পাটের আবাদ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের এক হিসাব বাহির হইয়াছে। গত বৎসবাপেক্ষা এ বৎসব বাংলা দেশে মোট ৩০৮০০০ বিঘা কম ভূমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে। বরিশতপুর জেলায় ১৬৩০০০ বিঘা, ময়মনসিংহ জেলায় ১০৩০০০ বিঘা, যশোর জেলায় ৪২০০০ বিঘা, বাকরগঞ্জ জেলায় ৩৩০০০ বিঘা এবং ঢাকা জেলায় ৩২০০০ বিঘা কম ভূমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে। বঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, রাজশাহী প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় পাটের আবাদ আবার কিছু কিছু বাড়িয়াছে। সব্কারী হিসাবে জানা যাইতেছে এবার ৪০ লক্ষ বেল পাট জন্মিতে পাবে। কিন্তু কল-কারখানার জন্ত প্রয়োজন হইবে প্রায় ৯০ লক্ষ বেলের। কাজেই এবার পাটের মূল্য খুব চড়িবার কথা। তবে আমাদের দেশের কৃষকগণ এই বৃদ্ধির ফল কি-পরিমাণ ভোগ করিতে পারিবে তাহা বলা যায় না। সকলে এককেন্দ্রীভূত প্রতিষ্ঠানের (organisation-এর) অন্তর্গত থাকিয়া চেষ্টা করিলে এবার অল্প জমির দ্বারা ই কৃষকবৃন্দের হাতে কিছু বেশী টাকা আসিবার সম্ভাবনা আছে।

—চাকমিহির

বঙ্গদেশে রেসমের চাষ—

বঙ্গদেশে একসময় রেসমের চাষ খুব উন্নতিলাভ করিয়াছিল। বঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বাজশাহী, মালদহ, বগুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় রেসম চাষের বেশ প্রসাৰ হইয়াছিল। কতিপয় ইংরেজ কোম্পানী কৃষ্টি স্থাপন করিয়া প্রভূত বেসম খরিদ এবং নানা দেশে চালান দিতেন। রেসমের চাষ বিশেষ লাভজনক। তুঁত গাছের চাষ করিয়া শুট-পোকা পালন করিলেই বেসম উৎপন্ন করা যায়। বাড়ীর মেয়েবাই বেসম-পোকা পালন ও উহা হেঁকাঙ্গ করিতে পারে। অবশ্য ইহাতে অনেক ঝগড়া, সতর্কতা ও পরিশ্রম আছে। ওসব ত থাকিবারই কথা। বিনা পরিশ্রমে ও বিনা ঝগড়াতে অর্থ লাভ হইতে পাবে না। বগুড়া জেলা হইতে বেসমের চাষ উঠিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি আবার নূতন উদ্ভূত উহা বাক্স আরম্ভ হইয়াছে। আমবা আশা করি, বাজালা দেশের সকল জেলায়ই বেসম চাষের বন্দোবস্ত করা হইবে। কার্পাস চাষের ন্যায় বেসম চাষও অতি দরকারী। বিশেষতঃ ইহা অর্থাগমের একটি প্রধান উপায়।

—নবযুগ

শিক্ষা—

বালিকা-শিক্ষার সাহায্য।—বাজালা পূর্বমেন্ট বালিকা-শিক্ষার জন্ত মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার ৬ শত ৭০ টাকা সাহায্য সম্মুখ করিয়াছেন। ইহা যে তালিকা বাহির হইয়াছে, তাহাতে মুসলমানদিগের কোনও বালিকা-বিদ্যালয়ের নাম দেখা গেল না। কলিকাতার সাধাওয়ার্ড পালস্কুল ও মোহাবাওয়ার্দি বালিকা-স্কুলে পূর্বমেন্টের সাহায্য আছে, কিন্তু এই তালিকায় তাহাদের নাম নাই। অনেক নারী-বিদ্যালয় (কলেজ) বা বালিকা-স্কুলে বার্ষিক সাহায্য ব্যতীত এককালীন সাহায্য ২৫০০ হইতে ৭০০০ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছে।

—নবযুগ।

ফেনীতে কলেজ।—নোয়াখালী-ফেনীতে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব অনেকদিন হইতে চলিতেছিল। এতদিনে সেই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইয়াছে। আগামী ২০শে জুলাই হইতে কলেজ খোলা হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তি

করা হইবে। হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদিগের জন্ত ছাত্রাবাসের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

—ঢাকা গেজেট

জাতীয় কলেজ।—যে-সকল ছাত্র জাতীয় বিদ্যালয়ের আশ্রয় পাইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাদিগের অসুবিধা দূর করিবার জন্ত সম্প্রতি বরিশাল ব্রজমোহন জাতীয় বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তথায় একটি উচ্চাঙ্গের জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

—এডুকেশন গেজেট

বাধ্যতামূলক শিক্ষা।—আসাম-প্রদেশের বালকদিগকে শিক্ষা-লাভে বাধ্য করার চেষ্টা হইতেছে। শুনিতেছি, আসাম ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্ত একটি বিল উপস্থিত করা হইবে। এই বিল অনুসারে কার্য করার নিমিত্ত শিক্ষা-বিভাগের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা প্রদানের এবং বাধ্য-নির্বাহ্যার্থ প্রয়োজন হইলে করত্যাগেরও প্রস্তাব করা হইয়াছে।

—ঢাকা-প্রকাশ

দান ও সদস্যদান—

বাণীভবনে দান—গত ৭ই জুলাই তারিখে বেনবো ক্লাব অভিনয় করিয়া যে টিকিট বিক্রয় করিয়াছিল, তাহা হইতে ঐ ক্লাবের কর্তৃপক্ষ বিদ্যাসাগর বাণীভবনের জন্ত তিন শত টাকা দান করিয়াছেন।

—বন্দেমাতরম্

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সত্যেন্দ্রনাথের দান—বঙ্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের জননী শ্রীযুক্তা মহাশয়া দত্ত মহাশয়া সত্যেন্দ্রনাথের সংগৃহীত লাইব্রেরী, নানা প্রকারের পুস্তক, প্রস্তাবমুদ্রিত প্রত্নতী নানা প্রকারের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের দান করিয়াছেন।

—বন্দেমাতরম্

অল্পত দান—বরিশালের বাবু শবৎকুমার ঘোষ, গত বৎসব তাঁহার সর্বসম্বিত ৭০০ টাকা স্বদেশী কার্যে দান করিয়া চাকরি ত্যাগ করতঃ স্বদেশী কার্যে প্রাথমিক চালিয়া দিয়াছেন। গত ১৮ই জুলাই পার্শ্বী পূণ্যাহ দিনে তাঁহার সহবন্ধিনীও স্বামীৰ অনুকরণে তাঁহার সমস্ত স্বর্ণলঙ্কা—প্রায় ১২০০ টাকা মূল্যের উৎকৃষ্ট জিনিষ এবং তদীয় জাতবধু, ছগাছা অনন্ত, ভিলক স্বরাজ্য-ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

—কাশীপুরনিবাসী

বস্ত্রায় সাহায্য।—হুগলী কংগ্রেস কমিটি চেষ্টায় এ পর্যন্ত দ্বাবকেশব বস্ত্রায় হুগলী ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ মোট ২৪১৮/৯ টাকা চাঁদা আদায় হইয়াছে।

—চুচুড়া বার্তাবহ

সম্প্রতি কলিকাতা জগন্নাথ ঘাটের ইট-ব্যবসায়ীগণ এক সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, দেশের বর্তমান সঙ্কটকালে কেবল পুজার ধ্বংস ব্যতীত ব্যবসায়ী উপলক্ষে যাত্রা প্রভৃতি তামাসার কোনরূপ অর্থ অপব্যয় না করিয়া ব্যবসায়ী ফণ্ডের উত্তম অর্থ তথাকার কংগ্রেসের গঠন-কার্যের জন্য কংগ্রেস-কমিটির হস্তে অর্পণ করিবেন। ইহাদেব দান আনুমানিক হাজার টাকা হইবে। গত বৎসবও ইহা তালক স্বরাজ্য-ভাণ্ডারে দেড়-সহস্রাবিক টাকা অর্পণ করিয়াছেন।

—নীহার

শ্রমিক আশ্রম—বর্তমান আমোলনের কলে কুমিল্লাতে শ্রমিক আশ্রম (House of Labourers) নামে একটি নানাবিধ কল তৈয়ারী করিবার প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। এখান হইতে সম্প্রতি উন্নত প্রণালীর নিয়ন্ত্রণাধীন কল ও তৎসম্পর্কীয় বিবিধ প্রণালীর সব্বত্র তৈয়ারী হইতেছে। কয়েকজন তাকী যুবকের অত্রান্ত চেষ্টা ও অসম্মত উৎসাহে ফলেই এই প্রতিষ্ঠানটি ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এতৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের নামে উল্লেখযোগ্য।

তিনি সমস্ত সমস্ত বিশেষ বিশেষ বস্তুর দ্বারা তাহাদিগকে বিনা স্নেহে অর্ধনাহাধ্য কবির্য প্রতিষ্ঠানটির প্রকৃত সহায়তা কবিতেন।

—ত্রিপুরা-হিতৈষী

নিপীড়িতা বালিকা বধু আনন্দময়ী জন্য সাহায্য সংগ্রহ করা হইতেছে। "দৈনিক বহুমতী"তে সাহায্যের তালিকা ছাপা হইতেছে।

—নবযুগ

পরীক্ষণীয় ব্যবসার পথ—

ইন্সুর মোম।—“অয়েল, পেট এণ্ড ড্রপ বিপোর্টার” পত্রিকার প্রকাশ যে ইন্সুর রস পবিত্রাব করিবার সময় যে গাধ পাওয়া যায় তাহাতে শতকরা দশ ভাগ মোম পাওয়া যায়। এই মোম বেসম্মিনের সাহায্যে বাহিব কবিত হব। প্রথমবারের এই মোম কট্টন এবং দেখিতে হরিদ্রা বর্ণের।

—এডুকেশন পেজেন্ট

আমাদের সমাজ!—

কেরোসিনে আত্মহত্যা।—শ্রীমপুরের নিকটে বৈষ্ণবাট গ্রামে একটি ১৭ বৎসরের বালিকা বধু কেরোসিনে আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, কোন পারিবারিক কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া বধুটি কেবোসিনে কাপড় ভিজাইয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়। তাহার চীৎকার শুনিয়া বাড়ীর লোকেরা দৌড়িয়া যায়, কিন্তু অচিরেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়।

বালিকার আত্মহত্যা।—কাঁদাবীপাড়ার একটি হিন্দু বালিকা বধু বিব খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, তাহার স্বামী দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে বিশেষ আদর যত্ন করিত না। এই মনঃকষ্টেই নাকি বালিকা আত্মহত্যা করিয়া ভববন্ধনা শেষ করিয়াছে। হিন্দু-সমাজে বালিকা ও যুবতীদের মধ্যে এই আত্মহত্যার সংখ্যা বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

—নবযুগ

আবাব বালিকাবধু-নির্ধ্যাতন।—গত মঙ্গলবার সকালে মুটিপাড়া থানার ইন্সপেক্টার হামিদ ২৪ নং বহবাঙ্গার স্ট্রিট হইতে সারথী নারী একটি স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। সাবদা তাহার ১৪ বৎসর বয়স। পূত্রবধু কুমারকুমারীকে প্রহার কবাব অভিযোগে অভিযুক্ত। বধুটি শান্তদীর অনুমতি মা লইয়া বাগের বাড়ী চলিয়া যাওয়ার পর ফিবিয়া আসিলে তাহার শান্তদী লোহা পুড়াইয়া বধুর শরীরের কয়েকটি স্থানে ছেঁকা দিয়াছে। বধুটির হৃদযন্ত্রচলিত চিকিৎসা চলিতেছে।

—২৪ পরগণা বাৰ্ত্তাবহ

ত্যাগী দেশমোহী—

বিশিষ্ট সতীন্দ্রনাথ।—বহুমতীর নিজস্ব সংবাদদাতার পক্ষে প্রকাশ, আজ ৩৫ দিন যাবৎ বরিশাল জেলে সতীন্দ্রনাথের প্রায়োপবেশন চলিতেছে। ১৩ দিন উপবাসের পর তাঁহাকে জোর করিয়া খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু উহা পবিত্যস্ত হইয়াছে। তাঁহার শরীর নাকি খুব দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

বরিশাল জেলে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র রায় ও ধীবেন্দ্র সেন নামক দুইজন বন্দী খেচ্ছাসেবকও নাকি ১০:১২ দিন যাবৎ প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন।

সতীন্দ্রনাথের বৃদ্ধ পিতা শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বরিশাল আসিয়াছেন। জেল-কর্তৃপক্ষ নাকি তাঁহাকে সাক্ষাতের অনুমতি দিতেছে না।

—মানন্যবাজার পত্রিকা, ৩১ আষাঢ়, ১৩২১

কৃতী ও সাহসী বাঙালী—

দীর্ঘ সম্বরণে প্রতিবোধিতা—খড়ম্ব হইতে আহিবীটোলা পর্যন্ত হুগলী নদীর ১৩ মাইল জলপথে সেদিন সাতাবেব এক প্রতিবোধিতা

হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন সম্বরণ ক্রাবেব প্রায় ১৮জন সম্বরণকাবী বেঙ্গা ৩টা ৫ মিনিটের সময় খড়ম্ব হইতে সম্বরণ আরম্ভ করে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাত্র ৮জন সাতার দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীমান আশুতোষ দত্ত নামক এক ১৬ বৎসরের যুবক প্রতিবোধিতার প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আশুতোষ এক ঘণ্টা সাত মিনিটে ১৩ মাইল সাতাব দিয়াছেন। ইহাব ৮ মিনিট পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি পৌছিয়াছিলেন।

—নীহার

বালকের বীরত্ব—বারাসতে একটা কুপ হইতে জল তুলিবার সময় তথাকার অধিকা কৰ্মকারেব পত্নী সেই কুপেব মধ্যে পড়িয়া যান। সেই সময় তথাকার উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান অরোঞ্চল দেব সেই পথ দিয়া গাইতেছিল। বালকটি তাহা দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ কুপের মধ্যে লাফাইয়া পড়ে এবং নিজের জীবন বিপন্ন কবির্য অতি কষ্টে স্ত্রীলোকটিকে অজ্ঞান অবস্থায় জল হইতে তুলিয়া আনিয়াছে।

—নীহার

সেবক

ভারতবর্ষ

হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বৃত্তির ব্যবস্থা—

বোম্বাইএব রায় যুগলকিশোর বিব্লা বাবাণীর হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ৭৫টি বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসারে এই বৃত্তিগুলি প্রদত্ত হইবে।

(১) মাসিক ১৫ টাকা হিসাবে এক ৭৭সরের জন্ম প্রার্থী-দিগকে এই বৃত্তি দেওয়া হইবে।

(২) বৃত্তিধারী যতদিন বৃত্তি ভোগ করিবেন, ততদিন তাঁহাকে কোমার্ধ্য ব্রত পালন ও নিরামিষ ভোজন করিতে হইবে। তাঁহার পক্ষে হর্যাপানও নিষিদ্ধ।

(৩) প্রত্যেক বৃত্তিধারীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে যে, পাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি বধ্যশক্তি স্বদেশ-সেবা করিবেন ও বাবাণী বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করিবেন।

(৪) প্রত্যেক বৃত্তিধারীকে সামুদায় জগবন্দীতা অধ্যয়ন করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে।

(৫) প্রত্যেক বৃত্তিধারী প্রতিশ্রুতি দিবেন যে, তিনি একদিকে যেমন নিজের ধর্মমত বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করিবেন, তেমনি অপব দিকে জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, ব্রাহ্ম, আর্ধ্য-সমাজ প্রভৃতি হিন্দু-সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর প্রতি শ্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিবেন, তিন্ন তিন্ন ধর্মসমাজের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ বর্জন করিয়া শ্রীতি ও জাত্যভাব ছাপনে সচেষ্টি হইবেন, এবং সমগ্র মানবজাতির শান্তি ও কল্যাণের জন্ত বধ্যশক্তি চেষ্টা করিবেন।

(৬) ব্রাহ্মণ বৃত্তিধারীদিগকে অস্ত্রাস্ত্র বিবয়ের সহিত সংস্কৃত অবস্থাই শিক্ষা করিতে হইবে।

(৭) প্রো-ভাইসচ্যান্সেলার অন্তরঙ্গ আদেশ না করিলে বৃত্তি-প্রাপ্ত প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের হোষ্টেলে বাস করিতে হইবে।

(৮) ষাঁহার বয়স ১৮ বৎসরের কম, যিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, স্বস্থদেহ, সবলকায়, সচ্চরিত্র এবং ২০ বৎসর বয়সের পূর্বে বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহেন এরূপ আণ্ডাব-প্রাজুয়েটদিগকে বৃত্তি দেওয়া হইবে।

(২) সিণ্ডিকেটের সভাপতিত্বের যদি কাহারো পাঠোন্নতি সম্ভাব-জনক না হয়, অথবা কাহারো ব্যবহার বা চরিত্র পূর্বোক্ত নিয়মানুযায়ী না হয় তাহা হইলে তাঁহাকে বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইবে।

যুক্ত-বিভাগের গোশালা—

যুক্ত-বিভাগের যন্ত্র বাউলপিণ্ডি, কর্মসী ও পুন্যে গোশালা আছে। এতকাল এই-সব গোশালার ভার ইউরোপীয়ান সৈন্তদের হাতে জন্ম ছিল। ইহাতে খবচ পড়িত বহু টাকা, কুলাটে না পাবিষা গবমেণ্ট এখন ব্যয় কমাইতে চেষ্টা করিতেছেন। স্বতঃ গোশালা-বিভাগে ইংরেজ সৈন্ত নিযুক্ত না কবিষা ভাবতবাসী নিযুক্ত করা স্থির হইয়াছে। ষাঁহাদের কৃষি, গোপালন ও পোচিকিংসা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, ঐ পদলাভের যন্ত্র তাঁহাবাই কেবল আবেদন কবিত্তে পারিবেন। শিক্ষানবীশেরা মাসে বেতন পাইবেন ৬০ টাকা হিসাবে। পবীক্ষার উত্তীর্ণ হইলে কৃতী ছাত্রদিগকে ওভারশিয়ারের পদ দেওয়া হইবে তখন তাঁহাদের বেতন হইবে একশত টাকা। প্রতিবৎসর ১০ টাকা হারে বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া এই বেতন ক্রমে ২৫০ টাকা হইতে পারিবে। ষাঁহা ম্যানেজারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন তাঁহাদের মাহিনা গোড়াতে হইবে ২০০ টাকা, এবং উত্তীর্বে ৫০০ টাকা পর্যন্ত।

রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি ব্যবহার—

রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি জেলে যে প্রকার অত্যাচার চলিতেছে, প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজে তাহার নমুনা পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে অনেক প্রদেশেরই ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনা হইয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক কর্মীদের সম্বন্ধে একটু ভালো ব্যবস্থা করার প্রস্তাবও অনেক ব্যবস্থাপক সভাতেই পবিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদের অবস্থার যে বিশেষ কোনো পবিবর্তন হয় নাই, কর্মীদের নুনের কথায় এবং কোনো কোনো স্থলে পবিদর্শকদের বিপোর্টেই তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে। এই অত্যাচারের বহবও বড় সহজ নহে। নীচে কতকগুলি নমুনা দেওয়া গেল।

শ্রীযুক্ত ভোজরাজ এবং শ্রীযুক্ত ভেবোমল নামক দুইজন রাজনৈতিক কর্মেরী সম্প্রতি ছয় মাস জেল খাটিয়া বোম্বাইএর বিজ্ঞাপন জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। “নিউ টাইমস্” পত্রিকায় তাঁহারা তাহাদের কাবাপাবের অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত কবিয়াছেন। এখানে আমরা তাহাব সংক্ষিপ্ত মন্তব্য উদ্ধৃত কবিয়া দিলাম। “ছয় মাস বরাবর চাকী দেওয়া হইত। আমাদের একজনের ওজন ছয়মাসে ৩৬ পাউন্ড কমিয়া গিয়াছে। রাত্রিতে পায়ে শিকল দেওয়া থাকিত। তাহাতে দুই পায়ের অধিক সবিয়া যাওয়া সম্ভব হইত না। প্রথম দুইমাস একরকম নিয়মিত ভাবেই আমাদেরকে একটা মোটা বেত দিয়া প্রহাষ করা হইত। একবার ভোজরাজ বিনা দোষে ১৮ ঘণ্টা বেত খাইয়াছিলেন। তিনি মুচ্ছিত হইবার পবেও প্রহাষ চলিতে থাকে। দিনের ভিতর পাঁচবার আমাদেরকে উলঙ্গ কবিয়া দেওয়া হইত। একই সময়ে একই পাত্রে একসঙ্গে বহু লোককে মুত্র তাগ করিতে হইত। নিষম ছিল—বেলা দুইটার পব হইতে পরদিন বেলা নবটার পূর্ব পর্যন্ত এই উনিশ ঘণ্টার ভিতর কেহ মলমূত্র তাগ করিতে পারিবে না। ফলে মূত্রবেগ বোধের যন্ত্র অনেক দড়ি বাধিয়া বাধিতে বাধ্য হইত।”

পরলোকগত মনোবজ্ঞান গুহ ঠাকুরতাব পুত্র শ্রীযুক্ত চিত্তবজ্ঞান গুহ ঠাকুরতা হজারিবাগ জেলে আছেন। পুণলিখা কংগ্রেস অফিসের শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দাসগুপ্ত সম্প্রতি উক্ত জেল হইতে বাহির হইয়া

আসিয়া ‘বেহাব হেরাল্ডে’ এক পত্র প্রকাশ কবিয়াছেন। এই পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীযুক্ত চিত্তবজ্ঞান অসহ্যতার যন্ত্র ওজন দশ পাউন্ড কমিয়া গিয়াছেন। এজন্য ইহাব সম্বন্ধে কোনোরূপ বিবেচনা করা দূরের কথা, ইহাকে চারিদিন ‘দাঁড়া’ হাতকড়া লাগানো হইয়াছিল। সকাল হইতে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত হাতকড়া লাগানো থাকিত। কেবল দুপুর বেলায় খাইবার যন্ত্র এই হাতকড়া অল্পক্ষণের যন্ত্র খুলিয়া দেওয়া হইত মাত্র। তাঁহাব শিবোদ্যুত রোগ থাকে সত্ত্বেও তাঁহাকে এইরূপ ভাবে হাতকড়া লাগানো হইয়াছিল।

কানপুরের ‘বর্তমান’ নামক হিন্দী দৈনিক লিখিয়াছেন—“শ্রীযুক্ত কৈলাসনাথ কানপুরের বীর বংশেশেবক। এখন তিনি নাইনী জেলে বন্দী আছেন। জেলের ভিতর তাঁহার পৃষ্ঠে হামেশা বেত্রাঘাত চলিতেছিল, তাঁহাকে ছোব করিয়া ঘানিতে জুড়িয়া দেওয়া হইত। লালস চানানোব কাজেও তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।”

আমাদের তেজপু ব্রজ হইতে যুক্ত কর্মীদের মূণ হইতে সেধানকার জেলের অত্যাচারের বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা জানাইয়াছেন, একদল রাজনৈতিক কর্মেরীকে ঢেঁকিতে ধান ভানিতে দেওয়া হইয়াছে। জেলে মাত্র তিনটি ঢেঁকি আছে, অথচ প্রত্যেক কর্মেরীকে প্রত্যহ একমন কবিয়া ধান ভানিতেই হইবে। শেখ আব্বাস নামক জনৈক রাজনৈতিক কর্মেরী নির্দিষ্ট পবিমাণ ধান ভানিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাকে তিন সপ্তাহ চট পিরিয়া থাকিতে হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি হাতকড়িরও ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীযুক্ত ধানেশ্বর নামক আর-এক ব্যক্তির ঐ অপরাধের যন্ত্র তিনদিনের ‘বেহাই’ কাটিয়া লওয়া হইয়াছিল। স্থানীয় বাগী থিয়েটারের অসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বড়ুয়া ঢেঁকিতে কাজ কবিত্তে গিয়া আঙ্গুলে গুরুতব আঘাত পাইয়াছিলেন।

আসাম ব্যবস্থাপক সভার অন্ততম সদস্য শ্রীযুক্ত ডালিমচন্দ্র বোবা গত ১১ই মে তাবিধে তেজপু জেল পবিদর্শন কবিত্তে গিয়াছিলেন। তিনি জেল-পবিদর্শন-বহিতে লিখিয়া আসিয়াছেন—“আবাসউদ্দিন নামক নতের বৎসব বয়স একজন মুসলমান বালক কর্মেরীকে প্রত্যহ তিন বাজ কবিয়া পাথর ভাঙ্গিতে দেওয়া হইয়াছে। এত অল্পবয়স সাধাবণ কর্মেরীকেও একপ কষ্টকর কার্য করিতে দেওয়া হয় না। তাহাদের যন্ত্র আইনে অল্পপ্রমাণ্য কার্যেই ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ডুমথের বিষয় জেল-কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক কর্মেরীদের বয়স ও বংশমর্যাদা সম্বন্ধেও কোনো পার্থক্য রাখেন না। প্রফুল্লচন্দ্র বড়ুয়া একজন আশুব-প্রাজুমেট। ইহারও বয়স অল্প। ইহাকেও পাথর ভাঙ্গিতে দেওয়া হইয়াছে। চন্দ্রনাথ নামক আর-একজন রাজনৈতিক কর্মেরী পা খোঁড়া। এইরূপ বিকলাঙ্গ ব্যক্তির পক্ষে পাথর ভাঙ্গার ছায়া শ্রমসাধ্য কাজ যে কিরূপ কষ্টকর তাহা সহজেই অনুমেয়। অন্ততঃ দয়া-পরবশ হইয়াও ইহাব যন্ত্র বিশেষ ব্যবস্থা করা জেল-কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল। শ্রীযুক্ত অধিকাচরণ রায় চৌধুরীর বিষয়ে গবমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টিপাত আবশ্যক। তিনি আমাব কাছে অভিযোগ করেন, তাঁহাব পা হইতে মাথা পর্যন্ত মাঝে মাঝে কাঁপে এবং তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করেন। ইহাতে শ্রমসাধ্য কাজ করা সব সময় তাঁহাব পক্ষে সম্ভবপব হইয়া ওঠে না। গোহাটী জেলে অবস্থান কালে তাঁহাব চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু ডেরাএর সিভিল সার্জন বলেন যে, ইহা তাহার বদমায়েসী—বলে চিকিৎসা বন্ধ হইয়াছে। আমি দেখিলাম তাঁহাব দেহের ওজন ক্রমেই কমিয়া বাইতেছে।”

“টাইমস্ অব আসাম” পত্রিকা বলিতেছেন—শ্রীযুক্ত ডালিমচন্দ্র বেড়া তেজপুবে বেসবকারী জেল-পরিদর্শক ছিলেন। তাঁহার এই পরিদর্শনের ক্ষমতা গবমেণ্ট নাকচ কবিয়া দিয়াছেন। বেড়া মহাশয়

ভৈরবপুর জেলখানা পরিদর্শন করিয়া পরিদর্শনের খাতার যে মন্তব্য করিয়াছিলেন ইহা সম্ভবতঃ তাহারই দণ্ড। একথা সত্য হইলে ইহা যে আরো অপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত মালবীর সম্প্রতি জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছেন—“তাহাকে একদিন কুয়ার ভিতর মাথা নীচে ও পা উপরে করিয়া ঝুলাইয়া বাঁধা হইয়াছিল।”

‘মাদারল্যাণ্ড’ পত্রিকা শ্রীযুক্ত জগৎনারায়ণ, এম-এ, এল-এল-বির সম্বন্ধে বলিয়াছেন—“ছয়মাস জেল পাটিয়া তাহাব স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। জেলে তাহাব প্রতি নৃশংস ব্যবহার করা হইয়াছে।”

বাংলাব বনিশালেব জেলেও বাজনৈতিক কর্মীদের উপর ভীষণ অত্যাচার চলিতেছে বলিয়া নানা সংবাদপত্রে প্রকাশ। এক্ষত অন্তঃপুরিকাদের ভিতবেও বিধম উদ্বেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার পথে বাহির হইয়া, কলেজের দ্বারে দাঁড়াইয়া ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন।

যে কোনো অবস্থাতেই হোক, মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার বর্ষণতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। হতরাং কোনো অবস্থাতেই তাহা সমর্থনের যোগ্য নহে।

রামরক্ষার মৃত্যু—

কলিকাতার হিন্দী দৈনিক ‘ভারতমিত্র’ লিখিয়াছিলেন—পণ্ডিত রামরক্ষা নামক জনৈক ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করার অপরাধে আন্দামানে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। তাহাব যজ্ঞোপবীতও জোর কবিতা কাড়িয়া লওয়া হয়। কলে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ২১ দিন অনশনে থাকিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। সম্প্রতি ভারত গবর্নমেন্ট এই সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করিয়া এক কমিউনিকে প্রচার করিয়াছেন। স্বকাবে জানাইয়াছেন, রামপ্রকাশ—রামরক্ষা নহে—অন্থে মাঝা গিয়াছেন। রোগের প্রকৃতি সম্বন্ধে কমিউনিকেতে কোন কথাই উল্লেখ করা হয় নাই। কমিউনিকের উত্তর স্বরূপ ‘ভারতমিত্র’ গবর্নমেন্টকে নিম্নলিখিত চারিটি প্রশ্ন করিয়াছেন।

(১) রামরক্ষা নামে কোনো ব্রাহ্মণ ষড়যন্ত্র সাম্রাজ্য আন্দামানে নির্বাসিত হইয়াছিলেন কি না?

(২) কালাপানিতে পৌঁছিবামাত্র তাহাব যজ্ঞোপবীত ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল কি না?

(৩) যজ্ঞোপবীত ফেলিয়া দেওয়ার পূর্বে রামরক্ষা অনশন-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না?

(৪) দীর্ঘকালব্যাপী যেচ্ছাকৃত অনশনের ফলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন কি না?

ধামা চাপা দেওয়ার বার্ষ চেষ্টা না করিয়া এই প্রশ্নগুলির সত্য এবং নির্ভীক উত্তর দেওয়া গবর্নমেন্টের দরকার। চুনকামের বাহ্যিকের অন্তঃপন্থের কমিউনিকেগুলি হইতে সত্যের সহজ মুষ্টিটি সহজে ধরা পড়ে না। এইজন্য গবর্নমেন্টের কমিউনিকেগুলির উপরে বাহিরের লোকের আস্থা ক্রমেই কমিয়া বাইতেছে।

স্যাণ্ড হাউসে ভারতবাসী—

চারিজন ভারতীয় যুবক স্যাণ্ড হাউসের রাজকীয় সামগ্রিক বিদ্যালয়ে ছাত্ররূপে গৃহীত হইয়াছেন। তাহাদের নাম হইতেছে—(১) তরুণীপ সিংহ, ইনি পবলোকপত রিশালবার-মেজর সর্দার বাহাদুর রায় সিংহের পুত্র, (২) আশুপুত্র আলি, ইনি অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনার এম্. আজিজুদ্দিনের পুত্র; (৩) বলরাম সিংহ, ইনি গুজরানের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট তারা সিংহের পুত্র; (৪) শেখ মকবুল হোসেন, ইনি

মুলতানের অনারারি এসিস্ট্যান্ট কমিশনার খাঁ বাহাদুর সেখ বিরাজ হোসেনের পুত্র। এ ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি এই যে, মাজাজ, বোম্বাই, মহাভারত, উড়িষ্যা, বিহার, বাংলা, আসাম, এবং আশ্রী-অমোঘ্যর একজন যুবকও স্যাণ্ড হাউসের ছাত্ররূপে পরিগৃহীত হন নাই। অথচ এ সম্বন্ধে যে আইন-কানুন আছে তাহাতে এই-সব প্রদেশের লোকদের প্রবেশের কোনরূপ বাধা আছে বলিয়াও আমাদের জানা নাই।

সাদা ও কালো—

মাজাজের মহিলা কর্মী শ্রমতী দুবরাম সাবাস্ত্রা এক বৎসরের জন্ত সশ্রম কাবান্দে দণ্ডিত হইয়াছেন। প্রকাশ, মাজাজের ‘ল এণ্ড অর্ডার’ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ কন্ট্রোলারের সদস্য শ্রীযুক্ত কে, ঐনিবাস আয়াজার এই মহিলা কর্মীদেরকে মুক্তি দিবার হুকুম দিয়া ছিলেন। কিন্তু গোদাবরীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ব্র্যাকেন তাহা হইলে পদত্যাগ করিবেন বলিয়া ভয় দেখানোতে এই আদেশ কার্যে পরিণত করা হয় নাই। দেশী লোক যত বড়ই হোক না কেন তাহার দোড় ঐ রসজিৎ পর্যন্ত। তাহার মত ততক্ষণই বড় যতক্ষণ পর্যন্ত সাদার সহিত সে মতের সংঘর্ষ না বাধে। সাদা ছোটই হোক এবং বড়ই হোক, সে যে যে-কোনো কালোর অপেক্ষা বড়, এ বুদ্ধি ভাবতে থাকিয়া আজও যাহার জন্মায় নাই তাহার দৃষ্টির দোষ আছে একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

দেশী রাজ্যে মদ বর্জন—

কাঠিয়াবাদের অন্তর্গতঃ লিখড়ি রাজ্যে দেশী মদেব বিরুদ্ধে সম্প্রতি এক আইন প্রবর্তিত করা হইয়াছে। এই আইন অনুসারে এই রাজ্যে কেহ দেশী মদ আমদানি করিতে বা রাখিতে পারিবে না। যদি কেহ এই নিয়ম ভঙ্গ করে তাহা হইলে তাহার কর্তার দণ্ড হইবে। নিয়মভঙ্গকারীকে যে ধরাইয়া দিবে সে তাহার অর্থদণ্ডের এক-চতুর্থাংশ পুরস্কার পাইবে। কেবল মাত্র দেশী মদের বিরুদ্ধেই লিখড়ি রাজ্য এই যুদ্ধ ঘোষণা কবিলেন কেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। দেশী মদেই কেবল যে লোককে মাতাল, যতিহীন করিয়া তোলে তাহা নহে, ও গুণটি বিলাতি মদের ভিতবেও পুরা মাজাতেই আছে। হতরাং সঙ্গে সঙ্গে বিলাতি মদের নির্বাসনের ব্যবস্থাটাও করা উচিত ছিল।

মৌলবী মজহরুল হকের কারাদণ্ড—

পাটনাব ‘মাদারল্যাণ্ড’ পত্রিকার সম্পাদক মৌলবী মজহরুল হক সাহেবের বিরুদ্ধে পাটনাব সদর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে বিহাব-উদ্ভাব ইন্সপেক্টর জেনারেল মানহানিবে এক মামলা দাবের কবিতা ছিলেন। গত ২৬শে জুলাই সে মামলা শেষ হইয়া গিয়াছে। জেলে মুসলমান ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করা সম্বন্ধে মাদাবল্যাণ্ড পত্রিকার ইনি এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। মাদাবল্যাণ্ড পত্রিকা উঠিয়া গেলেও তাহা সেই প্রবন্ধের জের চালাইয়াছিল। অবশেষে মৌলবী হকের দণ্ডাজ্ঞার তাহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট মৌলবী হককে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া এক হাজার টাকা জরিমানা করিয়াছিলেন। টাকা না দিলে তিন মাস শ্রমহীন কারাবাসের হুকুম দেওয়া হইয়াছিল। মৌলবী সাহেব অসহযোগ নীতি অবলম্বন করিয়া ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। হতরাং বলা বাহুল্য তিনি জরিমানা দেন নাই—জেলাকেই বরণ করিয়া লইয়াছেন। প্রেস আইন উঠাইয়া দেওয়ার স্বরূপটা যে কি এই ব্যাপারগুলিই তাহার নমুনা।

বাবা গুরুদিং সিংহের নির্দাসন—

‘কোমাপাতা মার’ জাহাজেব হাঙ্গামা সম্পর্কে শিখ বাবা গুরুদিং সিংহ রাজদ্রোহ অভিযোগে আসামী হইয়াছিলেন। অমৃতসরের ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত অমর রায়ের এজলাসে ইঁহাব বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। এক লিখিত এজ্রাহারে ইনি সহযোগীদিগকে এবং ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগকে ‘কোমাপাতা মার’ এবং বজ্রবজ্র কাণ্ডেব সভ্যতা নির্ণয়েব জন্য বিশেষ তদন্তের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। বিচারক বাবা গুরুদিং সিংহের প্রতি পাঁচ বৎসরের জন্য নির্দাসন দণ্ড বিধান করিয়াছেন। ‘কোমাপাতা মার’ এবং বজ্র-বজ্র কাণ্ড সম্বন্ধে জনশ্রুতি অনেক বকস। সুতরাং এই দুইটি ব্যাপার সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়াব প্রয়োজন আছে ইহাই আনাদের পিতাস।

গণ্টুরে সভা বন্ধ—

দেশের বর্তমান অবস্থায় নিরপেক্ষভাবে আইন ভঙ্গ করা সঙ্গত কি না তাহাই নির্ণয়ের জন্য কংগ্রেস ও খেলাফত সমিতি অনুসন্ধান-কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। সেই কমিটি ভারতবর্ষেব ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ঘুরিয়া দেশেব অবস্থা সম্বন্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছেন। গত ৩১শে জুলাই এরোজ হইতে কমিটি মাজাফ জায়া করেন। সেখান হইতে সেই দিনই তাঁহাবা গণ্টুরে গমন করিয়াছিলেন। কমিটিব পরিদর্শন উপলক্ষে সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ দিয়াছেন—কমিটির আগমন উপলক্ষে এখানে অস্ত্র স্থান হইতে কংগ্রেস ও খেলাফত-কর্মীরা আসিতেছেন, শাস্তি-সেনাব আমদানি হইতেছে, কিন্তু ইহাতে এখানকার শান্তি ভঙ্গ হইতে পারে। সুতরাং ৩১শে জুলাই হইতে এই আগষ্ট পর্যন্ত এখানে কোন রকম মিছিল বা সভা-সমিতি হইতে পারিবে না।

ভারতবর্ষে শান্তিটা বড় ঠুনকো জিনিষ।

জেলের ভাষা—

মোলানা মহম্মদ আলি বর্তমানে বিজাপুর জেলে আবদ্ধ আছেন। তাঁহাব মাতা এবং পত্নী উভয়েই তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য যাইতেছিলেন। কিন্তু বিজাপুর জেলের কর্তৃপক্ষ বলিয়াছেন—ইংবেজী ভাষা ছাড়া মোলানা মহম্মদ আলির সহিত আর কোনো ভাষার কথা বলিতে দেওয়া হইবে না। ফলে মাতা এবং পত্নী উভয়েই সর্দাহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। টীকা অনাবশ্যক।

গরহাজিরার শাস্তি—

বোম্বাই প্রদেশেব গবর্ণর স্যার জর্জ লয়েড কিছুদিন পূর্বে কাঠমা-বাড় পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। সে সময় তাঁহাকে সেলাম করিবার জন্য সে অঞ্চলের সকল জমিদার এবং তালুকদারই লাঠি-দরবারে আসিয়া হাজির হইয়াছিলেন, কেবল হাজিরা দেন নাই কবাচীর তালুকদার ঠাকুর গোপালদাস অম্বাহিদাস দেশাই। এই অনুপস্থিতির জন্য তাঁহাব কৈফিয়ত তলব করা হইয়াছিল এবং তাঁহাকে ফমা প্রার্থনা করিতেও বলা হইয়াছিল। কিন্তু এই তেজস্বী তালুকদার ফমা প্রার্থনা করিতেও রাজি হন নাই, অসহযোগ আন্দোলন পন্থাভাগ করিতেও অস্বীকৃত হইয়াছেন। ফলে বোম্বাই গবর্ণমেন্ট দেশাই মহাশয়ের দুই-খানি তালুক বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছেন। বিদেশীর কাছে আজ এইরূপ ভাবে অকারণে লাঞ্চিত হইয়া স্বদেশবাসীভূত জমদ দেশাই মহাশয় ভ্রম করিয়া লইয়াছেন। দেশবাসীগণ এজন্য বিরাট সভা করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে।

রাজনৈতিক আসামী—

শ্রীযুক্ত ধর্মবীর কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েব পোষ্ট-গ্রাজুয়েট স্কলার

এবং কাশীবিদ্যাপীঠের গণিতশাস্ত্রেব অধ্যাপক। ইনি সম্ভ্রতি কোজদারী সংশোধিত আইনের ১৭(২) ধারা অনুসারে গৃহ হইয়া-ছিলেন। অপরাধ—কংগ্রেসের জন্য ভলান্টিয়ার ভর্তি করা। অস্বামী জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত জালাপ্রসাদের বিচারে ইঁহাব ছয় মাস বিনাপ্রশ্নে কাবাবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। এলাহাবাদের লীডার সংবাদ দিয়াছেন—বিচারের সময় ইঁহাকে প্রতিদিন হাতে হাতকড়া এবং কোমরে দড়া বাধিয়া হাজত হইতে আদালতে হাজির করা হইত। থানাদার নাকি নিজ ব্যয়ে একার ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু পণ্ডিত ধর্মবীর থানাদারের ব্যয়ে একা ব্যবহার করিতে সম্মত হন নাই।

আনাদের বিশ্বাস, বাজদ্রোহন্যচক হাজাব বক্তৃত্যেও গবর্ণমেন্টেব বিরুদ্ধে জনসাধিবর্ষেব মনে যে বিদ্বেষেব সৃষ্টি না হয়, সাধাবশেষে একা-ভাজন ব্যক্তিব উপর এইসব জুলুম ও অত্যাচারেব দ্বারা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বিদ্বেষেব সৃষ্টি হয়।

কয়েদীর মুক্তি—

কারাগারের ব্যবস্থাব অত্যধিক রকমে বাড়িয়া উঠায় যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণমেন্ট সম্ভ্রতি ৫০০০ বন্দীকে মুক্তিদান করিষাছেন। এরূপ ব্যবস্থা যুক্তপ্রদেশে নাকি এই নতুন নহে—আবো দুই-এক বার এইরূপ ভাবে বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এমন ধারা ব্যয়-সঙ্কোচের কথা বিশেষ শোনা যায় না। সুতরাং এই নতুন পথ গ্রহণেব জন্য যুক্তপ্রদেশেব গবর্ণমেন্ট ধন্যবাদেব পাত্র। এই ব্যবস্থাব হেতু নির্দেশ করিতে গিয়া গবর্ণমেন্ট বলিয়াছেন—মনেক স্থলে আদালতসমূহ অর্থদণ্ডের পবিত্রতাকে অঙ্গদিনেব জন্য কাবা-দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, একপ স্থলে কতকগুলি লোককে কারাগারে রাখা বিশেষ কোন লাভ দেখা যায় না—কেবল মাত্র ব্যয়-বাহুল্য ঘটে। সেইজন্য কাবাক্ষেপ ভোগেব যাহাদের অল্পদিন মাত্র বাকী আছে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

এদেশে কারাগারেব আবহাওয়া বেকাপ তাহাতে সেখানে প্রতি-মুহুর্তে নৈতিক অধঃপতনই ঘটে। সুতরাং সে আবহাওয়া হইতে যাহাদিগকে দূরে রাখা সম্ভব তাহাদিগকে দূরে রাখাই সঙ্গত। এইজন্য আমরা তরুণ অপরাধীদের কাবাসুস্তির পক্ষপাতী।

জাতীয় শিক্ষা দান—

মন্ত্রকবনপরের শেঠ বিহারী লাল জাতীয় শিক্ষা ও শিল্প শিক্ষার উন্নতিব জন্য একলক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করিয়াছেন। পণ্ডিত নরনমোহন মালবীর, হাকিম আজমল খাঁ, ডাক্তার আনসারী ও আবো কয়েকজনকে টাকি নিযুক্ত করিয়া এই সম্পত্তিভার তাঁহাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কি ভাবে এই অর্থ ব্যয় করা হইবে তাহাবাই তাহাব ব্যবস্থা স্থির করিয়া দিবেন।

বালক মজুরের আইন—

ভারত গবর্ণমেন্ট আইন পাশ করিয়াছেন, ১২ বৎসরের কম বয়স্ক বালকদিগকে বন্দনের মাল বহন বা নাড়াচাড়া কাজে নিযুক্ত করা হইবে না। ভারতের দারিদ্র্য যেকপ ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে বালকদিগকে নানাকপ ভ্রমসাধ্য কাজে আশ্বিনিয়োগ করিতে হইতেছে। বাহা তাহারা পারে না, বাহা তাহাদের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা উভয় দিক হইতেই অপকারী, তাহাও তাহাদিগকে অনেক সময় করিতে হয়। এজন্য জাতিব ক্ষতি নিতান্ত কম হইতেছে না। সুতরাং এইসব ক্ষতি বাহাতে না হয়, আইন করিয়াই তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে এরূপ ব্যবস্থাও করা দ্ব্যকার বাহাতে উপযোগী,

বাগের অভাবে বালকদিগকে বসিয়া থাকিতে না হয়। এই দরিদ্র দেশে কি বালক কি বৃদ্ধ, বসিয়া থাকিবার অবসর কাহারো নাই—অধিকাবণ্ড কাহারো নাই। সুতরাং কতকগুলি কাজ আইন করিয়াই বালকদের জন্ত আশ্রয় করিয়া রাখা দরকার।

পার্শ্বের বদান্যতা—

অনেক দরিদ্র পার্শ্ব-পরিবার অর্থেব অভাবে অস্বাস্থ্যকর নোয়া স্থানে বাস করিতে বাধ্য হন এবং সেজন্য নানা রকমের ব্যাধি পীড়িতে কষ্ট পান। তাঁহারা যাহাতে অল্প ভাড়ায় ভাল ঘরে বাস করিতে পারেন সেজন্য করাচীর পার্শ্ব অল্পমান নামক পঞ্চায়েৎ ১২খানি বাড়ী নির্মাণের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ আর্দাণের এইচ. নামা করাচীর একজন ধনশালী পার্শ্ব। তিনি ৭৫,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া একখানি বড় ও সুন্দর বাড়ী নির্মাণ করিয়া অল্পমানের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। মিঃ নামা দানশীলতার জন্য বিখ্যাত, এপর্যন্ত তিনি নানা সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য তিন লক্ষ টাকার উপরে দান করিয়াছেন। গৃহসমস্তা বাঙালী দরিদ্র ভ্রাতৃলোকদের পক্ষেও বড় সহজ সমস্তা নহে। আর সব সম্প্রদায়ের ভিতরেই একিকে নজর দিবার মত মহাপ্রভাব ব্যক্তি ছই-চারিজন মিলেই। কিন্তু বাঙালীদের ভিতর একরূপ একজন লোকেরও সন্ধান এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই, ইহা বড়ই লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়।

ট্রেন-চুর্ঘটনা

বিহার চম্পারণেব অন্তর্গত রান্ধউল ষ্টেশনের কাছে গত ২৩শে জুন একটি ভীষণ চুর্ঘটনা ঘটয়া গিয়াছে। অথচ এই ঘটনাটি সম্বন্ধে জন-সাধারণ এতদিন বিশেষ কিছুই জানিতে পাবে নাই। ঘটনাটির বিবরণ এখানে প্রকাশিত হইল। ইহার গুরুত্ব যে কতখানি তাহা এই বিবরণ হইতেই বোঝা যাইবে। ঘটনাব দিন রাত্রি ১০টা হইতে

১১টার ভিতর ২৬ নং ডাউন ট্রেন ভেবরা ষ্টেশন পরিত্যাগ করে। তখন বৃষ্টি হইতেছিল। ট্রেনখানি একখানি ‘মিস্ত্রি’ ট্রেন; ইহাতে যাত্রীগাড়ী ছিল, ডাকপাড়ী ছিল, আবার মালগাড়ীও ছিল। ট্রেনখানি একটি সেতুব উপর দিয়া যাইবার সময় হঠাৎ একস্থানের জোড়া ফাটয়া যায়। ফলে কয়েকখানি গাড়ী পিছনে পড়িয়া থাকে। ট্রেনের যে অংশটি পিছে পড়িয়া ছিল তাহার আবার কতক অংশ ছিল সেতুর উপরে, আর কতকটা ছিল সেতুব বাহিরে। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর সেতুটি ভাঙিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে সাতখানা যাত্রীপূর্ণ গাড়ী সলিল-সমাধি লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই সম্বন্ধে সম্ভ্রান্তি একখানি পত্র সংবাদপত্রের দরুণে পেশ করিয়াছেন। তাহা হইতেই অবস্থার এই পরিচয়টা পাওয়া গিয়াছে। তাহার পক্ষে প্রকাশ, এই চুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী একজন ভুক্তভোগী উচপদস্থ সরকারী কর্মচারী হিসাব দিয়াছেন, লোক মাঝা গিয়াছে অনুন-ছই শত। যাহারা রক্ষা পাইয়াছিল তাহাও ১৭ ঘণ্টাকাল কোনো রকম সাহায্য পায় নাই। পরের দিন সমস্তা হয়টার একখানা ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও লোকদিগকে সাহায্য কবিবার জন্য নহে, ডাক লইবার জন্য। যাত্রীরাই বিশেষ চেষ্টা করিয়া তিনজন স্ত্রীলোক এবং একজন পুত্রকে জল হইতে তুলিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় হইতেছে—রেল-কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন, একজন লোকও মরে নাই, সকলেই রক্ষা পাইয়াছে। আমবা বিহার গবর্নমেন্টকে এ সম্বন্ধে সত্য নির্ণয়ের জন্য অনুরোধ করিতেছি। ক্ষতি-পূরণের ভয়ে যদি আত্মীয়-স্বজন পুত্রকন্যা-পরিবারের নিকট মৃত্যুর খবরটাও গোপন করা হয় তবে তাহার মত অসামুখিক ও অস্বাভাবিক ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে না।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন

কার্যের প্রারম্ভ

যাহাব নামের সহিত এই আশ্রমেব নাম জড়িত সেই প্রাচীনশ্রমণীয় মহাপুরুষ দীক্ষরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণের দিনে সিদ্ধিদাতার আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া আমরা কার্য্যারম্ভ করিতেছি।

আজকার দিনে বাংলা দেশের এমন অবস্থা যে যে-কোন সংউদ্দেশ্য লইয়াই শিক্ষাকার্য্যে নামা চলে। বোন এক রকম শিক্ষার আমাদের আর-দরকার নাই, আর-এক নূতন রকম শিক্ষা না হইলে এখন আর চলিবে না, এসমস্ত কথা বলা আমাদের শোভা পায় না। আমরা দরিদ্র ভিক্ষকের অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, এক মুঠা ভিক্ষা পাইলেই পরম ভাগ্য বলিয়া

গণিব; চাল আতপ কি সিদ্ধ, ছাটা কি আছাটা কান্দাল গরীব তাহা দেখিতে যায় না। শিক্ষার আমাদের দরকার—এইটাই হচ্ছে সকলের চেয়ে বড় কথা। মেয়েদের ত আরোই দরকার, কারণ শিক্ষার সহিত সম্পর্ক তাঁহাদের নাই বলিলেই চলে।

আজকাল চারিদিকে যে ছই চারিটি বালিকা-বিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সকল বালিকার শিক্ষা দীক্ষা হওয়া যে সম্ভব নয় তাহা ত সকলেই জানেন। সুতরাং বয়স্কদের স্থান যে এখানে নাই তাহা ত বলাই বাহুল্য। অথচ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে অল্প বয়সে তাঁহাদের অধিকাংশেরই শিক্ষালাভের কোন

স্বয়ংগ হয় নাই; কিন্তু সংসারচক্রের আবর্তনে পড়িয়া তাঁহারা পদে পদে এই অভাব অনুভব করিতেছেন। যাহাদের অর্থ-সামর্থ্যের অভাব নাই, স্বামী পিতা সকলেই বর্তমান, তাঁহারাও শিক্ষার মূল্য বুঝিয়া অনেক স্থলে পরিণত বয়সে পাঠচর্চা স্বীকৃত করিতে চান। আর যাহাদের সংসারে অন্ন সংস্থান নাই কিন্তু ক্ষুধিতের কান্না আছে, আশ্রয় নাই কিন্তু অসহায় শিশু-সন্তান আছে, তাঁহারা যে এ অভাব অনুভব করিবেন তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে? অল্পবয়সে বিবাহিত হইয়া হিন্দুবালিকা স্বামীর সংসারে যান। যখন বিবাহ হয় তখন অনেক স্বামীও বালক মাত্র। ভবিষ্যতে অন্ন কোন্ সংস্থান তিনি করিতে পারিবেন কি না জানিবার আগেই তাঁহার সংসার পাতান হইয়া যায়। শিক্ষা সমাপ্ত হইবার আগেই তাঁহার মাধ্যম জ্ঞী পুত্র কন্যা বিধবা মাতা ভগ্নী প্রভৃতি ৬-৭ এমন কি দশ বারো জনের ভারও চাপিয়া বসে। এমন অবস্থায় শিক্ষাতেও মন বসে না, ভাল কাজ কি অর্থকরী ব্যবসায়ের আশায় বসিয়া থাকা চলে না। হাতের কাছে যাহা জোটে তাহাই অবলম্বন করিয়া দুটি মোটা ভাত কাপড় জোটানই হইয়া উঠে তখন জীবনের একমাত্র সমস্যা। এই হাতের কাছে পাওয়া তৃণমুষ্টিতে অন্নসমস্যা মিটে না, অথচ তাহা ছাড়িয়া অধিকতর লাভবান কিছু ব্যবসায় বাণিজ্য ফাঁদিবার ভরসা এত বড় সংসার কেলিয়া করা চলে না। কাজেই জীবন-মরণের এই সন্ধিক্ষেত্রে “হা অন্ন হা অন্ন” করিয়াই তাহাদের চিরদিন কাটে। এমন দৃশ্য ত বাংলার ঘরে ঘরে। যাহাদের দুই বেলা পেট ভরিয়া অন্ন জোটে না শীতে শতছিন্ন পুরাতন বাল্যপোশকের উপরে নতুন একখানা কিনিবার সামর্থ্য নাই, ব্যাধি কবলে পড়িতেও তাহাদের দেয়ী হয় না; কারণ দেহ পোষণের জন্য গ্রহণ করে যতটুকু, অর্থচিন্তার আর দুর্ভাবনায় ক্ষয় করে তার চেয়ে অনেক বেশী। তার উপর জীবনব্যাপী নিবানন্দ দেহ মন এমনই অবসন্ন করিয়া রাখে যে ক্ষীণ প্রাণ লইয়া ছরস্তু কেন সামান্য ব্যাধি সঙ্গ্রেও যুদ্ধ করা অসম্ভব

হইয়া উঠে। কাজেই সংসারের মাথা ভাঙিয়া পড়িতে বিলম্ব হয় না; তৃণমুষ্টি যাহাদের সম্বল ছিল ধূলিমুষ্টি তাহাদের সম্বল হয়। তখন সেইসব অশিক্ষিত বালিকা বধূর চক্ষে সংসার যে কি মূর্খিতে দাঁড়ায় তাহা তাঁহারাই জানেন। মনে হয় এ অনন্ত দুঃখের সাগরে ডুবিয়া মরা ছাড়া আর হইবার বুঝি আর কোনো উপায় নাই।

এই-সব সংসারের মেঘেরা বিশেষতঃ আশ্রিতা বিধবারা যদি নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের একটা ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, সংসারে দুই পয়সা সাহায্য করিতে পারিতেন, তাহা হইলে সংসার তাঁহাদের চক্ষে এমন অন্ধকার ঠেকিত না, সংসারে তাঁহারা একটা প্রতিষ্ঠা পাইতেন, আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য করিয়া বহু দুঃখেও একটু আনন্দের সন্ধান পাইতেন। সংসারে মেয়েবা যদি দুপয়সা আনিয়া কিছুদিনের ভরণপোষণের ব্যবস্থা কবিতেন পারিতেন তাহা হইলে পুরুষকেও এমন নিরুপায়ভাবে যখন যাহা জোটে তাহাই আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে হইত না। যে মেয়েদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াইবার ক্ষমতা আছে তাহাদের স্বখে রাখিবার ভাবনা মাথায় নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিতে পারে, এবং দেখিয়া শুনিয়া একটা সুব্যবস্থা কবিতেন পারে। কাজেই দেখা যাইতেছে প্রাপ্তবয়স্ক রমণী মাত্রই যদি কিছু অর্থকরী বিদ্যা জানিতেন, তাহা হইলে সংসারের দুঃখ অন্তত অর্ধেক কমিয়া যাইত। বিধবাদের পক্ষে এই প্রকার শিক্ষার আর-একটা দরকার এই যে পরে সংসারে উপার্জনক্ষম হইয়া আত্মসম্মান রক্ষা করা তাঁহাদের নিতান্ত প্রয়োজন।

এই ত গেল অন্নসমস্যার কথা। এ প্রত্যেকের ঘরের কথা। ইহা ছাড়া আরও অনেক ভাবিবার কথা আছে। এই যে শিক্ষা-বিস্তারের কথা আমরা বলিতেছি ইহা ত আপনি বিস্তৃত হইতে পারে না; এই কার্যের ভাব লইবার জন্যও তাহা মাথায় দরকার। আমাদের ঘরে ঘরে বিধবা, স্বামীপরিত্যক্তা প্রভৃতি কত দুঃখিনী মেয়ের মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে তাহা ত কেবল অকাজে কি বিনা কাজে অপচয়ই হয়;

একটু শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে এই-সমস্ত মিলিত শক্তিতে ত দেশে যুগান্তর আনিতে পারিত। শিক্ষা স্বাস্থ্যবক্ষা শিশুপালন দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষনিবারণ প্রভৃতি কত কাজের জন্য দেশে কর্মীর প্রয়োজন, কিন্তু করে কে? এই-সব মেয়েদেব যদি আমরা গড়িয়া তুলিতে পারি তবে কি অন্তত অর্ধেক অভাবও দূর হয় না? মনে করিবেন না, এই-সব বাহিরের কাজে মেয়েরা কিছু করিতে পারিবেন না। প্রথমতঃ শিক্ষা-বিস্তার, বোণীর সেবা, শিশুর পালন, ধাত্রীবিদ্যা—এ-সব ত মেয়েদেরই কাজ; তা ছাড়া যা-কিছু পুরুষের কাজ বলিয়া মনে করা যায় তাহাও মেয়েদের পক্ষে করা অসম্ভব নয়। পাশ্চাত্য দেশের মেয়েরা ত সকল কাজই করিতেছেন। সমাজ-রক্ষার জন্য যে-সব সংকল্পের প্রয়োজন তাহা ত অনেক জায়গায় মেয়েদের একচেটিয়া। বাহিরের নিত্যন্ত পুরুষোচিত কাজও যে তাঁহারা কেমন করিয়াছেন তাহা বিগত মহাযুদ্ধের কথা যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারা ইহা জানেন। দেশে কাজ করিবার জন্য বৃদ্ধ ও শিশু ভিন্ন একটি পুরুষ ছিল না বলিলেই চলে। এত বড় বড় দেশের এত কাজ কে করিল? গৃহ সংসার সমাজ আপিস আদালত কল কারখানা হাঁসপাতাল বিদ্যালয় যান বাহন বজায় রাখিল কে? মেয়েরাই ত সব করিয়াছেন। তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে রোগীর সেবা করিয়াছেন, আবার ঘর হইতে বোঁদ্ধাদের মাল মসলা খাদ্য পানীয় পোষাক-পরিচ্ছদ জোগাইয়াছেন। তাহার উপর ট্রাম মোটর চালাইয়াছেন, পুলিশের কাজ করিয়া শাস্তিরক্ষা করিয়াছেন, টেলিগ্রাফ টেলিফোন প্রভৃতিব কাজ করিয়াছেন, আপিস আদালত করিয়াছেন, ঘরসংসার করিয়াছেন, এক কথায় সংসারটা তাঁহারা ইহা আগাগোড়া চালাইয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য সংসার সমাজ যে কতখানি জটিল তাহা যিনি জানেন তিনি মেয়েদের কোনো ক্ষমতায় কখনও অবিশ্বাস করিবেন না। সমগ্র দেশকে শুধু মেয়েরা যদি বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন তবে আমাদের দেশের মেয়েদের কাছে দেশ কিছু আশা করিবেন না কেন? দেশেব নানা জনহিতকর কার্যে আমাদের

মেয়েদেবও গড়িয়া তুলিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশে এই-সব কাজ কুমারী মেয়েরাই করেন, কারণ তাঁহারা বিবাহিত জীবন আরম্ভ করিবার আগেই কার্যক্ষম হইয়া উঠেন, অনেকে বিবাহ করেনই না। আমাদের মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ হয় বলিয়া লোকের অভাব হইবে না, ব্যাধি ও জরা ধরে ঘরে এত বিধবার সৃষ্টি করিয়াছে যে তাঁহাদের দ্বারাই সমস্ত দেশের সেবা করাইয়া লওয়া যায়।

যাঁহাদের আমরা গড়িয়া তুলিতে চাই তাঁহাদের শুধু শিক্ষা দিলে ত হইবে না, আশ্রয়ও দিতে হইবে। আমরা যাঁহাদের উপার্জনক্ষম করিয়া তুলিতে চাই, তাঁহাদের অর্থ দিয়া শিক্ষা লইবার সামর্থ্য অনেকেরই নাই, এক্ষেত্রে শিক্ষা-ব্যয় গ্রহণ না করিয়া দেওয়াই উচিত। আমরা সেই রকম ব্যবস্থা করিতেছি। মেয়েদের এই অস্থানে মেয়েদের মঙ্গলাকাজক্ষী ভগিনীদের অর্থ সামর্থ্য ও শুভ ইচ্ছাই আমাদের প্রধান সম্বল। মানুষ আত্মীয়ের দুঃখ যেমন বুঝে পরের দুঃখ কি তেমন বুঝে? তাই মেয়েদের কাছেই আমরা মেয়েদের মঙ্গলকামনা চাহিতেছি। তাঁহারা আমাদের সহায় না হইলে বাহিরে হাত পাতিব কোন্ ভরসায়? আমাদের কার্যের সূচনাই ত হইত না যদি আমাদের শ্রদ্ধেয়া ভগিনী শ্রীমতী হরিশ্চন্দ্র দত্ত মহাশয় ১০,০০০ টাকা দিয়া এই শুভ-কার্যের উদ্বোধন না করিতেন। বিধবা ও অসহায় রমণীদের দুঃখ যে কত বহুল এবং জীবনব্যাপী, এ কথা অনেকেই একটু আধটু জানেন, কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধেয়া ভগিনীর মত অন্তরের সহিত সে দুঃখ কল্পন অসম্ভব করিয়াছেন? করিলে কি আজ তাঁহাদের মানসিক ও দৈহিক দুঃখ মোচনের জন্ত অর্থ ও সামর্থ্যের অভাব হইত?

এ বিষয়ে বেশী আর কি বলিবার আছে। আবাব আপনাদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া শেষ করিতেছি। দুঃখিনী ভগিনীদের দুঃখ মোচনে সহায়তা ভগিনীরা সহায় হউন এই আমাদের প্রার্থনা।

[এই প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত অবলা বহু কর্তৃক পঠিত হইয়াছিল]

জয়ন্তী

প্রথম পরিচ্ছেদ

মৃগয়া

মহকুমা নূরপুরের মনসবদার জলালুদ্দীন শীকারে যাইতেছিলেন। কেল্লার ভিতর তাঁহাব প্রাসাদ। কেল্লার সম্মুখে প্রকাণ্ড মাঠে শীকারের দলবল প্রত্যুষে সমবেত হইয়াছিল। শীতকাল। শীকারীরা ও অপর লোকেরা তুলাভরা মিবজাই পরিয়া ব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শীকারীদের পিঠে বন্দুক, হাতে বর্শা, কোমরে তরওয়াল। চারিদিকে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, অস্ত্রের হেঁসা ধ্বনি। শিকলে বাঁধা তাজী কুকুর মাঝে মাঝে ডাকিতেছে, ধমক খাইয়া আবার স্তব্ধ হইতেছে। কয়েক জনের হাতে চক্ষু-বাঁধা বাজ পাকী। শীকার-যাত্রার বিলম্ব নাই।

আকাশ পরিষ্কার, কিন্তু সূর্য্যোদয় হয় নাই। উত্তর হইতে শীতল বায়ু বহিতেছে। সহসা কোলাহল স্তব্ধ হইয়া গেল। মনসবদার কেল্লার ফটক পার হইয়া বাহিরে আসিতেছেন, সঙ্গে পাঁচ-সাতজন বন্ধু ও কর্মচারী। সকলেরই শীকারের বেশ। তাঁহাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুই আছেন। পাগড়ীতে প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। মনসবদার নিকটে আসিলে সকলে তাঁহাকে ঝুঁকিয়া সেলাম করিল। মনসবদার হাস্যমুখে মস্তকে হাত তুলিয়া কহিলেন, “তমলীম!”

জলালুদ্দীনের বয়স চল্লিশ হইবে। দুই-চারি-গাছা গোঁফ দাড়ি পাকিয়াছে। শরীর দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, কিছু স্থূল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দিব্য সুপুরুষ, চক্ষে ওষ্ঠে দৃঢ়তার লক্ষণ, দৃঢ়তার সহিত নিষ্ঠুরতা। হাসিলেও চক্ষের কটাক্ষে ও অধরপ্রান্তে নিষ্ঠুরতার চিহ্ন বিলীন হয় না।

পার্শ্ববর্তী এক ব্যক্তির স্কন্ধে জলালুদ্দীন বাম হস্ত রক্ষা করিয়া ছিলেন। সে হিন্দু ও বয়সে মনসবদারের অপেক্ষা অনেক ছোট। তাহাকে একবার দেখিলে আবার তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিতে হয়। আকৃতি জলালুদ্দীনের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব, বক্ষ প্রশস্ত, কটি ক্ষীণ। দেখিয়া বলবান কি না বুঝিতে পাওয়া যায় না, তবে চলিবার

ভঙ্গীতে ক্ষিপ্র ও লঘুগামী মনে হয়। একপ রূপবান পুরুষ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। আকাবে ইঙ্গিতে বড় মোলায়েম, চক্ষের দৃষ্টি বড় কোমল ও মধুর। কণ্ঠের স্বরও সেইরূপ, কিছু আলস্যজড়িত, মৃদু, পুরুষকণ্ঠের পুরুষতাপশূন্য। মনসবদার যুবককে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, “কেমন বিহারীলাল, কিছু শীকাব পাওয়া যাইবে? দিন ত ভাল বোধ হইতেছে।”

বিহারীলাল চৌধুরী মহকুমার বড় জমিদার, মনসবদারের প্রিয় পাত্র। তিনি মধুর অলস স্বরে কহিলেন, “শীকার ত পাশা খেলা, পড়ে ত পোয়া বারো, না পড়ে ত তিন কাশা।”

পাশে একজন মোসাহেব বলিল, “ঠিক বাত বাবু সাহেব, ঠিক বাত!”

শীকাবের সরঞ্জাম মনসবদার ভাল করিয়া দেখিলেন। ঘোড়া, কুকুর, বাজ সব দেখিলেন। তাহার পর অস্ত্রে আরোহণ করিয়া অগ্রসর হইবার ছকুম দিলেন। বিহারীলাল ও আর কয়েক জন তাঁহার সঙ্গে রহিলেন।

কিছু দূর গিয়া অরণ্য। সকলে সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। স্থানে স্থানে অরণ্য নিবিড়, অল্পত্র বিরল, কোথাও পঞ্চল, কোথাও বৃহৎ জলাশয়। একটা জলাশয় হইতে কতকগুলি বক উড়িয়া গেল। দেখিয়া, বাহাদের হাতে বাজ ছিল তাহা বাজের চক্ষু উন্মোচন করিয়া, বাজকে বলাক দেখাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিল। তাহার পর অস্বারোহণে বাজের পিছনে ছুটিল।

জলালুদ্দীন, তাঁহার সঙ্গীবর্গ ও কয়েকজন অনুচর মেলিকে না গিয়া সম্মুখে অশ্চালনা করিলেন। বনের মধ্যে একটা মাঠ, সেইখানে একদল হরিণ চরিতেছিল। মুগ্ধ দেখিয়া শিকারীরা কুকুরের শিকল মুক্ত করিয়া দিল, সেই সঙ্গে একদল অথাবোহী দাবিত হইল।

জলালুদ্দীন, বিহারীলাল ও আব সকলে সেই পথ অনুসরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটা বৃহৎ বন্য বরাহ তাঁহাদের পাশ দিয়া বেগে পলায়ন করিয়া বনে প্রবেশ কবিল। জলালুদ্দীন ও বিহারীলাল তৎক্ষণাৎ

সেইদিকে অশ্বের মূখ ফিরাইলেন। আর সকলে অতটা লক্ষ্য না করিয়া পূর্ববৎ হরিণের দিকে ধাবমান হইল। মনসবদারকে বনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কেবল এক জন তাঁহার অনুগামী হইল।

নিবিড় শাখা প্রশাখা, লতা গুল্ম ভেদ করিয়া বরাহ ছুটিল; পশ্চাতে জলালুদ্দীন ও বিহারীলাল। পাশাপাশি বাইবার পথ ছিল না, মনসবদার আগে বিহারীলাল পশ্চাতে। দুই জনে বিশ ত্রিশ হাত ব্যবধান হইবে। কিছু দূর গিয়া বরাহ বিটপীশূন্য তৃণাবৃত পরিষ্কার স্থানে উপস্থিত হইল। পরিসর অল্প, কিন্তু আক্রমণকারীর সুবিধা। মনসবদার বর্শা লক্ষ্য করিয়া বরাহকে আক্রমণ করিলেন।

তাঁহার নিমেষ মাত্র বিলম্ব হইয়া থাকিবে। বরাহ চকিতের মত ফিরিয়া অশ্বকে আক্রমণ করিল। জলালুদ্দীনের বর্শা বরাহের বক্ষে অথবা পার্শ্বস্থলে বিদ্ধ না হইয়া, তাহার পৃষ্ঠে অল্প লাগিয়া, ভূমিতে প্রোথিত হইল। বর্শাকলক মুক্ত করিবার পূর্বেই বরাহ বজ্রদস্ত দিয়া অশ্বের উদর বিদীর্ণ করিল। বিকট চীৎকার করিয়া অশ্ব পড়িয়া গেল।

মনসবদার লম্ব দিয়া অগ্রদিকে দাঁড়াইলেন বটে, কিন্তু বর্শা হস্তচ্যুত হইল। অশ্বকে ছাড়িয়া বরাহ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

পশ্চাৎ হইতে বিহারীলাল দেখিলেন। বর্শার মুষ্টি দিয়া অশ্বকে দাক্ষণ প্রহার করিলেন। অশ্ব লম্ব দিয়া বরাহের সম্মুখে আসিল। বিহারীলাল মনসবদার ও বরাহকে দেখিতেছিলেন, অগ্র দিকে দৃষ্টি ছিল না। বর্শাকলক সজোবে বৃক্ষশাখায় লাগিয়া, বর্শা তাঁহার হস্ত হইতে ঠিকরিয়া দূবে গিয়া পড়িল। যখন তাঁহার অশ্ব বরাহের সম্মুখে তখন তিনি নিবন্ধ, কেবল কটিতে তরবারি। তাহাও বাহির কবিবার অবসব হইল না। বরাহ আবার ফিরিয়া বিহারীলালের অশ্বের উরু চিরিয়া ফেলিল। মনসবদারের স্রাব্য বিহারীলালও লম্ব দিয়া দূরে দাঁড়াইলেন। তখন বরাহ পাটাইয়া আবার মনসবদারকে আক্রমণ করিল। তাঁহার হস্তে তরবারি, কিন্তু তরবারি দ্বারা তিনি কখনই আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন

না, কারণ তিনি বরাহকে আঘাত করিলেও সে তাঁহাকে দীর্ঘ করিয়া হত্যা করিত।

পলকের মধ্যে এই-সকল ঘটতেছিল। বিহারীলাল কোন কথা না কহিয়া, বেগে গিয়া বরাহেব পিছনের দুই পা ধরিয়া, অমাত্মীয় শক্তিতে তাহাকে তুলিয়া ধরিলেন। বরাহের সম্মুখের দুই পা মাটিতে রহিল, পিছনের দুই পা শূন্যে উঠিল। দস্ত দিয়া আঘাত করিবার ক্ষমতা একেবারেই রহিত। ঘুরিতে যায়, ঘুরিতে পাবে না, কিংবা সঙ্গে সঙ্গে বিহারীলালও ধোরেন। দস্তে পড়িয়া বরাহ গৌ গৌ করিতে লাগিল। বিস্ময়ে বাকশূন্য ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া মনসবদার কয়েক পদ হটিয়া দাঁড়াইলেন।

এমন সময় তৃতীয় অশ্বরোহী উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া বিহারীলাল কহিলেন, “মক্‌তুম শাহ, বিলম্ব করিও না। ইহাকে আর রাখিতে পারিতেছি না।”

মক্‌তুম শাহ হস্তস্থিত বর্শা বরাহের পঙ্করে আমূল বিদ্ধ করিলেন। তখন মনসবদারেরও বিস্ময় ও মোহ অপনীত হইল। লক্ষ্য করিয়া বরাহের হৃদয়ে তরবারি বিদ্ধ করিলেন। বরাহ গতাস্থ হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

কিয়ংকাল কেহ কোন কথা কহিল না। পরে জলালুদ্দীন বিহারীলালের নিকট গিয়া, তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, “আজ তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছ।”

বিহারীলাল কহিলেন, “নাহেব, ও কথা আর বলিবেন না, আমি ওরূপ অবস্থায় পড়িলে আপনিও আমাকে রক্ষা করিতেন।”

মনসবদার ঘাড় নাড়িলেন, “আমার বাহুতে এমন বল নাই যে বজ্র বরাহকে তুলিয়া ধরিতে পারি। নিজেব চক্ষে না দেখিলে আমি প্রত্যয় করিতাম না।”

“আমি ত আপনাকে বলিয়াছিলাম শীকার ও পাশা খেলা সমান। সৌভাগ্যক্রমে তিন কাণা না পড়িয়া তিন ছয় আঠারো পড়িয়াছে।”

জলালুদ্দীন গম্ভীর স্বরে কহিলেন, “তোমার এ অশ্ব আমি কখন শোধ করিতে পারিব না, কখন তুলিব না। যদি তুলি তাহা হইলে যেন দোষপ্রাপ্ত আমার স্থান না হয়।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বনদেবী

মধ্যাহ্নের সময় আহালাদির জন্ত নির্দিষ্ট স্থানে সকল শীকারী একত্র হইল। বিহারীলালের অদ্ভুত বাহুবলের কথা শুনিয়া সকলে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। সকলে বুঝিল বিহারীলাল না থাকিলে মনসব্দার বরাহ হইতে রক্ষা পাইতেন না।

আহালাদিব পব অর্দ্ধ দণ্ড বিশ্রাম করিয়া সকলে গৃহের অভিমুখে ফিরিল। ফিরিবার সময় অস্ত্র পথ দিয়া, দুই তিন দলে বিভক্ত হইয়া চলিল। জলালুদ্দীন ও বিহারীলাল এবার বর্শা ছাড়িয়া বন্দুক লইলেন। জলে নানা জাতীয় পক্ষী, তাহারই শীকার হইবে। দুই জনের লক্ষ্য অব্যর্থ, পাখী উড়াইয়া মারিতে লাগিলেন। অল্পচরেরা সংগ্রহ করিতে লাগিল। তাহার পর অনেক দূর পর্য্যন্ত আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হয় বন্দুকের আওয়াজে পাখী উড়িয়া গিয়া থাকিবে। মনসব্দার ও বিহারীলাল দুই জনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে দেখিতেছিলেন।

অকস্মাৎ উভয়ে দেখিলেন বনের মধ্যে একপাশে প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে একটি রমণী একাকিনী বসিয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের কণ্ঠস্বর ও অশ্বের পদধ্বনি শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কোতুহলাক্রান্ত হইয়া জলালুদ্দীন রমণীর সম্মুখে উপনীত হইয়া অশ্বের গতি রোধ কবিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিহারীলাল দাঁড়াইলেন। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অল্পচরেরা বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে বগণীর প্রতি চাহিয়া ছিল।

সাক্ষাৎ বনদেবীর স্তায় এই নারী কে? এমন স্থানে একাকিনী কি করিতেছে? ধনীর ঘরের পুরস্ত্রী না হউক, নীচ জাতীয় দরিদ্র রমণী নহে। বস্ত্র ও বেশ বহুমূল্য না হউক, পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার। পবিধানের ধরণে বিদেশিনী বিবেচনা হয়। আলুলায়িতদীর্ঘকেশী, কপে বন আলোকিত কবিয়াছে। বিশাল নয়নের দৃষ্টি স্থির, ভয়শূন্য। অশ্বারোহী অস্ত্রধারী পুরুষদিগকে দেখিয়া কিছুমাত্র চঞ্চল বা ত্রস্ত হইল না। যেমন দাঁড়াইয়াছিল সেই-রূপ দাঁড়াইয়া রহিল।

মনসব্দার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে?”

রমণীর ক্রম দ্রব্য কুঞ্চিত হইল, কহিল, “আপাততঃ এই বনবাসিনী।”

“কি জাতি?”

“আমার পরিচয় জানিয়া আপনার কি হইবে?”

“আমি রাজকর্মচারী। অজ্ঞাত ব্যক্তির পরিচয় লইবার আমার ক্ষমতা আছে।”

“আমি ক্ষত্রিয়কন্যা।”

“কোথায় নিবাস?”

“এইমাত্র ত বলিলাম—সম্প্রতি আমি এই বনবাসিনী।”

“এখানে কেমন করিয়া আসিয়াছ?”

“কিছু দূর আপনার স্তায় অশ্বারোহণে, অবশিষ্ট পথ পদব্রজে।”

“এমন জনশূন্য বনে তোমার কি প্রয়োজন?”

“বনবাসের বাসনা।”

“তুমি কি বনবাসের যোগ্য?”

“তাহার বিচারকর্তা আপনি নহেন।”

মনসব্দারের কোতুহল—সেই সঙ্গে আবণ্ড কোন মনোভাব—বাড়িতেছিল। কিছু রাগও হইতেছিল।

রক্ষ স্বরে সংক্ষেপে কহিলেন, “তোমাকে আমাদের সঙ্গে ধাইতে হইবে।” অল্পচরদিগকে আদেশ করিলেন, “এই স্ত্রীলোককে অশ্বে আরোহণ করাইয়া দুর্গে লইয়া চল।”

বিহারীলাল এতক্ষণ প্রস্তরমূর্তির স্তায় নিষ্পন্দ ছিলেন। এখন একটি মাত্র কথা কহিলেন, “কেন?”

স্বরে আলস্ত নাই, কোমলতা নাই, তীক্ষ্ণ, তীব্র, স্পষ্ট কণ্ঠ। আকাশপ্রান্তে বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় একবার চক্ষু জলিয়া উঠিল।

মনসব্দার বিহারীলালের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, “এই রমণী একাকিনী, অসহায়, দুর্গের অন্তঃপুরে আশ্রয় পাইবে।”

বিহারীলাল প্রথম কথা কহিতেই রমণী তাহার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিল। এখন অবনত নয়নে তাঁহার উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

বিহারীলাল মনসব্দারকে কহিলেন, “ইনি একাকিনী

হউন, অসহায় হউন, আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন নাই, স্বেচ্ছায় বাক্যলাপও করেন নাই। ইনি ইচ্ছাপূর্বক যদি আপনার মহলে বাইতে চাহেন সে কথা স্বতন্ত্র।”

মনসব্দার আবার বিহারীলালেব দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দৃষ্টি জুর, কুটিল, ওষ্ঠাধরের প্রান্তে নিষ্ঠুরতার রেখা প্রস্তুরে লৌহবেধার ছায় স্পষ্ট। তিনি কথা না কহিতেই রমণী বলিল, “বনচারিনী বলিয়া আমি অসহায় বা একাকিনী একপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। আমি কাহারও আশ্রয়প্রার্থী নহি, এবং আপনার বা আর কাহারও স্বস্ত্যপূরে প্রবেশ করিতে চাহি না। আপনাবা উদ্ভিষ্ট পথে গমন করুন। আমি একাকিনী হইলেও নিবপবানিনী, আমাকে পীড়ন করিবেন না।”

মনসব্দাব কি উত্তর করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে বিহারীলাল কহিলেন, “আমাব অমুরোধ—আপনি ইহাকে অনিচ্ছা-সবে দুর্গে বা আর কোথাও পাঠাইবেন না, ইহার যেখানে ইচ্ছা গমন করিতে দিন।”

জলালুদ্দীনকে কথা কহিতে অবসর না দিয়া রমণী বিহারীলালকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, “আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। কিন্তু এই অত্যাচারী রাজকর্মচারী হইতে আমার কোন আশঙ্কা নাই।”

একবার রমণীর ও বিহারীলালের চক্ষু মিলিল। অপর মুহূর্ত্তে রমণী বনে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইল।

মনসব্দারের আদেশে অমুচরেরা অনেক অন্বেষণ করিল, রমণীকে কোথাও দেখিতে পাইল না।

শীকার বন্ধ হইয়া গেল। বিহারীলাল মনসব্দারের পার্শ্ব পরিত্যাগ করিলেন, পথে আর বড় একটা কথা-বার্তাও হইল না।

সেই দিন প্রভাতে, তখন হইতে শিশিরবিন্দু লীন হইবার পূর্বে বিহারীলাল মনসব্দার জলালুদ্দীনের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। কেন? ভবিতব্য সর্বস্বামী ব্যতীত কে জানে?

(ক্রমশঃ)

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বিদ্যাসাগর

আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণ-সভা বছর বছর হয় কিন্তু তাতে বক্তারা মন খুলে সব কথা বলেন না, এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশের লোকেরা একদিক দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না করে' থাকতে পারেননি বটে কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্রের যে মহৎগুণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করিতে পেরেছিলেন সেটাকে কেবলমাত্র তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের খ্যাতির দ্বারা তাঁরা ঢেকে রাখতে চান। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ সকলের চেয়ে বড় পরিচয় সেইটাই তাঁর দেশবাসীরা তিরস্করণী দ্বারা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করতেন।

এর থেকে একটি কথার প্রমাণ হয় যে তাঁর দেশের লোক যে যুগে বন্ধ হয়ে আছেন বিদ্যাসাগর সেই যুগকে

ছাড়িয়ে জয়গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সেই বড় যুগে তাঁর জয়, যার মধ্যে আধুনিক কালেবও স্থান আছে, বা ভাবী কালকে প্রত্যাখ্যান করে না। যে গঙ্গা মরে' গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে; বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেচে, সমুদ্রেব সঙ্গে তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল, এইজন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।

বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি অতীতের প্রথা ও বিশ্বাসের মধ্যে মায়ুষ হয়েছিলেন।—এমন দেশে তাঁর জন্ম হয়েছিল, যেখানে জীবন ও মনের যে প্রবাহ মায়ুষের সংসারকে নিয়ত অতীত থেকে বর্তমান, বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের

অভিমুখে নিয়ে যেতে চায় সেই প্রবাহকে লোকেরা বিশ্বাস করেনি, এবং তাকে বিপজ্জনক মনে করে' তার পথে সহস্র বাধা বেঁধে সমাজকে নিরাপদ করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তৎসঙ্গে তিনি পুরাতনের বেড়ার মধ্যে জড়ভাবে আবদ্ধ থাকতে পাবেননি। এতেই তাঁর চারিত্রের অসামান্যতা ব্যক্ত হয়েছে। দয়া প্রভৃতি গুণ অনেকের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় কিন্তু চারিত্র-বল আমাদের দেশে সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। যারা সবলচরিত্র, যাদের চারিত্র-বল কেবলমাত্র ধর্মবুদ্ধি-গত নয় কিন্তু মানসিক-বুদ্ধি-গত সেই প্রবলেরা অতীতের বিধিনিষেধে অবরুদ্ধ হয়ে নিঃশেষে নিস্তক হয়ে থাকেন না। তাঁদের বুদ্ধির চারিত্র-বল প্রথার বিচারহীন অহু-শাসনকে শাস্তিশিষ্ট হতে মানতে পারে না। মানসিক চারিত্র-বলের এইরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের পক্ষে অতিশয় মূল্যবান। যারা অতীতের জড় বাধা লঙ্ঘন করে' দেশের চিন্তকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন করে' নিয়ে যাবার সারথী স্বরূপ, বিজ্ঞানাগর মহাশয় সেই মহাবিশিষ্টের একজন অগ্রগণ্য ছিলেন, আমার মনে এই সত্যটিই সব-চেয়ে বড় হয়ে লেগেছে।

বর্তমান কাল ভবিষ্যৎ ও অতীত কালের সীমাত্তে অবস্থান করে, এই নিত্যচলনশীল সীমারেখার উপর দাঁড়িয়ে কে কোন্ দিকে মুখ ফেরায় আসলে সেইটাই লক্ষ্য করবার জিনিষ। যারা বর্তমান কালের চূড়ায় দাঁড়িয়ে পিছন দিকেই ফিরে থাকে, তারা কখনো অগ্রগামী হতে পারে না, তাদের পক্ষে মানবজীবনের পুরোবর্তী হবার পথ মিথ্যা হয়ে গেছে। তারা অতীতকেই নিয়ন্ত দেখে বলে' তার মধ্যেই সম্পূর্ণ নির্বিষ্ট হয়ে থাকতেই তাদের একান্ত আস্থা। তারা পথে চলাকে মানে না। তারা বলে যে সত্য হৃদয় অতীতের মধ্যেই তার সমস্ত কসল কলিয়ে শেষ করে' ফেলেছে; তারা বলে যে তাদের ধর্ম-কর্ম বিষয়-ব্যাপারের যাকিছু তত্ত্ব তা ঋষিচিন্ত থেকে পরিপূর্ণ আকারে উদ্ভূত হয়ে চিরকালের জন্ত স্তব্ধ হয়ে গেছে, তারা প্রাণের নিয়ম অহুসারে ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করেনি, হুতরাং

তাদের পক্ষে ভাবী বিকাশ নেই, অর্থাৎ ভবিষ্যৎকাল বলে' জিনিষটাই তাদের নয়।

এইরূপে অসম্পূর্ণ সত্যের মধ্যে অর্থাৎ মৃত পদার্থের মধ্যে চিন্তকে অবরুদ্ধ করে' তার মধ্যে বিরাজ করা আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে সর্বত্র লক্ষ্য-গোচর হয়, এমন কি আমাদের দেশের যুবকদের মুখেও এর সমর্থন শোনা যায়। প্রত্যেক দেশের যুবকদের উপর ভাব রয়েছে সংসারের সত্যকে নূতন করে' যাচাই করে' নেওয়া, সংসারকে নূতন পথে বহন করে' নিয়ে যাওয়া, অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। প্রবীণ ও বিজ্ঞ যারা তাঁরা সত্যের নিত্যনবীন বিকাশের অল্পকূলতা করতে ভয় পান, কিন্তু যুবকদের প্রতি ভার আছে তারা সত্যকে পরখ করে' নেবে।

সত্য যুগে যুগে নূতন করে' আত্মপরীক্ষা দেবার জন্তে যুবকদের মনুষ্যে আহ্বান করেন। সেই-সকল নব-যুগের বীরদের কাছে সত্যের ছদ্মবেশধারী পুরাতন মিথ্যা পরাস্ত হয়। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, আমাদের দেশের যুবকেরা এই আহ্বানকে অস্বীকার করেছে। সকল প্রকার প্রথাকেই চিরন্তন বলে' কল্পনা করে' কোনো রকমে শাস্তিতে ও আরামে মনকে অলস করে' রাখতে তাদের মনের মধ্যে পীড়া বোধ হয় না, দেশের পক্ষে এই-টেই সকলের চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়। সেইজন্তেই আশ্চর্যের কথা এই যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করেও, এই দেশেরই একজন সেই নবীনের বিদ্রোহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি আপনাদের মধ্যে সত্যের তেজ, কর্তব্যের সাহস অল্পভব করে' ধর্মবুদ্ধিকে জয়ী করবার জন্তে দাঁড়িয়েছিলেন। এখানেই তাঁর যথার্থ মহত্ব। সেদিন সমস্ত সমাজ এই ব্রাহ্মণ-তনয়কে কিরূপে আঘাত ও অপমান করেছিল, তার ইতিহাস আজকার দিনে ম্লান হয়ে গেছে, কিন্তু যারা সেই সময়ের কথা জানেন তাঁরা জানেন যে তিনি কত বড় সংগ্রামের মধ্যে একাকী সত্যের জোবে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি জয়ী হয়েছিলেন বলে গৌরব করতে পারেন। কারণ সত্যের জয়ে দুই প্রতিকূল পক্ষেরই যোগ্যতা থাকা দরকার। কিন্তু ধর্মবুদ্ধি যারা বাহিরে পরাভব পান তাঁরাও অন্তরে

অরী হন, এই কথাটি জেনে আজ আমরা তাঁর জয়কীর্তন করব।

বিদ্যাসাগর আচার্যের দুর্গকে আক্রমণ করেছিলেন, এই তাঁর আধুনিকতার একমাত্র পরিচয় নয়। যেখানে তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যে সম্মিলনের সৈতু-স্বরূপ হয়েছিলেন সেখানেও তাঁর বুদ্ধির ঔদার্য প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যা-কিছু পাশ্চাত্য তাকে অশুচি বলে' অপমান কবেননি। তিনি জানতেন, বিদ্যাব মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের দিগ্বিবাধ নেই। তিনি নিজের সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন অথচ তিনিই বর্তমান যুরোপীয় বিদ্যার অভিমুখে ছাত্রদের আগ্রহের করবার প্রধান উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং নিজের উৎসাহ ও চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিদ্যা আয়ত্ত বয়েছিলেন।

এই বিদ্যাসম্মিলনের ভার নিয়েছিলেন এমন এক ব্যক্তি যার বাইরের ব্যবহার বেশভূষা প্রাচীন কিন্তু বাব অন্তর চির-নবীন। স্বদেশের পরিচ্ছদ গ্রহণ করে' তিনি বিদেশের বিদ্যাকে আতিথেয় বরণ করতে পেরে-ছিলেন এইটেই বড় রমণীয় হয়েছিল। তিনি অনেক বেশী বয়সে বিদেশী বিদ্যায় প্রবেশলাভ করেন এবং তাঁর গৃহে বাল্যকালে ও পুরুষাভুজের সংস্কৃত-বিদ্যারই চর্চা হয়েছে। অথচ তিনি কোনো বিরুদ্ধ মনোভাব না নিয়ে অতি প্রাচুর্যে পাশ্চাত্য বিদ্যাকে গ্রহণ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই আধুনিকতার গৌরবকে স্বীকার করতে হবে। তিনি নবীন ছিলেন এবং চির-যৌবনের অভিব্যক্তি লাভ করে' বলশালী হয়েছিলেন। তাঁর এই নবীনতাই আমার কাছে সব-চেয়ে পূজনীয় কারণ। তিনি আমাদের দেশে চলবার পথ প্রস্তুত করে' গেছেন। প্রত্যেক দেশের মহাপুরুষদের কাজই হচ্ছে এইভাবে বাধা অপসারিত করে' ভাবী যুগে যাত্রা করবার পথকে মুক্ত করে' দেওয়া। তাঁরা মাছুয়েব সঙ্গে মাছুষের, অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের সত্য সম্বন্ধের বাধা মোচন করে' দেন। কিন্তু বাধাই যে-দেশের দেবতা সে দেশ এই মহাপুরুষদের সম্মান করতে জানে না। বিদ্যাসাগরের পক্ষে এই প্রত্যাখ্যানই তাঁর চরিত্রের সব-চেয়ে বড় পশিচ্য হয়ে থাকবে। এই স্বাক্ষরতনয় যদি

তাঁর মানসিক শক্তি নিয়ে কেবলমাত্র দেশের মনোরঞ্জন করতেন, তাহলে অনায়াসে আজ তিনি অবতারের পদ পেয়ে বসতেন এবং যে নৈরাশ্রের আঘাত তিনি পেয়েছিলেন তা তাঁকে সহ্য করতে হত না। কিন্তু যারা বড় জনসাধারণের চাটুভূতি করবার জন্তে সংসারে তাঁদের জন্ম নয়। এইজন্তে জনসাধারণও সকল সময়ে স্তুতিবাক্যের মঞ্জুবি দিয়ে তাঁদের বিদ্যায় করে না।

একথা মানতেই হবে যে বিদ্যাসাগর দুঃসহ আঘাত পেয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই বেদনা বহন করে-ছিলেন। তিনি নৈরাশ্রগ্রস্ত pessimist ছিলেন বলে' অধ্যাত্ম লাভ করেছেন, তার কারণ হচ্ছে যে যেখানে তাঁর বেদনা ছিল দেশের কাছ থেকে সেখানে তিনি শাস্তি পাননি। তিনি যদিও তাতে কর্তব্যব্রত হননি, তবুও তাঁর জীবন যে বিষাদে আচ্ছন্ন হয়েছিল তা অনেকের কাছে অবদিত নেই। তিনি তাঁর বড় তপস্কার দিকে স্বদেশীয়ের কাছে অভ্যর্থনা পাননি, কিন্তু সকল মহা-পুরুষেরাই এই না-পাড়ার গৌরবের দ্বারাই ভূষিত হন। বিধাতা তাঁদের যে দুঃসাধ্য সাধন করতে সংসারে পাঠান, তাঁরা সেই দেবদত্ত দৌত্যের দ্বারাই অন্তরের মধ্যে সম্মান গ্রহণ করেই আসেন। বাহিরের অগৌরব তাঁদের অন্তরেব সেই সম্মানের টাকাকেই উজ্জ্বল করে' তোলে,—অসম্মানই তাঁদের পুরস্কার।

এই উপলক্ষে আরেক জনের নাম আজ আমার মনে পড়ছে—যিনি প্রাচীন কালের সঙ্গে ভাবী কালের, এক যুগের সঙ্গে অন্তর যুগের সম্মিলনের সাধনা করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ও বিদ্যাসাগরের মত জীবনের আরম্ভকালে শাস্ত্রে অসামান্য পারদর্শী হয়েছিলেন এবং বাল্যকালে পাশ্চাত্য বিদ্যা শেখেননি। তিনি দীর্ঘকাল কেবল প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যেই আবিষ্ট থেকে তাকেই একমাত্র শিক্ষার বিষয় করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই সীমার মধ্যেই একান্ত আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারলেন না। রামমোহন সত্যকে নানা দেশে, নানা শাস্ত্রে, নানা ধর্মে অনুসন্ধান করেছিলেন, এই নির্ভীক সাহসের জন্য তিনি ধন্ত। যেমন ভৌগোলিক সত্যকে পূর্ণভাবে জানাবার জন্য মাছুষ নূতন নূতন দেশে নিক্ষেপ করে'

অসাধারণ অধ্যবসায় ও চরিত্রবলের পরিচয় দিয়েছে, তেমনই মানসলোকের সত্যের সন্ধানে চিন্তকে প্রথার আবেষ্টন থেকে মুক্ত করে' নব নব পথে ধাবিত করতে গিয়ে মহাপুরুষেরা আপন চরিত্র-মহিমায় দুঃসহ কষ্টকে শিরোধার্য করে' নিয়ে থাকেন। আমরা অমূল্যব করতে পারি না যে এঁরা এঁদের বিরাট স্বরূপ নিয়ে ক্ষুদ্র জনসংঘকে ছাড়িয়ে কত উর্দ্ধে বিরাজ করেন। যারা ছোট, বড়র বড়কেই তারা সকলের চেয়ে বড় অপরাধ বলে' গণ্য কবে। এই কারণেই ছোটব আঘাতই বড়ব পক্ষে পূজার অর্থ্য।

যে জাতি মনে করে' বসে' আছে যে অতীতের ভাণ্ডারের মধ্যেই তার সকল ঐশ্বর্য, সেই ঐশ্বর্যকে অর্জন করবার জন্তে তার স্বকীয় উদ্ভাবনার কোনো অপেক্ষা নেই, তা পূর্বযুগের ঋষিদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়ে চিবকালের মত সংস্কৃত ভাষায় পুঁথির প্লোকে সঞ্চিত হয়ে আছে, সে জাতিব বুদ্ধির অবনতি হয়েছে, শক্তির অধঃপতন হয়েছে। মইলে এমন বিশ্বাসেব মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে' কখনই সে আয়াম পেত না। কারণ বুদ্ধি ও শক্তির ধর্মই এই যে, সে আপনার উদ্যমকে বাধার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে' যা অজ্ঞাত যা অলঙ্কার তার অভিমুখে নিয়ত চলতে চায়; বহুমূল্য পাথর দিয়ে তৈরি কবরস্থানের প্রতি তাব অমুরাগ নেই। যে জাতি অতীতের মধ্যেই তার গৌরব স্থির কবেছে, ইতিহাসে তাব বিজয়বাত্রা স্তব্ধ হয়ে গেছে, সে জাতি শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে কর্মে শক্তিহীন ও নিষ্ফল হয়ে গেছে। অতএব তার হাতের অপমানের দ্বারাই সেই জাতির মহাপুরুষদের মহৎ সাধনার যথার্থ প্রমাণ হয়।

আমি পূর্বেই বলেছি যে যুরোপে যে-সকল দেশ অতীতের আঁচল ধরা, তারা মানসিক আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রিক সকল ব্যাপারেই অল্প দেশ থেকে পিছিয়ে পড়েছে। স্পেন দেশের ঐশ্বর্য ও প্রতাপ এক সময়ে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল, কিন্তু আজ কেন সে অল্প যুরোপীয় দেশের তুলনায় সেই পূর্ব-গৌরব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে? তার কারণ হচ্ছে যে স্পেনের চিন্তা ধর্ম্যে কর্মে প্রাচীন বিশ্বাস ও আচারপদ্ধতিতে আবদ্ধ, তাই তার চিন্তাসম্পদের

উন্মেষ হয়নি। যারা এমনি ভাবে ভাবী কালকে অবজ্ঞা করে, বর্তমানকে প্রহসনের বিষয় বলে, সকল পরিবর্তনকে হান্তকর দুঃখকর লজ্জাকর বলে' মনে করে, তারা জীবন্ত জাতি। তাই বলে' অতীতকে অবজ্ঞা করাও কোনো জাতির পক্ষে কল্যাণকর নয়, কারণ অতীতের মধ্যেও তাব প্রতিষ্ঠা আছে। কিন্তু মানুষকে জানতে হবে যে অতীতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ভাবীকালের পথেই তাকে অগ্রসর করবার জন্তে। আমাদের চলার সময় যে পা পিছিয়ে থাকে সেও সামনেব পাকে এগিয়ে দিতে চায়। সে যদি সামনের পা-কে পিছনে টেনে রাখত তাহলে তার চেয়ে খোঁড়া পা শ্রেয় হত। তাই সকল দেশের মহাপুরুষেরা অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে মিলনসেতু নির্মাণ কবে' দিয়ে মানুষের চলার পথকে সহজ করে' দিয়েছেন। আমি মনে করি যে ভারতবর্ষে জাতিব সঙ্গে জাতিব, স্বদেশীর সঙ্গে বিদেশীর বিরোধ তত গুরুতর নয় যেমন তার অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিরোধ। এইরূপে আমরা উভয় কালের মধ্যে একটি অতলস্পর্শ ব্যবধান সৃষ্টি কবে' মনকে তার গহ্বরে ডুবিয়ে দিয়ে বসেছি। একদিকে আমরা ভাবীকালে সম্পূর্ণ আস্থাবান হতে পারছি না, অন্যদিকে আমরা কেবল অতীতকে আঁকড়ে থাকতেও পারছি না। তাই আমরা একদিকে মোটর-বেল-টেলিগ্রাফকে জীবনযাত্রার নিত্য-সহচর করেছি, আবার অন্যদিকে বলছি যে বিজ্ঞান আমাদের সর্বনাশ করল, পাশ্চাত্য বিদ্যা আমাদের সহাবে না। তাই আমরা না আগে না পিছে কোনো দিকেই নিজেকে প্রতিক্রিয়া করতে পারছি না। আমাদের এই দোটার কারণ হচ্ছে যে আমরা অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিরোধ বাধিয়েছি, জীবনেব নব নব বিকাশের ক্ষেত্র ও আশার ক্ষেত্রে আয়ত্তেব অতীত কবে' রাখতে চাচ্ছি, তাই আমাদের দুর্গতির অন্ত নেই।

আজ আমরা বলব যে, যে-সকল বীরপুরুষ অতীত ও ভবিষ্যতেব মধ্যে সেতুবন্ধন করেছেন, অতীত সম্পদকে রূপণের ধনের মত মাটিতে গচ্ছিত না রেখে বহমান কালের মধ্যে তার ব্যবহারের মুক্তিসাধন করতে উদ্যমশীল হয়েছেন তাঁরাই চিরস্ববর্ণীয়, কারণ

তাঁরাই চিরকালের পথিক, চিরকালের পথপ্রদর্শক। তাঁদের সকলেই যে বাহীরের সফলতা পেয়েছেন তা নয়, কারণ আমি বলেছি যে তাঁদের কর্মক্ষেত্র অল্পসারে সার্থকতার ভারতম্য হুয়েছে কিন্তু আমাদের পক্ষে খুব আশার কথা যে আমাদের দেশেও এঁদের মত লোকের জন্ম হয়।

আজকাল আমবা দেশে প্রাচ্য বিদ্যার যে সম্মান করছি তা কতকটা দেশাভিমান বশত। কিন্তু সত্যের প্রতি নিষ্ঠা বশত প্রাচীন বিদ্যাকে সর্বমানবেক সম্পদ করবার জন্য ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ত্রুতী হয়েছিলেন আমাদের বাংলাব রামমোহন রায় এবং তাঁর জ্ঞান অনেকবার তাঁর প্রাণশক্তি পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছে। আজ আমরা তাঁর সাধনার ফল ভোগ করছি কিন্তু তাঁকে অবজ্ঞা করতে কুণ্ঠিত হইনি। তবু আজ আমরা তাঁকে নমস্কার করি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেইরূপ, আচারের যে হৃদয়হীন প্রাণহীন পাথর দেশের চিত্তকে পিষে গেবেছে, রক্তপাত করেছে, নারীকে পীড়া দিয়েছে, সেই পাথরকে দেবতা বলে মানেন নি, তাকে আঘাত করেছেন। অনেকে বলবেন যে তিনি শাস্ত্র দিয়েই শাস্ত্রকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু শাস্ত্র উপলক্ষ্য মাত্র ছিল; তিনি অজ্ঞায়ের বেদনায় যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সে ত শাস্ত্রবচনের প্রভাবে নয়। তিনি তাঁর কল্পনার ঔদার্যে মানুষকে মানুষরূপে অঙ্গভব করতে পেরেছিলেন, তাকে কেবল শাস্ত্রবচনের বাহকরূপে দেখেন নি। তিনি কতকালের পুঞ্জীভূত লোকপীড়ার সম্মুখীন হয়ে নিষ্ঠুর আচারকে দয়ার দ্বারা আঘাত করেছিলেন।

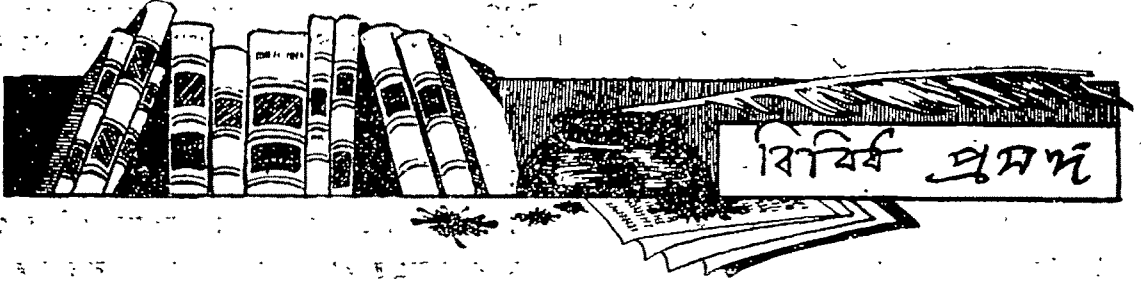
তিনি কেবল শাস্ত্রের দ্বারা শাস্ত্রের খণ্ডন করেননি, হৃদয়ের দ্বারা সত্যকে প্রচার করে' গেছেন।

আজ আমাদের মুখের কথায় তাঁদের কোনো পুরস্কার নেই। কিন্তু আশা আছে যে এমন একদিন আসবে যেদিন আমরাও সম্মুখের পথে চলতে গৌরব বোধ করব, ভূতগ্রস্ত হয়ে শাস্ত্রাঙ্কশাসনের বোঝায় পঙ্গু হয়ে পিছনে পড়ে থাকব না, যেদিন “মুঞ্চং দেহি” বলে প্রচলিত বিশ্বাসকে পরীক্ষা করে' নিতে কুণ্ঠিত হব না। সেই জ্যোতির্ময় ভবিষ্যৎকে অন্বেষণ করে' আনন্দের জন্তে যারা প্রত্যাশেই আগ্রহ হয়েছিলেন, তাঁদের বলব, “দয়্য তোমরা, তোমাদের তপস্বী ব্যর্থ হয়নি, তোমরা একদিন সত্যের সংগ্রামে নির্ভয়ে ঠাঁড়াতে পেরেছিলে বলেই আমাদের অগোচরে পাশাপের প্রাচীরে ছিদ্র দেখা দিয়েছে। তোমরা একদিন স্বদেশবাসীদের দ্বারা তিবদ্ধত হয়েছিলে, মনে হয়েছিল বুঝি তোমাদের জীবন নিষ্ফল হয়েছে, কিন্তু জানি সেই ব্যর্থতার অন্তরালে তোমাদের কীর্তি অক্ষয়রূপ ধারণ করছিল।”

সত্যপথের পথিকরূপে সঙ্কানীরূপে নবজীবনের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে, ভাবীকালের তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে একতালি পা ফেলে যেদিন আমরা এই কথা বলতে পারব সেইদিনই এই-সকল মহাপুরুষদের স্মৃতি দেশেব হৃদয়ের মধ্যে সত্য হয়ে উঠবে। আশা করি-সেই শুভদিন অনতিদূরে।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদ্যাসাগর-স্মরণসভায় বক্তৃতাব মর্ম (১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১। ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা।) শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক অঙ্ক-লিখিত।



কয়েকটি রাজনৈতিক প্রশ্ন

বর্তমান সময়ে তিনটি রাজনৈতিক প্রশ্ন সর্বাপেক্ষা অধিক চিন্তা ও আলোচনার বিষয় হইয়াছে। নিরুপ-
দ্রব আইনভঙ্গ তদন্ত কমিটি কিছুদিন হইতে ভারতের
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গিয়া প্রধান প্রধান অসহযোগী
সাক্ষ্য লইয়া স্থির করিতে চেষ্টা করিতেছেন, যে, দেশ
ব্যাপকভাবে নিরুপদ্রব আইনভঙ্গ করিবার উপায়
হইয়াছে কি না। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবও দুইটি
বিষয় আলোচিত হইতেছে। কংগ্রেসওয়ালাদেব অধিকাংশ
কয়েক বৎসর হইতে অসহযোগনীতির পক্ষপাতী
হইয়াছেন। কিন্তু এখনও কংগ্রেসের এমন সভ্য আছেন
যাহারা, অসহযোগ প্রচেষ্টার মূলীভূত নীতিসমূহ সম্পূর্ণ-
রূপে মানেন না, বা মানিতে প্রস্তুত নছেন। মহারাষ্ট্রে
অধিকাংশ কংগ্রেসওয়াল, কিছুকাল হইতে, ব্যবস্থাপক
সভাসমূহে প্রতিনিধিরূপে প্রবেশ করিয়া, তথায় দেশহিত-
সাধনের চেষ্টার পক্ষপাতী হইয়াছেন। অন্যান্য প্রদেশেও
এই মতাবলম্বী লোক আছেন। চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক
কনফারেন্সের সভানেত্রী শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর অভি-
ভাষণে এই মত সমর্থিত হইয়াছিল। অবশ্য তাহার
প্রতিকূল সমালোচনাও হইয়াছিল। কংগ্রেস ও অসহযোগ
দলের আলোচ্য আব-একটি বিষয় এই, যে, যে-সব
কংগ্রেস ও অসহযোগদল-ভুক্ত আইনজীবী সর্বকাবী
আদালতে নিজ নিজ ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন বা
স্থগিত রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের পুনর্কাল আইন ব্যবসায়ে
প্রবৃত্ত হওয়া উচিত কি না।

উল্লিখিত তিনটি প্রশ্ন প্রধানতঃ অসহযোগীদের চিন্তার
বিষয় হইলেও মডারেটরাও তাহার আলোচনা করিতেছেন।
তজ্জপ, ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর একটি কক্ষতা প্রধানতঃ

মডারেটদের ভাবনার কারণ হইয়া থাকিলেও, উহা
অসহযোগী ও মডারেট উভয়দলের লোকদের আলোচনার
বিষয় হইয়াছে।

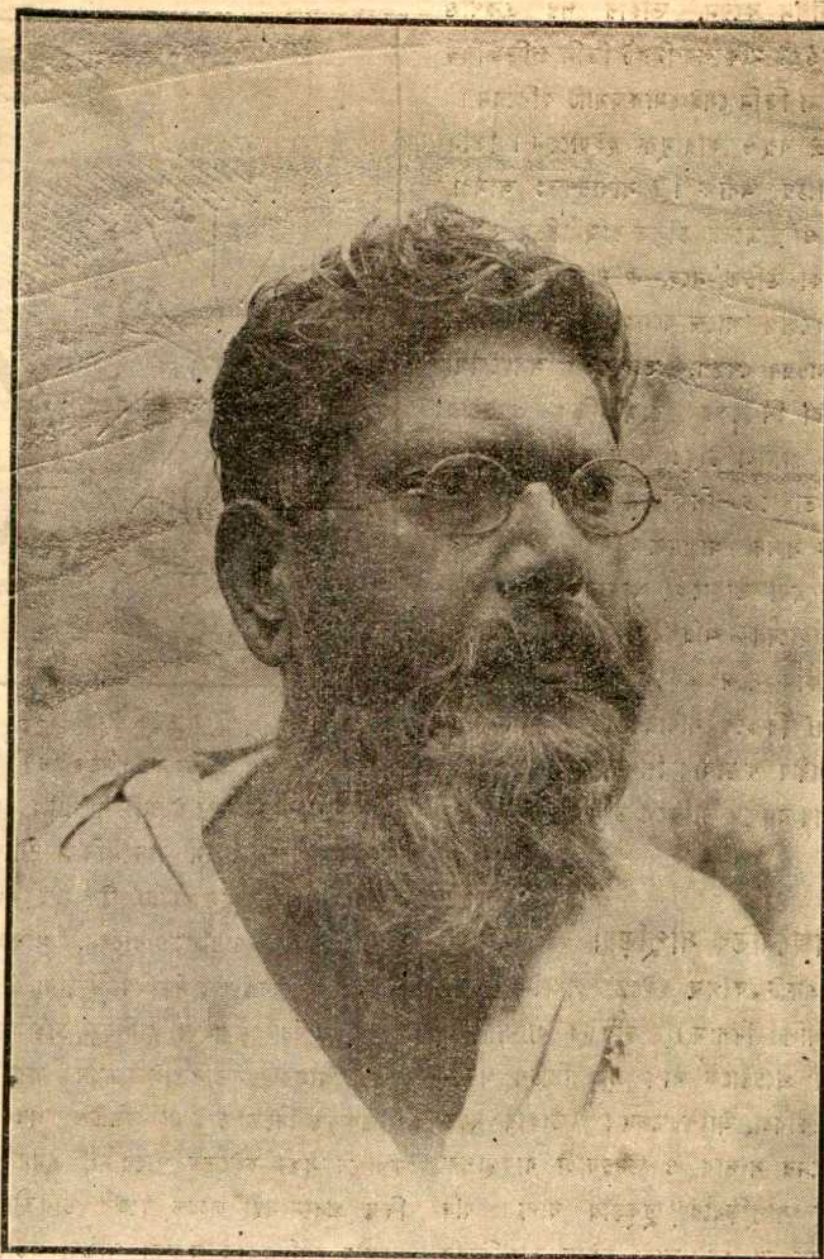
কয়েকজন নেতার কারামোচন

এই প্রকার গুরুতর প্রশ্ন-সকলের আলোচনার সময়
অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্তক ও নেতা মহাত্মা গান্ধী
স্বাধীন থাকিলে বড় ভাল হইত। তিনি দেশেব অবস্থা
বুঝিয়া তদনুরূপ ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে পারিতেন।

কিন্তু যদিও এসময়ে তাঁহার কারাবাসে দেশ তাঁহার
পরামর্শ ও নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, তথাপি
তাঁহার কারাবাস দ্বারা অসহযোগীদের পরীক্ষাও হই-
তেছে। কেবলমাত্র একজন নেতার বুদ্ধিবিবেচনা
রাজনীতিজ্ঞান দৃঢ়তা ও সাহসেব বলে কোনও রাষ্ট্রীয়
প্রচেষ্টা চলিতে বা সফল হইতে পারে না। দলের
অগ্রাঙ্গ লোক ও নেতাদেরও চিন্তা ও কাজ করিবার
ক্ষমতা থাকা চাই, এবং দৃঢ়তা ও সাহস আদি গুণ থাকা
চাই। ইহা অতি সাধারণ কথা। কিন্তু সাধারণ কথা
হইলেও ভুলিয়া গেলে চলিবে না।

স্বপ্নের বিষয়, সমুদয় নেতা কারাবদ্ধ হন নাই;
এবং যাহা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও ক্রমে ক্রমে
কেহ কেহ কাবামুক্ত হইতেছেন। তাঁহারা ত্যাগ স্বীকার
ও দুঃখ ভোগ করিয়া নেতৃত্বের বোধ্যতা সপ্রমাণ
করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদেব সকলকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন
কবিতেছি।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় কয়েকদিনের মধ্যেই
দেশেব অবস্থা বিশেষভাবে জ্ঞানিয়া লইতে পারিবেন।
অসহযোগীগণ তাঁহার পরামর্শ গুনিবার জন্য ব্যগ্র



শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ (কারামুক্তির পর)

আছেন। শীঘ্রই তিনি পরামর্শ দিতে পারিবেন। তিনি জেলে থাকিবার সময় জেলসমূহের ইন্সপেক্টর-জেনারেল বলিয়াছিলেন, যে, তিনি কারামুক্ত হইয়া আবার ব্যারিষ্টারিতে প্রবৃত্ত হইবেন। বেসরকারী লোকেরাও এ বিষয়ে কানাখুশা করিতেছিলেন। তিনি এই-সব

গুজবের প্রতিবাদ করিয়াছেন। সমালোচকেরা এই কথা রটাইয়াছিলেন, যে তিনি ডুমুরাও-রাজের মোকদ্দমায় এক পক্ষে ব্যারিষ্টারি করিবেন। যদি তিনি তাহা করেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে না। কারণ, তিনি যখন ব্যারিষ্টারি ত্যাগ করিবার সংকল্প

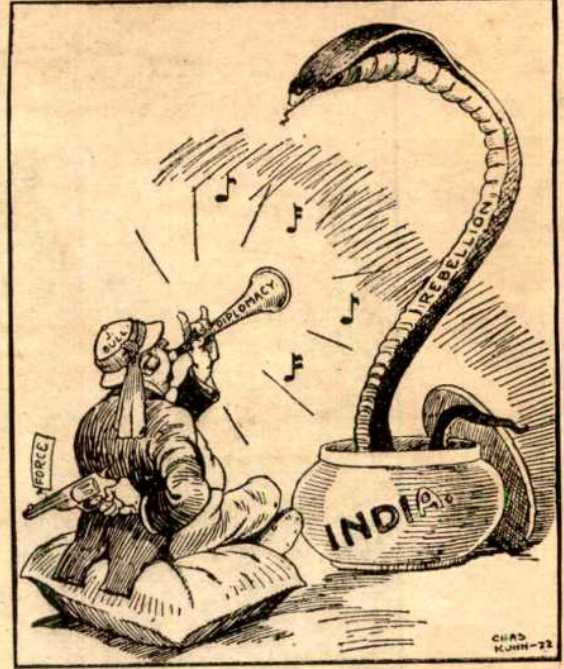
প্রকাশ্য সভায় জ্ঞাপন করেন, তাহার পর একথাও বলেন, যে, ডুমরাওঁএর মক্কেলের নিকট তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন, এবং তজ্জন্য তিনি সেই মোকদ্দমাটি করিবেন।

শ্রীযুক্ত স্বাসচন্দ্র বসুও কারামুক্ত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ। সাধারণতঃ আমরা, অধ্যাপক শিক্ষক ও ছাত্রদের চলিত রাজনীতির সহিত কোনই সম্পর্ক থাকা উচিত নহে, এ মতের পক্ষপাতী নহি। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি গবর্ণমেন্টের মনের ভাব ও আচরণ ঘেঁরপ, তাহাতে অসহযোগী কোন অধ্যাপক বা শিক্ষকের রাজনৈতিক প্রচেষ্টার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রাখিয়া উহার কর্ম্ম হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি না। তাহাতে শিক্ষাদান কার্যে ব্যাঘাত ঘটে। যে শিক্ষক সর্বদা আপনাকে বিপদ হইতে দূরে রাখিতে ব্যগ্র, ছাত্রেরা তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করে না সত্য, কিন্তু যাহাদের অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। এরূপ শিক্ষকগণ দেশমধ্যে কিরূপে সাধারণ শিক্ষা, নানাবিধ বৃত্তিশিক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের শিক্ষার বিস্তার হইতে পারে, তাহার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিলে ভাল হয়।

রাজনৈতিক সাপুড়িয়া

আমেরিকার একটি কাগজ হইতে এখানে একটি ব্যঙ্গচিত্রের প্রতিলিপি দিলাম। ছবিটির ব্যাখ্যাকর্ত্তা ভারতবর্ষের জাতীয় প্রচেষ্টাকে সাপ এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে সাপুড়িয়া করিয়া আঁকিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতশাসন আইনের সংস্কার ও তদনুযায়ী ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি এই সাপুড়িয়ার তুবড়ীর বাদ্য। যদি এই বাদ্যে সাপ মুগ্ধ না হয়, তাহা হইলে সাপুড়িয়ার হাতে যে অস্ত্র আছে, তাহা প্রয়োগ করা হইবে।

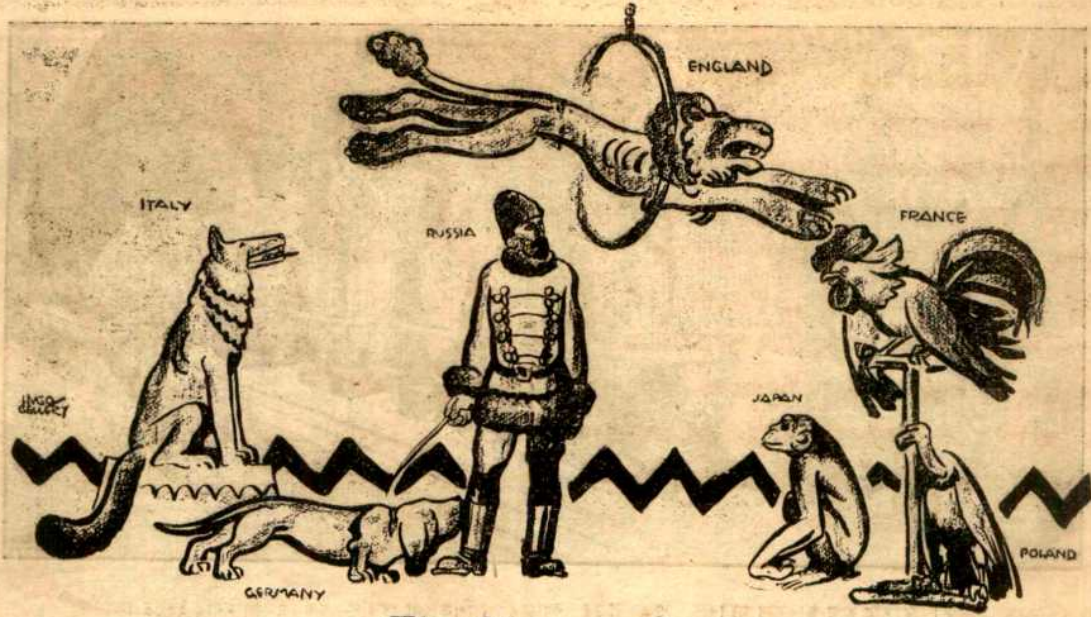
ভারতবর্ষের লোকেরা যে প্রকার রাজনৈতিক পরিবর্তন দ্বারা স্বরাজ লাভ করিতে চাহিতেছে, তাহা জগতের অতীত ইতিহাসে লিখিত বিপ্লব-ও বিদ্রোহ-সমূহের মত নহে। আমরা আমাদের বিরোধীদিগকে আঘাত করিতে চাহিতেছি না। সহযোগী অসহযোগী



সাপ-খেলা।—মিঠে বুলির বাঁশী ও নিপীড়নের অঙ্গি।

(ইণ্ডিয়ানাপোলিস হইতে)

উভয়দলের ভারতীয়েরাই অহিংসাপন্থী। সুতরাং ভারতবর্ষের সমুদয় বা কোন রাজনৈতিক দলকে দংশনোদ্যত সর্প বলিয়া আঁকিলে তাহা ঠিক হয় না। অত্য়দিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টও বলিতে পারেন, “আমরা শাসনসংস্কার-আইন ও ব্যবস্থাপক সভা আদি দ্বারা ভারতবাসীদিগকে মন্থমুগ্ধ করিয়া ভুলাইয়া রাখিতে চাই না, আমরা ভণ্ড নহি, আমরা সত্যসত্যই ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে আত্মকর্তৃত্ব দিতে চাই।” ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের এরূপ কথা যে সত্য হইতেই পারে না, এমন বলা যায় না; কিন্তু প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জের ভারতীয় সিভিল-সার্বিস সম্বন্ধীয় সেদিনকার বক্তৃতা পড়িয়া মডারেটরাও গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছেন। অবশ্য, ব্যঙ্গচিত্রটি লয়েড জর্জের উল্লিখিত বক্তৃতার কয়েক মাস পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, সাপুড়িয়ার হাতের অস্ত্রটা কোনপ্রকার ব্যাখ্যা দ্বারা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কারণ, গবর্ণমেন্ট শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া, কয়েক বৎসর হইতে, “শান্তি ও শৃঙ্খলা”, “আইন ও



The Circus at Genoa

জেনোয়ার সার্কাস (লিবারেটর পত্র হইতে)

শৃঙ্খলা", প্রভৃতি রক্ষা করিবার নিমিত্ত গুলি চালাইবার পক্ষপাতী হইয়াছেন।

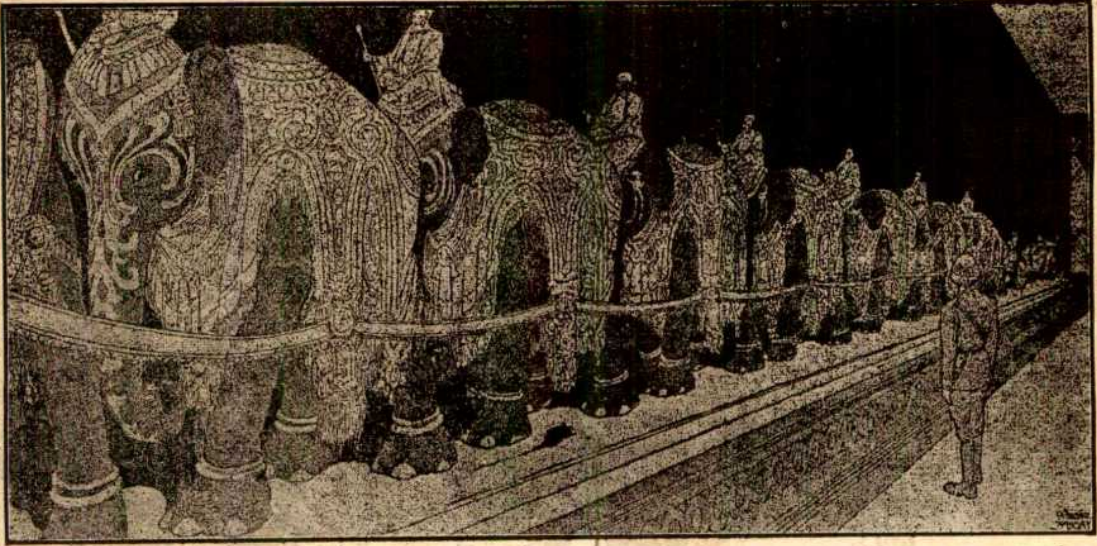
জেনোয়ার সার্কাস

মহাযুদ্ধে ইউরোপের প্রধান প্রধান জাতির বিস্তার ক্ষতি হইয়াছে। মাছুষ হত, আহত, অঙ্গহীন, অক্ষম হইয়াছে লক্ষ লক্ষ; অর্থনাশেরও পরিমাণ করা অতি কঠিন। যুদ্ধের অবসানের পর হইতে ইউরোপের বিজয়ী জাতিরা চেষ্টা করিতেছেন, যে, তাঁহারা, বিশেষতঃ ফ্রান্স, কি প্রকারে জার্মেনীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিবেন, কি প্রকারে নিজেদের ভাড়া ঘর গড়িয়া তুলিবেন, কি প্রকারে জার্মেনীকে চিরকালের মত হীনবল করিয়া রাখিবেন, কি প্রকারে এশিয়া ও আফ্রিকার ভূমি ও অস্ত্রাশ্রয় সম্পত্তি এবং বাণিজ্যের স্ববিধা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবেন, এবং কি প্রকারে রুশিয়ার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিবেন, বলশেবিকদের প্রভাব নষ্ট করিবেন ও রুশিয়ার কাঁচা মাল নিজেদের দেশে আমদানী ও নিজেদের কারখানায় প্রস্তুত পণ্যক্রম রুশিয়ায় রপ্তানী

করিয়া ধনবান হইবেন। কেরোসীন্ ও অল্পবিধ ভূগর্ভস্থ তৈল যে-যে দুর্বল দেশে আছে, তাহার মালিক হওয়াও বিজিতাদের অত্যন্ত মল্ল্য।

এই-সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত, যুদ্ধ শেষ হইবার পর, অনেক কন্ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। জেনোয়ার কন্ফারেন্স তাহাদের মধ্যে অত্যন্তম। উহাতে বিজয়ীরা কাজ হাসিল করিতে পারে নাই, কিন্তু রুশিয়ার প্রতিনিধিরা যে খুব খেলোয়াড় তাহা দেখা গিয়াছে। রুশিয়া ও জার্মেনী অল্প সব জাতিদের মুখাপেক্ষা না করিয়া জেনোয়ায় বাণিজ্য ও আত্মরক্ষা বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বুঝাপড়া করিয়া লইয়াছে।

রুশিয়ার চতুরতা উপলক্ষ করিয়া আমেরিকার লিবারেটর সংবাদপত্র জেনোয়ার কন্ফারেন্সকে একটা সার্কাসের মত করিয়া আঁকিয়াছে। তাহাতে রুশিয়ার নির্দেশ মত অস্ত্রাশ্রয় জাতির প্রতিনিধিরা পী জন্তরা নানাবিধ খেলা দেখাইতেছে।



আট হাতীর রথে ভারতীয় মহারাজা, ও ইংলণ্ডের যুবরাজ। (শিকাগো হেরাল্ড এণ্ড এঞ্জািনিয়ার হইতে)

আট হাতীর রথ

ইংলণ্ডের যুবরাজ যখন ভারতবর্ষ দেখিতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি দেশী রাজাদের রাজ্যসকলেই অধিক সময় যাপন করিয়াছিলেন, এবং তথায় যেক্রপ জাঁকজমকের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনার ও মনোরঞ্জনর চেষ্টা হইয়াছিল, ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে তেমন হয় নাই। একজন মহারাজার রাজ্যে তিনি যখন যান, তখন তাঁহাকে যে-সব আড়ম্বর দেখান হয়, তাহার মধ্যে মহারাজার রোপ্যানিধিত আট হাতীর রথ একটি। তাহার ছবি একখানা আমেরিকান কাগজে বাহির হইয়াছে। আটটা হাতীর পশ্চাতে হস্তীবানে মহারাজা আসীন, অদূরে দাঁড়াইয়া ইংলণ্ডের যুবরাজ তাহা দেখিতেছেন। এই চিত্র অবলম্বন করিয়া আমেরিকান কাগজখানার সম্পাদক যে-সব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা আগষ্টমাসের মডার্ন রিভিউ কাগজে তাহার অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। আমেরিকান সম্পাদকের বক্তব্যের সার কথা এই, যে, মানুষের বাহিরের আড়ম্বর কোন কাজের নয়, ভিতরের আস্বাব অর্থাৎ নানাবিধ মানসিক শক্তিই মানুষকে বড় করে। তিনি নিজের দেশের ধনী লোকদেরও

রেহাই দেন নাই। তাঁহারা মনে করেন, যে, তাঁহারা অনেক হাজার টাকা দামের মোটর গাড়ীতে চড়েন বলিয়া তাঁহারা, যে-সব লোকের পা-ছুখানা মাত্র অবলম্বন, তাদের চেয়ে বড় মানুষ; কিন্তু বাস্তবিক বড় তাহারা বাহারা মানসিক শক্তিতে বড়।

একটা হাতীতেই দশবিশ গুণা মানুষকে টানিতে পারে; অথচ একজন মহারাজাকে টানিবার জন্য আট-আটটা হাতীর দরকার হইল। এইরূপ মহারাজাগুলো বড়, না স্কটল্যান্ডের সেই ছেলেটা বড়, যে ষ্টীম এঞ্জিন-রূপ লোহার এমন একটা বাষ্পীয় হাতী প্রথম নির্মাণ করিয়াছিল বাহার এক-একটাতে এক-একটা রেলওয়ে ট্রেন টানিয়া লইয়া যায়?

এক-একটা হাতী বাহা যায়, তাহাতে বহুসংখ্যক মানুষের অন্নসংস্থান হইতে পারে। সকল দেশী রাজ্যের সকল মানুষই স্বপুষ্ট নহে। অনশনশ্রিষ্ট মানুষদের ক্ষুধা নিবারণ বাহার দ্বারা হইতে পারিত, তাহার দ্বারা কতকগুলি হাতী পুষিবার কি সার্থকতা আছে?

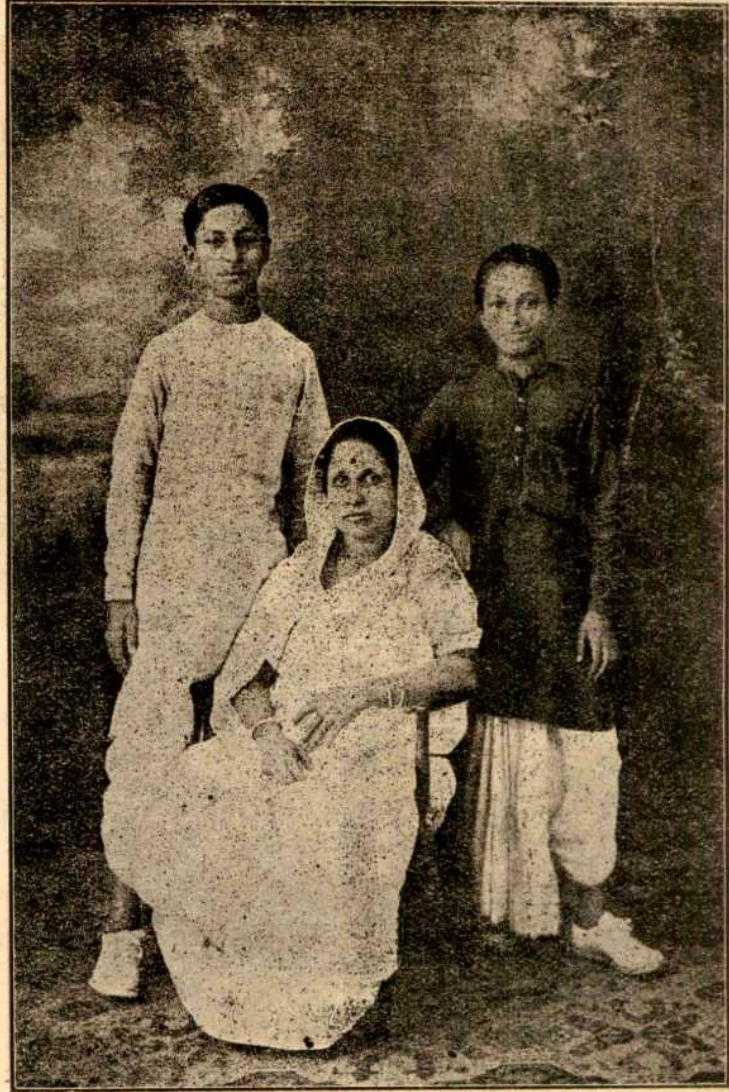
বিদেশী বস্ত্র ক্রয় নিষেধ

কলিকাতার বিদেশী কাপড়ের সওদাগরেরা মহাত্মা

গান্ধীর নিকট অনেকেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে, তাঁহাদের হাতে যত বিদেশী মাল আছে, তাহা বিক্রী হইয়া গেলে তাঁহারা আর বিদেশী কাপড় আমদানী করিবেন না। কিন্তু সে মাল কি অফুরন্ত? এখনও ত সওদাগরেরা বিদেশী কাপড় বিক্রী করিতেছেন!

তাঁহারা স্বয়ং যখন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন না, তখন বিদেশী কাপড়ের কাটুতি বন্ধ বা হ্রাস করিয়া দেশী কাপড়ের ব্যবহার বাড়াইবার চেষ্টা অন্তপ্রকারে করা আবশ্যিক। কিন্তু কোন প্রকার বল-প্রয়োগ যেমন গৃহিত তেমনি ব্যর্থ হইবে। যাহা দেশের পক্ষে উপকারী, মানুষকে বুঝাইয়া তাহা করিতে প্রবৃত্ত করা, কিম্বা যাহা দেশের পক্ষে অনিষ্টকর মানুষকে বুঝাইয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত করা, ধর্মনীতি-অনুসারে বৈধ, আইন-অনুসারেও বৈধ। অথচ দেখা যাইতেছে, যাহারা বড়বাজারে কাপড়ের দোকান-সকলের সম্মুখে বা নিকটে দাঁড়াইয়া বিদেশী কাপড়ের ক্রেতাদিগকে উহা না-কিনিতে অহুরোধ করিতেছেন, কোন প্রকার বলপ্রয়োগ করিতেছেন না, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছেন।

এবারকার বিদেশী বস্ত্র ক্রয় নিষেধ চেষ্টার প্রবর্তন করিয়াছেন শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটি বালকমাত্র। সেও এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাকে জেলে যাইতে হইয়াছে। শ্রীমতী হেমপ্রভার সহিত আরো অনেক মহিলা ও ভক্তলোক যোগ দিয়াছেন। শুধু বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার না-করিতে অহুরোধ করিয়া দেশী বস্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে



শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার ও পুত্রদ্বয়

পারা যাইবে না, জানি। কিন্তু তাহা হইলেও, যাহারা ছুংথকে বরণ করিয়া লইয়া এই নিষেধবার্তা জানাই-তেছেন, তাঁহারা কৃতজ্ঞতার পাত্র।

যদি হাতের তাঁতে বোনা চরুখায় কাটা সূতার কাপড় না পাওয়া যায়, তাহা হইলে দেশী কাপড়ের কলে প্রস্তুত কাপড় ব্যবহার করা উচিত; বিদেশী কাপড় ব্যবহার করা উচিত নয়। খন্দর ব্যবহার করা কেন উচিত, তাহা অনেকবার বলিয়াছি। যথেষ্ট পরিমাণে ঝাঁটি খন্দর যাহাতে উৎপন্ন হয়, এবং যে-

সকল সহরে ও গ্রামে এখন বিদেশী কাপড়ের দোকান আছে, তাহা যাহাতে খদ্দের দোকান স্থাপিত হয়, তাহার বন্ধাবণ করা কংগ্রেসকর্মীদের একান্ত কর্তব্য। চরখার সূতা যাহাতে ক্রমশঃ আরো শক্ত ও মিহি হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা দুঃসাধ্য নহে; কারণ কলের সূতার প্রবর্তনের পূর্বে চরখায় কাটা সূতা হইতেই ঢাকাই মসলিন তৈরি হইত। আমরা বিলাসিতার জগু মিহি শক্ত সূতা কাটিতে বলিতেছি না। মিহি শক্ত সূতা কাটিলে অল্প ভুলায় বেশী সূতা ও কাপড় হইবে, এবং যাহারা মোটা ভারী কাপড় পরিতে অনিচ্ছুক, তাহাদের আপত্তি খণ্ডিত হইবে। আর একটি দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অতিপৌরে খদ্দের সৌখীন লোকদের পোষাকী কাপড় নহে; ইহা দেশের সকল শ্রেণীর লোকদের দ্বারা ব্যবহৃত হউক, দেশহিতৈষীদিগের ইহাই উদ্দেশ্য। দেশের অধিকাংশ লোক গরীব। সূতরাং খদ্দের দাম যাহাতে ক্রমশঃ কমিতে থাকে, সেই চেষ্টা করিতে হইবে।

কোন কোন কাপড়ে খদ্দের সম্বন্ধে উপহাস-বিদ্রূপ দেখিতে পাই। ইহার বসগ্রহণ করিতে আমরা অসমর্থ। বস্ত্রের অঙ্গচ্ছেদের পর-বে স্বদেশী আন্দোলন হয়, তাহাতে স্বজাতির উন্নতিপ্রয়াসী সকল রাজনৈতিক দল বোগ দিয়াছিলেন। এখন কেন সে ভাব দেখিতে পাই না? খদ্দের গোড়ামি না করুন, কিন্তু উহা লইয়া বিদ্রূপ করিবার কারণ কি? উহাও ত এক প্রকার দেশী কাপড়? বিদেশী কাপড় কিনিলে কোন প্রকার পুণ্য হয়, এবং খদ্দের কিনিয়া পরিলে কোনরূপ পাপ হয়, ইহা কেহ বলিতে পারেন কি? অন্য দিকে, বিদেশী কাপড় পরিলে পাপ হয়, ইহাও আমরা মনে করি না; কিন্তু দেশী কাপড় প্রাপ্তব্য হইলেও বিদেশী বস্ত্র ক্রয় ও ব্যবহার করা যে গর্হিত সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। খদ্দের কিনিয়া ব্যবহার করিলে তাহাতে স্বদেশবাসী বিস্তর লোকের এবং স্বজাতির মঙ্গল হয়, ইহাও আমাদের বিশ্বাস।

অনেকে এই বলিয়া তর্ক করেন, যে, তোমরা

অমুক অমুক বিদেশী জিনিষ ব্যবহার কর, যেমন মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি নানা বিদেশী কল, বিদেশী কাগজ, বিদেশী বৈজ্ঞানিক বস্তু ইত্যাদি, অথচ বিদেশী কাপড়ের বেলাতেই তোমাদের যত আপত্তি! এইরূপ তর্ক যাহারা করেন, তাহাদের প্রতি নিবেদন এই, যে, সকল রকম বিদেশী জিনিষের ব্যবহার বন্ধ করা অসাধ্য ও অবাস্তবীয়, কিন্তু তাই বলিয়া, যাহা আমাদের দেশে আগে প্রস্তুত হইত, এবং এখনও হইতে পারে, সে রকম স্বদেশী জিনিষ উৎপাদন ও ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে না, এমন কেন মনে করা হয়?

আমরা খাটি খদ্দের বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে ছাপিতে প্রস্তুত আছি। এরূপ বিজ্ঞাপন কংগ্রেস কমিটির মারফতে কিম্বা বিজ্ঞানচাৰ্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের মত লোকের অহুমোদন সহ আমাদের নিকট প্রেরিত হইলে, আমরা আহ্লাদের সহিত উহা ছাপিব। উহাতে কেবল বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা, এবং ভিন্ন ভিন্ন রকম কাপড়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ রং ও মূল্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিবরণ থাকা আবশ্যক।

ডাকাত ও গুণ্ডার অত্যাচার

কলিকাতায় গুণ্ডার এবং মফঃস্বলে ডাকাতের অত্যাচার খুব হইতেছে। গুণ্ডারা প্রায় সকলেই বস্ত্রের বাহিরের লোক। ডাকাতদের মধ্যেও এরূপ লোক অনেক আছে। এ অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টা করা গবর্ণমেন্টের অরণ্যকর্তব্য। কিন্তু যাহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ, কোন গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। সূতরাং এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টের কর্তব্য যতটা আছে, দেশের লোকদের কর্তব্য তদপেক্ষা অধিক আছে।

গবর্ণমেন্ট পুলিশের সংখ্যা বাড়াইতে পারেন। কিন্তু তাহাতে পুলিশ বিভাগের ব্যয় বাড়িবে ও তাহাতে আপত্তি হইবে। কিন্তু যাহারা আপত্তি করিবেন, তাহাদিগকে অস্ত্র সছপায় দেখাইয়া দিতে হইবে।

বাঙালীদের পেটে অন্ন নাই; তাহার উপর ম্যালেরিয়া, হৃৎ ক্রমি, উদরাময়, ইনফ্লুয়েন্জা তাহারা জর্জরিত। ইহাতে শরীর ও মন দুর্বল ও নিপুঞ্জ হইয়া গিয়াছে।

একপ লোকদিগের হাতে অস্ত্র দিলেও তাহারা অনেক সময় অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না। কখন কখন হয়ত ডাকাতরা অস্ত্র কাড়িয়া লইতেও পারে। তথাপি যাহারা আত্মরক্ষার জন্ত অস্ত্র চায়, তাহাদের অস্ত্র-প্রাপ্তির উপায় এখনকার চেয়ে সহজ করিয়া দেওয়া উচিত। দেশের অন্নবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্ত সম্মিলিত ও ব্যক্তিগত একাগ্র চেষ্টা হওয়া একান্ত আবশ্যিক। যাহাতে গায়েব জোর বাড়ে তাহার জন্ত বাল্যকাল হইতে শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি আরো বেশী মন দেওয়া দরকার। বালকদেব নানাবিধ কুঅভ্যাস যাহাতে না জন্মে, ও ব্রহ্মচর্য রক্ষিত হয়, সেইরূপ শিক্ষা ও সংসর্গের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। লাঠি হইতে আরম্ভ করিয়া অস্ত্র নানারূপ অস্ত্রব্যবহার করিতে সকলের অভ্যস্ত হওয়া, এবং যুষ্টিযুদ্ধ ও জাপানী জিউজুৎসু সকলের শিক্ষা করা উচিত।

কিন্তু গায়েব জোর যতই বাড়ুক, অস্ত্রশস্ত্র যতই থাকুক, এবং অস্ত্রচালনার অভ্যাস যতই থাকুক না কেন, মনের জোব ও সাহস না থাকিলে সবই বৃথা। মনের জোর ও সাহস কেমন করিয়া বাড়িতে পারে, তাহা হঠাৎ এক কথায় বলিয়া দেওয়া কঠিন। কিন্তু বাঙালীর ভীকতা কেন হয়ত দ্রুত কমিতেছে না, হয়ত বা বাড়িতেছে, তাহার কোন কোন কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। ইস্কুলে দেখা যায়, এক-একটা ক্লাসের ২৩টা ছুট বালকের ভয়ে সমস্ত ক্লাস তটস্থ হইয়া থাকে; অথচ ঐ ২৩টা ছাত্র আর-সকলের চেয়ে বলিষ্ঠ না হইতে পারে। ছুট ছেলেরা যেমন ‘মরিয়া’ ও একজোট, ভাল-ছেলেরা যদি তেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও একতান্ত্রে বদ্ধ হয়, তাহা হইলে ছুট ছেলেদের প্রতাপ সহজেই নষ্ট করা যায়। সেইরূপ যে গ্রামে ডাকাতী হয়, তাহার অধিবাসীরা যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও একমন হন, তাহা হইলে তাহারা ডাকাত তাড়াইতে ও কোন কোন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন। ইহাতে অবশ্য বিপদ আছে। কিন্তু ডাকাতদের সহিত যুদ্ধ না করিলেও ত বিপদ ঘটে, ডাকাতরা ত নিরীহ অবিরোধী লোকদেরও খুন জখম করে। ডাকাতদের হাতে হত, হতসর্ক্স বা জখম

হইবার পালা কখন কাহার হইবে, তাহারও স্থিতি নাই। কলিকাতায় গুণ্ডার হাতে কখন কাহার অর্থ-নাশ বা প্রাণসংশয় ঘটবে, তাহারও স্থিতি নাই। গুণ্ডা কাহাকেও আক্রমণ করিতেছে দেখিলে, দর্শকেরা যদি বিপন্ন ব্যক্তির সাহায্যার্থ অগ্রসর হন, তাহা হইলে গুণ্ডার অত্যাচার কমে। কিন্তু যদি সবাই “চাচা, আপনা বাঁচা” নীতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে কাহারও আত্মরক্ষার উপায় হয় না।

আমাদের ভীকতার কারণ আর-একটি এই, যে, আমরা কেবলই বলি ও শুনি, যে, বাঙালী ভীক ও কাপুরুষ, বাঙালী অমুক জায়গায় আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টাও না করিয়া মার খাইল এবং দর্শকেরা কেবল দাঁড়াইয়া দেখিল বা পলায়ন করিল; কিম্বা অমুক গ্রামে ডাকাতী হইয়া গেল, ডাকাতদের সংখ্যা ১০১২০১২৫ ছিল, তাহারা মার ধরু করিয়া অত্যাচার করিয়া এত হাজার টাকার জিনিষ লইয়া গেল, গ্রামবাসীরা কিছু করিল না, বা করিতে পারিল না। ইহাতে আমাদের ভীকতা বাড়ে, আমরা যে অসহায়, এই ভাব বদ্ধমূল হয়। কিন্তু ১০১২০ জন ডাকাতদের সাহায্য কে করে? তাহারা অনেক শত বা হাজার লোকের বাসভূমি গ্রাম থানা লুট করে কি সাহসে? নিজের বৃকের পাটা বড় করা চাই। আর যদি ভগবানের উপর নির্ভরের কথা বল, তাহা হইলেও ত ইহা নিশ্চিত, যে, ভগবান ডাকাতদের পক্ষে নহেন, সংলোকদেরই পক্ষে। কিন্তু তিনি ভীক কাপুরুষেরও পক্ষে নহেন, ইহাও নিশ্চিত।

তবে কি, “আমরা ভীক, আমরা ভীক,” না বলিয়া ও না শুনিয়া, আমরা ক্রমাগত কল্পনা করিয়া বলিতে ও শুনিতে থাকিব, “আমরা সাহসী, আমরা বীর”? তাহা নয়;—মিথ্যা বলিলে ও কল্পনা করিলে কখনও উন্নতি হয় না। সত্যের পথই অবলম্বন করিতে হইবে।

ইহা সত্য নহে, যে, বাঙালী সর্বত্র সর্বদা ব্যক্তিগত ভাবে কেবলই মার খাইয়াছে, কখন আত্মরক্ষা করিতে ও ছুর্ত্ত আততায়ীকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। ইহাও সত্য নহে, যে, বঙ্গের কোনও গ্রামের লোকেরা

ডাকাত তাড়াইতে বা ধরিতে পারে নাই, ডাকাতদের হাতে কেবলই হতসংসর্গ, হত ও আহত হইয়াছে। কোন কোন বাঙালী আততায়ীকে পরাস্ত করিয়াছে, ইহা সত্য কথা। কোন কোন গ্রামের লোক ডাকাত তাড়াইয়াছে ও ধরিয়াছে, ইহাও সত্য কথা। সাহসের সহিত ডাকাত তাড়ান ও গ্রেপ্তার করার জন্য অনেকে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক পুরস্কৃত হইয়াছেন, ইহাও সত্য কথা। এইসব সত্য ঘটনা সন্ধান করিয়া যদি খবরের কাগজে ও পুস্তকাকারে প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে অনেক সুকল হইতে পারে। কিন্তু সাবধান হইতে হইবে, ঘটনার বৃত্তান্তে যেন একটুও অত্যাতি, মিথ্যার ভেজাল বা আফালন না থাকে। বিবরণগুলি হইতে আমরা কেবল এই উপদেশ ও অনুপ্রাণনা লাভ করিতে চেষ্টা করিব, যে, অল্প বাঙালীরা যেকপ মনুষ্যত্ব দেখাইয়াছেন, আমবাও যেন সেইরূপ মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই।

বাঙালী কি “ঘরকুনো” ?

[প্রবাসের প্রবাসী হইতে উদ্ধৃত]

নানা দেশের ও প্রদেশের লোকেরা বঙ্গে আসিয়া অর্থ-উপার্জন কবে, ও অনেকে ধনী হয়। তাহাব মধ্যে দৈহিক-শ্রমজীবীর সংখ্যাই অধিক। দৈহিক শ্রম দ্বারা রোজ্জগার করিয়া খাইবার নিমিত্ত, ওড়িয়া, হিন্দু-স্থানী, বিহারীদের মত হাজাব হাজার বাঙালী ঘব ছাড়িয়া অগ্নত্র যায় না। তাহাব কারণ কি ? আগে হয়ত এ কথা বলা যাইত, যে, জমীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও উর্দুরতা বশতঃ বঙ্গের সাধারণ লোকদের অবস্থা ভাল বলিয়া তাহারা ঘরেই থাকে। কিন্তু এখন ত সেকথাও জোর করিয়া বলা যায় না। এখন কোন কারণে বঙ্গে অল্পবষ্ট হইলে অগ্নাত্র প্রদেশের লোকদের চাঁদার উপর বিপন্ন লোকদের প্রাণধারণ নির্ভর করে। তবে সাধারণ বাঙালী খাইতে না পাইলেও কেন বাংলা ছাড়িয়া অগ্নত্র যায় না ? ইহার কারণ অনুসন্ধান করা কর্তব্য। একটা কারণ এই মনে হইতে পারে, যে, বাঙালী “ঘরকুনো”, কিন্তু লেখাপড়া-জানা বা বিচারী বাঙালী ত পৃথিবীর নানা

দূবদেশে যায়। সম্ভবতঃ সাধারণ বাঙালী অনিশ্চিতের উপর ততটা নির্ভর করিতে চাব না। কোন একটা আশ্রয়, যেমন কেরানীগিবি বা অগ্ন চাকরী, মিলিলে বাঙালী দূরতম স্থানে যাইতে রাজী হয়। কিন্তু বড় বা ছোট ব্যবসা, কিস্ব কারিগরী বা দৈহিক শ্রমরূপ অনিশ্চিত রোজ্জগারেব আশায় বাঙালী হয়ত গৃহ ছাড়িয়া দূবে যাইতে চাব না। ইহা হয়ত বাঙালী-প্রকৃতির একটা দুর্বলতা। কিন্তু এই দুর্বলতা সে সর্বলরই আছে, তাহা নয়। কারণ, চাকরী না লইয়াও ত অনেক লিখন-পঠনক্ষম বাঙালী ওকালতী প্রভৃতি করিবার নিমিত্ত দূবদেশে যায়। বহু প্রবাসী বাঙালীর জীবন-চরিত হইতে ইহা জানা যায়। সম্ভবতঃ বঙ্গের বাহিরের জগতের জ্ঞান বে-বাঙালীর যত কম, উক্ত দুর্বলতা তাহার তত বেশী, যাহাব ঐ জ্ঞান যত বেশী, তাহার এই দুর্বলতা তত কম। বাংলা দেশের উর্দুরতা বশতঃ বহু শতাব্দী ধবিয়া সাধারণ বাঙালীর জীবিকা-অন্বেষণে কোথাও না-যাওয়ায় বে অভ্যাস জন্মিয়া গিয়াছে ও যে অজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছে, অনশনক্লিষ্ট আধুনিক বাঙালীর সেই অভ্যাস ও অজ্ঞতা রহিয়া গিয়াছে। ইহা দূব কবিতো হইবে। সম্ভবতঃ অগ্নাত্র প্রদেশ-সকল অপেক্ষা বাংলা দেশ অধিকতর গ্রামবহুল বলিয়া অধিকাংশ বাঙালী পাড়ারগেয়ে, এবং পাড়ারগেয়ের প্রকৃতিগত দুর্বলতা ও অজ্ঞতা তাহাদের অধিক। কলিকাতা, হাবড়া ও ঢাকা বাদ দিলে বঙ্গে শহরের মত শহর, লক্ষাধিক মানুষের শহর, নাই; অগ্ন অনেক প্রদেশে বিস্তর আছে। সাধারণ বাঙালীর ঘরকুনো ভাব ঘুচাইতে হইবে। পৈত্রিক ভিটার মায়ায় না-খাইয়াও সেখানে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। পূর্ববঙ্গেব মুসলমানদের এ মায়া কম; তাই তাহারা নূতন চরের আবাদ করে, জাহাজে চাকর হয়, নানা সাহসেব কাজ করে। এই জগ্ন তাহাদের অনেকের অবস্থা ভাল। গ্রাম্য বাঙালীকে মধ্যে মধ্যে ঠাই-নাড়া করিলে হয়ত তাহার কিছু উন্নতি হইতে পারে।

বাঙালীর অবাঙালীর একটি প্রভেদ

আমরা অনেক ঘংসর ধবিয়া “প্রবাসী”তে প্রবাসী

বাঙালীদের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় এই-সকল বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। তাঁহার লিখিত জীবনচরিতগুলি “বঙ্গের বাহিরে বাঙালী” নাম দিয়া পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। তিনি এখনও নূতন নূতন জীবনচরিত “প্রবাসী”তে দিতেছেন। এই-সকল বিবরণ হইতে পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন, যে, লিখন-পঠনক্ষম ভদ্র শ্রেণীর বাঙালীরা বহুদূরবর্তী স্থানে গিয়া অর্থ ও ধন উপার্জন করিয়াছেন, এবং অনেকে নানাপ্রকার লোকহিতকর কাজও করিয়াছেন। নূতন জায়গায় ভিন্নভাষাভাষী লোকদের মধ্যে গিয়া নিজ বুদ্ধি ও কৰ্ম্মঠতা দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। অতএব সব বাঙালীই যে ঘব-কুনো এবং পল্লী-জননীর অকল ধরিয়া বসিয়া থাকিতেই অভ্যস্ত, বা কেবল তদ্রূপ পৌরুষবিহীন জীবনেরই ঘোগ্য, ইহা সত্য নহে। কিন্তু বাঙালী ও অবাঙালীদের মধ্যে একটি প্রভেদ লক্ষ্য ও উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। ছোটনাগপুর, বিহার, ওড়িশা, আগ্রা-অধোধ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশ হইতে হাজার হাজার অশিক্ষিত লোক রোজ্জগারের জন্ত জয়স্থান হইতে দূরে গিয়াছে; কিন্তু বাংলা দেশ হইতে অশিক্ষিত লোকেরা এত বেশী সংখ্যায় রোজ্জগারের জন্ত পৈত্রিক ভিটা ছাড়িয়া দূরে যায় নাই। বাংলা দেশের উর্ধ্বরতা এবং, কিয়ৎ-পরিমাণে, ভূমির স্বাধীনতার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইহার কারণ। ভীকতা বা প্রকৃতিগত ঘরকুনো ভাব যে ইহার কারণ নহে, তাহা শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর বাঙালীদের বিদেশযাত্রা হইতেই প্রমাণ হয়। ইহার আরও এক প্রমাণ এই, যে, পূর্ববঙ্গের নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত বাঙালী মাঝি-মাল্লারা লব্ধবরূপে জাহাজে কাজ লইয়া পৃথিবীর নানাদেশে যায়, এবং ঝড়তুফানের মধ্যেও ষ্টেনাবিক্রদের সমান সাহস ও দক্ষতার সহিত কর্তব্য সাধন করে।

কারণ বাহাই হটক, কথাটা সত্য, যে, ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের যত লোক বিদেশে যায়, বঙ্গের তত-লোক বিদেশে যায় না। নিজের লোকদের মধ্যে

থাকিলে বোকা অডপ্রকৃতির লোকেরাও কোনপ্রকারে জীবনধারণ করিতে পারে। কিন্তু বিদেশে গিয়া রোজ্জগার করিয়া থাইতে হইলে কতকটা চালাক-চতুর কৰ্ম্মিষ্ঠ ও সপ্রতিভ না হইলে চলে না। এই জন্ত, বাঙালী ভারতবর্ষের অন্তর্জাতিদের চেয়ে বুদ্ধিতে হীন না হইলেও, অধিকাংশ বাঙালী, অর্থাৎ পল্লীগ্রামের নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত বাঙালী, অন্যান্য প্রদেশের ঐ শ্রেণীর লোকদের মত বিদেশগামী না হওয়ায় চালাক-চতুর কৰ্ম্মিষ্ঠ ও সপ্রতিভ হয় না। “আমরা বাঙালীরা সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান,” এই অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া থাকিলে চলিবে না। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বাঙালীর গায়ের জোর অন্যান্য প্রদেশের লোকদের চেয়ে কম, ইহা বলিলেই নিরক্ষর লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ক্ষুধিত ও বেকার অবস্থার সম্যক কারণ ব্যাখ্যাত হইবে না। কেন-না, যে-সব ওড়িশা বিহারী হিন্দুস্থানী কারিগর কলিকাতায় নানাবিধ কাজ করিয়া খায়, তাহাদের দৈহিক বল বা বুদ্ধি তাহাদের শ্রেণীর বাঙালীদের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশী বলি যায় না। আমরা যে কারণের উল্লেখ করিতেছি,—তাহাও একমাত্র কারণ নহে। তাহাতে কিছু সত্য আছে, ইহাই আমাদের অহুমান।

অধিকাংশ বাঙালীর পাড়ারগেয়ে ভাবের আর-একটা কারণ ভাষা। তাহাদের মাতৃভাষা হিন্দী বা হিন্দুস্থানী তাহাদের অনেক সুবিধা আছে। কল-কারুখানার মালিকেরা বহুস্থলে ইউরোপীয়। তাহাদের মধ্যে যত লোক চলনদই হিন্দুস্থানী বলিতে পারে, তত লোক অন্ত কোন ভারতীয় ভাষা বলিতে পারে না। রেল, ষ্টীমারে, জাহাজের বন্দরে হিন্দুস্থানীর যত প্রচলন, অন্ত ভাষার তত প্রচলন নাই। এই কারণে হিন্দী-ভাষীরা যত কাজ বা কাজের সুবিধা পায়, বাংলা-ভাষীরা তাহা পাইতে পারে না। আরও একটা ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, যে, অন্যান্য যে-সব প্রদেশের মাতৃভাষা হিন্দী নহে, তাহারা হিন্দী বলিতে যতটুকু অভ্যস্ত, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙালীরা ততটুকু অভ্যস্ত নহে। “বাংলা সহিত্য ভারতবর্ষের সব সাহিত্যের সেরা” এইরূপ ধারণা হয়ত শিক্ষিত

বাঙালীদের হিন্দী না বলিবার ও শিখিবার আংশিক কারণ হইতে পারে। কিন্তু নিরক্ষর বাঙালীরা ত কোন সাহিত্যেবই ধাব ধারে না; তাহাদের হিন্দী বলিতে অনভ্যস্ত হওয়ার কারণ কি? বোধ হয়, তাহাদের অধিকাংশ বঙ্গের বাহিবে অর্থ উপার্জন করিতে যায় না বলিয়া, তাহাদের হিন্দী বলার অভ্যাস হয় না।

নিরক্ষর ও লিখনপঠনক্ষম বাঙালীরা হিন্দুস্থানী বলিতে অভ্যাস করিলে তাহাদের কার্যক্ষমতা ও উপার্জনক্ষমতা নিশ্চয় বাড়িবে।

আইনভঙ্গ তদন্ত-কমিটি

কাহাকেও আঘাত না করিয়া, কাহারো উপর জোঁধ জ্বরদস্তি বলপ্রয়োগ না করিয়া, সাংখ্যিক ভাবে আইন বা সরকারী আদেশ অমান্য ব্যাপক ভাবে করিবার জন্ত দেশে প্রস্তুত কি না, তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য অবহেলাগে আন্দোলনের কয়েকজন নেতা ভারতের সকল প্রদেশে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছেন। এই প্রকাৰে অবাদ্যতা (disobedience) দুই রকমেই হইতে পারে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনক্যারেন্সের বরিশালে যে অধিবেশন হয়, তাহা চব্বিশঘণ্টার অধিবেশন নহে। তাহাতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার গিত্ত, প্রভৃতি বিখ্যাত মডারেটগণ নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা সরকারী আদেশ অমান্য করিয়াছিলেন। আবার গত বৎসর যখন ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারতবর্ষে আসিবাব পর কোন কোন প্রদেশে স্বেচ্ছাসেবক (Volunteer) হওয়া বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়, তখন শ্রীযুক্ত মোতিলাল নেহরু, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, এবং আরও অনেক নেতা ও কয়েক হাজার অসহযোগী সরকারী আদেশ অমান্য করিয়া জেলে যান। সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহ পূর্বে গোরখপুর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এক হুকুম জারি করেন, যে, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীষ ঐ জেলায় বক্তৃতা করিতে পারিবেন না। ঐ হুকুম অমান্য করিয়া পণ্ডিতজী ঐ জেলার পাঁচ জায়গায় পাঁচটি বক্তৃতা করেন। এই দৃষ্টান্ত-গুলিতে গবর্ণমেন্ট প্রথমে সাধারণ রাষ্ট্রীয় অধিকারে

হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং তাহা রক্ষার নিমিত্ত সরকারী আদেশ অমান্য করা হইয়াছিল। সাধারণ অধিকারে হস্তক্ষেপ গবর্ণমেন্ট যখন যেখানে করিবেন, তখন সেই-খানেই গবর্ণমেন্টের আদেশ লঙ্ঘন করা প্রত্যেক ভারতীয়ের একান্ত কর্তব্য। এই রকমের অবাধ্যতার জন্য দেশে প্রস্তুত কি না, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য তদন্ত কমিটি সাক্ষ্য লইতেছেন না। তাঁহারা অন্যবিধ অবাধ্যতা সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন। তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

কোন প্রদেশ, জেলা বা মহকুমার লোক বরাবর যে ভূমিকর বা অন্যবিধ ট্যাক্স দিয়া আসিতেছেন, তাহা হয়ত বেশী নহে, বা অন্যায় নহে। কিন্তু “যে-গবর্ণমেন্ট লোকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, যে-গবর্ণমেন্ট লোকমতকে অগ্রাহ্য ও অপমানিত করে, যে-গবর্ণমেন্টের আমলে জালিয়ানওয়ালা বাগের মত কাণ্ড ঘটে ও তাহার সমুচিত প্রতিফল হয় না, তাহা আইন মানা বা তাহাকে ট্যাক্স দেওয়া উচিত নহে,” এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া কোন প্রদেশের, জেলার, মহকুমার, বা গ্রামের লোক যদি ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিতে চায়, তাহা হইলে সেইরূপ অবাধ্যতার জন্ত দেশে প্রস্তুত কি না, কমিটি তাহারই বিচার করিবেন—আমরা এইরূপ বুঝিয়াছি। কোন প্রদেশ, জেলা, প্রভৃতির যোগ্যতার বিচার তাঁহারা কি প্রকাৰে করিবেন, জানি না। তবে, ইহা সহজেই বুঝা যায়, যে, হাজার হাজার লোক উক্ত প্রকারে আইন লঙ্ঘন করিলে তাহাদের উপর খুব নির্দ্যাতন আসিবে, তাহাদিগকে দারিদ্র্য ও অন্ত্র নানা দুঃখ সহ্য করিতে হইবে, অথচ শাস্ত সংঘত থাকিতে হইবে। তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া, তাহাদিগকে প্রহার ও অপমান করিয়া, তাহাদের জীলোকদিগকে অপমান করিয়া, শাস্তিভঙ্গ করাইবার চেষ্টা হইবে। এরূপ ঘটিলেও শাস্ত থাকিতে হইবে। ইহার জন্ত কাহারো প্রস্তুত, কমিটির ইহাই নির্ধারণীষ।

শাসকেরা সব দেশেই চিরকাল একদল লোককে আর-এক দলের বিরুদ্ধে লাগাইয়া দিয়া নিজেদের প্রভুত্ব রক্ষার চেষ্টা করিয়া থাকে। অতএব, যেখানে সাম্প্রদায়িক

বিরোধ দেরী আদি প্রবল ভাবে বিদ্যমান, তাহা আইন-লজ্ঞানের ধোঁয়া স্থান নহে। যেখানে “অস্পৃশ্যতা” আছে, তথায় একদল লোক অবজ্ঞাপীড়িত থাকায় অবজ্ঞা-কাবীদের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন নহে, ইহা সহজবোধ্য। হুতরাং সাম্প্রদায়িক বিবোধ ও মনোমালিন্যের এবং “অস্পৃশ্যতা”র অস্তিত্ব আইনলজ্ঞানের ধোঁয়াতাব অভাব প্রমাণ করে।

অদেবে কল্যাণের জ্ঞান ষাহারা আইনলজ্ঞান করিয়া জ্বলে যাইতে ও অগ্রবিধ নানা দুঃখ সহ কবিত্তে বাস্তবিক প্রস্তুত, বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া খন্দর উৎপাদন ও ব্যবহার নিশ্চয়ই তাঁহাদের পক্ষে সহজ বাক্ত। ষাহারা এই অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ করিতে পারেন না, ষাহাদের ইহা কবিবার মত ধৈর্য ও আত্মসংযম নাই, তাঁহারা দীর্ঘ শাস্ত্রভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া আইনলজ্ঞানের আত্মবিক্রম সকল দুঃখ সহ কবিত্তে পারিবেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। খন্দর উৎপাদন ও ব্যবহার আইনলজ্ঞানের ধোঁয়াতাব অস্তমত প্রমাণ, এরূপ মনে কবিবার ইহা একটি কাবণ।

তন্নিম্ন, বাণিজ্যিক ও আর্থিক স্বাধীনতা স্বরাজ্বেব একটি প্রধান অঙ্গ। আমবা খন্দর দ্বারা এই স্বাধীনতা কতকটা লাভ করিত্তে পারি। এবং ইহা বহুটা কেবলমাত্র আমাদের চেষ্টাব উপর নির্ভর কবে, রাজনৈতিক স্বরাজ্জ লাভ ততটা কেবলমাত্র আমাদের চেষ্টাপেক্ষ নহে; উহাতে অস্ত্রের সম্মতিও চাই। ষাহা প্রধানতঃ আমাদের চেষ্টাপেক্ষ, তাহা যদি আমরা করিত্তে না পারি, তাহা হইলে ষাহা অস্ত্রেরও সম্মতিপেক্ষ, তাহা কেমন কবিয়া লাভ করিব?

স্বরা ও অগ্রাঙ্গ মাদকদ্রব্য ত্যাগ ও তাহার বিক্রী বন্ধ করা রাজনৈতিক স্বরাজ্জ লাভ করা অপেক্ষা সহজ কাজ। ইহা যদি দেশের লোকে কবিত্তে না-পাবেন, তাহা হইলে তাঁহারা কি প্রকারে স্বরাজ্জ লাভ করিবেন? দেশবাসী সকলের “স্ব”-রাজ্জ পাওয়ার মানে এই, যে, সকলে নিজের নিজের প্রস্তু হইয়াছেন। কিন্তু দেশের বিস্তর লোক যদি দেশের বশ থাকে, তাহা হইলে “স্ব”-রাজ্জের পবিবর্ত্তে দেশ-রাজ্জই অনেক স্থলে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। অধিকন্তু শাস্ত্র ও নিরুপদ্রব্য আইনলজ্ঞান প্রচেষ্টার জ্ঞান দেশব্যাপী

যে শাস্ত্র সংযত সাম্বিক অবস্থার প্রবোধন, স্বরা ও অগ্রাঙ্গ মাদক দ্রব্যের প্রচলন থাকিত্তে তাহা সর্বত্র সম্ভব নহে।

লয়েড জর্জের বক্তৃতা

সম্প্রতি বিলাতের পার্লামেন্টে ভারতীয় সিবি-ল সার্ভিসের চাকুরিযাদের দুঃখ ও আশঙ্কার কথা আলোচিত্ত হয়। তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত কবিবার জ্ঞান প্রধান মন্ত্রী এক বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি বলেন, যে, ভারতবর্ষে আব-বত পরিবর্ত্তনই হউক না কেন, সিবি-ল সার্ভিস ও তাহাতে ইংরেজের চাকরী এবং ইংরেজ সিবি-লিয়ানদের প্রভুত্ব ও অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তিনি ভাবতশাসন-সংস্কার আইন এবং তদনুযায়ী সমুদয় ব্যবস্থাকে একটি এক্স-পেরিমেন্ট বা পরীক্ষা বলেন। অর্থাৎ যদি ভাবতীয়েরা ইংবেজদের মনের মত ব্যবহার করে, তাহা হইলে এই আইন অনুসারে কাজ চলিত্তে থাকিবে, যদি তাহা না করে, তাহা হইলে ব্রিটিশ জাতি ভারতীয়দিগকে “পুনর্মুষ্কো ভব” বলিবেন। কিন্তু তাঁহা বক্তৃতা হইতে ইঙ্গ বুঝা যায়, যে, আমরা যেরূপ ব্যবহাবই কবি না কেন, ইংরেজরা কোনকালেই আমাদের হিত করিবার দায়িত্ব ত্যাগ কবিবেন না। অর্থাৎ আমরা নিজেরাই নিজের মঙ্গলের ব্যবস্থা কবিবার উপযুক্ত কখনও হইব না, চিরকাল নাবালক থাকিব, নিজের দেশের কাজ চালাইবার দায়িত্ব পাইবার ও লইবার ধোঁয়া কখন হইব না, ইংরেজ চিরকালই আমাদের হিত করিত্তে থাকিবেন! অথচ মডারেটরা বুঝি-ছিলেন, যে, শাসনসংস্কার আইন কালক্রমে নিশ্চয়ই ভারত-বর্ষকে কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার মত আত্মকর্ত্ত্ব আনিয়া দিবে, এবং তখন ইংরেজ সিবি-লিয়ানদের প্রভুত্ব থাকিবে না। এ বিষয়ে সম্ভবতঃ মডারেটদের ভ্রমই হইয়াছিল। কারণ, যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষকে ঠাণ্ডা রাখিবার জ্ঞান ভারতশাসন আইন সংস্কার করা হইয়াছিল, এবং অনেক স্তোকবাক্য বলা হইয়াছিল। হইতে পারে, যে, মডারেটের এরূপ প্রবন্ধনার অভিসন্ধি ছিল না; কিন্তু মন্ত্রীরভার অস্ত্র সভ্যেরা রাজনৈতিক চাল চালিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরেজ গবর্ণমেন্ট যে অঙ্গীকার-

ভঙ্গ বহুবার করিয়াছেন, তাহা বঙ্গের বর্তমান লাটের পিতা ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড লিটন পর্যন্ত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

গবর্ণমেন্ট হাত গুটাইবাব বা উর্টা দিকে চলিবার উপায় আইনের মধ্যেই যে রাখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা হয়ত মডারেটবা সম্বন্ধভাবে তলাইয়া দেখেন নাই। কিন্তু শাসন-সংস্কার আইনের একচল্লিশ ধারায় স্পষ্ট লেখা আছে, যে, দশ বৎসর পবে একটা ক্ষমতাকমিশন নিযুক্ত হইবে—

“for the purpose of inquiring into the system of government, the growth of education, and the development of representative institutions, in British India, and matters connected therewith, and the Commission shall report as to whether and to what extent it is desirable to establish the principle of responsible government, or to extend, modify, or restrict the degree of responsible government then existing therein.”

মডারেটরা সম্ভবতঃ ব্রিটিশ জাতি ও ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের “শ্রাঘপরায়ণতা” ও “সদাশয়তা”র উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন।

যাহা হউক, লয়েড জর্জ কি বলেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কোন পরাদীন জাতি এ পর্যন্ত কেবল ভাল-মালুমী দ্বারা বিজ্ঞেতাের ন্যায়পরায়ণতা ও সদাশয়তার উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীনতা পায় নাই। আমেরিকা দ্বারা বিজিত ফিলিপিনোরা স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি পাইয়াও এখনও স্বাধীনতা পাইতেছে না। তাহাদিগকে খুব আন্দোলন করিতে হইতেছে। ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিদ্রোহ হউক, ইহা আমরা চাই না; তাহা হইলেও তাহা একটা বড় রকমের মোপ্লাবিদ্রোহের মত হইবে, ও ব্যর্থ হইবে। তথাপি জন্ ব্রাইট লালমোহন ঘোষকে পরিহাস করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে, তাহা হইতে আমরা উপদেশ লাভ করিতে পারি। গুনা ঘাঘ, জন্ ব্রাইট বলিয়াছিলেন, “তোমরা যদি আর-একটা বিদ্রোহ ঘটাইতে পার, তাহা হইলে মহারাজা ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-পত্রের মত আর-একটা রাজকীয় ঘোষণা-পত্র পাইবে।” জন্ ব্রাইট কোয়েকার

ছিলেন ও শান্তিপ্ৰিয় রাজনীতিবিদ ছিলেন; তিনি যে সত্যসত্যই ভারতীয়দিগকে সশস্ত্র বিদ্রোহ করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার কথার গুঢ় মর্ম এই, যে, গবর্ণমেন্টকে অতিষ্ঠ ও অস্থির করিয়া না তুলিতে পারিলে ভারতীয়েরা কখন রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইবে না।

লয়েড জর্জের বক্তৃতায় অনেক পুরাতন “বাধি গং” আছে। যথা,—“India has never been governed on these principles before”; অর্থাৎ ভারতবর্ষে প্রজাদের বা তাহাদের প্রতিনিধিদের নিকট দায়ী গবর্ণমেন্ট কোনকালে ছিল না। একথা যে সত্য নহে, তাহা আমরা অনেকবার দেখাইয়াছি। বিস্তারিত ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক প্রমাণ Towards Home Rule নামক পুস্তকে আছে।

নিতান্ত বাজে মিথ্যা কথাও প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতায় আছে। তিনি ইংলণ্ডের লোকদের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—“They have made a great sacrifice for India”। ইহা অপেক্ষা ভিত্তিহীন কথা কি হইতে পারে? ইংরেজ জাতি আমাদের জন্য কোন প্রকার স্বার্থত্যাগ করে নাই। স্বার্থসিদ্ধির জন্তই তাহারা এদেশে আসিয়াছিল, এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্তই তাহারা এখানে আছে। অবশ্য অল্পসংখ্যক ইংরেজ, যেমন অল্প কোন কোন দেশে তেমনি এদেশেও, স্বার্থত্যাগ করিয়া কাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন, ইহা আমরা স্বীকার করি।

লয়েড জর্জের আর-একটা হাস্যকর কথা শুনি। ইংরেজ সিবিలిয়ানদের সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

“There is not one of this 1200 that could not easily find a much better job in this country and a much better-paying one.”

বটে! তবে তাঁহারা স্বদেশ ছাড়িয়া এদেশে আসিয়াছেন কেন? আমাদের হিত করিতে? তাহা হইলে বেতন, পেনশন, ইত্যাদি বাড়াইবার জন্ত এত চীৎকার কেন হইয়াছে ও হইতেছে? তাঁহারা আগে যে বেতন পাইতেন, তাহাতে এদেশে শিক্ষিত ভদ্র ইংরেজদের যে বেশ চলে, তাহা ত লোকে বেশ জানে। কারণ, সিবিలిয়ানদের সমান বা তাঁদের চেয়ে বেশী

বিধান ও যোগ্য অধ্যাপক ও মিশনরীরা এখনও তাঁদের চেয়ে কম বেতনে সুস্থ সবল থাকিয়া কাজ করিতেছেন।

লয়েড্ জর্জের মতে আমরা যে কখনও আত্মকর্তৃক ও আত্মনির্ভরের উপযুক্ত হইব না, তাহা তাঁহার বক্তৃতায় অতি বিশদ ভাষায় বলা হইয়াছে। অথবা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য রূপে বা শাসনকর্ত্তা রূপে যতই যোগ্যতা দেখাই না কেন, ইংরেজ সিবিలిয়ানদের নেতৃত্ব ও সাহায্যের অপেক্ষা আমাদের চিরকাল করিতেই হইবে। একদা লর্ড মর্লী বলিয়াছিলেন, যে, তিনি এমন কোন দূরবর্তী ভবিষ্যৎ কালের কল্পনাও করিতে পাবেন না যখন ভারতীয়েরা স্ব-শাসনক্ষম হইবে। লয়েড্ জর্জও তদ্রূপ তাহাদের সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

“What I want specially to say is this, that, whatever their success, whether as parliamentarians or as administrators, I can see no period when they can dispense with the guidance and assistance of a small nucleus of British Civil Servants—of British officials in India.”

ইংরেজীতে একটা কথা আছে, None are so blind as those that will not see, যাহারা দেখিবে না বলিয়া পণ করিয়াছে তাহাদের মত অন্ধ আর কেহ নাই। লয়েড্ জর্জ সেই-জাতীয় লোক।

“সঞ্জীবনী” ও প্রবাসী-সম্পাদক

আমরা প্রাণ মাসে “প্রবাসী”তে “সঞ্জীবনী”র যে ভ্রম দেখাইয়াছিলাম, তাহা “সঞ্জীবনী” “প্রবাসী”র সম্বন্ধে স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন, যে, তিনি যাহা “প্রবাসী” সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, তাহা “মর্ডান রিভিউ” সম্বন্ধে সত্য; এবং ইহা প্রমাণ কবিলার ক্ষমতা তিনি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তদ্বিষয়ে আমরা ইহাই বলিতে চাই, যে, ঐ প্রবন্ধেও প্রধান কথাতে এবং অবাস্তব কোন কোন কথাতে তুল আছে।

বস্তায় বিপদ

আমাদের দেশের চেয়ে দুঃখী দেশ পৃথিবীতে আর আছে কি?

এদেশে লক্ষ লক্ষ লোক জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত পেট ভরিয়া খাইতে-পায় না, ম্যালেরিয়া, প্রেগ, প্রভৃতি নানা ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ত লাগিয়াই আছে; তাহার উপর এমন বৎসর যায় না, যখন দুর্ভিক্ষ, জল-প্রাচুর্য বা ঝড়ে দেশের কোন-না-কোন অংশ সাতিশয় বিপন্ন না হয়। গত বৎসর খুলনার দুর্ভিক্ষ লইয়া দেশ বিস্তৃত ছিল। তাহার জের মিটিতে না মিটিতে বন্যায় মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার বিস্তর গ্রাম জলমগ্ন হওয়ায় লোকেরা অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছে। অনেকের গৃহাদির চিহ্ন মাত্র নাই। অনেকে নিজে মারা পড়িয়াছে, গবাদি পশু ভাসিয়া গিয়াছে, শস্যক্ষেত্রের অবস্থা দেখিলেই বুঝা যায় এ বৎসর কোন শস্য হইবে না। মেদিনীপুরে কংগ্রেস আফিসে শ্রীযুক্ত সাতকড়িপতি রায় মহাশয়ের নামে টাঙ্কাকড়ি পাঠাইলে বিপন্ন লোকেরা সাহায্য পাইবে। বাঁকুড়ার শিমলাপাল অঞ্চল হইতে যে চিঠি পাইয়াছি, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

আজ ধনী দরিদ্র সকলেই এক দশা। এখন তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক, আর্থিক, মহাপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের অনুরোধই একমাত্র ভরসা। আপনাবা এখানে আসিয়া স্বচক্ষে অবস্থা দেখিয়া যদি ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে এতগুলি লোকের পবিণাম অতি ভয়াবহ হইবে। ইহাব মধ্যেই নানারূপ অহুত্বের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিতে যে সামান্য চাউল সংগৃহীত ছিল, তাহাতেই এই কয়দিন একরূপ কষ্টে চলিল। অতি সস্তর সাহায্য প্রেরণ আবশ্যক। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাহায্য প্রেরিত হইলে তাহা উপযুক্ত পাত্রে বিতরিত হইবে। ইতি—

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাণ্ডা,
ভেলাইডিহা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও সেক্রেটারী,
সিমলাপাল পোঃ, বাঁকুড়া।

ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের খাইখরচ ও রাহাখরচ

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা খাইখরচ ও রাহাখরচ বাবদে দেড় বৎসরে কে কত টাকা লইয়াছেন, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নন্দর মহাশয়ের এক প্রশ্নের উত্তরে তাহা বাহির হইয়াছে। সকলে টাকা লন নাই। যাহারা লইয়াছেন, তাহারা মোট ১৫২২৩০/৩ লইয়াছেন। গরীব দেশের পক্ষে ইহা খুব বেশী বলিতে হইবে। শুনা যায়, কোন কোন

“সভা” সচরাচর কলিকাতাতেই বাস করেন, অথচ বরাদ্দ অনুযায়ী দৈনিক খাইখরচ ও বাসাখরচ দশটাকা করিয়া লইয়াছেন, এবং ‘মফঃস্বলে’ পত্রিকার বাসস্থান হইতে যাতায়াত বাবদে বরাদ্দ রেলভাড়াও লইয়াছেন, যদিও সেখান হইতে আসেন নাই ও তথায় যান নাই! এরূপ প্রবঞ্চকদিগের অন্ততঃ নামটী প্রকাশিত হওয়া আবশ্যিক। আইন অনুসারে অল্প শাস্তি হইলে আরও ভাল হয়। কোন কোন “সভী”, ঘন ঘন বাড়ী যাতায়াত করিয়া রাহাখরচ আদায় করিলে কলিকাতায় থাকিয়া খাইখরচ আদায় করা অপেক্ষা বেশী লাভবান হইবেন দেখিয়া, দশ হইতে একশবার পর্যন্ত বাড়ী যাতায়াত করিয়াছেন। এই প্রকারে ফাঁকি দিয়া টাকা আদায় করার পথ বন্ধ করা উচিত। অনেক “সভা” রেলের প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে যাতায়াত না করিয়াও বরাদ্দ-মত দুটা প্রথম শ্রেণীর ভাড়া আদায় করিয়াছেন। ইহাও সুনীতিসম্মত নহে। কিন্তু ইহার সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। গবর্ণমেন্ট কর্মচারীরা বেতন ও পদমর্যাদা অনুসারে ভ্রমণব্যয় পাইয়া থাকেন। ঘোড়ার গাড়ী, নৌকা, প্রভৃতির ভাড়া, কুলিখরচা, প্রভৃতির আলাদা আলাদা হিসাব যাহাতে বাখিতে না হয়, এইজন্য গবর্ণমেন্ট দুটা ১ম, ২য়, মধ্য, বা ৩য় শ্রেণীর বেলগুয়ে টিকিটের ভাড়া দিয়া থাকেন। সুতরাং এক এক জনে দুটা টিকিটের মূল্য লওয়া অন্যায় নহে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের অনেক কর্মচারী নীচের শ্রেণীর গাড়ীতে ভ্রমণ করিয়াও নিম্ন মত উচ্চশ্রেণীর ভাড়া আদায় করেন; ব্যবস্থাপক সভার অনেক সভ্যও তাহাই করিয়াছেন। রাহাখরচ হইতে এইরূপ লাভ করা গবর্ণমেন্টের অভিপ্রেত নহে। অতএব ইহা গর্হিত। ইহা বন্ধ করা উচিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি কমিটির রিপোর্ট

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ব্যয় এবং অন্যান্য মানা বিষয় সম্বন্ধে রিপোর্ট দিবার জন্য সেনেট দুটি কমিটি নিযুক্ত করেন। একটির বিপোর্ট দিবার নির্দিষ্ট শেষদিন ছিল ১৩ই এপ্রিল, অন্যটির ২৫শে এপ্রিল।

কিন্তু প্রথমটির রিপোর্ট সভ্যদের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয় ২৯শে এপ্রিল, এবং দ্বিতীয়টির স্বাক্ষরিত হয় ৮ই জুলাই। বাহা ইউক, রিপোর্ট দুটি এত বিলম্বে প্রস্তুত হইলেও, জুলাই মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য দিবার প্রস্তাব আলোচিত হইবার পূর্বে ঐ দুটি প্রকাশিত হইতে পারিত। এবং তাহা হইলে শিক্ষাসচিব ও সভ্যেরা রিপোর্ট দুটি পড়িয়া তত্ত্বাবধান সত্যাসত্য এবং বিক্রপের বিচার করিয়া টাকা দেওয়া না-দেওয়া স্থির করিতে পারিতেন। কিন্তু বিপোর্ট দুটি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার জুলাইয়ের অধিবেশন শেষ হইবার এবং তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়কে আড়াই লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্জুর হইবার পর ২৯শে জুলাই সেনেট কর্তৃক বিবেচিত হইয়া তদনন্তর প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা আকস্মিক ঘটনা বলিয়া মনে হয় না। ইহাব মধ্যে চাতুরী আছে, এইরূপ ধারণাই জন্মে। কারণ, বিপোর্ট দুটি এরূপ, যে, তাহা পড়িয়া শিক্ষাসচিব ও সভ্যেরা সন্তুষ্ট ও খুসি হইবেন না। রিপোর্ট দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক মুখপত্র কলিকাতা রিভিউতে ছাপা হইয়াছে। দুটি ঠাণ্ডা ১১৪ পৃষ্ঠা পরিমিত। তা ছাড়া, আলাদা কয়েকটি লম্বা হিসাবের ফর্দ আছে। এত বড় জিনিষের সম্যক সমালোচনা “বিবিধ প্রসঙ্গে” সম্ভবে না। আমরা তাই রিপোর্ট দুটির একটি মাত্র প্রধান বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি কমিটির রিপোর্টের কোন কোন অংশ অক্ষরে অক্ষরে এক। আমরা যাহার আলোচনা করিতে বাইতেছি, উহা তদ্রূপ একটি অংশ।

কমিটিদ্বয়ের সভ্যগণ * গবর্ণমেন্টের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্পর্শ কোন্ কোন্ বিষয়ে আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা ঐ ঐ বিষয়ে কতটুকু, তাহা দেখাইতে গিয়া, আয়ব্যয়পরীক্ষা ও ব্যয় কি প্রকারে

* Sir Asutosh Mookerjee, Sir Nil Ratan Sircar, Principal H. Maitra, Sir A. Chaudhuri, Sir P. C. Ray, Rev Dr G. Howells, Dr. Bidhan Chandra Ray, Principal G. C. Bose, Dr. Hiralal Halder, Rev. Dr. G. Watt, and Dr. Jatindranath Maitra;

হইবে তাহার ক্ষমতা উপদেশ দেওয়া সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের
কি অধিকার আছে, তাহার আলোচনা করিতে গিয়া
বলিতেছেন :—

The point which has been reserved above for consideration, arises on Section 15 of the Act of Incorporation. The section, as enacted in 1857, was in the following terms

"The said Chancellor, Vice-Chancellor and Fellows shall have power to charge such reasonable fees for the degrees to be conferred by them and upon admission into the said University and for continuance therein, as they, with the approbation of the Governor General of India in Council, shall, from time to time, see fit to impose. Such fees shall be carried to one General Fee Fund for the payment of expenses of the said University, under the direction and regulations of the Governor General of India in Council, to whom the accounts of income and expenditure of the said University shall, once in every year, be submitted for such examination and audit as the said Governor General of India in Council may direct."

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ১৫ ধাৰাটি
এইরূপে উদ্ধৃত করিয়া কমিটিও বলিতেছেন :—

Let us now turn to the language of Section 15, which, as we have stated, has been in operation since 1857. The fees mentioned in the first sentence of the section have to be carried into one General Fee Fund for the payment of expenses of the University under the direction and regulations of the Government. Apart from the question of the meaning of the expression "direction and regulations," it is obvious that such direction and regulations can apply only to the classes of fees specified in the first sentence, namely, (1) fees for degrees conferred by the Senate, (2) fees for admission into the University, (3) fees for continuance in the University. Under (1) comes the fee of Rs. 5 charged by the University when a degree is conferred *in absentia*; under (2) comes what is known as the Registration fee of Rs. 2; under (3) comes the fee payable by Registered Graduates. The Government is not authorised to issue "direction and regulations" in respect of other classes of fees which the University may charge or other kinds of income which the University may possess.

বিশ্ববিদ্যালয় কি কি ফী আদায় কবিত্তে পারিবেন,
তাহার উল্লেখ ১৮৫৭ সালের আইনের উপরে উদ্ধৃত ১৫
ধারা ভিন্ন আর কোথাও নাই। তাহাতে তিন রকমের
ফীর উল্লেখ আছে। কমিটিও সন্মত বলিতেছেন, যে,
উহার মানে এইরূপ :—

(1) Fees for degrees conferred by the Senate, (2) fees for admission into the University, (3) fees for continuance in the University. Under (1) comes the fee of Rs. 5 charged by the University when a degree is conferred *in absentia*; under (2) comes what is known as the Registration fee of Rs. 2; under (3) comes the fee payable by Registered Graduates.

তাহা যদি হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, বিশ্ববিদ্যালয়
কোন আইনের জোবে প্রবেশিকা হইতে পিএইচ-ডি,
ডি-এল, এম-ডি, ডি-এসসি পর্যন্ত সব পরীক্ষার ফী আদায়
কবেন? কমিটিওয়ের উল্লিখিত ফী তিনটি অল্প অল্প
টাকার, পরীক্ষার ফী-গুলি বেশী বেশী টাকার। ইহা
কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে, যে, গবর্ণমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে
ছোট ছোট ফী তিনটি বসাইবার ও আদায় করিবার
অধিকার দিলেন, কিন্তু বড় বড় ফী বসাইবার ও আদায়
করিবার অধিকার দেন নাই। ইহা কিরূপ অসঙ্গত কথা,
তাহা একটা কোন বৎসরের মোট আদায়ী উভয়বিধ
ফীর টাকার পরিমাণ তুলনা কবিলেই বুঝা যাইবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২১-২২ সালের বজেটে দৃষ্ট হয়,
যে, ১৯২০-২১ সালে প্রবেশিকা আদি পরীক্ষার ফী
আদায় হয় মোট ২২,৫৯৫ (দুই লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচ
শত পঁচানব্বই) টাকা, কিন্তু কমিটিওয়ের উল্লিখিত তিনটি
ফী মোট আদায় হয় ২,৭২৬ (দুই হাজার সাতাশ পঁয়ষট্টি)
টাকা। তাহা হইলে কমিটি দুটির সভ্যরা বলিতে চান,
যে, গবর্ণমেন্ট লক্ষ লক্ষ টাকা পরিমিত ফী সম্বন্ধে কোন
আইন করেন নাই, কিন্তু যাহা হইতে সামান্য কয়েক হাজার
টাকা আদায় হয়, তাহা বসাইবার আইন করিয়া গিয়াছেন।
আরও মজাব কথা এই, যে, ১৯০৪ সালে যে নূতন বিশ্ব-
বিদ্যালয় আইন হয়, সর্বপ্রথমে তাহার ২৫ ধারায়
প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে রেজিষ্টারীভুক্ত করিবার
কথা পাওয়া যায়, এবং সর্বপ্রথমে ঐ আইনের ৫, ৭,
ও ২৫ ধারায় গ্রাজুয়েটদিগকে রেজিষ্টারীভুক্ত করিবার
কথা পাওয়া যায়। তাহার পূর্বে ঐ ফীগুলিও উল্লেখ
কোথাও নাই। তাহা হইলে, কমিটিওয়ের মতে আস্থা
স্থাপন কবিত্তে হইলে, বিশ্বাস করিতে হইবে, যে, গবর্ণমেন্ট,
যে-সব ফী হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় হয়, তাহার উল্লেখ
বা ব্যবস্থা ১৮৫৭ সালের আইনেও করেন নাই, ১৯০৩
সালের আইনেও করেন নাই, কিন্তু সামান্য কয়েক হাজার
টাকা আদায় যাহা হইতে হয়, তাহার উল্লেখ ও ব্যবস্থা
দুটা আইনেই কবিয়াছেন!

আবশ্য শুধুন। কমিটিওর যে তিনটি ফীর কথা
বলিয়াছেন, তাহা ১৯০৪ সালের নূতন বিশ্ববিদ্যালয় আইন

পাস হইবার পর বসান হয় ও আদায় হইতে আরম্ভ হয় ; অর্থাৎ সেগুলি ১৮৫৭ সালের আইনের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে বসান হয় । কিন্তু ১৮৫৭ সালের আইন হইবার পূর্বে হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা পরীক্ষা গ্রহীত হইতে আবশ্য হয়, সুতরাং সেগুলির জন্য ফী আদায়ও তখন হইতেই আবশ্যিক ও আরম্ভ হয় । তাহা হইলে কথাটা ঠাড়াইতেছে এইরূপ, যে, ১৮৫৭ সালের আইন পাস হইবার পর হইতেই যে-সব বকমের ফী আদায় করা আবশ্যিক ও আবশ্য হয়, গবর্ণমেন্ট ঐ সালের আইনে তাহার কোন উল্লেখ বা ব্যবস্থা করেন নাই, কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে যে-যে ফী বসান হয়, তাহাব ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন ! ইহা যে গবর্ণমেন্টের ভৎসনিক নিকট-অদর্শিতা ও ভয়ঙ্কর দূর্ব-দর্শিতার পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই !

সর্বাপেক্ষা মজার কথা বলিতে এখনও বাকী আছে। যদি ব্যয় সম্বন্ধে কোন কর্তৃপক্ষ (যেমন গবর্ণমেন্ট) অপব্যয় চুরি প্রভৃতি নিবারণের জন্য কোন উপদেশ দিতে বা নিয়ম প্রণয়ন করিতে চান, তাহা হইলে ইহা মনে করাই যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক, যে, ছোট বড় সব রকম আয় সম্বন্ধেই ঐ কর্তৃপক্ষ তদ্রূপ ব্যবস্থা করিবেন ; কিন্তু যদি তাহা না কবেন, তাহা হইলে অসম্ভবতঃ পক্ষে মোটা মোটা টাকার ব্যয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবেন, অল্প টাকা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন। কিন্তু কমিটিব বলিতেছেন, যে, যে ছোট ছোট ফীগুলি অর্দ্ধশতাব্দী পরে অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, যেগুলি ১৮৫৭ হইতে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত ছিল না, এবং পরে যাহার মোট বার্ষিক পরিমাণ সামান্য কয়েক হাজার টাকা মাত্র হইয়াছে, তাহার ব্যয় সম্বন্ধে উপদেশ দিবার ও নিয়ম করিবার ক্ষমতা ১৮৫৭ সালেই গবর্ণমেন্ট লইয়াছেন, কিন্তু যে-সব মোটা মোটা ফী ১৮৫৭ সালের পর হইতেই আদায় আরম্ভ হয় এবং যাহার মোট পরিমাণ এক্ষণে বৎসবে বহু লক্ষ টাকা, তাহার ব্যয় সম্বন্ধে উপদেশ দিবার ও নিয়ম করিবার কোন ক্ষমতা গবর্ণমেন্ট কোন আইন দ্বারাই এপর্যন্ত গ্রহণ করেন নাই ! গবর্ণমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিবার বিষয়ে বিশ্বাসভাজন মনে করিয়াছেন,

কিন্তু কয়েক হাজার টাকা খরচ করিবার বিষয়ে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই !

কমিটিতে দুজন নামজাদা আইনজ্ঞ লোক ছিলেন, এবং আমরা আইন জানি না। সেই জন্য সহজ বুদ্ধির সাহায্যে ভয়ে ভয়ে কিছু লিখিলাম। তুল হইয়া থাকিলে আইনজ্ঞগণ রূপাপুরঃসর দেখাইয়া দিবেন। আমাদের পূর্বোক্ত ১৫ ধারায় প্রবেশিকা আদি পরীক্ষার সাধারণ ফী'ব সম্বন্ধেই ব্যবস্থা করা হইয়াছে ; ব্যবস্থাপকগণ নিকটকেও উপস্থিতকে ছাড়িয়া দিয়া ভবিষ্যৎজ্ঞান-বলে দূর ও অনাগত সম্বন্ধে কল্পনার সাহায্যে ব্যবস্থা করেন নাই।

ভারত-সভা

কয়েকদিন হইল, ভারত-সভার বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। চলিত ভাষায় যাহাকে “ফুলুম” বা যথেষ্টাচার বলে, শুনা যায়, এই অধিবেশনের কার্যপরিচালনা ব্যাপারে আগাগোড়া তাহা প্রকাশ পাইয়াছিল। এ সম্বন্ধে আমাদের নিকট কতকগুলি বিশেষ অভিযোগ আসিয়াছে। অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন, স্ত্রীর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কিরূপে প্রচলিত বিধি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাব অনেকগুলি দৃষ্টান্ত সমেত দুইখানি পত্র আমরা পাইয়াছি। স্থানাভাবে আমরা তাহা এবার ছাপিতে পারিলাম না, সুবিধা হইলে ভবিষ্যতে ছাপিব। কিন্তু শুধু সভাপতি নয়, অন্য কর্মকর্তারাও সভাপরিচালনা নির্দিষ্ট বিধান মানিয়া চলেন নাই। তাঁহারা যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা যে কেবল ভারত-সভার নিয়মাবলীর বিরুদ্ধ তাহা নহে, বস্তুতঃ যে কতকগুলি নিত্যমৌলিক বিধি না মানিয়া সাধারণ কোনও সমিতিই চলিতে পারে না, তাহাদেবও সম্পূর্ণ বিপরীত।

সাধারণ সভা ও অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির উদ্দেশ্যই এই, যে, জনসাধারণ স্বাধীন মত স্বাধীনভাবে প্রকাশ কবিতে পাবে। এইজন্য এই সমস্ত সভাসমিতি প্রভৃতিতে যাহাতে রাজকর্মচারীদিগের তেমন প্রভাব বা প্রভাব না থাকে,

তদ্রূপ নীতি সর্বত্রই অনুসৃত হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যেই, যাহাতে আমাদের দেশে মিউনিসিপ্যালিটি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে রাজকর্মচারীদের কর্তৃত্ব বা কোন-প্রকার হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা না থাকে, সে বিষয়ে বরাবরই প্রবল আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। ভারত-সভার বর্তমান অধিনায়কগণই এক-সময় এই আন্দোলনের অগ্রণী ছিলেন। বর্তমান সচিবগণ (Ministers) সরকারের সহিত বৈরুপ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, এবং পক্ষান্তরে যে প্রণালীতে ভারতসভার কর্তৃপক্ষরা কিছুকাল ধরিয়া ইহার কার্যনির্বাহ করিয়া আসিতেছেন, তাহা বিবেচনা করিলে আমাদেরই নিশ্চিত ধারণা হয়, যে, সচিবগণ এই সভার সহিত একরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকিলে সভার উদ্দেশ্যসিদ্ধি কখনই সম্ভব নয়। অর্থাৎ সাধারণের অভিপ্রায় ও ইচ্ছা প্রকাশ করা সভার যদি মূখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এই উদ্দেশ্য বর্তমান ব্যবস্থায় কখনই সুসিদ্ধ হইতে পারিবে না। একজন সচিবের পক্ষে ভারতসভার সভাপতির কার্য করা, তাহার পক্ষে যেকোন অশোভন, সভার পক্ষেও সেইরূপ অহিতকর ও অস্বাস্থ্যকর।

অদাহ কাপড়

ফ্রেড হাওয়ার্ড নামক আমেরিকার একজন রসায়নবিৎ একরূপ একটি রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহার সাহায্যে কাপড় অদাহ করা যায়। ছবিতে দেখা যাইতেছে, তিনি অগ্নিশিখার উপর একটুকরা কাপড় ধরিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তাহা পুড়িতেছে না। যে-সব কারখানায় শ্রমীদিগকে আগুনের কাছে কাজ করিতে হয়, এইরূপ কাপড়ে তাহাদের পোষাক তৈরি করিবার কথা উঠিয়াছে।

বঙ্গীয় সমাজে ও বাঙালী অনেক পরিবারে নারীর প্রতি ব্যবহারের রূপ, তাহাতে নারীদের পরিধেয় বস্ত্র অদাহ করিতে পারিলে কিছু সুবিধা হইত কি? বোধ হয় হইত না। কারণ, স্নেহলতার দ্বারা যখন পরিহিত সাদা কেবেরোসীন তেলে ভিজাইয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া আত্মহত্যা করিবার উপায় আবিস্কৃত হয়, তাহার



অদাহ কাপড়

পূর্বে আত্মহত্যার আবণ্ড বিবিধ উপায় বিদ্যমান ছিল। সেগুলি এখনও বিদ্যমান আছে। যাহাদের জীবন দুর্বিষহ যন্ত্রণায় পূর্ণ, তাহাদিগকে আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করা সুকঠিন। তাহাদিগকে আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করিলে তাহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হয় কি না, তাহাও সন্দেহহীন। যদি তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখা যায়, এবং তাহাদের দুঃখ দূরীভূত হয় ও তাহাদের প্রতি অত্যাচার নিবারিত হয়, কেবল তাহা হইলেই তাহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শিত হয়। কিন্তু বাঙালী জাতির ধর্মবুদ্ধি না জাগিলে এবং শিক্ষা দ্বারা ও বিবাহের বয়স পরিবর্তনাদি দ্বারা নারীগণ আত্মরক্ষায় সমর্থ না হইলে তাহাদের দুঃখ দূর ও তাহাদের প্রতি অত্যাচার নিবারিত হইবে না।

যুদ্ধের ঋণ ও ক্ষতিপূরণের দাবী

গত মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধের রত উভয় পক্ষের জাতিরা কোনপ্রকারে জিতিবার জন্য পাগল হইয়া গিয়াছিল। এইজন্য অমিতব্যয়, অপব্যয়, শত্রুর সম্পত্তি নাশ, উৎকোচ প্রদান, চুরি, এত হইয়াছিল, যে, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। এখন জাতি-সকল পরস্পরের নিকট যত টাকা চাহিতেছেন, তাহা কাগজে পড়া যায় বটে, কিন্তু তাহার পরিমাণ সম্বন্ধে ঠিক ধারণা জন্মে না। একসঙ্গে কয়েক শত টাকার বেশী কখন চোখে দেখি নাই, এতগুলো

শুল্ক হইতে কি ধারণা করিব? ইংলণ্ড আমেরিকার নিকট বিস্তর টাকা ধার করিয়াছিল, আমেরিকা ইংলণ্ডের নিকট ১২৭৫০০০০০০০ টাকার দাবী করিতেছে। ইহার মানে বারশত পঁচাত্তর কোটি টাকা। তদ্রূপ ইংলণ্ড তাহার অন্ত্র মিত্র জাতিদিগকে যে টাকা ধার দিয়াছিল, তাহাব পরিশোধ স্বরূপ ১৬৪৭০০০০০০০ অর্থাৎ ষোল শত সাতচল্লিশ কোটি টাকা চাহিতেছে। ফ্রান্স জার্মানীর কাছে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ৩৭৫০০০০০০০০ (তিন হাজার সাতশত পঞ্চাশ কোটি) টাকা চাহিতেছে। কিন্তু সবাই জানে, ইংলণ্ডের, তাহার ইউরোপীয় মিত্র দেশসকলের ও জার্মানীর এত টাকা দিবার ক্ষমতা নাই। টাকা আছে কেবল আমেরিকা। এখন যুদ্ধ করিয়া পরস্পরের দেশ দখল করা কিম্বা ঋণশুল্ক অনাদায়ী বলিয়া খাতায় লিখিয়া ফেলা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু লোভ কেহ ছাড়িতে চায় না। আমাদের দেশে যাহাদের ছেলেমেয়ে দুই-ই আছে, তাহারা মেয়ে বিবাহের সময় বরপণের বিরুদ্ধে চীৎকার করে, কিন্তু ছেলের বিবাহের সময় বৈবাহিকের ধখাসর্ব্বস্ব লইতে চেষ্টা কবে। তেমনি পাশ্চাত্য জাতিরা চাহিতেছে, তাহাদের দেন্দারেরা শেষ কড়িটি পর্য্যন্ত প্রদান করুক, কিন্তু পাওনাদারেরা ঋণ মাফ করুক।

কচুরি পানা কমিটি

আব এক সপ্তাহ পরে বিজ্ঞানচাৰ্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় কচুরি পানা বিনাশের উপায় সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিবেন বলিয়া সংবাদপত্রে খবর বাহিব হইয়াছে। ইহা পড়িয়া সর্বসাধারণের জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে, যে, কচুরি পানা বিনাশ করিবার উপায় সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টকে পরামর্শ দিবার জন্য বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাব কাজ শেষ হইয়াছে কি না, এবং কমিটির সভ্যগণ কি বিপোর্ট দিয়াছেন। আগরা শুনিয়াছি, কমিটিব কাজ শেষ হইয়াছে। তাহা হইলে এখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাব সভ্যগণ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে কমিটির পুরা বিপোর্ট দেখিবার দাবী করিতে পারেন।

এইরূপ শোনা গিয়াছিল, যে, যে দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতবাসীরা শেখাল-কুকুরের মত ব্যবহার পায়, তথাকার একজন শ্বেতকার লোক বাংলা গবর্ণমেন্টকে কি একটা গুপ্ত বিষের পাতি বলিয়া দিতে চাহিয়াছিল, যাহার সাহায্যে

কচুরি পানা বিনষ্ট হইতে পারে। এই গুপ্ত কথার দাম নাকি মোটা মবলগ ছয় অঙ্কেব কিছু টাকা, এবং বিষ প্রয়োগ করিবার বার্ষিক ব্যয়ও তাহা হইলে কোন্ দু-চার লাখ টাকা না হইবে? সর্বসাধারণের ইহা জানিবার অধিকার আছে, যে, এই জনরব সত্য কিনা, এবং দক্ষিণ আফ্রিকার এই লোকটা বাংলা গবর্ণমেন্টের কৃষিবিভাগকে ও কচুরি-পানা-কমিটিকে যত্নমুগ্ধ করিয়া গবির দেশেব অর্থ শোষণ করিতে পারিয়াছে কি না। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ, দেশবাসীদের এই কোতূহল চরিতার্থ করিবেন কি? তাহা এ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন না?

অসহযোগ ও ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ

আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, যে, যদিও আমাদের মনের কোঁক সম্পূর্ণ অসহযোগের দিকে, তথাপি এখন তাহা ঘটয়া উঠে নাই, এবং ব্যবস্থাপক সভাব স্বাধীনচেতা সভ্যদের দ্বারা কিছু ইষ্ট সাধন ও কিছু অনিষ্ট নিবারণরূপ হিত হইতে পারে, তখন কেহ উক্ত সভা-সকলের সভা হইতে চাহিল তাঁহাকে আক্রমণ করা উচিত নয়। ইহা যদি মানিয়াও লওয়া যায়, যে, ব্যবস্থাপক সভাগুলি দেশকে চিরপদানত বাধিবার অস্ত্রস্বরূপ, তাহা হইলেও ঐ অস্ত্রগুলিকে নিজেদের কাছে লাগাইবার চেষ্টা করায় দোষ কি, বিপক্ষ যদি লাঠি বা অস্ত্র অস্ত্র লইয়া আমাদের বশীভূত করিতে আসে, তাহা হইলে উহা বিপক্ষের অস্ত্র বলিয়াই আমি কেন উহা কাড়িয়া লইয়া নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিতে চেষ্টিত হইব না? এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে পারে।

অসহযোগ ও সরকারী আদালত

অসহযোগীদিগকেও সরকারী আফিস আদালতের সাহায্য কখন কখন লইতে হয় ও হইয়াছে; উকীল ব্যারিষ্টারদের সাহায্যও লইতে হয় ও হইয়াছে। অতএব, আইনজীবীরা নিজ নিজ ব্যবসা করিলে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করা উচিত নয়। তবে তাঁহারা আপনাদিগকে অসহযোগী বলিতে পারেন কি না, তাহা বিচার্য্য। কংগ্রেসের সভা তাঁহারা থাকিতে পারেন, আমাদের ধারণা এইরূপ।

জুল-সংশোধন

এই মাসের প্রবাসীর ৭৫৪ পৃষ্ঠাব পর পৃষ্ঠাসংখ্যা জুল ছাপা হইয়াছে, বরাবর ৪ সংখ্যা কম ধরিয়া পড়িতে হইবে। ৭৫৬ পৃষ্ঠার ব্যঙ্গ-

চিত্রের নামেব নীচে 'ইণ্ডিয়ানপোলিস'এব পরে 'নিউজ' পড়িতে হইবে।



“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নায়মাস্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

২২শ ভাগ

১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩২৯

৬ষ্ঠ সংখ্যা

শারদীয় উৎসব

বর্ষার অবসানে,—ভাত্তের শেষে, যখন জল-ঝরা সাদা সাদা মেঘগুলি অনির্দিষ্ট শূন্যপথে ভাসিয়া যায়, প্রভাতে যখন শিউলি-গন্ধি বাতাস বহিয়া যায়, স্বচ্ছ জলে যখন গাঢ় নীল আকাশের ছায়া পড়ে, তখন উৎসবের রূপ দেখি, উৎসবের গন্ধ পাই, উৎসবের স্পর্শ অনুভব করি। মনে হইতে পাবে, যে, আমবা আশ্বিনের উৎসবে অভ্যস্ত বলিয়াই প্রকৃতির পবিত্রতনে অজ্ঞাতে উৎসবের স্মৃতিরসে উৎফুল্ল হই; আমাদের আনন্দে স্মৃতি-জন্মিত ভাবের উচ্ছ্বাস অস্বীকৃত হইতে পাবে না, কিন্তু শারদীয় উৎসব ও বসন্ত-উৎসব যে প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির ডাকে উদ্বুদ্ধ, তাহা ভুলিতে পারি না।

বেশি পুরাতন না ঘাঁটিয়া সেকালের কয়েকখানি পবিচিত নাটক পড়িলেই দেখিতে পাইব যে, বাজা ও রাণীবা বসন্ত-উৎসব করিতেছেন উপবনে; উপবনের গাছে গাছে দোলনা ঝুলিতেছে আর সেই দোলনায় বসিয়াছেন যুবতী রাণী ঠাকুরাণীরা,—“পূজার ঠাকুরেবা” নহেন; এবং এই দোলনাগুলিতে দোল দিতেছেন নিজে রাজা বা। রাজ-প্রাসাদের উপরে দাঁড়াইয়া মোঘা সম্রাট নন্দেন্দু চন্দ্র-গুপ্ত, পাটলিপুত্র নগরে লোকসাধাবণের যে শারদ-উৎসব দেখিয়াছিলেন, সে উৎসব পূজা-পাঠের নহে,—সুভূষিত

নাগরিকদের আনন্দলীলাব। উৎসবের সঙ্গে প্রবৃত্তির উৎস্কলতার ভয় আছে; উৎসবের আনন্দের দিনে আপনাব আপনাব ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলে ও পূজা করিলে বিলাস-লীলার বাড়াবাড়ি হয় না বলিয়াই হয়ত বসন্ত-উৎসবে দেব-পূজা প্রবর্তিত হইয়াছিল; বাসন্তী পূর্ণিমা বসন্তের বিধান বৈদিক যুগেই শেষ হইয়াছিল, আব তাহা ছাড়া জনসাধারণের প্রাকৃতিক উৎসব কখনও সেই যুগে শাসিত হয় নাই। উত্তর ভারতে আমবা পুরামাত্রাব কৃষ্ণলীলা লইয়াই দোল-বাজা দেখি; কিন্তু দক্ষিণ ভাষাতে শৈবেবা শিব-পার্বতী লইয়া দোলযাত্রা করেন। এ উৎসবটি মূলে কোন একটি দেবলীলার স্মৃতিতে নয়, আমাদের প্রাকৃতিক উৎসব প্রাচীন কোন ঐতিহাসিক কীর্তির—অর্থাৎ নবলীলাব স্মৃতিতেও নয়।

বসন্তের প্রাকৃতিক আহ্বানে চঞ্চলতাব সৃষ্টি আছে, —কামনার জাগরণ আছে, কিন্তু শারদ-প্রতিমা মানুষকে শান্তবসে আশ্রিত করে, এবং সৌন্দর্য্যেব গাষ্ঠীর্থে মনকে অনন্ত দিকে উন্মুখ করে; শিলায় বিভক্ত “ফেনিলাধু-রাশি”র সৌন্দর্য্যেব গাষ্ঠীরতা বুঝাইবার জন্ত কবিকে শবতের আশ্রয় লইয়া লিপিতে হইয়াছে—

ছায়াপথেবে শরৎপ্রসঙ্গম্

আকাশমাবিকৃতচাক্তারম্ ।

শারদীয় উৎসবের অল্পাধানে বঙ্গদেশে অল্প একটুখানি বিশেষত্ব আছে বটে, কিন্তু এ উৎসব বাঙ্গালীর মধ্যেও বদ্ধ নয়, আৰ্য্যজাতির মধ্যেও বদ্ধ নয়; সারা ভারতবর্ষে আৰ্য্যোত্তর সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই এ উৎসব চিবকাল প্রচলিত আছে। এ জীবনে যাহা দুর্কোধ্য, জীবন-মরণের সমস্তার যাহা হেয়ালী, তাহার কথা এই শরৎকালে মনে পড়ে বলিয়া অনাৰ্য্যদের শারদীয় উৎসবে নৃত্য-গীত ছাড়াও দেব-সাধনার অনেক অল্পাধান আছে। যাহাবা জানে উন্নত নয়, তাহাদের চিন্তা যখন অলক্ষ্যে অনন্তের দিকে যায়, তখন তাহারা কাল্পনিক অপদেবতা ও ভূত-প্রেতের কথা ভাবে; তাই এই সময়ে মানুষের ঘাড়ে ভূত নামাইয়া হিতাহিতের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আছে এবং ভূত প্রভৃতিকে শাস্ত করিবার রাখিবার অল্পাধানও আছে।

শারদীয় উৎসবে বঙ্গের বিশেষত্বের দাবী করিবার আগে, অনাৰ্য্যদের উৎসব-পদ্ধতির সংবাদ লইলে ভাল হয়। ছত্রিশগড়ের সীমান্তে ওড়িশার পশ্চিমভাগে যে-সকল অনাৰ্য্যজাতি এখন আৰ্য্যসমাজভুক্ত, তাহাদের “কুমারী ওষা” নামে পরিচিত শারদীয় উৎসবের একটু বিবরণ দিতেছি। আশ্বিনের কৃষ্ণ-অষ্টমী হইতে শুক্লনবমী পর্যন্ত এই উৎসব হইয়া থাকে। এই পূর্বে কুমারীরা একবেলা উপবাস করিয়া কুমারী দেবীর পূজা করে বলিয়া ইহার নাম কুমারী ওষা। এ অঞ্চলের পল্লীতে পল্লীতে পনের দিন ধরিয়া বাজনা বাজে, ও নিমন্ত্রণের শব্দ জাতির কুমারীরা নাচিয়া ও গান গাইয়া উৎসব করে। প্রথমে কৃষ্ণ-অষ্টমীর দিন প্রাতঃকালে কুমারীরা স্নান করিয়া নুতন রঙ্গীন কাপড় পরিয়া এক একখানি ডালা মাথায় করিয়া দল ঝাড়িয়া গান গাইতে গাইতে কুমারী দেবী গড়িবার মাটি আনিবার জন্ত বাহির হয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ী বাজানদাঁওরা ঢাক শানাই ও কাড়া বাজাইতে বাজাইতে যায়। মেয়েরা বেলা প্রায় দশটার সময় মাটি লইয়া ঘরে ফেরে এবং গান গাহিতে গাহিতে সকলেই এক একটি করিয়া কুমারী দেবীর মূর্তি গড়িতে

থাকে। ঘরে ঘরে কুমারী দেবীর পুতুল বসে, ও দেয়ালের আলনায় উহার ছবি চিত্রিত হয়।

যে কুমারী দেবীর নামে এই উৎসব, তিনি কে? একজন ব্রাহ্মণ আমাকে বলিয়াছিলেন, “উনি বন-দুর্গা।” বলিয়া রাখি যে ব্রাহ্মণ করণ (কায়স্থ) প্রভৃতি উচ্চ জাতির লোকেরা এ উৎসব করেন না। এই দেবী দুর্গা হইতে পারেন, কিন্তু শিবের উমা বা পার্শ্বতী নহেন। ব্রাহ্মণ যাজকেরা উৎসবের শেষ দিনে ফুল ফেলিয়া দক্ষিণা লইতে আসেন বলিয়াই হউক, অথবা উৎসবকারীরা আৰ্য্য-সমাজভুক্ত হইয়াছেন বলিয়াই হউক, দেয়ালের আলনায় কুমারী দেবীর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী ও হর-পার্কতী প্রভৃতি দেবতাদের ছবিও চিত্রিত হয়। ইতিহাসের হিসাবে ইহা ভালই হইয়াছে; কারণ কুমারী যে হর-পার্কতীর কেহ নহেন, তাহা সহজে বুঝিবার পথ রহিয়াছে।

মহাভাবতের প্রক্ষিপ্ত দুর্গাস্তোত্রে দুর্গা অবিবাহিতা ও বিদ্যাবাসিনী। পূর্বে স্থানান্তরে এ বিষয়ে অনেক কথা লিখিয়াছি; এখানে কেবল কথাটির উল্লেখ করিলাম। এই বিদ্যা-সংলগ্ন আরণ্য প্রদেশে সেই কুমারী দুর্গাই-পূজা পাইয়া আসিতেছেন মনে হয়। বলিয়াছি, যে, পূজার শেষ দিনেই কেবল ব্রাহ্মণ যাজক আসেন, নহিলে সাবা উৎসবটি নাচিয়া গাহিয়াই শেষ হয়। অষ্টমীর বাজে কুমারীর পূজা শেষ হয় এবং নবমীর দিন প্রাতে কুমারীমূর্তিগুলি বিসর্জন দেওয়া হয়। বিসর্জনের পরে গ্রামের কুমারীরা ছাড়া অল্প জীলোকেরাও নাচিয়া গান গায়, এবং বিশেষ ভাবে হাসিতামাসার আনন্দ বাড়াইবার জন্ত কয়েকজন বেহায়া বর্ষীয়সী অনেক অলীল গান গাহিয়া থাকে।

বর্ষিত প্রদেশে আৰ্য্যসভ্যতা এখনও ভাল করিয়া বিস্তৃত হয় নাই; জাতিনিষ্ঠ অনেক প্রথাই অক্ষুণ্ণ আছে। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোকেরা যে পূজা ও উৎসব করেন না, তাহার উৎপত্তি নিশ্চয়ই অনাৰ্য্য সমাজে। উৎসবটি যাহাদের মধ্যে প্রচলিত, তাহাদের অল্পরূপ শ্রেণীর লোকেরাই কি আৰ্য্য-প্রভাবের পূর্বে বঙ্গদেশে আপনাদের এইরূপ উৎসব করিত না? সন্দেহ হয়, বঙ্গের দুর্গা পূজা

যেন এই প্রাচীন উৎসবেরই সংস্কৃত সংস্করণ। এখনও আমাদের অষ্টমীতে কুমাবী পূজা আছে, দুর্গা প্রতিমা ছাড়াও বন-দুর্গা নামে একটি কলাগাছেব প্রতিষ্ঠা আছে, এবং ঠিক নবমীব দিনে এক সময়ে বকের সকল পূজার বাড়ীতেই কুমারী-ওষার নবমীব দিনের অঙ্গীল গানের অল্পরূপ নবমীর খেঁউড় প্রচলিত ছিল।

যাহাদেব উৎসবের কথা বলিলাম তাহাদের এই কুমারী-ওষার আব-এক নাম “ভাইজিঁউতিয়া”; ভাইদের কল্যাণের কামনায় কুমাবীরা এই উৎসব করেন। ভাই-দ্বিতীয়া পর্কটির নাম ও বিধি বিধান আমাদের প্রাচীন পুরাণ ও স্মৃতিতে পাই না; ভাই-দ্বিতীয়ার পর্ক শবতের উৎসবের মধ্যে, তবে দুর্গা-পূজার পবেব শুরু দ্বিতীয়াতে হয়। অনার্থ্য-প্রাণ জাতিবা যদি কুমারী-ওষা আর্ধ্যদেব নিকটে ধার করিয়া লইত, তবে আমার বর্ণিত প্রদেশের আর্ধ্য সমাজে এই ওষা ও জিঁউতিয়া পর্ক উপেক্ষিত হইত না। এই প্রসঙ্গে একট কথ্য বলিতে চাই; বঙ্গে কেবল ধনীদেব গৃহে দুর্গাপূজা হয়, কিন্তু পশ্চিম ওড়িশাব প্রতি পল্লীতে সকলে মিলিয়া নাচিয়া গাইয়া উৎসব — উপভোগ করে।

বঙ্গেব বাহিবে যে যে গ্রামে বা নগরে আর্ধ্যদের দেবীমন্দির আছে, সেইখানে মহালয়ার পর হইতে দেবীব নবরাত্র পূজা হয়, এবং বহু গ্রামের লোকেরা মন্দিরে আসিয়াই পূজা দিয়া যায়, অথবা পূজা দেখিয়া যায়; বাড়ীতে বাড়ীতে উৎসব হয় না। বঙ্গে মন্দিরের আধিক্য নাই। তবে যখন দেশে বাজা ছিল, তখন হয়ত কেবল রাজবাড়ীতেই উৎসব হইত; এখন সকল ধনীই রাজা, তাই বহু চণ্ডীমণ্ডপে দেবীর পূজা হয়। অল্প প্রদেশে দেখি, যে, একটা উৎসবের সময়ে একটি মন্দির হইতেই দেবতার “যাত্রা” অর্থাৎ প্রোশেশন চলে, আর সেই যাত্রা বা মিশিলের সঙ্গে সঙ্গে নাচ গান ও তামাসা-ওষালারা চলিতে চলিতে অভিনয়াদি করে। বঙ্গে এক সময়ে ঠিক তাহাই হইত বলিয়াই মিশিলের সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত গানের দলের আগেকাব নাম ঘোচে নাই; এক স্থানের এক আসবে যে গানের পালাব অভিনয় হয়,

তাহাব নাম বহিষা গিয়াছে “যাত্রা-গান”। ‘যাত্রা বা মিশিলের সঙ্গে সঙ্গে যে-সকল কোঁতুক অভিনয় হইত, তাহা ছিল যাত্রার “শোভাঙ্গ”; এই শোভাঙ্গের প্রাকৃত নাম ওড়িয়ায় দাঁড়াইয়াছে “শোয়াঙ্গ” এবং বাঙ্গলায় হইয়াছে—“শং”। সেদিন পর্যন্ত আমাদের যাত্রা-গানে “শং” সাজিবাব বীতি ছিল। ঘরে ঘরে দুর্গা-পূজার প্রথা যে গোড়াগুড়ি বঙ্গে প্রচলিত ছিল না,—একটি অবস্থা-বিশেষেই শেষে এইরূপ দাঁড়াইয়াছে, এ কথা বুঝিয়া লইলে আমাদের বিশেষত্বের দাবী কিঞ্চিৎ কমিবে; আর জাতি সাধারণেব অথবা নিম্নস্তরের লোকের উৎসবে মাতিয়া আমরা যে শাবদীয় উৎসবের প্রসার বাড়াইয়াছি, ইহা জানিলে আমাদের অপমান নাই, বরং মান বাড়িবে।

পূজার শেষে বিজয়া দশমীব সামরিক উৎসব, খাঁটি আর্ধ্য সমাজের। দেবী বা শক্তির নম্র দিনের পূজায় শক্তি সাধনাব পব অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যে খেলা হইত, এখনও তাহা স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। এই উৎসবে, স্বীয় দলের লোকের মন্যে মনোমালিন্য ঘুচাইয়া, সৈন্ত সামন্ত জুটাইয়া ক্ষত্রিয় রাজ্যে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিতেন; দিগ্বিজয়ের এই সময়ের কথা অনেকেই জানেন, কারণ প্রাচীনের সকল কাহ্যেই ঐ বিজয়-যাত্রা শবতে বর্ণিত। এখন একটি জাতীয় লক্ষ্যে সকলের একসঙ্গে জৈত্রযাত্রা নাই; কিন্তু সকলের সঙ্গে কোলাকুলি রহিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক শরতের উৎসবে, উদ্বোধন যে প্রকৃতিব আস্থানে,—প্রশান্ত শারদ-প্রতিমাব অল্পধ্যানে, তাহাই বিশেষ ভাবে মনে পড়িতেছে। যে উৎসবের জন্ম প্রকৃতির স্বভাব-নিষ্ঠ আনন্দের আকর্ষণে, সে উৎসবকে অপৌরুষেয় বলিতে পারি। সংক্ষেপে কথা কয়েকটি এই :—(১) এ উৎসবের খাঁটি মূল নৈসর্গিক আকর্ষণে; (২) উৎসবে উদ্ভূতবা উৎসবের পবিত্রতা বাড়াইতে চাহিয়াছে আপনাদেব ইষ্টদেবতাকে পূজা করিয়া; (৩) উচ্চেরা আপনাদের উচ্চতা ভুলিয়া নিম্নস্তরের প্রতিবেশীদের আনন্দকে আপনাদেব আনন্দে মিলাইয়া স্থখী হইয়াছে।

শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার

খন্দর চাই কেন ?

যাইরা দেশেব দুর্দশা গোখে দেখিয়াছেন, অন্তবে অল্পভব কবিয়াছেন, খন্দর কেন চাই, তাইদিগকে বুঝাইতে হইবে না। অনেকে দেখেন, কিন্তু ভুলিয়া যান। অনেকে দেখিতে পান, কিন্তু দেখেন না। এই যে অতিবৃষ্টিতে ও নদীর বানে পশ্চিম বঙ্গে তি.টা জেলায় হাহাকাব পড়িয়াছে, তাইবা শুনিয়াছেন, কিন্তু দুই-দশ টাকা দিয়া ভুলিয়াও গিয়াছেন। যখন দুর্ভিক্ষের দারুণ সংবাদ পাইবেন, তখনও দুই-দশ টাকা দিয়া দেশের দুঃখেব মাত্রা ভুলিয়া যাইবেন। ভারত ভূমিতেই এত দুর্দশা কেন ?

কলিকাতা টাকাব শহর। এত ধন এত ঐশ্বর্যেব মধ্যে যাইবা বাস করেন. তাইবা দেশের দশা কেমন করিয়া অল্পভব কবিবেন ? সে দশা বলিতে গেলে তাইাদের বিশ্বাস হইবে কি না, সন্দেহ। কত লোকের যে একখানি বই দুইখানি কাপড় নাই. এই বর্ষায় মাথাষ দিবার একখানা গাম্‌ছাও নাই, একথা বিশ্বাস করা কঠিন বটে। এমন পরিবাবও আছে, যে পরিবারের সকলেব তরে একখানিমাত্র আছে, কাহাকেও কোথাও যাইতে হইলে সেইখানি পরিয়া যায়। পুরুষে লেংটি পরে, মেয়েবা বাড়ীর বাহিৰ হয় না। সাঁওতাল নয়, কোল ধাঙ্গড় নয়, বাউরী নয়, বাগ্দী নয়। যাহাদের কাপড় নাই, তাহারা ধায় কি ?

অথচ দেখি, পরণে প্রায় সবারই সবু ধুতি বা পাছা-পাড় শাড়ী ! অল্প লেকে মোটা পবে, কাবণ সবু তাইাদের কুরুচি। বহুব মধ্যে দুই-একজনকে দেখিয়াছি, ঘরেব কাটা সূতাষ খাদি পবিয়াছে। বঙ্গদেশে মিহিব দিকে ছুটিধা ধনে প্রাণে মঞ্জিতেছে।

কে মঞ্জাইয়াছে ?

কে বাঁচাইতে পাবে ?

কাটনী সূতা কাটিয়া বেচিয়া যে পয়সা পাইতেছে, সে পয়সাষ মিহি কিনিতেছে। নিজের কাটা সূতাষ কাপড় বোনাইয়া পরিবাব সাহস হইতেছে না।

কে সাহস সঞ্চাব কবিবে ?

ইংরেজী শিক্ষা পাইয়াছে বলিয়া সে শৌৰ্য জন্মিয়াছে, তাও ত নয়। আশ্চর্য বোব হয়, লোকে দেহেব একটা বাহিবের খোলসকে এত মূল্যবান জ্ঞান কবে। কত বকমে এই খোলসের মান বাঁচাইয়া চলিয়াছে, সব লিখিতে গেলে পুখী বাড়িয়া যায়। টাকার টানাটানি, দশহাতী ধুতি মহার্ঘ, কিন্তু লম্বা কোঁচা চাই-ই চাই। এই কাবণে আট হাত লম্বা কিন্তু ৪৫ ইঞ্চি বহবের ধুতি বোনাইয়া শি-ক্ষি-ত জন পবিতেছেন। $৮ \times ২ = ১৬$ বর্গহাত কাপড়ে যাহাব চলিতে পাবিত, তিনি $৮ \times ২১ = ২০$ বর্গহাত কাপড় পরিয়া ৪ বর্গহাত কাপড় অপব্যব কবিতেছেন। অপব্যব কেন বলিতেছি, তাহা পবে লিখিব। কলিকাতাষ দেখিয়াছি, বাড়ীতে লুঙ্গ পরিয়া আছেন। মুসলমানেব লুঙ্গী বুঝি, সে লুঙ্গী মোটা সূতাব ও বন্ধিন। ব্রহ্মদেশের বসন লুঙ্গী; কিন্তু সে লুঙ্গী পাটেব ও রন্ধিন। কিন্তু বাক্সালী বাবুর লুঙ্গী না মোটা না বন্ধিন। কোন কোন জাঙ্গিষ-দারী ‘মিলিটারী’ বাবু বলিয়াছেন, ধুতির পয়সা জোটে না—বলিয়া জাঙ্গিয়া পবেন। যদি তাই, খাদি পবিলে ইহাদের মানের কি লাঘব হইত, ইহাবাই জানেন। কেহ কেহ বাড়ীতে খন্দরেব জামা গায়ে দেন, কিন্তু অপব্যব বেশ নইলে কর্মস্থানে যাইতে পাবেন না। কেহ বা স্থান-বিশেষে, সভা বিশেষে খন্দবে সাজিয়া যান; বাড়ীতে অসিয়া সৰু পরিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। যাইরা শিক্ষিত বলিয়া অভিমান কবেন, তাইরাই যদি লুকা-চুরি খেলিতে থাকেন, অশিক্ষিতের দোষ কি ?

আমাদের গেঞ্জি ও জামাব খবচ বছবে কম কি ? কেহ কেহ খন্দরেব কোট পবিতেছেন, কাবণ খন্দর মোটা। ভাবিয়া দেখিলে বুঝিবেন, গেঞ্জির বদলে অধম খাদির ছোট জামা বহু গুণে উত্তম। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা, তিন কালেই ভাল। কারণ খাদির আল্‌গা সূতাষ বায়ু আবদ্ধ হয়, এবং এই হেতু শীত নিবাবণ করে, গ্রীষ্মে ঘর্ম শোষণ করে, বর্ষার আর্দ্র বায়ু রোধ কবে। খাদিব দুই ফর্দ চাদর গায়ে দিলে শীতে কাঁপিতে হইবে না। যাহারা পাকানা সূতাব

‘চেক’ চাদব গায়ে দেয়, তাহারা নির্বোধ। চরকার সূতায গামছা ও তোয়ালে উত্তম বলিতে হইবে। বিছানার চাদর, লেপ বাগিশেব খোল চিরকাল গড়ায় হইয়া আসিতেছিল। অতএব ধুতি শাড়ী ছাড়িয়া দিলেও খন্দরেব অনেক প্রয়োজন আছে। বঙ্গদেশ এই সবেই সূতা যোগাইতে পারিবে কি না, সন্দেহ।

যাইবা শিল্প-লোপের আশঙ্কায় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, তাইবা শুনিয়া আশ্বস্ত হইবে, ‘চরকার মোটা সূতায ঢাকাঠি তাঁতী ঢাকাই শিল্প স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করিতেছে। কাবণ সেটা শিল্প নহ, কলা। তা ছাড়া, যে শিল্পে বিলাতী সূতা বই গতি নাই, সে শিল্প আছে ক ? ‘মেলিন্স ফুড’ খাইয়া যাহাকে বাঁচিতে হয়, সে আর বাঁচিয়া কই ? বিলাতী সরু সূতা না পাইলে বেঁটাটীকে অঙ্ককার দেখিতে হয়, সে যে অঙ্ককারেই আছে। মনে রাগিতে হইবে, তাহাব সখেব ব্যাপাব নহ, তাহাব জীবিকা।

যে-সব সূতা-কাটা বিলাতী কল চলিতেছে, সে-সবের ভরসায় দেশ থাকিতে পারে কি ? সে কল কি কল, যার টেকো তৈয়ারি করিবার যোগ্যতাও আমাদের হয় নাই ? পাঁচ-ছয় লক্ষ টাকার কমে যে কল পাওয়া যায় না, সে-রকম বড় কলের দাম কে পায় ? কার পরিশ্রমে ও বুদ্ধিতে সে কলের উৎপত্তি ? বিলাতী-বর্জন নয়, নিজের জীবন বন্ধার কথা। যাহাকে ভাত-কাপড়-ওষুধের তরে পরের মুখ তাকাইয়া থাকিতে হয়, সে বাঁচিয়া আছে কি ?

খন্দরে এক আপত্তি, ইহার সূতা অসমান। কিন্তু অসমান বলিয়াই যে হুন্দব ! ‘মার্কিন’ ও ‘লংক্লথের’ মনুষ্যতায় সৌন্দর্য কই ? দেখিবেন, কেবল মোটা বলিয়া খন্দরেব কোট পরেন না, বৈষম্যে সৌন্দর্য আছে বলিয়াই কোট করাইতেছেন।

খন্দর পরিলে না কি খোট্টাব মতন দেখায় ? বাদ্যালীর যে কি স্বযোগতি হইয়াছে, তাহাব কার্তিকের মূর্তিতেই প্রকাশ। যে কার্তিক দেব-সেনাপতি হইয়াছিলেন, তিনি কি ফুল-বাবু ছিলেন ? খন্দব মোটা। কিন্তু মোটার ভিতবে মোটা চিত্ত ববং থাকিতে পাবে,

সরুর ভিতরে নয়। লোকে কি বলিবে, সে আশঙ্কা নয় ; আশঙ্কা নিজের মনের কাছে।

মোটার আর-এক গুণ এই, অল্প কাপড়ে চলে। এই হুর্দানে অনাবশ্যক অর্থ ব্যয় উচিত কি ? যদি আট হাতে চলে, দশ হাত কেন পবিবে ? যদি ৩৮ ইঞ্চিতে চলে, কেন ৪৫ ইঞ্চি পরিবে ?

আবও কথা আছে। আমরা যত কাপড় চাই, তত কাপড় দেশে জন্মিতেছে না। যখন এই অবস্থা, তখন কাপড় অপব্যয় কর্তব্য কি ? যখন বস্ত্রাভাবে কত নর নারী জবে ও শ্রেয়াব ভুগিতেছে, শীতে কাঁপিতেছে, লজ্জায ঘবের ভিতর লুকাইয়া আছে, আত্মহত্যাও কবি-খাছে, তখন লজ্জা কোটা সাঙ্গে কি ? আমরা আট হাতে তুষ্ট হইলে আমাদের চারি জনের কেলা কাপড়ে একজন দুঃখী চলিয়া যাইবে। বস্ত্র দান কবিত্তে বলি না, নিজের কাপড়-খবচ কমাইতে বলি। যত কম কবিবে, কাপড়ের দামও তত কমিবে। ইয়ুবোপেব যুদ্ধের সময় যে বে দেশ যুদ্ধ কবিত্তেছিল, সে সে দেশে লোকের দৈনিক আহাব বাঁচিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কারণ আহাবীয় প্রচুর ছিল না। ভাতের টানাটানি ও দুর্ভিক্ষেব সমব, ভাতের ফেলা-ছোঁড়া চলে না। সেইরূপ, দেশটি যদি এক পবিবার মনে কবি, গোনও বিষয়ে কাহারও অপব্যয় কর্তব্য হইবে না।

আমাদের তাঁতীদের প্রতিও দৃষ্টি কর্তব্য। বলিব চাপে তাহাব পেশা হইয়া যাইতেছে। মাঝারী সূতাব কাপড় বুনিয়া কোনও তাঁতী বাঁচিতে পাবে না। কলে সেখানে নিশ্চয়ই সস্তা। সরু বুনিয়া পারে, মোটা বুনিয়াও পারে। ভাল পারে তা নয় ; কোনও রকমে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। একথা পবে লিখিতেছি। মোটা বুনিয়া যে পাবে, তার সাক্ষী জোলা। যাহারা কাচা ও গামছা বোনে, তাহাবাও এক বকম বাঁচিয়া আছে। যাহারা খাদি বোনে, গড়া বোনে, তাহারাও দশ-বাব নম্ববেব সূতায বোনে। কারণ মোটা বোনা সোজা, বেশী বুনিত্তেও পারা যায়। কলের পক্ষেও সে কথা বটে। কলে বাণি কম, হাতেও বাণি কম। যে কর্ম মোটা, সে কর্মে কল ও হাতে প্রায় সমান

দাঁড়ায়। সূতা কাটায কলের কাছে হাত পারিবে না, কিন্তু মোটা কাপড় বোনায প্রায় পারিবে।

শেষ কথা এই যে যদি মোটা পরিলে আত্মপ্রসাদ আসে, দেশের কাপড় পবিত্রেছি বলিয়া অভিমান জন্মে, সেটার মূল্য অল্প কি? চরকার খন্দাই পবিত্রে হইবে, এমন নয়; মোটা ধরিতে বলিতেছি। মোটা ধবিলে বহু অমঙ্গল দূর হইবে। এইটুকু কষ্ট স্বীকার অসম্ভব কি? চরকার হাত পাগিলে সবু সূতা জন্মিতে থাকিবে, অন্ততঃ ২০১২ নম্বরের সূতা পাওয়া যাইবে। তখন এত কষ্টও করিতে হইবে না।

খন্দর যে আক্রা

ধান-চালের দরের তুলনায় আক্রা নয়, কলের কাপড়ের তুলনায় আক্রা। কিন্তু কাপড় খরচ কম করিলে বেশী দামেও আটকায় না। তা ছাড়া, হাত-বোনা কাপড় বেশী দাম দিয়াও ত লোকে কিনিতেছে। যদি দশ-হাত আড়াই-হাত ধুতি বা শাড়ী সস্তায় পরিতে হয়, মিহি পবিত্রে হয়, বিলাতী পরাই এক উপায়। কারণ হাত-কাটা হাত-বোনা কাপড় বিলাতীর তুলনায় নিশ্চয়ই আক্রা পড়িবে। এখন দেখিতেছি, যে হাত-বোনা কাপড়ের দাম ৫ টাকা, দেশী কলের সে কাপড় ৪০ টাকা, বিলাতী কলের ৪ টাকায় পাওয়া যায়। খন্দরের দাম আরও বেশী।

তুলা কিনিয়া কাটনাও বোনার বাগি দিয়া খন্দর জন্মাইতে গেলে দাম বেশী পড়িবেই পড়িবে। চরকা-মন্দের বিশেষ এই, নিজে জপ করিলে ফল পাইবে, ভাড়া করিয়া অন্যকে দিয়া জপিলে ফল পাইবে না। স্বাবলম্বন ইহার বীজ, সাহজিক সমাধ ইহার প্রয়োগ।

দ্বিতীয়তঃ, খাদির ক্ষুদ্র তুলিয়া আরও অনর্থ হইতেছে। খাদিকে খাদি রাখিতে হইবে। যদি কেহ ক্ষুদ্র ধুতি বা শাড়ী পবিত্রে না পাবেন, খন্দর-প্রচার হাজার হইলেও তাহাকে পবাইতে পারিবেন না। কারণ অর্থনীতি বলবান হইয়া তাহার প্রতিজ্ঞা রাখিতে দিবে না। পুরুষের ধুতি ও উড়নী নইলে নয়। উড়নী উত্তরীয়; অনেকের এখন জামা বা কোট, উত্তরীয় হইয়াছে।

অতএব খাদির ধুতি ও খাদির জামা বা কোট পরিলে বাহিবে বাইতে পারা যায়। এই দুই-এ খরচ তত বেশী পড়ে না। দেশের লোকের পক্ষে এইরূপ বেশ স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে।

অবশ্য প্রেমের নিকট অর্থনীতি দাঁড়াইতে পারে না। আর, প্রেমই অসাধ্য সাধন করিতে পাবে, আর কিছুতে পারে না। স্বদেশ-প্রেম জন্মিলে, “মাঘের দেওয়া মোটা কাপড়” গানের ‘মোটা’ উঠিয়া গিয়া ‘ভাল’ হইবে। মাঘের দেওয়া কাপড় ‘মোটা’ হইতে পারে না। সে কাপড় সস্তা কি আক্রা, এ তর্কও উঠিতে পারে না। তখন ঘবে ঘরে-চরকা চালাইবারও দরকার হইবে না। ব্রহ্মদেশের পাটের লুঙ্গী ৩৫ টাকার কমে পাওয়া যায় না। কিন্তু তা বলিয়া কেহ কাপাস সূতার সস্তা লুঙ্গী পরে না।

খাদি সস্তা হইবে কি?

কলের কাপড়ের তুলনায় কখনও হইবে না। মাত্রিকা (raw materials) কাপাস তুলা ঘবে যেমন দাম, কলেও তেমন দাম। বরং লক্ষ লক্ষ টাকার তুলা কিনিতে গিয়া কলে সস্তায় পড়তা করিবে। তার পর কাটনার বাগি ও বোনার বাগি কলেই সস্তা।

কলেব কাপড়ের সহিত তুলনা না করিয়া দেখি। আমি লিখিয়াছিলাম, এক সের সূতায় (দশ নম্বরের) এক জোড়া ধুতি বা শাড়ী হইতে পারে। এক সমা-লোচক লিখিয়াছেন, এক সেবে হইতে পারে না, সাত-পোয়া সূতা লাগে। দশহাত X আড়াই হাত শাড়ীর জন্য প্রায় তাই লাগে। আমার বিবেচনায় কাপড়ের টানা-টানির দিনে এত লম্বা-চওড়া খুজিলে চলিবে না। মনে রাখিবেন, ধনবানের কথা হইতেছে না, দেশের কথা হইতেছে এবং দেশের বন্ধার নিমিত্তে সকলকে ছোট পরিতে বলিতেছি। পুরুষের জন্য আট হাত X আট পোয়া, এবং নারীর জন্য দশ হাত X নয় পোয়া যথেষ্ট। দেখি, এই দুই পবিমাণের কাপড় বুনিতে কত সূতা লাগিবে।

এক সঙ্গে পাঁচ-সাত জোড়া তাঁতে জুড়িতে না পাবিলে

বাণি বেশী পড়ে, সূতাও বেশী লাগে। কারণ, এক জোড়ার সূতার পাইট, পূবনি, ব-তোলা প্রভৃতি কর্ম করিতে যত সময় লাগে দশ জোড়ায় দশ গুন সময় লাগে না, অনেক কম লাগে। এই হেতু বাণি কম। নরাজে চড়াইতে এক জোড়ায় যত দশী লাগে, দশ জোড়াতেও প্রায় তত লাগে। টানা ও পড়ানের সূতা পবিমাণে সমান হইলে কাপড় ভাল জমে। আনাড়ী তাঁতী সমানে বুনিতে পারে না। শূনি, এখানকার তাঁতী পড়ানে বেশী, ঢাকাব তাঁতী কম খাওয়ায়। বয়ন-বিজ্ঞায় দুইই অবিধি। মনে কবি ৫ জোড়া ৪ গজা ধুতি চাই। অর্থাৎ ৪০ গজ কাপড়। ৪০ গজে মরতি ২ গজ, দশী ১ গজ। মোট টানা হইবে ৪৩ গজ। বহর ৩৬ ইঞ্চি থাকিবে। কাজেই মরতি ২ ইঞ্চি দিয়া ৮ ইঞ্চি জুড়িতে হইবে। ১০ নম্বরের সূতা ইঞ্চি-প্রতি ২ খাই লাগে। (টানা ও পড়ান সমান থাকিলে ৩২ খাই ষপেঠ, বরং ৩০ খাইতে চলে।) অতএব $৮ \times ৩২ = ২২১৬$ খাই। পাড়ে ষিগুন, আধ ইঞ্চি আধ ইঞ্চি পাড়ে অধিক ৩২ খাই। $২২১৬ + ৩২ = ২২৪৮$ খাই। সূতবাং টানায় $২২৪৮ \times ৪৩ = ৯৭,৬৬৪$ গজ সূতা

চাই। পড়ানেও এত। মোট $২ \times ৯৭,৬৬৪ = ১,৯৫,৩২৮$ গজ। ১০ নম্বরের সূতার ২১৬ গজে ১ তোলা। এই সূতা ৫০০ তোলা হইবে এবং জোড়া-প্রতি ১০০ তোলা বা ১১০ পোয়া সূতা লাগিবে। এখন কাটুনীকে বাণি ১১০ সিকা, তুলার দামও প্রায় ১১০ সিকা, মোট ২২০ টাকা। বুনিতে বাণি হাতে ১০ হিসাবে ১১০ টাকা। মোট খরচ ৪২ টাকা। রন্ধিন পাড় দিলে রং খরচ ৭০ আনা, ব্যাপারীর লাভ অন্ততঃ ১০ আনা। অর্থাৎ কিনিতে গেলে ৪১০ টাকা জোড়া পড়িবে। ঘরে কাটুনা চলিলে ৩৭০।

এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি পাড় দিয়া নয় পোয়া বহরের দশ হাতী শাড়ী বুনিতে কত খরচ পড়িবে? ৪০ ইঞ্চি বহর রাখিতে ৪২ ইঞ্চি জুড়িতে হইবে। দুই ধারে দুই ইঞ্চি পাড় হেতু অধিক দুই ইঞ্চি। মোট ৪৪ ইঞ্চি $\times ৩২ = ১৪০৮$ খাই। ৫ জোড়ায় ৫০ গজ, মরতি ২১০ গজ, দশী ১ গজ, মোট টানা ৫৩১ গজ। সূতা $৫৩১ \times ১৪০৮ = ৭৪,৩২৮$ গজ। পড়ানেও এত। মোট সূতা $১৫০,৬৫৬$ গজ, দশ নম্বরের ৭০১ তোলা। জোড়া-প্রতি ১৬০

পোয়া। অতএব সূতারই দাম ৩০ টাকা। বুনিবার বাণি ২০ হাতে ১৬০০, বং খরচ ১০০। জোড়া-প্রতি খরচ ৫১০০। ব্যাপারীর লাভ দিয়া ৬২ টাকা বটে।

কোন বাবদে খরচ কমাইতে পারা যায়? তাঁতী বাণি কমাইবাব জো নাই। কেন নাই পবে বলিতেছি। কাটুনার বাণি দিতে না হইলে ১৬০ সিকা কম হইবে। মাঝে ব্যাপারী না থাকিলে কিছু কম হইবে। তথাপি ৪২ টাকা পড়িবে। বিধবার পক্ষে বন্ধিন পাড় লাগিবে না। তাহার পক্ষে ৩৭০।

ঘরে না-ই কাটুনা চলিল, তাঁতীকে বাণি দিতেই হইবে। ঘবে ঘরে তাঁত বসানোও সোজা নয়। কাপাসও কিনিতে হইবে। বাঙ্গলা দেশে কাপাস চাষ নাই বলিলেও চলে। যা-কিছু আছে চট্টগ্রামের পাহাড় অঞ্চলে। তার পর, কিন্তু অনেক কম, বাঁকুড়ায়; তার পর মেদিনীপুরে। সূতরাং কাপাস চাষ হঠাৎ এত বাড়িবে না যে তুলা সম্ভা হইবে। গ্রামে গ্রামে বাড়ীতে বাড়ীতে দেব-কাপাস রাখা এক সোজা উপায়; এত সোজা যে অনেকের পক্ষে তুলার দাম লাগিবে না।

সব জায়গায় তাঁতী বোজ্জ্গার সমান নয়। তাঁতী যেমনই খাটুক, মাসে ২০ দিন তাঁত চলে, ১০ দিন জোড়ন করিতে লাগে। তাব উপর পালি-পার্বন আছে, অম্মথ-বিহুথ আছে। মাসে ২০ টাকা হয় কি না সন্দেহ। বাঁকুড়ায় তাঁতীর সহযোগী-সমিতি আছে। প্রায় ৫০০ তাঁতী লইয়া এই সমিতি। এই সমিতির সম্পাদকের মুখে শুনিলাম তাঁতীরা কোনও রকমে বাঁচিয়া আছে। মাসে ১৭।১৮ মাত্র বাণি পায়। অথচ সূতা পাইতে কাপড় বেচিতে কষ্ট নাই। এই উপার্জন তাঁতীর একাধ নয়, সমস্ত পরিবারের ভাগ আছে। গড়া বুনিবার বাণি হাতে ১৫, কদাচিত ১০। ২২ হাত বহরের প্রমাণ শাড়ী বুনিবার বাণি ১০০—১১০। ঢাকার দিকে জোলায় বিলাতী রন্ধিন সূতার লুঙ্গী ও শাড়ী বুনিয়া নাকি বেশী পায়। শুনিতে প্রত্যহ এক টাকা পাঁচসিকা বটে, কিন্তু বহুবৎ হিসাব খতাইতে গেলে মাসে ২০ টাকা অধিক হইবে না। সগোষ্ঠীব ২০ টাকা বেতন যে কিছুই নয়! যাহারা মাটি কাটে, তাহারও যে ২০ টাকা বোজ্জ্গার

করে। তাঁতী কারু। কামাব কুমার ছুতার প্রভৃতি সব কারুর বেতন বাড়িয়াছে, পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ত্রিগুণ হইয়াছে, তাঁতীর বাড়ে নাই। কাবণ শিয়রে করাল কল পাড়াইয়া আছে। এত কষ্ট কবিয়া বুনিলেও হাত তাঁতের কাপড় কলের দরে দিতে পারে না। এই যেবিক্রি হইতেছে, সে দেশেব অল্পগ্রহে। কাবণ বেশী দাম দিয়া লোকে কিনিতেছে। বয়ন-শিক্ষাশালা বসাই আর গ্রামে গ্রামে শিক্ষকই পাঠাই, তাঁতী নিজের জোবে বাঁচিতে পারিবে না। যাহারা সবু বোনে, পোড়ে ফুল তোলে, জমীতে নক্সা বাহির করে, তাহারা নিজের জোবে পাড়াইয়া আছে। কিন্তু 'সখের কাপড় দিয়া বেশ চলিতে পাবে না।

কলের সূতায কাপড় বোনার বাণি উপবে দিয়াছি। চরকার সূতায় সে বাণিতে পোষায় না। অতএব সূতা টান-সূহ ও কিছু সমান কব, তাঁতীর বাণিও কম হইবে। তাঁতী চবকার সূতার নামে ভয় পাষ। ভয়ের হেতু আছে। আমার মনে হয়, ইহাদিগকে ইহাদেব কর্মে ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। ইহাবা যেমন বুনিতেছে বুলুক। নূতন তাঁতী তৈয়াব ঋষিযা লইতে হইবে। কয়েক বৎসব হইতে নূতন তাঁতী কিছু কিছু জন্মিতেছে। ইহারা তাঁতী নয, তাঁত বোনা এক জীবিকা নয। এই চাষের সময়ে তাঁত বন্ধ আছে, চাষ ফুরাইলে চলিবে। তাঁতী বুঝিয়াছে, নূতন এক প্রতিদ্বন্দ্বী জন্মিতেছে। মনে করিতেছে, ইহাদিগকে তাঁতের কর্ম না শিখাইলে রক্ষা পাইবে। কিন্তু জানে না, দেশময় কি বিপুল সংগ্রাম চলিতেছে; অর্থলোভে লোকের কি উদ্ভ্রান্তি জন্মিয়াছে; কে মরিল কে বাঁচিল, কে কার বার্তা রাখিতেছে। এই নূতন তাঁতীকে আটকাইয়া রাখিলেও কাপড়ের কল আটকাইতে পারিবে না; এক-একটি কল বসিবে, তাঁতীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে। যে-সব তাঁতীর তাঁত আছে, চাষও আছে, তাহাবাই বাঁচিয়া আছে; যাহাদেব তাঁত আছে চাষ নাই, তাহারা মৃতবং পড়িয়া আছে। শূণ্য তাঁতী নয, এমন কোনও কাবু নাই, যে গ্রামে চাষ না করিয়াও বাঁচিয়া আছে। পূর্বের মতন বংখ্যায় অধিক থাকিলে একজনেরও দিন চলিত না। দেশ যে দরিদ্র, কাবু পুষিতে পারিতেছে না।

নূতন তাঁতীর তাঁত মোটা, শানা মোটা, মাকু মোটা হইবে। চবকার সূতা কাটিতে ঠক-ঠক মাকুব কর্ম নয, হাত-মাকু চাই। নূতন তাঁতীর অল্প জীবিকা থাকিবে; চাষের সময় চাষ করিবে, চাষ ফুরাইলে তাঁত ধবিবে। এই তাঁতী হাতে আনা বাণিতে বুনিতে পারিবে। অতএব কেবল চবকা শিখাইলে খন্দর চলিবে না, তাঁতও শিখাইতে হইবে।

লুপ্তপ্রায় কলাব উদ্ধাব যেমন-তেমন যত্নে হয় না, দূঢ়-সংকল্প হইয়া লাগিয়া থাকিলে, নূতন পথ দেখাইতে পারিলে উদ্ধার সম্ভব। কাপড়েই দেখিতেছি, প্রাচীন বন্ধাজীব নাই, যদি বা মাছুষ আছে বন্ধেব মাত্রিকা নাই। অল্প রং না পাই, লাল ও কাল চাই। কিন্তু লাল বন্ধেব চাষ উঠিয়া গিয়াছে, নীল চাষও প্রায় তাই। এখন বিলাতী বং ভিন্ন গতি নাই। যখন জাহাজের পথ খোলা, তখন কোন্ ভরসায় কে নূতন পত্তন কবিত্তে বসিবে? কত জন রত্নিন পোড় বিসর্জন কবিত্তে চাহিবে? দেশ-প্রেম প্রবল হইলে বিলাতী বং পবিত্যাগ অবশ্য সম্ভব। কিন্তু এই ত্যাগ দ্বারা স্বদেশী রন্ধেব উৎপত্তি হইবে কি না সন্দেহ। বোধ হয়, প্রবান অল্পে স্বদেশী হইতে পারিলেই যথেষ্ট বিদেশী বং না পাইলেও কাপড় পরা চলিবে, কোনও বং না পাইলেও চলিবে।

এইরূপ, টানা ও পড়্যানের সূতা, দুই-ই চবকার না হইলে উদ্দেশ্য-সিদ্ধি ব্যাঘাত হইবে, এমন নয। কেবল পড়্যানের সূতা যোগাইতে পারিলেও যথেষ্ট মনে কবি। তা ছাড়া, অনেকে খন্দেব দাম দিতে পারিবে না, চরকাও ঘুরাইতে পারিবে না। ইহাবা কলেব ১০১২ নম্বরের সূতাব কাপড় পরিলে সে উদ্দেশ্যের বিশেষ বিষ হইবে না। উদ্দেশ্যটি আবাব বলি, বস্ত্র-বিষয়ে স্বাধীন হইতে হইবে, মোটা না ধবিলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। কলের মোটা ও চবকাব মোটা প্রায় একই। এই হেতু, মোটা সভ্য বিবেচিত হইলে গ্রামের দরিদ্র নর-নারী চরকার সূতার কাপড় পরিয়া আত্মমানি বোধ কবিবে না। তখন তাহাদেব ঘরে চরকাও চলিতে পারিবে।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

রসসৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল

আরব্যোপস্থানের কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে যেত—সে-সব শেষটা স্তূপাকার করে' গাধা বোঝাই কবে' ঘরে নিয়ে আসা ছিল তার নিত্য কাছ—তার যানবাহন সামান্যই ছিল—এমনি করে' তার প্রয়োজনের খাতিরের মান রক্ষা করিতে হ'ত। হঠাৎ একদিন তার ভাগ্যে সোনার কসল জুটে গেল—মুঠি মুঠি স্বর্ণমুদ্রা, হীরক-মরকত সে পেয়ে গেল। তা বধে' নেওয়ার তার আর অস্ত্র উপায় ছিল না—সে-সব গাধাব পিঠেই আনন্দে চাপিয়ে বাড়ী চলল। আর সে-সবের দামও সে তার সোজা চোখে দেখে বুঝল না—গণিতশাস্ত্রকে ব্যঙ্গ কবে' এক-গাছি দাঁড়িপাল্লা এনেই রত্নসম্ভারের পরিমাপ ঠিক করিতে হ'ল।

বসসৃষ্টির পরিমাপও দুর্ভাগ্যক্রমে এমনি ভাবে অনেক কাল থেকে হয়েছে। এ যুগে একটা বড় রকমের সংস্পর্শ পাওয়া গেছে—একটা যাহুমন্ত্র হঠাৎ মাহুম পেয়েছে যাতে 'করে' নানা দেশের শিল্প-সৌন্দর্য ও কাব্যগীতি একটা পরম রূপলোককে উদ্ভাসিত কবে' তুলছে যার হীরক-কনকেব প্রাচুর্যে মাহুম বিস্মিত হচ্ছে! আজও বি আমাদের সে-সবকে পুবাণ ও কল্প উপায়ে পরিমাপ করিতে হবে? আজও কি আমরা সে-সমস্ত স্বপ্ন-সৌন্দর্যকে গাধার পিঠে বোঝাই কবে' দুনিয়ার পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে' বেড়াব এবং শেষটা অমনি নির্দিষ্ট ভাবে গুদাম ভর্তি করব?

ইতিহাসে ছাবাব পূর্ব-পশ্চিমের সৌন্দর্যগত মিলনের সূচনা হয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। প্রোফেসর স্ট্রিগ-গাওস্কি (Strzygowski) মতে বাইজেন্টাইনেব মধ্যবর্তিতায়, প্রাগ্যভাবানুসিক্ত পূর্বাঞ্চলের হেলেনিস্টিক (গ্রীক) আর্ট উবোপেব প্রাথমিক মিডিয়েল (মধ্যযুগের) আর্টের উপর একটা বড় রকমের গভীর প্রভাব সঞ্চার করেছিল। কলার এই সংস্পর্শের ফলে আর্টের ভিতব একটা নূতন রস-সঞ্চার হয়েছিল—যা, ভাল হোক মন্দ হোক, পূর্ব ও পশ্চিমের ভিতব একটা ভাবেব বিনিময় ঘটিয়েছিল। এবার এই মিলনের সূচনা হয়েছে বর্তমান কালে। পাহাড়ের মত দেশকালের বাধা চূর্ণ হয়ে গিয়ে

এ ভাব-সঙ্গম একটা অপূর্ব রসলোককে সার্থক করে' তুলছে। উরোপীয় কলাব সহিত জাপানী আর্টের সঙ্গম ক্রমশঃ চীন ও ভারতকেও নিকটতর করেছে। ওদিকে প্রত্নতাত্ত্বিকদের বেবিলন পারশ্ব প্রভৃতি দেশের প্রত্ন-দ্রব্যাদির সঞ্চয়ও উবোপকে বাঁধা নোঙর ছিঁড়তে বাধ্য করেছে। শিল্পীরা এসিয়ার কন্ভেনশন বা প্রথা ও পদ্ধতি বিনাসকোচে গ্রহণ করেছে। ইম্প্রেশনিষ্ট মোনের ছবি ত স্পষ্টভাবে জাপানী—হিরোসিগে ও হোকুশাইর ছবির সঙ্গে তা আশ্চর্যভাবে মেলে।

এই রকমে একবার যেমন পথ ভাঙল অমনি প্রাচ্য-ভাবের স্রোত হড়মড় করে' উরোপে ঢুকল। চৈনিক আর্টের প্রভাব উবোপেব আর্টের উপর ব্যাপ্ত হয়েছে। এসব আমাদের কীর্ত্তি-কথা মনে না করে' উরোপেরই ব্যাপকতব জীবনলীলা মনে করা মন্দ নয়। যাকে decorative arts মণ্ডন-শিল্প বলা হয়, সে-সকলের মূলই হচ্ছে প্রাচ্য। কোন লেখক বলছেন :

The whole history of these arts in Europe is the record of the struggle between orientalism with its frank rejection of imitation, its love of artistic convention, its dislike to the actual representation of any object in Nature and our own imitative spirit. Whenever the former has been paramount as in Byzantine, Sicily and Spain by actual contact or in the rest of Europe by the influence of Crusades, we have had beautiful and imaginative work in which the visible things of life are transmuted to artistic conventions and the things that Life has not are invented and fashioned for her delight.

আধুনিক যুগেও পূর্বদেশের সম্পর্কে এই স্বভাব-বাদের সম্পর্কে—ঐন্দ্রিয়িক সত্যকে—পশ্চিম প্রত্যাখ্যান কবে' নূতন নূতন রসলীলায় আত্মহারা হয়ে গেছে। তার

ভিতর আমাদেরও স্থান আছে একথা ভাবলে অনেকটা আরাম পাওয়া যায় নিঃসন্দেহ । কিন্তু সে অধিকার কি সকলের জন্মেছে? আমরা জ্ঞানী বলে' ভাবছি যে মানুষ বুদ্ধি শুধু ছুটো চোখ এবং একটা nervous system বা স্নায়ুমণ্ডল দিয়ে রচিত হয়েছে—এত বড় অলীকতাকে আজকাল মনস্তত্ত্ববিদ্রাও প্রত্যাখ্যান করছেন। শবীর ও মনের parallelism বা পরস্পর-সাপেক্ষতা একটা উদ্ভট কল্পনা। মনের লীলা শরীরকে পদে পদে ছাড়িয়ে যায়—প্রফেসর বার্গসে। বার বার একথা দেখিয়েছেন। কাজেই চাক্ষুষ সত্যের পরিমাপের উপর মনের আনন্দ ও বেদনা মোটেই নির্ভর করে না। আমরা জ্ঞানী বলেই রসজ্ঞ বা রসবিদ বৈশী, একথা বলা কম শক্ত নয়; এবং সৃষ্টির রূপরসগন্ধের সন্ধিহীন হতে সৌন্দর্যের যে অফুরন্ত উৎস উদ্বেলিত হয়ে উঠছে প্রতি যুগেই তার বহন ও অহুভবের ক্ষমতাকে বার বার পরাজয় মানতে হচ্ছে। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি অগ্রদূতের মত স্বন্দরের পতাকা বহন করে' এগিয়ে চলেছে, মানুষও সে মাধামুগের পিছনে ছোটে। আশ্চর্য্যের বিষয় শত শত বৎসর পবেও তার এই রম্য প্রমাণ তাকে ক্লান্ত করে নি, তাকে আশ্বাস ও আনন্দ দিয়েছে, তাকে হৃদয় ও সজীব করে' নিত্যনূতন রূপলোকের বিভ্রম এনে তা ক্রমশঃ সত্যোপেক্ত করে' তুলেছে।

প্রতিমুহূর্ত্তেই সৌন্দর্য্যের সংস্পর্শ এই পরম রমণীয় অভিযানের ভিতর দিয়ে সৃষ্টিকে বিকশিত করছে—সৃষ্টির কণ্ঠে রূপমালা দান করছে। প্রতি পলকে মানুষ ধাতার কুহেলি-কৌতুকে এই রসভিনয়ে চরিতার্থ হচ্ছে। কিন্তু যা লীলা, তার ভিতরকার রসসমাবেশ ও রসান্বাদ এক অনির্বচনীয় আকর্ষণেই হয়ে থাকে—তা' মূলে যে পরমলোকের সহিত যুক্ত তার সঙ্গে সব সময় বৈজ্ঞানিক বোঝাপড়া হয় না। এজন্ত রসান্বাদেও নানা অন্তরায় ঘটে উঠে।

আজকাল পশ্চিমে ললিতকলার যে কয়েকটা রম্য সৃষ্টি হয়েছে—সে সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে। কবিতায় আর্ট বস্তুনিরপেক্ষ হয়েছে—ছন্দের রূপ-মাধুর্য্যে নানা ভাবের বায়বীয় রামধন্য চিস্তফলকে বিস্তৃত করা হচ্ছে—সঙ্গীতে প্যাটারণ, মিউজিক ভেঙে ওয়াগনার যার স্বরূপাত করে'

গেছেন, ষ্ট্রাওস ও Lisz প্রভৃতি তাকে অবিভাজ্য লোকোত্তর অনির্দিষ্টতার ভিতর নিয়ে গেছেন। চিত্রে বাগিন্‌স্কী (Kandinsky) অরূপলোককে রূপলোকের রম্যমঞ্চে প্রতিষ্ঠা করার স্পর্ধা করেছেন। আর্চিপেনকো (Archipenko) ভাস্কর্য্যে সে চাক্ষুষ অরূপতার ললিত রূপকে খোদিত করতে সঙ্কোচ করেননি। এ-সব হয়েছে বলে' যারা বিচার ও তর্কের ভিতর দিয়ে দুনিয়াকে দেখতে চায় শিল্পীরা আজ তাদের অপ্রিয় হয়েছে। কাগিন্‌স্কীর spiritual impressions বা আধ্যাত্মিক প্রত্যয়, internal harmonies বা আন্তর্লৌকিক স্বর, psychical effects বা অধ্যাত্মব্যঞ্জন, soul vibration বা অধ্যাত্ম-পুলক আজ না জ্ঞানীর না রসার্থীর প্রিয় হতে পেরেছে। জনতার অশ্রদ্ধায় আর্চিপেনকোর রূপলোকও আজ ক্লান্ত হয়ে লগাট কুঞ্চিত করে' আছে। এ যুগব ভূতত্ব জীব-তত্ত্ব প্রভৃতি বিশ্বতত্ত্বাদি যদি আর্টেব উপর ক্রকুটি করে তবে অধ্যাত্মতত্ত্বও বাদ যায় কেন? রাসেল (Russel) ও (Wright) রাইটের বর্ণস্তববিধি ত মুকুলেই অকুল পাথারে ডুবেছে। আজ এ-সব বহন করার দুর্গোণ কি অসামান্যই হয়ে পড়েছে!

উরোপ যেমন এশিয়ার সংস্পর্শে জেগেছে, তেমনি এশিয়ার শিল্প-লোকও উরোপের সজ্জাতে একটা সদ্য বিকাশের মহিমা পেয়েছে। কিন্তু সে রচনাও কি পট্টিপূর্ণ সার্থকতার ভিতর দিয়ে যেতে পারছে? অজস্তার অপূর্ণ ও অকুণ্ঠিত কলা আজ বিচার করে' বিজ্ঞতার চশমা দিয়ে দেখতে হচ্ছে। অধ্যাপক ফুসে সে-সবের মানে বার করতে যতটা পরিশ্রম কবেছেন, রসান্বাদ তার সামান্য কণাও করেছেন কি না সন্দেহ। দেশের হৃদয়ের সহিত মমি বা মিউজিক্সিমের যতটা যোগ, অর্ধ অন্ধকারে স্তিমিত দিবালোকে তুল্য সে অপূর্ণ সৌন্দর্য্যস্বপ্ন তার চেয়েও দুর্জয়ের ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে।

চিবকালই হযত এমনিভাবে চলে' এসেছে। এ শুধু একুল ওকুলের বোঝাপড়ার কথা নয়, এদেশের ওদেশের বলে' এটা শুটা যে ছুর্ধোধ্য তাও নয়। এদেশ ওদেশ যখন কোথাও বা এক-জায়গায় মিলেছে তখনও যে সৌন্দর্য্যের টানকে নিঃসঙ্গভাবে কেউ ওজন কবেছে তা

নয়, তখনও লোক বিশ্বাসে এমন কি শঙ্কায় সে রম্যাবস্ঠার চারিদিকে চড়ক-পূজার পুতুলের মত ঘুরেছে—আকর্ষণকে অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছে অথচ মাথাও ঘুরে গেছে।

এ বিরোধের একটা ভিত্তি হচ্ছে খাঁটি সৌন্দর্য্যস্থিতি—পরিপূর্ণ ও বহুমুখী; তা ময়ূরকণ্ঠের রঙের মত রসব্যাঞ্জনায় নিত্য নূতন রঙে-হযত ফলিত হয়—তার কুল পাওয়া যায় না,—যেমন করে’ আদি কাল হতে সূর্য্যাস্তের কুসুমরক্ত হোলিলীলা, মধ্যাহ্নের শুভ্র দুকূলবাসের নিঃশব্দ স্বচ্ছতা, এবং প্রভাতের সদামিলিত স্নিকুমার হরিৎ হিল্লোলের কোন কুল নেই। পূর্ণস্থিতির ভিতর অনাদ্যন্ত স্তম্ভমহিমা নিহিত আছে বলে’ তার রসের নিবেদন বা æsthetic appeal অসীম, তা নিঃশেষ হতে পারে না। এ জন্মই গুপ্ত হওয়া, অমুদিত থাকা, মুকুল-কপী হওয়াটা কোন কোন শিল্পীর একটা লক্ষ্য হয়ে পড়েছে একালে। পশ্চিমের আধুনিক কবি ও শিল্পী এজ্ঞস্ত স্পষ্ট করেই বলে, যে ফরাসীতে যাকে বলে—“abscon” অমুদিত, অপরি-ক্ষুট, তা হওয়াই তাদের লক্ষ্য। ম্যালারমের সেই পবিচিত্ত উক্তি, “To name is to destroy, to suggest is to create” তাদের জপমন্ত্র হয়ে পড়েছে।

এটা হচ্ছে গোড়াকার কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সৌন্দর্য্যস্থিতিকে সিদ্ধবাদের মত বহুকাল হতে নানা আবর্জনা কাঁধে করে’ অগ্রসর হ’তে হয়েছে। সেটা সৌন্দর্য্যেব সৌভাগ্য হোক না-হোক, অন্ততঃ আবর্জনার ভাগ্য বলতে হয়। কিন্তু তাতে একটা ভ্রান্তি জন্মে’ গেছে। শ্রাম-দেশের বুদ্ধ-যজ্ঞের মত এ সূক্ষ্ম সম্পর্কে কোন্টা রসের রূপ কোন্টা তর্ক বা তথ্যের রূপ—এটা বোঝা শক্ত হয়েছে। যেটা যা নয় তা নিয়ে এমন কঠিন সংস্কার দাঁড়িয়ে গেছে যে এ যুগে যা সত্যোপেত তা নির্দ্বারণ করতে একটা নির্ধর্ম antithesis বা বৈপরীত্যের ভিতর দিয়ে যেতে হচ্ছে। আধুনিক পশ্চিমের আর্ট তারই প্রতিরূপ।

ইন্ডিয়ের আখ্যানগত সম্পর্ক ও সাযুজ্য (association) এজ্ঞস্ত আজ আঘাত পাচ্ছে—কিন্তু তা বলে’ রসরূপস্থিতির পথে ইন্ডিয়ের অধটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি অব্যাহত আছে। এটা একটু ভাল কবে’ বোঝা দরকার।

এসিয়ার সহিত প্রাথমিক সম্পর্কেও উরোপকে একবার ইন্ডিয়ের অধিকারকে সঙ্কুচিত করতে হয়েছিল—এবারও বাহিব থেকে দেখলে তাই মনে হতে পারে, কিন্তু তা নয়। এবার আনন্দে রূপরসগন্ধকে জগৎ বরণ করেছে—কিন্তু বিচিত্রতা হচ্ছে তার বিস্তৃত ও খাঁটি স্বরূপকে আঁকড়ে ধরবার জ্ঞান এবার বিশ্বের প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

আশ্চর্যের বিষয়, যে অধিকার সব-চেয়ে বড় ও স্বতঃ-সিদ্ধ বলে’ আজ মানুষ বড়াই করে, তাকে যে সে বার বার কত পঙ্খ ও বিকল করে’ রেখেছিল তা ইতিহাস দেখলে বিস্মিত হ’তে হয়। সৌন্দর্য্যের আকুল আকর্ষণ মানুষকে জীবনের নানা সঙ্কিস্থলে মুক্তি ও স্বাধীনতা, আলোক ও আনন্দের দিকে টেনে নিতে চেয়েছে; আর অমনি ভীত ও চকিত গতাহুগতিক বিধিব্যবস্থা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে—এবং ছায়াময়ী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীকে অর্গলবদ্ধ করতে না পেয়ে মানুষের ইন্ডিয়াকে বার বার শিকল দিয়ে বেঁধে পঙ্খ ও বিকল করেছে;—কখনও বা দোহাই দেওয়া হয়েছে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের পিচ্ছল-প্রান্তে বিহার করার উপর, কখনও বা নৈতিক রাজ্যের ভাল-মন্দের মধ্যবর্তী যে অনিশ্চিত ও ক্ষুব্ধার সেতু হুঁচুতে তাতে বিচরণ করার খাতিরের উপর।

এজ্ঞস্ত চোখের দেখাকে পঙ্খিল, কানের শোনা মধুর আওয়াজকে গরল বলে’ মানুষ অনেককাল ডমরু বাজিয়েছে—কখনও বা ধর্মোপজীবীর আদেশে, কখনও বা কল্প রাজ্যের দণ্ড-ভয়ে।

কাজেই ছনিবার রূপরসগন্ধের জগৎ হঠাৎ এমনি ঝরে’ পড়ে’ মানুষকে পেঁধে বসেনি। পথে কাঁটাবন অনেক পাওয়া গেছে—আবার বাইরের শাসন দেখানে তববারি হাতে দাঁড়িয়ে নেই—সেখানেও ভিতর হতে মনের উপর অনেক পর্দা এসে পড়েছে।

মানুষের সামাজিক জীবনের জটিলতা নানা নৈতিক ধর্মগত ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আলোড়িত হয়ে এসেছে, যা তাকে ঝড়ের মত এদিক ওদিক নিয়ে গেছে—বিচারকে মূঢ় কবেছে, আনন্দকে শিথিল করেছে; গতিকে সঙ্কুচিত কবেছে। এজ্ঞস্ত সে বিস্তৃত সৌন্দর্য্যের জালে

ধরা পড়লেও সে কথা অস্বীকার করতে ইতস্ততঃ করেনি। শিল্পীরা যে রকমের আবহাওয়ার ভিতর বসস্থি করেছে—সব সময় তা মুক্ত বা সহজ ছিল না, নানা বজ্রঘোষ ও আগ্নেয় সংঘর্ষের ভিতর শিল্পী আশ্রয় ধৈর্য্য ও নিপুণতার সহিত নির্ভয়ে সোনার স্বপ্ন বুন' গেছে। সমাজবিধির অলুশাসনে মানুষ নিজের চোখ বেঁধে ইন্দ্রিয়কে যেমন হিতোপদেশে দুর্বল করতে উৎসাহ পেয়েছে—তেমন নিজের ভিতরকার অন্তবতম প্রেবণাকেও সে ইচ্ছা করে' এমন অস্বচ্ছ ও স্থূল করে' তুলেছে যে তার পক্ষে সৌন্দর্য্যের স্বল্প ভাবাবেশ অনুভব করা সকল সময় সম্ভবও হয় নি। হয়ত এ জগুই—এরকম কঠিন বলেই—রসাস্বাদকে এ দেশ অপকৃপ মর্যাদা দিয়েছে—

ব্রাহ্মস্বাদ-সহোদরঃ রসাস্বাদ-লোকোত্তরঃ।

আশ্রয়ের বিষয়, এদেশে—এদেশে কেন, বোধ হয় সব দেশেই—রূপরসজগতের পথে অরূপ জগৎ বাধা দিয়েছে। অরূপ জগতের ধ্যানোপাসনারূপী রূপরসজগৎ প্রলোভন ত একটা না-হলে-নয় ব্যাপারই হয়ে পড়েছিল, এদেশের কাব্যে ও পুবাণে।

এজন্ত রসচর্চাব গোড়াতে এই রকমের একটা বিচার ও আলোচনা দরকার হয়ে পড়েছে। রসাস্বাদ ও রস-স্থিতিকে কঠিপাথরে কবে' দেখা অনিবার্য্য হয়ে পড়েছে।

চোখে দেখা ও চোখে পাওয়া—এ দুটিতে অনেক তফাৎ। চোখের উপর দুনিয়ার অনেক জিনিষ পড়েছে ও ভাসছে—কানেও অহবহ অনেক আওয়াজই আসছে—সে-সব কোন্ ধূসরিত পথে চলে' যায় তাব ঠিক নেই। কোকিলের আওয়াজ, আশ্রমকুলের গন্ধ স্থতির আদি হতেই ত মানুষ পেয়ে আসছিল—কিন্তু কলাব ইঞ্জজালেই তা লোকের ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে প্রথম আবিষ্ট কবে—সে-সব কালিদাস ও জয়দেবের মত কবির অপেক্ষা ছিল—তাঁরা শোনে নি মাত্র—তাঁরা পেয়েছেন এবং সে-সবকে সৌন্দর্য্য-লোকের চিরন্তন অধিকারী করেছেন। তেমনই বর্ষাগমে ময়ূরময়ূরী মত্ত কেকাদ্বানি, রক্তচক্ষু খঞ্জনব বমনুত্য—এ সব মানুষের রসজন্ম অধিকাংশ কবে' বসেছে শিল্পের ভিতর দিয়ে—এক অপকৃপ-রূপ পেয়ে গেছে সার্থক বসস্থিভিতর। এজন্তই পশ্চিমে ঊনবিংশ শতাব্দীকে

ব্যালজাকের (Balzac) স্থিতি বলে। ব্যালজাকের রসস্থিতির ভিতর নবনারী ও সমাজব্যবস্থা এমন এক রূপ পেয়ে গেছে যে, তিনি যে বসেব রসিক ছিলেন সে ভাবের ভাবুক না হবে করাসী জাতি পারে নি—এখানেই হচ্ছে সৌন্দর্য্যের জয়! দেশকালের প্রাকৃত বন্ধনকে ছিন্ন করে' কলা এই রকমেই জগৎকে উন্নীত ও রূপান্তরিত করে। কোন পশ্চিমের লেখক পশ্চিমের রসসাহিত্য ও কলায় জাপানের যে মূর্ত্তিটি পাওয়া গেছে, তা যে একেবারে লণিতকলার স্থিতি, তা দেখাতে গিয়ে বলেছেন :—

The Japanese people are the deliberate self-conscious creation of certain individual artists. If you set a picture, by Hokusai or Hokkai or any of the great native painters, beside a real Japanese gentleman or lady, you will see that there is not the slightest resemblance between the two. The actual people are not unlike the general run of English people.....One of our most charming painters went recently to the land of Chrysanthemum in the foolish hope of seeing the Japanese. All he saw—all he had the chance of painting were a few lanterns and some fans. He did not know that the Japanese people are simply a mode of style—an exquisite fancy of art.

কাজেই চোখে যা পাওয়া যাচ্ছে—তা চোখে যা মাত্র দেখা যায় তাব চেয়ে স্বতন্ত্র। সৌন্দর্য্যের মাধ্যম চোখে দিতে হয়—চিত্রের সঞ্চিত আবেগ বসন্তিক করতে হয়—তবেই রূপজগতের অলৌকিক ধারা চোখে পড়ে। উচ্চতর স্থিতি উপলব্ধির পথে সাধনা চাই। সৌন্দর্য্যলক্ষী সাতমহল হর্ম্যের অগণ্য সস্তারে বেষ্টিত হয়ে রূপরস-রাগেব অজস্র উৎসের মধ্যে রূপকথার রাজকন্ডার মত সোনার খাটে ঘুমিয়ে আছে—কোন্ দিন বাজপুত্র সমস্ত বাধা চূর্ণ কবে' তাকণ্যের উষ্মেগে বাইবের বাধাকে রম্যমন্ড্রে বিপর্য্যস্ত কবে' সোনার কাটি ছুঁইবে তাকে

সঙ্গীতবিত করবে! সে চেষ্টা আজ কত দিকে চলেছে।
নীটসের জরথুষ্ট্র বলেছেন :—

“A thousand paths are there, which never
have been trodden—a thousand salubrities
and hidden islands of life. Still unexhausted
and undiscovered is mankind and man's
world.”

যা-কিছু আমরা হুম্মর দেখছি তার পিছনে ললিত-
কলার এরকম আকর্ষণ আছে—তাব শিহরিত মুচ্ছনার
সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত রম্যতর লোকের অধিকারী হয়ে উঠেছে।
কলা-জগতে কোন বস্তুবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়-জগতের
ভিতরও যে কি-রকম বিপর্যয় ঘটে—তা কোন লেখক
কৌতুক করে' উল্লেখ কবেছেন :

“The quivering sun-light that one sees
now in France with its strange blotches of
mauve and its restless violet shadow is her
(Art's) latest fancy……and nature reproduces
it quite admirably. When she used to give
us Corots and Daubignys, she gives now
exquisite Monets and enhancing Pissaros.

এর মানে হচ্ছে মোনে ও পিসারো যে ছায়াজগৎকে
উদ্ঘাটন করে' সকলের চোখে ফেলেছেন তার মূলে ললিত-
কলার প্রবল প্রেরণা কাজ করেছে। এ দেশের আচাধ্যেরা
জ্ঞানার্জন-শলাকা দিয়ে চক্ষুমান করে' সকলকে ব্রহ্মসাক্ষাৎ-
কারে সক্ষম করতেন বলা হয়—ভেগনি ভাবে কলা ও
কবিতাও মানুষের পক্ষে সৌন্দর্য্যের সপ্তলোক-বিচরণের
জন্তু বম্য দেবদানের সৃষ্টি করেছে।

কাজেই মানুষের ইন্দ্রিয়-জগৎ একটিমাত্র চওড়া ও
বাঁধান রাস্তায় চলে না—তা পলকে সৃষ্টির ভিতর এক
রম্য ইন্দ্রজাল উপস্থিত করে' রূপরস-জগতের অপূর্ব ও
বহুমূল্য স্বরূপকে উদ্ঘাটন করে।

একবার তাত্ত্বিকদের মতামত দেখা যাক। কাব্য ও
কলা প্রসঙ্গে নীটসেকে ভোলা অসম্ভব। লেভির মতে
উরোপের নব্য Renascence বা নব-অভ্যুদয়ের ভিতর
তিনটি ভাবুক মাথা তুলে দাঁড়ান ; একজন হচ্ছেন, স্তাঁদাল

—যিনি বর্তমানকে অতি তুচ্ছ করে' অগ্রসর হয়েছিলেন ;
দ্বিতীয় হচ্ছেন গ্যোটে, যিনি বাইবেলকে সবচেয়ে বিপজ্জনক
বই বলেছেন, এবং অধিক বা majorityর মতামতকে
বরাবরই ব্যঙ্গ কবেছেন ; তৃতীয় হচ্ছেন, নীটসে—the
greatest hero of the Renascence রেনেসাঁসের
বা নব-অভ্যুদয়ের মাথার মণি। নীটসের আবির্ভাবের
আগেকার উরোপীয় কাব্য ও কলার খবর যারা রাখেন
তারা জানেন নীটসের দীক্ষামন্ত্র উরোপে কি অসাধ্য সাধন
করেছে।

ইন্দ্রিয়-পরিধি অতিক্রম করার আবেগ ও কল্পনা
মানুষের সব জায়গায় আছে। এ দেশ সে পথে মানুষকে
অতিমাত্র না করে', দেবতাকে মানুষ করেছে—তা'তে
সকলেব আত্মপ্রসাদ লাভ ঘটেছে। উরোপ দেবতা মানে
না। কাজেই সেখানে মানুষকে মনুষ্যত্ব অতিক্রম করার
কল্পনা করলে কল্পনার দিক থেকে ভাল লাগে, কিন্তু ব্যব-
হাবেব দিক থেকে দুঃসহ হয়। মানুষকে ও-রকম দেবতা-
স্থানীয় করলে ওখানে তাকে স্বর্গচ্যুত করতেই হয়। এজন্য
অতিমানবত্বের অনেক ব্যঙ্গ পশ্চিমে হয়েছে।

আজকাল নীটসের will to power ও কল্পনাকেও
রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে লঘু ব্যঙ্গের বিষয় করা হচ্ছে, যদিও
উরোপ তা এখন মাথা পেতে নিচ্ছে। অথচ জিগীষাব
এই প্রেবণা উরোপেব বুক হতে রুগ্ন ও গলিত কত
আবজ্ঞনা যে দূর করেছে তার সীমা নেই। অন্ততঃ
সকীর্ণ বস্তুবাদের ধারা থেকে চিত্তকে মুক্ত করার কাজটিও
যৎসামান্য নয়। এদেশের লোক ভাল কবে' জানে
না যে নীটসে শোপেনহাউয়ারের শিষ্য। শোপেনহাউয়ারের
Will-বান্ধই নীটসের ভিতর প্রলয়ঙ্কর শক্তি পেয়েছে
এবং তাবই মূলে বেদান্তের ‘আত্মানং বিদ্ধি’ ‘নান্মাত্মা
বলহীনেন লভ্যঃ’ প্রভৃতি রয়েছে। কারণ শোপেনহাউয়ারের
সহিত উপনিষদের সম্পর্কের কথা সকলেই জানে।
নীটসে স্পষ্টই বলেছেন, সৃষ্টিব কাজ ত মানুষই করে'
আসছে। ছনিয়া যখন এক অজ্ঞাত ও অবিগিষ্ট বস্তু-
ভাও ছিল তখন ইন্দ্রিয়জগতের সঙ্গে বোঝাপড়া করে'
মানুষই ত তার নাম ও দাম্য কবে' নিষেছে, সেটাই ত
সৃষ্টি।

"Naming, adjusting, classifying, qualifying, valuing, putting a meaning into things and above all, simplifying—all these functions acquired a sacred character and he who performed them to the glory of his fellows became sacrosanct."

তাতে করে' মানুষ দুনিয়াকে বোঝবার সূত্র পেলে, এলো-মেলা ইন্দ্রিয়ের বিচ্ছিন্ন ফাঁদ হতে বেরিয়ে দুনিয়ার বস্তুপার্থ্যায় নাম পেয়েই যেন সৃষ্টি হ'ল। এজন্য কোন কোন জায়গায় নামকরণ ও সৃষ্টি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মিসর-ধর্মের ঈশ্বর নাম-করণ করে' দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন বলা হয়েছে। জিহোবা শুধু নাম উচ্চারণ করে' বস্তুবারা সৃষ্টি করেছেন এ রকম একটা বর্ণনাও আছে।

নীটসে একজন Dionysian বা মোদ-মত্ত আর্টিষ্টের কল্পনা করেছেন—যে নতুন নতুন ভূবন সৃষ্টি করবে—যার হাতে becoming বা ভাব্য রম্যত্বের being বা সত্তাতে পরিণত হবে। তাঁর মতে অলস হয়ে বহিরিন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে পুরাণ কথাষ না মজ্জা' বিশ্বামিত্রের মত নতুন সৃষ্টি ঘটিবে তুলতে হবে। Art is the will to overcome becoming, it is a process of eternalising, আর্ট অনন্ত হওয়ার প্রক্রিয়া। সৃষ্টির শিহরিত কম্পন ও মবীচিকার ভিতর দিয়ে, শিল্পীর রূপসৃষ্টিব ভিতর দিয়ে, স্থলর অসীমতার স্পর্শ পায়, অমর হয়ে যায়! এই অপরূপ ইজ্জতালবের অধিকার স্বকুমার-কলার আদিম ও নিজস্ব। কথাটিতে দার্শনিক শেলিঙের একটি কথা মনে পড়ে—

"Art, in that it presents the object in this movement, withdraws it from time and causes it to display its pure being in the form of eternal beauty"—আর্ট কাল অতিক্রম করে' বস্তুকে অনন্ত সৌন্দর্যের শুদ্ধ রূপে প্রকাশিত করে।

দুনিয়ায় এই যে অপ্রান্ত প্রবাহ, এই যে flux—গতি, এই বিসৃষ্টি ও বিসর্জন চলছে, তার কোন মুহূর্তকে চয়ন করাকে বার্গসোঁ অলীক-ব্যাপার বলে' মনে করেন। তিনি বলেন এই অঘটন-ঘটন-পটায়সী

শক্তি শুধু আটেরই আছে। Becoming বা প্রবাহকে মস্তবলে নিরস্ত করবে' বোম্‌টা খুলে তাকে চিরন্তন স্রী দান করার এ মস্ত কবি ও শিল্পীবাই জানে, এ ইজ্জতাল শুধু তাদের হাতেই সম্ভব হয়।

বিচার বিবেচনা বা কার্যকারণের ধারা অহুসরণ করে' এই গুপ্তন উন্মোচন হয় না—উদ্দীপনার ভিতর দিয়ে হয়। এরকমের অদ্ভুত উদ্দীপনা শিল্পীর হাতের রঙের তাস—ভেঙ্কীর মস্তদণ্ড। তা ইন্দ্রিয়কে স্থপ্ত করে' আবার অপরূপ সৃষ্টির ভিতর জাগ্রত করে। বার্গসোঁ'ব কথাটি বলি :—

"It is like a refined and spiritualised version of hypnosis. Music in its ordered rhythm invades us with such power that it suspends the usual course of our sensations and ideas and renders us susceptible to the smallest artistic hints of this feeling or that."

তিনি কবিতা সম্বন্ধে বলেন :—"Its rhythm masters us, our mind is enchanted, led captive by the thoughts of the poet, his words conjure up images before our eyes—there we attain in sympathy that which without his magic we should have missed. The artist tears away a veil which the exigencies of practical life have placed between his consciousness and ours, and the richer in thought the more inspired by feeling is the world into which he brings us, the loftier and the more intense is the beauty he enshrines in his colour, his marble, his notes of music and his words."

প্রাগ্‌মেটিষ্টদের অল্পতম প্রতিনিধি নীটসে'ব কথা এবং আত্মপ্রত্যয়বাদী নব্যদর্শনকার বার্গসোঁ'র উক্তি, এই একটি লায়গায় মিলে যাচ্ছে।

বার্গসোঁ' সৃষ্টিকে অহরহ পরিবর্তনশীল মনে করেন। Science বা বিজ্ঞান যা নিয়ে ক্রিয়া করছে সেটা হচ্ছে যন্ত্র-জগৎ—dead matter, তাব ভিতর নিয়মতন্ত্রের অপূর্ণ



অনুলেখক
চিত্রকর শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন।

বাধা-বাধকতা ও শৃঙ্খলা আছে, তাকে বাধা যায় এবং এ-রকমে বেঁধে মানুষ তাকে নানাভাবে কাজে লাগাচ্ছে। কিন্তু যেখানে জীবনের সম্পর্ক সেখানে গেলে মনে হয় যেন এক অসীম ও অকূল সাগরে পৌছন গেল। তা নিত্য চঞ্চল, তার ক্রম-হিলোল এক মুহূর্তের জন্ত অপেক্ষা করছে না,—তা ওতপ্রোত ও অথও, এজন্ত তাকে পাওয়া মুশ্কিল, দেখা মুশ্কিল। হুনিয়াকে টুকরো টুকরো করে' দেখা যায়, কিন্তু তা হলে সে ত হুনিয়া আর থাকে না! এজন্ত এমন লোক চাই যার চোখ আছে, যে দেখিয়ে দিতে পারে। সে চোখ অন্তর-নিরপেক্ষ নয়। সে চোখ যার আছে সে দেখতে জানে। বার্গসে' বলেন, এ-রকমে দেখতে জানে যারা তারা ইচ্ছে আটিং।

"From the beginning of humanity there have been men whose peculiar office has been to see and to make other men see that which without their aid would never have been discovered. They are artists."

এই সৌন্দর্য্য উল্কাটন বা সৌন্দর্য্যারোপকে বার্গসে' অনেকটা জন্মগত সংস্কার বলেছেন। এ যেন অসীমের রূপ-সংস্পর্শের সহিত মনের একটা আদিম বন্ধন, যাতে শিল্পী বাঁধাও পড়েছে—মুক্তও হয়েছে।

এ অবস্থাটিকে আমাদের গীতাকারের মতে অনেকটা বিভূতি-যোগের ফল বলতে হয়। শুধু সংস্কার নয়—চর্চারও দরকার হয় সংস্কারেরই খাতারে। 'নাম-রূপ' যেমন অগ্রসর হওয়ার সোপান, তেমনি বাধাও। গীতাকার আর-একটা উচ্চতর অবস্থার কথা বলেছেন, যে অবস্থায় বিশ্বরূপদর্শন হয়। সেটা বিভূতি-যোগের পরের অবস্থা। এ প্রসঙ্গে কথাটি মনে করা ভাল।

এদেশের শব্দ- ও ইন্দ্রিয়-জ্ঞান সম্পর্কে একটা স্ফোটবাদ অনেক কাল হতে চলে আসছে। তাত্ত্বিকদের মতে প্রত্যেক জিনিষের পিছনে একটা অনাদি শব্দবাক্যের ঝড়ের মত ভাবের হিলোল উপস্থিত করে—যা-কিছু দেখছি তা অর্থযুক্ত করে' তোলে। না হলে ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। শারীরিক-স্থত্রের বিচারে শব্দের পূর্বপক্ষের দিক হতে এ বিচার করেছেন। একটা কথাকে অক্ষরে বিভক্ত

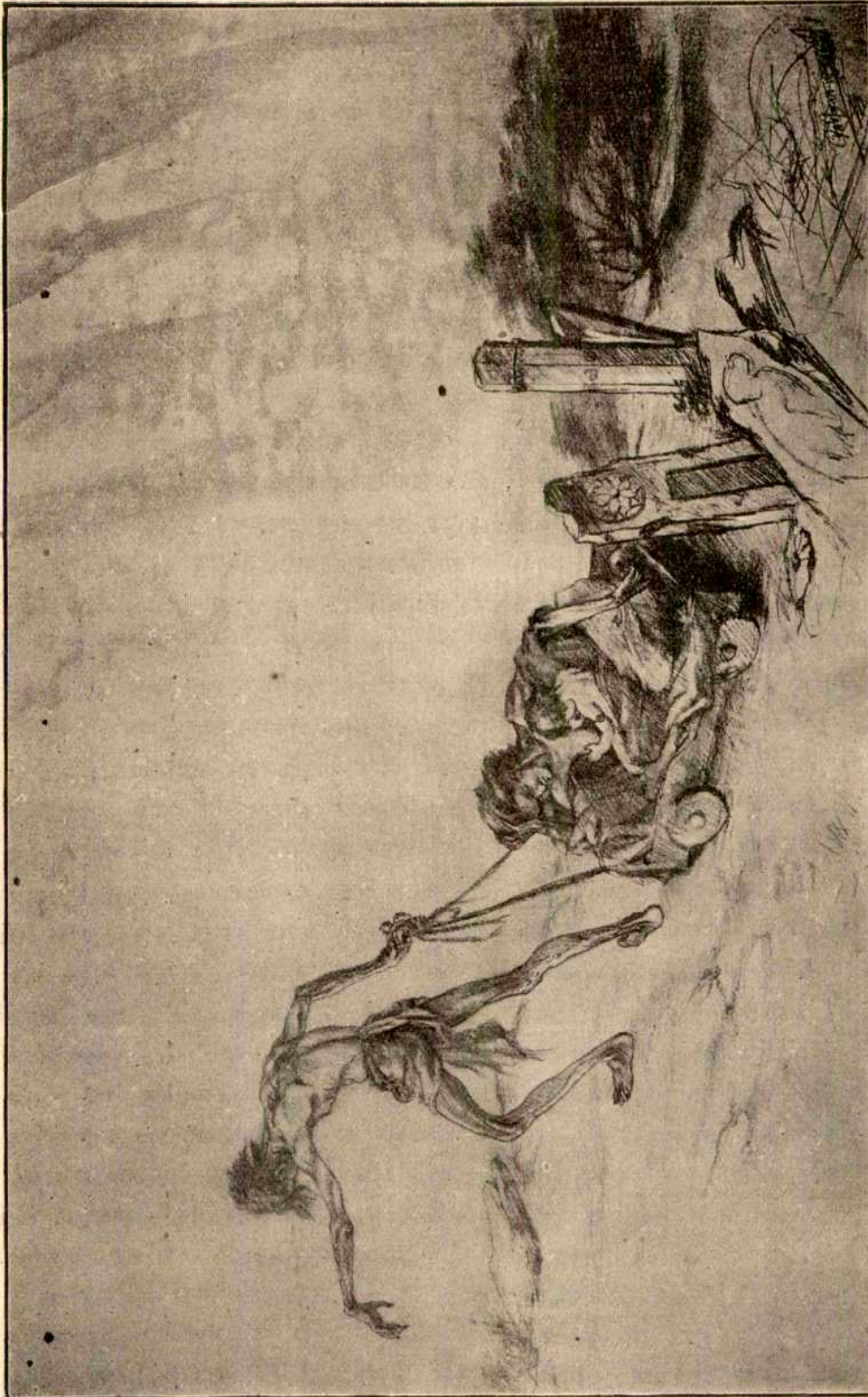
করা হলে কোনও অক্ষরে সমস্ত বাক্যের মানে নিহিত থাকে না, কিন্তু একে একে শেষ অক্ষর উচ্চারণ হতেই সমস্ত কথাটি হঠাৎ জাগ্রত ও জীবন্ত হয়ে উঠে। এ স্ফোটকে বার বার বাক্যটি উচ্চারণ করলে পাওয়া যায়। এজন্ত তাকে অনাদি বলা হয়েছে। এমন কি বলা হয়েছে, হুনিয়া সার্থক ও পরিস্ফুট হচ্ছে এরকমের একটা অসীমতা তাকে অর্থযুক্ত করছে বলে'। তর্ক ছেড়ে সহজে শিল্পীর এ অবস্থাটিকে আমরা একটা রসের স্ফোটবাদ বলে' কল্পনা করলে অনেকটা বার্গসে'র কল্পনার সামনে এসে পড়ি। শিল্পীর ভিতর একটা অনাদ্যন্ত রসরূপ এমনি সংস্কারকে সার্থক করে' তোলে।

সে যাক। ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল-প্রসঙ্গে ঐন্দ্রজালিকের প্রসঙ্গ এমনিভাবে উঠছে। চোখে দেখার পিছনে যে দেখছে তার প্রশ্নই বার বার উঠছে। শ্রুতি বা শিল্পী ইন্দ্রিয়স্থানীয় মনেরও অতীত। শুধু মনকে এদেশের তত্ত্ববিদরা ইন্দ্রিয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন—একাদশ ইন্দ্রিয়ের ভিতর মনকে অন্ততম ইন্দ্রিয়স্থানীয় করা হয়েছে, স্থূল থেকে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর অবস্থার দিকে বিচার করে'। এজন্ত মানুষের পঞ্চকোষাত্মক জীবাত্মার কথা বলা হয়েছে—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ।

ইন্দ্রিয়াত্মক মনোময় কোষের অধিকার সামান্য। বুদ্ধি ও বিচারাত্মক (conceptual sheath) কোষের একটা প্রয়োজনীয় স্তরের ভিতর দিয়ে গেলে—তবেই আনন্দময় কোষে ব্রহ্মাবাদ লাভের আনন্দ ঘটে। কাজেই মনকে ছাড়িয়ে আরও গভীরতর জায়গায় গেলে দেখা যায় তা অতলম্পর্শী—সে গভীর আনন্দ-ভূমে যারা পড়েছে তারা বেরোবার পথ পায়নি। তারা যা চায় তা পেয়েছে, জীবনের বহুমুখ রসসংস্পর্শের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে পরম কৈবল্য লাভ করেছে। কাব্যচর্চায় ও কাব্যের রসভোগেও এ-সমস্ত স্তর সতর্ক অশুভলি না হোক অন্ততঃ কয়েকটা প্রশ্ন এ যুগে ভাল রকমেই উঠেছে। চিত্রেও সে জটিলতা সম্মুখীন হয়েছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রী বামিনোকান্ত সেন



ନିରାଶାର ବୃକ୍ଷେ ଆଶାର ଅନ୍ଧର
 ଚିତ୍ରକର ଶ୍ରୀଦେବୀ ଅନାଦ ସ୍ୱୟ ଚୌଧୁରୀ

মালবিকা

জ্যোৎস্নালোকে সম্রাট অশোক উদ্যানে পাদচারণ করিতেছিলেন, সঙ্গে দুই-চারিজন বয়স্ক। ঝাউ বৃক্ষে নৈশ বায়ু মর্মর করিতেছিল, গন্ধরাজ কিঞ্চৎ মল্লিকা রজনী-গন্ধার গন্ধে চাবিদিক আমোদিত হইতেছিল। সম্রাট অল্পভাবী, মাঝে মাঝে দুই-চারিটি কথা কহিতেছিলেন, বয়স্কেরা চপল, তাহাদের মুখে কথাব বিরাম নাই।

অশোক ধীবে ধীবে, কখন তরুহাষাতলে, কখন জ্যোৎস্নাশোভিত দুর্বাদলেব উপবে পাদচারণ করিতে-ছিলেন। সরোবরের জলে পাদপছায়া কম্পিত হইতেছিল, বায়ুভবে সম্রাটের কুক্ষিত কেশ ও উন্ময় চঞ্চল হইতেছিল। নীল নিম্নল আকাশ, আকাশে ও পৃথিবীতে চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত নিশীথিনীর মাথা।

পদ্মনাভ কহিলেন, “প্রয়াগে মহাবাজের নূতন কীর্তি-শিলা-স্তম্ভ নির্মিত হইতেছে।”

ধর্মপাল কহিলেন, “তক্ষশিলার স্তম্ভের সমান হইবে।”

চন্দ্রচূড় কহিলেন, “ইন্দ্রপ্রস্থের স্তম্ভই শ্রেষ্ঠ। পাণ্ডবের কীর্তি মহাভারতে; মহাবাজের কীর্তি সর্বলোকের দৃষ্টির গোচর, আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, যুগে যুগে এই কীর্তিস্তম্ভসমূহ দেখিয়া লোকে বিস্মিত চমৎকৃত হইবে; পাটলীপুত্র হইতে তক্ষশিলা, উজ্জ্বিনী হইতে দারকা, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে মহাবাজের অক্ষয় কীর্তি, সমাগরা ধবণীর চক্রবর্তী অধীশ্বর; ইতিহাসে পুৰাণে সম্রাট অশোকের সম-কক্ষ কে?”

সম্রাট আকাশের দিকে চাহিয়া দৈপিলেন। প্রশান্ত প্রশস্ত ললাট, বিশাল চক্ষে গভীর অন্তর্দৃষ্টি। স্নিগ্ধ গম্ভীর বীর স্বরে কহিলেন, “পাষাণে উৎকীর্ণ যশেব কাহিনী কি অক্ষয় কীর্তি?”

চাটুবাদী বয়স্কগণ স্তব্ধ হইলেন।

সম্রাট কহিতে লাগিলেন, “যে কীর্তি মানব-হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে, পুরুষপরম্পরায় যে কীর্তি কণ্ঠে কণ্ঠে কথিত হয়, সেই কীর্তিই অক্ষয় কীর্তি। আমি এ পর্যন্ত আপনাদের নামের সার্থকতা সম্পন্ন করিতে পাবি নাই।”

অল্পবৃদ্ধি বয়স্কেরা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ধর্মপাল সঙ্কোচের সহিত কহিলেন, “নামের সার্থকতা? মহারাজের নাম জগতে সর্বত্র ঘোষিত হইতেছে, মহারাজের জয়ধ্বজা দেশ-দেশান্তরে উড্ডীয়মান, কত বাজা মহাবাজা মহাবাজের পদানত, মহারাজের নামে শত্রুর জয়কম্প হয়। নামের সার্থকতা নাই?”

চিন্তাযুক্ত স্ববে, যেন আপনাব মনে সম্রাট কহিলেন, “আমার নাম অশোক। পিতামাতা এ নাম কেন রাখিয়াছিলেন? শুধু কি আমি রাজ্যবিস্তার কবিব, দিগ্বিজয়ী হইব, এই মনে করিয়া? পিতা-মাতার শোক হরণ করিব, এইজ্ঞ? অশোক তরুর নাম সার্থক, ফেন না শোকাক্তা সীতা অশোক-বনে গিয়া পরিণামে শোকশূন্য হইয়াছিলেন। আমি কি অশোক, শোকশূন্য? কাহারও শোক মোচন করিয়াছি? শোকসাগরে কত লোককে নিমগ্ন করিয়াছি, স্বাধীন রাজাদিগকে কবদ করিয়াছি, অপরের সম্পত্তি বলপূর্বক গ্রহণ কবিয়াছি। কেমন কবিয়া আমার নামের সার্থকতা হইল? আমি কি অশোক?”

আব কেহ কোন কথা কহিল না। এক খণ্ড মেঘ আসিয়া চন্দ্রকে ঢাকিল। অশোক ধীবে ধীবে প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

২

সম্রাট আপনাব নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বয়স্কেরা প্রমোদ-আগারে গমন করিল।

সুসজ্জিত প্রমোদ-প্রকোষ্ঠ আলোকে উজ্জ্বলিত। স্বর্ণ-প্রদীপে স্নগন্ধি তৈলে আগাব আলোকিত, আমোদিত। কোথাও সুরভি পুষ্পরাশি, কোথাও বিচিত্র মাল্যদাম। এক দিকে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের মধুব আরাব, তাহাব পার্শ্বে নর্তকীর নূপুর নিকণ, অলঙ্কারশিখন, বিচিত্র অলস লাস্ত। মধ্যে মধ্যে রমণীকণ্ঠের মধুময় গীত।

প্রমোদগৃহে সম্রাট ইচ্ছামত আগমন করেন, অথবা করেন না। আজ আসিলেন না।

প্রাসাদের অপর পার্শ্ব, নির্জন প্রকোষ্ঠে, করতললগ্ন-কপোল সম্রাট চিন্তা কবিতেছিলেন। কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া উঠিয়া রাজবেশ ত্যাগ করিয়া সাধারণ নাগরিকের বেশ ধারণ করিলেন। তৎপরে স্বহস্তে আলোক নির্বাপিত করিয়া প্রাসাদ হইতে গোপনে নিষ্কাশ্ত হইলেন। তাঁহার স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র দ্বাব ছিল, সেখানে প্রহরী থাকিত না।

চন্দ্র অন্ত গিয়াছে। অশোক রাজপথ ত্যাগ করিয়া একটা সঙ্কীর্ণ পথে প্রবেশ কবিতেছেন, এমন সময় নগর-প্রহরী ডাকিল, “কে ঘায়?”

সম্রাট কহিলেন, “নাগরিক।”

“বল, মহাবাজ্ঞ অশোকের জয়!”

সেইকপ বলিবা সম্রাট গলিতে প্রবেশ কবিলেন। সে পথে আলোক অল্প, অন্ধকারে অশোক সাবধানে চলিলেন।

কিছু দূর গিয়া দেখিলেন একটি জীর্ণ ক্ষুদ্র কুটার, দ্বার অর্ধমুক্ত, ভিতরে প্রদীপের সামান্য আলোক। সম্রাট ধীরে ধীরে দ্বারে করাঘাত করিলেন। ভিতর হইতে কে কহিল, “দ্বাব মুক্ত আছে, প্রবেশ কর।”

অশোক প্রবেশ কবিয়া দেখিলেন, জীর্ণ কক্ষার উপর একটি বৃদ্ধা বসিয়া আছে। বৃদ্ধা কহিল, “তুমি তঙ্কর? এ কুটার হইতে অপহরণ করিবার যোগ্য কিছুই নাই।”

সম্রাট কহিলেন, “আমি তঙ্কর নহি। আমি ধনবান নাগরিক, কাহাবও কোনকপ অভাব হইলে পূরণ করিবার প্রয়াস করি।”

বৃদ্ধার চক্ষুষ্য অশ্রুপূর্ণ হইল, কহিল, “আমার অভাব কে পূর্ণ করিবে?”

অশোক কহিলেন, “আমাব সাধ্যের অতীত হয়, সম্রাট অশোককে জানাইব।”

বৃদ্ধার চক্ষু হইতে উদ্বেলিত অশ্রুধারা বহিল, কহিল, “সম্রাট অশোককে আপনি জানেন?”

“জানি।”

“তিনি আমার অভাব মোচন করিবেন?”

“তাঁহার ক্ষমতা অসীম, ঐশ্বর্য্য অতুল, তিনি ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারেন?”

“তিনি কি বড় দয়ালু?”

“শুনিতো ত পাই।”

“তিনি ত অশোক, তাঁহার কোন শোক নাই। তিনি কি অপরেরও দুঃখ মোচন করেন?”

“তিনি নিজে শোকশূন্য নহেন, কিন্তু তাঁহার বড় ইচ্ছা সাধ্যমত অপরের শোক দূর করেন। অনেক সময় অমুতাপে তিনি আকুল হন।”

“কিসের জন্ত অমুতাপ?”

“এই নিরবচ্ছিন্ন রাজ্য ও প্রতাপের বিস্তৃতির জন্ত। এই সাম্রাজ্য কোন ছার, সমস্ত জগতের অধিপতি হইলেই বা কি ফল? সম্রাটের চারি পাশে চাটুবাদী, সত্যবাদী কেহ নাই। লোভ সকলের, মমতা কাহারও নাই। বহু পার্শ্বচর, মিত্র কেহ নাই। কেবল তৃষ্ণা, নিবৃত্তি কিছুতে নাই।”

বৃদ্ধা প্রদীপ তুলিবা সম্রাটেব মুখের সম্মুখে ধরিল। জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে?”

সম্রাট মস্তক অবনত করিলেন, কহিলেন, “আমি অশোক।”

বিস্ময়ে বা সম্মুখে বৃদ্ধা অভিভূত হইল না। প্রদীপ রাখিয়া দিল। চক্ষের অশ্রু শুকাইয়া গিয়া চক্ষু অন্ধারের ত্রায় জলিতে লাগিল। মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত সম্রাটের মুখের সম্মুখে ধরিয়া উন্নাদিনীর ত্রায় বৃদ্ধা বলিল, “তুমি অশোক, তুমি সম্রাট, রাজ্যে দণ্ড্য-তঙ্করের ত্রায় এই ভয়প্রায় জীর্ণ কুটারে, এই বৃদ্ধা অনাথিনী ভিখারিণীর আলয়ে প্রবেশ করিয়াছ? আর কেহ এ কথা শুনিলে হাসিবে। আমি জানি তোমার কথা সত্য, তুমি জগৎবিশ্রুত রাজ্যধিরাজ অশোকই বটে। কোথায় তুমি প্রমোদগৃহে নিলাজ নৃত্য দেখিবে, না তুমি এই শূন্য প্রাচীন কুটারে গভীর রাজ্যে তঙ্করের ত্রায় প্রবেশ করিয়াছ! কেন মহারাজ? তুমি কি জান না, যে হত্যা করে সে হত্যা স্থানে পুনঃ পুনঃ আগমন করে, তাহার অন্তরের পাগ তাহাকে আকর্ষণ কবিয়া লইয়া আসে? তুমি অশোক, তোমার নামের সার্থকতা সম্পন্ন করিতে এই রাজ্যে এমন স্থানে আসিয়াছ? দ্বার সাগর তুমি, অর্ধ দিয়া আমার দুঃখদারিত্ব মোচন করিবে? মহারাজ, তঙ্করে ত ছুচ্ছ তৈজস অপহরণ কবে, তুমি যে আমার প্রাণসর্কষ

অপহরণ কবিয়াছ। আমি বিধবা, দরিদ্র, দুইটিমাত্র আমার পুত্র; কত যত্নে, কত কষ্টে তাহাদিগকে লালন পালন করিয়াছিলাম। আমার চক্ষের মণি যে তাহাবা, আমার আশাব সম্বল, বৃদ্ধ বয়সে ভরসার স্থল! রূপে শুণে, বলে বিনয়ে রাজপুত্রও তাহাদের সমকক্ষ নহে। কোথায় তাহাবা, মহারাজ? তোমাব যমদূতেরা দুই ভাইকে ধরিয়া লইয়া গেল, তোমার সৈনিক হইয়া তাহারা যুদ্ধ করিবে। তোমাব জয় হইল, আর এক রাজ্যে তোমার জয়ধ্বজা উড়িল। কিন্তু আমার দুই পুত্র কোথায়, মহারাজ? যুদ্ধক্ষেত্রে শৃগাল শকুনী তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিয়াছে। তুমি আমার অভাব মোচন করিবে, আমার দুই পুত্রকে ফিরাইয়া দিবে? তুমি অশোক? তুমি কৃতান্ত স্বয়ং!”

মহারাজ অশোক অবনত মস্তকে, হেঁট মুখে, বিনা বাক্যে কুটীর হইতে প্রস্থান করিলেন।

৩

ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, কোথাও কোনরূপ সজ্জা নাই। ধবণীতলে সামান্য আসনে বসিয়া সম্রাট অশোক। চিন্তামগ্ন।

দৌবারিক আসিয়া যুক্ত করে নিবেদন করিল, “মহাবাজ, সেনাপতি দ্বারে দণ্ডায়মান।”

সম্রাট কহিলেন, “দ্বার মুক্ত। তাঁহাকে আহ্বান কর।” সেনাপতি আনিয়া, দুই হস্ত তুলিয়া অভিবাদন করিলেন, “জয়, জয় মহারাজ!”

সম্রাট কহিলেন, “তোমাব মঙ্গল হউক! মৌন সংবাদ আছে?”

“মহারাজ, কলিঙ্গের বাজকন্তা আসিতেছেন। দূত-মুখে সংবাদ পাঠাইয়াছেন আত্ম সজ্জার সময় নগরে আসিয়া উপনীত হইবেন।”

“কলিঙ্গের বাজকন্তা? এখানে কেন?”

“রাজদর্শনে। কলিঙ্গ বিজিত হইবার পরে রাজ্যাব মৃত্যু হয়। বাজকন্তা পিতৃমাতৃহীন, যুবতী, এ পর্যন্ত বিবাহ করেন নাই। মহারাজের দর্শন কামনায় রাজধানীতে আগমন করিতেছেন।”

“এখানে তাঁহাকে কোথায় বাসস্থান দেওয়া হইবে?”

“মহারাজের আদেশ গ্রহণ কবিতে আসিয়াছি।”

অশোক ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। চিন্তা কবিয়া কহিলেন, “অমরাবতী উত্তান-প্রাসাদে তাঁহার বাসের আয়োজন কর। অল্পচরবর্গের সংখ্যা কত?”

“পঞ্চাশ জন।”

“তাহাদের জন্তও উপযুক্ত আয়োজন কর। আমি স্বয়ং যাইতেছি।”

অমরাবতী প্রাসাদে গিয়া সম্রাট স্বয়ং সকল আয়োজন পর্যবেক্ষণ করিলেন। রাজকন্তাব শয়নাগার, স্নানাগার, বিশ্রামাগার দেখিলেন। স্থানে স্থানে সজ্জার সামগ্রী পরিবর্তনের আদেশ দিলেন। বাজপ্রাসাদ হইতে নানা-বিধ বহুমূল্য সামগ্রী আনীত হইল। সঙ্গীতাগারের বীণা সেতার বংশী পবীক্ষা করিয়া দেখিলেন। শিল্পা-গারের শিল্পের সকল সামগ্রী দেখিলেন। প্রসাধন-ক্ষেত্রে অঙ্গবিন্যাসের সকল উপকরণ আছে কিনা লক্ষ্য করিলেন। দাসদাসীদের বাসস্থানও স্বয়ং পরিদর্শন করিলেন।

সম্রাট কলিঙ্গ-রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। সেই দেশের রাজকন্তা আসিতেছেন। কি উদ্দেশ্য? অহুযোগ, অভিযোগ? সম্রাট শঙ্কিত হইলেন।

অপরাজে উত্তান-প্রাসাদ পুষ্পে সজ্জিত হইল। রাত্রি দীপাবলী। চাবিদিকে দীপমালা সাজাইয়া রক্ষকেরা ইজপুরী করিয়া তুলিল।

সম্রাটের আদেশে সেনাপতি একদল সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইয়া রাজকন্তাকে আনয়ন করিলেন। প্রত্যাগমনে জন্ত নগরদ্বারে দাঁড়াইয়া সম্রাট স্বয়ং।

স্বর্ঘ্য অন্ত যাইবার পূর্বে রাজকন্তা মালবিকা নগর-দ্বারে উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সম্রাট কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন। রাজকন্তা শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা কবিতে উত্তত হইলেন। ব্যস্তভাবে সম্রাট তাঁহাব হস্ত ধারণ কবিয়া তাঁহাকে নিঃসরণ করিলেন।

কিয়ংকাল সম্রাট রাজকন্তার হস্ত মুক্ত করিতে বিম্বত হইলেন। তিনি অনেক স্তম্ভবী দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এমন স্তম্ভবী অদ্যাবধি কখনও তাঁহাব নয়ন-

গোচর হয় নাই। অতুলনীয় রাজরাজেশ্বরীর রূপ রাজপুত্র আলোকিত করিয়া সম্রাটের সম্মুখে বিরাজিত হইল। চাকল্যরহিত, স্থির রূপবাশি, অঙ্গে প্রত্যঙ্গে সজ্জিত উর্ধ্বমালার লাবণ্যলহরী।

বেশ এবং অলঙ্কার রূপের অল্পরূপ। ললাটে কুঞ্চিত কেশে এক খণ্ড বৃহৎ হীরক অন্তর্গত সূর্য্য-কিরণে জ্বলিতেছে, চূর্ণকুন্তলে মুক্তামালা। বক্ষে মণি-মুক্তাখচিত কঙ্কুক, হীবকে মাণিক্যে স্বর্ণাঙ্কল ঝল-মলায়মান।

মুগ্ধ বিস্ময়বিত্ত লোচনে সকলে সেই অপূর্ণ যুগল মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বমণী অপূর্ণ রূপসী, পুরুষ তেজস্বী ধীর সৌম্য মূর্ত্তি।

সম্রাট রাজকন্যার হস্ত মুক্ত করিলেন, কহিলেন, “তোমার শুভাগমনে পাটলীপুত্র ধন্য হইল।”

রাজকন্যা কহিলেন, “আমি আপনার দাসী।”

৯

দিন যায়। রাজকন্যা মালবিকা পাটলীপুত্র নগরে কেন আগমন করিয়াছেন কেহ জানে না, কেহ তাঁহাকে সে কথা জিজ্ঞাসাও করে না। সম্রাট প্রতিদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাঁহাদের নানা বিষয়ে অনেক কথোপকথন হয়, কিন্তু রাজকন্যার আগমনের উদ্দেশ্য সম্রাট কখন জিজ্ঞাসা করেন না, সে কথা উত্থাপন করেন না।

মালবিকার সহিত কথা কহিতে কহিতে সম্রাট বিস্মিত, চমৎকৃত হইতেন। রাজকন্যার বিদ্যারূপ, বহুমুখী বিদ্যার অল্পশীলন, তাঁহার যুক্তিপূর্ণ সরস বাক্যালাপ, তাঁহার নম্রতা ও ধীরতা দেখিয়া সম্রাট আশ্চর্য্য হইতেন।

যাহাতে রাজকন্যার সময় স্নেহে অতিবাহিত হয় অশোক তাহার নানা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাজধানীতে যে-সকল দেবতার উপযুক্ত স্থান, সেখানে রাজকন্যাকে পাঠাইয়া দিতেন। পণ্ডিতেরা তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করিতে আসিতেন। দুই-এক দিনেই সম্রাট স্মৃতিতে পারিয়াছিলেন যে যুবতীসুলভ আগোদ-প্রমোদে

রাজকন্যার অভিকৃতি নাই, এজন্ত তাহার আয়োজন কবিতেন না। মালবিকা যে কলাবিদ্যা জানিতেন না তাহা নহে। বীণা উত্তম বাজাতেন। অতি মধুব কণ্ঠে কখন কখন গান করিতেন, কিন্তু অনেক সময় একা থাকিতেন।

রাজকন্যা দেখা হইলে স্নানাহারের পূর্বে সম্রাট একবার রাজকন্যাকে দেখিতে যাইতেন; বৈকালে ভ্রমণ করিয়া আসিয়া দ্বিতীয় বার যাইতেন। প্রথম প্রথম অল্পক্ষণ থাকিতেন, তাহার পর সাক্ষাতের সময় দীর্ঘ হইতে লাগিল। সম্রাট কখন নিজের উদ্যান হইতে ফুল লইয়া আসিতেন, কখন ভূর্জপত্র লিখিত গ্রন্থ লইয়া আসিতেন। রাজকন্যার সহিত নানা বিষয় আলোচনা করিতেন।

কিন্তু রূপের আকর্ষণী শক্তি কোথায় যাইবে? ক্রমে ক্রমে সম্রাট রাজকন্যাকে কয়েক দণ্ড না দেখিলে চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। কিন্তু হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিবেন কিরূপে? রাজকন্যা অতিশি, তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিতেন না, আপনার সম্বন্ধে কোন কথা কহিতেন না, তাঁহার কথা হইলে কোণে অল্প প্রশংসা উত্থাপন করিতেন।

অশোক লক্ষ্য কবিয়াছিলেন যে রাজকন্যা নগরে প্রবেশ করিয়াই সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন, আর কখন কোন অলঙ্কার ধারণ করিতেন না। কেন? সম্রাট ইহার কোন কাণ নির্ণয় কবিতেন পাবিতেন না।

সন্ধ্যার সময় মুক্ত বাতায়নের সম্মুখে বসিয়া সম্রাট ও রাজকন্যার কথোপকথন হইতেছিল।

অশোক কহিলেন, “রাজকন্যা, তুমি নিজের সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করিতে চাহ না। এমন কি কথা থাকিতে পারে যাহা বলিতে তোমার বাধা আছে?”

“কিছুই না, মহারাজ। আপনি ত সকলই অবগত আছেন। আমার পিতা-মাতা নাই, রাজগৃহ ত্যাগ করিয়াছি, একজন আত্মীয়ের গৃহে বাস করি। আমার নিজের সম্বন্ধে বলিবাব কিছুই নাই। আত্মকথা বলা সম্ভব নহে।”

কলিঙ্গ রাজ্যে যে অশোক জন্ম করিয়াছিলেন এবং

মালবিকার পিতা সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন রাজকন্তা সে কথার কোন উল্লেখ করিলেন না।

সম্রাট কহিলেন, “অনেকের আত্মকথা আত্মগরিমার নামান্তর। তোমাকে দিয়া তাহা হইবে না, জানি। কিন্তু তুমি মনেরও কোন কথা প্রকাশ কর না। তোমাব এই নবীন জীবনে কত আশার সঞ্চার, কত কল্পনা, কত বাহ্য উদয় হইবাব কথা। আমি তাহাই শুনিতে চাই। তুমি কিসের কামনা কর, কি তোমার বাঞ্ছনীয়?”

“মহারাজ, আমি কিছু প্রার্থনা করি না।”

“কঠোর শব্দ! তোমার নিকটে আমি সম্রাট নহি। প্রার্থনা কিসের? তুমি আদেশ কব, আমি তোমার আদেশ প্রতিপালনের স্বথ মাত্র চাই।”

“মহারাজ, আপনার মৌজ্ঞাত্ত ও আতিথ্যে আমি আপ্যায়িত হইয়াছি এবং আমাব কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমার ত কিছুই অভাব নাই।”

“ইহা ত শুধু শিষ্টাচারের কথা। ইহার অপেক্ষা অধিক কি আর কিছু আশা করিতে পারি না?”

“মহাবাজ, আশা ও লালসা উভয়েবই নিবৃত্তি নাই।”

“এ কথা সত্য। আশা পূর্ব হইলেই কি স্বথ হয়? কে বলিতে পাবে? সম্রাটের মুকুট ধারণে শিরঃপীড়া হয় মাত্র, আর কি কল? পিতৃপিতামহের এই বিশাণ রাজ্য আমার পক্ষে গুরুভাব মাত্র। সাধ্য-মত প্রজার হিত সাধন করি, তাহাদের কার্যে সময় কাটিয়া যায়, কিন্তু ইহাতে স্বথ শাস্তি কোথায়? যদি কাহাকেও স্বথী করিতে পারি, কাহারও শোকে সাস্তুনা দিতে পারি, তাহা হইলেই আমার নাম ও জীবন সার্থক।”

“আমরা যাহাকে দুঃখ স্বথ মনে করি তাহা ত তুচ্ছ বস্তু, ও সেই কারণেই জীবন সঙ্গীর্ণ ও দুঃখদায়ক হইয়া উঠে। স্বথ-মরীচিকার অতুসরণেই জীবন বহিয়া যায়, সত্যকে মায়াব দৃঢ় করিয়া ধারণ করিতে পারে না। স্বথ ছদ্মকপী স্বর্ণমুগ, নিতা মানবকে সত্য হইতে ভ্রষ্ট করে। সংযম ও চিন্তদমন ব্যতীত কি আর কোন স্বথ আছে?”

“মালবিকা, তোমার কথা শুনিয়া আমাব অনেক

সময় বিস্ময় হয়। তুমি বাজকন্তা, যুবতী, সম্পদে ভোগে লালিত, সংসারের স্বথে, সংসারের আনন্দ-কোলাহলে তোমার নিবিষ্ট থাকিবাব কথা, কিন্তু তুমি সর্বদাই গভীর চিন্তায় মগ্ন থাক, তোমার মুখে আমি যে কত জ্ঞানগূঢ় কথা শুনিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। যাহা কিছু স্পৃহণীয় সকলই তোমার আছে, অথচ সংসারের কিছুতেই তোমার বিশেষ স্পৃহা নাই। কিন্তু সংসারের দ্বারে দাঁড়াইয়া বীতরাগ হইও না। সংসারে প্রবেশ কবিয়া দেখ।”

৫

আবার জ্যোৎস্না রাজি আসিল। আকাশে আবার পূর্ণচন্দ্র উদয় হইল, চন্দ্রালোকের তরল মায়ায় জগৎ আচ্ছন্ন হইল।

মানকে সম্রাট অশোক ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতে-ছিলেন, পাশে মালবিকা। বিকশিত পুষ্পের স্বগন্ধে উত্তান পরিপূর্ণ। অলস, গন্ধবহ বায়ু বহিতেছিল।

ধীব পদক্ষেপে, মালবিকার সমগতি, বীথিকা হইতে বীথিকান্তরে, কখন মুক্ত দুর্ধাদলে সম্রাট ভ্রমণ করিতে-ছিলেন। গতি ধীব, কিন্তু হৃদয়ে তুমুল অধৈর্য। তিনি স্থির করিয়াছিলেন আজ মালবিকাকে বলিবেন যে তিনি তাহার প্রেমপ্রার্থী, পাণিগ্রহণের অভিনাবী। তাঁহাকে প্রবান মহিষী কবিয়া প্রকাশ্য সভায় স্বতন্ত্র সিংহাসনে স্থান দিবেন।

মালবিকাও কি মনে করিয়া আজ নূতন বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। যেমন অলঙ্কৃত হইয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অলঙ্কৃত হইয়া উত্তানে-বাহির হইয়াছেন। প্রতি পদক্ষেপে চরণে অলঙ্কার শিক্তি হইতেছে, অঙ্গের অলঙ্কার, ললাটে হীরকখণ্ড জলিতেছে। আবার সেই রাজরাজেশ্বরী মূর্তি!

অশোকের মুখে কথা নাই, মালবিকাও নীরব। কিয়ৎকাল পরে অশোক কহিলেন, “আজ তোমাকে কেন এখানে আস্থান কবিয়া আনিয়াছি, তোমাকে কি কথা বলিবাব জন্ত আমাব হৃদয় ব্যগ্র হইতেছে তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না?”

মালবিকা অশোকের মুখে চক্ষু তুলিয়া আবার নত

করিলেন, কহিলেন, “মহারাজ, যদি বলি বুঝিতে পারিতেছি তাহা হইলে স্পর্ধাব কথা হয়।”

অশোক অধীর হইয়া মালবিকার হস্ত ধারণ করিলেন। রুদ্ধ বাক্যশ্রোত মুক্ত হইল। “তুমি যেমন এই নগর আলোকিত করিয়া আসিয়াছিলে, সেইরূপ আমার হৃদয়ে আইস। আমাকে অশোক বলিয়া সম্ভাষণ কর, তোমার মুখে আমার নাম শুনিয়া শ্রবণ শীতল হউক। এ সাম্রাজ্য তোমার, তুমিই ইহার উপযুক্ত। কিন্তু তোমার সিংহাসন আমার হৃদয়ে, আমার হৃদয়-আসনে তোমার স্থান।”

মালবিকা কহিলেন, “অশোক, যদি সংসারে আমার স্থান থাকিত, সম্পদের কামনা থাকিত, তাহা হইলে আজ আমি আপনাকে দৌভাগ্যবতী বিবেচনা করিতাম। জগতে যাহা-কিছু বাঞ্ছনীয় আছে তুমি সকলই দিতে পাব। তোমার বশ স্বর্ঘ্যের দ্বায় স্বপ্রকাশ, কিন্তু তোমার দেবতুল্য প্রকৃতি সকলে জানে না। আমি জানি। কিন্তু আমি সংসার-স্বখে বঞ্চিত, তোমার গৃহে প্রবেশ করিতে পারিব না।”

“এমন কথা কেন বলিতেছে? কি ছুঃখে তুমি সংসার তাগ করিবে? মালবিকা, আমাকে ছলনা করিও না, বল আমাকে বিবাহ করিবে।”

অতি কোমল স্বরে—সে হবে নিবতিশয় বরুণা, অসীম বেদনা—মালবিকা কহিলেন, “আমি ত সামান্ত মানবী, দেবী-নহি যে ছলনা কবিব। ঘটনাচক্র যদি

অন্ত দিকে ফিবিব, যদি আমার মনের গতি অন্তরূপ হইত, তাহা হইলে আজ নিজেই কৃতার্থ মনে করিতাম, কিন্তু সংসারে আমার স্পৃহা নাই। দেখিতেছি নখর জীবনে কেবল অনিত্যের বাসনা। রূপ ঘোবন, ঐশ্বর্য সম্পদ—কয় দিন থাকে? কে কাহাকে স্থায়ী করিতে পারে? পিতার রাজ্য গিয়াছে, আমি তাহাতে মজল মনে করি। কোন দেবতা অলক্ষ্যে আমার হস্ত ধারণ করিয়া সংসারের বাহিরে লইয়া যাইতেছেন। তুমি কেমন করিয়া আমাকে সংসারে ফিরাইবে? অশোক, মহারাজ, আমি আর রাজকন্যা নই, আমি ভিক্ষুণী।”

মাথা তুলিয়া মালবিকা চন্দের দিকে চাহিলেন। মুখে অপূর্ব অলৌকিক দীপ্তি, চক্ষে প্রশান্ত কোমল দৃষ্টি। ধীরে ধীরে অন্ধের প্রচ্ছাদন মুক্ত করিলেন। ভূজঙ্গিনী ঘেরুপ নির্মোহক ত্যাগ করে, অঞ্চল ও অন্ধের আবরণ স্রুত হইয়া সেইরূপ দুর্বাদল আন্তবর্ণে পতিত হইল। মালবিকার পদতলে অঙ্গবস্ত্র সংসর্পিণী সর্পিণীর দ্বায় লক্ষিত হইল। অন্ধের অলঙ্কার উন্মোচন করিলেন। ললাটের হীরক অঞ্চলে পড়িয়া ভূজঙ্গের মস্তকের মণির দ্বায় জলিতে লাগিল।

এক মাত্র গৈরিকবসনধারিণী ভিক্ষুণী সম্রাটের সম্মুখে পাড়াইলেন।

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

মুখর আধার

অন্ধকারে সম্মুখে মোর বইচে কল-জলশ্রোত—
ও যেন ওই অন্ধকারের অন্তরেই ব্যাখা
কান্নাতে আঁজ ফেটে পড়ে’ অশ্রুতে হয় ওতপ্রোত
চম্কে দিয়ে নিশীথ-নিশার নিদ্রিত শুক্লতা।
থেকে থেকে সজল বাতাস শিউরে বয়ে’ যায়,
ও যেন তার অশ্রুমাথা দীর্ঘনিশাস হায়!

কোন অনাদি কালের থেকে এই আধারের মনক্ষোভ
না জানি যে অনাগত কোন আলোকের লাগি,
নিত্য নীরব জমে’ জমে’ গভীর ব্যাখার গোপন ভোগ
প্রাণে সে কেঁদে কেবল বারেক উঠে জাগি’।
ঘরের দুয়ার দিছি খুলে, নয়নে নাই নিদ্রা-বোধ,—
অন্ধকারে সম্মুখে মোর বইচে কল-জলশ্রোত!

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্তী

সমস্যা

সে খুব বেশীদিনের কথা নয়, হারাদা নৈস্খথ যখন তাঁর জীকে নিয়ে জাপানের সিনাগাওয়া নামক স্থানে বাস করতেন। তিনি সামান্য জ্যোত্সারী করতেন, আর অবশ্য খুবই গরীব ছিলেন। সেবার যখন বৎসর প্রায় শেষ হয়ে এল তখন তাঁদের মন ভয়ে ও চিন্তায় আকুল হয়ে উঠল। কেননা হাতে যে তাঁদের একটিও পয়সা নেই, অথচ দেনা যে মেটাতে হবে অনেক।

যা হোক, অবশেষে অনেক ভেবে চিন্তে তাঁরা এক উপায় ঠিক করলেন। নৈস্খথের জীর এক দাদা কান্দা সহরে বাস করতেন। তিনি ছিলেন ডাক্তার আর তাঁর পয়সাও ছিল যথেষ্ট। নৈস্খথের জী তাঁর কাছে তাঁদের বর্তমান অবস্থা জানিয়ে কিছু ধার চেয়ে চিঠি লিখলেন।

দাদাটির মনটি ছিল সাদা এবং অন্তঃকরণটিও ছিল উঁচু। তিনি বোনের চিঠিখানা পড়ে খুবই হুঃখিত হলেন। ভাবলেন, ‘না, বোনটা বড়ই কষ্ট পাচ্ছে; এদের জন্ত দেখছি কিছু না করলেই নয়।’ সেদিনই ‘একটা ছোট ঔষধের বাক্সের ভিতর ১০টি মোহর ভরে’ কাগজে ভাল করে’ মুড়ে বোনের নামে পাঠিয়ে দিলেন।

ডাক্তারের লোক নৈস্খথের বাড়ীতে এসে মোড়কটি দিয়ে গেল। নৈস্খথ ও তাঁর জী তাকে কতই-না ধন্যবাদ ও কতই-না আপ্যায়িত করলেন। মোড়কটি খুলেই হর্ষে ও বিস্ময়ে তাঁদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল। একটি ছোট ডাক্তারী বাক্স, তার উপর ডাক্তারের হাতে বেশ স্পষ্ট করে’ লেখা :—

রোগ—দারিদ্র্য।

ঔষধ—স্বর্ণমুদ্রা-বড়ি।

মাত্রা—উপযুক্তরূপ ব্যবহারে বোগের উপশম হইবে।

ঠিক যেন সত্যিকার রোগের ব্যবস্থা!

তাঁরা ডাক্তারের এই অদ্ভুত রোগনির্ণয় ও তার ব্যবস্থা দেখে খুবই এক চোট হাসলেন এবং বাক্স খুলে মোহর দশটি দেখে প্রথম ত তাঁদের চোখকে বিশ্বাসই করিতে পারছিলেন না। দশ দশটা মোহর, এ ত কম

কথা নয়! এ যে ঐশ্বর্য! যা-হোক তাঁরা খুবই আনন্দিত হয়ে উঠলেন; এবং খাঁটি সামুবাইদের (কুলীন) মতনই তখনই ঠিক করলেন যে প্রতিবেশীদেরও এ আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। নৈস্খথ তখনই তাঁর বন্ধুদের রাজিতে নিমন্ত্রণ কবে’ পাঠালেন।

সেদিন রাজিতে বিষম শীত পড়েছিল, তুষারপাতও অবিশ্রাম হচ্ছিল। তাই বন্ধুদের মধ্যে সাত জন মাত্র উপস্থিত হতে পেরেছিলেন। তাঁর বন্ধুরা ত বেশ একটু আশ্চর্যই হয়ে গিয়েছিলেন যে নৈস্খথ আবার হঠাৎ এত টাকা পেলেন কোথায় যে তাঁর সমস্ত বন্ধুদেব নিমন্ত্রণ করিতে পারলেন। যাহোক শীঘ্রই তাঁদের ঔষ্ণ্য নিবারিত হল। খাবার প্রস্তুত হলে নৈস্খথ তাঁর বন্ধুদেব সকল কথা জানিয়ে তাঁর শালার গজার ব্যবস্থাপত্র ও মোহরগুলি দেখালেন।

সবাই একচোট খুব হেসে নিলেন এবং যে দারিদ্র্য-ব্যাধিতে তাঁরা সকলেই প্রপীড়িত তার এই অমোঘ ঔষধ স্বর্ণমুদ্রা-বড়িগুলিরও যথেষ্ট প্রশংসা করলেন। সকলের দেখা শেষ হলে নৈস্খথ বলেন, “আচ্ছা, তা হলে এখন ঔষধগুলিকে ভরে’ রাখা যাক।” মোহরগুলি সংগ্রহ করে’ নৈস্খথ চম্কে উঠলেন। একি! দশটির জায়গায় মাত্র নয়টি পাওয়া যাচ্ছে যে!

নৈস্খথের কথা শুনে সবাই দাঁড়িয়ে উঠে কাপড় ঝাড়তে লাগলেন যদি তাঁদের কাপড়ে কোথায়ও আটকে থাকে। কিন্তু হারানো মোহরটি কোথায়ও পাওয়া গেল না। সবাই তখন বলাবলি করিতে লাগলেন, “এ ত বড় আশ্চর্য, মোহরটি যাবে কোথায়?”

নৈস্খথ তখন এমন একটা ভান করলেন যেন হঠাৎ তাঁর একটা কথা মনে পড়ে’ গেছে। কপাল চাপড়ে তিনি বলে’ উঠলেন, “পোড়া কপাল! আমার মন যে কি হয়েছে! আবে আমি যে একটা মোহর খরচ কবে’ কেলেছি, বাক্সে যে মাত্র ন’টি মোহর ছিল।” এই বলে’ তাড়াতাড়ি বাকি নয়টি মোহরকে মুড়ে রেখে দিলেন।

বন্ধুরা কিন্তু নৈস্বখের এই ভদ্রতায় ভুল্লেন না; বেশ বুঝলেন যে তিনি ব্যাপারটা চাপা দিচ্ছেন। তাই তাঁরা সবাই বললেন, “না নিশ্চয়ই দশটা ছিল।” কিন্তু তা হলে আর-একটা গেল কোথায়! নৈস্বখের ঠিক পাশেই যিনি ছিলেন তিনি তাঁর কাপড় খুলে ফেলে বেশ করে’ ঝেড়ে সবাইকে দেখিয়ে দিলেন। পাশের দ্বিতীয় লোকটি নিঃশব্দে উঠে তাই করলেন।

কিন্তু এ কি! তৃতীয় লোকটি গম্ভীর হয়ে চুপ করে’ বসে’ রইলেন; লজ্জায় তাঁর মুখ বাঙা হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ সে অবস্থায় থেকে তিনি সেখান হতে উঠে এলেন। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে’ হাত-ছুখানি উর্দ্ধে তুলে তিনি ভাঙা গলায় সকলকে সোধোধন করে’ বলতে লাগলেন; “বন্ধুগণ, জীবনটা বিড়ম্বনাময়। আমার কাপড় তল্লাস করেই বা কি হবে? আমার কাছে একটি মোহর আছে; বাড়ী থেকে আসবার সময় সেটিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। অদৃষ্টের করে আজ তাই আগাকে চোব বনতে হলো। আমার পূর্বজন্মেব পাপেরই বোধ হয় এ শাস্তি। যা হোক আমি আর এ জীবন রাখবো না।” এ কথা বলেই প্রকৃত সামুদ্রিকের মত তিনি আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলেন।

সবাই তাঁকে বাধা দিয়ে বলে’ উঠলেন—“আহা, আহা, করেন কি! আপনি ত সত্যি কথাই বলছেন। আপনি কেন মোহর নেবেন? আমরা গরীব সম্মেহ নেই, তা বলে’ সঙ্গে নিয়ে না ঘুরলেও অমন এক-আধটা মোহর আমাদের ঘরে সবারই আছে।”

কথাটা যত জোরে তাঁরা বলতে পারলেন, বিশ্বাস করতে তত জোরে পারলেন না। কেননা মনে মনে তাঁরা বেশ জানতেন যে আধখানা মোহরও তাঁদের সমস্ত ঘর খুঁজে বের করা যাবে না।

তখন সেই লোকটি বলতে লাগলেন, “তেকুজো আমাকে যে ছোরাটি তৈয়ারী করে’ দিয়েছিল কাল আমি সেটিকে জুজ্জমেনের কাছে এক মোহরে বিক্রী কবেছি। যা হোক, সে কথা আর বলে’ কি হবে। আমার ইচ্ছা গেছে। মৃত্যুই এখন আমার শ্রেয়। আমি এখনই আত্মহত্যা করবো। কিন্তু আপনারা আমার

একটা কথা রাখবেন কি? কাল যেন একবার জুজ্জমেনের কাছে আপনারা যান, তবেই আমার কথার সত্যাসত্য টের পাবেন।

কথা শেষ করে’ তিনি যখন পেটের ভিতর ছোরা বসাতে যাচ্ছেন তখন চীৎকার করে’ হঠাৎ একজন অভ্যাগত বলে’ উঠলেন, “এই যে, এই যে, মোহরটি পাওয়া গেছে। বাতিটার আড়ালে পড়ে’ ছিল; এইমাত্র কুড়িয়ে পেলাম।”

সকলেই হাঁক ছেড়ে বাঁচলেন। লোকটিরও আব আত্মহত্যা করতে হল না। সবাই বললেন—“ভাল কবে’ না খোঁজার ফলে কি ফ্যাশাদই ঘটছিল!” বিপদ কেটে যাবার আনন্দে সবাই সবাইকে একচোট ধন্যবাদ দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন। কিন্তু তখনই নৈস্বখের স্ত্রী দৌড়ে এসে চীৎকার করে’ বললেন, “এই যে মোহরটি, বাত্মটির ডালায় আটকে ছিল।”

তাই ত, এ ত বড় অদ্ভুত। অবশ্য নৈস্বখের স্ত্রী যা বললেন সেটা সত্য ঘটনা। কিন্তু তা হলে যে দশটিব জামগায় এগারটি মোহর হয়ে বসলো। তবে বাতির আড়ালে যেটি পাওয়া গেল সেটি এল কোথা থেকে? নিশ্চয়ই সেটি অভ্যাগতদের মধ্য হতে কেউ রেখেছিলেন। কিন্তু রাখলেন কে? সকলেই পরস্পরের মুখ চাইলেন। ‘দশটি মোহর এগারটি হল—এ ত বেশ ভাগ্যবশি কথা’ এই বলে’ সকলে নৈস্বখকে তাঁদের খুব আনন্দ জানিয়ে দিলেন।

নৈস্বখের বাড়ীওয়ালাও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। তিনি বললেন, “দশটি মোহরের একটি হারিয়ে নথি হয়েছিল, ফের পাওয়া যাওয়াতে দশটি হয়েছে, এটা ত স্বাভাবিক; কিন্তু এগারটি হল কি করে’? আপনাদের মধ্যে নিশ্চয় সেই বিপদের সময় কেউ একটি দিয়েছেন। যিনি দিয়েছেন তিনি বলুন এবং অহুগ্রহ করে’ তাঁবটা ফিরিয়ে নিন।”

বারবার অহুগ্রহ হয়েও কেউই মোহরটিকে নিজের বলে’ স্বীকার করতে রাজী হলেন না। অনেকক্ষণ কেটে গেল। সকলেই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন, কিন্তু তবুও মোহরের মালিক ঠিক হল না। এই ব্যাপারে

সমস্ত আনন্দোৎসবটা মাটি হয়ে গেল। অবশেষে বাড়ী-ওয়ালা জিজ্ঞাসা করলেন—“দেখুন, আমি যাকে মালিক সাব্যস্ত করে’ দেবো তাকে আপনারা মানবেন?” সকলেই রাজী হলেন।

তখন তিনি বললেন, “বেশ, তা হলে শুভন। মোহরটি বাক্সে ভরে’ বাইরে বাগানের বেড়ার কাছে যে কুয়োটি আছে সেখানে রেখে আসব। আপনারা সকলে একে একে সেই পথ দিয়ে বাড়ী চলে’ যাবেন। প্রত্যেকেই যাবার সময় ঘরের দরজাটি বন্ধ করে’ যাবেন এবং বাগানটি পেরিয়ে বেড়ার দরজাটি দিয়ে বেরিয়ে যাবেন। বেড়ার দরজাটি বন্ধ হওয়ার শব্দ না পাওয়া পর্যন্ত অগ্র কেউ আর বের হবেন না। যাবার সময় যার মোহর তিনি নিয়ে যাবেন।”

বাক্সে ভরে’ মোহরটি কুয়োর কাছে রেখে আসা হল। একে একে সবাই চলে’ গেলেন। সবাই চলে’ গেলে নৈস্থ ও তাঁর পত্নী বাক্সটি গিয়ে দেখলেন, মোহরটি তার ভিতরে আর নেই।

আচ্ছা, নিল কে? কেউই তা জানেন না; কিন্তু এটা নিশ্চয়ই—যে দিয়েছিল সেই নিয়েছে; কারণ তাঁরা যে সবাই সামুরাই। গরীব হলেও আত্মসম্মান-জ্ঞান তাঁদের যথেষ্টই ছিল এবং কর্তব্যাকর্তব্য তাঁরা ভাল করেই বুঝতেন।*

শ্রী সতীশচন্দ্র সেন

* জাপানের সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ লেখক ইবারা হাইকাকুর একটি গল্পের ইংরেজী অনুবাদ হইতে অনূদিত।

ভারতীয় শিল্পপ্রতিভা

মানুষের মনে যে স্বজনী শক্তির বেগ আছে তার প্রকাশচেষ্টাতেই শিল্পকলার জন্ম। সৃষ্টি বলতে আমরা দুটো কথা বুঝি, স্রষ্টা, যে সৃষ্টি করবে, এবং সেই জিনিষ, যা সৃষ্ট হবে। শিল্পীর উপাদান হচ্ছে জীবন,—প্রাণের প্রাচুর্য্যকে, তার অন্তর্হীন বৈচিত্র্যকে রূপের ভিতর দিয়ে ব্যক্ত করে’ তোলা, শিল্প-রচনার মধ্যে আকার দান করাই হচ্ছে তাঁর সমস্ত সাধনার লক্ষ্য। শিল্পরচনামাত্রই সৃষ্টি, এবং সেইজন্তে তার মধ্যে একটা প্রাণধর্ম আছে যাকে অবলম্বন করে’ সে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং নিজের অস্তিত্বের অধিকার ও সত্যতা প্রমাণিত করে;—তার সার্থকতার মূল কারণ তার নিজেরই মধ্যে নিহিত, বাহিরে বা অগ্র কোথাও নয়। প্রত্যেক শিল্পরচনাতেই রেখা, সমতল ক্ষেত্র, আয়তন ও বর্ণ পরস্পরের সঙ্গে একটা গভীর সামঞ্জস্য, একটা নিবিড় সম্বন্ধের গূঢ় যোগসূত্রে বিধৃত হয়ে বিরাজ করে, একটা বিশিষ্ট অভিপ্রায়সূচক আকৃতির মধ্যে তারা একটা ভাবের ঐক্যে মিলিত হয়ে তাৎপর্য্য পায় এবং অনন্তের চিরন্তন সঙ্গীতকে ধ্বনিত করে’ তোলে।

দেশে দেশে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জীবনের এক-

একটা অংশ সমাদৃত হয়ে থাকে, জীবনের এক-একটা রূপ নূতন করে’ যেন চোখে পড়ে’ যায়, এবং সেইজন্তে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বংশায়ুক্রমেই শিল্পীর মনেরও দিক-পরিবর্তন না হয়ে পারে না, শিল্পসৃষ্টির প্রবাহ ক্রমাগত নব নব ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়ে তবেই যেন আপনার প্রকৃত সত্তাকে অন্বেষণ করে। এই কারণে পৃথিবীতে অধ্যাত্ম জগতের আর অন্ত নেই, চার দিক থেকেই আমরা এই-সব অদৃশ্য ভুবনের দ্বারা পরিবেষ্টিত; কোন্‌ শুভমূহুর্তে অকস্মাৎ কোন্‌ শিল্পীর কাছে তাদের রহস্যের ঘন-আবরণ সহসা উন্মুক্ত হয়ে যাবে, তাদের অন্তরের গোপন কথাটি আবার এক নূতন প্রাণের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে সজীব সত্য হয়ে উঠবে—সেই আশা-পথ চেয়ে যেন তারা নীরব ধৈর্য্যে চির-অপেক্ষায়মান হয়ে থাকে।

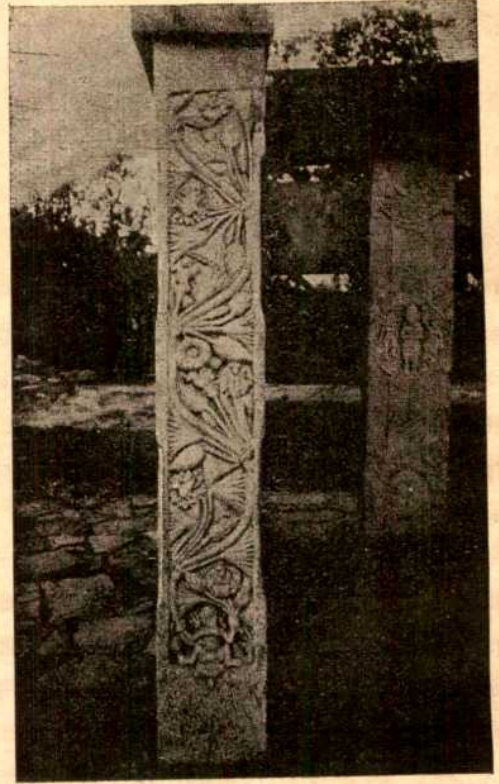
আট সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই রূপক এবং সাক্ষেতিকতা জাতীয় সব কথা ভোলা চাই, কারণ শিল্পরচনা মাত্রই স্বপ্রকাশ, মূল সত্যের সঙ্গে তাদের একেবারে সোজা সৃষ্টি কারবার, এবং সত্যকে অখণ্ডভাবে



ত্রিমূর্তি—হস্তীশঙ্খ।

ফুটে তুলছে বলে' তার সমগ্ররূপের মধ্যেই তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়, বাহিরের যুক্তি বা চিন্তা, ব্যাখ্যা বা বিবৃতির কিছুমাত্র দরকার করে না। এলিফান্টার গুহা-মন্দিরের দেয়ালের মধ্য থেকে “ত্রিমূর্তির” বিরাট প্রস্তর-ক্ষোদিত মূর্তি তার সমস্ত বিশালতা এবং অপূর্ব রেখাবিন্যাস নিয়ে যেন চতুর্দিক অন্ধকারের পুঞ্জ স্তম্ভিত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। নিখুঁত সৌসামঞ্জস্য এবং ক্ষোদিত আকৃতির ক্রমবিকাশমান রূপপর্যায়ের একটা তরঙ্গ এক মাথার পার্শ্বদেশ থেকে ধীরে ধীরে উথিত হয়ে, মধ্যস্থিত মাথার সম্মুখ দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, তৃতীয় মাথাটির ধারে ধারে অল্পে অল্পে নিম্নদিকে হ্রাস হতে হতে মিলিয়ে গিয়ে যেন সমস্ত ত্রিমূর্তিকে আলিঙ্গন করে' রয়েছে। তাদের ভিন্ন ভিন্ন দেহগুলি পাথরের ভিতর তলিয়ে গিয়ে আপন আপন স্বতন্ত্র সত্তা এবং বিশেষত্ব হারিয়ে ফেল্ল, যা থেকে গেল তা হচ্ছে একটা বিরাট প্রস্তরের স্তম্ভ, এবং সমস্তটাকে ব্যাপ্ত করে' একটা অদৃশ্য অপূর্ব দেবত্বের ভাব। অতি কোমল কম্পিত রেখা যেন কপোল ও ক্র্যুগলের উপর দিয়ে লীলা করতে করতে চলে' গেছে। এই ছন্দোময়

সমান্তরালগামী গতি মাথার উপরকার ত্রিকোণাকৃতি কিরীট-সদৃশ আচ্ছাদনাদির উচ্চ নীচু নির্মাণ-প্রণালীর আরেকটা বিরুদ্ধগতির সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে একটা স্থিরতা, একটা সমতা, একটা অতি মনোরম এবং নয়নাভিরাম স্বপ্ন প্রাপ্ত হয়েছে। এখন এই যে শারীরিক আকৃতির নান অংশের অতি সূক্ষ্ম সূনিপুণ সমাবেশ ও রচনা-প্রণালী, উচ্চ নীচু ও পাশাপাশি রেখার বিরুদ্ধগতিকে সংযত এবং সংহত করে' এই যে একটা অটল অপরিবর্তনীয় ভারদায়ো নিবন্ধীকরণ—এ-সমস্তের ভিতর দিয়ে শিল্পীর সেই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে—সেই কল্পনাই



দাঁচি স্তম্ভের রেলিঙের গায়ে পদ্মলতা

মূর্তি হয়ে উঠেছে যেখানে তিনি ভগবানের পরম অদ্বৈত ধ্রুব স্বরূপকে ত্রয়ীরূপে দেখেছেন। এবং শিল্পীর এই মনোভাবটি বুঝতে হলে সরল মন ও বথার্থ অহুতাবিকতার সঙ্গে ঐ বিশেষ শিল্পরচনাটির দিকে তাকালেই যথেষ্ট, কেননা তার অন্তরের বাণী আপনা হতেই ধ্বনিত

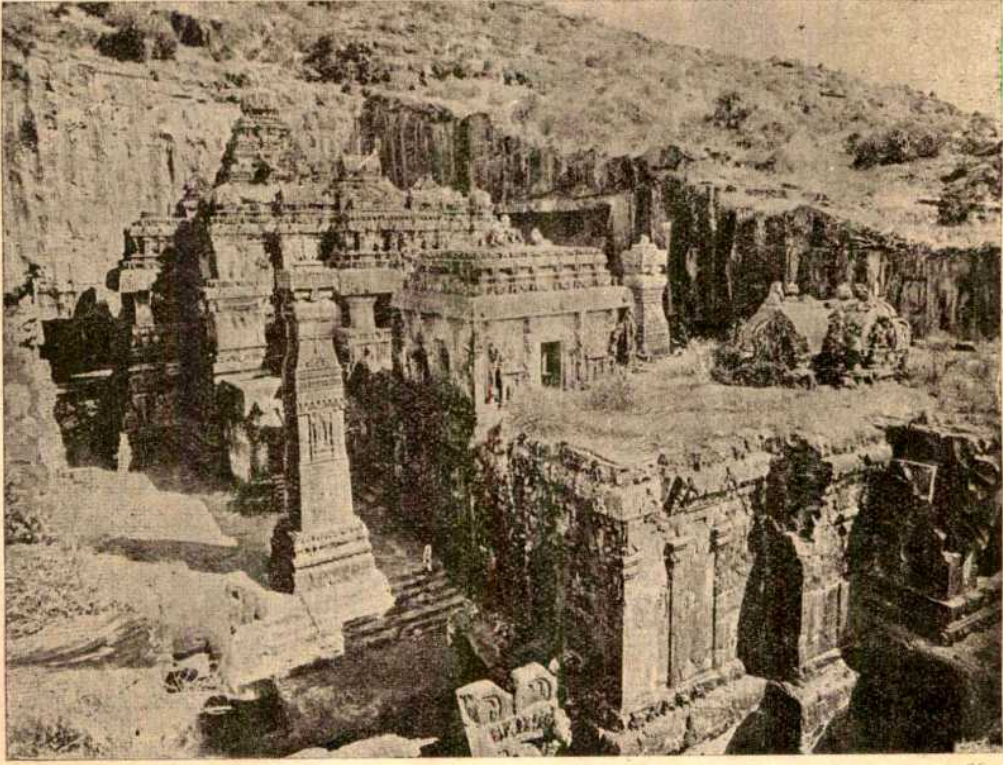
হয়ে উঠছে, বাহিরের কোনো টীকা বা অঘয়ের জন্তে কোথাও লেশমাত্র অপেক্ষা রাখেনি।

এ হল ভারতীয় শিল্পপদ্ধতির একটি ধারা; এ ছাড়াও আর-একটি প্রণালী আছে যেখানে মানসমূর্তিকে রূপ দেওয়া নয়, বাহ্য প্রকৃতিকে ভাবে অল্পপ্রাণিত করে' দেখানোই হচ্ছে শিল্পীর উদ্দেশ্য। আর, ভেবে দেখতে গেলে আধ্যাত্মিক জগৎ এবং প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে যে একটা স্বস্পষ্ট স্তূনির্দিষ্ট সীমারেখা আছে তাও ত নয়। “অসীম সে চায় সীমার নিবিড় সঙ্গ”, যা অরূপ এবং নিরাকার তারও পরিচয় ত আমরা বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে রূপের মধ্য দিয়েই পাই; এই প্রকৃতি এই বাস্তবজগৎ সেও ত এক অনির্কচনীয় অপরিমেয় প্রাণশক্তিরই অভিযাজনায় স্পন্দমান। স্বতরাং শিল্পীর পক্ষে দুই সমান সত্য, এবং তাঁর রচনার জন্তে দুয়েরই সমান দরকার। তিনি আমাদের এই মাটির কাছ থেকেই ফুল ধার করে' তবে ত তাকে পাথরের গায়ে গায়ে কোমল কম্পিত যুগল-বস্তুর উপর অপূর্ণ লাভণ্য-লহরে লীলায়িত করে' তুলতে পারলেন। ফুল, পাতা, জল, পাখী সেখানে এক বিস্তৃত স্থরের অমরাবতীতে স্থান পেল—সেই দ্বন্দ্ববিরোধ-বৈষম্যবর্জিত ছন্দোময় জগতে যেখানে প্রতি পুষ্প-কোরক, প্রতি কোমল পত্রপল্লব এক অনন্ত সৌন্দর্যের রূপরশ্মিপাতে সমুদ্ভাসিত, যেখানে কোনো কিছুই ব্যর্থ বা অপ্ৰাসঙ্গিক নয়, কল্পনা এবং বাস্তবিকতা যেখানে অপরূপ মিলনের মাধ্যমে বিলীন হল। এই যে রূপস্থিতি এ ত কেবল আলঙ্কারিক নয়, এ ত কেবল সাজসজ্জা শিল্পচাতুর্য্য-সংক্রান্ত নয়, এ যে “সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জ প্রশান্ত পাষাণে” বিকশিত একটি করুণ কমলের মুগ্ধ জয়গান। প্রকৃতির শুধু অবিকল নকল করে' যাওয়া, বা কেবল তার ভাবকে রূপ দেওয়া, এর কোনটাই ভারতীয় শিল্পীর ঠিক আদর্শ নয়; প্রকৃতির নিবিড়-নিহিত গতিবেগ, তার গোপন প্রাণ-স্পন্দনকে তিনি উপলব্ধি করে' নেন এবং তারই তালে তালে নিজের মনোবর্ষ এবং স্বভাবগত সৃষ্টিপ্রণালী অহুসারে তিনি একটা স্বতন্ত্র ভাবোজ্জ্বল রূপরচনা করতে বসেন। আমরা যে বিশেষ শিল্পরচনাটির কথা বলছিলাম সেখানে প্রস্তর-ক্ষোদিত ঐ কম্পিত পদ্মবস্তুগুলি তাদের

উপরকার পূর্ণকুহ্মিত স্বডোল পদ্মফুল এবং সূক্ষ্মগ্র কমল-কলিকার মাধুর্য্যসজ্জার নিয়ে অতি মধুর স্বয়মার সহিত প্রকৃতির একটা ভারী অপূর্ণ ছন্দকে ছলিয়ে তুলেছে।

ভারতীয় শিল্পকলায় প্রত্যেক জিনিষকেই এমনি একটা অল্পভূতির প্রাবল্য, একটা নিবিড়তা এবং একাগ্রতার সঙ্গে ধরে' দেখানো হয়, কারণ যদিও চেতনাশক্তির সূক্ষ্মতাহেতু অল্পভেদেই শিল্পীর মন সাড়া দেয়, তৎসঙ্গেও কল্পনাবিকাশের জন্যে তাঁকে কোনো বিশিষ্ট বিষয়ে নিবদ্ধ থাকতে হয় না, কোনো বাহ্যিক বস্তুরামগ্রীর উপর একান্তভাবে তাঁর অবলম্বন না করলে চলে। তাই তিনি ক্রমাগত নূতন নূতন রচনার বিষয় এবং তার জন্তে নূতন নূতন নিয়ম এবং প্রয়োগপ্রণালী উদ্ভব করে' যান। বস্তুত ভারতের মত এমন স্বাধীনতাপ্রিয় এবং স্বাতন্ত্র্যচােরী শিল্পপ্রতিভা জগতে আর দ্বিতীয় নেই। নিজের বিশেষত্ব এবং স্বগঠিত নিয়মপ্রণালীকে এখানে এতদূর পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় যে শেষে আপনার উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছাকেও সম্পূর্ণভাবে কাঠো পরিণত করে' তোলা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। এইজন্তে শেষে এমন সব প্রকাশপদ্ধতি এমন সব নিরীক্ষণ-প্রণালীগত নিয়মের সৃষ্টি করতে হয় যা সমগ্র শিল্পরচনার প্রতি সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না, অথচ ছবির প্রত্যেক অংশের উপর খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে আপন অধিকার বিস্তার করে। এর একটা ভাল দৃষ্টান্ত এলোরায় যে একটা পাথরে-কাটা মন্দির আছে সেইটে। এই শিল্পরচনায় অতি সূক্ষ্ম স্তূনিপুণ কারুকাঠা এবং অপচ্যাপ্ত জটিল রেখার বৈচিত্র্য যেন সৃষ্টির অজস্রত্বে উৎসারিত হয়ে সকল বাধাবিঘ্ন একেবারে আচ্ছন্ন করে' সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করে' দিয়েছে। এখানে দেখতে পাই শিল্পজানিত সংঘমের বদলে অফুরন্ত শক্তির আতিশয্য, সীমা ও পরিমাণের স্থানে পূর্ণতা ও সমগ্রতা, এবং রচনাবিজ্ঞাসের পরিবর্তে সৃষ্টির একটা বিপুল উদ্যম ও দ্বিধাবিহীন আনন্দ-উচ্ছ্বাস।

এই প্রকার শিল্পসৃষ্টি রূপপ্রকাশের যা সবচেয়ে সহজ বাস্তব্যবর্জিত উপায়—রেখা—তার মধ্যেই নিজেকে



কৈলাশ-মন্দির—এলোরা

সংযত এবং ঘনীভূত করে' তোলে, অন্ততঃ এইদিকেই তার বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে বলে' ত মনে হয়। অজস্তা-গুহার গায়ে গায়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী বা ঘরবাড়ীর নকসা, মানুষ দেবদেবী অথবা প্রাণীজগতের যে-সব নানা বর্ণ ও রূপের ঘনসমাবেশপূর্ণ বিচিত্র চিত্র-রচনা আছে তাতেও এই রেখা জিনিষটাই হয়েছে ভাবপ্রকাশের প্রধান বাহন,—ছবির গূঢ় অভিব্যঞ্জনা ও যথার্থ তাৎপর্য তারি মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

এই সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকেও ভারতীয় শিল্প-কলার মূলনীতি এবং আদর্শ সম্বন্ধে হয়ত কিছু কিছু বোঝা যাবে। এইসব মূলনীতি এবং বিশেষ বিশেষ প্রয়োগপ্রণালী ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে ঠিক তেমনিই অবশ্যপ্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক জগতের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধকে চিত্র বা ভাস্কর্যের সমতল ক্ষেত্রে কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে পরিণত করা মিশরদেশীয় শিল্পের পক্ষে যেমন প্রয়োজন হয়েছিল; এবং ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সময়-

কার ত্রিকোণ-পদ্ধতি কিংবা বারোক্ (Baroque) চিত্রগুলির চোণাকুণি বা ত্রিভুজগামী রচনাবিন্যাস-প্রণালীকে যেমন ভাবে মেনে নেওয়া হয় এদেরও ঠিক তেমনি ভাবেই মেনে নিতে হবে। তা ছাড়া একথাও মনে রাখতে হবে যে ভারতীয় শিল্পের একটা অত্যন্ত বিশ্বযোদ্ধীপক বিশেষত্বই এই যে একে কিছুতেই কোনো একটা বিশেষ শিল্পপ্রণালী বা কোনো একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পরিণত করা যায় না, এর অসীম প্রাণশক্তি নানাপ্রকার পরম্পরবিরোধী গতিকে বা ধারাকে শোষণ করে' নিয়েছে এবং সব ছাড়িয়েও আপন প্রকৃতিকে পূর্ণ প্রকাশিত করতে পেরেছে।

অবিচ্ছিন্ন ভাবকে, কল্পমূর্তিকে রূপের মধ্য দিয়ে আকারের মধ্য দিয়ে পাবার জন্মই ভারতীয় শিল্পে পরিমাণ, আয়তন ও রেখা ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে খৃষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে যে বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয়, কিংবা তার বহু পরে হিন্দুশিল্পী



মাটি স্তূপের কারুকার্য—লতানো নারীমূর্তি

যে “ত্রিমূর্তি” রচনা করেন এ ছুয়েতেই এই কথা প্রমাণ করছে। এ ছাড়া এই প্রকার নির্মাণপ্রণালীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রকৃতির আর একটা গতি প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় শিল্পরচনায় দেখা যায়,—সেটা হচ্ছে একটা কম্পমান অসমরেখার তরঙ্গলীলা—প্রায় কোনো মূর্তি বা প্রতিকৃতি বা অঙ্গসমাবেশে এই জিনিষটা আসেনি এমন দেখা যায় না। শিল্পী যেখানেই কোনোপ্রকার প্রাণরূপ, কোনোপ্রকার সজীবতা দেখাতে চেয়েছেন—সে মাছুষ, তরুলতা বা কর্মজীবন সঞ্চর্যী কোনো ঘটনা—যারই বিষয় হোক,—এই লীলায়িত রেখাই এ বিষয়ে তাঁর প্রধান সহায় হয়েছে। এইজন্যে পদ্মের কম্পিত মৃণাল ভারতীয় শিল্পকলায় একটা বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে, এবং তার একটা প্রধান উপাদানে পরিণত হয়েছে।—এই উপায়ে জ্যামিতিগত রচনাবিন্যাস অবিচ্ছিন্ন ভাবরূপকে এবং অসম রেখা প্রাণের গতিকে প্রকাশ করেছে। আর এই ছুয়ে মিলে শিল্পীর কাছে কত যে অজস্র রচনার বিষয় এবং রূপের উপলব্ধি এনে দিয়েছে তার ঠিক নেই। কিন্তু এ ছাড়াও আরো

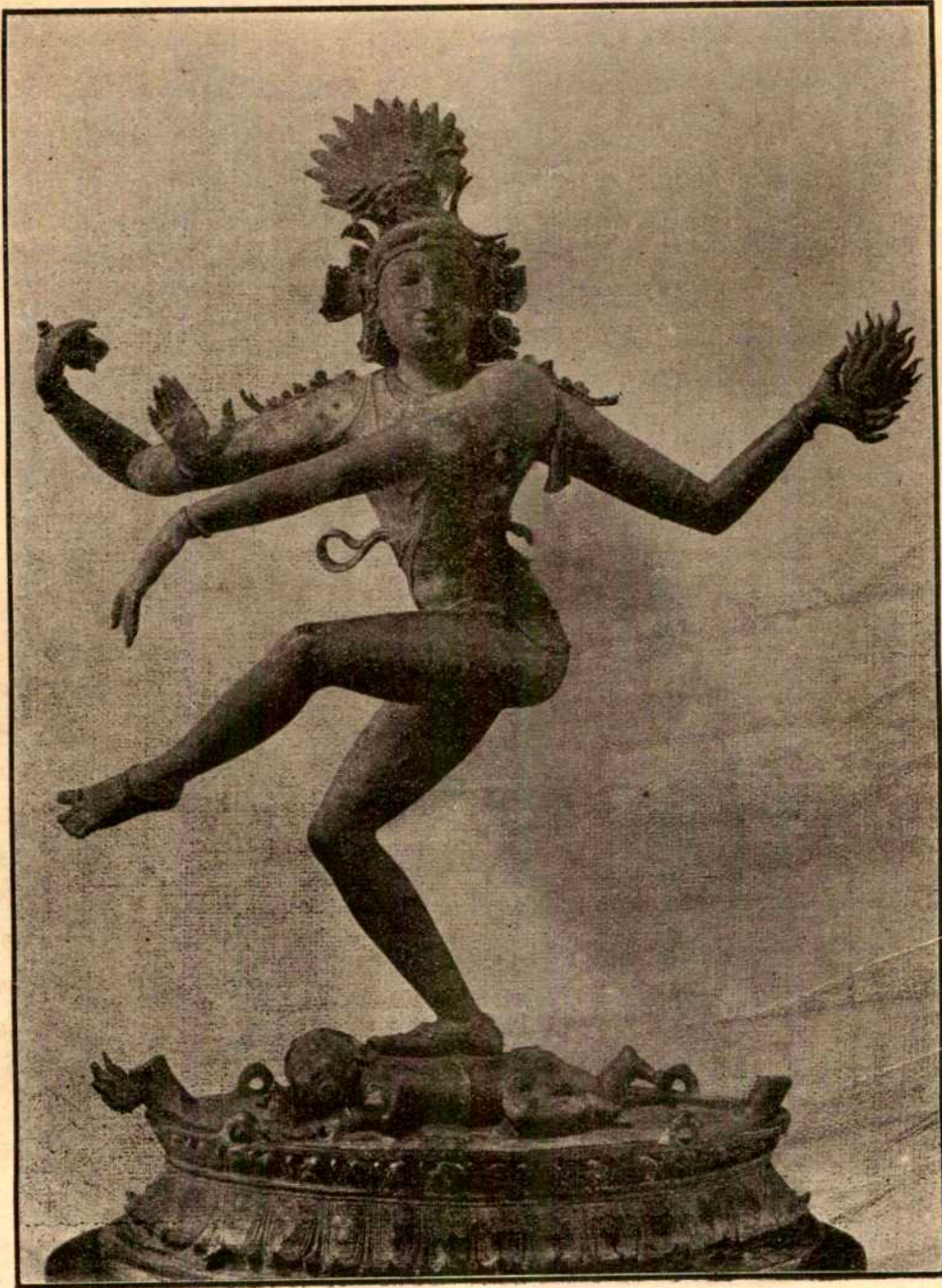
একটা কথা মনে রাখতে হবে, এবং সেই তৃতীয় কথাটি হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক দেশের শিল্পকলারই একটা সমগ্ররূপ আছে, সব মিলে তার একটা এমন রচনা-প্রণালীর ভঙ্গী, এমন একটা প্রয়োগবিদ্যাগত স্বাতন্ত্র্য আছে যা বিশেষ করে’ তার নিজেরই সম্পদ,—এবং এই স্বতন্ত্র রূপ হচ্ছে স্বপ্রকাশ,—অর্থাৎ আপনা হতেই সে নিজের এমন একটা জাতীয়তা ও বিশিষ্টতাকে প্রকাশ করে’ নিজেকে ফুটিয়ে তোলা ছাড়া যার অন্য



ধ্যানী বুদ্ধ, সিংহল

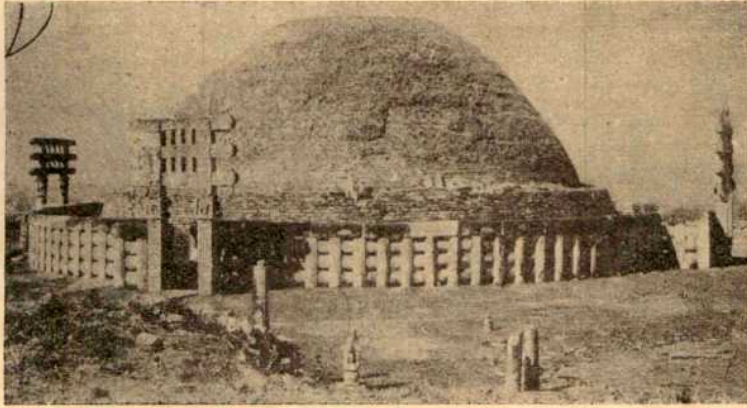
কোনো উদ্দেশ্য নেই। ভারতীয় শিল্পকলায় দেখি আকার-সৃষ্টির অজস্র শিল্পীর শক্তি-বেগকে এবং রেখা জিনিষটা তাঁর হৃদয়-বেগকে ফুটিয়ে তুলেছে,—মন দিয়ে দেখলে বোধ হয় ভারতীয় শিল্পের এই বিশেষত্ব-টাই বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

কিন্তু এ-সমস্তই হচ্ছে যাকে বলে—সাধারণ সিদ্ধান্ত, এবং সেইজন্যে এইসব বাহিরের কথার তেমন যে



নটরাজ শিব

মূল্য আছে তা নয়, যদিও আর্ট সম্বন্ধে কিছু বলতে এমন একটা জটিলতা এবং রহস্যময়তা আছে যে গেলে এ ছাড়া উপায়ও নেই, কারণ আর্ট জিনিষটা কথায় 'তাকে ধরে' দেখানো একেবারেই সম্ভবপন্ন নয়। হচ্ছে একটা জীবন্ত জিনিষ, এবং সজীব পদার্থমাত্রই আর একথাও ভুলে চলবে না যে ভারতীয় শিল্পে



সাঁচি স্তূপ

যেমন আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্য আছে তেমনি সে একটা প্রাণপূর্ণ পদার্থও বটে, বিশ্বপ্রকৃতির ধমনীস্পন্দনে তার প্রতিমূর্ত্তি এবং রেখা কম্পমান।

ভারতীয় শিল্পী জীবনের এই গভীর হৃদস্পন্দনকে অহুভব করেছেন, তার গতিবেগ তাঁর সমস্ত মনকে আন্দোলিত করে' তুলেছে। ভারতীয় চিত্রকলায় বহু কাল থেকেই নারীদেহ ও তরুণতার মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো এবং উভয়কে একজায়গায় উপস্থিত করার যে একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা এবং প্রয়াস প্রকাশ পেয়েছে তাতেও এই কথা বলে, কারণ ঐসব ছবিতে শুধু যে রমণীদেহের রমণীয়তা ও সৌকুমার্য্য ফুটে উঠেছে তা নয়, একটা সকৌতুক স্নেহময় লাবণ্যলীলা এবং গতিতরঙ্গ যেন রমণীর দেহ এবং তার বক্র বাহুচুটি, গাছের শাখা-প্রশাখা এবং তার কোমল পত্রপল্লবগুলি সমস্তের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র দৃশ্যকেই যেন একটা অনির্কলচনীয় সুষমায় স্বর্গীয় করে' তুলেছে।

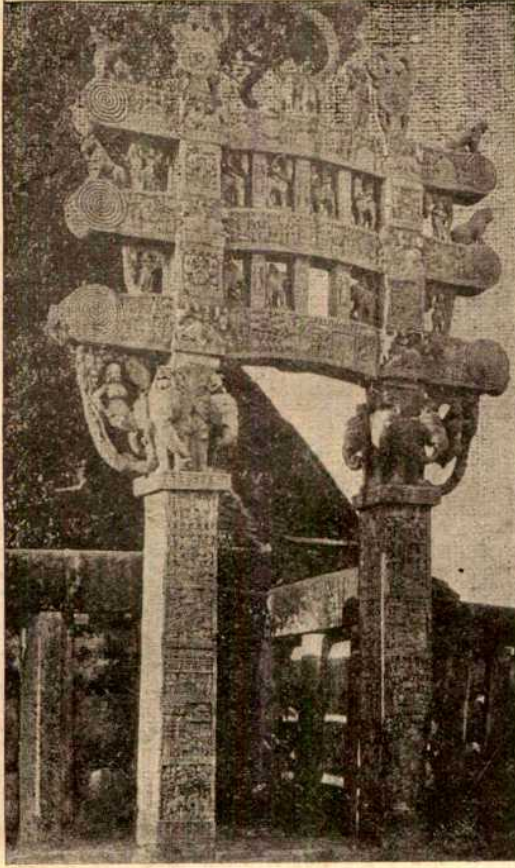
বুদ্ধদেবের যে সৌম্য শাস্ত্র ধ্যান-মৌন মূর্ত্তি, তার চারদিকে একটা বিপুল নীরবতা এবং একটা অচল অটল তপশ্চর্য্যার ভাব আছে সত্য, কিন্তু দেহের ঐ অনবিচ্ছিন্ন স্থিরতার ভিতর দিয়েও একটা প্রাণের ছন্দ স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। আনন্দ-নয়নপল্লব এবং মৃদু বাহু দুটি থেকে একটা জীবনের কম্প নিম্নপ্রবাহিত হয়ে ভাবময় করণ্যগলে এসে শাস্তি লাভ করেছে, সমস্ত দেহের উপর দিয়ে একটা প্রাণের তরঙ্গ হলে

হলে শেষে ঐ পদ্মাসনযুক্ত পদদ্বয়ে যেন এক পরমাশ্রয় পেল। বুদ্ধদেবের ঐ তদগত-ভাবপূর্ণ অপূর্ব মূর্ত্তিটির অন্তরের ঐক্য, জীবন্ত দেহের সঙ্গে তার সৌসাদৃশ্য, কিম্বা অংশ-সমাবেশে সমসঙ্গতির উপর নির্ভর করে' নি, সমস্ত মূর্ত্তিকে ব্যাপ্ত করে' এবং প্রতি অঙ্গকে গুঢ় যোগ-সূত্রে মিলিত করে' যে অস্তঃ-শীলা ছন্দগতি নিবিড়-প্রবাহিত

হয়ে গিয়েছে তারই ফলে সেটা ফুটে উঠতে পেরেছে।

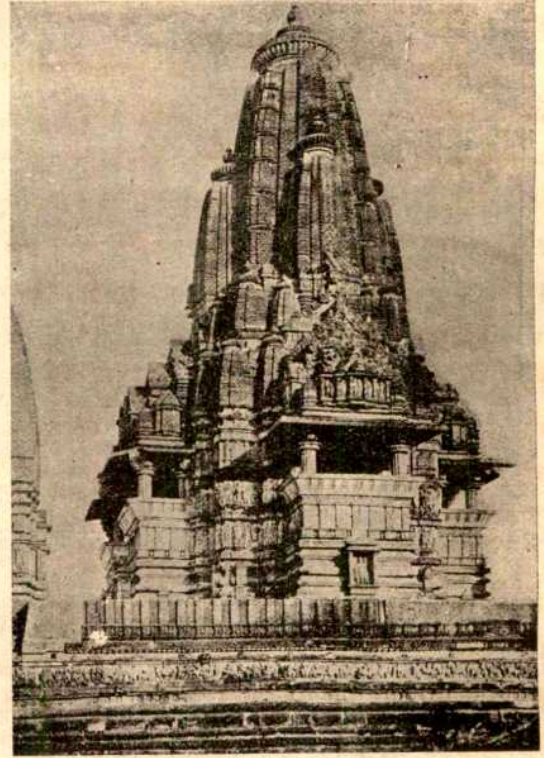
শিবের তাণ্ডবনৃত্যের নানা নিদর্শন এবং তাকে অবলম্বন করে' যে-সব বিচিত্র শিল্পসৃষ্টি দেখতে পাওয়া যায় তাতে সমুখ বা পিছন, বাম বা দক্ষিণ, সবই যে কোথায় লুপ্ত হয়ে গেছে তার ঠিকানা নেই, এমন কি, নৃত্যের কোনো অঙ্গভঙ্গী পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়নি, কারণ একটা গতির উন্নয়ন, নৃত্যের নেশাতেই যেন সমস্তটা মেতেছে, প্রাকৃতিক জগতের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ এবং সময় ও সীমার বেধকে অতিক্রম করে' চলার উদ্দাম গতি-বেগের অব্যক্ত আলোড়নে যেন দণ্ড-পল-মুহূর্ত্ত-বিবর্জিত দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য একটা ভাবলোকের স্বতন্ত্র দেশ ও কাল সৃষ্ট হয়ে উঠেছে। এই নৃত্যোন্মত্ত প্রচণ্ড গতিস্রোতকে গোচর করে' দেখাবার জন্তে বাধ্য হয়ে এমন একটি দেহের সৃষ্টি করতে হল যাতে বাহুর বহুত্বই অলৌকিক শক্তিবৈগকে রূপতরঙ্গে ব্যক্ত করে' তুলতে পারে। এই চলচঞ্চল আবেগবিকম্পিত রূপচ্ছবির মধ্যে জেয় অজেয় সকল প্রকার বেগের বিকাশ আছে বলে' এর মধ্যে এক অপূর্ব গতিসাম্য ঘটেছে, এবং বুদ্ধদেবের ধ্যানস্তব্ধ মূর্ত্তিতেও যেমন একটা নিবিড় জীবনের প্রবাহ দেখতে পাই এখানে আবার তেমনি সমস্ত বিরুদ্ধ গতিকে পরম সামঞ্জস্যে সম্মিলিত করে' সমস্তটার একটা বিরাট শাস্ত্র রূপ চোখে পড়ে।

ভারতের শিল্পী জীবনের অন্তরতম গোপনগামী গতিকে উপলব্ধি করেছেন। স্বতীতন্তু বা ময়ূরমেন্ট্ মাত্রেরই



সাঁচি স্তূপের তোরণ

একটা বিশালতা, একটা বিস্তৃত স্থিরতার ভাব থাকা চাই; কিন্তু তিনি যখন “স্তূপ” রচনা করলেন তখন তাকে এমন একটা রূপ এমন একটা আকার দিলেন যাতে স্থিরতা আছে বটে কিন্তু সে স্থিরতাকে জড়ত্বের নিজস্বতা বললে ভুল হবে, গতির তরঙ্গ যেন সেখানে স্তম্ভিত হয়ে জমাট বেঁধে গিয়েছে। ভারতবর্ষীয় মহামেট—স্তূপ—আকৃতিতে অর্দ্ধবৃত্তাকার, যেন ভূমণ্ডলের আধখানা টুকরো নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। মিশরের পিরামিড মিশরের পক্ষে যেমন মূল্যবান, এই স্তূপ জিনিষটা ভারতবর্ষের পক্ষে তার চেয়ে কিছু কম নয়, কিন্তু দুয়ের মধ্যে কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ! পিরামিডের চারটে ধারই সমান, তার প্রতি রেখা দৃঢ় এবং স্থনির্দিষ্ট, এবং সমস্তটা মিলে সে যেন খাড়া উপরের দিকে উঠে গিয়েছে, কিন্তু স্তূপের মধ্যে আগাগোড়া একটা গতির লীলা উচ্ছ্বসিত



চতুভুজ মন্দির—থাঙ্গুরাহো

হয়েছে, সে গতি যেন আপনার বেগে আপনহারা হয়ে কেবল প্রবাহের মধ্যেই সার্থকতা লাভ করেছে এবং নৃত্য কর্তে কর্তে ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে নিজেরই উপর এসে পড়েছে,—এখানে না আছে সরল রেখা, না আছে স্থনির্দিষ্ট দিকনির্ণয়ের কোনো চেষ্টা।

তাহলেই দেখতে পাই একটা গতি, একটা চলন্ত জীবন্ত ভাবই হচ্ছে ভারতীয় শিল্পরচনার প্রধান বিশেষত্ব; একেই অবলম্বন করে তার সৌধশিল্প বা চিত্রকলা, তার জড়প্রকৃতি বা জীবজগতের নানা রূপছবি সব ফুটে উঠেছে। মানুষের মুখের ভাবে, তার অঙ্গের আকৃতিতে সকলখানেই এই প্রাণের নিবিড় সঞ্চার অল্পভব করা যায়, যেন গোপন অন্তরের “বেগের আবেগ” “আকারের অসহ্য পিয়াসে” রূপের ফোয়ারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, আত্মার শুভ রশ্মিরাগে দেহ এবং মুখাবয়বকে যেন উজ্জ্বল করে তুলেছে। নাক মুখ বা চোখে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে বিশেষভাবে প্রকাশ না করে ভারতীয় শিল্পী তারও

ভিতর দিয়ে জীবনের বিরাট ছন্দকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন।

এই বিরাট ছন্দের তালে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিই ত নিয়ত স্পন্দিত হয়ে উঠছে, তাই আর্টিষ্টের কাছে কোনো জিনিষই সামান্য বা তুচ্ছ নয়, কিন্তু শিল্পরচনার সময় তিনি কোনো একটা বিশেষ জিনিষকেই বড় করে' দেখেন, জগৎ যেন তখনকার মত ঐ একটা রূপের মধ্য দিয়েই তাঁর কাছে সার্থক হয়ে ওঠে। তা ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত জিনিষই তাঁর কাছে মূল্যবান এবং অর্থহীন বলে' তাঁর শিল্পরচনাতেও তিনি কোনো জিনিষকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না, পটভূমির কোনো জায়গাতেই শূন্যতা রেখে বা কোনো সামান্য রেখাতেও প্রাণসঞ্চার না করে' তিনি সন্তুষ্ট হন না। এইজন্তে এই শিল্পে এমন একটা ছবি বা প্রস্তর-কোদিত মূর্তি নেই যা আগাগোড়া বিবিধ আকারসৃষ্টিতে পরিপূর্ণ নয়, সাঁচির যে অত বড় বিশাল তোরণদ্বার তারও সমস্তটা কাঠামো খোদাই-করা বড় বড় প্রস্তর-ফলকের দ্বারা আবৃত, আর এই-সব ফলকও আবার প্রথম থেকে শেষ অবধি সমস্তখানি শূন্যতাহীন কারুকার্যে খচিত এবং চিহ্নচিত্রিত। শিল্পী যেন শূন্যতার বিভীষিকায় ভীত হয়ে কোনো একটা জায়গায় এসে থেমে যেতে সাহস পান নি, আর এই-জন্তে তিনি ক্রমাগত নূতন নূতন আকারসৃষ্টি করে' বিশাল পাথরটার প্রতি কোণ প্রতি রন্ধ্র ভরে' তুলেছেন, এবং অত বড় যে তোরণ তারও উপরিভাগ যথাসম্ভব মূর্তি প্রতিমূর্তি দিয়ে সজ্জিত করে' ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

মন্দিরের বেলাতেও দেখতে পাওয়া যায় ঠিক এই ঘটেছে, তাদের দেয়াল বা বহির্দেশকে অসংখ্য প্রস্তরমূর্তি এবং রেখাচিত্রে আচ্ছন্ন না করে' ছাড়া হয়নি। স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের মধ্যে যা ব্যবধান ছিল সে যেন অপসারিত

হয়ে গেল, কোনখানে এসে যে কার আরম্ভ এবং কার শেষ তাও বোঝা শক্ত। শিল্পী যেন বড় বড় বাড়ীর কঠিন আড়ষ্ট জড়ত্বের ভাবে কিছুতেই তৃপ্ত হতে না পেরে সৌখিন এবং শিলাশিল্পের (ভাস্কর্য) একটা সম্মিলন করবার চেষ্টা করেছেন, যতক্ষণ তাঁর হাতে একটুকুও নির্মাণসামগ্রী অবশিষ্ট থেকেছে তিনি ক্রমাগত কেবল এক রূপের মধ্য থেকে অন্য রূপের উৎপত্তি করেছেন, এবং এইভাবে জড়জিনিষের মধ্যেও একটা জীবন্ত ভাব, একটা ছন্দোময় প্রাণের চাঞ্চল্য এসে গিয়েছে, কোঠাবাড়ীর কাঠিগ শিল্পের সৌন্দর্যে কমনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। শিবের তাম্রব নৃত্যের প্রস্তরমূর্তিতে যেমন, এখানেও তেমনি—শিল্পের দিক থেকে দেখতে গেলে সমুখ বা পিছন বলে' যেন কোনো জিনিষের অস্তিত্বই নেই, আছে কেবল একটা বাধাহীন গতির বিকাশ, একটা ঘূর্ণমান বেগের প্রবাহ।

ভারতীয় শিল্পের সম্ভবপরতা অসীম। মানুষ এবং প্রকৃতি, আধ্যাত্মিক জগৎ বা স্থূল জগৎ, স্থাপত্য বা ভাস্কর্য—সকলের মধ্যে যে গূঢ় সম্বন্ধস্থল, গভীর অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে এই দেশের শিল্পী ছন্দোময় শিল্পরচনার মধ্য দিয়ে প্রাণপূর্ণ রেখাবিন্যাসের মধ্য দিয়ে সেইটিকেই ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন, এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের স্বাভাবিক প্রাচুর্যের ভাব অথবা গণিতগত জটিলতার অভাব আছে কি না-আছে সেটা ভাববার বিষয় নয়, আসল কথা হচ্ছে এই যে সহজেই তার মধ্যে একটা সত্য উপলব্ধির আন্তরিকতা, একটা ভাবের স্বচ্ছতা, এবং একটা যথার্থ গভীরতা দেখতে পাওয়া যায়। *

ষ্টেলা ক্রীমরিশ

* শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী দ্বারা ইংরেজী হইতে অনূদিত।

রমলা

(১৬)

কলেজে লেকচার দিবার সময় তুলসী-বাবুর অমনো-যোগিতা দেখিয়া ছাত্রেরা সেদিন সত্যিই অবাক হইয়া গেল। সেদিন শেষের দুই ঘণ্টা ছুটি দিয়া তিনি সকাল সকাল বাড়ী ফিরিলেন। বাড়ী ঢুকিয়াই দেখিলেন, হাসি, জলঝরা ও কাঁটার শব্দে সমস্ত বাড়ী মুখরিত, সিমেন্টের মেজে যেন এশ্রাজ্জের মত বাজিতেছে, গোপাল চৌবাচ্চা হইতে জল তুলিয়া দিতেছে, রজত ঢালিতেছে আর রমলা বাঁটা ঘসিতেছে। সিঁড়ি ধোয়া শেষ করিয়া তাহার উঠান লইয়া পড়িয়াছিল, এমন সময় সম্মুখের বারান্দায় তুলসী-বাবুকে আসিতে দেখিয়া রজত ও গোপাল প্রমাদ গণিল। বীজাণু ঘাঁটিয়া তুলসীবাবুর যেমন বীজাণু-বিভীষিকা ছিল, সব ধূলাতেই তিনি যক্ষ্মা বা কলেরা বা কোন ভয়ানক রোগের বীজাণু দেখিতে পাইতেন, তেমনি বীজাণুদের সঙ্গে বহুদিন বাস করিয়া তাহার শত্রুদের প্রতিও তাঁহার বিশেষ অহুরাগ ছিল না। বেশী রোদে থাকা, বেশী হাওয়া খাওয়া, বেশী জল ঘাঁটা তিনি-মোটাই পছন্দ করিতেন না, তাঁর ঘরের দরজা-জান্নাগুলি যেমন প্রায়ই বন্ধ থাকিত তেমনি নিজের দেহকেও সর্বদা গলাবন্ধ রূপার মোজা ইত্যাদি দিয়া মুড়িয়া তিনি আপনাকে হাওয়া বা ঠাণ্ডা হইতে সর্বদা বাঁচাইয়া চলিতেন।

হাতের মোটা একখানি বই নাড়িয়া রজতের দিকে চাহিয়া মামাবাবু গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—হত-ভাগারা, কি হচ্ছে ?

রমলা নন্দমার মুখের আবর্জনা বাঁটা দিয়া সরাইতে সরাইতে তাঁহার মুখের দিকে না চাহিয়া বলিল,—মামাবাবু, সিঁড়িটা এখনও শুকোয়নি, জ্বলো পায়ে দিয়ে যাবেন না।

রমলার দিকে চাহিয়া মামাবাবুর আর কিছু বলা হইল না। তাহার খোলাচুল মাথার ওপর ঝুঁটির মত বাঁধা, আঁচলটা কোমরে জড়ানো, সাদা শাড়ী ধুলায়, জলের ছিটায় গেরুয়া রংএর ব্লাউসের সঙ্গে এক রংএর হইয়া গিয়াছে, লাল পাড়টা জলের উপর লুটাইতেছে, হাসিভরা

চোখে প্রবলবেগে বাঁটা নাড়িতে নাড়িতে সে চারিদিকে এরূপভাবে জল ছিটাইতেছিল যে তাহার দিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। আজ সমস্ত দিন কি অপরিমিত ধূলা ও স্প্রচুর জল মহানন্দের সহিত ঘাঁটা হইয়াছে তাহার দীপ্ত মৃতি দেখিলেই তাহা বোঝা যায়। তাহার কাজের কোন প্রতিবাদ করিবার বা বাধা দিবার মত শক্তি তাঁহার রহিল না।

—সবই ত পরিষ্কার হয়ে গেছে মা, তুমি এবার উঠে এস, ওই জঙ্গাল ওই বাদরটাকে সরাতে দাও,—বলিয়া সত্যিসত্যিই জুতা খুলিয়া তিনি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে উপরের ঘর হইতে মামাবাবুর ক্লানেল জড়ানো গলার শব্দ পাওয়া গেল,—ওরে গোপাল, খানিকটা গরম জল করে' নিয়ে আসবি। এ জল তাঁহার খাবার জন্ত নয়, তাঁর পা গরম করিবার জন্ত।

পরদিন সকালে তুলসী-বাবু কলেজে যাইবার জন্ত বাহির হইতেছেন, দেখিলেন একখানি গরুর-গাড়ী বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, খাট, বিছানা, আলমারী, ড্রেসিং টেবিল, রকিং চেয়ার ইত্যাদি বোঝাই করা। এগুলি রমলার দাদা তার বিবাহের যৌতুকরূপে পাঠাইয়া দিয়াছেন। মামাবাবুর আর কলেজ যাওয়া হইল না। তিনি বুঝিলেন, এইগুলি লইয়া তাঁহার ভাগ্যে ও ভাগ্যেবো কালকের মতনই ধূলা ঘাঁটিবে, আর রজত তাহার ছোট ঘরেই এইগুলি কোনমতে ঢুকাইয়া লইবে। তিনি তাঁহার দোতলার বড় ঘরটা রজতকে দিয়া নীচে নামিয়া আসিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া গলির মোড় হইতে বারোজন কুলী ডাকিয়া আবার বাড়ী ফিরিলেন। বিনা অস্বখে এই তাঁহার প্রথম কলেজ কামাই হইল।

সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্ত বাড়ীটির অনেকগুলি স্থবিধা ছিল। তাহার সম্মুখেই খাবারের দোকান, মন্দির দোকান, ভক্তারের বাড়ী, চায়ের দোকান, পানের দোকান প্রায় পাশাপাশি ছিল। গলিটি উত্তর ও দক্ষিণ দুই দিকেই বড় রাস্তায় গিয়া পড়িয়াছে; উত্তরদিকে বড় রাস্তায়

পড়িলেই ট্রাম, বাজার, পোষ্টাফিস, পুলিশের থানা, উকীলের বাড়ী, আর দক্ষিণদিকে বড়রাস্তার মোড়ে গাড়ীর আড্ডা, কাপড়ের দোকান, সেকরার দোকান, মুটের আড্ডা।

বারোজন কালো ষণ্ডা গুণ্ডার মত কুলী সমভিব্যাহারে মামাবাবু চুকিতেই রজত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—এ কি মামা! কি লুট হবে?

যা, তোর ষণ্ডরবাড়ীর দরওয়ানটাকে ভাল করে খাওয়াগে, আর গাড়োয়ানটাকে খাওয়াতে তুলিস না,—বলিয়া একখানি পাঁচটাকার নোট তাহার দিকে ফেলিয়া দিয়া তিনি কুলি লইয়া নিজের ঘরে গেলেন। রমলা ঘরের জিনিষপত্র সাজাইতেছিল, অর্থাৎ ঘাঁটিয়া দেখিতেছিল, সহসা একরূপ কুলীসমেত মামাবাবুকে চুকিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, তাহার হাতের টেবুটিউবটা মেজ্ঞেতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

এর শাস্তি,—বলিয়া মামাবাবু হাসিয়া তাহাকে অঙ্গুলি-নির্দেশে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিলেন।

—বা, আমি ত জিনিষ গোছাচ্ছিলুম, এ কি, এরা!

—এর শাস্তি হচ্ছে, লক্ষ্মীমেয়ের মত ওই বারান্দার কোণে চুপ করে বসে থাকবে, কিছু গোছাতে পারবে না।

—বা!

—বা, টা, নয়, ওসব ধূলো ঘাঁটা চলবে না।

—আচ্ছা, আপনি ত রোজ বাড়ী থাকবেন না।

ধীরে সে চুপ করিয়া একটা চেয়ারে বসিল। রজত আসিয়া মামাবাবুর ঘর ছাড়িয়া দেওয়া সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া নতুন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কারণ দেখাইয়া তর্ক করিয়া ধমক খাইয়া চুপ করিল বটে, রমলা কিন্তু চুপ করিল না। বহুক্ষণ ঝগড়া করিয়া ঠিক হইল, মামাবাবু একতলায় যাইবেন না, রজতের ছোট ঘরে শুইবেন, তাঁর জিনিষপত্র নীচের বড় ঘরে যাইবে।

নাকে রুমাল ঝুঁজিয়া, একবার এঘর ওঘর করিয়া চোঁচাইয়া লাফাইয়া ছুটাছুটি করিয়া কুলীদের ধমক দিয়া দাক্তা মারিয়া কয়েকটি জিনিষ নাড়িয়া তুলসীবাবু যখন শান্ত হইয়া পড়িলেন, রজত ও রমলা তাঁহার ডুই হাত ধরিয়া চেয়ারে আনিয়া বসাইল, বলিল,—মামা, তুমি

এবার একটু চুপচাপ বস, আমরা একটু লাফাই, চোঁচাই।

—আচ্ছা, আচ্ছা, শুধু দাঁড়িয়ে দেখিয়ে দিবি কোথায় কি রাখতে হবে, নিজের হাতে ধূলো ঘাঁটবি না।

রমলা বলিল,—কোথায় ধূলো? আর আপনার ওই ফ্রাক্, শিশি, ওরা যে ওসব ভেঙ্গে ফেলবে।

সত্যিই কোন ঘরে কিছু ধূলা ছিল না, পূর্বদিন রমলার ঝাঁটার স্পর্শে সমস্ত বাড়ী নির্মল হইয়া উঠিয়াছিল।

আচ্ছা, শুধু আমার ফ্রাক্, শিশিগুলো তোরা সর, —বলিয়া একটু বিক্রাম করিয়া তিনি আবার উঠিয়া কুলীদের সঙ্গে চোঁচাইতে শুরু করিলেন।

রমলা বলিল,—মামাবাবু, আপনার এই বইগুলো না-হয় আমাদের ঘরেই রইল।

তুলসীবাবু তাঁহার বৃহৎ মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন,—না, মা, তা কি হয়, ও আমার চাই, ওসব বইয়ের আলুমারি আমার শোবার ঘরে যাবে।

প্রেমিক যেমন তাহার প্রিয়ার মুখ বা ছবি না দেখিয়া সমস্ত দিনের কাজের শেষে শান্তিতে শুইতে পারে না, তেমনি এই বইয়ের আলুমারীগুলি চোখের সম্মুখে না দেখিলে, তুলসী-বাবুর রাত্রে নিদ্রা হইবে না। প্রত্যেক বই যেন তাঁহার পরিচিত বন্ধু, চোখ বুজিয়া তিনি আলুমারীর কোথায় কোন বই আছে বলিয়া দিতে পারেন, বন্ধু যেমন বন্ধুর দেহ স্পর্শ করে তিনি তেমনি রোজ একবার বইগুলির ওপর হাত বুলাইতেন, এ স্পর্শের আনন্দ গ্রন্থকীটেরাই জানে।

পাঁচটি বইয়ের আলুমারী ও শোবার খাটে টেবিলে রজতের ছোট ঘর ভরিয়া গেল, বাকী আলুমারীগুলি নীচে পাঠাইতে হইল। ঘরের পাশের বারান্দা চাটাই-চট দিয়া ঘিরিয়া একটা ঘর তৈরী করা হইল, সেখানে টেবিলে ভূতবৃন্দার পাখরগুলি রহিল। বৃষ্টিতে ভিজিলে কিছু ক্ষতি হইবে না। পাশের ছোট ঘরে তুলসী-বাবুর বাকী জিনিষগুলি কোনমতে গুছান হইল।

রজতের নতুন বড় ঘরটিতে কিরূপ-ভাবে জিনিষপত্র গোছান হইবে তাহা লইয়া এবার তর্ক বাধিল। রজত

বলিল,—আজ যেমন করে' হোক রাখা যাক, পরে সাজিয়ে নেওয়া যাবে। রমলা কিন্তু থাকিবার ঘরকে গুদাম-ঘর বা আসবাবের দোকান করিয়া রাখিতে সম্মত হইল না। আর-একদিন যে তাহারা ধূলা ঘাঁটিবে তাহাতে তুলসী-বাবু আপত্তি জানাইলেন। রমলা ঘর সাজাইবার ভার লইল। রাত্তার দিকে পূর্ব-মুখে ঘরটির চারিটি জান্না, সিঁড়ির সামনে একটি দরজা আর বারান্দার দিকে দুইটি জান্নার মধ্যে একটি দরজা। নতুন খাটটা উত্তর দিকের দেওয়াল ঘেসিয়া রহিল। খাটের পাশে রাত্তার দিকের জান্নার কাছে ড্রেসিং টেবিল আর তাহার উটাদিকে কাচওয়াল কাপড়ের আলুমারী রহিল। সে আলুমারীর পরেই বারান্দার দিকের দরজা, সেই দরজা ও জান্নার ফাঁকে রজতের ছবির বই ও নভেলে ভরা ছোট আলুমারী রহিল। দক্ষিণ দিকের দেওয়াল ঘেসিয়া আলনা, পূর্ব কোণে লিথিবার টেবিল চেয়ার ও তাহার পাশে সোফা রাখা হইল। মাঝে খানিকটা জায়গা ফাঁক রাখা হইল, মাদুর পাতিয়া বেশ বসা যাইবে। বাকী জায়গাটুকু একটা গোল সাদা মার্বেল টেবিল ঘিরিয়া রকিং চেয়ার, ইজিচেয়ার ও কোচে ভরিয়া গেল। চেয়ারে বসিয়া ছলিতে রমলা খুব ভালবাসে বলিয়া তাহার দাদা রকিং চেয়ারখানি বিশেষ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইজি-চেয়ারটি রজতের অতি পুরাতন বন্ধুর মত, এখন ছারপোকাসমাকুল হইয়া কতদূর আরামের তাহা বলা শক্ত।

আসবাবপত্র গুছাইয়া রমলা ঘরের দেওয়াল হইতে নানা ভঙ্গির মেমদের চিত্র সম্বলিত ইংরেজ ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপন ও ক্যালেন্ডারগুলি টান মারিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল।

রমলা বলিল,—আচ্ছা, আর্টিষ্টের ঘরে এসব ছবি রাখতে লজ্জা হয় না!

উচ্চ হাসিয়া রজত বলিল,—আহা, jealous হও কেন, এখন আর কোন ছবির দরকার হবে না।

যাও,—বলিয়া মুখ রাঙা করিয়া রমলা ঘর হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া গেল।

জিনিষপত্র সাজাইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। ঘর

গোছান শেষ হইলে মামা-বাবু রমলার সাজাইবার শক্তির উচ্চপ্রশংসা করিয়া কুলীদের জন্ত খাবার আনিতে দশ টাকার নোট ফেলিয়া দিলেন। বিবাহের ভোজটা কুলীরাই খাইয়া লইল। সম্মুখের খাবারের দোকানদার তাহার এরূপ খাবার বিক্রিতে নববধূকে আশীর্বাদ করিতে লাগিল।

মেঘছায়াঘন ক্ষান্তবর্ষণ শুকুদিন সন্ধ্যার তীর পার হইয়া রাত্রির অন্ধকার পাত্রে অঝোরে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বারিধারা-মুখর তারাহীন রাত্রি, পথে পথে ঝোড়ো হাওয়া দুরন্ত শিশুর মত হাঁকিয়া বেড়াইতেছে, ছাদের উপর নর্দমা দিয়া ঝিলিমিলি বহিয়া গলি উজ্জুসিয়া জল খলখল হাশ্বে বহিয়া যাইতেছে, বন্ধ দরজা জান্না মাঝে মাঝে সজল বাতাসে কোন প্রমত্ত পথিকের করাঘাতের মত কাঁপিয়া উঠিতেছে, ঘরের কোণে একটি বাতির ম্লান শিখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। রমলা দোলানো-চেয়ারে চূপ করিয়া বসিয়াছিল, তাহার পাশেই ইজিচেয়ারে একটি পাংলা লেপ পাতিয়া রজত হেলান দিয়া শুইয়া পা নাড়িতেছিল। দুইটি চেয়ার ধেসাধেসি বসান, দুইজনের পা এক নীল শালে জড়ান। রমলার একখানি হাত রজতের মাথার উপর চেয়ারে আর-একখানি হাত ইজিচেয়ারের হাতে। দুইজনেই শুক, শুধু মাঝে মাঝে রজত রমলার আঙ্গুলগুলি লইয়া খেলা করিতেছিল আর তার চেয়ারটিতে যুহু দোলা দিতেছিল। বাহিরের ঝোড়ো হাওয়ায় সমস্ত ঘরটিকে যেন যুহু দোলা দিতেছিল।

সমস্ত দিন ধরিয়া সাজানো এই আলোছায়ায় ঘর-খানি যেন কি অপূর্ণ রহস্য, কি মাধুর্যময় স্বপ্নে ভরা। দুইজনে হাতে হাত জড়াইয়া ধীরে ছলিতে ছলিতে কোন অজানা স্বপ্নের জাল বুনিতেছিল।

রজত মুহূর্তে ডাকিল—এই—

রমলা অতি মিষ্ট করিয়া বলিল—কি!

আবার দুইজনে চূপচাপ, রজত রমলার মুক্তকবরীর অলকগুলি চেয়ারের মাথা হইতে সরাইয়া ধীরে সাজাইতে লাগিল।

ঝড়ের রাতে বুকের নীড়ে দুই কপোত-কপোতীর

মত তাহারা মাথায় মাথা ঠেকাইয়া চোখ অন্ধক বুজিয়া বসিয়া রহিল। মামাবাবু যে একবার নিঃশব্দে তাহাদের দেখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাহারা জানিতেও পারিল না।

রমলা অতি মুহূর্ত্তে কানে কানে বলিল,—ওগো!

রজত মুহূর্ত্ত হাসিয়া বলিল,—কি গো!

আবার দুইজনে স্তব্ধ। এ যে বিনাপ্রয়োজনে অক্ষরপে নামের ভাকার নেশার স্থখে ডাকা।

বাহিরে বজ্রপাতের শব্দ হইল, বন্ধ জান্‌লার ফাঁক দিয়া বিদ্যুতের ঝিলকি দেখা গেল।

রমলা ধীরে বলিল,—মামাবাবুর ওঘরে গিথে হয়ত কষ্ট হবে।

—তা হবে, কিন্তু উনি ত কিছুতেই শুনলেন না।

—অমন মামা, তাই তুমি এমন হতে পেরেছ।

—আচ্ছা গো, আমার নিজের কোন গুণ নেই, সব ধার-করা।—জলের ছাট আসছে কি খড়খড়ি দিয়ে?

—একটু আশ্বক। দেখ, ঘরখানায় কয়েকখানা ছবি দিতে হবে, কি বল?

—আমি ত জীবন্ত ছবি দিয়েই ঘর সাজিয়ে রেখেছি। তোমার যদি দরকার হয় দিও।

—যাও!

—আচ্ছা, তোমার যে ছবিখানা এঁকেছিলুম, আছে ত?

—আছে, তা বলে সেখানা টাঙাতে দিচ্ছি না, না। দেখ, তোমার আঁকা কয়েকখানা ছবি আর কতকগুলো খুব famous ছবি কপি করে’—

—যেমন?

—যেমন, র‍্যাফেলের ম্যাজোনা লেগোনাদো দা ভিকির মোনালিসা, ওয়াটসের হোপ, আর টার্নারের দু’একখানা, আর দেখ, অজস্তার সেই ‘মা ও মেয়ে’—

—বলে’ যাও, বলে’ যাও—

—আর তোমার একখানা Portrait by Artist Himself.

—বেশ, বেশ।

রজত রমলার গণ্ডে একটু আঘাত করিয়া বলিল,—
এই, একটু ওঠোনা, আমি একটু ছলি।

—থাকনা, আব্দার, নিজে এমনি একটা চেয়ার আনলেই পার।

—আচ্ছা, আমার যখন ভেত্‌ভেটে মোড়া চেয়ার আসবে, তুমি বসতে পাবে না।

—দেখা যাবে।

অতিশ্রদ্ধায় রজত ডাকিল, রমু। এ নাম যেন সে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত দিনের পর দিন আজীবন ডাকিয়া যাইতে পারে, তবু এ নামের অপূর্ণ অসীম মাধুর্য্য নিঃশেষিত হইবে না। রমলা কোন উত্তর দিল না, চেয়ারটা একটু কাৎ করিয়া ধীরে তাহার মাথাটা রজতের বুকের উপর কেলিয়া দিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। এ মুখ যেন সে বৎসরের পর বৎসর জন্মের পর জন্ম অনন্ত যুগ ধরিয়া দেখিতে পারে, তবু নয়ন তৃপ্ত হইবে না, হৃদয় জুড়াইবে না।

বাহিরের আঘাতের আকাশ আরও মেঘঘন বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ হইয়া বন্ধনহীন বারিধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ঝড়ের হাওয়ায় পথের গাছগুলির মধ্যরে কে যেন উদাস স্বরে গাহিয়া ফিরিতে লাগিল, ‘ভরা বাদর মাহ ভাদর।’ প্রথম যৌবনের কত বর্ষামুখর-রাতে বিদ্যাপতির এই গানটি রজত গাহিয়াছে। তাহারই স্বর বারি-ঝরঝরে কানে বাজিতে লাগিল। পরিপূর্ণ অনন্তমিলনের মধ্যে কোথায় অসীম বিরহ রহিয়াছে। মন্দির ত পূর্ণ হইল, তবু শূন্য যেন কোথায় কাদিয়া ফিরিতেছে। বুকে যাহাকে পাই, মনে হয়, তাহাকে ত সম্পূর্ণ পাই নাই, এ মিলন ক্ষণিক, এ ফাঁকি, এ বিরহের ব্যঙ্গরূপ! শিশুর জন্ত মায়েচ চিরচঞ্চল প্রাণের ভয়ের মত তাহার বুক ছলিয়া উঠিল, আবেগের সহিত রমলাকে আপন বক্ষে টানিয়া লইল।

আঘাট-নিশীথ-গগন হইতে অবিশ্রাম জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, মত্ত শিশুর মত বাতাস দিকে দিকে আনন্দধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। বাতিটি পুড়িয়া শেষ হইয়া নির্বাপিতপ্রায় হইয়া আসিল।

(১৭)

রাত্রি আরও গভীর হইয়াছে।

কলিকাতায় সাহেব-পাড়ায় যতিনের সুসজ্জিত বাড়ীর স্তরম্য শুইবার ঘরে এক সোফায় মাধবী চুপ করিয়া

বসিয়া ছিল। ঘরটি অতি সুন্দরভাবে সাহেবী ফ্যাসানে সাজান। কার্পেট-পাতা মেজেতে কিছুক্ষণ ঘুরিল, ইলেকট্রিক আলোয় নীল সিল্কের আবরণ টানা ছিল, সেটা টানিয়া খুলিয়া দিল, বড় আয়নার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, ঘড়ি দেখিল, রাত বারটা বাজিয়া গিয়াছে।

যতীন অতি উগ্র রকমের সাহেব, চেয়ার-টেবিলে না বসিলে, কোট-প্যাণ্ট না পরিলে বাঙ্গালী কখনও কখনো ক্ষিপ্ততা লাভ করিবে না, শাক চচ্চড়ি ভাত ছাড়িয়া মাংস না খাইলে তাহার দেহ স্থগাম মাংসবহুল হইবে না, আর পাশ্চাত্য সন্যস্তা বরণ না করিলে জাতির পুনরুত্থান হইবে না, এই ছিল তাহার মত। বর্তমান জগতে যে যন্ত্ররাজ বণিকসভ্যতারানীকে লইয়া রাজত্ব করিতেছেন, সে ছিল তাহারই এক মূর্তিমান প্রতিনিধি।

ধীরে দরজা খুলিয়া মাধবী পাশের ঘরে ঢুকিল। এক বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সম্মুখে গদিওয়ালা ঘোরান চেয়ারে বসিয়া স্লিপিং-সুট পরিয়া যতীন এক বড় খাতা লইয়া হিসাব দেখিতেছিল। ধীরে মাধবী টেবিলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, চেয়ারটা একটু ঘোরাইল। খাতা হইতে মুখ না তুলিয়া যতীন বলিল,—আচ্ছা? তুমি এখনও শোওনি? যাও, যাও, শীগগীর শুতে যাও, অনেক রাত হয়েছে।

মাধবী দাঁড়াইয়া রহিল। —আ! দেখ-দেখি হিসেবটা গুলিয়ে দিলে।—বলিয়া যতীন পাতার উপর হইতে আবার অঙ্কগুলি গুণিতে লাগিল। সে-পাতার হিসাব শেষ করিয়া যতীন মাধবীর দিকে মুখ তুলিয়া বলিল,—দেখ, আজ আমায় এ খাতাখানা চেক করে' রাখতেই হবে, পরশুর মধ্যে কোম্পানীর dividend declare করতে হবে। অনেক রাত—লক্ষ্মী মেয়ে, আর রাত জেগো না, শুতে যাও।

তাহার মুখের দিকে আর খাতার দিকে একবার স্থির নয়নে তাকাইয়া বক্রমধুর হাসিয়া কোন কথা না বলিয়া মাধবী ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যতীন নিমেষের জন্ত তাহার এই যাওয়ার সৌন্দর্যগতির দিকে চাহিল, তাহার মধ্যে প্রেমভূষিত বিরহী মানুষটি ক্ষণিকের জন্ত জাগিয়া বলিল,—বন্ধ কর খাতা, ও হিসাব চিরজীবন থাকবে, কিন্তু এ বর্ষার রাত—

অমনি কক্ষগর্জিত ইঞ্জিনিয়ার মানুষটি দাবাইয়া উঠিল, —সাবধান, don't be sentimental, কাজ আগে, লভ পেরে। বিরহী মানুষের কান্না অঙ্কের কালো দাগের মধ্যে কোথায় চাপা পড়িয়া গেল। পাইপ টানিতে টানিতে যতীন লিমিটেড কোম্পানীর dividend-এর p. c. কষিতে বসিল।

মাধবী ধীরে শুইবার ঘরে গিয়া ঢুকিল। পূর্বাঙ্গিকের জানলার সবুজ নীল ফুলভরা cretonne-এর পদ্মাটা টানিয়া জানলা খুলিয়া পাশের কিংখাবে মোড়া সোফায় হেলান দিয়া বসিল। বাহিরে তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, আকাশ নিকষমণির মত কালো, চাপা আর্দ্রনাদের মত বাতাস কয়েকটি নারিকেল গাছ মর্মরিত করিতেছে, অন্ধকারে কিছু দেখা যাইতেছে না, শুধু দীর্ঘশ্বাসের মত করুণ একটানা শব্দ। মাধবীর চক্ষে অশ্রু আসিল না, বক্ষে হতাশাস উঠিল না, প্রদীপ্তনেত্রে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রায় ছয় মাস হইল তাহাদের বিবাহ হইয়াছে। এই ছয় মাসেই তাহার জীবনের সব স্বপ্ন ছুটিয়া গিয়াছে। কেন সে যতীনকে বিবাহ করিয়াছিল, আর্দ্র স্তব্ধ অন্ধকারে সে-কথা ভাবিতে চেষ্টা করিল। আপনাত্মক মনকে সে বিবাহের পূর্বেও বুঝিতে পারে নাই, এখনও বুঝিতে পারিল না। কোন অজানা শক্তির হাতে সে যেন ক্রীড়নক, এ তিমিররাত্রি পার করিয়া কাণ্ডারী কোথায় লইয়া যাইবে!

মাধবীর কাছে যতীন যখন বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল, সে অসম্মতি জানাইয়াছিল। কিন্তু যতীন হার মানিল না, হার মানা তার স্বভাব নয়, সে মাধবীর পিতার শরণাপন্ন হইল। রমলা চলিয়া যাইবার পর যোগেশ-বাবুর মদের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছিল। কোন কোন বিনিত্র রাত্রে তিনি ভূতের মত বাড়ীর চারিদিক ঘুরিতেন। এক সকালে দেখা গেল, যে-ঘরে মাধবীর মা মরিয়াছিলেন, সেই ঘরের দ্বারের সম্মুখে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন। কত অর্ধরাত্রি মাধবী জাগিয়া শুনিত, পাশের ঘরে তাহার পিতা গৌঁ গৌঁ শব্দে আর্দ্রনাদ করিতেছেন।

যোগেশ-বাবু বেশ বুঝিতেছিলেন, তিনি ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তাই এ বিবাহের প্রস্তাবে মাধবীর অসম্মতি থাকিলেও তিনি তাহাকে সম্মতি দিবার জন্ত নানাপ্রকারে অহুন্নয় করিতে লাগিলেন। মাধবীকে পিতার মতে মত দিতে হইল। কিন্তু একমাত্র পিতার অহুরোধ বিবাহের কারণ বলা যায় না,—ইহার মধ্যে রজতের প্রতি একটু অভিমান ছিল, পিতার সঙ্গে দুঃস্বপ্নময় জীবনভারের শ্রান্তি ছিল, নারীজনোচিত নবজীবনস্বাদের ঔৎসুক্য ছিল, আর নবজাগ্রত তরুণী-চিত্তের ক্ষুধাও ছিল। মাধবী বিবাহের কারণ বুঝিতে চেষ্টা করে নাই, চেষ্টা করিলেও বুঝিতে পারিত না। যেদিন সে বিবাহে মত দিল তারপর দিন হইতে দেখিল, যতীনকে সে সত্যই ভালবাসিয়াছে। তাহার দেহ সুন্দর, তাহার সঙ্গ মধুর, তাহার বাণী সুখকর, তাহাকে ঘিরিয়া কি স্বপ্নরহস্যজাল বিজড়িত।

বিবাহের পর যতীন মাধবীকে কয়লার খনিতে লইয়া গেল। সেখানে প্রথম মাস সত্যই যেন স্বপ্নের ঘোরে কাটিয়া গেল। সে যে কেমন করিয়া তাহার পূর্বজীবন, তাহার পিতার অবস্থা ভুলিয়া পরিপূর্ণ আনন্দে দিন কাটাইল তাহা ভাবিয়া সে নিজে বিস্মিত লজ্জিত হইয়া উঠিত। সকালে যতীনকে চা করিয়া দিতে, দুইজনে বসিয়া এক টেবিলে খাইতে যে কি অপূর্ণ আনন্দ পাইত। তাহার গাঙ্গীর্ঘ্য মাঝে মাঝে ভাঙিয়া যাইত, রমলার মত সে চঞ্চলা কোতুকময়ী হইয়া উঠিত। যতীন কাজে চলিয়া গেলে প্রভাতের আলোর দিকে চাহিয়া বিরহিণী স্বপ্নের জাল বুনিত। ছপুরে আবার দুইজনে একসঙ্গে থাকার সুখ, কত মৃদুগন্ধ, শীত মধ্যাহ্নের রৌদ্রের দিকে চাহিয়া সে দিবাস্বপ্ন দেখিত। সন্ধ্যাবেলায় তাহারা প্রায় মোটর করিয়া বেড়াইতে বাহির হইত, উচুনীচু আকা-বাঁকা লালপথ ধরিয়া কতদূর চলিয়া যাইত, যতীনের পাশে বসিয়া তাহার মোটর চালানর কায়দা দেখিয়া তাহার বুক অসীম সুখে ভরিয়া উঠিত।

কিন্তু এ স্বপ্নের ঘোর বেকীদিন রহিল না, মদের নেশার মত কাটিয়া গেল। নারীর সম্বন্ধে যতীনের ধারণা ছিল যে নারী পুরুষের কাছে নেশার পাত্রের মত, সে যেন

জীবনের কাজের মধ্যে জুড়িয়া না বসে। সন্তান জন্মদান ও পালনের জন্ত প্রকৃতি নারীকে সৃষ্টি করিয়াছে, এ গভী হইতে জোর করিয়া বাহির করিয়া প্রকৃতির এ অভিপ্রায় পুরুষ যেন ব্যর্থ না করে। বস্তুতঃ, শিকার বা করা মোটর হাঁকানর মত, বিবাহ করাটাও যতীনের কাছে জীবনের একটা সখ মেটান মাত্র। শিকার-শেষের পর বন্দুকটা যেমন বাক্সে পুরিয়া রাখে, কোথায় থাকে তাহার ঠিকানা থাকে না, তেমনি বিবাহের প্রথম মাসের পর যতীন মাধবীকে তাহার কলিকাতার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল এবং নানা ব্যবসায়-সংক্রান্ত চিঠির সঙ্গে প্রতिसপ্তাহে একখানি করিয়া চিঠি লিখিয়া খোঁজ লইত সে বাঁচিয়া আছে কি না।

কালো আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অগ্নিরেখা টানিয়া একটা বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। মাধবীর মনটাও অমন চমকিয়া উঠিল। সে ভাবিতেছিল, হয়ত সব বিবাহে এইরকমই ঘটে, এইরূপ ক্ষণিক আনন্দ স্বপ্নমায়ার পর দীর্ঘ অবসাদ, শ্রান্ত জীবনভার। সত্যই ত, উষার আকাশে আলোর হোলিখেলা কতক্ষণ থাকে, সে রঙের স্বপ্ন নিমেষে টুটিয়া যায়, সমস্তদিন ধরিয়া বর্ণহীন তপ্ত জ্বালাময় আলোর দীপ্তি, তারপর স্নিগ্ধ অন্ধকারভরা রাত্রি আসে। সে মৃত্যুরাত্রির অতল কালো স্নেহের জন্ত এখনও তাহার প্রাণ তৃষিত হইয়া উঠে নাই বটে, কিন্তু এ সজল অন্ধকার তাহার বড় ভাল লাগিতেছিল না, ইচ্ছা হইতেছিল জনহীন পথে মন্ত-বাতাসের সঙ্গে তামসী রাত্রি বাহির হইয়া পড়ে।

আর সত্যসত্যই তাহাদের বিবাহ যদি ভুল হইয়া থাকে! এ ভুল সংশোধন করিবার কি কোন উপায় নাই? তাহা হইলে কি সমস্ত জীবন দুইজন দুইজনকে ফাঁকি দিবে, প্রেমের ভণ্ড অভিনয় চলিবে আর—আর তাহার ভাবিতে ভাল লাগিতেছিল না। ব্রাউসের ভিতর হইতে কাজী-সাহেবের চিঠিখানি বাহির করিল। কাজীসাহেব তাহার নববিবাহিত জীবনের নানা সুখচিত্র নানা রংএ বর্ণনা করিয়া বহুফার্সীকবিতামণ্ডিত করিয়া এক দীর্ঘপত্র লিখিয়া-ছেন, তাহার এই কল্পিত আনন্দগুলির কথা পড়িয়া তাহার ঠোটে এক ব্যঙ্গ হাসি খেলিয়া গেল। তারপর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। চিঠির সবশেষে কাজীসাহেব

লিখিয়াছেন, তাহার পিতার মদের মাত্রা দিন দিন বাড়িতেছে, তিনি কিছুতেই তাঁহাকে দমন করিতে পারিতেছেন না। চিঠিটি বৃকের ভিতর ফেলিয়া মাধবী আবার অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

কি একখানি ইংরেজী নভেলে মাধবী পড়িয়াছিল, We marry only to develop ourselves, why should we otherwise marry at all? আত্মার বিকাশের জন্তই বিবাহ, তাহা ছাড়া বিবাহের অন্ত সার্থকতা কোথায়? আত্মার সে বিকাশের পথ এ বিবাহজীবনের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া সে খুঁজিয়া পাইবে? যে প্রেমের আলোয় জীবন পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিয়া কল্যাণের বর্ণে সেবার সৌরভে চারিদিক আনন্দিত করে, সে প্রেম,—ভাবিতে ভাবিতে সে যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িল, পর্দা দিয়া জান্না বন্ধ করিয়া আলোর পর্দাটা টানিয়া বিছানায় চূপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

যতীন যখন ঘুমাইতে আসিল, তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে। যতীন বিছানার কাছে আসিতে মাধবী গম্ভীরকণ্ঠে বলিল,—দেখ—

হঁ,—বলিয়া যতীন এক পাশে শুইয়া পড়িল।

মাধবী গম্ভীরভাবে বলিয়া যাইতে লাগিল,—বাবার বড় অসুখ, ভাব্ছিলুম একবার যাব।

বেশ, যাওনা,—বলিয়া যতীন চোখ বুজিল।

—দেখনা, এই চিঠিটা।

আচ্ছা, যেদিন খুসি, কালই যেতে পার, বড় ঘুম পেয়েছে,—বলিয়া যতীন ভাল করিয়া শুইল, কিছুক্ষণের মধ্যেই নিদ্রায় অসাড় হইল।

যতীনের দিকে চাহিয়া মাধবীর যেন কেমন ভয় হইল, এ যেন কে অপরিচিত। ধীরে সে বিছানা হইতে উঠিয়া জান্নার কাছে আসিয়া বসিল। নয়নের কালো-তারার মত কালো আকাশ করুণনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, শুধু ছেঁড়া মেঘের মাঝখানে একটি তারা জলজল করিতেছে। সেই তারার দিকে চাহিয়া সহসা মাধবীর মাকে মনে পড়িল। ছেলেবেলায় এক বর্ষারাত্রের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল—অন্ধকার সিঁড়িতে ভয় পাইয়া সে ক্রুরূপে ছুটিতে ছুটিতে ঘরে ঢুকিয়া মার কোলে আশ্রয় লইয়া শান্তি পাইয়াছিল। সেই রকম কোন স্নিগ্ধ শীতল স্নেহময় ক্রোড়ের আশ্রয়ের জন্ত তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

বাহিরের অন্ধকারে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ জলিয়া উঠিতে লাগিল আর শূন্যঘরে ইলেকট্রিকের আলো আর মাধবীর দুই চক্ষু জলিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু

দিবেহি রাজ্যে

মালদ্বীপপুঞ্জের নাম আমরা প্রায় সকলেই শুনেছি, কিন্তু আমরা অনেকেই এই দ্বীপ ও সেখানের অধিবাসীদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না বল্লেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এস্থানের অধিবাসীরা তাদের জন্মভূমিকে “দিবেহি রাজ্যে” (দ্বীপ-রাজ্য) বলে। আপনারা সকলেই জানেন যে, মালদ্বীপপুঞ্জ ভারত-মহাসাগরের কোলে কতকগুলি ছোট ছোট দ্বীপের নাম। এই দ্বীপগুলি পাশাপাশি লম্বালম্বি ভাবে সাজান। সিংহল দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল থেকে এগুলি প্রায় সাড়ে চারশো মাইল দূরে অবস্থিত। সর্বসমেত তেরো চৌদ্দটি দ্বীপ

আছে। প্রত্যেক দ্বীপটির মাঝে খানিকটা অগভীর জলাভূমি সেগুলিকে বিযুক্ত করে’ রেখেছে। দ্বীপগুলি মাপে ও আকারে এক নয়, কোনোটি গোল, কোনোটি বাদামী, এই রকম নানা আকারের আছে।

মালদ্বীপের অধিবাসীরা কোনো একটা বিশেষ জাতির (race) বংশধর। তাদের নিজেদের গভর্ণমেন্ট, ভাষা, ইতিহাস প্রভৃতি আছে। এই ইতিহাস খেবে জানতে পারা যায় যে তারা একটি পুরাতন সভ্য জাতি। গত বংসরের আদম-স্মারিতে জানতে পারা গেছে যে দিবেহি রাজ্যের লোকসংখ্যা সত্তর হাজারেরও বেশী

এখানকার অধিবাসীরা পরি-
শ্রমী, সমজাতিক এবং সম-
ধর্মসম্পন্ন। মাছধরা আর
নারিকেল চাষই তাদের
প্রধান ব্যবসা, এ ছাড়া
তারা ঘাসের মাহুর বোনে,
তুলার সূতা কেটে কাপড়
তৈরী করে, ছোটখাট প্রয়ো-
জনীয় কাঠের কাজও করে
থাকে। এদের মধ্যে কেউ
কেউ সমুদ্রযাত্রার উপযোগী
বেশ ভাল নৌকাও তৈরী
করতে পারে। এই-সব
নৌকাতে চড়ে তারা এডেন,
সিংহল, কলিকাতা এবং
এমন কি ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত



মহম্মদ সামস-উদ্-দীন—মালদ্বীপের সুলতান

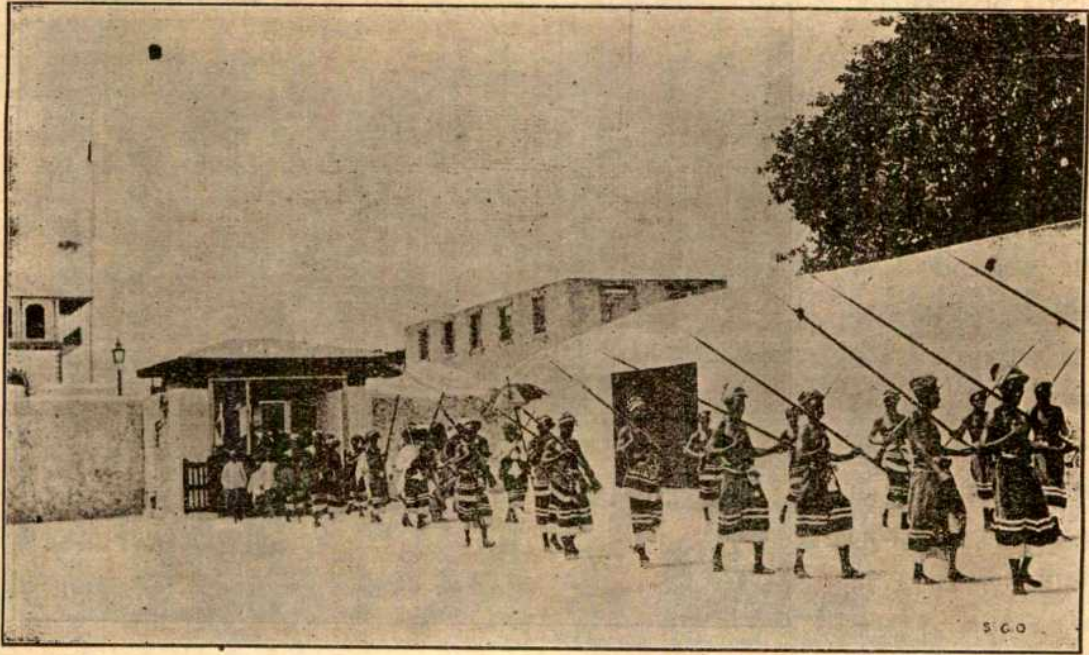
পাড়ি দেয়। দিবেহি রাজ্যের লোকেরা মাছ (শুটকী
ও লোণা), নারিকেলের দড়ি, নারিকেল, নারিকেলের
শাঁস (শুষ্ক অবস্থায়), কড়ি শামুক, কচ্ছপের খোলা
ইত্যাদি রপ্তানি করে ; আর চাল, সুপারি, তুলাজাত বস্ত্র,
তেল, মসলা ও আরো কিছু কিছু জিনিষ আমদানী করে।

গত বৎসর সিংহলের অবসরপ্রাপ্ত পুরাতত্ত্বানুসন্ধানী
(Archaeological Commissioner) মিঃ এইচ সি পি
বেল মালদ্বীপে গিয়েছিলেন—সেখানের অধিবাসীদের
সুস্থক্ষে তদন্ত করতে। তাঁর রিপোর্টে প্রকাশ যে
দেশ কাল ও পাত্র অনুসারে এখানকার শাসনপ্রণালী
দ্বীপবাসীদের সম্পূর্ণ উপযোগী। লোকেরা এই শাসন-
প্রণালীর অধীনে বেশ সুখেই আছে। অল্প কোন
দেশের সঙ্গে তাদের কোনো রকম যোগ না থাকায়
এখানে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক হাঙ্গামা নেই।

এই দ্বীপগুলির মধ্যে “মালে” নামক দ্বীপে সুলতান
বাস করেন। মালদ্বীপপুঞ্জের মধ্যে “মালে”ই সর্বপ্রধান
দ্বীপ, খাস সরকারী দপ্তরখানা ইত্যাদি যা কিছু তা
মালেতেই বসে ; কিন্তু আকারে মালের চেয়েও বড় দ্বীপ
দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে অনেকগুলি আছে।

মিঃ বেল বলেন, বহুশতাব্দী থেকেই এখানকার
প্রজারা বেশ উন্নত শাসনবিধির অধীনে বাস করছে।
শাসন-ব্যাপারে সেখানকার প্রজাদের অনেক বিষয়েই
পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল—অনেকটা constitutional monar-
chy বা বিধি-সংঘত রাজত্ব ; সুলতান এবং তাঁরও
আগেকার অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত
নৃপতিগণ প্রজা-সাধারণের প্রতিনিধি সর্দারদের ইচ্ছামতই
চলতে বাধ্য হতেন। সর্দারেরা মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহী হয়ে
মারামারি কাটাকাটি ইত্যাদি হাঙ্গামাও করতো।
বর্তমানে সুলতানকে পরামর্শ দেবার জন্য তিনটি কাউন্সিল
আছে। এই কাউন্সিলগুলিকে সিংহল গবর্নমেন্টের শাসন,
ব্যবস্থাপক ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের (Executive,
Legislative, and Municipal Councils) সঙ্গে
তুলনা করা যেতে পারে।

শাসন এবং খাজনা ও শুদ্ধ আদায়ের সুবিধার
জন্য সমস্ত দ্বীপপুঞ্জকে তেরটি বিভাগে বিভক্ত করা
হয়েছে। প্রত্যেক বিভাগে প্রধান গবর্নমেন্টের (Central
Government) একজন প্রতিনিধি থাকেন এবং তিনিই
সেই প্রদেশের সর্বপ্রধান কণ্ঠস্বর। আগেই বলা হয়েছে



মালদ্বীপের প্রধান মসজিদ হুকুর মিস্কিট (মসজিদ) অভিমুখে সুলতানের সমারোহ-যাত্রা

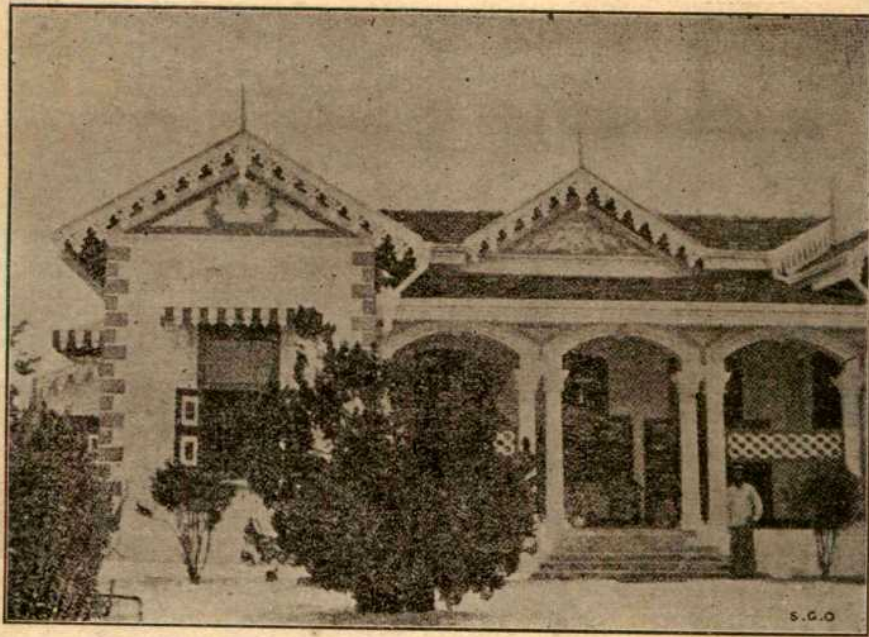
যে, দ্বীপগুলি পাশাপাশি থাকলেও তাদের মধ্যে মধ্যে একটু কোরে জলভাগ তাদের পৃথক কোরে রেখেছে; এদের মধ্যে একটি দ্বীপ এই দ্বীপপুঞ্জ থেকে একটু বেশী দূরে অবস্থিত; এই দ্বীপটি আলাদাভাবে শাসিত হয় অর্থাৎ মূল দ্বীপপুঞ্জের গবর্নমেন্টের সঙ্গে এই দ্বীপের গবর্নমেন্টের সাক্ষাৎভাবে কোনো সম্পর্ক থাকে না। এই দ্বীপটিকে নিয়ে মালদ্বীপপুঞ্জে সর্বসমেত চৌদ্দটি দ্বীপ আছে।

এখানে নৌ ও ডাঙার সৈন্য ও সেনানী নিয়ে সর্বসমেত আট শো থেকে এক হাজার মাত্র লোক মোতায়েন থাকে। একজন স্বাধীন সুলতান এই দ্বীপে রাজত্ব করেন, কেবলমাত্র বৎসরে একবার এখান থেকে একজন প্রতিনিধি সিংহল গবর্নমেন্টকে কর দিয়ে আসে। এই কর দেওয়া ছাড়া শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে সুলতান সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন।

মালদ্বীপপুঞ্জের ইতিহাস খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। শোনা যায় যে, টলেমি একস্থানে এই দ্বীপের উল্লেখ করেছেন। সিংহলদ্বীপের নিকটবর্তী কোনো দ্বীপের

অধিবাসীদের প্রতিনিধি রোমক সম্রাট জুলিয়ানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন এমন কথাও শুনে পাওয়া যায়। মালদ্বীপের সুলতানের নিকট আরবী ভাষায় লিখিত যে ইতিহাস (তওয়ারিখ) আছে, তার মধ্যে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বর্তমান সময়ের পর্যন্ত ইতিহাস পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দ্বীপবাসীরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে।

মিঃ বেল এই ইতিহাস থেকে বিরাশীজন সুলতানের নাম, উপাধি এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই বিরাশীজন সুলতান ১১৪১ অব্দ থেকে ১৯১৩ অব্দ পর্যন্ত সেখানে রাজত্ব করেছিলেন। ইতিহাসখানি আরম্ভ করা হয়েছে সেখানকার প্রথম সুলতান মহম্মদ-উল্-আদিলের রাজত্বকাল থেকে। এর আমলেই দ্বীপবাসীরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় (১১৫৩—৫৪ খৃষ্টাব্দে)। তাব্রিজবাসী শেখ ইয়ুসুফ শামসউদ্দীন নামক এক ব্যক্তি এদের মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন। এই ইতিহাসখানিতে মালদ্বীপপুঞ্জ এবং সেখানের অধিবাসীদের সম্বন্ধে এমন অনেক কথা



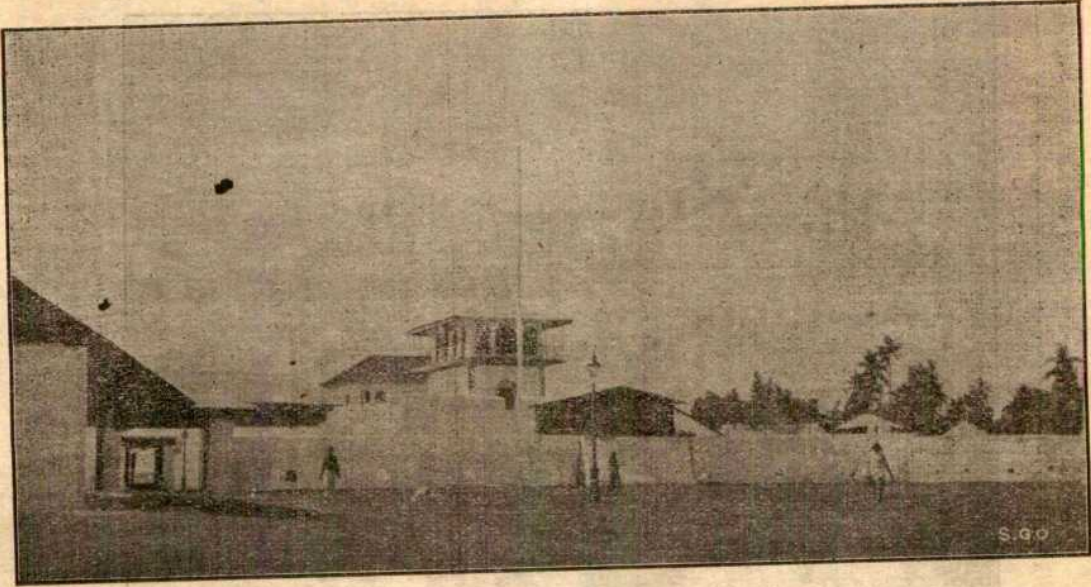
মালদ্বীপের শ্বলতান-পুত্র হাসান ইজ্জদ্-দীনের নূতন প্রাসাদ

জানা যায় যা সাধারণের কাছে এতদিন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। মিঃ বেল বলেন যে, ঐতিহাসিকদের কাছে এখানি একটি অমূল্য গ্রন্থ। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বিখ্যাত মুসলমান পরিব্রাজক ইব্ন বাতুতা এই দ্বীপে এসেছিলেন এবং তিনি তাদের বিষয়ে একটি কোতূ-হলোদ্বীপক ইতিহাস রেখে গিয়েছেন। দ্বীপবাসীরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করার অনেক দিন পরে ইব্ন বাতুতা সেখানে গিয়েছিলেন।

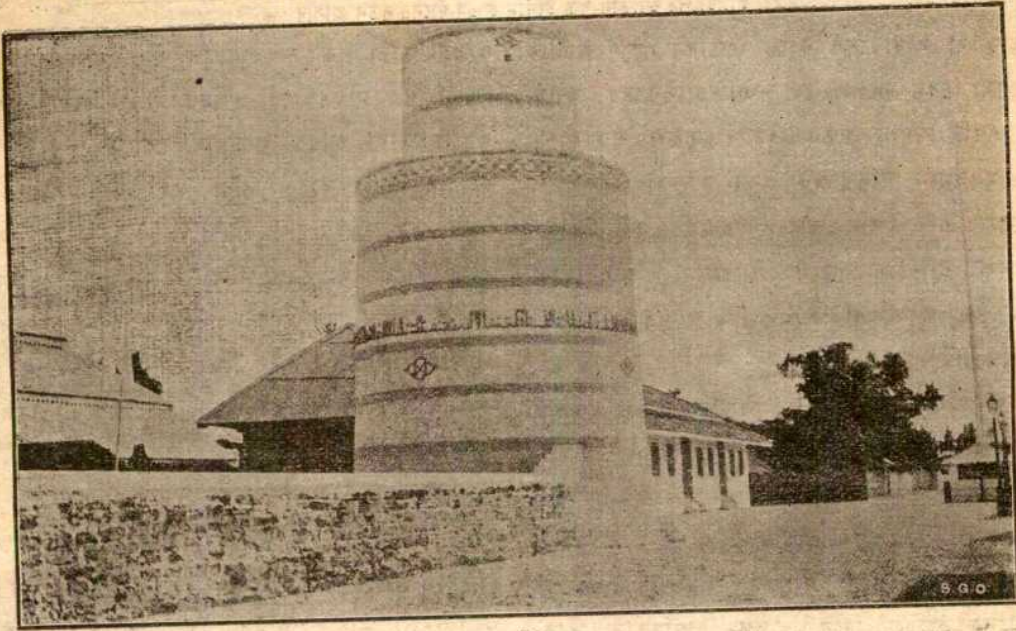
১৫'২ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজেরা কিছুদিনের জন্ত একবার মালদ্বীপ অধিকার করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দ্বীপবাসীরা তাদের তাড়িয়ে দেয়। পর্তুগীজেরা কিন্তু তাতে হতাশ না হোয়ে এই দ্বীপ অধিকার করবার বার বার চেষ্টা করতে থাকে। অবশেষে একবার দ্বীপবাসীদের হারিয়ে দিয়ে দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে বসে। এইবার পর্তুগীজেরা একাদিক্রমে প্রায় পনেরো বছর এখানে রাজত্ব করেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজেরা রক্তক্ষণ্ডে এসে আবির্ভূত হলো। তারা এসেই সিংহলদ্বীপে পর্তুগীজদের অধিকৃত জায়গাগুলি দখল করে বসলো। সিংহলের স্থানগুলি অধিকার

করেই তারা বুঝতে পারলে যে, মালদ্বীপের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ না কোরে তাদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করলে তারা অধিক লাভবান হোতে পারবে। এই-সব বিবেচনা কোরে তারা এই দ্বীপবাসীদের সঙ্গে বোধ হয় একটা রফানিম্পত্তি কোরে ফেলেছিল। এই সম্পর্কে মিঃ বেল এক জায়গায় লিখেছেন যে, ১৬৪৫ অব্দে মালদ্বীপ থেকে সিংহলে সর্বপ্রথমে প্রতিনিধি পাঠান হয়। তখন থেকে এখন পর্যন্ত সমানভাবে প্রতিবৎসরে মালদ্বীপ থেকে সিংহলে রাজ-প্রতিনিধি পাঠান হোয়ে থাকে।

এখানকার ভাষার সঙ্গে দেশের ইতিহাস এমন ভাবে জড়িত যে, ভাষা না জানা থাকলে তাদের ইতিহাস জানা এক রকম অসম্ভব। এখানকার ভাষা ও সিংহলী ভাষায় অনেক মিল আছে। এই দুটি ভাষা ভাল কোরে পরীক্ষা করলে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, এক সময়ে এই দুই ভাষা প্রায় এক ছিল। বর্তমানে সিংহলের যে ভাষা চলে তার সঙ্গে বর্তমানের মালদ্বীপের ভাষার মিল নেই বটে, কিন্তু সিংহলে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে



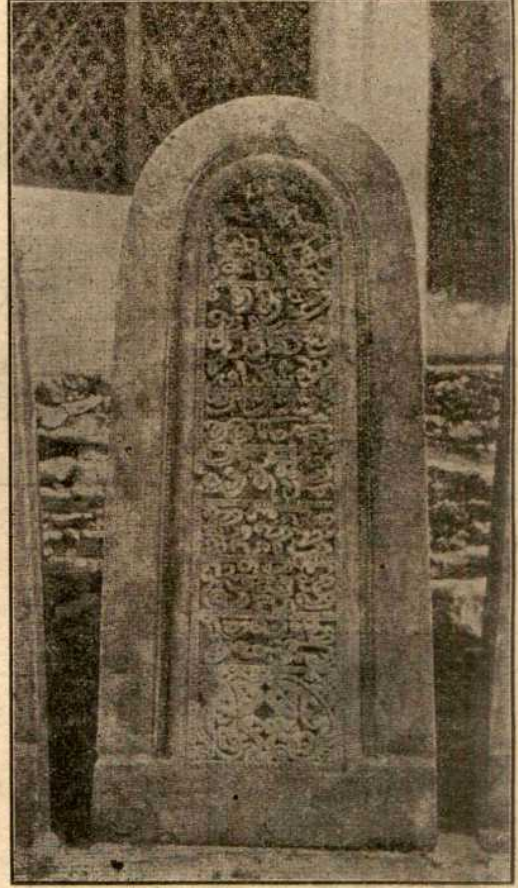
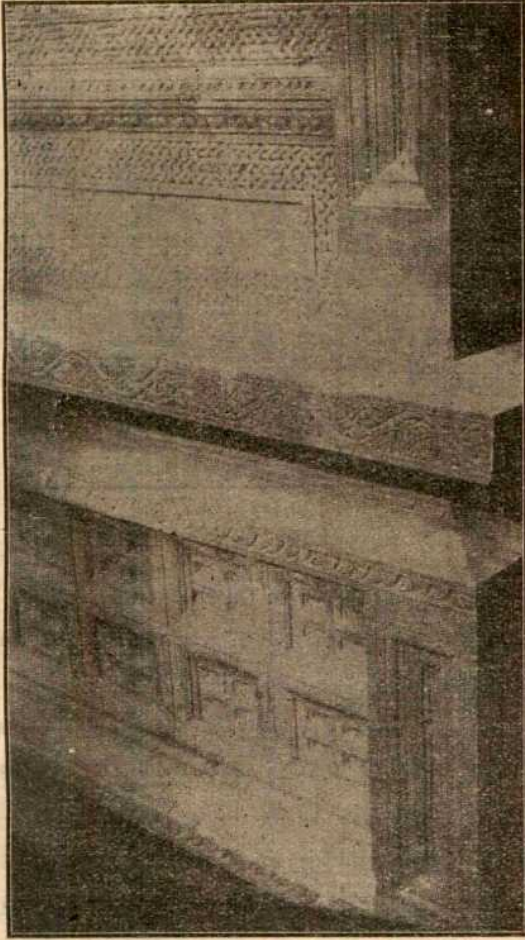
মালদ্বীপের রাজপ্রাসাদের আবেষ্টন-গৃহ



মসজিদ হুক্ক মিস্কিট ও মুল্লার মিনার, মালদ্বীপ

ভাষার প্রচলন ছিল সেই ভাষার সঙ্গে এখনকার মাল-
দ্বীপের ভাষার অভূত সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।
অবশ্য দ্বীপবাসীরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করার পর
থেকে এই আটশো বছর ধরে তাদের মূল ভাষার

অনেক পরিবর্তন হোয়ে গিয়েছে। মুসলমানদের প্রধান
ধর্মগ্রন্থ কোরান আব্বী ভাষায় লিখিত। সেইজন্য
তাদের ভাষায় একটা একটা কোরে আব্বী কথা প্রবেশ
করতে আরম্ভ করে; ক্রমে কোরানের ভাষার ওপর

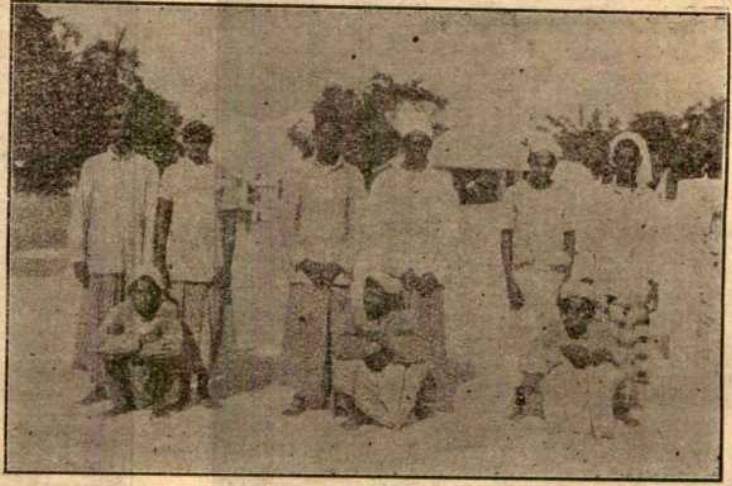


প্রাচীন মালদ্বীপের ভাষার (দিবেহি অক্ষর) লিখিত সমাধি-স্তম্ভ

মসজিদ হকুর মিস্কিটের খোদিত প্রাচীর-গাত্র অত্যধিক আকর্ষণ থাকায় তাদের ভাষার অক্ষরের আকৃতি পর্য্যন্ত আরবীয় অক্ষরের অল্পরূপ হোয়ে পড়েছে। এখন সরকারী দা-কিছু নথি-পত্র তা আরবী অক্ষরেই লেখা হয়। তাদের পুরাতন দেশজ ভাষা, অর্থাৎ যে ভাষা প্রায় সব বিষয়েই সিংহলী ভাষার অল্পরূপ ছিল সে ভাষা, তারা বর্জন করেছে এবং আরবী ভাষার অল্পকরণে তারা এখন ডান দিক থেকে লেখা আরম্ভ করেছে ও সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর আরবী ভাষার কথাও তাদের ভাষার মধ্যে এসে পড়েছে। ওদিকে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে সিংহলী ভাষার মধ্যেও পরিবর্তন শুরু হয়; এবং এই কয়েক বছরে তাদের ভাষাও বিস্তর পরিবর্তিত হয়েছে। এই দুই দেশ দুই বিভিন্ন দিকে অগ্রসর

হওয়ায় এখন তাদের ভাষার মধ্যে ব্যবধানটা খুবই বেশী হোয়ে পড়েছে। তার ওপর মালদ্বীপবাসীরা মুসলমান হওয়ায় সিংহলীদের সঙ্গে তাদের প্রায় সমস্ত আদান-প্রদান বন্ধ হোয়ে গিয়েছিল, এবং এমনি কোরে তাদের মধ্যে পার্থক্যটা ক্রমে বেড়েই গিয়েছে। সিংহলীদের পুরাতন সাহিত্যের মধ্যে এখনও পর্য্যন্ত মালদ্বীপের কোনো কথা পাওয়া যায় নি; কিন্তু যতদূর জানতে পারা গেছে তাতে মনে হয় যে, সিংহলের ভাষাই মালদ্বীপের ভাষার মাতৃভাষা। এই দুটি দ্বীপের সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য সংগৃহীত হোলে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হোতে পারা যাবে। হয়তো এও প্রমাণ হোয়ে যেতে পারে যে, মালদ্বীপবাসীরা সিংহলদ্বীপবাসীদেরই বংশধর, কোনো সময়ে সিংহলদ্বীপের একদল লোক সেখানে গিয়ে বসবাস

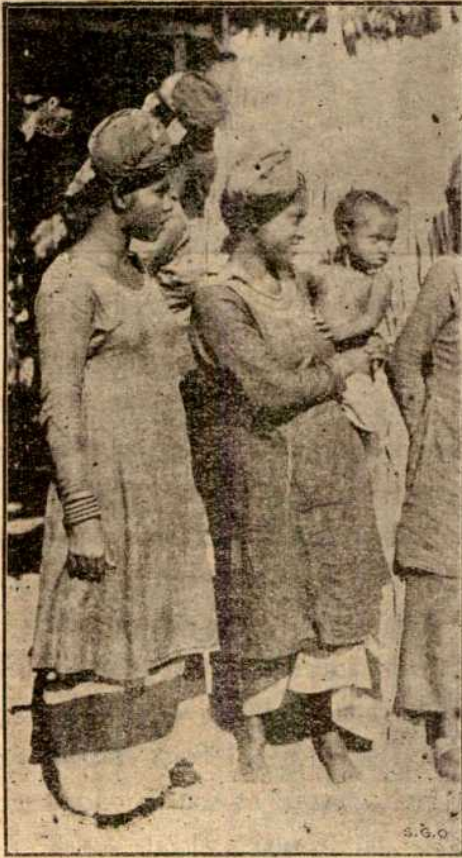
শুরু করেছিল। বিখ্যাত শব্দতত্ত্ববিদ অধ্যাপক উইল্‌হেল্ম গেইগের (Wilhelm Geiger) তাঁর Maldivian Linguistic Studies নামক পুস্তকে বলেছেন—“কোনো এক সময়ে (যদিও সময়টা এখনও স্থির করতে পারা যায় নি) সিংহলদ্বীপ থেকেই লোক গিয়ে মালদ্বীপে বাস করতে আরম্ভ করে কিংবা ভারতবর্ষ থেকে আর্থোরা যে সময়ে সিংহলে এসেছিল একদল আর্থ্য সেই সময় মালদ্বীপেও গিয়ে বাস করতে থাকে।” কিন্তু এদের ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করলে মনে হয়



মালদ্বীপের পুরুষ

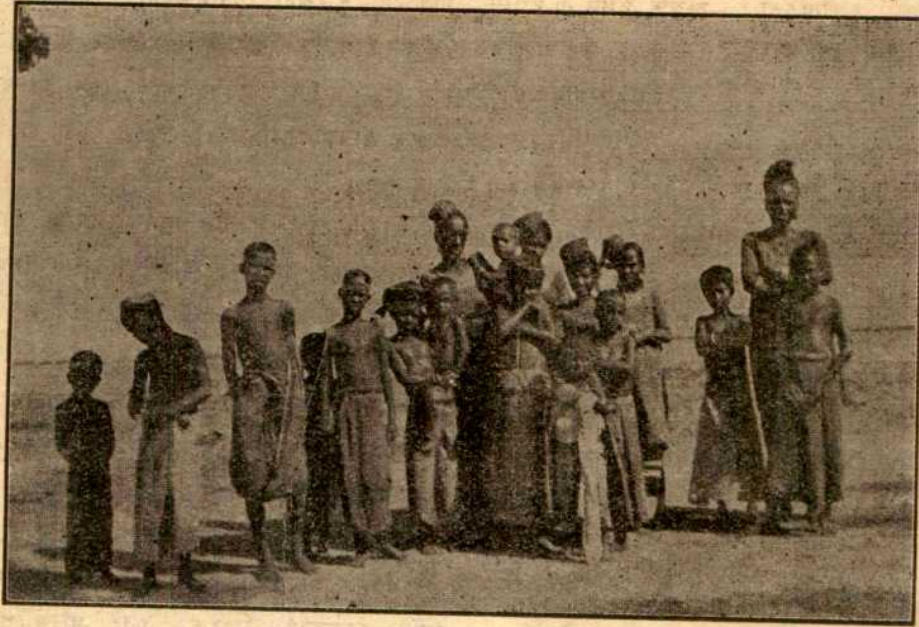
যে সিংহলদ্বীপ থেকেই একদল লোক মালদ্বীপে গিয়েছিল; কারণ সিংহলের অনেক দেশজ শব্দ মালদ্বীপের ভাষার মধ্যে পাওয়া যায়।

মিঃ বেল সেথানকার সুলতানের নাম ও উপাধির যে তালিকা সংগ্রহ করেছেন, সেই-সকল উপাধির মধ্যেও সিংহলী ভাষার আঁচ পাওয়া যায়। এই-সকল সম্মান-সূচক উপাধিকে বিরুদ্ধ বলা হয়; অথচ মালদ্বীপের ভাষায় বিরুদ্ধ শব্দের কোনো অর্থই নেই, কিন্তু সিংহলী ও সংস্কৃত ভাষায় বিরুদ্ধ শব্দের অর্থ রাজস্বতি। মালদ্বীপের সুলতানদের এই-সকল উপাধির সঙ্গে সিংহলী রাজাদের উপাধির অভূত সাদৃশ্য দেখা যায়। আমরা নীচে মালদ্বীপী, সিংহলী সংস্কৃত বা পালি ও বাংলা এই চার ভাষার একটি তালিকা দিলাম। মালদ্বীপী ও সিংহলী ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য কতটা নিকট, এ থেকে পাঠক তা অনুমান করতে পারবেন।



মালদ্বীপের নারী ও শিশু

মালদ্বীপী	সিংহলী	সংস্কৃত, পালি বা বাংলা
দিব্	দিব্ বা দিবইন	দ্বীপ (সং, বাং)
		দীপ (পালি)
রাজ্জে	রাজ্জে	রাজ্য (সং, বাং)
		রাজ্জ (পালি)
অকুরু	অকুরু	অক্ষর (সং, বাং)
		অকথর (পালি)



মালদ্বীপের নারী ও বালকবালিকা

মালদ্বীপী	সিংহলী	সংস্কৃত, পালি বা বাংলা	মালদ্বীপী	সিংহলী	সংস্কৃত, পালি বা বাংলা
দক্ষমবস্ত্র	ধর্মবস্ত্র	ধর্মবৎ বা ধর্মবস্ত্র (সং, বাং) ধর্মবস্ত্র (পালি)	নলি মাগু	নেলি মাগ	নলী মার্গ (সং, বাং) মগ্গ (পালি)
লঙ্কানদ্বীপ	লঙ্কাপুর	লঙ্কাপুর	মারাকা	মারাওয়া	মারা (মৃত)
এতুরু	এতুরু	আচাধ্য	একেকু	একেকু	একক
উস্তব	স্তূপ	স্তূপ	অনেনেকু	অনিকেকু	অগ্ন এক
হীরিগা	হীরিগল	প্রবাল	তিরি	তিরি	তির্যাক
বেলিগা	বেলিগল	বেলে পাথর			তেবুছা
বুন্দা—গে	বুদ্ধ—গে	বুদ্ধ-গৃহ	দেবী	দেব	দেব (রাক্ষস)
মা	মা কিংবা মহা	মহা	ফরুওয়ান	পোরাওয়ানাওয়া	প্রাবরণ
কুদা	কুদা	ক্ষুদ্র, কোদা (থোকা)	হফন	হপন	চর্কণ, হাপ্‌ডানো
বন্দর	বন্দর	মহৎ, বড়	হতুরু	হতুরু	শত্রু
দহর	দহর	দহর (ক্ষুদ্র), হ্রদ, ডহরা (গর্ত)	মা	মামা	অহং, আমি
ইস্	ইস্ কিংবা উস	উচ্চ, উঁচু	তিবি নামা	তিবে নামা	বদি হয়
রিয়	রিয়ন	এক হাত পরিমাণ	ইরু	ইরু	ইতু (স্বর্ঘ্য)
এটিরি	এটিলি	বাটি বা পাত্রী	মা-গে	মা-গে	(ঋতু > ইতু) মম, আমার, মোগোর, আমাগোর

মালদ্বীপী	সিংহলী	সংস্কৃত, পালি বা বাংলা	যায় যে, শতকরা পঁচানব্বইটা শব্দ সিংহলী ভাষা
উষা আমা	উষা আশ্বা	তব অথা (তোমার মা)	থেকে এসেছে; কাজেই এ ক্ষেত্রে যদি ধরে' নেওয়া
বিরুদ্ধ	বিরুদ্ধ	বিরুদ্ধ (রাজস্বত্তি)	যায় যে, সিংহল থেকেই লোক এসে মালদ্বীপে বাস
রাজুন	রাজুন বা রাজুন	রাজুন, রাজা	করতে আরম্ভ করেছিল তা হোলে সেটা নেহাৎ অত্যা
হাত-তৈলি	হাত-তৈলিয়া	সাত তোলো (সাত হাঁড়ি)	হবে না।
বেহিমান ফুরি	বিহারমান পুরী	ব্রাহ্মণপুরী, বিহারমানপুরী	ভাষা ছাড়া সেখানে অনেক প্রাচীন কীর্তি আছে
মুন্নফুরি	মুনিপুরী মুনিপুর	(বুদ্ধ মুনির পুর)	বা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হতে পারে যে মালদ্বীপবাসীরা
কছু	কছু	খড়া (তলোয়ার)	মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করবার আগে বৌদ্ধ ছিল। মি:
রা	রা	তাড়ি	বেল এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। মি:
বেরে	*	বিহার	বেল মালদ্বীপপুঞ্জের সমস্ত স্থানে যান নি, কিন্তু
বোই গাস	*	বটগাছ	সেখানকার দ্বীপবাসী অনেকের কাছে শুনেছেন যে,
হবিত্ত	*	চৈত্যা	এই দ্বীপপুঞ্জের কোনো কোনো দ্বীপে প্রাসাদতুল্য
			পাথরের বাড়ী চৈত্যা ইত্যাদি ভগ্নাবশেষ পড়ে' আছে।
			এই-সকল অট্টালিকা এবং সেখানকার ধ্বংসস্তুপের
			মধ্যে ভারতবর্ষ, সিংহল এবং মালদ্বীপের প্রাচীন
			সভ্যতার কত অমূল্য ইতিহাস লুকিয়ে আছে তা কে
			বলতে পারে।

কথার তালিকা বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই। সেখান-
কার ভাষার আর্বী ও পারসী শব্দ বাদ দিলে দেখা

শ্রী প্রেমাকুর আতর্ষী

চোখ গেল

সাধারণের চোখে হয়ত সে অস্বাভাবিক ছিল না। আমিও
তাহাকে যে খুব সুন্দরী মনে করিতাম তাহা নহে—কিন্তু
তাহাকে ভালবাসিতাম। তাহার চোখ দুটোতে যে কি ছিল
তাহা জানি না। তেমন স্বপ্নময় সুন্দর চোখ জীবনে কখনও
দেখি নাই! ছুটু বলিয়াও তাহার অখ্যাতি ছিল।

সেই কুরুপা এবং চঞ্চলা 'মিনি' আমার চিত্ত-হরণ করিয়া-
ছিল। তাহার চোখ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

মনে আছে তাহাকে একদিন নিভৃত আদর করিয়া
বলিয়াছিলাম—“ইচ্ছে করে তোমার চোখ দুটো কেড়ে
রাখি।”

“কেন?”

“ওই দুটোই ত আমাকে পাগল করেছে। আমি
সবচেয়ে ওই দুটোকেই ভালবাসি।”

এত ভালবাসিতাম—কিন্তু তবু তাহাকে পাই নাই।

অজ্ঞাত অপরিচিত আর-একজন আসিয়া বাজনা
বাজাইয়া সমারোহ করিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।

প্রাণে বড় বাজিল।

কিন্তু সে বেদনা হয়ত মুছিয়া যাইত যদি সঙ্গে সঙ্গে
আর-একটা মস্তান্তিক ঘটনা না ঘটিত।

‘মিনি’ যখন বাপের বাড়ী আসিল, দেখি, তাহার দু’টি
চক্ষুই অন্ধ! কারণ শোনা গেল যে চোখে গোলাপজল দিতে
গিয়া সে ভুলক্রমে আর-একটা গুঁষ দিয়া ফেলিয়াছে।

আমার সঙ্গে আর-একদিন আড়ালে দেখা হইয়াছিল।
বলিলাম—“অসাবধানতার জন্তে অমন দু’টি চোখ গেল!”

সে উত্তর দিল—“এর মধ্যে যে কত কথা লুকানো
আছে তা’ যদি না বুঝতে পেরে থাক তাহলে না জানাই
ভাল।”

“বনফুল”

জয়ন্তী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিহারীলাল ও পুণ্ডরীক

বিহারীলালের পূর্বপুরুষেরা হিন্দুস্থানী। বহু দিন পূর্বে তাঁহাদের একজন বঙ্গ প্রদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা ধনাঢ্য জমিদার। বিহারীলাল তাঁহাদের বংশধর ও সম্পত্তির বর্তমান অধিকারী।

অল্প বয়সে বিহারীলালের পিতামাতার মৃত্যু হয়। পিতৃব্য বনওয়ারিলাল ও তাঁহার পত্নী শিশু বিহারীলালকে লালন পালন করেন। বনওয়ারিলাল সত্যনিষ্ঠ, চরিত্রবান, বিহারীলালকে যত্ন পূর্বক শিক্ষা দিয়াছিলেন। ব্যায়ামাদি শিখাইবার জন্ত উত্তম লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। জমিদারী ও অপর সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিয়া বিষয় অনেক বাড়াইয়াছিলেন। বিহারীলাল বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে সকল সম্পত্তি বুঝাইয়া দিয়া অবসর গ্রহণ করেন। দুই বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

বিহারীলাল সচ্চরিত্র, ধীর, বুদ্ধিমান। শিক্ষাগুণে বিলাসলালসাবজ্জিত, আমোদ-প্রমোদে অধিক অনুরাগ নাই, তোষামোদপ্রিয়তা নাই, অথচ কোনরূপ বিরক্তিও নাই। সকল বিষয় নিজে দেখিতেন, সকল দিকে নজর রাখিতেন। খাজনা আদায়ের জন্ত উৎপীড়ন বা অন্য কোনরূপ অত্যাচার করিতেন না বলিয়া প্রজারা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সম্মত ছিল, ও মুক্তকণ্ঠে তাঁহার সুখ্যাতি করিত।

বিহারীলালের কিশোর বয়সে পিতৃব্য তাঁহার বিবাহ দেন। বিবাহের অল্প দিন পরেই পিত্রালয়ে বধূর মৃত্যু হয়। বিহারীলাল এ পর্যন্ত দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেন নাই। এখন তাঁহার বয়স ছাব্বিশ বৎসর। বিধবা পিতৃব্য বাড়ীর গৃহিণী, বিহারীলালকে আবার বিবাহ করিতে অনুরোধ করিতেন। তাঁহার সম্মুখে বিহারীলাল চূপ করিয়া থাকিতেন, পরোক্ষে বলিতেন, বিবাহের জন্ত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই।

চৌধুরীদিগের বসতবাটা অট্টালিকা বলিলে অত্যাঁকি হয় না। পুরুষাত্মকমে বাড়ীর আয়তন বাড়িতেছিল। তিন চার মহল বাড়ী, বিস্তর লোকজন, সিংহদরজায় হাতী বাঁধা, তাহার বাহিরে গোপালজীর মন্দির, মন্দিরের সম্মুখে বৃহৎ পুকুরিণী। একদিকে অশ্বশালা, তাহার পাশে হস্তীশালা। আর এক দিকে প্রকাণ্ড বাগান, তাহাতে সকল জাতীর ফল। অন্দর মহলে খিড়কীর দিকেও পুকুরিণী ও প্রাচীর দিয়া ঘেরা বাগান। সিংহদ্বারের উপর সকাল সন্ধ্যায় রোশনচৌকী বাজিত। বৈঠকখানায় তিন চারিটা বড় বড় কামরা, চারিদিকে ঝাড় লঠন, দেয়ালে ছবি, যে দিকে দেখে ঐশ্বর্যের নিদর্শন। একটা ঘরে সকল রকমের বাস্তবস্ত্র, যেখানে সর্বদা মহফিল, মোজরা নাচ হইত। বিহারীলালের আমলে সে-সকল অনেক কমিয়া গিয়াছিল, তবে দেওয়ালি ও হোলিতে বংশপ্রথা অনুসারে উৎসব হইত। অগ্ন্যজ্ঞ বিষয়ে, আহার ব্যবহারে, আচার বিচারে, কথাবার্তায় চৌধুরী বংশ বাঙ্গালীর মত হইয়া গিয়াছিলেন, কেবল স্ত্রীলোকেরা হিন্দুস্থানী ধরণে কাপড় পরিতেন ও পুরুষেরা মাথায় টুপি কিম্বা পাগড়ী ব্যবহার করিতেন।

যে সময় বিহারীলালের মাতার মৃত্যু হয় তখন বিহারীলাল নিতান্ত শিশু। বালককে স্তন্যদুগ্ধ পান করাইবার জন্ত গ্রাম হইতে একজন দাসী নিযুক্ত করা হয়। তাহার কোলে একটু পুত্র, বিহারীলালের অপেক্ষা দেড় বৎসরের বড়। নাম পুণ্ডরীক। বাল্যাবস্থায় ও কৈশোরের প্রথম অবস্থায় পুণ্ডরীক বিহারীলালের খেলার সাথী ও তাঁহার নিত্যসঙ্গী। বিহারীলালের বয়স যখন ষোল ও পুণ্ডরীকের সাড়ে সতেরো, সেই সময় পুণ্ডরীকের মাতার মৃত্যু হয়। সেই সময় হইতে সে বিহারীলালের কাছে থাকিত।

পুণ্ডরীক ঠিক ভৃত্যের মত নয়। অপরের সাক্ষাতে বিহারীলালের সহিত সম্মানপূর্বক কথা কহিত, আর কেহ না থাকিলে সমবয়স্ক বন্ধুর মত। বিহারীলাল তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, ও কেহ তাহাকে রচনা

বলিলে অসম্ভব হইতেন। পুণ্ডরীক অল্প স্বল্প লেখাপড়া শিখিয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রতি সরস্বতীর রূপাদৃষ্টি বড় ছিল না। তাহা না থাকুক, অল্প পক্ষে পুণ্ডরীকের সমকক্ষ কেহ ছিল না। একা বিহারীলাল ব্যতীত তাহার তুলা বলবান সে অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যাইত না। লাঠি তরবারি খেলায়, বর্শা বন্দুকে শীকার করিতে, অশ্বে আরোহণ করিতে সে অদ্বিতীয়। দৌড়িতে, মাতার দিতে তাহার সঙ্গে কেহই পারিত না।

দেখিতেও পুণ্ডরীক অদ্ভুত রকম। আকৃতি খর্ব, মাথাটা প্রকাণ্ড, চক্ষু ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ, বাহু আজ্ঞাতুলনিত। তাহাকে অনেকে বিদ্রূপ করিয়া জাম্বুবান বলিত—কিন্তু আড়ালে, তাহার সাক্ষাতে নয়। একবার একটা নূতন ঘোড়সোয়ার অবজ্ঞা করিয়া পুণ্ডরীককে জাম্বুবান বলিয়াছিল, পুণ্ডরীক কিছু না বলিয়া এক মুঠোঘাতে তাহার দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। বিহারীলালের কাছে নালিশ হওয়াতে তিনি বলিয়াছিলেন, “উত্তম করিয়াছে। আবার যদি বলে তাহা হইলে মাথা ভাঙ্গিয়া দিবে।” বিহারীলাল যেখানেই থাকুন পুণ্ডরীকের পথ অব্যাহত। যে গোপনীয় কথা বিহারীলাল আর কাহাকেও বলিতেন না তাহা পুণ্ডরীককে বলিতেন। পুণ্ডরীকও প্রাণান্তে তাহার কোন কথা প্রকাশ করিত না।

শীকারে বিহারীলালেরও দুই চারি জন লোক ছিল, কিন্তু পুণ্ডরীক যাইতে পারে নাই। শীকারের ঘটনা কাছারিতে, বাড়ীতে রাষ্ট্র হইয়া গেল। পুণ্ডরীক বড় বড় দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে বিহারীলালকে গিয়া বলিল, “লালজী”—বিহারীলালের ডাকনাম—“তুমি না কি আজ একটা শূরোরের ঠ্যাং ধরিয়া তাহাকে নাচাইয়াছিলে? শূরোরের গায় কি হাত দিতে আছে? মহাভারত!”

বিহারীলালও হাসিয়া ফেলিলেন, “অত বিচার করিলে মনসবদারের কি হইত?”

“বেড়ে হইত, বরাহরাজ মনসবদারের ভুড়ি ফুটকাটা করিয়া দিত!” নরসিংহ যেমন নখর দিয়া হিরণ্যকশিপুৰ উদর চিরিয়া ফেলিয়াছিলেন, পুণ্ডরীক দুই হাতের নখ দিয়া সেইরূপ নিজের পেট চিরিবার ভঙ্গী করিল।

বিহারীলাল হাস্ত সম্বরণ করিলে পুণ্ডরীক তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপিচুপি কহিল, “আর সেই যে যক্ষ-না মুনিকজা, সে কে?”

“হানি না”, বলিয়া বিহারীলাল অন্তমনা হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মনসবদার জলালুদ্দীন

বাদশাহী আমলে দেশবিদেশ হইতে নানাজাতীয় বালিকা ও যুবতী আনিয়া ভারতবর্ষে বিক্রয় করা একটা ব্যবসা ছিল। সে ব্যবসা আরবদিগের হাতে। খাউ নামে সমুদ্রগামী বড় বড় নৌকায় অপহৃত বা ক্রীত কিশোরী ও তরুণীর চালান পাঠাইত, এনেশে পহুঁছিতেই দালালেরা খরিদ করিয়া লইত, পরে সুবিধামত গ্রাহক দেখিয়া বিস্তর লাভে বিক্রয় করিত। শুধু যে সুন্দরীর আমদানী এমন নহে, সব রকম রমণীর খরিদার হইত। জঙ্গীবারের সীদী ও কাফ্রী স্ত্রীলোক সিদ্ধদেশে অনেক মূল্যে বিক্রয় হইত, পঞ্জাবে বেলুচিস্তানের ও মেকান দেশের স্ত্রীলোক পসন্দ। কেবল বাদশাহী সহর দিল্লীতে কিছু পড়িতে পাইত না। মোখীন বিলাসী ধনী তমাশবীন অসংখ্য, রমণী বাজারে আসিলেই চিলের মত ছোঁ। মারিয়া লইয়া যাইত। পাঠানী, ইরানী, তুর্কী, আরবী, সবুকেশিয়ানী, ইহুদীনী, মিসরবাসিনী, ইটালী দেশীয়া রমণী, কৃষিয়ার স্থলাঙ্গী স্নাভ, ফ্রান্সের অঙ্গভঙ্গীহাবভাবচতুরা চপলা রমণী, স্পেনের কৃষ্ণকেশী কৃষ্ণতারচক্ষু দীর্ঘায়তনী সুন্দরী, ইংলণ্ডের নীলচক্ষু পিঙ্গলকেশী তরুণী, এমন দেশের স্ত্রীলোক ছিল না যে বাদশাহের হরমে ও আমীর-ওমরাহের মহলে মিলিত না। চিড়িয়াখানায় যেমন সকল দেশের পশু পক্ষী থাকে, দিল্লীর প্রাচীরাবৃত জেনানায় সেইরকম সকল দেশের স্ত্রীলোক থাকিত।

জলালুদ্দীন দিল্লীর একজন ধনীর বেলুচী দাসীর পুত্র। জলালুদ্দীনের পিতা সকল সম্পত্তি নষ্ট করিয়া অল্প বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। কয়েক বৎসর পরে মাতারও মৃত্যু হয়। জলালুদ্দীনের পিতার এক বন্ধু বালককে আশ্রয় দেন। যখন তাহার বয়স কুড়ি

বৎসর, তখন সুবেদার ফইয়াজ আলি স্বা বাঙ্গালায় যাইতেছিলেন। জলালুদ্দীনের পিতার বন্ধুর সুপারিসে সেই সঙ্গে জলালুদ্দীন সিপাহী হইয়া গেলেন। জলালুদ্দীন চতুর, পরশ্রমী, উপরওয়াল কৰ্মচারীদের তোষামোদ করিতে পটু। তাঁহার উন্নতি দ্রুত হইল। দশ বার বৎসরের মধ্যে মনসবদার হইলেন। নূরপুরে নিযুক্ত হইবার সময় রাজকৰ্মচারী জলালুদ্দীনের যথেষ্ট প্রণাম। যেমন কৰ্মে দক্ষ, তেমনি রাজশাসনে মজ্জ্বত। তাঁহার প্রতাপে মহকুমার লোক ও জমিদারেরা থরহরি কাঁপিত।

সামান্ত চাকরী হইতে বড় কৰ্ম হইলে যে-সকল দোষ হয় জলালুদ্দীনের সে-সকল দোষ ছিল। তাহার উপর হিন্দুবিদ্বেষী ও ছুটচরিত্র। বিহারীলাল ও কয়েক জন হিন্দু তাঁহার প্রিয় পাত্র, কিন্তু সাধারণতঃ তিনি হিন্দুদিগকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য করিতেন। তবে তাঁহাকে উচ্চ পদে নিযুক্ত করিবার সময় সুবেদার ফইয়াজ আলি তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, “জলালুদ্দীন, তোমার যোগ্যতা সম্বন্ধে আমি কোন সংশয় করি না, কিন্তু তোমার গ্ৰায়-পরাধীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বাদশাহ প্রজাদিগের মধ্যে ধর্ম বা জাতি বিচার করেন না, হিন্দু মুসলমান-ভুগ্যা জান করেন। এ বিষয়ে কোন অলুযোগ তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলে তিনি নারাজ হইবেন।”

এ কথা মনসবদারের শ্রবণ ছিল।

জলালুদ্দীনের তিন বিধি—মলেকা, ফতেমা, খদিজা। তিন বেগমের স্বতন্ত্র মহল, কিন্তু ফতেমা স্বামীর হৃদয়ের অনেকটা স্থান দখল করিয়া ছিলেন এবং জেনানায় আসিলে জলালুদ্দীন অধিকাংশ সময় তাঁহার মহলেই থাকিতেন। ফতেমা যে সপত্নীদিগের অপেক্ষা স্ত্রমরী তাহা নহে, কিন্তু তিনি সকলের অপেক্ষা বুদ্ধিমতী ও নানাপ্রকার কৌশলে স্বামীর মনস্তৃষ্টি করিতেন। তাঁহার বাবচিথানায় যেমন পাক হইত এমন আর কোন মহলে হইত না, তাহার কারণ ফতেমা নিজে উত্তম রন্ধন করিতে জানিতেন এবং বাদীদিগকে নিজে শিখাইতেন। তেমন জব্দা পোলাও ও মুরগীর দোপেয়াজা জলালুদ্দীন কোথাও খান নাই। তেমনি তোক সরাব ও শরবত। ফতেমা

যখন স্বহস্তে শরবত প্রস্তুত করিতেন তখন জলালুদ্দীন মুগ্ধ নয়নে তাঁহার হস্তচালনা নিরীক্ষণ করিতেন; কোন সময় জিজ্ঞাসা করিতেন, “বিবি, তোমাকে এমন হনর কে শিখাইল?”

ফতেমা বলিতেন, “মার কাছে শিখিয়াছি। তিনি বাদশাহের হাবেলিতে পাচিকার কৰ্ম করিতেন।”

কথাটা সর্বৈব মিথ্যা, কিন্তু একটু কৌতুকের জন্ত ফতেমা ঐরূপ করিতেন। আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল। মনসবদার পদস্থ হইয়া নিজের জন্মবৃত্তান্ত না ভুলিয়া যান ও পত্নী পাচিকা-কন্ডা বলিয়া তাহাকে অবজ্ঞা না করেন, ফতেমা এইরূপ কৌশলে তাহা শ্রবণ করাইয়া দিতেন।

শিকারের পর সন্ধ্যার সময় জলালুদ্দীন অস্ত্রপুরে আসিলে ফতেমা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ শীকার কেমন হইল?” বেগম সমস্তই অবগত ছিলেন, কিন্তু প্রশ্নের ভাবে বিবেচনা হয় যেন তিনি কিছুই জানেন না।

মনসবদার সব কথা বলিলেন, কেবল বনে যে-রমণীকে দেখিয়াছিলেন তাহার কোন উল্লেখ করিলেন না। তিনি ফতেমাকে একটু ভয় করিতেন।

ফতেমা মনের অঞ্চলে একটা গাঁইট বাধিলেন।

অলক্ষণ বলিয়া জলালুদ্দীন উঠিয়া গেলেন। উঠিবার সময় কহিলেন, “সদরে কাঁজ আছে। এলাকা হইতে কিন্তু আসিবার কথা আছে।”

তিনি চলিয়া গেলে বেগম পুরাতন বিখ্যাত বাদী নসরৎকে ডাকিলেন। সে আসিলে দরজা বন্ধ করিয়া বিবিতে বাদীতে অনেক কথাবার্তা হইল।

বাহিরে আসিয়া মনসবদার এলাকার কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার সঙ্গে শীকারে রমজান নামক পুরাতন ভৃত্য গিয়াছিল। তাহাকে ডাকাইয়া গোপনে তাহার সহিত অনেকক্ষণ কথা কহিলেন।

এ রাতে অন্ধরে বাহিরে গোপনীয় পরামর্শের পালা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গিরিশূহাষ

রেবতী নদীর তীরে ত্রিকুট পর্বত। নদীর স্রোতে অত্যন্ত বেগ, কিন্তু নদী তেমন প্রশস্ত নহে। পর্বতের

এক পার্শ্ব ধৌত করিয়া নদী প্রবাহিত। কিছু দূরে পর্বতের উপর মন্দির। গ্রাম হইতে মাঝে মাঝে লোক দেবতা দর্শন করিতে আসিত। পর্বতের আর-এক দিকে বনজঙ্গল, সেদিকে বড় একটা লোকের যাতায়াত ছিল না, সময়ে সময়ে ব্যাঘ্র ভল্লুক আসিত। নিকটে লোকালয় ছিল না।

এক দিন মধ্যাহ্নের সময় এক ব্যক্তি নদী পার হইয়া পাহাড়ের পথে মন্দিরে না গিয়া সেই দিকে গমন করিল। সাধারণ পথিকের বেশ, হস্তে কোন অস্ত্র ছিল না। কিন্তু তাহাকে ভাল করিয়া দেখিলে সাধারণ লোক মনে হয় না। দীর্ঘাকৃতি, প্রশস্ত ললাট, ক্র নিবিড়, চক্ষু তীব্রোজ্জ্বল, মুখের ভাবে অত্যন্ত দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। ক্ষমতাশালী পুরুষের সকল লক্ষণ বিদ্যমান। এ পথে এমন পথিক বড় দেখিতে পাওয়া যায় না।

যে রূপ দ্রুত পদক্ষেপে কোন দিকে না চাহিয়া পথিক গমন করিতেছিলেন তাহাতে বিবেচনা হয় পথ তাঁহার পরিচিত। পর্বতের নিকটে গিয়া পথিক দেখিলেন পথের আর কোন চিহ্ন নাই। তাহাতে নিরুৎসাহ বা নিরস্ত না হইয়া তিনি কোন নির্দিষ্ট দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে আরও কিছু দূর গমন করিয়া পথিক একটা গিরিগুহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সাধারণতঃ যে রূপ গিরিগুহা হইয়া থাকে ইহাও সেইরূপ। একটু অপেক্ষা করিয়া, এদিক ওদিক দেখিয়া, পথিক সাবধানে সেই গুহার প্রবেশ করিলেন।

পথিক পদ গণনা করিতেছিলেন। সপ্তদশ পদ গণনা করিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানে কিছু অন্ধকার। পথিক বস্ত্রের মধ্য হইতে বাতি বাহির করিয়া জালিলেন। আলোক দিয়া উত্তমরূপে দেখিয়া একখণ্ড প্রস্তর তুলিয়া লইয়া পাহাড়ে বার কয়েক আঘাত করিলেন। আঘাতে সঙ্কেতের ভাব। আঘাত করিয়া বাতি নিবাইয়া দিলেন।

অলক্ষণ পরে পাহাড়ের ভিতর দিক হইতে কয়েক বার শব্দ হইল। পথিক আবার প্রস্তরখণ্ড দিয়া আঘাত করিলেন, কিন্তু এবার শব্দের সঙ্কেত অগুরুপ।

নিঃশব্দে, অল্পে অল্পে অলক্ষিত দ্বার মুক্ত হইল। দ্বারে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া, বাম হস্তে আলোক, দক্ষিণ হস্তে মুক্ত

তরবারি। পথিককে দেখিয়া সে তরবারি ও মস্তক নত করিল, নিঃশব্দে আলোক ধরিয়া পথ দেখাইয়া চলিল, পথিক তাহার অশ্রুবর্তী হইলেন।

মুক্ত দ্বার আবার নিঃশব্দে বন্ধ হইয়া গেল।

কিছু দূর গিয়া পর্বতের ভিতর একটি প্রকোষ্ঠ। কয়েকটি দীপে আলোকিত। প্রকোষ্ঠে চার জন লোক মৃগচর্ম্মের উপর উপবিষ্ট। পথিককে দেখিয়া তাহার উত্তিয়া তাঁহাকে সসন্মমে অভিবাদন করিল। পথিক দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া তাহাদিগকে অভিবাদন করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

এই চার ব্যক্তি পথিকের তুণ্য তেজস্বী না হউক, কেহই সামান্য লোকের মত নহে। বেশভূষা আড়ম্বরশূন্য, কিন্তু সকলেরই মুখে কিছু বিশেষ আছে। সকলেই মনস্বী, গভীরপ্রকৃতি, স্বল্পভাষী। যে পথিক সর্ব্বশেষে আগমন করিলেন তিনিই প্রথমে কথা কহিলেন। তাঁহাকে যে পথ দেখাইয়া আনিয়াছিল সে দ্বারের নিকট ফিরিয়া গেল।

পথিক কহিলেন, “আমাদের লোকেদের নিকট সকল দেশের সংবাদ পাইয়াছি। আপাততঃ কোথাও অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই, কোথাও বিশেষ অত্যাচার নাই। তবে এ সুবার সংবাদ তেমন সন্তোষজনক নহে। নূতন সুবেদার আসিয়াছে, সে লোভী ও অত্যাচারী। নূরপুরের মনস্‌বদার দূরের কয়েক এলাকায় গোপনে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। অস্ত্র দোষও আছে। বিশেষ সে হিন্দুবিদ্বেষী। পুরাতন সুবেদার ও বাদশাহের ভয়ে এতদিন প্রকাশ্যে কিছু করে নাই। এখন সে ভয় কতক দূর হইয়াছে। সুবেদার স্থানান্তরিত হইয়াছেন, বাদশাহ অনেক দূরে।”

চার জনের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি কহিল, “বাদশাহের চক্ষু ও কর্ণ সর্ব্বত্র। তিনি শুনিতে বা জানিতে কতক্ষণ?”

পথিক কহিলেন, “সত্য। কিন্তু বাদশাহ সত্যও শুনিতে পারেন, মিথ্যাও শুনিতে পারেন। যে অত্যাচার করে সে অর্থব্যয় করিয়া কর্ম্মচারীর মুখ বন্ধ করিতে পারে, অথবা তাহাকে দিয়া মিথ্যা বখাও বলাইতে পারে।”

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, “বাদশাহ আমাদের সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন। সে বিষয়ে কোন সংবাদ আছে?”



অন্ধ বালক

চিত্রকর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী।

“আছে। গুপ্তচর-বিভাগের নায়েব মন্ত্রী নিকট খবর তলব করিয়াছেন। চরেরা সর্বত্র মুখে মুখে আদেশ পাইয়াছে, কিন্তু কোনরূপ পরোয়ানা জারি হয় নাই। বাদশাহও কোনরূপ ফরমান কিম্বা ইরশাদ প্রচার করেন নাই।”

দ্বিতীয় ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করিল, “ইহাতে আমাদের আশঙ্কার কোন কারণ আছে?”

প্রশ্নকর্তার প্রতি পথিক একবার বিদ্যুতের ত্রায় কটাক্ষ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নিজের কোন আশঙ্কা হইতেছে?”

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, “কিছু মাত্র না। আমরা যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, কোনরূপ আশঙ্কা থাকিলে, অথবা কোনও কালে আশঙ্কার সম্ভাবনা হইলে, তাহা করিতে পারিতাম না। আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য, যে কার্যে আমরা নিযুক্ত আছি, তাহার কোন ব্যাঘাত হইবার আশঙ্কা আছে কি না।”

“তোমার কথাতেই ইহার উত্তর দেওয়া যায়, কিছু মাত্র না। যে কয়জন আমরা এখানে উপস্থিত আছি, দি এই দণ্ডে নিহত হই তাহা হইলেও নির্দিষ্ট কর্মের কোনও ব্যাঘাত হইবে না। আমাদের সম্প্রদায়ের সকল কথাই তোমরা অবগত আছ, তবে এ সংশয় কেন? বাদশাহের বাদশাহী নিমেষের মধ্যে যাইতে পারে, কিন্তু আমাদের কর্ম কখন নিবারিত হইতে পারে না, কারণ আমাদের কাহারও কোনরূপ স্বার্থ নাই, অথচ আমাদের সঙ্কল্পও বিচলিত হয় না। নির্দিষ্ট কর্ম একজন না পারে আর-একজন করিবে।”

অপর দুই ব্যক্তি নীরবে সকল কথা শুনিতেছিল, একটিও কথা কহে নাই।

পথিককে যে দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল সে আসিয়া দূরে দাড়াইল। সন্বেত-মত নিকটে আসিয়া পথিককে একটি অস্ত্রী দেখাইল। দেখিয়া পথিক কহিলেন, “এখানে নইয়া আসিস।”

দ্বারবক্ষক কিরিয়া গিয়া একটু দ্বালোককে সঙ্গে করিয়া আনিল।

বনে মনস্‌বদার ও বিহারীলাল বাহাকে দেখিয়া-
ছিলেন এই সেই রমণী!

পথিক জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার কি বলিবার আছে?”

রমণী স্পষ্ট মধুর স্বরে কহিল, “আদেশ পালন করিয়াছি।”

“উত্তম। তোমার আবাসস্থান কেহ অবগত আছে?”

“আপনি আছেন।”

এইবার প্রথম পথিকের মুখে দ্রব্য হাসির চিহ্ন দেখা দিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্তহিত হইল। পথিক কহিলেন, “আমি না জানিলে তুমি কেমন করিয়া যাইতে? আর কেহ জানে?”

“বলিতে পারি না, কিন্তু আর কেহ জানে বলিয়া মনে হয় না।”

“বাহাদের কথা বলিয়াছিলাম তাহাদিগকে দেখিয়াছ?”

“দেখিয়াছি।”

“তাহাদের সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারিয়াছ?”

“বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু এ পর্যন্ত ভাল করিয়া চেষ্টা করিতে পারি নাই।”

পথিক কহিলেন, “আবশ্যক হইলে তোমায় সংবাদ দিব অথবা তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।”

রমণী চলিয়া গেল। পথিক উঠিয়া দাড়াইলেন। অপর চারি জনও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। সংক্ষেপে সম্ভাষণ করিয়া সকলেই প্রস্থান করিলেন। কেহ কাহারও নাম করিলেন না, ব্যক্তিগত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। সকলেই অজ্ঞাত রহিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালী

জব্বলপুর ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশের মধ্যে নাগপুরের পরই উল্লেখযোগ্য বড় সহর। জব্বলপুরের একটি বিশেষত্ব এই যে ইহা ভারতবর্ষের প্রায় মধ্যস্থান। সহরের চারি পাঁচ মাইল দূরে নর্মদা নদী প্রবাহিত, এখান হইতে তের মাইল দূরে নর্মদা নদীর জলপ্রপাত ও মর্ম্মর প্রস্তরের পাহাড় (marble rocks)। এই পাহাড় ভেদ করিয়া নর্মদা নদী নিজের পথ কাটিয়া লইয়াছে। ইহা জগৎবাসীর একটি প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থান। ইহা ছাড়া আরও অনেক দেখিবার জিনিষ আছে, যেমন হ্রদ (reservoir) যেখান হইতে এখানকার জল সরবরাহ হয়, ‘মদনমহল’ যাহা স্বনামপ্রসিদ্ধা রাণী দুর্গাবতীর শেষ যুদ্ধের স্থান, ইত্যাদি। জব্বলপুর সম্বন্ধে রামায়ণ-মহাভারত-পাঠকগণের জ্ঞাতব্য এই যে এখান হইতে ১৩ মাইল দূরে, যেখানে জলপ্রপাত ও মর্ম্মর পাহাড় আছে, সেইখানেই ভৃগুমুনির আশ্রম ছিল এবং সেইজন্ত ইহার নাম “ভৃগুক্ষত্র”। জব্বলপুর চিত্রকূট পাহাড়ের প্রায় ১৮০ মাইল দক্ষিণে এবং খাণ্ডব-অরণ্যের (বর্ত্তমান খাণ্ডওয়ার) প্রায় ২৫০ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। ইহা নর্মদাক্ষেত্রের অন্তর্বর্তী বলিয়া তীর্থ হিসাবে একটি প্রধান স্থান।

জব্বলপুরে বাঙ্গালীদের থাকিবার জায়গা দুইটি—প্রথম, সহর, এবং দ্বিতীয়, সহর হইতে প্রায় তিনমাইল ব্যবধানে ক্যান্টনমেন্ট অথবা সদর বাজার। জব্বলপুরের কমিশনারিয়াট আফিস বেশ একটি বড় আফিস ছিল এবং সেই আফিসটি বঙ্গের অধিকার হইতে বাংলার অধিকারে আসায় এবং তাহার অধিকাংশ কর্মচারী বাঙ্গালী হওয়ায় সদর বাজারও বাঙ্গালীদের বেশ একটি ছোটখাট কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দূরত্ব হেতু সহরের বাঙ্গালীদের এবং সদরের বাঙ্গালীদের মধ্যে খুব কমই সংস্রব ছিল; সুতরাং তাঁহারা পরস্পর নিরপেক্ষ ভাবে আপনাদের জীবন কাটাইতেন। সহরের বাঙ্গালীরা পৃথক দুর্গাপূজা করিতেন এবং সদরের বাঙ্গালীরাও পৃথক দুর্গাপূজা করিতেন; তবে লর্ড কিচনারের সময়ে জব্বলপুরের কমিশনারিয়াট আফিস ভাঙ্গিয়া তাহার অধিকাংশ কর্মচারীকে মোএ বদলি

করা হয়। সেই অবধি সদর বাজারে বাঙ্গালীর সংখ্যা খুবই কমিয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদের পৃথক দুর্গাপূজাও বন্ধ হইয়াছে। সদরের বাঙ্গালীদের দুর্গাপূজা সেখানকার বাঙ্গালীদের নেতা ৬ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতেই সম্পন্ন হইত। বাঙ্গালীদের দুর্গাপূজা ছাড়াও সেখানকার মাদ্রাজীদের আর-একটি দুর্গাপূজা হইত এবং তাহা এখন পর্যন্তও তাঁহারা ধারাবাহিকভাবে চালাইতেছেন। মাদ্রাজীদের এবং আমাদের দুর্গাপূজার মধ্যে প্রভেদ এই যে আমাদের দুর্গাপূজা সাধারণতঃ তান্ত্রিক পদ্ধতিতে হইয়া থাকে, মাদ্রাজীদের পূজা বৈদিক পদ্ধতিতে হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়, যিনি প্রায় একশত বৎসর বয়সে মারা গিয়াছেন, তিনিই বোধহয় এখানকার বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তিনি প্রথমে কমিশনারিয়াটে কার্য করিতেন এবং সেই কার্যসূত্রে মিউটিনীর পূর্বে জব্বলপুরে আসেন। যদিও সিংহ মহাশয় কমিশনারিয়াটের কর্মসূত্রে এখানে প্রথমে আসেন, কিন্তু পরে তিনি এখানকার ভিপুটি কমিশনারের আফিসে কর্ম লইয়াছিলেন এবং কর্ম হইতে অবসর লইয়াও পেন্সন প্রাপ্ত হইয়া স্বদীর্ঘকাল এখানে কাটাইয়াছেন। তিনি অতি সং ও পরোপকারী লোক ছিলেন। তিনি অতি প্রাচীন বয়সেও বেশ ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিতেন এবং এখানে যে-কেহ নূতন বাঙ্গালী আসিতেন যতক্ষণ পর্যন্ত সেই নবাগত বাঙ্গালী মহাশয়ের বাসস্থান ও থাকিবার সমুদায় বন্দবস্ত ঠিক করিয়া দিতে না পারিতেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার শাস্তি থাকিত না। তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় বাঙ্গালী ভাষার প্রথম রেখা-লিপির (shorthand writing) প্রবর্তক। ৩০।৪০ বৎসর পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের বাড়ী জব্বলপুরের বাঙ্গালীদের মধ্যে সকলের বসিবার স্থান ছিল। এবং শুনিয়াছি রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত, কেশবচন্দ্র সেন ইত্যাদি বঙ্গের মুখোজ্জলকারী সন্তান অনেকেই বিলাতের যাতায়াতের রাস্তা হিসাবে সেই বাটীতে পদার্পণ ও দুই একদিন বিশ্রাম করিয়া

গিয়াছেন। জব্বলপুরের স্বনামখ্যাত উকীল ৬ শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় (যাঁহার বিবরণ পরে লেখা হইয়াছে) সিংহ মহাশয়ের শ্যালিকা-পুত্র ছিলেন এবং সিংহ মহাশয়ের বাসের কারণেই শ্রীশ-বাবুর আন্দাজ ১৮৭৬ সালে জব্বলপুরে প্রথম আগমন হয়।

কেহ বলেন—৬ মথুরামোহন বসু, এবং কেহ কেহ বলেন—হালদাব মহাশয় নামে একজন বাঙ্গালী এখানকার প্রথম প্রবাসী বাঙ্গালী। হালদাব মহাশয় জব্বলপুরের পোষ্টমাষ্টার ছিলেন।

জব্বলপুরস্থ পুরাতন বাঙ্গালীদের মধ্যে ৬ শ্রীনাথ বসু, ৬ নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬ গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এবং ৬ বীরেশ্বর দত্ত মহাশয়দিগের নাম শুনা যায়। ইহারা সকলেই রাজসরকারে উচ্চপদস্থ কর্মচারী (একট্টা এসিষ্টেন্ট কমিশনার) ছিলেন এবং প্রত্যেকে প্রভূত সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। জব্বলপুরের আর-একজন পোষ্টমাষ্টারও বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহার নাম হরিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। খুব কম লোকেই জানেন যে রেভারেন্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মস্থান জব্বলপুর। যে বাড়ীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন সেই বাড়ীতে অথবা তাহার খুব নিকটেই আজকাল বাঙ্গালীদের দুর্গাপূজা হইয়া থাকে।

জব্বলপুর আজকাল মধ্য প্রদেশে নাগপুরের নীচেই প্রসিদ্ধ স্থান হইলেও ইহার অব্যবহিত পূর্বে এতটা প্রসিদ্ধি ছিল না। মহারাষ্ট্র রাজ্যদিগের সময়ে এ প্রদেশের রাজধানী ছিল সাগরে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার ও বেঙ্গল নাগপুর রেলের জন্ম হওয়ার কারণে জব্বলপুর ক্রমে প্রসিদ্ধি লাভ করিবার পূর্বে সাগরই এ প্রদেশে বড় স্থান ছিল। বেটি এখন জব্বলপুর কলেজ নামে পরিচিত, তাহা পূর্বে ১৮৩৬ সালে সাগরে স্থলরূপে স্থাপিত হয় এবং বহুকাল পর্যন্ত সাগর হাইস্কুল নামে পরিচিত ছিল। সেই স্কুলের প্রথম হেড্ মাষ্টার বাঙ্গালী। Col. Sleeman's Rambles and Recollections পুস্তকে তাঁহার নাম আছে মনে হয়। সাগর হইতে ৬ দ্বারকানাথ সরকার মহাশয় এ প্রদেশে সর্ব প্রথমে এল-এ পাশ করেন। সেইজন্ম কিংবদন্তী আছে যে এখানকার চিক কমিশনারের সম্মুখে নগরবাসীরা তাঁহাকে

হাতীতে চড়াইয়া নগর প্রদক্ষিণ করান। ইনি পরে সাগর হাইস্কুলের শিক্ষকতা কার্য লয়েন এবং স্কুল ও কলেজ পরে জব্বলপুরে স্থানান্তরিত হইলে তিনি জব্বলপুরে আসেন এবং ক্রমে স্কুলের হেড্ মাষ্টার হয়েন। শুনিয়াছি সাগরে বাঙ্গালীরা ১০৭ বৎসর হইতে দুর্গাপূজা করিয়া আসিতেছেন। জব্বলপুরের বাঙ্গালীরাও দুর্গাপূজা প্রায় ৭০৮০ বৎসর হইতে ধারাবাহিক রূপে করিয়া আসিতেছেন।

জব্বলপুরের বাঙ্গালীরা এখানে সাধারণের উপকারের কার্য অনেক করিয়াছেন। এখানকার সর্বপ্রধান স্থানীয় সভা, যাহা হিতকারিণী সভা নামে পরিচিত তাহা, প্রথমে বাঙ্গালীদেরই দ্বারা স্থাপিত এবং তাহার সেক্রেটারী এখন পর্যন্তও বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত অধিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত অধিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ বাহাদুরী এই যে তিনি নিতান্ত হীনবস্থা হইতে শুধু নিজ ক্ষমতাবলে জব্বলপুরের বাঙ্গালীদের মধ্যে লীধস্থানীয় হইয়াছেন এবং তাঁহারই বাটীতে আজকাল এখানকার বাঙ্গালীদের দুর্গাপূজা হইয়া থাকে। ৬ কৈলাসচন্দ্র দত্ত শাস্ত্রী, এম-এ এখানকার কলেজের ভূতপূর্ব সংস্কৃত অধ্যাপক শুধুই যে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে; তিনি একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী চৌক্য পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বনামখ্যাত ৬ প্রসন্নকুমার সর্বাদিকারী মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং দেবপ্রসাদ সর্বাদিকারী মহাশয়ের বিলাত-যাত্রা-বৃত্তান্ত যাহা “ভাবতবর্ষ” মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইতেছে তাহার সর্বপ্রথমে কৈলাসবাবুর নাম দেখিতে পাইবেন। কৈলাস-বাবু কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন। কাউয়েল কর্তৃক সম্পাদিত দশকুমারচরিতের সংস্করণের ভূমিকায় তিনি যে কৈলাস-বাবুর সম্পাদিত সংস্করণ হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন এরূপ উল্লেখ আছে। তিনি আরো দুই-একখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দুর্ভাগ্যক্রমে প্রকাশিত হয় নাই এবং এখন যে তাঁহার অবর্তমানে প্রকাশিত হইবে তাহার সম্ভাবনা খুবই কম। হিতকারিণী সভার তিনি একজন প্রধান সভ্য

ছিলেন এবং এখানকার সম্ভ্রান্ত অধিবাসীরা অধিকা-বাবু ও কৈলাস-বাবুর সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। জব্বলপুরের হিতকারিণী সভার প্রধান কার্য—এখানকার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সাধারণের স্কুল—হিতকারিণী স্কুল—স্থাপন ও পরিচালনা। নাগপুরের স্বনামখ্যাত বাঙ্গালী রায় বাহাদুর সারু বিপিনকৃষ্ণ বহু মহাশয় জব্বলপুরের হিতকারিণী হাই স্কুলের হেডমাস্টার হইয়া সর্বপ্রথমে এই দেশে আসেন, পরে জব্বলপুর হইতে ওকালতি পাশ করিয়া নাগপুরে যান। তাঁহার নাগপুর যাওয়ার পর ৮ কালীচরণ বহু মহাশয় অনেকদিন পর্য্যন্ত হিতকারিণী স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। জব্বলপুরের সাধারণের উপকার করা তাঁহার জীবনের একটি ব্রত-স্বরূপ ছিল। প্রাতে গরীব-দুঃখীকে বিনামূল্যে ভ্রমশ্রম, সমুদায় দিন স্কুলে পরিশ্রম, তাহার পরে আবার নাইট স্কুল করিয়া গরীব-দুঃখীকে বিদ্যাদান—ইহাই তাঁহার দৈনন্দিন জীবন ছিল। ১৮৯৬-৯৭ সালে যখন এ প্রদেশে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখন কালী-বাবু কৈলাস-বাবু ইত্যাদির চেঁচায় অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা হয়। তাঁহারা ২১০ শত লোককে রোজ খিচুড়ী বিতরণ করিয়া থাওয়াইতেন। দুর্ভিক্ষের সময়ে এখানে সর্বাপেক্ষা পরিশ্রম করেন এখানকার ভিক্টোরিয়া হাসপাতালের এসিস্টেন্ট সার্জন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বরটি এম-বি মহাশয়। তাঁহারই চেঁচায় জব্বলপুরের সাধারণ কর্তৃক একটি Poor House বা দরিদ্রাশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল; সুরেন্দ্র-বাবু সেক্রেটারীরূপে তাহার কার্য পরিচালনা করিতেন এবং পরে গভর্ণমেন্ট হাতে লইলেও শেষ পর্য্যন্ত পরিচালনের ভার সুরেন্দ্র-বাবুর হাতেই ছিল। তাঁহার এই চেঁচার ফলে দুর্ভিক্ষের সময়ে এখানে যে কত লোকের জীবন রক্ষা হইয়াছে তাহা বলা হরহ। কালী-বাবু এখানকার ভৃগুক্ষেত্র খিও-সোফিকাল সোসাইটির একজন বিশেষ সভ্য ছিলেন; তিনি এবং এখানকার উকীল শ্রীযুক্ত জীবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, এল্ এল্ বি, মহাশয় অনেকদিন পর্য্যন্ত সেই সভা চালাইয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষে পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক বালিকা লইয়া হিতকারিণী সভার পক্ষ হইতে অধিকা-বাবু একটি অনাথাশ্রম খুলিয়াছিলেন এবং কয়েক বৎসর

চালাইয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণের সাহায্যের অভাবে তাহা ক্রমে উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন।

মধ্যপ্রদেশের ১৮৯৬-৯৭ সালের দুর্ভিক্ষ-সাহায্য-ভাণ্ডারের কার্য অতীব প্রশংসার সহিত চালিত হইয়াছিল। তাহার ৩য়তম সেক্রেটারী ছিলেন শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ বহু এবং সেই কার্যের জন্ত তিনি ১৮৯৮ সালের ১লা জানুয়ারী সি আই ই উপাধি পান। জব্বলপুরের দুর্ভিক্ষ-সাহায্য-ভাণ্ডারের কার্য অতীব সুখ্যাতির সহিত মিডিল সার্জন লেপ্টেন্যান্ট কর্নেল ম্যাকে এবং এসিস্টেন্ট সার্জন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বরটি চালাইয়াছিলেন এবং সেইজন্য সেইসময়ে ম্যাকে সাহেব সি-আই-ই এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বরটি মহাশয় রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হইলেন।

একথা বলিলে অত্যাক্তি হইবে না যে গত ৩০-৩৫ বৎসরের মধ্যে জব্বলপুরের সর্বপ্রধান বাঙ্গালী ছিলেন উকীল ৮ শ্রীশচন্দ্র রায় সৌধুরী। তাঁহার বাড়ী কলিকাতার দক্ষিণ রাজপুরে, এবং পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে এখানকার ৮ ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সম্পর্কসূত্রে আন্দাজ ১৮৭৬ সালে তাঁহার জব্বলপুরে প্রথম আগমন হয়। তিনি এন্ট্রান্স ও প্রিভারশিপ পাস করিয়া এদেশে আসিয়া ওকালতি আরম্ভ করেন, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ প্রতিভায় অনেক বড় বড় এম-এ বি-এল উকীল ও ব্যারিষ্টারকেও পরাজয় মানিতে হইল। এরূপ শুনা যায় যে জব্বলপুরের মতন গরীবস্থানেও তিনি এক সময়ে মাসে দুই আড়াই হাজার টাকা উপার্জন করিতেন। জব্বলপুরের প্রসিদ্ধ ধনী রাজা গোকুলদাসের অবস্থা এমন কিছু সমৃদ্ধিশালী ছিল না এবং তাঁহার নামও বড় বেশী কেহ জানিত না। শ্রীশ-বাবুর পরামর্শক্রমে চলিয়া তিনি এ প্রদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ও জমীদার-রূপে প্রসিদ্ধ হইলেন এবং ক্রমে গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে রাজা উপাধি পান। জব্বলপুরের যাহা-কিছু লোকহিতকর সাধারণ কার্য, —টাউনহল, ওয়াটার ওয়ার্কস্ ইত্যাদি—তাঁহার সমুদায় রাজা গোকুলদাসের বদান্যতায় ও দূরদৃষ্টিতে স্থাপিত এবং সেই বদান্যতার ও দূরদৃষ্টির মূলে শ্রীশ-বাবুর পরামর্শ। শ্রীশ-বাবুর প্রতিভা যে শুধু আদালতে বদ্ধ ছিল তাহা নহে।

তিনি রসায়ন (Chemistry), খনিবিজ্ঞান (Mining), ভূতত্ত্ব (Geology) ইত্যাদি বিষয়েরও খবর রাখিতেন এবং তাহার কতকগুলিতে বেশ উন্নতিলাভও করিয়াছিলেন। তাঁহারই পরামর্শক্রমে রাজা গোকুলদাস তাঁহার নিজের ও ভ্রাতৃপুত্র বল্লভদাসের নামে, গোকুলদাস বল্লভদাস মিল (Gokuldas Ballabhdas Mills) নামে সূতা ও কাপড়ের কল স্থাপন করেন এবং মধ্যে সেই কলটির অবস্থা যখন মন্দ হইয়া ক্রমে তাহার কার্য বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, শ্রীশ-বাবুর চেষ্টায় তাহা পুনর্জীবন লাভ করে। মধ্যপ্রদেশও বেরার তুলার জন্ত বিখ্যাত এবং এখানে রাজা গোকুলদাস যে অনেকগুলি তুলা-ধোনা কল (Ginning Factory) স্থাপন করেন তাহাও শ্রীশ-বাবুর পরামর্শক্রমে। এখানে পারফেক্ট পটারি ওয়ার্কস্ (Perfect Pottery Works) এবং রাজা গোকুলদাস বল্লভদাসের খনি সম্বন্ধে যে চেষ্টা তাহারও মূলে তিনিই ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে জব্বলপুরের বাঙ্গালীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী অন্তর্হিত হইয়াছেন।



৮ ধীরাজকৃষ্ণ ঘোষ, বার-এট-ল,
জব্বলপুর বার লাইব্রেরীর জনপ্রিয় নেতা

আম্বাজ ১৮৮৮ সালে শ্রীশ-বাবুর একটু দূরসম্পর্কীয় জামাতা কলিকাতা শোভাবাজার রাজবংশীয় ৮ ধীরাজকৃষ্ণ ঘোষ ব্যারিষ্টার মহাশয় জব্বলপুরে আসেন। সুন্দর, সুপুরুষ, সুবক্তা ও ধীর বিবেচনাগুণে তিনি শ্রীশ-বাবুর বর্তমানেই জব্বলপুর বারে (bar) প্রধান পদ লইয়াছিলেন। তাঁহার গুণাবলীর জন্ত একদিকে লোক-সাধারণ তাঁহাকে ঘেঁরুপ মান্য করিত, তাঁহার দীর বুদ্ধিমত্তার জন্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরাও তাঁহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিতেন। এই কারণে বর্তমান কালে জব্বলপুরে রাজা-প্রজা-সম্পর্কীয় যে কয়েকটি আধা-সরকারী সাধারণ (Semi-offical public) কাজ হইয়াছে তাহার সবগুলিতে তিনি অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি জব্বলপুর ডিভিসনে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কমিটির সেক্রেটারী হইয়াছিলেন এবং পরে ১৯০৮ সালে নাগপুরের একজিভিসন (প্রদর্শনী) কমিটির ও জব্বলপুর শাখার সম্পাদক হইলেন। এখানকার স্থানীয় ভার্গব কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের তিনি আইন সম্বন্ধে

পরামর্শদাতা ছিলেন ও আমার যতদূর জানা আছে তাহার প্রতিষ্ঠাতেও তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য ছিল। দুইবৎসর হইল তিনি অকালে ৫৩ বৎসর বয়সে হঠাৎ তিনদিনের জরে মারা গিয়াছেন। ঘোষ সাহেব অতি মিষ্টভাষী ও মিশুক লোক ছিলেন। তাঁহার, ভক্তার সুরেন্দ্রনাথ বরাটের এবং এখানকার ভূতপূর্ব সিভিল জজ ৮ মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় এখানে ওরিয়েন্টাল ক্লাব নামে একটি ক্লাব স্থাপিত হয়। অল্পদিনের মধ্যে ক্লাবটি বেশ উন্নতিশীল অবস্থায় পদার্পণ করে। এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগের একমাত্র মিলনের স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কলিকাতার বাহিরে খুব কম স্থানে বাহা হইয়াছে ঘোষ সাহেব, ভক্তার বরাট প্রভৃতির চেষ্টায় তাহা অর্থাৎ ক্লাবের নিজের বাড়ী পর্যন্ত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের অনেক কার্যের শেষ কালে বাহা ঘটিয়া থাকে এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল অর্থাৎ এত চেষ্টা করিয়াও ক্লাবটিকে তাঁহারা বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন নাই। তবে তাঁহারা যে রাস্তা

দেখাইয়া গিয়াছেন সেই রাস্তা ধরিয়া অল্প ক্লাব স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং এবিষয়েও জব্বলপুরের বাঙ্গালীরা অগ্রণী বলিতে হইবে।

শ্রীশ-বাবুর আর-এক একটুদূরসম্পর্কীয় জামাতা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু এখানে গোকুলদাস বল্লভদাসের মিলে উইভিং মাস্টার ছিলেন ও পরে জেলের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হইলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ দীর্ঘাকার স্পৃষ্ট সবল পুরুষ খুব কমই দেখা যায়। তিনি যেরূপ চেহারার, কাণ্ডেও সেইরূপ সাহসী ও বীর ছিলেন—যেমন বোড়ায় চড়িতে সেইরূপ বন্দুক ছুড়িতে পারিতেন। তখন (১৯০২-১৯০৩ সালে) বাঙ্গালীর মধ্যে প্রকৃত বয়নকার্য্য এক তিনিই শিখিয়াছিলেন। আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের অনেক পূর্বেই আমাদের দেশী তাঁতের উন্নতির জন্ত তিনি বাড়ীতে যন্ত্রাদি আনিয়া সে সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই একজন অনিপুণ ডাক্তারের হাতে ক্রোরোফর্ম দ্বারা অজ্ঞান অবস্থায় অস্ত্রোপচারে তাঁহার আর জ্ঞান হইল না, সেই অবস্থাতেই প্রাণবিয়োগ হয়। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে দেশের অনেক উপকার করিতে পারিতেন—স্বদেশী আন্দোলনের কিছু পূর্বে তাঁহার মাতুলের সাহায্যে তিনি চন্দননগরে একটি ছোট কাপড়ের কল স্থাপন করিয়াছিলেন।

উপস্থিত সময়ে আর-একজন বাঙ্গালীর নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ব্যারিষ্টার প্যারীচাঁদ দত্ত ব্যারিষ্টারী লাইনে থাকিয়া, খনিজ দ্রব্য আবিষ্কার এবং তাহা কার্য্যোপযোগী করা বিষয়ে যেরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইতেছেন, (Geological Department) ভূতত্ত্ব-বিভাগের লোক ভিন্ন যে অজ্ঞের দ্বারা তাহা সম্ভব তাহা লোকে পূর্বে বিশ্বাস করিতে পারিত না। ব্যারিষ্টারী লাইনে থাকিয়াও ইহার মনের গতি বরাবর খনিজ আবিষ্কারের দিকে। যে সময়ে তিনি খনিজ আবিষ্কারের দিকে প্রথম মন দেন, মধ্যপ্রদেশে যে নানা প্রকার খনিজ পদার্থে এরূপ সম্পত্তিশালী তখন লোকে তাহা জানিত না। ইহাই তাঁহার প্রধান বাহাদুরী এবং আজকাল এবিষয়ে মধ্যপ্রদেশে যে এতটা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহার অন্যতম কারণ দত্ত মহাশয়ের চেষ্টা ও অধ্যবসায়। তিনি নিজে

সময় ও অর্থব্যয় করিয়া এখানে কতকগুলি ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, সীসা, সার্বান-পাথর, গন্ধক-লৌহ-তামা-মিশ্রিত ধাতুজ (Manganese, Bauxite, Galena, Soapstone, Pyrites) ইত্যাদির খনি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার মধ্যে কয়েকটি ম্যাঙ্গানিজের খনি আমেরিকার প্রসিদ্ধ কার্ণেগী ও এথানকার টাটা কোম্পানীকে বিক্রয় করিয়াছেন। জব্বলপুরের নিকটবর্তী কাটনীতে তাঁহার আবিষ্কৃত বক্সাইট হইতে বিলাতী-মাটি প্রস্তুত করিবার কারখানা ভারতবর্ষে প্রথম। এবং তাঁহার আবিষ্কৃত খনিজ পদার্থগুলি যাহাতে আরো কাজে লাগাইতে পারেন সেইজন্ত বিশেষজ্ঞ ইত্যাদির সহিত পরামর্শ করিবার জন্ত তিনি এক বৎসর হইতে বিলাতে আছেন।

জব্বলপুরের অগ্ন্যাদি খনিজ দ্রব্যের মধ্যে স্ফইমাটি (white ball clay) প্রসিদ্ধ। কলিকাতার বার্ণ কোম্পানি সর্বপ্রথমে এই স্ফইমাটি কাজে লাগাইবার জন্ত রাণীগঞ্জে যেরূপ তাঁহাদের একটি পটারির কারখানা আছে, ১৮৮৮ সালে জব্বলপুরে এরূপ একটি কারখানার স্থাপত্য করেন। সর্বপ্রথমে তাঁহারা রাণীগঞ্জ হইতে তাঁহাদের একজন শিক্ষিত ফর্দচারী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পাঠান এবং নগেন্দ্র-বাবুর প্রস্তুত দ্রব্যাদিতে কলিকাতার হেড অফিস সন্তুষ্ট হইলে রীতিমত কারখানা তৈয়ারীর হুকুম দেন এবং ম্যানেজার প্রভৃতি পাঠাইয়া কার্য্য বিস্তারের বন্দোবস্ত করেন। ক্রমে নগেন্দ্র-বাবু এখানে অগ্ন্যাদি স্ফইমাটির খনি আবিষ্কার করেন এবং তাঁহার আবিষ্কৃত এরূপ একটি খনি লইয়া শ্রীশ-বাবুর পরামর্শক্রমে রাজা গোকুলদাসের পুত্র ও ভ্রাতৃপুত্র (রায় বাহাদুর জীবনদাস ও দেওয়ান বাহাদুর বল্লভদাস) তখনকার বার্ণ কোম্পানীর পটারির ম্যানেজার রোজ সাহেব ও কারখানার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নগেন্দ্র-বাবুদিগকে লইয়া পার্ফেক্ট পটারি ওয়ার্কস নামে নূতন একটি পটারির কারখানা খুলিতে সক্ষম হইয়াছেন।

জব্বলপুরের বর্তমান বাঙ্গালী অধিবাসীর মধ্যে বয়ীমান ও সকলের প্রজ্ঞাপ্রদ শ্রীযুক্ত মোহনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নামোল্লেখ না হইলে আমার বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিবে। মোহনচন্দ্র-বাবুর পিতা ৬ রামচন্দ্র চট্টো-

পাধ্যায় মহাশয় খড়দহ হইতে প্রথমে এলাহাবাদ ও আগ্রা যুক্তপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হামিরপুরে কার্যোপলক্ষে আসেন ; পরে তথা হইতে প্রায় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশে প্রথমে সিহোরে ও পরে হোসান্দাবাদে পোষ্টমাষ্টার হইয়া আসেন। মোহনচন্দ্র-বাবুর জন্ম ১৮২২ বিক্রম সম্বৎ (১৮৪২ খৃষ্টাব্দ) মার্চ মাসে, স্ত্রতরাং তাঁর বয়স প্রায় ৭৩ বৎসর হইল। বাড়ীতেই বাংলা, কাবুলী ও ইংরেজী শিক্ষা করিয়া সরকারী কর্মে প্রবিষ্ট হইয়া নিজ যোগ্যতা গুণে ক্রমে এক্টা অ্যান্ডিষ্টাণ্ট কমিশনারের পদ লাভ করেন। ও পরে যোগ্যতার সহিত কর্ম করিয়া ঐ কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কার্যোপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের প্রায় সকল জেলাই ইনি ঘুরিয়াছেন এবং এইরূপে ইহার নিকট হইতে অনেক কোতুলজনক পুরাতন গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। যখন শুধু মোগলসরাই পর্যন্ত রেল হইয়াছিল তখন মোগলসরাই হইতে এদেশে আসা কুরুপ সময়সাপেক্ষ ও কষ্টকর ছিল মোহনচন্দ্র-বাবুর গল্পে তাহা অতি সুন্দর হৃদয়ঙ্গম হয়। এ দেশের বাঙ্গালী প্রবাসীর পক্ষে তখন পুত্রকন্টার জন্ত উপযুক্ত সম্বন্ধ খুঁজিয়া লওয়া ও বিবাহ কাঁধ্য সমাধা করা এক বিষম ব্যাপার ছিল। মোহনচন্দ্র-বাবুর নিকট শুনা যায় তখন এদেশে একজন বাঙালী ঘটক ছিলেন যাহার কাজই ছিল এই ব্যাপারে মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং বাংলা ঘুরিয়া সম্বন্ধ ঠিক করা। মোহনচন্দ্র-বাবু ভাণ্ডারায় থাকেন। তখন এই ঘটকের চেষ্টায় ভাণ্ডারার একটি পাত্রীর অস্থালয় বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয় এবং ঘটক মহাশয় অস্থাল্য হইতে গরুর গাড়ী করিয়া পাত্র সহিত একমাসে ভাণ্ডারা আসিয়া বিবাহ কাঁধ্য সমাধা করেন। মোহন-চন্দ্র-বাবু সেক্স উপলক্ষে বাকুই (তাম্বুলী) ও নাপিত জাতির উৎপত্তির ইতিহাস অনেক পরিশ্রমের সহিত সংগ্রহ করেন এবং সেইজন্ত গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রশংসা প্রাপ্ত হইলেন। ইনি এখন অবসর লইয়া এখানকার সকলের আস্থাভাজন হইয়া দৈনন্দিন কাল-তিপাত করিতেছেন।

জবলপুরের সৌভাগ্যক্রমে দুই জন সাহিত্যসেবী এখানে কিছুদিন বাস করিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু তাহা

অল্পদিনের জন্ত। বঙ্গের স্বকবি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন স্বাস্থ্যলাভের চেষ্টায় দুই তিন বৎসর এখানে কাটায়াছিলেন। তাঁহার শেষ সময়ের কবিতাগুলি (গণেশ-মঙ্গল ইত্যাদি) এই স্থান হইতে লেখা ; তাঁহার গ্রন্থ-গুলির নূতন সংস্করণ ছাপারও এখান হইতেই বন্দোবস্ত হয়। শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ও প্রায় সেই সময়েই জবলপুরের ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার হইয়া আসেন। হরিদাস বাবুর লেখার অভ্যাস অনেকদিন হইতেই ছিল। কিন্তু তাঁহার জবলপুর আগমনের সময় হইতেই বলিতে গেলে তিনি সাহিত্য-সেবায় জীবন মন সম্পূর্ণ অর্পণ করিয়াছেন। যাহারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মুখপত্র আনন্দ-বাজার ও বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা নিয়ম-মত পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন যে হরিদাস-বাবুর লেখনী কুরুপ অক্লান্ত ও লেখা কুরুপ সরস। পূজনীয় শিবির-বাবুর তিরোধানের পর আনন্দবাজার সম্পাদক, শ্রীযুক্ত রক্ষিমোহন বিদ্যাভূষণ ও হরিদাস-বাবু বৈষ্ণব সাহিত্যের বিস্তার চেষ্টায় যাহা করিয়াছেন আর কেহই তাহা করিতে পারেন নাই। হরিদাস-বাবুও দুই তিন বৎসর জবলপুরে থাকিয়া ভূপালে পোষ্টমাষ্টাররূপে বদলি হইয়াছেন। স্ত্রতঃ জবলপুরের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল হইয়াছে।

আর একজন বাঙ্গালী ভ্রমণলোকের নামও এখানে উল্লেখযোগ্য, তবে তাহা একটু স্বতন্ত্র ধরণে। তিনি প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে প্রেঙ্গে মারা যান। তাঁহার নাম ছিল উমাচরণ মুখোপাধ্যায়। তবে জবলপুরের বাঙ্গালী সাধারণের নিকট তিনি মামা নামেই পরিচিত ছিলেন। গঞ্জিকা সেবনের জন্ত তিনি নিজের ভাবেতে সর্বদা মগ্ন থাকিতেন। তাঁহার প্রথম হইতে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের উপর বিশেষ ঝোঁক ছিল এবং কালক্রমে সেই ঝোঁক নন্দাদা নদীর বালুকারাশি হইতে স্বর্ণ নিষ্কাশনের চেষ্টায় পরিণত হয় এবং তাহাই শেষে তাঁহার জীবনের প্রধান কাঁধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জীবনের শেষ ভাগে তিনি তাহা অপেক্ষা আরো একধাপ উচ্চে উঠিয়াছিলেন। তাহা অন্ধার হইতে হীরক প্রস্তুত করা। তিনি মধ্য বয়সে ডেপুটি কমিশনারের আফিসে কাঁধ্য করিতেন। একদিন

আফিসের সাহেব তাঁহার উপর কোন কারণ বশতঃ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মারিতে দৌড়ান। তিনি পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন এবং ডেপুটি কমিশনারের আফিসের সম্মুখেই টেলিগ্রাফ আফিসে যাইয়া তৎক্ষণাৎ গভর্ণর জেনারেলকে এক তার প্রেরণ করেন “Umacharan in danger, send troops at once”. মধ্যপ্রদেশে অনেক ছোট ছোট করদ রাজা আছেন। স্বতরাং গভর্ণর জেনারেল মনে করেন যে তার-প্রেরণকারী উমাচরণ সেইরূপ করদরাজার মধ্যে কেহ একজন হইবেন। যাহা হউক তার তখনই করেন আফিসে (Foreign Office) প্রেরণ করা হইল, করেন আফিস হইতে জব্বলপুর কমিশনারের নিকট তদন্ত ও রিপোর্টের জন্য তার আসিল, কমিশনার তাহা আবার ডেপুটি কমিশনারকে পাঠাইলেন, এইরূপে ২১৩ ঘণ্টার মধ্যে জব্বলপুরে হলস্থল পড়িয়া গেল। পরে তার আফিসে তদন্তে প্রকৃত ঘটনা বাহির হওয়ায় জব্বলপুর হইতে সিমলা পর্য্যন্ত সকলে স্থস্থির হইতে পারিলেন এবং উমাচরণ বাবু ভবিষ্যতে পুনরায় এরূপ কার্য না করেন এরূপ ধমক দিয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইল। জব্বলপুরের বাঙ্গালী সাধারণের মধ্যে এই গল্পটি এত প্রচলিত যে ইহার মূলে ভিত্তি না থাকিলে এরূপ প্রচলিত হওয়া অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

পূর্বে বলিয়াছি যে একসময়ে জব্বলপুর অঞ্চলে অনেক বড় বড় রাজকর্মচারী বাঙ্গালী ছিলেন এবং বারেও (Bar) তাঁহাদের অক্ষর প্রতাপ ছিল। এখানে বড় হাসপাতালের ভার প্রাপ্ত ডাক্তারও উপস্থাপরি অনেকগুলি বাঙ্গালী ছিলেন—ডাক্তার রাধানাথ, উপেন্দ্রমোহন, রায়বাহাদুর ডাক্তার স্বরেন্দ্রনাথ বরাট ইত্যাদি। ১৮৯৬ সালের পূর্বে জব্বলপুরে চারজন বাঙ্গালী অধ্যাপক ছিলেন—সংস্কৃত-অধ্যাপক ৬ কৈলাসচন্দ্র দত্ত, ইংরেজী অধ্যাপক ৬ হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায়, গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত অপরূপচন্দ্র দত্ত, আইন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চন্দ্র। ৬ হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় ৩৯ বৎসর বয়সে অকালে কলগ্রাসে পতিত হইলেন। শ্রীযুক্ত অপরূপ দত্ত কেবলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র অস্ট্রিম (Senior

Optime) এবং তাঁহার নাম বঙ্গীয় সাময়িক সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া জ্যোতিষ-বিদ্যা সম্বন্ধে সুপরিচিত। তিনি মধ্যপ্রদেশ ছাড়িয়া পূর্ববঙ্গ ও আসামের শিক্ষা বিভাগে নিজ কার্য বদলি করিয়া লয়েন এবং এক্ষণে শ্রীহটে মুরারীচাঁদ কলেজের প্রিন্সিপাল। এ প্রদেশে শিক্ষার বিস্তার হওয়াতে প্রায় সমুদয় সরকারী কার্য-বিভাগেই বাঙ্গালীর সংখ্যা স্বাভাবিক কারণে হ্রাস পাইয়া আসিতেছে।

স্থানীয় উকিল ব্যারিষ্টার মহলে এখনও বাঙ্গালীর প্রাধান্য লক্ষিত হয়। ৬ শ্রীচন্দ্র ও দীরাজকৃষ্ণের অন্তর্দানের পরও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চন্দ্র, কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, জীবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং পি সি দত্ত এখন পর্য্যন্তও উকিল-ব্যারিষ্টারের মধ্যে নেতা। ইহাদের অপেক্ষা অল্পবয়স্ক বাঙ্গালী উকিল ব্যারিষ্টার ক্রমে উন্নতিলাভ করিতেছেন এবং ক্রমে বয়স্কদের পদ গ্রহণ করিতে পারিবেন আশা করা যায়। তবে domicile বা প্রবাসী হইবার নিয়ম চিফ কমিশনারের দ্বারা পাশ করাইয়া লইয়া এখানকার বাঙ্গালী ব্যবহারজীবীরা নিজেরদের পায়ে নিজেরা কুঠার মারিয়াছেন; স্বতরাং তাঁহাদের এ পদ আর কত দিন রাখিতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ।

শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর মিত্র, বি-এ, এ-এম্-আই, সি-ই, সুপারিটেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার এবং রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্র সাম্যাল, এম্-এ, বি-এল, ডিভিসন্যাল ও সেশন্স জজ ছিলেন। এক্ষণে ইহারা উভয়েই পরলোকে। শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর মিত্র মহাশয়ের পিতা মিউটিনীর পূর্বে ৬ কাশীধামে কমিশনারিয়ার পেন্সন ডিপার্টমেন্টের হেড আসিষ্ট্যান্ট ছিলেন, এবং সেই অবধি ইহাদের কাশীধামে বাস। ইহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ৬ বীরেশ্বর মিত্র মহাশয় কাশীর একজন খ্যাতনামা উকীল ছিলেন এবং কাশীর (waterworks ও drainage scheme) কলের জল ও ড্রেন ব্যবস্থা বলিতে গেলে বীরেশ্বর-বাবুর চেষ্ঠাতেই সম্পন্ন হয়। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে যখন এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি স্থাপিত করিবার প্রথম প্রস্তাব উঠে তখন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর, ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট হইতে সেই সম্বন্ধে



রায় সাহেব রাজেশ্বর মিত্র
সুপারিন্টেন্ডেন্ট এঞ্জিনিয়ার, নাগপুর

মন্তব্য চাহিয়া পাঠান। ৬ বীরেশ্বর মিত্র মহাশয়ের মন্তব্যের দক্ষতায় লেপ্টেন্যান্ট্‌ গভর্নর সার অক্ল্যাণ্ড্‌ কল্ডিন এবং গভর্নর-জেনারেল লর্ড ডাফ্রিন এমনই প্রীত হইলেন যে তাঁহারই মন্তব্যকে মূলভিত্তিক্রমে লইয়া নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠনের চেষ্টা আরম্ভ করেন। এবং বীরেশ্বর-বাবুকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য রূপে মনোনীত করিয়া গভর্নর-জেনারেল নিজে পত্র লিখিয়া তাঁহাকে সেই সংবাদ জ্ঞাপন করেন। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের (Legislative Council) ব্যবস্থাপক সভায় বীরেশ্বর-বাবু সর্বপ্রথম বাঙ্গালী সদস্য। তাঁহার পরে শ্রীযুক্ত চাকচন্দ্র মিত্র প্রমুখ অগ্রাগ্রহ বাঙ্গালী সদস্য হইয়াছিলেন বটে। রাজেশ্বর মিত্র মহাশয়ের শিক্ষা ক্রিয়দংশ বেনারস কলেজে এবং ক্রিয়দংশ বাকীপুরে পাটনা কলেজে হয়। সেখানে তিনি প্রসন্নকুমার সিংহ মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। স্বনামখ্যাত বলদেব পালিত মহাশয় বিবাহ-সম্বন্ধে ইহার নিকট-সম্পর্কীয়। রাজেশ্বর-বাবু বি-এ পাশ করিয়া রাড্‌কী কলেজে

ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়ন করিতে যান এবং সেখানে বিশেষ যোগ্যতার সহিত পাশ করিয়া মধ্যপ্রদেশে পূর্ত বিভাগে কর্ম লয়েন। শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর মিত্র মহাশয়ের রাজকীয় কর্মজীবন আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত অতীব সুখ্যাতিপূর্ণ এবং ইনি অনেক বৎসর পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশের গভর্নমেন্টের পূর্তবিভাগে আওর-সেক্রেটারি-রূপে অতি সুখ্যাতির সহিত কার্য চালাইয়াছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে নিজের কার্য সম্বন্ধে ইহার যেরূপ অভিজ্ঞতা, স্বেচ্ছক বলিয়াও সেইরূপ সুখ্যাতি ছিল। ১৮৯৮-৯৯ সালে যখন মধ্যপ্রদেশ পুনরায় দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয় তখন যে ৯৬—৯৭ সালের দুর্ভিক্ষের জ্বায়ে এই প্রদেশকে বিধ্বস্ত করিতে পারে নাই তাহার প্রধান কারণ মিত্র সাহেব কর্তৃক দুর্ভিক্ষ-সাহায্যের সুচারা বন্দোবস্ত। ইহার কার্য-কুশলতার জন্ত বিলাতের ইনস্টিটিউট অব্‌ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স ইহাকে সহযোগী সদস্য নির্বাচিত করেন এবং গভর্নমেন্টের নিকট হইতে কৈসর-ই-হিন্দু মেডাল প্রাপ্ত হইলেন। ভারতবাসীর মধ্যে বলিতে গেলে ইনিই সর্ব-প্রথমে সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের পদ প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পূর্বে বোধে প্রদেশে তারাপুরওয়ালা নামক একজন পার্শী ইঞ্জিনিয়ার অল্পদিনের জন্ত এই কার্য অস্থায়ী ভাবে করিয়াছিলেন। কিন্তু মিত্র সাহেব ১৯০৬ সাল হইতে এই কার্য বরাবর করিয়া সরকারী কার্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইলেন। ঋদ্ধিকিতে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার যে নিজের বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞানে অথবা পরিচালন-ক্ষমতার হিসাবে বিলাতের পাশ-করা ইঞ্জিনিয়ার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন তাহা শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর মিত্র, রায় বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর অমলাপ্রসাদ সরকার, রায় বাহাদুর গঙ্গারাম (বাহার হস্তে দিল্লীর দরবারের ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বন্দোবস্তের ভার ছিল) ইত্যাদির দৃষ্টান্তই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র সাম্মাল, এম-এ, বি-এল, মহাশয় বাকীপুরের সদরলা ৬গোবিন্দচন্দ্র সাম্মাল মহাশয়ের পুত্র এবং কুচবিহারের ভূতপূর্ব Judicial Member of the Council শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের জামাতা। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র



শ্রীশরৎচন্দ্র সাম্ম্যাল, জিলা জজ

সাম্ম্যাল মহাশয় দিল্লীর একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক। পাঠ্যাবস্থায় রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র সাম্ম্যাল ও রাজেশ্বর মিত্র মহাশয় কাশীতে বেনারস কলেজে এবং বাকীপুরে পাটনা কলেজে প্রায় একই সময়ে ছাত্র ছিলেন। পরলোক-গত কুচবিহার-পতি ও রেজেন্টরী বিভাগের ইন্সপেক্টর-জেনারেল রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সাম্ম্যাল মহাশয়ের সহপাঠী ছিলেন। সাম্ম্যাল মহাশয়ের কর্মজীবন সর্বপ্রথমে বঙ্গদেশে মুনসেফরূপে আরম্ভ হয়। সার এণ্টনী ম্যাকডনেল বঙ্গদেশে থাকিতেই ইহার কার্যে একরূপ প্রীত হইলেন যে যখন তিনি মধ্যপ্রদেশে চিফ-কমিশনার হইয়া আসেন তখন এখানকার বিচার-বিভাগে সুযোগ্য কর্মচারীর অভাব দেখিয়া ইহাকে ও ইহার সহকর্মচারী আর-একজন মুনসেফকে (শেষোক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র) এ প্রদেশে লইয়া আসিবার ব্যস্থা করেন। কিন্তু বিশেষ কারণবশতঃ শেষোক্ত মুনসেফ মহাশয়ের এ প্রদেশে আসা ঘটে

নাই। যেরূপ দক্ষতার সহিত সাম্ম্যাল মহাশয় কার্য করিয়াছেন এবং তিনি ক্রমে বিচার-বিভাগে যেরূপ উচ্চপদে আরোহণ করিয়াছেন তাহাই ম্যাকডনেল সাহেবের বিশ্বাসের বিশিষ্ট প্রমাণ। সাম্ম্যাল মহাশয়ের নিকট একখানি পুস্তক আছে যাহা সার ওয়াল্টার স্ট স্বহস্তে স্বাক্ষর করিয়া এডিনবার্গের পুস্তক-বিক্রেতা বন্ধু ব্যালাণ্টাইন্ (Ballantine) সাহেবকে উপহার দিয়াছিলেন। ব্যালাণ্টাইন্ সাহেবের দোকান হইতে সার ওয়াল্টারের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইত এবং ইহার দেউলিয়া হওয়ার ঘটনাচক্রে সার ওয়াল্টার সর্বস্বাস্ত হইয়া অবশেষে স্বপ্নগ্রস্ত হন এবং এই স্বপ্ন শোধ করিবার জন্তই সার ওয়াল্টার স্ট তাঁহার সুবিখ্যাত ওয়েভার্লি পর্যায়ের উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। এই ব্যালাণ্টাইন্ সাহেবের নিকট-কুটুম্ব ডক্টর জেমস ব্যালাণ্টাইন্ বেনারস কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইয়া আসেন এবং তাঁহার নিকট হইতে সাম্ম্যাল মহাশয়ের পিতা এই পুস্তকখানি প্রাপ্ত হইলেন।

যদিও স্থানীয় বাঙ্গালীরা জব্বলপুরের উন্নতির জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, তবু ইহা ছুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে এখানকার বাঙ্গালীদের স্থায়ী নিজস্ব জিনিস হিসাবে বাৎসরিক দুর্গাপূজা ছাড়া বিশেষ কিছুই নাই ও তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে মিলামিশাও খুব কম। পূর্বে এখানে বাঙ্গালীদের স্থাপিত একটি কালীবাড়ী ছিল। কিন্তু বহু বৎসর হইতে তাহা বাঙ্গালীদের হাতছাড়া ও লুপ্তপ্রায়। এখানে একটি মিশনারিদিগের দ্বারা পরিচালিত বাঙ্গালী মেয়েদের ইস্কুল আছে, কিন্তু স্থানীয় বাঙ্গালীদের সাহায্যের অভাবে তাহা মৃতপ্রায়। ১৯০৩ সালে ৬ ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত কিরণকৃষ্ণ মিত্র, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অপূর্বচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের চেষ্টায় এখানে একটি বাঙ্গালা লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। এখানকার বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যা যেরূপ স্বল্প ও তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে মিলামিশাও যেরূপ কম, তাহাতে যে লাইব্রেরীটি এতকাল বাঁচিয়া আছে ইহাই ভগবানের বিশেষ কৃপা বলিতে হইবে।

তবে স্থানীয় বাঙ্গালীরা নিজেদের মিলিত হইবার এবং নিজেদের ভাষার চর্চার জন্ত একটি সাধারণ স্থানের প্রয়োজন পূর্য্যাপেক্ষা ক্রমে অধিক বৃদ্ধিতে পারিতেছেন ইহাই আশাপ্রদ ।

এখানকার স্থানীয় বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের আর-একটি অঙ্গ—অত্রস্থ বান্ কোম্পানীর কারখানার বাঙ্গালী কর্মচারীগণ কর্তৃক বাৎসরিক কালীপূজা ও দোলযাত্রা উপলক্ষে অভিনয় । তাঁহারা গত ১৬১৭ বৎসর হইতে যেরূপ চেষ্টা ও পরিশ্রমের সহিত বাঙ্গাল ভাষার উৎকৃষ্ট নাটক প্রতি বৎসরে ২৩ বার করিয়া এখানকার বাঙ্গালী সাধারণকে দেখাইয়া থাকেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ । জব্বলপুর বঙ্গদেশ হইতে এতদূরে ও এখানকার স্থানীয় বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকের দেশের সহিত সম্পর্ক এরূপ কম হইয়াছে যে ইহা বলিলে অত্যাতি হইবে না যে সেইরূপ বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেকেরই জীবনে বাঙ্গালা অভিনয় দেখিবার এই একমাত্র সুযোগ ।

এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা নিতান্ত স্বল্প, বড়জোর ৭০৮০ ঘর হইবে ; তাহার মধ্যে স্বাধীন ব্যবসায়ী বড়ই কম, অধিকাংশ সরকারী কর্ম-সরকারী অথবা বেদসরকারী

আফিস অথবা কারখানায় নিযুক্ত এবং কিছু অংশ স্বাধীন ওকালতি ব্যবসায়ে নিযুক্ত । নিজের কার্যের ভাবনায় প্রত্যেকেই ব্যস্ত, নিজের কার্য ব্যতিরেকে অপরের সহিত সম্বন্ধ বড়ই কম । তবে এক জায়গায় অধিক দিন বাস করিলে অথবা সেখানকার চিরস্থায়ী অধিবাসী হইলে লোকে নিজের ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক নিজের কার্যের সহিত যে স্থলে বাস করিয়াছেন সেখানকার জন্ত কিছু করিবার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারেন না । ইহা জগতের স্বাভাবিক নিয়ম এবং সেই হিসাবে জব্বলপুরের বাঙ্গালী প্রবাসী তাঁহাদের নিজেদের কর্তব্যে পরাভ্রুত হন নাই, বরং তাঁহাদের নিজেদের সংখ্যা যেরূপ স্বল্প সেই অনুপাতে অনেক অধিকই করিয়াছেন ।

জব্বলপুর প্রবাসী বাঙ্গালীদের এই বিবরণ সাত বৎসর পূর্বে জব্বলপুর প্রবাসী এক বন্ধু আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন ; প্রায় অবিকল তাঁহার ভাষাতেই ইহা প্রকাশিত হইল ; এজন্ত আমি বন্ধুবরের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি ।

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

হাসি-কান্না

অবস্খীপরের রাজপুত্র মৃত্যুশয্যায় শুয়ে, বৈদ্যরা সব জবার দিখে গেছে । সারাটা রাজ্য একেবারে থমথমে, কারুর মুখে আজ হাসি নেই,—বৃকের খবর অবশ্য জানিনে । তবে বাইরে শুধু একটা অব্যক্ত হাহাকার বিরাজ করছে ।

মন্ত্রী ছেলে-হল-না ছেলে-হল-না করে' বৃড়ো বয়সে আ' একটি ছেলে হয়েছে । বৃকে তাই তার হাসির ঢেউ বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মুখে তা একটুও ফুটে উঠছে না—রাজা যদি দেখতে পান !

মন্দিরের পুরোহিত দেবতার সমুখে নিঃশব্দে বসে' আছে—চোখ মুদে, গম্ভীর হয়ে । বৃকে তার উৎসাহের অবশি নেই—লক্ষ্মীধর বণিক কিছুদিন আগে তার কাছে মানত করে' গিছিলো, এবারকার বাণিজ্য-অভিযান

তার যদি সফল হয়, তা হলে দেবতাকে সে বেশ মোটারকম ঘুস দিয়ে যাবে । আজ সে দেশে ফিরেছে এবং বাণিজ্য-অভিযানও তার সফল হয়েছে । একটু পরেই সে মোহরের তোড়া নিয়ে মন্দিরে আসবে, এমনি ধারা একটা সংবাদও পাওয়া গেছে । পুরোহিতের বৃকে আনন্দের জোয়ার খেলে যাচ্ছে, কিন্তু মুখ তার গম্ভীর, চোখ তার সজল, কেননা রাজার ছেলে মৃত্যুশয্যায়,—তার মুখে হাসি দেখতে পেয়ে কেউ যদি রাজার কানে সে কথা তোলে, তবেই তো সর্বনাশ । সে গম্ভীর গুরুমুখেই দেবতার সমুখে বসে' রইল ।

মন্দিরের দেবদাসী মদনমঞ্জরী । তার প্রাণে আজ হাসির লহর নেচে নেচে উঠছিল । গোপনে গোপনে

এতদিন ধরে' সে যাকে মনে মনে পূজা করে' আসছিল এবং আজ যাকে সাহস করে' প্রেমপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিল সখীর হাত দিয়ে, তারই জবাব এসেছে এই কিছুক্ষণ হল, রাত্তিরে কুঞ্জবাটিকার একপাশের বকুলবীথিকার ঘন ঝোপের আড়ালে মিলনের প্রস্তাব নিয়ে। তার ইচ্ছে হচ্ছিল সমস্ত বাছাই-করা অলঙ্কারগুলো আজ সন্ধ্যা চড়িয়ে সে এখন থেকেই রাত্তিরের অভিসারের জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসে' থাকে, কিন্তু উপায় নেই—রাজপুত্র যে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে! কাজেই তাকে মন্দিরের এক কোণে দেয়াল ঠেস দিয়ে চুপটি করে' বসে' থাকতে হল—মুহম্মানের মত।

বুকে যাদের হাসির লাল রঙ টকটকে হয়ে উঠেছে, তাদেরও আজ মুখখানাকে কালীবর্ণ করে' বসে' থাকতে হয়েছে—রাজার ছেলে মৃত্যুশয্যায় যে!

সবাই কাঁদছে, হাসি পেলেও কাঁদছে, কান্না পেলে তো বটেই। মোট কথা রাজ্যে এমন এশটিও লোক নেই যার মুখ না শুক আর চোখ না সজল।

আজ হাসিমুখ কেবল একজনার, তিনি হচ্ছেন রাজকুমারের মা।

কিছুক্ষণ হল রাজবৈদ্য রোগীকে দেখে গেছে। রোগী তাকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, “কেমন দেখলেন?”

রাজ-বৈদ্য গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বলে, “হয়ে এসেছে, আর দেৱী নেই বড়।”

রোগী বলেন, “এখনো তো বেশ জ্ঞান রয়েছে।”

বৈদ্য বলে, “বক্ষ্মারোগের বিশেষত্বই ওই, মদ্যবর শেষ মুহূর্ত অবধি জ্ঞান টনটনে থাকে।”

—“ওঃ, কি কষ্টই না তাহলে ওর! ও টের পাচ্ছে যে, ওকে আর-একটু পরেই—”

—“না, তা জানে না। এ রোগে, রোগী শেষ পর্যন্তও মনে করে যে সে সেরে উঠবে।”

রাজ-বৈদ্য চলে' গেলে রোগী চুপ করে' থানিকটা দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপর রোগী যখন জিজ্ঞেস করলে, “মা, বিবিরাজ কি বলে' গেলেন?”

রোগী বলেন, “বলে গেলেন, শীগগিরই তুমি ভালো হয়ে উঠবে বাবা।”

রোগী আবার বলে, “তবে তোমার মুখ এমন শুকনো কেন?”

“কই, না”—বলে' রোগী একবার অন্তরিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তার পর যখন রোগীর দিকে চাইলেন, তখন তাঁর মুখে হাসির অভাব নেই।

মন্ত্রী কাঁদছে, পুরোহিত কাঁদছে, দেবদাসী কাঁদছে—হাসিকে বুকের মধ্যে জোর করে' চেপে রেখে; রোগী কিন্তু হাসছেন—বুকের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের কান্নাকে জোর করে' আটকে রেখে!

শ্রী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

শেফালি

ভাল আমি বানি বড় শরতের শেফালির দল,
ঝরিয়া-পড়ারই এ যে ফুটে-ওঠা স্বপনে কেবল!

এ যেন রে একান্তে একেলা—

মৃত্যুর উরসে জমা তুহিন তুষার—তারি

প্রাণ হয়ে ফুটিবারই খেলা,

শুধু রাত্রিবেলা।

তরুণ আলোক-বুকে যত কিছু কামনার আগে

সচকিতে চুষনের যে নিবিড় অংকুরতা আগে,

আলোকের উত্তত সে চুষ—

অর্দ্ধপথে থেমে যায়, তারো আগে বারে ওরা—

ধূলিতলে নিঃশব্দ নিব্বাস

সত্ত-জমা ঘুম!

শুকতার তলে ডোবা ব্যর্থ স্বপনের ব্যথারশি

অতল হইতে এসে আঁধারের জোয়ারেতে ভাসি

ঠেকিয়াছে প্রভাতের তীরে;

স্বরহারা গান মোর রূপ ধরে' বারে যেন

যতবার দেখি ফিরে ফিরে

বরা শেফালিরে।

শ্রী সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য



আইরিশ বিপ্লবে আইরিশ রমণী

আয়ারল্যান্ডের দীর্ঘকালব্যাপী স্বাধীনতা-যুদ্ধের কথা আজ আর কারও অজানা নেই। এই সুদীর্ঘ যুদ্ধে বহু আইরিশ রমণী যে আশ্চর্য সাহসিক ও বহু দুঃসাহসিক কাজ করেছেন, আয়ারল্যান্ডের ইতিহাসে তা চিরকাল জলন্ত অক্ষরে লেখা থাকবে।

এই অসাধারণ জীলোকদের মধ্যে প্রধান (সর্ব-প্রধান বললেও অত্যুক্তি হয় না) কাউন্টেস্ মার্কিয়েভিক্‌স্ (Countess Markievicz)। একটি আশ্চর্য ঘটনা এই যে এঁর মা আইরিশ রমণী হলেও অত্যন্ত আইরিশ-বিদ্বেষী ও ইংরেজ-ভক্ত ছিলেন। প্রবাদ আছে যে তিনি জিদ্ করে' নিজের বাড়ীর সমস্ত ঘড়ীর আইরিশ সময় বদলে, ইংলিশ সময় রাখতেন। যা-কিছু ইংলিশ সবই ভাল, আর যা-কিছু আইরিশ সবই মন্দ। বালিকা কনষ্ট্যান্স্ (Constance, শেষে Countess Markievicz) এইরূপ ইংরেজ-ভক্ত মায়ের সন্তান হয়েও নিজের সমস্ত জীবন আয়ারল্যান্ডের কাজে উৎসর্গ করেন। মাতৃভূমি আয়ারল্যান্ডকে স্বাধীন করতে তাঁর সমস্ত দিয়েছেন। ইনি প্যারিসে চিত্রবিদ্যা শিখতে যান ও সেখান থেকে কাউন্ট্ মার্কিয়েভিক্‌স্‌কে (Count Markievicz) বিয়ে করে' আয়ারল্যান্ডে ফিরে আসেন।

টাকাকড়ি দিয়ে দেশের কাজে সাহায্য করা মহত্ব বটে, কিন্তু সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা ও জ্ঞী হয়ে চিরস্থখে লালিতা পালিতা হয়ে, নিজের অপূর্ব সৌন্দর্য্য নিয়ে দেশের কাজে যথাসমর্থ উৎসর্গ করা কত বেশী মহত্তর। শুধু উৎসর্গ নয়, অতি দীর্ঘ রাজনৈতিকের মত কাজ করা।

১৯০৯ সালে সর্বপ্রথম আইরিশ বয় স্কাউট্ (Boy Scout) গঠন আরম্ভ করেন কাউন্টেস্ মার্কিয়েভিক্‌স্। আয়ারল্যান্ডের ভবিষ্যৎ আশা তরুণ বালকেরা কাউন্টেস্‌কে দেবীর মত ভক্তি শ্রদ্ধা করত। কত দীর্ঘ দিন, কত

দীর্ঘ রাত্রি তিনি দেশের বালকদলকে নিয়ে স্বাধীনতার গল্প বলেছেন, কত পুরাণ আইরিশ বীরত্বের ইতিহাস বলে' তাদের প্রাণে উদ্দীপনা দিয়েছেন। নিজেই তাদের ডিল শিখিয়েছেন, কেমন করে' সবুজ সাদা ও কমলা রংএর জাতীয় পতাকাকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করতে হয় তা শিখিয়েছেন। তাঁর আদর্শ ছিল—“কোনও প্রকৃত বীরপুরুষ শত্রুকে পশ্চাৎ দেখায় না বা মিথ্যা বলে না।” তাই শেষে স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় বীর আইরিশ যুবক এত শৌর্য্য বীর্য্য দেখিয়েছে ও এখনো প্রত্যহ দেখাচ্ছে। কাউন্টেসের কাজ এই একরকমের নয়। সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে উৎসাহ দিতে এই সুন্দরী মাতৃমুণ্ডির আবির্ভাব দেখা গিয়েছে। যেখানে কাউন্টেস্ সেখানে যেন নূতন প্রাণ, নূতন উৎসাহ দেখা দিয়েছে, তাঁর কথায় যেন বালক বৃদ্ধ যুবা সকলে হাসিমুখে কর্তব্য পালন করতে পারে।

১৯১৩ সালে ডব্লিনের বড় ধর্ম্মঘটের (Strike) সময় এই অদ্ভুত রমণী অতি প্রত্যাশে বাইসিকেল চড়ে' গিয়ে নিজের হাতে খাবার তৈরী করে' ধর্ম্মঘটকারীদের মায়ের মত স্নেহে খাইয়েছেন। যাতে তারা মাতৃঘের মত ব্যবহার পায়—ও বিলাতি ছেড়ে আইরিশ ফ্যাক্টরীতে কাজ করে তার জন্ত ধর্ম্মঘট বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন।

কাউন্টেসের তীক্ষ্ণবুদ্ধি অনেক সময় অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। বিপ্লবের স্রোত যখন খুব প্রবল, ইংরেজের অত্যাচার যখন বড় প্রখর, এমন এক আগষ্ট মাসের শুরুবারে তিনি প্রচার করলেন যে জীম্ লার্কিন (Jim Larkin, Labour Leader) বীর শ্রমিক নেতা, পরের রবিবারে বিকালে সাধারণ সভায় বক্তৃতা দিবেন। লার্কিন অতি স্পষ্টবাদী, স্বাধীনতাপ্রিয় ও তেজস্বী বক্তা, তাঁর বক্তৃতায় লোকে মুগ্ধ ও উত্তেজিত হয়, বহু দূর থেকে হাজার হাজার লোক লার্কিনের বক্তৃতা শুনতে আসে।

পাছে তাঁর বক্তৃতা শুনে লোকে উন্নত হয়, তাই শনিবার, গভর্ণমেন্ট ঐ সভা বেআইনি বলে' প্রচার করে ও লাকিনকে গ্রেপ্তার করার ওয়ারেন্ট বাহির হয়। কিন্তু লাকিনকে কোথায়ও পাওয়া গেল না। অনেকে ভাবল তবে বোধ হয় লাকিন ধরা দেওয়ার ভয়ে পলাতক। কিন্তু যারা তাঁকে জানত তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনি। বিশেষতঃ যখন কাউন্টেন্স সভা প্রচার করেছেন, অনেকের ধারণা যে যখন কাউন্টেন্স আছেন, তখন সভা নিশ্চয়ই হবে। কি জানি কেন বক্তৃতার দিনে নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বে থেকে সভাস্থলে লোক জমা হতে লাগলো। গভর্ণমেন্ট তখনও কিছু প্রকাশ্য গোপনাল করে নি। সময় চলে' যায় তবুও বক্তার খোঁজ নেই। হাজার হাজার লোক উৎসুক ভাবে লাকিন বা কাউন্টেন্সের জন্ম অপেক্ষা করতে লাগলো, এমন সময় হঠাৎ একথানা মোটর গাড়ী এসে দাঁড়াল। কাউন্টেন্স একটি দীর্ঘশ্রমধারী পুরুষের সঙ্গে নামলেন। পুরুষটি তাঁর টুপী ও কৃত্রিম দাড়ী খুলে বক্তৃতা আরম্ভ করতেই সেই সহস্রাধিক লোক আনন্দে বিভোর হয়ে "লাকিন কথা রেখেছে" বলে' চীৎকার আরম্ভ করল। এদিকে গভর্ণমেন্টের সশস্ত্র পুলিশ প্রস্তুত ছিল; পুলিশ প্রথম সভা বন্ধ করতে বলে, কিন্তু শ্রোতারা এ অত্যাচার বিনাষাক্য-ব্যয়ে মাথা পেতে নিতে রাজি নয়। উভয় পক্ষের মারামারির পর সভা ভঙ্গ হয় বটে, কিন্তু উভয় পক্ষেই কয়েকটি খুন ও বহু জখম হয়। সমস্ত ডব্লিন সহর (Dublin) ঐ মৃতদের সংকারের দিনে নিস্তরূ ভাবে শোক প্রকাশ করে।

হেলেনা মলোনি (Helena Moloney) নামে একটি মেয়ে কাউন্টেন্সের ডান হাতের মত সাহায্য করেছে। ১৯১১ সালে যখন এম জর্জ আয়ারল্যাণ্ডে যান তখন ঐ জীলোক-ছুটি অক্লান্ত ভাবে দিনরাত বক্তৃতা দিয়ে লোককে বলেছেন যে রাজা জর্জকে বয়কট করে' দেখাও যে আইরিশরা তাঁর দোকানের অত্যাচারকে কত ঘৃণা করে। ইংরেজের অধীনে থেকে ইংরেজের রাজপতাকা ইউনিয়ন জ্যাক (Union Jack) পোড়ান কম সাহসের কথা নয়। মৃত্যুদণ্ড বা দীর্ঘ কারাবাস এর শাস্তি জেনেও

কাউন্টেন্স বহুবার সাধারণ সড়ার ইউনিয়ন জ্যাক পুড়িয়েছেন। অনেক সময় পুলিশ তাঁর কাছে যেতে সাহস করে নি। এইরূপ সাহস ছিল বলেই আজ আয়ারল্যাণ্ডের রাজনৈতিক অবস্থার এত পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। গত স্বাধীনতা-সংগ্রামে আয়ারল্যাণ্ডের ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ এবং সাধারণ শ্রমজীবী রমণীরাও যোগ দিয়েছিল, তাদের উৎসাহে তাদের উদ্ভেজনায পুরুষেরা অকাতরে দেশের জগ্ন জীবন দিতে পেরেছে।

কুটিল রাজনীতিতেও আইরিশ রমণী কম দক্ষতা দেখায়নি। মোটকথা জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে মেয়েদের শক্তি পুরুষকে যথেষ্ট সাহস দিয়েছে। আইরিশ জী-সভা (Irish Women's Council) সামাজিক আর্থিক রাজনৈতিক ও স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ে সাহায্য করেছে। এঁদের সেবা সংঘ (Red Cross), বালিকা সংঘ (Girl Guide) যে কাজ করেছে তা যে-কোন দেশের গর্বের কারণ। তাছাড়া এঁরা নিজেরা ইচ্ছা করে' কিছু কিছু যুদ্ধ-বিদ্যাও শিখেছিলেন। কেউই জানত না যে ইংরেজ এত সহজে নরম হবে, এবং ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ এত শীঘ্র ধাম্বে। তাই আবশ্যক হোলে জীলোকেরাও যুদ্ধ করতে-পারবে আশায় কাউন্টেন্স মার্কিয়েভিক্স এ বন্দোবস্ত করেন।

এই বীর রমণীদের আর একটি কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য—“স্বেচ্ছা-সেবিকা” দল গঠন ও জাতীয় ভাণ্ডারের জগ্ন অর্থ সংগ্রহ। টাকা না হোলে কোন কাজই আজকাল একরকম চলে না। বিশেষতঃ বিপ্লবের সময়ে, যদি আবশ্যক মত টাকা না থাকে তবে অনেক কাজ নষ্ট হবার সম্ভব। আইরিশ রমণীরা এ বিষয়ে আশাতীত সাহায্য করেছেন।

বহুবার জেল খেটে যদিও কাউন্টেন্সের শরীর খুব দুর্বল হয়েছিল, কিন্তু তাঁর মন উত্তরোত্তর সবল, ও স্বাধীনতা লাভের আশা ততোধিক প্রবল হয়েছিল। ব্রীটিশ পুলিশের বহু অত্যাচার ও লাঞ্ছনা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে, তাই তিনি প্রত্যেক বালিকা ও জীলোককে আত্মরক্ষার জগ্ন গুলি চালাতে শিখিয়েছিলেন। যেন তারা আবশ্যক-মত যুদ্ধেও সাহায্য করতে পারে।

১৯১৬ সালের বিপ্লবের সময়ে কাউন্টেন্স ও বহু আইরিশ

রমণী যে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন তা যে-কোনও জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয়। বহুবীর নিজের জীবন বিপন্ন করে', গোলা বর্ষণকে গ্রাহ্য না করে' এই বীর রমণী জাতীয় কর্তব্যে অগ্রসর হয়েছেন। এইরূপ কার্যতৎপরতা ও বীরত্বের জন্ম—বিল্লব সময়ে অল্প বীর পুরুষ নেতাদের মত একেও সহরের এক অংশ রক্ষার সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হয়েছিল। একে একে যখন সমস্ত নেতারা বন্দী হন, কাউন্টেম্ তখনও যুদ্ধ চালাতে থাকেন। একদিন পরে প্রায় ১০০ রমণী সহযোগীর সঙ্গে ইনি বন্দী হন। এই বিপ্লবের বিচারে এঁর (অল্প অনেকের সঙ্গে) জীবন-দণ্ড হয়। কিন্তু কৌশলে অনেকেই জেল থেকে পলায়ন করেন। এই সময়ে এঁদের প্রধান নেতা ডি ভালেরা (De Valera) পালিয়ে আমেরিকায় আসেন। আমেরিকায় তাঁর স্বদেশবাসী প্রায় ৪০ লক্ষ লোকের বাস। তাদের আর্থিক ও নৈতিক সাহায্য নিয়ে ডি ভালেরা পুনরায় দেশে ফিরলে ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হয়। যদিও ইতিমধ্যে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে তবু বাহুল্য-বোধে আর বেশী লিখলাম না। আইরিশদের স্বদেশপ্রীতিতে দুঃসাধ্য ব্যাপারও সম্ভব হয়েছে, তাই আজ আয়ারল্যান্ড স্বাধীন হতে যাচ্ছে। জগতের অগাধ স্বাধীন জাতির সঙ্গে সমান গর্বে মাথা উঁচু করে' দাঁড়াতে যাচ্ছে।

কোথায় ভারত ?

নিউ ইয়র্ক

শ্রী কমলা মুখার্জি

কুমারী লেনা

ভারতের বাহিরে দিন দিন নারীশক্তি যেমন করিয়া সর্বতোমুখী হইয়া বিকাশ লাভ করিতেছে তাহা ভাবিতে গেলে স্বদেশের দুর্দশায় লজ্জায় মাথা নত হইয়া আসে।

কুমারী লেনা অষ্ট্রেলিয়ার একটি পল্লীগ্রামে সামান্য একজন সূত্রধরের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার অবস্থা এমন নহে যে যথোপযুক্তরূপে একমাত্র কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন। কন্যার সাহায্য লইয়া কোনও ক্রমে কায়ক্রেমে দিনপাত হইতেছিল। তথাপি সারাদিন পরিশ্রমের পরও তিনি অবসরমত কন্যাকে সংবাদপত্রাদির সারাংশ পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের

শিল্প বিজ্ঞান ও সামাজিক রীতিনীতির কথা, উত্থান পতন ও ক্রমবিস্তৃতির কথা বলিয়া তাহার সহিত গল্প করিতেন। বালিকার তরুণ চিত্তপটে তাহা এমনই গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া যাইত যে কেবলমাত্র পিতার মুখে শুনিয়া তিনি তৃপ্ত হইতে পারিতেন না। লেনা নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অতি অল্পকালের মধ্যে লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়া ফেলিলেন। বয়স যখন সবেমাত্র নয় কি দশ তখন হইতেই আশ্চর্য শিক্ষা-পুণে অবসর-বিনোদনের জন্ম পিতাকে বহু দেশ-দেশান্তরের বিচিত্র ঘটনাবলী পড়িয়া শুনাইয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন। এই সময় হইতেই ইতিহাস পাঠে তাঁহার অদ্ভুত উৎসাহ দেখা যাইতে লাগিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইল এবং জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষাও অত্যন্ত বাড়িয়া চলিল। কুমারী লেনা এখন মাত্র সাতাইশ বৎসরের একটি তরুণী। কিন্তু এই বয়সেই তাঁহার সর্বগ্রাসী প্রতিভার কথা দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করিয়াই তিনি ক্লাস্ত হইয়া পড়িলেন না। অর্জিতজ্ঞান কার্যে পরিণত করিবার জন্ম তিনি প্রথমেই সমাজসংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। ইতিমধ্যেই ন্যূনাধিক তেরটি ভাষা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন; প্রায় প্রত্যেকটিতেই মাতৃভাষার ছায় অনায়াসে মনোভাব প্রকাশ করিতে পারেন। সঙ্গীত ও নৃত্যকলায়ও আজকাল তাঁহার যশ নগণ্য নহে।

সমাজ-সংস্কারে আত্মনিয়োগ করিয়া একনিষ্ঠ ভাবে দেশ-সেবা করিতে পারিবেন, এই মনে করিয়া লেনা এখন পর্যন্ত বিবাহ করিতে স্বীকৃতা হন নাই। পিতা জীবিত আছেন বটে, কিন্তু বিন্দুমাত্রও কন্যার মুখাপেক্ষী নহেন। অল্পদিনের মধ্যে এই দেশহিতপ্রাণা কুমারী ১৮টি শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াছেন। এবং স্বয়ং তাহার একটিতে প্রধান শিক্ষয়িত্রীরূপে নিযুক্তা আছেন। বলা বাহুল্য, সকল কয়টি বিদ্যালয়ই স্ত্রীশিক্ষা-কল্পে প্রতিষ্ঠিত। যাহাতে সারাজীবন অপরের মুখের দিকে তাকাইয়া, অপরের অর্জিত অর্থে দিনপাত করিতে না হয়, আত্ম-মর্যাদা রক্ষা করিয়া ভদ্রভাবে অভাব-অভিযোগের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়, লেনা-প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তন-

গুলির মূল স্বত্রই এই। একদিকে যেমন পারিবারিক স্বথ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের উদ্দেশ্যে স্বগৃহিণী মাতার ও জীর দায়িত্ব ও কর্তব্য শিক্ষা দেওয়া হয়, অত্রদিকেও তেমনই সমাজের প্রতি দেশের প্রতি কর্তব্যবোধ প্রত্যেক বালিকার চিত্তে উদ্ভূত করিয়া দেওয়া হয়। নিজে নিতান্ত আড়ম্বর-বিহীন জীবন যাপন করিয়া তিনি প্রত্যেক শিক্ষার্থিনীকে উচ্চতম আদর্শের দিকে লইয়া যাইতেছেন।

এই বিদুষী কুমারী বলেন যে, দেশের সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম কর্তব্য হইতেছে উপযুক্ত মাতা গঠন করা। এবং দেশহিতৈষণার সর্বনিম্ন সোপান হইবে বালিকা-শিক্ষা। বালিকার কেবল মানসিক ও নৈতিক উন্নতি বিধান করিতে পারিলেই তাহার শিক্ষা পর্যাপ্ত হইল না। স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে না পারিলে ইনি শিক্ষাকে ব্যর্থ বলিয়া মনে করেন। এইরূপ আংশিক শিক্ষা দ্বারা ইনি নিজেও পরিতৃপ্ত হন নাই এবং অপরকেও সেরূপ শিক্ষা দিত ইচ্ছা করেন না। শরীর ও মন যাহাতে পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করিতে পারে, সমভাবে উভয়েরই উৎকর্ষ সাধন হয়, তাহার শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে তদুপায়ী বন্দোবস্ত রহিয়াছে। কিছুদিন হইল ইনি বিজ্ঞানচর্চার মনোনিবেশ করিয়াছেন, এবং আপনাকে অধিকতররূপে কার্যোপযোগী করিয়া লইবার ইচ্ছায় কয়েক বৎসর বিদেশ ভ্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

শ্রী অনন্তকুমার সাগুাল

কুমারী মুগালিনী চট্টোপাধ্যায়

বাংলা মায়ের ধৈর্য-সমস্ত শক্তিমতী মেয়েরা দেশের বাইরে গিয়ে আপনাদের শক্তির পরিচয় দিচ্ছেন এবং দেশকে গৌরবান্বিতা করছেন, কুমারী মুগালিনী চট্টোপাধ্যায় তাঁদের একজন। স্বপ্রসিদ্ধ অধ্বোরনাথ চট্টোপাধ্যায় এঁর পিতা এবং ভারতনারী-গৌরব শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এঁর বড় দিদি।

মুগালিনীর শিক্ষা পিতার নিকটেই প্রথমে হয়। তাঁর কাছ থেকেই ইনি গণিত রসায়ন ইত্যাদি বিজ্ঞান এবং উর্দু ইংরেজী ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইনি আই-এসসি শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্ত রসায়ন

ও পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞানভাণ্ডার উপযুক্ত দুখান। চট্টা বই ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত করেন। ১৯১১ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা মহিলা-সমিতির প্রদত্ত বৃত্তি নিয়ে ইনি শিক্ষাদানের কাজে বিচক্ষণতা লাভের জন্ত ইংলণ্ডে যান। এঁর ইচ্ছা ছিল যে নিজের জীবনের কিয়দংশ নিজের দেশের নারীদিগের কল্যাণের জন্ত নিয়োগ করেন। ইংলণ্ডে টেনিং পাশ করার পর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্রের ট্রাইপস পরীক্ষা দিবার জন্ত প্রস্তুত হন এবং সম্মানের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হন। কিন্তু সেখানে থাকতে ইনি একখানা চট্টা বই লেখেন যাতে করে' নিজেকে অরাজক-পন্থীদের অন্তর্ভুক্ত করে' ফেলেন। ভারত-সরকার এঁর মনের এই ভাবটিকে মোটেই পছন্দ করেন নি এবং সেই কারণে সরকারী বা সরকারী-সাহায্য-প্রাপ্ত কোনও বিদ্যালয়ে এঁর কাজ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

বিলাত থেকে ফিরে এসে ইনি মাদ্রাজে যান এবং সেখানে মিসেস বেণাস্ত এবং শ্রদ্ধাস্পদ স্বব্রহ্মণ্য আয়ারের সঙ্গে মিলিত হয়ে নানা সংকারণে যোগ দেন।

গত এক বৎসর থেকে ইনি “শামা-আ” নামে এক স্বদর্শন ও সুখপাঠ্য ত্রৈমাসিক পত্র অতি দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করে' আসছেন। প্রতীচ্যের বলদর্পের বিরুদ্ধে প্রাচ্য জাতির মানব-সেবানীতি খাড়া করে' দেবার জন্ত স্বব্রহ্মণ্য আয়ার যে সমিতি গঠন করে' তুলবার জন্ত চেষ্টিত, মুগালিনী তার সম্পাদিকা নিযুক্ত হয়েছেন। এ ছাড়াও কলের কুলী-মজুরদিগের স্বথ সুবিধা দেখবার জন্ত যে সমিতি প্রতিষ্ঠিত আছে মুগালিনী তাতেও ঘনিষ্ঠ রকমে সংশ্লিষ্ট।

আমাদের দেশের এই বুদ্ধিমতী শক্তিশালিনী মেয়েটি অতি নীরবে এবং শান্তভাবে দেশের কল্যাণের জন্ত অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে' যাচ্ছেন। খুব সবল দেহ এঁর নয়, জীবনের উপর ঝঙ্কাবাতও অনেক গিয়েছে, গুরুভার দায়িত্বও ইনি মাথায় তুলে নিয়েছেন, কিন্তু সবই প্রসন্ন হাসির সঙ্গে, এবং অত্যন্ত তৃপ্ত মনে।

শ্রী জ্যোতিষ্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

ম্যাডাগাস্কারের নারী

সমগ্র ম্যাডাগাস্কারের সভ্যতার কোন একটা সীমা নাই—এই দেশের বিভিন্ন জাতির সভ্যতা বিভিন্ন প্রকারের। হোভা বা এন্টিমেরিনা জাতির সভ্যতা এক রকম, বেসিলেও জাতির সভ্যতা আর-এক প্রকার। এই দ্বীপটিতে অনেকগুলি জাতি বাস করে। পশ্চিম উপকূলে বাস করে স্কালাভা জাতি, পূর্ব উপকূল এবং মধ্য-প্রদেশের উচ্চভূমির মাঝখানে থাকে বেজানোজানো জাতি। পূর্ব উপকূলে বাস করে এন্টেমোরো এবং বেটুমিসারাকা জাতি। মাহাফালি এবং বারা জাতি দক্ষিণে বাস করে। উত্তর দিকে আন্টান্ কারানাদের প্রাধান্য। মাঝখানে উচ্চভূমিতে যে-সব জাতি বাস করে, তাহারা ই ম্যাডাগাস্কারের সর্বাপেক্ষা বেশী সভ্য এবং শাস্ত। এই স্থানের বাসিন্দাদের দৈনিক জীবনযাত্রার কথা খুব বেশী পরিমাণে জানিতে পারা যায়। এইস্থানের নারীরা প্রধানত মালাগাসি-নারী নামে অভিহিত হয়।



বেটুমিলেও বালিকা

এদের চেহারা অনেকটা মালয়-জাতিদের মতন, একটুখানি নিগ্রো-রক্তের মিশ্রণ আছে

দ্বীপের নারীদের মধ্যে পুরুষদের মতই নানা রকমের পার্থক্য দেখা যায়। এন্টিমেরিনা জাতির লোকেরা অনেকটা দেখিতে পলিনেশিয়ানদের মতন, অঙ্গের গড়নের বেশ সামান্য আছে—দেহের রং হরিদ্রা বর্ণের, দৈর্ঘ্য মাঝামাঝি। অগ্নাজাতির নারীরা দেখিতে নানা রকমের হয়—দেহের বর্ণ কৃষ্ণ, অনেকের রূপ ছবছ নিগ্রোদের



—স্কালাভা নারী, লাষা-পরিহিতা

ইহাদের চুল কৌকড়ানো, চেহারা নিগ্রো—

মতই। তাহাদের দৈর্ঘ্য আরো বেশী, নাক মুখ একটু বেশী চেপ্টা। ইহাদের ভাষার সহিত অস্ট্রো-এসিয়ান ভাষার কিছু ঐক্য আছে, কিন্তু আকারে প্রকাণ্ড উক্তদেশসমূহের লোকদের সহিত ম্যাডাগাস্কার-বাসীদের বিশেষ কোন মিল পাওয়া ছকর।

সমস্ত দ্বীপটিতে স্ত্রী এবং পুরুষের কাজ ভাগ করা আছে। পুরুষ বেশীর ভাগ সময়েই শীকার করে, মাছ ধরে, জাল বুনে, শস্তের ক্ষেত চষে বা ঘর জুয়ার তৈরী করে। পশু পালনের কাজও তাহারা করিয়া থাকে। গরুবাছুর ইত্যাদি পশুকে ইহারা জেবুস বলে। স্ত্রী-লোকেরা রান্নার কাজ করে, ছোট ছোট মাছ ধরে, ঘরের ছাউনি দেয়, ক্ষেতে শস্ত লাগায় এবং ছেলে-মেয়েদের সমস্ত ভার গ্রহণ করে। কাজের নমুনা দেখিয়া মনে হয় পুরুষই সকল শক্ত কাজ করে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নয়। নারীদের কাজের খাটুনি অনেক বেশী। কোন্ কাজের ক্রান্তি কতখানি তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া কাজ ভাগ করা হয় নাই।

বেজানোজানো জাতি ছাড়া অল্প সব জাতির মধ্যে নারীর স্থান পুরুষের সমান। ম্যাডাগাস্কারে পুরুষের

প্রাধাত্য দেখা যায় না। মুসলমান এবং খৃষ্টীয়ানদের মধ্যেও পুরুষ এবং নারীর এতখানি সাম্য নাই। ইহাদের বিবাহ—ক্রয়-বিক্রয়-প্রথা নয়। কত্কা তাহার সমস্ত জিনিষ-পত্রের মালিক, মাঝে মাঝে তাহার স্বত্ব রক্ষার জন্ত তাহাকে তুমুল কলহ করিতে হয়। পূর্বে যখন বহু-



—বেটসিমিসারাকা নারী, আংশিক ইউরোপীয় পোষাকে ইহাদের চেহারা কতকটা মালয় এবং কতকটা নিগ্রো জাতির মতন—বিবাহ-প্রথা খুব বেশীরকম চলিত ছিল, তখন এক জনের এক এক স্ত্রী, ভিন্ন ভিন্ন বেড়া-দেওয়া স্থানে বাস করিত। এই বেড়া-দেওয়া স্থানটিতে সেই স্ত্রীর পূর্ণ অধিকার ছিল। বিবাহের পূর্বে মেয়েরা যাহা ইচ্ছা করিতে পারিত। তাহার কাজে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা পুরুষের ছিল না। বিবাহ মনোমত না হইলে সহজেই বিবাহ বাতিল করিবার অধিকার প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই ছিল।

মালাগাসি-নারীর স্থান সমাজে পুরুষের সঙ্গে এক ছিল। বর্তমানে শ্বেতাঙ্গ-সভ্যতার আগমনে নারীর স্থান ভাল হওয়া অপেক্ষা অনেক পরিমাণে খারাপ হইয়াছে বলা যায়। ফরাসী-বিজয়ের পূর্বে দ্বীপের শাসন ব্যাপারে নারীদের খুব বেশী হাত ছিল। অনেক জাতির মধ্যে নারী-প্রাধাত্যই ছিল, এই-সমস্ত জাতির পুরুষেরা নারীদের অধীনে বাস করিত। কিন্তু মালাগাসি-নারীর বর্তমান জীবন দেখিয়া পূর্ববস্থা স্থির করা শক্ত। তবে এটা বেশ স্থির হইয়া গিয়াছে যে নারীও দেশের “রাজা” হইতে পারিত—তবে তাহা সময়-বিশেষে। কমাগাষ্ট ওইল্যার লিখিত সাকানাভা জাতির ইতিহাস পাঠে এমন অনেক রাণীর কথা জানিতে পারা যায়, যাহারাই প্রকৃত পক্ষে দেশ শাসন করিত; রাজারা মন্ত্রীর স্থান অধিকার করিত।

মাজুঙ্গা ইত্যাদি প্রদেশে মুসলমান-প্রাধাত্য বেশী। এখানে নারীর স্থান পুরুষদের সমান নয়। শ্বেতাঙ্গরাও যে যে স্থানে বাস করিতেছে, সেই-সব স্থানেও পুরুষ-প্রাধাত্য লক্ষিত হয়। মালাগাসি-নারীদেরও প্রাধাত্য দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। শ্বেতাঙ্গ-সভ্যতার শুভ আলোক কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের কৃষ্ণবর্ণের প্রতি লজ্জা আনিয়া দিতেছে, সেইজন্তই বোধ হয় তাহারা আন্তে আন্তে ঘরের কোণে প্রবেশ করিতেছে।

মালাগাসি-নারীরা তাহাদের নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে বেশ সচেতন। তাহারা বেশ ভাবপ্রবণ, বন্ধুত্বের এবং প্রণয়ের সম্মান তাহারা রক্ষা করে। বেটসিলেও এবং এক্টিমেরিনা জাতির নারীদের মন বড় কোমল। মনের কোমলতা আফ্রিকার নিগ্রো মেয়েদের একেবারে নাই বলিলেই হয়।

অনেক জাতির স্ত্রী-সজ্জা আছে। পূর্ব-দক্ষিণের জ্যাফিসোরো জাতির মধ্যে এই রকম সজ্জা খুবই শক্তি-শালী। কোন পুরুষ যদি কোন নারীর প্রতি কোন অত্যাচার ব্যবহার করে, তবে নারী-সজ্জা বসে—তাহারা রাজার কাছে সেই পুরুষের শাস্তি প্রার্থনা করে। নারী-সজ্জার কথা রাজা-মহাশয় সব সময় রাখিয়া থাকেন।

এণ্টেমোরো জাতির পুরুষেরা যখন শীকারে যায়,

তখন নারীরা এক প্রকার বিশেষ নাচ নাচিয়া থাকে। এই নাচের উদ্দেশ্য স্বামীদের কার্যে সফলতা এবং শরীরের বলবৃদ্ধি কামনা। নারীরা নানা রকম কবচ ইত্যাদি ধারণ করে। তাহাতে নাকি অস্থখ-বিস্থখ দূর হয়, সন্তান-প্রসবের কষ্টও কম হয়।

নারীরা “সিষো” নামে এক প্রকার ছুখ খোলা ছালা পরিধান করে। দেহের উপরান্ধে তাহারা তাকোঞ্জো নামে জামা ব্যবহার করে। জামা বৃকে আঁটা থাকে। এই-সমস্ত বস্ত্র এক এক জাতি এক এক প্রকার কাপড়ে তৈয়ার করে। কেহ কেহ খুব রঙিন করে। কেহ আবার ছুই রঙের করে। সিষো কোমরে চামড়ার পেটির দ্বারা আটকানো থাকে।

দ্বীপের মধ্য-প্রদেশের অধিবাসী নারীদের বেশ একটু সৌন্দর্যের জ্ঞান আছে। তাহা তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। পরিচ্ছদের কিনারে কিনারে তাহারা খুব চমৎকার নানা রকমের লেস লাগায়। এই লেস তাহাদের হাতের তৈরী। এই-সমস্ত বস্ত্রের উপর যে সূচীকার্য থাকে, তাহাও খুব সূক্ষ্ম এবং চমৎকার। ইহাদের এক রংএর সহিত আর-এক রং মিলাইবার দক্ষতা প্রচুর। পুরুষেরা এক প্রকার চাদর ব্যবহার করে, তাহার রং শাদা, এবং শাদা সূতার নানা রকম কাজ তাহার উপর থাকে। নারীরাও অনেকে এই চাদর ব্যবহার করে। বর্তমান সময়ে অনেকে ষ্টোদ্রদের অনুকরণে বিদ্যুটে পোষাক ব্যবহার শুরু করিয়াছে। বিশেষত টানানারিভো ইত্যাদি বড় বড় মহরে ইহা বেশী করিয়া লক্ষিত হইতেছে।

মালাগাসি নারীর চুল বাঁধা এক বৃহৎ কার্য। এক-জনের চুল বাঁধিতে জন-কয়েকের সাহায্য প্রয়োজন। চুলগুলিকে অনেকগুলি বিছনিতে ভাগ করা হয়। তার পর জাতীয় প্রথা অনুসারে বিছনি-গাঁথা হয়। এই-সমস্ত হইলে তাহার উপর কাঁদা বা গন্ধর চর্কি লেপা হয়। তাহাতে বিছনি ঠিক থাকে, এবং মাসে এক বারের বেশী চুল বাঁধিবার দরকার হয় না। চুল বাঁধিবার সরঞ্জাম—একখানা কাঠের চিকুণী এবং মাথা পরিষ্কার করিবার জন্ত একটুকরা সূচাল হাড়ের বা তামার কাঁটা।

মালাগাসি-নারী নাচ গান খুব ভালবাসে। তাহাদের বাঁশের তৈরী একপ্রকার বাজ্যন্ত্র আছে, বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বাঁশের ফালি এক সঙ্গে আর-একটা বাঁশের গায়ে বসান থাকে, তাহাতে ঘা মারিলে খুব তীক্ষ্ণ স্বর বাহির হয়। নাচের বিশেষ কোন বালাই নাই, সামনে এবং পিছনে নড়া-চড়া ছাড়া আর কিছুই করিতে হয় না। নাচ একলাও হইতে পারে, আবার দলবদ্ধ হইয়াও চলে।



হোভা (এক্টিমেরিনা) নারী, লাখা-পরিহিতা
চেহারা বিশুদ্ধ মালয়-জাতীয়ের মত

সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পূর্বেই ঘরের মাঝে মাজুর আড়াল দিয়া আর-একটি ছোট কামরা করা হয়। কামরার মাঝখানে আগুন জলে সব সময়, কারণ, ইহাদের মতে ঘর গরম থাকিলে প্রসূতির কষ্ট কম হয় এবং শরীর তাড়াতাড়ি সবল হইয়া উঠে। আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই ভাবী-জননীকে দেখিতে আসে এবং কিছু টাকা ভেট দিয়া যায়। এই ভেট দেওয়ার উদ্দেশ্য জালানি কাঠের খরচ জোগানোতে সাহায্য করা। ছেলে বা মেয়ে যাই

হোক, তাহাতে গৃহস্থের আনন্দের কোন কমতি হয় না। এই দেশে ছেলে-মেয়ের সমান আদর এবং কদর। আমাদের প্রাচীন-সভ্যতাভিমानी বর্তমান-মৃত দেশের মত সেদেশে কন্ডার আগমনে গৃহস্থের ঘরে চাপা কান্না শোনা যায় না।



বেটসিলেও নারীর লাম্বা-পরিধান-রীতি
বিশুদ্ধ মালয়-জাতিদের মতো চেহারা

সন্তানকে সাধারণত দুই বছর মায়ের দুধ খাওয়ানো হয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে চারি বৎসর পর্যন্তও দুধ ছাড়ানো হয় না। মায়েরা সন্তানকে পিঠে বহন করে। ইমারিনা জাতির মধ্যে একটা বেশ মজার প্রথা চলিত আছে। সন্তান বড় হইলে পর, সে তাহার মাকে একটা মুদ্রা দেয়। এই মুদ্রা দেওয়ার অর্থ—ছেলেবেলায় মা যে তাহাকে পিঠে করিয়া বহন করিয়াছেন তাহার ভাড়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

মেয়েদের নাম দেখিয়া তাহাদের কে বড় কে ছোট বোঝা যায়। যেমন কাহারও নাম “রাফারাভাভি”

শুনিলে বুঝিতে হইবে যে সে জননীর কনিষ্ঠা কন্যা। অনেক সময় কোন একটা জন্তুর নামে সন্তানের নাম রাখা হয়।

সন্তানবতী নারীদের সম্বোধন করা হয় “অমূকের-জননী” বলিয়া। একটা নির্দিষ্ট বয়স হইলে নারীদের বলা হয় “রামাটোয়া”—ইহা খুব সম্মানসূচক অভিভাষণ। বৃদ্ধা নারীকে “ইনেনি” বলা হয়। ইহার অর্থ—মাতা।

কোন পুরুষের বহু স্ত্রী থাকিলে প্রথমা স্ত্রী কয়েকটা বিষয়ে অন্য স্ত্রীদের উপর প্রভুত্ব করিতে পায়। কিন্তু প্রত্যেক স্ত্রীর নিজের নিজের তৈজসপত্রাদির উপর সম্পূর্ণ অধিকার আছে। গরীব লোক বহুবিবাহ করে না, তাহাতে খরচ অনেক বাড়িয়া যায়। কারণ এই দ্বীপে স্বামীকে তাহার স্ত্রীর সকল ভার গ্রহণ করিতে হয়। কাজেই যে ধনী সেই কেবল বহুবিবাহ করিবার পেয়াল বা সখ করিতে পারে। আমাদের দেশের কুলীন ব্রাহ্মণদের মতন বিবাহ করিয়া ফাঁকি দেওয়া সেই অসভ্য দেশে চলে না।

সমগ্র ম্যাভাগাস্কারে বিবাহের নানা রকম পদ্ধতি চলিত আছে। তবে সকল স্থানেই ছেলের কোন বন্ধু ঘটকের কাজ করে। কেবলমাত্র এন্টিমোরো জাতির মেয়েরা নিজেদের স্বামী নির্বাচন করিয়া লয়। এই নির্বাচন-প্রথা অনেকটা আমাদের দেশের স্বয়ম্বর-প্রথার মত।

বিবাহ পাকাপাকি রকমেই হয়, তবে অনেক সময় আইনের সাহায্যে বিবাহ ভঙ্গ করা যায়। বিবাহ বাতিল হইলে পুরুষেরই স্ত্রীবিধা বেশী হয়। অনেক জাতির মধ্যে স্ত্রী এবং পুরুষ কিছুকালের জন্ত সাময়িক বিবাহ করিয়া দেখে—যদি তাহাদের মনের মিল হয় এবং উভয়ের উভয়কে পছন্দ হয় তবে বিবাহ পাকা করিয়া লয়।

উভয়পক্ষের কথাবার্তা পাকা হইয়া গেলে পর বর কন্যাকে দাবী করিতে আসে। এই সময় কন্ডার পক্ষের সমস্ত মেয়েদের বেশ সাজান হয়—এবং যে আসল কন্যা তাহাকে তাহার রূপের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে হয়।

বিবাহের পর উভয় পক্ষের লোকেরা ভোজে বসে। এন্টিমেরিনা জাতির বর এবং কন্যা একটা বড় “লাম্বা”

উভয়েই একসঙ্গে পরিধান করে, এবং একই খালাতে ভোজন করে। সাকালভা জাতির বিবাহ-ভোজে বরের কোন বন্ধু একটা মুরগী মারে, এবং তাহার দুইটা পা বরকে দেয়। বৎ একটা পা কন্যাকে দেয় এবং একটা নিজে আহার করে। বাকি পক্ষীটাকে অগ্ন্যাঃ অভ্যাগতবৃন্দ আহার করে। অনেক জাতির বিবাহ-উৎসবে মহিষ বা ঘাড়া হত্যা করা হয়। এই ভোজের দ্বারা কেবল বর-কন্যার নয়, সঙ্গে সঙ্গে দুইটি পরিবারের মিলন ঘটে।

মেঘেদের ১২।১৪ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। অনেক ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে খুব ছোট থাকিতেই তাহার পিতামাতা তাহাদের বিবাহ স্থির করিয়া রাখে। কিন্তু প্রণয়-বিবাহ এদেশে একেবারেই বিরল নয়। এই গল্পটিতে তাহার আভাস বেশ ভাল করিয়া পাওয়া যাইবে।

পাহাড়ের ধারে এক গ্রামে এক যুবক বাস করিত। দেবতার মত তাহার রূপ, অম্বরের মত তাহার দেহের বল। পাশের গ্রামে এক যুবতী থাকিত—তাহার রূপে গ্রামের যুবকেরা পাগল হইয়াছিল। উভয়ে উভয়ে

ভালবাসিল—এবং একে অগ্নকে ছাড়িয়া আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না, প্রতিজ্ঞা করিল। বিধাতা বাদ সাধিল—দুই পরিবারে বহুকালের প্রাচীন কলহ ছিল। পিতায় পিতায় এবং মাতায় মাতায় মুখ দেখাদেখিও ছিল না। মরণের এপারে মিলন নাই দেখিয়া তাহারা দুইজনে নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া পাহাড়ের উপর হইতে নীচের অতল নীল জলে ঝাঁপ দিল। সেইদিন হইতে সেই কন্যার গ্রামে যদি কোন মেয়ে মারা যাইত, তবে অর্দ্ধেক খালের জল লাল হইয়া যাইত—এবং সেই যুবকের গ্রামের কোন যুবক মারা গেলে সমস্ত জল লাল হইয়া উঠিত—জল রক্তের মত দেখাইত। আশ্রিয়ানামজয়নীমেরিনা তখন টানানারিভোর রাজা। তিনি এই ব্যাপার দেখিয়া, তাহার রাজ্যে প্রচার করিলেন—“এখন হইতে আমার রাজ্যে কেহ প্রেমিক-প্রেমিকাকে মিলনে বাধা দিতে পারিবে না। যদি বাধা দেওয়া হয় তবে অকল্যাণ হইবে। যুবক যুবতী যাহার যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিবে।”

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

মুক

কেন প্রাণ পরশিলে ওগো বীণাপানি
বাণী যদি নাহি দিলে ? যে স্বরব কানে
আনে অমৃতের বক্সা কেন তারে গানে
আনিতে পারে না কণ্ঠ ; পরাভব মানি
মৌন বেদনার ভরে গুমরিয়া মরে !
এ ঘেন বোবার স্বপ্ন মুক রসনায়,
এ ব্যথা যে প্রজাপতি গুটির ভিতরে
লুকান রেখেছ তার গুটান পাখায় !
কত কথা জাগে মনে তোমার পরশে
ভাষা তার কোথা পাই ? না ফুটলে ফুল
কেমনে জানাবে শাখী কি অমৃত-রসে
বসন্তের স্পর্শ তারে ভরেছে আমূল ?
অবচনা এ রসনা পারে না বলিতে
কি বাণী তুলেছ মোর প্রাণের নিভতে।

শ্রী সুরেশ্বর শর্মা

সনেটের প্রতি

তুমি মোর বসন্তের শেষ পুষ্পকলি,
ফুটিতে পারনি তবু শাখা বিদরিয়া
বিকাশের ব্যথাভরে শুধু মুঞ্জরিয়া
উঠিয়াছ শেষ পলে ! গেল যবে চলি
ফুল ফুটিবার কাল, আসিলে তখন
ঝরিতে মরিতে শুধু ! ক্ষুদ্র বুকটিতে
ঢাকা ছিল কি স্বরভি কিবা সে বরণ
কে পাবে উদ্দেশ তার ? কে পারে জানিতে
মুকের মরমবাণী ? মৌন ব্যাকুলতা
ভাষা পায় কানে যার হেন সমদুখী
কেবা তোর আছে হেথা ? চির অপূর্ণতা
বক্ষে ধরি রয়েছি তুই মৃত্যুমুখী
অশ্রুট কিশোরী মোর ! চতুর্দশদলে
কি বারতা রেখেছি ঝাঁপিয়া সবলে ?

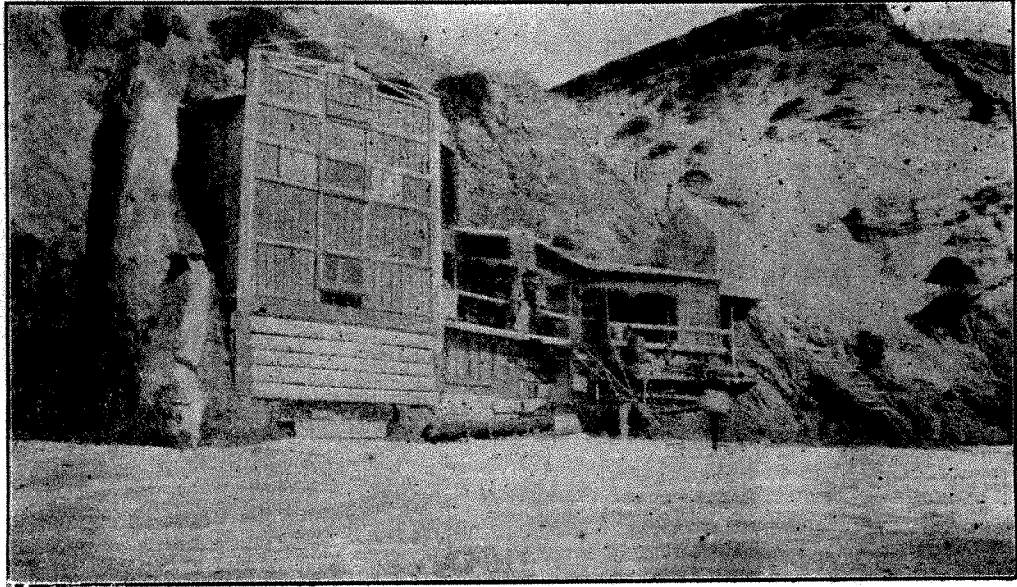
শ্রী সুরেশ্বর শর্মা



সমুদ্রে কুড়ানো জিনিসে বাড়ী তৈরী—

দৈনিক রোজনামচার পথ ছাড়িয়ে একটা-কিছু করলেই লোকের চোখে চমক লাগে—ছুটে আসে সবাই দেখতে—ব্যাপারটা কি হল। তা সামান্য একটা খেলনাই হোক আর খুব দরকারী বা অদরকারী কিছু একটা হোক। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার রেডোগোর কাছে সমুদ্রের উপকূলে একটা প্রকাণ্ড বাড়ী পাথরের পাশে এক ভয়লোক একটা বাসগৃহ তৈরী করেছেন মাত্র এক ডলার বা সাড়ে তিন টাকা ব্যয় করে। বিবম অস্থে ভুগে সমুদ্রের ধারে বাস করতে ইচ্ছে হল, কিন্তু বাড়ী ভাড়া বা তৈরী করবার পয়সার অভাব। কাজেই তাঁকে বিনা-পয়সায় যেমন করে' হোক একটা থাকবার মত বাড়ী তৈরী করবার উপায় চিন্তা করতে হল।

আগত অতিথিদের নাম সই করবার বন্দোবস্ত আছে খাতাতে নয়, খুব মশগ করে চাঁছা কাঠের তক্তাতে। লোহার তারে সার-বন্দি করে' এই তক্তা টাঙ্গানো থাকে—একখানা নামে ভরে' গেলেই সেটাকে তারের এক প্রান্তে সরিয়ে রাখা হয়। বসবার চোঁকি তৈরী করা হয়েছে মদের পিপার ওপর গদি লাগিয়ে। জানুয়ার সানি কেবল পয়সা দিয়ে কিন্তে হয়েছে; সমুদ্রে যে-সব কাচ পাওয়া যায়, তার বড় বেশী টুকরা টুকরা অবস্থা। বাড়ীর পাশে পাথরের গায়ে একটা ঝরণা আছে—তার মুখে নল লাগিয়ে বাড়ীর ভিতর খাবার-জল আনা হয়। বাড়ীর পাশে একটা পিপাতে সব সময় জল ভরা থাকে। বাড়ীটির নামকরণ হয়েছে “ফ্রিটনাম্ কাসল্” এবং ক্যাসল্‌এর অধিকারী হচ্ছেন—লুই ডাট্।

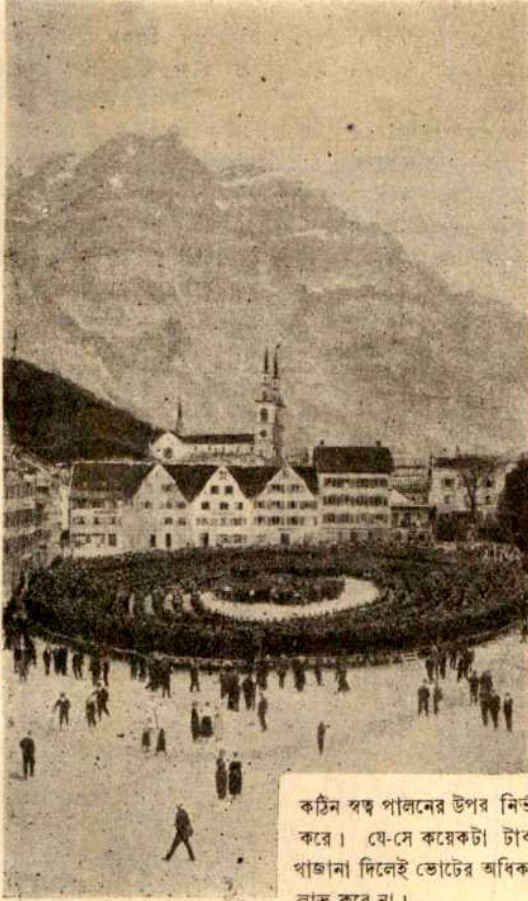


সমুদ্রের সাহায্যে তৈরী বাড়ী

সমুদ্রে নানা রকম জিনিষপত্র ভেসে আসে—সেই-সমস্ত জিনিষ যোগাড় করে' বাড়ী তৈরী শুরু হল। প্রথম যে বাড়ীটি হয়, সেটিতে কোন-রকমে থাকা চলত। কিন্তু বর্তমানে তার নানা রকম উন্নতি করা হয়েছে। এবং একতলার পরিবর্তে দুতলা করা হয়েছে। শোবার ঘর, বসবার ঘর, রান্নার ঘর ইত্যাদি সবই আছে। যে সিঁড়ি দিয়ে অভ্যাগতরা ওপরে ওঠেন তা কোন একটা জাহাজের ছিল। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেই একটা ছোট হাতল আছে, সেটা টানলেই ভিতরে একটা লোহার ডাঙা কড়িকাঠে-টাঙ্গানো একটা বস্তুতে আঘাত করে। বাড়ীর ভিতরে

সুইটজারল্যান্ডের নির্বাচন-ভূমি—

সুইটজারল্যান্ড ২২টি স্বাধীন প্রদেশের সমষ্টি। এক একট প্রদেশকে ক্যান্টন বলে। বহু পুরাতন চারিটি ক্যান্টনে বৎসরে বৎসরে এপ্রিল মাসের শেষ বা মে মাসের প্রথম রবিবারে জনসাধারণ আগামী বৎসরের শাসনকার্য নির্বাহ করবার জন্য কর্তৃচরী নির্বাচন করিয়া থাকে। নির্বাচন-স্থান খোলা মাঠের উপর। এই দেশে নাগরিক হইবার অর্থাৎ ভোট দানের অধিকার পাওয়া কতকগুলি



কঠিন স্বপ্ন পালনের উপর নির্ভর করে। যে-সে কয়েকটা টাকা খাজানা দিলেই ভোটের অধিকার লাভ করে না।

হাইটজারল্যান্ডের নিকরচন-ভূমি

ছড়ি-বেহালা—

আমেরিকাতে এক কনসার্টে একদিন এক ভদ্রলোক হঠাৎ একটা ছড়িকে কাঁধে বেশ করে বাগিয়ে ধরে' বেহালার মত বাজাতে শুরু



ছড়ি বেহালা

করলেন। ছড়ির মধ্যে বেহালার সবই আছে, এমন কি ছড়টাকেও ছড়ির মধ্যে বেশ সহজ ভাবে রাখা যায়। ছড়টাকে মোটা লাঠি না বলে' ছাতা বলাও টলে—অস্বস্ত

সেই রকমই কতকটা দেখতে। এর আওয়াজ বেশ ভাল বেহালার মত।

উচ্চে উড্ডয়ন -

গত আষাঢ় মাসে প্রবাসীতে “আলোচনায়” লেখা হইয়াছিল “আমেরিকান বীমান-বীর শ্রোয়ের (Shroeder) গত ১৯২০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ৩৩১৩৩ ফুট উচ্চে উঠেন।” এতদিন অবধি ইহার আসনই আকাশের সব-চেয়ে উচ্চতে ছিল। কিন্তু গত ২৯এ সেপ্টেম্বর (১৯২১ সন) লেপ্টেন্যান্ট জে, এ, ম্যাক্রেডি নিজেকে সব চেয়ে উচ্চতে তুলিয়াছেন। ইনি ৪০,৮০০ ফুট উপরে উঠিয়াছিলেন। ইহার মতে কিছুকাল পরে আকাশ-পথই সব চেয়ে সুবিধার হইবে, ইহাতে খরচ এবং সময় কম লাগিবে, আরাম এবং আনন্দ অনেক পরিমাণে বর্ধিত হইবে।

পাখা-টুপী—

মিস্ এথেল বিচ্ একজন আমেরিকান নারী। ইনি একদিন এক পার্টিতে মাথার টুপিতে ছোট ইলেক্ট্রিক ফ্যান লাগাইয়া হাজির হন।



টুপী পাখা

এই ফ্যান ছুটি ড্রাই-সেলের সাহায্যে ঘোরে। এই রকম পাখা লাগাইয়া ছজন মুখোমুখি বসিলে ছজনেই বেশ হাওয়া খাইতে পারেন।

—হেমন্ত

চলন্ত ঘরকন্না—

একটা-না-একটা অভূত জিনিস আমেরিকায় অনবরতই তৈরী হচ্ছে। মোটরগাড়ীর মত কলকজার উপরে এক প্রকাণ্ড কাঠের ঘর, তাতে মানুষের খাওয়ার ও শোবার সমস্ত সরঞ্জামই আছে। এ গাড়ী-ঘর যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন রাস্তার উপর দিয়ে চালানো যায়। ভাল শ্লিং থাকার জন্তে আরোহীর কোন কষ্ট বা অসুবিধা হয় না। এই ঘরের ভিতরটা অনেকটা জাহাজের কেবিনের মত দেখতে, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শোবার বিছানা বেশ আরামের। গাড়ীর মাথায় আবার একখানা ছোট নৌকা থাকে, পথে জলা পাড়ি দেবার জন্তে।

হস্তহীন লোকের লেখা—

ইংলণ্ডের অনেক হাস্পাতালে হস্তহীন লোকদের লেখাবার জন্যে অনেক রকম পদ্ধতি অবলম্বিত হচ্ছে। হস্তহীন লোকদের বুকের উপর একটা কাঠের যন্ত্র লাগিয়ে দেওয়া হয়—তাতে বুকের ঠিক মাঝখান থেকে একটা এক ফুট লম্বা ডাঙা থাকে, তার মুখে



হস্তহীন লোকের বুক দিয়ে লেখা

পেনসিল ধরবার একটা কল, তাতে পেনসিল লাগিয়ে হস্তহীন লোক বুকের চাপে বেশ গড়গড় করে লিখে যেতে পারে। এ প্রণালীর উদ্ভব হওয়াতে হস্তহীন লোকের মনের কোভ কত পরিমাণে যে দূর হয়েছে তা বলা যায় না। এই সমস্তই সদা সজাগ সভ্যতার স্বফল।



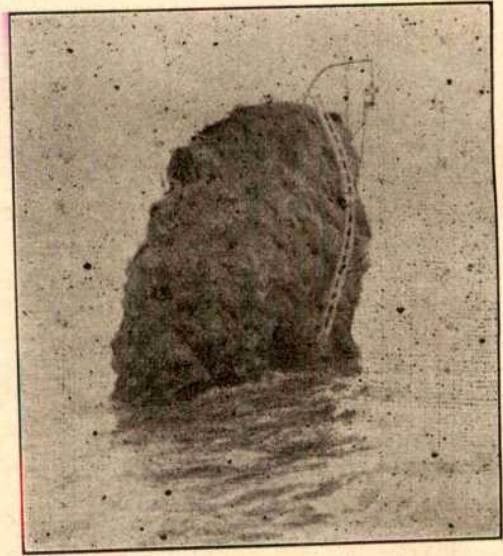
বাইসাইকেল গুটিয়ে ঝুলিয়ে নেওয়া

বাইসাইকেল বহনের সুবিধা—

ঘোড়ার গাড়িতে বা ট্রেনে বাইসাইকেল নিয়ে যাওয়া এক অসুবিধাজনক ব্যাপার। তার জুড়ে জায়গা চাই বিস্তার আর আরোহীদের খুব অসুবিধা। সম্প্রতি আমেরিকার নিউইয়র্ক সহর থেকে খবর পাওয়া গেছে যে সেখানে এমন এক রকম বাইসাইকেল তৈরী হচ্ছে যার চাকা মুড়ে পুঁটলি করে হাতে ঝুলিয়ে অনায়াসে বহন করে নিয়ে যাওয়া যাবে। এই সাইকেলের চাকা সাধারণ প্রচলিত সাইকেলের চাকার চেয়ে একটু ছোট। একে মুড়েছে একটা পোর্টম্যান্টোর মধ্যে অনায়াসে নিয়ে যাওয়া যায়। এই সাইকেলের উদ্ভাবনে ভ্রমণকারীদের প্রচুর সুবিধা হবে।

নদীর উপর পাহাড়—

আমেরিকার ওয়াশিংটন ও অরিগনের মাঝামাঝি কলম্বিয়া নদীর মোহানার ২০ মাইল উপরে একটা ২০ ফুট উঁচু প্রকাণ্ড পাথর আছে। সেটি দেখতে অদ্ভুত, যেন নদীর উপর থেকে একটা থাম উঠে গেছে।

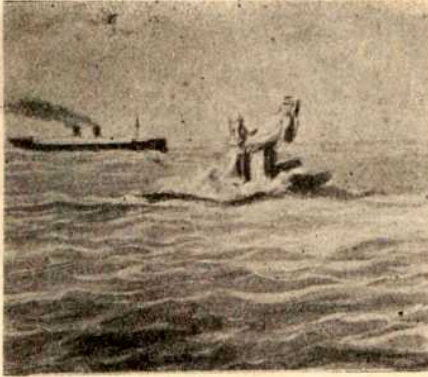


জলের উপর পাহাড়

আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে ঐটি অনেকের দর্শনীয় জিনিস ছিল। সম্প্রতি এটিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এর মাথার উপরে একটা লাল আলো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাতে সেই নদীর নাবিকেরা আপনাদের গন্তব্য পথ অন্ধকারেও ঠিক দেখে যেতে পারে।

জলের উপর স্মৃতিস্তম্ভ—

টরপেডো দিয়ে লুসিটানিয়া জাহাজ গত যুদ্ধের সময় ডোবানো হয়েছিল। ঠিক যেখানে জাহাজটি ডুবেছিল সেই জায়গায় একটা স্মৃতিস্তম্ভ ভাসিয়ে রাখবার জন্তে ফরাসী ভাস্কর জর্জ ছ বোয়া একটা মাতৃমূর্তি তৈরী করছেন—মজমানা জননী প্রিয় সন্তানকে আঁকড়ে ধরে নিরাশায় মর্মবেদনায় স্বর্গের দিকে তাকিয়ে আছেন। মূর্তিটি



সমুদ্রের উপর ভাসিয়ে রাখা হবে তীর থেকে তাদের সাহায্যে।
তাতে রাজ্যে বিদ্রোহের সাহায্যে আলো জ্বলবে—এতে জাহাজদের
পথ দেখানোর কাজও অনেকটা হবে। একটা ভেলার উপর
এই অরণ-চিহ্ন থাকবে। ভেলার নাম হবে লুসিটানিয়া।



আমেরিকার প্রকাণ্ড বেহালা—

সম্প্রতি আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে একটি প্রকাণ্ড বেহালা
প্রদর্শিত হয়েছিল। সেটি এগার ফুট সাত ইঞ্চি উঁচু, চার ফুট সাত ইঞ্চি
চওড়া, তের ইঞ্চি মোটা এবং তার ওজন ১৫০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৭৫

লুসিটানিয়া স্মৃতিচিহ্ন সাগরে ভাসমান



পৃথিবীর সবচেয়ে প্রকাণ্ড বেহালা

সের বা ১ মন ৩৫ সের। এই বেহালাটি নাকি জগতের মধ্যে
সবচেয়ে বড় বেহালা। বেহালার তারগুলি মানুষের আঙ্গুলের মত
মোটা মোটা।

ব্যথার গোরব

(বাউলের স্বর)

আমায় তুমি ব্যথা দিলে অন্তরে,
নাইক আমার এই গরবের অন্ত রে।
দানের দিনে সবাই আসি
নিয়ে গেল হাসি-রাশি,
সুখ-সায়রে চিত্ত সবার সন্তরে—
নাইক আমার এই গরবের অন্ত রে !

বিতরণের ভার দিলে মোর মস্তকে,
দিলে নাকো চাইতে আমার হস্তকে।
সবার শেষে আপন জেনে
তাক্ত ব্যথা দিলে এনে,—
স্নেহের পরশ করলে হৃদি-বস্তরে,
নাইক আমার এই গরবের অন্ত রে !

গোলাম মোস্তফা

কণ্ঠ পাথর



গান

ভোর হল যে আবেগ-শব্দরী
তোমার বেড়ায় উঠল ফুটে
হেনার মঞ্জরী।
গন্ধ তারি রহি রহি
বাদল বাতাস আনে বহি,
আমার মনের কোণে কোণে
বেড়ায় সঙ্গরি।
বেড়া দিলে কবে তুমি
তোমার ফুল-বাগানে,
আড়াল ক'রে রেখেছিলে
আমার বনের পানে।
কখন গোপন অন্ধকারে
বর্ষারাতের অশ্রুধারে
তোমার আড়াল মধুর হয়ে
ডাকে সঙ্গরি।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬ আষাঢ়, ১৩২২।

একলা ব'সে একে একে অশ্রুমনে
পদ্মের দল ভাসাও জলে অকারণে।
হায়রে বুঝি কখন তুমি গেছ তুলে
ও যে আমি এনেছিলাম আপনিতুলে,
রেখেছিলেম প্রভাতে ঐ চরণ-মূলে
অকারণে,
কখন তুলে নিলে হাতে যাবার ক্ষণে
অশ্রুমনে।
দিনের পর দিনগুলি মোর এমনি ভাবে
তোমার হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হারিয়ে যাবে।
সবগুলি এই শেষ হবে যেই তোমার খেলায়,
এমনি তোমার আলসভরা অবহেলায়,
হয়ত তখন বাজবে বাখা সঙ্কোবেলায়
অকারণে,
চোখের জলের লাগবে আভাষ নয়ন-কোণে
অশ্রুমনে।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০ আষাঢ়, ১৩২২।

আবেগ মেঘের আধেক ছুয়ার ঐ খোলা,
আড়াল থেকে দেখে দেখা কোন পথ-ভোলা।
ঐ যে পূর্ব গগন জুড়ে
উত্তরী তার যায় রে উড়ে,

সজল হাওয়ার হিন্দোলাতে দেয় দোলা।
লুকাবে কি প্রকাশ পাবে কেই জানে
আকাশে কি ধরায় বাসা কোন্‌খানে।
নানা বেশে ক্ষণে ক্ষণে
ঐ ত আমার লাগায় মনে
পরশখানি নানা সুরের ঢেউতোলা।

শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, শ্রাবণ

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২ আষাঢ়, ১৩২২।

বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা

বাঙ্গালী যে ভারতবর্ষের অশ্রু প্রদেশের জাতিসকল হইতে পৃথক এবং স্বতন্ত্র, বাঙ্গালীর যে একটা নিজস্ব বিশিষ্টতা আছে, ইহা ঠিকমত বুঝিতে হইলে,—(১) বাঙ্গালার উপাসক সম্প্রদায়ের পরিচয় লইতে হইবে, (২) বাঙ্গালা ভাষার ব্যাপ্তি, পুষ্টি ও প্রকৃতির পরিচয় লইতে হইবে, (৩) জীমূতবাহন হইতে ত্রীকূল তর্কালঙ্কার পর্য্যন্ত প্রায় সাত শত বর্ষকাল কোন সিদ্ধান্তের উপরে বাঙ্গালীর স্থিতি ও দায়শাস্ত্র বিস্তৃতি ও পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহা জানিতে হইবে, (৪) বাঙ্গালীর জাতি এবং কুল-পরিচয় পূর্ণরূপে লইতে হইবে। এমন কি বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডে, যজ্ঞাদিতে বাঙ্গালী ভবদেবের পদ্ধতি মান্য করিয়া চলে, অশ্রু কোন আর্ঘ্য পদ্ধতিকারকে গ্রাহ্যই করে না। দায়তন্দ্বে জীমূতবাহন বাঙ্গালীকে অপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া গিয়াছেন; দায়ভাগ বাঙ্গালার হিন্দু-মানীকে অনেকটা Territorial বা দেশগত ও জাতিগত করিয়া রাখিয়াছে। জয়দেব, উমাগতি-প্রমুখ সংস্কৃত কবিগণ, লুইপাদ কাহ্ন-প্রমুখ দ্বিজাচার্যগণ, শঙ্কর-কৃষ্ণানন্দ-প্রমুখ তান্ত্রিক আচার্যগণ বাঙ্গালীকে এক অপূর্ণ বিশিষ্টতা দিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধযুগে ধর্ম কর্ম, শীল ও আচার লইয়া বাঙ্গালী নালন্দার পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছিল। বাঙ্গালী বজ্রযানের আদিস্থান, আবার সে বজ্রযান সহজিয়া মত এবং তন্ত্র মতের দ্বারা এমনই ওতঃপ্রোতঃভাবে জড়িত হইয়াছিল যে, পরে হীনযানী সঙ্কর্ষ হইতে উহা পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হইয়াছিল। যত জীব তত শিব, এই মহাবাক্য বাঙ্গালাদেশেই প্রথম উথিত হয়; এই মহাবাক্য অনুসারে মনুষ্য-সমাজে যতটা কাজ হওয়া সম্ভবপর তাহা বাঙ্গালাদেশেই শাক্তালী জাতির মধ্যে হইয়াছিল। বাঙ্গালার সহজ মত, তন্ত্র ধর্ম, এবং পরবর্তী গোড়ীর বৈষ্ণব ধর্ম এই মহাবাক্যের বেদীর উপরে বিস্তৃত। এমন কি বাঙ্গালীর ভক্তিশাস্ত্রটা এই মহাবাক্যের দ্বারা এতটা সঞ্জীবিত যে উহা রামানুজ-বল্লভাচার্য-প্রমুখ মধ্যযুগের আচার্য-পাদগণের ব্যাখ্যাত ভক্তিদর্শন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন হইয়া রহিয়াছে। “যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে; তাই আছে দেহভাণ্ডে।” ইহাও বাঙ্গালার একটা মহাবাক্য। ব্রহ্মাণ্ড Macrocosm, নরদেহভাণ্ড Microcosm; একটা ব্যাপ্তি, অপরটা সঙ্কুচিত; একটা বিরাট, অপরটা স্বরাট। দেহভাণ্ডকে বুঝিতে পারিলে, আয়ত্ত করিতে পারিলে, ব্রহ্মাণ্ডকে

বুঝা যায়, ব্রহ্মাণ্ডকে আরও কবা যায়। এই সিদ্ধান্ত, এই অপূর্ণ generalisation বান্ধালীর একটা বড় বিশিষ্টতা। এই সিদ্ধান্তের উপরে সহজিষা মত এবং বৈকবদিয়েব “দেহতত্ত্ব” প্রতিষ্ঠিত। বান্ধালীর “দেহতত্ত্ব” বান্ধালীর নিজস্ব; এই দেহ-তত্ত্বই বান্ধালীর Anthropomorphism বা নবপুজাব—নরদেবতাপুজাব বেরী। বান্ধালীর আগমনী বান্ধালীর নিজস্ব; বান্ধালীই একা নরদেবতা এবং নারীদেবীকে পূজা করিতে শিখিয়াছিল। বান্ধালাদেশেই প্রেমের ধর্মের প্রথম বিকাশ হয়।

বেদের বহির্দেববাদের প্রতিবাদ বান্ধালীর তাত্ত্বিকগণ সার্থকভাবে করিতে পারিয়াছিল।

“আত্মস্থ দেবতায় ত্যজ।

বহির্দেব বিচিহ্নিতে।

করস্থ কোন্তত্ত্ব ত্যজ।

ত্রমতে কাচত্বয়।”

অর্থাৎ হাতের মুঠার মধ্যে কোন্তত্ত্বমণিকে ফেলিয়া দিয়া বা উপেক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি কাচগুণ অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তি যেমন অজ্ঞতার পরিচয় দেয়, তেমনি যে ব্যক্তি চৌদ্দপোষা মাপের নরদেহে অবস্থিত আত্মরূপী দেবতাকে অবহেলা করিয়া ব্যক্তিরে অস্ত্র দেবতার পূজার ব্যস্ত হয়, সে ততোহিক মূর্খ। সোজা কথা এই—বাহিরের দেবতার পূজা বন্ধ করিয়া, যাগযজ্ঞাদি পরিহাণ করিয়া, পরমাত্মার পূজায় ব্যাপৃত হও। এই সিদ্ধান্তের উপরে বান্ধালীর উপাসনা-তত্ত্ব বিশুদ্ধ। বান্ধালীর দেহতত্ত্ব বেদের Deism-এর প্রতিবাদ। বান্ধালীর দেহতত্ত্বের প্রভাবে বান্ধালীর বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি লোপ পাইয়াছিল; আমাদের মনে হয় বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি এবং Deism কোন কালেই বঙ্গদেশে তেমন প্রতিষ্ঠান লাভ করিতে পারে নাই। এই দেহতত্ত্বের অন্তরালে, একটা প্রকাণ্ড Philosophy বা দর্শনশাস্ত্র নিহিত আছে। এই দেহতত্ত্ব বৃষ্টিতে হইলে, নাম, রূপ, ভাব, বস এই চারি পদার্থকে বৃষ্টিতে হইবে। এই দেহতত্ত্ব বৃষ্টিতে হইলে ঘটক্রমের ব্যাপারটা বৃষ্টিতে হইবে। নহিলে বান্ধালা সাহিত্যের অর্ধেকটা বৃষ্টিতে পারিবে না, বান্ধালীর বিশিষ্টতাবের অর্ধেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না।

বান্ধালীর ব্যক্তিত্ব তাহার আবিষ্কৃত সকল ব্যাপারে যেন শতমুখী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। পূর্বে কেবল মিথিলার জ্বারের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইত, মিথিলার পণ্ডিতগণ বান্ধালী ছাত্রদের পুঁথি লিখিয়া আনিতে দিতেন না। বান্ধালার কাণ্ডা ভট্টশিরোমণি রঘুনাথ মিথিলায় যাইয়া স্বাধীনভাবে অধ্যয়ন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল পুঁথি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। দেশে আসিয়া একচক্ষু রঘুনাথ তাবত জ্ঞানপ্রসূ লিপিবদ্ধ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ণ-মনীষা-প্রভাবে নব্য-জ্ঞানের উদ্ভাবনা করিলেন। ফলে মিথিলার একচেটিয়া চূর্ণ হইল, নবদীপ নব্য এবং পুরাতন জ্ঞানের পঠন-পাঠনের কেন্দ্রস্থল হইল। ইহাই বান্ধালীর বিশিষ্টতার পবিচারক। বান্ধালী জ্ঞানের এই অভ্যুদয়-বা চারিশত বৎসর কাল অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছিলেন, নবদীপকে নব্য-জ্ঞানের অধিতীয় কেন্দ্র করিয়া রাখিয়াছিলেন।

দায়ভাগ ও জীর্নবিশ্বাসে বান্ধালী স্মার্ত যে গণবাদের পরিচয় দিয়াছেন তাহা ইংলণ্ডে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কল্পনামাত্র ছিল। জীমূতবাহনের সিদ্ধান্ত-সকল পুরামাত্রায় এখনও ত্রীশিক্ষাতি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। জীমূতবাহনের “দায়ভাগ” মিতাক্ষরার প্রকাণ্ড প্রতিবাদ, Feudalism-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ protest। সহস্রবৎসর পূর্বে, সকল সভ্যজাতির আগণভাগে বান্ধালী এই প্রতিবাদট করিয়া গিয়াছেন।

স্মার্ত-ভট্টাচার্য্য বধুনন্দন একজন বিদ্রোহী Protestant ছিলেন। তিনি

ব্রাহ্মণতাব জাতি-সকলের মধ্যে যে ব্যাপক সময় সাধনের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন তাহা অপূর্ণ এবং অতুল্য। তাহারই প্রভাবে বান্ধালায় আচার্য্য-দিগের “ছুৎসার্গ” দাক্ষিণাত্যের তুল্য প্রবল হইতে পারে নাই।

ঐচ্ছিক-প্রবর্তিত গোড়ার বৈকব ধর্ম বান্ধালীর বিশিষ্টতাব আর-একটা উপাদান।

আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ এবং শাক্তানন্দতরঙ্গিণী-প্রণেতা ব্রহ্মানন্দ সিংহ বান্ধালীর বিশিষ্টতা উন্মেষের আর দুইজন সাধক। ইহারাই “বাগীশ পদ্ধতি” অবলম্বন করিয়া বান্ধালায় “শৈব বিবাহের” প্রচলন করিয়াছিলেন। শৈব বিবাহে নারীর জাতি-বিচার কবিত হই না, যৌবনের পূর্ণ উন্মেষ না ঘটিলে শৈব বিবাহ হইতে পারে না। এই শৈব-বিবাহের প্রভাবে বান্ধালায় নানা জাতির সম্মেলন ঘটাইয়াছিল, শাক্তের যেমন শৈব বিবাহ, বৈকবের তেমন “কপ্পী বদল” ছিল।

দীপঙ্কর ঐজ্ঞান অথবা বিক্রমপুরের নাস্তিক ভট্টাচার্য্য বান্ধালীর ব্যক্তিত্বের একজন প্রধান সহায়ক। ইনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন, তাই লোকে ইহাকে নাস্তিক ভট্টাচার্য্য বলিত। দীপঙ্কর ভট্টানে তিব্বতে চীনে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। বান্ধালায় বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ পূর্বে এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন; টেকুরে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়; নেপালে বান্ধালী কীর্তিব অনেক পুঁথিপত্র আছে। ছিল দিন যখন বান্ধালী বৈবাহিক সূত্রে তিব্বৎ চীন নেপাল ভূটান প্রভৃতি দেশের সহিত সংবদ্ধ ছিল; ছিল দিন যখন বান্ধালায় অসংখ্য বিদেশীর পণ্ডিত আসিয়া-বাস-কবিত এবং বান্ধালী রমণীকে শৈব বিবাহের সাহায্যে শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গৃহস্থ হইয়া থাকিত। “ভরার মেয়ে বিবাহ” বান্ধালা দেশে বংশ ও কষ্টশ্রোত্রীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল; শাক্ত কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে এবং কুলচাচারী অস্ত্র জাতির মধ্যে পাকস্পর্শের দিনে নব-বধুর জাতি-কুলের পবিচার লইয়া ঘোঁট হইত না। ইহা একটা বড় কথা।

দেবীবরের মেলবন্ধন এবং কোলীজের নবপ্রতিষ্ঠা বান্ধালীর ব্যক্তিত্বের একটা বড় পরিচয়। দেবীবর মেলবন্ধন করিয়া যে কত সাক্ষ্যকে চাকিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আব এখন হিন্দাব করিয়া বলা যায় না।

বান্ধালার প্রথম ও মধ্য যুগের সাহিত্যেও একটা অপূর্ণত্ব আছে। কবিকঙ্কণ, ঘনরাম প্রভৃতি সকল বড় কবিই ব্রাহ্মণ, পরন্তু তাহাদের লিখিত সকল মহাকাব্যের Hero and Heroine নায়ক-নারিকা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় নহে। গন্ধবণিক, সন্দোপ, কৈবর্ত, গোড়া, গোরাল প্রভৃতি জাতীয় পুরুষ-সকলই এই-সকল কাব্যের নায়ক। ভারতজন্মের পূর্বকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণ-লিখিত সকল মহাকাব্যে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্তের লেশমাত্র নাই। চণ্ডীর ঘট স্থাপন ফুল্লরা নিজেই কবিত, তঙ্কজ ব্রাহ্মণ ডাকিতে হইত না। কালকেতু, পুষ্পকেতু, ইছাই ঘোষ, লাউসেন, ভীম, ধনপতি প্রমুখ নায়কগণ কোন্ জাতীয় ছিলেন? ইহার যদি মহাকাব্যের নায়ক হইতে পারেন, তবে তাহারিগকে অস্পৃশ্য বলি কোন হিসাবে? কাজেই বলিতে হয় স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের, জল আচবস্ত্রীর এবং জল অনাচরণীর মধ্যে এমন অজ্ঞাত কোন তত্ত্ব আছে, যাহা এখনও আমাদের ধর্মিতে পারি নাই।

বাংলা ভাষা বান্ধালীকে অপূর্ণ বিশিষ্টতা দিয়াছে।

বান্ধালীর বিশিষ্টতা এবং ব্যক্তিত্ব সমাজ-শরীরের সর্বাঙ্গবয়বে, শিল্প-কলায়, গানে-নাচে, চিকিৎসা-শাস্ত্রে, চিকিৎসা-পদ্ধতিতে, ঔষধ-নির্মাণে, লাঠি খেলায়, কুসপা-বগপা নির্মাণে ও ব্যবহারে, নৌশিল্পে, নৌকা প্রস্তুতিতে, কথকতায়-ব্যাখ্যায়, বরন-শিল্পে, তসর-পবনের বরন প্রস্তুতিতে, গজদন্তের কারুকার্যে, স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কারে,—সভ্যজাতির সকল ব্যসন-বিলাসে যেন সদাই স্পষ্ট হইয়া আছে। মনোমী শ্রীযুত অক্ষয়কুমার

মৈত্রেয় সপ্রাণ করিয়া দিয়াছেন যে বাঙ্গালার ভূগর্ভ হইতে যত প্রতিম। বাহির হইতেছে, যত বুদ্ধিমত্তি আবিস্কৃত হইতেছে, তাহাদের Tech-
nique ভারতবর্ষের অন্তঃপ্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। বাঙ্গালীর
ভাষার্য অপূর্ণ ও স্বতন্ত্র। বাঙ্গালার বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে খুব বিশিষ্টতা
একট হইয়া আছে; বাঙ্গালার কবিগোলাদেব চোল বাজনা অপূর্ণ
ও অনন্তসাধারণ। এমন ভাবে চোল বাজাইতে ভাবতবর্ষের আব কোন
জাতি পারে না। বাঙ্গালীর গৃহনির্মাণ-পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। এমন ঘর
ছাইতে ভাবতবর্ষের, বুঝি ঐ পৃথিবীর আব কোন জাতিতে পাবে না।
বাঙ্গালার আটচালা ও চণ্ডীমণ্ডপসকল সত্যি বিদেশীয়ের বিস্ময় উৎপাদন
করিত; তেমনটি পৃথিবীর আর কোথাও ছিল না—নাইও। বাঙ্গালার
“পঞ্চের কাজ” বাঙ্গালীর নিজস্ব; উহা বাঙ্গালার বাহিবে ছিল না,—
নাইও। এমন কি বাঙ্গালার জনান্দন, বিশ্বস্তব, জনমেজয়
প্রভৃতি কর্মকাবগণ যেমন ভোপ কামান তৈয়ার করিতে পাবিত,
দিল্লীর কারিকবে তেমনটি পাবিত না, আহান-কোষা, দল-মাদল, কালে ঐ
প্রভৃতি কামান এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বাঙ্গালীর নৌশিল্প
সত্যি অপবাজ্জেষ ছিল। এমন নৌকা বানাইতে, জাল বুনিতে ভাবতব
আর কোন জাতি পাবিত না। বাঙ্গালার “ঘট বৈঠা ছিপে” চড়িয়া
মীরকাসেম একরাতে গোলাগিরি হইতে মুস্বেবে গিয়াছিলেন। বাঙ্গালার
আব-একটা শিল্প ছিল—কুহুম-শিল্প। নানা পুষ্পের আভরণ ও অলঙ্কার
বাঙ্গালী যেমন তৈয়ার করিতে পাবিত, এমন আর কোন জাতি পাবিত
না। আওরঙ্গজেবপুত্র যুবরাজ মহম্মদ পিতাকে লিখিয়া পাঠাইয়া-
ছিলেন,—“কি আব মণিমুক্তা, চুপি পাল্লার লোভ দেখাও পিত, বাঙ্গালার
কুহুমভরণ দিল্লীর জড়োয়া অলঙ্কার-সকলকে হেলায় পবাজয় কবে।
এমনটি তুমি দেখ নাই।” সে শিল্প লোপ পাইয়াছে।

বাঙ্গালী আর্ধ্যবর্তের আর্ধ্যগণ হইতে একটা সম্পূর্ণ পৃথক জাতি।
বৈদিক যুগের সময় হইতে বাঙ্গালার এক স্বতন্ত্র সভ্যতা ও মনুষ্য-সমাজ
বিদ্যমান ছিল। প্রাচ্যের সে সভ্যতা বৈদিক সভ্যতাব প্রতিদ্বন্দী ছিল।
বাঙ্গালার বৈদিক ধর্ম, সভ্যতা, আচার ব্যবহাব কিছুই শিকড় গাড়িয়া
বসিতে পাবে নাই। যুগেযুগে, বাবেবাবে পশ্চিম দেশ হইতে ব্রাহ্মণ
ক্ষত্রিয়াদি আম্রানী করিয়া বাঙ্গালায় যোগ-যজ্ঞাদিবে তেমন প্রচলন হয়
নাই। এত আক্রমণেও বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী জাতি স্বীয় বিশিষ্টতা বঙ্গ।
কবিত্তে পাবিয়াছিল, উপরন্তু আগন্তুকগণকে বাঙ্গালার বিশিষ্টতার মণ্ডিত
করিতে পারিয়াছিল। বাঙ্গালী আর্ধ্যবর্তের অনুগামী হয় নাই বলিয়া
মনে হয় আর্ধ্যবর্তের পণ্ডিতগণ যোগা করিয়া দিয়াছেন যে, তীর্থযাত্রা
ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে যাইয়া বাস করিলে, “পুনঃসংস্কার-
মর্হতি।” কেননা বাঙ্গালার দীর্ঘকাল বাস করিলে সোমরসপারী গৌর
আর্ধ্যগণের জাতিনাশ ঘটত, তাহাদের বিশিষ্টতা নষ্ট হইত। বাঙ্গালার
জৈন ধর্মের প্রথম বিকাশ হইয়াছিল, এমন কথা বলিলে অত্যাঙ্গি কবা
হইবে না। মহাবীর রাজমহলেব কাছে কোন গ্রামে তুমিট হইবা
জীবনেব অর্ধেকটা কাল বর্তমান বিভাগে বা রাঢ়দেশে কাটাইয়াছিলেন;
বাল্মপুত্র্য উত্তর রাঢ়ে ও ভাগলপুর জেলার পূর্ববংশে জৈন ধর্ম প্রচার
করিয়াছিলেন। এই জৈন ধর্ম বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার পুষ্টি পক্ষে অনেকটা
সহায়তা করিয়াছিল। পোবক্ষনাথের “নাথী ধর্ম” বাঙ্গালার উত্তর রাঢ়ে
খুব প্রসার লাভ করিয়াছিল। একপক্ষে জৈন তীর্থঙ্করগণ, অন্য পক্ষে
সৌরক্ষনাথের যোগী শিষ্যগণ বাঙ্গালীর বিশিষ্টতাব পুষ্টি পক্ষে অনেক
উপাদান সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালারই কপিল-কণাদ, বাঙ্গালারই
অহিসা পরম ধর্মের বেদী, বাঙ্গালারই জৈনাচার্যগণের লীলাক্ষেত্র,
বাঙ্গালার সিদ্ধাচার্যগণের প্রভাব এখনও ধর্ম-কর্মে, আচার-ব্যবহাবে
পরিষ্কৃত।

বঙ্গবাণী, ভাদ্র

শ্রী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার নবযুগের কথা

ব্রাহ্মসমাজ ও স্বাধীনতাব সংগ্রাম

ইংরেজী শিক্ষার ফলে বাংলাব নব্যশিক্ষিত সমাজে যে স্বাধীনতার
আদর্শ জাগিয়া উঠে, ব্রাহ্মসমাজই সর্বপ্রথমে সেই আদর্শকে জীবনেব
সকল ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে পড়িয়া তুলিবাব চেষ্টা করন। এই কারণেই
পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব এতটা
বাড়িয়া উঠিয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময়েই এই স্বাধীনতাব
সংগ্রাম আরম্ভ হয়।

এই স্বাধীনতাব সংগ্রাম পবিপূর্ণমাত্রায় বাধিয়া উঠে কেশবচন্দ্রের
নেতৃত্বাধীনে। সর্বদ্বন্দ্বী ধর্মের মূলমন্ত্র হইল সত্য ও স্বাধীনতা।
নিজের বিচারবুদ্ধিতে বাহা সত্য বলিয়া মনে হয়, এাণ পাত করিয়াও
তাহার অনুসরণ কবিত্তে হইবে। এ বিষয়ে কোনও গ্রন্থেব,
কোনও পুর্বোহিত-সম্প্রদায়েব, সমাজের স্বাধীনতা স্বীকার করিলে
চলিবে না। তাহাতে ধর্মহানি হইবে। এই মূলমন্ত্র স্বাধীনতাব মন্ত্র।
এইভাবে সেকালের শিক্ষিত লোকমাজেই ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব
কেশবচন্দ্রের দোশাবোধকে সে সময়ে বিশেষভাবে জাগাইয়া তুলেন।

বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী যে স্বাধীনতামন্ত্র সাধন করিয়া
আসিয়াছে, বলিতে গেলে কেশবচন্দ্রই সেই মন্ত্রের একরূপ প্রথম
দীক্ষাভক্ষ। জাতীয় স্বাধীনতা জগতের সর্বত্রই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাব
উপবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যেখানেই জাতীয় স্বাধীনতাব প্রচেষ্টা
হইয়াছে, সেইখানেই তাহার গোড়ায় একটা ধর্মের প্রেবণা জাগিয়াছে।
এবং এই ধর্মের প্রেবণাষ মানুষ আপে ভিতরের বাঁধন কাটিয়াছে,
নিজের চিন্তা ও চিন্তকে বাহিবেব বন্ধনমুক্ত করিয়াছে, পরিবাবে ও
সমাজে এই স্বাধীনতাব আদর্শকে পড়িয়া তুলিতে গিয়াছে, এবং
পরিবাসে এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হৃদয় ভিত্তিবে উপরেই নিজের রাষ্ট্রব
স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা কবিবার জন্ত অগ্রসব হইয়াছে। ভিত্তিবে যে দাঁস,
বাহিবে সে স্বাধীন হইতে পারে না। পরিবাবে এবং সমাজে যে
স্বাধীনতা বিচারবুদ্ধি এবং বিশ্বাস অনুসাবে চলিতে ভয় পায়, সে
কখনও নির্ভাক হইয়া একতন্ত্র ব্রাহ্মজতির দম্বাধীন হইতে পারে না।
কেবল সাংসারিক সুখ সুবিধা যেখানে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাব মূল
প্রেরণা হইয়া রহে, সেখানে এই স্বাধীনতার সংগ্রাম কদাপি জয়যুক্ত
হইতে পারে না। যেখানে জয়যুক্ত হয়, সেখানে দেশের জনসাধারণে
এক স্বাধীনতা হইতে মুক্তিস্থান করিয়া অপর স্বাধীনতাতে যাইয়া পড়ে,
‘স্ব’য়ের উপরে ঝাঁড়াইতে পারে না। আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাব
প্রচেষ্টা যে পরিমাণে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শের প্রেবণা লাভ
করিয়াছে, সেই পরিমাণেই তাহা বিশুদ্ধ উদার এবং অপবাজ্জেষ
হইয়াছে এবং হইতেছে। এই দিক দিয়া ভাবতের, বিশেষতঃ বাংলার,
বর্তমান স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করিলে, ইহাব
মূলে একরূপ প্রথম শিক্ষা- ও দীক্ষা-ভক্ষরূপে কেশবচন্দ্র এবং তাহাব
প্রতিষ্ঠিত ভাবতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে দেখিতে পাই।

কেশবচন্দ্র বা ভাবতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সাক্ষাৎভাবে রাষ্ট্রীয় পবাসীন-
তাব শৃঙ্খল ভাঙিতে চেষ্টা করেন নাই, একথা সত্য। কিন্তু সে সময়
রাষ্ট্রীয় বন্ধনের বেদনাও লোকে অনুভব করিতে আরম্ভ করে নাই।
বন্ধনের বেদনা যেখানে নাই, মুক্তিব বাসনাও সেখানে জাগে না।
পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ইংরেজের শৃঙ্খল আমাদের গলায় বাধে নাই।
প্রচলিত হিন্দুধর্মের কর্মকাণ্ডে এবং জাতিভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত ও
ছুৎসার্গচারা সমাজেব কঠোর বন্ধুটাই আমাদের গলায় এবং হাতে
ও পায়ে বড়ই বাজিয়া উঠিয়াছিল। এইখানেই বন্ধনের বেদনা জাগিয়া-
ছিল। পোবাপিক দেবদেবীতে বিশ্বাস নাই, অথচ তাহাদিগেব নিকটে

মাথা নোয়াইতে হইত ; ব্রাহ্মণের অতিপ্রাকৃত অধিকাংশে আত্মা-ছিল না, অথচ পরিবারের শাসন-ভয়ে গৃহপার্বণে ব্রাহ্মশাস্তিতে বাসন ডাকিয়া সস্ত্র পড়িতে হইত। সংস্কৃতজ্ঞান বা শাস্ত্রজ্ঞান তখনও জন্মে নাই ; হস্তরাং না পুরোহিতের, না যজ্ঞমানেব, কাহাবও মন্ত্রের অর্থবোধ ছিল না, অথচ টিয়াপাখীর মতন এ সকল অর্থশূন্য শব্দ আবৃত্তি কবিত্তে হইত। এই-সকল ব্যাপাবে বিচারবুদ্ধিতে আঘাত লাগিত। এই আঘাতের তাড়নাতেই মন বিমোহী হইয়া উঠে। যাঁহারা সমাজ-ভয়ে এ-সকল অনুষ্ঠান করিতেন তাঁহাবাও মনে মনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়া ছিলেন। সত্যধর্মের প্রবেশ—বিশ্বাস ও ভক্তি। বিশ্বাস বিচারবুদ্ধির দ্বারা সমর্থিত হইলেই সত্যও শক্তিশালী হয়। এখানে তাহা হইত না। সমাজে জাতিভেদ মানিয়া চলিতে হইত। অথচ নব্যশিক্ষিত লোকেরা কিছুতেই বিচারবুদ্ধি কিংবা নিজেদের ধর্মবুদ্ধি দ্বারা এই কৃত্রিম সামাজিক ভেদবাদকে সত্য বা কল্যাণকর বলিয়া মানিয়া লইতে পারিতেন না। এই জাতিভেদ মানিতে যাঁহাবাও তাঁহাদের অন্তরে গুরুতর আঘাত লাগিত। যাঁহাবা মানিতেন তাঁহাবাও নিজের কাছে নিজে অত্যন্ত খাটো হইয়া থাকিতেন। আর নিজের কাছে নিজে খাটো হইয়া থাকার মতন দুর্বলতা মানুষের আবেদন কিছুতে হয় না। ইহাতে তাহাব আত্মদমনে যেমন আনাত লাগে, পবেব অপমানে বা নির্ঘাতনে তাহাব শতাংশের একাংশও আঘাত লাগিতে পারে না। এই বন্ধন-বেদনটাই তখন আমাদের শিক্ষিত সমাজে অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। এইরকম স্বাধীনতা এবং মুক্তির সংগ্রাম সর্বপ্রথমে ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রেই বাধিয়া উঠিল। সেই সাধনার উত্তরাধিকারীরাই বাংলা আজি পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতার সাধনে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু হইয়া আছে। স্বাধীনতার গৌরববোধ জাতীয় স্বাধীনতার প্রথম বনিয়াদ। এই স্বাধীনতাভিমান সর্বত্রই জাতীয় জীবনের এবং জাতীয় আত্মচৈতন্য—National life এবং National consciousnessএব স্থচনা করে।

হুনিয়াতে আজিও যে আমাদের কিছু দিবাং আছে, সত্য জগতের যে আমাদের নিকটে শিক্ষণীয় বিষয় আছে, কেশবচন্দ্রই প্রথমে শিক্ষিত বঙ্গালীর অন্তরে এই ভাবটা জাগাইয়া দেন।

প্রথম যুগের স্বাধীনতার সংগ্রামে কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার অনুগত নবীন ব্রাহ্ম যুবকবাই সেনানী হইয়াছিলেন। তাঁহারা যে স্বাধীনতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন তাহাবই উপরে আমাদের বর্তমান স্বাধীনতার বৃহত্তর প্রচেষ্টা গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলায় নবযুগের ইতিহাসে কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের ইহাই প্রধান কীর্তি।

বঙ্গবাণী, ভাদ্র

শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

রুষ্টি-রৌদ্র

খুঁটি-বাঁধা ডাকাত সেজে
দল বেঁধে মেঘ চলেছে যে
আজকে সাবাবেলা।
কালো কাঁপির মধ্যে ভরে
স্বর্ঘ্যকে নের চুরি করে
ভয়-দেখাবার খেলা।
বাতাস তাদেব ধবতে মিছে
ইপিয়ে ছোট পিছে পিছে,
যায় না তাদেব ধবা।
আজ যেন ঐ জড়সড়

আকাশ জুড়ে মস্ত বড়
মন-কেমন-করা।
বটের ডালে ডানা ভিজে
কাক বসে' ঐ ভাবচে কি যে,
চড়ুইগুলো চুপ।
বৃষ্টি হয়ে গেছে ভোরে,
সম্মনে-পাতার ঝরে' ঝরে'
জল পড়ে টুপটুপ।
লাজের মধ্যে মাথা ধুয়ে
খাঁদন-কুকুর আছে শুয়ে
কেমন একরকম।
দালানটতে ঘুবে ঘুরে
পায়রাগুলো কাঁদন-ধরে
ডাকচে বন্ধুকম।
কার্তিকে ঐ ধানের ক্ষেতে
ভিজে হাওয়া উঠল নেতে
সবুজ চেউষের পরে।
পবন লেগে দিশে দিশে
হি হি কবে' ধানের শিবে
শীতের কাঁপন ধবে।
গোবাল-পাড়ার লক্ষ্মী বড়ি
ছেঁড়া কাঁধায় মুড়িহাড়ি
গেছে পুকুর-পাড়ে,
দেখতে ভাল পায় না চোপে
বিড়বিড়িয়ে বকে' বকে'
শাক তোলে গাড় নাড়ে।
ঐ স্বমায়ম্ বৃষ্টি নামে
মাঠের পায়ে দুরের গ্রামে
কাঁপুয়া কাঁপের বন।
গরুটা কার থেকে থেকে
খোঁটার বাঁধা উঠচে ডেকে,
ভিজ্জে সারাক্ষণ।
গদাই কুসোর অনেক ভোরে
সাজিয়ে নিয়ে উঁচু কবে'
ইাড়ির উপর ইাড়ি।
চলছে রবিবারের হাটে
গাম্ছা মাথায় ধলের ছাঁটে
হাঁকিয়ে পক্ষর গাড়ি।
বন্ধ আমার রইল খেলা,
ছুটিব দিনে সাবাবেলা
কাঁটবে কেমন কবে' ?
মনে হচ্ছে এমনিতব
বব্বে বৃষ্টি ঝরঝর
দিন বাস্তব ধবে'।
এমন সময় পুবেব কোণে
কখন যেন অস্ত্রমনে
কাঁক ধরে' যায় মেঘে,
দুখের চাদর সরিয়ে কেলে
হঠাৎ চোখের পাতা মেলে
আকাশ ওঠে মেগে।

ছিঁড়ে-বাঁওবা মেঘের থেকে
পুত্রে বোদ পড়ে বৈকে,
লাগায় ঝিলিমিলি ;
বাঁশবাগানের মাথাষ মাথাষ
ঠেঁতুল-গাছের পাতার পাতায়
হাসায় ঝিলিমিলি ।
হঠাৎ কিসেব মস্ত এসে
ভুলিয়ে দিলে এক নিমেষে
বাদল-বেলায় কথা,
হাবিয়ে পাওয়া আলোটিবে
নাচায় ডালে ফিবে কিয়ে
বেড়ান ঝুমকো-লতা ।
উপর নীচে আকাশ ভরে'
এমন বাদল কেমন কবে'
হয়, সে কথাই ভাবি ।
উলটপালট খেলাটি এই,
সাজের ত তাব নীমানা নেই,
কার কাছে তার চাবি ?
এমন যে ঘোব মন-খাবাশি
বুকের মধ্যে ছিল চাপি
সমস্ত খন আজি,—
হঠাৎ দেখি সবই মিছে,
নাই কিছু তার আগে পিছে,
এ বেন কার বাজি ।

সন্দেহ, ভাদ্র

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের ঐশ্বর্য

ভারতের ঐশ্বর্যেব শ্রেষ্ঠ পরিচয় সম্রাট শাহজহানের বাজ্যকালেই পাওয়া যায়। প্রাচ্যবাজসিক ঐশ্বর্য-গণিমায় ভারতবর্ষ বোধ হয় সেই সময় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। আব্দুল হামিদ লাহোরীর সমসাময়িক ইতিহাস থেকে ১৬৪৮ খৃঃ সম্রাট শাহজহানের অর্থসম্ভারের একটি ঠিক ধারণা করিতে পারা যায়। তখনকার টাকার মূল্য ছিল উনবিংশ শতাব্দীর ২৩ শিলিং অর্থাৎ আঠাব আনার সমান। এই সঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে এখন এক টাকায় যে জিনিষ কিনিতে পাওয়া যায় তখন ইহাব সাতগুণ জিনিষ পাওয়া যাইত।

সমস্ত মুদ্রা সাম্রাজ্যে ২০ কোটি টাকা বাজনা আদায় হইত। সম্রাটের খাস মহলের আয় ছিল দেড় কোটি টাকা; তাহা হইতে সম্রাটের নিজের খরচ চলিত।

রাজস্বের প্রথম ২০ বৎসরে শাহজহান দান ও পুরস্কার কার্যে ৯৩ কোটি টাকা ব্যয় কবেন, তাহার মধ্যে ৪৩ কোটি টাকা নগদ আর ৫ কোটি টাকার জিনিষপত্র।

প্রাসাদসৌধ প্রভৃতি নির্মাণে তিনি কি বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন তাহা নিয়ে তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে।

প্রাসাদ সৌধমালা :—

চূর্ণাভ্যস্তবহ বোতী মসজীদ, প্রাসাদ ও প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান

৬০ লক্ষ টাকা

তাজমহল

৫০ " "

দিল্লীর সৌধমালা :—

প্রাসাদসমূহ

৫০ লক্ষ টাকা

জুম্মা মসজীদ	১০ " "
দিল্লী নগরীর চাবিদিকে প্রাচীর	৪ " "
দিল্লীর সহবতলীর ইন্দগাহ	৩ " "
লাহোবের সৌধমালা :—	
প্রাসাদ, উদ্যান ও খাল	৫০ লক্ষ টাকা
কানুলের সৌধমালা :—	
মসজীদ, দুর্গ, প্রাসাদ ও নগরপ্রাচীর	১২ " "
কান্দহারের সৌধমালা :—	
প্রাসাদ ও উদ্যান	৮ লক্ষ টাকা
কান্দহারের সৌধমালা :—	
কান্দহারের বিশ্ব ও জমিন্দাবাবের দুর্গ	৮ " "
আজমীরের সৌধমালা :—	
আজমীর ও অহমদাবাদ	১২ " "
মুশলিমপুরের সৌধমালা :—	
রাজপ্রাসাদ	৬ " "
যুবরাজ দারাগুকেব প্রাসাদ	২ " "

মোট ২৭২৩ লক্ষ টাকা

সম্রাটের ৫ কোটি টাকার হীরা জহবত ছিল। তা বাদে ২ কোটি টাকার হীরা জহবত শাহজাদা ও শাহজাদী ও অন্যান্য সকলকে দান করিয়াছিলেন।

সম্রাট নিজের মাধ্যম গলাষ বাহতে ও কোমরে যে-সকল গহনা পবিতেন তাবই হীরা-জহবতের মূল্য ছিল ২ কোটি টাকা। এই সম্রাটের নিজব্যবহার্য্য ২ কোটি টাকা মূল্যের রত্নালঙ্কার হাবসে দাসীদেব জিন্মায় থাকিত। বাকী ৩ কোটি টাকার রত্নালঙ্কার বাহিরে জীতদাসের জিন্মায় থাকিত।

সম্রাটের জপমালায় ৫ খানা রুবি [চুনি] ও ৩০টি মুক্তা ছিল। জপমালাটির মূল্য ছিল ৮ লক্ষ টাকা। এই জপমালাটি ছাড়া আরও দুইটি জপমালা ছিল। তাহারও প্রত্যেকটিতে ১২৫টি করিয়া বড় বড় রুবি [চুনি] ছিল। প্রত্যেক দুটি জপের দানব মাঝখানে একটি করিয়া ইয়াকুতও ছিল। জপমালার সম্মুখটি (মাঝখানের বড় রুবিটার) ওজন ছিল ৩২ রতি, আর তাব মূল্য ছিল ৪০,০০০ হাজার টাকা। আব দু'টো মিলিয়া দাম ছিল ২০ লক্ষ টাকা। এই জপমালার রুবি প্রভৃতির অধিকাংশই সম্রাট আকবরের সংগৃহীত।

প্রথম জপমালাটিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর রত্নাদি ছিল। পাগড়ী-ঘেরা সরপেচ-এই সবচেয়ে দামী ও বড় রুবিগুলি ছিল। সিংহাসনা-বিরোহণের (জলদ) বাৎসরিক উৎসবের দিন শুধু এই বহুমূল্য সরপেচ সম্রাট পাগড়ীতে ব্যবহার করিতেন। ইহাতে ৫টি বড় রুবি, ২৪টি মুক্তা ছিল। মাঝখানের বড় রুবিটির ওজন ২২৮ রতি ও মূল্য ২ লক্ষ টাকা, এবং সরপেচটির সর্বসমেত মূল্য ১২ লক্ষ টাকা। ১৬৪৪ খৃঃ ১১ ই নবেম্বর এই সরপেচের সহিত ৪০,০০০ হাজার টাকা মূল্যের একটি মুক্তা পাঁখিবা দিয়া ইহার মূল্য আবও বৃদ্ধি করা হয়। সম্রাটের নিজের হীরা-জহবতের মধ্যে সবচেয়ে বড় হীরার ওজন ৪৩০ রতি এবং মূল্য ২ লক্ষ টাকা। এই রুবিটি অবশ্য সরপেচের বড় রুবিটি অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। আর একটি ৪৭ রতি ওজনের রুবি ছিল, সেটির মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা।

১৬৫৩ খৃঃ ১২ই মার্চ তারিখে সম্রাট শাহজহান সর্বপ্রথম তাঁর বড় সাবের ময়ূব-সিংহাসনে উপবেশন করেন। হামিদ লাহোরী বলেন, “সম্রাট আকবর, জহাঙ্গীর, শাহজহান ইঁহার তিন পুরুষ ধরিয়া বহু হীরা মুক্তা সংগ্রহ করিয়াছেন। লোকের যদি তাহা না দেখিল তবে তাহার মূল্য কি ? সম্রাটও এরূপ ভাবিয়া বাহির-

বাড়ীতে ক্রীতদাসদের কাছে যে ২ কোটি টাকা মূল্যের হীরা জহরত থাকিত-তাহা হইতে ভাল ভাল কএকটি বাছিয়া লইলেন। এই কএকটি মূল্য ছিল ১৬ লক্ষ টাকা। সর্বকারী সর্বকারদের ডাকিয়া এই-সকল হীরা মুক্তা প্রভৃতির সঙ্গে এক লক্ষ তোলা সোনাও দেওয়া হইল। তখন এই এক লক্ষ তোলা সোনার মূল্য ছিল ১৪ লক্ষ টাকা। বেবাদল খাঁ ছিলেন সর্বকারদের প্রধান। তাঁহার কর্তৃত্বধানে এই সোনা ও হীরা প্রভৃতি দিয়া ময়ূর-সিংহাসন নির্মিত হইল। ময়ূর-সিংহাসনখানি ৩৬ গজ লম্বা, ২৬ গজ চওড়া ও ৫ গজ উঁচু ছিল। সিংহাসনের ছাদের তলা এনামেল (মিনা) করা হইল; ছাদের ভিতরের দিকে খুব অঙ্গসংখ্যক হীরা মুক্তা বসান ছিল, কিন্তু বাহিরের দিকে অসংখ্য পাথর বসান ছিল। বারটি পাল্লাব খামের উপর ছাদ। তার উপর মণিমুক্তা-খচিত দুইটি ময়ূর, আর এই দুই ময়ূরের মাঝে ঐরূপ মণিমুক্তা-খচিত একটি পাহ। গদিতে উঠিবাব তিনটি সিঁড়ি। সিঁড়িগুলি আবার রেলিং দিয়া ঘেরা। শুধু সম্রাটের বসিবাব জায়গার সামনে কোনও রেলিং ছিল না; অস্ত্র এগার দিকেই রেলিং ছিল। এই এগারটি বেটনীর মধ্যটিই ছিল সবচেয়ে ভাল। এই মধ্যটিতেই সম্রাট হেলান দিয়া বসিতেন। এইটিই তৈয়ারী করিতে খরচ পড়িয়াছিল ১০ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্য-মণিটিব দাম ১ লক্ষ টাকা। এই মধ্য-মণিটি পারস্ত-সম্রাট প্রথম শাহ আব্বাস সম্রাট জহাঙ্গীরকে উপহাস দেন। এই রূবিটিতে তৈমূর মীর শাহ-রব-মৌজা উলুক বেগ, শাহ আব্বাস, আকবর-পুত্র-জহাঙ্গীর ও শাহ-জহানের নাম খোদিত ছিল। সিংহাসনের ভিতরের দিকে হাজী মহম্মদ জান কুশীর রচিত একটি কবিতা (৪০ লাইনে) মিনা-করা অক্ষরে লিখিত হয়। কবিতাটির শেষ তিনটি শব্দ ছিল এই—আওরঙ্গ-ই-মাহানশ-ই-আদিল অর্থাৎ “জাহাঙ্গীরের রাজ্যধিরাজের সিংহাসন।” তাবপব সিংহাসনটির নির্মাণেব তারিখ দেখা।

সর্বকার প্রভৃতির মাহিনা বাদে শুধু সিংহাসন তৈরীর মালমশালা ক্রয় করিতেই এক কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল।

ভারতের এই বিপুল রাজকীয় অর্থসম্ভার লুণ্ঠিত হইবাব সম্ভাবনা তখনকার দিনে যথেষ্টই ছিল। অতএব ইহা লুণ্ঠনের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য সেইরূপ বিপুল সৈন্তসামন্ত রাখিতে হইত। তাই দেখিতে পাই ১৬৪৮ খৃঃ সম্রাটবাহিনী ছিল—

২০০,০০০ অশারোহী

৮,০০০ মনসবদার

৭,০০০ আহুদী এবং অশারোহী তীবন্দাজ

৪০,০০০ তীরন্দাজ ও পৌলন্দাজ

ইহার মধ্যে ১০,০০০ হাজার সম্রাটের সঙ্গে থাকিত। বাকী ৩০,০০০ হাজার বিভিন্ন স্থানে থাকিত। ইহা ছাড়া বিভিন্ন রাজপুত্র ও আদালত-ওসরাহের অধীনে ১৮৫,০০০ অশারোহী ছিল। সর্বসমেত ৪৪০,০০০ পদাতক ছিল। এই সংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন পরগণার কোষদার ও ক্রোড়ী আমলাদের অধীনেও যে-সকল স্থানীয় পদাতক ছিল তাহাদের হিসাব ধরা হয় নাই।

শাহ-জহানের বন্দী হইবাব অব্যবহিত পূর্বে তিনি যে চিঠি লিখিয়া-ছিলেন তাহাতে নিম্নে ২ লক্ষ সোনারের প্রভু বলিয়া বর্ণনা করিয়া-ছেন। তখনকার দিল্লীর পদতনের সংখ্যা আর ৮৮ লক্ষ ছিল, যদিও সমগ্র ভারতবর্ষ-তাঁহার অধীনে ছিল না।

প্রভাতী, ভাদ্র

শ্রী যক্ষনাথ সরকার

কলার কথা

চরশিল্প হচ্ছে মানবান্নাভ সেই উদার ক্রীড়াক্ষেত্র, যেখানে সে একদিকে ঐকান্তিক প্রাণচেষ্টা অপর দিকে শুদ্ধমাত্র পুণ্যতৃষ্ণার দোটান থেকে ছাড়া পেয়ে হাঁক ছাড়ছে; এবং যুগে যুগে তার সম্ভ্রাতা বর্ষরত্ন প্রত্যাবর্তনের সঙ্কট থেকে বেঁচে যাচ্ছে। যশাসম্মত ব্যাপক কবে' যদি দেখি,—সামুখ যেখানেই প্রকৃতির উপর আপনাব ইচ্ছার প্রয়োগ করেছে, সেইখানে তাব শিল্পের হৃতপাত। 'ইহা এইরূপ হয়, ইহা এইরূপ আছে'—এই হ'ল বিজ্ঞান; একে এই রকম করো'—এই হচ্ছে শিল্প। আমার পাঠ্য আমি লেজেই কাটব,—আমার কুড়লের গায়ে আমি কচুপাতা আঁকব,—আমাবই বুসির নিমিত্তে। কিন্তু কথা আছে। সেটা অস্ত্রবণ্ড ভাল লেগে যায়—অস্ত্রতঃ স্বধন লাগে, তখন সেটা আর্ট।

আর্ট হচ্ছে—একটা অ-দব্কাবের লীলা।

ভারতবর্ষ, ভাদ্র

শ্রী স্বরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

ঘামের ফোঁটা

খেলেতে খেলেতে ফোঁটাঘ ফোঁটাঘ

ঘামলো খোকার রাঙা গাল!

শুকোয়নি জল—না মুছে কে

রাখলে মেজে' সোনার খাল!

খোলা সিঁদুর-কোঁটাতে কে

মোতির-ছড়া গেছে রেখে,

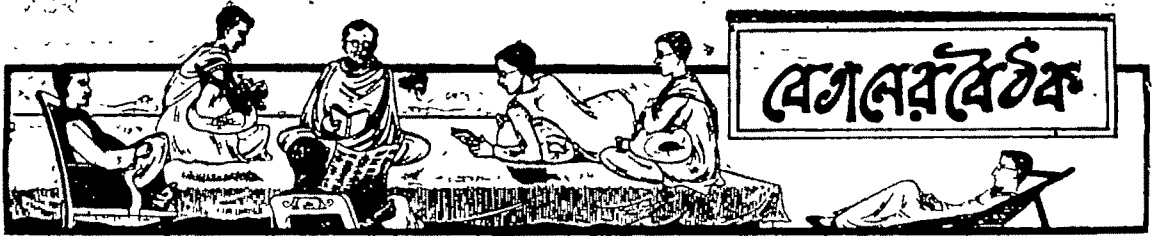
কে তুলে' এ আনলে মরি

নীহার-নাওয়া ফুলটি লাগ;

রক্ত-মর্মরে এল কি

নির্বাবেরি জন্ম-কাল!

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্তী



[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন সংক্রান্ত প্রয়োক্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাহাব উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাহাদের নাম প্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনান্য প্রয়োক্তর ছাপা হইবে না। প্রশ্ন ও উত্তর কাগজেব এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় শ্রবণ রাখিতে হইবে যে বিষয়কোষ বা অনুসাইক্লোপিডিয়ায় অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকাব সাধ্যাতীত; যাহাতে সাধারণের সম্মুখ-নিরসনের দিগদর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা একপ হওয়া উচিত যাহাব মীমাংসার বহুলোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আত্মজ্ঞী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিসূক্ত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের স্বেচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে আমরা পাবিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকেব প্রশ্নগুলি নূতন কবিতা সংযোগনা আবৃত্ত হইবে। হতবাং যাহাবা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাহারা কোন বৎসরের কৃত সংখ ব প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহাব উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(৪৮)

“মহালায়া” শব্দের অর্থ কি? শাবদীয়া পুজার অব্যবহিত পূর্বের আমাবস্তার দিন “মহালায়া” হয় কেন? ঐ দিনে পার্বণ আত্মাদি কবিবার উদ্দেশ্য কি?

শ্রী অর্পণচরণ নোম

(৪৯)

কোনও দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিলে একই জিনিষ ২১০টি করিয়া দেখা যায়। ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ কি?

শ্রী শান্তিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

(৫০)

ডাক-বাকালী কথটি ভাবতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই নামকরণের সহিত বাকালী দেশের কোন সম্পর্ক আছে কি না?

শ্রী যতীন্দ্রনাথ বহু কাব্যবিনোদ

(৫১)

অনেকেই খামের পশ্চাতে ৭৪৭ লিখে কেন?

শ্রী বীরেন্দ্রনাথ সাহা

(৫২)

খুঁয়া বা চল্ল এইণের সময় হিন্দুরা পাকপাত পরিচ্যাগ করেন। গ্রহ-স্পর্শের পূর্বের যদি কোন বস্তু রক্ষণ করা থাকে তাহাও ভক্ষণ করেন না। ইহাব বৈজ্ঞানিক ও পৌরাণিক কাণ কি? হিন্দু ব্যতীত অন্ত জাতিও ইহা পরিচ্যাগ করে কি না? যদি অন্ত কোন জাতি পরিচ্যাগ করে তাহাব কাহার?

শ্রী জ্যোতিষকল্ল হুবা

(৫৩)

‘বাবের ঘরে ঘোগের বাসা’ এই প্রবাদ বাক্যের তাৎপর্য কি? ‘ঘোগ’ নামক কোনও প্রাণী বাস্তবিক আছে কি না, এবং থাকিলে উহাব আকৃতি ও স্বভাব ইত্যাদি কিরূপ?

শ্রী বীরেন্দ্রনাথ বহু

(৫৪)

“ভাবতবর্ষের প্রভাব” শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রী সিলভাগেলি লিখিয়াছেন “ভাবতবর্ষে আধ্যাত্মিক যে খৃষ্টপূর্ব সহস্র বৎসরের পূর্বে প্রবেশ করিয়াছিলেন তা মনে করা বড় ভ্রম।” কিন্তু কৃষ্ণদেবের যুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব চৌদ্দশত বৎসরে হইয়াছিল বলিয়া কোপ্তক প্রভৃতি মনীষীবর্গ বিশ্বাস করেন। ভাবতবর্ষের কতিপয় পণ্ডিত মহাভারতান্ত জ্যোতিষসংস্থান দেখিয়া বলিয়াছেন যে সেই যুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব ৫০০০ বৎসরে হইয়াছিল। তাহা হইলে কি সেই যুদ্ধের যুগ্মধনের অর্থাৎ কোবনের আখ্য ছিলেন না? অথবা, শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যেমন বলেন, যুদ্ধটা কি ভাবতবর্ষের বহির্ভাগে হইয়াছিল?

শ্রী বীরেন্দ্রনাথ সেন

(৫৫)

পূর্বাশ্তে প্রাগজ্যোতিষ যে বর্তমান কামরূপ ইহা সকলেরই মত হইলেও তাহাব কি কোন প্রমাণ আছে? এই প্রশ্ন কবিবার কাণ এই যে পাণ্ডবেরা অথবা কৃষ্ণ যে আত্মা পর্যন্ত গিয়াছিলেন তাহা বিশ্বাস হয় না, যে হেতু ইহাব অন্ত কোন প্রমাণ নাই। কৃষ্ণ যে ঋষীকে বিবাহ কবিবার জন্য আনামের পূর্বপ্রাপ্ত সদীয়ায় যান নাই, কৃষ্ণ বলবাস যে বাণবাজার সহিত যুদ্ধ কবিবার জন্য আনামের অন্তর্গত তেজপুবে যান নাই, হিড়িম্ব হিড়িম্বা ও ঘটোৎকচের বাড়ী যে কাছাড়ে ছিল না এবং অজ্ঞান যে বর্তমান মণিপুরাখ্য দেশে যান নাই, ইহা মহাভারত বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে। হতবাং ভগদত্তকে বধ করিবার জন্য কৃষ্ণ যে প্রাগ জ্যোতিষ গিয়াছিলেন সেই প্রাগজ্যোতিষ কামরূপ ভিন্ন অন্ত কোন দেশ বলিয়া বোধ হয়।

আমরা বাল্যকালে শুনিতাম যে প্রাগেব সান্নিধ্যে কোন স্থানকেই প্রাগজ্যোতিষ বলে।

শ্রী বীরেন্দ্রনাথ সেন

(৫৬)

শীতকালে ভোর বেলা পুরুবেব ও কুপের অঙ্গ একটু গরম থাকে। ইহাব কাণ কি?

শ্রী সোণোপ্রসাদ পাণ্ডা

(৫৭)

ভোজনকালে যে পঞ্চদেবতার নামে অন্ন নিবেদন করা হয়, সেই পঞ্চদেবতা কে কে ?

শ্রী বিগেলেনাথ পালিত

(৫৮)

দুর্গা প্রতিমার নানা ভেদ পবিদূষ্ট হয়। কোথাও হরপার্বতী মূর্তি; কোথাও বুধারূঢ়া চতুর্ভুজা মূর্তি; কোথাও (পূর্ববঙ্গে) প্রতিমার দক্ষিণে কার্তিক, বামে গণেশ; কোথাও বা (পশ্চিমবঙ্গে) কার্তিক বামে, গণেশ দক্ষিণে। এ সকল ভেদ সম্বন্ধে কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে কি না ?

শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

(৫৯)

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে মেঘ প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা, cirrus, stratus, cumulus এবং nimbus. সংস্কৃত ভাষাতেও পুঙ্কর আবর্তক শ্রেণি ও মেঘের চার শ্রেণী দৃষ্ট হয়। এই উভয় প্রকার শ্রেণী-বিভাগেব কোন সাদৃশ্য আছে কি ? পুঙ্করাদি মেঘের আকৃতি ও প্রকৃতির বিবরণ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় এবং তাহা কি ?

শ্রী সতীশ

(৬০)

বারের নাম গ্রহণের নামানুসারে হইয়াছে দেখা যায়। কিন্তু রবির পর সৌম, সৌমের পর মঙ্গল এইরূপ পরম্পরার কারণ কি ? Encyclopaedia Britannicaতে মিশরীয় জ্যোতিষানুযায়ী এক কারণ প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতীয় জ্যোতিষে এইরূপ পরম্পরার কোন কারণ পাওয়া যায় কি ? এই পরম্পরা-মত নামকরণ ভারতবর্ষে কত দিন আছে ? বেদে কি এই-সকল নাম এইরূপ ক্রমে অনুসারে পাওয়া যায় ?

শ্রী সতীশ

মীমাংসা

(৬১)

উক্ত হেয়ালির অর্থ “মলক”।

শ্রী হরিশাধন সুখোপাধ্যায়

(৬৪)

ভাস্কর্য্য মাসের প্রবাসীতে প্রিন্সিপ্যাল কালিপদ মিত্র জিজ্ঞাসা করেছেন “যখন যুগপৎ রৌদ্র ও বৃষ্টি হয় তখন শৃগাল-শৃগালীর বিয়ে হয়” এরূপ প্রবাদ বাঙ্গালা ও বিহার ভিন্ন ভারতের অন্ত কোনও প্রদেশে আছে কি না। দক্ষিণ ভারতের মালবার ও তামিল প্রদেশেও এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, ইহার ঠিক মীমাংসা বা উদ্ভবের হেতু জানিতে পারা যায় না।

এলু—বি—রামবাণী আইয়ার

(৬৬)

দালা ও দিদি শব্দ দুইটি সংস্কৃত দারাদ বা তাত শব্দের অপভ্রংশ। মামী পিসী শব্দ সংস্কৃত মাতৃদাদা পিতৃদাদা শব্দের অপভ্রংশ, প্রাকৃত মাদিনী পিউনী হইতে সংকিশ্লিপ্ত রূপ।

শ্রী নীহাররঞ্জন ঘোষ

(৬৭)

ধাতব পদার্থে কোন কঠিন দ্রব্যের আঘাত লাগিলে উহাতে দ্রুত আণবিক স্পন্দনের সৃষ্টি হয়। এই স্পন্দন স্রবতরঙ্গ রূপে কোন স্থিতিস্থাপক (elastic) বস্তু (যথা বায়ু) ভিতর দিয়া সঞ্চারিত হইয়া আমাদের কর্ণপটলের (tympanum) সংস্পর্শে আসে। ইহাই শ্রবণেন্দ্রিয়ের চেতনার ক্রিয়া করে। বস্তুতঃ এই স্পন্দনই শব্দশক্তির হেতু। কম্পের ক্ষিপ্ততার উপর স্রবের গ্রাম (pitch) নির্ভব করে; আব কম্পতরঙ্গের পার্থক্য বিস্তারের (amplitude of vibration) উপর স্রবের প্রাবল্য (intensity or loudness) নির্ভব করে।

এই শব্দায়মান ধাতব পদার্থের পায়ে অপব কোন-একটা ক্ষুদ্র ধাতু অতি সূক্ষ্মপর্বে স্পর্শ করাইলে উহাতে দ্রুত স্পন্দনের আন্তর্য অতি সহজেই অনুভব করা যায়। কোন কোনও স্থলে এই কম্প চোখেও স্পষ্ট দেখা যায়। সাধারণ অবস্থায় আপন স্থিতিস্থাপকতাব (elasticity) স্বাভাবিক চৌম্বক কম্পতরঙ্গের বিস্তার (amplitude) ক্রমে কমিয়া আসে—শব্দও সেইমতে লয় পাইতে থাকে। তাহা ছাড়া ঐ শব্দায়মান বস্তু কোন অ-স্থিতিস্থাপক (inelastic) বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে কম্প বিশেষ বাধা পায়। এই কারণে, সন্ন্যাসে বা দড়িতে বুলান ঘণ্টায় আঘাত করিলে তাহা বেশ জোরে বাজিয়া উঠে; কিন্তু হাতে রাখিয়া আঘাত করিলে মন্দ চাপা আওয়াজ বাহির হয়। শব্দায়মান পার্শ্বার্থকে হাত দিয়া ধরিলে, উহার স্পন্দন অব্যবহিত পরেই শেষ হইবে, ফলে শব্দও ধামিয়া বাইবে। অবশ্য সংস্পর্শ কম হইলে বাধাও কম হইবে।

শ্রী ধীবেঞ্জকিশোব চক্রবর্তী

বায়ু বা অন্ত কোনও জড় পদার্থেব স্পন্দনে শব্দের সৃষ্টি হয়। কানার ঠালাকে ফেলে দিলে সেটা কাঁপতে থাকে, হাত দিয়ে ছুঁলেই তা বোঝা যায়। এই কাঁপনেই শব্দের উৎপত্তি। ঠালার পাশেব বায়ুকে ছোট ছোট বায়ুস্তরের সমষ্টি বলা যায়। ঠালার কাঁপনেব স্রব্দ যেই ঠালা ডান দিকে চোলে আসে, ঠালার ডান দিকের প্রথম বায়ু-স্তরটি ঠেলা পায়, এই প্রথম-স্তরের (ডান দিকের) পাশে (আব একটি দ্বিতীয় স্তর থাকাব প্রথম স্তরটি সঙ্কুচিত হয়, যদিও দ্বিতীয় স্তরকে সে ঠেলা দিতে থাকে। কিন্তু আবার ইতিমধ্যে ঠালাটি বাঁদিকে চোলে আসে, হতরং (ঠালার ডান দিকের) প্রথম স্তরটি এবার প্রসারিত হয়, ও সেই সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কুচন তরঙ্গ দ্বিতীয় স্তরে গিয়ে পৌঁছায়; কারণ প্রথম স্তরটি প্রসারিত হলে সে তার ডান দিকে (দ্বিতীয় স্তরের দিকে), বাঁদিকে (ঠালার দিকে) দু দিকেই ঠেলতে থাকে, আর দ্বিতীয় স্তরবেব ডান পাশে আবার তৃতীয় স্তর একটি আছে। এর পর ঠালা আবার ডান দিকে কিয়ে আসে, আবার বাঁ দিকে কিয়ে যায়, ইত্যাদি। এইরূপে, পর পর স্তর দিয়ে সঙ্কুচন ও প্রসারণ শেষে আমাদের কানের পর্দায় এসে পড়ে, আব এতে আমরা শব্দ শুনি।

বাতাসে (বা অন্ত শব্দ-বাহনে) একবার এইরূপ তরঙ্গের সৃষ্টি হলে তা বরাবর থাকে না, কারণ শব্দ-শক্তি (sound energy) তাপ-শক্তিতে (heat energy) পরিণত হয়, নানা বকম কারণে। ঠালা কাঁপার দক্ষন যে শব্দটা হোলো সে একই ভাবে ততক্ষণ থাকবে যতক্ষণ বাতাস একই রকম সঙ্কুচন-ও প্রসারণ-তরঙ্গ পুনঃ পুনঃ পেতে থাকবে, অর্থাৎ যতক্ষণ ঠালাটা সমানভাবে কাঁপতে থাকবে। ঠালার কাঁপন যেই আপুনি কমে আসতে থাকে, শব্দও কমে আসতে থাকে, কারণ শব্দের বাহন (এখানে বাতাস) ততই সঙ্কুচন-প্রসারণেব ঠালা কমে পেতে থাকে; ঠালার কাঁপন হাত দিয়ে ধামিয়ে

দিলে এই একই কাবণে শব্দ থেমে যায়। তবে ধালায় হাত দেওয়া মাত্রই যে শব্দ থেমে যায় তা নয়, খালাব কাঁপন ধামিয়ে দেবার পূর্ব শব্দের সামান্য বেষ্ট অন্তত অতি অল্প ক্ষণেব্রজ্ঞেও শোনা যায় (ভালা করে' কান রাখলেই বোঝা যায়)। 'কাবণ ধালা ধাম্বাব আগে বাতাস যে স্পন্দনটা পেয়েছিল তা ত একেবারে তখনি থেমে যায় না; স্পন্দন একেবারে ধাম্বতে অন্তত একটু সময়ও লাগে। যে কারণে ধালাকে একবার আঘাত করলে, যে কাঁপন সে পায় সে কাঁপন যদিও চিরস্থায়ী নয়, ভবু একেবারে লোপ পেতে একটু সময় লাগে, ঠিক সেই কাবণেই বাতাস যে কাঁপন (সঙ্কচন ও প্রসারণেব) একবার পেয়েছে তাব লোপ হতে অন্তত অতি অল্পক্ষণও লাগে। হুতরাং ধালা ধাম্বাব পব অতি অল্পক্ষণেব্রজ্ঞেও শব্দের বেষ্টা থাকে।

ঐ ভবধী প্রভাতনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩৮)

স্বোভিল ও পাবস্বব বলেন দিবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু স্মার্ত ভট্টাচার্য বলেন, “বিবাহে তু দিবাভাগে কস্তা স্যাং পূত্রবর্জিতা। বিবাহানল-সন্দন্ধা নিরতং স্বামীঘাতিনী।” (উদাহতঃ) অর্থাৎ দিবাবিবাহে কস্তা পূত্রবর্জিতা, বিবাহানল-সন্দন্ধা ও স্বামীঘাতিনী হয়। স্মার্ত ভট্টাচার্যেব মত বঙ্গদেশে বিধিবদ্ধ বলিতে হইবে। নচেৎ মিথিলা প্রাবিড়, শুজরাট প্রভৃতি দেশেব বিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিতে হইবে। সেইসব দেশে দিবাবিবাহ এখনও প্রচলিত।

ঐ রেহাংশুভূষণ বরী

(৪৪)

১। কাগজের বে স্থানে তেলের দাগ লাগিয়াছে সেই স্থানে খানিকটা গোলাচূর্ণ (slaked lime) লাগাইয়া কাগজখানি কয়েক মিনিট বোজে রাখিতে হইবে; তৎপরে কাগজ শুকাইলে শুঁড়া চূর্ণ ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ করিলে কাগজ পূর্ববৎ পবিত্র হইবে।

২। কাগজেব যে জায়গাটায় দাগ লাগিয়াছে সেই জায়গায় দুই পিঠেই কিছু শুঁড়া খড়ি ঘনিয়া কাগজখানি একদিন এই অবস্থাতেই রাখিয়া দিতে হইবে। এই বকম তিনবার করিলে তেলের দাগ একেবারে উঠিয়া যাইবে।

ঐ রাধাবমণ হর

(৪৫)

যখনই কোন জিনিস জলিয়া শিখাব সৃষ্টি কবে তখনই বুঝিতে হইবে দুইটি ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। জাল্যবস্তুটি প্রথমতঃ বাষ্পীভূত হয় ও তৎপরে ঐ বাষ্প বায়বীয় অক্সিজেনেব (oxygen) সাহায্যে জলিয়া উঠে।

প্রাচীন জলিবার সময় প্রাচীরের তৈলটি প্রথমতঃ বাষ্পীভূত হয় ও তৎপরে তাহা অক্সিজেন বা অক্সিজেন সাহায্যে (যাহা সাধারণ বায়ুতে আছে) জলিয়া শিখাব সৃষ্টি কবে। সাধারণতঃ প্রাচীরের শিখাব

উত্তাপ এত হয় না যাহাতে তাহার গর্তস্থ সমস্ত তৈলটি উত্তপ্ত হইয়া উঠে, পরন্তু মুখেব কাছে যে অল্পটুকু তৈল থাকে তাহাই বাষ্প হইয়া জলিতে থাকে। এবং উহা ফুগাইয়া গেলে পলিতার ভিতর যে ফাঁক থাকে সেই ফাঁকের সাহায্যে ক্রমাগত কৈশিক আকর্ষণে মুখেব কাছে তৈল সংযোগ হয় ও অবিবত শিখাটি প্রজ্জ্বলিত থাকে এবং বাষ্পটি পশ্চাৎদিকে বা অন্ত কোন দিকে বিস্তৃত হইতে পায না, কাবণ শিখাব উত্তাপ তৈল থাকাব দরুণ ছড়াইয়া পড়ে না।

কিন্তু যখন প্রাচীরের তৈল নিঃশেষ হইয়া আইসে তখন পলিতাটি অবশেষে জলিয়া উঠে অর্থাৎ পলিতাও বাষ্পীভূত হইয়া তৈলবাষ্পের সহিত মিলিয়া শিখাব সৃষ্টি করিয়া থাকে। যখন সমস্ত তৈল শেষ হইয়া আইসে অথবা তৈল জলন্ত শিখাব এত দূরে পড়িয়া যায় যে আর পলিতা তৈল টানিতে পাবে না, তখন ঐ বাষ্প (তৈল ও পলিতা উভয়েব) জলন্ত শিখার উত্তাপে পশ্চাৎদিকে সরিয়া যায়, হুতরাং শিখাটি ক্ষণিকের জন্ত ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়ে ও পরক্ষণেই ঐ বাষ্প উত্তপ্ত হইয়া একেবারে জলিয়া উঠে ও শিখাটি উজ্জ্বলতব হইয়া উঠে এবং পরক্ষণে পলিতা ও তৈল উভয়ই শেষ হওয়ার্তে আর শিখা থাকে না ও একেবারে নির্বাপিত হইয়া যায়। এইরূপ পর্যায়ক্রমে প্রাচীরের উজ্জ্বল হওয়া ও নিস্ত্রস্ত হওয়াকে চলিত কথায় প্রাচীরেব “হাসি ও কান্না” বলে।

ঐ হীরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়

(৪৫)

কাবন্ ডাই-অক্সাইড (CO₂) আলো জলিবার সাহায্য কবে না। যতক্ষণ তৈলের বা মোমের শেষ বিন্দু থাকে, ততক্ষণ উত্তাপেব সাহায্যে CO₂ সংগঠিত হয়। কিন্তু যখন তৈলের বা মোমের কোন অবশিষ্ট থাকে না তখন CO₂ সংগঠিত হইতে পাবে না, কাজেই আলোটি আরো জ্বরে জলিয়া উঠে। আমরা আবো দেখিতে পাই যদি তৈল কিবা মোম থাকে কিন্তু পলিতা ফুগাইয়া যায় তখন আলোটি হঠাৎ জলিয়া উঠে না। যদি কেহ আবও কিছু Engineering সম্বন্ধে জানিতে চাহেন এই টিকানায় পত্র দিলে আমি বাধিত হইব।

ঐ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

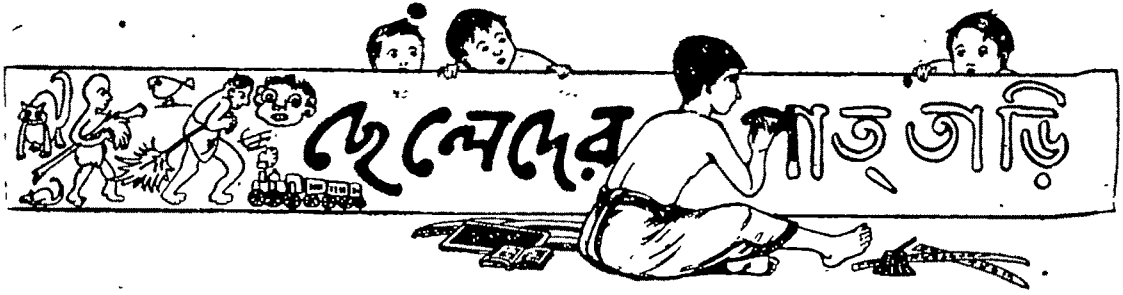
Mechanical and Electrical Engineer
58 M Road,
Jamshedpur.

(৪৭)

অগ্রহাব-পুং (অগ্র+হাব)

অর্থ—অগ্রহ, দেবদ, শতপূর্ণা ভূমি।

ঐ কালিদাস ভট্টাচার্য



পদার্থ ও তাহার পরিণতি

আমরা সচরাচর যে-সমস্ত জিনিষ দেখতে পাই সে-সকলকে যদি আমরা ভেঙ্গে ভেঙ্গে ক্রমাগত ভাগ করিতে করিতে চলে যাই, তবে কি হয়? যেমন লেখবার খড়ি—এই খড়ি যদি ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করি, সেই টুকরার কোন-একটিকে যদি আরো ভাঙ্গি, তাকে যদি আবার ভাঙ্গি, তা হ'লে ক্রমে ক্রমে এমন এক অবস্থাতে এসে পৌঁছব যে আর ভাগ করা যাবে না। যদিই বা অন্তঃকোন এমন সূক্ষ্ম রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা তাকে সূক্ষ্মতর ভাবে ভাঙতে চেষ্টা করি তাহলে সে পদার্থটা আর খড়ি থাকবে না—সেটা ভেঙ্গে গিয়ে তখন হ'বে যাবে তিনটে জিনিষ, যে তিনটে জিনিষ খড়ির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, পরস্পর পরস্পর থেকেও ভিন্ন। এই রকম অবস্থার নাম হচ্ছে অণু (molecule)। সুতরাং অণু অবস্থা পর্যন্ত জিনিষটা রইল খড়ি। কিন্তু ঐ অণুকে যখন সূক্ষ্ম রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ভেঙ্গে অল্প তিন প্রকার জিনিষে পরিণত করা যায় তখন তাঁর নাম হয় পরমাণু (atom)। এতদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা পদার্থের পরিণতি পরমাণু পর্যন্তই জানতেন। পরমাণুকে আর ভাঙতে পারা যেত না। কিন্তু সম্প্রতি পরমাণুকেও ভাঙা হয়েছে—এবং তা হতে কেবলমাত্র তেজের উৎপত্তি হয়েছে। এরূপ তেজের নাম ইলেকট্রন।

একটি বিন্দু-পরিমিত কেন্দ্রের চারিদিকে কতকটা তড়িৎশক্তি আবদ্ধ, এই তড়িৎশক্তিই ইলেকট্রন। সুতরাং বেশ বুঝা যায় যে কতকটা শক্তি যখন বৃত্তাকারে কেন্দ্রীভূত হয় তখন তা ইলেকট্রন। এইরূপ কতকগুলি ইলেকট্রন একত্র মিশে একটি পরমাণু গড়ে উঠে। কতকগুলি পরমাণু মিশলে একটি অণুর সৃষ্টি হয়, এবং কতকগুলি অণু সমষ্টিতে একটি পদার্থের প্রকাশ। সুতরাং

জগতের যত কিছু পদার্থ আছে তার চরম অবস্থা শক্তি; এই শক্তিরই বিভিন্ন রূপ হচ্ছে পদার্থ। অতএব শক্তি ছাড়া এ জগতে আর কিছুই নেই—সেই এক শক্তি থেকেই সমস্ত জগতের সৃষ্টি, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি, সমস্ত জীব-জন্তব সৃষ্টি, তবে কম আর বেশী। যখন কম শক্তি একত্রীভূত হয় তখন এক পদার্থের উৎপত্তি হয়, আবার বেশী শক্তি মিলিত হলে আর-এক পদার্থের বিকাশ হয়। বর্তমান বৈজ্ঞানিক জগতের এই দৃঢ় ধারণা। তুমিও শক্তি, আমিও শক্তি, তবে তোমাতে আমাতে তফাৎ এই যে তুমি হয়ত আমাব অপেক্ষা একটু বেশী শক্তি, আমি হয় ত একটু কম শক্তি; এই বেশী-কমের তারতম্যই পদার্থগুলির মধ্যে বিভিন্নতার কারণ।

শ্রী ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

“থোকা হোক” পাখী

তরুণ রাজপুত্র আজ গভীরবনে গাছতলায় একাকী বসে। গালে হাত দিয়ে কি ভাবছেন। হৃদয়ের মুখখানি মেঘলা পূর্ণিমা রাতের চাঁদটিরই মত স্নান।

কি দোষে তাঁর এ দশা?

রাজ্যে মহামারী; রোজ হাজার লোক মরছে। রাজ্যে উজাড় হতে ক'দিন লাগে? এক একটি লোক মরে, প্রজাবংশল রাজ্যের দেহ থেকে এক এক বিন্দু রক্ত ঘেন্না ঝড়ে পড়ে। দিন দিন লোকক্ষয় বেড়ে চলেতে লাগল। রাজ্যের ওপর শনির যে কোপদৃষ্টি পড়েছে তা কাটাবার জন্ত রাজা কত যাগযজ্ঞ করলেন, কিছুতেই কিছু হল না। শেষে রাজ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বমঙ্গলার মন্দিরে রাজ্যের মঙ্গলের জন্ত রাজা হত্যা দিলেন। একদিন গেল, দুদিন গেল, তিন দিনের দিন ভোর রাজ্যে রাজা স্বপ্ন দেখলেন, দেবী বলছেন, “মহারাজ, কুমারই তোমার রাজ্যেব শনি

স্বরূপ। তার খরদৃষ্টিতে রাজ্য পুড়ে যাচ্ছে। রাজ্যের যদি মঙ্গল চাই ত রাজ্যের বাইরে কোথাও তাকে পাঠিয়ে দাও, কক্ষণও তাকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে পাবে না। আনলেই আবার অমঙ্গলের সৃষ্টি হবে। তবে যদি এখন তাকে বনে পাঠিয়ে দাও তা'হলে তোমার ও তার এটুকু সুবিধে হবে যে, -সে যদি সেখান থেকে খোকাহোক পাখী ধরে' নিয়ে এসে রাজ্যে ছেড়ে দিতে পারে ত তাব কুদৃষ্টিটুকু কেটে যাবে। রাজ্যের আর অমঙ্গল হবে না। তোমাব মৃত্যুর পব. সে সুখে ও শান্তিতে রাজত্ব করতে পারবে।” রাজা স্বপ্নে বললেন, “সে কি রকম পাখী, মা? কুমার আমার সে পাখী খুঁজে পাবে ত?” দেবী উত্তর করলেন, “সে পাখী গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী খোকাহোক খোকাহোক বলে' ভেঁকে বেড়িয়ে তাদের কল্যাণ কামনা কবে। সে পাখী কুমার পাবে কি না বলতে পারি না। তবে আমার উপর বিশ্বাস বেখো। আর একটা কথা, বনে পাঠাবার সময় রাজপুত্রকে বলো, ‘স্বপ্নে দেবীর কাছে জানলুম তুমি এ রাজ্যেব অমঙ্গলের কারণ। তাই তোমাকে বনে চিরতরে নির্বাসিত করলুম।’ ব্যস্ এই পর্যন্ত! আর কোন কথা না। আর জেনে রাখবে আমি যা করি সবই মঙ্গলের জন্তে।” রাজা পরদিনই দেবীর উপদেশ-মত কাজ করলেন। “যা করেন সর্বমঙ্গলা সবই মঙ্গলের জন্তে”—এই হল রাজার জপমালা।

রাজপুত্র ভাবছিলেন, “যার জীবনটা কেবল অমঙ্গলের বোঝা তার বেঁচে থাকায় লাভ কি? এ জীবন না রাখাই শ্রেয়! তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তখন পশ্চিম দিকের আকাশের কোলে বাড়া রবি আস্তে আস্তে ডুবছে। রাজপুত্র পেরদিকে চেয়ে দেখলেন, আকাশের গায়ে কে রাশি রাশি ফাগ ছড়িয়ে দিয়েছে। বসনপ্রান্তে তাঁব চোপ পড়ল, তাই ত তাঁর কাপড়েও যে ফাগেব ছিটে লেগেছে! তাঁর মনে পড়ল আজ হোলি-খেলা। বনের গাছের মাথায় মাথায়, লতাব পাতায় পাতায় ফাগের ছড়াছড়ি। বনের গাছপালা সবই যেন তাঁকে হোলি খেলতে ডাকছে। জীবনের খেলা তাঁর ত তো ফুরোয় নি। বনের মাঝে একটু খেলতে হবে যে!

বনের একটা গাছে কেমন সুন্দর সুন্দর ফল পেকে

বয়েছে। রাজকুমার একটি কবে' পাড়েন, একটি কবে' খান।

কাছেই ঝরণা। তার তক্তকে জল। তার ওপর ছোট ছোট চক্চকে টেউ। অঞ্জলি ভরে' জলপান কবে' রাজপুত্রের প্রাণ সুশীতল হল।

বনের পাখীর ডাক কেমন মিষ্টি! শুনে রাজপুত্র মোহিত হলেন।

“কে রে অমন চাঁদের মত ছেলে?—কেমন কবে' এখানে এলি রে বাপ্!” এই কথাগুলো উচ্চারিত হতে শুনে রাজপুত্র অবাক হয়ে পেঁছন ফিরে দেখলেন, নিবিড় গাছপালার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে এক বুড়ী,—কেমন সুন্দরী! গা দিয়ে দুধে-আলতা-গোলা রঙ কেটে পড়ছে।—মাথায় নিয়েছে একটা ঝুড়ি,—তাতে কাঠ।

রাজপুত্রের ছেলেবেলায় ধাইমার-কাছে-সোনা কাঠ-কুড়োনি গল্পেব একটা ছড়া মনে পড়ে গেল—

কে গো মা বুড়ী,

মাথাতে ঝুড়ি,

কাঠ-কুড়ী!

এই বিজনবনে বুড়ীকে দেখে রাজপুত্র আশ্চর্য হলেন, যাহোক এমন বনেও মানুষের মুখ দেখতে পাওয়া গেল! তিনি বুড়ীর কাছে তাঁর এই দুর্দশার কারণ সব খুলে বললেন। বুড়ীর চোখে জল এল। রাজপুত্রের সুন্দর মুখ দেখে বুড়ীর হৃদয়ে যেন-পুত্র-স্নেহ উথলে উঠল। “আয় বাপ্ আমারি কাছে থাকবি! তোর ভয় কি?”—এই না বলে' বুড়ী তার কুঁড়েঘরে রাজপুত্রকে নিয়ে গেল।

* * *

রাজপুত্রের সঙ্গে বুড়ীব প্রথম সাক্ষাতের ক্ষণ থেকে তিন তিনটি বছর চলে' গেছে। রাজপুত্র এখন বুড়ীকে মা বলে' জানেন, বুড়ীও রাজপুত্রকে পুত্র বলে' জানে। দুজনের মধ্যে মায়ার বন্ধনটা বেশ সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে। বুড়ী এখন হাঁটতে পারে না, বড্ডই দুর্বল। রাজপুত্র সেবা করছেন। তিনি রোজ ঝুড়ি নিয়ে কাঠ কুড়োতে যান, ফল পেড়ে আনেন, শ্রামা-বাসের বোঝা বয়ে এনে ঘাসের ফলগুলি পিষে পিঠে তৈরী করেন। বুড়ী বসে'

বসে’ বেশ রাজভোগ খাচ্ছে। তার যে উপযুক্ত পুত্র বর্তমান! এত খাটাখাটুনিতেও রাজপুত্রের কোনো কষ্ট নেই। বন তাঁকে খাবার জিনিষ সবই জুগিয়ে দিচ্ছে, ভোর বেলায় বনের পাখী ডেকে তাঁর ঘুম ভাঙাচ্ছে। উঠেই বেণুবনের মাথায় মাথায়, সবুজ পাতায় পাতায় আলোর মাতন তিনি দেখতে পাচ্ছেন—বন ঘেন এই নিষে তাঁর সঞ্চর্চনা করছে। সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে পবিত্র যা—মায়ের ভালবাসা,—তাও বনের মধ্যে তিনি পেয়েছেন। তাঁর মা তাঁকে ছেলেবেলায় ছেড়ে স্বর্গে গিয়েছিলেন; তাঁকে আবার নতুন করে’ ফিরে পেয়েছেন। এমনটি কি আর রাজধানীতে মিলত?

বুড়ী বসে’ বসে’ ভাবে, তার শৌণ্ড্যের কথা। রাজপুত্র তার ছেলে, সে ত আজ রাজরাণী! ভাবতে ভাবতে বুড়ীর চোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রু জ্বল-এক ফোঁটা ঝরে’ পড়ে। যখন-তখন রাজপুত্রের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে গভীর স্নেহে চুমা খায়। মনে মনে কত কি আশীর্বাদ করে সেই জানে! রাজপুত্র এক-এক দিন হেসে বলেন, “এত কি আশীর্বাদ করছ বুড়ীমা? এত আশীর্বাদ যদি ফলে’ যায়; আশীর্বাদের বোঝার চাপে মায়া যাব বলে’ রাখছি।” বুড়ী কিছু বলে না; রাজপুত্রকে সজোরে বুকে চেপে ধরে। কখন কখন বলে, “বাপ, তোর একটা বিয়ে দিতে পারলে কি সুখই না হত! কেমন একটি সুন্দর থোকার মুখ দেখে আনন্দে মরতে পারতুম।” শুনে রাজপুত্র কেবল হাসেন।

রাজপুত্র সামনে না থাকলে বুড়ী তার ছোট্ট কুঁড়ে ঘরখানি আশীর্বাদে আশীর্বাদে ভরিয়ে তোলে—“বাবা, তোর থোকা হোক থোকা হোক...” কতবার যে এই আশিস্ বুলিটি বুড়ী আওড়ায়, তার সংখ্যা নেই। একটা গল্প আছে;—এক বুড়ী জন্মের কাছে হুবিচার পেয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করে—“বাবা তুমি দারোগা হও।” সে তার অভিজ্ঞতা দ্বারা নিজের গ্রামের দারোগার প্রবল প্রতাপ দেখে’ ধারণা করেছিল, দারোগা হওয়াটাই যেন পৃথিবীর সবচেয়ে গৌরবের জিনিষ। এ বুড়ীরও হয়েছে তাই। নিজে নিঃসন্তান বলে’ পুত্রের অভাবটা তার কাছে বড়ই বাজত। থোকা পাওয়াটাই যেন তার কাছে সবচেয়ে

শৌভাগ্যের বিষয় ছিল। তাই তার কাছে থোকা হোক এই আশীর্বাদ নাকি সবচেয়ে সেরা আশীর্বাদ।

বুড়ীর দিন দিন শরীর ভেঙ্গে পড়ছিল। নানান রকম অসুখ বিস্ময় লেগেই আছে। কিন্তু আশীর্বাদের সংখ্যাটা বেশী ছেড়ে কম হয়নি। আজকে অসুখটা তার বড়ই বেড়েছে। রাজপুত্র রোজ যেমন তার জন্তে গাছ-গাছড়া খুঁজতে নদীর তীরে যেতেন—আজও গেলেন। সেখানে পৌঁছে বিস্মিত হয়ে দেখলেন, একটি পরম সুন্দরী মেয়ের দেহ—তার কতকটা ভাস্ছে নদীর নীরে, কতকটা পড়ে’ নদীর তীরে। মেয়েটির দেহলতা জড়িয়ে বেগুন রঙের শাড়ী, তাতে কারুকার্য করা, চুনির চুম্বিকি বসান। মেয়েটির গা-ভরা গয়না—সোনা হীরে জহরতে মোড়া, স্বর্ঘ্যের আলোয় ঝকঝক করে’ জ্বল্ছে—এ ত রাজকন্যা না হয়ে যায় না। অজানা আনন্দে তরুণ রাজপুত্রের বুক কেঁপে উঠল। রাজপুত্র ধীরে ধীরে মেয়েটির অচেতন দেহ তুলে শুকনো ডাকায় এনে রাখলেন।

ক্রমে রাজপুত্রের সেবা ও যত্নে মেয়েটির চেতনা হল।

পরিচয়ে রাজপুত্র জানতে পারলেন, সে রাজকন্যাই বটে। সখীদের সঙ্গে নৌকায় করে’ নদীতে বেড়াতে বার হয়েছিল, হঠাৎ ঝড় আসায় নৌকো ডুবে যাওয়ায় এই দুর্দশা হয়েছে। সখীরা কোথাও ভেসে গেছে কে জানে। রাজপুত্রও নিজের পরিচয় দিলেন। রাজপুত্রের বাকী সমস্ত জীবনসুত্রটা এই বনের সঙ্গে গাঁথা আছে শুনে রাজকুমারীর চোখে জল এল। টলটলে জলভরা চোখের দৃষ্টি রাজপুত্রের ওপর নিবদ্ধ করে’ রাজকুমারী বললেন, “কেন আমার সঙ্গে আমাদের রাজ্যে আপনি চলুন না—আপনাকে সুখে রাখবার প্রাণপণ বন্ধ করব।” রাজকুমারী বললেন, “না, রাজকুমারী তা হয় না। এই বনটিতেই আমি বেশ সুখে আছি—আমার মা যে এখানে আছেন। চল আমাদের কুঁড়েঘরে—বুড়ীমাকে দেখলে ভাল করে’ চিন্তে পারবে। মা তোমাকে দেখলে কতই না খুসী হবেন। আমি তোমাকে ঠিক সময়ে তোমার পিতার নিকট বেখে আসব। তবে যদি কখনও এই বনের কথা মনে পড়ে, তবে এই হতভাগা রাজপুত্রের কথা মনে করো। আর কিছু চাই না।” বলে’ প্রশান্ত

চোখছুটি রাজকন্তাব সামনে থেকে রাজপুত্র সরিয়ে নিলেন।

রাজপুত্র রাজকন্তাবে সঙ্গে করে' কুঁড়েয় ফিরে দেখেন সর্বনাশ হয়েছে। বুড়ীমা মারা গেছেন। হায, তিনি কত সাধ করেছিলেন, কিছুই ত পূর্ণ দেখতে পেলেন না—

রাজপুত্র বুড়ীমার সংকার করে' কুঁড়েঘরে ফিবে এলেন বিজয়া দশমীর বিসর্জনের চোখের জল নিয়ে। রাজপুত্রের কাছে তাঁর বুড়ীমার গুণেব কথা শুনে রাজকুমারী'ব চোখ-ছুটি জলে ভরে' গেল। মা-হারা কুঁড়েখানা রাজপুত্রের চোখেব সামনে বাঁ বাঁ করুতে লাগল। রাজপুত্র আঙ্গিনায় আছড়ে পাড়ে' কেঁদে উঠলেন—“মা—মাগো! তুমি নেই—আর আমাব কেউ নেই গো! তোমায় ছেড়ে কেমন করে' এ গহনবনে বাস করুব মা—”

রাজকুমারী রাজপুত্রের মাথা কোলে তুলে নিলেন। চোখের জল মুছিয়ে দিলেন। কি বলবার জন্তে তাঁর ঠোঁট-ছখানি কেঁপে উঠল, কিন্তু কণ্ঠে স্বর ফুটল না। রাজপুত্র খানিকক্ষণ পরে উঠে বসলেন; তারপর হাতজোড় করে' কুঁড়েঘরের পানে চেয়ে বসলেন, “ওগো আমার মায়ের ঘর, ওগো আমাব মাঘেব মাটি, তোমাদের ছেড়ে এখন চলুম, আর ফিরুব কি না জানি না। ফিরবারও বড় ইচ্ছে নেই। মা-হারা ঘর দেখতে পারুব না।” তার পর ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। রাজকুমারীও দেখাদেখি প্রণাম করলেন।

তাঁরা ছিলেন আঙ্গিনার অশোক-গাছের তলায়। গাছের ওপর থেকে কে বলে' উঠল—“খোকা হোক, খোকা হোক।” রাজপুত্র মাথা তুলে অবাক হয়ে গাছের দিকে তাকালেন। দেখলেন গাছের একটা উঁচু ডালে কেমন ছোট একটি হৃন্দব পাখী! সবুজ পাতার সঙ্গে বেন মিশে আছে। পাখী আবার ভেকে উঠল, “খোকা হোক, খোকা হোক।”

পাখীর এমন ডাক ত রাজপুত্র কখনো শোনেন নি। কতদিন বনে আছেন, কত রকম পাখী দেখলেন, পাখীর কত রকম ডাক শুনলেন। তাঁর কাছে এ পাখী বে একেবারেই অচেনা!

রাজপুত্র তুড়ি দিয়ে আদব কবে' ডাকলেন, “আয়

পাখী আয়, আদরে রাখিব তোরে সোনার খাঁচায়!”

পাখী সত্যসত্যই উড়ে এসে তাঁর কাঁধের উপর বসল।

রাজপুত্র তাকে ধরে' খাঁচায় পুরলেন। রাজকুমারী বললেন, “চলুন রাজপুত্র, এ পাখী আমাদের রাজ্যে নিয়ে যাব। রাজবাড়ী'ব তোরণে এর সোনার খাঁচা টাঙানো থাকবে। দেশ-বিদেশের লোক একে দেখতে আসবে।” রাজপুত্র বললেন, “না রাজকুমারী, একে কাছছাড়া করুতে পারুব না। বুড়ীমা আমার খোকা দেখবার জন্য বড়ই সাধ করুতেন। এর ডাক শুনে তাঁর কথা সবই মনে পড়বে।”

রাজকন্তা কি জানি কি মনে করে' লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন।

* * * *

এ দিকে রাজা রাজপুত্রকে বনে পাঠানোর পর সর্বমঙ্গলা-দেবীর পূজায় মনপ্রাণ উৎসর্গ করেছেন। এক বছর যায়, দু বছর যায়, তিন বছর যায়,—কুমার কই “খোকাহোক” পাখী নিয়ে রাজ্যে ফিরে এল না! দুর্বল মনকে শক্ত করে' রাজা আবার নিজেকে পূজার মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন। চার বছর গেল, পাঁচ বছর যায় যায়—রাজার মনের বাঁধন বৃদ্ধি আর থাকে না! সর্বমঙ্গলা-দেবীর মন্দিরে পুত্রের মঙ্গলেব জন্তে রাজা এবার হত্যা দিলেন। প্রথম দিনই দুপুর রাতে স্বপ্নে সর্বমঙ্গলা-দেবী রাজার শিয়রের পাশে আবির্ভূত হয়ে হাসতে হাসতে রাজাকে বললেন, “মহারাজ, আপনার কুমারের সঙ্গে মালব-রাজকন্তার বিবাহ হয়েছে। কুমার এখন মালব-দেশে। সে বন থেকে ‘খোকাহোক’ পাখী ধবে' এনেছে। শীঘ্রই মালবরাজ্যে যাও। মহাসমারোহ করে' নবদম্পতীকে এ রাজ্যে নিয়ে এস।” স্বপ্নভঙ্গে রাজার দেহমন আনন্দে শিউরে উঠল। পরদিনই তিনি হাতীঘোড়া লোকলম্বর নিয়ে মালবরাজ্যে যাত্রা করলেন।

রাজকন্তাকে তাঁর পিতার কাছে নিয়ে এসে, রাজপুত্র আব বনে ফিরুতে পাননি। রাজকুমারীর রাঙা অঞ্চলেই বাঁধা পড়েছেন। এমন হৃন্দর রাজপুত্র হাতে পেয়ে পিতা মালবরাজ্য কন্যাকে তাঁর হাতে সমর্পণ না করে' থাকতে পারেন কি? বিশেষ সে যখন কন্যার রক্ষা-

কর্তা, আর কন্যাও তাকে কম শ্রদ্ধার চোখে দেখেনি।
সোনার পিঞ্জরাবদ্ধ “খোকাহোক্” পাখীর ডাকে বুড়ীমার
কথা রাজপুত্রের মনে পড়ে যায়। তিনি আকাশের দিকে

চেয়ে কপালে দুহাত ঠেকিয়ে কাকে প্রণাম করেন।

একদিন রাজপুত্র দেখলেন, রাজধানী হাতীঘোড়া
লোক-লস্করে ছেয়ে গেছে। ব্যাপার কি জানবার জন্যে
সভায় যাবার উদ্ভোগ করছেন এমন সময় মালবরাজ এসে
তাকে বললেন “তোমার পিতা এসেছেন। তাঁর সঙ্গে
দেখা করবে চল!” মালবরাজের মুখ হাসি-হাসি।
রাজপুত্র অবাক হয়ে তাঁর সঙ্গে চললেন।

পিতা-পুত্রের দুজনোরি চোখে জল এল। পুত্রের অভি-
মানে; পিতার মিলন-আনন্দে। পরে পিতা যখন পুত্রকে
সব কথা খুলে বললেন—পুত্র পিতার বৃকে মাথা রেখে
কাদতে লাগল। পুত্রের নিকট তার বনবাসের সব কথা শুনে
পিতা শিউরে উঠলেন, তাঁর গায়ে কাঁটা দিল। পিঞ্জরাবদ্ধ
“খোকাহোক্” পাখীর পানে চেয়ে কপালে বদ্ধহাত
ঠেকিয়ে সজল নয়নে রাজা বললেন, “মা সর্বমঙ্গলা, অপার
তোর করুণা। আমার কুমারের মঙ্গলের জন্যে বনে তুই
‘বুড়ীমা’ সাজেছিলি—এখন আবার খোকাহোক্ পাখী

সেজে এসেছিল। ধন্য কুমার ধন্য! তোর ভালবাসা সে
পেয়েছে—” তাঁর কর্ণধর ভারী হয়ে এল। রাজা পুত্রকে
গভীর স্নেহে আলিঙ্গন দিলেন।

রাজ্যে এসে মহাসমারোহে “খোকাহোক্” পাখীর
পূজা করে’ রাজকুমার তাকে ছেড়ে দিলেন।

এই গল্পটি অনেকেই জানেন। তাঁরা বলেন যে
রাজপুত্রের “খোকাহোক্” পাখীরই বংশ পৃথিবীতে ছড়িয়ে
আছে। তাঁদের কেউ কেউ বলেন যে, রাজপুত্রের
“খোকাহোক্” পাখী তাঁর বুড়ীমাই। রাজপুত্রের মায়া
কাটাতে না পেরে “খোকাহোক্”—এই বুলি নিষে মরার
পর পাখীর মূর্তি নিয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেন
যে রাজপুত্রের “খোকাহোক্” পাখী একটা পাখীই।
রাজপুত্রের বুড়ীমার কুণ্ডেঘরের আঙ্গিনায় অশোক-গাছে
সে বাস করত। সেখানে বসে’ বুড়ীমার “খোকা হোক্”
আশীর্বাদটি অনবরত শুনে শুনে সে বুলি সে ভুলতে পারে
নি। “খোকাহোক্” বলে’ তাকা তার অভ্যাস হয়ে গিয়ে-
ছিল। বুড়ীমার মরার পরই সে রাজপুত্রের নজরে পড়ে।

কোনটা ঠিক কে জানে?

শ্রী জুর্গাপ্রসাদ গঙ্গুসদার

কাজরী গান

“ছটা মাথা গগনের ঘন ঘটা সাজনা,
হুমহুম্ হুমহুম্ খুন-করা বাজনা;
খোকারে পাড়ানো ঘুম—সে আমার কাজ না।”

“—সেহলী লো সেহলী!

গুরুগুরু দেবা ডাকে, তাই শুনে’ এ হ’লি?”

“সমীরণ-শিহরণে ফুলে ফুলে নাচনা,
আকুল নয়ন তুলি অকুলের যাচনা;
এ কুলে বসতি করে’ প্রাণ আর বাঁচনা।”

“—সেহলী লো সেহলী!

বায়ু বহে ফুল দোলে, তাই দেখে’ এ হ’লি?”

“স্বরব্রহ্ম বারে ওই শাওনের ঝরণা,
অধর ধরায় নামি করে পদচারণা;
এই পড়ে’ রইলো এ ছার ঘর-করনা।”

“—সেহলী লো সেহলী!

বরষার ঝবিষণে অকারণে এ হ’লি।”

“ঝম্ঝম্ নুপুরের ঝণুঝণু লাহনা,
পিতমের বৃকভরা প্রাণকাড়া বাহনা;
সোহাগ-মিনতি-স্ববে ঘরে মন রহে না।”

“—সেহলী লো সেহলী!

জলদ প্রপাত হেরি তুই যেন কি হ’লি।”

“চিতচোর এলো মোর দূরে গেল ভাবনা,
পরশনে ধুয়ে গেল বিরহের দাবনা;
বাহিরে পরাশপাজা ঘরে আর যাব না।”

“—সেহলী লো সেহলী!

কুলের বহরী হয়ে বাড়ুরী কি হইলি?”

“এসো এসো পিয়া মোর হিয়া আছে বিছানা,
অঙ্গে অঙ্গে কর তবঙ্গ রচনা;
ঝুম্ঝুম্ দাও চুম—আর নাই যাচনা।”

“—সেহলী লো সেহলী!

বসন তিতিল জলে,—লাজ খেয়ে কি হ’লি?”

দরবেশ



চাতকের সৃষ্টি

ভাস্কর্যসেব প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় ছেলেদের পাততাড়ি বিভাগে “চাতকের সৃষ্টি” শীর্ষক একটি গল্প লিখিয়াছেন। চাতকের সৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের দেশে (ব্রাহ্মণ গাঁ, ঢাকা) আর-একপ্রকার কিশোরী প্রচলিত আছে। পাঠকপাঠিকা-গণের কোতুলক-নিবারণার্থ আমাদের জানা গল্পটী প্রকাশ করিলাম।

এক নগরে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বাস করিত, তাহাব একটিনার পুত্র ছিল, আর দ্বিতীয় কোন সন্তানসম্বন্ধে তাহাব ছিল না। রমণী দরিদ্রা, সামান্য ব্যবসাদি করিয়া কোন প্রকারে জীবিকা নির্বাহ করিত, পুত্রটিও ভরণপোষণ করিত।

একদা বৃদ্ধা অরোগে আক্রান্ত হইল। ক্রমে তাহাব রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, পাড়া-প্রতিবেশীরা আসিয়া বৃদ্ধাকে দেখিয়া যাইত, পুত্রটিও নিকটে থাকিত। ক্রমে বৃদ্ধাব অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন হইল, তাহাব এমন শক্তি ছিল না যে ডাক্তার বা কবিবাজ দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। কাজেই বৃদ্ধার রোগ উত্তবোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

একদিন বৃদ্ধা মৃদু অবস্থায় জলপান করিতে চাহিল; কিন্তু ঘরে কেহই ছিল না যে একটু জল তাহাকে দেয়। সে কাতরভাবে পুত্রকে ডাকিতে লাগিল। পুত্র ঘরের বাহিরে বসিয়া কি যেন খেলা খেলিতেছিল, সে জননীকে ডাক শুনিয়া বাহির হইতে উত্তর কবিল এবং জিজ্ঞাসা কবিল—“মা! আমাকে ডাক কেন?” জননী তাহাব নিকট জল চাহিল। কিন্তু বালক “দেই” বলিয়া খেলা কবিতে লাগিল এবং জল দেওয়ার কথা ভুলিয়া গেল।

এদিকে বৃদ্ধা শেষ অবস্থায় উপনীত। একেই ত সঙ্কটাপন্ন অবস্থা, তাহাতে আবার প্রবল জলপিপাসা; কিন্তু সময়মত জল না পাইয়া বৃদ্ধা বড়ই কাতর হইয়া পড়িল, আব জল চাহিতে পারিল না; অত্যন্তকাল মধ্যে বৃদ্ধা রমণী প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

পুত্রটি অনেকক্ষণ পবে ঘবে আসিয়া দেখিল জননীকে দেখে প্রাণ নাই; তখন হঠাৎ তাহাব জলের কথা স্মরণ হইল কিন্তু এখন আব স্মরণ হইলে কি হইবে! বালকটি উচ্চৈঃস্বরে রোদন কবিতে লাগিল। জননী জল-পিপাসায় কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিল এই কথা ভাবিয়া বালক বড়ই অমুতাপ ভোগ কবিতে লাগিল। পাড়াব লোক সংবাদ পাইয়া আসিয়া বৃদ্ধাব মৃতদেহের বধারীতি সংকার কবিল এবং জনৈক গ্রামবাসী বৃদ্ধার পুত্রটিকে নিজ বাড়ীতে রাখিয়া ভরণপোষণ করিতে লাগিল। কিন্তু মাতৃশোক বালক বড়ই কাতর হইয়া পড়িল; অবশেষে একদিন প্রবল অরোগে বৃদ্ধাব স্মৃতিচিহ্ন পুত্রটিও জননীর নিকট চলিয়া গেল।

বালকের মৃত্যু হইলে ধর্মরাজের রাজসভায় পাণপুণ্য বিচার আরম্ভ হইল। ধর্মরাজ বালকের পাণপুণ্য বিচার করিয়া বলিলেন, “তুই তোর জননীকে মৃত্যু-সময়ে জল দিস্ নাই, একারণে স্তম্ভতব পাণপ্রস্ত হইয়াছিস্, জননীর আত্মাও তোকে অভিশাপ দিয়াছে; অতএব এই পাপের ফল তোকে ভোগ করিতেই হইবে। এ পাপ হইতে তোর কিছুতেই নিস্তার নাই। তোব স্নেহময়ী জননী জলপিপাসায় কাতবক্ঠে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।”

বালক ধর্মরাজের নিকট অনেক কাতুতি-গিনতি কবিল। ধর্মরাজ

অনেকক্ষণ ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিলেন—“তুই পরজন্মে পাণী হইয়া জীবনধারণ করিবি, এবং তোর জননীর মত শুষ্কক্ঠে ‘জল, জল, ফটিক জল’ বলিয়া চীৎকার কবিয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াইবি—বৃষ্টিপাত না হইলে কখনও জলপান করিতে পারিবি না, এবং তোব তৃষ্ণাও মিটিবে না।”

সেই অবধি অভিশাপপ্রাপ্ত বালক চাতকপাণী হইয়া আকাশপথে উড়িয়া বেড়ায় আব তৃষ্ণায় কাতবক্ঠে ফটিকজল ফটিকজল বলিয়া চীৎকার কবিয়া থাকে, বৃষ্টি না হইলে আর জলপান কবিতে পারে না।

শ্রী নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী

তেলে-জলে

এ বছরের ২৪ নং জিজ্ঞাসাব মীমাংসায় শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথায় মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন, “তৈল প্রভৃতি পদার্থ জলে পড়িলে যে কেবল ভাসিয়া থাকে তাহা নহে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত হয় (droplets)। ...” (ভাস্ক, ৭১৭ পৃষ্ঠা।)

কিন্তু ব্যাপারটি একেবারেই তা নয়। তৈল জলের উপর ভাসে বটে কিন্তু বিন্দুতে পরিণত মোটেই হয় না। Surface Tensionএব জলে জলের উপর তৈল, যত কমই দিন না কেন, জলের সমস্ত surfaceএব উপরে স্থব হয়ে ছড়িয়ে পড়বে বা পড়তে চেষ্টা করবে। জলের surface যত বড় হবে তৈলের স্তর তত পাতলা হবে। হুতরাং ইন্দ্র-বাবুর মীমাংসা বিজ্ঞান-সম্মত হয় নি।

শ্রীযুক্ত বিজয় বাহু জিনিটটিকে ঠিক বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, তবে বাঙলায় খুব ভালো করে এই interference colourকে বোঝানো শক্ত। জলের উপর তৈল পড়ার দরুন বং, সাবানের ফেনাব রং, বা ইপ্সাতের surfaceএব বং সবই এক কাণে হয়; একে Colour of thin plates বলে। এ সব ক্ষেত্রেই আলোক-তরঙ্গ একই কারণে বিপর্যস্ত হয়।

বিজয়-বাবুর মীমাংসায় একটা ভুল রয়ে গেছে। তিনি লিখেছেন “তৈলের উপর শাদা আলো পড়িলে এক অংশ ‘উপরিতল’ (upper surface) হইতে প্রতিফলিত হয়, আব-এক অংশ তৈলের স্তরে প্রবেশ করে। ইহার একভাগ তৈলের ‘নিম্নতল’ (lower surface) হইতে প্রতিফলিত হয়। ...” (ভাস্ক, ৭১৭ পৃষ্ঠা।)

তৈলের নিম্নতল থেকে তো প্রতিফলিত হয় না, হয় তৈলের নিম্ন-তলের নীচে অবস্থিত জলের “উপরিতল” থেকে।

প্রভাতনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

বাস্তালী কি ঘরকুণো

বাস্তালীবা কি ঘরকুণো, এ সম্বন্ধে প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয় আলোচনা করিয়াছেন। আমি চিবকাল বঙ্গের বাহিরে নানা স্থানে নানা প্রকার অবস্থায় বাস্তালী দেখিয়া বাহা স্থির করিয়াছি তাহাই বলিতেছি। শিক্ষিত বাস্তালীদের ঠিক ঘরকুণো বলা যায় না, কিন্তু তাহাবও একান্ত অভাবে না পড়িলে বিদেশে যাইতে চাছেন না।

কিন্তু অশিক্ষিত বাঙ্গালী শ্রমিকেরা ও শিল্পীরাও যেরের আধপোটা, সিকিপেটা, এমন কি প্রায় অনশন ছাড়িয়া বিদেশেব হৃদয়সঙ্কলতা পছন্দ করে না। আঙ্গকাল পূর্ব-আফ্রিকা, মেসোপোটামিয়া ইত্যাদি স্থানে বাঙ্গালী আছে বটে, তবে বেশী নহে, ও ইহারা প্রায় সকলেই কেরানি; ব্যবসায়ীর মধ্যে ডাক্তার ও উকিল ছাড়া অল্প ব্যবসায়ী নাই বলিলেই হয়। বঙ্গের বাহিরে—ভারতের সীমানা মধ্যেও—বাঙ্গালী ব্যবসায়ী এত কম যে নাই বলিলেও চলে। অল্পদেশবাসী অপেক্ষা সাধারণ বাঙ্গালীদের পৈত্রিক ভিটার মায়া অত্যন্ত বেশী। সঙ্কল অবস্থা হইলেও সাধারণ বাঙ্গালী পৈত্রিক ভিটার এক কাঠা ক্ষমিতে কষ্টে বাস কবে, কিন্তু ভিন্ন স্থানের বড় বাড়ীতে বাইতে চাহে না। আমার ধারণা যে বাঙ্গালীরা শারীরিক শ্রমসাধ্য কর্ম করিতে পারে না, বা চাহে না, অথবা তাহাকে ছোটলোকের কাজ বলিয়া ঘৃণা করে। কানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকাতে বহু ভারতবাসী শ্রমিকেরা অর্থোপার্জন করিতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালী নাই বলিলেও চলে। কয়েক বৎসর পূর্বে একটি বাঙ্গালী যুবক বি-এসসি পাস করিয়া কলিকাতা হইতে বঙ্গের একটি ফার্মে ৫০ বেতনের কেরানিগিরি চাকরি লইয়া আসে। বোধ হয় বঙ্গের ব্যয় সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান ছিল না। বন্ধেতে পোষ্ট অফিসের পত্রবাহক পিওনেব ৫০ বেতন পাও। প্রবর্তে তদন্ত কবিতা দেখিয়াছেন যে ইহার কমে তাহাদের পেষ্ট চলিতে পারে না। এই যুবকটি আসিবার অল্পদিন পরেই কোনও কারণে ফার্মটি উঠিয়া গেল। যুবক কর্মহীন অবস্থায় অনাহারে কষ্ট পাইতে লাগিল। সেই সময়ে টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্টেব একটি বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ারের অগ্রহে প্রাত্যহিক ৩ বেতনে টেলিগ্রাফের ধামে উঠিয়া তার বাঁধা কুলির কাজ পাইল। অতি কষ্টে বাড়ী ফিরিবার রেলভাড়া সংগ্রহ করিয়া যুবকটি দেশে চলিয়া গেল। কিন্তু সেই ইঞ্জিনিয়ার-বাবু বলিয়াছিলেন, আমাদের একটু বুদ্ধিমান কুলিই রাখিতে হয়, আমার কাছে প্রাত্যহিক ৩ র কমের কুলি নাই। ২১ মাসের মধ্যে ভাল কাজ শিখিতে পাবিলে বেতন বাড়িয়া দিতে পারিব। আমার কাছে ১০ প্রাত্যহিক পর্য্যন্ত নিরক্ষর কুলি বা মেকানিকেরা কাজ কবে। বাঙ্গালীরা বি-এসসি পাস করিয়া ৩০০ মাসিক আয়ের এইরূপ কুলিগিরি বা মেকানিকের কাজ অপেক্ষা ৫০ বেতনের কেরানিগিরি করিতে চাহে। তাহার কারণ (আমাব বিধান) দ্বিবিধ—(১) বাঙ্গালীরা শ্রমসাধ্য কাজ করিতে চাহে না ও (২) আমাদের সমাজে কুলিবা ৩০০ মাসিক অর্জন করিলেও ছোটলোক ও কুলি, কিন্তু কেরানিবা মণটাকা উপার কবিতা উপবাস করিলেও বাবু। লোকে এ সহজলব্ধ সম্মান (cheap respect) সহজে ছাড়িতে চাহে না।

বাঙ্গালী শ্রমিকেরা শ্রমস্বীকার করিলে যুক্তপ্রদেশ, বেহার, পঞ্জাব ও উড়িষ্যা শ্রমিক বাঙ্গলাদেশেব গলি-ঘুঁচিতে পাওয়া যাইত না। বাঙ্গালী শ্রমিকেরা অল্পকাল কষ্টে পড়িলেও বিদেশে বাইতে চাহে না। কেবানিরা কষ্টে পড়িলেই বিদেশে যায়। এখানে (দক্ষিণ হায়দ্রাবাদে) একজন বাঙ্গালী কর্মকার ছিলেন। তাহার দোকানে ১০১২টি বাঙ্গালী স্বর্ণকার শিল্পী কাজ করিতেন। তাহাদের শাওয়া, বাড়ী, খোপা, নাপিত ছাড়া বেতন ১০০০ হইতে ২০০০ বাৎসরিক ও বৎসরে দুই মাস ছুটি দিতেন। অর্থাৎ ঐ বেতন ১০ মাসেব। ওখাপি কর্মকার মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাহার কারিগররা বেশে চলিয়া গেলেন, ২০১২ বৎসরেব দোকান উঠিয়া গেল।

বাঙ্গালীরা যতদিন শারীরিক শ্রমে পটু ও ঐ শ্রমেব উপযুক্ত সম্মান না করিতে পারিবে ততদিন তাহাদের উন্নতি সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। বাঙ্গালীদের আব-একটি দোষ আছে, সেটিও না বলিয়া

থাকিতে পাবিলাম না। বাঙ্গালীরা—বিশেষতঃ বিদেশে আগন্তুকেরা—স্বয়ং যতই নির্য্যাস হউন না কেন—বিদেশে আসিয়াই প্রায় আপনাকে অতি বুদ্ধিমান ও এই দেশের লোকদের নির্য্যাস ভাবিয়া থাকেন ও ঘৃণা ও করবার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাহারা বালাবধি এইরূপ বিদেশীদের সম্বন্ধে ছাড়াছুরা, খোটা, মেডো ইত্যাদি কতকগুলি অশ্রদ্ধানুচক কথা ব্যবহার কবিতো অভ্যস্ত; তাহাদের আবাল্য ধারণা সম্বন্ধে বাইতে চাহে না। সেইজন্য অনেক সময়ে তাহারা বাস্তবিক যোগ্যতব হইয়াও স্থানীয় অধিবাসীর সম্মান আকর্ষণ করিতে পারেন না। পূর্বে (মিউটিনিব পরই) যখন বাঙ্গালীরা বিদেশে (বা পশ্চিমে) আসিয়াছিলেন, তখন স্থানীয় লোকেরা ইংরেজি শিক্ষা কবে নাই, অতএব ইংরেজি অক্ষিসেব কেরানিগিরি ও কালতি ও ডাক্তারি বাঙ্গালীদের একচেটিয়া হইয়া গিয়াছিল। এখন সকল স্থানেই ইংরেজি-জানা স্থানীয় উপযুক্ত লোক যথেষ্ট পাওয়া যায়। অতএব ১০১৬ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালীরা স্থানীয় লোকদের মূর্খ ভাবিলে—অশ্রুচিত হইলেও—কতক কতক ভাবিতে পারিতেন, কিন্তু এখন আর সেসুপ ভাবা চলে না অথচ বাঙ্গালীরা পুর্বাতন বুলি ছাড়েন নাই।

বিদেশে বাঙ্গালীদের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। জীবনধারণের একমাত্র উপায়—চাকরি এখন বাঙ্গালীর ছেলেরা প্রায় পায় না। ইহা ছাড়া শিক্ষা সম্বন্ধেও অবনতি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ৩০১৪ বৎসর পূর্বে যুক্তপ্রদেশেব ইউনিভার্সিটির পর্বীক্ষার ফলে প্রথম শ্রেণীতে যত বাঙ্গালী ছেলেব নাম দেখিতে পাওয়া যাইত, এখন বিভাগীয় সংখ্যা বাড়িয়াও তত দেখা যায় না।

দেশে কার্য্যভাব হইলে তবে লোকে বিদেশে যায়, নতুবা যায় না। বাঙ্গালী শ্রমিকদের এখনও বিদেশে যাইবার মত অভাব বা প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তাহারা শ্রমসাধ্য কাজ কবিতো স্বীকার করিলে বঙ্গদেশেই যথেষ্ট কাজ পাওয়া যায়। বিদেশী শ্রমিকদের আমদানি কমে মাত্র। বাঙ্গালীদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা বাড়িতেছে, তাহাদের শ্রমসাধ্য কাজ করিবার ক্ষমতা ও ঐ কাজ সম্মান করিবার সংসাহস হইলেই তাহাদের ১৫ আনা কষ্ট দূর হয়। আমরা সমাজে শ্রমিকদের হীন বিবেচনা না কবিলেই আমাদের যুবকেরা গ্রাঙ্কবেট হইয়া কেরানিগিরিতে যাহা উপার্জন করেন, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী উপার্জন কবিতা সমাজের মুখোচ্ছল করিতে পারিবেন।

শ্রী অমৃতলাল মীল

“মনসা পূজা” সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

গত ভাদ্র মাসেব প্রবাসীতে ঐযুত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাব “মনসা পূজা” প্রবন্ধেব (প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২০) কোনো কোনো বিষয়ে প্রতিবাদ কবিতাছেন। তিনি এজন্য যে মনোবোগসহ আমাব প্রবন্ধ পড়িয়াছেন ও শ্রমস্বীকার কবিতাছেন সেজন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

তাঁব প্রতিবাদের একটি কথা এই যে আমাব প্রবন্ধে নাগদেব বিষয়ে নানা কথা থাকিলেও বলদেব যে অনন্ত নাগের অবতার তাহা নাই। আর কৃষ্ণ নাগবিবোধী। অনন্তাবতার বলরাম কৃষ্ণের ভাই হন কেমন করিয়া?

নাগদেব ইতিহাস আমাব এই প্রবন্ধেব প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। মনসা পূজাব অবতারণা একটু একটু বলিতে হইয়াছে।

আমাব প্রবন্ধটি একটি সাক্ষ্য সভাব পঠিত। তাই সমযাজ্যাবে নাগদেব দীর্ঘ বিবরণ দিতে পাবি নাই। ভাদ্র-প্রবাসী ৩৮৫ (১ম

প্যারা), ৩৮৭ (৪র্থ প্যারা), ৩৯০ (১ম প্যারা), ৩৯৫ (২য় প্যারা) পৃষ্ঠা দেখিলে বুঝা যাইবে যে আমি সব কথা বলি নাই।

একদল নাগ যে হুপর্ণদের ভয়ে নারায়ণকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল তাহা আমি প্রবাসী ৩৮৮ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্যারাতে বলিয়াছি।

তাই অচ্ছুরন কুকসখা হইয়াও নাগকল্যকে বিবাহ করিতে পারিলেন (৩৮২ পৃঃ, ৫ম প্যারা)। নাগেরা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত এবং কোনো কোনো দলের সঙ্গে অচ্ছুরনের বিরোধ ছিল না (৩৮৭ পৃঃ, ৬ষ্ঠ প্যারা)।

ভবিষ্যতেও যে এই বিষয়ে অনেক কথা বলিব তাহাও ৩৯৫ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় প্যারাতে জানাইয়াছি। যে বক্তব্য হাতে রাখিয়াছিলাম তাহাব মধ্যে অনন্ত ও শেব নাগের কথাই প্রধান।

অনন্তনাগ নারায়ণকে গ্রহণ করিতেই শক্তিশালী হইল। তাই অনন্তের দল ও নারায়ণের দল এক হইয়া যাওয়া আশ্চর্যের কথা নয়। তাই অবতারণার দ্বারা অনন্তের স্থান হইল।

পীঠায় ১০ অধ্যায়ে আছে “সর্পাধাম্ অগ্নি বাহুকি,” (২৮ শ্লোক), “অনন্তশ্চাগ্নি নাগানাম্” (২৯ শ্লোক)। “বৈনতেয়শ্চ পক্ষিপাম্” (৩০ শ্লোক)। সেখানে কুক আপনাকে শ্রেষ্ঠ বুঝাইতেই অনন্ত ও বাহুকির সঙ্গে এক করিয়াছেন (ত্রঃ—বনপর্ব, ১৮৯, ১১ এবং অশুশাসন পর্ব ১৪৭, ৫৭)।

অশুশাসন পর্বের ১৪৮ অধ্যায়ে শিবকেও এইরূপ “অনন্তনাগ” বলা হইয়াছে (২২ শ্লোক)।

মহাভারতে আছে শেষনাগ অন্ত নাগদেব অধর্শাচরণে বিরক্ত হইয়া নানা তীর্থে তপস্তা করেন। ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “বেশ কথা, তুমি জগতের ভার বহন কর”। তোমার ধর্মকার্যে হুপর্ণ তোমাব সহায় ও মিত্র হইবেন (আদি পর্ব, ৩৬, ২৫)।

আদি পর্বের বলদেবকে শেষনাগেব অশ্বাবতাব বলা হইয়াছে (৬৭ অধ্যায়, ৫২ শ্লোক)। শেষ ও অনন্ত বিরুদ্ধ, তাই এই কথাকে বিরুদ্ধতা হয় নাই। বলদেবের মুখ হইতে অনন্তনাগ বাহিব হইয়া গেলে বলদেব দেহত্যাগ করেন (মৌল পর্ব, ১৬, ১২-১৭ শ্লোক)।

অশ্বশাসন পর্বের (১৪৭ অধ্যায়, ৫৭-৬০ শ্লোক) আছে “বেই রাম, সেই বিষ্ণু স্বীকণ, সেই অনন্ত।”

অনন্ত ও শেব সম্বন্ধে এইরূপ বহু কথা বলিবার আমার আছে। তাহা পরে এক প্রবন্ধে লিখিব। “শেষ নাগের অবতার” কথাটির অর্থ যাহা বুঝিয়াছি তাহাও তখন লিখিব।

আবার আদি পর্বের ১২৭ অধ্যায়ে (৩২, ৩৩ শ্লোক) আছে যে নারায়ণের স্তম্ভ ও কুক কেশেব অবতার বলদেব ও কুক।

ইহা দেখাই ঘাইতেছে যে অন্ত অধাঙ্গিক নাগদেব সঙ্গে ধার্মিক অনন্তনাগেব বিরোধ হইল। তাই অনন্ত বিষ্ণু ভক্ত ও হুপর্ণেব সখা। তাই বলদেব অনন্তের অবতাব হইলে ঘোষ নাই।

ইহা ছাড়া ঐ প্রবন্ধে আমার অনেক সিদ্ধান্ত ও তাহাব হেতু আমি লিখিয়াছি। তাহাব সবগুলি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মনঃপুত হব নাই। ইহা কিছুই আশ্চর্য নয়। সবাই আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এমন আশা করাই অসম্ভব। তবে এইসব বিষয়ের আলোচনা চলিলে নানা জনের সিদ্ধান্ত ও নানাবিধ ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশিত হইতে থাকিবে। তাহাতে আমাদের জ্ঞান প্রতিদিন বাড়িতে থাকিবে।

এই বিষয়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয় আলোচনা করিয়া আমাদেরগকে উপকৃত করিয়াছেন। তাই পুনরায় তাহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রী ক্ষিত্তিমোহন সেন

শূদ্র ও ক্ষুদ্র

কিছুদিন পূর্বে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় “শূদ্র” শব্দ ও “ক্ষুদ্র” শব্দ একই বলাতে কিছু বাতানুবাদ হইতেছিল। শাস্ত্রী মহাশয় সম্প্রতি ভাষা হইতে তাহাব বাক্য প্রমাণিত করিয়াছেন। তবে এই বিষয়ে হিন্দী ও বাংলার প্রাকৃত গ্রন্থাদি হইতেও প্রমাণ মিলিতে পারে।

যথা, ঢাকা মোগলটুলী হইতে শ্রী পূর্ণচন্দ্র সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞ বংশীদাস বচিত পদ্মাপুরাণ গ্রন্থের ১৮৯ পৃষ্ঠাতে দেখি, চাঁদ সদাগর লঙ্কারাজকে আপন পবিত্র দিতেছেন—

“চন্দ্রধর নাম মোর হই ক্ষুদ্র জাতি।

ভরদ্বাজ গোত্র গন্ধবাণিকা পদ্ধতি।”

আবার ১৯৮ পৃষ্ঠাতে দক্ষিণ পাটনের চন্দ্রকেতু রাজাকে পবিত্র দিতেছেন—

“চন্দ্রধর বলে আমি হই শূদ্র জাতি।

ভরদ্বাজ গোত্র গন্ধবাণিকা পদ্ধতি।”

আবার ২১১ পৃষ্ঠাতে রাজাকে পরিচয় দিবার সময় চাঁদ বলিতেছেন—

“চন্দ্রধরে বলে আমি হই ক্ষুদ্র জাতি।

ভরদ্বাজ গোত্র গন্ধবাণিকা পদ্ধতি।”

ইহা হইতে বুঝিতে পারি—বিজ্ঞ বংশীদাস “শূদ্র” ও “ক্ষুদ্র” একই কথা বলিয়া জানিতেন। এইরূপ পুরাতন বাংলা ও হিন্দী শুল্লিলে এই বিষয়ে আরও প্রমাণ মিলিতে পারে।

শ্রী ক্ষিত্তিমোহন সেন

শ্রীযুক্ত হরিদাস ঘোষ

গত ভাত্র মাসখা প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস “মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালী” শীর্ষক প্রবন্ধে নৈহাটি-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস ঘোষ মহাশয়কে ‘সর্গী’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু হরিদাস-বাবু এখনও সশরীরে বর্তমান। তিনি ৫১ নং সিমলা স্ট্রিটে অবস্থান করেন।

শ্রী কিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রী প্রকাশচন্দ্র দত্ত

শ্রী উমাপ্রসাদ ঘোষ

মাঠে আশ্রয়

গত আষাঢ় মাসের “প্রবাসীতে” অজ্ঞানন্দ শ্রীযুক্ত ক্ষিত্তিমোহন সেন মহাশয়ের লিখিত ঢাকা জেলাব “সাতগাঁয়েব বিল” নামক স্থানে মাটির তলায় আশ্রয়ের বর্ণনা দেখিলাম। এই বর্ণনা পাঠেই আমার মনে হয় স্থানটিতে Peat (উদ্ভিজ্জীবনের কয়লায় রূপান্তরিত হইয়াব প্রথম অবস্থা) আছে। আমি সেমন্ত এখানকার জিওলজি বা ভূবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক Dr. Fettes সহিত এ বিষয়ে সামান্য আলোচনা করিয়াছিলাম—তাহারও এই মত।

কয়লার উৎপত্তি উদ্ভিদ হইতে, একথা সকলেই জানেন। অগভীর হ্রদগুলি অনেক সময়ই নানাক্রমে আগাছার পূর্ণ থাকে দেখা যায়। এইসকল গাছ মলে পচিয়া হ্রদের তলায় জমা হইতে থাকে। উদ্ভিদশরীরে অজারের পবিমাণ শতকরা শূন্য বেনী—এই অজার হ্রদের তলায় বহুৎসব ধবিয়া জমিয়া পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপে অবশেষে কয়লায় পরিবর্তিত হয়। এই রূপান্তরের কথেকটি ভিন্ন

ভিন্ন অবস্থা আছে—যেমন peat, lignite, bituminous coal, semi-bituminous, semi-anthracite ও graphite। পীট এই রূপান্তরের প্রথম অবস্থা। দেশের জলবায়ুর অবস্থা শুষ্ক (arid) হইলে—বৃষ্ণ অপভ্রাত হওয়ার শীঘ্রই শুকাইয়া যায়, হুতরাং বেশী কমলা জমিতে পারে না; কিন্তু জলবায়ু ভিঙ্গা বা humid হইলে বৃষ্ণ বহুবৎসর ধরিয়া একই অবস্থায় থাকে—হুতরাং কমলা হইবার খুবই সুবিধা হয়।

ঐযুক্ত ক্রিতিমোহন-বাবুর বর্ণনায় দেখা যায়—হানট বিল। হুতরাং ঐ স্থানে যে বহুবৎসর পূর্বে একটা ছোট বৃষ্ণ ছিল এক্ষণ সহজেই মনে করা যাইতে পারে। এবং সম্ভবতঃ ঐ বৃষ্ণের তলার বহুবৎসর ধরিয়া উদ্ভিদ পচিয়া জমিয়া আছে এবং তাহাব রূপান্তর বোধ হয় প্রথম অবস্থাতেই আছে—কারণ কমলাব ঘনতা (density) পীট অপেক্ষা অনেক বেশী—সেজ্জন্ত সহজে তাহাতে আগুন ধরিতে পারে না এবং আগুন ধরিলেও উহা বেশীদূর পর্যন্ত যায় না—বদি না বাহির হইতে কমলাব মধ্যে বায়ুপ্রবেশের ক্ষমতা যথেষ্ট পথ বা ফাটল থাকে। বর্ণনায় দেখা যায় আগুনধরা জায়গাটি চাবের মাঠ। চাবের মাঠে সাধারণতঃই বেশী জল ঝাঁড়াইতে পারে না (well drained)। সেজ্জন্ত মাটির তলার পীট বেশ শুকাইয়া খুব সহজ (porous) হইতে পারে। এইরূপ পীটে একবার আগুন ধরিলে তাহা সহজে নিবে না। ২১টা বর্ষা বা বস্তার জল তাহার কিছুই করিতে পারে না। প্রায় সমস্ত পীট পুড়িয়া না যাওয়া পর্যন্ত এই আগুন থাকে। আমেরিকার ওয়াশিংটনের নিকট একবার এইরূপ একটা পীটের স্তরে আগুন লাগে—বহু শত একর স্থান ব্যাপিয়া এই আগুন জ্বলিতে থাকে এবং সহস্র সহস্র হিঙ্গপথ দিয়া অনর্গল ধূম উল্লিঙ্গ হয়। ২৩টা বর্ষাতেও ঐ আগুন নিবে নাই।

পীট আমাদের অনেক কাজে আসে—আমেরিকার অনেক বড় বড় কারখানার পীটের আগুনে গীম তৈয়ারি হয়—এদেশে পীটের দাম বিটুমিনাস কমলার দামের প্রায় সমান। পীটের উত্তাপকারী ক্ষমতাও (heat of combustion) খুব বেশী—পীট অনেক সময় সার হিসাবেও ব্যবহৃত হয় এবং ইহা হইতে অনেক সময় কাঠকমলা প্রস্তুত করা হয়। এইসকল নানা কারণে ক্রমেই পীটের ব্যবহার বেগ বাড়িতেছে। সেজ্জন্ত ঐ মাঠের আগুন যতশীঘ্র সম্ভব নিবাইতে পারিলে এই পীটের উদ্ধার হইতে পারে। তা ছাড়া চাবের জঙ্গল আগুন নিবান দরকার। এই আগুন নিবাইতে হইলে ঐ মাঠের চতুর্দিকে জল নির্গমনের পথ (drainage) সমস্ত বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত—তাহা হইলে এই-সমস্ত বাঁধে জল আটকাইয়া ঐ জায়গায় কিছুদিন ঝাঁড়াইতে পারিলে আগুন নিবিত্তে পারে। আমাদের দেশে আমরা খনিজ পদার্থের তত মূল্য বুঝি না। অনেক জায়গায় অনেক রকম মাটি পাথর চুন ইত্যাদি চিবকাল দেখিয়া আসি—তাহা ব্যবহারের চেষ্টা করি না। কিছুদিন পরে দেখি কোনও সাহেব কোম্পানী আসিয়া ঐ জায়গায় সমস্ত বড় কারখানা খুলিয়া বিস্তর টাকা উপার্জন করিতে থাকে। আমাদের নিজেদের অবহেলাতেই অনেক সময় আমরা এই-সব জিনিস হারাই। যে মাঠে আগুন লাগিয়াছে—সেখানে পীট আছে বলিয়া সম্ভব হওয়া খুবই সহজ—হুতরাং উহাব ভাল করিয়া সম্ভবতঃ একটা পরীক্ষাও হওয়া একান্ত দরকার। এই পীট পাওয়া গেলে ইহার আর বড় অর্থ হইবে না।

অবশ্য এতদূর হইতে ঐ স্থানের সকল তথ্য ঠিক করিয়া না জানিয়া কিছু একটা স্থির নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তাহা ছাড়া—ঐ স্থানে পীট থাকার বিরুদ্ধেও একটা জিনিস দেখিতে পাই ঐ জায়গার মাটির রঙ। সাধারণতঃ যেখানে পীট থাকে—সেখানে

মাটির রঙ কাল বা brown অর্থাৎ পাটল হয়—কিন্তু এই জায়গায় মাটির রঙ ক্রিতিমোহন-বাবুর বর্ণনায় দেখি লাল। Dr. Fettke মনে করেন বোধ হয় ঐ স্থানে পূর্বে আরও একবার আগুন লাগিয়াছিল—তাহাতে মাটির রঙ বদলাইয়া গিয়াছে।

যাহা হউক এ সম্বন্ধে অন্ততঃ একটা অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন মনে করি। পীটের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইলে আগুন যতশীঘ্র সম্ভব নিবাইয়া ফেলা উচিত। স্থানীয় দরিদ্র চাষারা এই-সকল বিষয়ে অত মাথা ঘামানো দরকার মনে না করিতে পারে—কিন্তু বাঁহাদের পয়সা আছে—তাহারা আরও কিছু পয়সা করিবার জন্য একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন।

সম্প্রতি নিউইয়র্কের আমাদের একটা বাঙালী বন্ধু এদেশে একটা পীটের জায়গা ইজারা লইয়া খনি করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রী সন্তোষকুমার বসু

Mining Engineering Student,
Carnegie Institute of Technology,
Pittsburgh., Pa.
U.S.A.

খন্দর

খন্দর প্রচলনের বিরুদ্ধে যে-সকল যুক্তি সচরাচর প্রদর্শন করা হয় তন্মধ্যে একটি এই যে দেশীয় তাঁত বিদেশীয় মিলের প্রতিযোগিতায় আটকা উঠিবে না। এই যুক্তি যে অন্ততঃ কিয়দংশে অসার তাহা জাপানের বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হয়।

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি New York-এর National Bank of Commerce কর্তৃক প্রকাশিত "Commerce Monthly" নামক মাসিক পত্রিকায় বিগত July সংখ্যায় Japan's Trade in Cotton and Wool Textiles শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত হইল। বলা বাহুল্য উক্ত ব্যক্তির মুখপত্রের খবরাখবব অতীব বিশ্বাসযোগ্য হইতে সংগৃহীত হয়।

"For many years after the beginning of cotton manufacturing in Japan, yarns were practically the only product of the industry. These were woven into cloth in the homes on Inarrow hand-looms, and were exported to China."

"The number of Japan's power looms in 1920 was estimated at 110,000 as compared with 798,000 looms in the United Kingdom, and 728,000 in the United States. Japan's ability to export cotton cloth, however, is greater than would at first appear, for as domestic demand is largely met by the product of hand-looms, a considerable number of Japan's power looms produce for export only."

অতঃপরে হাতের তৈয়ারী কাপড় ব্যবহার করিয়া বিশেষে কলেব জিনিষ রপ্তানী করে।

পুনরাব, জাপানে যে এখনও মোটা সূতা ও মোটা সূতার কাপড় প্রস্তুত হয় তাহার প্রমাণ—

"Coarse, low count yarns have always formed the greater part of Japan's output."

"Up to the present time, the large trade in textiles has consisted mainly of inferior and coarsely woven materials."

কম্বার কথায় আমরা জাপানের সহিত ভারতের তুলনা করি। এই বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে জাপানীদের ব্যবসায়ী বুদ্ধি অনুসরণ করিলে আমরাও তাহাদের ন্যায় উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিব

শ্রী—



চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ [ব্রজলীলা] - ঐশ্বর্যচরণ বিদ্যাহূষণ
সঙ্কলিত। প্রকাশক ভাবত-চিত্র-মন্দির, ১৪২ গ্রাণ্ড টাঙ্ক, বোম্বে,
শিবপুর, হাওড়া। ৪১ পৃষ্ঠা, ৪১ খানি বন্ডিন ছবি, বেশশী কাপড়ে
উত্তম বাঁধা। দাম চাব টাকা।

ঐকৃষ্ণের ব্রজলীলার প্রধান প্রধান ঘটনা এক এক পৃষ্ঠায়
বিবৃত হইয়াছে ও তাব সম্মুখে এক এক পৃষ্ঠাব্যাপী বন্ডিন ছবিতে
সেই ঘটনা প্রকটিত হইয়াছে। কৃষ্ণভক্তদের কাছে এই পুস্তক
সমাদৃত হইবে। ছবিগুলি রঙিন, কিন্তু তার মধ্যে কোনো আঁট নাই—
নিতান্ত মানুসি।

সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা—শ্রী যতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন
প্রণীত। ভট্টাচার্য এণ্ড সন্স, কলিকাতা, ঢাকা, ও ময়মনসিংহ।
ডবল ফুলফ্যাপ ১৬ পেজি, ১২৭ পৃষ্ঠা। কাপড়ে উত্তম বাঁধা। দাম
আট আনা।

প্রথমে কাব্য ও আর্টের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া লেখক এই স্থির
করিয়াছেন যে—লোকশিক্ষা ও সমাজেব উন্নতিসাধন আর্টের প্রধান
উদ্দেশ্য। তাবপব বর্তমান যুগের বাংলা সাহিত্যে এই উদ্দেশ্য কি পরিমাণে
সাধিত হইতেছে তাহা বিচাৰ কবিত্তে প্রযুক্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথের
চোখের বাঁলি, নষ্টনীড়, ঘরে-বাইরে; শবৎচক্রে চরিত্রহীন, বড়দিদি,
পল্লীসমাজ, দেবদাস, স্বামী; হবিদাস হালদাবের কণ্ঠের পথে প্রভৃতি
পুস্তক সমালোচনা করিয়াছেন; এবং বিধবাব প্রেম, সম্ভব প্রেম ও
বারবনিতাব প্রেম অঙ্কনের জন্ত লেখকদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া
সমালোচক নিন্দা করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথকে এক জায়গায়
'পাগল' বলিতেও সমালোচক দ্বিধাবোধ করেন নাই। সমালোচকের
মতে—সমাজে অনেক খাবাপ লোক আছে, তাহাদের প্রলোভনময়
পাপচিত্র অধিকতর প্রলোভনীয় কবিদ্বা ধরিতে তাহারা অনেকের
অনুকরণীয় হইতেছে। কবি কেবল পুণ্যের আলোক ফুটাইবার
জন্ত তাহার পাশে পাপচিত্র অঙ্কিত করিবেন, পাপের দণ্ডবিধান
করিয়া পুণ্যের মর্যাদাবৃদ্ধি করিবেন, কাবণ ইহাই সমাজের পক্ষে
মঙ্গলজনক। সমাজে এসব ছনীতিপূর্ণ পুস্তকের প্রচাবে যে প্রেমরোগ
ছড়াইতেছে তার প্রতিবেদক হইতেছে বালাবিবাহ।

সমালোচক গোড়ায় গলদ করিয়াছেন—খাবাপ পাপচিত্র অঙ্কিত করেন
তারাও তাহা গর্ত করিয়াই প্রকাশ করেন, কেবল গুপ্ত-ঠাকুরের মতন
উপদেশ দিয়া পাঠককে বলিতে যান না যে—দেখিলে ত পবিণাম,
ধবরবদাব ও পথে পা দিও না। সেকপ করিলে এক শ্রেণীর লোক হাঁপ
ছাড়িয়া বাঁচেন বটে, কিন্তু কলাসবস্তীর তাতে হাঁপ ধরে। লেখক
পাঠকের কাছে এতটুকু বুদ্ধিব আণা করেন যে সে আধ্যাতিকাব
অজনিহিত উদ্দেশ্যটি তলাইয়া বুঝিবে। চোখের বাঁলি বিনোদিনী,
ঘরে-বাইরের বিমলা, চরিত্রহীনের কীরণময়ী প্রভৃতিব আচরণ যে জন্তর
ও ভুল এইটাই লেখকেরা দেখাইয়াছেন, কোথাও লেখকেরা সেইসব
চরিত্রের আচরণ সমর্থনও করেন নাই, অনুকরণীয়ও বলেন নাই।
যতীন্দ্রমোহন-বাবু পাড়াকুঁছলী মতন কুলগাছের কাঁটায় কাপড়
আটকাইয়া কৌদল খুঁজিয়াছেন—রসজ্ঞতাব পবিচয় দেন না।

তিনি বসিক, বসবচনাতেও তাঁর কৃতিত্বের সাক্ষী প্রবতারা ও উড়িয়ায়
চিত্র। মানুষের মন বিকল্প (biased) হইলে তার আর সুবিচারের
শক্তি থাকে না—এই বইখানি তাহার দৃষ্টান্ত হইয়াছে বলিয়া আমবা
হুঃখিত।

মুদ্রাবাক্স

পূর্ণপুট [দ্বিতীয় খণ্ড]—শ্রী কালিদাস রায়, বি-এ প্রণীত।
খণ্ড এণ্ড কোং হইতে শ্রী চন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত, ৪২
রমা রোড নর্থ, ভবানীপুর, কলিকাতা। দাম পাঁচ টাকা।

কবি বাংলা সাহিত্যে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ। তাঁহার পূর্ণপুট সুপরিচিত কাব্য-
গ্রন্থ। পূর্ণপুটের আলোচ্য খণ্ডে কতকগুলি পৌরাণিক ও পল্লী সম্বন্ধীয়
কবিতা আছে। অধিকাংশ কবিতাই বেশ সহজ স্থলর। পৌরাণিক
কবিতাগুলি স্বদেশ-প্রেমে ও স্বজাতি-গৌরবে অনুপ্রাণিত। পল্লী সম্বন্ধীয়
কবিতাগুলি স্নিগ্ধ। গ্রামের 'পুঙ্খ ৭ ঠাকুর' হইতে 'কুবক-বালা' পর্যন্ত
সকলকার ব্যথাই কবি সমান ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। 'চীন
পরিব্রাজকের প্রতি' শীর্ষক কবিতাটিতে কবির স্বদেশাত্মরোগ ও স্বজাতি-
গৌরব সহজ ধাবায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই কবিতাটি শব্দসম্পদেও
সম্পদশালী—

"কহ—মোবা নহি হেম আফ্রিকাব কাক্সির মতন,
মোদের অতীত নহে অবগ্যেব জঘন্য জীবন।

সমগ্র নিখিল যবে ঘন বনে,—গিবিব গুহায়
হুঃখন্ন দেখিতেছিল অজ্ঞতার বোব তমিশ্রায়,
ভারত তখনি ছিল বিঘবন্দ্য। আলোকের বাণী,
জ্ঞানের হুমেক-শুদ্ধে ছিল তার তুঙ্গ-রাজধানী।
নালন্দা বৈশালী কাঞ্চী তক্ষশিলা উজ্জয়িনী কাশী
প্রবমন্ত্রে সত্যমার্গে জ্ঞানস্বর্গে উঠিল উদ্ভাসি";
জ্যোতিষ্মণ্ডল যেন দৌলোকে সমুচ্ছলতম,
বিবিধিষ চতুর্মুখে মুষ্টিমান বেদগান সম।

* * * *

অহিংসা-মন্ত্ৰের স্বধা, মৈত্রীচন্দ্র তুলিয়া আকাশে
মগধের রাজশক্তি আখ্যাবর্তে বাঁধে বাহুপাশে,
সর্ব্বষ বিলাসে নিঃস্ব বকপট পবিত্র সন্ধানি,
জানি-গুণি-পদপ্রান্তে ক্ষাত্রশক্তি লুটাত ললাট।"

একটা কথা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কবির পূর্ণপুট
প্রথম খণ্ডের সহিত দ্বিতীয় খণ্ডের অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়।
প্রথম খণ্ড যেমন স্বতঃ-উৎসারিত সহজ-কবিত্ব-মণ্ডিত, দ্বিতীয় খণ্ড
তেমন বলিয়া বোধ হয় না। দ্বিতীয় খণ্ডে ভাষা ও ছন্দেব দিকে
কবির সৌক দেখা যায়। তবে প্রথম খণ্ডেব প্রেম-অভিব্যক্তির
চঞ্চলতা দ্বিতীয় খণ্ডে শান্ত হইয়া ফুটিয়াছে।

উনপঞ্চাশী—শ্রী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক
শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২ রামবতন বোস লেন, শ্রামবাজার,
কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৪৭। দাম পাঁচসিকা।

মানুষের তীব্রতম বেদনাও অনেক সময়ে হাসিব আকাবে ফুটিয়া
উঠে। উপেন্দ্র-বাবুকে আমবা একজন প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষী বলিয়া

জানি। দেশের নানা গল্প তাঁহার মনে যে বেদনার সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই তিনি বিজ্ঞপের আকারে হাসিতে প্রকাশ করিয়াছেন। 'বিজ্ঞপ' নামের "হাসির গান" এই ভাব হইতেই উদ্ভূত। "হাসিব পানব" পর আলোচ্য গ্রন্থে ছাড়া, দেশের অন্তর-অন্তরের উপর এমন বিজ্ঞপ-কশাঘাত আব দেখা যায় না। বহু বৎসর ধরিয়া স্বপ্নাস্তর-নির্ধ্যাতিত মানুষের চিত্তে যে এমন অনাবিল হাসিব ধাৰা সঞ্চিত থাকিতে পারে তাহা ভাবিলে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে হয়। শেষে একটা কথা আমরা না বলিয়া পারিতেছি না। মহাত্মা গান্ধীর মত ব্যক্তিকে লইয়া মাঝে মাঝে যে ব্যঙ্গ-তামাসার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অনেকের পক্ষেই পীড়াদায়ক। বইটির দাম কিছু কম হইলে ভাল হইত।

—শুভ

পথের সন্ধান—স্বামী স্বরূপানন্দ। কলকাতা-গুরুকুল-সমিতি, ১৩ ব্লকিয়া স্ট্রিট, কলিকাতা। অবৈতনিক ব্রহ্মচর্য আশ্রমের সাহায্যার্থ মূল্য—ছয় পয়সা।

কতকগুলি ছোট ছোট উক্তির সমাবেশে জীবনের পথের সন্ধান প্রদর্শিত হইয়াছে। জীবনের পথ হইতেছে—আশা, ত্যাগ, সাধুতা, প্রেম, অতীত। উক্তিগুলি বেশ জোড়ালো ও সত্যজিহ্বিতে স্বদৃঢ়।

স্বামীজীর পত্র—স্বামী স্বরূপানন্দের লিখিত কতকগুলি পত্র। অবৈতনিক ব্রহ্মচর্য আশ্রমের সাহায্যার্থ মূল্য দশ আনা। বহু সত্য উপদেশ এই পত্রগুলিতে আছে। বলায় ভাষা তেজস্বী, উক্তি স্বামুভব-সম্প্রদায়, সেইজন্য মর্ম্ম স্পর্শ করে। যিনি পড়িবেন তিনিই উপকৃত হইবেন।

শশিনাথ—শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ২০৩/১ কলকাতা স্ট্রিট, কলিকাতা। ২০ পৃষ্ঠা, কাগজে বাঁধা। আড়াই টাকা।

এখানি উপন্যাস—পারিবারিক ও সামাজিক উপন্যাস শ্রেণীর। গল্পের গট নিত্যন্ত ঘরোয়া, কিন্তু সেই ঘরোয়া গটকে ঘোবালো কবিতা লেখক বিশেষ শক্তি ও মূল্যমানের পরিচয় দিয়াছেন।

সোমনাথ ও শশিনাথ দুই ভাই; অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন হইলে তাঁহাদের পিসিমা তাঁহাদের পালন করেন। বাড়ীর পাশে এক রুগ্ন ভদ্রলোকের ভাস্কর্য্য দেখিয়া পিসিমা উপাচার্য্য হইয়া সেই মেয়ে উর্দুলাব সঙ্গে সোমনাথের বিবাহ দেন; বিবাহের পথেই উর্দুলাব মামা মামা যান, উর্দুলাব বোন লীলাও ভাব পিসিম গ্রহণ করেন উর্দুলাব বাকরী বৃদ্ধি লইলে পিসিমা কানীবাদিনী হন।

সোমনাথ বিবাহ করিয়া আর লেখাপড়া কবিতা পাবেন নাই; তিনি নিত্যন্ত সংসারী সামাজিক জীব এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে একটু মাটো। শশিনাথ দাদার উট—বিদ্যান, বুদ্ধিমান, সংসার-বিস্তৃত, রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হইতে উৎসৃষ্ট। উর্দুলাব এই দুই ভাইয়ের guardian angel—রক্ষণ-দেবতা। স্বামী-স্ত্রী, ভাই ভাই, ভ্রাতৃত্বা-দেবর এই ত্রি-সম্পর্কে চিত্র লেখক বড় মধুময় প্রাণস্পর্শী কবিতা আঁকিয়াছেন—একপাশি আদর্শ গৃহস্থালি ছবি।

উর্দুলাব ইচ্ছা যে ভগিনী লীলাব সঙ্গে শশিনাথের বিবাহ দিয়া বোমকে নিজেব কাছে ও দেবরকে সংগে ধরিয়া রাখেন। এই প্রস্তাব বেদিন শশিনাথের কাছে কবা, হইল তখন শশিনাথ অস্বীকার কবিতা দাদাকে বলিল—“লীলা যেন স্বপ্নেও একথা মনে না কর্তে পাও যে সে তোমার আশ্রয়ে আছে বলে” তুমি সংপাত্রেব চেষ্টা একবার রাস্তা পর্য্যন্ত মাড়ালে না সস্তা মাল বাড়ী থেকেই ধরে দিচ্ছ।—দেশে ত সংপাত্রেব অভাব নেই—আম যদি দেখি যে

লীলাব এমন কোনো পাত্রেব সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে যে আমার চেয়ে কোনো অংশে হীন, তখন আমি সে বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে লীলাকে বিয়ে করব। কিন্তু তার আগে কেন?” শশিনাথ তার সহপাঠী স্মৃতির সঙ্গে লীলাব বিবাহ স্থির কবিল—স্মৃতির রূপে শুধে বিদ্যার প্রতিষ্ঠার ধনে মানে অসাধারণ।

বিবাহের পবদিন লীলাব বাকস সাজাইতে গিয়া উর্দুলাব বাকসর ভিতর হইতে বাহির কবিলেন শশিনাথের একজোড়া জুতা। সেই দিন জানাজানি হইল যে লীলা শশিনাথকেই ভালোবাসে, শশিনাথের হকুমেরে সে বিবাহ কবিতাছে।

ইতিমধ্যে ব্যাপার আর-একটু জটিল হইয়াছে এক সরযু আবির্ভাবে। সরযু শশিনাথের পিতৃবন্ধুব কস্তা; এক কায়স্থ একেবারে সরযুব পাণিগ্রার্থী হওয়ার সরযু গ্রামিকেবা ব্রাহ্মণকস্তার ধর্ম্মরক্ষা জন্ত ব্যস্ত হইয়া সরযুব পিতাকে উৎপীড়ন করিতেছিল। শশিনাথ এই সংবার পাইয়া বন্ধু ববেলকে লইয়া সবু ও তার শযাপত পিতাকে গ্রাসিকরের অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিয়া কলিকাতা আনে। একেসব-পুঙ্খব শেষে সরযুকে বিবাহ করিতে অস্বীকার কবে, এবং সরযুব রুগ্ন পিতা সরযুকে শশিনাথের হাতে সমর্পণ কবিতা প্রাণত্যাগ করেন।

বরেন্দ্র সরযুকে ভালোবাসিয়াছিল। কিন্তু শশিনাথের প্রতি নিজেব কৃতজ্ঞতাকে ও শশিনাথের হাতে তাকে তার পিতা সমর্পণ কবিতাছেন অতএব শশিনাথই তার স্বামী এই ধারণাকে সরযু শশিনাথের প্রতি ভালোবাসা বলিয়া ভুল কবিতা ববেলকে প্রত্যাখ্যান কবে।

লীলাব বিবাহের পরে লীলাব স্বামী স্মৃতির ভ্রানিতে পারে যে লীলা উর্দুলাব সহোদরা নয়, এবং লীলাব মা লীলাব পিতাব সহধর্ম্মিনী ছিলেন না। স্মৃতির কুশণ্ডিকা সিন্দূরদান প্রভৃতি অস্থান না কবিতা লীলাকে ত্যাগ কবে।

লীলাব বিবাহ হইয়া গেলে শশিনাথ বৃদ্ধিতে পারে যে সে লীলাকে কত ভালোবাসিত। স্মৃতি লীলাকে ত্যাগ কবিতাছে জানিয়া শশিনাথ লীলাকে নিজের বাড়ীতে কিবাইয়া আনে এবং লীলাকে বিবাহ করিতে প্রস্তত হইল। কিন্তু এই বিবাহের বাধা হইল সোমনাথ ও লীলা—সোমনাথ সমাজের ভয়ে এবং লীলা শশিনাথকে লোকচক্ষে হেঁয় করিবাব ভয়ে ও সরযুকে দুঃখী কবিবাব আশঙ্কায়।

লীলা বেঙ্গল চাকরী লইয়া যাইবে, পোপনে সে শশিনাথের কাছে গভীর রাতে বিদায় লইতে গিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িতাছে। শশিনাথ লীলাকে নিজেব শয্যায শোয়াইয়া শুশ্রুষা করিতেছে, এমন সমব উর্দুলাব ও সোমনাথ সেই ঘবে আসিতা তাহাদের সেই অবস্থায় দেখিতা সন্নিহান হয়।

লীলা ও শশিনাথ মিথ্যা কলঙ্কেব প্রতিবাদ না কবিতা উভয়ে রেঙ্গুন চলিতা গেল। সোমনাথ ও উর্দুলাব যখন নিজেদের ভুল জানিতে পারিতা শশিনাথ ও লীলাকে কিবাইতে গেল তখন ঈশ্বার জেট ছাড়িতা মার গঙ্গার ভাসিতা গিতাছে।

বরেন্দ্রের অনুরাগ সরযুব স্বয়ং অথ করিতে সক্ষম হইলেও বন্ধু ও আত্মীয়-বিচ্ছেদে তাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হইতে পারিতা না।

এই মোটামুটি গট। কিন্তু সংক্ষেপে গটের জটিলতা ও বর্ণনাব চাতুর্য্য কিছুই বুঝাইতে পারিতাম না। সরযু শশিনাথকে পতীর শ্রদ্ধা কবে, তাই তার মুখে শশিনাথের প্রতি কোনো মমতাব কথা প্রকাশ পায় না; কিন্তু শশিনাথের বন্ধু ববেলকে উপব তার টানের পবিচয় কথায় কথায় পাওয়া যায়; শ্রদ্ধাঙ্গব ব্যক্তির বন্ধু বলিতা যে দবদ, তাকে শশিনাথ ও ববেল দুজনেই ভালোবাসা বলিতা ভুল কবিতাছে—এইট লেখক অতি কৌশলে পাঠককেও না জানাইয়া

ববাবব প্রকাশ করিয়াছেন। সীলা, শশিনাথ, ববেন্দ্র ও সবুয মনস্তত্ত্বের জটিলতা ও সংবাত্ত অতি নিপুণতাব সহিত দেখানো হইয়াছে। প্রত্যেক চবিত্র জীবন্ত হইয়াছে, এমন কি পিসিমা মাত্র দুবার গটনাঙ্কেত্রে আবিস্কৃত হইলেও একটি নিজস্ব মূর্তিতে পাঠকের মানস-লোকে প্রতিভাত হন।

এই বইখানি পড়িয়া আমবা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি—লেখক অসাধারণ শক্তির ও শিল্পচাতুর্য্যের পবিত্র দিয়াছেন।

ভুলের ফসল—শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, এল-এম্বি। প্রকাশক—শ্রী রবীন্দ্রনাথ মিত্র, ১ নিকানীপাড়া লেন, গুামবাজার, কলিকাতা। দশ আনা।

লেখক চাৰা। লিখিয়াছেন গল্প, চাৰের মহিমা প্রকাশ করাৰ উদ্দেশ্যে। চাৰ, সমবায়, পল্লীসংস্কার, প্রভৃতি বিবরের চারটি গল্প। গল্পগুলি সম্পূর্ণ নূতন ধৰণের। পেরো চবি মাঝে মাঝে বেশ ফুটিয়াছে। লেখার মুক্তিযানাব অজাব আছে; তবে লেখকের এই প্রথম উদ্যম ও রচনা উদ্দেশ্যমূলক, হৃতবাং শিল্পবচনা আশা করা যায় না।

প্রবাসীমুদ্রী ও শ্রীকৃষ্ণরত্নাবলী—শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণ-নন্দ স্বামী-প্রণীত। কানী বোগাশ্রম হইতে প্রকাশিত ও বিনা মূল্যে বিতবিত। ছোট আকাবের ক্ষুদ্র বই।

এতে দেহ চিত্র আত্মা সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা, কতকগুলি হিন্দী তত্ত্বমূলক কবিতাব অনুবাদ, সংসদ্রের স্বরূপ, ও সাধনাভ্যাসের ক্রম নিরম দেওয়া হইয়াছে।

ভক্ত নন্দ—শ্রী স্ববচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। প্রকাশক শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, মেদিনীপুর। খুব ছোট আড়াব ছোট বই। দাম দশ পয়সা।

মাত্রাজী ভক্ত অস্পৃশ্যমন্ত পড়িয়া জ্ঞাতির নন্দের মহত্বকথাব বই।

প্রার্থনাতত্ত্ব—শ্রী বোগেন্দ্রনাথ দেবশর্মা (মৈত্র)। পাবনা। বিনামূল্যে বিতবিত।

ভগবান ও মাতৃভূমিব ধ্যান ও আবাধনা সম্বন্ধীয় বই।

তারবিন্দ-মন্দিরে—প্রবর্তক হইতে পুনমুদ্রিত, দাম বাবো আনা।

শ্রীযুক্ত অববিল্ল বোধের মন্দিরে যে সব কথা আলোচনা হইয়াছে তাবই সংগ্রহপুস্তক। বিবিধ গভীর তত্ত্ব ও জটিল সমস্যাব মীমাংসা আছে।

সনাতন ধর্ম ও মানব-জীবন—স্বামী বোগানন্দ প্রণীত। পাবো হিল বোগাশ্রম। এক টাকা।

মমুষ্যত্ব, দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব, ব্রহ্মত্ব কি, ও তাহা লাভের সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

মালুটী রাজবংশ—শ্রী ইন্দ্রনাথবরণ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। মালুটী, সাঁওতাল পরগণা। এক টাকা।

মালুটী রাজবংশের ইতিহাস। অনেক অমৌকিক আঙ্কণবি কথাও ইতিহাস নামে এই বইএ স্থান পাইয়াছে।

ভাঙ্গাগড়া—শ্রী হুম্মাববন্দন দাশ, রাব এও বাবচৌধুরী, ২৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট দোতলা, কলিকাতা। ছয় আনা।

প্রবন্ধ পুস্তক। ষাধেশিকতাব সীমা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, গ্রহণ ও বর্জন, ভাঙ্গন ও গড়ন, যুগ-সাধনা, শক্তি-সাধনা সম্বন্ধে ছবিট প্রবন্ধের সমষ্টি। বিশেষ সঙ্গে বোগয়ুক্ত হইয়া, সকলের সঙ্গে চলাব

তাল টিক বাখিরা ষদশের কল্যাণের জন্ত শক্তিসাধনা করিতে হইবে—ইহাই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য।

হেথা-সেথা—শ্রী পাঁচকড়ি বোধ। প্রকাশক শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বাব, ১৭২ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা। ছবি আছে। নানা দেশ ভ্রমণের বর্ণনার বই। শিমলা থেকে রামেশ্বর ও শিলা থেকে বোম্বাই চৌহন্দীর মধ্যে অনেক দুর্গম স্থানের বর্ণনা ইহাতে আছে।

পঞ্চশস্য—সংগ্রাহক শ্রী পাঁচকড়ি বোধ। প্রকাশক শ্রী অঞ্জনচন্দ্র সান্তাল, ১ বিবি বোজিও লেন, কলিকাতা। এক টাকা। ১০ টি বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধের বই। পুণ্যচবিত্র, প্রাচীন কবি, ভক্তিপ্রসঙ্গ, বঙ্গসাহিত্য, কাব্যহন্দরী—এই পাঁচ বিষয়ের ১০ টি প্রবন্ধ এতে আছে।

যুধিষ্ঠির—শ্রী শশিকৃষ্ণ বহু। ইন্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ; ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। সচিত্র। এক টাকা। যুধিষ্ঠিরের চরিত্র বিশ্লেষণের শিশুপাঠ্য পুস্তক। ইহাব মধ্যে মহাভারতের মূল উপাধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের মহত্ব ও বিশেষত্ব ক্রমশ উদ্ঘাটিত করা হইয়াছে।

প্রাথমিক ব্যবসা শিক্ষা—শ্রী সন্তোষনাথ শেঠ সাহিত্য-রত্ন প্রণীত। চন্দ্রনগর। ২৮৪ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। আড়াই টাকা। ব্যবসা-শিক্ষার্থীর বিশেষ উপকারী বই। এতে ব্যবসায়ের অনেক তত্ত্ব, তথ্য, জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

আত্মিক জগৎ—শ্রী মদ্রনাথ নাগ প্রণীত। মেদিনীপুর-হিতৈষী কার্যালয়।

ভূত নাগানো, সম্মোহন, অশবীষী আত্মাব সঙ্গে কথাবার্তা সম্বন্ধীয় বই। লেখক নিজের অভিজ্ঞতা ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

গুণভক্তি—সিট বুক সোসাইটি, ৬৪ কলেজ স্ট্রীট। সচিত্র। চাব আনা।

একলব্য, আকণি, উপমম্মা—মহাভারতের তিনটি বিখ্যাত চবিত্রের গুণভক্তিব কাহিনী। শিশুপাঠ্য বই।

মিতা—ভাঙ্গ সংখ্যায় মরমের উপাধ্যান আছে। শ্রী অমিয়া মিত্রজাযার লেখা, শেষ পাতায় একটি কবিতা আছে—শিশুর প্রাণ।

সুবল সখার কাণ্ড—শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন। রাব এও বাবচৌধুরী, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট দোতলা, কলিকাতা, রেশমী কাপড়ে বাঁধা, অনেকগুলি বঙিন ছবি আছে। দাম আঠারো আনা। কুকলীলার কথা—সুবল নানা রূপ ধাবণ কবিয়া অভিনয় করিতেন তাবই বর্ণনা। ভূমিকায় বৈকবতত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে।

পাপের ছাপ—শ্রী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। এম সি সবকার এও সঙ্গ, ২০১২ হ্যাভিসন বোড, কলিকাতা। কাপড়ে বাঁধা। নয় সিকা।

উপনাস—এতে Criminology বা অপরাধতত্ত্ব ও Sexology বা মিথুনতত্ত্ব উপস্থানের প্রটেব সঙ্গে জড়াইয়া অতি দক্ষতা ও শক্তির সঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। সকলের ক্রটিতে এই বই ভালো লাগিবে না; কিন্তু ক্রটি ও সাহিত্যে এইসব তত্ত্ব আলোচনার উপযোগিতার বিচাব ছাড়িয়া দিয়া যে উদ্দেশ্যে এ বই লেখা কেবল

তাহারই বিচার কবিলে বলিতেই হইবে যে লেখক বিশেষ শক্তিসমন ও বঙ্গসাহিত্যে একটি নতুন ধারার প্রবর্তন কবিতেন্নে।

প্রলাপ—শ্রী যশোদালাল তালুকদার। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩/১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। পাঁচ টাকা। উপস্থাস।

ঝড়ের দোলা—প্রকাশক Four Arts Club, ৮৮বি হাঙ্গরা রোড, কলিকাতা।

চারটি গল্প চারজন লেখা। পাগল—শ্রী হনীতি দেবী। মাধুরী—শ্রী গোকুলচন্দ্র নাগ। শ্রীপতি—শ্রী মনীন্দ্রলাল বসু। জয়মালা—শ্রী বীণেশ্বরনাথ দাশ। চারটি গল্পই স্থলিত।

ঘর পরে—শ্রী বৈষ্ণবনাথ কাব্যপুণ্ডরীক। ডি. এম. লাইব্রেরী, ২০১এ বোম্বার স্ট্রিট, কলিকাতা। উপস্থাস।

আমার ফটে—শ্রী অবতাবল্ল লাহা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। বেশী কাপড়ে বাঁধা। দেড় টাকা। উপস্থাস।

ব্যথার দান—কাজী নজরুল ইসলাম। মোসলেম পাবলিশিং হাউস, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, দেড় টাকা। ছোটগল্পের বই। ৬টি গল্প আছে।

বসন্ত-প্রসূন—শ্রী প্রমোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন। প্রকাশক শ্রী বলিভ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, কক্সের রোড, শ্রীবামপুত্র। চাব আনা। পঞ্চের বই।

গান্ধী-মাহাত্ম্য—শ্রী কালীহর দাস বসু। প্রকাশক শ্রী মনসা-চরণ বসু, হাঁসাড়া, ঢাকা। তিন আনা।

মহাযন্ত্র—শ্রী কালীহর দাস বসু ভক্তিসাগর। প্রকাশক শ্রী মধু-সুধন দাস অধিকারী, শ্রী বৈষ্ণবসঙ্গিনী কার্যালয়, এলাটি পোষ্টাফিস, জেলা হুগলি। সওয়া চার আনা।

চৈতন্যদেবের কথা, বর্ণনা নেকামীন্দ্রা।

হোমিওপ্যাথিক কলেরা এবং রক্তামাশয়

চিকিৎসা—ডাক্তার শ্রী আশুতোষ চক্রবর্তী, হুগলিশ্রমণ দাতব্য ঔষধালয়, ব্রজকব পোষ্টাফিস, জেলা কদ্রিপুর। দশ আনা।

বহু প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের মত ও ঔষধনির্দেশ এই পুস্তিকায় সংগৃহীত আছে। গৃহস্থের ও চিকিৎসকের উপকারে লাগিবে।

বাজীকর—শ্রী প্রেমাকুর আতর্ষী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। আট আনা।

ছোটগল্পের বই। গল্পগুলি স্থপাঠ্য।

মহাশ্মেতা—শ্রী বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। আট আনা। ছোট উপস্থাস।

দুঃখের পাহাড়—শ্রী বঙ্কিম সেনগুপ্ত। প্রকাশক শ্রী শঙ্করচরণ সেনগুপ্ত, রিসার্চ হোম, পাটনা। এক টাকা। উপস্থাস।

পরীর কাহিনী—শ্রী হবিব রহমান। মধ্যমী লাইব্রেরী, ৫এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। বাবো আনা।

পরীর আবির্ভাবের গল্প।

মিলন—শ্রী সরদারলাল বসু। প্রকাশক—শ্রী অনাথনাথ মুখো-পাধ্যায়, ৫০ বাগবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা। ১৫০। উপস্থাস।

শ্রোয়সী—শ্রী সরদারলাল বসু, শিশির পাবলিশিং হাউস, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা। ১০। ছোট গল্পের বই।

এসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য—মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ২৯ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। এক টাকা।

কোরান ও হাদিসের বাক্য উদ্ধৃত কবিয়া জীবনযাত্রার প্রত্যেক ক্ষেত্রে সদাচরণ কবিবার উপদেশের বই।

স্মরণ কোন পথে—শ্রী হেমন্তকুমার সরকার। ইতিহাস বুক ক্লাব, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা। আট আনা।

এ বইএ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে—(১) আমাদের সাধনা, (২) সত্যপ্রকাশ, (৩) কো-অপারেটিভ নন-কোঅপারেশন, (৪) সমবেতভাবে নিরুপদ্রব আইনভঙ্গ, (৫) কৃষিশ্রমী-সমস্যা, (৬) শ্রমজীবী-সমস্যা, (৭) গ্লেবে ভয়, (৮) নারীজাতির কর্তব্য, (৯) স্বাভাবিক সময়, (১০) নন-কোঅপারেশন ও সোসিয়ালিস্ট আন্দোলন, (১১) কংগ্রেসের পুনর্গঠন, (১২) কাউন্সিলে যাওয়া, (১৩) কাউন্সিলে নন-কো-অপারেশন।

হেমন্ত-বাবু তাপ করিয়া ক্ষতি স্বীকার কবিয়া দুঃখ বরণ কবিয়া নিজে যে ক্ষেত্রে কাজ কবিতেন্নে সেই ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতা-লব্ধ মত তিনি প্রকাশ কবিয়াছেন; হুতরাং সকলের এইমত মত ধীর ভাবে বিচার কবিয়া স্বাভাবিক-সাধনায় চেষ্টা ও সমবেত সাহায্য করা উচিত।

বন্দী ডায়েরী—শ্রী হেমন্তকুমার সরকার, ইতিহাস বুক ক্লাব। এক টাকা।

ছয় মাস সশ্রম কারাবাসের ডায়েরী ও যে-সব মাহাত্ম্যের সংস্পর্শে বন্দীর কারাবাস তাঁদের কাহিনী এই পুস্তকে আছে। প্রত্যেক নরনারীর স্বদেশসেবা ব্রত হওয়া উচিত; সেই ব্রত পালনের ফল স্বরূপ কারাবাস ভোগে ঘটা বুঝই সম্ভব। হুতরাং সকল নরনারীর এইসব কারাকাহিনী পড়িয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কবিয়া বাধ্য উচিত।

বিশ্বভারত—শ্রী রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। ইতিহাস বুক ক্লাব, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা। পাঁচ টাকা।

মানুষের সভ্যতা বিকাশের উপকরণের সঙ্গে জন্মের যোগ না থাকিলে যে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে না, রাষ্ট্র ও শিল্পের নিগড় হইতে বিশ্বসভ্যতাকে মুক্ত কবিয়া সমূহের সমবায়-শক্তির মহিমা প্রতীক্ষিত কবিত হইবে, ভাবত এই বিশ্বব্রহ্মের প্রধান পুত্রোহিত হইয়া সকলের হাতে মিলনের বাণীবন্ধন কবিবে—ইহাই এই পুস্তকের প্রধান প্রতিপাদ্য। এই পুস্তকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে—(১) বিশ্বসভ্যতায় হিন্দুসভ্যতার বাণী, (২) যুদ্ধ ও শান্তি, (৩) যুগ্ম-বিজ্ঞান, (৪) পাকাত্য সভ্যতার আত্মঘাত, (৫) হিন্দু ও পাকাত্য সভ্যতার শক্তি ও সাধনা, (৬) জাতীয়তা ও বিশ্বজনীনতা, (৭) পাকাত্য সভ্যতার বিশিষ্টতা, (৮) পাকাত্য চিন্তার অবসাদ। সকল প্রবন্ধেই চিন্তাশীলতা ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় আছে।

মহাজিয়া—শ্রী বিহুতিভূষণ ভট্ট। ইণ্ডিয়ান সিগিট, ১১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। কাপড়ে বন্ধ বাঁধা। দেড় টাকা। উপস্থাস।

সোনার কাঠি—শ্রী মোরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। কমলিনী-সাহিত্য-সন্দিব। এক টাকা। উপস্থাস।

আঁধি—শ্রী সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। বায় এগু বায়চৌধুরী, ২৪ নং কলেজস্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। হৃদয় বাঁধা। আড়াই টাকা। উপন্যাস।

পিয়াসী—শ্রী সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। বায় এগু বায়চৌধুরী। হৃদয় বাঁধা। পাঁচ টাকা। ছোটগল্পের বই। চারটি গল্প আছে।

নীলব ভাষা বা ধাত্রীবানী—পঞ্চিক। প্রকাশক শ্রী মাণিক লাল দে, হবিনাভি, সোনারপুর পোঃ, ২৪ পরগণা।

প্রকৃতির সমস্ত বাধা-বিঘ্ন তৈলিয়া মানব কিরূপে আর্থাবিজ্ঞান ও আর্থসম্ভারতার চরম পবিগতি, এবং সাম্য ও শাস্তিব প্রতিষ্ঠাস্থল-ঋষিভাষ্য করিতে পারেন এবং জীবমাত্রেরই জন্মনিহিত ধাত্রীপীণী জগন্মাতার অভয়বাণী ও উৎসাহবাণী কিরূপে তাঁহাকে এই আনন্দময় অবস্থার দিকে অগ্রসর কবে তাহা এই কবিতা-পুস্তকে বিবৃত করিতে গ্রন্থকার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কিছুই পবিকার করিতে পাবেন নাই। কবিত্ব, হৃদয়, শব্দচয়নে বসজ্ঞতার পরিচয় নাই। কাপঙ্গ ও ছাপা উৎকৃষ্ট।

টুলটুল—শ্রী কান্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত। ক্রেণ্ড্‌ য়াণ্ড কোম্পানী, ৬৪ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। ছয় আনা।

শিশুদের গল্পের বই। ৭টি গল্প আছে। শেষ গল্পটি গম্ভীর মশারি আবিষ্কারের কোড়কর কাহিনী। সব গল্পগুলিই দেশের বা বিদেশের প্রচলিত উপকথা বা পুর্বাণকথার পুনরুজ্জীবন, ছেলেদের চিত্তবিনোদনের জন্য নতুন কথার লেখা। সহজ সরল চলিত ভাষায় গল্পগুলি লেখা। শিশুদের সহজবোধ্য। অনেকগুলি বহুবর্ণের ও এক-বর্ণা ছবি আছে; ছুখানি ছবি বিদেশী চিত্রকরদের আঁকা, প্রতিছবির ছবিখানি প্রসিদ্ধ শিল্পীর বিখ্যাত ছবির প্রতিলিপি। মলাটের উপরের ছবিখানি খুব

হৃদয় হইয়াছে। একরঙা ছবির মধ্যেও টুলটুলের পলা থেকে কুলের আঁঠি বাহির করার ও মশারি তৈয়ারীর ছবি ছুখানি ভালো হইয়াছে। মোটের উপর লেখা ছবি ছাপা শিশুদের মনোবল্লন করিবে; সমস্ত লেখার মধ্যে হাঁকা টুলটুলে ভাবটি আছে; তাই মলাটের উপর কচুপাতায় জলেব কোঁটার ছবিতে দেখানো হইয়াছে।

পঞ্চকন্যা—শ্রী শরৎকুমার রায়। প্রকাশক শ্রী জ্যোতিবিন্দুনাথ বাব, ১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। কাপড়ে বাঁধা বাহো আনা।

পুণ্যলোক পাঁচটি মহিলাব চরিত্রকথা, একটি চরিত্র কবিকল্পনাব স্রষ্টা—সীতা; অপর চারটি ঐতিহাসিক মহানারীদের—ভগবতী দেবী, বাবেয়া, ফোবেন্দু নাটটিলেল, ডোবা। এইসব পুতচরিত্রা পুণ্যশীলা নারীদের চরিত্রকথা আমাদের মেরেদের পাঠ করা খুব উচিত; তাতে চিত্ত উদার, চরিত্র উন্নত, মন পবিত্র ও স্বভাব হৃদয় মেধাপটু হয়। গ্রন্থকার এই সুযোগ দিয়া সমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন। রচনা প্রাঞ্জল ও বিস্তৃত।

দক্ষবিকাশ শ্রী উদ্ভাস্ত-চৈতন্য গোস্বামী। হুমকেতু কেল, ৭ প্রতাপ চাটুর্জীব গলি, কলিকাতা। চার আনা।

হাস্যরসায়নক বাঙ্গ-কবিতার বই। অনেক প্রসিদ্ধ লেখকের রচনা-রীতি ও কবিতার অমুকৃতি-কৌতুক। বঙ্গ হাস্য স্ফুর্জিত; লেখক হাসিয়াছেন, হাসাইয়াছেন, এই যথেষ্ট। কবিতাগুলি চলনসই হইয়াছে; কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের হাস্যস্বাদা কাব্যের কথা পদে পদে স্মরণ করার।

বিবেকানন্দ স্মৃতি—শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস ও শ্রী মাধবচন্দ্র দাস। রায় সাহেব এণ্ড সন্স, ৬২ ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

গদ্যে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিত।

—মুদ্রাবাক্স—

সন্ধ্যাকিশোরী

শরৎসাঁজে কে এল আজ

মনোহর বরণে,

আমার প্রিয়র কিশোর কালের

বেশেব অহু করণে।

ভালে শশীর টীপটি আলা,

গলায় তারার পলার মালা,

আলোকলতার হাতের চুড়ি

পল্লীবালায় ধরণে।

শালিক্লেতের আলিপথে

চলতে কত রঙ্গেতে

জবুদা শাড়ীর আঁচল লাগে

ধানের ক্ষেতের অঙ্গেতে।

ছাতিমতলায় প্রাচীন ঘাটে

আধ-আধার পল্লীবাটে

ঝিঁঝিঁর ঝিঁঝিঁ রবে শুনি

নূপুর বাজে চরণে।

শ্রী গোপেন্দ্রনাথ সরকার



ভারতবর্ষ

মিঃ এণ্ড্রুজের দান—

মিঃ সি এফ এণ্ড্রুজ ধরন আফ্রিকার উপনিবেশসমূহে ভারত-বাসীদের অবস্থা জানিবার জন্য সফরে বাহির হইয়াছিলেন তখন উপনিবেশের প্রায় সর্বত্রই ভারতবাসীরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। অভিনন্দনপত্রগুলি যে-সব বোপ্যাথায়ে তাঁহাকে প্রদান করা হইল সেই-সমস্ত বোপ্যাথাই তিনি তিলক-স্ববাস্ত-কণ্ঠে দান করিয়াছেন। যশোর কর্তৃপক্ষ সেগুলি আবার গুজরাত রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে উপহার দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহুঘরে এই পাত্রগুলি রক্ষিত হইবে।

মুলসী পেট্রাব সত্যাগ্রহ—

মুলসী পেট্রাব টাটা কোম্পানী জলে: তোড় হইতে শক্তি লইয়া বিদ্যুতের কাখানা কবিবেন। সে কাখানায় এত বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাইবে যে গোটা বোম্বাই সহরের কলকাখানা চালনা ও জালা বাতাস সর্ববরাহেব জন্য বিদ্যুতের আব অভাব ঘটবে না। এই সুবিধা-টুকুর জন্য মুলসী পেট্রাব দ্বিতীয় গৃহস্থদ্বিগকে উৎসাহ কবিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ধনী কারবারী বণিক বন্দী আঁটিয়াছেন, গবর্ণমেন্ট দিয়াছেন তাহাতে সার। কিন্তু মুলসী পেট্রাব দ্বিতীয় তাহাদের বাপ-পিতামহের বাস্তবিক পবিত্র্য কবিত্তে রাজি নহে। ইচ্ছা লইয়া তাহারা অনেকবার অনেক রকমের প্রতিবাদ কবিয়াছে। কিন্তু সে-সব প্রতিবাদে বিশেষ বল হয় নাই। ৪ঠা সেপ্টেম্বরের 'এসোসিয়েটেড প্রেস' সংবাদ দিয়াছেন, মুলসী পেট্রাব টাটা কোম্পানীর হাইড্রো-ইলেকট্রিক ট্যাক্সের নিকট আবার সত্যাগ্রহ আন্দোলন আবস্থ হইয়াছে। পুনঃ হইতে আগত কয়েকজন নেতা এবং স্থানীয় কৃষকেবা এই আন্দোলন আর কবিয়া দিয়াছেন। সত্যাগ্রহীরা প্রস্তাবিত ট্যাক্সের নবনির্ধারিত ভিত্তি উপব দাঁড়াইয়া এই কার্যে বাধা দিয়াছেন। যলে উঁহাদের নেতা মিঃ রাপাং এবং আবে ২০ জন লোককে দণ্ডবিধি আইনেব ১৪৩, ৪২৬ এবং ৪৪৭ ধারা অনুসারে পুলিশ গ্রেপ্তার কবিয়াছে। পবেব খববে জানা গিয়াছে, এই দলের বিচারও শেষ হইয়া গিয়াছে। মিঃ বাপাং প্রভৃতি তিন জন ছয়মাস এবং আবে আঠার জন তিন মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। এই দলের ভিতর দুইজন স্ত্রীলোকও ছিলেন। তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি ২৫ টাকা কবিয়া অর্থদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। দণ্ডের অর্থ না দিলে একমাস করিয়া তাহাদিগকে কারাগারে বাস কবিত্তে হইবে। মুলসীতে এখনও সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম পুরাত্নাভাব চলিতেছে।

গুরু-কা-বাগের অবস্থা—

পাঞ্জাবে অকালীদের ব্যাপার লইয়া দেশের ভিতর একটা বড় বকমের চাকল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। একদিকে পুলিশ জোবসে লাঠি

চালাইতেছে, আবার একদিকে অকালীরা পড়িয়া মার খাইতেছে ও সঙ্কল্পে আবে দূত হইয়া উঠিতেছে।

গুরু-কা-বাগ অমৃতসর হইতে ছয় মাইল দূরেব একটা স্থান। এখানে একটি শিখ দেবালয় আছে। এই দেবালয়ের মোহন্তের সহিত অকালী শিখদের ঝগড়া। তাহাই গড়াইয়া একরূপ আশাব ধারণ কবিয়াছে। অকালীরা গত ৯ই আশ্বিন দেবালয়ের ক্ষেতে গিয়া কয়েকটা পাছ কাটে। মোহন্ত এই ব্যাপার লইয়া আদালতে হাজির হন। কলে চৌর্য-অপরাধে পাঁচ জন অকালীর দণ্ড হইয়া যায়। ইহার পব অকালীরা দণ্ডাজ্ঞার প্রতিবাদ স্বরূপেই পাছ কাটিতে মবিয়া হইয়া উঠে। তাহারা বলে, মন্দির এবং মন্দিরের সমস্ত সম্পত্তি তাহাদেরই ন্যায্য অধিকারের 'জিনিষ'। মোহন্তের ইহাতে কিছুমাত্র অধিকার নাই। হুতবাং এই অধিকার বজায় রাখিবাব জন্য তাহারা প্রাণ পণ করিয়া চেষ্টা কবিবে। বস্তুতঃ তাহারা কবিত্তেছেও তাহাই। তাহারা দলে দলে গৃহ হইতেছে, কাবাগাবে নিষ্কিন্ত হইতেছে, পুলিশের লাঠিতে জখম হইতেছে, অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছে। অথচ তাহারা সঙ্কল্প হইতে চিত্ত হইতেছে না। এ ব্যাপারে আবে একটা বিশেষ দৃষ্টি হইতেছে এই—এত মার খাইয়াও অকালীরা একেবারে নিকপত্র, জোয়াবেব জলের মত দিনেব পর দিন তাহারা অধিকারের দাবী করিয়া লোক পাঠাইতেছে। একদল মাঝেব চোটে অকর্ণগা হইয়া পড়িতেছে, আবার একদল আসিবা তাহাদের স্থান অধিকার কবিত্তেছে।

কর্তৃপক্ষ অবস্থা বলিতেছেন, অকালীদিগকে সবাইয়া দিবার জন্য যতটুকু বলপ্রয়োগ করা যাব তাহা বোধী তাহারা কিছু কবিত্তেছেন না। কিন্তু এই যতটুকু কবিত্তেছেন তাহাই বহু যে কতখানি নানা প্রত্যক্ষদর্শীর পক্ষে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে।

লাহোরেব ট্রিবিউন পত্রিকা এ সম্বন্ধে ধারাবাহিক রূপে বিস্তৃত বিবরণ বাহিব কবিত্তেছেন। তাহা হইতে পুলিশের জুলুমের একটা নমুনা আমবা এখানে তুলিয়া দিতেছি।

লাহোরের জেলাব একশত অকালী দলবদ্ধ হইয়া বেলা দুইটায় সমগ্র স্বর্ণমন্দির হইতে যাত্রা কবে। যাইবাব পূর্বে অকাল তথ্যেব নিকট গিয়া প্রতিজ্ঞা কবে যে, যত সত্যাচারই হোক, কেহ অহিংসা বৃত্তি ভাগ কবিবে না। বেলা ষ্টেশন হইতে রাজাশংসী পর্যন্ত মোটিবে বাইবাব সময় দেখিলাম, বহুলোক চৌকিতে, টমটমে এবং পদব্রজে ঘটনা-স্থলের দিকে যাঁতেছে। ঐ স্থানটি মেলাব মত দেখাইতেছিল। শিখের দল পোনে পাঁচটার সময় রাজাশংসীতে পৌঁছিল। সেখানে পুলিশ অর্পার্টেমেণ্ট মিঃ ম্যাকফারসন ও তাহার সহকারী মিঃ বেটী অপেক্ষা কবিত্তেছিলেন। দলটিকে চলিয়া যাইতে বলা হইল। উত্তর আসিল—সকলে গুরু-কা-বাগে যাইবে, কোনো নিবেধ শুনিবে না। তহলীদদার ঐ স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেটের কক্ষ কবিত্তেছিলেন। তিনি

পাঞ্জাবী ভাষার দলকে সম্বোধন করিলেন। দল চলিয়া যাইতে অসম্মত হইল। ম্যাক্‌কাসন পুলিশকে হুকুম দিলেন সকলকে তাড়াইয়া দিবার জন্ত। পুলিশ বেস্তমেশন লাঠি লইয়া তাহাদের উপর কাপাইয়া পড়িল। অকালীদের উপর এলোপাখালি লাঠি পড়িতে লাগিল। একজন পুলিশ চোল পিড়িতেছিল, বাকি সকলে তালে তালে লাঠি চালাইতেছিল। ১৫ মিনিট লাঠি চালানোর পর অকালীরা দোজা হইয়া মাটির উপর শুইয়া পড়িল। অনেকে অজ্ঞান হইয়া গেল। যাহাদের জ্ঞান ছিল তাহারা সবিয়া পড়িল। পুলিশ আবার লাঠি চালাইতে লাগিল। ইট-পাথরের মত সকলকে রাস্তা হইতে সরাইয়া দেওয়া হইল। অজ্ঞান ও আহতদিগকে দেখিয়া অশ্রুসম্বরণ করা কঠিন। আহতদিগের ভিতর অনেক ৬০ বৎসরের বৃদ্ধকে দেখিরাছি। অনেকের মাথার চুলে রক্ত লাগার ছটা পড়িয়া গিয়াছিল। লাঠিগুলির একদিকে পাঁচ ছয় ইঞ্চি পবিসিত স্থান লোহা বাঁধা ছিল। সকলে 'ওয়া গুরু' 'ওয়া গুরু' বলিয়া চোঁচাইতে চোঁচাইতে মার খাইতেছিল। মিঃ বেটী মোবের সময় খুব কাঁজ করিতেছিলেন—ম্যাক্‌কাসন ঘূবে দাঁড়াইয়া আদেশ দিতেছিলেন।” * * *

এমনি আরো অনেক নমুনা দেওয়া যায়। অকালীদের প্রতি অশ্রীশ্রদ্ধ অত্যাচার চলিতেছে। এই অত্যাচারে তাহাদের সাহস এবং দৃঢ়তা বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। কর্তৃপক্ষের এই জুলুম যে কেবলমাত্র অকালীদের ভিতরেই নিবন্ধ আছে তাহা নহে। অনেক গণ্যমান্য লোক যাহারা এই ব্যাপারটা আপোষে নিষ্পত্তি করিবার চেষ্টা করিয়া, সেখানে পমন করিয়াছেন, এবং বস্তুতঃ যাহাদের মধ্যস্থতায় একটা নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব বলিয়াও মনে হয়, তাহারাও পুলিশের হাতে রীতিমত লাঞ্চিত হইতেছেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীরকে গুরু-কা-বাগে ধাইতে দেওয়া হয় নাই। তাহার প্রতি পুলিশের ব্যবহারও বিশেষ সম্মানকর নহে।

এই-সব জুলুম চিরসহিষ্ণু নারীসম্প্রদায়কেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। গুরু-কা-বাগে যাইয়া এই-সব অত্যাচারের অংশ গ্রহণ করিবার জন্ত অনেক শিখ মহিলা জাঠাধলভুক্ত হইতে চাহিতেছেন। কিন্তু গুরুদ্বার এবং ককর্মিষ্ঠ তাহাদিগকে গুরু-কা-বাগে ধাইতে দিতেছেন না।

মহরমে দাঙ্গা—

মূলতানে মহরম উপলক্ষ্যে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর এক ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। এই দাঙ্গার বহু ব্যক্তি নিহত ও আহত হইয়াছে। লুট-তরাজ ও গৃহদাহে বিস্তর সম্পত্তিও নষ্ট হইয়াছে। সৈয়দদলের সাহায্যে এই দাঙ্গা বন্ধ করা হয়। তবে রাঁচোয়া এই গুলি চালাইতে হয় নাই। রাত্রি ৯টায় পর বাস্তাব কাহাবো বাহির হইবার হুকুম ছিল না। মুসলমানগণ বাজার লুট করিয়াছে, অনেকগুলি দোকান ও ঘরবাড়ী আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিয়াছে, বয়েকটি দেবমন্দির ও ধর্মশালা অপকৃত্র করিয়াছে। এই আতঙ্কলহ বাহাতে না ঘটে, হিন্দু-মুসলমানের ভিতর বাহাতে ঐতিহ্য ভাব প্রতিষ্ঠিত হয় কংগ্রেস এতদিন ধরিয়া সেই চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সে চেষ্টা যে তাহাদের সর্বত্র সফল হয় নাই এইগুলিই তাহার প্রমাণ। এরূপ বিরোধের দ্বারা জাতিব শক্তি ধ্বংস হয়, তাহাব ছর্কলতা বাড়ে। পবের কাছে প্রতিনিরত জাতিনা সহ করিয়াও আমরা এই সহজ সত্যটা বুঝিয়া গলদ শোধরাইতে পারিতেছি না। ইহা যেমন দুর্ভাগ্যের বিষয় তেমনি লজ্জার কথা।

মোপ্লা অন্ধকূপ হত্যাব বিচার—

একশত মোপ্লাকে বাঘচাচলহীন মালগাড়ীতে বস্তাবন্দী করিয়া

তির্যক হইতে পদানুরে পাঠানো হইয়াছিল। পথে ৭০জন মোপ্লা দমবদ্ধ হইয়া বাঁধা যায়, এ ধরব এদেশে আজ আব কাহাবো অজ্ঞাত নাই। এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধেই মন্তব্য করিতে গিয়া বিলাতের 'ডেলি মেল' পত্রিকা লিখিয়াছিলেন, "ব্রিটিশ শাসনের ছদ্মবেশে এই ভীষণ অত্যাচার অঘুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার ফলে কলিকাতার অন্ধকূপ-হত্যাব মত ইংরেজের লগাটেও একটা দ্রুপনের কলঙ্কে ছাপ পড়িয়াছে। এই ব্যাপারটিব জন্ত যে দায়ী তাহাকে এই মুহূর্তেই খুঁজিয়া বাহির করা উচিত এবং বিচার করিয়া তাহাকে ফাঁসী দিতে কিছুতেই দেরী করা সঙ্গত নহে। যে স্ফার-বিচারের গরু আমবা করি, ভারতে সে গরু অন্ধুর বাধিতে হইলে ইহা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই।"

এতদিন পবে এই হত্যা সম্পর্কে গবর্মেণ্টের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। এণ্ড্রু নামক বে সার্জেন্ট এই-সব বন্দী লইয়া আসিতে-ছিল, অনেক বিবেচনা করিয়া গবর্মেণ্ট তাহাকেই দায়ী সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং তাহাব নামে মাদ্রাজ গবর্মেণ্টকে মামলা রুজু করিতে আদেশ দিয়াছেন। আব একজন খেতাব ট্রাফিক ইন্সপেক্টারকেও অপরাধী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু তিনি ইতিপূর্বেই মারা গিয়াছেন। এ ব্যাপারে গবর্মেণ্ট সামরিক কর্মচারীদের কোন দোষ দেখিতে পান নাই। মালগাড়ীতে এরূপ অবস্থায় বন্দী পাঠানোও অস্বাভাবিক নহে এবং ভবিষ্যতেও এরূপ অবস্থায় যাত্রীর জন্ত মালগাড়ী ব্যবহার চলিতে পারিবে এই বাস্তব উদ্ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতগবর্মেণ্টের বাব এবং ডেলি মেলের মন্তব্য প্রায় জাতিগোষ্ঠেই কাছাকাছি যেিয়া গিয়াছে। চসৎকাব।

কাগজ তৈবীব উপাদান—

বাঁশের মণ্ড হইতে কাগজ তৈরী হয় এবং ভাবতের বাঁশে কাগজের মাল-মশলা যথেষ্ট পরিমাণেই আছে, কিছুদিন পূর্বে বিশেষজ্ঞরা এই বায় প্রদান করিয়াছিলেন। বন বিভাগের ডেপুটি কন্সার্নেটর মিঃ জে ডব্লিউ নিকলসন ইহার পর উড়িষ্যার জর্জল-সমূহ পরীক্ষা করা শুরু করিয়া দেন। সাত সপ্তাহ পরীক্ষা করিয়া তিনি রিপোর্ট দিয়াছেন, কটকে বাঁশের মণ্ড তৈরীকর জন্ত একটা কাবখানা প্রতিষ্ঠিত করিলে বেশ ভাল কাজ চলিতে পারে।

বস্ত্রায় প্রাবন—

উত্তর-পশ্চিম-ও বৃহৎ-প্রদেশের ও বিহারের কয়েকটি স্থান বস্ত্রায় প্রাবনে একেবাবে ভাসিয়া গিয়াছে। উনাও অঞ্চলের বহু লোক আশ্রয়ের অভাবে গাছে চড়িয়া প্রাণ রক্ষাব চেষ্টা করিতেছে। 'বাস্তাবাট সমস্ত ভাসিয়া গিয়াছে এবং শস্তের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। এবার গঙ্গায় যেকূপ বাণ ডাকিয়াছে গত ত্রিশ বৎসরের ভিতর এমন আর দেখা যায় নাই। এসব অঞ্চলে নাহায প্রেরণ আবশ্যক।

ট্রেনে পানাহারের ব্যবস্থা—

কলিকাতার মাদোয়ারী এনোসিয়েশন শিমলায় রেলওয়ে বোর্ডের কাছে এক দ্ব্যস্ত পেশ করিয়াছেন। এই দ্ব্যস্তে তাহারা বলিয়াছেন, এ দেশের 'পু' ট্রেনগুলিতে দেশী যাত্রীদের জন্ত দেশী রকমের পানাহারের ব্যবস্থা নাই। ফলে যাত্রীদের পরমা হইতে কোম্পানীর এত আয় তাহাবাই যথেষ্ট অহবিধা ভোগ কবে। হতরাং যাত্রাতে প্রত্যেক 'পু' ট্রেনেই দেশী রকমের অন্ন-ব্যাঞ্জন ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকে তাহাব বন্দোবস্ত বাবা দৃকব। সেজন্ত প্রত্যেক ট্রেনের সঙ্গে সাহেবী 'ডাইনিং ক্যাবের' মত একখানি কবিধা তিন-কাম্বা-ওয়ালা গাড়ী বাধিলেই সব সমস্তাব সমাধান হয়। এ ব্যবস্থা মঞ্জুর হইলে কোনো কোনো লাইনে মাদোয়ারী

এসোসিয়েসনই ঐকপ গাড়ীর বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করিতে রাজি আছেন।

দূরপাশের যাত্রীদের পক্ষে পান-ভোজন-সমস্যা যে খুব একটা বড় সমস্যা তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ ব্যবস্থা থাকিলে সে সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়। তাহা ছাড়া ছুঁৎমার্গের সুচিবায় হইতেও ইহাতে দেশকে মুক্তি দেওয়ার সাহায্য করিবে। বেল-ষ্ট্রিমারের কল্যাণে অসুখ্যতার বালাই অনেকটা কমিয়াছে। এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে তাহা আবে কসিবে।

সদস্যের মৌলিকতা—

পীর মহম্মদ আজান খাঁ নামক ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের একজন সদস্য ব্যবস্থা-পরিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন বলিয়া নোটিশ দিয়াছেন। প্রস্তাবে এই কথাই বলা হইবে, প্রধান সন্ন্যাসী শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে পাল্লমস্টে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছে। শাসন-সংস্কার বার্থ হইয়াছে, কারণ এপর্যন্ত কোনো ভারতবাসীই সমুচিত দায়িত্ব-জ্ঞানের পরিচয় দিতে পাবেন নাই। বাহাদুর হুবিধার জন্ত নতুন দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্যে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করা হইয়াছে তাহার গবর্নমেন্টের সহযোগিতা করিতে নাবাঙ্গ। এই-সকল বিবেচনা করিয়া শাসন-সংস্কার প্রত্যাহার করা এবং শাসন-শৃঙ্খলা ও আইনের সম্মান বজায় রাখার জন্ত এ দেশকে জবাবদস্ত সামরিক শাসনের অধীনে আনা উচিত।

পীর সাহেবের মগজে যে মৌলিকতা আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বোম্বাইয়ের হিতসাধন-মণ্ডলী—

দেশের জাগরণের অর্থ নিজেদের উন্নতির পথগুলি নিজেদের চেষ্টায় পরিষ্কার করিয়া লওয়া। জাতির প্রয়োজনের প্রতি জাতির মনে তাগিদ না থাকিলে এই উন্নতি সম্ভবপর হয় না। অথচ এই-পানেই আমাদের প্রকাশ্য গলদ রহিয়া গিয়াছে। আমরা উন্নতি চাই কিন্তু উন্নতির পথে বড়ো রাগটাপুলি স্রু করিতে আসব একান্তই নাবাঙ্গ। সেগুলি সহিবার ভার পরের উপরে ছাড়িয়া দিয়া উন্নতিটাই প্রতি আমবা লোভ করি। ফলে সমস্ত আলোচন আমাদের খানিকটা দূর অগ্রসর হইয়া থাকিয়া যায়—জাতি যে তিসিবে সেই তিসিবেই পড়িয়া থাকে। বোম্বাইয়ের হিতসাধনমণ্ডলী আমাদের এই সনাতন জড়তাব পথ পবিত্যাগ করিয়া বাস্তব কাজের আসরে নামিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাহা যে ধরণে কাজ শুরু করিয়া দিয়াছেন, আব-সমস্ত প্রদর্শনের কর্ম্মদেও তাহা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

জনসাধারণের ভিতর শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে এই সমিতির তত্ত্বাবধানে ৩০টি স্কুল পরিচালিত হইতেছে। এই-সব স্কুলের মোট ছাত্রসংখ্যা ১৩৩৯ জন। ছাত্রদের ভিতর ১২১৬ জন বয়স্ক পুরুষ ও বালক এবং ১২৩ জন বালিকা ও নারী। ৩০টি স্কুলের ১৮টিই হইতেছে নৈশ বিদ্যালয়। নৈশবিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যা ৭৪৪ জন।

সমিতির তত্ত্বাবধানে ৯টি পুস্তকালয় আছে। তাহা ছাড়া ৫০টি বাক্সে চলন্ত লাইব্রেরীর কার্য চলিতেছে। সারা বৎসরে ৬৮৪৩৫ জন লোক এই-সব পুস্তকালয়ে পাঠ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কর্ম্মদিবসের জন্ত কোন কোন কাবাগবে এবং রঙ্গ ব্যক্তির জন্ত কোনো কোনো হাসপাতালেও পুস্তক সরবরাহ করা হইয়াছে।

সারা বৎসরে ম্যাজিক লন্ডনের সাহায্যে ১৯টি বক্তৃতা দিয়া শ্রমজীবীদের সমবায় অবলম্বন ও মদ্যপান নিবারণের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। শ্রমজীবীগকে লইয়া ১৯ বার

খোলা জায়গায় বেড়ানো এবং ৩৭ বার ক্রীড়াকৌতুকের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ভ্রমণে ১৮১২ জন এবং ক্রীড়া কৌতুকে ১৬৭৫ শ্রমজীবী যোগদান করে। শ্রমজীবীদের সম্মানদেব লইয়া তিন দল ‘বয়স্কাউট’ গঠন করা হইয়াছে। প্রত্যেক দলে ৪০ জন কবিধা বালক ভর্তি হইয়াছে।

সমিতির তত্ত্বাবধানে দুইটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে, একটি কেবলমাত্র স্ত্রীলোক ও বালকদের জন্ত। এখানে সাবাবৎসরে ৯০৫২ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করা হয়। ইহাতে চিকিৎসিত হইয়াছে ২৪২৬ জন। প্রথম চিকিৎসালয়টির ব্যয় নির্বাহের একটি স্বামী কণ্ডেব জন্ত কানজি কর্ণওয়াল ৫৫,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

দরিদ্র শ্রমজীবীদের উপকারের জন্ত সমিতির দ্বারা ৮৪টি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ৮৪টি সমবায়-সমিতির মূলধন ১ লক্ষ ৩ হাজার টাকা এবং সভ্যসংখ্যা ৫৬৭৫ জন। এই সমিতিগুলিতে সারা বৎসরে ৩ লক্ষ ২ হাজার টাকার কাব্বার চলিয়াছে।

তাঁরা সান্স শ্রমজীবী ইনস্টিটিউট এবং ক্রিমমাই ইব্রাহিম শ্রমজীবী ইনস্টিটিউট এই সমিতির নানা বকমে সাহায্য করিতেছেন। এই দুইটি ইনস্টিটিউটে দৈনিক এবং নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে; কেবানী ও স্ত্রীলোকদের জন্ত বিশেষ শ্রেণী খোলা হইয়াছে। নারী শ্রমজীবীদের শিশু সম্মানদেব আশ্রমের জন্তও আশ্রম খোলা হইয়াছে। শ্রমজীবী মাতা বা এই আশ্রমে উপযুক্ত ধাত্রী তত্ত্বাবধানে আপনাদের শিশুদিগকে রাখিয়া কলে কাজ করিতে যায়। পাবেল ও মদনপুরে শ্রমজীবীদের দুইটি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মদনপুরে ৪টি উর্দু নৈশ বিদ্যালয় এবং পাবেলে ২২টি সমবায়-সমিতি চলিতেছে।

সমিতির তত্ত্বাবধানে ক্লেবেল নাইটিঙ্গেল গ্রাম্য স্বাস্থ্যমন্ত্রিত্ব ফণ্ড নামক ফণ্ড খোলা হইয়াছে। এই ফণ্ড হইতে ১১টি গ্রামের স্বাস্থ্যমন্ত্রিত্ব জন্ত সাহায্য করা হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে সমিতির সভ্যসংখ্যা ৭২৩ জন। সমিতির মোট আয় ছিল ৩,০০,৯৭৮ টাকা এবং ব্যয় হইয়াছে ২৮০৪৫৫ টাকা।

কোনো প্রতিষ্ঠানের বাস্তবিক ‘খার এবং ভাব’ থাকিলে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চলা কাহাবো পক্ষে সহজ হয় না। ভারতের আমলা-তন্ত্র গবর্নমেন্টের মত খামখেয়ালী গবর্নমেন্টও যে এই প্রতিষ্ঠানটিকে উপেক্ষা করিতে পাবেন নাই, তাহাই ইহার সাক্ষ্যের প্রমাণ। এ বৎসর গবর্নমেন্ট (১) ফ্যাক্টরী আইন সংশোধন, (২) সম্মান প্রদানের পূর্বে ও পবে স্ত্রীলোকদিগের কলেব কার্য্যে নিষেধ, (৩) ট্রেড ইউনিয়নের (শ্রমী-সঙ্ঘের) পরিচালনা ও (৪) শ্রমজীবীদের ক্ষতিপূরণ বিষয়ক আইন সম্বন্ধে সমিতির মত বিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

বিদেশ যাত্রায় বাধা—

বাবদোলী হইতে দেড়শত অসহযোগী পানামায় উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্ত যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা বাধাই পর্যন্ত গিয়াছিল, বাণরায় জাহাজও তাহাদের স্থির হইয়া গিয়াছিল। ইঠাং সুব্যাটের ম্যাজিস্ট্রেট তাহাদের যাত্রা স্থগিত বাধিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। এসম্বন্ধে সম্যক তদন্ত করিয়া তাহাদিগকে পানামায় বাইতে দেওয়া হইবে কি হইবে না তাহা স্থির হইবে। বিদেশ-যাত্রার সম্বন্ধ সম্ভবত অপবাধ নহে। ভারতবাসীর মত সবমুখে জাতির পক্ষে বিদেশের আবহাওয়ায় নিবাস কেলিয়া আসিবার প্রাধিকার আছে। তাহাতে জাতির জ্ঞান বাড়ে, নতুন পথ ধরিয়া চলিবার ক্ষমতা জন্মে। এই ভারতবর্ষে হাজার জাতি আসিয়া পকেট ভরি করিয়া ঘরে ফিরিতেছে, অথচ ভারতবাসী অনশনের হাত হইতে আত্মবিস্ময় পথ খুঁজিয়া

পাইতেছে না। বিদেশটা ঘুরিয়া আসিলে বিদেশীদের অর্থোপার্জনকে ফিকির-ফন্দীগুলিও যে সম্ভব তাহা বা, আয়ত্ত কবিতা যবে কিবিত্তে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

উড়িয়া যুবকের দেহের শক্তি—

কশীরাম পাত্র নামে একজন উড়িয়া যুবক ছাত্র যুবযন্ত্রের বাজাব কাছে সম্ভ্রান্তি কতকগুলি দৈহিক বলের পরিচয় প্রদান কবিয়াছেন। একখানি মোটর গাড়ী এবং একটি হাতীর পতিবোধ কবা, আঙ্গুলের টিপে একটি টেনিস বল ফাটাইয়া দেওয়া, দুইটি তিন মণ ওজনের গদায় পাঁচশত টাকার একটি তোড়া কুলাইয়া তাহা তোলা—এই-সব শক্তির কাজ ইনি অবলীলাক্রমে সাধন কবিয়াছেন। ভাবতবাসীর ভিতর এক্ষণ শক্তির নমুনা এই নূতন নহে। তথাপি শক্তিমান লোক ভাবতবাসীর ভিতর এত কম যে ইহাদের সংখ্যা যত বাড়ি ততই ভাল।

হাস্পাতালে গাঙ্গী টুপী—

মিবার্টের 'ওপিনিয়ন' পত্রিকা সংবাদ দিয়াছেন, মিবার্টের কোনো হাইস্কুলের দুইটি ছাত্র গাঙ্গীটুপী মাথায় পবিয়া লুডোভিক পোর্টার হাস্পাতালে চিকিৎসার জন্য গমন কবিয়াছিল। হাস্পাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার গাঙ্গীটুপী দেখিয়াই তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন, চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করেন নাই। ছাত্র দুইজন বিদেশী, মিরাটে তাহাদের অভিভাবক বা আয়ীরা কেহ নাই। টুপী পরিত্যাগ করিয়া ইহাবাও হাস্পাতালে ভর্তি হইতে বাজি হয় নাই। গবর্মেণ্টের অফিসে ও কোন কোন ইংরেজ ব্যবসায়ীর অফিসে গাঙ্গীটুপী অচল এই খবরই ইতিপূর্বে শোনা গিয়াছিল, কিন্তু হাস্পাতালেও যে ইহা অচল হইতে পাবে তাহা আমাদের জানা ছিল না। মানুষের মনের বিকার যত রকমের তাহার কতকগুলি নমুনা এবারকার অসহযোগ আন্দোলনে পাওয়া গিয়াছে।

জেলের বেত্রাবাস্ত—

'নবীন রাজধান' নামক সংবাদপত্রে প্রকাশ,—ঐযুক্ত ছোট্টলালজী জোশীর পুত্র ঐযুক্ত গঙ্গারাম সাত বৎসরের জন্য কাবাবদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া মেবার জেলে আছেন। জেলে প্রবেশ কবিবার সময় তাহার গীতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া তিনি সত্যগ্রহ কবিয়াছেন। ৯ দিন অন্তর পবিত্যাপ কবিবার পব তাহার প্রতি ১২ ঘা বেত মাঝার আদেশ হয়। উপবাস-ক্রান্ত শরীরে এই আঘাত সহ্য কবিত্তে না পারিবা তিনি অজ্ঞান হইবা পড়েন। সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে খাওয়ারিয়া দেওয়া হয়। তাহার পব নখরদার গোপনে তাঁহাকে একখানা গীতা প্রদান কবিলে সমস্ত গোলযোগের অবসান হয়। কিন্তু জেল-দাবোগা আবার তাহার গীতা কাড়িয়া লইয়াছেন। এবার গঙ্গারাম প্রতিজ্ঞা কবিয়াছেন, প্রাপ্ত ঘা সেও ভালো তথাপি নিত্য ধর্ম-কর্ম সমাপন না কবিবা কখনো ভোজন কবিবেন না। ২৩শে জুলাই হইতে সত্যগ্রহ আবস্ত হইয়াছে, কিন্তু আজ পঞ্চম উহা বন্ধ হওয়ার কোনো সূচনা দেখা যাইতেছে না।

গীতা বিপ্লববাদের সহায় একপ আশঙ্কা কবা এক ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের পক্ষেই সম্ভব, এই ছিল আমাদের ধারণা। এখন দেখিতেছি ভাবতবর্ষে হিন্দু মহাবাণা এই গীতাভীতির হাত চইতে মুক্ত নহেন। বেত্রদণ্ড সমস্ত অবস্থাতেই বর্ধিত। উদযপুরের মহাবাণাব জেলেও যদি গীতাপাঠ বন্ধ কবিবার জন্য এইসব বর্ধিত অত্যাচার চলে তবে তাহা জাতিব পক্ষে যেমন লজ্জা তেমনই অগোরবের বিষয় হইবা ঠাড়া।

হাইকোর্টের ব্যবস্থা—

ঐযুক্ত মতিলাল নেহেরু প্রমুখ সিন্ডিকাল ডিস্‌ওবিডিএস্ কমিটির সভাপনকে মাল্লাজ হাইকোর্টের উকিলেবা বাব-নাইত্রেবী গৃহে সযর্ধনা কবিয়াছিলেন। অপবাদ তো এই। ইহাবই অন্য হাইকোর্টের জজেরা উকিলদের কাছে একটি কৈফিয়ৎ এবং বার-লাইব্রেরী-গৃহে ভবিষ্যতে আব কখনো বাজ্ঞনৈতিক আলোচনা কবা হইবে না একপ একটা প্রতিশ্রুতি দাবী কবিয়াছিলেন। উকিলেরা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, হাইকোর্ট প্রকৃত ঘটনা না জানিয়াই তাহাদের কার্যে হস্তক্ষেপ কবিয়াছেন। ঐযুক্ত নেহেরু প্রতৃতির অন্তর্যনতে রাজনীতির কোনো সংশয় ছিল না, ইহা সম্পূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠান। প্রতিশ্রুতিব প্রস্তাবে তাহাদের বক্তব্য এই, উকিল-সভা যদিও বাজ্ঞনৈতিক প্রতিষ্ঠান নহে, তথাপি অনেক সময়েই তাহাদিগকে বাজ্ঞনৈতিক বিষয়ে মতামত প্রকাশ কবিত্তে হয়। সুতরাং তাহার একপ প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইতে পারেন না। উকিলদের এই কৈফিয়ৎ জজদের মনঃপূত হয় নাই। এই সযর্ধনা যে বাজ্ঞনৈতিক অনুষ্ঠান নহে, কেবলমাত্র সামাজিক অনুষ্ঠান, জজেরা ইহা স্বীকার করেন না। তাহা উকিল-সভাকে জানাইয়াছেন, বাজ্ঞনৈতিক উদ্দেশ্যে এই গৃহ ব্যবহার কবিত্তে দেওয়া সম্ভব নহে। ভবিষ্যতে আবার যদি কখনো ঐ গৃহে কোনো বাজ্ঞনৈতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন কবা হয় তবে হাইকোর্ট-গৃহ তাহাদিগকে আর সভাগৃহরূপে ব্যবহার কবিত্তে দেওয়া হইবে না।

গবর্মেণ্টের লোকমত সংগ্রহ—

সমগ্র দেশ সিন্ডিকাল ডিস্‌ওবিডিএস্‌গের যোগ্যতা লাভ কবিয়াছে কি না তাহা নির্ণয় কবিবার জন্য কংগ্রেস একটি কমিটি গঠন কবিয়াছেন। এই কমিটি গোটা ভারতবর্ষ ঘুরিয়া এ সম্বন্ধে মতামত গ্রহণ কবিত্তেছেন। তাহাদের বিপোর্ট বাহিব হইলে এ সম্বন্ধে দেশের যোগ্যতা কতখানি তাহা বোঝা যাইবে। কিন্তু বিহার-উড়িয়া গবর্মেণ্টও এদিক দিবা বেশ একটা চাল চালিয়াছেন। সিন্ডিকাল ডিস্‌ওবিডিএস্‌ সম্বন্ধে তাহাবাও লোকের মতামত সংগ্রহ কবিবার চেষ্টা কবিত্তেছেন। পাছে কংগ্রেস সিন্ডিকাল ডিস্‌ওবিডিএস্‌ গোষণা করেন এবং কমিটির সাফা যদি জনসাধারণের মত বলিয়া গৃহীত হয় সেই ভয়েই সম্ভবতঃ এই ব্যস্থা। সিন্ডিকাল ডিস্‌ওবিডিএস্‌ গোষণা কবিবার আগে ইহাব ফলাফল, দেশের যোগ্যতা ইত্যাদি বিশেষ রকমেই ভাবিবা বেশা দরকার। এবং আমাদের বিশ্বাস কংগ্রেস সে দিক দিবা কিছুমাত্র ক্রটি থাকিত্তে দিবেন না। কিন্তু বিহার-উড়িয়া গবর্মেণ্টের এই মতামত সংগ্রহের কোনো সার্থকতা আছে কি না সে সম্বন্ধে আমাদের বশেষই সন্দেহ আছে। কারণ গবর্মেণ্টের সংগৃহীত মতামতের উপর এদেশের লোকের শ্রদ্ধা যে দিন-দিনই কমিযা যাইতেছে তাহাত কিছুমাত্র ভুল নাই।

মহিলা বৃত্তি—

বিস্তারিত হইতে শিক্ষালাভ কবিবা এদেশের শিক্ষা-কার্যে শক্তি ও সময় নিয়োগ কবিত্তে বাজি আছেন এমন একজন ভারতীয় মহিলাকে ৩০০ পাউণ্ড হিনাবে বৃত্তি দানের জন্য বাংলা গবর্মেণ্টে অন্তরিক্ত বক্সেটে ২২০০ টাকা এবং পাণ্ডেশ্বর জন্য ৭৫০ টাকা চাহিয়াছেন। বৃত্তি প্রার্থিনী কেশিজে বা অল্পকর্মে পড়িলেই তাঁহাকে এই ৩০০ পাউণ্ড বৃত্তি দেওয়া হইবে, অন্তরা তাহার বৃত্তিব পরিমাণ হইবে ২৫০ পাউণ্ড। ভারতীয় মহিলাব জন্য এই ব্যবস্থা। কিন্তু ইউরোপীয় মহিলাব জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে ইহা অপেক্ষা একটু স্বতন্ত্র। একজন ইউরোপীয় মহিলাকেও বৃত্তি প্রদানের বন্দোবস্ত হইতেছে। কিন্তু

—বনে মাতিব

কলিকাতায় অসম্ভব মুতু।—কলিকাতার কবুপোবেশনের এক সাধারণ সজায় কলিকাতার অতিরিক্ত মুতুর কাষণ নির্ধারিত করিবার প্রসঙ্গে মিঃ এ. সি. ব্যানার্জি বলেন যে জন্মের সংখ্যা হইতে মুতুর হার শতকরা ৫০ জন কবিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহাব কাষণ দেখাইতে যাইয়া বলা হইয়াছে যে, মফস্বল হইতে যে-সকল বোগী বিনা চিকিৎসায় অথবা স্বল্প চিকিৎসায় জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া এখানে আসে, তাহারা ই কলিকাতার মুতুর সংখ্যা বাড়াইয়া দেয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই কারণ যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই।

২২শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতাতে ৪৭৪ জন মুতুমুখে পতিত হইয়াছে। ইহার পূর্ববর্তী দুই সপ্তাহে ৪৩৭ এবং ৪৪৯ জন কালগ্রাসে পতিত হয়। সকল বকসের বোগের মুতুর হাব কবিয়া দেখা গিয়াছে যে পূর্ব পূর্ব সপ্তাহ হইতে বর্তমানে মুতুর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব পাঁচ বৎসরে প্রত্যেক মাইলে প্রতি সপ্তাহে ২৩০ হাব মুতুর সংখ্যা ছিল। কিন্তু এই বৎসর তাহাব স্থানে ২৭২ দাঁড়াইয়াছে।

—বন্দেনাতবম্

আমাদের তুর্দশা—

বাংলায় তুলা ও পাটের কল।

বাংলায় তুলার কল তেবটা—তা'ব মধ্যে আটটা মালিক ইংবেজ, তিনটা মালিক মাদোয়ারী, আর মাত্র দুইটি কলেব মালিক বাঙ্গালী। ইংবেজের আটটা কলের মধ্যে দুইটা কলেব মূলধন জানা যায় নাই, বাকী ছটা কলেব মূলধন ১,৪৫,০০,০০০ টাকা; মাদোয়ারীর তিনটে কলের মধ্যে একটার মূলধন ৮০,০০,০০০ টাকা ও বাকী দুইটি কলেব মূলধন জানা যায় নাই; আর বাঙ্গালীর দুইটা কলের মূলধন মাত্র ৩০,০০,০০০ টাকা।

বাংলায় পাটের কল একাদ্রটা, তাহাব একটিও বাঙ্গালী বা মাদোয়ারীর নহে, সমস্ত ইংবেজের। এই ১১টা পাটকলে মূলধন খাতে প্রায় তেব কোটি ঊনককই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা। বেশটা কাহার?

—বীরভূমবাসী

আশার আলো—

বাংলার জয়,—বেশী মোজা ইত্যাদি আত্মদানী ১ বৎসরে ৬৬ লাখ টাকা থেকে ৭০ হাজারে নেমেছে। জুতোর আমদানি ১৬৬ লাখ থেকে ৩ লাখে নেমেছে। এইবাব কাপড়ে মন দিলে ভাল হয়।

—সনাতন

স্বকাৰী হিসাবে প্রকাশ, গত ১৯২২ সালের জুন মাসে সমগ্র ভারত-বর্ষে ১১২ লক্ষ টাকা মূলধনে ৩৩টি বোথ কারবার খোলা হইয়াছে। ইহার পূর্ব মাসে ৪৭৬ লক্ষ টাকা মূলধনে ৩২টি কোম্পানী এবং তৎপূর্ব বৎসর এই মাসে ২৩৭৫ লক্ষ টাকা মূলধনে ৬৬টি কোম্পানী খোলা হইয়াছিল। এক বঙ্গদেশেই ৩১ লক্ষ টাকা মূলধনে ১৪টি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে দেশের লোকের মন ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতির দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা দেশের পক্ষে যে মঙ্গলগ্রন্থ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

—যশোহর

কিন্তু এইসব বোথ কারবারের মধ্যে দেশী লোকের কারবার কয়টা, তাহা না জানিলে কিছু বলা কঠিন। আমাদের দেশের কারবার প্রায়ই বেশী নয়।

চরকার অর্থার্জন—

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় আচার্য মহাশয় সম্প্রতি চরকার অর্থনীতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে তিনি অতীত কালে চরকা কাটিয়া আনাদের দেশেই জীলোকগণ কিরূপ অর্থ উপার্জন

করিত, তাহাব একটি বিবরণ প্রদান করি।

সাধারণ উদ্ধৃত কবিনাম :—

১৮০৭ সালে ডাক্তার বুকাননের বিবরণে পাটনার ৩,৩০,০২৬ জন জীলোক চরকা কাটিয়া অধিকাংশই অপবাহুর মাত্র কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া তাহাব বৎসবে দশ লক্ষ একশি হাজার পাঁচ টোকা

মাছাবাদে ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৫ শত জন জীলোক বৎসবে ২ লক্ষ ৩৯ হাজার ২ শত ৫০ টোকা উপার্জন

জাগলপুরে ১ লক্ষ ৬০ হাজার জীলোক চরকা কাটিয়া ৭ লক্ষ ২০ হাজার টোকা বোজগাব করিত।

গোবিন্দপুরে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬ শত জীলোক বৎসবে ৪ লক্ষ ৩৯ হাজার টোকা আয় করিত।

দিনাজপুরে ভদ্র ইত্যব সকল শ্রেণীর জীলোকগণই চরকা কাটিয়া বৎসবে ৩৫ হাজার ১৫ লক্ষ ১৫ হাজার টোকা উপার্জন করিতেন।

একশত বৎসর পূর্বে পাঁচটি জেলাব জীলোকগণ বৎসবে ১০ টোকা উপার্জন করিতেন। আজকালকাব হিসাবে এই টোকা দুই কোটি টাকার উপর।

দেশবাসী, দেশ, বাক, আর নিক্কোথের মত হাতের লক্ষী পাইলিও না।

ভারতের বঙ্গশিল্প :—“লেবাব গেজেট” প্রকাশ ১৮৮০-১১ খৃষ্টাব্দে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ১৩ হাজার উত্ত ও ১ লক্ষ চবকা চলিত এবং ৪৮ হাজার শ্রমিক উহাতে নিযুক্ত ছিল। ১৯১২-২০ খৃষ্টাব্দে সে ভারপায় কিকির্দখিক ১০ লক্ষ উত্ত ও ৬০ লক্ষ চবকা চলিতেছে, এবং প্রায় ৩ লক্ষ শ্রমিক উহাতে নিযুক্ত আছে। একমাত্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতেই ২ লক্ষেব উপর শ্রমিক নিযুক্ত আছে।

—জনশক্তি

বদেশী মেলা—

আগামী মাসের মধ্যভাগে মির্জাপুর পার্কে আর-একটি বড় বকসের বদেশী মেলা বসাইবার আয়োজন হইতেছে। ধন্দর প্রচারকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে মাঝে মাঝে এইকণ মেলা বসানোর যে প্রয়োজন আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। তাবপব পূজা আসিতেছে। পূজাব এই বিকিকিনিব মব্বহসে বিদেশী বস্ত্র এবং বিদেশী জবোব মধ্য দিয়া যে কত টাকা বিদেশে চলিয়া গাইবে তাহা বলা যায় না। এই মব্বহসে মেলা বসাইবা মেলাব কত পক্ষ যে দেশের মহোপকার সাধন করিতেছেন তাহা অস্বাকার কবা যায় না। আমবা জাতীয় অমুঠান এই মেলাব প্রতি দেশবাসীব মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

—বন্দেনাতবম্

তুর্দশার কারণ ঔষানীত—

যে-সমস্ত বস্ত্র আমাদের দেশে জন্মে, তাহাদের সধ্যবহাব কিরূপে কবিত হই, তাহা আমবা ভাবি না, কিন্তু বিদেশী তাহা দ্বারা যথেষ্ট লাভবান হয়। এই দেখুন না কেন জাপানে নারিকেল জন্মে না; কিন্তু বিদেশ হইতে জাপানে প্রচুর পবিমাণে নারিকেল রপ্তানি হইয়া থাকে। জাপানীবা ঐ-সকল নারিকেল খাদ্যরূপে ব্যবহার কবে না, উহা হইতে ভৈল প্রস্তুত করিয়া বিদেশে পাঠাইয়া দেয়। ইহাতে তাহারা কোটি কোটি টাকা লাভ করে। অধিকন্তু নারিকেল-খৈল সাবরূপে ব্যবহার করিয়া ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। এই বিবিধ একাবেই তাহারা লাভবান হইয়া থাকে। গত বৎসর জাপান হইতে

১১৬৮... পাউণ্ড মূল্যের নারিকেল-তৈল বিদেশে রপ্তানি করা হইয়াছিল। এই তৈল প্রস্তুত করিতে ১৩০০... পাউণ্ড মূল্যের নারিকেল ব্যবহার করা হয়। সুতরাং একমাত্র নারিকেল-তৈল প্রস্তুত করিয়াই জাপানীরা ১০৩৭৫... পাউণ্ড লাভ করিতে পারিয়াছে।

আমাদের দেশের বাধরগঞ্জ নোরাখালী প্রভৃতি জেলাব প্রচুর পরিমাণে নারিকেল জন্মে, অথচ আমরা নারিকেল তৈলের ক্ষুদ্র আয় ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া আছি। ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়? আমরা সব কর্তব্যে, বিদেশী বাঁচে বৃদ্ধি-বশে।

—জ্যোতি:

ব্যবসায়ে সত্যতার অভাব—

কলসাই হইতে উৎপন্ন স্যাকারিন, চিনি-অপেক্ষা বহুগুণে মিষ্ট ও অত্যন্ত স্বলভ বলিয়া ব্যবসায়ীরা চিনির পরিবর্তে উহা সাধারণ লোকের অজ্ঞাতসারে বিক্রয় করিতেছে। মিষ্টান্ন-ব্যবসায়ীরা চিনি অপেক্ষা প্রচুর সস্তা অথচ মুখপ্রিয় মধুস্বাদু মিষ্ট বলিয়া উহা মিষ্টান্নে মিশ্রিত করিতেছে। উহা লেমনেড প্রভৃতি পানীয়ের সহিত যথেষ্ট মিশ্রিত করা হয়। কিন্তু ডাক্তারি পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে স্যাকারিন একটি তীব্র বিষ। ইহা দ্বারা পাকস্থলীতে ক্যান্সার বা ককটী বোগ উৎপন্ন হয়। কোন ডাক্তার ইহার ঔষধ আশ্রয় অবধি বাহির করিতে পারেন নাই। সুতরাং ব্যবসায়িকগণের অর্ধেক লোভে অপরের শরীরাভ্যন্তরে দ্রুতকিঞ্চৎ বোগ উৎপন্ন করিয়া নেওয়া ষড়্ধবিদ্ধ। সে অর্ধ কখনও ব্যবসায়িকগণের চোখে আসে না, জানা উচিত। সাধারণ লোকেরও এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত।

—এডুকেশন পেজেন্ট

দান—

মিঃ এণ্ড্রুয়ের দান :—মিঃ এণ্ড্রু বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে অতিনিশ্চিত হইয়া যে-সমস্ত উপহার-পেটিকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসমুদায় তিনি তিলক-স্বাধ্য-ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। সেগুলি সমস্তে রক্ষিত হইবে।

—সত্যবাদী

কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুত চণ্ডীচরণ লাহা মহাশয় ফেনী মহকুমার জৈনক জমিদার। তিনি সম্ভ্রতি নবপ্রতিষ্ঠিত ফেনী কলেজে ৪০০০ টাকা দান করিয়াছেন। পাইকপাড়ার কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ মহাশয়ও উক্ত কলেজে উপযুক্ত ভাবে দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, কিন্তু তিনি কত দান করিবেন তাহা এখনও অপ্রকাশিত।

—যশোহর

বস্তাপীড়িতের সাহায্য—

ঘাটালের বস্তা।—আমরা বস্তার সর্বস্বান্ত ঘাটালের নরনারীদের সাহায্যে অল্প দেশের ভাই-বোনদের কৃপা প্রার্থনা করি। যবরের কাগজে ঘাটালের যে দুর্ভাগ্য কথার প্রকাশ পেতেছে, তা এতদিনে সবাই দেখেছেন বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা আশা করি এবং অনুরোধ করি যিনি যেমন শ্রমের তাই দিয়েই হস্তশ্রমী নর-নারীর সাহায্য করুন। অর্থ বস্ত্র সব ৪৩ নম্বর চক্রবেড়ে রোড, নর্থ ভবানীপুর কলিকাতা, সাতকড়িপতি রায় মহাশয়ের কাছে পাঠাতে হবে।

—বিজলী

ঘাটাল এলেকার বস্তাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্য জন্ত নাড়াজোল-রাজ শ্রীযুত কুমার দেবেন্দ্রলাল, ষা এক হাজার টাকা ও তরী কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। জেলা বোর্ডের সভাপতি মহাশয় জেলা বোর্ডের তহবিল হইতে ৫০০০ টাকা দান করিবার প্রতিশ্রুতি

প্রদান করিয়াছেন। অস্তান্ত বহু সম্মদ ব্যক্তিও সাহায্য-ভাণ্ডারে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

কলিকাতার শ্রীযুত সাতকড়িপতি রায় মহাশয়ের চেষ্টায় প্রায় ১২০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী ও শ্রীযুত মোহিনীমোহন দাস মহাশয়গণ উক্ত অর্থসহ ঘাটালে গমন করিয়াছেন।

মেদিনীপুর জেলা বাঙ্গীর সমিতির কর্তৃপক্ষ ভিক্ষা করিয়া গত মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রায় ৮০ টাকা ও ৫ মণ চাল সংগ্রহ করিয়াছেন।

বর্ধমানের মহাবাজাবিয়ার বাহাদুর মেদিনীপুর বাকুড়া হুগলী ও হাওড়ার বস্তা-পীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্য জন্ত ১০০০ টাকা দান করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৫০০ শত টাকা মেদিনীপুরে, ২০০ টাকা বাকুড়ায়, ২০০ শত টাকা হুগলীতে ও ২০০ শত টাকা হাওড়ায় ব্যয়িত হইবে।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবকগণও বস্তাপীড়িত হানে দুঃস্থ ও আর্ন্তব্যক্তিগণের সেবা করিবার জন্ত গমন করিয়াছেন। দেশবাসীর দুঃস্থ দূর করিবার জন্ত দেশবাসীর এই চেষ্টা বড়ই স্বলক্ষণ।

—সত্যবাদী

বস্তাপীড়িতের জন্ত সাহায্য-ভাণ্ডার।—কলিকাতা ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারী দোসাইটি স্কুলের কর্তৃপক্ষ ঘাটালের বস্তাবিপন্ন নরনারীর সাহায্যে জন্ত এক সাহায্যভাণ্ডার খুলিয়াছেন। ভাণ্ডারে গত ২২শে আগষ্ট মঙ্গলবার পর্যন্ত মোট ১২২১০/১৫ সংগৃহীত হইয়াছে। গত বৃহস্পতিবার উক্ত মিশনের সদস্যগণ ঘাটালে উপস্থিত হইয়া সাহায্য-বিতরণ আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার ৭৬ মণ চাউল, ১৬ মণ দাইল, ১ মণ লবণ, ১০০ জোড়া কাপড়, ২ মণ আঁপু, আঁধ মণ পিঁয়াজ, ১০ মণ চিড়া এবং ১৫ মের মুড়কী লইয়া গিয়াছেন। দেশের অস্তান্ত হানের সেবক-মণ্ডলী ইহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া অক্ষর পুণ্য অর্জন করুন।

—২৪ পরগণা বার্তাবহ

বস্তা ও রামকৃষ্ণ মিশন।—বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষগণ আরামবাগ-বস্তার ২২১টি কুটাব নির্মাণের জন্ত ৬৩০ সাহায্য প্রদান ও ১১ মণ চাউল বিতরণ করিয়াছেন। হুগলী জেলাব কংগ্রেস কমিটি ঐ স্থানেব সাহায্য-কার্যেব সমস্ত ভার গ্রহণ করায় রামকৃষ্ণ মিশন আপাততঃ সমস্ত ভাহায়েবই হাতে প্রদান করিয়াছেন।

—চুঁচুড়া-বার্তাবহ

সং অমুষ্ঠান—

অবৈতনিক আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়।—মাননীয় মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত স্তার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর আয়ুর্বেদীষ চিকিৎসার বহুলপ্রদার ও প্রচারোদ্দেশ্যে ২০ নং রামকান্ত বস্ত্র ষ্ট্রীটে কাশিমবাজার মহারাজার অবৈতনিক গোবিন্দহন্দরী আয়ুর্বেদীষ বিদ্যালয় নামে একটি আয়ুর্বেদীষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৭ নং বাগবাজার ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মল্লিক কাব্যব্যাকরণসাংখ্যাতীর্থ ভিবক্ষান্ত্রী মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়েব অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বহু সুবিজ্ঞ কবিবাল ও ভাস্কর অধ্যাপনার ভাব লইয়াছেন। এই দক্ষিণ দেশে এই প্রকার অবৈতনিক বিদ্যালয়ের যত প্রতিষ্ঠা হয় ততই মঙ্গল। ১৫ই ভাদ্র পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ে ছাত্র গ্রহণ করা হইবে। নিশ্চিষ্ট ছাত্রসংখ্যা পূর্ণ হইলে আর ছাত্র গ্রহণ করা হইবে না।

—২৪ পরগণা বার্তাবহ

মহামিলনমন্দির।—উত্তরপাড়া মহামিলনমন্দিরের একটি অমুষ্ঠান-পত্র গেয়েছি। এই মন্দিরের কর্মীরা গ্রামে গ্রামে পদর প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। ছয়মানে প্রায় দুই হাজার টাকার ধর্ম জনসাধারণকে দিতে সক্ষম হয়েছেন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও শিল্পের উন্নতির চেষ্টা তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। 'উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠ' নাম দিয়ে একটি বিদ্যালয়ও খুলেছেন। আমরা এই অমুষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি।

—সনাতন

বন বিদ্যালয়।—মেদিনীপুর সহরের ছোটবাজার পল্লীতে স্থানীয় কয়েকজন যুবকের চেষ্টায় শ্রীশ্রীচরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের নামে উৎসর্গিত একটি বন-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তৎসঙ্গে নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাও আয়োজন হইয়াছে। এই সাধু চেষ্টা সিদ্ধিলাভ কবে ইহাই বাঞ্ছনীয় এবং দেশে একগুণ বিদ্যালয়ের যতই আধিক্য হয় ততই মঙ্গল।

—সত্যবাদী

লাভপূব সমাজ-সেবক সমিতি।—প্রায় ১৫ বৎসর পূর্বে “সমাজ-সেবক সমিতি” প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্থানীয় সর্বপ্রকার জনহিতকর কার্যে অগ্রণী হইয়াছে ও আর্থিক অবস্থানুযায়ী বর্ষাসাধ্য ‘দরিদ্রনারায়ণ’ সেবা করিয়া আসিয়াছে।

যে কোনও রূপ সাহায্য সাদরে গৃহীত হইবে ও সংবাদপত্রাদিতে প্রাতিষ্ঠানিক করা হইবে।

শ্রী লক্ষ্মীনাথায়ণ মুখোপাধ্যায়, বি-এ,
সম্পাদক।

—বীভূতমবর্জ্য

অনাথ-সেবা ভাণ্ডার।—২৪ পরগণা অঙ্গরগত গার্লস্‌ স্কুলে একটি অনাথ-সেবা ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সেবকগণ সোৎসাহে কার্যে প্রযুক্ত হইয়াছেন।

—২৪ পরগণা বার্তাবহ

ষেচ্ছাসেবক সমিতি।—কয়েকজন পরার্থপর শ্রীশ্রী যুবক উৎসাহী হইয়া এই সেবা-সমিতি গঠিত করিয়াছেন। উদ্দেশ্য—বর্তমান জেলার বিশেষতঃ কালুনা মহকুমার পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ ও অর্ধশিশু সেবা করা। বিহুটিকা প্রভৃতি কঠিন পীড়ায় যন্ত্রের অভাবে যাহা বা নিবাস্রয়, সমিতির সেবকগণ তাহাদের গুণস্বভাব জন্ত সতত প্রস্তুত। এই উদ্দেশ্যে কালুনা মিশন হাসপাতালের দুইটি বোগীশয্যা আমরা আরম্ভ করিয়াছি।

সেবকেরা সকলেই সামান্তবেতনজীবী, সমস্ত ব্যবস্থার বহন করা অসম্ভব। সর্বসাধারণের কাছে বিনীত প্রার্থনা,—প্রিয়বন্ধুগণ আমাদের এই সাধু উদ্দেশ্যে সহায় হউন। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে আহ্নান, সকলে ঈশ্বর ও পীড়িতের এই সেবাত্রিতে সাহায্য করুন। যিনি আমাদের সমিতির সদস্য হইতে চান দয়া করিয়া পত্র দিবেন।

আপনি দয়া করিয়া যাহা সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, প্রজ্ঞাপদ “পল্লীবাসী” সম্পাদক মহাশয়ের নামে পাঠাইলে আমরা অঙ্গুগৃহীত হইব। পত্রাদি এই ঠিকানা দিবেন।

শ্রী সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসুধা।

মুপাবুভাইজার, ষেচ্ছাসেবক সমিতি,
মিশন হাউস, কালুনা।

—পল্লীবাসী

পাঠাগার স্থাপন।—পাণ্ডুয়া থানার অধীন দাবাসানী গ্রামে স্থানীয় কয়েকজন যুবকের চেষ্টায় সম্প্রতি একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে।

—চুঁচুড়া-বার্তাবহ

বাঙালীর গোরব—

ঢাকা বহুযোগিনী গ্রামের অধিবাসী শ্রীযুক্ত সোমেশচন্দ্র বহু অক্ষবিদ্যায় অসাধারণ কৃতি পুরুষ। সম্প্রতি তিনি বিলাতে অবস্থান করিতেছেন। ইনি অতি বড় বড় অঙ্ক-ভাগ, পূরণ, ভগ্নাংশ, বর্গমূল প্রভৃতি বড় অতি অল্পকাল মধ্যেই মুখে মুখে প্রকাশ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি বিলাতের “ইন্ডিয়ান নিউজ” পত্রের জনৈক প্রতিনিধি সহিত

তাঁহার আলোচনায়। প্রতিনিধি ইঁহা অক্ষশাস্ত্রের অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া উপবে নীচে বাট বাট সংখ্যা অঙ্ক রাখিয়া তাঁহার ফল প্রকাশ করিতে বলেন। সোমেশ-বাবু অতি অল্পকাল মধ্যেই মনে মনে সেই বৃহৎ অঙ্ক কথিয়া ফল প্রকাশ করেন। তাঁহার এরূপ অসাধারণ অক্ষবিদ্যার পরিচয় পাইয়া বিলাতী সংবাদপত্রগুলি তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিতেছেন। আমবা সোমেশচন্দ্রের প্রশংসার কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন, এই প্রার্থনা।

—ঢাকা গেজেট

বাঙ্গালী জু-পার্শ্বটক।—উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নামক একজন বাঙ্গালী জুপার্শ্বটক মাস্ত্রাজ এবং সিংহল হইয়া অফিসের বাইতেছেন। গত ১৬ই আগষ্ট তারিখে সকাল বেলা তিনি উড়িষ্যার রূপনা নামক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সেখানকার লোকেরা তাঁহাকে সমারোহের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ১৭ই তারিখে তিনি বারিপদায় যান এবং ১৮ই বালেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি নাকি পঁচিশ হাজার মাইল পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছেন।

—সময়

সং সাহস—

সম্প্রতি দামোদর ও কানা নদীর বন্যায় অনেক গ্রাম ভাসিয়া যায়; হাওড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ পূর্বনাথ গত শনিবার বন্যা-পীড়িতদের সাহায্যার্থ পূর্বন করিয়া কুলগেছিয়াব নিকট নদীপ্রান্তে একটি জীলোককে নিঃসহায় অবস্থায় ভাসিয়া বাইতে দেখিতে পান এবং তৎক্ষণাৎ নিজের বিপদের কথা না ভাবিয়া জীলোকটির উদ্ধারের জন্য জলে ঝাঁপাইয়া পড়েন ও অতি কষ্টে তাহাকে উদ্ধার করিয়াছেন।

—নীহার

নারী-পদঙ্গ—

কর্ণোবেশনে, জীলোকের ভোটের অধিকার।—গত গুরুবার-দিন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধে আলোচনা কবিলার জন্য কর্পোরেশনের এক অধিবেশন হইয়াছিল। অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইয়াছে, জীলোকদিগকে ভোট দিবার অধিকার প্রদান করিতে হইবে। সম্প্রদায়গত নির্বাচন বহিত কবিলার জন্য একটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল। উহা পক্ষে ১৬ ও বিপক্ষে ১৭টি ভোট হওয়াতে উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। একজনকে বহু ভোট প্রদানের অধিকারও লোপ করা হইয়াছে।

—বঙ্গবন্ধু

মুসলমান মহিলার কৃতিত্ব।—এবংসব সাকিনা কল্লু মুসলমান মোহাম্মদজালা, বি-এ পরীক্ষায় ইংরেজীতে ১ম শ্রেণীর অনাস পাইয়াছেন। অন্যান্য মুসলমান পরীক্ষার্থী তাঁহার চেয়ে অনেক কম নম্বর পাইয়াছেন। তাঁহার ছোষ্ঠা ভগ্নী বেগম হুসনাতুন মোহাম্মদজালা বি-এ পরীক্ষায় গুণানুসারে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার কবিরাজিয়াছেন। তিনি গত শ্রীলিমিনারী বি-এল পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বোম্বাই আইনে সর্বাপেক্ষা বেশী নম্বর পাইয়াছিলেন। তাঁহার পারস্তের উচ্চ ও নানাগুণসম্পন্ন মুসলমান-বংশ-সম্মত। তাঁহার “হাবুল মাস্তিন” পত্রিকার সম্পাদক মোমিনা মুহাম্মদউল ইসলাম জালাল-উদ্দিন আলিহানানের কন্যা। আবাবী, পার্শী, উর্দু তাঁহার বেশ ভাল জ্ঞানে এবং উত্তমরূপে বাংলা লিখিতে ও পড়িতে পাবেন। তাঁহার প্রবাসী পত্রিকায় কয়েকটি উত্তম প্রবন্ধও লিখিয়াছেন।

—মোস্তাফিজ-জগৎ

বঙ্গমহিলাব কৃতিত্ব।—কুমারী সত্যপ্রিয়া ঘোষ কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এম-বি পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংলেণ্ডে চিকিৎসা-বিদ্যাৰ অধিকতর পারদর্শিণী হইবার জন্ত গমন করিয়াছিলেন। তিনি কিয়দ্দিন হুইল ইংলেণ্ডেব এক-আর-সি-এস উপাধি পাইয়া কলিকাতায় প্রত্যা-গমন করিয়াছেন। এক-আর-সি-এস উপাধি-বিশিষ্ট মহিলা ভাস্কর্য্য ভাবতবর্ষে অতি কমই আছেন। কুমারী সত্যপ্রিয়া এই উপাধি লাভ করিয়া বঙ্গমহিলাব পোবব বিশেষরূপে বৃদ্ধি কবিয়াছেন।

—২৪ পরগণা বার্তা হ

বাঁকুড়ায় স্ত্রীশিক্ষা।—গত ২৭শে আগষ্ট তাবিবে বাঁকুড়ায় পক্ষী মহিলাগণের এক সভা হইয়া গিয়াছে। এই সভাতে পক্ষীনশীন মহিলা-দিগের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। সভাপতি চব্বা, কুটীর-শিক্ষা, ব্যাখ্যাস, শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। প্রায় ৭০ জন মহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন। এইসব কার্য্য-সূচ্যরূপে সমাধার জন্ত একটি সভা গঠন করা হইয়াছে। সভাগণের বৎসবে কমপক্ষে এক টাকা করিয়া চাঁদা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

—বন্দেমাতরম্

সমাজেব গলদ—

উপরি উপরি কয়েকটা বধু-নির্ধ্যাতনের মামলা হয়ে গেল। স্ত্রী উপব অমামুখিক অত্যাচার করাৰ জন্ত কয়েকজনৰ সাঙ্গাও হয়ে গেছে। অবশ্য এদের সাজা হওয়ার সামাজিক উপকার হয়। কিন্তু যারা স্ত্রীর শরীরের উপর অত্যাচার না কোরে তাদের মনৰ ওপর অত্যাচার করে তাবাব কম অপরাধী নয়। অনেক স্বামী স্ত্রী বর্ধমানে সন্ত স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত; অনেক স্বামী এক স্ত্রী বর্ধমানে আর-একটি বিবাহ কোরে দ্বিতীয়া পত্নীৰ সঙ্গে সংসা-বধর্ম পালন কৰ্ব্বেন। এরা অপরাধী হলেও আমাদের দেশেব আইনে এদের সাজা দেবাব কোনো ব্যবস্থা নেই। আইনত যে-সকল অপরাধীকে দণ্ড দেবাব ব্যবস্থা নেই, তাদের সামাজিক দণ্ড দেবারি স্ত্রীরা কবা উচিত। কিন্তু আমাদের দেশেব সমাজে একমাত্র নারীকে দণ্ড দেবার ব্যবস্থাই কোবে রেখেছে—তাব প্রধান কারণ নারীবা সেই দণ্ড মাথা পেতে স্বীকার কবে বলে। আমবা শুনশুন যে, বধু-নির্ধ্যাতনেব মামলাব বিচার করেচেন এমন কোনো ধর্ম্মাধি-কাবী যিনি এক পত্নী বর্ধমান থাকা সবেও আর-একটি বিবাহ কোরে দ্বিতীয়াকে নিয়ে সংসা করছেন।

—বিজলী

মুসলমানের ঔদার্য্য—

গো-হত্যা নিবারণ।—কবিদপুৰ সহরস্থিত মুসলমান আতাপণ পবিত্র বক্ৰিদ দিনে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইবা গো-হত্যা নিবারণ করিয়া হিন্দুদিগের প্রীতিভাজন হইয়াছেন।

—কল্যাণী

হিন্দুর ঔদার্য্য—

হিন্দুধর্মে পুনঃদীক্ষিত।—যে-সকল ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্ম হইতে ছ্যাত হইয়াছেন এবং পুনৰায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চান, তাঁহাবা যেন ১৯ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে আৰ্য্য সমাজে অথবা শঙ্কুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীটে আৰ্য্যস্বামী সভার প্রেসিডেন্টেব নিকট আবেদন কবেন।

—বন্দেমাতরম্

সেবক

বিদেশ

তুরস্কের বিজয়-অভিযান—

মিত্রশক্তিবর্গের যৌক গ্রীসের দিকে থাকতে গ্রীসের দস্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তাই বকানিস্পজিব উপর নির্ভব না করিয়া নিজেব বাহবলে এমিয়া মাইনবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াসে গ্রীস যে উদ্যোগপর্ক আরম্ভ করিয়াছিলেন কামালের বাহবলে তাহা চূর্ণাকৃত হইয়াছে। গ্রীসসৈন্যে এফিসসরের নিকট সমবেত হইয়া আফিউন-কাবা-হিসাবেব দিক হইতে তুরস্ক সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবার মানসে সামরিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ কবিয়া ফেলিবার চেষ্টায় ছিলেন। গ্রীক আক্রমণকে প্রতিহত করিবার জন্য আ্যাক্সোয়া সর্ব্কারও খুব ক্ষিত্রতার সহিত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কামালের পরিচালনার সে বন্দো-বস্ত এত সূচ্যরূপে চলিতে লাগিল যে ইংরেজ সেনাপতি স্তার চার্লস টাউনশেণ্ডেব চমক লাগিয়া গেল। তিনি তুর্কী সৈন্যের সমরসজ্জা সম্বন্ধে ডেলী এন্ডপ্রেন্স নামক পত্রিকার অভিমত প্রকাশ কবিলেন যে “কামালের সৈন্যদল অত্যন্ত সাহসী এবং তাহারা একপ্রাণ হইয়া দূততার সহিত স্বদেশ-উদ্ধার-ব্রত গ্রহণ কবিয়াছে। এমন সংববদ ও স্থপরি-চালিত সৈন্যদল প্রাবই দেখা যায় না। ইহাদের বসদ সর্বববাহের বন্দোবস্তও উত্তম এবং শাস্ত্রাদি ও যুদ্ধোপকরণগুলি বেশ ভালই। গোলাগুলি ও বাকদণ্ড প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে। সেভাস-স্টিক অগুসাবে বন্দুকের ত্রিচরকগুলি (breech blocks) তাহাবা মিত্রশক্তিবর্গেব হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু কোনিয়ার অত্রা-পাবে আবাব সেগুলি তাহারা করিয়া লইয়াছে। তুরস্কের সামরিক কর্ম-চাবীবর্গ হৃদয় এবং চতুৰ।” টাউনশেণ্ডেব অভিমত প্রকাশিত হওয়ারতে অনেকেই ইহা-অতিবিক্রিত মনে কবিবা নানাবর্ণ ঠাট্টা-বিজ্ঞপ করিয়া-ছিলেন। ইউরোপেব স্তম্ভ বাস্তা যে এত সহজেই আবার হৃদয় ও সবল হইয়া উঠিতে পারে ইহা কেই সহজে বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই। কিন্তু আজ রণকূলী কামালের অপূৰ্ব্ব কৃতিত্বে জগৎ-সমক্ষে তুরস্ক-গৌরবেব পুনরুদ্ধার সাধন করিয়া একটি শক্তিশালী মুসলমান-সাম্রাজ্যেব পুনঃ-প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে। পাঁচ দিন অক্লান্ত যুদ্ধেব পব আফিউন-কাবা-হিসার অঞ্চলে গ্রীক সৈন্যকে বিধাবিস্তৃত কবিয়া ফেলিতে কামালের সৈন্যদল সমর্থ হয়। তাহাব পর উস্তাবাকলের গ্রীকদিগকে সমূলে বিনাশ করিয়া দক্ষিণ দিকের গ্রীক বাহিনীর উপব তুর্কুবনার অঞ্চলে তুরস্ক সৈন্য অবল বেগে আক্রমণ করে। গ্রীক সৈন্য পবাজিত হইবা উসাক অঞ্চলে প্রস্থান কবে। পবে তুরস্ক সৈন্য এফিসসহর দখল কবিবা আর্গা আক্রমণেব উদ্যোগ আরম্ভ কবেন। এই যুদ্ধে তুরস্ক সৈন্য দশ হাজার গ্রীক সৈন্য ও চারিশত গ্রীক সেনাপতিকে বন্দী করে ও অনেক গোলাগুলি ও বসদ দখল করে। যুদ্ধে হাবিয়া গ্রীক সৈন্য এমনই ছিন্ন-ভিন্ন বিশৃঙ্খল হইবা পড়ে যে গ্রীক সর্ব্কার প্রকৃত অবস্থা জানিবার অবকাশও পান নাই। গ্রীক সর্ব্কার প্রধান সেনাপতিকে পদচ্যুত কবিয়া তাঁহাব পবিরর্থে সেনাবেল ত্রিকোপিস্কে (Tricupis) প্রধান সেনাপতি নির্দ্ধাচিত কবেন। কিন্তু পবে সংবাদ আসিয়াছে যে এই নির্দ্ধাচনের তিন দিন পূর্বেই সেনাপতি ত্রিকোপিস্ তুরস্ক সৈন্যেব হস্তে বন্দী হইবাছেন।

গ্রীসেব সমব-সজ্জা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইবা যাওয়ারতে যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার জন্ত গ্রীস মিত্রশক্তিবর্গের সাহায্য ভিক্ষা কবে এবং গ্রীসের ভবক হইতে যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব মিত্রশক্তিবর্গেব তুরস্ক সর্ব্কারেব নিকট প্রেরণ করেন। আ্যাক্সোয়া সর্ব্কার সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তাঁহাবা বলেন যে গ্রীস যদি আফ্রিয়ানোপোল ও থেস-ছাডিয়া দিতে

অন্তত থাকেন তাহা হইলে অ্যাস্টোরা সর্বকাব যুদ্ধ হগিত রাখিবার প্রস্তাব ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

যুদ্ধজয়ের সংবাদ পাইয়া কামাল তাহাব সৈন্তবর্গের নিকট এক ইস্তাহাব জারি করিয়া বলিলেন—“শত্রুপক্ষের শক্তিব কেন্দ্রে আঘাত করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হওয়াতে তোমরা দেশের 'কুন্তজতা'-ভাজন হইয়াছ। তোমাদের শক্তির পরিচয় পাইয়া ভবিষ্যতেব প্রতি তুরস্ক জাতিব ভরসা জন্মিয়াছে। অ্যানাটোলিয়াতে যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই। সৈন্তগণ! তোমাদের প্রথম কর্তব্য সমুদ্রতীরে স্মার্মা দখল করা। অগ্রসর হও। জয়লাভ কর।” কামালেব ইস্তাহাবে উৎসাহিত হইয়া তুরস্ক সৈন্ত স্মার্মা অভিমুখে রওনা হইল। ১১ই সেপ্টেম্বর ধর আসিয়াছে তুরস্ক সৈন্ত স্মার্মা দখল করিয়াছে। উত্তরে দার্দানেলিস প্রণালীর তীরে ক্রমা সহরও তুরস্ক সৈন্ত দখল করিয়াছে। গ্রীসের এই আকস্মিক ভাগ্য-বিপর্যয়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থান পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। সে পরিবর্তন স্বেতকার জাতির গঞ্জে খুব সুবিধাজনক হইবে না বলিয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্র-ধুবক্ষরেরা চিন্তাকুলিত হইয়া উঠিয়াছেন।

তুরস্ক তাহার অজানা শক্তির পরিচয় লাভ করিয়া আবার উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে। থেস ও আড্রিয়ানোপোল পুনরুদ্ধার করিয়া ইউরোপে আবার আপনাদের শক্তির প্রতিষ্ঠা করিবার ভরসা তাহাব হইয়াছে। তাই তেজদৃষ্টকণ্ঠে তুরস্ক-প্রতিনিধি কতে বে বলিতেছেন, “আমরা ইউরোপে আবার তুরস্ক সাম্রাজ্যেব প্রতিষ্ঠা করিয়া, থেস ও আড্রিয়ানোপোল দখল করিয়া তবে ক্ষান্ত হইব। ইহাতে যে-কোন শক্তি আমাদেরিগকে বাধা দিবে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আমরা প্রস্তুত হইব না।” তুরস্কের এই আপত্তি ইংরেজ বড় ভীত নহেন। ক্রীস বলিতেছেন যে তুরস্ককে তাহার স্তত সাম্রাজ্য ধ্বংস দেওয়া উচিত; আর গণ্ডগোলে প্রয়োজন নাই। ইংরেজ বলিতেছেন, “এসিয়া মাইনরে তুরস্ক আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সেখানে তাহাকে স্বীকার করা বাইতে পাবে। কিন্তু ইউরোপে তাহার প্রতিষ্ঠা-হওয়া সম্ভবপর হইবে কি না সন্দেহ। বর্কান রাজ্যসমূহ, জেকো-দোভাকিয়া, যুগো-স্লাভিয়া প্রমুখ পশ্চিমের প্রাচ্যপ্রান্তিক রাজ্যসমূহ যে ইহার বিরোধী। আমরা এই নূতন রাজ্যগুলিব স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিতে যে প্রতিশ্রুত আছি। কাজেকাজেই আমরা তুরস্কের দাবী এত সহজে স্বীকার করিলে প্রতি-শ্রুতি ভঙ্গ হইবে। আর তুরস্কের পৃষ্ঠান প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করিবার গুরু দায়িত্ব যে আমাদের। সেজন্যও আমাদের অবস্থা অত্যন্ত দায়িত্ব-পূর্ণ। আমরা সহজে কোনও মীমাংসা করিয়া ফেলিতে পারি না।”

তুরস্ক বলিতেছেন, “কেহ আমাদের স্বীকার কর আর নাই কর, আমরা আমাদেরিগেব স্তত সাম্রাজ্য নিজ বাহুবলে উদ্ধার করিব। আমরা কাহারো সাহায্যের প্রত্যাশী নহি। যদি কেহ আমাদেরিগকে বাধা দিতে আসে, সে বাধা আমরা মানিব না। তুরস্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই আমাদেরিগেব সাধনা। আমরা সে সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করিব।”

ফরাসী কাগজপত্রের হুগে আবার ইংরেজ-বিশেষ ফুটয়া বাহির হইয়াছে। পুতি পাবিসিয়ার নামক সুবিখ্যাত ফরাসী পত্রিকা বলেন যে মর্দোয়া সাগরের তীরে ফরাসী সৈন্ত এখনই প্রেবণ করা উচিত। কেননা সেখানে ইংরেজ সৈন্ত গ্রীক সৈন্তের স্থানে আসিয়া উক্ত স্থান রক্ষা করিয়া গ্রীসের সাহায্য করিতেছে বলিয়া উক্ত পত্রিকাব বিশ্বাস। এবং কাশালের সৈন্তের সঙ্গে বুটিশ বাহিনীর সংঘর্ষ এক ফরাসী সৈন্তই ধামাইতে পারিবে। মার্ত্যা পত্রিকা বলেন যে, আমরা ইংরেজদিগকে এই উপদেশই দিতেছি যে অজ্ঞেয় শত্রুর সহিত সন্ধি করাই সমীচীন। ইংলণ্ডে লয়েড জর্জের শাসনের বিরুদ্ধে মহা অসন্তোষ দেখা বাইতেছে। লোকে ইজিপ্ট ও আরবের অশান্তির জঘন্যতা হইতে দারী

কবিতোছে এবং ইংরেজ সর্বকাবের তুরস্ক-নীতি অত্যন্ত অবিবেচনার পরিচায়ক হইয়াছে বলিয়া লয়েড জর্জকে দোষ দিতেছে। লয়েড জর্জ পদত্যাগ করিবেন এমন কথাও শুনা বাইতেছে। কাজেকাজেই বলিতে হয় যে প্রাচ্য সমস্যার আরও জটিল হইয়া উঠিল।

সমস্ত মুসলমান জগৎ এখন যুদ্ধনেত্রে এই অজুত মুসলমান বীর গাজী মুস্তফা কামাল পাশাব প্রতি চাহিয়া আছে। ইহাব অলৌকিক দৌর্য্যে ভরসা হয়, বুরি বা মুসলমান শক্তিব ভাগ্য আবার প্রসন্ন হইল।

গ্রিকিথসের মহাপ্রস্থান—

মহাত্মা গান্ধী যেমন সত্যপ্রহ আন্দোলনের প্রবর্তন করিয়া ভাবতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ধাবকে এক অভিনব পথে পরিচালিত করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শকে উন্নততর নৈতিক ভূমিতে লইয়া গিয়াছেন, আয়ারুল্যাণ্ডেব রাষ্ট্রনৈতিক ধারাকে তেমনি নূতন পথে পরিচালিত করিয়া আর্থার গ্রিকিথস আয়ারুল্যাণ্ডেব সাহিত্য, রীতিনীতি, হুকুমাব কলা, দর্শন ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সর্বাত্মক উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসপরাপর হইয়া নিজের চেষ্টায় স্বদেশের মঙ্গলসাধন করাই গ্রিকিথস-প্রবর্তিত সিন্ধি আন্দোলনের উদ্দেশ্য। ভাবার, আর্টে, আদর্শে ও এমন কি খেলা-ব্লাষ সম্পূর্ণভাবে স্বদেশী ছাঁচে আইরিশ জাতিকে গড়িয়া তুলিতে এই আন্দোলন প্রয়াস পাইয়াছে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রীয় বিধান ইংলণ্ড ও আয়ারুল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র এক বলিয়া ঘোষিত হয়; সেইদিন হইতে আয়ারুল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার লোপ হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে আইরিশ বীর বার্ট এমেট্ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া জীবন বিসর্জন করেন। তাহাব পর ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে আয়ারুল্যাণ্ডেব তবণ সমুদায় চন্দান্ ডেভিস, গ্যাভান ডাফ ও জন্ মিচেলের অধিনায়কত্বে আইরিশ জাতীয় আন্দোলনের স্বজন করেন এবং তাহাদের মুখপত্ররূপে “নেশন” পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সে আন্দোলন অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। মিচেল একাকী ইটনাইটেড আইরিশম্যান কাগজ স্থাপন করিয়া জাতীয় আন্দোলন চালাইতে থাকেন। তাহাব নির্ভাসনের পব আইরিশ আন্দোলন কিছুদিনের জঘন হগিত থাকে। আমেরিকার প্রবাসী আইরিশগণ নানা প্রকার বাজমোহকব সমিতি স্থাপন করিয়া ইংবেজ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতে থাকেন। ১৮৯৩ সালে পিয়াসেব নেতৃত্বে গেলিক লিগ্ স্থাপিত হয়। তাহাব উদ্দেশ্য ছিল আইরিশ ভাষা সাহিত্য সঙ্গীত ও বাগিঞ্জের যুষ্টি। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে গ্রিকিথস ‘ইটনাইটেড আইরিশম্যান’ কাগজ স্থাপিত করিয়া এই আন্দোলনকে খুব প্রসারিত করিয়াছেন। গ্রিকিথসের লেখায় এমন একটা তেজ ছিল যে চারিদিকে মহাচঞ্চল্যের স্কাব হইল। আইরিশ জাতি নব উৎসাহে মাতিয়া কর্তৃক্ষেত্রে নামিয়া গেলেন। ইংবেজ সরকার বিপদ দেখিয়া গ্রিকিথসের পত্রিকার প্রচার বন্ধ করিয়া দিলেন। গ্রিকিথস বারবার বাধা পাইয়াও ক্ষান্ত হইলেন না। উল্ফটোন, জন মিচেল, লুইক্ হুথ ও জন্ ডিক্ প্রভৃতি স্বদেশহিতকামী ব্যক্তিদ্বিগেব জীবনচরিত ও কর্তৃপ্রণালীব সহিত আইরিশ জাতির পরিচয়-সাধন করাইয়া গ্রিকিথস আইরিশ জাতিকে বেকাপ ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলেন তাহার কলে আয়ারুল্যাণ্ডে, ডিকেব নেতৃত্বে হাক্সেরীতে বেকাপ আন্দোলন হইয়াছিল, তদনুরূপ একটি আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এই আন্দোলনই সিন্ধি আন্দোলন নামে ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়াছে। গ্রিকিথসকেই ইহাব প্রষ্ঠা বলা বাইতে পাবে। গ্রিকিথস এই আন্দোলনের ব্যাখ্যারূপে আইরিশ সাহিত্য দর্শন সঙ্গীত চিত্রকলা প্রভৃতি জীবনের সমস্ত দিকেই যে নূতন ভাবের স্বজন করেন তাহাতে আয়ারুল্যাণ্ডে যে নবজীবনের স্বত্রপাত হয় তাহার

কলেই নবীন আয়ারল্যান্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। ইংরেজ সর্কারের সহিত ঘনিষ্ঠ এবং পরবর্তীকালে স্বাধীনতাপ্রার্থীদের সহিত ঘনিষ্ঠ গ্রিকিণ্ড্‌স্‌ যে অলৌকিক রাষ্ট্রীয় জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তাহাব কথা প্রবাসীতে ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। আয়ারল্যান্ডের এই সঙ্কট-সঙ্কুল সময়ে আইরিশ জাতিকে স্বল্পের পথে লইয়া বাইবার জন্ত গ্রিকিণ্ড্‌স্‌ যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন তাহাতেই, তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাহার পর ডি ভ্যালেরার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গ্রিকিণ্ড্‌স্‌ যে মনোকষ্ট পাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার মন একে-বাংবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাই তাঁহার জীবন এমনই অকালে শেষ হইয়া গেল। গ্রিকিণ্ড্‌স্‌ জন্মবোণে সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। আয়ারল্যান্ডের আশা ভরসা, আয়ারল্যান্ডের গোবব সহসা নিবিয়া গেল। এখন তাহাব স্থানে কে আবারল্যান্ডেব গোববদীপ জ্বালাইয়া রাখিবে?

কলিন্সের আত্মাহুতি—

আয়ারল্যান্ডেব অস্ত্রযোঁহেব দাবদাহে একে একে অনেকগুলি আইরিশ জননায়ক আত্মাহুতি দিয়াছেন। ইহার মধ্যে দুইজননের মৃত্যু আইরিশজাতির প্রাণে বাজিয়াছে সবচেয়ে বেশী। স্বরাজপন্থী নেতা মাইকেল কলিন্স ও স্বাধীনতাপ্রার্থী নেতা চার্লস বার্জেসের মৃত্যুতে আইরিশজাতির হৃদয় ব্যথায় ভরিয়া উঠিয়াছে। বার্জেস্‌ বিদ্রোহীদের দলপতিরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মৃত্যু বরণ করিয়া লইয়াছেন আর কলিন্সেব ভাণ্ডে ছিল গুপ্তযাতকের হস্তে শোচনীয় মৃত্যু। বার্জেস্‌ আইরিশ জাতির নেতৃত্ব করিয়া আসিতেছেন বহুদিন। কলিন্স্‌ কিন্তু সহসা লোকনায়করূপে আবির্ভূত হন। কলিন্সের আবির্ভাব অত্যন্ত অদ্ভুত।

কলিন্সের পিতার সামান্য একটি ক্ষেত ছিল। সেই ধামাবে চাষ কবিয়া বৃদ্ধ কলিন্স্‌ কোনও রকমে দিনাতিপাত করিতেন। মাইকেল কলিন্স্‌ প্রায়ের জাতীয় বিদ্যালয়ে অল্পস্বল্প পড়াশুনা করেন। এবং অল্প বয়সেই আইরিশ জাতীয়দলের সংস্পর্শে আসিয়া কলিন্সের মনে দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠে। কিন্তু অবস্থা ভাল না থাকতে অল্পবয়সে বাধ্য হইয়া কাম খুঁজিতে আরম্ভ করেন। বোলেও বৎসর বয়সে কলিন্স্‌ লণ্ডনের পোষ্ট অফিসে চিঠি বাছাই কাজে নিযুক্ত হন। লণ্ডন সহবে অনেক আইরিশ যুবক কাম কর্ত্ত করিবার জন্ত বাস করেন। তাহাদের লইয়া কলিন্স্‌ একটি দল গঠন করেন; তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতাপ্রাপ্ত হইতে আয়ারল্যান্ডকে উদ্ধার করা। কলিন্সের বন্ধন কেবলমাত্র চকিণ বৎসর বয়স, তখন বিয়বুদ্ধ বাধিয়া উঠে। তখন কলিন্স্‌ তাঁহার দলের লোকদের সঙ্গে ওয়াশ্‌উড নামক স্থানে গোপনে সমরকৌশল ও সৈন্যপরিচালনাপদ্ধতি শিক্ষা করিতে আবৃত্ত করেন। তিনি অর্থনীতির মূলতত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্ত গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোম্পানী নামক কারখানায় চাকুরী গ্রহণ করেন এবং লণ্ডনেব কিংস্‌ কলেজে অধ্যয়ন করিতে আবৃত্ত করেন। ইনি এতই তীক্ষ্ণদী ছিলেন যে অতি অল্প সময়েই মধ্যেই বার্তাশাস্ত্রে এমন রূপান্তর হইয়া পড়েন যে বয়স্ক বৎসরের মধ্যেই তিনি আইরিশ সর্কারের রাজস্ব-সচিব নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ বৎসর বয়সে তিনি আয়ারল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন করিয়া সিন্‌ফিন্‌ নেতা কাউন্ট মন্‌কেটের সহকারী হন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডেলের সভ্য নির্বাচিত হন এবং আইরিশ জাতীয় সৈন্যের গঠনকার্যে মনোনিবেশ করেন। ইংরেজ সর্কার বৎসর ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই জাতীয় সৈন্যদলের উচ্ছেদেরে জন্ত প্রাণপণ প্রয়াস পান তখন কলিন্স্‌ পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন এবং গোপনে গোপনে আইরিশ সৈন্যদল গঠন করিতে থাকেন। কলিন্সের পরিচালনায় এই গুপ্ত আইরিশ সৈন্যদল গুপ্ত যুদ্ধে

অত্যন্ত সফল হইয়া উঠে। কলিন্স্‌ অতি অল্পদিনের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ হুশিক্ষিত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইংরেজ শাসক-সম্রাটকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। অসমসাহসী মাইকেল বহবার ইংরেজ-হস্তে ধরা পড়িয়াও অদ্ভুত কৌশলে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। তাঁহার চাতুর্য্যে ইংরেজ সর্কার এতই বিব্রত হইয়া উঠেন যে শেষে তাঁহার সন্ধির জন্ত ব্যর্থ হইয়া আইরিশ নেতাবিগের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করেন। আইরিশ সেনাপতি কলিন্স্‌ হৃদয়ক সৈন্য-পরিচালক রূপেই এতদিন পরিচিত ছিলেন। এইবার তাঁহার গভীর রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয়ও পাওয়া গেল। তিনি গ্রিকিণ্ড্‌সের সহিত একযোগে ইংরেজ সর্কারের সহিত রক্ষানিপত্তি করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; চার্লস্‌ বার্জেস্‌ ও ডি ভ্যালেরা কিন্তু সে রক্ষানিপত্তি মানিলেন না। কালেক্টরেই আয়ারল্যান্ডে অস্ত্রযোঁহের আগুন জ্বালা উঠিল। কলিন্স্‌ স্বরাজপন্থী দলের সৈন্য পরিচালনা তো করিতেই লাগিলেন, আবার আইরিশ সর্কারেব অর্থদণ্ডি রূপে শাসনকার্য্যেও বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে লাগিলেন। কলিন্সের অধিনায়কত্বে স্বরাজপন্থীদের স্বাধীনতাপ্রার্থী-দলকে হাওয়া দিলেন। কিন্তু সেই সময় জন্মবোণে গ্রিকিণ্ড্‌সের মৃত্যু হওয়াতে স্বাধীনতাপ্রার্থীদল ভাবিলেন যে কলিন্স্‌কে যদি হত্যা করা যায় তবে উপযুক্ত নেতাব অভাবে স্বরাজপন্থীদের জাতিয়া যাইবে। তাই ২২শে আগষ্ট সন্ধ্যাবেলা ব্যাটন সহরে গুপ্তযাতকের হস্তে কলিন্স্‌ প্রাণ হারাইয়াছেন। মৃত্যুর সময় কলিন্স্‌ হত্যাকাবীরদিককে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কলিন্স্‌ :সদা-প্রফুল্ল এবং উৎসাহী লোক ছিলেন। মৃত্যুর সময়ও তাঁহার মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স মোটে বত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। আরও দুঃখের কথা এই যে তাঁহার বিবাহ সমাপ্তি হ্রি হইয়াছিল।

কৃতিপুর্ণ সমস্তা—

আগষ্ট মাসের লণ্ডন বৈঠকেও কৃতিপুর্ণ সমস্তার কোনই মীমাংসা সম্ভবপর হইল না। কেননা কৃতিপুর্ণের দাবীর চাপে জার্মান মার্কের দাম এত কমিয়া গিয়াছে যে তাহাতে জার্মানীর বিদেশের সন্ততি ব্যবসা করা বস্‌ভাবনা অতি অল্প হইয়া যাওয়াতে ইংরেজ সর্কার প্রমাদ গণিলেন। তাই কৃতিপুর্ণ-দাবী স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব বাহাতে সকলে গ্রহণ করে ইংরেজ সর্কার তাহার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু জালা সে প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইতে পারেন না। জালাসে প্রধান মন্ত্রী পরাকাবে এক বক্তৃতা কবিয়া বলিলেন যে “আমাদের অত্যন্ত অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন কবিয়া যে চেষ্টা হইতেছে তাহা অত্যন্ত অন্যায্য। আমরা নিরো কিশা বিস্মার্কের মত নিষ্ঠুর নহি। আমরা আমাদের নিজস্বের সহিত সন্ধ্যা-স্বপ্নে আবৃত্ত থাকিতেই চাহি এবং আমাদের পরাজিত শত্রুর সহিতও ভদ্রতা বজায় রাখিয়া চলিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু আমরা সর্ব্বাঙ্গে এই কথাই জোব করিয়া বলিব যে আমাদের কৃতিপুর্ণের যে সমস্ত দাবী আমরা জানাইয়াছি তাহা পূরণ কবিতেই হইবে। আমরা তাহা না পাইলে কিছুতেই নিরস্ত হইব না। এই প্রসঙ্গে ইংরেজ সর্কারের ব্যবহারের তীব্র সমালোচনাও পরাকারে করেন। তাহাতে ইংরেজ রাষ্ট্র-নৈতিক গগনে অত্যন্ত ঢাকলোর স্ফার হইতে দেখা যায়। এদিকে ফরাসী কাগজপত্রে পরাকারের বক্তৃতাকে সমর্থন করিয়া খুব লেখালেখি চলিতে লাগিল। অবস্থা এমনই গুরুতর হইল যে ইংরেজ প্রতিনিধি স্তার জন ব্রাড্‌বেরি বিপদ গণিলেন। এদিক অবস্থা সঙ্কটজনক দেখিয়া মার্কের দাম আরও কমিয়া যাইতে লাগিল। এক পাউণ্ডে প্রায় ১০০০ মার্ক পাওয়া যাইতে লাগিল। এ সময়্যার মীমাংসা হওয়া অসম্ভব বিবেচনা করিয়া বশন প্রায় সকলেই নিবাণ হইয়া পড়িয়া-

ছিলেন তখন বেলজিয়ান প্রতিনিধি দেলাক্রোয়া (Delacroix) চেষ্টায় একটা ক্ষণস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া বর্তমান বিবাদ কিছুদিনের জন্যও স্থগিত থাকি সম্ভব হইয়াছে। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে জার্মানীর নিকট হইতে দাবীর টাকা আদায় স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে যীমান্স হওয়া, যে পর্যন্ত জার্মান রাজ্যের স্ববন্দোবস্ত মিত্রশক্তিবর্গের প্রেরিত প্রতিনিধিরা না করিয়া উঠিতে পারিবেন সে পর্যন্ত, স্থগিত থাকুক। কিন্তু যতদিন রাজ্যের স্ববন্দোবস্ত ঘটনা না উঠিতেছে ততদিন স্ববস্তাবে না বসিয়া থাকিয়া জার্মানীর নিকট ১৯২২ সালের দাবীর টাকাটি ছয়মাসের ট্রেজারি বিলে আদায় করা হউক। ট্রেজারি বিলে টাকা আদায় করিলে নগদ সোনা বা রূপায় দাবীর টাকাটি না দিয়া কাগজপত্রে দাবীর টাকার স্বীকারোক্তি দেওয়াতে, চলিত মুদ্রার দাম আরও কম হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকিলে না। কিন্তু ট্রেজারি বিলের টাকা অবস্থা ভালো হইলে যাহাতে জার্মানী দিতে বাধ্য থাকেন, তাহার জন্য পাকাপাকি বন্দোবস্ত এখন হইতে রাখা সম্ভব মনে করিয়া দেলাক্রোয়া প্রস্তাব করেন যে জার্মানী এই স্বীকারোক্তির টাকাটা বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের ইচ্ছামত কোনও বিদেশী ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিবেন। দেলাক্রোয়া প্রস্তাবে মিত্রশক্তিবর্গের সকলেই বাজী থাকিতে গণ্ডগোল আপত্তত মিটিয়াছে। জার্মান অর্থসচিব সন্ডাব কিন্তু বলিতেছেন যে এই বন্দোবস্ত মানিয়া লইতে হইলে জার্মান ব্যবসাদারেরা যে ফ্রাঙ্ককে কয়লা ও কাঠ সর্বস্বরাহ কবিত্তে স্বীকৃত হইয়াছিল সে বন্দোবস্ত বজায় থাকিবে না। দেননাষ্টাইনিস, সিলভারবার্গ প্রভৃতি বড় বড় জার্মান ব্যবসাদার মার্কেব দাম যাহাতে আরও না পড়িয়া যায় সেইজন্য ক্ষতি স্বীকার কবিয়াও অল্পমূল্যে কাঠ ও কয়লা বিক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, শুধু এই অঙ্গীকারে যে ফ্রাঙ্ক দাবীর টাকা আদায়ের চেষ্টা ৩১শে ডিসেম্বর অবধি স্থগিত রাখিবেন। ফ্রাঙ্ক যখন সে অঙ্গীকার না মানিয়া ট্রেজারি বিলে টাকা আদায়ের চেষ্টায় আছেন তখন ষ্টাইনিস্ও পূর্বে প্রতিশ্রুতি রাখিতে বাধ্য নহেন। ষ্টাইনিস্ এরূপভাবে কিবিয়া দাঁড়াইতে ফ্রান্সের মহামুশ্কেল হইল। ফ্রান্সের যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানগুলিকে নূতন করিয়া নির্মাণ করিবার ক্ষমতা ফ্রান্সের শক্তিতে একা কুলাই না। তাই ১,২০,০০০ গৃহ নির্মাণের সমস্ত সাধনসম্পদ মাত্র শতকরা ছয় টাকা লাভে কবিয়া দিতে ষ্টাইনিস্ পূর্বে স্বীকৃত হওয়াতে ফ্রাঙ্ক খুব হবিয়া পাইয়াছিলেন। ষ্টাইনিস্ এই ব্যাপারে (১০০,০০০,০০০) প্রায় দেড়শত কোটি টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এমনদা পণিয়া ফরাসী ধনী দেলত্রাক্ ষ্টাইনিসের সহিত দেখা সাফাৎ আরম্ভ করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে শীঘ্র একদল জার্মান ব্যবসায়ী ফ্রান্সে

ধ্বংসপ্রাপ্ত ভূখণ্ডসমূহ পরিদর্শনের জন্য আসিবেন। ফরাসী লোহার খনিও ভাল চলিতেছে না। জার্মান লোহার কাঁচবায়ীরা যাহাতে তাহা চালাইয়া লইবার ভার লন তাহারও চেষ্টা চলিতেছে। এইসব ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় যে ক্ষতিপূরণের দাবীর চাপ আর সহজে বড় ফরাসী দিতে পারিবেন না। কিন্তু এইসব ব্যাপারে ইংরেজ বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন। তাহা বা স্পষ্টই বলিতেছেন যে জার্মান ব্যবসা ও জার্মান ধনপ্রাধান্য এমন হুসংস্থিত ও সুপরিচালিত যে ইহাব সঙ্গে প্রতি-যোগিতায় ফ্রান্স জাঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। একবার যদি জার্মান ধনীরা ফ্রান্সে ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা পায় তবে ফ্রান্সের বাজার তাহাদের একচেটিয়া হইয়া যাইবে। জার্মানীর ব্যবসায়ের গতিরোধ করা তখন অসম্ভব হইবে।

“ইজিপ্ট” তদন্তের ফল—

ইজিপ্ট জাহাজ ভুবি সম্বন্ধে দোষারোপ বিচার কবিবার জন্য যে বিচার-সভা বসিয়াছিল তাহার বিচার-কল প্রকাশিত হইয়াছে। বিচারের ফলে লক্ষবর্গের কলঙ্ক স্থান লইয়াছে। যুদ্ধের সংখ্যা যে অত্যধিক হইয়াছে তাহার জন্য বিচারকগণ জাহাজের মাষ্টাব এবং চিক্ অফিসারকেই দায়ী কবিয়াছেন। জাহাজের কর্ম-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা ও হুসংবদ্ধ থাকিবার ব্যবস্থাও ভাল ছিল না। ভারতীয়দিগের ভাষা কর্মচারীদের না জানা থাকিতে অধীনস্থ নাবিকদিগকে সংযত রাখিতে পারা যায় নাই। তদন্ত-সমিতি মনে করেন যে কর্মচারীদেরকে ভারতীয়দিগের ভাষা শিখিতে বাধ্য করা উচিত। ভারতীয় লক্ষ্যেরা যে খুব কর্মঠ ও সাহসী তাহাও তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন। তদন্ত-ফল বাহিব হইবার পর নাবিক সমবায়ের সম্পাদক কাথবার্ট ল সাহেব ইন্ট্রিং ষ্টাণ্ডার্ড পত্রিকায় ভারতীয় লক্ষ্যদিগের গুণকীর্তন করিয়া এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া একটি বিষয়ে তাহাদের দোষ দেখাইয়াছেন, তাহা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। তিনি বলেন যে ভারতীয় শ্রমিকগণ বিশেষতঃ লক্ষ্যেরা শ্রমিক সভা বা সমবায়ের নিয়ম মানিয়া চলেন না এবং যে একতা এবং দৃঢ়তা থাকিলে শ্রমিক সভা ধর্মীর অত্যাচারের প্রতিকার করিতে সমর্থ হয় তাহা ভারতীয়দিগের মধ্যে এখনও দেখা যায় নাই। এগুলি শিক্ষা না লইলে ভারতীয়গণ ইংবেজ ধর্মীর সঙ্ঘিত জীবন-সংগ্রামে জাঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। এবং ইহাদিগের সাহায্যে ইংরেজ ধর্মী ইংবেজ শ্রমিককেও বিপর্যস্ত করিয়া তুলিবে। শ্রমজীবীদের জন্য বাহারা চিন্তা কবেন তাহাদের এই কপাগুলি ভাল কবিয়া বিচার কবিয়া দেখা কর্তব্য।

কচুরী পানা

কচুরী পন্নার (Water Hyacinth) উৎপাতে আমাদের বাংলা দেশের কৃষিকার্যের যে কি-প্রকার অনিষ্ট হইতেছে তাহার উল্লেখ নিম্নয়োজন। কয়েক বৎসর পূর্বে পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে এই পানা জন্মিয়া ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিতেছিল। ইহা দ্বারা যে কৃষিকার্যের বিঘ্ন হইবে, তখন লোকে তাহা কল্পনা করিতে পারে নাই। এখন পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ কৃষিযোগ্য ভূমিই

এই পানায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে এবং উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গেরও স্থানে স্থানে ইহাব উৎপাত অহুত হইতেছে। পূর্ববঙ্গের ভূমি উর্বরতার জন্য প্রসিদ্ধ, সেখানকার ভূমিতে সার দিতে হয় না; চাষের হাল্লামাও সেখানে খুব কম। তাই সেখানকার জমিতে সোনা ফলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু কচুরী পানার উৎপাত যে-প্রকারে বৎসরের পর বৎসর চলিতেছে, তাহাতে

পূর্ববঙ্গের উর্বরতা যে আর অধিক দিন থাকিবে, তাহা আশা করা যায় না।

কচুরী পানার উৎপাত যে কেবল বঙ্গদেশেই আছে তাহা নহে, আমেরিকাতেও ইহার উৎপাত কম নয়।

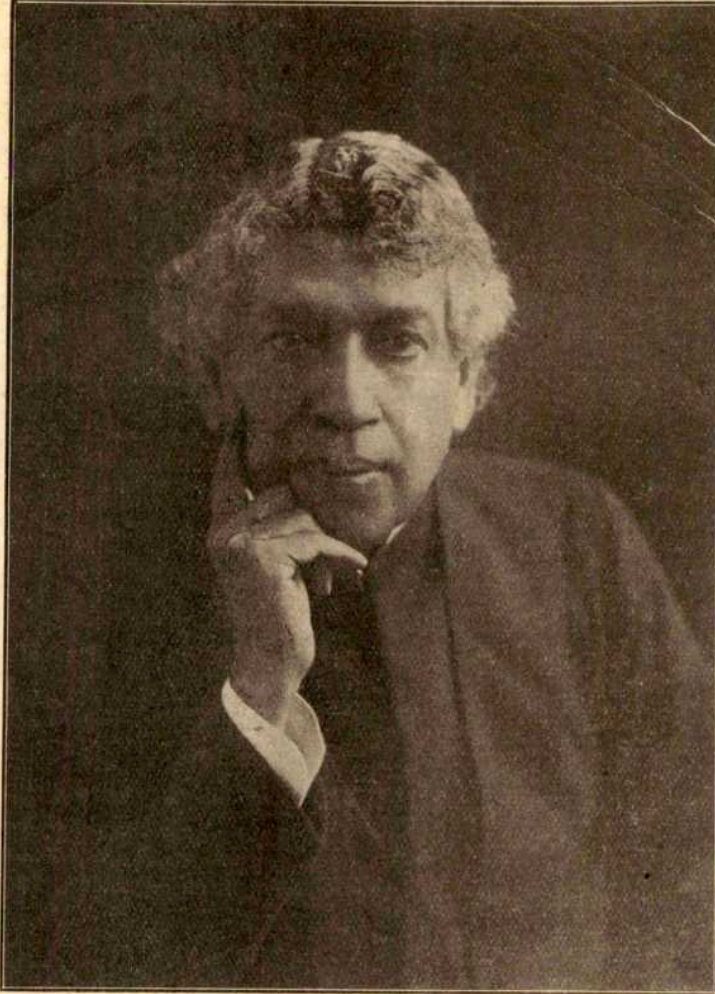
সেখানে আজও এই উৎপাত নিবারণ করা যায় নাই। ইহা শুনিয়া হয়ত কেহ কেহ বলিবে ন—তবে আর কি, বাহাদের এত টাকা, এত আয়োজন, তাহারা যখন পানা নষ্ট করিতে পারিল না, তখন আমাদের চেষ্টা বৃথা। আমরা এই প্রকার উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছি, আমেরিকা পারিল না বা অপর কোন দেশ পারিল না বলিয়া আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে

চলিবে না। রাজা

ও প্রজা উভয় পক্ষকেই এই উৎপাত নিবারণের জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। চেষ্টা ফলবতী হইবেই। এখানে একটি কথা স্মরণ করিতে হইবে,—অতি প্রাচীনকালে যখন পৃথিবীতে কেবল উদ্ভিদেরই আধিপত্য ছিল, তখন আমাদেরই পূর্বপুরুষেরা উদ্ভিদের উচ্ছেদ-সাধন করিয়া আরণ্যভূমিকে ক্ষয়িক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন অরণ্য মাছুষের নিকটে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। সুযোগ

বন্নিয়া এইক্ষণে উদ্ভিদেরই এক বংশধর মাথা-চাড়া দিয়া আজ আবার আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছে।

মাছুষের হাতে অঙ্গের ত অভাব নাই। উদ্ভিদের সহিত মাছুষের এই প্রকার সংগ্রাম চিরকালই চলিবে। কোন



আচার্য্য স্তার জগদীশচন্দ্র বসু

প্রাণী বা কোন উদ্ভিদ নিজের বংশ বিস্তার করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে দখল করিয়া বজ্রক ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম-বিরুদ্ধ। তাই কোন জীব যাহাতে পৃথিবীতে একাধিপত্য স্থাপন করিতে না পারে তাহার জন্ত প্রকৃতিতে অনেক ব্যবস্থা আছে। প্রথমতঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিকূলতায় অনেক জীব মারা যায়। তাহার পরে এক জাতীয় জীব আর-এক জাতির সহিত প্রতিযোগিতা

করিতে গিয়াও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। এই প্রকারে দেখা যায়, মাছুষের সহিত পশুর এবং প্রাণীর সহিত উদ্ভিদের নিয়তই সংগ্রাম চলে। ইহার ফলে যে জীব বতটা অধিকার পাইবার দোষ তাহা আপনা হইতেই পায়। যদি কোন কারণে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের দ্রুত বংশবিস্তারের কোন বাধা না থাকে, তবে তাহাই হস্তা দাঁড়ায় উৎপাত। অষ্ট্রেলিয়াতে থরগোস



(১) কচুরী পানার দাম, সিঙ্গুরিয়ার কাছে গঙ্গার ধারে ছিল না। কয়েক বৎসর পূর্বে সেখানে এক জোড়া খরগোস ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র জন্তুর বংশবিস্তারে অষ্ট্রেলিয়াতে এখন এত খরগোস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে তাহাদের উৎপাতে কৃষিকার্যের ক্ষতির আশঙ্কা হইতেছে। কোনো এক খেয়ালী লোক ইংলণ্ড হইতে এক জোড়া পোকা সংগ্রহ করিয়া আমেরিকায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, পোকাগুলি নাকি দেখিতে সুন্দর ছিল। অল্পকাল অবস্থা পাইয়া সেই পোকাদের বংশধর-গুলি এখন আমেরিকার বিবিধ প্রদেশে ভয়ানক বিস্তার লাভ করিয়াছে। তাহাদের উপদ্রবে মূল্যবান পাইন গাছ লোপ পাইতে বসিয়াছে। ইহাকেই বলে উৎপাত। আমাদের দেশে কচুরি পানাও কতকটা এই রকমেরই উৎপাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের শৈশব-উপাখ্যানের রাজপুত্র ও পাত্রের পুত্র সেই প্রকাণ্ড রাক্ষসটাকে বহু চেষ্টাতেও বিনষ্ট করিতে পারে নাই, কারণ রাক্ষসটার প্রাণপুরুষ ছিল চৌদ্দ হাত জলের তলায় স্ফটিক-স্তম্ভের ভিতরে লুকানো। আমাদের ও অন্য দেশের রাজপুরুষেরা কচুরি পানা বিনাশের জন্ত যে-সকল চেষ্টা করিতেছেন, তাহা রাজপুত্রের রাক্ষস বিনাশের চেষ্টার মতোই বুঝা হইয়া যাইতেছে। কারণ ইহারা কেহই জানেন না পানা-রাক্ষসীর প্রাণ-

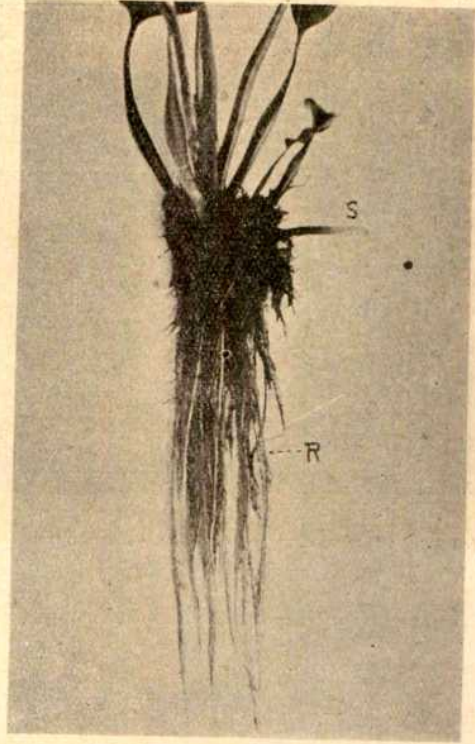
পুরুষটা কোথায় লুকানো আছে। এইজন্ত লক্ষ্য স্থির না করিয়া লক্ষ্যভেদের চেষ্টার দ্বারা ইহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতেছে। কচুরি পানার জীবনের ইতিহাস পরীক্ষা করিয়া, কি প্রকারে তাহারা বংশ বিস্তার করে এবং কোন অবস্থা তাহাদের বুদ্ধির অল্পকাল, এই-সকল তথ্য প্রথমে সংগ্রহ করা কর্তব্য। এই-সকল তথ্য আজও সংগৃহীত হয় নাই। তাই পানা বিনাশের জন্ত যে-সকল উপায় অবলম্বন করা হইতেছে, সেগুলি অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার দ্বারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছে। অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণ প্রায়ই বিজ্ঞানকে যাদুবিদ্যার কোঠায় ফেলিয়া থাকেন। তাহারা যখন কোন প্রাকৃতিক উৎপাতে ভীত হইয়া পড়েন, তখন মনে করেন বুঝি বিজ্ঞানই মন্ত্রবলে উৎপাতের শাস্তি করিবে। স্বার্থান্বেষী চতুর লোকেরা সুযোগ ছাড়ে না। তাহারা বৈজ্ঞানিক সাজিয়া নানা আড়ম্বরে জনসাধারণকে প্রতারিত করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে। লোকে ভাবে ইহাই বুঝি বৈজ্ঞানিক প্রণালী। কোন অজ্ঞাত ব্যাপারের মূল কথা জানিয়া কার্য করিতে গেলে এই ভড়ং পরিত্যাগ না করিলে চলে না। ভড়ং করা বা ভড়ং দেখিয়া মুগ্ধ হওয়া বৈজ্ঞানিক রীতি নয়। যিনি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, তিনি অল্পসম্বন্ধের বাহ্য শাখাপ্রশাখাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহার মূল কোথায় তাহাই দেখিবার জন্ত অবিরাম চেষ্টা করেন। কত অবাস্তব ব্যাপার চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে বিপথগামী করিতে চেষ্টা করে তাহার ইয়ত্তাই হয় না। যে বৈজ্ঞানিক এই-সকল অবাস্তব ব্যাপারের কুহক কাটাইয়া সোজা পথটি ধরিয়া চলিতে পারেন, তিনিই মূলতত্ত্ব আবিষ্কারে কৃতকার্য হন। আবিষ্কার মাত্রেরই ইহাই মূলমন্ত্র। গাছের রস কি প্রকারে তাহাদের দেহের ভিতর দিয়া উপরের দিকে প্রবাহিত হয়, তাহা এ পর্যন্ত উদ্ভিদবিদ্যার একটি প্রকাণ্ড সমস্যা হইয়া ছিল। পূর্বোক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়াই আমি দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের অবিরাম চেষ্টার পরে এখন রসপ্রবাহের মূল কারণ জানিতে পারিয়াছি। অবাস্তব ব্যাপারগুলিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া লক্ষ্য নির্ণয় করা এবং পরে সেই লক্ষ্যপথে অগ্রসর হওয়া আবিষ্কারের মূলমন্ত্র।

কচুরী পানার গাছটি কিরূপ এখন তাহার আলোচনা

করা যাউক। গন্ধার তীরে সিজ্বেড়িয়া নামক স্থানের একটি খালে যে পানা আছে ১ম চিত্রে তাহার একটি ছবি দেওয়া হইল। গাছগুলি কখন কখন দুই তাত পর্যন্ত উচ্চ হয় এবং স্থানে স্থানে সেগুলি এমন নিবিড়ভাবে জলভাগ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে যে, পানার উপর দিয়া মানুষও হাঁটিয়া চলিতে পারে। দ্বিতীয় চিত্রে একটি বিচ্ছিন্ন পানার ছবি দেওয়া হইল। ছবি দেখিলেই বুঝা যাইবে পাতা-সমেত গাছটি যত উচ্চ তাহার শিকড় প্রায় সেইরূপ দীর্ঘ। এক-একটি গাছে কখন কখন দেড় শতেরও অধিক শিকড় থাকে। কেবল ইহাই নয়, এই পানোগুলি আবার জলের তলায় লতাইয়া চলে, এবং ইহাতে তাহাদের বংশ বিস্তার লাভ করে। কিন্তু কচুরী বংশ বিস্তারের ইহাই একমাত্র উপায় নয়। এসম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। কচুরী পানার পাতার ডাঁটাগুলিও শুষ্কত,—সেগুলি ফাঁপা ধরণের,— তাই জলে ভাসে।

যাহা প্রত্যক্ষ এবং যাহা হঠাৎ চক্ষুগোচর হয়, মানুষের মন সর্বাগ্রে সেই দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু এই রকমে মনকে বিক্ষিপ্ত করার বিপদ অনেক। ইহাতে আসল চাপা পড়িয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা বাধা নিয়মে কচুরী পানা সম্বন্ধে যে গবেষণা করিয়াছেন, তাহাতে আসলকে ঠেলিয়া ঝুঁটাকে লইয়াই মারামারি করিয়াছেন। পানার চক্চকে পাতা ও ফুলগুলি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাই তাহারা সেইগুলি নষ্ট করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে পাতা ও ফুল নষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু গাছ মরে নাই। গাছগুলি যে লম্বা শিকড় চালাইয়া জলের তলা হইতে পাণ্ডা সংগ্রহ করে তাহা ইহাদের নজরে পড়ে নাই। এই শিকড়গুলিই গাছগুলিকে জীবিত রাখিয়াছিল।

পুঙ্করিণী হইতে পানা উঠাইয়া ফেলিলে দেখা যায়, কয়েক মাসের মধ্যে ধীরে ধীরে তাহা আবার পানায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। যে দুই চারিটা শিকড় জলের তলায় থাকিয়া যায়, সেইগুলিই নূতন পানার উৎপত্তি করে। জলের ভিতরকার শিকড় নষ্ট করিতে না পারিলে এই শক্তির বিনাশ নাই। যাহারা পানা নষ্ট করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করেন, তাহাদিগকে এই



(২) কচুরী পানার জলে-ডোবা খুলিয়া-পড়া লম্বা শিকড় (R) এবং আড়ে বিস্তৃত শিকড় (S)

কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছি। কচুরী পানার একটি ক্ষুদ্র শিকড় হাজার হাজার নূতন গাছের সৃষ্টি করিয়া ১০ বিঘা স্থানকে কয়েক মাসের মধ্যে আচ্ছন্ন করিতে পারে।

এখন কচুরী পানা বিনাশের উপায় কি, তাহার আলোচনা করা যাউক। এসম্বন্ধে চিন্তা করিলে চারিটি উপায়ের কথা মনে হয়,—

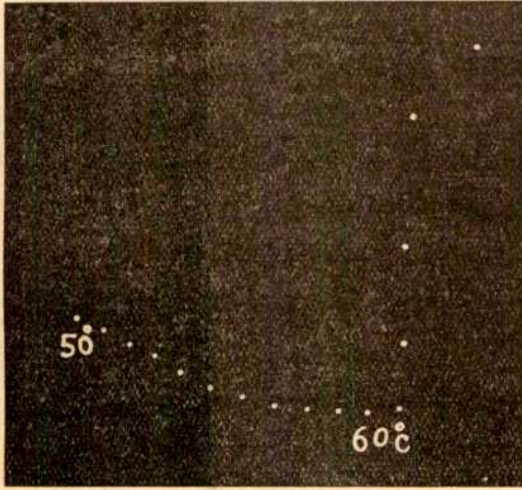
(১) পানাদের গায়ে ছত্রাক জাতীয় (Fungal parasites) পরাসক্ত উদ্ভিদ জন্মাইয়া তাহাদিগকে নষ্ট করা।

(২) উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প প্রয়োগ করা।

(৩) পানার গায়ে বিষময় দ্রব্য সেচন করা।

(৪) পানোগুলিকে জল হইতে উঠাইয়া নষ্ট করা।

প্রথম উপায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা কঠিন। বিষময় বিষমৌষধম্ কথাটা সব জায়গায় খাটে না। পানা মারিবার জন্য যে ছত্রকের আমদানি করা হইবে, তাহা



(৩) কচুরী পানার মরণ-আক্ষেপ শতাংশিক ৬০ অংশ তাপে উদ্ধ গামী বিচ্ছিন্ন বিন্দুশ্রেণীতে পরিলক্ষিত

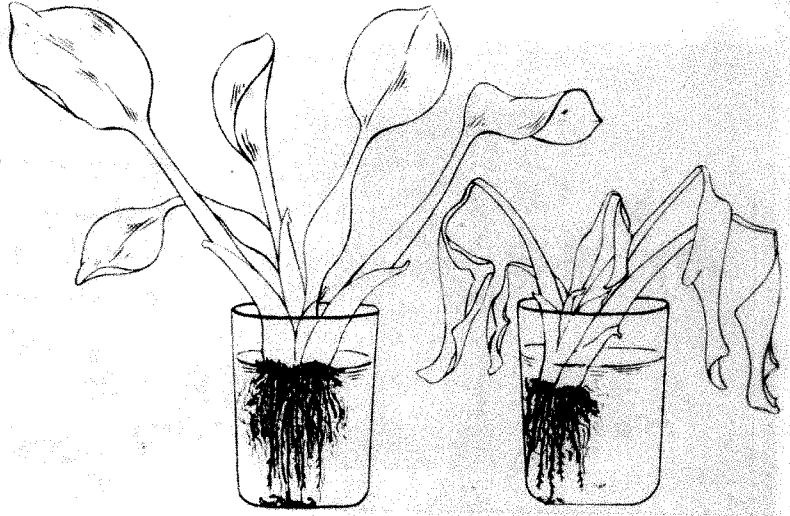
ধান পাট বা অপর গাছের যে ক্ষতি করিবে না, ইহা বলা যায় না। একটা উদাহরণ দিই। সাপ মারিবার জন্ত ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ অঞ্চলে ভারতবর্ষ হইতে বেজির আমদানি করা হইয়াছিল। ইহাতে সাপের উপদ্রব কমে নাই, কিন্তু বেজিদের উৎপাতে লোকের হাঁস বা অপর পাখী পোষা দায় হইয়াছে। কাজেই সেখানে এক উপদ্রবের শাস্তি করিতে গিয়া আর-এক নূতন উপদ্রবকে ডাকিয়া আনা হইয়াছে। পানা মারিবার জন্ত ছত্রকের আমদানি করিলে এই প্রকার বিপদের সম্ভাবনা আছে।

আমেরিকা বিজ্ঞানে খুবই উন্নতি দেখাইয়াছে। আমেরিকার ফ্রাঙ্কলিন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তা ছাড়া ল্যাঙ্লে আকাশযান উদ্ভাবন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু অগ্রান্ত দেশের গ্রায় আমেরিকাতে বুটো বিজ্ঞানের আড়ম্বরে আসল বিজ্ঞান চাপা পড়িতে বসিয়াছে। ইউনাইটেড ষ্টেটসে কচুরী পানা নষ্ট করিবার জন্ত জলীয় বাষ্প প্রস্তুত করিয়া তাহা নলের সাহায্যে গরম গরম পানার গায়ে লাগানো হইয়াছে। পানা নষ্ট করার এই পদ্ধতির প্রশংসা খবরের কাগজে অনেক পড়া গিয়াছে। বহু ব্যয়ে বর্ষান্তেও এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছিল। কিন্তু কোন স্থানেই সফল পাওয়া যায় নাই। গরম জলীয় বাষ্প নলের মুখ হইতে

বাহির হইয়া কেবল পাতাগুলিকে ছিঁড়িয়া এবং বিবর্ণ করিয়া নষ্ট করিয়াছিল মাত্র, গাছকে মারিতে পারে নাই। আশা ছিল, এই বিফলতা কর্তৃপক্ষকে ভগ্নোৎসাহ করিবে, তাঁহারা আর জলীয় বাষ্প দিয়া পানা নষ্ট করিবার পক্ষ-পাতী হইবেন না। কিন্তু তাঁহাদের উৎসাহ অদম্য; সাধারণ উপায়ে গরম জলীয় বাষ্প দ্বারা পানা মরিল না দেখিয়া তাঁহারা কলকারখানা বসাইয়া যতদূর সম্ভব চাপ প্রয়োগে অত্যুষ্ণ জলীয় বাষ্প পানা গাছের উপরে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ইহারও ফল পূর্ববৎ হইল, পানা মরিল না। আমাদের দেশেও পানা মারার এই অভিনয় অচ্যুত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই প্রকার একটা বৃহৎ আয়োজনে হাত দিবার পূর্বে কত উষ্ণতা পানা পুড়িয়া মরে তাহার কেহই অনুসন্ধান করিলেন না।

প্রথম হইলে গাছের পাতা ও ডাল প্রভৃতির অবস্থান্তর ঘটে। দেখিলেই মনে হয় বুঝি গাছটি মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু এগুলি সত্যি মৃত্যুর লক্ষণ নয়। গাছের প্রকৃত মৃত্যুর লক্ষণ লইয়া বহু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা হইয়া গিয়াছে। কোন্ গাছ জীবিত অবস্থা ছাড়িয়া ঠিক কোন্ সময়ে মৃত্যুর কোঠায় পা দিল, তাহাও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেখানে নিরূপিত হইয়াছে। কচুরী পানা মৃত্যুলেখ যন্ত্রের (Death Recorder) আধারস্থ জলে ডুবাইয়া রাখিয়া জলের উষ্ণতা ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। যখন জলের উষ্ণতা সেন্সিগ্রেডের ৬০ অংশ (অর্থাৎ ফাহরনহিটের ১৪০ অংশ) হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন যন্ত্রে পানার মৃত্যুরেখা অঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল। কচুরী পানা ১৪০ অংশ উত্তাপ দ্বারাই মরিয়া থাকে, তাহা পানা নাশকারী সবুকারী কর্মচারীরা জানিতেন না। তাঁহারা যে জলীয় বাষ্প দিয়া পানা নাশ করিতে গিয়া অজস্র অর্থ নাশ করিয়াছেন তাহা উষ্ণতার অনাবে হয় নাই। তাহার কারণ বাষ্প দ্বারা জলের নীচের শিকড় বিনষ্ট হয় নাই। কাজেই উপরকার পাতাগুলি ঝলসাইয়া গেলেও পানা মরে নাই। মৃত্যুকালে যেমন প্রাণীদের সর্বদেহে আক্ষেপ দেখা যায়, উদ্ভিদের মৃত্যু-সময়েও ঠিক সেই প্রকার আক্ষেপের লক্ষণ প্রকাশ পায়। মৃত্যুকালে কচুরী পানা কি প্রকারে আক্ষেপ দেখাইয়া থাকে, ৩য় চিত্রে তাহা অঙ্কিত হইয়াছে।

গাছের বৃদ্ধি নষ্ট করে এমন অনেক বিষপদার্থ আমাদের জানা আছে। বিষমিশ্র জল পিচ্কারীর মত কোন যন্ত্র দ্বারা পানার গায়ে ছিটাইয়া দিবার ব্যবস্থা আমেরিকায় হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থাতেও ফল পাওয়া যায় নাই। নিবিড় পাতার আবরণ ভেদ করিয়া বিষ-জল গাছের সর্বাঙ্গ সিক্ত করিতে পারে নাই। সিক্ত করিলেও বিষ শিকড়ে প্রবেশ করিতে পারে নাই।



(৪) কচুরী পানার শিকড়ে বিষপ্রয়োগের ফল।—বাম দিকের ছবিতে বিষপ্রয়োগের পূর্ব অবস্থা, ডান দিকে পরের অবস্থা।

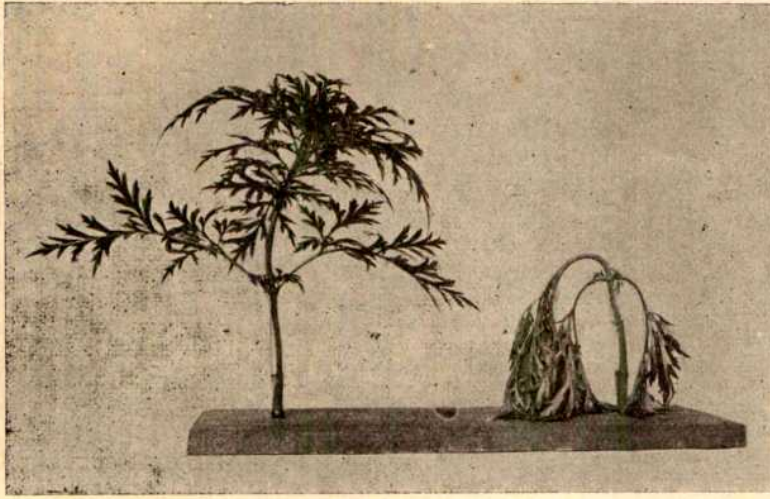
বিষপ্রয়োগের বৈজ্ঞানিক দিক্টা আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, গরম জলীয় বাষ্প পানার পাতাই ঝলসাইয়াছিল, ইহাতে পাতা মরিয়াছিল, কিন্তু জলের তলার শিকড় মরে নাই,—কাজেই গাছও মরে নাই। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, গাছের পাতায় বিষ-জল ছিটাইয়া দিলে তাহাতে উহার শিকড় মরিবে কি? সর্বপ্রথম এই প্রশ্নটার মীমাংসা করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া ডগায় বিষ লাগাইলে তাহা গোড়ায় গিয়া পৌঁছিবে, ইহা অনুমান করিয়া কতৃ-পক্ষেরা বিষজল ছিটাইয়া পানা মারিবার ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। “বহু বিজ্ঞান মন্দিরে” এ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হইয়া গিয়াছে। কিপ্রকারে উদ্ভিদের দেহের ভিতর দিয়া রসপ্রবাহ চলাচল করে, তাহা ঐ-সকল গবেষণার ফলে স্পষ্ট জানা গিয়াছে। এখন সকলেই জানিয়াছেন, উদ্ভিদের দেহে বিষপ্রয়োগ করিলে, তাহা উহার ভিতরকার রস-প্রবাহের সহিত নীচ হইতে উপর দিকে চলে,—বিষ উপর হইতে নীচ দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, ইহা কখনই ঘটে না। স্বতরাং বৃষ্টিতে হইবে, বিষ দিয়া পানা মারিতে হইলে বিষ-জল পানার শিকড়ে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এই মোটা কথাটি না-জানার জন্ত যে সময় ও অর্থের অপব্যয় হইয়াছে তাহা একান্ত শোচনীয়।

পূর্বে যে কথাগুলি বলিলাম, তাহা আমরা অনুমানের উপরে নির্ভর করিয়া বলি নাই। পরীক্ষাতে উক্তিগুলির

সত্যতা সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইয়াছে। ৪র্থ চিত্রের বাম দিকে একটি সতেজ কচুরী পানার ছবি দেওয়া হইয়াছে। শিকড়ে বিষ-জল প্রয়োগ করায় তাহার অবস্থা যে প্রকার হয়, তাহা চিত্রের দক্ষিণ অংশে অঙ্কিত আছে। শিকড়ই গোড়ার বিষ শোষণ করিয়া তাহা রসপ্রবাহের সহিত উপরকার সর্বাঙ্গে ছড়াইয়াছে। তাই গাছটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নীচের দিক হইতে মরিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিষপ্রয়োগে কেবল যে কচুরী পানা এই প্রকারে মৃত্যু গটে তাহা নয়। ৫ম চিত্রের বাম অংশে একটি সতেজ চন্দ্রমল্লিকার গাছ দণ্ডায়মান আছে। মূলে বিষ-প্রয়োগে তাহার যে দশা হইয়াছে দক্ষিণের অংশটিতে তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইবে। রসের সহিত গোড়ার বিষ উপরের সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া গাছটিকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

গাছের গোড়ায় বিষপ্রয়োগ না করিয়া তাহা আগায় লাগাইলে কি হয়, এখন দেখা যাউক। আগায় বিষ-জল ছিটাইয়াই কচুরীপানা মারিবার চেষ্টা হইয়াছিল। লোহা বা অপর ধাতব বস্তুর আগা গরম করিলে ক্রমে তাহার গোড়া গরম হইয়া পড়ে। উদ্ভিদের দেহের ভিতর দিয়া বিষ এই প্রকারে প্রবাহিত হয় কি? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, হয় না। প্রত্যক্ষ পরীক্ষাতেও আমাদের এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। কচুরী পানার একটি



(৭) চন্দ্রমল্লিকা গাছের নীচে বিষপ্রয়োগের পূর্বের ও পরের অবস্থার ছবি

ডাঁটা সমেত পাতাকে বিষ-জলের ভিতরে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছিল। ৬ষ্ঠ চিত্রের বামদিকের ছবিতে তাহা অঙ্কিত আছে। ইহাতে দেখা গিয়াছিল, বিষ নীচের দিকে নামে নাই,—যে পাতাটি বিষের সংস্পর্শে আসিয়াছিল, কেবল তাহাই মরিয়া বিবর্ণ হইয়াছিল। কেবল কচুরী পানাতেই যে ইহা দেখা যায়, তাহা নহে। চন্দ্রমল্লিকার একটা ডাঁটাকে ঠিক ঐ প্রকারে বিষের সংস্পর্শে রাখিয়া অবিকল ঐ ফলই পাওয়া গিয়াছিল। ৬ষ্ঠ চিত্রের দক্ষিণে তাহারই ছবি লিপিবদ্ধ আছে।

আমরা এ পর্যন্ত যে আলোচনা করিলাম, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, কচুরী পানার বিনাশকে লোকে যে একটা মহা সমস্যা বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছিল, এখন তাহা মনে করার হেতু নাই। পাতা ফুল বা ফল নষ্ট করিলে ইহা মরিবে না। শিকড় দিয়া ইহার বংশ বিস্তার করে,—সেই শিকড়গুলিকে নষ্ট করার চেষ্টাই এখনকার কর্তব্য। আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অল্পসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদের গবর্ণমেন্ট সাবধান হইতে পারিবেন। আশা করি, সাধারণের অর্থ আর মিথ্যা আড়ম্বরে ব্যয়িত হইবে না।

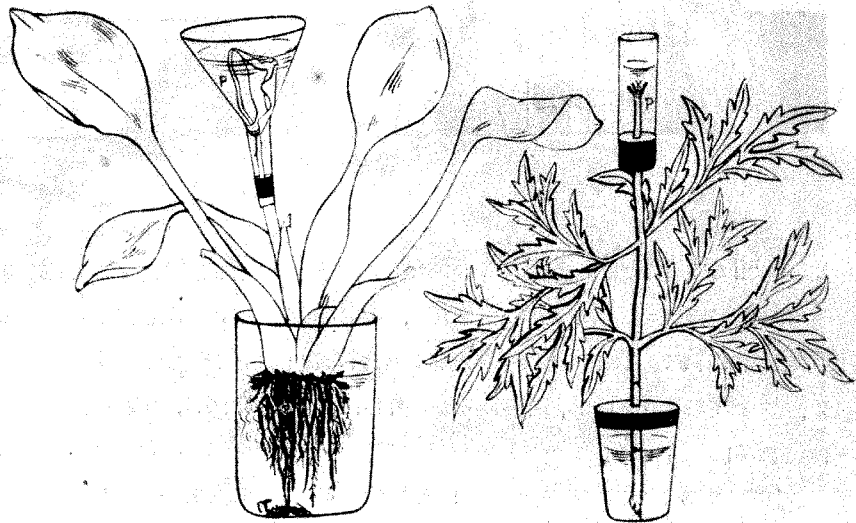
কি করিয়া পানা বিনাশের কাজ আরম্ভ করা উচিত, ইহা বোধ হয় অনেকে জানিতে চাহেন। আমার এ সম্বন্ধে এই মত যে কচুরী পানা জল হইতে সংগ্রহ

একটি স্থান একবারে পানা-বর্জিত করিতে হইবে। নচেৎ কাছাকাছি জায়গা হইতে পানা আসিয়া পরিতৃপ্ত স্থান আবার আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। কচুরী পানা যে কি সর্বনাশ করিতেছে কৃষিজীবীরা তাহা বুঝিয়াছেন এবং ইহা বুঝিয়া যাহাতে সকলে বাধ্য হইয়া একত্র পানা-নাশের চেষ্টা করিতে পারেন, তাহার জ্ঞাত আইন জারির প্রার্থনা করিতেছেন। আইন মাজেই কঠিন ও নির্মম। কিন্তু যাহাতে আইনের অপব্যবহার না হয়, তাহার জ্ঞাত যে সতর্কতা অবলম্বন একেবারে অসম্ভব, তাহা বলিতে পারি না। প্রথম কয়েক বৎসর ইহা আমাদের শিক্ষাদানের কাজ করিবে। সকলে একত্র থাটিয়া পরস্পরের উপকার করিবার পথ মুক্ত করিতেছি, এই ভাবটি মনে বদ্ধ করাকে শিক্ষাই বলিতে হয়। এই শিক্ষাতেই রাষ্ট্রীয় কার্যভার গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করা যায়। যাহা হউক, রাজা ও প্রজার সমবেত চেষ্টাতেই ভবিষ্যতে উৎপাতের শান্তি হইবে।

বঙ্গ বিজ্ঞান মন্দিরে অনেক গুরুতর গবেষণা চলিতেছিল। সেই কার্য বন্ধ রাখিয়া আমরা কচুরী পানা সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত হইয়াছিলাম। এখন আমরা আমাদের নির্দিষ্ট কার্যে যোগ দিব। কচুরী পানা সম্বন্ধে গবেষণা আজও শেষ হয় নাই, শেষ করিতে হইলে কয়েকজন ব্যক্তিকে এই কার্যে নিযুক্ত করিতে হইবে।

তঁাহাদিগকে এই উদ্ভিদের জীবনের খুঁটিনাটি সকল ব্যাপারের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইবে এবং তাহারা কি প্রকারে বংশবিস্তার করে তাহা আরও ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাহার পরে দেখিতে হইবে, কচুরী পানাগুলিকে জল হইতে উঠাইয়া আমাদের কোন লাভজনক কার্যে ব্যবহার করিতে পারা যায়

কি না। এই প্রকারে (৬) কচুরী পানা ও চল্লমল্লিকা গাছের উপর হইতে বিবপ্রয়োগের ফল।—নীচের অংশে বিবের ক্রিয়া হয় না



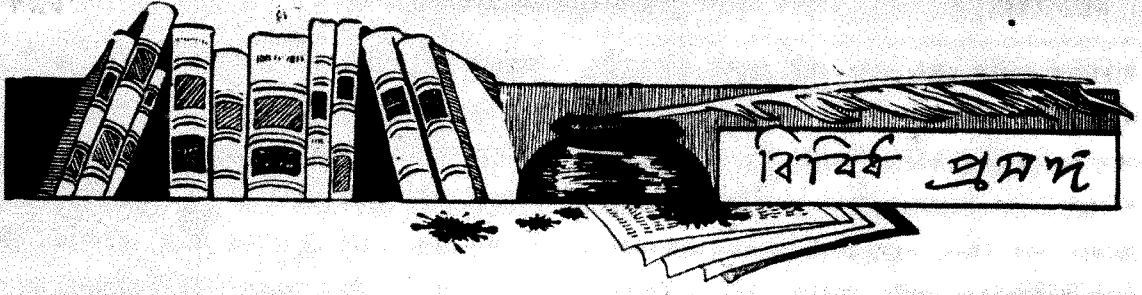
ব্যবহার করা সম্ভবপর হইতে পারে; তাহা হইলে পানা তুলিবার খরচা উহাতে আদায় হইয়া যাইবে। যাহারা এই-সকল অনুসন্ধানের কার্যে নিযুক্ত হইবেন, তঁাহাদের সত্যিই সে সম্বন্ধে যোগ্যতা আছে কি না, তাহা সৰ্বাগ্রে দেখার প্রয়োজন হইবে। এই ব্যাপারে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কেবল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকেই প্রাধান্য দিলে চলিবে না, সুবিবেচনা করিয়া হাতে-কলমে কাজ করিবার দক্ষতা ইহাদের থাকা চাই। তাহা ছাড়া যাহাতে নির্দিষ্ট সময়ান্ত্রে তঁাহাদের গবেষণার কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হয়, তাহার ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে। জনসাধারণ ও বিশেষজ্ঞেরা ইহাতে তঁাহাদের কার্য কোন পথে চলিতেছে জানিতে পারিবেন এবং কার্যের সমালোচনা করিবারও সুযোগ পাইবেন। সম্প্রতি একজন সহকারী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি কল্লনা করিয়াছেন, কচুরী পানাকে কাগজ প্রস্তুতের মূখ্য উপাদান স্বরূপে নাকি ব্যবহার করিতে পারা যায়। যে-কোন উদ্ভিজ্জ বস্তুকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কাগজ প্রস্তুতের উপাদান করিয়া তোলা কঠিন নয়। এই প্রক্রিয়ার খরচা উঠাইয়া সেই উপাদানে এখনকার মত সস্তায় কাগজ বিক্রয় করা সম্ভব হইবে কি না, ইহা সৰ্বাগ্রে দেখা কর্তব্য। তাহা না করিয়া সাধারণের চক্ষে ধুলি দেওয়া হয়। কিছুদিন পূর্বে আর-একটি জনরব শুনিয়াছিলাম, কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি নাকি

আর কতগুলি উদ্ভিজ্জ সামগ্রীকে লাভজনক কার্যে ব্যবহার করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। আজকাল আর তাহার কথা শুনিতে পাই না।

যাহা হউক, কচুরী পানা আমাদের যে বিপদের সম্মুখীন করিয়াছে তাহা সামান্য নয়। বোর বিপদের সময়েই লোকে একত্র হয় এবং একত্র হইয়া বিপদ-নিবারণের চেষ্টা করে এবং বিপদই যে মনুষ্যকে জাগাইয়া তুলিয়া কাজে লাগায় তাহার আভাস তখন তাহারা প্রত্যক্ষ করে। এই মনুষ্যই বিপদের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাকে খর্ব করে এবং শেষে জয়ী হয়। অতীত যুগে এই মানুষই বহু বাধাবিঘ্ন জয় করিয়া এই পৃথিবীকে শ্রামল শস্যক্ষেত্রে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল এবং তাহাতে সোনার ফসল ফলাইয়াছিল। আজ আবার সেই মানুষকেই আলস্ত ত্যাগ করিয়া কণ্ঠপটু ও মিতব্যয়ী হইয়া এবং পরস্পরের সহিত মিলিয়া যাহা সমস্ত মানবের অকল্যাণ তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। তাহাতে অকল্যাণ দূর হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইবার বল সঞ্চিত হইবে।

[আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'র বক্তৃতা অবলম্বনে লিখিত।]

শ্রী জগদানন্দ রায়



শক্তির সাধনায় ত্যাগ ও গ্রহণ

আমরা সকলেই শক্তি চাই; দৈহিক, মানসিক, হার্দিক, আধ্যাত্মিক, সর্ববিধ শক্তিই মানুষের আকাঙ্ক্ষার বস্তু; যদিও ইহাও সত্য যে, সকল মানুষ সকল রকম শক্তি চায় না।

দৈহিক শক্তির প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট। ইহা ব্যতিরেকে কোন কাজই সুসম্পন্ন হয় না। ভীমের মত শারীরিক বল না থাকিলেও পার্শ্বিক নানা কাণ্ড সম্পন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণ রকমের কিছু দৈহিক শক্তি না থাকিলে কোন কাজ সুসম্পন্ন হয় না। যাহার বসিয়া থাকিবার ক্ষমতা নাই, দুর্বলতা বশত যাহাকে শুইয়া থাকিতে হয়, তাহার দ্বারা মৌখিক উপদেশ দেওয়ার কাজও কতক্ষণ বা কতটুকু হইতে পারে?

কিন্তু গায়ে খুব জোর থাকিলেও, মনের হৃদয়ের আত্মার বল না থাকিলে, দেহের সে বলও পূরা কাজে লাগে না। একটা ক্লশকায় ইংরেজ বালক তাহার দ্বিগুণ লম্বাচোড়া, সুস্থবল, পরাধীন জাতির একটা মানুষকে আঘাত করিলেও সব স্থলে তৎক্ষণাৎ সমুচিত দণ্ড পায় না কেন? কারণ ঐ পরাধীন লোকটার মনের বল নাই, সাহস নাই। গায়ে জোর থাকিলেই সাহস জন্মে না। সার্কাসে যে-সব লোক ইঞ্জিত মাত্র সিংহ বাঘ হাতীকে নানা রকমের খেলা দেখাইতে বাধ্য করে, সেই-সব মানুষের দৈহিক বল ঐ পশুগুলির চেয়ে বেশী নহে। তাহার উহাদের উপর মানসিক প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছে বলিয়া, তাহাদের দ্বারা ইচ্ছামত কাজ করাইয়া লয়। অতএব মানসিক আত্মকর্তৃত্ব, আত্মিক বল, কিসে জন্মে, তাহা স্থির করিয়া তাহার জগৎ সাধনা করিতে হইবে।

এক-একজন মানুষের, বিশেষ বিশেষ মানুষের, কথা

ছাড়িয়া দিয়া, এক-একটি জাতির বিষয় বিবেচনা করাই ভাল। অল্পসংখ্যক ক্ষীণদেহ দুর্বল মানুষের নাম করা যাইতে পারে, যাহারা খুব সাহসী বা খুব কশ্মিষ্ঠ। কিন্তু ক্ষীণকায়, অসুস্থ, দুর্বল একটি জাতিরও নাম কেহ করিতে পারিবেন না, যাহারা সাহসী ও কশ্মিষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনেকে মনে করেন, কোন জাতির দৈহিক স্বাস্থ্য এবং বল না থাকিলেও তাহার মানসিক, হার্দিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা ভুল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের এই বাঙালী জাতিকেই ধরুন না। কোন বাঙালীর গায়ের জোর, মনের জোর, সাহস, কশ্মিষ্ঠতা, হৃদয়ের বল, আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য নাই, ইহা সত্য নহে; কিন্তু ইহাও আমরা জানি, যে, আমরা জাতি হিসাবে, বলবান, সাহসী, হৃদয়বান ও কশ্মিষ্ঠ জাতিদের মধ্যে পরিগণিত হই না। আমাদের হৃদয়বত্তার অভাব গম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন। কিন্তু তাহারা একটু অনুসন্ধান ও চিন্তা করিলেই সত্য উপস্থিতি করিতে পারিবেন। বন্ধে অজ্ঞতা, দুঃখদারিদ্র্য, পশু শিশু দুর্বল মানুষ ও নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার, পানদোষ ও নানাবিধ পাপাচার—এ-সকলের অভাব নাই; এ-সব খুব আছে। কিন্তু এই-সকলের প্রতিভার, নিবারণ বা উচ্ছেদসাধনের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে আমাদের অর্থাৎ বাঙালীর দ্বারা বাঙালীর টাকায় ও চেষ্টায় বাঙালীর দ্বারা আরও কত কাজ হইয়াছে বা হইতেছে? বন্ধের লোকসংখ্যা মোটামুটি ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়ারল্যান্ডের সমান। কিন্তু বিলাতে লোকহিতকর যত প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠান আছে, আমাদের তাহার শতাংশের এক অংশও নাই। অনেকে বলিতে পারেন, আমাদের দারিদ্র্য ইহার কারণ। কিন্তু, আমরা উর্বর ও প্রাকৃতিক নানাবিধ সুবিধা ও সম্পত্তি সম্পন্ন দেশে

থাকিয়াও গরীব কেন, এবং সেই দেশেই ইউরোপীয়, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, বিন্দিওয়ালা প্রভৃতিরা ধনী কেন, তাহার বিচার না করিয়া, জিজ্ঞাসা করি, আমাদের ধনের পরিমাণ যাহা তাহারই মত লোকহিতকর সংকাজ আমরা করি কি? স্যার রবার্ট গিফেনের এক বৎসরের (১৯০৩ সালের) একটা অনুমান অনুসারে বিলাতের বার্ষিক আয় ছিল একশত পঁচাত্তর কোটি পাউণ্ড এবং ভারতবর্ষের ছিল ষাট কোটি পাউণ্ড। বঙ্গের লোকসংখ্যা ভারতের লোকসংখ্যার এক-সপ্তমাংশ। বঙ্গের আয় কম করিয়া ধরিয়া ভারতবর্ষের দশমাংশ মনে করিলে ছয় কোটি পাউণ্ড হয়। উহা বিলাতের আয়ের ঊনত্রিশ ভাগের এক ভাগ। সুতরাং আমরা যদি বিলাতের লোকদের সমান লোকহিতব্রত হই, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেক ২৯টি লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠান ও প্রচেষ্টার জায়গায় আমাদের একটি থাকা উচিত। কিন্তু তাহা নাই। তাহাদের প্রতি একশতটিতে একটিও আমাদের নাই। লংঘ্যান্ কোম্পানীর প্রকাশিত শুধু লণ্ডনেরই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের তালিকার একটি পুস্তক আছে। ইহা আমরা ভুলিয়া যাই নাই, যে, মানুষ লোকহিতকর কার্যে টাকা দেয় আয়ের উদ্ধৃত্ত হইতে, এবং উদ্ধৃত্ত অর্থ ধনী জাতির ধারণা থাকে, গরীব জাতির সেরূপ থাকে না। কিন্তু আমাদের দেশের ধনীরাও তাহাদের সমান ধনী পাশ্চাত্য লোকদের সমান দান লোকহিতকর কার্যে করেন না। বিলাতের সঙ্গে তুলনা না করিয়া দেখিতে পাই, আমাদের দেশেই বিদেশীদের চালিত ও প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাদের অর্থে পুষ্ট যত লোকহিতকর কাজ আছে, আমাদের তাহা নাই। সাহিত্যিকতা, আধ্যাত্মিকতা, হৃদয়বন্তা, সাহিত্যিক জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন, মন, মুখের কথাই হয় না; কাজে তাহার পরিচয় ও প্রমাণ থাকা চাই।

অনেকের ধারণা আছে, যে, বাঙালীর মত বুদ্ধিমান জাতি, অন্ততঃ পক্ষে বাঙালী অপেক্ষা বুদ্ধিমান জাতি, জগতে আর একটিও নাই। ইহা সত্য, যে, আমরা বুদ্ধিহীন নহি। ইহাও সত্য, যে, আমাদের মধ্যে প্রতিভাশালী কয়েকজন লোক জন্মিয়াছেন। কিন্তু

সমুদয় বাঙালী জাতিকে, কিম্বা সমুদয় ভারতীয় জাতিকে বর্তমান সময়ে অধিতীয় বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী বা অপর সব সভ্য জাতিদের সমান বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী মনে করিবার কোন প্রমাণ পাইতেছি না। আমেরিকার একজন ভারতবন্ধু সাণ্ডার্স সাহেব এমন একখানি বহি লিখিতে বা লিখাইতে চান যাহাতে ভারতবর্ষের মৃত ও জীবিত ঐতিহাসিক (অর্থাৎ শুধু পুরাণে ও কাব্যে বর্ণিত নহে) এমন কুড়িজন মানুষের জীবনচরিত থাকিবে যাহারা জগৎসভার মধ্যে বরণ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন, অর্থাৎ যাহাদিগকে, শুধু ভারতবর্ষের নহে, জগতের মহৎ লোকদের মধ্যেও পরিগণিত করা যাইতে পারে। তিনি আমার নিকট এরূপ কুড়িজননের একটি তালিকা চাহিয়াছেন। এরূপ একটি তালিকা প্রস্তুত করা সহজ নহে। মনে রাখিতে হইবে, যে দেশে বনস্পতি নাই, সে দেশে ভেরেণ্ডা গাছও বৃক্ষ।

এখন ঠিক প্রাসঙ্গিক কথার মধ্যে আসা যাক। জাতির বুদ্ধিমত্তার ও প্রতিভার পরিচয় দুই দিকে পাওয়া যায়। এক সাংসারিক ধনদৌলত কৃষি শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যে, আর-এক জ্ঞানের ও রসস্থিতির রাজ্যে। বাংলাদেশে পুরুষানুক্রমে যাহাদের বাস, সেই বাঙালী আমরা গরীব, এবং ক্রমশঃ আরও গরীব হইয়া যাইতেছি; কিন্তু বাংলায় ভারতবর্ষের অগ্রাগ্র প্রদেশ হইতে ও বিদেশ হইতে যে কোন জাতির লোক আসিতেছে, সেই খাইতে পাইতেছে, ধনী হইতেছে, অনেকে লক্ষপতি কোরপতি হইতেছে, ইহা দ্বারা কি বাঙালীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে? বঙ্গে সকলের চেয়ে বড় বড় কলকারখানা পাটের, কিন্তু সে কলকারখানা বাঙালীর একটিও নাই। ইহাতে কি বাঙালীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে? বড় বড় কয়লার খনি ও কারবার, বড় বড় লোহা ইম্পাতের কলকারখানা, এসব কাহাদের? বাঙালীর নহে। বঙ্গের বৃহত্তম ছাপাখানা বাঙালীর নহে, সকলের চেয়ে ধনী সওদাগরেরা বাঙালী নহে। অতএব সাংসারিক হিসাবে বাঙালীকে বুদ্ধিমান বলা যায় না।

বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস সাহিত্য এবং সুকুমারশিল্পের ক্ষেত্রে প্রতিভাশালী বাঙালী আছেন, স্বীকার করি।

কিন্তু “সবে ধন নীলমণি”র মত জন-কয়েকের নাম খোড়বড়িখাড়া ও খাড়াবড়িখোড়ের মত বার বার আফালনপূর্বক উচ্চারণ করিয়া আমরা যেন মনে না করি, যে, আমরা জগতের কোনো শ্রেষ্ঠ জাতির সমান হইয়াছি। আগে বলিয়াছি, বঙ্গের লোকসংখ্যা মোটামুটি বিলাতের সমান। আচ্ছা, বিলাতের জীবিত ও মৃত বৈজ্ঞানিক গবেষক, আবিষ্কর্তা ও যন্ত্র-উদ্ভাবকদের নামের একটা ফর্দ প্রস্তুত করুন। জীবিত ও মৃত বাঙালী বৈজ্ঞানিক গবেষক আবিষ্কর্তা ও যন্ত্র-উদ্ভাবকদেরও একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। দেখিতে পাইবেন, আমাদের মানসিক দারিদ্র্য কত বেশী। আমরা কেবল নামের গুস্তিই করিতে বলিতেছি। খুব বড় বৈজ্ঞানিক কোথায় কয়জন জন্মিয়াছেন, তাহার বিচার করিতে বলিতেছি না। কোন কোন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রের ও পুস্তক ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপনের ভাষার অনুকরণ করিয়া আমাদের জনকয়েক মনস্কীর অতিশয়োক্তিপূর্ণ প্রশংসা করা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়।

দর্শনের ক্ষেত্রে, ইতিহাসের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, স্ক্রুমারশিল্পের ক্ষেত্রে, এইরূপ তালিকা প্রস্তুত করিলে দেখিতে পাইবেন, আমাদের মানসিক দারিদ্র্য কত বেশী। আরও একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, যে, ইউরোপ আমেরিকা ও জাপানের মনীষীরা বিদেশের দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়া তাহাতে নূতন কিছু করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু সেরূপ করিবার মত মানসিক সাহস প্রতিভা পাণ্ডিত্য আমাদের জাতির ত নাই-ই, ভারতবর্ষ-স্বক্ষীয় জ্ঞানরাজ্যের নানা বিভাগেও সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষক ও লেখক অল্পহলেই ভারতবর্ষবংশীয়। ইউরোপের যে-সকল দেশের লোকসংখ্যা বঙ্গের চেয়ে কম, তাহাদের সহিতও আমাদের তুলনা এইপ্রকারে করা যাইতে পারে। আধুনিক জাপানের বয়স আধুনিক বঙ্গের বয়স অপেক্ষা কম। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ও জ্ঞানরাজ্যে জাপানীরা ইতিমধ্যেই বাঙালী অপেক্ষা কশিষ্ঠতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছে।

এইরূপ নানা কারণে, আমাদের ধারণা এই, যে, বাঙালীর অহঙ্কার করিবার বিন্দুমাত্রও কারণ নাই,

লজ্জিত হইবার কারণ যথেষ্ট আছে। লজ্জিত হইবার কারণগুলি ক্রমে ক্রমে নষ্ট করিতে পারিলে তবে আমরা একটু সোজা হইয়া ঠাঁড়াইতে পারিব। গৌরব বোধ করিবার সময় পরে আসিতে পারে। কোন অবস্থাতেই কাহারও অহঙ্কার হওয়া উচিত নয়; আমাদেরও কখনও উচিত হইবে না।

অবস্থা ত এইরূপ। প্রতিকার কি? সে বিষয়ে ব্যবস্থা প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। একেবারে অশ্রুতপূর্ব রকমের নূতন কিছু এবিষয়ে আমরা বলিতে অসমর্থ। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী, প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া জীবনযাপন করিবার নিয়মাবলী, গায়ে জোর যাহাতে হয় এরূপ খাওয়া ক্রীড়া ও ব্যায়ামের ব্যবস্থা—এসব আমরা বাল্যকাল হইতেই পড়িয়া ও শুনিয়া আসিতেছি। তাহার অনুসরণ না-করাতেই ত যত কুফল হয়। উপদেশ ও ব্যবস্থা পুরাতন হইলেই অকেজো হয় না। সত্য কথা বলিতে উপদেশ কত হাজার বা লক্ষ বৎসর পূর্বে কে কোথায় প্রথম দিয়াছিলেন, কেহ জানে না; কিন্তু সে উপদেশের প্রয়োজন এখনও রহিয়াছে। স্বস্থ থাকিবার ও গায়ে জোর করিবার প্রয়োজন এখনও আছে, চিরকাল থাকিবে। তাহার জ্ঞান যাহা করা ও যাহা না-করা উচিত, তাহার জ্ঞান অনেকের আছে, অনেকেরই নাই। যাহা জানা আছে, তদনুসারে কাজ করিলে সুফল অনিবার্য।

মানসিক শক্তি লাভ ও বুদ্ধিও অনুশীলনসাপেক্ষ। সভ্যদেশসমূহে শিক্ষাদান-প্রণালী সম্বন্ধে বহু গবেষণা হইতেছে। তাহার সাহায্যে অল্পবুদ্ধি বালকবালিকাদেরও উন্নতি হইতেছে। সে-সকলের খবর আমরা রাধি না। রাখা উচিত।

অনেকের ধারণা এই, যে, সব সাহসী মানুষ জন্মাবধি সাহসী, এবং যে শৈশবে বা বাল্যে ভীৰু ছিল, পরে সে সাহসী হইতে পারে না। ইহা ভুল। মহাবীর গর্ভনু বলিয়াছেন, “যদি কেহ বলে যে সে জীবনে কখনও ভয় পায় নাই, তাহা হইলে সে সত্য কথা বলে না। আমি প্রথম যখন যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দুক ছুঁড়ি, তখন চোখ বুজিয়া ছুঁড়িয়া ছিলাম।” চেষ্টার দ্বারা মানুষের সাহসও বাড়ে। কোন

প্রকার দুঃখকষ্টই মানুষের সহিবার শক্তি অপেক্ষা বেশী নহে; বেশী হইলে মানুষ অজ্ঞান হইয়া যায়, ও তখন কোন কষ্ট থাকে না। মৃত্যুকেই লোকে সর্বাপেক্ষা বেশী ভয় করে, কিন্তু কোন-না-কোন সময়ে মৃত্যু ত হইবেই, এবং যে-কোন মুহূর্ত্তে আমাদের মৃত্যু হইতে পারে। সুতরাং মৃত্যুভয়ে মনুষ্যোচিত আচরণ ও কাজ হইতে বিরত থাকা শুধু কাপুরুষতা নয়, বুদ্ধিহীনতাও বটে। অদৃষ্টবাদী তুর্কদের একটি প্রবাদ-বাক্য আছে, যে, “ছুটি দিনে তোমার মৃত্যু হইতে পলায়ন অনাবশ্যক—যে-দিন তোমার মৃত্যু হইবে বলিয়া বিধাতাকর্তৃক নির্দিষ্ট আছে, সেই দিন, এবং যে-দিন নির্দিষ্ট নাই, সেই দিন” (এমাসনের ভাষায় “The appointed and the unappointed day”)। আমরা অদৃষ্টবাদী হই বা না-হই, তুর্কদের এই কথাটা বুঝা খুব সহজ। যে-দিন তোমার মৃত্যু বিধিনির্দিষ্ট, সেদিন তুমি পলাইলেও মরিবে; যে-দিন তোমার মরিবার কথা নয়, সেদিন তোমার উপর চারিদিক হইতে গুলিগোলাবৃষ্টি হইলেও তুমি বাঁচিয়া যাইবে; অতএব কোন অবস্থাতেই কোন দিনও মানুষের ভীক হওয়া উচিত নয়। ইতিহাসে ও বহু জীবনচরিতে ইহা দেখাও যায়, যে, খুব বিপদ হইতেও মানুষ বাঁচিয়া যায়, আবার যখন কোন বিপদের আশঙ্কা কেহ করে নাই, তখনও অনেকে হঠাৎ মারা যায়।

প্রকৃতির নিয়ম-লঙ্ঘনে, পাপাচরণে, ব্যাসনে, বিলাসিতায়, প্রয়োজনান্তিরিক্ত ভোগে অর্থাৎ ভোগের অনাচারে, দৈহিক শক্তি যেমন কমে, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিও তেমন কমে। অনেক দুর্বৃত্ত দৈহিকবলশালী এবং অনেক কুচরিত্র বুদ্ধিমান, প্রতিভাশালী বা বিদ্বান লোকদের নাম করিয়া কেহ কেহ এ বিষয়ে তর্ক উপস্থিত করিতে পারেন। কিন্তু সে তর্কের কোন মূল্য নাই। মানুষ উত্তরাধিকার-স্বত্রে এবং সামাজিক ও নৈসর্গিক পরিবেষ্টন অনুসারে যে-সব দৈহিক ও মানসিক গুণ ও শক্তির উত্তরাধিকারী হয়, সকল মানুষের তাহা সমান নহে। অনেকে জন্ম হইতে যাহা পায়, অনাচার অত্যাচার সম্বন্ধে তাহার যতটা অবশিষ্ট থাকে, তাহা সদাচারী

অনেকের চেয়ে, তাহাদের উত্তরাধিকারলব্ধ জন্মগত পুঁজি কম বলিয়া, বেশী। তদ্বিত্ত দুর্বৃত্ততারও প্রকার-ভেদ আছে। যদি কোন দস্যু, বা মিথ্যাবাদী, বা প্রবঞ্চক, দৈহিক স্বাস্থ্যের নিয়ম ভঙ্গ না করে, তাহা হইলে তাহার গায়ের জোর কমিবার কারণ নাই। যে স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান সে প্রবঞ্চক হইলেও তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা কমিবে না।

শরীরের কল্যাণের জন্ত পাপাচরণ, ব্যাসন, বিলাসিতা, ভোগের আতিশয্য, ত্যাগ করা প্রয়োজন? “ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবস্মৈ ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥” “কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার কখনও নিবৃত্তি হয় না, প্রভূত স্মৃতপ্রাপ্ত অগ্নির দ্বারা তাহা আরও বাড়িতেই থাকে।” কিন্তু ভোগ মাত্রেই অনিষ্টকর ও পরিত্যাজ্য নহে। গীতার উপদেশ অনুসারে মানুষকে “মুক্তাহারবিহার” হইতে হইবে। কোন মানুষকে কোন অবস্থাতেই কুচ্ছ সাধন করিতে হইবে না, বা কোন অবস্থাতেই তাহার উপবাসাদির প্রয়োজন নাই, এমন নহে। বুদ্ধ, জ্ঞানী, প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবনে কঠোর কুচ্ছ সাধন ও দীর্ঘকালব্যাপী উপবাসের বৃত্তান্ত দেখা যায়। কিন্তু ইহাও দেখা যায়, যে, তাহারা সারাজীবন এই ভাবে যাপন করেন নাই। এক দিকে যেমন বিলাস-ব্যাসন তাহারা ত্যাগ করিয়াছিলেন, অন্যদিকে আবার তেমন শরীর-ধারণের জন্ত ও সুস্থ সবল থাকিয়া কাজ করিবার জন্ত অল্প মানুষদের মত পানাহারও করিয়াছিলেন। বিশেষ বিশেষ মানুষের বিশেষ বিশেষ অবস্থার জন্ত উপযোগী ব্যবস্থা যাহাই হউক, এক-একটি জাতির জন্ত পূর্বোক্ত শ্লোকটি যেমন সদুপদেশ, নিম্নোক্ত শ্লোকগুলিও তেমন সদুপদেশ :—

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিরস্তমসেবয়া।

বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ॥

জ্ঞানের আদেশে যথাযোগ্য ব্যবহার দ্বারা বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়-সকলকে নিত্য বশে যেমন রাখা যায়, নিত্যন্ত ভোগ পরিত্যাগ দ্বারা সেরূপ পারা যায় না।

বশে কুৎসিদ্ভিঃপ্রাণং সংযম্য চ মনস্তথা।

সর্বান সংসাধয়েদধীনক্ষিপ্তং যোগতত্তত্ত্বম্।

যাহাতে শরীর ক্ষীণ না হয়, এমত উপায় দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়-সকলকে বশীভূত করিয়া সর্বার্থ সাধন করিবে।

যুদ্ধের সময় মানুষকে খুব দৃঢ় খুব কঠোর হওয়া চাই; কিন্তু যাহারা সেকালের ও একালের যুদ্ধ-সম্ভারের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন, অভিযানের সময়েও যোদ্ধাদের আরামের ও আমোদ-আহ্লাদের এবং পড়াশুনা করিবার কিরূপ বিস্তৃত আয়োজন করা হয়। মানব-দেহ ও মানব-প্রকৃতি জটিল। উহাদের প্রত্যেক অংশের পুষ্টি ও কার্যক্ষম অবস্থা অল্প সব অংশের পুষ্টি ও কার্যক্ষম অবস্থার উপর কি ভাবে ও কি পরিমাণে নির্ভর করে, তাহা না জানিয়া ও না ভাবিয়া কোন প্রকার ত্যাগমাত্রমূলক ব্যবস্থা করা সমীচীন নহে। মন্দ যাহা তাহা অবশ্যই ত্যাগ্য, কিন্তু গ্রহণীয় ও ভোগ্য যাহা তাহা যথাকালে ও যথানিয়মে ভোগ্য ও গ্রহণীয়। ঐকান্তিক ত্যাগ, সন্ন্যাস ও কৃচ্ছ্রসাধনের আদর্শের আকর্ষণ আছে, উহা যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা অনুসৃত হইলে কার্যকরও হয়; কিন্তু উহা কোন জাতির বা মানবসমষ্টির আদর্শ হইতে পারে না। যুক্তাহারবিহার ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ অনুসরণ করা সন্ন্যাসীর আদর্শ অনুসরণ করা অপেক্ষা কঠিন। এই কঠিনতর আদর্শই মানবসমষ্টির আদর্শ।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাদের ষতটুকু জ্ঞান আছে, তাহাতে ভারতবর্ষ কোন দেশের কোন বিজ্ঞা জ্ঞান শিল্প সভ্যতাকে প্রত্যাখ্যান কখন করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ভারতবর্ষের প্রভাব অল্প অনেক জাতির উপর পড়িয়াছিল, অল্প অনেক জাতির প্রভাব ভারতবর্ষের উপর পড়িয়াছিল; এইরূপে ভারতবর্ষ বড় হইয়াছিল। অতএব স্বদেশ ও বিদেশের মন্দ যাহা তাহা ত্যাগ করিব বা লইব না, ভাল যাহা তাহা সংরক্ষণ করিব ও লইব,—এই সোজা কথাই প্রকৃত আদর্শের সূচনা করে বলিয়া মনে করি। ভারতবর্ষের জ্ঞান সভ্যতা ও আদর্শ ছাড়া আর কিছু গ্রহণীয় নহে, কিম্বা তাহার মধ্যে পরিবর্তনীয় ও বর্জনীয় কিছু নাই, ইহা ঠিক কথা নহে। ভারতবর্ষীয় সভ্যতার সংজ্ঞানির্দেশও বড় সোজা নয়। ভারতবর্ষের ইসলামিক

সভ্যতা শিল্প সাহিত্য জীবনযাপনরীতি বিদেশ হইতে আসত, যদিও এদেশে তাহার পরিবর্তনও হইয়াছে। ইহাকে কেহ বাদ দিতে চান কিম্বা পারেন কি? তেমনি, অধুনা বিদেশ হইতে ভাল কিছু আসিলে ও পাইলে তাহাকে কেন বাদ দিব, কেন বর্জন করিব? মনের ও আত্মার কপাট বন্ধ রাখিব কেন? মনের ভয়ে বন্ধ রাখিলে ভালও ত আসিবে না।

বিলাতে বাঙালী এঞ্জিনীয়ার

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দে বিলাতে স্বাধীনভাবে পরামর্শদাতা (consulting) এঞ্জিনীয়ারের কাজ করেন। তিনি বৈদ্যুতিক (electrical), যান্ত্রিক (mechanical) এবং সিভিল, তিন প্রকার এঞ্জিনীয়ারিং কায়েই বিশেষ পারদর্শী। মিঃ জে আবু সার্জ্যান্টসন্ কর্তৃক সম্পাদিত ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইণ্ডিয়া নামক উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রের আগষ্ট সংখ্যায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, ছবি, এবং তাঁহার কৃতিত্বের একটি নিদর্শনের বিস্তারিত বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে। আমরা যে ছবি দিলাম, তাহা ঐ ছবির প্রতিলিপি। বীরেন্দ্রনাথের বয়স এখন ত্রিশ বৎসর। তিনি কলিকাতা ও গ্রাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি বিলাতে যে-যে কাজ করিয়াছেন, তাহার কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। গ্রাসগো ও সাউথ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের এসিস্টেন্ট এঞ্জিনীয়ার, ওয়েস্ট হার্টল্‌পুল টেকনিক্যাল কলেজের শিক্ষাদাতা, পীটার লিও ওন্ কোম্পানীর ও ওয়ের শিপ্‌বিল্ডিং কোম্পানীর প্রধান এঞ্জিনীয়ার, ওয়েস্ট-মিন্‌স্টারের অনেকগুলি কোম্পানীর নির্মাণকার্যে পরামর্শদাতা বিশেষজ্ঞ। তিনি এক্ষণে ইণ্টারন্যাশনাল এঞ্জিনীয়ার্স্‌ নীওকেট এবং ইকনমিক্‌ ট্রাক্‌চস্‌ কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর। বিলাতে তিনি নানা এঞ্জিনীয়ারিং কারখানার নকসা প্রস্তুত করিয়া তাহা নির্মাণ করিয়াছেন, এবং তদ্বিপর্যায় গ্যাস, জল, ও বাষ্প সরবরাহের কারখানা এবং ড্রেন্‌ নির্মাণে বহুস্থানে পরামর্শদাতার কাজ করিয়াছেন। তিনি এঞ্জিনীয়ারিং সম্বন্ধে অনেক



শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দে

প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এফগে "Modern Municipal Engineering Practice" নামক একখানি বৃহৎ চারি ভল্যুমে সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত আছেন। যুদ্ধের সময় তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের জন্ত অনেকগুলি ফেরো-কংক্রিটের জাহাজ, বজ্রা ও পণ্টনের নকসা প্রস্তুত করেন ও তদনুসারে তাহা নির্মিত হয়; তদ্বিন্ন তিনি রণতরী বিভাগের ও অন্যান্য অনেক সরকারী কন্ট্রাক্টের কার্য নির্বাহ করেন।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইণ্ডিয়াতে তাঁহার যে বৃহৎ কাজটির বিস্তারিত সচিব বৃত্তান্ত ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে, তাহা গ্যাম্গো শহরের মিউনিসিপ্যালিটির স্ববৃহৎ গ্যাস সরবরাহের কারখানা। এই শহরের লোকসংখ্যা এগার লক্ষের উপর। ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে উহার মিউনিসিপালিটি গ্যাসের বন্দোবস্ত করাইবার নিমিত্ত যে-সব এঞ্জিনিয়ারের নিকট হইতে নকসা ও আনুমানিক ব্যয়ের

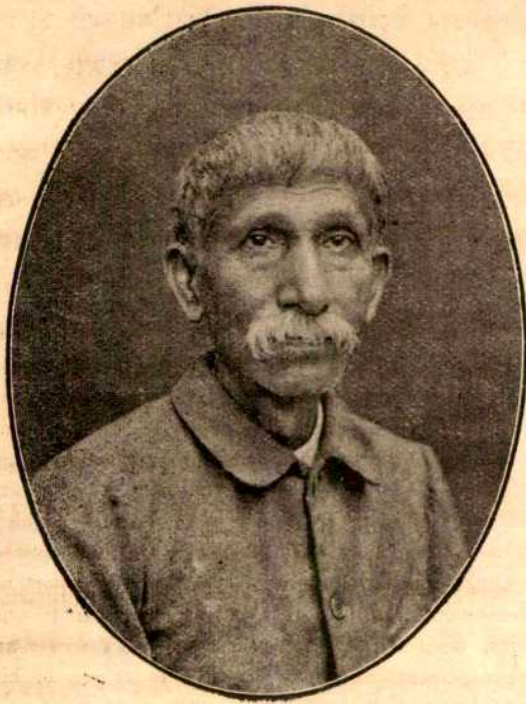
তালিকা চান, বীরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার নকসা প্রভৃতি সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, এবং তদনুসারে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই গ্যাসের কারখানার মোট ব্যয় প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা হইবে। ইহার মধ্যে নানাপ্রকারের কংক্রীট ও ইম্পাতের ইমারৎ, রেলওয়ে লাইন, ইত্যাদি আছে।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইণ্ডিয়ার সম্পাদক বলেন :—

"It may be said that Mr. Dey is the first Indian Consulting Engineer who has achieved a success of this sort in Great Britain, and his record confirms our contention that the purely Indian Engineer has a chance of achieving the highest position in his profession if he will only give his utmost courage, ability and industry to winning the laurels which await him.....we would like to take this opportunity of congratulating him upon his most important achievement, and, what is even more dear to our hearts, we would like to record his success as an encouragement and an incentive to others of his nationality to follow in his footsteps. It is always relatively easy for others to follow where a pioneer has led, and Mr. Dey's success in securing and carrying through such an important undertaking as the extension of the Glasgow Gas Works is truly an encouraging and inspiring achievement."

পরলোকগত মতিলাল ঘোষ

ভারতবর্ষের প্রবীণতম সংবাদপত্র-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় ৭৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি স্বস্থসবল মানুষ ছিলেন না, অথচ দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন, এবং মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত কর্মিষ্ঠ ছিলেন। মৃত্যুশয্যাতে যখন তিনি শয়ান, তখনও তাঁহার বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির হ্রাস লক্ষিত হয় নাই। ইহা হইতে মনে হয়, যে, দীর্ঘ কর্মিষ্ঠ জীবনের নিগূঢ় রহস্য এখনও আবিস্কৃত হয় নাই। ঘোষ মহাশয়ের জীবন হইতে অল্প অল্প ও ক্রমশঃ ব্যক্তির উৎসাহিত হইতে পারেন। স্বদেশের কল্যাণার্থ পরিশ্রম করিলে ও তন্নিমিত্ত দীর্ঘজীবী হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে তাঁহাদেরও আয়ু দীর্ঘ হইতে পারে। ঘোষ মহাশয়ের দীর্ঘজীবনের



পরলোকগত মতিলাল ঘোষ

মূলে সম্ভবতঃ এইরূপ প্রতিজ্ঞা ছিল ; কেননা, তিনি মৃত্যুর কিছু পূর্বে দেশের বর্তমান সঙ্কট অবস্থায় কার্যক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইতে হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন ; বলিয়াছিলেন যে, আরো কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত দেশের কিস্তি সেবা করিতে পারিতেন।

মতিলাল ঘোষ ও তাঁহার ভ্রাতারা যশোর জেলার একটি ছোট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মাতা অমৃতময়ীর নাম অনুসারে উহার অমৃতবাজার নামকরণ হয়। প্রসিদ্ধ অমৃতবাজার পত্রিকা ঐ গ্রাম হইতেই বাংলা সাপ্তাহিক রূপে কিছুকাল প্রকাশিত হইয়াছিল।

ঘোষ ভ্রাতাদিগের মাতৃদেবীর উল্লেখ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতে দৃষ্ট হয়। তাঁহাদেরও উল্লেখ এই পুস্তকে আছে। তাহার দুই-একটি স্থান হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

“একবার রাত্রি দুইটার সময় উপেন সপরিবারে পলাইয়া কলিকাতা হইতে অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষের বাড়ীতে যান। তখন শিশিরবাবুরা অগ্রসর সংস্কারক ও ব্রাহ্ম ছিলেন।”

“তখন উন্নতিশীল ব্রাহ্মদের মধ্যে ‘আনন্দবাদী দল’ নামে একটি দল হইয়াছিল, অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ এই দলের নেতা বলিয়া গণ্য ছিলেন। ইহার একটু ইতিবৃত্ত আছে।...

কেশববাবুর দলের লোকদিগের যীশু-ঈশ্বরের প্রতি অতিরিক্ত ষোক হইয়া পড়ে।... ইহার ফলস্বরূপ দ্বুষ্টির ধর্মভাব যে অনুতাপ ও প্রার্থনা, তাহ উন্নতিশীলদলকে প্রবলরূপে অধিকার করে ; পাপবোধ নব্য ব্রাহ্মদের সকলের অন্তরে প্রবল হইয়া উঠে ; অনুতাপব্যঞ্জক সংগীতাদি রচিত হইতে থাকে।.....

“যখন একদিকে অনুতাপ, ব্যাকুলতা ও প্রার্থনার তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, তখন অপরদিকে ব্রাহ্মদের মধ্যে একদল লোক বলিতে লাগিলেন, ‘এত অনুতাপ ও ক্রন্দন কেন ? প্রেমময়ের গৃহে এত ক্রন্দনের রোল কেন ? আনন্দময়ের প্রেমমুখ দেখিয়া আনন্দিত হও।’ এই দলকে ব্রাহ্মেরা তখন ‘আনন্দবাদী দল’ বলিতেন। শিশিরবাবু ইহারে অগ্রণী ছিলেন। নরপুজার হাঙ্গামা দেখিয়া ইহারা আমাদের ভিতর হইতে সরিয়া পড়িলেন। ৮৬৯ সালের মাঘোৎসবে একজন মুন্সের হইতে সমাগত ব্রাহ্ম, উপাসনাস্থে—র চরণে ধরিয়া কি প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শিশিরবাবুর দাদা হেমসুন্দর বাবু রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।...

“ইহার পরে অমৃতবাজারের দলকে আর আমাদের উপাসনাতে বড় আসিতে দেখিতাম না। কলিকাতা পটলডাঙ্গা, পটুয়াটোলা লেনে যশোরের লোকদের এক বাসা ছিল। শিশিরবাবু সেখানে মধ্যে মধ্যে আসিতেন। তিনি আসিলেই আনন্দবাদী দলের সমাগম হইত। তাহার আমাকে ডাকিতেন, সে সময়ে প্রধানতঃ সংগীত ও সংকীর্তন হইত। শিশিরবাবু চমৎকার কীর্তন করিতে পারিতেন, তাহার কীর্তনে আমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিত।

“একদিকে যেমন অনুতাপ ও ক্রন্দন শুনিলাম, অপরদিকে ইহাদের কাছে গিয়া আনন্দ ও নৃত্য দেখিতাম, তখন ইহা বেশ লাগিত। শিশিরবাবুদের ভাইয়ে ভাইয়ে ভাব দেখিয়া মন মুগ্ধ হইয়া যাইত। ইহার পরেই তাঁহারা কলিকাতা হিদেলাম বাঁড়ুয়ার গলিতে আসিয়া বাসা করিয়া থাকেন। সে সময়ে তাহাদিগকে সর্বদা দেখিতাম। শিশিরবাবুর অমায়িকতা দেখিয়া আমার মন মুগ্ধ হইয়া যাইত। এক দিনের কথা স্মরণ আছে, তিনি সেদিন আমাকে আহ্বান করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আহ্বানের সময় উপস্থিত হইলে বলিলেন, ‘কি পল্পের মত বাহিরে বসে থাকে! চল, রান্নাঘরে গিয়ে মাকে বলি, হাঁড়ি হতে গরম গরম ভাত তরকারি মার হাতে না খেলে হৃৎ হয় না।’ এই বলিয়া ছুজনে গিয়া রান্নাঘরে আহ্বানে বসিলাম। বস্ত্রদূর স্মরণ হয়, তাঁর জননী গরম গরম ভাত তরকারি দিতে লাগিলেন, ও আমরা আহ্বান করিতে লাগিলাম। ইহার পর হইতে শিশিরবাবুরা অল্পে অল্পে ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে সরিয়া পড়িলেন।”

শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, “শিশিরবাবুদের ভাইয়ে ভাইয়ে ভাব দেখিয়া মন মুগ্ধ হইয়া যাইত।” বস্তুতঃ মতিলাল ঘোষ মহাশয় যেক্রূপ ভ্রাতৃগতপ্রাণ ছিলেন, তেমন প্রায় দেখা যায় না। আপনাকে পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রজ শিশিরকুমারের গুণকীর্তন করিতে তিনি বড়ই ভালবানিতেন।

অমৃতবাজার পত্রিকার ইতিহাস এবং মতিলাল ঘোষের জীবনচরিত অচ্ছেদ্যভাবে পরস্পর সম্বন্ধ, উভয়কে প্রায় এক বলিলেও চলে। অমৃতবাজার পত্রিকা প্রথমে

একখানি গ্রামা বাংলা সাপ্তাহিক ছিল। কাঠের প্রেসে ছাপা হইত। ঘোষ ভাইয়েরা নিজেরাই কম্পোজিটর ও মুদ্রাকর ছিলেন, নিজেরাই কালী প্রস্তুত করিতেন। তাঁহারা সাহসী, তেজীয়া ও গরীবের উপর অত্যাচার দমনে বন্ধপরিকর ছিলেন বলিয়া কর্তৃপক্ষের ক্রোধভাজন হন। সেকালে জেলে যাওয়ার ভয় বেশী ছিল; এখনকার মত দলে দলে ভ্রমসন্তানদের জেলে যাওয়ার দৃষ্টান্ত তখন দেখা যাইত না। সেই যুগেও ঘোষ ভ্রাতারা কারাদণ্ড-ভীতি অগ্রাহ্য করিয়া সাহসের সহিত অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লিখিতেন। ফলে তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা হয়। তাহাতে তাঁহারা বেকসুর খালাস পাইলেও সর্বস্বান্ত হন। অতঃপর তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া এখান হইতে তাঁহাদের কাগজ বাহির করিতে আরম্ভ করেন। দেশ-ভাষায় লিখিত অমৃতবাজার পত্রিকা প্রমুখ খবরের কাগজগুলিকে জব্দ করিবার জন্য যখন তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেস আইন হয়, তখন শিশির-বাবুরা কোন প্রকারে কিছু ইংরেজী হরফ সংগ্রহ করিয়া, তাঁহাদের কাগজখানিকে আইন পাস হইবার পরের সংখ্যা হইতেই ইংরেজীতে বাহির করিয়া গবর্ণমেন্টকে ব্যর্থকাম ও হতভম্ব করেন। ইহাতে তাঁহারা খুব তৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন।

কয়েক বৎসর হইল ভারতবর্ষে স্বাভাষিকতার উদ্বোধক ও প্রচারক অনেক খবরের কাগজ দেখা দিয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে অমৃতবাজার সকলের অগ্রণী। স্বাভাষিকতা প্রচারের জন্য অমৃতবাজার পত্রিকার মত ভারতবাসী খ্যাতি সেকালে কোন কাগজের ছিল না। এইজন্য শিশির-কুমার ঘোষ এবং পরে মতিলাল ঘোষকে দেখিবার ব্যগ্রতা বঙ্গের মফস্বলের ও বঙ্গের বাহিরোসব প্রদেশের লোকদের খুবই ছিল।

অমৃতবাজার পত্রিকার এই একটি বিশেষত্ব বরাবরই ছিল, এবং এখনও আছে, যে, কোথাও কোন রাজকর্মচারীর দ্বারা অত্যাচার হইলে, কোন বিচারবিভাগ ঘটিলে, এই কাগজে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও দোষ উদ্ঘাটন হইয়া থাকে। এই কারণে কয়েকবার অমৃতবাজারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হইয়াছে। গবর্ণমেন্টের কোন আইন

বা অন্তর্বিধ কাজের দ্বারা দেশের অনিষ্ট-সম্ভাবনা হইলে, অমৃতবাজার তাহার বিস্তারিত সমালোচনা করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া ইংরেজেরা মনে করেন, যে, গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধবাদিতা করাই অমৃতবাজারের ধর্ম। সে কথা ঠিক সত্য না হইলেও ইহা ঠিক যে গবর্ণমেন্টকে খুসি করা অমৃতবাজারের উদ্দেশ্য নহে, কখনও ছিল না।

দেশী রাজাদের উপর রেসিডেন্ট প্রভৃতির অত্যাচার জুলুম জবরদস্তি নিবারণের জন্য অমৃতবাজার যাহা করিয়াছেন, তাহাও ঘোষ ভ্রাতাদের একটি কীর্তি।

বস্তুতঃ রাজনীতি-ক্ষেত্রে এবং ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ও রোগজীর্ণ অবস্থার প্রতিকার বিষয়ে অমৃতবাজারের চেষ্টা প্রশংসার যোগ্য ও চিরস্মরণীয়।

আমরা পুনঃ পুনঃ অমৃতবাজারেরই উল্লেখ করিতেছি যে জন্য তাহা পূর্বেই বলিয়াছি—মতি-বাবুর ও কাগজ-খানির জীবন প্রায় অভিন্ন। প্রবীণ ও বিচক্ষণ সম্পাদকেরা কেবলমাত্র কাগজ চালাইলেও নেতৃস্থানীয় হইতে পারেন। কিন্তু অনেক সম্পাদক কাগজ চালান ছাড়া অন্য প্রকারেও নেতৃত্বাভিলাষী হইয়া থাকেন। মতি-বাবুর প্রায় সমুদয় শক্তি অমৃতবাজারের উন্নতিতে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার স্ব্টিশক্তি প্রখর ছিল। তিনি স্বরসিক ছিলেন। তোফা ইংরেজী লিখিবার উচ্চাভিলাষ তাঁহার ছিল না। বৃথা বাগাড়ম্বর না করিয়া সহজ ভাষায় তিনি লিখিতেন, এবং তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইত।

তিনি বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী এবং পরলোকে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। ঘোষ ভ্রাতাদের বিশেষতঃ শিশিরকুমারের চেষ্টায় বৈষ্ণব পুস্তক-সকলের প্রচার ও সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছিল। মৃত্যুশয্যায় তিনি দেশহিত-চেষ্টায় নিযুক্ত সকল কর্ম্মীকে আশীর্বাদ করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া গিয়াছেন। দেশের কল্যাণের জন্য তিনি অতি অল্প কাজ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে যে-সব মহিলা ও পুরুষ কর্ম্মী দেশহিতে রত আছেন, তিনি দেশহিতার্থে যাহা করিয়া যাইতে পারেন নাই, তাঁহারা তাহা করিবেন, ইহা তাঁহার মৃত্যুশয্যায় একটি শেষ আশা ও অভিলাষ। ইহাদের মধ্যে মহিলাদের উল্লেখ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রস্তাব ধার্য হইয়াছে, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো বা সদস্যদের মধ্যে শতকরা আশী জন নির্বাচিত হইবেন, যাহারা কোন নির্বাচনের তারিখের অন্তর সাত বৎসর আগে এম্-এ, এম্-এসসী, এম্-এল্, ডি-এসসী, পীএইচ্-ডি, ডি-এল্, এম্-ডি, ইত্যাদি উপাধি পাইয়াছেন, তাহারা এই শতকরা আশীজনকে নির্বাচন করিবেন, এবং নির্বাচকদিগকে কোন ফী দিতে হইবে না।

শতকরা অন্তর আশীজন ফেলো বা সদস্য নির্বাচিত হওয়া উচিত, ইহা আমাদেরও মত। এই নির্বাচ্য ফেলোর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের দ্বারা নির্বাচিত হউন, ইহাও আমরা চাই। কিন্তু কোন শ্রেণীর বা কতবৎসরের পুরাতন গ্রাজুয়েটরা নির্বাচনের অধিকার পাইবেন, সে-বিষয়ে আমরা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সহিত একমত নহি। উক্ত সভার প্রস্তাব নির্বাচকসমষ্টিতে বড় সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিতে চায়। বর্তমানে নাম-রেজিষ্টারী-করা গ্রাজুয়েটরা যত ফেলো নির্বাচন করেন, তাহাদের সংখ্যা খুব কম বটে। কিন্তু অল্প দিকে, মাষ্টার বা ডক্টর উপাধিদারী যে-কোন গ্রাজুয়েট নির্দিষ্ট ফী দিয়া রেজিষ্টারীভুক্ত হইতে পারেন, তাহাদের সাত বৎসরের কিম্বা এমন কি এক বৎসরেরও পুরাতন হওয়ার প্রয়োজন নাই। তদ্বিল্ল দশ বৎসরের পুরাতন যে-কোন ব্যাচিলার (অর্থাৎ বি-এ, বি-এল্, এম্-বি, বি-স্ট, বি-এসসীও) রেজিষ্টারীভুক্ত হইতে পারেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, বর্তমানে যে-সব গ্রাজুয়েট নির্বাচক হইতে পারেন, তাহাদের অনেককে নির্বাচন-অধিকার হইতে কেন বঞ্চিত করিতে চাহিতেছেন, বুঝি না। বরং এখন যাহাদের সে অধিকার নাই, তাহাদেরও সেই অধিকার পাওয়া উচিত মনে করি।

আমাদের মতে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাচিলার মাষ্টার বা ডক্টর উপাধিবিশিষ্ট যে-কোন গ্রাজুয়েট ফেলো-নির্বাচনের সময় ছাত্রত্ব অতিক্রম বা ত্যাগ করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষা দিবার জন্ম

কোর কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্যত্র শিক্ষালাভ করিতেছেন না, তাহারা ই নির্বাচক হইবার অধিকার থাকা উচিত। যদি ইহা প্রমাণ হয়, যে, এরূপ ব্যবস্থা করিলে নির্বাচক-সংখ্যা এত বেশী হইবে, যে, নির্বাচন-ব্যাপার স্থপরিচালিত হওয়ার পক্ষে বাধা জন্মিবে (যদিও আমাদের এরূপ কোন আশঙ্কা নাই, কারণ রাজনৈতিক নির্বাচনে লক্ষ লক্ষ লোক নির্বাচক হইয়া থাকেন), তাহা হইলে কিঞ্চিৎ রক্ষা করা যাইতে পারে। তাহা এই :—“মাষ্টার ও ডক্টর উপাধিযুক্ত সকল গ্রাজুয়েট, এবং নির্বাচনের তারিখের অন্তর পাঁচ বৎসর আগে ব্যাচিলার উপাধিপ্রাপ্ত সকল গ্রাজুয়েট নির্বাচক হইতে পারিবেন, কিন্তু কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত শিক্ষাধীন থাকিলে তৎকালে তাহার নির্বাচনাধিকার জন্মিবে না ও থাকিবে না।”

ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে যাহারা সভ্য নির্বাচন করেন, তাহারা সম্পূর্ণ নিরক্ষর হইতেও পারেন; এবং তাহাদের নির্বাচিত সভ্যেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজেব আলোচনা করেন ও করিবার অধিকারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম নূতন আইন প্রণয়ন পর্যন্তও তাহারা করিতে পারেন। অতএব দেখা যাইতেছে, যে, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অর্থাৎ উহার সদস্যসমষ্টির উপর কোন কোন বিষয়ে কর্তৃত্ব ও ব্যবস্থাপকত্ব করিতে অধিকারী, তাহাদের নির্বাচকরা নিরক্ষর হইলেও চলে, এমন কি ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত এই মুকব্বি সভ্যেরাও শিক্ষিত না হইতে পারেন। অতএব ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা বলিতেছেন, যে, যাহাদের উপর তাহারা মুকব্বিআনা করেন, তাহাদের নির্বাচকদের সাত বৎসরের পুরানো মাষ্টার বা ডক্টর উপাধিকারী না হইলে চলিবে না। ইহা সম্ভব নহে।

সভ্য বটে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ যাহারা করিবেন, তাহাদের অর্থাৎ ফেলোদের কোন-না-কোন বিভাগ পারদর্শী হওয়া উচিত; ব্যবস্থাপক সভায় যেরূপ অশিক্ষিত লোকদেরও সভ্য হইবার সম্ভাবনা আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট তেমন লোক ফেলো রূপে ঢুকিলে তাহা হাস্যকর ও অনিষ্টকর হইবে। কিন্তু

University had no control. The shortage comes to about three lakhs, if the progressive increase of previous years is taken into account."

ইহা স্বীকার করিলেও আড়াই লক্ষ টাকা ঘাটতি যথেষ্ট খরচের জন্য হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিবার জো নাই। কিরূপ বেবন্দোবস্ত হেতু কিরূপ যথেষ্ট খরচ হয়, তাহার কিছু নমুনা হিসাব-বিভাগের রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"There is a Board of Accounts appointed by the Senate whose functions are to prepare the Budget estimate, examine and audit the University accounts, consider ways and means and the financial effect of any important measures in contemplation and make recommendations relating to the finance of the University. Had sufficient control been exercised from the very beginning the expenditure on post-graduate studies would have been kept within the income of the University. In 1916 they prepared detailed rules for the preparation of Budget estimates and scrutiny of accounts, but the rules were not fully approved of by the syndicate, nor any effect given to such of the rules as were accepted.....Their [the Board's] scrutiny of accounts was not sufficient, as they hardly met more than twice a year from 1917 to 1921.

হিসাব-বিভাগের রিপোর্টে দেখিতেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে খরচের দায়িত্ব কোন কর্মচারীর তৎসম্মুখে কোন নিয়মের বহি নাই।

"There is no manual for the guidance of the office or for fixing the financial responsibility of the officer dealing with University funds. The different spending departments of the University pass the bills as they come, under an impression that any scrutiny or budget check would be made by the Registrar. The secretary, post-graduate studies in science, did not know whether the grants passed by the Council were ultimately sanctioned by the Senate, although he continued to pass the bills of the department.

এইরূপ বেবন্দোবস্তের দরুন কিরূপে বজেটের নিয়মাবলী লঙ্ঘিত হয়, এবং যথেষ্ট খরচ হয়, তাহার দৃষ্টান্ত রিপোর্টে আছে।

"Professors of Science in the Science College place orders in England for the apparatus or other articles required for lecture and research work, disregarding the sanctioned grants. When the bills come, they are forwarded to the secretary of the

post-graduate studies in science, who passes them also without any reference to the budget grants and forwards them on to the Registrar for payment. The Board of Accounts recorded a resolution at their meeting of November 8, 1918, to the effect that all orders for the purchase within the Budget grants should be sent to the Registrar or the Secretary of the Council of Postgraduate Teaching in Science. In spite of that expenditure on equipment and working expenses largely exceeded the Budget grant of 1920-21 as shown below :—

	Grant	Expenditure
Physics	Rs. 8,000	Rs. 17,207
Chemistry	" 8,000	" 26,171
Botany	" 8,000	" 14,678

No attempt is made to watch the progress of receipts, on the regular flow of which the expenditure depends. The result is that on several occasions the accumulated balances of the different solvent funds are drawn upon to meet the current expenditure.

তাহার পর রিপোর্টে লেখা হইয়াছে, যে, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি, পোর্টট্রাষ্ট প্রভৃতির আয়-ব্যয়ের আত্মনিক তালিকা বা বজেট বর্ষান্তরের আগেই প্রস্তুত করিয়া কর্তৃপক্ষের দ্বারা মঞ্জুর করান হয়। তাহাতে মঞ্জুরী অনুসারে ব্যয় নিয়মিত হয়। তদ্বির কর্মচারীরা অভিনিবেশ পূর্বক দেখিতে থাকে, যে, যে-যে প্রকারে যত আয় হইবার অনুমান আছে, তাহা হইতেছে কি না। না হইলে যথাসময়ে ব্যয় সংক্ষেপের চেষ্টা হয়। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বজেট মঞ্জুর অনেক বিলম্ব হয়, এবং বিনা মঞ্জুরীতে খরচ চলিতে থাকে।

"The Calcutta University, on the other hand, allows the expenditure to go on for months against no grant sanctioned by the Senate, and does not prepare an estimate till the year sufficiently advances. Estimate for 1919-20 was passed by the Senate on November 29, 1919, 1920-21 on December 4, 1920 and 1921-22, on March 4, 1922. Thus the expenditure up to those dates was incurred without sanctioned grant.

১৯১৭ সালে পরীক্ষার প্রায় পরীক্ষার আগেই বাহির হইয়া যাওয়ায় পুনরবার পরীক্ষা গ্রহণে বিস্তর



আমরা ছুই, ওরা ছু খায় !

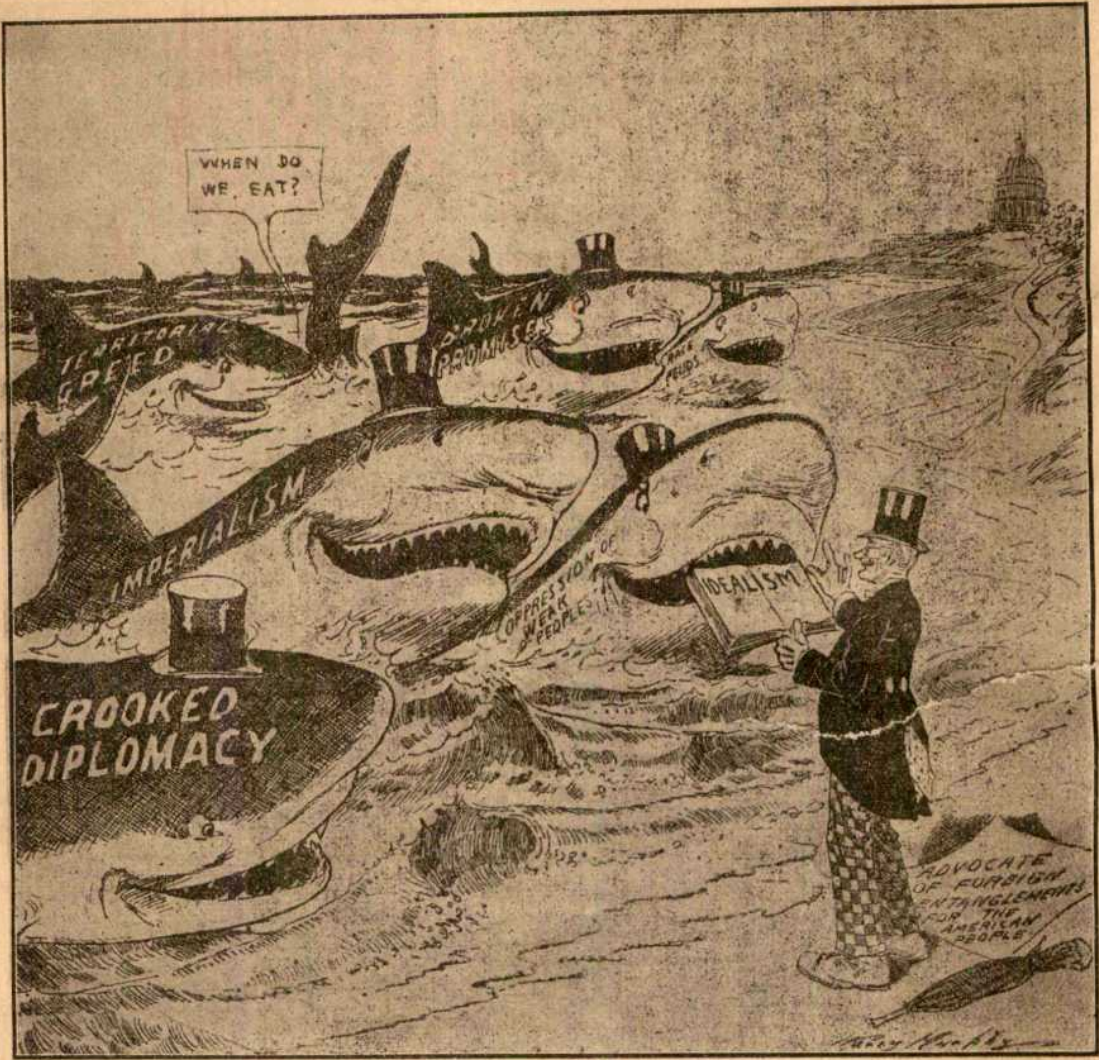
ইংরেজ-জাপানে বন্ধুত্ব এশিয়ায় পরস্পরের স্বার্থ-সংরক্ষার খাতিরে—কিন্তু কল হইতেছে জাপানের সাইবেরিয়া আর চীন সাম্রাজ্যের খানিক খানিক বেদখল করিবার সুযোগ লাভ ও ইংরেজের মর্দুজালা !

থরচ হয়। তজ্জন্য ১৯১৭-১৮ সালে বার্ষিক মোটামুটি ছত্রিশ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ে পরীক্ষাসমূহের কণ্টোলার ও তাঁহার কর্মচারীবৃন্দ নিযুক্ত হন। অথচ রেজিষ্ট্রারের আফিসের কোন প্রকার কর্মচারী হ্রাস করা হয় না, যদিও সে-পর্যন্ত ঐ আফিসই সব কাজ করিয়া আসিতেছিল !

বস্তুতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন অনাবশ্যক অধ্যাপক-

বাছিয়া আছে, তেমনি অনাবশ্যক কেরানী-বাছিয়া আছে। অনেক লোককে হাতে রাখিতে হইলে তাহাদের আত্মীয়-স্বজনকে চাকরী দেওয়ার প্রয়োজন স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু টাকা দিবার গোরীসেনটি কোথায় ?

একাউণ্ট্যান্ট-জেনেরাল্ বিশৃঙ্খলা ও অমিতব্যয়ের প্রতিকারের জন্ত নানা প্রকার উপায় সূচনা করিয়াছেন।



হাঙ্গরের স্বভাব সংশোধন!

শামু খুড়ো (আমেরিকা) হিতোপদেশ খুলিয়া বাণিজ্যলোভ, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, সাম্রাজ্য-লোলুপতা, দুর্বলদলন, বক্রকূটনীতি প্রভৃতি দোষে দুই হাঙ্গরপ্রকৃতির পাশ্চাত্য রাজ্যশক্তির সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

বাংলা গবর্ণমেন্টের শিক্ষা-সেক্রেটারীর পত্রে অনেকটা তদনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়কে লেখা হইয়াছে, যে, যে আড়াই লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্জুর হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট সন্তুগুলি অনুসারে চলিতে রাজী হইলেই তাহা দেওয়া হইবে। তৎসম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য পরে লিখিতেছি।

গোপনীয় কাগজ প্রকাশ

৭ই ও ৯ই সেপ্টেম্বরের স্টেটসমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে লিখিত সরকারী চিঠি এবং একাউন্ট্যান্ট-জেনেরালের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ায় সেনেটের এক সভায় বিশ্বয় ক্ষোভ ক্রোধ আদি প্রকাশিত হয়, এবং এ বিষয়ে অনুসন্ধানার্থ এক কমিটি নিযুক্ত করিয়া এরূপ গোপনীয় জিনিষ প্রকাশ বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিতে বলা হয়। এরূপ আশা করা যাইতে পারে কি,

যে, কোন “সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি” “সম্মানবানী”তে এই-সব অল্পনা-কল্পনার শেষ ফলটা ছাপাইয়া দিবেন?

কিন্তু এসব অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ কথা। আসল কথা এই, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গোপন করিবার দিকে এত ঝোঁক কেন? পরীক্ষা হইয়া যাইবার আগে পরীক্ষার প্রশ্ন, এবং পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্বে ছাত্রদের প্রাপ্ত নম্বর, অবশ্য গোপনীয়; পরে সেগুলিও প্রকাশিতব্য। ইহা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সব জিনিষই অবাধে প্রকাশ করিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু গবর্ণমেন্ট বিনা মূল্যে যে-সব ও যেরূপ জিনিষ খবরের কাগজে পাঠান বা বিক্রয়ার্থ রাখেন, বিশ্ববিদ্যালয় সেরূপ জিনিষও লুকাইয়া রাখিতে চান, এবং কেহ বাহির করিলে রাগ করেন। গোপন করিবার প্রবৃত্তি এত প্রবল হইবার কারণ কি? পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফলের সঙ্গে উত্তীর্ণ প্রত্যেক ছাত্রের প্রাপ্ত মোট নম্বর ছাপিয়া দেওয়া হয়।

আড়াই লক্ষ টাকা সাহায্যের সর্ত

গবর্ণমেন্টের শিক্ষা-সেক্রেটারী বিশ্ববিদ্যালয়কে যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা সম্ভাব্যপূর্ণ, এবং তাহাতে বিরক্তি কোথ প্রতীহিংসা বিক্রপ বা উপহাসের লেশ মাত্র নাই। চিঠিতে আড়াই লক্ষ টাকা সাহায্য প্রাপ্তির এবং পরে আরও ঐরূপ সাহায্য পাইবার আটটি সর্ত লিখিত আছে। যে-কেহ বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা দেয়, তাহার উহার ব্যয় সম্বন্ধে সর্ত করিবার অধিকার আছে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের সর্তগুলির মধ্যে অষ্টমটি ছাড়া অন্যগুলি সাহায্যার্থ প্রদত্ত টাকার ব্যয় সম্বন্ধে নহে। এইজন্য ঐ-সকল সর্ত করিবার অধিকার আইন-অনুসারে গবর্ণমেন্টের আছে কি না, বিচার্য। এইরূপ অধিকার আছে, ইহা কোন আইনে লেখা নাই বোধ হয়। অন্তরিক্ত এমন কোন আইনের বিষয়ও আমরা অবগত নহি। তাহাতে গবর্ণমেন্টকে ঐরূপ সর্ত করিতে বাধা দিতে পারে। গবর্ণমেন্ট যখন কমিশন বসাইয়া একবার কার্জনের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ পরিবর্তন করিয়াছেন,



শ্রীমতী ইন্দিরা -
১৩২০২

ব্যক্তি।

এবং তাহার আমূল পরিবর্তনার্থ স্যাড্‌লার সাহেবের সভাপতিত্বে আর-একবার যে কমিশন বসাইয়াছিলেন তদনুসারেও পরিবর্তন হইবে, তখন লোকহিতার্থ কোন সর্ত বা অস্ত্র কিছু করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেন্টের নাই, ইহা বলা কঠিন। আমেরিকার ব্যবস্থাতত্ত্বজ্ঞ (jurist) বুভিয়ার (Bouvier) তাহার আইন অভিধানের প্রথম ভল্যুমে ৬৮৪-৫ পৃষ্ঠায় (pp. 684-5 of Bouvier's Law Dictionary, vol. i) লিখিয়াছেন :—

“A corporation is a creature of the State. It is presumed to be incorporated for the benefit of the public. It receives certain special privileges and franchises and holds them subject to the laws of the State and the limitations of its charter. Its powers are limited by law. It can make no contract not authorized by its charter. Its rights to act as

corporation are only preserved to it so long as obeys the laws of its creation. There is a reserved right in the legislature to investigate its contracts and ascertain if it has exceeded its powers."

তাহা হইলে আইনের দ্বারা সৃষ্ট কোন সমিতি বা সংস্থা (corporation) যাহাতে তাহার ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন না করে, বা কেবল লোকহিতার্থ ("for the benefit of the public") কাজ করে, তদ্বিধ সর্ব্বোপায় তাহাকে আবদ্ধ করিবার ক্ষমতাও গবর্ণমেন্টের আছে মনে হয়। ইংলণ্ডের মত স্বাধীন দেশে আইনসৃষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান বা সমিতির ক্ষমতা আইন দ্বারা সূনির্দিষ্ট না থাকিলেও তাহা যথেষ্ট কাজ না করিতে পারে; কারণ তথায় জনমত প্রবল। এদেশে জনমত প্রবল নহে। সুতরাং এখানে কিরূপ কাজ ক্ষমতাবিহীন (ultra vires), তাহা সূনির্দিষ্ট হওয়া ভাল।

গবর্ণমেন্টের কি সর্ব্ব করিবার ক্ষমতা আছে বা নাই, তদ্বিষয়ে ঠিক মীমাংসা যাহাই হউক, আলোচ্য বিষয়ে যে আর্টটি সর্ব্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার সবগুলিই একপ, যে, বিশ্ববিদ্যালয় আগে হইতে স্বতঃপ্রসূত হইয়া তদন্তভাবে চলিলে খুব ভাল হইত, এবং চলা কঠিনও ছিল না। এখনও যদি সেনেট বলেন, যে, "গবর্ণমেন্টের সর্ব্ব করিবার ক্ষমতা আছে ইহা মানিয়া না লইয়া, ক্ষমতা আছে কি না তাহা আলোচনা করিবার অধিকার অব্যাহত রাখিয়া, আমরা ঐ সর্ব্বগুলি অহুসারে কাজ করিতে রাজী আছি," তাহা হইলে ভাল হয়। যদি সেনেট মনে করেন, যে, গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা আছে, তাহা হইলে ত কোন কথাই নাই।

অষ্টম সর্ব্বটি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। উহা নিম্নলিখিত রূপ :—

"All arrears of salaries and at least half the amount of the examiners' remunerations amounting to Rs. 1,75,000 up to June 30, 1922, should be forthwith paid."

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, পরীক্ষকেরা এবংসর একলক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা ফী পান নাই। পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে পরীক্ষার ফী লওয়া হয়, প্রধানতঃ পরীক্ষা-কাগজ সম্পাদন জন্ত। অতএব

পরীক্ষকদিগকে তাঁহাদের ফী দেওয়া প্রথমেই উচিত ছিল। তাহা না দিয়া পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বহুলক্ষ টাকা অল্প কাজে ব্যয় করা, আইনের চক্ষে যাহাই হউক, ধর্ম্মনীতির চক্ষে সাময়িক পরস্বাপহরণ হইয়াছে। অধ্যাপকদের বেতনও, পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকা এবং পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্রদিগের প্রদত্ত বেতনের টাকা হইতে, ইতিপূর্বেই দেওয়া উচিত ছিল। এতদিন তাঁহাদিগকে বঞ্চিত রাখা নীতিবিরুদ্ধ হইয়াছে। কারণ, পরীক্ষার্থীদের ফীর একতৃতীয়াংশ পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট আছে, এবং ছাত্ররাও বেতন দেয় প্রধানতঃ অধ্যাপকদিগের বেতন দিবার নিমিত্ত।

হাওয়েল সাহেব ও ভাইস্-চ্যান্সেলার

সেনেটে গবর্ণমেন্টের শিক্ষা-সেক্রেটারীর চিঠি সম্বন্ধে আলোচনার সময় কথা উঠে, যে, উহার বিষয়ে কর্তব্য নির্ধারণ জন্ত নিযুক্ত কমিটি যেন এক সপ্তাহ মধ্যে নিজ কর্তব্য সমাপ্ত করেন। তাহাতে ভাইস্-চ্যান্সেলার বলেন, যে, তাহা অসম্ভব। তখন হাওয়েল সাহেব মুসাহেবী ধরণে কিছু বলিতে গিয়া একটা সত্য কথার আভাস দিয়া ফেলেন। যেমন একদা বাবু রমাপ্রসাদ চন্দ্র ভাইস্-চ্যান্সেলারের পক্ষসমর্থন করিতে গিয়া বলিয়া ফেলেন, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন কমিটি প্রভৃতির অধিকাংশ সভ্যের ভোট তাঁহার মুঠার ভিতর, হাওয়েল সাহেবের কথা হইতেও সম্ভবতঃ তেমনি একটা ভিতরের রহস্য বাহির হইয়া পড়ায় ভাইস্-চ্যান্সেলার উম্মার সহিত উহার প্রতিবাদ করেন। ডাঃ হাওয়েলের কথার ষ্টেটসম্যানের প্রতিলেখন (report) এই :—

"Dr. Howells said he did not accept the Vice-Chancellor's judgment that it was humanly impossible to get a report in a week. He knew what was possible to the Vice-Chancellor and he believed that if the Vice-Chancellor took the matter in hand a reply would be possible even in a week."

সম্ভবতঃ ইহা হাটে হাড়ি ভাঙার মত কিছু হইয়া বলিয়া ভাইস্-চ্যান্সেলার বক্তাকে তিরস্কার করিতে

বাহ্য হন। তিনি বাহ্য বলেন, ষ্টেটসম্যানের ভাষায় প্রতিবেদন এই :-

'The Vice-Chancellor, referring to Dr. Howell's mention of his capacity for work, said, he repudiated the suggestion that this was his job. This concerned every one of the hundred members of the Senate and he assured them that he was the last man in the world to force his views upon them. He declined to have their support unless he knew that it was a representative and reasoned judgment on their part.'

কোন কোন কাণ্ডে ইহা অপেক্ষাও বেশী এবং হোবার কথা আছে। সমস্ত পণ্ডিতা শোষণিযাবেব ভাষা একটু বদলাইয়া বলা দায় কি,

"The angels doth protest too much, methinks" "

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ

অধ্যাপকাদিগের অধিক কাল ধরিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বে বৃহৎ ও মহৎ কার্যে ব্যাপৃত আছেন, ইহার নোংরা দূরীভূত হইয়া তাহা বাহাতে সুসম্পন্ন হয়, এবং বাহাতে ইহার উন্নতি হইয়া ইহা সকল দিক দিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়সমূহের অন্ততম বলিয়া পরিগণিত হয়, সেইজন্য আমরা অনেকদিন হইতে ইহার সমালোচনা করিয়া আসিতেছি। ইহা দ্বারা শিক্ষা-বিস্তার, জ্ঞান-বিস্তার, এবং জগতের জ্ঞানভাণ্ডার-পুষ্টির যে সাহায্য হইয়াছে, তাহাও উল্লেখও আমরা মধ্যে মধ্যে করিয়াছি। কিন্তু সমালোচনা তদপেক্ষা অধিক করিতে হইয়াছে। ইহাতে বহুবার বাহিবে অত্যন্ত প্রদেশের ও বিদেশের অনেকে এই ধারণা হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভাবতবর্ষের অত্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা নিকৃষ্ট, এবং আমাদেরও বিবাস যেন ভ্রূপ। তাহা সত্য নহে। বরং শতকরা যত পবিত্রার্থী পান হয়, ভাবতবর্ষের অত্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ তাহা অপেক্ষা কম পাস হয়। কিন্তু যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পদীক্ষায় 'দ' যত কম হয়, সে বিশ্ববিদ্যালয় তত ভাল কিম্বা খারাপ তাহা হ্রাসের তত অধিক জানী, বুদ্ধিমান ও গণ্যমান্য, ইহা সত্য নহে। অবশ্য, যেখানে শতকরা

খুব বেশী ছাত্র পাস হয়, তাহাও যে সেই কারণেই ভাল শিক্ষাকেন্দ্র (বা খুব মন্দ শিক্ষাকেন্দ্র) তাহাও সত্য নহে। আমাদের ধারণা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের প্রদর্শিত জেন-বকল সহজেই পূর্ণ হইয়াছে। ইহা জানবান্ ও প্রতিভাশালী ছাত্রেরা বাহির হইয়াছেন এবং এখনও হইতেছেন। ইহা জানবান্ অল্প কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তত ভাল শিক্ষা পাইবে। অধিকসংখ্যক ও অধিক পরিমাণে জেন-বকল পাইয়া ছাত্র পাস করিয়া বাহির হন নাই ও হইতেছেন না। তাহাও কয়েকটি প্রমাণ মিলেছে। জেন-বকল হিসাবে না বরিয়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ গবেষণা যত হইয়াছে, ভাবতবর্ষ অন্তত তত হইয়াছে। ইহার ছাত্র ও উপাধিধারীরা প্রভুত করিয়াছেন, অল্প কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে তত উপাধিধারীরা তত করেন নাই। ইহার উপাধিধারীরা বহুবার বাহিরে গিয়া যত জন শিক্ষক অধ্যাপক হইয়া করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা যে অন্যত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদের মধ্যে তত জন অধ্যাপক বাহিবে শিক্ষকতা ও অধ্যাপকতা করেন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীরা কিম্বা ইহার শিক্ষার্থীরা কলেজ-সকলে কতকদূর শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা কত সাহিত্যকে যে পরিমাণে পুষ্ট ও উন্নত করিয়াছেন, অল্প কোন প্রদেশের ইংরেজীশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা তাহাও প্রাদেশিক সাহিত্যকে ততদূর পুষ্ট ও উন্নত করিতে পারেন নাই।

সমালোচনার কাজ আমরা অনেক বিনিয়োগ, ভবিষ্যতেও প্রয়োজন হইবে করিব—যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের সম্ভাবনা দেখিয়া মনে হয়, যে, তাহাও যত বেশী সমালোচনা অতঃপর করিতে হইবে না। কিন্তু আমরা সমালোচক হইলেও এই ধারণা উন্মিত বা বদমূল হইতে দিতে পারি না, যে, ইহার মনোভাব ঠিকিলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যোঁড় উপাধি, অল্প কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহা কম কাজ করিয়াছে বা করিতেছে।

চলন্ত অন্ধকূপ

সেই রবে বিদ্রোহী মোপ্লা বন্দীরা দরজাখানালা-বন্ধ মালগাড়ীতে দম আটকাইয়া মাঝা গিয়াছিল, তৎ-সময়ে ভারতগবর্ণমেন্টের মন্তব্য এতদিনে বাহির হইল। বীজ ও এণ্ড্রুজ্ নামক যে-দুইজন রেল-কর্মচারীকে গবর্ণ-মেন্ট বিশেষভাবে দোষী স্থির করিয়াছেন, তাহা য় মধ্যে বীজের মৃত্যু হইয়াছে, এবং এণ্ড্রুজ্কে ফৌজদারী সোপর্দ কবিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। যে তিনজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহার দাখিল কতটুকু, গবর্ণমেন্ট তাহার আলোচনা করিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন; তাঁহাদের কাহাকেও দণ্ড দিবার প্রয়োজন স্বীকার বা চেষ্টা করেন নাই। বন্ধ মালগাড়ীতে বন্দী চালান সরকারের মতে দোষাবহ হয় নাই। যদিও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে আলোচ্য দুর্ঘটনাব সময়েই মালাবারের অগ্রান্ত বিদ্রোহসমূহ অংশে খোলা গাড়ীতে বিদ্রোহী বন্দী লইয়া যাওয়া হইত এবং তাহার জন্ত যথেষ্ট পুলিশও জুটিয়াছিল। যথা—

“We observe that rebel prisoners despatched after conviction from other parts of the district (e.g., from Calicut and Cannanore) passed through the rebellion area in open carriages and that police were evidently available to furnish for them an escort of the necessary strength; and we cannot but think that if consideration had been given to the matter it would have been possible to find police to furnish similar escorts from Tirur.”

চলন্ত অন্ধকূপ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশে যে বিলম্ব হইয়াছে, তাহার যথেষ্ট কারণ গবর্ণমেন্ট দেখাইতে পারেন নাই; মন্তব্য এবং তদন্তকারী আদেশও যথেষ্ট এবং সন্তোষজনক হয় নাই। দুর্ঘটনার সময়ে মিঃ ন্যাপ (Knapp) মালা-বারের স্পেশ্যাল কমিশনার ছিলেন; তাঁহাকে অহুসন্ধান-কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করা উচিত হয় নাই। বন্ধ মাল-গাড়ীতে গোঙ্গ ভেড়া ঘোড়া প্রভৃতি পশুও কখন লইয়া যাওয়া হয় না; সুতরাং কোন অবস্থাতেই, বিদ্রোহী বা অন্য কোন গুরুতর দোষে অভিযুক্ত মাহমুদকেও একপ গাড়ীতে লইয়া যাওয়া উচিত নয়।

সিরাজুল্লোহার আগলের অন্ধকূপহত্যা যদি বাস্তবিক

ঐতিহাসিক ঘটনা হয়, তাহা হইলেও তাঁহাকে ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা ধরুপ গালাগালি দিয়াছেন, তিনি তাহার যোগ্য নহেন। সুতরাং ইংরেজদের লেখা প্রত্যেক ভারত-ইতিহাস হইতে সেই-সকল কটু কথা ও নিন্দা বাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু যদি ইংবেজেরা সিরাজুল্লোহাকে দোষী সাব্যস্ত কবিয়াই রাখেন, তাহা হইলে মালাবারের গবর্ণর, এবং মালাবার জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, স্পেশ্যাল কমিশনার ও অগ্রান্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা কেন দোষী সাব্যস্ত হইবেন না? মাকড় মারিলে ধোকড় হয় বলিয়া? এ বিষয়ে দুর্ঘটনার পবেই অনেক কথা লিখিয়াছিলাম। পুনরুক্তি অনাবশ্যক ও নিষ্ফল। যাহার কোন প্রতিকার কবিবার ক্ষমতা নাই, সে বিষয়ে লিখিতে লজ্জাবোধও হয়।

অকালীদের প্রতি নির্ভরতা

শিখদিগের ধর্মমন্দিরকে গুরুদ্বারা বলে। অখ্যতসর হইতে পাঁচক্রোশ দূরে গুরু-কা-বাঘ (অর্থাৎ গুরুর উদ্যান) নামক স্থানে এইরূপ একটি মন্দির এবং তৎসংলগ্ন কয়েকটি বাসগৃহ বাগান ও জমী আছে। এই-সব পূর্বে এক শিখ মহন্তের অধিকারে ছিল। যেমন বাংলা দেশে তেমনি পঞ্জাবেও, ধর্মার্থে প্রস্তুত অনেক সম্পত্তি মহন্তের হাতে আনিয়া পড়িয়াছে এবং তাহারা অনেক স্থলে তাহার সদ্যবহার করে না। এইজন্য অকালী ও অগ্রান্ত শিখরা গুরুদ্বারাগুলি ও তাহার সম্পত্তিসকল মহন্তদের হাতে হইতে সরাইয়া দইরা নিজেরদের নিরীকৃতিত কমিটিং হাতে দিতে চেষ্টা করিতেছেন। গুরুদ্বারা-প্রবন্ধক-কমিটি এইরূপ একটি কমিটি।

গুরু-কা-বাঘ মন্দির অকালীরা কিছুকাল হইল দখল করে। এখনও উহা তাহাদেরই দখলে আছে। গবর্ণ-মেন্ট তাহাতে বাধা দেন নাই। কিন্তু উহার সংলগ্ন বাসগৃহ বাগান ও জমী মহন্তের অধিকারে আছে, গবর্ণমেন্ট এই কথা বলেন। কিছুদিন হইল, কয়েকজন অকালী বাগান হইতে বিছু জালানী কাঠ কাটিয়া লয়। তাহারা উহা নিজের লাভের জন্ত কাটে নাই; গুরু-কা-লদর অর্থাৎ গুরুব্রহ্মসম্মতের পাকশালার জন্ত লইয়াছিল।

পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া চুরির অভিযোগে বিচারার্থ প্রেরণ করে, এবং তাহাদের ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তাহার পর হইতে অকালীরা দলে দলে নানাস্থান হইতে গুরু-কা-বাঘে গিয়া বাগান হইতে অন্নসত্রের জন্ত কাঠ কাটিবার অধিকার রক্ষা বা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত যাইতে থাকে। তাহাদের যাওয়া বন্ধ করিবার জন্ত ও তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্ত এবং গুরু-কা-বাঘে বাহারা কোন প্রকারে পৌঁছিয়া যাইতেছিল, তাহাদিগকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত পুলিশ অকালীদিগের প্রতি প্রহারাদি বত প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে, তাহা অনেক দিন ধরিয়া খবরের শগুজে বাহির হইতেছে। গবর্ণমেন্ট কর্মচারীরা বলিতেছেন বটে, যে, অকালীরা পুলিশকে আক্রমণ করিয়াছে; কিন্তু যদি নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া তাহারা দুই এক বার তাহা করিয়াও থাকে, তাহা হইলেও মোটের উপর ইহাই সত্য, যে, যোদ্ধা ও বীর অকালী সম্প্রদায়ের লোকেরা মার খাইয়াছে কিন্তু মারে নাই। এখন পুলিশের নানাপ্রকার অত্যাচারেও অকালীরা নিবৃত্ত না হওয়ায় গবর্ণমেন্ট তাহাদের গুরু-কা-বাঘ যাওয়াতে বাধা দেওয়ার সংকল্প ছাড়িয়া দিয়া মহন্তর অধিকারভুক্ত বাগান বাসগৃহ প্রভৃতির চারি ধারে কাটাযুক্ত তারেব বেড়া দিয়াছেন এবং কেহ অধিকার প্রবেশ করিলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে, ঘোষণা করিয়াছেন।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, যে, শেষোক্ত ব্যবস্থাটি প্রথম হইতেই করা হয় নাই কেন? তাহা হইলে নিম্নিত অকালীদিগকে প্রহার, তাহাদিগকে সরাইয়া দিবার জন্ত কেশ আকর্ষণ ও উৎপাটন, প্রহারের চোটে অনেকের গুরুতর আঘাতপ্রাপ্তি ও কাহারো কাহারো সংজ্ঞালোপ এবং অনেকের হাসপাতালে যাওয়াব প্রয়োজন, দেশব্যাপী উত্তেজনার সৃষ্টি, ইত্যাদি হইত না। সরকারী কর্মচারীরা বলিতেছেন বটে, যে, অকালীদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্ত যতটুকু বলপ্রয়োগ আবশ্যক তাহার বেশী কিছু করা হয় নাই। কিন্তু বাহারা অত্যাচার করিয়াছে ও করাইয়াছে বলিয়া অভিযোগ, ইহা তাহাদেরই কথা; গবর্ণমেন্ট স্বতন্ত্র অন্নসন্ধান দ্বারা ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। বোরতর

অত্যাচার হইয়াছে বলিয়া অনেক প্রত্যক্ষদর্শী সম্ভ্রান্ত লোক এবং সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ সাক্ষ্য দিতেছেন।

যে মন্দির অকালীদেব দখলে আছে, তাহারই সংলগ্ন সম্পত্তিও অকালীদের কি না, সে বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা হইতে পারে। মন্দিরের জিনিষ মনে করিয়া গুরুর অন্নসত্রের জন্ত যদি অকালীরা জ্ঞানানী কাঠ কাটিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সাধারণ চোরদের মত শাস্তি হওয়া অত্যন্ত আশ্চর্যের ও দুঃখের বিষয়। হইতে পারে, যে, তাহাদের হুম বা বিবেচনার ক্রটি হইয়াছে। তাহার জন্ত ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড অতি উৎকট শাস্তি। অপরে বা বন হইতে এমনিও অনেক সময় লোকে জ্ঞানানী কাঠ সংগ্রহ করে। এস্থলে দেখা যাইতেছে, যে, শিখ মন্দির, তাহার সংলগ্ন বাসগৃহ, বাগান, জমী, এই কয়টি জিনিষ পূর্বে একই গুরুদ্বারার সম্পত্তি ছিল; মহন্ত ছিল তাহার সেবাইতরূপী স্বত্বাধিকারী। পরে মন্দিরটি অকালীরা দখল করে। গবর্ণমেন্ট তাহা উহাদের দখলেই থাকিতে দেন, মহন্তকে তাহার দখল দেওয়াইয়া দেন নাই। সুতরাং যদি অকালীরা মনে করিয়া থাকে, যে, বাসগৃহ বাগান এবং জমীও মন্দিরটির মত জায়তঃ শিখদের সাধারণ সম্পত্তি, প্রভেদ এইমাত্র, যে, তাহারা এখনও উহা দখল করিতে পারে নাই, এবং যদি সেই ধারণা বশতঃ উহারা কাঠ কাটিয়া থাকে, তাহা হইলে কি তাহাদিগকে বেশী দোষ দেওয়া যায়, না তাহাদেব কাহাবও দাপ্তরী চোবের মত শাস্তি হওয়া উচিত হইয়াছে?

কমাল পাশার জয়

গাজী মুস্তাফা কমাল পাশার জয়ে ও গ্রীসের পরাজয়ে তুর্কদেব প্রতি ইউরোপীয় “মিত্রজাতি”-পুঞ্জের জায়বিরুদ্ধ আচরণের প্রতিকার হইবে। এখন ইংরেজ ও অন্যান্য “মিত্রজাতি”-গণ মহানুভব সাজিবার স্বযোগ পাইবেন। পরদেশাধিকারী পাশ্চাত্য জাতিদের ইহা একটা মহৎ গুণ, যে, যখন তাঁহারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও জায়পরায়ণ হইতে বাধ্য হন, তখন তাঁহারা নানাপ্রকার দলিল বাহির

করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন, যে, গ্রাধা ব্যবহার করিবার মূল্যব তাঁহাদের অনেক আগে হইতেই ছিল, এবং তাঁহারা তাহার বন্দোবস্তও করিয়া রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে স্বযোগ বুঝিয়া তাহা করিতেছেন।

হিংস্রটো, পরশ্রীকাতর ও পরধনলোলুপ নহেন, এরূপ মানুষ অনেক আছেন; কিন্তু এরূপ জাতি আছে কি না বলা কঠিন, যাহারা তাহাদের ইতিহাসে কখনও ঐ-সকল দোষের দৃষ্টান্তস্থল হয় নাই। বর্তমান সময়ে ইউরোপের পরস্বাপহাবী জাতিদের ঐ দোষ খুব দেখা যায়। তাহারা পৃথিবীর সব মহাদেশে ডাকাতি ও প্রতুল করিয়া বেড়াইবে, অথচ লোককে স্বীকার করিতে বলিবে, যে, তাহারা অসভ্য জাতিদিগকে সভ্য করিবার জন্ত তাহাদের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে! কিন্তু বহুশতাব্দী পূর্বে তুর্করা এশিয়া হইতে গিয়া যে ইউরোপের অনেক দেশ জয় করিয়াছিল ও তাহার কোন কোন স্থানকে তাহারা স্বদেশে পরিণত করিয়াছে, ইহা ইউরোপের জাতিদেব কিছুতেই সন্মত হইতেছে না। তাহারা চায়, যে, ইউরোপে প্রাচ্যদেশোদ্ভব অখৃষ্টিয়ান কোন জাতি যেন না থাকে, অন্ততঃ সেকপ কোন জাতি তথায় স্বাধীন ও প্রবল না থাকে। ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে। পৃথিবীতে কোন দেশের অধিবাসী এমন কোন জাতি নাই, যাহারা আদিমকাল হইতে ঐ দেশের অধিবাসী ও মালিক। প্রাগৈতিহাসিক স্মরণাভীত কাল হইতে একজাতি অল্প জাতিকে জয় করিয়াছে, একজাতি স্বদেশ ছাড়িয়া গিয়া অন্য দেশে আড্ডা গাড়িয়াছে। সুতরাং এখন “তোমরা নিজের দেশে ফিরিয়া যাও,” বা “তোমরা আগন্তুক, অতএব আমাদের অধীন হও,” সম্বন্ধে রক্ষা করিয়া সর্বত্র এই নিয়ম খাটাইবার উপায় নাই। যাহাদের স্থায়ী বাসস্থান কোনও প্রকারে পুরুষাঙ্কুরে কোন দেশে হইয়াছে, তাহাদিগকে তথাকার অধিবাসী বলিয়া মানিতেই হইবে।

খৃষ্টিয়ান ইউরোপীয়েরা বলেন, যে, তাঁহারা অখৃষ্টিয়ান এশিয়া ও আফ্রিকার অসভ্য লোকদের মধ্যে সভ্যতা ও জ্ঞান বিস্তার করিতেছেন। বহন মধ্যযুগের পূর্বে ইউরোপে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের খুব প্রাচুর্য্য, তখন

এশিয়া হইতে মুসলমানেবা গিয়া ইউরোপে সভ্যতা ও জ্ঞান বিস্তার করিয়াছিল। এখন তুর্কদের বিরুদ্ধে প্রায়ই এই অভিযোগ শুনা যায় বটে, যে, তাহারা খৃষ্টিয়ান আশ্বিনিয়ান ও গ্রীকদিগকে নিষ্ঠুর ভাবে সংহার করে। কিন্তু গ্রীকদের বিরুদ্ধেও ত তুর্ক-সংহারের অভিযোগ অনেকবার শোনা গিয়াছে। বস্তুতঃ পৃথিবীর খৃষ্টিয়ান জাতিরা এ পর্য্যন্ত কত কোটি মানুষ মারিয়াছে, এবং মুসলমান জাতিরাই বা কত মারিয়াছে, তাহার হিসাব প্রস্তুত করিলে এ বিষয়ে সম্ভবতঃ খৃষ্টিয়ান জাতিরাই বেশী দক্ষ বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

যাহা হউক, এখন ইউরোপের লোকেরা বুঝুন, যে, তুর্ক ও অন্যান্য মুসলমানদের মরিতে দেবী আছে, সম্ভবতঃ তাহারা খৃষ্টিয়ানদের আগে মরিবে না।

শ্রী বিঠলদাস দামোদর ঠাকুর

শ্রী বিঠলদাস দামোদর ঠাকুর বোম্বাইয়ের একজন প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন। তাঁহার কয়েকটি কাপড়ের কল ছিল। তিনি ভাবতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। বাণিজ্যনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। কিন্তু তিনি সামাজিক হিতসাধন জন্ত, বিশেষতঃ নারীজাতির কল্যাণের জন্ত, যে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন, ইহাই তাঁহার প্রধান কীর্তি। পুনর মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পনের লক্ষ টাকা দান করেন। এই দান এবং এইরূপ আরও লক্ষাধিক কয়েকটি দান তিনি জীবিতকালেই করিয়া যান। তাঁহার পরলোকগতা জননী শ্রীমতী নাথীবাইর স্মৃতি তাঁহাকে নারীজাতির কল্যাণার্থ দানে অল্পপ্রাণিত করিত। অকালে উপপঞ্চাশ বৎসর বয়সে একপ মানুষের মৃত্যুতে ভারতবর্ষের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

গ্রামবাসী ও ডাকাইতদের লড়াই

কিছুদিন আগে মেদিনীপুর ও ঢাকা জেলার দুটি গ্রামে ডাকাইত পড়ায় গ্রামবাসীরা ডাকাইতদিগকে

৫ সমর্থ হয়। যেখানে ডাকাইতী হইবে, এইরূপ চেষ্টা হওয়া আবশ্যিক।

মসবর্ণ ও ভিন্নধর্মাবলম্বীর বিবাহ আইন

হিন্দুদের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ যাহাতে অনুসারে বৈধ বলিয়া গণিত হয়, তৎক্ষণ্ণ আইন ফরাইবার চেষ্টা ত্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও তৎপবে বিঠলভাই পটেল করিয়াছিলেন। গোঁড়া এবং মির ভানকারী লোকদের বিরোধিতায় তাঁহারা যা হন নাই। তৃতীয় বার চেষ্টা করিতেছেন, হরি সিং গোড়া। তাঁহার প্রস্তাবিত আইনের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিবাহ সিদ্ধ হইবার আছে। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, যে, যদি ৫ মুসলমানদের অনতিক্রম্য প্রবল আপত্তি দেখেন, হইলে আইনটি কেবল হিন্দুদের অনুলোম প্রতি-অসবর্ণ বিবাহেই আবদ্ধ রাখিবেন। তাঁহার ও বিরোধিতা হইতেছে। যাহা হউক, উহা অক্ষরেই হয় নাই। উহার কি কি পরিবর্তন আবশ্যক স্থির করিবার জন্ত, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের মধ্য নির্বাচিত সিলেক্ট কমিটির নিকট উহা পেশ হইছে। ৩৩ জন সভ্য ইহার বিপক্ষে এবং ৩৪ জন ছিলেন।

মিরা এইরূপ আইনের সমর্থক। ইহা কাহাকেও বিবাহ করিতে বা ভিন্নধর্মীকে বিবাহ করিতে করিতে চায় না। ইহা কেবল ভদ্রপ বিবাহকে করিতে চায়। গোঁড়া লোকদের মাহুষের এই ভাৱা ভাৱের বিরোধী হওয়া উচিত নহে। এরূপ ভাৱা সকল সভ্য দেশেই আছে।

কমিশনার-পদপ্রার্থী রজক

চুড়ায় একজন রজক মিউনিসিপ্যাল কমিশনার প্রার্থী হইয়াছেন। ইহা স্বলক্ষণ। যে-কোন ব্যক্তির ও শক্তি আছে, এবং যিনি তাহা লোকহিতার্থ

ব্যয় করিতে প্রস্তুত, শ্রেণী ও জাতিনির্কিশেষে তাঁহারই তাহা করিবার স্বযোগ থাকা উচিত। বন্দের ব্যবস্থাপক সভায় নমঃশূদ্ৰ, চর্মকাব ও শকটবান্ সভ্য আছেন। মিউনিসিপালিটি-সকলেও সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি থাকা উচিত।

রেলওয়ে ট্রেনে খাইবার গাড়ী

রেলওয়ে ট্রেনে যেমন ইউরোপীয়দের খাইবার গাড়ী আছে, দেশী লোকদের জন্তও সেইরূপ একটি গাড়ী রাখিবার নিমিত্ত মাড়োয়ারী সভা প্রস্তাব ও আবেদন করিয়াছেন। তাঁহারা কেবল নিরামিষ খাদ্যের ব্যবস্থা চান। দুধ ঘিকে নিরামিষ মনে করা হয়। প্রস্তাবটি ভাল।

ঘোড়দৌড়ে জুয়াখেলা

ঘোড়দৌড়ে বিশেষ বিশেষ ঘোড়ার উপর বাজী রাখিয়া জুয়া খেলার খুব চলন আছে। ইহা অত্যন্ত অনিষ্টকর প্রথা, যদিও লার্টসাহেবরা পর্যন্ত ইহার প্রশংসা দেন ও এই খেলা খেলেন। সম্প্রতি একজন বাঙ্গালী যুবক এই খেলায় সর্বস্বান্ত হওয়ায় সত্বীক আত্মহত্যা করিয়াছে। ইহা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। যে-সব খবরের কাগজে এই খেলাসম্বন্ধে সংবাদাদি বাহির হয়, তাহারা দেশের শত্রু। রেলুনের বিশপ তথাকার ঘোড়দৌড়ের ক্লাবের দান অঙ্ক ও কালা-বোবাদের সাহায্যার্থ প্রথমে লইয়া ছিলেন। পবে এ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ হওয়ায় উহা লইতে অস্বীকার করিয়াছেন। ঠিক করিয়াছেন। পাপের টাকা লইলে পরোক্ষভাবে পাপের প্রশংসা দেওয়া হয়। যাহারা গর্হিত কাজ করিয়া টাকা রোজ্জগার করে, তাহারা যদি অতুতপ্ত হইয়া পাপ-পথ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তখন সংকল্পে ব্যয়ের জন্ত তাহাদের দান লওয়া যাইতে পাবে।

মজার জন্ম মানুষ খুন

কয়েক মাস আগে এলাহাবাদ হাইকোর্টে এক নয়-হত্যার বিচার হয়। দুইজন গোরা মদ খাইতেছিল।

তখন তাহারা বলে, “এস, আমরা কাহারো দক্ষা শেষ করি।” এই বলিয়া তাহারা নিকটস্থ এক দরজির দোকানের বারাণ্ডায় যায়, এবং ঈটন নামক গোরা নেহতা চৌকিদারকে ঘুষি লাগি মাঝিতে থাকে। তাহার পর ঈটন বলে, “উহাকে একদম শেষ করিয়া ফেলা যাক।” এই বলিয়া, সঙ্গী সৈনিকের নিষেধ ও বাধা সত্ত্বেও সে একটা বড় ছোরা লইয়া নেহতাকে আঘাত করিতে থাকে। তাহার পর, “মরা মানুষ কোন অভিযোগ করিতে বা খবর দিতে পারে না,” এই বলিয়া দুজনে মিলিয়া তাহাকে একটা কুপের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। বিচারে জুরী ঈটনকে নরহত্যা-অপরাধী বলিয়া রায় দেয়, কিন্তু দয়া দেখাইতে অস্বীকার করে। তাহার ফাঁসীর হুকুম হয়, কিন্তু আশ্রা-অধোধ্যার লাট তাহাকে ফাঁসীর পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়াছেন। দয়াতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু শাদা চামড়া হইলেই কেন ফাঁসী হয় না?

কোন ঝগড়া বিবাদ উত্তেজনার কারণ ব্যতিরেকে, কেবল মজা করিবার জন্ত, মাছুষ খুন করিবার প্রবৃত্তি আমাদের দেশের অতি অধম লোকদের মধ্যেও দেখা যায় না। ঈটনের মত জন্ত যে সমাজে ও দেশে আছে, তাহাদের সভ্য হইবার প্রয়োজন আছে। আমরাও এমন পতিত হইয়াছি, যে, কখন কখন কেহ খুন করিতে আসিলেও কেহ কেহ তাহাতে পর্য্যাপ্ত বাধা দিতে চেষ্টা করিতেও পারে না।

পল্লীসংস্কার সমস্যা

সেদিন এক বৈঠকে শোনা গেল, ভারতবর্ষের উপেক্ষিত জাতিদের ক্ষেপিয়ে তুললে তার ফল ভাল হবে না। যিনি বল্লেন, পূর্ববঙ্গে তাঁর বাড়ী—সে অঞ্চলের নানা স্থানে নমঃশূদ্ভেরা দল গঠন কবে’ তাদের দুর্গতি ও দৈন্য ঘোচাবার চেষ্টা করুচে; আব তারা ব্রাহ্মণকে মান্তে চায় না, এমন কি বর্গা স্বত্বে ব্রাহ্মণের জমি পর্য্যাপ্ত চাষ করুতে রাজি নয়!

তাবপর সামাজিক পীড়ন অসহ্য বোধ করে’ অনেকে

“অস্পৃশ্যে”র সহিত প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব

আহমদাবাদের শববমতী নামক স্থানে মহাত্মা সত্যগ্রহ-আশ্রমে অনেক যুবক চবথায় স্ত্রীতা কপড় তাঁতে কাপড় বোনা শিক্ষা করে। একদিন কতকগুলি ছাত্র বাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে একটা বিষ্ঠাপূর্ণ ময়লা-কেলা চলন্ত গাড়ীব একটা প্রায় খুলিয়া পড়িয়াছে, এবং উহা খুলিয়া পড়ি গাড়ীটা হইতে ময়লা রাস্তায় ছড়াইয়া পড়িবে। মেথর দুজন ভারী গাড়ীটার একদিক তুলিয়া চাকাটা পরাইয়া খিল লাগাইয়া দিতে পারিতেছিল। তখন ছাত্রগুলি আস্তীন গুটাইয়া মেথরদের সঙ্গে বিষ্ঠাপূর্ণ গাড়ী তুলিয়া ধরিল এবং চাকাটি স্বচ্ছ হইল। এই ছেলেগুলির যত্নবান ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রশংসনীয়। ইহারা নমস্যা, এবং মহাত্মা গান্ধী শিষ্য।

আমাদের শারদীয় ছুটি

শারদীয় ছুটি উপলক্ষে প্রবাসী-কাৰ্যালয় ৭ই হইতে ২১শে আশ্বিন পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই দিন কোন কাজ হইবে না।

খৃষ্টান পাদ্রীদের হাতে গিয়ে পড়চে; ধর্মবিশ্বাসে প্রভোদিত হয়ে এরা হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হ’লে কেঁদে খেদ ছিল না, কেননা সেখানে মানুষ স্বাধীন। চিন্তবৃত্তি যে বিশ্বাসের আশ্রয়ে বিকশিত হতে পারেন সেই হচ্ছে তার অধ্যাত্মজীবনের ভিত্তি।

দিক্ত উপেক্ষিত ঘৃণিত হয়ে এরা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়চে বলেই আমরা শঙ্কিত। আমাদের সমাজের অন্ধহানি হচ্ছে।

গ্রামে, বিশেষতঃ করিদপুৰ ও বাখবগঞ্জের বিদ্যমান বহুসংখ্যক নমঃশূজের বাস। ইহারা “চণ্ডাল” “শূদ্র” নামে অভিহিত। অধিকাংশই কৃষিজীবী, কৃষিরেব জমি খাজনা নিয়ে তাতে চাষবাস করে। এরা পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। ভূস্বামীর বিপদ-কষ্টে এরা প্রাণপণ সাহায্য করে। সব দিক্ থেকেই কল্পে দেখা যায় এদের সহযোগিতা না পেলে গ্রামের আর্থিক স্বার্থও বজায় থাকে না। অথচ এদেরই কল্পে বলে দূবে রাখা হয়েছে। এদের শিক্ষিত করবার সমস্ত পল্লীসমাজেব, কিন্তু সমাজ তা করেনি। এদের জাত্যাভিমানী হিন্দু এদের পরিশ্রমলব্ধ অর্থে পুষ্ট হইতে পারে। এদের দিকে তাকায় না। আজ যখন সমগ্র দেশে স্বাধীনতার কথা উঠেছে, তখনও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীদের অধনের প্রস্তাবটা চাপা রাখবার চেষ্টার উদয় হয়েছে। দেশে।

আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকারের জন্ত আন্দোলনের বিরাম নাই। কেউ কেউ বলেন, স্বরাষ্ট্রের অধিকার পেলে ভারত-সম্রাজ্যে বিচিত্র জাতিরা এক হয়ে উঠতে পারবে—তাদের স্বাধীনতা থাকবে না। যিনি দেশনায়ক, মহাত্মা গান্ধী, তিনি কিন্তু বলেন,—ছোয়াবসা নিয়ে যে পাপ আমাদের সমাজে দেখা দিয়েছে, তার আলিন না হলে স্বাধীনতা মিলবে না। তিনি কি অর্থে ‘স্বরাজ্য’ কথাটি ব্যবহার করছেন, এই নিয়ে তর্ক উঠেছে। জাতি-বৈষম্য দূরে হলেই ইংরেজশক্তি আমাদের হাতে সীমিত হইত। তবু এমন আশা করা যায় না,—তবে স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন জাতি এক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হলে আমাদের স্বাধীনতা দানা বেঁধে উঠবে, আমরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন রাষ্ট্র স্বয়ংগ পাব। কিন্তু কেবল রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কথাই দিবে কি এই প্রভেদ, বৈষম্য ঘুচান যাবে? এর দিক্ থেকে মিলতে পারে বরং সহজ। চাই হিন্দু, অহুতী যার কেন্দ্র হইবে স্বত্বের মাঝখানে; হিন্দু থেকে মিলনের বীজ সংগৃহীত হলে তবেই স্বাধীনতা। আর বাইরের আয়োজনের উপর ভর করে জাতিগত বৈষম্য দূব করিতে যাই, তবে কিছুতেই স্বাধীনতা ঘটবে না।

কি কল্পে এ সমস্যাব সমাধান হবে এই প্রশ্ন আজ আমাদের মনে এসেছে। পল্লীসংস্কারের কাছে যারা ভ্রান্তী হতে ইচ্ছুক, তাঁরা এই-সব না ভেবে চিন্তে কাজে নামলে পদে পদে ঠেকতে হবে; কেননা জাতিগত বৈষম্য সহ্যে নানা কারণে ভেদন চোখে পড়ে না, কিন্তু পল্লী-সমাজে এর প্রকাশ এতই স্ব্পষ্ট যে চলতে ফিরতে উঠতে বসতে জাতের দৌরাখ্য সহ্য করতে হয়।

বেহালার নিকট প্রায় তিন শ’ ঘর মুসলমান নিয়ে একটি পল্লী আছে। এরা সাউথ স্বাবাব্দ গিউনি-সিপ্যালিটি-মধ্যেই বাস করে; কিন্তু এদের পল্লী অবস্থা সব-চেয়ে শোচনীয়, এ কথা বললে অত্যাশ্চর্য হয় না। গ্রামের কয়েকজন মিলে বহরখানেক হ’ল একটি পাঠশালা খুলেছে—তারই একজন মৌলভী প্রায়ই আমার কাছে যাতায়াত করেন। একদিন তাঁর সম্মুখে জলপান করে পিপাসা মিটিয়েছিলাম এই অপরাধে তিন দিনের মধ্যে খিচাকর বিদায় নিলে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, গায়েব শাস্তিক হিন্দুরা চোখ বাড়িয়ে খিচাকরদের জাত বক্ষা করেছেন!

তারপর পল্লীসংস্কারে যত্ন করবার উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রামের মোড়লদেব সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়ে যে উপদেশ লাভ করলাম তাতে বোঝা গেল পল্লীসমাজের ঐক্য-সূত্রগুলি ছিন্ন হয়ে গেছে। কি-ভাবে কাজে হাত দিলে পল্লীসমাজটাকে পুনরায় গড়ে তোলা যাবে এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। একদিন হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভার প্রধান ভক্ত আমাকে ডেকে বললেন, “যা-ই করুন, মশায়, ব্রাহ্মণধর্ম বজায় রেখে করবেন। এ গ্রাম হচ্ছে ব্রাহ্মণ-প্রধান; এখানে অনাচার চলবে না।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম “ব্রাহ্মণধর্ম মানে কি?” তারপর এই নিয়ে অনেকক্ষণ তর্ক চলল। কিছুদিন পরে ছেলেদের মধ্যে সুনাম, আমরা যে এখানে হুঃস্থ দরিদ্র আড়রকে ঐশ্বর্যপথ্য দিচ্ছি, গ্রামের স্বাধ্যোমতির চেষ্টা করছি, পাঠশালা ও নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করছি, চব্বা তাঁত চালিয়ে কুটীৰজাত শিল্পের প্রচলন করছি, এ-সব কাজের মতলব হচ্ছে ব্রাহ্মণধর্ম প্রচার করা, এম মধ্যে স্বদেশপ্রীতি বা হিতৈষণা সেশমীত নেই।

খোঁজ নিয়ে দেখলাম, এ-যাবৎ এই পল্লীতে যে দুই-একটা সভা-সমিতি গঠিত হয়েছে, মুসলমান ও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীদের তার মধ্যে আস্থান করা হয়নি। এদের হিসাবের বাইরে রেখে কেমন করে স্বরাজ-সাধনা সিদ্ধিলাভ করবে এ আমি ভেবেই পাইনে। বারম্বার এই 'পল্লীয় কর্ম-চেষ্টার' মধ্যে দেখা গেছে যে এদের দূরে রেখে কাজ করবার চেষ্টা সফল হয়নি, হতেও পারে না।

বাংলাদেশে হিন্দুসংখ্যা ১৯১১ সালের গণনায় পাওয়া যায়, দুই কোটি নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তিনশত ঊনআশী। তার মধ্যে বাঙ্গালী দশ লক্ষ, বাউরী ছয় লক্ষ, গোয়ালী ঊনচল্লিশ লক্ষ, নমঃশূত্র উনিশ লক্ষ, রাজবংশী উনিশ লক্ষ, কোচ সওয়া লক্ষ, জেলে কৈবর্ত তিন লক্ষ, মালো আড়াই লক্ষ, তিয়র দুই লক্ষ, মুচি সাড়ে চার লক্ষ, ধোপা ছয় লক্ষ, কাপালী দেড় লক্ষ, সূত্রধর দেড় লক্ষ, হুনার আট লক্ষ। অর্থাৎ এক কোটি তেইশ লক্ষের উপর জনসংখ্যাকে আমরা হিসাবের বাইরে রাখতে চাই! কিন্তু কিছুতেই এদের বাদ দিয়ে পল্লীসমাজের পুনর্গঠন সম্ভব হবে না।

যে কারণে আমাদের কাজ এত জটিল ও দুঃসাধ্য বলে' ঠেকছে তার গোড়াটাও হচ্ছে এই। শিক্ষায় দীক্ষায় ও জীবিকা-সংস্থানের ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য এত বেশী, যে, কোনো-একটা ক্ষেত্র পাওয়া যাচ্ছে না যেখানে এদের নিয়ে বর্তমানকালের উপযোগী একটি কেন্দ্র গড়ে তোলা যায়। গ্রামে ঘরে ঘরে নবায়নের আয়োজন হয়; আমি প্রস্তাব করেছিলাম, কোনো স্থানে সবাই মিলে নবায়নসব করা হোক। অতি দৃষ্টে কয়েকজনকে একত্র করা গেল, কিন্তু যাদের চিরকাল দূরে ঠেকিয়ে রাখা গেছে, তারা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে সাহস পেলো না। সমবায় প্রণালী অল্পবায়ী টাকা কর্ত্ত দেবার ব্যবস্থা করতে গিয়ে দেখলাম, আমাদের উপর এদের ভরসা নেই। অর্থাৎ পল্লীর মধ্যে যে ঐক্যবৃত্ত (Homogeneity) থুঁতু ছিলাম, দেখা গেল, "ভঙ্গলোকের" দৌরাণ্ডো তা মেলা ভার। অতএব এখন দেখা দরকার, একটা একটা শ্রেণী, যারা একই ধরণের কাজ করে, যাদের

আচাব-অহুটান একরকম, তাদের নিয়ে ছোট ছোট স্থাপন করা যায় কি না। এই ভাবে group (এক-একটা দল) নিয়ে কাজ শুরু না করলে একটা পাওয়া যাবে না। এই গ্রামের মুচি-পাড়ায় ত্রিশঘর দুই একসঙ্গে থাকে - কোনো ব্যবস্থা দ্বারা তাদের চান্দা ব্যবসার উন্নতি করতে পারলে এদের মধ্যে একতাকাজ করবাব ভিত্তি অনায়াসেই পাওয়া যাবে। স্বাধীন দিগে প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে এমনি করে 'unity of interests' পাওয়া গেলে তারপর সমষ্টিগত কাজ ক্ষেত্র মিলতে পারে।

অতএব যারা পল্লীসংস্কারের কাজে হাত দিতে ইচ্ছুক তারা সব-প্রথমে যেন প্রত্যেক বিভিন্ন শ্রেণীর আর্থিক অবস্থার উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেন। আর্থিক উন্নতি বলতে এ যেন মনে না করি, যে, দুই-একটা সমবায় ভাণ্ডার স্থাপন করা বা চাষীদের কিছু ভাল বীজ কিনে দেওয়া, তাঁতির কাপড়গুলো সহরের পাইকারের কাছে পাঠাবা ব্যবস্থা করা। আধুনিক ব্যবসাবাণিজ্যের সকল সুযোগ সুবিধাই এরা পাবে এমন চেষ্টা করতে হবে। চাষী ব্যবসার্টা ক্লাইড ষ্ট্রিটের রপ্তানী সওদাগরদের চেয়ে কোই অংশে খাটো নয়,—অতএব বর্তমানকালের যত ব্যবসায়িক সুযোগ সুবিধা সওদাগরের কাছে, কৃষিক্রীবী তা যে কেন বঞ্চিত হবে? তারপর, হয়ত দেখা যাবে, যে-জাতি উপর এরা যতজন জীবিকানির্ভর করতে চেষ্টা করে সে-জমিতে সেই পরিমাণ ফসল ফলে না; এমন ক্ষেত্র এদের জন্য অন্য পথ খুলে দেবার আয়োজন করা দরকার হবে।

যাই হোক, কোন প্রণালী অবলম্বন করে' এই বিবিধ জাতির মধ্যে পল্লীসংস্কারের কাজে হাত দেওয়া সমীচীন বলে' মনে হয়, তাই বলা হল। এই প্রসঙ্গে এ বলতে চাই যে অনাচরণীয় সম্ভাব্যকে কিস্তিতে কিস্তি (by instalments) জাতে তুলে আনবার যে প্রবন্ধীয় প্রাদেশিক বাস্তবতায় গৃহীত হয়েছে, এমন অসম্ভবতার পাপ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারব—নিম্নশ্রেণীর ছোয়া জল গ্রহণ করা থেকে নাকি কিস্তি হবে—কিন্তু কিস্তি খেলাপ হলে কি করা যাবে রা?

চৰুকা—নূতন ও পুরাতন

আজকাল নৃতন প্রণালীর চরুকাতে যত সজ্জা প্রদত্ত হইতেছে সে হাতে বস্তুর কাপড়ের "পড়েন" দেখা ভিন্ন "টানার" স্বভাব কাজ হইতেছে না। পড়েনের হাত ও বখনকালীন অনুবিধায় অন্য তত্ত্ববায়গণ ব্যবহার কবিত্তে নহে যে রাজি নয়। যদিও কেহ রাজি হয়, অধিক বানি বইয়া কাজ করিয়া থাকে, ইহাতে খণ্ডের দাম অধিক পড়িতেছে। এখান লোকের পক্ষে খণ্ড ব্যবহার কষ্টসাধ্য হইতেছে। পুরাতন প্রণালীর চরুকা নামা বাহাণী হুতা প্রস্তুত করিতেছেন, সেই হুতা নত ও সমান ভাবে কাটা হইতেছে; তাহাতে পড়েন ও টানা উভয় হাতই চলিতেছে। কাপড় প্রস্তুতের দামও অধিক দিতে হয় না।

পুরাতন চরুকাই কেন কাজ ভাল হয় তাহা আজকাল করা হইতেছে। চরুকার মধ্যস্থানে যে গোলাকার ভারী একটি কাঠ থাকে তাহা গোলাকার ও দুই দিকে সমান ভাবে থাকায় চরুকা ঘুরাইবার সময় "টাকু" কাপে না এবং চরুকা একবার ঘুরিতে ভারস্রম করিলে সমান ভাবে সমান গতিতে অধিক সময় ঘুরিতে থাকে। লম্বা আশের তুলা ভাল করিয়া কাটা করিয়া আদুনের টিপ সমান ভাবে রাখিলেই নৃত্যাসব মোটা হইতে পারে না। লম্বা আশের তুলা ও এই যে বেশী পাক দিলেও হুতা কাটিয়া যায় না।

উপরেব লিখিত কাৰণে হুতা সমান ভাবে থাকে, নর-মোটা হইতে পারে না।

পুরাতন প্রণালীর চরুকাতে হুতা ভাল চরুকা ব্যবহার কবিলার পূর্বে দেখিবা না টাকু সমান ভাবে খাটান আছে কি না সমান লেবেলে (level) রাখিতে হইবে, তাহা টাকু কাটিবার কোনও সম্ভাবনা থাকিবে না।

পুরাতন প্রণালীর চরুকাব বিজ্ঞাপন দিওঁ নি নৃতন চরুকার আবিষ্কারকদিগকে নিকণ্ডায় ক এইরূপ কেহ মনে করিবেন না। যতদিন পর্যন্ত কার্যেব উপযোগী চরুকা প্রস্তুত কবিত্তে না ততদিন পর্যন্ত পুরাতন প্রণালীর চরুকাই ভাল দিতেছে ও দিবে। যে-সমস্ত বারিশ-করা চরুকার "উপচোকন" ও ড্রিং কমে মাজানো থাকে সে চরুকাব প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া পুরাতন প্রণালী দ্বারা হুতা কাটিলে নিজের পরিভ্রমহাত উৎ ব্যবহারের উপযোগী হইয়া নিজের অভীষ্ট সিদ্ধি যাহাদের এ বিষয়ে কোন-রকম সন্দেহ আছে একবার অল্পগ্রহ-পূর্বক আমাদেব কথাগুলি পরীক্ষা দেখিতে পারেন ইহাই আমাদেব নিবেদন। আমাদেব প্রবাসী ৪৪২ পৃষ্ঠা দেখুন।)

ললিতকুমার সি

ভ্রম সংশোধন

এই মানের প্রবাসীর প্রথম ফ্যার 'পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৮৮—৮৮৬৬ আয়গার ৭৮০—৮৬ হইবে। প্রবণের প্রবাসীর প্রথম "ভুলনা" নামক পুস্তিকার সমালোচনায় লেখকের নাম "শরচ্চন্দ্র মিত্র" হইবে, প্রম-ভ্রমে "শরচ্চন্দ্র" হইয়াছে।